প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

চতুর্দ্দশ ভাগ—প্রথম খণ্ড

১৩২১ সাল, বৈশাখ—আশ্বিন

প্রবাসী কার্য্যালয়

২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা ছয় আনা

বিষয়ানুক্রমণিকা।

সূচীপত্র

লেখক ও তাঁহাদের রচনা।

চিত্রানুক্রমণিকা।

পৌষ পার্ব্বণ।

(শ্রী নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে)

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

১৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩২১

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

দেশভক্তি। যিনি যে স্থানটিকে পবিত্র মনে করেন, বা যেখানে ভগবানের পূজা করেন, সেই স্থানটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত রাখিতে চেষ্টা করেন। হিন্দুর দেবমন্দির ও তপোবন, বৌদ্ধের চৈত্য ও বিহার, খৃষ্টিয়ানের গির্জ্জা ও সমাধিস্থান, মুসলমানের মসজিদ ও কবর, প্রভৃতি স্থান পরিষ্কার রাখা হয়। অধিকন্তু জগতের সুন্দরতম নিকেতন-সমূহের মধ্যে অনেকগুলি এই জাতীয়।

আমরা আপনাদিগকে দেশভক্ত বলিয়া মনে করি। কিন্তু বঙ্গের খানা, ডোবা, রাস্তা ঘাট, পচা পুকুর, পূতিগন্ধময় নর্দ্দমা, আগাছা ও জঙ্গলপূর্ণ পতিত ভূমি দেখিলে কি মনে হয় যে আমরা দেশকে পবিত্র স্থান মনে করি? অরণ্যের গম্ভীরতা ও সৌন্দর্য্য বিধান করিবার জন্য মানুষকে কোন চেষ্টা করিতে হয় না। পর্ব্বতের ভীমকান্ত শোভা মানুষের চেষ্টার কোনও অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মানুষের বাস ও মানুষের হাত যেখানে আছে, সেখানকার চেহারা দেখিলেই বুঝা যায় যে, মানুষ নিজের জীবনকে ভগবানের লীলাক্ষেত্র মনে করিতেছে কি না।

দেশকে আমরা যে ভক্তি করি, পবিত্র মনে করি, তাহা এই জন্য যে, উহার ভিতর দিয়া ভগবানের স্নেহ-দয়া আমাদিগকে পুষ্ট করে; উহার প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে তিনি বিরাজিত। তবে উহাকে এমন হতশ্রী করিয়া কেন রাখি?

ফুলবাগানটির মতন সুন্দর সাজান পল্লী, নগর, দেশ যে পৃথিবীতে নাই, তাহা ত নয়।

দারিদ্র্য অনেক লোককে অপরিষ্কার অশুচি থাকিতে এবং নিজগৃহ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহকে ঐরূপ অবস্থায় রাখিতে বাধ্য করে, দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। কিন্তু অনেকের সচ্ছল অবস্থা সত্ত্বেও ঐরূপ দশা দেখা যায়, আবার অনেক দরিদ্র ব্যক্তিও অপরিচ্ছন্নতা ও অশুচিতা সহ্য করিতে পারে না। ইহা কিন্তু সত্য যে, দরিদ্র অপেক্ষা ধনীর পক্ষে নিজ দেহের ও বাসভূমির পরিচ্ছন্নতা সাধন সহজসাধ্য।

আমরা গরীব কেন? ভারতবর্ষ বিদেশীর অতুল ঐশ্বর্য্যের কারণ, অথচ ভারতবাসী গরীব। ইহা কাহার দোষ?

আমরা দেশকে "জনকজননী-জননী," "দেশমাতা" প্রভৃতি নামে অভিহিত করি; "বন্দেমাতরম্" গান গাই। দেশবাসীকে ভাই বলিয়া রাখীবন্ধন করি, "ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই," প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করি। তাহা হইলে কার্য্যতঃ দেখান কর্ত্তব্য যে যাহারা চিরজীবন অর্দ্ধাশনে কাটায়, যাহারা অর্দ্ধনগ্ন ও চীর-পরিহিত, যাহাদের চালে খড় নাই, যাহাদের কুঁড়েঘরও নাই, যাহারা নিরক্ষর, যাহারা পাইক গোমস্তা পিয়াদা কনষ্টেবল হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতরপদস্থ নানা জনের

উৎপীড়ন সহ্য করে; যাহারা পীড়িত হইলে বিনা চিকিৎসায় বিনা যত্নে মারা পড়ে, যাহারা দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পশুর অধম জীবন যাপন করে, তাহারাও আমাদেরই দেশমাতার সন্তান।

কিন্তু সে ভাই কেমন ভাই যে কেবল আপনার সুখ লইয়াই ব্যস্ত, মাতার অন্য সন্তানদের কোন খবর রাখে না।

সত্যের বিরোধ ও সামঞ্জস্য।

সত্যের স্বরূপবৈচিত্র্য।

কোনও বিষয়ে একটি মন্তব্য প্রকাশ করিলাম, একটি প্রবন্ধ রচনা করিলাম। সত্য নির্ণয় ও সত্য প্রকাশ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। পরে ভাবিয়া দেখি, সত্য বলিয়াছি বটে, কিন্তু আংশিক সত্যমাত্র বলিয়াছি।

সত্যকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিয়া সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য, হয় ত অসাধ্য। মানুষ স্মরণাতীত কাল হইতে সত্যের সন্ধানে ফিরিতেছে; পাইতেছে, আরও পাইতেছে, কিন্তু সমস্তটা পাইতেছে না।

বিশ্ব এক, কিন্তু নানা বিপরীতকে লইয়া এক।

একটি চক্রাকার পথের এক যায়গা হইতে যদি এক-জন পূর্ব্ব মুখে চলিতে আরম্ভ করে, এবং আর একজন তাহার ঠিক্ বিপরীত স্থান হইতে পশ্চিম মুখে চলে, তাহা হইলে মনে হইবে বটে যে, তাহারা পরস্পর উল্টা দিকে যাইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহারা এক দিকেই যাইতেছে। কারণ, প্রথম ব্যক্তি যে-স্থান হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই স্থানে পৌঁছিলে দেখা যাইবে যে, সেখানে প্রথম ব্যক্তির মুখ যে-দিকে ছিল, দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখ সেই দিকেই রহিয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে জাপান দিয়া আমেরিকা যাওয়া যায়; আবার পশ্চিমাভিমুখে ইংলণ্ড হইয়াও আমেরিকা যাওয়া যায়।

বিপরীতের একত্র সমাবেশে ও সামঞ্জস্যে জগৎ চলি-তেছে। বিশ্বে আগুনও আছে, জলও আছে। জল আগুন নিবাইয়া দেয়, আগুন জলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া উড়াইয়া দেয়। অথচ এই জল ও আগুনের সহযোগে রেলগাড়ী, ষ্টীমার ও নানা কল কারখানা চলিতেছে।

শুধু তাপেও বিশ্ব চলে না, শুধু শৈত্যেও চলে না; আবার খুব কম তাপেরই নাম শৈত্য। কেবলমাত্র তাপের বা শৈত্যের বিরুদ্ধে বা অনুকূলে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলে তাহা সত্য হইবে না।

বিশ্বে জন্মও আছে, মৃত্যুও আছে। বীজ মরিয়া গাছ হয়। তবে কি মৃত্যু জন্ম ও জীবনের কারণ? না মৃত্যু জন্মজীবনের রূপান্তর মাত্র? বীজের যে দশা আমাদেরও কি তাই? আমাদের এই পৃথিবীতে মনুষ্য-রূপে মৃত্যু অপর কোনও স্থানে অন্য কোনও জীবের আকারে জন্মের পূর্ব্বাবস্থা, নামান্তর বা রূপান্তর হইতে পারে না কি? তাহা হইলে অমুক মরিয়াছে বলিলে সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না; সঙ্গে সঙ্গে বলিতে হয়, অমুক জন্মিয়াছে। কিন্তু কোথায় কি আকারে, কে জানে?

বিশ্বে আলো ও আঁধার আছে। আলোর পরিমাণ যত কম হয়, আঁধার তত নিবিড় হয়। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন নিরেট আঁধার বলিয়া কিছু আছে কি? বাস্তবিক আঁধার আলোর শৈশবমাত্র। তাহা হইলে আলো-আঁধারের বৈপরীত্য কি সত্য?

জগতে স্থাবর জঙ্গম দুই আছে, গতি ও নিশ্চেষ্টতা আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ স্থির ও স্থাবর কিছু আছে কি? গতি ভিন্ন স্থিতির জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান হয়। আলোক, শব্দ প্রভৃতি, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। কিন্তু আলোক, শব্দ, প্রভৃতি এক এক প্রকারের তরঙ্গ; আর তরঙ্গও এক রকমের গতি। কে চলিতেছে, কে দাঁড়াইয়া আছে, কে কর্ম্মিষ্ঠ, কে নিষ্ক্রিয়, বলা কঠিন। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সাক্ষ্য অনুসারে পৃথিবীর মত নিশ্চল ত কেহ নাই; কিন্তু জ্যোতিষী বলিতেছেন, যে, পৃথিবী অতি ভীষণ বেগে সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছেন। আমরা কোন একটা ঘটনার সত্যতার চূড়ান্ত প্রমাণ এই দি যে, উহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য কি সব

সময়ে প্রামাণিক ? অথচ ইন্দ্রিয়কে অবিশ্বাস করিলেই বা চলে কেমন করিয়া ? সত্য নির্ণয় বড়ই কঠিন।

একটি আম পাড়িয়া হাঁড়ির ভিতর রাখিয়া দিলাম। আমি তাহার সম্বন্ধে তার পর আর কিছু করিলাম না. সেও নড়িল, চড়িল না ; কিন্তু ক্রমশঃ পাকিল, পচিয়া গেল। সুতরাং উহা স্থির নিশ্চল ছিল বটে, কিন্তু উহার ভিতরে ক্রিয়া চলিতেছিল।

চেতনের রাজ্যে কে অলস কে কর্ম্মিষ্ঠ, সহজে বলা যায় না। যে বুদ্ধদেব বৎসরের পর বৎসর বৃক্ষতলে নিশ্চলভাবে বসিয়া ছিলেন, তিনি কি অলস ছিলেন ? তাঁহার ভিতরে যে শক্তি কাজ করিতেছিল, তাহা এমন ধর্ম্মচক্র ঘুরাইয়াছে যে, তাহার প্রভাবে ছোট বড় হইয়াছে, বড় ছোট হইয়াছে, সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে, কত জাতি সুসভ্য হইয়াছে, এখনও কত কোটি লোক জীবনে পথ দেখিতে পাইতেছে, বল, সাহস, সান্ত্বনা ও শান্তি পাইতেছে। এই অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষকে নিষ্কর্ম্মা বলা চলে না।

যে বাষ্পীয় কল (ষ্টীম্ এঞ্জিন) পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাহাও একদিন নিশ্চল ভাবে চিন্তামগ্ন এক স্কচ্ কারিগরের চিন্তামাত্র ছিল।

চঞ্চলতা বা গতিশীলতাই কর্ম্মিষ্ঠতা নয়, নিশ্চলতাও নিষ্ক্রিয়তা নহে।

শক্তি সঞ্চয়, শক্তিপ্রয়োগের উপায় নির্দ্ধারণ, নিশ্চলতা নীরবতা নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘটে।

চৈতন্য নিদ্রা সংজ্ঞাহীনতা সব অবস্থাই আমরা প্রত্যক্ষ করি। পূর্ণ সতর্ক সজাগ অবস্থা ও অন্যমনস্কতা, পাতলা ঘুম ও গাঢ়নিদ্রা, গাঢ়নিদ্রা এবং সংজ্ঞাহীনতা, এ সকলের মধ্যে প্রভেদ কি ? নিদ্রার সময়ে আমাদের চৈতন্য কি লুপ্ত হয়, না কোন অজ্ঞাত ভাবে থাকে ? স্বপ্ন কি রকমের চৈতন্য ? স্বপ্নে কেহ কেহ যে শক্ত অঙ্ক কষিয়া ফেলে, উহা কিরূপ চৈতন্যের ক্রিয়া ? মৃত্যুকে আমরা যে চিরনিদ্রা বলি, ওটা কি একটা অলঙ্কারমাত্র, না বাস্তবিকই ইহলোকের চিরনিদ্রা লোকান্তরের জাগরণে পরিণত হয় ? তাহা হইলে মৃত্যুও কেবল চিরনিদ্রা নয়, জাগরণেরই নামান্তর।

বাস্তবিক জগতে একান্তভাবে কাহাকে ধরিব, একান্ত ভাবে কাহাকে ছাড়িব, বুঝিতে পারি না। ধ্যানের নিস্তব্ধতার মধ্যে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় ; কিন্তু প্রমত্ত কীর্ত্তনের মধ্যেও ভক্তির ধারা অবতীর্ণ হয় না কি ? প্রেমের মহিমা অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু যাহা অমঙ্গল অশুচি, তাহার সম্বন্ধে প্রতিকূল ভাব পোষণ না করিলে শ্রেয়ের প্রতি প্রেম পুষ্ট হয় কি ? প্রেমের কাজ আছে। হিংসাদ্বেষের কি কোন কাজ নাই ? আলোকের অভাব বা ন্যূনতা যেমন আঁধার, প্রেমের অভাব বা ন্যূনতা তেমনই দ্বেষ, তাহা ত বলা যায় না ; তাহাকে বরং ঔদাসীন্য বলা যায়। দ্বেষের সত্তা প্রেমেরই মত প্রবল ভাবে অনুভূত হয়। প্রেম দ্বারা অপ্রেমকে পরাজিত কর, এই সদুপদেশ বুদ্ধদেব ও তাঁহার পরে আরও অনেকে দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা অপ্রেমকে পরাজিত করিতেই বলিয়াছেন ; অপ্রেমকে প্রেম করিতে, ভাল বাসিতে বলেন নাই। বিশ্বের বিধানেও দেখিতেছি, তাহার মধ্যে অমঙ্গলের প্রতি হিংসা অর্থাৎ তাহাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা, এবং তদুপযোগী বন্দোবস্ত রহিয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, বিশ্বে মঙ্গল অমঙ্গল দুই কেন আছে, অমঙ্গল কি, কে তাহার সৃষ্টি করিল, দেশকালপাত্রভেদে মঙ্গল অমঙ্গলের এবং অমঙ্গল মঙ্গলের স্বরূপ প্রাপ্ত হয় কেন ? এ-সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য আছে, তাহাও দুই এক কথায় সারিয়া দেওয়া যায় না। যে-সকল সহজ বিষয় আপাততঃ বিপরীতধর্ম্মী মনে হয়, সেইরূপ আরও কয়েকটি বিষয়েরই আলোচনা করি।

কথা ও কাজ।

"এখন আর কথা কহিবার সময় নয়, কাজের সময় আসিয়াছে ;" "বাঙ্গালী কেবল বকে, কাজ করে না ;" "বক্তৃতা টক্তৃতা রাখিয়া দাও, কাজ কর ;" এইরূপ অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কথাগুলি ভাল ; কিন্তু ওগুলির মধ্যে সত্য আংশিক ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। একটুও কথা না বলিয়া কোনও বড় কাজ করা যায় কি ? কথা না বলিয়া কাজে প্রেরণা জন্মাইবে

কেমন করিয়া? উদ্দীপনা কোথা হইতে আসিবে? কাজ যে কেন করা দরকার, তাহাও ত বুঝাইয়া দেওয়া চাই। কেমন করিয়া কাজ করিতে হইবে, তাহা বাক্যের দ্বারা জানান আবশ্যক। কাজ করিবার আদেশ বাক্যের দ্বারা দিতে হয়। যুদ্ধ যে একটা এত বড় কাজ, তাহাও বিনা বাক্যব্যয়ে হয় না। যাহারা খুব কর্ম্মিষ্ঠ জাতি, তাহারা বাঙ্গালীর চেয়ে সোরগোল বেশী বই কম করে না। কিন্তু ইহা সত্য কথা যে, কেবল বকা ভাল নয়, ফাঁকা আওয়াজ ভাল নয়, কাজের চেয়ে বক্তৃতা বেশী হওয়া উচিত নয়। কথাও চাই, কাজও চাই। কোন্‌টির পরিমাণ বা অনুপাত কিরূপ হইবে, তাহা কেহ বলিয়া দিতে পারে না।

কথাও খুব বড় কাজ, যদি তাহার ভিতর প্রাণ থাকে। জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা মানুষ ও পশুর চিকিৎসালয়, অন্ধ আতুরদের সেবাশ্রম, অনাথালয়, বিদ্যালয়, পতিতা নারীদের জন্য উদ্ধারাশ্রম, এ সব স্থাপন করিয়া যান নাই; তাঁহারা কেবল কথা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কাজের চেয়ে সে সব কথার মূল্য, সে সব কথার শক্তি, সে সব কথার ফল কম নয়।

ভক্তি ও সৎকর্ম্ম।

যেমন কথা ও কাজের একটা অনাবশ্যক বিরোধ ঘটান হয়, তেমনি ভক্তি ও সৎ কর্ম্মের মধ্যেও যেন কোন ঝগড়া আছে এইরূপ কথা মাঝে মাঝে শুনা যায়। যাহারা খুব ভাববিলাসী, তাহারা কাজের লোক না হইতে পারে। কিন্তু ভাববিলাসিতা যে ভক্তি তাহা কে বলিল? কথায় কথায় চোখে জল আসে এমন লোকেরও প্রকৃত ভক্তি না থাকিতে পারে; আবার যাহার চোখে সহজে জল আসে না এমন প্রকৃত ভক্তও অনেক আছেন। সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সৎকাজ করিবার শক্তি প্রকৃত ভক্তি হইতে পাওয়া যায়। কোন্ কাজ যে কাজের মত কাজ, ভগবানের সহিত যুক্ত না হইয়া তাহা স্থির করা কঠিন। যশের জন্য বা অন্য কোন প্রকার লাভের জন্যও অনেক সময় সৎকাজ করা হয়। তাহা সাত্ত্বিক কর্ম্ম নহে। প্রকৃত ভক্ত যিনি তিনি সাত্ত্বিক ভাবে কাজ করিতে পারেন। পূজা অর্চনা ধ্যান ধারণায় বেশী সময় দিলে সৎকর্ম্মের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় কি না, তাহা বিচার্য্য বটে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সময় ভাগ করিয়া দেওয়া কাহারও সাধ্য নয়। নিজ নিজ প্রকৃতি ও শক্তি অনুসারে প্রত্যেকে সময় ভাগ করিয়া লইবেন। "মধ্যপথ অবলম্বন কর" বলা সহজ, কিন্তু এই মধ্যপথের রেখা নির্দ্দেশ কে করিবে?

উপদেষ্টা ও উপদিষ্ট।

অনেকে মনে করেন, উৎকৃষ্ট উপদেশ, উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, প্রভৃতি, ঘরে বসিয়া লোককে আকর্ষণ করিবে। তাহাকে লোকের দ্বারে লইয়া গিয়া উপস্থিত করিবার আবশ্যক কি? ধর্ম্মপিপাসু যে, জ্ঞানার্থী যে, সে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াও সদ্‌গুরুর কাছে যায় সত্য। কিন্তু ধর্ম্ম-পিপাসা এবং জ্ঞানলিপ্সা জন্মাইয়া দেওয়াও কি উপদেষ্টার কর্ত্তব্য নহে? অনেক ছেলেমেয়ে আপনা হইতে পড়িতে চায় না। তথাপি বাপ মা তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। শিক্ষাকে ইচ্ছাধীন রাখিয়া, আইনের দ্বারা উহাকে অবশ্যকর্ত্তব্য না করিয়া, কোনও দেশের নিরক্ষরতা এ পর্য্যন্ত দূর হয় নাই। সুতরাং, কেহ উপদেষ্টার নিকট আসিলে তবে তিনি উপদেশ দিবেন, এইরূপ ব্যবস্থায় আংশিক ফললাভেরই সম্ভাবনা। হিন্দীতে একটি এই মর্ম্মের দোহা আছে যে, দুধকে গলি গলি ফেরী করিতে হয়, আর মদের বিক্রী দোকানে বসিয়াই হয়। মানুষের প্রবৃত্তির অনুকূল যাহা, মানুষ তাহার পানে, অগ্নিশিখার প্রতি পতঙ্গের মত, ধাবিত হয়। শ্রেয়ের প্রতি তেমন উধাও হইয়া দৌড়ে খুব কম লোকে। কিন্তু যিনি নিজেই উদ্যোগী হইয়া উপদেশ দিতে যান, তাহার বিপদ আছে। তিনি যদি মনে করেন যে, আমি উচ্চ স্থানে পৌঁছিয়াছি, অন্যের উপকার করিতে যাইতেছি, তবেই ত তাঁহার পতন আরম্ভ হইল। কিন্তু কবি যে-ভাবে নিজের আনন্দের ভাগ আর সকলকে দিতে যান, উপদেষ্টা যদি সেই ভাবে ধর্ম্মরসের আস্বাদন সকলকে দিতে ভালবাসেন, তাহা হইলে তাঁহার কোন অমঙ্গল হয় না। পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে যথাতথা ধর্ম্মের কথা বলিবে, এরূপ ব্যবস্থাও কিন্তু দেওয়া যায় না। "বেনা বনে মুক্তা ছড়াইও না"

এই নিষেধ সম্পূর্ণ নিরর্থক নহে। ধর্ম্মপিপাসু ও জ্ঞানার্থী কতদূর অগ্রসর হইয়া যাইবেন, সৎশিক্ষকই বা শিক্ষার্থীর দিকে কতটা অগ্রসর হইবেন, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন।

স্বার্থ ও পরার্থের বিরোধ।

স্বার্থ ও পরার্থের বিরোধের কথা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু নিজের শাশ্বত মঙ্গলও কি এই প্রচলিত অর্থে স্বার্থের অন্তর্গত? তাহা হইলে, যে-ব্যক্তি নিজের মঙ্গল করিল না, নিজে ভাল হইল না, তাহার দ্বারা অপরের উপকার কেমন করিয়া সম্ভবে? আমোদ, অর্থ, যশ, সাংসারিক পদমর্য্যাদা, স্থলবিশেষে ও সময়বিশেষে মানুষ এই সকল স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু নিজের শ্রেয়-রূপ যে স্বার্থ, তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে মনুষ্যত্বলাভ কেমন করিয়া হইবে? এই দিক্ দিয়া দেখিলে স্বার্থে ও পরার্থে কোন বিরোধ নাই।

রূপ ও গুণ।

রূপের চেয়ে যে গুণ বড় তাহা লোককে স্বীকার করান শক্ত নয়। কিন্তু রূপটা যদি নিতান্তই নগণ্য হইত, তাহা হইলে জগতে শোভা ও সৌন্দর্য্যের এত প্রাচুর্য্য কেন হইল? "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি জাতানি," সমুদয় সৃষ্টি আনন্দ হইতেই জন্মিয়াছে, তাই সৃষ্টি সুন্দর। বিধাতা সুন্দর; সৌন্দর্য্য তাঁহারই ঘনীভূত আনন্দ। রূপও দেখিতে জানিতে হয়। স্বাস্থ্য রূপ বাড়ায়, আত্মার সৌন্দর্য্য মুখের মধ্যে ফুটিয়া বাহির হয়। কে সুন্দর কে কুৎসিত সে বিষয়ে মানুষে মানুষে খুব মতভেদ দেখিয়াছি। যে নিজেকে কুৎসিত মনে করে এবং অনেকে যাহাকে রূপহীন মনে করে, সেও যে দেখিতে বেশ, এমন কথা একাধিক ব্যক্তির সম্বন্ধে শুনিয়াছি। রূপটা যদি শুধু শরীরের ও বাহিরের জিনিষ হইত, তাহা হইলে একই মানুষের যৌবনের রূপ প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্যের রূপের অপেক্ষা অধিক হইত। কিন্তু যৌবনাপগমে রূপ বাড়িয়াছে, এমন প্রসিদ্ধ কোন কোন মানুষের নাম করা খুব সহজ। স্থূলদর্শীর কাছে রূপগুণের বিরোধ আছে, সূক্ষ্মদর্শীর চক্ষে বিরোধ নাই। রূপ দেখিতে হইলে দ্রষ্টার সাত্ত্বিকতা চাই। মহাকবি স্পেন্সর যে বলিয়াছেন "soul is form and doth the body make," "আত্মাই রূপ, আত্মা শরীরকে গঠন করে", ইহাতে গভীর সত্য আছে। আমরাই কি দেখি নাই, সুগঠিত মুখ পাপ ও দুষ্প্রবৃত্তির বশে কেমন শ্রীহীন হইয়া যায়, আবার সতত উচ্চচিন্তা ও সাধুজীবনের প্রভাবে সৌষ্ঠববিহীন মুখেও কেমন অশরীরী সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে?

কর্ত্তব্য ও আনন্দের মিলন।

কর্ত্তব্যপরায়ণতা ভাল, আমোদের লালসা ভাল নয়। কিন্তু আমোদ ও আনন্দ এক জিনিষ নহে। আনন্দ ব্যতীত কোন কাজ সুন্দররূপে করা যায় না। যে কেবল নিয়মের অনুরোধে অনুশাসনের আনুগত্যে কর্ত্তব্য করে, সে বেশী দিন কর্ত্তব্যপরায়ণ থাকে না। কর্ত্তব্যের মধ্যে যে রস পাইয়াছে, সেই প্রকৃত রূপে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে।

সত্য, মিথ্যা ও কল্পনা।

সত্যবাদীর সত্য কথা এবং মিথ্যাবাদীর মিথ্যা কথার মধ্যে যে বৈপরীত্য, বাস্তব বিষয় এবং কবিকল্পনার মধ্যে সেরূপ বৈপরীত্য নাই। কারণ কবিকল্পনার মানসী সত্তা আছে। বাস্তব পদার্থ ও বিষয় যেমন ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, কবিকল্পিত বস্তুও তেমনি ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে। কবি নিরঙ্কুশ বলিয়া তাঁহার কল্পিত বস্তু কখন কখন বাস্তব অপেক্ষা সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। অনেকে কবিকল্পিত নাটক উপন্যাসাদি মাত্রেরই পাঠের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু যদি প্রমাণ হইয়া যায় যে রাম বা ভীষ্ম বা যুধিষ্ঠির বলিয়া কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না, তাহা হইলে বাল্মীকি ও ব্যাসের মানসী সৃষ্টিগুলি কি তৎক্ষণাৎ মূল্যহীন হইয়া পড়িবে? ভগবান কবিকে নিজের সহকারী করিয়াছেন। সেই জন্য কবিকল্পনাপ্রকল্পিত বস্তুকে মানস অস্তিত্ব দিতে পারে। মিথ্যাবাদীর মিথ্যা কথার মত কবিকল্পনা অলীক নহে।

জড়শক্তি ও আত্মিক শক্তি।

দৈহিক বা জড়ীয় শক্তিতেই কাজ হয়, বুদ্ধিবল, চরিত্রবল, আত্মিক শক্তিতে কিছু হয় না; কিম্বা বুদ্ধিবল, চরিত্রবল, আত্মিক শক্তিতেই সব হয়, দৈহিক বা জড়ীয় শক্তিতে কিছু হয় না;—ইহার মধ্যে কোনটিই সম্পূর্ণ

সত্য প্রকাশ করে না। জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ দৈহিক শক্তিতে ভীম ছিলেন না, কিন্তু যদি তাঁহারা ক্ষীণজীবী, চিররুগ্ন হইতেন, তাহা হইলে সত্যপ্রচার তাঁহাদের দ্বারা হইতে না। বড় বড় গ্রন্থকার, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। বাষ্পীয় কলের সৃষ্টির আগে মানুষকে নিজের হাতে যত কাজ করিয়া নানা শিল্পদ্রব্য গড়িতে হইত, এখন ততটা হয় না। কিন্তু এখনও কলকারখানার অল্পবুদ্ধি অশিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান্ শিক্ষিত কর্ম্মীদের মধ্যে যেমন প্রভেদ আছে, দুর্ব্বল ও বলিষ্ঠ কর্ম্মীদের মধ্যেও তদ্রূপ প্রভেদ আছে। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের মজুরেরা যে লাঙ্কেশায়রের কাপড়ের কলের মজুরদের চেয়ে কম কাজ করিতে পারে, তাহা কেবল জলবায়ুর প্রভেদ বা শিক্ষার তারতম্যের জন্য নহে, শারীরিক বলের প্রভেদও তাহার একটা কারণ। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও দৈহিক এবং আত্মিক উভয় শক্তিরই প্রয়োজন লক্ষিত হয়। শারীরিক শক্তিতে পাঠানরা ইংরেজদের চেয়ে, আরবেরা ইটালীয়দের চেয়ে বা তুর্কিরা গ্রীকদের চেয়ে হীন নয়। কিন্তু তাহারা যুদ্ধে হারিয়াছে এইজন্য যে বুদ্ধি, শিক্ষা, কাজের শৃঙ্খলা, আয়োজন, আধ্যাত্মিক শক্তি এবং শারীরিক শক্তি সব একত্র করিলে তাহারা হীন। তীতুমীরের লড়াইয়ে কোন ফল হয় নাই, ক্রমওয়েলের লড়াইয়ে ফল হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয়-অধিকার-প্রার্থিনী সফ্রেজেট্‌দিগের উপদ্রবে ও ধমকে এখনও কোন ফল হয় নাই, কিন্তু আয়র্লণ্ডের স্বায়ত্তশাসনবিরোধী সর্ এড্‌ওয়ার্ড কার্সন এবং তাঁহার দলের ধমকে কাজ হইয়াছে।

বহু-অধ্যয়ন ও স্বাধীন চিন্তা।

বেশী পড়িয়া পড়িয়া জ্ঞানে মাথা বোঝাই করা ভাল, না নিজের স্বতন্ত্র চেষ্টা ও চিন্তা দ্বারা নূতন সত্য আহরণ করা ভাল? ইহার "হাঁ, কি, না" গোছ কোন উত্তর দিতে গেলে তাহা সম্পূর্ণ সত্য হইবে না। অতিরিক্ত অধ্যয়নে উদ্ভাবনীশক্তি, চিন্তাশক্তি চাপা পড়িয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু কাহার পক্ষে কতটুকু অধ্যয়ন যে অতিরিক্ত তাহা এক কথায় বলা যায় না। ইহাও মানুষের মানসী শক্তির উপর নির্ভর করে। মিল্টনের অধ্যয়ন বহুবিস্তৃত ছিল, তিনি মহা পণ্ডিত ছিলেন; অথচ তাঁহার প্রতিভা অধীত বিষয়কে আত্মসাৎ করিয়া তাহার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছিল। যেমন দুর্ব্বল ব্যক্তি কতকগুলা খাইয়া উদরাময় ঘটায়, সবল ব্যক্তি তত আহার করিলে তাহার বলবৃদ্ধিই হয়; তেমনই অল্প আত্মিকশক্তিবিশিষ্ট লোকে অনেক পড়িয়া কেবল বড় বড় পণ্ডিতদের বাক্য ঠিক্ অবিকৃত ভাবে উদ্গিরণ করে, কিন্তু প্রতিভাশালী লোকে তত পড়িলে অধীত বিষয়গুলি তাহাদের আত্মার পুষ্টিসাধন করিয়া নব নব সত্যের আকারে প্রকাশ পায়। শূন্য লইয়া চিন্তা চলে না; চিন্তা করিবার উপকরণও ত কিছু চাই। সুতরাং যেমন নিজের পর্য্যবেক্ষণ চাই, তেমনি পড়াও চাই। বুঝিয়া পড়া চাই। কিন্তু পড়ার ভারে ও চাপে মস্তিষ্কটাকে হায়রান করিয়া ফেলিলে চলিবে না। অধ্যয়নের সহজবোধ্য আরও একটা আবশ্যকতা এই যে একজন মানুষের আয়ুষ্কালে সে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় কতটুকু জ্ঞানই বা আহরণ করিতে পারে? কতযুগ ধরিয়া কত দেশে মানুষ কত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে, অধ্যয়ন দ্বারা উত্তরাধিকার সূত্রে সেগুলি দখল করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বাধ্যতা ও স্বাধীনচিত্ততা।

অবাধ্যতা ভাল নয়, বাধ্যতা ভাল; আজ্ঞানুবর্ত্তীদিগকে (তাহারা বয়সে বালক, যুবক বা প্রৌঢ়ই হউক) শাসনে রাখা উচিত, প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, এইরূপ নীতিবাক্য শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ছেলে হউক বুড়ো হউক, মানুষকে যদি সকল সময়ে ও সকল বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, বিশেষ কোন আদেশ পালন করিতে হয়, তাহা হইলে সে নিজে ভাবিয়া চিন্তিয়া কর্ত্তব্যপথ স্থির করিয়া নিজে দায় ঝুঁকি লইয়া কাজ করিতে শিখিবে কখন? বিদেশীরা আমাদের চরিত্রে একটা প্রধান খুঁৎ এই ধরে যে আমরা বেশ ভাল অনুচর, কিন্তু নেতৃত্বের যোগ্যতা আমাদের নাই। অর্থাৎ নিজে পথ আবিষ্কার ও উপায় নির্দ্ধারণের ক্ষমতা আমাদের নাই; আপনার পথে আপনি চলিবার এবং অপরকে চালাইবার সাহস ও শক্তি আমাদের নাই; নেতৃত্বের দায় ঝুঁকি লইবার মত নির্ভীকতা ও মনের বল

আমাদের নাই। ইহা যে কতকটা সত্য তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু ইহার জন্য কি আমরাই দোষী? আমাদের পারিবারিক প্রথা, আমাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত, আমাদের সামাজিক রীতিনীতি, আমাদের দেশের শাসনপ্রণালী যদি আমাদিগকে শৈশব হইতে কেবল নিয়মানুগত্য, আদেশ-পালন, গতানুগতিকত্ব, আইন মানা, ইহাই শিখায়, নিজের স্বাতন্ত্র্য বিকাশের এবং নেতৃজনোচিত যোগ্যতা অর্জ্জন ও বর্দ্ধনের কোন সুযোগ না দেয়, তাহা হইলে আমরা এক এক জন (readymade) তৈরী নেতা হইয়া আকাশ হইতে পড়িব, এমন আশা করা বাতুলতা মাত্র। "তবে কি তুমি চাও যে মানুষ শৈশবে মা বাপ গুরুজনকে মানিবে না, বাল্যে ও যৌবনে শিক্ষক অধ্যাপকের কথা শুনিবে না, সামাজিক সব বিধিব্যবস্থা উল্টাইয়া দিবে, আইনকানুন কিছুই মানিবে না?" না। আমি বলি, বিধিব্যবস্থার, আদেশের, হুকুমের এবং নিয়মের সংখ্যা ও প্রয়োগক্ষেত্র কমাও, আইনের সংখ্যা ও মানবজীবনের উপর প্রভুত্ব কমাও। বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত মানুষকে অনুভব করিতে দাও, যে, বিধিনিষেধের, হুকুম-নিয়মের এবং আইনকানুনের বাহিরে তাহার স্বাধীন চিন্তা ও আচরণের জন্য বৃহৎ সীমাহীন ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সেখানে সে নিজে প্রভু, তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি ও ইচ্ছাই নিয়ম। তাহা হইলে বলিষ্ঠ, দৃঢ়, সাহসী, নেতৃত্বের যোগ্য মানুষ পাওয়া যাইবে। মনুষ্যত্ব বাড়াইবার অন্য উপায় নাই। এই উপায়ে, অনেকে বিপথে যাইবে, এরূপ আশঙ্কা আছে; কিন্তু তথাপি ইহাই উপায়; দ্বিতীয় উপায় কোন দেশে কখনো ছিল না, এখনও নাই। ভুল না করিলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। খুঁটি-নাটি প্রত্যেক বিষয়ে পরের গড়া-বিধিব্যবস্থার আনুগত্য "গো-বেচারী" বা "ভালমানুষ" গড়িবার পক্ষে ভাল; কিন্তু মনুষ্যের গণনায় আসে, এমন মানুষ ওরূপ উপায়ে তৈরী হয় না।

বিদেশীরা আমাদের বিরুদ্ধে আরও একটা কথা বলেন যে আমরা নূতন চিন্তা, নূতন আবিষ্কার করিতে পারি না। ইহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। কিন্তু ইহারও কারণ উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে। সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষাপ্রণালী, সকল বিষয়েই আমাদের জন্য "দাগা বুলাইবার" ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সম্প্রতি শিক্ষাপ্রণালীতে ছাত্রাবস্থার শেষের দিকে দাগা-বুলান ছাড়িয়া কিছু গবেষণার সুযোগ দিবামাত্রই সুফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এরূপ যে এখানে "এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।" এরণ্ডকে অতিক্রম করিয়া আমাদের শালগাছ হইবার যো বেশী আছে কি? শুনিয়াছি অশ্বিনীকুমার দত্তের নির্ব্বাসনের অন্যতম কারণ এই ছিল যে বরিশালে তাঁহার প্রভাব ম্যাজিষ্ট্রেটের চেয়ে বেশী হইয়াছিল।

স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম।

পাশ্চাত্যদেশে স্বদেশের স্বার্থ অন্বেষণের নাম পেট্রিয়টিজম্। ইহার সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের বিরোধ আছে। কারণ, দেখা যাইতেছে যে, মানুষ ইহার প্রেরণায় অন্যদেশের অনিষ্ট করিয়া, অন্যদেশকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, অন্যদেশ লুণ্ঠন করিয়া, অন্য দেশকে ঠকাইয়া, স্বদেশের ধন ও ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু দেশভক্তির সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের এইরূপ বিরোধ যে থাকিবেই, তাহা নয়। "আমরা অন্য দেশকে বা অন্য জাতিকে আমাদের দেশের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে দিব না, আমাদের দেশ ও জাতিও অন্যের কোন অনিষ্ট করিবে না; আমরা এইভাবে আমাদের দেশের মঙ্গল-চেষ্টা করিব;" এবম্বিধ স্বদেশহিতৈষণা বিশ্বপ্রেমের অবিরোধী। ইহা বিশ্বহিতৈষণার অনুকূলও এই পর্য্যন্ত, যে, আমাদের দেশও ত বিশ্বের অন্তর্গত; তাহার হিতচিন্তা সুতরাং আংশিকভাবে বিশ্বহিতেচ্ছা। কিন্তু ইহাও অবশ্যস্বীকার্য্য যে ইহা বিশ্বপ্রেম অপেক্ষা সংকীর্ণ আদর্শ। বুদ্ধদেব কেবল মগধবাসী বা ভারতবাসীর মুক্তির জন্য নির্ব্বাণের পথ আবিষ্কার করেন নাই, সকল মানবের জন্য করিয়াছিলেন; তাঁহার হিতৈষণা স্বদেশহিতৈষীর উপচিকীর্ষা অপেক্ষা উদার ও মহৎ। কিন্তু তথাপি স্বদেশপ্রেমের প্রয়োজন আছে। নবজাত শিশুটির প্রতি মায়ের একনিষ্ঠ বাৎসল্যকে তুমি সঙ্কীর্ণ বলিতে চাও বল, কিন্তু উহাই বিধাতার মঙ্গলবিধান। বৈষ্ণব ভগবান্‌কে শিশুগোপালরূপে দেখিয়া তাঁহার প্রতি বাৎসল্য অনুভব করেন। আমাদেরও দেশপ্রীতি নিজ

নিজ সন্তানের প্রতি বাৎসল্যের মত গাঢ় হইতে পারে না কি?

দেশভক্তির আর এক রূপ আছে, যাহাকে ভাল মন্দ দুই বেশ ধারণ করান যায়। মন্দ বেশ এই যে, আমার দেশ তোমার দেশের চেয়ে ভাল ও বড়; আমি আমার দেশের প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব না, তোমার দেশের নিন্দা কুৎসা করিয়া তাহাকে খাট করিতে চেষ্টা করিব; এমন কি দরকার হইলে তোমার দেশকে যুদ্ধে ছারখার করিব এবং পরাধীন করিব। ভাল বেশ এই যে, তোমার দেশ ছোট বা বড়, ভাল বা মন্দ, আমার সে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। আমার দেশ ভাল ও বড়; ইহা অতীতে মহৎ ছিল বা বর্ত্তমানে ইহা মহৎ, কিম্বা ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল,—আমরা ইহাকে ভাল ও বড় করিব! যেমন মায়ের ছেলে নিজের মাকে নির্বিচারে অহেতুকী ভক্তি করে, তাহাকে, কাহারও সঙ্গে তুলনা না করিয়াই, সকল নারীর মধ্যে পূজ্যতমা বলিয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দেয়; দেশভক্তির এই রূপ তদ্বিধ। আমাদের মাতৃভূমি, তোমার প্রত্যেক ধূলিকণা পবিত্র। আমরা তোমাকে অতীত বা বর্ত্তমান কালের কোনও দেশের চেয়ে ছোট মনে করি না। তোমার অতীত আছে, তোমার বর্ত্তমান আছে, তোমার ভবিষ্যৎ আছে। তুমি আরাধ্যতমা।

কন্যার সমাদর। প্রাচীন ভারতে কন্যা সর্ব্বত্র অনাদৃতা হইতেন, ইহা মনে করিবার যে যথেষ্ট প্রমাণ নাই, ইহার বিপরীত মনে করিবার যে বহু প্রমাণ আছে, তাহা অনেকবার প্রদর্শিত হইয়াছে। কন্যার আদরের আর একটি প্রমাণ উল্লিখিত হইতেছে।

মহাকবি ভাস ন্যূনকল্পে আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবিমারক নামক নাটকের প্রথম অঙ্কে এই শ্লোকটি আছে:—

> ন তত্র কর্ত্তব্যমিহাস্তি লোকে
> কন্যাপিতৃত্বং বহুবন্দনীয়ম্।
> সর্ব্বে নরেন্দ্রা হি নরেন্দ্রকন্যাং
> মল্লাঃ পতাকামিব তর্কয়ন্তি॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে কন্যাপিতৃত্ব বহুবন্দনীয়, অর্থাৎ কন্যার পিতা হইলে লোকে বহু সম্মান পাইয়া থাকে। রাজার কন্যাকে সকল রাজাই অধিকার করিতে চায়, যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধারা পতাকাটি দখল করিতে চেষ্টা করে।

বর্ত্তমান সময়ে বর ও বরপক্ষ মনে করেন যে, বর বিবাহ করিয়া কন্যা ও তাহার পিতামাতাকে অনুগৃহীত করিতেছেন; কন্যাও যে বরকে ধন্য করিতেছেন, এ কথাটা বরপক্ষের মনে যতদিন না ঢুকিতেছে, ততদিন বরপণ প্রথার সমূলে উচ্ছেদের আশা নাই। বর ও কন্যা উভয়েরই বিবাহের প্রয়োজন আছে। কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট অল্প বয়সের মধ্যে কন্যার বিবাহ হওয়া চাইই, এবং তাঁহার কোন স্বতন্ত্র সম্পত্তি নাই, উপার্জ্জনের সুযোগ এবং ক্ষমতাও নাই, ইহাতে কন্যাকে খাট করিয়া রাখিয়াছে।

সন্ন্যাসীর দল ও দেশের কাজ। দেশের কাজ করিবার জন্য যথেষ্ট লোক পাওয়া যায় না। পর্য্যাপ্তসংখ্যক লোক পাইবার উপায় চিন্তা অনেকেই করিয়া থাকেন। কেহ কেহ এই এক উপায় নির্দ্দেশ করেন যে ভারতময় যে-সব সাধু সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারা যদি দেশের নানাপ্রকারের আধুনিক দুঃখদুর্গতি ও অভাব দূর করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। কিন্তু তাঁহাদিগকে কি ঐহিক কোন কাজে লাগান সম্ভবপর? সেন্সস্ রিপোর্টে দেখা যায় যে সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্ম্মের নামে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন পঞ্চাশ লক্ষ লোক। ইঁহাদের অধিকাংশ সম্ভবতঃ অবিবাহিত সন্ন্যাসী। যাঁহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভাবনা ভাবিতে হয় না, কোন সাংসারিক বন্ধন নাই, এমন ৫০ লক্ষ কেন, এক লক্ষ লোক দেশহিতব্রত হইলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই দেশে যুগান্তর উপস্থিত করা যায়। কিন্তু এই-সকল সন্ন্যাসী প্রায় সকলেই জগৎকে মায়া, সংসারকে কারাগার, এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকে বন্ধন মনে করেন। যাহা অবশ্য,

মায়িক, সেই পৃথিবীর জন্য তাঁহারা খাটিবেন কেন? যে সংসারকে ত্যাগ করাই তাঁহারা শ্রেয় ভাবিয়াছেন, তাহাকে সুখের জিনিষ করিবার জন্য তাঁহারা খাটিবেন কেন? অধিকন্তু এই সব সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকের কোনও শিক্ষা নাই, সৎকর্ম্ম করিবার কোনও যোগ্যতা নাই। অনেকে আবার দুর্নীতিপরায়ণ, কুক্রিয়াসক্ত; কেহ কেহ পলাতক আসামী। যাঁহারা বিবেকানন্দের শিষ্যদের মত নববৈদান্তিক, অবশ্য তাঁহাদের কাছে কোন কোন প্রকারের সমাজসেবার আশা করা যায়।

অনেক সন্ন্যাসীর প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান আছে। জ্ঞানান্বেষীরা তাঁহাদের নিকট গেলে তাঁহারা শিক্ষা দিয়া থাকেন। জগতের এই উপকার তাঁহাদের দ্বারা হয়। বাহ্য বিষয়ে অনাসক্তি, এবং আত্মিক উৎকর্ষ লাভের জন্য সাধনার যে দৃষ্টান্ত তাঁহারা নিজ জীবনে দেখান, তাহার প্রভাবও কম নয়। তাঁহাদের জীবনের আদর্শ সর্ব্বাংশে অনুকরণীয় মনে হয় না, কিন্তু তাঁহাদের বৈরাগ্য ও সাধনা প্রাণে নূতন শক্তি আনিয়া দেয়।

পুরাকালে সাধু সন্ন্যাসীদের দ্বারা ভারতবর্ষের আর একটি উপকার সাধিত হইত, এবং এখনও হয়। তাঁহারা ভারতের সর্ব্বত্র সকল তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রকারে এক প্রদেশের লোক অন্যান্য প্রদেশে সর্ব্বদা যাতায়াত করায়, রাষ্ট্রীয় হিসাবে ভারত এক না হইলেও, ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ ঐক্য রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইত। এক প্রদেশের সাধনার ফল অন্য প্রদেশেও বিকীর্ণ হওয়ায়, ভাবে,জ্ঞানে এবং সভ্যতার আধ্যাত্মিক উচ্চ অঙ্গে ভারতের একত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিত। বর্ত্তমান সময়ে দেশমধ্যে একই ইংরেজী শিক্ষা, একই শাসনপ্রণালী, রেলওয়ে দ্বারা সহজে যাতায়াতের এবং বাণিজ্যের সুবিধা, ডাকঘর ও টেলিগ্রাফের দ্বারা পত্রব্যবহারের সুযোগ, প্রভৃতি কারণে, সর্ব্বত্র একটি ঐক্যের বন্ধন বিস্তৃত হইতেছে। যাঁহারা ইংরেজী জানেন না, কেবল দেশভাষা জানেন, তাঁহারাও পরোক্ষভাবে আধুনিক দেশীয় সাহিত্যের দ্বারা একই প্রকারের ভাব ও চিন্তায় পরিপুষ্ট হইতেছেন। এখনও কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর; এবং শাসনপ্রণালী,রেলওয়ে, ডাকঘর প্রভৃতির দ্বারা যে একত্বের ছাপ পড়ে, তাহাও তাহাদিগকে বেশী স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষের ঐক্য সাধন ও রক্ষণ বিষয়ে এই-সকল লোকের মধ্যে এখনও হয়ত সাধুসন্ন্যাসীদের দ্বারা অজ্ঞাতসারে কিছু কিছু কাজ হয়।

সংসারবিরাগী হওয়ার কুফলও ভারতবর্ষে খুব ফলিয়াছে। ভারতবর্ষে যে পাশ্চাত্য দেশসকলের মত স্বদেশ-প্রেম, পাশ্চাত্য দেশসকলের মত রাষ্ট্রীয়-অধিকারপ্রিয়তা জন্মে নাই,সন্ন্যাস ও সংসার হইতে ছাড়াছাড়া ভাব তাহার জন্য প্রভূত পরিমাণে দায়ী। সংসারটাই যখন কিছু নয়, তখন হিন্দু মুসলমান খৃষ্টীয়ান স্বদেশী বা বিদেশী, কে দেশ শাসন করে, কে খাজনা আদায় করে, সেটা খুব গুরুতর ব্যাপার বলিয়া মনে না হইবারই কথা। জন কতক ইংরেজ রাজপুরুষ, "জনকত শ্বেত প্রহরী পাহারা" যে এত বড় দেশ শাসন করিতেছে, সন্ন্যাসিত্বের প্রভাব তাহার অন্যতম কারণ।

৫০ লক্ষ লোক ভিক্ষোপজীবী, ইহার মানে এই যে এতগুলি লোক নিজেরা ত কোন প্রকারে দেশের আয় বাড়ানই না, ধনবৃদ্ধি করেনই না, বরং তাহার বিপরীত কার্য্য করেন;—যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জ্জন করে, তাহাদের আয়ে ভাগ বসান। সন্ন্যাসীরা যদি সকলে ধর্ম্ম ও সুনীতি প্রচার করিতেন, নিরক্ষর লোকদিগকে শিক্ষা দিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভরণপোষণের ব্যয় অপব্যয় হইত না। কিন্তু সেরূপ কোন উপকার তাহাদের অধিকাংশের নিকট হইতে পাওয়া যায় না।

অতএব উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া সন্ন্যাসীদিগকে যাঁহারা সমাজসেবক করিতে পারিবেন, তাঁহারা দেশের মহা উপকার সাধন করিবেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই গুরুভার কে বহন করিতে পারিবেন?

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আট বৎসর গুরুতর পরিশ্রমের পর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে। তিনি হাইকোর্টের জজ, জজিয়তী যোগ্যতার সহিত করেন। তাঁহার মত উচ্চ-

পদস্থ লোককে সাধারণতঃ যে-সকল সম্মানভূতিক (honorary) কাজ করিতে হয়, তাহাও তিনি করেন। তাহার উপর গত আট বৎসর তিনি ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, সাধারণতঃ তাহাই একজন অনন্যকর্ম্মা কর্ম্মিষ্ঠ লোকের পক্ষে যথেষ্ট।

আমাদিগকে কখন কখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষ-ত্রুটি দেখাইতে হইয়াছে। তিনি শক্তিশালী লোক, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রায় সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। এইজন্য এইসব দোষত্রুটি হয়ত তাঁহাতেই অর্শিয়াছে, হয়ত বা সবগুলির জন্য ব্যক্তিগত ভাবে তিনি দায়ী নহেন।

তাঁহার আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে যে সব কাজ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সমালোচনার একটা প্রধান কারণ হইয়াছে মানুষ নির্ব্বাচন ও পুস্তক নির্ব্বাচন। শুনা যায়, আইনের কলেজে ও বি. এ, উপাধিধারীদের শিক্ষার জন্য অধ্যাপক নিয়োগে এবং পরীক্ষক-নিয়োগে কোন কোন স্থলে অযোগ্য লোক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং যোগ্য লোক নির্ব্বাচিত হন নাই। আগে যে এমন হইত না তাহা নহে। কিন্তু যাহার যোগ্যতা বেশী, তাহার কাজের উৎকর্ষও তত বেশী হইবে বলিয়া লোকে আশা করে। কোন কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পক্ষপাতিত্ব ও আশ্রিতবাৎসল্য এবং অপর কাহারও কাহারও সম্বন্ধে তাঁহার প্রতিকূল ভাব, কি পরিমাণে নিয়োগসম্বন্ধীয় অবিবেচনার জন্য দায়ী তাহা ঠিক্ করিয়া বলা যায় না।

আমাদের এইরূপ বিশ্বাস যে বিশ্ববিদ্যালয় বহু অর্থব্যয়ে যে-সকল ইউরোপীয় পণ্ডিতকে উচ্চ উচ্চ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়াইয়াছেন, এবং দেওয়াইবেন, তদ্দ্বারা উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্র যথেষ্ট পরিমাণে লাভ-বান্ হন নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপাধিবিতরণ সভায় (Convocationএ) যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে এই বিশ্বাস ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। আমাদের বিবেচনায় তাহাতে যথেষ্ট আত্মপক্ষসমর্থন-দক্ষতা থাকিলেও সে চেষ্টা সফল হয় নাই। বহু অর্থব্যয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগকে অধ্যাপক নিয়োগের একটি কারণ অনুমিত হইয়াছে; তাহা ঠিক্ কিনা বলিতে পারি না। আশুবাবু একটি বড় ভাল কাজ করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় অধ্যাপকদিগকে উচ্চ উচ্চ বিষয়ে শিক্ষা দিবার সুযোগ দিয়া দেশবাসীর অধিকার বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ক্ষমতার প্রমাণ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন। তিনি যদি কেবল ভারতীয় অধ্যাপকই নিযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে ইংরেজেরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা কালাআদমির ব্যাপার মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিবার বেশ সুবিধা পাইত। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হওয়ায় এরূপ ঠাট্টাবিদ্রূপের সুযোগ কম হইয়াছে। দেশে বিদেশে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটু খাতিরও হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে সাংসারিক হিসাবে এরূপ ভড়ংএর প্রয়োজন আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচিত বাংলা বহিগুলির মধ্যে ভাল বই বিস্তর আছে। কিন্তু বিষয় ও ভাষা হিসাবে নিকৃষ্ট কোন কোন বহি কেন মনোনীত হইয়াছে বলা কঠিন।

আশুবাবুর আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুতর ভ্রম বা অপকার্য্য এখানে উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে যে আইনের পাণ্ডুলিপি বড়লাটের সভায় উপস্থিত করেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার বিরুদ্ধে মত দিয়া নিজেরই অসম্মান করিয়াছেন।

প্রতিকূল সমালোচনারূপ অপ্রীতিকর কার্য্য শেষ করিয়া আশুবাবুর আমলে ভাল কাজ যাহা হইয়াছে, এখন তাহারও কিছু কিছু উল্লেখ করিতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ং ছাত্রদের এম্ এ পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাহাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ছাত্রবেতনও যথাসম্ভব কম রাখা হইয়াছে। এই বন্দো-বস্তের ফলে ন্যূনাধিক এক হাজার ছাত্র এম্ এ পড়িতেছে। ইহাতে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের খুব সাহায্য হইতেছে।

ভারতীয় অধ্যাপকগণকে এম্ এ পড়াইবার পূর্ব্বা-পেক্ষা অনেক অধিক সুযোগ দেওয়ায় তাঁহাদের অধিকার

বিস্তৃত হইয়াছে, ক্ষমতা প্রদর্শন ও বিকাশের সুবিধা হইয়াছে, এবং দেশের বিদ্বান লোকদের দ্বারা উচ্চ অঙ্গের অধ্যাপনার ব্যবস্থা হওয়ায় পরোক্ষভাবে ছাত্রদের মধ্যে বিদ্যালাভে উৎসাহ বাড়িয়াছে। "চিরকাল কেবল শিখিব, শিখাইতে পাইব না", এইরূপ নৈরাশ্যজনক ভাব শিক্ষিত লোকদের মন হইতে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে দূর হইবার সম্ভাবনা হওয়ায়, কেবল যে দেশ ও জাতি অপমানমুক্ত হইতে চলিয়াছে, তাহা নয়, ইহাতে দেশে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার পথও ক্রমশঃ বিস্তৃত হইবে।

পূর্ব্বের সঙ্গে তুলনায় এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষাতেও অনেক অধিক পরিমাণে দেশীয় অধ্যাপকেরা পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ইহা দ্বারাও দেশের লোক তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার পাইতেছেন, এবং ইহার দ্বারা পরোক্ষভাবে দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে সাহায্য হইতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মাবলী যখন বিধিবদ্ধ হয়, তখন এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে তদ্দ্বারা উচ্চশিক্ষার বিস্তার না হইয়া উহার ক্ষেত্র ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতর হইবে। কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদ্যোৎসাহিতা এবং সুবিবেচনায় এ পর্য্যন্ত সেরূপ কোন কুফল ফলে নাই। বরঞ্চ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যায় বেশী ও শতকরা বেশী ছাত্র পাশ হয়। তবে যাহাতে আশুবাবুর হাত নাই, সে বিষয়ে তিনি কিছু করিতে পারেন নাই। অধিকাংশ কলেজে ছাত্রসংখ্যা এত বেশী হইয়াছে যে ভাল করিয়া শিক্ষা দিবার অসুবিধা হইতেছে। কলেজের সংখ্যা বাড়িলে ভাল হয়। কিন্তু নূতন নিয়মাবলী অনুসারে নূতন কলেজস্থাপন বড়ই কঠিন।

বি এস্‌সী, এবং এম্ এস্‌সী পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞান শিখিবার ব্যবস্থা অতি অল্পসংখ্যক কলেজে থাকায়, এবং তাহারা, কেহবা স্থানাভাব ও অসমার্থ্য বশতঃ, কেহবা ইচ্ছাপূর্ব্বক, কম ছাত্র লওয়ায়, বিজ্ঞানশিক্ষার্থীদের বড় অসুবিধা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজ খুলিতে বেশী বিলম্ব হইবে না। তখন এই অসুবিধা অনেকটা দূর হইবে। এই কলেজের জন্য টাকা দিয়াছেন তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষ। কিন্তু তাঁহাদের দানের স্রোত বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে আনিবার চেষ্টা আশুবাবু করিয়াছিলেন বলিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস। এই বিজ্ঞান-কলেজে কেবল ভারতীয় অধ্যাপকেরা শিক্ষা দিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা থাকায় ভারতবাসীর উচ্চতম যোগ্যতা লাভে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, এবং যোগ্যতম ব্যক্তিদের একটি কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা দাতারা প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে আশুবাবুর যোগ ছিল বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞান-কলেজের জন্য যোগ্য অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন; কিন্তু আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে বিজ্ঞান-কলেজে কার্য্য করাইবার জন্য যথোচিত চেষ্টা না হওয়ায় অসন্তোষের কারণ ঘটিয়াছে। পদার্থ-বিজ্ঞানে তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, এবং উদ্ভিদ্-শারীরতত্ত্বে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। অধ্যাপক সংগ্রহের জন্য দেশে বিদেশে চিঠি এমন কি টেলিগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছিল শুনিয়াছি, কিন্তু বসু মহাশয়কে পাইবার জন্য কোন আগ্রহ দৃষ্ট হয় নাই।

বিজ্ঞান-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিন লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই টাকা ছাত্রদের প্রদত্ত পরীক্ষার ফীর উদ্বৃত্ত টাকা হইতে দেওয়া হইয়াছে। এই দানের জন্য বিজ্ঞান-কলেজের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক সন্তানের মমতা জন্মিবে। তাঁহারা ইহা মনে করিয়া আনন্দিত হইবেন যে সকলেই ইহার সংস্থাপন-কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত কিয়ৎ পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচলন দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা কমান হইয়াছে। সাহিত্যিকদিগকেও উৎসাহিত করা হইয়াছে। বাঙ্গালা-শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা ক্রমশঃ আরও একটু শক্ত রকম করিলে ভাল হয়; কারণ এখনও উহা যেন ইচ্ছাধীন-প্রায় রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন বাংলা ব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রথমে ২।১ জন যোগ্যব্যক্তিকে অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া, কিছুকাল পরে ঐ দুই বিষয় বি-এ, ও এম্-এ পরীক্ষার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অন্তর্ভূত করিলে ভাল হয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন দ্বারা

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়াইয়াছেন। তাহাতে ব্যাকরণ ও ভাষা-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিয়োগের নজীর প্রস্তুত হওয়ায় পথ পরিষ্কার হইয়া আছে।

আর একটি কথা বলিলেই আশুবাবুর সম্বন্ধে আমাদের প্রধান প্রধান বক্তব্য শেষ হয়। তাঁহার মত বহু গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত উচ্চপদস্থ লোকের কথা দূরে থাক, তাঁহা অপেক্ষা অনেক বেশী অবসরশালী ও পদমর্য্যাদায় অখ্যাত ব্যক্তিকেও তাঁহার মত সকলের জন্য দ্বার অবারিত রাখিতে দেখা যায় না। কনিষ্ঠতম ছাত্র হইতে প্রবীণতম অধ্যাপক পর্য্যন্ত তিনি সকলের সঙ্গেই সহজেই দেখা করিয়াছেন, এবং সকলের কথা মন দিয়া শুনিয়া তাঁহার যাহা সাধ্যায়ত্ত ও নিয়মসঙ্গত তাহা করিয়াছেন। বরং ইহা বলাই ঠিক্‌ যে ছাত্রগণ যত সহজে তাঁহার দেখা পাইত, অন্যেরা হয়ত তত সহজে পাইত না। তাঁহার একটি প্রধান গুণ এই যে তিনি আধুনিক মৌখিক ভদ্রতার নিয়মানুসারে "চেষ্টা করিব" বলিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই. লোকের উপকার করিবার উপায় ও সম্ভাবনা থাকিলে তাহা অন্তরের সহিত করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার সমকক্ষ লোক দেশে কেহই নাই। সুতরাং তাঁহার পরে যাঁহারা ভাইস-চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে তাঁহার সঙ্গে তুলনায় খাট না হওয়া সাতিশয় কঠিন হইবে।

বরপণ। টাউন হলে বরপণ আদায়ের বিরুদ্ধে যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত অনেক মান্য গণ্য ব্যক্তি, নব্য শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক বিদ্বান ও ধনী মানী লোক, এবং অন্যান্য কারণে সমাজে খ্যাতিপ্রতিপত্তি-বিশিষ্ট অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতাগুলিও মোটের উপর বেশ হইয়াছিল। আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা সংগৃহীত হইলে স্নেহলতা দেবীর মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত একটি আবক্ষ মূর্ত্তি (bust) নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আশা করি অন্ততঃ এই সামান্য টাকা উদ্যোগীরা শীঘ্র সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

সভাস্থলে কেহ কেহ "ধান ভানতে শিবের গীত" আরম্ভ করেন। সমুদ্রযাত্রানিষেধের আলোচনা, বা ব্রাহ্মণদিগকে গালাগালি দেওয়া এই সভার উদ্দেশ্য বহির্ভূত ছিল। সুতরাং ঐ দুটা বিষয় বাদ পড়িলে কোন ক্ষতি হইত না।

এই সভায় এবং বরপণ বিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনেক সভায় বক্তাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে বরপণ আদায় রূপ কুরীতি পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে। ইহা ভ্রম। আর সকল দেশের ন্যায় পাশ্চাত্য দেশে টাকার জন্য ধনীর কন্যাকে বিবাহ করার রীতি আছে। কিন্তু বরের পিতা কন্যার পিতাকে বলিতেছেন, "তুমি ঘর বাড়ী বন্ধকই দাও আর সর্ব্বস্বান্তই হও, আমাকে এত টাকা না দিলে আমার ছেলে তোমার মেয়েকে বিবাহ করিবে না," ইহার দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য দেশে কোথাও নাই। যে জিনিষটা পাশ্চাত্য দেশে নাই, সেটা সেদেশ হইতে আমদানী কেমন করিয়া হইবে? যদি বলেন, বিবাহের মত পবিত্র কার্য্যে টাকা কড়ির দাবী করাটা লোভের কাজ এবং ব্যবসাদারী; এই লোভ ও ব্যবসাদারীটা পাশ্চাত্য দেশ হইতে আসিয়াছে। তাহাও অস্বীকার্য্য। আমরা আধ্যাত্মিকতার বড়াই করি বলিয়া লোভ ও ব্যবসাদারীটা আমাদের দেশে পূর্ব্বে ছিল না, সেটা পাশ্চাত্য দেশেরই বিশেষত্ব, এরূপ অপ্রকৃত কথা কখনও বলা যাইতে পারে না। হিন্দু বিবাহের প্রাচীন আদর্শ খুব উচ্চ, তাহা আমরা গত সংখ্যায় নিজেই দেখাইয়াছি; তাহা খুবই স্বীকার করি। কিন্তু তাহার মধ্যেও প্রাচীন কাল হইতে লোভ ও ব্যবসাদারী ছিল; প্রভেদ এই যে তাহা কন্যাপক্ষের ছিল। এইজন্য শাস্ত্রে কন্যাপণের নিন্দা আছে। বরপণ খুব প্রাচীন কালে থাকিলে শাস্ত্রে তাহারও নিন্দা থাকিত।

কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, ইংরেজী শিক্ষা ও চালচলনের প্রভাব দেশে বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বেও যে বরপণ দেশে ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। প্রভেদ এই যে তখন এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না।

ইংরেজীতে ঔদ্বাহিক ব্যাপারে dowry জিনিষটির ও কথাটির চলন আছে; পণের সমার্থক কোন কথারও ব্যবহার নাই, বরপণ বলিয়া কোন জিনিষও পাশ্চাত্য দেশে নাই। এই পণ জিনিষটি ও কথাটি আমাদের স্বদেশী মাল। উহা পচা মাল বলিয়া, এখন উহার দোষটা পরের ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে কেন?

উত্তরপাড়া কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলীর নাম শিক্ষিত লোকদের কাছে অপরিচিত নহে। তিনি একখানি পত্রে আমাদিগকে লিখিয়াছেন, যে, তিনি যখন ৯।১০ বৎসরের বালক তখনও কুলীন ব্রাহ্মণদের বিবাহ উপলক্ষে পণ গণ কথা দুটির ব্যবহার শুনিয়াছেন। এখন তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর। তখন পণের পরিমাণ কম ছিল; কোন কোন স্থলে ১২ টাকা মাত্র দেওয়া হইত; কুল ভঙ্গ করাইলে যথেষ্ট বেশী টাকা চাওয়া হইত। গাঙ্গুলী মহাশয় বহুকাল পূর্ব্বেকার কুলভঙ্গের পণ বা কুলমর্য্যাদার একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তাঁহার পৈত্রিক বাসগ্রাম গরলগাছার বাব রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বয়স এখন প্রায় ৭০; ইঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূরস্মটের রাজপরিবারের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া দুই শত বিঘা নিষ্কর জমী প্রাপ্ত হন। এক এক পুরুষে গড়ে ২৫ ব[illegible] ধরিলে এই বিবাহ ১৭০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল বলি[illegible] স্থির হয়। পলাশির যুদ্ধকে বঙ্গে ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভ কাল ধরিলে উহা ১৫৭ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয়। তাহারও ১৩ বৎসর আগেকার বরপণের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। আগে না হয় কৌলীন্যের জন্য পণ লওয়া হইত, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ অনুসারে লওয়া হয়, এই প্রভেদ। কিন্তু জিনিসটা তখনও ছিল, এখনও আছে। উহা পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমদানী নহে।

নবদ্বীপের রাজপরিবার কষ্ট শ্রোত্রিয়। ইহাঁরা বরাবর খুব বেশী পণ দিয়া উচ্চ কুলীনদিগের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া আসিতেছেন। এই প্রকারে এক নূতন থাকের উৎপত্তি হয়। এই রাজপরিবার সমাজের অগ্রণী। তাঁহারা পাশ্চাত্য দেশ হইতে বরপণ প্রথা আমদানী করেন নাই। গাঙ্গুলী মহাশয় নিজেও জানিতেন এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘটক মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছেন যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ফুলিয়া মেলের উচ্চ কুলীন বলরাম ঠাকুরকে নিজপরিবারের এক কন্যাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিতে বিফল চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য দেশ হইতে যে-সকল পাপ দুর্নীতি আসিয়াছে, তাহার জন্য পাশ্চাত্যেরা দোষী এবং আমদানীকারী আমরাও দোষী। কিন্তু যে দোষ পাশ্চাত্য দেশ হইতে আসে নাই, তাহা তাহাদের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা বৃথা।

কন্যাকে নির্দ্দিষ্ট একটি বয়সের মধ্যে বিবাহিত করিতেই হইবে, যে ক্ষয়কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত বা কোন প্রকারে বিকলাঙ্গ বা চিররুগ্ন, তাহাকেও বিবাহ দিতে হইবে, এই নিয়ম এবং ধারণা দূর না করিলে বরপণ প্রথার মূলোচ্ছেদ করা অসম্ভব।

কন্যাকে যৌতুক দেওয়া এবং বরপণ দেওয়া এক কথা নহে। বর্ত্তমান হিন্দু উত্তরাধিকার নিয়ম অনুসারে কন্যা ও পুত্র দুই থাকিলে কন্যা পিতৃধনের কোনও অংশের উত্তরাধিকারী হয় না। ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। কন্যারও পিতৃধনের অংশ পাওয়া উচিত। কিন্তু তাহা কন্যারই স্ত্রীধন, এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই দখলে থাকা উচিত। কিন্তু "কন্যাকে পিতৃধনের অংশ দাও," বলিয়া প্রকারান্তরে বরপণ লওয়ার সুবিধা ঘটিতে পারে। সুতরাং ইহাতেও বরপণ প্রথা পরোক্ষভাবে থাকিয়া যাইবার সুযোগ পাইতে পারে। অতএব এই প্রকারের যৌতুক বিবাহের পর দিবার নিয়ম বা অপর কোন প্রকার যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বিত হওয়া উচিত।

জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্য। মানুষের সমষ্টিই জাতি। মানুষের বাহিরের ও ভিতরের জীবনের ছবি উঠে সাহিত্যে। কোন জাতি বড় হইলে, তাহার মানেই এই যে তাহার মধ্যে অনেক বড় বড় মানুষ আছে। জাতিতে বড় বড় মানুষ থাকিলে তাহাদের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য জীবনের আভাস জাতীয় সাহিত্যে নিশ্চয় পাওয়া

যাইবে। সুতরাং জাতীয় সাহিত্যও বড় এবং শক্তিশালী হইবে।

বড় জিনিষের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে মানুষের ও জাতির শক্তি জাগিয়া উঠে। ইংরেজী সাহিত্যে রাণী এলিজাবেথের যুগ বিখ্যাত। ঐ যুগ সাহিত্যে এত বড় কেন হইল? উহার পূর্ব্বে ও ঐ সময়ে ইউরোপে এবং ইংলণ্ডে বিদ্যাচর্চ্চার পুনর্জন্ম (Renaissance) হইয়াছিল। তাহার ফলে গ্রীক লাটিন ফরাশিশ ও ইটালীয় সাহিত্যের প্রভাব ইংরেজ জাতির উপর পড়িয়াছিল; এলিজাবেথের রাজত্বের প্রাক্কালে ইংলণ্ডে ধর্ম্মসংস্কার (Reformation) হয়। তাহাতেও জাতীয় চিত্ত আলোড়িত হয়। জাতির বুদ্ধি ও বিবেক জাগিয়া উঠে। ড্রেক, রলী, প্রভৃতি নাবিক ও জলযোদ্ধাগণ নূতন নূতন দেশের বার্ত্তা আনিয়া জাতীয় কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়া দেন। ইহার পরোক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে, ওথেলো ডেসডিমোনাকে যে-সব অদ্ভুত জাতির গল্প বলিতেন, তাহার মধ্যে;—যেমন সেই জাতি যাহাদের মাথা কাঁধের নীচে স্থিত ছিল। স্পেন তখন ইউরোপে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেশ। সেই দেশের রণতরী সকল (Armada) জলযুদ্ধে ইংলণ্ড কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হওয়ায় ইংরেজেরা নিজের শক্তির প্রমাণ প্রাপ্ত হয়। এক দিকে যখন শক্তির প্রমাণ পাওয়া গেল, তখন অন্য দিকে শক্তি না জাগিবে কেন? জাতীয় অবসাদের সময় ত সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় না, জাতীয় স্ফূর্ত্তির সময়েই হয়। আবার যখন ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ ইংলণ্ডেও আসিয়া পড়ে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যেরও নব অভ্যুদয় হয়। জাতীয় শক্তির বিকাশ যে-কোন দিকে হউক, জাতীয় শক্তির প্রমাণ জাতি যে-ভাবেই প্রাপ্ত হউক, জাতীয় চিত্তের আলোড়ন যে-ক্ষেত্রেই হউক, কোনও মহৎ প্রচেষ্টা আন্দোলন বিপ্লবের তরঙ্গ যেরূপেই কোন জাতিকে আঘাত করুক, তাহার দ্বারা সাহিত্যে নূতন উদ্যম, নব প্রভাত, নব জাগরণ আসিয়া পড়িবে, নূতন শক্তি দেখা দিবে।

বাংলা দেশ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্লাবনে ও তরঙ্গাভিঘাতে যখন তোলপাড় তখন সাহিত্যেও নব বসন্ত দেখা দিয়াছিল। ইংরেজ-শাসনের প্রথম যুগে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষে ও কেরীপ্রমুখ মিশনরীগণের চেষ্টায় বঙ্গসাহিত্যের কিছু উন্নতি হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার-প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের উন্নতিরও সূত্রপাত হইয়াছিল। যাহা বাহিরে বাহিরে থাকে, জাতীয় চিত্তকে গভীর বেদনা, গভীর আনন্দ দেয় না, যাহার আঘাতে জাতির হৃদয় আন্দোলিত হয় না, সাহিত্যে সে সব জিনিষের কোন স্থায়ী চিহ্ন থাকিয়া যায় না।

এমন কোন জাতির নাম মনে পড়িতেছে না, যাহাদের অমর সাহিত্য আছে, কিন্তু অপর কোন প্রকারের অমর কীর্ত্তি নাই। যে জাতি বড় সাহিত্য চায় তাহাকে বড় হইতে হইবে, অথচ আবার ইহাও সত্য যে সাহিত্যের উদ্দীপনাও জাতিকে বড় করিবার পক্ষে সহায়তা করে।

কেবল ভাববিলাসী হইয়া, কথার হাটে কেনা বেচা করিয়া, ফাঁকা কল্পনার নৌকায় পাড়ি দিয়া, মহৎ অমর সাহিত্যের সৃষ্টি করা যায় না। সত্য মহৎ কাজ কর, সত্য উপলব্ধি কর, সত্যের সংস্পর্শ ও সত্যের আঘাত অনুভব কর। কূপমণ্ডূকতা ত্যাগ করিয়া যে মানব-চিত্ত সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এক, তাহার সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব উপলব্ধি কর।

গ্রীক লাটিন ইতালীয় ফরাশি জার্মেন প্রভৃতি কত সাহিত্যের প্রভাবে ইংরেজী সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে। শুধু ইংরেজী জানাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

আমাদের অনেক পথ রুদ্ধ বটে; কিন্তু সব দিকে বেড়া নাই। যদি সব পথই বন্ধ মনে হয়, তাহা হইলেই বা আমরা নিরাশ ভাবে আলস্য অবলম্বন করিব কেন? বেড়া ভাঙ্গিবার, পথ বাহির করিবার চেষ্টা করিব। এইরূপ চেষ্টাতেই আমাদিগকে শক্তিশালী করিবে।

বিশ্বের উদার মুক্ত বায়ুতে আমাদের অগ্রণীরা তত্ত্বদর্শীর, কবির ও বৈজ্ঞানিকের পথ দিয়া বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ-সকল পথ আরও প্রশস্ত হইবে। বাণিজ্যের, শিক্ষার এবং পর্য্যটনের দ্বার দিয়া আরও কত পথ দেখিতে পাইব।

ভাষায় গ্রাম্যতা দোষ পরিহার করিবার একটি

বিধি আছে। সাহিত্যেও যাহা কেবল মাত্র দেশ-বিশেষের বা প্রদেশবিশেষের জিনিষ, কেবল একটি দেশের বা প্রদেশের লোক যাহার রসাস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হয়, তাহা খুব উৎকৃষ্ট নহে। বাল্মীকি, কালিদাস কোন্ প্রদেশের লোক ছিলেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যায় নাই। কিন্তু ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহাদের আদর। অনুবাদের সাহায্যে অন্য দেশের লোকেও তাঁহাদের আদর করিতেছে। অনুবাদ-সহতা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের একটি লক্ষণ। আমরা অনুবাদে ভিক্তর হিউগো, গেটে পড়ি, মূলে শেক্‌সপীয়র, ওআর্ডস্‌-ওআর্থ, এমার্সন্ পড়ি; তাঁহাদের জাতি, ভাষা, ধর্ম্মবিশ্বাস, আচার, পোষাক আমাদের মত না থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁহাদের গ্রন্থাবলী হইতে আনন্দ ও অনুপ্রাণনা পাই।

যাহা একান্তভাবে সাময়িক ও স্থানিক, তাহা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নহে। যাহা সাম্প্রদায়িক, তাহাও বড় সাহিত্য নহে।

যাঁহারা হিন্দু সাহিত্য, খৃষ্টীয় সাহিত্য, মুসলমান সাহিত্য, ইত্যাদি কথা প্রয়োগ করেন, তাঁহারা বিশুদ্ধ সাহিত্য জিনিষটি যে কি, তাহা বোধ হয় ভুলিয়া যান।

বিশেষ কোন ধর্ম্মমত বা সামাজিক মত প্রচার করিবার জন্য যিনি গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা নহে। কালিদাস মূর্ত্তিপূজার সপক্ষে বা বিপক্ষে, কন্যার বিবাহের বয়স সম্বন্ধে, সমুদ্রযাত্রার অবৈধতা সম্বন্ধে, চটি বহি লিখিতে পারিতেন বোধ হয়; এরূপ বহি লেখা অনাবশ্যক বা অশ্লাঘার বিষয় নহে। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার ঐ রচনাগুলি অভিজ্ঞান-শকুন্তলের একজাতীয় হইত না। শেক্‌স্পীয়র খৃষ্টীয়ান ছিলেন, কিন্তু ত্রিত্ববাদ, খৃষ্টের অবতারত্ব, তাঁহার রক্তে পাপীদের পরিত্রাণ, ইত্যাদি বিষয়ে তিনি কিছু লেখেন নাই। যদি কোন খৃষ্টীয়ানের লেখা খৃষ্টীয়ান অখৃষ্টীয়ান সকলেই পড়িয়া আনন্দ পায়, যদি কোন হিন্দুর লেখা হিন্দু অহিন্দু সকলেই পড়িয়া একই প্রকারের ভাব অনুভব করে, যদি কোন মুসল-মানের লেখা মুসলমান অমুসলমান সকলেরই আদরের জিনিষ হয়, তবে তাঁহাদের সাহিত্যিক চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিতে হইবে। বিশ্বজনীন সাহিত্য ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তাহা যাহা মানুষের মানবত্ব লইয়া লেখা, মানুষের হিন্দুত্ব, বৌদ্ধত্ব, খৃষ্টীয়ত্ব বা মুসলমানত্ব যাহার প্রধান উপাদান নহে। ওআর্ডস্‌ওআর্থ তাঁহার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাসবিষয়ক Ecclesiastical Sonnetsগুলি সম্বন্ধে কি মনে করিতেন জানি না; বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হিন্দু-ধর্ম্মবিষয়িণী রচনাগুলিকে সাহিত্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন কিনা, জানি না। কিন্তু ইহাঁদের এই-সকল রচনা তাঁহাদের অন্যান্য রচনার মত যে স্থায়ী কীর্ত্তি নহে, তাহা সাহিত্যরসিকেরা বুঝিতে পারেন।

বিদেশে কি শিক্ষণীয়। আমাদের দেশের অনেক ছাত্র বিদেশে বিদ্যালাভের জন্য যান। তাঁহারা যাহা শিখিতে যান, তাহাই তাঁহাদের প্রধান অর্জ্জনীয় বিষয়, কিন্তু তদ্ভিন্ন অবসরমত অন্যান্য অনেক বিষয় জানিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শুধু ছাত্রদের নয়, যাঁহারা বিষয়কর্ম্ম বা দেশভ্রমণাদি উপলক্ষে বিদেশে যান, তাঁহাদেরও এসকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত।

আমাদের দেশের চিন্তাশীল ছাত্র বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা বিদেশে গেলে নিশ্চয়ই একথা ভাবেন যে সেই দেশের শক্তির কারণ কোথায়, মহত্ত্ব কোথায়? বিদ্যা-শিক্ষার জন্য আমাদিগকে এই দেশে আসিতে হইতেছে কেন? আমাদের দেশেই বা অন্য দেশের লোক বিদ্যা শিক্ষার জন্য আসে না কেন?

ভারতবর্ষে মানুষের অকালমৃত্যু হয় প্রধানতঃ দুর্ভিক্ষে এবং সংক্রামক ব্যাধিজনিত মহামারীতে। ভারত-বাসী যেখানেই প্রবাসী থাকুন, তাঁহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য যে সেই দেশে এখন দুর্ভিক্ষ এবং প্লেগ ম্যালেরিয়া আদি আছে কিনা, বা পূর্ব্বে ছিল কিনা। যদি পূর্ব্বে ছিল এবং এখন নাই, তাহা হইলে কেমন করিয়া সে দেশের অবস্থার উন্নতি হইল? পাশ্চাত্য অনেক দেশে সে দেশ-বাসীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত খাদ্য উৎপন্ন হয় না, সেখানেও বৃষ্টিপাত সব বৎসর সমান হয় না; ভারতে ভারতবাসীর

পক্ষে পর্য্যাপ্ত খাদ্য উৎপন্ন হয়, অথচ এখানে দুর্ভিক্ষও হয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে দেখা যায়, সেখানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইত; যে-সব কাউণ্টিতে অনেক জলা ছিল তথায় জ্বরেরও খুব প্রাদুর্ভাব হইত। এখন কিন্তু প্লেগও হয় না, সংক্রামক ম্যালেরিয়া জ্বরও নাই। এইরূপ ইটালীতেও খুব ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল এখন এই-সকল দেশ যে বহুপরিমাণে ব্যাধিমুক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ লোকদের খাইবার পরিবার সঙ্গতি বৃদ্ধি, দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পয়ঃপ্রণালী আদির বিস্তার, এবং দেশমধ্যে শিক্ষার বিস্তার; কিন্তু এরূপ মোটামুটি জ্ঞান কোন কাজের নয়। নানা দিকে যে লোকদের অবস্থার উন্নতি হইল, কি কি উপায়ে ও প্রণালীতে হইল, গবর্ণমেণ্ট কি করিলেন, জনসাধারণ কি করিলেন, ইত্যাদি সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা চাই।

সভ্য লোকদের শাসনাধীন অথচ নিরক্ষর দেশ পৃথিবীতে ভারতবর্ষের মত আর দ্বিতীয় নাই। অন্যান্য দেশও এইরূপ নিরক্ষর ছিল, সে সব দেশে কেমন করিয়া শিক্ষার বিস্তার হইল, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস জানা চাই। কে কে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কি কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট কি করিয়াছিলেন এবং এখনও করেন, সর্ব্বসাধারণ কি করিয়াছেন এবং করেন, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের বিরুদ্ধে, স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে, যে-সব মামুলী কুতর্ক ও আপত্তি আছে, তাহা কিরূপে খণ্ডিত হইয়াছে, ইত্যাদি নানা ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া জানা দরকার। প্রত্যেক সভ্যদেশে শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট জনকরা কত খরচ করেন; সমগ্র রাজস্বের কি অংশ, শতকরা কত অংশ, শিক্ষাকার্য্যে ব্যয়িত হয়; এসব কথা জানা চাই। শিশুদের শিক্ষার নূতন নূতন প্রণালী; হাতের দক্ষতা (manual training) দিবার আবশ্যকতা, উপকারিতা, উপায় ও প্রণালী; ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের বিস্তর জানিবার আছে। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সাশ্রম (residential) করিবার চেষ্টা করার ফলে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার যেরূপ দ্রুতভাবে হওয়া উচিত, তাহা হইবে না। এইজন্য সভ্যদেশসমূহে এই সাশ্রম প্রণালীই একমাত্র প্রথা কি না, প্রবাসী ছাত্রেরা সংবাদ রাখিবেন। এই প্রণালী ও ইহার বিপরীত প্রণালীর সুবিধা অসুবিধা, যে যে দেশে সাশ্রম প্রথার চলন বেশী তথাকার জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অধিকার কিরূপ, তাহাও জানা কর্ত্তব্য। কারণ আমাদের দেশে সাশ্রম প্রথার বিরুদ্ধে প্রধান এই দুই আপত্তি আছে যে ইহা অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য, এবং ইহার অধীনে ছাত্রদিগকে কি ভাবে গড়া হইবে, তাহাদের শাসনের নিয়ম কি কি হইবে, তাহাদের স্বাধীনতার সীমা কোন্ দিকে কোন্‌খানে নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহার উপর আমাদের কোন হাত নাই। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির সহিত বিবাহের এবং জন্মমৃত্যুর হারের হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ও অনুসন্ধানযোগ্য।

জমীর বন্দোবস্ত ও খাজনার হার, খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, না মাঝে মাঝে খাজনা বাড়ে, চাষাই জমীর মালিক, না আমাদের দেশের জমীদারদের মত মধ্যবর্ত্তী কোন শ্রেণী আছে, কৃষির উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট কি করেন, শিক্ষাবিস্তারের সহিত কৃষির উন্নতির সম্পর্ক, এই সব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার।

আরও যে-সব বিষয় জ্ঞাতব্য, তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

গ্রাম ও নগরের রাস্তা ঘাট পরিষ্কার রাখা ও মেরামত করা, কিরূপে হয়; মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ক্ষমতা কিরূপ; কাহারা উহার সভ্য হইবার ও নির্ব্বাচন করিবার অধিকারী; লেখাপড়া জানা এই যোগ্যতার একটা অঙ্গ কি না; রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিসভার সভ্যের যোগ্যতা ও ক্ষমতা; নির্ব্বাচকদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা; পুলিস ও প্রজার সম্বন্ধ; পুলিসের উপদ্রব কিরূপ আছে; পুলিসের ক্ষমতা; সমুদয় লোকসংখ্যা ও পুলিসের সংখ্যার অনুপাত; সমগ্র রাজস্বের কত অংশ পুলিসের জন্য ব্যয় হয়; বিচারবিভাগ ও শাসনবিভাগের সম্পর্ক; বিচারকদের ন্যায়বিচার করিবার স্বাধীনতার উপর পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে হস্তক্ষেপ করা হয় কি না; লোকসংখ্যা ও অপরাধীর সংখ্যার অনুপাত; বালকবালিকাদিগকে পৌর ও জানপদ

কর্ত্তব্য ও অধিকার (civic rights and duties), শিক্ষা দিবার কিরূপ বন্দোবস্ত আছে; সংবাদপত্রের ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করিবার জন্য কি কি আইন আছে; প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সভাসমিতি করিবার অধিকার, এবং সভায় বক্তৃতা করিবার অধিকার কিরূপ আছে; বিনা বিচারে কারারোধ ও নির্ব্বাসন আছে কি না; দেশী শিল্প বাণিজ্যের সংরক্ষণ জন্য বিদেশী আমদানী দ্রব্যের উপর ট্যাক্স কিরূপ আছে বা নাই; গবর্ণমেণ্ট রেলভাড়া, জাহাজভাড়া ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য করিয়া বা ভাড়া কমাইয়া দিয়া দেশী শিল্প-বাণিজ্যের সাহায্য করেন কি না; অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত থাকিলেও, ইচ্ছাপূর্ব্বক বিদেশী জিনিষ না কিনিয়া দেশী জিনিষ খরিদ করিবার সপক্ষে সামাজিক মত কিরূপ প্রবল; তাহার বাস্তব দৃষ্টান্ত সংগ্রহ; শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান বিষয়ে এবং জানপদ, পৌর ও রাষ্ট্রীয় সর্ব্ববিধ ব্যাপারে নারীর কিরূপ অধিকার আছে; ঐরূপ অধিকারের কি ফল হইয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন জাতির, শ্রেণীর ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষার বা স্থানিক ও রাষ্ট্রীয় সভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে কি না; ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ধর্ম্মসম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে সদ্ভাব, অসদ্ভাব, হিংসা, দ্বেষ, বিরোধ, দাঙ্গাহাঙ্গামা; তাহার বাস্তব দৃষ্টান্ত সংগ্রহ; বিদ্যাবুদ্ধি যেমনই হউক সরকারী কর্ম্মচারী হইলেই তাহার খাতির খুব বেশী, না মানুষের গুণের ও যোগ্যতার আদর বেশী; না, সমান সমান; ইত্যাদি।

আমাদের তালিকার দৈর্ঘ্য দেখিয়া প্রবাসী ছাত্র বা অন্য প্রবাসীরা ভয় পাইবেন না। যাঁহার যে দিকে অনুসন্ধানের সুযোগ বেশী, তিনি সেই দিকেই অনুসন্ধান করিবেন। খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতেও উল্লিখিত বিষয়সকল সম্বন্ধে অনেক তথ্য চোখে পড়িবে। একটি স্বতন্ত্র বহি করিয়া বা অন্য উপায়ে খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রাদি হইতে কাটিয়া এই-সকল তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। এক একটি সংগ্রহের খাতার এক একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রস্তুত করিয়া রাখিলে কাজের সময় দরকারী তথ্যটি খুব সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

যাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল, তাঁহারা যদি বিদ্যালাভ ও উপাধিলাভের পর আরও কিছু দিন প্রবাসে থাকিয়া উল্লিখিত নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে মাতৃভূমির সেবার যোগ্যতা তাঁহাদের বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে।

শিক্ষণীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিতে আমরা চেষ্টা করি নাই। আমরা যাহার উল্লেখ করি নাই, এরূপ অনেক বিষয় অনেকেরই মনে পড়িবে।

যাঁহারা নিজে প্রবাসী নহেন, দেশেই আছেন, তাঁহারা প্রবাসী বন্ধুদিগকে চিঠি লিখিয়া এই-সকল বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করিতে পারেন।

শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে যে টাকা এককালীন দান করেন, গত বৎসর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সকল তাহা নিঃশেষে ব্যয় করিতে না পারায় আমরা গত সংখ্যায় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার কিছু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। ঐ মন্তব্য মুদ্রিত হওয়ার পর আমরা নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি যে ভারত গবর্ণমেণ্টের কোন বৎসরের মঞ্জুরী টাকা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এমন কোন কোন কারণে ব্যয় করিতে অসমর্থ হইতে পারেন, যাহার জন্য তাঁহারা দায়ী নহেন। মনে করুন বাংলা গবর্ণমেণ্ট কোনও কলেজকে বলিয়াছেন "আপনারা জমী ক্রয় করুন বা খাজনার বন্দোবস্ত করিয়া স্থায়ী ভাবে গ্রহণ করুন; তাহা হইলে আপনাদিগকে উহার উপর ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের জন্য টাকা দিব।" যে বৎসরের মঞ্জুরী টাকা, সেই বৎসরের মধ্যে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ জমীর যোগাড় করিতে পারিলেন না, সুতরাং ছাত্রাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত টাকা গবর্ণমেণ্টের হাতে মজুত রহিয়া গেল। এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্টকে দোষ দেওয়া যায় না।

ভূপতিমোহন সেন। শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন সেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মিথ্স্ পুরস্কার (Smith's Prize) পাইয়াছেন। ইনি তিন বিষয়েই সম্মানের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এস্‌সী

পরীক্ষায়, এবং এম্ এস্‌সী পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। কেম্ব্রিজে গণিতের ট্রাপস্ পরীক্ষার প্রথম অংশে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন; এবং দ্বিতীয় অংশে উত্তীর্ণ হইয়া বি ষ্টার (B*) চিহ্নিত হন। এই শেষোক্ত সম্মান অতি উচ্চ। এখন কেম্ব্রিজে গণিতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের নাম গুণানুসারে ছাপা হয় না। সুতরাং প্রথমস্থানীয় হইয়া কে সীনিয়র র‍্যাংলার অভিহিত হইলেন, বলা যায় না। কিন্তু বি ষ্টার তাহার সমতুল্য সম্মান। সীনিয়র র‍্যাংলারেরাও অনেক সময় স্মিথ্‌স্ প্রাইজ্ পান্ নাই। কারণ স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার শক্তি যতটা থাকিলে সীনিয়র র‍্যাংলার হওয়া যায়, স্মিথ্‌স্ প্রাইজ পাইতে হইলে তদপেক্ষা অধিক স্বতন্ত্র চিন্তার শক্তি থাকা প্রয়োজন। এপর্য্যন্ত কোন ভারতবাসী স্মিথ্‌স্ প্রাইজ্ পান নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব হিসাবে ভারতবাসী ছাত্রদের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। স্মিথ্‌স্ প্রাইজ্ পূর্ব্বে পূর্ব্বে কিরকম মনস্বী ও পণ্ডিত লোকেরা পাইয়াছেন, তাহা কয়েকটি নাম হইতে বুঝা যাইবে; যথা—হর্শেল (Herschel), কেল্‌ভিন্ (Kelvin), টেট্ (Tait), ষ্টোক্‌স্ (Stokes), ক্রিষ্ট্যাল (Chrystal), টড্‌হাণ্টার (Todhunter), ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (Clerk Maxwell), বল (Ball), ইত্যাদি। ভূপতি বাবুর জীবনের আরম্ভের একটি কীর্ত্তি এই-সকল জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতদের জীবনের প্রারম্ভিক একটি কীর্ত্তির সমান হইল, ইহা ভাবিয়া আমরা আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিতেছি। ভূপতিবাবুর ভবিষ্যৎ জীবন ইঁহাদের মত উজ্জ্বল হউক, সর্ব্বান্তঃকরণে এই কামনা করিতেছি।

চিৎপুরে পুলিশ খুন। চিৎপুরে গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষকে হত্যা করার অপরাধে নির্ম্মলকান্ত রায় নামক এক যুবক ধৃত হয়। প্রথম বিচারে জুরী একবাক্যে তাহাকে হত্যাপরাধ হইতে মুক্তি দেন; হত্যার সাহায্য করা, ইত্যাদি অভিযোগে ৫ জন জুরী তাহাকে নির্দ্দোষ ও ৪ জন দোষী বলেন। দ্বিতীয় বিচারে ৭ জন নির্দ্দোষ এবং ২ জন দোষী বলেন। জজ জুরীর এই মত ঠিক বলিয়া গ্রহণ না করায়, তৃতীয়বার বিচারের আদেশ হয়। কিন্তু এক দিন পরেই, সম্ভবতঃ বিলাত হইতে অন্যরূপ আদেশ আসায়, নির্ম্মলকে আদালতে হাজির করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। জজ কিন্তু তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি দেন নাই; কেবল ছাড়িয়া দিয়াছেন মাত্র।

নির্ম্মল দোষী কি নির্দ্দোষ, তাহা ভগবান্ জানেন। কিন্তু পুলিশ তাহার অপরাধ প্রমাণ করিতে পারে নাই, ইহা সর্ব্বসাধারণে বুঝিতে পারিতেছে। যাহারা পরে এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহাদের অনেককে আগেই পুরস্কার দেওয়াটা মহা ভুল হইয়াছে। লর্ড কারমাইকেলের মত ভদ্র লোকের পুরস্কারবিতরণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা বড় দুঃখের বিষয় হইয়াছে। পুলিশের প্রধান প্রধান সব সাক্ষী দাগী লোক। এতগুলি দাগী লোক ঘটনাক্রমে হত্যাস্থলে এক সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারেই না, এমত বলা যায় না। ইহা সম্ভব হইলেও বিশ্বাসযোগ্য। মনে হয় না আসামীর ব্যারিষ্টার এই দাগী লোকগুলিকে পুলিসের সাজান সাক্ষী ও মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। এরূপ বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

যাহাই হউক, এরূপ কয়েকটি খুনের যে কোনও কিনারা হইল না, ইহা দুঃখের বিষয়।

যাহারা পুলিশ বা অন্য রাজকর্ম্মচারী খুন করে, তাহারা যদি ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার জন্য ঐরূপ কাজ করে, তাহা হইলে কারণটা বেশ সহজবোধ্য বটে; কিন্তু যদি "রাজনৈতিক" কারণে এই-সকল খুন হয়, তাহা হইলে ইহার ভিতরকার যুক্তিটার সারবত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ২।১০ জন রাজকর্ম্মচারীকে খুন করিলে দেশের কি মঙ্গল হইবে, বুঝিতে পারি না। যুদ্ধে ত বহুসংখ্যক ইংরেজ সেনাপতি ও সৈন্য, এবং তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক দেশী সৈনিক কর্ম্মচারী ও সিপাহী মারা পড়ে; সবাই যে সম্মুখযুদ্ধে মারা পড়ে, তাহাও নয়; হঠাৎ অতর্কিত আক্রমণেও অনেকের প্রাণ যায়। তথাপি প্রতিবৎসরই ত শত শত হাজার হাজার ইংরেজ ও ভারতবাসী ভারতে ইংরেজ রাজের সেনাদলে প্রবেশ করিতেছে। মৃত্যুভয় তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিতেছে না।

সুতরাং মৃত্যুভয়ে লোকে পুলিশবিভাগে বা অন্যবিভাগে সরকারী চাকরীতে আর ঢুকিবে না, এমন মনে করা ভুল। এই-সব নরহন্তারা যে-দেশের যে-জাতির ও যে-শ্রেণীর লোক, পুলিশ কর্ম্মচারীরাও সেই দেশের সেই জাতির ও সেই শ্রেণীর লোক। একই রকমের মানুষদের মধ্যে, যাহারা খুন করে তাহাদের যদি দুঃসাহস থাকিতে পারে, তাহা হইলে যাহারা চাকরী করে, তাহাদের কর্ত্তব্যকার্য্য করিবার মত সাহস কেন থাকিবে না, তাহা বুঝা যায় না। তাহাদের সাহস যে আছে তাহা ত কয়েকটা খুনের পরও পুলিশ কর্ম্মচারীর অভাব না হওয়া দ্বারা এবং তাহাদের আচরণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে। এবম্বিধ হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাতের সময় যিনি যাহাই মনে করিয়া থাকুন, এখন অল্পবুদ্ধি লোকদেরও বুঝিবার সময় আসিয়াছে এবং বুঝিবার যথেষ্ট কারণও ঘটিয়াছে যে গুপ্ত খুনের দ্বারা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের ইংরেজ বা ভারতীয় কর্ম্মচারীর অভাব জন্মান অসম্ভব, এবং ইহা দ্বারা ইংলণ্ডেশ্বরের রাজত্ব অচল করা বা ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া অসম্ভব।

প্লীহা ফাটা। ইংরেজের পদাঘাতে বা মুষ্ট্যাঘাতে হতভাগা ভারতবাসীর প্রাণ-বিয়োগের মোকদ্দমা মাঝে মাঝে হয়; সম্প্রতিও একাধিক হইয়াছে। ইহার ফল সর্ব্বত্র, হয় অভিযুক্ত ইংরেজের বেকসুর খালাস বা সামান্য চড়টা চাপড়টা মারার মত দণ্ড। এইরূপ মোকদ্দমা হইলে স্বভাবতঃ এইরূপ মনে হয় যে, দেশী লোকে দেশী লোকে মারামারি দাঙ্গা হাঙ্গামা যত হয়, ইংরেজ ও দেশী লোকে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। অথচ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ঝগড়ার ফলে কোন দেশী লোকের পিলা কখনও ফাটিয়াছে বলিয়া ত শুনি নাই। দেশীতে দেশীতে এবং দেশীতে ইংরেজে বিবাদের ও মোকদ্দমার সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে কোন্ শ্রেণীর মোকদ্দমায় পিলা ফাটার অনুপাত কি, গবর্ণমেণ্ট তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেখাইলে ভাল হয়। হাঁসপাতালে এবং স্বাধীন চিকিৎসকদের কাছে নানা রকমের গুরুতর ও সাংঘাতিক আঘাতের চিকিৎসার্থ রোগী আসে, তাহার মধ্যে শ্বেতকায়দের হস্তপদাদির সংযোগ ব্যতীত কতগুলি পিলা-ফাটা রোগী আসে, তাহা জানিতে পারিলে ভাল হয়। আমরা নিজে ডাক্তার নই; কিন্তু ডাক্তারদের মুখে এরূপ রোগীর কথা কখনও শুনি নাই। হইতে পারে যে এই প্রকারের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ইংরেজ আসামী, সাক্ষী ইংরেজ ডাক্তার, এবং ইংরেজ জজ, সকলেই ভাল লোক। কিন্তু ভারতবাসীদের ধারণা এই যে প্লীহা-ফাটা এই-সকল দুর্ঘটনায় মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নয়, আসামীরা বাস্তবিক সম্পূর্ণ দোষী এবং তাহারা দেশী লোক হইলে তাহাদের গুরুতর দণ্ড হইত, সাক্ষী ইংরেজ ডাক্তারদের সাক্ষ্য বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য, এবং জজেরা স্বজাতির প্রতি টান বশতঃ অবিচার করেন। ভারত-বাসীদের এই ধারণা ভ্রান্ত হইতে পারে। কারণ স্বজাতি-বাৎসল্য বশতঃ ইংরেজদের মত আমাদেরও বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া সম্ভব; কিন্তু ধারণাটি যে আছে তাহা প্রকাশিত হওয়া ভাল। এই ধারণা দূর করা গবর্ণমেণ্ট যদি আবশ্যক মনে করেন ও তাহা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলে উহার অস্তিত্ব ও বদ্ধমূলতা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট গোপনে অনুসন্ধান করিতে পারেন।

এক যাত্রায় পৃথক্ ফল। ভারতবর্ষে বিচার-বিভ্রাট কেমন করিয়া ঘটে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কয়েক মাস পূর্ব্বে বজ্‌বজ্‌ পাটের কলের সন্নিহিত জমীর উপরিস্থ রাস্তায় কাহার অধিকার আছে, তাহা লইয়া ঝগড়া হয়। কলের এঞ্জিনীয়ার সিম্ অধীনস্থ কতকগুলি কুলিকে পুলিশের ক্ষমতা অগ্রাহ্য করিতে এবং ঘটনাস্থলে মোতাইন্ কয়েকজন কন্‌ষ্টেবলকে আক্রমণ করিতে হুকুম দেয়। তাহাতে সিম্ ও তাহার কুলিরা ফৌজদারী সোপর্দ্দ হয়। আলিপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার হয়। তিনি কুলিদিগকে জেলে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু সিমের কেবল জরিমানা করিয়াছেন। দণ্ডের পার্থক্যের কারণ বিচারক রায়ে নিম্নলিখিত রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

"But for his (Sim's) action there would probably have been no disturbance and it is a serious matter when a European of his position encourages coolies to

attack the police. I think, however, he acted suddenly without realizing the gravity of his action and, considering what imprisonment would mean to a man of his position, I think a substantial fine will meet the case."

নিম্ নিশ্চয়ই বলিবে যে কুলিদের চেয়ে তাঁর বুদ্ধি বেশী, বিবেচনা কৌ। সে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া হুকুম দিয়াছে, তাহার কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই; এই ওজুহাতে তাহার দণ্ড হইল কম। আর নিরক্ষর নির্ব্বোধ কুলিরা ইংরেজ মনিবের হুকুম তামিল করা নির্দ্দোষ ভাবিয়া কনষ্টেবলদিগকে আক্রমণ করিল বলিয়া তাহাদের দণ্ড হইল বেশী। তাহারা তাহাদের কাজের গুরুত্ব সিমের চেয়ে বেশী উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, জজ কি এইরূপ মনে করেন? তা নয়; সিমকে লঘু দণ্ড দেওয়ার কারণ এই যে তাহার পোজিশানের (অবস্থার) লোকের পক্ষে কারাদণ্ড বড় ক্লেশকর ও তাহাতে তাহার চাকরী যাইত! কিন্তু আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে আইন ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ও জাতিনিরপেক্ষ। আলিপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বোধ হয় তাহা স্বীকার করেন না। ন্যায়বিচারে সিমের দণ্ড কুলিদের চেয়ে বেশী হওয়া উচিত ছিল, অন্ততঃ সমান হওয়াও উচিত ছিল। কারণ সে-ই প্রধান দোষী, এবং তাহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিবার ক্ষমতাও তাহাদের অপেক্ষা বেশী। সে সচ্ছল অবস্থার লোক; অর্থদণ্ড তাহার পক্ষে মশার কামড়ের তুল্য।

ভারতে শিক্ষার বিস্তার। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে শিক্ষালয়ে যাইবার বয়সের (school-going ageএর) বালকবালিকাদের মধ্যে শতকরা ১৪·৮ জন ইস্কুলে যাইত, ১৯১২ তে ১৭·৭ জন যাইত। অর্থাৎ ৫ বৎসরে শতকরা ২·৯ (মোটামুটি ৩ জন) বেশী ছাত্র ও ছাত্রী ইস্কুলে যাইতেছে। শিক্ষার আদর্শ এই যে ১০০ জনের মধ্যে একশ জনই ইস্কুলে যাইবে। ধরা যাক্ যে এখন ১৮ জন যায়, এবং প্রতি পাঁচ বৎসরে তিন জন বাড়ে। তাহা হইলে প্রতি পাঁচ বৎসরে তিন জন করিয়া বাড়িয়া বাড়িয়া বাকী ৮২ জনের ইস্কুলে যাইতে আরও ১৩৭ বৎসর লাগিবে। অতএব ইহা বলিলে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অবিচার করা হইবে না যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত চেষ্টা হইতেছে না।

ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষের সহিত বড়োদার এ বিষয়ে তুলনা করিলে দেখা যায় যে তথায় ইস্কুলে যাইবার বয়সের শতকরা ৮০·৭ জন বালক এবং ৪১·৩ জন বালিকা ইস্কুলে যায়।

মোটামুটি বলিতে গেলে ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত হয়, এবং সকল ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে পাঠাইতে আরও দেড়শত বৎসর লাগিবে। অর্থাৎ সর্ব্বসমেত তিন শত বৎসরে গবর্ণমেণ্ট দেশে সম্যকরূপে শিক্ষাবিস্তার করিতে সমর্থ হইবেন। এই তিনশত বৎসরের কার্য্যের সঙ্গে জাপানের গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের তুলনা করা যাক্। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জাপান-সম্রাটের একটি শিক্ষাসম্বন্ধীয় অনুশাসন প্রচারিত হয়। তাহার একটি স্থানে সম্রাট বলিতেছেন: "It is designed henceforth that education shall be so diffused that there may not be a village with an ignorant family, nor a family with an ignorant member." অর্থাৎ "অতঃপর এইরূপ অভিপ্রায় করা হইতেছে যে শিক্ষা এ প্রকারে বিকীর্ণ হইবে যাহাতে কোনও গ্রামে একটিও মূর্খ পরিবার না থাকে, এবং কোনও পরিবারে এক জনও মূর্খ লোক না থাকে"। এই কথাগুলি সম্বন্ধে ভারত-গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত অধ্যাপক ডবলিউ, এইচ, শার্প প্রণীত "The Educational System of Japan" নামক পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে, "ambitious words, which nevertheless Japan has come as near to fulfilling as any nation could have done in 30 years;" "কথাগুলি উচ্চাকাঙ্ক্ষাব্যঞ্জক বটে; তথাপি ৩০বৎসরে জাপান এই উদ্দেশ্য, যে-কোনও জাতির পক্ষে যতটা সম্ভব, সিদ্ধ করিয়াছে।" ২৯ পৃষ্ঠায় শার্প সাহেব আবার বলিতেছেন—"Over 90 per cent. of the children of school age, boys and girls, are attending the prescribed course." "স্কুলে যাইবার বয়সের ছেলেমেয়েদের শতকরা নব্বই

জনের উপর লেখাপড়া শিখিতেছে।" ইহা ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের কথা। তাহার পর ১০ বৎসরে আরও উন্নতি হইয়াছে। অতএব ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে জাপান-গবর্নমেণ্ট চল্লিশ বৎসরে যাহা করিয়াছেন, বর্ত্তমানে ভারতে শিক্ষাবিস্তারের মন্থর গতি অনুসারে বিচার করিলে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাহা করিতে তিনশত বৎসর লইবেন; অর্থাৎ বিদ্যোৎ-সাহিতায় ভারত গবর্ণমেণ্ট ২৬০ বৎসর পশ্চাতে পড়িয়াছেন।

স্কুলবিহীন গ্রাম ও নগর। ইংরেজ-শাসিত ভারতে ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে ১৭৬,৪৪৭টি শিক্ষালয় ছিল। তন্মধ্যে ১৬০,৩৩৪টি ছাত্রদের জন্য, ১৬১১৩টি ছাত্রীদের জন্য। এই স্কুলগুলি দ্বারা ৫৮২,৭২৮টি গ্রাম এবং ১৫৯৪টি সহরের (অর্থাৎ ৫০০০ বা তদূর্দ্ধসংখ্যক অধিবাসিযুক্ত স্থানের) শিক্ষাকার্য্য চলিত। অতএব ছাত্রদের প্রত্যেক স্কুলে ৪টি গ্রামনগরের এবং ছাত্রীদের প্রত্যেক স্কুলে ৩৬টি গ্রামনগরের শিক্ষাকার্য্য চালাইতে হইত। সোজা ভাষায় ইহার মানে এই যে প্রতি ৪টি গ্রামনগরের মধ্যে ৩টিতে ছাত্রবিদ্যালয় নাই, এবং প্রতি ৩৬টি গ্রামনগরের মধ্যে ৩৫টিতে ছাত্রীবিদ্যালয় নাই। ইহা কেবল একটা গড় মাত্র। বাস্তবিক ইহা দ্বারা যাহা বুঝা যায়, দেশে শিক্ষার অবস্থা তাহা অপেক্ষা খারাপ। কারণ, যদি সৌভাগ্যশালী গ্রামনগরগুলির প্রত্যেকটিতে কেবল ১টি করিয়া স্কুল থাকিত, তাহা হইলে বলা যাইত যে ঠিক তিন-চতুর্থাংশ স্থানে ছাত্রবিদ্যালয় নাই, এবং ৩৫-ষট্‌ত্রিংশতম স্থানে ছাত্রীবিদ্যালয় নাই। কিন্তু বাস্তবিক অনেক শহরে এবং কোন কোন গ্রামে একাধিক ইস্কুল আছে। সুতরাং সম্পূর্ণ স্কুলবিহীন স্থানের অনুপাত আরও বেশী।

শার্প সাহেবের পুস্তক হইতে দেখা যায় যে জাপানে শহর ও গ্রামের সংখ্যা ১৪৫৮০ (৪০ পৃষ্ঠা), এবং সর্ব্বপ্রকার শিক্ষালয়ের সংখ্যা ৩০,৪২০ (৪৯০ পৃষ্ঠা)। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে জাপানে স্কুলবিহীন গ্রাম বা নগর নাই।

ভারতবর্ষের বড়োদারাজ্যের ১৯১১-১২র শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় যে উহার ৩০৯৫টি গ্রাম ও নগরের মধ্যে ২১১৯টিতে স্কুল আছে; স্কুলগুলির সমগ্র সংখ্যা ২৯৬১। বাকী ৯৭৬টি গ্রামের মধ্যে ৭০৯টিতে মোটে ২১৪ ঘর বসতি আছে; তাহারাও আবার যাযাবর, স্থায়ী বাসিন্দা নহে; সুতরাং তথায় স্কুল চলিতে পারে না। ৬০টি গ্রামে চাষে অজন্মা হওয়ায় স্কুল বন্ধ করিতে হইয়াছিল; সেগুলিতে আবার স্কুল খোলা হইয়াছে। অবশিষ্ট ১৫৬টি গ্রামে শিক্ষাবিভাগ, যেখানেই অন্ততঃ ১৫টি ছাত্র-ছাত্রী পাইবেন, সেখানেই স্কুল খুলিবার চেষ্টায় আছেন।

স্বদেশপ্রেমিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের, তাঁহাদের নিজের নিজের জেলায় কোন্ কোন্ স্থানে একটিও বালকবিদ্যালয় এবং বালিকাবিদ্যালয় নাই, অবিলম্বে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়া, বিদ্যালয় খুলিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সব উন্নতির গোড়ায় দৈহিক বল ও স্বাস্থ্যের পরই শিক্ষা। অতএব শিক্ষার অভাব মোচনে সকলে বদ্ধপরিকর হউন। বাঙ্গলা দেশের কয়েকটি জেলার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের স্কুলের সংখ্যা আমরা গত আগষ্ট মাসে ডিরেক্টর সাহেবের আফিস হইতে আনাইয়াছিলাম। ঠিক্ দিয়া স্কুলসমূহের মোট সংখ্যা স্থির করিয়াছি। এ-সকল জেলার গ্রামনগরের সংখ্যা ও স্কুলের সংখ্যা নীচের তালিকায় দিলাম। গ্রামনগরের সংখ্যা ১৯০১ সালের সেন্সস্ রিপোর্ট অনুসারে দিলাম; এই সংখ্যার বিশেষ হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। তুলনার সুবিধার্থ বড়োদার সংখ্যাগুলিও এখানে জুড়িয়া দিলাম।

জেলা	গ্রামনগরের সংখ্যা	স্কুলের সংখ্যা
মেদিনীপুর	৮৪৭১	৪০৪৫
২৪পরগণা	৫১০৭	১৭৫৯
রংপুর	৫২১৮	১২৫৯
ঢাকা	৭২৬৫	২৩৪৫
মৈমনসিং	৯৭৭৮	২৫৪৭
ফরিদপুর	৫২৮৫	১৫৮৪
বাখরগঞ্জ	৪৬১৭	৩২০১
ত্রিপুরা	৫৩৬৪	২১৬০
বড়োদা	৩০৯৫	২৯৬১

এই সব জেলার প্রত্যেকটিরই লোকসংখ্যা বড়োদা রাজ্য অপেক্ষা বেশী। জেলাগুলির মধ্যে বাখরগঞ্জেই বেশীর ভাগ স্থানে স্কুল আছে, কিন্তু সেখানেও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থানে স্কুল নাই। বড়োদার অবস্থা এ জেলা অপেক্ষাও খুব ভাল। শিক্ষায় বঙ্গদেশ আর সকল প্রদেশ অপেক্ষা অগ্রসর। এহেন বঙ্গের জেলাগুলির এই অবস্থা! ২৪পরগণা জেলা রাজধানীর নিকটতম। তাহার ৫১০৭টি গ্রামনগরে মোটে ১৭৫৯টি স্কুল আছে, অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ স্থানে স্কুল নাই।

জাতীয় বিশেষত্ব ও মানবের একত্ব। পরস্পর খুব দূরবর্ত্তী দুটি দেশের দুটি মানুষের কঙ্কাল যদি পাশাপাশি রাখিয়া দেখা যায়,

তাহা হইলে মোটামুটি দুইটি এক বলিয়া মনে হইবে; সূক্ষ্ম প্রভেদ মাপ জোখ করিয়া বৈজ্ঞানিক ধরিতে পারিবেন। মানুষের শরীরের মূলগত ঐক্য তাহার চামড়ার রং, চুলের রং, মুখের গড়ন, ভাষা ও পোষাকে নষ্ট করিতে পারে না। মানুষের শরীরের যেমন প্রধানতঃ ঐক্য আছে, এবং অবান্তর বিষয়ে অনৈক্য আছে, তাহার হৃদয়মনেরও এইরূপ ঐক্য আছে। এই ঐক্য না থাকিলে, সমুদয় বিজ্ঞানের মূলভিত্তিস্বরূপ তর্কশাস্ত্রের নিয়মগুলি সব দেশে এক হইত না। ভারতবর্ষের পাটীগণিত, জ্যামিতি, ইত্যাদিতে যাহা সত্য, অন্যান্য দেশের তত্তৎবিদ্যাতেও তাহা সত্য। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক একই প্রকার নিয়মাধীন যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া এই-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বুদ্ধি দ্বারা মানুষ যাহা বুঝে বা আবিষ্কার করে, মানুষ যাহা চিন্তা করে, স্থূলত তাহার একত্ব যেমন সব দেশে লক্ষ্য করা যায়, মানুষের হৃদয়ের ভাবেরও তেমনি মোটামুটি ঐক্য আছে। ইতিহাসে ও কাব্যে সাহস, বিশ্বস্ততা, সতীত্ব, একনিষ্ঠ প্রেম, দেশভক্তি, ইহার দৃষ্টান্ত দেখিলে এক দেশের লোক প্রশংসা করে, এবং অন্য কোন দেশের লোক নিন্দা করে, এমন কেহ কখন দেখিয়াছেন কি? তবে ইহা ঠিক বটে যে কোন দেশের লোক কোন একটি গুণের যত ভক্ত, অন্য আর এক দেশের লোক তাহার ততটা অনুরাগী না হইতে পারে। যেমন শরীর সম্বন্ধে কোন জাতি কটা চোখ, কেহ বা কাল চোখ ভাল বাসে; কিন্তু চোখ থাকাটারই বিরোধী কোন জাতি নাই।

মানুষের চিন্তা ও ভাবের মূলতঃ ঐক্য থাকাতেই দেখা যায়, যে, প্রাচ্য এশিয়াখণ্ডের খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পাশ্চাত্য ইউরোপে আমেরিকায় প্রচারিত হইয়াছে; পাশ্চাত্য ইংরেজ জাতি প্রাচ্য নানা প্রাচীন শাস্ত্রের অনুবাদ (The Sacred Books of the East series) আদরের সহিত পড়িতেছেন। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ও ব্রাহ্ম প্রচারকদের কথা শুনিবার লোকের একান্ত অভাব ইউরোপ আমেরিকায় হয় নাই। আবার পাশ্চাত্যদেশের প্রচারকেরা আসিলে আমাদের দেশে তাঁহাদের শ্রোতার অভাব হয় না। আমাদের সাহিত্য পাশ্চাত্যদেশে আদৃত হয়, পাশ্চাত্য সাহিত্য আমাদের দেশে আদৃত হয়। মানুষের মনের এই ঐক্য থাকায় প্লেটো বা শঙ্করাচার্য্য যাহা চিন্তা করিয়াছেন, আমরা তাহা চিন্তা করিতে পারি; বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি যাহা অনুভব করিয়াছেন, আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি; যে-কোন দেশে ও যে-কোন যুগে কোনও মানুষের জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি।

আমরা জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষার জন্য সাতিশয় আগ্রহান্বিত; কিন্তু বিশেষত্ব রক্ষা করিতে গিয়া বিশ্বমানবের এই ঐক্য ভুলিয়া যাইতে পারি না। ঐক্যটাই বড় জিনিষ, বিশেষত্ব তাহার নীচে। তবে যে বিশেষত্ব রক্ষার জন্য যত চেষ্টা হয়, ঐক্য উপলব্ধি ও রক্ষা করিবার তত চেষ্টা হয় না, তাহার কারণ এই যে এখনও জাতিতে জাতিতে বিরোধ এবং ভক্ষ্য-ভক্ষক সম্বন্ধ থাকায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতিরা আত্মরক্ষার জন্য জাতীয়তা রক্ষার জন্যই অধিক প্রয়াসী হয়। বিশ্বের সর্ব্বত্র দেখা যায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। মানবজাতিতেও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য লক্ষিত হয়। এই বৈচিত্র্য ঐক্য নষ্ট করে না, কেবল একঘেয়েমি নষ্ট করে।

অনেকে মনে করেন, ভারতবর্ষের বিশেষত্ব রক্ষার জন্য তাহাকে সর্ব্বপ্রকার বাহ্য সংস্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া রাখা দরকার। প্রথমতঃ বুঝা আবশ্যক এই বিশেষত্বটি কি? ইহা একতারার ধ্বনির মত একটি অমিশ্র জিনিষ নয়; বহুতারবিশিষ্ট যন্ত্রের যৌগিক ধ্বনির মত। এখানে অনার্য্য আর্য্য, হিন্দু ম্লেচ্ছ, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান, মুসলমান, সবাই যাঁহার যাহা দিবার ছিল, দিয়াছেন। কাহাকেও একবারে বাদ দিবার যো নাই। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধতম বা মহত্তম ১৫।২০ জন লোকের নাম করিতে গেলেই দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের জীবনসঙ্গীতে নানা সুর মিশিয়া বাজিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষের বিশেষত্ব ঠুনকো জিনিষ নয়। বহুবহুশতাব্দীব্যাপী ভারতেতিহাসে বিদেশীর অনেক প্রচণ্ড আঘাতে উহা চুরমার হয় নাই; উহা কিছু পরিবর্ত্তিত, কিছু পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়াছে। কারণ বাহিরের জিনিষ আত্মসাৎ করিয়া নিজের অঙ্গীভূত করিবার ক্ষমতা উহার যথেষ্ট আছে। মুসলমান রাজত্বের প্রথম অবস্থায় ভারত যতটা ছিন্ন ভিন্ন ছিল, মুসলমান-প্রভাবের শেষদশায় দেশের তদপেক্ষা একত্ব ও সংহতি সাধিত হইয়াছিল। আবার ইংরেজের আগমনকালে আমরা আমাদের ঐক্য ও বিশেষত্ব ততটা বুঝি নাই, এখন যতটা বুঝিতেছি।

তৃতীয়তঃ, বিদেশীর সংস্পর্শ হইতে দূরে বাস যদি বাঞ্ছনীয় হইত (আমরা উহা বাঞ্ছনীয় মনে করি না), তাহা হইলেও উহা করা অসাধ্য। বিদেশীর সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্যপ্রণালী, শিক্ষাপ্রণালী আমাদের এই দেশে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিয়াছে। বিদেশীর প্রভাবের বাতাসে দিনরাত নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া, কেবল সমুদ্র-যাত্রা বন্ধ করিলেই বিদেশীর প্রভাব হইতে মুক্ত থাকা যাইবে মনে করা মহা ভ্রম। আমরা কলার নেকটাই না পরিলেও সাধারণতঃ যে কোট কামিজ পরি, তাহা

বিদেশী, জুতার আকৃতিটা বিদেশী, ঘরের আসবাব বিদেশী ধাঁচের। দোয়াত, কলম, কাগজ, কেতাব, কোন্ দেশী কথা? চোগা, চাপকান, শামলা ইত্যাদির নামেই বুঝা যায় যে তাহারা খাঁটি দেশী নয়। ধুতি ও উত্তরীয় সম্ভবতঃ খাঁটিদেশী। বাহিরের অঙ্গ-সজ্জা ও গৃহসজ্জার মত মনের সজ্জার মধ্যেও বিদেশী জিনিষ পণ্ডিতুদের বিশ্লেষণে ধরা পড়ে। আসল কথা, বহু প্রাচীন কাল হইতে নানা দেশের মধ্যে আদান প্রদান চলিয়াছে; ইহাতে কাহারও কোন অগৌরব নাই। বিশেষতঃ আমরা জগৎকে বহু অমূল্য বস্তু দিয়াছি। কিছু লইয়া থাকিলে তাহাতে অসম্মান নাই।

চতুর্থতঃ, যে যে দেশ বিদেশীর সংস্পর্শ পরিহার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা সফলপ্রযত্ন হয় নাই; হয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, নয় স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া সে নীতি পরিত্যাগ করিয়াছে। যেমন ভারতবর্ষ, চীন, জাপান।

বিদেশীর কত জাতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র যাইতেছে। সকলের সাহিত্য, শিল্প, সভ্যতা হইতে রত্ন সংগ্রহ করিতেছে। তাহারা ত নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব হারাইতেছে না। সত্য বটে আমরা বাহিরে তত শক্তিশালী নহি। কিন্তু প্রকৃত শক্তির উৎস সকলেরই আত্মায় আছে। আত্মাকে বলিষ্ঠ করিয়া আমরা যেখানেই যাই, আমাদের জাতীয়তা নষ্ট হইবে না। পক্ষান্তরে দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি ভারতবর্ষে থাকিয়াই সম্পূর্ণরূপে জাতীয়তা হারাইতে পারে, এবং অনেকে হারাইতেছে।

ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি করিবে, বা ছোঁয়াচে রোগের বীজ শরীরে ঢুকিয়া যাইবে, এই ভাবিয়া সুস্থদেশ ও সুস্থপ্রকৃতির কোন মানুষ কি ঘরের বাহিরের মুক্ত বায়ু সেবনে বিরত থাকে? তাহাতে বলবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষা হয় কি? জাতীয় বলবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অবশ্যকর্ত্তব্য।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন। গত ২৭শে চৈত্র কলিকাতার টাউনহলে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয়। যাঁহারা এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন যে উহা অনাবশ্যক দীর্ঘ হইয়াছিল। শৃঙ্খলা, সুব্যবস্থা এবং গাম্ভীর্য্যের অভাবও লক্ষিত হইয়াছিল। বঙ্গের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎপরে অনেক বক্তার বক্তৃতা ও কবিতাদি পাঠের পর সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিভাষণ পঠিত হয়।

অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ ও সুখপাঠ্য। তাঁহার ভাষাও বেশ বিশদ। ইহাতে তিনি ২৪ পরগণা জেলা ও কলিকাতার ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন, এবং ঐ জেলার ও রাজধানীর প্রধান প্রধান সাহিত্যিকগণের পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ প্রবন্ধের সারসংগ্রহ করা সুসাধ্য নয়। তাহা করিবার সময়ও নাই। সাহিত্যের ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

> দেশের লোককে ভাল ও মন্দ পথে লইয়া যাইবার বিষয়ে সাহিত্যের ক্ষমতা প্রভূত। ...... ভিক্ষায় আত্মসম্মান রক্ষা হয় না। তাই আপনাদিগকে বলিতেছিলাম, বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বারা আপনারা বঙ্গবাসীদিগকে সর্ব্বপ্রথমে 'পরিশ্রমের মাহাত্ম্য' (Dignity of Labour) শিক্ষা দিউন। ভিক্ষা হইতে লোককে বিরত করুন।

চব্বিশপরগণার ইতিহাস সম্বন্ধে বলেন :—

> চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত ২৪ পরগণা জেলাকে বুড়নিয়ার দেশ বলিত, অর্থাৎ বর্ষাকালে উহা জলে বুড়িয়া যাইত। এখন বুড়নিয়ার দেশ আছে, কিন্তু তাহা ২৪ পরগণা হইতে কিছু দূরে। বুড়িয়া যাইত বলিয়া যে দেশে লোক ছিল না বা সাহিত্যচর্চ্চা হইত না, এমন নয়। প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ২৪পরগণার নানাস্থানে বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল।

বাংলা গদ্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন :—

> রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধে কোন পুস্তক লিখিলে গৌরীশঙ্কর তাহার প্রতিবাদ করিতেন। রামমোহন রায়ও আবার তাহার জবাব দিতেন। এইরূপে যে-সকল গ্রন্থ লিখিত হইত, লোকে আগ্রহসহকারে সেইগুলিই পাঠ করিত। কেহ বা রামমোহনের জয় দিত, কেহ বা গৌরীশঙ্করের জয় দিত। বলিতে গেলে বাঙ্গলায় গদ্যগ্রন্থ ও বিচারগ্রন্থের এই উৎপত্তি।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিয়াছেন :—

> অনেকে মনে করেন সমুদ্রযাত্রা যখন এতই নিষেধ, তখন বাঙ্গালীরা কি করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল? কিন্তু বাস্তবিক সমুদ্রযাত্রা নিষেধ নহে। কল্পসূত্রকার ঋষি বৌধায়ন বলিয়া গিয়াছেন যে আর্য্যাবর্ত্তবাসীর পক্ষে সমুদ্রযাত্রায় কোন দোষ নাই; যদি কোন দোষ থাকে সে দাক্ষিণাত্যে। সুতরাং আর্য্যাবর্ত্তবাসীরা প্রাচীনকালে অবাধে সমুদ্রযাত্রা করিত এবং বিদেশে গিয়া মোকাম করিত এবং তথায় বাস করিত।

বঙ্গের পূর্ব্বগৌরব সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। সমুদয় উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। গোড়ার অংশটি এই :—

> আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটী আত্মবিস্মৃত জাতি। বিষ্ণু যখন রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কোন ঋষির শাপে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ধরাধামে আসিয়া ঈশ্বরেরই লীলা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে ঈশ্বর এ কথা তিনি কখনও বলেন নাই, কার্য্যে বা কর্ম্মে কখনও দেখান‌ও নাই এবং কখনও তিনি স্মরণ করেন নাই। বাঙ্গালীও তেমনি। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে একজন সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার জমি এত উর্ব্বরা, বাঙ্গালায় এত শস্য উৎপন্ন হয়, বাঙ্গালায় এত বড় বড় নদী আছে, নৌকাযোগে বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এত সহজে যাওয়া

যায়, ইহার জঙ্গলে এক অদ্ভুত পদার্থের উৎপত্তি হয়, ইহাতে এত লোক আছে, তাহারা এইরূপ পরিশ্রমী ও মিতাচারী যে বোধ হয়, বাঙ্গালা অতি প্রাচীনকালে সভ্যতার অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। যে-কেহ মন দিয়া বাঙ্গালার কথা ভাবিয়াছে, বাঙ্গালাকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাকেই বলিতে হইবে বাঙ্গালা একটি অতিপ্রাচীন সভ্যদেশ।...যখন আর্য্যগণ মধ্য-এসিয়া হইতে পঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন, তখনও বাঙ্গালা সভ্য ছিল। আর্য্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হন, তখন বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহারা বাঙ্গালীকে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য এবং ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতে বাঙ্গালাকে ঘটোৎকচের লীলাক্ষেত্র বলা হয়।

বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা জলে ও স্থলে এত প্রবল হইয়াছিল যে, বঙ্গরাজের একটি ত্যাজ্যপুত্র সাত শত লোক লইয়া নৌকাযোগে লঙ্কাদ্বীপ দখল করিয়াছিলেন। তাঁহারই নাম হইতে লঙ্কাদ্বীপের নাম হইয়াছে সিংহলদ্বীপ। রামায়ণে লঙ্কাদ্বীপের নাম সিংহল দ্বীপ কোথাও নাই, কিন্তু ইহার পরে উহার লঙ্কা নাম উঠিয়া গিয়া ক্রমে সিংহল নাম সংস্কৃত সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বড় বড় খাঁটি আর্য্যরাজগণ এমন কি যাঁহারা ভারতবংশীয় বলিয়া আপনাদের গৌরব করিতেন, তাঁহারাও বিবাহসূত্রে বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি রাজার জন্য নহে, রাজনীতিতে বঙ্গ কখনই তত প্রবল হয় নাই। খ্রীষ্টীয় পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ও আর একবার খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বাঙ্গালা নানা দেশ জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম বাঙ্গালার গৌরব রাজনীতিতে নহে, যুদ্ধবিগ্রহেও নহে। বাঙ্গালার গৌরব শিল্পে, বাণিজ্যে কৃষিকার্য্যে এবং উপনিবেশ সংস্থাপনে।

শেষের কিয়দংশও উদ্ধৃত করিতেছি।

আবার বলি আমরা বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি; আমাদের পূর্ব্ব-গৌরব আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। এককালে আমরা শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিকার্য্যে ও উপনিবেশস্থাপনে দক্ষিণ এসিয়ার মধ্যে প্রধান জাতি ছিলাম। ধর্ম্মপ্রচারেও বাঙ্গালীরা বড় কম ছিল না।...বাঙ্গালার ইতিহাস অতি অদ্ভুত পদার্থ। এই ইতিহাসের মূলতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য শুদ্ধ ঘরে বসিয়া পুঁথি পড়িলে হইবে না। নিকটবর্ত্তী সকল দেশেই যাইতে হইবে। Burma, Cambodia, Anam, মালয় উপদ্বীপ, শ্যাম দেশ, যাবা দ্বীপ, তিব্বত, মঙ্গোলীয়া, এমন কি চীনদেশ অবধি যাইতে হইবে, এবং যতই অন্বেষণ হইবে ততই বাঙ্গালীর গৌরবের নূতন নূতন কথা জানা যাইবে, বাঙ্গালীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে, বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নিতান্ত ভীরু এবং অলস ছিলেন না।

বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের কার্য্যারম্ভ লর্ড কারমাই-কেলের দ্বারা করাইবার প্রয়োজন বা সার্থকতা আমরা বুঝিতে পারি নাই। তাঁহাকে কোন প্রকার অসম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা একথা লিখিতেছি না। তিনি অতি সদাশয়, ভদ্রব্যক্তি। সাহিত্যসম্মিলনে উপস্থিত থাকিবার জন্য দার্জ্জিলিং-যাত্রা পিছাইয়া দিয়া তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছেন, এবং এই গ্রীষ্মের দিনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সভায় উচ্চারিত বাক্যা-বলী সমস্ত না বুঝিয়াও ধৈর্য্যসহকারে বসিয়া ছিলেন তাঁহার মত নানাকার্য্যে ব্যস্ত অবসরবিহীন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পক্ষে ইহা অপেক্ষা সৌজন্য আর কি হইতে পারে? তিনি যদিও নিজের আনন্দ এবং কর্ত্তব্যপালনের জন্য বাংলা শিখিতেছেন, তথাপি আমরা তাঁহার আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়াসের জন্য তাঁহার প্রতি প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন করি। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনে তাঁহাকে প্রথম স্থান দিবার কোনও কারণ দেখিতেছি না। লর্ড মর্লীর ভাষায়, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ব্রিটিশসাম্রাজ্যবাসী আমরা সকলেই "equal subjects of the King," "রাজার সমান প্রজা"। যিনি যে রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সেই কার্য্যের উপ-যোগী সম্মান ও বাধ্যতা আমাদের নিকট হইতে পাই-বেন। ইহার বেশী তাঁহাদের কোন পাওনা নাই, আমাদেরও কোন দেয় নাই, লর্ড কারমাইকেলের মত লোক সম্ভবতঃ চানও না। তাহার পর অবশ্য সামাজিকতা আছে। সেখানে কিন্তু সমানে সমানে ব্যবহার। ঠিক এই আদর্শ অনুসারে আমরা যে চলিতে পারি না, সেটা আমাদের দুর্ব্বলচিত্ততা, স্বার্থান্বেষণ বা চাটুকারিতার জন্য।

সাহিত্যে যিনি বড়, তিনি সাহিত্যিক সভায় উচ্চ আসন পাইবেন। এখানে অন্য কোনও কারণের প্রাধান্য হওয়া অবাঞ্ছনীয়। হালহেড্ বা তাঁহার মত আর কোনও ইংরেজের পুনরাবির্ভাব হইলে আমাদের এবম্বিধ আপত্তির কারণ হইত না। ইংরেজ বা শাসনকর্ত্তা হইলেই তাঁহার সর্ব্ববিষয়িণী যোগ্যতা জন্মে না।

সত্য বটে লর্ড মর্লী যে, সকলেই রাজার সমান-প্রজা, বলিয়াছেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাহার এখনও সর্ব্বত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা চাকরীর বেলায় যে বৈষ-ম্যের তীব্র প্রতিবাদ করি, ভারতবাসীর জন্ম-ও-জাতিগত নিকৃষ্টতা ধরিয়া লওয়ায় ক্ষুণ্ণ হই, আমরা সামাজিক নানা ব্যাপারে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে নিজে উপযাচক হইয়া প্রকারান্তরে কেন সেই নিকৃষ্টতা নিজেদের ঘাড়ে তুলিয়া লই? দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেকার রাষ্ট্রীয় পরাজয়, জীবনের সর্ব্ববিভাগব্যাপী পরাভব নহে।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু টাকা পাইয়া থাকেন বটে। তাহা লওয়া বাঞ্ছনীয় কি না, তাহার আলোচনা এখানে করিব না। কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ এবং সাহিত্যসম্মিলন এক জিনিষ নয়। সুতরাং কৃতজ্ঞতার দিক্ দিয়াও কোনও রাজপুরুষকে রাজপুরুষ বলিয়া সাহিত্য সম্মিলন যজ্ঞে পৌরোহিত্যে বৃত করিবার কারণ দেখিতেছি না। আমাদের বিবেচনায় লর্ড কারমাইকেলকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া হইয়াছে।
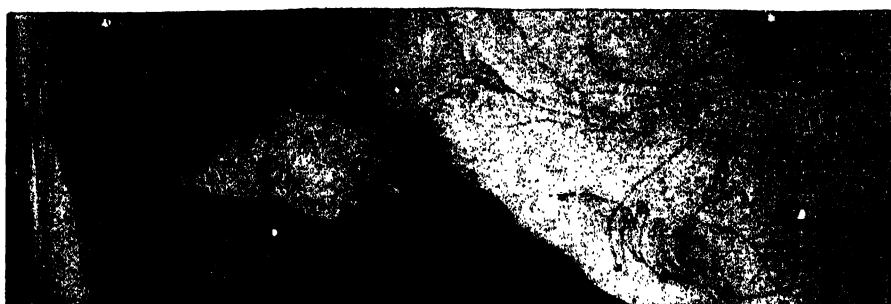
গান

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি
বেলাশেষের তান।
পথে চলি, পথিক শুধায়
"কি নিলি তোর দান?"
দেখাব যে সবার কাছে
এমন আমার কিবা আছে,
সঙ্গে আমার আছে শুধু
এই ক'খানি গান।
ঘরে আমার রাখতে যে হয়
বহু লোকের মন;—
অনেক বাঁশি, অনেক কাঁসি,
অনেক আয়োজন।
বঁধুর কাছে আসার বেলায়
গানটি শুধু নিলেম গলায়,
তারি গলার মাল্য করে
করব মূল্যবান।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমুদ্র-যাত্রা

অধুনা শিক্ষালাভার্থ ইংলণ্ড, জর্ম্মনি, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে গমনের প্রবৃত্তি বাঙ্গালী যুবকদিগের মধ্যে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক বাঙ্গালী যুবক সোৎসাহে পাশ্চাত্যদেশে যাত্রা করিতেছেন; অনেকে শুধু উপায়াভাবে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন। সুতরাং সমুদ্রযাত্রার ঔচিত্যানৌচিত্য বাঙ্গালীজাতির বিশেষ বিবেচ্য হইয়া উঠিয়াছে। রক্ষণশীল সম্প্রদায় সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন, যুক্তিবাদী উন্নতিপ্রয়াসীগণ সমুদ্রযাত্রার কালোচিত আবশ্যকতা ও অনিবার্য্যতা দর্শনে শাস্ত্রের নিষেধ বা বিধির প্রতি কোনও লক্ষ্য করিতেছেন না। পরন্তু মধ্যপন্থী এক সম্প্রদায় যুক্তি দ্বারা সমুদ্রযাত্রার বৈধতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কল্পনায় অকৃতনিশ্চয় হইয়া আছেন। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের জন্য আমরা এই প্রবন্ধে সমুদ্রযাত্রার শাস্ত্রীয়তা ও রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মতের শাস্ত্রীয়-ভিত্তিহীনতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব।

হিন্দুশাস্ত্র সামান্য বিষয় নহে। পুরাণাতীত বৈদিকযুগ হইতে নিরন্তর বর্দ্ধিতায়তন সুবিপুল শাস্ত্রপ্রবাহ ক্রম-পরিবর্ত্তিত ধারায় বর্ত্তমানে আসিয়া মিশিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে তথাপি এই ক্রমবর্দ্ধমান প্রবাহের বিরতি নাই। বিশাল অরণ্যানীর যেমন কোথাও অতিকায় মহীরুহ, কোথাও পুষ্পতরু, কোথাও কণ্টকলতা, কোথাও বা সামান্য তৃণ-গুল্মাদি বর্ত্তমান, হিন্দুশাস্ত্রারণ্যেরও সেই অবস্থা। তাই অগণিত শাস্ত্ররাশি হইতে শাস্ত্রকারগণের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া ইতর ত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্তুত সঙ্গত শাস্ত্র-বিধির অন্বেষণই একমাত্র কর্ত্তব্য ও সার্থক প্রয়াস। এই প্রবন্ধে আমরা তাহাই করিব।

মনু বলিতেছেন—

> বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
> এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥
> মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ শ্লোক।

বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মপ্রিয়, ধর্ম্মের এই চারি প্রকার সাক্ষাৎ লক্ষণ কথিত হইয়াছে।

মনু সদাচারেরও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

> সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
> তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ ২—১৭।
> তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্য-ক্রমাগতঃ।
> বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥ ২—১৮।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী দেবনির্ম্মিত ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ও সঙ্কীর্ণ বর্ণ-সমূহের পরম্পরাগত যে আচার, তাহাই সদাচার।

অতএব মনুর মতে ধর্ম্মের ভিত্তি চারিটী;—(১) বেদ; (২) স্মৃতি; (৩) ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশের আচার; এবং (৪) আত্মপ্রিয়, বা যাহা নিজ আত্মার তুষ্টিদায়ক, অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা যাহার ঔচিত্য উপলব্ধি হয়। এই প্রবন্ধে আমরা চতুর্থটীর বিষয় বিশেষ-কিছু আলোচনা করিব না।

যাজ্ঞবল্ক্য, পুরাণকেও ধর্ম্মভিত্তি বলিয়াছেন। যথা—

পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, ১—৩।

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও স্মৃতি, এই চতুর্দ্দশ বিদ্যাও ধর্ম্মের ভিত্তি।

পুরাণ সংখ্যায় বহু, স্মৃতিপ্রবর্ত্তক ঋষিও বহু। সুতরাং শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতির বিরোধ অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। সকলেই জানেন 'বেদাঃ বিভিন্নাঃ, স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ, নাসৌমুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।' কাজেই পরস্পরবিরোধী শাস্ত্রসমূহের সমন্বয়-সাধন বা তাদৃশস্থলে বিধেয় নির্দ্দেশের জন্য শাস্ত্রকারগণকে ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। এই ব্যবস্থাকে ইংরেজের ভাষায় হিন্দুশাস্ত্রের General Clauses Act বা সর্ব্ববিধি-নিয়ামক বিধান বলা যায়। তাহা এই—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥

ব্যাসসংহিতা—১—৪।

যখন বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বচনের বিরোধ দৃষ্ট হয়, তখন বেদই প্রমাণ; কিন্তু স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধস্থলে স্মৃতিই বলবৎ হইবে।

অতএব আমরা দেখিতেছি বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধস্থলে শ্রুতির বিধানই সর্ব্বতোভাবে মান্য। যে বিষয়ে শ্রুতিতে ব্যবস্থা আছে, সে বিষয়ে স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রুতিরই অনুসরণ করিতে হইবে। যে বিষয়ে শ্রুতি নির্ব্বাক্, সুধু সেই বিষয়ে স্মৃতি মান্য। স্মৃতিতে ব্যবস্থা থাকিলে পুরাণের তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা গ্রাহ্য নহে। যেস্থলে শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই নির্ব্বাক্, সুধু তথায় পুরাণের বিধি বলবৎ হইতে পারে। আর যদি কোন শাস্ত্রে কোন ব্যবস্থা না থাকে, তবে সদাচার বা ব্রহ্মাবর্ত্ত-দেশপ্রচলিত আচার অনুসরণ করিতে হইবে। যদি বিষয়-বিশেষে সদাচারও পন্থানির্দ্দেশ না করে, তবে আত্মপ্রিয়ই কর্ত্তব্য, অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে। ইহাই ঋষিগণ-বিহিত শাস্ত্র-ব্যাখ্যা-নীতি।

উল্লিখিত ব্যাখ্যানীতি হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে শ্রুতিতে সমুদ্রযাত্রা বিহিত হইয়া থাকিলে, স্মৃতি বা পুরাণের শত নিষেধ সত্ত্বেও তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইতে পারে না। অতএব সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে শ্রুতির মতামত সংগ্রহ করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু তৎপূর্ব্বে শ্রুতির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আর একটী প্রাচীন ঋষি-নির্দ্দিষ্ট নীতির উল্লেখ আবশ্যক।

মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্য স্বকৃত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে বলিতেছেন—

যদ্যপ্যুক্তং মন্ত্রার্থবাদয়োরন্যার্থত্বান্ন দেবতাবিগ্রহাদি প্রকাশন-সামর্থ্যমিতি অত্র ব্রূমঃ প্রত্যয়াপ্রত্যয়ৌ হি সদ্ভাবাসদ্ভাবয়োঃ কারণং নান্যার্থত্বমনন্যার্থত্বং বা তথাহি অন্যার্থমপি প্রস্থিতঃ পথি পতিতং তৃণ-পর্ণাদি অস্তীত্যেব প্রত্যেতে। বেদান্তসূত্র, শাঙ্করভাষ্য, ১ম অধ্যায়, ৩য় পাদ, ৩৩ সূত্র।

শাঙ্করভাষ্যের উক্ত অংশের ব্যাখ্যানে সুপ্রসিদ্ধ বাচস্পতিমিশ্র স্বীয় ভামতী নামক টীকায় লিখিয়াছেন—

তস্মাদ্ যাবতি পদসমূহে পদাহিতাঃ পদার্থস্মৃতয়ঃ পর্য্যবসন্তি বিনৈব বিধিবাক্যং বিশিষ্টার্থপ্রতীতেঃ।

বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বাঙ্গলায় উপরি-উদ্ধৃত শাঙ্কর-ভাষ্য ও ভামতীর দার্শনিক ভাষার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়া অর্থ প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই আমরা সে চেষ্টা হইতে বিরত হইলাম। সংক্ষেপতঃ আমাদের ভাষায় বলিলে ইহার অর্থ এই যে, বেদোক্ত দৃষ্টান্তসমূহও বিধিবাচক; অর্থাৎ বেদে কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষ কোন বিধি বা নিষেধ না থাকিলে তদ্বিষয়-সম্পর্কে কোন দৃষ্টান্ত থাকিলে সেই দৃষ্টান্তই বিধিস্বরূপ গণ্য করিতে হইবে।

কোন কোন মীমাংসক ইহার বিরুদ্ধমতাবলম্বী। তাঁহাদের মত নিবর্ত্তনার্থ শঙ্করাচার্য্য উল্লিখিত নীতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের মতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কোনও হিন্দুর সাধ্যায়ত্ত নহে। শঙ্করোক্ত এই নীতি স্মরণ করিয়া আমরা সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে বৈদিক বিধির আলোচনা করিব।

ঋগ্বেদ বলিতেছেন—

তং গূর্ত্তয়ো নেমন্নিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবঃ।
পতিং দক্ষস্য বিদথস্য নূ সহো গিরিং ন বেনা অধিরোহ তেজসা।

প্রথম মণ্ডল, ৫৬—২।

সায়ণাচার্য্য ইহার এই টীকা করিয়াছেন—

গূর্ত্তয়ঃ স্তোতারো নেমন্নিষো নমস্কারপূর্ব্বং গচ্ছন্তঃ যদ্বা নীতহবিষ্কাঃ পরীণসঃ পরিতো ব্যাপ্য বর্ত্তমানাঃ এবং গুণবিশিষ্টা যজমানাস্তমিন্দ্রং স্তুতিভিরধিরোহন্তি স্তুবন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ সনিষ্যবঃ সনিং ধনং আত্মন ইচ্ছন্তো বণিজঃ ধনার্থং সঞ্চরণে সঞ্চরে নিমিত্তভূতে সতি সমুদ্রং ন। যথা নাবা সমুদ্রমধিরোহন্তি এবং স্তোতারোঽপি স্বাভিমত-ধনলাভায় ইন্দ্রং স্তুবন্তীতি ভাবঃ।

রমেশবাবু ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

ধনার্থী বণিকেরা যেরূপ সকল দিকে সঞ্চরণ করিয়া সমুদ্র ব্যাপিয়া থাকে, হব্যবাহী স্তোতাগণ সেইরূপ সেই ইন্দ্রকে সর্বদিকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

অনাবশ্যক বোধে আমরা উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তির টীকা বা অনুবাদ উদ্ধার করিলাম না। যাহা হউক ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই বৈদিকযুগে আর্য্যগণ ধনলাভার্থ সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতেন। অধিকন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত শঙ্করোক্ত ব্যাখ্যানীতি অনুসারে সমুদ্রযাত্রা বেদবিহিত প্রথা।

আধুনিক ইংরেজরাজ স্বীয় পুত্রকে নৌবিদ্যাশিক্ষার্থ নাবিকবেশে সমুদ্রে প্রেরণ করিয়া থাকেন। অস্মদ্দেশীয় জনগণ ইহাতে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া থাকে। ইদানীং ভারতীয় রাজন্যবর্গ ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গমনাগমন আরম্ভ করাতে তাহাদের পারিপার্শ্বিক ও অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীগণ 'তেজীয়সাং ন দোষায়' বলিয়া কথঞ্চিৎ স্ব স্ব কাল্পনিক শাস্ত্রপ্রীতিজনিত আত্মপ্রসাদ ও প্রভুপ্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হয়। কিন্তু শ্রুতি যদি আমাদের শ্রুতিগোচর হইত, তবে রাজা ও রাজপুত্রগণের সুখশয়নের পরিবর্ত্তে ঈদৃশ কঠোর উদ্যমে আমরা কোনও অভিনবত্ব দেখিতে পাইতাম না। ঋগ্বেদ বলিতেছেন

তুগ্রো হ ভুজ্যুমশ্বিনো দমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্মমৃবাঁ অবাহাঃ।
তমূহথুঃ নৌভিরাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষ প্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ ॥

১—১১৬—৩।

অনারম্ভণে তদবীরয়েথামনাস্থানে অগ্রভণে সমুদ্রে।
যদশ্বিনা উহথুর্ভুজ্যুমস্তং শতারিত্রাং নাবমাতস্থিবাংসং ॥

১—১১৬—৫।

টীকাকার সায়ণ বলেন—

অত্রেয়মাখ্যায়িকা। তুগ্রোনামাশ্বিনোঃ প্রিয়ঃ কশ্চিদ্রাজর্ষিঃ। স চ দ্বীপান্তরবর্ত্তিভিঃ শত্রুভির্ভৃশমুপদ্রুতঃ সন্ তেষাং জয়ায় স্বপুত্রং ভুজ্যুং সেনয়া সহ নাবা প্রাহৈষীৎ। সা চ নৌমধ্যসমুদ্রমতিদূরং গতা বায়ুবলেন ভিন্নাভীৎ। তদানীং স ভুজ্যুঃ শীঘ্রমশ্বিনৌ তুষ্টাব। তৌ চ স্তুতৌ সেনয়া সহিতমাত্মীয়াসু নৌষ্বারোপ্য পিতুস্তুগ্রস্য সমীপং ত্রিভিরহোরাত্রৈঃ প্রাপয়ামাসতুরিতি।

এস্থলে আমরা আর সুবিস্তৃত সায়ণ-টীকা উদ্ধার করিলাম না। উক্ত দুই শ্লোকের রমেশবাবুর অনুবাদ এই—

কোন মিয়মাণ মনুষ্য যেরূপ ধনত্যাগ করে, সেইরূপ তুগ্র (অতি কষ্টে তাঁহার পুত্র) ভুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠাইলেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আপনাদিগের নৌকাসমূহ দ্বারা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলে, সে নৌকা জলে ভাসিয়া যায়, তাহাতে জল প্রবেশ করে না।

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অবলম্বনরহিত, ভূপ্রদেশরহিত, গ্রহণীয়-বস্তু-রহিত সমুদ্রে এই কর্ম্ম করিয়াছিলে; শতদাঁড়যুক্ত নৌকায় ভুজ্যুকে রাখিয়া তাহার গৃহে আনিয়াছিলে।

অতএব দেখা যাইতেছে শুধু আজ যে ইংলণ্ড, জর্ম্মণি, যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি যুদ্ধার্থ বিদেশে নৌবাহিনী প্রেরণ করেন, তাহা নহে, পরন্তু উক্ত ঋক্ রচনার পূর্ব্বে স্মরণাতীত অতীতে আর্য্যরাজ স্বীয় পুত্রকে সেনাপতি করিয়া দ্বীপান্তরবাসী শত্রুদমনার্থ অকূল সমুদ্রের পরপারে নৌবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বৈদেশিক বাণিজ্য ও নৌযুদ্ধ নিত্য সহচর। পরন্তু এতদুভয়ের অস্তিত্বস্থলে অন্য কারণেও সমুদ্রযাত্রা অবশ্যম্ভাবী, তাহা আমরা বর্ত্তমান জগতে প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রাচীন আর্য্যসমাজেও তাহার ব্যভিচার দৃষ্ট হইবে না। ইংরেজ যাজক লিভিংষ্টোন আফ্রিকার মধ্যভাগ আবিষ্কার করিয়া সভ্যজগতের ভৌগোলিক জ্ঞানবৃদ্ধি করিয়াছেন। বর্ত্তমান ইয়োরোপ সুমেরু ও কুমেরুতে কত অভিযান প্রেরণপূর্ব্বক স্বীয় জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। জাপানী যুবকগণ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গমনপূর্ব্বক স্বদেশের জ্ঞানবৃদ্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন। অনেকে স্বাস্থ্যলাভার্থ, কেহ কেহ বা শুধু অদম্য ভ্রমণপিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য সমুদ্র পার হইতেছেন। আর্য্যঋষি বশিষ্ঠও প্রাচীনকালে তদ্বৎই সমুদ্রগমন করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে বশিষ্ঠ ঋষি বলিতেছেন—

আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎসমুদ্রমীরয়াব মধ্যম্।
অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব প্র প্রেংখ ঈংখয়াবহৈ শুভেকম্ ॥

৭—৮৮—৩।

বাহুল্যভয়ে আমরা এস্থলে সায়ণটীকা উদ্ধার করিলাম না। রমেশবাবুর অনুবাদ এই—

যখন আমি ও বরুণ উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ নৌকারূপ দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম (নিম্নোন্নতৈস্তরঙ্গৈরিতশ্চেতশ্চ প্রবিচলন্তৌ সংক্রীড়াবহৈ ইতি সায়ণঃ)।

অতএব দেখা যাইতেছে আধুনিক ভ্রমণকারীদিগের ন্যায় আর্য্যঋষি বশিষ্ঠও আমোদের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে; পরন্তু—

বশিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাদৃষিং চকার স্বপামহোভিঃ।
স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অহ্নাং যান্নু দ্যাবস্তুতন্যাদুষাসঃ॥
৭—৮৮—৪।

সায়ণাচার্য্য বলেন—

এবং বশিষ্ঠেনাত্মনোক্তে যদ্বরুণেন কৃতং তদ্দর্শয়তি। বশিষ্ঠং হ বশিষ্ঠং অনু বরুণো নাবি স্বকীয়ায়ামাধাৎ। তথাত্মমৃষিমবোভীরক্ষণৈঃ স্বপাং স্বপসং শোভনকর্ম্মাণং চকার। বরুণঃ কৃতবান্। ইত্যাদি।

রমেশ বাবুর অনুবাদ এই—

মেধাবী বরুণ গমনশীল ছিল ও রাত্রিকে বিস্তার করতঃ দিন সমূহের মধ্যে সুদিনে বশিষ্ঠকে নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন, তাহাকে রক্ষা দ্বারা সুকর্ম্মা করিয়াছিলেন।

ইহা হইতে প্রতীত হয় যে সমুদ্রযাত্রাই বশিষ্ঠের সুকর্ম্মত্ব বা ঋষিত্ব লাভের কারণ। সুতরাং জ্ঞানলাভার্থ সমুদ্রযাত্রা শুধু বিংশশতাব্দীর নববিধান নহে; অথবা ইংরেজীশিক্ষাপ্রাপ্ত, ধর্ম্মদ্বেষী বঙ্গীয় যুবকের বিকৃত-মস্তিষ্কত্বের পরিচায়কও নহে; পরন্তু বৈদিক ঋষিগণও জ্ঞানলাভার্থ সমুদ্রযাত্রা করিতেন। কিন্তু সেকালে ধর্ম্ম-রক্ষণী সভা প্রভৃতিও ছিল না, ধার্ম্মিকের সংখ্যাও বোধ হয় বর্ত্তমানবৎ সমধিক ছিল না। অন্যথা হয়ত বশিষ্ঠকে এবং যে বরুণদেব তাঁহাকে সমুদ্রযাত্রায় প্রবুদ্ধ করেন, তাঁহাকেও 'একঘরে' হইতে হইত। যাহা হউক এই বশিষ্ঠোপাখ্যান হইতেও সমুদ্রযাত্রা বেদোক্ত বিধি প্রতিপন্ন হইতেছে।

হিন্দুদিগের মতে বেদ অপৌরুষেয় সনাতন, চিরমান্য এবং সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রের শিরোদেশে প্রতিষ্ঠিত। যাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহা কোন শাস্ত্রের অঙ্গীভূত হইলেও বর্জ্জনীয়। সুতরাং বেদে সমুদ্রযাত্রা ব্যবস্থিত হওয়াতে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া যাঁহারা ঘোষণা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব শাস্ত্রনিষ্ঠার অভাব মাত্র প্রদর্শন করেন। যদি স্মৃতি বা পুরাণাদিতে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধও হইয়া থাকে, তথাপি উল্লেখিত বেদবিধির অস্তিত্ব-হেতু তাহা অগ্রাহ্য। আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমেই দেখাইয়াছি যে শাস্ত্রকার-গণের মতানুসারেই বিরোধস্থলে স্মৃতি ও পুরাণের ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া বেদবাক্য পালন করিতে হইবে। অধিকন্তু সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে বেদবাক্য প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও যাঁহারা স্মৃতিকার, পুরাণকার, বা টীকাকার বিশেষের নিষেধ দর্শনে কলিকালে বেদবাক্য অননুসরণীয় মনে করেন, তাঁহাদের মতও সমীচীন নহে। কারণ সনাতন বেদ চারি যুগেরই মান্য। যাঁহারা ইহা অস্বীকার করিবেন, তাঁহারা হিন্দু নহেন। সুতরাং যাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহা কলিযুগেও পরিত্যাজ্য। যে বিষয়ে বেদ নির্ব্বাক্, শুধু সেই বিষয়েই স্মৃতিপুরাণাদির ব্যবস্থা বলবৎ হইবে, অন্যত্র নহে। সমুদ্রযাত্রা বেদসম্মত; অতএব যদি আধুনিক স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের স্মৃতিতে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে সে নিষেধ বেদবিরুদ্ধ, সুতরাং অশাস্ত্রীয়, অধর্ম্ম্য ও অপ্রতিপাল্য।

এক্ষণে আমরা হিন্দু সমাজের দ্বিতীয় ধর্ম্মভিত্তি স্মৃতির ব্যবস্থা আলোচনা করিব। যুগভেদে বিভিন্ন স্মৃতি প্রামাণ্য। যথা—

কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ।
পরাশর-সংহিতা, ১—২৩।

অর্থাৎ সত্যযুগে মনুব্যবস্থিত ধর্ম্ম, ত্রেতায় গৌতমধর্ম্ম, দ্বাপরে শঙ্খলিখিত-ব্যবস্থিত ধর্ম্ম, এবং কলিযুগে পরাশর-ব্যবস্থিত ধর্ম্ম প্রামাণ্য।

আমরা যথাক্রমে যুগচতুষ্টয়ের জন্য বিহিত বিভিন্ন স্মৃতির ব্যবস্থা উদ্ধৃত করিতেছি।

মনু বলেন—

দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরো ভবেৎ।
নদীতীরেষু তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্॥ ৮—৪০৬।

'দেশ ও কাল অনুসারে দীর্ঘপথের তরপণ্য (নৌকাভাড়া) হইবে; কিন্তু তাহাও নদীবিষয়ে জানিবে, সমুদ্রগমনে কোনও নিয়ম নাই।'

ইহা হইতেই দৃষ্ট হইবে মানবধর্ম্ম সমুদ্রযাত্রা-বিরোধী নহে; পরন্তু মানবযুগে সমুদ্রযাত্রা প্রচলিত ছিল, এবং তদানীন্তন ব্যবস্থাপক অর্ণবযানের ভাড়া নির্দ্দিষ্ট নিয়মবদ্ধ না করিয়া পক্ষগণের প্রয়োজন ও সুবিধাদি দ্বারা তাহা নিয়মিত হওয়াই প্রকৃষ্ট নীতি মনে করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগামী বণিক্‌গণের প্রদেয় সুদের হার সম্বন্ধে মনু বলেন—

সমুদ্রযানকুশলাঃ দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি॥ ৮—১৫৭।

সমুদ্রযাত্রাকুশল, দেশকালার্থদর্শী ব্যক্তিগণ সুদের যে হার ব্যবস্থা করেন, তাহাই তদ্বিষয়ে অর্থাৎ সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে প্রদেয় সুদের হার।

মনুর সময়ে আর্যসমাজে সমুদ্রযাত্রা এতদূর সুপ্রচলিত

ছিল যে তাঁহাকে সমুদ্রগামী বণিকগণের প্রদেয় সুদ এবং সমুদ্রগামী পোত-সমূহের ভাড়া সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এস্থলে আমরা আধুনিক সভ্য সমাজের রীতির উল্লেখ করিতে পারি। ইংলণ্ডে যখন প্রথম ষ্টীমার প্রচলন আরম্ভ হয়, তখন ষ্টীমারের ভাড়া সম্বন্ধে আইন প্রণীত হইয়াছিল। সুদ সম্বন্ধে আমাদের দেশে এখনও ইংরেজরাজকৃত আইন প্রচলিত আছে।

যাহা হউক, উপরে সাধারণতঃ সমুদ্রগমনের বিধি পাওয়া গেল। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে মনু একটী বিশেষ বিধিও করিয়াছেন। শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজন-কালে মনু 'সমুদ্রযায়ী' ব্রাহ্মণদিগকে বর্জ্জন করার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে সমুদ্রগমন নিষিদ্ধ হয় না। প্রথমতঃ শুধু 'ব্রাহ্মণ' সম্বন্ধে এই ব্যবস্থার বিধান হইতেই অন্য বর্ণের সমুদ্রগমন কোন প্রকারেই অসঙ্গত নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ শুধু শ্রাদ্ধকালে ভোজন সম্বন্ধে সমুদ্রগামী ব্রাহ্মণ 'অপাংক্তেয়' হওয়াতে অন্য কোন বিষয়েই সমুদ্রগামী ব্রাহ্মণ পরিত্যাজ্য নহে সূচিত হইতেছে। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-ভোজন বিশেষরূপে পবিত্র ধর্ম্মকার্য্য। তৎসম্পর্কে বিশেষ পরীক্ষা ও পরিবর্জ্জন বিহিত হইতে পারে। মনুও তাহাই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন (৩য় অধ্যায়, ১৪৯ শ্লোক)। কিন্তু তাহাতে অন্য সামাজিক ব্যাপারে সমুদ্রগামী ব্রাহ্মণদিগকে পরিত্যাগ করার কোনও কারণ হয় না। শ্রাদ্ধবাসরে দীর্ঘশিখ, ত্রিপুণ্ড্রকধারী পুরোহিত ঠাকুরকেই যথাসাধ্য ভোজ্যদান ও ভোজন করাইতে হইবে। আশুতোষ চৌধুরী বা ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণকে নিমন্ত্রণ করিলেও যখন তাঁহারা মহান্নদানের দধিক্ষীর, ষোড়শের পীঠাঙ্গুরীয়ক বা বৃষোৎসর্গের সদস্যবরণ গ্রহণ করিবেন না, তখন তাঁহাদের দ্বারা কাহারও কোন পাপস্পর্শের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ ইঁহারা দানসাগরের ফলসংস্রবশূন্য ফলাহারে ভাগ বসাইতে চাহিলেও সে দক্ষযজ্ঞে কাহারও কোন ত্রুটি পড়ার আশঙ্কা নাই। তথাপি যদি ইঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ না করিতে চাহেন, তাহাতেও আপত্তি নাই। কিন্তু অন্যত্র বিদেশপ্রত্যাগতদিগের সংস্রবত্যাগের কি কারণ হইতে পারে?

বিশেষতঃ যদি শ্রাদ্ধে শুধু সমুদ্রগামী ব্রাহ্মণেরই ভোজন নিষেধ হইত, তবুও রক্ষণশীলদের মতের কতক সমর্থন হইত। কিন্তু মনুর মতে অন্ধ, ক্লীব, নাস্তিক, দাম্ভিক, ধূর্ত্ত, পরুষভাষী, মদ্যপায়ী, মদ্যবিক্রয়ী, পণ্যজীবী, জটিলপ্রকৃতি, কূটসাক্ষ্যপ্রণেতা, দ্যূতাসক্ত, বেদাধ্যয়নরহিত, চিকিৎসাব্যবসায়ী, রাজকর্ম্মচারী, বৃদ্ধিজীবী, দ্বিচারিণী স্ত্রীর স্বামী, শূদ্রশিষ্য ও শূদ্রের গুরু, গৃহদাহী, মিত্রদ্রোহী, পক্ষি-কুক্কুর-পোষক, শূদ্রবৃত্তি, পিতামাতার শুশ্রূষাবিমুখ, পিতার সহিত কলহপরায়ণ, সেতু দ্বারা স্রোতোভেদক, বিপ্লুতব্রহ্মচর্য্য, অপস্মার-গণ্ডমালা-শ্বেত-কুষ্ঠাদি-ব্যাধিযুক্ত, আচারহীন, জ্যোতিঃশাস্ত্রোপজীবী, বেতনগ্রাহী অধ্যাপক, নিত্যযাচক, কৃষিজীবী প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণই সমুদ্রগামী ব্রাহ্মণদের ন্যায় শ্রাদ্ধে অপাংক্তেয়। মনু স্বকৃত সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে বলেন,—

> ন ব্রাহ্মণং পরীক্ষেত দৈবে কর্ম্মণি ধর্ম্মবিৎ।
> পিত্র্যে কর্ম্মণি তু প্রাপ্তে পরীক্ষেত প্রযত্নতঃ॥ ১৪৯।
> যে স্তেন পতিতক্লীবা যে চ নাস্তিকবৃত্তয়ঃ।
> তান্ হব্যকব্যয়োর্বিপ্রাননর্হান্মনুরব্রবীৎ॥ ১৫০।
> জটিলঞ্চানধীয়ানং দুর্ব্বলং কিতবন্তথা।
> যাজয়ন্তি চ যে পূগাং স্তাংশ্চ শ্রাদ্ধে ন ভোজয়েৎ॥ ১৫১।
> চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িণস্তথা।
> বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ॥ ১৫২ ইত্যাদি।
> আগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
> সমুদ্রযায়ী বন্দী চ তৈলিকঃ কূটকারকঃ॥ ১৫৮।
> পিত্রা বিবদমানশ্চ কিতবো মদ্যপস্তথা।
> পাপরোগ্যভিশস্তশ্চ দাম্ভিকো রসবিক্রয়ী॥ ১৫৯। ইত্যাদি।
> হস্তিগোঽশ্বোষ্ট্রদমকো নক্ষত্রৈর্যশ্চ জীবতি।
> পক্ষিণাং পোষকো যশ্চ যুদ্ধাচার্য্যস্তথৈব চ॥ ১৬২। ইত্যাদি
> এতান্ বিগর্হিতাচারানপাংক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্।
> দ্বিজাতিপ্রবরো বিদ্বানুভয়ত্র বিবর্জয়েৎ॥ ১৬৭।

বাহুল্যভয়ে আমরা সমুদয় শ্লোক উদ্ধার করিলাম না। তৃতীয় অধ্যায়ের ১৫০ হইতে ১৬৭ পর্য্যন্ত সমুদয় শ্লোকই শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয় ব্রাহ্মণের তালিকায় পূর্ণ। তাহার কয়েক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নামমাত্র আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। পাঠকগণ দেখিবেন মনুর এই বিধানমতে দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি স্বনামধন্য প্রাচীন ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধে অপাংক্তেয়।

ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে মনুর এই বিধি শুধু

শ্রাদ্ধকালের জন্য; অন্যত্র এই বিধি প্রযুজ্য নহে। যদি এই-সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণকেই সর্ব্বকর্ম্মে বর্জ্জন করিতে হয়, তবে একটি ব্রাহ্মণও আচরণীয় থাকিবে কি না সন্দেহ; অথবা কাহারও কাহাকেও বর্জ্জন করিতে হইবে না। কারণ, অন্ততঃ আধুনিক সকল ব্রাহ্মণই উল্লিখিত অষ্টাদশ শ্লোকব্যাপী তালিকার কোন-না-কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবেন। ব্রাহ্মণ মুন্সেফ বাবু, ডিপুটী বাবু, ইঞ্জিনিয়ার বাবু, ইন্‌স্পেক্টর বাবু, উকিল বাবু ও ডাক্তার বাবু, স্কুল কলেজের প্রফেসর বাবু, মাষ্টার বাবু ও পণ্ডিত মহাশয়, কেহই ব্রাহ্মণত্বে সমুদ্রগামী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহেন। সরকার বাহাদুরের ডাক-কেরাণী, ষ্টেশন মাষ্টার বা টিকেট কালেক্টর, অথবা নবাব সাহেব বা মহারাজা বাহাদুরের ম্যানেজার, নায়েব বা তহশীলদার, কেহই উক্ত তালিকার বহির্ভূত নহেন। চারিদিকে ব্রাহ্মণের মুদি-দোকান, মনোহারী দোকান, কাপড়ের দোকান, কাঠের গুদাম, টিনের গুদাম প্রভৃতি দেখিতেছি। এ-সকল ব্রাহ্মণ মানবধর্ম্মানুসারে সমুদ্রগামীরই সমতুল্য। বৃদ্ধিজীবিত্ব আধুনিক হিন্দুসমাজে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ হইয়া উঠিয়াছে। বহু ব্রাহ্মণ কুসীদ গ্রহণ দ্বারা স্ফীতোদর হইতেছেন। তাঁহাদের অট্টালিকা প্রাকৃত জনের স্পৃহণীয় হইলেও মনুর মতে তাঁহারা সমুদ্রগামী অপেক্ষা পবিত্রতর নহেন। যে-সকল উকিল বাবুরা এবং তৎপন্থী কূটবুদ্ধি গ্রাম্যদেবতাগণ আজকাল বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের বিধান অতিক্রম করার প্রত্যাশায় স্বীয় স্ত্রী বা পুত্রকে জোতদার সাজাইয়া কৃষককে কোর্ফাদারে পরিণত করিতেছেন এবং তাহার শ্রমলব্ধ শস্যের ভাগ দ্বারা স্বোদর পূরণ করিতেছেন, মনুর ব্যবস্থাতিক্রমী সেই-সকল মহাশয়েরা কোন্ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বিদেশপ্রত্যাগতদিগকে সমাজবহির্ভূত রাখার ঔচিত্য প্রমাণে অগ্রসর হন? কৃষিলব্ধভুক্ অধ্যাপক সমুদ্রগামীরই ন্যায় 'বিগর্হিতাচার' ও 'অপাংক্তেয়'। ব্রহ্মোত্তরভোগী অধ্যাপকগণের পক্ষে মনুর এই বিধিবিস্মৃতি অমার্জ্জনীয় নহে কি? যাঁহারা পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ, কন্যাদায়, পুত্রের উপনয়ন, দুর্গাবিপত্তি প্রভৃতি বহু বিপত্তিকালে 'ফিরায়' বাহির হন, নিত্যযাচক সেই-সকল ব্রাহ্মণের ভোজ্যান্নতাও তদ্বৎই নিষিদ্ধ। যাঁহাদের কারণান্তরাভাবহেতু উদরাময়ে বা অতিশ্রম-জনিত অবসাদে অথবা মাংসসাহচর্য্যে-বর্দ্ধিতস্বাদ পলান্ন-ভোজনপ্রাক্কালে "কলিযুগোচিত যাবন সোমরসসেবন অপরিহার্য্য হয়, তাঁহাদের পক্ষে সমুদ্রগামিবর্জ্জনপ্রয়াস স্বার্থানুকূল হইলেও মনুবিহিত নহে। সভাস্থলে বা পত্রিকাদিতে বাক্যবিন্যাসবাহুল্যে বা সময়োচিত ইঙ্গিত-চাতুর্য্যে স্ব স্ব অবিপ্লুত ব্রাহ্মণ্যের কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীন করিলেও স্বীয় হৃদয়ের অন্তস্তলে কয়জন ব্রাহ্মণ আপনাকে অস্খলিতব্রহ্মচর্য্য বলিতে পারেন? বিপ্লুত-ব্রহ্মচর্য্য ব্রাহ্মণকে মনু সমুদ্রগামীর সমাসনেই উপবিষ্ট করিয়াছেন। ফলতঃ ইহা হইতেই প্রতীত হয় যে, মনুর সমুদ্রগামী ব্রাহ্মণসম্বন্ধে এই ব্যবস্থা অবশ্যপ্রতিপাল্য বিধি নহে, পরন্তু শুধু আপেক্ষিক ঔচিত্যানৌচিত্যসূচক। আর যদি কেহ ইহা অবশ্যপ্রতিপাল্যও মনে করেন, তাহাতেও সমুদ্রগমন ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হয় না। কারণ আধুনিক প্রায় কোন ব্রাহ্মণই মনুর 'অপাংক্তেয়' শ্রেণীর বহির্ভূত নহেন।

বহুবৎসর পূর্ব্বে একটি গল্প পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা এ স্থলে উদ্ধার করার লোভসম্বরণ করিতে পারিলাম না। কলিকাতার কোন কায়স্থযুবক শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাগমনের প্রাক্কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণ তাঁহাদের পরিবারস্থ সরলহৃদয়া, নিষ্ঠাবতী পিতৃস্বসাকে বলিলেন, 'পিসীমা, —কে আমরা বাড়ীতেই রাখিতে চাই; যদি আপনার আপত্তি থাকে, তবে আপনাকে ভিন্ন বাড়ীতে থাকার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।' কপটতাস্পর্শশূন্য, ধর্ম্মভীরু বর্ষীয়সী কহিলেন, 'কেন বাবা, আমার ভিন্ন বাড়ীর কি আবশ্যক? তোমাদিগকে নিয়াও তো এই বাড়ীতে আছি। তোমরা ছুঁইলেও আমি স্নান না করিয়া খাই না, সে ছুঁইলেও স্নান করিয়াই খাইব।' ফলতঃ যাঁহারা সরল হৃদয়ে শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে সমুদ্রগামী আর আধুনিক অন্য হিন্দুর মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই।

আমরা দেখিলাম মনুর মতে সমুদ্রগমন নিষিদ্ধ নহে; পরন্তু বাণিজ্যার্থ সমুদ্রগমন তিনি প্রত্যক্ষ ভাবেই ব্যবস্থা

করিয়াছেন। ত্রেতামান্য গৌতমসংহিতায় এবং দ্বাপর-মান্য শঙ্খ- ও লিখিত-সংহিতায় সমুদ্রগমনের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও ব্যবস্থা নাই। সুতরাং ত্রেতা বা দ্বাপরেও সমুদ্রগমন নিষিদ্ধ ছিল না; কারণ যদিও প্রত্যক্ষ বিধির অভাব, তথাপি তদ্বৎই নিষেধেরও অভাব।

পরাশরস্মৃতি বিশেষতঃ কলিযুগমান্য। সুতরাং পরাশরসংহিতাই আমাদের বিশেষ বিবেচনার বিষয়। মহামুনি পরাশর কুত্রাপি সমুদ্রগমন নিষেধ করেন নাই; পরন্তু পরাশরসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে সমুদ্রগমনের বিধি আছে। যথা—

এতেষু খ্যাপয়েন্নরঃ পুণ্যং গত্বা তু সাগরম্।
দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্॥ ৬২
রামচন্দ্রসমাদিষ্টং নলসঞ্চয়সঞ্চিতম্।
সেতুং দৃষ্ট্বা সমুদ্রস্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥ ৬৩

এই-সমস্ত স্থানে (নিজ পাপ) কীর্তন করিয়া পবিত্র সাগরে গমন করিয়া দশযোজন প্রশস্ত ও শতযোজন দীর্ঘ, রামচন্দ্রের আদেশে নলের পরিশ্রম দ্বারা প্রস্তুত সমুদ্রের সেতু দর্শন করিয়া ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

অতএব কলির ধর্মশাস্ত্রপ্রযোজকের মতে সমুদ্র পবিত্র এবং সমুদ্রগমনপূর্বক সেতুবন্ধদর্শনে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ পর্য্যন্ত বিদূরিত হয়। ঈদৃশ পবিত্র সমুদ্রে গমনে নিষেধ কি?

রক্ষণশীলগণ বলিতে পারেন এ স্থলে 'গত্বা তু সাগরম্' সাগরসমীপে গমন মাত্র বুঝায় এবং তীর হইতে সেতু দর্শনই পরাশর মুনির অভিপ্রেত।

প্রত্যুত্তরে আমরা কলুর বলদ ও নৈয়ায়িকের গল্পটি-মাত্র বলিতে চাই। বলদ চলিতেছে কি না, অন্তরাল হইতে ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা তাহা জানিবার জন্য কলু বলদের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দেয়। ঘণ্টার শব্দ না শুনিলেই বুঝিতে পারে বলদ দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু নৈয়ায়িক মহাশয় দেখিলেন বলদ তো দাঁড়াইয়াও গলা নাড়িয়া ঘণ্টাধ্বনি করিতে পারে। কলুকে সেই ভাবে প্রবঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিলে কলু শুধু বলিয়াছিল, 'মহাশয়, বলদ তো ন্যায়শাস্ত্র পড়ে নাই।' বস্তুতঃ 'গত্বা তু সাগরং' স্বাভিপ্রায়প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী তার্কিকের মতে সাগরসমীপগমন বুঝাইতে পারে; কিন্তু সংহিতাকার-ব্যবহৃত ভাষার অর্থ তাহা নহে।

সমুদয় সংহিতার মধ্যে মনুসংহিতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গৌতমসংহিতাদি মনুসংহিতার পার্শ্বে নিতান্ত ম্লান। আমাদের মতে মনুসংহিতার পর যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতানুগামী মিতাক্ষরা আজিও সমগ্র ভারতব্যাপী হিন্দুসমাজকে শাসন করিতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতাকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করিতে পারেন না। তাই সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে আমরা যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতারও মত উল্লেখ করিতেছি।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

কান্তারগাস্তু দশকং সামুদ্রা বিংশকং শতম্।
দদ্যুর্বা স্বকৃতাং বৃদ্ধিং সর্ব্বে সর্ব্বাসু জাতিষু॥

দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৯ শ্লোক।

যাহারা বাণিজ্যার্থ কান্তারে গমন করে, তাহারা শতকরা শত-ভাগের দশভাগ এবং সমুদ্রগামীরা শতভাগের বিংশতি ভাগ সুদ দিবে, ইত্যাদি।

অতএব যাজ্ঞবল্ক্য সমুদ্রগমন স্বীকার করিতেছেন।

মনুকথিত ধর্ম্মস্থানসমূহের মধ্যে বেদ সমুদ্রযাত্রার বিধি দিতেছেন; মানবধর্ম্মে ও যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় সমুদ্রযাত্রা স্বীকৃত; গৌতম-শঙ্খ-লিখিত-ধর্ম্ম সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করেন নাই; পরাশরস্মৃতি সমুদ্রদর্শন পুণ্য কর্ম্ম বলিয়াছেন। ইহার পর যাঁহারা সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলেন তাঁহারা, হয় শাস্ত্র কি তাহা জানেন না, অথবা শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত নহেন; অথবা শাস্ত্রবাক্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক লঙ্ঘন বা কুব্যাখ্যা দ্বারা দলন করিয়া শাস্ত্রের অবমাননা করেন।

আমরা এই প্রবন্ধ শাস্ত্রবাদীগণের জন্য লিখিতেছি। কাজেই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে তাঁহাদের পন্থানুবর্ত্তন করিতে হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংহিতাসমূহের 'স্মৃতি' বা 'ব্যবহারশাস্ত্র' বা আইন স্বরূপে মূল্যবত্তা অতি সামান্য। এই-সকল গ্রন্থ অতি আধুনিক। সংহিতা-গুলির প্রারম্ভ পাঠ করিলেই তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। পঞ্জিকাগুলি যেমন চিরনূতন এবং প্রতি বৎসরই যেমন 'গুপ্ত'-গৃহে বা তর্কচূড়ামণির চতুষ্পাঠীতে—

"হরপ্রতি প্রিয়ভাষে ক'ন হৈমবতী।
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি॥"

ঠিক সেইরূপই প্রত্যেক সংহিতালেখকই প্রাচীন অমুক ঋষির নিকট অন্যান্য ঋষিগণ গমন করিয়া কি ভাবে ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহার ব্যাখ্যানে আষাঢ়ে গল্প জুড়িয়া স্বগ্রন্থের গৌরচন্দ্র করিয়াছেন এবং সেই উপদেষ্টা প্রাচীন ঋষির বাক্যসমূহ লিপিবদ্ধ করিতেছেন বলিয়া তাঁহার নামে স্বকৃত গ্রন্থ চালাইয়াছেন। তাই সংহিতা-কারগণ সকলেই প্রাচীন। কিন্তু মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, পরাশর প্রভৃতির নাম সংযুক্ত হইলেও ঐ-সকল সংহিতা তত্তৎ ঋষির লিখিত গ্রন্থ নহে, তাহা লেখকগণই স্বীকার করিতেছেন।[৫] প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সংহিতা-সমূহের ভাষা তুলনা করিলেও তাহাদের আধুনিকত্ব প্রতীত হইবে। মহাভারতের ভাষা অপেক্ষাও সংহিতার ভাষা অনেক আধুনিক। ফলতঃ অনেক সংহিতাই যে মুসলমান-প্রভাব-কালে বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করার বিশেষ কারণ নাই। মুসলমান-রাজত্বে ব্রাহ্মণগণ ব্যবস্থাপকের গৌরবান্বিত আসনচ্যুত হইয়া প্লেটোর আদর্শ রাজ্যের ন্যায় স্বাভিপ্রায়ানুকূল আদর্শ সমাজ কল্পনা করিতেছিলেন। তাঁহাদের লিখিত স্মৃতিগ্রন্থসমূহ সেই কল্পিত সমাজের চিত্রমাত্র; তাই প্রাচীন সমাজের বাস্তব চিত্র তাহাতে নাই। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। পরাশরসংহিতা সমুদ্রদর্শনই ব্রহ্মহত্যার যথেষ্ট শাস্তি মনে করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজা কি ব্রহ্মহত্যাকারীকে কারাদণ্ডাদি কঠোর শাস্তি দিতেন না? সংহিতাকার সে-সকল শাস্তির উল্লেখও করেন নাই। পরন্তু যখনই লঘু বা গুরু যে-কোন অপরাধে কেহ অপরাধী হইত, তখনই তাহার চান্দ্রায়ণাদির ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। অর্থাৎ যাহাতে সংহিতালেখক ব্রাহ্মণগণের মানবজীবনের প্রতিপদক্ষেপে ভোজ্যদক্ষিণাদি-প্রাপ্তিপ্রাচুর্য্যের কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, তদনুকূল বিলক্ষণ সুবিধাজনক সুব্যবস্থায় সংহিতা-সমূহের কলেবর পরিপূর্ণ। কিন্তু যে রাজবিধি সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে, রাজ্যভ্রষ্ট হিন্দুগণের পুরোহিতকুল তাহার পর্য্যবেক্ষণ বা আলোচনার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই। তাই যদিও সংহিতাসমূহ কিয়ৎ পরিমাণে 'ব্যবহার-শাস্ত্রের' ছায়াস্বরূপ বর্ত্তমান আছে, তথাপি তাহা বাস্তব-সম্পর্কবিরহিত, যাজকস্বার্থপ্রণোদিত, ব্যবহারেতরবিধি-পূর্ণ। ফলতঃ সংহিতাসমূহে স্থানে স্থানে সমাজে প্রচলিত বিধি লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলেও অধিকাংশ স্থলেই যাহা লেখকের মনোরাজ্যে বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাই বাস্তব বিধি বলিয়া সংহিতায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই কারণেই মনুসংহিতা সমুদ্রগমন স্বীকার করিয়াও সমুদ্রগামী ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে অপাংক্তেয় বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণ লেখক কখনও নাবিকবৃত্তিপর ব্রাহ্মণকে আত্মতুল্য জ্ঞান করিতেন না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। শঙ্করাচার্য্য বেদের দৃষ্টান্তগুলিকে বিধিবৎ গণ্য করিয়াছেন। নব্য-গণের মতে ইহার উৎকৃষ্ট কারণ আছে। যখন আর্য্য-সমাজ জীবিত ছিল, বেদ তখন লিখিত হইয়াছিল। কাজেই বেদের দৃষ্টান্তসমূহ জীবিত সমাজের বাস্তব চিত্র; সমাজের রীতিপদ্ধতি তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য আধুনিক গ্রন্থ লেখকের মনঃকল্পিত বৈধা-বৈধপ্রতিপোষক; কাজেই তাহাদের দৃষ্টান্তসমূহের কোন অনুকরণীয় মূল্যবত্তা নাই। এই আলোচনা হইতেই যুক্তিবাদীগণ সমুদ্রগমন সম্বন্ধে স্পষ্ট বিধির আপেক্ষিক অল্পতার কারণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

যাহা হউক, আমরা পুনরায় শাস্ত্রবিধির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইব। যে বিষয়ে শাস্ত্রে কোন বিধান নাই, তথায় সদাচার এবং আত্মতুষ্টিও মনুর মতে ধর্ম্মের প্রমাণ বটে। সমুদ্রগমন সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান আছে, অতএব তদ্বিষয়ে সদাচার ও যুক্তির আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। তথাপি তদ্বিষয়ে দু চারিটি কথা আমরা এ স্থলে বলিব। যুক্তি যে সমুদ্রযাত্রার পক্ষে, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অকাট্য প্রমাণ এই যে, আধুনিক রক্ষণশীলগণও ইয়োরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে শিক্ষাদির জন্য গমন নিষেধ করেন না। তাঁহাদের যত আপত্তি শুধু বিদেশপ্রত্যাগতের সমাজে পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে। ইহা হইতেই প্রতীত হয়, রক্ষণশীলগণও সমুদ্রযাত্রার অবশ্যকর্ত্তব্যতা ও অনিবার্য্যতা হৃদয়ঙ্গম ও স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু চিরন্তন সংস্কারবশে এখনও তাঁহারা সমুদ্রযাত্রীর সহিত সামাজিক আদান প্রদানে সম্মত হইতে পারিতেছেন না। সুতরাং যুক্তি সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র।

সদাচার সম্বন্ধেও আমরা দুই চারিটি কথা বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনুর মতে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশের আচারই সদাচার। মনুসংহিতায় সেই দেশের আচার লক্ষ্য করিয়াই সমুদ্রগামী বণিক প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রথিতনামা দাক্ষিণাত্যবাসী সূত্রকার বৌধায়ন স্বকৃত সূত্রে বলিতেছেন,—

পঞ্চধা বিপ্রতিপত্তিঃ দক্ষিণতস্তথোত্তরতঃ।
যানি দক্ষিণস্তানি ব্যাখ্যাস্যামঃ।
যথৈতদনুপেতেন সহ ভোজনম্ স্ত্রিয়া সহ ভোজনম্
পর্য্যুষিত ভোজনম্ মাতুলপিতৃস্বসৃদুহিতৃগমনমিতি।
অথোত্তরতঃ ঊর্ণাবিক্রয়ঃ শীধুপানং উভয়তো দদ্ভির্ব্যবহারঃ আয়ুধীয়কং সমুদ্রসংযানমিতি। ইতরাদিতরস্মিন্ কুর্ব্বন্ দুষ্যতীতরদিতরস্মিন্।

এ স্থলে 'উত্তর' ও 'দক্ষিণ' এই দুইটি অনির্দ্দিষ্টার্থক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দুই শব্দ নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু অস্বাভাবিক কূটার্থ দ্বারা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হয় না, পরন্তু বলিদান হয়। উত্তর শব্দে ভারতবর্ষের উত্তরাংশ অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত এবং দক্ষিণ শব্দে দাক্ষিণাত্য স্বভাবতঃই বোধ হয়। যাঁহারা উত্তর শব্দে হিমালয়ের অর্থাৎ ভারতের উত্তর সীমার উত্তর বলিতে চাহেন, তাঁহাদের মতানুসারে দক্ষিণ শব্দে ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমার দক্ষিণ অর্থাৎ ভারত সাগরের লবণাম্বুমাত্র বুঝাইতে পারে এবং তাহা হইলে বৌধায়ন যে 'দক্ষিণের' আচার বিবৃত করিতেছেন, তাহা নিতান্তই নিরর্থক ও উপহাসজনক হয়। বস্তুতঃ তিব্বৎ দেশের আচার পদ্ধতির আলোচনায় বৌধায়নের কোনও প্রয়োজন ছিল না; তাঁহার সূত্র হিন্দুস্থানবাসী আর্য্যগণের জন্যই গ্রথিত।

টীকাকারও বলেন,—

দক্ষিণেন নর্ম্মদামুত্তরেণ কন্যাতীর্থম্। উত্তরতস্ত দক্ষিণেন হিমবন্তমুদৃগ বিন্ধ্যাস্ত।

অর্থাৎ নর্ম্মদা হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত দক্ষিণ দেশ এবং হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্য্যন্ত উত্তর দেশ।

অতএব উপরি উদ্ধৃত বৌধায়নবাক্যের সরলার্থ এই—

আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের পঞ্চবিধ বিসংবাদ আছে। অনুপনীতের সহিত ভোজন, স্ত্রীর সহিত ভোজন, পর্য্যুষিত ভোজন, মাতুল- ও পিতৃষ্বস্কন্যাপরিণয়, এই সব দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত। এবং ঊর্ণাবিক্রয়, শীধুনামক সুরাপান, অশ্বাদি জন্তুর ব্যবসায়, অস্ত্রধারণ এবং সমুদ্রসংযান অর্থাৎ সমুদ্রের পরপারস্থিত দেশে গমন ('নাবা দ্বীপান্তরগমনম্') আর্য্যাবর্ত্তের রীতি। এই-সকল রীতি তত্তৎ দেশে অনুসরণীয়; কিন্তু অন্যত্র তাহার অনুসরণে দোষ হয়।

পাঠকগণ দেখিবেন বৈশ্যের পক্ষে ঊর্ণা বা অশ্ববিক্রয় এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অস্ত্রধারণ কদাপি কোন স্থানে নিষিদ্ধ নহে। সুতরাং উল্লিখিত বৌধায়নবাক্যের মর্ম্ম এই যে, সমুদ্রযাত্রাদি আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও প্রচলিত আছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে তাহা দূষণীয়; এবং মাতুলকন্যাদি বিবাহ দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও প্রচলিত আছে, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে তাহা দূষণীয়। অর্থাৎ অপরাপর বর্ণ সম্বন্ধে সমুদ্রগমন কুত্রাপি নিষিদ্ধ নহে; আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধেও নহে।

ব্রহ্মাবর্ত্ত আর্য্যাবর্ত্তেরই অংশবিশেষ। সুতরাং দেখা যাইতেছে মনুবিহিত সদাচারও সমুদ্রযাত্রার অনুকূল।

মনুকথিত চতুর্বিধ ধর্ম্মলক্ষণই সমুদ্রযাত্রার অনুকূল, ইহা দেখা গেল। যাজ্ঞবল্ক্য পুরাণকেও ধর্ম্মস্থান বলিয়াছেন। অতএব আমরা পুরাণের বিধিও আলোচনা করিব; কিন্তু সংক্ষেপার্থে শ্লোক উদ্ধার করিব না।

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে সমুদ্রবেষ্টিত কুশদ্বীপাদির ও সামুদ্রিক জোয়ার ভাটার বর্ণনা এবং ঐ অংশের তৃতীয় অধ্যায়ে হূণ ও পারসীকদিগের উল্লেখ আছে।

বায়ুপুরাণের ৪১শ অধ্যায়ে চারি মহাদ্বীপসমন্বিত পৃথিবীর বর্ণনা আছে। ৪৫শ অধ্যায়ে বাহ্লীক, গান্ধার, যবন, শক, রমট (রোমান?), বর্ব্বর (Barbary?) পহ্লব, কসেরুক প্রভৃতি উদীচ্য এবং ব্রহ্মোত্তর, মালদ প্রভৃতি প্রাচ্যজাতির উল্লেখ আছে। ৪৮শ অধ্যায়ে মণিরত্নচন্দনাকর ম্লেচ্ছবাসভূমি মলয়দ্বীপ, লঙ্কাপুরী-সমন্বিত লঙ্কাদ্বীপ এবং শঙ্খদ্বীপ প্রভৃতির বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

গরুড়পুরাণের পূর্ব্বখণ্ডে ৬৮ম অধ্যায়ে প্রবাল ও মুক্তা, ৬৯ম অধ্যায়ে শঙ্খ ও শুক্তিজাত মুক্তা এবং সিংহল ও পারসীক দেশজাত মুক্তার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ৭২ম অধ্যায়ে সিংহল-কামিনীগণের সাক্ষাতে সমুদ্রতীরে ইন্দ্রনীল মণির উৎপত্তি বর্ণিত আছে। ৭৭ম অধ্যায়ে বাগদেব (?) দেশজ পুলকমণি, ৭৯ম অধ্যায়ে যাবন ও চীনদেশজ তৈলস্ফটিকমণি এবং ৮০ম অধ্যায়ে রোমক দেশজ বিদ্রুমমণির উল্লেখ আছে।

কূর্ম্মপুরাণের উপবিভাগে ২১শ অধ্যায়ে ৩১ হইতে ৪৭ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধে অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণশ্রেণীর মধ্যে 'সমুদ্রযায়ী' ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। কূর্ম্মপুরাণের এই অংশ মনুসংহিতারই প্রতিধ্বনিমাত্র এবং মনুসংহিতার অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, কূর্ম্মপুরাণের এই অংশ সম্বন্ধেও তাহাই আমাদের বক্তব্য। ইহাতেও ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর সমুদয় বর্ণের সমুদ্রগমন-পদ্ধতিই সূচিত হইতেছে।

বরাহপুরাণের ১৭১ম ও পরবর্ত্তী কয়েক অধ্যায়ে মথুরাবাসী বণিক গোকর্ণ কিরূপে অর্ণবযানারোহণে চারিমাস সমুদ্রে থাকিয়া অপরপারবর্ত্তী দ্বীপে উপনীত হন এবং দীর্ঘকাল পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৩৫শ অধ্যায়ে প্রবাল ও মুক্তা, ৫৭শ অধ্যায়ে কাম্বোজ, বর্ব্বর এবং চীনদেশ, ৫৮শ অধ্যায়ে লঙ্কা, সিংহল, শ্যামক প্রভৃতি দেশের উল্লেখ আছে। পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে যবন, কাম্বোজ, হূণ, পারসীক প্রভৃতি জাতির উল্লেখ আছে।

আর বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। শাস্ত্রকথিত অষ্টাদশ পুরাণে কুত্রাপি সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ নহে; পরন্তু অনেক পুরাণই হিন্দুদিগের সমুদ্রগমন স্বীকার করিতেছেন। উপরোক্ত পৌরাণিক বর্ণনাসমূহ হইতে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয় যে, পৌরাণিকযুগে হিন্দুগণ রোম হইতে চীন পর্য্যন্ত নানাদেশে সর্ব্বদা গতায়াত করিতেন।

ঋষিকথিত বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সদাচার ও আত্মতুষ্টি এই পঞ্চবিধ ধর্ম্মস্থানই সমুদ্রযাত্রার অনুকূল, ইহা প্রতিপন্ন হইল। সুতরাং সমুদ্রযাত্রা কোনক্রমেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে; পরন্তু সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রানুগামী। অধঃপতিত, অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন বঙ্গদেশ শাস্ত্রজ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া অজ্ঞ ও স্বার্থান্ধ লোকের কুহকে ভুলিয়া পুণ্যদর্শন সাগরোত্তরণ পাপানুষ্ঠান জ্ঞান করিতেছেন। কিন্তু লীলাময় বিধাতার অপরূপ বিধানে পাশ্চাত্যসভ্যতাসূর্য্য এ দেশে মাধ্যন্দিন কিরণজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্বল্পব্যয়-সাপেক্ষ মুদ্রাযন্ত্রের এবং 'অবারিতদ্বার' বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে পুনরায় বিশুদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইতেছে। তাই প্রবুদ্ধ বঙ্গসমাজে অস্তিত্ববিহীন কল্পিত শাস্ত্রবিধির কাটতি কমিয়া যাইতেছে। স্বাবলম্বী বঙ্গীয় যুবক বুঝিতেছেন সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্র তাঁহার উন্নতিপ্রয়াস ও উদ্যমের পথের কণ্টক নহে।

সমুদ্রযাত্রাবিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষেধ নাই বলিয়া সুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যে নিষেধ নাই এমন নহে। অনেকে মনে করেন, আদিত্যপুরাণ ও বৃহন্নারদীয় পুরাণ সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু এই উভয় গ্রন্থই উপপুরাণ, পুরাণ নহে। আদিত্যপুরাণের মূলগ্রন্থে সমুদ্রযাত্রা-নিষেধবিষয়ক শ্লোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। অতএব আমরা আদিত্যপুরাণের বিষয় আলোচনা করিব না। বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন,—

> কর্ম্মণা মনসা বাচা যত্নাদ্ধর্ম্মান্ সমাচরেৎ।
> অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্নতু ॥ ১২
> সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
> দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা ॥ ১৩ ।
> দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
> মাংসদানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা ॥ ১৪ ।
> দত্তাক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ।
> দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ ॥ ১৫ ।
> মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথামখম্।
> ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ১৬
>
> ২২শ অধ্যায়।

পণ্ডিত পঞ্চাননতর্করত্ন সম্পাদিত ১৩১৬ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

মানুষগণ যত্নপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে ধর্ম্মাচরণ করিবে। যাহা লোকনিন্দিত, তাহা ধর্ম্মজনক হইলেও আচরণীয় নহে। সমুদ্রযাত্রা স্বীকার, দ্বিজগণের অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ, মহাপ্রস্থান গমন ইত্যাদি ধর্ম্ম (আমরা আর অধিক অনুবাদ করিলাম না) কলিযুগে বর্জ্জনীয় বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন।

সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন স্বকৃত উদ্বাহতত্ত্বে বলেন,—

কলৌতু অসবর্ণায়া অবিবাহ্যত্বমাহ বৃহন্নারদীয়ম্ 'সমুদ্রযাত্রা-স্বীকারঃ.........মনীষিণঃ।'

বৃহন্নারদীয় পুরাণ কলিযুগে অসবর্ণা কন্যা অবিবাহ্যা বলিয়াছেন; যথা সমুদ্রযাত্রা স্বীকার...ইত্যাদি।'

পাঠকগণ দেখিবেন উল্লিখিত দ্বাদশ ও ষোড়শ শ্লোকে 'সমুদ্রযাত্রা স্বীকার' ধর্ম্ম বলিয়া বৃহন্নারদীয় কবুলা জবাব দিয়াছেন; কিন্তু তথাপি লোকবিদ্বিষ্ট অর্থাৎ সামাজিকগণের মনঃপূত নয় বলিয়া তাহা নিষেধ করিয়াছেন। 'পাছে লোকে কিছু বলে,' এই ভয়ে সৎকর্ম্ম-বিরতি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পরিদৃশ্যমান, আমাদের দেশে

বিশেষতঃ; কিন্তু যাহা ধর্ম্ম, তাহার আচরণে দোষ নাই। যিনি লোকলজ্জা অতিক্রম করিতে পারেন, তিনিই লোকবিদ্বিষ্ট ধর্ম্মাচরণ করিতে পারেন। সুতরাং বৃহন্নারদীয়ের এই ব্যবস্থায় সমুদ্রযাত্রাস্বীকার নিতান্ত নিষিদ্ধ হয় না।

সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে রঘুনন্দন কোনও ব্যবস্থা দেন নাই; আধুনিক স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্বে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া কেন মনে করেন, তাহা বুঝা কঠিন। উদ্বাহতত্ত্ব বিবাহসম্বন্ধীয় বিধান; তাহাতে সমুদ্রযাত্রাসম্বন্ধীয় কোনও বিধি বা নিষেধ বা আলোচনা নাই ও থাকিতে পারে না। উদ্ধৃত ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শ্লোক পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ উদ্ধার না করিলে 'কলিযুগে অসবর্ণা কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ' এই পূর্ণ বাক্যটি পাওয়া যায় না; কাজেই রঘুনন্দন বাধ্য হইয়া এই চারিটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা হইতে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ রঘুনন্দনের মত বলিয়া যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহারা "চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের" আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে পারিলেও তাহার অর্থগ্রহণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করার কারণ দেখি না।

'সমুদ্রযাত্রাস্বীকার' পদটি স্পষ্টার্থক নহে। অনেকে মনে করেন, ইহা বিশেষ বা technical অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে যাহারা ব্রহ্মহত্যা করিত, তাহাদের পক্ষে সমুদ্রে অবগাহনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা ছিল। যথা কূর্ম্মপুরাণ বলেন,—

> অকামতঃ কৃতে পাপে প্রায়শ্চিত্তমিদং শুভং।
> কামতো মরণাচ্ছুদ্ধির্জ্ঞেয়া নান্যেন কেনচিৎ॥ ১৭।
> কুর্য্যাদর্শনং বাথ ভৃগোঃ পতনমেব বা।
> জ্বলিতং বা বিশেদগ্নিং জলং বা প্রবিশেৎ স্বয়ং॥ ১৮।
> ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা সম্যক্ প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
> ব্রহ্মহত্যাপনোদনার্থমন্তরা বা মৃতস্য তু॥ ১৯।
> উপবিভাগ, ৩০শ অধ্যায়।

অর্থাৎ জলে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ দ্বারা ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত হয়।

যেমন গঙ্গাযাত্রার অর্থ মরণের জন্য গঙ্গাতীরে গমন, সেইরূপ সমুদ্রযাত্রার অর্থ প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রাণত্যাগ জন্য সমুদ্রে গমন। পণ্ডিত কাশীরাম বাচস্পতি স্বকৃত 'সম্বন্ধতত্ত্ববিবৃতি' নামক উদ্বাহতত্ত্বের টীকায় 'সমুদ্রযাত্রা'র এই অর্থই করিয়াছেন। যথা "মরণমুদ্দিশ্য সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ...মহাপ্রস্থানগমনং মরণমুদ্দিশ্য হিমালয়গমনম্।" এই অর্থ পরিগৃহীত হইলে বৃহন্নারদীয়োক্ত উদ্ধৃত বচন বিদেশগমনের প্রতিষেধক হয় না।

কেহ কেহ 'সমুদ্রযাতুঃ স্বীকারঃ' এইরূপ পাঠোদ্ধার করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কমলাকরকৃত নির্ণয়সিন্ধুর উল্লেখ করা যায়। এইরূপ পাঠে কাশীরাম বাচস্পতির পারিভাষিক অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ পাঠ ভ্রমাত্মক। কারণ আমরা মূল বৃহন্নারদীয়ের পাঠ উদ্ধার করিয়াছি। তাহাতে 'সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ' এইরূপ পাঠ আছে।

'সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ' পদটি নিতান্তই যদি লৌকিক-অর্থপ্রযুক্ত হইয়া থাকে, তবু তাহাতে সমুদ্রগমন নিষিদ্ধ হয় না। ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত পদাবলীমাত্রই ধর্ম্মশাস্ত্র নহে। ধর্ম্মশাস্ত্র কি এবং তাহার ব্যাখ্যা প্রণালী কি তৎসম্বন্ধে প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। উপপুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্র নহে। আর তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র হইলেও শ্রুতি এবং স্মৃতির বিরুদ্ধ বলিয়া তাহা সর্ব্বথা লঙ্ঘনীয়।

বৃহন্নারদীয় অতি আধুনিক গ্রন্থ। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সমরঘোষণা করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর বৃহন্নারদীয় রচিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ পোষণ করা যায় না। উক্ত গ্রন্থের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বৌদ্ধগণ 'পাষণ্ড' নামে অভিহিত হইয়াছেন; এমন কি বৌদ্ধগৃহে প্রবেশ পর্য্যন্ত ঘোর পাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; যথা,—

> বৌদ্ধালয়ং বিশেদ্যস্তু মহাপদ্যপি বৈ দ্বিজঃ।
> তস্য বৈ নিষ্কৃতি নাস্তিপ্রায়শ্চিত্ত-শতৈরপি॥ ৬৯।
> বৌদ্ধাঃ পাষণ্ডিনঃ প্রোক্তাঃ যতো বৈ বেদনিন্দকাঃ।
> তস্মাদ্দ্বিজস্তন্নেক্ষেত যদি বেদেষু ভক্তিমান্॥ ৭০।

ঐ অধ্যায়েই শিবলিঙ্গ ও নারায়ণস্পর্শে স্ত্রীজাতি, শূদ্র ও অনুপনীতের অধিকারহীনতা বর্ণিত হইয়াছে। বৃহন্নারদীয়ের প্রতিপাদ্যবিষয় চৈতন্যোক্ত ধর্ম্ম ও তাঁহার আধুনিক শিষ্যগণের আচারের অতি অনুরূপ। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবভক্তি, তুলসীকানন, তুলসীমাহাত্ম্য, পুরাণপাঠস্থান, হরিকীর্ত্তন প্রভৃতি ওতপ্রোতভাবে উক্ত উপপুরাণের সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। অধিকন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে

দশাবতার-প্রসঙ্গ গীতগোবিন্দের 'কেশবধৃত বামনরূপ' ইত্যাদি দশাবতার বর্ণনার পূর্ব্বাভাষমাত্র; অথবা গীতগোবিন্দ বৃহন্নারদীয়ের উক্তাংশের পূর্ব্বাভাষ।

এই-সকল গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষা ইত্যাদির উৎপত্তি ও তত্তৎ ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির পরবর্ত্তী, তাহারও আভাষ পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণ বলেন 'দেশভেদে যে-কোন ভাষাতেই পুরাণ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; তবে কেবল দেশভাষায় রচিত গ্রন্থ পাঠ করিলে যথোক্ত-ফল পাওয়া যায় না।' যথা পাতালখণ্ডে—

> পুরাণন্থং পঠেদ্ গ্রন্থং ব্যাখ্যাস্বেচ্ছ বিচারয়ন্।
> যয়া কয়াপি বা রাম ভাষয়া দেশভেদতঃ ॥ ৬৩।
> নদেশভাষারচিতং গ্রন্থং শ্রুত্বা ফলং লভেৎ। ১ম অধ্যায়।

এই-সব চিন্তা করিয়া প্রতিপন্ন হয় যে, মুসলমান-রাজত্বে যখন হিন্দুসমাজ অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং হিন্দুর স্বাধীন উদ্যম রুদ্ধ হইয়া গেল এবং কচ্ছপশুণ্ডের ন্যায় হিন্দুগণ অধিক হইতে অধিকতর স্বগৃহ-কোটরগত হইতে লাগিলেন, সেই পতিত সমাজের অন্তরাজ-শক্তিক ব্যবস্থাপ্রণয়নশক্তিহীন পুরোহিত ঠাকুর সমুদ্র-যাত্রা ধর্ম্মসঙ্গত স্বীকার করিয়াও তাৎকালিক নির্জীব, নিশ্চল সমাজের অনভিপ্রেত বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন। সেদিনকার উপপুরাণ বৃহন্নারদীয় বা সেদিনকার টীকাকার রঘুনন্দনের এমন কি মাহাত্ম্য আছে যে, শ্রুতি ও প্রাচীন সংহিতাসমূহ উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিব? মন্বাদি ঋষি হইতেও কি রঘুনন্দনের গুরুত্ব অধিক?

আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ আলোচনা করিলাম। সহৃদয় পাঠক দেখিবেন শাস্ত্রে কুত্রাপি সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয় নাই। বোধ হয় ইহা বুঝিতে পারিয়াই আধুনিক রক্ষণ-শীলগণ একটুক সুর বদলাইয়াছেন। পূর্ব্বে শুনিতাম সমুদ্রযাত্রাই দূষণীয়; কিন্তু আজকাল শুনিতেছি সমুদ্র উত্তরণ তত দূষণীয় নহে; কিন্তু বিদেশে অখাদ্য ভোজনই দূষণীয়; প্রায়শ্চিত্তেও সে দোষের স্খালন হয় না। কলিকাতার উইলসনের হোটেল বা পেলেটীর দোকানের রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যসমূহ বোধ হয় শোধিত, কলবাহিত গঙ্গাজলে বিগতদোষ হয়; অন্যথা বিদেশে অখাদ্যভোজনে এত আপত্তি কেন? পূর্ব্বকালে যাহারা বিদেশে যাইত, তাহারা কি তত্তৎ দেশের লোকের হস্তস্পৃষ্ট 'অখাদ্য' গ্রহণ করিত না? কিন্তু শাস্ত্রে তো কোথাও তাহার কোন প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা নাই, বা প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক বলিয়াও উল্লেখ নাই। সম্প্রতি পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বঙ্গবাসী পত্রিকায় সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধির আলোচনা করিতেছেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় এক সময়ে পুনরুত্থানকারী সম্প্রদায়ের নেতৃস্বরূপ ছিলেন। সুতরাং সমুদ্রগমনের পক্ষে তাঁহার বাক্য অতিশয় মূল্যবান্। তাই এ স্থলে আমরা তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধার করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

> "সে সময়ে ভারতবাসী আর্য্যগণ ইয়ুরোপাদি বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেশে জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতেন, ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিম্বা নিকৃষ্টশ্রেণীর ভারতবাসিগণ যে গমনাগমন করিতেন, তাহাও বলা সঙ্গত নহে। মহামান্য ব্রহ্মবর্চ্চঃ-সম্পন্ন বহুসংখ্যক আর্য্যকুলধুরন্ধর ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়গণও ইয়ুরোপাদি প্রদেশে গমনাগমন করিয়াছেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে।"
> বঙ্গবাসী, ৮ই কার্ত্তিক, ১৩২০।

বস্তুতঃ সমুদ্রবাসীর প্রায়শ্চিত্ত রক্ষণশীলদের মতাপেক্ষিতাপ্রসূত হইলেও শাস্ত্রানুসারে তাহার কোনও প্রয়োজন নাই।

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূর্য্যের ব্রত

সূর্য্যের ব্রত করিলে মনস্কামনা পূর্ণ হয় ইহাই সংস্কার।

সূর্য্যের ব্রত বৎসরে দুইবার বৈশাখ ও মাঘ মাসে করা হয়। উক্ত দুই মাসের রবিবারে ব্রত করিতে হইবে।

ব্রতীদিগকে ব্রতের পূর্ব্বদিন একবেলা নিরামিষ ভোজন করিয়া সংযম করিতে হইবে। ব্রতের দিবস সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। বসিলেই ব্রতভঙ্গ হইবে এবং ঘরের ভিতর প্রবেশও নিষেধ। তবে ভ্রমণ ইত্যাদি আমোদ প্রমোদ করিয়া সময় কর্ত্তন করা যায়। *

* এই ব্রত মালদহ জেলাতেও প্রচলিত ছিল; স্থানীয় নাম "থাড় ব্রত।"—প্রবাসীর সম্পাদক।

ব্রতীরা ব্রতের দিবস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ, করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নান করেন। স্নানের পর আর্দ্রবস্ত্রে (কেহ কেহ বা পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন) "চাটা" (প্রদীপ) হাতে নিয়া করপুটে সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত সূর্য্যাভিমুখে দাঁড়াইয়া সূর্য্যের নানাপ্রকার স্তবস্তুতি করিয়া থাকেন। সূর্য্যোদয় হইলে পর আর্দ্রবস্ত্র পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক নানাপ্রকার বসন ভূষণ পরিধান করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ ও সঙ্গীতাদি করিয়া সময় কাটাইয়া থাকেন। আর কেহ কেহ বা ভিজা কাপড়েই দাঁড়াইয়া দিন কাটাইয়া থাকেন। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে পুনরায় স্নান করিয়া পূজা ও যজ্ঞের আয়োজন করিয়া রাখেন। ঠাকুর আসিয়া পূজা ও যজ্ঞ শেষ করিলে পর, ব্রতীদিগকে "যজ্ঞকুণ্ড" সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। তার পর সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রমণীগণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া নিম্নলিখিত ছড়াগুলি সুর করিয়া বলিতে থাকেন।

প্রথম দল—"কৈ যাও লাল ঠাকুর কি না বর দিয়া।
　　অমুকে রাখ্‌ছে তোমায় হাতে পায় ধরিয়া।"
দ্বিতীয় দল—"হোক তার ধনজন পরমায়ু বিস্তর।
　　সকালেতে হোক তার তীর্থ দরশন॥
　　পুত্র দরশন, বিবাহ দরশন, বিদ্যা দরশন"
　　　　ইত্যাদি।

এই ছড়াগুলি বরপ্রার্থনা ও বরপ্রাপ্তির জন্যই প্রত্যেকের নাম করিয়া বলা হইয়া থাকে।

সূর্য্য অস্ত গেলে পর ব্রতীরা গৃহে প্রবেশ করিয়া ফলমূল ভক্ষণ করিয়া থাকেন; আর কেহ কেহ বা নিরম্বু উপবাসও করিয়া থাকেন।

উপরোক্ত প্রণালীতেই এতদঞ্চলের মহিলাগণ সূর্য্যের ব্রত করিয়া থাকেন।

ধর্ম্ম ও পতি-পুত্রের মঙ্গলের জন্য এত কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ়বিশ্বাস।

শ্রীসত্যভূষণ দত্ত।

ত্রিপুরা।

অরণ্যবাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ:—কলিকাতাবাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটী বিক্রয় করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত পার্ব্বত্য বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই খানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাঁহাকে কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইল। গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। একদা মাধব দত্তের পত্নী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরী কন্যা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু সতীশবাবু পূজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্যা সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া সৌদামিনীর পিতা সতীশচন্দ্রকে কন্যাদানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কন্যা আশীর্ব্বাদ করিবেন স্থির হয়। সতীশচন্দ্র অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সৌদামিনীকে আশীর্ব্বাদ করিলে, দুই বন্ধুর মধ্যে কন্যাদের যৌবনবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহার ফলে, যৌবনবিবাহের অপ্রচলন সত্ত্বেও তাহার শাস্ত্রীয়তা সিদ্ধ হয়। ১৫ই ফাল্গুন তারিখে সতীশের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হইবে, স্থির হয়। সতীশের অনুরোধে ক্ষেত্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রকে পুরুলিয়া জেলা স্কুলে পড়িবার জন্য পাঠাইতে সম্মত হন। সতীশ সুরেন্দ্রকে আপনার বাসায় ও তত্ত্বাবধানে রাখিবার প্রস্তাব করেন। ক্ষেত্রনাথ অমরনাথ-নামক একজন দরিদ্র যুবককে আশ্রয় দিয়া বল্লভপুরে একটি পাঠশালা ও পোষ্ট-অফিস খুলিবেন, এবং সেই-সকল কর্ম্মে তাহাকে নিযুক্ত করিবেন সঙ্কল্প করিলেন।]

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

১৪ই ফাল্গুন তারিখের প্রাতঃকালে, সতীশচন্দ্র, তাঁহার পিসতুতো ভ্রাতা রজনীবাবু, তাঁহার দুইটী জ্ঞাতি ভ্রাতা, এবং পুরোহিত, পাচক ব্রাহ্মণ, দুইজন খানসামা ও একজন দাসী কাছারী বাটীতে উপনীত হইল। সতীশ-চন্দ্র সর্ব্বাগ্রে সাইকেলে অতি প্রত্যূষেই বল্লভপুরে উপস্থিত হইয়া ক্ষেত্রনাথকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিলেন। ক্ষেত্রনাথ সতীশকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। ক্ষেত্রনাথের সহিত দেখা হইবামাত্র সতীশচন্দ্র বলিলেন "ক্ষেত্তর, তোমাদের এখানে 'আলাদীনের প্রদীপ' আছে না কি? এ যে এই কয়েকদিনের মধ্যেই বল্লভপুরের শ্রী ফিরে গেছে! রাস্তা মেরামত হয়েছে; তোমার বাড়ী মেরামত হ'য়ে ধপ্‌ ধপ্‌ কর্‌ছে; তোমার বাইরের

ঐ ঘরগুলোরও সংস্কার হয়েছে; তোমার বাড়ীর সাম্‌নের এই বিস্তৃত মাঠটি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে—যেন এক নূতন স্থানে এসেছি ব'লে মনে হচ্ছে!"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "নূতন স্থানই তো! তুমি নূতন, আর আমাদের সহ্ ঠাকুরুণও নূতন; কাজেই বল্লভপুরও তোমার চক্ষে নূতন! তোমার সঙ্গীদের কত দূরে ছেড়ে এলে?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "তাঁরা বোধ করি এতক্ষণ মাধবপুরের কাছাকাছি হয়েছেন। তাঁদের আস্‌তে আর বড় দেরী নাই; এই চলে এলেন বলে। আরে ভাই, কাল রাত্রিতে বড় হিমভোগ করতে হয়েছে। তোমার বেহারা বেটারা মদের দোকানে মদ খেয়ে বেহুঁস্ হয়ে পড়েছিল। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর তোমার লখাই সর্দার তাদের একত্র কর্‌লে। তার পর বেটারা রাত্রি থাকতে থাকতে কিছুতেই পাল্কী তুল্‌তে চায় না। রাস্তার ধারে কতকগুলো শুক্‌নো পাতা আর খড় জেলে আগুন পোহাতে লাগ্‌ল। শেষে রাত্রি চারটের সময় আমি তাড়া দিলে, তারা পাল্কী নিয়ে উঠ্‌লো। আমি সকলকে বিদায় করে দিয়ে, ষ্টেশনে মুখ হাত ধুয়ে, সকলের শেষে সাইকেল চড়ে বেরুলেম। তোমার এই পাহাড়ো দেশে বেজায় ঠাণ্ডা হে—বেজায় ঠাণ্ডা। শীগ্‌গীর একটু চা তৈয়ের কর্‌তে বল।"

ক্ষেত্রনাথ যমুনার মাকে শীঘ্র চা প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পরে সতীশচন্দ্রের আত্মীয়গণের অবস্থানের জন্য তিনি যে যে ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে দেখাইলেন। সতীশচন্দ্র বলিলেন "চমৎকার বন্দোবস্ত হয়েছে; কোনও ত্রুটি নাই। আমার রজনীদাদা কখনও কল্‌কাতার বাহিরে আসেন নাই। শুন্‌তে পাই, ছেলেবেলায় নাকি তিনি একবার বর্দ্ধমান পর্যন্ত এসেছিলেন! তাঁর বিশ্বাস কল্‌কাতা ছাড়া আর কোথাও সভ্য মানুষের বাস নাই! পাড়াগাঁয়ের লোক সব ধাঙ্গড়-সাঁওতাল! এখন তিনি এসে কি বলেন, শোন। তাঁর জন্যই আমার একটু চিন্ত। তিনি কি এখানে আস্‌তে চান? তাঁকে যে কষ্টে বাড়ী থেকে বার করেছি, তা আমিই জানি।"

ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রের কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "একমাত্র তোমার রজনী দাদাই এ বিষয়ে দোষী নন। কল্‌কাতাবাসী অনেকেরই ধারণা, পাড়াগাঁ বাসের অযোগ্য, আর পাড়াগাঁয়ের লোক বড় অসভ্য। আমার আত্মীয় স্বজনেরাও বলেন যে, আমি পাড়াগাঁয়ে এসে বাস করে সাঁওতাল ধাঙ্গড়ের তুল্য হয়েছি। যাক্ সে সব কথা—এখন এই নাও,—চা প্রস্তুত হয়ে এসেছে।"

উভয়ে চা খাইতে খাইতে অনেক বিষয়ে গল্প করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "ওহে সতীশ, আমাদের ভট্টাচার্য্য মশাইটি যে-সে লোক ন'ন! এ অঞ্চলের রাজা জমীদারদের ঘরে তাঁর বিলক্ষণ সম্মান আর প্রতিপত্তি! তিনি মেয়ের বিয়ের জন্য যেরূপ উদ্যোগ আয়োজন করেছেন, তা সকলে করে উঠ্‌তে পারেন না। আমি তো দেখেই অবাক্!"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "তাঁর অবস্থার অতিরিক্ত বাহ্যাড়ম্বর করছেন না কি? তাঁকে তুমি নিষেধ কর নাই কেন? বেশী গোলমাল না করে চুপে চুপে কাজ সার্‌লেই তো হতো? আমি বাহ্যাড়ম্বর আদৌ ভাল বাসি না; বিশেষতঃ এই বয়সে বিয়ে কর্‌তে এসে। তোমার কথা শুনে আমার মনটা বড় খারাপ হ'ল যে!"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আচ্ছা, সতীশ, তোমার না হয় ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়স হয়েছে; তুমি না হয় একটু প্রবীণ হয়েছ। কিন্তু স্বহ্ ঠাকুরুণ তো আর প্রবীণা হন নাই। তার বিয়েতে তার বাপ যদি একটু বাহ্যাড়ম্বর করেন, তায় দোষ কি? আর অবস্থার অতিরিক্ত খরচপত্র তিনি অবশ্যই করছেন না, বা করবেন না। কিন্তু আমি যা কখনও আশা করি নাই, তিনি তাই করছেন। সেই কারণেই আমি চমৎকৃত হয়েছি। কাল তুমিও সমস্ত ব্যাপার দেখে বিস্মিত হবে।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "ব্যাপার কি, শুনি?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তা আমি বল্‌ছিনা। ঐ হে, ঐ তোমার পাল্কী দেখা দিয়েছে। ওঠ, ওঠ, ওঁদের অভ্যর্থনা করি গে, চল।"

বৈঠকখানার বারাণ্ডার সম্মুখে পাল্কী আসিয়া

লাগিলে, ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র অগ্রসর হইয়া পাল্কীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। পাল্কী হইতে সকলে অবতরণ করিলে, ক্ষেত্রনাথ প্রত্যেককে করজোড়ে প্রণাম করিয়া সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। সতীশ ক্ষেত্রনাথকে প্রত্যেকের পরিচয় প্রদান করিলেন। রজনীবাবু ক্ষেত্রনাথের বৃহৎ সুন্দর বাটী, বাটীর সম্মুখে প্রশস্ত পরিষ্কৃত মাঠ, ও অনতিদূরে বনাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালা দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া বলিলেন "আপনারই নাম বুঝি ক্ষেত্রবাবু? বাঃ, আপনি তো, মশাই, অতি সুন্দর স্থানেই বাস করেছেন! কল্‌কাতার বাইরে যে দ্রষ্টব্য কোনও সুন্দর স্থান থাকৃতে পারে, আমার তো সে ধারণাই ছিল না। এ যে দেখ্‌তে পাচ্ছি, আপনার এ দেশ স্বর্গরাজ্য বা নন্দনকাননের ন্যায় সুন্দর! আমি তো প্রকৃতির এমন বিচিত্র সৌন্দর্য্য জীবনে আর কখনও কোথাও দেখি নাই। আহা, যা দেখ্‌ছি সবই নূতন, সবই অদ্ভুত, সবই সুন্দর, সবই বিচিত্র! আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন একটী স্বপ্নের রাজ্যে বেড়াচ্ছি। আহা, আজ ভোরের সময় কি শোভাই না দেখ্‌লুম, আর কি সঙ্গীতই না শুন্‌লুম! আপনার বেহারারা একটী পাহাড়ের নীচে পাল্কী নামিয়েছিল। আমি কৌতূহল বশতঃ একবার পাল্কীর বাড় খুলে দেখি, পূর্ব্বদিক্ লাল হ'য়ে উঠেছে, আর রাস্তার পার্শ্বে স্তরে স্তরে পাহাড় আর বন। আমি অবাক্ হ'য়ে সেই শোভা দেখ্‌ছি, এমন সময়ে, মশাই, কার যেন ইঙ্গিতে সহসা সেই পর্ব্বত আর অরণ্য সহস্র সহস্র পাখীর সুমধুর কণ্ঠধ্বনিতে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌লো! ওঃ, সে কি চমৎকার, কি অদ্ভুত, কি শ্রুতিমধুর! আমি তো পাল্কী থেকে বেরিয়ে অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। যতীন, চারু,—তোমরা পাখীদের গান শুনেছিলে? পুরোহিত মশাই, আপনি শুনেছিলেন?"

যতীন্দ্র বলিল "তা আবার শুনি নাই? সে যে কি চমৎকার, তা কেউ না শুন্‌লে বুঝ্‌তে পারবেন না। আর পাখীই কত রকমের! সে সব পাখী আমরা কখনও দেখি নাই, বা তাদের গান শুনি নাই।"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন "ওগো, এই জন্যই আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় মুনি ঋষিগণ লোকালয় ছেড়ে অরণ্যে ও পর্ব্বতে বাস করতেন। পাহাড়-জঙ্গলে যে কেবল ধাঙ্গড় সাঁওতাল বাস করে, তা নয়। এই তো ক্ষেত্রবাবুর মতন লোক কল্‌কাতা ছেড়ে এই দেশে এসে বাস করছেন। ক্ষেত্রবাবুর মতন আরও অনেক সম্ভ্রান্ত লোক এদেশে বাস করেছেন। তা নইলে, সতীশ বাবু কি ধাঙ্গড়ের দেশে একটা মেয়ে পছন্দ করেন, না বিয়ে করতে আসেন?"

রজনীবাবু ও যতীন্দ্রের উপর কটাক্ষ করিয়াই এই শেষোক্ত মন্তব্যটি প্রকাশিত হইল। সেই কারণে সতীশচন্দ্র অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিলেন। রজনীবাবু পুরোহিত মহাশয়ের মন্তব্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সরলভাবে বলিলেন "পুরুত মশাই, আপনি ঠিক্ কথাই বলেছেন। আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ছিল।"

পুরোহিত মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "শুধু তাই নয়;—আমি এখনও মেয়ে দেখি নাই; কিন্তু আপনাদের ব'লে রাখছি, আপনারা দেখ্‌তে পাবেন, মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ ঋষিকন্যা! প্রকৃতির এমন সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে কন্যার জন্ম আর লালন পালন হয়েছে, তার স্বভাব ঠিক ঋষিকন্যাদের মতন হবেই হবে। আমরা যে সহরে বাস করি, সে তো সাক্ষাৎ নরক! আর এই দেশ যেন ঋষিদের পবিত্র আশ্রম বা তপস্বীদের তপোবন! আজ সতীশবাবুর কল্যাণে এমন দেশ দেখে ধন্য হলাম। দেখুন দেখি একবার চারিদিকে চেয়ে?"

ক্ষেত্রনাথ তাঁহাদিগকে বলিলেন "আজ, কাল, পরশ্ব—এখন এই তিন দিন আপনারা এই প্রদেশের শোভা দেখে বেড়াবেন। এখন আপনারা ভেতরে এসে বসুন, ও প্রাতঃকৃত্য সমাধা করুন।"

দুইটী বালক ভৃত্য সকলের জন্য জল, গাড়ু, ঘটী, তোয়ালে, গামোছা, মঞ্জন, দাঁতন প্রভৃতি লইয়া আসিল। সকলে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া উপবিষ্ট হইলে, গরম গরম চা ও মোহনভোগ আনীত হইল। পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, তিনি স্নানাহ্নিক সমাপ্ত না করিয়া কিছু খাইবেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে, দুইটী গোযানে, পাচকব্রাহ্মণ দাসী

ও ভৃত্যেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা গাড়ী হইতে বাক্স, তোরঙ্গ, বিছানা প্রভৃতি নামাইয়া যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিল। দাসী অন্তঃপুরে গমন করিল। তাহার অল্পক্ষণ পরেই ক্ষেত্রনাথের বরাতী দধি মৎস্য, ক্ষীর সন্দেশ প্রভৃতি আসিয়া পহুঁছিলে, ক্ষেত্রনাথ রজনীবাবুকে বলিলেন "আজই গাত্রহরিদ্রা; আপনি গাত্রহরিদ্রার জিনিষপত্র বা'র ক'রে দিন।"

রজনীবাবু একটী তোরঙ্গ হইতে সাড়ী, বডি, সেমিজ্, আয়না, চিরুণী, মাথার ফিতা, সাবান, তোয়ালে, রুমাল, এসেন্স্, সুগন্ধি তৈল, মাথাঘসা মশলা, চাঁদির রেকাব, কটোরা প্রভৃতি বাহির করিয়া দিলেন। কলিকাতা হইতে তাঁহারা দুই ঝুড়ি উৎকৃষ্ট ফল এবং ভাল আম-সন্দেশ আনিয়াছিলেন; তাহাও বাহির করিয়া দিলেন। মনোরমার অন্তঃপুরে এই-সমস্ত দ্রব্য ও দধি সন্দেশাদি নীত হইলে, তিনি সেগুলি সাজাইয়া গোছাইয়া কতিপয় দাসী ও ভৃত্যের দ্বারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কাছারীবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া রজনীবাবু প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইয়া গেলেন। ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের সৌজন্য ও বিনয়ে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন।

সেইদিন বেলা এগারটার পর গাত্রহরিদ্রা না হইলে কন্যার গাত্রহরিদ্রা হইবে না, এই কারণে পুরোহিত মহাশয় সতীশচন্দ্রকে ত্বরাপ্রদান করিতে লাগিলেন। সতীশচন্দ্র বিপন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া পুরোহিত মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন "সতীশবাবু, তোমার কোনও চিন্তা নাই। তুমি স্নানাহ্নিক ক'রে প্রস্তুত হও; আমি কেবল একবিন্দু হরিদ্রা তোমার কপালে স্পর্শ করিয়ে কন্যার গৃহে পাঠিয়ে দেব। শাস্ত্রোক্ত বিধি, যতদূর সম্ভব হয়, পালন করা কর্ত্তব্য।"

সতীশচন্দ্র কি করেন, অগত্যা স্নানাহ্নিক সম্পন্ন করিয়া একটী গৃহের মধ্যে আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পুরোহিত মহাশয় তাঁহার কপালে হরিদ্রাবিন্দু স্পর্শ করাইবামাত্র অন্তঃপুরের বারাণ্ডা হইতে বামাকণ্ঠে উলুধ্বনি ও শঙ্খ-ধ্বনি হইল। মনোরমা গ্রামের কতিপয় ব্রাহ্মণকন্যাকে অগ্রেই ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন। শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি শুনিবামাত্র সতীশচন্দ্র চমকিত হইয়া উঠিলেন, এবং লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া বহির্ব্বাটীতে পলাইয়া আসিলেন।

যথাসময়ে কন্যার গৃহেও কন্যার গাত্রহরিদ্রা হইয়া গেল। ময়নাগড়ের রাজা তাঁহার বিখ্যাত রওশনচৌকীর বাদ্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রওশনচৌকীর সুমধুর ধ্বনিতে ও আনন্দকোলাহলে বল্লভপুর গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মধ্যাহ্নে রজনীবাবু প্রভৃতি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। এমন দুগ্ধ, এমন ক্ষীর, এমন মৎস্যের ঝোল, এমন মিষ্ট তরকারী তিনি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও কোথাও আস্বাদন করেন নাই। কফি, মটরসুঁটি, আলু প্রভৃতি ক্ষেত্রনাথের বাগানে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবগত হইয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। চাউল, মুগের দাল প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার কৃষিজাত, ইহা অবগত হইয়া তাঁহার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দুগ্ধ তাঁহার গৃহপালিত গাভী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবগত হইয়া তাঁহার বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, চলুন, চলুন, আপনার গাইগরু আর গোলঘর দেখে আসি।" ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র তাঁহাকে এবং অপর সকলকে সঙ্গে লইয়া খামারবাড়ী, গোয়ালঘর, তরকারী-বাগান প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। ধান্যের মরাই এবং তাঁহার ভাণ্ডার-গৃহে রক্ষিত ও সঞ্চিত রাশীকৃত কলাই, মুগ, অড়হর, সরিষা, গুঞ্জা ও আলু দেখিয়া সকলে অবাক্ হইলেন। রজনীবাবু আনন্দমিশ্রিত বিস্ময় সহকারে বলিলেন "এ কি দেখ্‌ছি, ক্ষেত্রবাবু? এ যে আপনি রাজার হালে আছেন! এ যে আপনি আমাদের মতন দশটি গৃহস্থকে প্রতিপালন করতে পারেন! আপনি কলকাতা ছেড়ে কতদিন এখানে এসেছেন?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "প্রায় একবৎসর হ'বে।"

রজনীবাবু বলিলেন "বটে? এর মধ্যেই আপনি এত উন্নতি করেছেন? চমৎকার তো? আপনার বাড়ী পটল-ডাঙ্গায় ছিল বলছিলেন না?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "হাঁ।"

"আমাদের চোরবাগানেও যে আপনাদের অনেক গন্ধবেণে আছেন। আপনি সর্ব্বেশ্বর দাঁকে চেনেন?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "তিনি আমার শ্বশুর।"

রজনীবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন "বটে? বটে? আপনি সর্ব্বেশ্বর দাঁয়ের জামাতা? আপনি তাঁর কোন্ মেয়েকে বিয়ে করেছেন? ছোটমেয়েকে বুঝি?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "হাঁ।"

রজনীবাবু বলিলেন "কি অদ্ভুত! কি চমৎকার! তার নাম মনোরমা নয়? ওহে, মনোরমা আর আমার ছোট বোন্ সরলা যে সমবয়সী, আর তারা সর্ব্বদাই একসঙ্গে খেলা কর্‌তো ও বই পড়তো। মনোরমাকে নিয়ে আপনি এখানে এসেছেন?—হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে, বটে। সরলা সেদিন আমাদের বাড়ী এসেছিল; সে আপনার ছোট শালা বীরুকে মনোরমার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল। বীরু বল্‌লে যে, মনোরমার শরীর বড় অসুস্থ; তাই পশ্চিমে হাওয়া বদ্‌লাতে গেছে! মনোরমা যে এখানে এসেছে, তা তো আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। যা হোক্, আজ আমি আপনাদের এখানে এসে ভারি আশ্চর্য্য হ'য়ে পড়্‌লুম, দেখ্‌ছি। বাঃ, আপনি তো ভারি সুন্দর জায়গায় এসে বাস করেছেন।" এই বলিয়া তিনি সতীশকে বলিলেন "সতীশ, তুমি তো মধুপুর, বৈদ্যনাথ দেখেছ। সে সব স্থান কি এমন স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "মধুপুর, বৈদ্যনাথ স্বাস্থ্যকর স্থান বটে। কিন্তু সেখানে আজকাল বহু লোকের বাস হয়েছে, আর ম্যালেরিয়া বিষও প্রবেশ করেছে। স্বাস্থ্যকর হ'লেও সেখানকার প্রকৃতির শোভা এর কাছে কিছুই নয়। আমি তো ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য অনেক প্রদেশে বেড়িয়েছি, কিন্তু ঐ পাহাড়ের উপর থেকে অপর পার্শ্বে নন্দনপুর মৌজার যে চমৎকার প্রাকৃতিক শোভা দেখেছি, তেমন আর কোথাও দেখি নাই। আপনি যদি পাহাড়ে উঠতে পারেন, তা হ'লে সেই শোভা দেখে মুগ্ধ হবেন।"

রজনীবাবু বলিলেন "না, হে সতীশ, একেবারে আর অত সৌন্দর্য্য দেখে কাজ নাই। তা হ'লে, মাথা গুলিয়ে যাবে। যা দেখ্‌ছি, তা'তেই আমি অস্থির হ'য়ে পড়েছি। যদি আর কখনও এখানে আসা হয়, তা হ'লে তখন তোমার পাহাড়ে উঠ্‌বো।" কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি চিন্তা করিয়া বলিলেন "দেখ সতীশ, এই অঞ্চলে আমাদের এক-একটা বাঙ্গলা প্রস্তুত কর্‌লে হয় না? কল্‌কাতায় মাঝে মাঝে প্লেগ্ টেলেগ্ নানারকমের উপদ্রব উপস্থিত হয়; তখন কোথায় পালানো যাবে, তাই ভাবি। এইরূপ স্থানে যদি একটা বাড়ী থাকে, তা হ'লে নিশ্চিন্ত হ'য়ে দিব্যি দুমাস কাটানো যায়। আর যখন ক্ষেত্রবাবু এখানে বাস করেছেন, আর আমাদের একজন নূতন কুটুম্বও হচ্ছেন, তখন এখানে এলে আমরা একেবারে নির্ব্বান্ধবপুরীতে এসে পড়্‌বো না। তুমি কি বল? রেলষ্টেশন থেকেও তো বল্লভপুর বেশী দূরে নয়। পাঁচ ছয় মাইল দূর হ'বে। ... ..হাঁ, তোমার ক্ষেত্রবাবুকে দেখে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে। আমাদের নিশি তো এল্-এ ফেল্ হ'য়ে অবধি কি কর্‌বে তাই ভাবছে। তাকে এই অঞ্চলে কিছু জমীজায়গা কিনে দিলে হয় না? সেও ক্ষেত্রবাবুর মত ফার্ম্মিং কর্‌তো? কি ক্ষেত্রবাবু, জমী জায়গা এই অঞ্চলে সুবিধামত পাওয়া যায় না?"

ক্ষেত্রনাথ উত্তর প্রদান করিবার পূর্ব্বেই সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "উনিই এই বল্লভপুরের মালিক; আর বোধ হয় শীঘ্রই পাঁচ সাত হাজার বিঘা জমী ওঁর হাতে আস্‌ছে। উনি একজনের কেন, ইচ্ছা কর্‌লে, দুই শত লোকের সংসার চালাবার উপযুক্ত জমী বিলি কর্‌তে পারবেন। তা নিশিকে আপনি যদি এখানে পাঠাতে চান, জমীর অভাব হ'বে না।"

যতীন্দ্র ও চারু তাহা শুনিয়া ব্যগ্রভাবে ক্ষেত্রবাবুকে বলিল "বলেন কি, মশাই? আপনার এত জমী? তা হ'লে আমাদেরও কিছু কিছু জমী দিতে হ'বে। আমরাও আস্‌বো।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, তার জন্য কিছু আটকাবে না। যখন জমী বিলিবন্দোবস্ত হ'বে, তখন আপনাদের সংবাদ দেব। আপনাদের মতন লোক এসে চাষ বাস কর্‌লে তো খুব আনন্দেরই কথা হবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। মনোরমা সৌদামিনীদের বাড়ীতে অবুঢ়ান্নের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইলে নগেন্দ্র তাঁহাকে রজনীবাবুর পরিচয় প্রদান করিল। তাহা অবগত হইয়া মনোরমা রজনী-বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যগ্র হইলেন। নগেন্দ্র আসিয়া তাহার পিতাকে চুপি চুপি জননীর ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, ক্ষেত্রবাবু বলিলেন "যাও না, রজনীবাবুকে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাও।" তারপর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মশাই, আপনি একবার বাড়ী-ভেতরে যান।"

রজনীবাবু বলিলেন "তা যাব বই কি? মনোরমাকে একবার দেখে আসি।" এই বলিয়া তিনি নগেন্দ্রনাথের সহিত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। (ক্রমশ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

প্রতিজ্ঞা পূরণ

(গল্প)

(১)

ফুলের প্রয়োজন ফুরাইলেই ফুল ঝরিয়া পড়ে। যতক্ষণ তাহাকে আদর করিয়া গলায় পরিবে, দেবতার পূজায় লাগাইবে ততক্ষণই তাহার জীবন; রাত্রির ফোটাফুল প্রভাতের উপেক্ষা সহিতে না সহিতেই মৃত্যুর স্নিগ্ধ-কোলে আপনার অনাদৃত জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস শেষ করিয়া যায়। দীর্ঘ রাত্রিদিন জীবনের বোঝা বহিয়া তাহাকে বেড়াইতে হয় না। কিন্তু মানুষের ভাগ্যে এত সুখ নাই; গন্ধহীন, সৌন্দর্য্যহীন জীবন লইয়া পুঞ্জীভূত অশ্রুজল ও দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে বহুকাল কাটাইয়া তবে তাহার ছুটী। আসল কথা জীবনের দেনা পাওনার হিসাব কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া না দিয়া কাহারও মুক্তি নাই। জীবনের দীর্ঘযাত্রার জন্য যে যতখানি পাথেয় সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছে তাহা নিঃশেষে ভোগ করিয়া যাইতেই হইবে।

এই জন্যই যদিও সকলেই মনে করিয়াছিল এবার আর উমার নিস্তার নাই তথাপি দীর্ঘ রোগ ভোগের পরে উমাকে বাঁচিয়া উঠিতে হইল। কতদিন ধরিয়া যে রোগীর গৃহে জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধ চলিতেছিল তাহা বলা যায় না; উমার স্বামী অনাথ কত বিনিদ্র রজনী বালিকা উমার ম্লান পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া ভোর করিয়াছে। ডাক্তার কবিরাজ একরকম জবাব দিয়া গিয়াছিল। উমার শাশুড়ী মা-কালীর কাছে জোড়া-পাঁঠা মানত করিয়াছিলেন। অনেকগুলি স্নেহশীল হৃদয়ের ব্যাকুল প্রার্থনায় বোধ করি নিষ্ঠুর মৃত্যুর মনে একবিন্দু দয়ার উদয় হইয়াছিল। সে আপনার কবলিত এই তরুণ জীবনটীকে রাখিয়া গেল বটে কিন্তু নিজ কঙ্কাল করের চিহ্ন রাখিয়া যাইতে ভুলিল না। রোগ সারিবার কিছুদিন পরে সকলেই বুঝিল উমা চিরদিনের মত পঙ্গু হইয়া গিয়াছে, দুর্ব্বল পা দুখানা আর কোনদিন দেহের ভার বহিতে সমর্থ হইবে না। বহুদিন ধরিয়া অনেক দেবতার চরণামৃত পান, ঔষধ সেবন ও ভস্মলেপন চলিল কিন্তু ফল হইল না!

এই দুর্ঘটনার একটা সুফল দেখা গেল; উমার বিবাহের পর হইতে তাহার শ্বশুর ও পিতার মধ্যে যে একটা মনোমালিন্য চলিতেছিল তাহা দূর হইয়া গেল। উমার চিকিৎসা প্রভৃতি লইয়া দুই পরিবারের মধ্যে আবার পরামর্শের আদান প্রদান চলিতে লাগিল।

এই নিষ্ঠুর আঘাতে উমার যে কেমন অবস্থা হইয়াছিল তাহা আর বলিতে হইবে না। তরুণ জীবনে শক্তিহীন জীবন্মৃত হইয়া থাকার মত দুরদৃষ্ট আর নাই। এই প্রতীকারহীন বেদনা একখানা ভারি পাথরের মত তাহার বুকের উপরে রাত্রিদিন চাপিয়া রহিল; ইহাকে সে যে কোন উপায়ে ফেলিয়া দিতে পারে তাহার পথ নাই। এই অবস্থায় পুরুষপ্রকৃতি নিষ্ঠুর ও অবিশ্বাসী হইয়া উঠে, নারীপ্রকৃতি নম্র ও স্নেহশীল হয়। উমা সংসারের কাছে বঞ্চিত হইয়া যখন কোন সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইল না তখন আপনার অন্তরবাসী দেবতার নিভৃত মন্দিরের মধ্যে ক্ষুধিত ব্যথিত হৃদয়ের রিক্ত ভিক্ষাপাত্র লইয়া থামিয়া দাঁড়াইল। সেইখানেই সে আপনার সমস্ত

দৈন্য সমস্ত মলিনতা বিসর্জ্জন দিয়া অপূর্ব্ব শান্তিলাভ করিল। সে মনে মনে বলিল "ঠাকুর, তুমি যা নিয়েছ তার জন্য আমার কেন এই শোক! কেবল দেখিও আমার স্বামী যেন আমাকে বোঝা মনে না করেন।"

হায়! উমা তখনও বোঝে নাই যে দেবতা যখন চান তখন সবটুকুই চান, খানিকটা হাতে রাখিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করা যায় না।

পাড়ার অনেক প্রবীণা গৃহিণী উমার শ্বাশুড়ীকে বলিতে আসিলেন "এইবার ছেলের আর একটা বিবাহ দাও। এ বৌ ত তোমার থাকিয়াও নাই।"

শ্বাশুড়ী বলিলেন "উহার অদৃষ্ট মন্দ তাই বলিয়া উহার কষ্টের বোঝা বাড়াইয়া কাজ নাই! ভগবান এতে খুসী হইবেন না।"

গৃহিণীগণ বিস্ময়ে কণ্টকিত হইয়া বলিতেন "এমন সোনারচাঁদ ছেলে, তার এমন বউ! এ ত চক্ষে দেখা যায় না।"

শ্বাশুড়ী কপালে করাঘাত করিয়া বলিতেন "যেমন কপাল! সব ত এই পোড়া কপালের দোষ। নইলে বৌমার ত শরীরে কোন দোষ ছিল না।"

এই রকম আলোচনা গৃহিণীগণের সমিতিতে প্রায়ই আলোচিত হইত। উমা সকলই বুঝিত কিন্তু তাহার একটি দুর্ব্বলতা ছিল—সে কোনদিন মুখ ফুটিয়া স্বামীকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতে পারিল না। সে সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যগুলিও একান্ত চেষ্টা নৈপুণ্য ও নিষ্ঠা-সহকারে সমাপন করিতে লাগিল। সে মনে মনে বলিত "একেই ত আমি অযোগ্য, তাহার উপরে গুরুজনের সেবা হইতেও যদি বঞ্চিত হই তবে ত পাপও করিলাম—প্রায়শ্চিত্তও ত হইল না।" এইরূপে দুঃখের দীর্ঘদিন উমার পক্ষে সহজ হইয়া আসিল, সে জোর করিয়া মনকে প্রসন্ন করিয়া তুলিল।

(২)

এইরূপে সুখে দুঃখে দিন কাটিতেছিল। ইতিমধ্যে উমার শ্বশুরের মৃত্যু হইয়াছিল। যিনি দুঃখ বিপদের মধ্য দিয়া নিপুণ নাবিকের মত সংসারটীকে চালাইয়া লইতেছিলেন তাঁহার অভাবে সংসার তেমন করিয়া চলিতে পারে না; তা ছাড়া অমনোযোগী কাণ্ডারীর হাতে পড়িয়া সমস্তই বিশৃঙ্খলা হইয়া পড়িল। উমার মনে হইতেছিল অনাথ যেন যথেষ্ট পরিমাণে মনোযোগ দিতেছে না, গৃহকর্ত্তার যতখানি সংযম জ্ঞানশীলতা প্রয়োজন তাহা তাহার নাই। আগে যে-মুখ হাসিভরা ছিল, সে-মুখের হাসি নিভিয়া গিয়াছে এবং তাহা ঢাকিবার জন্য সে যেন একখানা মুখোস পরিয়া আছে। আশঙ্কাধর্ম্মী ভালবাসা উমার চিত্তের মধ্যে অবিরত গুঞ্জন করিতে লাগিল। যে সূর্য্যমুখী সূর্য্যের মুখ চাহিয়া বাঁচে, সূর্য্য যে অস্ত গিয়াছে তাহা তাহাকে বলিয়া দিতে হয় না। উমা হৃদয়ের মধ্যেই অনুভব করিতেছিল যে তাহার সৌভাগ্য-রবি অস্ত গিয়াছে।

শ্বশুরের মৃত্যুর পর একবৎসর না কাটিতেই উমা শুনিতে পাইল যে কালীহর ভট্টাচার্য্যের কন্যা শশীর সঙ্গে অনাথের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। শশী তাহাদেরই প্রতিবেশিনী। তাহাকে উমা অনেকদিন হইতেই দেখিতেছে। সেই সুন্দরী প্রগল্‌ভা বালিকা যে কেন সপত্নীর ঘর করিতে আসিতেছে তাহা উমা প্রথমটা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে শুনিল যে কন্যার কোষ্ঠীপত্রে বৈধব্যের সম্ভাবনা লেখা ছিল; সেই ভবিতব্য খণ্ডন করিবার জন্যই পিতামাতা কন্যাকে সপত্নীহস্তে সমর্পণ করিতেছেন, যদি সপত্নীর স্বামীভাগ্যে তাঁহার বৈধব্যদশা কাটিয়া যায়।

স্বামীর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সংসারের ভাঙ্গনধরা উপকূলে উমা যে আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়াছিল এক নিমেষে সে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া গেল, সমস্ত জগতের চেহারা এমন বদল হইয়া গেল যে উমা যেন তাহার মধ্যে পরিচিত কিছুই দেখিতে পাইল না। দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের মত সে উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্যে ঘুরিয়া মরিতে লাগিল। দগ্ধ হৃদয়খানির জন্য একবিন্দু জলও যেন তাহার প্রার্থনীয় ছিল না। অন্তরের এই দারুণ বিপ্লবে উমা একবিন্দু চোখের জল ফেলিল না, একটা পর্ব্বত-প্রমাণ বোঝা নিরুদ্ধ অশ্রুউৎসের দ্বার চাপিয়া রহিল। কেবল এই একান্ত নিঃসহায় অবস্থায় পিতৃগৃহে স্নেহময় মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল

হইয়া উঠিল। সে শাশুড়ীকে বলিল "অনেক দিন মা-বাবাকে দেখি নাই, আমাকে মা একবার সোনাপুকুরে পাঠাইয়া দাও।" শাশুড়ী অত্যন্ত দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। এমন সময় তাঁহার সঙ্কট মোচন করিয়া উমার পিতাই তাহাকে লইতে পাঠাইলেন। যাইবার পূর্ব্বে উমা অনাথের কাছে বিদায় লইতে গেল; উমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিয়াছিল; অনাথও যেন কোন কথা খুঁজিয়া পাইতেছিল না; তথাপি দুএকটা কথা বলিয়া লইবার জন্য উমাই প্রথমে কথা কহিল, বলিল, "মাসে মাসে যেন তোমাদের খবর পাই, কতদিন পরে আসি ঠিক নাই।"

এবার অনাথের মুখ ফুটিল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "উমা, তুমি রাগ করিয়া যাইতেছ? আমি জানি আমি অপরাধী, কিন্তু তুমি আমায় পরিত্যাগ করিও না।"

উমা বলিল "না, রাগ করি নাই, তুমি আমাকে ত্যাগ না করিলে কি আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি?" উমা আর কিছু বলিতে পারিল না।

শাশুড়ীর পায়ে প্রণাম করিতেই তিনি মুখ ফিরাইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

পাল্কী যখন বাড়ী ছাড়িয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল তখন উমা একবার সেই প্রিয় গৃহের দিকে ফিরিয়া তাকাইল। দুর্দ্দিনের ঝড়ে নীড়চ্যুত বিহঙ্গের মত তাহার সমস্ত চিত্ত সেইখানেই উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। যে গৃহে আট বৎসর পূর্ব্বে বার বৎসরের বালিকা উমা লাল বেনারসী পরিয়া, রত্নালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া, মঙ্গলশঙ্খধ্বনি ও উন্মুখ চিত্তের শুভ আবাহনের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল আজ সে আশ্রয় হইতে কে তাহাকে ভিখারিণীর মত দূর করিয়া দিতেছে? সে দিনের সে উৎসব-সমারোহ কোন্ স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছে! গ্রাম ছাড়িয়া পাল্কী মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল; দেখিতে দেখিতে গ্রামের উচ্চ শিবমন্দিরের চূড়াও দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেল। অনেক দিনের সঞ্চিত অশ্রু দুই চোখ দিয়া হু হু করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। গ্রামের প্রান্তে সবুজ শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া স্নিগ্ধ বাতাস বহিয়া যাইতে লাগিল; উড়ে বেহারার উৎকট চীৎকারে দুএক জন রাখাল বালক মেঠো সুরে অনাগত প্রিয়ার উদ্দেশে যে বিরহবেদনা নিবেদন করিতেছিল তাহা বন্ধ করিয়া কৌতূহলী চোখ তুলিয়া পাল্কীর দিকে চাহিয়া দেখিল।

(৩)

পিতামাতার স্নেহের মধ্যে থাকিয়াও উমা যেন শান্তি পাইল না। একটা দুঃখের তীক্ষ্ণ শর তাহার বুকের মধ্যে বিঁধিয়া থাকিয়া অহরহ পীড়া দিতে লাগিল। উমা মনে মনে ভাবিল আমি ভুলিয়া যাইব যে কোনদিন এ ঘর ছাড়িয়া গিয়াছিলাম; এই খানেই আমার আশ্রয়; যে নৌকায় যাত্রা করিয়াছিলাম সে নৌকা ত ডুবিয়াছে; এখন সে নষ্ট-সৌভাগ্যের কথা আর কোন মতেই মনে স্থান দিব না।

কিন্তু ভুলিব এই পণ যেন মনে করাইয়া রাখিবার কারণ হইয়া উঠিল। শৈশবে যে-গৃহ সুখের আলয় ছিল আজ সে গৃহের সে-ইন্দ্রজাল আর নাই। উমার বক্ষের মধ্যে ক্ষুধিত আকাঙ্ক্ষা মাতৃহীন শিশুর মত তাহার কাছে কাতরকণ্ঠে কি যে ভিক্ষা চাহিতে লাগিল তাহা উমা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। অতীতের সহস্র স্মৃতি ও তাহার বাল্যসঙ্গিনীগণ হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিয়া গেল।

অনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে সে খবর উমা পাইয়াছিল। উমার মা সিদ্ধেশ্বরী কঠোর প্রকৃতির রমণী, তিনি উমার শ্বশুরকুলের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। উমার শাশুড়ী বধূকে লইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী তাহাদিগকে এমন কতকগুলা অপমানকর কথা বলিয়া বিদায় করিয়াছিলেন যে তাহার পর আর কেহ সোনাপুকুরে আসিতে সাহস করে নাই। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়াছে। এতদিন চলিয়া গিয়াছে কেহ তাহার খোঁজ লইতেছে না। উমা আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছিল না। পিতামাতার কাছে মুখ ফুটিয়া অনুমতি চাহিতেও বাধিতেছে। সেদিন আপনার ঘরের মেঝেতে বসিয়া উমা রামায়ণ পড়িতেছিল, সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, পশ্চিম আকাশের শেষ রক্ত আভা জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া মুমূর্ষুর শেষ হাসির

মত একবার উজ্জ্বল হইয়া পরক্ষণেই মিলাইয়া গেল। রামায়ণের সেই প্রাচীন কাহিনীর চিরন্তন করুণ-রাগিণীটি উমার বক্ষের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া বাজিতে লাগিল। উমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বইখানা বন্ধ করিয়া রাখিয়া সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকার আকাশের দিকে চাহিল, দুই চোখ দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। এমন সময়ে দাসী একখানা পত্র আনিয়া উমার হাতে দিল এবং প্রদীপটা আগাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কে উমাকে পত্র লিখিল! উপরে অপরিচিত হস্তাক্ষর। তথাপি কিসের আশা এবং আশঙ্কা বুকের মধ্যে দ্রুততালে স্পন্দিত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে চিঠি খুলিল। উমার শাশুড়ী পত্র লিখিয়াছিলেন। দু চারিটী অবান্তর কথার পরে লেখা ছিল "মা! সংসারে আর আমার সুখ নাই। তাই কাশী যাইব স্থির করিয়াছি। তবে আমার একটা অনুরোধ মা তুমি রাখিও। এই মাসের শেষে আমি, যাইব তাহার আগে আমাকে দেখিয়া যাইও।" উমা বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সেই মমতাময়ী ক্রোধবিরোধহীনা রমণী কেন আজ সংসারের মায়া কাটাইতে যাইতেছেন। তাঁহার এ অনুরোধ ত রাখিতেই হইবে। বলিয়া কহিয়া পিতা মাতার কাছে অনুমতি মিলিল। উমা কাহাকেও খবর দিল না; পিতৃগৃহের বিশ্বাসী ভৃত্য সাধুদাদাকে সঙ্গে লইয়া উমা শ্বশুরবাড়ী গেল। উমা যখন শ্বশুরবাড়ীতে পৌঁছিল তখন সবে সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে, বাড়ীটি নিস্তব্ধ, বৃদ্ধা গৃহিণী অন্ধকার বারান্দার এককোণে বসিয়া মালা জপিতেছিলেন, পাল্কীর শব্দে চকিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কে এলে গা?" সাধু অগ্রসর হইয়া উত্তর দিল। শাশুড়ী বধূকে সযত্নে উঠাইয়া ঘরের মধ্যে লইয়া আসিলেন। উমা তাঁহার পায়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেই উভয়েরই অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। নীরব সহানুভূতি-ভরা অশ্রুজলের স্নিগ্ধ শান্তি উমার তাপদগ্ধ হৃদয়কে জুড়াইয়া দিল।

(৪)

দুই বৎসর পরে উমা শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। এমন ত কিছু বেশী দিন নয় কিন্তু উমার মনে হইল যেন কত যুগ পরে সে ফিরিয়াছে। তাহার স্নেহ-সেবায় মণ্ডিত হইয়া যে ঘর উজ্জ্বল ছিল, আজ তাহার শ্রীহীন অনাদৃত মূর্ত্তি দেখিয়া দু এক দিনেই উমা বুঝিল গৃহলক্ষ্মীর আসন স্থানচ্যুত হইয়াছে। দেওয়ালে মাকড়সার জাল, তেলের ছাপ; বাগানে উমার স্নেহপালিত যুঁই বেলফুলের গাছ আগাছার নীচে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে; তবে যে দু চারিটী গোলাপের গাছ ছিল, জলাভাবে উহারা শুকাইয়া মরিয়া গিয়াছে। এই নূতন সংসারে উমা আর একটী নব আগন্তুককে দেখিল, সেটী অনাথের শিশুপুত্র ননী। ইহার আগমন-সংবাদ উমা পায় নাই। গৃহের সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা, অনাথের দর্শনলাভ কদাচিৎ ঘটে। আগেকার পরিচিত সংসারের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র শিশুটী কোন্ ইন্দ্রজালে উমার হৃদয়ের মধ্যে একটী স্নেহের উৎস খুলিয়া দিল। তাহার স্নেহের শিশুটির মাতা বলিয়া শশীকেও সে আপন করিয়া লইল, সপত্নী বলিয়া তাহাকে দূর করিতে পারিল না। বাস্তবিক শশীর প্রতি উমার করুণার অন্ত ছিল না। তাহার মনে হইত শশী জীবনে কি লাভ করিল! তাহার স্বামী আর শশীর স্বামী কি একই ব্যক্তি? তরুণ বয়সে উমা যাহাকে দেবতার মত পূজার অর্ঘ্য সমর্পণ করিয়াছিল, সে দেবতা পৃথিবীর মলিন ধূলায় একেবারে ম্লান হইয়া গিয়াছে।

ননীকে লইয়া উমার জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল; সে তাহাকে নাওয়াইয়া, খাওয়াইয়া, ঘুম পাড়াইয়া, কাজল পরাইয়া সমস্তদিন কাটাইয়া দিত। সন্ধ্যাবেলা ননী ঘুমাইয়া পড়িলে তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া অতৃপ্তনয়নে তাহার সুন্দর সুকুমার মুখখানি দেখিত। শশীও ক্রমে ক্রমে উমার ঘরে নিত্য অতিথি হইয়া পড়িল। অনাথ যতক্ষণ নেশায় ও আমোদে বাহিরে বাহিরে ঘুরিত ততক্ষণ এই দুইটী ব্যথিতা নারী একই ব্যথায় একই স্নেহে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল। এক-একদিন শশী উমাকে বলিত "দিদি, তুমি আমাকেও আপন করিলে। যে তোমার কাছে আসে তুমি তাকেই টান, কেবল স্বামী কেমন করিয়া যে তোমার কাছ হইতে দূরে গেলেন তা বুঝিতে পারি না।"

উমা হাসিয়া বলিত "তুমি দিদিকে যত বড় মাণিক

মনে কর আসলে দিদি তা নয়। যারা মণি চেনে তাদের কাছে নুটার আদর থাকে না।"

শাশুড়ী কাশীযাত্রাকালে উমার হাত ধরিয়া বলিয়া গেলেন "তুমি এখর ছাড়িও না মা! অনাথ ত সব উড়াইল। তুমি থাকিলে তবু তোমার শ্বশুরের ভিটাটা বজায় থাকিবে।"

উমা দেখিতে পাইতেছিল যে অনাথের হাতে তাহার শ্বশুরের সম্পত্তি জলের মত উড়িয়া যাইতেছে। ননীর জন্য তাহার ভাবনার অন্ত ছিল না। তবু একটা সুখ তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল। পিতার প্রচুর সম্পত্তির সমস্তই ত উমার। তাহার যাহা কিছু আছে সব সে ননীকে দিয়া সুখী হইবে। উমার মনে হইত ননী তাহারই। সুদূর ভবিষ্যতে তাহার এই পুত্র ও একটী বালিকা বধূ লইয়া উমা বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রা আবার আরম্ভ করিবে। এইরূপে উমার জীবনের এই সুখের দিনগুলি দ্রুতবেগে অতীত হইয়া গেল। একদিন সংবাদ আসিল পিতা অসুস্থ, তিনি কন্যাকে ডাকিয়াছেন। সংসারের সমস্ত ব্যবস্থা শশীকে বুঝাইয়া দিয়া উমা যাত্রা করিল। যাত্রাকালে শশী মিনতি করিয়া বলিল "দিদি, তোমারই ঘর সংসার, যখনই ছুটী মিলিবে তখনই আসিও।" খোকাকে বুকে তুলিয়া চুম্বন করিতেই উমার বুক উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, কোনমতে অশ্রুসংবরণ করিয়া পাল্কীতে উঠিয়া পাল্কী চলিয়া যাইতেই উমা লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল "ঠাকুর, আর ব্যথা দিও না। প্রাণ কেন এদের ছাড়তে ভেঙ্গে যেতে চায়, একটু শক্তি দাও।"

(৫)

সোনাপুকুরে আসিয়া উমা দেখিল পিতা সত্যই অত্যন্ত পীড়িত। এতদূর অসুখ বাড়িয়াছে তাহা সে ভাবে নাই। রোগে শক্তিহীন হইতে হইতে এখন শয্যাগত হইয়াছেন। সকলেই বুঝিয়াছিল মৃত্যুর ডাক পড়িয়াছে। উমা প্রাণপণে পিতার সেবা করিতে লাগিল এবং বিপদের জন্য চিত্তকে বলশালী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। দীর্ঘরাত্রি জাগরণে উমার স্বভাবপাণ্ডুর মুখ অধিকতর ম্লান দেখাইতেছিল। চোখের নীচে অবসাদসূচক কালিমারেখা পড়িয়াছে। সেদিন সিদ্ধেশ্বরী অনেক অনুরোধে তাঁহাকে শয্যায় পাঠাইয়াছিলেন। সেইখানে নীরবে বসিয়া তাহার শঙ্কাকুল চিত্ত দ্বিগুণ আশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়িল; পিতার নিকট হইতে দূরে বসিয়া উমা যেন মৃত্যুরও অলঙ্ঘ্য দুরত্ব অনুভব করিতে লাগিল। কতক্ষণ উমা এইরূপে স্তম্ভিত চেতনাহীনের মত বসিয়া ছিল বলা যায় না, দাসী আসিয়া ডাকিতে উমা আবার পিতার রোগশয্যার পাশে উপস্থিত হইল। সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর নিকটে বসিয়াছিলেন। উমার মনে হইল সমস্ত গৃহ যেন কোন অভূতপূর্ব্ব আতঙ্কে স্তব্ধ হইয়া আছে। অবশেষে সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন "উমা এসেছে।" পিতা তথাপি নীরব। উমা কণ্ঠের বাষ্প দূর করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "বাবা! আমাকে কি তোমার কিছু বলিবার আছে?" পিতা তখন ধীরে ধীরে বলিলেন "মা! তোমার মা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে চান, কিন্তু তোমার বিষয় সম্পত্তি আমি আর কাহাকে দিয়া যাইব? মৃত্যুকালে কি আমি তোমার কাছে অপরাধী থাকিব?" উমা নীরব হইয়া রহিল; তাহার মর্ম্মের মাঝখানে যে নিরাশার রাগিণী বাজিয়া উঠিল তাহাকে কোন মতে সে কণ্ঠ চাপিয়া নীরব করিতে পারিল না। সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিয়া বলিলেন "তুমি ত চলিলে। মেয়ের ত কপালে সুখ হইল না; তোমার সমস্ত সম্পত্তি ওর হতভাগা স্বামী আর সতীনেই ভোগ করিবে এ ত আমি সহিতে পারিব না।"

পিতা স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কন্যাকে বলিলেন "আমার আর এখন ভাবিবার শক্তি নাই। তুমি যদি আঘাত না পাও, তুমি যদি অনুমতি কর, তবেই আমি অনুমতি দিই, নতুবা নহে।"

উমা বলিল "বাবা, আমাকে আজ রাতটুকু ভাবিবার সময় দাও।"

সিদ্ধেশ্বরী একটু কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন "তোমরা নিজের নিজের কথাই ভাবিও না। আমার দিন কেমন করিয়া কাটিবে সে কথাও ভাবিয়া দেখিও। আমি একটী ছেলে চাই। তাহার বিবাহ দিব, তাহাকে লইয়া সংসারের সাধ মিটাইব। নহিলে এ শূন্য সংসারে আমি তিষ্ঠিতে পারিব না।"

সমস্ত রাত্রি উমা শয্যায় বসিয়া কাটাইল। জীবনের

সমস্ত সাধ আশা নিরাশার যজ্ঞে আহুতি দিয়া উমা জীবন আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু আজিকার এই নিরাশা তাহার সমস্ত সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিতেছে। উমা ভুলিতে পারিতেছিল না, যে, শ্বশুরগৃহে তাহার সমাদর যে জীর্ণ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এই বিষয় হস্তান্তর হইলে সে ভিত্তি আমূল টলিয়া উঠিবে। আর তাহার ননী! উমার ক্লিষ্ট বক্ষে যে শিশু মাতৃত্বের অমৃত সিঞ্চন করিয়াছে তাহাকে কি দিয়া উমা হৃদয়ের ক্ষুধিত বাসনাকে তৃপ্ত করিবে? কিন্তু সে মাতার আবেদনের সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল। যাহারা তাঁহার সন্তানকে বিতাড়িত করিয়াছে তাহাদেরই সুখের জন্য এই ত্যাগ তাঁহার পক্ষে দুঃসহ। উমা স্বার্থ চিন্তায় মাতার অশান্তির কারণ হইবে? উমা শিক্ষার্থী বালকের মত নিজের মনকে পিতা মাতার উদ্দেশে বার বার করিয়া বলাইয়া লইল যে আমি বেদনা পাইব না, তোমাদের যাহাতে সুখ তাহাতেই আমার সুখ।

স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বে সিদ্ধেশ্বরী সমস্ত বিধি ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলেন। এবং তাঁহার মৃত্যুর কয়েকটী দিনমাত্র পূর্ব্বে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক করিয়া লইলেন। এই পোষ্যপুত্র গ্রহণে চারিদিকেই নানা আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। অনাথ এ সংবাদ শুনিয়া একেবারে বজ্রাহত হইয়া গেল। শ্বশুর পোষ্যপুত্র গ্রহণে বিরোধী বলিয়া এতদিন নিজের সমস্ত সম্বল নেশায় উড়াইয়াছে, এখন দরিদ্রতার করাল ছায়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। এতদিন সে উপেক্ষিতা পত্নীর দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই, কিন্তু অপর পক্ষও যে এমন করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে এ সম্ভাবনাও তাহার মনে উদয় হয় নাই। কেমন করিয়া যে এই দুর্ভাগ্য দূর করিবে সেই চিন্তাই নিশিদিন তাহার মনে জাগিতে লাগিল। উগ্র আকাঙ্ক্ষার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া ন্যায় অন্যায় বোধ কোথায় ভাসিয়া গেল। উমার দিন একরূপ কাটিতেছিল। ননীর স্মৃতি একখানি অদৃশ্য চুম্বকের মত তাহার হৃদয়ের কাঁটাটাকে সেই পরিত্যক্ত গৃহের দিকে টানিতেছিল, কিন্তু সেখানে ফিরিয়া যাইতে সাহস হইতেছিল না। উদাসীন চিত্ত আবার সংসারের প্রলোভনে জড়াইয়া পড়িতেছিল, উমা তাহাকে সবলে ফিরাইয়া আনিয়া হৃদয়ের নিভৃত দেবমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল, পুষ্প চন্দনে অর্ঘ্য সাজাইয়া তাহার অন্ধকার জীবনের দেবতাকে নিবেদন করিল. কিন্তু উমার মনে হইল দেবতা যেন বিমুখ হইয়াছেন; হয়ত সংসারের উপেক্ষিত পূজায় তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না। উমা চোখের জলে ভাসিয়া প্রতিদিন দেবতার উদ্দেশে বলিতে লাগিল "আমার এই ভাঙ্গা মন আর কারো নয়, এ মন তুমি তোমার কাজে লাগাও।" কিন্তু কোথায় দেবতা!

উমার মনের এই অবস্থায় একদিন অনাথ দেখা করিতে আসিল। উমা অনেকখানি আশঙ্কা লইয়াই স্বামী সন্দর্শনে চলিল। উমার সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইতেই যে অনাথের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল এটুকু উমার চক্ষু এড়াইল না।

অনাথ বলিল "আমি তোমার কাছে সহস্র অপরাধে অপরাধী. এজন্য সাহস করিয়া একদিনও আসিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার কাছে আমার সম্ভ্রম বাঁচাইবার আর উপায় নাই। হীনতার শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। তুমি যদি সহায় হও তাহা হইলে আমি উঠিতে পারিব, এ পাপের ধূলা ঝাড়িয়া আবার মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিব। সমস্ত জীবন এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব. আজ তুমি আমায় বাঁচাও।"

উমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অনাথের মুখের দিকে চাহিল। অনাথ ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে আপনার নিবেদন জানাইয়া গেল, বলিল—উমার পিতা মৃত্যুশয্যায় যে উইল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা, অনাথ ইহা প্রমাণ করিবে। সমস্তই সে সুন্দর মীমাংসা করিয়া আনিয়াছে কেবল উমাকে তাহার পক্ষে সাক্ষ্যদান করিতে হইবে।

উমার সমস্ত চিত্ত নিদারুণ ঘৃণায় জ্বলিয়া উঠিল। তাহার সম্বন্ধে অনাথের এমন হীন ধারণা! যে স্ত্রীকে সে ত্যাগ করিয়াছে, আজ তাহাকে তাহার পাপ কর্ম্মের সহকারিণীরূপে ডাকিতে তাহার লজ্জা হইল না! মোহ মানুষকে এমন করিয়া হীনতা-পঙ্কে নিমজ্জিত করিতে পারে!

অনাথ আবার বলিল "উমা, তুমি ভাবিয়া দেখ। তোমার স্বামী পথের কাঙাল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে একি তুমি দেখিতে পারিবে? এ বয়সে আর নূতন করিয়া জীবিকার সংস্থান করিতে পারিব না। নিজের সম্বল ত সমস্তই নষ্ট করিয়াছি। এতদিন তোমার বিষয়ের আশা করিয়া কেমন করিয়া এখন সে আশা ছাড়িব। তুমি সহায় হও, আমি আর বিপথে ঘুরিব না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

উমা হৃদয়ের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া দৃঢ়-কণ্ঠে বলিল "না, সে হইতেই পারে না, তুমি এমন করিয়া পাপের পথে যাইতে পারিবে না।"

অনাথ বলিল "আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ উমা! আমি কি ছিলাম কি হইয়াছি! আমার এ দশা তুমিই দূর করিতে পার।"

উমা বলিল "আমি যদি সাক্ষ্য দিই, আমি বলিব বিষয় আমার নহে। তুমি পথের ভিখারী হও তাহাও দেখিব কিন্তু পাপের পথে তোমার সহায় হইতে পারিব না।"

অনাথ সহস্র অনুরোধ করিল, কিন্তু উমা অটল।

সেই ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মিলন অত্যন্ত বীভৎস হইয়া উঠিল। অবশেষে উমা কাঁদিয়া স্বামীর দুইপা ধরিয়া বলিল "তুমি এই চেষ্টা ছাড়। ননীর জন্য এমন বিষ তুমি সঞ্চয় করিয়া রাখিও না। বিষয় না হইলে তাহার চলিবে, তাহার জন্য অভিশাপ টানিয়া আনিও না।"

অনাথ উদ্দীপ্তরোষে পা টানিয়া লইয়া বলিল "আজ হইতে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। যে পথে চলিয়াছি কুপথ হোক স্বপথ হোক তাহাতেই আমার গতি।"

উমা পা ছাড়িয়া দিয়া মাথা তুলিয়া বলিল "আমি তোমাকে রক্ষা করিব। যদি আমি একমনে দেবতার পূজা করিয়া থাকি তাহা হইলে আমার এ পণ বৃথা হইবে না। তোমাকে একদিন ফিরিতেই হইবে।"

অনাথ ফিরিয়া চাহিল না। এইরূপে মিলনের অবসান হইল।

* * *

আকাশে মেঘের সূচনা দেখিয়া মাঝি যেমন ঝড়ের আশঙ্কা করে তেমনি উমাও প্রতিমুহূর্ত্তেই বিপ্লবের আশঙ্কা করিতে লাগিল। মাতাকে একথা জানাইতে তাহার সাহস ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না।

তাহার স্বামী, যাহার জন্য উমা জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে তাহার এ ক্লেদাক্ত ম্লান মূর্ত্তি কেমন করিয়া উমা উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবে। আর এই ঝড়ে নৌকা সামলাইবার উপায় কি? শক্তিহীন দুর্ব্বল নারী ভাঙ্গা হৃদয়ের হালখানা লইয়া কতই বা যুঝিতে পারে? চিরকাল বেদনা সে নীরবে বহন করিয়াছে, আজও তাহাই করিতে লাগিল। এক-একবার উমার আশা হইতেছিল যে এমন হয়ত হইবে না, স্বামী হয়ত এ দুশ্চেষ্টা ত্যাগ করিবেন; কিন্তু তাহা হইল না, অনাথ মোকদ্দমা তুলিল যে উইল মিথ্যা; উমার পিতা সম্পত্তি তাহাকেই দান করিয়াছেন; পোষ্যপুত্রগ্রহণের অনুমতি ষড়যন্ত্রকারীগণের ছলনামাত্র। অসহিষ্ণু সিদ্ধেশ্বরী শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। উমার ঘরে প্রবেশ করিয়া পরুষ কণ্ঠে বলিলেন "এইজন্যই বুঝি জামাই তোমাকে পড়াইতে আসিয়াছিলেন? অর্থের যদি তোমার এতই লোভ তবে তাহা আগে বল নাই কেন?"

উমা স্থির কণ্ঠে বলিল "মা, তোমার কোন ভয় নাই। আমি মিথ্যা কথা বলিব না, বিষয় তোমারই থাকিবে; যদিই বা মোকদ্দমায় তোমার হার হয়, আমার যাহা আছে সব আমি আমার ভাইকে লিখিয়া দিব।"

দেশসুদ্ধ একটী প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া মোকদ্দমা মিটিয়া গেল। উমার সাক্ষ্যেই সিদ্ধেশ্বরীর জয় হইল। মোকর্দ্দমা মিটিবার পর হইতেই অনাথকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। কেহ কেহ বলিল অনাথ আত্মহত্যা করিয়াছে।

অনেক আঘাত সহিয়া সহিয়া উমার বুকের ভিতরটা যেন পাথর হইয়া গিয়াছিল। কয়েক দিন কাটিল, কিন্তু একটা দুরন্ত অতৃপ্তি তাহাকে এমন করিয়া পীড়ন করিতে লাগিল যে উমা আর থাকিতে পারিল না।

মাতাকে গিয়া বলিল "মা আমি কাশী যাইব।" মাতা কিছুতেই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। উমা কাশী গিয়া শ্বাশুড়ীর নিকটে থাকিবে। যাইবার পূর্ব্বে ননীর মুখখানি একবার দেখিয়া যাইতে হইবে।

সেই নিরানন্দ গৃহে প্রবেশ করিতে উমার মনে কি হইতেছিল তাহা আর বলিয়া কাজ নাই। গ্রামের মধ্যে মুখ দেখাইতে ইচ্ছা ছিল না, এজন্য সন্ধ্যার অন্ধকারে উমা বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। দাসী পাল্কীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। উমা তাহাকে বলিল "বৌ-ঠাকরুণকে ডাকিয়া দাও।" সুখদুঃখমণ্ডিত পরিচিত গৃহের সমস্ত স্মৃতি উমাকে যেন দুই বাহু তুলিয়া ডাকিতে লাগিল। শশীকে উমা কি বলিবে তাহাই তাহার মনে হইতে লাগিল। শশী যদি আসিয়া তাহাকে বলে "দিদি, তুমি আমাকে বিধবা করিলে।" তবে সে কি উত্তর দিবে? বেশীক্ষণ ভাবিবার সময় ছিল না, শশী আসিয়া দুই বাহু দিয়া উমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া অজস্র অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল। যখন সে শান্ত হইয়া আসিল তখন উমা বলিল "আমার বেশী সময় নাই, আমি কাশী চলিয়াছি, একবার শুধু ননীকে দেখিব; তাকে দেখা।"

শশী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "দিদি, আশা ছিল তুমি আসিয়া তোমার ননীকে লইবে, তাকে মানুষ করিয়া তুলিবে। কিন্তু আর তোমাকে সংসারে টানিতে চাই না, অনেক দুঃখের পরে তোমার শান্তিলাভ হউক।"

শশী ননীকে লইয়া আসিল। তাহার ঘুমন্ত মুখ চুম্বনে ভরিয়া দিয়া উমা তাহাকে শশীর কোলে সমর্পণ করিল। মনে মনে যে আশীর্ব্বাদ করিল তাহা নিশ্চয়ই তাহার দেবতার চরণপ্রান্তে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। উমা আঁচল হইতে আপনার অলঙ্কারগুলি খুলিয়া শশীর হাতে দিয়া বলিল "এগুলি ননীকে দিয়ে গেলাম, ননীর বৌ আসিলে আমাদের দুজনের আশীর্ব্বাদ সহ এগুলি তাহাকে পরাইয়া দিস্।"

উমা সেই নীরব নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে জীবনের লীলাভূমির কাছে শেষ বিদায় গ্রহণ করিল।

(৬)

কাশীতে আসিয়া উমা অপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ করিল। স্থানমাহাত্ম্য অস্বীকার করা চলে না। যেখানে সহস্র ভক্তহৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত ভক্তিস্রোত চারিদিক পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে তাহার মধ্যে হৃদয়ের শূন্যপাত্র সহজেই পূর্ণ করিয়া লওয়া যায়। কেবল একটী চিন্তা এক এক সময় উমাকে কাতর করিত। দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল কিন্তু তাহার স্বামী কোথায়? অনাথের মৃত্যু হইয়াছে এ কথা সে বিশ্বাস করিতে পারিত না; সে যে পণ করিয়াছিল তাহাকে রক্ষা করিবে, সে পণ কি বৃথা হইয়া গেল? ভগবান ভক্তের মান রাখিলেন না? কে জানে অনাথ অধিকতর পাপের পঙ্কে তলাইয়া গিয়াছে কি না।

বর্ষাকাল; পথে পথিকের কোলাহল অপেক্ষাকৃত কম। আকাশের ম্লান আভা প্রকৃতির শ্যাম-চিক্কণ মুখের উপরে একটা স্নিগ্ধতার ছায়া ফেলিয়াছিল। সিক্ত গৃহচূড়াগুলি সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতেছিল। মুক্ত বাতায়নে বসিয়া উমা তাহাই দেখিতেছিল। ক্রমে রাত্রি বাড়িয়া চলিল। মন্দিরে মন্দিরে আরতির ধ্বনি সান্ধ্য-আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া নীরব হইয়া গেল। সন্ধ্যা এতক্ষণ যে উদাত্ত অশ্রু রোধ করিয়া ছিল তাহা আর বাধা মানিল না, ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। গৃহকোণে কম্পিত দীপশিখা গৃহের গাম্ভীর্য্যকে বাড়াইয়া তুলিল। উমার বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীর পায়ে তেল মালিস করিতে করিতে ঝি অনর্গল বকিতেছিল। উমা তখনও নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল; জনশূন্য পথে ক্বচিৎ পদশব্দ ধ্বনিত হইতেছে। এমন সময়ে সহসা গৃহদ্বারে আঘাত পড়িল, কে একজন ডাকিয়া বলিল "ঘরে কে আছ আশ্রয় দাও।" ঝি দরজা খুলিল, পথিক শ্রান্ত স্বরে বলিল "আজ ঝড়ের রাতে আমাকে বাঁচাও।"

পথিকের শীর্ণ পাণ্ডুর মূর্ত্তি দেখিয়া উমা শিহরিয়া উঠিল। এমন অসহায় করুণ মুখ সে যেন আর দেখে নাই। বৃষ্টিজলস্নাত অঙ্গ হইতে সহস্রধারায় জল ঝরিয়া পড়িতেছে। দরজা খোলা পাইয়া সে ঘরের

মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা গৃহিণী করুণ কণ্ঠে বলিলেন "কার বাছা তুমি গা, এমন রাতে বেরিয়েছ!"

পথিক চমকিয়া ভগ্নকণ্ঠে কাঁদিয়া বৃদ্ধার পায়ে পড়িয়া বলিল "মা, তুমি!"

মাতা পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইলেন, বধূর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "বৌমা, আজ আমার হারানিধি ফিরে পেয়েছি।" অনাচারে, দুঃখে অনুতাপে অনাথের দেহে যে রোগের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা হইতে সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিতে তাহার বহুদিন লাগিল। প্রতিদিবসের কাহিনী, দুই বৎসরের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস যেন ফুরাইতে চায় না। সে প্রতিদিন বলিত "উমা, তুমি দেবী, তুমিই আমাকে রক্ষা করিয়াছ। লোভের নেশায় যতদিন ছুটিতেছিলাম দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়াছিলাম। যখন জাগিলাম দেখিলাম কোথা হইতে কোথায় পতন। তোমার কথা দৈববাণীর মত আমার মনে জাগিতেছিল, কিন্তু তোমার কাছে আসিতে পারি নাই। আজ বুঝিয়াছি তুমিই আমাকে রক্ষা করিয়াছ।"

উমা হাসিয়া বলিত "না, বরং তুমিই আমাকে বাঁচাইয়াছ। আমি মরিতেছিলাম, অবিশ্বাসে সংশয়ে ডুবিতেছিলাম, তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ।"

স্বামীর এ মহৎ পরিবর্ত্তন উমার সকল দ্বন্দ্ব সকল বেদনা দূর করিয়া দিল। এতদিন যে চেষ্টা তাহার সকল শক্তিকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা দূর হইবা মাত্রই উমা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। কোন চিকিৎসায় ফল হইল না। সকলেরই মনে হইতেছিল এই ক্ষুদ্র কুসুমটী জীবনের বৃন্ত হইতে অবিলম্বে ঝরিয়া পড়িবে। উমা বলিল "ননীকে না দেখিয়া আমি সুখে মরিতেও পারিব না, তাহাকে আনাও।"

যে দিন শশী আসিবে সে দিন সকাল হইতে উমা সুস্থ ছিল। একটা আনন্দের আলোকে তাহার সুন্দর মুখখানি ঢল ঢল করিতেছিল। সন্ধ্যা বেলা যখন উমা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তখন দ্বারে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। শশী ননীকে লইয়া উমার শয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, একটা অব্যক্ত বেদনায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। উমা চকিত হইয়া জাগিয়া উঠিল, শশী মাটিতে বসিয়া উমার বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া বলিল "দিদি, ননী যে এসেছে!" উমা ননীকে টানিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল "তোর স্বামীকে ফিরে পেয়েছি, শশী। দিদি তোর দুরদৃষ্ট সঙ্গে লইয়া চলিল।"

শশী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "দিদি ফিরে চল। আবার আমাদের সংসার আরম্ভ করি।"

উমা হাতখানি তুলিয়া বলিল—"আজকে আমার ঘুমোবার ছুটী। এমন সুন্দর রাতটী, এমন রাতেই যে আরামে ঘুমিয়ে পড়তে হয়।" সেই সুন্দর রাত্রিতে প্রকৃতির মুখে আনন্দের হাসি দেখিয়া দেখিয়া সংসারের তাপদগ্ধ উমা যেন হাসিমুখে তাহার মাতৃক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

শ্রীমতী—।

সঙ্গীত-সুন্দরী

কণ্ঠ-সরসীর ঘাটে সোপানে সোপানে
কঙ্কণে কনককুম্ভ বাজাইয়া যায়,
কে রূপসী ভরি তায় কলকল তানে,
উঠে এসে ঢালি ফেলে লীলায় হেলায়?

একি লীলা, ছেলেখেলা উঠা নামা মিছে,
হিসেবী বিষয়ী ভাবে এ যে অকারণ,
যন্ত্রপাঁতি ফেলি পথে কাজকর্ম্ম পিছে,
মুগ্ধনেত্রে চাহে শিল্পী শুনে না বারণ।

লীলাচ্ছলে শুণ্ডে করী সিংহেরে জড়ায়
ভুলে গিয়ে জলপান। সখা-অনুরাগে
ভেকেরে জড়ায়ে ফণী মুগ্ধনেত্রে চায়।
প্রেমের কমল ফুটে আলতার দাগে,

চরণে লুটিয়া পড়ে মুগ্ধ মনোমীন,
রোমাঞ্চিত শিলাবক্ষে বাজে প্রাণবীণ।

শ্রীকালিদাস রায়।

সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ.

কলিকাতা-মহানগরীর এই বিশাল পুরশ্রীমণ্ডপে বঙ্গ-সরস্বতীর অনুরক্ত ভক্ত পুত্রগণকে একত্রে সমাসীন দেখিয়া আমার কী যে আনন্দ হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। আমার ইচ্ছা হইতেছে দুই দণ্ড নিস্তব্ধ হইয়া অকূল আনন্দ-সাগরে মন'কে ভাসাইয়া দিই। সেদিন বই না—আমার চক্ষের সম্মুখে ভারতী-মাতার জন দশ বাছা বাছা ভক্ত সেবক বঙ্গবিদ্যা'র পতিত ভূমিতে একটি ক্ষুদ্র চারা-গাছ রোপণ করিয়া সক্ করিয়া তাহার নাম দিলেন সাহিত্য-পরিষৎ। ইহারই মধ্যে তাহা একটা বৃক্ষের মতো বৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমার মনে আনন্দ ধরিতেছে না—বিধাতার কাণ্ড দেখিয়া আহ্লাদে আমার মুখে বাক্য সরিতেছে না। সে দিন নিম্নে গ্রীবা নত করিয়া যাহাকে আমি দেখিয়াছি ক্ষুদ্র একরত্তি চারা-গাছ—আজ ঊর্দ্ধে নয়ন উন্মীলন করিয়া তাহাকে দেখিতেছি প্রকাণ্ড একটা বনস্পতি—ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কী হইতে পারে? ঈশ্বরের কৃপায় তাহার শুভ ফল বঙ্গের আপাদমস্তক জুড়িয়া যে কিরূপ প্রচুর পরিমাণে ফলিয়া উঠিয়াছে, তাহা আপনারা যতটা জানেন, ততটা জানা আমার পক্ষে সম্ভব নহে যদিচ;—কেননা প্রথমত ষোলো-সাতারো বৎসর বা ততোধিক কাল যাবৎ আমি লোকালয় হইতে বহুদূরে বোলপুরের নির্জন কুটীরে বাস করিতেছি, দ্বিতীয়ত আমি সংবাদপত্র ছুঁইনা; কিন্তু তবুও যখন ভাল ভাল লোকের মুখ দিয়া সময়ে সময়ে সাহিত্য-পরিষদের শ্রীবৃদ্ধির কথা—সুদূর আকাশ-মার্গে যেন শঙ্খঘণ্টার মঙ্গলধ্বনি হইতেছে এইরূপ মৃদু-মধুর ভাবে—আমার কর্ণে পৌঁছিতে ক্ষান্ত হইতেছে না, তখনই আমি বুঝিয়াছি যে, এ আগুন খড়ের আগুন নহে;—বাড়বানল যেমন জলে নেভে না, ঝড়ে টলে না, এ আগুন তাহারই ছোটো-ভাই! অপার করুণার সাগর বিশ্ববিধাতার গূঢ় অভিপ্রায় কে বুঝিতে পারে! কিন্তু সকলেই আমরা এটা বুঝিতে পারি যে, মঙ্গলের সূচনা যেখানে যত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তাঁহারই অভিপ্রেত, সুতরাং তাহা ব্যর্থ হইবার নহে। এখন যাঁহারা আজিকের মতো এইরূপ ঘটাড়ম্বরকেই সাহিত্য-পরিষদাদি সভার সার সর্ব্বস্ব মনে করিতেছেন—কতিপয় বৎসর পরে যখন সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের দৈবী শক্তির প্রভাবে বঙ্গলক্ষ্মীর বিষাদাচ্ছন্ন মলিন বদন মেঘমুক্ত শারদ পূর্ণিমার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, আর, তাহা দেখিয়া লোকে যখন সাহিত্য পরিষদের জয়জয়কার করিতে থাকিবে, তখন তাঁহারা বলিবেন "এ যাহা দেখিতেছি এ'কে তো শুধু কেবল ঘটা-আড়ম্বর বলা সাজে না—এ যে মঙ্গল মূর্ত্তিমান্! দশজন কলহপ্রিয় বাঙ্গালীর সংসদ্ হইতে যাহা কস্মিন্‌কালেও হইয়া উঠিতে পারে বলিয়া স্বপ্নেও মনে করি নাই—ঐ যে দেখিতেছি তাহা চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ বিরাজমান! ধন্য জগদীশ্বর! তোমার লীলা অদ্ভুত! তোমার করুণা অপার!

বঙ্গবিদ্যার এই মহাসাগরে কী যে আমি আজ অর্ঘ্য প্রদান করিব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। আমার ঘটে যৎকিঞ্চিৎ সরস্বতীর প্রসাদ যাহা সংগোপিত আছে, তাহার মূল্য আমার নিকটে যদিচ নিতান্ত কম না, কিন্তু যাঁহাদের একত্র-সম্মিলনে আজিকের এই সভা গৌরবান্বিত হইয়াছে, সেই-সকল বড় বড় বিদ্যা'র-জহরীগণের নিকটে তাহার মূল্য অতীব যৎসামান্য হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু আপনারা যখন আপনাদের মহত্ত্ব-গুণে আমার ক্ষুদ্রত্বের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আমাকে আজিকের এই শুভ সম্মিলনের সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন আমার পুতুল-খ্যালা-গোচের ছোটো খাটো নৈবেদ্যের ডালা সভা'র সমক্ষে অনাবৃত করিতে কুণ্ঠিত হওয়া এখন আর আমার পক্ষে শোভা পায় না; অতএব সাহসে ভর করিয়া তাহাতেই এক্ষণে আমি প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমার একটি অবশ্যম্ভাবী অপরাধ যাহা আমার পক্ষে সাম্‌লানো দুষ্কর তাহার জন্য আপনাদের নিকটে অগ্রিম ক্ষমা যাচ্‌ঞা করিতেছিঃ—আমার বক্তব্য কথাটি আমি সংক্ষেপে সারিতে চাই; আর সেইজন্য তাহার বারো আনা ভাগ আমার মনের মধ্যে আটক

পড়িয়া থাকিবে! আমার এ অপরাধটি আপনারা যদি দয়ার্দ্র চিত্তে ক্ষমা না করেন তবে আমি নিরুপায়; কেননা আয়-সংক্ষেপের সহিত বুঝিতে হইলে ব্যয়-সংক্ষেপ ব্যতিরেকে যেমন গৃহস্থের গত্যন্তর নাই—সময়-সংক্ষেপের সহিত বুঝিতে হইলে তেমি বচন-সংক্ষেপ ব্যতিরেকে বক্তার গত্যন্তর নাই। আমার একটি অনতিক্রমণীয় ভাবী অপরাধের দায় হইতে কথঞ্চিৎপ্রকারে নিষ্কৃতি পাইবার অভিলাষে একটু যাহা আমার বলিবার ছিল তাহা বলিলাম। এক্ষণে অনুমতি হোক্—সভাস্থ সজ্জনগণকে সাদরে অভিনন্দন করিয়া অভিভাষণ কার্য্যটা প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ করি।

আর্য্য-সভ্যতা **এখন এই যে** মহা মহা সাগর'কে গোষ্পদ জ্ঞান করিয়া—মহা মহা পর্ব্বতকে বল্মীক জ্ঞান করিয়া—অজেয় বল বিক্রমের সহিত পৃথিবীর উপরে আধিপত্য করিতেছে, এ সভ্যতার মূল-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল আমাদের এই পুণ্য ভারতভূমিতে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে অমরাপুরী হইতে কল্পতরুর একটা ডাল কাটিয়া আনিয়া গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমস্থানে রোপণ করা হইয়াছিল **সমবেত অরণ্যবাসী ঋষিমহর্ষিগণের সামগানের সহিত তান মিলাইয়া**! তাহাই এক্ষণে পাতালে মূল প্রসারিত করিয়া এবং আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া শত সহস্র শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া অযুত সহস্র দল-পল্লবে এবং নানা রসের নানা রঙের ফলফুলে পৃথিবীর আপাদ-মস্তক ছাইয়া ফেলিয়াছে। আর্য্য-সভ্যতা ভুঁইফোঁড়-শ্রেণীর নূতন সভ্যতা নহে; পুরাতন আর্য্যাবর্ত্তের সভ্যতা'র নামই আর্য্য-সভ্যতা। যেমন, হিমালয় যে দেখে নাই, সে পর্ব্বত কাহাকে বলে তাহা জানে না; ভাগীরথী যে দেখে নাই, সে নদী কাহাকে বলে তাহা জানে না; ভারতভূমি যে দেখে নাই, সে পৃথিবী কাহাকে বলে তাহা জানে না; তেমি, আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্য-সভ্যতা যে দেখে নাই, সে সভ্যতা কাহাকে বলে তাহা জানে না। কেহ যদি আমাকে বলেন "বাক্যের ফোয়ারা ছুটাইয়া এ যাহা তুমি বলিতেছ তাহার প্রমাণ কি?" তবে আমি তাঁহাকে বলিব—ভারতের মহা-সভ্যতার প্রমাণ ভারতেরই মহাভারত! প্রশ্নকর্ত্তা যদি দেবনাগর অক্ষরে লিখিত মহাভারতখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করেন, তবে সভ্যতা যে **বলে কাহাকে**—সভ্যতা'র যে কতগুলি গঠনোপকরণ; সভ্যতার যে কোথায় কি দোষ, কোথায় কি গুণ; কাহাকে বলে রাজধর্ম্ম, কাহাকে বলে আপদ্‌ধর্ম্ম, কাহাকে বলে মোক্ষধর্ম্ম; কোন ধর্ম্ম কখন কী অংশে সেবনীয়—কোন ধর্ম্ম কখন্ কী অংশে বর্জ্জনীয়—সমস্তই তাঁহার নখদর্পণে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইবে। সভ্যতার একটা সর্ব্বাঙ্গীন এবং সমীচীন আদর্শ মনোমধ্যে গঠন করিয়া তুলিতে হইলে তাহার জন্য যত কিছু মালমসলার প্রয়োজন সমস্তই তিনি দেখিবেন—তাঁহার হাতের কাছে মৌজুত; তাহার কিছুরই জন্য তাঁহাকে দেশ বিদেশে ঘুঁটিয়া বেড়াইতে হইবে না। কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তা যদি বলেন **"তবে কেন আমাদের এ দশা?"** তবে সে কথাটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে! আজ কিন্তু ঐ বৃহৎ মামলাটার একটা সরাসরি রকমের বিচার-নিষ্পত্তি ভিন্ন পাকাপাকি-রকমের চরম নিষ্পত্তি এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে আমাকর্ত্তৃক ঘটিয়া ওঠা অসম্ভব। কিন্তু তা বলিয়া একেবারেই হাল ছাড়িয়া দেওয়া আমি শ্রেয় বোধ করি না। আমার ক্ষুদ্র আদালতের মোটামুটি রকমের বিচার্য্য কার্য্য আমি উপস্থিত মতে নির্ব্বাহ তো করি—তাহার পরে আপীল আদালতের সূক্ষ্ম বিচারের মালিক আপনারা আছেন—সেজন্য **আমার** মাথা ঘামাইবার আমি কোনো প্রয়োজন দেখি না।

আমার এইরূপ ধারণা যে, আমাদের দেশের সভ্যতা'র মস্তক **তত্ত্বজ্ঞান**; পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সভ্যতা'র মস্তক **বিজ্ঞান**। কেহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—দুটার মধ্যে কোন্‌টা ভাল? তত্ত্বজ্ঞান ভাল—না বিজ্ঞান ভাল? তবে আমি তাঁহাকে বলিব—দুটাই ভাল। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে:—প্রকৃতির সমস্ত ব্যাপারই ত্রিগুণাত্মক। সকল বস্তুরই দুই দিক্ আছে; ভাল'র দিক্‌ও আছে—মন্দের দিক্‌ও আছে। মন্দ জিনিসেরও ভাল'র দিক্ আছে—ভাল জিনিসেরও মন্দের দিক্ আছে। উচিত ব্যবহার দুয়েরই ভাল'র

দিক্ ফুটাইয়া তোলে; অনুচিত ব্যবহার দুয়েরই মন্দের দিক্ ফুটাইয়া তোলে। ধোঁয়া-কলের নৌকা খুবই ভাল জিনিস্; কিন্তু **কখন্** তাহা ভাল জিনিস্? যখন তাহা পাকা মাঝির হাতে পড়ে তখনই তাহা ভাল জিনিস; আনাড়ি মাঝির হাতে পড়িলে তাহা সর্ব্বনাশের মূল। তত্ত্বজ্ঞানও যেমন, বিজ্ঞানও তেমি; দুইই পরমোৎকৃষ্ট বস্তু, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু হইলে হইবে কি—তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহার আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে এবং হইতেছে; বিজ্ঞানের অপব্যবহার ইউরোপ আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে এবং হইতেছে। বিজ্ঞানের অপব্যবহার-জনিত দুর্গতি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের অধিবাসীদিগের ঘটিয়াছে যেরূপ ভয়ানক—আগে সেই কথাটা বলি; তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহার-জনিত দুর্গতি আমাদের দেশের লোকদিগের ঘটিয়াছে যেরূপ বিসদৃশ—পরে তাহা বলিব।

ইউরোপ-আমেরিকায় মহা মহা বিজ্ঞান-প্রসূত কলকারখানার ঘূর্ণাচক্রের টানে পড়িয়া সহস্র সহস্র দীন দরিদ্র শ্রমজীবী লোকের ইহকাল পরকাল ক্রমশই রসাতলের নিকটবর্ত্তী হইতেছে—তাহাদের মা-বাপ বলিবার কেহই নাই। বড়লোকেরা দুষ্ট লক্ষ্মীর পূজায় জীবন উৎসর্গ করিয়া ধর্ম্মকে গির্জার ফাটকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আর সেই-সব বড়লোকদিগের মনস্কামনা আশু সফল করিবার জন্য গির্জার কারাধ্যক্ষেরা ধর্ম্মকে বিষমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করাইতেছেন; সংকীর্ণতা কৃত্রিমতা এবং আত্মগরিমা'র কালকূট মিশাইয়া ঈসা মহাপ্রভুর উদার সরল এবং সুধাময় উপদেশান্ন ভক্ষণ করাইতেছেন। বড় বড় বণিক মহাজনদিগের হাঁপায় পড়িয়া মধ্যবিধ শ্রেণীর কর্ম্মী লোকেরা ব্যবহার-বিজ্ঞানকে (political economyকে) ধর্ম্মশাস্ত্রের তুলাভিষিক্ত করিয়া লক্ষ্মী-বেশধারিণী অলক্ষ্মীর পশ্চাতে, এক কথায়—আলেয়া-কিন্নরীর পশ্চাতে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইতেছেন;—কেবল ঈসা মহাপ্রভুর গোটা চার-পাঁচ সেরা সেরা ধর্ম্মোপদেশের বাল্যসংস্কার তাঁহাদিগকে ভয়ানক অধোগতি হইতে এযাবৎকাল পর্য্যন্ত কথঞ্চিৎ প্রকারে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আমেরিকা দেশের বড় বড় রুই-কাৎলা-শ্রেণীর বণিক্ জনেরা পুঁটিমাছ-শ্রেণীর বণিক্‌দিগকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছেন। ছোটো ছোটো মৎস্যেরা বড় বড় মাছদিগের সঙ্গে বল-বিক্রমে এবং ফন্দিবাজিতে আঁটিয়া উঠিতে অক্ষম হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ব্যাঙাচী-বেচারীগুলির উপরে ঝাল ঝাড়িতেছেন **সাম্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া**! ইহাই যদি সভ্যতা হয়, তবে সভ্যতা'কে **ধিক্**!

তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহার-জনিত দুর্গতি আমাদের দেশের লোকের যাহা ঘটিয়াছে তাহাও শোচনীয় কম না। তাহা যে-সূত্রে যে-রকম করিয়া ঘটিয়াছে তাহা বলিতেছি প্রণিধান করুন্।

বহু পুরাকালে আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞান ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত তপোবনের চতুঃসীমার মধ্যেই অবরুদ্ধ ছিল। কিয়ৎ কাল পরে তাহা তপোবনের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া বিশ্বামিত্র জনক ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-কুলের মস্তক স্থানীয় কতিপয় মহাত্মার হস্তে ধরা দিয়াছিল; আর সেই সঙ্গে বিদুরের ন্যায় দুই এক জন নিম্নবংশীয় সাধু পুরুষের কুটীর-দ্বারেও মাথা নোয়াইতে সংকুচিত হয় নাই। কিন্তু তদ্ব্যতীত অপরাপর লোকের নিকটে—জন-সাধারণের নিকটে—তাহা একপ্রকার প্রহেলিকার আকার ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিল; তবে যদি দৈবের কৃপায় উহার দুর্ভেদ্য রহস্যের ভিতরে প্রবেশের অধিকার সহস্রের মধ্যে এক ব্যক্তির ভাগ্যে কোনো গতিকে ঘটিয়া থাকে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে; কিন্তু তাহাও ঘটিয়াছিল কি না সন্দেহ। তত্ত্বজ্ঞানের দেবস্পৃহনীয় অমৃত মান্ধাতার আমল হইতে এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশের বিদ্যার ভাণ্ডারে এত যে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং যত্ন সমাদরের সহিত সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহা সত্ত্বেও কেন-যে তাহা পূর্ব্বতন কালেও জনসাধারণের উচিত-মতো ভোগে আসে নাই এবং অধুনাতন কালেও জনসাধারণের উচিত-মতো ভোগে আসিতেছে না, তাহার কোনো-না-কোনো কারণ অবশ্য থাকিবে। তাহার প্রধান একটি কারণ যাহা আমার বিবেচনায় সম্ভব বলিয়া মনে হয় তাহা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতেছি—প্রণিধান করুন্।

কাহাকে যে বলে **বিজ্ঞান**—অধুনাতন কালের

পাঠশালার বালকদিগেরও তাহা জানিতে বাকি নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এক্ষণে আমাদের দেশ যেহেতু **আমাদের দেশ** নহে, এইজন্য ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানের **কিরূপ** তাহা আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণেরও **নিজ-বুদ্ধির অগোচর**; কেবল তাহার এক-একখানি বিকলাঙ্গ ছবি যাহা তাঁহারা ছাত্র-পাঠ্য ইংরাজি পুস্তক হইতে আপন আপন মানস-পটে ফটোগ্রাফ্ করিয়া লইয়াছেন, সেই আব্ছায়া-গোচের ফটোগ্রাফের ফটো-গ্রাফ্ তাঁহাদের নিকটে ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানের সার সর্ব্বস্ব। প্রথমে আমি তাই ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানের মূল মন্ত্রটির মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য খোলাসা করিয়া ভাঙিয়া বলিব —কিন্তু খুব সংক্ষেপে: এইরূপে আমি আমার বক্তব্য কথাটি'র গোড়া ফাঁদিয়া তাহার পরে একটি ছেলে-ভুলানিয়া গোচের ছোটো খাটো গল্পের আকারে তাহাকে আমি সভা'র মাঝখানে উপস্থিত করিব। এ রকমের একটা বিসদৃশ ব্যাপার দৃষ্টে পাছে আপনারা আশ্চর্য্য হ'ন, এইজন্য আমি আগে-ভাগে আপনাদিগকে তাহা জানাইয়া রাখিতেছি। ইহাতে আমার অপরাধ নাই; কেননা তাহা না করিয়া আমি যদি প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের দেশের পুরাকালের ঐতিহাসিক বিবরণের গহন অরণ্যে ধৃষ্টতা'র সহিত প্রবেশ করি, তাহা হইলে দুই চারি পা অগ্রসর হইতে না হইতেই পথ হারাইয়া কোথায় যে কোন্ অন্ধকার-অমানব-পুরীতে গিয়া পড়িব তাহার ঠিকানা নাই।

ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানের মূল মন্ত্রটির প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য যাহা আমি বেদান্তাদি শাস্ত্রের মধ্য হইতে নিষ্কর্ষণ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে আমার বুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিয়াছি তাহা সংক্ষেপে এই :—

সত্য যদিচ এক বই দুই নহে, কিন্তু তথাপি তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশকালপাত্রে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। বৈদান্তিক আচার্য্যেরা তাই বলেন—

সত্য তিন প্রকার,

(১) পারমার্থিক সত্য,
(২) ব্যাবহারিক সত্য,
(৩) প্রাতিভাসিক সত্য;

আর, তদনুসারে তাঁহারা জ্ঞানরাজ্যের পংক্তি-বিভাগ ধার্য্য করিয়াছেন তিনটি;

(১) পরাবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান,
(২) অপরাবিদ্যা বা বিজ্ঞান,
(৩) অবিদ্যা বা ভ্রমজ্ঞান।

বিজ্ঞান ব্যষ্টি-জ্ঞান বা শাখা-জ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান সমষ্টিজ্ঞান বা মোট জ্ঞান। মোট জ্ঞানের মোট সত্যের নাম পারমার্থিক সত্য। সে সত্য কী—আপনারা আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে সত্য কথা যদি বলিতে হয়—তবে এ সভার মাঝখানে সহসা আমি তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু আবার—**একটা কথা** কোমর বাঁধিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়া পথের মাঝখানে থামিয়া যাওয়াও দোষ! অতএব জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটির মোটামুটি-রকমের একটা মীমাংসা যাহা আমার মনে উপস্থিত হইতেছে—সংক্ষেপে তাহা আপনাদের সুবিবেচনায় সমর্পণ করিতেছি প্রণিধান করুন।

সাম্প্রদায়িক দলাদলি এবং দার্শনিক মতামতের রাজ্যে নগর-সংকীর্ত্তনের ধুম বেজায় অতিরিক্ত! সে নগর-সংকীর্ত্তন কম নহে কীর্ত্তন! তাহা মতবাদী-দিগের স্ব স্ব মতের এবং দলপতিদিগের স্ব স্ব দলের **মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন**! সে নগর-সংকীর্ত্তনের খোল-পিটন হ'চ্চে **বাদের** বাদ্যোদ্যম, আর, করতাল-সংঘর্ষণ হ'চ্চে ISMএর ঝমাঝম-ধ্বনি। **বাদের** বাদ্যোদ্যমের চরম পর্য্যাপ্তি হ'চ্চে **বিবাদের** উন্মত্ত কোলাহল; ISMএর ঝমাঝম-ধ্বনির চরম পর্য্যাপ্তি হ'চ্চে SCHISMএর দম্ভ-আস্ফালন। আমাদের দেশে যত প্রকার বাদ আছে তাহার মধ্যে সদ্দার-শ্রেণীর প্রধান দুই মল্ল হ'চ্চে **অদ্বৈতবাদ** এবং **দ্বৈতবাদ**। দেশসুদ্ধ লোকের এইরূপ ধারণা যে, উপনিষদের **তত্ত্বমসি** বাক্যটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ তাহা **অদ্বৈতবাদ**। আমার কিন্তু এটা ধ্রুব বিশ্বাস যে, উপনিষদে এক যা বাদ আছে **সত্যবাদ**, তদ্ব্যতীত দ্বিতীয় বাদ তাহার ত্রিসীমার মধ্যে নাই। তবে যদি উপনিষদ্-শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের ঐ সাঙ্কেতিক সাধন-মন্ত্রটিকে কোনো দার্শনিক পণ্ডিত অদ্বৈতবাদের অঙ্গীভূত

করিয়া সাজাইয়া দাঁড় করা'ন্—সে কথা স্বতন্ত্র; যিনি সাজাইয়া দাঁড় করা'ন তিনিই তাহার জন্য দায়ী, তা'. বই উপনিষদ্ তাহার জন্য ঘুণাক্ষরেও দায়ী নহে। তত্ত্বমসি-বচনটি'র শব্দার্থ যে কি তাহা কাহারো অবিদিত নাই। সংস্কৃত বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর বালকেরাও জানে যে, তৎ শব্দের অর্থ তাহা বা সে-বস্তু; ত্বং শব্দের অর্থ তুমি। "তৎ ত্বং" কি না সে-বস্তু তুমি! কথাটা ওটা যে নিতান্তই একটা হেঁয়ালি-ঢঙের সংকেত-বচন, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। কাজেই, উহার প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্যটি তলাইয়া না বুঝিলে উহা কেবল একটা মুখের কথা হইয়া—ফাঁকা আওয়াজ হইয়া -বাতাসে উড়িয়া যায়। ত্বং শব্দের বাক্যার্থ তুমি—একথা খুবই সত্য; কিন্তু তাহার ভাবার্থ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। আমি যেমন তোমাকে ত্বং বলিয়া সম্বোধন করি, তুমিও তেমি আমাকে ত্বং বলিয়া সম্বোধন কর; আর, বেদান্তের সেই যে এই দেবদত্ত ("সোহয়ং দেবদত্তঃ") যিনি ভাগ্যক্রমে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, ইঁহাকে আমরা উভয়েই ত্বং বলিয়া সম্বোধন করি। তুমি ত্বং আমার নিকটে, আমি ত্বং তোমার নিকটে, দেবদত্ত ত্বং আমাদের উভয়েরই নিকটে। অতএব, আত্মা কেবল তুমিই যে ত্বং তাহা নহে; তুমিও ত্বং, আমিও ত্বং, দেবদত্তও ত্বং। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ত্বং আমি-তুমি-তিনি'র প্রতিনিধি স্বরূপ; এক কথায়—সমষ্টি আত্মার প্রতিনিধি-স্বরূপ। তবেই হইতেছে যে ত্বং শব্দের বাক্যার্থ যদিচ "তুমি" বই না, কিন্তু তাহার ভাবার্থ সমষ্টি আত্মা কিনা পরমাত্মা। এমতে দাঁড়াইতেছে, যে, "তত্ত্বমসি" বচনটির বাক্যার্থ যদিচ "সে বস্তু তুমি" কিন্তু তাহার ভাবার্থ "সে বস্তু পরমাত্মা"। উপনিষদে তত্ত্বংও আছে—তদ্‌ব্রহ্মও আছে—দুইই আছে। তার সাক্ষী "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম"; ইহার অর্থ এই যে, সে বস্তুকে বিশেষ মতে জানিতে ইচ্ছা কর—সে বস্তু ব্রহ্ম। সাংখ্য দর্শনের মতে প্রকৃতিই বিশেষ মতে জানিবার বস্তু, আর সেইজন্য সাংখ্যের পারিভাষায় ব্রহ্ম প্রকৃতিরই আর এক নাম। গীতাশাস্ত্রে ব্রহ্ম শব্দ স্থল-বিশেষে প্রকৃতি অর্থে এবং স্থল-বিশেষে পরম পুরুষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন

> "সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
> তাসাং ব্রহ্ম মহৎ যোনি রহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥"

এখানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ প্রকৃতি। আবার

> "পরংব্রহ্ম পরংধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
> পুরুষং শাশ্বতং দিব্যং আদিদেবং অজং বিভুং ॥
> আহুস্ত্বাং ঋষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।"

এখানে ব্রহ্মশব্দের অর্থ পরম পুরুষ। বেদান্ত শাস্ত্রে কিন্তু তৎসৎ শব্দ এবং তদ্‌ব্রহ্ম শব্দের মধ্যে মূলেই কোনো অর্থ-ভেদ নাই। সৎ শব্দের অর্থ ধ্রুব সত্য। সকল শাস্ত্রের মতেই পুরুষ অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্য—প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল। তবেই হইতেছে যে "তৎসৎ" বলাও যা (অর্থাৎ "সে বস্তু ধ্রুব সত্য" বলাও যা) আর, "সে বস্তু পরম পুরুষ পরমাত্মা" বলাও তা, একই কথা। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, তিন স্থানের এই যে তিনটি উপনিষদ্-বচন (১) তত্ত্বং, (২) তদ্‌ব্রহ্ম, (৩) তৎসৎ, তিনটিরই ভাবার্থ "সে বস্তু পরম পুরুষ পরমাত্মা।" তৎ শব্দের সামান্য অর্থ হ'চ্চে চেয়ার-টেবিল-ঘটিবাটি'র ন্যায় যা-তা জ্ঞেয় বস্তু, আর, তাহার বিশেষ অর্থ হ'চ্চে পরম জ্ঞেয় বস্তু অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট জানিবার বস্তু। সৎশব্দের বহুবচন হচ্চে "সন্তঃ", সন্তঃ শব্দের অর্থ সৎপুরুষেরা! এতদনুসারে দাঁড়াইতেছে এই যে, সৎ শব্দের সামান্য অর্থ তুমি-আমি-তিনি প্রভৃতির ন্যায় যে-সে সৎলোক বা সৎপুরুষ; আর, তাহার বিশেষ অর্থ পরম-পুরুষ পরমাত্মা! বেদান্তাদি শাস্ত্রের মতে ব্রহ্ম শুধুই কেবল পরম জ্ঞেয় বস্তু নহেন—শুধুই কেবল তৎ নহেন; একদিকে যেমন তিনি জ্ঞানের পরম লক্ষ্য তৎ, আর এক দিকে তেমি তিনি আত্মার পরম প্রতিষ্ঠা সদাত্মা বা পরমাত্মা। "তৎ" কিনা সত্যস্বরূপ পরম বস্তু; "সৎ" কিনা মঙ্গল স্বরূপ পরম আত্মা। ইংরাজি দার্শনিক ভাষায়—তৎ হ'চ্চে Fundamental Substance, সৎ হ'চ্চে Supreme Subject। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এবিষয়ে আর বেশী বাক্যব্যয় এবং সময়-ব্যয় না করিয়া সংক্ষেপে আমার বক্তব্য কথা-টার উপসংহার করি।

পারমার্থিক সত্যের মূল মন্ত্র ওঁ তৎ-সৎ। এই মহা মন্ত্রটির অর্থ আমার বুদ্ধির খদ্যোতালোকে আমি যে-টুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহা এই ঃ—

তৎ কিনা জ্ঞেয় প্রকৃতি।)
সৎ কিনা জ্ঞাতা পুরুষ।)
তৎ উপাদান কারণ। |
সৎ নিমিত্ত কারণ। |
তৎ সত্য : সৎ মঙ্গল।

"ওঁ তৎসৎ" কিনা যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা তিনি সত্য এবং মঙ্গল একাধারে ; তিনি জানিবার বস্তু এবং জানিবার কর্ত্তা একাধারে ; তিনি Substance এবং Subject একাধারে ; তিনি উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ একাধারে ; তিনি প্রকৃতি এবং পুরুষ একাধারে ; তিনি মাতা এবং পিতা একাধারে ; এক কথায়—তিনি মোট জ্ঞানের মোট সত্য ; আর তাহারই নাম পারমার্থিক সত্য।

পারমার্থিক সত্য যেমন মোট জ্ঞানের মোট সত্য ; ব্যাবহারিক সত্য তেমনি বিভিন্ন জ্ঞানের বিভিন্ন সত্য ; যেমন—জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের গ্রহাদিঘটিত সত্য ; বীজগণিতের সংখ্যা-ঘটিত সত্য ; ক্ষেত্রতত্ত্বের স্থানাধিকার-ঘটিত সত্য ; রসায়ন বিজ্ঞানের দ্রব্যগুণ-ঘটিত সত্য ; ইত্যাদি।

পারমার্থিক সত্য এবং ব্যাবহারিক সত্য ছাড়া আর এক রকমের সত্য আছে যাহার শাস্ত্রীয় নাম—প্রাতিভাসিক সত্য। "প্রাতিভাসিক" অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে Phenomenal। রীতিমত বুদ্ধি বিবেচনা খাটাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা সত্যকেই যেমন পৃথিবী গোলাকার এই একটি সত্যকে বিজ্ঞান-রাজ্যে যত্ন সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাহার জন্য যথোপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় ; আর সেই সঙ্গে মনের সংস্কার-মূলক আপাত-সুলভ সত্যকে (পৃথিবী চ্যাপটা এই রকমের কাঁচা সত্যকে) দ্বার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। বিজ্ঞান-রাজ্যের সুপরীক্ষিত সত্য খুব কাজের সত্য তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু তথাপি তাহা ব্যাবহারিক সত্য বই পারমার্থিক সত্য নহে। বিজ্ঞানের সত্যকে ব্যাবহারিক সত্য বলিবার কারণ কি—আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমার বিবেচনায় সে কারণ এই ঃ—

বড় বড় বণিক্ মহাজনেরা কিছু-আর জাহাজ-বোঝাই করা সমগ্র বিক্রেয় বস্তুর মোট ভাঙিয়া তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ পৌরজনের ব্যবহারার্থে আপনারা বিক্রয় করেন না ; সে কার্য্যের ভার তাঁহারা খুচ্‌রা জিনিসের ব্যাপারীদিগের হস্তে গছাইয়া দ্যা'ন্। তত্ত্বজ্ঞানের সমগ্র সত্য বিজ্ঞানের বাজারে চলিতে-পারে-না এই জন্য—যেহেতু অতবড় মহামূল্য সামগ্রী যে-মানুষ ক্রয় করিতে পারে তদুপযুক্ত ক্রোড়পতি বিদ্বজ্জন-সমাজে সুদুর্ল্লভ। তাহা ক্রয় করিতে হইলে বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত শমদমাদির পরাকাষ্ঠা আবশ্যক—পাতঞ্জল শাস্ত্রোক্ত যমনিয়মাদির পরাকাষ্ঠা আবশ্যক! যিনিই যত বড় পণ্ডিত হউন্ না কেন তাঁহার ঘর-পোরা বিরাট বিশ্ব-কোষেও অত মূল্যের তপস্যা-নিধির সিকির সিকিরও সংস্থান নাই। পৌরজনেরা যেমন স্ব ব্যবহার্য্য সামগ্রী-সকল ছোটো-খাটো দোকানদারদিগের নিকট হইতে ক্রয় করে, তা' বই বড় বড় বণিক্ মহাজনদিগের নিকট হইতে ক্রয় করে না, বিদ্যার্থী ব্যক্তিরা তেম্নি স্ব স্ব ব্যবহার্য্য সত্য-সকল বিজ্ঞানের দোকানদারদিগের নিকট হইতেই ক্রয় করেন, তা' বই তত্ত্বজ্ঞানের মহাজনদিগের নিকট হইতে ক্রয় করেন না ; আর সেইজন্য বিজ্ঞানের সত্যসকল ব্যাবহারিক সত্য নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে।

আমাদেরই এই ভারতবর্ষ যে, বিজ্ঞানের জন্মভূমি তাহার আমি সন্ধান পাইয়াছি নানা প্রকার লক্ষণ দৃষ্টে ; কিন্তু তাহা কৃতবিদ্য সমাজের বিচারালয়ের প্রখরবুদ্ধি জুরি-মহোদয়গণের নিকটে প্রমাণ করিতে পারিবার মতো ঐতিহাসিক সাক্ষীর জোগাড় করিয়া ওঠা আমি বড় সহজ মনে করি না। যাহাই হো'ক্ না কেন—পূর্ণ বিচারালয়ের মাঝখানে দ্বাদশ শপথকার মহোদয়গণের মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমি এ কথা বলিতে একটুও ভীত নহি যে, পুরাকালে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের বয়স যদিচ খুব অল্প ছিল—কিন্তু তাঁহার সেই কচি বয়সে

তিনি যেরূপ তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে বড় বড় প্রবীণ পণ্ডিত-গণের বিদ্যা-বুদ্ধির মাথা হেঁট হইয়া যায়। এ বিষয়ে বেশী ওকালতি করা আমার পক্ষে নিতান্তই একটা তেলা-মাথায়-তেল-দেওয়ার ন্যায় বাহুল্য কার্য্য; কেননা, পুরাতন ভারতে জ্যোতিষ-বিদ্যা, বীজগণিত, ক্ষেত্র-তত্ত্ব, রসায়ন-বিদ্যা, পশুপালনী-বিদ্যা, স্থাপত্য-বিদ্যা, চিত্রকর্ম্ম, সঙ্গীত-বিদ্যা প্রভৃতি অনেকানেক বিদ্যা কতদূর যে কালোচিত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহা ত্রিজগতে রাষ্ট্র। তা ছাড়া—রাবণের পুষ্পকবিমানের কথার ভিতরে যদি কোনো প্রকার ঐতিহাসিক সত্য চাপা দেওয়া থাকে—তবে তো এতাদৃশেরই জিত! কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার একটা তাম্রলিপি বা আর কোনো প্রকার মাতব্বর-গোচের ঐতিহাসিক দলিল ভারতবাসীর হস্তগত না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কোনো কথার উচ্চবাচ্য না করাই ভারতের উকিল-ব্যারিষ্টার-গণের পক্ষে সৎপরামর্শসিদ্ধ।

ঘড়ি কি বলিতেছে তাহা জানি না—কিন্তু আমার কণ্ঠের তেজ নরমিয়া আসিতেছে দেখিয়া আমার মন বলিতেছে সময় নাই। অতএব আর কাল-বিলম্ব না করিয়া আমার অবশিষ্ট বক্তব্যটিকে একটি ক্ষুদ্র উপকথা'র বেশ পরিধান করাইয়া তাহার প্রতি আপনাদের কৃপাদৃষ্টি যাচ্ঞা করিতেছি। আপনাদিগকে মাঝে-মাঝে হুঁ দিতে বলিতে আমি সাহস করি না—কেবল যদি আপনারা গল্পটিকে অযোগ্য-বোধে শ্রবণ-দ্বার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া না দ্যা'ন, তাহা হইলেই আমি আজ আপনাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত মনে করিব।

পুরাকালে আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞান ছিলেন সভ্যতা রাজ্যের রাজর্ষি। পরাবিদ্যা ছিলেন রাজমহিষী। বিজ্ঞান ছিলেন তাঁহাদের সবে-মাত্র একটি পুত্র। স্মৃতি-পুরাণ ছিলেন রাজমন্ত্রী। রাজর্ষি তত্ত্বজ্ঞান মনে মনে সংকল্প করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষির ন্যায় পত্নী সহ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। বিজ্ঞানের বয়ঃক্রম সাত আট বৎসরের অধিক না—তা নহিলে রাজর্ষি বিজ্ঞানকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাইতেন। তাহা যখন দেখিলেন হইবার নহে, তখন তিনি বিজ্ঞানের বয়প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত রাজ্যশাসনের ভার তাঁহার প্রবীণ মন্ত্রিবর স্মৃতি-পুরাণের হস্তে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে মনস্থ করিলেন। তিনি বনে গমন করিবার পূর্ব্বে রাজ্যময় ধর্ম্মদুর্ভিক্ষ হইয়াছে শুনিয়া মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণকে ডাকাইয়া প্রজারা যাহাতে অক্ষয় রাজ ভাণ্ডারের অমৃতোপম ভক্ষ্য পানীয়-সকল সুলভ মূল্যে পাইতে পারে তাহার একটা সদ্ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন; আর সেই সঙ্গে—কিরূপে বিজ্ঞানকে ধীরে ধীরে সর্ব্ববিদ্যায় এবং সর্ব্বগুণে সম্ভৃত করিয়া তুলিয়া যথোপযুক্ত বয়সে রাজধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইবে এবং বিশেষত বিজ্ঞান যাহাতে বিপথে পদার্পণ না করে তাহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে, সেই বিষয়ের একটা সারগর্ভ উপদেশ-পত্র স্বহস্তে লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রিবরের হস্তে তাহা সযত্নে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর রাজর্ষির আজ্ঞাক্রমে মন্ত্রিবর ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া পুনঃপুন শপথ করিলেন যে, তাঁহার জীবন থাকিতে উপদেশ-পত্রের একটি কথারও তিনি অন্যথাচরণ করিবেন না। অনতিপরে রাজর্ষি-তত্ত্বজ্ঞান পত্নী সহ তপোবনে প্রয়াণ করিলেন।

মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রাজ-ভাণ্ডারের অপর্য্যাপ্ত ভক্ষ্য-পানীয়-সকল যাহাতে প্রজারা সুলভ মূল্যে পাইতে পারে, তাহার উচিতমতো ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার অনেক কালের বহুদর্শিতা এবং বিচক্ষণতা রীতিমত কাজে খাটাইয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া এবং সবদিক্ বাঁচাইয়া যে-দ্রব্যের যে-মূল্য ধার্য্য করিলেন, তাহা প্রজাদিগের আদবেই মনঃপূত হইল না। কিয়ৎ পরে সমস্ত প্রজাবর্গ একযোট হইয়া মন্ত্রিবরের নিকটে এইরূপ আবেদন জানাইল যে, "ন্যায়মতে রাজভাণ্ডারের ভক্ষ্য-পেয়-সকল আমরা বিনামূল্যে পাইবার অধিকারী। নিতান্তই যদি আমাদিগকে তাহা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়, তবে এক টাকার জিনিস্ এক পয়সা মূল্যে লইতে আমাদের মনকে কোনোমত-প্রকারে লওয়াইলেও লওয়াইতে পারি; নচেৎ আমরা না খাইয়া মরিব সেও ভাল, তথাপি তার সিকি পয়সা বেশী মূল্যে আমরা তাহা লইব না।"

মন্ত্রিবর ফাঁপরে পড়িলেন। মন্ত্রিবরের মন্ত্রিণী ঠাকুরাণী ছিলেন দুই সপত্নী। তাঁহার কৌশল্যা ছিলেন রক্ষা-নীতি, আর, তাঁহার কৈকেয়ী ছিলেন লোকরঞ্জনা। প্রজাদের ঐরূপ কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা উভয় মন্ত্রিণী ঠাকুরাণীরই কর্ণে পৌঁছিল। মন্ত্রিবর মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিয়া ভাল করিয়া আহার করিতেছেন না দেখিয়া বড় মন্ত্রিণী রক্ষানীতি বলিলেন "ভাবচ কেন অত; প্রজাদের যারা প্রধান মোড়ল—যাদের বুদ্ধি আছে, বিবেচনা আছে, তাদের সবাইকে ডাকিয়ে এনে ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্লেই তারা বুঝ্বে, আর প্রধানেরা বুঝলেই ক্রমে ক্রমে সবাই বুঝবে; তা হ'লেই আপদ্ বালাই চুকে যাবে।" ছোটো মন্ত্রিণী লোকরঞ্জনা বলিলেন "দিদি যা ব'ল্চেন তা যদি ভাল বোঝো তবে তাই কর'। সখীমণি ঘাটে জল তুল্তে গিয়েছিল—জল তুলে এনে আমাকে ব'ল্লে যে, রাস্তায় লোকের ভিড় হ'য়েচে এম্নি যে, দুই দণ্ড তা'কে পথের একধারে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হ'য়েছিল; আর, প্রজারা সবাই মিলে যা ব'লছিল, সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব সে শুনেচে; তার চ'কের সাম্‌নে, প্রধান মোড়োলেরাই বা কি, আর খুচ্‌রো চাসাভুসোরাই বা কি, সবাই মিলে ব'ল্‌ছিল যে, তারা না খেয়ে মর্‌বে তবুও তারা এক টাকার সামগ্রী এক পয়সার বেশী দাম দিয়ে নেবে না। দেশসুদ্ধ লোক না খেয়ে ম'চ্চে আমি তা চ'কে দেখ্‌তে পার্‌ব না; তার আগে যা'তে তা আমাকে দেখ্‌তে না হয়, আমি তা না খেয়েই হো'ক্ আর যা-খেয়েই হো'ক্—যেমন ক'রে হো'ক্—ক'রে ক'ম্মে চুকে নিশ্চিন্তি হ'ব। তা হ'লেই দিদি ঘরের একেশ্বরী হ'বেন আর তোমার সব আপদ বালাই চুকে যাবে।" মন্ত্রিবর তাঁর কৈকেয়ী-ঠাকুরাণী লোকরঞ্জনা'র শক্ত আবদার কিছুতেই থামাইতে পারিলেন না; তিনি আর কোনো উপায় না দেখিয়া রাজভাণ্ডারের বিশুদ্ধ তত্ত্বান্নের সহিত নানা প্রকার অর্থহীন এবং অসার ক্রিয়াকর্ম্মের ভেজাল মিশাইয়া প্রজাদিগের মধ্যে এক টাকার জিনিস সিকি পয়সা মূল্যে বিলি করিতে আরম্ভ করিলেন। বিজ্ঞানের বয়স তখন যদিও খুব কম তথাপি মন্ত্রিবরের ঐরূপ গর্হিত কার্য্য তাঁহার একটুও ভাল লাগিল না। বিজ্ঞানের মুখ ভার দেখিয়া মন্ত্রিবর তাঁহাকে বলিলেন "তুমি আমার কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়াছ? কেন যে আমি এইরূপ দেশকাল-পাত্রোচিত বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনা করিতেছি, এখনো তোমার তাহা বুঝিতে পারিবার সময় হয় নাই; আমার মতো যখন তোমার চুল পাকিবে তখন তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিবে যে, বৃদ্ধ মন্ত্রীটি ছিলেন বলিয়া রাজ্য এখনো পর্য্যন্ত টেঁকিয়া আছে, নহিলে কোন্ কালে তাহা রসাতলে যাইত।" বিজ্ঞান বলিল "আপনি ঐ যে কদর্য্য সামগ্রীগুলা বাজারে চালাইয়া দিতেছেন, ও যে বিষ!" মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণ বলিলেন "ঐ-দ্রব্য-গুলারই মধ্যে দুই চারি কৌঁটা অমৃত যাহা সঙ্গোপিত আছে তাহা অমনধারা দশ দশ হাঁড়ি বিষকে গিলিয়া খাইতে পারে।" মন্ত্রিবরের সঙ্গে বিজ্ঞানের এই সূত্রে মনান্তর ঘটিল। বিজ্ঞান একদিন কথাপ্রসঙ্গে মন্ত্রিবরকে বলিল, "আমি বালক বলিয়া আমার কথা আপনি অগ্রাহ্য করিবেন তাহা আমি জানি, কিন্তু তবুও আমি বলিতেছি যে এ রাজ্যের মঙ্গল নাই! বছর-আষ্টেক পরে যখন আপনার দুর্নীতির ফল পাকিয়া উঠিবে, তখন আপনি বলিবেন যে, সত্য কথা বালকের মুখ দিয়া বাহির হইলেও তাহা সত্য বই মিথ্যা নহে, আর, অশুভ কার্য্য প্রবীণের হস্ত দিয়া বাহির হইলেও তাহা অশুভ বই শুভ নহে।" বছর আষ্টেক পরেই বিজ্ঞান কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার জননী ভারতভূমির নিকট হইতে জন্মের মতো বিদায় গ্রহণ করিলেন, আর, কিয়ৎপরে ঈশ্বরের কৃপায় এবং আপনার বাহুবলে নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আপনার আধিপত্য অটলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনতিবিলম্বে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের কথাই ফলিল। অসার এবং অধম সামগ্রী-সকল উদরস্থ হওয়াতে-করিয়া দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হাড়ে হাড়ে নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধির সঞ্চার হইতে লাগিল। অন্তঃসারশূন্য অলীক অপদার্থ এবং অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়া-কর্ম্মের ভারে তত্ত্বজ্ঞানের রাজভাণ্ডারের বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম চাপা পড়িয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে আর্য্য-সভ্যতার জ্যোতির্ম্ময় মুখশ্রী তমসাচ্ছন্ন হইয়া গিয়া

আর্য্যসভ্যতা অধম বর্ব্বরতায় পর্য্যবসিত হইল। তাই আমাদের আজ এই দশা!

বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহারের যে কিরূপ বিষময় ফল এই তো তাহা দেখিলাম। কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বরের করুণা অপার! পশ্চিমে বিজ্ঞানের এত যে অপব্যবহার হইয়াছে এবং হইতেছে কিন্তু তথাপি তাহা বিজ্ঞানের সত্য-জ্যোতিকে তিল মাত্রও খর্ব্ব করিতে পারেও নাই, পারিবেও না। আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞানের এত যে অপব্যবহার হইয়াছে এবং হইতেছে কিন্তু তথাপি তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সুমঙ্গল শান্তিকে একচুলও টলাইতে পারেও নাই পারিবেও না।

প্রবীণ স্মৃতিপুরাণ নবীন বিজ্ঞান'কে এই যে একটি কথা বলিয়াছিলেন—যে, রাজ-ভাণ্ডারের ভক্ষ্যপেয় সামগ্রীতে সহস্র ভেজাল-মিশ্রিত থাকা সত্ত্বেও তাহার ভিতরে এক আধ কৌটা অমৃত যাহা সঙ্গোপিত রহিয়াছে তাহা সকল রোগের মহৌষধ, তাঁহার এ কথা সত্য বই মিথ্যা নহে; তা'র সাক্ষী—রামায়ণ এবং মহাভারত এখনো পর্য্যন্ত আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক সভ্যতা'কে মৃত্যুর হস্ত হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আবার, তা'ও বলি—মন্ত্রিবরের উপরে রাগ করিয়া বিজ্ঞান যে, তাঁহার পিতার অনভিমতে আপনার জননীতুল্য জন্মভূমিকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া পশ্চিম ভূগোলখণ্ডে আপনার রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—এটা তাঁহার উচিত কার্য্য হয় নাই। ব্যাবহারিক সত্যের জ্ঞানোপার্জ্জন মনুষ্যবুদ্ধি কর্ত্তৃক হইয়া ওঠা যতদূর সম্ভবে—বিজ্ঞানের তাহা হইতে বাকি নাই যদিচ, কিন্তু তথাপি ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে যে, পারমার্থিক সত্যের ক-খ-গ-ঘও আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের আয়ত্তের মধ্যে ধরা দিল না। বিজ্ঞানের উচিত ছিল—ভারতভূমি পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহার দেবতুল্য পিতার নিকটে পারমার্থিক সত্যের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই মন্ত্রের যথাবিহিত সাধন দ্বারা তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের শূন্য উপর-মহলটা পুরাইয়া লওয়া। তাহা না করিয়া তিনি তাঁহার অর্দ্ধশিক্ষিত অবস্থায় ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা'তে তাঁহার রাজ্যমধ্যে এক্ষণে যেরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, তাহা যে অবশ্যম্ভাবী—প্রবীণ মন্ত্রিবর তাহা তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; বুঝিতে পারিয়া—কলিতে দুর্ভিক্ষের পরে দুর্ভিক্ষ, ক্লেশের পরে ক্লেশ, ভয়ের পরে ভয় যাহা যাহা ঘটিবে তাহা ভারতময় ঢ্যাঁঢ়রা পিটিয়া দেওয়াইয়াছিলেন। অতএব বিজ্ঞান যদি বৃদ্ধ ভারতমন্ত্রীর হিত-পরামর্শ শোনেন, তবে ভারতে ফিরিয়া আসুন; ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার লোকপূজ্য পিতা'র নিকটে দীক্ষিত হউন; দীক্ষিত হইয়া ভারতবর্ষীয় আর্য্যসভ্যতা'র যৌবরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া তাঁহার রাজর্ষি পিতার চির-পোষিত মনস্কামনা পূরণ করুন; তাহা হইলে তাঁহার পৈতৃক প্রাচ্যরাজ্যেরও মঙ্গল হইবে, আর, তাঁহার স্বোপার্জ্জিত প্রতীচ্য রাজ্যেরও মঙ্গল হইবে। আমার ক্ষুদ্র উপকথাটি ফুরাইল। আমারও শান্তি হইল, আপনাদেরও শান্তি হইল, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাপানী উৎসব ও অনুষ্ঠান

যে জাতির প্রাণ আছে সে জাতি কর্ম্মেও যেমন মাতিতে পারে উৎসব আনন্দেও তেমনি। আর যে জাতির মধ্যে সেটির অভাব সে জাতির কর্ম্ম নিরানন্দ, উৎসব শুষ্ক বৈচিত্র্যহীন—মাতিবার শক্তি তাহার একেবারেই নাই।

জাপানকে কর্ম্মভূমি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আবার উহাকে উৎসবের দেশও বলা যায়—সে দেশে উৎসবের আর অন্ত নাই। সে-সকল উৎসবে জাপানীদের সৌন্দর্য্যবোধ ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের বাংলাদেশেও উৎসব ছিল অনেক, কিন্তু এখন তাহার মধ্যে অধিকাংশ লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায়। অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক উৎসবের না আছে প্রাণ, না আছে রস, না আছে কিছু। আমাদের উৎসবে কেবল পুরুষের মেলা। স্বাধীন দেশের নরনারীর মেলার সরস সম্পূর্ণতা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

জাপানের অধিকাংশ উৎসব গৃহপ্রাঙ্গণে না হইয়া প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেখানে বাধার লেশমাত্র নাই, কেহই সঙ্কোচ বোধ করে না, ধনী নির্ধন সকলেরই উৎসবে মাতিবার সমান অধিকার।

অন্যান্য দেশের ন্যায় জাপানেও সুবেশ পরিধান ও সুখাদ্য ভোজন করা উৎসবের দুইটি প্রধান অঙ্গ।

১লা জানুয়ারি। নববর্ষের আরম্ভ। ঐ দিনই নববর্ষ-উৎসব—জাপানের প্রধান উৎসব। বাংলাদেশে আজকাল বিপণির দ্বারে মঙ্গলকলস ও আম্রশাখা দেখিয়া আমাদের মনে পড়িয়া যায় যে সেদিন ১লা বৈশাখ, নববর্ষের আরম্ভ; কারণ আমাদের গৃহে পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিয়া নূতনকে আহ্বান করিয়া লইবার জন্য কোনো আয়োজন নাই, কোনো আনন্দ নাই, উৎসবের চিহ্নমাত্র নাই—প্রত্যহ যেমন সেদিনও তেমনি। জাপানে ইহার বিপরীত। সেখানে বর্ষশেষের শেষ সপ্তাহে দেশময় গৃহে গৃহে নববর্ষ উৎসবের আয়োজন চলিতে থাকে। অতি দীনহীনও, আর কিছু না পারুক গৃহদ্বারে মাঙ্গলিক স্থাপন করিতে ভোলে না।

নববর্ষ-উৎসবের কথা ইতিপূর্ব্বে শ্রেষ্ঠ বাঙলা মাসিক-পত্রগুলিতে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। সে জন্য সে উৎসবের বর্ণনা আর দেওয়া হইল না।

প্রাচীনকালে জানুয়ারি মাসের ৬ই তারিখে কিও-তোর রাজসভাসদেরা দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণে বাহির হই-তেন। হেইয়ান যুগে এই প্রথা সমধিক প্রচলিত ছিল। রীতি ছিল ভ্রমণে বাহির হইয়া একটি দেবদারু শাখা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হইবে। কালক্রমে শাখার পরিবর্ত্তে লোকে ছোট ছোট দেবদারু গাছ লইয়া বাড়ী ফিরিয়া সৌভাগ্যের আশায় সেগুলি গৃহে রোপণ করিতে লাগিল। কারণ দেবদারু দীর্ঘ সুস্থ নিরাময় জীবনের নিদর্শন। এই প্রথাটির নাম ছিল কোমাৎসু-হিকি।

সেৎসুপ্রদেশে মিনোর্মো পর্ব্বতে একটি জলপ্রপাত আছে। নিকটেই লক্ষ্মীদেবীর মন্দির। ৭ই তারিখে এখানে অর্থপ্রত্যাশী বহু ব্যক্তির সমাগম হয়। দেবমূর্ত্তির সম্মুখে তিনটি সিন্দুক থাকে। সিন্দুকের ডালার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। মন্দিরের পুরোহিত অনেকগুলি কার্ডের উপর আবেদনকারীদের নাম লিখিয়া সিন্দুকের মধ্যে ফেলিয়া দেন, তারপর সিন্দুক নাড়াইয়া কার্ডগুলি মিশাইয়া ফেলিয়া ডালার উপরকার গর্ত্তের মধ্য দিয়া একটি করিয়া শলাকা ফেলিয়া দেন। শলাকা যাহার নামাঙ্কিত কার্ডে বিদ্ধ হয় তাহারই অর্থলাভ ঘটিবে আশা করা যায়। প্রথম সিন্দুকটি দ্বিতীয় অপেক্ষা এবং দ্বিতীয়টি তৃতীয় অপেক্ষা শুভফল দর্শায়।

হিতাচি নামক স্থানে ১০ই জানুয়ারি একটি উৎসব হয়। ঐ দিবস কাশিমা মন্দিরে বহু রমণী সমবেত হন। পতিপ্রার্থিনী রমণীরা কোমরবন্ধের অনুরূপ দুই ফালি শণ লইয়া আসেন। একটির উপর রমণীর নিজের নাম লেখা; অপটির উপর নিজ নিজ প্রেমাস্পদের নাম লেখা। ফালিগুলি দুমড়াইয়া মুড়িয়া মুঠার মধ্যে রাখিয়া চারটি খোলা মুখ পুরোহিতের নিকট ধরা হয়। বাহির হইতে দেখিলে কোন্ মুখটি কোন্ ফালির তাহা বোঝা দুঃসাধ্য। পুরোহিত ফালির দুইটি মুখ ধরিয়া গেরো বাঁধেন, তার-পর অন্য দুটি মুখ ধরিয়া তদ্রূপ করেন। মুঠা খুলিয়া যদি দেখা যায় একই ফালির দুইটি মুখ বদ্ধ রহিয়াছে, তাহা হইলে রমণীর প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের সম্ভা-বনামাত্র নাই। আর যদি দেবতার অনুগ্রহে দুইটি ফালিতে গেরো পড়িয়া একত্র সংযুক্ত হইয়া একটি বৃত্ত রচনা করিয়াছে দেখা যায়, তবে রমণীর নিঃসঙ্গ জীবনের অবসান সন্নিকট জানিতে হইবে—তাহার বিবাহ নিশ্চিত।

কাওয়াচি প্রদেশে হিরাওকা মন্দির চারিজন দেব-তার নামে উৎসর্গীকৃত। দেবতার নামগুলি এত দীর্ঘ যে লিখিতে সাহস হইল না। এই মন্দিরে ১৫ই জানু-য়ারি একটি অনুষ্ঠান হয়—এই অনুষ্ঠানের ফলে নাকি ক্ষেত্র ও শস্য একবৎসরের জন্য অপদেবতার কুনজর হইতে রক্ষা পায়। মন্দিরের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড কটাহে লাল মটর সিদ্ধ করা হয়। পাঁচ ইঞ্চি দীর্ঘ ৫৪টি ফাঁপা বাঁশখণ্ড আঁটি বাঁধিয়া কটাহমধ্যে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক বংশখণ্ডের উপর একটি করিয়া শাকসবজির নাম খোদা থাকে। পরদিন প্রাতে সিদ্ধ মটর দেবতাকে নিবেদন করিয়া দিয়া উত্তম ফসল-লাভের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হয়। বংশখণ্ডগুলি

পাত্র হইতে উঠাইয়া মাঠের মধ্যে লইয়া গিয়া ফাটাইয়া দেখা হয় কোন্ বংশখণ্ডের মধ্যে কতগুলি মটর প্রবিষ্ট হইয়াছে। যে বংশখণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক মটর প্রবিষ্ট হইয়াছে সেইটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—যে ফসলের নাম সেই বংশখণ্ডে খোদিত সে ফসল সে বৎসর প্রচুর পরিমাণে জন্মিবে।

রক্তবর্ণ 'তোরি' বা ফটক এবং শৃগালমূর্ত্তি দ্বারা বিশেষরূপে চিহ্নিত ইনারি মন্দির জাপানের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ইনারি-দেব ধান্যক্ষেত্রের অভিভাবক। তাঁহার চীনা নামটি লিখিতে শৃগালবাচক একটি অক্ষর লাগে, সেই হেতু ঐ জন্তুটির মূর্ত্তি ইনারি-দেবের মন্দিরের সম্মুখে স্থান পাইয়া থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম 'অশ্ব-দিনে' জাপানের সকল ইনারিমন্দিরে একটি উৎসব হইয়া থাকে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে জাপানী সপ্তাহগুলিকে জন্তুর নামে অভিহিত করা হয়, যেমন 'ইঁদুর', 'ষাঁড়', 'বাঘ', 'সাপ', 'ঘোড়া', 'খরগোস', ইত্যাদি। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুরোহিত মন্দিরের বেদির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া সাকে বা মদ নিবেদন করিয়া দেয়। তৎপরে জনসমূহ নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌতুকে মাতিয়া উঠে। শিশুগণও প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে। ঢক্কানিনাদ, নৃত্য ও সুখাদ্য ভোজনে উৎসব সুসম্পন্ন হয়।

১৫ই ফেব্রুয়ারি নেহান-য়ে বা বুদ্ধদেবের মৃত্যুদিনের উৎসব। নেহান শব্দের অর্থ—সেই পবিত্র স্থান যেখানে জন্ম মৃত্যু কিছুই নাই। কোনো কোনো মন্দিরে এই নেহানের চিত্র প্রদর্শিত হয়। কথিত আছে বুদ্ধদেব উত্তর দিকে মাথা ও পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে ভর দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। চিত্রে ইহাই অঙ্কিত হইয়াছে; চতুর্দ্দিকে পশুপক্ষী বুদ্ধের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিতেছে।

১৫ই ফেব্রুয়ারি সাইগ্যো-কি বা সাইগ্যো-দিবস নামে কথিত। ঐ দিন সাইগ্যো নামক এক বিখ্যাত সামুরাই বা ক্ষত্রিয়ের স্মৃতি-উৎসব। ধনুর্ব্বিদ্যা ও অশ্বারোহণে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কিন্তু জগতের দুঃখদুর্দ্দশা দর্শনে ব্যথিত হইয়া তিনি পরিবার ত্যাগ করিয়া গৃহহীন সন্ন্যাসীর ন্যায় জাপানের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বিশ্রামের সময় তিনি বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন হইয়া কাটাইতেন। তাঁহার বাসনা ছিল তিনি পুষ্পভারে অবনত প্লাম বৃক্ষের তলে প্রাণত্যাগ করিবেন। এ মর্ম্মে তিনি একটি কবিতা রচনাও করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-সাধুর বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল। দীর্ঘ জীবনের অবসানে ১১৯৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন—প্লামবৃক্ষগুলি তখন কোমল শ্বেত পুষ্পের সম্পদভারে নতনম্র।

তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিন অর্থাৎ ৩রা মার্চ একটী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এটি বালিকাদের উৎসব। সম্ভবত চীনদেশে ইহার উৎপত্তি। কারণ চীনারা বাড়ী হইতে ভূতপ্রেত তাড়াইবার জন্য ঐ দিনটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিত। একটি পুতুলের উপর সংসারের যাবতীয় পাপ ও অশুভ প্রভাব আরোপ করিয়া সেই পুতুলটিকে নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইত।

এই হিনা-উৎসবের জন্য প্রত্যেক পরিবারের একসেট করিয়া পুতুল থাকে। উৎসবের পূর্ব্বদিন পুতুলগুলিকে যথাযোগ্য সাজে সজ্জিত করিয়া কক্ষমধ্যে সাজাইয়া রাখা হয়। প্রত্যেক পুতুল কোনো-না-কোনো জাতীয় ইতিহাস-বর্ণিত ব্যক্তির প্রতিনিধিরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। পুতুলগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে দাইরিসামা ও কিসাকি। ইহারা সম্রাট দাইরি ও সম্রাজ্ঞী ওহিনাসামার পরিবর্ত্তে বসে। এই দম্পতিকে জাপানীরা আদর্শ দম্পতি বলিয়া মনে করে। রাজদম্পতির পরেই হইতেছে সাদাইজিন্ ও উদাইজিন্। ইহারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, জীবনসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। ইহারা বসে যৌবন ও বার্দ্ধক্যের পরিবর্ত্তে। সকল পুতুলগুলিই প্রাচীনদিনের জমকালো পোশাকে সজ্জিত। এতদ্ব্যতীত শ্বেতপরিচ্ছদ ও রক্তবর্ণ ঘাঘরা পরিহিত তিন জন সম্ভ্রান্ত মহিলা আছেন, আর তাঁহাদের সঙ্গে আছে যন্ত্রবাদক পাঁচটি সুন্দর বালক। তারপর তিন জন ভৃত্য। একজন রাজপাদুকা বহন করিতেছে, একজনের হাতে একটি ছাতা এবং তৃতীয়ের হাতে কিছু মোটমাটরা।

পুতুলগুলির দৈর্ঘ্য পাঁচ হইতে বারো ইঞ্চি পর্য্যন্ত

হইয়া থাকে। কলাকুশল শিল্পী এগুলিকে সযত্নে গড়িয়া তোলে। শিল্পীর দক্ষতা অনুসারে পুতুলগুলির মূল্য কয়েক মুদ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া শতসহস্র মুদ্রা পর্যান্ত হইতে পারে। পুতুল ও তাহার সাজসজ্জা রাখিবার জন্য আলমারি দেরাজ প্রভৃতিতেও অনেক খরচ হয়। পুতুলের আহারের বাসনগুলি দর্শনীয় পদার্থ।

উৎসবের দিন বাড়ীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কক্ষের সর্ব্বোত্তম স্থানে পুতুলগুলি সাজানো হয়। পুতুলের মঞ্চ পীচফুল দিয়া সাজানো হয়। মঞ্চের সম্মুখে শ্রদ্ধার সহিত আহার্য্য সজ্জিত করিয়া রাখা হয়। বয়োজ্যেষ্ঠা বালিকাই হয় কর্ত্রী। সে তাহার বালিকা বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া শ্বেত মদ্য পান করিতে দেয়। সন্ধ্যার সময় পুতুলের কক্ষ সুন্দর সুন্দর মোমবাতি জ্বালাইয়া আলোকিত করা হয়।

জাপ-পরিবারের নিকট এ উৎসবটির যথেষ্ট সার্থকতা আছে। কারণ ইহা সম্রাট সম্রাজ্ঞীকে জাতির আদর্শ দম্পতিরূপে চিত্রিত করিয়া বালিকার মনে রাজভক্তি জাগাইয়া দেয়—তাহার চোখের সম্মুখে নিষ্কলঙ্ক সুখী সংসারের মোহন চিত্র ফুটাইয়া তোলে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং বাক্যে ও ব্যবহারে সংযম হইতেছে এ উৎসবের বাহ্যমূর্ত্তি; ভিতরের মর্ম্ম হইতেছে মহৎ চরিত্রের প্রতি অনুরাগ এবং পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি সম্মান।

মার্চ মাসের আর একটি উৎসবের নাম হইতেছে ক্যোকুসুই-নো-এন্। এটি একটি কবিতা রচনা করিবার প্রতিযোগিতা। অভ্যাগতেরা উদ্যানে একটি বঙ্কিমগতি জলধারাকে ঘিরিয়া বসে। কবিতা-রচনার বিষয়টী উল্লেখিত হইলে এক পেয়ালা মদ্য বাহির করা হয়। প্রথম অভ্যাগত পেয়ালায় এক চুমুক দিয়া পেয়ালাটি স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া কবিতা রচনায় মনঃসংযোগ করে। পেয়ালা ভাসিতে ভাসিতে যেই দ্বিতীয় অভ্যাগতের নিকট উপস্থিত হয় অমনি তিনি উহা উঠাইয়া লইয়া এক চুমুক দিয়া পেয়ালা জলে ভাসাইয়া কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। এমনি চলিতে থাকে, যতক্ষণ না পেয়ালাটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর মুখে গিয়া পৌঁছে।

তোকিওর অন্তর্গত মুক্যোজিমা নামক স্থানে মোকুবোজি মন্দিরে ১৫ই মার্চ একটী উৎসব হয়। কথিত আছে মার্চ মাসের দশই তারিখে কিওতোর জনৈক ওমরাহের পুত্র অপহৃত হইয়া এদো বা তোকিওতে আনীত হয় এবং সেখানে তাহার মৃত্যু হয়। মন্দিরের পুরোহিত হতভাগ্য প্রিয়দর্শন বালকটিকে সমাধিস্থ করেন। সমাধির উপর একটি মন্দির নির্ম্মিত হয়। সেই অবধি বালকের মৃত্যুদিনে যাত্রীর দল সেস্থানে গিয়া জীবনের বিপদ আপদ এবং প্রবাসী বন্ধুহারাদের দুরদৃষ্ট সম্বন্ধে কবিতা রচনা করে। এমন কি এই শোচনায় ঘটনা অবলম্বন করিয়া নাট্যও রচিত হইয়াছে। নাটকের উপাখ্যানভাগ হইতেছে—হতভাগিনী মাতা হারানো পুত্রের সন্ধানে বৃথায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে নদীর ধারে এক উইলো গাছের উপর পুত্রের ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া তাহার অবস্থা জানিতে পারিলেন।

মার্চ মাসের আর একটি উৎসব হইতেছে সাঞ্জা মাৎসুরী। ১৮ই মার্চ এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে সম্রাজ্ঞী সুইকোর রাজত্বকালে (৫৯৩-৬২৮) তিন ভাই মাছ ধরিতে গিয়া জাল দিয়া দেবী কানন বা করুণা দেবীর একটি মূর্ত্তি টানিয়া তুলে। মূর্ত্তিটি একটি মন্দিরে স্থাপিত আছে। ঐ মন্দির উপরোক্ত তিন ভ্রাতার নামে উৎসর্গীকৃত। প্রতি বৎসর তাহাদের নামাঙ্কিত কাষ্ঠফলক লইয়া মন্দির হইতে নাগরিকগণের মিছিল বাহির হয়।

১৯এ মার্চ জাপানের য়্যামাশিরো প্রদেশে একটি অদ্ভুত ধরণের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ স্থানে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে বুদ্ধের একটি পাঁচ ফুট উচ্চ মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের দ্বার বৎসরে মাত্র একবার খোলা হয়। মূর্ত্তির গাত্রে সম্বৎসর ধরিয়া যে ধূলিরাশি সঞ্চিত হয়, সে দিন সেই ধূলা ঝাড়া হয়। এই ধূলা-ঝাড়াই হইল প্রধান অনুষ্ঠান—এবং উহা দেখিতে দলে দলে লোক আসে। শুনা যায় মন্দিরনির্ম্মাতা সাত দিন ধরিয়া বেদির সম্মুখে বসিয়া বুদ্ধের ধ্যান করিয়াছিল। ধ্যানে তুষ্ট হইয়া ভগবান বুদ্ধ তাহার নিকট প্রকাশ করিলেন যে তাহার পিতা বর্ত্তমান সময়ে একটি বলীবর্দ্দে পরিণত হইয়া নূতন মন্দির নির্ম্মাণের জন্য কাষ্ঠ বহনে নিযুক্ত

রহিয়াছে! তখন হইতে লোকটি সকল গৃহপালিত বলীবর্দ্দের প্রতিই সদয় হইয়া উঠিল—বেচারা তো জানিত না কোন্ বিশেষ বলীবর্দ্দের মধ্যে তাহার পিতার আত্মা অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাই তাহার ভয় হইত পাছে সে পিতাকে অসম্মান করিয়া বসে! এইরূপে সে বুদ্ধের করুণা লাভে সমর্থ হইয়াছিল। গৃহপালিত পশুর সাজসজ্জা মূর্ত্তির উপর ঘষিয়া লওয়া হয়—পশুগুলির যাহাতে মঙ্গল হয় এই উদ্দেশ্যে। শোনা যায় এইরূপে মূর্ত্তিগাত্রে ঘর্ষণের পর সাজসজ্জা না কি মধুর সুরভিপূর্ণ হয় এবং সে গন্ধে বলীবর্দ্দ বিশেষ আনন্দ লাভ করে! মূর্ত্তিটি ঝাড়িয়া মুছিয়া ধূলিমলিন বস্ত্রখণ্ড সমবেত জনমণ্ডলীকে দেখানো হয়।

তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিনে যেমন বালিকাদের উৎসব, তেমনি পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে অর্থাৎ ৫ই মে বালকদের উৎসব। অন্যান্য অনেক জাপানী উৎসবের ন্যায় খুব সম্ভব এ উৎসবটিরও আমদানি চীন দেশ হইতে। ৫ই মে তারিখটির সহিত চীনদেশের একটি বিষাদকাহিনী জড়িত। কথিত আছে ঐ দিনে চীনের কবি কুৎসুগেন জাতীয় অবনতি দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া একটি কবিতা রচনা করেন এবং তৎপরে হোগিরা নদীতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন! সেই অবধি প্রতি বৎসর ঐ দিনে জনসমূহ নদীর নিকট আসিয়া মৃত কবির গুণাবলী স্মরণীয় করিবার জন্য এবং তাঁহার অতৃপ্ত আত্মাকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে নদীর জলে সবুজ বংশখণ্ড ভাসাইয়া দিত। কিছুকাল পরে মৃত কবির আত্মা কাহারো নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন—নদীতে বংশখণ্ড ভাসাইয়া লাভ নাই, কেননা জলের ড্র্যাগন বা মকর উহা চুরি করিয়া লয়! অতএব তিনি পরামর্শ দিলেন যে বংশখণ্ডগুলি মাটিতে পুঁতিয়া সেগুলি ধ্বজপতাকায় শোভিত করাই যুক্তিযুক্ত। ইহা হইতেই ক্রমশঃ জাপানের বালকদের উৎসবের উৎপত্তি। যে বাড়ীতে সেই বৎসরের মধ্যে শিশুপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই বাড়ীতে একটি বাঁশ পুঁতিয়া বাঁশের মাথায় একটি কাগজের ফাঁপা মৎস্য বাঁধিয়া দেওয়ার রীতি প্রচলিত। মাছটি মুখব্যাদান করিয়া বায়ুভরে ফুলিয়া উঠিয়া আন্দোলিত হইতে থাকে—মনে হয় যেন নদীর জলে সন্তরণ করিয়া চলিয়াছে। জীবনস্রোতে বালককেও এইরূপেই অগ্রসর হইতে হইবে—সফল হইতে হইলে তাহাকে স্রোতের বাধাবিঘ্ন সমস্তই অতিক্রম করিতে হইবে। মৎস্যটি বালককে ইহাই বুঝাইয়া দিতেছে। এই সময়ে ওক-পাতায় মোড়া এক প্রকার বিশেষ পিষ্টক খাওয়া হয়। এই পিষ্টকই প্রাচীনকালে কুৎসুগেনের আত্মার উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দেওয়া হইত।

সে দিন পৈত্রিক সম্পত্তিগুলি বাহির করা হয়। পিতৃপুরুষেরা বহু শতাব্দী ধরিয়া যে পাত্রে ভোজন করিয়াছে বালকেরাও সে দিন সেই পাত্রে ভোজন করে। পরিবারে রক্ষিত পুরাতন বর্ম্ম ও অস্ত্রশস্ত্র বাহির করা হয়—সেগুলি শিশুগণকে পরিবারের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রবুদ্ধ করে। যাহাদের বাড়ীতে অস্ত্রশস্ত্র নাই তাহারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পুতুল দিয়া ঘর সাজায়। পুতুলগুলি সেই পরিবারের প্রতিভূস্বরূপ।

প্রাচীনকাল হইতে বাঁশ একস্থান হইতে তুলিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিবার জন্য ১৩ই মে শুভদিনরূপে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। মে মাসের শেষ সপ্তাহ জাপানে ধান্য বপন করিবার সময়। বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকেরাই এই কাজে নিযুক্ত হয়! এই স্ত্রীলোকগণকে "সাওতোমে" বলা হয়। তাহারা নীলবর্ণের পোষাক ও লাল কোমরবন্ধ পরিধান করে। মাথায় চওড়া টুপি পরে এবং টুপির চারিদিকে একখানা তোয়ালে জড়াইয়া রাখে। জাপানে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন ইহারা দলে দলে ধান্যক্ষেত্রে এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিবসব্যাপী পরিশ্রমের ভার গান গাহিয়া লাঘব করে। গানগুলি প্রায়শঃই প্রেমের গান। জাপানের কোন কোন স্থানে এই গানের সময় শিশুগণের বাদ্য বাজাইবার রীতি প্রচলিত আছে। সেই বাদ্যসহযোগে গান গাওয়া হয়। কথিত আছে ধান্য বপনের সময় কিওতোর কোনো কোনো ওমরাহ রমণীগণের মধুর সঙ্গীত শুনিবার জন্য গরুর গাড়ী চড়িয়া ধান্যক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইতেন।

মে মাসে সাপ খোলস পরিত্যাগ করে! ঐ খোলস

১৫ই মে কেহ যদি কুড়াইয়া পায় এবং চালের কুঁড়োর সহিত টুকরা টুকরা করিয়া মিশাইয়া একটি থলির মধ্যে ভরিয়া স্নানের সময় গাত্রে ঘর্ষণ করে তো রং ফর্শা হয়—এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। এক কালে রমণীগণের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট দিনে সাপের খোলস অন্বেষণ করিবার প্রথা খুব প্রচলিত ছিল—আজকাল কিন্তু নব্যাদের সহিত সর্পের খোলসের পরিচয় নাই বলিলেই হয়।

সপ্তম মাসের সপ্তম দিন বা ৭ই জুলাই তানাবাতা মাৎসুরি বা তারকা-উৎসব সম্পন্ন হয়। জনশ্রুতি এইরূপ যে স্বর্গের পূর্ব্বনদী বা ছায়াপথের তীরে রাজনন্দিনী তানাবাতা বাস করিতেন। তিনি ছিলেন তারকা—স্বর্গে বসিয়া বসিয়া ধরণীর উপর জ্যোতি বর্ষণ করিতেন। বস্ত্রবুনন করা ছিল তাঁহার কাজ। তিনি যখন রমণী, তখন তো আর অবিবাহিতা থাকা ভালো দেখায় না, তাই ভগবান তাঁহার সহিত একটি পুরুষ-তারকার বিবাহ দিলেন। পুরুষ-তারকার গৃহ ছিল পশ্চিম নদীর তীরে। উভয়ে উভয়কে পাইয়া তরুণ দম্পতি এত সুখী হইলেন যে তানাবাতা কিছু কালের জন্য তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বস্ত্রবুনন করিতে ভুলিয়া গেলেন—ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই ছিল না, এরূপ তো ঘটিয়াই থাকে। কিন্তু ভগবান কর্ত্তব্য কর্ম্মে রমণীর অবহেলা দেখিয়া বেজায় চটিয়া গিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বনদীর তীরে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। দয়া করিয়া এই মাত্র বলিলেন যে, বৎসরে তিনি কেবল একবার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। এই শুভদিন হইতেছে ৭ই জুলাই। সেদিন সকলে প্রার্থনা করে যেন দিনটি পরিষ্কার হয়—কারণ অল্প একটু বারিবর্ষণ হইলেও পূর্ব্বনদী কূল ছাপাইয়া উঠিবে, তখন আর নদী পার হওয়া সম্ভব হইবে না—বিরহিণী রাজনন্দিনীর প্রিয়মিলনে বাধা পড়িবে।

ঐ দিন সন্ধ্যায় উদ্যানে একখানি মাদুর বিছাইয়া তাহার উপরে একটি টেবিলে তারকা-দম্পতির জন্য ফল, পিষ্টকাদি রক্ষিত হয়। এ কার্য্যটি বাড়ীর রমণীরাই করিয়া থাকেন, কারণ প্রেমব্যাপারে তাঁহারাই সবিশেষ অভিজ্ঞা। আহার্য্য সাজাইয়া তারকা-দম্পতির জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে রমণীরা নিজ নিজ গোপন প্রেমকাহিনী ও অন্তরের আকাঙ্ক্ষার কথা চিন্তা করে। কেহ বহু সন্তানের জননী হইয়া দীর্ঘজীবন কামনা করে। যাহারা আরো সাংসারিক ধরণের—তাহারা সীবনবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের কামনা করিয়া একটি বাঁশ পুতিয়া তাহার উপর একখণ্ড ফুলতোলা কাপড় ঝুলাইয়া দ্যায়। গ্রাম্য লোকেরা বাঁশের গায়ে কাগজের টুকরায় কবিতা লিখিয়া টাঙাইয়া দ্যায়। এই-সব কবিতায় তারকা-দম্পতির গুণ কীর্ত্তন করা হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তোকিওর ন্যায় বড় বড় শহরে এই রমণীয় উৎসবটি লোপ পাইতেছে। তবে কয়েকটি পল্লীতে এখনো এই উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে।

তানাবাতা উৎসবের সহিত বিশেষভাবে জড়িত আর একটি উৎসব ৬ই জুলাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেদিন সুবিখ্যাত দেশভক্ত মিচিজানের উদ্দেশে স্থাপিত তেন্‌জিন্ মন্দিরের সম্মুখে শিশুগণ সমবেত হইয়া পরদিন তানাবাতা উৎসবে বাঁশের খোঁটায় ঝুলাইবার জন্য কবিতাগুলি লিখিয়া হস্তলিখন অভ্যাস করে। এস্থানে বলা আবশ্যক মিচিজানে খুব খোসখৎ লিখিয়ে ছিলেন।

১৩ই জুলাই "বোন" উৎসব সম্পাদিত হয়। বিশ্বাস, ঐ দিন মৃতের আত্মা তাহার পূর্ব্ব বাসস্থানে বেড়াইতে আসে। তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যই উৎসবের ব্যবস্থা। জাপানের প্রাচীনতম উৎসবের মধ্যে এও একটি। সকল পরিবারেই কেহ-না-কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সেজন্য উৎসবটি প্রায় সর্ব্বত্রই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে শুনা যায় যে, বহুকাল পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের শৈশবাবস্থায় ভারতবর্ষে একটি বালক পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। পরলোকে গিয়া সে দেখিল যে তাহার মাতা আহার্য্যের অভাবে দারুণ কষ্ট পাইতেছেন। সে করুণার দেবতাকে মাতার সাহায্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করাতে তিনি জানাইলেন যে ঐ স্ত্রীলোক বড় পাপীয়সী, পৃথিবীতে তাহার বন্ধুবর্গকে স্ত্রীলোকটির জন্য প্রার্থনা ও স্বস্ত্যয়নাদির দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এবং বৎসরের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে পাঁচ প্রকার ফল নিবেদন করিতে হইবে। এই কার্য্যগুলি সম্পাদিত করাইয়া বালক মাতাকে খুব সুখী করিতে

সমর্থ হইয়াছিল। ক্রমে ঐ দিনটি জাপানে যাবতীয় পরলোকগত আত্মাকে অভ্যর্থনা করিবার দিনরূপে ধার্য্য হইল। ঐ দিন পারিবারিক দেববেদির উপর ধূপ জ্বালাইয়া দিয়া ফল রাখা হয়। মৃতের সমাধির উপরও ধূপের সুগন্ধ ছড়াইয়া পড়ে। যে-সব মৃতব্যক্তির পরিবার লোপ পাইয়াছে, যাহাদের কোনো পারিবারিক আস্তানা নাই, তাহারাও অভ্যর্থনা লাভে বঞ্চিত হয় না। ইহা কতকটা আমাদের তর্পণের মতো। নিভৃত নির্জ্জন অরণ্যের মাঝে বা পাহাড়ের গায়ে তৃণ-গুল্মকণ্টকাকীর্ণ কত বিস্মৃত সমাধি কল্যাণময়ী নারীর

তিন চার দিন উৎসব চলে। কেহ আহ্বান করিলে উৎসবের মধ্যে যে-কোনদিন পুরোহিতেরা সেই পরিবারে গিয়া ধূপধুনা জ্বালাইয়া স্তত্রপাঠ করে। উৎসবের সময় দ্বারে দ্বারে কাগজের লণ্ঠন টাঙাইয়া দেওয়া হয়। কোনো কোনো স্থানে পাহাড়ের উপর দাহ্য পদার্থে একটা বৃহৎ অক্ষর বা চিত্র রচনা করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। দূর হইতে সেই উজ্জ্বল অগ্নিময় অক্ষর বা চিত্র অতি সুন্দর দেখায়; নদী সমুদ্রের জলে তাহার প্রতিচ্ছবি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

অনেক স্থানে এই উৎসবের সময় পল্লীর যুবকযুবতী

জাপানের চন্দ্রোৎসব।

হস্তপ্রজ্বালিত ধূপের সুগন্ধে আমোদিত হইয়া উঠে। কোন কোন স্থানে বোন-উৎসব খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। নাগাসাকি বন্দরে পোতাশ্রয়ের উপরিস্থ পাহাড়ের গাত্রে প্রাচীনকাল হইতে বহু মৃতব্যক্তিকে সমাহিত করা হইয়াছে। বোন-উৎসবের দিন সন্ধ্যাবেলা সেই পাহাড়ের উপর প্রত্যেক সমাধির নিকট একটি করিয়া আলো রাখা হয়। মনে হয় যেন পাহাড়ের গায়ে আলোর ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। পোতাশ্রয়ের জলের মধ্যে অসংখ্য আলোর প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠে, এবং আকাশে নক্ষত্র থাকিলে, জল স্থল আকাশ আলোর মালা পরিয়া অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে।

একত্রে নৃত্য করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। কেবল-মাত্র এই উৎসব উপলক্ষেই যুবকযুবতীকে একত্র নৃত্য করিতে দেখা যায়। উচ্চশ্রেণীর জাপানীরা যুবকযুবতীর একত্র নৃত্যের পক্ষপাতী নন। কিওতোর উত্তরে কোনো কোনো গ্রামে প্রচলিত "বোন্" নৃত্য অতি সুন্দর। পল্লীরমণীরা মাথায় এক একটি লণ্ঠন লইয়া সারি বাঁধিয়া হাচিমান মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে যুবকেরা গান ধরে এবং রমণীরা গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করে। রমণীরা স্বহস্তে গোপনে লণ্ঠনগুলি নির্ম্মাণ করে—উৎসবের রাত্রে তাহাদের বন্ধুবর্গ লণ্ঠনের নকসা দেখিয়া অবাক হইয়া যায়।

১৫ই জুলাই উপহার বিনিময়ের দিন। সুদৃশ্য বাক্সে ভরিয়া পিষ্টক, ডিম্ব বা কোন প্রকার কাপড় আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে উপহার দেওয়া হয়। ভৃত্যেরাও উপহার লাভে বঞ্চিত হয় না।

২৪এ জুলাই জিজো উৎসব। জিজো মৃত শিশুগণের দেবতা। তিনিই শিশুগণকে মৃত্যুর পর ডাকিয়া লন। শহরের কোনো কোনো স্থানে এই দেবতার মূর্ত্তি আছে—সন্তানহারা মাতা সেখানে মৃত শিশুকে স্মরণ করিয়া একটা ছোট খেলনা বা তদ্রূপ কিছু রাখিয়া যান।

হাচিমান উৎসব হইতেছে আগষ্ট মাসের প্রধান উৎসব। জাপানের প্রায় সর্ব্বত্রই যুদ্ধদেবতা হাচিমানের মন্দির বিদ্যমান। হাচিমান শিন্তো দেবতা। শিন্তো মতে মানুষ মৃত্যুর পর দেবতা হয়—যিনি মহাপুরুষ তিনি মহৎদেবতা হন। জাপ-সম্রাট ওজিন কোরিয়া-বিজেত্রী সম্রাজ্ঞী জিঙ্গোর পুত্র ছিলেন। তিনি ২৭০-৩১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কথিত আছে, তাঁহার মৃত্যুর পর ক্যুশু প্রদেশে জনৈক কৃষকতনয় স্বপ্ন দেখে—সম্রাটের আত্মা তাহাকে বলিলেন যে তিনি জাপানের প্রধান অভিভাবকদেবতা হইবেন। বালকের স্বপ্নে সমস্ত জাতির গভীর বিশ্বাস জন্মিল—ফলে সম্রাট কিন্‌মেই মৃত সম্রাট ওজিনের উদ্দেশ্যে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ দিলেন। এই সময় হইতে সম্রাট ওজিনের নাম হইল হাচিমান দেব। ১৫ই আগষ্ট হাচিমান-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। হাচিমানের তিনটি প্রধান মন্দিরে উৎসবের প্রধান অঙ্গ হইতেছে বন্দী পাখীকে মুক্তিদান করা। এই প্রথার উৎপত্তি সম্বন্ধে শুনা যায় যে অষ্টম শতাব্দীতে ক্যুশু প্রদেশে বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিলে সম্রাট-সৈন্যদল যুদ্ধে সফলতার জন্য হাচিমানের নিকট প্রার্থনা করে। হাচিমান এই সর্ত্তে প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন যে অন্তর্যুদ্ধঘটিত পাপক্ষয়ের জন্য প্রতিবৎসর বন্দী পাখীকে মুক্ত করিতে হইবে। আমাদের দেশেও বিজয়ার দিন বন্দী নীলকণ্ঠ পাখীকে মুক্তি দেওয়া প্রচলিত ছিল। কোনো কোনো হাচিমান মন্দিরে উৎসবদিনে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে তীরনিক্ষেপ, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

জুলাই মাসে যেমন তারকার উৎসব, সেপ্টেম্বর মাসে তেমনি একটি চন্দ্রমা-উৎসব হইয়া থাকে। ব্যাপারটি আর কিছুই নয়—পূর্ণিমার রাত্রে নদীতীরে বা জলাশয়ের ধারে কোনো ভোজনালয়ে সমবেত হইয়া পূর্ণচন্দ্র দেখিতে দেখিতে আহার ও কবিতা রচনা দ্বারা সময় ক্ষেপন করা। প্রাচীনকালে নিম্নলিখিতভাবে উৎসব সম্পন্ন হইত। উদ্যানে একখানি মাদুর বিছাইয়া তাহার উপর একটি টেবিলে ভাতের পিষ্টক, আলু- ও মটরসিদ্ধ রাখা হইত। নিকটে একটি পাত্রে সুস্মুকি নামক একপ্রকার শারদীয় শাক রক্ষিত হইত। নিরূপিত সময়ে পরিবারবর্গ ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবেরা আসিয়া জ্যোৎস্না-লোকে বসিয়া নৈবেদ্য আহারে মনঃসংযোগ করিত।

১৭ই সেপ্টেম্বর একটি উৎসবের দিন। উৎসবের নাম আয়াহা-উৎসব। বহুকালপূর্ব্বে সম্রাট ওজিনের রাজত্বসময়ে জাপ-রমণীগণকে বস্ত্রবুনন শিখাইবার জন্য জাপান চীনা শিক্ষয়িত্রী চাহিয়া পাঠায়। আয়াহা ও কুরেহা এই দুইজন শিক্ষয়িত্রীকে চীন প্রেরণ করে। ইহাদের নিকট জাপানের বস্ত্রবুনন শিক্ষার হাতেখড়ি হইয়াছিল। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ, সেপ্টেম্বর মাসে ইঁহাদের মৃত্যু হইলে, জাপান গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশে মন্দির স্থাপনা করেন। এখনো নির্দ্দিষ্ট দিনে জনসমূহ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া গুরুর স্মৃতিসম্মানার্থ পট্ট ও কার্পাশ বস্ত্র অর্পণ করে। প্রাচীনকালে ঐরূপ বস্ত্রেই সাধারণ জাপানীর পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইত।

জাপানে অক্টোবর মাসকে কান্না-জুকি বলে। ইহার অর্থ—যে মাসে দেবতারা অনুপস্থিত থাকেন। এই মাসে জাপ-দেবতাগণের একটি কনফারেন্স্ বা সভা বসে। তাই সকল দেবতা নিজ নিজ মন্দির ছাড়িয়া ইজুমো মন্দিরে সমবেত হন। একমাত্র ইজুমোর ওয়াশিরো মন্দির হইতেই কেবল দেবতারা কখনো অনুপস্থিত থাকেন না। পয়লা অক্টোবরকে কামি-ওকুরি বা দেবতাদিগকে বিদায় দিবার দিন বলা হয়। ঐ দিন দেবতারা কনফারেন্সে যোগ দিবার জন্য যাত্রা করেন। মাসের ১১ই তারিখের মধ্যে সকল দেবতা সমবেত হইয়া সপ্তর দিন ধরিয়া আলোচনা করেন। সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন ইজুমো মন্দিরে একটি

বিরাট উৎসব চলিতে থাকে। আলোচ্য বিষয়টি হইতেছে প্রেমের বন্ধন—সেই বৎসর কোন্ তরুণতরুণীকে প্রেমের ফাঁদে ধরিতে হইবে, কাহার সহিত কাহার হৃদয় বিনিময় করাইতে হইবে, ইত্যাকার বিষয় আলোচিত হয়। অপ্রত্যাশিত ভাবে কেহ যদি কাহারো সহিত প্রেমে পড়িয়া পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়, লোকে বলে ইহা নিশ্চিতই ইজুমো মন্দিরে সমবেত দেবতাগণের কাজ! অসম্ভব রকম মিলন, যেমন বয়সের অত্যধিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও মিলন, বা একজন সুপুরুষের সহিত কদাকার নারীর বিবাহ বা রূপসীর সহিত কুশ্রী পুরুষের বিবাহ—এ সমস্তই দেবতাগণের কারচুপি! সেই হেতু প্রেমপাগল নরনারী অভীষ্ট মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ইজুমো মন্দিরে গিয়া দেবগণের শরণাপন্ন হয়।

১২ই অক্টোবরের উৎসব জাপানী কবি বাশোর স্মরণার্থ হইয়া থাকে। তিনি হাইকু-কবিতা রচনায় অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। ঐ দিন, হাইকু-কবিতা-রচয়িতারা কোনো স্থানে সমবেত হইয়া সভার মধ্যে বাশোর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, তাহার সম্মুখে ধূপধুনা জ্বালাইয়া দেন এবং মৃত কবির স্মরণে সতেরো-মাত্রিক-ছন্দের হাইকু-কবিতা রচনা করিয়া উৎসব সুসম্পন্ন করেন। প্রথম জীবনে বাশো সামুরাই বা ক্ষত্রিয় ছিলেন। শেষজীবনে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, তাঁহার ক্ষুদ্র কবিতায় তিনি যে আদর্শ প্রকাশ করিতে চাহিতেন সেই আদর্শেরই ধ্যানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ১৬৯৪ সালে ১২ই অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়।

জাপানের কর্ম্মকারদের উৎসব।

১৩ই অক্টোবর সংস্কারক নিচিরেণের মৃত্যুদিনে তোকিওর নিকটবর্ত্তী ইকেগামি নামক স্থানে একটি উৎসব হয়। নিচিরেণ বৌদ্ধধর্ম্মান্তর্গত নিচিরেণ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ঐ দিন তাঁহার শিষ্যেরা দলে দলে লণ্ঠন ও পতাকা হস্তে সমবেত হইয়া সমস্বরে সূত্র আবৃত্তি করিতে করিতে মৃত মহাত্মাকে স্মরণ করেন।

জাপানের সপ্তভাগ্যদেবতার মধ্যে এবিসু একজন। ব্যবসায় ও ব্যবসায়ীকে রক্ষা করাই তাঁহার কাজ। তাঁহার সম্মানার্থ ব্যবসায়ীগণ ২০শে অক্টোবর উৎসবের আয়োজন করে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ

করিয়া ভোজ দেওয়া হয়। ভোজের ঘরে দেওয়ালে এবিস্থ-দেবের চিত্র বিলম্বিত থাকে। দেবতা যখন পৃথিবীতে ছিলেন তখন মৎস্য ধরিতে ভালো বাসিতেন, তাই চিত্রে তাঁহার পরিধানে জেলের পোশাক, হাতে এক-গাছা ছিপ, একটি মৎস্যকে বঁড়শিতে গাঁথিয়া টানিয়া তুলিতেছেন। চিত্রের সম্মুখে একটি বৃহৎ 'তাই'-মৎস্য নৈবেদ্য-স্বরূপে রাখা হয়, এবং ঐ মৎস্যই রন্ধন করিয়া ভোজের সময় খাওয়া হয়।

নভেম্বর মাসের প্রথম অংশে ফুইগো বা হাপর-উৎসব। কামার ও স্বর্ণকারের দোকান বা অন্যত্র যেখানে যেখানে হাপর জীবিকা অর্জ্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেই-সকল স্থানেই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শুনা যায় হাপর সৃষ্টি করিয়াছিলেন অগ্নিদেবতা কামো। রাত থাকিতে থাকিতে উৎসব আরম্ভ হয়। যে গৃহে উৎসব সেখানকার বাতায়ন-গুলি উন্মুক্ত করিয়া দিয়া কতকগুলি কমলালেবু বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উৎসবের সূচনা করা হয়। লেবু-প্রত্যাশী শিশুর দল বাহিরে অপেক্ষা করিয়া থাকে, লেবু পড়িতে আরম্ভ করিলেই তাহাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়।

জাপানে ৩, ৫, ৭, এই সংখ্যাগুলি শুভসূচক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। শিশুপুত্রের তিন বৎসর বয়স হইলে সর্ব্বপ্রথম সে হাকামা নামক ঘাঘরা পরিধান করে। নভেম্বর মাসের ১৫ই তারিখে এই অনুষ্ঠানটি ঘটিয়া থাকে। নূতন পোশাকে সজ্জিত শিশুকে নিকটবর্ত্তী মন্দিরে লইয়া গিয়া দেবতার নিকট নৈবেদ্য অর্পিত হয় এবং শিশুর শুভ কামনা করিয়া প্রার্থনা করা হয়।

জাপানীর প্রধান খাদ্য ভাত। সেইহেতু ধান্য জাপানীর চোখে পবিত্র। ২৩শে নভেম্বর নীনামেসাই উৎসব—ফসলের জন্য ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার দিন। ঐ দিবস পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার উদ্দেশে নির্ম্মিত মন্দিরের সম্মুখে সম্রাট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নূতন ধান্য নিবেদন করিয়া দেবসান্নিধ্যে সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতা জানাইয়া জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। তাহার পর সম্রাট নবান্ন ভক্ষণ করেন পরদিন তিনি একটি প্রকাণ্ড ভোজ দেন, তাহাতে দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন।

কামাদো-হারাই বা উনান-উৎসব ডিসেম্বর মাসে শেষ ভাগে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তখন উনানের দেবতা উনানের ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়া উর্দ্ধতম স্বর্গে উধাও হইয়া গিয়া ভগবানের নিকট সেই পরিবারের সম্বৎসরের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে রিপোর্ট করেন। সেই জন্য সেই সময়ে পরিবারে পুরোহিতের ডাক পড়ে—তিনি আসিয়া পূজা প্রার্থনাদির দ্বারা উনান-দেবতার মনস্তুষ্টি করেন, কারণ তাহা হইলে তিনি যজমান সম্বন্ধে ভালোরকম রিপোর্ট করিবেন বলিয়া আশা করা যায়! আজকাল তোকিও ও অন্যান্য শহরে উনানের স্থানে গ্যাসষ্টোভের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উনান-দেবতা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছেন।

ডিসেম্বরের শেষভাগে পুনরায় নববর্ষ উৎসবের আয়োজনে সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। চতুর্দ্দিকে দোকান পশারে নববর্ষ উৎসবে ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ গৃহসজ্জা মাঙ্গলিক প্রভৃতি বিক্রয় হয়। পারকপক্ষে নববৎসরে কেহই পুরাতন বৎসরের ঝাঁটা, মাংস-থোড়া-পিঁড়ি তারের রুটিসেঁকা জালতি প্রভৃতি ছোটখাটো জিনিস ব্যবহার করেন না। এসকল জিনিসও প্রচুর বিক্রয় হয়।

পুরাতন বর্ষকে শেষ বিদায় দিবার জন্য একটি ভোজের আয়োজন হয়। বাড়ী বা কারখানার কর্ত্তা তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আশ্রিতজনকে নিমন্ত্রণ করেন। ভোজের সভায় পরস্পরে পরস্পরের দোষ ক্রটির কথা ভুলিয়া আপনাদের মধ্যে সখ্যসংস্থাপনের জন্য প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়। এবং সারাবৎসরের সকল বিফলতার কথা বিস্মৃত হইয়া আশান্বিত মনে নববর্ষের অপেক্ষায় থাকেন।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হৃতসর্ব্বস্ব

চাঁদের সকল সুধা পান করে' কা'রা
ফেলিয়া দিয়াছে তারে আকাশ-সীমায়?
গড়ায়ে গড়ায়ে চলে হয়ে দিশাহারা
লবণ-সাগরে বুঝি অই ডুবে যায়!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ

আমাদের এবারকার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্বন্ধে প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় কিছু লিখিবার জন্য সম্পাদক মহাশয় আমাকে আহ্বান করিয়াছেন। আমি এই সু-যোগ লাভ করিয়া অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব।

সংসারে লোকের অনেক দিক্ থাকে, সংসারীকে অনেক দিকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, অনেক কার্য্য করিতে হয়, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের যদি কোন দিক থাকে, যদি তিনি সমগ্রজীবনে কিছু আরাধনা করেন, তবে তাহা একমাত্র জ্ঞান। সংসারে আমার যে-সকল ব্যক্তির সহিত পরিচয় হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে আর একজনকেও দ্বিজেন্দ্রনাথের ন্যায় জ্ঞানের অনন্যনিষ্ঠ সেবক দর্শন করি নাই। এই অতি-বৃদ্ধ বয়সেও, কি দিন, কি রাত্রি, নিরবচ্ছিন্নভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ গভীর জ্ঞানচিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। উৎসাহসম্পন্ন যুবকের ক্লান্তি আছে, কিন্তু শাস্ত্রচিন্তায় জ্ঞানচিন্তায় দ্বিজেন্দ্রনাথের কখন ক্লান্তি দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধিবাসিগণ গভীর নিশীথ সময়ে সুষুপ্ত, শালসমীরণ তাঁহাদের ললাটস্পর্শ করিয়া দিবসের ক্লান্তিখেদকে অপনয়ন করিতেছে, আশ্রমলক্ষ্মী শান্ত-স্নিগ্ধ-গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু সেখানকার আমলককুঞ্জের অধিদেবতা দ্বিজেন্দ্রনাথ তখনও জাগিয়া রহিয়াছেন, ভৃত্য মুনীশ্বর দুইধারে দুইটি মোমবাতী জ্বালিয়া দিয়াছে, আর তাঁহার লেখনী অবিশ্রাম চলিতেছে। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বগগন লোহিতরাগে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! দ্বিজেন্দ্রনাথের এ নিশা-কাহিনী পিতামহীর কাহিনী নহে।

দর্শনশাস্ত্র তাঁহার অতি প্রিয়, অধিকাংশ সময় ইহাঁর ইহাতেই অতিবাহিত হইয়া থাকে। গভীর তত্ত্বসমূহ চিন্তা করিতে করিতে যখন কিঞ্চিৎ বিশ্রামের প্রয়োজন মনে করেন, তখন তিনি ইহার অতিবিচিত্র উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। সকলেই হয়ত মনে করিবেন তিনি এজন্য মানসিক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন কার্য্য করেন। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। তিনি তখন গণিতের গভীর তত্ত্বসমূহ অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি—"এই সব করিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছি!"

যখন তিনি নিতান্তই বিশ্রাম করিতে চাহেন, তখন তিনি বিনা সূতা বা আঠায় বিচিত্র কৌশলে কেবল ভাঁজিয়া ভাঁজিয়া কাগজের বিবিধ প্রকারের খাতা, খাপ, ব্যাগ, পাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র-পৌত্র, ধন-জন-বৈভব সমস্তই রহিয়াছে। কিন্তু তিনি ইহাতে আবদ্ধ নহেন, এ সমুদায় তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি যে গভীর জ্ঞানসমুদ্রের অমৃত রসাস্বাদে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, তাহার নিকটে আর কিছুই উপাদেয় বলিয়া বোধ হয় না। সময়ে সময়ে সংসারে অনেক শোক-ক্ষোভও উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি যেমন চলিতেন তেমনই চলেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, তিনি সংসারে থাকিলেও সংসারের অতীত। পুত্র পৌত্র স্বজন-বান্ধবের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য চিন্তা করিতে, চেষ্টা করিতে, বা কোনো দিন একটিমাত্রও কথা কহিতে তাঁহাকে কখন দেখি নাই, কিন্তু সেই আমলককুঞ্জের জীবগুলির প্রতি তাঁহার কি স্নেহ-করুণা! তাহাদের জন্য তাঁহার কি যত্ন! পরিবারবর্গের কেহ-কেহ নিকটে থাকিলেও বস্তুত তাঁহাদের কাহাকেও তাঁহার নিত্যসহচর বলা যায় না। যদি কেহ নিত্যসহচর থাকে, তবে সেখানকার কাঠবিড়াল ও পাখী। তিনি নিরুপদ্রবে একাকী বসিয়া জ্ঞানসমুদ্রের রত্নগুলি আহরণ করিতেছেন, আর সম্মুখের আমলক-তরু হইতে পাখী নিজের মনে তাঁহার গায়ে মাথায় আসিয়া বসিতেছে, খেলা করিতেছে, আর খাবার খাইতেছে; কাঠবিড়ালগুলিও লাফাইয়া লাফাইয়া এইরূপ খেলা করিতেছে! দ্বিজেন্দ্রনাথ ভৃত্যকে দিয়া ইহাদের উপযুক্ত আহার প্রচুররূপে সংগ্রহ করাইয়া নীরব চিন্তায় বসিয়া আছেন। কাহারো কোন উদ্বেগ নাই, আশঙ্কা নাই। সকলেই যেন বলিতেছে "সর্ব্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু"—সমস্ত দিক্ আমার মিত্র হউক! "মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষা-

মহে”—মিত্রের চক্ষুতে আমরা দর্শন করি! একদিন একটি পাখী তাহার কাঁধে বসিয়া খেলিতে খেলিতে সহসা ঠোঁট দিয়া চোখের মধ্যে আঘাত করে, চোখটি ইহাতে অত্যন্ত লাল হইয়া উঠে। সংবাদ পাইয়া আমরা একটু চিন্তিত হইয়াছি, এমন সময় দেখি তিনি স্বয়ং আমাদের নিকটে উপস্থিত। দেখিয়াই বুঝিলাম চোখে বেশ আঘাত লাগিয়াছে। কিন্তু তিনি বলিলেন—‘না, ও বিশেষ কিছু নহে, এখনই সারিয়া যাইবে। ও তো আর ইচ্ছা করিয়া আমায় কষ্ট দেয় নাই!’ দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্ঞানচর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করিয়া নীরস হইয়া যান নাই, তাঁহার “ভূতদয়া” এইরূপই পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের চিন্তাশক্তি দর্শন করিয়া আমি অনেক-বার বিস্মিত হইয়াছি। দার্শনিক কাহাকে বলে, ইঁহাকে দেখিলে তাহার প্রতীতি হয়। আমি দেখিয়াছি শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও তিনি কেবল নিজের চিন্তা-প্রভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া দৃঢ়তরভাবে বলিয়া-ছেন যে, ইহা এইরূপ হতেই হইবে। আনন্দের বিষয় বস্তুতও তাহা সেইরূপই শাস্ত্রে দেখা গিয়াছে। একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। একদিন দিকসমূহের নামসম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, ‘প্রাতে সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে উদিত হয়, তাহার সেই উজ্জ্বল জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া মানব সেই মুখে দাঁড়ায় অতএব সূর্য্য সেই সময়ে তাহার সম্মুখ দিকে থাকে। ইহা হইতেই সম্মুখবাচী প্র-শব্দ দিয়া ঐ দিকের নাম হইল প্রা ক্‌, বা প্রাচী, অর্থাৎ পূর্ব্ব। পশ্চিম দিক্‌ ঠিক ইহার বিপরীত, সম্মুখের বিপরীত পশ্চাৎ, এই জন্য প্রতিকূলবাচী প্রতি-শব্দ দিয়া তাহার নাম হইল প্র ত্য ক্‌, বা প্রতীচী, অর্থাৎ পশ্চিম। ভারতের আর্য্যগণ দেখিলেন উত্তর দিকটা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, কেননা সেদিকে হিমালয় পর্ব্বত রহি-য়াছে, এই উচ্চ-বাচী উৎ-শব্দ দিয়া তাহার নাম হইল উ দ ক্‌, বা উদীচী, অর্থাৎ উত্তর। দক্ষিণ দিকে সমুদ্র থাকায় তাহা নিম্ন, উচ্চের বিপরীত নিম্ন, নিম্নবাচী শব্দ হইতেছে অব, এই অব দিয়া একটি শব্দ থাকা দরকার। অব দিয়া অ বা ক্‌, বা অবাচী শব্দ যে দক্ষিণ দিক্‌ অর্থে প্রসিদ্ধ আছে, তাহা তাঁহার মনে সে সময় উদিত হয় নাই, তাই তিনি ভাবিতেছিলেন। আমি তাহা বলামাত্র তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ যে, রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন করে[ন] তাহা নহে। তিনি অধ্যয়ন করেন অল্প, কিন্তু চি[ন্তা] করেন খুব বেশী। অধ্যয়নে তাঁহার দৃষ্টি থাকে অ[র্থে] শব্দে নহে। কতকগুলি শব্দ আয়ত্ত করিয়া তিনি সন্ত[ুষ্ট] থাকিবার নহেন। তিনি যাহা ধরিবেন, ভাঙ্গিয়া-চুরি[য়া] তাহার অন্তস্তলে মর্ম্মস্থলে প্রবেশ না করিয়া বিশ্রা[ন্ত] হইবেন না। কিছু গোঁজামিল দিয়া তৃপ্ত থাকিবা[র] লোক তিনি নহেন। আসল খাঁটি জিনিসটি তিনি টানি[য়া] বাহির করিবেনই।

তাঁহার শাস্ত্রচিন্তায় জ্ঞানচর্চ্চায় সফলতা লাভের এক[টি] প্রধান কারণ তাঁহার সত্যনিষ্ঠা। তাঁহার হৃদয় কো[ন] সাম্প্রদায়িক সংস্কারে কলুষিত নহে। পক্ষপাতিতা তাঁহাকে সত্যের পথে অন্ধ করিয়া দেয় নাই। তিনি নিজের[ও] কু দেখিতে পান, আবার অন্যেরও সু দেখেন। আমি দেখিয়াছি, তিনি কোন সম্প্রদায়ের কোন অনুষ্ঠানে[র] বহির্ভাগমাত্র না দেখিয়া অন্তর্ভাগে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা[র] তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করেন। হউক না কেন ভিন্ন সম্প্রদায় তিনি কাহারও প্রতি কোন অনুচিত আরোপ সহ্য করে[ন] না। একটি ঘটনার উল্লেখ করি। এক দিন এক ব্যক্তি প্রসঙ্গক্রমে প্রকাশ করেন যে, হিন্দুগণের শ্রীকৃষ্ণের যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অতি কুৎসিত; এবং ইহা অসভ্য বর্ব্বর বন্য জাতিগণের কল্পনা হইতে লওয়া হইয়াছে। কথাটি ঘুরিতে ঘুরিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের কর্ণে গিয়া পৌঁছে। দিবা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর, প্রখর রৌদ্র, বৃদ্ধ জ্ঞানতপস্বী ধীরপদক্ষেপে উপস্থিত হইয়া মৃদুতীব্র ভাষায় তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়া উপসংহার করিলেন—‘শ্রীকৃষ্ণের কুৎসিত রূপের কথা কোথায় আছে? সর্ব্বত্রই ত তাঁহাকে “শ্যামসুন্দর”, “মদনমোহন” বলা হইয়াছে!’

দ্বিজেন্দ্রনাথ দর্শনরসিক। তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয় দর্শনেরই যথার্থ রসের আস্বাদন করিয়াছেন। দর্শনের প্রসঙ্গ উঠিলে তাঁহার হৃদয়ের আবরণ যেন উন্মুক্ত হইয়া যায়, হৃদয়ের ভাবরাশি এরূপ উথলিয়া উঠে যে, শ্রোতা বিচক্ষণ না হইলে তাঁহার পক্ষে তৎসমুদয়কে অনুসরণ

করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। ভারতীয় দর্শনসমূহের মধ্যে বেদান্ত, সাঙ্খ্য ও যোগেই তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দেখিয়াছি। সাঙ্খ্যের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের ব্যাখ্যায় তিনি অপরিসীম চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, এবং আমার বিশ্বাস বর্ত্তমান বহু মহামহোপাধ্যায় তাহা পড়িয়া মুগ্ধ হইবেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের তুলনা-প্রসঙ্গে সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে প্রাচ্যের বিজয়গীতিকা শ্রবণ করিয়া আসিয়াছি।

তাঁহার সরলতা পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায়। যে ইহা দেখিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে। তিনি নিজে যেমন পণ্ডিত, মনে করেন সকলেই তাঁহারই মত। তাঁহার আচার ব্যবহার সমস্তই প্রয়োজন-অনুসারে, প্রচলিত প্রথা বলিয়া তাঁহার নিকটে কিছু নাই। চশমার যে-যে স্থান শরীরের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকে, কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভব হয় বলিয়া তিনি চশমার সেই-সমস্ত স্থানে তুলা জড়াইয়া লইবেন। বেড়াইবার সময় চাপকান ঝুলিয়া থাকায় অসুবিধা হয়, তিনি বাম-দক্ষিণ স্কন্ধে মোটা ফিতা দিয়া তাহা বাঁধিয়া চলিবেন। চটি জুতায় বুড়ো আঙ্গুলে লাগে, তিনি তজ্জন্য জুতার সেই স্থানটুকু গোল করিয়া কাটিয়া লইবেন। যতটুকু প্রয়োজন তিনি ততটুকুই করিবেন, তা যে-কোন বিষয়েই হউক ; আহার-বিহার বসনপরিচ্ছদ ইত্যাদি সর্ব্বত্রই তাঁহার এই নিয়ম অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনি কিছুই করেন না।

কোন লেখায় শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধেও তাঁহাকে এই নিয়মে পরিচলিত হইতে দেখা যায়। তিনি নিজেও বলিয়া থাকেন, তিনি তৌল করিয়া ওজন করিয়া শব্দ-প্রয়োগ করেন। বলা বাহুল্য, ইহাই হইতেছে উৎকৃষ্ট লেখকের লক্ষণ। হৃদয়ের ভাব যথাযথরূপে সুব্যক্ত করিতে পারে, এরূপ শব্দপ্রয়োগে তাঁহার ন্যায় নিপুণ লেখক আর আমি কাহাকেও জানি না। এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দে ভাবসম্পদ্ কিরূপ সুচারু প্রকাশিত হয়, যাঁহারা তাঁহার লেখা পড়িয়াছেন, তাঁহারা তাহা জানেন। ভাবকে সুব্যক্ত করিবার জন্য তিনি জানিয়া শুনিয়াও কোন-কোন স্থানে ব্যাকরণকে উল্লঙ্ঘন করেন, ইহা আমি দেখিয়াছি, তাঁহারও নিকটে শুনিয়াছি। ভাষাকে সুপরিস্ফুট করিবার জন্য এইরূপই তাঁহার অনুরাগ। নূতন নূতন ভাবের প্রকাশের জন্য নব-নব শব্দ উদ্ভাবনেও তাঁহার বিচিত্র শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। একটি উদাহরণ দিব। আমার প্রতি তাঁহার "অহৈতুক" অপার স্নেহ। তিনি আমাকে একখানি রে খা ক্ষ র উপহার দিয়া তাহার উপরে আমার বিশেষণ দিয়াছিলেন "নিখিল-শাস্ত্র-সাগরের অগস্ত্যমুনি।" আমি হাসিলাম, এবং যখন আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে ঐ কথার উল্লেখ করিলাম, তখন তিনিও তাঁহার স্বাভাবিক উচ্চ হাস্য করিয়া সন্নিহিত আমলকতরুশ্রেণীকে কম্পিত করিয়া তুলিলেন। এই শব্দপ্রয়োগটি একটি কৌতুকের কারণ বটে, কিন্তু ইহা যে সম্পূর্ণ নূতন এবং বিবক্ষিত ভাবকে অতি পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত করিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অগস্ত্য যেমন মহাসমুদ্রকে 'চুলুকিত' করিয়াছিলেন, এক চুলুকে পান করিয়াছিলেন, তাঁহার উপহারভাজনও সেইরূপ সমস্ত শাস্ত্রকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ একবার কিছু লিখিয়াই তাহা প্রকাশ-যোগ্য মনে করেন না। দেখিয়াছি, তিনি পুনঃ পুনঃ পড়িয়া পরিবর্ত্তন করিতে থাকেন। সহজে তাঁহার তৃপ্তি হয় না! সামান্যও কোন খুঁত মনে হইলে তিনি তাহা ছাড়িবেন না। যতক্ষণ মনঃপূত না হয়, ততক্ষণ তিনি অবিশ্রাম পরিবর্ত্তন করেন। ইহাতে তাঁহার ক্লান্তি নাই। তাঁহার বিনা-সূত্রের কাগজের খাতার পাতা কতবার বদলাইয়া যায়। এইরূপে রেখাক্ষরের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার কত ভাল-ভাল কবিতা বাদ পড়িয়াছে, এবং তাহাদের স্থানে কত নূতন নূতন রচিত হইয়াছে। তিনি কত আগ্রহের সহিত আমাদিগকে এই-সমুদয় শুনাইয়াছেন।

মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বলিবার বহু কথা রহিয়াছে, কিন্তু তৎসমুদয়ের স্থান ও সময় উভয়েরই অভাব বলিয়া আমি আমার সংক্ষিপ্ত উক্তির এইখানেই শেষ করিলাম। শ্রীশ্রীভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি ইঁহার সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের জয়জয়কার হউক!

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

আলোচনা

বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়।

শ্রীকালীপদ মৈত্র মহাশয় ফাল্গুনের প্রবাসীতে কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন। আনন্দের বিষয়, কেহ কেহ বাঙ্গালা শব্দ সংগ্রহে ও শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। যিনি বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে চাহেন, তিনি শব্দের ব্যুৎপত্তি জানিতে স্বভাবতঃ ব্যগ্র হন। মুদ্রিত তথা-কথিত বাঙ্গালা অভিধানে দেশ-প্রচলিত বাঙ্গালা শব্দ অল্প আছে, এবং যাহা আছে তাহার ব্যুৎপত্তি হয় "দেশজ" না-হয় "যাবনিক" এই পর্য্যন্ত আছে। সংস্কৃত-পণ্ডিত সংস্কৃত শব্দের পক্ষপাতী, এমন পক্ষপাতী যে বাঙ্গালা ভাষার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করিয়া বাঙ্গালাকে সংস্কৃত ভাষার রূপান্তরমাত্র জ্ঞান করেন। এক বাঙ্গালা ব্যাকরণে কৃ ধৃ ধাতুর পরিবর্তে কর্ ও ধর্ ধাতু ছিল। এক সংস্কৃত-পণ্ডিত সেই ব্যাকরণ-সমালোচনার সময় কর্ ধর্ ধাতু দেখিয়া কৃ ধৃ ধাতু না পাইয়া বিরক্ত হইয়া ব্যাকরণখানা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ মনে করেন, মাতৃভাষা আমাদিগকে শিখিতে হয় না, ক্ষুধাতৃষ্ণার ন্যায় স্বভাবতঃ সে ভাষার জ্ঞান জন্মে। মাতৃভাষা শিক্ষা সহজ, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়; কিন্তু চেষ্টা করিতে হয়, স্বভাবতঃ শিক্ষা হয় না। ছুতারের ছেলে বাড়ীতে বাটালী করাত প্রভৃতি শস্ত্র দেখে, চালাইতে দেখে, একটু আধটু চালাইতে পারে। কিন্তু তাহাকে বাটালা ধরা শিখিতে হয়, করাত দিয়া কাঠ চিরিতে শিখিতে হয়। কিন্তু কোন্ কাঠের পক্ষে কোন্ করাত উপযুক্ত; কোমল ও কঠিন কাঠের পক্ষে, পুরু ও পাতলা পাটার পক্ষে, লম্বা ও আড়ে চিরিবার পক্ষে, এক করাত কেন ঠিক নহে, তাহা বুঝিতে শিখিতে সময় লাগে। ভাষার শব্দ সূত্রধারের শস্ত্রতুল্য। প্রয়োগ শিখিতে হয়, এবং ব্যুৎপত্তি জানিলে প্রয়োগ-শিক্ষা সহজ হয়।

বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রের বিষয় পুরাতন, তাহাও অল্প। কিন্তু চারু শুদ্ধ ভাষায় কদাচিৎ পত্র পাই। একখানি ছাপা পত্র দেখাইতেছি। নাম দিলাম না, ধাম পরিবর্তন করিলাম।

কলিকাতা
২৯—১—১৪।

মহাশয়!

আমার পুত্রী—র বিবাহ আগামী ২৯শে মাঘ রামনগর গ্রাম-নিবাসী—র চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্—র সহিত হইবে। উক্ত তারিখে আপনি আমার কলিকাতাস্থ পটলডাঙ্গা ভবনে শুভাগমন পূর্ব্বক নৃত্যগীতাদি শ্রবণ ও পান ভোজন করিয়া বাধিত করিবেন। পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি

নিমন্ত্রণকর্তা ইংরেজীতে উচ্চশিক্ষিত। সংস্কৃতও শিখিয়াছিলেন। প্রমাণ, পুত্রী, কলিকাতাস্থ, ভবন শব্দ, এবং বানান-শুদ্ধি। কিন্তু "মহাশয়!" হইতে আরম্ভ করিয়া "ত্রুটিমার্জ্জনা" পর্য্যন্ত অনেক ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালা "জলপান করা" জানিলে "পান ভোজন" করাইয়া বাঙ্গালা ভাষা বাধিত করিতেন না। কিন্তু বাধিত শব্দ এত চলিয়া গিয়াছে যে বোধ হয় কৃ ধৃ ধাতুর পক্ষপাতী পণ্ডিত মহাশয়ও ভুলিয়া লিখিয়া ফেলিতেন।

বাঙ্গালা শব্দকোষ লিখিবার সময় এইরূপ অনেক শব্দ পাইতেছি। আকারে সংস্কৃত কিন্তু অর্থে বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশে ভাবিতে হইতেছে, কখনও বিদ্যায় কুলাইতেছে না; কখনও ব্যুৎপত্তি কাল্পনিক হইয়া পড়িতেছে। অন্য ভাষার শব্দের ব্যুৎপত্তিনির্ণয়ে এমন অবস্থা হইবার অধিক সম্ভাবনা। শ্রীকালীপদ মৈত্র মহাশয় ঠিক লিখিয়াছেন, "ব্যাপার গুরুতর, একজনের দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়া কঠিন এবং সকলেরই যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত।" এই উক্তির জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ করিতেছি। প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পত্রে শব্দ আলোচনার নিমিত্ত স্থান দিয়া বাঙ্গালাভাষার উন্নতির সাহায্য করিতেছেন।

এখন প্রদত্ত ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলি। মৈত্রমহাশয় মনে করেন, আল্‌গোছ আঙ্গিনা কুদা খেয়া চাঁচনি চোট চাওয়া ছাঁটি ঝুঁকা ঝাঁপা প্রভৃতি শব্দ হিন্দী হইতে পাইয়াছি। প্রমাণ কি? এই এই শব্দ কিংবা কিঞ্চিৎ রূপান্তর হিন্দী ভাষায় আছে বলিয়া প্রমাণ হইতে পারে না। কে জানে, বাঙ্গালা হইতে হিন্দীতে যায় নাই কিংবা হিন্দী ও বাঙ্গালার মূল সংস্কৃত হইতে হিন্দী ও বাঙ্গালা পায় নাই? আঙ্গিনা শব্দ দেখি। বাঙ্গালা আঙ্গিনা, ওড়িয়া অগণা, হিন্দী অঙ্গনা, মরাঠী আঙ্গণ শব্দ আছে। যে চারি ভাষা সংস্কৃত হইতে জন্মিয়াছে, সে চারি ভাষাতে একই অর্থে অল্প অল্প রূপান্তরে আছে। অতএব মূল সং অঙ্গন (কিংবা অঙ্গণ) বলিতেছি। হিন্দী হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, কি বাঙ্গালা হইতে হিন্দীতে গিয়াছে, এ বিতর্কের অবকাশ নাই। বাঙ্গালায় আজিকালি আঙ্গিনা পরিবর্তে উঠান শব্দ অধিক চলিয়াছে। (উঠান শব্দও সং উত্থা[ন] হইতে স্বাভাবিক ক্রমে আসিয়াছে। (উত্থান—প্রাঙ্গণ—মেদিনী।) আমার বিবেচনায় এইরূপ বহু বহু শব্দ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা পাইয়াছে, ওড়িয়া হিন্দী মরাঠীও পাইয়াছে। অর্থাৎ দুই ভাষায় এক শব্দ একই আকারে কিংবা কিঞ্চিৎ রূপান্তরে পাইলে এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় আসিতে পারে কিংবা এক তৃতীয় ভাষা হইতে দুই ভাষায় আসিতে পারে। ইহা তর্কবিদ্যার কার্য্যকারণ নির্ণয়ের সূত্রপ্রয়োগমাত্র।

এই কথাটা একটু বাহুল্য করিলাম। কারণ, দেখিয়াছি, যিনি হিন্দী জানেন তিনি হিন্দী মূল, যিনি ফারসী জানেন তিনি ফারসী মূল, যিনি আরবী জানেন তিনি আরবী মূল, যিনি ত্রৈলঙ্গী জানেন তিনি ত্রৈলঙ্গী মূল ইত্যাদি অনুমান করেন। বোধ হয় যেন বাঙ্গালা একটা নূতন ভাষা, দশ ফুলে সাজি ভরার মতন বাঙ্গালা ভাষা শব্দে ভরিয়াছে। কার্য্যের কারণ নির্ণয় চিরকাল দুরূহ; তার উপর তর্কবিদ্যা অবহেলা করিলে কারণ নির্ণয় অসাধ্য হইয়া উঠে। যখন সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় নয় শত নিরানব্বই শব্দ আসিয়াছে, তখন সহস্রের অবশিষ্ট শব্দও সংস্কৃত হইতে আসিয়া থাকিতে পারে। অতএব প্রথমে সংস্কৃত মূল অনুমান করিব, তাহা অসিদ্ধ হইলে সম্ভাব্য অন্য ভাষায় অন্বেষণ করিব।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। মৈত্রমহাশয় লিখিয়াছেন, "কঞ্চি—অবিকল ফারসী—"কম্‌চি" শব্দ।" তাঁহার অনুমানে কম্‌চি হইতে কঞ্চি পাইয়াছি। আমার এক মৌলভি বন্ধু বলিলেন যাবতীয় ... প্রত্যয়ান্ত শব্দ তুর্কী। ফ্যালোন সাহেব কৃত হিন্দুস্থানী কোষে দেখিতেছি, কম্‌চী তুর্কী শব্দ, অর্থ সরু ডাল। মৌলভি সাহেব বলেন যদ্দ্বারা অশ্ব তাড়না করিতে পারা যায় তাহা কম্‌চী শব্দের মূলার্থ (অর্থাৎ সং প্রাবান বাং পাচনী)। গাছের সরু ডালের নাম কম্‌চী। পারস্য-দেশে বাঁশ গাছ নাই বলিয়া বোধ হয়। বাঁশ গাছের জন্ম গ্রীষ্মদেশে, হিমালয়ের দক্ষিণ হইতে পূর্ব্বদিকে বঙ্গে আসামে ব্রহ্মে। ফারসী ভাষায় বাঁশের নাম নাই। আছে 'নও'

যাহার অর্থ নল বা নলাকার গাছ। বাঙ্গালায় নল গাছ খড়ী গাছ যেমন, বোধ হয় ফারসীতে নএ বাং নই তেমন।*

এদিকে, সং কঞ্চিকা শব্দ শব্দকল্পদ্রুম, বাচস্পত্য, শব্দার্থচিন্তামণি, উইল্‌সন্‌, উইলিয়ম্‌স, প্রভৃতি সংস্কৃত কোষে আছে। অমর মেদিনী হেমচন্দ্রে নাই, আছে শব্দচন্দ্রিকায়। সংস্কৃত প্রাচীন কোষে নাই; কিন্তু প্রাচীন কোষের একখানিও সম্পূর্ণ নহে। সং কন্‌চ ধাতু বন্ধনে হইতে কঞ্চিকা, অর্থ বেণুশাখা। কন্‌চ ধাতু হইতে অন্য শব্দও আসিয়াছে। কঞ্চুক, কঞ্চুলী শব্দে কন্‌চ ধাতু। এই ধাতুর রূপান্তরে সং কচ ধাতু, কচ ধাতু হইতে সং কচ শব্দ -কেশ, যাহা বাঁধা হয়। বোধ হয় কঞ্চিকা হইতে বাং কেঁচকা যেমন তিল গাছের (আমার কোষে তিল শব্দ দেখুন)। কঞ্চিকা শব্দের এক রূপ কুঞ্চিকা, যদিও এখানে কুন্‌চ ধাতু বক্রণে বলা হয়। কুঞ্চিকা অর্থেও কঞ্চিকা। অন্য অর্থ বাং কুঁজি কাটি (চাবি-কাটি) কুঁচগাছ (ওং কাঁইচ্‌), এবং মানপাত্র কুঞ্চি। কুঞ্চি, কেহ কেহ বলে খুঞ্চি, কেহ বলে কুনিকা। বাং কঞ্চি ওং -তে কণি। চ লুপ্ত হইয়া কঞি -কণি। (ঞ স্থানে ণ, যেমন রাজ্ঞী রাণী)। বিহারী হিন্দীতে করচি। করচি ও কঞ্চি মূলে এক না হইতে পারে (সং কূর্চি?)। বোধ হয় সং কান্দূক (যষ্টি) শব্দের মূল সং কঞ্চিকা।

আর এক কথা মনে রাখিতে হইবে। ফারসী ও সংস্কৃত ভাষা এক কালে ঘনিষ্ঠ ছিল। একই শব্দ যৎকিঞ্চিৎ রূপান্তরে এই দুই ভাষায় ছিল। সং বন্ধ ফাং বন্দ, সং পাদ ফাং পায়, সং ভ্রূ ফাং অব্রু, সং সহস্র ফাং হাজার, সং দান ফাং দাদন, সং ভূ ধাতু ফাং বূ, সং উপসর্গ বি ফাং বে, ইত্যাদি। আমার মনে হয়, সংস্কৃত ও ফারসীর নৈকট্য হেতু অনেক ফারসী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় সহজে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। নাচার লাচার, বেআড়া বেগতিক, ফাং নালা (সং নালী), নাম নামা, ফাং গোলা (ফাং গাএন) (সং গোল বলিয়া গোলা=মরাই), ফাং গরম সং ঘর্ম, বোধ হয় সং খণ্ড (খাঁড় গুড়) হইতে আর্বী কন্দ প্রভৃতি শব্দ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। আশ্চর্য্য ওড়িয়াতে খণ্ড খন্দ না বলিয়া কন্দ বলে। এই কন্দ হইতে ইং sugar-candy। এইরূপ, সং হইতে শব্দ আর্বী ফার্সীতে গিয়া ঘুরিয়া আসিতে পারে। আমি আরবী ফারসী জানি না। ফারসী ও হিন্দুস্থানী অভিধানের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে যাহা পাইয়াছি, তাহা লইয়া এ বিষয়ে অধিক লেখা ধৃষ্টতা প্রকাশ হইবে।

কিন্তু আমাদের পক্ষে হিন্দীভাষা যৎকিঞ্চিৎ লেখা কঠিন নহে। কারণ হিন্দীভাষারও মূল সংস্কৃত। সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত শব্দ ব্যতীত হিন্দীতে আরবী ফারসী শব্দও আছে। বাঙ্গালা ওড়িয়া মরাঠীতেও আছে। এই-সকল শব্দ ব্যতীত সংস্কৃতভব শব্দের উৎপত্তি ও রূপান্তর এক এক ভাষায় একটু একটু ভিন্ন ভাবে হইয়াছে। আলগোচ বা আলগোছ শব্দ হিং অলগ্‌সে (আমার কোষে ভুলে ফাং ছাপা হইয়াছে) প্রথমে মনে হইয়াছিল। কিন্তু ধ্বনিসাম্য সব স্থলে প্রমাণ গণ্য হইতে পারে না। বাং গোচ বা গোছ (যেমন সেই গোচের (গতিকের) মানুষ, গোছে-গাছে) শব্দ আছে। সং অলগ্ন হইতে আলগা বলিতে সন্দেহ হয় না। সং গতি হইতে প্রাম্য গইত, এবং গইত হইতে গইচ গোচ অনায়াসে আসে। এই কারণে অলগ্ন-গতি-আলগা-গইৎ-আলগা গোচ -আলগোচ আসা অসঙ্গত নহে। সে যাহা হউক, হিন্দী বলিয়া নিরস্ত হইলে চলে না। হিন্দী শব্দের সংস্কৃত মূল অন্বেষণ কর্ত্তব্য। তখন হয়ত হিন্দী মূল ছাড়িয়া একেবারে সং মূলে যাইতে পারা যাইবে। আমি অধিকাংশ স্থলে মূল অন্বেষণ করিয়াছি। সং মূল দেখাইয়া হিন্দী কিংবা অন্যান্য সংস্কৃতমূলক ভাষা হইতে অনুরূপ শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছি। গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় অবশ্য সকল স্থলে সব ভাষা হইতে অনুরূপ শব্দ দিতে পারি নাই; জানাও নাই। পাশা খেলার কচে বারু শব্দের কচে অর্থ বাঁচা জানিতাম না। আমি বুঝিয়াছিলাম কচ=১, ১ যোগে বারু। কাঁচা বারু থাকিলে পাকা বারু থাকিবার কথা। (৫+৫।২ -- পাকা বারু?)। কিন্তু কচ অর্থে এক কিরূপে হইল তাহাও জানি না। খাঁড়ি বা খাঁড়ী মসূর শব্দের খাঁড়ীর হিন্দী অনুরূপ খড়ী। কিন্তু হিং খড়ী বলিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলে না। সং অখণ্ডিত হইতে, কি সং খণ্ডী (—বনমুদ্গ—হেমচন্দ্র) হইতে, তাহা নিশ্চয় করিতে পারি নাই। দ্রষ্টব্য এই, বাঙ্গালাতে খাঁড়ি বা খাঁড়ী, যেন সং খণ্ড শব্দ মূল। মৈত্র-মহাশয়-প্রদত্ত অন্য শব্দ আমার কোষে পাওয়া যাইবে। তন্মধ্যে চওলা ডগুর শব্দ জানি না। চহলা শব্দ স্থানে চওলা ভাখার গুণে বা দোষে ঘটিয়াছে। যদি ডহর শব্দ স্থানে ডগুর হইয়া থাকে, তাহা হইলে ডগুর শব্দও ভাখার বলিতে হইবে। এ সকল স্থলে কোন্‌ অঞ্চলের ভাখা তাহা জানিলে কাজে লাগিত। বলা বাহুল্য বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা ভাখা এক নহে। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাখা এক নহে, কিন্তু পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ বঙ্গের ভাষা এক। যখন লেখা আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন ভাষা ভাখা এক ছিল। লেখা ছাপা আবিষ্কারের পর ভাষা স্থির হইয়া গিয়াছে। লেখার শব্দ স্থায়ী, কহার শব্দ স্থায়ী নহে। এইরূপে বানানে শব্দ মূর্ত্তিমান হইয়া পড়িয়াছে। চাকর কর্ত্তব্য অক্ষয় প্রভৃতি শব্দ যশোরে চাকোর কোত্তোব্বো, ওক্ষয়; অষ্টমী নবমী প্রভৃতি শব্দ কলিকাতায় ওষ্টোমী নোবোমী, অম্বল অমাবস্যা আম্বল আমাবাস্যা, ইত্যাদি। এই প্রকার উচ্চারণ-বিকারে ভাখার উৎপত্তি। কেহ কেহ বাঙ্গালা শব্দটি না জানিয়া ভুল লেখেন। যেমন গেঁদা না লিখিয়া গাঁদা, ছেনা (দুধের) না লিখিয়া ছানা। ইহার বিপরীত, ঝেঁটা ঝাঁটা), লেতা বা নেতা (লাতা), ইত্যাদি। একটা বাঁধা রূপ চাই, আমার জানা শোনা কহা রূপ যাহাই হউক, নচেৎ ভাষার উন্নতি হয় না। সদাপরিবর্ত্তনশীল কথা ভাষা দ্বারা ভাষার চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, কথা ভাষাকে লেখ্য ভাষা সংযত করিয়া রাখে।

লেখা ভাষারও পরিবর্ত্তন হয়। সংসারে অপরিবর্ত্তনীয় কি আছে? কিন্তু সে পরিবর্ত্তন জোর করিয়া আনা কর্ত্তব্য নহে। যেখানে ভাষার ধাতু বা প্রকৃতিতে দোষ ঘটে না, সেখানে আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তন চলে। আমার অভিমত না হইলেও সে পরিবর্ত্তন ঘটিবে। কেহ কেহ গিয়াছে স্থানে গেছে লিখিতেছেন। কিন্তু মিলিয়াছে, শুইয়াছে প্রভৃতি ক্রিয়াপদও এইরূপ সংক্ষিপ্ত করিতে হয়। নচেৎ বাঙ্গালা ব্যাকরণে নিপাতন সূত্র আনিতে হয়। এ-সকল অপেক্ষা করিছে (করিতেছে), যাইছে (যাইতেছে) প্রভৃতির তে লোপ করা বরং চলে। মাইকেল মধুসূদন এইরূপ করিয়াছেন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রবন্ধে মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন বানান পাই। শুনিয়াছি, প্রবাসীতে প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে তিনি একবার ছাপা দেখিয়া থাকেন। ফাল্গুনের

---

* এই নই হইতে নইচা যেমন হুকার। বোধ হয় ফাং নএ নই আর সং নলী মূলে এক, এবং নইচা আর নলিকা এক। বাঙ্গালায় বহু স্থানে হুকার নইচা বলে না, বলে নলিচা, নলচা। ফারসীতে বাঁশ গাছের নাম নএ-ই-হিন্দী।

প্রবাসীতে তিনি চোঁয়া ধাতু স্বীকার করিয়াছেন। আমি ইহার পক্ষপাতী। কিন্তু দেখিতেছি তিনি ঢ্যালা (ঢেলা), ঘ্যাঁসা (ঘেঁষা) লিখিয়াছেন। যে কারণে ছোঁয়া না হইয়া ছোঁআ সে কারণে ঢ্যালা ঘ্যাঁসা উচ্চারণে বাঙ্গালা থাকে কি? যদি বা তাঁহার উচ্চারণে কি আমার উচ্চারণে থাকে, লোকে তাহা ত প্রমাণ বলিবে না। আর এক শব্দ, তেয়ি। এখানে ন, ফলার আকার পাইবে কেন? 'সং' কে—সং কে এইরূপ লিখিলে বোধ হয় ভাল হইত। কারণ ' এই চিহ্ন অন্যত্র লুপ্ত বর্ণের দ্যোতক হইয়াছে। এক স্থানে দেও, অন্য স্থানে দ্যায়। এইরূপ, ঋ্যালনা, ফ্যালা, প্রভৃতি বানান সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জানিতে পারিলে আমার মত অনেকের সংশয়চ্ছেদ হইত।

ভবিষ্যতে আলোচনা সুগম করিবার অভিপ্রায়ে এত কথা পাড়িলাম। আশা করি, যাঁহারা শব্দ কিংবা ব্যুৎপত্তি দিয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার সাহায্য করিতেছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ হইতে এই অযোগ্যকে বঞ্চিত করিবেন না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বাঙ্গালা শব্দকোষ।

গত চৈত্র মাসের প্রবাসীতে শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার বাঙ্গালা শব্দ-কোষ আলোচনায় যে শব্দ-সংগ্রহ দিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার অন্বেষণ ও পরিশ্রমের পরিমাণ বুঝিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। কিছু দিন হইতে শব্দসংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া যাহা পারি নাই, তিনি অবলীলাক্রমে পারিয়াছেন! প্রবাসী হওয়াতে শব্দ সংগ্রহে অসুবিধা হইয়াছে। নিবাসী হইলে যে পারিতাম, তাহা মনে হয় না। আরও আশ্চর্য্য, তাঁহার কৃত অর্থ। অনেকে সময়ে সময়ে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় গ্রাম্যশব্দসংগ্রহ দিয়াছেন। কিন্তু সে-সব সংগ্রহে ও চারু বাবুর সংগ্রহে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে। এই সংগ্রহের কতকগুলি শব্দ আমার কোষে অবিকল, কতকগুলি রূপান্তরে আছে, কতকগুলি আমার কাছে একেবারে নূতন। আমার কোষে ক্রটি যে কত আছে, তাহা যিনি দেখাইতেছেন, তিনি আমাদের মাতৃভাষার যথার্থ সেবক। কতকগুলি শব্দ লিখিতে লিখিতে কি ছাপিতে ছাপিতে হারাইয়া গিয়াছিল, চারু বাবুর চোখে কিন্তু হারায় নাই। গুলা, চাদর প্রভৃতি শব্দ নিশ্চয় লিখিয়াছিলাম: আশ্চর্য্য, কোষে দেখিতেছি না! চোখ দিবার লোক পাওয়া যাইতে পারে, চোখ খুলিয়া দিবার মানুষ সুলভ নহে।

এবারে তিনি দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এক, বাঙ্গালায় প্রচলিত ও যাবনিক ও ম্লেচ্ছ ভাষা হইতে আগত শব্দের মূলার্থ প্রদর্শন। এ যে কঠিন কাজ, আমার পক্ষে অতি কঠিন কাজ, তাহা বলিয়া নিবৃত্ত হইলে চলে। আমি ফারসী আরবী জানি না, সব সময় মৌলবি সাহেবের মুখ-নিরীক্ষক হইতে পারি না। যিনি সংস্কৃত ও যাবনিক—দুই বা তিন ভাষা জানেন, বিশেষতঃ যিনি এই এই ভাষা তুলনা করিয়া বিচার করিয়াছেন, তিনি এ কর্ম্মের অধিকারী। আমি সংস্কৃতের দিকে কিছু অধিক টানিয়াছি। কারণ অন্যত্র বলিয়াছি। আর দুই একটা দৃষ্টান্ত দিই। সং গুণ-আবৃত্তি বা ফের, ফাং গুনা: এক-গুনা দু-গুনা প্রভৃতি শব্দে সং গুণ ধরিয়াছি। সং গল, ফাং গলু বাং গলা; সং একল, বাং একলা, (মৌলবি সাহেব বলেন ফাং একলু নাই, + আছে অন্য রূপে), সং এক ফাং য়ক; সং দ্বি ফাং দু; সং চত্বারি বাং চারি ফাং চহর*; সং কিম্ ফাং কি; সং ত্বম্ বাং তুই ফাং তু; ইত্যাদি বহু বহু শব্দের সাদৃশ্য আছে। এ-সকল স্থলে কোন্ ভাষা হইতে কোন্ বাং শব্দ, তাহা ত নির্ণয় কঠিন। এখানে আমি দুই দিক দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালার মা সংস্কৃত ভাষা, আগে মায়ের দিকে তাকাইয়াছি। তার পর বাঙ্গালার ভগিনীদের কোষে খুঁজিয়াছি। যখন একটা শব্দ এসব কোষেও পাইয়াছি, তখন আর অন্য ভাষায় যাই নাই। সকল স্থলে আমার কোষে এত কথা দিই নাই, অনুরূপ ফারসী শব্দও দিই নাই। তথাপি, হয় ত কোন কোন স্থলে মূল ফারসী; আমার ভুলে সংস্কৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কথা, দেশের কোথাকার ভাষা লইয়াছি। কথিত ভাষাকে ভাখা বলিতেছি। ব্যাকরণ ও কোষে বাঙ্গালা ভাষা উদ্ধারের যত চেষ্টা হউক, ভাখার হাত এড়ানা দুঃসাধ্য। নানা কারণে কেহ কেহ কিংবা অনেকে কলিকাতার ভাখা গ্রহণ করিতে বলেন। কিন্তু কলিকাতার ভাখা সম্পূর্ণ নহে। কারণ গ্রামে যাহা আছে, কলিকাতায় তাহার বহু শব্দ অজ্ঞাত; কারণ গ্রাম গ্রাম, বঙ্গের গ্রাম যেখানে ভাষা জন্মিয়াছে বাড়িয়াছে: কারণ কলিকাতা একটা বৃহৎ হাট, এ হাটের কথা ও-হাটে শুনিতে পাওয়া যায় না; কারণ হাটে বিহারী হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী ছাড়াও অন্য অনেক হাটুয়া আসিতেছে যাইতেছে। কে কার কথা শোনে, মানে। যার যা সুবিধা সে তাই বলে; হট্টগোলে বাঙ্গালা ভাষা মিশিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। বিহারী হিন্দী শব্দ কিংবা বাঙ্গালা শব্দের বিহারী হিন্দী রূপ দ্রুত প্রচলিত হইতেছে। খাড়াই বাঁধাই সেলাই ধোলাই চোলাই মলাই ইত্যাদি হিন্দীরূপ: অথচ বাঁধন বাঁধা অর্থে বাঁধাই পুস্তকসমালোচকও দেখিতে পাইতেছেন না। এখানে এ বিষয় বিস্তর লিখিবার স্থান নহে। যাঁহারা মনে করেন কলিকাতার ভাখাকে বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিলে সব সুবিধা হয়, আপত্তি চুকিয়া যায়, আমার মনে হয় তাঁহারা সব দিক তলাইয়া দেখেন নাই। কলিকাতাই ভাখার আটোপ (যেমন London cockney) বঙ্গের গ্রামে প্রবেশ করিবে না; কিন্তু ভাখার দিদিমণি দাদাবাবু মামাবাবু ইত্যাদি নূতন নূতন শব্দ-সংযোগও প্রবেশ করিতে বহু বিলম্ব আছে।

কিন্তু কলিকাতাই ভাখার ভিতরে একটা ভাষা আছে। সে ভাষা বাঙ্গালা ভাষা। এই ভাষা সাহিত্যে চলিতেছে, পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। চট্টগ্রামের হউক মৈমনসিংহের হউক সেখানকার প্রাচীন পুথির ভাষা সে সে অঞ্চলের ভাখা নহে; এখানে ওখানে দুই একটা শব্দ ভাখার থাকিতে পারে কিন্তু ভাষা বাঙ্গালা, কলিকাতার ভাষা। অতএব বলা যাইতে পারে, কলিকাতার ভাষা বাঙ্গালা ভাষা।

শহরে ভাষা পুষ্ট হয় কিন্তু শুদ্ধ থাকে না; শহরে জন্মে না, স্বীয় প্রকৃতিবিকাশের অবকাশ পায় না। অন্য স্থানের, নিকটবর্ত্তী গ্রামপুঞ্জের ভাখা শহরে গিয়া সুশ্রী হয়, প্রায়ই কৃত্রিম সৌন্দর্য্য পায়, যেন বনের গাছ ধনীর আরামবাটিকায় রোপিত হয়। ইহাতে তাহার স্বাভাবিক তেজের হানি হয়। গ্রামের সম্পর্ক ছাড়িলে তাহা নিস্তেজ হয়, পরে বিকৃত ও রুগ্ন হয়।

\+ একলু (য়া-কাফ্-লাম-ওয়াও বানান) আছে, তাহার উচ্চারণ প্রদর্শিত হইয়াছে yaklu রূপে; অর্থ single, simple (thread)। তেমনি একানা, এগানা (বাং একানে) আছে।—চারু।

* আমি ফারসী দুখানি অভিধান দেখিলাম। দুখানিতেই ফারসী চার=four শব্দও আছে।—চারু।

দক্ষিণ রাঢ়ের ভাষা কলিকাতার ভাষার মূল। এই ভাষা গঙ্গার দুই কূলের ভাষা নহে, পূর্ব্বের নহে, পশ্চিমের নহে, অধিক উত্তরের নহে। এই ভাষা রাজা রামমোহনের, বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্রের। এই অঞ্চলের ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেন।* আমার যৎসামান্য আলোচনায় বঙ্গের এই অংশের ভাষা বাঙ্গালা ভাষার নিকটতম। আমার কোষে এই ভাষা প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। সংক্ষেপে রাঢ়ের এই দক্ষিণ ভাগকে রাঢ় নামে উল্লেখ করিয়াছি।

কিন্তু এখানেও ভাষার দোষ ত্যাগ করিয়াছি। যেখানকার শব্দ হউক, তাহা বাঙ্গালা ভাষার আদর্শে পরিণত করিয়া গ্রহণ করিয়াছি। কুলো তুলো পিঠে খিদে কিংবা আঁব কাঁটাল ম্যাদ (মিয়াদ) শ্যাল (শিয়াল), কিংবা গুনা-গুনতি চাকুরী ধুচুনী, কিংবা (বিশেষণে) কপালে, বেলে, তেঁতুলে প্রভৃতি রূপ স্থান পায় নাই। হয়ত আমার প্রদত্ত রূপ সব স্থলে শুদ্ধ হয় নাই। না হইবার দুই কারণ আছে। এক, সকল স্থলে ব্যুৎপত্তি ধরিতে পারি নাই; দুই, বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত রূপ পাই নাই। অতএব এই দুই বিষয়েও সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

বাঙ্গালা ছাপার অক্ষর।

বাঙ্গালা শব্দকোষ ছাপার সময়ে বিভিন্ন আকারের অক্ষরের অভাব পুনঃ পুনঃ অনুভব করিতেছি। হাতের লেখা কিংবা ছাপা দেখিয়া পড়া চক্ষুর বিষয়। সংক্ষেপে লিখিতে লিখিতে শব্দবিশেষ ভিন্ন অক্ষরে লিখিয়া দেখাইতে পারিলে শব্দের শ্রেণীবিভাগও হয়। বাঙ্গালায় এক প্রমাণের টাইপ দ্বারা এই শ্রেণীবিভাগ চলে না; কোথায় কোন্ শব্দ কোন্ অভিপ্রায়ে বসিয়াছে তাহা জানাইবার উপায় নাই। প্রত্যেক স্থলে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে হইলে গ্রন্থকলেবর বাড়িয়া যায়। সংস্কৃতে 'ইতি' 'ইতি' লিখিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; বাঙ্গালার উদ্ধার চিহ্ন ব্রেকেট চিহ্ন ও কমি দিয়া কতক হয়, সম্পূর্ণ হয় না।

এ দিকে বাঙ্গালা অক্ষর এত যে এক প্রমাণের নানা আকারের অক্ষর নির্ম্মাণ বহু ব্যয়সাধ্য হইয়াছে। কালে উদ্‌যোগী মুদ্রাকর জন্মিবেন, কালে বাঙ্গালা ছাপার অক্ষর সুন্দরতর হইবে।

ইতিমধ্যে টাইপ লেখার কল নির্ম্মাণে কেহ কেহ মনোযোগী হইয়াছেন। এখানে সারদাকান্ত সেন মহাশয়ের "বঙ্গাক্ষর সহজ করিবার প্রস্তাব *" একটু আলোচনা করিতেছি। এক কথায় বলিতে গেলে, ইঁহার প্রস্তাব প্রায় ইংরেজী-লিখন-রীতির অনুরূপ। ইংরেজীতে স্বর ও ব্যঞ্জন অক্ষর পৃথক; বাঙ্গালাতেও পৃথক, অধিকন্তু যুক্ত স্বরের অক্ষর ও অধিকাংশ যুক্ত ব্যঞ্জনের অক্ষরও পৃথক। ফলে অক্ষরের সংখ্যাধিক্য হইয়াছে, টাইপ লেখার কল-নির্ম্মাণ অসাধ্য হইয়াছে, ছাপার অক্ষর-নির্ম্মাণ ব্যয়সাধ্য হইয়াছে।

অন্য প্রদেশের সংবাদ পাই নাই, ওড়িশাতে কয়েকজন অন্য কৌশলে অক্ষরসংখ্যা অল্প করিবার চেষ্টায় আছেন। বাঙ্গালায় একটা নূতন বিপত্তি এই যে শব্দের অন্ত্য অকার লুপ্ত হইলেও অকারান্ত ব্যঞ্জন লিখিয়া পাঠকের বুদ্ধির বা বিদ্যার পরীক্ষা করিয়া থাকি। ওড়িয়াতে এই বিপত্তি নাই। সংস্কৃতেও নাই; যেমন অক্ষর তেমন উচ্চারণ। সংস্কৃত শব্দ কটক আর বাঙ্গালা শব্দ কটক এক নহে; প্রথমটি স্বরান্ত দ্বিতীয়টি হলন্ত। অর্থাৎ বাঙ্গালায় ক ট ক নহে, কটক্।

* মন্দারমালা নামক মাসিকপত্রের গত পৌষ ও মাঘের পত্র।

কিন্তু কে এত হলন্ত চিহ্ন দিবে? তুমি বুঝিয়া লও শব্দ 'কাল' কি অর্থে লিখিয়াছি। অভিধান দেখিয়া বুঝিয়া লও ইহার অর্থ কৃষ্ণবর্ণ, কি সময়, কি (আধুনিক হিন্দীর প্রভাবে) কালি (সংক্ষেপে কাল)। অর্থাৎ সেই এক ব্যঞ্জন অক্ষর কোথাও অকারান্ত কোথাও হলন্ত। সেন মহাশয়ের প্রস্তাব, যেমন অন্য স্বর যোগ করিয়া লেখ (লেখ্ নহে লেখ পড়িতে হইবে) তেমন অ স্বরও যোগ করিয়া লেখ। কালা, কালী, কালু, কালে, কালো লিখিতেছ, তেমন যুক্ত অকারের একটা অক্ষর বাছিয়া কটক শব্দের প্রথম ক অক্ষরে লাগাইয়া দেও। এই অক্ষরটা কেমন হইবে, তাহাতে তাঁহার নির্ব্বন্ধ নাই; তবে লেখার সুবিধা ও সঙ্গতি-রক্ষাহেতু তিনি এক দাঁড়ী চিহ্ন (।) অকারের, কাজেই দুই দাঁড়ী চিহ্ন (॥) আকারের প্রস্তাব করিয়াছেন। এইরূপে, কটক লিখিতে হইলে কাটাক, কাল (সময়) কাল, কাল (কৃষ্ণবর্ণ) কালা লিখিতে হইবে।

এই একটা পরিবর্ত্তন স্বীকার করিলে আর সব বিষয় সহজ হইয়া পড়ে। কারণ তখন ক খ গ ঘ ইত্যাদি মূর্ত্তি হলন্ত হইয়া পড়ে। কালী—কালঈ, কালু—কালউ, কালে—কালএ, কালো—কালও লিখিতে পারা যাইবে। ইংরেজীর সহিত তুলনা করুন, kal, kala, kalu, kali, kalu, kale, kalo। তিনি বলেন, কই এ-সকল পড়িতে ত কষ্ট হয় না, বাঙ্গালাতে কেন হইবে। শব্দে অ আ অনেক লাগে, গোটা অ আ লেখায় সময় যায়, এই হেতু সংক্ষিপ্ত রূপের প্রয়োজন। যুক্ত স্বরাক্ষর সাধন যেমন, যুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর সাধনও তেমন। বিদ্বান্—বইদবান, ত্যক্ত—তয়কত, হ্রদ—হরাদ, কর্ম্ম—কারমম, ব্যুৎপত্তি—বযউতপাততই, ইত্যাদি।

তিনি আর একটু গিয়াছেন। ক্+হ=খ, গ্+হ=ঘ, ইত্যাদি সূত্র ধরিয়া ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিতীয় চতুর্থ অক্ষর অনাবশ্যক করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এই পরিবর্ত্তন গ্রহণ না করিলেও আমাদের মুখ্য প্রস্তাবের কোন হানি হইবে না।" "আমাদের প্রস্তাবানুসারে বাঙ্গালা ভাষাতে স্বরবর্ণের ১০টী, স্বরচিহ্নের (অ আ) ২টী, ব্যঞ্জন বর্ণের (হ চিহ্ন সহ) ৩০টী এবং টাকার ভগ্নাংশ /০, ৵০, ৶০, ।০, ৷৷০, ৸০, এবং ৲ (ইলেক) চিহ্নের ৭টী, সমষ্টিতে ৫২টী মাত্র অক্ষর থাকিবে। ইংরাজীতেও "ছোট হাত" ও "বড় হাত" যোগে অক্ষরসংখ্যা ৫২। অঙ্ক এবং বিরাম চিহ্নাদির সংখ্যাও উভয় ভাষাতে তুল্য। আমরা তিনটি যুক্তাক্ষর অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দিতে ইচ্ছা করি—শ্রী, জ্ঞ এবং ক্ষ।"

কাজে চলিবে কি না, পৃথক কথা; তাঁহার যুক্তিচাতুর্য্যের প্রশংসা করি। ইহাও বলিতে পারি, যদি টাইপ লেখার কল করিতে হয়, তাহা হইলে এই রকম কিছু ধরিতে হইবেই। আমার ব্যাকরণ ও কোষে কোথাও কোথাও অকারান্ত উচ্চারণ জানাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। সেখানে আমি অকারান্ত অক্ষরের তলে মাত্রা দিয়াছি। দেখিতেছি এইরূপ স্থলে আসামী হেমচন্দ্র কোষে অক্ষরের উপরে মাত্রা দেওয়া হইয়াছে। মাত্রার উপরে মাত্রা ভাল বোধ হয় না; তলে মাত্রা মন্দের ভাল। বাস্তবিক প্রথম মনে হয়, বাঙ্গালা নাগরী অক্ষরের মাথার মাত্রার উৎপত্তি কেন হইল। মাত্রা শব্দের সংস্কৃত মূলার্থ—যাহা দ্বারা পরিমিত হয় (ইংরেজী mete, ফরাসী metre, গ্রীক metron)। ইহা হইতে অমরকোষে এক অর্থ পরিমাণ; মেদিনী-কোষে অন্য অর্থ অক্ষরাবয়ব। ছন্দে লঘু গুরু উচ্চারণ-কাল। বোধ হয়, এই উচ্চারণ-কাল-বোধক চিহ্ন হইতে অক্ষরের মাথার

কমির উৎপত্তি। এখন অক্ষরের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে। গুজরাতী অক্ষর নাগরী, কিন্তু মাত্রা নাই। ওড়িয়া তেলুগু টামিল মলয়লম প্রভৃতি অক্ষরের মাথায় অলঙ্কার আছে, কিন্তু তাহা গোল। মাত্রাহীন বাঞ্জন অক্ষর হলন্ত বিবেচনা করিলে ক্ষতি কি? এখন তেমন অক্ষর নাই। প্রচলিত অক্ষরের মধ্যে ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ ঙ ঞ ং ঃ অক্ষরের মাথায় মাত্রা নাই। খ গ থ ধ প শ অক্ষরের মাথায় মাত্রা ক্ষুদ্র, ণ্ড শু যুক্তাক্ষরের মাথায় মাত্রা নাই। এ অক্ষরের মাথায় মাত্রা দিলে ত্র (ত্‌র) হইয়া পড়ে; এইরূপ ও না লিখিয়া ত্ত লিখিলে ঠ বা ৩ বুঝায়। এক মাত্রায় এত প্রভেদ ঘটায়। তথাপি ঙ ঞ ণ কেন মাত্রাহীন হইল তাহার কারণ পাই না। অক্ষর-ক্ষোদক কর্ম্মকারের ইচ্ছা, না এই তিন অক্ষরের উচ্চারণে কিছু বিশেষ আছে বলিয়া এই গতি?

সেন মহাশয় প্রচলিত মাত্রাযুক্ত অক্ষর হলন্ত মনে করিতে বলিতেছেন। এটা একটু জোরের কথা। যেটা হলন্ত নহে, সেটা হলন্ত মনে করিতে পারি না। তিনি বলিতে পারেন, কটক শব্দের শেষের ক হলন্ত নহে কি? উত্তরে বলিতে পারি, বাঞ্জন অক্ষর মাত্রেই অকারান্ত—ইহাই বিধি। অন্যথায় হলন্তচিহ্ন দেওয়া বিধি; আমরা সব স্থলে দিই না, সেটা আলস্যে।

এই কারণে দেখিতেছিলাম, অক্ষরগুলা মাত্রাহীন করিলে হলন্ত বুঝাইতে পারে কি না। ইহাতেও দোষ আছে। লিখিবার সময় টানা অক্ষরের মাথা জুড়িয়া যায়, কাহারও অক্ষরের মাথায় মাত্রা প্রায় থাকে না। তবে যদি টাইপ লেখার আর হাতে লেখার ও ছাপার অক্ষর পৃথক রাখা যায়, তাহা হইলে মাত্রাহীন অক্ষর দ্বারা টাইপের কাজ চলিতে পারিবে।

কিন্তু যদি টাইপ লেখার অক্ষর পৃথক রাখিতে হয়, তাহা হইলে কয়েকটা স্বরাক্ষরও নূতন করাইলে সুবিধা হইবে। সেনমহাশয় এরূপ অনেক পরিবর্তন চাহেন। কিন্তু পরিবর্তনে উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছেন। সবই যদি পরিবর্তন করিলেন তখন আর বাঙ্গালা অক্ষর থাকিল কই? বাঙ্গালা অক্ষর যদি না থাকিল তবে বাঙ্গালা টাইপ-লেখা কল না বলিয়া অন্য টাইপ-লেখার কল বলাই ভাল। তিনি যুক্ত স্বরাক্ষর ইংরেজী অক্ষর হইতে লইতে চাহেন। আমার বিবেচনায় ইহা অনাবশ্যক। যদি নূতন আকারের বাঙ্গালা অক্ষর করাইতে হয় তবে ১৩টা স্বরাক্ষর বাদ দেওয়া কেন।

আমার বোধ হয়, তিনি দুইটি বিষয় ছাড়িতে চাহেন না। এক, ইংরেজী টাইপ-লেখার কলে স্বর ও বাঞ্জন অক্ষর ৫২টা, বাঙ্গালাতেও অক্ষর ৫২টা রাখিতে পারিলে বিলাতী কলে বাঙ্গালা ছাপার অক্ষর অক্লেশে আঁটিতে পারা যাইবে; দুই, বাঙ্গালা ইংরেজী নাগরী এই তিন প্রকার অক্ষর লইয়া কাজ চালাইতে পারিলে নূতন অক্ষর তৈয়ার করাইতে হইবে না। প্রথম যুক্তি বরং মানি, দ্বিতীয় যুক্তি মানি না। নূতন অক্ষর নির্ম্মাণ এদেশে অসাধ্য নহে; প্রথম বায় দেখিয়া যোগে-যাগে কাজ সারিলে পরে তাহা মনের মতন দাঁড়ায় না। ইংরেজী টাইপ-লেখা কলে ৮৪টা টাইপ থাকে। বাঙ্গালা লিখিতে ৮৪টা অক্ষর পর্য্যাপ্ত হইবে। অতএব সংখ্যাধিক্যের প্রতি না তাকাইয়া যাহাতে অক্ষরগুলা হাতেও লেখা সহজ হয়, তাহা ভাবিয়া আকার দেওয়া কর্ত্তব্য। আসল কথা দুইটি,—(১) "বাঞ্জনাক্ষরের পরে কোন স্বরাক্ষর না থাকিলে তাহা হসন্ত উচ্চারিত হয়।" (২) "বাঞ্জন বর্ণের সহিত বাঞ্জন বর্ণ যুক্ত হইতে অক্ষরগুলি পর পর একটির ডান পাশে অপর একটি বসে; আদ্যের অক্ষরগুলির হসন্ত উচ্চারণ হয়, শেষের বাঞ্জনটি উহার অন্তেস্থিত স্বর সহকারে উচ্চারিত হয়।" এই দুই স্বীকার করিলে অপর চিন্তা থাকে না। কলে লেখার বেলা স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু হাতে লেখায় কি লেখা ছাপায় স্বীকার করিতে বিলম্ব আছে। কারণ অভ্যাস ভোলা কঠিন। কলে লেখায় শব্দ দীর্ঘে বাড়িয়া যাইবে, উচ্চে কমিবে। কিন্তু আমরা যে দুই দিকেই কমাইতে চাই।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

স্বাগত

(কলিকাতায় সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষ্যে)

স্বাগত বঙ্গ-মনীষী-সঙ্ঘ
ভূষিত অশেষ মানের হারে!
এ মহানগরে এস আজি এস
ভাবের জ্ঞানের সন্তাগারে।
এস প্রতিভার রাজটীকা ভালে,
এস ওগো এস সগৌরবে,
এস পুস্তক-পুণ্য পূজারী
সারদার উপাসকেরা সবে।
ফুল্ল মনের অম্লান ফুল
ঝরে তোমাদের সমুখে পিছে,
প্রীতির আরতি দিকে দিকে দিকে,
উলু উলু উলু উল্লসিছে।
জলধি-গভীর জাতীয় জীবন,
তার প্রতিনিধি শঙ্খ ঘোষে,
অমৃতের ধারা সঞ্চরে মৃদু
নাড়ীতে দেশের হৃদয়-কোষে।
এস নিতি নব-নব-উন্মেষ-
শালিনী বুদ্ধি করিয়া সাথী,
নূতন নগরী এই কলিকাতা
আন হেথা নবীনতার ভাতি।
গৌড় আজিকে গৌরব হারা,
যশোহরে নাই যশের আলো।
অল্প বয়সী এই কলিকাতা
প্রবীণেরা এরে বাসে না ভালো;
বিদেশী ইহারে করেছে লালন,
স্বদেশের যত তরুণ হিয়া
ইহারে ঘিরিয়া গুঞ্জরে তবু
এরি নয়নের কিরণ পিয়া।

এনেছে তরুণী চন্দন-মালা,
দাঁড়ায়েছে আঁখি করিয়া নীচে,
নব বঙ্গের নবীনা নগরী
তোমাদের সবে আহ্বানিছে।

* *

এই কলিকাতা—কালিকা-ক্ষেত্র—
কাহিনী ইহার সবার শ্রুত,
বিষ্ণু-চক্র ঘুরেছে হেথায়
মহেশের পদধূলে এ পূত।
ধাত্রী ইহার ভাগীরথী-ধারা,
সতী-পঞ্জর বুকে এ বহে,
পুরাণ-স্মৃতির জড়োয়া-জড়িত
এ ঠাঁই কখনো হেলার নহে।
হেথা প্রকাশিল অনুরু অরুণ
অকালে মাতার চরণাতে,
আলোকের রথে সারথি যে আজ
অস্ফুট-আঁখি ধূসর প্রাতে।
মহা-ভারতের কল্পনা-পূত
মহাজীবনের কেন্দ্র ইহা,
মন্তরে এর মুঞ্জরে মন
অন্তরে এর আলোর স্পৃহা।
হিন্দুর কালী আছেন হেথায়,
মুসলমানের মৌলা আলি,
চারি কোণে সাধু পীর চারিজন
মুস্কিলাসান চেরাগ্ জ্বালি'।
অভিষেক হ'য়ে গেছে এ পুরীর
স্বর্গ-নদীর হেমাম্বুতে,—
প্রসাদ-পরমহংস-কেশব—
কালীচরণের প্রেমাশ্রুতে।
জন্মিল হেথা বিবেকানন্দ
দেশ-আত্মার কুণ্ঠা হরি';
এ পুরীর রাজপথের ধূলিরে
মোরা কহি রাজরাজেশ্বরী।
সকল ধর্ম্ম মিলেছে হেথায়
সমন্বয়ের মন্দ্র সুরে,
স্বাগত সাধক-ভকত-বৃন্দ
মরতের বৈকুণ্ঠ-পুরে।

*

এই কলিকাতা ব্যাঘ্র-বাহিনী
ছিল এ একদা বাঘের বাসা,
বাঘের মতন মানুষ যাহারা
তাহাদেরি ছিল যাওয়া ও আসা,
প্রতাপের সেনা পৌরুষ-ভরে
গিয়াছে ইহার বক্ষ দিয়া,
দক্ষিণে এর দক্ষিণরায়
বেড়েছে বাঘের স্তন্য পিয়া।
কালা পল্টন গোরা কোম্পানী
একদা ইহারে করিল রাণী,
কালা ও গোরার স্মৃতির অঙ্কে
বাঘ-ডোরা এর আঙিয়া খানি।
মৃত গৌড়ের অমর জীবন
বিরাজিছে আজ ইহার দেহে,
সপ্তগ্রামের লুপ্ত বিভব
গুপ্ত রয়েছে এ মহা গেহে।
নাহি কলঙ্ক-কালিমা-অঙ্ক,
সাত সাগরের সলিল আনি'
করেছে ক্ষালন মৈত্র ইহার
অন্ধকূপের মিথ্যা গ্লানি।
জগতের সেরা দ্বাদশ নগরী,
গণনা ইহার তাদেরি সাথে,
স্বাগত স্বদেশভকতবৃন্দ
এরি রাখী-ডোর পর গো হাতে।

* * * *

নবীন বঙ্গে এ মহা নগরী
মন্ত্র জপিছে মৃত্যুঞ্জয়ে,
পূরবে পছিমে গেঁথে সে তুলিছে
একটি বিপুল সমন্বয়ে;
দানে ও পুণ্যে ত্যাগে মহত্ত্বে
গড়েছে গড়িছে ঋষির ছবি,
"তত্ত্ববোধে"র "প্রচারে" ঢেলেছে
"নবজীবনে"র "সাধনা" হবি।

এই নগরীর জন-অরণ্যে
ওঠে নৈমিষ-বনের গীতি,
সত্যনিষ্ঠ ঋষি দেবেন্দ্র
সত্যযুগের জাগায় স্মৃতি।
রামমোহনের ঐক্য মন্ত্র
এ মহানগরী শুনেছে সুখে।
বিদ্যাসাগর দয়া-সাগরের
ঢেউ খেলে গেছে ইহারি বুকে।
অক্ষয় হেথা ধর্ম্মের সোনা
আগুনে পোড়ায়ে করিল খাঁটি।
জগদীশ হেথা জড়ের জগতে
বুলাইয়া দিল সোনার কাঠি।
রমেশ হেথায় প্রচারিল বেদ
সব বাঙালীরে শুনাল শ্রুতি;
হেথায় সিংহ ভাষায় রচিল
ভারতের মণি ভারত পুঁথি।
দীপঙ্করের দীপখানি হেথা
চির উজ্জ্বল প্রাণের বায়ে,
নব রসায়নে হবে এ নগরী
নদীয়া যেমন নব্য ন্যায়ে।
রামগোপালের কর্ম্মভূমি এ,
কৃষ্ণদাসের হৃদয়প্রিয়,
হেথা বিতরিল প্রাণদ মন্ত্র
বাগ্মী বন্দ্য বন্দনীয়।
নীল বানরের বদনবিম্ব
দর্পণে হেথা উঠিল ফুটে,
চরণে দলিল ঝুটা সম্মান
আটাশ নগর-জ্যেষ্ঠ জুটে।
হারামণি যারা খুঁজিয়া এনেছে
তাহাদেরও এই লীলাস্থলী।
স্বাগত কর্ম্মী! বাগ্মী! মনীষী!
স্বাগত সত্যসন্ধ! বলী!

* * * *

ভাব ভারতের সারনাথ এই,
হেথায় কি এক শুভক্ষণে
চলিল নূতন বোধিচক্র সে
নূতন বোধের উদ্বোধনে;
সমন্বয়ের অভিনব সাম
ধ্বনিয়া ইহার উঠেছে প্রাণে,
খ্রীষ্টপন্থী ভারতভক্ত—
তারে এ হিন্দু বলিয়া টানে!
আচারে হয়তো ত্রুটি আছে এর,
বিচারে হয় তো রয়েছে গ্লানি,
তবু নবযুগে এ নব তীর্থ
নব সাধনার পীঠ এ জানি।
সনাতন রীতি মানে না এ সব,
নূতনেরি যেন পক্ষপাতী;
ক্ষমা কোরো ওগো ক্ষমা কোরো তবু,
যৌবন আজি ইহার সাথী।
তরু-লতিকার সনাতন রীতি
পত্র গজানো সকাল সাঁঝে,
দৈবে রঙীন পুষ্প উপজে
রাজাসনে যবে ফাগুন রাজে;
ফুল-মাঝে ফল থাকে লুকাইয়া
নব জীবনের বীজ সে ফলে,
মুকুলে লাগুক ব্যাকুল বাতাস,
সনাতন—সে তো আপনি চলে।
নিতি নব নব নব উন্মেষে
নবীন জীবন করুক লীলা,
রসাল মুকুলে না লাগে যেন গো
অকাল মেঘের দারুণ শিলা।
বুল্‌বুল্‌ আনো ফাগুন-বারতা
পেচকের বুলি ভুলিতে চাহি।
স্বাগত ভাবুক! ভাবে সুতরুণ
আশা আশাবরী রাগিণী গাহি।

* * *

সাধনার পীঠ সাধের আসন
শিল্পের নব জীবন-ধারা,
এ মহানগরী ভারত-আকাশে
সাতাশ তারার নয়নতারা।

একদা যে দীপ জ্বালিল ধীমান
　　সে দীপ আজি এ নগরী জ্বালে,
পঞ্চপ্রদীপ—অবনী-গগন-
　　অসিত-মুকুল-নন্দগালে।
মাইকেল মধু হেথা সমাহিত
　　বঙ্কিম-হেম-ভস্মকণা,—
ধূলিতে ইহার রয়েছে মিশায়ে
　　কত না ভাবুক রসিক জনা;
হেথা "মহীয়সী মহিলা"র কবি
　　গাহিল মধুর মায়ের স্তুতি;
বিহারী বঙ্গসুন্দরী-ভালে
　　স'পিল শ্লোকের শুক্ল যূথী।
কবির স্বপ্নপ্রয়াণ তুরগী,
　　রবির প্রভাতগীতির শ্রোতা
এই কলিকাতা কোলাহলময়ী,
　　এর ভাগ্যের তুলনা কোথা?
কবি-গুঞ্জনে এ ধূলিপুঞ্জ
　　ধরেছে কুঞ্জবনের ছিরি,
জগৎ উজল যার প্রতিভায়
　　এ সেই রবির উদয়-গিরি।
হেথা আশুতোষ আশু নিরমিল
　　নব নালন্দা শিক্ষা-গেহ,—
দেশের কিশোর হৃদয়গুলিতে
　　বিথারি' পক্ষীমাতার স্নেহ।
এরি উপান্তে বৈষ্ণব লালা
　　লভিল প্রথম অমৃত-ছিটা,
প্রত্ন-প্রেমিক রাজা রাজেন্দ্র,—
　　এইখানে তাঁর আছিল ভিটা।
হেথা পরিষৎ অশথের চারা
　　দিকে দিগন্তে পসারে শাখা,
টেকচাঁদ আর গুপ্ত কবির
　　প্রকাশে এ ঠাঁই পুলকে মাখা।
গিরীশ হেথায় রঙ্গে মাতিল,
　　রায় দ্বিজেন্দ্র হাসিল হাসি।
স্বাগত কাব্য-কোবিদ! হেথায়
　　উজ্জয়িনীর বাজিছে বাঁশী।

ভারতের শেষ বয়সের মেয়ে
　　এ নগরী আজ অর্ঘ্য নিয়া,
বঙ্গবাণীর সকল ভকতে
　　বন্দনা করে ফুল্ল হিয়া,
চন্দনরসে পুষ্প ডুবায়ে
　　পরায় তিলক উজল ভালে,
মালা-চন্দন দ্যায় জনে জনে
　　পীরিতি-পরশমণির থালে;
প্রসন্ন মনে লও যদি সবে'
　　সোনা হ'য়ে যাবে এ ক্ষুদ্ কুঁড়া,
দোষ ধর যদি, রোষ কর মনে,
　　কুবেরেরও হয় গরব গুঁড়া।
মানস-ভোজের আছে আয়োজন
　　যার যাহা রুচি, যার যা' শ্রেয়,—
চারি ভাণ্ডারী বাঁটিছে,—মনের
　　চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়।
তোমরা সাধক বাণী-উপাসক
　　তোমরা মনীষী ভাবগ্রাহী,
অতিথি! দেবতা! মোরা তোমাদের
　　প্রসন্নতার প্রসাদ চাহি।
চণ্ডীদাসের দায়াদ তোমরা,
　　কবিকঙ্কণ-ধনাধিকারী,
ভারতচন্দ্র-সুধার চকোর,
　　মধুচক্র সে তোমা সবারি;
রবির রশ্মি তোমাদেরি হিয়া
　　রসে লাবণ্যে দিতেছে ভরি,
ভাব-ভুবনের প্রদীপ তোমরা
　　তোমাদের মোরা প্রণাম করি!
ভাষায় তোমরা সঞ্চার কর
　　প্রাণ-সঞ্চিত আশার জ্যোতি,
তোমাদের সমবেত সাধনায়
　　জাগিছেন মহাসরস্বতী;
ভাবের মুলুকে তোমরা মালিক
　　মালিক ভবিষ্যতের ভবে,

ভাব-লোকে যাহা সত্য আজিকে
জীবনে তা কালি সত্য হবে।
স্বাগত! স্বাগত! হে মধুব্রত!
মনীষীবৃন্দ! মনের মিতা!
তোমা-সবাকার প্রতিভার দীপে
আজি এ নগরী দীপান্বিতা।
স্বাগত জ্যেষ্ঠ! স্বাগত শ্রেষ্ঠ!
স্বাগত প্রমুখ! সভাধিপতি!
স্বপ্ন-সারথি! সত্যের রথী!
তোমাদের মোরা জানাই নতি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পঞ্চশস্য

জাপানের ক্রীড়াকৌতুক (Japan Magazine)

অতি প্রাচীন কালে আনন্দে সময় কাটাইবার জন্য জাপানীরা যে-সব উপায় অবলম্বন করিত, সেগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রাচীন মিশরের ঐ জাতীয় উপায়ের সহিত তাহাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। বাড়ীর বাহিরে শীকার করা ও মৎস্য ধরা এবং বাড়ীর অভ্যন্তরে নৃত্যগীত—ইহাই ছিল আমোদ। জাপানী পুরাণে দেখিতে পাই দেবতাদেরও শীকার করা ও মৎস্য-ধরার কথা বর্ণিত হইয়াছে! প্রাচীনকালে বাহিরের এই-সব ক্রীড়ায় জাপ-রমণী কতটা যোগদান করিতেন তাহা ঠিক বোঝা যায় না; কিন্তু তাঁহারা যে গৃহাভ্যন্তরে যন্ত্রবাদন ও নৃত্য প্রভৃতি কোমল ক্রীড়ায় যোগ দিতেন এ কথা ভাবিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাপানীদের ক্রীড়া-কৌতুকের প্রবৃত্তি অতিমাত্রায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কারণ ঐ ধর্ম্ম আমোদপ্রমোদ ধার্ম্মিকের উপযুক্ত নয় বলিয়াই ঘোষণা করিত। সুখী সৌম্য-আনন জাপানী-দেবতার গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করা উচিত, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা এই মত প্রকাশ করিত। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাণীহত্যা নিবারণ করিয়াছিল। এই সময়ে উচ্চশ্রেণীর লোকেদের শীকার করা ও মৎস্য ধরার অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত না হইলেও তাহারা গৃহাভ্যন্তরে যন্ত্রবাদন, কবিতারচনা, নৃত্য প্রভৃতি নারীজনোচিত ক্রীড়াকৌতুকের উপরই বেশী ঝোঁক দিয়াছিল। ফল এই হইল যে তাহাদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিল, মানসিক বলের হ্রাস হইল—জাতি অনেকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। জাপানী সভ্যতার লাভ হইল কমনীয়তা ও কোমলকলা; লোকসান হইল সাহস, শক্তি ও মনুষ্যত্ব। এই সঙ্কটে দেশকে রক্ষা করিল সামুরাই বা ক্ষত্রিয়ের দল। তাহারা ধর্ম্মের অনুশাসন মানিয়া চলিয়া যোদ্ধাজনোচিত মৃগয়ার অভ্যাস ছাড়িল না। হেইয়ান যুগের শেষে কামাকুরা যুগের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে তরবারি- ও ধনুদ্ধারী লোকেদেরই প্রাধান্য হইল, এবং তাহার ফলে অবিলম্বে দেশের প্রাচীন ক্রীড়াকৌতুকগুলি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। স্বয়ং শোগুন তাঁহার পরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিতে যাইতেন। সপরিবারে তিনি ঐ সময় তাঁবুতে বাস করিতেন। তাহার পর দেশে অন্তর্বিদ্রোহ জাগিয়া উঠাতে ক্রীড়াকৌতুকের অবনতি ঘটিল। লোকে মৃগয়া অপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক ক্রীড়ায় মনঃসংযোগ করিল। সুযোগ বুঝিয়া জেন্ নামক বৌদ্ধসম্প্রদায় এ যুগের পার্থিবতার বিরুদ্ধে লোকের মন উত্তেজিত করিতে লাগিল। তাহারা বুঝাইয়া পড়াইয়া আমোদ আহ্লাদ ছাড়াইয়া লোককে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিল। অনেক পদস্থ ব্যক্তি সংসার ছাড়িয়া শেষ জীবন মঠে মন্দিরে কাটাইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে আর একখণ্ড মেঘ উঠিয়া সদানন্দ জাপানের প্রাণের উপর বিষাদের ছায়া বিস্তার করিল। সামাজিক মেলামেশা যাহাতে একেবারে লোপ না পায় সে কারণ চানোয়ু অনুষ্ঠান (আদবকায়দায় চা প্রস্তুত, চা পরিবেষণ ও চা পান। রীতিমত একটা কসরৎ) উদ্ভাবিত হইল। নূতন সামাজিক প্রথায় নারী অবরুদ্ধা হইলেন, ফলে তাঁহাদের মানসিক অবনতি ঘটিল। জাতির প্রাণে সঙ্গীতের প্রতি যে একটা গভীর অনুরাগ ছিল তাহা ক্রমে শুষ্ক হইয়া গেল। অতি-আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে জীবন নিতান্ত নিরানন্দ একঘেয়ে হইয়া উঠিল।

সুখের বিষয় কিছুকাল গত হইলে একটা বিরুদ্ধ স্রোত বহিতে আরম্ভ করিল। এইবার সংস্কার আসিল নিম্নস্তর হইতে। নিম্নস্তরের লোকেরা মুখ গম্ভীর করিয়া না থাকিয়া মুখে হাস্য ফুটাইতে বদ্ধপরিকর হইল। তোকুগাওয়া যুগের শেষাশেষি থিয়েটার ও জোরুরি নামক একপ্রকার সঙ্গীত সৃষ্ট হইয়াছিল। ধীরে ধীরে ইহাদের উন্নতি হইতে লাগিল, ধীরে ধীরে ইহারা জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিল। লোকেরা মৃগয়া ও মৎস্যধরা ছাড়িয়া দিয়াছিল, তবে বাজপাখী দ্বারা পাখীশীকার খুব প্রচলিত ছিল। আগ্নেয়াস্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক ছোড়াও একটা ক্রীড়ার মধ্যে দাঁড়াইল।

মেইজি যুগ বা ভূতপূর্ব্ব মিকাদো মুৎসুহিতোর শাসনারম্ভের সহিত জাপানে পাশ্চাত্য চিন্তা, সভ্যতা এবং তৎসঙ্গে পাশ্চাত্য ক্রীড়াকৌতুকেরও আমদানি হইল। উচ্চশ্রেণীর ও মধ্যবিত্ত লোকেদের মধ্যে বন্দুক দিয়া শীকার ও মৎস্যধরা প্রচলিত হইল। ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা ও অন্যান্য ক্রীড়াও আসিয়া জুটিল। যুবকেরা বেসবল, লনটেনিস, বিলিয়াড্স্ ও হকি খেলা আরম্ভ করিল, তবে তাহারা একমাত্র বেসবল খেলাতেই বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে ফুটবল খেলার যেমন আদর, জাপানীদের মধ্যে বেসবল খেলারও তেমনি। জাপ-জাতি কোনো কুৎসিত, জঘন্য বা নিষ্ঠুর আমোদে বিশেষ করিয়া কখনো মাতে নাই। প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিক্ ক্রীড়া জাপানের প্রাঙ্গণে কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই, জাপানী মল্ল রোমীয় গ্লাডিয়েটরের মত ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে কখনও রক্তের নদী বহায় নাই, স্পেনে প্রচলিত নিষ্ঠুর ষাঁড়ের লড়াইয়ের মত কিছু দেখিয়া কখনও আনন্দ উপভোগ করে নাই এবং পারস্যের জ্যান্ত মানুষ লইয়া দাবা খেলার মত বর্ব্বর ক্রীড়ায় কখনও যোগদান করে নাই। যে জাতি এখনও পুষ্পের দেবীকে পূজা করে, এবং তাঁহার বাৎসরিক অভিষেকের সময় দলে দলে তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া বাহির হয় তাহারা যে সুরুচিসঙ্গত আমোদ প্রমোদের একটা পন্থা নির্দ্দেশ করিবে তাহা নিশ্চিত।

আজকাল জাপানে ক্রীড়াকৌতুকের মধ্যে ম্যাজিক, তাসখেলা, লাঠিম ঘুরানো, ঘুড়ি ওড়ানো, কুস্তি, নৌকার বাচখেলা, থিয়েটার প্রভৃতি প্রচলিত। দুর্নীতিপোষক সকল ক্রীড়াকৌতুকের উপর জাপানী সরকারের খুব কড়া নজর। জুয়াখেলা, অশ্লীল অভিনয় বা চলন্ত চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি আমোদপ্রমোদের কথা সরকারের গোচরে আসিলেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

সু।

প্রাচ্য রাজ্যে ইংরেজ রাণী (My Life in Sarawak, by the Ranee of Sarawak, Methuen and Co. 12s. 6d. net. পুস্তক হইতে)—

মালয় উপদ্বীপের সারাবক রাজ্যে যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন ব্রুক (Brooke) নামক একজন ইংরেজ ভবঘুরে পর্য্যটক ভ্রমণ করিতে করিতে সেই দেশে গিয়া উপস্থিত হন, এবং সেই দেশের শাসনকর্ত্তাকে বিদ্রোহ-দমন করিতে বিশেষ সাহায্য করেন। বশীভূত বিদ্রোহীরা সেই ইংরেজ পর্য্যটককে তাহাদের রাজা হইবার জন্য ধরিয়া বসে, এবং তিনি তাহাদের রাজা হইয়া সেই দেশেই থাকিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর অপর যে একজন দেশীয় ব্যক্তি রাজা নির্ব্বাচিত হন, তিনি একজন য়ুরোপীয় বালিকাকে বিবাহ করেন। সেই বালিকাটি স্কুল ছাড়িয়াই তাঁহার ভ্রাতা উইণ্ডের (Harry de Windt) সঙ্গে বোর্নিয়ো দ্বীপে অনাবিষ্কৃত দেশ আবিষ্কার করিতে গিয়াছিলেন; সে আজ প্রায় ৪০ বৎসরের কথা। তখনকার দিনে সমুদ্রযাত্রা এমন সুখের ব্যাপার ছিল না। অধিকন্তু তখন প্রাচ্য দেশের ইঁদুর আরসুলা প্রভৃতির ভয় য়ুরোপীয় মেয়েদের মনে যথেষ্টই ছিল। সুতরাং সেই বালিকাটির বোর্নিয়ো যাত্রায় বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সেই দেশে উপস্থিত হইলে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবামাত্র রাজা তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং অবশেষে উভয়ের বিবাহ হয়। অল্প কয়েক সপ্তাহ পরেই রাজাকে তাহার নব-পরিণীতা রাণীকে ছাড়িয়া মফস্বলে রাজ্যপরিদর্শনে যাইতে হয়। তখন একলা পড়িয়া রাণী দেখিলেন যে তিনি মালয় ভাষা বলিতে না শিখিলে সেদেশে টিকিতে পারিবেন না; তিনি কাহারও কথা বুঝেন না, কেহ তাঁহার কথা বুঝে না, কেবল রাজপাচক দুই একটা ইংরেজি কথা বলিতে বুঝিতে পারে। তিনি স্থির করিলেন দেশের মেয়েদের সহিত বন্ধুত্ব পাতাইয়া ভাব করিয়া লইতে হইবে। একখানা দোভাষী অভিধান সম্বল করিয়া এবং পাচককে দোভাষী মধ্যস্থ রাখিয়া রাণী দেশের মহিলাদের সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগকে রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলেন; এবং পাচকের সাহায্যে অনেকবিধ কিম্ভূত-কিমাকার অদ্ভুত হাস্যকরুণ-রসাশ্রিত কসরতের পর রাজ-দরবারের দরবারী আদব কায়দা শিখিয়া রাণী অভ্যাগতদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং স্বকীয় ভাষায় বক্তৃতা করিয়া বলিলেন—"দাতু, দায়াঙ্, সখী, আপনাদের আমি নিমন্ত্রণ করিয়াছি, কারণ আমি একাকিনী বড় কষ্ট বোধ করিতেছি। আমি যখন আপনাদের সঙ্গে জীবনসূত্র জড়াইয়া ফেলিয়াছি, তখন আপনাদের সখীত্ব না পাইলে আমার চলিবে কেন? আমি এই শুভদিনের প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলাম; স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের সখীত্ব বিনা টিকিতে পারে না; আপনাদের প্রীতি ও সখীত্বে আমার এই নূতন দেশে বাস করা সুখময় হইয়া উঠিবে আশা করি।"

পাচক তালিপ এই বক্তৃতাটাকে খুব পল্লবিত করিয়া রঙের উপর রং চড়াইয়া অনুবাদ করিয়া শুনাইল। তখন প্রধান মন্ত্রী দাতু বন্দরের পত্নী দাতু ইসা হাঁটুতে হাত রাখিয়া নত হইয়া দাঁড়াইয়া ভূমির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন—"মহারাণী, আপনি আমাদের বাপ মা, বাপ মায়েরও বাপ মা, ধর্ম্মাবতার। আমরা আপনাকে প্রাণপণে যত্ন সেবা করিব। আপনি রাণী হইলেও হাজার হোক বালিকা, আমাদের বয়স হইয়াছে। আমরা আপনাকে কন্যার ন্যায় দেখিব; রাজা এখানে না থাকিলে আমিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠা বলিয়া আমিই আপনার খোঁজ খবর লইব। কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখিতেছি, সেটি এদেশে চলিবে না। শুনিয়াছি ইংরেজ মেয়েরা নাকি পুরুষের হাত ধরাধরি করিয়া পথে বাহির হয়; সে অভ্যাস আপনাকে ছাড়িতে হইবে। যখন আপনার একলা ঠেকিবে আমাকে স্মরণ করিলেই আমি আপনার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইব।"

তারপর রাণী অভিধানের সাহায্যে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। প্রজাদের সম্বোধন করিতে হইলে রাণী "পুত্র" বা "কন্যা" বলিয়া সম্বোধন করেন। বিদেশী রাণী ভুল করিয়া সেই সত্তর বৎসর বয়সের বুড়ীকে "খুকী" বলিয়া সম্বোধন করাতে সমবেত মহিলারা হাস্যসম্বরণ করিতে পারেন নাই।

সেইদিন হইতে রাণী সঙ্গী পাইয়া আনন্দে স্বদেশ সমাজ ভুলিয়া নূতন দেশে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন।

প্রাচ্য দেশের প্রতীচ্য রাণী ও তাঁহার সহচরীগণ।

এই রাণী তাঁহার রাজ্যের পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, সামাজিক আচার ব্যবহার, ইতিহাস ইত্যাদির অতীব কৌতুককর ও সরস বর্ণনা ও ও বৃত্তান্ত দিয়া একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুস্তকে রাজা ব্রুকের সারাবক রাজ্যলাভ; তাঁহার স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজ্যে অভ্যুদয়, উন্নতি, ও প্রজার সন্তোষ—জগতের ইতিহাসের যাহা আশ্চর্য্য ঘটনা; এবং বর্ত্তমান রাজার স্বদেশ- ও প্রজাহিতৈষণা প্রভৃতির বর্ণনা অতি সরস ও বিচিত্র ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান রাজার একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিয়া এই পুস্তকের পরিচয় শেষ করি।—রাজা বলিয়াছেন—"ভগবানের ইচ্ছায় আমি যদি আমার দেশে এমন একটা কল্যাণের ছাপ রাখিয়া যাইতে পারি যে আমার মৃত্যুর পরও তাহা মুছিবে না, তবেই আমার জীবন ধন্য হইবে। সেই জীবন সম্রাটেরও লোভনীয়।"

জাপানীর নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তি (Japan Magazine):—

এবারে এসিয়াখণ্ডের জয়-জয়কার! সাহিত্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ পুরস্কৃত হইয়াছেন, এবং চিকিৎসাবিদ্যার অন্তর্গত রোগোৎপাদক

উদ্ভিজ্জাণু (Bacteria) ও রসায়ন সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করার জন্য একজন জাপানী ডাক্তার নোবেল-পুরস্কার পাইয়াছেন। জাপানীরও এই প্রথম নোবেল-পুরস্কার লাভ।

ডাক্তার হিদেয়ো নোগুচি বর্তমানে আমেরিকা নিউ-ইয়র্ক শহরের রকফেলার ইনষ্টিটিউট নামক বীক্ষণাগারে বিবিধ তত্ত্বের গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। ইনি গরিব চাষার সন্তান; ডাক্তারী পড়িবার কোনো মৎলব বা সম্ভাবনা ইঁহার ছিল না। একদা দৈবগতিকে তাঁহার এক হাতে অস্ত্র করা দরকার হয়; সেই অস্ত্রচিকিৎসায় তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া এই হিতকর বিদ্যা আয়ত্ত করিতে উৎসুক হইয়া উঠেন। গরিব বলিয়া নিজের উপার্জ্জিত অর্থেই অনেক কষ্টে তাঁহাকে ডাক্তারী পড়িতে হয়। জাপানের প্রসিদ্ধ ডাক্তার কিতাজাতো'র শিক্ষাধীনে থাকিয়াও এই জ্ঞান-পিপাসু ছাত্রের তৃপ্তি হইতেছিল না; তখন তিনি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গিয়া রকফেলার ইনষ্টিটিউটে একজন সহকারীর পদে নিযুক্ত হন। সেখানে গিয়াই তিনি সর্পবিষ সম্বন্ধে বিবিধ মৌলিক অনুসন্ধান করিয়া নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তাহাতে তিনি অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন এবং তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ উপাধি Doctor of Medicine প্রাপ্ত হন। তাহার পর দুই বৎসর তিনি রোগবীজাণু সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা দ্বারা বিবিধ তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এবং তাহার ফলে এ বৎসর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এশিয়ার দুই দেশ একই বৎসরে দুই বিভিন্ন বিভাগে নোবেল পুরস্কার পাওয়াতে শাদা-চামড়ার লোকেদের একটু তাক লাগিয়া গিয়াছে। চামড়া শাদা না হইলেও এসিয়াবাসীরা সর্ব্ববিষয়ে শাদা চামড়ার লোকদের সমকক্ষতা যে করিতে পারে, এ ধারণা জন্মাইয়া দেওয়াতে উভয় পক্ষেরই লাভ এবং বিশেষ লাভ বিশ্বমানবের। ইহাতে কেহই মনে করিতে পারে না যে আমরা পরমেশ্বরের আদুরে ছেলে, বিশ্বের প্রভু হইয়াই জন্মিয়াছি; অথবা আমরা পরমেশ্বরের ত্যাজ্যপুত্র, অপকৃষ্ট, আমাদের বৈমাত্রেয় ভাইদের লাথি-ঝাঁটা খাইতেই জন্মিয়াছি; সুতরাং বিশ্বমানবের মৈত্রীবন্ধন ও সাম্য-বোধ খুব সহজ ও নিকট হইয়া আসে। জাপানীরা অন্য রকমেও আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে; সুতরাং নোবেল-প্রাইজ পাওয়াতে আমাদেরই লাভ সবার চেয়ে বেশী হইয়াছে। আমরা পরাধীন জাতি, বিজেতা জাতির কাছে আমরা সর্ব্ব বিষয়ে নিকৃষ্ট হইয়া আছি,—দেশের চাকরীর ক্ষেত্রে আমাদের যোগ্যতা স্বীকৃত হয় না, শাদা-চামড়ার ছোকরাও প্রবীণ বহুদর্শী স্বীকৃত সুপণ্ডিত ও সুদক্ষ ভারতবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং উচ্চ পদ ও অধিক বেতন পাইবার উপযুক্ত; দেশ-রক্ষার কার্য্যে আমাদের সৈনিক হইবার অধিকার নাই, আমরা নাকি ভীরু দুর্ব্বল; রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমাদের হাত নাই, আমরা নাকি অক্ষম অশিক্ষিত। সুতরাং আট ঘাট বাঁধার মধ্যে থাকিয়াও কোনো সুযোগে আমাদের দেশের একজনেরও যদি অসাধারণত্ব ও জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়া যায় তবে তাহা পরম লাভ। তাহাতে প্রমাণ হয় সুযোগ ও সুবিধা পাইলে আমরাও মানুষের সাধ্য সম্পাদন করিতে পারি; এবং যে ক্ষেত্রে কেহ বাধা দিয়া আটক রাখিতে পারে না সেই জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ক্ষমতা বহুবার প্রমাণ করিয়া চুকিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ সেই প্রমাণের উজ্জ্বল নিদর্শন। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের গৌরব আমাদের দেশের গৌরব ও কল্যাণের কারণ হইয়াছে, আমাদের অষ্টেপৃষ্ঠের নাগপাশ একদিকেও একটু আলগা হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র আমন্ত্রিত হইয়া য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে নিজ উদ্ভাবনের পরিচয় দিতে যাইতেছেন। আশা করি অচিরকাল মধ্যে তিনিও বিশ্ববাণীর বরমাল্য আহরণ করিয়া স্বদেশ-জননীর মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

জাপানে বিবাহের বয়স (Japan Magazine)

জাপানী বিবাহ-আইন অনুসারে পুরুষ ১৭ বৎসর ও রমণী ১৫ বৎসর বয়সের হইলেই বিবাহ করিতে পারে। সরকারী হিসাব হইতে জানা যায় যে, বৎসরে রমণীর বিবাহ ১৫ বৎসর বয়সে হয় মাত্র ২০০, ১৬ বৎসর বয়সে ৭ হাজার, ২০ বৎসর বয়সে ৪০ হাজার, ২১ বৎসর বয়সে প্রায় ৫০ হাজারের কাছাকাছি। তার পর আবার সংখ্যা কমিতে থাকে। ২২ বৎসর বয়সে রমণীর বিবাহ-সংখ্যা ৪৫ হাজার, এবং তাহার পরে ক্রমশঃ কম। সুতরাং দেখা যাইতেছে আইন-অনুসারে বিবাহের বয়স ১৫ বৎসর নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও অধি-কাংশ মেয়েরই বিবাহ হয় ২১ বৎসর বয়সে।

পুরুষদের বেলা দেখা যায় ১৫ বৎসর বয়সেও ২০।৩০ জন লোকের বিবাহ হয়; ১৭ বৎসরে ৪ হাজার; ২৬ বৎসর বয়সের বিবাহ, সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ৩৬ হাজারেরও উপর, এবং তাহার পর বয়সও যত বাড়িতে থাকে সংখ্যাও তত কমিয়া আসে। সুতরাং দেখা যাইতেছে অধিকাংশ পুরুষেরই ২৬ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়।

৩০ বৎসর বয়সে গড়ে ১৮ হাজার পুরুষ ও মাত্র ৮ হাজার রমণীর বিবাহ হয়; ৪০ বৎসর বয়সে ৩৭০০ পুরুষ, ১৬০০ রমণী; ৫০ বৎসরে ১২০০ পুরুষ, ৪০০ রমণী; ৬০ বৎসরে ৪৫০ পুরুষ, ১২০ রমণী; ৬৫ বৎসরে ৯০ পুরুষ, ২৮ রমণী; ৬৭ বৎসরে ১৬৮ পুরুষ, ১০ রমণী। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে বয়স বেশী হইলে রমণী বিবাহ করে অল্প। সভ্য স্বাধীন দেশ মাত্রেই কচি বয়সে বিবাহ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু বিবাহের বয়সের শেষ সীমা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই তাহাতে বুড়াবুড়ীর বিবাহের ন্যায় হাস্যজনক ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়।

আমাদের দেশে হিন্দুমুসলমান দুই প্রধান জাতির মধ্যে বিবাহের বয়সের কোনো মুড়াই সীমাবদ্ধ নয় বলিয়া গর্ভস্থ ভ্রূণ হইতে মুমূর্ষু শতজীবীরও বিবাহ হওয়া অসম্ভব বা অসাধারণ ব্যাপার নহে। তথাপি হিসাব করিয়া দেখিলে আজকাল বোধ হয় পুরুষের ২৩।২৪ বৎসরে ও রমণীর ১২।১৩ বৎসরে অধিক সংখ্যক বিবাহ হইতে দেখা যাইবে। কোনো হিসাবজ্ঞ ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন। চারু।

কষ্টিপাথর

গৃহস্থ (ফাল্গুন)

পল্লীভাষা ও সাহিত্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী—

পল্লীভাষা হইতে বিচ্যুত হইয়া সাহিত্যভাষা বেশী দিন আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না, কারণ পল্লীভাষা প্রাণের ভাষা, সাহিত্যভাষা কৃত্রিম। পল্লীভাষায় শব্দ, শ্লোক, ছড়া, প্রবাদ, ঐতিহাসের ইঙ্গিত, স্বাস্থ্যতত্ত্বের বীজ প্রভৃতি এত আছে যে তাহার সঙ্গে যোগ রাখিলে সাহিত্যভাষা সম্পূর্ণ ও বলিষ্ঠ হইবে, এবং সাহিত্যভাষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া পল্লীভাষাও সর্ব্ব জেলায় সমতা প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

ভারতবর্ষ (ফাল্গুন)

ঋতুবিচার—শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী—

জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অনুসারে বর্ত্তমান ঋতুবিচার করিয়া দেখানো হইয়াছে আধুনিক পঞ্জিকা ভ্রমসঙ্কুল। এখন ১০ই চৈত্র মহাবিষুব-সংক্রমণ পঞ্জিকায় লিখিত হইলেও দিবারাত্রি সমান হয় ১০ই চৈত্র; এখন বড়দিন আরম্ভ হয় ১০ই পৌষ, কিন্তু পাঁজিতে মকর-সংক্রমণ লেখে পৌষের শেষ দিনে; দিনমান হ্রাসের প্রথম দিন ১০ই আষাঢ়, পঞ্জিকায় আষাঢ় মাসের শেষ দিন কর্কটসংক্রান্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকে। সুতরাং অয়ন-সংক্রমণ অনুসারে মাঘাদি বর্ষ, বিষুব-সংক্রমণ অনুসারে বৈশাখাদি বর্ষ, এবং ঋতুপর্য্যায়, বিচার করিলে দেখা যায় পঞ্জিকার নির্দ্দেশ ভুল। সমরাত্রিন্দিবকাল মহাবিষুব-সংক্রমণ হইতে (অর্থাৎ ১০ই চৈত্র হইতে) বৈশাখ মাস ধরিলে তবে ছয়টি ঋতু ধরিতে পারা যায়।

চরকের মতে ঋতু-লক্ষণ হইতেছে—শীত, উষ্ণ ও বর্ষণ। শীত লক্ষণ ঋতুর নাম—হেমন্ত, উষ্ণ-লক্ষণ ঋতুর নাম গ্রীষ্ম, এবং বর্ষণ-লক্ষণ ঋতুর নাম—বর্ষা। ইহাদের মধ্যে সাধারণ দুইটি লক্ষণযুক্ত আরও তিনটি ঋতু আছে। উষ্ণ ও বর্ষণ লক্ষণযুক্ত ঋতু প্রাবৃট্, বর্ষণ ও শীত লক্ষণযুক্ত ঋতু—শরৎ, এবং শীত ও উষ্ণ লক্ষণযুক্ত—ঋতু—বসন্ত।

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস প্রাবৃট্ ঋতু, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস শরৎ ঋতু, ফাল্গুন ও চৈত্র মাস বসন্ত ঋতু। অতএব বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্ম, ভাদ্র ও আশ্বিন বর্ষা এবং পৌষ ও মাঘ হেমন্ত ঋতু।

দুইটি অয়ন। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি হইতে ছয় মাস উত্তরায়ণ, এবং দক্ষিণায়ন-সংক্রান্তি হইতে ছয় মাস দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণে তিনটি ঋতু,—শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম; এবং দক্ষিণায়নে ঋতু,—বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত। মাঘাদিমাসক্রমে এই ঋতু-বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব—

মাঘ ও ফাল্গুন—শিশির চৈত্র ও বৈশাখ—বসন্ত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—গ্রীষ্ম	উত্তরায়ণ।
শ্রাবণ ও ভাদ্র—বর্ষা আশ্বিন ও কার্ত্তিক—শরৎ অগ্রহায়ণ ও পৌষ—হেমন্ত	দক্ষিণায়ন।

এই ঋতু-বিভাগ অমরকোষ, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থেরও সম্মত। চরক ও সুশ্রুতেও ঋতুর লক্ষণ এই ক্রম অনুসারেই।

প্রকৃত পক্ষে এই ঋতু-বিভাগই সর্ব্ববাদিসম্মত এবং যে দেশে বসিয়া এই সমুদায় গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, সেই-সকল দেশের অনুযায়ী। বস্তুতঃ দেশভেদে যে ঋতুর বিভিন্নতা হইয়া থাকে, এবিষয়ে প্রাচীন প্রমাণও আছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (২০।৩)

উত্তর-রাঢ়-ভ্রমণ	শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, শ্রীহরিদাস পালিত ও শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রাচীন কামরূপের রাজমালা	শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ।
চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।
বাণীকণ্ঠের মোহমোচন নামক প্রাচীন গ্রন্থ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।
তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
দেবজিৎ	শ্রীকালীকান্ত স্মৃতিবেদান্ততীর্থ।
ময়মনসিংহের গীতিরামায়ণ	শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক।

প্রতিভা (মাঘ-ফাল্গুন)

চিল—(চিল পক্ষীর সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণফল)—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য (ভাদ্র ও আশ্বিন)

পল্লীবিদ্যালয়ে নূতন শিক্ষাপ্রণালী—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে—

আদর্শ পল্লীবিদ্যালয়ে সহজেই নিম্নলিখিত বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে—পুস্তকালয়; কারখানা; অনাথ-আশ্রম ও দাতব্য-চিকিৎসালয়; দেশে পানীয় জলাশয় প্রতিষ্ঠা; দেশীয় ভেষজের গুণপরীক্ষা; কৃষিবিভাগ: মূল, ফল, ফুল হইতে বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিবার শিক্ষাপ্রণালী; ফসলের পোকার পরিচয় ও প্রতিকার; দেশীয় বিবিধ বীজসংগ্রহ ও উহাদের বপন ও রোপণ-প্রণালী; প্রাণীবিদ্যা: বিজ্ঞানশিক্ষা; ভূগোলশিক্ষার আরোহ পদ্ধতি; গণিত; ভাষা ও সাহিত্য; ইতিহাস; শ্রমজীবীদিগকে অবৈতনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা; আমোদ ও ব্যায়াম; ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও ফটোগ্রাফী শিক্ষা; সাহিত্যালোচনা বিভাগ; শিক্ষাদানপ্রণালী শিক্ষা; ছাত্রশিক্ষক; ধর্ম্মশিক্ষা।

এই প্রণালীতে মালদহ জেলার কালগ্রামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন—

মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য যাহা শিক্ষার উদ্দেশ্যও তাহাই—নিত্যসুখ লাভের চেষ্টা। হার্বার্ট স্পেন্সরের ভাষায়—It is the preparation for complete living.

বিজ্ঞান (অক্টোবর)

মাখন ও ধাতব পাত্র—

মাখন পুরাতন হইলে স্বাদ ও গন্ধের বিকৃতি ঘটে, কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষায় সে পরিবর্ত্তন ধরা যায় না। মাখনের সহিত ধাতু, বিশেষত লৌহ বা তাম্র, মিশ্রিত হইলে ঐরূপ গন্ধ হয়; এজন্য টিনের ঘি মাখন অপেক্ষা মটকির ঘি মাখন শ্রেষ্ঠ। মাটির পাত্রের ভিতরটা গ্লেজ করিয়া লইলে আরো ভালো হয়।

বৃক্ষের বৃদ্ধি—শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ—

ডুহামেল (Duhamel) নামক এক পণ্ডিত বলিতেন বৃক্ষের ত্বক্ হইতেই কাষ্ঠ নির্ম্মিত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ বলেন ত্বক্ হইতে কাষ্ঠের উৎপত্তির অভিমত ভ্রমাত্মক, কারণ ত্বক্ কিরূপে উৎপন্ন হয় অগ্রে তাহাই দেখা উচিত। ত্বকেরও বৃদ্ধি আছে।

কাষ্ঠের উৎপত্তিস্থান। অনেক গবেষণা ও তর্ক বিতর্কের পর পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বৃক্ষের অভ্যন্তরে ত্বক্ ও কাষ্ঠ

তাহাদের পরস্পরের সংযোগস্থল হইতে বিভিন্ন মুখে যুগপৎ উৎপন্ন হয়। ভিন্ন ভিন্ন দিকের বৃদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংসাধিত হয়। ত্বকের বৃদ্ধি অভ্যন্তরমুখী এবং কাষ্ঠের বৃদ্ধি বহির্মুখী। কাষ্ঠ, কাণ্ড-কেন্দ্রের চারিদিকে বৃত্তাকারে উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক বৎসর এক একটা বৃত্ত উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তের উপর বহির্দিকে স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়। বৃক্ষের কাণ্ড আড়া-আড়ি ভাবে ছেদন করিলে এই স্তরগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা গণনা দ্বারা বৃক্ষটী কয় বৎসরের সঠিক বলিতে পারা যায়।

এই বৃত্তস্তরগুলির বেধ, সকল বৃক্ষের সমান নহে। যে-সকল বৃক্ষের কাণ্ড অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্থূল হইয়া উঠে, তাহাদের বৃত্ত-স্তরের বেধ কখন কখন এক ইঞ্চি হইয়া থাকে। আবার যে সকল বৃক্ষের কাণ্ড বহু বৎসরে স্থূল হয় তাহাদের স্তরগুলি অতি সূক্ষ্ম। কাগজের ন্যায় পাতলা স্তরগুলি বিশেষ সাবধানতা সহকারে দেখিতে হয়। যে-সকল বৃক্ষের বৃত্তস্তর যত সূক্ষ্ম তাহাদের কাষ্ঠ তত কঠিন।

স্তরের বেধ চারিদিকে সমান থাকে না, এক এক দিকে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ও ঘনসন্নিবিষ্ট হইতে দেখা যায়। বৃক্ষের এই দিকটি নিশ্চয়ই উত্তর দিকে ছিল। এই কারণেই অনেক বৃক্ষের কেন্দ্র ঠিক মধ্যস্থলে না হইয়া কিঞ্চিৎ পার্শ্বে গিয়া পড়ে।

প্রত্যেক বৃক্ষের কাণ্ড উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা; কাণ্ডের উত্তর দক্ষিণের ব্যাস অপেক্ষা পূর্ব্ব পশ্চিমের ব্যাস বৃহৎ। পৃথিবীর এবং অপরাপর গ্রহাদিরও ঐরূপ আকৃতি। তবে কি জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিয়মের সহিত বৃক্ষকাণ্ডের কিছু সম্বন্ধ আছে?

ত্বকের বৃদ্ধি। ত্বকের বৃদ্ধি অভ্যন্তরমুখী; ইহা অনবরত ভিতর দিকে উৎপন্ন হইয়া যাইতেছে এবং বহিরাবরণ অনবরত ক্ষয় হইয়া যাইতেছে বা খসিয়া পড়িতেছে।

অশ্বত্থ জাতীয় পাকুড় বৃক্ষের ত্বক্ অপেক্ষাকৃত মসৃণ ও সবুজ বর্ণ; ইহার উপর কোন বর্ণ বা কাহারও নাম খোদিত করিলে কিয়ৎ-দিনের মধ্যে তাহা অতি সুন্দর অক্ষরে পর্য্যবসিত হয়, যেন ত্বকের উপর স্বাভাবিক অক্ষর আপনা হইতেই হইয়াছে, অস্ত্র উপচারের কোনই লক্ষণ জানা যায় না। শুনা যায় কোন ভণ্ড এই বৃক্ষের ত্বকে "শীতলা দেবী" নাম খোদিত করিয়া অজ্ঞ দেশবাসীর নিকট পূজা গ্রহণ করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল। এই-সকল অক্ষর কয়েক বৎসর পরে মিলাইয়া যায়। ঐ ভণ্ড বৃক্ষের বিপরীত দিকে আচ্ছাদন রাখিয়া তাহাতে আবার নূতন করিয়া নাম লিখিত। একদিকের লিখা মিলাইয়া আসিলেই অপর দিক খুলিয়া দিত। যাহাই হউক এই বৃক্ষের এই গুণ আমরা বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ইচ্ছা করিলে সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কোন কোন দেশে এই বৃক্ষকে গয়া-অশ্বত্থ বলে।

কাষ্ঠস্তরের কার্য্য।—যদি অস্ত্র গভীর রূপে চালাইয়া ত্বকের অভ্যন্তরস্থ কাষ্ঠময় বৃত্তস্তর সমুৎকীর্ণ করিয়া কাহারও নাম অঙ্কিত করা হয়, তবে এক অত্যাশ্চর্য্য বিপরীত ঘটনা পরিলক্ষিত হইবে। বৃক্ষ ঐ নাম ঘুচাইয়া ফেলিবার চেষ্টা না করিয়া যত্নে তাহা হৃদয়াভ্যন্তরে রাখিয়া দিবে। কিন্তু সহজে কেহ দেখিতে পাইবে না। বৃত্তস্তর একটীর উপর একটি বহির্দ্দিকে উৎপন্ন হয় বলিয়া উক্ত লেখা নূতন স্তরাবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া যাইবে। তাহার উপর বৎসর বৎসর নূতন স্তর উৎপন্ন হইয়া অক্ষর কয়টীকে কাণ্ডের অতি অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইবে। কিন্তু অক্ষর কয়টির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। বহু বৎসর পরে ঐ বৃক্ষ ছেদন করিয়া দেখিলে সেই নাম বাহির হইবে। তখন লোকের বিস্ময়ের সীমা থাকিবে না।

দারুময় বৃত্তস্তরের মধ্যে যদি কোন কঠিন বস্তু সমাহিত হয় তাহা হইলেও উহা নূতন স্তরাবরণের দ্বারা শীঘ্রই আচ্ছাদিত হইয়া অভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইবে। অধ্যাপক ডেফন্‌টেনের (Desfontaines) নিকট একখণ্ড কাষ্ঠ ছিল; ঐ কাষ্ঠের অভ্যন্তরে একটা হরিণের শৃঙ্গ দেখা যাইত। স্তরের উপর স্তর জন্মাইয়া প্রায় সমস্ত শৃঙ্গটাই আবৃত হইয়াছিল। তিনি বলেন হরিণগণ মধ্যে মধ্যে তাহাদের পুরাতন শৃঙ্গ ফেলিয়া দেয়; সময় হইলে শৃঙ্গ আপনিই সহজে খসিয়া পড়ে; সহজে না খসিলে হরিণ বড়ই অস্থির হয় এবং শৃঙ্গ ঘুচাইবার জন্য উহার অগ্রভাগ বেগে বৃক্ষে প্রবেশ করাইয়া দেয়। এইরূপে সহজেই শৃঙ্গ মস্তকচ্যুত হইয়া বৃক্ষে সংলগ্ন থাকিয়া যায়। বৃক্ষ ইহাকে ফেলিয়া দিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া বৎসর বৎসর নূতন স্তরাবরণ দ্বারা ইহাকে অভ্যন্তরে নিহিত করে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অরলীন্‌স্ সহরের সন্নিকটে একটা বৃহৎ বৃক্ষ ছেদন করা হয়। উহার অভ্যন্তরে একটা গহ্বর ও তন্মধ্যে এক নর-কপাল অবস্থিত দেখিয়া লোকে যারপরনাই বিস্মিত হইল। বহুকাল পূর্ব্বে কোন বনবাসী সন্ন্যাসী উক্ত বৃক্ষের কাণ্ড কর্ত্তন করিয়া একটা গহ্বর নির্ম্মাণ করিয়াছিল। উহার মধ্যে নর-কপাল রাখিয়া তাহার সম্মুখে ধ্যানে নিমগ্ন থাকিত। কালক্রমে যোগী তথা হইতে চলিয়া যায়। তখন বৃক্ষ স্বয়ং তাহার দেবমন্দির সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিল। বৎসরের পর বৎসর স্তরের পর স্তর উৎপন্ন করিয়া বৃক্ষ ঐ গহ্বর সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলিল; তখন আর ঐ গহ্বরের চিহ্নমাত্র বাহির হইতে দৃষ্টিগোচরে রহিল না।

ত্বকের সাহায্য ভিন্ন কাষ্ঠস্তর উৎপন্ন হইতে পারে না। ত্বকের কোন স্থান ছিন্ন হইয়া কাষ্ঠস্তরে ক্ষত হইলে ত্বক্ চারিদিক হইতে বাড়িয়া আসিয়া কাষ্ঠস্তরকে ঢাকিয়া ফেলে। ত্বক্ বোধ হয় ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে অধিক বৃদ্ধি পায়।

যে-সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ অতিশয় দৃঢ় তাহাদের বৃদ্ধি অতি অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। কোমল কাষ্ঠবিশিষ্ট বৃক্ষ অতি শীঘ্র বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের স্তরগুলিও অপেক্ষাকৃত পুরু হইয়া থাকে।

বৃদ্ধির গতি।—কয়েক জাতীয় বৃক্ষের বৃদ্ধি এত দ্রুত সম্পাদিত হয় যে তাহাদের বৃদ্ধি আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। বাঁশ গাছের বৃদ্ধি অতি দ্রুত, ইহা এক মাসের মধ্যে ত্রিতল প্রাসাদের উচ্চতা লাভ করে। প্যারিসে লক্ষ্য রাখিয়া দেখা হইয়াছে যে বাঁশ প্রতিদিন ৩·৮ ইঞ্চি হিসাবে বৃদ্ধি পায়। আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে বংশের বৃদ্ধি প্রতিদিন উহার দ্বিগুণ হইয়া থাকে। বংশশিশু প্রথমে দিন কয়েক অতি অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পায়; চারি পাঁচ হাত উচ্চ হইলে পর ইহার বৃদ্ধি অতিশয় দ্রুত হইয়া থাকে। আবার যে সময় অনবরত ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি পড়িতে থাকে তখন ইহার বৃদ্ধি অতিশয় অধিক হয়। নিয়মিত বৃষ্টি ও মৃত্তিকার উর্ব্বরতায় আমাদের দেশের বংশ প্রতিদিন এক ফুটের উপর বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়াছি।

পুরাতন খড়ের গাদায় বর্ষাকালে আমাদের খাদ্যোপযোগী এক প্রকার ছত্রিকা (ছাতা) উৎপন্ন হয়। কখন কখন এই উদ্ভিদ এক রাত্রিতেই ৪ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট হইয়া থাকে। মাঠে এক প্রকার এই জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায় সেগুলি ছত্রাকার না হইয়া বর্ত্তুলাকার হইয়া থাকে। শুষ্ক হইলে রাখাল বালকগণ ইহা লইয়া খেলা করে। ইহাতে হঠাৎ আঘাত করিলে ভূট্ করিয়া একরূপ শব্দ হয় ও ইহার মধ্য হইতে ধূলি-কণার ন্যায় পদার্থ ধূমের ন্যায় বাহির হইয়া পড়ে; এই জন্য ইংরেজীতে ইহাকে puff-ball বলে। চলিত বাংলায় ইহাকে ভুরকুণ্ডা বলে। গরুর পায়ে ঘা হইলে ইহার অভ্যন্তরস্থ গুঁড়া লাগাইয়া দিলে শীঘ্র ভাল হইয়া যায়। ইহা নালি ঘায়েরও ঔষধ। আমাদের দেশে এই ভুরকুণ্ডা (puff-ball) ২ ইঞ্চি

ব্যাস-বিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মাত্র এক রাত্রিতেই ইহার বৃদ্ধি! কিন্তু ইউরোপীয় উদ্ভিদবেত্তাগণ অতি সুবৃহৎ ভূঁইকুণ্ডা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন এক একটা ভূঁইকুণ্ডা এক রাত্রিতেই একটা প্রকাণ্ড কুষ্মাণ্ডের আকার ধারণ করে! আমাদের শিশুগণ দশ বৎসরে যতটুকু বৃদ্ধি পায়, ঐ ভূঁইকুণ্ডা এক রাত্রিতেই ততখানি বাড়িয়া থাকে। এক জাতীয় ভূঁইকুণ্ডা এক রাত্রিতে নয় ফুট পরিধি-বিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড গোলকের আকার ধারণ করে। পিষ্টকাদি যেরূপ ফাঁপিয়া উঠিতেছে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, এই ভূঁইকুণ্ডা তদপেক্ষা অধিক দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধিস্থান।—সকল জাতীয় বৃক্ষেরই দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি, মজ্জা হইতে হইয়া থাকে। তাল, খেজুর, নারিকেল প্রভৃতির মজ্জা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। মজ্জাই বৃক্ষের কারখানা। অশ্বত্থ, বট, আম, কাঁটাল প্রভৃতি বৃক্ষেরও মজ্জা আছে। প্রত্যেক প্রশাখার বৃদ্ধি করিতে হয় বলিয়া তাহাদের প্রত্যেকের অগ্রভাগে সামান্য পরিমাণে মজ্জা দেখিতে পাওয়া যায়। তাল জাতীয় বৃক্ষের বৃদ্ধি একমুখী, সেজন্য তাহাদের মজ্জা একস্থানে সমাহিত। কদলী, বংশ, বেত্র, শর, কাশ প্রভৃতি তৃণ জাতীয় উদ্ভিদেরও অগ্রভাগে মজ্জা রহিয়াছে।

স্বভাবতঃ জীবজন্তুর মজ্জা যেরূপ অতি যত্নের সহিত সুরক্ষিত, অনেক উদ্ভিদের মজ্জাও সেইরূপ দৃঢ় আবরণে নিহিত। আবশ্যক হইলে খর্জ্জুরের মজ্জা বাহির করিতে কিরূপ আয়াস পাইতে হয় তাহা অনেকেই অবগত আছেন, সুচিক্কণ ও মসৃণ শ্বেতবর্ণের আবরণগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকিয়া যত্নের সহিত মজ্জাকে রক্ষা করে। চিকিৎসকগণ বলেন, কৃমিরোগে এই মজ্জা খাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। আবার বাঁধাকপির ন্যায় রন্ধন করিয়া খাইতেও বিশেষ উপাদেয়। বাঁশের মজ্জাও ঐরূপ অনেকে খাইয়া থাকেন। অনেকে বলেন অশ্বত্থ ও বটের নূতন কলি (মজ্জা) অতি উপাদেয় তরকারী। জীবের মজ্জাও আমাদের প্রিয় খাদ্য।

যেদিকে বৃক্ষ অধিক আলোক পায় ইহার শাখা প্রশাখা সেই দিকেই অধিক প্রসারিত হয়। ভূগোলকের গ্রীষ্মমণ্ডল হইতে যতই উত্তরে গমন করা যায় ততই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বৃক্ষের বৃহৎ শাখা দক্ষিণ দিকে অধিক প্রসারিত। আমাদের এই প্রদেশ গ্রীষ্মমণ্ডলের উত্তর প্রান্তে; এখানে লক্ষ্য করিলে এই কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। চারিদিকে অবারিত প্রান্তরমধ্যস্থ বৃক্ষ দেখিলে ইহা বুঝিতে হয়। বাগানের প্রান্তস্থ বৃক্ষগুলি বাগানের বহির্দ্দিকে অধিক পরিমাণে শাখা বিস্তার করে।

অনেক লতার বৃদ্ধি অতিশয় অধিক। লাউ, কুমড়া, শসা, সীম প্রভৃতি লতা প্রতিদিন এক হাতেরও অধিক বৃদ্ধি পায়। ইহাদের মধ্যে লাউ গাছের বৃদ্ধিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

তাল, নারিকেল বৃক্ষের বয়স নিরূপণ।—তাল গাছ ও নারিকেল গাছ অতি সুদীর্ঘ হয়: কিন্তু ইহাদের বৃদ্ধি অতি ধীরে হইয়া থাকে। ফল প্রসবের উপযুক্ত হইতেই বার বৎসরের অধিক সময় লাগে। "বার বছরে ধরে তাল" প্রচলিত প্রবাদ। ইহাদের গাত্রে খাঁজ-কাটা দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ এক এক খাঁজ এক এক বৎসরের বৃদ্ধি। গাছ যখন প্রমাণ হইয়া পড়ে, তখন ঐ এক এক খাঁজের বিস্তৃতিও ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। তাল অপেক্ষা নারিকেল বৃক্ষের খাঁজ প্রশস্ত।

বৃদ্ধির সীমা।—বৃক্ষ যদি অনবরত মজ্জা হইতে বাড়িয়া উঠিতেছে এবং মজ্জাও যখন সকল বৃক্ষেই সর্ব্বদা নিহিত, তখন বৃক্ষ অনবরত বৃদ্ধি পাইয়া আকাশ ভেদ করিয়া গগন মার্গে অধিক দূর প্রসারিত হয় না কেন? বৃক্ষ মূল হইতে যে রস টানিয়া লয় তাহা কৈশিকা-কর্ষণে উপরে উঠে। কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এবং বৃক্ষের বিশালত্ব প্রভৃতি ইহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। বৃক্ষ অতি বিশাল হইয়া পড়িলে মূল দ্বারা সংগৃহীত রস কেবল মাত্র বৃক্ষের জীবন সংরক্ষণে ব্যয়িত হইয়া থাকে: তাহা আর বৃদ্ধির কার্য্যে কুলায় না। বট-বৃক্ষ কিন্তু ক্রমাগত বাড়িয়া চলে; তাহার কারণ বট আদি-মূলের সংগৃহীত রসের উপর নির্ভর করে না; যতই শাখা বিস্তৃত হইয়া যায় ততই উহা হইতে ঝুরি নামিয়া নূতন স্থান হইতে রস সংগ্রহের পথ করিয়া লয়। তবে মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার উপায় নাই সেজন্য ঊর্দ্ধে অধিক উঠিতে পারে না। এই জন্যই প্রাচীন তাল-গাছের মজ্জা উপযুক্ত পরিমাণে রস পায় না; শেষে মজ্জা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং বৃক্ষও শূন্যমস্তক হয়।

ফল—

খাদ্যের গুণ এবং উপকারিতা হিসাবে ফলের মূল্য অতি অল্প। কেননা ইহাতে শরীরের পুষ্টিকারক প্রোটীন বা নাইট্রোজেন-ঘটিত উপাদান এবং মাখন জাতীয় উপাদান অতি সামান্য। যাহারা অপরিমিত ভোজী, তাহাদের শারীর-যন্ত্র ফলের দ্বারা উপকার পাইয়া থাকে। কাজেই খাদ্য হিসাবে ফলের মূল্য রাসায়নিক পণ্ডিতের পরীক্ষাগারে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না; জনসাধারণের ভোজনপ্রবৃত্তি ইহার মূল্যনির্দ্ধারক।

সাধারণতঃ ফল প্রচুর না খাইলে শরীরের পুষ্টি সাধন হইতেই পারে না। ইহাতে জলীয় অংশ শতকরা ৮৫ হইতে ৯২; প্রোটীন ০·৩ হইতে ২ ভাগ; মাখন জাতীয় উপাদান ০·১৩; শর্করা জাতীয় বা অঙ্গার-হাইড্রোজেন-ঘটিত উপাদান ২ হইতে ১৫, ধাতব পদার্থ ০·২ হইতে ১; এবং উদ্ভিজ্জ দ্রাবক ০·৫ হইতে ৭।

অম্লতা।—ফল রসনায় সংস্পৃষ্ট হইলেই অম্লাস্বাদ অনুভূত হয়। ইহার কারণ এই যে ইহাতে অযুক্ত (free) অম্ল থাকে, অথবা পটাশ, লাইম বা সোডার অম্লতাবিশিষ্ট লবণ থাকে। বাতাবী লেবু, কমলা, টোমাটো, টাপারীতে সাধারণতঃ সাইট্রিক দ্রাবক থাকে। ন্যাসপাতি আপেল ইত্যাদিতে ম্যালিক দ্রাবক থাকে। রেউচিনি, টোমাটো, ইত্যাদি হইতে প্রচুর পরিমাণে অক্‌জালিক দ্রাবক স্বভাবতঃই পাওয়া যায়। করাত-গুঁড়ার সাহায্যে এই দ্রাবক কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে এসিটোসেলা নামক এক প্রকার উদ্ভিদ হইতে এই দ্রাবক প্রচুর উৎপাদিত হইত। টারটারিক দ্রাবক তেঁতুলে প্রচুর বর্ত্তমান আছে। এই দ্রাবকের অস্তিত্বই আঙ্গুরের বিশেষত্ব। অতএব সাইট্রিক, ম্যালিক, এবং অক্‌জালিক দ্রাবক উদ্ভিদের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। কোন কোন উদ্ভিদে বেনজোয়িক দ্রাবকও পাওয়া যায়। এই-সমস্ত দ্রাবকের অধিকাংশই হয় সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ পোটাসিয়াম বা লাইমের সহিত রাসায়নিক যৌগিক হইয়া বর্ত্তমান থাকে।

পক্বতা।—ফল পাকিয়াছে বলিলে ইহাই বুঝায় যে, ফলের আঁশ (fibre), অম্লত্ব, পেক্‌টিন এবং শ্বেতসার ইত্যাদি অল্প হয় এবং শর্করা, ইথার ও তৈল ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। আম্র ইত্যাদি ফলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ফলে এরূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে ইহা পাকিয়া উঠে। একরূপ গাঁজন (fermentation) দ্বারা এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ইংরেজিতে এই গাঁজনকে অক্সিডাসেস (Oxydases) বলে। যাঁহারা রসায়ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহারা অবগত আছেন যে, অক্সিজেন প্রস্তুত করিবার জন্য পোটাসিয়াম ক্লোরেট নামক এক প্রকার অক্সিজেন পোটাসিয়াম এবং ক্লোরিণের যৌগিককে

উত্তপ্ত করিলে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। তবে অত্যন্ত অধিক উত্তাপ প্রয়োগ না করিলে অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট হয় না। কিন্তু ইহার সহিত পরিমাণ অনুসারে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড নামক এক প্রকার দ্রব্য অথবা সাধারণ বালি মিশাইয়া দিলে অতি অল্প উত্তাপেই পোটাসিয়াম ক্লোরেটএর অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট হয়; অথচ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড বা বালির কিছুই পরিবর্তন হয় না। যে দ্রব্য নিজে পরিবর্ত্তিত না হইয়া অন্য দ্রব্যের পরিবর্তনে সহায়তা করে, তাহাকে ইংরেজিতে ক্যাটালিটিক দ্রব্য বলে, এই ক্রিয়াকে ক্যাটালিটিক ক্রিয়া বলে, এবং এই প্রণালীর নাম ক্যাটালিসিস। পূর্ব্বোক্ত অক্সিডাসেস্ ক্যাটালিটিক ক্রিয়ার দ্বারা ফলের অদ্রবণীয় উপাদান সমূহকে দ্রবণীয় করিয়া তুলে। সাধারণ আনারসে প্রচুর পরিমাণে অক্সিডাসেস বর্ত্তমান আছে।

পাচ্যতা।—আমরা যত প্রকার খাদ্য খাইয়া থাকি, তাহা প্রায় সমস্তই পরিপাক পায় না। কিন্তু ফলের সমস্ত ভোজ্য অংশই পরিপাক হয়। ফলের প্রয়োজনীয় উপাদান সমস্তই শরীরের ব্যবহারে লাগে। অতএব ইহার সহিত অন্য কোন দ্রব্য মিশ্রিত হইলেই অনায়াসে শরীর সুস্থ এবং স্বাস্থ্যসম্পন্ন থাকিতে পারে। যদি ৩৫০ ক্যালরি তাপ উৎপাদক মাংস ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে দ্রবীভূত করিতে অন্ততঃ ১ পাঁইট জল প্রয়োজনীয়। সেই জল খাদ্যকে তরল করিয়া শরীরে চলাচল করে। এক্ষণে কোন লোক যদি ৩৫০ ক্যালরি তাপ উৎপাদক কোন ফল, যেমন নারিকেল ইত্যাদি, ভক্ষণ করে, তাহা হইলে স্বভাবতঃই ফলে এত জল থাকে যে তাহাকে পুনরায় জল পান করিতে হয় না। কাজেই যাহারা ফলভোজী তাহাদিগকে মাংসভোজীর ন্যায় অত্যধিক জলপান করিতে হয় না।

ধাতব পদার্থ।—ফলে যে ধাতব পদার্থ থাকে তাহা পরিমাণে অতি সামান্য হইলেও শরীর রক্ষার্থে অবশ্যপ্রয়োজনীয়। চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে মানবের বহুবিধ পীড়ার কারণ শরীরের ধাতব পদার্থের অসামঞ্জস্য আধিক্য বা অল্পতা। কাজেই ফল ভোজনে শরীরে ধাতব পদার্থের সামঞ্জস্য বেশ রক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ আপেল উল্লিখিত হইতে পারে। অৰ্দ্ধসের আপেলে প্রায় ১/৩ গ্রেণ লৌহ আছে। সেইরূপ ন্যাসপাতিতে লৌহ অপেক্ষা পোটাসিয়াম অধিকতর বর্ত্তমান। এই ধাতব যৌগিক পদার্থ বা ধাতব লবণ এবং অযুক্ত অম্ল বর্ত্তমান থাকায় গ্রীষ্মঋতুতে ফল অতি উপাদেয় এবং স্নিগ্ধকর হইয়া থাকে। ঘর্ম্মাদির সহিত শরীর হইতে এই-সমস্ত পদার্থ নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায় এবং ফল ভোজনে তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। দারুণ গ্রীষ্মের সময় আম, জাম, আনারস আদি ভোজনে শরীর নবজীবন লাভ করে।

কদর্য্য ফল।—ফলের ভোজ্য অংশ নানাবিধ উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং জল সহযোগে উৎপাদিত হয়। কাজেই ফল অতি অল্প কারণেই খারাপ হইয়া পড়ে। অতিপক্ক বা কাঁচা ফল উপযুক্ত আহার্য্য নহে। ইহারা প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর এবং রোগ-উৎপাদক। যদি ফলের খোসা কোনরূপে নষ্ট না হয়, তাহা হইলে ফল অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাল থাকে, কিন্তু খোসা কোনরূপে ছিন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ সেইখানে পচন-উৎপাদক পদার্থ বা ছাতার বীজ প্রবেশ করে এবং ফলটিকে পচাইয়া ফেলে। ফলকে কিয়ৎকাল রক্ষা করিয়া পাকাইয়া তুলা প্রায় সর্ব্বত্রই অনিবার্য্য। এরূপ করিতে হইলে যে-গৃহে ফল রক্ষা করা হয়, তাহা বেশ প্রশস্ত, শীতল, শুষ্ক এবং দুর্গন্ধ- বা সর্ব্বগন্ধবিহীন হওয়া উচিত।

শুষ্ক ফল।—পূর্ব্বে ফল শুষ্ক করিবার প্রণালী অতি কদর্য্য ছিল; তখন ছাদের উপরে ধূলি, জঞ্জাল, আর্দ্রতা ইত্যাদিতে পরিব্যাপ্ত স্থানে সূর্য্যোত্তাপে ফল শুষ্ক বা দগ্ধ হইত। ইহাতে ফলগুলি কৃষ্ণবর্ণ বিশ্রী হইত। আমাদের দেশে এখনও এই প্রণালীই অবলম্বিত হইতেছে, কিন্তু ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ফলগুলিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শুষ্ক করা হয়, ফলের বর্ণ ইত্যাদি নষ্ট হইলেও ইহার সুগন্ধ ইত্যাদি নষ্ট হয় না। আপেল, নাশপাতি, কুল ইত্যাদিই এই-সমস্ত শুষ্ক ফলের মধ্যে প্রধান। সমান ওজনের টাটকা ফল অপেক্ষা এই-সমস্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত ফলের পুষ্টিকারিতা আট গুণ অধিক। ইহার মধ্যে যে অম্ল থাকে, তাহা কোনরূপে অপচিত হয় না।

উপসংহার।—উপরে যাহা বিবৃত হইল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সাধারণতঃ ফল উপাদেয়, পুষ্টিকর, মুখমিষ্ট এবং প্রিয় খাদ্য। আমাদের দেশে ফল যেরূপ প্রচুর উৎপন্ন হয়, তাহার বহুল ভোজন মিতব্যয়িতা, স্বাস্থ্য, ইত্যাদির অনুকূল। ফল ভোজনে উদর স্নিগ্ধ থাকে, এবং রক্ত পাতলা হয়। ফলের দ্বারা লৌহ, পোটাসিয়াম, লাইম, ম্যাগনেসিয়া, সোডিয়াম ইত্যাদি স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান ধাতব উপাদানসমূহ যথোপযুক্ত পরিমাণে গৃহীত হয়। যাহাদের দাস্ত পরিষ্কার হয় না, ফল তাহাদের মহোপকারী ঔষধ।

যে ঋতুতে যে শাক সব্জী বা ফল উৎপন্ন হয়, সেই ঋতুতে সেই ফল নিশ্চয়ই উপকারী। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত শাক ভোজনে শরীর সুস্থ থাকে। গাছ-পাকা ফল দুর্লভ বটে, কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে পাকান ফলও বিশেষ হানিকর হয় না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যখন অতিমাত্রায় ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়, তখন ফল ভোজন স্বাস্থ্যসাধক।

ভারতী (চৈত্র)

বোম্বাই প্রদেশের সমাজ ও ধর্ম্ম এবং তাহার সংস্কার—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ আধুনিক হিন্দুসমাজের সারভূত দুই প্রধান অঙ্গ। হিন্দুসমাজ-শৃঙ্খলার মূলে জাতিভেদ, ও হিন্দুধর্ম্মের অস্থিমজ্জা হচ্চে পৌত্তলিকতা। সমাজ সংস্কারের প্রতি যাঁদের একান্ত লক্ষ্য তাঁরা জাতিভেদ উন্মূলন করতে ব্যগ্র। ধর্ম্মসংস্কার যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁরা পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান্। ভারত-ইতিহাসে সময়ে সময়ে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের পুর্ব্বাপর একান্ত চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু ধর্ম্মবীরেরা অনেক সময় পরাস্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে আসেন। বোম্বাই প্রদেশে হিন্দুয়ানীর দুর্গ আটে ঘাটে এমনি দৃঢ় বদ্ধ। হিন্দু সমাজে যা কিছু পরিবর্তন, যা কিছু উন্নতি প্রত্যক্ষ হয় তার বারো আনা বাইরের সংস্রবে, সমাজের নিজস্ব নৈসর্গিক বলে তা সাধিত হচ্চে বোধ হয় না; সে সবই প্রায় ইংরেজি শিক্ষার ফলে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে।

সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে হিন্দু সাধারণের নিশ্চেষ্টভাব দেখে কষ্ট বোধ হয়। যে পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হওয়া উচিত তার তৃপ্তি-জনক কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বোম্বায়ের লোকেরা অনেকে আমাদেরই মত বিবাহাদি গৃহ-অনুষ্ঠানে অপরিমিত ব্যয় করে বিপদ্-গ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু আসল যে-দিকে আমাদের লক্ষ্য দেওয়া উচিত সে হচ্ছে বাল্য-বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ।

বাল্য-বিবাহের বিষম ফল ভারতের সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর প্রত্যক্ষ করা যায়। কন্যাকে অত ছোট বয়সে পিতা মাতা গৃহ থেকে বিদায় করে যে কি স্বর্গসুখ লাভ করেন তা আমি ভেবে পাই না। পুত্রের

বিবাহেও অনেক স্থলে অকারণ ব্যস্ততা দেখা যায়। পুত্রের বিদ্যা শিক্ষা, তার স্বাধীন বৃত্তি উপার্জ্জনের উপায় করে দেওয়া—এ-সকল গুরুতর কর্ত্তব্য ছেড়ে সর্ব্বাগ্রে তার বিবাহ দিতেই গুরুজনেরা ব্যস্ত। মেয়ে পুরুষের বিবাহযোগ্য বয়স বাড়িয়ে না দিলে সমাজের কল্যাণ নেই। পূর্ণ বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়াতে স্ত্রী পুরুষ উভয় পক্ষেরই অনিষ্ট, সন্ততির পক্ষেও অনর্থকর। বিপন্না বালপ্রসূতি, নির্ব্বীর্য্য সন্তান সন্ততি, শিক্ষার ব্যাঘাত, দারিদ্র্য, অকাল বার্দ্ধক্য, অকাল মৃত্যু—জাতীয় অবনতির এই-সমস্ত লক্ষণ দেখেও আমাদের চৈতন্য হয় না—আশ্চর্য্য !

কেহ বলিতে পারেন যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মানুষের শরীর মনের শক্তিসকল অকালে পরিপক্ক হয়, এইজন্যে তরুণ বয়সে বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু তার ত একটা সীমা প্রকৃতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কোন্ বয়সে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ দেওয়া উচিত? পাঠকের মধ্যে অনেকে অবগত আছেন, বিবাহের নূতন আইন প্রচলিত হবার পূর্ব্বে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এই বিষয়ে কতকগুলি দেশীয় ও য়ুরোপীয় ডাক্তারের মত জিজ্ঞাসা করেন—ডাক্তার নর্ম্মান্, ডাক্তার ফেরার, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার চন্দ্র, ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ প্রভৃতি বিচক্ষণ ডাক্তারেরা বিবাহের বয়স সম্বন্ধে সেই সময়ে আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এ দেশের আবহাওয়ার গুণাগুণ, দেশীয়দের শরীর প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় বিচার ক'রে তাঁরা বলেছেন যে পুরুষের ২০ বৎসরের নীচে, মেয়ের ১৬ কিম্বা ১৭ বৎসরের আগে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। ১৬ জন ডাক্তারের মত নেওয়া যায়, তার মধ্যে কেবল একজন (ডাক্তার চন্দ্র) এ দেশে স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স অন্যূন ১৪ বৎসর নির্দ্দেশ করেন। এই-সকল পণ্ডিতের মত এই যে স্ত্রীলোক স্ত্রীধর্ম্ম প্রাপ্ত হলেই সে সন্তান ধারণের উপযুক্ত হয় তা নয়। আরো দুতিন বৎসর অতীত হলে তবে তাদের প্রসবের উপযোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে—আমাদের দেশে বিবাহের নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী।

যেখানে স্ত্রীর যৌবনাবস্থা হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে বাস করা রীতি আছে, যেমন মারাঠা দেশের কোন কোন স্থানে দেখেছি, সেখানে অবশ্য বাল্য-বিবাহের দোষ অনেকটা খণ্ডন হয়। কিন্তু আমাদের দেশে বালক বালিকার বিবাহের পর থেকেই একত্র বাসের যে নিয়ম আছে তার চেয়ে অনিষ্টকর কুৎসিত নিয়ম আর কি হতে পারে?

পুত্র কন্যার উপর পিতামাতার যতই অধিকার থাক্ না কেন তবুও দেখতে হবে যে সে স্বাধীন ইচ্ছাবিশিষ্ট জীব—ঘটী বাটীর মত ব্যবহারের জিনিষ নয়। তার স্বাধীনতাটুকু যতদূর বজায় রাখা যেতে পারে তা করা কর্ত্তব্য। যে সামাজিক নিয়ম তার প্রতি একেবারেই লক্ষ্য করে না অথবা যার প্রভাবে তা সমূলে বিনষ্ট হয় সে নিয়ম কখন হিতাবহ হতে পারে না।

আমি বিবাহ সম্বন্ধে দুইটি মূলতত্ত্ব বলতে চাই, তার প্রতি সমাজপতিদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রথম এই যে, স্ত্রী পুরুষের যোগ্য বয়সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করা; দ্বিতীয়, স্ত্রীপুত্র ভরণপোষণের সামর্থ্য বুঝে দারপরিগ্রহ করা।

অপ্রাপ্ত বয়স্কের কথা ছেড়ে দিলে, বিবাহ বিষয়ে স্ত্রী পুরুষের স্বাধীন অধিকার সমান থাকা উচিত। পুরুষেরা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের উচ্চ উপদেশ দিতে বিলক্ষণ পটু কিন্তু আপনাদের বেলায় কি করেন? উপদেষ্টাগণ বিধবার ব্রহ্মচর্য্য যতই সমর্থন করুন না কেন, তাঁরা যখন নিজেদের বেলায় মৃতপত্নীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে নববধূর পাণিগ্রহণে একটুও ইতস্ততঃ করেন না, তখন তাঁদের কথার মূল্য কি? স্ত্রী পুরুষের ব্রহ্মচর্য্যে কি বিধাতানির্দ্দিষ্ট এতই প্রভেদ?

বোম্বায়ে সাধারণ হিন্দুসমাজ যে বিধবা বিবাহের বিরোধী তা নয়। এমন অনেক জাতি আছে যাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের অনুকরণশীল জাতিবর্গেই এই বিবাহ নিষিদ্ধ। এই নিষেধের আনুষঙ্গিক এক ভয়ানক কুপ্রথা আবহমান কাল চলে আসছে—সে কি না বিধবার মস্তক-মুণ্ডন। বঙ্গবিধবাদের অনেকগুলি কঠোর নিয়ম পালন করতে হয়, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তার উপর শিরোমুণ্ডন অবশ্যকর্ত্তব্য নহে।

এই প্রসঙ্গে অপ্রৌঢ়া বালিকাদের প্রতি আর এক প্রকার অত্যাচারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বোম্বাই প্রদেশে 'নায়িকা' নামে একদল বারাঙ্গনা আছে (অন্য নাম দেবদাসী), তারা দেবমন্দিরে নর্ত্তকী রূপে নিযুক্ত। তাদের বিবাহ হয় না। এই কার্য্যে দীক্ষিত হবার একটা বিশেষ অনুষ্ঠান আছে তাকে বলে 'সেজ'। সে অনুষ্ঠান বিবাহের ভড়ং মাত্র। বরের ঠিকানায় একটা খড়্গ রাখা হয়, তার উপর ফুলের মালা সাজিয়ে পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে ও বালিকা তাকে পতিত্বে বরণ করে। সেই অবধি দেবতার কার্য্যে ও আনুষঙ্গিক অকার্য্যে তার জীবন উৎসর্গীকৃত হয়। দেশাচার যাই হোক্, যারা কিশোরবয়স্ক বালিকাদের মতিভ্রষ্ট ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হতে বাধ্য করে তাদের বিধিমতে দণ্ডনীয় হওয়া উচিত, তার আর কোন সন্দেহ নেই। এই অত্যাচার নিবারণ-উদ্দেশে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় যে নূতন আইন প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব উঠেছে তা আমার মতে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ ক'রে যাঁরা হিন্দুধর্ম্মের দোহাই দিয়ে চীৎকার আরম্ভ করেছেন তারা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম্মের কলঙ্ক রটনা করেছেন।

আমি দেখতে পাই দক্ষিণে জাতিভেদের নিয়ম নিরতিশয় কঠোর, আমাদের জাতীয় একতা-বন্ধনের পথে বিষম কণ্টক! এক এক জাতির ভিতরে যে কতগুলি শাখা তার অন্ত নেই। এক ব্রাহ্মণবর্ণ স্থান ভেদে তার মধ্যে কত শাখা ভেদ, এমন কি নদীর এপার ওপার হলে পরস্পর আদান প্রদান বন্ধ। তাদের পরস্পর পান ভোজন চলে কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধ হয় না, আমাদের রাঢ়ী বারেন্দ্র যেমন। জাতীয় শিকড়ের চেয়ে ঘটনার স্রোত বলবত্তর। তাই দেখা যায় তার ভাঙ্গন-দশা আরম্ভ হয়েছে। শৌচাশৌচ বিচার, ভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর প্রীতিভোজন ইত্যাদি অনেক বিচারে আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা কুসংস্কারবর্জ্জিত, স্বীকার করতেই হবে। বিচারের সঙ্গে সঙ্গে আচারের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কতকগুলি বাহিরের ঘটনাও এই পরিবর্ত্তনের অনুকূল। অন্ত্যজ জাতি-সমস্যার প্রতি আমাদের কৃতবিদ্য যুবকদের মন পড়েছে, এ একটা শুভলক্ষণ বলতে হবে। আমরা আমাদের রাজপুরুষদের সমকক্ষ হবার জন্যে চীৎকার ক'রে আকাশ ফাটিয়ে তুলছি কিন্তু আমাদের ভাইদের মধ্যে যে অসংখ্য লোক হিন্দুসমাজের পদদলিত ঘৃণিত ত্যাজ্য পুত্র হয়ে পড়েছে তাদের প্রতি একবার ভ্রূক্ষেপও করি না, একি সামান্য লাঞ্ছনার বিষয়? এই হীন জাতির উদ্ধারের জন্যে আর্য্যসমাজের উদ্যমশীলতা দেখে আশ্বাস হচ্ছে যে এখনো আমাদের প্রাণ আছে; এই সাধু দৃষ্টান্তে যদি সমগ্র হিন্দু-সমাজ জাগরিত হয়ে এই-সকল দীনহীন পতিত সন্তানদের স্বীয় ক্রোড়ে স্থানদান করতে প্রস্তুত হ'ন, তবেই দেশের মঙ্গল; নতুবা বলতে হবে আমাদের সমাজ আত্মশ্লাঘা করে আত্মঘাতী হতে চলেছেন, তাঁর অধঃপাতের আর বিলম্ব নেই। আর একটা দৃষ্টান্ত

বলি সমুদ্রযাত্রা। বিলাতযাত্রা, আগেকার কালে কি ভয়ানক ব্যাপার ছিল, আর এখন অপেক্ষাকৃত কত সহজ হয়ে এসেছে। এখন জাতে উঠতে একটা লোক-দেখানো প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু ভেবে দেখলে এই ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত নেওয়াটাই হীনতা স্বীকার। পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত—তার একটা অর্থ আছে; কিন্তু বিনা দোষে লোক-দেখানো প্রায়শ্চিত্ত, য়ুরোপ প্রবাসের পাপকলঙ্ক ধুয়ে ফেলবার জন্যে সমাজের খাতিরে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করা—এতে কি আপনার কাছে আপনাকে খাটো করা হয় না? এ কি সত্যনিষ্ঠ সাহসী পুরুষের কার্য্য?

এই বিদেশ ভ্রমণে ব্যক্তিগত যা-কিছু উপকার হচ্চে, এর ফলভোগী যে সমাজ, কে না স্বীকার করবে? বিদেশ ভ্রমণে আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়, আমরা য়ুরোপীয় সমাজ থেকে নূতন রীতি-নীতি, নূতন সমাজতন্ত্র—সাম্য স্বাধীনতা একতা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আসি। অল্প লোকের মনোগত ভাব-তরঙ্গ ক্রমে দূরে দূরে বিস্তৃত হয়ে পড়ছে।

এই পূর্ব্বপশ্চিমের যোগে, নবীন প্রাচীনের সঙ্ঘর্ষে আমাদের সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে। এই সঙ্ঘর্ষের ফলে সকলি যে ভাল সকলি উন্নতি হচ্ছে তা বলা যায় না; ভালর সঙ্গে মন্দও প্রসূত হচ্ছে মানতেই হবে। আমাদের জীবন কতকটা দ্বিধাভিন্ন হয়ে যাচ্ছে—ঘরে এক বাইরে এক;—নকলের যে-সমস্ত কুফল, কতকটা কৃত্রিমতা এসে পড়ছে—আমাদের মধ্যে য়ুরোপ-সমাজের বিলাসিতা কতকটা প্রবেশ করছে। সে যাই হোক্, মোটের উপর বলা যেতে পারে এই ভাল-মন্দর ভিতর দিয়ে আমাদের সমাজ পরিবর্ত্তন ও উন্নতির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। পুরাকালে ভারতবর্ষ আপনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর বদ্ধ থেকে জাতিভেদের দুর্দ্ধর্ষ প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন; একালে আমরা নূতন শিক্ষা দীক্ষা লাভ করে সেই প্রাচীর ভাঙবার পন্থা অন্বেষণ করছি কিন্তু ভাঙ্গা কি অসামান্য কঠিন ব্যাপার!

শিক্ষিতমণ্ডলী হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট; সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা তাঁহাদের অনেকেরই মনে জাজ্বল্যমান, কিন্তু কি উপায়ে তাহা সাধিত হবে সে বিষয় নিয়েই মতভেদ। কাহারো মত এই যে জোর জবরদস্তি করে জাতিবন্ধন ছিন্ন করে ফেল—সামাজিক কুরীতি কুসংস্কার উৎপাটন কর। তদপেক্ষা শান্ত ও দূরদর্শী লোকেরা বলেন জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষা দ্বারা আগে লোকের মনকে প্রস্তুত কর, তা হলে সমাজসংস্কার আসতে কালবিলম্ব হবে না। অন্য কথায়, তাঁহাদের মতে ধর্ম্মসংস্কারের সোপান দিয়ে সমাজ-সংস্কারে আরোহণ করাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

আত্মা ও মন সম্বন্ধে শারীরবিধান শাস্ত্রের মত—

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—

গীতায় একটী শ্লোক আছে:

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি যে বুদ্ধে পরতস্তু সঃ॥৪২।৩।

দেহ হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধিরও পরে যিনি সেই আত্মা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বর্ত্তমান যুগের শারীরবিধান বিদ্যার সাহায্যে এই শ্লোকটি সুন্দররূপে বুঝা যায়।

মানব ও অন্যান্য সকল জীবই এক একটী ক্ষুদ্র কোষরূপে জীবন আরম্ভ করে। সেই আদি কোষটী মাতৃদেহজাত একটী কোষ (cell) ও পিতৃদেহজাত একটী কোষ এই দুইটীতে মিলিয়া সংগঠিত হয়। এই আদি কোষটী জীবদেহ সংগঠন-কালে বিভক্ত হইয়া দুইটীতে পরিণত হয় এবং সেই দুইটী আকারে বাড়িয়া পুনরায় বিভক্ত হইয়া চারিটীতে পরিণত হয়। এইরূপে উহা সংখ্যায় বাড়িতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে সেই-সকল কোষ ভিন্ন ভিন্ন রূপে সাজাইয়া শরীরের অবয়বসমূহকে গঠন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহ, চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়-সমূহ এবং বুদ্ধি ও মনের যন্ত্র মস্তিষ্ক নির্ম্মিত হয়।

যে আদি কোষ (embryonic cell) হইতে মানবদেহ নির্ম্মিত হয় তাহাতে মস্তিষ্ক নাই, ইন্দ্রিয়গণ নাই, কাজেই উহার মন বা বুদ্ধি নাই বলিতে হইবে। অতএব মন ও বুদ্ধি আত্মা নহে। ঐ কোষের অভ্যন্তরে এক অদ্ভুত শক্তি নিহিত আছে উহা তৎপ্রভাবে নিজের মন ও বুদ্ধির যন্ত্র প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। যে আদি কোষ হইতে মানব নির্ম্মিত হয় এবং যাহা হইতে কুকুর জন্মে তাহাদের উভয়কেই দেখিতে ঠিক একরূপ অথচ উহাদের একটী হইতে মানুষ হয় ও অপরটী হইতে কুকুর জন্মে। এই যে এক নির্দ্দেশক শক্তি যাহা ঐ কোষের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকিয়া উহার কোষগুলির বিভাগ ও বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে, নিজের উপযোগী হস্ত, পদ, দেহ, মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয় গঠন করিয়া লয়, সেই দুর্জ্ঞেয় শক্তিই কি উপনিষদের "আত্মা"?

মস্তিষ্ক যে মন ও বুদ্ধির যন্ত্র শারীরবিজ্ঞান শাস্ত্র তাহা ভূরি ভূরি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে। মস্তিষ্কের (Brain) অংশবিশেষকে উৎপাটিত করিলে খুব সহৃদয় ব্যক্তিকেও দয়াহীনে পরিণত করা যায়। কিম্বা মস্তিষ্কের উপর ঔষধের প্রয়োগ দ্বারা স্বভাবের সৎপ্রবৃত্তি পরিবর্তন করা যায়।

মস্তিষ্কের কোন কোনও স্থানকে অনুভূতির স্থান (Sensory) ও কোন কোন স্থানকে বুদ্ধির স্থান (Psychic) নাম দেওয়া হইয়াছে। যেমন মাথার পশ্চাৎদিকে অবস্থিত দৃষ্টির অনুভূতির স্থান (Visuo-Sensory area) ও উহার চারি পাশে কিয়দ্দূর ধরিয়া দৃষ্টিজনিত বুদ্ধির স্থান (Visuo-Psychic area)।

বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের দ্বারা আরও স্পষ্টীভূত হইবে। একজন ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতেছে, এমন সময় তাহার ঘরে তাহার ছেলেটী প্রবেশ করিয়া তাহাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিল। সে অন্যমনস্ক, কাজেই ছেলের আগমন ও তাহার কথা শুনিতে পাইল না। এখানে 'বিষয়' (শব্দ ও মূর্ত্তি) এবং চক্ষু কর্ণ আদি ইন্দ্রিয়, উভয়ই বিদ্যমান, তথাচ সে ব্যক্তির মনে কিছুই অনুভূত হইল না। একটু ডাকাডাকির পরে তাহার চমক ভাঙ্গিল। মনে হইল একটী শব্দ ও একটী মূর্ত্তি নিকটেই আছে। ইহা মনের দ্বারা অনুভূতি,—অর্থাৎ Visuo-sensory এবং auditory-sensory area-র কার্য্য।

তারপর তাহার একটু বেশী মনোযোগ পড়িল, তখন মনে হইল এ মূর্ত্তি ও শব্দ তাহার জানা—তাহারই পুত্রের মূর্ত্তি ও তাহারই কণ্ঠস্বর! ইহা বুদ্ধির কার্য্য। অর্থাৎ Visuo-psychic এবং auditory-psychic area-র কার্য্য।

অতএব বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য বুঝা গেল।

কিন্তু এই তিনেরই অন্তরালে আর এক শক্তি কার্য্য করিতেছে—

যাহা ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে, মনকে মনের কার্য্যে এবং বুদ্ধিকে বুদ্ধির কার্য্যে প্রযুক্ত করিতেছে।*

এই শক্তি কে?

তিনিই আত্মা!

পাটলিপুত্র খননের বিবরণ — শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার—

চৈনিক পরিব্রাজকগণের বর্ণনা দৃষ্টে, এবং ডাক্তার ওয়াডেল, ও পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়দিগের কার্য্যাবলী কতকাংশে অনুসরণ করিয়া ডাক্তার স্পুনার গত বৎসর কুমড়াহার ও বুলন্দিবাগ নামক দুইটী স্থানে খনন আরম্ভ করেন। কুমড়াহারের সন্নিকটেই ডাক্তার ওয়াডেল একটী অশোকস্তম্ভের কতকগুলি ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুলন্দিবাগ কুমড়াহারেরই উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে ডাক্তার ওয়াডেল অশোকস্তম্ভের শীর্ষদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে, অশোক বর্ত্তমান কুমড়াহার নামক স্থানে প্রায় একশতটী স্তম্ভে সুশোভিত একটী বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করেন। অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই হল বা গৃহ রাজচক্রবর্ত্তীর রাজপ্রাসাদসংলগ্ন ছিল অথবা তাহারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই স্তম্ভগুলির নিম্নদেশ ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং উচ্চে ইহারা অন্ততঃ ২০ ফুটের কম নহে। পূর্ব্বপশ্চিমে পঞ্চদশ ফুটের ব্যবধান রাখিয়া তাহাদিগকে স্থাপিত করা হইয়াছিল। পার্সিপোলিসে যে শতস্তম্ভ হলের চিত্র দেখা যায়, তাহার সহিত কুমড়াহারের এই হলের বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই স্তম্ভগুলির উর্দ্ধদেশে সুবৃহৎ শালকাষ্ঠের গাঁথুনি (superstructure) ছিল। এবং ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, এই স্তম্ভগুলির উপরে কোন প্রকার কারুকার্য্যখচিত শীর্ষদেশ (Capital) ছিল না। যাহাতে স্তম্ভ ও উর্দ্ধস্থ কাষ্ঠগুলি স্থানচ্যুত না হয়, তজ্জন্য ধাতুনির্ম্মিত গোলাকার দণ্ড বা অর্গল ব্যবহৃত হইয়াছিল। এগুলি খুব সম্ভব তাম্রনির্ম্মিত ছিল। শালকাষ্ঠগুলিকে একটী অপরের সহিত সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রাখিবার জন্য সুবৃহৎ কীলক সমূহ ব্যবহৃত হইয়াছিল। স্তম্ভমূল ও গৃহতল কাঠের ছিল এবং বর্ত্তমান কালের মৃত্তিকার সপ্তদশ ফুট নিম্নে অবস্থিত ছিল। এই গৃহ ধর্ম্মোদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত বহু মুর্ত্তি ছিল।

সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই স্থান ও গৃহ জলপ্লাবিত হয় এবং সেই প্লাবনে গৃহতল ৮।৯ ফুট কর্দ্দম ও বালুকায় আবৃত হয়। সম্পূর্ণ কর্দ্দমাবৃত হইবার পূর্ব্বে একটী স্তম্ভ ভূমিসাৎ হয়। প্লাবনে অন্যান্য স্তম্ভগুলির ক্ষতি হয় নাই। তাহারা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াই ছিল। এই অবস্থায় কিছুদিন থাকিবার পরে হল অগ্নিদগ্ধ হয়। অগ্নিতে স্তম্ভের উপরস্থ কাষ্ঠ সমুদায় ভস্মীভূত হইয়া ভস্ম স্তূপে পরিণত হয়। যে-সকল তাম্রকীলকের সাহায্যে কাষ্ঠগুলি প্রস্তরস্তম্ভের সহিত গ্রথিত ছিল, সেই কীলকগুলি অগ্নিতাপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভগুলি চূরমার হইয়া যায়। সেইজন্য স্তম্ভগুলির উর্দ্ধাংশ যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়াছিল, নিম্নাংশগুলি সেরূপ হয় নাই। উর্দ্ধাংশের সহিতই কাষ্ঠখণ্ডগুলি কীলক সহযোগে আবদ্ধ ছিল বলিয়াই এরূপ ঘটিয়াছিল। তৎপরে, এইস্থানে গুপ্তরাজগণের সময়ে ইষ্টকের গৃহ নির্ম্মিত হয়। গুপ্তরাজগণের সময়ে যে-সকল গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাও অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, স্তম্ভের নিম্নস্থ কাষ্ঠমঞ্চগুলি দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল; এদিকে বহুদিন পূর্ব্বে যে জলপ্লাবন হইয়াছিল, তাহাতে কাষ্ঠমঞ্চের নিম্নস্থ ভূমিও নরম হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং যে-কয়েকটি স্তম্ভ মৃত্তিকাভ্যন্তরে থাকার জন্য দণ্ডায়মানাবস্থায় ছিল, তাহারা অনেক পরিমাণে আশ্রয়হীন হওয়াতে ক্রমে ক্রমে আরও গভীর মৃত্তিকাগর্ভে প্রবেশ করিতে থাকে। এই-সকল স্তম্ভের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকাগর্ভে বৃত্তাকার গর্ত্ত হইতে থাকে এবং উর্দ্ধস্থ প্রস্তরখণ্ড ও ভস্ম এই গর্ত্তগুলি পূর্ণ করে। স্তম্ভের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তরাজগণের সময়কার ইষ্টক-গৃহেরও অধোগতি হইতে থাকে। তৎপরে, অনেকদিন আর এইস্থানে কোন গৃহাদি নির্ম্মিত হয় নাই।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্শনীয় দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি ত্রিরত্ন পাওয়া গিয়াছে—ইহার নিম্নদেশে ধর্ম্মচক্র রহিয়াছে। ভ, দ এবং ড উৎকীর্ণ একখানি প্রস্তরের ক্ষুদ্র খণ্ড পাওয়া গিয়াছে। একটি বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির বক্ষস্থলের অংশ পাওয়া গিয়াছে। ইহা "মথুরা প্রস্তরে" নির্ম্মিত। এ মূর্ত্তিটী যে সুবৃহৎ ছিল তাহা এই ক্ষুদ্রাংশ হইতেই অনুমান করা যায়। একটি বুদ্ধমূর্ত্তির মস্তকও পাওয়া গিয়াছে। আরও, কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে—সংখ্যায় ৬৯টী। ইন্দ্রমিত্রের একটী মুদ্রা ও কণিষ্কের দুইটী তাম্রমুদ্রা উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৭৫-৪১৩) একটী মুদ্রাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশটী মোহর (Seal) আবিষ্কৃত হইয়াছে। অষ্টাদশফুট মৃত্তিকাগর্ভে ত্রিশূল-চিহ্নিত একটী মোহর ও গোপাল নামক একজনের একটি মোহর পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ এই শেষোক্ত মোহর সুঙ্গরাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে স্থানে কাষ্ঠমঞ্চ রহিয়াছে সেই মঞ্চের সন্নিকটে একটী গর্ত্তে কয়েকটী অটুট মৃত্তিকাপাত্র পাওয়া গিয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজকগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, অশোকের প্রাসাদাদি দৈত্যগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল—কেননা উহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত ছিল। আজ একজন ইংরেজও সেই কথার পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছেন "When one considers the difficulty of getting out these large columns from small pits with all our modern day appliances, it makes one wonder how the stones were brought to the place from several hundred miles away and erected over 2000 years ago."

১৯১৩ সনের ৬ই জানুয়ারী প্রথম কার্য্যারম্ভ হয় এবং গত বৎসরে সর্ব্বসুদ্ধ ১৯,০০০ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৫,০০০ মনস্বী টাটার তহবিল হইতে প্রদত্ত ও বাকী ৪০০০ গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন। চম্পারণে দুইটী স্তম্ভ স্থানান্তরিত করিতে ১০,০০০ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে; সুতরাং সে হিসাবে অল্পব্যয়েই গত বৎসরের কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

---

* কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ পততি প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেব যুনক্তি।

জব্বলপুর ও গঢ়ামণ্ডলা

(জব্বলপুর বাঙ্গালা লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।)

ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মধ্যদেশে 'মধ্যপ্রদেশ' নামক বিস্তৃত ভূভাগ দৃষ্ট হইবে।

'জব্বলপুর' জেলা এই 'মধ্যপ্রদেশে'র উত্তরাংশে অবস্থিত। 'জব্বলপুর' এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকের মতে 'জবল' আরবী ভাষায় প্রস্তরকে বলে, ও সংস্কৃত পুর অর্থে নগর। আরবী ও সংস্কৃত ভাষার এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ মুসলমান অধিকারের পরই হওয়া সম্ভব। পুরাতন শিলালিপিতে ও গ্রন্থে 'জাবালী-পত্তন' বা 'জউলী' এই নাম পাওয়া যায়। 'জাবালী' এক ঋষি ছিলেন। তিনিই হয় ত আর্য্য-সভ্যতা প্রথমে এই প্রদেশে প্রচার করেন। তিনি এই প্রদেশে তপস্যা করিতে আসিয়াছিলেন। 'অগস্ত্য' ঋষির ন্যায় ইনিও sage, poet, philosopher, geographer, explorer ও coloniser একাধারে সবই ছিলেন। তাঁহার সময় নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে মেজর কানিঙ্‌হামের মতে "Javali was a Brahman priest and held sceptical philosophical opinions. His followers were not allowed to live in the king's capital and consequently settled down here and named the place after their leader." অর্থাৎ 'জাবালী' ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও ঘোর সংশয়বাদী ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ রাজধানীতে থাকিবার অধিকারে বঞ্চিত হইয়া এই প্রদেশে বাস করে। সেই হইতে ইহার নাম হইল 'জাবালী-পত্তন'। কানিঙ্‌হামের এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার ভিত্তি কি তাহা জানিতে পারিলে আমরা ইহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে আরও অধিক নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম; কোন্ রাজার সময় 'জাবালী' ঋষি বর্ত্তমান ছিলেন তাহাও স্থির হয় নাই। তবে এ নামটী যে অতি পুরাতন তাহাতে সন্দেহ নাই।

'জব্বলপুর' একটী ডিভিজন্, একটী জেলা ও একটী নগরের নাম। 'জব্বলপুর ডিভিজন' ৫টী জেলা লইয়া গঠিত, যথা, 'সাগর', 'দামোহ,' 'সিউনি,' 'মণ্ডলা,' ও 'জব্বলপুর'। প্রত্যেক জেলা এক একজন ডেপুটী কমিশনার দ্বারা ও ডিভিজন্ একজন কমিশনার দ্বারা শাসিত হয়। এইরূপ ৪টী ডিভিজন লইয়া 'মধ্যপ্রদেশ' গঠিত ও সমগ্র প্রদেশ একজন চিফ্ কমিশনার দ্বারা শাসিত হয়।

নর্ম্মদা-জলপ্রপাত (ধুঁয়াধার)। জব্বলপুর হইতে ১৩ মাইল দূরে ভৃগুক্ষেত্র বা ভেড়াঘাট নামক স্থানে।
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চন্দ্র বি-এস-সি কর্তৃক এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে।

'জব্বলপুর' জেলা পূর্ব্বে তিনটী 'তহসীলে' বিভক্ত ছিল, যথা, 'জব্বলপুর,' 'সিহোরা,' ও 'মুরওয়াড়া'। এক একটী 'তহসীল' এক একজন 'তহসীলদার' দ্বারা শাসিত হয়। প্রায় এক বৎসর হইল 'জব্বলপুর তহসীলকে' দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা, 'জব্বলপুর' ও 'পাটন'। এখন সর্ব্বসমেত ৪টী তহসীল। এই জেলা একজন ডেপুটী কমিশনার দ্বারা শাসিত হয়।

'জব্বলপুর' নগর বা সহর, একটী সমৃদ্ধিশালী জনপদ।
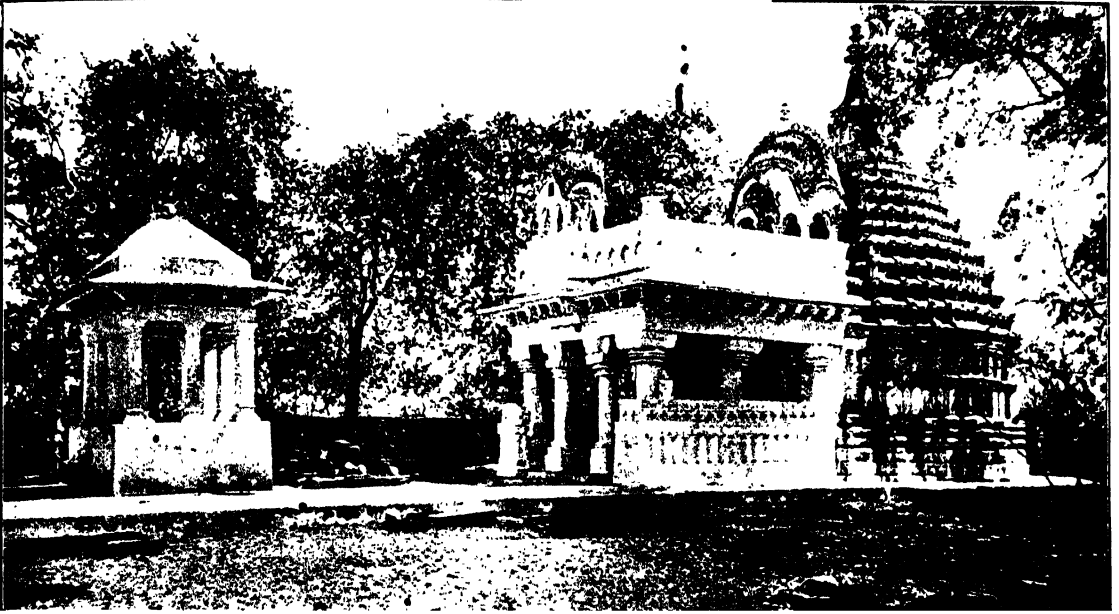
মদনমহল পর্ব্বত-শিখরে গৌরীশঙ্করের মন্দির।
১১৫৬ খৃষ্টাব্দে কলচুরী বংশীয়া রাণী অল্হন দেবী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। উপরে উঠিবার ১০৮ সিঁড়ি আছে। মন্দিরের ভিতর দেওয়ালের চারি পার্শ্বে চৌষট্টি যোগিনীর ও অন্যান্য দেবদেবীর লইয়া মোট ৮১টি মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। মূর্ত্তিগুলি মুসলমান-অত্যাচারে এখন অর্দ্ধভগ্ন।
এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

মধ্যপ্রদেশের মধ্যে রাজধানী 'নাগপুরের' পরেই ইহার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। এই স্থানটী অতি সুরক্ষিত ও চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত। গোঁড় রাজাদিগের সময় এই নগরের অস্তিত্ব জ্ঞাত ছিল না। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই নগর ১৭৮১ সালে প্রসিদ্ধ করেন। বর্ত্তমান 'মলোনিগঞ্জের' নিকট কোথাও—সম্ভবতঃ 'কোতোয়ালী'র নিকট তাঁহাদের কেল্লা ছিল। সমস্ত নগর 'পরকোটা' * নামক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। উত্তর দিক্ রক্ষার জন্য কাট্‌রার নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর তোপ থাকিত। 'দামোহের' দিকে ও 'গড়া'র দিকে উচ্চ প্রাচীরবিশিষ্ট ফাটকের উপর তোপ থাকিত। এখন নগর প্রাচীর ও কেল্লার চিহ্নমাত্রও নাই। কেবল 'গড়া ফাটক' ও 'কমানিয়া ফাটক' পুরাতন কাহিনীর সাক্ষ্যদান করিতেছে।

* নগর প্রাচীর, rampart.

'জব্বলপুরের' ৫ মাইল দক্ষিণে পুণ্যসলিলা 'নর্ম্মদা' নদী প্রবাহিতা। 'টলেমীয়' ভূগোলে 'নর্ম্মদার' নাম Namandos পাওয়া যায়। Periplus ইহাকে Namnadios বলেন। একদিক্ হইতে 'গৌরনদী' ও কিছু দূরে অপর দিক্ হইতে 'হিরণ' নদী নর্ম্মদার সহিত মিলিত হইয়াছে। পুরাণে নর্ম্মদার আর একটী নাম 'রেবা নদী' বা 'রুদ্রনদী' (রৌদ্রসম্ভবা)। অতি রুদ্র বেগে ধাবিত বা পতিত হয় বলিয়া বোধ হয় এই নাম, 'কাশীখণ্ডে' যেরূপ 'কাশীধামের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, সেইরূপ স্কন্দ পুরাণান্তর্গত 'রেবাখণ্ড' নামক পুঁথিতে নর্ম্মদার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ভারতবর্ষের পুণ্যতোয়া নদীগুলির মধ্যে গঙ্গার পরেই নর্ম্মদার পদ। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমাদের শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে এক সময়ে গঙ্গা-মাহাত্ম্য নর্ম্মদায় অর্শিবে এবং নর্ম্মদা মাহাত্ম্যে গঙ্গার স্থান অধিকার করিবে। নর্ম্মদা-তীরে 'চাতুর্ম্মাস্য' ব্রত করা এবং নর্ম্মদা-ক্ষেত্রে অর্থাৎ

নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থান হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত প্রদক্ষিণ করা সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য নিয়ম। কাশীধামে সহস্র সহস্র ভক্ত শ্রোতৃবৃন্দকে যেরূপ ভক্তিভাবে 'কাশীখণ্ড' শ্রবণ করিতে দেখিয়াছি, সেইরূপ এখানেও 'নর্ম্মদাখণ্ড' (রেবাখণ্ড) পঠিত ও শ্রুত হয়। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় 'কাশীর' ন্যায় এখানে সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণের অভাব, সুতরাং এদেশে 'নর্ম্মদাখণ্ড' (রেবাখণ্ড) শ্রবণ করা কাশীতে 'কাশীখণ্ড' শ্রবণ করা অপেক্ষা অধিক পুণ্যের কাজ। 'গৌরনদী' পার্ব্বত্য নদী বলিয়া ইহার জল দ্রুতবেগে ধাবিত হয়। সেই জলের বেগে এখানে প্রায় ৫।৭ টা Watermill চালিত হয়। Watermillকে হিন্দিতে পনচক্কী বলে,—পানী অর্থে জল ও চক্কী অর্থে চাক্কী বা যাঁতা। বাঙ্গালায় ইহাকে জলযন্ত্র বা জলযাঁতা বলা যাইতে পারে। বোধ হয় ইহার কোনও পারিভাষিক নাম 'বাঙ্গালায়' নাই, কারণ বাঙ্গালা সমতল ভূমি, সেখানে এরূপ জলস্রোত হওয়া সম্ভব নহে। এই পনচক্কীগুলিতে গমই বেশীর ভাগ পেষা হয়। (আজকাল 'ভেড়াঘাটে'ও কয়েকটী জলযন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে)। গৌরনদী পাহাড় হইতে সমতল ভূমিতে নামিতে গিয়া দুই এক জায়গায় একতালা সমান উচ্চ জলপ্রপাত হইয়াছে। 'নর্ম্মদা' নদীতেও তিনটী এইরূপ জলপ্রপাত আছে। তাহার মধ্যে ধোঁয়াধার নামে প্রপাতটী সমাধিক প্রসিদ্ধ সে প্রপাতটী প্রায় ৩০ ফুট উপর হইতে পড়িতেছে। জব্বলপুর হইতে ইহা প্রায় ১৩ মাইল দূরে 'ভেড়াঘাট' নামক স্থানে অবস্থিত। সেখানে নদীর দুইধারে অত্যুচ্চ শ্বেতবর্ণের মর্ম্মর প্রস্তরের পাহাড়। ইহাই Marble Rocks নামে প্রসিদ্ধ। অনেক দূর দেশ হইতে, এমন কি য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে, বহুলোক ইহা দেখিবার নিমিত্ত আসেন, কেননা পৃথিবীর মধ্যে ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। ইহা অপেক্ষা সুন্দর জলপ্রপাত অনেক স্থানে আছে। আমেরিকার নায়াগ্রা প্রপাত, আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া প্রপাত ও নরওয়ের প্রপাতগুলি জগৎপ্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের কাবেরী প্রপাত ও আসামের প্রপাত ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ। কিন্তু মর্ম্মর প্রস্তরের পাহাড় ভেদ করিয়া নদী রাস্তা করিয়া লইয়াছে এবং নদীর দুই ধারে ১০০-১২৫ ফুট উচ্চ হস্তীদন্তের ন্যায় শ্বেত পাহাড় দেওয়ালের ন্যায় উঠিয়াছে, এরূপ দৃশ্য জব্বলপুর ছাড়া কোথাও আছে কি না সন্দেহ।

পিসনহারীর মঢ়িয়া। (জৈন মন্দির)।
২৫৩টি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে হয়। সম্মুখে ফটক ও উচ্চ গিরিশৃঙ্গে মন্দির অবস্থিত।
(এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে)

এখানেই ভৃগুমুনির আশ্রম ছিল, সেই জন্যই ইহার নাম ভৃগুক্ষেত্র; আধুনিক নাম 'ভেড়াঘাট,' ভৃগুক্ষেত্রের অপভ্রংশ মাত্র। দ্বাদশ শতাব্দীতে কুলচুরীবংশীয়া রাণী 'অহ্লন দেবী' কর্ত্তৃক স্থাপিত গৌরীশঙ্কর ও চৌষট্টি যোগিনীর একটি মন্দির পর্ব্বতশিখরে অবস্থিত; ইহাও এখানকার একটি প্রধান দর্শনযোগ্য জিনিষ। উপরে উঠিবার ১০৮টি সিঁড়ি আছে। দেওয়ালের চারিধারে চৌষট্টিটি যোগিনী-মূর্ত্তি, ও অন্যান্য মূর্ত্তি লইয়া সর্ব্বসমেত

বাদশা হালুইকরের মন্দির।
শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত গণেশজননীমূর্ত্তি সজীব বলিয়া ভ্রম হয়।
(এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে)।

৮১টি মূর্ত্তি বর্ত্তমান। সবগুলিই ভগ্ন, কেবল গৌরীশঙ্কর অখণ্ডিত।

নদীর স্রোতে আনীত অনেক প্রকার মূল্যবান প্রস্তর এখানে পাওয়া যায় ও তাহা হইতে সুদৃশ্য বোতাম ও চেন ইত্যাদি নির্ম্মিত হয়। এগুলি বেশীর ভাগ নর্ম্মদাগর্ভেই পাওয়া যায়।

জব্বলপুরের নিকট দিয়া যে নর্ম্মদা নদী প্রবাহিত হইয়াছে তাহার তীরে ছয়টি ঘাট সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। (১) ক্ষীরেণী ঘাট, (২ জিলেরী ঘাট, (৩) গোয়াড়ী ঘাট, (৪) তিলওয়ারা ঘাট, (৫) লমেটা ঘাট, (৬) ভেড়াঘাট। লমেটাঘাট ভেড়াঘাটের ৩ মাইল উপরের দিকে ও জব্বলপুর হইতে ১০ মাইল দূরে। এখানে অনেক পুরাতন মন্দির আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট অনুসন্ধান হয় নাই। Lameta formation ভারতবর্ষীয় ভূতত্ত্ববিদ্যার একটি প্রসিদ্ধ অধ্যায়।

জব্বলপুরের ভিন্ন ভিন্ন পাহাড়ের উপর ৪টি শিবের মন্দির ও একটি জৈন মন্দির আছে। এই জৈন মন্দির 'পিসনহারীর মঢ়িয়া' নামে প্রসিদ্ধ। একটি জৈন স্ত্রীলোক যাঁতায় গম ভাঙিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল তদ্দ্বারা সে পাহাড়ের উপর এই মন্দির ও মন্দিরে উঠিবার ২৫৩টি সিঁড়ী নির্ম্মাণ করায়। কথিত আছে যে মন্দির ও সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিতে প্রতিঘড়া জলের দাম দু পয়সা দিতে

গুপ্তেশ্বরের মন্দির।
পর্ব্বতবেষ্টিত গুপ্তেশ্বরের মন্দিরের গুহার ভিতরে অর্দ্ধলুক্কায়িত মহাদেবমূর্ত্তি ; সম্মুখে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত মহাদেবের মণ্ড অন্ধকারিত দেখা যাইতেছে।
(এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে)

হইয়াছিল। শিবের মন্দিরগুলির মধ্যে নর্ম্মদার গোয়ারী ঘাট যাইবার পথে বাদশা হালুইকরের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহার নির্ম্মাণ-প্রণালী অতি সুন্দর এবং এই মন্দিরে গণেশজননীর মূর্ত্তি এত সুন্দর যে সজীব বলিয়া ভ্রম হয়। মাতৃভাবের স্নিগ্ধতা এই মূর্ত্তিতে চরম পরাকাষ্ঠা পাইয়াছে। আলোকের অভাবে ফটোতে মূর্ত্তিটি কাল দেখাইতেছে কিন্তু ইহা শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের নির্ম্মিত ও দেখিতে অতি সুন্দর। পিসনহারীর মঢ়িয়ার সম্বন্ধে যেমন প্রবাদ আছে, বাদশা হালুইকরের মন্দির সম্বন্ধেও সেইরূপ একটি প্রবাদ আছে। বাদশা নামে এক হালুইকর (মিঠাইওয়ালা) স্বপ্নে আদেশ পায় যে নর্ম্মদার পথে একটি গুহায় গুপ্তধন প্রোথিত আছে, তাহা লইয়া তুমি গৌরীশঙ্করের মন্দির নির্ম্মাণ কর ; যতদিন মন্দিরের কাজ চলিবে ততদিন টাকা পাইবে ; কাজ বন্ধ হইলে আর টাকা পাইবে না। বাদশাহের জীবনকাল পর্য্যন্ত কাজ চলিল—মন্দির নির্ম্মাণ শেষ হইলেও একজন কামার, একজন ছুতার ও একজন মিস্ত্রী কোন-না-কোন কাজে নিযুক্ত থাকিত। বাদশাহের বংশধরগণ বাজে খরচ জানিয়া কাজ বন্ধ করে ও টাকা পাওয়াও বন্ধ হয়। গুপ্তেশ্বরের মন্দিরও অতি মনোরম স্থান। চারিদিকে পাহাড় দ্বারা এরূপ বেষ্টিত যে মন্দির পর্য্যন্ত না আসিলে মন্দির আছে কিনা জানা যায় না। একটি গুহার ভিতর মহাদেব অর্দ্ধলুক্কায়িত ভাবে বর্ত্তমান ; সেই জন্যই এই নামকরণ। এখন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

জব্বলপুরের আশে পাশে অনেকগুলি পুষ্করিণী আছে। এমন কি এস্থানটি এখনও 'বাহান্ন তালাও' নামে পরিচিত। পুষ্করিণীকে হিন্দীতে তলাও বলে। ইহার মধ্যে অনেক-গুলি ভরাট হইয়া গিয়াছে। যেগুলি বর্ত্তমান তাহাদের মধ্যে গঙ্গাসাগর, সংগ্রাম-সাগর, দেওতাল, রাণীতাল, ঠাকুরতাল সুপাতাল, চেরীতাল, হনুমানতাল ও আধার-তালই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। সংগ্রামসাগরের মধ্যে গোঁড় রাজাদের 'আমখাস' নামক গুপ্তমন্ত্রণা-গৃহ ছিল এখনো তাহার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। এতদ্ভিন্ন জব্বল-পুরের একটি সর্ব্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য—পাহাড়ের উপর গোঁড় রাজাদের ক্ষুদ্র প্রাসাদ ও দুর্গ। ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহা একখানি অখণ্ড প্রস্তরের উপর নির্ম্মিত। ইহাই রাণী দুর্গাবতীর শেষ যুদ্ধের স্থান। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

পিসনহারীর মন্দিরের নিকট মদনমহল অবস্থিত। ইহার চারি পাশ্বের দৃশ্য অদ্ভুত ধরণের। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড (boulders) এরূপ ভাবে চারিদিকে

দেওতাল।

একটি প্রসিদ্ধ পুষ্করিণী ও তীর্থস্থান, জব্বলপুর শহর হইতে ৫ মাইল দূরে। এখানে একটি মেলা হয় এবং সেই উপলক্ষ্যে স্কুল কলেজের ছুটি হইয়া থাকে।
(এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে)

ছড়ান রহিয়াছে যে দূর হইতে মনে হয় যেন অসংখ্য হস্তী দাঁড়াইয়া ও বসিয়া আছে। অনেকে অনুমান করেন যে অগ্ন্যুৎপাতে কোন প্রকাণ্ড পাহাড় ফাটিয়া এরূপ টুকরা টুকরা হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ভিতর বিশেষভাবে একটি পাথর এরূপভাবে আর একটির উপর মাত্র ৩ ইঞ্চি পরিমিত স্থানে ঠেকিয়া দাঁড়াইয়া আছে যে মনে হয় একটু ধাক্কা লাগিলেই পড়িয়া যাইবে, অথচ শত চেষ্টাতেও তাহাকে নড়ান যায় না। কত সহস্র বৎসর যে ইহা এইভাবে দাঁড়াইয়া আছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। বাদশা হালুইকরের মন্দির, গুপ্তেশ্বরের মন্দির, মদনমহল, সারদার মন্দির, দেওতাল, পিসনহারীর মন্দির, ও আমখাস এগুলি সব ৪।৫ মাইলের মধ্যেই অবস্থিত। সারদার মন্দির মদন-মহলের নিম্নে। এখানে শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবারে মেলা হয়। এগুলির প্রত্যেক স্থান হইতেই পারিপার্শ্বিক দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। জব্বলপুর সহর প্রাকৃতিক শোভার জন্য প্রসিদ্ধ। ইহার রাস্তা-ঘাটগুলিও অতি সুন্দর ও মনোরম। বিশেষতঃ জব্বলপুর জলের কলের রাস্তাটী অতি সুন্দর।

জব্বলপুর ভারতবর্ষের এরূপ মধ্যস্থলে অবস্থিত যে ইহাকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জব্বলপুর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলার ও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের সঙ্গমস্থল (junction)। এখানে একটী বড় জেলখানা ও একটী চরিত্র-সংশোধক স্কুল আছে। একটী কামান-বহা গাড়ীর কারখানা নির্ম্মিত হইয়াছে। জব্বলপুরকে সামরিক সদর (Military head-quarterএ) পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে। এখানে দুই দল দেশী পল্টন, দুই দল ইংরেজ পল্টন, একটী

তোপখানা ও এক দল দেশী অশ্বারোহী সেনা আছে। জেলার ও দায়রাবাবু আদালতও এখানে বর্ত্তমান। এখানে ৬টী উচ্চ স্কুল, একটী কলেজ ও একটী ট্রেনিং কলেজ আছে। অন্যান্য দ্রষ্টব্য দৃশ্যের মধ্যে 'ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতাল' ও 'টাউন হল' ও সাধারণী উদ্যান। সহরের জল সরবরাহের এক অভিনব উপায় আছে, সহরের ৭ মাইল

আমখাস।
সংগ্রামসাগর নামক পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে গোঁড়ারাজাদের গুপ্তমন্ত্রণা-গৃহ। ইহার উপরে ছাদ নাই, মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ আম গাছ ছাদের কাজ করিতেছে। ইহা অতি দুর্গম স্থান।
(এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে)।

দূরে পাহাড়-বেষ্টিত একটী নালা প্রকাণ্ড প্রাচীর দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিয়া তথা হইতে নল লাগাইয়া জল আনা হয়। স্থানটী অপেক্ষাকৃত উচ্চ হওয়ায় জল এখানকার দোতলা পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। এখানে একটী কাপড়ের কল, একটী ময়দার ও তেলের কল, দুইটী মদের কল, একটী বরফের কল ও দুইটী চীনে মাটির বাসনের কারখানা আছে। পূর্ব্বে এই স্থান খুব স্বাস্থ্যকর ছিল। এখনও নানাদেশ হইতে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক লোক এখানে আসিয়া থাকে কিন্তু এখন এখানে এক বৎসর অন্তর প্লেগ হইয়া থাকে, মাঝে মাঝে বসন্ত ও কলেরাও দেখা দেয়।

এই জেলার উত্তরে 'মৈহার' রাজ্য। ইহা Central India Agencyর অন্তর্গত। ঈশান দিকে 'পান্নারাজ্য'। পূর্ব্বদিকে 'বঘেলখণ্ড' বা 'রেবা' ষ্টেট। দক্ষিণ ও অগ্নি-কোণে 'মণ্ডলা জেলা'। এই জেলার ইতিহাস 'জব্বলপুরের' সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। ইহা পরে বিবৃত হইবে। দক্ষিণের কিছু অংশে 'সিউনি' জেলাও আসিয়া পড়ে। নৈঋত দিকে 'নরসিংহপুর' জেলা ও পশ্চিমদিকে 'দামোহ' জেলা। জব্বলপুর জেলা দুইটী প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড 'মৈহার' ষ্টেট হইতে 'নর্ম্মদা'-তীর পর্য্যন্ত 'উত্তরাখণ্ড অর্থাৎ 'আর্য্যাবর্ত্তের' অন্তর্গত। দ্বিতীয় খণ্ড 'নর্ম্মদার' দক্ষিণ হইতে 'মাণ্ডলা' ও 'সিউনি' পর্য্যন্ত। (এখানে বলা আবশ্যক যে নর্ম্মদা নদীই 'আর্য্যাবর্ত্ত' ও 'দাক্ষিণাত্যের' মধ্যে প্রাকৃতিক ব্যবধান)। ইহা আবার দুইটী প্রধান রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত। ১৮১৮ সালে শেষ 'মারাঠা' বিগ্রহে সীতাবল্দীর যুদ্ধের পর এই জেলার বৃহত্তর অংশ ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। দ্বিতীয় অংশ 'বিজরাঘোগড়' রাজত্ব সিপাহী-বিদ্রোহের পর কাড়িয়া লইয়া জব্বলপুরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখন ইহা 'কাটনি তহসীলে'র অন্তর্গত। 'সাতপুরা' ও 'বিন্ধ্য' পর্ব্বতের মধ্যে থাকায় 'জব্বলপুর' ভারতবর্ষের একটী প্রধান 'জলকর ভূমি' বলিয়া গণ্য। রেবা ষ্টেটে অমরকণ্টক পাহাড়ই নর্ম্মদা ও সোণের জন্মস্থান। উত্তরদিকে বিন্ধ্য পর্ব্বতের শাখা প্রশাখার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য 'ভাণের' ও 'কৈলব' পাহাড় ও দক্ষিণে 'সাতপুরা' পাহাড়।

সমুদ্রতল হইতে সমতলভূমির উচ্চতা ১২০০ হইতে ১৫০০ ফুটের মধ্যে। জব্বলপুর ষ্টেসন ১৩০৬ ফুট, 'মদন মহল' ১৫৪০ ফুট ও 'গোসলপুর' ১৫৭৪ ফুট উচ্চ। কোন কোন স্থল ২২০০ ফুট উচ্চ। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উচ্চতা 'কটঙ্গির' নিকট, ২৫০০ ফুট। নর্ম্মদাই এ জেলার

প্রধান নদী। জেলার ভিতর ইহার দৈর্ঘ্য ৭০ মাইল। 'গৌর' ও 'হিরণ' নর্ম্মদার শাখা-নদী। 'গৌর নদী' 'মাণ্ডলার' নিকট উৎপন্ন হইয়া জব্বলপুরে 'ক্ষীরেণী ঘাটে'র নিকট নর্ম্মদার সহিত মিলিত হইয়াছে। এখানেই বেঙ্গল-নাগপুর রেলের সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। 'হিরণ নদী' কুস্তমৃএ উৎপন্ন হইয়া ও কিছু দূর উত্তরে গিয়া পশ্চিমে হেলিয়া নর্ম্মদার সহিত মিলিত হইয়াছে। 'পরিয়ট' নদী 'হিরণের' শাখা-নদী। 'মহানদী' মাণ্ডালায় উৎপন্ন হইয়া উত্তরগামী হইয়া 'সোণ' নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। 'নিউয়ার' ও 'কাটনী' মহানদীর শাখা। এই 'মহানদী' কটকের প্রসিদ্ধ 'মহানদী' নয়। 'কেন্' আর একটি ছোট পার্ব্বত্য নদী।

১৮৬৯ সালে এখানে একটী বায়ু-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মানমন্দির' (Meteorological Observatory) ১৩৩৭ ফুট উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়। তাহার রিপোর্টে প্রকাশ যে গ্রীষ্মকালে মে মাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাপ ১০৫·৬° ডিগ্রি ও সর্ব্বাপেক্ষা কম ৭৮·৪° ডিগ্রি হইয়া থাকে। এখানে গ্রীষ্মকাল প্রায় মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হয় ও জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত থাকে। উত্তর ভারতের ন্যায় গ্রীষ্মাধিক্য এখানে নাই। 'লু' নামক গরম হাওয়া খুব বেশী চলে না। রাত্রে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা পড়ে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাপ ১৮৮৯ সালে হইয়াছিল ১১৪·৮° ও ১৯১১ সালে হইয়াছিল ১১৬°।

বর্ষাকাল প্রায় জুনমাস হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত থাকে। এই সময় সমস্ত দেশ সবুজ উদ্ভিদে আচ্ছন্ন হয়। নিদাঘ-তপ্ত শুষ্ক মরুভূমির পরেই এই হরিৎ শোভা বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক। জুনমাস হইতে আরম্ভ করিয়া সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। যদিও এখানে গমের চাষই বেশী হয় তথাপি অনেক স্থানে ধানের আবাদও হইয়া থাকে। সুতরাং এক বৎসরের বৃষ্টিপাতে সকল শস্যের উপকার হয় না। ফসলের পরিমাণ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপেক্ষা সাময়িক বণ্টনের উপর অধিক নির্ভর করে। বর্ষাকালের প্রারম্ভে যথেষ্ট জল, সেপ্টেম্বর মাসেও ভাল জল, অক্টোবর মাসে অল্পাধিক জল, ও ডিসেম্বর বা জানুয়ারী মাসে কয়েক পসলা জল হইলেই শস্য ভাল হয়। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বৃষ্টি না হইলে শরৎকালের শস্য নষ্ট হয়। ইহার পরে বৃষ্টি হইলে 'রবি'-শস্য ভাল হয়। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে অতিবৃষ্টি হইলে 'রবি'-শস্যের কোন হানি হয় না বটে কিন্তু পরবর্ত্তী 'রবি'-শস্যের অনিষ্ট হইয়া থাকে। যদি নভেম্বর মাসে ও শীতকালে বৃষ্টি

মদনমহল।
১১৩৬ খৃষ্টাব্দে গোঁড় রাজা মদন সিং কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গিরিদুর্গ. জব্বলপুরের ৪ মাইল পশ্চিমে। ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহা একখানি বৃহৎ অখণ্ড প্রস্তরের উপর নির্ম্মিত। আসফখাঁর সহিত রাণী দুর্গাবতীর শেষ যুদ্ধের স্থান।
(এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে)

হইতে থাকে তাহা হইলে পোকা লাগিয়া শস্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। কোন কোন স্থানে উচ্চ আল্ দিয়া ক্ষেত ঘিরিয়া জল জমা করা হয় ও অক্টোবর মাসে জল ছাড়িয়া দিয়া জমী চষিয়া বীজ বপন করা হয়। এই

উপায়ে অনাবৃষ্টি ক্ষতি করিতে পারে না। অক্টোবর মাসে ৪ ইঞ্চি জল না হইলেও ক্ষতি হয় না।

'জব্বলপুর', 'মুরওয়াড়া', 'সিহোরা,' 'বিজুরাঘোগড়' ও জলের কলে বৃষ্টিপরিমাণ-যন্ত্র আছে। জলের কলের যন্ত্রের হিসাবে বৃষ্টিপাত গড়ে ৫৯·৩৮ ইঞ্চি। ৪১ বৎসর ধরিয়া সমগ্র জেলার বৃষ্টিপাত গড়ে ৪৯·৫০ ইঞ্চি হইয়াছে।

এই দেশের প্রধান ফসল ও খাদ্য 'গম্'; ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। অন্যান্য ফসলের মধ্যে 'ছোলা', 'যব' ও 'ধান' প্রধান। 'জনার,' 'বাজ্‌রা,' 'কোদো', 'কুট্‌কি'ও যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। তৈলপ্রদ বীজের মধ্যে 'তিসি,' ও 'তিল' জন্মায়, 'সরিষা' দুষ্প্রাপ্য। 'মহুয়া'-বীজের তৈলও প্রচলিত আছে। 'রেড়ী'র চাষ নাই। কোথাও কোথাও আপনি জন্মিয়া থাকে। কেরোসিনের প্রচলনে ইহার আদর কমিয়াছে। ডালের মধ্যে 'মটর,' 'মসূরী,' 'অড়হর,' 'খেসারী', 'কড়াই' ও 'মুগ' প্রধান। 'আখ' ও 'কার্পাসের' চাষ, স্থানে স্থানে হয়। ইতর ফসল যথা 'শামা,' 'মাড়িয়া, 'কাকুন.' 'শণ,' 'পাট,' 'আম,' 'ঢেড়স্' বা 'ভিণ্ডি,' 'বেগুন,' 'রাঙ্গাআলু' (দুই প্রকার লাল ও শাদা), সাধারণ 'আলু,' অল্প পরিমাণে 'কচু,' প্রচুর পরিমাণে (পুষ্করিণীতে) 'পানফল' ও 'গাজর'।

নভেম্বর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত শীতকাল। ১৮৭৮ সালের ১৪শে ডিসেম্বরে তাপমান যন্ত্রের পারা ৩২·৩০ ডিগ্রি নামিয়াছিল। এরূপ ঠাণ্ডা আর কখনও পড়ে নাই। এখনও জানুয়ারী মাসে মৃৎপাত্রে জল বাহিরে রাখিলে রাত্রে জমিয়া যায়। দুর্গাপূজার পর হইতে দোল-যাত্রা পর্য্যন্ত জব্বলপুরের স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে (কখনও কখনও প্লেগ এই সময়ে দেখা দেয়)। নভেম্বর হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত নাকি ঠিক্ বিলাতের শরৎকালের ন্যায়। এই সময় বৃক্ষসকল পত্র ত্যাগ করে। সাহেবেরা জব্বল-পুরের জলবায়ু (বিশেষ শীতকালের) অত্যন্ত পছন্দ করে। অনেকেই অবসর গ্রহণের পর এখানেই বাস করিতেছে। প্রায় সকল সাহেবই, কি শাসনকর্ত্তা, কি ভ্রমণকারী, কি মিশনারী, সকলেই (The region of the Nerbudda valley) নর্ম্মদা-নদীতীরবর্ত্তী প্রদেশের জলবায়ুর শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। বর্ষাকালের মধ্যভাগ হইতে শীতকালের আরম্ভ পর্য্যন্ত এই স্থানটী একটু অস্বাস্থ্যকর থাকে। এ সময় জ্বর ও আমাশয় হইয়া থাকে।

কাষ্ঠনির্ম্মিত লৌহফলকবিশিষ্ট লাঙ্গল দ্বারা এখানে চাষ হয়—ইহাকে এদেশে 'হল' বা 'নাগর' বলে। 'বখর' (মই), 'পরেণা' (ডাঙ্গস্), বোধ হয় প্রেরণা শব্দের অপভ্রংশ। এখানে বলদে লাঙ্গল টানে না। লাঙ্গ-লের পিছন দিকে বাঁশের উপর একটী চোঙ বাঁধা থাকে; তাহার উপর একটী ছোট ফুটো 'ডালিয়া' বা বীজের ঝুড়িতে বীজ থাকে। লাঙ্গল যেমন চষিতে চষিতে অগ্রসর হয় তেমনি ফালের মধ্যে বীজ পড়িতে থাকে। অন্যান্য যন্ত্রের মধ্যে ঘাস নিড়াইবার জন্য ছোট কোদালি বা 'খুরপি', কাটিবার জন্য 'হাঁসিয়া' বা কাস্তে, মাটী কাটিবার জন্য 'ফাড়ুয়া'. বা কোদাল। আবর্জ্জনা জড় করিবার জন্য কাঠের (কুরাণীর বা চিরুণীর ন্যায়) 'পাঁচা'। ভুষো উড়াইবার জন্য 'ঝুড়ি', একটা 'তেপাই' ও একগাছি 'ঝাঁটা'।

গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ গ্রীষ্মকালে কোন চাষ হয় না। মাঠ ধূ ধূ করিতে থাকে। কেবল বাগানের তরী তরকারী (কূপ হইতে জল তুলিয়া) সিঞ্চিত হয়। নদী বা নালা হইতে জল দেওয়ার বিধি এ দেশে প্রচলিত নাই। গমের খেতে আল্ বাঁধিয়া জল ধরিয়া রাখা হয়, পরে জল বাহির করিয়া দিয়া বীজ বপন করা হয়। সম্প্রতি গবরমেণ্ট হইতে জল সেচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। উচ্চ-স্থানে যেখানে তিনদিকে পাহাড় ও একদিকে ঢালু, সেই ঢালু দিকে বাঁধ দিয়া বর্ষার জল রক্ষা করা হয়, পরে যেমন দরকার হয় নালা কাটিয়া খেতে জল সরবরাহ হয়।

চাষের জন্য 'বলদ' ও বর্ষাকালে 'মহিষ', দুগ্ধের জন্য 'মহিষ'; গাড়ীর জন্য 'বলদ' 'মহিষ' ও 'টাটু ঘোড়া'; লোম ও মাংসের জন্য 'ভেড়া'; মাংস ও দুগ্ধের জন্য 'পাঁটা' ও 'পাঁটী'; ক্ষেতরক্ষার জন্য 'গ্রাম্য কুকুর'; 'খচ্চর' ও 'গাধা' ধোপা ও ইটওয়ালাদের ভার বহনের জন্য, গৃহে পালিত হয়।

১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত ১৭ বৎসরের মধ্যে ৩১৫ জন লোক ও ২৮৭৯৮ গৃহপালিত পশু বন্য শ্বাপদ কর্ত্তৃক নষ্ট

হয়। 'বাঘ' 'চিতা' ও 'গুলবাঘ', হিংস্র জন্তুর মধ্যে প্রধান। সর্পাঘাতে ১৫৩৫ জন লোক মরিয়াছে।

বনজ সম্পত্তির মধ্যে প্রধান ইমারতি কাঠ। 'সাল' ও 'সেগুন' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য দামী কাঠ যথা 'ধরা', 'সেজা', 'সাজ', 'খয়ের', 'ঘোট', 'সলই', 'গাব', 'তিন্‌সা', 'বীজা', 'পলাশ', 'আঁমলকী', 'গুঞ্জা', 'আচার' (যাহার ফলে চিরঞ্জি-দানা হয়), 'মহুয়া', 'বাব্‌লা', করঞ্জা', 'হরিতকী', ও 'অর্জ্জুন'। জ্বালানি কাঠও যথেষ্ট পাওয়া যায়। ১৯০৬।১৯০৭ সালে ইমারতি কাঠ ৮৯০০ টাকার, জ্বালানি কাঠ ১৪৩০০ টাকার ও বাঁশ ৩৬০০ টাকার বিক্রয় হয়। কাঠ-কয়লা যথেষ্ট তৈয়ারী হয়। বাঁশের বন স্থানে স্থানে আছে। বাঁশের কয়লা কামারের কাজে লাগে। বাঁশ ঘর ছাইতে ও খোঁটা পুঁতিতে লাগে। সরকারী উন্মুক্ত ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ঘাস জন্মায়; সেই জমি গোচারণের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। বনজ সম্পত্তির মধ্যে অন্যতম 'লাক্ষা', 'মহুয়া', 'চার' (চিরঞ্জির ফল), 'গাব', 'হরিতকী', 'খয়ের', বনের মৃত পশুর চামড়া, 'গঁদ', 'মধু' ও 'মোম', 'লোহা', 'বন্য আমলকী', 'আম' ও 'জাম'। ১৯০৬।১৯০৭ সালে ফল, কাঠ, ও ঘাস বিক্রয় করিয়া ৫২১০০ টাকা গবর্ণমেণ্ট পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের মধ্যে 'মধ্য-প্রদেশে' যত প্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় বোধহয় অন্য প্রদেশে এত পাওয়া যায় না। আবার মধ্য-প্রদেশের মধ্যে জব্বলপুরই যেন খনিজ পদার্থের কেন্দ্রস্থল। কাট্‌নীর 'চুনের পাথর' ও 'সাজীমাটী', স্লোলির 'গিরিমাটী' ও জব্বলপুরের 'সাদা ছুই মাটী' এই কয়েকটী উপস্থিত অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। অন্যান্য খনিজের তালিকা :—

১। 'মূল্যবান্ প্রস্তর'—'Agate', 'Amethyst', 'Cornelian', 'Jasper', 'Mossagate', 'Onyx', 'Heliotrope', ও 'Rock crystal' —এগুলি নর্ম্মদাগর্ভে বিশেষতঃ ধুঁয়াধারের (জলপ্রপাত) নিকট পাওয়া যায়। দেশী কারিগরেরা এই সব প্রস্তরের উপর এমন সুন্দর পালিস্ করে যে নেল্‌সন সাহেব বলেন যে বিলাতী কারিগর ভাল কল ও যন্ত্র দিয়াও ইহার বেশী পারে না।

অল্পাশ্রিত প্রস্তর (Poised rock)।
উপরের বড় পাথরখানি নীচের পাথরের উপর মাত্র তিন ইঞ্চি স্থানে ভর করিয়াই অনড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।
(এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে)।

২। অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান প্রস্তর—ইমারতী ও অন্যান্য কারুকার্য্যোপযোগী প্রস্তর, কাট্‌নীর 'Laterite', ভেড়াঘাটের 'Dolomite' ও মারবেল, জব্বলপুরের বেলে পাথর ও কাট্‌নীর চুণো পাথর প্রধান। অন্যান্য প্রস্তর যথা—'Barytes', 'Felspar', 'Limestone', 'Flourspar', 'Quartz' 'Ochre', 'Soapstone', 'Road metal'.

৩। খনিজ 'মাটী' ও 'কয়লা'।

৪। ধাতু—'লোহা', 'সীসা', 'তামা', 'manganese', 'রূপা' ও 'সোনা'। 'Bauxite' বা এলুমিনিয়মের মূল প্রথমে মিঃ প. চ. দত্ত ব্যারিষ্টার পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ (analysis) দ্বারা আবিষ্কার করেন।

সমস্ত 'জব্বলপুর' ডিভিজনের' ক্ষেত্রফল ১৯০০৩ বর্গ-মাইল ও লোকসংখ্যা ২০৮১৯১৬। জেলার ক্ষেত্রফল ৩৯১২ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় ৭০০০০০। জব্বলপুর সহরের লোকসংখ্যা প্রায় ১০৭০০০। সমগ্র জেলার লোকসংখ্যা প্রতি-বর্গমাইলে গড়ে ১৭৪। জব্বলপুর তহসীলের লোকসংখ্যা প্রতি-বর্গমাইলে ২১৯ ও সহরের কোন কোন স্থানে বর্গমাইলে ৫০০। 'গোঁড়' রাজাদিগের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী 'গঢ়াতে' প্রতি-বর্গমাইলে ২১০ ও 'সিহোরা' Station house areaতে প্রতি-বর্গ-মাইলে ৩২৫।

গোঁড়েরাই এদেশের আদিম অধিবাসী এবং পূর্ব্বে এই প্রদেশে রাজত্ব করিত। কিন্তু বহু পুরাকাল হইতেই আর্য্য জাতি এদেশে আসিয়া বাস করেন। 'ব্রাহ্মণ', 'রাজপুত', 'বেণে', 'কায়স্থ', 'লোধী', 'কূর্ম্মী', 'কাছি', 'আহীর', ইহারা সকলেই উত্তর হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেছে। 'গোঁড়' ব্যতীত 'কোল', ও 'ভাড়িয়া', অনার্য্য জাতি। 'ভাট' ও 'যোশী' শনির শান্তি ও কবিতা পাঠ করিয়া বেড়ায়। 'হালুইকর', 'ভূঁজ্‌রী', 'দর্জ্জি' ও 'মেষপালক'; 'কচেরা' বা কাচের শিশি- ও চুড়ী-নির্ম্মাতা; 'লখেরা', বা লাক্ষার চুড়ী-নির্ম্মাতা, 'নাপিত', 'মল্লাহ', 'শিকারী' বা 'পার্‌ধী', 'খটিক্' বা 'কসাই', শূকরপালক 'পাসী', 'ধীবর' বা 'ঢীমর', ও 'চামার', 'কঞ্জড়', 'যোগীয়া', 'বেহেনা', 'কোষ্টা', প্রভৃতি ইতর জাতি। এই জেলায় শতকরা ৮৮ জন হিন্দু, শতকরা ৬ জন মুসলমান ও শতকরা ৫ জন অপদেবতা-উপাসক animists)। শতকরা ১ জন জৈন, পার্শী বা খৃষ্টান। জৈনদের সংখ্যা ৬১৭৭ ও খৃষ্টান ৩৬৮৮। হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষাই এ প্রদেশে সাধারণতঃ প্রচলিত।

জব্বলপুর হইতে ৬ মাইল দূরে ভেড়াঘাট যাইবার পথে 'তেউর' নামে এক গ্রাম আছে। কথিত আছে যে ইহা ত্রিপুরাসুরের রাজধানী ছিল। লমেটা ঘাটে 'ত্রিশূলভেদ' নামক স্থান এখনও পৌরাণিক প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া প্রদর্শিত হয় ('মহাদেবের ত্রিশূল 'ত্রিপুরকে' ভেদ করিয়া পর্ব্বতে প্রোথিত হয় বলিয়া এই স্থানের নাম 'ত্রিশূল-ভেদ')। 'নর্ম্মদা-স্তোত্রে' শঙ্করাচার্য্য এই কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিয়াছেন। 'মহাভারত' পাঠে জানা যায় যে 'হৈহয়' বংশীয় রাজাগণ এই 'নার্ম্মদ' প্রদেশে রাজ্য করিতেন। 'স্কন্দ পুরাণে' পাওয়া যায় যে এই প্রদেশ অবন্তী রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ও উজ্জয়িনী ইহার রাজধানী ছিল। নটচূড়ামণি ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকে যে অবন্তীশ্বর দণ্ডীর কথা আছে, তিনি এই প্রদেশেরই রাজা ছিলেন। (ক্রমশ)

কুমারেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ধর্ম্মপাল

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জীর্ণ দেউল।

সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভাগীরথীর অবস্থা এত শোচনীয় ছিল না, ভাগীরথীর বক্ষে মরুভূমির ন্যায় বিস্তৃত বালুকারাশি বৎসরের মধ্যে নয় মাস ধূ ধূ করিত না, কারণ তখনও গঙ্গার জলরাশি ভাগীরথী দিয়াই বহিয়া আসিয়া মহাসমুদ্রের সহিত মিলিত হইত। তখন সমুদ্র-গামী পোতসমূহ এই ভাগীরথী দিয়া যাতায়াত করিত। আর্য্যাবর্ত্তের বাণিজ্য, গঙ্গা ও ভাগীরথী বক্ষে বহন করিয়া আনিয়া দেশ দেশান্তরে প্রেরণ করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন আকারের জলযানে নদীবক্ষ পরিপূর্ণ থাকিত। এখনও স্থানে স্থানে বালুকাস্তূপ খনন করিতে করিতে অর্ণবপোতের ধ্বংসাবশেষ বৃহদাকার লৌহশৃঙ্খল নঙ্গর প্রভৃতি পাওয়া যায়।

পদ্মার উৎপত্তিস্থানের অনতিদূরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে, সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে একটি প্রাচীন দেবমন্দির ছিল। বহু শত বৎসর পূর্ব্বে মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল; কালে তাহা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাতে যে দেবমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও বহুপূর্ব্বে অন্তর্হিত হইয়া-ছিল। মন্দিরের সম্মুখে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে মন্দিরের ভগ্ন চূড়ার উপরে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছিল। কাহার মন্দির, তাহাতে কোন্ দেবতা

প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা তখনও কেহ বলিতে পারিত না তথাপি মন্দিরটি দেশবিখ্যাত ছিল। গৌড় হইতে সপ্তগ্রামের পথে ইহা পথিকদিগের বিশ্রামের স্থান ছিল; গঙ্গা পার হইয়া এই মন্দির পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত, সেই জন্য পথিকগণ এই ভগ্ন মন্দিরে অথবা অশ্বত্থ-বৃক্ষের নিম্নে রাত্রিতে আশ্রয় লইত।

মন্দির-নিম্নে ভাগীরথী প্রবাহিত। প্রাচীন কালে মন্দির হইতে নদীগর্ভ পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী বিস্তৃত ছিল, কালবশে তাহাও জীর্ণ হইয়াছিল বটে কিন্তু তখনও ব্যবহারের যোগ্য ছিল। বহুদিন যাবৎ গৌড়ের পথে "ভাঙ্গা দেউল" পান্থগণের বিশ্রামস্থল ছিল, পরিবর্ত্তনশীলা ভাগীরথী কেন যে তাহা গ্রাস করেন নাই ইহাই লোকে আশ্চর্য্য ভাবিত। শত শত বৎসর পূর্ব্বে "ভাঙ্গা দেউল," অশ্বত্থ-বৃক্ষ, এমন কি গৌড়ের রাজ-পথ পর্য্যন্ত নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। যেখানে জীর্ণ মন্দিরটি ছিল এক কালে সেই স্থান দিয়া ঘোর রবে ভাগীরথীর জলরাশি ছুটিয়া যাইত; আবার সেই স্থানেই এখন শ্যামল শস্যক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কালের গতি সত্য সত্যই কুটিলা।

সে সময়ে দেশভ্রমণের পক্ষে জলপথই প্রশস্ত ছিল। তবে যাহারা দ্রুতগমন আবশ্যক বোধ করিতেন তাহারা রথে অথবা অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতেন।

প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দুইজন অশ্বারোহী এই রাজপথ অবলম্বন করিয়া সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। ভাদ্র মাস। ভাগীরথী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছেন। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বৃষ্টি হওয়ায় পথ অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। সূর্য্যদেব অস্তাচলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন, চারিদিক ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। অশ্ব দুইটিকে দেখিলে বোধ হয় যে তাহারা বহুপথ অতিক্রম করিয়াছে। আরোহীগণও তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া ধীরে ধীরে চালাইতেছিলেন।

অশ্বারোহীদ্বয়ের মধ্যে একজন যুবাপুরুষ, তাহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের অধিক হইবে না। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রৌঢ়, তাঁহার কেশরাশি শুক্ল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চাশৎ বর্ষ। উভয়েই সশস্ত্র, লৌহবর্ম্মে উভয়ের দেহ আবৃত, মস্তকে বৃহৎ উষ্ণীষ। প্রত্যেকের সম্মুখে অশ্বপৃষ্ঠের আসনের সহিত রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ এক একটি লৌহ-নির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ। যুবক অগ্রে চলিতেছিলেন; প্রৌঢ়ের অশ্ব ধীরে ধীরে প্রথমের অনুগমন করিতেছিল।

পুরাতন মন্দিরের নিকটে আসিয়া যুবক প্রৌঢ়কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন 'কোন স্থানেই ত মনুষ্যের আবাসের চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না, অন্ধকারও গাঢ় হইয়া আসিতেছে, কি করিব?"

প্রৌঢ় উত্তর করিলেন "পুত্র, সত্য সত্যই দেশের অবস্থা অত্যন্ত ভীষণ হইয়াছে। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে রাজপথের উভয় পার্শ্বে শত শত গ্রাম দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহাদিগের চতুষ্পার্শ্বস্থিত শ্যামল শস্যক্ষেত্র দেখিলে যে কি আনন্দ হইত তাহা আর কি বলিব। দেখিতে দেখিতে সমস্ত অন্তর্হিত হইয়া গেল। দেখ, পঞ্চদশ ক্রোশের মধ্যে একখানি গ্রাম দেখিতে পাই নাই, একটি মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাই নাই, দেখিতেছি কেবল ভীষণ অরণ্য। রাত্রিকালে লোকালয়ে আশ্রয় পাইলে ভাল হইত। দূরে একটা অশ্বত্থ-বৃক্ষ দেখা যাইতেছে না? দেখ ধর্ম্ম, এই স্থানে একটি জীর্ণ দেবালয় ছিল, আমি একাকী এই পথে চলিবার সময়ে তাহাতে কতবার রাত্রিকালে আশ্রয় লইয়াছি।"

ধর্ম্ম।— পিতা! অশ্বত্থ-বৃক্ষ দেখিতে পাইতেছি বটে কিন্তু দেবালয়ের ত কোন চিহ্ন দেখিতেছি না?

প্রৌঢ়।— তবে চল অশ্বত্থ-তলেই রাত্রিযাপন করিতে হইবে।

ক্লান্ত অশ্বদ্বয় ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল। প্রৌঢ় চারিদিক লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। অশ্বত্থ-বৃক্ষের নিকটে আসিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "ধর্ম্ম, এই স্থানই বটে, দেখ চারিদিকে প্রস্তর- ও ইষ্টকখণ্ড পতিত রহিয়াছে। এই বৃক্ষের পশ্চাতে বনমধ্যে বোধ হয় সেই দেবালয় আছে।"

উভয়ে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন ও বৃক্ষকাণ্ডে অশ্ব দুইটিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পথের উভয় পার্শ্বে নিবিড় বন, বোধ হয় বহুকাল সেই স্থানে লোকসমাগম হয় নাই, ক্ষুদ্র বৃক্ষসমূহে ভূমি আচ্ছন্ন, বেতসী লতা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে আশ্রয় লইয়া দুর্ভেদ্য আবরণ সৃষ্টি করিয়াছে। অস্ত্র দ্বারা পথ পরিষ্কার না করিলে বনে প্রবেশ করিবার উপায় নাই দেখিয়া উভয়েই আসি হস্তে পথ পরিষ্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। অল্পদূর গমন করিবার পরই মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের সম্মুখে কতক স্থান পরিষ্কার ছিল। প্রৌঢ় কণ্টকাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন, তিনি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন "মন্দির শূন্য। তুমি অশ্ব দুইটিকে এইখানে লইয়া আইস।"

পিতা মন্দিরদ্বারের শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিলেন, পুত্র অশ্বত্থ-বৃক্ষাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক অশ্ব লইয়া ফিরিয়া আসিলে প্রৌঢ় তাঁহাকে কহিলেন "নিকটেই নদী আছে, তুমি অশ্ব দুইটিকে জল পান করাইয়া লইয়া আইস।"

নদীর দিকে অগ্রসর হইয়া যুবক দেখিলেন কিয়ৎকাল পূর্ব্বে কে যেন পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। যুবক বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন পথ সেই দিনই পরিষ্কৃত হইয়াছে বেতসী লতার ছিন্ন শীর্ষ সরস রহিয়াছে, কর্ত্তিত বৃক্ষশাখাগুলি শুষ্ক হয় নাই, আর্দ্র ভূমিতে অস্পষ্ট মনুষ্য-পদচিহ্ন। অন্ধকার তখন গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং পদচিহ্ন কোন দিকে গিয়াছে তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। নিকটেই ঘাট, বর্ষায় স্ফীত হইয়া নদীর জলে সোপানাবলী মগ্ন হইয়া গিয়াছে। ঘাটের উপরে একটি বৃহৎ আম্র-বৃক্ষ, তাহার তলে অন্ধকারে শ্বেতবর্ণ একটি পদার্থ পতিত আছে। অল্পক্ষণ পরে অতি ক্ষীণস্বরে কাতরতাজড়িত কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল "জল।"

একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষে অশ্ব দুইটিকে বাঁধিয়া যুবক অসি হস্তে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন বৃক্ষতলে একজন মনুষ্য পতিত রহিয়াছে। সে বোধ হয় পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, ধীরে ধীরে বলিল "যাই—কে আছে—জল।" যুবক দেখিলেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত। বোধ হইল যেন তাহার অন্তিম সময় উপস্থিত। যুবক ব্যস্ত হইয়া নদী হইতে উষ্ণীষ ভিজাইয়া আনিলেন এবং আহত ব্যক্তির মুখে একটু একটু করিয়া জল দিতে আরম্ভ করিলেন। জল পান করিয়া সে একটু সুস্থ হইল। তাহার পর বলিল "আমি যাই, আমার অধিক সময় নাই—তুমি বড় উপকার—জল।" যুবক পুনরায় তাঁহার মুখে জল দিলেন। আহত ব্যক্তি তাহা পান করিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল "আমি মণিদত্ত—গৌড়ে আমার গৃহে দেবতার নিম্নে বহু ধন—জল।" আহত ব্যক্তি পান করিয়া একটু বিশ্রাম করিল, তাহার পর পুনরায় বলিল "তুমি লইও—জল।" যুবক আবার জল দিলেন, আহত ব্যক্তি অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। যুবক বুঝিলেন যে তাহার শেষ হইয়া আসিতেছে। তাহার পর আহত ব্যক্তি বলিয়া উঠিল "রাজা নাই—অরাজক—ধর্ম্ম নাই—তুমি রাজা—জ—" যুবক মুখে আবার জল দিলেন কিন্তু তাহা গড়াইয়া পড়িল। তখন উত্তরীয়খণ্ডে শবদেহ আচ্ছাদিত করিয়া যুবক অশ্বদ্বয়কে জলপান করাইলেন ও মন্দিরে প্রত্যাগমন করিলেন। বনমধ্য হইতে দেখিতে পাইলেন মন্দির-মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছে। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নিকটে আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহার পিতা অগ্নির পার্শ্বে বসিয়া তাহাতে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ করিতেছেন। পুত্রকে দেখিয়া পিতা কহিলেন "দেখ ধর্ম্ম, আমাদিগের পূর্ব্বে বোধ হয় আর একজন এই মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল। সে মন্দিরের পার্শ্বে শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিয়া গিয়াছে, বোধ হয় শীঘ্রই ফিরিবে।" যুবক তখন পিতাকে আহত ব্যক্তির কথা জ্ঞাপন করিলেন। প্রৌঢ় কহিলেন "সত্যই রাজার অভাবে, ধর্ম্মের অভাবে দেশের সর্ব্বনাশ হইতে চলিয়াছে। এরূপে যে কতদিন কাটিবে তাহা বলিতে পারি না। ক্রমে দেখিতেছি আর্য্যাবর্ত্ত হইতে গৌড় দেশের নাম লুপ্ত হইবে। রাত্রিকাল, দস্যু তস্করের অভাব নাই, চল অশ্ব দুইটি লইয়া মন্দির-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করি, কালি প্রাতে মণিদত্তের দেহের সৎকার করিব।"

পুত্র নীরবে অশ্ব দুইটি লইয়া মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহার পর অসি হস্তে পিতা পুত্র মন্দিরের দ্বার রক্ষা করিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন।

অতি প্রত্যুষে উভয়ে অশ্ব লইয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। নদীতীরে আসিয়া দেখিলেন ঘাটের উপরে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে গৈরিক বসন। তাঁহার সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ ও কৃষ্ণ কেশ দেখিয়া যুবাপুরুষ বলিয়া প্রতীতি হয়। পার্শ্বে লৌহনির্ম্মিত ত্রিশূল ও অলাবুপাত্র পড়িয়া আছে। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর, আপনি কখন এইস্থানে আসিয়াছেন?"

উত্তর হইল "গোপালদেব, আমি তোমার অপেক্ষায় সমস্ত রাত্রি বসিয়া আছি।"

প্রৌঢ় অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি আমার পরিচয় অবগত আছেন? আমি ত আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না?"

সন্ন্যাসী।— তুমি আমাকে পূর্ব্বে দেখ নাই বলিয়া চিনিতে পারিতেছ না, কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। মণিদত্তের দেহ দাহ করিবে ত?

গোপাল।— আমরা পিতাপুত্রে তাহাই স্থির করিয়াছিলাম। আপনি তাহা কি করিয়া জানিলেন?

সন্ন্যাসী।— বাধ্য হইয়া আমাকে অনেক অনাবশ্যক কথা জানিতে হইয়াছে, ক্রমে সমস্তই জানিতে পারিবে। মন্দিরের পশ্চাতে অনেক শুষ্ক কাষ্ঠ সঞ্চিত আছে, তাহা লইয়া চিতা প্রস্তুত কর।

মন্দিরের পশ্চাতে রাশি রাশি শুষ্ক কাষ্ঠ সঞ্চিত ছিল। উভয়ে তাহা হইতে কাষ্ঠ লইয়া ঘাটের উপরে চিতা রচনা করিলেন। তাহার পরে মণিদত্তের মৃতদেহ তাহাতে স্থাপন করিয়া কাষ্ঠরাশিতে অগ্নি সংযোগ করিলেন। সন্ন্যাসী তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন না, চিতার অদূরে ঘাটের উপরে বসিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে মণিদত্তের দেহ ভস্মে পরিণত হইল। চিতা জ্বলিয়া উঠিলে উভয়ে সন্ন্যাসীর নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন। গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর, নিকটে কি কোন গ্রাম আছে? আমরা গ্রামান্তর হইতে যে আহার্য্য আনিয়াছিলাম তাহা কল্যই নিঃশেষিত হইয়াছে।"

সন্ন্যাসী।— তোমাকে গ্রামে লইয়া যাইবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি।

গোপাল।— আপনি কিরূপে জানিলেন যে আমি এই স্থানে আসিয়াছি।

সন্ন্যাসী।— সে কথা পরে বলিব।

মণিদত্তের মৃতদেহ প্রায় ভস্মীভূত হইয়াছিল, চিতাও নির্ব্বাপিতপ্রায়। পিতা ও পুত্র উভয়ে ভাগীরথী হইতে জল উঠাইয়া চিতা ধৌত করিলেন ও কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে মৃতদেহের অবশিষ্টাংশ জলে নিক্ষেপ করিলেন। সন্ন্যাসী তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও তাঁহাদিগকে কহিলেন "আমার সঙ্গে আইস।"

পিতাপুত্র অশ্বারোহণে সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাৎস্যন্যায়।

রাজপথের অনতিদূরে জঙ্গলের মধ্যে কতকগুলি আম্রবৃক্ষ দেখা যাইতেছিল। সেই স্থানে পূর্ব্বে আর একটি পথ নির্গত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গিয়াছিল. ক্রমশঃ তাহা তৃণে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে, দুই একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ স্থানে স্থানে জন্মিয়াছে। সন্ন্যাসী রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র পথ অবলম্বন করিলেন। সে পথটি আম্রবনের ভিতর দিয়া পশ্চাৎস্থিত একটি গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। রাজপথ হইতে গ্রামটি দেখা যাইত না, এখনও দেখা যাইতেছিল না। পথিকগণ যে-পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া তাঁহাদিগের বোধ হইতেছিল যে পূর্ব্বে সে পথে বহু শকট যাতায়াত করিত কিন্তু কোন কারণে অনেক দিন এ পথে শকট চলে নাই। আম্রবন পার হইয়া তিনজনে গ্রামে প্রবেশ করিলেন।

গ্রামের প্রান্তে সর্ব্বপ্রথমে ইষ্টক-নির্ম্মিত একটি অট্টালিকা তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল। অট্টালিকা পুরাতন নহে, তথাপি তৃণগুল্মে প্রাচীর ও ছাদগুলি ভরিয়া গিয়াছে, সম্মুখের উদ্যানে এত বন হইয়াছে যে তাহাতে দুই একটি হিংস্র জন্তু অনায়াসে লুক্কায়িত থাকিতে পারে, অট্টালিকার প্রবেশদ্বারের কবাট নাই। তিন জনে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তাহাও বনে ভরিয়া গিয়াছে। প্রাঙ্গণের

পার্শ্বে পূজার মণ্ডপ, তাহা হইতে দুইটি শৃগাল মনুষ্যের পদশব্দ পাইয়া পলায়ন করিল। মণ্ডপের মধ্যে দুইটি নরকঙ্কাল পতিত রহিয়াছে। আগন্তুকত্রয় অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে নরকঙ্কাল ব্যতীত মানবের আবাসের কোন চিহ্নই নাই।

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "গোপালদেব কি দেখিলে?"

গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "অধিবাসীরা কি গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে?"

উত্তর হইল "মণ্ডপে ও কক্ষে কক্ষে ত অধিবাসীদের দেখিতে পাইয়াছ।"

আগন্তুকত্রয় অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া পথে আসিলেন। সন্ন্যাসী পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন পথের উভয় পার্শ্বে উচ্চ মৃণ্ময় প্রাচীর ছাদ-শূন্য, স্থানে স্থানে বংশদণ্ডের ভস্মাবশেষ প্রাচীরে সংলগ্ন রহিয়াছে। পথের বামপার্শ্বস্থিত একটি গৃহে অথবা গৃহের ধ্বংসাবশেষে কয়েকটা নারিকেল-বৃক্ষ তখনও অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল, সন্ন্যাসী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অশ্বারোহীদ্বয়ও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা প্রবেশ করিয়া দেখিলেন বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে নরমুণ্ডের একটি স্তূপ রহিয়াছে, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বহু নরকঙ্কাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য কুটীরের মৃণ্ময় প্রাচীর সন্ন্যাসী তাহার একটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহের ছাদ নাই। স্থানে স্থানে দুই একটি অর্দ্ধদগ্ধ মাংসখণ্ড পতিত আছে। গৃহতলে অসংখ্য পশুর দগ্ধ কঙ্কালের স্তূপ রহিয়াছে। গোপালদেব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর! অগ্নিদাহের সময়ে গ্রামের লোক কি পশুগুলি রক্ষা করে নাই?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন "যাহারা রক্ষা করিবে তাহাদিগের ছিন্ন মস্তকগুলি তখন প্রাঙ্গণে স্তূপীকৃত হইতেছিল।"

তিন জনে নীরবে গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাজপথে আসিলেন। পথে আসিয়া গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর, এই গ্রামে কি এখন আর মানুষ আছে?"

সন্ন্যাসী।— আছে, দুই একজন মাত্র।

গোপাল।— আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া চলুন, আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি।

সন্ন্যাসী।— গ্রামে প্রবেশ করিলে, গ্রাম্য দেবতার দর্শন না করিয়াই চলিয়া যাইবে?

গোপাল।— দেবতার মন্দির কোথায়?

সন্ন্যাসী।— আমার সহিত আইস।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী পথ দেখাইয়া চলিলেন, জনমানবশূন্য গ্রামপথ অতিক্রম করিয়া গ্রামের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে শ্যামল তৃণমণ্ডিত ক্ষেত্রের মধ্যস্থানে একটি মন্দির রহিয়াছে। মন্দিরের কপাট নাই, দূর হইতে চতুর্ভুজ পাষাণ-নির্ম্মিত বাসুদেব-মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। পিতাপুত্র অগ্রসর হইয়া দেখিলেন বহু নরকঙ্কাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাঁহারা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে দুই তিনটি সম্পূর্ণ কঙ্কাল দেবমূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, মরণের আশঙ্কায় তাহারা গ্রাম্য দেবতার আশ্রয় লইয়াছিল; ভাবিয়াছিল, দেবতা তাহাদিগকে অকাল-মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিবে। মৃত্যু যখন নিকটে আসিয়াছিল তখন তাহারা প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া মন্দিরের বিগ্রহ জড়াইয়া ধরিয়াছিল, বোধ হয় ভাবিয়াছিল যে শেষ মুহূর্ত্তে নির্ম্মম পাষাণ করুণ হইবে এবং হস্ত প্রসারণ করিয়া আততায়ীর অস্ত্রাঘাত নিবারণ করিবে। স্তম্ভিত হইয়া পিতাপুত্র মন্দির-মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী মন্দিরের বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন "গোপালদেব কি দেখিতেছ? নির্ব্বোধ গ্রামবাসীগণ ভাবিয়াছিল যে দেবমন্দিরে শত্রু আসিবে না, আসিলে স্বয়ং বাসুদেব তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন। বাসুদেব কেমন রক্ষা করিয়াছেন তাহা দেখিতে পাইতেছ ত?"

গোপাল।—ঠাকুর, যথেষ্ট দেখিয়াছি, আর দেখিতে চাহি না; আমরা খাদ্য বা আশ্রয় চাহি না, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, আমি এখনই এই স্থান পরিত্যাগ করিব।

এই বলিয়া গোপালদেব মন্দিরের বাহিরে আসি-

লেন, তখন সন্ন্যাসী তাঁহার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন "ব্যস্ত হইও না, তুমি বিচলিত হইলে দেশ রক্ষার কোন উপায়ই থাকিবে না। আমার সহিত আইস।"

গোপাল ও ধর্ম্মপাল সন্ন্যাসীর পশ্চাতে পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। নদীতীরে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী ডাকিলেন "গৌর!"

কেহই উত্তর দিল না। দুই তিন বার ডাকিবার পরে বেণুকুঞ্জের অন্তরাল হইতে কে একজন উত্তর দিল "কে ডাকে? ঠাকুর?"

সন্ন্যাসী তখন হাসিয়া বলিলেন "গৌর, ভয় নাই, আমিই বটে। তুমি পার হইয়া আইস।"

গোপালদেব লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন স্থানটি দুর্ভেদ্য, ক্ষুদ্র নদীটি বাঁকিয়া তাহার তিন দিক বেষ্টন করিয়াছে। অপর দিকে নদীর পুরাতন গর্ভ, বর্ষার জলে তাহাও কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই দ্বীপটির কূলে কূলে ঘন বেণুকুঞ্জ, দেখিলে মনুষ্যের আবসস্থান বলিয়া বোধ হয় না। ইতিমধ্যে গৌর তাল-বৃক্ষকাণ্ড-নির্ম্মিত উড়ুপে চড়িয়া নদী পার হইয়া আসিল এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল, গোপালদেব বা তাঁহার পুত্রের দিকে ফিরিয়াও দেখিল না। সে ব্যক্তি ক্ষীণকায়, খর্ব্বাকৃতি, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; কোনও পরিহাস-রসিক বোধ হয় ব্যঙ্গ করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন গৌর। তাহার সমস্ত অবয়বের মধ্যে নাসিকাটি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ তাহা শরীরের মাংসহীনতার অভাব পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। গৌর স্থির হইয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে দাঁড়াইল, সন্ন্যাসী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "গৌর কি দেখিতেছ?"

গৌর।— প্রভু যাহা দেখিতেছেন তাহাই দেখিতেছি।

সন্ন্যাসী।— তোমার সম্মুখে যে দুইজন অতিথি উপস্থিত তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না?

গৌর।— অতিথি? প্রভু, আমি অতি দীন, অতিথি-সেবার সৌভাগ্য কি আমার হইবে?

সন্ন্যাসী।— আরে পাগল, দুইজন ক্ষুধার্ত্ত অতিথি সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

গৌর।— ঠাকুর তবে কি হইবে?

গৌরচন্দ্র এই বলিয়া ক্রন্দনের উপক্রম করিল। সন্ন্যাসী তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন "কি হে গৌর, ব্যাপার কি? কাঁদিতে আরম্ভ করিলে কেন?"

গৌরচন্দ্র তখন ঈষৎ অনুনাসিক ক্রন্দনমিশ্রিত সুরে কহিল "প্রভু, আমার সহিত ছলনা করিতেছেন।"

সন্ন্যাসী অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

গৌর।— প্রভু, ঘরে মুষ্টিমাত্র চাউল নাই দেখিয়া ভিক্ষায় বাহির হইব মনে করিতেছিলাম, এমন সময়ে প্রভু কি না দুইটি ক্ষুধার্ত্ত অতিথিদেবতা লইয়া আমার দুয়ারে উপস্থিত।

গৌরচন্দ্র পুনরায় ক্রন্দনের চেষ্টা করিতেছিল। সন্ন্যাসী তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন "সে কি হে! এক পক্ষ পূর্ব্বে যে তোমাকে এক নৌকা চাউল আনাইয়া দিয়াছি! তাহা কি করিলে?"

গৌর।— সে সমস্তই প্রভু শেষ করিয়াছেন।

সন্ন্যাসী।—আমরা তিন জনে একপক্ষে এক নৌকা চাউল খাইয়াছি?

গৌর।—আজ্ঞা।

সন্ন্যাসী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই কি ভাবিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। গোপালদেব সপুত্র আম্রবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া এই অভিনয় দর্শন করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে তাঁহাদিগের জন্য অন্নহীন গৌরচন্দ্র বিপদে পড়িয়াছে, তিনি অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসীর নিকটে গেলেন এবং করজোড়ে কহিলেন "প্রভু, ইহাকে বিপন্ন করিয়া কাজ নাই। এখনও সময় আছে, আমাদিগের দ্রুতগামী অশ্বদ্বয় শীঘ্রই আমাদিগকে গ্রামান্তরে পৌঁছাইয়া দিবে।"

সন্ন্যাসী তাঁহার কথা শুনিয়া পুনরায় হাসিয়া উঠিলেন "গোপালদেব, গৌরচন্দ্রের কথায় বিশ্বাস করিলে চলিবে না, গৃহে যথেষ্ট তণ্ডুল আছে, কিন্তু সে ভাবিতেছে এই দীর্ঘকায় পুরুষদ্বয় নিশ্চয়ই দুই তিন সের চাউল আহার করিয়া ফেলিবে, সেইজন্যই সহজে তোমাদিগকে দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে।" গৌরচন্দ্র অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া নত দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসী তাহা

দেখিয়া কহিলেন "গৌর,' ইহাদিগকে বিদায় করিলে চলিবে না, ইহাদিগের জন্য কিছু তণ্ডুল ব্যয় করিতেই হইবে।"

গৌরচন্দ্র তাহা শুনিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "যে আজ্ঞা।" সন্ন্যাসী ও গোপালদেব তাহার ভাব দেখিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বনমধ্যে শৃগালের পদশব্দ শুনিয়া অশ্ব দুইটি অস্থির হইয়া উঠিল। এক্ষণে গৌরচন্দ্র তাহাদিগকে দেখিতে পাইল, দেখিয়াই তাহার মুখ শুখাইয়া গেল। সে ভাবিয়াছিল দুই তিন সের চাউল ব্যয় করিলেই সে পার পাইবে, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিল যে আজ তাহার ঘোর দুর্দ্দিন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তীর ন্যায় বলবান অশ্ব দুইটি নিশ্চয়ই দশ সের তণ্ডুল আহার করিবে। সে ব্যাকুল হইয়া কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল "প্রভু।"

সন্ন্যাসী তখন গোপালদেবের সহিত কথা কহিতেছিলেন। তিনি মুখ ফিরাইয়া কহিলেন "কেন?"

গৌর সভয়ে একপদ অগ্রসর হইয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "প্রভু, ইঁহারাও কি আহার করিবেন?"

সন্ন্যাসী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহারা?"

গৌর।—আজ্ঞা, এই চতুষ্পদ অতিথি দুইটি?

সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "ইহারা খাইবে না ত কোথায় যাইবে?"

গৌরচন্দ্র পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

তণ্ডুলব্যয় অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া গৌর আলস্য ত্যাগ করিল ও ভেলাখানি তীরে লাগাইয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসী কহিলেন "গৌর, তুমি আমাদিগকে পার করিয়া আসিয়া ঘোড়া দুইটির নিকট দাঁড়াইয়া থাক।"

গৌর উত্তর করিল "যে আজ্ঞা।"

সকলে পার হইয়া আসিলে সন্ন্যাসী বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গোপালদেব ও ধর্ম্মপাল তাঁহার অনুসরণ করিলেন। উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলেন যে বনমধ্যে বেণুকুঞ্জসমূহের অন্তরালে একটি বৃহৎ অট্টালিকা রহিয়াছে, নদীর পরপার হইতে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। অট্টালিকার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী ডাকিলেন "কাত্যায়নী, দুয়ার খোল, আমি আসিয়াছি।" অল্পক্ষণ পরে একটী অবগুণ্ঠনাবৃতা প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া দ্বার মুক্ত করিল। সন্ন্যাসী অতিথিদ্বয়কে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অট্টালিকার মধ্যস্থলে বিস্তৃত অঙ্গন, তাহার চারি পার্শ্বে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ। সন্ন্যাসী প্রথম দুই তিনটি গৃহ পার হইয়া চতুর্থ গৃহে প্রবেশ করিলেন। গোপালদেব আশ্চর্য্য হইয়া গৃহগুলির সজ্জা দেখিতেছিলেন। প্রথম গৃহটি নানাবিধ বর্ম্ম ও অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ, দ্বিতীয় গৃহে নূতন ও পুরাতন পরিধেয় বস্ত্রাদি সজ্জিত আছে, চতুর্থ গৃহে বিস্তৃত কাষ্ঠাসনের উপরে দুগ্ধফেননিভ শয্যা বিস্তৃত ছিল। সন্ন্যাসী তাহার উপরে বসিয়া পড়িলেন ও গোপালদেবকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। সপুত্র গোপালদেব উপবিষ্ট হইয়া বর্ম্ম ও অস্ত্রাদি মোচন করিয়া শয্যার উপরে রক্ষা করিলেন। পূর্ব্বপরিচিতা প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া পাদপ্রক্ষালনের জল দিয়া গেল। হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া তিন জনে শয্যায় উপবিষ্ট হইলেন। গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, এই গৃহ কাহার?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া উত্তর করিলেন "উপস্থিত আমার।"

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার গৃহ! আপনার গৃহে এত অস্ত্র শস্ত্র কেন?"

সন্ন্যাসী।— সময়োপযোগী গৃহসজ্জা মাত্র। আপনি আহার করুন, তাহার পর সমস্ত কথা খুলিয়া বলিব। বলিবার জন্যই ত আপনাকে এখানে আনিয়াছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

——

অন্তিম বাসনা

[শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একমাত্র গীতিকবিতা যাহা ছাপা হইয়াছিল। পুরাতন ভারতী হইতে উদ্ধৃত।]

অস্তাচলে গেল গো দিনমণি
আইল রজনী
উঠিল শশধর রজত-রুচি।
জীবনের সুখের দিন—হায়
এমনি চলি যায়
রঙ্গ-ভঙ্গ যায় চকিতে ঘুচি॥
ত্বরায় গো ফুরায় খুসি-হাসি—
পোড়া অদৃষ্ট আসি
অন্তিম যবনিকা ফেলিতে বলে।
খেলা-ধূলা সকলি অবসান—
বন্ধুজন-বয়ান
ভাসে গো অবিরাম নয়ন-জলে॥
ভাব এক এমনি—মরি হায়
কি যেন মৃদু বায়—
যাবে চলি আমার উপর দিয়া।
মনে হবে জীবন-যাত্রা মোর
হইয়ে এল ভোর,
বিশ্রাম করিবারে চাহিবে হিয়া॥
প্রিয় বন্ধু-সকল তোমরা কি
কাঁদিবে পাশে থাকি
গেছি আমি এ দুখ প্রাণে না স'য়ে?
তবে মোর আত্মা যে-আকাশে
যেখানে থাক-না সে
কাঁদিবে তোমাদের দোসর হ'য়ে॥
তুমি-ও হে ফেলিও একবিন্দু
অধিক নহে বন্ধু
একটি-ফোঁটা শুধু নয়ন-লোর।
ফুল তুলি একটি প্রাণ-প্রিয়
মোর মাথায় দিও
সাধ মিটায়ো চেয়ো শয়নে মোর॥
পীরিতির সোহাগে ঢল ঢল্
সে তব অশ্রুজল
মোরে তা সঁপি দিতে ক'র'না লাজ।
ত্রিভুবনে আছয়ে যত মণি
সবার সেরা গণি'
রাখিব করি তারে মুকুট-সাজ॥

———

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৪৬ সালে ২৯এ ফাল্গুন শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে কলিকাতা সহরের জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে স্বর্গীয় শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

যুবা দেবেন্দ্রনাথ তখন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। ইহার অনতি পরেই তাঁহার পিতা দ্বারকানাথের সুদূর প্রবাসে মৃত্যু হইল। তাহার পর ঋণ-ভার-প্রপীড়িত দেবেন্দ্রনাথ কিরূপ অকাতরচিত্তে শেষ কড়িটি পর্য্যন্ত দান করিয়া ঋণ-দায় হইতে মুক্ত হইয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইলেন তাহা সকলেই জানেন। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিতান্ত শিশু ছিলেন এবং পিতার স্নেহক্রোড়ে থাকিয়া দুঃখ দারিদ্র্যের ক্লেশ কিছুমাত্র অনুভব করিবার অবসর পান নাই।

পাঁচ বৎসর বয়সে দ্বিজেন্দ্রনাথের হাতে-খড়ি হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সহোদর সত্যেন্দ্রনাথ এবং খুল্লতাত-পুত্র নগেন্দ্রনাথ একসঙ্গে এক মাষ্টারের নিকট পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রিয় পাঠ্য-পুস্তক ছিল। এক বৃদ্ধ কর্ম্মচারী ছিল তাহাকে উঁহারা সকলেই 'দাদা' বলিয়া ডাকিতেন—প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় মহাভারত, রামায়ণের গল্প তাহার নিকট শুনিতেন এবং যতক্ষণ না সে গল্প বলিয়া সেদিনকার পালা শেষ করিত ততক্ষণ তাহার অব্যাহতি ছিল না। সাত কিংবা আট বৎসর বয়স হইতেই দ্বিজেন্দ্রনাথের বাঙলা লেখার ঝোঁক আরম্ভ হইল। যাহা কিছু মনে আসিত তাহাই গদ্যে কিংবা পদ্যে লিখিয়া ফেলিতেন। এই সময় বাঙলা স্কুলে তিন ভাই ভর্ত্তি হইলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বাল্যকালে তাঁহার মেজ কাকীমার নিকট প্রায় সর্ব্বদাই থাকিতে ভাল বাসিতেন। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবামাত্র বৃদ্ধের চক্ষু ছলছল্ করিয়া ওঠে এবং প্রশংসা আর মুখে ধরে না। স্কুলে যাহা কিছু নূতন শিখিতেন তাহাই বাড়ী আসিয়া আগে

মেজ কাকীমার নিকট জাহির করিয়া তবে অন্য কাজ! একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন মেজ কাকীমাকে এই বালক কি চক্ষে দেখিতেন।

বাঙলা স্কুল হইতে ইংরেজী স্কুল সেণ্ট পল্‌স্‌এ যখন দ্বিজেন্দ্রনাথকে ভর্ত্তি করা হইল তখন দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স দশ কি এগারো হইবে। একদিন কোন কারণে ছুটীর সময় অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথকে বাড়ী আসিতে দিলেন না, শাস্তিস্বরূপে তাঁহাকে আধ ঘণ্টা আটকাইয়া রাখিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত। তাইত! ৪॥০ টার সময় মেজ কাকীমার কাছে ছুটিয়া যাইয়া স্কুলের সমস্ত দিনের বন্ধন যাতনার পর মুক্তির আনন্দ ভোগ করিতে পারিব না! এ হইতেই পারে না! আর অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া একেবারে সোজা সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিলেন। সাহেব সেখানে নাই। সাহেব আর কোথায় থাকিতে পারেন? নিশ্চয়ই পাশের কাপড় ছাড়িবার ঘরে আছেন, এই ভাবিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে পর্দ্দা টানিয়া সেখানে যাইয়া উপস্থিত! সাহেব ত চটিয়া খুন, ধমক দিয়া এমন গর্হিত কার্য্য যেন কখন না করেন এইরূপ বাক্য বলিয়া শাসাইয়া দিলেন, কিন্তু বাড়ী যাইবার অনুমতিটাও সঙ্গে সঙ্গে দিয়া দিলেন। যেমন ছুটী পাওয়া অমনি দ্বিজেন্দ্র উচ্ছ্বসিত আনন্দের আবেগে দ্রুত পদক্ষেপে হাস্যমুখে নিমেষের মধ্যে সাহেবের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন এবং বাড়ী আসিয়া মেজ কাকীমার কাছে গিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলেন।

বাল্যকাল হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথের বাঙলা শিক্ষা এবং লেখার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং ইংরেজী স্কুলে পড়িবার সময়েও ইংরেজী ভাল করিয়া শিক্ষা করার বা ভাল ইংরেজী লিখিবার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না। সহপাঠীগণ সকলেই ইংরেজী ভাষার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষার আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। একদিন ঐ স্কুলের অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথকে Charity (বদান্যতার) উপর এক Essay (প্রবন্ধ) লিখিতে দিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ এক প্রসিদ্ধ সাহেব সাহিত্যিকের লেখা হইতে ধারাবাহিক নকল করিয়া লইয়া তাহা অধ্যাপকের হস্তে প্রদান করিয়া সে যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলেন। এবং অধ্যাপক গম্ভীর ভাবে বলিলেন 'হইয়াছে ভাল, কিন্তু তুমি খৃষ্টান নও কাজেই খৃষ্টান Charity কাহাকে বলে তাহা তুমি জানিবে কি প্রকারে?'

এই সময় হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে তিনি তখন কবিতায় 'মস্‌গুল' ছিলেন। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্য-লীলা তাঁহার চিত্তকে এমনই মুগ্ধ করিত যে কবিতার পর কবিতা লিখিয়াও কিছুতেই তিনি তৃপ্তি অনুভব করিতেন না। সে-সকল কবিতা বসন্তের ফুলের মত ফুটিয়াই ঝরিয়া পড়িয়া কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে! লেখার আনন্দে লিখিতেন আর নিমেষে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া বারাণ্ডাময় ছড়াইয়া দিতেন। চিত্রবিদ্যার প্রতিও তাঁহার এই সময়ে অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল এবং নিজেই বলেন "আঁকিতে পারিতাম এক রকম মন্দ নয়।"

সেণ্টপল্‌স্‌ স্কুল হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথকে আর একটি বাঙলা স্কুলে ভর্ত্তি করা হইল। এখানকার অনুশাসন এবং বাঁধাবাঁধি নিয়ম তাঁহার একেবারেই পছন্দ হইত না। কোন কালেই স্কুলে যাইতে ভাল বাসিতেন না এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের প্রতি বিতৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্লাসে বসিয়া ছবি আঁকিয়া সময় কাটাইতেন, কখনও কখনও কবিতাও লিখিতেন। এইরূপে সারা বৎসর ছবি আঁকিয়া, কবিতা লিখিয়া, কাব্য পাঠ করিয়া কাটাইলেন। সহসা একদিন শুনিলেন পরীক্ষার সময় আসন্নপ্রায়। কি করা যায়? মহা বিপদ! ইংরেজী, সংস্কৃত, বাঙলা, অঙ্ক, এ-সকল ত বেশ চলিবে, ইহার জন্য ভয় নাই, কিন্তু ইতিহাস যে একেবারেই পড়া হয় নাই, এখানে কেবল নিছক কল্পনার দৌড়ে কার্য্য সুসাধা হওয়া ত অসম্ভব! অতএব এক ফন্দি বাহির করিলেন। একটি প্রকাণ্ড নক্সা প্রস্তুত হইল, তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসটি ঘটনা এবং কাল অনুসারে বিভাগ করিয়া একটি মানচিত্র প্রস্তুত করিলেন;

তাহার সাহায্যে অল্প দিনের মধ্যেই ইতিহাস সহজে মুখস্থ হইল এবং পরীক্ষায় গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন এবং দশ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইলেন। এখনও রেখাগণিতের পাণ্ডুলিপিতে যা দুই একটি কলমের আঁচড়ের ছবি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে বোঝা যায় অভ্যাস করিলে ইনি একজন জবরদস্ত চিত্রকর হইতে পারিতেন।

সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের প্রতিও বাল্যকাল হইতে ইঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। বাল্মীকির রামায়ণ, এবং মেঘদূত ইঁহার প্রিয় কাব্য ছিল। উনি বলেন 'এই দুইটা কাব্য যে কতবার পড়িয়াছিলাম, তাহার ঠিক নাই, পড়িয়া আশ মিটিত না।' চৌদ্দ কি পনের বৎসর বয়সে মেঘদূত কাব্যটিকে বাঙলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিছুই হয় নাই বলিয়া তাহা ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কি জানি কেমন করিয়া এই একটিমাত্র রচনা বিনাশের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল এবং বহুদিন পরে মুদ্রিত হইয়া পুস্তিকাকারে বাহির হইয়াছিল। পদ্যপাঠ দ্বিতীয় ভাগে এখন অনেকেই কুবের আলয় ছাড়ি, উত্তরে আমার বাড়ি, গিয়া তুমি দেখিবে তথায় ইত্যাদি কণ্ঠস্থ করেন; কিন্তু অল্প লোকেই জানেন উহা কাহার রচিত।

ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের প্রতি ইনি খুব বেশী অনুরক্ত ছিলেন না, তবে সেক্সপিয়ার, বাইরন এবং কীটস্‌এর খুব ভক্ত ছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত সেক্সপিয়ারের নাটক পড়িতে ভালবাসেন। তাঁহার সেক্সপিয়ারের আবৃত্তি প্রবন্ধ-লেখক অনেকবার শুনিয়াছে। ওথেলোর বীর্য্যের কথা পড়িতে পড়িতে মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিত, চক্ষের মণি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিত। হাস্যরসের সময় যে অট্টহাস্য শুনিয়াছি সে হাস্য সমস্ত শরীর ও অন্তঃকরণ দিয়া একটি বিরাট সম্পূর্ণ হাস্য, তাহার মধ্যে কার্পণ্য লেশ মাত্র থাকিত না, বাড়ীর ছাদ দ্বিধা বিভক্ত হইবার উপক্রম হইত এবং করতলস্থিত টেবিলের কাষ্ঠখণ্ডের আয়ুঃশেষ হইবার উপক্রম হইত। এ হাসি গ্রামোফোনে তুলিয়া রাখিবার মত হাসি,—সরস, উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রাচুর্য্যে দীপ্তিময় হাসি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যলীলা দ্বিজেন্দ্রনাথকে অধীর করিয়া তুলিত। এক সময়ে তাঁহার মনে এই প্রশ্ন উদয় হইল 'কেন? ঐ সুন্দর আকাশের বর্ণমাধুরী আমার চিত্তকে এমন নাড়া দেয় কেন? আমার মন এবং আকাশের সহিত কি সম্বন্ধ?' ইহার পর হইতেই তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। দেশী এবং বিদেশী সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার প্রথম রচনা 'তত্ত্ববিদ্যা' বাহির হইল। তখন ইঁহার বয়স কুড়ি কি একুশ হইবে। ইহারই দুই এক বৎসর পরেই 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্য রচনা করেন। কাব্যের জহরীরা একবাক্যে এই কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজে বলেন "আমার যথার্থ কবিতার mood যখন ছিল—অর্থাৎ সেই বাল্যকালে আমি এ কাব্য লিখি নাই বলিয়া ইহা আমার মনোমত হয় নাই; সে সময়ে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় মসগুল ছিলুম তাই জন্য উহাতে metaphysics ঢুকিয়াছে।" ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিষয় কিছু নাই। কেননা নিজের রচনাকে তীব্র প্রতিবাদের বাণবিদ্ধ করিয়া জর্জ্জরিত করিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ যেরূপ পটু সেরূপ পটুতা খুব কম লোকেরই আছে। পরে আরও অনেক কবিতা ছাপা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি 'ভারতী' পত্রিকায় স্থান পাইয়াছিল। স্বপ্নপ্রয়াণের সর্গের পর সর্গ লিখিত হইত আর যাহাকে সামনে পাইতেন তাহাকেই পড়িয়া শুনাইতেন। বাড়ীর এক বুড়ী দাসীকেও এ রসে বঞ্চিত করিতেন না। না বোঝা সত্ত্বেও তাহারও কানে ইহা এমনই মধুর ঠেকিত যে সে ঠাকুর দেবতার নাম হইতেছে মনে করিয়া বার বার মাথা নত করিয়া দেবোদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ শিশুকাল হইতেই বড় একটা কাহারও সঙ্গে মিশিতেন না। বাড়ীর মধ্যে নগেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের সহিত মিশিতেন এবং বন্ধুর মধ্যে একমাত্র স্বর্গীয় মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ছিলেন। তাঁহাকে ইনি যেমন ভাল বাসিতেন তেমনি তাঁহার প্রতি ইঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ব্রাহ্মসমাজে কত লোক আসিতেন, কত লোক যাইতেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ অনেককে চিনিতেনই না। এমন কি কেশব বাবু অনেক দিন পর্য্যন্ত দ্বিজেন্দ্রনাথের গৃহেই বাস করিয়াছিলেন কিন্তু মৌখিক আলাপ ব্যতীত আর পরস্পর কোন যোগ হয় নাই। নূতন লোক আসিলে এখনও বড়

ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, সাহেব আসিলে ত কথাই নাই! ইহার কিছু পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'ভারতী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হইলেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সাহিত্যালোচনার উৎসাহের কিছুমাত্র হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনও পর্য্যন্ত লিখিতে লিখিতে রাত্রি বারটা একটা হইয়া যায়, খেয়ালই থাকে না। পূর্ব্বে দেখিয়াছি লিখিতে লিখিতে ভোর হইয়া গেল, চাকরকে ডাকিয়া শয়ন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সময়ে শুনিলেন প্রভাতের বিহঙ্গম-বৈতালিকগণ তাহাদের গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আর শয়ন করা হইল না, স্নান করিয়া দৈনিক দুই মাইল পর্য্যটন সমাপ্ত করিয়া চা পান করিয়া আবার খাতা লইয়া লিখিতে বসিলেন।

গত বৎসরে দ্বিজেন্দ্রনাথের একদিন খুব জ্বর হইল। ডাক্তারের ঔষধ ত কোন মতেই সেবন করিতে রাজী হইলেন না; পরদিন প্রাতঃকালে নিয়মিত সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া গত রাত্রের তোলা শীতল জলে স্নান করিয়া চা পান করিলেন এবং ভাত খাইতে নিষেধ করার দরুণ আটার রুটি এবং অড়হড়ের ডাল পথ্যরূপে নির্ব্বিবাদে আহার করিলেন, জ্বরও সারিয়া গেল। ডাক্তার ত দেখিয়া শুনিয়া অবাক। এ কালের আমরা এরূপ করিলে শীতল জল স্পর্শে অঙ্গ এমনি শীতল হইত যে পুনশ্চ উষ্ণতা বিধানের পথ একেবারে চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া যাইত।

বাল্যকাল হইতে দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ একজন অকৃত্রিম স্বদেশভক্ত। বাঙলা শিখিব, বাঙলা ভাষায় যাহা নাই তাহা দিয়া তাহার পুষ্টিসাধন করিব, এই ছিল তাঁহার জপ, এই ছিল তাঁহার একমাত্র সাধনা! এমন কি বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে এক জনের দ্বারা সম্ভবপর হইবে না দেখিয়া ইহা ছাড়িয়া দিলেন। এই জন্য অঙ্ক শাস্ত্র এবং বিজ্ঞান রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অধুনা রচিত ইংরেজীতে লিখিত বাক্স-রচনা-প্রণালী পুস্তক পাঠ করিয়া মার্কিন এবং ইংলণ্ডের অঙ্কশাস্ত্রবিদেরা তাঁহার অনন্তভন্ত্রতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। অনেক দিন পূর্ব্বে দ্বাদশপ্রতিজ্ঞা-বৰ্জ্জিত জ্যামিতি লিখিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিতও হইয়াছিল। স্বদেশপ্রীতির বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি এবং তাঁহার কয়েকজন আত্মীয় এবং বন্ধু মিলিয়া প্রথম হিন্দু-মেলা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার কতক বৃত্তান্ত পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবন-স্মৃতি'তে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

শেষ বয়সে দ্বিজেন্দ্রনাথ এখন শান্তিনিকেতন আশ্রমের নির্জ্জন কুটীরে বাস করিতেছেন। শালিক, চড়াই, কাঠবিড়ালী আসিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, গায়ের উপর, মাথার উপর, খাতার উপর নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে বিচরণ করিতেছে। লেখার ব্যাঘাত হইলে মাঝে মাঝে 'আঃ বড় জ্বালাতন কর্‌চে' বলিয়া বৃদ্ধ চেঁচাইয়া উঠিতেছেন, তাহারা ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া যাহারা যেমন ছিল তেমনি রহিল, কেবল কাঠবিড়ালী ভদ্রতার অনুরোধে লেখার টেবিল ছাড়িয়া পার্শ্বস্থিত পাথরের টেবিলে লাফাইয়া চড়িয়া লেজে ভর করিয়া বসিল। বহুদিন পূর্ব্বে একটি হাঁড়িচাঁচা পাখী তাঁহার এমন পোষ মানিয়াছিল যে দ্বিজেন্দ্রনাথের সে একরূপ নিত্য সহচর হইয়া উঠিয়াছিল। 'নাই দিলে মাথায় চড়ে' ইহা জানা কথা। মাথায় ত চড়িতই, অধিকন্তু পক্ষীসুলভ এমন সকল গর্হিত কার্য্য করিত যে পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার রাখা দ্বিজেন্দ্রনাথের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন সে তাঁহার চক্ষের ভিতরে এমন ঠোক্‌রাইয়া দিয়াছিল যে পনেরো দিন চোখ বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল। রাগিয়া তাহাকে দুর করিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু পরদিন প্রাতে যখন দেখিলেন সে উপস্থিত নাই, তখন ভৃত্যকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন 'আহা, তাড়াতে বল্লেই কি তাড়াতে হয়! যা, তাকে ডেকে নিয়ে আয়।' ডাকিয়া আনিতে হইল না, সে আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ একদিন রাত্রে হঠাৎ উঠিয়া দেখিলেন একটি শীর্ণদেহ কুকুর বারাণ্ডায় শুইয়া শীতে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে এবং কুঁই কুঁই করিয়া কাঁদিতেছে। তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন, বলিলেন 'তোদের কি কোনও মায়া দয়া নেই! আহা

কুকুরটা এই রকম করে কাঁদ্‌চে, তোরা দরজা বন্ধ করে ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমুচ্ছিস্?' এই বলিয়া আপনার একখানি নূতন লাল রঙের কম্বল আনিয়া কুকুরের গায়ের উপর তাহা চাপা দিয়া যখন দেখিলেন যে সে কতকটা সুস্থ হইয়াছে তখন আবার ফিরিয়া গিয়া আপনার বিছানায় শয়ন করিলেন। পরদিন এই কথা শুনিয়া চাকরগুলা হাসিয়া খুন।

দশ এগারো বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত কবি ৺সতীশচন্দ্র রায় তাঁহার কোন বন্ধুকে একখানি সুন্দর পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে অতি নিপুণ ভাবে ভাষা দিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্তঃকরণের একখানি অবিকল চিত্র আঁকিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

"* * * এক ঘরে গিয়া কবি (রবীন্দ্রনাথ) ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে * * * দেখিতে পাইলাম। দুজনকেই পা ছুঁইয়া নমস্কার করিলাম।—পরে রবিবাবু আমাকে তাঁহার অগ্রজের কাছে চিনাইয়া দিলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিলেন 'তাই বটে? তোমার সমালোচনাটি * বড় ঠিক হয়েছে। বড় আশ্চর্য্য! তুমি কেমন করে আমাকে ঠিক ঠ'ক্ ধর্‌লে? * * * তুমি আমার মনের কথাগুলি কেমন করে জান্‌লে হে?' ইত্যাদি। ক্রমে নানা কথা-বার্ত্তায় পরিচয় হইতে লাগিল।

"এখন দ্বিজেন্দ্রবাবুর একটি প্রতিকৃতি আমি তোমায় দেখাইতেছি। প্রতিকৃতিটি অবশ্য অন্তরের।

"এইরূপ লোকের প্রতিকৃতি লিখিত করা খুব কঠিন নয় provided তোমার প্রাণ থাকে। তোমার প্রাণ না থাকিলে এরূপ লোকের সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিবে না—এমন কি একটু ভোলানাথ মনে হইতেও পারে। তুমি কি নির্ব্বিশেষেই ভোলানাথের admirer? আমি ত নই। একরকম ভোলানাথগিরি শুদ্ধমাত্র carelessness বা 'হযবরল'ত্ব হইতে জন্মিয়া থাকে—তাহাকে আমি admirable মনে করি না—এই-সব ভোলানাথদের বাহিরও যেমন শিথিল অন্তরও তেমনি শিথিল। হৃদয়ে কোন গভীর স্রোত নাই, এমন কি হৃদয় নিতান্ত মলিন। অবশ্য এদের মধ্যে helplessnessএর একটা সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবুর মত ভোলানাথ কি admirable! ইহারা-সব ideaর ভোলানাথ। Art বল, Philosophy বল, সমস্তের উচ্চতম শিক্ষা দ্বিজেন্দ্র-বাবুর মাথায় আছে। সাধারণ লোকের মত যে আছে তা নয়। Geniusএর মত আছে, বা Originally আছে। তিনি Modern Literature হয়ত জানেন না (আমি খুব modernএর কথাই বলিতেছি) অথচ তাহার কোন ভাব ইঁহার অনায়ত্ত নাই, ইনি originally সে সব জানেন। তা ত হইবেই, কবিতা পড়িয়াই বুঝিতে পার। বিনা নকলে আমাদের দেশে অত বড় কবি আধুনিক কালে আর কেউ আছে—তোমার মনে হয়? আমার তো মনে হয় না।

"দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন 'তখন (যৌবনে) আমি কবিতা অনেক সময়ে লিখিতেই পারিতাম না, ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতাম। একটা তেতলা কামরায় থাকিতাম, সামনে একটা বাগান, দূরে একটা পুকুর, করে আমি মনে কর্তুম এই উপবন এই সরোবর ইত্যাদি। Natureএর sceneryতে বিভোর হয়ে থাক্‌তুম। চাঁদকে যে আমি কি ভালবাসতুম সে আর বল্‌তে পারিনে। তোমাদের এই Keatsএর কবিতা আমার খুব ভাল লাগে—আমারও অনেকটা এই রকম ভাব ছিল।' এই বলিয়া Keatsএর St. Agnes' Eve হইতে

"St. Agnes' Eve—Ah! bitter chill it was!
The owl for all his feathers was a-cold."

এই প্রথম লাইন দুটি বলিলেন। বাস্তবিক তাঁহার কবিতার সঙ্গে Keatsএর কবিতার সৌসাদৃশ্য আছে—নয় কি?

"পোষাকপরিচ্ছদ বিষয়ে ইনি—শুন! একদিন একটি বিছানায় পাতিবার লাল কম্বল গায়ে দিয়া উপস্থিত—সে আবার ময়লা। ইনি সন্ধ্যাবেলা আসিয়া আমাদের সঙ্গে বসেন। আসিয়া এখানে এ-কথা ও-কথা বলিতে বলিতে যদি একবার ধরিলেন ত Kant, Spinoza, Herbert Spencer, বেদান্ত ইত্যাদি বিষয়ে ইঁহার যতগুলি মতামত

* সতীশচন্দ্র রায় তখন 'বঙ্গদর্শন' নামক মাসিক পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন-প্রয়াণের' এক সমালোচনা লিখিয়াছেন।

সমস্ত আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন—দু'একবার হয়ত বলিলেন 'আপনাদের আমি detain কচ্ছি কি?' আবার আরম্ভ করেন। শেষে আমরা হয়ত খাইতে যাইব এই যোগাড় দেখিয়া 'ও, তবে আপনাদের খাবার এসেছে' বলে—দুতিনবার বলে ধীরে ধীরে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও 'তবে এখন পালাই' বলিয়া চলিয়া যান।

"হয়ত কিছুদূর আলাপ করিতে করিতেই নিজের খাতাটি বাহির করিয়া 'আপনারা আমার এই সার সত্যের আলোচনাটি শুনবেন কি?' এই বলিয়া আমাদের মত একটু সঙ্কোচের সঙ্গে পড়িতে থাকেন এবং পাঠান্তে আমাদের মত সঙ্কোচের সঙ্গে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করেন 'কেমন হইয়াছে?' 'ভাল হইয়াছে' শুনিলে 'এ, ভাল হইয়াছে?' বলিয়া প্রীত হন। এত জ্ঞানী অথচ এত সরল লোক আমি আজ পর্যন্ত দেখি নাই! বাস্তবিক প্রকৃত জ্ঞানীরাই সরল। আজ সকাল বেলা Maeterlinckএর Wisdom and Destiny অর্থাৎ 'প্রজ্ঞা ও নিয়তি' নামক বহিটি পড়িতেছিলাম—পড়িয়া দেখিও তার মধ্যে প্রজ্ঞার কি গভীর কি সুন্দর ব্যাখ্যা Maeterlinck করিয়াছেন। অত্যন্ত ব্যগ্র, পরম বিশ্বাসী, মেঘের মত প্রেমী, নিশীথের ন্যায় শান্ত নিরহঙ্কার অথচ অতি উদার, সমস্ত বিশ্বজগতের রহস্যের মুখামুখী শয়ান, অভিভূতব্য চিত্তের একটি ভাব, তাহাকেই বলে প্রজ্ঞা বা Wisdom! সেই প্রজ্ঞা দ্বিজেন্দ্রবাবুর আছে।

"তিনি বলেন 'কেউ যদি আমার কাছে জানতে চায় Philosophy কি করে পড়তে আরম্ভ করবে তা হ'লে আমি ঠিক পেয়ে উঠিনা তাকে কি উপদেশ দেব! তাকে কি পড়তে বলব! Philosophy পড়বে? কেন পড়বে? তোমার কি দরকার? এই প্রশ্নটি আগে জিজ্ঞাসা করতে হয়।" ভাবিয়া দেখ কি গভীর! আমরা এই রকম করিয়া যদি জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে যাই তবেই প্রকৃত মানুষ হইতে পারি না কি? একটা জিনিষ কেন পড়ি? টাকা—নয়ত নাম, নয়ত বিদ্যাফলানের জন্য—নয়ত গড্ডালিকা-প্রবাহে চলন! কিন্তু বাস্তবিক আমার Humanity গরুড়ের মত ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া হাঁ করিয়া খাইতে চায়—Spiritual Life ক্ষুধায় হা হা করিতেছে, তার ক্ষুধা নিভাইতে দর্শন, বিজ্ঞান, কবিতা, অঙ্ক—কিছু একটা পড়িব—এ ভাবে ক'জন পড়ে?

"Lifeএর ক্ষুধায় না পড়িলেই বিদ্যাটি জীবনের কাঁধে চড়িয়া বসে—আত্মার চেয়ে বিদ্যা প্রবল হয়—এ বিদ্যার জ্ঞান হয় না, অবিদ্যা জন্মে—অজ্ঞান জন্মে। ইহাকে দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন দোমেটে জ্ঞান—অর্থাৎ কিনা অসরল জ্ঞান—আমার যাহা common sense আছে তার উপর বিদ্যা লেপিয়া দিলাম। ইহা অজ্ঞান—ইহার উপর যদি আবার তা নিয়া অহঙ্কার হইল (হওয়াই স্বাভাবিক) তাহা হইলে হইল দোমেটে অজ্ঞান (দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাষায়)।

"এখন বুঝিবে দ্বিজেন্দ্রবাবু কোন্ জায়গাটিতে দাঁড়াইয়াছেন—অর্থাৎ প্রকৃত wisdomএর উপরে। বাস্তবিক একএক সময় ঐ সরল হৃদয়টি ভেদ করিয়া যে গভীর অধ্যাত্ম-ব্যগ্রতা বাহির হয় তাহাতে যার হৃদয় না স্পর্শ করে সে পাষাণ হইতে পাষাণ। আমার চিরদিন এই দৃশ্যটি মনে থাকিবে—

"রাত্রি প্রায় এগারোটা! শান্তিনিকেতনের নীচের বৈটকখানায় couchএ শুইয়া সেই বৃদ্ধ কবি—পাশে চেয়ারে বসিয়া আমি। ঐ পাশে চেয়ারে গ্লোবের মধ্যে মোমের বাতি জ্বলিতেছে। বুড়ার মাথাটির দৃঢ় সারল্য-ব্যঞ্জক গঠনটি দেখিতেছি—উন্নত কপালের চৌদিকে পিছে উঠান সাদা চুল। নাকের উপর চস্‌মা আলোতে চক্ চক্ করিতেছে—একএক সময়ে চক্ষুটি জ্বলিয়া উঠিতেছে। * * * *

* * * *

"প্রকৃত idealistএর প্রতিকৃতি এতদিনে আমি দেখিলাম। ইঁহাদের একটি লক্ষণ এই যে ইঁহারা যে কথাই বলুন তাহা নিজের অন্তরাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া যেন বলিতে থাকেন—বাইরের লোক সামনে দাঁড়াইয়া থাকে মাত্র। ভাবিয়া দেখ দেখি—জাগ্রত অন্তরাত্মাকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা যদি কথাবার্ত্তা সব বলি, তাহা হইলে আমাদের বাক্যে কি সত্য, কি তীব্রতা, কি তেজ স্ফুরিত হইতে বাধ্য। আমরা যাহাকে ভালবাসি তার কথা বলিতে গেলে তার মধ্যে কি একটা মর্ম্মঘাতী সুর থাকে ভাব দেখি!

"দ্বিজেন্দ্রবাবুর মুখে এই দু'দিনে কালীবর বেদান্ত-বাগীশের কথা কয়েকবার শুনা গেল। সেই নাম উচ্চারণের সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার মূর্ত্তি আমি দেখিয়াছি। * * * কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কথা পাড়িয়া বলিলেন 'বাস্তবিক, আমাদের দেশে রাজা রাজড়ারা যে কেমন, ওঁকে patronize করে না!—আমি যদি পার্ত্তুম তা'হলে কর্ত্তুম। এবার গিয়েই তাঁকে দেখতে হচ্ছে, হয়ত তিনি জীবিত নাই, এতদিনে অন্তর্ধান করেছেন।' এই সব কথায় বৃদ্ধের স্বরটি এমনি তীব্র করুণ হইল যে তাহা তুমি নিজে না শুনিলে বুঝিবে না। ঐ সুরেই আমি সশ্রদ্ধ প্রীতির মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাষা ঠিক তাঁহার অন্তরটির ছবি। ঠিক ঐ রকম সরল তেজস্বী, চিরযুবা, সত্যান্বেষী, একাগ্র।

* * *

দ্বিজেন্দ্রবাবুর মুখে (বৃদ্ধের চেহারা অন্তরেই দেখিতে পাইবে, আবার অন্তর তাঁহার কথাবার্ত্তাতেই দেখা যায়) সরল ভাব তো আছেই, কিন্তু অন্তরের চেহারায় একটি বড় জোরের অথবা বীর্য্যের ভাব আছে। এই-সকল জ্যোতির স্পর্শে অন্তরাত্মা জাগে।"

* * *

দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনী লেখা বড় সহজ নহে। লিখিতে গেলে রীতিমত একখানি পুস্তক লিখিয়া ফেলিতে হয়। তবে মোটামুটিভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সাহায্যে তাঁহার আভাস দিবার চেষ্টা করিলাম। কৃতকার্য্য হই নাই সে বলাই বাহুল্য, তবে উপরিউক্ত পত্রটিতে তাহার পূরণ হইয়াছে। এমন দৃষ্টি দিয়া দেখিবার ক্ষমতা অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে।

শ্রী—।

প্রাণের জোয়ার

প্রাণে আমার জোয়ার জাগে
ভরা নদী কানায় কানায়,
কূল-ভাঙ্গা ঢেউ উছলে লাগে
সান্-বাঁধা এই বুকের রানায়।
গুম্‌রে কাঁদে স্রোতের ধারা
মাথা গোঁজে ঘূর্ণিপাকে,
আথাল্-পাথাল্ দিশেহারা
ছুট্‌ছে নদী বানের ডাকে।
ঘাটের তটে ফেনিল ব্যথা
কাঁপে ক্ষণেক বুদ্‌বুদিয়ে;
দুখের মোটে দুটি কথা
ফোটে স্মৃতি উদ্বোধিয়ে।

২

অধীর জোয়ার গভীর নদীর
কি যে বেগে ছুট্‌ছে ঘুরে,
জান্‌বি যদি, দেখ্‌বি যদি,
বস্ রে বুকের ঘাটটি জুড়ে।
না না তোরা আসিস্‌নে রে!
হলেও পাষাণ সিক্ত দাওয়া;
তোরা যে কেউ পারিস্‌নে রে
সইতে হেথায় জলো' হাওয়া।
উছল গাঙ্গে জল ধরে না,
উজান বহে খর ধারে।
শুষ্ক আঁখি, জল ঝরে না;
ক্ষুব্ধ দৃষ্টি অকূল পাবে।

৩

পাড় ভেঙ্গে যাক্ নদীর তোড়ে,
সান্ ভেঙ্গে যাক্ পাষাণ-বাঁধা।
রুদ্ধ সন্ধির জোড়ে জোড়ে
বান্ ডাকিয়ে আমায় কাঁদা।
তীরের ঢেউএ বুক ভরে না,
ফেনিয়ে শুধু গুম্‌রে মরি;
উছল গাঙ্গে জল ধরে না
পিছল পথে ঝাঁপিয়ে পড়ি।
আথাল্-পাথাল্ ঘোলা জলে
যাই রে ভেসে দিশেহারা!
জোয়ার বহে প্রাণের তলে
তীব্র বহে ক্ষিপ্তধারা।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

অবিমারক

মহাকবি ভাস-বিরচিত নাটক।

[মহাকবি ভাস নামে যে কোনো একজন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটক-রচয়িতা প্রাচীন কালে ছিলেন, তাহা অধিকাংশ লোকেই জানিতেন না। তাঁহার কোনো গ্রন্থও লোকসমাজে পরিচিত নাই। কেবল বিবিধ সংস্কৃত কাব্যে ও নাটকে ভাসের গুণকীর্তির উল্লেখ দেখিয়া অনুমান করা হইত যে ভাস নামে কোনো একজন শ্রেষ্ঠ নাটককার প্রাচীন ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রসন্নরাঘব নাটকে কবিতারূপিণী কামিনীর বিভিন্ন লীলাবিভ্রমের প্রতিরূপ বলিয়া বিভিন্ন কবি বর্ণিত হইয়াছেন; সেই প্রসঙ্গে আমরা ভাসের নাম পাই—

যস্যাশ্চোরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো,
ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।
হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ
কেষাং নৈষা কথয় কবিতা-কামিনী কৌতুকায় ॥
(প্রসন্নরাঘব নাটক)

সপ্তম শতাব্দীর মহাকবি বাণভট্টের হর্ষচরিতেও ভাসের উল্লেখ আছে—

"সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশোলেভে ভাসো দেবকুলৈরিব ॥"

মহাকবি রাজশেখরকৃত সূক্তিমুক্তাবলীতে ভাসের নাম পাওয়া যায়—

ভাসনাটকচক্রেঽপিচ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুং।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ।

সুভাষিত-শার্ঙ্গধরে এই অবিমারক নাটকের প্রথম অঙ্কের শেষ শ্লোক "ধর্মঃ প্রাগেব চিন্ত্যঃ সচিবমতিগতিঃ প্রেক্ষণীয়া স্ববুদ্ধ্যা" ইত্যাদি শ্লোকটি প্রায় অবিকল উদ্ধৃত দেখা যায়।

এমন কি মহাকবি কালিদাসও মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন "প্রথিতযশসাং ভাস-সৌমিল্ল কবিপুত্রাদীনাং।" এবং শকুন্তলা নাটকের অনেক শ্লোক ভাসের শ্লোকের অনুকৃতি বলিয়া এখন বুঝা যাইতেছে। মৃচ্ছকটিক নাটকেও ভাসের বহু পংক্তি অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়। ভাসের অবিমারক নাটকে নায়িকাকে হস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া নায়কের প্রণয়বিলাপ ভবভূতির মালতীমাধব নাটকে শার্দ্দূলকবল হইতে নায়িকাকে রক্ষাকর্তা নায়কের মুখে অনুকৃত হইতে শুনা যায়।

অতএব বুঝা যাইতেছে ভাস বড় সামান্য কবি ছিলেন না।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ত গণপতি শাস্ত্রী মহাকবি ভাসের বহু পুস্তক আবিষ্কার করিয়াছেন। নাটকগুলির নাম—(১) স্বপ্নবাসবদত্তা (২) প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ (৩) পঞ্চরাত্র (৪) চারুদত্ত (৫) দূতঘটোৎকচ (৬) অবিমারক (৭) বালচরিত (৮) মধ্যমব্যায়োগ (৯) কর্ণভার (১০) ঊরুভঙ্গ (১১) অভিষেক (১২) প্রতিমা (১৩) একখানি নামহীন নাটক। পুস্তকগুলির নাম হইতেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে পরবর্ত্তী বহু কবির কাব্যাদর্শ হইয়াছিল ইহারা; অনেক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের উপাখ্যান ভাসের নাটকের অনুরূপ। এই-সমস্ত পুস্তকের আন্তরসাদৃশ্যপ্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে এগুলি একই লোকের লেখা, কিন্তু কোনো নাটকেই লেখকের নাম বা পরিচয় নাই। কিন্তু বাণভট্টের হর্ষচরিতের উদ্ধৃত শ্লোক হইতে স্বপ্নবাসবদত্তা যে ভাসের রচিত তাহা জানা যায়; এবং তাহা জানিয়া রচনাসাদৃশ্যে অপরগুলিকেও ভাস-রচিত বলিতে সন্দেহ থাকে না।

বন্দ্যঘাটীয় সর্ব্বানন্দের অমরকোষটীকাসর্ব্বস্ব, অভিনবগুপ্তের ভরতনাট্যবেদবিবৃতি, বামনের ধ্বন্যালোক ও কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি, দণ্ডিনের কাব্যাদর্শ, বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণ, ভামহের কাব্যালঙ্কার, গুণাঢ্যের বৃহৎকথা, বিষ্ণুগুপ্তের কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্র, প্রভৃতির মধ্যে ভাসের নাটকের উল্লেখ দেখিয়া শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী ভাসকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল এবং শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা ভাসের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর এদিকে নয় স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মহাকবি ভাস সুঙ্গরাজভৃত্য কাণ্ব বা কাণ্বায়ন রাজবংশের তৃতীয় রাজা নারায়ণের সভাকবি ছিলেন। অবিমারক নাটকের মঙ্গলাচরণে এই নারায়ণেরই স্তুতি উদ্‌গীত হইয়াছে। তাহা হইলে ভাস দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বকার কবি! ভাসের নাটকে উপাখ্যানের পারিপাট্য, ঘটনাবিন্যাসের কৌশল, কবিত্ব প্রভৃতি অপেক্ষা তাৎকালিক সামাজিক রীতিনীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া এগুলি বিশেষ সমাদরের যোগ্য। আমরা ক্রমশ ভাসের অধিকাংশ নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।]

পাত্র

পুরুষ—

রাজা—নাটকের নায়িকা কুরঙ্গীর পিতা কুন্তিভোজ।

কৌঞ্জায়ন, ভূমিক — কুন্তিভোজ রাজার অমাত্য।

ভৃত্য—কুন্তিভোজ রাজার, জয়সেন নামধেয়।

অবিমারক—নাটকের নায়ক, সৌবীররাজের পুত্র।

সৌবীররাজ—অবিমারকের পিতা।

বিদূষক—অবিমারকের বয়স্য, নাম সন্তুষ্ট।

নারদ—দেবর্ষি।

বিদ্যাধর।

স্ত্রী—

দেবী—কুন্তিভোজ রাজার মহিষী।

কুরঙ্গী—কুন্তিভোজ রাজার কন্যা।

সুদর্শনা—অবিমারকের জননী, কাশীরাজ-মহিষী।

প্রতিহারী—কুন্তিভোজের অন্তঃপুরদ্বারপালিকা।

দাসী—কুরঙ্গীর কিঙ্করী, নাম চন্দ্রিকা।

ধাত্রী—কুরঙ্গীর উপমাতা, নাম জয়দা।

নলিনিকা

মাগধিকা　　কুরঙ্গীর সখী।

বিলাসিনী

বসুমিত্রা } মহিষীর দাসী।
হরিণিকা }

সৌদামিনী—বিদ্যাধরবধূ।

(নান্দী পাঠের পর সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার

প্রলয়পয়োধিজলে মজ্জমানা বসুধারে ধরি
এক দন্তে জল হতে উদ্ধারিল যেই দয়া করি,
বলিরে ছলিয়া যেই এক পদে ধরণীর বুক
ঢাকি দিয়া দিয়েছিল প্রীতিপূর্ব্ব পরিপূর্ণ সুখ,
একচক্রা বসুধারে জয় করি নিজ ভুজবলে,
সম্ভোগ করিল যেই চক্রবর্ত্তী রাজন্যমণ্ডলে,
সেই নারায়ণ যিনি বিশ্ববন্ধু নরের অয়ন,
একচ্ছত্র ছায়াতলে বসুধারে করুন পালন !

(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) আর্য্যে, এই দিকে একবার এস।

নটী (প্রবেশ করিয়া)

আর্য্য, এই যে আমি।

সূত্রধার

আর্য্যে, তোমার মুখের কৌতুহল ও স্মিত ভাব অন্তরের ভাব প্রকাশ করে দিচ্ছে। তোমার কিছু বলতে ইচ্ছে হয়েছে নিশ্চয়।

নটী

আপনি যে মুখ দেখে মনের ভাব টের পাবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? আর্য্য ভাবজ্ঞ।

সূত্রধার

তবে অভিলাষ ব্যক্ত করে ফেল।

নটী

আর্য্যের সঙ্গে উদ্যানভ্রমণে যেতে অভিলাষ হয়েছে, সেখানে আমার কিছু মেয়েলি ব্রতকর্ম্ম আছে।

নেপথ্যে

ভৃত্তিক, কুরঙ্গীকে রক্ষা করবার জন্যে তুমিও উদ্যানে যাও। রাজহস্তী অঞ্জনগিরি আজ মদমত্ত হয়েছে।

সূত্রধার

আর্য্যে, তুমি শুনলে ত—রাজকুমারী উদ্যানে গেছেন। এখন উদ্যানের চারিদিকে পর্দা পড়েছে, পাহারা বসেছে। রাজকুমারী ফিরে এলে যাওয়া যাবে তখন।

নটী

আর্য্যের যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

ইতি স্থাপনা

প্রথম অঙ্ক

পরিজন-পরিবৃত রাজা সমাসীন।

রাজা

নির্ব্বিঘ্ন সকল যজ্ঞ, তাই তুষ্ট সর্ব্ব দ্বিজগণ,
গর্ব্বিত রাজেন্দ্র যত ভয়রস করে আস্বাদন,
তথাপি আমার মনে হর্ষ নাহি তিল স্থান পায়,
কন্যার পিতার প্রাণে নানা চিন্তা শান্তিরে খেদায়।

কেতুমতী, দেবীকে ডেকে আন।

প্রতিহারী

যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান)

দেবী (পরিজন-পরিবৃতা হইয়া প্রবেশ করিয়া)

মহারাজের জয় হোক।

রাজা

দেবী, তোমার নিত্যপ্রসন্ন মুখ আজ অতিপ্রসন্ন দেখাচ্ছে। এই আনন্দের কারণ কি ?

দেবী

মহারাজ ঠিক ধরেছেন—কুরঙ্গীর জন্যে দূত এসেছে, অচিরে জামাইয়ের মুখ দেখতে পাব।

রাজা

বটে ? কিন্তু তাড়াতাড়ি কিছু ঠিক করে ফেলো না যেন। এস, বস, সব বলছি।

দেবী

মহারাজের যেমন অভিরুচি।

(উপবেশন করিলেন)

রাজা

দেবী, বিবাহ অনেক পরীক্ষার পর স্থির করা উচিত। কারণ,

আগে সবিশেষ নাহি বিচারিলে
জামাতার সঙ্গতির কথা
শেষে অদৃষ্টে অশেষ দুঃখ
ইহা একেবারে অনন্যথা।—
গরীবের ঘরে ধনীর কন্যা
দুই কূল সে যে ভাঙিবে স্বত,
বর্ষায় রাঙা দুই-কূল-ভাঙা
ক্ষুব্ধসলিলা নদীর মতো।

অ্যাঁ গোলমাল কিসের ?

বহুকণ্ঠে উচ্চরোল দূরে তবু নিকটে শুনায়,
কুরঙ্গীর কারণেতে চিত্ত মোর ব্যাকুল শঙ্কায়।

দেবী

হাঁা, বাছা আমার উদ্যানে গেছে।

রাজা

কে ওখানে ?

ভৃত্য (প্রবেশ করিয়া)

মহারাজের জয় হোক। আর্য্য কৌণ্ডায়ন নিবেদন করতে উপস্থিত হয়েছেন।

রাজা

শীঘ্র নিয়ে এস।

ভৃত্য

মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(নিষ্ক্রান্ত)

(দূরে কৌণ্ডায়নের প্রবেশ)

কৌণ্ডায়ন (দুঃখিত ভাবে)

হায়, অমাত্য হওয়া কি কষ্ট।

সুসম্পন্ন হলে কার্য্য প্রশংসা যা সমস্ত রাজার ;
পণ্ড হলে, অমাত্যের সীমা নাহি থাকে লাঞ্ছনার।

জয়সেন, প্রভু কোথায় আছেন ? উপস্থানগৃহে ? সেইজন্যই এই স্থান নিঃশব্দ হয়েছে। (অগ্রসর হইয়া সসম্ভ্রমে) প্রভু প্রসন্ন হৌন, প্রভু প্রসন্ন হৌন।

রাজা

আহা থাক থাক হয়েছে। বস, ব্যাপার কি বল।

কৌণ্ডায়ন

প্রভুকে সমস্তই নিবেদন করছি। প্রভু আমাকে আদেশ করেছিলেন যে— রাজকুমারীর সঙ্গে তুমি উদ্যানে যাও......

রাজা

হাঁা তা ত বলেছিলাম। তাতে কি ?

কৌণ্ডায়ন

রাজকুমারী উদ্যানে গিয়ে আপন মনে খেলা করে' দাসদাসীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাসতে হাসতে ফিরে আসছিলেন, এমন সময় উচ্চ বৃংহণে শ্রবণ বিদীর্ণ করে' মদমত্ত হস্তী মূর্ত্তিমান পবনের মতো দেখতে না দেখতে সেখানে ছুটে এসে পড়ল ; হস্তীর মস্তক হতে মদ-ধারাস্রাব হচ্ছিল, গমনবেগে উচ্ছ্রিত ধূলিজালে তার সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল; সে সমস্ত রক্ষীদের ফেলে দিয়ে মাড়িয়ে বধ করে' রাজরক্ষীদের দোষী করবার ও একজন অপরিচিত পুরুষের পৌরুষ প্রকাশের অবসর দেবার জন্যেই যেন এসে পড়ল।......

রাজা

থাক থাক্ তোমার বিস্তারিত বিবরণ। আগে বল কুরঙ্গী কুশলে আছে ত ?

কৌণ্ডায়ন

প্রভুর সৌভাগ্য থাকতে তাঁর কি অকুশল হতে পারে ?

রাজা

ভাগ্যিস বেঁচে গেছে ! যাক, এখন সব বল।

কৌণ্ডায়ন

তখন সমস্ত লোকে প্রাণভয়ে পলায়ন করতে লাগল ; স্ত্রীলোকেরা তাদের প্রতিকারের একমাত্র উপায় হাহাকার জুড়ে দিলে ; সমস্ত বীররক্ষীরা নিহত হল ; আমাকে মুহূর্ত্তে দূরে নিক্ষেপ করে' সেই মদান্ধ হস্তী উদ্যানস্থ সমস্ত সামগ্রীকে একবার পরীক্ষা করে' দেখবার জন্যেই যেন রাজকুমারীর পাল্কীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

দেবী

উঃ ! তারপরে না জানি কি ঘটবে !

রাজা

কুরঙ্গীর সহায় তখন কে হ'ল ?

কৌণ্ডায়ন

একজন সুন্দর......(অর্দ্ধোক্ত কথা বন্ধ করিল)

রাজা

এখন বিপদ কেটে গেছে, এখন সব কথাই খুলে বল।

কৌঞ্জায়ন

তখন একজন সুদর্শন অথচ নিরহঙ্কার, তরুণ অথচ অনুদ্ধত, বীর অথচ বিনয়ী, সুকুমার অথচ বলবান্ যুবক হস্তীর আক্রমণে ভয়াভিভূতা রাজকুমারীকে তৎকাল-দুর্লভ অভয় দান করে' নিঃশঙ্ক হৃদয়ে গিয়ে সেই গজ-রাজকে বাধা দিলে।

রাজা

তারপর তারপর ?

কৌঞ্জায়ন

তারপর সেই দুষ্ট হস্তী সেই যুবকের ক্ষিপ্রহস্তের ঘন ঘন তাড়নায় রুষ্ট হয়ে রাজকুমারীকে ছেড়ে তাকেই বধ করবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

দেবী

আহা, বাছার কুশল ত ?

রাজা

তারপর ? তারপর ?

কৌঞ্জায়ন

তারপর ভূতিক এসে পড়ল, আমিও গিয়ে পড়লাম; রাজকুমারীকে তাড়াতাড়ি পাল্কীতে চড়িয়ে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলাম।

রাজা

উঃ কী ভয়ানক বিপদ! আচ্ছা, মন্ত্রী ভূতিক কেন সংবাদ দিতে এলেন না ?

কৌঞ্জায়ন

ভূতিক আমায় বলে দিলেন—তুমিই গিয়ে এই ব্যাপার প্রভুকে নিবেদন কর। আমি সেই যুবকের পরিচয় জেনে শীঘ্রই আসছি।

রাজা

ভূতিক যখন গেছে তখন সমস্ত ঠিক জেনে আসবে। কৌঞ্জায়ন, সেই পরের বিপদের সহায় যুবকটি কোন্ বংশের লোক বলে' মনে হয় ?

কৌঞ্জায়ন

মহারাজ! তিনি আপনাকে অন্ত্যজ জাতি বলে পরিচয় দিয়ে বিষম বিসম্বাদ বাধিয়ে দিয়ে গেছেন।

দেবী

মহারাজ, অকুলীন লোক কি কখনো এমন পরদুঃখ-কাতর হয় ?

রাজা

তবে সে কি হওয়া সম্ভব ?

(দূরে ভূতিকের প্রবেশ)

ভূতিক (সবিস্ময়ে)

আহা, পৃথিবীর বুকে কত রত্নই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে! সেই যুবকটির ত্বরিত-প্রকাশিত অকপট বিক্রমের কাছে মনস্বীদের বুদ্ধির ক্ষিপ্রতা ও বিক্রম হার মেনে যায়! একটা সন্দেহ আমার মনে জাগছে, কেন সে আপনার বংশপরিচয় গোপন করছে ? কিন্তু সূর্য্যকে হস্ত দিয়ে আচ্ছাদন করার মতো তার ছদ্ম পরিচয় তাকে গোপন করে রাখ্তে পারছে না।

আপনার অন্তরের গুপ্ত হেতুবশে,
গুরুজন-আজ্ঞা মানি, কিংবা দৈবদোষে
সাধুজন ছদ্মবেশে ভ্রমে পৃথিবীতে ;
পরদুঃখে ভুলে কিন্তু নিজেরে সম্বৃতে।

জয়সেন, মহারাজ কোথায় আছেন ? উপস্থান-গৃহে ? সেই হেতু এই স্থান নিঃশঙ্ক হয়েছে। তবে প্রবেশ করি। (দরবার-গৃহে প্রবেশ করিয়া) ঐ যে দেবীর সহিত মহারাজ বিরাজ করছেন। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হোক।

রাজা

দেবী, তুমি অন্তঃপুরে গিয়ে কুরঙ্গীকে আশ্বস্ত করগে ; আমি তোমার পায়ে পায়ে এলাম বলে'।

দেবী

যে আজ্ঞা মহারাজ।

(নিষ্ক্রান্ত)

রাজা

পরের বিপদে নিজের শরীর ও প্রাণ যে তুচ্ছ করে-ছিল, সেই যুবকের সংবাদ কি ?

ভূতিক

মহারাজ শ্রবণ করুন। সে মুহূর্ত্তমধ্যে সেই দুর্দ্দান্ত হস্তীকে বিশেষ কোন কৌশলে বশীভূত করে' ঠিক প্রিয় বয়স্যের মতো তার সঙ্গে খেলা করতে করতে যেন এই কার্য্যের জন্য লজ্জায় ও সকল লোকের প্রশংসায় মাথা নত করে' ধীরে ধীরে নিজগৃহে প্রস্থান করলে।

রাজা

আঃ বাঁচা গেল! এই আর এক লাভ।

ভূতিক

তারপর সেই হস্তীকে হস্তিনীদের দ্বারা পরিবৃত করে হস্তীশালায় তাকে বন্ধন ও বদ্ধ করে রাখিয়ে আমি সেই যুবকের পশ্চাতে পশ্চাতে অজ্ঞাতসারে তার পরিচয় জানবার জন্যে তার বাড়ী পর্য্যন্ত গেলাম।

রাজা

কি জেনে এলে? আমরা ত শুনলাম সে অন্ত্যজ জাতি।

ভূতিক

না না না। সে কখনো অন্ত্যজ নয়। কোনো কারণে এখন ছদ্মপরিচয়ে আত্মগোপন করছে।

রাজা

তুমি তা হলে কি জেনেছ?

ভূতিক

এখানে জানবার আর বাকী আছে কি?

দেবতার তুল্য যার সুকুমার দেহখানি,
ব্রাহ্মণের মতো যার স্নিগ্ধ মিষ্ট প্রিয় বাণী,
হৃদয়ের তেজ আর শক্তিবল শরীরের
দেখিলেই পাই যার পরিচয় ক্ষত্রিয়ের,
সেই লোক যদি হয় নীচ কুলে উদ্ভূত
শাস্ত্র তবে পণ্ড সব, ধর্ম্ম পথবিচ্যুত।

রাজা

সে ব্যক্তি কি বিবাহিত?

ভূতিক

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়া আমার স্বভাব নয়।

রাজা

স্ত্রীদর্শন পরিহার করলেও তার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ত কোনো বাধা ছিল না।

ভূতিক

সেই সৎপুত্রসম্পন্ন ভদ্র লোককে দেখে এসেছি বৈ কি।

ব্যায়ামে বিপুল আয়ত বক্ষ উন্নত তার স্কন্ধ,
ধনুর্গুণের ঘন ঘর্ষণে কর্কশ মণিবন্ধ,
চক্রবর্ত্তী-চিহ্ন ফুটিয়া উঠিছে ছদ্মবেশে,
মেঘের আড়ালে রবির প্রতাপ প্রভায় উঠিছে হেসে।

রাজা

এই সব অনুমান কথা থাকুক। তুমি পুনরায় ত পরিচয় সন্ধান কর।

ভূতিক

যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা

সম্প্রতি কাশীরাজের দূতকে কি বলা যায়?

ভূতিক

প্রভু, শত শত দূত যাবে, আসবে। কিন্তু তাতে কি

কন্যার জনক, সে ত যে-সে লোক নয়,
তার কন্যা লাভ তরে সবার বিনয়।
যুদ্ধক্ষেত্রে পতাকার সম কন্যারত্ন,
তারি অধিকার তরে সবাকার যত্ন।

রাজা

তোমার কি পরামর্শ?

ভূতিক

সর্ব্বত্র দয়া করা চলে না। চাইলেই ত যাকে-তাকে দান করা যুক্তিসঙ্গত নয়। গুণবাহুল্য দেখে, বর্ত্তমা ও ভবিষ্যৎ আলোচনা করে,' ত্বরা ও দীর্ঘসূত্রতা পরিহা করে', দেশ ও কালের অবিরোধী ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

রাজা

ঠিক বলেছ ভূতিক। কৌণ্ডায়ন, তুমি চুপ করে রয়েছ যে?

কৌণ্ডায়ন

প্রভু, ক্ষত্রিয় ত আছেন অনেক। তার মধ্যে সৌবীররাজ ও কাশীরাজ উভয়েই মহারাজের ভগিনীপতি সুতরাং নিকট কুটুম্ব। সম্বন্ধ করতে হলে এঁরাই মহারাজের বৈবাহিক হবার যোগ্য বলে' আমার মনে হয় এর পূর্ব্বেই সৌবীররাজ তাঁর পুত্রের সঙ্গে কুরঙ্গী বিবাহের প্রস্তাব করে দূত পাঠিয়েছিলেন। কন্যা অতি বালিকা বলে আমরা সেই দূতকে ফিরিয়ে দিয়েছি এখন কাশীরাজ পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবার প্রস্তাব করে দূত পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে কোন্ সম্পর্ক সমধিক স্পৃহণীয় তা মহারাজই বিচার করবেন।

রাজা

কৌঞ্জায়ন ঠিক বলেছ। ভূতিক, সমস্ত রাজমণ্ডলের মধ্যে এই বিশেষ দুজনের কোন জন সবিশেষ ?

ভূতিক

রাজারা ভৃত্যের দোষ গ্রহণ করেন না। মন্ত্রীদের প্রভু রাজারাই।

রাজা

অত সম্মানের ছলনা রাখ। কি স্থির করেছ বল।

ভূতিক

এখন আর না বলে' উপায় কি ? মহারাজ, সৌবীর-রাজ ও কাশীরাজ মহারাজের ভগিনীপতি, সুতরাং উভয়েই তুল্য আত্মীয়। কিন্তু সৌবীররাজ আবার দেবীর ভ্রাতা, সুতরাং তাঁরই স্বত্বপ্রার্থনা বলবত্তর।

রাজা

তোমার পরামর্শ আমাদের ইচ্ছার প্রতিকূল নয়।

ভূতিক

সর্ব্ব প্রকারেই অনুগৃহীত হলাম।

রাজা

আচ্ছা. সৌবীররাজ পুনরায় দূত প্রেরণ করছেন না কেন ?

ভূতিক

এ সম্বন্ধে আমার কিছু সন্দেহ জন্মেছে। ভালো করে পরীক্ষা করে বলব, এখন ঠিক বলতে পারছি না।

রাজা

তাঁর কুশল ত ?

ভূতিক

চর-মুখে শুনিয়াছি পুত্র সহ রাজা নিরুদ্দেশ,
রাজ্য এবে মানিতেছে প্রতিনিধি অমাত্য-আদেশ,
কারণ ইহার কিছু নাহি পাই করি অন্বেষণ,
কিংবা তত্ত্ব নাহি পাই কোথা আছে সপুত্র রাজন।

রাজা

হায় হায় ! এর কারণ কি ?
লোভতন্ত্রী মন্ত্রী যত কুচক্র করিয়া
রাজার জীবন রাজ্য নিল কি হরিয়া ?
কিংবা রোগাতুর হয়ে লুকাইয়া থাকি
আত্মীয়ের আনুগত্য পরীক্ষার ফাঁকি ?
কিংবা শাপে ব্রাহ্মণের সন্তপ্ত জীবন,
করিছেন প্রায়শ্চিত্ত শান্তি স্বস্ত্যয়ন ?
সৌবীররাজের অজ্ঞাতবাসের কারণ শীঘ্র নির্ণয় কর।

ভূতিক

যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা

কৌঞ্জায়ন, কাশীরাজের দূতকে এখন কি বলা যায় ?

কৌঞ্জায়ন

কাশীরাজের দূতকে সমাদরের সহিত ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

রাজা

হায়, অমাত্যদের বুদ্ধি শুধু কাজের কথাই জানে, স্নেহের ধার ধারে না !

নেপথ্যে

প্রভুর জয় হোক, মহারাজের জয় হোক, দশটা নল পূর্ণ হয়ে গেল—দশ দণ্ড বেলা হয়েছে।

ভূতিক

মহারাজ, শেষ কথা আমরা চিন্তা করে দেখব। স্নানের বেলা অতিক্রান্ত হচ্ছে। রাজকুমারীকে আশ্বস্ত করারও প্রয়োজন আছে। মহাদেবী অনেকক্ষণ আপনার প্রতীক্ষা করছেন। এই উপদ্রবে সমস্ত জন-সাধারণও আপনাকে দেখতে উৎসুক হয়ে উঠেছে।

রাজা

হায়, রাজ্য করা কি ঝকমারি !
সদা ধর্ম্ম চিন্তনীয় ; সচিবের মতিগতি
প্রেক্ষণীয় নিজ বুদ্ধিবলে ;
প্রচ্ছন্ন রাখিয়া মনে নরধর্ম্ম রোষক্ষোভ
স্নেহপ্রীতি, চলি যেন কলে ;
লোকের মনের মাঝে উঁকি মেরে ফিরি সদা
চরচক্ষু আমরা কুটিল ;
রণক্ষেত্রে আত্মরক্ষা ধর্ম্ম, কিন্তু আত্মচিন্তা
পাপ ; রাজধর্ম্ম কি জটিল !

(সকলের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আত্মত্যাগী

কোথা তপোবনে যজ্ঞকুণ্ডে জ্বলেনি যজ্ঞানল,
অশুভ নাশিতে পড়েনি আহুতি শুকাতেছে কুশজল।
আহিতাগ্নিক! হ'য়োনা নিরাশ—দধীচি দিতেছে প্রাণ,
অস্থি-শোণিত—ইন্ধন-হবি, দিতে যাগে বলিদান।

বৃষ্টি অভাবে রৌদ্রের দাহে কোথা দেশ ছারখার।
ধু ধু করে মাঠ, হু হু করে প্রাণ, মাঠে মাঠে হাহাকার।
হে কৃষকবর! হয়োনা নিরাশ দধীচি দিতেছে প্রাণ,
বর্ষণ-ধারে মেঘগর্জ্জনে আসিতেছে মহাত্রাণ।

ধর্ম্মজগতে বিপ্লব কোথা, পাপের নিত্যজয়,
সত্যের গ্লানি, পুণ্যের গ্লানি, নিরীহের শত ভয়,
সাধু মহারাজ! উঠ উঠ আজ, দধীচি দিতেছে প্রাণ,
ক্রুশে যোগে রণে কারাগারে বনে তাহার আত্মদান।

স্বর্গ কোথায় রসাতলে যায় অসুরের করতলে,
গিরি গুহা বনে ফিরে দেবগণে লুকাইয়া দলে দলে।
উঠ দেবরাজ, ত্যজ ঘৃণা লাজ, দুখনিশা অবসান,
যোগাসনে ঐ বসেছে দধীচি করিতে অস্থিদান।

শ্রীকালিদাস রায়।

একজন ওরাওঁর আত্মকাহিনী

মঙ্গরার পিতা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। সে মঙ্গলবারে জন্মিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম মঙ্গরা; খৃষ্টীয়ান হওয়ার পর তাহার আর এক নাম হইয়াছে গাব্রিয়েল। সে একদিন আমার আফিসে আসিয়া আমাকে তাহার জীবনের যে কাহিনী বলিয়াছে, তাহাই নীচে বিবৃত হইল।

"আমার শৈশবের প্রথম স্মৃতি সেই এক দিনের যে দিন আমি আমাদের বাড়ী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে বাবার কাঁধ হইতে ঝুলান শিকা-বাহিঙ্গার ঝুড়িতে বসিয়া একটি মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাদের ওরাওঁ মেয়েরা মাথায় করিয়া বোঝা বহে, পুরুষেরা শিকা-বাহিঙ্গায় বোঝা বয়; তেমনি মেয়েরা পিঠে শিশুকে কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ছেলে বয়, আর পুরুষে শিকাবাহিঙ্গা করিয়া বহন করে। এই নিয়ম ভঙ্গ ক শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। আমি এতদিন মা ও দিদিদের পি চড়িয়া বেড়াইতাম। সুতরাং বাবার কাঁধে ঝুল শিকা-বাহিঙ্গায় চড়িয়া মেলা দেখিতে যাওয়ায় আম খুব মজা বোধ হইতেছিল।

"ব্যাপারীরা সেই মেলায় বিক্রয় করিবার জ নানাবিধ পণ্যদ্রব্য সারি সারি বলদের পিঠে ছাল বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতেছিল। বনপথের দৃ বড়ই সুন্দর। আপনারা তেমন দৃশ্য বঙ্গের সমত প্রদেশে দেখিতে পান না। কিন্তু আমার চোখে সে ভারবাহী বলদগুলিই নূতন বোধ হইতেছিল।

"শৈশবের মেলা দেখিতে যাওয়ার পরই মনে প আর একটি অনেক বৎসর পরের ঘটনা। ওরাওঁ গ্রা গুলিতে অবিবাহিত বালক ও যুবকেরা নিজের নিজে মা-বাপের বাড়ীতে ঘুমায় না। তাহারা "ধুমকুড়িয় নামক অবিবাহিতদের সাধারণগৃহে রাত্রিযাপন করে যে দিন আমি প্রথম ধুমকুড়িয়ায় ভর্ত্তি হইলাম, সেদিনকা কথা এখনও ভুলিতে পারি নাই, আমি তখন ১২।১ বৎসর বয়সের। আমাদের ধুমকুড়িয়াটা একটা নী খড়ের চালযুক্ত কুঁড়েঘর মাত্র। দেওয়াল চারিটা মাটী তাহাতে মাত্র একটা দ্বার; জানালা মোটেই নাই তাহাতে আমরা ত্রিশজন থাকিতাম। জন কুড়ির বয় ছিল ষোল হইতে ২১ বৎসর; বাকী জন দশেকের বয় হইবে ১২ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত। বড়রা আমাদের উপ খুবই প্রভুত্ব করিত। প্রাচীন রীতি অনুসারে আমাদিগকে বড়দের গা হাত পা টিপিয়া দিতে হইত, চুলে তেল দিয় আঁচড়াইয়া দিতে হইত, তাহাদের বরাত খাটিতে হই এবং আরও নানারকমে তাহাদের হুকুম তামিল করিতে হইত। বেশী বয়সের অবিবাহিত যুবকদের কাহার কাহারও গুপ্তপ্রণয়ের কাহিনী আমাদের কানে পৌঁছিত কিন্তু ছোটদলের আমাদের কাহারও সে-সব কথ রাষ্ট্র করিতে সাহস হইত না। মাঝে মাঝে চাঁদনী রাতে আমরা ধুমকুড়িয়ার বাহিরে ঘুমাইতাম। তাহাতে আমা দেরও বেশ আরাম হইত, বড়দেরও সুবিধা হইত

ওরাওঁ শিকাবাহিঙ্গায় করিয়া ছেলে বহিতেছে।

আমরা ধুমকুড়িয়া হইতে অদূরে কোন খোলা মাঠে একটা খড়ের গাদায় শুইয়া শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িতাম। গাঢ়নিদ্রায় রাত্রি কাটিয়া যাইত।

"আপনি মনে করিবেন না যে ধুমকুড়িয়ার ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ মন্দ। ইহার ভাল দিক্‌ও আছে। ধুমকুড়িয়ায় বাধ্যতা শিখিবার এবং দল বাঁধিয়া একজোটে কাজ করিতে শিখিবার সুযোগ হয়। সেখানে আমরা আমাদের সামাজিক ও অন্যান্য কর্ত্তব্যও শিখিতাম। কিন্তু সকলের চেয়ে আমাদের ভাল লাগিত শিকার-যাত্রা। প্রায়ই ধনুর্ব্বাণ, লাঠি, বর্শা লইয়া কোন বনাকীর্ণ-পাহাড়ে বা সুবিস্তৃত জঙ্গলে প্রবেশ করিতাম, এবং সমস্ত দিন মৃগয়ার আমোদে কাটাইয়া দিতাম।

"কিন্তু এ-সকল সত্ত্বেও, ধুমকুড়িয়ার কোন কোন ব্যাপার এরূপ ঘৃণ্য যে তাহা আমি বলিতে চাই না। আমার পুত্রপৌত্রদিগকে যে ধুমকুড়িয়া-জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে না, ইহা ভাবিলে আমি এখনও যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। আমাকেও সৌভাগ্যক্রমে বেশীদিন ধুমকুড়িয়ায় যাপন করিতে হয় নাই; যদিও যখন আমাকে তথা হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল, তখন খুব যে আনন্দিত হইয়াছিলাম তাহা নয়।

"সেটা ঘটিয়াছিল এই প্রকারে। আমাদের এক প্রতিবেশীর একটি ছেলে হঠাৎ পীড়িত হইয়া মারা গেল। আমাদের জাতিতে, হঠাৎ কেহ পীড়িত হইলে ও মারা গেলে, অধিকাংশ স্থলে জাদু, ডাইনে খাওয়া, বা এইরূপ একটা কারণ অনুমান করা হয়। আমার ঠাকুরমা গ্রামের মধ্যে সকলের চেয়ে বৃদ্ধা ছিলেন। বার্দ্ধক্যে তাঁহার চেহারা শুষ্কন, শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, গায়ের চামড়া যেন ভাঁজ পড়িয়া গুটাইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তিনি ভিন্ন আর কাহার উপর গ্রামের লোকদের সন্দেহ হইবে? তারপর, যা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, গ্রামের লোকেরা, "সোখা" বা গ্রামের প্রধান জ্ঞানী ব্যক্তির মত জিজ্ঞাসা করায় তিনিও তাহাদেরই মতে সায় দিলেন। গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েৎ করিয়া ঠাকুরমাকে বলিল, "তুমি যে-ভূতকে লাগাইয়া ছেলেটির প্রাণবধ করাইয়াছ, তাহাকে সন্তুষ্ট কর।" সোখা বলিয়াছিল যে অনেকগুলি শূকর, ছাগল ও মোরগমুরগী বলি দিলে তবে ঐ ভূত প্রসন্ন হইবে।

ওরাওঁ বা লকদের খড়ের গাদায় নিশিযাপন।

এতগুলি প্রাণীর দাম ত কম নয়, অনেকগুলি চকচকে টাকা। ঠাকুরমা ভূতপ্রেতের সঙ্গে কোনও প্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করিলেন; বাবাও দৃঢ়তার সহিত তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। কিন্তু সবই বৃথা। পঞ্চায়েৎ তাহাদের দাবী ছাড়িল না। বাবা চিরকালই একটু একগুঁয়ে ছিলেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁহার গোঁ মাত্রায় একটু বাড়িল বই কমিল না। ঠাকুরমা যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ তাহা তিনি দৃঢ়তার সহিত বার বার বলিতে লাগিলেন, এবং সোখাদের ধূর্ত্ততা ও পৈশাচিক কৌশলের নিন্দা করিতে লাগিলেন। ইহাতে গ্রামবাসীরা তাঁহাকে নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তাঁহাকে সকলে একঘরে করিল। তিনি তাহাতেও নরম হইলেন না। শেষে একদিন দুপরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর তিনি নিকটতম পাদ্রিসাহেবের বাড়ী রওনা হইলেন। সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিয়া মা ও ঠাকুরমাকে বলিলেন 'আমি খৃষ্টীয়ান হইব ঠিক করিয়াছি। প্রতিবেশী-দের উৎপীড়ন হইতে উদ্ধার-লাভের ইহা ছাড়া আর উপায় নাই।' মা জানিতেন বাবার

ওরাওঁ দেশে ব্যাপারীদের পণ্যবাহী বলদের দল।

প্রতিজ্ঞা টলিবার নয়। সুতরাং তিনি উচ্চবাচ্য করিলেন না।

"কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের সমস্ত পরিবার খৃষ্টীয়ান হইল। আমরা চিরদিনের জন্য ভূত প্রেত ডাইনী ধুমকুড়িয়া প্রভৃতির নিকট বিদায় লইলাম। ধুমকুড়িয়ার সহিত আমার সম্পর্ক পূর্ব্বেই ঘুচিয়া গিয়াছিল। এখন আমি আমার গলার নানা রকম জাঁকাল গহনা খুলিয়া ফেলিয়া তাহার বদলে একটি

ওরাওঁ ধনুর্দ্ধারী।

ছোট ক্রুশচিহ্ন ধারণ করিলাম। আমাদের জাতির নানা রকমের নাচ শেখা ছাড়িয়া, কেমন করিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া প্রার্থনা করিতে হয়, তাহাই শিখিতে লাগিলাম। তাহার পর আমি পাদ্রিদের প্রাইমারী স্কুলে প্রেরিত হইলাম। সেখানে আমি দুই বৎসরের কিছু অধিক কাল ছিলাম। দুঃখের বিষয় বাবা আমাকে সেখানে আর বেশী দিন রাখিতে পারিলেন না। চাষে তাঁহার সাহায্য করিবার কেহ ত ছিল না। তাই, শুদ্ধ হিন্দুস্থানীতে চিঠি লিখিতে শিখিবার আগেই আমাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনিলেন। যাহাই হউক আমি ভগবানের কৃপায় খাজনার দাখিলা পড়িয়া দেখিতে এবং আমার জোতের পরিমাণ কত তাহা পড়িতে শিখিয়াছিলাম। জমীদার ধূর্ত্ততা করিয়া উহাতে কোন ভুল করিলে আমি তাহা বুঝিতে পারিতাম।

"ইস্কুলে পড়িবার সময় আমার চেয়ে চার বৎসরের ছোট মরিয়ম নামে একটি বালিকার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। মরিয়মদের বাড়ী আমাদের গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক গ্রামে। সে বালিকা-বিদ্যালয়ের

ওরাওঁ বালক ইস্কুল ছাড়িয়া চাষ করিতেছে।
ইস্কুলেপড়া ছেলের ও মূর্খ ছেলের বেশের তারতম্য দ্রষ্টব্য।

ছাত্রীনিবাসে থাকিত। এই ছাত্রীনিবাস ও আমাদের ইস্কুলের ছাত্রাবাসের মাঝখানে কেবল একটা রাস্তা ব্যবধান ছিল। ইস্কুলে পড়িবার সময় আমাদের কেবল গির্জ্জায় দেখা হইত। কিন্তু ইস্কুল বন্ধ হইলে ছুটিতে আমাদের গ্রামে আসিবার সময় এবং বাড়ী হইতে ইস্কুলের গ্রামে ফিরিয়া যাইবার সময় আমরা একসঙ্গে এক রাস্তা দিয়াই যাতায়াত করিতাম। এইরূপে আমাদের পরিচয় হয়, এবং আমরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হই। মরিয়মের গ্রামের কাছেই দিদির শ্বশুর-

ওরাওঁ বিবাহের মিছিল—বধূকে একজন স্ত্রীলোক ঘোমটায় ঢাকিয়া কোলে করিয়া লইয়া যাইতেছে।

বাড়ী। হঠাৎ আমার দিদির প্রতি টান অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, আমি ঘন ঘন দিদিকে দেখিতে যাইতে লাগিলাম।

"ইস্কুল ছাড়িবার দু বৎসর পরেই আমার বাপমার একটি বৌ ঘরে আনিবার সাধ হইল। আমি তখন মাকে আমার মনের কথা বলিলাম। মা দিদির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মরিয়ামকে পছন্দ করিলেন। মরিয়মের বাপ-মায়েরও অমত হইল না। কিছু দিন পরে এক গির্জ্জায় মরিয়মের সঙ্গে আমার বিবাহ হইল। ঐ গির্জ্জা যে-গ্রামে অবস্থিত, আমাদের বাড়ী সেখান হইতে চার ক্রোশ। বিবাহের পর আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমরা আমাদের গ্রামের নিকট আসিয়া পৌঁছিবা মাত্র বাজনা বাজিয়া উঠিল। এটি আমার দিদির কীর্ত্তি। তিনিই এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু ইহাতেই তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি আমাদের গ্রামের সীমায় পৌঁছিয়াই মরিয়মকে আমাদের জাতীয় প্রথা-অনুসারে ঘোমটা দিয়া ঢাকিয়া নিজে কোলে তুলিয়া লইয়া বরযাত্রীদের সঙ্গে বাড়ী লইয়া আসিলেন।

"আমার বিবাহের দু বৎসর পরে, আমাদের গ্রামে ওবা অর্থাৎ ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়। তাহাতে বাবা ও মা দুজনেই মারা গেলেন। আমি ইস্কুলে থাকিবার সময়ই ঠাকুরমার মৃত্যু হইয়াছিল।

"বাবার মৃত্যুতে আমাদের জমীদার খুব সুযোগ পাইলেন। ওরাওঁ দেশের ছোট ছোট জমীদারেরা খৃষ্টীয়ান ওরাওঁ প্রজাদিগকে দেখিতে পারে না। এই-সব প্রজা যে অন্য রায়তদের চেয়ে খারাপ তা নয়; বরং তাহারা খুব নিয়মিতরূপেই খাজনা দেয়। তাহাদের অপরাধ এই যে তাহারা আইন-বহির্ভূত বাজে আদায়ের বিরোধী এবং আপদে বিপদে ইউরোপীয় পাদ্রিদের পরামর্শ গ্রহণ করে। আমাদের জমীদার মিথ্যা সাক্ষীর সাহায্যে নিম্ন আদালতে আমার বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকর্দ্দমা জিতিলেন; কিন্তু আপীলে আমি জিতিলাম। কিন্তু জিতিলে কি হয়। মোকর্দ্দমায় এত খরচ হইয়াছিল, যে, তজ্জন্য আমাকে মহাজনের নিকট ২০০, টাকা কর্জ্জ লইতে হইয়াছিল। সুতরাং আমি আমার জমী জায়গা মহাজনকে বন্ধক দিয়া স্ত্রী ও ভাইদের সঙ্গে অন্যত্র

ওরাওঁ দম্পতি।

রোজগারের চেষ্টায় যাইতে বাধ্য হইলাম। এ বন্ধক এ রকমের যে জমীর উৎপন্ন ফসলেও মহাজনের দখল জন্মিল। এখানে বলা দরকার যে আমার জমীতে এত ফসল হইত যে দুবৎসরের ফসলেই সমস্ত মূলধন শোধ হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু মহাজন কেবল স্থদের জন্যই সমস্ত ফসল দাবী করিয়া বসিল। কি করি, গরীব লোক তাহাতেই রাজী হইলাম। সরকার বাহাদুর দয়া করিয়া স্থদের একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই মঙ্গল। নতুবা আমাদের রক্ষা নাই।

"নিকটবর্ত্তী করদ রাজ্যে নাগ্রার শালবনে একজন বাঙ্গালী কড়িকাঠের সদাগরের অধীনে কাঠ কাটিতে আমরা গেলাম। তিনটি বৎসর ধরিয়া আমরা গাছের ডাল ও পাতা দ্বারা নির্ম্মিত কুঁড়েঘরে বাস করিলাম। প্রতিদিন, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করিয়া আমরা ঋণের অর্দ্ধেক শোধ করিয়া অর্দ্ধেক জমী বন্ধকমুক্ত করিবার মত টাকা জমাইলাম। তখন অর্দ্ধেক জমী ফিরাইয়া পাইবার আশায় কাষ্ঠ-বিক্রেতা বাঙ্গালী বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া, সাত দিন ধরিয়া কষ্টেসৃষ্টে পাহাড়িয়া ও জঙ্গলী পথ অতিক্রম করিয়া এই চৌদ্দ দিন হইল বাড়ী পৌঁছিয়াছি।

"কিন্তু হায়! বাড়ী পৌঁছিবার দু এক দিন পরে যখন মহাজনকে পুরা একশ টাকা দিয়া অর্দ্ধেক জমী চাহিলাম, তখন সে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া আমাকে একেবারে হতভম্ব করিয়া দিল। সে সমস্ত টাকা, দু শ টাকা, এক সঙ্গে থোক চাহিয়া বসিল। বলিল, তাহা না হইলে সে এক আঙ্গুল জায়গাও ছাড়িয়া দিবে না।

ওরাও খৃষ্টানের মৃতসমাধিতে প্রার্থনা।

"এখন বাবু মহাশয়, আপনার কাছে পরামর্শের জন্য আসিয়াছি; আপনি বলিতেছেন যে আইন অনুসারে সাহু (মহাজন) অন্ততঃ আরও দুবৎসর আমাকে এক

ওরাওঁ খৃষ্টানদের পথভ্রমণ।
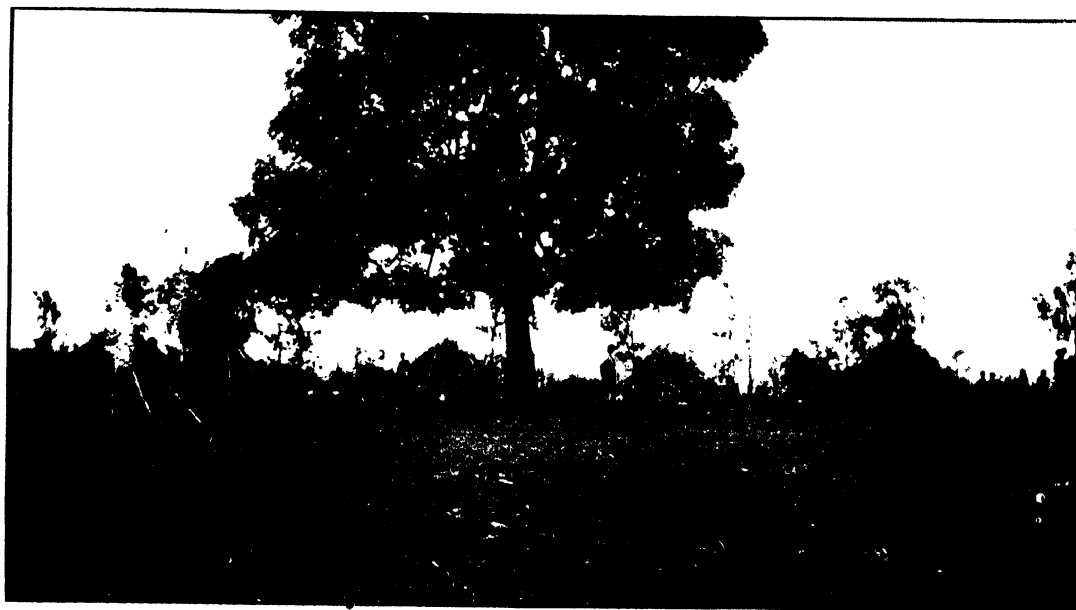
ওরাওঁদের প্রবাসের কুঁড়েঘর।

কানাশী * জমীও ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিতে পারে। এরকম আইন আপনাদের মত বিদ্বান লোক-দের বিচারে এবং অবস্থাপন্ন লোকদের পক্ষে ভাল হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মত সোজা লোকেরা ইহার ন্যায্যতা মোটেই বুঝিতে পারে না। যাক্ সে কথা। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াইতেছে এই যে মরিয়ম ও আমার ভাইদের সঙ্গে আবার অন্ততঃ দুই তিন বৎসরের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটিবার জন্য আমাকে নাগ্রা জঙ্গলে ফিরিয়া যাইতে হইবে। বাবু গো, আমি যদি না জন্মি-তাম ত ভাল হইত। আমি মঙ্গলবারে জন্মিয়াছিলাম বলিয়া আমার বাবা আমার নাম রাখিয়াছিলেন মঙ্গরা। ওরাওঁদের ধারণা মঙ্গল-বারে জন্মিলে মানুষ বড় সৌভাগ্য-শালী হয়। তাহার প্রমাণ ত হাতে হাতেই দেখিতেছি। আপনারা বিদ্বান্ লোক বিশেষ বিশেষ তিথি নক্ষত্র লগ্নে মানুষ জন্মিলে তাহার ভাগ্য ভাল বা মন্দ হয় কি না সে বিষয়ে আপনারা কি মনে করেন জানি না; আমার নিজের জীবনে যাহা দেখিয়া বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার কিন্তু আর ও রকম বিশ্বাস নাই।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়।

* ওরাওঁদেশে জমীর নূতনতম পরিমাণ।

ভীমের লাঠি

ইদানীং শীতের সময় অগ্রহায়ণ ও মাঘ মাসে, এবং ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার পর বৈশাখে, শুভবিবাহের ভিড় লাগিয়া যায়। গত বৎসর শীতের মরসুমে কলি-কাতায় আসিয়া অহরহ বৈবাহিক বাড়ীর নিমন্ত্রণ ভক্ষণ করিতে করিতে যখন জ্বর-যুক্ত হইয়া পড়িলাম, তখন ডাক্তার অবিলম্বে কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র বায়ু-ভক্ষণের নির্ম্মম আদেশ প্রদান করিয়া ফেলিলেন। অগত্যা স্বাস্থ্যের জন্য পুরী-যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু দেওঘর-যাত্রী কতিপয় বন্ধু ভবার্ণবের অপর পারের ত্রাণকর্ত্তা শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেব অপেক্ষা বৈদ্যনাথ জীউর চিকিৎসা-নৈপুণ্যের অধিকতর প্রশংসা জ্ঞাপনপূর্ব্বক দেবগৃহবাসের অনুকূলে বিস্তর উপদেশরত্ন এ দীনের সম্মুখে স্তূপীকৃত করিতে লাগিলেন। আবার কেহ কেহ পশ্চিমে ভ্রমণের উপদেশ দিয়া পশ্চিমে-হাওয়া যে দক্ষিণ মলয়-পবনের ন্যায় সদা মন ও প্রাণ-হরণ-কারী তাহা নানা উদাহরণ আহরণ করিয়া সপ্রমাণ করিতে ত্রুটি করিলেন না। এই তিন স্রোতে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় আমি একদিন সহসা রাত ৯টার পর কাহাকেও বিশেষ কিছু না বলিয়া জনৈক চির-পরিচিত সব-জজ বন্ধুর সঙ্গে হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া একদিকে রওনা হইয়া ছুটিলাম।

জজ মহাশয় বয়সে বিশেষ বৃদ্ধ না হইলেও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানে স্থবির বলিলেই হয়। তিনি অবকাশ লইয়া স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের অন্বেষণে মজঃফরপুরে যাইতেছেন। আমি তাঁহার সৎ-সঙ্গ পাইয়া ধন্য হইলাম। তাঁহার সঙ্গে একটি গুরুভার ট্রাঙ্ক ছিল। উহা ইস্তক গীতাঞ্জলি, স্বরলিপি-সংহিতা, লাগাইদ বেদ-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র-মন্ত্রে বোঝাই ছিল; মন্ত্রি ঋষির তেজে তোরঙ্গটি হরধনুর ন্যায় কতকটা বাঁকা হইয়া পড়িয়াছিল। ষ্টেসনে ঘোড়ার-গাড়ী পহুঁছিবা মাত্র আমাদের অভ্যর্থনাকারী ৪৭ নং কুলি উহার উত্তোলন-সুখ অনুভব করিয়া মনে মনে পরম পুলকিত হইয়াই থাকিবে। সে আত্ম-গোপন-পূর্ব্বক ধীরে গম্ভীরে প্রস্তাব করিতেছিল "বাবু সাহেব, সব মাল ওজন হোগা।" তাহা শুনিয়া "কিছু পরোয়া নাস্তি, সব মাল লগেজখানামে লইয়া যাও" ভৃত্যের প্রতি এই হুকুম দিয়াই আমরা ১০ নং প্লাটফরমের দিকে অগ্রসর হইলাম। তখন কি জানি কি ভাবিয়া কুলিরা ভৃত্যকে নিরস্ত করিয়া বিনা বাক্য ব্যয়ে মাল-পত্র আমাদের কামরায় বহন করিয়া আনিয়া দিয়া মুহুর্মুহু সেলাম জ্ঞাপন করিতে লাগিল। কুলি-বিদায় করা এক-কথায় হয় না; জজ বাহাদুর তাহাদের দিকে পকেট হইতে খোস মেজাজে যে বকৃশিশ নিক্ষেপ করিয়া-ছিলেন তাহা পাইয়া প্লাটফরমের পাষাণ-হৃদয়ও প্রতিঘাত করিয়া "থ্যাঙ্ক ইউ" বা তদ্বৎ আনন্দধ্বনি ঝঙ্কার করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কুলিদের আননে সন্তোষের আভা দেখিলাম না, অথবা উহা তাহাদের হৃদয়কন্দরে

লুক্কায়িত ছিল। মুখ দেখিয়া অনেককেই চেনা যায় না।

আমাদের প্রকোষ্ঠ রিজার্ভ-করা। উহার ভিতর নিদ্রাদেবী ভিন্ন অন্য জনমানবের প্রবেশ নিষেধ। ছোট-গল্পের প্রাণস্বরূপা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী কল্পনা দেবী চেষ্টা করিয়াও আমাদের প্রকোষ্ঠে প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং রেল-পথ ভ্রমণ-কাহিনী সংক্ষেপে সারিতে হইল, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

পরদিন কুজ্ঝটিকাময় ভোরে ধীরে ধীরে গঙ্গা পার হইয়া এবং ষ্টিমার কোম্পানির ধার শোধ করিয়া বেলা ১১টার সময় আমরা মজঃফরপুরে পহুঁছিলাম। উকীল সু-বাবু ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া অশেষ আদর আপ্যায়ন সহকারে আমাদিগকে লইয়া তাঁহার গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। ঘোড়ার-গাড়ীতে বসিয়া বিজ্ঞবর জজ যখন বালকের ন্যায় হাঁ করিয়া রাস্তার উভয়পার্শ্বস্থিত নানাবিধ মিষ্টান্ন-বিপণি, সুপক্ক কদলী, এক্কা পুষ্পক, অপিচ বোধ হয় নাভিতলবসনা পূর্ণকুম্ভশীর্ষা শিশুসন্তান-কক্ষা ধুচুনি-করা অনেকা কার্য্যকুশলা ইতর রমণীর প্রতি বিহ্বল দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তখন বিপরীত আসনে উপবিষ্ট আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে এই জ্ঞানবৃদ্ধের বদনবিবরে বিশ্বদর্শন করিয়া বাস্তবিকই ক্ষণকাল সমাধিস্থ হইয়া অবাক ছিলাম। গৃহে আসিয়া সু-বাবু "অতিথি প্রত্যক্ষ দেবতা" জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে পুণ্য সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। আমরাও যাহাতে তাঁহার এই জ্ঞান ভঙ্গ না হয় তৎপক্ষে শিষ্যগৃহে গুরুর ন্যায় বিশেষ যান্ত্রিক থাকিয়া তাঁহাকে নির্বিষ্টচিত্তে কৃতার্থ করিতে লাগিলাম।

মজঃফরপুর জেলা ত্রিহুতের অন্তর্গত। গঙ্গার (উত্তর) তীরবর্ত্তী বলিয়া এই প্রদেশ বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্ব হইতে তীর-ভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। সেন বংশীয় রাজগণের তাম্রশাসনে প্রাচীন তীরভুক্তি প্রদেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তীরভুক্তি হইতে তীরহুত বা ত্রিহুত শব্দের উৎপত্তি—ইহাই আধুনিক মহামহোপাধ্যায় মহাশয়েরা মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু মুনি ঋষিদের ন্যায় স্থানীয় মৈথিল ব্রাহ্মণগণও একটি ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, মিথিলাধিপতি সীরধ্বজ জনকের অনুষ্ঠিত তিনটি মহাযজ্ঞের হোত্রীয় ভূমি বলিয়াই প্রাচীন মিথিলার নামকরণ কালক্রমে লোকমুখে 'ত্রিহুতে' পরিণত হইয়াছে। প্রথম যজ্ঞ সীতার জন্মক্ষেত্র মজঃফরপুর জেলার সীতামাঢ়ি গ্রামে। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হরধনুর্ভঙ্গস্থল ধনুখা গ্রামে। তৃতীয় মহাযজ্ঞ বৈদেহীর বিবাহোৎসবে, রাজধানী জনকপুরে। ধনুখা ও জনকপুর এখন নেপালের সীমাভুক্ত। আমাদের সু-বাবুও একটি তৃতীয় মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, আর্য্যমনীষীগণ আত্মসম্মান বিসর্জ্জন করিয়া বিনা নিমন্ত্রণে রবাহুত হইয়া এতদঞ্চলে পদার্পণ করেন নাই। তাড়কা রাক্ষসীর পূর্ব্বপুরুষ বা পূর্ব্ব"স্ত্রী"গণ আর্য্যবীরদিগকে পুনঃপুনঃ তীর দ্বারা আহ্বান করাতেই এদেশের নাম তীরাহুত! বলা বাহুল্য এই মতটি সু-বাবুর নিজস্ব, এবং কপি-রাইটও তাঁহার।

এককালে ত্রিহুত অতি বিস্তৃত রাজ্য ছিল। তখন ইহার সীমা উত্তরে হিমালয়ের প্রান্তদেশ, দক্ষিণে গঙ্গা ও মগধ রাজ্য, পূর্ব্বে কৌশিকী বা কুশী নদী এবং পশ্চিমে গণ্ডকী নদী ও কোশল রাজ্য। উত্তর কালে ত্রিহুতের গণ্ডি ক্রমশঃ সঙ্কোচপ্রাপ্ত হয়। ইংরেজী আমলের প্রথমে ত্রিহুত একটি জেলা মাত্র। এখনও ইহার বিস্তার ৬৩০৩ বর্গমাইল। এত বড় জেলা একজন কালেক্টারের সাধ্যায়ত্ত নয়। সুতরাং ১৮৭৫ সনের একদিন মেঘশূন্য নির্ম্মল প্রভাতে ত্রিহুত জেলা সহসা দুইখণ্ডে ভগ্ন হইয়া গেল। একটু টুঁ শব্দও হইল না! পূর্ব্বাংশ হইল দ্বারবঙ্গ জেলা এবং পশ্চিমাংশ মজঃফরপুর জেলা। তখনও বোধ হয় ময়মনসিংহ (৬২৪৯ বর্গমাইল) এবং মেদেনীপুর (৫০৮২ বর্গমাইল) জেলাদ্বয়ের বর্ত্তমান নেতৃ-বৃন্দ জন্ম-পরিগ্রহান্তে বাল্যলীলা সমাপন করেন নাই। একাল হইলে জেলাবিভাগ উপলক্ষে ত্রিহুতের গ্রামে গ্রামে, প্রতি আম্র-কানন ও লিচু-বাগানের মুক্ত বায়ুতে, তুমুল আন্দোলন, তীব্র প্রতিবাদ ও জ্বালাময়ী-বক্তৃতা-সঙ্কুল বিরাট সভার অনুষ্ঠান লোমহর্ষণ হৃৎকম্প উৎপাদন করিত।

নিজ মজঃফরপুর সহর আধুনিক। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে মজঃফর খাঁ নামক কোনও কীর্ত্তিমান জমিদার

তাঁহার নামের স্মৃতিটি ভূতলে ফেলিয়া রাখিয়া ঊর্দ্ধলোকে প্রস্থান করেন। তদবধি নাম মজঃফরপুর। গণ্ডকীনদীর তীরে নূতন বনিয়াদের উপর স্বাধীন ইংরেজী প্রভাবে সূর্য্যস্পর্শা হইয়া নগরী ক্রমশঃ শ্রীসম্পন্না হইয়া উঠিয়াছে। তারপর, সে দিন বিহার স্বতন্ত্রা হওয়াতে এ স্থানে রাজপুরুষগণ সতত ভিজিট করিতেছেন। সুতরাং নগরীর অঙ্গমার্জ্জনা, প্রসাধনা ও নানারূপ গহনা রচনার ধুম লাগিয়া গিয়াছে।

আমরা সকালে বিকালে সহরের অনেক স্থান দেখিয়া লইলাম। সহরটি বেশ পরিচ্ছন্ন। ঊর্দ্ধতন রাজপুরুষগণের সতত যাতায়াত এবং প্রবল প্রতাপান্বিত নীলকর সাহেবদের মফঃস্বল হইতে মোটর যোগে অবিরাম আনাগোনা; সুতরাং মিউনিসিপালিটী দিবানিশ শ্রীচৈতন্যময়। জেল রোড হইতে আরম্ভ করিয়া অপর সীমানায় বড় ডাকঘর পর্য্যন্ত রাজপথ বিশেষ সুরক্ষিত দেখিলাম। দ্বারবঙ্গ প্রাসাদ, গণ্ডকীব্রীজ, প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স্‌-পার্ক এবং কমিশনর সাহেবের নবনির্ম্মিত প্যালেস দর্শনযোগ্য। বাজারের ভিতর রাম সীতা ও শিবের মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্যস্থলে প্রস্তর-সোপানে মণ্ডিত সুবৃহৎ গভীর জলাশয়, তীরে উচ্চচূড় মন্দির গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে।
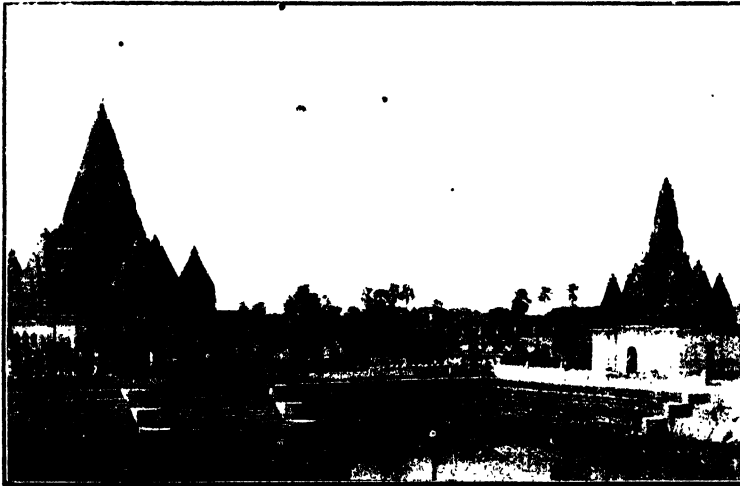
রাম সীতা ও শিবের মন্দির।

মজঃফরপুরের বাজার এবং চাকর-বাকর অপেক্ষাকৃত সস্তা। ছাগ-মাংসের সের তিন আনা হইতে চারি আনা। বাড়ীভাড়াও বেশী নয়। কোন কোন ডেপুটি বাবু-সাহেবগণ যে-সব কুঠিতে বিরাজ করেন, পূর্ব্বে জানা না থাকিলে তথাকার গেট পার হইয়া বিনা টিকেটে অগ্রসর হইতে বাস্তবিকই ইতঃস্তত করিতে হয়। সহরের উত্তরে প্রবাহিত নদীর নাম গণ্ডকী। ইহা গঙ্গার উপনদী বড় গণ্ডকীর অন্যতম শাখা। নেপালের অরণ্য-সন্নিহিত গণ্ডকীর একদেশে শালগ্রাম-স্থল; তথাকার শিলাই আমাদের শালগ্রাম-শিলা বলিয়া কথিত। চারি ধারে বিশাল শাল বৃক্ষ; সুতরাং পুষ্করিণীর "তাল-পুকুর" অভিধানের ন্যায় নেপালের নিকটবর্ত্তী গ্রামের নামটি "শাল-গ্রাম" হওয়া বিচিত্র নহে। বৃদ্ধেরা গণ্ডকী নদীকে "নারায়ণী" বা "শালগ্রামী" আখ্যা দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, মজঃফরপুরের গ্রাম্য লোকেরা গণ্ডকীর জল পান করে না। গণ্ডকীর জল গিলিলে নাকি গলগণ্ড রোগ হয়। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দুই একটা জীবন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিতেও ইহারা পশ্চাৎপদ নয়। অনেক সাধু সন্ন্যাসী কণ্ঠে শালগ্রাম রাখেন, শুনিয়াছি। কথাটি গণ্ডগ্রামের গণ্ড-মূর্খদের স্ব-গণ্ডগঠিত কি না বলা যায় না।

এখানে কলেজও আছে। নামটি বেশ, ভূমিহার ব্রাহ্মণ কলেজ। একদিন কলেজের প্রত্নতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক শ্রীমান্ র-বাবু সহসা আমাদের আশ্রমে উপনীত হইলেন। তিনি পাদ্য অর্ঘ্য প্রাপ্ত হইয়া সুখাসনে উপবিষ্ট হইলে আমরা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে অনেক প্রত্নতত্ত্ব জানিয়া লইলাম। অবশেষে তিনি প্রস্তাব করিলেন, "একবার সহরের বাহিরে বেড়াইয়া আসিলে হয় না?" হয় বৈ কি। আমরা তো তাই-ই চাই। আজকাল হুজুগের মধ্যে এক প্রত্নতত্ত্ব। বায়স্কোপ যেমন বাই-খেমটা নাচকে দেশ

হইতে বিদূরিত করিয়া দিয়াছে, প্রত্নতত্ত্বও তেমনি মাসিক-পত্রের আসরে ছোট্ট গল্পের গলদেশে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানে উদ্যত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্বের হুজুগ স্বদেশী হুজুগকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। এই যে কুমারী স্নেহলতার আত্ম-বিসর্জ্জনে শ্বশুরবাড়ীর তত্ত্বের কথাটা উঠিয়াছে, ইহাও বেশী দিন টিকিবে না; টিকিবে কেবল প্রত্নতত্ত্ব। সে যাহা হউক, আমাদের যেমন কথা, তেমনি কার্য্য। সেই দিনই কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া গেল। ডাক্তার "ভায়া সাহেব"কে ধন্যবাদ; তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে, ততোধিক তাঁহার "প্রাতে সমাগত গরীব রোগীদের" প্রতি ঔদার্য্য-গুণে, আমি সপ্তাহের ভিতরই একরূপ সারিয়া উঠিয়াছি। তিনিও তৎক্ষণাৎ কৃপা করিয়া আমার প্রত্নতত্ত্ব-যাত্রায় অনুমোদন করিলেন।

পরদিন সুপ্রভাতে কাক-স্নান ও গো-গ্রাসের অভিনয় করিয়া আমরা ঘোড়ার-গাড়ীতে "কলুহা" গ্রামাভিমুখে রওনা হইলাম। আমরা তিন জন। অধ্যাপক র-বাবু, শ্রীযুত অ-বাবু এবং আমি। জজ বই ফেলিয়া গেলেন না, তিনি একরূপ গ্রন্থকীট। বোধ হয় তিনি প্রাচীন কালের রীত্যনুসারে কেবল ন্যায়শাস্ত্র পাঠের জন্যই মিথিলায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি পুঁথি হইতে মুখ তুলিয়া অসুখের ভান করিয়া বলিলেন, আমি যাইতে পারিব না। আমরাও বলিলাম, তথাস্তু! কারণ এই বৃদ্ধকে লইয়া গেলে অনেক কৈফিয়-তের ভিতর পড়িতে হইত। উকীল শ-বাবু সৌখীন ফটোগ্রাফারও বটে। তাঁহাকে লইয়া যাইতে আমি ভোর না হইতেই তাঁহার শিয়রে বসিয়া তাঁহার গাত্রোত্থানের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গের পর অর্জ্জুন মিশ্র নামক জনৈক বিশিষ্ট মও-ক্কেলের মুখ দর্শন করায় তিনি তাহার সঙ্গে কাছারী যাওয়ার উদ্‌যোগে রহিলেন, এবং আমাদিগকে নারায়ণী-সেনা-স্বরূপ তাঁহার লোকলস্কর ও ক্যামেরা-সরঞ্জামাদি সঙ্গে দিয়া বিদায় করিলেন।

মজঃফরপুর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৮ মাইল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা অতিক্রম করিয়া আমরা কোনও ছোট নদীর উপর একটি সুন্দর পোল দেখিতে পাইলাম। বাম দিকে সরায়া নামক স্থানের বৃহৎ নীলকুঠি। নীলকর-দের প্রসাদে রাস্তাঘাট সুরক্ষিত। এমন সুন্দর রাজপথ বঙ্গদেশে মফঃস্বলে নাই বলিলেই হয়। ইঁহাদের মোটর গাড়ী সহর হইতে সুদূর মফঃস্বলে সতত ধাবমান। রাস্তার দুই ধারে নিম্ন ভূমিতে গোযানের পথ। গোরুর-গাড়ীর উপরে উঠিবার হুকুম নাই। সরায়া হইতে কএক মাইল দূরে বখরা গ্রাম। স্থানীয় প্রবাদ, এই স্থানেই ভগবান শ্রীবিষ্ণু বলিরাজার মগজ-স্থিত দর্প নামক সুকঠিন পদার্থটাকে পদাঘাত করিয়া পাউডারে পরিণত করিয়াছিলেন।

তৎপর আমাদের গন্তব্য স্থান "কলুহা"। কলুহা হইতে গ্রাম্য রাস্তায় তিন চারি মাইল দক্ষিণে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বসাঢ় গ্রাম। এই স্থানে গণ্ডকীতীরে বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী তীরভুক্তি রাজ্যের রাজধানী বৈশালী নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বসাঢ়েরই প্রাচীন নাম বৈশালী। মিথিলার রাজধানী জনকপুরের গৌরবসূর্য্য অস্তমিত হইবার বহুকাল পর, বৃজ্জি-বংশীয় "লিচ্ছবী"-উপাধি-ধারী নরপতিগণ প্রথমে এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। বিশাল রাজার নামানুসারে রাজধানীর নাম বৈশালী। কালক্রমে নামের পরিণতি বিসাঢ়া, বর্ত্তমানে বসাঢ়। বসাঢ়ে প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেদীপ্যমান। নেপাল-রাজকুমার শাক্যসিংহ গৃহত্যাগ করিয়া এই বৈশালী নগরে পণ্ডিতদের নিকট কিছুকাল হিন্দুশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রচারার্থ পাটলিপুত্র হইতে দেশভ্রমণ-সময়ে বুদ্ধদেব আরও দুইবার বৈশালী নগরে শুভাগমন করেন। নগরের উপকণ্ঠে, বর্ত্তমান কলুহা গ্রামে, সেই অতীত যুগের সাক্ষীস্বরূপ এক অশোকস্তূপ ও প্রস্তর-স্তম্ভ বর্ত্তমান। মহারাজ অশোক বুদ্ধদেবের অবস্থান স্মরণার্থ এই স্তূপ ও স্তম্ভ স্থাপন করেন। সে আজ দুই সহস্র বৎসরাধিকের কথা। খ্রীঃ পূঃ ২৩২ অব্দে অশোকের মৃত্যু হয়। পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্গ ইংরেজী ৬৪০ সনে এই স্তূপ ও স্তম্ভ দেখিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি এগুলি বর্ত্তমান। কীর্ত্তির ধ্বংস নাই।

এই স্থানে বহুকাল বৌদ্ধভিক্ষুদের আশ্রম ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলে উহারই সমাধিক্ষেত্রে পর-

সিংহস্তম্ভ বা ভীমসেনের লাঠি।
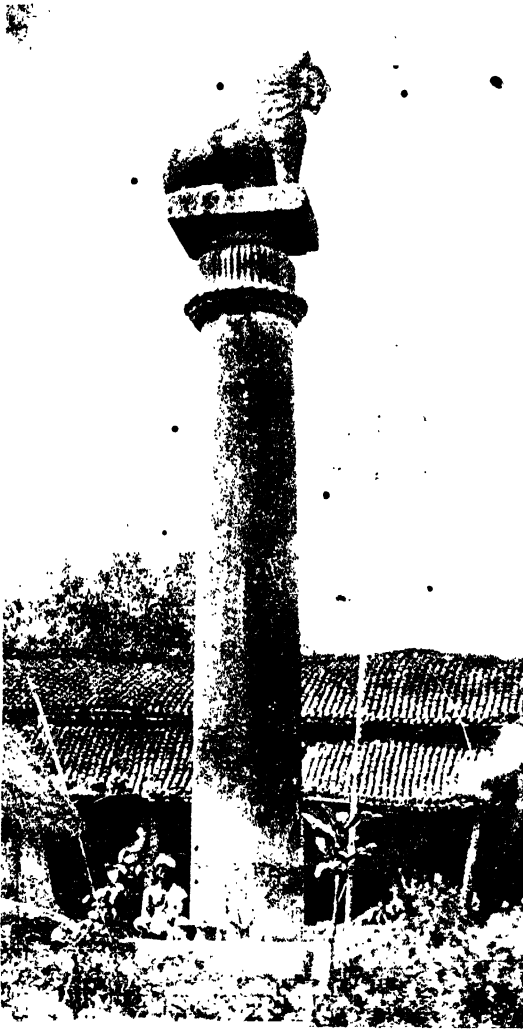
বর্ত্তীকালে হিন্দু দেবমন্দিরের উদ্ভব হইয়াছে। রাম-সীতার মন্দির দ্বারা অধুনা এই বৌদ্ধমঠ অধিকৃত। মন্দিরের বর্ত্তমান মালিকের নাম মোহান্ত নারায়ণ দাস। ইঁহারা ব্রাহ্মণ। আমরা যে দিবস এই তীর্থক্ষেত্রে উপনীত হই তাহার তিন দিন পূর্ব্বে ইঁহার পিতৃব্য ও পূর্ব্ব মোহান্ত শিবরাম দাসের মৃত্যু হয়। আমাদের আগমন-সময়ে তাঁহার শ্রাদ্ধের আয়োজন চলিতেছিল। উক্ত প্রস্তর-স্তম্ভকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া মোহান্তের প্রাচীর-বেষ্টিত খোলার-ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাঙ্গণের পশ্চিমাংশে এই উত্তুঙ্গ বৌদ্ধস্তম্ভ সগৌরবে দণ্ডায়মান। স্তম্ভের উপর উত্তরাভিমুখী সুগঠিত সিংহমূর্ত্তি। বাড়ীর দক্ষিণদেশে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাঠাকুরাণীর ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির। বাড়ীর বহির্ভাগে (উত্তরে) প্রবেশদ্বারের ডানদিকে অর্থাৎ পশ্চিমে অশোকস্তূপ। স্তূপের উপর বিশাল নিম-বৃক্ষ। উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। স্তূপের গাত্রে একটী পূর্ব্বদ্বারী ঘর, খোলার চালা। তাহার ভিতর প্রস্তরময় বুদ্ধমূর্ত্তি।

৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী ধান্যক্ষেত্রে কৃষকেরা হল-সংযোগে এই বুদ্ধমূর্ত্তির আবিষ্কার করে। পরে স্তূপের পার্শ্বে ঐ খোলার-ঘরে মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে; মূর্ত্তির উপরে চালিতে এবং নিম্নে অঙ্কিত চিত্রগুলি ভাবিবার বিষয়। মোহান্ত কর্ত্তৃক ইহার পূজা হয় না। কিন্তু যাত্রীগণের ফুলজল দেওয়ার ত্রুটি নাই।

আমূল সমগ্র স্তম্ভ একটা বৃহৎ অখণ্ড প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। আমরা বংশদণ্ডের সাহায্যে ইহার পরিমাণ করিলাম। ভূতল হইতে সিংহের কর্ণ পর্য্যন্ত ইহার উচ্চতা ১৫ ইঞ্চি হাতের প্রায় ২১ হাত। নিম্নদেশে (ছবিতে যে স্থানে মোহান্ত নারায়ণ দাস উপবিষ্ট) ইহার বেষ্টন ৮ হাত ৪ অঙ্গুলি। উপরের বেড় ক্রমশঃ কম। ইহাকে প্রাচীন স্থপতিবিদ্যার বিজয়স্তম্ভ বলিলেও হয়। উপরিস্থ কেশরসমন্বিত সিংহপ্রতিমূর্ত্তি ভাস্করবিদ্যার জীবন্ত প্রমাণ।

ইংরেজেরা এদেশে আগমন করিবার পরক্ষণ হইতেই এই সিংহস্তম্ভ তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা আকর্ষণ করিয়াছে। বহু ইউরোপীয় সন্দর্শক ইহার প্রস্তরগাত্রে তাঁহাদের নাম খোদিত করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা সন উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে জি. এইচ. বার্লো ১৭৮০ সর্ব্বপ্রথম বলিয়া বোধ হইল। তারপর গত শতাব্দীতে অসংখ্য সাহেব বিবি ইহার গাত্রে আঁচড় কাটিয়া অমর হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা চীনা ভাষা জানি না, হুয়েনসাঙ্গের নাম আছে কি না, বলিতে পারিলাম না। তাঁহার "সি-ইউ-কি" গ্রন্থই তাঁহাকে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ জীবিত রাখিবে। তিনি স্তম্ভটিকে ৫০ ফুট (=৩৩ হাত) বলিয়া লিখিয়াছেন। ভূতলে এতদিনে ইহার অনেকাংশ

প্রোথিত হইয়া থাকিবে। স্তম্ভের (হিন্দি = জাঠ) গাত্র দেশীবিদেশী আগন্তুকবর্গের নামের লেখায় ক্রমশঃ কলঙ্কিত হইতেছে দেখিয়া ১৮৯৪ সনে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এক নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। প্রত্যেক তীর্থ-মন্দিরেই এইরূপ পেন্সিলের খোঁচা ও অঙ্গারের কলঙ্ক বিদ্যমান।

আমাদের দেশে কানু ছাড়া গীত নাই, অন্ততঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ছিল না; সেইরূপ রামায়ণ ও মহাভারত ছাড়া অন্য ইতিহাস বা গল্পও নাই। এইজন্য সাধারণ অশিক্ষিত লোকেরা অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের উপর রামায়ণী বা মহাভারতীয়

কলুহা গ্রামে অশোক-স্তূপ।

গল্পের আবরণ টানিয়া লয়। এই বৌদ্ধস্তম্ভের স্থানীয় নাম "ভীমসেনের লাঠি।" প্রবাদ এই, মধ্যম পাণ্ডব মহাবীর ভীমসেন স্বকীয় বিপুল যষ্টিখানি বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত ঐ স্তূপের ভিতর দিয়া পাতালে বলিরাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, আবার শীঘ্রই ফিরিবেন। মৃত্তিকা খনন করিয়া যাওয়াতে ঐ স্তূপ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা সমবেত গ্রামবাসীদের নিকট এই প্রবাদের অনুকূলে কি যুক্তি আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাদের মুখপাত্র স্থানীয় পাঠশালার গুরু রূপনারায়ণ সিংহ ব্যতিরেকী প্রমাণ (indirect proof) অবলম্বন করিয়া বলিলেন, বাবু-সাহেব তাহা যদি না হইবে তবে লাঠির উপরিস্থিত সিংহটি উত্তরদিকস্থ স্তূপের প্রতি আকুল-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে কেন, আর মুখ ব্যাদান করিয়া ভীমনাদের ভঙ্গিই বা করিবে কেন? এই যুক্তির উপর আর কথা চলিল না।

আজকাল হাঙ্গরমুখো, কুকুরমুখো (দংষ্ট্রা-বদনা) ছড়ির ছড়াছড়ি। দ্বাপরযুগেও বোধ হয় সিংহমার্কা যষ্টির প্রাচুর্য্য ছিল। কলির ভীম রামমূর্ত্তি, স্যাণ্ডো প্রভৃতি বীরগণ দুইবেলা কি আহার করেন তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু মধ্যম পাণ্ডবের অতিরিক্ত ভোজন-দোষ সর্ব্বজনবিদিত। স্বর্গের দ্বার ক্ষুদ্র, কিন্তু শরীরটা প্রকাণ্ড এইজন্যই বোধ হয় তিনি সশরীরে স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। বৃকোদর যুধিষ্ঠিরের দেখাদেখি একাদশীর উপবাস করিতে বাধ্য হইয়া উদরে কিরূপ বুভুক্ষাবহ্নি প্রজ্বলিত করিতেন, যাঁহারা ভাগলপুর লাইনে রেলভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা সে কথার প্রমাণ দেখিয়া থাকিবেন। কহালগাঁ ষ্টেশনের নিকটে তিনটি সুন্দর পাহাড় উনানের ঝিঁকের ভাবে থাকায় লোকে বলে ভীমসেন ভীম-একাদশীর উপবাসের পর ঐ স্থানে সস্ত্রীক (হিড়িম্বা দেবীকে লইয়া) পারণ করিয়াছিলেন এবং ঐ উনানের উপর তাঁহার রন্ধনাদি হইয়াছিল। গয়াধামে বামহাঁটু গাড়িয়া পিণ্ড দিতে হয়। গয়ার একটি পাহাড়ে একটা বৃহৎ গহ্বর আছে; লোকে বলে ভীমসেন ঐ স্থানে পিণ্ডদান করিয়াছিলেন এবং গহ্বরটি তাঁহার বামহাঁটুর চাপের চিহ্ন। মহাজনেরা কত স্থানে কত পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

অশোকস্তূপ হইতে পশ্চিমদিকে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে আরও দুইটি স্তূপ পাশাপাশি দৃষ্ট হয়। উহাদের নাম

"ভীমসেন কা টুকরি।" ভীমসেনকে শ্রমজীবীদের ন্যায় কোদাল ও ঝুড়ি লইয়া কাজ করিতে হইত। পূর্ব্বে বলিয়াছি তিনি তাঁহার হাতের লাঠি ফেলিয়া কোদাল ধরিয়া পাতাল যাত্রার জন্য মৃত্তিকা খনন করিয়াছিলেন। প্রবাদ, তিনি তাঁহার ঝুড়ি দুইটি উবুড় করিয়া রাখিয়া মধ্যাহ্নে ক্ষণকাল ঐ স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। হায়, আজ যদি ভীমসেন ইহলোকে বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে এই লাইবেলের জন্য যে অনেকের উরু ভঙ্গ হইত না, কে বলিতে পারে। কিন্তু যখন আদি-মানব আদমকেও কোদাল ধরিতে হইয়াছিল তখন ভদ্র আর কে?

অশোকস্তূপের উত্তর-গাত্রে একটা গহ্বর দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানটা এখন জঙ্গলাবৃত। মোহান্ত ও তাঁহার সহচর অনুচর ও পার্শ্বচরেরা বলিলেন, পঞ্চপাণ্ডব-মূর্ত্তির অন্বেষণে জনৈক সাহেব ঐ স্থান খনন করিয়াছিলেন এবং দুইটি মূর্ত্তি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। জল বাহির হওয়ায় তিনি বেশী দূর খনন করিতে পারেন নাই। এই কথা শুনিয়া আমার মনোমধ্যে একবার এই গহ্বর গবেষণার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। বলিরাজা একশত মূর্খ সহ স্বর্গে গমন করার বর প্রত্যাখ্যান করিয়া পাঁচজন পণ্ডিতের সঙ্গে পাতালবাস শ্লাঘ্য মনে করিয়াছিলেন; আমার সঙ্গীয় পণ্ডিত দুই জন সর্পভয়ে পাতালের দ্বারে অগ্রসর হইতে চাহিলেন না; সুতরাং অনেক ইতর ব্যক্তি রাজী হইলেও তাহাদের সঙ্গে পাতাল দর্শন করা সমীচীন বোধ করিলাম না।

পরিব্রাজকাগ্রগণ্য হুয়েনসাঙ্গ সিংহস্তম্ভের দক্ষিণে একটি পুকুর দেখিয়াছিলেন, তাহা বুদ্ধদেবের ব্যবহারের জন্য খনন করা হইয়াছিল। এই বৌদ্ধ পুকুর মন্দিরের পশ্চাতে এখনও বিদ্যমান। ইহার বহু সংস্কার হইয়া গিয়াছে। অধুনা ইহার নাম রামকুণ্ড। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে নামেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

আমরা অতঃপর রাম-সীতার মন্দিরে প্রণামী রাখিয়া নিকটবর্ত্তী আম্রকাননে জলযোগের ঝুড়ি খুলিয়া বসিলাম। তখন গগনে মধ্যাহ্ন-তপন। "বেঙ্গলী"-পত্র আমাদের বসিবার আসন, এবং কদলীপত্র আমাদের ভোজনাধার। ভোজনে বসিয়া জনার্দ্দনের নাম লইতে হয়, কিন্তু আমরা তাহা ভুলিয়া ভীমসেনের ভাবে বিভোর ছিলাম। সুতরাং ঝুড়ি খুলিয়া যে ভূরি ভোজন করিলাম এ জনমে তাহা ভুলিব না। অন্যতম সহচর ভক্তিভাজন অ-বাবু আমাদের পরিবেষণ করিতেছিলেন এবং পরম স্নেহভরে কাছে বসিয়া এটা খাও সেটা খাও বলিতেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে বৃদ্ধ জজ সঙ্গে ছিলেন না, নতুবা ভোজন-ব্যাপারে 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং' করিতে পারিতাম কিনা বলিতে পারি না। আমাদের দুই জনের আহারান্তে অ-বাবু ভোজনের

অশোকস্তূপে বুদ্ধমূর্ত্তি।

উদ্‌যোগ করিলেন। আহারে বসিয়া তিনি সবে মাত্র একটি সন্দেশে কামড় দিয়াছেন এমন সময়ে অদূরবর্ত্তী অন্য এক আম্রবাগানে বাদ্যধ্বনি হইল এবং জনতা দেখিলাম। শুনিলাম আম-গাছের বিবাহ হইতেছে। যেই শোনা আর অমনি দংষ্ট্রা-ধৃত-সন্দেশ অ-বাবুকে তদবস্থ ফেলিয়া আমরা দুই জন এক দৌড়ে বিবাহ-স্থানে ছুটিলাম।

সকলেই জানেন ত্রিহুত আমের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু এখানে প্রত্যেক আম্র-বৃক্ষের বিবাহ দেওয়া হয় এ সংবাদ

বোধ হয় অনেকেরই অবিদিত *। অবিবাহিতা অবস্থায় আম-গাছের ফল হইলে সেই কানীন ফল দেবতার কেন মানুষেরও অভক্ষ্য। বাগানের মধ্যে অন্ততঃ একটী বৃক্ষের বিবাহ দেওয়া চাই-ই চাই। বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বটবৃক্ষের একটি শাখা আনিয়া একটি অল্পবয়স্কা আম্র-তরুণীর সঙ্গে একত্র নব বস্ত্রে বন্ধন করা হইয়াছে। বটবৃক্ষের নাম বড়-গাছ। এই বড়ই আম্র-বধূর বর। দেখিলাম, ললাটে-সিন্দূরলিপ্তা রক্তবস্ত্র-পরিহিতা সীমন্তিনীগণ মঙ্গলগীতি গাহিতে গাহিতে পুষ্পসম্ভার সহ সমবেত হইয়াছেন। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। কিঞ্চিৎ দূরে একটি কাষ্ঠের পুতুল প্রোথিত করা হইয়াছে। ইহার নাম চুঁগলা, অর্থাৎ পরনিন্দক। এই ব্যক্তি বিবাহের সাক্ষী। তাৎপর্য্য এই, অতঃপর আর কেহ কুৎসা রটনা করিতে পারিবে না যে উদ্যান-স্বামী গৃহস্থ বিবাহ না দিয়াই কানীন ফল ভক্ষণ করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর মানহানির কথা আর কি হইতে পারে? বিবাহ দেখিয়া আমরা কোনমতে হাস্য-সম্বরণ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

তখন অপরাহ্ন; গৃহ-প্রতিগমনের সময় হইয়াছে। ফিরিবার সময় রাস্তার দুই ধারে বিস্তর খেজুর ও তাল বৃক্ষ দেখিলাম। বর্দ্ধমান অঞ্চলে যেমন পাচুই মদের বন্যা বহিয়াছে, এ দেশেও তেমন তাড়ির আয়ে আব-কারি-নদী উচ্ছলিত হইয়াছে। ত্রিহুতে তাড়ির রস অতি প্রাচীন; পিতৃ-শোণিতের ন্যায় ইহা ইতর লোকের অস্থিমজ্জাগত। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির সময় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাদের শাস্ত্রে দশবিধ আচরণ নিষিদ্ধ ছিল। মদ্যপান তাহার অন্যতম। সামাজিক অনাচারের বিচারের জন্য এই বৈশালী নগরেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু-সঙ্গতির দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। অধিকাংশের ভোটে মীমাংসা হইয়া গেল যে, হাঁ তাড়ি পান দোষাবহ বটে, কিন্তু বেশী মাতানো (fermented) না হইলে উহাতে ধর্ম্মহানি হইবে না। আরও স্থিরীকৃত হইল যে, স্বগৃহে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ ভক্ষণ করিতেও দোষ নাই। তখন ভোটের বিচার; শতকরা ৫১ জনের যেমন ইচ্ছা তেমন বিধি। সেই যে ধর্ম্মশাসনে শিথিলতার প্রশ্রয় দেওয়া হইল তদবধি তাড়ির আদর হু হু করিয়া বাড়িয়া গেল, এবং এখনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনীর শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা বাসায় প্রত্যাগত হইলাম। ফটোগ্রাফার সু-বাবুকে ক্যামেরা-মুক্ত ভ্রমণচিত্র উপহার দিয়া আমি শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। সু-বাবু যখন তাঁহার অন্ধকার কক্ষে (dark room) চিত্র-চিন্তায় নিমগ্ন, তখন আমি স্বপ্নে ভীমসেনের গদা মুদ্গর ও লাঠির লড়াই দেখিতে দেখিতে নিশি পোহাইতেছিলাম।

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।

* এ সংবাদ পূর্ব্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবাসীর সম্পাদক।

পুস্তক-পরিচয়

ব্রহ্মচর্য্য—

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি-এ, প্রণীত। শিলচর এরিয়েন প্রেসে শ্রীমথুরানাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২৯ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই আনা।

ব্রহ্মচর্য্য পালনই যে ব্যক্তিগত ও জাতিগত কল্যাণের মূল লেখক তাহা বিশেষ জোরের সহিত পাঠকের মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অপ্রিয় প্রশ্নাবলী—

ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের জনৈক সভ্য বিরচিত। মহামণ্ডল সংস্কার-সমিতির আনুকূল্যে শ্রীজংবাহাদুর সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক আনা।

ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের পরিচালনা ও পরিচালকদিগের মত ও কার্য্যের অসঙ্গতি ও গলদ আলোচনা করা হইয়াছে।

অবসরচিন্তা—

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র সেন হাইকোর্টের উকিল কর্ত্তৃক প্রণীত। ছাপা, কাগজ, মলাট সুন্দর। মূল্য আট আনা।

ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়ে ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে—

কামনা, সৎপ্রবৃত্তি, সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী, অতৃপ্ত বাসনা ও আত্মাভিমান, সৎপ্রবৃত্তির পরিচালনা, উপকার ও প্রত্যুপকার, কৃপণতা, পিতাপুত্র, ভদ্রতা, সংসারে থাকিয়া ক্রটী ও অন্যান্য কথা, অপরের স্বভাবের সমালোচনা, বন্ধুতা, শত্রুতা, কয়েকটী কথা, নানা কথা।

মঞ্জুশ্রী

বীণাপাণি (চন্দনকাঠের)

তারা (নেপালের)

প্রাচীন পারস্য-চিত্র

পদ্মপাণি (নেপালের)

মান্দ্রাজের দারুশিল্প

আরেখন চিত্র (কাংড়া)　　নেপালী ধাতুমূর্ত্তি　　মান্দ্রাজের তৈজস প্রদীপ।

লক্ষ্ণৌএর মিনা-করা বদনী ও ফরসী হুকা।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের পরিচয়-পত্র—

ট্রাষ্টীদের আদেশানুসারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২৮ চৌরঙ্গী রোড ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের আফিসে পাওয়া যায়। ডিমাই অষ্টাংশিত ১৩৩ পৃষ্ঠা। মূল্য মাত্র দুই আনা।

এই পরিচয়-পত্র প্রকাশ করিয়া ও মূল্য অত্যন্ত সুলভ করিয়া মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধিৎসু ও জিজ্ঞাসু দর্শকদের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। মিউজিয়াম যে শুধু চোখ বুলাইয়া দেখিবার স্থান নহে, সে যে জ্ঞানের ও শিক্ষার ভাণ্ডার তাহা অল্প দর্শকই মনে রাখিয়া মিউজিয়াম দেখিতে যান। এই পুস্তকের সাহায্যে এখন সাধারণ লোকেও সেখানে শিক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য কি আছে তাহার হদিস পাইবে। এই পুস্তকে প্রবেশ-তোরণের সম্মুখে

বেনারসী কিংখাব।

বৌদ্ধদেবতার মূর্ত্তি নানা দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া কালপর্য্যায়ে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে।

গুপ্তগৃহের পূর্ব্বে ছোট ঘরটি "শিলালিপি-গৃহ"। এই গৃহে প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান বহু শিলালিপি সংগৃহীত আছে।

স্বকুমারশিল্প-বিভাগ।

শিল্পশালা যাদুঘরের দোতালার দক্ষিণপশ্চিমাংশে স্থিত, সরীসৃপগৃহের ভিতর দিয়া যাইলে পাওয়া যায়। এখানকার প্রদর্শিত সামগ্রীগুলি তিন-ভাগে সাজানো (১) চিত্র (২) তৈজস ও দারু দ্রব্য (৩) বস্ত্রাদি। এই বিভাগে সম্রাট আরঙ্গজীবের পরিধানের পোষাক, চেলী ও সাচ্চা-জরীর নমুনা, সূচীশিল্প ও তাঁতের কাপড়, গালিচা, শতরঞ্চি, শাল প্রভৃতি বহুস্থান হইতে সংগৃহীত ও সুশৃঙ্খলায় রক্ষিত হইয়াছে। ধাতু-নির্ম্মিত জিনিস, পাথরের জিনিস, চীনা মাটির জিনিস, গালার জিনিস, হাতির দাঁত ও মহিষের শিঙের জিনিস, চামড়ার জিনিস, জমাট কাগজের জিনিস প্রভৃতি দ্বিতীয় পর্য্যায়ে রক্ষিত। এই পর্য্যায়ে নানাদেশ হইতে আনীত বিবিধ শিল্পচাতুর্য্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। ব্রহ্মদেশের রাজা থিবর সিংহাসন, প্রথমেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিত্রসংগ্রহের মধ্যেও তিনটি পর্য্যায় আছে—(১) প্রাচীন হিন্দুচিত্র (২) প্রাচীন পারস্য ও মোগল-চিত্র (৩) আধুনিক এবং হিন্দু ও মোগল ভাবমিশ্রিত চিত্র। খৃষ্টীয় ভাবে প্রভাবান্বিত কয়েকখানি চিত্র আছে; তাহার মধ্যে একটি মাতৃমূর্ত্তি বড় সুন্দর। অন্যান্য চিত্রের বহু নমুনা সময়ে সময়ে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিভাগে সংগৃহীত কয়েকটি সামগ্রীর চিত্র এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল।

রক্ষিত সামগ্রীগুলি হইতে পরিচয় আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে ক্রমে ক্রমে কোন্ ঘরে কি কি বিষয়ের কি কি সামগ্রী সংগৃহীত আছে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ।

প্রবেশদ্বারের ডানহাতি প্রথমঘর "ভর্হুত গৃহ" অর্থাৎ নাগোদ নামক দেশীয় রাজ্যের অন্তর্গত ভর্হুত নামক স্থান হইতে সংগৃহীত বৈদিক, বৌদ্ধ ও প্রাচীন মিশরীয় যুগের প্রাচীন পদার্থ ইহাতে রক্ষিত আছে। এই গৃহে রক্ষিত পদার্থগুলির মধ্যে বিশেষ কৌতূহলের সামগ্রী ঈজিপ্ট দেশের রক্ষিত মৃতমনুষ্যশরীর বা মমী; জাতক-উপাখ্যান-চিত্র-খোদিত বৌদ্ধ স্থাপত্য, প্রাচীন পোষাক-পরিচ্ছদ-পরিহিত-মূর্ত্তি; বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ-রক্ষার পাত্র; বৈদিকযুগে মৃতপোথনস্তূপে প্রাপ্ত সোনার পাতে খোদা স্ত্রীমূর্ত্তি—পৃথিবীদেবীর পরিকল্পিত রূপ। বৈদিক যুগের ভারতীয়েরা তাঁহাদের মৃত আত্মীয়কে মাতা পৃথিবীর ক্রোড়ে সমর্পণ করিতেন।

তাহার পরেই "গান্ধার-গৃহ" বা গ্রীস দেশীয় শিল্পভাবাপন্ন বৌদ্ধ নিদর্শনের গৃহ। এই শিল্প পেশোয়ার প্রদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে; পরে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধারশিল্প মধ্যএসিয়া হইয়া চীনদেশে প্রবেশ করে। কিন্তু জাপানী শিল্পে গান্ধার শিল্পের ভাব অপেক্ষা গুপ্তসাম্রাজ্যকালের শিল্পের প্রভাব অধিক দেখা যায়।

গান্ধারগৃহ হইতে বামদিকে ফিরিলে "গুপ্তগৃহ"। এখানে মাথুর-সম্প্রদায়ের শিল্পনিদর্শন, গুপ্ত সময়ের নিদর্শন বুদ্ধ ও নানাবিধ গৌণ

ভূতত্ত্ববিভাগ।

সদর দরজার বামদিকে জীবাশ্ম বা ফসিলের ঘর। ভারতের অতীতযুগের পশুপক্ষী সরীসৃপ প্রভৃতির দেহাবশেষ পাষাণ হইয়া গিয়াছিল; সেই-সমস্ত সংগ্রহ করিয়া প্রাচীনকালের পরিচয় লওয়ার সুবিধা হইয়াছে। প্রাচীন কালের হাতী, ঘোড়া, হরিণ ও অদ্ভুত আকারের বহু জীবের অবশেষ এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এই বিভাগের উপবিভাগ উল্কাপিণ্ডের কামরায় বহু উল্কাপ্রস্তর, মানচিত্র, অনুকৃতি ও মডেল রক্ষিত আছে।

ভারতীয় ও বিদেশীয় আয়কর জিনিস কয়লা, ধাতু, অভ্র, চীনা-বাসন তৈয়ারীর মালমসলা, পালিসের জন্য আবশ্যক জিনিসও এই বিভাগের উপবিভাগে সংগৃহীত আছে।

শ্রমজাত দ্রব্যসংগ্রহ বিভাগ।

এই বিভাগে গঁদ ধুনা রবর, তৈল ও তৈলদ বীজ, রং ও চামড়া প্রস্তুতের মসলা, তন্তু বা আঁশ, ঔষধের উপাদান, খাদ্যদ্রব্য, কাঠ,

জাহ্নবীর জঙ্গল দিয়া কবিতার ভ্রমণ।
(পঞ্জাবের কাংড়া প্রদেশের চিত্র, আনুমানিক ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত)

এই পুস্তকের সাহায্যে মিউজিয়াম দেখা ও বোঝা লোকের পক্ষে সহজ হইবে। এবং যাঁহারা মিউজিয়ামের দ্রব্যসংগ্রহের সহিত না মিলাইয়া অমনি পড়িবেন তাঁহারাও ইহার মধ্যে প্রচুর শিক্ষা ও জ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য লাভ করিবেন।

পুস্তকখানি অত্যন্ত উপকারী ও উপাদেয় হইয়াছে।

তত্ত্বজ্ঞান—

হজরত হাজী কারী হাফেজ, মৌলবী, মওলানা জনাব মোহাম্মদ শাহ সাহাব-উদ্দীন চিশতি পীর সাহেব প্রণীত "তোহফায়ে বোরজখী" নামক উর্দ্দু ও পার্শী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক মোহাম্মদ আশরফ উদ্দীন, রঙ্গপুর মুন্সীপাড়া। ছাপা কাগজ ভালো নয়। ডিমাই অষ্টাংশিত, ৫২ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

ঈশ্বর-আরাধনা ও নীতি-ধর্ম্মের উপদেশমূলক গ্রন্থ। ইহাতে শাশ্বত সত্য, সাম্প্রদায়িক মত ও গোঁড়ামির সঙ্গে মিশিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। অধিকন্তু ইহার মধ্যে পীর বা গুরুবাদের মাহাত্ম্য ও গুরুকরণের প্রণালী ও উপকারিতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—

"পীরের প্রতিমূর্ত্তি অবলম্বনে ধ্যান করা, সাক্ষাৎভাবে মূর্ত্তি পূজার পরিপোষণ করিলেও, ইহার উদ্দেশ্য মহৎ। প্রথমতঃ ইহাকে মূর্ত্তিপূজা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না; কিন্তু পরিণামে এই মূর্ত্তিপূজা

খনিজদ্রব্য প্রভৃতি ও তাহা হইতে প্রস্তুত সামগ্রী পর্য্যায়ক্রমে সজ্জিত আছে।

প্রাণী ও মানবতত্ত্ব বিভাগ।

এই বিভাগে এককোষ প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া, স্পঞ্জ, কৃমি, শুক্তিশম্বুকাদি, কীটপতঙ্গ, মাছ, সরীসৃপ, পাখী, স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং মানব পর্য্যন্ত ক্রমবিকাশের ধারানুযায়ী সংগৃহীত আছে। ইহাদের আকার প্রকার, স্বভাব প্রকৃতি ভূপ্রকৃতির বর্ণনা অতি বিশদ ভাবে এই পুস্তকে সহজ ভাষায় দেওয়া হইয়াছে।

হইতেই একেশ্বরে উপনীত হওয়া যায়। ইহা ব্যতীত একেশ্বরে উপনীত হওয়ার আর কোন প্রশস্ত পথ দেখা যায় না। মওলানা নেয়াজ রহমতুল্লা বলিয়াছেন, "বোত পরস্তীকে ছেওয়া আওর মুঝে কুচ কাম নেহী"। মওলানা রুদ্রু রহমতুল্লা বলিয়াছেন; সমস্ত পৃথিবীর লোকে বলিয়া থাকে যে আমি মূর্ত্তি পূজা করি; বাস্তবিকই আমি তাহাই করিয়া থাকি, কিন্তু পৃথিবীর লোকের সহিত আমার কোন সংস্রব নাই। কেননা আমার চিন্তা আমার পীরের মূর্ত্তিকেই আনয়ন করে। দেখিতে গেলে যদিও ইহা মূর্ত্তি

ন্তু ইহার উদ্দেশ্য মূর্ত্তিনাশক।" হজরত সেখ ম্মদ চিস্তি "আদব তালেবিনে" লিখিয়াছেন; রেের মূর্ত্তি এরূপ ভাবে ধ্যান করা কর্ত্তব্য যে, হা যেন হূরের মুজস্যও অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয়। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে শ্চয়ই সুফল লাভ হয়।"

এইরূপ যুক্তি অবিদ্যার ফল। এরূপ পুস্তক কাশে পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের একেশ্বরবাদ ও রাকার ব্রহ্মোপাসনা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া চিগ্রস্ত হয়। মুদ্রারাক্ষস।

লক্ষৌ-এর রূপার থালায় তোলা কাজ ও কাচের পাপড়ি।
(অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমানী শিল্প)

ভাতের জন্মকথা—

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ-প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং উস, কলিকাতা। ১৯২০। মূল্য আট-আনা।

এই বইখানি ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা। ইহার খাই খুব সুন্দর ও বাংলা বহির পক্ষে নূতন রণের। কাগজ পুরু ও টেকসই, ছাপা বেশ রিষ্কার। ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ছবি, এবং প্রত্যেক বি নানা রঙে ছাপা। ছবিগুলি নানা রঙে ছাপা, ন্তু লেখা কাল কালীতে ছাপা। এ রকমের পা বই বাঙ্গালা সাহিত্যে এই প্রথম। ইহা মোলিথো-প্রণালীতে ছাপা হইয়াছে।

বাংলা শিশুপাঠ্য অনেক বহি আছে, যাহাতে নেক ব্যর্থ রসিকতার চেষ্টা, কবিতা লিখিবার নেক ব্যর্থ প্রয়াস দেখা যায়। বালকের ছবি াকিতে গিয়া কচি দেহে পাকা মুণ্ড বসাইবার দৃষ্টান্তও াহাতে বিরল নহে। এই বহিখানি এই শ্রেণীর নহে। ইহার ষয় ছেলেদের জানিবার বিষয়, বিশেষতঃ শহরের ছেলেদের। াতে, ক্ষেতে লাঙ্গল দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ধান্য সঞ্চয় চাউল প্রস্তুত করা এবং তারপর ভাত রাঁধা পর্য্যন্ত সমুদয় প্রক্রিয়া ন্দোবদ্ধভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কবিতার একটি পংক্তিতেও িড়তা বা কষ্টকল্পনা নাই; উহার গতি সর্ব্বত্র অবাধ ও সহজ। াষা সব সোজা। এই বহির সাহায্যে শিশুদের প্রকৃতির সঙ্গে রিচয় ঘটিবে, এবং চাষারা যে আমাদের কেমন বন্ধু তাহা তাহারা ঝিতে পারিবে।

বহিখানির আরম্ভ এইরূপ:

গৃহস্থদের ছেলেমেয়ে খেতে বসল ভাত,
ডাইনে নিয়ে গেলাস ঘটী সামনে পেতে পাত।
বাড়ীর গিন্নি মূর্ত্তিমতী-অন্নপূর্ণা-বেশে
পরিবেষণ করেন সবে মিষ্ট মধুর হেসে।
"আমায় আগে, ও ঠাকুর-মা" কেউ বা বলে ডেকে,
"ওকে আগে, দিলে" বলে কেউ বা বসে বেঁকে।
কেউ বা হাঁকে মাছের ঝোল; কেউ বা হাঁকে ডাল,
শান্ত শোনে মিষ্ট কথা, দুষ্ট খায় গাল।
পর্ব্বমুখে সোজা হয়ে খেতে বসে ভাত
নানান্ মুখো কমে কমে পা ছড়িয়ে কাত।
গাতে মুখে ডাল ভাত, কতই ফেলা ছড়া,
চেঁচামেচি গণ্ডগোলে অস্থির সে পাড়া।

ছোট ছেলেদের জন্য লিখিত বলিয়া ইহাতে যে প্রকৃত কবিত্ব নাই, তা নয়।

"নবীন ধানের মঞ্জরী ঠিক লক্ষ্মীদেবীর চুল,
মানিক হীরা নয় সে তবু শোভাতে অতুল;
সোনার বরণ শীষগুলি সব সবুজ বরণ গাছে,
হাওয়ার তালে ঢেউ তুলে সে দুলে যখন নাচে,
ভরাক্ষেতের কোলটি জুড়ে তখন অনুমানি
দুলছে দেবীর জরির বুটি ঢেলির আঁচলখানি।"

এরূপ বর্ণনা পড়িয়া আমাদের শৈশবের অনুভূত কিন্তু অব্যক্ত আনন্দ আবার ফিরিয়া পাই। ধানের ক্ষেতের সেই ঢেউখেলান শোভা, সেই মিষ্ট সৌরভ, সেই শীতল সমীরণ,—সবই মনে পড়িয়া যায়।

ইহার চিত্রকর ছবির সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আঁকেন নাই বটে, কিন্তু তাহার অল্প কয়েকটি রেখার আঁচড়ে এক একটি ছবিতে বঙ্গের শাস্ত্রী বড়ই মধুর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন সেই ছবিখান যাহাতে এক গৃহলক্ষ্মীর নদী হইতে জল আনার চিত্র আঁকা হইয়াছে।

সম্পাদক।

শান্তিময়ীর গল্প—

শ্রীবসন্তকুমার বসু প্রণীত। শ্রীরামপুর নির্ম্মালা-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য চার আনা। ছাপা কদর্য্য।

শান্তিময়ী নাম্নী এক বর্ষীয়সী বালবিধবার মুখ দিয়া গল্পচ্ছলে পৌরাণিক কাহিনীর ভিতর দিয়া সতীমহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিজ্ঞানসূত্র (প্রথম ভাগ)—

শ্রীঅম্বিকাচরণ ঘোষ কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য এক আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় জীবনে যে-সমস্ত ঘটনা বালকবালিকারা প্রত্যক্ষ করে তাহারই মধ্যকার সহজ সরল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি প্রশ্নোত্তর-পরম্পরায় বিবৃত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া বালক-বালিকা কেন বয়স্ক ব্যক্তিরাও অনেক নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। এই বইখানি বেশ ভালো করিয়া সুদৃশ্য সুন্দর আকারে ছাপাইলে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে। এমন একখানি পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন ও উপকারিতা আছে। পুস্তকখানি চমৎকার হইয়াছে।

"পথ বিজন তিমির সঘন"
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি- আই-ই অঙ্কিত।
(ইহার একখানি বড় প্রতিলিপি পূর্ব্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে)

সরল বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—

শ্রীনগেন্দ্রকুমার চন্দ প্রণীত, ১২ মালীটোলা ঢাকা। মূল্য চার আনা।

শ্রীকামিনীকুমার সেন, ঢাকা জগন্নাথ ও ময়মনসিংহ সিটী কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"ভাষা শিক্ষার বিজ্ঞান-সম্মত উপায়, প্রথমতঃ উদাহরণ ও তৎপরে সেই উদাহরণসমূহ হইতে লব্ধ সূত্র আয়ত্ত করা। বর্ত্তমান ব্যাকরণখানিতে এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে ইহাই ইহার বিশেষত্ব। গ্রন্থকার যে-সকল উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা আদর্শস্বরূপ গণ্য করিয়া শিক্ষকমহাশয় বহু উদাহরণ সংগ্রহ করিবার অবসর পাইবেন এবং ছাত্রেরা যত অধিক উদাহরণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া মূলসূত্র বুঝিতে পারিবে, তাহাদের শিক্ষা ও জ্ঞান ততই দৃঢ় হইবে। আরো একটী বিশেষত্ব এই যে, এই বাঙ্গালা ব্যাকরণখানির ভাষা অতি সরল ও খাঁটি বাঙ্গালা। ইহাতে সংস্কৃতের ছড়াছড়ি নাই কিম্বা সংস্কৃত ব্যাকরণের অযথা অনুকরণ বা অনুসরণ নাই। বাঙ্গালা ভাষায় ৯ বর্ণের ব্যবহার না থাকিলেও বর্ণমালার সম্পূর্ণতা-বিধান জন্য তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র।"

আমরা এই কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। মুদ্রারাক্ষস।

সরাইখানায় আগুন পোহানো।
(ইহার একখানি বড় প্রতিলিপি পূর্ব্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে.

চিত্র-পরিচয়

প্রচ্ছদপট।

পাখীর গাছে জন্ম। এখনও সে গাছে বাস করি-তেছে বটে, কিন্তু তাহার আর সে স্বচ্ছন্দ গতি নাই. সে এখন খাঁচার পাখী। যে গাছে তাহার জন্ম, এ গাছও ত তাহার মত দেখাইতেছে না। ইহারও শিকড়. গুঁড়ি, ডাল পালা, সব আছে; কিন্তু তবুও পাখীর জন্ম বৃক্ষ হইতে ইহাকে ভিন্ন বোধ হইতেছে।

মূলদেশের কয়েকটি সজীব পত্রপল্লব হইতে জানা যাইতেছে যে গাছের প্রাণশক্তি এখনও কোথাও লুকায়িত আছে। আর তাহার পাদদেশ ধৌত করিয়া, আশ্রয়ভূমির সরসতা সম্পাদন করিয়া অনন্ত অতলস্পর্শ জীবন-স্রোত বহিয়া যাইতেছে, এবং তাহাতে ভগবানের লীলাপদ্ম প্রস্ফুটিত হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি দুখানি শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের মানসকল্পিত মূর্ত্তি। রবীন্দ্রনাথকে শিল্পী স্মরণ হইতে তাঁহার গানের ভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সাহিত্যসম্মিলনে বিষয় বিভাগ।

বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনকে বিষয় অনুসারে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস এই চারি ভাগে ভাগ করায় মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে শিক্ষার ও দেশীয় সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ বিভাগ ঠিক্ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

ছাত্রেরা যখন বিদ্যাশিক্ষা করে, কখন কিছুদূর পর্য্যন্ত সকলেই সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রভৃতি শিখে। কতকদূর অগ্রসর হইলে কেহ বা গণিত শিখে, কেহ বা তাহা ছাড়িয়া দেয়। ইতিহাস ভূগোল আদিও সকলে শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষা করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার শেষ অবস্থায় ছাত্রেরা কেবল এক একটি বিষয়ের এক একটি অংশ বিশেষ ভাবে শিক্ষা করিয়া তাহাতেই পারদর্শিতা দেখায়।

বাঙ্গালীদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোক কোন কোন বিদ্যায় খুব অগ্রসর হইয়া থাকিলেও, অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, এবং শিক্ষিত লোকদের অধিকাংশই কতকগুলি বিষয় অল্প অল্প জানেন, কোন বিষয়ই খুব ভাল করিয়া জানেন না। এরূপ অবস্থায় যদি বলা যায় যে বাঙ্গালীরা এখনও শিক্ষালয়ের নিম্নশ্রেণীতে আছেন, তাহা হইলে কথাটা মিথ্যা হয় না।

তাহার পর দেখুন, সাহিত্যের অবস্থা। বিজ্ঞান বিষয়ে বিদ্যালয়পাঠ্য অল্পসংখ্যক পুস্তক ছাড়া কয়খানি বহি আছে? উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান শিখাইবার একখানিও বহি নাই। দর্শনের বহি কয়খানি আছে? যাহা পড়িয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রধান প্রধান দার্শনিকদের মত জানা যায় ও বুঝা যায়, এমন বহি একখানিও আছে কি? অন্য দেশের ইতিহাসের কথা দূরে থাক্, ভারত-বর্ষের বা বাঙ্গলাদেশের একখানিও সম্পূর্ণ ইতিহাস কেহ বাঙ্গলাভাষায় লিখিয়াছেন কি? বিদ্যালয়ে বালক-বালিকাদিগের পাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থ গণনায় ধর্ত্তব্য নহে।

পাশ্চাত্য নানাদেশে শিক্ষার অবস্থা এরূপ যে তথায় এক এক বিদ্যার এক একটি অংশেরও আলোচনার জন্য কত মাসিক ও কত ত্রৈমাসিক পত্র আছে। আমাদের দেশে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত পাঠকের অভাবে একই মাসিকপত্রে সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি সব বিষয়েরই আলোচনা করিতে হয়। তাহাতে রং তামাসা আদিও চালাইতে হয়। তাহাতেও যদি আশানুরূপ গ্রাহক না জুটে, তাহা হইলে স্থলবিশেষে গালাগালি ও কুৎসা ছাপিবার ব্যবস্থাও হইয়া থাকে।

কেবলমাত্র ঐতিহাসিক বিষয়ের আলোচনার জন্য কাগজ চালাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আমরা যত দূর জানি, শুধু বিজ্ঞানের চর্চ্চার জন্য একখানি মাত্র মাসিক আছে। উহার পরিচালক গণকে সম্ভবতঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। বাঙ্গলা যত বহি বাহির হয়, তন্মধ্যে সাধারণ সাহিত্যিক বহিই বেশী; অর্থাৎ

কবিতার বহি, ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ-পুস্তক, ইত্যাদির সংখ্যাই অধিক। এইগুলি ভাল কি মন্দ হইতেছে, ইহাতে বাঙ্গালীর ভাব ও চিন্তার গতি কোন্ দিকে যাইতেছে এবং কোন্ দিকেই বা যাওয়া উচিত, ভাষার পরিবর্ত্তন ভাল বা মন্দর দিকে যাইতেছে, পৃথিবীর লোকের মনের সঙ্গে বাঙ্গালীর মনের যোগ রক্ষা হইতেছে কি না,—এই সব কথা বলিবার জন্য অন্ততঃ একখানিও পাক্ষিক বা মাসিক কাগজ থাকা উচিত, সমালোচনাই যাহার প্রধান কর্ত্তব্য হইবে। কিন্তু সেরূপ কাগজ একখানিও নাই। সাধারণ মাসিক-পত্রগুলিতে সমালোচনা ভাল করিয়া করিবার মত স্থান নাই, সমালোচনা করিবার মত সম্পাদকদিগের যথেষ্ট সহায়কও নাই।

বাঙ্গলাদেশে শিক্ষা ও সাহিত্যের অবস্থার কিছু আভাস ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। এই দেশে বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যসম্মিলনের চারিটি ভাগ করা উচ্চাকাঙ্ক্ষাসূচক হইলেও সঙ্গত বা আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষায় অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে তাহারাও বুঝিতে পারে যে তাহাদের কোন্ বিদ্যার দিকে বেশী ঝোঁক এবং কোন্‌টি শিখিবার ও অনুশীলন করিবার শক্তি তাহাদের বেশী আছে, এবং তাহাদের অধ্যাপকেরাও বুঝিতে পারেন যে তাহারা ভাল করিয়া কোন্ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। দেশের শিক্ষিত লোকেরাও, ২।১০ জন লোক বাদ দিলে, সকলেই সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সব বিষয়েই পল্লবগ্রাহী; সব বিষয়েই তাঁহাদের কৌতূহল আছে। এই কৌতূহল যাহাতে আরও বাড়ে, তাহাই করা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের কর্ত্তব্য। সুতরাং এখন সব বিষয়ের প্রবন্ধই কিছু কিছু একই সভায় পঠিত ও আলোচিত হওয়া উচিত। ইহাতে পঠিত প্রবন্ধের সংখ্যা কম হইতে পারে, কিন্তু ফল ভাল হইবে। বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ কেবল জনকতক বিজ্ঞানবিৎ শ্রোতা শুনিলেই চলিবে না। দেশের খুব বেশী সংখ্যক লোকের বিজ্ঞানে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা জন্মাইতে হইবে। বিষয়বিভাগ হওয়ায় ইহাতে বাধা পড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধলেখকগণ যদি জানেন যে তাঁহাদের প্রবন্ধ কেবল বিজ্ঞানবিৎ শ্রোতা ও পাঠকদের জন্য লিখিতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা উহা যথেষ্ট সহজ ও চিত্তাকর্ষক করিয়া লিখিবেন না। কিন্তু যদি উহা সাহিত্যসম্মিলনের সমুদয় সভ্যের সমক্ষে পড়িতে হয়, তাহা হইলে লেখাও বেশ সহজ ও মনোজ্ঞ করিবার দিকে লেখকগণের ঝোঁক থাকিবে। তাহা হইলে সেগুলি যখন মাসিক পত্রাদিতে ছাপা হইবে, তখনও দেশের হাজার হাজার পাঠক তাহা পড়িয়া উপকৃত হইবে। বিজ্ঞানে যেমন দর্শনাদিতেও তেমনি কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা জন্মানই সাহিত্যসম্মিলনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

বিশেষজ্ঞ জন্মাইবার সময় বাঙ্গলাদেশে এখনও আসে নাই, একথা আমরা বলিতেছিনা। সময় আসিয়াছে। তাহার প্রমাণও রহিয়াছে। বিশেষজ্ঞ কেহ কেহ ইতিমধ্যেই জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের নিজের আবিষ্কৃত তথ্য সকল এখনও বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ পায় নাই; তৎসমুদয়ের আভাসমাত্র আমরা বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে পাইয়াছি। সম্পূর্ণ জ্ঞান যিনি চাহিয়াছেন, তাঁহাকে ইংরাজীতে লেখা মূল প্রবন্ধ বা গ্রন্থ পড়িতে হইয়াছে। আমাদের মত এই যে এই সকল নবাবিষ্কৃত তথ্যের যতটুকু, বাঙ্গালা-ভাষায়, সাধারণ শিক্ষিত লোকদের বোধগম্য করা যায়, তাহাই বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের সমুদয় সভ্য ও প্রতিনিধিবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলে ভাল হয়।

আমাদের প্রস্তাবিত রফায় রাজি হইতে হইলে পণ্ডিতমণ্ডলী সাহিত্যসম্মিলনে আমাদিগকে তাঁহাদের জ্ঞানের সম্পূর্ণ ফলভাগী করিবার সুযোগ পাইবেন না বটে। কিন্তু এখন যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে অনেকে সম্মিলনের কোনও শাখাতেই বেশীক্ষণ থাকিতে পারেন নাই; অনেককে জ্ঞানফলের অন্বেষণে শাখায় শাখায় ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। আমরা পণ্ডিতবর্গের সম্মানের কোনও হানি করিতে চাহি না। কিন্তু তাঁহারাও শ্রোতৃবর্গের শাখাচারিত্ব বন্ধ করিতে পারিলে ভাল হয়।

বিলাতের বৃটিশ এসোসিয়েশন বৈজ্ঞানিক পরিষৎ।

শত শত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক তাহাতে উপস্থিত হন। কিন্তু তাহারও বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা এরূপভাবে লিখিত হয় যে অবৈজ্ঞানিকেরাও তাহা বুঝিতে পারে। যে দেশে বিজ্ঞানের এত চর্চ্চা, সে দেশেও সভাপতির অভিভাষণ সহজবোধ্য করিবার এই যে চেষ্টা, ইহা হইতে আমাদের কি কিছু শিক্ষণীয় নাই? আমাদের বিবেচনায় উহা হইতে ইহাই আমাদের শিক্ষণীয় যে আমাদের এই অবৈজ্ঞানিকের দেশে কি বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের জন্য, কি মাসিক পত্রের জন্য, লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, সাধারণ শিক্ষিত লোকদের বোধগম্য হওয়া উচিত, এবং আমাদের বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সম্ভ্রম ও গৌরব রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র দল বাঁধিবার প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধেও তাহা ন্যূনাধিক সত্য।

সাহিত্য-পরিষৎ ও সরকারী সাহায্য। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বার্ষিক সাহায্য পাইয়া থাকেন। এরূপ সাহায্য লওয়ার ফলাফল চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

ইহা সকলেই জানেন যে, যে সকল স্কুল কলেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য পায় তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের অনেক নিয়ম মানিতে হয় এবং শিক্ষাবিভাগের নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দিতে হয়। গবর্ণমেণ্টের পদ্ধতি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিম্বা একমাত্র উৎকৃষ্ট পদ্ধতি তাহা নয়। সুতরাং সাহায্যের টাকা লওয়ায় যেমন সুবিধা আছে, নিয়মের বাঁধনের তেমনি অসুবিধাও আছে; শিক্ষাপদ্ধতি নির্ব্বাচন বা পরিবর্ত্তন বিষয়ে স্বাধীনতা না থাকায় ততোধিক অসুবিধা আছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্টের টাকা লওয়ার সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে অসুবিধাও আছে। এমন এক সময় ছিল যখন গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন কাজে টাকা চাহিলে সরকারী কর্ম্মচারীরা আমাদিগকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে বলিতেন। এখন তাঁহারা সাধিয়া যাচিয়া সাহায্য দেন; এমন কি যাহারা সাহায্য চায় না, তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত ও অতিষ্ঠ করিয়া তুলেন। শিক্ষাদান এরূপ ব্যয়সাধ্য করিয়া তুলা হইতেছে যে সাহায্য না লইলে স্কুল কলেজগুলির টিকিয়া থাকা কঠিন হইতেছে। এই সকলের অর্থ কি? যিনি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইবেন, তিনি গবর্ণমেণ্টের নিয়মের অধীনে আসিতে বাধ্য হইবেন। প্রধানতঃ দেশের শিক্ষাপ্রণালী ও দেশের সাহিত্য দ্বারা মানুষের মন গঠিত হয়। শুধু আইনের দ্বারা মানুষকে শাসন করা যায় না। তাহার মনকে ইচ্ছানুরূপ গড়িতে পারিলে, মনের গতি ইচ্ছানুরূপ দিকে চালিত করিতে পারিলে শাসনকার্য্য খুব সহজ হয়। এই জন্য দেশের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের করায়ত্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে। লর্ড রিপনের সময়কার এড়ুকেশন কমিশন এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে গবর্ণমেণ্ট নিম্ন ও উচ্চশিক্ষা দান কার্য্যে কেবল আদর্শ দেখাইবার জন্য কতকগুলি আদর্শ পাঠশালা, স্কুল, কলেজ রাখিবেন; কিন্তু দেশের অধিকাংশ শিক্ষাকার্য্য বেসরকারী পাঠশালা ও স্কুলকলেজ দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে। লর্ড কার্জ্জনের সময় হইতে সেই নীতি পরিত্যক্ত হইয়া বর্ত্তমান নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

শিক্ষাকে নিজের নিয়মের অধীন করার মত সাহিত্যকেও নিয়মের মধ্যে আনিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে স্বাভাবিক। তাহার বন্দোবস্তও হইয়াছে। বাঙ্গলা পাঠশালা ও স্কুলগুলির ও মাইনর স্কুলগুলির পাঠ্যপুস্তক, ম্যাপ, অভিধান, পাঠ্যপুস্তক-কমিটি স্থির করিয়া দেন। ইংরেজী ইস্কুলের উচ্চশ্রেণীর এবং কলেজের পাঠ্যপুস্তকসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় নির্ব্বাচন করেন। সম্পূর্ণ বেসরকারী কতকগুলি এণ্ট্রেন্স স্কুল অন্যান্যশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচন করিতে পারেন বটে, কিন্তু পাঠ্যপুস্তক-কমিটির নির্ব্বাচিত পুস্তকের কাট্‌তি বেশী বলিয়া গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ উহা প্রণয়নে ও প্রকাশে বেশী মন দেন। সুতরাং অনেকস্থলে উক্ত কমিটির নির্ব্বাচিত বহিই পড়ান হয়। ঐ কমিটি প্রাইজের বহি এবং স্কুল লাইব্রেরীতে রাখিবার বহিও বাছিয়া দেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমরা 'ক' 'খ' শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজের উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধিকাংশ বহি যাহা পড়ি, তাহা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও অনুমোদিত।

বাকী থাকে অন্য প্রকারের সাহিত্য। খবরের কাগজ এবং মাসিক ও ত্রৈমাসিকপত্র তাহার অন্তর্গত। গবর্ণমেণ্ট যে কাগজ, সাময়িক পত্র বা পুস্তক আইনবিরুদ্ধ মনে করেন, বিদেশ হইতে তাহা ভারতবর্ষে আসিতে দেন না। দেশে এরূপ কিছু ছাপা হইলে তাহা বাজেয়াপ্ত হয়। সাহিত্যকে নিয়মের মধ্যে আনিবার চেষ্টা এখানেই ক্ষান্ত হয় না। স্কুল কলেজের লাইব্রেরীতে বা পাঠাগারে বা ছাত্রনিবাসে কোন্ কোন্ কাগজ ও মাসিকপত্র লওয়া যাইতে পারে, কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট তাহার এক তালিকা বাহির করেন। ইহার দ্বারা পরোক্ষভাবে তালিকাবহির্ভূত কাগজগুলির কাটতি কমান হয়। অনেকস্থলে ছাত্রেরা তালিকা-বহির্ভূত কাগজ ও মাসিকপত্র লইলে শিক্ষকেরা তিরস্কার করেন, এবং ছাত্রদিগকে উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। তদ্ভিন্ন পুলিশ কোন কোন কাগজের গ্রাহকদের তালিকা প্রস্তুত করায় লোকে ভয়ে সে সব কাগজ লয় না। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষেরা জমিদারাদি ধনী ব্যক্তিদিগকে কথা প্রসঙ্গে কোন কোন কাগজ লইতে ও পড়িতে নিষেধ করেন, এরূপও শুনা গিয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শুধু আইন মানিয়া চলিলেই যে খবরের কাগজ ও মাসিকপত্রগুলির প্রচার অবাধে হইতে বা বাড়িতে পারে, তাহা নহে; পরোক্ষ বাধাও আছে। যে সব সম্পাদক এই সব বাধা অতিক্রম করিতে চান, এবং অধিকন্তু গবর্ণমেণ্টের সাহায্য চান, তাঁহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের ও গবর্ণমেণ্টকর্ম্মচারীদের কাজের সমালোচনা ত একপ্রকার ছাড়িয়াই দিতে হয়, তাহার উপর তাঁহাদের প্রশংসার মাত্রাটাও বাড়াইতে হয়।

গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় কোন কোন বহির কয়েকখণ্ড ক্রয় করিয়া লেখকগণকে উৎসাহিত করেন। এই সকল বহি কিরূপ হওয়া দরকার, তাহা বিস্তৃতভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই।

এই সকল কথা অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। আমাদের ইহাই দেখান উদ্দেশ্য যে গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিগ্রহ ও অনুগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্যকে নিয়মিত করেন, এবং আইন মানিয়া চলিলেও সাহিত্যের প্রচার আমাদের দেশে অবাধ নহে। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের প্রত্যাশা রাখেন, তাঁহাদিগকে, আইনে যতটুকু সাবধান হইতে বলে, তাহা অপেক্ষা আরও অধিক সাবধান হইতে ত হয়ই, অধিকন্তু রাজকর্ম্মচারীদের তুষ্টিসাধনজন্য স্তুতিবন্দনাও করিতে হয়। এমন অবস্থায় সাহিত্যের স্বাধীন বিকাশ সম্ভবপর নহে।

অবশ্য সাহায্য দিবার সময় গবর্ণমেণ্ট কোন সর্ত্ত নির্দ্দেশ না করিতে পারেন, কিন্তু সর্ত্তটা উহ্য থাকে। যদি সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা সমিতি গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষজনক কোন কাজ করেন, তখন হয় ভবিষ্যতে ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইতে হয়, নতুবা সাহায্য বন্ধ হইয়া যায়। অতএব যাহাতে সাহায্য বন্ধ না হয়, তজ্জন্য সতর্কতার সহিত কাজ করিতে হয়। কেবল আইনের কবলে না পড়িবার মত সাবধান হইলেই চলিবে না; তদপেক্ষা অধিক হুশিয়ার থাকা দরকার। মনের মধ্যে এতটা হুশিয়ারী থাকিলে সাহিত্যের পূর্ণবিকাশ সম্ভবপর নহে। তা ছাড়া, রাজভৃত্যেরা শিক্ষা ও সাহিত্যকে নিয়মিত করিয়া নিজেদের অর্থাগমের পথ ও প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান; কিন্তু আমরা এরূপ শিক্ষা ও সাহিত্য চাই যদ্দ্বারা আমাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ হয়।

এক্ষণে কথা উঠিতে পারে যে সাহিত্যপরিষদের প্রতি এসকল মন্তব্যের প্রযোজ্যতা কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সাহিত্যপরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যের একটা ধারণা থাকা দরকার। এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে বিজ্ঞানশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"নয় বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকতা গ্রহণের পর একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বসিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাহিত্যপরিষদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। দশ বৎসর ধরিয়া আমি সাহিত্যপরিষদের ঢাক বাজাইয়াছি। যখনই অবসর হইয়াছে, কাঁধে হইতে ঢাক নামাইয়া পরিষদের ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে অন্যের সহিত আলোচনা এবং অন্যের উপদেশ গ্রহণ আমার ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই উদ্দেশ্য লইয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট যখনই গিয়াছি, তখনই কিছু না কিছু লাভ করিয়া আসিয়াছি। সেই দিন প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন, সাহিত্যপরিষদের কার্য্যক্ষেত্র বাঙলা দেশ জুড়িয়া বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। বাঙলা দেশ এবং বাঙলা জাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য হইতে পারে, সাহিত্যপরিষৎ যদি সেই

সমস্ত বার্তা কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের জীবন সার্থক হইবে। এই কার্য্যের জন্য সমস্ত বাঙলা দেশ ব্যাপিয়া সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে যথাসম্ভব জাগাইয়া তোলা পরিষদের সম্প্রতি মুখ্য কর্ত্তব্য।"

রামেন্দ্রবাবু উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই পরিষদের কর্ত্তব্য। উহাই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও, দেখা যায় যে বাঙলাদেশের একখানি ইতিহাস লেখান পরিষদের উচিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সাহায্যকামী কেহ কি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নির্ভীকভাবে বঙ্গের ইতিহাস লিখিতে পারেন? বাঙলাদেশের ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়া যে সকল বাঙলা ঐতিহাসিক গ্রন্থ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রায়, প্রভৃতি লিখিয়াছেন, সেগুলি গবর্ণমেণ্টসাহায্যপ্রাপ্ত সমিতি কর্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত হইতে পারিত কি? অথচ সেগুলি আইনবিরুদ্ধ বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন নাই, করিবার যুক্তিযুক্ত কোন কারণও নাই। কিন্তু তৎসমুদয় যে গবর্ণমেণ্টের প্রীতি উৎপাদন করে নাই, তাহাও নিশ্চিত।

আমাদের বিশ্বাস বিদ্যালয়পাঠ্য ইতিহাস রচনা করিবার সময় পাঠ্যপুস্তক-কমিটির প্রীত্যর্থ লেখকগণকে যেমন সত্যগোপন করিতে হয়, গবর্ণমেণ্টসাহায্যপ্রাপ্ত ও সাহায্যকামী সভাকেও বাঙলার ইতিহাস লিখিতে হইলে তদ্রূপ আচরণ করিতে হইবে। সুতরাং হয় ইতিহাস না লেখারূপ ত্রুটি, নয় লিখিবার সময় সত্যগোপনরূপ ত্রুটি হইবে। পরিষদের পক্ষে ইহা কি বাঞ্ছনীয়?

দৃষ্টান্তস্বরূপ কেবল বাঙলার ইতিহাসের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু রামেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে পরিষদের সমুদয় কর্ত্তব্য লিপিবদ্ধ হয় নাই। পরিষদ্ এমন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা বাঙালীর হিতকর, কিন্তু যাহার বিষয় বিশেষভাবে বাঙলাদেশ বা বাঙালীজাতি সম্বন্ধীয় নহে। বাস্তবিকও বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা পরিষদের কর্ত্তব্য। ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে প্রাচীন ও আধুনিক উন্নত দেশ সকলের ইতিহাস থাকা উচিত। কিন্তু এই সকল দেশেই প্রজাশক্তি ও রাজশক্তির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল ব্যাপারের যথাযথ ইতিহাস না থাকিলে কোনও ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী আদরণীয় হইতে পারে না; সেরূপ বহি লিখিবারও প্রয়োজন নাই। কিন্তু সরকারের অনুগৃহীত কোন সভা কি এইরূপ গ্রন্থাবলী লিখাইয়া প্রকাশ করিতে পারেন? অথচ তাহা না করিলেও পরিষদের একটি কর্ত্তব্য করা হইবে না।

বিদেশী সাহিত্য হইতে ভাল ভাল বহির অনুবাদ করান পরিষদের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু পরিষদ্ কি মিলের "স্বাধীনতা"র মত বহির অনুবাদ করাইতে পারিবেন? প্রশ্ন হইতে পারে, যে, পাশ্চাত্য নানাদেশীয় সাহিত্যে এত ভাল বহি থাকিতে, তাহার মধ্যে ঐরূপ দুএকখানি বহির অনুবাদ নাই বা হইল? কিন্তু তাহার উত্তরে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে ঐ বহিখানি একখানি খুব ভাল পুস্তক হইলেও কেন উহা বাদ দেওয়া হইবে? ব্যক্ত না হইলেও অব্যক্ত উত্তর এই হইবে যে ওরূপ বহি প্রকাশ করিলে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বন্ধ হইতে পারে। অথচ মিলের "স্বাধীনতা" বহিখানি আইনবিরুদ্ধ নহে; উহার হিন্দী অনুবাদ বাহির হইয়াছে ও বিক্রী হইতেছে।

ভারতবর্ষের অর্থনীতি কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টসাহায্যকামী সভা কি নিরপেক্ষ কোন বহি প্রকাশ করিতে পারেন? ভারতবর্ষের ইতিহাসসম্বন্ধে, অজ্ঞতাবশতঃ বা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে, একটি পাশ্চাত্য মত প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, যে, এদেশে যথেচ্ছাচারী রাজার শাসনই বৃটিশ শাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে, শাসনকার্য্যে প্রজার মতামতের মূল্য, বা প্রজার অধিকার পূর্ব্বে কখনও ছিল না, রাজা যেমনই হউন, তাঁহার হুকুম যাহাই হউক, নির্ব্বিচারে তাহা মানিয়া চলাই পূর্ব্বে এদেশের চিরন্তন রীতি ও ধর্ম্মবিধি ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য অন্যরূপ; তাহা প্রভুত্বপ্রিয় রাজকর্ম্মচারীদের মনোরঞ্জক হইবার সম্ভাবনা কম। অথচ তাহা সর্ব্বসাধারণে জানিতে পারিলে দেশের উন্নতি হয়। এইরূপ প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান বিস্তার পরিষদের উদ্দেশ্যবহির্ভূত নহে। কিন্তু ইহাতে কি পরিষদ হাত দিতে পারিবেন?

হিন্দুমুসলমানে; আরবীফার্সী ও সংস্কৃতে, পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে, লিখিত ভাষায় ও কথিত ভাষায়, জেলায় জেলায়, বিরোধ, সংঘর্ষ, ঈর্ষ্যাদ্বেষ জন্মিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একত্ব নষ্ট হইবার আশঙ্কা এখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্যের ইষ্টানিষ্ট কি হইবে, তাহা দেখিতে বাকী আছে। এই সেদিনও একজন মুসলমান নেতা ঢাকানগরে মুসলমানদের ব্যবহৃত আরবী ফারসী শব্দ প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গলাভাষায় চালাইবার সপক্ষে মত প্রকাশ করায় খুব তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। এপর্য্যন্ত বঙ্গের সেন্সসরিপোর্টসমূহে, গ্রিয়ারসন সাহেবের ভাষিক বৃত্তান্তে ('Linguistic Survey' তে), ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির রিপোর্টে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বঙ্গের শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক প্রচারিত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের ভাষাসম্বন্ধীয় মন্তব্যে, রাজকর্ম্মচারীদের যেরূপ ভাব দেখা গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের দ্বারা বঙ্গীয় ভাষা ও সাহিত্যের একত্ব রক্ষার সাহায্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। এরূপ অবস্থায় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ সম্পূর্ণরূপে সরকারী অনুগ্রহ-নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাঁহারা কিছু টাকা পান বলিয়া ভাষা ও সাহিত্যের একত্বনাশে মত দিবেন, বা একত্বনাশের সম্ভাবনা দেখিয়াও চুপ করিয়া থাকিবেন, আমরা ইহা বলিতেছি না। কিন্তু আমরা, তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্যপথ হইতে মনেমনেও রেখামাত্র বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা রাখিতে চাই না।

গোয়ালপাড়ায় আসামীয়া ও বাঙ্গালা। সমগ্র আসাম প্রদেশে ৭০,৫৯,৮৫৭ জন লোকের বসতি। তাহার মধ্যে ৩২,২৪,৬০৪ জনের ভাষা বাঙলা এবং ১৫,৩২,৩৩২ জনের ভাষা আসামীয়া। বাস্তবিক প্রাকৃতিক এবং ভাষিক হিসাবে আসামের শ্রীহট্ট প্রভৃতি কয়েকটি জেলা বঙ্গেরই অংশ এবং রাজনৈতিক হিসাবেও পূর্ব্বে বঙ্গের অন্তর্ভূত ছিল। এই সব জেলার লোকেরা বাঙ্গলাদেশভুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনাও করিয়াছিলেন। সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই। যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত এই সকল স্থানে আফিস্, আদালত ও বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষায় কার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়ায় লোকের বেশী অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি আসামের চীফ কমিশনার হুকুম দিয়াছেন যে গোয়ালপাড়া জেলার আফিস, আদালত ও বিদ্যালয় সমূহে আসামীয়া ভাষা প্রচলিত করিতে হইবে। এই আদেশ ন্যায়সঙ্গত নহে। যাহার যাহা মাতৃভাষা নিজের বাসভূমে তাহাকে তাহাই ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত। অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী যদি নাসিক জেলায় গিয়া বাস করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আফিস, আদালত ও বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত মরাঠী ভাষাই ব্যবহার করিতে হইবে। আগ্রায় গেলে তাহাদিগকে হিন্দী ব্যবহার করিতে হইবে। এইরূপ যিনি যেখানে ঔপনিবেশিক হইবেন, তিনি তথাকার প্রচলিত ভাষা শিখিবেন। কিন্তু যদি কোথাও আদিমনিবাসীদিগের অপেক্ষা ঔপনিবেশিকদিগের সংখ্যা অধিক হয়, বা উভয়ের সংখ্যা প্রায় সমান হয়, তাহা হইলে ঔপনিবেশিকেরাও নিজেদের মাতৃভাষা ব্যবহার করিবার অধিকার ন্যায়তঃ দাবী করিতে পারে। কিন্তু গোয়ালপাড়া জেলার বাঙ্গালীরা ঔপনিবেশিক নয়, তাহারা তথায় পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছে। এই জেলার ৬,০০,৬৪৩ অধিবাসীর মধ্যে ৩,৪৭,৭৭২ জনের মাতৃভাষা বাঙ্গলা, এবং কেবল মাত্র ৮৫,৩২৯ জনের মাতৃভাষা আসামীয়া। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গালীর সংখ্যা আসামীয়াদিগের সংখ্যার চারি গুণ। অতএব এক্ষেত্রে বাঙ্গালীদিগকে মাতৃভাষা ব্যবহারের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কখনই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। যাঁহাদের মাতৃভাষা আসামীয়া তাঁহাদেরও কোন অসুবিধা জন্মান উচিত নয়। যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আসামীয়া ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত।

সাহিত্যসম্মিলনে মুসলমান। বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের গত অধিবেশনে সাহিত্য-শাখায় ২৬টি, দর্শন-শাখায় ১২টি, বিজ্ঞান-শাখায় ২১টি, এবং ইতিহাস-শাখায় ২০টি প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। এই উনআশীটি প্রবন্ধের মধ্যে কেবল দুটি মুসলমানের লেখা। সাহিত্য-শাখার জন্য চট্টগ্রামের মুন্‌শী আবদুল করীম "বাঙ্গলা মুসলমানদের মাতৃভাষা" এই বিষয়ে প্রবন্ধ

লেখেন এবং ইতিহাস-শাখার জন্য মাননীয় মুন্‌শী আমানৎ উল্লা "উত্তরবঙ্গের পীরগণের কাহিনী" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশনের সময় মুসলমানদিগের শিক্ষা-কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইতেছিল। কিন্তু সেই সময়ে বঙ্গের প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনও কুমিল্লায় হইতেছিল; তাহাতে বেশীর ভাগ হিন্দুরাই যোগ দিয়াছিলেন এবং বরাবর দিয়া থাকেন। তাহাতে সম্মিলনে প্রবন্ধ পাঠাইবার পক্ষে হিন্দুদের কোন বাধা হয় নাই। সুতারং অন্যত্র অন্য প্রকার সভার অধিবেশন হওয়াতেই যে মুসলমানগণ সাহিত্যসম্মিলনের কার্য্যে যোগ দেন নাই, তাহা নহে। তাঁহাদের যোগ না দিবার প্রধান কারণ ২টি;—তাঁহাদের মধ্যে এখনও শিক্ষার বিস্তার ভাল করিয়া হয় নাই, এবং তাঁহাদের শিক্ষিত লোকেরা এখনও বাঙ্গলাকে মাতৃভাষা বলিয়া শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। যাহাতে এই দুই প্রতিবন্ধক দূর হয়, তাহার জন্য মুসলমান-বাঙ্গালী এবং অন্য সকল বাঙ্গালীরই সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

সমগ্র ভারতবর্ষে ৪,৮৩,৬৭,০০০ জনের অর্থাৎ প্রায় পাঁচ কোটি লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গলা। বর্ত্তমানে বাঙ্গলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা ২,৪২,৩৭,২২৮। ইহারা সকলেই বাঙ্গালী না হইলেও, অধিকাংশই বাঙ্গালী; তদ্ভিন্ন শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলার বহুসংখ্যক বাঙ্গালী মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গলা যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক মুসলমান। আড়াই কোটী লোক তাহাদের মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উদাসীন থাকিলে তাহাদেরও মঙ্গল নাই, এবং ঐ ভাষা ও সাহিত্যেরও যতদূর উন্নতি হইতে পারে, তাহা হইবে না।

বঙ্গের প্রাদেশিক সমিতিসমূহ।

কোন দেশে অল্পসংখ্যক অস্থায়ী প্রবাসী ছাড়া যদি বাকী আর সমস্ত লোকের মাতৃভাষা একই হয়, তাহা হইলে কি ধর্ম্মে, কি বিদ্যায়, কি ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পাদিতে সে দেশের উন্নতি যত সহজে হইতে পারে, দেশমধ্যে অনেকগুলি ভাষা প্রচলিত থাকিলে তত সহজে হইতে পারে না। ভাষা সম্বন্ধে বাঙ্গলা দেশের যেরূপ সুবিধা ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশের তেমন সুবিধা নাই। বঙ্গের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৯২ জনের ভাষা বাঙ্গলা। অন্য কোনও প্রদেশে একই-ভাষা-ভাষীর অনুপাত এত বেশী নহে। সত্য বটে আগ্রা-অযোধ্যা অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে শতকরা ৯৭ জনের ভাষা হিন্দী, হিন্দুস্তানী বা উর্দ্দু। কিন্তু হিন্দী নাগরী অক্ষরে ও উর্দ্দু ফারসী অক্ষরে লিখিত হওয়ায় এবং হিন্দুমুসলমানের মধ্যে হিন্দী উর্দ্দু লইয়া ঝগড়া থাকায়, কথিত ভাষার একত্বের সুফল তথায় পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যাইতেছে না; বাঙ্গলা দেশে হিন্দু মুসলমানের কথিত ও লিখিত ভাষায় যে কিছু কিছু প্রভেদ নাই, তাহা নহে; কিন্তু সকলেরই ভাষা একই অক্ষরে লিখিত হওয়ায়, এবং শ্রেষ্ঠ মুসলমান গ্রন্থকারদের ভাষা ও শ্রেষ্ঠ হিন্দু গ্রন্থকারগণের ভাষা একই প্রকারের হওয়ায়, এ পর্য্যন্ত কোন অসুবিধা অনুভূত হয় নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি বঙ্গের বাসিন্দাদের মধ্যে শতকরা ৯২ জন বাঙ্গলা বলে। শতকরা ৪ জন হিন্দী-উর্দ্দু বলে; তাহাদের পক্ষে বাঙ্গলা বুঝা কঠিন নহে। ২,৯৪,০০০ জন ওড়িয়া বলে; তাহারাও বাঙ্গলা বুঝে। ছয় লক্ষের উপর সাঁওতালী বলে; তাহারা অনেকেই বাঙ্গলা বলিতে ও বুঝিতে পারে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ভাষা অল্প অল্প লোকের মাতৃভাষা।

আসামে প্রায় অর্দ্ধেক লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গলা, পঞ্চমাংশের আসামীয়া, এবং বাকী তিন-দশমাংশের মাতৃভাষার সংখ্যা ৯৮টি। বিহার ও ওড়িষাতে দুই-তৃতীয়াংশের ভাষা হিন্দী ও বিহারী, পঞ্চমাংশের ভাষা ওড়িয়া, শতকরা ৬ জনের ভাষা মুণ্ডারী, সাঁওতালী, হো, ইত্যাদি। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শতকরা ৪০ জন মরাঠী, ২৮ জন গুজরাটী, ১৩ জন সিন্ধী, ১১ জন কানাড়ী বলে। মধ্য প্রদেশ ও বেরারে শতকরা ৫৫ জন হিন্দী, ৩১ জন মরাঠী, ৭ জন গোঁড়, ২ জন ওড়িয়া এবং একজন করিয়া রাজস্থানী, তেলুগু ও কুর্কু বলে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে শতকরা ৪১ জন তামিল, ৩৮ জন তেলুগু, ৭ জন মলয়ালম, ৪ জন ওড়িয়া এবং ৪ জন কানাড়ী বলে।

এইরূপে ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশের সংবাদ লইলে দেখা যাইবে যে বঙ্গের মত কোথাও শতকরা ৯২ জন একই ভাষা এবং একই অক্ষর ব্যবহার করে না। শতকরা ৯২ জনের সাহিত্য আর কোনও প্রদেশে এক নহে।

আমাদের এই যে বিশেষ সুবিধা, সর্ব্বপ্রকারে ইহার সাহায্যে আমাদের উন্নতির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। রাজনৈতিক প্রাদেশিক সমিতি, সমাজসংস্কারসম্বন্ধীয় প্রাদেশিক সমিতি, কৃষিশিল্পবাণিজ্যবিষয়ক প্রাদেশিক সমিতি, এই উন্নতিচেষ্টারই অঙ্গ।

সমাজ-সংস্কার প্রায় সম্পূর্ণ রূপে দেশবাসীরই কাজ। ইহার সহিত বিদেশী রাজার কোন সম্পর্ক নাই। দুই এক স্থলে, যেমন বিধবা-বিবাহকে বা অসবর্ণ-বিবাহকে আইনসঙ্গত করিবার জন্য, আইনের প্রয়োজন হইয়াছে। তখন গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লওয়া ও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বিধবাবিবাহ বা অসবর্ণ বিবাহ চালাইবার জন্য ইহার বেশী গবর্ণমেণ্ট কিছু করিতে পারেন না। তাহার নিমিত্ত চেষ্টা, যাঁহারা ঐরূপ বিবাহ চান, তাঁহাদিগকেই করিতে হইবে। সমাজসংস্কারকদিগের বাঞ্ছিত অন্যান্য পরিবর্ত্তনও তাঁহাদিগেরই চেষ্টাসাপেক্ষ। সুতরাং বঙ্গে সমাজসংস্কার-সমিতির সমুদয় কার্য্য বাঙ্গলা ভাষাতেই হওয়া উচিত। যখন কোন আইনের প্রয়োজন হইবে, তখন সমিতির প্রস্তাব ও আবেদন আদি ইংরাজীতে লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইলেই চলিবে। বাঙ্গালীর সমাজকে শুধরাইতে চাই, আর বক্তৃতা করিব এবং প্রস্তাব উপস্থিত ও ধার্য্য করিব ইংরেজীতে, যাহা দেশের মধ্যে শতকরা একজন মাত্র জানে,—ইহা বড়ই অসঙ্গত ব্যবস্থা। অন্য প্রদেশে যাহাই হউক, বাঙ্গলা দেশে, সভাপতির অভিভাষণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজসংস্কার-সমিতির সমুদয় কার্য্যই বাঙ্গলায় হওয়া একান্ত আবশ্যক। দেশের নেতৃস্থানীয় সকলেই বাঙ্গলায় বক্তৃতা করিতে পারেন। যদি কেহ বাঙ্গলায় বক্তৃতা লিখিয়া পড়িতেও না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সভাপতি বা বক্তা না হইয়া শ্রোতা হওয়াই ভাল।

কৃষিশিল্পবাণিজ্যোন্নতি-বিষয়ক সমিতির উদ্দেশ্য, কিরূপে আমরা দেশের লোকেরা নিজের দেশের কৃষিশিল্পবাণিজ্য নিজেদের হাতে রাখিতে বা লইতে পারি ও তাহার উন্নতি করিতে পারি। বিদেশীরা কি প্রকারে ইহা আরও বেশী পরিমাণে নিজেদের করায়ত্ত করিতে পারে, তাহা এই সমিতির উদ্দেশ্য নহে; সে চিন্তা ও চেষ্টা বিদেশীরাই করিতেছে ও করিবে। আমাদের যাহা উদ্দেশ্য তাহা সিদ্ধ হইবার পক্ষে আমাদের চেষ্টা চাই, এবং কোন কোন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য চাই। যেখানে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রয়োজন হইবে, সেস্থলে দরখাস্ত ইংরাজীতে করিব, আমাদের সমিতিতে গৃহীত প্রয়োজনীয় প্রস্তাবগুলির ইংরাজী অনুবাদ গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইব, আবশ্যক হইলে কোন কোন বক্তৃতার ইংরাজী অনুবাদও পাঠাইব। কিন্তু সভাপতির অভিভাষণ হইতে সমুদয় বক্তৃতা ও প্রস্তাব পর্য্যন্ত, বাকী সব কাজ, বাঙ্গলায় হওয়া চাই। যদি কৃষি-শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য এমন কোন প্রক্রিয়া বা প্রণালীর প্রবর্ত্তন আবশ্যক হয়, যাহার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ রূপে বাঙ্গলা ভাষায় করা যায় না, তাহা হইলে সে স্থলে ইংরাজী ব্যবহার করা উচিত। আমাদের দেশের প্রধান ব্যবসা চাষ। বঙ্গের বার আনা লোকের জীবিকা পশু-চারণ ও চাষ; দুই-তৃতীয়াংশের জীবিকা শুধু চাষ। ইহাদের অধিকাংশই বাঙ্গলাও পড়িতে পারে না। চাষের উন্নতির কথা আমরা বাবুরা ইংরাজীতে বলিলে তাহাতে চাষার কি শিক্ষা বা লাভ হইবে? আমরা লাঙ্গলের বা গরুর গাড়ীর কোন্ অংশকে কি বলে, তাহাও জানি না। জমী চষা হইতে চাল প্রস্তুত করা পর্য্যন্ত, ধান-চাষের কি কি প্রক্রিয়া আছে, ইত্যাদির কতটুকু জ্ঞান আমাদের আছে? চাষের কথাটা বাঙ্গলাতেই বলা উচিত। বাঙ্গলা দেশের বাণিজ্য প্রধানতঃ ইংরেজের হাতে, তাহার নীচে মাড়োয়ারীদের হাতে এবং তন্নিম্নে বাঙ্গালী কোন কোন ব্যবসায়ী জাতির হাতে। মাড়োয়ারী এবং বাঙ্গালী ব্যবসায়ী জাতিদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন কম। সেই কারণে এবং দেশের ভাষা বাঙ্গলা বলিয়া বাণিজ্যের উন্নতি বিষয়ক সমুদয় আলোচনা বাঙ্গলায় হওয়া উচিত। আমাদের দেশের ছুতার, কামার, তাঁতি, প্রভৃতি শিল্পীদিগের মধ্যে ইংরাজী জানা লোক কম। এইজন্য এবং দেশের ভাষা

বাঙ্গলা বলিয়া শিল্পোন্নতি বিষয়ক সমুদয় আলোচনা বাঙ্গলায় হওয়া উচিত।

রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য আমরা যে পরামর্শ-সমিতি স্থাপন করিয়া বৎসর বৎসর তাহার অধিবেশনের বন্দোবস্ত করিতেছি, তাহার কার্য্য কোন্ ভাষায় হওয়া উচিত, এখন তাহাই বিবেচ্য। গোড়াতেই ইহা স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই যে, বিদ্রোহ দ্বারা প্রজাশক্তির প্রাধান্য স্থাপন করা, বিদ্রোহ দ্বারা দেশের শাসনকার্য্য স্বায়ত্ত করা যখন আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তখন আমরা আন্দোলন করিব, দাবী করিব, চাহিব, এবং গবর্ণমেণ্ট তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই প্রাদেশিক সমিতির কার্য্য-প্রণালী ও উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা হইলেই কথা উঠিতেছে, এবং সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজেরা এ কথা বার বার বলিয়াছেন, যে, কে আন্দোলন করিতেছে, কে দাবী করিতেছে, কে চাহিতেছে? সমুদয় গবর্ণমেণ্টই স্থিতিশীল, সহজে নড়িতে চান না। তাঁহাদের উপর চাপ পড়িলে তবে তাঁহারা কিছু করেন। যতক্ষণ তাঁহারা বেশ শান্তিতে দিন কাটান, কেহ চীৎকার করিয়া বা অন্য প্রকারে তাঁহাদের আরামে ব্যাঘাত উৎপাদন না করে, ততক্ষণ তাঁহারা প্রায়ই কিছু করেন না। আপনা হইতে তাঁহারা যাহা করেন, অধিকাংশস্থলে তাহা আপনাদের সুবিধার জন্য করেন। প্রজাপক্ষ হইতে যাহা চাওয়া যায়, তাহা ন্যায্য ও সঙ্গত হইলেই যে পাওয়া যায়, তাহা নহে। ২।৪ জন লোকে চাহিলে গবর্ণমেণ্ট কিছু করেন না। যখন এত বেশী লোকে এত বেশী চীৎকারাদি করিতে থাকে, যে শাসকদিগের মনে শান্তি থাকে না ও শাসনকার্য্যে অসুবিধা বোধ হইতে থাকে, তখনই গবর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তন করেন।

আমরা যে চাওয়া ও পাওয়ার কথা বলিলাম, তাহা, বাহিরে কি ভাবে প্রজাদের অধিকারলাভ ঘটে, তাহারই বর্ণনামাত্র। বাস্তবিক ভিতরের নিগূঢ় কথা তাহা নয়। প্রজাপক্ষ একতা, জ্ঞান, সাহস, দশের কাজে উৎসাহ ও তজ্জন্য স্বার্থত্যাগ, প্রভৃতি দ্বারা শক্তিশালী হইয়া উঠিলে, তাহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কেবল বিদ্রোহ ও যুদ্ধ দ্বারা অধিকার লাভ করিতে হইলেই শক্তির দরকার, আর আইনসঙ্গত উপায়ে অধিকারলাভ করিবার জন্য শুধু নাকে কাঁদিতে পারাই যথেষ্ট, এরূপ মনে করা বাতুলতা। ইহাতেও শক্তি চাই। এই শক্তি একপ্রাণ না হইলে জাতীয় চিত্তে অবতীর্ণ হয় না। ক্ষুদ্র একদল লোক বিদেশী ভাষায় বক্তৃতার আতসবাজী দেখাইলে, এই একপ্রাণতা জন্মিতে পারে না। প্রাচীন ঋষিরা ঐক্যলাভের যে উপায় বলিয়াছেন তন্মধ্যে "সংবদধ্বম," "একসঙ্গে একই কথা বল," এই উপদেশও আছে। আমরা চাই একপ্রাণতা। সকলের প্রাণের প্রকাশ ও মিল দেশ ভাষায় যেমন হইতে পারে, এমন আর কোন্ ভাষা দ্বারা সম্ভব? আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ। এই স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তি বা প্রথম ধাপ পল্লীগ্রামে। সেখানে ইংরাজীতে সুপণ্ডিত সাহিত্যাচার্য্য, বিজ্ঞানাচার্য্য, দর্শনাচার্য, ব্যবস্থাচার্য্যেরা বাস করেন না। নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত লোকেরাই তথাকার বলবুদ্ধি ভরসা। তাহাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের জন্য ব্যাকুল, রাষ্ট্রীয়ব্যাপারে শিক্ষিত কেমন করিয়া করা যাইবে, যদি তাহাদের ভাষায় এই সব বিষয়ের আলোচনা না হয়?

বাঙ্গলাদেশে শতকরা একজন ইংরেজী জানে। এই জানার অর্থ গভীর জ্ঞান নহে, সামান্য লিখিতে পড়িতে পারা মাত্র। এহেন ইংরাজী জানা লোকদেরও সকলে বা অধিকাংশ, আন্দোলনে যোগ দেন না, দিতে পারেনও না; কারণ যাহারা বেশী ইংরেজী জানেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সরকারী চাকরী করেন। সুতরাং দেশের খুব অল্পসংখ্যক লোকই রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে ইংরেজ রাজভৃত্যদের ধারণা এই, যে, তাঁহারা দেশের অবস্থা জানেন না, দেশের লোকদের সঙ্গে তাঁহাদের যোগ নাই, তাঁহারা সাধারণ লোকদের মঙ্গল চান না, বরং তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারিলে ছাড়েন না। এই ধারণা সত্য কি মিথ্যা, আন্তরিক না কপটতা-প্রসূত, তাহার মীমাংসা করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা যাহা চাই, তাহা দেওয়া না দেওয়া এই ইংরেজদেরই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সুতরাং আমাদের দাবী

যে দেশের দাবী, তাহার এমন প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে, যাহা, যদি বা তাঁহারা মুখে অস্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে মনে মনে ও কার্য্যতঃ স্বীকার করিতেই হইবে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমরা যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা যে দেশের লোকেরই চাওয়া, তাহার প্রমাণ এই যে নয়জন বাঙ্গালীকে নির্ব্বাসন দিতে হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলন এত বিস্তৃতি, গভীরতা ও বল লাভ করিতে পারিয়াছিল এইজন্য যে উহা দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। দেশবাসী সকলেই যে স্বদেশী মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা নহে। অনেকে ইহার দারুণ বিরোধী হইয়াছিল। কিন্তু শক্তির ও সারবত্তার পরিচয়ই ত এইখানে;—তুমি যাহা বলিতেছ তাহার সম্বন্ধে যদি লোকে উদাসীন থাকে, তাহা হইলে তাহার মূল্য আছে কি না বুঝা গেল না; কিন্তু যদি কেহ তাহাকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসে, কেহ বা অন্তরের সহিত ঘৃণা করে, তবে তাহাতে বস্তু আছে বুঝিতে হইবে। বরং উৎপীড়িত হওয়া ভাল কিন্তু উপেক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। স্বদেশী আন্দোলন উপেক্ষিত হয় নাই। উহার শক্তির অন্যান্য কারণ আছে; কিন্তু মাতৃভাষায় আন্দোলন যে একটি প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আন্দোলনের সময় বাঙ্গলা ভাষায় বলিতে অভ্যস্ত বাগ্মীরা ত বাঙ্গলায় বক্তৃতা করিয়াই ছিলেন; ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে সুদক্ষ সুরেন্দ্রবাবু, ভূপেন্দ্রবাবু, অম্বিকাবাবু প্রভৃতিও বাঙ্গলা ভাষা অবলম্বন করিয়াছিলেন। বাঙ্গলাভাষায় আন্দোলন না করিয়া কেবল ইংরাজীতে বলিলে শত শত সুরেন্দ্রবাবুও জাতীয় জীবনে ঢেউ তুলিতে পারিতেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে রাজনৈতিক প্রাদেশিক সমিতিতে সভাপতির অভিভাষণ প্রভৃতি সমস্তই বাঙ্গলায়, খুব সোজা বাঙ্গলায়, হওয়া উচিত। তাহা হইলে দেশের আরও বেশী লোক উহাতে যোগ দিতে পারিবে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের অশিক্ষিত সাধারণ লোকেও বেশ সুযুক্তিপূর্ণ মর্ম্মস্পর্শী কথা বলিয়াছে। প্রাদেশিক সমিতিতেও এইরূপ লোকদিগকে বলিতে দেওয়া উচিত। তাহা হইলে, শিক্ষিত লোকদের সহজে চোখে পড়ে না, এমন অনেক অভাব, বেদনা ও প্রতিকার দেশের লোকের গোচর হইবার সম্ভাবনা। রাজনৈতিক প্রাদেশিক সমিতির এমন কোনও বিবেচ্য বিষয় নাই, যাহার আলোচনা সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গলায় করা যায় না। আমাদের সমুদয় রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা অভাব অভিযোগ দাবী দাওয়া প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা বাংলা ভাষার আছে। সমিতির প্রস্তাবগুলির এবং সভাপতির অভিভাষণ ও অন্যান্য কোন কোন বক্তৃতার ইংরাজী অনুবাদ গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান যাইতে পারে। সম্বৎসর ধরিয়া জেলায় জেলায় বাঙ্গলাভাষায় আন্দোলন হইলে এবং প্রাদেশিক সমিতির সমুদয় কাজ বাঙ্গলায় হইলে প্রজাপক্ষের দাবী এমন বলবৎ হইবে যে গবর্ণমেণ্ট নিজেই রিপোর্ট লইবার ও ইংরেজীতে অনুবাদ করাইবার বন্দোবস্ত করিবেন। তথাপি বিকৃত রিপোর্ট ও অনুবাদের অপকারিতা নিবারণ জন্য আমাদের তরফ হইতেও রিপোর্ট ও অনুবাদের বন্দোবস্ত থাকা দরকার। সমিতি হইতে দরখাস্তও ইংরাজীতে লিখিয়া পাঠান যাইতে পারে।

বাঙ্গলাদেশে দেশভাষায় প্রাদেশিক সমিতির কাজ চালাইতে কোনই অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। এখানকার শতকরা ৯২ জনের মাতৃভাষা বাঙ্গলা। বাকী অধিকাংশ লোকও বাঙ্গলা বুঝে। কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ প্রদেশের এ সুবিধা নাই। বোম্বাইয়ে মরাঠীতে কাজ চালাইতে গেলে শতকরা ৪০ জন বুঝিবে, গুজরাটীতে আরও কম, শতকরা ২৮ জন মাত্র। মান্দ্রাজে তামিলে কাজ চালাইতে গেলে শতকরা ৪১ জন এবং তেলুগুতে ৩৮ জন বুঝিবে। বাঙ্গালীর এই অনন্যসাধারণ সুবিধার সুফল হইতে বঞ্চিত থাকা সুবুদ্ধির কাজ হইবে না। বাঙ্গলা ভাষায় প্রাদেশিক সমিতির কাজ চালাইতে গেলে প্রথম প্রথম ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে অভ্যস্ত ২।১ জনের একটু বাধ বাধ ঠেকিতে পারে। কিন্তু প্রত্যাশিত সুফলের তুলনায় এই অতি সামান্য অসুবিধা উল্লেখযোগ্যও নহে।

বলা বাহুল্য, জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেস, সমগ্র

ভারতের জাতীয় সমাজসংস্কারসমিতি, প্রভৃতি সমগ্র ভারতের সমিতিগুলির ভাষা আপাততঃ ইংরেজীই থাকিবে। কখনও যদি কোন দেশভাষা ভারতব্যাপী হয়, তখন পরিবর্ত্তন সহজেই করিতে পারা যাইবে।

বঙ্গে শিক্ষিতের সংখ্যা। ভারতবর্ষের কেবল বড় বড় প্রদেশগুলি ধরিলে শিক্ষায় বঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। এখানে শিক্ষিতের সংখ্যাও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, শতকরা হারও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বঙ্গে শতকরা ৭.৭, বোম্বাইয়ে ৬.৯, মান্দ্রাজে ৭.৫, আগ্রা-অযোধ্যায় ৩.৪, বিহার-উড়িষ্যায় ৩.৯, আসামে ৪.৭, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ৩.৩, পঞ্জাবে ৩.৭ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৩.৪ জন শিক্ষিত। এই তুলনায় বাঙ্গালীদের হয় ত অহঙ্কার জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইউরোপ আমেরিকার সভ্যদেশ সকলের সঙ্গে কিম্বা জাপানের সঙ্গে তুলনা করিলে এই অহঙ্কারের কোন কারণ থাকিবে না। অথবা আমাদের অহঙ্কারের সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য অতদূরে যাইবারই বা প্রয়োজন কি? খাস্ ভারতবর্ষের বাহিরে কিন্তু ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ব্রহ্মদেশে শতকরা ২২.২ জন শিক্ষিত। অর্থাৎ তথায় শিক্ষিতের হার বঙ্গদেশের তিন গুণ। ভারতবর্ষের মধ্যেই কোন কোন দেশীয় রাজ্যে শিক্ষিতের অনুপাত বঙ্গদেশ অপেক্ষা অধিক। যথা কোচীনে শতকরা ১৫.১ জন (অর্থাৎ বঙ্গের দ্বিগুণ), ত্রিবাঙ্কুরে ১৫ (বঙ্গের দ্বিগুণ) এবং বড়োদায় ১০.১ (বঙ্গের প্রায় দেড়গুণ) শিক্ষিত। বঙ্গের সব জেলায় শিক্ষার অবস্থা সমান নহে। কোন্ জেলায় হাজার করা কত জন শিক্ষিত তাহা নীচের তালিকায় দৃষ্ট হইবে। হাজার করা যে অঙ্ক দেওয়া হইল, তাহাকে দশ দিয়া ভাগ করিলেই শতকরা কয় জন শিক্ষিত তাহা পাওয়া যাইবে।

হাজার করা কয় জন শিক্ষিত।

জেলা	মোট	পুরুষ	স্ত্রীলোক
বর্দ্ধমান	১০০	১৮৬	১১
বীরভুম	৮৮	১৭১	৬
বাঁকুড়া	৯৪	১৮৪	৭
মেদিনীপুর	৯৪	১৮১	৭
হুগলী	১১১	১৯৯	২১
হাবড়া	১৪২	২৪৮	২৩
২৪ পরগণা	১২৪	২১৬	১৭
কলিকাতা	৩২১	৩৯৬	১৬৪
নদীয়া		৯৮	১৪
মুর্শিদাবাদ	৫৮	১০৮	৯
যশোহর	৭০	১২৭	১০
রাজশাহী	৪৬	৮৬	৫
দিনাজপুর	৫৯	১০৮	৪
জলপাইগুড়ী	৫৬	৯৯	৪
দার্জ্জিলিং	৯৯	১৬৯	১৯
রংপুর	৪২	৭৬	৩
বগুড়া	৫৯	১১১	৫
পাবনা	৫১	১০১	৭
মালদহ	৪৬	৮৯	৩
কুচবেহার	৭৪	১৩৪	৬
খুলনা	৮৪	১৫৩	১১
ঢাকা	৭৫	১৩৪	১৬
মৈমনসিং	৪৬	৮৫	৫
ফরিদপুর	৬১	১১১	১০
বাখরগঞ্জ	৮৬	১৫৬	১১
ত্রিপুরা	৭১	১৩২	৮
নোয়াখালী	৬১	১১৮	৬
চট্টগ্রাম	৬৭	১৩৩	৭
ঐ পার্ব্বত্য	৬৪	১১৫	৪
পার্ব্বত্য ত্রিপুরা	৪০	৬৯	৮
মানভূম	৪৫	৮৪	৫
গোয়ালপাড়া	৪১	৭৪	৪
কাছাড় (সমতল)	৬১	১১০	৮
শ্রীহট্ট	৫৪	৯৮	৬

উপরের তালিকায় সন্নিবিষ্ট মানভূম, গোয়ালপাড়া, কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলা বর্ত্তমান সরকারী বিভাগ অনুসারে বঙ্গের অন্তর্গত নহে। কিন্তু ঐ সকল জেলা প্রাকৃতিক বঙ্গের অন্তর্গত এবং উহাদের অধিবাসীদের মধ্যে যত লোক বাঙ্গলা বলে এত আর কোন ভাষাই বলে না। এই জন্য আমরা উহাদিগকে বঙ্গের বহির্ভূত মনে করি না। আমাদের দেশ যে কিরূপ নিরক্ষরের দেশ, তাহা সকলে অনুভব করুন, এবং নিজ নিজ জেলার অবস্থা দেখিয়া শিক্ষা বিস্তারে প্রবৃত্ত হউন। যিনি বেশী কিছু করিতে পারিবেন না তিনি অন্ততঃ একজন লোককেও সংযুক্ত ও অসংযুক্ত অক্ষর পরিচয়ের বহি এক একখানা দিয়া উহা পড়িতে শিখাইয়া দিউন।

বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা বিশেষ করিয়া শোচনীয়। বঙ্গে হাজার করা ১১ জন স্ত্রীলোক শিক্ষিত; আজমের-মেরোআরায় ১৩, আণ্ডামান-নিকোবরে ২৯, বোম্বাইয়ে ১৪, ব্রহ্মদেশে ৬১, কূর্গে ২৮, মান্দ্রাজে ১৩, বড়োদায় ২১, কোচীনে ৬১, মহীশূরে ১৩ এবং ত্রিবাঙ্কুরে ৫০।

ধর্ম্ম ও জাতি অনুসারে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সংখ্যা। ইউরোপীয়দিগকে বাদ দিলে ব্রাহ্মদের মধ্যে শিক্ষিতের অনুপাত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; তাহাদের মধ্যে শতকরা ৭৮ জন লিখিতে পড়িতে পারে। দেশীয় খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যে শতকরা ২৪ জন, হিন্দুদের মধ্যে ১২ জন, বৌদ্ধদের মধ্যে ৯ জন এবং মুসলমানদের মধ্যে ৪ জন শিক্ষিত। অসভ্য আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা একজনও শিক্ষিত নহে, হাজারে ৫ জন মাত্র শিক্ষিত।

হিন্দুদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম শিক্ষিত জাতি—বাগ্দী হাজারে ১৯ জন শিক্ষিত, বাউরী দশ, ভুঁইমালী ৩৪, ধোবা ৫৫, গোয়ালা ৭৭, জেলিয়া কৈবর্ত্ত ৪৪, কপালী ৬০, কোচ ১৮, কুমার ৮০, মালো ২৮, মুচি ১২, নমশূদ্র ৪৯, পাটনী ১৮, রাজবংশী ৫১, সূত্রধর ৮৬, তিয়র ২০।

বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা দুইকোটি নয় লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিন শত উনআশী। তন্মধ্যে বাগ্দী দশ লক্ষ, বাউরী ছয় লক্ষ, গোয়ালা ৩৯ লক্ষ, নমশূদ্র উনিশ লক্ষ, রাজবংশী উনিশ লক্ষ, কোচ সওয়া লক্ষ, জেলিয়া কৈবর্ত্ত তিন লক্ষ, মালো আড়াই লক্ষ, তিয়র দুই লক্ষ, মুচি সাড়ে চারি লক্ষ, ধোবা ছয় লক্ষ, কপালী দেড় লক্ষ, সূত্রধর দেড় লক্ষ, কুমার আট লক্ষ, ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে যে সকল জাতি খুব কম শিক্ষিত, তাহাদের সংখ্যা এক কোটি পঁচিশ লক্ষেরও উপর। অর্থাৎ অর্দ্ধেকেরও অধিক হিন্দুর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার অতি সামান্যরূপ হইয়াছে।

অল্পশিক্ষিত জাতিদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার। সুখের বিষয় এই সকল অল্প-শিক্ষিত জাতিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছে। এই কাজ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে হইতেছে, বঙ্গেও আরম্ভ হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে যে চেষ্টা হইতেছে তাহার প্রধান কেন্দ্র বোম্বাই, সম্পাদকের নাম শ্রীযুক্ত বিঠলরাম শিন্দে। এই শিক্ষা-সভার অধীনে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ২৭টি শিক্ষালয় ছিল। তাহাতে ৫৭ জন বেতনভোগী শিক্ষকের অধীনে ১২৩১ জন ছাত্র ও ছাত্রী শিক্ষা পাইতেছিল। ছাত্র ও ছাত্রীদের সকলের মাতৃভাষা এক নহে; পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা তাহাদের মাতৃভাষা। বোম্বাই, পুণা, হুবলী, মাঙ্গালোর, ভাবনগর, অমরাবতী, আকোলা, দাপোলী, মালওআন, সাতারা, ঠানা, মাথেরান, রাজকোট এবং য়েওটমলে এই সভার শাখা আছে। মোটের উপর ইহার বার্ষিক ব্যয় পঁচিশ হাজার টাকা। এই সভা কেবল লেখাপড়া শিখাইয়াই ক্ষান্ত হন না; স্থানে স্থানে ছুতার ও দরজির কাজ, বহি বাঁধাই এবং সাইন-বোর্ড আঁকা শিখাইয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন পাঁচটি ভজনসমাজ স্থাপন করিয়া ছাত্র ও ছাত্রীগণকে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, কাওয়াজ (drill) এবং সঙ্গীত শিখান হইয়াছে, এবং মাঙ্গালোরে এড়ির সুতা ও কাপড় প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশে সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা অনেক বৎসর পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে নানাস্থানে কাজ হইতেছে। সকল স্থানের কাজের মুদ্রিত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। যে সকল সভা এই কাজ করিতেছেন, তন্মধ্যে "বঙ্গ ও আসাম অবনত শ্রেণী সকলের শিক্ষাসমিতি" অন্যতম। কলিকাতায় ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, এবং ঢাকায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত। এই সমিতি ঢাকা, মৈমনসিং, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, যশোহর ও বাখরগঞ্জ জেলায় কাজ করিতেছেন। ইহার অধীনে চারিটি মাইনর স্কুল, পঁয়ত্রিশটির উপর উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালা, কয়েকটি বালিকাবিদ্যালয় এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষার জন্য অল্পসংখ্যক নৈশ বিদ্যালয় আছে। সকলেরই এইরূপ কাজে সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

নন্দলাল বসুর অভিনন্দন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বোলপুরস্থ বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে ছুটি হইয়াছে। ছুটির পূর্ব্বে

রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্রকে লইয়া "অচলায়তন" নাটকের চমৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে বিদ্যালয়ের অনেক বন্ধু বোলপুর গিয়াছিলেন। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু তাঁহাদের মধ্যে এক জন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মত গুণী ব্যক্তিকে আশ্রমে পাইয়া তাঁহার যথোচিত আদর করেন। ইহা সামান্য সৌভাগ্য নহে। রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন-কবিতার প্রতিলিপি আমরা মুদ্রিত করিলাম।

ওঁ

শ্রীমান নন্দলাল বসু
পরমকল্যাণীয়েষু

তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে
ভারত-ভারতী-চিত্ত।
বঙ্গলক্ষ্মী ভাণ্ডারে সে যে
যোগায় নূতন বিত্ত।
ভাগ্যবিধাতা আশিষমন্ত্র
দিয়েছে তোমার কর্ণে—
বিশ্বের পটে স্বদেশের নাম
লেখ অক্ষয় বর্ণে!
তোমার তুলিকা কবির হৃদয়
নন্দিত করে, নন্দ!
তাইত কবির লেখনী তোমায়
পরায় আপন ছন্দ।
চিরসুন্দরে কর গো তোমার
রেখাবন্ধনে বন্দী!
শিবজটাসম হোক তব তুলি
চিররস-নিষ্যন্দী!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১২ই বৈশাখ
১৩২১

জাপানী ও স্বদেশী। স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেকে স্বদেশী জিনিষ না পাইলে আদর করিয়া জাপানী জিনিষ কিনিতেন, এবং এখনও কিনেন। অনেকে স্বদেশী ও জাপানী জিনিষ প্রায় সমান আদরণীয় মনে করেন। কিন্তু ইহা মহা ভ্রম। শিল্পবাণিজ্য বিষয়ে জাপান মোটেই আমাদের বন্ধু নহে, প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী। কারণ, জাপান ভারতবর্ষে তাহার শিল্পজাত দ্রব্য যত সস্তায় দিতেছে, ইউরোপের কোন জাতিই তত সস্তায় দিতে পারিতেছে না। সুতরাং জাপানের প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশী শিল্পসমূহের অনিষ্ট ও বিনাশ যেমন হইবে, পাশ্চাত্য দেশ সকলের প্রতিযোগিতায় সেরূপ হইবে না।

জাপান ম্যাগাজিন নামক মাসিক পত্রে লেখা হইয়াছে যে জাপান ভারতবর্ষের বাজারে ইতিমধ্যেই দিয়াশলাই, কোন কোন প্রকারের কার্পাস বস্ত্র, কোন কোন রকমের কাচের জিনিষ, প্রভৃতিতে ফ্রান্স, সুইডেন, ইংলণ্ড, হলাণ্ড, প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশকে পরাস্ত করিয়াছে। ভারতের বাজারে জাপানের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মেনী। তাহার কারণ জার্মেনরা, ভারতবর্ষের লোকেরা কিরূপ জিনিষ চায়, তাহা দেশের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেশ করিয়া জানিয়া লয়, এবং আমাদের রুচি অনুযায়ী জিনিষ জোগায়, এবং খুব সস্তা দরে দেয়। জাপান ম্যাগাজিন জাপানীদিগকেও এইরূপ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। জাপানীদের ধারণা যে তাহারা ভারতবর্ষে যেরূপ সস্তা দরে জিনিষ বিক্রয় করিতে পারিবে, আর কোনও দেশের লোকে সেরূপ পারিবে না।*

* "The future of Japan's foreign commerce no doubt lies in India and China, where there rae

১৯০৮—০৯' খৃষ্টাব্দে জাপান হইতে ভারতবর্ষে ২,১৪,৭০,০০০ টাকার মাল আসিয়াছিল। পাঁচ বৎসরে এই আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়া ৪,০৬,৬৭,০০০ টাকার অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। জাপানীরা বৎসরে চারি কোটি টাকার উপর জিনিষ ভারতবর্ষে বেচিতেছে! সহজ কথা নয়। জাপানীদের দৃঢ়বিশ্বাস যে আমরা প্রতিযোগিতায় কোন মতেই তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিব না। আমাদের অকর্ম্মণ্যতা ও অপটুতায় যে জাপানীরা খুব আনন্দিত তাহা জাপান ম্যাগাজিনের ভাষা হইতেই বুঝা যায়।

"Japan does not appear to be in any fear that Indian manufacturing industries will so far develop as to be able to meet the home demand. Neither in mechanical nor manual industry has India made the same progress that has marked the last few years in Japan; and no doubt the increasing importation of cheaper Japanese and German goods will still further retard the growth of Indian industries. At least Japan has no fear of meeting successful rivals in Indian trade".

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু।
(শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার কর্তৃক অঙ্কিত।)

অর্থাৎ "জাপানের এরূপ কোনই আশঙ্কা নাই যে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন জন্য প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কলকারখানাদির এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইবে যে তাহাদের দ্বারাই, ভারতবর্ষের লোকদের যত জিনিষ দরকার, সমস্তই সরবরাহ হইবে।

কি হাতের কারিগরী দ্বারা শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণে, কি কল কারখানা দ্বারা তদ্রূপ দ্রব্য উৎপাদনে, গত কয় বৎসরে জাপান যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, ভারতবর্ষ সেরূপ করিতে পারে নাই; এবং ইহা নিঃসন্দেহ যে সস্তা জাপানী ও জার্ম্মেন জিনিষের আমদানীতে ভারতীয় শিল্প সকলের উন্নতিতে আরও বাধা পড়িবে। অন্ততঃ, ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে জাপানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কেহ সফল প্রযত্ন হইতে পারিবে, জাপানের এরূপ কোন আশঙ্কা নাই।

অতএব ইহা আর ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে না যে জাপান আমাদের এমনই বন্ধু যে, যদি আমাদের শিল্পসমূহের শ্রীবৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে তাহা তাহার "আশঙ্কা"র কারণ হইত; এবং সেই আশঙ্কা নাই বলিয়া জাপান আনন্দটা চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

জাপানীদের প্রতি আমাদের বন্ধুভাব ও সহানুভূতির সুযোগে তাহারা কেমন আমাদের ক্ষতি করিবার সুবিধা পাইয়াছে, জাপান ম্যাগাজিন হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

"There are other circumstances, too, which assist in brightening the future of Japan's trade with India. The people of India have a good deal of sympathy with the Japanese as a race, and Japanese goods are popular and cheap."

অর্থাৎ—"আরও কতকগুলি অবস্থা আছে, যাহাদের আনুকূল্য ভারতবর্ষের সহিত জাপানের বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়াছে। জাতি হিসাবে জাপানীদের সহিত ভারতবর্ষের লোকদের খুব সহানুভূতি আছে, এবং লোকে জাপানী জিনিষ খুব ভাল বাসে ও উহা খুব সস্তা।"

immense populations constantly in demand of cheap manufactures, too cheap to find any great market in the West, and cheaper than Western goods, even of the same quality, can be put down in India or China, by any other country." *The Japan Magazine.*

জাপানীরা জাহাজ ভাড়া দিয়া তুলা এদেশ হইতে লইয়া যায়। তাহা হইতে জিনিষ প্রস্তুত করিয়া আবার জাহাজ ভাড়া দিয়া ভারতবর্ষে আনে। দুবার জাহাজ ভাড়া দিয়াও তাহারা ভারতের কাপাস হইতে ভারতে প্রস্তুত সূতী জিনিষের চেয়ে সস্তাদরে নিজেদের জিনিষ বিক্রী করে। ভারতবর্ষ হইতে কাঁচা মাল লইয়া গিয়া তাহারা এইরূপ আরও কোন কোন জিনিষ ভারতবর্ষেই আনিয়া দেশী জিনিষের চেয়ে সস্তায় বেচে। ইহা কেমন করিয়া হয়, তাহার অনুসন্ধান দেশের লোকের ও গবর্ণমেণ্টের করা উচিত। জাপানীদের শিক্ষা, সামাজিক রীতিনীতি, পারিবারিক ব্যবস্থা, জাতীয় চরিত্র, জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য, প্রভৃতি কি কি কারণে জাপানীরা আমাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিতেছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য শিল্প-বাণিজ্যে বিচক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণদক্ষ কয়েকজন ভারতবাসীর জাপান যাওয়া উচিত, এবং তাঁহাদের রিপোর্ট সমুদয় দেশভাষায় মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হওয়া উচিত।

জাভার চিনি ও গুড়। ১৯০৮—০৯ খৃষ্টাব্দে জাভা হইতে ভারতে ৬ কোটি ২০ লক্ষ ২১ হাজার টাকার চিনি ও গুড় আসিয়াছিল। ৫ বৎসর পরে ৯ কোটি ৫৩ লক্ষ ৯১ হাজার টাকার আসিয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে চিনি ও গুড়ের প্রধান আকর ছিল এই ভারতবর্ষ। এখানে যে আর যথেষ্ট শর্করা হইতেছেনা, যাহা হইতেছে তাহাও যে জাভার গুড় চিনি হইতে মহার্ঘ, তাহার কারণ কি? বিদেশী চিনির কাটতি হু হু শব্দে বাড়িয়া চলিতেছে দেখিয়া কয়েকটি দেশী চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইল, উঠিয়াও গেল, কিন্তু কেহই বোধ হয় জাভায় গিয়া একবার দেখিয়া আসেন নাই যে কি কি কারণে সেখানে এত সস্তায় এত বেশী পরিমাণ গুড় চিনি উৎপন্ন হয়। দেশের লোকের একটা একটা করিয়া জীবিকা মাটি হইতেছে, তাহার প্রতিকার আমরাও করিতেছি না, গবর্ণমেণ্টও করিতেছেন না। গুড়চিনিতে ভারতের সহিত ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতা নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট অবাধে কিছু করিতে পারেন।

আলষ্টারের "আইনসঙ্গত" আন্দোলন। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড আয়র্লণ্ড জয় করেন। তখন হইতে, দেশটাকে বেশ শায়েস্তা করিবার জন্য, অনেক ইংরেজ ও স্কচ্‌কে আয়র্লণ্ডে বসান হয়। তাহারা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী এবং তাহাদের বংশধরেরা প্রধানতঃ আলষ্টার প্রদেশে বাস করে। আয়র্লণ্ডের মূল অধিবাসীদের অধিকাংশ রোমান ক্যাথলিক। প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকে ঝগড়া বিদ্বেষ বেশ আছে; তাহার উপর প্রটেষ্টাণ্টদের বিজেতা ও প্রভু বলিয়া ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কারও আছে। সুতরাং আয়র্লণ্ডকে আত্মশাসন ক্ষমতা দিবার জন্য বৃটিশ পার্লেমেণ্টে হোম রূল বিল নামক যে আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইয়াছে, আলষ্টারবাসী প্রটেষ্টাণ্টরা তাহার ভীষণ বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। রক্ষণশীল দলের নেতারা ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। তাহারা বরাবর ভয় দেখাইয়া আসিতেছিল যে হোমরূল আইন পাস হইলে তাহারা যুদ্ধ করিয়া তাহা আলষ্টারে চালাইতে দিবে না। তজ্জন্য হাজার হাজার লোক ভলাণ্টিয়ার বা সখের সৈন্য হইয়াছে, তাহাদিগকে কুচকাওয়াজ শিখান হইয়াছে। অল্পদিন হইল, উপদ্রব বা রক্তপাত নিবারণ জন্য যদি আবশ্যক হয়, সেই নিমিত্ত কয়েক দল সৈন্যকে গবর্ণমেণ্ট আয়র্লণ্ডে পাঠাইবার হুকুম দেন। তাহাতে, "আলষ্টারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব না", বলিয়া বহুসংখ্যক সেনানায়ক ইস্তফা দেন। রক্ষণশীল দলের ও আলষ্টারের নেতাদের এমনই ষড়যন্ত্র! সম্প্রতি কৌশল করিয়া এবং কোথাও কোথাও সমুদ্রোপকূলরক্ষী প্রহরীদিগকে বন্দী করিয়া হাজার হাজার বন্দুক এবং লক্ষ লক্ষ টোটা আলষ্টারে আনিয়া নানা স্থানে ভলাণ্টিয়ারদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। সম্রাট পঞ্চম জর্জ প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা আয়র্লণ্ডে বন্দুক গোলাগুলি আমদানী নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও রক্ষণশীলদলের নেতারা ও আলষ্টারের নেতারা নিবৃত্ত হন নাই। ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দলের মন্ত্রীরা এবং ডেলীনিউজ প্রভৃতি পত্রের সম্পাদকেরা এই সকল নেতাকে বিদ্রোহী বলিতেছেন, এবং বাস্তবিকও তাহারা বিদ্রোহী। কিন্তু বিদ্রোহের নেতা সার্ এড্‌ওয়ার্ড কার্সন বা আর কাহাকেও ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হয় নাই। অথচ এই ইংলণ্ডেই, "ধর্ম্মঘটকারী শ্রমজীবীদের উপর বন্দুক চালাইও না," সৈনিকদের উদ্দেশে, বক্তৃতার মধ্যে শুধু এই অনুরোধটুকু করায়, বর্ত্তমান উদারনৈতিক গবর্ণমেণ্টই শ্রমজীবীদের নেতা টম্ ম্যানকে জেলে পাঠাইয়াছিলেন। আইন ভঙ্গ করিতে উত্তেজনা দেওয়ার অপরাধে রাষ্ট্রীয়-অধিকার প্রার্থিনী সাফ্রেজেট্ দলের নেত্রী মিসেস্ প্যাঙ্ক-

হার্পৈরও দণ্ড হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডে অবস্থাচক্রে উদারনৈতিক মন্ত্রিসভাকে "শক্তের ভক্ত নরমের যম" সাজিতে হইয়াছে।

যেরূপ অসাবধানতার সুযোগে রক্ষণশীল ও আলষ্টার-পক্ষীয়েরা এত বন্দুক ও গোলাগুলি আলষ্টারে আমদানী করিতে পারিয়াছে, উদারনৈতিকদের সেই অসতর্কতা যারপরনাই নিন্দনীয়। কিন্তু তাঁহারা যে বিদ্রোহী নেতাদিগকে দণ্ড দিবার চেষ্টা করিতেছেন না বা সশস্ত্র আলষ্টারবাসীদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিতেছেন না, তাহা বিজ্ঞতারই পরিচায়ক; যদিও তাহাতে তাঁহাদের আচরণে অসঙ্গতি দেখা যাইতেছে। কেন না ইহা অপেক্ষা শতগুণ লঘু অপরাধে শ্রমজীবীদের নেতাদের এবং সাফ্রেজেটদের নেত্রীদের দণ্ড হইয়াছে। বিজ্ঞতার পরিচায়ক এইজন্য বলিতেছি যে এখন বিদ্রোহোন্মুখ নেতাদিগকে শাস্তি দিবার বা তাঁহাদের অনুচরদিগকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই দেশে অন্তর্যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, এবং হোমরূল বিধিবদ্ধ হওয়া সুদূরপরাহত হইবে; কারণ বিদ্রোহোন্মুখ নেতাদের সাহস আছে, অর্থবল আছে, যুদ্ধের উপকরণ সংগৃহীত আছে, যুদ্ধনিপুণ সেনাপতিগণ সহায় আছে এবং যুদ্ধ করিতে সমর্থ অনুচরও বিস্তর আছে। এ অবস্থায় আসল উদ্দেশ্য যে হোমরূল তাহার জন্য স্থিরচিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বন রাষ্ট্রনীতিকুশলতার বিশেষ পরিচায়ক। হোমরূলপ্রার্থী আইরিশ ও তাঁহাদের নেতাদের ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও বাক্‌সংযম বিশেষ প্রশংসনীয়।

আলষ্টারপক্ষীয়রা বলেন যে তাঁহারা বিদ্রোহী নহেন, কারণ তাঁহারা নিজের প্রদেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতাকার নীচে অর্থাৎ উক্ত সাম্রাজ্যভুক্ত রাখিতে চাহিতেছেন, সম্রাট্ জর্জের অধীন রাখিতে চাহিতেছেন। কিন্তু আয়র্লণ্ডকে যে আত্মশাসন-ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহা কানাডা বা অষ্ট্রেলিয়ার আত্মশাসন-ক্ষমতা অপেক্ষা বেশী নয়। ঐরূপ ক্ষমতা পাইয়া কানাডা বা অষ্ট্রেলিয়া যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যায় নাই, তখন আয়র্লণ্ডই বা কেন যাইবে? আর, কার্সন যে এত রাজভক্তির ভান করিতেছেন, তাহার প্রমাণ সম্রাটের আদেশের বিরুদ্ধে বন্দুক টোটা আমদানী করাতেই পাওয়া গিয়াছে।

ভারতের অনেক এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ স্বপ্ন দেখেন যে এদেশে ভয়ঙ্কর রাজবিদ্রোহের আয়োজন হইতেছে এবং সিপাহীদিগকে অবাধ্য ও বিদ্রোহী করিবার চেষ্টা হইতেছে; অথচ একজন সিপাহীও বাস্তবিক বিদ্রোহী হইয়াছে বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু আলষ্টারে বিদ্রোহ ও বিদ্রোহের আয়োজন এবং বহুসংখ্যক সেনানায়কের অবাধ্যতা সম্বন্ধে ত কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত কাগজগুলি সব আলষ্টারের পক্ষে; কেন না,—মাকড় মারিলে ধোকড় হয়।

আচ্ছা, যদি বঙ্গবিভাগের পর একদল বাঙ্গালী বলিত, "আমরা কোনমতেই পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাটের এলাকার মধ্যে যাইব না, বঙ্গের ছোটলাটই আমাদের শাসনকর্ত্তা থাকুন, যদি আমাদের কথা না শুন, তাহা হইলে আমরা আমাদের রাজভক্তি, ব্রিটিশপতাকাভক্তি এবং বঙ্গের ছোটলাটের প্রতি ভক্তির অনুরোধে যুদ্ধ করিব", এবং এই বলিয়া তাহারা সখের সেনাদল গড়িত, তাহাদিগকে যুদ্ধ শিখাইত এবং হাজার হাজার বন্দুক টোটা আমদানী করিত, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত এংলোইণ্ডিয়ান কাগজগুলি কি ঐ সব বাঙ্গালীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের রাজভক্তির প্রশংসা করিতেন? কখনই না। প্রকৃত কথা এই যে আলষ্টারের প্রটেষ্টাণ্টরা যেমন ভুলিতে পারিতেছেন না যে তাঁহারা জেতার বংশধর এবং আইরিশেরা বিজিত, এখানকার এংলোইণ্ডিয়ানরাও তেমনি সর্ব্বদাই ভাবেন যে তাঁহারা জেতার জাতি ও ভারতীয়েরা বিজিত। তাই আলষ্টারের সহিত এংলো-ইণ্ডিয়ানদের এত সহানুভূতি।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্পত্তি। ভারতবর্ষে অর্থাভাবে শিক্ষার উন্নতি হয় না। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কিরূপ ধনী দেখুন।

বিশ্ববিদ্যালয়।	সম্পত্তির পরিমাণ।	
হার্ভার্ড	৮, ২৩, ২০, ০০০	টাকা
ষ্টানফোড়	৭, ১০. ০০. ০০০	"
শিকগো	৫, ৪৪, ৩৫, ০০০	"
য়েল্	৪. ৩৯, ৯৫, ০০০	"
টেক্সাস্	৩, ০০, ০০, ০০০	"
কর্ণেল	২, ৮৭, ৫৫, ০০০	"
কোলাম্বিয়া	২, ৭০, ৮৫, ০০০	"
কার্নেগী শিল্পশিক্ষালয়, পিট্স্বর্গ	২, ১০, ০০, ০০০	"
পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া	১, ৯৯, ৬৫, ০০০	"

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বার্ষিক আয় নিম্নলিখিতরূপ—

হার্ভার্ড	৭৬, ৯৫, ০০০	টাকা
কর্ণেল	৭৪, ৫৫, ০০০	"
মিনেসোটা	৭০, ৬৫, ০০০	"
উইস্‌কন্সিন্	৬৪, ৬৫, ০০০	"
পেন্সিলভেনিয়া	৫৭, ১৫, ০০০	"
কোলাম্বিয়া	৫২, ৬৫, ০০০	"
শিকগো	৫২, ২০, ০০০	"
য়েল	৪৯, ৬৫, ০০০	"
মিশিগান	৪৫, ৪৫, ০০০	"
ষ্টানভোর্ড	৪২, ০০ ০০০	"

জীবনরস

ঋষি বলিয়াছেন, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি—আনন্দ হইতেই ভূত-সকল জন্মগ্রহণ করে, আনন্দেই জীবন ধারণ করে এবং পরিণামে আনন্দের মধ্যেই প্রবেশলাভ করে।

এই মধ্যরজনীর নিবিড় বিরাম ও শান্তির মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া আমি এই ঋষিমন্ত্রের গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। মনে পড়িতেছে কবি সতীশচন্দ্রের দুইটি ছত্র :—

> সত্য কোথা নাহি জানি, নাহি জানি সত্য কারে কই,
> মনে হয় এ আঁধার একেবারে নহে রস বই !

আমার মনে হইতেছে যে, ঈশ্বরকে যখন আমরা সত্য বলি, তখন তাঁহার পূজা হয় না, যখন রস বলি, আনন্দ বলি তখনই পূজা হয়। সত্য আর সতি অর্থাৎ আছে বোধ হয় একই কথা—সত্য বলিলে একটা 'আছে' মাত্রকে স্বীকার করা হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র এক নিয়ম ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টায় আজ বৈজ্ঞানিক মানুষ ব্যস্ত। সে বস্তুমাত্রের উপদানত্ব খুঁজিতে গিয়া দেখে যে তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল উপাদান কিছুই নাই, বস্তু এক কম্পিত তরঙ্গিত অবস্থা মাত্র। সে জড়ে জীবে যে-সকল ব্যবধান ছিল তাহা দূর করিয়া সর্ব্বত্রই প্রাণের নর্ত্তন অনুভব করিতেছে—দেখিতেছে যে এক পরিণামের সূত্রে জড় হইতে উন্নততম জীব পর্য্যন্ত বাঁধা। এম্‌নি করিয়া বিশ্বের আদি ও অন্ত এক অখণ্ড নিয়মে বিধৃত, ইহাই সে উপলব্ধি করিতেছে। বিশ্বে যেমন, তেমনি মানুষের ইতিহাসে, মানুষের সমাজে, মানুষের মনে এক পরিণামই আপনাকে নানার মধ্য দিয়া পরিণত করিয়া তুলিতেছে, ইহাই সে দেখিতে পাইতেছে। সর্ব্বত্র সেই এক, সেই অদ্বৈত, সেই সর্ব্বময় এক আছেন—কিন্তু এই এক 'আছেন' মাত্র এই ধারণায় বুদ্ধি যতই সায় দিক, এই বোধে জীবন কাল যে জায়গায় ছিল, আজও সেই জায়গায় থাকিয়া যায় এবং আগামী কল্য যে তাহার কোন নড়চড় ঘটিবে এমন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। বৈজ্ঞানিকের সত্যের নব নব রূপ আবিষ্কারের আনন্দ ইহাতে নাই—ইহা কেবলমাত্র একটা বিশ্বজোড়া স্বীকার মাত্র। হাঁ, আছেন—এক আছেন। তাঁহারই মধ্যে অণুপরমাণুর নৃত্যকল্লোল; তাঁহারই মধ্যে গ্রহচন্দ্রের অশ্রান্ত ঘূর্ণি। তাঁহারই মধ্যে সকল বিকাশ উদ্ভিন্ন হইতেছে, জীবনের রূপরূপান্তর দেখা দিতেছে। তিনি এক, সকল কাল ও দেশকে পূর্ণ করিয়া, সকল সীমা ও অসীমতাকে পূর্ণ করিয়া অতিক্রম করিয়া পরম এক, চরম সত্য।

আজ রাত্রে আমি ভাবিতেছি, যে, এসব কথা তো অনেক দিন শুনিয়া আসিতেছি, আলোচনা করিতেছি, কিন্তু জীবনে বেদনার মুহূর্ত্তে, সমস্যার অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া বেড়াইবার সময় এসকল কথা অন্ধকার রাত্রে সমুদ্রের ফেনার মত জ্বলিয়া উঠে এবং নিভিয়া যায় কেন? কোন স্থির আশ্রয় এ-সকল কথায় মিলে না কেন?

তাহার কারণ এখন আমার স্পষ্টই মনে হইতেছে—এ যে তত্ত্ব, এ তো রস নয়। এ চিন্তা, শুষ্ক চিন্তা মাত্র, গোটা-কতক বাক্যের পিঞ্জরের মধ্যে এই চিন্তাটিকে রুদ্ধ করিয়া বরাবর ইহার এই এক বুলি শোনা-ই আমার অভ্যাস হইয়াছে। শুধু আমার অভ্যাস নয়—সমস্ত মানুষের এ-ই অভ্যাস। তাহার গির্জ্জায়, মন্দিরে, মঠে, সর্ব্বত্রই এই খাঁচার পাখীর বাঁধা গান; তাহার শাস্ত্রগুলি এই বুলিরই পুঞ্জমাত্র। কিন্তু বুলি যেমনই কায়েম হোক্, জীবন জিনিসটা একেবারে আর এক রকমের। সে ঐ খোলা আকাশের পাখীর মত আজ এই বনে গান ধরিয়াছে বটে, কিন্তু বসন্ত গেলেই তাহার পাখা চঞ্চল হইয়া তাহাকে আর এক দেশে যাত্রা করাইবে এবং হয়ত যোজন যোজন ব্যাপী সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেও তাহার লেশমাত্র ডর হইবে না। বাঁধা বিশ্বাস বাঁধা খাঁচার মত বা বড় জোর বাঁধা নীড়ের মত তাহার চিরদিনের ঠাঁই নয়, তাহার ঘুরিয়া বেড়ানো চাইই চাই। কারণ তাহার নূতনত্ব চাই, রস চাই।

জীবনের সঙ্গে তত্ত্বের এই অসামঞ্জস্য আছে বলিয়াই ভক্তদের বাণীতে আমরা বাঁধা বিশ্বাসের কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না। ভক্ত হয়ত মুখে অদ্বৈতবাদী, কিন্তু

তাঁহার বাণীতে তিনি স্বীকৃত তত্ত্বকে ক্রমাগতই উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছেন। যীশুখৃষ্ট বল, কবীর বল, নানক বল, উপনিষদের ঋষিগণ বল—সকলেই পৃথিবীর সকল তত্ত্বের জালকে ছিন্ন করিয়া তত্ত্বান্বেষী ব্যাধগণের ধরিবার প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাদের বাণীর পরিমাপকার্য্য আজও শেষ হইল না—কালে কালে তাহার নব নব ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইল।

আমার একটা উপমা মনে পড়িতেছে। নাটক দেখিতে যাইবার সময়ে নাট্যারম্ভের পূর্ব্বে একটা যবনিকা পড়িয়া থাকে—অনেক সময় তাহাতে নাট্যটির মূলঘটনা বা দৃশ্যটি অঙ্কিত থাকে। সকল যবনিকায় থাকে না, কোন কোন যবনিকায় থাকে। ধর্ম্মতত্ত্ব সেই যবনিকায়-অঙ্কিত নাট্যবস্তুর মূল দৃশ্যটি বা ঘটনাটি। কিন্তু জীবননাট্য অঙ্কে অঙ্কে যখন নব নব দৃশ্যপট উন্মোচিত করিতে থাকিবে, তখন সেই যবনিকার ছবির কথা কি কাহারও মনে পড়িবে? প্রত্যেক অঙ্কেই তখন নূতন রস নূতন বিস্ময়।

যে কবি এই রাত্রির অন্ধকারের যবনিকা অপসারিত করিয়া তাহার মর্ম্মস্থিত সুধাভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে পারে, সেই বলিতে পারে সত্য কোথায় জানি না, মনে হয় এ আঁধার রস ভিন্ন আর কিছুই নয়। সে এই অন্ধকারের অঙ্কে অঙ্কে নব নব রসদৃশ্যপট অপাবৃত হইতে দেখে। সে শুধু বলে না যে এই অন্ধকার একটা পরিপূর্ণ শুন্যতা বা শান্তি বা আর কিছু।

হে আমার চিরচঞ্চল জীবন, তোমাকে আমি যে-কোন বাঁধনে বাঁধিনা, যে-কোন অভ্যস্ত সত্যের মধ্যে বা আদর্শের মধ্যে চিরকাল খোটায় বাঁধা নৌকার মত ধরিয়া রাখিতে চাই না, তুমি নদীর জলের তরঙ্গের মত ক্রমাগত আপনার সমস্ত পূর্ব্ব ইতিহাসকে নিঃশেষে মুছিয়া আপনার বর্ত্তমানকে ক্রমাগতই একটি ক্ষণ-দোলাইয়া দিয়া কোথায় চলিয়াছ, [illegible]নার দেশে, তাহার আমি কি জানি! তোমার পাশেই যেসব লোক [illegible]রাও ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গমঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন স্রোতের পাকে অসম তরঙ্গ-সকল উৎপন্ন করিয়া অস্ফুট কলধ্বনিতে বহিয়া চলিতেছে—তাহারা তোমাকে কতটুকু জানে, তুমিই বা তাহাদের কতটুকু জান! না, এই বড় আশ্বাস যে কিছুই তোমার কাছে চিরদিনের মত স্থির নয়। সত্য তোমার যাহা জানা আছে তাহা জানা মাত্র আছে এই জীবনের স্রোতের টানে সে জানার খুঁটিখোঁটা কোথায় ভাসাইয়া লইয়া চলিল!

কে বলিল এই জগতের সমস্ত ব্যাপারই অর্থযুক্ত! নাটকের মধ্যে সবই কি মিলনান্ত নাটক, বিয়োগান্ত নাটক কি নাই? শেক্সপীয়রের হ্যাম্লেট কি সত্য নাটক নয়? হ্যাম্লেট আপনার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইয়া ওফেলিয়াকে বিবাহ করিয়া সকল সমস্যার সমাধান করিয়া গুছাইয়া বসিতে পারিত না কি? কে তাহাকে সিন্ধুশকুনের মত সংশয়-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় উড়াইয়া উড়াইয়া কোথাও বিশ্রাম দিল না—গর্জ্জিত জীবনসমুদ্রের অন্ধ তরঙ্গের উপর কম্পমান সন্ধ্যার আলো-ছায়ার মত অস্থির করিয়া মারিল? আমাদের ইচ্ছা ও চেষ্টাই কি পর্য্যাপ্ত—যাহা ভবিতব্য তাহা কি আমাদিগকে কিছুমাত্র রেয়াৎ করে? অবশ্য আমরা বলি 'যে-নদী মরুপথে হারাল ধারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা'—আমরা অনন্তলোকের মধ্যে সকল অশান্তি, সকল বিপ্লব, সকল অকৃতার্থতার একটা স্থিরনিশ্চিত শান্ত পরিণাম ও সফলতা কল্পনা করিয়া থাকি, কিন্তু সে আমাদের এক রকম মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা মাত্র। ইতিমধ্যে জীবনের ক্ষেত্রে নয় হয় এবং হয় নয় হইয়া চলিয়াছে। বড় বড় ঝড়ে তিনশত বৎসরের বনস্পতি উন্মূলিত হইয়া যাইতেছে—অনন্তকালের মধ্যে তাহার বনস্পতিজন্ম আবার কবে সার্থক হইবে সেই সান্ত্বনা তাহার কোন কাজেই লাগিতেছে না।

কিন্তু তবে আনন্দটা কোথায়? রসটা কোথায়? তত্ত্বে যদি জীবন বাঁধা পড়ে, তবে ছাড়া পায় কিসে, ভরসা পায় কিসে? না, জীবনের এই নিয়ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে, তাহার এই নাট্যলীলার মধ্যেই রস। ঈশ্বরকে সত্য বলিয়া যখন ভাবি, তখন ভাবি মাত্র, তখন এই অনির্ব্বচনীয় রস পাই না। কিন্তু তাঁহাকে জীবনের জীবন বলিয়া

যখন অনুভব করি—যখন জানি যে এই নাট্যের প্লটটা ইঁহারই মধ্যে, তখনই জীবনের সকল দুঃখ-সংগ্রামের মধ্যেও আনন্দ। তখন, 'সত্য কোথা নাহি জানি, নাহি জানি সত্য কারে কই!'

চারদিকের স্রোত এক জায়গায় মিলিয়া এক ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি করিয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবন ক্লান্ত, অবসন্ন—সে বলে, আর পারি না! কিন্তু যদি জানি যে জীবনের ভিতরে যে জীবন, তিনি ঘুরাইয়া মারিলেও প্রবাহিত করিয়া দিবেনই দিবেন, তবে এই ঘুরিতেও, কত মজা! ঈশ্বর, তুমি এই সঙ্কট হইতে আমায় রক্ষা কর! না, কদাচ এ প্রার্থনা নয়। এ সঙ্কট তোমারই সৃষ্টি, এ সঙ্কটকে দূরও তুমিই আমার মধ্য দিয়া আপন শক্তিতে করিবে, ইহা আমি জানি।

কিন্তু ইহাও আমি কেবলমাত্র জানার কথা বলিতেছি—ইহাও রস নহে। রস প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না হইলে জন্মে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রেম হয়, একথা জানিয়া রাখিলে কি হয়? কিন্তু যখন সত্যই দুটি চোখ দুটি চোখের জন্য তৃষিত হয়, এক হৃদয় অন্যের জন্য বাজিতে থাকে, তখনই প্রেমের রস অনুভব করা হয়। ঈশ্বরকে জীবনে উপলব্ধি,—তাঁহাকে জীবন বলিয়া উপলব্ধি করিলেই রস। কিন্তু এ যে বড় সর্ব্বনেশে কথা! তাঁহাকে আমার জীবন বলিলে জীবনের যত গ্লানি, যত অন্যায়, যত পাপ, সমস্তই তো বুঝায়—সে সমস্ত কি ঈশ্বরের? আমি বলি হাঁ—সে সমস্তই ঈশ্বরের। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত তাঁহার সত্তা বা সত্য হইলেও আমার জীবনে তিনি অশুদ্ধি, তিনি নির্বুদ্ধি ও তিনি বন্ধন। কিন্তু তিনি যদি ইহাই হইতেন, তবে কে তাঁহাকে মানিত? তিনি নদীর জলের মত ক্রমাগতই এই নামরূপকে বদল করিয়া নিজেকে সকল রূপের অতীত করিয়াছেন। জীবনকে তিনিই বাঁধেন, আবার তিনিই তাহার বন্ধন মোচন করেন। এই যে তিনি রস এ আর বাক্যের রস নহে, একেবারে জীবনের মজ্জাগত রস।

আমরা অনেক সময় ভাবি জীবনকে কোন একটা সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শের গণ্ডীর মধ্যে বা কর্ম্মের পরিবেষ্টনের মধ্যে বরাবর একটানাভাবে যাপন করিলেই বুঝি তাহাকে সফল করিয়া তোলা যায়। কিন্তু গর্ভাবরণ হইতে মুক্তিলাভ যেমন জন্ম, সেইরূপ সকল প্রকারের অভ্যস্ত আবরণকে বিদীর্ণ করিয়া নূতন নূতনের পথে বাহির হইয়া পড়াই জীবন। জীবনেও তাই সত্য হইব এই কামনাটাই সকলের চেয়ে বড় কামনা নয়—রসলাভ করিব, আনন্দলাভ করিব এই কামনাটাই সবার বাড়া কামনা। জল যেমন বাঁধা পড়িলেই বিকৃত হয়, রসও তেমনি দ্রুতগতি হইলেই, বিশেষ কোন একটি আধারের মধ্যে নিবদ্ধ হইলেই বিকারপ্রাপ্ত হইয়া পচিয়া উঠে। এইজন্য জীবনের ধর্ম্মই পরিবর্ত্তন, সে ক্রমাগত মরিয়া মরিয়া নব নব রূপে আপনাকে প্রকাশমান করিয়া চলিয়াছে। মানুষ সেই পরিবর্ত্তনকে জড়তাবশতঃ ভয় করে এবং বাধা দিবার চেষ্টা করে। সে সব বসাইয়া রাখিতে চায়, গুছাইয়া জমা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়। ইতিহাসে বারম্বার তাহার এই চেষ্টার নিদর্শন দেখা গিয়াছে এবং বড় বড় চিন্তাশক্তি যে কেমন করিয়া বন্যার মত বেগে তাহার সমস্ত কৃতকীর্ত্তি, সমস্ত সঞ্চিত আয়োজনকে বিধ্বস্ত করিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছে তাহাও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কর্ম্ম যখন বৈদিকযুগে অত্যন্ত জটিল ও ধ্রুব হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছিল, তখনই তাহার প্রতিক্রিয়া এমন অভাবনীয় জায়গা হইতে আসিল যাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। নৈপালের প্রান্তসীমায় এক ক্ষুদ্ররাজ্যের রাজকুমার যে এই বাহ্যআচারপরায়ণ ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া তাহাকে বিলুপ্ত করিয়া দিবেন একথা কে চিন্তা করিয়াছিল? পৌরাণিক যুগে যখন অনার্য্য দেবদেবীর পূজাপদ্ধতির দ্বারা আমাদের সমাজ অভিভূত হইয়া গিয়াছিল, তখন যে দাক্ষিণাত্যে এক মহাপণ্ডিত বিশুদ্ধ বেদান্তধর্ম্মের ধারা স্রোতরোধকারী তৃণশৈবালদামকে ভাসাইয়া প্রবাহিত করিয়া দিবেন তাহা কে ভাবিয়াছিল? কে স্বপ্নে জানিত কোথায় আরবের মরুভূমিতে বিচ্ছিন্ন দস্যুদলের মধ্যে এক নিরাকার আল্লার পূজা জাগিয়া উঠিবে, এবং পারস্যে তাহাই আসিয়া সুফী ভক্তিধর্ম্মে পরিণত হইয়া অবশেষে এই ভারতবর্ষে একদিন ঝড়ের বিজয় নিশান উড্ডীন করিয়া দিয়া সকল মন্দিরের কল্পিত দেবমূর্ত্তিগুলিকে

ভাঙিয়া চুরিয়া এখানকার লোকের চিত্তসমুদ্র মথিত করিয়া পুনরায় নব নব ধর্ম্মের সুধাপাত্র উদ্ধার করিবে? নানক, কবীর, দাদূ প্রভৃতির মধ্যে হিন্দুমুসলমানের মিলনসঙ্গীত যে সপ্তমে বাজিয়া উঠিবে, একথা কি সেই-দিনকার ভারতবর্ষের কোন মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ কল্পনামাত্র করিয়াছিল? ইতিহাসের বিরাট মানুষের জীবনে যে তরঙ্গলীলা, যে উত্থানপতন, আমাদের ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্রজীবনে সেই একই লীলা। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ বড়, দৃশ্য বিরাট ও বিচিত্র—আমাদের রঙ্গমঞ্চ ক্ষুদ্র, দৃশ্য স্বল্প ও সংকীর্ণ—ইহা ভিন্ন আর কোন প্রভেদ নাই।

ইতিহাসের সেই বিরাটজীবনের মধ্যে যদি কোন অখণ্ড রস থাকে, যদি তাহা স্বপ্নের মত বিচ্ছিন্ন না হয়, তবে আমাদের জীবনের মধ্যেও অখণ্ড রস থাকিতেই হইবে। সেই অখণ্ড রসটিই ঈশ্বর। না—তিনি কেবল কল্পনা নন্, তিনি তত্ত্বকথা নন্, তিনি প্রত্যক্ষ, সুস্পষ্ট, আনন্দের সর্ব্বজয়ী প্রবাহ। তিনিই জীবন। আমরা নিজেকে নিজেদের জীবনের মালেক মনে করি বলিয়া ভুল করি, আমরা যে জীবনকে বাঁধি—বাঁধা কথায়, বিশ্বাসে, অনুষ্ঠানে, সমাজে, শিক্ষায়। তিনি মুক্তি দেন, তিনি প্রলয় আনেন,—পিণাক বাজে, যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়, শ্মশানের ভস্মবিভূতি সমস্ত কৃতকীর্ত্তিকে ছায়ার মত অন্ধকারময় করিয়া দেয়।

তাঁহাকে সত্য বলিতে যদি আপত্তিই থাকে, তবে তাঁহাকে আনিবার প্রয়োজন কি? সত্য বলিতে তো আপত্তি নাই কিন্তু সত্যকে জানিনা বলিয়াই তাহাকে বাঁধা কথা বলিয়া ঠেলিতেছি। জগৎকে যখন সত্য বলি, তখন মনে করি বুঝি আমাকে বাদ দিয়া আর একটা কোন পদার্থকে আমি বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া তাহার ভিতরকার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতেছি। কিন্তু আমার জগৎ একেবারেই অব্যবহিত ভাবে আমার জগৎ, অন্য জীব দূরে থাকুক, তাহা অন্য কোন মানুষেরও জগৎ নহে। এ আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনে-অনুভব-করা আমার সৃষ্ট জগৎ—বাস্তবিক জগৎ আছে কি নাই তাহা আমি জানি না, জানিতে পারি না। বলিতে পারি এ কথা বলিলে অন্য মানুষ বা জীবের সম্বন্ধে কোন তথ্য জানা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। কিন্তু আমরা কি বাস্তবিক নিজের ছাড়া আর কারো কোন খবর জানি? অন্যকে যখন জানি, তখন নিজকেই আর এক রকম করিয়া জানি। অন্য মানে নিজেরই রূপান্তর। আমার মধ্যে যে অসংখ্য রূপ আছে—জগৎকে যে আমি আমার ইন্দ্রিয় মন দ্বারা সৃষ্টি করিতেছি। এই জন্য যে মানুষ জড় নয়, যে বাঁধা অভ্যাসের নিগড়ে অন্যের মুখের বাক্য আওড়ায় না, যে সত্য সত্যই সৃজন করিবার শক্তি রাখে, তাহার সৃষ্টি একেবারেই তাহার সৃষ্টি হয়। শেক্‌স্‌পীয়রের সৃষ্টির সঙ্গে মহাভারতকারের সৃষ্টি মিলিবে না—কোন কবির সঙ্গেই কোন কবির তুলনা চলে না। হয়ত দুইজন কবি একই কথা বলিতেছেন, তথাপি এমনি একটু বিশেষ রং বিশেষ ধরণ বিশেষ স্বাদের তফাৎ আছে যাহাতে কখনই একজনকে আর-এক জনের সঙ্গে ঘোলাইয়া দেওয়া যায়না। বিশ্লেষণ করিয়া সেই পার্থক্য দেখানোও যায় না, কারণ তাহা জৈব পার্থক্য।

ঈশ্বরকে বাঁধা ধ্রুব সত্য না বলিয়া জীবন বলি এই জন্য যে তাহা নহিলে জীবনের রস কোথায় তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, জীবন বিকাশের পথে ধাবিত না হইয়া অভ্যাসের চাকার মত আপনার চারিদিকে আপনি ঘুরিতে থাকে। ঈশ্বর আমার জীবন, তাই তিনি বিশ্বের জীবন—কারণ আমার জীবনের সঙ্গে বিশ্বের জীবনের কোথাও কোন বিচ্ছেদ নাই। বিশ্ব নিয়ত সৃজ্যমান, তাহা আমার ভিতরকার অশান্ত সৃষ্টির ভিতর হইতেই দেখি। বৈদিক ঋষিরা যে প্রাণকে সমস্ত জীবন-মৃত্যু-সুখ-দুঃখের মধ্যে বিরাট করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এইজন্য বুঝিতে পারি। তাঁহারা ঈশ্বরকে সত্য ও অনন্ত যে বলিয়াছেন তাহা কোন বাঁধা অর্থে নহে। সে সত্য প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সত্য, সে অনন্ত প্রত্যেকটি অন্তের অনন্ত। নহিলে এমন স্ববিরোধী কথা তাঁহারা বলিতেন না, যে, তিনি চালান অথচ চলেন না। চলা বলিলে পাছে একটানা একঘেয়ে চলা বুঝায়, এইজন্য চলাকে অচল চলা বলা হইয়াছে। কিন্তু চলাটাই জীবন, চলাতেই আনন্দ।

ঈশ্বরকে জীবনের মধ্যে জীবন বলিয়া অনুভব করিবার প্রয়োজন আরও এক জায়গায় আছে। আমাদের 'আপনি' জিনিসটা বাঁধে, সে একটা 'আবর্ত্তের, মধ্যে সমস্তকেই ঘুরাইয়া মারিবার চেষ্টায় আছে। জীবনে যখন আর কেউ নাই, আমি আপনি একা আছি, তখন সে-জীবনের ভার বড় ভয়ানক দুঃসহ ভার। কিন্তু যেম্নি দেখি আর একজন প্রেমে আমাদের সেই 'আপনি'টিকে কাড়িয়া লইয়াছে, অম্নি আবর্ত্তন থামিয়া যায়, স্রোত আবার জগতের অভিমুখে কলধ্বনি জাগাইয়া চলিতে থাকে। মানুষের ভিতর দিয়া এই দিব্যপ্রেম সব সময়ে জীবনকে ছাড়া দেয় না, তেমন প্রেম বিরল। লাখে না মিলল এক। কিন্তু যদি দেখি যে আমার পাশাপাশি আর-একজন আমার জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তের সঙ্গের সঙ্গী হইয়া চলিয়াছেন—তাঁহার সঙ্গে আমার জীবনের বিচ্ছেদ আর কোথাও নাই, কেবল ঐ 'আমি'-বোধটাই একমাত্র বিচ্ছেদ—তখন জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা কি আশ্চর্য্য রহস্যময়—প্রত্যেকটি পরিবর্ত্তন কি অসীম বিস্ময়ের নিদান!

যাঁহাদিগকে আধুনিক জগৎ 'mystic' নাম দিয়াছে, তাঁহারা আমাদের সত্তাকে এই দ্বিবিভক্ত করিয়া দেখিতে পাইয়াছেন এবং ঈশ্বরকে সমস্ত জীবনের পতিরূপে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে অনুভব করিয়াছেন। এই যে অতীন্দ্রিয় চেতনা, সত্তার অন্তর্নিহিত সত্তার বোধ, ইহাকে অত্যন্ত অবিশ্বাসী ব্যক্তিও কোন-না-কোন সময়ে উপলব্ধি করিয়াছে। সকলেই জানেন যে উইলিয়ম্ জেম্স বিশ্ব-সত্তাকে অসংখ্য বলিয়াই মনে করিতেন, তিনি এককে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। অথচ তিনি এক ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এইরূপ লিখিয়াছেন ; It is very vague and impossible to describe or put into words. In this it is somewhat like another experience that I have constantly—a tune that is always singing in the back of my mind but which I can never identify nor whistle nor get rid of. Something like that is my feeling for God or a Beyond. Specially at times of moral crisis it comes to me as the sense of an unknown something backing me up. It is most indefinite, to be sure, and rather faint. And yet I know that if it should cease there, would be a great hush, a great void in my life. অর্থাৎ—ইহা এত অস্পষ্ট যে বর্ণনা করিয়া বলা অসম্ভব, ব্যক্ত করা অসম্ভব। ইহা কতকটা আমার আর একটি অভিজ্ঞতার মত—যেন আমার মনের পিছনে একটা সুর বাজিতেছে অথচ সেটা কি তা আমি জানি না, আমার কণ্ঠে তাহাকে আনিতে পারি না, তাহাকে মন হইতে দূর করিতেও পারি না। ঈশ্বর কিম্বা আমাদের অতীত কোন সত্তা সম্বন্ধে আমার ঐ রকমের অনুভব হয়। বিশেষত যখন কোন নৈতিক আলোড়ন চলিতে থাকে, সে সময়ে যেন অজানা কোন সত্তা আমাকে পিছন হইতে নির্ভর দান করিতেছে এমন একটা বোধ মনে জাগে। ইহা অত্যন্ত ভাসাভাসা, ক্ষীণ বোধ, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা যদি একেবারে থামিয়া যাইত, তবে আমার জীবনে যে বড় একটি শূন্যতা, বড় একটি নীরবতা আসিত তাহা আমি বিলক্ষণ জানি।

তারপরেই তিনি লিখিতেছেন "বুদ্ধির কাজ যদি বিশ্লেষণ করা বল, তবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার মত কোন বস্তু তো তাহার চাই—সে বস্তুকে বুদ্ধি সৃষ্টি করে না, তাহা বুদ্ধির অনধিগম্য গভীরতর নিবিড়তর আনির্ব্বচনীয় এক বোধ। ধর্ম্মজগতে যাঁহারা এই বোধকে লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বলেন যে ইহা কোন কোন শুভ মুহূর্ত্তে বুদ্ধিকে পরাস্ত করিয়া স্বত-উচ্ছ্বসিত ভাবে আসিয়াছে। তাঁহারাই ইহার সাক্ষী। আমরা যেমন বৈজ্ঞানিকদের মুখের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্যকে সত্য বলি, তাঁহাদের সেই সাক্ষ্য অবলম্বন করিয়া অধিকাংশ লোক সেইরূপ এই বোধের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয় না।"

জেম্স্ এই লেখায় যাহাকে বুদ্ধি ও অধ্যাত্মবোধ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, আমি তাহাকেই বলিতেছি জীবনের দ্বিবিভক্ত রূপ—আমার জীবন এবং ঈশ্বরের জীবন। আমি ঈশ্বরকে ভক্তি করিবার জন্য কোন বিশেষ অবতারবাদ বা গুরুবাদ আশ্রয়ের কোন সার্থকতা দেখি না। খৃষ্টান ও বৈষ্ণব প্রভৃতি ভক্তিধর্ম্মে তাহাই করিয়াছে। তিনি খৃষ্ট, কি কৃষ্ণ, তাহা ভাবিবার কোন আবশ্যকতা আমার নাই। আমার জীবনের ভিতরেই

তাঁহার মূর্ত্তিমান্ জীবন আমি দেখিতে পাইতেছি। আমার জীবনের প্রত্যেক অংশে অংশে বিশ্বের রূপরসের আনন্দ উপলব্ধিতে, স্নেহপ্রেমকল্যাণের সকল রসে, দুঃখে বিপদে, পাপে মলিনতায়, সংশয়ের অন্ধকারে দুর্য্যোগের ঝটিকায় —নিশ্বাসে প্রশ্বাসে—সেই দ্বিতীয় জীবন, সেই চিরস্পন্দ্যমান জীবন লীলায়িত। তাঁহার স্বরূপ কি আমি জানিনা— সত্য বলি, এক বলি—যাহাই বলি—সে সব কথার কথা। তাঁহার স্বরূপ আমার কাছে নিত্য নূতন এবং আনন্দময়।

যে বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন যে তিনি অনন্ত আকাশের অসংখ্য গ্রহ তারকা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন কিন্তু কোথাও ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলেন না, তিনি সত্য কথা বলিয়াছিলেন। ঐ অন্ধকার কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতির্ম্ময় আলোকছটার নীচে কত রাত্রে ব্যথিত হৃদয়ে করজোড়ে দাঁড়াইয়াছি, কিন্তু ব্যথাকে মুছিয়া দেয় কে? ওখানে যে-শক্তির খেলা, সেই শক্তি কি আমার কেহ? তিনি অনন্ত শক্তিমান্ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে ভগবান্, তিনি যে বন্ধু এ আশ্বাস তাঁহার অনন্ত শক্তি দেয় না, এ আশ্বাস একমাত্র দেয় জীবন—সে যখন তাহার মধ্যে তাঁহার মাধুর্য্যরস আস্বাদন করে, তখন সমস্ত জগৎখানি একটি সুন্দর ফ্রেমের মত তাহার ছবিটিকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়—তখন সমস্তই তাহার, সমস্তই তাহার সৃষ্টি। তখন জ্যোতি বলে আমি তোমারই জ্যোতি, অন্ধকার বলে আমি তোমারই স্নিগ্ধতা, আকাশ বলে আমি তোমারই অসীমতা—তুমিই আমাদিগকে এমন করিয়া সৃষ্টি করিয়া তোমার জীবনের সঙ্গে মিলিত করিয়া লইয়াছ। তোমার এই সমস্ত জীবন চিরচঞ্চল চিরপরিবর্ত্ত্যমান অথচ চিরানন্দময়। ইহা কখনই নির্ব্বিশেষে নয়, ইহা তোমার তোমার তোমার—ইহা একান্ত বিশেষ। এবং তোমার সেই একান্ত-বিশেষ তুমি তোমাতে ওতঃপ্রোত।

আজ এই রাত্রির গভীরতার মধ্যে আমি আমার সেই লোকলোকান্তরপরিপূর্ণ একমাত্র বিশেষকে আমার জীবনের সমস্ত দুঃখ-বেদনার অত্যন্ত মাঝখানে দেখিতে পাইতেছি। আমি তাঁহাকে বিশ্বাস না করিয়াও বিশ্বাস করি—ভক্তের মত তাঁহাকে জানি না, কিন্তু জানি যে আমার সমস্ত উদ্‌ভ্রান্ত বিশৃঙ্খল জীবনের মধ্যে তিনি হইতেছেন, নব নবরূপ সৃষ্টি করিতেছেন। আমার জীবনের দৃশ্য আমি, দর্শক তিনি; যন্ত্র আমি, যন্ত্রী তিনি; ঘটনা আমি, লেখক তিনি; নাট্য আমি, নট তিনি। তাঁহাকে জানি না এই আনন্দ, তাঁহাকে শেষ করি নাই এই আনন্দ। আমার জীবনের এই চলার পথে, ঘর বাড়ি সমাজ ইস্কুল গির্জ্জা সমস্তই এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইবে, পথ রোধ করিয়া তাহাকে তাহার চরমসার্থকতা হইতে বঞ্চিত করিবে না।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

জব্বলপুর ও গঢ়ামণ্ডলা

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে এ প্রদেশের প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায়। মৌর্য্যবংশের মহারাজ অশোকের অনুশাসন (একখানি শিলা-পট্টিকায় খোদিত) সীহোরা তহসীলে 'রূপনাথ' নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭২ অব্দে মহারাজ চণ্ডাশোক সিংহাসন আরোহণ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও অন্যান্য অমাত্যগণকে হত্যা করিয়া ইনি রাজা হন বলিয়া ইনি ইতিহাসে 'চণ্ডাশোক' বলিয়া পরিচিত। ইনি অতিশয় পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ২৬১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে কলিঙ্গ বিজয়ের সময় বহুসহস্র সৈন্য হতাহত দেখিয়া তাঁহার মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটে ও তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করেন। সেই হইতে তিনি 'ধর্ম্মাশোক' বলিয়া পরিচিত। ইঁহার আর একটি উপাধি "পিয়াদসি"; ইহা পালি শব্দ সংস্কৃত 'প্রিয়দর্শী' শব্দের অপভ্রংশ। বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে ইনি দেবতাদিগেরও প্রিয় ছিলেন। ইনি দেশ বিদেশে বৌদ্ধ প্রচারক প্রেরণ করেন ও অনুশাসন-খোদিত স্তম্ভ স্থাপন করেন। রূপনাথে ইঁহার যে অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এইরূপ লেখা আছে—"৩২ বৎসর হইতে আমি এই ধর্ম্মমত শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু পালন করিতে তৎপর ছিলাম না। বৎসরাধিক কাল হইতে আমি ভিক্ষুসম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছি ও যথোপযুক্তরূপে ধর্ম্মানুশাসন পালন করিতে চেষ্টা করিতেছি। আজ

পর্য্যন্ত জম্বুদ্বীপে যে-সকল দেবতা পূজিত হইতেন আজ তাঁহারা পরিত্যক্ত হইলেন। পুরুষার্থ দ্বারাই মহত্ব লাভ হয়। উচ্চ বংশে জন্ম দ্বারা নয়। একটী নিকৃষ্ট ব্যক্তিও পুরুষার্থ দ্বারা অত্যুচ্চ স্বর্গ লাভ করিতে সক্ষম হয়। নীচ ও মহৎ নির্ব্বিশেষে সকলেরই পুরুষার্থ প্রকাশ দ্বারা ধর্ম্মপথে থাকা প্রয়োজন। এই ধর্ম্ম চির-কাল থাকিবে, আর কিছুই নহে। এই নিমিত্তই এই অনু-শাসন শিলায় খোদিত ও প্রচারিত হইল।" বুদ্ধদেবের তিরোভাবের ২৫০ বৎসর পরে ইহা খোদিত হয়, সুতরাং ২৩২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ ইহার সময়।

মৌর্য্যবংশ ১৭৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে শেষ হয়। তখন পুষ্যমিত্র নামক একজন সেনাপতি সিংহাসন অধিকার করেন এবং শুঙ্গবংশ নামক রাজবংশ স্থাপন করেন। পাটলিপুত্রই রাজধানী থাকে, রাজ্যও নর্ম্মদা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইঁহারই সময় গ্রীক্‌রাজা মেনান্দার বা মিলিন্দ ভারত আক্রমণ করিয়া বিফলপ্রযত্ন হন। ১১২ বৎসর পর্য্যন্ত এই বংশ রাজ্য করিয়া ৭২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে অগৌরবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই বংশের দশম ও শেষ রাজা চরিত্র-হীনতায় ও অন্যান্য জঘন্য কার্য্যে জীবন নষ্ট করেন।

শুঙ্গরাজের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী যিনি শুঙ্গবংশ ধ্বংস করেন তিনি ও তাঁহার অধস্তন ৩ পুরুষ ৪৫ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে 'অন্ধ্র' বা 'শাতবাহন' বংশের রাজা কর্ত্তৃক শেষ রাজা নিহত হন। এই 'অন্ধ্র' বংশ দাক্ষিণাত্যে আসমুদ্র বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতেন। ২৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বংশ রাজত্ব করে। 'শুঙ্গ' ও 'অন্ধ্র' বংশ স্বীয় রাজত্বের কোন চিহ্নই রাখিয়া যায় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী অন্ধতমসাচ্ছন্ন। ৩০৮ খৃষ্টাব্দে আবার ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায়। ঐ সালে পাটলিপুত্রের রাজা 'দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত' নেপাল-রাজ-কন্যাকে বিবাহ করেন। এই রাজকন্যা বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রশংসিত, 'লিচ্ছবি' রাজপুত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই বিবাহের নিমিত্ত সেই রাজা যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও মৌর্য্য-বংশের সমকক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। ৩২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তিনি সিংহাসন আরোহণ করিয়া সেই দিন হইতে এক নূতন সালের প্রবর্ত্তন করেন। ৫।৬ বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র 'সমুদ্রগুপ্ত' সিংহাসন আরোহণ করিয়াই রাজ্য জয় করিতে আরম্ভ করেন। গঙ্গার উভয় তীরবর্ত্তী সকল রাজ্য ইনি অল্পকালেই স্বীয় অধিকার-

গৌড় রাজাদের হাতীশালা।
মদন মহল হইতে কিছু দূরে গঙ্গাসাগরের দক্ষিণ-তীরে।

ভুক্ত করেন। পরে 'দাক্ষিণাত্য' জয় করিতে প্রবৃত্ত হন। এই অধ্যবসায় অসাধারণ বলবীর্য্য ও কার্য্যকুশলতার পরিচায়ক। প্রথমেই তিনি 'মহানদী'-উপত্যকাস্থিত 'দক্ষিণ কোশল' আক্রমণ করিয়া উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ জয় করেন। এলাহাবাদের খোদিত-স্তম্ভে লেখা আছে যে তিনি বহু রাজাকে বন্দী করিয়া মুক্তি দান করেন। প্রায় সকল করদরাজ্যই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও ভয় করিত। এই শিলালিপিতে 'খর্পরিক' জাতি বিশেষ ভাবে উল্লিখিত আছে। স্মিথ সাহেব মনে করেন যে সিউনি ও মণ্ডলাবাসীরাই 'খর্পরিক' বলিয়া উল্লিখিত

অশোকের শিলালিপি।
জব্বলপুর হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে রূপনাথ নামক স্থানে।

হইয়াছে। কিন্তু দামোহ জেলায় একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে খর্পর সৈন্যের উল্লেখ আছে। সুতরাং 'খর্পরিক'গণ সম্ভবতঃ দামোহ ও জব্বলপুর জেলারই অধিবাসী ছিল।

জব্বলপুর সে সময়ে 'গুপ্ত'বংশের করদরাজ্য ছিল। 'পরিব্রাজক মহারাজ' উপাধিধারী রাজা এই দেশ শাসন করিতেন। এই বংশের রাজাদিগের খোদিত গুপ্ত-সম্বৎযুক্ত ৬ খানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি সম্ভবতঃ ৪৭৫ হইতে ৫২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খোদিত। 'বেতুল' জেলার ভূম্যধিকারীর নিকট যে শিলালিপিখানি ছিল, তাহা দ্বারা জানা যায় যে 'প্রস্তর বাটক' ও 'দ্বার-বাটিকা' নামক দুইটী গ্রাম 'ত্রিপুরিরাজ্যের' অন্তর্গত ছিল। এই গ্রামগুলি এখন 'মুরওয়াড়া তহশীলের' অন্ত-র্গত 'বিলহরির' নিকট অবস্থিত। ইহাদের আধুনিক নাম 'পটপরা' ও 'দ্বার'। জব্বলপুর সহর হইতে ৬ মাইল দূরে 'তেউর' নামক যে গ্রাম আছে তাহাই পূর্ব্বে 'কুল-সুরী' বংশের রাজধানী 'ত্রিপুরি' নামে পরিচিত ছিল। Jubbalpore District Gazeteerএ কুলসুরী বংশের বানান Kalchuri কলচুরী লেখা আছে। বাঙ্গালা গ্রন্থে কয়েকস্থলে 'কুলসুরী' দেখিয়া কুলসুরীই ব্যবহার করিলাম)।

'বিজরাঘোগড়ের' প্রান্তদেশে 'উচ্চকল্প মহারাজা" নামক এক বংশ জব্বলপুরের কিয়দংশ শাসন করিত। এই বংশ 'পরিব্রাজক মহারাজা'দিগের সমসাময়িক, ও কখন বন্ধুভাবে, কখনও বা শত্রুভাবে ব্যবহার করিত। 'পরিব্রাজক' ও 'উচ্চকল্প মহারাজ'গণ 'গুপ্তবংশের' প্রাধান্য স্বীকার করিতেন, কারণ তাঁহাদের শিলালিপিতে 'গুপ্ত-সম্বৎ' ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

'হুন'দিগের আক্রমণে 'গুপ্ত'বংশ হীনবীর্য্য হইয়া পড়ায় করদরাজগণ স্বাধীন হইয়া পড়েন, কেবল

নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করিতেন। 'সাগরে' প্রাপ্ত শিলালিপিতে জানা যায় যে হুনেরা এ জেলাও আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু ৫২৮ খৃষ্টাব্দে উহারা বিতাড়িত হয়। রাজা 'সংক্ষোভের' সময়কার ৫১৮ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি 'বেতুলে' পাওয়া যায়; তাহাতে প্রকাশ যে 'পরিব্রাজক মহারাজ'বংশ এদেশে রাজত্ব করিতেন ও 'ত্রিপুরি' এক প্রধান নগর ছিল। 'বিজরাঘোগড়ের' নিকট 'খোহ' নামক স্থানে ৫২৮ খৃষ্টাব্দের একখানি শিলালিপি পাওয়া যায়। কতকাল যে এ বংশ নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিয়াছিল তাহা ঠিক জানা যায় না। কিন্তু সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল ইহা অনুমান করা যায়। 'কুলস্বুরী'বংশ ঠিক কোন্ সময়ে এদেশে রাজত্ব স্থাপন করে তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। একাদশ শতাব্দীতে আরবী পরিব্রাজক 'আল্‌বেরুণী' জব্বলপুর-প্রান্তকে 'দাহাল' নামে উল্লেখ করেন। 'পরিব্রাজক মহারাজ'দিগের শিলালিপিতেও এদেশের নাম 'দাভাল' পাওয়া যায়। অনেকের মতে 'কুলস্বুরী'বংশ 'চেদী'বংশের একটী শাখা। 'চেদী'বংশ মহাভারতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। শিশুপাল এই 'চেদী'বংশের রাজা ছিলেন। 'কুলস্বুরী'-বংশ জব্বলপুরে আধিপত্য বিস্তার করে। ইহাদেরও একটা অব্দ প্রচলিত ছিল। এই অব্দ ৫ই সেপ্টেম্বর ২৪৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ডাক্তার ভগবানলাল ইন্দ্রজী বলেন যে 'পশ্চিমভারতে' খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই বংশ গুজরাত ও অন্যান্য প্রদেশে রাজত্ব করিত। ইহারা শকাব্দা ব্যবহার করিত। 'ঈশ্বরদত্ত' নামক 'আভীর' জাতীয় রাজা সমুদ্রপথে 'সিন্ধুদেশ' হইতে আসিয়া এ রাজ্য জয় করেন। 'নাসিক' গুহায় ইহার বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে। ইনি পশ্চিম সমুদ্রতীর জয় করিয়া 'ত্রিকুটে' রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার পূর্ব্বের রাজার রাজত্ব ১৭০ শকাব্দায় বা ২৪৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। 'ঈশ্বরদত্ত' তাহার পর হইতে নিজ নামে অব্দ প্রচার করেন। সুতরাং 'কুলস্বুরী' অব্দ ও ঈশ্বরদত্তের 'ত্রৈকুটক অব্দ' একই সময় স্থাপিত। ডাক্তার ভগবানলালের মতে 'ত্রৈকুটক' অব্দই পরে 'কুলস্বুরী' বা 'চেদী'অব্দ নামে পরিচিত হয়।

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের সহিত 'পরিব্রাজক মহারাজা'-দের ক্ষমতা হ্রাস হইতে থাকে ও 'কুলস্বুরী' এই রাজ্য গ্রাস করিতে থাকে। 'কুলস্বুরী'বংশের রাজধানী 'ত্রিত-শৌর্য্য' নামক কোনও স্থানে ছিল। ইহার বর্ত্তমান অবস্থান এখনও নির্ণীত হয় নাই। শিলালিপি আদির দ্বারা জানা যায় যে ৯০০ খৃষ্টাব্দে 'ত্রিপুরি' নগরে রাজধানী স্থাপিত হয়। কুলস্বুরীবংশ প্রায় ৩০০ শত বৎসর 'তেউরে' থাকিয়া 'জব্বলপুর' শাসন করেন। ৮৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে 'কুলস্বুরী'বংশের কোন ঐতিহাসিক তথ্য সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। এই বংশের ১৫টী রাজা ৮৭৫ হইতে ১১৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশে রাজত্ব করেন। কতকগুলি শিলালিপি হইতে যে ক্রমবংশাবলী সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

'কুলস্বুরী'বংশাবলী—

(১) কোকল্ল্য প্রথম—৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ (২) মুগ্ধতুঙ্গ, প্রসিদ্ধ ধবল, কোকল্ল্যের পুত্র ৯০০ খৃষ্টাব্দ (৩) বালাহর্ষ মুগ্ধতুঙ্গের পুত্র (৪) কেয়ুরবর্ষ, যুবরাজ দেব প্রথম, মুগ্ধতুঙ্গের পুত্র ও বালাহর্ষের ভ্রাতা ৯২৫ খৃষ্টাব্দ। (৫) লক্ষ্মণরাজ, কেয়ুরবর্ষের পুত্র ৯৫০ খৃষ্টাব্দ (৬) শঙ্কর গণদেব, লক্ষ্মণরাজের পুত্র ৯৭০ খৃষ্টাব্দ (৭) যুবরাজ দেব দ্বিতীয়, লক্ষ্মণরাজের পুত্র ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ (৮) কোকল্ল্যদেব দ্বিতীয়, ৭ম-এর পুত্র ১০০০ খৃষ্টাব্দ (৯) গাঙ্গেয় দেব বিক্রমাদিত্য, ৮ম-এর পুত্র ১০৩৮ খৃঃ (১০) কর্ণদেব, ৯ম-এর পুত্র ১০৪২ খৃষ্টাব্দ (১১) যশঃ-কর্ণদেব, ১০ম-এর পুত্র ১১২২ খ্রীষ্টাব্দ (১২) গয়াকর্ণ দেব, ১১শ-এর পুত্র ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দ (১৩) নরসিংহ দেব, ১২শ-এর পুত্র ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দ (১৪) জয়সিংহ দেব, ১২শ-এর পুত্র ১১৭৭ খৃঃ (১৫) বিজয়সিংহ দেব, ১৪শ-এর পুত্র ১১৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

প্রথম কোকল্ল্যের নাম সম্বলিত · খানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। দুখানিতে ৭৯৩ ও ৮৬৬ 'কুলস্বুরী' অব্দ অর্থাৎ ১০৪১ ও ১১১৪ খৃঃ খোদিত আছে। তৃতীয় খানিতে কোনও তারিখ নাই। এই শিলালিপিগুলি হইতে জানা যায় যে 'চন্দ্রবংশে' রাবণবিজয়ী 'কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন' জন্মগ্রহণ করেন। এখান হইতে

৬০ মাইল দূরে 'মণ্ডলা' নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহারই কুলে 'হৈহয়' রাজা জন্মগ্রহণ করেন। মহামতি 'কোকল্ল' এই রাজবংশকে অলঙ্কৃত করেন। (আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে 'চেদী', 'কুলস্মুরী' ও 'হৈহয়' একই বংশের নাম। অবশ্য শিলালিপিগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে)। এই রাজা কান্যকুব্জের রাজা ভোজকে, স্বীয় জামাতা দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকুটের অধিপতি দ্বিতীয় কৃষ্ণকে, চন্দেলরাজ হর্ষকে ও চিত্রকূটরাজ শঙ্করগণকে অভয়দান করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ ইহাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছিলেন)। রতনপুরের শিলালিপি অনুসারে মহারাজ কোকল্লের ১৮টী সন্তান ছিল। তন্মধ্যে একজন ত্রিপুরির রাজা হইয়াছিলেন। মহারাজ কোকল্ল 'চন্দেল'-রাজকন্যা 'নাট্যদেবী'কে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে 'মুগ্ধতুঙ্গ' জন্মগ্রহণ করেন, পরে 'প্রসিদ্ধধবল' উপাধি গ্রহণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনিই সম্ভবতঃ তেউরের প্রথম রাজা। ইনি পূর্ব্বদিকের সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত সকল দেশ জয় করেন ও 'কোশল'রাজের নিকট হইতে 'পালি' কাড়িয়া লয়েন। 'বালাহর্ষ' ও 'কেয়ুরবর্ষ' নামে ইহাঁর দুই পুত্র ছিল। একজনের পর আর একজন রাজ্য করেন। 'কেয়ুরবর্ষ' 'যুবরাজ দেব' উপাধি গ্রহণ করিয়া নানা দেশ জয় করেন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণরাজ 'পশ্চিম ভারত' জয় করিয়া সমুদ্রে স্নান ও গুজরাতে 'সোমেশ্বর' দেবের পূজা করেন। ইহাঁর কন্যাকে 'পশ্চিম চালুক্য'বংশের রাজা বিবাহ করেন। ইহাঁদের পুত্র প্রসিদ্ধ 'তৈলপ' 'চালুক্য'বংশ উজ্জ্বল করেন। লক্ষ্মণরাজের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র 'শঙ্করগণদেব' রাজা হন। তাঁহার পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'দ্বিতীয় যুবরাজ দেব' সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'উদয়পুর' প্রশস্তির অনুসারে মালবাধিপতি বাক্‌পতি-মুঞ্জ, যুবরাজদেবকে পরাজিত করিয়া ত্রিপুরি জয় করেন। চালুক্যরাজ তৈলপকেও ইনি ষোড়শবার পরাজিত করিয়া সপ্তদশবারে নিজেই পরাজিত ও নিহত হন। তৈলপও স্বীয় মাতুল যুবরাজদেবকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।

'দ্বিতীয় যুবরাজের' পর তাঁহার পুত্র 'দ্বিতীয় কোকল্ল দেব' ও কোকল্লদেবের পুত্র 'গাঙ্গেয়দেব' সিংহাসনে আরোহণ করেন। গাঙ্গেয়দেব অতি প্রসিদ্ধ ও পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। জব্বলপুরের তাম্রশাসনে পাওয়া যায় যে গাঙ্গেয়দেব 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'চন্দেল'দেশেও ইনি বিশ্ববিজয়ী বলিয়া বিখ্যাত। ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর পরাক্রম 'ত্রিহুত' পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল। ইনি স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা নিজের নামে প্রচলিত করেন। ১৫টী রাজার মধ্যে ইহাঁর মুদ্রাই পাওয়া গিয়াছে। ১০৩০ [illegible] ব্রাজক আল্‌বেরুণী গাঙ্গেয়দেবকে 'দাহনাধিপতি' বলিয়া উল্লেখ করেন। ১০৪০ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর রাজত্ব শেষ হয়। প্রয়াগের অক্ষয়বট তাঁহার প্রিয় বাসস্থান ছিল। সেইখানেই তিনি এক শত পত্নীর সহিত নির্ব্বাণলাভ করেন। গাঙ্গেয়দেবের পর কর্ণদেব রাজা হন। ইনি 'কর্ণাবতী' নগরী ('তেউরের' নিকট) স্থাপন করেন ও কাশীতে 'কর্ণমেরু' নামক মন্দির নির্ম্মাণ করান। ভেড়াঘাটের অহ্লনদেবীর শিলালিপিতে প্রকাশ যে কর্ণদেব, 'পাণ্ড্য', 'মুরল', 'গৌড়', 'কুঙ্গ', 'বঙ্গ', 'কলিঙ্গ', 'কির', ও 'হুন' জাতিকে দমন করিয়াছিলেন। 'করণবেলের' শিলালিপি অনুসারে তাঁহার অধীন 'চোড়', 'কুঙ্গ', 'হুন', 'গৌড়', 'গুর্জ্জর', ও 'কির' জাতি ছিল। 'কর্ণদেবের' তাম্রশাসনের প্রায় ৮১ বৎসর পরের তাঁহার পুত্রের একখানি শিলালিপি পাওয়া যায়। ইহাতে জানা যায় যে কর্ণদেব দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণদেব গুজরাতের রাজা 'ভীমের' সহিত যোগদান করিয়া 'মালবের' পণ্ডিত রাজা 'ভোজের' রাজ্য ধ্বংস করেন। 'নাগপুর' প্রশস্তি অনুসারে মালবরাজ 'উদয়াদিত্য' কর্ণদেবের হাত হইতে ১০৮০খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় রাজ্য উদ্ধার করেন। 'চন্দেল'রাজ 'কীর্ত্তিবর্ম্মণ'ও শ্রীর বরপুত্র কর্ণদেবকে পরাজিত করিয়া চন্দেলের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেন। এই সময়ই বোধহয় মুরওয়াড়া তহসীলের 'বিলহরী' চন্দেলরাজকে দেওয়া হয় ও অনুমান শতবৎসর ইহাদের হাতেই থাকে। এখানকার মন্দিরগুলি যদিও কুলস্মুরীগণের নির্ম্মিত,

(কারণ শিলালিপিতে তাহাই প্রকাশ পায়) তথাপি লোকেরা এই মন্দিরগুলি চন্দেলরাজের নির্ম্মিত বলিয়াই পরিচয় দেয়। ইহাতে চন্দেলবংশের প্রতিপত্তিই প্রমাণিত হয়। কর্ণদেব হুনরাজকন্যা 'অবল্লদেবীকে' বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র 'যশঃকর্ণদেব' ১১২২ খৃঃ একটী তাম্রশাসন প্রচার করেন। কনৌজরাজ গোবিন্দচন্দ্র-দেব ১১৭৭ বিক্রম সম্বতে বা ১১২০ খৃষ্টাব্দে একটী তাম্র-শাসনে কিছু ভূমি হস্তান্তরিত করিবার অনুমতি দেন। ইহাতে আরও প্রমাণ হয় যে কুলস্থরী রাজ্যের কিয়দংশ তাহা ঠিক জানা যায় না ছিল। নাগপুর প্রশস্তি অনু-সারে উদয়াদিত্যের পুত্র মালবরাজ লক্ষ্মণদেব ত্রিপুর বিধ্বস্ত করেন। 'যশঃকর্ণদেব' শিলালিপিতে গোদাবরী-তীর-বাসী অন্ধ্ররাজকে ধ্বংস করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভেড়াঘাটের অহ্লন দেবীর শিলালিপিতে প্রকাশ যে যশঃকর্ণদেব 'চম্পারণ্য' বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। এই 'চম্পারণ্য' যে কোথায় তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। কিন্তু বল্লভাচার্য্যের শিষ্যগণ রায়পুর জেলায় রাজীমের নিকট 'চম্পাঝাড়' নামক স্থানকেই চম্পারণ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। (কথিত আছে বল্লভাচার্য্য চম্পারণ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন)। যশঃকর্ণদেবের পুত্র 'গয়াকর্ণদেব' তাঁহার পর রাজা হন। ইনি মেবারের 'গুহিল'বংশের রাজা 'বিজয় সিংহের' কন্যা 'অহ্লন'দেবীকে বিবাহ করেন। ইহাঁদের দুই পুত্র হয় 'নরসিংহদেব' ও 'জয়সিংহদেব'। 'কুলস্থরী' অব্দের ৯০২ সালের অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ ১১৫১ সালের 'গয়া-কর্ণের' একখানি শিলালিপি পাওয়া যায়। গয়াকর্ণের স্ত্রী অহ্লন দেবীই ভেড়াঘাটের প্রসিদ্ধ 'গৌরীশঙ্কর' ও 'চৌষট্টি যোগিনীর' মন্দির প্রতিষ্ঠা করান। এই মন্দির প্রসিদ্ধ। যুদ্ধবিগ্রহের সময় ইহা কেল্লার কাজ করিত। মহারাষ্ট্রদের সহিত 'গোঁড়' রাজাদিগের যুদ্ধ এই মন্দিরের চারিপার্শ্বে বহুবার হইয়াছিল। এই মন্দিরে অহ্লন দেবীর একখানি শিলালিপি ছিল। তাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।

"নরসিংহদেবের জননী অহ্লনদেবী এই অদ্ভুত সুদৃঢ়-ভিত্তিসঙ্কুল শিবমন্দির ও তৎসংলগ্ন এক মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। জাউলী পরগণার উদী নামক সমগ্র গ্রাম দেবতার জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিল।" আরও এক-খানি শিলালিপি এখানে ছিল, সেখানি এখন আমেরিকায় আছে। জাউলী পরগণা এই জব্বলপুর জেলা। চৌষট্টি যোগিনীর মূর্ত্তিগুলি বোধ হয় কালাপাহাড় বা ঔরঙ্গ-জেব কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে। 'পিণ্ডারীদের' আক্রমণের সময়ও ইহা খণ্ডিত হইতে পারে। কেবল মধ্যস্থ গৌরী-শঙ্করমূর্ত্তিই একপ্রকার অখণ্ডিত অবস্থায় বর্ত্তমান। ৬৪টী যোগিনীমূর্ত্তি ব্যতীত ৮টী শক্তিমূর্ত্তি, ৩টী নদী-মূর্ত্তি, শক্তির ৪টী মূর্ত্তি, শিব ও গণেশের দুই মূর্ত্তি, মোট ৮১ মূর্ত্তি মন্দিরের চারি পার্শ্বে বর্ত্তমান। নিম্নে মূর্ত্তিগুলির নাম বাহন ও পরিচয় দেওয়া গেল।

১৩০৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যার ভারতীতে প্রকাশিত।

১	শ্রীগণেশ	......	......	......
২	ছত্রসম্ভর	হরিণ	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
৩	অজিতা	সিংহ	ঐ	ঐ
৪	চণ্ডিকা	নরকঙ্কাল	দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্ত্তি	শক্তি
৫	আনন্দা	পদ্ম	উপবিষ্টা স্ত্রী	যোগিনী
৬	কামদি	(অবনত) পুরুষ ও স্ত্রী মূর্ত্তি	ঐ	ঐ
৭	ব্রহ্মাণী	রাজহংস	ঐ	শক্তি
৮	মাহেশ্বরী	ষণ্ড	ঐ	ঐ
৯	টঙ্কারি	সিংহ	দশভূজা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
১০	শ্রীজয়া	মার্জ্জার	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
১১	পদ্মহংসা	পুষ্প	ঐ	ঐ
১২	রণজীরা	হস্তী	ঐ	ঐ

১৩	(নাম নাই)	নাগিনী	ঐ	ঐ
১৪	হংসিনী	রাজহংস	ঐ	ঐ
১৫	(নাম নাই)	ষোড়শ-হস্ত পুরুষ	ত্রিনেত্র শিবমূর্ত্তি	যোগিনী
১৬	ঈশ্বরী	ষণ্ড	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
১৭	স্থানী	পর্ব্বতচূড়া	ঐ	ঐ
১৮	ইন্দ্রজালী	হস্তী	ঐ	যোগিনী
১৯	(ভগ্ন)	ষণ্ড	ঐ	......
২০	(স্থানচ্যুত)	......	ঐ	......
২১	থাকিনী	উষ্ট্র	ঐ	......
২২	ধনেন্দ্রী	অবনত মনুষ্য	ঐ	......
২৩	(শূন্য অংশ)	......	......	......
২৪	উত্তলা	কালসার	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি	......
২৫	লম্পটা	অবনত মনুষ্য	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি	......
২৬	শ্রীউহা	ময়ূর	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি	সরস্বতী
২৭	......	বরাহ	......	......
২৮	গান্ধারা	অশ্ব	......	......
২৯	জাহ্নবা	মকর	দ্বিহস্তা দেবী	গঙ্গা
৩০	ডাকিনী	মনুষ্যাকঙ্কাল	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
৩১	বন্দিনী	স্ত্রীমূর্ত্তি	......	......
৩২	দর্পহারিণী	সিংহ	......	......
৩৩	বৈষ্ণবী	গরুড়	......	......
৩৪	অঙ্গিনী	ঐ	......	যোগিনী
৩৫	ঋক্ষাণী	মকর	......	......
৩৬	শাখিনী	গৃধ্র	......	......
৩৭	ঘণ্টালি	ঘণ্টা	...	......
৩৮	তত্বারি	হস্তী	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি (হস্তামূর্দ্ধা)	যোগিনী
৩৯	(খোদা নাই)	......	......	......
৪০	গঙ্গিনী	বৃষ	......	......
৪১	শ্রীভীষণী	অবনত মনুষ্য	......	......
৪২	সতনুসম্বর	হরিণ	......	......
৪৩	গহনী	মেষ	......	......
৪৪	(খোদা নাই)	......	......	......
৪৫	উদরী	সজ্জিত ঘোটক	......	......
৪৬	বারাহি	বরাহ	বরাহমূর্দ্ধা	শক্তি
৪৭	নলিনী	বৃষ	উপবিষ্টা স্ত্রী	যোগিনী
৪৮	(দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রবেশদ্বার)	......	......	......
৪৯	(স্থানচ্যুত)	......	......	......
৫০	নন্দিনী	সিংহ	......	......
৫১	ইন্দ্রাণী	ঐরাবত	......	শক্তি
৫২	ইরারি	গাভী	......	যোগিনী
৫৩	স্যান্দিনী	গর্দ্দভ	ভগ্ন হইয়াছে	......
৫৪	শ্রীঅঙ্গিনী	হস্তিমূর্দ্ধা মনুষ্য	......	......

৫৫	(নাম নাই)	......	......	......
৫৬	তেরান্ত	মহেশ্বর	স্ত্রীমূর্ত্তি বিংশভূজা	......
৫৭	শ্রীপারণী	অবনত মনুষ্য	দশভূজা	......
৫৮	বায়ুবেগা	কালমার	ভগ্ন	......
৫৯	ভূভাগবর্দ্ধিনী	পক্ষী	ঐ	......
৬০	(খোদা নাই)	......	......	......
৬১	সর্ব্বতোমুখী	যন্ত্র ও পদ্ম	ত্রিমূর্দ্ধা দ্বাদশহস্তা	......
৬২	মন্দোদরী	কৃতাঞ্জলি পুরুষদ্বয়	স্ত্রীমূর্ত্তি ভগ্ন।	......
৬৩	ক্ষেমুকী	সারস	......	......
৬৪	জাম্বভী	ভল্লুক	......	......
৬৫	আরোগ	নগ্ন পুরুষ	......	......
৬৬	(স্থান শূন্য)	* * * *	* * * *	* * * *
৬৭	স্থিরচিত্তা	কৃতাঞ্জলি পুরুষ	......	অজ্ঞাতব্য
৬৮	যমুনা	কূর্ম্ম	......	যমুনা নদী
৬৯	নীলদাম্বরা	গরুড়	দ্বিহস্তা	যোগিনী
৭০	বিভাষ	মানুষ ও নরকঙ্কাল	......	স্থির নাই
৭১	নারসিংহ	নৃসিংহমূর্ত্তি	......	শক্তি
৭২	অন্তকারি	মহিষ	উপবিষ্ট নরসিংহমূর্ত্তি	যোগিনী
৭৩	পিঙ্গলা	ময়ূর	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি	শক্তি
৭৪	অক্ষলা	যোড়হস্ত পুরুষ	ঐ	......
৭৫	(খোদা নাই)	......	ঐ	......
৭৬	ক্ষেত্রধর্ম্মিণী	শৃঙ্খলাবদ্ধ বৃষ	উপবিষ্টা স্ত্রী	যোগিনী
৭৭	বীরেন্দ্রী	অশ্বমূর্দ্ধা	ঐ	ঐ
৭৮	(স্থানভ্রষ্ট)	*	*	*
৭৯	ঋধানি দেবী	কোন অজানিত জন্তুমূর্ত্তি	উপবিষ্টা স্ত্রী	যোগিনী
৮০	(পশ্চিম প্রবেশ-পথ)	*	*	*
৮১	(স্থানভ্রষ্ট)	*	*	*

গয়াকর্ণের পর নরসিংহদেব ও তাঁহার পর জয়-সিংহদেব রাজা হন। নরসিংহদেবের রাজত্বের সময়কার ৩ খানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। দুখানিতে কুলসুরী অব্দ ৯০৭ ও ৯০৯ (১১৫৫ ও ১১৫৭ খৃঃ) আছে। জয়সিংহ দেবের ৩ খানি শিলালিপি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২ খানি ৯২৬ ও ৯২৮ কুলসুরী অব্দ যুক্ত (১১৭৫ ও ১১৭৭ খৃষ্টাব্দ)। জয়সিংহদেব গোশালা দেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহারই স্থাপিত গ্রাম পনাগড়ের নিকট গোশলপুর নামে বিখ্যাত। ইঁহাদের পুত্র বিজয়সিংহদেব রাজা হন। তাঁহার সময়কার দুখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। একখানিতে কুলসুরী ৯৩২ অব্দ (১১৮০ খৃষ্টাব্দ) ও অপরখানিতে ১২৫৩ বিক্রম সম্বত (১১৯৬ খৃষ্টাব্দ) আছে। বিজয়সিংহের পুত্রের নাম অজয়সিংহ দেব পাওয়া যায়। কিন্তু ইনি রাজা হন নাই। ইঁহার পর কে যে রাজা হন তাহা জানা যায় না। শিলালিপি হইতেই জানা যায় যে কর্ণদেবই প্রথমে ত্রিকলিঙ্গাধিপতি উপাধি ধারণ করেন। বিজয়সিংহ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশের সকলেই এই উপাধি ভোগ করিতে থাকেন। কিন্তু যদি বিজয়সিংহের মৃত্যুর সহিত কুলসুরী বংশের রাজত্ব শেষ হয়, তাহা হইলে এত বড় রাজ্য হঠাৎ কিরূপে লোপ পাইল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কটকের রাজা দশম শতাব্দীতে 'ত্রিকলিঙ্গাধিপতি' উপাধি গ্রহণ করেন। অতএব অনুমান হয় যে 'ত্রিকলিঙ্গ'

(তৈলঙ্গ) কটকের রাজারাই শাসন করিতেন, কারণ তাঁহারা নিকটে ছিলেন। কর্ণদেব ব্যতীত ত্রিপুরির অন্য সকল রাজাই উপাধি মাত্রই ধারণ করিতেন। দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে কুলস্থরী-ক্ষমতা অবশ্য খর্ব্ব হইয়া আসিতেছিল। ইহার পতন হঠাৎ হয় নাই। মালবের পোমার, নাগোড়ের পরিহর, বুন্দেলখণ্ডের চন্দেলা, ও দাক্ষিণাত্যের চালুক্যেরা ইহাকে ক্রমে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। পরিহর ও চন্দেলাগণ কিছু অংশ আত্মসাৎ করিয়া বিলহরিতে বাস করে। চন্দেলরাজ মদনবর্ম্মা ১১২৮ ও ১১৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেন। তাঁহার শিলালিপিতে প্রকাশ যে 'সিংগৌর গড়' দুর্গ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সিংগৌর গড় কুলস্থরী-রাজধানী হইতে মোটে ৭৮ ক্রোশ দূরে ছিল। ইহাতেই জানা যায় যে কুলস্থরী রাজ্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বঘেলাগণ গুজরাত্ হইতে আসিয়া রেবা অধিকার করেন। আদিম নিবাসী গোঁড় জাতিও প্রতিবাসীকে দুর্ব্বল দেখিয়া মাথা তুলিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই, বরং অন্যান্য প্রতিবাসী প্রতিযোগী অপেক্ষা ইহারাই সমধিক কৃতকার্য্য হয়। প্রায় ১৬ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহারা এদেশে রাজ্য করিতে থাকে। (ক্রমশ)

শ্রীকুমারেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অরণ্যবাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ:—কলিকাতাবাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটী বিক্রয় করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত পার্ব্বত্য বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই স্থানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাঁহাকে কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইল। গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। একদা মাধব দত্তের পত্নী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরী কন্যা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু সতীশবাবু পূজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্যা সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া সৌদামিনীর পিতা সতীশচন্দ্রকে কন্যাদানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কন্যা আশীর্ব্বাদ করিবেন স্থির হয়। সতীশচন্দ্র অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সৌদামিনীকে আশীর্ব্বাদ করিলে, দুই বন্ধুর মধ্যে কন্যাদের যৌবনবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহার ফলে, যৌবনবিবাহের অপ্রচলন সত্ত্বেও তাহার শাস্ত্রীয়তা সিদ্ধ হয়। ১৫ই ফাল্গুন তারিখে সতীশের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হইবে, স্থির হয়। সতীশের অনুরোধে ক্ষেত্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রকে পুরুলিয়া জেলা স্কুলে পড়িবার জন্য পাঠাইতে সম্মত হন। সতীশ সুরেন্দ্রকে আপনার বাসায় ও তত্ত্বাবধানে রাখিবার প্রস্তাব করেন। ক্ষেত্রনাথ অমরনাথ-নামক একজন দরিদ্র যুবককে আশ্রয় দিয়া বল্লভপুরে একটি পাঠশালা ও পোষ্ট-অফিস খুলিবেন, এবং সেই-সকল কর্ম্মে তাহাকে নিযুক্ত করিবেন সঙ্কল্প করিলেন।

সতীশচন্দ্র তাঁহার পিসতুতো ভাই, পুরোহিত প্রভৃতির সঙ্গে বল্লভপুরে আসিয়াছেন। আগন্তুকেরা বল্লভপুরের শ্রী ও ক্ষেত্রনাথের সম্পদ দেখিয়া প্রীত হইলেন। সতীশচন্দ্রের পিসতুতো ভাই কথা-প্রসঙ্গে জানিলেন যে ক্ষেত্রনাথের স্ত্রী তাঁহার ভগিনীর সখী, তাঁহাদের বিশেষ পরিচিতা।]

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ সতীশ-সৌদামিনীর শুভ বিবাহ। ক্ষুদ্র বল্লভপুর গ্রামটি আজ উৎসবময় হইয়াছে। সৌদামিনীর ন্যায় সুন্দরী গ্রামের মধ্যে আর কেহ নাই; সে নিজ সৌন্দর্য্য ও মধুর স্বভাব দ্বারা সকলের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সকলেই সৌদামিনীকে স্নেহ করে; সকলেই তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত হয়; সে যেন গ্রামের আলোক-স্বরূপ! —আজ তাহার শুভ বিবাহ। সতীশ বাবুর ন্যায় সুশিক্ষিত, সুন্দর ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে। যোগ্যা যোগ্যের সহিত মিলিত হইতেছে। তাই গ্রামস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আহ্লাদের আর পরিসীমা নাই। শুধু গ্রামবাসী কেন, এই প্রদেশবাসী জমীদার ও গৃহস্থ, যাঁহারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত পরিচিত,—সকলেরই আনন্দের সীমা নাই, যাঁহার যেরূপ সাধ্য, প্রত্যেকেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এই শুভকার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অন্তঃপুর ও বহির্ব্বাটী আজ আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত। দূরবর্ত্তী আত্মীয়-কুটুম্বগণের সমাগম হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী হিতাকাঙ্ক্ষী মহাশয়েরা শুভাগমন করিয়াছেন। কেহ চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইতেছে; কেহ ঝাড় ঝুলাইতেছে; কেহ খুঁটি

পুঁতিতেছে, কেহ ফটক বাঁধিতেছে; কেহ কানাত দিয়া প্রাঙ্গণ ঘিরিতেছে। কোথাও গ্রামবাসী যুবকেরা শোভা-যাত্রা করিয়া বরকে আনিবার নিমিত্ত মশাল বাঁধিতেছে; কোথাও বালকবালিকারা রওশনচৌকীর সুমধুর বাদ্য শুনিতেছে। কোথাও ভারে ভারে দধি, ক্ষীর ও মৎস্য আসিয়া পঁহুছিতেছে। মহিলাগণের কলরবে, হাস্য পরিহাসে এবং বালকবালিকাগণের ক্রন্দন ও চীৎকারে অন্তঃপুর শব্দায়মান। এমন সময়ে সহসা বিচিত্র পরিচ্ছদ-পরিহিত একদল ব্যাগ্-পাইপ্ বাদ্যকর আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে সমবেত হইল! তাহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদের যন্ত্রাদি বাহির করিয়া একতান বাদ্য আরম্ভ করিল। মৃদঙ্গে ঘা পড়িল; ব্যাগ্পাইপ্ হইতে বিচিত্র সুর বাজিয়া উঠিল। সকলে চমকিত হইয়া সেই দিকে ছুটিয়া আসিল। এমন বিচিত্র বাদ্যধ্বনি কেহ কখনও শুনে নাই ও এমন বিচিত্র বাদ্যকর কেহ কখনও দেখে নাই! বালক ছুটিল, বালিকা ছুটিল; যুবক ছুটিল, যুবতী ছুটিল; প্রৌঢ় ছুটিল, প্রৌঢ়া ছুটিল; বৃদ্ধ ছুটিল, বৃদ্ধা ছুটিল। সকলেই চমৎকৃত ও মুগ্ধ! কুটিত মৎস্য ছাড়িয়া দাসী ছুটিয়া আসিল; সেই অবসরে চিলে ছোঁ মারিয়া দুই চারি খানা মাছ লইয়া পলাইল, এবং একটা মার্জ্জার একটী মাছের মুড়া লইয়া কোঠাঘরের সিঁড়িতে উঠিল। দধি, দুগ্ধ ও ক্ষীর ভাণ্ডারে না তুলিয়াই অর্পিত-ভার কুটুম্ব মহাশয় বাদ্য শুনিতে ছুটিয়া আসিলেন। অন্তঃ-পুরের মহিলারা স্ব স্ব কার্য্য ছাড়িয়া বাদ্য শুনিবার জন্য সদর দ্বারে সমবেত হইলেন। চন্দ্রাতপ একদিকে টাঙ্গানো হইয়াছিল, অপর দিকে আর টাঙ্গানো হইল না। কুলী খুঁটি পুঁতিতে পুঁতিতে আর খুঁটি পুঁতিল না। যুবকগণের আর মশাল প্রস্তুত করা হইল না। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ বাদ্যকরদিগের চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া এই অদ্ভুত ও বিচিত্র বাদ্যধ্বনি শুনিতে লাগিল। কোথা হইতে এই বাদ্যকরদল আসিল ও তাহাদিগকে কে আনিল, তাহা কেহ জিজ্ঞাসা করিল না, অথবা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকতাও বুঝিল না;—সকলেই তন্ময় হইয়া এই অদ্ভুত বাদ্যধ্বনি শুনিতে লাগিল। সহসা বাদ্যধ্বনি নীরব হইল। বাদ্যকরেরাও কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া যন্ত্রাদি সহ কাছারী-বাড়ী অভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বালকবালিকারা দৌড়িতে লাগিল।

সতীশচন্দ্র নান্দীমুখ ক্রিয়াদি শেষ করিয়া রজনীবাবু প্রভৃতির সহিত বৈঠকখানার বারাণ্ডায় বসিয়া ছিলেন, এমন সময়ে বাদ্যকরেরা তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া ব্যাগ্-পাইপ্ বাজাইতে আরম্ভ করিল। সতীশচন্দ্র ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া ক্ষেত্রনাথের মুখের দিকে চাহিলে, তিনি হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "এটি তোমার বন্ধু ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার হরিগোপাল বাবুর কাজ। তিনি সেদিন এখানে এসেছিলেন এবং তোমার বিয়েতে ব্যাগ্-পাইপ্ নিয়ে আস্‌বেন ব'লে ভয় দেখিয়ে গেছলেন। তিনি যা ব'লে গেছেন, তাই করলেন, দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "সে হতভাগাটা এখানে এসেছিল না কি? আজও আস্‌বে, ব'লে গেছে না কি? এলে মুস্কিল কর্‌বে দেখ্‌তে পাচ্ছি।" ব্যাগ্পাইপ্ থামিলে, তিনি বাদ্যকরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তোমাদের এখানে পাঠালে? তোমরা কোথা থেকে আস্‌ছ?"

প্রধান বাদ্যকর সম্মুখ দিকে অর্দ্ধেক ঝুঁকিয়া ও জোড়হাত করিয়া বলিল "হুজুর, আমরা বর্দ্ধমান থেকে আস্‌ছি? হুজুরের চাপরাসী আমাদের নিয়ে এসেছে।"

তখন সতীশচন্দ্র বুঝিলেন, ইহা হরিগোপালেরই কাজ। ঠিক্ সেই সময়ে সাইকেলে চাপিয়া তিনটি ভদ্রলোককে কাছারীবাড়ী অভিমুখে আসিতে দেখা গেল। সতীশচন্দ্র সভয়ে দেখিলেন যে, হরিগোপাল-বাবু, মুন্সেফ সুখময়বাবু ও ডেপুটী অভয়বাবু আসিতে-ছেন! হরিগোপালবাবু সাইকেলে আসিতে আসিতেই "হুর্‌রে, হুর্‌রে" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সতীশচন্দ্র রজনীবাবুর পশ্চাতে দাঁড়াইলেন, রজনী বাবুকে দেখাইয়া, হাত নাড়িয়া বাড়াবাড়ি না করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু হরিগোপাল সেদিকে যেন লক্ষ্য না করিয়া, সাইকেল হইতে নামিয়াই, বাদ্যকরদিগকে বলিলেন "ব্যাটারা চুপ্ করে আছিস্ যে? বাজা, বাজা।" বাদ্যকরেরা আবার বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিল।

ক্ষেত্রনাথ অভ্যাগত ব্যক্তিত্রয়কে সমাদর করিয়া বসাইলেন। হরিগোপালবাবু রজনীবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন "মশায়, আমার বে-আদবী মাপ করবেন। আপনারা নিশ্চয়ই বরযাত্রী; মশাই, আমরাও তাই; তবে আপনাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ এইটুকু যে, আমরা অনিমন্ত্রিত, অনাহূত ও রবাহূত। যাই হোক্, আমরাও যে বরযাত্রী, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু সতীশভায়ার আক্কেলটার একবার পরিচয় শুনুন। সতীশ তার বিয়ের কথা আমাদের আদৌ জানায় নাই। আজ যে তার এখানে বিয়ে, তা আমরা ঘটনাচক্রে জান্‌তে পারি। জান্‌তে পেরে বরযাত্রী হ'য়ে আমরা এখানে এসেছি। আর, মশায়, বর্দ্ধমান থেকে এই ব্যাগ্‌পাইপের দলও আনিয়েছি। এই অভয়বাবু হলেন ডেপুটী, এই সুখময়বাবু হলেন মুন্‌সেফ, আর আমি, মশায়, হলাম রাস্তাঘাটের তদারককার। আমরা সর্ব্বদাই সতীশবাবুর বাসায় যাই ও একসঙ্গে উঠি বসি। কিন্তু ইনি এমনই চমৎকার লোক যে, এমন একটা ব্যাপারে আমাদের আদৌ নিমন্ত্রণ করেন নাই। সেই দুঃখে, আমি এই ব্যাগ্‌পাইপ বাজনা নিয়ে এসেছি। মশায়, আমি কিছু অন্যায় করেছি কি?"

রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন "আপনি অন্যায় কি করেছেন? খুব ভাল কাজই করেছেন। শুভকার্য্যে বাদ্যভাণ্ডের প্রয়োজন। তবে আমরা—"

হরিগোপাল বাবু রজনীবাবুকে বাধা দিয়া বলিলেন "বস্! মশায়, আর কোনও কথায় কাজ নাই। আমি আর কারুর পরোয়া রাখি না! এই ক্ষেত্রবাবু সেদিন এই বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে খুব ঝগড়া করেছিলেন। এই ব্যাগ্‌পাইপ্ ছাড়া আমি কতকগুলি গেঁঠে বোম্, হাউই, চরকী, তুব্‌ড়ি, রোশনাই প্রভৃতিও আনিয়েছি; তা ছাড়া লোহাগড়ের রাজাসাহেব তাঁর প্রধান ওস্তাদকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আসরে তার কালোয়াতী গান হবে।"

রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন "আপনি বেশ ব্যবস্থা করেছেন।"

হরিগোপালবাবু উল্লাসমিশ্রিত বিদ্রূপের সহিত সতীশচন্দ্রের দিকে একবার চাহিলেন। সতীশচন্দ্র এইবার যো পাইয়া বলিলেন "আজ না হয় রবিবার। কিন্তু তোমরা ষ্টেশন ছেড়ে এলে যে?"

হাকিম দুইজন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিলেন "তার জন্য ভাবনা নাই। আমরা সাহেবের অনুমতি নিয়ে এসেছি। এত কাঁচা কাজ আমরা করি নাই। কাল সাতটার ট্রেনে পুরুলিয়ায় ফিরে গিয়ে আবার কাছারী করব।"

সতীশচন্দ্র বড় দমিয়া গেলেন। রজনীবাবু সেখান হইতে উঠিয়া ভ্রমণের জন্য মাঠের দিকে বাহির হইলে, তিনজনে সতীশচন্দ্রের সহিত এরূপ হাস্য পরিহাস ও ঠাট্টা বিদ্রূপ আরম্ভ করিলেন যে, বেচারী তাহাতে একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন।

ক্ষেত্রনাথ আগন্তুকত্রয়ের জলখাবার ও চায়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে কিরূপ উদ্যোগ-আয়োজন হইতেছে, তাহা দেখিতে গেলেন।

একোনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার সময় বিবাহের সভা সুসজ্জিত হইল। চন্দ্রাতপের চারিদিকে বিচিত্র বর্ণের কাগজের মালা ও ফুলের ঝালর লম্বিত হইল। ফটকটি লতাপাতায় বিমণ্ডিত হইল। সেই সময়ে বনে অসংখ্য পলাশবৃক্ষ পুষ্পিত হইয়াছিল। লোহিত বর্ণের পলাশপুষ্পগুচ্ছসমূহ হরিদ্বর্ণ পত্ররাজির মধ্যে বিন্যস্ত হওয়ায় ফটকের এমন অপূর্ব্ব শোভা ও সৌন্দর্য্য হইল যে, তাহা দেখিবার জন্য দলে দলে দর্শক-বৃন্দ সমবেত হইতে লাগিল। বিবাহ-সভা ঝাড়-দেওয়ালগিরি-সেজ প্রভৃতিতে ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। গ্রাম হইতে কিছু দূরে—অথচ সকলে দেখিতে পায়—এরূপ স্থলে, আতসবাজি পোড়াইবার বন্দোবস্ত হইল। অন্তঃপুরে বিবাহ-মণ্ডপও সুসজ্জিত হইল এবং দানসামগ্রীসমূহ সুবিন্যস্ত করিয়া রাখা হইল। সেখানে ভদ্রলোকগণের উপবেশনেরও স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজনের সুব্যবস্থা হইল। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ কাছারী বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন।

আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, সতীশচন্দ্র বন্ধুগণের সহিত বিবাহসম্বন্ধে আলাপ করিতেছেন। সতীশচন্দ্র বলিতেছিলেন "ভেবে দেখ, আমাদের মতন লোকের একে তো বিবাহ করাই একটা বিষম সঙ্কট ; তার উপর, তোমরা সব এসে প'ড়ে আমার সঙ্কট শতগুণে বাড়িয়েছ। আমি মনে করেছিলাম, চুপি চুপি কাজটা সার্‌ব ; কিন্তু এই মহাত্মাটি (হরিগোপালবাবুকে দেখাইয়া) তা কর্‌তে দিলেন না। ইনিই যত নষ্টামীর গুরু। এখন তোমরা সত্য ক'রে বল দেখি, আমি বর সাজি কি করে ? আর তোমাদের এই বাদ্যভাণ্ড নিয়ে পাল্কী চ'ড়েই বা যাই কি করে ?"

হরিগোপাল বলিলেন "আচ্ছা, তোমার যদি এত লজ্জা হ'চ্ছে, তা হ'লে আমাদের মধ্যেই যে হোক্ বর সেজে চলুক (সকলের মধ্যে উচ্চ হাস্যধ্বনি); আর এই ব্যাগপাইপ্ বাজনাটা সঙ্গে নিয়ে যেতে যদি আপত্তি থাকে, তা হ'লে মাদোল আর কাড়ানাগ্‌রার ব্যবস্থা করা যাক্।" (সকলের মধ্যে আবার উচ্চ হাস্যধ্বনি)।

সতীশচন্দ্র বলিলেন "তোমাদের সঙ্গে এঁটে উঠা ভার। আমি যেন আজ তোমাদের কাছে চোর হ'য়ে ধরা পড়েছি !"

সুখময়বাবু বলিলেন "সত্যই তো ; তুমি চোর নও তো কি ? চুরী ক'রে বিয়ে কর্‌তে এসেছ, আর তুমি বুঝি সাধু পুরুষ ! ডেপুটী অভয়বাবুর কাছে আজ চোরের বিচার হোক্।"

ডেপুটী অভয়বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন "চোরের বিচার আমি অনেক আগেই করেছি, আর সাজাও ঠিক্ ক'রে রেখেছি। চোর, তুমি আমার হুকুম শোন—তুমি আজ মাথায় টোপর দিয়ে, আর বেনারসী চেলী প'রে পাল্কীতে চ'ড়ে, ব্যাগ্‌পাইপ্ বাজনা সঙ্গে নিয়ে, ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের কন্যা সৌদামিনীকে বিবাহ কর্‌তে যাও। না গেলে, তোমাকে এক জনের জেলে ছয় মাস আটক ক'রে রাখ্‌ব।" দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া আবার সকলের মধ্যে হাসি পড়িয়া গেল।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "হুজুরের চমৎকার বিচার হয়েছে ! তা নইলে আপনাকে লোকে ধর্ম্মাবতার বল্‌বে কেন ? এখন আপনাদের এজ্‌লাস্ ভাঙ্গলে হয় না ? সতীশ, ওঠ, ওঠ ; সায়ংসন্ধ্যে ক'রে প্রস্তুত হও।"

সুখময়বাবু বলিলেন "আজ্‌কে আবার সায়ংসন্ধ্যে কি মশায় ? আজ্‌কে যে পূর্ণিমা—সায়ংসন্ধ্যা নাস্তি ! ভট্টাচার্য্য মশায়ের বাটীতে গিয়ে সতীশ একেবারে সায়ংসন্ধ্যে কর্‌বে। (আবার সকলের হাস্য)। বিয়ের লগ্ন ক'টার সময় ?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন "রাত্রি দশটার পর।"

সুখময়বাবু বলিলেন "তবে, সতীশ ভায়া, ওঠ, ওঠ। আসরে গিয়ে দুটো কালোয়াতী গান শুন্‌তে হ'বে। বসে বসে আর ভাব্‌ছ কি ? সাহস কর, সাহস কর। অত এলিয়ে পড়্‌লে চল্‌বে কেন ? আরে, ভাই, একটা রাত্রি যা কষ্ট ; তার পর আর কষ্ট কি ? কবির বাক্যটি স্মরণ কর :—

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে ?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ?

সুখময়বাবুর কথা শুনিয়া সকলে "ক্যাবাত, ক্যাবাত" বলিয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

সকলে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পূর্ব্ব গগনে পূর্ণ-চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। বনে বনে কোকিল ও পাপিয়ার ঝঙ্কার হইতেছে ও ঝির্ ঝির্ করিয়া শীতল বাতাস বহিতেছে। পাল্কী বেহারা সমস্তই প্রস্তুত। লোহাগড় রাজবাটী হইতে রৌপ্যমণ্ডিত আসাসোঁটা লইয়া কুড়ি জন ভৃত্য আসিয়াছে ; এসিটালিন্ গ্যাসের অনেকগুলি আলোক ও ঝাড় আসিয়াছে ; গ্রামের লোকেরা অসংখ্য মশাল লইয়া আসিয়াছে। কন্যার বাড়ী হইতে মধুর রওশন্‌চৌকী বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে একদল লোক বরের অভ্যর্থনার জন্য কাছারীবাড়ী-অভিমুখে আসিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া সুখময়বাবু প্রভৃতিও বরের সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

হরিগোপালবাবু ও হাকিমবাবুদিগকে শিবিকারোহণ করিয়া যাইবার জন্য রজনীবাবু অনেক অনুরোধ করি-লেন ; কিন্তু তাঁহারা বলিলেন "পাল্কী চড়ার প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন হ'লে আমরা সাইকেলে যাব। এও তো যান ?"

সতীশচন্দ্র বরসজ্জা করিয়া বাহিরে আসিলেন; এবং রজনীবাবু ও পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম করিয়া শিবিকায় আরোহণ করিলেন। তাঁহার শিবিকাটি সুন্দর পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত হইয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ ও হরিগোপাল বাবু শোভাযাত্রার লোকজনকে সুবিন্যস্ত করিয়া দিলেন। সর্ব্বাগ্রে দুইটী গ্যাসের ঝাড়; তার পর রওশনচৌকীর বাদ্য; তৎপরে মশালশ্রেণী; তৎপরে ব্যাগ্‌পাইপের বাদ্য; তৎপরে আসাসোঁটাধারী বিচিত্র পরিচ্ছদ-পরিহিত ভৃত্যবৃন্দ এবং এসিটিলিন্ গ্যাস ল্যাম্প ও ঝাড়ের শ্রেণী, তৎপরে বরের পুষ্পমণ্ডিত সুসজ্জিত শিবিকা; তৎপরে অন্যান্য শিবিকা ও সর্ব্বশেষে সাইকেল যানারোহী বন্ধুত্রয়। "সাইকেল্ যানারোহী" বলিলে তাঁহাদের ঠিক বর্ণনা করা হয় না। তাঁহারা নিজ নিজ সাইকেল্ বাম-হস্তে ধরিয়া গল্প করিতে করিতে পদব্রজেই গমন করিতে লাগিলেন। যাহাতে শোভাযাত্রার ক্রম ভঙ্গ না হয়, তজ্জন্য ক্ষেত্রনাথ, অমর, নগেন্দ্র ও তাঁহাদের ভৃত্যগণ ব্যস্ত রহিলেন।

শোভাযাত্রা অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিবামাত্র, দিগন্ত ও পর্ব্বতের কন্দরসমূহ প্রতিধ্বনিত করিয়া একটী বোমের ভীষণ শব্দ আকাশমার্গে উত্থিত হইল। সেই শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া বিহঙ্গকুল বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশে উড্ডীন হইল ও ভয়সূচক চীৎকারধ্বনি করিতে লাগিল, এবং অদূরে পর্ব্বতকন্দরে কতিপয় বন্যপশু ভীতিমিশ্রিত বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। বোমের শব্দ নিবৃত্ত হইতে না হইতে, শোভাযাত্রার পুরোভাগে একটী হাউই আকাশে উত্থিত হইয়া নানা বর্ণের বিচিত্র তারকামালা বর্ষণ করিল। এক মিনিট্ অন্তর এক একটী বোমের শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং এক একটী হাউই আকাশে উঠিয়া বিচিত্রবর্ণের আলোকচূর্ণ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে শত শত দর্শক এই অপূর্ব্ব ও মনোহারিণী শোভা দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইল। মধ্যে মধ্যে এক একটী তুবড়ী অপূর্ব্ব আলোক-প্রস্রবণের সৃষ্টি করিয়া সকলের চিত্ত বিমোহিত করিতে লাগিল। যথাসময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে শোভাযাত্রা উপস্থিত হইলে ফটকের নিকট পাল্কী লাগিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সমাদর-পূর্ব্বক বরের করধারণ করিয়া তাঁহাকে বহুমূল্য কারুকার্য্য-খচিত নির্দ্দিষ্ট আসনের উপর উপবিষ্ট করাইলেন। অমনই অন্তঃপুর হইতে উলুধ্বনি ও তুমুল শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। বরযাত্রিগণও যথোচিত সমাদৃত হইয়া বরের উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। বিবাহসভায় শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়া সুখময় বাবু, অভয় বাবু, রজনী বাবু প্রভৃতি সকলেই চমৎকৃত হইলেন। এই আরণ্য প্রদেশেও যে এরূপ আড়ম্বর সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা তাঁহাদের বিস্ময়ের বিষয় হইল। পান তামাক লইয়া ভৃত্যেরা সকলের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল।

সভায় সকলে উপবিষ্ট হইলে, দুইটী ব্রাহ্মণ বালক এই বিবাহোপলক্ষে রচিত একটী চমৎকার গান গাহিল। তাহাতে "সতীশ সৌদামিনী"র সুখ, সম্পদ্ ও মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা ছিল। গান শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন। তৎপরে সঙ্গীতজ্ঞ কতিপয় ব্রাহ্মণ যুবক বেহালা, এস্‌রাজ, তানপুরা ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে নানা প্রকার বৈঠকী সঙ্গীতের দ্বারা সকলের চিত্ত বিনোদন করিলেন। পরিশেষে লোহাগড় রাজবাটীর ওস্তাদজীর গান আরম্ভ হইল। তাঁহার গান শুনিয়া সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া রহিলেন।

বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মণগণের ও সভাস্থ সকলের অনুমতি গ্রহণ করিয়া স্ত্রী-আচারাদির অনুষ্ঠানের জন্য বরকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। পরে কন্যাদানের সময় বরযাত্রী ও অভ্যাগত ভদ্র ব্যক্তিগণকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিলেন। দরিদ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বরের জন্য যে-সমস্ত দানসামগ্রী সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। যখন সালঙ্কারা সৌদামিনী বিবাহ-মণ্ডপে আনীত হইল, তখন রাজ্ঞীর ন্যায় তাহার সৌন্দর্য্য ও বেশভূষা দেখিয়া রজনী বাবু, সুখময় বাবু, অভয় বাবু, হরিগোপাল বাবু প্রভৃতি সকলেই বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইলেন। সুখময় বাবু অনুচ্চস্বরে বলিলেন "সাধে কি সতীশ ভায়া এই বল্লভপুরে ফাঁদে পা দিয়েছে?"

অভয় বাবু বলিলেন "সাক্ষাৎ রাজরাণী হে রাজরাণী !"

হরিগোপাল বাবু বলিলেন "এঁর সৌদামিনী নামটা ঠিক হয় নাই। এঁর নাম 'স্থির সৌদামিনী' রাখা উচিত ছিল।"

যথাসময়ে কন্যাদান হইয়া গেল। সকলে আবার বিবাহ-সভায় আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রওশনচৌকী ও ব্যাগপাইপ আবার বাজিয়া উঠিল এবং সভার সম্মুখবর্ত্তী মাঠে আবার বোমের ভীষণ নাদ উত্থিত হইয়া পর্ব্বতগাত্র ও কন্দরসমূহ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। আতশবাজি দেখিয়া গ্রামবাসিগণ যারপরনাই আনন্দিত হইল। পরিশেষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া প্রচুররূপে পরিতুষ্ট করা হইল। কোকিল ও পাপিয়ার ঝঙ্কারে রজনী প্রভাত হইল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাতে কাছারীবাটীতে চা পান করিয়া হরিগোপাল বাবু প্রভৃতি সাইকেলে চাপিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মধ্যাহ্নে কুশণ্ডিকা সমাপ্ত হইল। অপরাহ্ন সময়ে বরকন্যার বিদায়ের উদ্যোগ হইল।

সেই সময়ে রজনী বাবু, ক্ষেত্রবাবু প্রভৃতি সকলেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। রজনী বাবু বরকর্ত্তা রূপে কাঙ্গালী ও অন্ধ-খঞ্জ দিগের মধ্যে অর্থ বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। গ্রামবাসীরা গ্রামভাটী চাহিতে আসিল। গ্রামের বুড়া শিবের জীর্ণ মন্দির সংস্কারের জন্য পঞ্চাশ টাকা ও গ্রামে নূতন স্থাপিত পাঠশালার জন্য একশত টাকা প্রদত্ত হইল। যখন রজনীবাবু সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কাছারীবাটী অভিমুখে আসিতে উদ্যত হইলেন, ঠিক সেই সময়ে ফটকের নিকটে একদল ভূমিজ যুবতী তাঁহার গমনপথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "এ হে, তুই কুথা যাচ্ছুস্; তুই আমাদের সঙ্-ছাড়ানি দিয়ে যা।" রজনীবাবু মহা বিপদে পড়িলেন; তিনি তাহাদের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ক্ষেত্রনাথও ব্যাপার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না; তিনি যুবতীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি গো, তোমরা কি চাও?" যুবতীরা বলিল "কি আবার চাইবো হে? তোরা আমাদের সঙ্-ছাড়ানি দিয়ে যা।" সেই সময়ে একজন স্থানীয় ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে সেই স্থানে আসিয়া বলিলেন "মশায়, কনে এই গ্রামে এদের সঙ্গে এতদিন ছিল; আজ আপনারা তারে এদের সঙ্গ ছাড়িয়ে আপনাদের দেশে নিয়ে যাচ্ছেন। সেই জন্য এদের মনঃকষ্ট হচ্ছে। সেই মনঃকষ্ট শান্তির জন্য এরা কিছু পাবার দাবী রাখে। তারই নাম সঙ্-ছাড়ানি।" রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন "ওঃ, এতক্ষণে বুঝলাম। বেশ কথাটি তো? সঙ্গ-ছাড়ানির জন্য এদের কি দিতে হ'বে?" সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন "আপনার যা অভিরুচি হয়; এদেশে সঙ্গ-ছাড়ানিও একটী গ্রামভাটী।" রজনী বাবু পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া অগ্রবর্ত্তিনী যুবতীর হস্তে প্রদান করিলেন। যুবতী আনন্দে এক মুখ হাসিয়া বলিল "ঢের দিয়েচুস্, ঢের দিয়েচুস্, যা তোরা এখন যা।" এই বলিয়া তাঁহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিল।

রজনী বাবু রাস্তায় বাহির হইয়া হাসিয়া অস্থির হইলেন। তিনি ক্ষেত্র বাবুকে বলিলেন "এদেশের ভারি অদ্ভুত নিয়ম দেখছি। আমাদের দেশের মেয়েরা শয্যা-তোলানি বাসর-জাগানি ইত্যাদি আদায় করে। এদেশে দেখছি আবার সঙ্-ছাড়ানি আছে। গ্রামভাটী প্রথাটি কোনও-না কোনও আকারে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। আচ্ছা ক্ষেত্রবাবু, আপনি বল্‌তে পারেন, এ প্রথার উৎপত্তি কিরূপে হ'ল?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "উৎপত্তি বলা বড় শক্ত; তবে আমার মনে হয়, এই প্রথাটি প্রাচীন কালের বিবাহ-প্রথা থেকেই উৎপন্ন হ'য়ে থাক্‌বে। প্রাচীনকালে বল প্রয়োগ করে কন্যাকে হরণ করে নিয়ে যাওয়া হ'ত। সেই কন্যা হরণের ব্যাপার নিয়ে দুই দল অর্থাৎ দুইটী গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে ভয়ানক বিবাদ, কলহ, এমন কি, যুদ্ধ ও রক্তপাত পর্য্যন্ত হ'ত। শেষকালে, কন্যার অভাব-জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কন্যার পিতাকে ও গ্রামবাসীদিগকে কিছু টাকা কড়ি দিয়ে বিবাদ মিটানো হ'ত। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে ভীষ্মের অম্বা ও অম্বালিকা হরণ,

অর্জ্জুনের সুভদ্রা হরণ প্রভৃতি পৌরাণিক গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করার পরিণাম বড় ভয়ানক দেখে, শেষে বিবাহার্থী যুবক বা তার অভিভাবক কন্যার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব কর্‌ত ও তাঁকে টাকা কড়ি বা গোমহিষ দিয়ে রাজি করে কন্যা নিয়ে যেত। কিন্তু কন্যার পিতা একলা রাজি হ'লে চল্‌ত না, গ্রামবাসীদেরও রাজি করা আবশ্যক হ'ত কেননা কন্যার পিতা 'গ্রামনী' অর্থাৎ গ্রামপতি বা গ্রামের পঞ্চায়েতের অনুমতি ব্যতীত কোনও কাজ করতে পারত না। এখনও পল্লীগ্রামে কোনও সামাজিক কার্য্যানুষ্ঠানের পূর্ব্বে গ্রামনী বা 'গ্রামুন্নি'র অনুমতি নিতে হয়। গ্রামবাসীদের সন্তুষ্ট কর্‌বার জন্যই এই গ্রামভাটীর সৃষ্টি হ'য়ে থাকবে।"

রজনীবাবু বলিলেন "আপনার কথা যথার্থ ব'লেই মনে হচ্ছে। শুনেছি, বিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই বাঙ্গলা দেশেই বিবাহের সময় গ্রামবাসীরা একটা যুদ্ধের অভিনয় কর্‌ত। অর্থাৎ, বরের পাল্কী গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র গ্রামের ছেলেরা ও যুবকেরা পাল্কীতে ঢিল মার্‌ত। তারপর তাদের কিছু দিতে স্বীকার কর্‌লে তবে তারা ক্ষান্ত হ'ত। এই সব প্রথার বিদ্যমানতা দ্বারা দেখতে পাচ্ছি, আমরা সেই প্রাচীন কালের অসভ্য সমাজের প্রথা হ'তে বড় বেশী দূরে যাই নাই।"

যতীন্দ্রনাথ কিছু দিন পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে বিবাহ করিতে গিয়া বিবাহের সময় শ্যালকদের কাছে কিল-চাপড় এবং শ্যালীদের হাতে এক-আধটা কানমলাও খাইয়াছিলেন। সেই ব্যাপারটি তাঁহার স্মরণ হওয়ায়, তিনি বলিলেন "যুদ্ধের অভিনয়ই বটে! পাড়াগাঁয়ে বিয়ের সময় শ্যালারা কিল চাপড় মার্‌তে, আর শ্যালীরা কান ম'ল্‌তেও ছাড়ে না। তারা বলে যে বিয়ের সময় কিল মারা ও কানমলা একটী সনাতনী প্রথা ও বিয়ের একটী প্রধান অঙ্গ। সনাতনী প্রথা হোক্ আর নাই হোক্, এটি যে সেই অসভ্য সমাজের যুদ্ধ বিগ্রহের একটী অবশিষ্ট নিদর্শন, সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ নাই।"

রজনীবাবু ও ক্ষেত্র বাবু উভয়েই হাসিয়া উঠিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "যতীন্দ্র বাবুর অনুমান বোধ হয় মিথ্যা নয়।" এইরূপ গল্প করিতে করিতে তাঁহারা কাছারীবাটীতে উপনীত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বরকন্যা বিদায় গ্রহণ করিয়া কাছারীবাটীতে উপস্থিত হইল। সতীশচন্দ্র শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া বৈঠকখানায় প্রবিষ্ট হইলেন। সৌদামিনী তাহার দাসীর সমভিব্যাহারে মনোরমার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইল।

* * * * * * *

যে গ্রামে সৌদামিনী জন্মগ্রহণ করিয়া এত বড় হইয়াছে, যে স্থানে সে বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, যে স্থানের সহিত তাহার কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে, সেই গ্রাম ও গ্রামবাসিগণের প্রতি মমতা ত্যাগ করিতে সৌদামিনীর হৃদয়গ্রন্থি যেন ছিন্ন হইতে লাগিল। স্বর্ণলতা জননীদেবীর স্মৃতি, বৃদ্ধ পিতা, পিতৃস্বসা ও ভ্রাতৃগণের স্নেহ, বৌদিদির সাদর যত্ন, প্রতিবাসিনী মহিলাগণের সস্নেহ ব্যবহার, সঙ্গিনীগণের সুমধুর সখ্য, আর সর্ব্বোপরি মনোরমার অকপট স্নেহ ও সৌহার্দ্দ্য—এই সমস্ত স্মরণ করিয়া, এবং এই সমস্ত হইতে অতঃপর তাহাকে চিরদিনের জন্য দূরে থাকিতে হইবে, ইহা মনে করিয়া সৌদামিনী দুঃখে ও কষ্টে বিহ্বল হইয়াছিল এবং অদ্য প্রায় সর্ব্বক্ষণই নীরবে ক্রন্দন করিয়াছিল! কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার বৃহৎ চক্ষু দুটী শিশিরসিক্ত রক্তকমলদলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। মনোরমার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ও মনোরমাকে দেখিবামাত্র, তাহার হৃদয়ের আবেগ আবার উদ্বেল হইয়া উঠিল এবং সে অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মনোরমার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। কিন্তু তিনি কোনও রূপে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন "ও কি কর, সদু? ছিঃ, কাঁদতে আছে?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনিও অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

নরু সেই সময়ে ছুটিয়া আসিয়া উভয়কে কাঁদিতে দেখিয়া বলিল "মা, মাসী-মা, তোমরা কাঁদ্‌ছ কেন? মাসী-মা, তুমি কোথায় যাচ্ছ, বলনা? আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"
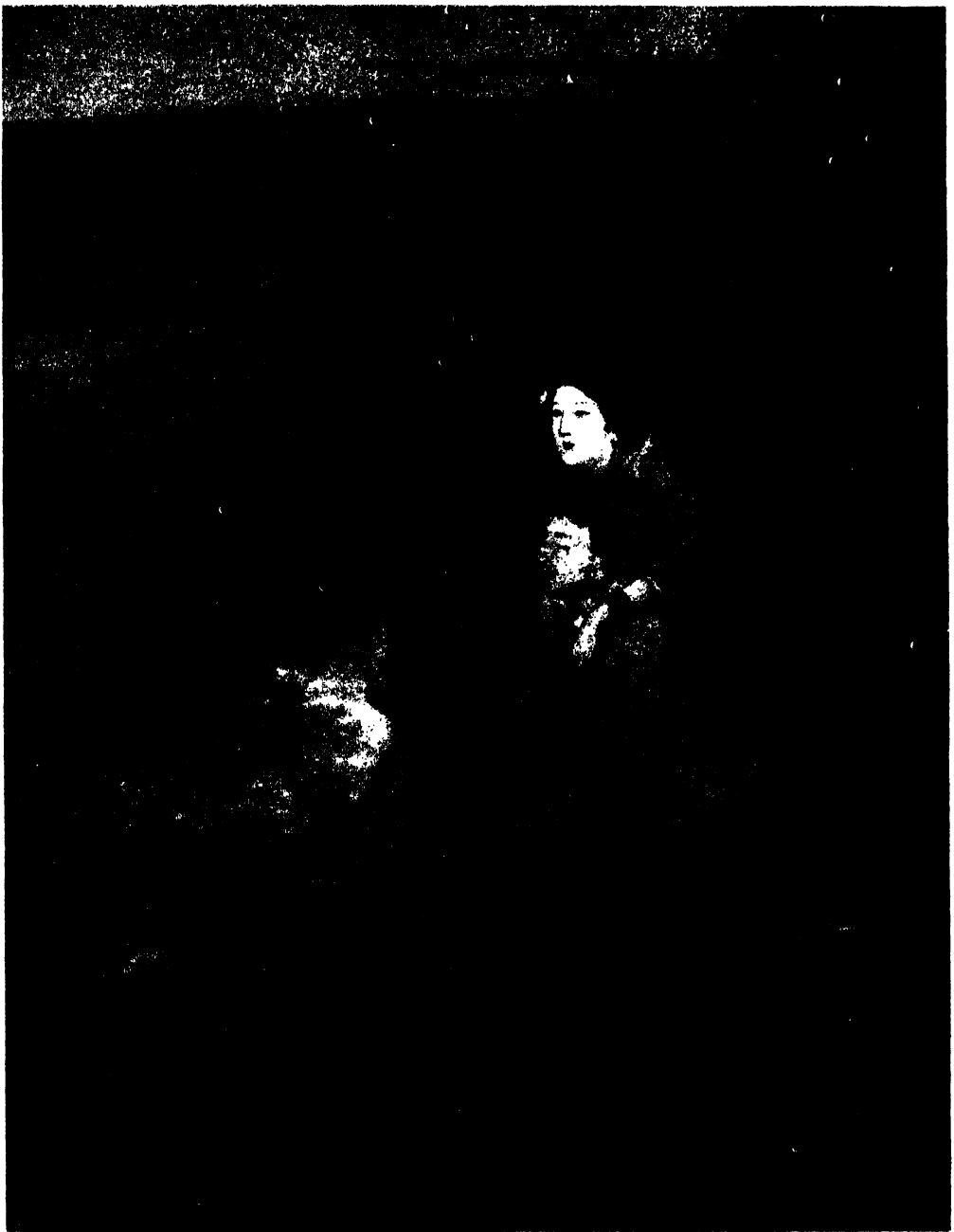
সৌদামিনী আর থাকিতে পারিল না। একবারে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরে কোনও রূপে সংযত হইয়া নরুকে ক্রোড়ে লইয়া ছাদের উপর উঠিল। সেখানে সে নরুকে বলিল "লক্ষ্মী-ছেলে, বাবা ছেলে, তুমি কেঁদো না। আমি তোমার কাকা বাবুর সঙ্গে কল্‌কাতায় যাচ্ছি। সেখানে থেকে তোমার জন্য একটা গাড়ী, আর একটা ছোট বন্দুক নিয়ে আস্‌ব। তুমি আমার জন্য কেঁদো না। আমি আবার শীগগীর আস্‌বো। বুঝলে ?"

নরু বলিল "হাঁ; আমি কাঁদ্‌ব না, মাসী-মা। তুমি আমার জন্যে কাকা বাবুর মতন একটা গাড়ী নিয়ে আস্‌বে ? তুমি আবার কবে আস্‌বে ?"

সৌদামিনী বলিল "শীগগীর আসব।"

মনোরমা ছাদে আসিয়া সৌদামিনীকে বলিলেন "চল, সদু, নীচে চল। তুমি কিছু খাবে এস।"

সৌদামিনী বলিল "না, দিদি, আমি কিছু খাব না; তুমি চল; আমি যাচ্ছি।" এই বলিয়া সৌদামিনী সেই ছাদ হইতে একবার চারিদিকে চাহিয়া পাহাড়, নদী, বন, জঙ্গল, শস্যক্ষেত্র, গ্রাম ও তাহার পিতার বাড়ীটি দেখিয়া লইল। আবার তাহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল, এবং সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সৌদামিনী ঈষৎ সংযত হইয়া তাহার দক্ষিণ হস্তের আনত অঙ্গুলিগুলি মস্তকে স্পর্শ করিয়া তাহার প্রিয় জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

ভৃত্যেরা গো-যানে জিনিষপত্র বোঝাই করিয়া অগ্রেই ষ্টেশনাভিমুখে গমন করিয়াছিল। অতঃপর বল্লভপুর হইতে পাল্কী না উঠিলে, রাত্রি আটটার ট্রেন ধরা কঠিন কার্য্য হইবে। এইজন্য ক্ষেত্রনাথ মনোরমাকে ত্বরা প্রদান করিতে লাগিলেন। মনোরমা সৌদামিনীর খোঁপাটি মনোজ্ঞ করিয়া বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহার কপালে একটী ছোট সিন্দুরের টিপ্ দিলেন। তৎপরে দুইটী স্বর্ণমণ্ডিত শাঁখা বাহির করিয়া সৌদামিনীকে বলিলেন "এই দুইটী তোমার দিদির উপহার; এস, তোমার হাতে পরিয়ে দিই।" সৌদামিনী আপত্তি করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মনোরমা দুঃখিত হইয়া বলিলেন "সদু, তোমার দিদিকে মনে রাখবার জন্য হাতে কিছুই রাখবে না ?"

সৌদামিনী আর আপত্তি করিতে পারিল না। সে মনোরমার দিকে হাত বাড়াইয়া আবার অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শাঁখা পরানো শেষ হইলে, সৌদামিনীর ভয়ানক আপত্তি সত্ত্বেও, মনোরমা তাহার পদধূলি লইয়া নরু ও বিভার মাথায় দিলেন।

মনোরমার আগ্রহাতিশয্যে সৌদামিনী কিছু না খাইয়া থাকিতে পারিল না। এদিকে রজনীবাবু সতীশচন্দ্র প্রভৃতিও কিছু জলযোগ করিয়া লইলেন। যথাসময়ে সকলে ক্ষেত্রনাথ প্রভৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শিবিকারোহণ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে শিবিকাগুলি দৃষ্টিপথের অতীত হইল। নরু বৈঠকখানার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ মাসীমার জন্য কাঁদিল।

নগেন্দ্র, অমলনাথ ও লখাই সর্দ্দার গো-যানগুলির সহিত অগ্রেই ষ্টেশনে গিয়াছিল। সুতরাং ক্ষেত্রনাথ আর ষ্টেশন পর্য্যন্ত গমন করিলেন না। তিনি বৈঠকখানার বারাণ্ডায় কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া অবশেষে নরুর সহিত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। সূর্য্যাস্তের পর কৃষ্ণা-প্রতিপদের তরল অন্ধকার সেই নিস্তব্ধ গ্রামখানির উপর অবতীর্ণ হইয়া নিরানন্দ গ্রামবাসিগণের হৃদয়ের তাৎকালিক অবস্থাটি যেন সূচিত করিয়া দিল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সতীশ-সৌদামিনীর বিদায়ের পর ক্ষেত্রনাথ দুই তিন দিন কোনও কাজে ভাল করিয়া মন লাগাইতে পারিলেন না। তাহাদের শুভ বিবাহোৎসবটি তাঁহার কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যে যেন ক্ষণিক সুখস্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দুই চারি দিন পরে সেই স্বপ্নের মোহ ভাঙ্গিয়া গেলে, জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা তাঁহার মানসচক্ষুর সম্মুখে আবার দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল, এবং তিনি অদম্য উৎসাহে সেই সংগ্রামে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলেন।

ক্ষেত্রনাথ একদিন মাধবদত্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বল্লভপুরে একটী হাট-স্থাপনের প্রস্তাব-সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। মাধবদত্ত বলিলেন যে, সৌদামিনীর

বিবাহের সময় বল্লভপুরে গিয়া তিনি তাঁহার উক্ত প্রস্তাব অবগত হইয়াছেন। একটী হাট স্থাপিত হইলে, সর্ব্বসাধারণের যে সবিশেষ সুবিধা হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু হাটে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিতে হইলে, হাটের নিকট আড়ত এবং কাপড়, মশলা, বাসন ও মনোহারীর দোকান স্থাপন করা কর্ত্তব্য। পুরুলিয়ার দরে, কিম্বা দুই এক আনা উচ্চ দরেও দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিলে, লোকে পুরুলিয়ায় না গিয়া বল্লভপুরেই জিনিষপত্র ক্রয় করিতে আসিবে।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আমিও তাই ভেবেছি। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্র কোনও একটা কাজ কর্‌তে চায়; কিন্তু সে ছেলে মানুষ, একলা কাজ চালাতে পারবে কি না, তাই ভাবছি। আমার নিজের সময় বড় অল্প; এক কৃষিকাজ নিয়েই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি। আমি নিজে দেখতে পারলে কোনও কথা ছিল না।"

মাধবদত্ত মহাশয় কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "দেখুন, ব্যবসাই বলুন, আর কৃষিকাজই বলুন, নিজে না দেখতে পারলে, কোনটিতেই লাভ হয় না। কথায় বলে 'আঁতে পুঁতে চাষ'; ব্যবসা সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। আমিও নিজে কৃষি-কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি; নিজে কোনও ব্যবসাতে লিপ্ত হ'তে পারি না। আমার বড় ছেলে হরিধন মাঝে মাঝে এদেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি সুবিধাদরে ক্রয় ক'রে কখনও পুরুলিয়ায়, আর কখনও বা কল্‌কাতায় গিয়ে বেচে আসে। তারও একটা কাজ কর্‌বার খুব ঝোঁক আছে। বল্লভপুরে হাট স্থাপিত হবে এই কথা শুনে সে বল্‌ছিল যে, সেখানে গিয়ে সে একটা দোকান খুলবে। আমি এখনও তার প্রস্তাবে সম্মত হই নাই। আপনার কাছে শুনছি, আপনার পুত্র নগেন্দ্রও কিছু একটা কাজ কর্‌তে চায়। কিন্তু আপনিও এখন পর্য্যন্ত কিছু স্থির কর্‌তে পারেন নাই। তারা যখন কিছু কাজ কর্‌তে চায়, তখন একটা কাজে তাদের লিপ্ত ক'রে দেওয়া আবশ্যক। নতুবা, পরে কোনও কাজে আর তাদের তেমন উৎসাহ থাকবে না। আমার মনে হয়, হরিধন আর নগেন্দ্র যদি একত্র মিলে কাজ করে, তা হ'লে কতকটা সুবিধা হ'তে পারে। আপনি নিকটে আছেন, সর্ব্বদা তাদের কাজের তত্ত্বাবধান কর্‌তে পারবেন; আর আমিও অবসর-মত গিয়ে দেখে শুনে আসব। টাকাকড়ি সব আপনার কাছেই থাকবে। রোজ যা নগদ বিক্রয় হবে, তহবীল মিলিয়ে আপনার কাছে তা জমা রাখবে। আপনি যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হ'ন, আর অংশমত টাকা দেন, তা হ'লে, না হয়, একটা যৌথ কারবার খোলা যায়।"

ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপাততঃ কি কি বিষয়ের কারবার খুল্‌তে চান?"

মাধবদত্ত বলিলেন "প্রথমে একটী আড়ত খুল্‌তে চাই। আড়তে চাল, কলাই, গম, সরিষা, সব রকমেরই শস্য থাকবে, খরিদ্দারও অনেক আস্‌বে। যারা জিনিষ বেচ্‌তে আস্‌বে, তাদের জিনিষ বেচে দেওয়ার জন্য আমরা দস্তরী পাব; যারা ক্রয় কর্‌বে, তাদের গরজ অনুসারে তারাও সময়ে সময়ে কিছু দস্তরী দেবে। আমরা কেবল ব্যাপারীর জিনিষপত্রগুলি উচিত দরে বেচে দিয়ে ক্রেতার নিকট থেকে টাকা আদায় করে দেব। বেচা-কেনা সব নগদ টাকায় হ'বে। ধারে কারেও জিনিষ দেওয়া হবে না। তবে যারা মাল নিয়ে আস্‌বে, তাদের মাল বিক্রয় না হ'লে, তারা কখনও কখনও আমাদের গুদামে মাল রেখে যাবে; আর হয়ত কখনও কখনও সেই মালের উপরে তাদের কিছু টাকাও দাদন কর্‌তে হবে। এতে বিশেষ কিছু ঝোঁক নাই। এই জন্য আপাততঃ আমাদের পাঁচশত টাকা মূলধন চাই। চাল, কলাই ইত্যাদি ব্যতীত, লাহার সময়ে লাহা, তসরের সময়ে তসর, হরিতকী আমলা কুসুমবীজ প্রভৃতি বনজ মালের সময় বনজ মাল,—এই সমস্ত দ্রব্যও আড়তে আমদানী হবে। কিন্তু এই কাজের জন্য একটী পাকা কারবারী লোক চাই। নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে মহেশহালদার নামে একজন গন্ধবণিক্ আছেন। সেই লোকটি খুব ভাল ও হুঁসিয়ার লোক—এই সব কাজে একপ্রকারের ঘুণ। তাঁকে খাওয়াপরা ব্যতীত মাসে দশটি টাকা বেতন দিলেই চলবে। এছাড়া মাল ওজন করা ও অন্যান্য কাজের জন্য আরও দুই তিন জন লোক রাখ্‌তে হবে। তাদের বেতন ও বাসাখরচ ইত্যাদি বাবতে মাসে

৫০।৬০ টাকা খরচ হ'তে পারে। কিন্তু যদি আড়ত চলে, তা হ'লে ঐ এক আড়ত থেকেই মাসে দুইশত টাকা আয় হ'বে। আর আড়ত না চল্‌বার তো আমি কোনও কারণ দেখি না। হাট বসাবার আগে চারিদিকের গ্রামে ঢোল দেওয়াতে হবে। একবার লোকজন আস্‌তে আরম্ভ কর্‌লে মুখে মুখে হাটের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। আমি ঝালদ্যা, তুলীন, চাঁড়িল, বেগুনকুদ্‌, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে সংবাদ পাঠিয়ে দেব। আমাদের নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামের গন্ধবণিকেরাও তাঁদের জিনিষপত্র হাটে বেচতে নিয়ে আস্‌বেন। এ অঞ্চলের সব লোককেই আমি চিনি, আর মহেশ হালদারও চেনেন। সুতরাং ঠক্‌বার সম্ভাবনা খুব অল্প।

"এই হ'ল একটী কারবার। এই কারবার ছাড়া হাটের নিকটে আমাদের তিনটি দোকান খুল্‌তে হবে। একটী কাপড় আর বাসনের দোকান, একটী মশলার দোকান, আর একটী মনোহারীর দোকান। এখন বেশী পুঁজির দরকার নাই। কাপড় ও বাসনের দোকানের জন্য আপাততঃ হাজার টাকা পুঁজি হ'লেই যথেষ্ট হবে। এদেশের লোকে যে রকম কাপড় পরে ও পছন্দ করে, সেই রকম কাপড়ই বেশী রাখতে হবে; অন্যান্য রকমের কাপড়ও আবশ্যকমত রাখ্‌লেই চল্‌বে। বাসনও নানা রকমের আনাতে হবে। মশলার দোকানের পুঁজি আপাততঃ পাঁচশত টাকার বেশী দরকার হবে না। মনোহারী দোকানেরও পুঁজি সাতশত টাকার বেশী নয়। মনোহারী দোকানে বিলক্ষণ লাভ হবে। এদেশের লোকে যে যে জিনিষ পছন্দ করে, সেই সমস্ত জিনিষই বেশী রাখ্‌তে হবে। মনোহারী দোকানে অল্প দামের আয়না, চিরুণী, কাচের বাটী, ফিতে, গেঞ্জী, নানা রঙ্গের কাচের মালা, পলার মালা, পুতির মালা, দুই এক ডজন মোজা, দুই এক ডজন রুমাল, শ্লেট্ পেন্‌শিল্, কলাইকরা লোহার বাটী রেকাব প্রভৃতি, কালী, কলম, চিঠির কাগজ, সাদা কাগজ, বাদামী কাগজ, ছুরী, কাঁচি, ছুচ-সূতা, বাতিল, লণ্ঠন, হ্যারিকেন্ লণ্ঠন, ল্যাম্প, বাল্‌টী, অল্পদামের নানা প্রকার সুগন্ধি তৈল, সাবান, তোয়ালে, চীনামাটীর পুতুল, ছেলেদের নানারকমের খেলনা যেমন বাঁশী ঝুমঝুমী ইত্যাদি, তাস, দুই দশখানা বটতলার রামায়ণ মহাভারত ও পাঁচালী, ছেলেদের জন্য বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ইত্যাদি, অল্পমূল্যের পশমের কম্ফর্টার ও টুপি—এই সব জিনিষ রাখ্‌তে হবে। এ ছাড়া, এই দোকানে তারের চালুনী, লোহার কড়া, ছান্‌তা, হাতা, বেড়ী, কোদাল, কুড়ুল, টাঙ্গি, গাঁতি, লাঙ্গলের ফাল, স্ক্রু, জলুই, গজাল, কাঁটা, এই সবও রাখ্‌তে হবে। এদেশের লোকেরা এই সকল দ্রব্য সর্ব্বদাই চায়, আর তা কিন্‌বার জন্য পুরুলিয়া, ঝালদা, বলরামপুর প্রভৃতি স্থানেও যায়। কাট্‌তীর মুখেই লাভ; জিনিষ যেমন কাট্‌তি হবে, তেমনই লাভ হবে।

"এখন ধরুন, আড়তের জন্য আপাততঃ ৫০০৲ টাকা, কাপড় বাসনের দোকানের জন্য ১০০০৲ টাকা, মশলার দোকানের জন্য ৫০০৲ টাকা, আর মনোহারী দোকানের জন্য ৭০০৲ টাকা, এই মোট ২৭০০৲ টাকা পুঁজির আবশ্যক। এছাড়া গুদামের জন্য করুগেটেড্ লোহার ছাদের একটী ঘর, আর তিনটি দোকানের জন্যও ঐরূপ ছাদের তিনটি ঘর প্রস্তুত কর্‌তে হবে। তা'তেও ৫০০ টাকা খরচ হবে। তা হ'লে মোট ৩২০০৲ টাকার দরকার। এ ছাড়া ৭০০।৮০০ টাকা মৌজুৎ রাখ্‌তে হবে। তা হ'লে ৪০০০৲ টাকা মূলধন আবশ্যক। আপনি যদি ২০০০৲ টাকা দেন, আর আমিও ২০০০৲ টাকা দিই, তা হ'লে বল্লভপুরে একটী বেশ কার্‌বার চল্‌বে। গুদাম আর দোকানগুলি পাশাপাশি হ'লেই ভাল হয়। হরিধন যদি বাসন-কাপড়ের দোকানে থাকে, আমার মেজছেলে কৃষ্ণধন যদি মশলার দোকানে থাকে, আপনার নগেন্দ্র যদি মনোহারী দোকানে থাকে, আর মহেশ হালদার যদি আড়তের জিম্মায় থাকেন, তা হ'লে ৩৫০০৲ টাকা মূলধন খাটিয়ে যদি বৎসরের শেষে সাড়ে তিন হাজার টাকাই লাভ হয়, তা'তেও বিস্মিত হবেন না।"

ক্ষেত্রনাথ সত্যসত্যই বিস্মিত হইয়া বলিলেন "সাড়ে তিন হাজার টাকা মূলধনে সাড়ে তিন হাজার টাকা লাভ কি রকমে হ'বে, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। লাভের হার কি খুব বেশী ধর্‌বেন?"

মাধবদত্ত হাসিয়া বলিলেন "আরে, মশায়, না, না। আপনি নিজে গন্ধবেণে, এ কথাটা আর বুঝ্‌তে পার্‌লেন না? প্রত্যেক চালানে টাকায় যদি দুই আনা লাভ থাকে, আর বৎসরের মধ্যে আটবার সেই টাকার জিনিষ আনিয়ে যদি ঐ হারে লাভ করা যায়, তা' হ'লে বৎসরের শেষে টাকায় টাকা লাভ হ'বে। এই জন্যই তো বলছিলাম, কাট্‌তির মুখেই লাভ। পুরুলিয়ার অনেক দোকানদার টাকায় দুই আনারও অধিক লাভ রাখে। আমরা এখানে টাকায় দুই আনা লাভ রাখ্‌লে, পুরুলিয়ার দরেই জিনিষ বেচতে পারব। যদি জিনিষের কাটতি বেশী হয়, তা হ'লে লাভের হার কম করলেও ক্ষতি নাই। কেননা কাট্‌তির মুখেই লাভ। বৎসরের মধ্যে যত বেশীবার চালান আস্‌বে, লাভের পরিমাণও ততই বাড়্‌বে।" এই বলিয়া মাধবদত্ত কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে বলিলেন "হাটে লোকের আমদানী আর বেচাকেনা বেশী রকম হ'লে, অন্য একটী উপায়েও আপনার কিছু আয় হবে। যত লোক হাটে জিনিষ বেচ্‌তে আস্‌বে সকলেরই নিকট আপনি কিছু কিছু তোলা পাবেন। তাতেও আপনার বাৎসরিক দুই তিন শত টাকা আয় হ'তে পারে।" পুনর্ব্বার কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া মাধবদত্ত আবার বলিতে লাগিলেন "দেখুন, আমি এই অঞ্চলের সব হাটই দেখেছি। সে-সব হাটে দুই একটী ছোট আড়ত, আর দুই একটী সামান্য দোকান আছে। কিন্তু আমি যে রকম দোকানের কথা বল্‌লাম, সে রকম দোকান এক পুরুলিয়া ব্যতীত এ অঞ্চলে বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। এ অঞ্চলের কোন কোন দোকানদার ঠিক যেন ডাকাতের মত ব্যবহার করে। সাঁওতাল, কুড়মি আর পাড়াগাঁয়ের লোক দেখ্‌লেই তারা তাদের ঠকিয়ে বসে। আমরা খরচ পুষিয়ে আর কেবল সামান্য লাভ রেখে জিনিষ বেচ্‌ব। আমাদের সাধুতায় লোকে একবার বিশ্বাসস্থাপন করলে, সহজে সে বিশ্বাস টল্‌বে না। ব্যবসায়ে সাধুতা না থাকলে, তায় কখনও শ্রীবৃদ্ধি হয় না। গন্ধবেণের একটী উপাধি হচ্ছে সাধু, তা আপনি জানেন।"

ক্ষেত্রনাথ মাধবদত্ত মহাশয়ের নিকট কারবারের প্রস্তাব শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন "আপনি একজন বহুদর্শী, প্রবীণ ও পাকা লোক। আপনার কাছে যা শুন্‌লাম, তা'তে মনে হয়, আপনার পরামর্শ অনুসারে কাজ করলে, নিশ্চয়ই কারবারে লাভ হবে। কিন্তু মশলা, মনোহারী ও বাসনকাপড়ের দোকানে এক এক জন লোক থাক্‌লে তো চল্‌বে না। আরও সহকারী লোক চাই।"

মাধবদত্ত হাসিয়া বলিলেন "তার জন্য ভাব্‌ছেন কেন ক্ষেত্রবাবু? কারবারে যদি লাভ হয়, এক একটি দোকানে এক এক জন সহকারী কেন, পাঁচ পাঁচ জন সহকারী নিযুক্ত করা যাবে। লোকের অভাব হবে না। খাওয়া পরার ব্যবস্থা থাক্‌লে, আর মাসে মাসে কিছু বেতন দিলে অনেক সহকারী পাওয়া যাবে। এ অঞ্চলে স্বজাতির অনেক ছেলে বেকার বসে আছে। তাদের মধ্যেই একজনকে এখন পাক করতে নিযুক্ত করা যাবে। সে পাকও করবে, আর অবসর-মত দোকানেও বস্‌বে। ডাল, ভাত আর একটা তরকারী রাঁধলেই যথেষ্ট হবে ব্যবসা করতে গেলে কি নবাবী করা চলে? আমার ছেলেরাও সেখানে থাক্‌বে; সকলে যা খাবে, তারাও তাই খাবে। প্রথমে দুঃখ না করলে কি কখনও সুখ হয়?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "আপনি যা বল্‌ছেন তা খুব সত্য। যাই হোক্‌, আপনার প্রস্তাবটী আমি বেশ ক'রে বুঝে দেখি; তারপর শীঘ্রই আপনাকে আমার মত জানাব।" এই বলিয়া তিনি মাধবদত্ত মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বল্লভপুরে প্রত্যাগত হইলেন। (ক্রমশ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

প্রদক্ষিণ

আমারি দরশ মাগি অবিরাম ঘুরে এস তুমি,
সারা পৃথ্বী, অতিক্রমি শৈল সিন্ধু নদী বনভূমি;
ধরণী যেমন সদা বসন্তের আনন্দের লাগি,
তপনে ঘুরিয়া চলে, সারাবর্ষ অহর্নিশি জাগি!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

প্রতিফল

(ঐতিহাসিক গল্প)

বড় বিরাট পুরুষ ছিলেন মাকিদনরাজ সেকেন্দর সাহ। অমন বীর আর কেহ আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসেন নাই। দুর্দ্দান্তেরও দুর্দ্দান্ত যে অশ্বকিনয় জাতি—আর দশহাজার রাজপুত অসি যাদের সহায় ছিল—তারাও সেকেন্দরের বীরত্বের কাছে টিকিল না।

এই অশ্বকিনয় জাতির রাজধানী মেসেগা ছিল ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম কোণে। পাহাড়ে জঙ্গলে আকীর্ণ সে দেশ। তার পূর্ব্বপশ্চিম দুইদিক্ দিয়া সোয়াত ও কুণারের জলধারা কাবুল নদীর দিকে ছুটিয়াছে। তিন সীমায় তিনটি স্বভাবের পরিখা লইয়া উত্তরে উন্নত পর্ব্বতপ্রাচীর লইয়া আর চারিদিকে চারি মাইল প্রস্তর-প্রাকারে বেষ্টিত হইয়া, অজেয় মেসেগার দুর্ভেদ্য দুর্গ দাঁড়ায়মান—ইহা হিমাচলের মত সুদৃঢ়, কারাগারের মত সুরক্ষিত, পাতালপুরীর মত অনধিগম্য।

এ রাজ্যের যারা অধিবাসী, তারা ছিল স্বভাবতঃই বীর। মালভূমির পবিত্র বায়ু তাদের রক্তে সজীবতা দান করিয়াছিল. শৈলভ্রমণের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যায়াম তাদের মাংসপেশীতে শক্তি যোজনা করিয়াছিল, এবং জীবিকার কঠোর সংগ্রাম তাহাদিগকে সকল বিষয়ে কষ্টসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল। তাদের খর্ব্বকায় ঘোটক পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ী হরিণের মত ছুটিত; তাদের দীর্ঘ বর্শা সাততাল ভেদ করিয়াও শক্রর বুকের রক্তপান করিত, তাদের সুযোজিত ধনুর্ব্বাণ মেঘের উপরে বাজের চক্ষু লক্ষ্য করিত। এমন জাতি অশ্বকিনয়, আর তাদের সহায় ছিল দশ হাজার সিন্ধু-মরুর রাজপুত।

সেই দশ হাজার রাজপুত আর পঞ্চাশ হাজার অশ্বকিনয় পাঁচ দিন পর্য্যন্ত সেকেন্দর সাহকে যুদ্ধ দিল। পাঁচ দিনে পাঁচ হাজার সৈন্য প্রাণ দিল—বাইশ হাজার অশ্বকিনয় আর তিন হাজার রাজপুত। কিন্তু গ্রীক সৈন্য দুর্গদ্বারে পৌছিতে পারিল না। ছয় দিনের দিন দুই হাজার গ্রীক্‌সৈন্য হস্তীদেশ লুণ্ঠন করিয়া কুণার পার হইয়া সেকেন্দরের সৈন্যের সঙ্গে মিলিল।

মেসেগা-সর্দ্দার যখন এ সংবাদ শুনিলেন, তখন পাত্র মিত্র সৈন্য সেনাপতি সকলকে জড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বল দেখি বীরগণ, আজ তোমাদের কর্ত্তব্য কি?"

কেহ বলিল "পিতৃপিতামহ হইতে এ দাস মেসেগার বুকে খেলিয়া আসিয়াছে, আজ সে মেসেগার বুকে প্রাণ দিবে।"

কেহ বলিল "এ পাহাড়ী ভূমির রাঙা মাটীতে নিজের হৃদয়খানি এতদিন বিছাইয়া রাখিয়াছিলাম, আজ পরের পদধূলি পড়িবার আগে হৃদয়ের রক্ত দিয়া তাকে ডুবাইয়া দিব।"

আবার কেহ বলিল—"এ জন্মে বহু চিতায় আগুন ধরাইয়াছি, আজ বরং নিজের চিতা নিজে রচনা করিব, তবু আমাদের এ পাহাড়-তলীর ফটিকগালা ঝরণা পরের পায়ের ধূলি মাখিবে, তা দেখিতে পারিব না।"

তখন সর্দ্দার সিন্ধুসেনাদের ডাকাইলেন "রাজপুতগণ! সত্য বল দেখি, আজ তোমরা কার?"

রাজপুতগণ উত্তর করিল "যতদিন মেসেগার একটিও পুরুষ মেসেগার জন্য লড়িবে, ততদিন আমরা মেসেগার।"

"তারপর?"

"তারপর যে আমাদিগকে রাখিতে পারে, আমরা তার।"

মেসেগাপতি রাজপুতদিগকে ভুল বুঝিলেন। মনে করিলেন বা বিপদ দেখিলে ইহারা সেকেন্দর সাহের পক্ষও লইতে পারে। "অতএব ইহাদের যুদ্ধশেষ পর্য্যন্ত বন্দী করিয়া রাখ।"

সাত হাজার রাজপুত কোন কথা না বলিয়া ধীরপদে দুর্গ-কারাগারে প্রবেশ করিল।

এদিকে সদরপথে দুর্গে প্রবেশ করা অসম্ভব দেখিয়া সেকেন্দর সাহ অন্য উপায় দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু উপায় কোথায়? পাহাড়ে যদি চড়িতে পারা যায়, তার বাহিরে ত প্রাচীর আছে! প্রাচীর যদি ভাঙ্গিতেই পারা যায় তার বাহিরে ত পরিখা আছে! গ্রীকবীর চিন্তিত হইলেন। অবশেষে আদেশ করিলেন যে গভীর পরিখার একটা দিক্ গাছপাথর মাটি ফেলিয়া ভরিয়া তুলিতে

হইবে। শত্রুর তীরের ঘা খাইয়াও তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৈন্যদের উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এমন লোকের নাড়া পাইলে মড়ার দেহেও সাড়া আসে। গ্রীকসৈন্যগণ অন্তরের মধ্যে মহাপ্রাণের স্পর্শ পাইয়া প্রবলবেগে দুঃসাধ্য সাধন করিতে লাগিল। অবশেষে নয় দিনে সে "সেতু-বন্ধ" শেষ হইল।

দশদিনের দিন যখন ভোর হইয়াও হয় নাই; চাঁদের মণ্ডল ডুবিয়াছে, ত তারার হাসি মিলায় নাই; গাছের মাথায় আলো পড়িয়াছে, কিন্তু গাছের তলায় অন্ধকার রহিয়া গেছে; সেকেন্দর সাহ তখন সৈন্য লইয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। গ্রীক সৈন্যের তীরের রাশি ঝড়ের মুখের ধূলির মত ছুটিল। মেসেগা সৈন্যগণ আশা করে নাই যে এত সকালে গ্রীকগণ হানা দিবে। সুতরাং তারা দুর্গদ্বারে এক-শ প্রহরী খাড়া রাখিয়া ভিতরে যুদ্ধের সাজ পরিয়াই ঘুমাইতেছিল। এমন সময়ে প্রধান প্রহরীর বিপদের শিঙা যখন বাজিয়া উঠিল, তখন তারা বাঁ হাতে চক্ষু মুছিয়া আর ডান হাতে বর্শা ধরিয়া লাফে লাফে বাহির হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে গ্রীকসৈন্য দেখিল, তাদের সম্মুখে মেসেগার পঁচিশ হাজার অসি পার্ব্বত্য নদীর ক্ষিপ্ত তরঙ্গের মত নাচিতেছে।

তখন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দুর্দ্দম পাহাড়িয়া জাতি ত আর ভয় কাহাকে বলে জানে না; মৃত্যু তাহাদের কাছে নিদ্রার মত সামান্য, অসির আঘাত পিঁপড়ার কামড়ের মত তুচ্ছ; তারা কেবল মারে আর মরে, কিন্তু পথ ছাড়ে না; গ্রীকসৈন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। বেলা প্রহর খানেক থাকিতে বিশহাজার অশ্বকিনয় প্রাণ দিয়াছে; কিন্তু বাকী পাঁচ হাজার যে আছে, তারা পাষাণ-প্রাচীরের মত অটল। এদিকে সেকেন্দর সাহের তীরন্দাজগণ সারাদিনের পরিশ্রমে অবসন্ন। তবে উপায়? ভুবন বিজয় করিয়া কি মাকিদনের গৌরব ভারতবর্ষের পাহাড়ের গহ্বরে তলাইয়া যাইবে? সেকেন্দর সাহ হাত তুলিয়া গ্রীকদিগকে প্রশ্ন করিলেন, 'আর অমনি হাজার সৈন্য লাফাইয়া উঠিল। যারা লড়িতেছিল, তারাও লাফাইয়া উঠিল, আর যারা রক্তপাত হইতে হইতে অবশ-দেহে পড়িয়া রহিয়াছিল, তারাও লাফাইয়া উঠিল। সেকেন্দর তখন বাছা বাছা পাঁচশত নূতন সৈন্য লইয়া শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। অসুরের মত বলশালী সে সেনাগণ; বাজের মত ক্ষিপ্র তাদের গতি; সিংহ-নখের মত তীক্ষ্ণ তাদের অস্ত্রফলক। পাঁচশত লম্বা বর্শা সামনে পাতিয়া যখন তারা বেগে ধাওয়া করিল, মেসেগার রণক্লান্ত খর্ব্বকায় বীরগণ তখন মাটিতে নিষ্পেষিত হইয়া গেল। মাকিদন-বীর হাঁপ ছাড়িয়া দুর্গ অধিকার করিলেন।

দুর্গের সাত হাজার রাজপুত বন্দী তখন সেকেন্দর সাহের হাতে। সেকেন্দর পাঁচদিন ইহাদের বিক্রম লক্ষ্য করিয়াছেন; ইহাদের অব্যর্থ হাতের তীক্ষ্ণ তীরের মুখে পাঁচ হাজার প্রাণপ্রিয় সৈন্যকে বলি দিয়াছেন; আজ ইহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন যে, এই সাত হাজার সৈন্য যদি ভারতবর্ষে ফিরিয়া যায়, তবে গ্রীকের ভারত জয় সিন্ধুনদীর পশ্চিম পারেই সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। তাই এবার তাঁকে রাজনীতির আশ্রয় লইতে হইল। বন্দীদের প্রতি আদেশ হইল "তোমরা সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট সেকেন্দর সাহের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছিলে, সুতরাং তোমরা প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত। কিন্তু সম্রাট দয়াবশে তোমাদিগকে মার্জ্জনা করিতে পারেন—যদি তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে ভারত জয়কালে তাঁহার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবে।'

আদেশ শুনিয়া রাজপুতদের মধ্যে প্রথমে একটা মত কাটাকাটি চলিল। কেহ নীরব থাকিল; কেহ বলিল "ভালই বুদ্ধি করিয়াছে সেকেন্দর সাহ।" কেহ বলিল "প্রাণ দিতে হয়, তাতেও রাজি আছি; কিন্তু দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা—জীবন থাকিতে তা হইবে না।" তার পর কতক্ষণ কি কানাকানি পরামর্শ চলিল। একজন হঠাৎ বলিয়া উঠিল "বিশ্বাসঘাতকতা!" একজন উত্তেজিত হইয়া উত্তর দিল "বিশ্বাসঘাতক হইয়া নরকে যাই, তাও ভাল; তবু দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিব না।" তখন আর সকলে ধরিয়া তাহাদিগকে নীরব করিয়া দিল। সন্ধ্যার সময় সেকেন্দর উত্তর পাইলেন "সম্রাট যদি সম্প্রতি তাঁর বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেন, তবে ভারতবর্ষে

পৌঁছিয়াই তিনি তাহাদিগকে পক্ষে পাইবেন।" সেকেন্দর সাহ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন "আচ্ছা, কাল সকালে ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিও।"

রাজপুতদের মধ্যে একব্যক্তি ছিল, নাম তার চন্দন। চন্দন দ্বিপ্রহর রাত্রে শিবিরে গিয়া সেকেন্দর সাহের দর্শন মাগিল। নয়দিনের অনিদ্রার পর সেকেন্দর সাহের তখন একটু ঘুমের আবেশ আসিয়াছিল। কিন্তু রাজপুত সেনার কথা শুনিয়া সকল জড়তা বাসন্তী কুয়াশার মত মিলাইয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজপুত তাঁহাকে কুর্ণীশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "সম্রাট, ভয়ে বলিব, না নির্ভয়ে বলিব?"

সম্রাট উত্তর করিলেন "সেকেন্দর সাহের কাছে কথা বলিতে কারো ভয় পাইবার কারণ নাই।"

চন্দন বলিল "রাজপুত সেনারা পরামর্শ করিয়াছে, সম্রাটের হাতছাড়া হইলেই তারা দেশের জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইবে।"

একটা বিকট ভ্রূভঙ্গী সেকেন্দর সাহের কপালের উপর আষাঢ়ের বিদ্যুদ্দীর্ণ মেঘের মত ঘনাইয়া উঠিল।

পরদিন ভোর বেলা যখন রাজপুতগণ বাহির হইবে, তখন দেখে, তাদের ক্ষুদ্র কারাগৃহ অসংখ্য গ্রীক্‌সৈন্যে পরিবেষ্টিত, উষালোকে তাদের উন্নত বর্শাফলক দাবানলের লক্ষ শিখার মত লক্ লক্ করিতেছে।

ধীরে ধীরে সত্য তাদের মনে গ্রীষ্মমধ্যাহ্নের কঠোর আলোকের মত পরিষ্কার হইয়া আসিল। প্রাণ দেওয়ার বাড়া আর উপায় কি? প্রাণের জন্য যদি কিছু মমতা থাকে, তা শুধু কাজের সময় তাকে পাত করিবার জন্যই। প্রাণের জন্য প্রাণের মমতা রাজপুত রাখে না। সুতরাং সাত হাজার কণ্ঠ গর্জ্জিয়া বলিল "মারো আর মর।" অমনি সাত হাজার বন্দীর সাত হাজার তলোয়ার কোষের মধ্যে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল; পরমুহূর্ত্তে সাতহাজার বিদ্যুৎ গ্রীক্‌সৈন্যমধ্যে লাফাইয়া লাফাইয়া খেলাইতে লাগিল। রাজপুতের অসি নির্ভীক-বিদ্যুতের মত ছুটে, ক্ষুরের মত কাটে; সেকেন্দর সাহ মুহূর্ত্তের জন্য প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু তাঁর অসংখ্য সৈন্য শীঘ্রই সেই অসিসম্বল রাজপুতদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল; গ্রীসের দীর্ঘ বর্শার কাছে ইহারা ঘেঁসিতে পারিল না। অবশেষে নিরাশ হইয়া পাগলের মত শত্রুর অস্ত্রমুখে পড়িতে লাগিল। সে ভীষণবেগে গ্রীক্‌সৈন্য টলেটলে হইল—কিন্তু টলিল না।

পরে যখন বেলা পড়িয়া আসিল, সূর্য্যদেব পশ্চিম-আকাশের একরাশি মেঘের তলে ডুবিয়া গেলেন, আর মানুষের রক্তগন্ধে লুব্ধ শৃগাল অদূর বনমধ্য হইতে উল্লাসে চীৎকার করিতে লাগিল, রাজপুতদের শেষ বীর তখন ভাঙা অসির প্রচণ্ড কোপে একজন মেকিডনীয়কে হত ও একজনকে আহত করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, শত্রুর বর্শা তাঁর পাঁজর ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

সেকেন্দর সাহের ভারত আক্রমণের পথ এমনি করিয়া নিষ্কণ্টক হইল। দিগ্বিজয়ী বীর, চন্দনের হাতে মেসেগার শাসনভার দিয়া, পূর্ব্বদিকে সৈন্য চালনা করিলেন।

(২)

চন্দনের কূটবুদ্ধি সেকেন্দর সাহ ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন। আর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, একটা নূতন রাজ্যকে বশে আনিতে এমনি লোকের প্রয়োজন। সামান্য সেনা চন্দন তাই একটা রাজ্যের রাজা হইল; পাঁচ-শ গ্রীক্‌সৈন্য তার ইঙ্গিত মানিয়া চলিতে লাগিল; অশ্বকিনয়রা ত চিনিতেই পারিল না, এ কোন্ চন্দন। এ কি সেই—যে নির্ঝরিণীর কূলে বসিয়া পাথরের উপর হেলিয়া পড়িয়া পাহাড়ী বালকদের কাছে সিন্ধুনদীর বিশাল জলধারার গল্প করিত? যে রাত্রিবেলা কুটীরের আঙ্গিনায় আগুন পোহাইতে পোহাইতে মেসেগার পিতা পুত্র কন্যার কাছে রাজপুতানার মরুভূমির কথা কহিত? যে হিংবনের কোণায় কোণায় পাথরের সৈন্য সাজাইয়া মেসেগা শিশুদের যুদ্ধকৌশল শিখাইত? এ কি রে অপরূপ খেলা!

চন্দনও ভাবিল—এ একটা ভাগ্যের খেলা! অথচ তার মনে হইল না, যে, খেলা যখন-তখনই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। তাই যখন ভোরবেলা দরবার করিতে বসিলে গ্রীক্‌সেনা তাকে কুর্ণীশ করিত, যখন কোন গল্পের সাথী বৃদ্ধ অশ্বকিনয় ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তার রাজপদে বিচারের আবেদন লইয়া আসিত, সন্ধ্যাবেলায়

দুর্গপ্রাচীরে দাঁড়াইয়া সেই বিশাল পার্ব্বত্যরাজ্যের সুবর্ণতরঙ্গমালাকে যখন সে নিতান্ত আপনার বলিয়া ভাবিত, তখন আনন্দে, গর্ব্বে, আশায় তার বুকের ভিতরটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত; একটা মত্ততা তাকে সমস্ত ভুলাইয়া রাখিত। সে ভাবিত, দুনিয়ায় যতটা সুখ আছে, সে ই তার একমাত্র মালীক।

এমনিভাবে কিছুদিন কাটিল।

একদিন চন্দন বিচারে বসিয়াছে। একজন অশ্বকিনয়-রমণীর শিশুপুত্র এক গ্রীকৃবীরের ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়িয়া নিষ্পেষিত হইয়া গেছে, তারই বিচার। রমণী সজল করুণ নেত্রে বলিল "দেখ রাজা, আমার সাত ছেলে ছিল; শালগাছের মত উঁচু, বাপের মত বলিষ্ঠ, কার্ত্তিকের মত সুন্দর—সাত সাতটি ছেলে—নাড়ী ছিঁড়িয়া তাদের পাইয়াছিলাম, বুকের রক্তে তাদের পালিয়াছিলাম, চোখে চোখে তাদের আগুলিয়া রাখিতাম। কুক্ষণে কালযুদ্ধ বাধিল; আমার সাতমণির হারের ছটি মণি একে একে খসিয়া পড়িল। খালি সূতায় একটি মণি ঝুলিতেছিল, এর দিকে চাহিয়া চোখ মুদিয়া বুক বাঁধিয়া পড়িয়া-রহিয়াছিলাম। কাল তোমার তুরুক্‌-সোয়ার তার বুকের উপর দিয়া ঘোড়া চালাইয়া দিয়াছে। ওগো, সে চাঁদমুখে রক্তের ফেনা উঠিয়াছিল। সে কচি হাড়—না না—পারি না রাজা, আর বলিতে পারি না—তোমার ধর্ম্ম তোমার ঠাঁই।" অনাথিনী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; শিশুগণ তার কান্না শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল; সৈন্য সেনাপতি পাইক চর চক্ষু মুছিল; কঠোর হইতেও কঠোর যে জল্লাদ সেও চোখের জল লুকাইতে এদিক্ ওদিক্ চাহিতে লাগিল; কিন্তু চন্দন টলিল না। সে রাজা—মৃত্যুশিলার মত স্থির; শ্মশানের মত গম্ভীর; পাষাণের মত অকর্দ্দম। স্থির কণ্ঠে সে উত্তর করিল "তুরুকসোয়ারের কোন অপরাধ নাই। তোমার পুত্র অসাবধান। সে আপন পাপের ফল পাইয়াছে। তোমার কান্নাকাটি বৃথা। যে ছয় ছেলেকে বলি দিয়াছে, তার একছেলের জন্য আবার দুঃখ কি?"

শুনিয়া হতভাগিনী নারী কপালে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িল; আর সেই আঘাতের শব্দ হঠাৎ যেন চিতানলের কাঠ ফাটার শব্দের মত চন্দনের বুকে বাজিয়া উঠিল। কিন্তু চন্দন নিমেষমধ্যে আপনাকে সামলাইয়া লইলেন।

দিনও গেল না—প্রহরও গেল না—দণ্ডও গেল না—পাঞ্জাব হইতে খবর আসিল সিন্ধুরাজের সাত হাজার সৈন্য ও সাতজন সেনাপতি সেকেন্দর সাহের যুদ্ধে হত হইয়াছে। চন্দন অমনি লাফাইয়া উঠিয়া বলিল "সৈন্যের সেরা সৈন্য আমার সাত পুত্র—আলোরের সেনার সরছাঁকা ননী!"

চন্দন নূতন রাজ্যের দিকে চাহিলেন না, নূতন রাজপদের দিকে চাহিলেন না—সব ফেলিয়া, সৈন্যসামন্ত মন্ত্রী সেনাপতি সব ছাড়িয়া ঘোড়ায় চড়িলেন; পাগলের মত ভারতবর্ষের দিকে ছুটিয়া চলিলেন।

উন্মত্ত উপদেবতার মত চন্দন ছুটিলেন। পোয়াপথ যাইতে না যাইতে মুখে ফেনা উঠিয়া ঘোড়াটি মারা পড়িল, হাতে ছিল সোনার অঙ্গদ, তাই দিয়া এক পার্ব্বত্য ঘোড়া কিনিয়া লইয়া আবার ছুটিলেন। কিছুদুর গিয়া এক পার্ব্বত্যনদী লাফ দিয়া পার হইতে সেটিও পা ভাঙ্গিয়া চিত হইয়া পড়িল। তখন গলার মালা ফেলিয়া দিয়া কিনিলেন আর এক ঘোড়া। এমনি করিয়া অশ্রান্ত দিবস অনিদ্র রজনী ছুটিতে ছুটিতে, কোনদিন বা ফলাহারে, কোনদিন বা জলাহারে, কোনদিন বা অনাহারে কাটাইতে কাটাইতে, আধমরার মত চন্দন যখন আলোরে পৌছিলেন, তখন সেখানকার দগ্ধ গৃহসমষ্টির ভস্মরাশি হইতে ধুঁয়ার কুণ্ডলী বিগতদুর্দ্দৈবের স্মৃতির মত থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। অস্থির চিত্তে তিনি বাড়ীর খোঁজে চলিলেন। কোথায় বাড়ী? কেবল পোড়া অঙ্গার, আর আধপোড়া শবের রাশি। ঘরের আধপোড়া খোঁটাগুলি সন্ধ্যার আলোকে মহাশ্মশানের প্রেতের মত দাঁড়াইয়া আছে। কার বাড়ী কোথায় ছিল, তার চিহ্নমাত্রও নাই!

চন্দন পাগলের মত ছুটিতে লাগিলেন। পথে এক কৃষকের সঙ্গে দেখা। "তুমি কে হে? তুমি কে হে? বীরের সেরা বীর আলোরের সেনার সরছাঁকা ননী সাতভাই রাঠোরের খবর জান?"

"সাত ভাই রাঠোর ?"

"হাঁ হাঁ ! আলোরের সেনার সরছাঁকা ননী সাতভাই রাঠোর !"

"ইঃ ! তারা কি ভয়ঙ্কর লড়েছে !"

"তারপর ?"

"তারপর সেকেন্দর সাহের অসুরের মত সেনাদলকে তিন তিন বার হটিয়ে দিয়েছে।

"বেঁচে আছে তারা ? বল বল—শীঘ্র বল—সাত ভাই রাঠোর"—

"সাত ভাই ত নয়, সাতহাজার সৈন্য ! ভুবনবিজয়ী বীর সেকেন্দর তাদের বর্শার মুখে পড়্‌তে পড়্‌তে বেঁচে গেলেন।"

"আর তারা সাত ভাই ?"

"সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তারা সাত ভাই লড়্‌ল—আলোরের দশহাজার সেনা তখন প্রাণ দিয়েছে।"

"তারপর ?"

"তারপর রাজাকে আর ছয় মন্ত্রীকে পালাতে বলে তারা এক-শ মাত্র সৈন্য নিয়ে লড়্‌তে লাগ্‌ল।"

"আরো লড়্‌তে লাগ্‌ল ?"

"উঃ ! সে কি ভয়ঙ্কর লড়াই। অন্ধকার চারধারে ঘিরে এসেছে—গ্রীক্‌দের ঘোড়াগুলি ঘন ঘন চীৎকার করছে—সেকেন্দরের পাঁচ-শ নূতন সৈন্য লম্বা লম্বা বর্শা পেতে সার বেঁধে তেড়ে আস্‌ছে"—

"আবার নূতন সৈন্য ?"

"বাছা বাছা—গ্রীক্‌সেনার সার পাঁচ-শ নূতন সৈন্য"—

"হায় হায় ! তারপর ?"

"আলোরের এক-শ সৈন্য তখন করে কি ? তারা সার বেঁধে বুক পেতে দাঁড়িয়ে 'শিবশম্ভু' বলে চীৎকার করে উঠল, আর এক সঙ্গে এক-শ বর্শা শত্রুর কপাল লক্ষ্য করে ছুট্‌ল।"

"আর সাত ভাই ?"—

"এক-শ বর্শা এক-শ শত্রুর কপাল ভেদ করে' চলে' গেল—কিন্তু বাকী চার-শ'র চার-শ' ঘোড়া আলোরের সেনার বুকের উপর দে' ছুটে চল্‌ল।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কি ? কাল সকালে ছয় মন্ত্রীকে শূলে দিয়েছে।"

"আর তারা সাত ভাই ? আলোরের সেনার—সরছাঁকা ননী সাতভাই রাঠোর ?

"তারা বীর !"

"বেঁচে আছে তারা ?"

"কোথাকার বৃদ্ধ তুমি ? বীর কি বাঁচে ? অই তারা বীরের মত শুয়েছে।"

"কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?"

"বীরের মত শুয়েছে। কালা নাকি হে তুমি ?"

"কোথায় ? কোথায় শুয়েছে তারা ?"

"অই—অই ভস্মরাশির নীচে—আলোরের সাতহাজার ঘর জ্বলে' তাদের চিতা রচনা হয়েছে !"

"চিতা ?"

"হাঁ গো হাঁ। শ্মশান ! চিতা !—আর পারিনে তোমার সঙ্গে বকতে।" বলিয়া কৃষক চলিয়া গেল। চন্দন প্রথম কিছুক্ষণ জড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল; লোকটার কথার জাল তার কাছে কেমন এক কুহেলিকাময় স্বপ্নকাহিনীর মত ঠেকিতে লাগিল। তারপর যখন মাথা একটু ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, চারিদিকের ধ্বংসের দৃশ্য যখন পরিষ্কার অর্থ লইয়া চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে যখন ম্যালেরিয়া-কম্পের মত ব্যাপক, সাপের বিষের মত তীব্র, পাপের অনুতাপের মত মর্ম্মস্পর্শী এক বেদনা তার সমস্ত অন্তরকে পীড়িত করিয়া তুলিল, তখন হতভাগা কপালে ঘা দিয়া বুক-ফাটা সুরে ফুকারিয়া উঠিল—"হায়রে হায় ! এই কি আমার ভরা বৎসর গ্রীক্‌সেবার পুরস্কার ?"

তখন চাঁদ উঠিয়াছে; মরুদেশের চাঁদের অবাধ আলো সে মহাশ্মশানের উপর ডাকিনীর অট্টহাসির মত পড়িয়াছে ! চন্দন তীব্র কটাক্ষে একবার আকাশের দিকে চাহিয়া যত দগ্ধ গৃহের ভস্মের স্তূপ সরাইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে রাত্রি স্তব্ধ হইয়া গেল। চাঁদ পূবদিকে উঠিয়াছিল; পশ্চিমদিকে হেলিয়া পড়িল। প্রহরী পাখী প্রহর ডাকিয়া সেই আকাশপাতালব্যাপী নীরবতাকে

বিদ্যুদ্দীর্ণ অন্ধকারের মত আরও গভীর করিয়া তুলিল।' চন্দনের তখনো বিরাম নাই। তাল বেতালের মত অক্লান্তভাবে সে কেবল ভস্মস্তূপের পর ভস্মস্তূপ সরাইতেছে। অবশেষে একরাশি পোড়া খোড়ার নীচ হইতে সাতটি আধপোড়া শবদেহ বাহির হইল। চিনিবার উপায় নাই সেগুলিকে; চামড়া পুড়িয়া গিয়াছে, চোখ ফুটিয়া গিয়াছে, ঠোঁট গলিয়া গিয়া দাঁতের সারি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। চন্দন সেগুলিকে একত্র করিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ভীষণ হাস্যে চীৎকার করিয়া উঠিল "প্রতিফল! প্রতিফল! প্রতিফল!"

তারপর চন্দনকে আর কেহ দেখিতে পায় নাই। কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত, গভীর রাত্রে যখন সংসার নীরব হইয়া যাইত, পশুপাখী মানুষ যখন গভীর স্বপ্নে ডুবিয়া থাকিত, যখন গাছের পাতায় ও আকাশের নীলিমায় মায়াবী রজনী স্তম্ভন মন্ত্র পড়িয়া রাখিত, তখন গ্রামের গৃহস্থরা ঘুম ভাঙ্গিলে শুনিতে পাইত কে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"প্রতিফল! প্রতিফল! প্রতিফল!"

শ্রীঅশ্বিনীকুমার শর্ম্মা।

তিরোধান

(১)

এই কাননে মিলিয়ে গেল আমার মায়ার উর্ব্বশী,
যে গো আমার হৃদ্‌গগনের মোহন সুমধুর শশী।
তার—অধর পাকা বিম্বফলে,
পা'দুটী তার থলকমলে,
চুলগুলি তার মিলাইল তমাল ঝাউয়ের অন্ধকারে,
হরষ তাহার পরশ তাহার—কুসুমরাশির গন্ধভারে।

অঙ্গ তাহার লতিয়ে গিয়ে জড়াল কোন্ বৃক্ষপরি,
পাখীর গানে বাজলো বলয় মুখর বন-বক্ষ ভরি'।
কিসলয়ের তাম্ররাগে
কর দুটী তার রম্য জাগে,
লাবণ্য তার উঠলো ফুটে সকল তরুবল্লীপ্রাণে,
লতায় পাতায় দুকূল দুলে, নূপুর বাজে ঝিল্লীতানে।

(২)

মনের বনে মিলিয়ে গেল আমার মায়ার অপ্‌সরী,
নয়নে আর পাইনাক তায় ফিরেনা সে রূপধরি।
চুলগুলি তার গভীর কালো,
নিরাশাতে তাই মিলালো,
রক্ত চরণ উঠলো ফুটে গভীর রাঙা যন্ত্রণাতে,
হরষ তাহার পরশ তাহার জাগছে বৃথা সান্ত্বনাতে।

লাবণ্য তার, মোহ হয়ে ফেল্লে মোরে অন্ধ করি,
তাহার হাসি আবেশ হয়ে উঠলো হিয়ার রন্ধ্র ভরি'।
স্বপন হয়ে বসন উড়ে
মনের চোখে বেড়ায় ঘুরে,
তাহার আশা ভালবাসা সঙ্গে সে যে লক্ষপাকে
হয়ে স্মৃতির নিবিড় লতা জড়ালো এই বক্ষটাকে।

শ্রীকালিদাস রায়।

ধর্ম্মপাল

[গোপালদেব ও তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক ভগ্নমন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে দস্যুলুণ্ঠিত এক গ্রামের ভীষণ দৃশ্য দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন দুর্গে লইয়া যান।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আর্ত্তত্রাণে

অপরাহ্ণে সন্ন্যাসী তাঁহার অতিথিদ্বয়কে লইয়া বিশ্রামের জন্য পুনরায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা পালঙ্কের উপরে উপবিষ্ট হইলে সন্ন্যাসী গোপালদেবকে বলিলেন, "গোপালদেব! তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে—এ গৃহ কাহার? ইহা দেখিয়া তোমার কি মনে হয় যে, ইহা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর আবাস?"

গোপাল।— না। যেরূপ দুর্ভেদ্য স্থানে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া বোধ হয়, ইহা যুদ্ধ-ব্যবসায়ীর গৃহ। শত্রুর আকস্মিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য জলবেষ্টিত স্থানে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রভু! ইহা ত গৃহ নহে, একটি সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য দুর্গ।

সন্ন্যাসী।— গোপালদেব! সত্য সত্যই ইহা যুদ্ধ-ব্যবসায়ীর গৃহ। ইহা এই অঞ্চলের ভূস্বামীর দুর্গ। প্রভাতে যে গ্রাম দেখিয়া আসিয়াছ, তাহা এই দুর্গস্বামীর অধিকারভুক্ত ছিল।

গোপাল।— দুর্গস্বামী জীবিত থাকিতে তাহার অধিকারে দস্যু তস্করে অত বড় বৃহৎ গ্রামখানিকে শ্মশান করিয়া গেল, দুর্গস্বামী তাহা নির্ব্বিকার চিত্তে দুর্গে বসিয়া দেখিল?

সন্ন্যাসী।— এ কথা স্বীকার করিতে হইলে মহাবীর নরবর্ম্মার প্রতি অবিচার করা হইবে। দস্যুগণ যখন গ্রাম লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিল, তখন নরবর্ম্মা মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বে দুর্গ স্বামীহীন হইয়াছে। দুর্গস্বামীগণের সহিত "ঢেক্করী"র সামন্ত রাজগণের বহুবর্ষব্যাপী বিবাদ ছিল। যতদিন দেশে রাজা ছিলেন, রাজশক্তি অপ্রতিহত ছিল, ততদিন দুর্ব্বল দুর্গস্বামীগণ প্রবলের গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেশ যখন অরাজক হইল তখন ঢেক্করীয়রাজ অনায়াসে দুর্গস্বামীর অধিকার গ্রাস করিলেন। পৈত্রভূমি রক্ষা করিতে গিয়া বৃদ্ধ নরবর্ম্মা প্রাণ হারাইলেন। তদবধি এই গৃহ জনশূন্য ছিল।

গোপাল।— তবে গ্রাম লুণ্ঠন করিল কে?

সন্ন্যাসী।— ঢেক্করীয়রাজ অবশ্য গ্রাম লুণ্ঠন করিতে আসেন নাই। দস্যু তস্করে গ্রাম ধ্বংস করিয়াছে।

গোপাল।— গ্রামের নূতন অধিকারী কি প্রজারক্ষা করিতে চেষ্টা করেন নাই?

সন্ন্যাসী।— তখন গ্রামের অধিকারী কে গ্রামবাসীগণই তাহা জানিত না। ঢেক্করীর রাজা নরসিংহ তখন সুদূর দক্ষিণে সপ্তগ্রাম বন্দরে লুণ্ঠনে ব্যস্ত। তাঁহার সৈন্যগণ যখন রাজস্ব গ্রহণ করিতে আসিত, তখন গ্রামবাসীগণ রাজস্ব প্রদান করিত। কিন্তু স্বেচ্ছায় তাহারা কাহাকেও কর দিত না। সুতরাং বিপদের সময়ে কেহই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় নাই।

গোপাল।— এত বড় গ্রাম, ইহার অধিবাসীগণ কি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই।

সন্ন্যাসী।— এখন দস্যুগণ সুশিক্ষিত সেনা লইয়া গ্রাম বা নগর আক্রমণ করিয়া থাকে, তাহাদিগের আক্রমণ হইতে—

সন্ন্যাসীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দূরে সজোরে বংশীরব হইল, তাহা শুনিয়া সন্ন্যাসী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পুনরায় বংশীরব হইল, তাহা শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন "গোপালদেব! কি বিপদ হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না, আমি দেখিয়া আসি।"

গোপালদেবও গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন "আমিও আপনার সহিত আসিতেছি।"

কিন্তু তাঁহারা কক্ষ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই গৌর আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইল। সে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সন্ন্যাসী তাহাতে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "গৌর কি হইয়াছে?"

গৌর বলিল "প্রভু! মধ্যম প্রভু আসিয়াছেন, আমি তাঁহাকে পারে রাখিয়া আপনাকে সংবাদ দিতে আসিতেছি।"

সন্ন্যাসী।— তাঁহাকে পারে রাখিয়া আসিলে কেন?

গৌর।— আপনি যদি কিছু মনে করেন?

সন্ন্যাসী।— তুই শীঘ্র তাঁহাকে লইয়া আয়।

গৌর বাহির হইয়া গেল। সন্ন্যাসী অন্যমনস্ক হইয়া গৈরিক বসনের উপরে বর্ম্ম পরিধান করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা দেখিয়া গোপাল ও ধর্ম্মপাল স্ব স্ব বর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে আর একজন সন্ন্যাসী আসিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অমৃত কি সংবাদ?"

অমৃত।— প্রভু! বড়ই বিপদ। গোকর্ণের গ্রামস্বামিনী সংবাদ দিয়া পাঠাইয়াছেন যে, অদ্য রাত্রিতে গ্রামে দস্যু আসিবে, তাহারা সংবাদ দিয়া পাঠাইয়াছে। গ্রামস্বামী রঘুসিংহ দুই বৎসর পূর্ব্বে—

সন্ন্যাসী।— সে সংবাদ আমাকে দিতে আসিয়াছ কেন?

অমৃত।— প্রভু! উপায়ান্তর না দেখিয়া। আমাদিগের গ্রামে এখন কেহ নাই। সমস্ত সেবক লইয়া অচ্যুতানন্দ ভাগীরথী-পারে শস্য সংগ্রহ করিতে গিয়াছে, দুই তিন দিন পরে ফিরিবে।

সন্ন্যাসী।— গোবর্দ্ধনে তোমরা কয়জন আছ?

অমৃত।— একা আমিই ছিলাম। সেই জন্যই আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি। গোকর্ণে স্বামী-পুত্রহীনা দুর্গস্বামিনী ব্যতীত আর বড় একটা কেহই নাই। অধিকাংশ গ্রামবাসী দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে মরিয়া গিয়াছে। যাহারা অবশিষ্টও ছিল, তাহারা দেশ অরাজক দেখিয়া, গ্রাম স্বামীহীন দেখিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে। গ্রামে স্ত্রী ও শিশুর ভাগই অধিক। যে কয়জন পুরুষ আছে তাহারা দস্যুদলের সম্মুখে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিবে না।

সন্ন্যাসী মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "অমৃত, তবে উপায়?"

সপুত্র গোপালদেব কক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন, তিনি অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রভু! যুদ্ধ ব্যবসায়ে জীবন অতিবাহিত করিয়াছি, পুত্রকেও এই ব্যবসায়ে শিক্ষিত করিয়াছি, সুতরাং আমরা থাকিতে আর্ত্তত্রাণের জন্য আপনার লোকাভাব হইবে না।"

সন্ন্যাসী মস্তক অবনত করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, তিনি গোপালদেবের দিকে চাহিয়া কহিলেন "গোপালদেব! যাহারা সংবাদ দিয়া দুর্গ আক্রমণ করিয়া থাকে, তাহারা সাধারণ দস্যু বা তস্কর নহে। দেশ অরাজক হইলে, চিরকালই প্রবল দুর্ব্বলকে গ্রাস করিয়া থাকে, ইহাই মাৎস্যন্যায়। রঘুসিংহের বিধবাকে অনাথা ও আশ্রয়হীনা দেখিয়া তাহার অধিকারের প্রতি প্রতিবেশী বহু সামন্তরাজের লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহারাই দেশের দস্যু তস্কর। হীনবল রাজশক্তি যখন অত্যাচারী ভূস্বামীগণকে আর নিবৃত্ত রাখিতে পারে না, তখন সকল দেশেই এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। অমৃত! কে গোকর্ণ লুণ্ঠন করিতে আসিতেছে?

অমৃত।— শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ।

সন্ন্যাসী।— বসুদেব ঘোষের পুত্র?

অমৃত।— হাঁ।

সন্ন্যাসী।— গোপালদেব, শত শত সুশিক্ষিত বর্ম্মাবৃত সৈন্য লইয়া নারায়ণ ঘোষের পুত্র গোকর্ণ লুণ্ঠন করিতে আসিবে। আমরা চারিজনে কতক্ষণ তাহাদিগকে বাধা দিব?

গোপাল।— প্রভু! আর কিছু করিতে পারি আর না পারি, একবার ত বাধা দিব। গোকর্ণে কি দুর্গ আছে?

সন্ন্যাসী।— আছে। কিন্তু তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, সে দুর্গ রক্ষা করিতে হইলে বহু সৈন্যের আবশ্যক।

গোপাল।— গ্রামে কত লোক অস্ত্র ধারণ করিতে জানে?

অমৃত।— পঁচিশ জনের অধিক হইবে না।

গোপাল।— তাহাতেই যথেষ্ট হইবে। নিকটে আর কোন স্থানে সাহায্য পাওয়া যাইবে কি?

সন্ন্যাসী।— উদ্ধারণপুরে সংবাদ দিতে পারিলে হয়, কিন্তু কে সেখানে সংবাদ দিতে যাইবে?

গোপাল।— কেন, গৌর?

সন্ন্যাসী।— সে ভয়ে পথেই মরিয়া থাকিবে।

গোপাল।— তবে আপনার শিষ্যকেই উদ্ধারণপুরে প্রেরণ করুন, আমরা তিন জনে গ্রামবাসীদিগের সাহায্যে সমস্তরাত্রি দুর্গ রক্ষা করিব।

সন্ন্যাসী।— পারিবে কি?

গোপাল।— পারিতেই হইবে। বিলম্বে প্রয়োজন নাই। গোকর্ণ এখান হইতে কতদূর হইবে?

অমৃত।— প্রায় তিন ক্রোশ হইবে।

গোপাল।— উত্তম। গাত্রোত্থান করুন এখনই যাত্রা করিব।

গৌর ভেলায় তাঁহাদিগকে পার করিয়া দিল। গোপালদেব পার হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের অশ্ব দুইটির সহিত আরও দুইটি অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে। চারি জনে অশ্বারোহণ করিয়া জনমানবহীন গ্রাম্যপথ অবলম্বন করিয়া চলিলেন। রাজপথে উপস্থিত হইয়া নূতন সন্ন্যাসী তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা তিনজনে দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া উত্তরাভিমুখে চলিলেন।

এক ক্রোশ পথ চলিয়া সন্ন্যাসী সপ্তগ্রামের রাজপথ পরিত্যাগ করিলেন। পথের উভয় পার্শ্বে আম্র পনসের নিবিড় বন, তাহার ভিতর দিয়া একটি বক্র সঙ্কীর্ণ পথ

পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, তিন জনে সেই পথ অবলম্বন করিলেন। গোপালদেব বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, সুদীর্ঘ পথের কোন স্থানে মনুষ্য আবাসের চিহ্নমাত্রও নাই; স্থানে স্থান তাল, তমাল, তিন্তিড়ীর ঘন আবরণ ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইতেছে।

পথ বনমুক্ত হইয়া একটি পুরাতন নদীগর্ভের পার্শ্ব দিয়া চলিতেছে. সন্ন্যাসী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন "গোপাল, দেখ, ইহাই ভাগীরথীর পুরাতন গর্ভ।" পথের উভয় পার্শ্বে নিবিড় বন, বেতসী লতার ঘন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?" গোপালদেব বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, কাহার সহিত কথা কহিতেছেন?" সন্ন্যাসী কোন উত্তর না দিয়া তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইলেন। গোপালদেব দেখিলেন, লৌহফলকযুক্ত দ্বিহস্ত পরিমিত শর সন্ন্যাসীর উষ্ণীষ ভেদ করিয়াছে। তিন জনেরই শিরস্ত্রাণ আসনের সম্মুখে আবদ্ধ ছিল, বাক্যব্যয় না করিয়া সকলে উষ্ণীষের পরিবর্ত্তে শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিলেন। তরুচ্ছায়াঘন আম্রকুঞ্জের মধ্য হইতে উত্তর আসিল "তোমরা কে?" সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন "ভয় নাই, আমি বিশ্বানন্দ।"

তখন অন্ধকার হইতে একটি বর্ম্মাবৃত মনুষ্যমূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিল, সন্ন্যাসী শিরস্ত্রাণ খুলিয়া তাহাকে আপনার মুখ দেখাইলেন। সে ব্যক্তি প্রণাম করিয়া কহিল "প্রভু! অপরাধ মার্জ্জনা করুন, গ্রামস্বামিনী আপনারই জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" সে ব্যক্তি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বংশ নির্ম্মিত বংশী বাহির করিয়া তাহা বাদন করিল। তাহা শুনিয়া তাহারই ন্যায় চারি পাঁচজন বর্ম্মাবৃত পুরুষ ধনুহস্তে বৃক্ষকাণ্ড হইতে অবতরণ করিল। প্রথম বর্ম্মাবৃত পুরুষ তাহাদিগের মধ্যে একজনকে সম্বোধন করিয়া কহিল "কেদার! গোবর্দ্ধন হইতে প্রভু আসিয়াছেন, তুমি ইহাঁদিগকে দুর্গে লইয়া যাও।" যোদ্ধা পথ প্রদর্শন করিয়া চলিল, তিন জনে তাহার অনুসরণ করিলেন।

আম্রকুঞ্জের অনতিদূরে নদীগর্ভে ক্ষুদ্র দুর্গটি অবস্থিত। ভাগীরথী যখন এই পথে প্রবাহিতা ছিলেন, তখন নদী বক্রগতি হইয়া এইস্থানে একটি কোণ সৃষ্টি করিয়াছিল, এই কোণের উপরই এই দুর্গটি নির্ম্মিত। দুর্গের চারিদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাকার, প্রাকারের দুই দিকে নদী, অপর দুই দিকে পরিখা এবং পরিখার পরপারে আম্র- ও বেণুকুঞ্জবেষ্টিত গোকর্ণ গ্রাম। পরিখার উপরে কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র সেতু, দুর্গবাসীগণ শত্রু-আগমনের প্রতীক্ষায় তাহা উঠাইয়া রাখিয়াছে, সেতুর পরিবর্ত্তে দুইটি বংশদণ্ড পরিখার উপর পতিত রহিয়াছে।

অশ্বারোহী দেখিয়া দুর্গাভ্যন্তর হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল "কে যায়?"

পথপ্রদর্শক উত্তর করিল "আমি কেদার, গোবর্দ্ধন হইতে প্রভু বিশ্বানন্দ আসিয়াছেন, সেতু নামাইয়া দাও।"

সে ব্যক্তি দুর্গাভ্যন্তর হইতে উত্তর করিল "মহারাণীর অনুমতি ব্যতীত পারিব না, তোমরা ঐ স্থানে দাঁড়াও।" সে ব্যক্তি অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "সেতু নামাইতেছি।" লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ সেতু ধীরে ধীরে অবতরণ করিল। সূর্য্যাস্তের অব্যবহিত পরে অশ্বারোহী-ত্রয় গোকর্ণ দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অগ্নিদাহে।

আগন্তুকত্রয় দুর্গে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে পথের উভয় পার্শ্বে বহু বর্ম্মাবৃত সুসজ্জিত যোদ্ধা দাঁড়াইয়া আছে। তোরণের সম্মুখে একজন বর্ষীয়ান যোদ্ধপুরুষ দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি প্রথমে সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারেন নাই, কারণ সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিতেছিল। সন্ন্যাসী তাহা বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া একপদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন "আমি বিশ্বানন্দ, গোবর্দ্ধন মঠ হইতে আসিতেছি।"

বৃদ্ধ তাঁহার নাম শুনিবামাত্র প্রণাম করিয়া কহিলেন, "প্রভু, মার্জ্জনা করিবেন, আপনাকে কখনও বর্ম্ম পরিধান করিতে দেখি নাই, সেই জন্যই চিনিতে পারি নাই।"

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "তাহাতে আর কি হইয়াছে? তুমি বোধ হয় উদ্ধব ঘোষ?"

বৃদ্ধ বলিল "আজ্ঞা হাঁ।"

সন্ন্যাসী।— দেশের যে রকম অবস্থা হইয়াছে, যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে সন্ন্যাসীর অস্ত্রধারণ কিছুই বিচিত্র নহে। অনেক সন্ন্যাসীই বর্ম্ম ধারণ করিয়াছে, দেবকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নরহত্যার জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আজি আমাকেও এই বৃদ্ধ বয়সে বর্ম্ম ধারণ করিতে হইয়াছে। উদ্ধব, আজি গোবর্দ্ধন মঠে এমন কেহ নাই যাহাকে প্রাতঃস্মরণীয় রঘু সিংহের আশ্রয়হীন পরিবারের সাহায্যে লইয়া আসি। আমি বিশ্বানন্দ, আমি বড় অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলাম যে, গোবর্দ্ধন মঠের অস্তিত্ব থাকিতে দেশে আর্ত্তত্রাণের জন্য লোকাভাব হইবে না। কিন্তু আজি আমিও নিরুপায় নিঃসহায়। অমৃত আসিয়া বলিল যে গোকর্ণে দস্যু আসিতেছে, সে দস্যু অপর কেহ নহে, বাসু ঘোষের পুত্র নারায়ণ ঘোষ। নারায়ণ ঘোষের পরিবর্ত্তে তাহার পিতা যদি আসিত তাহাতেও আমি বিচলিত হইতাম না, কিন্তু আজ আমি বলহীন। মঠে কেহই নাই, সকলেই ভাগীরথীপারে শস্য সংগ্রহের চেষ্টায় গিয়াছে।

উদ্ধব।— প্রভু! আমরা যে আপনার ভরসায় গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা লইয়া আসিয়া দুর্গে আশ্রয় দিয়াছি! তাহাদিগের উপায় কি হইবে? আপনার শিষ্যগণের ভরসায় মহারাণী স্বয়ং দুর্গরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, কিন্তু দুর্গেও ত্রিশজনের অধিক অস্ত্রধারী সৈন্য নাই। কি উপায় হইবে প্রভু?

সন্ন্যাসী।— উদ্ধব, উপায় নারায়ণ। কোন চিন্তা নাই, আমি অমৃতকে দ্রুতগামী অশ্বারোহণে উদ্ধারণপুরে পাঠাইয়াছি, ঢেক্করীয় রাজের সেনা লইয়া সে শীঘ্রই আমাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিবে। যতক্ষণ তাহারা না আসে ততক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে হইবে। তোমাদিগের রক্ষার জন্য একজন মহাপুরুষের সাহায্য পাইয়াছি। বরেন্দ্র মণ্ডলের সামন্তচক্রচূড়ামণি গোপালদেবের নাম শুনিয়াছ কি? মহারাজ গোপালদেব স্বয়ং ও যুবরাজ ধর্ম্মপালদেব তোমার সম্মুখে উপস্থিত। ইহাঁদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা কর।

গোপাল।— প্রভু, অভ্যর্থনার আবশ্যক নাই, ইহা অভ্যর্থনার সময়ও নহে। ক্ষত্রধর্ম্মপালনে ক্ষত্রিয় কখনও পরাঙ্মুখ থাকিতে পারে না। রজনী আগতপ্রায়, হয়ত দেখিতে দেখিতে শত্রুসৈন্য আসিয়া পড়িবে, সর্ব্বাগ্রে দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

উদ্ধব।— মহানুভব, গৌড়বঙ্গে এমন কে আছে যে আপনার বলবীর্য্যের কথা শুনে নাই? আপনি যখন আসিয়াছেন তখন আর গোকর্ণের ভয় নাই। প্রভু! আপনি স্বয়ং দুর্গরক্ষার ভার গ্রহণ করুন, আমি মহারাণীকে আপনাদের আগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া আসি।

বৃদ্ধ উদ্ধব ঘোষ অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। আগন্তুকত্রয় দুর্গের চারিপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে দুর্গপ্রাকারের সংস্কার হইয়াছে, প্রাচীরের পার্শ্বে স্থানে স্থানে বৃহৎ কটাহে শত্রুসৈন্যের অভ্যর্থনার জন্য তৈল উত্তপ্ত হইতেছে, বর্ম্মাবৃত এক একজন সৈনিক সমান্তরালে দাঁড়াইয়া পরিখার পরপার লক্ষ্য করিতেছে এবং প্রাকারের পার্শ্বে অস্ত্রশস্ত্র সাজাইয়া রাখিতেছে, দেখিয়া গোপালদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এই সময়ে উদ্ধব ঘোষ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "প্রভু, মহারাণী আপনাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" দুর্গের মধ্যস্থলে দুর্গস্বামীর গৃহ, গৃহদ্বার যবনিকায় আবৃত, দ্বারের সম্মুখে একজন দাসী প্রজ্জলিত উল্কা হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উদ্ধব ঘোষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোপালদেব, ধর্ম্মপাল ও সন্ন্যাসী দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উদ্ধব বলিলেন "মহারাণি, প্রভু বিশ্বানন্দ ও বরেন্দ্রীপতি মহারাজ গোপালদেব সপুত্রক উপস্থিত হইয়াছেন।" যবনিকার অন্তরাল হইতে উত্তর আসিল "প্রভু, আপনার ভরসায় আমরা এখনও উত্তর রাঢ়ে বাস করিতেছি। আমার অবস্থার কথা আপনাকে আর কি বলিব। শুনিলাম বারেন্দ্ররাজ স্বয়ং আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে

রঘুসিংহের বিধবা, পিতৃহীনা কল্যাণী ও গোকর্ণের সমস্ত কুলবধূ ধর্ম্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিবে।

সন্ন্যাসী।— মা, কোন চিন্তা নাই, রঘুসিংহের দুর্গে পুরুষাভাব, গোবর্দ্ধন মঠে লোকাভাব, সমস্তই ভগবানের ইচ্ছা, কিন্তু বৃদ্ধ বিশ্বানন্দ জীবিত থাকিতে আপনাকে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে না।

গোপাল।— উদ্ধবদেব, মহারাণীকে নিবেদন করুন যে, গোপাল বা ধর্ম্মপাল জীবিত থাকিতে গোকর্ণদুর্গে শত্রুসৈন্য প্রবেশ করিতে পারিবে না।

উদ্ধবকে কিছু বলিতে হইল না, যবনিকার অন্তরাল হইতে উত্তর আসিল "ভগবান আপনাদিগকে জয়যুক্ত করুন।" দাসী উল্কা লইয়া গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসীর সহিত উদ্ধব, গোপালদেব ও ধর্ম্মপাল দুর্গ-দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "উদ্ধবদেব, শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য, দুর্গের বাহিরে আপনাদের লোক আছে দেখিতে পাইলাম। আর কোন স্থানে কি লোক রাখিয়াছেন?"

উদ্ধব।— রাখিয়াছি, রণগ্রামের ঘাটে পাঁচজন যোদ্ধা লুকাইয়া আছে, তাহারা শত্রুসেনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে না বটে, কিন্তু সৈন্য পার হইতে দেখিলে শীঘ্র আসিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিবে।

গোপাল।– আর কোন দিক হইতে আসিবার পথ নাই?

উদ্ধব।— উত্তর হইতে আসিতে হইলে রণগ্রাম ব্যতীত আর কোন স্থানে ভাগীরথীগর্ভ পার হওয়া যায় না।

গোপাল।— উত্তম। রণগ্রামে কি মনুষ্যের আবাস নাই?

সন্ন্যাসী।— আবাস আছে, তবে মনুষ্য নাই।

দেখিতে দেখিতে চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল, দুর্গের স্থানে স্থানে উল্কা জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু গোপালদেব তাহা নির্ব্বাপিত করিতে আদেশ করিলেন। গাঢ় অন্ধকারে নিস্তব্ধ হইয়া গোকর্ণবাসী শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তোরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আগন্তুকত্রয় শত্রুসৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ দূরে আম্রকুঞ্জে একটি উল্কা জ্বলিয়া উঠিল, পরক্ষণেই, পরিখার পারে দাঁড়াইয়া একজন বলিয়া উঠিল "দুয়ারে কে আছ?"

উত্তর হইল "কে?"

"আমি কেদার।"

"কি সংবাদ?"

"রণগাঁয়ের লোক ফিরিয়াছে।"

"ভিতরে আসিতে বল।"

"বাহিরে ঘাটি থাকিবে, না উঠাইয়া আনিব?"

"এখন থাক।"

বংশদণ্ডদ্বয়ের সাহায্যে চারি পাঁচজন লোক পরিখা পার হইয়া তোরণের কপাটের ছিদ্রপথে দুর্গে প্রবেশ করিল। উদ্ধব, গোপালদেব ও সন্ন্যাসী তোরণের পশ্চাতেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। গোপালদেব তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

"কত লোক আসিল?"

"আট নয় শত।"

"সকলে পার হইয়াছে?"

"শেষ নৌকা রণগাঁয়ের ঘাটে লাগিলে আমরা চলিয়া আসিয়াছি।"

"তখন বেলা কত?"

"সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে।"

"উত্তম। তোমরা কয়জন এইখানেই থাক। উদ্ধব-দেব! বাহিরের ঘাটি উঠাইয়া আনুন।"

একজন সেনা বংশদণ্ড অবলম্বনে পরিখা পার হইয়া চলিয়া গেল ও মুহূর্ত্তের মধ্যে আর পাঁচজন সেনা লইয়া দুর্গে প্রবেশ করিল। গোপালদেব তখন পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ধর্ম্ম! এই পাঁচজন সেনা লইয়া তুমি অন্তঃপুর রক্ষায় চলিয়া যাও।"

ধর্ম্ম।— এখন অন্তঃপুরে সেনা পাঠাইবার কোন প্রয়োজন আছে?

গোপাল।— অন্তঃপুর অরক্ষিত, তুমি ইহাদিগকে লইয়া দুর্গস্বামীর গৃহদ্বারে অপেক্ষা কর। প্রাকার রক্ষার জন্য যদি ইহাদিগকে আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে সংবাদ দিয়া পাঠাইব।

পিতাকে প্রণাম করিয়া পাঁচজন সেনা লইয়া ধর্ম্মপাল তোরণ পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে দূরে উজ্জ্বল আলোক দেখা গেল, দুর্গবাসীরা বুঝিতে পারিল যে, শত্রুসৈন্য আসিয়া পড়িয়াছে। আলোক নিকটে আসিল, গোপালদেব উল্কার আলোকে দেখিতে পাইলেন যে, প্রায় সহস্র বর্ম্মাবৃত সেনা দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সর্ব্বাগ্রে একজন অশ্বারোহী এবং তাহার পশ্চাতে সারি সারি বর্ম্মাবৃত যোদ্ধা। বিবাহের বর-যাত্রার মত এই সৈন্যশ্রেণী অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে দুর্গ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে, তাহারা উৎসবে যোগদান করিতে যাইতেছে, যুদ্ধ করিতে নহে।

তোরণের সম্মুখে পরিখার পাড়ে দাঁড়াইয়া একজন অশ্বারোহী পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "দুর্গে কে আছ? তোরণ মুক্ত কর। উদ্ধব ঘোষ কোথায়?" উদ্ধব ঘোষ তোরণের পশ্চাতেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি উত্তর করিলেন "প্রভু, দুর্গস্বামিনীর আদেশে তোরণদ্বার রুদ্ধ আছে।"

অশ্বারোহী।— শীঘ্র দুয়ার খুলিয়া দে, নতুবা তোকে এবং তোর দুর্গস্বামিনীকে কুক্কুর দিয়া খাওয়াইব। তোরা ভাবিয়াছিস্ যে, গোবর্দ্ধন মঠের সন্ন্যাসী আসিয়া তোদের রক্ষা করিবে? তোরা জানিস্ না বৃদ্ধ শৃগাল বিশ্বানন্দ এখন দেশে নাই?"

সন্ন্যাসী প্রাকারের উপরে উঠিয়া বলিলেন "নারায়ণ, দন্তহীন বৃদ্ধ শৃগাল দেশেই আছে, যদি মঙ্গল চাও গৃহে ফিরিয়া যাও।"

সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অশ্বারোহী ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল, বলিল "বৃদ্ধ, তোকে অনেক দিন মার্জ্জনা করিয়াছি, এইবার তোকে সদলে গোবর্দ্ধন মঠে পোড়াইয়া মারিব।"

সন্ন্যাসী।— নারায়ণ, বৃদ্ধ শৃগালের গতি অপ্রতিহত, তাহাকে উত্তেজিত করিও না।

এই সময়ে গোপালদেব নিম্নে দাঁড়াইয়া কহিলেন "প্রভু! বাক্যযুদ্ধের আবশ্যক নাই, আপনি নামিয়া আসুন।"

বাধা পাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া নারায়ণ ঘোষ দুর্গ আক্রমণের আদেশ প্রদান করিল। বংশদণ্ডের সাহায্যে সেতু নির্ম্মিত হইল, কিন্তু সেতু অবলম্বনে শত্রুসৈন্য দুর্গের নিম্নে আসিবামাত্র কটাহের পর কটাহ অগ্নিবৎ উত্তপ্ত তৈল তাহাদিগের উপর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল শত্রুসেনা ভঙ্গ দিয়া পলাইল। ইহার পরে একই সময়ে চারি স্থানে চারিটি সেতু লাগাইয়া নারায়ণ ঘোষের সেনা পরিখা পার হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উত্তপ্ত তৈল ও দুর্গবাসীগণের শরসমূহ তাহাদিগকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিল। এইরূপে চতুর্থবার প্রতিহত হইয়া নারায়ণ ঘোষ আর দুর্গ আক্রমণ না করিয়া সরিয়া গেল অল্পক্ষণ পরে গ্রামে অগ্নিশিখা দেখা গেল। বিদ্যুদ্বেগে গৃহ হইতে গৃহান্তরে আগুন লাগিয়া গেল, কোথা হইতে প্রবল বায়ু আসিয়া অগ্নির সহায় হইল। গ্রাম হইতে শত শত পশুর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল, তাহা শুনিয়া দুর্গবাসীগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। দুর্গবাসীগণ যখন গৃহদাহ ও গৃহপালিত পশুগুলির নিধনে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন সুযোগ বুঝিয়া শত্রুসেনা পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করিল নানাস্থানে আক্রান্ত হইয়া দুর্গরক্ষীসেনা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী, গোপালদেব ও উদ্ধবঘোষ তিনস্থানে থাকিয়া তাহাদিগকে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। শত্রুসেনা বার বার দুর্গপ্রাচীর আক্রমণ করিয়াও দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিল না।

গ্রামের গৃহগুলি জ্বলিয়া উঠিবার সময়ে প্রবল বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি দ্রুতবেগে গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিয়া সমস্ত গ্রাম ভীষণ চিতায় পরিণত করিয়াছিল। দুই একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ক্রমে দুর্গ মধ্যে আসিতে আরম্ভ করিল, রমণী ও শিশুগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে লাগিল। কিন্তু গ্রামের অগ্নি যখন দুর্গের নিকটে আসিয়া পড়িল তখন তাহাদিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দুর্গাভ্যন্তরের পর্ণ শালাগুলি জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে অট্টালিকার কপাটে ও বাতায়নে অগ্নি লাগিয়া গেল। ব্যস্ত হইয়া পুরমহিলাগণ অঙ্গনে বাহির হইয়া আসিলেন। পাঁচজন সেনা লইয়া ধর্ম্মপাল তখন দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন।

রাজপুত মহিলা

তাঁহাকে দেখিয়া দুর্গস্বামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?"

ধর্ম্ম।— মা! আমি ধর্ম্মপাল, গোপালদেবের পুত্র।

দুর্গস্বামিনী।— এখানে কেন?

ধর্ম্ম।— পিতা আমাকে অন্তঃপুর রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছেন।

দুর্গস্বামিনী।— অন্তঃপুর ত আর রহিল না বাপু, তুমি সেনা পাঁচজনকে প্রাকারে পাঠাইয়া দাও।

ধর্ম্মপালের আদেশে সেনাগণ প্রাকারাভিমুখে ধাবিত হইল। দুর্গস্বামিনী কহিলেন "পুত্র! আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারিব, কিন্তু এই বালিকা ভয়ে আকুল হইয়া পড়িয়াছে, তুমি ইহাকে যে প্রকারে পার রক্ষা করিও।" এই বলিয়া তিনি তাহার পশ্চাতে লুক্কায়িতা ভয়-বিহ্বলা কন্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। ধর্ম্মপাল অভিবাদন করিয়া সম্মতি জানাইলেন। এই সময়ে শত্রুপক্ষের ভীষণ জয়ধ্বনিতে ক্ষুদ্র দুর্গ কাঁপিয়া উঠিল, তিন স্থানে ও অবতরণিকার সাহায্যে তাহারা দুর্গপ্রাকার অধিকার করিল, মুষ্টিমেয় দুর্গরক্ষীসেনা তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না।

যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া গোপালদেব দুর্গরক্ষীসেনা একত্র করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। দুর্গের নানাস্থান হইতে বৃদ্ধ, বালক ও রমণীগণ দুর্গস্বামীর গৃহের ধ্বংসাবশেষের দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন দুর্গস্বামিনী ধর্ম্মপালকে বলিলেন "পুত্র! এখন তুমি কল্যাণীকে রক্ষা কর। নদীতীরে আম্রকুঞ্জে সুসজ্জিত অশ্ব আছে, শত্রুসেনা সেদিকে যায় নাই। যদি পরিখা পার হইতে পার তাহা হইলে রক্ষা পাইবে। আমাদিগের জন্য চিন্তা করিও না।"

ধর্ম্মপাল কালবিলম্ব না করিয়া মূর্চ্ছাগতা কল্যাণী দেবীকে স্কন্ধে লইয়া পরিখার পার্শ্বে একটি বাতায়নে গিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন—গ্রামে তখনও অগ্নি জ্বলিতেছে কিন্তু সে স্থানে শত্রুসেনা নাই। এই সময়ে দুর্গমধ্যে শত্রুসেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, ধর্ম্মপাল ভাবিলেন দুর্গরক্ষীসেনা বোধ হয় আত্মসমর্পণ করিল। তিনি কটীবন্ধ দৃঢ় করিয়া, স্কন্ধে কল্যাণীর দেহ লইয়া বাতায়নপথে লম্ফ প্রদান করিলেন। তিনি যখন শূন্যে, তখন শুনিতে পাইলেন কে যেন পরিচিত স্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে "ভয় নাই, ভয় নাই।" (ক্রমশঃ)

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিশীথে

(গল্প)

গভীর রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া একটা আকুল আর্ত্তস্বর ফুটিয়া উঠিল, "আগুন লেগেছে! আগুন!"

সুপ্ত নর-নারী চকিতে জাগিয়া উঠিল। কোথায় আগুন! একটা আশঙ্কায় বুক তাহাদের কাঁপিতেছিল, মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি জানালার পানে সকলে ছুটিয়া আসিল। ঐ দূরে অগ্নির লেলিহান শিখা গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে—চারিধার কে যেন লাল রঙে রাঙাইয়া তুলিয়াছে। যেন কে নিশীথিনার কমনীয় কোমল কণ্ঠে শাণিত ছুরিকা বসাইয়া দিয়াছে—নিশীথিনীর কণ্ঠ ছিঁড়িয়া উষ্ণ লোহিত রক্তধারা উৎসের মতই ঝরিয়া পড়িয়াছে!

উন্মাদের মত ব্যগ্র লোকজন অগ্নি লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিল।

সহরের প্রান্তে দরিদ্র-বস্তি—দীন-দুঃখীর মাথা গুঁজিবার আশ্রয়, জীর্ণ পর্ণকুটির! তাহারই উপর আজ ভীষণ হুতাশনের রোষ-দৃষ্টি পড়িয়াছে! রক্ষা নাই—রক্ষা নাই। এ রুদ্র রোষানল থামাইবার এতটুকু সামর্থ্য, জীর্ণ পর্ণকুটিরের শীর্ণ কঙ্কালের কোথাও নাই, কোথাও নাই।

সারা দিন ধরিয়া এই-সকল দরিদ্র, ধনীর চলিবার পথ হইতে কাঁটা বাছিয়া তুলিতে গিয়া দেহের রক্তপাত করিয়া আসিয়াছে, বিলাসীর সজ্জিত ভবনে সম্ভোগের উপকরণ সাজাইয়া একমুষ্টি অন্নের জোগাড় করিয়া ফিরিয়াছে। এখন প্রসন্ন চিত্তে স্ত্রী-পুত্রের মধুর সঙ্গলাভে বেচারা দরিদ্রের দল দিনের শ্রান্তি ভুলিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। তাহাদের এ নিশ্চিন্ত নিদ্রা-সুখ কোন্ নিষ্ঠুর অদৃশ্য দেবতার অসহ্য বোধ হইল। তাই তাঁহার উষ্ণ

নিশ্বাসে আজ উপায়হীন বান্ধবহীন দরিদ্রের সর্ব্বস্ব বুঝি-বা পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়!

মা শিশুকে কোলে তুলিয়া, স্বামী স্ত্রীকে বুকে ধরিয়া উন্মাদের মত কুটির ছাড়িয়া বাহিরের পানে ছুটিল। মৃত্যুর দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে—ওরে কে কোথায় আছিস্, আয়, আয়, মৃত্যু কোল পাতিয়াছে, ছুটিয়া আয়! নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বক্ষণে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া মৃত্যুকে যে আহ্বান করিয়াছিল, সেও এখন মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার কাছ হইতে দূরে পলাইবার জন্য অধীর আগ্রহে ছুটিয়া চলিয়াছে!

পাশাপাশি অসংখ্য ঘর। সুখ দুঃখ, হর্ষ বেদনার লীলাভিনয়-ক্ষেত্র এই অসংখ্য ঘরে মুহূর্ত্তে একটা চাঞ্চল্য সাড়া দিয়া উঠিল। ভয়ের একটা নিকষ-কৃষ্ণ শিখা ঘরগুলাকে বিদ্যুতের মতই চিরিয়া দিয়া গেল।

একটি ঘরে রুগ্ন স্বামী দুর্ব্বল দেহে পড়িয়াছিল। স্ত্রীর সহিত পূর্ব্বাহ্নে তাহার বিষম কলহ হইয়া গিয়াছিল। স্ত্রীকে অকথ্য গালি দিয়া স্বামী তাড়াইয়া দিয়াছিল। স্ত্রীও সতেজে স্বামীর মুখের উপর বলিয়া গিয়াছিল, "এই চললুম, যদি আর কখনও ফিরি—" স্ত্রী একটা উৎকট শপথ করিয়া বিদায় লইয়াছিল।

এখন পথে দাঁড়াইয়া স্ত্রী আগুনের পানে চাহিয়া ছিল। চোখে পলক পড়িতেছিল না। সে যেন পুতুলের চিত্র-করা চোখের মতই—তাহার দুই চোখ! বুকের মধ্যে রুদ্ধ অভিমান হিংসার আবরণ পরিয়া সাপের মতই ফুঁসিতেছিল। আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এক জায়গা হইতে অপর জায়গায় লাফাইয়া ছুটিয়াছে! সে যেন এক ভৈরবের উন্মাদ নৃত্য! প্রলয়ঙ্করী কপালিনীর তীক্ষ্ণ খর্পর যেন নিশীথের গাঢ় অন্ধকার কাটিয়া জ্বলিয়া ঝকিয়া উঠিতেছে! সহসা নারীর আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল। উন্মাদের মত ছুটিয়া সে অনলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাহিরে দাঁড়াইয়া কৌতূহলী দর্শকের দল তামাসা দেখিতেছিল। এই আগুনের মুখে অগ্রসর হয় কাহার এমন সাধ্য আছে! নারীকে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চোখ তাহাদের ঠিকরিয়া পড়িবার মত হইল সকলে কলরব করিয়া উঠিল! কলরব করা ছাড়া উপায়ও কিছু ছিল না। দগ্ধ বংশখণ্ড ফট্ ফট্ করিয়া ফাটিয়া বাজির মতই আকাশে লাফাইয়া উঠিতেছে। যেন অগ্নির সাগর, চারিধারেই অনলের তরঙ্গ ছুটিয়াছে! ব্রহ্মার ক্ষুধা জাগিয়াছে; যতক্ষণ না সে ক্ষুধার পরিতোষ হয়, ততক্ষণ মুক্তি নাই, মুক্তি নাই! কাহারও মুক্তি নাই!

সহসা দূরে ঢঙ্ ঢঙ্ ঢঙ্ ঢঙ্ করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ঐ দমকল—দমকল আসিতেছে! আঃ, বাঁচা গেল। এতক্ষণে দর্শকের দল নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! মুক্তির আরাম ঐ গাড়ীখানার পৃষ্ঠে চড়িয়া এতক্ষণে আসিয়া দেখা দিয়াছে।

গাড়ী আসিয়া পড়িল। নল চালাইয়া জল ছড়াইয়া আগুন নিবাইবার উদ্যোগে সকলে লাগিয়া গেল। মুখে তাহাদের কথা নাই। হাত-পা-গুলা কলের মতই ক্ষিপ্র সহজ গতিতে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে ধরাধরি করিয়া একটা জ্বলন্ত পদার্থ বাহিরে লইয়া আসিল। দর্শকের দল ঠোঁট বাঁকাইয়া বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল, গাঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ দুইটি প্রাণী। একটি পুরুষ, অপর নারী। দর্শকের দল শিহরিয়া উঠিল। এ সেই নারী—উন্মাদের মত এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে ঐ অগ্নির মুখে ছুটিয়া গিয়াছিল! এই কতক্ষণ পূর্ব্বে যে শপথ করিয়া স্বামীর নিকট হইতে চির-বিদায় লইয়া আসিয়াছিল, সে স্বেচ্ছায় অনল-সাগরে ঝাঁপ দিয়া রুগ্ন স্বামীকে বাঁচাইতে না পারিয়া শেষে স্বামীর সহিত সহমরণে গিয়াছে!

* * * *

আগুন নিবিয়া গিয়াছে। দেখিবার আর কিছু নাই। দর্শকের দলও নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহে ফিরিয়া আরাম পাইয়া বাঁচিয়াছে! দমকল চলিয়া গিয়াছে। এখনও দূর হইতে তাহার ঘণ্টাধ্বনি অস্পষ্ট আসিয়া কানে লাগিতেছে। দগ্ধ ভস্মস্তূপ নিশীথের কালিমাকে আরও ঘন করিয়া তুলিয়াছে! এবং সেই কৃষ্ণ ভস্মস্তূপের সম্মুখে আশ্রয়হীন উপায়হীন নরনারীর দল পাথরের মূর্ত্তির মতই নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিয়াছে—তাহারা গৃহহীন, রিক্ত, সর্ব্ব-হারা। এত দুঃখে কাঁদিতে কাহারও চোখে এক

ফোঁটা জল অবধি নাই! সে জলটুকুও আগুন-তাতে শুকাইয়া গিয়াছে। জড়পিণ্ডের মতই মৌন মূক তাহারা তাল পাকাইয়া বসিয়া ছিল! সব তাহাদের ফুরাইয়া গিয়াছে—কাল যে আবার এ রাত্রি পোহাইয়া দিনের আলো দেখা দিবে, সে সম্ভাবনার কথাও কাহারও মনে ছিল না! তাহারা কেবল ভাবিতেছিল, এত কোলাহল, এত লোকজন, আলো ও কোলাহলের এমন সমারোহ এইমাত্র যেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মুহূর্ত্তের অবসরে মৃত্যুর এ কি সঘন নিবিড় স্তব্ধতায় সে-সব চাপা পড়িয়া গেল! যেন একটা স্বপ্ন চকিতে সকলকে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে! লোক-জন, সাহায্য—সে সব যেন জোয়ারের জল—উচ্ছ্বসিত নদীবক্ষ ছাপাইয়া তীরে আসিয়া উঠিয়াছিল, এখন কৌতুহল-পরিতৃপ্তির অবসানে ভাঁটার টান পড়িয়াছে। সে উচ্ছ্বসিত জলরাশি কোথায় সরিয়া গিয়াছে, আর তাহারা জলে-ভাসা কাঠি-কুটাগুলার মতই তীরে তাহাদের কুৎসিত দৈন্যের মূর্ত্তি লইয়া পড়িয়া আছে —জল তাহাদের লইয়া যায় নাই, ধরণীর আবর্জ্জনা বলিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

লোকশিক্ষক বা জননায়ক

লোকশিক্ষার সূচনা।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে লোকশিক্ষা বিস্তারের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা হইতেছে। বাঙ্গালাদেশেও শ্রমজীবী-গণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসর হইল অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় গত সাতবৎসর ধরিয়া লোকশিক্ষার আয়োজন চলিতেছে—এক্ষণে কুড়িটি নৈশবিদ্যালয়ে শ্রমজীবী-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। কৃষক, মজুর ও শিল্পীগণকে বিদ্যা-লাভের সুযোগ দিতে হইলে রাত্রেই বিদ্যালয়গুলির অধিবেশন করিতে হয়। ছাত্রদের অধিকাংশই সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া থাকে। ইহাদিগের পাঠগুলি সরস করিয়া তুলিবার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যথা-সম্ভব চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সচরাচর ছাত্র-দিগকে গল্প বলিয়া থাকেন এবং ম্যাজিকলণ্ঠন ও ছবির সাহায্য গ্রহণ করিয়া ছাত্রগণের মধ্যে কৌতূহল জাগা-ইয়া দেন। শ্রমজীবীগণের ভীরু ও দুর্ব্বল হৃদয়ে আশা ও উৎসাহ সঞ্চার করিবার জন্য তাহাদিগকে মহাপুরুষের জীবনী ও দেশের ইতিকথা শুনান হয় এবং রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির গল্পের দ্বারা তাহাদিগের চরিত্রের উন্নতি সাধনেরও চেষ্টা করা হয়। বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষারও বিশেষ আয়োজন আছে। উদ্ভিদ- ও জীব-বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ ম্যাজিকলণ্ঠনের সাহায্যে অতি সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে; এরূপে বিশ্বজগতের অনন্ত দৃশ্যাবলী বিজ্ঞানালোকে রঞ্জিত হইয়া শ্রমজীবীগণের নিকট একটি নূতন বার্ত্তা আনিয়া দিতেছে। বিচিত্র তরুলতা, সুনীল আকাশ, অসংখ্য তারকারাজির সহিত তাহারা এখন নূতন পরি-চয় লাভ করিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইতেছে। বাঙ্গালার কৃষক এবং শ্রমজীবী সমাজে নবজীবনের উন্মেষ দেখা গিয়াছে। ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা শ্রমজীবীগণের মধ্যে যেমন নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতেছে, শিল্পশিক্ষাও তাহা-দিগের দৈনন্দিন জীবিকানির্ব্বাহের সহায় হইয়া হৃদয়ে নূতন বল প্রদান করিতেছে।

লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য।

সাত বৎসর হইল আমাদিগের শ্রমজীবীশিক্ষা-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমে আমরা কিছুই ফল পাই নাই, অকৃতকার্য্য হইলাম মনে করিয়া ভগ্নহৃদয় হইয়া-ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে শ্রমজীবীগণের উন্নতি দেখিয়া সকলেরই হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছে। এই কয় বৎসরের মধ্যে যে আমাদিগের উদ্যম কিয়ৎপরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছে তাহা বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়; কারণ শিক্ষার ফল কখনও শীঘ্রই পাওয়া যায় না। অনেক নিষ্ঠা ও সংযম অভ্যাসের পর অনেক দুঃখ ও ব্যর্থপ্রয়াসের মধ্য দিয়া ছাত্রের চরিত্র ফুটিয়া উঠে। তাই হঠাৎ ফল না পাইলে নিরাশ হইবার কারণ নাই। লোকশিক্ষা-প্রদানের কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন

তাঁহাদিগের এই কথাটা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়। মানুষকে ত একদিনে গড়িয়া তুলা যায় না; তাই শিক্ষককে বহুবৎসর ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হয়, ফলপ্রত্যাশী না হইয়া কর্ত্তব্যপথে ধীরভাবে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হয়। ফলের জন্য ব্যগ্র হইলে উন্নতি না হইয়া অবনতি হইতে পারে। তাই অসংখ্য অসম্পূর্ণতার বন্ধনে শৃঙ্খলিত হইয়া আমাদিগকে স্থির দৃষ্টিতে উচ্চতম আদর্শকে নিরীক্ষণ করিতে হইবে, নৈরাশ্যের অন্ধকারকে একমাত্র আলোক মনে করিয়া অটল বিশ্বাসের সহিত দুরূহ এবং কণ্টকময় কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হইবে। ভগবান্ লোকশিক্ষায় ব্রতীগণকে সে বিশ্বাস দান করিয়া তাঁহাদিগের সহায় হউন।

লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য শ্রমজীবীগণকে কতকগুলি বই মুখস্থ করান নহে। মানসিক বৃত্তিগুলিকে ফুটাইয়া তুলা শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য। আমাদিগের দেশের শ্রমজীবীদিগের চরিত্রে কতকগুলি গুণ ও কতকগুলি দোষ আছে। গুণগুলি যাহাতে আরও বৃদ্ধি পায় এবং দোষগুলি সংশোধিত হয়, শিক্ষকের তাহাই চিন্তার বিষয়।

জনসাধারণের চরিত্রগুণ।

আমাদিগের জনসাধারণের চরিত্রের প্রধান গুণ তাহাদিগের আধ্যাত্মিকতা। যে কারণে এই চরিত্রের প্রভাব হউক না কেন, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের বহুলপ্রচার ও জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মচর্চ্চা ও আন্দোলন জাতীয় চরিত্রের এই গুণটিকে এখনও উজ্জ্বল রাখিয়াছে। বাংলার কৃষক শ্রমজীবীদিগের ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণতা পৃথিবীর অন্য দেশে নাই। কোন বাঙালী কৃষক সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা শোক দুঃখে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইলেও সান্ত্বনার কথা বলিতে যাইলে সে এরূপ দুই একটি ভাব প্রকাশ করিবে, যাহা অত্যন্ত গভীর, যাহা জ্ঞানের নহে, অনুভূতির সামগ্রী, এবং যাহা তাহার অন্তরতম অন্তরের সামগ্রী বলিয়া সে গৌরব অনুভব করে। এরূপ ভাব, সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে এরূপ দৃঢ় ধারণা, ভগবানের প্রতি অটল বিশ্বাস প্রেম ও ভক্তি, অদৃষ্টের প্রতি অটল নির্ভরতা, অন্য কোন জাতির জনসাধারণের হৃদয়ে কখনই স্থান পায় না। ইহা গবেষণার ফল নহে, বিদ্যালাভের ফল নহে, বহুকালব্যাপী জাতীয় সংযম ও অভ্যাসের ফল। ইউরোপীয় জাতিসমূহের এই সাধনা নাই বলিয়া ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের এইরূপ প্রভেদ, এবং ইহার জন্যই ইউরোপীয় লোকসাহিত্যে ও ভারতবর্ষের লোকসাহিত্যে এরূপ বৈসাদৃশ্য। ইউরোপীয় জনসাধারণের গানে গল্পগুজবে আমোদআহ্লাদে অনেক সময়ে এরূপ একটা নীচভাব ও প্রবৃত্তি লক্ষিত হয় যাহা আমাদের নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত ও জঘন্য বলিয়া মনে হয়। আর আমাদের দেশের জনসাধারণের প্রেম ও ভক্তি বশতঃ আমাদের লোকসাহিত্যে এরূপ একটা ভাবুকতা আছে যাহা ইউরোপীয় জাতিসমূহের উচ্চ সাহিত্যেও বিরল। আমাদের কৃষক শিল্পী শ্রমজীবীগণের মধ্যে প্রচলিত রামপ্রসাদী গান, ভাটিয়াল গান, হরগৌরীর গান, বাউলের গান, প্রভৃতিতে এমন অনেক উচ্চ ভাব আছে যাহা একজন ইউরোপীয় দার্শনিককে বিশ্লেষণ করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয়।

মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা।

বাস্তবিক বাঙালীসমাজ যে এত ভাবুকতাপূর্ণ, সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়া যে একটা ভাবুকতার সঞ্জীবনী স্রোত এখনও বহিয়া যাইতেছে তাহার প্রধান কারণ আমাদের জনসমাজের উদার ও মহৎ প্রাণ। আমাদের মধ্যবিত্ত-সমাজ আধুনিক কৃত্রিম শিক্ষা ও দীক্ষার গুরুভারে ক্রমশঃ হীনবল পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মধ্যবিত্তজীবন বহুবর্ষ হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শে গঠিত হইতেছে। এ শিক্ষার আদর্শের সহিত জাতীয় আদর্শের সামঞ্জস্য হয় নাই বলিয়া শিক্ষা জীবনকে একটা সার্থকতার দিকে লইয়া না যাইয়া, একটা সর্ব্বাঙ্গীন পরিসমাপ্তিতে পর্য্যবসিত না করিয়া ক্রমশঃ একটা অন্ধকার অচলায়তনের মধ্যে আবদ্ধ করিতেছে। তাই আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে এরূপ কৃত্রিমতা, এরূপ অস্বাভাবিকতা, এরূপ সরলতার অভাব। যাহা কৃত্রিম তাহার বিকাশ নাই। যাহা সহজ সরল তাহার ত বন্ধন নাই, তাহাই উন্নতিশীল। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য, সমাজের দুর্ভাগ্য, এই কৃত্রিমতা-পরিপূর্ণ মধ্যবিত্ত সমাজ আপনার চিন্তা ও কষ্টের মাপ-

কাঠিতে সমগ্র সমাজের আদর্শ গঠন করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। যদি মধ্যবিত্ত সমাজের আদর্শ কখনও জনসমাজে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে, তবে সে সময় যে হিন্দুসমাজ, ভারতীয় সভ্যতা ও জগতের সভ্যতার পক্ষে ঘোর দুর্দ্দিন, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমাদের বিশ্বাস সে দিন কখনই আসিবে না। কারণ কৃত্রিমতার জয় কতদিন থাকে ?

আধুনিক সাহিত্যের পঙ্গুতা।

আমাদের আধুনিক বাঙালা-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে এই কৃত্রিমতা যে কত দুর্ব্বল তাহা বুঝিতে পারিব। বর্ত্তমান বাঙালা-সাহিত্যে এখন কৃত্রিমতা বুঝাইতে হইবে না। বাঙালা-সাহিত্যে এখন রচনাকৌশল আছে, বাক্যবিন্যাস আছে, কলাকৌশল প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু অকৃত্রিম ভাব নাই, সরলতা নাই, সহজ ও স্বাভাবিক ভাবুকতা নাই। ভাবুক-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ যখন বাঙালী ভাবুকতাকে জগৎসভ্যতা-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্ন বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তখনও বলিতে হইবে বাঙালা সাহিত্য সহজ নহে, সবল নহে, অকৃত্রিম নহে। আর এই সরলতার অভাবের জন্যই সাহিত্য তাহার সঞ্জীবনী শক্তি হারাইয়াছে। মধ্যবিত্ত-সমাজের আজীবন কৃত্রিমতার মধ্যে সাহিত্যের প্রাণ পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। তাই সাহিত্য সমাজের মর্ম্মস্থলের ভিতর নিবিড় আনন্দ সঞ্চার করিতে পারে নাই, সাহিত্যের বাণী সমাজের মর্ম্মস্থলকে স্পন্দিত করিয়া তুলিতে পারে নাই। সাহিত্যের প্রাণ যে রক্তের মত সমাজের রুদ্ধ ধমনীসমূহের ভিতর দ্রুতগতিতে সঞ্চারিত হইয়া সমাজকে জীবন-চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিয়া তুলে, সমাজের জীবনস্পন্দনকে দ্রুততর করিয়া এক অপূর্ব্ব পুলক এক নিবিড় অনুভূতি আনিয়া দেয়। সে প্রাণ কি আমাদের আধুনিক বাঙালা-সাহিত্যের আছে ?

প্রাচীন সাহিত্যে প্রাণের পরিচয়।

আধুনিক বাঙালা-সাহিত্যের সে প্রাণ নাই। সে প্রাণ সে সঞ্জীবনীশক্তি প্রাচীন বাঙালা-সাহিত্যে ছিল। সে প্রাণের পরিচয় কৃত্তিবাস কাশীরামদাসে পাওয়া যায়; ধর্ম্মমঙ্গলে, মনসার ভাসানে পাওয়া যায়। সেই প্রাণে অনুপ্রাণিত দরিদ্র কবি মুকুন্দরামের কাব্য। কবিকঙ্কণের চণ্ডীর সহিত ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের তুলনা করিলে সাহিত্যে প্রাণ না থাকিলে কি দশা হয় তাহা বুঝা যাইবে। জনসাধারণের বাণী মুকুন্দরামের কাব্যে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল, আর কোন বাঙালীর কাব্যে সেরূপ প্রকাশ পায় নাই। বাঙালী সমাজ যদি আবার কখন জাতীয় আদর্শবিকাশে মহীয়ান হইয়া উঠে, তখন বুঝিবে মুকুন্দরামের অকৃত্রিম ও ভাষাপারিপাট্যবিহীন সাহিত্য বাঙালীর মর্ম্মকথা এত স্পষ্ট সহজ ও সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছে যে আর কোন কাব্যসাহিত্য তাহা করিতে পারে নাই।

কবিকঙ্কণের কাব্যে কাহাদিগের চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে? দরিদ্র ব্যাধ কালকেতু ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি সাধ্বী বাঙালীরমণী ফুল্লরার চরিত্র; বাঙালী সদাগর ধনপতি শ্রীমন্ত ও সদাগরপত্নী খুল্লনার চরিত্র। কবিকঙ্কণ দরিদ্রের ভাঙা কুটির চিত্রিত করিয়াছেন, দরিদ্র বাঙালীর সুখ দুঃখ আকাঙ্ক্ষা আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ জনসাধারণের কবি, তাই তাঁহার কালকেতু কুঁড়েঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও রামচন্দ্র অর্জ্জুনের সহিত সমান স্থান অধিকার করিয়াছেন; তাই ফুল্লরা, খুল্লনা, অশিক্ষিতা নিম্নবংশীয়া হইলেও সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর সহোদরা ভগ্নীরূপে গৃহীত হইয়াছেন।

কবিকঙ্কণের সাহিত্যের সহিত পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্য তুলনা করিলে, ভারতচন্দ্রের যুগের কথা স্মরণ করিলে, দেখিতে পাই সাহিত্য কিরূপ বিকৃত অবস্থায় আসিয়াছে। এ সাহিত্যে ভাষা সুন্দর ও মার্জ্জিত, কিন্তু আদর্শ হীন ও মলিন। এ সাহিত্যে আবেগ নাই, সরলতা নাই,—আছে কেবল অসংযম, হৃদয়হীনতা, কৃত্রিমতা। এ সাহিত্য মিষ্টভাষী, কিন্তু ভিতরে উহার গরল,—বিষকুম্ভং পয়োমুখম্‌এর মত। সাহিত্য তখন জনসমাজ—দেশের প্রাণ হইতে আপনার শক্তি সঞ্চয় করে নাই বলিয়া উহার এত দুর্দ্দশা। বিজাতীয় মুসলমানী আদর্শ, কুরুচি-কলুষিত মুসলমানী শিক্ষা-দীক্ষায় সাহিত্য পুষ্ট হইতেছিল বলিয়া সাহিত্য বিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু কবিওয়ালাগণ রাজধানী হইতে বহুদূরে থাকিয়া নিভৃত পল্লীগ্রামে জনসাধারণের

হৃদয়ের কথা পাইয়া এই বিকৃত রুচির দিনেও সাহিত্যের প্রাণকে সজীব রাখিয়াছিল।

তাহার পর বহুশতাব্দী চলিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সাহিত্যের ভিতর দিয়া নূতন আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে। টেকচাঁদ, ঈশ্বরচন্দ্র, ভূদেব, বঙ্কিম, হেম, নবীন, মাইকেলের ভিতর দিয়া বাঙালীর সাহিত্য-সাধনা এক নূতন পথে অগ্রসর হইয়াছে। আরও অগ্রসর হইবে,—বিশ্বসভ্যতা-মন্দিরের দিকে কতদূর অগ্রসর হইবে, বিশ্বসভ্যতা-মন্দিরে বাঙালা-সাহিত্য কি অঞ্জলি প্রদান করিবে, তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যে পাওয়া যাইবে। বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের সমস্ত ধারাগুলি ক্রমবিকশিত হইয়া আসিয়া মিশিয়াছে; শুধু মিশিয়াছে নহে, সমুদ্রে নদীগণের মত একেবারে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাচীন সাহিত্য-গৌরবের কেবল মাত্র উত্তরাধিকারী নহেন; তিনি স্বয়ং একটা নূতন জগৎ আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি স্রষ্টা ও তিনি পরিদর্শক, যে জগৎ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সে জগতে শুধু বাঙালীর জাতীয়তা নহে, বিশ্বসভ্যতাও সার্থকতা লাভ করিবে, সে জগতে পৌঁছিবার পথ কবি তাঁহার গানে কাব্যে উপন্যাসে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

"বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ।"

তাই রবীন্দ্র-সাহিত্য শুধু বাঙালীর সাহিত্য নহে, রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে আপনার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে।

রবীন্দ্রসাহিত্য সার্ব্বজনীন নহে।

কিন্তু যে রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাঙালীর যুগযুগান্তরের সাধনা নিহিত, যে রবীন্দ্রসাহিত্যে ভবিষ্যৎ বাঙালীর আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ সূচিত হইয়াছে, সে সাহিত্য কি বাঙালীর অন্তরতম প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে? রবীন্দ্রনাথ আমাদের এত নিকটতম হইলেও এত দূরে কেন?

ইহা রবীন্দ্রনাথের দোষ নহে, ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্ভাগ্য। আমাদের আধুনিক সাহিত্য বহুকাল হইতে জনসাধারণের নিকট হইতে দূরে সরিয়া আসিতেছে। জনসাধারণের ভাব ও চিন্তাপ্রণালীর সহিত আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকগণের ভাব ও চিন্তার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ খুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য আধুনিক সাহিত্য জাতীয় ভাব, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেও, প্রকৃত পক্ষে জাতীয় বলা যায় না। কারণ প্রকৃত জাতি ত কয়েকজন ইংরেজী-শিক্ষিত উকিল ব্যারিষ্টার মাষ্টার কেরাণী সম্পাদক লইয়া নহে। বাঙালী জাতিকে চিনিতে হইলে পর্ণকুটিরবাসী অশিক্ষিত কৃষক, তাঁতী, জোলা, মজুর, কামার, কুমোর, তেলী ও নাপিতের অভাব ও অভিযোগ আশা ও আকাঙ্ক্ষা জানিতে হইবে।

সাহিত্য ও জনসমাজ।

ইহাদিগের ভাব ও চিন্তাই সাহিত্যের মূল প্রস্রবণ। এই মূল প্রস্রবণের সঞ্জীবনী অমৃতধারা হইতে সাহিত্য যদি বহুকাল বঞ্চিত থাকে, তবে সে সাহিত্যে কাহারও পিপাসা মিটিবে না, সে সাহিত্য অস্বাস্থ্য আনিবে, স্বাস্থ্য আনিবে না। আর সে সাহিত্যের জীবনও অধিক কালের নহে। বালুকারাশির মত কৃত্রিমতা সে সাহিত্যধারার গতি রোধ করিবেই এবং অচিরে বাক্য-বিন্যাস ও হৃদয়হীনতার শুষ্ক মরুভূমিতে সে সাহিত্যধারা জীবন হারাইবে। পক্ষান্তরে জনসমাজ—যাহা সমাজের মর্ম্মস্থল, সাহিত্যে সঞ্জীবনীশক্তি প্রদান করিলে, জনসমাজের অভাব ও আদর্শ সাহিত্যের প্রাণসঞ্চার করিলে, সাহিত্য অমর হইবে। নদীর স্রোতের মত সে সাহিত্য প্রতিমুহূর্ত্তে শক্তি সংগ্রহ করিয়া সমাজক্ষেত্রকে সুশ্যামল ও অনন্ত সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিবে। এবং সে সাহিত্যই জাতির সমগ্র ভাবরাশিকে বিশ্বসভ্যতারূপ মহাসমুদ্রের দিকে নিশ্চিতই পৌঁছাইয়া দিবে।

বিশ্বসাহিত্যে জনসাধারণের বাণী।

বিশ্বসাহিত্যে এ শক্তির পরিচয় যে প্রায়ই ঘটে তাহা নহে। তবুও যখন কোন সাহিত্য এ শক্তিতে শক্তিসম্পন্ন তখনি ইহাকে অমর ও অসীম তেজসম্পন্ন হইতে দেখা যায়। ইউলিয়ম ল্যাঙ্গল্যাণ্ড (William Langland) তাঁহার Piers the Plowmanএ দরিদ্রের

ক্রন্দন প্রকাশ করিয়া অমর হইয়াছেন। জন বুল (John Bull) তাঁহার When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman ছন্দে যে সুর তুলিয়াছিলেন তাহা তাৎকালীন ইংলণ্ডের সমাজে যে বিপুল আন্দোলন আনিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। Arthurian Legends ও Ballad গানেও জনসাধারণের বাণী অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল; ঐ গান ও গল্পগুলিকে অবলম্বন করিয়া যখন কোন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে তখনি তাহা জনসমাজের অন্তরতম প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে। স্কটল্যাণ্ডে ওয়াল্টার স্কট (Walter Scott) পুরাতন চারণদিগের গানগুলি নূতনভাবে চালাইয়া দিয়া সাহিত্যে এক নূতন সুর আনিয়াছিলেন; জনসাধারণের আত্মাকে তিনি কিরূপ স্পর্শ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার Wizard of the North নামেই প্রমাণ। রবার্ট বার্নস্ (Robert Burns) অসংস্কৃত ভাষায় কৃষকের প্রেম-সঙ্গীত গাহিয়া সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ইংলণ্ডে গ্রে, কলিন্স, কাউপার (Gray, Collins, Cowper) দরিদ্রের সুখদুঃখের কথা গাহিয়াছিলেন। জর্ম্মানসাহিত্যে হার্ডার, ফরাসীসাহিত্যে ভিক্তর হ্যুগো (Victor Hugo) এবং রুশ সাহিত্যে Karamsin;—তাঁহাদিগের প্রতিভা ও অকৃত্রিমতা জনসমাজের সহিত তাঁহাদিগের সমবেদনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিন জনই আপনাদের লেখনীপ্রভাবে স্ব স্ব সমাজে যুগান্তর আনিয়াছিলেন। সাহিত্যসম্বন্ধে Karamsin কি বলিয়াছিলেন?—তুমি লেখক হইতে চাহ? তবে তুমি তোমার জাতির শত শতাব্দীর সঞ্চিত দুঃখ-বেদনার কাহিনী পড়। তাহাতেও যদি তোমার অন্তঃকরণ না কাঁদিয়া উঠে, তবে কলম ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও। তোমার পাষাণ হৃদয়কে সকলে চিনুক।

রবীন্দ্রনাথের "এবার ফিরাও মোরে"।

ইহার সঙ্গে আমাদের রবীন্দ্রনাথের বাণী মিলাই—

ওরে তুই ওঠ্ আজি
আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগতজনে? কোথা হ'তে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল?

* * *

ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে,—ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণকাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—
তারপরে, সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি';
নাহি ভৎর্সে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ: নাহি জানে অভিমান
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দারিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে,—এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে।

* * *

কবি, তবে উঠে এস, যদি থাকে প্রাণ—
তবে তাই লহ সাথে—তবে তাই কর আজি দান;
বড় দুঃখ বড় ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দারিদ্র্য, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার!—
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য মাঝারে কবি
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি।

এবার ফিরাও মোরে,—লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী!
ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।

* * *

বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসর প্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে!
যে দিন জগতে চলে আসি
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি?

* * *

সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে
কর্ম্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্ত্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে উঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি,—তবে ধন্য হবে মোর গান
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্ব্বাণ।

রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিয়াছেন। তিনি দৈন্যের মধ্যে "বিশ্বাসের ছবি" আঁকিয়াছেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীত গাহিয়াছেন। কিন্তু সে ছবি, সে

সঙ্গীত, জনসাধারণকে, সমগ্রজাতিকে, স্পর্শ করিতে পারে নাই। দুর্ভাগ্য আমাদের। দুর্ভাগ্য আমাদের সাহিত্যের।

পোষাকী সাহিত্য ও আটপৌরে সাহিত্য।

আমাদের সাহিত্যে কোন্ গান ও কোন্ কাব্য অমর হইয়াছে কোন্ গান সকলের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিতে যাইলে দেখিব আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকগণের সহিত সমাজের কোন যোগই নাই। কোন্ কবির গান আমাদের সমাজে আদরণীয়? রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের গান নহে। জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের গান, রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণের গান, নীলকণ্ঠ ও বাউলের গান, ভাটিয়াল গান, গম্ভীরার গান, হরু-ঠাকুর গোপালউড়ের গান। অনেকে বলিবেন আমাদের জনসমাজে ধর্ম্মসঙ্গীত ভিন্ন অপর সঙ্গীত সহে না। তাহা অনেকটা ঠিক, কারণ ধর্ম্মই আমাদের সমাজের অন্তরতম প্রাণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবিগণ কি ধর্ম্ম-সঙ্গীত রচনা করেন নাই? তাঁহাদিগের ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি সার্ব্বজনীন হইল না কেন? ইহার একমাত্র উত্তর,—ইঁহাদিগের গানের ভাব সহজ নহে, সরল নহে, অকৃত্রিম নহে, ইঁহাদিগের ভাষাই এই কৃত্রিমতার প্রধান সাক্ষী। ভাব ও ভাষার কৃত্রিমতার জন্যই ইঁহাদিগের গানগুলি সার্ব্বজনীন হইতে পারে নাই। শুধু ধর্ম্মসঙ্গীতে কেন প্রেম-সঙ্গীতগুলিতেও এই কৃত্রিমতা লক্ষিত হয়। আধুনিক বাঙালা-সাহিত্যে প্রেমসঙ্গীতের অভাব নাই, কিন্তু শ্রীধর রামবসু নিধুবাবুর প্রেমসঙ্গীত ভিন্ন বাঙালী কৃষক শিল্পী অপর কাহারও গান ত কখনই গাহে না।

এই সকল কারণে আমার অনেক সময় মনে হয় আমাদের আধুনিক সাহিত্য পোষাকী, আটপৌরে নহে; ইহা বিলাসিতা, সৌখীনতার উপকরণ; জল বাতাসের মত আমাদের অত্যাবশ্যক, আমাদের আত্মীয় নহে; ইংরেজী-শিক্ষিত ভদ্রসমাজের ইহা club, drawing room অথবা parlourএর কল্পনার সামগ্রী মাত্র। সেখান হইতে ইহার অন্য কোন স্থানে গমনাগমনের হুকুম নাই। আমাদের সাহিত্যের স্বাধীনতা নাই। আমাদের সাহিত্য শিল্পকলা, কারুকার্য্য, নৈপুণ্য ও অলঙ্কারের বোঝায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সাহিত্যের বাণী দেশের হাট মাঠ ঘাট বাটে শুনা যায় না।

"আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা,
আমি ঢালিব ঝরণা ধারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা"

আমাদের সাহিত্যের সে শক্তি, সে তেজ নাই।

লোকসাহিত্যের শক্তি ও স্বাধীনতা।

সাহিত্যকে সার্ব্বজনীন হইতে হইলে সাহিত্যের ভাষা, উপমা, imagery বা শব্দের ছবি, ভাবের অভিব্যঞ্জনার পদ্ধতি সার্ব্বজনীন হওয়া চাই। একটা উপমা, একটা imagery, বা শব্দের ছবি খুব সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহা যদি কল্পনার সামগ্রী হয়, দেশের সমাজের বাস্তবজীবনের সহিত যদি তাহার সামঞ্জস্য না থাকে, তাহা হইলে উহা কবির মস্তিষ্কের একটা abstract বা বস্তু-অনপেক্ষ ভাবময় অলীক ধারণা হইয়া থাকিবে মাত্র, তাহা জাতির হৃদয়ে স্থান পাইবে না। গম্ভীরার গায়ক গাহিলেন,

তুমি হয়ে চাষী কাশীবাসী কেন কাশীশ্বর
কর্ম্মক্ষেত্র এ ব্রহ্মাণ্ডক্ষেত্র তব হর।

* * *

মন আত্মা দুই বলদে বেঁধে
কর্ম্ম-জুয়াল চাপিয়ে কাঁধে
মায়ারজ্জু নাসায় ছেঁদে
কতই বা আর তাড়?
সুখ দুঃখ দুই শক্ত জোতা
সেই জুয়ালে আছে যোতা
আশা লাঠির দিচ্ছ গুঁতা
ওহে দিগম্বর।

এ গানের imagery বা ছবিগুলি কল্পনা করিতে হয় নাই। কল্পনা বরং কবিকে আশ্রয় করিয়া এমন একটা সুন্দর স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল, যে, প্রত্যেক কৃষক পল্লীবাসীই সে ভাবমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইল। এ গান অমর, কারণ দেশের কৃষকের প্রাণকে ইহা স্পর্শ করিয়াছে। কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ যখন বাউলের সুরে গাহিলেন

দোকানি ভাই, দোকান সার না।
কত করবি আর বেচাকেনা॥

ও তোর লাভের আশায় দিন কেটে গেল
দোকানের সব মাল মশলা, চোর ছজন মিলে
(দোকানি);
ও তোর মহাজনের
(ওরে ও ও দোকানি)
কি করিবি তাগাদির দিন বল না॥
ফিকিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা,
এখন, মহাজনের শরণ লয়ে জানাও গো ব্যথা,
(দোকানি) তিনি বড় দয়াল ;
(তার মত আর দয়াল নাই রে)
শুনলে সাওয়াল, তোরে নিদয় হবেন না॥

অমনি সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী এ সুরে সাড়া দিয়া উঠিল। পূর্ব্ববঙ্গের মাঝি "ভাটির স্রোতে ভাটার গড়ানে" নৌকা ছাড়িয়া যখন গাহিয়া উঠিল

ওগো দরদী—আমার মন কেন
উদাসী হইতে চায় ?
ও তার ডাক নাহি, হাক নাহি গো
আপনি আসে চইলে যায়।
ধৈরয না ধরে অন্তরে
সদা কেঁপে উঠে মন শিহরে,
যেন নীরবে, সুরবে সদা—
ডাকিতেছে আয় গো আয়।
যেন ভাটির স্রোতে ভাটার গড়ান
সাগর যেমন সদা গো টানে
নদীর পরাণ
সে টান এতই সরল, মনেরই গরল
অমৃত হইয়ে যায়।

তখন তাহার ভাব ভাষা কল্পনা একেবারে শ্রোতার মনের মধ্যে গিয়া পৌঁছে! যুগযুগান্তর ধরিয়া তুমি উদাসী হইয়া ব্যাকুল ভাবে ভগবানকে খুঁজিতেছ, সে খোঁজার অন্ত নাই, আড়ম্বর নাই, আছে কেবল ক্ষণে ক্ষণে পুলক-বেদনা ; আর তিনিও কত না যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমাকে নীরবে অথচ সুরবে আয় আয় গো আয় বলিয়া ডাকিতেছেন। এ ডাকে এ আকুল আকর্ষণে সাড়া না দিয়া থাকা যায় না, এ প্রেমের টানে তোমার সব কুটিলতা সব পাপ এক নিমেষে দূর হইবে। তুমি অমৃতময় হইবে। এ প্রকার সাহিত্য অমর, সার্ব্বজনীন। ইহার ভাব যেরূপ উচ্চ ইহার ভাবের অভিব্যঞ্জনার পদ্ধতি সেরূপ সহজ ও সরল। এ সাহিত্যে "ভাবের কুজ্ঝটিকা ও ভাষার ব্যাসকূট" নাই। এ সাহিত্য মর্ম্মস্পর্শী, প্রাণোন্মাদনকারী।

লোকসাহিত্যে হিন্দুসমাজের বাণী।

আর যদি বাঙালীর বাঙালীত্ব কিছু থাকে তবে আমাদের এই সাহিত্যেই উহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় নহে, বাংলার দরিদ্র জনসাধারণ কৃষক শিল্পীগণই বাঙালীর বাঙালীত্বকে এখনও সজীব সতেজ রাখিয়াছে। বাঙালীত্ব কি তাহা পূর্ব্বেই সূচনা করিয়াছি,—ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতা, হিন্দুর অনন্তবোধ ;—সংসারের সমস্ত বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও একটা অসীমে প্রীতি একটা অনন্তের আকর্ষণ। শুধু যে একটা মুক্তির প্রতীক্ষা, বন্ধন ছিঁড়িবার আকাঙ্ক্ষা, তাহা নহে ; দৈনন্দিন, কঠোর জীবনকেও এই অসীমে প্রীতির দ্বারা মধুর সরস করিয়া তুলা, সংসারের ক্ষুদ্র কার্য্যকলাপ অসীম মানবের সমস্ত বন্ধনকে ঐ অনন্তবোধের দ্বারা অনুরঞ্জিত করা,—সংসার ও সন্ন্যাস, বন্ধন ও মুক্তি, ভোগ ও ত্যাগ, ইন্দ্রিয় ও তুরীয়, সসীম ও অসীমের সমন্বয় সাধন।

অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।

ইহাই হিন্দুসমাজের, বাঙালা সমাজের অন্তরতম প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ; ইহাই হিন্দুসাহিত্যের, বাংলার লোকসাহিত্যের বাণী।

সমাজ ও সাহিত্যে বিপ্লব।

এই আকাঙ্ক্ষা এই সুর বাংলার জনসমাজে এখনও পরিস্ফুট রহিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষা, এই ভাবুকতা, এই আধ্যাত্মিকতাকে আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে। আধুনিক বাঙালা সমাজের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু দায়িত্ব। আধুনিক লোকশিক্ষকের ইহাই মহত্তম কর্ত্তব্য। এই মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজ ও সাহিত্যের ভাব ও চিন্তার কৃত্রিমতাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। লোকশিক্ষক দেশের জনসাধারণের ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আধুনিক সমাজ ও সাহিত্যের আমূল পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত করিবেন, সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্রে এই বিপ্লবের তিনি নেতা হইবেন।

লোকশিক্ষক ও যুগান্তর।

জনসাধারণের মধ্যে এই আধ্যাত্মিকতা বিকাশের ফলে, আধুনিক বাঙ্গালা সমাজ ও সাহিত্যজগতে এই বিপ্লবসাধনের ফলে, বাঙালী সমাজ ও সাহিত্য আরও জাতীয়, আরও মহনীয় হইয়া উঠিবে, বাংলার সমাজ ও সাহিত্য নূতন ফল ও নূতন প্রাণ লাভ করিবে, বাঙালীর বাণী বিশ্বজগতের চিন্তাক্ষেত্রে আরও বিচিত্র, মধুর ও অমোঘ সুরে বাজিয়া উঠিবে। বাস্তবিক লোকশিক্ষক বাংলার সমাজে এক যুগান্তর আনিবেন।

জনসাধারণের এই আধ্যাত্মিকতাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া লোকশিক্ষক যে সন্তুষ্ট থাকিবেন তাহা নহে। এই আধ্যাত্মিকতাকে তিনি কার্য্যকারী করিয়া তুলিবেন।

লোকশিক্ষকের কর্ম্মক্ষেত্র।

দেশে আধুনিক কালে জনসাধারণের মধ্যে এমন একটা অবসাদ, আলস্য ও কর্ম্মের প্রতি অনাদর জন্মিয়াছে যাহা দূর করা অত্যাবশ্যক এবং যাহা দূর করা এখন দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। জনসাধারণের এখন অসংখ্য অভাব, নিত্যনৈমিত্তিক অভাবের তাড়নায় তাহারা জর্জ্জরিত, কিন্তু অভাব-সমুদয় মোচন করিবার জন্য তাহাদিগের বিশেষ ব্যাকুলতা নাই। ব্যাকুলতা থাকিলেও তাহাদিগের কার্য্যশক্তি অত্যন্ত অল্প। ভারতবর্ষ বহুকাল হইতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাইয়াছে। কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতাকে আপনার পল্লীসমাজে সজীব রাখিয়া জনসাধারণের কর্ম্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ রাখিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে অনেককাল অভ্যাসের অভাবে কর্ম্মশক্তি ও সমবেত উদ্যোগ একবারেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। লোকশিক্ষক একদিকে যেমন জনসমাজের স্বাভাবিক চরিত্রগুণকে ভাবুকতাকে উদ্বুদ্ধ করিবেন, অপরদিকে সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে কর্ম্মের বাণী প্রচার করিয়া তাহাদিগকে এক বিপুল কর্ম্মজীবনে যোগদান করিতে আহ্বান করিবেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার কর্ম্ম আবদ্ধ থাকিবে না। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমগ্র সমাজে ব্যাপ্ত হইবে। সমাজের যেখানে যাহা অভাব তাহা তিনি জাগাইয়া তুলিবেন, তাহা মোচন করিবার জন্য তিনি বিপুল আয়োজন করিবেন এবং সেই আয়োজনে অদম্য উৎসাহের সহিত জনসাধারণকে ব্রতী করিবেন। বিপন্ন মধ্যবিত্ত, নির্য্যাতিত শিল্পী ও অনশনক্লিষ্ট কৃষকগণকে তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিবেন। স্বাস্থ্য চাই, বল চাই, অন্ন চাই, শিক্ষা চাই, দীক্ষা চাই, আনন্দ চাই,—তিনিই তাহাদিগের বিচিত্র অভাবনিচয়ের অভিযোগের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবেন। নিজেই কর্ম্মী হইয়া বিচিত্র শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়া এই-সমস্ত অভাব যাহাতে জনসাধারণের সমবেত চেষ্টা ও উদ্যোগে মোচন করা যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

লোকশিক্ষকের আদর্শ।

লোকশিক্ষক কেবল যে শিক্ষাদানে অভ্যস্ত থাকিবেন তাহা নহে। পাশ্চাত্যজগতের উন্নত কৃষি ও শিল্পকর্ম্ম-প্রণালীর বিচিত্র খবর পল্লীসমাজে প্রচার করিয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন না। গ্রাম্যকৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলি তিনি হাতে কলমে কাজ করিয়া পল্লীসমাজে প্রচার করিবেন। কেবল যে তিনি কৃষি-শিল্প-ও বাণিজ্য-প্রচারক হইবেন তাহাও নহে। আমাদের প্রাচীন সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির সংস্কার-সাধন করিয়া এবং নব নব অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি পল্লীসমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ধীর ও বিপুল আয়োজন করিবেন। সমগ্র পল্লীসমাজ তাঁহার নিঃস্বার্থ জীবন হইতে প্রাণ পাইবে, তাঁহার প্রাণ পল্লীসমাজের উন্নতিসাধনে নিযুক্ত থাকিয়া প্রসারলাভ করিবে।

> তং বেধা বিদধে নূনম্ মহাভূতসমাধিনা।
> তথৈব সর্ব্বে তস্যাসন্ পরার্থৈক ফলাগুণাঃ॥

পঞ্চভূত যেমন শুধু সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত, সেরূপ তাঁহার সমস্ত গুণই সমাজ-সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। তিনি পঞ্চভূতের উপাদানে গঠিত হইবেন। লোকশিক্ষক এরূপ উপাদানে গঠিত না হইলে সমাজকে তিনি জাগ্রত করিতে পারিবেন না। সুপ্ত জাতিকে বহুশতাব্দীর নিদ্রা ও অবসাদ হইতে উদ্ধার করিতে হইলে ভগবানের অংশসম্ভূত লোকচরিত্রনিয়ামক কর্ম্মীর প্রয়োজন। তাঁহার চরিত্রে দুইপ্রকার গুণের সমাবেশ চাই। এক-

দিকে তিনি বজ্রকঠোর অসীম তেজসম্পন্ন হইবেন। তাঁহার ধূমকেতুর মত করালমূর্ত্তির তেজে সমস্ত বাধাবিঘ্ন শত্রুতা অসম্পূর্ণতা ম্রিয়মাণ হইবে। অপর দিকে তিনি কুসুমমৃদু,—নিরহঙ্কারী, অসীম প্রেম ও ভক্তির আধার হইবেন। যে সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে সমাজ তাঁহাকে শৈশবে লালন-পালন করিয়াছে এবং যৌবনে বিদ্যা অর্থ ও সম্মান গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছে, যে সমাজ তাঁহার প্রাণে বল, কণ্ঠে ভাষা, বাহুতে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তি দান করিয়াছে, তাঁহার সেই শিক্ষা- ও দীক্ষা-গুরুর নিকট তিনি ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে বলিবেন,—

---"ইহা আমি কিছুই না জানি
যে তুমি কহাবে সেই কহি আমি বাণী।
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুক পাট,
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট?
হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাও বাণী
কি কহিব ভাল মন্দ কিছুই না জানি।"

সমাজের বাণী তাঁহার বাণী হইবে, জাতির সাধনা তাঁহার সাধনা, দেশের শক্তি তাঁহার শক্তি হইবে। সমগ্র সমাজের সুপ্ত কর্ম্মশক্তি হইতে তিনি ধীরে ধীরে আপনার শক্তি সঞ্চয় করিবেন। শুধু সমাজ নহে, বিশ্বপ্রকৃতি হইতেও তাঁহার শক্তিসঞ্চার করিতে হইবে। অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকার, বৈশাখ মধ্যাহ্নের প্রখর দীপ্তি, বর্ষারাত্রির ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রধ্বনি, দুর্গম গিরিকন্দর ও নিবিড় অরণ্য হইতে তিনি তাঁহার সাধনায় অসীম শক্তি লাভ করিবেন। রুদ্রপ্রকৃতির সমস্ত তেজ তাঁহার তেজ হইবে। বিশ্বপ্রকৃতি হইতে অমরজীবন লাভ করিয়া তিনি তখন নির্জীব সমাজকে জীবনদান করিতে পারিবেন। হীনবল জনসাধারণকে বিন্দু বিন্দু করিয়া শক্তিদান করিয়া তিনি তাহাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রণোদিত করিবেন। তাঁহার পূর্ণ-জীবনে জীবন লাভ করিয়া জনসাধারণ জাগিয়া উঠিয়া একটা কর্ম্মিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইবে। লোকশিক্ষক প্রকৃত লোকচরিত্রনিয়ামক—জননায়ক হইয়া নিজের ও জাতির জীবন সার্থক করিবেন।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

নাটেশ্বর শিব

বিগত ১৩১৮ বঙ্গাব্দের "ভারতী" পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় "লঙ্কায় নট-রাজ-শিব" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"নটরাজের মূর্ত্তি অতি দুর্লভ। আর্য্যাবর্ত্তের কোথাও এ মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না। দক্ষিণাপথের কেবল একটী স্থানে নটরাজের মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। এই স্থানের নাম চিদম্বরম্।"

ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মহাশয় "ভারতী" পত্রিকায় লঙ্কার নটরাজ-মূর্ত্তির যে প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছেন, ঐরূপ গঠন-সমন্বিত শিবের নৃত্য-বেশের মূর্ত্তি সম্ভবতঃ অদ্যাপি বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু শিবের অন্যবিধ নৃত্যাভিনয়-সংস্থিত শিলাময়ী মূর্ত্তি আমরা বঙ্গদেশে একাধিক প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

বর্ত্তমান সময়ে শিবের লিঙ্গমূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে কিন্তু পুরাকালে শৈবগণ ভবেশের পুরাণোক্ত বিবিধ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার অর্চ্চনা করিতেন। তাহার নিদর্শন স্বরূপ বর্ত্তমান যুগে আমরা প্রাচীন দীঘী ও পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে, উমা-মহেশ্বর, অর্দ্ধনারীশ্বর, নাটেশ্বর, পঞ্চানন প্রভৃতির ভগ্ন ও অভগ্ন মূর্ত্তিগুলি প্রাপ্ত হইতেছি। ঐ-সকল মূর্ত্তি কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করাও কঠিন নহে। ইতিহাসজ্ঞগণ সকলেই স্বীকার করিবেন যে, লক্ষ্মণসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী সেনবংশীয় নৃপতিবৃন্দ পরম শৈব ছিলেন। বল্লালসেন কাটোয়া-শাসনে হেমন্তসেনকে "বৃষধ্বজচরণাম্বুজষট্‌পদগুণাভরণ" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বল্লালসেন তাঁহার শাসনের প্রারম্ভেই অর্দ্ধনারীশ্বরের বন্দনা করিয়াছেন। বিজয়সেন হরিহরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে যে-সকল তাম্র-পট্ট প্রদান করিয়াছেন সেগুলির প্রারম্ভেও মহাদেবের বন্দনাই দৃষ্টিগোচর হয়। বিক্রমপুর অঞ্চলে যে-সকল প্রাচীন দেউলের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যেও শৈব দেউলের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। "নাটেশ্বর" দেউলে যে মহাদেবের নৃত্যবেশের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা ঐ দেউলের নামেই সূচিত হইতেছে। "শঙ্করবন্দ"

নাটেশ্বর শিব।

দেউলেরও নাম দ্বারাই উহার শৈবত্ব প্রতিপন্ন হয়। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি দ্বারা সংগৃহীত বাঙ্গালার মূর্ত্তিশিল্পের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন স্বরূপ অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিখানি বিক্রমপুরের অন্তর্গত কুড়াপাড়া গ্রামের দেউলের শোভা-বর্দ্ধন করিত। উল্লিখিত দেউলগুলি সেনরাজগণের রাজধানী রামপাল নগরের অনতিদূরে অবস্থিত। এই-সকল কারণেই অনুমান হয় যে সেনবংশীয় ভূপতিবর্গের রাজত্বকালে এই-সকল মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সেই সময়ে বঙ্গদেশে শৈবধর্ম্মও সবিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। [illegible] বিক্রমপুর অঞ্চলের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ, শক্তিমন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে, শিবমন্ত্রও গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোনো কোনো পরিবারে উক্ত উভয় মন্ত্রের নিমিত্ত বিভিন্ন গুরুবংশ নির্দ্দিষ্ট আছেন। যে দেশে শৈবধর্ম্ম এতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং যে দেশের শাসকগণ শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, সে দেশে নাটেশ্বর বা নটরাজের মূর্ত্তি বিদ্যমান থাকা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় নহে।

বিগত ১৩১৯ বঙ্গাব্দের "সম্মিলন" পত্রে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় একখানি ভগ্নমূর্ত্তির প্রতিলিপি দ্বারা, ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উক্তি খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহার ফলে, সম্মিলন পত্রে এক ছোট খাটো সাহিত্যিক সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। আমরা সেই ভয়ে ভয়েই মূর্ত্তিখানিকে 'নটরাজ' না বলিয়া 'নাটেশ্বর' নামে অভিহিত করিলাম। কারণ "নাটেশ্বর" নামক দেউল অন্ততঃপক্ষে বাঙ্গালীর উক্ত নামধেয় মহাদেবের উপর দাবী সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সেনবংশীয় নরপতিগণের পূর্ব্বপুরুষ দক্ষিণাপথ হইতে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, অধুনা ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। হইতে পারে, সেনরাজগণের নটরাজ-প্রীতি,—দক্ষিণাপথ হইতে আমদানী হইয়াছিল। তবে দক্ষিণাপথের নটরাজমূর্ত্তি কিছু উগ্র, কিন্তু বাঙ্গলার নাটেশ্বর বঙ্গীয় ভাস্করগণের স্বভাব ও শিক্ষানুযায়ী, অপেক্ষাকৃত সৌম্য এবং শান্ত। নটরাজ, নটেশ, নর্ত্তেশ, নাটেশ্বর প্রভৃতি মহাদেবের নামগুলি একার্থবোধক। ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মহাশয় দক্ষিণাপথে প্রচলিত নটরাজের যে ধ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতেও নটরাজের পরিবর্ত্তে নটেশ শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। * শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্, এ মহাশয় ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের নিমিত্ত ত্রিপুরা জিলা হইতে একখানি মহাদেবের নৃত্যবেশের মূর্ত্তি আনয়ন করিয়াছেন। ঐ মূর্ত্তির পাদপীঠে প্রাচীন অক্ষরে "নর্ত্তেশ" এই লিপিটী ক্ষোদিত আছে। ঐ মূর্ত্তি এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে মূর্ত্তির প্রতিলিপি প্রদান-করিলাম, তাহা একই রূপ। সুতরাং বঙ্গদেশেও যে এক সময়ে নট-

* লোকানাহূয় সর্ব্বান্ ডমরুকনিনাদৈ র্ঘোর সংসারমগ্নান্।
দত্বা ভীতিং দয়ালুঃ প্রণতভয়হরং কুঞ্চিত সপাদপদ্মম্॥
উদ্ধৃত্যেদং বিমুক্তে র্য়নমিতিকরাদ্দর্শয়ন প্রত্যয়র্থ।
বিভ্রদ্ বহ্নিং সভায়াং কলয়তি নটনং সঃ স পায়ান্নটেশঃ॥

রাজের আবির্ভাব হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহের কারণ বিদ্যমান নাই। আমরা নিম্নে এই শিলাময়ী নাটেশ্বর মূর্ত্তিখানির যথাসম্ভব পরিচয় প্রদান করিলাম।*

মহাদেব নৃত্যাবস্থায় কুঞ্চিত পদে দণ্ডায়মান। পদতলে বৃষভ নৃত্যানন্দে বিভোর হইয়া প্রভুর পানে চাহিয়া নৃত্য করিতেছে। দক্ষিণ পার্শ্বে মকরবাহিনী গঙ্গা। বাম পার্শ্বে সিংহবাহিনী গৌরী। উভয় মূর্ত্তিই শিল্পসম্পদে গরীয়সী। উক্ত উভয় মূর্ত্তির নিম্নে ভূত বেতালগণ তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। দেবাদিদেব দ্বাদশ হস্তবিশিষ্ট। দ্বাদশ হস্তই অঙ্গদ- ও বলয়-পরিশোভিত। সর্ব্বোর্দ্ধের উভয় হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক গজাজিন ধারণ করিয়া আছেন। তন্নিম্নের উভয় হস্ত দ্বারা অর্দ্ধমানবাকৃতি নাগরাজ বাসুকিকে ধনুকাকারে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তন্নিম্নের দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা এবং বাম হস্তে ত্রিশূল পরিশোভিত। তন্নিম্নের দক্ষিণ হস্তে ডমরু, বাম হস্তে সম্ভবতঃ নরকপাল। তন্নিম্নের দক্ষিণ হস্ত অভয় দানে নিয়োজিত এবং বাম হস্ত দ্বারা কমণ্ডলু ধারণ করিয়া আছেন। সর্ব্বনিম্নের হস্তদ্বয় তুম্বিফলযুক্ত বীণা বাদনে নিয়োজিত। মহেশ্বরের বদনমণ্ডল হর্ষোৎফুল্ল। গলদেশে আবক্ষবিলম্বিত রত্নহার। উভয় কর্ণ কুণ্ডল ও অন্যান্য আভরণ দ্বারা সমলঙ্কৃত। কটিদেশ বেষ্টন করিয়া নাগহার দোদুল্যমান। পরিধেয় নাগচর্ম্ম নানাবিধ কট্যাভরণ দ্বারা বেষ্টিত। চরণদ্বয়ে নৃত্যকালীন আভরণ নূপুর শোভা পাইতেছে। চালিতে কয়েকটী ক্ষুদ্র মূর্ত্তি তক্ষিত রহিয়াছে; তন্মধ্যে বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয় এবং গণেশের মূর্ত্তি পরিস্ফুট। অপর মূর্ত্তিগুলি অপরিস্ফুট। মৎস্যপুরাণান্তর্গত প্রতিমালক্ষণ নামক অধ্যায়ে, রুদ্রমূর্ত্তি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যেরূপ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি রুদ্রাদ্যাকারমুত্তমম্।
আপীনোরু ভুজস্কন্ধ শুপ্তকাঞ্চন-সপ্রভঃ॥
শুক্লার্করশ্মিসংঘাত চন্দ্রাঙ্কিতজটো বিভুঃ।
জটামুকুটধারী চ দ্বিরষ্টবৎসরাকৃতিঃ॥
বাহুর্বারণহস্তাভো বৃত্তজঙ্ঘো কমণ্ডলঃ।
উর্দ্ধকেশস্তু কর্ত্তব্যো দীর্ঘায়তবিলোচনঃ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানঃ কটিসূত্রত্রয়ান্বিত।
হারকেয়ূরসম্পন্নো ভুজঙ্গাভরণ স্তথা॥
বাহবশ্চাপি কর্ত্তব্যা নানাভরণভূষিতাঃ।
পীনোরুগণ্ডফলকঃ কুণ্ডলাভ্যামলঙ্কৃতঃ॥
আজানুলম্ব বাহুশ্চ সৌম্যমূর্ত্তিঃ সুশোভনঃ।
খেটকং বামহস্তে তু খড়্গঞ্চৈবতু দক্ষিণে॥
শক্তিং দণ্ডং ত্রিশূলঞ্চ দক্ষিণে তু নিবেশয়েৎ।
কপালং পামপার্শ্বে তু নাগং খট্বাঙ্গমেব চ॥
একশ্চ বরদো হস্ত স্তথাক্ষবলয়োঽপরঃ।
বৈশাখং তানকং কৃত্বা নৃত্যাভিনয়সংস্থিতঃ॥
নৃত্যে দশভুজঃ কার্য্যো গজাসুরবধে তথা।
তথা ত্রিপুরদাহে চ বাহবঃ ষোড়শৈব তু॥
শঙ্খং চক্রং গদা শার্ঙ্গং ঘণ্টা তত্রাধিকা ভবেৎ।
তথা ধনুঃ পিনাকঞ্চ শরো বিষ্ণুময়স্তথা॥

উল্লিখিত বিবরণে নৃত্যকালীন মহাদেবের দশ হস্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আলোচ্য মূর্ত্তিতে হস্তের সংখ্যা দ্বাদশটী। প্রকৃতপক্ষে মূর্ত্তিতে দশ হস্তেরই কার্য্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়। ঊর্দ্ধের দুইটী হস্ত নিশ্চেষ্ট ভাবে মস্তকোপরি স্থাপিত রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ভাস্কর মূর্ত্তির শোভা বর্দ্ধনের নিমিত্ত অতিরিক্ত হস্তদ্বয়ের সমাবেশ করিয়া থাকিবেন।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ।

পাবনা জেলার প্রজা-বিদ্রোহ

বাঙ্গালা ১২৭৯।৮০ সালের জমিদার ও রায়তগণের মধ্যে বিবাদ পাবনা জেলার আধুনিক সময়ের প্রধানতম ঐতিহাসিক ঘটনা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বাঙ্গালার ভূম্যধিকারিগণ গবর্ণমেণ্টের সহিত চিরকালের জন্য স্থায়ীভাবে রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া লন, কিন্তু তাঁহারা প্রজার নিকট হইতে যদৃচ্ছা খাজনা আদায় ও তাহা বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। এমন কি স্থানবিশেষে তাঁহারা জোর করিয়া ও উৎপীড়ন করিয়া বৃদ্ধি-জমা ও বাজে-জমা ইত্যাদি আদায় করিতেন। এ বিষয়ে যদিও পূর্ব্ব হইতে দেশে নানাপ্রকার আন্দোলন চলিতেছিল, তথাপি প্রজা ও জমিদারগণের মধ্যে এযাবত খাজনা সম্বন্ধীয় আইনের

* এই মূর্ত্তিখানি রামপাল নগরীর ৩॥ মাইল পশ্চিম দিকস্থ আউটসাহী গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ গুপ্ত বি, এ মহাশয়ের বাটীর বাঁধাঘাটের উপরে একটী স্তম্ভগাত্রে সংলগ্ন আছে। ইহা তাঁহাদের জমিদারীর অন্তর্গত রাণীহাটী গ্রামে মৃত্তিকা-খনন-কালে পাওয়া গিয়াছিল। রাণীহাটি, আউটসাহীর দক্ষিণপ্রান্তসংলগ্ন গ্রাম।

কোন বিশেষ বিধান না থাকায়, গবর্ণমেণ্ট জমিদারগণের এতাদৃশ অত্যাচর হইতে রায়তগণকে রক্ষা করিতে সহসা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। পাবনা জেলার রায়তগণ সাধারণতঃ শান্তপ্রকৃতি ও নিরীহ হইলেও এক্ষণে তাহারা সবিশেষ উৎপীড়িত হইয়া স্থানে স্থানে বহুলোক একত্র দলবদ্ধ হইয়া জমিদারগণের বৃদ্ধি-জমা আদায়ে বাধা প্রদান করে এবং তদুপলক্ষে স্থানে স্থানে নানাপ্রকার দাঙ্গাহাঙ্গামা উপস্থিত হইয়া সমস্ত জেলায় অশান্তির সৃষ্টি হয়। ১২৭৯-৮০ সালের জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে এই সংঘর্ষই পাবনা জেলার প্রজাবিদ্রোহ নামে পরিচিত। এই তুমুল আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এই বিষয়ে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয় এবং ফলস্বরূপ ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন প্রবর্ত্তিত হয়।

("The Agrarian Riots of 1873 in Pabna are very important, because it led to the exhaustive discussion of the tenant's right, which culminated in the "Rayat's charter," the Bengal Tenancy Act of 1885.—*Imp. Gazetteer E. B. and Assam, p. 285.* "These Pabna rent disturbances of 1873 were really the origin of the discussions and actions which eventually led to enactment of the Bengal Tenancy Act in 1885."—*Bengal under the Lieutenant Governor, p. 548.*)

বিদ্রোহের কারণ।

(১) বাজে-জমা আদায়।

প্রজাগণ তাহাদের দেয় খাজনা ব্যতীত বাজে-জমা প্রভৃতি দিতে আপত্তি করে; জমিদার ও তাহাদের কর্ম্মচারিগণ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাহা আদায়ের নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করেন। তাঁহারা গ্রামখরচ, স্কুল-খরচ, ও বিবাহাদিতে প্রজার নিকট সাহায্য ও ভিক্ষা প্রভৃতি আদায় করিতে থাকেন। কোনস্থলে রায়তগণ স্বেচ্ছায়, কোনস্থলে অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া এই-সমস্ত দিয়া আসিতে থাকে।

যখন জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে বাজে-জমা প্রভৃতি লইয়া এবম্প্রকার আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময় সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীনস্থ নাটোররাজ জমিদারির অন্তর্গত ইউসুফসাহী পরগণা বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হওয়ায় নিম্নলিখিত কয়েকজন ভূম্যধিকারী তাহা খরিদ করেন।

(১) কলিকাতার ঠাকুর জমিদার
(২) ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায় "
(৩) সলপের সান্যাল "
(৪) পোরজনার ভাদুড়ি "
(৫) স্থলের পাকড়াশি "

পূর্ব্ব হইতেই প্রজাবর্গ উপরোক্ত বাজে-জমা প্রভৃতি আদায়ের জন্য জমিদারগণের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এক্ষণে উক্ত পরগণা নূতন মালেকগণ খরিদ করিয়া প্রকারান্তরে প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টিত হওয়ায় অসন্তোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

(২) নূতন জরিপপ্রণালী।

তাঁহারা প্রজার জমি জরিপ করিতে গিয়া নূতন জরিপপ্রথা প্রবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। নাটোর-রাজের সময়ে জরিপের যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাঁহারা তৎপরিবর্ত্তে নূতন মাপের নল প্রচলন করিয়া প্রজার জমি জরিপ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে রাজা রামজীবনের সময় হইতে সাধারণতঃ ২২।॰ ইঞ্চি হাতের মাপের নল প্রচলিত ছিল; এক্ষণে ১৮ ইঞ্চি হাতের মাপের নল দ্বারা জরিপ আরম্ভ হওয়ায় প্রজার জমি হ্রাস হইতে লাগিল, পক্ষান্তরে নানাপ্রকার বাজে-জমা প্রভৃতি লইয়া তাহাদের দেয় খাজনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইল। ইহাতে রায়তগণের মনে বিষম আঘাত লাগায় মনোমালিন্য ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

("The quarrel arose owing to the purchase, by absent (landlord) Zaminders, of lands, which formerly belonged to the Natore Raja. From the first the relations between the new-comers and the Rayats were unfriendly. The Zaminders attempted to enhance rents and also to consolidate customary cesses with rents, and dispute arose over the proper length of the measuring pole."—Imperial Gazetteer E.B. and Assam, p. 285.)

(৩) বৃদ্ধি-জমার কবুলিয়ত গ্রহণ।

এই সময় রোড্‌সেস্‌ আইন সর্ব্বত্র জারী হওয়ায় জমিদারগণ পথকরের রিটারনে প্রজার জমিজমার বিব-

রণ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। এ কারণে তাঁহারা রায়তের নিকট হইতে বৃদ্ধি-জমার কবুলিয়ত আদায় করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রজাগণকে পাট্টাদি কিছুই দিতে স্বীকৃত হইলেন না। নাটোর-রাজার সময়ে যাহার খাজনা ১ টাকা ছিল, পরে তাহার উপর ॥০ আনা বৃদ্ধি হইয়াছিল, এক্ষণে ১৮৭৩ সালে তাহার উপর আরও ॥০ আনা বৃদ্ধির চেষ্টা হইল; মোটের উপর যাহার খাজনা পূর্ব্বে ১৲ টাকা ছিল, এক্ষণে তাহা ২৲ টাকা হইতে চলিল; আদালতের বিচারে স্থলবিশেষে ১৸০ টাকা সাব্যস্ত হইতে লাগিল। এই প্রকারে প্রজাগণ আপনাদের দেয় খাজনার পরিমাণ সহসা নির্ণয় করিতে পারিতেছিল না। যেখানে যেখানে জমিদারগণের কার্য্যকারকগণ জোর করিয়া প্রজাগণের নিকট কবুলিয়ত রেজেষ্টারি করিয়া লইয়াছিলেন, সেক্ষেত্রেও প্রজাগণ তাহা অস্বীকার করিল, এবং স্থলবিশেষে প্রজার বিনা-সম্মতিতে বলপূর্ব্বক কবুলিয়ত লওয়া হইয়াছে, বিচারে এমত সাব্যস্ত হইতে লাগিল।

"(These were the two original causes of the dispute :— A high rate of collection as compared with other parganas, and an uncertainty as to how far the amount claimed was due. The third and auxiliary cause is to be found in the violent and lawless character of some of the Zaminders, and of the agents of others."—Hunter's Statistical Account of Bengal, Pabna, p. 319-20.)

বিদ্রোহের প্রকাশ।

জমাসম্বন্ধীয় গোলযোগ ক্রমশঃ জমিসম্বন্ধীয় গোলযোগের সহিত মিলিত হওয়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে রায়তগণ স্বেচ্ছায় জমিদারগণের খাজনা প্রভৃতি দিয়া আসিলেও ১২৭৯ সালের চৈত্র ও ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে তাহারা খাজনা দিতে একেবারে অস্বীকার করিল। কোন কোন গ্রামের লোক জমিদারের বিরুদ্ধে ২।১টী মোকদ্দমায় জয়লাভ করে ও আপীল আদালত কর্ত্তৃক বৃদ্ধি-জমা রহিত হয় এবং রায়তকে কয়েদ রাখার জন্য কোন কোন জমিদারের পক্ষের লোকের শাস্তি হয়। এই-সমস্ত কারণে উৎসাহিত হইয়া সাহাজাদপুর থানার এলাকাস্থিত রায়তগণ একেবারে খাজনা আদায়ে বাধা-প্রদান করে এবং ক্রমশঃ দলবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করে।

"The rayats formed themselves into Bidrohi, as they styled themselves, a word which may be interpreted into Unitist, and placing themselves under the guidance of an intelligent leader and a small land-holder, peaceably informed the magistrate that they had united."—Statistical Account of Bengal, Pabna, p. 321.

অন্যান্য জমিদারগণ সহজে বিবাদ মীমাংসা করিতে স্বীকৃত হইলেও বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারের পক্ষের কর্ম্মচারিবর্গ কিছুতেই আপোষে বিবাদ মীমাংসা করিতে রাজী হন না; কোন কোন রায়তকে কয়েদ রাখিয়া খাজনা আদায় ও কবুলিয়ত গ্রহণের চেষ্টা করায় সিরাজগঞ্জের তাৎকালীন মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নোলন সাহেবের বিচারে জমিদারপক্ষীয় লোকের শাস্তি হয়। উল্লিখিত কারণে প্রোৎসাহিত হইয়া বাঁড়ুজ্যে জমিদারের এলাকা খুবড়াবেড়া গ্রামের প্রজাগণ একেবারে খাজনা আদায়ে বাধা প্রদান করে এবং রায়তগণকে ধরিয়া আনিবার চেষ্টা করিলে তাহারা পেয়াদাকে বেদখল করে। ইহাই বিদ্রোহিগণের কার্য্যের প্রধান সূত্রপাত।

"The Estate on which the disturbances originated is that of the Banerjees of Dacca. This Zaminder rejected all overtures towards arbitration; and resorted extremely to litigation. The first class of suits brought by them were on Kabuliats—agreements characterised by the Government of Bengal, as unfair and illegal documents, and obtained by undue pressure."—Hunter's Statistical Account of Bengal, Pabna, p. 324.

সচরাচর বিদ্রোহী অর্থে আমরা যাহা বুঝি, ইহাদের উদ্দেশ্য

তাহা ছিল না; দলবদ্ধ রায়তগণ প্রকাশ করিতে লাগিল যে, জমির খাজনা কম দিবে, অথচ তাহারা বেশী মাপের নল প্রচলন করিবে। যাহাতে জমিদারগণ নিজ নিজ ইচ্ছামত ক্রম মাপের নল দ্বারা জমি জরিপ করিয়া প্রজার জমি হ্রাস ও জমা বৃদ্ধি করিতে না পারেন, তাহা নিবারণ করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

বিদ্রোহিগণের কার্য্য।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধন মানসে বিদ্রোহিগণের মধ্যে বহুলোক দলবদ্ধ হইয়া সিরাজগঞ্জের মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নোলন সাহেবের নিকট জমিদারগণের অত্যাচার-কাহিনী জ্ঞাপন করিবার জন্য ১৮৭৩ সালের এপ্রিল হইতে ১লা জুলাই পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত প্রায় ২৬৯ খানি গ্রামের অধিবাসিগণ দরখাস্ত করে।

"এই জেলার উল্লাপাড়া থানার মধ্যে দৌলতপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। তথাকার রায়বংশ অতি প্রসিদ্ধ; এই বংশে ঈশানচন্দ্র রায় নামে একজন বুদ্ধিমান ও সুচতুর লোক ছিলেন। হুরাসাগর নদীতীরস্থ বেতকান্দি গ্রাম লইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল। কিন্তু তাঁহারা প্রবল ও ধনবান্ জমিদার; কিছুতেই দমা নহেন। সুতরাং ঈশানচন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না। তখন তিনি এই বিদ্রোহীদলের সহিত মিলিত হইলেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে তাহাদের নেতা হইলেন।" (সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশিত "আশালতা" ৯।১০ সংখ্যা—১৪৯ পৃষ্ঠা)।

ঈশানচন্দ্র রায় বিদ্রোহিদলের "রাজা" বলিয়া অভিহিত হইতেন। রুদ্রগাঁতির বিখ্যাত অশ্বারোহী গঙ্গাচরণ পাল নামক জনৈক কায়স্থ তাঁহার প্রধান সহকারী ছিলেন; তিনি বিদ্রোহী রাজার দেওয়ান বলিয়া পরিচিত ছিলেন—নিম্নলিখিত পল্লীগাথায় তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

> "ও চাচা বিদ্রোহিদলের কথা কব কি।
> নূতন আইন, নূতন দেওয়ান কালুপালের ব্যাটা
> সকলের আগে চলে মাথা বাঁধ্যা ফ্যাটা।"

গঙ্গাচরণ পালের পিতার নাম কালীচরণ পাল, তিনি পাবনায় মোক্তারী করিতেন বলিয়া জানা যায়।

এতদ্ব্যতীত ডেমরা অঞ্চলের বাজু সরকার, ছালু সরকার, রোমজান খাঁ প্রভৃতি কতকগুলি মুসলমান বিদ্রোহিদলে যোগদান করিয়া অনেকের ঘরবাড়ী লুণ্ঠন করিয়াছিল।

২।৪ গ্রামের রায়তগণ দলবদ্ধ হইয়া অন্যান্য গ্রামের লোকদিগকে জমিদারগণের বিরুদ্ধে আপনাদের দলে যোগদান করিতে অনুরোধ করিত। যাহারা তাহাদের দলে যোগদান করিত না বিদ্রোহিগণ তাহাদের ঘর বাড়ী লুঠ করিত। রাত্রিতে মহিষের শিঙ্গা বাজাইয়া সকলকে উৎসাহিত ও একত্রিত করিত। মৎস্য শীকার করিবার ভান করিয়া তাহারা প্রত্যেকে স্কন্ধে একটী বাঁশের লাঠির অগ্রভাগে এক একটী "পলো' লইয়া বহুলোক একত্রে যাতায়াত করিত, এজন্য বিদ্রোহিদল সাধারণতঃ "পালোওয়ালা" বা "পলমাথ কোম্পানী" নামে অভিহিত হইত।

> "লাঠি হাতে পলো কাঁধে চল্ল সারি সারি
> সকলের আগে জা'য়ে (যেয়ে) লুটিল বিশির কাচারি।"

জেলার সর্ব্বত্রই লোকের আতঙ্ক এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কয়েক মাস পর্য্যন্ত কোন গ্রামের একজন ঐ 'পলো-ওয়ালা আসিয়াছে' বলিলে সে দিন সে গ্রামের অধিবাসিগণের আহারাদি বন্ধ হইত। কেহ হাটে বা বাজারে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিলে, বিদ্রোহিদলের কার্য্য মনে করিয়া সে দিন হাট ভাঙ্গিয়া লোকে পলায়ন করিত। ধনী গৃহস্থের বাটীতে অনেকে লুট করিবার ভয়প্রদর্শন করিয়া পত্রাদি লিখিয়া তাহাদিগকে শঙ্কিত করিত। অবস্থাপন্ন লোক প্রত্যেকেই আত্মরক্ষার্থ নিজ নিজ বাড়ীতে লাঠিয়াল সর্দ্দার নিযুক্ত করিয়াছিল। বিদ্রোহিদল প্রকাশ্য দিবালোকে দলবদ্ধ হইয়া জমিদার ও ধনী গৃহস্থাদির বাড়ী আক্রমণ করিত। তাহারা কোন বাড়ীতে গিয়া প্রথমে গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিত, তিনি তাহাদের দলে আছেন কি না। যদি তিনি তাহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাহাদের কার্য্যের সহায়তার জন্য অগ্রসর হইতেন, তবে তাহারা নীরবে চলিয়া যাইত, নচেৎ বিদ্রোহিদল তাঁহার বাটী লুণ্ঠন করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিত। এই প্রকারের বহুলোক এখনও বর্ত্তমান আছেন, যাঁহাদের নিকট জানা যায় যে, তাঁহারা বিদ্রোহিগণ বাড়ীতে উপস্থিত হইলে দলপতিকে ১০।২০ টাকা পর্য্যন্ত নজরানা বা সেলামী দিয়া ও তৎপক্ষাবলম্বনে তাহাদের সঙ্গে লোক প্রেরণ করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছেন।

প্রথম প্রথম সিরাজগঞ্জের অধীন সাহাজাদপুর থানার অধীন গ্রামসমূহেই বিদ্রোহের সূচনা হয়, কিন্তু ক্রমশঃ তথা হইতে পাবনা সদর পর্য্যন্তও বিদ্রোহিগণ আপনাদের প্রভাব বিস্তার করে। নাকালিয়া, সারাসিয়া, হাটুরিয়া, গোপালনগর প্রভৃতি গ্রামে এতদুপলক্ষে অনেকের বাড়ী লুণ্ঠিত হয় এবং অনেকের গৃহাদি অগ্নিদাহে ভস্মীভূত

হয়! সর্ব্বশেষে গোপালনগরের মজুমদার মহাশয়দিগের বাড়ী লুঠ করিতে গিয়া বিদ্রোহিদলের ২১৪ জন সাংঘাতিক রূপে আহত হয় এবং কয়েকজন ধৃত হওয়ায় বিদ্রোহিগণের অত্যাচার ক্রমশঃ প্রশমিত হইতে থাকে। এখনও গোপালনগরের মজুমদারগণের বাড়ী লুঠ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ছড়া স্থানে স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়।

"গোপালনগরের মজুমদাররা তারা কেঁদে ম'ল
ডেমরা হইতে বাজু সরকার বাড়ী লুটে নিল ;
কাশী কাঁদে, মহেশ কাঁদে, কাঁদে তাহার খুড়ি,
গোলামের বেটা বিদ্রুক আ'সে লুটল সকল বাড়ী ;
বিদ্রুক এসে লুটে নিল গাছে নাইকো পাতা
জঙ্গলের মধ্যে লুকায়ে থেকে ফুচকি পারে মাথা।"

বিদ্রোহ-দমন।

গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতে প্রজা ও জমিদারগণের মধ্যে এই গোলযোগ আপোষে মীমাংসা হয় তাহার চেষ্টায় ছিলেন। রায়ত ও ভূম্যধিকারিগণ নিজেরা আপনাপন বিবাদ মীমাংসা করিবেন, সরকার বাহাদুর তাহাতে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন—প্রথম হইতে সরকার পক্ষ এই মতই পোষণ করিয়াছিলেন। নিরীহ পাবনাবাসী রায়তগণ এতাদৃশ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে, কেহই তাহা আদৌ বিশ্বাস করে নাই। জেলার তাৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ভি, জি, টেলার সাহেব বাহাদুর অত্যাচার-পীড়িত লোকের কথায় সহসা আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। যখন বহু লোকের বাড়ীঘর লুণ্ঠিত হইল এবং লোকে পুত্রকলত্রাদি ও আত্মসম্মানাদি রক্ষার্থ গ্রামান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং এমন কি পুলিসের লোক পর্য্যন্ত বিদ্রোহিদলের সহিত সংঘর্ষে পরাজিত ও অপমানিত হইয়া ফিরিতে লাগিল, তখন গবর্ণমেণ্ট হইতে বিদ্রোহ দমনার্থ সবিশেষ চেষ্টা হইল।

যে-সমস্ত গ্রামে অধিকতর অত্যাচার হইয়াছিল, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং সেই-সমুদয় স্থান পরিদর্শন করিয়া বিদ্রোহিদলের নেতৃবৃন্দকে গেরেফ্‌তার করিলেন। যে-সমস্ত স্থানের প্রজাগণ অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া লুটতরাজে যোগদান করিয়াছিল, তিনি সেই-সমুদয় গ্রামে স্পেশাল পুলিসকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বিভাগীয় কমিসনার সাহেবের আদেশে অন্য জেলা হইতে ৪০জন অতিরিক্ত পুলিস, এবং লাটসাহেবের আদেশে গোয়ালন্দ হইতে একদল সামরিক পুলিস পাবনায় আনা হয়। কুষ্টিয়াতে ১০০ রিজার্ভ পুলিস রাখা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশে ঈশানচন্দ্র রায় ও অন্যান্য দলপতিগণকে পাবনায় স্থানান্তরিত করা হয়। বিচারে ঈশান রায় মহাশয় মুক্তিলাভ করেন। অন্যান্য ৩০২ জন অপরাধীর ১ মাস হইতে ২ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইল।

এই প্রকারে ক্রমশঃ লুঠপাট বন্ধ হইল এবং লোকের শান্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। গবর্ণমেণ্ট জমিদার ও প্রজাগণের উপর ১৮৭৩ সালে ৪ জুলাই তারিখে নিম্নলিখিত অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন।

অনুজ্ঞাপত্র।

"Whereas in the district of Pabna, owing to the attempts of Zaminders to enhance rents, and to the combinations of Rayats to resist the same, large bodies of men have assembled at several places in a riotous and tumultuous manner, and serious breaches of peace have occurred. This is very gravely to warn all concerned, that, while on the one hand, the Government will protect the people from all forces and extortion, and the Zaminders must assert any claims they may have by legal means only : on the other hand, the Government will firmly repress all violent actions on the parts of the rayats and will strictly bring to justice all who offend against the law to whatever class they belong.

The rayats and others who have assembled are hereby required to disperse, and to refer peacefully and quietly any grievance they may have. If they so come forward, they will be patiently listened to, but the officers of Government cannot listen to the rioters ; on the contrary they will take serious measures against them. It is asserted by the people who have combined to resist the demands of the Zaminders, that they are to be rayats of Her Majesty the Queen, and of her only. These people and all who listen to them are warned that the Government cannot and will not interfere with the right of property as secured by ; that they must pay what is legally due from them to those to whom it is legally due. It is perfectly lawful to unite in a peaceful manner to resist any excessive demands of the Zaminders, but it is not lawful to unite to use violence and intimidation."

পাবনা জেলায়, জমিদারেরা জমা বৃদ্ধি করিবার ও প্রজারা তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করাতে দাঙ্গা ফসাদ উপস্থিত হইয়াছে। উভয় পক্ষকেই বিশেষ ভাবে সতর্ক করা যাইতেছে যে কাহারও বে-আইনী কার্য্য ক্ষমা করা হইবে না। প্রজারা জমায়েত না হইয়া শান্তভাবে তাহাদের নালিশ জানাইলে সরকার তাহা শুনিয়া সুবিচার করিবেন, বিদ্রোহীর গণ্ডগোলে কর্ণপাত করিবেন না ত বটেই, বরং বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন। প্রজারা মহারাণীর খাস প্রজা হইতে অভিলাষ প্রকাশ করিতেছে। তাহা হইবার নহে, সরকার কাহাকেও ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না। জমিদারের ন্যায্য পাওনা তাহার পাওয়া উচিত; কিন্তু অপর পক্ষে অন্যায় বাজে আদায়ে বাধা দিবার জন্য প্রজার সমবেত শক্তি প্রয়োগও ন্যায়সঙ্গত—এই বাধা অবশ্য আইন-সঙ্গত উপায়ে শান্তি ভঙ্গ না করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

কিন্তু প্রজাগণ সহজে জমিদারগণের খাজনা দিতে বাধ্য হইল না, ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত জমিদারগণের খাজনা আদায়ে বিশেষ বেগ পাইতে হইল। বহু বাকীখাজনার মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে প্রজাগণ ক্রমে নিরস্ত হইল।

শ্রীরাধারমণ সাহা।

পঞ্চশস্য

ভাস্কর্য্য শিল্পের পুনরুত্থান যুগের শিশুমূর্ত্তি (Literary Digest):—

পাথর কাটিয়া শিশুর স্বরূপ প্রকাশ করা ভাস্কর্য্য শিল্পের কঠিনতম প্রয়াস। এইজন্য অনেক শিল্পী ভাস্কর শিশুমূর্ত্তিকে অনেকটা কাল্পনিক ভাবরূপ (Idealistic) করিয়া গঠন করেন; প্রকৃতি প্রকৃত হুবহু নকল কেহ করিতে পারেন না। কিন্তু পরবর্ত্তী যু[গে] যখন আর্টকে প্রকৃতির দর্পণ করিয়া তুলিয়া শুধু নকলের চে[ষ্টা] চলিল, তখন শিল্পীরা মহা ফাঁপরে পড়িল—কেমন করিয়া সত্যকা[র] শিশুর সদাচঞ্চল সুকুমার ভাবটি কঠিন পাষাণে স্থায়ী করি[তে] পারিবে। বয়স্ক লোকের মুখের প্রতি রেখায় রেখায় তাহার অন্তরে[র] পরিচয় দাগা হইয়া যায়, সুতরাং তাহাকে পাথরে প্রকাশ ক[রা] তত কঠিন নয়; কিন্তু শিশুর মন যে মুখে কোনো স্থায়ী ছাপ তখনো ফেলে নাই, শিশু যে চিররহস্যময়। অনেক শিল্পী শিশু[র] চরিত্রের কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম ধরিতে না পারিয়া যাহা চো[খে] সুন্দর তাহাই গড়েন, কিন্তু তাহা সত্যকার শিশুর প্রতিরূপ হয় না। কিন্তু চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে একদল ভাস্কর ইটালীতে প্রাদুর্ভূত হই[য়া] সত্য ও সুন্দরকে একত্র মিলাইয়া সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের শিশুমূর্ত্তির সৃষ্টিতে রূপ ও মন দুই ধরা পড়িয়াছিল। [যে]ন ফুলের সহিত তাহার গন্ধটিকেও রূপদান করা। ইঁহাদের মধ্যে আর্টের সূতিকাগার ফ্লোরেন্সের দোনাতেলো (Donato di Pett[o] Bardi) এবং তাঁহার ছাত্রগণ—আন্দ্রিয়া (Andrea della Robbia) এবং লুকা (Luca della Robbia) প্রধান। শিশুর প্রকৃত বাহ্য সৌষ্ঠব বজায় রাখিয়া অন্তরের ভাবলীলা প্রকাশ পাইয়াছে এব[ং] মোটের উপরও মূর্ত্তিটি সুন্দর হইয়াছে—ইহাই ইঁহাদের শিল্পচাতুর্য্যে[র] বিশেষত্ব।

ভাস্কর্য্যে প্রথম গঠিত শিশু। লুকা দেলারবিয়া কর্ত্তৃক গঠিত।

শিশুর হাসি।—দেসিদেরিও দা সেত্তিগ্নানো কর্ত্তৃক গঠিত।

ইট গাঁথিয়া প্রতিমূর্ত্তি গড়া (Scientific American):—

প্রাচীন বাবিলোনিয়ানেরা ইট গাঁথিয়া গাঁথিয়া বিবিধ মূ[র্ত্তি] সংগঠন করিতে পারিত; বাবিলোনিয়ার ধ্বংসাবশেষ হইতে সেরূপ

শিশু।—আন্দ্রিয়া দেলা রবিয়া কর্ত্তৃক ফ্লোরেন্সের শিশু-হাসপাতালের দেয়ালে উৎকীর্ণ।

ডেভিডের মস্তক।—দোনাতোলা কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ।

মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহার পরিচয় প্রবাসীর পাঠকেরা পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। বর্ত্তমানকালে তাহারই অনুকরণ করিয়া ইটে গাঁথিয়া মনুষ্য ও পশুপক্ষীর মূর্ত্তি সংগঠনের চেষ্টা হইতেছে। এই-সমস্ত মূর্ত্তি চার কোণা ইট আকারানুযায়ী কাটিয়া গাঁথা হয় না; কারণ ইটের উপরকার স্তর পোড় খাইয়া যেমন কঠিন হয় অভ্যন্তর তেমন হয় না, সেই পোড়-খাওয়া কঠিন স্তর কাটিয়া ফেললে জলবাতাসে ইট শীঘ্র জখম হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য একটি মূর্ত্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন আকার, খাঁজ, বাঁক প্রভৃতির অনুযায়ী করিয়া নানা আকারের খণ্ড খণ্ড ইট গড়িয়া পোড়াইয়া তাহাই যথাস্থানে গাঁথিয়া একটি অখণ্ড মূর্ত্তি গড়িয়া তোলা হয়। এইরূপ উপায়ে পারী নগরের দুইজন স্থপতি-ভাস্কর এজার (Edzard) ও দোনাঁ (Donandt) একটি উষ্ট্রারোহী মূর্ত্তি গড়িয়াছেন। ইহা জার্ম্মাণীর একজন আফ্রিকাপর্য্যটক নবদেশ-আবিষ্কারকের হুবহু প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহারই স্মৃতিসংরক্ষণের জন্য ওয়েজার শহরে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

প্রকৃতির কারখানায় নক্সার নমুনা (Textile World Record):—

জার্ম্মাণীর ডুসেলডর্ফ শহরের ফটোগ্রাফিক গবেষণাগারের (Photographic Testing Department) অধ্যক্ষ, ডাক্তার এরউইন কেডেনফেল্‌ড্‌ট্‌ প্রাকৃতিক ব্যাপারের ফটোগ্রাফ হইতে কাপড়ের নকাসি ও ফুলকাটার নমুনা সংগ্রহ করিবার পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। এতদিন পর্য্যন্ত ফুল, লতা, পাতা, পশুপক্ষী, ক্রিষ্টালের

ইটে গাঁথা প্রতিমূর্ত্তি।
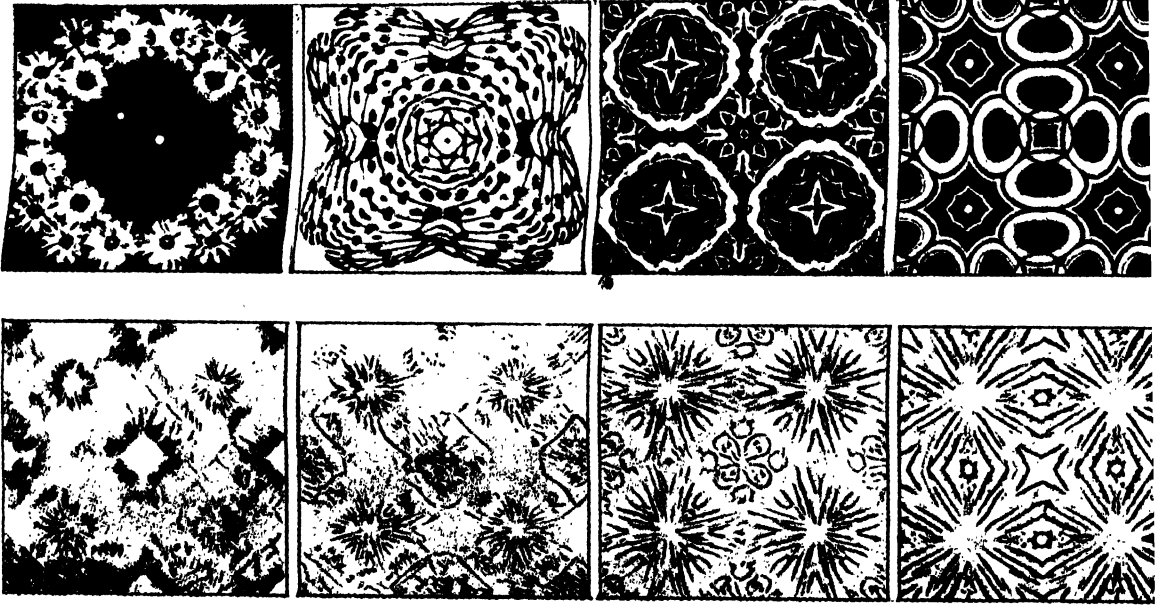
প্রাকৃতিক নক্‌সার নমুনা।
(১) ফুলের মালার নক্‌সা, (২) প্রজাপতির ডানার নক্‌সা, (৩) মার্ব্বেল পাথরের দাগের নক্‌সা, (৪) রঙিন পাথরের দাগের নক্‌সা। (৫, ৬, ৭, ৮) ক্রিষ্টাল বা দানার ঘন আয়তন বা বর্দ্ধিতায়তনের নক্‌সা।

গঠন, প্রভৃতির অনুকরণে নক্সা কাটা হইত। এক্ষণে ক্যালিডোস্কোপ হইতে বিভিন্ন নক্সার ফটোগ্রাফ লইয়া তাহাই কাজে লাগানো হইতেছে; ইহাতে মানুষকে বিভিন্ন বস্তুকে শোভনসুন্দর সুসমঞ্জস ভাবে সাজাইবার জন্য আর মাথা ঘামাইতে হয় না, একেবারে তৈরী-করা নক্‌সা পাওয়া যায়। একটা চোঙের মধ্যে তিনখানা কাচ ত্রিভুজাকারে বসাইয়া তাহার মধ্যে নানান রঙের কাঁচের কুচি দিয়া ঘুরাইলে তাহার মধ্যে বিবিধ বর্ণসুষমায় বিচিত্র নক্‌সা হইতে দেখা যায়।—এই যন্ত্রকে বলে ক্যালিডোস্কোপ অর্থাৎ সুন্দর-নক্‌সা-দর্শন। এই প্রণালীতে নক্‌সা পাইবার জন্য ফটোগ্রাফের ক্যামেরাকে ক্যালিডোস্কোপের ধরণে গঠন করিয়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর গায়ের দাগের ফটোগ্রাফ হইতে বিচিত্র নক্‌সা পাওয়া যাইতেছে। মার্ব্বেল পাথরের উপরকার হিজিবিজি ডোরা, প্রজাপতির ডানার দাগ, ফুলের পাপড়ির সংস্থান প্রভৃতি হইতেও তিনি বিচিত্র নক্সার ফটোগ্রাফ লইতে সক্ষম হইয়াছেন।

কৃষিবিদ্যালয়ে ছাত্রোপনিবেশ (United Empire)

অনাথ ও দরিদ্র শিশুদের লইয়া কি করা যাইতে পারে ইহা জগতের একটা বৃহৎ সমস্যা। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়াতে একটি কৃষি-বিদ্যালয়-সংলগ্ন শিশু-উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার আয়োজন হইতেছে। এই উপনিবেশে ৩৩টি বালক ভর্ত্তি হইয়াছে, সব-বড়র বয়স ১৩, সব-ছোটর বয়স ৮। ইহারা ইংলণ্ডের মা-বাপ-হারা অনাথ ছেলে; ইহাদিগকে ঐদেশ হইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এইসব নানান্ বংশের নানান্ স্বভাবের ছেলে সৎপথে থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জনের এক উদ্দেশ্যে একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত

কৃষিবিদ্যালয়ে ছাত্রেরা গাছ ছাঁটিবার উপদেশ শুনিতেছে।

ইহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া তারপর ইহাদিগকে রীতি চাষবাস শিক্ষা দেওয়া হইবে। কিন্তু ইহারা কৃষিবিদ্যালয়ের অন্তভু বলিয়া দেখিয়া শুনিয়া বাল্য হইতেই কৃষিপদ্ধতি শিক্ষা কা লইতেছে। ইহারা স্বেচ্ছায় মনের আনন্দে চাষ করার খেলা কা তাহাতে ইহারা লাঙল দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ফলবাগা কাজ পর্য্যন্ত সমস্তই নিজের হাতে করিতে পারে। কোনো বা চাষের প্রণালীতে দক্ষতা দেখাইতে পারিলেই তাহাকে আড়ে ৮ হ ও লম্বে ৩০ হাত এক এক খণ্ড জমি দেওয়া হয়; সে তাহাতে আ

হাতে নিজের খেয়াল খুশী মতো ছুটির সময় ও অবসর কালে নানাবিধ উদ্ভিদের চাষ করে। সেই ক্ষেতে উৎপন্ন তরিতরকারীর তিন ভাগের এক ভাগ তাহার স্কুলকে দান করিতে হয়; বাকি দুভাগ স্কুল বাজার-দরে তাহার নিকট হইতে কিনিয়া লয়। যাহারা লেখাপড়ায় নিতান্ত অগা, তাহারাও চাষে যথেষ্ট দক্ষতা দেখায়।

ইহা ছাড়া বড় বড় ছেলেরা ফলের গাছ ছাঁটা, ফল পাড়া, প্যাক করিয়া বাজারে রপ্তানি করা, ঘাস শুকানো, দুধ দোহা, পশুপক্ষী পোষণ ও পালন প্রভৃতি ক্ষেত্রকর্ম্মের আনুষঙ্গিক অনেক কাজ করিতে শিখিতেছে।

শিশুকালে দেখিয়া দেখিয়া যাহা কেবল অভ্যাসের ফলে করিতে শিখে, চৌদ্দ বৎসরের পর তাহার কারণ ও প্রণালীর উদ্দেশ্য বুঝিতে শিখে। প্রত্যেক ছাত্রকেই পালা করিয়া বিদ্যালয়ের রান্না, ঘরকন্না, পরিবেষণ, ধোপার কাজ, চাকরের কাজ, সমস্ত করিতে হয়।

এই ছেলেরা শহরের অনাথাশ্রমের কয়েদখানা হইতে মুক্ত প্রান্তরে প্রকৃতির কোলে ছাড়া পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। ইহারা এখানে পেট ভরিয়া খায় ও প্রাণ ভরিয়া খেলা করে: কাজেই দেশে ফিরিতে মোটেই চাহে না।

এই-সমস্ত ছেলে পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে বড় হইয়া উঠিতেছে বলিয়া ইহারা স্বাবলম্বন, সততা, দায়িত্ব, শৃঙ্খলা স্থাপন, সমবেত হইয়া মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা এবং নিজেদের বুদ্ধি ও চেষ্টায় কাজ করিতে পারা প্রভৃতি বহু সদ্গুণ অর্জ্জন করিতেছে। ইহারা বিনয়ী, সুশীল, এবং বেশ সপ্রতিভ এইজন্যই। তাহাদের স্বাস্থ্য ভালো, মন প্রফুল্ল।

এরূপ স্কুলের সফলতা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে উহার পরিচালকদের উপরে। যাহারা সমস্ত লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন, যাহারা নানান্ শ্রেণী হইতে আগত, যাহাদের মধ্যে সমাজের নানান্ স্তরের লোক আছে, তাহাদিগকে সত্য ও মঙ্গলের পথে চালনা করিবার জন্য খুব দক্ষ ও সহৃদয় ভদ্রলোকের প্রয়োজন—হৃদয়ের ক্ষুধা না মিটিলে মন অনাহারে কৃশ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এমন কি মারা যায়। শিশুর শিক্ষার জন্য যেমন-তেমন লোক নিযুক্ত করা বড় ভুল; বিশেষত যদি সেই শিশু মা-বাপ-হারা অনাথ হয়। ইহাদের শিক্ষার জন্য শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির প্রয়োজন। এই বিদ্যালয়ে সে বিষয়ে খুব দৃষ্টি রাখা হয়।

বালকেরা ঘুষাঘুষি, ফুটবল, ক্রিকেট, সাঁতার প্রভৃতি খেলা শিক্ষা করে। তাহারা ড্রিল করে; এবং শিশু-সৈন্যদল গঠন করিতেছে। ইহাতে তাহাদের দেশপ্রীতি এবং স্বয়ং আয়োজন সংবিধানের ক্ষমতা জন্মে।

এই-সব অনাথ শিশু-উপনিবেশীর মধ্যে বংশগত গুণাগুণের প্রভাব কিরূপ তাহা ভাবিয়া দেখিবার কথা। কিন্তু বংশগত গুণাগুণ ও অবস্থান-অর্জ্জিত গুণাগুণ—কোনটি মানব-চরিত্রকে অধিক গঠিত ও প্রভাবান্বিত করে, সে বিষয়ে বিজ্ঞান এখনো শেষ নিষ্পত্তি করিয়া উঠিতে পারে নাই। এই কৃষি-বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রই অবস্থানের গুণে বেশ সৎ ও সুশীল প্রকৃতির।

প্রথম এক বৎসরে ফি ছাত্র-প্রতি পড়ে ৩৯০্ টাকা করিয়া খরচ পড়িয়াছে; এই খরচ পরে ৩০০্ টাকায় সারিতে পারা যাইবে আশা হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে এই আদর্শের কৃষিবিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে।

আমাদের দেশে বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে অনেকটা এই প্রণালীতেই শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। এখানে এইরূপ বহু বিদ্যালয়ের অবকাশ ও আবশ্যক আছে। অভাব কেবল উদ্যোগী অনুষ্ঠাতার।

অনুভবের সীমা (Literary Digest):—

একজন স্কচ আঙ্কিক না গণিয়া শুধু একবার দেখিয়াই একটা ভেড়ার পালে কতগুলা ভেড়া আছে বলিয়া দিতে পারিতেন। এখন এইরূপ গণনার একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার নাম টাচিষ্টো-স্কোপ অর্থাৎ ত্বরিত-অনুভব-মান। মনোযোগ মানে কোনো বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করা!—এই লক্ষ্য ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় ঘটিতে পারে। এই লক্ষ্য দ্বারা বাহিরের বস্তুকে আমরা অন্তরে ধারণা করিয়া থাকি। ফটো-গ্রাফের ক্যামেরার সম্মুখে যা পড়ে সে তাই গ্রহণ করে; কিন্তু যত-টুকুতে আমরা মনোযোগ করি চক্ষু ততটুকুই মাত্র গ্রহণ করে। প্রথম ছবিতে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, যে-বিন্দুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হইবে তাহার নিকটের নক্সাগুলি স্পষ্ট দেখা যাইবে এবং দৃষ্টিনিবদ্ধ বিন্দু হইতে যে-নক্সা যত দূরে সে-নক্সা তত অস্পষ্ট লাগিবে বা একেবারে নজরেই পড়িবে না। ইহাতে বুঝা যায় যে দৃষ্টির ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, এবং তাহার মধ্যকার সমস্ত জিনিস পরস্পর জড়াইয়া কতক স্পষ্ট কতক বা ঝাপসা দেখায়। এক্ষণে কথা হইতেছে কতটুকু মনোযোগে কতখানি দেখা যায়? তাহাই মাপিবার যন্ত্র টাচিষ্টো-স্কোপ। এই যন্ত্রের মধ্যে কতকগুলি কার্ডের উপর বিভিন্ন প্রকারের
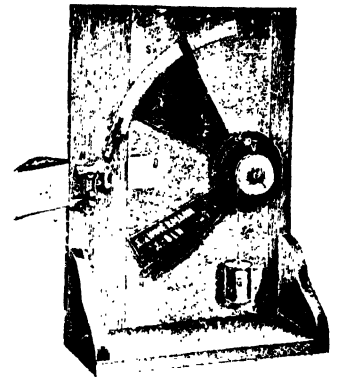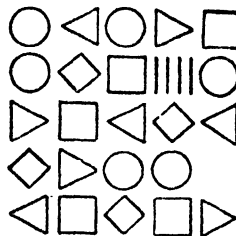
টাচিষ্টোস্কোপ যন্ত্র ও অনুভবশক্তি পরীক্ষার নক্সা।

দাগ কাটা থাকে; যন্ত্রের সম্মুখে ফটোগ্রাফের ক্যামেরার মতন একটা ঝাঁপ (শাটার) থাকে; এক সেকেণ্ডের অতি সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ কালের জন্য সেই ঝাঁপ তুলিয়া সেই কার্ড দেখানো হয়; এবং কে সেই সময়টুকুতে কতগুলা দাগ দেখিতে পায় তাহা জানিয়া মনো-যোগ ও অনুভবশক্তির মাপ বুঝা যায়। কোনো কাগজে যদি এলো-মেলো ফোঁটা কাটা থাকে, তবে ৮ ফোঁটা পর্য্যন্ত গণিয়া বুঝিতে এক সেকেণ্ডের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ সময় লাগে। সেই সমস্ত ফোঁটা যদি শৃঙ্খলায় কোনো নির্দ্দিষ্ট আকারে সাজানো থাকে তবে ঐ সময়েই বেশী গণিতে পারা যায়। এই যন্ত্রে, বাক্য, শব্দ, ভুল পদ প্রভৃতি পড়িতে বা সংশোধন করিতে কত সময় লাগে তাহাও মাপা যাইতে পারে—এক একটা কার্ডে ঐ-সমস্ত লিখিয়া যন্ত্রে পরাইয়া দিলেই হইল। এই যন্ত্রে দৃষ্টির অনুভব ছাড়া স্পর্শের ও

শ্রবণের অনুভবও মাপা যায়। একটা কার্ডে গোটাকত আলপিন বিঁধিয়া তাহার উপর হাত দিলে একেবারে ছয়টার বেশী অনুভব করা যায় না; এই জন্যই অন্ধের লেখায় কোনো অক্ষরে পাঁচের বেশী বিন্দু নাই।

টাফ্‌ট্‌স্‌ চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার ডিয়ারবর্ণ
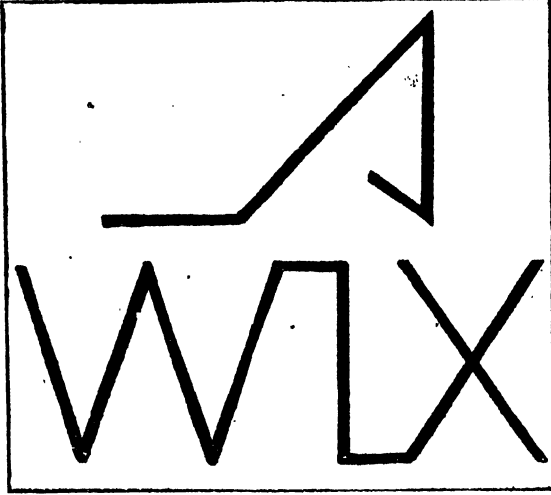
কিনেসথেসিয়া বা পেশীর অনুভবশক্তি পরীক্ষার নক্‌সা।

বলেন যে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুই সর্ব্বাপেক্ষা ত্বরিত; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও পেশীর অনুভবশক্তি আরো ত্বরিত—যে অনুভবশক্তি হইতে আমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের জ্ঞান জন্মে সেই পেশীর অনুভবকে তিনি নাম দিয়াছেন কিনেস্থেসিয়া (Kinesthesia)। এই অনুভূতি হইতেই, আমাদের সুপ্তচৈতন্য অবস্থাতেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হইয়া থাকে; ইহা হইতেই আমাদের দক্ষতা নামক শক্তি লাভ হয়; ইহার অভাবে মানুষ নির্ব্বোধ, অঙ্গ সংযমনে অক্ষম এমন কি পাগল পর্য্যন্ত হয়। তিনি ইহার সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। মস্তিষ্কের হুকুম বুঝিয়া পালন করা এই পেশীর অনুভূতির প্রধান কাজ। ডাক্তার ডিয়ারবর্ণ ৩৮ জন লোকের চোখ বাঁধিয়া হাত ধরিয়া প্রদর্শিত নক্‌সার উপর দাগা বুলাইয়া দিয়া আলাদা কাগজে সেই নক্সাটি আঁকিতে বলেন; তাহারা উহা না দেখিয়া আঁকিয়া দিয়াছিল। এই না-দেখিয়া কেবল পেশীর গতি অনুভব করিয়া কার্য্য করা ডাক্তার ডিয়ারবর্ণের মতে কিনেস্থেসিয়ার কার্য্য। ইহাই কোনো কর্ম্মে দক্ষতা ও কুশলতা অর্জ্জনের প্রথম সোপান ও মূল কারণ। যে ব্যক্তি চোখ বাঁধিয়া দাগা বুলাইবার পরও কোনো নক্সা না দেখিয়া নকল করিতে পারে না, সে নিশ্চয় অতি নির্ব্বোধ, তাহার কিনেস্থেসিয়া বা পেশীর অনুভবশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

রাষ্ট্রীয়-অধিকার-লাভেচ্ছু রমণীর প্রতি পুরুষের অত্যাচার (Lancet) :—

ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশ স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়া যতই বড়াই করুক স্ত্রীস্বাধীনতা কোথাও সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। আদিম সমাজে রমণী যে কারণেই হোক পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি[ল] পুরুষ এখন সেই স্বাধিকার ত্যাগ করিতে পারিতেছে না রমণীরা যে পুরুষের সমকক্ষতা লাভের ইচ্ছা ও চেষ্টা করিতে[ছে] ইহা তাহাদের সহিতেছে না। যে রমণী-মাতা পুরুষ প্রসব করিয়াছেন, তাঁহাকে অমান্য ও অবহেলা করিয়া হীন ভা[গ] তুল্য অধিকার না দিতে চাওয়ার মতো হৃদয়হীন বর্ব্বরতা আর হইতে পারে? ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের নারী-সম্প্রদায় অনিচ্ছু পুরুষের নিকট হইতে জোর করিয়া অধিকার আদায় করিবার অ[ঙ্গী]পণ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তাহার ফলে তাঁহ[ারা] প্রহার খাইতেছেন, কয়েদ হইতেছেন, লাঞ্ছিত অবমানিত হইতেছে[ন] এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছেন—কিন্তু তাঁহাদের [পণ] হইয়াছে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। তাঁহাদের নিষ্ঠা তেজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিলে শ্রদ্ধা হয়, অবাক হইতে হ[য়]; আর আমাদের মতো ভীরু কাপুরুষ যাহারা তাহাদের লজ্জায় মা[থা] হেঁট হয়, কিন্তু বুকে বলও বাঁধে।

ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয়-অধিকার-লাভেচ্ছু রমণীদিগকে প্রায়ই ক[য়েদ] করা হইতেছে বলিয়া তাহারা মুক্তির এক উপায় ঠাওরাইয়াছে তাহারা জেলে গিয়া প্রায়োপবেশন করে, ছাড়িয়া দিতে হয় ছাড়ি[য়া] দাও নতুবা না খাইয়া উপবাসে মরিব। জেলখানার কর্ত্তৃপক্ষ না[না] উপায়ে তাহাদিগকে খাওয়াইতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়া প্র[থম] প্রথম তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেছিল। কিন্তু যখন দেখি[ল] অনেকেই মুক্তি লাভের এই পন্থা অবলম্বন করিতেছে, তখন কর্ত্তৃপ[ক্ষ] কঠোর হইয়া কৃত্রিম উপায়ে আহার করাইতে চেষ্টা করিতেছে ইহা নিষ্ঠুর অত্যাচারের নামান্তর মাত্র। চেয়ারে বা খাটের স[ঙ্গে] বাঁধিয়া রাখিয়া হাত পা চাপিয়া ধরিয়া যন্ত্রবলে মুখের হাঁ চাড়ি[য়া]

উপবাসপ্রতিজ্ঞ রমণীকে জোর করিয়া আহার দান।

রাখিয়া গলার মধ্যে একটা নল ঢুকাইয়া দেওয়া হয়; সেই নলে[র] মধ্যে তরল খাদ্য ঢালিয়া দিলে তাহা অনিচ্ছাতেও উদরস্থ হয় কখনো কখনো নাকের ভিতর দিয়া বা অন্য উপায়েও খাদ্য উদরস্থ করানো হইয়া থাকে। এইরূপ জোর জবরদস্তির ফলে অনেক সময় গায়ের ছাল উঠিয়া যায়, ছড়িয়া যায়, দাঁত ভাঙিয়া যায়, গলা ছিঁড়িয়া যায়, এবং সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীর উপর যে ধাকা লাগে তাহা ত কহতব্যই নহে। নাকের ভিতর নল ভরিয়া খাওয়াইবার উপায় আরো নিষ্ঠুর, তাহাতে ভয়ানক যন্ত্রণা হয়, নাকের মধ্যে ক্ষত হইয়া নানাবিধ যন্ত্রণাদায়ক রোগ উৎপন্ন হয়। এখানে এইরূপ জবরদস্তি আহার করানোর একটি চিত্র প্রদর্শিত হইল।

মুক্তা তুলিবার শ্বেতাঙ্গ ডুবুরী (Cosmos, Paris)—

শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীরা এসিয়ার লোককে দেখিতে পারে না। তাহাদের ভয় যে এসিয়ার লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইলে পরবর্ত্তী বংশধরেরা কৃষ্ণাঙ্গ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা; এসিয়ার লোকেরা অল্পে তুষ্ট, সুতরাং জীবন-সংগ্রামে শ্বেতাঙ্গ টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। এইজন্য ইংরেজদের কোনো উপনিবেশে এসিয়াবাসীর প্রবেশ অব্যাহত নহে; এবং তাহাদের দেখাদেখি অন্য শ্বেতাঙ্গ জাতিরাও এসিয়াবাসীদের বিষনজরে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু পরিশ্রম-বহুল কুলির-কাজ করিতে গিয়া শ্বেতাঙ্গদের দম বাহির হইয়া যায়, এবং কর্ম্মদাতা ব্যবসাদারদের মজুরীও দিতে হয় অনেক বেশী। এইজন্য এসিয়াবাসীদের কুলির কাজে লইতে তাহারা বাধ্য হয়, কিন্তু তাহাদের সহিত মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করাতে উভয় পক্ষে বিস্তর মনোমালিন্যের কারণ ঘটে। উপনিবেশীরা এসিয়ার লোকদের মানুষ বলিয়া মানিতে চাহে না, অথচ না মানিলেও শান্তি নাই—এই উভয় সমস্যায় পড়িয়া উহারা এসিয়ার লোককে দেশ হইতে বিদায় করিবার নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছে; ইহাতে তাহাদের অসুবিধা হইবে যথেষ্ট, কিন্তু তাহাও স্বীকার তবু এসিয়াবাসীর সহিত মনুষ্যোচিত সাম্য ব্যবহার করিতে তাহারা নিতান্ত নারাজ।

অষ্ট্রেলিয়াতে মুক্তা তুলিবার ব্যবসায়ে সম্প্রতি য়ুরোপীয় ডুবুরী নিযুক্ত করিয়া দেখা গেল যে দুই বৎসরের মধ্যে তাহারা হয় মরিয়া গেল, নয় পক্ষাঘাতে পঙ্গু হইয়া গেল, এবং খরচও যে মারাত্মক হইল তাহা ত বলাই বাহুল্য। অধিকন্তু প্রত্যেক য়ুরোপীয় ডুবুরী বৎসরে বড় জোর এক টন (২৭ মণ) মুক্তা উঠাইয়াছিল; সেই স্থানে এসিয়ার ডুবুরী ৪।৫ টন তুলিতে পারে। এসিয়ার ডুবুরীর মজুরী মাসে ৩০ হইতে ৪৫ টাকা; য়ুরোপীয় ডুবুরীর মজুরী অন্ততঃ ২১০ টাকা, এবং তাহার যাতায়াতের খরচ এসিয়ার ডুবুরীর তিন গুণ বেশী। অতএব ইহা স্থির নিশ্চয় যে ডুবুরীর কাজ শাদা চামড়ার লোকের পোষাইবে না।

কালা আদমি না হইলে শ্বেতাঙ্গদের যখন সংসারযাত্রা অচল হয়, তখন সংসারে সে বেচারাদের একটু সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে দিতে তাহাদের যে এত আপত্তি কেন তাহা ত বুঝিয়া উঠা সুকঠিন। মনুষ্যধর্ম্ম অপেক্ষা গরজ এতই প্রবল হওয়া কি কল্যাণের কথা?

বোতল বনাম বই (Literary Digest):—

রুষিয়ার একজন লেখক লিখিয়াছেন যে রাজসরকার হইতে মদ বিক্রয় বাড়াইবার জন্য যেরূপ চেষ্টা ও ব্যবস্থা হয়, বই বিক্রয়ের জন্য সেরূপ করিলে পৃথিবীতে জ্ঞানের সত্যযুগের আবির্ভাব হইত। গ্রামে গ্রামে, শহরের গলিতে গলিতে মদের দোকান; যাহাতে মদের বিক্রয় বেশী হয়, অর্থাৎ প্রজাদের বেশীর ভাগ লোক মাতাল হয়, তাহার জন্য রাজার বিশেষ আগ্রহ; কারণ মদ সরকারের খাস একচেটিয়া ব্যবসা, এবং আবকারীর আয় মস্ত আয়। কিন্তু অপর দিকে বই, খবরের কাগজ, ছাপাখানা প্রভৃতির প্রচার ও বিস্তার সম্বন্ধে রাজসরকারের কী কঠিন কড়াকড়ি—কারণ জ্ঞানবিস্তার হইলে অন্যায় করা চলে না। একখানা বই বা খবরের কাগজ কর্ত্তাদের ইচ্ছা হইলেই বাজেয়াপ্ত বা বন্ধ করা খুব সহজেই হয়; কিন্তু প্রজাদের শত চেষ্টাতেও একটা মদের দোকান বন্ধ হয় না, একটা খোলাভাঁটি ঠাঁই-নাড়া করা যায় না।

চারু।

সুপ্রজনন-বিদ্যা ও প্রতিভা (British Medical Journal):—

সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে Eugenics (ইউজেনিক্স্) নামে এক নূতন বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে। মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে পিতামাতার দোষগুণ প্রাপ্ত হইতে পারে ইহা একরূপ সর্ব্ববাদী-সম্মত কথা। এরূপ স্থলে যে-সকল ব্যক্তির শরীর বা মন ঠিক স্বাভাবিক নয়, তাহাদের পক্ষে বংশবৃদ্ধি করা যে ঘোরতর অন্যায় এ কথায় বিশেষ আপত্তি করা হয়তো সঙ্গত নহে। সকলকেই যে বিবাহ করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। যাহারা সম্পূর্ণ সুস্থ—যাহাদের শরীর বা মনের কোনরূপ দুর্ব্বলতা নাই—শুধু সেই-সকল ব্যক্তিই বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা করুক—রুগ্ন দুর্ব্বল ব্যক্তিদের জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার অনুপযোগী সন্তান উৎপন্ন করার কোন অধিকার নাই। Eugenics (ইউজেনিক্স্) বিজ্ঞানের মূল মন্ত্রই ঐরূপ। ব্রিটিশ মেডিকাল জার্ণালের (British Medical Journal) সম্পাদক মহাশয় সুপ্রজননবাদীদের (Eugenists) উক্ত মতের উপর একটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন তাঁহাদের কথা যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা যায়, তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যে animal (জীব) হিসাবে মানবজাতি সম্পূর্ণ সুস্থ ভাবাপন্ন হইবে বটে—কিন্তু মানুষ হিসাবে মানব জাতির বিশেষ ক্ষতিরই আশঙ্কা করা যায়। মানুষের মধ্যে সময়ে সময়ে এমন দু-চারিজন ক্ষণজন্মা লোক জন্মান যাঁহাদিগকে সাধারণ মানবশ্রেণীর সহিত কোন মতেই তুলনা করিতে পারা যায় না। লোকে এই-সকল মহাজনকে Genius বা "প্রতিভাবান্" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। সুপ্রজননবাদীদের (Eugenist) মতানুসারে বিবাহ-সংস্কার করিলে পৃথিবীতে genius (প্রতিভা) অভ্যুদয়ের আর কোন আশা থাকিবে না—ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্ণাল্ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় এইরূপ আশঙ্কা করেন। মিঃ এডমণ্ড গস তাঁহার "Portraits and Sketches" নামক পুস্তকে কবিবর (Swinburne) সুইন্‌বার্নের চরিত্রবিশ্লেষণের প্রসঙ্গে এ বিষয়ে কতকগুলি সমীচীন কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, মহাপুরুষদের (genius) জন্মরহস্য আজ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। তাঁহারা কোন্ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন তাহাও ঠিক বলা যায় না। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, জগতে এ কাল পর্য্যন্ত যে-সকল ব্যক্তি কোন একটা বড় আবিষ্কার করিয়াছেন, কি অসাধারণ চিন্তাশীলতা বা মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় কাহাকেও absolutely normal man or woman (সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নর বা নারী) বলা যাইতে পারে না পূর্ণ স্বাস্থ্যবিশিষ্ট বলিলে যাহাদের বুঝায়, ইহাদের মধ্যে সেরূপ ব্যক্তি নাই বলিলেই হয়। পৃথিবীতে যাঁহারা ভাব ও জ্ঞানের পরিসীমা বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা যে খুব বেশী তাহা বলা যায় না। Darwin (ডারউইন) জাহাজে কাজ করিয়াছেন বলিয়া সকল মাল্লারাই যে ডারউইন হইতে পারে কিম্বা Elizabeth Browning (এলিজাবেথ ব্রাউনিং) কৃষকের ঘরে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া সকল কৃষক-কুমারীই এলিজাবেথ ব্রাউনিং-এ পরিণত হইতে পারে তাহার কোন অর্থ নাই। যে-সকল মহিমান্বিত পুরুষ বা রমণী জগতে বৈচিত্র্যের উৎপাদন করিয়া, মানবজীবনকে দুঃসহ একঘেয়ের হাত হইতে ত্রাণ করিয়াছেন, একদল চিকিৎসক তাঁহাদের চিরকালই লোক রক্তাইয়া আসিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন জগতে বৈচিত্র্য

যেন কোন আবশ্যক নাই; সকল নরনারীর হৃদয় ও মন একটা আদর্শের অনুযায়ী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। জগতের আরম্ভ হইতে একাল পর্য্যন্ত যে-সকল প্রতিভাবান্ পুরুষ ভাবরাজ্যে কিম্বা কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় যতই পর্য্যালোচনা করা যায় ততই মনে হয়, বৈচিত্র্যের মূল উৎপাটন করিয়া, সকলকেই একটি ধারায় আনিতে গেলে মোটের উপর জগতের লাভ অপেক্ষা ক্ষতিরই বেশী সম্ভাবনা। কেননা, এরূপ হইলে, যে-সকল প্রতিভাবান্ পুরুষ বৈচিত্র্যের ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া, মানবজীবনকে চিরশ্যামল করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আবির্ভাবের আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। আমরা morbid aberration ও healthy abnormalityতে গোল করিয়া বসি। আদর্শের একটু এদিক ওদিক হইলেই আমরা তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করি। এই অস্বাভাবিকেরও যে ভাল মন্দ আছে তাহা বিচার করিয়া দেখি না। এই কারণে আমরা কাহারও মধ্যে যদি কোন-রূপ অস্বাভাবিকত্ব দেখি অমনি সেটা একটা মানসিক রোগবিশেষ বলিয়া স্থির করিয়া বসি। পৃথিবীতে এতকাল যে-সকল প্রতিভাবান্ (genius) পুরুষ ও নারী জন্মিয়াছেন তাঁহাদের দৈহিক বিশেষত্ব বর্ণনাকালে হয় আমরা সেটাকে একেবারে উপেক্ষা করি, নয় রোগ-বিশেষের গৌণফল বলিয়া নিশ্চিন্ত হই। গস উদাহরণ স্বরূপ Pascal, Pope, Michel Angelo এবং Tasso প্রভৃতির নাম করিয়াছেন। আরও বলেন যে, কবি সুইনবার্ণের শরীরটা একবারেই সাধারণ মানবের মত ছিল না। তাঁহাকে কাহারও সহিতই তুলনা করা চলে না। তিনি যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। এই বিশেষ মানুষটির genus homoর (মানবজাতির) কোন্ স্থানে ঠাঁই তাহা বলা বড়ই কঠিন। অবশ্য স্বাভাবিকের বিকৃতি বলিলে ত সব গোলই চুকিয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? চিকিৎসা-শাস্ত্রে "বিকৃতির" যে-সব লক্ষণ আছে সুইনবার্ণের বেলায় সে-সব খাটে না। তাঁহার শরীরের এই অদ্ভুত অবস্থা যে রোগের পরিণামফল, তা বলিবারও জো নাই। বংশের দুর্ব্বলতার জন্য সেরূপ হইয়াছে সে কথাও বলিতে পারা যায় না। আসল কথা, সাধারণ মানুষ আর সুইনবার্ণকে এক বলিয়া মনে করিলে কবিবরের উপর নিতান্তই অবিচার করা হয়। পিণ্ডার সম্বন্ধে কাউলে বলিয়াছিলেন—"he formed a vast species alone." সুইনবার্ণ সম্বন্ধেও ঐ উক্তিটি সম্পূর্ণ খাটে—তিনি নিজেই একটা বিশাল জাতি। যদি এমন সম্ভব হইত যে সুইনবার্ণ, আমাদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না করিয়া এমন কোন পৃথিবীতে জন্মাইলেন—যেখানকার সবাই এক একটা সুইনবার্ণ, তাহা হইলে কবির শরীর ও মন কোনটাই অস্বাভাবিক বলিয়া চোখে ঠেকিত না। কবির যাহা যাহা আমাদের চক্ষুতে অস্বাভাবিক বলিয়া ঠেকে, সে-সব যে অস্বাস্থ্যের (ill health) জন্য তাহা বলা যায় না। এগুলি তাঁহার সহজাত। তথাপি মোপাসাঁ সুইনবার্ণের যে বিবরণ লিখিয়াছেন (এবং গস্ তাহা সমর্থন করিয়াছেন) তাহা পাঠে কবিকে "বিকৃতি" (degeneration) বলিয়াই মনে হয়। শিশুর দেহের উপর যেন একটা প্রকাণ্ড মস্তক, না আছে বুক পিঠ; না আছে স্কন্ধদেশ; ক্ষুদ্র বদনখানি নিম্নে সুতীক্ষ্ণ চিবুকে শেষ হইয়াছে, ঊর্দ্ধে বিশাল কপালটি যেন গম্বুজের মত উত্থিত হইয়াছে; তীক্ষ্ণ চক্ষু দুটির উপর দৃষ্টি পড়িলে সরীসৃপের চক্ষু মনে পড়িয়া যায়। শরীর সর্ব্বদা কম্পমান, নড়াচড়া উঠাবসা যেন কোন নিয়মের বশে নয়, দেহযন্ত্রের স্প্রিংটি যেন বিগড়াইয়া গিয়াছে। সুপ্রজননবাদীদের (eugenist) কাছে কবির এ-সব অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হওয়া খুবই সম্ভব, তথাপি একথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে সুপ্রজননবাদীদের কল্পিত লক্ষলক্ষ আদর্শ পুরুষের মায়া জগৎ অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারে—তবুও তাঁহাদের দ্বারা নিন্দিত, উপেক্ষিত একটি (Algernon Charles Swinburne) এলগ্যারনন্ চার্লস সুইনবার্ণের মায়া ত্যাগ করিতে পারে না।

প্রাচীন গ্রীসে সুপ্রজনন-চেষ্টা (British Medical Journal): —

ডাক্তার M. Moissidis, (Janus) জেনাস পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। গ্রীকেরা যাহাতে দুর্ব্বল ও রুগ্নকায় না হয় তাহার জন্য প্রাচীন গ্রীসে যে-সকল বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ডাক্তার ময়সায়ডিস তাঁহার প্রবন্ধে সেই-সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমাদের এই কথা মনে হয়—সভ্য জগতে বর্ত্তমান সময়ে এ বিষয়ে যতটা আন্দোলন ও চেষ্টা হইতেছে—প্রাচীন গ্রীসে তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই কম চেষ্টা হয় নাই। অনেক বিষয়ে গ্রীকেরা বেশী অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়।

রাজপুরুষ, দার্শনিক, চিকিৎসক, এমন কি মহিলাগণ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। বিবাহ বিষয়ে প্রাচীন গ্রীসে অতিশয় কঠিন নিয়ম প্রচলিত ছিল। ক্রীট্ (Crete) দ্বীপে নিখুঁত, সুন্দর ও বলবান ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও বিবাহ করিবার অধিকার ছিল না। ইহার উদ্দেশ্য বলবান্ সুন্দর সন্তান উৎপাদন ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। উচ্চ বংশে এবং সৈনিকদিগের মধ্যে যাহাতে কোন প্রকার বংশগত দুর্ব্বলতা প্রবেশ না করিতে পারে, তাহার জন্য লাইকারগ্যাস্ (Lycurgas) ঐ সকল বংশে যথেচ্ছা বিবাহ একবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা আর্কিডেমাস্ (Archidamus) একটি খর্ব্বকায়া রমণীর পাণিগ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছিল। প্লুটার্কের (Plutarch) গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সেকালে গ্রীসে বালক বালিকাদের শিক্ষা বিষয়ে কোন রূপই ভেদবিচার ছিল না। কুমারীদেরও দস্তুর মত ব্যায়াম করিয়া শরীর দৃঢ় ও মজবুত করিতে হইত। ইহারা পুরুষেরই মত কুস্তী করিত, মুগুর ভাঁজিত, ধনুর্ব্বিদ্যা শিখিত, দৌড় ঝাঁপ, অশ্বারোহণ প্রভৃতি করিত। মাতা বলবতী না হইলে সন্তান সবল, পূর্ণাবয়ব হয় না—পাইথাগোরাসের (Pythagorus) এইরূপ ধারণা ছিল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই গ্রামের দশজন প্রাচীন মিলিয়া তাহাকে রীতিমত পরীক্ষা করিয়া দেখিত। যে শিশুটিকে রুগ্ন, কদাকার, বিবর্ণ ও বিকৃতাঙ্গ বলিয়া বোধ হইত, তাহাকে তদ্দণ্ডে জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলা হইত।

প্লেটো (Plato) তাঁহার Laws (লজ্) নামক বিখ্যাত অনুশাসনের একস্থলে বলিয়াছেন বিবাহ ব্যাপারটাকে কেবল গার্হস্থ্য ব্যাপার মনে করিলে চলিবে না। ইহার উপর জাতীয় শুভাশুভ সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। এই কারণে প্লেটোর মতে পাত্র-কন্যার মতের উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর না করিয়া বিবাহ ব্যাপারটা (State) ষ্টেটের হস্তে ন্যস্ত থাকা কর্ত্তব্য। বিবাহের ঘটকালী ম্যাজিষ্ট্রেট্ (Magistrate) করিবেন। তিনি খুব বলবান যুবক বাছিয়া সুন্দরী যুবতীর সহিত মিলন ঘটাইয়া দিবেন। এরূপ মিলনের সন্তানগণ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সাহসী হইবারই কথা।

বিবাহের বয়স সম্বন্ধে গ্রীসে নানা মুনির নানা মত। তবে বাল্য বিবাহের কেহই সমর্থন করিতেন না। তাঁহারা বলিতেন বাল্য বিবাহে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, আর সন্তানগণ দুর্ব্বল হয়। এরিস্টটেল্ (Aristotle) বলেন বাল্য বিবাহের সন্তানগণ ক্ষুদ্রকায়, দুর্ব্বল ও অপূর্ণদেহ হয়। ইহারা অধিক বয়সে বিবাহও আবার অনুমোদন

করেন না। ইহাতে সন্তানগণের দেহ ও মন কোনটাই সম্যক পরিণতি লাভ করিতে পারে না। বৃদ্ধ বয়সে কদাচিৎ সবল দীর্ঘায়ু সন্তান হইতে দেখা যায়। এথেন্স (Athens) নগরে বিবাহে পাত্র-কন্যার মতের আবশ্যক হইলেও বিবাহে তাহাদের কোন কালেই পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না। বিবাহার্থী ও বিবাহার্থিনীদের সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করা হইত -কোনরূপ দুর্ব্বলতা ও বিকলাঙ্গতা দেখিতে না পাইলে তবেই বিবাহে সম্মতি দেওয়া হইত। ছেলে মেয়ে সকলকেই একরকম শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহারা একত্রে দৌড়াদৌড়ি জিমন্যাষ্টিক্ প্রভৃতির চর্চ্চা করিত, প্রতিযোগী পরীক্ষায় মেয়েরা পুরুষদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত। বিবাহের পর স্ত্রীলোকের এ-সকলে আর কোন অধিকার থাকিত না। টার্সাস্ (Tarsus) নগরে এথেনেলাস্ (Athenalus) নামে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বলিতেন সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও সন্তান কামনা করা উচিত নহে। সন্তানার্থীদের দেহ ও মন প্রফুল্ল হওয়া উচিত। পরিমিত শারীরিক শ্রম করা উচিত; সহজপাচ্য অথচ পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া কর্ত্তব্য।

পানাহার প্রভৃতি সকল বিষয়ে সংযম শিক্ষাও দেওয়া হইত। মাতালের সন্তানগণ কখনও ভাল হয় না—গ্রীকদিগের কাছে তাহাও অজ্ঞাত ছিল না। ডায়োজেনিস্ (Diogenes) একটি বিকলাঙ্গ বিকৃতমস্তক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "যুবক। তোমার পিতা মাতাল বলিয়া তোমার আজ এই অবস্থা।"

আমাদের দেশেও এইজন্য মন্বাদি সংহিতায় ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিবাহের বহু সতর্ক বিধিনিষেধ আছে দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ে এ-সকল বিষয়ে ইহা অপেক্ষা নূতন কিছু শুনিতে পাওয়া যায় আমাদের এমন মনে হয় না।

মহিলা-স্বাস্থ্য-প্রচার-সমিতি (British Medical Journal) :—

স্ত্রীবিদ্বেষীরা যতই বলুন না, কতকগুলি কায আছে, যেগুলি মেয়েদের হাতে যতটা সফলতা লাভ করে এমন পুরুষদের দ্বারা নয়। আর্ত্তের সেবা, সন্তান পালন, রোগীর পরিচর্য্যা প্রভৃতি কাযে নারী-জাতি চিরকালই পুরুষদের পরাভব করিয়া আসিতেছে। জন-সাধারণকে স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কাযটাতেও রমণীদের যতখানি স্বাভাবিক উপযোগিতা আছে এমন পুরুষের নয়। সম্প্রতি Gentlewoman (ভদ্রমহিলা) নামক পত্রিকার সম্পাদিকা এ বিষয়ে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সাধারণের কোন জ্ঞান নাই বলিলেই হয়। জাতীয় উন্নতির পথে এ যে একটা প্রকাণ্ড বাধা এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এ অজ্ঞতা দূর করিতে না পারিলে দেশের আর আশা নাই। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব? সম্পাদিকা মহা-শয়া বলেন—শিক্ষিতা মহিলারা যদি চেষ্টা করেন তবেই ইহা অচি-রাৎ দূর হওয়া সম্ভব। গৃহকর্ম্মের পর সকলেরই কিছু-না-কিছু অবসর থাকে, সে সময়টা আলস্যে না কাটাইয়া, স্বাস্থ্য-সমাচার প্রচারের জন্য ব্যয় করিলে, দেশব্যাপী অজ্ঞানতা বেশীদিন স্থায়ী হইতে পারে না। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন দেশে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে সত্য—তথাপি স্বাস্থ্যবিষয়ে জনসাধারণ পূর্ব্বেরই ন্যায় অজ্ঞ রহি-য়াছে। চিকিৎসক সম্প্রদায় এ বিষয়ে কতকটা কায করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, সাধারণের নিকট তাঁহাদের উপদেশবাক্য পৌঁছায় কিনা সন্দেহ। এরূপ স্থলে রমণীরা যদি অগ্রবর্ত্তিনী হয়েন, তাহা হইলে, স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় অজ্ঞান-অন্ধকার শীঘ্রই বিদূরিত হইতে পারে। স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে মানুষের যে-সব ভুল ভ্রান্তি ও কুসংস্কার আছে সেগুলির অপনোদনের জন্য যে কোনই চেষ্টা হয় নাই বা হইতেছে না আমরা অবশ্য সে কথা বলিতেছি না। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, নিজেদের বুদ্ধির দোষে, এবং হাতুড়েদের মিষ্টবচনে প্রলুব্ধ হইয়া জনসাধারণ সর্ব্বদাই বিপথে গমন করিতেছে। বিজ্ঞাপন ও প্রশংসা-পত্রের চটকে ভুলিয়া লোকেরা রাশি রাশি পেটেণ্ট (patent) ঔষধ ক্রয় করিয়া, এবং তাহা সেবন করিয়া অর্থ ও স্বাস্থ্য এই উভয়ই নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিজ্ঞাপনবর্ণিত রোগলক্ষণগুলি পাঠ করিয়া, মনে মনে কাল্পনিক রোগ সৃষ্টি করিয়া লইয়া, তাহার অপ-নোদনের আশায় বহুবিধ পেটেণ্ট (patent) ঔষধ, এবং দৈব বা সন্ন্যাসীপ্রদত্ত কিম্বা স্বপ্নাদ্য ঔষধাদি সেবন করিয়া আজীবন কষ্ট ও অশান্তি ভোগ করিতেছে। রোগকালে, যথাসময়ে উপযুক্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন না হইয়া, হাতুড়েদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনকে সত্য সত্যই দুঃসহ করিয়া তুলিতেছে। উপযুক্ত শিক্ষিত চিকিৎসকের কথায় ও চিকিৎসায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া, আজগুবী অলৌকিক চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় হইবার আশায় সাধারণের যে কি দুর্গতি হইতেছে—তাহা প্রকাশ করা যায় না। চিকিৎসকগণ যদি কোন patent (পেটেণ্ট) ঔষধ বা হাতুড়ে চিকিৎসার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন, লোকে তাহা ঈর্ষাসঞ্জাত মনে করিয়া সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিমতী সুশিক্ষিতা মহিলারা যদি এ ব্রত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে লোকের মনে অন্যবিধ ধারণা জন্মাইতে পারে। গৃহকার্য্যের পর অনেক মহিলারই যথেষ্ট অবসর থাকে, সে সময়টা কেবল নাটক নভেল না পড়িয়া, অথবা তাস না পিটিয়া, কিম্বা পরচর্চ্চা না করিয়া যদি পূর্ব্বোক্তভাবে অতিবাহিত করেন, তাহা হইলে সমাজের কত দিকে কত যে উন্নতি হয় তাহার ঠিকানা নাই। ডাক্তারের উপদেশ-বাক্য যেখানে মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না, সেরূপ স্থলে রমণীর চেষ্টায় অনেক কায হইতে দেখা যায়। শিক্ষিতা মহিলারা ইচ্ছা করিলে শিশুদের স্বাস্থ্যবিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন, অশিক্ষিতা জননীদের শিশুপালন বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন। এইরূপে সাধারণের চিত্ত হইতে কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা দূর করিয়া চিকিৎসা বিষয়ে তাঁহারা ডাক্তারদের বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন।

প্রেমের নিদান (The Pathology of Love : British Medical Journal) :—

প্রেম-রোগটার সঙ্গে সকলেরই কিছু-না-কিছু পরিচয় থাকা সম্ভব। অনেকের বেলায় কিন্তু এটা নিতান্ত কাব্যরসাত্মক হইয়া একবারেই কাল্পনিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তা বলিয়া সত্যকার প্রেমরোগ যে হয় না ইহা যেন কেহ মনে না করিয়া বসেন। আমরা এমন অনেক নিরাশ প্রেমিকের কথা জানি, যাহাদের বেলায় ইহাকে কোন মতেই কাল্পনিক রোগ বলা যায় না। ব্যর্থ প্রেমের নিদারুণ বেদনায় আমরা অনেকের ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পাইতে দেখিয়াছি। শরীর শুকাইয়া কঙ্কালমাত্র সার হইতে দেখিয়াছি। Burton (বার্টন্) তাঁহার Anatomy of Melancholy (এনাটমী অফ্ মেলাঙ্কলী) নামক পুস্তকে সর্ব্বপ্রকার বিষাদেরই লক্ষণাবলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু হতাশ প্রেমের কি লক্ষণ তাহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু প্রেমরোগে শারীর-বিধানের যে-

সকল পরিবর্ত্তন হয়, তাহাদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে প্রাচীন দার্শনিক (Empedocles) এম্পেডোক্লেসের কথা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। প্রেম-যাতনায় মৃত কোন ব্যক্তির দেহ ব্যবচ্ছেদকালে এম্পেডোক্লেস উপস্থিত থাকিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তননিচয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সে ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডটা পুড়িয়া অঙ্গারবৎ হইয়া গিয়াছিল, যকৃত হইতে ধূম উদ্গীর্ণ হইতেছিল, ফুস্‌ফুস্ দুটি শুকাইয়া গিয়াছিল। প্রেমের হুতাশনে বেচারার আত্মাপুরুষটি যেন পুড়িয়া শিককাবাবের দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অধুনা একটি লেখক প্রেমের জ্বালার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাও কম কৌতুকাবহ নহে। প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের উপর একটা প্রকাণ্ড কটাহ স্থাপিত হইয়াছে আর Cupid (মদনদেব) কুলার বাতাসে আগুন নিভাইতে দিতেছেন না। অগ্নি-তাপে যেমন জল বিশুষ্ক হয় প্রেমানলে তেমনি শরীরের রস শুকাইয়া যায়। (Dutch) ওলান্দাজ শিল্পীরা প্রেম-রোগের যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন, এস্থলে তাহাও উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা প্রেম-জ্বরকে একটি কৃশা, ক্ষীণাঙ্গী নারীমূর্ত্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পার্শ্বে ভাণ্ড হস্তে একজন চিকিৎসক দণ্ডায়মান আছেন; চিকিৎসকের নেত্রদ্বয় হস্তস্থিত ভাণ্ডের প্রতি অর্পিত রহিয়াছে। সম্প্রতি একখানি ইতালীর চিকিৎসা পত্রিকায়, Dr. Barret (ডাক্তার ব্যারেট্) নামক এক ব্যক্তি প্রেম-রোগের উপর একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ডাক্তার ব্যারেট্ বলেন—প্রেম।—সে তো স্নায়ু-কেন্দ্রগুলির (nerve centre) অত্যধিক উত্তেজনা ভিন্ন আর কিছু নহে। ইহাতে রক্ত সঞ্চালনের যন্ত্রাদিও কম আক্রান্ত হয় না, বিশেষতঃ রোগী যদি কম বয়সের হয়—আর রোগটা যদি প্রথম দেখা দেয়। ইহাতে আমাদের সে কালের গালেনের (Galen) একটি রোগিণীর কথা মনে পড়িল। একবার একটি যুবতীর সহসা রোগ দেখা দেয়। রোগ যে কি, কোন চিকিৎসকই তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। রোগিণীর নাড়ী বসিয়া যাইবার মত হইয়াছিল, তাহার দেহ নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল—দেখিলে বোধ হয় তাহার জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হইবার যেন আর বিলম্ব নাই। যুবতীর বাপ মা নিরুপায় হইয়া, অবশেষে গালেনকে ডাকেন। সুচতুর গালেনের আসল রোগ চিনিতে কালবিলম্ব হইল না। তিনি বুঝিলেন যুবতী প্রেম রোগে জর্জ্জরিত। তাহার এরূপ অবস্থার কারণ যুবতীর প্রতিবেশী একজন যুবক। গ্যালেন সেই যুবা পুরুষটিকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় রোগিণীর নিকট আনিলেন এবং তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। যুবকের উপস্থিতি দেখিতে দেখিতে যুবতীর হৃদয়ে মন্ত্রের ন্যায় ক্রিয়া করিতে লাগিল। তাহার লুপ্ত নাড়ী ফিরিয়া আসিল—সমস্ত দেহে স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। ডাক্তার ব্যারেট্ প্রেমার্ত্ত ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষা করিয়া তাহাতে শ্বেতকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন—প্রেম-রোগের যদি শীঘ্র চিকিৎসা করান না হয় তাহা হইলে শেষে ইহা হইতে বিবিধ বায়ু-রোগ (nervous disease), এমন কি উন্মাদ রোগ পর্য্যন্ত জন্মাইতে পারে। ব্যর্থ প্রেমে যাহাদের হৃদয় ভাঙিয়া গিয়াছে—তাহাদের ক্ষয়কাশ (pthisis) রোগ হওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে। প্রেম-রোগের ডাক্তারী মতে আজ পর্য্যন্ত কোনরূপ চিকিৎসাই আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাকে আর উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কিন্তু কি প্রণালীতে ইহার চিকিৎসার চেষ্টা করা উচিত তাহাই জিজ্ঞাসার বিষয়। প্লেগ, বসন্তাদি রোগের মত প্রেমের কোন বীজাণু (bacillus) আছে কি না তাহা আজিও স্থির হয় নাই। সুতরাং vaccination (টীকা) দেওয়া চলিতে পারে না। ম্যালেরিয়ায় যেমন কুইনাইন অব্যর্থ—প্রেম-রোগে সেরূপ কোন ঔষধ আছে কি না তাহাও এখনও কেহই বলিতে পারে না। Dr. Barret (ডাক্তার ব্যারেট্) প্রেম-রোগকে চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধীন করিতে চাহেন, কিন্তু কি উপায়ে তাহা সম্ভব তাহার কোন ইঙ্গিত প্রকাশ করেন নাই। প্রেম কোন কালেই কাহারও বশ্যতা স্বীকার করে নাই—ইহা যে কখনও চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধীনতা স্বীকার করিবে আমাদের এমন মনে হয় না। Ovid (ওভিড্) Remedia Amoris (রেমিডিয়া এমোরিস্) নামক পুস্তকে প্রেম-রোগ চিকিৎসার অনেকগুলি উপায়ের উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু এদের কোনটার প্রয়োগে কাহারও যে কিছু ফল হইয়াছে এমন কথা কেহই বলিতে পারেন না। প্রেম-রোগ চিকিৎসার পথে একটা মস্ত বাধা এই যে রোগী নিজেই অনেক সময় রোগমুক্ত হইতে চাহে না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল-এম-এস।

সনাতনজৈনগ্রন্থমালা

(সমালোচনা)

সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গজাধর লাল জৈন শাস্ত্রী, প্রকাশক শ্রীজৈনধর্ম্মপ্রচারিণী সভার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পন্নালাল বাকলীবাল জৈন, শ্রীজৈনধর্ম্মপ্রচারিণী সভা, কাশী, বেনারস সিটী। ইহাতে দিগম্বর জৈনসম্প্রদায়ের মূল সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত দর্শন, সাহিত্য, ব্যাকরণ, পুরাণাদি সর্ব্বপ্রকার প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে। আকার প্রতিখণ্ড সুপার রয়াল ৮ পৃষ্ঠার দশ ফর্ম্মা, ১২ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ৮৲।

নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক পণ্ডিতগণকে এবং সংস্কৃতপুস্তকালয়সমূহে বিনামূল্যে প্রদত্ত হয়।

প্রথম খণ্ড—স্যাদ্বাদবিদ্যাপতি শ্রীমদ্ বিদ্যানন্দস্বামি-বিরচিত (১) আপ্তপরীক্ষা ও (২) পত্রপরীক্ষা।

দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রীমদ্ভগবৎ-কুন্দকুন্দাচার্য্য-বিরচিত সময়প্রাভৃত।

তৃতীয় খণ্ড—শ্রীমদ্‌ভট্টাকলঙ্ক-দেব বিরচিত তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিক।

পূর্ব্বে আমরা বোম্বাই হইতে শ্রীপরমশ্রুতপ্রভাবকমণ্ডল-প্রকাশিত রায়চন্দ্র জৈনশাস্ত্রমালা ও কাশীর যশোবিজয়জৈনগ্রন্থমালা অবলোকন করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম, অদ্য সনাতনজৈনগ্রন্থমালা দর্শন করায় আমাদের সেই প্রীতি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতের নানাস্থানে জৈনসাহিত্য আলোচনার বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। জৈন সাহিত্যিকগণ এবার যোধপুরে "শ্রীজৈনসাহিত্যসম্মিলনের" ব্যবস্থা করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা অতি শুভ চিহ্ন। আশা করা যায় এইবার জৈনধর্ম্ম ও জৈনসাহিত্য সম্বন্ধে লোকের অজ্ঞান ও ভ্রান্ত ধারণা ধীরে ধীরে লোপ প্রাপ্ত হইবে। ভারতবর্ষ দার্শনিকের দেশ, এখানে দর্শনশাস্ত্র আলোচিত হয়, সত্য, কিন্তু এই আলোচনা যে সম্পূর্ণ নহে তাহা অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। দেশান্তরীর দর্শনের কথা স্বতন্ত্র, ভারতের দর্শনশাস্ত্র বলিতে কেবল ব্রাহ্মণ্য দর্শন ধরিলে চলিবে না। তাহার পার্শ্বে এক দিকে জৈন

ও আর এক দিকে বৌদ্ধ দর্শনের স্থান দিতে হইবে। আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ ব্রহ্মসূত্রের শারীরকভাষ্যের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের দুই-চারিটী কথা পড়িয়াই মনে করেন ঐ দুই দর্শনশাস্ত্র অকিঞ্চিৎকর, তাহাতে কিছু আলোচনার যোগ্য নাই। তাঁহাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের একটি প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন আলোচনা করিয়া দেখেন না। আর একটি কারণ এ বিষয়ে তাঁহাদের সুবিধাও হয় না। জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহের যেরূপ সুলভ ও বিপুল প্রচার হওয়া আবশ্যক, এ পর্য্যন্ত সেরূপ হয় নাই। এই কারণেই সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লিখিত হইলেও তাহার মধ্যে এই দুই সাহিত্যের কোন স্থান নাই। এখন যাঁহারা নূতন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন, তাঁহাদিগকে এই দুই সাহিত্যও সবিশেষ আলোচনা করিতে হইবে, অন্যথা তাঁহাদেরও গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

ভারতের অধিবাসী বৌদ্ধের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। যাহা আছে তাহার মধ্যে আবার বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রচার-প্রকাশাদি বিষয়ে উৎসাহী বা কার্য্যপটু ব্যক্তির খুবই অভাব। এজন্য ভারতীয় বৌদ্ধগণ স্বকীয় সাহিত্য-প্রচার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত তেমন কিছুই করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও, সিংহল, বর্ম্মা, শ্যাম ও পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণ তাঁহাদের ঐ কার্য্য বিশেষ ভাবে নিজ-নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ইহাতেই বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রচারের অভাব কতকটা দূরীভূত হইয়াছে। ভারতে বৌদ্ধ অপেক্ষা জৈন অধিবাসী অধিক, এবং ইঁহাদের মধ্যে কার্য্যনিপুণ ব্যক্তিও অনেক আছেন। দেশান্তরীর পণ্ডিতেরা জৈনসাহিত্য-প্রচারের তেমন কোন ভার গ্রহণ না করিলেও তাঁহারা স্বয়ংই তাহা গ্রহণ করিয়া স্বকীয় কর্ত্তব্য ও জাতীয়তা রক্ষা করিতেছেন। জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থের অভাব নাই, এবং স্বধর্ম্ম ও সাহিত্য-প্রচারে অর্থের বিনিয়োগ করিতেও ইঁহারা জানেন। ইহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। সনাতনজৈনগ্রন্থমালার আবির্ভাবেও আমাদের এই কথাই প্রমাণিত হইতেছে। এই গ্রন্থমালা বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করা অপেক্ষা যোগ্য পাত্রে বিতরণ করিয়া জৈনসাহিত্যের প্রচার করাই ইহার অধিকতর প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। প্রকাশক পণ্ডিত শ্রীপান্নালাল বাকলীবাল মহাশয় নিয়মাবলীতে বলিয়াছেন যে, নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক বা পুস্তকালয়ের জন্য এই গ্রন্থমালা বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। যাহাতে তাঁহার এই সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হয় তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য তিনি তাঁহার জৈনভ্রাতৃগণকে আবেদন করিয়াছেন। পণ্ডিত পান্নালাল জৈন সাহিত্য বিষয়ে স্বয়ং অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক। ইনি জৈনসাহিত্য প্রচারের জন্য নীরবে বিপুল পরিশ্রম করিতেছেন। যদি কোন বঙ্গীয় পাঠক জৈনসাহিত্য আলোচনা করিতে চান, তিনি তাঁহাকে বহুপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার এই সাধু সঙ্কল্প সম্পূর্ণ হউক, আমরা প্রার্থনা করি।

আলোচ্য গ্রন্থমালার ১ম খণ্ডে প্রকাশিত আপ্তপরীক্ষা ও পত্রপরীক্ষা উভয়ই জৈনদর্শনে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক বিদ্যানন্দি বা বিদ্যানন্দ স্বামীর রচিত। যিনি বিশ্বতত্ত্বজ্ঞ, শ্রেয়োমার্গের উপদেশক ও কর্ম্মরাশির বিনাশক তিনিই আপ্ত। এই আপ্ত কে? ঈশ্বর, না কপিল (সাংখ্যকার), না প্রধান (সাংখ্যশাস্ত্রের প্রকৃতি), না সুগত (বুদ্ধ), না অর্হৎ? গ্রন্থকার আপ্তপরীক্ষায় নানা যুক্তিতর্কের সাহায্যে ইহাই পরীক্ষা করিয়া অবশেষে, বলা বাহুল্য, অর্হৎকেই সেই পদলাভের গৌরব প্রদান করিয়াছেন। অনন্তর মোক্ষ ও মোক্ষলাভের উপায় কি ইহাই প্রতিপাদন করিয়া তিনি গ্রন্থশেষ করিয়াছেন। ঈশ্বর যে আপ্ত হইতে পারেন না, ইহা বিচার করিতে গিয়া গ্রন্থকার একবারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। যাঁহারা কুমারিলভট্টের শ্লোকবার্ত্তিকের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা বিদ্যানন্দির এই অংশের যুক্তিপ্রণালী পাঠ করিলে অবশ্যই বলিবেন যে, ইনি ভট্টপাদকে অনেকটা অনুকরণ করিয়াছেন। পার্থসারথি মিশ্রের শাস্ত্রদীপিকাতেও ঈশ্বরখণ্ডনের বহু যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। সাংখ্য-মীমাংসা ও জৈন দর্শনের সাধারণ কথা ঈশ্বর-অস্বীকার। বৌদ্ধদর্শনেও ঈশ্বরের স্থান নাই। ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিলেও জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে, এই তত্ত্ব সূত্রযুগের পূর্ব্বেই ভারতীয় তত্ত্ববিদ্‌গণের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, এবং জৈনদর্শনে তাহাই স্থান লাভ করিয়াছে।

দেবনন্দির পত্রপরীক্ষা একখানি অনতিক্ষুদ্র ন্যায়গ্রন্থ। পত্র শব্দের পারিভাষিক অর্থ বাক্য; যেহেতু শব্দাত্মক বাক্যকে লিপিতে আরোপিত করা যায় ও তাহা পত্রে (কাগজ-প্রভৃতিতে) থাকে সেই জন্য তাহার নাম পত্র। বস্তুত বিচারবিষয়ীভূত বাক্যই এখানে পত্র-শব্দের বিবক্ষিত অর্থ। গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে একান্তবাদী অক্ষপাদ-প্রভৃতির এতাদৃশ বাক্যই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। অক্ষপাদ স্বকীয় ন্যায়দর্শনে অনুমানের প্রতিজ্ঞা-প্রভৃতি পাঁচটি অবয়ব বাক্য আছে বলিয়াছেন, দেবনন্দি ইহা যুক্তিপ্রভাবে খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যাহাকে বুঝাইতে হইবে তাহার বুদ্ধি অনুসারে অবয়ববাক্য স্থলবিশেষে তিনটি হইতে দশটিও হইতে পারে। ইহার পর তিনি শব্দবিষয়ে একান্তবাদিগণের বিভিন্ন মত সমালোচনা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নৈয়ায়িকাদিসম্মত একান্তবাদ টিকিতে পারে না, জৈনদর্শনসম্মত অনেকান্তবাদই যুক্তিযুক্ত।

জৈনধর্ম্মে প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে কুন্দকুন্দাচার্য্যের নাম অতিপ্রসিদ্ধ। ইনি সময়সার, পঞ্চাস্তিকায়, প্রইত্যাদি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পাহুড় (প্রাভৃত) নামে প্রসিদ্ধ ৮৪ খানি গ্রন্থেরও ইনিই রচয়িতা। সময়প্রাভৃত ইহাদের অন্যতম। ইহা প্রাকৃত ভাষায় আর্য্যাছন্দে লিখিত। জৈনদর্শনের প্রসিদ্ধ শুদ্ধ নয় ও ব্যবহার নয় অবলম্বনে জীব বা আত্মারস্বরূপ কি, দেহাদির সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, অন্যান্য-বাদিগণ কাহাকে আত্মা বলেন এবং তাহা কতদূর সত্য, কর্ম্মের সহিত আত্মার কি সম্বন্ধ, আত্মার বন্ধ বা মুক্তি কি, ইত্যাদি আত্মতত্ত্ব ইহাতে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। আলোচ্য সংস্করণে প্রতিগাথার সংস্কৃত অনুবাদ এবং তাৎপর্য্যবৃত্তি ও আত্মখ্যাতি নামে দুইটি সুন্দর সংস্কৃত টীকা যোজিত হইয়াছে। গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ডে এই গ্রন্থের কিয়দংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডে তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকের একাংশ রহিয়াছে। শ্রীমদ্ উমাস্বাতি বা উমাস্বামী বিক্রমসংবতের প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রণীত তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র জৈনদর্শনের মূলভূত গ্রন্থ। ইহা তত্ত্বার্থসূত্র বা মোক্ষশাস্ত্র নামেও কথিত হইয়া থাকে। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়েরই এই গ্রন্থ পরম আদরণীয়। উমাস্বাতি স্বয়ংই ইহার একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন (কলিকাতা ও বোম্বাই নগর হতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে)। ইহা ছাড়া গন্ধহস্তি মহাভাষ্য,

শ্লোকবার্ত্তিকালঙ্কার,' গন্ধহস্তিমহাভাষ্য, সর্ব্বার্থসিদ্ধি প্রভৃতি আরও ব্যাখ্যা আছে। ভট্ট-অকলঙ্কদেব-রচিত রাজবার্ত্তিকালঙ্কার ইহাদের অন্যতম'ও উপাদেয়। পূজ্যপাদস্বামীর সর্ব্বার্থসিদ্ধি-নামক ভাষ্যকে সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া ইহা বিস্তৃত ভাবে রচিত হইয়াছে। জৈনশাস্ত্রে স্থানান্তরে ৩৬৩ প্রকার পাষণ্ডবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ক্রিয়াবাদ ১৮০, অক্রিয়াবাদ ৮৪, অজ্ঞানবাদ ৬৭, ও বৈনায়িকবাদ ৩২। সূত্রকৃতাঙ্গ সূত্রে (১. ৫. ৮. ৯, ১১-১৩ ; ইত্যাদি) ইহাদের কতকগুলি আলোচিত হইয়াছে। দ্বাদশ অঙ্গশাস্ত্রের অন্যতম দৃষ্টিবাদ (অথবা দৃষ্টিপ্রবাদ) অঙ্গসূত্রে এই-সকল মত বর্ণিত আছে। আমাদের অদ্যকার আলোচ্য তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিকে (৫১ পৃঃ) এই সকল মতবাদের উদ্ভাবন কর্ত্তাদের কতকগুলির নাম উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যাইবে। ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের ইতিহাস রচনায় ইহাদের নামের উল্লেখ ও মতের আলোচনা অবশ্যই করিতে হইবে।

এই গ্রন্থমালার কাগজ ও ছাপা ভাল। কিন্তু সংস্করণ আশানুরূপ সুন্দর হইতেছে না, ইহা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে। বহুস্থানে অশুদ্ধি থাকিয়া যাইতেছে, শোধনকর্ত্তার ত্রুটি স্থানে-স্থানে সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। বাহুল্য ভয়ে আমরা কেবল দুই একটি স্থান দেখাইতেছি। দ্রষ্টব্য—তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিক ৬৯ পৃষ্ঠা, ২য়, ৪র্থ ও ৭ম পঙ্ক্তি। ঐ গ্রন্থেরই ৪৯ পৃষ্ঠায় (২০২) "মতিজ্ঞানং ব্যাখ্যাতং তৎ পূর্ব্বমস্তেতি। পূর্ব্বং", এই স্থলে "মতিজ্ঞানং ব্যাখ্যাতং, তৎ পূর্ব্বমস্তেতি মতিপূর্ব্বং" ইহাই হইবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। এরূপ ভুলও আছে যাহা ছাপার ভুল বলিয়া মনে করা যায় না। পত্রপরীক্ষায় (২ পৃষ্ঠায়) "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রটিকে বিকৃত করিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সময়প্রাভৃতে (৭ম পৃষ্ঠা, ১২শ গাথা) "নিচ্চুবজুত্তো" এই প্রাকৃত শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ "নিত্যোদ্যতঃ" করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা "নিত্যোপযুক্তঃ" হইবে। এই গ্রন্থেরই ৬৯ পৃষ্ঠায় "ব্রাহ্মণো ন ম্লেচ্ছিতব্যঃ" স্থানে "ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ" হইত।

গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডে দুইখানি গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু একখানিরও সূচীপত্র করা হয় নাই। গ্রন্থে প্রতিপাদিত বিষয়সমূহের সূচী ত থাকিবেই, তাহা ছাড়া, উদ্ধৃত গ্রন্থ, গ্রন্থকার, আবশ্যক শব্দাবলী ও শ্লোক সমূহেরও সূচী দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। সম্পাদক পত্রপরীক্ষার টিপ্পনীতে কতকগুলি অনাবশ্যক শব্দের অর্থ না লিখিয়া সেই সময়টা এই দিকে দিলে ভাল হইত। আশা করি গ্রন্থমালার এই সমস্ত ত্রুটি সংশোধিত হইবে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

কর্ম্মকথা

(সমালোচনা)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রণীত "কর্ম্মকথা" নামক পুস্তকখানি অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার হাতে সমালোচনার জন্য আসিয়াছে, কিন্তু আমি আজ পর্য্যন্ত আমার লেখা পাঠাই নাই বলিয়া "প্রবাসী" আফিস হইতে সম্প্রতি তাগিদপত্র পাইয়াছি।

সাধারণত যে সকল পুস্তক চোখে পড়ে, এ গ্রন্থখানি যদি সেই শ্রেণীর হইত, তবে যে দিন ইহা হাতে আসিয়াছিল, সেই দিনই ইহার সমালোচনার কাজ সারিয়া ফেলিতাম। কিন্তু গ্রন্থপাঠে কি দূর অগ্রসর হইতেই দেখিলাম যে ইহা অলসভাবে চোখ বুলাই পড়িয়া যাইবার মত গ্রন্থ নহে। ইহার পশ্চাতে সুদীর্ঘ কালের সে উত্তাপ, সেই পেষণ, সেই সাধনার ইতিহাস রহিয়াছে যাহা সহ মুখোচ্চারিত ছেঁদো কথার পুনরাবৃত্তির অঙ্গার-কালিমাকে ভাবে জ্যোতির্ম্ময় হীরক-দীপ্তিতে পরিণত করিয়া দেয়।

সেইজন্য রামেন্দ্র বাবুর এই ২১২ পৃষ্ঠার বইখানিতে আমি এমা ঠেকিয়া গেলাম যে অনেক দিন পর্য্যন্ত এই বইখানির মধ্যে আ কি যে দেখিলাম তাহা বলিবার কোন ইচ্ছাই আমার হইল না আমি স্পষ্টই অনুভব করিলাম যে আমাদের সাহিত্যের যে বিশ্ববন্দর টিতে বিদেশের ভাবসম্পদ্ বহন করিয়া বাণিজ্যতরী-সকল আসি লাগিতেছে, এবং এদেশের যুগসঞ্চিত পণ্যসকল আহরণ করি যেখানে বড় বড় মহাজন লেনাদেনা করিতেছেন, মূল্য যাচাই করিতে ছেন—ইনি সেই বন্দরটিতে বাস করেন, ইনি সেই বড় মহাজনদে মধ্যে একজন। ইনি বিদেশের ভাবের পণ্যকে অজস্র গ্রহণ করিয়া ছেন, অথচ মূঢ়ের মত গ্রহণ করেন নাই,—দর যাচাই করিয়া লইয়া ছেন। ইনি শুধু গ্রহণ করেন নাই, ইনি ভাবের পরিবর্ত্তে ভাব আনিয়াছেন। ইঁহার জোর আছে—ইনি স্বাধীন ভাবেই গ্রহ করিয়াছেন এবং স্বাধীন ভাবেই বর্জ্জন করিয়াছেন—পরের জঞ্জালকে ঘাড়ে তুলিয়া লইয়া আপনাকে ভারাক্রান্ত করেন নাই। সুতরা ইঁহার সঙ্গে কোন্ ভাবের কি মূল্য তাহা লইয়া যদি ঝগড়াও করি তবে তাহাতেও আনন্দ আছে।

এই গ্রন্থে ১১টি প্রবন্ধ আছে এবং গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছে যে প্রবন্ধগুলি গত বিশ বৎসরের মধ্যে লিখিত হইয়াছে। তথা এই প্রবন্ধগুলি এমনি একটি বিশেষ ভাবের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত ে ইহাদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা অসম্ভব। এই গ্র কেবল মাত্র একটি প্রবন্ধ আমার চোখে পড়িয়াছে যাহা এই সূত্রে মধ্যে ধরা দেয় নাই—যাহা বাস্তবিকই স্বতন্ত্র। সেই প্রবন্ধটির না "প্রকৃতি-পূজা"।

পাঠকগণ এইবার আমাকে প্রশ্ন করিবেন—সেই ঐক্যসূত্রটি কি কিন্তু আমি দুএক কথায় তাহার জবাব দিতে চাহি না। কারণ ে সূত্রটি বজ্রসূত্রের মত। তাহা প্রাচ্য সভ্যতার সহিত প্রতী সভ্যতার প্রবল সংঘাত ও সংঘর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে। এই দু বিরুদ্ধ সভ্যতার বিরুদ্ধ আদর্শের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে তাহার জ বলিয়া তাহা এমনি কঠিন যে হঠাৎ কোন যুক্তির শাণিত অস্ত্রের দ্বার তাহাকে ছিন্ন করিবার কল্পনাও মনে আনা সম্ভাবনীয় নহে। তা নিজের দেশের শাস্ত্র সমাজ সমস্তকেই এমন বাঁধনে বাঁধিয়াছে, যে কোথাও অঙ্গুলির সাহায্যে গ্রন্থি ধরিবার মত সূক্ষ্ম রন্ধ্রটুকু মাত্র রা নাই। সমস্ত পুস্তকটির পাতায় পাতায় সেই কঠিন গ্রন্থির উপ হাত পড়ে।

এই কঠিনতা যতই বিস্ময়কর হোক্, ইহাকে জীবনের পরিচায় বলিয়া মনে করিতে পারি না। পৃথিবীতে মৃত্যুই কঠিন, জড়ই কঠি —কিন্তু জীবন কোন এক জায়গায় বাঁধা পড়িতে চাহে না বলিয়াই তাহাকে অবিরত চলিতে হয় বলিয়াই, বিধাতা তাহাকে কঠি করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। যে আদর্শ জীবনের আদর্শ, তাহার পরিচয় লক্ষণ জীবনের মতই হওয়া উচিত। তাহার মধ্যে যে টুকু স্থিতি কথা আছে, সেটুকু গতিকে ছন্দিত করিবার জন্য, গতিকে ব্যাহত করিবার জন্য নহে। পাষাণ কঠিন পর্ব্বত যেমনি উত্তুঙ্গ হোক্ ন নদীপ্লাবনে তাহাকে এক মুহূর্ত্তে দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া দিতে পারে ঠিক্ সেইরূপ স্থিতির আদর্শ, বন্ধনের আদর্শ যতই নিশ্চল, ধ্রুব

শান্তিময় বলিয়া প্রতীয়মান হোক্, জীবনের একটি তরঙ্গ-অঙ্গুষ্ঠের আঘাত সহিবার শক্তি তাহার নাই। মানুষের প্রাণশক্তি যদি এইরূপ অপরাজিত না হইত, তাহা হইলে মানুষের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, মানুষের সমাজ তাহাকে কোন্ কালে জড়পিণ্ডের সঙ্গে সমান করিয়া রাখিয়া দিত।

কিন্তু প্রতিক্রিয়ার মুখে এ-সকল কথা কোন কালেই রুচিরোচন হয় না। নদীর একদিকে যেমন ভাঙে এবং অন্য দিকে চড়া পড়ে, সেইরূপ অধুনা আমাদের সমাজে বাহির হইতে প্রবল আঘাত আসিয়া সমস্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে, তাই আমাদের সমাজ আপনাকে বাঁচাইবার জন্য নদীর গতির মুখেই নিশ্চলতার চড়া বাঁধিবার উপক্রম করিতেছে। তাহাতেও যদি না কুলায়, তবে কৃত্রিম বাঁধ দিয়াও নদীবেগকে রুদ্ধ করিবার প্রস্তাব উঠিবেই। কারণ ভাঙিবার বেগ যত প্রচণ্ড, বাঁধের কঠিনতা ততই সুদৃঢ় না হইলে তাল রক্ষা হইতে পারে না। কিন্তু এই আঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে সত্যের চেহারাটা ক্রমশই অন্তর্ধান করিতে আরম্ভ করে। যে বাস্তব বোধ জীবনের একেবারে মর্ম্মগত জিনিস—জীবন যখন রুদ্ধ হয়, তখন দেখিতে দেখিতে তাহারও বিকার ঘটিতে থাকে।

কেবল যে প্রতিক্রিয়ার তাড়নায় আমরা সত্যকে ঠিক-মত দেখিতে পাইতেছি না আমি তাহা মনে করি না। তাহা একটা বড় কারণ। কিন্তু তাহার চেয়েও বড় কারণ আছে। আমাদের দেশে সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমরা আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র পাই নাই বলিয়া বাস্তবের বোধটা আমাদের একেবারেই ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে। এইজন্য ধর্ম্মে বল, সমাজে বল—যেখানেই আমরা যে কোন তত্ত্বকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করি না কেন, সেখানেই এমন একটা কথা বলিয়া বসি যাহা চূড়ান্ত হইতে পারে, কিন্তু যাহা অস্বাভাবিক, মানবপ্রকৃতিবিরুদ্ধ, অব্যবহার্য্য এবং সর্ব্বতোভাবেই কাল্পনিক। ধর্ম্মব্যাপারে যেমন সমত্ববুদ্ধির কথা—সুখদুঃখকে সমান জ্ঞান করা, সকল ভূতকে সমান জ্ঞান করার উপদেশ। এ যে সমত্ব এ সমস্ত বিশেষত্বকে লোপ করিয়া দেয়, এ ঐক্যতত্ত্বে যথার্থ ভেদের কোন স্থানই নাই। আমি সুখও অনুভব করিব না, আমি দুঃখও অনুভব করিব না—আমি "সুখদুঃখবিনির্ম্মুক্ত" কি একটা অদ্ভুত অবস্থা প্রাপ্ত হইব—ইহা এমনি একটা কাল্পনিক কথা যে রামেন্দ্র বাবুর মত লেখক যখন তাঁহার প্রথম প্রবন্ধেই ইহাকে ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া সেই সঙ্গে লিখিতেছেন "এই মুক্তিবাদ ভারতবর্ষে জনসমাজকে গঠিত, নিয়মিত ও চালিত করিয়াছিল" তখন এই কথাই ভাবি, যে, এ মুক্তিবাদের মধ্যে 'নিয়মিত' করিবার আয়োজন থাকিতে পারে, কিন্তু 'চালিত' করিবার আয়োজন কোথায়? সমস্ত সমান কর বলিলে কোন কথাই বলা হয় না—এই কথাই বলা চলে যে সমস্তই আধ্যাত্মিক পরশপাথরের স্পর্শে রূপান্তরিত কর, সোনা করিয়া দাও। সুখকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়ো না, দুঃখকে একান্ত করিয়া তুলিয়ো না—একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে যদি সব সুখ দুঃখ ধরা দেয়, তবে সমস্ত জীবন এমন একটি আশ্চর্য্য সঙ্গীতের মত হয় যাহার মধ্যে বেসুরাগুলাও সুরের অঙ্গীভূত হইয়া উঠে। সর্ব্বভূতকে সমান দেখ—ইহাও বলিলে বিশেষ কিছুই বলা হয় না। কারণ একটা ফুলও আমার কাছে যেমন মূল্যবান একটা প্রস্তরও সেইরূপ—ইহা বলিলে সমস্ত জিনিসের মূল্যকে একেবারে অস্বীকার করা হয়। এই কথাই বলা উচিত যে একটি অসীম আনন্দের মধ্যে সৌন্দর্য্যের মধ্যে কল্যাণের মধ্যে সত্যের মধ্যে যদি সমস্ত ভেদকে স্থাপন করিয়া দেখিতে পারি, তবেই দেখিব যে অসুন্দরও সুন্দর হইয়া উঠিবে, অকল্যাণ কল্যাণে পরিণত হইবে, অসত্য সত্যে বিলীন হইবে। অর্থাৎ ভেদকে বিলুপ্ত করিয়া যে অভেদ, সে একটা দার্শনিক সংজ্ঞা মাত্র—তাহাকে লইয়া জীবনে কোন ব্যবহার চলে না। ইহার জন্য কোন তর্কের অবতারণার আবশ্যকতা দেখি না—সমত্ববোধই যদি আমাদের দেশের মুক্তিতত্ত্ব হয় তবে সমাজে বিষমত্বের বিষ এমন প্রবল আকারে প্রকাশ পাইল কেমন করিয়া? তত্ত্বে ভেদকে মানিনা কিন্তু ব্যবহারে মানি—এ অসঙ্গতিকে কোন সূক্ষ্ম যুক্তির আবরণে বাঁচাইবার চেষ্টা মাত্র করা হাস্যকর।

ধর্ম্মের প্রসঙ্গে যেমন আমরা পরিমাণবোধ হারাই—আমরা মানবপ্রকৃতিকেই অস্বীকার করিয়া বসি, আমরা এমন কথা বলি যাহা আমাদের সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধ, আমাদের সমস্ত আচরণ যাহার প্রতিবাদী, ঠিক সেইরূপ সমাজের কথা বলিতে গেলেও সেই একই কাণ্ড ঘটে। আমরা বলি, যে-সমাজে "ব্যক্তিজীবন সমাজজীবনের অনুকূল, যেখানে প্রবৃত্তি নিরঙ্কুশ নহে, যেখানে নিবৃত্তি প্রবৃত্তিকে নিয়মিত রাখে" সেই সমাজই সবল এবং তাহারই জয় হয়। কারণ সেখানে "জীবনের পরিধি প্রসার লাভ করে; জীবনের আয়তন বর্দ্ধমান হয়। * * * এবং নিবৃত্তিই ক্রমশঃ প্রবৃত্তিতে পরিণতি লাভ করে।" এ সমস্ত কথাই মানিয়া লইলাম কিন্তু প্রশ্ন এই যে যাহাকে নিবৃত্তি বলা হইতেছে তাহাকে সমস্ত সমাজের মধ্যে জাগাইয়া তুলিবার কি উপায় অবলম্বন করা হইবে? যদি নিয়ম, আচার, অনুষ্ঠান প্রভৃতি বাহ্য ব্যাপারের দ্বারা মানুষকে ধরিয়া বাঁধিয়া নিবৃত্তিমার্গে চালাইবার চেষ্টা করা হয় (আমাদের দেশে যে চেষ্টা এ কাল পর্য্যন্ত অবলম্বিত হইয়া আসিয়াছে), তবে নিবৃত্তির তো প্রবৃত্তি হইয়া উঠিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না—তবে যে নিবৃত্তিসাধনা মানুষকে একেবারে কল বানাইয়া ছাড়িয়া দিবে। আমাদের দেশে কি তাহারি চেহারা অত্যন্ত কদর্য্য-রূপে আমরা ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই না? আমরা মুখে আস্ফালন করিয়া থাকি যে আমাদের মত 'ধর্ম্মপ্রাণ' জাতি পৃথিবীতে নাই, কারণ দেখ—আমাদের স্নান, পান, আহার প্রভৃতি শারীরিক কর্ম্মের মধ্যেও ধর্ম্মকে আমরা স্বীকার করিয়াছি—কত শৌচি, শুদ্ধি, আচমন, কত কি অনুষ্ঠান আমাদের সমস্ত কর্ম্মকে কেবলি ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিয়া কল্যাণের আকর করিয়া তুলিয়াছে—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোথাও কোন জায়গা মাত্র রাখে নাই। কিন্তু এই 'ধর্ম্মপ্রাণতার' মধ্যে প্রাণ কোথায় দেখিতেছি? 'জীবনের পরিধি' এখানে কোথায় 'প্রসার' লাভ করিতেছে? 'জীবনের আয়তন' কোথায় বর্দ্ধমান হইতেছে? প্রাণের মধ্যে তো অন্তহীন পুনরাবৃত্তি নাই—তাহার যে নব নব লীলা—নব নব রূপ। কোথায় আমাদের সমাজে সেই প্রাণের তরঙ্গিত উচ্ছ্বাস যাহা শিল্পে সাহিত্যে দর্শনে বিজ্ঞানে নানা ধারায় নৃত্য করিয়া চলিতেছে? যাহার মধ্যে সব জানা শেষ হইয়া নাই, সব কর্ম্মানুষ্ঠান স্থির হইয়া নাই,—যাহা ক্রমাগতই পরীক্ষা করিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে, আঘাত করিতেছে, ভুল করিতেছে এবং এমনি করিয়া সমাজকে সকল দিক্ হইতে গড়িয়া তুলিতেছে? আমরা আমাদের সমাজে 'ধর্ম্মপ্রাণতার' কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না, যাহা দেখিতে পাই যদি তাহার কোন নামকরণ করিতে হয় তবে তাহাকে 'ধর্ম্মজড়তা' বলাই উচিত। আমাদের মত এমন ধর্ম্মজড় জাতি পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাওয়া দুর্লভ—কারণ আমরা সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে নিয়মের দ্বারা এমনি করিয়া বাঁধিয়াছি যে মানুষের স্বাধীনতা নামক পদার্থকে সেই নিয়মের চাকার তলায় গুঁড়া করিয়া দিয়াছি। মানুষের স্বাধীন প্রবৃত্তি যদি স্বাভাবিক উপায়ে নিবৃত্তিমার্গে উপনীত হয় তবে তাহা সত্য হয়—তবেই তাহাতে প্রাণ আপনাকে

প্রকাশ করে। কিন্তু যদি কৃত্রিম আচারের দ্বারা মানুষকে জবরদস্তি করিয়া নিবৃত্তিসাধন করানো হয় তবে নিবৃত্তিপ্রাণতা ঘুচিয়া গিয়া নিবৃত্তিজড়তাই রাজত্ব করিতে থাকে। মানুষ আর মানুষ থাকে না, সে ইঁট পাথরের সমান হইয়া যায়। সে তখন জড়তাকেই মুক্তি বলিয়া মনে করে, অভ্যাসের পাকে ঘুরিয়া বেড়ানোকেই মস্ত চলা বলিয়া ভ্রম করে।

কিন্তু এ-সকল কথা কি রামেন্দ্র বাবু অস্বীকার করেন? 'আচার' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে আধুনিক কালে আমাদের দেশের সামাজিক আচারগুলি অর্থশূন্য ও অনাবশ্যক। কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে একথাও বলিতেছেন "যে-সকল পুরাতন অনুষ্ঠান আবহমান কাল হইতে সমাজমধ্যে আচরিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের সহিত সমাজশরীরের রক্তমাংসের অস্থিমজ্জার এরূপ একটা সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া নূতন অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন সুবুদ্ধির কাজ বলিয়া বিবেচিত হয় না। পুরাতন মন্দ হইতে পারে, কিন্তু নূতনের ভিতর কি আছে কে জানে? পুরাতনে অর্থ দেখিতে পাইতেছি না; উপযোগিতা দেখিতে পাইতেছি না। ক্ষতি নাই, এতকাল ত একরকমে চলিয়া আসিতেছে, এখনও চলিতে দাও।"

ক্ষতি নাই? আচারপরায়ণতা যে আমাদের বুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে, আমাদের সমস্ত মনুষ্যত্বকে শক্তিকে পঙ্গু করিয়া আমাদিগকে সর্ববিষয়ে দুর্ব্বল করিয়াছে—ইহা কি কোনমতেই অস্বীকার করা চলে? আমাদের যে চতুর্দ্দিকেই বাধার অন্ত নাই, নিষেধের অন্ত নাই। তিথি মানি, নক্ষত্র মানি, হাঁচি মানি, টিকটিকি মানি, মনসা শীতলা ওলাবিবি, সব মানি—কি যে মানি না তাহা তো জানি না। সমুদ্রযাত্রার বিধান শাস্ত্রে আছে কিনা ইহা লইয়া আমাদের দেশে আজিও আলোচনা চলিতেছে। শুদ্ধমাত্র এই ব্যাপারটিই কি কম হাস্যজনক? পৃথিবীতে জন্মিয়াছি, পৃথিবীর সব স্থান দেখিব—ইহার আবার বিধিই বা কি, নিষেধই বা কি? অবশ্য আমরা আরামে মনে করিতে পারি যে আমাদের নিরর্থক আচারগুলির মধ্যেও একটা সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু যাহারা বাহির হইতে দেখে তাহারা আমাদের এই ভয় ও মূঢ়তা দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের কাছে আমরা স্বপ্নচালিত ব্যক্তির মত (Somnambulist) প্রতীয়মান হই—আমরা যে জাগিয়া আছি এ কথা বিশ্বাস করা তাহাদের পক্ষে শক্ত হয়। সুতরাং আচার মানিলে ক্ষতি নাই, এতকাল যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহাকে চলিতে দাও—একথা কখনই মানা চলে না। ক্ষতি সামান্য হয় নাই—আমাদের সমস্ত মনুষ্যত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমাদিগকে কৃত্রিম উপায়ে নিবৃত্তি সাধন করাইতে গিয়া নিরর্থক আচারের বন্ধনে এমনি বাঁধা হইয়াছে যে আমরা বহুযুগ ধরিয়া স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তিকে একেবারে খোয়াইয়া বসিয়াছি। এই 'অচলায়তনে'র বেড়া ভাঙিবার উৎসুক্যকে রামেন্দ্র বাবু 'বহির্মুখ ভাবপ্রবণতা' বলিয়া যতই নিন্দা করুন ইহা ভাঙিয়াছে ভাঙিতেছে এবং ভাঙিবে কারণ ইহা স্বভাবকে, বুদ্ধিকে, বাস্তব জগৎকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া জড় অভ্যাসের কারাগারে মানুষকে চিরকালের মত বন্দী করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাহিরের বিশ্বের আক্রমণকে ঠেকাইবার জন্য ইহা প্রাচীর তুলিয়াছে, ভিতরের স্বভাবের স্বতোচ্ছ্বসিত প্রাণকে আনন্দকে ইহা অবিশ্বাস করিয়াছে, বুদ্ধিকে অভ্যাসের শতপাকের ফাঁসিতে মারিয়া ফেলিয়া অন্ধ সংস্কারের ভয়াবহ শাসনকে অদ্বিতীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। 'নরদেহের অনাবশ্যক বসনভূষণের' সঙ্গে আচারকে তুলনা করিয়া তাহার সমর্থন করা রামেন্দ্র বাবুর ন্যায় সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ লেখকের নিকটে প্রত্যাশিত নহে। অনাবশ্যক ভূষণ যদি প্রাণহন্তা হয়, তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলা আর চলে না, কারণ প্রাণ বাঁচানোটাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

আমি প্রবন্ধারম্ভেই যাহা বলিয়া আসিয়াছি তাহাই আসল কথা—অর্থাৎ আমাদের সমাজের মধ্যে কোন সৃজনী শক্তি নাই বলিয়া, আমরা বড় কর্ম্মক্ষেত্রে সমস্ত জাতি সম্মিলিত হইয়া কিছুই গড়িতেছি না বলিয়া, আমরা সমাজের হইয়া যে ওকালতি করি, তাহা একেবারেই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা হয়। আমরা প্রাচীনের দোহাই দিয়া যে এক আদর্শ সমাজ কল্পনার সাম্‌নে খাড়া করি, বাস্তব সমাজ তাহাকে প্রতিপদেই অপ্রমাণ করিয়া দেয়। আমাদের গতিশক্তিকে যে-সকল কৃত্রিম বাধা অবরুদ্ধ করিয়াছে, আমরা কোন মতেই মানিতে চাই না যে সেগুলি বাধা—কারণ আমরা তো কাজ করি না, কথা কই—সুতরাং বাধা যে বাধা নয় তাহার পরীক্ষা হইবে কি উপায়ে? 'জাতিভেদ' জিনিসটা খুব ভাল, যদি 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' নামক কল্পিত ব্যবস্থার দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান সমাজ বাস্তবিকই চালিত হইত—অর্থাৎ জাতিভেদ যদি সত্য সত্যই বৃত্তিভেদ হইত এবং বৃত্তিভেদের জন্য যদি মনুষ্যত্বের কোন অবমাননা না ঘটিত। কিন্তু কোথায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম—কোথায় বৃত্তিভেদমূলক সমাজ-ব্যবস্থা? আজ যদি হাত পা নাড়িয়া আমাদের দেশের সব লোককে একত্রিত করিয়া দেশের কোন মহৎ কাজ আরম্ভ করিতে হয়—তখন কি তাসের কেল্লার মত এই কল্পিত বন্ধন ভাঙিয়া পড়িবে না? তখন জাতিভেদ সত্ত্বেও আমরা এক জাতি, "এক সনাতন ধর্ম্মানুশাসনই হিন্দুর জাতীয়তাকে সহস্র বিপত্তির মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে" এই মায়াটা দূর হইতে কি এক মুহূর্ত্তও সময় লাগিবে? হিন্দুর জাতীয়তা কোটিকোটি ভারতবাসীকে যে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে, যাহাদের ছায়া মাড়ানো পাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে—জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে তাহাদের আহ্বান করিলে তাহারা এই অপমান এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ভুলিয়া গিয়া "অযোধ্যা মথুরা মায়া হইতে কাশী কাঞ্চী অবন্তিক পর্য্যন্ত, পুরী হইতে দ্বারাবতী পর্য্যন্ত সর্ব্ব দেশ" হইতে ছুটিয়া আসিবে, কারণ এখন মূঢ়তাবশত পুণ্যলোভে ঐ সকল তীর্থ স্থানে তাহারা ছুটিয়া যায়? এ-সকল কল্পনা করিয়া খুব আরাম আছে—কিন্তু আমাদের এখন আপনাদের ভুলাইবার আর সময় নাই; অনেক দিন পর্য্যন্ত সে কাজ আমরা করিয়া আসিয়াছি। আমরা যে কি প্রকারের 'জাতীয়তা' গড়িয়া তুলিয়াছি, তাহা আজ বিশ্ব জগতের সকলেই দেখিতেছে। আমাদের "সেই প্রবল জাতীয়ত্ব কোন বাহ্য শক্তির নিকট অদ্যাপি সঙ্কুচিত বা পরাভূত হয় নাই" ইহা ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিলেও স্বীকার করিব না কারণ সঙ্কোচ এবং পরাভব আমাদের যুগযুগ ধরিয়া ঘটিয়াছে। আমরা জাতি রক্ষা করিয়াছি বলিয়াই জাতীয়তা রক্ষা করিয়াছি ইহা সত্য নহে। আমাদের দেশ যখন এক সময়ে সভ্যতার উন্নততম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তখন আমাদের সমাজ এমন জাতিবিচ্ছিন্ন আচারবন্ধনে আবদ্ধ জড় সমাজ ছিল না। মহাভারত পড়িলেই আমরা বেশ দেখিতে পাই যে সমাজের মধ্যে তখন নানা বিচিত্র এবং বিরুদ্ধ শক্তির আঘাত প্রতিঘাত চলিতেছিল, নানা প্রথা ও অনুষ্ঠানের তরঙ্গে সমাজ তরঙ্গিত গতিবেগ লাভ করিয়াছিল—সমস্ত একেবারে চিরকালের মত সংহিতার শিলমোহরের ছাপ লাভ করিয়া স্থির হইয়া যায় নাই। তখনই আমাদের 'জাতীয়তা' প্রকৃত ছিল। কিন্তু আমরা এক সময়ে অনার্য্যজাতি ও বৈদেশিক জাতিদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া অত্যন্ত একটা বিশিষ্টতাহীন একাকারত্বের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়া,

ওরাওঁদের মাছধরা।

তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমাদিগকে চিরকালের মত এক জায়গায় বাঁধিয়া রাখিবার আয়োজন হইয়াছিল। সেই দিনই আমাদের 'জাতীয়তার' ঐক্য জাতিভেদের দ্বারা শতধা বিচ্ছিন্ন খণ্ড বিখণ্ড হইয়া বিনষ্ট হইয়া গেল। এখন আমাদিগকে যদি পুনরায় 'জাতীয়তা' গড়িয়া তুলিতে হয়, তবে শুদ্ধ মাত্র হিন্দু উপকরণে গড়া সম্ভবপর হইবে না—সমস্ত ভারতবর্ষের সমস্ত জাতিকে এক ঐক্যসূত্রে বাঁধিতে হইবে, ভারতবর্ষের জাতীয় মন্দির নানা জাতির নানা মালমসল্লার সাহায্যে গাঁথিতে হইবে। কারণ যে ভেদের উপরে জাতিতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সেই ভেদই যে 'জাতীয়তার' প্রাণ সংহারক সেই ভেদ দূর করিতে হইলে ভিত্তিকে প্রশস্ততর করিতেই হইবে। এ কথা যতদিন পর্য্যন্ত স্বাদেশিক সংস্কারে বদ্ধ থাকিয়া অস্বীকার করিব, ততদিন আঘাতের পর আঘাত, বিনাশের পর বিনাশ, আমাদের দেশের ভাগ্যে চির বর্ত্তমান।

রামেন্দ্র বাবু তাঁহার সমস্ত গ্রন্থে স্থিতিশীল দলের বিচারের মানদণ্ডের দ্বারা তাঁহার সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলির বিচার করিয়াছেন। তিনি নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ইহা স্বীকার্য্য, কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী গতিশীল পক্ষকে বরাবরই তিনি প্রতিপক্ষেরই ন্যায় গণ্য করিয়াছেন। তাঁহার বিচারের সহিত আমাদের বিচারের পার্থক্য কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইলাম বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাঁহার তরফের কথা যে জোরের সহিত এবং যথেষ্ট নৈপুণ্যের সহিত বলিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন নাই। আমাদের দেশে সচরাচর যে-সকল লোক স্থিতিশীলতার পক্ষ হইয়া সামাজিক প্রশ্নের আলোচনা করিয়া থাকে, তাহাদের অনেকের নাম পাঠকেরা অবগত আছেন এবং তাহাদের প্রলাপবাণী যে অনেক সময়ে কিরূপ হাস্যকর এবং সময়ে সময়ে কিরূপ বিরক্তিকর তাহাও তাঁহাদের অবিদিত নাই। সেই-সকল লেখকের নামের সহিত রামেন্দ্র বাবুর নামোচ্চারণ করাও বিগর্হিত। তিনি যে মতই প্রচার করুন্—সাহিত্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, তাঁহার ন্যায় মনস্বী প্রবন্ধ-লেখক আমাদের দেশে দুএকজন ব্যতীত আর কেহই নাই। মতামতের উপর সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষের নির্ভর নাই। যিনি যে-মতই প্রচার করুন, যাহাই বলুন, যদি তাহার রচনায় আগাগোড়া একটি যুক্তির সুসঙ্গতি থাকে, ভাবপ্রকাশের সংযত ও নিপুণ সৌন্দর্য্য থাকে, ভাষা ভাবকে কোথাও আচ্ছন্ন না করিয়া তাহাকে সম্যক্ ব্যক্ত করিতে পারে এবং গতি দান করিতে পারে, তবেই রচনা সাহিত্য হিসাবে উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে। রামেন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থখানি আমাদের সাহিত্যের সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

ওরাওঁ যুবকদের জীবন-যাত্রা

আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধের নায়ক মঙরা ওরাওঁকে ধুমকুড়িয়ার জীবন সম্বন্ধে তাহার কি অভিজ্ঞতা জিজ্ঞাসা করাতে সে নিম্নলিখিত বিবরণটি দিয়াছিল।

বাড়ী।

আমি বলিয়াছি ধুমকুড়িয়া একটি সাদাসিধা ধরণের বাড়ী—তাহাতে সাধারণতঃ চারিটি মাটির দেওয়াল এবং

ওরাওঁ বালক পাখী ধরিবার জন্য আঠা-কাঠি পুঁতিতেছে।

চ্যাটাইয়ের উপর নিদ্রা যায়, কখনো কখনো খড়ের আঁটি বালিসের কাজ করে। শীতের রাত্রে ঘরের এক প্রান্তে কাঠ জ্বালাইয়া রাখা হয়। সাধারণত বাড়ীর অভ্যন্তর মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলেও, বহিঃপ্রদেশ অতিমাত্রায় নোঙরা ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকে। দালানের লাগালাগি (কোনো কোনো গ্রামে ঘরের অভ্যন্তরেই) একটি দুর্গন্ধ নর্দ্দামা থাকে। উহা কখনো পরিষ্কৃত হয় না। উহার মধ্যে ধুমকুড়িয়ার বালকেরা প্রস্রাব করে।

অন্যান্য গ্রামে এই উদ্দেশ্যে ঘরের মধ্যে একটি মৃৎপাত্র রক্ষিত হয়। প্রতিদিন প্রাতে ছোট ছেলেরা উহার মধ্যস্থিত জলীয় পদার্থ বাহিরে ফেলিয়া দ্যায়। কোনো কোনো গ্রামে এই মনুষ্যমূত্র গৃহপালিত পশুর আহার্য্যের সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়—তাহাতে না কি পশুগুলির শক্তি ও তেজ বৃদ্ধি হয়।

ওরাওঁ সঙ্গীতযন্ত্র।—ছবির বাঁ দিক হইতে যন্ত্রগুলির নাম যথাক্রমে—সাইকো, তুহিলা, মাদল, থেচকা, মুরলী।

একটি দরজা থাকে; জানালা থাকে না। বাড়ীগুলি, হয় টালির চাল, নয় বুনো ঘাস দিয়া ছাওয়া। বাড়ীর মধ্যে একটি বিস্তৃত ঘর, উহার মধ্যে বালকেরা তালপাতার

ওরাওঁএর যুদ্ধ সজ্জা।
আসুরিক বিবাহের নকল অভিনয়ে এখন পরা হয়।

ধুমকুড়িয়ার ধাঙড়দিগের বয়স।

প্রায় বারোবৎসর বয়সে ওরাওঁ-বালক ধুমকুড়িয়ায় বাস করিবার অধিকার পায়। শুনা যায় পূর্ব্বকালে ভর্ত্তি হইবার বয়স আরো বেশী ছিল কিন্তু ইদানীং সম্ভবত স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীগণের দৃষ্টান্তে ওরাওঁ বালকবালিকার বিবাহের বয়স কমিয়া যাওয়াতে তদনুসারে ধুমকুড়িয়ায় ভর্ত্তি হইবার বয়সও কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ধাঙড়ের শ্রেণী।

ধুমকুড়িয়ার বালকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) পুনা জোখার বা নিম্নতমশ্রেণীর ধাঙড় শিক্ষানবীশ (২) মাঝতুড়িয়া জোখার বা মধ্যম শ্রেণীর সভ্য। ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর ধাঙড়। (৩) কোহা জোখার বা প্রাচীনতম ধাঙড়, ইহারা তৃতীয় বা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রথম দুই শ্রেণীর ধাঙড়েরা তিন বৎসর ধুমকুড়িয়ার সভ্য থাকিতে পারে কিন্তু তৃতীয় বা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ধাঙড়েরা তাহাদের বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত সভ্য থাকিতে পারে। কিন্তু আজকাল সাধারণত ওরাওঁ বালকেরা অতি অল্পবয়সে বিবাহিত হয় বলিয়া প্রায়শই তাহারা দুইএকটি সন্তানের পিতা হওয়া পর্য্যন্ত সভ্যশ্রেণীভুক্ত থাকে। সেই জন্য ধুমকুড়িয়ার মধ্যে বারো বৎসরের বালক হইতে বিশ বৎসরেরও অধিক বয়স্ক যুবক দেখা যায়।

(৩) আমোদপ্রমোদ।

মাছধরা, শীকার করা, পাখীধরা, নৃত্য ও যন্ত্রবাদন—এইগুলিই ধুমকুড়িয়ার বালকদের প্রধান আমোদ। অন্যান্য অধিকাংশ আমোদপ্রমোদ এত অশ্লীল যে সেগুলির উল্লেখ করা যায় না। ওরাওঁ বালকদের নিরীহ আমোদগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

মাছধরা।

মাছ আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মায় না, সে জন্য ইহা আমাদের একটি প্রধান খাদ্যসামগ্রী হইয়া উঠে নাই; কাজেই মাছধরা আমাদের বালকদের ক্রীড়ামাত্র, ব্যবসায় নহে। আমাদের ছয় প্রকারেরও অধিক মাছধরা জাল, ঝুড়ি ও ফাঁদ আছে। এগুলি হয় বাঁশ নয় তুলার সূতা দিয়া নির্ম্মিত। কতকগুলি ফাঁদের আকারের, আবার কতকগুলি জালের মত। বুনো ঘাস দিয়া তৈরি মাছধরা ফাঁদও ব্যবহৃত হয়। বাল্যকালে আমরা কখনো কখনো প্রাতরাশের পর পাঁচ ছয় জন করিয়া দলে দলে মাছধরা ফাঁদ ও জাল লইয়া কোনো নদী, পুকুর বা জলাশয় গিয়া উপস্থিত হইতাম এবং মাছ ধরিয়া, সাঁতার কাটিয়া, ডুব দিয়া, পরস্পরের গায়ে কাদা ও জল ছিটাইয়া সমস্ত দিন কাটাইয়া দিতাম।
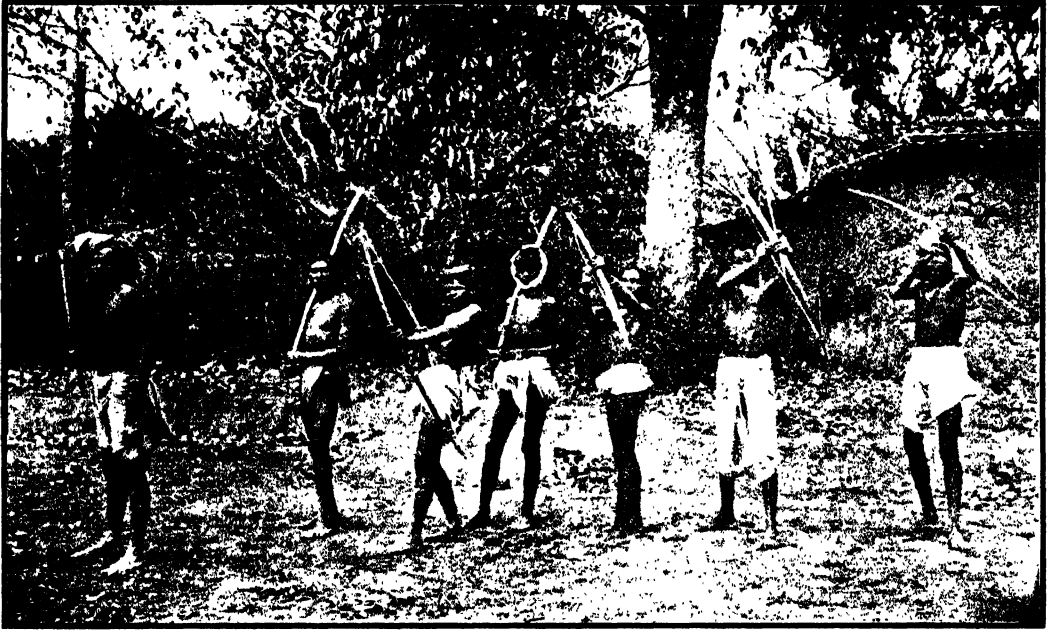
ওরাওঁ শিকারী।—ধনুকগুলির কতক গুলতি, বাঁটুল ছুড়িবার; কতক তীর ছুড়িবার।

পাখীধরা।

মাছধরার ন্যায় পাখীধরাও আমাদের ছেলেদের ক্রীড়াবিশেষ, ব্যবসায় নহে। বাখারির গায়ে আঠা লাগাইয়া, কয়েকটি বাখারি খানিকটা জায়গা ঘেরিয়া পোতা হয়। মাঝখানে একটি ইঁদুরকে একখণ্ড ছোট বাঁশে ল্যাজ বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়। ইঁদুরের লোভে পাখীরা যেই উড়িয়া আসে অমনি তাহাদের ডানা বাখারির আঠায় আটকাইয়া গিয়া তাহারা ধরা পড়িয়া যায়।

সঙ্গীত।

সকল প্রকার আমোদপ্রমোদের মধ্যে ওরাওঁ বালকেরা নাচ গান এবং যন্ত্রবাদনই বেশী ভালবাসে। আমাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে লোহার নাগেরা বা বড় ঢাক, মৃণ্ময় মাদল বা ছোট ঢাক এবং বাঁশের মুরলী বা বাঁশি বহির্জগতে পরিচিত, কিন্তু আমাদের আরো কতকগুলি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র আছে। সেগুলির ব্যবহার ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। তাহাদের বিষয় বাহিরের লোক অতি অল্পই জানে; যেমন আমাদে থেচকা বা কাঠের করতাল; মনে হয় আপনাদে কাঁশার করতাল ইহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। আমা দের আর একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম সাঁইকো—সে আপনাদের মত সভ্য লোকদের বিস্ময় উৎপাদন করিবে একটি বড় লোহার আংটায় ছোট ছোট লোহার আং গলানো, হাত দিয়া ইতস্তত নাড়াইলে বেশ মি আওয়াজ হয়, আপনারা তাহাকে হয়ত ঝিন্ ঝিন্ শ বলিবেন। প্রত্যেক হাতে এক-একখানি সাঁইকে লইয়া একই সময়ে বাজানো হয়।

পাইকি নৃত্য।

আমাদের সকল নাচের মধ্যে পাইকি নাচই বাহি রের লোকের ভালো লাগিবে। কেবলমাত্র বিবাহে মিছিলেই এই নাচ দেখা যায়। দুইটি বা তাহার অধি সংখ্যক বালককে আমাদের প্রাচীন যোদ্ধার সাজে সজ্জি করা হয়—হাতে ঢাল ও তরবারি এবং মাথায় কাপড়ে শিরস্ত্রাণ। মিছিলের সর্ব্বাগ্রে তাহারা চলে। বরযাত্রী

দল যখন কন্যার গ্রামের প্রান্তে আসিয়া উপনীত হয়, তখন কন্যাপক্ষীয়ের দলও মিছিল করিয়া সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং দুই দলের পাইকিদের মধ্যে নকল যুদ্ধ বাধিয়া যায়। আজকাল এই প্রথাও লোপ পাইতে বসিয়াছে! শুনা যায় পুরাকালে কন্যাকে তাহার পিতার গ্রাম হইতে সত্যসত্যই এইরূপে দখল করিয়া কাড়িয়া আনিতে হইত—এই প্রথাকে আপনাদের মত বিদ্বান লোক বোধ হয় আসুরিক বিবাহ বলিবেন?

ওরাওঁদের অভিবাদনপদ্ধতি।

সামাজিক রীতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠান শিক্ষা।

সামাজিক ও নৈতিক কর্ত্তব্য বলিতে আমার অশিক্ষিত দেশবাসী যাহা বোঝে ধুমকুড়িয়াতে সে বিষয়ে কিছু পরিমাণ শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষার একটি অঙ্গ হইতেছে বয়ঃজ্যেষ্ঠ, সমবয়স্ক ও কনিষ্ঠদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহারই শিক্ষা। সমবয়স্ককে অভিবাদন করিতে হইলে উভয়েই বাম হাতের তালু দক্ষিণ হাতের কনুইয়ের নীচে রাখিয়া নত হইবে এবং সেই ভঙ্গীতে দক্ষিণ হাতের আঙুল দিয়া কপাল স্পর্শ করিবে। বয়ঃজ্যেষ্ঠকে অভিবাদন করিবার সময় সেই একই প্রকার নিয়ম, কেবল বয়সে বা সম্বন্ধে যে ছোট সে খুব নত হয়; বয়ঃজ্যেষ্ঠ প্রায় সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

চণ্ডী-পূজা।

শীকারে সাফল্যলাভ এবং মানুষ ও গৃহপালিত পশুর ব্যাধি দেশ হইতে তাড়াইবার জন্য যে-সব ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন, ধুমকুড়িয়ায় যুবকগণকে সে-সকলই শিখান হয়। অবিবাহিত ওরাওঁ যুবকেরা বিশেষ করিয়া যুদ্ধ ও শীকারের দেবী চণ্ডীকে পূজা করে। ধুমকুড়িয়ার অবিবাহিত একটি যুবক পুরোহিতপদে বৃত হয়। মুক্ত উচ্চভূমির উপর চণ্ডীপ্রস্তর রক্ষিত। মধ্যে মধ্যে মধ্যরাত্রে পুরোহিত সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া সেখানে গিয়া পাথরের উপর জল ঢালিয়া চণ্ডীর প্রীতিসম্পাদন করে।

ব্যাধি-বিতাড়ন।

যে দুষ্টাত্মা গৃহপালিত পশুর পীড়া জন্মায় তাহাকে তাড়াইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে মধ্যরাত্রে ধুমকুড়িয়ার বালক ও যুবকেরা দল বাঁধিয়া লাঠি হাতে লইয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় বাহির হইয়া পড়ে। গ্রামের রাখাল কাষ্ঠনির্ম্মিত গরুর ঘণ্টা গলায় পরিয়া আগে আগে দৌড়াইয়া যায়, (এই ঘণ্টাটিকে ব্যাধির ভূত বলিয়া মনে করা হয়) এবং পশ্চাতে উলঙ্গ যুবকের দল তাহাকে তাড়া করিয়া ছোটে। প্রত্যেক পরিবার তাহাদের বাড়ীর সামনে দুই একটা মৃৎপাত্র রাখিয়া দ্যায়, যুবকেরা ছল করিয়া রাখালকে তাড়া দিবার সময় লাঠি দিয়া সেগুলি ভাঙিতে ভাঙিতে গরুর মত 'হাম্বা' 'হাম্বা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটে। এই সময়ে গ্রামের অন্যান্য সকলে টু-শব্দ করিতে পারে না। কেহ বাড়ীর বাহির হইতেও পারে না। আহির বা রাখাল নিজ গ্রামের সীমানা ছাড়াইয়া গিয়া ঘণ্টাটি ফেলিয়া চলিয়া আসে। তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী যুবকেরাও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের লাঠিগুলি

ওরাওঁ যুবকেরা গ্রাম হইতে ব্যাধির ভূত তাড়াইতেছে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে উহারা উলঙ্গ হইয়া এই অনুষ্ঠান করে; ভদ্রতার খাতিরে কাপড় পরাইয়া ফটো লওয়া হইয়াছে।

ফেলিয়া দ্যায় এবং একটি মুর্গির বাচ্ছার কপালে সিঁদুর লাগাইয়া ব্যাধির ভূতকে সেটি ঘুস দ্যায়। এরূপ করিলে ব্যাধির ভূত আর গ্রামে ফিরিয়া আসিবে না এইরূপ বিশ্বাস।

রাঁচি। শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

অবিমারক

মহাকবি ভাস-বিরচিত নাটক

[পূর্ব্বকথার বস্তুসংক্ষেপ—কুন্তিভোজ রাজার কন্যা কুরঙ্গী উদ্যান-ভ্রমণে গিয়া মত্তহস্তীর দ্বারা আক্রান্ত হন। অন্ত্যজ জাতি বলিয়া পরিচিত অবিমারক নামক এক যুবক রাজকুমারীকে রক্ষা করেন। প্রথম দর্শনেই উভয়ের মনে প্রণয়সঞ্চার হয়।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

বিদূষক

আঃ পোড়াকপাল! কৃষ্ণের জীবের কখন যে কি অদৃষ্টে থাকে তা বলা যায় না। অবিমারক ভায়া এদিকে ত ঋষির শাপে অন্ত্যজ রূপে প্রবাসে পড়ে' আছেন, কিন্তু কুন্তিভোজকন্যা কুরঙ্গীকে যেই দেখা অমনি একেবারে অজ্ঞান—নিজের ছদ্ম অবস্থা ধরা পড়ে যাবে, কি বাপ মা কি বলবে, সে দিকে হুঁসই নেই, একেবারে ছুটে গিয়ে লাগিয়ে দিলে হাতীর সঙ্গে হাতাহাতি! সেই দিন থেকে লোকটা একেবারে বিগড়ে গেল গা! আমার সঙ্গে পর্য্যন্ত একটু কথা বলে না, সদাসর্ব্বদা চিন্তার নেশায় একেবারে বুঁদ হয়ে রয়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ! লোকে যে বলে যে আপদ একলা আসে না, তা বড় মিথ্যে নয়। রাজার মেয়েও স্বয়ং একটা অন্ত্যজ লোকের খোঁজ নিচ্ছে! আর আমিও কিনা ব্রাহ্মণত্বের অপবাদ অগ্রাহ্য করে' সেই অন্ত্যজটার সন্ধানে তার বাড়ীতে চলেছি!

দাসী (প্রবেশ করিয়া)

রাজবাড়ীতে হুলস্থূল বেধে গেছে, কাজকর্ম্ম কিছু নেই, তাই একটু নগর দেখতে বেরিয়ে পড়েছি। (অগ্রসর হইয়া) ঐ যে সন্তুষ্ট ঠাকুর যাচ্ছে। লোকটা ভারী আমুদে কিন্তু। ওর সঙ্গে একটু রঙ্গ করা যাক।......(অগ্রসর হইয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া) ওলো কৌমুদিকে!

বামুন খুঁজে পেলি না?.........কি বলছিস? পাস নি?......

বিদূষক

চন্দ্রিকে! ব্যাপার কি?

দাসী

ঠাকুর, একজন বামুন খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বিদূষক

ব্রাহ্মণ নিয়ে তোর কি কাজ?

দাসী

বামুনের আবার কাজ কি? নেমন্তন্ন খাওয়া!

বিদূষক

বটে? আমায় বুঝি চোখে সুঝ্‌ছে না? আমি বুঝি ব্রাহ্মণ নই, বৌদ্ধ শ্রমণ নাকি আমি?

দাসী

তুমি ত ঠাকুর মুখ্‌খু অবৈদিক!

বিদূষক

কী! আমি মুখ্‌খু অবৈদিক; তবে দেখ আমার বিদ্যের দৌড়—রামায়ণ নামে একখানা নাটক আছে, সম্বৎসরে তার পাঁচপাঁচটা শ্লোক আমি পড়েছি! বুঝলি?

দাসী

বুঝেছি ঠাকুর খুব বুঝেছি! ঠাকুরের কি যে বুদ্ধি!

বিদূষক

শুধু শ্লোক নয়, তার মানেও আমি জানি। আরো আছে। পড়তেও পারে অর্থও বোঝে আমার মতন এমন ব্রাহ্মণ তুই আজকালকার দিনে কজন পাবি?

দাসী

আচ্ছা, দেখি তোমার বিদ্যে, পড় ত কি লেখা আছে?

(শীল-আংটি বাহির করিল)

বিদূষক

(স্বগত) বিপদে ফেল্লে দেখছি! পড়তে ত জানি অষ্টরম্ভা! এ-কে এখন বলি কি? (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা মতলব ঠাওরেছি! (প্রকাশ্যে) চন্দ্রিকে! ও রকম অক্ষর আমার পুঁথিতে নেই ত!

দাসী

পড়তে যদি না জান তবে ভোজনদক্ষিণা পাবে না—শুধু ফলার।

বিদূষক

তাই সই চন্দ্রিকে তাই সই।

দাসী

ঠাকুর তোমার আংটি দেখি।

বিদূষক

দেখ দেখ, দেখবে বৈ কি, এ আমার দেখবার মতন জিনিস।

দাসী (আংটি লইয়া)

ঠাকুর ঠাকুর তোমাদের ছোট কর্ত্তা এই দিকে আসছেন!

বিদূষক (মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে দেখিতে দেখিতে)

কই কই কোথায় সে?

দাসী

বোকা বামুনকে খুব ঠকিয়েছি। এই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে' চৌমাথায় গিয়ে বামুনকে ভোগা দিয়ে ভাগতে হবে। (দৌড়)

বিদূষক (চারিদিকে চাহিতে চাহিতে)

চন্দ্রিকে! ও চন্দ্রিকে! কোথায় রে চন্দ্রিকে কোথায়! আ আমার পোড়াকপাল! আমায় ডাহা ঠকিয়ে গেল। গাঁটকাটা মাগীর নেমন্তন্নর কথায় আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। ভোজনের ভুজংভাজং দেখিয়ে আংটি নিয়ে চম্পট। (অগ্রসর হইতে হইতে) ভোজের কথাটাও মিছে বোধ হয়। (সম্মুখে দেখিয়া) ঐ যে ঐ দৌড়ে পালাচ্ছে। থাম থাম থাম রে ওরে অধম্মিষ্ঠে পাপীয়সী দাসী। দাঁড়া দাঁড়া! ওরে অত ছুটছিস কেন? আমাকেও দৌড় করালে দেখ্‌ছি। কিন্তু স্বপ্নে হাতীর তাড়া খেয়ে দৌড়ানোর মতন আমার পা দুটো লটপট করে' সেই একই জায়গায় পড়ছে! হায় হায়! দাসী মাগীর বৃত্তান্ত বন্ধু অবিমারকের কাছে নালিশ করতে হবে!

(প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

(অবিমারক উপবিষ্ট)

অবিমারক

হাতীর শুঁড়ের শীকর লেগে শীতলদেহ সেই যে বালা
ভয়ে ডাগর বিষাদ-কাতর চক্ষু দুটি সমুজ্জ্বলা

স্বপ্নে আমার চিত্তে জাগে ; জাগলে শুধুই স্মৃতিগত,
জাতিস্মরের পূর্বজনম-ছায়াটুকুর আভাস-মতো।

হায়, প্রেমের কি প্রভাব !

সে দিন হতে দৃষ্টিতে আর কোনো রূপই রুচ্‌ছে না,
ক্ষণে ক্ষুণ্ণ ক্ষণে হৃষ্ট মনের দ্বিধা ঘুচ্‌ছে না।
বদন আমার পাণ্ডুবরণ, শরীর হল আধ খানা,
দিনটা কাটে কেঁদে কেটে, রাতটা দুখের একটানা।

কিন্তু পুরুষের অধৈর্য্য হওয়া মানায় না। (চিন্তা করিয়া) আহা কি তার রূপ! যেমন রূপসী তেমনি সুকুমারী !

যুবতীরূপের নমুনা করিয়া বিধি কি গড়িল এরে,
কিংবা জ্যোৎস্না নারীরূপ ধরি ধরার পৃষ্ঠে ফেরে ?
শ্রী কি স্বয়ং ত্যজি নারায়ণ সাগরে শয়ন-ভয়ে
ধরণীর ধূলি করে কুতূহলী রাজার ঝিয়ারী হয়ে ?

আবার আমি তারই চিন্তা করছি! কি বা করা যায় ? মন যে আর আমার বশে নেই।

যত্নে তাহারে করিলে বারণ বশ তবু নাহি মানে,
অনায়ত্ত সে বিদ্যা যেমন কোথা যায় কেবা জানে।

মনটাকে বশ করা গেল না। তবে তাকেই বসে' ভাবা যাক। সে যেন নারীর সকল গুণের প্রতিমূর্ত্তি। (চিন্তায় অভিভূত)

(ধাত্রী ও নলিনিকার প্রবেশ)

ধাত্রী (চিন্তিত ভাবে)

হায়, কি কঠিন কাজই হাতে নিয়েছি! যদি করি তবে রাজকুল দূষিত হয়। যদি না করি তবে তার ক্লেশ হবে। অনেক রকম ভেবে চিন্তে দেখেছি। তাকে ত আমিই এক রকম ঢেকে ঢুকে আগলে রেখেছি। ঢাকতেই বা পেরেছি কই? সেদিন থেকে তার ফুলে চন্দনে অরুচি হয়েছে, আহার বন্ধ হয়েছে ; সখীদের সঙ্গেও আর আমোদ আহ্লাদ করে না, শুধু হা হুতাশ, দিনরাত দীর্ঘনিশ্বাস, লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে, আপন মনে হাসে, কি যে বলে তার ঠিক নেই ; দিনকের দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে, পাঙাশ বর্ণ হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, এমনতর অবস্থা হলেও সে লজ্জায়, ভয়ে, কুলমানের খাতিরে তার মনের কথা একজনের কাছেও বলে না।

নলিনিকা

কেন বলবে না, আমায় ত সব কথাই বলে।

ধাত্রী

হ্যাঁ লা হ্যাঁ, তোকে যত বলে তা আমার জানা আছে। তুই সমস্ত ব্যাপারটা যাই জানিস তাই ওর অবস্থার সঙ্গে জুড়েতেড়ে মনগড়া একটা কিছু বানিয়ে তুলেছিস।

নলিনিকা

আচ্ছা, যার অত গুণ সে লোক কি কখনো অন্ত্যজ জাতি হতে পারে ?

ধাত্রী

তাই ত সন্দেহ। মহারাণীর কাছে মন্ত্রীরা বল্‌ছিল আমি শুনেছি—সে অন্ত্যজ নয়। কোনো কারণে আপনাকে নীচ জাতি বলে গোপন করে রেখেছে।

নলিনিকা

তবে ও লোকটা কে ?

ধাত্রী

ও যে কোনো সৎবংশের লোক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওর চেয়ে বেশী গুণবান্ জামাতা আর কে হবে ?

নেপথ্যে

কুলহীন জন হতে পারে ধনী, রূপে জ্ঞানে বলে পূর্ণ,
কিন্তু তাহার স্বভাব আচার শুদ্ধির লেশশূন্য।
পাবে নিশ্চয় এর পরিচয় বলিয়া রাখিনু ধ্রুব,
ত্যজি সংশয় কর প্রত্যয় পরিণাম এর শুভ !

ধাত্রী

ওমা! কে এ কথা বল্লে লো!

নলিনিকা

এ তল্লাটে ত কাউকে দেখ্‌ছি না।

ধাত্রী

আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। নিশ্চয় এ দৈববাণী। আমি বুঝতে পারছি, ঐ ছেলেটি মানুষ নয়।

নলিনিকা

তার কুলের সন্দেহ ত কেটে গেল। আমাদের কথা সে রাখবে, না রাখবে না, তাই এখন ভাবনা। ধন্যি বটে সেই দেবতা যে এমন লোককেও ক্ষেপিয়ে তোলে। আমাদের রাজকুমারীকে দেখলে মন্মথর মনও ক্ষেপে

ওঠে, অন্যে পরে কা কথা। তাই সে বেচারাও ক্ষেপে গেছে।

ধাত্রী

ওলো! এই ত তার বাড়ী। সেই হাতী ক্ষেপার দিন কৌতুহলের বশে সঙ্গে সঙ্গে এসে আমি দেখে গিয়েছিলাম।

নলিনিকা

বাঃ! এই দরজার সামনেটি ত দিব্যি সাজানো, দেখবার মতন! চল, আমরা প্রবেশ করি।

ধাত্রী

ওগো, ছোট কর্ত্তা কোথায়? কি বলছ?—চতুঃশালে আছেন? (অগ্রসর হইয়া, দেখিয়া) এই যে আমাদের ছোট কর্ত্তাটি একলা বসে কি ভাবছেন।

নলিনিকা

চল, আমরা কাছে যাই।

ধাত্রী

তাই চল। (নিকটে গিয়া) আর্য্যের সুখ ত?

অবিমারক

আহা! কি সুন্দর তার রূপ!

ধাত্রী (ব্যাকুল ভাবে)

ওমা কি হবে গো! .....আর্য্যের কুশল ত?

অবিমারক

তনুলতা তার অতি সুকুমার
যৌবন-ভার-নতা।

ধাত্রী

আহারে! কি আবোল তাবোল বকছে।

অবিমারক

কমল-বদন নয়ন-লোভন,
অধর বিম্ব যথা।

ধাত্রী

আহা! ধন্য সেই ভাগ্যবতী যার জন্যে এমন লোক পাগল!

অবিমারক

শঙ্কা-কাতর রূপ মনোহর
নয়নপাত্র-পেয়।

ধাত্রী

আহা! স্থির হও, ঠাণ্ডা হও!

অবিমারক

প্রণয়-লীলায় না জানি সে হায়
কেমন অনুপমেয়!

ধাত্রী

নিশ্চয় তার জন্যেই পাগল।

নলিনিকা

ঠিক বলেছ—এও কষ্ট পাচ্ছে।

ধাত্রী

ঠিক ধরেছিস তুই।......আর্য্যের কুশল ত?

অবিমারক (দেখিয়া, লজ্জিত ভাবে)

আসুন, আপনারা আসুন।

উভয়ে

আপনি কুশলে আছেন?

অবিমারক

আপনাদের দর্শনেই কুশল হবে।

ধাত্রী

আর্য্য, কি ভাবছিলেন?

অবিমারক

এই শাস্ত্রের বিষয়।

ধাত্রী

সে এমন রমণীয় কোন্ শাস্ত্র যে বিরলে বসে চিন্তা করছেন?

অবিমারক

সে রমণীয় যোগশাস্ত্র।

ধাত্রী (স্মিতমুখে)

আপনার মঙ্গলবচন সত্য হোক, যোগশাস্ত্রই হোক।

অবিমারক

(স্বগত) এ কথার মানে কি? নিজের মনের অভি-লাষের বশে একে আর ভাবছি হয়ত। (প্রকাশ্যে) আপনাদের কি অভিপ্রায়ে আগমন হয়েছে?

ধাত্রী

যোগের অভিপ্রায়েই আসা হয়েছে। আর্য্য যোগের অভিলাষী, আমাদেরও কার্য্য রাজার অন্তঃপুরের বিজন মন্দিরে। সেখানেও একজন যোগের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে আছে। সেখানে তার সঙ্গে আর্য্যের যোগ হলে যোগশাস্ত্রটার আলাপটা জমবে ভালে।

অবিমারক

আমার ভাগ্যে সুখ তা হলে একেবারে নিঃশেষ হয়ে ফুরিয়ে যায় নি! (আসন হইতে উঠিয়া) আপনারা আমায় পুনর্জীবন দান করলেন। কারণ—

ভয়াকুল দৃষ্টি হতে অতিতীক্ষ্ণ মনোহর বিষ
ক্ষরিয়া পশিয়াছিল দৃষ্টি দিয়ে অন্তরে আমার।
সেই বিষে জরজর ক্ষিপ্তপ্রায় চিত্ত অহর্নিশ,
আপনার বাক্যামৃত পানে এল চেতনা আবার।

ধাত্রী

আমি ত আর্য্যেরই প্রতিপালিত। আজকেই আপনাকে কন্যান্তঃপুরে যেতে হবে। কন্যাপুররক্ষক মন্ত্রী আর্য্য ভূতিককে আমাদের মহারাজ কাশীরাজের দূতের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

অবিমারক

চমৎকার! উত্তম হয়েছে। ঔষধ সেবনের পর কোন্ রোগীর অবস্থা মন্দ থাকে?

ধাত্রী

প্রবেশ করাটাই কঠিন; একবার গিয়ে পড়তে পারলে থাকতে পারা যায় অনেক দিন।

অবিমারক

আমি প্রবেশলাভ করেছি, এই কথা ভাবাই ভালো। আজ প্রাসাদের দ্বারগুলির অর্গল মুক্ত করে রাখবেন।

ধাত্রী

তাই করব, ভিতর থেকে যা করবার তা আমি করে রাখব। আর্য্য, খুব সাহস করে' চলে যাবেন।

অবিমারক

একবার আমাকে রাজবাড়ীর সংস্থানটা বুঝিয়ে দিন ত।

ধাত্রী

এই রকম, এই রকম।

অবিমারক

হায়!—

রাজার পুরীর নক্সার মাঝে
বুদ্ধি আমার অতি অবাধ।
পৌরুষে আর দৈবে লেগেছে
কলজ্জার বিসম্বাদ।

(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, আমাদের এই কার্য্যে প্রত্যয়ের প্রমাণ কি?

ধাত্রী ও নলিনিকা

এই প্রত্যয়ের প্রমাণ (অভিজ্ঞান দান)। ভর্ত্তৃদারকের জয় হোক।

অবিমারক

তোমরা এখন যাও। অর্দ্ধরাত্রে আমার প্রতীক্ষা কোরো।

ধাত্রী ও নলিনিকা

ভর্ত্তৃদারক যেমন আজ্ঞা করেন তাই হবে।

(প্রস্থান)

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক

বাঃ বাঃ নগরের কি শোভা হয়েছে। রাস্তার চুনকাম-করা দোকান-বাড়ীর ছাদের পিছনে সূর্য্যদেব অস্ত যাচ্ছেন, মনে হচ্ছে যেন দইয়ের ডেলার উপর কে গুড়ের ধারা ঢেলে দিচ্ছে। সৌখীন নাগরিকেরা সুন্দর সাজসজ্জা করে লোককে দেখাবার জন্যে নিজের নিজের বাড়ীতে কত লীলায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমি এইসব দেখে সেই পাগলটার সঙ্গে রাত কাটাব বলে নগর থেকে চলে এলাম। আমাদের কপালের দোষে লোকটা কি একটা অনর্থের কথা ভেবে ভেবে একেবারে বিগড়ে গেল গা! এই ত তার বাড়ী। বাজারের চকে জল্পনা শুনে এলাম যে আজ এ বাড়ীতে রাজকুমারীর ধাত্রী আর সখীর শুভাগমন হয়েছিল; এখানে তাঁদের পায়ের ধুলো পড়ল কেন? কে জানে বাবা পুরুষের ভাগ্যের কথা—সে যে হাতীর শুঁড়ের মতো সদাই চঞ্চল! তবে কি আমাদের বিপদ কেটে গেল? যোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে আমরা রাজপুরীতে বাস করব? (গৃহে প্রবেশ করিয়া) হাঃ হা! এই যে ভায়া সৌখীন লোকের চন্দন অনুলেপনের মতো একেবারে পাণ্ডুতা মেখে এইখানেই আসছেন। সুন্দর লোকগুলো যা করে তাই কি ছাই শোভা পায়। (নিকটে গিয়া) জয় হোক মশায়ের!

অবিমারক

বন্ধু, এত দেরী করে নগর থেকে ফিরলে?

বিদূষক

তুমি ত ভাই ফলারের নিমন্ত্রণবঞ্চিত ব্রাহ্মণের মতো দিনরাত্তির মহাচিন্তায় ডুব দিয়েই আছ। আমি সেই অবসরে সমস্ত দিন নগর বেড়িয়ে নিষ্ফল হয়ে রাতের বেলা নিজের লোকটির পাশেই এসে জুটেছি।

অবিমারক

বন্ধু, তোমায় একটা সুখবর দেবো।

বিদূষক

কি ? আমাদের ঋষিশাপ শেষ হল ?

অবিমারক

মূর্খ কোথাকার ! হবেই যা নিশ্চয় জানা আছে তার মধ্যে আবার আনন্দ কি ?

বিদূষক

তবে আবার কি ?

অবিমারক

কুরঙ্গীর ধাত্রী আর সখী নলিনিকা কি তোমার চোখে পড়ে নি ?

বিদূষক

হ্যাঁ হ্যাঁ ! তাদের ত দেখলাম। কি এনেছিল ?

অবিমারক

আমার শোকের ঔষধ।

বিদূষক

দেখি দেখি।

অবিমারক

সময়ে দেখবে পরে। এখন শোন।

বিদূষক

বল বল।

অবিমারক

অল্প কথায় মোট কথা এই—ওরা বলে গেল আজ কন্যান্তঃপুরে যেতে হবে।

বিদূষক (হাস্য করিয়া)

প্রাণটা নিয়ে ভিতরে যাবার কি উপায় ঠাওরেছ ? কুন্তিভোজরাজার মন্ত্রীগুলো বড় বিষম !

অবিমারক

কি ! তোমারও ভয় হচ্ছে !—

একাকী আমি যে সৈন্যের সহ
শত্রু করেছি নাশ,
আজো আর কেহ ভয়ে সন্দেহে
ভিড়ে না আমার পাশ।
মানুষ কি ছার অসুরেশ্বর
যেই 'অবি' নামধারী,
আমি বিখ্যাত অবিমারক
ভুজবলে তারে মারি' !

বিদূষক

জানি জানি তোমার অতিমানুষের তুল্য সমস্ত কর্ম্ম-কীর্ত্তি। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে পরের ঘরে প্রবেশ করা বড় ভয়ের কথা !

অবিমারক

সংক্ষেপে বলছি, যেমন করেই হোক কুন্তিভোজের কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করতেই হবে। মহাব্রাহ্মণের এখন সেটা সমর্থন করতেই হচ্ছে।

বিদূষক

কি ! আমাকে ছেড়ে তুমি যাবে ? আমি তোমাকে এক দণ্ড ছেড়ে কোথাও থাকি ? কেউ আক্রমণ করলেও ত একজনের সাহায্য দরকার হতে পারে।

অবিমারক

ঠাকুর ত শাস্ত্রের ধার ধারেন না। নইলে জানতেন

পরগৃহে গেলে একলাই যাবে,
মন্ত্রণার কালে দুইজন ;
যুদ্ধকর্ম্ম অনেকে মিলিয়া,
এই শাস্ত্রের নির্ব্বচন।

অতএব কুন্তিভোজের কন্যান্তঃপুরে আমার একলাই যেতে হবে। আমাদের জন্যে তোমার ভয় করতে হবে না। কারণ দেখ—

রাজার বাড়ীর দারোয়ানগুলো
দিব্যি আয়েসে আছে,
দাড়ি চুমরায়, ডাল-রুটি খায়,
ঘুমাইতে পেলে বাঁচে !
আমার হাতের বলটাও সখা
নেহাৎ নয় ত কম,
দারোয়ানগুলো এগোবে ভেবেছ
দেখিয়া তাদের যম ?

বিদূষক

যদি এই রকমই ঠিক করে থাক তবে চল এখনই আমরা নগরে প্রবেশ করে থাকি, সেখানে আমার এক বন্ধু আছে, তার বাড়ীতে ততক্ষণ [illegible] করা যাবে।

অবিমারক

বেশ বলেছ। এখন বাড়ীর ভিতরে গিয়ে আহ্নিক করে নিইগে; তারপর মহারাজের অনুমতি নিয়ে শয়ন-গৃহে প্রবেশ করে সেখান থেকে সকলের অজ্ঞাতসারে নগরে চলে যাওয়া যাবে, আর তোমার বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী

ভর্তৃদারকের জয় হোক। স্নানের জল আনা হয়েছে।

অবিমারক

এই আমি এলাম বলে। তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।

দাসী

ভর্তৃদারকের যেমন আজ্ঞা।

(নিষ্ক্রান্ত)

অবিমারক

বন্ধু, সূর্য্যদেব ত অস্ত গেলেন। এখন—

পূর্ব্বের গায় তিমির-প্রলেপ,
পছিমে লালিম-লেখা,
দু-রঙা আকাশ হরগৌরীর
মতন যেতেছে দেখা।

বিদূষক

ঠিক বলেছ। দিবস অবসান, সন্ধ্যা সমাগত।

অবিমারক

আহা! জগতে কি বিচিত্রতা! দেখ—

প্রকৃতি রাণী সে, ললাট হইতে
রবির তিলক মুছি
গলায় পরিল মালায় গাঁথিয়া
তারার রতন-কুচি।
রৌদ্রের জ্বালা ঘুচাইয়া বহে
মৃদুল শীতল বায়,
প্রেমিক লুকায় প্রেয়সীর পাশে,
চোর যত বাহিরায়।
প্রকৃতি রাণীর বেশবিন্যাস
বিলাসী লোকের মতো,
খনে খনে নব তার বৈভব
লীলা-বিভ্রম শত।

(প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুস্তক-পরিচয়

পুষ্পহার

শ্রীঊর্ম্মিলা দেবী প্রণীত। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য কাপড় বাঁধা ১।০ ও কাগজের মলাট ১৲। ডবল ক্রাউন, ষোল পেজী।

পুষ্পহার ছোট গল্পের বই। "আত্মকথা" বা ভূমিকাতে দেখিতে পাইতেছি "পুষ্পহারের" কয়েকটি গল্প ইংরাজী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত; কোনটি বা বহু পূর্ব্বে পঠিত বিদেশী গল্পের ছায়ার উপর রং ফলাইয়া লিখিত হইয়াছে। বাকী কয়টি মৌলিক। কোনটি অনুবাদ নহে।"

পুস্তকটিতে মোট সাতটি গল্প আছে। ইহার মধ্যে অন্ততঃ তিন ("ফরাসী বিপ্লবের চিত্র", "সঞ্চিত ধন" ও "একটি নির্ভীক হৃদয়" যে ইংরেজী গল্পের অবিকল অনুবাদ তাহা যিনিই সেগুলি পাঠ করিবেন তিনিই বিনা আয়াসে বুঝিতে পারিবেন। ঐ তিনটি গল্প বিভিন্ন ইংরেজী মাসিক গল্পের কাগজ হইতে "ছায়াবলম্বনে" কিন্তু "ছায়ার উপর রং ফলাইয়া" নহে,—যদিও ছায়ার উপর রং ফলানো ব্যাপারটি যে কি তাহা আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই—একেবারে কায়াবলম্বনে রচিত। ছায়াতে কি অনুবাদের তীব্র গন্ধ থাকে? "একটি নির্ভীক হৃদয়" গল্পটি ইংরেজী Royal Magazine-এর "A Brave Heart" নামক বহুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত রুসীয় নিহিলিষ্টদিগের একটি গল্পের অনুবাদ। গল্পটির বাংলা নামটিতে পর্য্যন্ত অনুবাদের সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান। "একটি নির্ভীক হৃদয়" কি বাংলা বাক্যরীতি বা Idiom-এর উপর যথেচ্ছাচার নয়?"

মোট সাতটি গল্পের মধ্যে তিনটি তো দেখা গেল ইংরেজীর অবিকল অনুবাদ। বাকী রহিল চারিটি। এখন দেখা যাক এই চারিটির মধ্যে "কোনটি বা বহু পূর্ব্বে পঠিত বিদেশী গল্পের ছায়ার উপর রং ফলাইয়া সম্পূর্ণ নিজের ভাবে ও ভাষায় লিখিত" আর "বাকী কয়টিই" বা "মৌলিক।" আমরা পড়িয়া যতদূর বুঝিতে পারিলাম তাহাতে মনে হইল এই চারিটি গল্পের মধ্যে "অবগুণ্ঠনবতী" ও "একটি চিত্র" এই দুইটি গল্প পাত্র ও পাত্রীর বাংলা নামকরণ করিয়া ইংরেজী হইতে যথাযথভাবে অনূদিত এবং "শিক্ষা" গল্পটি "ছায়াবলম্বনে," অর্থাৎ ইংরেজী গল্পের প্লট লইয়া রচিত। সুতরাং "বাকী কয়টি মৌলিক" গল্পের মধ্যে একটি অর্থাৎ "কল্যাণী" গল্পটি মৌলিকতার দাবী করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় লেখিকা তাঁহার এই একটিমাত্র মৌলিক গল্পতেও ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

মৌলিক গল্পের কথা দূরে থাকুক ইংরেজী গল্পের অনুবাদেও লেখিকার অক্ষমতা পদে পদে প্রকাশ পাইয়াছে। অনুবাদের ভাষা কোনস্থলেই ইংরেজীর ছাপ এড়াইতে পারে নাই। এমন কি লেখিকা স্থানে স্থানে অনুবাদের মধ্যে মারাত্মক ভুল করিয়া বসিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। "স্থানটি বড় জঘন্য, স্থানবাসী সকলেই প্রায় দরিদ্র ও অধিকাংশই অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোক" ("অবগুণ্ঠিতা," ৩০ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি)। স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে লেখিকা এস্থলে Suspicious characters-এর বাংলা করিয়াছেন "সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোক!" কিন্তু আসল অর্থ ঠিক ইহার বিপরীত।

পুষ্পহার সচিত্র। একখানি ত্রিবর্ণে মুদ্রিত ও ছয়খানি একরঙা ছবি আছে। কিন্তু ছবিগুলিতে যেরূপ কলাকুশলতা প্রকাশ পাইয়াছে

"সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে
আম কুড়াবার ধুম।"

শ্রীচারুচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

তাহা দেখিয়া মনে হয় পুস্তকে চিত্র যোজনা না করিলেই ভাল হইত। ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের লোকের অঙ্গে আধুনিক য়ুরোপীয় পোষাক এবং রুষীয় মজুরের পরণে চাঁদনীর কাটা কোট প্যাণ্ট দেখিলে বাস্তবিকই হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। পুস্তকের ছাপা কাগজ মন্দ নহে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে বিদেশী সাহিত্যের উৎকৃষ্ট গল্প বাংলাতে অনুবাদ করা ভালই। তাহাতে আমাদের কথা-সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধিই পায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের বর্ত্তমান কথা-সাহিত্যের এমন কিছু দৈন্যাবস্থা উপস্থিত হয় নাই যে ইংরেজী মাসিক কথা-সাহিত্য-পত্রিকার আবর্জ্জনাস্তূপ দ্বারা তাহাকে অলঙ্কৃত করিতে হইবে। লেখিকা যে-সমস্ত ইংরেজী গল্পের অনুবাদ তাঁহার এই সমালোচ্য পুস্তকখানিতে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদের সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে বাংলা কথা-সাহিত্যে প্রবেশের দাবী বা যোগ্যতা তাহাদের কোনটিরই নাই।

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম।

গীতারসামৃত—

শ্রীনকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও প্রকাশিত, বোয়ালিয়া ত্রিপুরা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২২৭ পৃষ্ঠা। মূল্য দশ আনা মাত্র।

মূল এবং কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ ও মাহাত্ম্য সহ অতি সরল পয়ার ছন্দে রচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। দ্বিতীয় সংস্করণ।

অনিন্দ্যা—

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও পুত্রগণ। মূল্য ছয় আনা।

ইংরেজ কবি টেনিসনের Geraint and Enid গাথা অবলম্বনে এই গল্পটি লিখিত হইয়াছে। গেরাণ্ট (গিরণ) ইংলণ্ডের পৌরাণিক রাজা আর্থারের সভাসদ্ ছিলেন; তিনি বহু দুষ্কর কার্য্য করিয়া এনিডকে (অনিন্দ্যা) বিবাহ করেন। এনিড মহিষীর প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠেন। মহিষীর চরিত্রের সম্বন্ধে কলঙ্ককথার কানাঘুষা শুনিয়া গেরাণ্ট স্ত্রীকে লইয়া রাজসভা ত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া যান; একদিন নিদ্রাভঙ্গের পর স্ত্রীর অসম্পূর্ণ কথা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ হয় এবং তিনি স্ত্রীকে বনবাস দিবার জন্য লইয়া যান। পথে সাধ্বী স্ত্রী হইতে বহু বিপদে উত্তীর্ণ হইয়া গেরাণ্ট এনিডের সতীত্বের মহিমা উপলব্ধি করেন এবং শেষ জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করেন। ইহাই গল্পের কাঠাম।

ইহার রচনা চলনসই। স্ত্রীপাঠ্য হইবার উপযুক্ত।

পঞ্চ মকার—

শ্রীযাত্রামোহন দাস সম্পাদিত, চন্দ্রনাথ সীতাকুণ্ড হইতে শ্রীহর-কিশোর অধিকারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য চার আনা।

ইহাতে পঞ্চমকার সাধনের আধ্যাত্মিক অর্থ শাস্ত্রবচন দ্বারাই বিবৃত করা হইয়াছে।

কর্পূর স্তব—

পাগল প্রণীত। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। মূল্যের উল্লেখ নাই।

কালীর কোন্ বীজমন্ত্র জপ করিলে কি ইষ্টসিদ্ধি হয় তাহাই পদ্যে বিবৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কদর্য্য অশ্লীল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা কদর্য্য কুৎসিত মতলব হাসিল করারও ব্যবস্থা আছে। এই কি ধর্ম্ম? ধর্ম্মে অধর্ম্মে প্রভেদ তবে কোন্ খানে? গোঁড়ামি করিয়া গায়ের জোরে ইহার ওকালতি করা চলে, কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধিতে ও যুক্তিসিদ্ধান্তে ইহা অত্যন্ত হেয়। ইহার রচয়িতা বাস্তবিকই পাগল। কথায় বলে—পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়। পাগল যাহা ইচ্ছা বলুক, রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ যাহা পান তাহাই প্রকাশ করেন কেন তাহাই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। ইহা প্রাচীন হইলেও ত্যাজ্য। কিন্তু রচনা দেখিয়া প্রাচীন মনে হয় না।

শ্রীশ্রীভগবৎ-লীলামৃত—

আদর্শ-গৃহিণী, নীতিকবিতা প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িত্রী প্রণীত, পুরীধাম হইতে শ্রীমতী রত্নমালা দেবী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২১৭ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বৃন্দাবনলীলা, মথুরা-লীলা ও পাণ্ডবদিগের সাহচর্য্যলীলা প্রভৃতি উপাখ্যান-আকারে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থরচয়িত্রী "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কীয় সমস্ত কাহিনীই বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং বিশ্বাসী ব্যক্তি ভিন্ন অপরে ইহা পাঠে আনন্দ পাইবেন না. পদে পদে যুক্তির অভাব দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইবেন।

পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ—

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর প্রণীত। ঢাকা নয়াবাজার হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভদ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১০৪ পৃষ্ঠা। মূল্য বারো আনা।

গৌড়ের পালরাজবংশের অধঃপতনের সময় সেই বংশের কোনো কোনো লোক পূর্ব্ববঙ্গের ভাওয়াল, ধামরাই, সাভার প্রভৃতি আধুনিক কাল পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ স্থানে গিয়া কয়েকটি স্বতন্ত্র খণ্ডরাজ্য স্থাপন করেন। এই পালরাজারা ২০০০ হইতে ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। এই পালরাজগণ গৌড়ের পালরাজগণের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন বলিয়া অনেকের ধারণা; লেখক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন ইহারা গৌররাজগণের অধস্তন পুরুষ, এবং ভুইঞা বা মাহিষ্য ছিলেন না, তাঁহারা ক্ষত্রিয় অর্থাৎ কায়স্থ ছিলেন। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন; এজন্য পূর্ব্ব-বঙ্গের এই অংশে বহু বৌদ্ধ স্তূপ মূর্ত্তি মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষের সহিত হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি, মন্দির প্রভৃতি মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাজাদের প্রাসাদ দুর্গ নগরাদির ভগ্নাবশেষ ও বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী, নক্সাকাটা ইষ্টক, উৎকীর্ণ স্তম্ভ, স্বর্ণমুদ্রা প্রভৃতি কীর্ত্তি-চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদের পরিচয় ঐতিহাসিককে দিতেছে। গ্রন্থকার নিজের চেষ্টায় অনেক তথ্য ও নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া কুড়িখানি মানচিত্র নক্সা ও পুরাকীর্ত্তির স্থান ও দ্রব্য-নমুনার চিত্র দিয়াছেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধানের ন্যায় এই দিকেও একদল কর্ম্মী বাঙালীর যথেষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে; লেখক সকলকে বাংলার এই প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। বইখানি বাঙালীর কীর্ত্তিকাহিনী; প্রত্যেক বাঙালীর পাঠ করিয়া আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিবার মতো অনেক কৌতুককর তথ্য ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা ঐতিহাসিকের উপযুক্ত প্রাঞ্জল ও স্থির ধীর।

জমীদারী শিক্ষা—

শ্রীতারকগোবিন্দ চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

গ্রন্থকার পাবনা জেলার তাতি-বন্দের একজন জমীদার। জমীদার, জমীদারী কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য "জমীদারী শিক্ষা" রচনা করিয়াছেন, দেখিয়া আমরা আগ্রহের সহিত পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি, এবং পাঠান্তে সুখী হইয়াছি। জমীদারী কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য ছোট বড় অনেকগুলি গ্রন্থ আছে; তথাপি তারক বাবু আবার কেন "জমীদারী গ্রন্থের দপ্তর" ভারি করিলেন, সহজেই এই কথাটি মনে আসে; কিন্তু পুস্তকখানি পাঠান্তেই সে প্রশ্নের সমাধান হইয়া যায়, কারণ এই গ্রন্থখানির কিছু বিশেষত্ব আছে, গ্রন্থকার "গণ্ডায় অণ্ডা" মিলাইয়া যান নাই। পুস্তকখানির আকার খুব বড় না হোক্ ইহাতে জমীদারী কার্য্যের জ্ঞাতব্য এবং শিক্ষণীয় অনেক বিষয়ই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

জমীদারী সেরেস্তার কাগজপত্রের বিবরণ; কোন্ কর্ম্মচারীর কি কর্ত্তব্য কার্য্য; সেরেস্তার কাগজপত্র হেপাজাতে রাখিবার বন্দোবস্ত; হিসাব-নিকাশাদির প্রস্তুতপ্রণালী, ও জমীদারী কাজ কর্ম্মের সুবিধার নিমিত্ত নানাবিধ ফরম, দলিলাদির মুশাবিদাও এ গ্রন্থে আছে। জমীদারী কার্য্যে সময় সময় যে-সকল আপদ বিপদ উপস্থিত হওয়া সম্ভব, সে-সব উল্লেখ করিয়া সেজন্য পূর্ব্ব হইতে কি কি উপায়ে সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, সে-সকল বিষয়ের আলোচনাও গ্রন্থকার এ গ্রন্থে করিয়াছেন।

আজকাল যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে আইন কানুন না জানিলে জমীদারী কার্য্য পরিচালন করা এক প্রকার অসম্ভব। সে অভাব দূর করিবার জন্য জমীদারী কার্য্যে ব্যবহৃত রাজস্ব আইন, পত্তনি আইন, প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন, রেজেষ্টারী আইন, কোর্টফি আইন এবং হিন্দু ও মহম্মদীয় আইন সংক্ষেপে এ গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইয়াছি।

ক্যাডাষ্ট্রেল সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয়ও গ্রন্থকার মহাশয় এ পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থখানির উপযোগিতা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

জমীদারী কার্য্যে ব্যবহৃত ভিন্ন ভিন্ন ভাষার বিবিধ শব্দের অর্থও গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে। তবে ইহা নূতন নহে, এ প্রকার লিষ্ট পূর্ব্বে প্রকাশিত অন্য গ্রন্থকার মহাশয়দের জমীদারী সংক্রান্ত পুস্তকেও আছে। মোটের উপর গ্রন্থকার সাধারণের সমক্ষে গ্রন্থখানিকে 'পূর্ণাবয়বে' উপস্থিত করিতে যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে সফল না হইলেও গ্রন্থখানি জমীদারী-কার্য্য-শিক্ষার্থীদের যে অনেক উপকারে আসিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থখানির 'পূর্ণাবয়বের' চেষ্টা কেন সফল হয় নাই, কেন ইহার কিঞ্চিৎ অঙ্গহানি ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখ সংক্ষেপে করিতেছি। গ্রন্থকার স্থানে স্থানে শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য বিষয় বড় সংক্ষেপে লিখিয়াছেন, সেটা কামারকে ইশপাত ফাঁকি দেওয়ার মত হইয়াছে। তাহাতে শিক্ষার্থীর আশ মিটিবে না, শিক্ষাও সম্পূর্ণ হইবে না, উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে গেলে আমাদের সমালোচনার পুঁথি বড়ই বাড়িয়া যায় সুতরাং গ্রন্থকার মহাশয়কে ইশারায় জানাইয়া গেলাম, কারণ তাঁহাকে জমীদারী রসে সুরসিক বলিয়াই মনে হয়, তাই আশা করি ইহার ফলাফল ভবিষ্যত সংস্করণে "যাবে জানা"।

ফরমগুলি আরও কিছু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা এবং জমা ওয়াসীল বাকীর [illegible] আরও কতকগুলি ঘর দিয়া সে সম্বন্ধে পরিষ্কার [illegible] ক বিষয়ে উপদেশ দিলে ভাল হইত।

জরিপ শিক্ষা সম্বন্ধে একটি পৃথক পরিচ্ছেদ না দেওয়াতে পুস্তকখানির বিশেষ অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। অবশ্য গ্রন্থকার বলি[তে] পারেন, জরিপ শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন বলিয়া তি[নি] সে দিকে হাত দেন নাই,—কিন্তু এ কথা ত আইনের সম্বন্ধেও খা[টে] তবে আইনের মর্ম্ম এ গ্রন্থে দিলেন কেন? পুস্তকখানি পূর্ণাব[য়ব] করিতে ত? আমরাও তাই বলি, জমীদারী কার্য্যের আইন কে[বল] দক্ষিণ হস্ত নহে, দক্ষিণ ও বাম দুই তা জানি, কিন্তু আবার জ[রিপ] শিক্ষা, সেটা জমীদারীর "পদ"; এই "পদ" সংযোগের অভাবে ব[ই] খানি কিঞ্চিৎ খোঁড়া হইয়াছে। সমালোচকও থোড়া বিপ[দে] পড়িয়াছেন। যা হোক ভবিষ্যতে গ্রন্থকার মহাশয় জরিপের অংশ জোড়া দিলেই সব গোল চুকিয়া যাইবে।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

ভিক্ষা

(সংস্কৃত হইতে)

রূপনামহীনে ধেয়ানে আরোপ
করিয়াছি রূপ নাম!
স্তুতি-গণ্ডীতে বচন-অতীতে
ঘিরিয়াছি অবিরাম!
নিখিল ব্যাপিয়া আছ তুমি, দেব!
তীর্থে গিয়াছি তবু;
এ মূঢ় ত্রিদোষে দোষী, জগদীশ!
মার্জ্জনা কর, প্রভু!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আলোচনা

(বাঙ্গালা অক্ষর)

বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায়, এম্, এ, বিদ[্যা]নিধি মহাশয় মৎকৃত "বঙ্গাক্ষর সহজ করিবার প্রস্তাব" সমালো[চনা] পূর্ব্বক যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ঐ প্রস্তাবটির প্র[তি] কিছু অবিচার করা হইয়াছে অনুভব করিতেছি। তিনি আ[মার] প্রস্তাবের এক ভাগ অনুমোদন করিয়াছেন, একভাগ করেন না[ই]; কিন্তু যে অংশ তিনি গ্রহণ করেন নাই তাহা কিরূপে সংশোধন ক[রা] যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে কোন উপদেশ দেন নাই। সর্ব্বাপে[ক্ষা] অধিক অবিচার এই করিয়াছেন যে, আমার প্রস্তাবটা কি ত[াহা] আপনার পাঠকবর্গকে পরিষ্কৃত রূপে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা ক[রেন] নাই। অতএব আমি এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে অনুম[তি] চাহিতেছি।

প্রথমতঃ কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া আমার প্রস্তাবের সূচনা করিব।

(১) সংস্কৃত ভাষায় ৪৯টি মূল বর্ণ, ইহা প্রসিদ্ধ বাক্য। ধরি

লইলাম, সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালাতেও ৪৯টি মূলধ্বনি আছে কি থাকা বাঞ্ছনীয়। ৪৯টি ধ্বনি জ্ঞাপনার্থ ৪৯টি চিহ্ন বা অক্ষর যথেষ্ট হওয়া উচিত : কিন্তু সে স্থলে আমাদিগকে প্রায় ৪৯০টি অক্ষর শিখিতে হইতেছে। এ অত্যাচার সহি কেন ?

(২) ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে অল্পপ্রাণ বর্ণগুলির সঙ্গে হ যোগে মহাপ্রাণ বর্ণগুলি উচ্চারিত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারাই ইহার অনুভূতি হয় ; শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি মহাশয়ও ইহা স্বীকার করেন। আর, আমরা দেখিতেছি চ অক্ষরের সঙ্গে হ অক্ষর যুক্ত হইয়া ছ অক্ষর গঠিত হইয়াছে। এখন আমার প্রশ্ন এই—যদি চ অক্ষরে হ যোগ করিয়া ছ গড়া যাইতে পারে, তবে ক অক্ষরে হ যোগ করিয়া খ গড়া যাইবে না কেন ? অল্পপ্রাণ অক্ষরগুলির সহিত প্রচলিত লুপ্ত অকার অক্ষর যোগ করিলেই অনায়াসে মহাপ্রাণ অক্ষরগুলি গঠিত হইতে পারে ; যথা—কহ—খ, চহ—ছ, টহ—ঠ, তহ থ, পহ -ফ, ইত্যাদি।

(৩) ব্যঞ্জন বর্ণ স্বরবর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে স্পষ্টরূপে স্বতন্ত্র উচ্চারিত হইতে পারে না, এজন্য আমরা ব্যঞ্জন বর্ণ অকারান্ত উচ্চারণ করিয়া থাকি। কিন্তু ব্যঞ্জনগুলির নাম ও উচ্চারণ অকারান্ত না হইয়া অকারাদ্য ও হলন্ত হউক না কেন ; যথা—অক্, অখ্, অগ্, অঘ্, অঙ্, ইত্যাদি ?

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নের সহিত আমার প্রস্তাবের বিশেষ সংস্রব নাই ; উহার মীমাংসা যেরূপ হউক তাহাতে আমার মূল প্রস্তাবের লাভ কি ক্ষতি অতি যৎসামান্য। অতএব এ সম্বন্ধে আমি আর অধিক বাক্য ব্যয় করিব না।

প্রথম প্রশ্নের উপরে আমার প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে। এই প্রশ্নের উত্তর এই—যুক্তাক্ষর থাকাতে বাঙ্গালা ভাষায় এত অক্ষর আবশ্যক হইয়াছে।

যুক্তাক্ষরের প্রয়োজন ও সুবিধা বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা ব্যাকরণ গ্রন্থে এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন ;—"যুক্তাক্ষর থাকাতে লেখার সময়, কাগজ, পরিশ্রম বাঁচে, হসন্ত চিহ্ন দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয় না।"

যে কালে পুস্তকাদি করিয়া সমস্ত লিপিকার্য্য হস্ত দ্বারা সম্পন্ন হইত, ভূর্জ্জপত্র কি তালপত্রে লিখিতে হইত, অথবা কাগজের মূল্য অত্যন্ত অধিক ছিল, সে সময়ে যুক্তাক্ষরের প্রয়োজন খুব বেশী ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে হাতের লেখার প্রয়োজন অনেক কমিয়া গিয়াছে, এবং কাগজ সুলভ এবং স্বল্পমূল্য হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার টাইপিং যন্ত্র প্রস্তুত হইলে এ ভাষায় হাতের লেখা আরও কমিয়া যাইবে। টাইপিং যন্ত্রে লেখনী অপেক্ষা অনেক দ্রুত লেখা যায় এবং এক সঙ্গে ২।৩ কপি প্রস্তুত হইতে পারে। ইংরেজী টাইপিং যন্ত্রে কেবল সাফ লেখা হইয়া থাকে এমন নহে ; ইহাতে খসড়া লেখাও হইয়া থাকে, ঘরাও চিঠি পত্রও লেখা হইয়া থাকে। যাঁহার টাইপিং যন্ত্র আছে তিনি নিতান্ত আবশ্যক না হইলে আর হাতে কলম ধরেন না। ধরিবেনই বা কেন ? অনেক স্থলে শর্টহ্যাণ্ডে খসড়া প্রস্তুত হইয়া টাইপিং যন্ত্রে সাফ ও আফিস কপি প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালা অক্ষরেরও এইরূপ পরিণতি একান্ত বাঞ্ছনীয়। যুক্তাক্ষর থাকিতে ইহা এক প্রকার অসাধ্য। অতএব বাঙ্গালা ভাষার যুক্তাক্ষর ছাড়িয়া দিতে পারা যায় কি না তাহা দেখাই আবশ্যক।

এ সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয়ের অভিমত এই—"সংযুক্ত ব্যঞ্জন পাশে পাশে লিখিবার রীতি হইলে অক্ষর-সংখ্যা কম হইতে পারিবে ; কিন্তু কাগজ ও সময় বেশী লাগিবে। এই দুইএর সামঞ্জস্য করিয়া ছাপাখানার অক্ষরসংখ্যা কম করা আবশ্যক হইয়াছে।" বিদ্যানিধি মহাশয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, এখন সামান্য দোকানী পশারীরাও খবরের কাগজ দিয়া জিনিসপত্র মোড়ক করে। কাগজের মূল্য বৃক্ষপত্র অপেক্ষাও কম। আর টাইপিং যন্ত্র প্রস্তুত হইলে লেখার সময় অনেক সংক্ষিপ্ত হইবে। অতএব এ সম্বন্ধে কাগজ ও সময়ের চিন্তা তিনি মন হইতে দূর করিতে পারেন।

বঙ্গভাষাকে যুক্তাক্ষরের ব্যাধি হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিদ্যানিধি মহাশয় দীর্ঘকাল যাবৎ কঠোর পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। তিনি ও প্রভৃতি উগ্র উপসর্গের শান্তির জন্য ভাষান্তর হইতে ং অনুস্বর আমদানি করিয়াছেন ; আর, বিষস্য বিষমৌষধম্—নূতন নূতন ধ্বনি আবিষ্কার করিয়া তজ্জন্য স্বতন্ত্র অক্ষর ঢালাই করাইয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার যত্ন কত দূর সফল হইয়াছে, জানি না। তিনি আমার প্রস্তাবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আরম্ভেই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন "বাঙ্গালা শব্দকোষ ছাপার সময়ে বিভিন্ন আকারের অক্ষরের অভাব পুনঃ পুনঃ অনুভব করিয়াছি।" বাঙ্গালার যুক্তাক্ষর যদি উঠিয়া যায়, অক্ষরগুলি স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে বাঙ্গালাতেও ইংরেজীর ন্যায় নানা ছাঁচের অক্ষর প্রস্তুত হইতে পারিবে। অতএব যুক্তাক্ষর সম্বন্ধে আপোসে রফা করিতে না যাইয়া উহা সমূলে তুলিয়া দিতে সাহস করাই কর্ত্তব্য।

আমার আশা হইতেছে, যুক্তাক্ষর ছাড়াইবার একটি উপায় আমি পাইয়াছি। তাহা এই—সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাতে অপর সমস্ত স্বরবর্ণের এক একটি সংক্ষিপ্ত আকার কিংবা চিহ্ন আছে, কেবল অ বর্ণের নাই। আমার প্রস্তাব, বর্ত্তমান আ-কার চিহ্ন অ বর্ণে দিয়া, আ বর্ণের জন্য দুইটি আকার গ্রহণ করা হউক। বাঙ্গালা ভাষাতে যুগ্ম আ-কারের চলন না থাকিলেও যুগল দাঁড়ির ব্যবহার প্রচলিত আছে। অতএব আ-বর্ণের চিহ্ন স্বরূপ দুইটি আ-কার গ্রহণ করা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইবে না। অ বর্ণের জন্য আ-কার অপেক্ষা সুবিধাজনক চিহ্ন কেহ উদ্ভাবন করিতে পারিলে তাহা গ্রহণ করিতে আমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই।

অ বর্ণের জন্য একটি স্বতন্ত্র চিহ্ন ব্যবস্থাপিত হইলে কেবল অ এবং আ বর্ণের চিহ্ন থাকিবে, অপর সমস্ত স্বরাক্ষর অখণ্ডরূপে ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইবে ; ব্যঞ্জন বর্ণে যুক্তাক্ষর থাকিবে না, একটির পাশে আর একটি বসিবে। কেবল তিনটি যুক্তাক্ষর থাকিবে—শ্রী, জ্ঞ এবং ক্ষ।

আমার প্রস্তাবিত এই উপায়টি আমার নিকটে অতি সহজই বোধ হয়। একটি উদাহরণ দিয়া দেখাইতেছি—

বর্ত্তমান প্রণালীতে

শ্রীযোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি

উদ্ভাবিত প্রণালীতে

শ্রীযওগএশ চনদরা কইদযানইধই

ইংরেজীতে

Joges chandra Vidyanidhi

ইংরেজী অক্ষর দ্বারা যেরূপে বর্ণবিন্যাস করা যায়, বাঙ্গালা অক্ষর দ্বারা সেইরূপ করা যাইবে না কেন ? অতি সহজেই পারা যাইবে। কেবল একটি কথা মনে রাখিতে হইবে—ব্যঞ্জনের উচ্চারণ হলন্ত। পরন্তু, একটি বিষয় ভুলিতে হইবে—অভ্যাস।

এই দুইটি বিষয়েই শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত আমার মতভেদ। তিনি বলেন "ব্যঞ্জন অক্ষর মাত্রেই অকারান্ত—ইহাই বিধি।" আমার বিনতি, ব্যঞ্জন বর্ণ মাত্রই হলন্ত—ইহা জগদ্ব্যাপী বিধি। "যোগেশ" শব্দে "যোগ"=যো[illegible] ব্যঞ্জনের সঙ্গে

স্বরচিহ্ন যুক্ত হইলে ব্যঞ্জনাক্ষর স্বকীয় হসন্ত-চিহ্ন ত্যাগ করিয়া স্বর-চিহ্ন ধারণ করে ; অ বর্ণের কোন চিহ্ন নাই, এজন্য ব্যঞ্জনের সহিত অ বর্ণ যুক্ত হইলে স্বীয় চিহ্নটি মাত্র ত্যাগ করে। এটি লিপি সংক্ষেপার্থ সংস্কৃত ভাষার একটি সঙ্কেত। আমি এই সঙ্কেতের স্থলে স্পষ্ট একটি চিহ্ন ব্যবহারের প্রস্তাব করিয়াছি মাত্র।

"অভ্যাস ভোলা কঠিন" বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই উক্তি ঠিক, সন্দেহ নাই। কিন্তু আবশ্যক স্থলে অভ্যাস পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করাই কর্তব্য : তৎপর, যাহারা এখন পর্য্যন্ত অভ্যাস করে নাই, এবং যাহাদের সংখ্যা আমাদের অপেক্ষা অশেষ গুণে বেশী, তাহাদের বিষয় চিন্তা করা কর্তব্য ; সর্ব্বোপরি ভাষার মঙ্গল চিন্তা করা কর্তব্য।

কুমিল্লা। শ্রীসারদাকান্ত সেন।

বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের ব্যুৎপত্তি নিরূপণের চেষ্টা।

ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত কালীপদ মৈত্র মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি দেশজ বা যাবনিক শব্দের ব্যুৎপত্তি নিরূপণ চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ চেষ্টা প্রশংসনীয় বটে ; পরন্তু এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে নানা ভাষায় জ্ঞান না থাকায় পদে পদে ভুল হইবার সম্ভাবনা। কালীপদ বাবু যে-সকল শব্দের তালিকা দিয়াছেন তাহা আমরা নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কঞ্চি শব্দ ফারসী "কমৃচি" শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয় না, সংস্কৃত "কঞ্চিকা" শব্দ হইতে উৎপন্ন। নোলক—সংস্কৃত নোল শব্দ হইতে উৎপন্ন। মাইরী—Mary (যীশুখৃষ্টের মাতা) হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, মাইরী শব্দ হিন্দী হইতে উৎপন্ন ; "মাইরী" অর্থ "ও গো মা"। লুচি—সংস্কৃত "লোচিকা" শব্দ হইতে উৎপন্ন। হালি (মুগ)—হরী মুগের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয় না ; উহা হিন্দী শব্দ "হাল" হইতে উৎপন্ন ; "হাল"এর অর্থ বর্ত্তমান, সুতরাং নূতন ; হালি মুগ (হালের মুগ)—নূতন মুগ।

খাণ্ডুয়া, মধ্যপ্রদেশ। শ্রীনফরচন্দ্র ঘোষ।

দেশের কথা

অনেক সময়েই শুনিয়া থাকি যে আমরা আমাদের দেশের কোন খবর রাখি না, দেশের লোকের সহিত আমাদের কোন যোগ নাই, তাহাদের সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ কার্য্যকলাপ মত ও চিন্তা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। কথাটা, শুনিতে যতই অপ্রিয় হউক না কেন, আংশিকভাবে সত্য। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই নিজ নিজ আবাসস্থলটি ভিন্ন স্বদেশের অন্য কোন অংশের যে কোনই সংবাদাদি রাখেন না সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আজকাল দেখা যায় অনেকের পক্ষেই ইংরেজী দৈনিক পত্রের স্তম্ভে প্রকাশিত অতি সামান্য ও সংক্ষিপ্ত তারের সংবাদটুকু পাঠ করা ভিন্ন দেশের অন্য কোন প্রকার সংবাদ রাখিবার অবসর ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেই আবার অনেকে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বহু বিদেশী সংবাদের বোঝা অনর্থক বহন করিয়া মরেন।

সে যাহাই হউক একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে স্বদেশ সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান না জন্মিলে আমাদের স্বদেশপ্রেমের বুনিয়াদ কখনই সুদৃঢ়ভিত্তি পাইবে না, চিরকালই তাহা শুধু ভাবপ্রবণতা ও বাক্যবিলাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যাইবে। দেশকে যথার্থ ভালবাসিতে এবং তাহার কার্য্যে আপনার শক্তি নিয়োগ করিতে হইলে সমগ্র দেশের ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম্ম, সাহিত্য সমাজ সম্বন্ধে যেমন একদিকে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন অপরদিকে তেমনি তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ, জিলা পল্লীগ্রামগুলির সমস্ত তথ্য জানা ও তাহাদের কর্ম্ম চিন্তার সহিত যোগ রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক একথা ভুলিলে কোন মতেই চলিবে না যে পল্লীগ্রামের সমষ্টিতেই দেশের সৃষ্টি। সুতরাং দেশের পল্লীগ্রামের ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, লোকব্যবহার উৎসব, আনন্দ, বাণিজ্য সম্বন্ধে আমাদের যথাসম্ভব জ্ঞানলাভ করিতে হইবে ; নতুবা দেশের কাজে আমরা আপনাদিগকে লাগাইতে পারিব না।

বাংলাদেশের পল্লীগ্রাম ও মফঃস্বলের সহিত প্রবাসী পাঠকদের অন্তত কতকটা যোগ যাহাতে স্থাপিত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে আমরা এই দেশের কথা বিভাগে মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাদি হইতে তথাকার কার্য্যকলাপ, মতামত অভাব অভিযোগ, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্যবিষয়ের সংবাদ সংকলন করিয়া দিব।

মফঃস্বলের স্বাস্থ্য ঃ—

গ্রীষ্ম পড়িতে না পড়িতেই বাংলাদেশের চতুর্দ্দিক হইতে নানা রোগের প্রাদুর্ভাবের সংবাদ আসিতেছে বহুস্থলেই কলেরা বসন্ত প্রভৃতি দেখা দিয়াছে ; তাহার উপর আবার ম্যালেরিয়া তো আছেই। নিম্নোদ্ধৃত

সংবাদগুলি পাঠ করিলেই মফঃস্বলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কতকটা আন্দাজ পাওয়া যাইবে।

মানভূম জেলার বহু পল্লীগ্রামে কলেরা ও পুরুলিয়া সহরে বসন্তের প্রাদুর্ভাব বহুদিন হইতে লক্ষিত হইতেছে। গত বৎসর এখানে কলেরায় বহু লোকক্ষয় হইয়াছিল। এ বৎসর এখনও পর্য্যন্ত মৃত্যুসংবাদ খুব কমই শুনা যাইতেছে। পুরুলিয়া-দর্পণ, ৭ই বৈশাখ ১৩২১।

মালদহ সহরে অদ্য মাসাধিক কাল হইতে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে। এতক ইহার প্রকোপ কমে নাই। এখনও মধ্যে মধ্যে ২।১টী আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কর্তৃপক্ষের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা বিধেয়। এ সমস্ত সংক্রামক ব্যাধির সময় খাদ্যদ্রব্যের দোকানগুলির সম্বন্ধে কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত তাহা অশিক্ষিত দোকানদারগণ বুঝেনা, কাজেই তাহারা অনাবৃত খাদ্য ড্রেনের উপর বা ড্রেনের ধারে বিক্রয় করিতে ইতস্তত করে না। এজন্য আমরা বহু দিন হইতে খাদ্যদ্রব্যের দোকানগুলিতে আলমারী প্রচলন জন্য বলিয়া আসিতেছি কিন্তু এতক তাহাতে কোনই ফল হয় নাই। আদৌ হইবে কি না জানিনা। কিন্তু ইহা যে একটা সাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল ব্যবস্থা তাহা যুক্তি দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন।—গৌড়দূত, ১৪ই বৈশাখ।

আজকাল দেশের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহা চিন্তা করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী জেলার পল্লী সমূহ হইতে প্রতিনিয়ত কলেরার মারাত্মক প্রকোপের কথা শুনা যাইতেছে, নিরীহ পল্লীবাসীগণ কঠোর ব্যাধির আক্রমণে পড়িয়া হাহাকার করতঃ প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। যে-সকল গ্রামে এখনও কলেরার সংক্রামকতা প্রসারিত হয় নাই সেই-সকল গ্রামের লোকও ভয়ে আত্মহারা হইতেছে। প্রত্যেক গ্রামের নিদারুণ জলকষ্টই যে এই-রূপ ব্যাধির মুখ্য কারণ তাহা আমরা আজীবন উল্লেখ করিয়া আসিতেছি। ফলে দেখা যায় আমাদের কাতর কণ্ঠনাদে কাহারও আসন টলিবে না, কাজেই কলেরা, বসন্ত ও ম্যালেরিয়া-জনিত মৃত্যু-সংখ্যাও কখন কমিবে না। জানি না, কত দিনে এই গুরুতর বিষয়ের কথা কর্ত্তৃপক্ষ ও দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী নেতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিবে।—প্রতিকার, (বহরমপুর), ৪ঠা বৈশাখ, ১৩২১।

মুর্শিদাবাদের ভাগীরথী এখন একটী দীর্ঘকায় নির্জ্জলা দীর্ঘিকায় পরিণত হইয়াছে বা তাহা অপেক্ষা হীনতোয়া পঙ্কিলা হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই জেলার উত্তর-দক্ষিণে এই পবিত্রসলিলা নদী প্রবাহিতা ছিল, কিন্তু এই জেলার উত্তর সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ সীমা দক্ষিণ পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, যে, এই জেলার প্রবাহিত স্থান সকলেই ইহার দুর্দ্দশার পরাকাষ্ঠা। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সদাশয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষরূপে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলা যে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, উদরাময় প্রভৃতি রোগের আবাসস্থান হইয়া ক্রমে মুর্শিদাবাদের স্বাস্থ্য ভীষণ হইতে ভীষণতম করিতেছে তাহার প্রতি কি একবার কৃপাকটাক্ষপাত করেন? বর্ত্তমান সময়ে এ জেলার সহর মফঃস্বলের সহস্র সহস্র নরনারী কলেরা বসন্ত প্রভৃতির তাড়নায় ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, চিকিৎসা-অভাবে কত নিঃস্ব নিরীহ প্রজার প্রাণবায়ু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, কত দরিদ্র প্রাণ রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া হাহাকার করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মুর্শিদাবাদের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই অস্বাস্থ্যকর স্থান ভিন্ন কিঞ্চিন্মাত্রও স্বাস্থ্যকর স্থান আছে বলিয়া জানা যায় না। একদিকে অপেয়জলা নদী, অপর দিকে খাল ডোবা দুর্গন্ধময় নর্দ্দমা জঙ্গল পরিলক্ষিত হয়। মুর্শিদাবাদের পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় পার্শ্বেই রেলওয়ে বিস্তার হওয়ায় মুর্শিদাবাদের কেবল দূরদেশে গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু ইহার ফলে স্বাস্থ্যের কোন উপকার হয় নাই। পেটে অন্ন, শরীর নীরোগ, হৃদয়ে বল না থাকিলে রেলওয়ের সামান্য উপকারে কোন সুফল ফলে না। যেরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে মুর্শিদাবাদবাসী একমাত্র নীরোগ থাকিয়া সুখে বা দুঃখে জীবন ধারণ করিতে পারিলেই জীবন সার্থক মনে করেন। আমরা মুর্শিদাবাদবাসী, আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্টের নিকট মুর্শিদাবাদের একমাত্র পানীয় জলের সম্বল ভাগীরথীর প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিতে, মুর্শিদাবাদের খাল ডোবা জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিয়া যাহাতে কার্য্যোদ্ধার হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে প্রার্থনা করিতেছি। মুর্শিদাবাদহিতৈষী, ৯ই বৈশাখ, ১৩২১।

মধ্যে ভাগীরথীর যেরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে আমরা নিতান্ত আশঙ্কিত হইয়াছিলাম। কারণ ঐ সময় পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর জল অত্যন্ত দূষিত হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে স্থানে স্থানে শেওলা ও বেঙাচি উৎপন্ন হইয়া সমস্ত জলই বিষাক্ত করিয়া তুলে। কারণ ভাগীরথীর স্রোত একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এমন কি, তখন বড় গঙ্গার জল ভাগীরথী দিয়া বহিয়া যাইবে কি ভাগীরথীর জলই বড় গঙ্গায় গিয়া পড়িতেছিল। এক্ষণে আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, যে, বড় গঙ্গার জল পুনরায় ভাগীরথীতে আসিয়া পড়ায় তাহার স্রোত হইয়াছে এবং তাহার ফলে পূর্ব্বোক্ত শেওলা ও বেঙাচি অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে।—প্রতিকার (বহরমপুর), ৪ঠা বৈশাখ, ১৩২১।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে দিন-দিনই বাংলার পল্লীগ্রাম ও মফস্বলের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া আসিতেছে, অথচ ইহার প্রতিকারের চেষ্টা কোন দিক দিয়াই তেমন হইতেছে না। গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে এ সম্বন্ধে যেটুকু হইতেছে বা হইতেছে না শুধু তাহারি মুখাপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ইহা সত্য বটে যে সমস্ত দেশব্যাপী বা জেলাব্যাপী স্বাস্থ্যবিধায়ক কোন বৃহৎ কার্য্য আমরা সহজে করিতে পারি না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বা দেশের নেতৃবর্গ সবই করিবেন বা করিতে পারেন, এরূপ আশা করা যায় না। আমরা নিজে নিজে কিছুই করিতে পারি না, নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে এরূপ অবিশ্বাসের ভাব পোষণ করা বড়ই নৈরাশ্যজনক। আমরা নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু করিতে পারি; এবং তাহা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পল্লীর প্রত্যেক গৃহস্থ যদি খানা ডোবা বুজাইয়া আগাছা জঙ্গল কাটাইয়া তাঁহার নিজের বাড়ীটির চতুর্দ্দিক যথাসাধ্য পরিষ্কার রাখেন

তাহা হইলে কতকটা কাজ হয়। তাহার পর কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর সময়ে পল্লীর ভদ্রলোকগণ সকলে একত্র হইয়া অন্ততঃ সেই সময়টার জন্য হাটে বাজারে যাহাতে পচা মাছ বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য না আসিতে পারে, সংক্রামক রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি কিম্বা অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহ পুষ্করিণী অথবা বদ্ধ জলাশয়ে ধৌত বা নিক্ষিপ্ত না হয়, সেই বিষয়ে তত্ত্বাবধানের বন্দোবস্ত করেন তাহা হইলে অনেকের প্রাণ বাঁচিয়া যায়। এ-সব কাজে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বা প্রচুর অর্থের দরকার হয় না। গ্রাম্য বাদ বিসম্বাদ বা দলাদলি ত্যাগ করিয়া সকলে একজোট হইলেই এই-সব ব্যাপার অতি সুচারুরূপেই সম্পন্ন হয়।

পল্লীগ্রামে কোন ব্যাধির প্রকোপ লাগিলেই সচরাচর দেখা যায় সন্ধ্যাকালে বারোয়ারীতলায় পল্লীবাসীগণ হরিসংকীর্ত্তন করিবার ও শুনিবার জন্য দলে দলে সমবেত হয়। গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সেই সময়ে যদি সেখানে উপস্থিত থাকিয়া নিরক্ষর পল্লীবাসীগণকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের সাধারণ নিয়মগুলি সরল গ্রাম্য কথায় ও মিষ্ট ভাষায় বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দেন তাহা হইলে যে কত উপকার হয় তাহা বলা যায় না। পল্লীগ্রামে মহামারী উপস্থিত হইলে স্বভাবতই গ্রামবাসীগণ অত্যন্ত ভীত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সাহসবাক্যে উৎসাহিত করিয়া যাহাতে তাহারা স্বাস্থ্য-হানিকর কোন কাজ না করিয়া বসে সেই বিষয়ে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া শিক্ষিত লোকের উচিত।

তারপর পানীয় জল সম্বন্ধে কথা। মফস্বলস্থ পত্রিকা-দিগের মতে "প্রত্যেক গ্রামের নিদারুণ জলকষ্টই সংক্রামক ব্যাধির মুখ্য কারণ"; আর বাস্তবিকই তাহাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া না থাকিয়া এমন কিছু উপায় অবলম্বন করা উচিত যাহাতে অন্তত পানীয় জলের কষ্টটা কতকটা নিবারিত হইতে পারে। আমাদের মনে হয় যে-সমস্ত গ্রামে নদী কিম্বা পানীয় জলের পুষ্করিণীর অভাব, সেই-সকল স্থলের অধিবাসীগণ যদি গ্রামের স্থানে স্থানে এক একটি কূপ খনন করিয়া সেই জল প্রথমে "পারম্যাঙ্গনেট অফ পটাশ" দ্বারা সংশো[ধন] করিয়া লন, তাহা হইলে উত্তম পানীয় জলের ব্যবস্থা হ[য়।] কয়েকটি কূপ খনন, নূতন পুষ্করিণী খননের ন্যায়, ব্যয়সা[ধ্য] নহে; অতি অল্প আয়াস ও অর্থব্যয়েই ইহা করা যাই[তে] পারে। গ্রামে কলেরা কিম্বা অন্য কোন মহামারী[র] সময় কূপের জল সিদ্ধ কিম্বা ফিলটার করিয়া পান করি[লে] রোগাক্রান্ত হইবার বিশেষ কোন আশঙ্কা থাকে না।

বাংলাদেশের বহু গ্রামেই অনেক সময় দেখা যা[য়] বহু সুন্দর সুন্দর পুষ্করিণী পঙ্কোদ্ধারের অভাবে অব্যবহা[র্য] হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রামবাসীগণ এক একা বারোয়ারী পূজার সময় যে টাকা শুধু কয়েক রাত্রি আমোদে প্রমোদে ব্যয় করেন সেই টাকাটা যদি গ্রামে কোন ভাল পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের কার্য্যে নিয়োগ করে[ন] তাহা হইলে বহু লোকের প্রাণও বাঁচিয়া যায় আ[র] দেবতাও সন্তুষ্ট হন। আর পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিবা[র] জন্য যদি অর্থ নাও জোটে তবে সমস্ত গ্রামবাসী যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজেরাই স্বহস্তে সেই কার্য্যে লাগিয়া যান তাহা হইলে গ্রামের জলকষ্ট দূর হইতে কদি[ন] লাগে? আর এইরূপ দৃষ্টান্ত তো বিরল নহে। অল্পদিন পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলার কোন কোন গ্রামের যুবকগণ স্বহস্তে পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া ত্যাগ ও সেবার সুমহৎ দৃষ্টান্তে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বাংলার জলকষ্টপীড়িত পল্লীগ্রামের যুবকবৃন্দ যদি ইঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করেন তাহা হইলে পানীয় জলের অভাব কতকটা ঘোচে না কি? আমরা কাহাকেও সাধ্যের বহির্ভূত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বিফলপ্রযত্ন ও হাস্যাস্পদ হইতে বলি না; কিন্তু ক্ষমতা থাকিতেও আপনাকে অসমর্থ ও অসহায় ভাবা অনুচিত। অতএব কলিকাতা ও মফস্বলের সম্পাদকগণ যদি সকলেই দেশের মধ্যে যথাসম্ভব স্বাবলম্বনের ভাব জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।

কৃষকের কথা :---

বাংলাদেশের কৃষকের দুর্দ্দশা চিরন্তন; কিছুতেই আর তাহা ঘুচিল না। দৈব তো চিরকালই তাহার

প্রতিকূল; তাহার উপরে আবার বাকী খাজানা ও সুদের যন্ত্রণায় বঙ্গীয় কৃষককুল উৎখাত হইতে বসিয়াছে। দেশের নানাস্থানে 'কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি' ও 'কৃষিব্যাঙ্ক' প্রভৃতি স্থাপন না করিলে শাইলক-রূপী মহাজনের হাত হইতে কৃষকদিগের রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। আবার অনেক স্থলে, 'ক্রেডিট সোসাইটি' ও কৃষিব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার অভাবে কৃষকেরা তাহা হইতে কোন উপকার পাইতেছে না।

এ বৎসর অপর্য্যাপ্ত ঝড় ও শিলাবৃষ্টির জন্য নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত বহু গ্রামের শস্যাদি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে "নোয়াখালী সম্মিলনী" পত্রিকায় "প্রজার প্রার্থনা" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

প্রজার প্রার্থনা। "আমরা দরিদ্র কৃষিজীবী প্রজা; কৃষিই আমাদের একমাত্র সম্বল। বিগত ১৯২২ সনের অকাল জলাধিক্য বশতঃ আমাদিগের শস্যাদি সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। ঋণ গ্রহণ করিয়া আমরা অন্ন বস্ত্রের সংগ্রহ করতঃ অতি কষ্টে সৃষ্টে থাকিয়া ভবিষ্যতের শুভযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গত বৎসরও উপর্য্যুপরি ভয়ানক শিলাবৃষ্টি সমস্ত শীত ও গ্রীষ্ম কালীন শস্য সমূলে নির্ম্মূল করতঃ আমাদিগের সব আশা ভরসা পণ্ড করিয়া দেয়। মনিবের খাজানা ও মহাজনের ঋণ শোধ করা দূরে থাকুক নিজ নিজ অন্নবস্ত্রাভাবে আমাদিগকে নিরতিশয় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ইহার উপর আবার বর্ষার অপরিমিত জলে আশু ধান্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কোন মহাজনই কাহাকেও আর টাকা কর্জ্জ দিতে চাহিলেন না। কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী খোলার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইয়াও মহাজন অভাবে বিফলমনোরথ হইতে হইয়াছিল। ফলে আমাদের দুর্গতির সীমা রহিল না। তার পর হৈমন্তিক ধান্য যাহা কিছু পাওয়া গেল রাজা, মহাজন ভাগাভাগি করিয়া প্রায় সমস্তই বিক্রয় করাইয়া তাঁহাদের প্রাপ্যের কিয়দংশ উশুল করিয়া লইলেন। কেহ কেহ অতি কষ্টে ২।১ মাসের খোরাকী রাখিতে পারিলেন, কেহ কেহ একেবারেই নিঃসম্বল হইয়া পড়িলেন। এমতাবস্থায় আবার খাইয়া না খাইয়া মরিচ, তিল, কালিজিরা, পাট প্রভৃতি বপন করা হইল, শস্য গৃহে আনিবার সময় হইল, নিশ্বাস ফেলিবার আশা জন্মিল; কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ বর্ত্তমান মাসের অপর্য্যাপ্ত ঝড়, ও শিলাবৃষ্টি হেতু হায়দরগঞ্জ, গজারিয়া, পাঙ্গাশিয়া, ঝাউডগী, দিঘলী, গাইয়ারচর, চর আবাবিল, বেপারির চর, উদমারা, বালুধুম প্রভৃতি বহু গ্রামের সমস্ত শস্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেক গৃহপালিত পশু সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে; ফলবান বৃক্ষ-সকল এমন কি পত্রবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। অধিকাংশ গৃহ ভূতলশায়ী। আমরা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। জমিদার, মহাজনদের অত্যাচারের কথা মনে করিয়া আমরা পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকার ন্যায় বিরলে বসিয়া রোদন করিতেছি। পেটে অন্ন নাই, পরনে বস্ত্র নাই, অস্থায়ী সম্পত্তি ইতঃপূর্ব্বেই গিয়াছে। এইবার স্থায়ী সম্পত্তি নেওয়ার জন্য রাজা, মহাজন হস্ত প্রসারণ না করিয়া পারিতেছে না; কাজে কাজেই দরিদ্র প্রজার আছে বলিতে আর কিছুই থাকিল না। বিশেষতঃ আমরা নিরক্ষর ও নিরীহ। চাষ ব্যতীত আর কোন উপায় জানি না। এই জিলার টাউন হইতে এই স্থানটি বহুদূরে ও এক প্রান্তে অবস্থিত বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা। সুতরাং যদিও এই স্থানের দুর্ভাগ্য প্রজাবৃন্দ এই তিন বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন প্রকার শোচনীয় অবস্থায় জর্জ্জরীভূত হউক, তথাপি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আদৌ ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই ও হইতে পারিতেছে না। অগত্যা তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত। এখনও যদি পিতৃ-সদৃশ সদাশয় গভর্ণমেণ্ট এই মুমূর্ষু সন্তান-সন্ততির প্রাণ রক্ষার যথোপযুক্ত উপায় বিধানে নিশ্চেষ্ট থাকেন তাহা হইলে নগণ্য নিরাশ্রয় প্রজাবৃন্দেরই ভবলীলা সাঙ্গ হইবে। দৈব-পীড়িত অধিকাংশ গ্রামই সদাশয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ডিয়ারা খাসের অন্তর্গত। আমাদের অভাব অভিযোগ রাজপুরুষগণের গোচরীভূত করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও আমরা ভরসা করি, আমাদের এই দৈব দুর্ব্বিপাকে যথোপযুক্ত সাহায্য করতঃ আমাদের প্রাণ রক্ষা করিতে আমাদের মহামান্য সদাশয় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কিছুতেই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিবেন না। অবশ্যই তিনি অনতি-বিলম্বে এই স্থানে রিলিফ ফণ্ড বা অন্ততঃ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটী স্থাপনে এই দুঃস্থ নিরীহ প্রজাবৃন্দের প্রাণ রক্ষার উপায় বিধান করতঃ সর্ব্ব সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইবেন।"

নোয়াখালী সম্মিলনী, ৭ই বৈশাখ, ১৩২১।

আমরা আশা করি গভর্ণমেণ্ট প্রজার এই প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন।

কৃষি ব্যাঙ্ক—দেশের অবস্থা কি হইল আমরা প্রতিনিয়ত এখানে বাস করিয়াও স্থির করিতে পারিতেছি না। মাছ, দুধ, ডিম, তরকারী মাংস যেদিকে দৃষ্টি করা যায় বাজার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাউলের কথা না বলিলেও চলে, কারণ প্রত্যেক অধিবাসী উহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে। বালাম চাউলের দর ৬৷৹ টাকা, ধানের বাজার কখন ৩৷৹ কখন ৩৷৶৹ আনা। এই দুর্দ্দিনে যথেষ্ট আয় হইলেও সংসার চালান কঠিন, সামান্য আয়ের কর্ম্মচারী-দিগের অবস্থা যে কত শোচনীয় তাহা বলা অপেক্ষা অনুমান করা সহজ। কিন্তু আজ আমরা তাহাদের অবস্থা আলোচনা করিতে উপস্থিত হই নাই। যাহারা দেশের প্রকৃত ধনবৃদ্ধিকারক সেই কঠোর পরিশ্রমী কৃষককুলের শোচনীয় অবস্থার কথা বিবৃত করিতে আমরা আজ অগ্রসর হইয়াছি।—আইনব্যবসায়ী হাকিম বা ডাক্তার সমাজের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় হইলেও ইহারা সাধারণের অর্থ কেন্দ্রীভূত করা ভিন্ন উৎপাদন করিতে সক্ষম নহেন। ধন বৃদ্ধি করিতে সক্ষম শুধু গ্রামের ঐ নিরন্ন চাষা, যাহার বিলাস নাই ব্যসন নাই বিশ্রাম নাই, শুধু ভূমি কর্ষণ শস্য উৎপাদন। আজ কৃষকের বড় দুর্দ্দিন। বলদ বীজ ভূমি সমস্ত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। কুসীদজীবীর নিকট সে দাসখত দিয়াছে, পরিত্রাণের উপায় দেখিতেছে না। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট তাহার জন্য মুক্তির উপায় স্বরূপ যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন তাহার কোন সংবাদ সে রাখে না। শিক্ষিত বন্ধু, তোমার শুভ মিলন ভিন্ন গরীবের দ্বারে এই সুসংবাদ কে প্রদান করিবে?

নোয়াখালী সম্মিলনী.

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শিক্ষার অভাবে আমাদের কৃষকেরা তাহাদের উপকারের নিমিত্ত যে-সমুদয় ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা হইতে কোনই সাহায্য লাভ করিতে পারিতেছে না। উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্যটিও আমাদের কথার সমর্থন করিতেছে। ইহা যে কত বড় ক্ষোভের বিষয় তাহা বলিতে পারি না। আমাদের দেশের যাঁহারা শ্রীযুক্ত গোখেলের "বাধ্যতামূলক শিক্ষাবিধির" বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহারা এ সম্বন্ধে কি বলেন এই সময়ে তাহা একবার জানিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। শিক্ষার প্রচলন ব্যতিরেকে আমাদের কৃষকদের দুরবস্থা কখনই সম্পূর্ণ ঘুচিবে না।

মফস্বলের মতামত—

হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারিতে জানা গিয়াছিল যে সমগ্র বালিয়া জেলায় দুইজন মাত্র দেশীয় খৃষ্টান ছিল, কিন্তু ১৯১১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারিতে চারি হাজার দেশী খ্রীষ্টান পাওয়া গিয়াছে। ১০ বৎসরে একটি মাত্র জেলায় চারি হাজার হিন্দুর খ্রীষ্টান হওয়া নিশ্চয়ই উপেক্ষার বিষয় নহে। এতদ্ব্যতীত মুসলমানও যে না হইয়াছে এমন নহে। এইরূপে সমস্ত ভারতবর্ষে হু হু শব্দে খৃষ্টান ও মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে এবং সেই পরিমাণ হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে। হিন্দু হয় ত বলিতে পারে, যে যাবে সে যাউক তাহাতে হিন্দুসমাজের কোন ক্ষতি নাই। ক্ষতি আছে কি না তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধির অন্য কোন উপায় নাই, অর্থাৎ জন্ম ভিন্ন বাহির হইতে আনিয়া বৃদ্ধি করিবার উপায় নাই। সুতরাং যে পরিমাণ হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়া যাইবে, সেই পরিমাণে হিন্দুসমাজের বল হ্রাস হইবে এবং সেই পরিমাণে অন্য সমাজ বলবান হইবে, ইহাতে হিন্দুসমাজের ক্ষতি নাই কেহ যদি বলেন, তবে তাঁহার মূল্য কতদূর তাহা বিবেচ্য বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ফল কথা হিন্দুর সাবধান হওয়া উচিত। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা যে ধর্ম্মের জন্য পাগল হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে তাহা নহে। সহানুভূতির অভাবেই অন্য সমাজে মিশিবার জন্যই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রমাণ স্বরূপ চণ্ডালের কথা বলা যাইতে পারে—আমরা যাহাদিগকে চাঁড়াল বলি, তাহারা শাস্ত্রকথিত চণ্ডাল নহে, অথচ তাহারা নাপিত ধোপা পায় না। আজ যদি সেই চণ্ডাল মুসলমান হয় তবে তৎক্ষণাৎ নাপিত ধোপা পাইবে। যে নাপিত কাল চাঁড়াল বলিয়া তাহাকে ক্ষৌরী করে নাই, আজ সেই নাপিতই নিরাপত্তো সেই মুসলমান চাঁড়ালকে আগ্রহ করিয়া ক্ষৌরী করিবে। অতএব আমাদের সামাজিক নিয়ম অনুসারে দেখা যাইতেছে, মুসলমান অপেক্ষাও চাঁড়ালগণ ঘৃণিত। এ অবস্থায় চাঁড়ালগণ এখনও যে হিন্দু আছে, ইহা অবশ্যই হিন্দুধর্ম্মের সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু এ সৌভাগ্য কতদিন থাকিবে? এ অবিচার আর অধিক দিন চলিলে হিন্দুর সংখ্যা দ্রুতগতিতে কমিয়া যাইবে। সামাজিক বল দ্রুতগতিতে হ্রাস হইবে। বল [illegible] হইলে হিন্দুসমাজ কয় দিন টিকিবে? সুতরাং যাহাতে বল হ্রাস না হয়, সংখ্যা যাহাতে কমিয়া না যায় তা চেষ্টা করা হিন্দুসমাজের কর্ত্তব্য।

হিন্দুরঞ্জিকা ১৪ই বৈশাখ, ১৩২১ রাজসাহী।

অত্যন্ত সুখের বিষয় যে এই গুরুতর বিষয়ে ক্রমে লোকের দৃষ্টি পড়িতেছে। হিন্দু-সমাজনেতৃগণ যদি সক একত্র হইয়া এ বিষয়ে আলোচনা ও ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধা করেন তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। বিষয়টিকে অ অবহেলা করা উচিত নয়।

মুষ্টিভিক্ষা।—আমাদের দেশে আজকাল ভিক্ষুকের সংখ্যা অত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সন্ন্যাসীর বেশভূষা ধারণ করিয়া কোনর গৃহস্থগণের নিকট ভিক্ষা সংগ্রহ করতঃ সংসারের সকল সুখ উ ভোগ করাই কতকগুলি অলস কুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তি সুপথ বলি গ্রহণ করিয়াছে। আবার ইহার উপর মুষ্টিভিক্ষারূপে উপ আসিয়া জুটিয়া দেশের এবং সমাজের কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সা করিয়াছে তাহা অনুধাবন করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যা মুষ্টিভিক্ষাগ্রহণকারী জাতি ও ব্যক্তিগণের দ্বারা সমাজের কিছুম হিত হয় না। অথচ অলস দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি ও জাতিগণ প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যে মুষ্টিভিক্ষা বর্ত্তমান সময়ে সমাজের অধঃ পতনের অন্যবিধ কারণের মধ্যে গণনীয় হইতে পারে তাহা একা সর্ব্ববাদীসম্মত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতের ভদ্রাভ সুকৃতি- বা দুষ্কৃতিপরায়ণ সক্ষম বা অক্ষম সকলেই অবাধে বিব করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিতে পায়। কাজেই এ শ্রেণীর লোকে দ্বারা যে বংশবিস্তৃতি ঘটিতেছে ইহা নিশ্চিত। একারণ আমরা দে যে দিন দিন ভিক্ষুক- ও সন্ন্যাসী-বেশধারী জনগণের সংখ্যা বাড়ি চলিতেছে। সমাজের হিতকামী জনগণের এ বিষয়ের প্রতিকারা সবিশেষ চেষ্টান্বিত হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। অল অকর্ম্মণ্য, দুষ্কৃতিপরায়ণ জনগণের দ্বারা বংশবৃদ্ধি ঘটিতে থাকি পরিণামে মেধাবী লোকের সংখ্যা কমিয়া গিয়া সমাজধ্বংসের প প্রশস্ত হইবে ইহা নিশ্চিত। আজকাল মুষ্টিভিক্ষা দেওয়ার ফা দেখা যায় যে, অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালক বালিকা, যুবক যুবত ভিক্ষুক ও ভিক্ষুণীগণের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। য ইহাদের মধ্যে কর্ম্মক্ষম কোনও স্ত্রীলোক বা পুরুষকে কোনও কা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনের পথ দেখাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহারা ব যে, অর্দ্ধঘণ্টা কাল ৩।৪ গৃহস্থবাড়ী ঘুরিলেই আমাদের ঝুলি পূর্ণ হই যাইবে, কাজ করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। আমাদের মালদ জেলায় কতকগুলি ভিক্ষুক জাতি আছে যাহাদের পাকা বাড়ী, জা জমা কর্জ্জ দাদন ইত্যাদি সত্ত্বেও এই উপরি লাভ পরিত্যাগ করিত পারে না। এ সমস্ত ভিক্ষুক জাতি সমাজের কণ্টক স্বরূপ নহে কি কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রে দান একটি অবশ্য করণীয় সৎকার্য্য এবং ইহা দ্বারা দাতার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, ব্যবস্থা থাকায় ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মুসলমান গৃহস্থগণ বর্ত্তমান কালে পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া ভিক্ষাদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে কি মুসল মান ফকির কি হিন্দু সন্ন্যাসী বিদ্যা বুদ্ধি এবং জ্ঞানের চরম সীমা উপস্থিত হইয়া সমাজের অশেষবিধ মঙ্গল সাধন করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমা যুগে এরূপ ফকির বা সন্ন্যাসী বিরল। এক্ষণে অবস্থা দৃষ্টে আমাদে মনে হয় যে যাহাতে অল্পবয়স্ক ও অল্পবয়স্কা বালক বালিকাগ ভিক্ষুকবৃত্তি অবলম্বন করিতে না পারে তজ্জন্য কোনও উপা

করা কর্ত্তব্য, ইহাতে সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের আশা নাই। তীর্থস্থান মাত্রেই ভিক্ষুকের আধিক্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ঐ-সকল লোকের মধ্যে সকলেই যে অক্ষম এমন নহে, বস্তুতর সবল ও সুস্থকায় ব্যক্তি আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা সংসারের সকল লোক অপেক্ষা নিজকে চতুর মনে করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতঃ সংসারের সকল সুখ ভোগ করিয়া থাকে।

গৌড়দূত, ১৪ই বৈশাখ, ১৩২১।

সমাজে নিষ্কর্ম্মা লোকের সংখ্যাধিক্য হইলেই ভিক্ষুক বৃদ্ধি পায়। এই-সমস্ত নিষ্কর্ম্মাদের ভিক্ষাদান করিয়া প্রশ্রয় দেওয়া কখনই উচিত নয়; তাহাতে আলস্যেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ভিক্ষা দিবার সময় সর্ব্বদাই পাত্রাপাত্র ও যোগ্যাযোগ্য বিচার করা উচিত। ভিক্ষাদান হিন্দুগৃহীর অবশ্যকর্ত্তব্য। তাই মনে হয় মুষ্টিভিক্ষা জিনিসটা আমাদের দেশ হইতে কখনো লোপ পাইবে না; আর লোপ পাওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। ইহাতে মানুষের একটি সদ্‌বৃত্তির বিকাশ সাধন হয়। Poor House কিম্বা Charity Houseএ মাসিক অথবা বার্ষিক হিসাবে কিছু চাঁদা দিয়া দরিদ্রের প্রতি সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল মনে করা আমাদের নিকট যেন কেমন বিসদৃশ ঠেকে।

রাজসাহীর ইতিহাস—

আমাদের দেশে কি আছে, কি ছিল, সেগুলি কি অবস্থায়ই বা আছে তাহা আমরা কিছুই জানি না। বিদেশের ভূগোল, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব আমরা বালককাল হইতে কণ্ঠস্থ করিয়া আসিতেছি, জিজ্ঞাসা করিলেই বলিতে পারি, কিন্তু দেশের সংবাদ রাখি না। দেশের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারি না! আজকাল সর্ব্বত্রই হিতৈষী মনস্বীগণ নিজ নিজ জেলার ইতিহাস লিখিয়া দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বিক্রমপুর, নদীয়া, মুরশিদাবাদ, ফরিদপুর, বগুড়া, সেরপুর প্রভৃতি স্থানের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে।

আমি রাজসাহীর একখানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছি। রাজসাহীবাসী সহৃদয় ব্যক্তিগণ স্ব স্ব গ্রামের, নিম্নলিখিত প্রশ্নক্রমে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণগুলি যথাসম্ভব সত্বর আমার নিকট প্রেরণ করিয়া আমাকে সাহায্য করেন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। যিনি যাহা লিখিবেন, হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকায় তাঁহার নাম দিয়া তাহা প্রকাশ করা হইবে।

১। গ্রামের নামোৎপত্তির কারণ, জনসংখ্যা, বিভিন্ন জাতির বিবরণ, বিদ্যালয়, মক্তব বা টোলের কথা।

২। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, মঠ, মন্দির, মসজিদ, প্রাচীন অট্টালিকা, বৃক্ষ, জাগ্রত দেবতা, গৃহসজ্জা, খোদিত লিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা ইত্যাদির বিবরণ, প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি, ইত্যাদি।

৩। পোল, রাস্তা, খাল, বন্দর, হাট, মেলা, নদী, বিল প্রভৃতির বৃত্তান্ত।

৪। গ্রামের খ্যাতনামা মৃত ব্যক্তির জীবনী, সম্ভবপর হইলে চিত্র সহ সম্ভ্রান্ত বংশের কথা, প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকের পরিচয়, তন্ত্র, জ্যোতিষ, পুরাণ, কাব্য ইত্যাদি।

৫। মহিলার ব্রত ও কথা, উপকথা, ডাকের কথা, প্রবচন, গ্রাম্যপ্রসঙ্গ, ছড়া, পাঁচালী, সাধু, ফকির, পীর প্রভৃতির তত্ত্ব, স্থানীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির আচার, ব্যবহার, উৎসব আদি। গ্রামের চৌহদ্দি।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।
সহকারী সম্পাদক।
হিন্দুরঞ্জিকা (রাজসাহী) ১৪ই বৈশাখ, ১৩২১।

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয় অত্যন্ত আবশ্যকীয় ও মূল্যবান কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আশা করি তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। এইভাবে বাংলা দেশের প্রত্যেক জিলার ইতিহাস বাঙালী কর্ত্তৃক রচিত হইলে আর আমাদিগকে বাংলার ইতিহাসের জন্য বিদেশীর মুখের দিকে তাকাইতে হইবে না।

শ্রীহট্ট সম্মিলনা,—

আসাম বেঙ্গল টি এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীর অরগেনাইজার শ্রীযুক্ত উমাচরণ বিশ্বাস মহোদয় "বর্ত্তমানে বঙ্গীয় মহিলা সমাজের শিক্ষা—তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও বিস্তারের প্রকৃষ্ট উপায়"—বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধলেখককে একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দেওয়ার জন্য সম্মিলনীর নিকট সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় লিখিতে হইবে এবং যে-কেহ এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন। প্রবন্ধলেখকগণ তাঁহাদের প্রবন্ধ আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে সম্পাদক, শ্রীহট্ট-সম্মিলনী ১৩৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই, মহোদয় প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পুরস্কার আগামী শারদীয় পূজার পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইবে।

প্লেগের চিকিৎসা,—

স্যালভেশন আর্ম্মি বা মুক্তি ফৌজের জেনেরেল বুথ টকার সাধারণের অবগতির জন্য, প্লেগ রোগের নিম্নলিখিত চিকিৎসাপ্রণালী প্রচার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন;—

বিহারে প্লেগ পুনরায় ভীষণ ও সাংঘাতিক মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে বলিয়া আমি, আইয়োডাইন নামক ঔষধে প্লেগের বিষনাশক ক্ষমতার কথা পুনরায় প্রকাশ করিতেছি। চিকিৎসাপ্রণালীটি অতি সহজ।

সংপ্রতি আমাদের দলের একটি সেবাকারিণী ইউরোপীয় রমণীর সহিত দেখা হইয়াছিল, তিনি আমাকে বলেন যে, কয়েক দিনের মধ্যে তিনি নয়টি রোগীকে এই আইয়োডাইন ব্যবহার করাইয়াছিলেন, নয়টি রোগীই আরোগ্যলাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে দুইটি রোগীর অবস্থা এতই ভয়ানক হইয়াছিল যে চিকিৎসকগণ দুই ঘণ্টার মধ্যে ঐ দুই জনের মৃত্যু হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। চিকিৎসা-প্রণালী এইরূপ :—

প্রথমে রোগীকে একমাত্রা ক্যাষ্টার অয়েল বা এরণ্ডতৈলের জোলাপ দিতে হয় এবং তৈল খাওয়াইবার অব্যবহিত পরেই একটু জলের সহিত ৫ ফোঁটা হইতে ৭ ফোঁটা পর্য্যন্ত টিংচার আইয়োডাইন খাওয়াইয়া দিতে হয়। যদি গ্রন্থিস্ফীতি হয় অর্থাৎ কোন স্থানে গ্রন্থি ফুলিয়া থাকে তবে সেই গ্রন্থির উপরেও টিংচার আইয়োডাইন লাগাইয়া দিতে হয়। পরদিন প্রাতঃকালে জলের সহিত দুই ফোঁটা মাত্র আইয়োডাইন দিতে হয়। যদি জ্বর থাকে তবে কুইনিন দিতে হইবে। রোগীর পথ্য দুগ্ধ।

ইতঃপূর্ব্বে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া একবার ৫৭ জনের মধ্যে ৫০ জন এবং আর একবারে ৩৫ জন রোগীর মধ্যে সকলেই আরোগ্য লাভ করে। এই-সকল রোগীকে একেবারে এক মাত্রায় ৫।৭ ফোঁটা আইয়োডাইন না দিয়া প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর এক ফোঁটা করিয়া আইয়োডাইন দেওয়া হয়।

জেনারেল মহোদয়ের প্রচারিত চিকিৎসাপ্রণালী অতি সহজ এবং সুলভ। আজকাল ম্যালেরিয়ার কল্যাণে, প্লীহা ও যকৃতের উপর টিংচার আইয়োডাইন দিতে হয়, ইহা বোধ হয় কোন ব্যক্তিরই অজ্ঞাত নহে। সুদূর মফস্বলের বেণের দোকানেও "টিংচার আইডিন" দুই চারি পয়সায় কিনিতে পাওয়া যায়।

জ্যোতিঃ ৩০শে চৈত্র ১৩২০।

সৎকর্ম্ম,—

বরিশালের এক ধনবতী পতিতা রমণী তাহার সমস্ত ধন সম্পত্তি দরিদ্র-বান্ধব-সমিতির হাতে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, রমণী অনেক দিন রোগযন্ত্রণায় ভুগিতেছিলেন। বরিশালের জননায়ক শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিরা তাঁহার বিপদের সময় সহায়তা করিয়াছিলেন। রমণীর মৃত্যু হইলে দরিদ্র-বান্ধব-সমিতির সভ্যগণ রমণীর দেহ সৎকার করিয়াছেন। রমণী যে ধন সম্পত্তি উইল করিয়া "দরিদ্র-বান্ধব" সমিতির হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন তাহার পরিমাণ প্রায় ২০,০০০্ হাজার টাকা।

ত্রিপুরাহিতৈষী ২রা বৈশাখ, ১৩২১।

মালদহ জেলার চাঁচলের রাজা শরচ্চন্দ্র রায় বাহাদুর তত্রত্য দাতব্য ঔষধালয়ের জন্য মঃ ৭৫০০০ পঁচাত্তর হাজার টাকা দান করিয়াছেন। গভর্ণর রাজসাহী বিভাগের কমিশনর সাহেবের নিকট হইতে এই সাধারণ-হিতকর সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার এলাকান্তর্গত ধানকুড়িয়ার জমিদার বাবু দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, বসিরহাট সবডিভিসনে একটি ঔষধালয় ও ডিসপেনসারির নিমিত্ত মঃ ২০,০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। সৎকার্য্য করিলে অবশ্য তাহার পুরস্কার পাওয়া যায়।

কাশীপুরনিবাসী, ৯ই বৈশাখ, ১৩২১।

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

(ইউরোপ ও আমেরিকার আন্তর্জাতিক মহিলা-সমিতির অভিনন্দন

অন্তরে তুমি দিলে আনন্দ—
নব আনন্দ-ধারা;
প্রাণে সুগভীর দিলে প্রশান্তি
গ্লানি-সন্তাপ-হারা।
মায়া-তুলিকায় আঁকিয়া দেখালে
আঁখিরে কত না ছবি,
বীণা-ঝঙ্কারে ছন্দের হারে
কর্ণে তুষিলে কবি!
আত্মারে তুমি যে দান দিয়েছ
সে দান সবার সেরা,—
সে তার অলোক-উদ্ভব-স্মৃতি,—
স্বর্গ-আলোকে ঘেরা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কষ্টিপাথর

বিক্রমপুর (বৈশাখ)।

ঢাকায় শিখধর্ম্মের শেষ চিহ্ন—শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শিখ-গুরু নানক সাহেবের ধর্ম্ম এক সময়ে যে ঢাকা নগ চতুর্দ্দিকে বিশেষরূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে বৃ মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায়।

ইদগার কিছুদূরে পিলখানার নিকট একটী প্রাচীন শিখ স আছে। এখানে উচ্চবেদীতে একখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নানকের পুণ্য পদ-চিহ্ন উৎকীর্ণ—উহা শিখেরা পূজা কা থাকেন। প্রাঙ্গণমধ্যে অষ্টকোণবিশিষ্ট একটি ইন্দারা দৃষ্ট হ ইহা 'গুরু নানকের কূপ' বলিয়া স্থানীয় লোকমুখে শুনি পাওয়া যায়। জনশ্রুতি যে, শিখগুরু নানক এক সময়ে ঢা আগমন করেন এবং তিনি স্বয়ং এই ইন্দারার জলপান করিয়াছিলে মহাপুরুষের স্পর্শহেতু এই কূপোদকের অলৌকিক শক্তি অ মনে করিয়া রোগমুক্তির জন্য আজিও বহু হিন্দু এখান হই জল লইয়া যান। সম্প্রতি এই ইন্দারায় একখানি প্রস্তরফ পাওয়া গিয়াছে। উহা গুরুমুখী ভাষায় লিখিত। ইহার মর্ম্ম যে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মোহান্ত প্রেমদাস এই ইন্দারা সং করাইয়াছিলেন।

গুরু নানক ঢাকা আসিয়াছিলেন একথা ইতিহাসে পা যায় না। নবম গুরু তেগ বাহাদুর সম্রাট ঔরংজেবের সময় ঢা আগমন করিয়াছিলেন, এবং তিনি এখানে বহু শিষ্যকে দী

করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাকেই সাধারণ লোকে গুরু নানক বলিয়া মনে করিয়া থাকিবে। ঘোড়দৌড়ের মাঠের নিকট একটী শিবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। শিখেরা এখানে সম্মিলিত হইয়া 'গ্রন্থ সাহেবের' পূজা করিয়া থাকেন।

প্রতিভা (বৈশাখ)।

চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার মহাশয়ের রচিত পুস্তকাবলী—

১। গনেশ-স্তোত্রম্ ২। ঈশ্বর-স্তোত্রম্ ৩। গুরু-স্তোত্রম্ ৪। দুর্গা-স্তোত্রম্ ৫। শিব-স্তোত্রম্ ৬। বিষ্ণু-স্তোত্রম্ ৭। ব্রহ্ম-স্তোত্রম্ ৮। গঙ্গা-স্তোত্রম্ ৯। কালী-স্তোত্রম্ ১০। সরস্বতী-স্তোত্রম্ ১১। ভাব-পুষ্পাঞ্জলিঃ ১২। আনন্দতরঙ্গিণী ১৩। যুবরাজ-প্রশস্তিঃ ১৪। বীর-প্রশস্তিঃ ১৫। রস-শতকম্ ১৬। প্রবোধ-শতকম্ ১৭। সতী-পরিণয়ম্ (মহাকাব্য) ১৮। চন্দ্রবংশম্ (মহাকাব্য) ১৯। কৌমুদী-সুধাকরম্ (দৃশ্যকাব্য) ২০। অলঙ্কার-সূত্রম্ ২১। কাতন্ত্রচ্ছন্দঃপ্রক্রিয়া (বৈদিক ব্যাকরণ) ২২। বেদ-প্রামাণ্যম্ ২৩। তত্ত্বাবলী ২৪। কুসুমাঞ্জলি-ব্যাখ্যাবিভাগঃ ২৫। বৈশেষিক-ভাষ্যম্ ২৬। মীমাংসাসিদ্ধান্তসংগ্রহঃ ২৭। চলসংক্রান্তিনির্ণয়ঃ ২৮। গোভিলগৃহ্যসূত্র-ভাষ্যম্ ২৯। গৃহনা-সংগ্রহ-ভাষ্যম্ ৩০। শ্রাদ্ধকল্প-ভাষ্যম্ ৩১। উদ্বাহ-চন্দ্রালোকঃ ৩২। ঔর্দ্ধদেহিক-চন্দ্রালোকঃ ৩৩। শুদ্ধিচন্দ্রালোকঃ ৩৪। আহ্নিক-চন্দ্রালোকঃ ৩৫। ব্যবহার-চন্দ্রালোকঃ ৩৬। দায়ভাগ-চন্দ্রালোকঃ ৩৭। কর্ম্মপ্রদীপ-টীকাপ্রভা ৩৮। অনুভূতি-প্রকাশ-টীকা।

বাঙ্গালা গ্রন্থ।

১। শিক্ষা ২। সত্যবতী (চম্পূ) ৩। ফেলোসিফের লেক্‌চর (১ম বর্ষ) ৪। ঐ ২য় বর্ষ ৫। ঐ ৩য় বর্ষ ৬। ঐ ৪র্থ বর্ষ ৭। ঐ ৫ম বর্ষ।

বিগত ত্রিশ বৎসরে ঢাকা জেলার স্বাস্থ্য—শ্রীবিলাসচন্দ্র দাস।

বিগত ত্রিশ বৎসরে ঢাকা জিলায় স্বাস্থ্যের অবস্থা বিষয়ে সরকারী রিপোর্টগুলিতে সাধারণতঃ দেখা যায়, পশ্চিম বাঙ্গলা অপেক্ষা পূর্ব্ববাঙ্গলার স্বাস্থ্য ভাল। এবং চট্টগ্রাম বিভাগ সব চেয়ে স্বাস্থ্যকর। ঢাকা জিলার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল। ঢাকা জিলার জন্মের হার মৃত্যুর হার অপেক্ষা বেশী। মারাত্মক ব্যাধিগুলির আক্রমণও সেই হিসাবে কম। সুতরাং ঢাকা জিলার লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ১৮৮১ খৃঃ অঃ ঢাকা জিলায় ২০ লক্ষ লোকের বসতি ছিল। ৩০ বৎসরে ১০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম দশ বৎসর পরে ২৩ লক্ষ, দ্বিতীয় দশ বৎসর পরে ২৬॥ লক্ষ এবং তৃতীয় দশ বৎসরে জনসংখ্যা ২৯॥ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক দশ বৎসর লোকসংখ্যা ক্রমান্বয়ে শতকরা ১৯, ১৫ এবং ১৩ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মোটের উপর ত্রিশ বৎসরে ঢাকা জিলায় শতকরা ৬৪ জন হিসাবে বাড়িয়াছে। এই সময়ে ময়মনসিংহে ৬৬ জন, বাখরগঞ্জে ৩২ জন, ত্রিপুরায় ৭৫ জন, পাবনায় ৮ জন, বর্দ্ধমানে ৯ জন, দিনাজপুরে ৭ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু নদিয়া, যশোর প্রভৃতি জিলায় লোকসংখ্যা শতকরা ৫ হইতে ১০ জন হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই পার্শ্ববর্ত্তী জিলাগুলির মধ্যে ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের পরেই ঢাকার স্থান। কিন্তু বিগত ১০ বৎসরে ইহার জনসংখ্যা কেন পূর্ব্বের ন্যায় বৃদ্ধি পায় নাই, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা উচিত। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি, শীতের আতিশয্য প্রভৃতির সহিত জন্মমৃত্যুহারের তারতম্য হইয়া থাকে। যে বৎসর ঢাকা জিলায় বর্ষা বেশী হয়, সেই বৎসরে মৃত্যুসংখ্যা কমে। ইহার কারণ এই যে বর্ষার জলে সমস্ত ময়লা ধুইয়া যায় এবং অতিরিক্ত আর্দ্র কিম্বা জলমগ্ন ভূমিতে মেলেরিয়ার কীটাণু জন্মিতে পারে না। ঈষদুষ্ণ আর্দ্র ভূমিই রোগকীটাণুর জন্ম ও বাসস্থান। সুতরাং বর্ষাকালই বঙ্গদেশে স্বাস্থ্যকর সময়। উহার পরে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসে বর্ষার জল সরিয়া গেলে চারিদিকে ম্যালেরিয়া জ্বর ও কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়। এই সময়টাকে যমাষ্টক বলে। চলিত কথায় যমের দুয়ার খোলা থাকে বলা হয়।

ঢাকা জিলায় বসন্তের মারী বিশেষ হয় না। কিন্তু এখানে গঙ্গা ও কাশির ব্যারাম কলিকাতা ও হাবড়া ভিন্ন অন্যান্য জিলা অপেক্ষা বেশী। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। আরো একটা গুরুতর কথা এই যে ঢাকা জিলায় আত্মহত্যার সংখ্যা ও হার, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের মধ্যে, অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত বেশী। পুরুষের দ্বিগুণ স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে। প্রতি বৎসর ঢাকা জিলায় দুই শতাধিক লোক আত্মহত্যায় মারা যায়।

দুগ্ধপোষ্য শিশুর মৃত্যুর হারও অত্যধিক। প্রত্যেক চারিটী শিশুর মধ্যে একটী ১ বৎসর মধ্যেই মারা যায়। শিশুমৃত্যুর হার বিগত ত্রিশ বৎসর একই ভাবে চলিয়াছে। পেটের অসুখ, জ্বর, সর্দ্দি কাশি এবং আঁতুড় ঘরের বন্দোবস্ত প্রভৃতি শিশুমৃত্যুর কারণ। তন্মধ্যে পেটের অসুখ কিম্বা দুধহারা রোগই সর্ব্বপ্রধান। পৈত্রিক ও মাতৃক দুর্ব্বলতাহেতুও কতক শিশু মারা যায়।

ঢাকা জিলায় প্লেগের ব্যারাম নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে—যে-সকল ইন্দুরের শরীরে প্লেগের মাছি কিম্বা পিসু থাকে, ঐরূপ ইন্দুর খোলার ঘরের চালে বাস করে। এখানে খোলার ঘরের সংখ্যা খুব কম, সুতরাং ঢাকা জিলায় সে ইন্দুর দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঢাকা জিলায় বন্যা, জলমগ্ন, ঝঞ্ঝাবাত, প্রভৃতি আকস্মিক কারণেও অপমৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। গড়পড়তায় হাজারকরা মৃত্যুর হার ২৫ হইতে ৩০ জন; কিন্তু জ্বর, কলেরা, বসন্ত ও আত্মহত্যা এইসকল কারণে মৃত্যুসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তন্মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বরই সর্ব্বপ্রধান। গত সনের সরকারী মৃত্যুতালিকায় প্রকাশ ঢাকা জিলায় হাজারকরা ১৬ জন অর্থাৎ মোট মৃত্যুসংখ্যার অর্দ্ধেকের বেশী জ্বররোগে মারা গিয়াছে। আড়াই জন কলেরা রোগে, আশি জন বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ম্যালেরিয়া রোগে দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছে। মাণিকগঞ্জ সবডিবিসন উহার প্রধান আক্রমণস্থল। তথায় বিগত ৪ বৎসর যাবৎ জ্বরের প্রকোপ পূর্ব্বাপেক্ষা কম। ১৯০৮ সনে হাজারকরা ১৬ জন, ১৯০৫ সনে ২৩ জন, এবং ১৯০১ সনে ২২ জন লোক জ্বররোগে মারা গিয়াছে। বিগত কয়েক বৎসরে কেন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম ছিল তাহা অনুসন্ধান করা উচিত। ঢাকা জিলায় ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যুসংখ্যা সমগ্র প্রদেশ অপেক্ষা সামান্য কম।

স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার কম। শতকরা ৮ জন পুরুষ বেশী মারা যায়। অর্থাৎ যে স্থলে ১০০ জন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয় সে স্থলে ১০৮ জন পুরুষ মরে। বঙ্গদেশের দেশীয় খৃষ্টানদিগের মধ্যে মৃত্যুর হার হিন্দু মুসলমানের হার অপেক্ষা কম। কিন্তু ঢাকা জিলায় সবই সমান।

জন্মের হার সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়

ঢাকা জিলায় হাজারকরা জন্মের হার প্রতি বৎসর ৩৫ হইতে ৪২ আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসেই জন্মসংখ্যা অত্যধিক। ১৮৯২-১৯০১ দশ বৎসরের গড়পড়তার হিসাবে ঐ বিষয়টা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। ফেব্রুয়ারীতে তিন জন (২.৯৮), মার্চ্চে সোয়া তিন (৩.৩১), এপ্রিলে পৌনে তিন (২.৩১), জুলাইয়ে আড়াই (২.৩৯), আগষ্টে পৌনে তিন (২.৭০), সেপ্‌টেম্বরে পৌনে তিন, অক্টোবরে সাড়ে তিন (৩.৪১), নবেম্বরে সাড়ে তিন (৩.৪১), ডিসেম্বরে সাড়ে তিন (৩.৫০), জানুয়ারীতে সোয়া তিন (৩.২৫), মোট সাড়ে পঁয়ত্রিশ (৩৫.৬) অর্থাৎ মার্চ্চ, অক্টোবর, নবেম্বর ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে জন্মসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয় মাঘ ফাল্গুন চৈত্র ও বৈশাখ মাসই অন্যান্য পশুপক্ষীর ন্যায় মানুষের গর্ভধারণের উপযুক্ত সময়। সে সময় খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষাকৃত সুলভ থাকে এবং সাধারণ স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। বঙ্গদেশের সর্ব্বগ্রাসী ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ তখন কম থাকে। এই সময় সকলে সর্ব্বাপেক্ষা সুখে কাটায়। বসন্তের আগমনে মলয়-হিল্লোল সকলের হৃদয়ে নূতন বল, নূতন আশা, নূতন ভাব জাগাইয়া তোলে।

যেমন কয়েকটী বিশেষ মাসে জন্মসংখ্যা বেশী, তেমনি কতকগুলি বিশেষ স্থানেও জন্মের হার খুব বেশী। এ বিষয়ে মধ্য প্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশ ভারতে সর্ব্ব প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে। বিহারে মুঙ্গের জিলায় জন্মের হার অত্যধিক। বঙ্গদেশে ত্রিপুরা, নোয়াখালি, নদীয়া, মালদহ ও মুরশিদাবাদ জিলায় জন্মের গড়পড়তা সবচেয়ে বেশী—হাজারকরা ৪০ হইতে ৪৪ জন। ঢাকা জিলায় বিগত পাঁচ বৎসরে হাজার লোকের সন্তানের সংখ্যা ছেলে ১৮টী ও মেয়ে ১৭টী মোট ৩৫টী। কন্যা অপেক্ষা পুত্রের জন্ম ও মৃত্যুসংখ্যা দুইই বেশী। ফলে এখানে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক পাঁচ হাজার অধিক। কলিকাতা সহরে জন্মের হার অত্যন্ত অল্প, মাত্র হাজারকরা ১৯টী। গ্রামে জন্মের হার সহরের প্রায় দ্বিগুণ। ইহার কারণ এই নয় যে সহরগুলি শিশুজন্মের প্রতিকূল স্থান, কিন্তু সহরের গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা প্রসবের সময় গ্রামে চলিয়া যাওয়ায় গ্রামের জন্মের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোটের উপর ঢাকা জিলার জন্মের হার মৃত্যুর হার অপেক্ষা হাজারকরা ৫—১০ জন বেশী। নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় বিশেষতঃ রায়পুরা থানায় জন্মের গড়পড়তা সবচেয়ে বেশী। আমার মনে হয় মুসলমানপ্রধান স্থানগুলিতে জন্মসংখ্যা বেশী।

স্বাস্থ্যনীতি পালন করিলে বহু ব্যাধির আক্রমণ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, এবং জর্ম্মানি দেশীয় বিগত অর্দ্ধশতাব্দী-ব্যাপী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও স্বাস্থ্যবিবরণ আলোচনা দ্বারা নিশ্চিত-রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে জ্বর বসন্ত কলেরা রোগগুলি নিবারণ-যোগ্য। কলিকাতা ও তৎনিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের মৃত্যু-তালিকা তুলনা করিলে দেখা যায় যে কলিকাতায় স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় উন্নত ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে উহার মৃত্যুর হার পার্শ্ববর্ত্তী হাবড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জিলার হার অপেক্ষা হ্রাস পাইতেছে।

আমাদের জানা দুই একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে স্বাস্থ্যবিধি পালন করিয়া আমরাও য়ুরোপের ন্যায় কলেরা বসন্ত, জ্বররোগগুলি কোন কোন স্থানে নিবারণ করিতে পারিয়াছি। বঙ্গদেশের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ ও বরিশাল সহরে কলেরা রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। তথায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা হেতু কলেরার প্রকোপ বহু পরিমাণে কমিয়াছে। বিগত ২০ বৎসরে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের কলেরায় মৃত্যুর হার সরকারি রিপোর্ট হইতে উল্লেখ করি[illegible]।

	১৮৯০	১৮৯৫	১৯০০	১৯০৭	১৯০৮
ঢাকা	২·৫	৭·০০	২·০০	৫	১·২৬
নারায়ণগঞ্জ	১০	১৫·০০	১১·	৩·৫	১·২০

অর্থাৎ পূর্ব্বে নারায়ণগঞ্জে কলেরায় মৃত্যুর হার ঢাকার চতুর্গুণ কিন্তু ১৯০৮ সনে নারায়ণগঞ্জে জলের কলে বিশুদ্ধ পানীয় ব্যবস্থা হওয়ায়, ঐ বৎসর হইতেই নারায়ণগঞ্জে মৃত্যুর হার অপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। গত বৎসর জলের কল হওয়ায় বরিশ পূর্ব্বের ন্যায় কলেরার প্রকোপ হয় নাই। সুতরাং বিশুদ্ধ ব্যবস্থা দ্বারা কলেরার আক্রমণ অনেক পরিমাণে নিবারণ করা সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

বসন্তব্যারাম নিবারণ করিবার জন্য গোবীজের টীকার কারিতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হই যে, যাহাদের একবারমাত্র টীকা হয় নাই ঐরূপ রোগীদের হার শতকরা ৫০ জনের উপর। যাহাদের টীকা হইয়াছে, সে রোগীদের মৃত্যুর হার শতকরা ৩০-৩৫ জন। যে-সব রোগীদের দুইবার টীকা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর শতকরা ৫-৭ জন। যাহাদের তিনবার কিম্বা ততোধিক টীকা হইয়াছিল তাহারা বসন্তে আক্রান্ত হইলে শতকরা ১ জ কম মারা যায়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি ম্যালেরিয়া জ্বরই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্ম উহাতে অর্দ্ধেক হইতে দুই-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। ম্যালে প্রধান স্থানগুলি নানা উপায়ে স্বাস্থ্যপ্রদ করা যায়। দুই এ সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। ঢাকা সিভিল ষ্টেসন হওয়ার পূর্ব্বে 'র অত্যন্ত ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থান ছিল। কিন্তু এখন জঙ্গল পরি হওয়াতে ও জলনিকাশের ব্যবস্থা দ্বারা রমণা ঢাকা সহরের সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান হইয়াছে।

কলিকাতা নানা উপায়ে ক্রমশঃ স্বাস্থ্যকর হইতেছে। চতুঃপ বর্ত্তী স্থানগুলি অপেক্ষা কলিকাতাতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অ কম।

	১৯১২	১৯০৫	১৯০১	১[illegible]
কলিকাতা—	৩·১৬	৫	৭	
২৪ পরগণা—	১৬	১৮·৭০	১৬	

বিগত ২০ বৎসরে ২৪ পরগণা জিলায় ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সমভাবেই আছে কিন্তু কলিকাতায় ক্রমশঃ কমিতেছে। সুত দেখা যাইতেছে আমাদের চেষ্টা দ্বারা ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানগুলি আমরা প্রভূত পরিমাণে স্বাস্থ্যকর করিতে পারি। স্বাস্থ্যের উ করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণের উভয়ের সাহায্যই দরকা ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্ম্মেণী সব দেশেই গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণের সাহা স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং আমাদেরও গবর্ণমেণ্ট সহিত একযোগে কার্য্য করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশে দেখাদেখি আমাদের দেশের নগরে সাধারণের টাকাতে অধিকা উন্নতি করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ লো ২৯॥ লক্ষের মধ্যে ২৮ লক্ষ লোক, গ্রামে বাস করে। গ্রামগু বড়ই অস্বাস্থ্যকর। ধনীগণ সহরে চলিয়া যাওয়াতে ঐগুলি হত হইয়াছে। সুন্দর সুন্দর দীঘিগুলি ভরিয়া যাওয়ায় গ্রামে গ্রা জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় সস্তায় মজুর পাওয়া না বলিয়া ঐ পুকুরগুলির পঙ্কোদ্ধার করা হয় না। ইহার উ ঢাকা জিলার গ্রামগুলি অতি নীচু, সর্ব্বদা ভিজা স্যাঁৎস্যাঁ থাকে—সুতরাং কলেরা ও মেলেরিয়ার আবাসস্থান। দেশের লো অগ্রসর হইয়া গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের উপায়, জঙ্গল পরিষ্কার জল নিকাশের ব্যবস্থা করিলে, জ্বর বসন্ত কলেরার প্রকোপ নিবারি হইবে। সকলেই সুস্থদেহে সুখে দীর্ঘজীবন যাপন করিতে পারি

[illegible]ওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

১৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩২১

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পরাধীনতা ও নিকৃষ্টতা। পরাধীন দেশসমূহের লোকেরা অনেক সময় এই ভাবিয়া নিরুৎসাহ, অবসন্ন, নিরুদ্যম ও কর্ম্মবিমুখ হন যে আমরা ত পরাজিত জাতি, আমাদের দ্বারা আর কি কাজ হইতে পারে? তাঁহারা পরাধীন দেশের লোক বলিয়া তাঁহারা যেন প্রত্যেকেই বিজেতা জাতিদের প্রত্যেক মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট, এইরূপ একটা ধারণা তাঁহাদের ব্যবহারে ব্যক্ত হইয়া পড়ে; কিম্বা বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও মনের কোণে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ ধারণা কখনও যুক্তিসঙ্গত নহে। পরাধীন দেশের মানুষ বলিয়া কাহারও নিরুৎসাহ, অবসন্ন, নিরুদ্যম বা কর্ম্মবিমুখ হওয়াও উচিত নহে। কারণ পরাধীনতার ইতিহাস কি? কোনও অতীত কালে কোন জাতির কতকগুলি লোক অপর এক জাতির কতকগুলি লোককে ছলে বলে কৌশলে হারাইয়া দিয়াছে। কিন্তু এই অতীত ঘটনা দ্বারা অতীত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল পর্য্যন্ত বিজিত দেশে যত মানুষ জন্মিয়াছে ও জন্মিবে, তাহারা বিজেতাদের দেশের ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ কালের প্রত্যেক মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট, ইহা কেমন করিয়া প্রমাণ হইল? হরির বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামের বৃদ্ধ প্রপিতামহকে কুস্তিতে যদি হারাইয়া থাকে, তাহা হইলে কি তজ্জন্য রামকে ও তাহার অধস্তন ৫২ পুরুষের সকল লোককে হরির ও তাহার অধস্তন ৫২ পুরুষের সকল লোকের কাছে মাথা নীচু করিয়া থাকিতে হইবে? শুধু শারীরিক বল ও কৌশলের দৃষ্টান্ত হইতেই যে আমাদের বক্তব্য সহজে বুঝা যায়, তাহা নয়; মানসিক শক্তিরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। একজন গ্রন্থকার নানা গ্রন্থ লিখিয়া মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন; একজন অধ্যাপক কঠিন কঠিন বিষয়ের অধ্যাপনা করিয়া মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের বাড়ীতে কেহবা রাঁধুনীর কাজ করিয়া, কেহ বা বাসন মাজিয়া দিন গুজরান করে। এই কারণে কি গ্রন্থকার ও অধ্যাপকের সমুদয় বংশধর অপেক্ষা পাচক ও চাকরের বংশধরেরা চিরকাল নিকৃষ্ট হইয়া থাকিবে? বাস্তবিক তাহা ত ঘটে না। অনেক বুদ্ধিমান সুপণ্ডিত লোকের বংশধর মূর্খ ও হীনাবস্থাপন্ন হইতেছে, এবং অনেক নিরক্ষর অল্পবুদ্ধি লোকের বংশধরেরা বুদ্ধিমান ও বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হইতেছে ও মাথা উঁচু করিতেছে। এক এক জন মানুষের পক্ষে যাহা সত্য, এক একটা জাতির পক্ষেও তাহা সত্য। কেননা, জাতি কতকগুলি মানুষের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু নয়। মানুষের উন্নতি উদ্যমের উপর নির্ভর করে। উদ্যম না থাকিলে স্বাধীন দেশের লোকেরাও হীন হয়, উদ্যম থাকিলে পরাধীন দেশের লোকেরাও মহৎ হয়। উদ্যমের শক্তি সকল মানুষেরই প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে।

প্রাচীন মানুষ ও প্রাচীন জাতি।

পরাধীন দেশের মানুষ মাত্রেই নিকৃষ্ট, এইরূপ যেমন একটা ধারণা আছে, তেমনি, কোন জাতি প্রাচীন হইলেই তাহার শক্তি সামর্থ্য কম হইতে থাকিবে, এই প্রকার একটা ধারণাও আছে। কিন্তু বার্দ্ধক্যে মানুষের শক্তির হ্রাস যেমন অনিবার্য্য, প্রাচীনতায় জাতিবিশেষের শক্তিহীনতা কি তেমনি অবশ্যম্ভাবী? মানুষ বৃদ্ধ হইলেই তাহার মৃত্যু হয়; এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নাই। যে জাতির সভ্যতা অতি প্রাচীন, তাহার বিলোপও কি এইরূপ সুনিশ্চিত? তাহা ত বোধ হয় না। পুরাকালে আসীরিয়া ও বাবিলোনিয়া সভ্য ও শক্তিশালী দেশ ছিল। তাহাদের সভ্যতা ও শক্তির প্রমাণ এখন মাটী খুঁড়িয়া বাহির করিতে হইতেছে। নানাবিধ মূর্ত্তিতে ও নানাবিধ শিলালিপি ও ইষ্টকলিপিতে তাহা পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ঐ দুই দেশের প্রাচীন অধিবাসীদের কি হইল, তাহাদের বংশধর কোন জাতি আছে কি না, থাকিলে তাহারা কে, এ-সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। অন্য দিকে দেখা যাইতেছে, মিশর দেশের সভ্যতা অতি প্রাচীন। মিশরের প্রাচীন ধর্ম্ম বা ভাষা এখন সে দেশে প্রচলিত নাই। কিন্তু প্রাচীন মিশরীয়দিগের বংশধরেরা এখনও সে দেশে বাস করিতেছে। এবং নব্য মিশরীয়-দিগের মধ্যে স্বদেশ-ও-স্বজাতিপ্রেম জাগিয়া উঠিয়াছে। চীনদিগের দৃষ্টান্ত হইতে প্রাচীনতা যে জাতিবিশেষের শক্তিহীনতার নামান্তর নহে, তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝা যায়। চীনের সভ্যতা অতি প্রাচীন। প্রাচীন চীন ও বর্ত্তমান চীনেরা মোটের উপর একই জাতি। আধুনিক চীন জাতি সকল বিষয়ে নিজ শক্তির পরিচয় দিতেছে। পুরাকালে গ্রীস্ ও ইটালী শক্তিশালী ছিল। এখন আবার নূতন করিয়া তাহাদের শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু অনেকে, যথেষ্ট কারণ ব্যতিরেকেই মনে করেন যে, ইউরোপে যে নিয়ম খাটে, পৃথিবীর অন্যত্র বিশেষতঃ এশিয়ায়, তাহা খাটে না। এইজন্য আমরা ইউরোপের বাহিরের দৃষ্টান্ত দিয়াছি।

বস্তুতঃ প্রত্যেক জাতিকেই কালক্রমে জরাজীর্ণ ও বিলীন হইতে [illegible] ইতিহাস এ কথা বলিতেছেন না। পৃথিবী বিলুপ্ত হইতে পারে, মানবজাতি বিলুপ্ত হই[তে] পারে; কিন্তু সে কথা স্বতন্ত্র।

কোন কোন প্রাচীন জাতির কোন জীবিত [বংশধর] পাওয়া যাইতেছে না, আবার কোন কোন প্রা[চীন] জাতি এখনও বাঁচিয়া আছে ও ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে; এরূপ কেন হয়? এক কথায় এই কঠিন প্রশ্নের উ[ত্তর] দেওয়া যায় না।

কিন্তু প্রাচীন কালে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, বর্ত্তম[ান] সময়ে দেখা যাইতেছে যে জাতীয় বিলোপ নিবারণে[র] উপায় আছে। দেশ যদি অস্বাস্থ্যকর হয়, বৈজ্ঞানি[ক] উপায়ে তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায়। ইটালী[তে] ম্যালেরিয়া খুব কমিয়া গিয়াছে। উত্তর আমেরিকা [ও] দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী পানামা যোজক খুঁড়ি[য়া] জাহাজ যাওয়া আসার জন্য একটি প্রকাণ্ড খাল কা[টা] হইয়াছে। ঐ যোজক ও তাহার নিকটস্থ স্থান-সব এরূপ অস্বাস্থ্যকর ছিল যে প্রথম প্রথম খাল কাটিবার জ[ন্য] মজুর লইয়া গেলে কয়েক মাসের মধ্যেই হাজারে কয়ে[ক] শত জ্বরে মারা পড়িত। এখন কিন্তু ঐ-সব জায়গা [খুব] স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। ইউরোপে পূর্ব্বে খুব প্লেগ হই[ত]; এখন আর হয় না। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টা[ন্ত] দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশের স্বাস্থ্যের [যে] উন্নতি হইতেছে না, তাহার কারণ যথেষ্ট উদ্যো[গ] নাই, অর্থব্যয় নাই। যদি দেখা যায় যে অন্নাভা[বে] ও সামাজিক কুপ্রথায় মানুষ ক্ষীণজীবী হইতেছে, তা[হা] হইলে তাহারও প্রতিকার মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূ[ত] নহে। যদি দেখা যায়, জ্ঞানের অভাবে মানুষ স্বা[স্থ্য] রক্ষা করিতে পারিতেছে না, কৃষি, শিল্প, বা বাণিজ[্য] দ্বারা অন্নসংস্থান করিতে পারিতেছে না, ধর্ম্মপথ চিনি[য়া] লইয়া নিজের ও দেশবাসীর ঐহিক পারত্রিক মঙ্গ[ল] সাধন করিতে পারিতেছে না, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণে[র] মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন করাও মানুষের পক্ষে অসাধ্য নহে। অন্য দেশে যে-সব উপায় অবলম্বি[ত] হইয়াছে, আমাদের দেশেও তাহা হইতে পারে।

প্রাচীন মানুষ জরাজীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কিন্তু জ্ঞান ও উদ্যোগ থাকিলে প্রাচীন জাতি নব যৌব[ন] লাভ করে।

বংশানুক্রম। শ্যামের পিতামহ জমীদার ছিলেন বলিয়া গরীব শ্যামের অন্নকষ্ট ঘুচিতেছে না। যদুর প্রপিতামহ বিদ্বান ছিলেন বলিয়া সে না পড়িয়া পণ্ডিত হইতে পারিতেছে না। তাহাদিগকে উদ্যোগ দ্বারা ধন ও বিদ্যা লাভ করিতে হইতেছে। রাজপুতেরা এক সময়ে বীর জাতি ছিল বলিয়া কেহ এখন তাহাদের ভয়ে কম্পমান হয় না। সুইডেনের দ্বাদশ চার্লস্ একদা শৌর্য্যে রুশিয়াকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া, এখন সুইডেনের রুশ-ভীতি ঘুচিতেছে না; এখন সুইডেন্‌কে রুশিয়ার গ্রাস হইতে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার আয়োজন করিতে হইতেছে। পূর্ব্বপুরুষের ভাল যাহা ছিল, তাহা আপনা হইতেই যেমন পাওয়া যায় না, মন্দ যাহা তাহাও তেমনি আমাদিগকে দুর্দ্দশায় ফেলিয়া রাখিতে পারে না। যে জাতি বীর বা জ্ঞানী ছিল, তাহা চিরকাল বিনা চেষ্টায় বীর বা জ্ঞানী থাকে না; যে জাতি ভীরু বা মূর্খ ছিল, তাহা চেষ্টা সত্ত্বেও চিরকাল ভীরু বা মূর্খ থাকে না। উদ্যোগই অভ্যুদয়ের পথ; দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।

জাতীয় চরিত্রের পরিবর্ত্তন। এমন কোন সদ্‌গুণের নাম করা বোধ হয় কঠিন হইবে, যাহার সম্বন্ধে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে উহা কেবল কয়েকটি জাতির চরিত্রে আছে, অন্যান্য জাতিদের নাই। কোন দোষের সম্বন্ধেও ইহা বলা যায় না, যে, উহা কতকগুলি জাতির আছে, অবশিষ্ট জাতি সকলের নাই। বাস্তবিক সমুদয় দোষগুণের বীজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল জাতির চরিত্রেই আছে। অথচ এইরূপ একটা ধারণা সকল দেশেই দেখা যায়, যে, জাতি-বিশেষের চরিত্র অপরিবর্ত্তনীয়। তাহাদের যে-সব দোষ আছে, তাহা বরাবর ছিল ও চিরকাল থাকিবে, এবং যে-সকল গুণ আছে, তাহাও প্রাচীনকাল হইতে আছে ও চিরকাল থাকিবে। জাতীয় চরিত্রের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে কিন্তু দেখা যাইবে যে এই ধারণা ভুল।

জার্ম্মেনীর বিখ্যাত দার্শনিক অয়কেন (Eucken) দেখাইয়াছেন যে একশত বৎসরে জার্ম্মেন জাতির চরিত্র গভীরভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রসিদ্ধ লেখিকা মাদাম দ্য স্তাএল (Madame de Stael) জার্ম্মেনদিগের বুদ্ধি এবং দার্শনিক বিচারদক্ষতার প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের কতকগুলি গুরুতর প্রকৃতিগত অভাবেরও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে কাজ করিবার মত উদ্যম ও শক্তি তাহাদের নাই। কিছু একটা লিখিতে বল, দেখিবে তাহাদের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী; তাহাদের সাহিত্যিক শক্তি সব দিকে সব বিষয়ে খেলে। কিন্তু কাজের বেলায় তাহাদের এ প্রকার সর্ব্বতোমুখী শক্তি নাই। কেজো জীবনে তাহারা নৈপুণ্যহীন, ক্ষুদ্রমনা, মন্থর-কর্ম্মী, অনড়; প্রত্যেক বিষয়ে তাহারা কেবল বাধাই দেখে, এবং তাহাদের মধ্যে যেমন ঘন ঘন "ইহা অসাধ্য, ইহা অসম্ভব" এইরূপ কথা শুনা যায়, এমন আর কোথাও নয়। যাহা কিছু বিদেশী, জার্ম্মেনজাতির তাহা আপনার প্রকৃতিসাৎ করিয়া লইবার ক্ষমতা থাকায় এবং বস্তুবিচ্ছিন্ন ভাবসকলের (Abstract ideas) সহিত অবিরাম যোগ থাকায়, তাহাদের এই এক অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে, যে, তাহারা এই (উনবিংশ) শতাব্দীর প্রাণশক্তি (spirit) দ্বারা হয়ত অনুপ্রাণিত হইবে না এবং বর্ত্তমান ও বাস্তব যাহা তাহা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

লেখিকার এই কথাগুলি লক্ষ্য করিয়া অয়কেন তাঁহার একটি প্রবন্ধে বলিতেছেন, "তখনকার জার্ম্মেনদের সহিত বর্ত্তমান কালের জার্ম্মেনদের তুলনা করিলে কি মহা পরিবর্ত্তন দেখা যায়! কারণ এখন জার্ম্মেনদিগকে, তাহাদের সৈন্যদলের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ও শিক্ষা, তাহাদের সব কাজে শক্তি ও দক্ষতা, এবং কৃষি শিল্প বাণিজ্যে অবিশ্রান্ত উন্নতি,—এই-সকলের জন্যই বিশেষভাবে বড় জাতি বলিয়া মনে হইতেছে। এখন মনে হয় যে জার্ম্মেনরা বর্ত্তমানের বাস্তব জীবনে যেন ডুবিয়া রহিয়াছে। সুকুমার সাহিত্যের অনুশীলন এখন নিম্নস্থান অধিকার করিয়া আছে; এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক এখন দার্শনিক প্রশ্নের মীমাংসা করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক।" আচার্য্য অয়কেনের সিদ্ধান্ত এই যে জার্ম্মেনদের আধুনিক

কর্ম্মবহুল জীবন অতীতের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে সম্বদ্ধ। "বহু শতাব্দী ধরিয়া আমাদের জাতি জীবনের যে বিভাগে উৎকর্ষলাভে অবহেলা করিয়াছে, তাহাতে এত শীঘ্র এত ভাল ফল তাহারা কখনই লাভ করিতে পারিত না, যদি তাহাদের বহুযুগসঞ্চিত আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্ভার এবং বুদ্ধির পুঁজি না থাকিত।"

শুনিতে পাই ভারতবর্ষের লোকের এমন সব দোষ আছে, যাহাতে তাহারা আর বড় হইতে পারিবে না। বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা বড় কর্ম্মবিমুখ, ভাবোচ্ছ্বাসপ্রবণ, হুজুকপ্রিয়, বাক্যবাগীশ, এবং নিরুদ্যম। সত্যসত্যই আমাদের এই-সব দোষ থাকিলেও নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। কোন জাতি যেদিকে যাইতে চায়, নিশ্চয়ই সেই দিকে যাইতে পারে। পথ খুঁজিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, শক্তি চাহিলেই পাওয়া যায়। কিন্তু এই চাওয়া আন্তরিক হওয়া চাই। ইহা আন্তরিক কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে, আমরা যতক্ষণ জাগিয়া থাকি, ততক্ষণ কিসের পশ্চাতে ধাবমান হই, রাত্রে স্বপ্ন দেখিলে কিসের স্বপ্ন দেখি।

স্বাবলম্বন ও সরকারী সাহায্য। দেশের অভাব নানাবিধ, দুঃখদুর্গতির অবধি নাই, কতদিকে যে উন্নতি হইতে পারে, তাহার সংখ্যা নাই। আমাদের বিরুদ্ধে একটা প্রধান নিন্দার কথা এই শুনা যায় যে আমরা সকল বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকি। এই নিন্দা কি পরিমাণে সত্য, তাহা নির্ণয় করিবার আবশ্যক নাই। পরমুখাপেক্ষী হওয়া ভাল নয়, স্বাবলম্বী হওয়া ভাল; ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু আমাদের বিপদ এই যে—অন্য সভ্যদেশের লোকে গবর্ণমেণ্টের টাকার উপরও নিজের টাকার মত দাবী করিতে পারে; আমরা চাহিলে ভিখারীর যে দশা আমাদের তাই ঘটে। ইউরোপের সভ্য দেশসকলে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতি হইয়াছে দুই প্রকারে:—(১) গবর্ণমেণ্টের টাকায়, ২) এক এক-জন ধনী লোক যাহা দিয়াছে, বা অনেকে চাঁদা করিয়া যাহা সংগ্রহ করিয়াছে সেই অর্থে। সবদেশেরই গবর্ণমেণ্টের টাকা বাস্তবিক দেশের লোকেরই টাকা; তাহারাই খাজনা দিয়া গবর্ণমেণ্টের কোষ পূর্ণ করে। আমাদের দেশে ও ঐসব দেশে প্রভেদ এই যে, তাহারা যাহা ট্যাক্স দেয়, তাহা কি কি কাজে কি পরিমাণে খরচ হইবে তাহা নিজেরাই পরোক্ষভাবে স্থির করিয়া দিতে পারে; আর আমরা শুধু দিবার মালিক, খরচ কি ভাবে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করা আমাদের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত। তাহাতে ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে ঐসব দেশে স্বাস্থ্যের জন্য, শিক্ষার জন্য, দরিদ্রের দুর্গতি নিবারণের জন্য যথেষ্ট টাকা খরচ হয়; আমাদের দেশে সৈনিক বিভাগের ব্যয়, উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের বেতন, বিলাতে অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজদের পেন্সন, ইণ্ডিয়া-আফিসের ব্যয়, ইত্যাদি বাদে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য কিছু কিছু ব্যয় হয়।

অতএব যদি আমাদিগকে কেবল স্বাবলম্বন দ্বারা পাশ্চাত্যদেশের লোকদের মত সুশিক্ষিত, সুস্থ, ও ধন-শালী হইতে হয়, তাহা হইলে তাহারা গবর্ণমেণ্টের টাকা এবং সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক দেশহিতার্থ স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান ও স্বেচ্ছাকৃত সেবা এই উভয়ের সাহায্যে যে উন্নতি করিয়াছে, আমাদিগকে কেবল স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান ও স্বেচ্ছাকৃত সেবা দ্বারাই তাহা করিতে হইবে। ইহা করা সম্ভব কি অসম্ভব তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন। কারণ, ভগবান্ সম্ভব অসম্ভব বলিয়া দুই জাতীয় কাজের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মাঝখানে একটা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর গাঁথিয়া দেন নাই। যে যত প্রেমিক ও শক্তি-শালী সে সেই পরিমাণে অসম্ভবের রাজ্যে অভিযান করিয়া সম্ভবের পতাকা উড্ডীন করে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট দেশহিতের জন্য কিছুই খরচ করিতেছেন না বা করেন নাই, তাহা নহে। যাহা খরচ করেন, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। এই জন্য যে-সব দেশে গবর্ণমেণ্ট দেশহিতার্থ যথেষ্ট টাকা ব্যয় করেন, সেই-সব দেশের লোকদের সমান উন্নতি করিতে হইলে, তাহারা দেশহিতকল্পে নিজ নিজ আয়ের ও সঞ্চিত ধনের যেরূপ অংশ দান করে, আমাদিগকে তদপেক্ষা অনেক বেশী অংশ দান করিতে হইবে; তাহারা যে পরিমাণে নিজেদের সময় ও শক্তি সমাজসেবায় নিয়োগ করে,

আমাদিগকে তদপেক্ষা অধিক সময় ও শক্তি সেবারতে উৎসর্গ করিতে হইবে। ইহাই আমাদের প্রধান সাধন হইবে।

কিন্তু গবর্ণমেণ্টকে নিষ্কৃতি দিলেও চলিবে না। সদ্ব্যয় করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ যত বাড়িবে, ততই অল্প অল্প করিয়া সদ্ব্যয় বাড়িবে। চাপ যদি কমে বা না থাকে, তাহা হইলে বাজে খরচেই অধিকাংশ বা সমস্ত টাকা ব্যয়িত হইবে। অতএব সরকারী টাকা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশহিতার্থ ব্যয় করিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য। গবর্ণমেণ্টের টাকা আমাদেরই টাকা, উহা আমরা ভিখারীর মত চাহিতেছি না, উহাতে আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী আছে, এই-সকল মত দেশমধ্যে প্রচারিত হউক। এই-সকল মত দেশবাসীর অস্থিমজ্জাগত বিশ্বাসে পরিণত হউক। সর্ব্বসাধারণের ন্যায়সঙ্গত আন্তরিক দাবী অগ্রাহ্য করিবার শক্তি কোন গবর্ণমেণ্টের নাই। সে চেষ্টা করিতে গেলে গবর্ণমেণ্টকেই পরাজিত হইতে হয়, ইতিহাস ইহাই বলিতেছে।

অন্যান্য সভ্যদেশসমূহ অপেক্ষা আমাদের দেশে কেন যে ত্যাগের ও সেবার অধিক প্রয়োজন, তাহা দেখাইয়াছি। ভগবান্ আমাদের পক্ষে ত্যাগ ও সেবা সহজতর করিয়াও দিয়াছেন। শীতপ্রধান দেশে মানুষের জীবনধারণ এক মহা সংগ্রাম; প্রচুর পুষ্টিকর উত্তাপজনক খাদ্য, যথেষ্ট শীতবস্ত্র, ভাল ঘর, এ সব না হইলে বাঁচা দায়। আমাদের দেশে জীবনধারণ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। সুতরাং কেবল বাঁচিয়া থাকার জন্য বেশী সময় ও শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় না বলিয়া আমাদের পক্ষে বিষয়সুখ ত্যাগ করিয়া সেবাব্রত ধারণ সহজতর হওয়া উচিত। সন্ন্যাসী বৈরাগী আমাদের দেশে বিস্তর আছে। কিন্তু তাহারা সকলেই ভাল লোক নহে, সেবাব্রতধারী নহে। জাতীয় আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হইলেই সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য সেবায় পরিণত হইবে।

মুসলমানের প্রতি অনুগ্রহ। বাংলা গবর্ণমেণ্ট এই হুকুম জারি করিয়াছেন, যে, সরকারী যত কেরানীগিরি চাকরী খালি হইবে, পূর্ব্ববঙ্গে তাহার এক তৃতীয়াংশ মুসলমানেরা পাইবে এবং বঙ্গের অন্যান্য স্থানে সমগ্র লোকসংখ্যার যত অংশ মুসলমান, মোট চাকরীরও তত অংশ মুসলমানেরা পাইবে।

এই হুকুম ন্যায়সঙ্গত নহে, গবর্ণমেণ্টের কাজও ইহাতে ভালরূপ হইবে না, এবং ইহা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ সালের ঘোষণাপত্রের বিরোধী; কেননা তাহাতে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে কেবল যোগ্যতা অনুসারে রাজকার্য্যে নিয়োগের অঙ্গীকার আছে।

এক-শ টি কেরানীগিরি চাকরী খালি হইলে যদি তাহার জন্য প্রার্থীদের মধ্যে ৮০ জন যোগ্য হিন্দু খৃষ্টান বৌদ্ধ থাকে, এবং ২০ জন যোগ্য মুসলমান থাকে, তাহা হইলে প্রথমোক্ত যোগ্য ৮০ জনের ১৩ জনকে বঞ্চিত করিয়া ১৩ জন অযোগ্য মুসলমানকে কেন কাজ দেওয়া হইবে? আবার যদি ৬০ জন যোগ্য অ-মুসলমান থাকে, এবং ৪০ জন যোগ্য মুসলমান থাকে, তাহা হইলে কি ঐ ৪০ জনের মধ্যে কেবল ৩৩ জনকে চাকরী দেওয়া হইবে, না ৪০ জনকেই দেওয়া হইবে? যদি ৩৩ জনকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে বাকী যোগ্য মুসলমান ৭জন কি দোষ করিল? যদি ৪০ জনকেই দেওয়া হয়, তাহা হইলে মুসলমানের বেলায় যোগ্যতা থাকিলে শতকরা ৩৩টিরও বেশী চাকরী তাহারা পাইবে, আর অমুসলমানের বেলায় যোগ্যতা থাকিলেও শতকরা ৬৭টির বেশী চাকরী তাহারা পাইবে না, ইহা কিরূপ ন্যায়-বিচার? এইরূপ নিয়ম বড় অসঙ্গত! যোগ্যতা অনুসারে যে সম্প্রদায়ের লোক যত বেশী চাকরী পাক্ না, এমন কি যদি সবগুলাই পায়, তাহাতেও কাহারও কিছু বলিবার থাকে না। যোগ্য লোক থাকিতে অযোগ্য লোক নিযুক্ত করিলে সরকারী কাজও খুব ভাল করিয়া হইবে না। আর এক কুফল এই হইবে, যে, যাহারা যোগ্যতা দ্বারা চাকরী না পাইয়া অনুগ্রহস্বরূপ পাইবে, তাহারা একটুও স্বাধীনচেতা হইবে না। ইহাও রাজকার্য্যের পক্ষে ভাল নয়। দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে এই হুকুম নূতন করিয়া অসন্তোষের সৃষ্টি করিল। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ঈর্ষা বৃদ্ধিরও ইহা একটি কারণ হইবে। স্বদেশপ্রেমিকের মনে এরূপ কারণে ঈর্ষা জন্মা উচিত নহে। কিন্তু স্থিরবুদ্ধি, দূরদর্শী লোকের সংখ্যা সব দেশেই কম।

এই আদেশ মুসলমানদের মধ্যে উচ্চতম শিক্ষালাভের আগ্রহ কিছু কমাইয়া দিতেও পারে। কারণ যদি হিন্দুর সমান যোগ্যতা না থাকিলেও চাকরী পাওয়া যায়, তাহা হইলে বেশী মুসলমান ছাত্র শিক্ষায় হিন্দুর সমান যোগ্যতা লাভ করিতে চেষ্টা করিবে বলিয়া মনে হয় না। জ্ঞানের জন্য জ্ঞান উপার্জ্জন করা উচিত, এইরূপ একটি আদর্শ সকল দেশেই আছে। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যার্থীই জীবিকার কথাটা মন হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে সমর্থ হন না। এবং জীবিকার জন্য বিদ্যার্জ্জন কিছু দোষের বিষয়ও নহে।

চৌকিদার, কনষ্টেবল, পিয়াদা, প্রভৃতি অল্পবেতন-ভোগী সরকারী চাকর ভিন্ন আর সকলকে ইংরেজী জানিতে হয়। বঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ২ জনের কম ইংরেজী জানে, মুসলমানদের মধ্যে হাজারে তিনজন। অতএব হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজীর চলন মুসলমানদের চেয়ে ছয় গুণেরও বেশী! কিন্তু চাকরী পাইবার সময় হিন্দুরা সে পরিমাণে পাইবে না।

ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের পুনর্গঠন। একদেশে বসিয়া দূরস্থিত আর এক দেশের কাজ ভাল করিয়া কখনও চালান যায় না। এইরূপে কাজ চালান আরও কঠিন হয় যদি প্রধান কর্ম্মচারীর এই দেশ সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ কোন জ্ঞান না থাকে। ভারতবর্ষ শাসনসম্পর্কে রাজার প্রধান কর্ম্মচারী সেক্রেটরী অব ষ্টেট অর্থাৎ ভারতসচিব। তিনি লণ্ডনে থাকেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার সাক্ষাৎজ্ঞান প্রায়ই থাকে না। বর্ত্তমান সেক্রেটরী একবার ভারতবর্ষ বেড়াইয়া গিয়াছেন মাত্র।

সেক্রেটরী অব্ ষ্টেট্‌কে রাজকার্য্য পরিচালনে সাহায্য করিবার জন্য ইণ্ডিয়া কৌন্সিল নামক একটি মন্ত্রীসভা আছে। তাহা পুনর্গঠিত করিবার জন্য নূতন আইন হইতেছে। তদনুসারে সভ্যসংখ্যা সাতের কম বা দশের বেশী হইবে না। তন্মধ্যে দুজন ভারতবাসী নিযুক্ত হইবেন। ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভাগুলির বেসর-কারী সভ্যেরা চল্লিশ জন যোগ্য লোকের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন। তাহার ভিতর হইতে সেক্রেটরী অব্ ষ্টেট দুই জন বাছিয়া লইবেন। এ প্রকার ছেলে-ভুলান নাম মাত্র নির্ব্বাচনাধিকারে কেহ সন্তুষ্ট হইতে পারে না। সেক্রেটরী অব্ ষ্টেট আমাদিগকে অপমানিত করিবার জন্য এইরূপ প্রস্তাব করেন নাই, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু আমাদিগকে ইংরেজেরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এইরূপ নাবালক মনে করিলে আমরা খুব গৌরব অনুভব করিয়া আনন্দে বিভোর হইতে পারি না। সমুদয় সভ্যের বেতন মাসে ১৫০০৲ করিয়া হইবে। কেবল ভারতবাসী দুইজন বাড়ী হইতে দূরে কাজ করিবেন বলিয়া ইহার দেড়গুণ, অর্থাৎ ২২৫০৲ করিয়া পাইবেন। যিনি আইনে এই ধারাটি বসাইয়াছেন, তিনি খুব চতুর লোক। কিন্তু এই কৌশলে ভারতবর্ষের লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইবে না। এই ব্যবস্থা দ্বারা ইংরেজেরা আমাদিগকে প্রকারান্তরে ইহাই বলিতেছেন যে "দেখ, আমরা যেমন তোমাদের দেশে আসিয়া তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী বেতন পাই, তোমরাও তেমনি আমাদের দেশে গিয়া আমাদের চেয়ে বেশী বেতন পাইবে।" উত্তরে আমরা বলি—

(১) তোমরা আমাদের দেশে আসিয়া যে বেতন পাও, সে টাকাটা আমরাই দি; আমাদের দেশের এই দুজনমাত্র লোক তোমাদের দেশে গিয়া যে বেতন পাইবে, তাহাও আমরাই দিব, তোমরা তাহার একটি পয়সাও দিবে না।

(২) আমাদের দেশের কেবল দুটি লোক বিলাতে গিয়া বৎসরে মোট ১৮০০০৲ টাকা মাত্র অতিরিক্ত বেতন পাইবে; আর তোমাদের দেশের শত শত লোক ভারতবর্ষে আসিয়া এই দুজনের চেয়ে অনেক বেশী হারে বেতন পায়, এবং লক্ষ লক্ষ টাকা দেশে লইয়া যায়। যত ইংরেজ ভারতবর্ষে মাসিক মোট যত টাকা ভারতবাসীর প্রদত্ত খাজনা হইতে বেতনস্বরূপ পায়, তত ভারতবাসী ইংলণ্ডে মাসিক মোট তত টাকা ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতে পাইলে বুঝিতাম ব্যবস্থাটা সমান সমান হইল। যদি কেহ বলেন,—এ বড় অদ্ভুত কথা; ইংরেজ হচ্চে রাজা, আর তোমরা হচ্চ প্রজা; তোমাদের ভালর জন্য ইংরেজরা তোমাদের দেশে আসিয়া দেশ শাসন করেন; এক্ষেত্রে সমান সমান ব্যবস্থা কেমন করিয়া হইবে? তাহার উত্তর এই, যে, বৃটিশসাম্রাজ্যের

একজনমাত্র রাজা আছেন, তিনি ইংরেজদেরও রাজা, ভারতবাসীদেরও রাজা। ইহাই আইনের কথা। কেহ যদি বলে যে ইংরেজজাতি ভারতবর্ষের রাজা, সে বে-আইনী কথা বলে; তাহার কথা অগ্রাহ্য। ইংরেজেরা ভারতবর্ষের কাজ চালানতে ভারতবর্ষের যত লাভ হয়, খুব কম করিয়া ধরিলে ইংলণ্ডের লাভ অন্ততঃ তাহার সমান সমান হয়। সুতরাং ইংলণ্ডকে ভারতশাসনের অর্দ্ধেক ব্যয় দিতে হইলে বিন্দুমাত্রও অবিচার হয় না।

(৩) ভারতবাসী দুজন মাত্র সভ্য ইংলণ্ডে ইংরেজ-সভ্যের সমান সমান কাজ করিয়া কেবল তাহাদের দেড়গুণ বেতন পাইবে। আর ভারতবর্ষে শত শত ইংরেজ, ভারতীয় কর্ম্মচারীরা যে কাজ করে ঠিক্ তাহাই বা তদপেক্ষা কম কাজ করিয়া, ভারতীয় কর্ম্মচারীদের তিন চারিগুণ বেতন পায়।

আমাদের বিবেচনায় ভারতসচিবের কৌন্সিলটি উঠিয়া যাওয়া উচিত। ভারতে প্রত্যাগত সিবিলিয়ানরাই ইহার অধিকাংশ সভ্য। তাহাদের ন্যায়ান্যায় জ্ঞানে আমাদের আস্থা নাই। তাহারা ভারতের মঙ্গল অপেক্ষা আপনাদের সম্প্রদায়ের স্বার্থ বেশী দেখে। যদি কৌন্সিল উঠিয়া না যায় তাহা হইলে ইহার সভ্যসংখ্যা অন্যূন দশ হওয়া উচিত। তাহার মধ্যে পাঁচ জন সভ্য ভারতীয় মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড সকলের বেসরকারী নির্ব্বাচিত সভ্যগণের এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নির্ব্বাচিত ফেলোদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। তিনজন সভ্য ভারত গবর্ণমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগের মধ্য হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সরকারী ও বেসরকারী সমুদয় সভ্য কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। যাঁহারা নির্ব্বাচনের সময় হইতে দুই বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে অবসর লইয়াছেন তাঁহাদের নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার থাকিবে না। বাকী দুই জন সভ্য ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা কর্ত্তৃক ইংলণ্ডীয় রাজনীতিজ্ঞদিগের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন। ভারতীয় বা ইংরেজ সকল সভ্যের বেতন সমান হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এক রাজার অধীন। ইহার যেখানেই যিনি চাকরী করুন, জন্মস্থান হইতে দূরে কাজ করেন বলিয়া বেশী বেতন পাইতে পারেন না। সেক্রেটরী অব্ ষ্টেটের বেতন ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য; কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে সহজেই পার্লেমেণ্টে তাঁহার কার্য্যের জন্য দায়ী করা যায়। তদ্ভিন্ন পাঁচ জন সভ্যের বেতনও ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতে দিলে ভাল হয়।

ভারতবাসীর পক্ষ হইতে কংগ্রেস চাহিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীরা তিন জন ভারতীয় সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন, এবং গবর্ণমেণ্ট তিন জন ভারতপ্রত্যাগত রাজভৃত্য ও তিন জন ইংলণ্ডীয় রাজনীতিজ্ঞ নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু ভারতসচিব এই ন্যায়সঙ্গত সামান্য দাবীও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সুতরাং উপরে আমরা যে প্রস্তাব করিলাম তাহাতে যে কেহ কান দিবে, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু কৌন্সিল রাখিতে হইলে ঐরূপই করা উচিত।

নূতন আইনে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে ভারত সচিব তাঁহার কৌন্সিলের সভ্যদিগকে না জানাইয়া গোপনীয় বিষয় সম্বন্ধে আদেশ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইতে পারিবেন। ইহা বড় সাংঘাতিক ব্যবস্থা। পরামর্শ করিবার জন্যই ত কৌন্সিল। কোন্ বিষয়টি যে গোপনীয় নহে, তাহা ঠিক্ করিয়া বলাও কঠিন। সুতরাং, বিস্তর টাকা বেতন দিয়া ১০ জন সভ্য রাখা হইবে, অথচ ভারত-সচিব প্রয়োজনমত তাঁহাদের পরামর্শ না লইয়াও কাজ করিতে পারিবেন, এরূপ অসঙ্গত ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। এখন সপ্তাহে একদিন কৌন্সিলের অধিবেশন হয়। নূতন আইন অনুসারে ভারত-সচিবের ইচ্ছানুসারে অধিবেশন হইবে। ইহাতেও তাঁহার ক্ষমতা বাড়াইয়া দিয়া কৌন্সিলের আবশ্যকতা কমান হইতেছে। এত বড় একটা দেশ, প্রায় ৩২ কোটি যাহার অধিবাসী, তাহার কাজ চালাইবার জন্য অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন সভা না বসিলে, অনেক গুরুতর বিষয়ে একা ভারত-সচিব বা এক এক জন সভ্য হুকুম দিবেন। কারণ, প্রস্তাব হইতেছে যে এক এক জন সভ্যকে এক একটা বিভাগের কর্ত্তা করা হইবে। ইহাতে ভারতশাসন স্বেচ্ছাকারী এক এক জন বৃদ্ধ সিবিলিয়ানের একচেটিয়া হইবে। তাহাতে কখনও সুফল হইবে না।

প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার বিস্তৃতি। তিব্বত চীন, জাপান, শ্যাম, কাম্বোডিয়া, আনাম, জাভা, প্রভৃতি দেশ পুরাকালে হিন্দু সভ্যতার প্রভাবে সভ্য হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ অনেক পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বলি দ্বীপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কিয়দংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মধ্য এশিয়ার বালুকাচ্ছন্ন মরুময় দেশসমূহের ভূগর্ভে চিত্র, পুঁথি ও মূর্ত্তিতে ভারতীয় সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

বিখ্যাত পর্য্যটক ও আবিষ্কারক ডাক্তার ভন্ ল্য কক্ (Dr. Von Le Coq কিছুদিন হইতে চীন-তুর্কিস্তানে ভূগর্ভ হইতে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের উপকরণ উত্তোলনে ব্যাপৃত ছিলেন, তিনি তাঁহার সংগৃহীত নানাবিধ সামগ্রী ১৫২টা বড় বড় বাক্সে বন্ধ করিয়া দেশে পাঠাইয়াছেন। তিনি মরালবাশীর নিকটস্থ কুবা এবং টুমশুগ্ নামক দুটি জায়গায় কাজ করিয়াছিলেন। মরালবাশীতে তিনি অনেকগুলি খাঁটি গান্ধার তক্ষণশিল্পের নমুনা পাইয়াছেন। কিন্তু এগুলি পাথর খুদিয়া প্রস্তুত করা হয় নাই, মাটী দিয়া গড়িয়া চূনবালীর আস্তর দেওয়া হইয়াছে। অনেকগুলির উপর এখনও রং এবং সোনার পাত লাগিয়া আছে। অনেকগুলির ছাঁচ নিকটেই পাওয়া গিয়াছে। ডাক্তার লে কক্ বহুসংখ্যক হস্তলিখিত পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা, অপর গুলি ইরাণীয় ভাষাবিশেষে লিখিত।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পাহাড় পর্ব্বত সমুদ্র মরুভূমি পার হইয়া কত দেশে হিন্দুসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। আর আমরা নিজের দেশের জ্ঞানের অভাবই দূর করিতে পারিতেছি না। তাঁহারা যে একটা বড় জাতি ছিলেন, ইহাই তাহার প্রমাণ।

বড় জাতি। বড় জাতির লক্ষণই এই যে তাহারা যে কেবল নিজের দেশের সর্ব্ববিধ অভাব নিজেই পূরণ করিতে পারে, তাহা নয়; প্রয়োজন হইলে অন্য দেশেও ধর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর ও কর্ম্মবীরদিগকে প্রেরণ করিতে পারে। ভারতের যখন সুদিন ছিল, তখন ভারতবাসী নানা দেশে গিয়া তদ্দেশবাসীদিগকে নানা শিল্প, নানা বিদ্যা শিখাইয়াছে; তখন কত দেশ হইতে ভারতের তক্ষশিলা, নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রেরা জ্ঞান লাভ করিতে আসিত, কত পর্য্যটক ভারত ভ্রমণ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় ও বিদ্যা অর্জ্জন করিত। এখন অন্য দেশের লোকেরা ভারতে আসিয়া আমাদিগকে বিদ্যাভিক্ষা দেয়, শিক্ষার জন্য আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হয়। এখন বিদেশীরা ধর্ম্ম বা বিদ্যালাভের জন্য এদেশে আসে না, আসে ধনী হইবার জন্য।

পারস্যের অর্থসচিবের প্রয়োজন হইল, আসিল এক জন আমেরিকার বা ইউরোপের লোক; সৈনিকদিগকে যুদ্ধ শিখাইবার প্রয়োজন হইল, আসিল সুইডেন হইতে সেনাপতি। তুরস্কের সৈনিকদিগকে যুদ্ধশিক্ষা দিল, জার্ম্মেনীর লোক। জাপানকে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষা দিল, আমেরিকান, ইংরেজ,- ফ্রেঞ্চ, ও জার্ম্মেনরা। তাহাদের সৈনিকদিগকে যুদ্ধ শিখাইল প্রধানতঃ জার্ম্মেনরা। বৈদ্যুতিক আলোকের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এঞ্জিনীয়ার আসিল বিলাত হইতে। এখন ইউরোপ আমেরিকা নিজের নিজের অভাব পূরণ করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র যোদ্ধা, এঞ্জিনীয়ার, বণিক্, অর্থনীতিজ্ঞ, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক, কারীগর, ধর্ম্মপ্রচারক, প্রভৃতি পাঠাইতেছে। এখনও ৫০ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, জাপান আধুনিক জ্ঞানলাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইতিমধ্যেই চীন ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ হইতে তথায় ছাত্র যাইতেছে। ইতিমধ্যেই জাপান আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মত জ্ঞানকেন্দ্রে অধ্যাপক যোগাইয়াছে, এবং নানা বিষয়ে আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছে।

ভারতবর্ষ কবে আবার নিজ অভাব নিজেই দূর করিয়া পৃথিবীকে জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে ঐশ্বর্য্যশালী করিবে?

বঙ্গের জেলাভাগ। মেদিনীপুর, মৈমনসিং, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, প্রভৃতি জেলাকে বিভক্ত করিয়া নূতন নূতন জেলার সৃষ্টি করিবার প্রস্তাব হইতেছে। মৈমনসিং জেলাকে তিনভাগে এবং অন্যগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইবে, শুনিতেছি। কারণ নাকি এই, যে, এখন মাজিষ্ট্রেট সমস্ত জেলার সঙ্গে সংস্পর্শ রাখিয়া ভাল করিয়া কাজ চালাইতে পারেন

না। রেল ষ্টীমারের বন্দোবস্ত যখন খুব কম ছিল বা ছিলই না, তখন মাজিষ্ট্রেটরা কাজ চালাইতে পারিতেন, এখন পারেন না, তাহার অর্থ কি? যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে পারেন না, তাহারও ত সহজ প্রতীকার এই যে, যেখানে যেরূপ উপায় সম্ভবপর, সেখানে রেল বা ষ্টীমারের বা উভয়ের বন্দোবস্ত করিয়া যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দাও, বিচার ও শাসনবিভাগ পৃথক্ করিয়া মাজিষ্ট্রেটকে বিচারকার্য্যের দায়িত্ব হইতে মুক্ত কর, স্বায়ত্তশাসনের বিস্তার দ্বারা মাজেষ্ট্রেটের হাত হইতে বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ উঠাইয়া লইয়া তাহা দেশের লোকের হাতে দাও, এবং যদি তাহাতেও কাজ না চলে, তাহা হইলে ২।১ জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাড়াইয়া দাও। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন, তখন বৃটিশশাসিত ভারতের আয়তন যাহা ছিল, এখন ১৪০ বৎসর পরে তাহা অপেক্ষা কত বাড়িয়াছে। কিন্তু গবর্ণর-জেনেরাল সেই এক জনই আছেন, কেবল অধস্তন কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। জেলাগুলি যেমন ছিল, তেমনি রহিয়াছে, বিশেষ কিছু হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই। অথচ একজনের যায়গায় ২ জন বা ৩ জন করিয়া মাজিষ্ট্রেট জজ আদি বাড়াইতে হইবে কেন বুঝা যায় না। আমরা এইরূপ জেলা বিভাগের সম্পূর্ণ বিরোধী। টাকা নাই, এই ওজুহাতে গবর্ণমেণ্ট দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু জেলা ভাগ করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা নূতন আফিস আদালত ও জজ মাজিষ্ট্রেট আদির বাসগৃহ নির্ম্মাণে এককালীন ব্যয় করিতে পারিবেন, এবং এক এক জন জজ, মাজিষ্ট্রেট্, জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট্, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, প্রভৃতি কর্ম্মচারীর স্থলে দুই বা তিন জন করিয়া ঐরূপ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে মাসে মাসে হাজার হাজার টাকা বেতন দিতে পারিবেন। জেলা ভাগ করিলে ইংরেজদের জন্য উচ্চ বেতনের আরও অনেকগুলি চাকরী বাড়িবে। এটি তাঁহাদের লাভ। কিন্তু দেশের লোকের ইহাতে কি সুবিধা হইবে? যে টাকা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য খরচ হওয়া উচিত, তাহা ইট চুন লোহার কড়ি ও কাঠের দরজা জানালায় এবং ইংরেজকে উচ্চ বেতন দানে নিঃশেষ হইবে।

অনেক জেলার সদর সহরে সমস্ত জেলার লোকের দেশহিতৈষিতার ফলে এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাহাদেরই প্রদত্ত অর্থে স্কুল, কলেজ, জলের কল, হাঁসপাতাল আদি স্থাপিত হইয়াছে। সমস্ত জেলা হইতে নানা বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে লোকেরা আসিয়া সদরে অল্লাধিক সময় ক্ষেপণ করে, তাহাদের ছেলেরা তথায় শিক্ষা পায়। জেলা ভাগ হইলে অনেকে এই সব সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে। নূতন জেলার নূতন কেন্দ্রে আবার নূতন করিয়া সভ্য সমাজের উপযোগী শিক্ষালয়, চিকিৎসালয় আদি স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের লোকের কত টাকাই বা আছে, এবং যদি জেলাগুলির সীমা ও সদর সহর পুনঃ পুনঃ বদল হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে লোকের টাকা দিবার উৎসাহই বা থাকিবে কেমন করিয়া? তদ্ভিন্ন লোকসমষ্টি যত বড় হয়, একপ্রাণ হইলে তাহারা তত বড় কাজ করিতে পারে। অখণ্ড জেলার পক্ষে যে কাজ করা সম্ভব, —দৃষ্টান্ত স্বরূপ, জেলার অন্ততঃ একখানি ভাল খবরের কাগজ চালাইয়া রাজপুরুষদের এবং দেশের মতের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব,—বিভাগজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলার পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। মানুষ নিজের গৃহ পরিবার, নিজের পাড়া, নিজের গ্রাম, নিজের সহর, নিজের জেলা, নিজের প্রদেশ, ও নিজের দেশকে ভালবাসে, এবং কোন-না-কোন কারণে তাহার গৌরব করে। এই যে ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সমষ্টি এবং স্থান সম্বন্ধে প্রেম ও গৌরববোধ, ইহা মানুষের অশেষ কল্যাণের আকর। ইহাকে ভাবুকতা বা কবিকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সহজ। কিন্তু যে-সব দেশের লোক স্বাধীন, তাহাদের দেশে প্রদেশের বা জেলার সীমায় এক বার হাত দিতে যাও দেখি,—ওয়েল্‌সের কতকটা অংশকে ইংলণ্ডের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া বল ইহা ওয়েল্‌স্ নয়, ইংলণ্ড; আলষ্টরের কতকটা অংশ কাটিয়া লইয়া বল ইহা মানষ্টার, সসেক্সের কতকটা অংশ কাটিয়া লইয়া বল ইহা এসেক্স,— দেখিতে পাইবে মানুষের এই স্থানিক নামের প্রতি অনুরাগ কি প্রবল।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ইংরেজদের মুখে এই ধুয়া শুনা যায়, যে, দেশে বড় অশান্তি (unrest) হইয়াছে। কিন্তু মানুষকে উদ্বিগ্ন ও অস্থির করিয়া তুলিয়া যদি অশান্তির সৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে উপায় কি?

"কোমাগাতা মারু।" বৃটিশ সাম্রাজ্যের এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরের যে-কোন জাতির ধর্ম্মের বা বর্ণের সুস্থ বা অসুস্থ সৎ বা অসৎ, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যে-কোন লোক ভারতবর্ষে আসিতে পারে। কিন্তু আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলিতে অবাধে যাইতে পারি না। কানাডা একটি এইরূপ উপনিবেশ। তথাকার শ্বেতকায় লোকেরা ভারতবাসীদিগকে সে দেশে গিয়া উপার্জ্জন করিতে দিতে চায় না। যাহাতে আর বেশী ভারতবাসী সে দেশে যাইতে না পারে, এবং যাহারা গিয়াছে, তাহারা পলাইয়া আসিতে বাধ্য হয়

তাহার জন্য কানাডার লোকেরা নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছে। প্রথমে যাহারা গিয়াছিল, তাহারা সঙ্গে বাড়ীর মেয়েদের লইয়া যায় নাই। তাহারা এখনও প্রায় সকলেই মাতা স্ত্রী ভগিনী কন্যার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ ভাবে মানুষ চিরকাল থাকিতে পারে না। থাকিলেও, ক্রমশঃ নির্ব্বংশ হইয়া সকলে লোপ পাইবে। ভারতবর্ষের পুরুষ বা নারীর আগমন বন্ধ করিবার প্রধান উপায় কানাডা এই করিয়াছে, যে, যাহার যে দেশে বাড়ী তথা হইতে বরাবর একই জাহাজে সে যদি কানাডা না আসে, তাহা হইলে তাহাকে নামিতে দেওয়া হইবে না। ভারতবর্ষ হইতে একায়িক কানাডা যাইবার কোন জাহাজ না থাকায় এই কৌশলে ভারতবাসীদের কানাডা যাওয়া বন্ধ ছিল। এই কৌশল ব্যর্থ করিবার জন্য সর্দ্দার গুরুদিৎ সিং নামক একজন স্বদেশপ্রেমিক পাঞ্জাবী স্বয়ং "কোমাগাতা মারু" নামক একটা জাপানী জাহাজ ভাড়া করিয়া প্রায় ৬০০ ভারতবাসীকে একায়িক কানাডা লইয়া গিয়া তথাকার ভ্যাঙ্কুবর নামক বন্দরে উপস্থিত করিয়াছেন। এদিকে কানাডা গবর্ণমেণ্ট আর এক হুকুম প্রচার করিয়াছেন যে আপাততঃ বিদেশ হইতে কোন মজুর বা কারীগর কানাডা আসিতে পারিবে না। এই হুকুম প্রথমে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল; এখন সময় বাড়াইয়া দিয়া ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বলবৎ রাখা হইবে। সুতরাং ঐ ৬০০ যাত্রী একায়িক কানাডা গিয়া থাকিলেও, তাহাদের প্রায় সকলেই মজুর বা কারীগর বলিয়া জাহাজ হইতে নামিতে পাইবে না। সর্দ্দার গুরুদিৎ সিং এই কৌশলেও নিরস্ত হন নাই। তাঁহার জাহাজের ১০০ জন যাত্রী শিখধর্ম্ম-প্রচারক রূপে গিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে শিখদের ধর্ম্মগ্রন্থ "গ্রন্থসাহেব" আছেন। কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশে নানাস্থানে ছয়টি শিখ ধর্ম্মমন্দির আছে। তাঁহারা এই ছয় মন্দিরে "গ্রন্থসাহেব" প্রদর্শন, সম্বর্দ্ধনা ও পাঠ করিবেন। তাঁহাদিগকে যদি কানাডা প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সম্ভবত বিচারালয়ে এই যুক্তি উপস্থিত করিয়া লড়িবেন যে, খৃষ্টীয় নানা প্রচারকদলকে কেন কানাডা আসিতে দেওয়া হয়? ভ্যাঙ্কুবরের হিন্দুরা বলিয়াছেন যে বিচারালয়ের শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত জাহাজের হিন্দুদিগকে নামিয়া সহরে থাকিতে দেওয়া হউক। তজ্জন্য তাঁহারা তিন লক্ষ টাকা জামীন দিতে রাজী আছেন। বিলাতের প্রিভি কৌন্সিল পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চলিবে। গুরুদিৎ সিং চাহিয়াছিলেন যে রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত করিয়া হিন্দুদের দাবীর ও কানাডার আপত্তির মীমাংসা করা হউক। কিন্তু কানাডা গবর্ণমেণ্ট তাহাতে রাজী হন নাই। ৯০ জন যাত্রীকে, ডাক্তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া, কানাডায় প্রবেশ করিবার অনুপযুক্ত বলিয়াছেন। এই এক প্রতিবন্ধক। ১৩ জন পূর্ব্বে কানাডায় ছিল বলিয়া তাহাদিগকে নামিতে দেওয়া হইয়াছে। গত ৪ঠা জুন খবর আসিয়াছে যে, জাহাজের যাত্রীরা ২ দিন উপবাসী আছে, জলও পায় নাই বলিয়া রাজা পঞ্চম জর্জ্জকে ও ডিউক অব্ কনটকে টেলিগ্রাফ করিয়াছে। তাহারা বড় অশান্ত হইয়া উঠিতেছে। তাহারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ও সভ্য-জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য অনাহারে হত্যা দিয়া থাকিবে।

এই সংগ্রামে গুরুদিৎ সিংহ ও তাঁহার সহযাত্রীরা জয়ী হউন, এই কামনা (অল্পসংখ্যক নিমকহারাম ভীরু তোষামোদকারী ভিন্ন) প্রত্যেক ভারতবাসীই করিবেন। ব্রিটিশসাম্রাজ্যের যে-কোন অধিবাসীর ইহার যে-কোন অংশে অবাধ যাতায়াত ও বসবাসের অধিকার থাকা উচিত। নতুবা ইহা নামে মাত্র সাম্রাজ্য। যদি সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশ ভারতবর্ষের লোকদিগকে নিজ সীমার বাহিরে রাখিবার অধিকার পায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষেরও ঐ-সকল স্থানের লোকদিগকে বাহিরে রাখিবার অধিকার থাকা উচিত। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারী সভ্যগণ ঐ প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ উপস্থিত করুন, যে-সকল ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতবাসীদিগকে তথায় যাইতে দেয় না, তাহাদের অধিবাসীরাও ভারতবর্ষে আসিতে পাইবে না, এবং তথা হইতে ভারতবর্ষে যে-সকল পণ্যদ্রব্য আসিবে, তাহার উপর শুল্ক আদায় করা হইবে। আমরা স্বদেশে শক্ত অর্থাৎ শক্তিশালী হইতে না পারিলে বিদেশে কেন লোকে আমাদিগকে সম্মান করিবে বা ভয় করিবে? যাহারা সুস্থ, সুশিক্ষিত ও একপ্রাণ নয়, তাহারা শক্তিশালী হইতে পারে না।

কবিতার আদর। আমেরিকার পুস্তক প্রকাশক ম্যাকমিলন কোম্পানীর সভাপতি জর্জ ব্রেট বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান সময়ে সকল প্রকার সাহিত্যের মধ্যে কবিতারই বিক্রী বেশী। উপন্যাসের কাটতি খুব ছিল; কিন্তু এখন যে-কোন উপন্যাস বায়োস্কোপে দেখান যায়। কবিতা ত বায়োস্কোপে দেখাবার জিনিষ নয়।

ব্রেট্ বলেন, যাঁহার খাঁটি কবিপ্রতিভা আছে, তাঁহার এখন যত শ্রোতা জুটিবে, পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও তত বেশী শ্রোতা কোন সাহিত্যিকের জুটে নাই। অন্যান্য গ্রন্থকারের মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম করিয়া বলেন, "যে-সব উপন্যাসের কাট্‌তি খুব

বেশী, ইঁহার কাব্যগ্রন্থের বিক্রী তার চেয়েও বেশী। তাঁহার "Gardener"এর বিক্রী আমেরিকাতেই এক লক্ষের উপর হইয়াছে। লোস্ এঞ্জেলীস্ সহরের একজন পুস্তকবিক্রেতাই ঐ বহি ৫০০০ খানা বিক্রী করিয়াছে। টেনিসনের খ্যাতি প্রতিপত্তি যখন চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল, তখন তাঁহার এক এক খানি নূতন কাব্যগ্রন্থ বাহির হইবামাত্র ইউরোপ আমেরিকা উভয় মহাদেশে কথা-প্রসঙ্গের বিষয় হইয়া উঠিত। তাহার পর আর কাব্যগ্রন্থের বিক্রী কখনও বর্ত্তমান সময়ের মত হয় নাই।" রবিবাবুর Gardener কয়েক মাস মাত্র বাহির হইয়াছে।

আমাদের দেশে সর্ব্বসাধারণের পাঠ্য নানাবিধ পুস্তকের মধ্যে কাব্যগ্রন্থের বিক্রীই সর্ব্বাপেক্ষা কম।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। "বঙ্গদর্শন"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হইলাম। তিনি বসন্ত রোগে প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি "ইন্দু" নামক উপন্যাস এবং "চিত্রবিচিত্র" নামক ছোট গল্পের বহি লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। "প্রদীপ" মাসিক-পত্রে তিনি "কলিকাল" নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন "নীলকণ্ঠ" প্রভৃতি দুই এক খানি উপন্যাস আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। "চিত্রবিচিত্র" বহিখানিতে উকীল, উমেদার, সম্পাদক, ব্যারিষ্টার, হাতুড়ে ডাক্তার প্রভৃতির চিত্র বেশ সুন্দর হইয়াছে। শৈলেশবাবু পরিহাসরসিক ছিলেন। এই রসিকতা "চিত্রবিচিত্র" বহিখানিকে উপভোগ্য করিয়াছে।

শৈলেশ বাবু বঙ্গদর্শনের নবপর্য্যায়ে প্রথমে রবীন্দ্রনাথের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। পরে রবিবাবু উহার সম্পাদকতা ত্যাগ করিলে তিনিই সম্পাদক হন। কিছুকাল "সমালোচনী" সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি "সাহিত্যসম্মিলনী" নামে একটি সাহিত্য আলোচনার সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার যে কয়টি অধিবেশন হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রজনীকান্ত সেন, মোহিতচন্দ্র সেন, প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ যোগ দিয়া প্রবন্ধ পাঠ, গান, গল্প, আলোচনা করিতেন, এবং নব্য লেখকদিগের সঙ্গে পরিচয় করিতেন। রবিবাবুর শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি এই সভায় পঠিত হয়।

শৈলেশবাবু বেশ অমায়িক ও মিশুক লোক ছিলেন।

বঙ্গের স্বাস্থ্য। উন্নতি করা দূরে থাক্, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যতিরেকে কোন জাতি টিকিয়াও থাকিতে পারে না। বঙ্গে শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে প্রায়ই লিখিয়া থাকি। এখন স্বাস্থ্যের কথা কিছু লিখি। ১৯১৩ সালের স্বাস্থ্যবিবরণী এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ১৯১২র রিপোর্ট হইতে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

১৯১২ সালে বঙ্গে ১৬,০০,৩৩৫ জনের জন্ম ও ১৩,৪৯,৭৭৯ জনের মৃত্যু হয়। তাহার পূর্ব্ব বৎসর ১৫,৮৫,১৮৭ জনের জন্ম ও ১২,২১,৫৮০ জনের মৃত্যু হয়।

১৯১২ সালে জন্মের হার হাজারকরা ৩৫·৩ এবং মৃত্যুর হার ২৯·৭৭ ছিল। ঐ বৎসর অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশের সঙ্গে বঙ্গের জন্মমৃত্যুর হারের তুলনা নীচের তালিকার সাহায্যে করা যায়।

প্রদেশ	হাজারকরা জন্মের হার	হাজারকরা মৃত্যুর হার
বঙ্গ	৩৫·৩	২৯·৭৭
মধ্য প্রদেশ	৪৮·২২	৪২·৩৫
পঞ্জাব	৪৫·৩	উল্লেখ নাই
যুক্তপ্রদেশ	৪৫·৩৮	২৯·৯১
বিহার ও উড়িষ্যা	৪২·৫২	৩১·০১
মান্দ্রাজ	৩০·৯	২৪·৩
বোম্বাই	উল্লেখ নাই	৩৪·৮৮

দেখা যাইতেছে যে মধ্যপ্রদেশে জন্ম ও মৃত্যু উভয়েরই হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং মান্দ্রাজে উভয়েরই হার সর্ব্বাপেক্ষা কম। গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বসাধারণ স্বাস্থ্যবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া তৎপ্রতি মনোযোগী হইলে মৃত্যুর হার কিরূপ কমিতে পারে, পাশ্চাত্য সভ্যদেশসমূহে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। তথায় ১৯১০ সালে মৃত্যুসংখ্যা হাজারে ১৫ মাত্র ছিল।

বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় হাজারকরা জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা নীচে দেওয়া গেল।

জেলা	জন্মের হার	মৃত্যুর হার
বর্দ্ধমান	৩০·২৭	৩১·৭৮
বীরভূম	৩৪·৩২	৩৪·৫১
বাঁকুড়া	৩৫·৭৭	২৯·৬৮
মেদনীপুর	৩১·৮৩	৩৩·৬২
হুগলী	৩১·৫৯	৩৫·১৬
হাবড়া	৩৩·০৫	২৮·১৯
২৪ পরগণা	২৯·৫৮	২৭·২৬
কলিকাতা	২১·৬৭	২৮·১৩
নদীয়া	৩৮·৯৫	৩৭·১৬
মুর্শিদাবাদ	৪৩·২৯	৩৬·৯৪
যশোর	৩২·৮৫	৩৩·৯৯
খুলনা	৩৯·৪৯	৩০·১১
রাজশাহী	৪১·৫৬	৩৬·৪৮
দিনাজপুর	৩৯·৫৮	৩৯·৭১

জেলা	জন্মের হার	মৃত্যুর হার
জলপাইগুড়ী	৩৫·৩২	৩৬·৩৮
দারজিলিং	৩৪·৭১	৩৭·১৩
রংপুর	৩৬·৩০	২৯·২২
বগুড়া	৩৭·২৮	২২·১৯
পাবনা	৩৭·০৪	২৬·৪৭
মালদহ	৩৬·৩৬	৪৩·৩৬
ঢাকা	৩৪·৮৭	২৭·২৯
মৈমনসিং	৩০·৬৮	২০·০৬
ফরিদপুর	৩৮·৬৫	৩০·৭১
বাখরগঞ্জ	৪০·৪০	২৯·৭৭
চট্টগ্রাম	৪০·৮৪	২৮·১৭
নোয়াখালী	৪৪·৪১	২৬·৪৪
ত্রিপুরা	৩১·২০	২১·৫২

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে বৰ্দ্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলী, কলিকাতা, যশোর, জলপাইগুড়ী, দারজিলিং ও মালদহে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু অধিক হইয়াছে। মালদহের মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং মৈমনসিংহ ও বগুড়ার সর্ব্বাপেক্ষা কম।

সহরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মৃত্যুর হার মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার (৫০·৯৭); তাহার পর যথাক্রমে ঐ জেলার ঘাটালের (৫০·৭২), মালদহের (৪৯·০৬) মেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুরের (৪৪·৩৩), এবং কার্সিঅঙের (৪৪·৩১)। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে যে যে স্থানে মৃত্যু খুব বেশী হইয়াছে, তাহাদের নাম :—চব্বিশ-পরগণায় টালিগঞ্জ ৮৭·৫২; মুর্শিদাবাদে আসানপুর ৭০·০৫; মালদহে ইংরেজবাজার, গোমাস্তাপুর ও নবাব-গঞ্জ ৫০এর উপর; সিলিগুড়ি ৫০এর উপর; ঘাটাল ৫০এর উপর।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লোক মরিয়াছে জ্বরে; তাহার পর যথাক্রমে ওলাউঠায়, আমাশয় ও উদরাময়ে, আঘাতে, শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায়, বসন্তে এবং প্লেগে।

সকল বয়সেই স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মৃত্যু বেশী হয়।

মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হিন্দুদের মধ্যে (৩১·০৯); তাহার পর মুসলমান (২৮·৬০) বৌদ্ধ (২৪·৪৮) এবং খৃষ্টিয়ানদের (২০·৮৩) মধ্যে।

মৈমনসিংহে প্রাথমিক শিক্ষা।

কুমিল্লায় গত প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ মহাশয় প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সারবান্ বক্তৃতা করেন। তিনি তাহাতে ঢাকা বিভাগের তাৎকালীন কমিশনার বীট্‌সন্ বেল সাহেবের ১৯১৩ আগষ্টের এক রিপোর্ট হইতে দেখান যে মৈমনসিংহে জেলাবোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের ও ছাত্রের সংখ্যা যথাক্রমে ১৪৬ ও ৭,৮৭৫ হইতে কমিয়া ১০৩ ও ৫,৭৯৮ হইয়াছে। নিম্নপ্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ২,০৫৯ হইতে ১,৪৫১এ নামিয়াছে এবং ছাত্রের সংখ্যা ৬৮,০০২ হইতে কমিয়া ৪০,১৭৭ হইয়াছে।

এইরূপে পাঠশালা ও ছাত্রের সংখ্যা কমিয়া যাওয়া অত্যন্ত দুর্লক্ষণ। দেশের লোকসংখ্যা কমে নাই, বাড়িয়াছে; লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা কমে নাই, বাড়িতেছে। সহকারী ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেব পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষের আয়ব্যয়ের আলোচনার সময় বলিয়াছিলেন যে শতকরা ৭৫ টি করিয়া স্কুল বাড়ান হইবে, অর্থাৎ যেখানে ১০০ স্কুল আছে তথায় ১৭৫ টি হইবে। কিন্তু সে কোন্ শতাব্দীতে হইবে? আপাততঃ ত বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হইতেছে। মৈমনসিংহের নমুনা বড় ভয়ের কারণ। শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীরা বলিতে পারেন, বহুসংখ্যক মন্দ বা চলনসই স্কুলের পরিবর্ত্তে অল্পসংখ্যক উৎকৃষ্ট স্কুল চালান ভাল, অনেক ছাত্রকে অপকৃষ্ট রকমে না শিখাইয়া তার চেয়ে কম ছাত্রকে উৎকৃষ্টরূপে শিখান ভাল, বহুসংখ্যক অল্প-বেতন-ভোগী অনিপুণ শিক্ষকের চেয়ে অল্পসংখ্যক যথেষ্ট-বেতন-ভোগী সুদক্ষ শিক্ষক ভাল। আমরা এসব বাজে কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারি না। দেশের সমুদয় বালক বালিকাকেই ভাল স্কুলে কার্য্যক্ষম শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা দেওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, এবং এই কর্ত্তব্য সভ্য দেশের গবর্ণমেণ্ট-সকল পালন করিতেছেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টও ইহা করিতে বাধ্য। একটা গ্রামের ছেলেরা ভাল স্কুলে পড়িবে, আর একটা গ্রামে মোটেই স্কুল থাকিবে না; ইহা হইতে পারে না। সকলেই খাজনা দেয়, সবাই রাজার প্রজা, সকলেরই শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য। ইহা অনুগ্রহ নহে। শিক্ষা পাইতে সকল প্রজার সন্তানদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে! নিশ্চিন্তপুর গ্রামের রামের ছেলেরা ভাল গুরুমহাশয়ের কাছে পড়িতেছে, ইহা শুনিয়া পাঠশালাবিহীন বিদ্যা-গঞ্জের শ্যামের কি লাভ হইবে? তাহার ছেলেরা যে কথামালা-বোধোদয়-পড়া গুরুমহাশয়ের নিকটও পড়িতে পাইতেছে না, তাহার জন্য দায়ী কে? বর্ত্তমান শিক্ষালয়গুলির উন্নতি এবং শিক্ষালয়-সমূহের দ্রুতবেগে সংখ্যাবৃদ্ধি, একসঙ্গেই করিয়া যাইতে হইবে। শিক্ষার উন্নতি সাধন করিতে হইলে কতকগুলি স্কুলের জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া বাকীগুলি উঠাইয়া দিতে হইবে, বা কতকগুলি শিক্ষকের বেতন বাড়াইয়া দিয়া অন্য কতক-গুলির চাকরী ঘুচাইয়া দিতে হইবে, ইহাই কি উন্নতির একমাত্র প্রণালী? বাঙ্গালা, বিহার, ছোটনাগপুর,

ওড়িশা, এই চারি প্রদেশের জন্য, পূর্ব্বে একজন মাত্র ছোট লাট ছিলেন। এখন একজন লাট, একজন ছোট লাট হইয়াছেন। এবং প্রত্যেকের তিন তিন জন করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য, নানা বিভাগের সেক্রেটরী, প্রত্যেকের অধীনে এক একজন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর, পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনেরেল, প্রভৃতি কত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ঢাকায় একবার রাজধানী হইল, তাহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা গেল। বাঁকীপুরে রাজধানী হইবে, হাইকোর্ট হইবে, আবার বেহারের শীতকালের রাজধানী হইবে; এই-সকলের জন্য কত লক্ষ টাকা খরচ হইবে। বঙ্গের কয়েকটা জেলা ত্রিখণ্ড বা দ্বিখণ্ড করিবার জন্য এককালীন ও বার্ষিক ব্যয় কতই না করিতে হইবে। এইরূপে দেখা যায় যে গবর্ণমেণ্টের নিজের যে কাজটি যখন ভাল লাগে, তখন তাহার জন্য অর্থের অভাব হয় না। অথচ, শিক্ষার উন্নতি করিতে হইলেই, কতকগুলি স্কুল উঠাইয়া দিতে হয়, ইহার অর্থ কি?

কোন দেশের কতকগুলি লোক যদি প্রচুর পরিমাণে সুখাদ্য পায়, এবং অন্যেরা দিনান্তে আধপেটা মোটা চালের ভাত এবং নুনও পায় না, তবে সে দেশের লোকের অবস্থা ভাল, বা তথাকার রাজা সুশাসক, ইহা কখনই বলা যায় না! অথবা, কেহ যদি কোন রাজাকে বলে, তোমার দেশের লোকেরা ভাল খাইতে পায় না, তাহা হইলে যদি তিনি প্রজাদের মধ্যে দুই আনা আন্দাজ লোককে ভাল করিয়া খাওয়াইবার জন্য বাকী চৌদ্দ আনার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লন বা তাহাদের আহারের কোন বন্দোবস্ত না করেন, তাহা হইলে কি তাঁহার কর্ত্তব্য করা হয়? কিম্বা যদি কেহ হরিকে বলে, তোমার ছেলে মেয়ে দশটির লেখাপড়া হইতেছে না, এবং হরি কেবল ২টি ছেলের জন্য ভাল শিক্ষক রাখিয়া বাকী ৮ জনকে গরু চরাইতে বলেন, তাহা হইলে কেহ কি হরির বুদ্ধিমত্তা বা কর্ত্তব্যপরায়ণতার প্রশংসা করিতে পারে? দুর্ভিক্ষের সময় যদি রাজা একজন কর্ম্মচারীকে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য পাঠান, এবং ঐ কর্ম্মচারী কতকগুলি লোককে ১০ টাকা মণ চালের অন্ন এবং নানাবিধ ব্যঞ্জন নিত্য ভোজন করান, এবং অনশনক্লিষ্ট বাকী লোকগুলির কোনই খবর না লন, তাহা হইলে তাঁহাকে কেহই বিবেচক বা কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারী বলিতে পারে না। আমাদের দেশের সর্ব্বত্র জ্ঞানের দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। এখন যাহাতে সকলে অন্ততঃ কিছু জ্ঞান পাইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা রাজকর্ম্মচারীদের একান্ত কর্ত্তব্য। রাজা পঞ্চম জর্জ্জ এদেশে আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে জ্ঞানের আলোকে তাঁহার প্রত্যেক প্রজার গৃহ আলোকিত হইবে। আমরা জানি ও বুঝি যে প্রত্যেকের গৃহে এক দিনের মধ্যে আলো জ্বালিবার মত তেল প্রদীপ ও মশালচী রাজকর্ম্মচারীদের নাই। কিন্তু যত দিনের পর দিন যাইবে, ততই নূতন নূতন গৃহের আঁধার ঘুচিয়া তাহাতে আলো জ্বলিতেছে, এরূপ দেখিতে পাইবার আশা ও দাবী আমরা নিশ্চয়ই করিতে পারি। কিন্তু তাহা ঘটিতেছে না। তৎপরিবর্ত্তে যে-সকল ঘর আঁধার ছিল, এবং তাহাদের সংখ্যাই অধিক, তাহারা আঁধারই থাকিতেছে; যে অল্পসংখ্যক ঘরে মাটীর প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহাদের কতকগুলি নিবাইয়া দিয়া রাজভৃত্যেরা বাকীগুলিতে চিমনি-যুক্ত কেরোসিনের উজ্জ্বল আলো জ্বালিবেন বা জ্বালিয়াছেন বলিতেছেন। ফলে, আমরা এই বুঝিতেছি যে রাজভৃত্যেরা রাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন না।

বিলাতের তৈরী দামী বোর্ডে ছেলেরা অঙ্ক না কষিলে কি অঙ্ক শিখা যায় না? ভাল ভাল বাড়ী না হইলে কি স্কুল হয় না? আমাদের দেশে বৎসরের অধিকাংশ সময় গাছের তলায় ছেলেরা পড়িতে পারে, এবং তাহাতেই তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। বেঞ্চিতে না বসিলে কি তাহারা লেখা পড়া শিখিতে পারে না? মাটীতে আসন বিছাইয়া বসিয়াও বিদ্যা লাভ করা যায়। প্রত্যেক জেলায় পরিদর্শক কর্ম্মচারীর (Inspecting Staff) সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে। কোন কোন জেলায় দ্বিগুণ অপেক্ষাও বাড়িয়াছে। অথচ স্কুলের সংখ্যা সামান্যই বাড়িয়াছে, বা কোথাও কোথাও কমিয়াছে। ঘোড়ার গা মাজা ঘসার জন্য এবং সে বিষয়ে খবর লইবার জন্য লোক বাড়িতেছে, কিন্তু ঘোড়ার খাদ্যের পরিমাণ বাড়িতেছে না।

মৈমনসিংহে যাহা ঘটিয়াছে, আর কোন্ কোন্ জেলার অবস্থা ঐরূপ হইয়াছে, তাহা জানা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক জেলার সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা জেলা বোর্ড হইতে সংবাদ লইয়া এই বিষয়ে আন্দোলন করিলে বড় ভাল হয়।

পাঠশালাবিহীন গ্রাম। ইহা অপেক্ষা একটু কঠিন একটি কাজ আছে, তাহাও জেলার কাগজগুলির দ্বারা হইতে পারে। বড়োদা রাজ্যে যে-সকল গ্রামে পাঠশালা নাই, অথচ পড়িবার বয়সের অন্যূন ১৫ জন বালকবালিকা আছে, তথায় নূতন পাঠশালা খুলিবার আদেশ হইয়াছে। বঙ্গেও প্রত্যেক জেলায় পাঠশালাবিহীন এমন কত ও কোন্ কোন্ গ্রাম আছে, যেখানে (১৫ জন না হউক) ৩০ জন ছাত্রছাত্রী বা কেবল ৩০ জন ছাত্র জুটিতে পারে, তাহার তালিকা জেলার কাগজে বাহির হওয়া উচিত। মোট বাসিন্দার

সংখ্যার শতকরা ১৫ জন পড়িবার বয়সের লোক, সরকারী হিসাবে এইরূপ ধরা হয়। সুতরাং কোন গ্রামের লোকসংখ্যা ২০০ হইলেই তথায় ৩০টি ছাত্র-ছাত্রী, বা লোকসংখ্যা ৪০০ হইলেই তথায় ৩০ জন ছাত্র আছে ধরিতে হইবে।

শিক্ষার জন্য দান। টেপার জমিদার শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন রায় চৌধুরী রঙ্গপুরে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজের জন্য নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ও পঞ্চাশ হাজার টাকার ভূসম্পত্তি, একুনে এক লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। যে যে জেলায় কলেজ নাই, তথাকার ধনীরা এই প্রকারে ধনের সদ্ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

জগদীশচন্দ্র বসু। সংবাদ আসিয়াছে যে গত ২০শে মে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান শরীরতত্ত্ববিৎ (physiologists) এবং অগ্রণী ছাত্র সমূহের (advanced students) সমক্ষে উদ্ভিদের উত্তেজনা-প্রবণতা সম্বন্ধে নিজ গবেষণালব্ধ তথ্য-সকলের বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি যে-সকল তত্ত্ব ঐ বক্তৃতায় প্রচার করেন, প্রাণ-সম্পৃক্ত নানা ব্যাপারের বিশদ ব্যাখ্যায় তৎসমুদয়ের বিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলির কার্য্য প্রদর্শিত হয়। বক্তৃতায় যে-সকল শরীরতত্ত্ববিৎ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মতে বসু মহাশয়ের নূতন যন্ত্র এবং তত্ত্বানুসন্ধানের নূতন প্রণালী দ্বারা শরীরতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণার অনেক উন্নতি সূচিত হইতেছে।

অধ্যাপক বসু মহাশয়ের নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্র সকল দ্বারা যখন তাঁহার আবিষ্কৃত সত্য সমূহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইলেন, তখন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস হইল যে বিশ্বে প্রাণ এক। যন্ত্র সহযোগে প্রমাণ স্বচক্ষে দেখিবার পূর্ব্বে বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত তত্ত্বসমূহের সত্যতা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই,—সেগুলি এতই বিস্ময়কর। তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রসকলে যে বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি এগুলি কোথায় তৈরী করাইয়াছেন?" গৌরবের সহিত বসু মহাশয় উত্তর দেন, "ভারতবর্ষে।" রয়্যাল সোসাইটী বিলাতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সভা। উহার সভাপতি ডাক্তার বসুর গৃহে আসিয়া তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বসমূহের যান্ত্রিক প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দিন স্থির করিয়াছিলেন বলিয়া চিঠিতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ তিনি প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন।

যাঁহাদের বয়স আছে, তাঁহারা বসু মহাশয়ের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হউন।

জাতিত্ব নাশের চেষ্টা। ইউরোপে পোল্যাণ্ড নামে একটি স্বাধীন দেশ ছিল। রুশিয়া, অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মেনী তাহা ভাগ করিয়া লইয়াছেন। রুশিয়া নিজের অংশে পোল্যাণ্ডের ইস্কুলে পোলিশ ভাষা শিখিতে দেন না, আফিস আদালতে পোলিশ ভাষা ব্যবহার হয় না। এই প্রকারে পোলরা যে একটি স্বতন্ত্রজাতি, এক সময়ে স্বাধীন ছিল, তাহা, তাহাদের সাহিত্যচর্চ্চা বন্ধ করিয়া, তাহাদিগকে ভুলাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু পোলিশ সাহিত্যের চর্চ্চা বাড়িয়া চলিয়াছে। জার্ম্মেনী পোলদের জাতীয়ভাব কোন প্রকারে বিনষ্ট করিতে না পারিয়া, নূতন আইন করিয়া তাহার অংশে সহজ সর্ত্তে জমী দিয়া বিস্তর জার্মেন প্রজা বসাইয়া পোলদিগকে উদ্বাস্ত করিতেছে। ফিন্‌ল্যাণ্ড রুশিয়ার অধীন হওয়ার পর হইতে ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে। এখনও তথায় স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট আছে। কিছুদিন আগে রুশিয়া এক নূতন আইন করিয়া তথায় রুশ ও ফিনদের অধিকার সমান করিয়া দিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে ফিনদের ফিনল্যাণ্ড-বাসী বলিয়া চাকরী ইত্যাদিতে এবং রাজনৈতিক বিষয়ে যে-সব অধিকার আছে, রুশেরা বিদেশী হইলেও সেই সব অধিকার পাইবে। ইহা ফিন্‌ল্যাণ্ডে বেশী পরিমাণে রুশের আমদানী করিয়া ফিনদের স্বাতন্ত্র্যলোপের চেষ্টা বলিয়া বোধ হয়। সম্প্রতি রুশিয়া একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কাজ দ্বারা নিজের দুরভিসন্ধির পরিচয় দিয়াছে। প্রাচীন গ্রীসে চারি চারি বৎসর অন্তর ওলিম্পিক ক্রীড়া হইত। তাহাতে সমুদয় খাঁটি গ্রীক দৌড়, লাফ ঝাঁপ, প্রভৃতি নানা পুরুষোচিত ব্যায়াম ও ক্রীড়ায় প্রতিযোগিতা করিত। গ্রীসের যে প্রদেশের বা নগরের লোক কোন ব্যায়াম বা খেলায় জিতিত, তাহার খুব সম্মান হইত। ইহা দ্বারা দৈহিক শক্তি ও কর্ম্মপটুতার দিকে লোকের দৃষ্টি থাকিত, এবং গ্রীকদের খুব দৈহিক শক্তিসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইত। কয়েক বৎসর হইতে ইউরোপ আমেরিকায় এই ওলিম্পিক খেলা আবার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শেষ খেলা আমেরিকায় হয়। তাহাতে ফিন্‌ল্যাণ্ডের কোলেহ্-মেনেন নামক একজন বলিষ্ঠ পুরুষ দৌড়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষ্যে ফিন্‌রা দিগ্বিজয়ী বীরের আগমনের মত উৎসব করে। তাহাতে রুশিয়া দেখিল যে ফিনরা স্বনামধন্য হইতেছে, কোলেহ্‌মেনেন্ রুশীয় সাম্রাজ্যের লোক বলিয়া পরিচিত না হইয়া ফিন্ বলিয়া পরিচিত হইতেছে। অতএব রুশিয়া এই হুকুম জারী করিয়াছে যে অতঃপর ফিন্‌ল্যাণ্ড আর নিজের নামে ওলিম্পিক খেলায় যোগ দিতে পারিবে না। ফিনিশ্ ওলিম্পিক কমীটীও বোধ হয় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে।

এশিয়াবাসীর লাঞ্ছনা। রয়টার তারে সংবাদ দিয়াছেন, যে, বৃটিশ উপনিবেশ নিউজীল্যাণ্ডে এশিয়াবাসী লোকদের আগমন বন্ধ করিবার জন্য তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় এই জুন মাসে এক আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায়, কানাডায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, সর্ব্বত্র বৃটিশ উপনিবেশ-সকলে এশিয়াবাসীদের যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে। দেখাদেখি, পোর্ত্তুগীজ ও আমেরিকানেরাও এইরূপ আইন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। এরূপ নিয়ম করিবার প্রকৃত কারণ এই যে এশিয়াবাসীরা অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহারা মোটের উপর ইউরোপ, আমেরিকার শ্রমজীবীদের মত নেশার ভক্ত বা দুর্দ্দান্ত নহে, এবং তাহারা পরিশ্রমী; এই-সকল কারণে তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শ্বেতকায় শ্রমজীবীরা পারিয়া উঠে না। তাহাদের বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ এই যে তাহারা যাহা রোজগার করে, তাহার বেশীর ভাগ প্রবাসে খরচ করে না, সঞ্চিত অর্থ দেশে লইয়া আসে বা পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু শ্বেতকায়েরা যে সমস্ত-পৃথিবী হইতে ধন সঞ্চয় করিয়া স্বদেশে লইয়া যায়, তাহাতে দোষ হয় না? অন্য এক অভিযোগ এই যে, এশিয়াবাসীরা যে-সব দেশে মজুরী বা ব্যবসা করিতে যায়, তথাকার শ্বেতকায়দের সঙ্গে তাহাদের মিশিয়া যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু শ্বেতকায়েরা যে-সব দেশে, শাসন ও ব্যবসা উপলক্ষে, বাস করে, তথাকার লোকদের সঙ্গে বৈবাহিক আদান প্রদান দ্বারা তাহারা কি মিশিয়া যায়? আর এক অভিযোগ এই যে এশিয়াবাসীদের সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার চেয়ে নিকৃষ্ট। ইহার প্রমাণ কি? প্রাচ্য দেশের লোক যুদ্ধে পাশ্চাত্য দেশের লোকের মত বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষ মারিতে পারে না বটে; কিন্তু সেটা একটা শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ মনে করিলে বাঘকে ঘোড়া ও গরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। এক সময়ে প্রাচ্য দেশের লোকেরাও পাশ্চাত্যদেশের লোকদের মত বিদেশজয়রূপ দস্যুতা করিত। সুতরাং এ বিষয়ে অতীত ও বর্ত্তমান উভয় কাল ধরিলে কে "শ্রেষ্ঠ" হইবে বলা যায় না। অহিংসা, দয়াদাক্ষিণ্য, বুদ্ধি, গৃহধর্ম্ম, শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণে হাতের নৈপুণ্য, এই-সকল বিষয়ে এশিয়াবাসী নিকৃষ্ট নহে। কল কারখানায় এশিয়াবাসী পাশ্চাত্যদের মত উন্নতি করে নাই। কিন্তু জাপানীরা অল্পদিনের মধ্যেই পাশ্চাত্যদের প্রায় সমকক্ষ হইয়াছে, চীনরাও হইতেছে; যে-কেহ সুযোগ পাইবে, সেই কল চালাইতে পারিবে। সভ্যতার প্রকৃত মানদণ্ড হৃদয় ও বুদ্ধি। তাহাতে এসিয়াবাসী নিকৃষ্ট নহে। আর এক অভিযোগ এই যে এশিয়াবাসীরা অপরিষ্কার। দেহের শুচিতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় এশিয়াবাসী কোন দেশের লোকের চেয়ে নিকৃষ্ট নহে, বরং শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ ও ঘরবাড়ী অনেক সময় তেমন ফিটফাট বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখা যায় না। ইহা কতকটা দরিদ্রতাবশতঃ কতকটা বাহ্য বিষয়ে অমনোযোগ বশতঃ। অনেক বৃটিশ উপনিবেশে এশিয়াবাসীদিগকে সহরের অপকৃষ্ট অংশে থাকিতে বাধ্য করা হয়, সে স্থলে তাহাদের নিকট হইতে পারিপাট্যের দাবী করা উপহাসের মত শুনায়। যাহা হউক, পরিষ্কার থাকাটা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। এ বিষয়ে এশিয়াবাসীদের মন দেওয়া উচিত। তথাপি এ কথা আমাদিগকে বলিতেই হইবে, যে, এশিয়াবাসীর ঘর-বাড়ী ও পোষাক ফিটফাট না হইলেও, শ্বেতকায়েরা বন্দুক দ্বারা, এবং মদ ও কুৎসিত সংক্রামক ব্যাধির আমদানী করিয়া নানা দেশের যেরূপ অনিষ্ট করিয়াছে, নোংরামি দ্বারা এশিয়াবাসী তাহার সহস্রাংশের একাংশ অনিষ্টও কোন বিদেশের করে নাই।

সুতরাং পৃথিবীর যত সুখসুবিধা আমরাই তাহা লুটিব, এশিয়াবাসীরা অংশ পাইবে না, ইহা খাঁটি গা-জোরী ভিন্ন আর কিছু নয়। এশিয়াবাসী দল বাঁধিতে না পারায় ও অন্যান্য কারণে হীনবল হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু স্বাস্থ্য, শিক্ষা, একপ্রাণতা ও প্রতিযোগিতার বাহ্য সরঞ্জামের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকিলে এশিয়াবাসীর দুর্দ্দশা বেশী দিন থাকিবে না।

শৈলনিবাস। হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত একটি সহরে বসিয়া দেখিতেছি, এখানে যাহারা সারা বৎসর বা বৎসরের অনেক মাস থাকে, তাহারা জীবিকার জন্য এখানে বাস করে। যাহারা অল্পদিন থাকে, তাহারা হয় শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য, নয় শারীরিক সুখের অন্বেষণে এখানে আসে। আত্মাকে সুস্থ সবল করিবার জন্য এখানে কয়জন আসে? এখানে রুগ্নের বিলাপ বা মৃদুহাস্য, বিলাসীর জান্তবমূর্ত্তি ও ফাঁকা হাসি, আর নানাবিধ ফ্যাশন মানুষকে উপলব্ধি করিতে দেয় না, যে, এই সেই হিমালয় যাহার অঙ্গে প্রাচীন আর্য্যগণ দেবমন্দির, মঠ ও আশ্রম নির্ম্মাণ করিতেন; যাহার নাম করিলে যোগীঋষি ব্রহ্মচারীদের কথাই মনে হয়; যেখানে মানুষ ভগবানের আরাধনা ধ্যান ধারণা এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও তপশ্চর্য্যায় ব্যাপৃত থাকিত।

দেশে নানা রোগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহাতে পার্ব্বত্য গ্রাম ও নগরসমূহে আরও স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পার্ব্বত্যপ্রদেশে স্বাস্থ্য-নিবাস ভিন্ন অন্যবিধ প্রতিষ্ঠানেরও আবশ্যক আছে।

ঋষিকবি ওআর্ডসোআর্থ তাঁহার একটি সনেটে

লিখিয়াছেন, মুক্তির বাণী পর্ব্বত ও সমুদ্রের কণ্ঠে যুগে যুগে উচ্চারিত হইয়াছে।

পর্ব্বত মানুষকে সুস্থ দেহ, সুস্থ মন, মুক্ত আত্মা লাভে সাহায্য করে। পার্ব্বত্য প্রদেশে বালক ও বালিকাদিগের জন্য শিক্ষালয়, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালী এ বিষয়ে মন দিতেছেন না।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে ধর্ম্মসাধনার্থ আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। রামকৃষ্ণ শিষ্যেরা মায়াবতীতে এইরূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

সত্তর বৎসরের অধিক বয়সে মহারাজা সার্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সঙ্গীতের উৎসাহদাতা বলিয়া দেশবিদেশে বিখ্যাত ছিলেন। এখন দেশে ভারতীয় সঙ্গীতের যে আদর ও চর্চ্চা দেখা যাইতেছে, তাঁহার চেষ্টা, উৎসাহ ও অর্থব্যয় তাহার মূলে। তিনি সঙ্গীতানুরাগী না হইলে সংগীতের অনুশীলন এখন যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, তাহা সম্ভব হইত না। তিনি অনেক প্রসিদ্ধ ওস্তাদের দ্বারা সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তক রচনা করান, এবং দেশীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি ও নূতন যন্ত্র রচনা করান। সম্মানস্বরূপ অক্স্‌ফর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সঙ্গীতাচার্য্য (Doctor of Music) উপাধি প্রদান করেন। বোধ হয় এমন কোন সভ্য দেশ নাই যেখান হইতে তিনি সম্মানসূচক উপাধি না পাইয়াছেন।

"চিত্রা।" রবিবাবুর "চিত্রাঙ্গদা"র ইংরেজী গদ্যানুবাদ "চিত্রা" * নামে প্রকাশিত হইয়াছে। বিলাতে ও আমেরিকায় ইহার খুব আদর হইয়াছে। নারীর নারীত্ব, নারীর প্রকৃত স্বরূপ দৈহিক সৌন্দর্য্যে নয় তাঁহার অন্তরে যে চিন্ময়ী সতী, তাঁহার যে "আপনাত্ব" আছে, তাহাই নারী। নারী যদি ভাবেন তিনি কেবল পুরুষকে মুগ্ধ করিবার যন্ত্রের মত, তাহা হইলে তিনি আপনাকে বুঝেন নাই। পুরুষ যদি ভাবেন নারী কেবল ভোগ্যা, তাহাতে তাঁহার হৃদয় অতৃপ্ত থাকে, নারীকেও পাওয়া হয় না। পুরুষ-নারীর সম্পর্কের এইরূপ অনেক নিগূঢ় কথা বহিখানি পড়িলে উপলব্ধি করা যায়। কবি শেষে চিত্রাঙ্গদাকে যে কথাগুলি বলাইয়াছেন তাহা যেমন সুন্দর, তেমনি নানা অর্থসম্ভারে ঐশ্বর্য্যশালী।

"I brought from the garden of heaven flowers of incomparable beauty with which to worship you god of my heart. If the rites are over, if the flowers have faded, let me throw them out of the temple [*unveiling in her original male attire.*] Now, look at your worshipper with gracious eyes.

"I am not beautifully perfect as the flowers with which I worshipped. I have many flaws and blemishes. I am a traveller in the great world-path, my garments are dirty, and my feet are bleeding with thorns. Where should I achieve flower beauty, the unsullied loveliness of a moment's life? The gift that I proudly bring you is the heart of a woman. Here have all pains and joys gathered, the hopes and fears and shames of a daughter of the dust; here love springs up struggling toward immortal life. Herein lies an imperfection which yet is noble and grand. If the flower-service is finished, my master, accept *this* as your servant for the days to come!

"I am Chitra, the king's daughter. Perhaps you will remember the day, when a woman came to you in the temple of Shiva, her body loaded with ornaments and finery. That shameless woman came to court you as though she were a man. You rejected her: you did well. My lord, I am that woman. She was my disguise. Then by the boon of gods I obtained for a year the most radiant form that a mortal ever wore, and wearied my hero's heart with the burden of that deceit. Most surely I am not that woman.

I am Chitra. No goddess to be worshipped, nor yet the object of common pity to be brushed aside like a moth with indifference. If you deign to keep me by your side in the path of danger and daring, if you allow me to share the great duties of your life, then you will know my true self. If your babe, whom I am nourshing in my womb, be born a son, I shall myself teach him to be a second Arjuna, and send him to you when the time comes, and then at last you will truly know me. To-day I can only offer you Chitra, the daughter of a king."

প্রবন্ধাদির দৈর্ঘ্য। যাঁহারা প্রবাসীর জন্য প্রবন্ধাদি প্রেরণ করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ রাখিলে উপকৃত হইব যে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধাদি আমরা একটু বেশী সহজে ও শীঘ্র ছাপিতে পারি। প্রবন্ধ প্রবাসীর ৪।৫ পৃষ্ঠা অপেক্ষা লম্বা না হইলেই ভাল হয়। গল্প ইহা অপেক্ষা কিছু বড় হইলেও চলে। রচনা ক্রমশঃপ্রকাশ্য না হইয়া এক সংখ্যায় সমাপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

---

* *Chitra* by Rabindranath Tagore. Macmillan & Co. Limited, London, Bombay, Calcutta. 2s. 6d. net.

"আয় চাঁদ আয়।"

বিষয়াসক্ত।
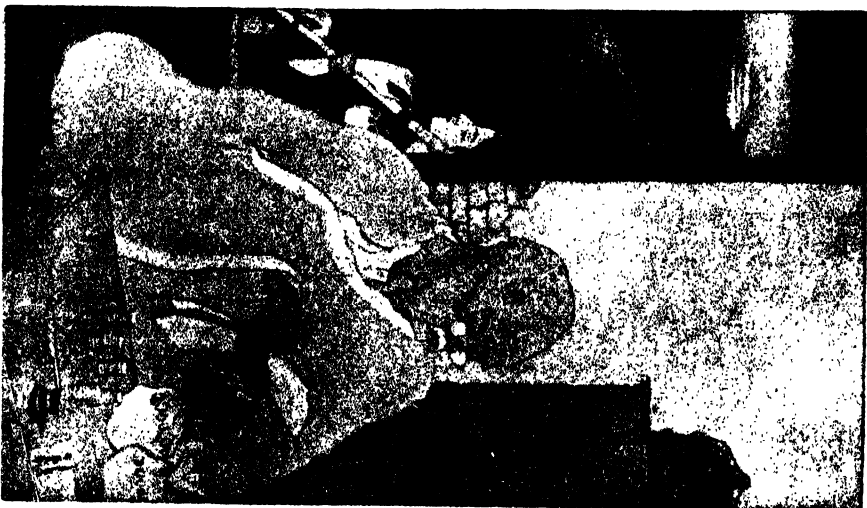
বাঙ্গালা ছন্দ

(কলিকাতা সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত)

ছন্দ নামক আপাতপ্রতীয়মান অনাদি পদার্থটির যদি একটা নিদান নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক ভূমিকা করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে বলিব, সঙ্গীতের ক্ষেত্র হইতেই ছন্দের উৎপত্তি। মনুষ্য-মনের মনুষ্য-কণ্ঠের আদিম উদ্ভাবনা সঙ্গীত। যখন মানুষ ভাষা পায় নাই, যখন তাহার বাগিন্দ্রিয়ে বর্ণ পর্য্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই, তখনও কিন্তু মানব সঙ্গীতকে লাভ করিয়াছিল; ইতর প্রাণীর ন্যায় অস্পষ্ট বিকৃত ভাবের উৎসাহকে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে প্রকাশ করিয়াই তৃপ্ত হইতেছিল। সরস্বতী মনুষ্যত্বের আদি দেবতা, সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কয়েকটি নামের মধ্যেই মনুষ্যের অতীত ইতিবৃত্ত-পথে এই দেবতার ক্রমবিকাশ-পদবী সূচিত হইতেছে। গীর্—বাক্—বাণী—বীণাপাণি। বাক্‌প্রকাশের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার নাম—ভাবের অস্পষ্টধ্বত এবং প্রধানতঃ গীতাত্মক অবস্থার নাম গীর্! "বাক্যের রস ঋক্, এবং ঋকের রস (essence) উদ্‌গীথ।" ইতর প্রাণী-জগৎ এখনো এই অবস্থায় আছে—মনুষ্যও এককালে ছিল। ক্রমে বর্ণাত্মিকা বাগ্দেবী প্রকটিত হইয়া, মনুষ্যের জ্ঞান ভাব এবং ঈষণার প্রবৃত্তিকে সম্যক গন্তে ধারণ করার যোগ্যতালাভ করিয়া বাণীরূপে—মানব-সভ্যতার আদি ধাত্রীরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন। উহার পর হইতেই সঙ্গীত এবং কাব্য আত্ম-জাগরণ লাভ করিয়া আপন আপন বিশিষ্ট ধারায় ছুটিয়া গিয়াছে। এই বাণীকে বীণাপাণি এবং পুস্তকধারিণী রমণীরূপে ধারণা করিয়া মানব তাহার উপাসনা করিতেছে।

আমরা দেখিব, বঙ্গীয় ছন্দের, সুতরাং বঙ্গসাহিত্যের, সমস্ত উন্নতির মূল কারণ সঙ্গীত। পয়ার লাচাড়ী এবং পাঁচালী—এই তিনটি শব্দ বঙ্গসাহিত্যের শৈশব-ইতিবৃত্ত বহন করিতেছে। উহাদের অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিতে জানিলেই আমরা তাহার সাহিত্যের নিদান-পরিচয় লাভ করিতে পারিব। সংস্কৃতই আর্য্যভারতের বিদ্বজ্জনের ভাষারূপে পরিণতি লাভ করে; প্রাচীন ভারত নিজের সমস্ত উন্নত জ্ঞানার্জ্জন এবং ভাবের উচ্ছ্বাসগুলি এই ভাণ্ডারেই রক্ষা করিয়া আদর্শ রাখিত। কিন্তু তাহার গার্হস্থ্য জীবনের মুহূর্ত্তগুলি, অষ্টপ্রহরীয় জীবনের সুখদুঃখ-সংঘাত, আনন্দের কিংবা বেদনার আবেগগুলি অনেক দিকে 'গাথা' নামক ভাষাপথে, অথবা 'প্রাকৃত' ভাষার মধ্যেই নিত্যকাল ফুটিয়া ঝরিয়া এবং মরিয়া আসিতেছিল। বৌদ্ধপ্রভাব হইতেই পল্লীভাষার আদর বৃদ্ধি পায়; এবং একটি দিকের কুশলগুলিই পালীভাষা গোলাজাত করিতে চেষ্টা করিতেছিল বই নহে। কিন্তু ভারতবিস্তৃত শস্যসম্ভারের তুলনায় এই রক্ষাব্যাপার কত সামান্য। উহার পর, মুসলমানের প্রভাব হইতে—ইসলাম ধর্ম্মের অনুপম সাধারণতন্ত্রের দৃষ্টান্ত এবং আরবী ও পার্শী ভাষার রাজকীয় গৌরবপ্রতিষ্ঠার সুযোগ হইতেই ভারতের জানপদ ভাষাগুলি তলে-তলে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার সুবিধা লাভ করে। এইরূপে, বলবান্ যুগধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া দেশে দেশে নানক কবীর তুকারাম এবং শ্রীচৈতন্য প্রমুখ যুগধর্ম্মের 'অবতার' পুরুষের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ প্রাচীন সংস্কৃত-হিমগিরির মাহাত্ম্যটাকে আপাততঃ বিস্মৃত হইয়াই অনাদৃত প্রাকৃত হৃদয়বৃত্তির সমতলকে বিস্তারিত ভাবে বরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেও ত দেশের গৃহস্থ-প্রাঙ্গণে রাঙ্গাদিদি 'খনা এবং 'ডাক' ঠাকুরদাদা দিনরাত্রি আসর জমাইয়া বসিতেন, নিত্য-নৈমিত্তিক উৎসবাদিতে পল্লীর আনন্দবাজারে গানের মজলিশ জমিত, বাসর-সভায় বিদগ্ধাগণকে প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইত, ধর্ম্মকথকতার ব্যাসাসন হইতেও 'শুকদেব'কে, ফুলদূর্ব্বা-গ্রহণ-পূর্ব্বক পদতলে ভক্তিনিবিষ্ট প্রাকৃতগণের উদ্দেশে তাহাদের প্রাকৃত ভাষাতেই বাক্যোচ্চারণ করিতে হইত! এই-সমস্তের ফলে দেশে দেশে অনুগৃহীত প্রাকৃত ভাষাগুলি উঠিতে বসিতে এবং বলিতে শিখিতেছিল। দিন দিন উহার চলৎশক্তি এবং উচ্চতর অভিলাষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া, পরিশেষে এই বঙ্গদেশেই এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, সে একদিন স্বয়ং ব্যাসাসনে পদকল্পতরু হইয়া বসিল, এবং দেবভাষাকেই (স্বপ্নাতীত ভাবে) উহার কথাগুলি টীকা-টিপ্পনী করিয়া বুঝিয়া লইতে হইল! লৌকিক দেবমাহাত্ম্যের

কীর্ত্তন এবং পাঁচালীসভার প্রতিপত্তি এত বাড়িয়া উঠিল যে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বকার কোন পূজ্যব্যক্তি আমাদের জন্য একটা দীর্ঘনিশ্বাস রাখিয়া গিয়াছেন ঃ—

মঙ্গলচণ্ডীর কথা গাহে জাগরণে
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জনে!

এই মঙ্গলচণ্ডী বিষহরী সুবচনী ষষ্ঠী বঙ্গসাহিত্যের পরম কৃতজ্ঞতা-পাত্রী; তাঁহাদের পাঁচালী-কীর্ত্তনগুলিই বাঙ্গালীহৃদয়ের গুপ্তগুহানির্গত আদিম গোমুখীধারা! ক্ষুদ্র পাঁচালীর পদ্ধতিই ক্রমে হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে বিপুলতা লাভ করিয়া মহাগাথায় পরিণত হইয়াছিল, বাঙ্গালীর গৃহপ্রাঙ্গণ হইতেই রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির পূজা-গৌরবের প্রতিস্পর্দ্ধী হইয়া মাথা তুলিয়াছিল! নিজের প্রতিপত্তি রক্ষায় উপায়ান্তরহীন হইয়াই দেব-ভাষার পরমপূজ্য রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণাদিকে প্রাকৃত বাঙ্গলার পরিচ্ছদ এবং পাঁচালী-গাথার রূপ পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। ফুলিয়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতটিই সর্ব্বপ্রথমে শাস্ত্রকারগণের নিষেধ-পত্রিকা অবহেলা করিয়া বাল্মীকির আর্য্যগাম্ভীর্য্যপূর্ণ ধ্রুবপদকে পাঁচালীগানের নিম্নভূমে নামাইয়া আনিতে লাগিয়া গেলেন। ইহাঁর দেখা-দেখি ক্রমে অচলপ্রতিষ্ঠ মহাভারত এবং মহামান্য শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রভৃতিও আপনাদের শুচিতা পবিত্রতা এবঞ্চ মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া একেবারে সাধারণের আসরেই নামিয়া দাঁড়াইলেন; এবং ঢোল এবং কাঁশীর সহযোগে পয়ার-প্রবন্ধে গলা ভাঁজিতে অথবা লাচাড়ীর নৃত্য-তালে অঙ্গভঙ্গী করিয়া সুর বিনাইতে লাগিয়া গেলেন! এই ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপচন্দ্রের 'হাট' হইতে তাঁহার পরম বিনয়ী 'ঝাড়ুদার'গণ এই পাঁচালীর আসরেই এমন সুর সঙ্গৎ করিয়া গেলেন যে, উহাই একদিকে প্রাচীন ঋষিপদবীর সমস্ত মহিমা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বাঙ্গালীর হৃদয়টাকে বাহুবলে অধিকার করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়া বসিল। ইহাঁদের সমসূত্রে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রামপ্রসাদ প্রভৃতিও এই পাঁচালীগানের আসরভিত্তি হইতেই আপনাদের স্বতন্ত্র পথে এমন এক রাগিণী বিনাইয়া গেলেন যে উহাতেই বঙ্গসরস্বতীর আত্মসম্পূর্ণ বীণা-পুস্তকধারিণী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে।

সুতরাং এই পাঁচালী পয়ার এবং লাচাড়ী তিনটি কথার প্রকৃত মর্ম্ম, উহাদের প্রকৃত শক্তি এবং ঋদ্ধি আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস এখনো যেন সম্যক ধারণা করিতে পারে নাই। আমরা দেখিতেছি, পায়ে পায়ে চলে অথবা দাঁড়ায় বলিয়া উহার নাম পয়ার; এবং নাচিয়া নাচিয়া চলে বলিয়া উহার নাম লাচাড়ী। এই দুইটি কথা বাঙ্গালার প্রাচীনতম গাথা এবং গানের মজলিস হইতে পরিভাষা স্বরূপে উদ্ভূত হইয়াই নানা অবস্থার মধ্য দিয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে। কথা যখন ছন্দকে অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহার প্রত্যেক পাদের নাম হয় "পদ"—"শ্লোকপাদং পদং কেচিৎ"। এইরূপে পদ বা পদকার হইতেই পয়ারের উৎপত্তি। পূর্ব্ব-পুরুষগণ প্রাকৃত ভাষার লেখকগণকে কবি বলিতে যেন সঙ্কুচিত হইয়াই পদকর্ত্তা বা পদকার নামেই নির্দ্দেশ করিতেন। পয়ার বঙ্গভাষার একটি আদিম ছন্দ; তারপর বলিব, আর একটি ছন্দও বঙ্গবাণীর নিজস্ব, উহাও বঙ্গ-ভাষার হৃদয় হইতে উদ্ভূত। বাঙ্গালী শিশুর কণ্ঠরুচি বা ঐ শিশুভাষার অভিব্যক্তি আলোচনা করিলে তাহার প্রধান প্রমাণটুকু মিলিবে। উহার নাম ছড়া, বাঙ্গালার স্নেহ-তরঙ্গিণী মাতৃহৃদয়ের প্রথম তরঙ্গ। এই ছড়ার ছন্দটাই পল্লীর আসরে আসিয়া নর্ত্তনশীলা লাচাড়ীর জন্মদান করিয়াছে। সুতরাং এই পয়ার এবং লাচাড়ীকে বঙ্গবাণীর জন্মশক্তি ও প্রথম প্রাপ্তি বলিয়া উহার আদিম এবং স্বতঃসিদ্ধ কবিতার ছন্দ রূপেই বুঝিতে হইবে। তেমনি পাঁচালীও বাঙ্গালী বাণীপুত্রের আদিম কাব্যচেষ্টা —তাহার প্রথম উচ্চাভিলাষযুক্ত এবং সামাজিকগণের হৃদয়-বিজয়োদ্দিষ্ট ঝঙ্কার! খনা বা ডাকের বচন বা ছড়ার ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যকে, উহাদের জ্ঞান-সঙ্কলনের আদর্শকে অতি-ক্রম করিয়া, পরিবার অথবা গার্হস্থ্য জীবনের আটপৌরে গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বঙ্গকবি যখন বাহিরের দিকে প্রথম দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন—তখন সরস্বতীর অপর হস্তে যে পুস্তক মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল তাহার নাম হইল পাঁচালী। অদ্য এত দূরে দাঁড়াইয়া বঙ্গ-কবিতার আদি চিন্তা করিতে যাইয়া দেখিতেছি ঐ যুগল বীজচ্ছন্দ হইতেই ক্রমে বঙ্গীয় কাব্যচ্ছন্দের বটবৃক্ষ বিপুল-আয়তন

হইয়া অনন্ত শাখা প্রশাখায় অভিব্যক্ত হইয়া আসিয়াছে। বঙ্গের কাব্যসাহিত্য উহাদের ছায়াতলে সমস্ত বঙ্গদেশের বিশাল হৃদয়কে রসানন্দে শীতল করিতে, এবং বাঙ্গালীর জ্ঞান ভাব ইচ্ছা বৃত্তির তাবৎ স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতেছে।

সচরাচর বাঙ্গালা অলঙ্কার গ্রন্থে একটা কথা দেখা যায় যে সংস্কৃত কবি জয়দেব হইতেই যেন বাঙ্গালী কবিগণ এই পয়ার ও লাচাড়ী ছন্দ শিক্ষা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে প্রচলিত করিয়াছেন। উহার ন্যায় একটা অযথার্থ কলঙ্কের কথা বাঙ্গালাকাব্যের বিষয়ে আর হইতে পারে না। ইহা নিশ্চয় যে জয়দেবের—

সরস মসৃণমপি। মলয়জ-পঙ্কম্
পশ্যতি বিষমিব। বপুষি সশঙ্কম্ ॥

কিংবা—বসতি বিপিন-বিতানে। ত্যজতি ললিত ধাম।
লুঠতি ধরণীতলে। বহু বিলপতি তব নাম ॥

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযানম্।

প্রভৃতি শ্লোক আপনাদের বিভক্তিচিহ্ন পরিত্যাগ করিলেই তাহা দ্বিপদ পয়ার বা ত্রিপদী লাচাড়ী হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা এই ছন্দগুলি সংস্কৃত হইতে ধার করিয়াছি বলিলে আমাদের ভাষার প্রকৃতি বা উহার পদগতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত প্রচার করা হয় সন্দেহ নাই। যাঁহারা সংস্কৃত কিম্বা বৈদিক আর্য্যভাষার প্রকৃতি চিন্তা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন বৃত্তছন্দই উহাদের প্রধান শক্তি। হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণের একটা নির্দ্ধারিত ভাঁজই বৃত্তছন্দের প্রাণ, উহাতে ব্যঞ্জন বর্ণের কিছুমাত্র প্রভুতা নাই। মাত্রাছন্দের মধ্যেই ব্যঞ্জনবর্ণের কিঞ্চিৎ প্রভুত্ব দাঁড়াইয়াছে। বরঞ্চ উহাতেও সংযুক্তপূর্ব্ব স্বরবর্ণকে গুরুবর্ণরূপে ধরিয়া উহাকে একটা ডবল বর্ণরূপে গণনা এবং পরিমাণ করার রীতি প্রচলিত। এখন, সমগ্র বেদে একটিমাত্রও মাত্রাছন্দ নাই; সমগ্র মহাভারতে একমাত্র আর্য্যাশ্লোক মিলিতেছে, এবং উহার প্রক্ষিপ্ত লক্ষণটাও সুস্পষ্ট। দশম শতাব্দীতে বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থেও মাত্রাছন্দের দৃষ্টান্ত মিলিতেছে না। এই ছন্দ ভারতীয় আর্য্যহৃদয়ের পরবর্ত্তীকালের সৃষ্টি। সঙ্গীতের রীতি হইতে, কণ্ঠগতির স্বাধীনতা লক্ষ্য করিয়াই মাত্রাছন্দের সৃষ্টি এবং পরিণতি। গীতি, গাথা, উদ্‌গীতি, আর্য্যাগীতি প্রভৃতি মাত্রাছন্দের নাম হইতেই উহাদের সঙ্গীতমূল প্রতিপন্ন। গীতগোবিন্দ বা গীতাবলি প্রভৃতি গ্রন্থও সংস্কৃত-সাহিত্যে অর্ব্বাচীন। সুতরাং সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় যে বাঙ্গালা পয়ার বা লাচাড়ীর মধ্যে পাদান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের যে মিলনের রীতি পরিস্ফুট হইয়া দাঁড়াইয়াছে—অন্ত্যবর্ণের অনুপ্রাসের উপরেই যাহার প্রধান শক্তি নিহিত আছে—তাহা কোন মতে সংস্কৃত কাব্যচ্ছন্দের প্রধান লক্ষণ নহে, বরং সংস্কৃতের মধ্যেই বাঙ্গালা পয়ার- বা লাচাড়ী-লক্ষণের ছন্দদৃষ্টান্ত যোগাইয়াছেন বাঙালী কবি জয়দেব। পারসিক রীতি কিম্বা বাঙ্গালীর হৃদয়নিঃসৃত গীতধারার সহিত পরিচয়লাভের পূর্ব্বে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর এই বাঙ্গালী কবির বাহিরে, সংস্কৃত ভাষার বিপুল রাজ্যে এই জাতীয় মাত্রাছন্দের দৃষ্টান্তও কদাচিৎ মিলিতেছে, বৃদ্ধা মাতামহী সংস্কৃত ভাষা বঙ্গীয় লাচাড়ীর এই নৃত্যবিলাস যে আদবেই অনুসরণ করেন নাই, তাহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র প্রতীয়মান। সুতরাং আমরা যদি একেবারে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া ফেলি যে, বাঙ্গালীই সংস্কৃতকে গানের ক্ষেত্রে আনিয়া এই চতুর্দ্দশ-অক্ষরের পদচ্ছন্দ বা ত্রিপদীর ছন্দ শিক্ষা দিয়াছে তাহা হইলেও নিতান্ত বাহুল্য হইবে না।

যে ছন্দদ্বয়কে সংস্কৃত ভাষার মধ্যে অর্ব্বাচীন বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায় তাহাই বঙ্গভাষার প্রধান শক্তি, এবং এই প্রসঙ্গে আমরা দেখিব যে উহারাই বঙ্গভাষার অতীত-ভবিষ্যতের অনন্ত ছন্দের মূলাধার। সমতলগামী পদবন্ধে দ্রুত অথবা ধীরোদাত্ত পাদদ্বয়ে পরিচালিত রচনার নাম যেমন পয়ার, তেমন নৃত্যশীল পদরচনামাত্রেই লাচাড়ী। প্রাচীনকালে এই পয়ার বা লাচাড়ী জাতি নামে (Generic) ব্যবহৃত হইত। পদের গতি- বা বিরাম-যতির মূল সুরটুকু অবলম্বন করিয়াই এই দুই বিভাগ। ভিতরে দৃষ্টি করিলেই দেখিবেন এখন বঙ্গভাষার সমস্ত ছন্দকে, আধুনিক কালের আবিষ্কৃত অসংখ্য মিশ্রছন্দকেও বৈজ্ঞানিক নিয়মে এই পয়ার বা লাচাড়ীর কোন-না-কোন বিভাগে সন্নিবেশ করিয়া নামকরণ করিতে পারিলেই আমরা যথার্থতা রক্ষা

করিব। বিষয়টি একবার বুঝিয়া লইলেই বাঙ্গলা ছন্দ নির্ণয় করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটিবে না। এইস্থলে আমরা প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা পয়ার ছন্দের এক একটা পংক্তি নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেছি। দেখিবেন যে প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণসংখ্যার উপর পয়ারের প্রকৃতি কিছুমাত্র নির্ভর করিতেছে না, অমিশ্র পয়ার সাধারণতঃ পরস্পর-সংযুক্ত অথচ সঞ্চারী পদদ্বয়ের উপরে নির্ভর করিতেছে। পাদসংখ্যাকে ক্বচিৎ বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়, কিন্তু ঐ ঘটনা ব্যতিক্রম বই নহে। বিরাম-যতিটুকুই পয়ারের প্রধান শক্তি, এবং উহার সংস্থান বিষয়েও কোন অপরিহার্য্য বিধি নাই বলিয়া কবিপ্রতিভা বেশী কম স্বাধীন ভাবেই পয়ারের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

এস্থলে ৯ হইতে ১৮ অক্ষরযুক্ত পয়ার ছন্দের বিভিন্ন বিরাম-যতিযুক্ত দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা গেল—

৯ গাছ রুইলে। বড় কর্ম্ম।
মণ্ডপ দিলে। বড় ধর্ম্ম॥ —খনা।

৯ নব অনুরাগিণী। রাধা।
কছু নাহি মানয়ে। বাধা॥- বিদ্যাপতি।

৯ এ ধনি। কর অবধান।
তো বিনে। উনমত কান॥ —বিদ্যাপতি।

১০ আজ্ কে গো। মুরলী বাজায়।
এ ত কভু। নহে শ্যামরায়॥—চণ্ডীদাস।

„ মৃদুমন্দ। দক্ষিণ পবন।
সুশীতল। সুগন্ধি চন্দন॥
পুষ্পরস। রত্ন-আভরণ।
আজি কেন। হল হুতাশন॥ আলাওল।

১১ আজি কেন তোমা। এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে। অরুণ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া। কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে। কি ভেল ব্যথা॥—চণ্ডীদাস।

১২ নয়ন যুগলে। সলিল গলিত।
কনক মুকুরে। মুকুতা খচিত॥—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ।

১৩ ক্ষণে ক্ষণে দশন। ছটা ছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর। আগে করু বাস॥—বিদ্যাপতি।

„ আপনি জলস্থল। আপনি আকাশ।
আপনি চন্দ্রসূর্য্য। আপনি প্রকাশ॥ —গোবিন্দ-চন্দ্রের গান।

„ সম্মুখে রাখিয়া করে। বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার। ভয়ে কাঁপে গা॥—চণ্ডীদাস।

„ এ সখি কি পেখনু। এক অপরূপ।
শুনইতে মানবী। স্বপন-স্বরূপ॥—বিদ্যাপতি।

১৪ কার কিছু নাহি চাই। করি পরিহার।
যথা যাই তথায়। গৌরব মাত্র সার॥—কৃত্তিবাস।

পয়ার এইরূপে চতুর্দ্দশ অক্ষরের সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া ক্রমে পঞ্চদশ, ষোড়শ, অষ্টাদশ অক্ষর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে।

১৫ সরোবরে স্নান হেতু। যেওনা লো যেওনা।
কমল কানন পানে। চেয়োনা লো চেয়োনা॥
-ভারতচন্দ্র।

১৬ নবমুগ্ধা-বদনী ধনি। বচন কহসি হসি।
অমিয় বরিখে যেন। শারদ পূর্ণিমা শশী॥
--বিদ্যাপতি।

„ যথা চাতকিনী কুতুকিনী। ঘন দরশনে।
যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী। হিমাংশু মিলনে॥
মরি কিবা মুরহর। পুরহর এক দেহে।
যেন নীলমণি স্ফটিকে। মিলিত হয়ে রহে॥
-মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

১৮ আদিম বসন্ত প্রাতে। উঠেছিলে মন্থিত সাগরে
হাতে সুধাভাণ্ড। বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে॥
—রবীন্দ্রনাথ।

দ্বিপাদ পয়ারছন্দ এইরূপে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

পয়ারের ধীরোদাত্ত পদবন্ধকে অতিক্রম করিয়া নৃত্যশীল লাচাড়ীছন্দও বঙ্গসাহিত্যে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের উপর নির্ভর করিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। লাচাড়ীর মূল, ছড়া—

যমুনাবতী। সরস্বতী। কাল যমুনার বিয়ে,
যমুনা যাবেন। শ্বশুরবাড়ী। কাজিতলা দিয়ে।
বৃষ্টি পড়ে। টাপুর টুপুর। নদী এল বান,
শিবু ঠাকুরের। বিয়ে হল। তিন কন্যা দান।

উহা হইতেই অক্ষরভেদে বা স্বরবর্ণের বাঙ্গলা কিংবা সংস্কৃত রীতির উচ্চারণ-ভেদে কতপ্রকার লাচাড়ী উদ্ভূত হইয়া ত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, ভঙ্গ-লঘুত্রিপদী, চৌপদী, লঘু-চৌপদী, দীর্ঘচৌপদী প্রভৃতির জন্মদান করিয়াছে, প্রাচীন কাল হইতে তাহাকে অনুসরণ করা যায়ঃ—

চিকন কালা। গলায় মালা। বাজন নূপুর পায়,
চূড়ার ফুলে। ভ্রমর বুলে। তেরছ চোখে চায়!
—গোবিন্দদাস।

অতি পুরাতন না-
অথির নীর। গভীর ধীর। অগাধ নাহিক থা॥
কল কল কল। হিল্লোল কল্লোল। দেখিয়া হানিছে গা,
হেলিছে দুলিছে। তুলিয়া ফেলিছে। চল চল স্রোতসা,
জ্ঞানদাসের। কেবল ভরসা। ও রাঙ্গা দু'খানি পা॥
শুনলো ভঁরা বাদর। মাহ ভাদর। শূন্য মন্দির মোর।
--বিদ্যাপতি।

যুবতী হইয়া। শ্যাম ভাঙ্গাইল। এমতি কঠিন কে,
আমার পরাণ। যেমতি করিছে। তেমতি করুক সে॥
—চণ্ডীদাস।

প্রত্যেক পদের অক্ষরসংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে,

এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পদের মিলনটিও ইচ্ছামত পরিচালিত হইতেছে :—

আধ আঁচরে বসি। আধ অধরে হাসি। আধই নয়নতরঙ্গ।
—বিদ্যাপতি।

হেরি হেরি ফিরি ফিরি। বাহু ধরাধরি। নাচত রঙ্গিণী মেলি।
জ্ঞানদাস কহে। নাগর রসময়। করু কত কৌতুক কেলি।

রজনী শাওন ঘন। ঘন দেয়া গরজন। রিমঝিম শবদে বরিষে।

হাসির হিলোলে মোর। পরাণ-পুতলী দোলে।
দিতে চাই যৌবন নিছনি।
জ্ঞানদাস।

বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়াইয়া, পাঁচালী বা কাব্যকারগণের মধ্যে আসিয়া অক্ষরসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছিল, এবং এই চলতির ঝোঁক হইতেই চৌপদী পঞ্চপদীর জন্ম হইয়াছিল। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে লাচাড়ীছন্দ একদিকে নিজের চরমকে লাভ করিয়াছে। ইংরেজের আমল প্রবর্ত্তিত হইবার পরেও একশত বৎসর কাল বঙ্গীয় কবিগণ নানাদিকে কেবল অমিশ্রপয়ার এবং ত্রিপদী ও চৌপদী লাচাড়ীর সাধনাতেই অবস্থান করিতেছিলেন। ক্রমে উহা যে প্রাঞ্জলতা এবং পরিমার্জ্জনা লাভ করিয়াছিল, আমরা কেবল অক্ষরসংখ্যার বৃদ্ধি সম্মুখে রাখিয়া তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া যাইব :—

কত মায়া কর। কত মায়া ধর। হেরি হেরি হর। হরে।
জিত মরামর। হর সেই নর। তুমি দয়া কর। যারে॥
—ভারতচন্দ্র।

এইরূপ ঢিমা তালে সন্তুষ্ট না হইয়া কবিগণ আর এক ছন্দের সৃষ্টি করিলেন; উহার একপদ অন্যপদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল বলিয়া, নাম হইল 'মাল ঝাঁপ'—

কোতোয়াল। যেন কাল। খাঁড়া ঢাল। ঝাঁকে।
ধরি বাণ। খরশান। হান হান। হাঁকে॥
—ভারতচন্দ্র।

কি রূপসী। অঙ্গে বসি। অঙ্গ খসি। পড়ে।
প্রাণ দহে। কত সহে। নাহি রহে। ধড়ে॥
—রামপ্রসাদ।

ভারতচন্দ্র চৌপদীর পদগতি আরও বর্দ্ধিত করিয়া গাহিলেন :—

বসন্ত রাজা আনি। ছয় রাগিণী রাণী
রচিল রাজধানী। অশোক-মূলে।
কুসুমে পুন পুন। ভ্রমর গুন গুন।
মদন দিল গুণ। ধনুক-হুলে।

তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মদনমোহন তর্কালঙ্কার :—

নয়ন কেবল। নীল উৎপল।
মুখ শতদল। দিয়া গঠিল,
কুন্দে দন্তপাঁতি। রাখিয়াছে গাঁথি।
অধরে নবীন। পল্লব দিল॥

এই চৌপদীর সাহায্যে মনের আবেগকেও অপরূপ মূর্ত্তি দান করিতে পারা গেল :—

নিদ্রার আবেশে। রজনীর শেষে।
মনোহর বেশে। বঁধু আসিয়া।
প্রেম-পারাবার। করিল বিস্তার।
নাহি পাই পার। যাই ভাসিয়া॥

উহার পদচ্ছন্দে ধ্বন্যাত্মক দ্রুতগতিও অপূর্ব্বরূপে আকার পাইয়া উঠিল :—

ওলো সুলোচনে। কটাক্ষ সন্ধানে।
আপনার পানে। চেও না চেও না চেও না।
উহার বেদনা। তুমি ত জান না।
অনর্থ যাতনা। পেও না পেও না পেও না॥
ও যে খরতর। নয়নের শর।
কেবা আত্মপর। জানে না জানে না জানে না।
পড়িলে রূপসী। খরধার অসি।
কামার বলিয়া। মানে না মানে না মানে না॥
—মদনমোহন।

উহার পদক্রম আরও বাড়াইয়া দিয়া, নর্ম্মকৌতুকের কটাক্ষ-উল্লাসকে মূর্ত্তিমান করিতে পারা যায় :—

নিত্য তুমি খেল যাহা। নিত্য ভাল নহে তাহা।
আমি যে খেলিতে চাহি। সে খেলা খেলিও হে।
তুমি যে চাহনী চাও। সে চাহনী কোথা পাও।
ভারত যেমত চাহে। সে চাহনী চাও হে।
নর্ম্মেরে প্রকাশিয়া। গর্ম্মেরে বিনাশিয়া
শীতল করিলি হিয়া। বাহবারে হাওয়া!
—ভারতচন্দ্র।

প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় পদ আরও উচ্চাভিলাষী হইয়া পয়ার হইতে একাবলী প্রভৃতি ধার করিয়াও উল্লসিত হইতে চাহিয়াছে :—

লক্ লক্ ফণী। জটা বিরাজ,
তক্ তক্ তক্। রজনী-রাজ,
ধক্ ধক্ ধক্। গহন সাজ
বিষ্কল-চপল গঞ্জিয়া।

ঢুলু ঢুলু ঢুলু। নয়ন লোল,
ভুলু ভুলু ভুলু। যোগিনী-বোল,
কুলু কুলু কুলু। ডাকিনী-রোল
প্রমদ-প্রমথ-সঙ্গিয়া।

বলা বাহুল্য, এই চৌপদীই পরে পরে মধুসূদনের মধ্যে আসিয়া আগ্রহচঞ্চল পদবন্ধে প্রকাশ পাইয়াছে

পিককুল কল কল। চঞ্চল অলিকুল
উথলে সুরবে জল। চল লো বনে।

উহাই নবীনচন্দ্রের মধ্যে কর্ণফুলীর তীরে বসিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়াছে ঃ—

এই কালিন্দীর তীরে
এই কালিন্দীর নীরে
এই তরুতলে, এই গভীর কাননে,
বসি এই শিলাতলে,
এই নির্ঝরিণী-কূলে
বলেছিলে কত কথা, ভুলিলে কেমনে।

উহাই আবার ভারত-সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গ অনুকরণ করিয়া উত্তাল হইয়া গড়াইয়া গড়াইয়া চলিয়াছে ঃ—

গাইছে পশ্চিমে। পূরবে দক্ষিণে।
ভারত-সাগর। আনন্দে তরল।
নাচিয়া নাচিয়া। নীলিমা অসীমে।
দেয় করতালি। তরঙ্গ চঞ্চল॥

উহাই হেমচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া 'হতাশের আক্ষেপ' গান করিয়াছে এবং নিজের বিশ্বতত্ত্বধ্যানী দৈব প্রতিভার স্বাধর্ম্ম্য অবলম্বনে হিমাদ্রি-শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া মহা-শূন্যে দৃষ্টিপাত করিয়াছে ঃ—

হেরিত উপরে। নীলকান্তি ধরে।
শূন্য ধূ ধূ করে। ছড়ায়ে কায়।
হেরিত অযুত। অযুত অদ্ভুত
নক্ষত্র ফুটিয়া। ছুটিছে তায়॥

এই পয়ার এবং লাচাড়ী ন্যূনাধিক অবিমিশ্রভাবে যেমন আদিবঙ্গে বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম ভাব-কবি চণ্ডীদাসের মধ্যে, তেমন ভাব-ছন্দের অপূর্ব্ব বাণীসাধক কবি বিদ্যা-পতির মধ্যেও বিকাশ পাইয়াছিল; যেমন বাঙ্গালী-জীবনের অপূর্ব্ব পরিদর্শক কবিকঙ্কণের মধ্যে, তেমনি বঙ্গসাহিত্যের অদ্বিতীয় শব্দমন্ত্রসাধক ভারতচন্দ্রের মধ্যেও নানাপথে বিকশিত হইয়া আধুনিক যুগসীমায় উপস্থিত হইয়াছিল; এবং উহারাই মধু হেম নবীনের মধ্যে আসিয়া নানা মিশ্রপথে আধুনিক ভাবসাধনায় অবহিত হইয়াছে। কিন্তু এই চৌপদী আরও অগ্রসর হইয়া বঙ্গবাণীর পদগতি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে—ভারতচন্দ্রেই তাহার উদ্ভাবনা পরিদৃষ্ট হইবে। তবে, এই চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিতে পারি না। হয়ত বঙ্গীয় ছন্দগতির পক্ষে এই চৌপদীই শেষ সীমা – তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন ঃ—

জটজালিনি। শিরমালিনি। শশিভালিনি।
সুখশালিনি। করবালিনি গো।
শিব-গেহিনী। শিব-দেহিনি। শিব-রোহিণি।
শিব-মোহিনি গো!

এই ছন্দের আভ্যন্তরীণ সুরটুকু যেন অতিরিক্ত টানে ছিন্ন হইয়া তাহা গদ্যে পরিণত হইয়া দাঁড়াইয়াছে! একমাত্র পংক্তি ধরিয়া যেমন ছন্দের প্রকৃতি স্থির করিতে হয়, তেমন ইহাও নিশ্চয় যে, এই পংক্তি একনিশ্বাস-সাধ্যতার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না—উহার অক্ষরসংখ্যা যদৃচ্ছাক্রমে বর্দ্ধিত করা যায় না। বঙ্গ-ভাষার প্রকৃতি এবং বাঙ্গালী-কণ্ঠের অপিচ তাহার ফুশফুশের শক্তির সঙ্গে বাঙ্গালাছন্দের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। সভ্যজগতের সমস্ত প্রাচীন এবং আধুনিক ভাষাগুলির মধ্য হইতেই দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া জানাইতে পারা যায় যে ছন্দের ক্ষেত্রে অক্ষর-বৃদ্ধির পরীক্ষা-ব্যাপার যথেচ্ছ চলিতে পারে না। তবে বঙ্গীয় ছন্দের উচ্চাভিলাষ যে এইস্থলে শেষ হয় নাই তাহা আমরা মিশ্রছন্দের বেলায় দর্শন করিতে পারিব।

বলিতে হয় যে, এই অমিশ্র পয়ার এবং লাচাড়ীর বিভিন্ন পদগতি দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের মধ্যে আসিয়াই পুরাপুরি নিম্মলতা লাভ করে, এবং তাঁহার দ্বারাই উহাদের সংযোগ এবং সম্প্রসারণের সাহায্যে নব নব ছন্দের পরিস্ফুট মূর্ত্তি আবিষ্কার করার পথ পরিষ্কৃত হয়। কিন্তু তাঁহার পরেও একশত বৎসর পর্য্যন্ত মদনমোহন, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি কবিগণ ভারতচন্দ্রের নেমিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই চলিতেছিলেন, প্রচলিত ছন্দের সংমিশ্রণে যে কত অগণিত অনন্ত ছন্দের ধারণা করা যাইতে পারে তাহার সুস্পষ্ট উপলব্ধি কিংবা সমুচিত অনুসরণ এই যুগে প্রকাশিত হইতে পারে নাই; তখনো বঙ্গবাণীর ছন্দ-প্রতিভা আধুনিক কালের উপযোগী জীবন কিংবা শক্তি লাভ করিতে পারে নাই। বঙ্গভাষা এ দীর্ঘকাল যেন প্রকৃত কবি-প্রতিভার জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল। হৃদয়ের যে পরিমাণ আবেগ গভীরতা বা উন্মাদনা হইতে জাতিবিশেষের সরস্বতী অভিনব পদ-পন্থার আবিষ্কার করিয়া প্রবাহিণী হইতে পারে, উহাঁদের কাহারও মধ্যে তাহার সঙ্কুলান ছিল না বলিয়াই ধরিতে হয়। প্রাচীন রীতির বিবরণী (narrative) কবিতা রচনায় তাঁহারা

সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু আধুনিক নিয়মের ভাবুকতার রং ধরিলে বা আন্তরিকতা লাভ করিলে কবির ভাষা যেমন নিজের সহকারী ছন্দ আবিষ্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া যায় ইহাঁদের ভিতর সে দৃষ্টান্ত মিলিতেছে না।

শত বৎসরের পর এই শৈলগুহারুদ্ধ ছন্দনির্ঝরে বঙ্গের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম নবজীবনের কলকল্লোল আনিয়াছিলেন মধুসূদন দত্ত! বলা বাহুল্য, বাঙ্গলা পয়ার একদিকে অত্যন্ত শক্ত রচনা; বিরামের যতিটুকুই উহার একমাত্র পরিচালনী শক্তি বলিয়া, উহাকে হৃদয়-ভাবের অনুগত গতি প্রদান করিতে না পারিলে, কেবল অক্ষরসংখ্যা বা বাহ্যিক মিলের দিকে দৃষ্টি রাখিলে, এই পয়ার অতি সহজেই একঘেয়ে হইয়া পড়ে। সকল প্রাচীন কবির মধ্যেই ইহার দৃষ্টান্ত আছে। তাঁহারা যে ইহা টের না পাইয়াছিলেন, এমন নহে; এই কারণে তাঁহারা পরম্পরাক্রমে পয়ার এবং লাচাড়ীর শরণ লইতে বাধ্য হইতেন। বিরামের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া শব্দের বাহ্যিক মিলনকে অবহেলা করিতে পারিলেই এ সমস্যার ভঞ্জন হয়; মধুসূদনই সর্ব্ব প্রথম তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। মধুর হৃদয় ইংরেজীর মধ্য দিয়া সমুদ্র-যাত্রা করিয়া বাঙ্গালীকে সম্পূর্ণ অভিনব ঐশ্বর্য্য— এমন কি আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের অন্তরঙ্গ জীবনটুকুই উপহার আনিয়া দিয়াছে। পাশ্চাত্য কিংবা প্রাচ্য কবি-গণের মধ্যে মিলটনের সমুদ্রচ্ছন্দা হৃদয়ের সহমর্ম্মিতা লাভ করিয়াছিলেন বোধ করি কেবল আমাদের এই মধুসূদন। মিলটন যে জগতের ছন্দ-কবিগণের মধ্যে অদ্বিতীয়, ইহা হৃদয়বান্ মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য। শেরার বলিয়াছেন, প্যারাডাইস লষ্টের ছন্দ is the very essence of Poetry। বলা বাহুল্য, অমিত্র ছন্দ সমস্ত ছন্দের মূলাধার। মেঘনাদবধের ছন্দও সর্ব্বপ্রকার বাঙ্গালা পয়ার এবং লাচাড়ী ছন্দের হৃদয়নিহিত আদ্যাশক্তিকে ধারণা করিয়াই বিলসিত হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রে মধুসূদন এখনো আমাদের দেশে অদ্বিতীয় বলিতে হইবে। এস্থলে অমিত্র ছন্দের বিস্তারিত আলোচনার সময় নাই। এক কথায় বলিতে পারা যায় যে মধুসূদন উহার দ্বারা সমুচিত দৃষ্টান্ত পথেই বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছেন যে, কাব্যের ছন্দ প্রকৃত প্রস্তাবে অক্ষরের বাহ্যিক মিলনের মধ্যে নহে—উহার মূল কবির হৃদয়ে; এবং উহার প্রধান তত্ত্ব unity in vareity, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সম্পাদন। প্রাচীন কালে যখন কবিতা ও সঙ্গীত অবিশিষ্ট ভাবে অবস্থান করিতেছিল তখন উভয়েই কেবল বৃত্তগতি বা metre-এর উপর নির্ভর করিত। ক্রমে উভয় কলা নানা দিকে বিশ্লিষ্ট হইয়া স্বতন্ত্র মূর্ত্তি লাভ করিয়া পরস্পর হইতে বহু দূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সঙ্গীত যেমন সুরের আস্থায়ী অন্তরা আভোগ সঞ্চারী গতি এবঞ্চ ঐক্যতানের নির্ভরেই বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, কাব্যও তেমনি এই সুরকে ব্যগর্থের রাজ্যে আনয়ন করিয়া উহার মাহাত্ম্যকে কবি-হৃদয়ের ভাব বা কল্পনাবিভব এবং রসাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াই স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তান যেমন সুরের সহকারী মাত্র, কাব্যের ক্ষেত্রে বাহ্যিক মিলনাত্মক ছন্দটাও সহকারী বই নহে, অপিচ এই ক্ষেত্রে উহার প্রভুত্বের অনুপাতও অনেক কম। মধুসূদনের দৃষ্টান্তের পর হইতেই বাঙ্গলার কবিগণ পয়ার এবং লাচাড়ীকে নিজ নিজ ভাব-গতিক মিশ্রপথে পরিচালন করিয়া নব নব বস্তুসাধনায় মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছেন; ছন্দের 'বাঁধি গৎ' বিস্মৃত হইতে পারিয়াছেন। এই ব্যাপারের মাহাত্ম্য স্বল্প-কথায় শেষ করা যায় না, আমরা উপস্থিতক্ষেত্রে মধুসূদন হইতে কেবল একটিমাত্র দৃষ্টান্ত পাঠকের বিচারের জন্য রাখিয়া অগ্রসর হইব :—

> বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজ
> রাবণ—বিশদ বস্ত্র বিশদ উত্তরী
> ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে;
> চারিদিকে মন্ত্রিদল দূরে নত ভাবে।
> নীরব কর্ব্বুরপতি অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
> নীরব সচীববৃন্দ অধিকারী যত
> রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
> রক্ষোপুরবাসী রক্ষ—আবালবনিতা-
> বৃদ্ধ; শূন্য করি পুরী—আঁধার রে এবে
> গোকুল ভবন যথা শ্যামের বিহনে।
> ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে তিতি অশ্রুনীরে
> চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে।

যদৃচ্ছভাবে উদ্ধার করিয়াছি। [illegible]

মধুসূদনের কাব্যচিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণ্য হইলেও, তদ্ভিন্ন এস্থলে অন্য কোন অলঙ্কার বিশেষ প্রভুতা দেখাইতে পারে নাই। কিন্তু ছন্দ! কবির হৃদয়গত ভাব-মূর্ত্তিই অপরূপ ছন্দগতি অবলম্বনে পাঠকের হৃদয়ে নিজেকে মুদ্রিত করিয়া দিতেছে। বাঙ্গালা পয়ার এবং লাচাড়ী এই কতিপয় পংক্তির মধ্যে বিরাম-যতির শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া, অক্ষরসংখ্যাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল কমা সেমিকোলন দাঁড়ীর উপরই নির্ভর করিতেছে! কখন ধীর গতিতে, কখন দ্রুতপদে চলিয়া, কখন বা একেবারে স্থগিত হইয়া দাঁড়াইয়া আমাদের মনে কি অপরূপ রেখা-বিন্যাস করিয়া চলিয়াছে! এবং শেষের দুই চরণের প্রবাহের সাহায্যে আমাদের মানসনেত্রের সমক্ষে সমগ্র শোভাযাত্রার ধীর বিষণ্ণ প্রবাহ-মূর্ত্তিটুকু কি অনুপম ভাবে অঙ্কিত করিয়া যাইতেছে!*

মধুসূদনের পর হেম নবীন প্রভৃতি কবিগণ কতমতে এই পয়ার এবং লাচাড়ীর মিশ্র পথে অগ্রসর হইয়াছেন, এবং পরিশেষে বঙ্গদেশের অতুলনীয় সঙ্গীতচ্ছন্দের কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আসিয়া এই মিশ্রচ্ছন্দ যে কত শত সহস্র রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা আমরা সকলেই জানি। এই ক্ষেত্রে মধুসূদন হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত এই মিশ্রচ্ছন্দের নানা পরিণতি অনুসরণ করিয়া একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিতে পারা যায়। তবে, এই ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা বাঙ্গলায় শ্লোকস্তবক বা Stanzaর প্রচলন। উহা হইতেই বাঙ্গালী কবির হৃদয় স্বাধীনভাবে পরিচালিত হইবার পক্ষে অনন্ত সম্ভাব্যতার ক্ষেত্র লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত ছন্দ চারিটি চরণেই আবদ্ধ ছিল, বৃত্ত এবং জাতি ছন্দ "তভজ" প্রভৃতি দশটি "গণের" সাহায্যে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য দখল করিয়া আছে—

"সমস্তং বাঙ্ময়ং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যমিব বিষ্ণুনা।"

সংস্কৃত ছন্দ চারি চরণের এই দেওয়াল-দেওয়া কারাগার অতিক্রম করিতে পারে না, গ্রীক এবং লাটিন ছন্দও এই প্রকারে "মিটারের" পাশে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য ছিল। অমিত্র ছন্দ বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের অপিচ ইয়ুরোপীয় সভ্যতার নব জীবনের (Renaissance) আবিষ্কার—অভিনব স্বাতন্ত্র্যের আদর্শে জাগ্রত ইটালির আবিষ্কার, তৎপূর্ব্বে ফরাশি দেশে উহার কথঞ্চিৎ উদ্ভাবনা ঘটিয়া থাকিলেও ইটালিই ইয়ুরোপকে এই শিক্ষা দিয়াছিল; তদ্ব্যতীত, ইটালি ইয়ুরোপকে (এই ষ্ট্যাঞ্জার পন্থায়) উহার কাব্যছন্দকে 'মিটারের' অপরিবর্ত্তনীয় ছাঁচ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যদৃচ্ছ ভাব-গতির অনুসরণে লীলায়িত হইবার রহস্যও শিক্ষা দিয়াছে। গ্রীক লাটিনকে নানা দিকে আত্মসাৎ করিয়া আধুনিক ইয়ুরোপীয় ভাষাগুলির সৃষ্টি এবং উন্নতি—উহাদের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিও এই ষ্ট্যাঞ্জার পরিচয় লাভ করিয়াই আধুনিক জীবনের বহু বিমিশ্র ভাবগতি এবং আন্তরিকতাকে সমুচিত বাক্যে প্রকাশ করিতে করিতে নিত্য নব নব ছন্দ প্রয়োগে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের বঙ্গভাষাও প্রাচীন আর্য্য সংস্কৃতকে আত্মসাৎ করিয়াই গঠিত—মধুসূদনের মধ্যে আসিয়াই উহা নিজকে ইয়ুরোপীয় সমস্ত আধুনিক ভাষার সমধর্ম্মী বলিয়া আত্ম-পরিচয় লাভ করিয়া সর্ব্ব প্রথম বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে বসিবার জন্য উচ্চাভিলাষ অনুভব করিয়াছিল। মধুসূদন

---

* এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, মধুসূদনের এই চতুর্দ্দশাক্ষর-চরণযুক্ত অমিত্র পয়ারকে আরও স্বাধীনতা প্রদান পূর্ব্বক ষোল-মাত্রায় অথবা একেবারে মাত্রা-অধিকারের বহির্ভাগে লইয়া গিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবাহিত করার চেষ্টাও চলিয়াছিল। উহাকে রঙ্গালয়ের মধ্যে আনিয়া (সম্ভবতঃ কণ্ঠস্থ করার সুবিধা সম্মুখে রাখিয়াই) গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নাট্যকারগণ এই চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে কবিতা জন্মিয়াছে কি না সে বিষয়ে পাঠমাত্রেই সন্দেহ হইতে থাকে। গিরীশ বাবুর অভিনেয় নাটক রচনার শক্তি অসাধারণ বলিতে হইবে। কিন্তু, তৎ-সত্ত্বেও, তাঁহার কবিত্বশক্তি—ভাবকে কাব্যরসাত্মক ছন্দে আকার দান করার শক্তি, যথোচিত ছিল না বলিয়াই ধারণা জন্মে। অমিত্র ছন্দের মূল তত্ত্ব, যাহা মধুসূদনের মধ্যে এত উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, উহার যথার্থ ধারণা আমাদের অভিনেয় নাটকগুলির মধ্যে কদাচিৎ মিলিতেছে। এ কালের অনেক অভিনেয় নাটকের মধ্যে এমনও দেখা যায়, যে পর্য্যন্ত গদ্যে কথাবার্ত্তা চলিয়াছে সে পর্য্যন্ত উহা বেশ চলন-সই ভাবেই চলিতে থাকে, কিন্তু সেই ভাবের কোন একটা উচ্ছ্বাসের সম্মুখীন হওয়া, অমনি পাত্রগণ অমিত্র ছন্দের বুলি গ্রহণ করিলেন, আর সমস্ত রস বিচিকিৎস ভাবেই নিহত হইয়া গেল। অনেক স্থলে বিপরীত হাস্যরসই উদ্রিক্ত হইয়া পড়ে। ইহার প্রধান কারণ হয়ত লেখকের শক্তির অভাব। কিন্তু ইহা জোরের সহিত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে স্বেচ্ছাচারী অমিত্র পয়ার এখনো বাঙ্গালার কবিতায় [illegible] লাভ করিতে পারে নাই।

যেমন চতুর্দ্দশ চরণের কবিতা বলিতে আধুনিক ইয়ুরোপের 'সনেট'কে ধারণা করিয়াছেন, তেমন তাঁহার "রসাল ও স্বর্ণলতিকা", "মেঘ ও চাতক", এবং "আশার ছলনা" ও "বঙ্গভূমির প্রতি" প্রভৃতি ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যেও বাঙ্গালার শৃঙ্খলবদ্ধ ত্রিপদী চৌপদীকে অপূর্ব্ব স্বাধীনতায় দীক্ষিত করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র 'অবকাশ-রঞ্জিনীর' মধ্যে, বিশেষতঃ হেমচন্দ্র তাঁহার কবিতাবলির "লজ্জাবতী লতা" "পদ্মের মৃণাল" এবং পিণ্ডারীয় ওড্-গুলির মধ্যে এই ষ্ট্যাঞ্জাকেই সর্ব্বাপেক্ষা সতর্কভাবে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের "স্বপ্ন-প্রয়াণ", বিহারীলালের "শারদামঙ্গল" ও "বঙ্গসুন্দরী", সুরেন্দ্রনাথের "মহিলা" বঙ্গীয় পয়ার এবং লাচাড়ীকে নব নব ষ্ট্যাঞ্জার মূর্ত্তির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে।

ইহাঁদের পর, রবীন্দ্রনাথ যেই শক্তি লইয়া বাঙ্গালার আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন উহা বিশেষভাবেই সঙ্গীত-অধিকারের শক্তি। তাঁহার অগণিত ছন্দের মূল রহস্য এই মনে হয়, যেন ছন্দটাই তাঁহার মনে সর্ব্বাগ্রে কবি-প্রতিভার ভাবোদ্দীপনার সুররূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়া পরে পরে বাক্যচ্ছন্দে আকারপ্রাপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ একটি মৌলিক এবং অসাধারণ ছন্দপ্রতিভার পুণ্য-সঙ্গম হইতে বঙ্গবাণী যে অত্যল্প কালের মধ্যেই এক অভিনব গীতিকবিতার ফসলে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিবে, এবঞ্চ নিজের বৈষ্ণবী কাব্যকলাকেও সঙ্গীত এবং কবিতার মধ্যক্ষেত্রে লইয়া গিয়া যে অভিনব ভাবগত কবিতার সৃষ্টি করিবে তাহাতে কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই। এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী ইয়ুরোপের সমক্ষে নিজের একটা বিশেষ উপার্জ্জন উপস্থিত করিতে পারিতেছে। গ্রীক লাটিনের ওড্, ইটালির সনেট, জাপানের তান্‌কা, পারস্যের "গজল" এবং "রুবাই" প্রভৃতি জাতীয়-বিশেষত্ব-জ্ঞাপক কবিতার ন্যায়, এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালীও "বাঙালী গীতিকবিতা" বলিয়া একটা স্বতন্ত্র ভাবগতিক কবিতা-মূর্ত্তি বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করিতে পারিতেছে। আমাদের এই গীতিকবিতা বিজাতীয়ের দৃষ্টির সমক্ষে, বাক্যচ্ছন্দের ন্যূনাধিক দেশীয় মাহাত্ম্যটুকু বাদ রাখিয়াও, কেবল ভাবের স্বাতন্ত্র্যেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছে।

আমরা এতক্ষণ কেবল লঘু-গুরু-বিচারহীন পয়ার এবং লাচাড়ীর দৃষ্টান্তই দর্শাইয়া আসিলাম। ইহা ছাড়া বঙ্গভাষায় আর এক প্রকার পয়ার এবং লাচাড়ী আছে; অতি প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গ-কবিতার প্রকৃতির মধ্যে এই লক্ষণ বিকশিত হইতে চেষ্টা করিতেছে, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বর-মাত্রিক ছন্দ। আমরা জানি সংস্কৃত ছন্দ মাত্রেই স্বর-মাত্রিক; স্বরবর্ণই সংস্কৃত ছন্দের নিয়ামক, ব্যঞ্জন বর্ণ উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে বই নহে। সংস্কৃত ছন্দ শাস্ত্রে স্বরের নামই অক্ষর; সংস্কৃত শাব্দিকগণের মতে এই সমস্ত স্বর অবিনশ্বর ধ্বনি; এবং উহাদের বিকাশেই যাবতীয় ব্যঞ্জন বর্ণের উৎপত্তি। তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া একমাত্র বর্ণ হইতেই—শব্দব্রহ্ম হইতেই সমস্ত বর্ণের উৎপত্তি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন। যাহা হউক এই স্বরবর্ণই সংস্কৃত ছন্দের প্রধান শক্তি। রুদ্রজামল বলিয়াছেন ঃ—

"স্বরা অক্ষরসংজ্ঞাঃ স্যু হলাস্তদনুযায়িনঃ।

বাঙ্গলা ছন্দও মূলতঃ স্বরমাত্রিক সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্গভাষা সংস্কৃতের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ-ভেদ অনেক দিকে পরিহার করিয়া, স্বর-পরিস্ফুট ব্যঞ্জন বর্ণের মিলনের উপর এত অধিক জোর দিয়াছে যে, ব্যঞ্জনকে বাদ দিলে বঙ্গীয় ছন্দের অস্তিত্বই দাঁড়াইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতিবশে বৃত্তছন্দই তাহার প্রধান ঐশ্বর্য্য; উহার দ্বারা সংস্কৃতে অতি বিস্ময়কর ছন্দ-সংখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। সচরাচর অলঙ্কার-শাস্ত্রে ৩৫০টি ছন্দের উল্লেখ দেখা যায়। সংস্কৃত ছন্দের আদি দার্শনিক পিঙ্গলাচার্য্য বলিয়াছেন উহার ছন্দসংখ্যা (১৬৭৭৭০১৬) এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ সাতাত্তর হাজার ষোলটা হইতে পারিবে। স্বরবর্ণের লঘু গুরু এবং হ্রস্ব দীর্ঘতার মাহাত্ম্য হইতেই এই অভাবনীয় ঘটনার সম্ভব হইয়াছে। অথচ বেদে সাতটির অধিক ছন্দ নাই। এই অল্প-সংখ্যক মৌলিক ছন্দ হইতেই এত সমস্তের উৎপত্তি। এখন বঙ্গভাষা স্বরের লঘু গুরু উচ্চারণ অগ্রাহ্য করার জন্যই তাহার পক্ষে সংস্কৃত ছন্দের এই অনন্ত মাহাত্ম্য অর্জ্জন

করা অসম্ভব। কিন্তু, এই ক্ষেত্রে, সংস্কৃত উচ্চারণের রীতি প্রচলিত করিবার উদ্দেশ্যে আদিকাল হইতেই কবিগণের মধ্যে অশ্রান্ত চেষ্টা পরীক্ষা এবং পর্য্যবেক্ষণ চলিয়া আসিতেছিল। এই চেষ্টা কোথাও একেবারে নিষ্ফল হইয়া, কোথাও বা চন্দন-সই সুফল প্রসব করিয়া পরিশেষে বঙ্গ-ভাষার মধ্যে ন্যূনাধিক স্বাধীন ভাবের একটা স্বর-বর্ণাত্মক ছন্দরীতি স্থির করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে, বিশেষতঃ বিদ্যাপতি এবং ভারত চন্দ্রের মধ্যেই, এই চেষ্টার দৃষ্টান্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইঁহারা প্রাচীন বঙ্গীয় ছন্দের রাজা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহাদের ছন্দের কান এত তীক্ষ্ণ যে দেখিবেন বাঙ্গলার এই স্বরমাত্রিক ছন্দের প্রধান লক্ষণগুলি তাঁহাদের মধ্যেই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই চেষ্টার ধারাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—প্রথম সংস্কৃত নিয়মে লঘু গুরু উচ্চারণ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা; দ্বিতীয় নিখুঁত সংস্কৃত ছন্দের প্রচলন।

বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে বিদ্যাপতির রচনাই সংস্কৃতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্ত্তী, এমন কি বিদ্যাপতি পাঠ করিতে বসিয়া স্বরবর্ণকে অনেকটা সংস্কৃতের অনুযায়ী উচ্চারণ করিতে না পারিলে, দীর্ঘ বর্ণকে অথবা সংযুক্ত-পূর্ব্ব বর্ণকে দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া গণনার সময় উহাদিগকে দ্বিমাত্রা বলিয়া না ধরিলে, এক কথায় বাঙ্গালা উচ্চারণ নানাদিকে বিস্মৃত না হইলে, তাঁহার কবিতার প্রধান রসটাই আমাদের রসনা হইতে দুরবর্ত্তী থাকিয়া যাইবে। এ স্থলে প্রধান কথা এই যে বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে ব্রজবুলি ব্যবহারের—সংস্কৃত এবং অর্দ্ধ-হিন্দি-মিশ্র অপ্রচলিত ভাষা ব্যবহারের—প্রধান কারণটাও হয় ত এই স্থলেই মিলিবে, তাঁহারা সংস্কৃত অনুযায়ী উচ্চারণের আবছায়া রক্ষার উদ্দেশ্যেই যেন আটপৌরে ব্যবহার হইতে দূরবর্ত্তী একটা ভাষা কল্পনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে বিদ্যাপতির চেষ্টা সকল দিকে সফল হয় নাই; তবে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চরণের মধ্যে যে-স্থলে সফল হইয়াছে, তাহাই অনেক সময়ে ভাব ভাষা এবং ছন্দধ্বনির ঐক্যতান ঘটনার দিক্ হইতে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়াই প্রতীতি হইবে।

বিদ্যাপতির দুইটি অতুলনীয় পয়ার পংক্তি গ্রহণ করুন—

"কি কহব রে সখি। আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব। মন্দিরে মোর॥"

ইহা একটা ষোড়শাক্ষরমাত্রিক পয়ার ছন্দের দৃষ্টান্ত। ইহার প্রধান শক্তি দীর্ঘ বর্ণের এবং সংযুক্তপূর্ব্ব বর্ণের সংস্কৃত অনুযায়ী উচ্চারণ; এবঞ্চ দীর্ঘ মাত্রাকে দ্বিমাত্রা বলিয়া গণনা। এই গণনার নিয়ম সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে আছে—

'এক মাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।'

এইরূপ আর কতিপয় পংক্তি—

লোচন জনু থির। ভৃঙ্গ-আকার
মধু মাতল কিয়ে উরই ন পার!
নীর ক্ষীর দুহু। করই সমান।

বলা বাহুল্য এইরূপে বিদ্যাপতির মধ্যে সংস্কৃত রীত্যনু-যায়ী দীর্ঘস্বর দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হয় এমন পয়ার ছন্দ যথেষ্ট আছে। লাচাড়ী ছন্দেরও দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখুন—

পাঁচ বাণ অব। লাখ বাণ হউ,
মলয় পবন বহু মন্দা।

ইহার প্রথম দুই চরণে আটটি করিয়া অক্ষর, তৃতীয় চরণে বারটি। এই দৃষ্টান্ত যথেচ্ছ বর্দ্ধিত করা যায়—

চন্দন-তরু যব, সৌরভ ছোড়ব।
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি সব, নিজ গুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥

কিন্তু উহাদের নিকটবর্ত্তী পংক্তিগুলি ধরুন—

সোহি কোকিল। অবলাক ডাকও
লাখ উদয় করু চন্দা।

অথবা—

সিন্ধু নিকটে যদি। কণ্ঠ শুকায়ব।
কো দূর করব পিয়াষা।

এই-সমস্ত চরণের উচ্চারণে খামখেয়ালির বশবর্ত্তী হইতে না পারিলে চলিবে না।

এইরূপে বিদ্যাপতি এবং সকল বৈষ্ণব কবির কণ্ঠই সংস্কৃত এবং প্রাচীন রীতির মধ্যস্থলে অস্থির ভাবে দোলায়মান হইতে দেখিবেন। বাঙ্গালা ছন্দ কোন্ পথে স্বাধীন ভাবে সংস্কৃতের ছন্দধ্বনিও যথাসাধ্য অর্জ্জন

করিয়া চলিতে পারে, এই প্রশ্নের সমুচিত মীমাংসা সতর্ক ভাবে কাহারও মনে না জাগিয়া থাকিলেও, অতর্কিতে সকলেই যেন সংশয়ারূঢ় হইয়া এদিক্ ওদিক্ ঝুঁকিয়াই চলিতেছিলেন। সংস্কৃতমূলক শব্দের উচ্চারণ-বিষয়ে কিছুমাত্র অপেক্ষা না থাকিলেও বাঙ্গালা বিভক্ত্যন্ত পদের উচ্চারণ-সমূহ তাঁহাদের সমক্ষে অনতিক্রম্য অন্তরায় উপস্থিত করিতেছিল— বাঙ্গালা পদের উচ্চারণ সংস্কৃত অনুযায়ী করিতে গিয়া সময় সময় নিতান্ত অস্বাভাবিক ঠেকিতেছিল। ভারতচন্দ্রের মধ্যেও একস্থলে এইরূপ সন্দিগ্ধ রীতির দৃষ্টান্ত আছে.—

আধই হৃদয়ে। হাড়ের মালা,
আধ মণিময়। হার উজালা,
আধ গলে শোভে। গরল কালা,
আধই সুধা-। মাধুরী রে।

এক হাতে শোভে। ফণিভূষণ,
এক হাতে শোভে। মণিকঙ্কণ,
আধ মুখে ভাঙ্গ। ধুতুরা ভক্ষণ,
আধই তাম্বুল পূরি রে।

বলা বাহুল্য এই ছন্দকে কোন্ নিয়মে পাঠ করিলে উহার মাধুর্য্য (melody) বা পদগতির সৌষ্ঠব (rythm) রক্ষিত হইবে তাহার কিছুমাত্র ঠিক নাই। এইরূপ দৃষ্টান্ত যখন স্বয়ং ভারতচন্দ্রের মধ্যেই মিলিতেছে—এবং এই দোষ অতর্কিত নহে—তখন, দেখিবেন, বিষয়টি কত গুরুতর আকারে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল! উহার ফল এই দাঁড়াইল যে, তাহারা মাত্রাছন্দে বাঙ্গালা পদ যথাসাধ্য পরিত্যাগ করিতে, অথবা বাঙ্গালা পদের ইচ্ছানুরূপ বর্ণবিন্যাস করিতে চেষ্টিত হইলেন। এইরূপে যে ছন্দ জন্মপরিগ্রহ করিল উহাকে ঠিক বাঙ্গালা বলা যায় কি না সন্দেহ; সংস্কৃত ভাষাই কেবল নিজের অনুস্বার বিসর্গ পরিত্যাগ করিয়া দেখা দিল বই নহে। গীতগোবিন্দের সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলা পদের বেশী তফাৎ রহিল না। গোবিন্দদাস গাহিলেন ঃ

ঈষৎ হসিত বদনচন্দ,
তরুণী-নয়ন নয়ন-কন্দ।
বিম্ব-অধরে মুরলি মুরলি
ত্রিভুবন মনোমোহিনী।
কুসুম-মিলিত চিকুর-পুঞ্জ
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ-
নিচয়রচিত মুকুট
মকর-কুণ্ডল-দোলনী।
সুন্দরী রাধে আওএ বনি
ব্রজ-রমণীগণ-মুকুটমণি।
আভরণধারিণী নব-অনুরাগিণী
স-আবেশিনী তরঙ্গিণী রে।
অঙ্গতরঙ্গিণী অধর সুরঙ্গিণী
সঙ্গিনী-নব-নব-রঙ্গিণী রে।
নব-অনুরাগিণী নিখিল-সোহাগিনী
পঞ্চম-রাগিণী-রূপিণী রে।
রাস-বিহারিণী হাস-বিকাশিনী
গোবিন্দদাস-চিত-মোহিনী রে।

ইহার পর ভারতচন্দ্র আসিয়া বাঙ্গালা শব্দ এককালে পরিহার করিয়া হ্রস্বদীর্ঘ নিয়মের নিশ্মল মাত্রা-ত্রিপদী এবং চৌপদী রচনা করিয়া গেলেন ঃ—

নগনন্দিনি। সুরবন্দিনি। চিরনন্দিনি। গো।
জয়কারিণি। ভয়হারিণি। ভবতারিণি। গো।
জয়তি জননি অন্নদা
গিরিশ-নয়ন-নর্ম্মদা।
অখিল ভুবন-। ভক্তকুল-। ভুক্তি-মুক্তি-শর্ম্মদা॥
তরুণ কিরণ। কমল-কোষ-। নিহিত চরণ চারুদা।
ভব-নিপতিত। ভারতত্রা। ভব-জলনিধি-পারদা॥

জয় সুরারিনাশন। বৃষেশবাহন। ভুজঙ্গভূষণ জটাধর,
জয় হিমালয়ালয়। মহামহোময়। বিলোকনোদয় চরাচর॥

বলা বাহুল্য সংস্কৃত রীতির উচ্চারণজনিত ধ্বনিগৌরবে মুগ্ধ হইয়া ভারতচন্দ্রের প্রদর্শিত পথে আধুনিক কালেও বহু কবি মাত্রিক লাচাড়ী রচনা করিয়াছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথই তাঁহাদের অগ্রণী।

ইহার পর এই দিকে আর একটিমাত্র কার্য্য ছিল; তাহা একেবারে সংস্কৃত বৃত্তছন্দকে বাঙ্গালায় প্রচলিত করার চেষ্টা। অবশ্য ভারতচন্দ্রের মধ্যেই উহার উৎসাহ মূর্ত্তিমান না হইয়া পারিত না; উহা হইতেই ভারতচন্দ্র এবং তাঁহার সমকালীন রামপ্রসাদ কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় তূণক তোটক ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতির প্রবর্ত্তন। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদনের সময় পর্য্যন্ত, এবং একালেও বহু লেখকের মধ্যে এতজ্জাতীয় উৎসাহ থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কয়েকটা দৃষ্টান্ত না তুলিলে বাঙ্গালা ছন্দের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে ঃ—

তূণক—

রাজ্যখণ্ড লণ্ডভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে
হলস্থূল কলকল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে॥

রুদ্রদূত ধায় ভূত নন্দী ভৃঙ্গি সঙ্গিয়া
ঘোর বেশ মুক্ত কেশ যুদ্ধরঙ্গ রঙ্গিয়া॥
ধৈল দক্ষ ভূত লক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে
ভারতের তূণকের ছন্দবন্ধ বাড়িছে।

ভুজঙ্গপ্রয়াত—

লটাপট জটাজুট সংঘট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা।
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে
অরে দক্ষ অরে দক্ষ দেরে সতীরে।
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে।

তোটক—

শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে,
তুঁহি পঙ্কজিনি মুঁহি ভাস্কর লো।

ছন্দসন্নিবিষ্ট বাক্যের এই ধ্বনি এই আবেগ এবং এই শক্তি বঙ্গভাষায় অপূর্ব্ব এবং এখন পর্য্যন্ত অতুলনীয় বলিতে হইবে। উহার গুণকীর্ত্তনে আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া এইমাত্র বলিব যে সংস্কৃত রীতির ধ্বনি-গৌরব বা পদলালিত্যের আকর্ষণে আবিষ্ট হইয়াই বহু লেখক—মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বলদেব পালিত, ভুবনমোহন চৌধুরী প্রভৃতি—পরে পরে আরো অনেকগুলি সংস্কৃত ছন্দকে বাঙ্গলায় অবতারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনুষ্টুপ্ পজ্ঝটিকা শশাবদনা মালিনী মন্দাক্রান্তা শিখরিণী শার্দ্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি বারংবার পরীক্ষিত হইয়াছে; বাঙ্গলা ছন্দের ক্ষেত্র প্রসারিত করার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু এ চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিতে পারি না। উপরে উদ্ধৃত সিদ্ধ-সৌন্দর্য্যের চরণগুলি লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে যে, বাঙ্গলাশব্দকে সংস্কৃত ছন্দে বসাইতে গিয়া ব্যাকরণের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে পরম অপ্রমত্তবুদ্ধি ভারতচন্দ্রকেও স্থানে স্থানে প্রমাদ ঘটাইতে হইয়াছে, তিনিও হ্রস্বকে দীর্ঘ এবং দীর্ঘকে হ্রস্ব উচ্চারণের "কারসাজি" করিয়াই চলিয়াছেন। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের দ্বারা বরং সংস্কৃত বৃত্ত-ছন্দকে বাঙ্গলার পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়াই যেন ধারণা জন্মিতে থাকে। যে কয়টাকে কথঞ্চিৎ গ্রহণ করিতে পারা যায়, ভারতচন্দ্র যেন তাহার শেষ পর্য্যন্তই দেখাইয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য তোটক যেমন বিলাতী সাহিত্যের পরম শক্তিশালী anapest, তূণক তেমনি trochee। উহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে বাঙ্গলাছন্দের শক্তি অপরূপ বৃদ্ধিলাভ করিত। কিন্তু নিয়তির নিদারুণ পরিহাস এই যে আর্য্যছন্দের মহিমান্বিতা ভাগীরথী আমাদের কর্ণরুচি হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন, এখন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইলে দুরবগাহ বালুচর এবং মরুকঙ্কর ব্যতীত আর কিছুই চক্ষে পড়িতেছে না। সংস্কৃত ছন্দকে বাঙ্গলায় আনিতে গিয়া ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে লেখকগণ প্রাণপণে বাঙ্গলা শব্দের পাশ কাটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও অপরিহার্য্যস্থলে বাঙ্গলাপদ নিতান্ত বেগতিক না হইয়া পারে নাই। দৃষ্টান্ত উদ্ধারপূর্ব্বক একটা সাধুচেষ্টা—অথচ দৈব দুর্ব্বিপাকে নিদারুণ নিষ্ফলতার প্রতি আপনাদের হাস্য উদ্দীপ্ত করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। আধুনিক কালে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার একজন সংস্কৃত-অভিজ্ঞ অথচ শক্তিশালী কবি। তাঁহার পরীক্ষাগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত বৃত্তের ক্ষেত্রে অতিশয় সুন্দর বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তাঁহার রচনা হইতেই কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছি :—

প্রচণ্ড সূরয অস্তাচল-গত
প্রতপ্ত ধরণী ধীরে প্রশমিত।
শীতল মৃদু মৃদু দক্ষিণ বাতে
পুষ্পিত কানন রম্য দিনান্তে॥
বিহঙ্গ-গানে কুসুমের বাসে
সুশ্যাম কুঞ্জে নবচন্দ্র হাসে।
বিমুগ্ধ মোহে যুবতীর চিত্ত
মধু ক্ষরেরে উপজাতি নিত্য।

বসন্ততিলক যথা—

উৎফুল্ল পল্লবদলে কুসুমের পুঞ্জে
সপ্তচ্ছদে মদভরা সিত পুষ্পকুঞ্জে
শেফালিকা-তরুতলে মুচুকুন্দ মুঞ্জে
নাগেশ্বরে মদনমত্ত দ্বিরেফ গুঞ্জে।

মালিনী—

বিহগ শিশির-পাতে ধুনিলা আর্দ্র পাখা,
শ্বসিল পবন কুঞ্জে মর্ম্মরে শুষ্ক শাখা,
অবিরত বনবালা পীড়িতা হে অনঙ্গে,
বিরচিল কবি গাথা মালিনী সর্গভঙ্গে।

শার্দ্দূলবিক্রীড়িত—

গাহে কোকিল চূত-চম্পক-বনে ঢালে সুধা চন্দ্রমা,
হাসে কিংশুক পাটলা বিকশিয়া শোভা সুবর্ণোপমা;
পুষ্পামোদ ভরে সমীরণ সদা ক্রীড়াবেশে কল্পিত,
আনন্দে কবি বর্ণিলা বিরচিয়া শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

স্বীকার করিব যে, বঙ্গভাষায় গোঁড়া সংস্কৃতের ছন্দধারণার এগুলি উত্তম দৃষ্টান্ত। বিজয়চন্দ্রের এই সংস্কৃত

ছন্দ বাঙ্গলার নিয়মে অন্ত্যব্যঞ্জনের মিল রক্ষাপূর্ব্বক বিশেষ শক্তিলাভ করিয়াছে এবং তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিতেছে। কিন্তু বাঙ্গলা শব্দবিভক্তি ক্রিয়া-বিভক্তি বা অকারন্ত পদের সহিত দেখা হইলেই কি সন্দেহ হইতেছে না—ইহার বাঙ্গলা উচ্চারণ কি? এই সমস্ত ছন্দ-উদাহরণের মধ্যে অনেক শব্দই এমন সংস্কৃত ধরণে উচ্চারণ করিতে হয় যাহা বাঙ্গলার উচ্চারণ নহে। ইহাতে সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনিটি বেশ ভাল রূপে জানা না থাকিলে পড়া যায় না; বাঙ্গলা ধরণে উচ্চারণ করিয়া পড়িলে পদে পদে ছন্দ-পতন হয়। বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দের উপযোগিতা-বিষয়ে কুতূহল সার্থক করা ব্যতীত উহাদের অন্য মাহাত্ম্য যেন প্রবল হইতে পারিতেছে না। বাঙ্গলার উচ্চারণের ধাতু ঠিক বজায় রাখিয়া সংস্কৃত ছন্দ রচনায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাহার দৃষ্টান্ত পরে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। সে সব ছন্দ ছন্দের প্রকৃতি না জানিয়া বাঙ্গলা উচ্চারণে পড়িয়া গেলেও ছন্দের স্বরূপটি আপনা হইতে প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

কিন্তু এই চেষ্টা এবং বিফলতাবোধ হইতেই বঙ্গ-সাহিত্য একদিকে পরমলাভ উদ্বৃত্ত করিয়াছিল। আমরা এই সূত্রে বাঙ্গলা পয়ার এবং লাচাড়ীর অপর এক-দিকের বিকাশ লক্ষ্য করিয়াই উপসংহারে উপস্থিত হইব। বাঙ্গলার সংস্কৃত স্বরমাত্রিক ছন্দের প্রবর্ত্তনের জন্য আদিকাল হইতে যে চেষ্টা হইয়াছে, এবং সেই চেষ্টার শিলাতলে পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক কবি মাথা খুঁড়িয়া-ছেন—তাহা আমরা দেখিয়া আসিলাম। কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাব হইতে বহুদূরে বাঙ্গালীর গৃহকোণ হইতেই বঙ্গ-ভাষার আর একটা স্বাধীন অথচ অক্ষরমাত্রিক ছন্দ বিকাশের ধ্রুবচেষ্টা অতর্কিতে কার্য্য করিয়া আসিতেছিল। বৈষ্ণব কবিগণ এবং পরবর্ত্তী সভ্য কিংবা সভাসদ কবি-গণ উহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি করিতে পারেন নাই; সাধু বাঙ্গলা উহাকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাঁহারা পদ্যের ভাষাকে গদ্য হইতে নানাদিকে পৃথক করিয়া তুলিয়াছিলেন, সংস্কৃত শব্দের সংপ্রসারণ এবং বিপ্রকর্ষণ করিয়া বঙ্গদেশের মধ্য হইতে accent নামক পদার্থটি যেন নির্ব্বাসিত করিতেই নিযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত বৃত্ত অনুকরণের বহিঃক্ষেত্রে বাঙ্গালা পদ্য কেবল কতকগুলি ঝাড়াঝুরা ব্যঞ্জন বর্ণের সমষ্টি হইয়া পড়িতেছিল। লিখিত গদ্য অথবা কথিত ভাষা হইতে বহু দূরবর্ত্তী এই যে পদ্যভাষার সৃষ্টি তাহার তুলনা অন্য কোন দেশে সুলভ নহে; মধুসূদন তদ্বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ ভাবের বাধ্য হইয়াই মেঘনাদবধের মধ্যে সময় সময় দুরুচ্চার্য্য সংস্কৃত শব্দের বজ্র করতাল বাজাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গভাষা যেই পরিমাণে লঘুগুরু বা উদাত্ত অনুদাত্ত উচ্চারণ অনুসরণ করিতে পারে, তাহার পরিচয় হয়ত এই পরিত্যক্ত রীতিতে,—গেঁয়ো রীতিতে বা পূর্ব্বকথিত ছড়ার মধ্যেই মিলিবে। ছড়া আমাদিগকে যেমন লাচাড়ীছন্দ শিখাইয়াছিল, তেমনি উহা আমাদের ভাষার একটা accentমূলক উচ্চারণ-পদ্ধতিও গোপনে গোপনে জাগাইয়া রাখিতেছিল; উহার দিকে ভারতচন্দ্রের দৃষ্টি যেমন আকৃষ্ট হয় নাই, তেমন বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যেও উপরে উদ্ধৃত দুই চারিটি স্থল ব্যতীত উহার বিশেষ আমল নাই। এইস্থলে বলিয়া ফেলা উচিত যে সময় সময় খামখেয়ালীর বশবর্ত্তী হইয়া চলিলেও উহাই স্বাধীন বাঙ্গলা উচ্চারণ। আমরা যেমন সংস্কৃত নিয়মের অনেক দীর্ঘ বর্ণকে অনুদাত্ত উচ্চারণ করিয়া প্রকারান্তরে হ্রস্ব করিয়া তুলিয়াছি, তেমনি অকারান্ত উচ্চারণের বাহুল্য বলিয়া সংস্কৃত শব্দের বিরুদ্ধে যে একটা অভিযোগ আছে আমরা সম্পূর্ণ হলন্ত বা ওকারান্ত উচ্চারণ করিয়া উক্ত অভিযোগ অনেকটা কাটাইয়া উঠিয়াছি; মোটের উপর সংযুক্তবর্ণের পূর্ব্বস্বর ব্যতীত আমাদের মধ্যে বাঁধাবাঁধি দীর্ঘ উচ্চারণ নাই বলিলেও চলে। এইরূপে হলন্ত উচ্চারণ করিয়াই পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের দীর্ঘতা বা accent উৎপাদনপূর্ব্বক একদিকে ভাঙ্গিয়া অন্যদিকে গড়িতেছি বই নহে। বাঙ্গালার লিখিত এবং উচ্চারিত ভাষার মধ্যে এই বিরোধ, সংস্কৃত বর্ণবিন্যাস বনাম বাঙ্গালা উচ্চারণ, ক্রমে সমস্যা-আকারে উপস্থিত হইতেছে। অবশ্য, কালে ইহার একটা কূল মিলিবে। যাহোক, উচ্চারণের এই প্রাকৃত রীতিই ছন্দের প্রাণ।

প্রাচীন কালের লিখিত গ্রন্থাদি অপেক্ষা বরং কবিওয়ালা ঝুমুর খেউড় এবং পাঁচালী গায়কগণের মধ্যেই উহা সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। দাশরথি যখন গাইতেন—

দিন্নু পুরুত মন্ত্র পড়ায় অর্দ্ধেক তার ভুল,
কিন্নু নাপিত দাড়ী কামায় অর্দ্ধেক তার চুল।

তখন তিনি খাঁটি বাঙ্গলার accentমূলক লাচাড়ীই ব্যবহার করিতেছিলেন। কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া কাব্যকারগণের মধ্যেও এই প্রণালী নানাদিকে প্রকাশ পাইয়াছে। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের প্রহসন এবং প্রাকৃত ভাবের লেখাগুলিতে উহার পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কড়ি ও কোমল এবং মানসীতে স্থানে স্থানে উহার আশ্রয় লইয়াছেন। ক্রমে এই প্রণালী সমধিক স্থিরতা এবং পরিমার্জ্জনা লাভ করিয়া তাঁহার ক্ষণিকা খেয়া ও আধুনিক রচনাগুলির মধ্যে এবং দেখাদেখি বহু তরুণ কবির মধ্যে, তরল, নর্ম্ম-কৌতুক বা ছড়া-কাটার লক্ষণ অতিক্রম পূর্ব্বক 'তত্ত্ব' ভাবেও প্রকাশ পাইতেছে। আমরা মধুসূদন হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার গতি অনুসরণ করিতেছি—

যেমন কর্ম্ম। তেমনি ধর্ম্ম। বুড়ো শালিকের। ঘাড়ে রোঁয়া।
—মধু।

হায় কি হলো। বঙ্গদর্শন। বঙ্কিম্ দিলে ছেড়ে।
হায় কি হলো। দেশটি গেল সাপ্তাহিকে জুড়ে।
হেমচন্দ্র।

রাত পোহালো। ফর্সা হলো। ফুটলো কত ফুল।
এলো চলে। বেনে বউ। আল্‌তা দিয়ে পায়।
দীনবন্ধু

সাতটি চাঁপা। সাতটি গাছে। সাতটি চাঁপা ভাই।
রাঙা-বসন। পারুল দিদি। তুলনা তার নাই।

পা ছড়িয়ে। বসুরে হেথায়। সারা দিনের শেষে.
তারায় ঘেরা। আকাশ-তলে। সব-পেয়েছির দেশে।
—রবীন্দ্রনাথ।

সদাই তপন। কাব্যরসে। ভরে থাকৃত মনটা,
পয়ার লিখেই। কেটে যেত। জিওমেট্রির ঘণ্টা।
বিজয়চন্দ্র।

এই-সমস্ত লাচাড়ী কি উপায়ে উদাত্ত এবং অনুদাত্ত উচ্চারণ করিয়া উহাদের স্বরমাত্রার সংখ্যা এবং তন্মধ্যে একটা সৌষ্ঠব রক্ষা করিতেছে তাহা বাঙ্গালী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রণালীকে দিগক্ষরা ... একাবলী পয়ারেও প্রসারিত করিয়াছেন—

আজ বুকের বসন। ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,
আকাশেতে। সোনার আলোয়
ছড়িয়ে গেল। তাহার বাণী।
সপ্ত ঋষি। গগন-সীমা হতে
কখন কোন্। মন্ত্র দিল পড়ি।
তিমির রাতি। শব্দবিহীন স্রোতে
হৃদয়ে তব আসিল অবতরি।

এক মনে তোর। একতারাতে
একটি যে তার। সেইটে বাজা।
ফুলবনে তোর। একটি যে ফুল
তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা।
রবীন্দ্রনাথ।

ওই দুধ-পাথরের। পরে রাখ
রক্তকমল। পা দুটি,
এস দুধ-পাথারের। লক্ষ্মী আমার
ক্ষীর-সাগরের। পদ্মটি।—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

তার গঙ্গাজলী। ডুরের ডোরা
বুকে আঁকে। দিঘীর জল। —সত্যেন্দ্র।

দুখের বেশে। এসেছ বলে। তোমারে নাহি। ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা। সেথায় তোমা। নিবিড় করি। ধরিব হে।
—রবীন্দ্র।

ক্রমে ইহার নূতন নূতন শক্তি আবিষ্কৃত হইতেছে। ইহাকে মিশ্রচ্ছন্দেও অনুপম ভাবে অবতারিত করিতে পারা যায়ঃ—

আদি অন্ত। হারিয়ে ফেলে,
সাদা কালো। আসন মেলে
পড়ে আছে আকাশটা খোশখেয়ালী।
আমরা যে সব। রাশি রাশি
মেঘের পুঞ্জ ভেসে আসি
আমরা তারি খেয়াল তারি হেঁয়ালী।
মোদের কিছু। ঠিক ঠিকানা। নাই,
আমরা আসি। আমরা চলে যাই।
—রবীন্দ্রনাথ।

বলিতে পারা যায় যে এই খোশখেয়ালী এবং ঠিক-ঠিকানা-হীন ছন্দই বাঙ্গলার একটা অপরূপ শক্তি। এই জঙ্গলাকে লাভ করিবার জন্য কোবিদগণ এবং কালোয়াৎগণও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে পারেনঃ—

আবার মোরে। পাগল করে। দিবে কে?
হৃদয় যেন। পাষাণ হেন। বিরাগভরা। বিবেকে।
আবার প্রাণে। নূতন টানে। প্রেমের নদী
পাষাণ হতে। উছল স্রোতে। বহাবে যদি,
আবার দুটি। নয়নে লুটি। হৃদয় হরে। নিবে কে?
আবার মোরে। পাগল করে। দিবে কে?
—রবীন্দ্রনাথ।

বঙ্গ-নির্ঝরিণীর এই তরল মধুর কুলু কুলু সুরের শক্তিটুকুই উচিত বিজ্ঞানীর হস্তে পড়িয়া উত্তাপে আলোকে বা তাড়িতে পরিণত হইয়া অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। এই অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক শিশুকে দোলা দিতে জানিলে উহার দ্বারা হৃদয় মন বাঁধিতে পারা যায় ঃ—

ঝুলিয়ে দোলা। দুলিয়ে দে।
নরম আঁচে। সদ্য দুধের। ফেনার রাশি ফুলিয়ে দে।
প্রাচীন দোলার নূতন মালিক
এসেছে ঐ ঐন্দ্রজালিক.
অরাজকের আপনি রাজা রাখবে হৃদয় মন বেঁধে।

—সত্যেন্দ্রনাথ।

উহা দ্বারা মনকে ইঙ্গিত এবং ঈশারার রাজ্যে লইয়া গিয়া তন্দ্রাগত অবসাদে আবিষ্ট রাখিতে অথবা ঘুম-পাড়ানিয়া মাসীর ছায়া-নাট্যে ঘুরাইতে পারা যায় ঃ—

দিনের শেষে। ঘুমের দেশে। ঘোমটাপরা। ঐ ছায়া
ভুলাল রে। ভুলাল মোর প্রাণ,
ওপারেতে। সোনার কূলে। আঁধারমূলে। কোন মায়া
গেয়ে গেল। কাজ-ভাঙানো গান।
অস্তাচলের। তীরের তলে। ঘন গাছের। কোল ঘেঁসে
ছায়ায় যেন। ছায়ার মত যায়,
ডাকলে আমি। ক্ষণেক থামি। হেথায় পাড়ী। ধরবে সে
এমন নেয়ে। আছেরে কোন্ নায়।

রবীন্দ্রনাথের এই পথে মেয়েলী ছড়ার ঘুম-নগরের রাজকুমারীর দেখাটাও তরুণ কবি সত্যেন্দ্রনাথ লাভ করিয়াছেন ঃ—

দেখা হল। ঘুমনগরের। রাজকুমারীর সঙ্গে
সন্ধ্যা বেলায়। ঝাপসা ঝোপের ধারে।

আবার নিপুণ 'নাচুনের' হস্তে পড়িলে এই পাগলী লাচাড়ী ছন্দ 'দুলকি চালে' এবং 'নৃত্য তালে' নাচিতে পারে ; কলিকাতা সহরের উড়ে বেহারার কাঁধে চড়িয়াও তাল দিতে পারে ঃ—

পাল্কী চলে রে
অঙ্গ টলে রে!
"আর দেরী কত
আরো কত দূর?"
"আর দূর কিগো
বুড়ো শিবপুর,
ওই আমাদের!
ওই হাটতলা
ওরি পেছু বাগে
ঘোষেদের গোলা।"

—সত্যেন্দ্রনাথ।

মন নাচিতে আরম্ভ করিলে এই ছন্দ-দেহটাকেও নাচাইয়া নাচাইয়া পাছে পাছে তাল ঠুকিতে পারি ঃ—

মম চিত্তে। নিতি নৃত্যে। কে যে নাচে,
তাতা থৈ থৈ। তাতা থৈ থৈ। তাতা থৈ থৈ।

—রবীন্দ্রনাথ।

একেবারে মাথার মধ্যেই ঘুরপাক লাগাইয়া দিয়া ভোলানাথী নৃত্য করাইতে পারি ঃ—

আমার ঘুর লেগেছে। তা ধিন। তা ধিন।
তোমার পিছন পিছন। নেচে নেচে
ঘুর লেগেছে। তা ধিন্ তা ধিন্!
তোমার তালে আমার। চরণ চলে,
শুনতে না পাই। কে কি বলে,
তোমার গানে আমার। প্রাণে বা কোন্
পাগল ছিল। সেই জেগেছে।
তা ধিন তা ধিন্।

—রবীন্দ্রনাথ।

কেবল একতালা তেতালায় নহে, এই পাগল ব্রহ্ম-তালেও নাচিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পথে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরবাসিনী লাচাড়ী ছন্দ হিমালয়পর্ব্বতবাসী পাগ্‌লা-ঝোরার মতন বিগলিততুষারভঙ্গভীষণ রুদ্র ছন্দে ছুটিয়াছে—দিন দিন উহার নূতন নূতন সঙ্গী জুটি-তেছে ঃ—

পিছল পথে। নাইকো বাধা। পিছনে টান। নাইকো মোটে.
পাগ্‌লা ঝোরার। পাগল নাটে। নিত্য নূতন সঙ্গী জোটে।
লাফিয়ে পড়ে। ধাপে ধাপে। ঝাঁপিয়ে পড়ে। উচ্চ হতে
চড়বড়িয়ে। পাহাড় ফেড়ে। নৃত্য করে। মত্ত স্রোতে।

—সত্যেন্দ্রনাথ।

বাঙ্গলা লাচারী ছন্দ এইরূপে নৃত্য করিতে থাকুক। বলা বাহুল্য উহা এ যাবত কেবল নৃত্য করিতেই বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছে ; পয়ারের ক্ষেত্রে এই accent লইয়া গিয়া বিশেষ প্রতিভা দেখাইতে পারে নাই। হয়ত এই বিশেষত্ব কেবল লাচাড়ীর ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকিবে। ইহা নিশ্চয় যে বিদ্যাপতি যখন অন্তর্যোগের পরম অনুভূতি রসোজ্জ্বল মুগ্ধ কণ্ঠে গাইয়াছিলেন ঃ—

শ্যাম পরশমণি। কি দিব তুলনা,
সে অঙ্গ-পরশে আমার। এ অঙ্গ সোনা!

তখন একরূপ অতর্কিতে এই accentএর ছন্দচেষ্টাই করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে এবং সকল পরবর্ত্তী কবির মধ্যে এই চেষ্টা কার্য্য করিয়া কতদিকে পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা আমরা মোটামুটি দেখিয়া আসিলাম। ইহাও ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ যখন গাহিয়াছেন ঃ—

নিয়ে যমুনা বহে। স্বচ্ছ শীতল
উৰ্দ্ধে পাষাণ তট। শ্যাম শিলাতল।

অথবা— সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণ-বরণ পারিজাত লয়ে হাতে।

তখন ভারতচন্দ্র বা মধুসূদনের প্রদর্শিত পথে শব্দের সংপ্রসারণ- বা বিপ্রকর্ষণ-প্রণালী পরিহার করিয়া সতর্কভাবে বাঙ্গলা পয়ার ছন্দকে স্বরমাত্রিক শক্তিদান করিতেই চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রণালীকে ক্ষুদ্র কবিতা কিংবা খণ্ডশ্লোকের স্বল্প পরিসর অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত করিতে কিংবা উহাকে অমিত্রচ্ছন্দে অথবা দীর্ঘ দীর্ঘতর পয়ারচ্ছন্দে প্রসারিত করিতে কোন বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। বঙ্গীয় পয়ারের প্রকৃতির মধ্যে ঐ শক্তি আছে কি না, উপযুক্ত প্রতিভা কর্তৃক পরীক্ষিত হওয়ার পূর্ব্বে কাহারও মতামত প্রকাশ করার ক্ষমতা নাই। ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাব্যতার অজানা রাজ্যে কোনরূপ খুঁটি গাড়িতে, কিংবা কবিপ্রতিভার সমক্ষেও কোনরূপ সীমা নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে নিরুৎসাহ করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। এস্থলে কেবল অভাব নির্দ্দেশ করিয়াই বিরত হইতেছি।

আমরা এস্থলে পুনরুক্তি করিয়াও বলিব যে এই পয়ার এবং লাচাড়ী—বিরাম-যতি এবং বর্ণের উদাত্ত ও অনুদাত্ত উচ্চারণের উপর নির্ভরশীল পয়ার ও লাচাড়ীই বঙ্গবাসীর নিজস্ব ছন্দ। নিজের ইচ্ছাসুখে উহাকে অমিশ্র কিংবা বিমিশ্রভাবে পরিচালিত করিয়া ভাবযোগ সাধন করাই বঙ্গীয় ছন্দ-সাধকগণের সর্ব্বপ্রধান স্বত্ব এবং দায়িত্ব। এ দুইটিকে অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালী এ পর্য্যন্ত কোন নবতর ছন্দ সম্যকভাবে আবিষ্কার করিতে পারে নাই। এই মূল প্রকৃতিকে যথাসম্ভব মানিয়া চলিতে জানিলে বাঙ্গালী সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের মানব-হৃদয়জাত ছন্দকেই আয়ত্ত করিতে পারিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। পরন্তু এই ক্ষেত্রে কার্য্য যে একেবারে আরব্ধ হয় নাই তাহা নহে। সংস্কৃতের বা যে-কোন বিদেশী ছন্দের মূল jiltটুকু ringটুকু—উহার ধ্বনিটুকু ধরিতে জানিলে এই দুই ছন্দকে আরও কত দিকে প্রসারিত করিতে পারা যাইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঙ্গালার ঐ accentমূলক ছন্দের শক্তি কম নহে। তরুণ কবি সত্যেন্দ্রনাথ মন্দাক্রান্তা ছন্দের ধ্বনিটুকু এইরূপে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন :—

পিঙ্গল্ বিহ্বল্ ব্যথিত নভতল্
কই গো কই মেঘ্ উদয় হও।
সন্ধ্যার্ তন্দ্রার্ মুরতি ধরি' আজ্
মন্দ্র-মন্থর্ বচন্ কও।
সূর্য্যের্ রক্তিম্ নয়নে তুমি মেঘ্
দাও হে কজ্জল্ পাড়াও ঘুম।
বৃষ্টির্ চুম্বন্ বিথারি' চলে যাও
অঙ্গে হর্ষের্ পড়ুক ধুম্।

ইংরেজী ছন্দকে এইরূপে আকার দান করা হইয়াছে—

এই সিন্ধুর্ টিপ্ সিংহল্ দ্বীপ
কাঞ্চনময় দেশ্ ?
ওই চন্দন্ যার্ অঙ্গের বাস্
তাম্বূল-বন্ কেশ্ !
যার্ উত্তাল্ তাল্-কুঞ্জের বায়্
মন্থর্ নিশ্বাস।
আর্ উজ্জ্বল যার্ অম্বর্, আর্
উচ্ছল্ যার্ হাস্ !

অক্ষরসংখ্যাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল accentএর উপর নির্ভর করিলে বাঙ্গালা পয়ার বা লাচাড়ীর ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বলতর হইবে তাহা উপরে উদ্ধৃত কবিতাংশগুলি দেখিলেই বিশ্বাস হয়।

এই পয়ার এবং লাচাড়ী বাঙ্গালা ছন্দের পুরুষ ও স্ত্রী। আমরা মিশ্র ছন্দের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া এবং উহাদের অর্থকেও স্বার্থে ব্যবহার করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহারে উপনীত হইতেছি : বাঙ্গালা পয়ার লাচাড়ীকে চিরকাল বলিতে পারে :—

তোমরা হাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যাও
কুলু কুলু কল নদীর স্রোতের মত,
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,
কোন সুলগনে হব না কি কাছাকাছি ?

কিন্তু কেবল কোমলকান্ত পদাবলীতে শব্দ-কবিতা রচনা করিয়া নহে, এই লাচাড়ী রুদ্র তাল বাজাইয়াও পাঠকের মনের সমক্ষে অপরূপ বিদ্যুৎ-বিভায় অসীমের ঝিলিক দিয়া যাইতে পারে :—

বজ্র হাতের। হাততালি সে। বাজিয়ে ফিরে চায়,
বুকের ভিতর। রক্তধারা। নাচিয়ে দিয়ে যায়।
ভয় দেখিয়ে। হাসে আবার। চিক্‌মিকিয়ে রে !
আকাশ জুড়ে। চিক্‌মিকিয়ে। চিক্‌মিকিয়ে রে !

বাঙ্গলা ছন্দের এই অভ্যন্তরতত্ত্ববিজ্ঞানে সুপ্রগল্‌ভ হইয়াই কবিহৃদয় গাইয়াছে—

কখনো উড়িব উধাও পদ্যে
কখনো নামিব গভীর গদ্যে
নাগর-দোলায় দুলিয়া।

গদ্যপদ্যের আভ্যন্তরীণ ধ্বনিতত্ত্বটাকেই বঙ্গভাষা 'ছন্দ' নামে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়া সংস্কৃত ছন্দ-শব্দ বা গ্রীক মিটরকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী কবি উহার রসপানে একেবারে পাগল হইয়া পরম জোরের সহিত বলিয়াছে

ধরিব ধূমকেতুর পুচ্ছ
বাহু বাড়াইব তপনে।

বিশ্বহৃদয়ের সমস্ত ছন্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে উর্ব্বশী বলিয়া ধারণা করিয়া অতুলনীয় মিশ্রচ্ছন্দে গাইয়াছে—

সুরসভা মাঝে যবে নৃত্যকর পুলকে উচ্ছ্বসি
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশী,
সিন্ধু মাঝে ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কেঁপে উঠে ধরার অঞ্চল,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষে দিশাহারা
কাঁপে রক্ত-ধারা !

কিন্তু হায়, ভাষা ও ভাবের এই মিলন-নৃত্য কতক্ষণ! সসীমের সীমাকারাগারবদ্ধ মানব-কবির পক্ষে এই যোগ-ধারণার স্থিরতাই বা কতক্ষণ!—

দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে!

জড়তার কারাবদ্ধ কবির ছন্দ এইরূপে হঠাৎ কাটিয়া যায়—তাহার উর্ব্বশীর তালভঙ্গ হয়। পয়ার এবং লাচাড়ীর আদিম ছন্দকে নব নব পথে সার্থকভাবে ধরিবার জন্য কবিহৃদয় নিত্যকাল চেষ্টা করিয়া আসিতেছে —এবং পরম নিষ্ফলতায় চিরকাল অতৃপ্তি অনুভব করিতেছে! কিন্তু এই অতৃপ্তি বোধের মধ্যেই সাহিত্যের সমস্ত উন্নতি এবং গতির তত্ত্ব নিহিত আছে। কবিগণের উৎসাহের সমক্ষে সেই পরম করুণাময় অপ্রাপ্য এবং অব্যক্ত নিত্যকাল দাঁড়াইয়া আছেন বলিয়াই মনুষ্য-জাতির সাহিত্যহৃদয় এখন পর্য্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। ভাব ভাষা এবং ছন্দের এই চরম অপ্রাপ্যের অভিমুখেই মহামিলনের অভিমুখেই চিরকাল সাহিত্যের গতি—এবং কবিসমাজের অধ্যাত্মলোক হইতে ইহা চিরকালের দীর্ঘনিশ্বাস:—

এ পারে সে। ফুটল না গো। ফুটল না
ওপারে যে। গন্ধে করে। মাৎ।

কিন্তু মনুষ্যের বিশ্বাস আছে, তৃপ্তি এবং সফলতার সেই অজানা ফুল ওপারে ফুটিয়াছে:—

স্বর্গভুবন। মত্ত তারি। সুগন্ধে
ফুটেছে সে। মন্দারেরি সাথ;
ইন্দ্র তারে। বক্ষে ধরে। আনন্দে
অনিন্দ্য সে। পারের পারিজাত!

মানবজন্মের প্রধান স্বত্বভূত এই চরম অপ্রাপ্তি-বুদ্ধির দীর্ঘ-নিশ্বাস সহকারে এই ছন্দের চিন্তা শেষ করিব। পরিশেষে বক্তব্য এই যে সংস্কৃত ছন্দের লঘুগুরু ভেদ বা সংস্কৃত বর্ণের জাতিভেদ আমরা অনেক দিকে হারাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহাতে দুঃখ করিবার যে বড় বেশী কারণ নাই, তাহা বোধ করি এতক্ষণে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ইউরোপীয় সাহিত্যের দিকেও দৃষ্টি করিয়া দেখিতেছি যে গ্রীক এবং লাটিন ভাষার দশপাশবদ্ধ মিটরের গতি বর্ত্তমান ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিয়াই অপরূপ স্বাধীনতায় সাধারণের হৃদয়গতিপথে অপরূপ বিস্তীর্ণতা শক্তি এবং প্রকাণ্ডতা লাভ করিয়াছে। ইটালী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সাহিত্যের নবজীবন-যুগের সময় হইতে ইউরোপীয় কাব্যের ভাব ভাষা এবং ছন্দোবন্ধ নানা মুখে অপূর্ব্ব তরঙ্গভরে প্রবাহিত হইয়াই দেশে দেশে, একদিকে যেমন জাতীয় বিশিষ্টতা অন্যদিকে তেমন বিশ্বজনীনতাকেও উদ্দেশ্য করিতেছে। প্রাচীন ছন্দ অনেক দিকে একটা চিরস্থায়ী পদার্থ; ঐ ছাঁচের মধ্যে পড়িতে হইত বলিয়াই প্রাচীন সাহিত্যের ভাব-প্রকাশ অনেকটা একঘেয়ে। তাই উহার উন্নতির ধাপগুলিও পরস্পর হইতে বহুদূরে অবস্থিত; সুতরাং প্রাচীনকালে সাহিত্য ধীর গতিতেই উন্নতিসাধন করিয়াছিল। আধুনিক সাহিত্য প্রাচীন আদর্শের ছাঁচ অস্বীকার করিয়া নানাদিকে দুর্জ্জয় স্বেচ্ছাচারিতা দেখাইয়াও মোটের উপর অল্পকালের মধ্যে আশাতীত এবং অভাবনীয় উন্নতি দেখাইতে পারিয়াছে। ভারতবর্ষেও সমস্ত আধুনিক ভাষা এবং তাহাদের কাব্যসাহিত্য[illegible]জগতের

যুগধর্ম্মবলে, বিশেষতঃ ইংরেজীর সাহায্যে লোকায়ত হইয়া পড়ার দরুণ উহাদের মধ্যে আর্য্য সংস্কৃতের বর্ণজাতিভেদ এবং ক্লাসিক বিধিবন্ধন নানাদিকে শিথিল হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু আধুনিকের ভাবগঙ্গা প্রাকৃত-জনের সমতলে আসিয়া যে তরঙ্গ যে আবেগ যে উচ্ছ্বাস এবং সময় সময় যে গভীরতা লাভ করিয়াছে, পরাধীনতার উচ্চ পৃঙ্গশিখরে অবস্থান করিলে ঐ ঘটনা কদাপি সম্ভব ছিল না। বঙ্গভাষা যাহা হারাইয়াছেন তাহা পরম গৌরবময় হইলেও, যাহা লাভ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে লাভ করিবার আশা রাখেন, তাহার মাহাত্ম্যও কোন অংশে কম নহে। প্রাচীন মন্দাকিনীই এখন লোকপাবনী হইয়া বিশ্বমানবের হৃদয় হইতে ভাবের অনন্ত উপাদান পরিগ্রহ করিয়া শতমুখে সাগরগামিনী হইতেছেন। তাঁহার এই গতি রোধ করা এখন কোন ঐরাবতের সাধ্য নহে। তাঁহাকে পুনর্ব্বার প্রাচীনতার পৃঙ্গশিখরে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়াও সর্ব্বথা অসাধ্য এবং অসম্ভব। ভাষার বাহ্যিক দিক্ হইতে ভাবের চলাচল শক্তির প্রতি কোনরূপ বিরোধ কিংবা প্রতিষ্ঠা না থাকিলেই হইল। আমরা দেখিতেছি বঙ্গভাষা 'গণ'-শৃঙ্খল ছাড়াইয়া ফেলিয়া হৃদয়সঞ্জাত ভাবের ছন্দকে আপন গর্ভে ধারণ করার পথে সমধিক অগ্রসর হইয়াই গিয়াছে। বঙ্গভাষা নানাদিকে ইউরোপীয় আধুনিক ভাষাগুলির সমধর্ম্মী হইয়া আপন কৌলিন্যের উপর নির্ভর করিতেছে। এই অনুপমা সরস্বতী আমরা লাভ করিয়াছি; এখন যথোচিত শক্তিসঙ্কুলান এবং তদ্গত সাধনার উপরেই আমাদের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে। আমরা আর্য গৌরবময় ভারবি রচনা করিতে পারি নাই, কিন্তু মেঘনাদবধ ও বৃত্রসংহার ধারণা করিয়াছি। রামায়ণ বা মহাভারত আমাদের শক্তিবহির্ভূত থাকিলেও আমরা ত উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত রচনা করিতে পারিয়াছি। আমরা পুষ্পদন্তের ন্যায় হৃদয়কে শিখরিণীর উদাত্ত মহিমাময় পাদপন্থায় পরিচালিত করিয়া মহিম্নস্তোত্র পাঠ করিতে পারিব না সত্য, শঙ্করের ন্যায় প্রাণের আনন্দলহরীকে শান্তগম্ভীর পদতরঙ্গেও আকারদান করিতে পারিব না, মন্দাক্রান্তার পৌরুষতরঙ্গিত উচ্ছ্বাসে হৃদয়কে প্রবাহিত করিয়া চিরবিরহের করুণ কাকলীও বিনাইতে পারিব না—বাঙ্গলা ছন্দের উর্ব্বশীর সেই গৌরব-সৌভাগ্য চিরতরে অস্তমিত হইয়া গিয়াছে। আমরা উপনিষদ্ রচনা করিতে পারি নাই; শ্রীমদ্ভাগবত যোগবাশিষ্ঠ কিংবা ভগবদ্গীতা আমাদের হৃদয়মনোবুদ্ধির সাধ্যসীমা হইতে চিরতরে দূরান্তরিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছি, তাঁহাদের পদপন্থা অনুসরণ করিয়া শক্তিসঙ্গীত ও ব্রহ্মসঙ্গীত—বা আমাদের আধুনিক যুগের উপনিষদ রচনা করিয়াছি; হৃদয়-রাজার চরণে নৈবেদ্য এবং গীতাঞ্জলি নিবেদন করিয়া সোনার তরীতে আরোহণ করিয়া অজ্ঞাতের উদ্দেশে খেয়া দিয়াছি। আমাদের সাধনা বহু পরিমাণে একদেশী হইলেও ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বলতর বলিয়াই বিশ্বাস করিতে পারি। বিশেষতঃ হতাশাসের পক্ষে এই প্রসঙ্গে মনে রাখাও আবশ্যক যে ন্যূনাধিক সঙ্গীত-ক্ষেত্রের এই ছান্দসিক বিশেষত্বই সাহিত্যের সর্ব্বস্ব নহে। স্বদেশ অথবা স্বজাতির সীমার বহির্ভাগে কিংবা বিশ্বসাহিত্যের দরবার-ক্ষেত্রে উহার মাহাত্ম্য অধিক নহে। এই ক্ষেত্রে বরং ভাবকে—আইডিয়াকেই মুখ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া পদচরণের আন্তর্জাতিক বিশিষ্টতাকে গৌণভাবে গ্রহণ করার বিচার-প্রণালীই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। ভাব এবং ছন্দ যে স্থলে অচ্ছেদ্যরূপে প্রকটিত হইয়া ভাষান্তরের সমক্ষেও নিজের মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে পারে তাহাই কাব্যাধিকারের মণিকাঞ্চন যোগ বলিয়া গৃহীত; ছন্দের মাহাত্ম্য যে স্থলে ভাবকে ন্যূনাধিক তরল করিয়াই বর্দ্ধিত হয়, সাহিত্যদার্শনিকগণ উহাকে decadent কবিতা অধঃ-পতিত কবিতা বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ চিরকাল নিজের দিক হইতে এই সমস্যা নির্ব্বিবাদে ভঞ্জন করিয়াই অগ্রসর হন। এই ছন্দের বিষয়ে এই স্থলে আর একটা কথাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, খণ্ডিত শ্লোক বা খণ্ডকবিতাকে অবলম্বন করিয়া যেমন ছন্দের মাহাত্ম্য দাঁড়াইতে পারে, তেমনি সমগ্র গ্রন্থকে সমগ্র রচনাকে এমন কি কবিজীবনের সমস্ত ভাব এবং কর্ম্মচেষ্টাকে বেষ্টন করিয়া পরিণতি এবং সঙ্গতি লাভ করিয়াও একটা পরম

ছন্দ সাধিত হইতে পারে। এই ছন্দ লেখকের হৃদয় হইতে, তাহার সমগ্র জীবন চরিত্র হইতেই নিজের চরিত্র এবং সুর সংগ্রহ করিয়াই সাহিত্য-জগতে নিজের বিশেষত্বে স্থির হইয়া যায়। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ছন্দশিল্পীগণ ক্ষুদ্র বাক্য-ছন্দ অপেক্ষাও কৃতিত্বের এই বৃহৎ ছন্দকেই কাব্যের মধ্যে প্রাণপণে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সাহিত্যের সমস্ত শ্রেষ্ঠ উপার্জ্জন—ইলায়ড বা ডিভাইন কমিডী, প্যারেডাইস লষ্ট, হ্যামলেট, রামায়ণ বা শকুন্তলা কিংবা আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহও—এই অধ্যাত্মছন্দ সাধন করিয়াই মনুষ্যের মনোরাজ্যে চিরস্থায়ী আসন অধিকার করিয়াছে।

উপসংহারে যেমন আদিবন্ধের তেমন চরমের কথাও এই যে, বিশ্বজগৎ ছন্দোময়। ভারতীয় ঋষিশিষ্যের চক্ষে বিশ্বজগৎ ধ্বনিময়—কবির চক্ষে উহা রাগিণীময়। এই বিশ্বরাগিণীই জগৎপ্রকটিতা ঈশ্বরীয় ইচ্ছারূপে—মহামায়ারূপে নানাভাবে ঋষি সাধক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক কবি বা শিল্পীর হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভাবকম্পন জাগ্রত করিতেছে। আমাদের প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থাদিতে রাগ রাগিণী আলাপ করার জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন শুভ এবং সহকারী কাল নির্দ্ধারিত আছে, উহা অনেক স্থলে মনুষ্যহৃদয় এবং বহিঃপ্রকৃতির গভীর সম্বন্ধজ্ঞান হইতেই উদ্ভাবিত। সংগীতকলার ক্ষেত্রে যেমন রাগরাগিণী এবং তাল, কাব্যকলার ক্ষেত্রে তেমনি ছন্দ ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সহযোগিতা, বিভিন্ন ভাবোদ্দীপনার সময়ে হৃদয়ঙ্গম হয়। সুতরাং ছন্দের যোগ একটা খামখেয়ালী কথা নহে। জাতীয় হৃদয়ের পরাৎপরা বাক্‌প্রকৃতি হইতেই জাতীয় বাণীছন্দের উদ্ভব। সুতরাং কবি যত অধিক পরিমাণেই প্রকৃতির তান-লয় সিদ্ধি করিতে পারেন, তাঁহার হৃদয় ততই স্বভাবসঙ্গতে এই পরাপ্রকৃতির মহাকাল হইতে যথাযুক্ত ছন্দটুকু সংগ্রহ করিয়া বিলসিত হইতে থাকিবে। বাস্তবিক পক্ষে ছন্দের আবিষ্কার কিংবা ধারণাও এইরূপে লয়ানুভবসিদ্ধ বা অতর্কিত না হইয়া পারে না; গণিতের প্রণালীর সঙ্গে উহার সম্পর্ক নাই। এই প্রকৃতির বশেই আনন্দের ছন্দ যেমন নাচিয়া নাচিয়া চলে, বিষাদের ছন্দও তেমনি গম্ভীর পদবন্ধে অথবা উদাত্ত উচ্ছ্বসিত নিশ্বাসে প্রবাহিত হইয়া আপনার সরস্বতীলাভ করিয়া অবলীলাক্রমে অবতীর্ণ হইয়া আসে। সুতরাং এই প্রকৃতিযোগ লাভ করাই প্রথম কথা। কবি এই স্থলে বিশ্বজগতে নিত্য সত্য ছন্দের দ্রষ্টামাত্র, স্রষ্টা নহেন। সরস্বতী বাণী কিংবা বীণাপাণি উভয় মূর্ত্তিই কবিপ্রতিভার শতদলবাসিনী। সুতরাং সাহিত্যের দিক হইতে আপাততঃ ইহাও বলিতে পারা যায় যে কবির হৃদয়-গুহাগত ভাবকম্পন হইতেই নিত্যকাল ছন্দের উৎপত্তি। বিশ্বজগতের এই ছন্দের সঙ্গে সঙ্গত হইয়া কবিহৃদয় যতই নৃত্য করিতে শিখিবে, তাহার সিন্ধু শৈল আকাশের অনন্ত ছন্দ-মুখর অনন্ত বিকাশের সঙ্গে কবির আত্মা যতই ঐকতানে আপনাকে বিনাইয়া বিনাইয়া চরমের অখণ্ড ঐক্যের দিকে যতই লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারিবে, বিশ্বসংসার-রূপ প্রণবসঙ্গীতের চরমস্থ লয়বিন্দুর দিকে যতই নিজের ভাবগতি স্থির রাখিতে পারিবে, ততই সাহিত্যে সঙ্গীতে এবং যাবতীয় ললিত কলায়, কবির কথায়—চিন্তায় কণ্ঠে এবং লেখনীতে, ভিতর কিংবা বাহিরের চরিত্র-ধারণায় এবঞ্চ তাঁহার সমগ্রজীবনেও নব নব ছন্দের নব নব ভাবমূর্ত্তি আকার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে চরমার্থের অভিমুখে অগ্রসর করিবে। ওমিতি ক্রমঃ ॥

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

চিরন্তন প্রশ্ন

একটা চিরন্তন প্রশ্নের বোঝা বহন করিয়া মানুষ সংসারে বিচরণ করিতেছে। প্রশ্নটা যে কি, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর বা সুযোগ অতি অল্প লোকেরই জোটে—অথচ সকলেরই মনে এ সম্বন্ধে একটা ভাসা-ভাসা অনুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহার মনে প্রশ্নটা একটা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে, এবং যিনি ভরসা করিয়া তাহার একটা উত্তর দাবী করিতে পারেন, জগতের চিন্তাসম্পদের হিসাবে, তিনিই কৃতী লোক।

সেই একই অব্যক্ত প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে ও ধর্ম্মজগতে নানা [illegible] নানা

আকারে জাগিয়া উঠিতেছে। সেই একই প্রশ্নের তাড়নায় মানুষের চিন্তা বিচিত্র জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়া বিচিত্র রকম উত্তরের প্রত্যাশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মানুষ যদি স্বচ্ছন্দ পশুজীবনের নিশ্চিন্ততার মধ্যে তৃপ্ত থাকিতে পারিত, তবে এ প্রশ্নের আদৌ কোন প্রয়োজন হইত না; কিন্তু সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে যে, তাহার দৈনিক জীবন-যাত্রার আয়োজন করিতে গিয়াও, তাহাকে পদে পদেই তাহার একান্ত প্রয়োজনীয় আহার নিদ্রা স্বাচ্ছন্দ্যের অতিরিক্ত ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। যে যে-পথেই চলি না কেন, যে যতই চিন্তাহীন সাধনবিমুখ সংসারাসক্ত জীবন যাপন করি না কেন, প্রশ্নটার হাত কেহই সম্পূর্ণরূপে এড়াইতে পারি না। জানিয়া হউক, না-জানিয়া হউক, জীবনের সফলতার ভিতর দিয়া, না হয় জীবনের ব্যর্থতার ভিতর দিয়া, আমাদের সকল অন্বেষণ বারবার সেই একই প্রশ্নে আসিয়া ঠেকিতেছে; এবং আমরা সকলেই আমাদের প্রত্যেকের সাধ্য ও অবস্থামত চিন্তা ও আচরণের দ্বারা জগতে তাহার এক-একটা স্পষ্ট বা অস্ফুট জবাব রাখিয়া যাইতেছি।

শিল্পে ও কাব্যে, ধর্ম্ম- ও বিজ্ঞানজগতে, মানুষের সকল প্রকার সাধনা-ক্ষেত্রে, আমরা দেখিতে পাই এক-একটা প্রশ্ন থাকিয়া থাকিয়া অনিবার্য্যরূপে জাগিয়া উঠে। মানুষ তাহার প্রাত্যহিক সাধনা ও কর্ত্তব্যানুসরণে ব্যাপৃত থাকিয়াও এক-একবার অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করে,—"আমার লক্ষ্য কি" "এ অন্বেষণের শেষ কোথায়"। শিল্পীর অন্তর্নিহিত রসানুভূতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহাকে শিল্প-সাধনায় প্রবৃত্ত করে, জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার জন্যই বৈজ্ঞানিক নব নব জ্ঞানের অন্বেষণে ধাবিত হন, সংসারী মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় বা সুখাসক্তির লালসায়, প্রেমের আকর্ষণে বা সমাজ-সংগ্রামের পেষণে সহজেই কত বিচিত্র কর্ত্তব্যের মধ্য দিয়া চালিত হয়, অথচ এই-সকল অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রয়াসের মূলে যে কি একটা অপূর্ব্ব রহস্য নিহিত আছে, মানুষ কিছুতেই তাহা ভুলিতে পারে না। জ্ঞান প্রেম ও সৌন্দর্য্যের সন্ধানে মানুষ নিরন্তরই ছুটিতেছে, অথচ সেই সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন [illegible]তেছে—"কোথায় চলিয়াছি", "এ কিসের আকর্ষণ"! ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এক অজানা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি, কেবল এই জ্ঞানটুকু লইয়াই মানুষ তৃপ্ত থাকিতে পারে না—"কোথায় চলিয়াছি" "কেন চলিয়াছি" এ প্রশ্নও সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছে। অনেক সময়ে আমরা মনে করি বুঝিবা আমাদের জ্ঞানগত কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্যই এই-সকল প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করিতেছি; সেই জন্য প্রশ্নটাকে অবান্তর জ্ঞান করিয়া আমরা অনেক সময়ে তাহাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করি। কিন্তু প্রশ্ন আর আমাদের ছাড়িতে চাহে না। কার্য্যতঃ দেখা যায় আমাদের জীবনের সকল প্রশ্ন সকল সমস্যার মূলে এইরূপ একটা প্রশ্ন নিহিত রহিয়াছে। যখনই কোন নৈতিক বা সামাজিক প্রশ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হই,—"কি করিব" "কেন করিতেছি" এই প্রশ্ন যখনই মনের মধ্যে উদিত হয়, তখনই দেখি সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন ছায়ার মত ঘুরিতেছে—"আমি কে" "এই জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য কি" "আমার জ্ঞান, আমার অনুভূতি, আমার ভাল-লাগা-না-লাগার মধ্যে কি রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে?" হাতের কাছে এই-সকল প্রশ্নের কোন উপস্থিত মীমাংসা না পাইয়া মানুষ অনেক সময়ে অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। মানুষ মনে করে, এ আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া লাভ কি? এবং গোড়ার প্রশ্নটাকে একেবারে বাদ দিয়া একটা কোন আপাতযুক্তিসিদ্ধ মীমাংসার সঙ্গে আপোষ করিয়া লইতে চায়। ইহা হইতেই 'জগতের কল্যাণ' "The greatest good of the greatest number", "The Progress of Humanity" ইত্যাদি কতকগুলি যুক্তি-সাপেক্ষ সংস্কারের উপর মানুষের সমগ্র ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-নীতির প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও অদম্য প্রশ্নকে নিরস্ত করিবার কোন উপায় দেখা যায় না। কারণ, এই-সকল সূত্রকে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিলেই প্রশ্ন উঠে, "কল্যাণ কি?" "Good কি?" "Progress কি?" এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চিরপুরাতন প্রশ্ন আবার জাগিয়া উঠে। সকল ক্ষেত্রেই মানুষের চিন্তা দ্বারে দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিতেছে—"এ প্রশ্নের সমাধান কোথায়?" এবং বার বার

একই উত্তর পাইতেছে "অন্বেষণ করিয়া দেখ"।

কোথায় অন্বেষণ করিব? কিসের অন্বেষণ করিব? অন্বেষণ ত নিরন্তরই চলিয়াছে—কিন্তু আমাদের অন্বেষণ মূল প্রশ্নে আসিয়া ঠেকিতেছে কৈ? বাস্তবিক আমাদের অন্বেষণ প্রশ্নেরই অন্বেষণ—প্রশ্নকে যখন ঠিক ধরিতে পারি তখন উত্তর পাইতে আর বিলম্ব হয় না। মানুষের চিন্তা মানুষের সাধনা মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক সকল প্রকার প্রয়াসের মধ্যে প্রশ্নটাকে বার বার নানা দিকে নানা বিচিত্ররূপে জাগিয়া উঠিতে দেখা যায়। যাহার মধ্যে প্রশ্ন এরূপে জাগে তাহার নিকট অন্বেষণের একটা পথ খুলিয়া যায়; কিন্তু সে পথ যে দেখে নাই তাহার অন্বেষণ কেবল একটা অস্থির অনিশ্চিততার মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়—"এই পাইলাম" "এই যে আলো" "এই আমার পথ" বলিয়া যে-কোন একটা অবান্তর আপাত-তৃপ্তিকর উপায় ও মীমাংসাকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চায়। সেই জন্যই আমাদের সাধনা পদে পদেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। আমরা চাই শাশ্বত আনন্দ, খুঁজি সংসারের সুখ; চাই জীবন্ত সত্য, খুঁজি শাস্ত্রবাণী ও পণ্ডিতের প্রমাণ; চাই জ্ঞান ভক্তি, খুঁজি কল্পনা ও ভাবুকতা। "যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।" কিন্তু যদি কোথাও ঠিক-মতই চাই এবং মনের মতই পাই, তবেই কি প্রশ্নটা মিটিয়া যায়? আমরা অনেক সময়ে তাহাই মনে করি। প্রশ্ন যে সকল ক্ষেত্রেই সকল অবস্থাতেই বিচিত্ররূপী অনন্তরূপী আমরা, অনেক সময়েই তাহা ভুলিয়া যাই। যখন যেরূপ উত্তর পাই মনে করি "ইহাই শেষ উত্তর, ইহাই চরম মীমাংসা।" তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া প্রশ্নটাকে একেবারে ঝাড়িয়া মিটাইয়া ফেলিতে চাই। কিন্তু প্রশ্ন তাহাতে নিরস্ত হইবে কেন?

জীবনসমস্যার সহিত সংগ্রামে মানুষ সহজে পরাস্ত হইতে চায় না, কিন্তু পদে পদেই সন্ধি করিতে চায়। মনকে ভুলাইবার মত একটা কিছু পাইলেই, সন্দেহের প্রবল তরঙ্গের মধ্যে একটু দাঁড়াইবার মত স্থান দেখিলেই, মানুষ সেই খানে আসিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে চায়; তাহারই মধ্যে বাসা বাঁধিয়া চিরকালের মত নিরুপদ্রবে বিশ্রাম করিতে চায়। অনেক সময়েই মানুষ যতটা বিশ্বাস করিতে চায়, সন্দেহকে অতিক্রম করিয়া ততদূর যাইতে পারে না; অতর্কপ্রতিষ্ঠ সত্যকে তর্ক-যুক্তির উপর দাঁড় করাইতে গিয়া ধরিবার ছুঁইবার মত একটা নিশ্চিত জানি খুঁজিয়া পায় না। অথচ প্রাণের মধ্যে সত্যের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ রহিয়াছে, যে অব্যক্ত শক্তির টানে মানুষকে নিরন্তর জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতে, দৃশ্য হইতে অদৃশ্যের দিকে উন্মুখ করিয়া তুলিতেছে, তাহাকেও ত এড়াইবার কোন উপায় নাই! সেই জন্য মানুষ সন্দেহাতীত সত্যকে না পাইয়া একটা যেমন-তেমন মনগড়া মীমাংসায় তৃপ্ত থাকিতে চাহিয়াছে, তাই মানুষ সত্যকে ছাড়িয়া জ্ঞানকে ছাড়িয়া, যুক্তি হইতে কল্পনায়, কল্পনা হইতে রূপকে, রূপক হইতে তুচ্ছ ভাবুকতায় অবতরণ করে। কিন্তু সন্দেহের কবল হইতে খঞ্জ বিশ্বাস ও দুর্ব্বল কল্পনাকে কে রক্ষা করিবে? সত্য যখন স্বয়ং প্রাণের দ্বারে আঘাত করিতে থাকে, তখন সে কি বলিতে চায় তাহা না বুঝিলেও, সেই আঘাতকে উপেক্ষা করি কিরূপে? অথচ অপর দিকে আপাত-অজ্ঞাত সত্যের খাতিরে আমাদের চিরাভ্যস্ত সংস্কারের বন্ধনকে অতিক্রম করাও সহজ নহে। সেই জন্য মানুষের চিন্তা ও কার্য্যে, বিচারবুদ্ধি ও কর্ম্মজীবনে কেমন একটা বিরোধ যেন থাকিয়াই যায়; এবং এই বিরোধ হইতেই প্রশ্ন আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠে। একটা আপাতবিরোধী দ্বন্দ্বকে আশ্রয় করিয়াই প্রশ্ন যুগে যুগে দেশে দেশে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। এক এবং অনেকের দ্বন্দ্ব, নিত্য ও অনিত্যের বিরোধ, ভিতর ও বাহির, জড় ও চেতন, আত্মা ও জগৎ ইত্যাদি ভেদকল্পনার অসামঞ্জস্য, এসকল একই প্রশ্নেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

মানুষের চিন্তা যেখানেই বিশ্রাম করিতে চায়, তাহার জিজ্ঞাসা যেখানেই তৃপ্ত ও নিরস্ত হইতে চায়, বিরোধ সেইখানেই প্রবল হইয়া উঠে, সেইখানেই আবার নূতন সংগ্রাম জাগিয়া উঠে। মানুষ যতবার

বলিয়াছে "Thus far and no further" এইখানেই আমার প্রশ্ন ও উত্তর, চাওয়া এবং পাওয়ার শেষ, ততবারই সে ঠকিয়াছে, এবং ঠেকিয়া শিখিয়াছে যে শেষ কোথাও নাই—গোড়ায় গিয়া না পৌঁছিলে শেষকে পাওয়া যায় না। আঘাতের পর আঘাত আসিয়া মানুষকে বারবার এই শিক্ষাই দেয়—"বিশ্রাম তোমার জন্য নয়; সত্যকে যে সাক্ষাৎভাবে, জীবন্তভাবে, সমগ্রভাবে পায় সেই কেবল বিশ্রাম করিতে জানে—তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।" মানুষ একদিকে আপোষ করিতে যায়, সন্ধির প্রাচীর তুলিয়া সন্দেহের তরঙ্গাঘাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে চায়,—আর একদিক দিয়া নূতনতর সন্দেহের বন্যা আসিয়া তাহার বাঁধ ভাঙিয়া তাহার কল্পনার ঘরবাড়ীকে একেবারে ডুবাইয়া ভূমিসাৎ করিয়া দেয়। মানুষের সমগ্রজীবন ও চিন্তার ইতিহাস এইরূপ সন্ধি ও বিদ্রোহ পরম্পরারই ইতিহাস।

আজকাল এই প্রকার একটা বিরোধকে শিল্পজগতে আমরা বিশেষভাবে দেখিতে পাই। "শিল্পের মূল উৎস কোথায়?" "শিল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সার্থকতা কিসে?"—এইরূপ একটা প্রশ্ন মানুষের শিল্পসাধনার সঙ্গে চিরকালই জড়িত আছে। যেখানে মানুষ সৌন্দর্য্যবোধকেই শিল্পের উৎস বলিয়া বুঝিয়াছে, সেইখানেই সৌন্দর্য্যের সন্ধান পড়িয়া গিয়াছে; সৌন্দর্য্যপিপাসু মানুষ শিল্পরচনার জন্য প্রকৃতির রাজ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৌন্দর্য্য চয়ন করিয়া বেড়াইয়াছে। সৌন্দর্য্যের আলোচনা, সৌন্দর্য্যের সাধনা, সৌন্দর্য্যের ধ্যান,—আলোকের মহিমায় সৌন্দর্য্য, ছায়ার রহস্যে সৌন্দর্য্য, দেহের গঠনে সৌন্দর্য্য, বর্ণের বৈচিত্র্যে সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির নির্বাত গাম্ভীর্য্যে সৌন্দর্য্য, গতির মৃদুচঞ্চল ছন্দের মধ্যে সৌন্দর্য্য। এমনি করিয়া মানুষ বাহিরের সৌন্দর্য্যকে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াছে—সাধনের ভিতর দিয়া, অনুভূতির ভিতর দিয়া, গভীর যোগের ভিতর দিয়া, সৌন্দর্য্যের পরিচয় গ্রহণ করিয়াছে। [illegible] বিরাটভাবে তাহার সমগ্রতাকে, কখন খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার বিশেষ বিশেষ প্রকাশকে আয়ত্ত [illegible]ত চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সৌন্দর্য্যকেও মানুষ নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে পারে নাই। যাহাকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অনুভূতির দ্বারা পায়, তাহাকেও বুঝিতে গিয়া মানুষ তর্কবিচারের মারামারির মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে আবার প্রশ্ন উঠিয়াছে—সৌন্দর্য্যকে এরূপ বাহিরে অন্বেষণ কর কেন? সৌন্দর্য্য কি বাহিরের জিনিষ? "সৌন্দর্য্য" বলিয়া একটা স্বতন্ত্র জিনিস কি এই-সকল দৃশ্য পদার্থের গায়ে মাখান থাকে যে তাহাকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করিতে হইবে? তোমার অন্তরে যে সৌন্দর্য্যের আদর্শ রহিয়াছে, তাহাকেই বাহিরে প্রতিফলিত দেখিতেছ। অতএব প্রকৃতির বাহিরের চেহারা দেখিয়া ভুলিও না। তাহার রূপের দাস হইও না। অন্তরের মধ্যে যে সৌন্দর্য্যের ছাপ রহিয়াছে তাহাকেই চিনিতে শেখ, এবং তোমার শিল্পের মধ্য দিয়া তাহাকেই পরিস্ফুট করিয়া তোল।

আপাতত মনে হইতে পারে বুঝি একটা ভাল মীমাংসা পাওয়া গেল; কিন্তু ইহার মধ্যে সমন্বয়বাদী আসিয়া নূতন সুর ধরিলেন—"ভিতরই বা কি আর বাহিরই বা কি? যাহাকে ভিতর বল, আর যাহাকে বাহির বল, তাহাদের মধ্যে বিরোধই বা কোথায়? ভিতর হইতে বাহির, বাহির হইতে ভিতর, মানুষের সকল সাধনাই ত এই ভাবেই চলিয়া থাকে। বাহিরে যে সৌন্দর্য্য দেখ, অন্তরের আদর্শের সহিত তাহাকে মিলাইয়া লও; আবার অন্তরে যে অব্যক্ত সৌন্দর্য্য আছে বাহিরের রূপের মধ্যে তাহাকেই অন্বেষণ কর। বাহিরের রূপকে অন্তরের ভাবের দ্বারা বুঝিয়া, বুঝাইয়া দাও, এবং অন্তরের ভাবকে বাহিরের রূপের মধ্য দিয়া জগতের কাছে প্রকাশ কর। অন্তর ও বাহিরের মধ্যে এই পরিচয়কে নিগূঢ় যোগে পরিণত করাই শিল্পীর সাধনা—এবং সেই যোগপ্রসূত আনন্দ হইতেই তাহার শিল্পের উৎপত্তি।" মীমাংসাটা শুনিতে বেশ তৃপ্তিকর বোধ হয়, মানুষের মন সহজেই ইহাতে সায় দিতে চায়। কিন্তু কার্য্যত সর্ব্বত্রই দেখা যায়, কেবল বিচারলব্ধ কোন সিদ্ধান্তের দ্বারা জীবনের কোন প্রশ্ন কোন সমস্যারই মীমাংসা হয় না। মীমাংসাকে জীবনের

অভিজ্ঞতা দ্বারা আবার নূতন করিয়া অর্জ্জন করিতে হয়, জ্ঞানের সিদ্ধান্তকে হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়।

মানুষ যতক্ষণ তাহার অভিজ্ঞতার মধ্যে হাতড়াইয়া সাধনার উৎসকে ধরিতে না পায়, যতক্ষণ সে আপনার শিল্পীরূপকে ঠিকমত চিনিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার সাধনাকে নিরাপদ মনে করা চলে না। ততক্ষণ সে হয় উৎকট উৎকেন্দ্র স্বেচ্ছাচারিতার দাস হইয়া পড়ে, না হয় বিশেষত্ববর্জ্জিত গতানুগতিকতার মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলে। একবার কোন বিশেষ শিল্প বিশেষ ফ্যাশান, বিশেষ প্রথাতন্ত্রতার পশ্চাতে ছুটিয়া যায়, আবার বিদ্রোহী হইয়া প্রথা, সংস্কার, tradition মাত্রকেই বন্ধন জ্ঞানে ভাঙিতে চায়। একবার শিশুর মত অন্ধের মত নির্ব্বিচারে বহিঃপ্রকৃতির অনুসরণ করে, আবার মুখ ফিরাইয়া প্রকৃতি-চর্চ্চাকেই উচ্চশিল্পের অন্তরায় জ্ঞানে খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। শিল্প আজ হয়ত সাক্ষ্য দিতেছে—"সত্যকে রেখা বর্ণাদি দ্বারা তর্জ্জমা করিলেই সত্যকে ব্যক্ত করা হয় না—রূপক ও অলঙ্কারের দ্বারা convention ও symbolismএর ইঙ্গিতে তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হয়। শিল্পের সত্য বাহিরের রূপে নয়—রূপের মধ্যে নিহিত অর্থগৌরবেই সত্য।" কিন্তু আজ সে যত জোরের সঙ্গেই এ কথা বলুক না কেন, কাল না হউক দু-দিন বাদে তাহাকে এ সুর একবার বদ্‌লাইতেই হইবে, একবার তাহাকে বলিতেই হইবে, "সত্য আপনার মহিমায় আপনি প্রতিষ্ঠিত, তাহার জন্য অলঙ্কার আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? তাহাকে যেমন সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করি তেমনি সহজ সুন্দর স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ করিতে হয়। আমরা যে সেরূপ করিতে পারি না, ক্রমাগতই অলঙ্কার ও উপমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হই, তাহা আমাদেরই অক্ষমতা—প্রকাশের অক্ষমতা, ধারণার অক্ষমতা, ভাষার অক্ষমতা। উপমা খণ্ডশিল্পের সৃষ্টি, শিল্পের একটা আনুষাঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। সে যখন শিল্পে কাব্যে বা চিন্তারাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া সত্যের আসনে বসিতে চায়, তখন তাহাকে ঘাড় ধরিয়া একেবারে নামাইয়া দেওয়া উচিত। যাহাকে 'রূপ' বলি, 'বাহিরের সত্য' বলি, শিল্পের চক্ষেও সে সত্য এবং আদরণীয়—আপনার মহিমাতেই সত্য, কেবল শিল্পীর ব্যাখ্যার খাতিরে সত্য নয়। তাহাকে জানা, তাহার সাধনা করা, শিল্পীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

এইরূপ দুইটা বিভিন্ন সুর শিল্পজগতে—শুধু শিল্পে কেন, সর্ব্বত্রই—থাকিয়া যায়; এবং এইরূপ থাকাই প্রয়োজন। কারণ, এ উভয়ই সত্য—ঠিক সত্যকে ধরিতে পারিলে, তাহার মধ্যে এ দুই মীমাংসারই যথার্থ স্থান পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে Cubists, Futurists প্রভৃতি কয়েকটি বিপ্লববাদী দল এই-সকল খণ্ডতত্ত্বকে ভাঙিতে গিয়া আপনাদের অজ্ঞাতসারে একেবারে ঠিক সত্যটাকে, মূল প্রশ্নটাকে, বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। ইঁহারা বলেন, "সুন্দর অসুন্দর আবার কি? শিল্পের রাজ্যে আবার আইন কানুন কি? অসত্য অসুন্দর ইত্যাদি কল্পনা শুধু নিরর্থক কল্পনামাত্র! মানুষ যখনই একটা কিছু বাহিরের জিনিষের অনুসরণ করিতে চায়—তা সে প্রথাতন্ত্রতাই হউক আর রূপের সাধনাই হউক, আচার্য্যের উপদেশই হউক আর সৌন্দর্য্য নামধারী কুসংস্কারই হউক, তাহার উপর সর্ব্ববাদীসম্মতির ছাপ থাকুক্ আর নাই থাকুক,—এই অনুসরণই দাসত্ব, এই অনুসরণই বন্ধন। অতএব, সর্ব্বপ্রথমে সাধনের মূলগত এই বন্ধনকে ভাঙ, সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের অনুসরণকে বর্জ্জন কর! তোমার শিল্পের নিয়ম, তোমার canons of art, তোমার সৌন্দর্য্যের সংস্কার, তোমার traditionএর নজীর, তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছা—যেখানে তুমি দাসখত লিখিয়াছ—সব ভাঙিয়া কেবল বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া রাখ। দেখিবে এই নির্ম্মমতার মধ্য হইতেই পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। কাহাকে অসুন্দর বলিয়া শিল্পরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চাও? ওই অসুন্দরেরই তপস্যা করিয়া দেখ—We shall revel in ugliness—we shall trample on the bondage of forms and the tyranny of ideas—রূপের বন্ধন ও ভাবের অত্যাচার এ উভয়কেই পদদলিত করিয়া অসুন্দরেই মত্ত হও। চিত্তকে সংস্কার-

বিমুক্ত করিয়া একেবারে নিরঙ্কুশভাবে ছাড়িয়া দাও— সে আপনাকে যথেচ্ছা প্রকাশ করুক"। শিল্পীর এই যে বিদ্রোহীমূর্ত্তি; ইহার বিদ্রোহের আবরণ খসিলেই ইহার প্রকৃত চেহারা প্রকাশ পাইবে। বিপ্লবালোড়িত পঙ্কিলতা যখন কালক্রমে সাধনার স্থিরতার মধ্যে তলাইয়া যাইবে তখন এই বিপুল মন্থনব্যাপারের মধ্য হইতে এই পরমতত্ত্ব আবির্ভূত হইবে—"আপনাকে প্রকাশ কর— আপনাকে প্রকাশিত হইতে দাও।" আপনাকে যে পরিমাণে পাইবে, আপনাকে যে পরিমাণে বিলাইয়া দিবে, তোমার শিল্পসাধনা—তোমার যে-কোন সাধনা —সেই পরিমাণে সার্থক হইবে। বাহিরের আশ্রয় আশ্রয়ই নহে; বাহিরের উপদেশের উপর, বাহিরের উদ্দীপনার উপর তোমার শেষ নির্ভর রাখিও না— অন্তরের প্রেরণাই তোমার নির্ভর। তোমার বিচিত্র অপূর্ণতার মধ্যেই তোমার পূর্ণ রূপ সার্থক রূপ নিহিত রহিয়াছে, তাহাকে বিকশিত হইতে দাও—তোমার সমস্ত লক্ষ্যহীন ব্যর্থতার মধ্যে "আদর্শ"রূপী তুমি ছায়ার মত ঘুরিতেছ, সেই আদর্শকে তোমার মধ্যে প্রকাশিত হইতে দাও।

শিল্পরাজ্যে যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপ মানুষের সকল প্রকার সাধনাক্ষেত্রেই তাহার অন্বেষণের সকল প্রকার খুঁটিনাটির মধ্যে কতকগুলি বিপরীতমুখী অথচ পরস্পর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ কাল পাত্র ও অবস্থাভেদে ইহাদের মধ্যে কখন একটি কখন অপরটি প্রবল হইয়া উঠিতে চায়, এবং সেই সঙ্গে মানুষের জিজ্ঞাসাও মূলপ্রশ্নের এক মাথা হইতে আর-এক মাথায় ঘুরিয়া বেড়ায়। বাতাস গ্রহণ ও বাতাস মোচন এই দুই ব্যাপারের মিলনে যেমন শ্বাসকার্য্য সম্পূর্ণ হয়, সেইরূপ মানুষের অন্বেষণের সাফল্যের জন্য তাহার সকল জিজ্ঞাসার মধ্যে একটা অন্তর্মুখী ও একটা বহির্মুখী ঝোঁক থাকা প্রয়োজন। একবার মানুষ জগৎব্যাপারের দিকে চাহিয়া বলে "জগৎটা ত এক রকম বোঝা গেল, কিন্তু যে বুঝিল সে কে? ইহার মধ্যে 'আমি' লোকটা দাঁড়ায় কোথায়?" আবার যখন নিজের দিকেই তাহার দৃষ্টি পড়ে তখন সে বলে "আমি যে এই-সব জানিতেছি, তাহা না হয় বুঝিলাম—কিন্তু যাহাকে জানিতেছি সেটা কি—এবং এই জানার অর্থই বা কি?"

বিজ্ঞানের চক্ষে প্রশ্নটা এইরূপ একটা জটিলতার মধ্য দিয়া দেখা দিতেছে। বিজ্ঞানের অন্বেষণ এতকাল আত্মাকে ছাড়িয়া চৈতন্যকে ছাড়িয়া জগৎ-ব্যাপারের সন্ধানে জড়প্রবাহের পশ্চাতেই ছুটিয়াছে। তাহার মধ্যে আত্মাকে কোথায় স্থান দিবে বিজ্ঞান আজ পর্য্যন্ত তাহার কোনরূপ কিনারা করিয়া উঠিতে পারে নাই। বিজ্ঞান কেবল জগতের সাক্ষ্যকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছে "অতীতে এই পথে আসিয়াছি, বর্ত্তমানে এই পথে চলিতেছি, এই ভাবে জড়জগৎ আপনাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে—এইরূপ বিচিত্র নিয়ম-বন্ধনের ভিতর দিয়া সৃষ্টিপ্রবাহ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আপনার ভবিতব্যকে গড়িয়া তুলিতেছে।" একের বিচিত্র লীলাকে বিচিত্র-রূপে খণ্ডিত করিয়া দেখা এবং সেই বিচিত্র খণ্ডতাকে আবার জোড়া দিয়া অখণ্ড নিয়মের একত্বকে প্রতিষ্ঠিত করাই বিজ্ঞানের সাধনা। কিন্তু এই সাধনার একটি সূত্রকে বিজ্ঞান আপনার সংগ্রামের দ্বারা কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছে না। বিজ্ঞান আপনার আত্মশিবির ছাড়িয়া যুক্তিবিচারের অকাট্য অস্ত্রে ক্রমাগতই জগৎ-শৃঙ্খলার ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহার ভিতরকার নিয়ম-বন্ধনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং দেশ কাল, একত্ব বহুত্ব, সত্তা শক্তি ও চৈতন্য, এই সপ্তরথীর সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া পদে পদেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। আর সকলকে একরকম এড়ান যায় কিন্তু ঐ যে ব্যূহের মুখে, ভিতর-বাহিরের সন্ধিস্থলে চৈতন্যরূপী জয়দ্রথ বসিয়া আছেন, বিজ্ঞানের অস্ত্রে ত তাহার গায়ে কোন দাগ পড়ে না। বিজ্ঞান নিজবলে আত্মার শিবিরে ফিরিবে কোন্ পথে?

যে দেশকালাশ্রিত পরিবর্ত্তন-পরম্পরাকে আমরা সংসাররূপে জানিতেছি, বিজ্ঞান এই অবিরাম গতির পূর্ব্বাপর কিছুই দেখিতে পায় না—তাহার মূলে একটা স্থিতিরূপ কেন্দ্রেরও কোন সন্ধান পায় নাই। অথচ, এই পরিবর্ত্তন-স্রোতের মধ্যে নিত্য, আপনাতে-আপনি-

স্থিত, একটা কিছু না থাকিলে সমস্ত গতিটাই একটা নিরর্থক ব্যাপার হইয়া পড়ে। বিজ্ঞান এক সময়ে জড়পরমাণুর স্থায়িত্বের উপর নিত্যতার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। বিজ্ঞান বলিয়াছিল, "এই শক্তির বিচিত্র লীলার মধ্যে শক্তির কেন্দ্ররূপে, অনন্ত গতির অন্তর্নিহিত অনন্ত স্থিতিরূপে এই অজ্ঞাতজন্ম শাশ্বত পরমাণু বর্ত্তমান। এই প্রবহমান নিত্য পরমাণুর বিচিত্র সংযোগ বিয়োগ-কেই আমরা জগৎব্যাপাররূপে জানিতেছি।" কিন্তু বিজ্ঞান যে আপাতস্থায়িত্বকে নিত্য নামে অভিহিত করিয়াছিল, তাহার মধ্যে আমরা গতি বা শক্তির কোন-রূপ মীমাংসা পাই না। বিশেষতঃ, আজকাল পরমাণু সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহার মধ্যে একান্ত অনিত্যতার যে-সকল প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহার ফলে বিজ্ঞান তাহার পূর্ব্বতন নিশ্চিন্ত ভরসা হারাইয়া, এখন কোন কিছুকেই নিত্য বলিতে সাহস পায় না। গতির কেন্দ্রে পরমাণু, পরমাণুর মধ্যে সূক্ষ্মতর গতি,—বিজ্ঞানের অন্বেষণ এইরূপ চক্রের মধ্যেই ঘুরিতেছে। একটা অন্ধ আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া বিজ্ঞান মূল প্রশ্নের আশেপাশেই ঘুরপাক খাইতেছে অথচ কোথাও প্রশ্নে আসিয়া ঠেকিতেছে না। সুতরাং প্রশ্ন থাকিয়াই যাইতেছে "শক্তির মূলে কে ?" শক্তিব্যাপারটা গতিরই নামান্তর মাত্র ; এই মুহূর্ত্তে যাহা এখানে পরমুহূর্ত্তে তাহা ওখানে—এইরূপ কালভেদে জড়ের দেশভেদের নামই গতি। সুতরাং অনেকের মতে শক্তি তেমন একটা প্রশ্নের বিষয় নয়, জড়পদার্থের স্বরূপ লইয়াই আসল সমস্যা। কেহ বা বলেন, দেখা দরকার শক্তি এবং জড় ইহাদের মধ্যে কাহার মূলে কে ?—অথবা ইহঁারা কি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু, না ইহাদের উভয়ের মূলে ইথার বা ইলেক্ট্রন্ বা অপর কোন সমন্বয়তত্ত্ব নিহিত আছে ? আবার কেহ কেহ প্রশ্নটাকে একেবারেই বাদ দিতে চান। তাঁহাদের মতে, একেবারে গোড়ায় গিয়া ঠেকিলে কোন্ জিনিষ স্বরূপতঃ কিরূপ দাঁড়ায় সে আলোচনা নিষ্ফল, এবং—অন্তত বিজ্ঞানের তরফ হইতে—সে বিষয়ে মাথা ঘামাইবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না।

কিন্তু প্রশ্ন যখন একবার উঠিয়াছে, তখন এরূপ উত্তরে মন প্রবোধ মানিবে কেন ? যে শক্তির প্রেরণায় সৃষ্টি-প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছি, যে শক্তির নিরন্তর আঘাতে জীবন গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাকে যতক্ষণ লক্ষ্যহীন অন্ধপ্রবাহরূপে জানিতেছি ততক্ষণ তাহার সঙ্গে কোনরূপ আদান প্রদানের সম্বন্ধ কল্পনা করা চলে না। বলিতে হয়, প্রবহমান শক্তির মধ্যে এই অন্ধ সংঘাতের ফলে আমার জ্ঞানশক্তিটুকু লইয়া আমি ভাসিয়া উঠিয়াছি—সে শক্তি জানিত না আমার মধ্যে সে কি অমূল্য সম্পদরূপে বিকশিত হইতেছে। সৃষ্টিবিকাশের আলো-চনা করিতে গিয়া মানুষ যখন ক্রমোন্নতির কথা বলিতে-ছিল বিজ্ঞান তাহাকে ধমক দিয়া বলিয়াছিল—উন্নতি নয়, পরিণতি। অন্ধশক্তি আপনার মধ্যেই আপনাকে সংযত করিবার জন্য, আপনার বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টায় অন্ধ সংগ্রামের দ্বারা আপনার সংঘাতে আপনি গড়িয়া উঠিতেছে—তাহাকে 'অন্ধ' বলিতে না চাও আত্মপ্রচোদিত বল—কিন্তু জ্ঞানপ্রসূত বা চৈতন্যময় বল কেন ? সে আপনার ঝুঁকিতে, আপনার অনিবার্য্য গতির প্রেরণায় অনিবার্য্য অজ্ঞাত পরিণতির দিকে ছুটিয়াছে, তুমি কেন তাহার উপর তোমার জ্ঞান, তোমার চিন্তা, তোমার অতৃপ্তি, তোমার ভবিষ্যতের আশাকে আরোপ করিতেছ ? জগৎব্যাপার কেবল বর্ত্তমানকেই জানে, বর্ত্তমানকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। সে অতীতের সোপান বাহিয়া আসিয়াছে এবং অতীতের ছাপ নিজদেহে ধারণ করিতেছে সত্য, কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তেই সে অতীতকে ছাড়িয়া অতীতের বোঝাকে, অতীতের সঞ্চয়কে, নূতন হইতে নূতনতর বর্ত্তমানতার মধ্যে বহন করিয়া আনিতেছে। সুদূর পরিণতির কোন সংবাদ সে রাখে না, প্রতিমুহূর্ত্তের পরিণতিই তাহাকে পরমুহূর্ত্তের পথ দেখাইয়া দিতেছে।

সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে যে একটা নিরবচ্ছিন্নতা দেখা যায়, যাহা সমস্ত জগৎকে দেশে [illegible]বং কালে খণ্ডিত করিয়াও, সংযোগসূত্ররূপে সমগ্র[illegible]কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, এবং প্রতিমুহূর্ত্তে এই[illegible]হের নিত্যতাকে রক্ষা করিতেছে, বিজ্ঞান এখন[illegible] জিজ্ঞাসু

দ্বারে আঘাত করিয়া দেখে নাই। অথচ ইহারই মধ্যে বিজ্ঞানের সকল সাধনা সকল অন্বেষণের সমন্বয়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং পরোক্ষভাবে জ্ঞানলক্ষণ-সম্পন্ন একটা অকাট্য প্রেরণাশক্তিকে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াও বিজ্ঞান এই জ্ঞানবস্তুটাকে কোথাও ধরিতে চেষ্টা করে নাই। কারণ, বিজ্ঞান ত চৈতন্যকে খুঁজিতে আসে নাই, সে শক্তির নিয়মকেই খুঁজিয়াছে, এবং সেই জন্যই পদে পদেই জীবন্ত জ্ঞানের সাক্ষ্য পাইয়াও সে তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছে।

আপনার মধ্যে যখন জ্ঞানকে অন্বেষণ করি, আপনার জ্ঞানের মধ্যে আপনার অন্বেষণের মধ্যে আপনার সত্তারহস্যের মধ্যে যখন খুঁজিয়া দেখি, তখন ত জ্ঞানরূপী অখণ্ডতাকে দেখিতে পাইই—যে দেখিতে জানে সে বাহিরের দিক দিয়া, নিয়মের অন্বেষণ ও খণ্ডতার সাধনের ভিতর দিয়াও তাহাকে প্রচুর পরিমাণেই পায়। মানুষ বর্ত্তমানের সঙ্গে খানিকটা অতীত ও খানিকটা ভবিষ্যৎকে সর্ব্বদাই জুড়িয়া রাখিয়াছে। একদিকে সে আপনার অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও সংস্কারের দ্বারা তাহার প্রতিমুহূর্ত্তের জীবনকে একটা ব্যাপকতা প্রদান করিতেছে, অপর দিকে তাহারই সঙ্গে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সাক্ষ্য জুড়িয়া দিয়া সে আপনার জ্ঞান ও চিন্তাকে আরও সুদূর অতীতের আভাস ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিতের মধ্যে ছড়াইয়া দিতেছে। বিলুপ্ত অতীত ও অনাগত ভবিষ্যৎকে সে আপনার জ্ঞানের ভিতর দিয়া এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় বাঁধিয়া রাখিতেছে। শুধু কালের দিক দিয়া নয়, দেশের দিক দিয়াও দেখা যায় যে, কার্য্যতঃ সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে দেহাত্মবাদী হইলেও, পদে পদেই আমরা এই শরীরকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছি। আমাদের চেতনা আমাদের প্রাণস্ফূর্ত্তি আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের ভিতর দিয়া আমরা প্রতিমুহূর্ত্তেই দেহের গণ্ডীকে লঙ্ঘন করিয়া বহির্জ্জগতে ছড়াইয়া পড়িতেছি। বাহিরে যেমন আহার নিশ্বাসাদির মধ্য দিয়া জগতের সঙ্গে আদান প্রদান চলিয়াছে—তেমনি [illegible]নার ভিতর দিয়াও নিরন্তর একটা বোঝা-পড়া চলি[illegible]। শুধু যদি চোখটুকুকে আমার দর্শনেন্দ্রি[illegible]নে ক[illegible] যখন তাহার সঙ্গে আদ্যোপান্তযোগ-যুক্ত 'ইথার'সমুদ্র ও জগৎব্যাপী আলোকতরঙ্গকে না দেখি, তবে ইন্দ্রিয় জিনিষটা একটা নিরর্থক ব্যাপার হইয়া পড়ে। টেলিগ্রাফের যন্ত্র হিসাবে শুধু সংবাদ-গ্রাহক কলটুকু একটা কলই নহে, বিদ্যুৎপ্রবাহ ও সুদূরপ্রসারিত তার অথবা ইথার-বন্ধনকে ছাড়িয়া তাহার কোনও সার্থকতাই নাই। আলোকতরঙ্গ আমার চক্ষে আঘাত করিবামাত্র, চেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়া, সেই আলোককে আশ্রয় করিয়াই, দেহকে অতিক্রম করিয়া যায়—এই আলোক, এই বাহির, এই জগৎ, এই বৃক্ষলতা, এই সুদূর আকাশ, এইরূপ করিয়া প্রতি অনুভূতি প্রতি ইন্দ্রিয়বোধের ভিতর দিয়া, চেতনা ছুটিয়া গিয়া জগতের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপনার মধ্যে টানিয়া আনে। এইরূপভাবে চিন্তা করিতে গেলে দেখা যায়, এই একটা হস্তপদ-বিশিষ্ট জড়পিণ্ডই আমার শরীর নহে—ইহা আমার দেহের কেন্দ্র মাত্র; আসলে সমস্ত জগৎ নিখিলবিশ্ব আমারই বিরাট শরীর।

বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্ম জটিলতার মধ্যে মন যখন আপনার সম্যক্‌দৃষ্টিকে হারাইয়া ফেলে, বাহিরের খণ্ডতার মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন সে আর পথ খুঁজিয়া পায় না, তখন পরিশ্রান্ত মানুষ তাহার চিরন্তন প্রশ্নের বোঝাকে আপনার মধ্যে অন্তরের দ্বারে ফিরাইয়া আনে। এই যাওয়া এবং আসা যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন মানুষ আপনার মধ্যে প্রশ্নকে ও প্রশ্নের অন্তর্নিহিত সাম্যকে আবার যথার্থভাবে দেখিতে পায়। তখন মানুষ বুঝিতে পারে বাহিরের সাধনা দ্বারা যে "আমি"কে আমরা অন্বেষণ করি, সে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ নয়। বিবর্ত্তনবাদের ভিতর দিয়া, জগতের সম্বন্ধের ভিতর দিয়া, মানব-ইতিহাসের ভিতর দিয়া আমার যে চেহারাকে দেখিতে পাই, সে কেবল আমার একটা বাহিরের ছায়া মাত্র। এই ভ্রান্ত আমিত্বের সংস্কারকে আবার জ্ঞানের আঘাতে ভাঙিয়া দেখিতে হয়। আমি এই দেহ নই, এই দেহের মধ্যে আবদ্ধ শক্তিবিশেষ নই, আমি এই প্রবহমান পরিবর্ত্তন-পরম্পরা নই—

"মানুষ-আকারে বদ্ধ যে-জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নমেষের ভরে,

যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে"—

—কেবল সেই আমিই আমি নই। এই-সকল যাহার ছায়া আমি সেই সত্যবস্তু; আমার জীবনস্রোতের অনিত্যতার মধ্যে নিত্যরূপে আমিই বর্ত্তমান; আমার অন্তর্নিহিত পূর্ণতার আদর্শের মধ্যে আমি, আমার জীবনের মূলগত সুখদুঃখাতীত আনন্দের মধ্যে আমি—

"যে আমি স্বপনমুরতি গোপনচারী
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি"—

—সেই আমিই প্রকৃত আমি। তাহাকে জানাই জীবনের প্রশ্ন, তাহাকে প্রকাশিত হইতে দেওয়াই জীবনের সাধনা, তাহার প্রকাশেই জীবনের সার্থকতা। জীবন যে-পথেই চলুক না কেন, যাহার সাধনা আপাতত যেরূপই হউক না কেন—কি ব্যক্তিগতভাবে কি জাতিগতভাবে, সকলকেই কোন-না-কোন দিক হইতে এই প্রশ্নে আসিয়া ঠেকিতেই হইবে।

প্রশ্ন কি আমাদের জীবনে উপস্থিত হয় নাই? সে কি আমাদের দেশে আমাদের কাছে একটা উত্তরের দাবী করিতেছে না? কতবার, কতদিক হইতে, কত বিচিত্র রকমে, এ প্রশ্নের অন্বেষণ হইয়াছে—কত যুগে কতজন জীবনের অভিজ্ঞতা ও সাধনা দ্বারা তাহার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে আমাদের জীবনের সমস্যা কোথায় মিটিয়াছে? অদম্য প্রশ্নের মীমাংসাকে সহজ করিবার জন্য, একটা পাকাপাকি মীমাংসা দ্বারা প্রশ্নের অস্থির তাড়নাকে নিরস্ত করিয়া মীমাংসাকে সমাজের অস্থিমজ্জাগত করিয়া দিবার জন্য, মানুষ কত আচার, কত শাসন, কত নিয়মবন্ধনের মধ্যে মানুষকে বাঁধিয়াছে—কত স্থানে কত উপায়ে তাহাকে ঘাড় ধরিয়া দাসখত লিখাইয়া লইয়াছে—দাসত্বের নিশ্চিন্ততার মধ্যে তাহার চরম ব্যবস্থা নির্ণয় করিয়াছে—মীমাংসার তাড়নায় প্রশ্নকে নির্ব্বাপিতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। এত বন্ধনে বাঁধিয়াছিল, খণ্ডতার এত প্রাচীর তুলিয়াছিল, তাই আজ প্রশ্নকে এত নির্দ্দয় এত হিংস্র-রূপে জাগিতে দেখিতেছি, তাই এত আঘাতের পর আঘাত আসিয়া এমন নিরুপায় করিয়া আমাদের বাঁধ ভাঙিতেছে। কিন্তু এই আঘাতই চরম সত্য নয়—এই বিদ্রোহই শেষ মীমাংসা নয়—ইহারই মধ্যে চিরন্তন প্রশ্নের শাশ্বত উত্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে, "আপনাকে অন্বেষণ কর, আপনাকে প্রকাশিত কর।" বাহিরের নিয়ম সংস্কারের আকর্ষণ সমাজের কষাঘাতে অনেক চলিয়াছ, একবার অন্তরের আলোককে অন্বেষণ করিয়া দেখ, একবার তাহারই দ্বারা চালিত হইয়া দেখ। ধর্ম্মকে সহজ করিবার লোকপ্রিয় করিবার চেষ্টা অনেক হইয়াছে, একবার ধর্ম্মকে জীবন্ত করিয়া দেখ! আমরা ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া ধর্ম্মকেই আশ্রয় দিতে চাই—ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না হইয়াই মনে করি ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিব। তাই আমাদের বিরোধ আর মিটিতে চায় না—আমাদের প্রশ্ন দ্বন্দ্বের পর দ্বন্দ্বের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়।

অতীত গৌরবের জীর্ণস্মৃতিকে রোমন্থন করিয়া মানুষ আর কতকাল তৃপ্ত থাকিতে পারে? কালের রথচক্র-নিষ্পেষণকে আর কতকাল উপেক্ষা করিতে পারে? আমরা চাই আর নাই চাই, ইচ্ছা করি আর নাই করি, অমোঘ প্রশ্ন যখন জাগ্রত হইয়াছে, সে যখন একবার এ পতিত জাতিকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "কে তুমি—কোথায় চলিয়াছ—কি তোমার করিবার ছিল আর কিই বা করিতেছ" তখন সে আমাদের ঘাড়ে ধরিয়া, আমাদের জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতাকে নিংড়াইয়া তাহার জবাব আদায় না করিয়া ছাড়িবে না।

শ্রীসুকুমার রায়চৌধুরী।

অরণ্যবাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ:—কলিকাতাবাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটী বিক্রয় করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত পার্ব্বত্য বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই স্থানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাঁহাকে কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রজা[illegible] সহিত ভূমাধিকারীর ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইল। গ্রামের লোকে [illegible] ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুরো[illegible]তে লাগিল। একদা মাধব দত্তের পত্নী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে [illegible] পূজার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরী [illegible]লের সহি[illegible] ক্ষেত্রনাথের

পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু সতীশবাবু পূজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্যা সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া সৌদামিনীর পিতা সতীশচন্দ্রকে কন্যাদানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কন্যা আশীর্ব্বাদ করিবেন স্থির হয়। সতীশচন্দ্র অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সৌদামিনীকে আশীর্ব্বাদ করিলে, দুই বন্ধুর মধ্যে কন্যাদের যৌবনবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহার ফলে, যৌবনবিবাহের অপ্রচলন সত্ত্বেও তাহার শাস্ত্রীয়তা সিদ্ধ হয়। ১৫ই ফাল্গুন তারিখে সতীশের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হইয়া গেল। সতীশের অনুরোধে ক্ষেত্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রকে পুরুলিয়া জেলা স্কুলে পড়িবার জন্য পাঠাইতে সম্মত হন। সতীশ সুরেন্দ্রকে আপনার বাসায় ও তত্ত্বাবধানে রাখিবার প্রস্তাব করেন। ক্ষেত্রনাথ অমরনাথ-নামক একজন দরিদ্র যুবককে আশ্রয় দিয়া বল্লভপুরে একটি পাঠশালা ও পোষ্ট-অফিস খুলিবেন, এবং সেই সকল কর্ম্মে তাহাকে নিযুক্ত করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। সতীশচন্দ্র ও সৌদামিনীর বিবাহ হইয়া গেলে পর ক্ষেত্রনাথ মাধব দত্তের সহিত পরামর্শ করিয়া বল্লভপুরে একটি হাট ও কয়েকটি দোকান প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথ গৃহে আসিয়া মাধবদত্ত মহাশয়ের দোকান করার প্রস্তাব মনোরমাকে জ্ঞাপন করিলেন। মনোরমা সকল কথা শুনিয়া বলিলেন "আমি মেয়েমানুষ; কাজ-কারবারের কথা কিছুই জানি না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, দত্ত মশায়ের প্রস্তাবটি ভাল। নগিন ছেলেমানুষ; একলা কাজকর্ম্ম চালাতে পার্‌বে না। দত্তমশায়ের ছেলেরাও যদি তার সঙ্গে একত্রে কাজ করে, তা হ'লে কোনও ভাবনা থাক্‌বে না। তুমি দত্তমশায়ের প্রস্তাবে সম্মতি দাও গে। তুমি তো দুই হাজার টাকা দিতে পার্‌বে?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "তা পার্‌ব। ব্যাঙ্কে কেবল বাৎসরিক শতকরা চারি টাকা সুদে টাকা জমা আছে। তাতে বছরের শেষে দুই হাজার টাকার সুদ মোটে ৮০, টাকা হয়। দত্তমশায় বল্‌ছিলেন যে, বেশ বুদ্ধিবিবেচনা ক'রে কাজ চালাতে পার্‌লে, বছরের শেষে দুই হাজার টাকায় দুই হাজার টাকা লাভ হ'তে পারে! সে কথা আমি অবিশ্বাস করি না। কথায় বলে 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'। কৃষিকাজেও বিলক্ষণ লাভ হয়; কিন্তু বাণিজ্যে যে রকম লাভের সম্ভাবনা, কৃষিতে তখন আর কিছুতেই থাকে না। বাণিজ্য ও কৃষি, এই দুইটিই বৈশ্যের বৃত্তি। আমি কৃষি-কাজের তত্ত্বাবধান কর্‌ব, আর এদের কারবারও নিজে দেখ্‌তে পার্‌ব। নগিনের জন্য কি কর্‌ব, তা আমি ভেবে কিছু ঠিক্ কর্‌তে পারি নাই। সেই কারণে, আজ দত্তমশায়ের সঙ্গে পরামর্শ কর্‌তে গেছলাম। তিনি নিজেই যখন যৌথ কার্‌বার কর্‌বার প্রস্তাব কর্‌লেন, তখন ভালই হ'ল।"

পরদিন বৈকালে ক্ষেত্রনাথ আবার মাধবদত্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রস্তাবে নিজ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মাধব দত্ত তাহা অবগত হইয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি হরিধন ও কৃষ্ণধনকে ডাকিয়া সকল কথা বলিলেন। তাঁহারাও তাহা অবগত হইয়া আনন্দিত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে মাধব দত্ত দুই পুত্রের সহিত বল্লভ-পুরে আসিয়া ক্ষেত্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কোথায় গুদাম ও দোকান-ঘর হইবে, এবং কোন্ দিকে হাটের জন্য দুইচালা ঘরসমূহ নির্ম্মিত হইবে, তাহা তাঁহারা স্থির করিলেন। কাছারী-বাড়ীর দক্ষিণ দিকে সম্মুখবর্ত্তী বৃহৎ মাঠের নিম্নেই রাস্তা। রাস্তা হইতে কাছারীবাড়ীর এই মাঠে প্রবিষ্ট হইতে হইলে, একটী ফটকের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। উত্তরমুখ হইয়া ফটকে প্রবিষ্ট হইলে, বাম-ভাগে রাস্তার ধারে বাবুর্চ্চিখানা, খানসামাদের ঘর ও গুদাম-ঘর, আর দক্ষিণভাগে রাস্তার ধারে আস্তাবল ও সহীসদের ঘর। এই সমস্ত ঘরই উত্তরদ্বারী, এবং রাস্তার দিকে তাহাদের পশ্চাদ্ভাগ। আস্তাবলটি পাঠশালাগৃহে পরিণত হইয়াছিল, আর বাবুর্চ্চিখানাটি ক্ষেত্রনাথ ডাক-ঘরে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাধব দত্ত বলিলেন যে, বাবুর্চ্চিখানায় ডাকঘর স্থাপন না করিয়া সহীসদের ঘরেই তাহা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, ডাকঘর ও পাঠশালা একদিকে এবং পাশাপাশি থাকিবে। আর বাবুর্চ্চিখানায় মনোহারীর দোকান, খান-সামাদের ঘরে মশলার দোকান, আর গুদামঘরে বাসন-কাপড়ের দোকান স্থাপন করা যাইতে পারে। এই সমস্ত ঘর পরস্পর সংলগ্ন থাকায়, দোকানগুলিও পাশাপাশি হইবে। ইহাদের সম্মুখে বারাণ্ডা না থাকায়, শালের

খুঁটি ও শালের কাঠামোর উপর করোগেটেড্ লোহার চাদরের একটী বারাণ্ডা করিলেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। কেবল আড়তের জন্য একটী গুদাম-ঘর প্রস্তুত করা আবশ্যক। যে পাকা গুদামঘরটি বাসনকাপড়ের দোকানের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার কিছু দূরে উত্তর-পশ্চিম ভাগে পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বা করিয়া এই নূতন গুদামঘর প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার সম্মুখের ভাগটি তিনদিকে খোলা থাকিবে, আর ইহার পশ্চিমে অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাগে গুদামঘর হইবে। এই গুদামঘরটি দুই-কুঠারী হইবে। সম্মুখের কুঠারীতে বিক্রেতৃগণের অবিক্রীত মাল মৌজুৎ থাকিবে, আর সর্ব্বপশ্চাতের কুঠারীতে ক্ষেত্রবাবুর কৃষিজাত অতিরিক্ত শস্যসমূহ সঞ্চিত থাকিবে। গুদামঘরের পশ্চাদ্দিকের সুপ্রশস্ত মাঠে মাল বোঝাই গাড়ীসমূহ আসিয়া লাগিবে এবং উক্ত গাড়ীসমূহ সদর ফটক দিয়া প্রবিষ্ট না হইয়া গুদামের পশ্চাদ্দিকের পথে প্রবিষ্ট হইবে। বাসন-কাপড়ের দোকানের অব্যবহিত পশ্চিমদিকে রন্ধনশালা ও বাসাবাটী হইবে। মাধবদত্ত বলিলেন, তিনি তাঁহার জঙ্গলে অনেক মোটা মোটা শালের খুঁটি কাটাইয়াছেন; গুদামঘর, রন্ধনশালা, বাসাবাটী এবং দোকানসমূহের সম্মুখবর্ত্তী বারাণ্ডা নির্ম্মাণের জন্য যত কাষ্ঠ লাগিবে, তাহা তিনি দিবেন। গুদামঘরের চারিদিকে মোটা মোটা শালের খুঁটি পুঁতিয়া ও শালকাষ্ঠের কাঠামো করিয়া চারিদিকের দেওয়াল ও ছাদ করোগেটেড্ লোহার চাদর দিয়া ঢাকিতে হইবে; কেবল মেজেটি পাকা করিয়া লইতে হইবে। ক্ষেত্রবাবুর ইট ও চনসুরকী মৌজুৎ ছিল। মেজে প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি তাহা দিতে সম্মত হইলেন।

পাঠশালা ও ডাকঘরের পূর্ব্বভাগে রাস্তার ধারে ধারে উত্তরমুখ করিয়া এবং তৎপরে হাতার পূর্ব্বসীমায় পশ্চিমমুখ করিয়া হাটের জন্য তৃণাচ্ছাদিত চল্লিশটি দু'চালা ঘর প্রস্তুত করা হইবে, তাহা স্থিরীকৃত হইল। একটী প্রশস্ত রাস্তা গুদামঘর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে দক্ষিণমুখে, তৎপরে দোকানঘরের নিকটে আসিয়া পূর্ব্বমুখে দোকানঘর, পাঠশালা, ডাকঘর ও হাটের গৃহশ্রেণীর সম্মুখ দিয়া যাইবে; পরে তাহার পূর্ব্বসীমায় উপনীত হইয়া উত্তরমুখে হাটের গৃহশ্রেণীর সম্মুখ দিয়া যাইবে। ক্ষেত্রনাথ তাঁহার বাটীর সম্মুখে দশ বিঘা স্থান বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লইবেন; অবশিষ্ট পঁচিশ বিঘা স্থান হাটের জন্য ছাড়িয়া দিবেন। এই পঁচিশ বিঘার মধ্যে অধিকাংশ ভূমিই তাঁহার বাটীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে থাকিবে। অনতিদূরে নন্দাজোড় প্রবাহিত হইতেছে; সুতরাং পানীয় জলের কোনও অভাব হইবে না।

এই ব্যবস্থা ক্ষেত্রনাথের মনোনীত হইল। তিনি মাধব দত্ত মহাশয়ের বৈষয়িক জ্ঞান ও ব্যবস্থাশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার সহিত পরামর্শক্রমে স্থির হইল যে, এখন হইতেই গুদামঘর ও হাটের জন্য ঘর নির্ম্মাণ করা হউক। শুভ বৈশাখমাসের দ্বিতীয় দিবস হইতে দোকান ও হাট খোলা হইবে; আরও স্থির হইল যে, ক্ষেত্রনাথ হরিধনকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র কলিকাতায় যাইবেন এবং সেখান হইতে করোগেটেড্ লোহার চাদর ক্রয় করিয়া সত্বর বল্লভপুরে পাঠাইবেন। তৎপরে দোকানের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া ও হরিধনকে কলিকাতায় রাখিয়া তিনি বল্লভপুরে প্রত্যাগত হইবেন। হরিধন যেমন যেমন জিনিস ক্রয় করিবে, অমনি রেলে তৎসমুদয় বোঝাই দিয়া পাঠাইতে থাকিবে।

এই-সকল কথাবার্ত্তা স্থির হইলে, মাধবদত্ত মহাশয় ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, এখন কারবার কো[illegible] নামে চল্‌বে, তাহা আমি স্থির করেছি, শুনুন। কারবার 'ক্ষেত্রনাথ দত্ত কোম্পানী'র নামে চল্‌বে! আমার নাম দেবার জন্য আপনি অনুরোধ কর্‌বেন না। আমি আর কয়দিন? আমাদের সৌভাগ্য বশতঃই আপনি এই দেশে এসেছেন। আপনার হাতেই আমি আমার ছেলেদের সঁপে দিলাম। আপনি তাদের মুরব্বি ও অভিভাবক হ'য়ে তাদের রক্ষা ও পালন কর্‌বেন। ভগবান্ আপনাকে সুখে রাখুন। আর অধিক কি বল্‌বো?" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি বাষ্পগদ্গদকণ্ঠ হইলেন।

ক্ষেত্রনাথ তাঁহার প্রস্তাবে আ[illegible] পত্তি করিলেন; কিন্তু মাধবদত্ত মহাশয় তাঁ[illegible] শুনি[illegible]লেন না।

অবশেষে তিনি বলিলেন "আমার আর একটী কথা আছে। আমাদের শ্রীশ্রী৺ গন্ধেশ্বরী দেবীর টাট। গন্ধবেণেদের মধ্যে কারবারনামা প্রায়ই লিখিত পঠিত হয় না। ধর্ম্ম আর বিশ্বাসই আমাদের মূল, আর আমাদের খাতাপত্রই আমাদের পাকা দলীল।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আপনার কথা যথার্থ।"

পরদিন প্রাতঃকালে ক্ষেত্রনাথ মণ্ডলগণকে ডাকাইয়া হাটের ঘরের জন্য বাঁশ, কাঠ ও উলুখড় সংগ্রহ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। হাটের ঘর কি প্রণালীতে প্রস্তুত হইবে, তিনি তাহাদিগকে তাহার একটি আভাস দিলেন। মাধবদত্ত মহাশয় আসিয়া কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তাহাও তিনি তাহাদিগকে জানাইলেন।

দুই তিন দিনের মধ্যে মাধবদত্ত মহাশয়ের বাটী হইতে মোটা মোটা শালের খুঁটি প্রভৃতি আসিয়া পঁহুছিল। দত্তমহাশয় একটী শুভদিনে ও শুভমুহূর্ত্তে গুদামঘরের পরিমাপ-অনুসারে চারিদিকে মোটা মোটা খুঁটি পোঁতাইলেন। তৎপরে কতিপয় সূত্রধর নিযুক্ত করিয়া তাহার কাঠামো প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। প্রজারাও জঙ্গল ও পাহাড় হইতে শালের খুঁটি, বাঁশ ও উলুখড় কাটিয়া আনিতে লাগিল। এইরূপে চারিদিকে কার্য্যারম্ভ হইলে, ক্ষেত্রনাথ হরিধনকে সঙ্গে লইয়া একটী শুভদিনে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

ব্যাঙ্ক হইতে দুই সহস্র টাকা বাহির করিয়া, ক্ষেত্রনাথ আবশ্যক-মত করোগেটেড্ লোহার চাদর ও বোল্ট্, রিভেট্ কাঁটা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া তৎসমুদয় রেলে বোঝাই দিলেন। তিনি বড়বাজারের একটী পরিচিত বড় কাপড়ের দোকান হইতে মাধবদত্ত মহাশয়ের প্রস্তুত তালিকানুসারে বস্ত্রাদি, অপর একটী পরিচিত বড় মশলার দোকান হইতে মশলাদি, এবং মুর্গীহাটা ও কলুটোলার দোকানসমূহ হইতে মনোহারী দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিলেন। বাসন কতক কলিকাতায় ও কতক বাঁকুড়ায় ক্রীত হই[illegible] তাহা স্থির হইল। হরিধনকে সকল বিষয়ে উপ[illegible]দিয়া, তিনি একদিন উত্তরপাড়ায় সতীশচন্দ্র ও স্নেহ[illegible]র সহিত দেখা করিয়া আসিলেন। [illegible] কা[illegible] দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে সঙ্গে লইয়া চোরবাগানে রজনীবাবুর সহিত দেখা করিতে যাইবার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু ক্ষেত্রনাথ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন "রজনীবাবু আমার শ্বশুরের প্রতিবাসী; আমার শ্বশুরবাড়ীর কারুর সঙ্গে এখন দেখা করবার ইচ্ছা নাই। সেখানে গিয়ে যদি তাঁদের সঙ্গে দেখা না করি, তা হ'লে সেটাও ভাল দেখাবে না।"

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সে বিষয়ে আর অনুরোধ করিলেন না। সতীশ ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন যে, আর সাত আট দিন পরেই তিনি সপরিবারে পুরুলিয়া যাত্রা করিবেন। সব্-ডেপুটীবাবু নূতন বাসা ভাড়া করিয়াছেন। সতীশচন্দ্র যেদিনে পুরুলিয়ায় পঁহুছিবেন, তাহার পূর্ব্বদিনেই তিনি নূতন বাসায় উঠিয়া যাইবেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আমি পুরুলিয়ার মেসে সুরেনকে দেখে যাব।"

দুই এক দিন পরেই অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ক্ষেত্রনাথ কলিকাতা হইতে পুরুলিয়া গমন করিলেন।

ত্রি-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পুরুলিয়ায় সুরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে উপস্থিত হইলেন। তিনি ষ্টেশনে সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, এখনও উহাঁর প্রেরিত দ্রব্যাদি সেখানে আসিয়া পহুঁছে নাই। বল্লভপুরে আসিয়া দেখিলেন মাধবদত্ত মহাশয় গুদামঘরের কাঠামো প্রস্তুত করাইয়াছেন। দোকানঘরসমূহের সম্মুখের বারাণ্ডার কাঠামোও প্রস্তুত হইয়াছে। বাসাবাটী এবং রন্ধনশালার কাঠামোও প্রস্তুত হইয়াছে! প্রজারা কেবল দুই তিনখানি হাটের ঘর বাঁধিয়াছে মাত্র। দত্তমহাশয় বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, বেগার দ্বারা কখনও কাজ ভাল হয় না। আপনার প্রজারা যে ঘর বেঁধেছে, তা বেশ পোক্তা হয় নাই। সেই জন্য ঘরবাঁধা বন্ধ রেখেছি। জনমজুর লাগিয়ে ঘর বাঁধাতে হবে। নতুবা ঘর পোক্তা হবে না। একদিনের ঝড়েই ঘর ভূমিসাৎ হ'য়ে যাবে। যা কাজ করতে হবে, তা পাকা হওয়া আবশ্যক। নতুবা পয়সা ও পরিশ্রম সবই নষ্ট হয়।"

দুই তিন দিনের মধ্যেই করোগেটেড্ লোহার চাদর প্রভৃতি আসিয়া পহুঁছিল। মাধবদত্ত মহাশয় মিস্ত্রী লাগাইয়া তদ্দ্বারা গুদামের ছাদ ও তৎপরে তাহার ভিত্তি প্রস্তুত করাইলেন। তৎপরে দোকানের বারাণ্ডার ছাদ প্রস্তুত হইল। সর্ব্বশেষে বাসাবাটী প্রস্তুত হইল। কেবল রসুই ঘরটি তৃণাচ্ছাদিত হইল।

এই-সমস্ত প্রস্তুত হইলে, তিনি দৈনিক বেতনে পঁচিশ-জন মজুর লাগাইয়া হাটের ঘরগুলি প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করিলেন। ঘরের সম্মুখভাগ খোলা রাখিয়া পশ্চাদ্ভাগ ও দুই পার্শ্ব ঝাঁটি ও বাঁশের কঞ্চী দ্বারা আবৃত করাইলেন এবং তাহার উপর মৃত্তিকা ও গোময় লেপাই-লেন। এইরূপে প্রায় বারদিনের মধ্যে চল্লিশটি ঘর প্রস্তুত হইল। ঘরগুলি প্রস্তুত হইলে, মাঠের এক অপূর্ব্ব শোভা হইল।

সর্ব্বশেষে দত্তমহাশয় গুদামের মেজে ও দোকান-ঘরসমূহের বারাণ্ডার মেজে ইট দিয়া গাঁথাইয়া পাকা করিয়া লইলেন। এই-সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে, তিনি বাঁশের জাফরী করাইয়া ক্ষেত্রনাথের বাটীর সম্মুখবর্ত্তী দশবিঘা ভূমি বেষ্টন করাইলেন। বাঁশের জাফরী দ্বারা এই প্রশস্ত ভূমি বেষ্টিত হইলে, তাহার মনোহারিণী শোভা হইল। তৎপরে তিনি আপণশ্রেণীর সম্মুখভাগে একটী প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করাইলেন। বলা বাহুল্য, এই-সমস্ত কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণে তিনি নগেন্দ্র ও অমর-নাথের বিলক্ষণ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

চৈত্রমাসের মাঝামাঝি সময়ে, কাপড়, মশলা, মনো-হারী দ্রব্য ও বাসন প্রভৃতি বল্লভপুরে আসিয়া পহুঁছিল। দত্তমহাশয়, ক্ষেত্রনাথ, নগেন্দ্র, হরিধন প্রভৃতি সকলেই চালানের ফর্দ্দ অনুসারে জিনিষপত্র মিলাইয়া যথাস্থানে তৎসমুদায় সজ্জিত ও বিন্যস্ত করিতে লাগিলেন। কাপড়ের গাঁইট হইতে কাপড় বাহির করিয়া প্রত্যেক কাপড়ে বিক্রেয় মূল্যের সঙ্কেত চিহ্নিত করা হইল। কাপড় রাখিবার জন্য কাঠের কতকগুলি ফ্রেম বা মাচা প্রস্তুত হইল। মনোহারী দ্রব্যাদিরও মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া তাহা মনোহররূপে সুসজ্জিত করা হইল। মহেশ হালদার, গোপীনাথ দাঁ, হারাধন মল্লিক প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ আসিয়া আপনাপন কর্ম্মের ভার লইতে লাগিলেন।

বল্লভপুরে একটী নূতন হাট বসিতেছে, তাহা চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিবৃন্দ ও দোকানদারগণ অবগত হইয়াছিল। তথাপি ঢোলসহরত দ্বারা সকলকে তাহা জ্ঞাপন করিবার ব্যবস্থা হইল। গ্রামের বলরাম মণ্ডলের একটী পুরাতন নাগরদোলা ছিল; তাহার সংস্কার করাইয়া সে ক্ষেত্রনাথ ও মাধবদত্তের অনুমতি-ক্রমে তাহা হাটের পূর্ব্বদিকের কোণে স্থাপিত করিল।

বুধবারে প্রথম হাট বসিবে; সেই বারে নিকটে অন্য কোথাও হাট বসে না। মাধবদত্ত মহাশয় বুধবারে ও রবিবারে বল্লভপুরে হাট বসাইবার সঙ্কল্প করিলেন।

প্রথম হাট বসিতে আর সাতদিনমাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে সতীশচন্দ্রের পত্র পাইয়া ক্ষেত্রনাথ ডেপুটীকমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পুরু-লিয়ায় গমন করিলেন।

মাধবদত্ত মহাশয় ইত্যবসরে হাটের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে একটী উচ্চ মাচা বা টঙ্ বাঁধাইলেন; এবং প্রতি হাট-বারে প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত তাহার উপরে একটী টীকারা বাজাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। টীকারার শব্দ বহুদূর হইতে শ্রুত হয়। টীকারার শব্দ শুনিলেই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসিগণ সেই দিন হাট-বার বলিয়া বুঝিতে পারিবে। [illegible] ব্যবস্থা করিয়া মাধবদত্ত মহাশয় হাটের কথা [illegible]দিকে ঘোষিত করাইলেন।

ক্ষেত্রনাথ পুরুলিয়ায় উপস্থিত হইয়া সতীশকে সঙ্গে লইয়া ডেপুটীকমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করি-লেন। সাহেব ক্ষেত্রনাথকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও বলিলেন যে, তিনি তাঁহাকেই নন্দনপুর মৌজা বন্দো-বস্ত করিয়া দেওয়া স্থির করিয়াছে[illegible] নন্দনপুরের নক্সা ও কাগজপত্র প্রস্তুত হইয়াছে [illegible]ন এখন জেলার বার্ষিক বিবরণী বা রিপোর্ট

রিপোর্ট লেখা শেষ হইল

গিয়া স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়া আসিয়া তাঁহাকে উক্ত মৌজা বন্দোবস্ত করিয়া লইবার জন্য আহ্বান করিবেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কার্পাস কিরূপ হইয়াছে?" ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "কার্পাসের সুঁটি বেশ পুষ্ট হইয়াছে; এখনও সুঁটি ফাটিয়া তুলা বাহির হয় নাই।" তৎপরে, সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, বল্লভপুরের রাস্তার সংস্কার-কার্য্য শেষ হইয়াছে। সাহেব ক্ষেত্রনাথকে হাসিয়া বলিলেন "আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে বল্লভপুর যাইতে বালীনদী নামক যে ছোট নদী পার হইতে হয়, বর্ত্তমান নূতন বৎসরের বজেটে তাহার উপর একটী পাকা সেতু নির্ম্মাণ করিবার জন্য টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই বৎসরের মধ্যেই পুল প্রস্তুত হইবে।" ক্ষেত্রনাথ তাহা শুনিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন এবং তজ্জন্য সাহেবকে প্রচুর ধন্যবাদ দিলেন।

সতীশচন্দ্রের বাসায় গ্রামোফোন্ নামক একটী নূতন বাদ্য-ও-সঙ্গীতযন্ত্র দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ আনন্দিত হইলেন। তিনি সতীশচন্দ্রকে বলিলেন "সতীশ, তোমরা আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য এই যন্ত্রটি আনিয়েছ। তোমার কাছে এটি দুই দশ দিনের জন্য চাওয়া অন্যায় হয়।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "তুমি বল্লভপুরে এটি নিয়ে যেতে চাও নাকি? তা অনায়াসে পার। উত্তরপাড়ায় আর এখানে ঐ যন্ত্রের বাদ্য আর গান শুন্‌তে শুন্‌তে সৌদামিনী বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে। আর এটি বাসায় আছে ব'লে, সন্ধ্যার সময় বন্ধুবান্ধবেরা এসে বাজাতে আরম্ভ করে। তা'তে আমাদের তো বড় বিরক্তি হয়-ই, আর সুরেনেরও পড়াশুনার বড় ব্যাঘাত হয়। তুমি এটা কিছুদিনের জন্য নিয়ে গেলে বাঁচি।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তবে এটি আমি নিয়ে যাব। আমাদের নূতন হাটে লোক আকর্ষণ করবার জন্য এটি একটি চমৎকার উপায় হবে।"

সতীশচন্দ্র বি[illegible] হইয়া বলিলেন "আরে, তুমি মতলব-ছাড়া কি[illegible]র না, দেখ্‌ছি। তুমি খাঁটি বৈশ্য। আমি [illegible]মনে করেছিলাম, বুঝি নরু ও নগিনের মার মুল[illegible] কা[illegible] যখন [illegible]বৈশ্য!"

ক্ষেত্রনাথ তাহার কথা শুনিয়া কেবল হাসিতে লাগিলেন।

বৈকালে ক্ষেত্রনাথ পুরুলিয়ার আড়তে ও বাজারে গিয়া জিনিষপত্রের উপস্থিত বাজার-দর জানিতে লাগিলেন। চালের আড়তে র‍্যালী ব্রাদার্সের একজন এজেন্টকে দেখিয়া তিনি তাহার সহিত আলাপ করিলেন। পুরুলিয়ায় আজ কতিপয় দিবস হইতে চালের আমদানী না থাকায়, তিনি অনর্থক বসিয়া আছেন ও অন্যত্র যাইবার সঙ্কল্প করিতেছেন, ইহা অবগত হইয়া ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে বলিলেন "বল্লভপুরে একটী নূতন হাট বসিতেছে; আপনি সেই হাটে গেলে সহস্র সহস্র মণ চাউল খরিদ করিতে পারিবেন।" চাউল ক্রয় করিতে এজেন্টের ব্যগ্রতা দেখিয়া, ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে বল্লভপুরে যাইবার পথ বলিয়া দিলেন এবং ২রা বৈশাখে যে প্রথম হাট বসিবে, তাহাও তাঁহাকে জানাইলেন।

ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে আসিয়া মাধবদত্তকে সমস্ত কথা বলিলেন এবং ঐ তারিখে আড়তে প্রচুর পরিমাণে চাউল আমদানী করিবার জন্য নিজগ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে লোক পাঠাইলেন। মাধবদত্ত ক্ষেত্রনাথের আনীত সঙ্গীতযন্ত্রটি দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, আপনি যে যন্ত্র এনেছেন, তার জন্যই দেখ্‌তে পাবেন, আপনার হাটে লোক ধর্‌বে না। চমৎকার হয়েছে; আপনি ভারি বুদ্ধির কাজ করেছেন। যেখানে নাগর-দোলা আছে, সেইখানের একটী ঘরে এই যন্ত্র বাজাতে হবে। অমরকে বাজাবার ভার দিবেন। সেই এই কাজের জন্য বেশ উপযুক্ত। ঘরের মধ্যে একেবারে কুড়িজনের অধিক লোক ঢুক্‌তে দেওয়া হবে না। প্রথম দিনে সকলে যন্ত্রটি দেখ্‌তে পাবে না তা নিশ্চয়। যারা দেখ্‌তে পাবে না, তারা এই যন্ত্র দেখ্‌বার জন্য আবার আস্‌বে। হাট বস্‌লে কেবল এক ঘণ্টামাত্র যন্ত্র বাজানো হ'বে; তার পর বন্ধ ক'রে দেওয়া যাবে। নইলে, সকলেই যন্ত্র দেখ্‌বার জন্য ছুটবে। দোকানে বেচাকেনা কম হবে।"

ক্ষেত্রনাথ দত্তমহাশয়ের অভিপ্রায় বুঝিয়া হাসিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শুভ ১লা বৈশাখ তারিখে, নূতন গুদামগৃহে শ্রীশ্রী৺ গন্ধেশ্বরী দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করা হইল। কেবল ঘটস্থাপন করিয়া এবং নূতন তৌল, দাঁড়ি, প'ড়েন, বাট্‌খারা প্রভৃতি ঘটের নিকট সুসজ্জিত করিয়া দেবীর আহ্বান ও পূজা হইল। যথাসময়ে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো হইল। বলাবাহুল্য যে, গুদামঘর ও দোকানঘরগুলি আম্রপল্লবে এবং নানাবিধ পুষ্প-মালায় সুসজ্জিত হইল। হাটের ঘরগুলিকেও তদ্রূপ সুসজ্জিত করা হইল।

২রা বৈশাখ তারিখের প্রত্যূষে হাটের উচ্চ টঙ্ হইতে টীকারা বাদিত হইতে লাগিল। বল্লভপুরের নূতন হাট দেখিবার জন্য গ্রামবাসী ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহের অধিবাসিগণের মনে এক নূতন উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার হইল। বেলা দশটা হইতে হাট বসিবে। আজ পাঠশালার ছুটি হইয়াছে। অমরনাথ গ্রামোফোন্ লইয়া নাগরদোলার নিকটবর্ত্তী একটি গৃহে উপবিষ্ট হইল। যাহাতে বহুলোক একেবারে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য প্রহরীও নিযুক্ত হইল।

রেলওয়ে ষ্টেশনের একজন ময়রা হাটের মধ্যে একটি ঘর ভাড়া লইয়াছিল। সে তাহার মিষ্টান্ন প্রভৃতি লইয়া হাটে উপস্থিত হইল। ক্ষেত্রনাথের পরামর্শক্রমে পরিষ্কৃত পানীয় জলের দ্বারা সে দুইটী জালা বা মট্‌কা পরিপূর্ণ করিল এবং পিত্তলের ঘটী ও গ্লাস্ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিল।

র‍্যালীব্রাদার্সের সেই এজেণ্ট মহাশয় তাঁহার লোক-জন সহ বল্লভপুরে উপনীত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ তাঁহাদের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

উচ্চ টঙ্ বা মঞ্চ হইতে টীকারার শব্দ চতুর্দ্দিক্ প্রতি-ধ্বনিত করিতে লাগিল। নগেন্দ্র, হরিধন, কৃষ্ণধন প্রভৃতি সকলেই শুদ্ধস্নাত হইয়া আপন আপন দোকান খুলিয়া তন্মধ্যে গঙ্গাজল ছিটাইল ও ধূপ জ্বালিয়া দিল। ধূপের মধুর গন্ধে সেই স্থান আমোদিত হইয়া উঠিল।

মহেশ হাল্‌দার আড়তের মধ্যে একটী চৌকী বিছা-ইয়া তাহার উপর বাক্স, কাগজপত্র ও খাতা লইয়া বসিল। ওজনের জন্য কাঁটা টাঙ্গান হইল।

ধীরে ধীরে দুইটি চারিটি করিয়া লোক হাটে উপনীত হইতে লাগিল। তাহারা হাট দেখিয়া বিস্মিত হইল। এমন সুন্দর ও সুব্যবস্থিত আপণ-শ্রেণী তাহারা আর কোনও হাটে দেখে নাই। মনোহারী দোকান, কাপড়ের দোকান, মশলার দোকান ও আড়ত দেখিয়া তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। মনোহারী দোকানের নানাবিধ অপূর্ব্ব সামগ্রী দেখিয়া তাহারা চমৎকৃত হইল। পুরুলিয়ার কোনও দোকানে এত জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

নগেন্দ্র তাহাদিগকে ডাকিয়া জিনিষপত্র দেখাইতে লাগিল এবং তাহাদের প্রশ্নানুসারে তাহাদের মূল্য বলিতে লাগিল। প্রথমে কেহ কিছু ক্রয় করিল না; পরন্তু স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া তাহারা পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করিতে লাগিল। পরে আবার আসিয়া মূল্য কিছু কমিতে পারে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। নগেন্দ্র বলিল "আমাদের একদর; কোনও হাটে বা পুরুলিয়াতে যদি এর চেয়ে কম দর হয়, তোমরা জিনিষ ফিরে দিয়ে মূল্যের পয়সা নিয়ে যেও। আমরা একেবারে কল্‌কাতা থেকে জিনিষ নিয়ে এসেছি, আর সামান্য লাভে তা বিক্রয় কর্‌ব।"

যাহারা পুরুলিয়ায় বা অন্য কোনও হাটে সেই প্রকা-রের দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিল, তাহারা সরলভাবে আসিয়া বলিল যে, নগেন্দ্রনাথ ঠিক্ কথাই বলিয়াছে; পুরু-লিয়াতেও সেই দ্রব্যের বেশী দাম। তখন তাহারা মনোহারী দোকান হইতে দ্রব্য ক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। একজনের দেখাদেখি আর একজন ক্রয় করিল। তাহার দেখাদেখি আর একজন ক্রয় করিল। এইরূপে নগেন্দ্রের দোকানে ক্রয়বিক্রয় আরম্ভ হইল। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার দোকানে ভিড় লাগিয়া গেল।

কাপড়ের দোকানেও ভিড় [illegible]গিল। নানাবিধ সুন্দর বস্ত্র দেখিয়া সকলে বি[illegible]ল। কেহ কেহ কাপড় এবং কেহ কেহ বাসন [illegible]িতে লাগিল। বাসন ও কাপড়ের দোকানের [illegible] আকর্ষণ

করিবার জন্য একটী বালক মধ্যে মধ্যে কাঁসর বা ঝাঁজ বাজাইতে লাগিল। বস্ত্রাদি পুরুলিয়ার দরে, এমন কি, এক আধ আনা সুবিধাজনক দরেও বিক্রীত হইতেছে দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইল।

মশলার দোকানে পাইকার খরিদ্দারগণ আসিয়া মশলার দর প্রভৃতি জানিতে লাগিল। পুরুলিয়ার দরে এখানে মশলা বিক্রীত হইতেছে, ইহা দেখিয়া তাহারাও মশলা ক্রয় করিতে লাগিল। মাধবদত্ত মহাশয়কে সেই দোকানে উপস্থিত দেখিয়া পাইকারেরা তাঁহাকে বলিল যে, হাটে তাঁহারা যদি খুচরা মশলা বিক্রয় না করেন, তাহা হইলে তাহারাই পাইকারী দরে মশলা ক্রয় করিয়া হাটে বসিয়া খুচরা দরে তাহা বিক্রয় করিবে। দত্তমহাশয় বলিলেন "তোমরা যদি হাটে ব'সে খুচরা বিক্রয় কর, তা হ'লে দোকানে খুচরা বিক্রয় হ'বে না।" নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের ছোট ছোট দোকানদারেরা হাটে ও নিজ নিজ গ্রামে মশলা বিক্রয় করিবার জন্য পাইকারী দরে মশলা ক্রয় করিতে লাগিল।

আড়তের পশ্চাদ্ভাগের বিস্তৃত মাঠে গো-গাড়ীতে চাউল আমদানী হইতে লাগিল। বিক্রেতৃগণ চাউলের নমুনা আনিয়া দেখাইতে লাগিল। ক্রেতৃগণ তাহা দেখিয়া দর করিতে লাগিলেন। দর স্থির হইলে এক একটী গাড়ী আড়তের সম্মুখে আনীত হইল এবং চাউলের বস্তাগুলিকে কাঁটায় তুলিয়া ওজন করা হইতে লাগিল। মহেশ হাল্‌দার দরদস্তুর চুকাইয়া দিতে ও ওজন দেখিতে লাগিলেন এবং হারাধন মল্লিক প্রত্যেক ব্যাপারীর নাম এবং চাউলের পরিমাণ, দর ও মূল্য লিখিতে লাগিলেন। আড়তে কলাই, সরিষা প্রভৃতিও আমদানী হইল। তাহাদেরও অনেক ক্রেতা জুটিল।

যে-সকল লোক হাটে কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিল, ক্ষেত্রনাথ ও দত্তমহাশয় তাহাদিগকে যথাস্থানে বসাইতে লাগিলেন। যাহারা পেঁয়াজ, রসুন, ডিঙ্গলা (বিলাতী কুমড়া) [illegible]লাউ, ও তরকারী লইয়া আসিল, তাহাদিগকে [illegible] একটী স্বতন্ত্রস্থানে বসাইলেন। যাহারা মৎস্য [illegible] করিতে আসিল, তাহাদিগকে অন্য [illegible] যথা[illegible]। কেহ মুড়ী, মুড়কী ও তেলেভাজা ফুলারু, ভাপ্‌রা ও গুড়পিঠা বিক্রয় করিতে আসিল। কেহ ছোলাভাজা ও ফুটকলাই, কেহ চিঁড়ে, কেহ টানা লাড়ু ও দেশীয় মিষ্টান্ন, কেহ সরু চাউল, কেহ কলাই, কেহ মুগ, কেহ অড়হর, কেহ রমা বা বরবটী, কেহ গম, কেহ ময়দা, কেহ যবের ছাতু, কেহ বুটের ছাতু, কেহ গুড়, কেহ বিটে বা ঝোলা গুড়, কেহ তৈল, কেহ খইল, কেহ ঘৃত, কেহ দুগ্ধ, কেহ দধি, কেহ ছানা, কেহ চাঁছি বা মোয়া, কেহ মধু, কেহ মোম, কেহ মালা ও ঘুন্‌সী, কেহ কাগজের ঘুড়ি, কেহ সোলার পাখী ও কদম্বফুল, কেহ কাঠের পুতুল, কেহ ছেলেদের জন্য টিম্‌টিমি বাদ্য, কেহ বাঁশের ঝাঁটা, ঝুড়ি, ধুচুনি, চেঙ্গারী, টোকা ও পেথে, কেহ ঢোলকবাদ্য, কেহ মাদোল, কেহ বাঁশী, কেহ রশী, কেহ সিকে, কেহ দড়ী ও দড়া, কেহ বাঁশের ছড়ি ও ছাতা, কেহ জুতা, কেহ কাটারী, কেহ জাঁতী ও ছুরী, কেহ কিরোশিন তৈল, কেহ হরিতকী, কেহ আমলকী, কেহ ধাঁইফুল, কেহ কুঁচিলা, কেহ সতরঞ্চ ও কম্বল, কেহ বিলাতী কাপড়ের গাইট্ ও কাটাপোযাক—এইরূপ নানাবিধ দ্রব্য লইয়া হাটে উপস্থিত হইল। লোকের কলরবে, মাদোলের ও ঢোলকের ধ্বনিতে এবং কাঁসরের শব্দে সেই বৃহৎ মাঠটি শব্দায়মান হইতে লাগিল। হাটে গো, মহিষ, ছাগল, পাঁঠা, ভেড়া, টাট্টুঘোড়া, পাতিহাঁস, রাজহাঁস, বাল-হাঁস, মোরগ, মুরগী হরিণশিশু, ময়ূরশাবক, তিতির, গরুড়পাখী, কপোত, পার্ব্বতীয় পারাবত, হড়িয়াল্ বা হরিৎ-কপোত, টিয়াপাখী, ফুলটুসী, ময়ূর, চন্দনা, দেশী ময়না বা শালিকপাখী, পাহাড়ে ময়না, শ্যামা, দয়েল্, কোকিল, বানরশিশু, গোচর্ম্ম, মহিষচর্ম্ম, ছাগচর্ম্ম, মেষচর্ম্ম, হরিণচর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মহিষশৃঙ্গ, হরিণশৃঙ্গ, হস্তিদন্ত প্রভৃতিও বিক্রয়ের জন্য আসিল। হাটের পূর্ব্বদিকের আপণ-শ্রেণীর পশ্চাদ্বর্ত্তী মাঠে গোমহিষাদি বিক্রয়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল; তাহার একপার্শ্বে পক্ষীবিক্রয়ের স্থান এবং আরও কিয়দ্দূরে শুষ্ক চর্ম্মাদি বিক্রয়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। অপরাহ্ণ সময়ে জনতা ও কলরব এত অধিক হইল যে সকলকেই ভিড় ঠেলিয়া হাটের একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিতে হইল.

এবং কেহ নিকটের লোকেরও কথা শুনিতে পাইল না। কোথাও অশ্বের হ্রেষা, কোথাও গাভীর হাম্বারব, কোথাও পাখীর চীৎকার, কোথাও ছাগ ও মেষের রব, কোথাও বাদ্যধ্বনি, কোথাও হাঁকাহাঁকি, কোথাও ডাকা-ডাকি, কোথাও তকরার, কোথাও হাস্যধ্বনি, কোথাও সঙ্গ হারাইয়া বালক-বালিকাদের ক্রন্দনধ্বনি— এই-সমস্ত বিচিত্রধ্বনির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে হাট হইতে এক মহাশব্দ উত্থিত হইল।

নাগর-দোলায় বালকবালিকারা ও পার্ব্বতীয় যুবক-যুবতীরা চাপিয়া দোল খাইতে লাগিল ও অতিশয় আমোদ অনুভব করিতে লাগিল। নাগর-দোলা এক মুহূর্ত্তের জন্যও অচল থাকিল না। গ্রামোফোনের ঘরের নিকটে ভয়ানক ভিড় হইল। সেখানে জনতা কমাইতে না পারিয়া অমরনাথ যন্ত্রবাদন বন্ধ করিয়া দিল। ময়রার দোকানেও ভিড় কম হইল না। গোপীনাথ দাঁ ও লখাই সর্দ্দার প্রভৃতি বিক্রেয় জিনিষের অবস্থা ও মূল্যানুসারে কাহারও নিকট অর্দ্ধ আনা, কাহারও নিকট এক পয়সা এবং কাহারও নিকট অর্দ্ধ পয়সা পর্য্যন্ত তোলা আদায় করিল। যাহার দ্রব্য সামান্য, তাহার নিকট কিছুই গ্রহণ করা হইল না। সূর্য্যাস্তের সময় হইতে হাট ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল এবং সন্ধ্যা না হইতে হইতে সেই কোলাহলময় প্রকাণ্ড হাটটি প্রায় জনশূন্য হইয়া গেল। সেই বিশাল জনসঙ্ঘ যেন যাদুমন্ত্রবলে কোথায় বিলীন হইয়া গেল! ভবের হাটেও মানুষের লীলাখেলা এইরূপই হইয়া থাকে! এই সংসারে কত সোনার হাট এইরূপ নিত্য বসিতেছে, আবার নিত্য ভাঙ্গিয়া যাইতেছে!

* * *

সন্ধ্যার পর, আড়তের ও প্রত্যেক দোকানের নগদ-বিক্রয়ের হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, আড়তে সেদিন নয়শত মণ চাউল, দুইশত মণ কলাই, পঞ্চাশ মণ সরিষা, যাইট•মণ গম ও ত্রিশ মণ মুগ বিক্রীত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা আড়তের দস্তরী প্রায় ৪০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। হাটের তোলা ৫৵৭ আদায় হইয়াছে। বাসন-কাপড়ের দোকানে ১০৩ টাকা, মশলার দোকানে ৬১ টাকা ও মনোহারী দোকানে ৪৭৷৵০ নগদ বিক্রয় হইয়াছে।

মাধবদত্ত মহাশয় ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, প্রথম দিনের হাট যে এমন জমকালো হবে, তা আমি ভাবি নাই। যা হোক্ আজকের বেচাকেনা দেখে আমার মনে খুব আশা হয়েছে। দেখ্ছেন্ কি? প্রত্যেক মাসেই কল্কাতা থেকে সব রকম জিনিষের নূতন আমদানী কর্তে হবে। লোকের কথা শুন্লেন না? তারা বলে, এমন হাট আর কখনও দেখে নাই, আর পুরুলিয়ার চেয়েও জিনিষ শস্তা। কালক্রমে দোকানের টাট্ আরও বাড়াতে হ'বে। নগদ টাকা ছাড়া ধারে আমরা কারেও একটা পয়সার জিনিষ বেচ্ব না। বরং টাকায় আধ আনা শস্তা দেব তবু ধারে জিনিষ দেওয়া হবে না।"

দত্তমহাশয় ক্ষেত্রনাথের অনুরোধক্রমে তাঁহার বাটীতে জলযোগ করিয়া রাত্রি আটটার সময় গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি আপন আপন দোকান বন্ধ করিল। রাত্রিতে দোকানে পাহারা দিবার বন্দোবস্ত করা হইল। কর্ম্মচারীরা দোকানঘরে ও আড়তে শয়ন করিবে, এবং দুইজন ভৃত্য বাহিরের বারাণ্ডায় থাকিবে। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দোকান বন্ধ করিয়া ও রোকড় মিলাইয়া হরিধন ও কৃষ্ণধন বাটী যাইবে, তাহা স্থির হইল।

পরদিন প্রভাতে আবার সকলে আপন আপন দোকান খুলিল। হাটবার ব্যতীত অন্যদিনেও দোকানে কিছু কিছু ক্রয়বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা ছিল।

ক্ষেত্রনাথ হাটতলায় ঝাঁট দেওয়ার ও জল ছিটাইবার জন্য তিনটি দাসী নিযুক্ত করিলেন। হাটের সমস্ত আবর্জ্জনা রাশীকৃত করিয়া অগ্নিসংযোগে তৎসমুদায় দগ্ধ করা হইল। আবার সেই বৃহৎ মাঠটি পূর্ব্ববৎ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন দেখাইতে লগিল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরি[illegible]।

বুধবারের হাট অপেক্ষা র[illegible] হাটে অধিক সংখ্যক লোক সমবেত হইল [illegible]নো-

হারী দোকানে, মশলার দোকানে ও বাসন-কাপড়ের দোকানে, জিনিষপত্র সুলভ দরে পাওয়া যাইতেছে, এই সংবাদ চারিদিকে বিকীর্ণ হওয়ায়, দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও অনেক লোক হাট দেখিতে আসিতে লাগিল। এই কারণে দোকানে এবং হাটে ক্রয়বিক্রয় সতেজে চলিতে লাগিল। দশ পনর দিনের মধ্যে মনোহারী দোকান প্রভৃতির জন্য জিনিষপত্র কলিকাতা হইতে আবার আমদানী করিতে হইবে, তাহা মাধবদত্ত মহাশয় ও ক্ষেত্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, এবং তজ্জন্য ব্যবস্থা করিলেন।

প্রত্যেক দোকানের নগদ বিক্রয়ের টাকা প্রত্যহ ক্ষেত্রনাথের নিকট জমা রাখা হইত। ক্ষেত্রনাথ প্রত্যেক দোকানের টাকা সেই দোকানের নামে জমা করিতেন। সুতরাং কোন্ দোকানে মোট কত টাকার দ্রব্য বিক্রীত হইল, খতীয়ান্ দেখিলে তাহা সহজেই বুঝা যাইত। খাতা ও খতীয়ানের সঙ্গে তাঁহার তহবীলের মিল থাকিল।

হরিধন, কৃষ্ণধন, নগেন্দ্র বা কোনও কর্ম্মচারীর উপর কোনও বাবতে কিছু খরচ করিবার ভার অর্পিত হইল না। তাহারা দোকানে কেবল জিনিষপত্র বিক্রয় করিত। সকলপ্রকার খরচপত্রের ভার ক্ষেত্রনাথ নিজ হস্তে রাখিলেন। প্রত্যহ প্রত্যেক দোকানের নগদ বিক্রয়ের টাকা বুঝিয়া লইবার সময় তিনি সেই দোকানের খাতায় নিজ নাম স্বাক্ষরিত করিয়া কর্ম্মচারীকে তাহা ফেরৎ দিতেন। এইরূপ সুব্যবস্থায় কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে লাগিল, এবং হিসাবেরও কোনও গোলযোগের সম্ভাবনা রহিল না।

বল্লভপুরে একটী পোষ্টঅফিস্ খোলা যাইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য একদিন পোষ্টঅফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ সাহেব সেখানে আগমন করিলেন। তিনি পুরুলিয়ায় প্রত্যাগত হইয়া বল্লভপুরে একটি ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস্ খুলিবার আদেশ প্রদান করিলেন [illegible]ং অমরনাথকে মাসিক ১০৲ দশ টাকা বেতনে ডাক্-[illegible]যুক্ত করিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ তাহাকে [illegible] মাসে শিক্ষানবিশী করিবার আদেশ [illegible] যখন [illegible] হইতে একটী অভিজ্ঞ ব্যক্তি এক মাসের জন্য ডাক্‌মুন্‌সী নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। অমরনাথ তাঁহার নিকট কার্য্যশিক্ষা করিতে লাগিল। গ্রামের একটী বিশ্বাসী লোক পিয়ন নিযুক্ত হইল।

স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্স্‌পেক্টারবাবু আসিয়া একদিন বল্লভপুরের পাঠশালা দেখিয়া গেলেন। তিনি পাঠশালা-গৃহ, ছাত্রসংখ্যা, অমরনাথের ন্যায় প্রধান শিক্ষক এবং আর একটি মধ্য-বাঙ্গলা-পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষক দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি পাঠশালার জন্য মাসিক সাত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিলেন। বুধবারে যে দিন হাট হইত, সেদিন কেবল প্রাতঃকালে পাঠশালা বসিত। রবিবারে পাঠশালা বন্ধ থাকিত।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়ে ডেপুটী কমিশনার সাহেব খাশ-মহাল নন্দনপুরে আসিয়া তাঁহার তাঁবু খাটাইলেন। তাঁহার সঙ্গে খাশ-মহালের ডেপুটী-কলেক্টার ও তহশীলদার এবং সতীশচন্দ্রও আসিলেন। দুই তিন দিন তাঁহারা নন্দনপুরের অবস্থা উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একদিন প্রাতঃকালে ক্ষেত্রনাথকে ক্যাম্পে আহ্বান করিলেন। ক্ষেত্রনাথ তাঁহাদের সঙ্গে নন্দনপুর মৌজার অনেক স্থান পরিদর্শন করিলেন। সার্ভে নক্সা ও চিঠায় দেখা গেল যে, নন্দনপুর মৌজার মোট রকবা (area) ৮৭৫৩ বিঘা; তন্মধ্যে প্রায় নয় শত বিঘার উপর ছোট শালবৃক্ষের বন একশত বিঘার উপর তিন সহস্র সুরক্ষিত বড় শালবৃক্ষ, একহাজার পাঁচশত বিঘার উপর কতিপয় বনাচ্ছন্ন শৈল, পাঁচশত বিঘার উপর কতিপয় পার্ব্বতীয় নদী বা জোড় ও তিনশত বিঘার উপর একটী স্বভাব-খাত হ্রদ আছে; অবশিষ্ট ভূমি অকৃষ্ট অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। সুতরাং বন, জঙ্গল, পাহাড়, নদী ও হ্রদ যে ভূমি অধিকার করিয়া আছে, তাহা বাদ দিলে, প্রায় ৫৪৫৩ বিঘা কৃষিযোগ্য ভূমি হইতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যেও কঙ্করময় ও প্রস্তরাকীর্ণ উচ্চনীচ ভূমির পরিমাণ প্রায় দেড় হাজার বিঘা হইবে। তাহা হইলে প্রকৃত কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ প্রায় চারি সহস্র বিঘা হইবে। ডেপুটী কমিশনার সাহেব তহশীলদারের কাগজ-

পত্র দেখিয়া অবগত হইলেন যে, এই মৌজার জঙ্গল ও কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া গড়ে বাৎসরিক ৬০৲ টাকার অধিক আদায় হয় না ; অথচ তহশীলদারকে মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে বাৎসরিক ১২০৲ টাকা বেতন দিতে হয়। অর্থাৎ, এই মৌজাটি গভর্ণমেণ্ট খাসে রাখিয়া প্রতিবৎসর ৬০৲ টাকা করিয়া ক্ষতি সহ্য করেন। এই মৌজার মধ্যে বহু মধুক বৃক্ষ (মহুয়া বা মোল গাছ) দেখিয়া ডেপুটী কমিশনার তহশীলদারকে বলিলেন "এই সমস্ত মহুয়া বৃক্ষের ফুল ও ফল কি হয়? তাহা বিক্রয় করিলে তো আরও অনেক টাকা আদায় হইতে পারিত? তুমি তৎসমুদায় বিক্রয় করিয়া সরকারী টাকা নিশ্চয়ই আত্মসাৎ কর।"

সরকারী টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগ শুনিয়া তহশীলদার ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, এবং তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। সে কৈফিয়ৎস্বরূপ বলিল "ধর্ম্মাবতার, মহুয়াফুল বা কঁচড়া ফল একটীও আদায় করিতে পারা যায় না।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

তহশীলদার বলিল "হুজুর, নন্দনপুরে ভালুকের ভয়ানক উপদ্রব। ফুল পড়িবামাত্র ভালুকে তাহা খাইয়া ফেলে।"

সাহেব বলিলেন "আর কঁচড়া ফল?"

তহশীলদার বলিল "হুজুর, এই নন্দনপুরে বাঘ ও ভালুকের সংখ্যা অনেক ; সেই কারণে, কেহ ফল ভাঙ্গিতে আসিতে সাহস করে না।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন "আর সেই কারণেই বুঝি নন্দনপুরের পলাশবনে ও কুসুমগাছে কেহ লাহা লাগাইতে আসে না? আমি তো অনেক গাছে লাহা দেখিলাম?"

তহশীলদার বলিল "হুজুর, কেহ লাহা ভাঙ্গিতে আসিতে চায় না বলিয়া তাহা ফুঁকিয়া যায়।" (অর্থাৎ লাহার কীটগুলি লাহা কাটিয়া বাহির হইয়া যায়)

সাহেব আবার বলিলেন "আচ্ছা, আমি তো আজ তিন দিন এখানে আছি ; কই, একটীও তো বাঘ বা ভালুক দেখিলাম না?"

তহশীলদার বলিল "হুজুর, গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের সময় তাহারা বাহির হয় না ; সন্ধ্যার পর বাহির হয়। কিন্তু হুজুরের তাঁবুর চারিদিকে রাত্রিতে আগুন জ্বলে। আগুন দেখিয়া কোনও জানোয়ার এদিকে আসে না।"

সাহেব তহশীলদারের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। "তুমি পাকা তহশীলদার! তুমি যে-সমস্ত কথা বলিলে, তাহা সত্য হইতে পারে ; কিন্তু আমি তাহা বিশ্বাস করি না। আচ্ছা, তুমি এখন যাইতে পার।"

তহশীলদার যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া সাহেব বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, আমি আপনার কৃষিকার্য্যে উৎসাহ দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি ; আপনার ব্যবস্থাশক্তিও যথেষ্ট আছে। এই কারণে, এই মৌজা আপনাকে বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য আমি গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছি। আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, এই মৌজাতে প্রজা স্থাপন করিতে আপনাকে কিছু কষ্ট পাইতে হইবে। এই কারণে, আমরা স্থির করিয়াছি যে, প্রথম পাঁচ বৎসর এই মৌজার জন্য আপনার নিকট কোনও রাজস্ব গ্রহণ করা হইবে না। এই পাঁচ বৎসরের পরে, আপনাকে বিঘা প্রতি অর্দ্ধ আনা হিসাবে রাজস্ব দিতে হইবে। এই রাজস্ব আপনি পাঁচ বৎসর কাল দিবেন। তাহার পর আপনাকে বিঘা প্রতি এক আনা হিসাবে রাজস্ব দিতে হইবে। তাহা হইলে মোট মৌজার রাজস্ব ৫৪৭/০ হইবে। এই রাজস্বই চিরস্থায়ী রাজস্ব হইবে। এই মৌজার মধ্যে যে-সকল বড় বড় শালবৃক্ষ সুরক্ষিত করা গিয়াছে, তাহার আনুমানিক মূল্য ৯০০৲ টাকা হয়। গভর্ণমেণ্ট এই গাছগুলিও আপনাকে বিনামূল্যে দিবেন, কিন্তু প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে আপনি একটীও গাছ কাটিতে বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। আপনি এই সময়ের মধ্যে এই মৌজায় প্রজা বসাইতে পারেন কি না, তাহা দেখিয়া তবে আপনাকে গাছের উপর অধিকার দেওয়া হইবে। আপনি সকল কথা ভাল করিয়া বুঝুন। যদি নন্দনপুর মৌজা পূর্ব্বোক্ত [illegible] বন্দোবস্ত করিয়া লইতে সম্মত হন, তাহা হই[illegible]কে জানাইবেন। আপনার পত্র পাইলে, [illegible] কবুলতীর মুসাবিদার জন্য কহিব"

ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "মৌজা বন্দোবস্ত করিয়া লইলে, মৌজার তলসত্বও তো আমার হইবে ?"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন "নিশ্চয়ই হইবে। আপনার দলীলে তাহাও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া যাইবে।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আপনার কথিত সর্ত্তে মৌজা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে আমার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু এই মৌজায় যে-সকল প্রজা বসাইব, তাহাদিগকে এক একটী বন্দুকের পাশ্ দিতে হইবে। নতুবা, এখানে বাঘ-ভালুকের যেরূপ উপদ্রবের কথা শুনিতেছি, তাহাতে কেহ সহজে সাহস করিবে না।"

সাহেব বলিলেন "যোগ্য ব্যক্তিকে বন্দুকের পাশ দিতে আমি আপত্তি করিব না। আর আপনি বাঘ-ভালুকের জন্য ভয় বা চিন্তা করিবেন না। আগামী শীতকালে শিকারের ব্যবস্থা করিয়া আমরা এই স্থানের বাঘ-ভালুক নির্ম্মূল করিব। যদি প্রথম বারে নির্ম্মূল না হয়, তাহা হইলে দুই তিন বার উপর্য্যুপরি শিকারের ব্যবস্থা করিলে তাহারা যে নির্ম্মূল হইবে, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"

তাঁবুর সম্মুখভাগে কিয়দ্দূরে একটী পার্ব্বত্য পথ দিয়া কতকগুলি নরনারী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল ; এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাদোল বাজাইতেছিল। তাহা দেখিয়া সাহেব ক্ষেত্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই-সকল লোক কোথায় যাইতেছে ?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন "আমি বল্লভপুরে একটী হাট স্থাপন করিয়াছি। আজ বুধবারের হাট। ইহারা হাটে যাইতেছে।"

সাহেব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কতদিন হইল হাট স্থাপন করিয়াছেন ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "এই বৈশাখ মাসের প্রথম হইতে।"

সাহেব বলিলেন "চমৎকার তো! চলুন, আপনার সঙ্গে আমরা আপ[illegible] হাট দেখিয়া আসি। এখন বৈকাল হইয়াছে [illegible]দ্রের তেজও আর বেশী নাই।" এই বলিয়া [illegible] কেলেক্টার ও সতীশচন্দ্রকে হাট দেখি[illegible] যখন [illegible]লেন।

তিন হাকিমে সাইকেলে যাওয়া অভিপ্রায় করিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "এই পাহাড়ের উপর দিয়া একটী সোজা পথ আছে, আমি সেই পথে যাইতেছি।"

(ক্রমশ)।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

রাম-কবচ

(গল্প)

রায়পুরের গৃহিণীর একমাত্র বংশধর সুরেন্দ্রনাথের অনেক বয়স পর্য্যন্ত সন্তান না হওয়ায় দিনকত তাঁহার চক্ষে নিদ্রাভাব হইয়াছিল। বধূর বয়স পঁচিশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; এবং মাতার অনেক চোখের জল ও সাধ্য সাধনাতেও কলিকালের ছেলে দুইটা বিবাহ করিতে চায় না, সুতরাং শ্বশুরের পিণ্ডলোপের ভয়ে গৃহিণী ব্যাকুল ও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মানুষ যখন নিজের শক্তি বা অন্য মানুষের সহায়তা সম্বন্ধে হতাশ হয়, অগত্যাই তখন দেবতার আশ্রয়ে আসিয়া দাঁড়ায়। তারকনাথ, বৈদ্যনাথ, পঞ্চাননতলা—ঘুরিয়া ঘুরিয়া গৃহিণী শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। শেষে একজন সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন, তিনি যদি অযোধ্যায় গিয়া সরযূতীরে রাম-মন্ত্রে স্বস্ত্যয়ন করাইতে পারেন তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহার বধূর সন্তান হয়—বংশ থাকে।

এ কথা তো কঠিন নয়! অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বধূ ও সন্ন্যাসীকে লইয়া অযোধ্যায় গিয়া কথিত-মত স্বস্ত্যয়ন করাইলেন। অনেক ঘটা করিয়া পূজা হইল, অনেক ঘি পুড়িল,—তাহার পর সন্ন্যাসী সেই পূজার ফুল ও ভূর্জ্জপত্রে রাম-কবচ লিখিয়া বধূর বামবাহু বা কণ্ঠে ধারণের জন্য দিলেন। কথা থাকিল সন্তান হইলে কবচ তাহারই গলায় রাখিতে হইবে, আজীবন সে তাহা খুলিতে পাইবে না।

যাহাই হউক, গৃহিণীর অর্থব্যয় ও সন্ন্যাসীর হোম বিফল হয় নাই, সেই বৎসরের মধ্যেই বধূ অন্তঃসত্ত্বা হইয়া সুরেন্দ্রনাথকে পর্য্যন্ত বিস্মিত করিয়া দিলেন। তিনি

আপনার নব্যভাবগ্রস্ত বন্ধুদিগের নিকট সন্ন্যাসীর গল্প করিয়া বলিলেন, "আমরা মানিনে বটে, কিন্তু এ ব্যাপারটায় যে কোন আশ্চর্য্য কাণ্ড বা বাহাদুরী নাই তা তো বল্‌তে পারিনে আর!—ডাক্তার দাস পর্য্যন্ত বলেছিলেন যে—ওর গর্ভ হবার কোন সম্ভাবনা নাই,—তারপর দ্যাখ দেখি—"

উত্তরে অনেকেই নীরব ছিলেন—শুধু চরণ মাষ্টার বলিল,—"আরে সে তো দু'বৎসর পূর্ব্বের কথা, তারপর এই যে একবৎসর ধরে মিস্ এলেনের চিকিৎসা করাচ্ছিলে তার ফল কি হতে পারে তা ভাব্‌ছ না?—একা সন্ন্যাসীর কাছেই কৃতজ্ঞ হয়ো না, সব দিকেই চেয়ো।

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"না না তা তো বলছিনে—, মোটের উপর কথা এই যে সন্ন্যাসীর উপরও আমার ভক্তি হচ্চে ভাই—সত্যি।—"

ইহার পর তাঁহার খোকা রামপ্রসাদ এখন ছয় বৎসরে পড়িয়াছে। তাহার গলায় সোনার হারে গাঁথা সেই রামকবচখানি। প্রত্যহ সকালে উঠিয়া গৃহিণী সেই কবচ-ধোয়া গঙ্গাজল শিশুকেও খাওয়ান ও নিজেও খান। কত সাধের রাম, গৃহিণীর দ্বিতীয় প্রাণ—নয়নের মণি; যত দিন পারিয়াছিলেন শিশুকে তিনি কোল-ছাড়া করেন নাই, বৌ বা খোকার ঝি বুড়ী ভুবনকে দিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইত না। ছেলের জন্য তাহাদের প্রয়োজন, অথচ খোকাকে ছাড়িয়া তিনি একদণ্ডও থাকিতে পারেন না, তাই জোড়া-উপগ্রহওয়ালা গ্রহের মত তিনি দিন-রাত বধূ ও ভুবন—এই দুইজনকে সঙ্গে লইয়া ছেলেকে মানুষ করিতেছিলেন। ঠাকুমা, বৌমা ও ভুবো মা, এই তিনটি ব্যতীত রামেরও চলে না।

শিশুকালটি বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল, কিন্তু এখন একটু মুস্কিল বাধিয়াছে? খোকা আর এখন শুধু ঠাকুরমার কোলে বা চোখের সাম্‌নে বাঁধা থাকিয়া সুখী হয় না। ছুটিয়া পথে বাহির হয়, বাগানে নামিতে পাইলে উঠিতে চায় না; বাবার সহিত গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য কাঁদিয়া অনর্থ করে! প্রথমে বাধা দিয়া গৃহিণী তাহার এসব 'বেয়াড়া বায়নার' প্রশ্রয় দিতে চান নাই—কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ তাহা হাসিয়া উড়াইলেন। "ছেলে কি শুধু কোলে কোলে মানুষ হয় মা? দৌড়াদৌড়ি খেলাধুলা না হলে ছেলে সবল হবে কেন?" বলিয়া ট্রাইসাইকেল, ফুটবল প্রভৃতি খেলার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া পুত্রকে তিনি বাহিরের জীব করিয়া তুলিতেছিলেন। গৃহিণী তাহাতে বিরক্ত।

এমনি সময় হঠাৎ একদিন খোকার গলার কবচ হারাইয়া গেল। সন্ধ্যা বেলায় জামা কাপড়ের ভিতর গৃহিণী অত খুঁজিয়া দেখেন নাই, সকালেও ভুবন কখন তাহাকে তাড়াতাড়ি পোষাক পরাইয়া বাহিরে লইয়া গিয়াছিল তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই,—হঠাৎ পূজার সময় ছেলের কবচের খোঁজ হওয়ায় দেখা গেল—তাহা গলায় নাই। কখন হারাইয়াছে কি বৃত্তান্ত কিছুই বোঝা যায় না।

গৃহিণী যেন পাগলের মত হইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী নাকি বলিয়াছিলেন যে, কবচ হারাইলে শিশুর ঘোর বিপদ ঘটিবে। কোথায় হারাইল? কে লইল?—ছেলে যখন বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই তখন বাড়ীর চাকর দাসী ব্যতীত আর কে লইবে? খোকার মা দাসীদের সঙ্গে লইয়া বাড়ী ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, বাগানের ঘাসগুলা পর্য্যন্ত ঝাঁটার দৌরাত্ম্যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল—কিন্তু কোথাও কবচ পাওয়া গেল না। গৃহিণীর মুখে কিন্তু এক কথা—"দাসী চাকর ছাড়া আর কেউ নিতে আসেনি,—বাছা বৌমা, আগে সেদিকে নজর দাও।"

পুত্রের অমঙ্গলের আশঙ্কায় বধূর মুখ শুখাইয়া চোখ ছল্‌ছল্ করিতেছিল—তিনি বলিলেন, "যা ভাল হয় তাই করুন না মা!"

গৃহিণীও কিংকর্ত্তব্য খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। কখনো ভাবিতেছিলেন, পুলিশ ডাকিয়া দলসুদ্ধ থানায় পুরি; কখনো মনে হইতেছিল, পুলিশে মাল আদায় করিতে পারিবে না, দরোয়ান ডাকিয়া সবাইকে ধরিয়া একচোট জুতার মাহাত্ম্য প[illegible]রি।—কখনো বা বক্‌শিষের প্রলোভন দেখাইবেন [illegible]রিতেছিলেন। এমনি কত উপায়ই [illegible]ছিল।

কিন্তু সুরেন বাবু এ-সকলের মধ্যে দরোয়ানের মারটি বাদ দিতে বলিলেন।—"এখন আর সেকাল নেই মা, আর এ কল্‌কাতা সহর—তোমাদের রাইপুর হলেও বা যা খুসি তাই হত,—ও মার টার এখানে হবে না মা; তা ছাড়া তোমার যা খুসি তাই কর।"

কিন্তু মারের ব্যাপারটাই গৃহিণীর সর্ব্বাপেক্ষা মনঃপূত ছিল। পুলিশের হাঙ্গামায় গৃহস্থের অনেক নাকাল্ হয়,—বিশেষ বৌ ঝি লইয়া কথা—সে তো হইতেই পারে না। তবে আর কি করিবেন?—কাঁদিয়া কাটিয়া সেদিন অমনি গেল। সুরেনবাবু বলিতেছিলেন, মা অত ব্যস্ত হচ্চ কেন? সে সন্ন্যাসীর ত ঠিকানা জানি, তাঁকে না হয় আনিয়ে আর একটা কবচ নেওয়া যাক্!—"

পুত্রের হাসি দেখিয়া মাতার আরও হাড় জ্বলিয়া উঠিল। "তুই যা তো সুরেন, তোকে তো আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাইনি—খামোখা বিরক্ত করিস্ কেন?" বলিয়া তিনি সেখান হইতে উঠিয়া উপরের তুলসীতলায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বধূ থাকিয়া থাকিয়া শুধু বলিতেছিলেন,—"কি হবে গা?"---

উত্তরে সুরেন্দ্র বলিলেন, "ভগবান যা করবেন তাই হবে। তার জন্য তোমরা এত ভাব্‌ছ কেন বল দেখি? স্থির হও—যাও, মাকে উঠিয়ে খাবার জোগাড় কর, উপোস দিলে কি আর কবচ পাওয়া যাবে?"

(২)

কোন উপায় হইল না। সন্ধ্যার পর গৃহিণী উঠিলেন কিন্তু আহারের নামও উঠিল না। বধূ একবার ম্লানমুখে কি বলিতে গিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে ঠাকুরাণী আরও জ্বলিয়া উঠিলেন!—"বৌ মা, তোমার রকম সকম আমার কেমন কেমন লাগছে বাছা,—তোমার না বত্রিশ-নাড়ী-ছেঁড়া ছেলে! পেটের বাছার প্রাণের উপর টান্ পড়েছে, সে দিকে কোন ভাবনা নেই—আর কে কোথায় [illegible] না-খেলে এসব ভাবনা ভাব্‌ছ কি করে বল্ল [illegible] তোমাদের ক্ষিদে পেয়ে থাকে খাও [illegible] যখন [illegible] অত আগুন জ্বলেনি! কর্ত্তাদের বংশ!"—বলিতে বলিতে আবার তাঁহার চক্ষে জল দেখা দিল। দেখিয়া বধূ সরিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ উপরে থাকিয়া গৃহিণী কি ভাবিলেন। তাহার পর নীচে আসিয়া গৃহদেবতা শালগ্রামের ঘরে গিয়া পুরোহিত ঠাকুরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামপ্রসাদ বাড়ী আসিয়া ঠাকুরমার জন্য কাঁদিয়া অনর্থ করিতেছে,—কিন্তু সেদিকে তাঁহার মন ছিল না, আজ যেন তাঁহার শিশুর প্রতি চাহিতেও ভয় হয়। আয়ুহীন বালক, উহার জীবনের যে আর কোন আশাই নাই, তবে আর কেন মায়া?

শাশুড়ীর কথা শুনিয়া বধূ চমকিতেছিলেন। সুরেন্দ্র বলিতেছিলেন, "মার কথা শুনে হাসি পায়, সামান্য কথাটাকে কত বড় করে নিয়েছেন দ্যাখ ত?—যদি সত্যি ওর আয়ু না থাকে তবে—"

স্বামীর কথায় বধূ আরও চম্‌কাইয়া বলিলেন, "চুপ্ কর ওগো—ওকথা মুখে এনো না।"

মাতার ভীতি, বধূর কাতরতা ও দাসদাসীগণের আশঙ্কায় বাড়ী যেন আঁধার হইয়া গিয়াছিল; শুধু মাঝে মাঝে উপর হইতে শিশু পুত্র ও পিতা—হাসি খেলার মিষ্টধ্বনি তুলিয়া বাড়ীর সে বিকল নিস্তব্ধ ভাব ভাঙ্গিয়া দিতেছিলেন।—

পুরোহিত আসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন,—"আমায় ডাকিয়েছ কেন মা!"

গৃহিণীর ভ্রু কুঞ্চিত হইল, অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন,—"বস, বল্‌ছি।"

পুরোহিত মনে মনে প্রমাদ অনুভব করিলেন। দেখিলেন দেবারতির সন্ধ্যারতির সমস্ত প্রস্তুত করিয়া পূজারী ব্রাহ্মণ নীরবে দূরে বসিয়া আছে, কর্ত্রীর ভাব দেখিয়া শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইতে সাহস করে নাই, গৃহিণীরও তাহাতে লক্ষ্য নাই! কবচ হারাইবার কথা পুরোহিত জানিতেন কিন্তু সেই ঘটনাই যে গৃহিণীকে এমন কাতর করিয়াছে তাহা তিনি বুঝিলেন না, সভয় বিস্ময়ে দূরে গিয়া বসিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ; সময় দেখিয়া পূজারী মৃদুভাবে উঠিয়া গিয়া শঙ্খে ফুঁ দিল। সেই শব্দে গৃহিণী প্রথমে চমকিয়া

মুখ তুলিলেন, পরে ডাকিয়া বলিলেন,—"কৈ? ভট্‌চায্যি-ঠাকুর এলেন?"

"এই যে মা, আমি অনেকক্ষণ এসে বসে আছি!"—

"ওঃ! হাঁ শোন এদিকে।" পুরোহিত আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন;—গৃহিণী বলিলেন, "বস বাবা, বস, ভাল করে শোন।"—ভট্টাচার্য্যের বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল, তিনি আসন টানিয়া কর্ত্রীর নিকট আসিয়া বসিলেন। ঠাকুরাণীর এতক্ষণে আরতি ও ঠাকুরের প্রতি লক্ষ্য হইয়াছিল, এইবার তিনি দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতেছিলেন।

খানিকক্ষণ আবার চুপ্‌;—পুরোহিত চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে গৃহিণী মুখ তুলিলেন; তাঁহার মুখ অশ্রুপ্লাবিত;—দেবতার উদ্দেশে করযোড়ে কি জানাইয়া ডাকিলেন, "শোন ভটচায!"

ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত মনোযোগের ভঙ্গীতে তাঁহার কাছে গিয়া বসিলেন। কাঁসর বাজাইতে বাজাইতে চাকরটা ভাবিতেছিল,—"কবচ-চোরের কোন কথা বোধ হয় ঠাকুরমশায়ের জানা আছে,—তাই চুপি চুপি এত কথা হচ্ছে!"—

সত্যই, অতি মৃদুকণ্ঠে গৃহিণী বলিতেছিলেন, "দেবতার উপর ভার না দিলে আর সে কবচ পাবার কোনও উপায় নাই বাবা, এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমায়—তুমি চার-ইয়ারীর 'চালপড়া' করে দিতে পার?—"

"চার-ইয়ারীর চালপড়া?"—মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণের মুখের সভয়ভাব দূর হইয়া গেল,—কাণ্ডটা তবে গুরুতর নয়! প্রসন্নভাবে উত্তর করিলেন "চার-ইয়ারীর চালপড়া!—এ আর কঠিন কি মা? একটা চার-ইয়ারী মোহর পেলেই হয়ে যাবে।"

"মোহর আমি দিচ্চি। তুমি এক্ষুণি নেয়ে এস গিয়ে।" বলিয়া গৃহিণী একটা সোনার মোহর বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে দিলেন। পুরোহিত ব্যগ্রহস্তে তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া—ভাল করিয়া দেখিয়া আবার গৃহিণীকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "স্নান? আচ্ছা—আমি যাচ্ছি মা, স্নানই করব এখন।—কিন্তু নূতন সরা, আতপ চাল এ সব কি সন্ধ্যার মধ্যে জোগাড় হয়ে উঠবে?"

"চাট্টি আলোচাল আর একখানা সরা? তুমি বল কি পুরুৎ ঠাকুর?—দুটি চাল আর সরার জন্যে আমার কোথাও খুঁজতে বেরুতে হবে নাকি?—তুমি শীতের ভয় কোরো না, নেয়ে এসগে। যদি আমার কবচ পাওয়া যায়—তোমায় আমি শাল কিনে দেব এখন।"

"আপনার দয়াতেই তো আমরা বেঁচে আছি, আপনি না দিলে কে দিবে? কিন্তু সে কথা নয়,—স্নান আমি এখনি করছি গে—ততক্ষণ আপনি খানিকটা গোবর গঙ্গাজল আর একটা মাটীর নূতন প্রদীপ আনিয়ে রাখুন!"—

"আমি সব জানি তুমি যাও। বেশ শুদ্ধ হয়ে পথ চলিও—আর একখানা রেশমী কাপড় পরে এস—জান তো আচার নিয়মই এসবের প্রাণ।"

পুরোহিত চলিয়া গেলে গৃহিণীও কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল লইয়া ঠাকুরঘরে গিয়া বসিলেন। একখানি বড় সরায় আতপ চাউল, গোময়ের উপর নূতন প্রদীপ, গঙ্গাজল তুলসী প্রভৃতি চালপড়ার সব উদ্যোগ ঠিক করিয়া তিনি দিনান্তের পর এতক্ষণে আহ্নিকে বসিলেন।

পুরোহিত মুখে যতটা বলিয়াছিলেন চালপড়া ব্যাপারটায় তাঁহার ততদূর অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর এদানি কাহারও বাড়ীতে চালপড়া তিনি দেখেন নাই। চার-ইয়ারী মোহর,—নূতন সরায় চাল—এসব গল্পই শোনা আছে—তাহার মধ্যে কোন মন্ত্র আছে কি অন্য বিধান আছে তাহা তিনি জানিতেন না। ছুটি পাইয়া তিনি স্নান করিতে গেলেন না, ঘরে গিয়া পিতার পুঁথি লইয়া পড়িলেন। কৈ? সব পূজা পাঠেরই তো বিধান লেখা আছে কিন্তু চালপড়ার কথা তো নাই? নাম পর্য্যন্ত নাই। পুরোহিত লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া তাঁহার পণ্ডিত স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের বাড়ী ছুটিলেন।

কথা শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় [illegible] অস্থির! "এখনকার লোকেরাও কি এসব [illegible]। যাক্‌, ও সব কোন শাস্ত্রীয় [illegible]

ক্রমশ

দেখাইয়া কতকটা ভেল্কীর ভাবে ভুজাং দিয়া চোর ইত্যাদি ধরিবার উপায় মাত্র। দাসী চাকর শ্রেণীর লোক চোর হইলে ভয়ে কাঠ হইয়া ভাল করিয়া চাল চিবাইতে পারে না, তাহাতেই মুখে রস থাকে না, চাল গুঁড়া হয় না গোটা থাকে কিম্বা জোরে দাঁত চাপিতে গিয়া রক্ত পড়ে। এই সকলে উহাকে চোর বলিয়া ধরে। মন্ত্র তন্ত্র কিছুই না, লোক দেখানে ভড়ং যত বেশি পার করিয়ো, বাস। আর গৃহিণীর মনস্তুষ্টির জন্য কতকগুলি সংস্কৃতমন্ত্র উচ্চারণ করিলেই হইবে।"

শুনিয়া পুরোহিতও হাসিলেন, কিন্তু কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে ভড়ং নামক ঝুঁটা সামগ্রী চালানো যে কতটা কঠিন তাহাও তাঁহার স্মরণে আসিয়া সে হাসিটাকে অনেকখানি ম্লান করিয়া দিল। কলের জল বন্ধ—চৌবাচ্চার তোলা জল ঘটী দুই মাথায় ঢালিয়া একখানি মটকা পরিয়া আবার তিনি সুরেন বাবুর বাড়ী চলিলেন। তখন চালপড়া শব্দটা মুখে মুখে বাড়ীর সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে!

পথেই বাড়ীর বামুনঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ—উগ্রমূর্ত্তি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিলেন, "এই যে ভটচায মশায়? চাল-পড়তে যাচ্ছেন বুঝি? আমাকেও খাওয়ানো হবে শুনছি। ভদ্রলোকের ছেলে—পেটের দায়ে ভদ্রলোকের বাড়ী না হয় ভাত রাঁধতেই এসেছি—কিন্তু তা বলে আমাদের সাত পুরুষে চুরি চামারীর নাম জানে না। কাল তো যাব না, কিন্তু এই চালপড়ার হাঙ্গাম মিটলে আর এ বাড়ীতে চাকরী করা হবে না। চোর?—মশায় আমি বুঝি চুরি করতে গেছি! তাই ছোটলোক চাকরবাকর-দের সঙ্গে চালপড়া খাব? এই কালকার দিনটা চোখ কান বুজে আছি মাত্তর—এখন গেলে বুড়ী জলজ্যান্ত চোরই বলবে!"—

তাহার কথা শুনিয়া ওদিক হইতে দরোয়ান্ মিঠ্ঠু সিংহ বলিল,—"তুমহারে বাংলা মুলুক কা ইয়ে কুল আজুবা তামাশা [illegible] বজি!—থোড়া চাউড় খিলানে সে কোই চোর নিক[illegible]"

ভট্টাচা[illegible] মনে মনে [illegible] হাসিতেছিলেন। চক্রবর্ত্তীর উদ্দেশে [illegible] কি[illegible] যখন [illegible] লিলেন, "তার জন্য দুঃখ কি ঠাকুর? এ তো থানাও নয় পুলিশও নয় যে অপমান হবে? ঠাকুরের নামে এ একটা সত্য মিথ্যার পরীক্ষা, তাতে তোমার ক্ষতি কি?"

উত্তরে চক্রবর্ত্তী গজগজ করিয়া কি বলিলেন। তাহা না শুনিয়াই ভট্টাচার্য্য দ্রুতপদক্ষেপে চলিয়া গেলেন। বাড়ীর পুরানো চাকর নলতে বলিতেছিল,—'চালপড়াই হোক আর যাতেই হোক্ ছেলের কবচটি পাওয়া গেলে বাঁচি! বউমার কান্না দেখে কারো মুখে অন্ন রুচছে না। বুড়ী তো মারা যেতে বসেছেন।"

(৩)

পরদিন প্রভাতে বাড়ীর সব দাসী চাকর স্নান করিয়া ঠাকুরঘরের দালানে একত্র হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী ঘরের মেঝেয় গিয়া বসিয়াছেন—কিছুতেই তিনি ছোটলোক-দের সঙ্গে এক পংক্তিতে খাইতে বসিবেন না, ইহাতে তাঁহাকে পুলিশে যাইতে হয় তাও স্বীকার! ঠাকুরাণী পূর্ব্ব হইতেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন—পুরোহিত আসিতেই বলিলেন—"যাও বাবা শীগগীর শীগগীর চাল উঠিয়ে আন, শুনেছি যত ভোরে হয় ততই সুবিধে।"

"নিশ্চয়! এ যে ভোরেরই কাজ।" বলিয়া গুরুগম্ভীর ভাবে আড়ম্বরের ভান করিয়া পুরোহিত ঘরে ঢুকিলেন! তিনি কিছুতেই চক্রবর্ত্তীকে ঘরে থাকিতে দিবেন না—ঘরে দ্বিতীয় মানুষ থাকিলে নাকি মন্ত্র ঠিক হয় না।

সমবেত ভৃত্যবর্গের মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছে। ব্যাপার-টির হাস্যজনক জটিলতা দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথের হাস্যরঞ্জিত মুখও কখনো কখনো বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছিল। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর দক্ষিণ হস্তটি বুকের কাছে কাপড়ের মধ্যে দ্রুত অঙ্গুলীচালনায় অত্যন্ত নড়িতেছে, মুখে কেমন একাগ্র অচঞ্চল ভাব,—ঠোঁট দুইটি বন্ধ থাকিলেও—চিবুকের স্পন্দন দেখিয়া স্পষ্ট তাঁহার জপের ভাব বোঝা যাইতেছিল।

পুরোহিত চালপড়ার চৌকিটী দুই হাতে উঠাইয়া বাহিরে আনিলেন। ক্ষুদ্র চৌকির চারিদিকে ঘৃতপ্রদীপ তখনও জ্বলিতেছে। মধ্যে তুলসীপত্র ও পুষ্পস্তূপের মধ্যে চালপড়ার সরায় তুলসীপত্রে আবৃত চাল;—তাহার উপর চক্‌চকে চৌকা মোহরটি ঝল্ ঝল্ করিতেছে, দেখিলেই

কেমন সত্য বা শপথের ধারণায় মন ভীত হইয়া পড়ে। আসনটি নীচে রাখিয়া ঠাকুর উচ্চ রবে শঙ্খধ্বনি করিলেন।

"উঠে এস, সবাই একসারিতে বস, এই শালগ্রামের সম্মুখে এস।" ভট্টাচার্য্যের কথায় সকলে অবসন্ন ভাবে আসিয়া সম্মুখে বসিল, এমন কি উগ্রমূর্ত্তি চক্রবর্ত্তীও থতমত খাইয়া বাহিরেই বসিয়া পড়িলেন। তখন চাউলের উপরের তুলসী তুলিয়া ধৌত নিক্তিতে সেই চৌকা মোহরটির মাপে এক মোহর করিয়া চাল সকলের হাতে দেওয়া হইল। এবং সকলেই পূর্ব্ব মুখে গঙ্গা নারায়ণ ও তুলসী স্মরণ করিয়া চাউল মুখে দিল। "এবার আর জুচ্চুরি খাটবে না। যে আমার কবচ নিয়েছে তার মুখের চাল পাথর হয়ে যাবে, মুখে ছাই উঠবে, রক্ত উঠবে দ্যাখ না!" কর্ত্রীর স্বরেই সকলের জিহ্বা শুকাইয়া উঠিতেছিল!

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "এইবার ফেল দেখি, সবাই মুখ থেকে ছিব্‌ড়ে ফেল।"

কেহ ভয়ে কেহ নির্ভয়ে মুখ হইতে চিবানো চাল ফেলিল। স্বয়ং গৃহিণী আসিয়া সেই চাল লক্ষ্য করিয়া পরীক্ষা সুরু করিলেন। চাকর দরোয়ানরা বেশ মোলায়েম করিয়া চিবাইয়াছে, তাহাতে রসও আছে। খোকার ছোক্‌রা চাকর রঘুয়ার চালে রস কম—যেন গুঁড়া গুঁড়া ধুলার মত। দাসীদেরও কতক গোটা কতক আঠা গোছ, রস প্রায় সকলেরই আছে। কিন্তু ও কি?—বুড়ী ভুবন দাসীর চিবানো চাল যে রক্তে রক্তময়। প্রায় আস্ত আস্ত চাল ও একমুখ লালার সহিত শুধু তার-টানা রক্ত!

গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ও মায়া-রাক্ষুসী! তোমারই এই কাজ? ছেলের বুকের রক্ত তুইই খেয়েছিস ডাইনী! দে—আমার কবচ দে—এক্ষুনি দে।"

অন্যান্য দাসীমহলে তখন বিকট হর্ষধ্বনি উঠিয়াছে। কেউ বলিতেছে "বাবা! ও যার কর্ম্ম তারে সাজে! আমি তো বলেছিলাম যে ও কাণ্ডটা ছোট খাটো কলজের নয়!" কেউ বলিতেছে,—"হ্যাঁ গা, নিলে কি করে বল দেখি? হাতে করে মানুষ-করা ছেলে,—তার পরমায়ুটুকু নাকি ঐ কবচে—তুচ্ছ সোনার লোভে কি করে নিলে!" চক্রবর্ত্তী তাঁহার গামছাখানি বেশ করিয়া কোমরে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিতেছিলেন—"বড়মানুষের ঘরে চুরি ডাকাতি ঐ সব সোহাগের দাসী খান্‌সামাদের দ্বারাতেই ত হয়।" ইত্যাদি।

ভট্টাচার্য্যের মুখ প্রফুল্ল। সুরেন্দ্রনাথ বিস্ময়ে চিন্তায় নীরব হইয়া ছিলেন। আর গৃহিণী পদলুণ্ঠিতা বৃদ্ধার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া কান্না চীৎকার ও গালির চোটে তাহাকে অর্দ্ধমৃত করিয়া দিতেছিলেন। ভুবনের কথায় যথার্থই কষ্ট হয়। একবার সুরেন্দ্রনাথ মৃদুস্বরে বলিলেন, "মা, তুমি একটু ভেবে দেখ, ভুবন বুড়ো মানুষ—ওর দাঁত খারাপ, ওর চাল যে অমনি হবে এতে আশ্চর্য্য কি? যে খোকাকে মানুষ করেছে সে কি সত্যি কবচ নিতে পারে?"

"কেন পারবে না! তুমি বল কি সুরেন? কলিকালে কি মানুষের মনে দয়া মায়া আছে? সোনার লোভে লোকে শালগ্রামের পৈতে চুরি করে—তা বলছ ছেলের কবচ! চালপড়ার ডাক্ কি মিথ্যে বল্‌তে পারে? মাগী আঁটি আঁটি ডাঁটা চিবোয়—তাতে তো কৈ রক্ত দেখিনি কখনো? তুমি শুদ্ধ আস্কারা দিও না, এখন যাতে মাল বাহির হয় তার উপায় কর।"

"সে সব তুমিই কর মা, আমি এর মধ্যে নেই।" বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ বাহিরে চলিয়া গেলেন।

"আচ্ছা আমি তাও করতে জানি।" বলিয়া গৃহিণী তাঁহার গৃহপালিত ভ্রাতুষ্পুত্র গয়াচরণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"গয়া, এ্যাদ্দিন ধরে বসে বসে আমার অন্ন ধ্বংস করছিস,—একটা কথা আমার রাখতে পারবি কি?"

গয়া বলিল, "কেন পারব না পিসিমা!"

"তাতে যদি তোর জেল হয়? ভেবে বল।—একজন বড়মানুষ তো দাসীর ভয়ে পালালো দেখলি?"

গয়ারও মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তবু মুখে সাহস দেখাইয়া বলিল, "যদি জেল হয় তোমরা বাঁচাবে তখন।"

"তবে আয়, আগে এই রাক্কুসী বুড়ীর হাড় ভেঙ্গে কবচ বাহির কর—তারপর যদি [illegible] জেল হয় তো তোর সাতগুষ্টিকে এনে আমি [illegible]।"

ভুবন আর্ত্তনাদ করি[illegible] শ্রীরা[illegible]মা, আমি তোমার পা ছুঁয়ে [illegible]

শান্ত থাকিত, কিন্তু বাহিরে তাহার দৌরাত্ম্যের সীমা ছিল না। পথে ঘাটে ভুবনকে দেখিলে সে রোদন আরও ভয়ানক হইত। কিন্তু সুরেনবাবুর নিষেধে কেহ তাহার কাছে কাছাইত না! ভুবনও পলাইত।—এমনি করিয়া কয় দিন সে-পাড়ার রাস্তা ঘাট শিশুর ক্রন্দনে অস্থির হইয়া উঠিল,—দেখিয়া ভুবন সে পাড়া ছাড়িল।

অনবরত কাঁদিয়া শিশুর শরীর শীর্ণ হইতেছিল। গৃহিণী বলিতেছিলেন, "ডাইনী মাগীর দায়ে বাছার আমার দুর্দ্দশা হ'ল! পলকে পলকে বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে!—এবার তো কাউকে কিছু বল্‌ব না, গুণ্ডা লাগিয়ে মার খাইয়ে—মাগীকে বিছানায় ফেল্‌ব।"

কিন্তু এ দিন ত থাকিল না, নিত্য নূতন খেল্‌না ছবি পাইয়া রামপ্রসাদও ক্রমে স্থির হইয়া আসিল। বালকের তরল চিত্ত দুদিনেই প্রফুল্ল হইল—উৎপাত থামিয়া গেল। বাড়ী শান্ত। কিন্তু গৃহিণীর প্রাণ সুস্থ ছিল না,—তিনি সেই সন্ন্যাসীর সন্ধানে লোক ছুটাইয়াছিলেন।

প্রায় একমাস অতীত। মাতাপুত্রের মনান্তর প্রায় ঘুচিয়া আসিয়াছে। এই সময় বাগবাজার বসুপাড়া হইতে ঠাকুরাণীর ননদের বাড়ীর নিমন্ত্রণ আসিল। পৌত্রের বিবাহ। বাল্যকাল হইতে এই ননন্দার সহিত গৃহিণীর অত্যন্ত হৃদ্যতা, রামের জন্মের পূর্ব্বে ননদের এই পৌত্র বসন্তই ইঁহার প্রাণ ছিল। তাহারই বিবাহ। বহুমূল্য উপহার লইয়া বধূ ও পৌত্রকে সঙ্গে করিয়া তিনি কয়দিন পূর্ব্বেই সেখানে গিয়া উঠিলেন। মধ্যের আশঙ্কাজনক দুর্ঘটনার বিষাদস্মৃতির ভিতর হইতে হঠাৎ চিরপরিচিত বাড়ীর আনন্দপ্রদ সখীসঙ্গে মিশিতে পাইয়া বধূও বাঁচিয়া গেলেন।

বিবাহ হইয়া গেল। বৌভাতের পরদিন তাঁহারা ফিরিবেন। বিবাহের পরদিন সুরেন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন। অযত্ন হইতেছে বলিয়া বধূ বাড়ী ফিরিবার জন্য একটু ব্যস্ত—তাই সঙ্গিনী জা ননদেরা তাঁহাকে ক্ষেপাইতেছিল। খোকা চাকরের কোলে বাহিরে গিয়াছে। নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতদের পরিচ[illegible]ণীদ্বয় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

প্রভাতের [illegible] দিকে ফাল্গুনের রং ছড়াইতেছে [illegible] বাজিতেছে।—সহসা বাহির-বাড়ী হইতে একটা বিকট কোলাহল শোনা গেল। সকলেই চমকিয়া উঠিল,—বাটীর কর্ত্রী ডাক্ দিয়া বলিলেন—"দেখ্‌ত রে বাহিরে অত চ্যাঁচাচ্ছে কে!"

* * * * *

যাহা হইয়া থাকে;—খোকাকে বাড়ীর অন্যান্য ছেলেদের সহিত খেলিতে দিয়া তাহার চাকর অন্য ভৃত্যদের নিকট তামাক খাইতে বসিয়াছিল। ছাতের উপর একটা টিনের ছোট ঘরে চাকরদের আড্ডা, সেই ছাতেরই উপর বাড়ীর ও নিমন্ত্রিতদের প্রায় আট নয়টি শিশু ছুটাছুটি খেলিতেছিল। এমন সময় রাম চেঁচাইল,—"ওরে দ্যাখ্ দ্যাখ্—ঐ আমার ঝি-মা—ভুবো মা! ও ভুবো-মা! ঝি-মা—আয় না এ বাড়ী—এই দ্যাখ্ এদিকে!—ও ঝি-মা—আয় আয়!" নীচে হইতে ভুবনও তাহাকে দেখিয়াছিল, কথা না বলিয়া সে হাত তুলিয়া নাড়া দিয়া ইসারা করিল সরিয়া যাও। কিন্তু বালক তাহা মানিল না, চীৎকার করিয়া ডাকিল, "না তুই আয় ঝি-মা। দাদার বৌ দেখে যা।" তাহাকে ধারে দেখিয়া ভুবন কাঁপিয়া উঠিল, ডাকিয়া বলিল,—"চাকর-বাকর কি সব মরেছে না কি? ছেলেকে একা ছেড়ে দিয়ে গেল কোথা? বাবা আমার, ধন আমার, সরে যাও—ওরে খোকা খুকারা, তোরাও সরে যা না, অত ধারে এসেছিস্ কেন?" উপর হইতে রামপ্রসাদ বলিল, "না আমি যাব না! তুই আয় না ঝি-মা, একবার আমায় কোলে নে না, কতদিন তোর কোলে চড়িনি বল্‌ত?"

ঝি সে কথার উত্তর না দিয়া চোখের জল মুছিল। খোকা আবার ডাকিল "আয় ভুবো-মা তোকে আমি সন্দেশ এনে দেব।"

ভুবন একবার উপরে চাহিয়া খোকাকে দেখিল, তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একটু দূরে গিয়া বলিল "না বাবা না, তোমার হাতের সন্দেশ আমার কপালে নেই—আমি যাই, কেউ দেখ্‌লে আর রক্ষা থাকবে না। যাও তুমি খেলা করগে।" বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

শিশু অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া গেল। ব্যাকুল দৃষ্টিতে মুখ ফিরাইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ নাই, যাহারা তাহাকে ভুবনের কাছে যাইতে বারণ করে

তাহারা কেহ নাই! তখন সে একেবারে আলিসায় উঠিয়া পড়িল—ঝুঁকিয়া হাত বাড়াইয়া ডাকিল, ঝি-মা ও ঝি-মা যাসনে মা! এখানে কেউ নেই—তুই চলে আয়—দেখে যা।"

ভুবন বিপদ দেখিয়া ছুটিয়া নিকটে আসিয়া ডাকিয়া বলিল, "ওরে ও খোকা, করিস কি বাবা? সরে যা—পড়ে যাবি সরে যা।" বালক তাহার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। ঝিকে কাছে দেখিয়া তাহার সাহস বাড়িয়া উঠিল, "তুই আমায় ধরে নেনা"—বলিয়া সেই উঁচু তেতালা হইতে লাফ্ দিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল।

নীচে ফুট্‌পাথ, ভুবন দৌড়িয়া কাছে আসিবার পূর্ব্বেই সে উল্টাইয়া মাথার ভরে নীচে আসিয়া পড়িল। একবার মাত্র অস্ফুট চীৎকার, তার পরে চুপ!

চারিদিকে কোলাহল উঠিতেছিল, প্রথমে রাস্তার লোক, মুটে মজুর—বাজনদারগণ—তাহার পর বাড়ীর লোক, বাবুর পরিজনবর্গ। চারিদিকে গোল—শব্দ উঠিতেছে "ডাক্তার ডাক্তার!" তাহারই মধ্যে কে একজন বলিল "আর কেন? আর ডাক্তারে কি করতে পারে?"—অল্পক্ষণেই বাহির বাড়ীর উঠানে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। পথের লোক ইতস্তত করিতেছিল, দরোয়ান হাঁকিল তফাৎ যাও—"মায়ীলোক বাহার আতী হৈঁ।"

ভাগিনেয় নরেন্দ্র বাবু বলিয়া উঠিলেন, "তাঁরা? তাঁরা এখানে কেন? যাই আমি—"

(৬)

শোকের অন্ত নাই। সেই দিনই সুরেন্দ্রনাথ সকলকে বাড়ী লইয়া আসিয়াছেন। বৌভাতের উদ্যোগ ফেলিয়া তাঁহার পিসীমাও সঙ্গে আসিয়াছেন। বধূ অচৈতন্য, গৃহিণী উন্মাদপ্রায়,—সুরেন্দ্রনাথ বিষাদ-শিথিল প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিস্তব্ধ। নরেন্দ্রনাথ নানা কথায় ভাইকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার উত্তরে সুরেন্দ্র বলিলেন,—"জানি ভাই, সংসারে এই খেলাটাই যে সব চেয়ে ফাঁকালো তা আমি জানি। কিন্তু এই ছেলেটার আয়ু যে সেই কবচটার সঙ্গে এমন করে জড়ানো ছিল তা জান্‌লে একটু সাবধান হতাম। মা মেয়েমানুষ, কিন্তু—"

বাধা দিয়া নরেন্দ্র বলিলেন, "তাই যদি হ'ত, কবচেই যদি ওর প্রাণ ছিল সত্যি—তবে এতদিন বিলম্ব হ'ত না, এও তুমি জেনে রাখ সুরেন!"

এমন সময় বাড়ীর মধ্যে আবার প্রবল রোদনধ্বনি শোনা গেল, যেন কোন নূতন বিপদের নূতন চীৎকার। দুই ভাই উঠিয়া তাড়াতাড়ি ভিতরে গেলেন। সত্যই নূতন কাণ্ড। ঠাকুরাণীর চাকর বিল্বদল পাড়িতে গিয়া কাকের বাসায় সেই কবচটি পাইয়া কর্ত্রীকে আনিয়া দিয়াছে,—তাই দেখিয়া সকলের এই নূতন শোক! গৃহিণী চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "ফেলে দিগে—জলে ফেলে দিগে ও কবচকে।—আমার বাছাকে কেড়ে নিয়ে ও মায়া-কবচ এত দিনে উড়ে এল—ও ফেলে দিগে!—"

নরেন্দ্র ডাকিলেন—"সুরেন—"

শ্রী......পাঁড়ে।

পঞ্চশস্য

সম্মানিত গ্রাম্য কবি (Literary Digest) :—

১৯০৪ সালে শাশ্বত সাহিত্যসৃষ্টির জন্য যিনি নোবেল পুরস্কার পাইয়াছি সেই কবি আল্‌তো ফ্রেদেরিক মিস্ত্রাল্ গত ২৫ মার্চলন মারা গিয়াছেন। সমগ্র য়ুরোপে তাঁহার জয়জয়কারের সহিত শোকের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অথচ ইনি ছিলেন একজন গ্রাম্য কবি। আসল কবিত্বশক্তি থাকিলে গ্রামে বা শহরে বাসে যে কিছু আসে যায় না মিস্ত্রাল্ তাহার প্রমাণ।

মিস্ত্রাল্ ফ্রান্সের দক্ষিণে প্রভেন্স প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। এককালে এই প্রদেশের ভাষাই, সাহিত্য ও রাজ-দরবারের ভাষা ছিল। কিন্তু পরে পারী নগরীর প্রাধান্য হওয়াতে প্রভেন্সাল ভাষা একরূপ মৃতপ্রায় ও বিস্মৃত হইয়া যাইতে বসিয়াছিল। মিস্ত্রাল যখন নিজের অন্তরে বীণাপাণির বীণাধ্বনি শুনিয়া উদ্বুদ্ধ হইয়া গান করিবার অনুপ্রাণনা উপলব্ধি করিলেন, তখন স্থির করিলেন তাঁহার যে জন্মজেলা এককালে সকলের মুখে ভাষা জোগাইত, সাহিত্যের ভাষার আদর্শ যে জেলার ভাষা ছিল, সেই জেলা ও ভাষা এখন "গ্রাম্য" বলিয়া অবজ্ঞাত হইতেছে—তাহাকে সম্মানিত পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার ভার তাঁহাকেই লইতে হইবে। প্রভেন্সাল ভাষা সম্রাজ্ঞীর আসন না পাক, অন্তত গর্ব্বিতা পারী সুন্দরীর দেমাক ত খর্ব্ব করিবে, "গ্রাম্য" বলিয়া নাক সিঁটকানো ত বন্ধ করিবে। মিস্ত্রালের প্রাদেশিক গ্রাম্য ভাষায় কবিতা রচনার আর একটি সুন্দর কারণ এই ঘটিয়াছিল যে তাঁহার মা একেবারে গেঁয়ো ছিলেন, গেঁয়ো ভাষা ছাড়া তিনি পারী শহরের কৃত্রিম পাঁচমিশালী ভাষা বুঝিতেন না; বালক মিস্ত্রাল্ স্থির [illegible]ন আমি যাহা লিখিব মা তাহা বুঝিবেন না, এ হইতেই [illegible] আমি মাতৃ-ভাষাতেই লিখিব। মিস্ত্রাল্ [illegible] শ্রীরা[illegible]ন্সাল ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত [illegible] ভা[illegible]র বহুবিস্মৃত

প্রবাদ, প্রবচন, গল্প, কাহিনী, রূপকথা, ছড়া সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, তাহাতে অতীত সাহিত্যের সহিত তাঁহার সৃষ্ট নবীন সাহিত্য যুক্ত হইয়া একটা অখণ্ড সাহিত্য-ধারা উপস্থিত করিল। ইহাতে তিনি শীঘ্র প্রভেন্সবাসীর মনের সিংহাসন দখল করিয়া বসিলেন— তিনি তাহাদের কবি, তিনি প্রিয়, তিনি হৃদয়ের অধীশ্বর, তিনি তাহাদের অতীত কীর্ত্তির ভাণ্ডারী; তাঁহারই কথা লোকের মুখে, তাঁহারই গাথা হাটে ঘাটে মাঠে গীত হইতে লাগিল। কিন্তু শহুরে লোকেরা পাড়াগেঁয়েকে কি সহজে আমল দেয়। মিস্ত্রালের যশ অতি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার পাশে আরো ছয়জন প্রভেন্সাল কবি আসিয়া জুটিলেন। তাঁহারা দেশের ভাষা, রীতিনীতি, ঐতিহ্য বজায় রাখিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন—তাঁহারা প্রচার করিতে লাগিলেন সহজ দেশভাষাতেই দেশের প্রাণশক্তি দেশের আত্মা বিরাজ করিতেছে, দেশভাষাকে উন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া দেশ-আত্মার মঙ্গলশক্তিকে উদ্বোধিত করা সকল প্রদেশবাসীর কর্ত্তব্য। ১৮৫৯ সালে মিস্ত্রালের ২৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মিরেইও (Mireio) নামক কাব্য প্রকাশিত হইল। এই কাব্যের খ্যাতি দিকে দিকে দাবানলের মতো দেখিতে দেখিতে ছড়াইয়া পড়িল; ফরাসী, ইংরেজি প্রভৃতি বহু ভাষায় তাঁহার কবিতা অনুবাদিত হইয়া প্রচার হইতে লাগিল। এই কাব্য ১২ সর্গে লিখিত। আখ্যানবস্তু অতি সামান্য—একটি দরিদ্রা রমণীর ধনী প্রেমিকের প্রণয়কাহিনী। কিন্তু মিস্ত্রাল এই কাব্যে প্রভেন্সের জীবনযাত্রা-প্রণালী, রীতিনীতি, চরিত্রের বিশেষত্ব, প্রবাদ, প্রবচন প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহাতে এমন [illegible] স্থানীয় রং ফলাইয়াছেন যে তাহা পল্লীজীবনের মহাকা[illegible] [illegible]য়াছে। এই কাব্য পাঠ করিয়া তাৎকালীন [illegible] [illegible]জর নেতা লামার্ত্তিন বলিয়াছিলেন [illegible] [illegible]কজন মহাকবি জন্মিয়া[illegible] [illegible] বাজ হোমার সদৃশ

কবিবর মিস্ত্রাল।

মহাকবি আবির্ভূত হইয়া পেত্রার্ক যেমন ইতালীয় ভাষাকে কথিত ভাষা হইতে সংগঠিত করিয়াছিলেন তেমনি গ্রাম্য ভাষা হইতে অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন—এই পল্লীসাহিত্যের গ্রাম্য ভাষা ছন্দে ও অলঙ্কারে পরিপূর্ণ, মন ও কান দুইকেই খুসী করিয়া তুলে।" মিস্ত্রালের অপরাপর রচনার নাম Calendan, Lis Isclo d'Or, Nerto, এবং Tresor don Felibrige নামক গ্রাম্য ভাষার অভিধান। অনেকে এই অভিধান দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন যে একই জনের মস্তিষ্কে এমন সরস তেজস্বী কবিত্ব এবং এমন জটিল ভাষাতত্ত্ব পাশাপাশি কেমন করিয়া স্থান পাইয়াছিল। মিস্ত্রাল ১৯০৪ সালে স্পেনের নাট্যকার একেগারের সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া নোবেল পুরস্কার পান। এ বৎসর একেগারেরও মৃত্যু হইয়াছে। মিস্ত্রাল নোবেল পুরস্কারের টাকা দিয়া প্রভেন্স প্রদেশের কীর্ত্তিকলা সংরক্ষণের জন্য একটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন। এমনই তাঁহার স্বীয় প্রদেশের প্রতি প্রীতি। তিনি গ্রামের চাষাভুষাদের মধ্যেই থাকিতে ভালো বাসিতেন, শহরের ত্রিসীমায় যাইতেন না। ফরাসী সাহিত্যপরিষৎ ১৮৯১ সালে তাঁহাকে সংবাদ পাঠান যে মিস্ত্রাল পরিষদে উপস্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তিনি পরিষদের পারিষদ নির্ব্বাচিত হইবেন। মিস্ত্রাল তথাপি শহরের দিকে ঘেঁষিলেন না। তাঁহার অবর্ত্তমানেই সাহিত্যপরিষৎ তাঁহাকে পারিষদ নির্ব্বাচন করিয়া সম্মানিত করিতে বাধ্য হইলেন। মিরেইও মহাকাব্যের পঞ্চাশতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে কবির গ্রাম্য-পরিচ্ছদ-পরিহিত একটি প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়; মিস্ত্রাল তাহাতে মহা আপত্তি তুলিয়াছিলেন এই বলিয়া যে তিনি যে-হোটেলে সন্ধ্যাবেলা বসেন ঐ মূর্ত্তি সেই হোটেলের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, উহা তাঁহার অবাধ দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিবে। মিস্ত্রালের মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৪ বৎসর। তিনি জীবদ্দশাতেই অশেষ প্রকার সম্মান লাভ করিয়া যাইতে পারিয়াছেন।

চুল ও চরিত্রের সম্পর্ক (Literary Digest) :—

মানুষের আকারের উপর তাহার শক্তি নির্ভর করে। তাহার চরিত্রগত গুণ ও দোষ তাহার মাথার চুলের রং ও গড়নের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত থাকিতে দেখা যায়।—চার্লস্ কাসেল নামে এক ব্যক্তি এই থিওরী প্রচার করিতেছেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা মিলাইয়া দেখাইতেছেন যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের চুল কালো, চিক্কণ, সরু ও কুঞ্চিত হয়; কটা-পাতলা-চুলওয়ালা প্রতিভাবান্ কে ক'টা দেখিয়াছে? কড়া, তারের মতন সটান চুল ঠক ও নীচ বংশের পরিচায়ক। কুঞ্চিত অলকদাম প্রাণের কবিত্বের বাহ্য বিকাশ মাত্র। কটা চুলওয়ালা লোকেদের উদ্দেশ্য সতত পরিবর্ত্তনশীল। তবে সোনালী রঙের নরম চুল মেয়েদের মাথায় প্রণয়নিষ্ঠার ও সতীত্বের নিশান। হ্যাভলক এলিস অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে কয়েদী দোষীদের মধ্যে অধিকাংশেরই দাড়ি ভালো করিয়া গজায় নাই, অথচ মাথায় টোকা-পানা চুল। ভেড়ার লোমের মতন অতিকুঞ্চিত চুল বোকার লক্ষণ। কয়েদী মেয়ে দোষীদের মাথায় যেমন প্রচুর চুল থাকে গায়ে মুখেও তেমনি লোমের আধিক্য হয়। কটা চুল ও কটা চোখের দেশেও দেখা গিয়াছে যে প্রতিভাবান্‌দের অধিকাংশেরই কালো চুল। কালো-চুলওয়ালাদের দলে পড়েন—ম্যাথ্যু আর্নল্ড, কোলরিজ, সার টমাস মুর, ইবসেন, ল্যাম্ব, হুইটিয়ার, ওয়েবেষ্টার, ব্রাউনিং, ডুমা, আর্ভিং, ল্যাণ্ডর, টেনিসন প্রভৃতি। ব্রায়াণ্ট, চার্লস দ্বিতীয়, কাপ্তান

বাদুড়ের নাকের উপর ও কানের সামনে ডানার আকারে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়

বাদুড়ের মুখে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। নাকে কানে দাড়িতে সূক্ষ্ম চুল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কাজ করে। ইহার চক্ষু ক্ষুদ্র ও অকর্ম্মণ্য।

বাদুড়ের কানের সম্মুখে ডানার আকারে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

কুক, ক্রমোয়েল, লংফেলো, গর্ডন, গ্র্যান্ট, কাটস্, নেপোলিয়ন, মিলটন, শেলী, ওয়াশিংটন প্রভৃতির চুল ছিল লালচে। ফিকে রঙের চুল সত্ত্বেও বিখ্যাত প্রতিভাবান্ ছিলেন—থ্যাকারে, বেনিয়ান, লাওয়েল, স্যুইনবার্ন, সাভোনারোলা। কিন্তু একেবারে কটা চুল কোনো প্রতিভাবানের দেখা যায় নাই। উপরে উল্লিখিত প্রতিভাবান্‌দের মধ্যে কবি বা আর্টিষ্ট মাত্রেরই কুঞ্চিত কোমল অলক ছিল। গাইয়ে লোকদের প্রায়ই বড় বাবরী চুল দেখা যায়। নেপোলিয়নের চুল বড় মোটা ছিল; ওয়েবেষ্টারের চুল ছিল ভেড়ার লোমের মতন; লাওয়েলের চুল ছিল তারের শলার মতন সোঁটা সোঁটা। সুতরাং এগুলিকে নিয়মের প্রতিপ্রসব বলিতে হইবে।

বাদুড়ের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় (Literary Digest) :—

টাইটানিক জাহাজ ডুবি হওয়ার পর হইতে নানান্ জনে জাহাজ রক্ষার নানান্ উপায় উদ্ভাবনে লাগিয়া গিয়াছেন। জাহাজে অ-তার

বাদুড়ের ডানায় স্নায়ুকেন্দ্র; ইহা দ্বারা উহারা বায়ুতরঙ্গের প্রকৃতি অনুভব করে।

টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা ও অনেক লাইফবোট প্রভৃতি রাখিবার বন্দোবস্ত ত হইয়াছেই; কেহ এমন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, যে জাহাজ ছেঁদা হইয়া গেলেও ডুবিবে না, জাহাজ ভাঙিয়া গেলে জাহাজের পাটাতন ভেলার মতন ভাসিবে। সার হিরাম ম্যাক্‌সিম লোক মারিবার ক্ষিপ্র কল ম্যাকসিম কামান উদ্ভাবন করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য লোক রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে মন দিয়াছেন। তিনি এমন এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন যে জাহাজ দূর হইতেই ডোবা পাহাড়, বরফের চাঁই, উপকূল, বন্দর প্রভৃতির অবস্থান, আকার ও প্রকৃতি টের পাইবে, এবং এমন কি ঐসব কত দূরে ও কোন্ দিকে আছে তাহাও জাহাজে বসিয়া জানা যাইবে।

এই উদ্ভাবন বাদুড়ের অন্ধকারে পথ চিনিয়া ধাক্কা বাঁচাইয়া চলিবার উপায় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অনুরূপ। প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদ্ কুভিয়ার আবিষ্কার করেন যে বাদুড়ের ডানায় সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ স্পর্শ-অনুভব-শক্তি আছে। ইহা তাহার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কাজ করে। ইহা পাঠ করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ম্যাকসিম দেখিয়াছেন এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বাদুড়ের ডানাতেই কেবল আবদ্ধ নহে; উহা বাদুড়ের সর্ব্বাঙ্গেই ব্যাপ্ত, বিশেষ করিয়া উহার মুখে—কোনো জাতের বাদুড়ের নাকের ডগায় একটা ডানার মতন ইন্দ্রিয় থাকে, কোনো জাতের বাদুড়ের দুই কানের ফুটোর সামনে দুইটা ডানার মতন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দেখা যায়; তাহার দ্বারা উহারা কোথায় কি বস্তু আছে না দেখিয়াও কেবলমাত্র সেই-সকল বস্তু হইতে প্রতিহত বায়ুতরঙ্গ অনুভব করিয়া বুঝিতে পারে। বাদুড় উড়িবার সময় খুব তাড়াতাড়ি ডানা নাড়িয়া উড়ে; এক সেকেণ্ডে ১০।১২ বার ডানা সঞ্চালন করে; ইহাতে যে বায়ুতরঙ্গ উত্থিত হয় তাহার নিশ্চয় একটা শব্দ আছে—কারণ শব্দ বায়ুতরঙ্গ ভিন্ন আর ত কিছুই না; কিন্তু সেই শব্দ এত মৃদু যে কানে তাহা শুনা যায় না। যেমন আলোক বা ঈথরতরঙ্গ নানা বস্তু হইতে প্রতিহত হইয়া চোখে লাগিলেই সেই অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁ[illegible] বস্তুর আকার আমাদের নিকট প্রকাশ করে, সেইরূপ বাদু[illegible] ঞ্চালিত বায়ুতরঙ্গ চারিদিকে ছড়াইয়া প[illegible] হইয়া চোখের ন্যায় জ্ঞানসাধন [illegible] গ, এবং
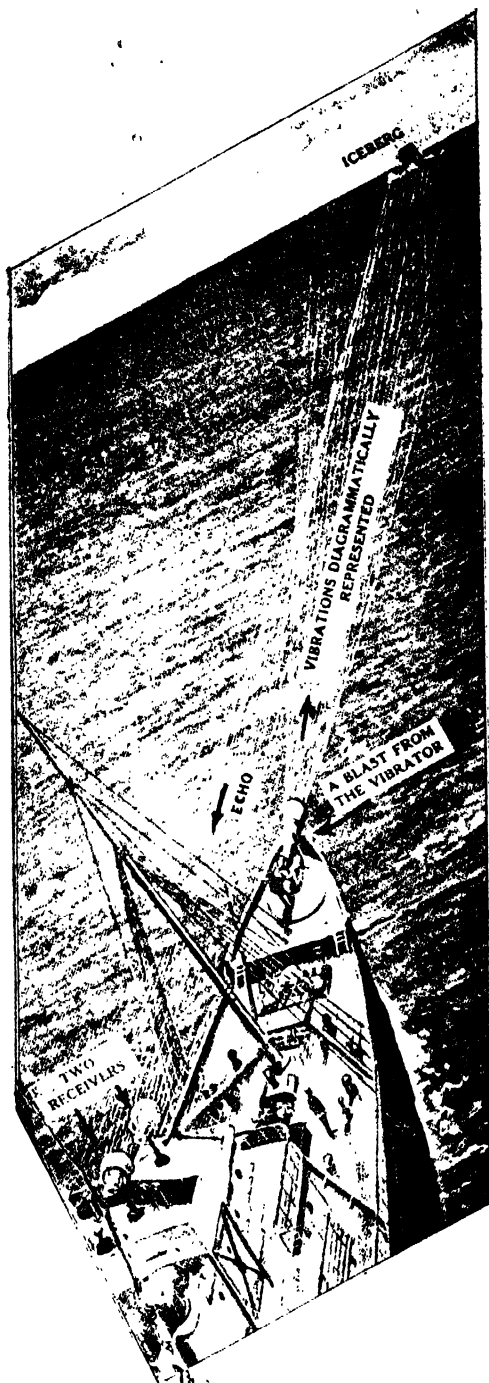
শ্রীরা[illegible]

সার হিরাম ম্যাকসিম জাহাজের গলুইয়ের উপর এমন একটি যন্ত্র বসাইবেন যাহা হইতে অবিশ্রাম বায়ু-প্রবাহ সূক্ষ্ম অথচ প্রবল বেগে তরঙ্গিত হইয়া নিঃশব্দে দিকে দিকে প্রেরিত হইতে পারিবে; সেই বায়ুতরঙ্গ দূরের পাহাড়ে, বরফ-স্তূপে, উপকূলে, বন্দরে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিলে তাহার নিঃশব্দ প্রতিধ্বনি দুইটি কর্ণবৎ যন্ত্রে ধরা পড়িবে; দুইটি কর্ণযন্ত্রের একটিতে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে; আর একটিতে কাগজের উপর দাগ কাটিয়া বস্তুর আকার প্রকৃতি ও দূরত্ব প্রদর্শিত হইবে। এই দাগের আকার প্রকার দেখিয়া দূরস্থিত বস্তুটি জাহাজ বা বরফস্তূপ বা পাহাড় বা উপকূল বা বন্দর তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে এবং কতদূরে অবস্থিত তাহাও ঠিক জানা যাইবে। সুতরাং অন্ধকারে কোয়াসায় জাহাজে জাহাজে ঠোকাঠুকি হওয়া, বরফস্তূপে ধাক্কা লাগা বা বন্দরে প্রবেশ করার অসুবিধা নিবারণ করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার হইবে।

ছায়া-প্রতিকৃতি বা Silhouette (Literary Digest):—

Silhouette বা আলোকের বিপরীত দিকে দাঁড়াইলে মানুষ, জীবজন্তু ও বস্তু প্রভৃতির যে ছায়া পড়ে সেইরূপ আকৃতির ছবি আঁকা

ছায়াপ্রতিকৃতি বা সিলহুয়েৎ।

এককালে য়ুরোপে আমেরিকায় খুব প্রচলিত ছিল; মাঝে চাপা পড়িয়া গিয়া পুনরায় প্রচলন দেখা যাইতেছে। এই বিদ্যা খুব প্রাচীন; মিশরের চিত্রলিপিতে ইহার নমুনা দেখা যায়; তারপর গ্রীসের বিভিন্ন দেশের প্রাচীন মৃৎপাত্রের গাত্রে এইরূপ ছায়া-প্রতিকৃতি অঙ্কিত দেখা গিয়াছে। ফ্রান্সের একজন মন্ত্রীর নাম ছিল সিলহুয়েৎ; তিনি রাজস্ব ব্যবস্থায় অত্যন্ত কৃপণতা করিতেন বলিয়া দেশসুদ্ধ লোক তাঁহার উপর চটিয়া গিয়া তাঁহার খরচ কমাইবার চেষ্টাটাকে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করে। রাজদরবারের নরনারী

[illegible]াছে। রাসুভূতির যন্ত্র।
[illegible] জর নেও।
তাহাতেই [illegible] দিকে [illegible] কজন [illegible]নের জ্ঞান বাদুড়ের
মস্তিকে [illegible] বাজহোমার স[illegible]

লোকেরা খাটো কুর্ত্তা, কাঠের নস্যদানি, টিনের তরোয়াল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে; চিত্রকরেরা সস্তা হইবে বলিয়া মাত্র অঙ্কিতব্য বস্তুর আকারের সীমারেখাটা আঁকিয়া চিত্রকার্য্য সমাধা করিতে থাকে। এইরূপে মধ্যযুগে য়ুরোপে ছায়াপ্রতিকৃতি অঙ্কনের প্রচলন হয় এবং বিদ্রূপ করিয়া তাহার নাম রাখা হয় সিলহুয়েৎ চিত্র—অর্থাৎ বাজেখরচ-শূন্য সস্তা চিত্র, মন্ত্রী সিলহুয়েতের অনুশাসন-সঙ্গত। য়ুরোপ আমেরিকায় ছায়া-প্রতিকৃতি অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন এড্হুয়ার (Edelhart); ইনি ফরাসী ছিলেন, পরে আমেরিকায় বাস করেন। ১৮৬১ সালে মারা গিয়াছেন।

আমাদের দেশে "দক্ষিণেশ্বর" নামক একখানি পুস্তিকার উপর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর একখানি সুন্দর ছায়া-প্রতিকৃতি দেখিয়া প্রীত হইয়া গত ১৩২০ সালের ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছিল। ছায়া প্রতিকৃতি সুন্দর করিয়া আঁকিতে পারা বিশেষ প্রতিভা সাপেক্ষ।

চোখ কখন কানের কাজ করে (Literary Digest) :—

যাহারা বায়োস্কোপে যায় তাহারা জানে যে ছবিতে অভিনেতাদের ঠোঁটনড়া দেখিয়া তাহাদের এক-একটা কথা ধরিতে পারা যায়। কালা লোকেরাও অনেক সময় ঠোঁটনড়ার ভঙ্গী দেখিয়া বক্তা কি বলিতেছে তাহা ধরিতে পারে। বোবা-কালাদের শিক্ষা ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে ৬০ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে জেরী এলবার্ট পিয়ার্স নামক এক ব্যক্তি বলেন যে যাহাদের চোখা কান আছে তাহাদেরও এই ঠোঁটনড়া দেখিয়া কথা বুঝিতে পারার শক্তি অর্জ্জন করা উচিত; এবং সকল লোকেরই এ শক্তি অজ্ঞাতসারে আছে এবং দরকার পড়িলে কার্য্যও করে। দুজন লোকের মধ্যে কথাবার্ত্তা যে শুধু কানেরই ব্যাপার তা নয়, কতকটা দেখারও ব্যাপার বটে। এ বিষয়টা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যখন দূর হইতে কোনো বক্তার বক্তৃতা শুনি; বক্তার মুখ দেখিতে না পাইলে অনেক কথা কানে ধরা যায় না। চোখ যেখানে কথা পড়িয়া সাহায্য করে সেখানে কান বেচারা অনেক বাজে খাটুনির হাত হইতে বাঁচিয়া যায়। যাহাদের মন খুব ত্বরিত তাহারা চট করিয়া চোখ দিয়া কথা ধরিতে পারে। আমরা যেমন কথার সমস্তটা না শুনিয়াও অংশ হইতেই সমগ্রটা আন্দাজ করিয়া লইতে পারি, তেমনি দক্ষ কথাপাঠকেরা সমস্তটা না ধরিতে পারিলেও অল্প হইতেই সমস্তটা জোড়াতাড়া দিয়া গড়িয়া লইতে পারে। It is nineteen miles to Omaha, and the roads are not good—এই বাক্যটি কোনো কালার কাছে সাধারণ ভাবে বলিয়া গেলে সে ঠোঁটনড়ার ভঙ্গী দেখিয়া এইরূপ পাঠ করে—Itis nty mlestma ndthrodes are not gd. ইহাতে বোকা কালাকে একটু গোলে পড়িতে হয়; কিন্তু চতুর লোকে আগে পিছের কথার সহিত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ মিলাইয়া মোদ্দা কথাটা আঁচিয়া লইতে চট করিয়াই পারে। তাহার মনের উপর দিয়া ত্বরিত গতিতে একটা যুক্তিধারা প্রবাহিত হইয়া যায় এবং সে পঠিত শব্দের সঙ্গে বাস্তবিক বাক্যের সঙ্গতি করিয়া অর্থ বাহির করিয়া লয়। ছোট বাক্য ধরা সহজ এবং কঠিন দুইই। কারণ ছোট বাক্যের মধ্যে অল্প শব্দ থাকে বলিয়া চট করিয়া আয়ত্ত করা যায়; আবার অল্প কথা থাকে বলিয়া একটা কথার খেই হারাইয়া গেলে বাকি শব্দগুলির সাহায্যে আসল রূপটি খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হয়। একটা বড় বাক্যের এখানে সেখানে এক-একটা কথা ধরিয়া আন্দাজি জোড়াতাড়া দিয়া সমস্ত পদটা পূরণ করিয়া লওয়া সহজ; কিন্তু ছোট বাক্যের কিছু হারাইলে হয় সবটাই, নয় অনেকখানিই হারাইতে হয়। কালার সঙ্গে কথা বলিতে গেলেই বক্তা মুখ খুলিবার পূর্ব্বেই কালা মনে মনে বক্তার সমস্ত খুঁটিনাটি বিশেষত্ব আন্দাজ করিয়া লইতে চেষ্টা করে; যেমন, বক্তা কোন্ দেশী, বক্তার স্বভাব প্রকৃতি শান্ত বা চঞ্চল, সে শিক্ষিত কি না, কোন্ ভাষায় সে কথা বলা সম্ভব, তাহার গোঁপ ও দাঁত আছে কি না, ইত্যাদি। শ্রবণক্ষম লোকেরাও এইরূপ করে, তবে অজ্ঞাতসারে সুপ্তচেতন ভাবে। ইহাতে বক্তার কথা বোঝা সহজ হইয়া যায়। বাক্যপাঠ কার্য্যটি অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য; অধিকক্ষণ করিলে শক্তিক্ষয় হয় এবং এমন কি নষ্টও হইয়া যায়। যে ব্যক্তি জন্ম-কালা, বাক্যপাঠ করিবার সময় তাহার মনে কিরূপ অনুভূতির উদয় হয় তাহা বলা শক্ত। কিন্তু যাহারা কিছু দিন কথা শুনিয়া পরে কালা হইয়াছে, যাহাদের মনে শব্দের উত্থান পতন ও মিহি মোটা স্বরের স্মৃতি মুদ্রিত আছে, তাহাদের কাছে চোখে কথা দেখা কানে শোনারই অনুরূপ। এমন অনেক শব্দ ও পদ আছে যাহা উচ্চারণ করিতে ঠোঁটের অবস্থানের পরিবর্ত্তন ঘটে না; তবুও সেসব শব্দ যে কালারা বুঝিতে পারে তাহা স্মৃতি হইতে। ইহারা বক্তার গলার আওয়াজ সরু কি মোটা, কর্কশ কি মিঠা, চোখে দেখিয়া স্মৃতির সহিত মিলাইয়া বলিয়া দিতে পারে।

অসার রুটি (Revue Scientifique) :—

আজকালকার বাবু লোকদের মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে—যার বরণ কালো তারে না দেখাই ভালো। এই জন্য জাঁতার আটার মিষ্ট পুষ্টিকর রুটি লুচি কালো বলিয়া আর রুচে না; কলের আটার শাদা ধবধবে চিমড়ে স্বাদহীন অসার রুটি লুচি বাবুদের আহারের ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে আটা ময়দার সার পুষ্টিকর অংশটা চালিয়া ফেলিয়া শাদা ধবধবে শ্বেতসারটুকু তাঁহারা আহার করেন—এ যেন সোনা ফেলিয়া আঁচলে গেরো দেওয়ার মতন। আটার মধ্যে তৈলাক্ত পদার্থ, ফস্ফরাসঘটিত বস্তু ও নাইট্রোজেনের যৌগিক সামগ্রী থাকে বলিয়া আটা ময়লা দেখায়; যে ময়দা যত সাফ সে ময়দা তত অসার; খাসা ময়দায় খাজা হয় ভালো কিন্তু শরীরের পুষ্টি হয় না। ৫০ বৎসর আগে হাতে-ভাঙা জাঁতার আটা হইতে লাভ ও পুষ্টি দুইই হইত, এখন সকল দিকেই লোকসানের পালা পড়িয়াছে। ১০০ মণ গম হইতে আগে ৮০ মণ আটা পাওয়া যাইত, এখন চালিয়া চালিয়া সমস্ত বাদ দিয়া ৫০ মণ থাকে কি না সন্দেহ। আটায় সুজি ও চোকোলের অংশ থাকিয়া যায় বলিয়া আটা ময়দা অপেক্ষা পুষ্টিকর। ফ্রান্সে এই বোকামি বা বাবুয়ানির বিরুদ্ধে The Academy of Sciences আপত্তি তুলিয়াছেন। আমরা দুর্ব্বল ও দরিদ্র বাঙালী জাতি—আমাদের বাবুয়ানির ফ্যাশান অপেক্ষা সস্তা ও পুষ্টির বেশী দরকার। আমাদের সাবধান হওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

গন্ধের অর্থ (Literary Digest) :—

গাছপালার ফুলে পাতায় শিকড়ে নানারূপ গন্ধ থাকিতে দেখা যায়। উহার প্রয়োজন কি? কোথা হইতেই বা গন্ধের উৎপত্তি এবং বিলয়ই বা হয় কিসে? ফুলের গন্ধ [illegible] এক বিশেষ সময়ে বিশেষ বৃদ্ধি পায় [illegible] আমেরিকার দুইজন লোক উহ[illegible] গা[illegible] শ্রীরা[illegible]রা বলেন—

গন্ধযুক্ত গাছ দুই শ্রেণীর—এক শ্রেণীতে গন্ধতৈল সবুজ অংশেই আবদ্ধ থাকে, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে কেবল তাহা ফুলেই নিহিত থাকে। সবুজ-অংশে-গন্ধধারী গাছের সবুজ-অংশে গন্ধ ফুল হওয়া পর্য্যন্ত সঞ্চিত ও উপচিত হইতে থাকে; ফুল হইলে সেই গন্ধসঞ্চয় মন্থর হইয়া পড়ে। গন্ধ পাতা হইতে ডাঁটায় এবং ডাঁটা হইতে ফুলে সঞ্চারিত হয়। পুষ্প বীজ ধারণ করিলে অনেকখানি গন্ধ পুষ্পের গর্ভ ধারণে ব্যয়িত হইয়া যায়। তখনও সবুজ অংশ আরও গন্ধ উৎপাদন করিতে পারে। তথাপি গন্ধ নিষ্কাশনের জন্য ফুলের বীজ ধারণের পূর্ব্বেই গাছ পাতা সংগ্রহ করা আবশ্যক। ফুল গর্ভধারণ করিলে ফুলের গন্ধ বোঁটা বাহিয়া ডাঁটা দিয়া পাতায় আবার ছড়াইয়া পড়ে।

যে-সব গাছে শুধু ফুলেই গন্ধ থাকে তাহারাও আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—এক যাহার ফুলের গন্ধ মজ্জাগত হইয়া থাকে, যেমন গোলাপ বকুল চাঁপা প্রভৃতি; ইহাদের চটকাইয়া পিষিয়া ফেলিলেও গন্ধের বিশেষ বিকৃতি হয় না। অন্য যাহার ফুলের গন্ধ ফুলের উপরে লাগিয়া থাকে, হাতে রগড়াইলেই সুগন্ধ গিয়া দুর্গন্ধ বাহির হয়, যেমন বেল যুঁই। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ফুল একদিকে গন্ধ যেমন ত্যাগ করে আবার অমনি সঞ্চয় করিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করে—সুতরাং উহাদের গন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং ঐসব ফুল হইতে ফুল গাছে থাকিতেই গন্ধ গ্রহণ ও সঞ্চয় করিতে পারা যায়। অনেক জায়গায় গোলাপক্ষেতে ফুটন্ত গোলাপ হইতে রোজ রোজ ভিজা তুলায় গন্ধ তুলিয়া সঞ্চয় করা হয়। কিন্তু যুঁই বেল ফুল একবার গন্ধ ত্যাগ করিলে আর গন্ধ সঞ্চয় করিতে পারে না। এইজন্য এক পশলা বৃষ্টির পর গোলাপের গন্ধ পাওয়া যায় কিন্তু যুঁই বেলীর গন্ধ ধুইয়া যায়।

এই গন্ধ গাছের গর্ভধারণের সময় কাজে লাগে। এবং এই গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া পতঙ্গ এক ফুল হইতে অন্য ফুলে বিচরণ করিয়া পরাগ-নিষেককার্য্যে সাহায্য করে।

জন্তুর গায়ের গন্ধও প্রাণীবিজ্ঞানের মতে তাহাদের প্রজননের জন্য আহ্বানসঙ্কেত মাত্র।

লোণা জলে কাষ্ঠ রক্ষা (Literary Digest):—

আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারেরা দেখিয়াছেন যে যে-সমস্ত কাঠ লোণা জলে পড়িয়া বা ডুবিয়া থাকিয়াছে তাহা ৫০ বৎসরেও খারাপ হয় নাই। সকল আবিষ্কারের মতন এ আবিষ্কারও অকস্মাৎ হইয়াছে; রেলরাস্তার ধারে ধারে টেলিগ্রাফের খোঁটা ইত্যাদিতে যেটাতে যেটাতে লোণা জল আসিয়া লাগিয়াছে তাহা খারাপ হয় নাই, এবং অন্যগুলা খারাপ হইয়াছে, দেখিয়া এই তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। কাঠ বহুদিন অক্ষয় ও অক্ষত রাখিতে হইলে জলে যতখানি পর্য্যন্ত নুন গলে ততখানি নুন গুলিয়া তাহাতে কাঠ কিছুদিন ডুবাইয়া রাখিতে হয়। কাঠের গায়ে নুনের প্রলেপ লাগিয়া গেলে তাহার উপর ক্রিওজোটের পোঁচাড়া লাগাইয়া দিলে সে নুন ঝরিয়া পড়িতে পায় না। নুনের প্রলেপ যতদিন থাকে ততদিন সে কাঠ পচে না বা ঘুণে ধরে না। চারু।

জাপানের আ[illegible] (… Magazine):—

কথিত [illegible] কজন [illegible] ইয়াছিল। সুদূর [illegible] বাজহোমার স[illegible]

অতীতে সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে সূর্য্যদেবী যখন শিশু জাপান-সাম্রাজ্যকে জন্ম দিয়াছিলেন তখন আকাশের গ্রহতারকা আনন্দে গান করিয়াছিল। যে দেবীর গর্ভে জাপানের জন্ম তাঁহাকেই জাপানীরা তাহাদের ৮০০ দেবদেবীর উপরে স্থাপন করিয়াছে। জাপানের মাতা যখন ধরায় অবতীর্ণ হইলেন তখন অনেক দেবী তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছিলেন। সেই-সকল দেবীগণ সকলেই সধবা ছিলেন। তাঁহাদের সন্তান সন্ততি হইতেই জাপানের রাজপরিবারের উৎপত্তি। অতএব দেখা যাইতেছে প্রাচীনতম কালের পুরাণে নারীর প্রাধান্যই ঘোষিত হইয়াছে, পুরুষের নয়।

পুরাণবর্ণিত নারীর অভ্যাস ও ক্রিয়াকলাপ হইতে জাপ-জাতির ধারণায় রমণীর আদর্শ কিরূপ তাহা বুঝা যাইবে। বস্ত্রবুননে, সুতাকাটায়, সন্তানপালন করায় ও সংসারের কাজকর্ম্মে দেবীগণ ব্যস্ত থাকিতেন। এ আদর্শ হইতে জাপ-রমণী কখন বিচ্যুত হন নাই। নারীর কাজ কেবলমাত্র সংসারের মধ্যে আবদ্ধ, জাপানের ইতিহাস এ কথার সমর্থন করে না। এমন কি পুরাণেও বর্ণিত আছে যে একদা যখন সূর্য্য-দেবীর পুত্র সুসানো-ও মাতার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছিলেন, তখন তিনি সংসারের কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুরুষের ন্যায় পুত্রকে স্ববশে আনিয়াছিলেন; নারীচরিত্রে এই কোমল ও কঠিনের একত্র সমাবেশই জাপানের আদর্শ। প্রথম হইতেই দেখা যায় স্বার্থত্যাগেই জাপ-নারীর বিশেষত্ব। জাপানী পুরাণে য়্যামাতো-তাকেরুর পত্নী ওতো-তাচিবানার উল্লেখ দেখা যায়। তিনি মানবী ছিলেন। স্বামী যখন পূর্ব্বপ্রদেশসমূহের মধ্য দিয়া আদিম অধিবাসীগণকে জয় করিবার আশায় বাহির হন তখন তিনি তাঁহার সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। সাগামি সমুদ্র পার হইবার সময় প্রবল ঝড় উঠিল—জাহাজ ডুবিবার উপক্রম হইল। তখনকার দিনে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে ঝড়ের সময় জাহাজ রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়, ক্রুদ্ধ সাগরদেবের নিকট একটি জীবন বলিদান। সেই জন্য রুদ্র প্রকৃতিকে শান্ত করিয়া পতির জীবন রক্ষার আশায় সতী তাচিবানা মুহূর্ত্তমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগে আসিয়াও আমরা সেই একই প্রকার আদর্শ ও দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। সেই প্রাচীন দিনের একটি আদর্শ নারী হইতেছেন ওবাকো। পতি যখন কোরিয়া আক্রমণ করিতে যান তখন তিনি তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়; তিনি পতির পার্শ্বে থাকিয়া অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া সেইখানেই প্রাণত্যাগ করেন। সম্রাজ্ঞী জিঙ্গোও সেই প্রাচীন যুগে আবির্ভূত হইয়া জাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার স্বামী স্বজাতিকে শত্রু-হস্ত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি মতলব আঁটিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার জয়-পতাকা তিনি সাগরপারে কোরিয়ার মৃত্তিকায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম জাপানী সম্রাজ্ঞী যিনি বিদেশ হইতে কর আদায় করেন।

সহিষ্ণুতা ও নিষ্কলুষ অনুরাগের দৃষ্টান্তরূপে হিকেতা-নো-আকাই-কোর নাম করা যাইতে পারে। কথিত আছে সম্রাট য়ুরাকু একদা মওয়া নদীতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন একটি সুন্দরী তরুণী নদীজলে কাপড় কাচিতেছে। সে এমনি রূপসী যে সম্রাট তাহাকে দেখিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারিলেন না। অবশেষে সম্রাট তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন—"তুমি কাহাকেও বিবাহ না করিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিও। আমি তোমায় একদিন

পত্নীরূপে গ্রহণ করিব, আমার আহ্বান যতদিন না আসে ততদিন অপেক্ষা করিও।” তরুণী সম্রাটকে চিনিতে পারিয়া নত হইয়া প্রণাম করিয়া সম্মতি জানাইল। সম্রাট চলিয়া গেলেন, তরুণী ভবিষ্যৎ সুখের চিন্তায় মগ্ন হইয়া তাহার প্রাত্যহিক কর্ম্ম করিয়া যাইতে লাগিল। দিনের পর দিন চলিয়া গেল, বৎসরের পর বৎসর অতীতে মিলাইয়া গেল, তরুণী সম্রাটের আহ্বানের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। কত লোক তাহার পাণিপ্রার্থনা করিল, সকলকেই সে প্রত্যাখ্যান করিল সে যে সম্রাটের বাগ্‌দত্তা। অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে না। এমনি করিয়া কত বসন্ত কত শীত চলিয়া গেল, তাহার যৌবন অতীতের স্বপ্নে পরিণত হইল; তাহার মস্তকের কেশ শুভ্র হইয়া গেল, সোনার বরণ মলিন হইল, গাত্রচর্ম্ম শিথিল হইল—কিন্তু প্রত্যাশিত আহ্বান আর আসিল না। অবশেষে অশীতি বৎসর বয়সে সে একদিন সম্রাটের জন্য একটি উপহার লইয়া কম্পান্বিত কলেবরে রাজসভায় গিয়া দাঁড়াইল। সম্রাটের সে সব কথা মনেই ছিল না। তিনি বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—সে কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি। বৃদ্ধার মুখে সকল কথা শুনিয়া সম্রাটের পূর্ব্বকথা স্মরণে যারপরনাই অনুশোচনা হইল। কিন্তু তাহাতে তাহার ব্যর্থ জীবন যৌবন আর ফিরিল না—ভাঙা হৃদয় আর জোড়া লাগিল না।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তনের ফলে জাপ-নারী জীবে-দয়া শিক্ষাটি অতি সহজেই গ্রহণ করিয়াছিল। নারীহৃদয় স্বভাবতই কোমল—এই সময় সর্ব্বপ্রথমে

৩ ৪

জাপানের আদর্শ নারী

(১) আমাতেরাসু-ও-মিকামি, বিদ্রোহী পুত্রের সহিত স্ব...

৫ ৬

৭ ৮

জাপানের আদর্শ নারী।

(৫) ওয়াগে-নো-[illegible] (৬) সম্রাজ্ঞী কোম্যো, হাসপাতাল-প্রতিষ্ঠাত্রী।
(৭) সেইশো[illegible] [illegible]) মুরাসাকিশিকিবু, জাপানের আদর্শ পুস্তকরচয়িত্রী।
[illegible] প্রকৃতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।]

প্রচেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছিল। নারা যুগে সম্রাজ্ঞী কোম্যো দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে আহত ও পীড়িতের শুশ্রূষার জন্য একটি হাঁসপাতাল স্থাপনা করিয়াছিলেন। তিনিই আবার একটি সাধারণ স্নানাগার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন — দরিদ্রেরা সেখানে বিনামূল্যে স্নান করিতে পাইত।

নারা যুগের আর একজন স্বনামধন্যা নারীর নাম ওয়াগে-নো হিরোমুশি। অন্তর্যুদ্ধের ফলে বহু দুর্দ্দশাগ্রস্থ ব্যক্তির অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বড় ক্লেশবোধ হইয়াছিল। ফুজিওয়ারা যুদ্ধের অবসানে দেশময় শত শত পিতৃমাতৃহীন শিশু ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। তিনি তাহাদিগকে সমবেত করিয়া, একটি অনাথাশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া সেখানে তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। সম্রাট কোনিন্ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বলিতেন—অন্যে যেমন পরের কুৎসা শুনিতে ও প্রচার করিতে সদাই উৎসুক ইনি তেমন নন। ইনি কাহারো সম্বন্ধে কখনো একটি কঠিন কথা বলেন নাই।

জাপানী প্রাচীন সাহিত্যের উৎকৃষ্ট আদর্শ গেঞ্জি-মোনোগাতারি নামক পুস্তক নারীরচিত। সেই বিখ্যাত নারীর নাম মুরাসাকিশিকিবু। সেই সময়ে সেইশো-নাগোন প্রভৃতি আরো অনেক প্রতিভান্বিতা রমণীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। তখনকার অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা নারী-রচিত। কামাকুরা যুগের অন্তর্যুদ্ধের সময় অনেক রমণী মানসিক ও নৈতিক শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। এ স্থলে আমরা কেবল একজনের উল্লেখ করিব। তাঁহার নাম শিজুকা। তিনি বিখ্যাত সেনানায়ক য়োশিৎসুনের পত্নী। তিনি অসামান্যা রূপবতী ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় স্বামীর দুর্দ্দিনে তাঁহার

সকল দুঃখ-দুর্দ্দশার অংশভাগিনী হইয়াছিলেন। নিষ্ঠুর ভ্রাতা য়োরিতোমোর কবল হইতে পালাইবার সময় জাহাজ-ডুবি হইতে রক্ষা পাইয়া য়োশিৎসুনে পাহাড়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। অনুরক্তা পত্নী সেখানেও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। য়োশিৎসুনে দেখিলেন এই দারুণ অবস্থাবিপর্য্যয়ে পত্নী তাঁহাকে কোনো সাহায্যই করিতে পারিবেন না, অধিকন্তু সেখানে থাকিলে পত্নীর অপমান এমন কি মৃত্যুর সম্ভাবনা; তাই তিনি পত্নীর হাতে এক থলি মোহর দিয়া তাঁহাকে কিওতো ফিরিতে অনুরোধ করিলেন। পথিমধ্যে য়োরিতোমোর অনুচরগণ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া কামাকুরায় লইয়া গেল। সেখানে পলাতক স্বামীর গতিবিধির কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি কোনো মতেই তাহা প্রকাশ করিলেন না। এ দিকে য়োরিতোমোর পত্নী মাসাকো নৃত্যে শিজুকার পারদর্শিতার কথা শুনিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার নৃত্য দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শিজুকা কোনো প্রকারে এ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অবশেষে এই সর্ত্তে সম্মত হইলেন যে রণদেবতা হাচিমান-সামার মন্দিরের সম্মুখে নৃত্য প্রদর্শিত হইবে। স্বরচিত একটি করুণ গান গাহিতে গাহিতে তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন। গানটির মর্ম্ম হইতেছে—"য়োশিনোর পাহাড় তুষারপাতে শুভ্র হইয়া গেছে; পাহাড়ের ঢালুর উপর চারিদিকে গভীর তুষার দেখিতে পাইতেছি। একজন নিম্নে উপত্যকার দিকে নামিয়া তুষারে ডুবিয়া গেল; সে যদি আমি হইতাম!" য়োরিতোমোর পত্নী নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি আর একটি নৃত্য দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন শিজুকা গাহিলেন—"বহুদিন পূর্ব্বে বালিকা বয়সে আমি ছিলাম এক নর্ত্তকী; সমস্ত অতীত যদি ভবিষ্যতে চলিয়া আসিতে পারিত, যদি তাহা আমার প্রিয়তমের গৌরব ফিরাইতে পারিত!" দেবমন্দিরের সম্মুখে শিজুকা এরূপে য়োশিৎসুনের প্রতি প্রেম প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া য়োরিতোমো কুপিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু পত্নীর প্রার্থনায় সে সংকল্প ত্যাগ করিলেন। স্বামীর প্রতি শিজুকার অনুরাগ দর্শনে প্রীত হইয়া মাশাকো তাঁহাকে বহু উপহার দিয়া সাদরে কিওতো পাঠাইয়া দিলেন।

সু।

রক্তের সাক্ষ্য (Literary Digest) :—

রূপকথার রাজারা সুয়োরাণীর কথায় দুয়োরাণীর ছেলে-মেয়েদের রক্ত দেখিতে চাহিলে বাপের চেয়েও সদয় জল্লাদ কুকুর-শেয়ালের রক্ত দেখাইয়া রাজাদের ঠকাইত বলিয়া ঠাকুরমাদের মুখে শুনা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতি হওয়াতে এখন আর কুকুর-শেয়ালের রক্ত মানুষের বলিয়া চালাইবার উপায় নাই। কেহ এখন মানুষের রক্তপাত করিয়া অপর জন্তুর রক্ত বলিয়া নিজের পাপও গোপন করিতে পারিবে না। এই আবিষ্কারে অপরাধ নিরূপণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

এই বিভিন্ন প্রাণীর রক্তের বিভিন্নতা আবিষ্কার করিয়াছেন আমেরিকার দুজন ভূতত্ত্ব-ও-খনিজতত্ত্ববিদ্। তাঁহারা বিভিন্ন বস্তুর দানা-বাঁধার নিয়ম আকার ও প্রকৃতির তারতম্য সম্বন্ধে গবেষণা করিতে করিতে রক্তের দানা-বাঁধার প্রকৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন।

রক্ত এক প্রকার রসের (serum) মধ্যে ভাসমান অসংখ্য অতি-ক্ষুদ্র কণিকার সমষ্টি মাত্র। এই-সমস্ত কণিকার (corpuscles) অধিকাংশের মধ্যে এক প্রকার লাল রং (hemoglobin) থাকে, সেইজন্য রক্তকে লাল দেখায়। এই লাল রং বাতাস হইতে অম্লজান বা অকসিজেন গ্যাস গ্রহণ করিয়া শরীরের টিশুগুলির পুষ্টিসাধন করে।

তাজা রক্তে এই রক্ত-রং (hemoglobin) প্রত্যেক রক্ত-কণিকায় বিযুক্ত অবস্থায় থাকে। তখন কোনো পরীক্ষাতেই বিভিন্ন জন্তুর রক্তের স্বতন্ত্রতা ধরা যায় না। কিন্তু রক্ত কিছুক্ষণ বাতাস পাইলেই জমিয়া দানা বাঁধিয়া যায়। তখন সেই দানা-বাঁধা রক্ত অনুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিলে বিভিন্ন জীবরক্তের বিভিন্নরূপের দানা দেখিতে পাওয়া যায়: সেইসব দানার আকার একবার চেনা হইয়া গেলে পরে রক্তের দানা দেখিয়া কোন্ জীবের রক্ত তাহা বলিয়া দেওয়া আর কঠিন হয় না। এমন কি শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির রক্তের দানাও আকারে বিভিন্ন; কিন্তু মানুষ ও বানরের রক্তের দানাতে এতই সামান্য প্রভেদ যে সহসা চিনিয়া সনাক্ত করা বড়ই কঠিন।

মানুষের রক্তদানা।

ইহাতে আর একটি প্রাণীতত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। মানুষে ও বানরে আকৃতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও জাতিগত ঐক্য প্রমাণিত হইতেছে; ইহা ডারউইন প্রভৃতির থিওরি সমর্থন করিতেছে। এইরূপ অন্যান্য অন্যান্য অনেক জন্তু, যাহাদিগকে পরস্পরের আত্মীয় বলিয়া জানা ছিল তাহারা পৃথক গোষ্ঠীর বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে; এবং যাহাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তা সন্দেহও করা যায় নাই, তাহারা পরমাত্মীয় বলিয়া ধরা পড়িতেছে। গিনিফাউল মুরগীর জাতি বলিয়া জানা ছিল, কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে উহাদের মধ্যে রক্তসম্পর্ক মোটেই নাই; গিনিফাউল অষ্ট্রীচ বা উট পাখীর জাতি। ভালুক স্থলচর কুকুর, শেয়াল, নেকড়ে বাঘ প্রভৃতির কেউ নয়; তাহার রক্তের সম্পর্ক জলচর শীল ও জল-সিংহের সঙ্গে।

এই তত্ত্ব সম্প্রতি ধরা পড়িয়াছে। ইহার নব নব বিচিত্রতা ক্রমশ প্রকাশ পাইবে। এই প্রসঙ্গে প্রদত্ত বিভিন্ন জন্তুর রক্তদানার চিত্রগুলি পরস্পর মিলাইয়া দেখিলে [illegible] উপলব্ধি করা যাইবে।
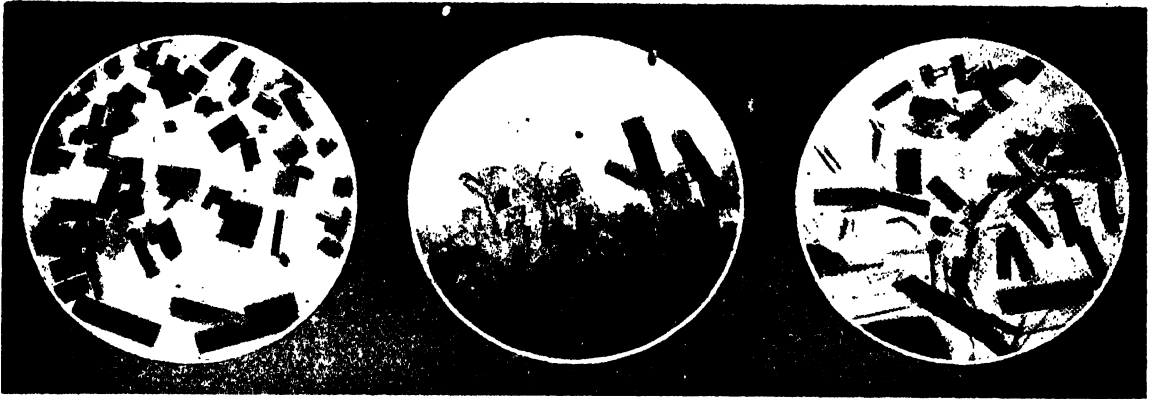
বেবুন বানরের রক্তদানা। শিম্পাঞ্জির রক্তদানা। ওরাং-ওটাং বানরের রক্তদানা।

আলোচনা

বাঙ্গালার ঐতিহাসিক—

পাবনায় উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন উপলক্ষে নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বক্তৃতা-প্রসঙ্গে প্রবাসীর মন্তব্য পাঠ করিলাম। ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান-ক্ষেত্রে প্রবাসী-সম্পাদক যাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে আরও কয়েকটি নামের সংযোগ না করিলে তাঁহার মন্তব্য সম্পূর্ণ হয় না বিবেচনায় এ স্থানে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিলাম। স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য ইনি ঢাকার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক বিবরণী 'নব্যভারতে' এবং 'সাহিত্য' ইত্যাদি পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'ফরিদপুরের ইতিহাস' 'বারভুঁইয়া' ইত্যাদি গ্রন্থরচয়িতা প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়, 'রাজমালা' ও 'সেনরাজবংশ'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ, 'ময়মনসিংহের ইতিহাস'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার, 'মোগলরাজবংশ', 'হজরত মহম্মদ' ইত্যাদির রচয়িতা শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত, 'ঢাকার ইতিহাস'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত ('আদোর গম্ভীরা' রচয়িতা), খান বাহাদুর সৈয়দ ঔলাদ হোসেন, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, ৺সুখবিন্দু সেন, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু, ৺মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি।

আমি যাঁহাদের নামোল্লেখ করিলাম তাঁহারা সকলেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত, কাজেই তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা সুসঙ্গত বিবেচনা করি।

অবশেষে আমার একটা বক্তব্য আছে। আমাদের দেশের রাজা মহারাজা বা জমিদারেরা সাহিত্যের ধার বড় একটা ধারেন না। যে দু'একজন মহাত্মা এদিকে অগ্রসর হ'ন, তাঁহাদের অভিভাষণে কোনরূপ দলাদলি কিংবা সংকীর্ণতার গন্ধ থাকিলে বড়ই মনঃক্লেশের কারণ হয়। মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ শুধু দুই একজন কৃতী ঐতিহাসিকের নামোল্লেখ করিয়াই তাঁহার প্রশংসার ভাণ্ডার শূন্য করিয়া [illegible] মহারাজা, তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বত্র পড়াই [illegible] দিকে [illegible] করিলেই ভাল করিতেন। [illegible] কজন [illegible] ও মহৎ হইলে [illegible] বাজে হোমার ও [illegible]

আমি বিশেষজ্ঞ নহি, যদি আমার কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তাহা হইলে কেহ দেখাইয়া দিলে আনন্দিত হইব।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বাঙ্গলা শব্দকোষ—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় উক্ত পুস্তকখানি সঙ্কলন করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তিনি এই পুস্তকে যথেষ্ট পরিশ্রম, গবেষণা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, "ইহার সমকক্ষ বাংলা অভিধান দেখি নাই, শীঘ্র দেখিবার সম্ভাবনাও দেখিনা।" কিন্তু এই গ্রন্থ যদিও উপাদেয় হইয়াছে, তথাপি সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্য হয় নাই। চারু বাবু চৈত্রের 'প্রবাসী'তে তন্মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু একটী কথার উল্লেখ চারুবাবু করেন নাই। সেটি এই যে গ্রন্থকার অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি-নিরূপণে অত্যধিক পরিমাণে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য, সেই শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি-নিরূপণ সহজ নহে এবং গ্রন্থকার ঐ-সকল ব্যুৎপত্তি-নিরূপণে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেগুলি মনঃপূত হয় না; গ্রন্থকারের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না; কিন্তু সেই ব্যুৎপত্তিগুলি যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে কিছুতেই ইচ্ছা হয় না। গ্রন্থমধ্যে ঐরূপ শব্দ অনেক আছে। সমুদয়গুলির উল্লেখ সম্ভবপর নহে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কতকগুলি শব্দ নিম্নেলিখিত হইল। অপর কতকগুলি শব্দের ব্যুৎপত্তি ঠিক হয় নাই বলিয়া আমার মনে হয়। আমার মতে সেগুলির ব্যুৎপত্তি কি হওয়া উচিত তাহাও লিখিত হইল। আমি কেবলমাত্র দোষ দেখাইবার জন্য এই বিষয়ের অবতারণা করিতেছি না। যাহাতে সত্য প্রকাশিত হয় ইহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আশা করি যাঁহারা এ বিষয়ে সমর্থ, তাঁহারা উদ্ধৃত শব্দগুলির যথার্থ ব্যুৎপত্তি-নিরূপণে সহায়তা করিবেন।

অথর্ব্ব বা অথব্ব—যোগেশ বাবু বলিতেছেন, চতুর্থবেদ অথর্ব্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অথর্ব্ব শব্দে চতুর্থ বেদ বুঝায়, তাহা হইতে মানবের চতুর্থদশা জরাবাচক হইয়াছে। ব্যুৎপত্তিটি বুদ্ধির পরিচায়ক বটে, কিন্তু পুষনঃত হয় না।
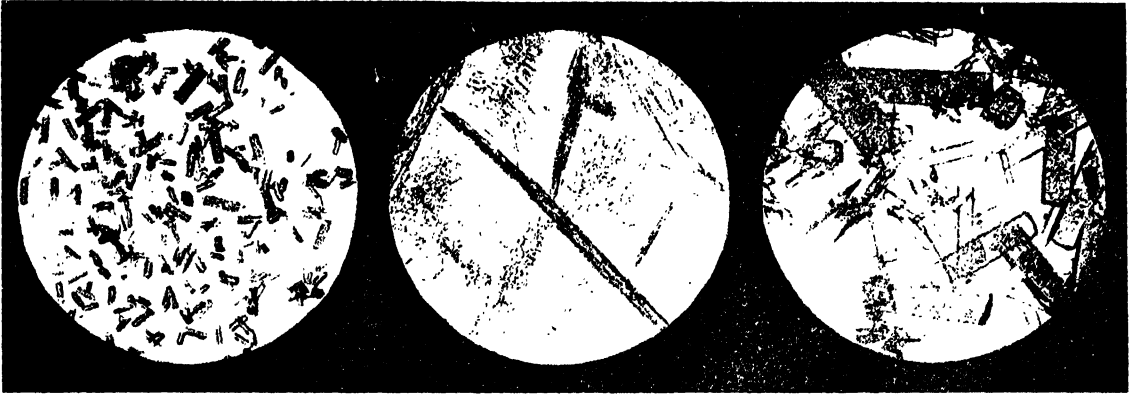
বাঘের রক্তদানা। বিড়ালের রক্তদানা সিংহের রক্তদানা।

আঙ্গট—যেমন আঙ্গট কলার পাতা। যোগেশবাবু বলেন 'অখণ্ড' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'অখণ্ড' হইতে 'আঙ্গট' কিরূপে হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না।

আঁচীল—যোগেশবাবুর মতে চর্ম্মকীল হইতে হইয়াছে। কিন্তু কিরূপে হইল তাহা বুঝা যায় না।

আঞ্জা—কথাটা আঁয়জা বলিয়াই স্ত্রীলোকদের মধ্যে শুনা যায়। যোগেশ বাবুর মতে 'অন্তরজন্ম' হইতে হইয়াছে, কিন্তু কিরূপে হইল বুঝা কঠিন।

আড্ডা—বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে সংস্কৃত অট্ (প্রাসাদের উপরের গৃহ) হইতে হইয়াছে। কিন্তু কিরূপে হইল? আড্ডার সহিত অট্টের কি সম্পর্ক আছে? তিনি কি বলিতে চান যে পূর্ব্বে প্রাসাদের উপরের গৃহে আড্ডার স্থান ছিল?

আড়—বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে 'আয়তি' হইতে হইয়াছে, কিন্তু কিরূপে হইল বুঝা কঠিন।

আড়েহাতে—বিদ্যানিধি মহাশয় নিশ্চয় করিয়া ইহার ব্যুৎপত্তি লেখেন নাই। তবে দুইটী ব্যুৎপত্তি সম্ভবপর বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে। প্রথমটী নিতান্তই হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। এ একটা সম্পূর্ণ নূতন তথ্য। দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তিটিও সম্ভবপর মনে হয় না। 'আড়েহাত' কি পদ গ্রন্থকার তাহা লেখেন নাই, কিন্তু অর্থ লিখিতেছেন, 'চিন্তায় কাতর'। তাহা হইলে ইহা কি বিশেষ্যের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়? 'যে ব্যক্তি চিন্তায় কাতর', এরূপ স্থলে 'যে ব্যক্তি আড়ে হাত' এ প্রকার বলা চলে কি? আমরা ত ক্রিয়ার বিশেষণ রূপেই ইহার ব্যবহার দেখিয়াছি, যথা, 'সে আড়ে হাতে লাগিয়াছে।'

আর্দ্দাশ—যোগেশ বাবু লিখিতেছেন (সং অর্দ্ ধাতু=যাচনা+আশ?) হইতে হইয়াছে। কিন্তু ফারসী অর্জ্ দাস্ত হইতে উৎপন্ন হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।

আসর—যোগেশ বাবুর মতে সংস্কৃত 'অবসর' 'অবকাশ' হইতে উৎপন্ন। কিন্তু অবকাশ হইতে সভা বা মজলিশের অর্থ কিরূপে হইল তাহা দেখান নাই। চারুবাবু বলেন যে আসর ফারসী শব্দ এবং তিনি ফারসী কেতাবে আলেফ, সে, রে, বানানের আসর শব্দ আমরা যতদূর জানি মজলিশ অর্থে আসর শব্দের প্রয়োগ কখন দেখি নাই।

আঁস্তাকুড়—যোগেশ বাবুর মতে উচ্ছিষ্ট হইতে আঁষ্টা, তাহা হইতে আঁস্তা ও কুল হইতে কুড়। উচ্ছিষ্ট হইতে কিরূপে আঁষ্টা হইল তাহা দেখান উচিত ছিল। কুল ওড়িয়া ভাষায় কুড় হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গলায় কি ঐরূপ হয়? [Houghton's অভিধানে "আচমন-কুণ্ড" হইতে বলা হইয়াছে।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

এঁড়েলাগা—এখানে ব্যুৎপত্তিটি যেন নিতান্তই গরজে পড়িয়া করা হইয়াছে—যেন ব্যুৎপত্তি ঠিক করিতেই হইবে, সেইজন্য কোনরূপে একটা ব্যুৎপত্তি খাড়া করা হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় সন্তান কন্যা হইলে কি হইবে? তাহা হইলে কি প্রথম সন্তানের এঁড়ে লাগিয়াছে এরূপ বলা চলিবে না?

এলেমান—যোগেশ বাবুর মতে ইহা আরবী আলেমান (শিক্ষিত) শব্দ হইতে উৎপন্ন। ভারতচন্দ্র হইতে এই অর্থের সমর্থক নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—"দিনেমার এলেমান করে ওলন্দাজী।" এখানে ওলন্দাজী পাঠ যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে ওলান্দাজী শব্দের অর্থ কি? সাধারণতঃ ওলন্দাজী অর্থে আজগুবি বা অদ্ভুত বুঝায়, যেমন ওলন্দাজী কাণ্ড। অথবা ওলন্দাজী অর্থে হয়ত গুণ্ডামি বা ষণ্ডামি বুঝায়। এখন, যদি যোগেশ বাবুর মতানুসারে 'এলেমান' অর্থে শিক্ষিত ধরা যায়, তাহা হইলে উদ্ধৃত বাক্যের অর্থ "শিক্ষিত দিনেমার একটা অদ্ভুত কাণ্ড করিতেছে", অথবা "শিক্ষিত দিনেমার ষণ্ডামি করিতেছে", এইরূপ হইবে। কিন্তু এরূপ অর্থ কি সম্ভবপর? শিক্ষার সহিত 'ওলন্দাজীর' বিশেষ সম্বন্ধ কি তাহা বুঝা যায় না। বরং শিক্ষিত হইলে 'ওলন্দাজী' না করাই অধিকতর সম্ভবপর। আর এক কথা, ভারতচন্দ্র বিশুদ্ধ 'আলেমান' শব্দের প্রয়োগ না করিয়া অপভ্রংশ 'এলেমান' ব্যবহার করিলেন কেন? তিনি পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ করা সম্ভবপর নয়। উক্ত কারণ-বশতই একবচনান্ত 'দিনেমার' শব্দের বহুবচনান্ত 'এলেমা[illegible] তাহার পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় [illegible] কি? আমার

কুকুরের রক্তদানা। শৃগালের রক্তদানা।

তাহার পূর্ব্বের বাক্যগুলি বিবেচনা করিলে, এই অর্থ অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বর্দ্ধমানের বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি লিখিতেছেন ;—

প্রথম গড়েতে কোলা পোষের নিবাস।
ইংরেজ ওলান্দাজ ফিরিঙ্গী ফরাস।
দিনেমার এলেমান করে ওলন্দাজী।
(অন্যপাঠ গোলন্দাজী)
সফরিরা নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী ॥ ইত্যাদি

এখানে তিনি ইউরোপীয় অনেক জাতিরই উল্লেখ করিয়াছেন, যথা ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার। তৎসঙ্গে জর্ম্মান জাতির উল্লেখও অসম্ভব নয়। যদি বলেন German না লিখিয়া Allemand শব্দের অপভ্রংশ 'এলেমান' লিখিলেন কেন, তাহার উত্তর এই যে 'অনেক' শব্দ ফরাসী ভাষা হইতে রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে। ইংরেজ শব্দও ফরাসী anglaise আংগ্রেজ শব্দের রূপান্তর মাত্র। ভারতচন্দ্র কিছুকাল ফরাসডাঙ্গায় বাস করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে German অর্থবোধক allemand শব্দ জানা অসম্ভব নয়।

যদি 'ওলন্দাজীর' পরিবর্ত্তে 'গোলন্দাজী' পাঠ ধরা যায়, তাহা হইলে 'এলেমান'এর অর্থ শিক্ষিত ধরিলে বিশেষ অসঙ্গতি হয় না; তবে ভারতচন্দ্র একবচনান্ত বিশেষ্যের বহুবচনান্ত বিশেষণ কেন প্রয়োগ করিলেন, এ আপত্তির কোন মীমাংসা হয় না।

চৌবাচ্চা—ইহার ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে; "ফাঃ চা—বাচ্চা—ছোটবাচ্চা। ক্ষুদ্র জলাধর।" ছোট বাচ্চা হইতে ক্ষুদ্র জলাধার অর্থ কিরূপে হইল তাহা বুদ্ধির অগম্য। চৌবাচ্চার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যদি ছোট বাচ্চাই হয়, ত উহাতে কেবল ক্ষুদ্র জলাধার বুঝায় কেন? ছোট জিনিষ মাত্রকেই কেন বুঝাইবে না? তা ছাড়া, 'চা' মানে যে ছোট তাহা দুই তিন খানি অভিধান খুঁজিয়াও পাইলাম না।

ঐছন—যোগেশ বাবু ইহার নিম্নলিখিতরূপ ব্যুৎপত্তি ও অর্থ দিয়াছেন। ("সং ক্ষণ—হি ছন ; ক্ষণ—সময়, উৎসব)। ঐক্ষণ, ঐ সময় : এমন, ঐ উৎসব।" যোগেশ বাবু বলিতেছেন কথাটী হিন্দী এবং উহা সংস্কৃত ক্ষণ হইতে [illegible] ঠিক বলিয়া মনে হয় না। হিন্দী [illegible] দিকে [illegible] ন্তু 'ঐ ক্ষণ'কে হিন্দীতে 'ঐ[illegible] কজন [illegible] ও 'ঐছন' হিন্দী 'ঐস[illegible] বাজহোমার ও হইয়া গিয়াছে।

হিন্দীতে 'সন্' 'সা'-এর রূপান্তর মাত্র; অর্থ, সাদৃশ্য। যেমন 'ঐসন্' বা 'ঐসা' 'কৈসন' বা 'কৈসা', 'যৈসন্' বা 'যৈসা', ইত্যাদি।

ওলন্দাজ—বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ। "ইং Holland-Dutch। হলাণ্ডদেশ-বাসী ডাচ—হলাণ্ডাচ—অলান্দাজ—ওলান্দাজ—ওলন্দাজ।" ইংরাজীতে Holland-Dutch বলিয়া কোন শব্দ আছে তাহা আমরা জানিতাম না। আমরা ত জানিতাম যে হলাণ্ডদেশবাসীকেই Dutch বলে, সুতরাং Holland-Dutch বলা নিষ্প্রয়োজন। যদি Holland-Dutch বলা চলে, তাহা হইলে England-English বলাও বোধ হয় চলিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ওলন্দাজ শব্দ Holland-Dutch হইতে উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু Hollanders হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন drawers হইতে দেরাজ।

করতব—যোগেশ বাবু বলেন ইহা সংস্কৃত কর্ত্তৃত্ব হইতে হইয়াছে, কিন্তু 'কর্ত্তব্য' হইতে হইয়াছে বলিলে দোষ কি? কোন্‌টা অধিক সম্ভবপর?

কাশীয়াল—যোগেশ বাবুর মতে ইহার অর্থ কাশীবাসী। কিন্তু কাশীয়াল বা কেশেল বলিলে শুধু কাশীবাসী বুঝায় না। 'কেশেল' কাশীবাসীদের পক্ষে একটা গালি। কাশীবাসীকে 'কেশেল' বলিলে সে মহা ক্রুদ্ধ হয়।

কাবিষ—অর্থ চেষ্টা। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন ইহা ফারসী শব্দ। চেষ্টা অর্থে কাবিষ বলিয়া কোন ফারসী শব্দ আছে কিনা তাহা বলিতে পারি না। আমরা ত 'কোষিষ্' মানে চেষ্টা ইহাই জানি এবং এইরূপ প্রয়োগই বরাবর শুনিয়া আসিতেছি।

কেলা—যোগেশ বাবুর মতে সং খেলা বা কেলি হইতে হইয়াছে। কেলাই-খেলাই-কেলি করাই। কিন্তু ইহার অর্থ ছাড়ান বা উন্মুক্ত করা। হিন্দী খিলা, খিলানা (অর্থ খোলা, প্রস্ফুটিত করা) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

কোর্ম্মা—বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার অর্থ "বিনা হলুদে ব্যঞ্জন" এইরূপ লিখিয়াছেন। আমি কিন্তু দুই তিন খানি অভিধান খুঁজিয়াও ঐ অর্থ পাইলাম না। উহাতে কোর্ম্মা অর্থে ভাজা জিনিষ, বিশেষতঃ ভাজা মাংস এইরূপ লিখিত আছে।

(মুতলক্ ভুনী হুঈ শয়্ খরস্থসন্ গোশ্‌ত্ ভুনা হুআ)

কোলা—যেমন কোলা বেং। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন 'ঘোলা', 'গোলা' হইতে 'কোলা' উৎপন্ন হইয়াছে। ঘোলা জলে থাকে বলিয়া 'কোলা' বেং বলা হইয়া থাকে, সম্ভবতঃ বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই মত। কিন্তু তাহা ঠিক বোধ হয় না। ফারসী কোল (=পুকুর, গর্ত্ত) হইতে কোলা নাম হইয়াছে। যে বেং পুকুরে বা গর্ত্তে থাকে, তাহাই কোলা বেং।

খোকা—খক্ খক্ হইতে—যে সর্ব্বদা হাসে সে খোকা। খক হাস্য হইতে খকা, খোকা। বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে খোকার ব্যুৎপত্তি এইরূপ। কিন্তু ইহাতে কয়েকটী আপত্তি আছে। ১ম, খক্ খক্ বাঙ্গালাতে হাসির শব্দ নহে, কাশির শব্দ। অতএব খক্ খক্ হইতে যদি খোকার উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে খোকা অর্থে শিশু না হইয়া বরং বৃদ্ধ হওয়া উচিত। কারণ বালক অপেক্ষা বৃদ্ধেরাই

খক্ খক্ শব্দে অধিক পরিমাণে কাশিয়া থাকে। ২য়, যদিও তর্কস্থলে হাসির শব্দ খক্ খক্ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে শিশু খক্ খক্ করিয়া হাসে বলিয়া যেমন এক দিকে তাহার নাম খোকা হইতে পারে, তেমনি অন্যদিকে সে টেঁ টেঁ প্যাঁ প্যাঁ করিয়া কাঁদে বলিয়া তাহার নাম টেঁটা বা পেঁপা কেন না হইবে? কারণ, হাসির অপেক্ষা শিশুর কান্নার ভাগ যে বড় কম তাহা নয়, বরঞ্চ বেশী।

গজল—অর্থ, স্তোত্র বা প্রণয়বিষয়ক কবিতা। বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার উদাহরণ দিতেছেন, "গজল করিলা তুমি আজব কথায়। ভাঃ"। এখানে 'গজল করিলা' এ কথার অর্থ কি? ইহার অর্থ কি 'স্তোত্র পাঠ করিলা' বা 'প্রণয়বিষয়ক কবিতা লিখিলা?' যেস্থলে ভারতচন্দ্র ঐ কথা লিখিয়াছেন, সে স্থলে স্তোত্র বা প্রণয়ের নাম গন্ধও নাই। তবে ঐ অর্থ কি করিয়া সঙ্গত হইবে? প্রকৃত কথা এই যে ঐ স্থলে 'গজল' কথাটা ভুল। ভারতচন্দ্রের ভুল নহে, ভুল বাঙ্গালার মুদ্রাকরের ও অভিধানকারের। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছিলেন "গজব করিলা তুমি আজব কথায়", কিন্তু মুদ্রাকর ভ্রম বশতঃ গজবের স্থানে 'গজল' করিয়া ফেলিয়াছে। আমি পুরাতন অন্নদামঙ্গলে "গজব করিলা তুমি আজব কথায়" এই পাঠ দেখিয়াছি। মুদ্রাকরের এরূপ ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয় কিরূপে ঐ ভুল বজায় রাখিলেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। 'গজব করিলা' মানে এখানে 'আশ্চর্য্য করিলে' 'অবাক করিলে।' এরূপ প্রয়োগ হিন্দী ও উর্দ্দুতে সর্ব্বদাই শুনা যায়। পশ্চিমাঞ্চলে অতি সাধারণ লোকেও কথায় কথায় বলিয়া থাকে, "তুমনে তো গজব কিয়া।"

গন্নাকাটা—বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার নিম্নলিখিতরূপ ব্যুৎপত্তি ও অর্থ লিখিয়াছেন। "স্কন্ধ হইতে গন্না। স্কন্ধ কাটা যার, কবন্ধ।" স্কন্ধ হইতে 'গন্না' কিরূপে হইবে তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। আর, 'গন্না কাটার' মানে কি কবন্ধ? আমরা ত জানি যে 'গন্না কাটা'র মানে 'যাহার উপর-ঠোঁঠ মাঝখানে কাটা।' গ্রন্থকার নিজেও ৩৮৫ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, "গন্নাকাটা—ওঃ গ্রহণ-খণ্ডিআ অর্থাৎ গ্রহণ-খণ্ডিত। যাহার উপর-ঠোঁঠ কাটা।" গ্রন্থকার দুই স্থানে দুই রকম অর্থ দিতেছেন, কোন্‌টী গ্রহণ করিব?

ঘাগী—যোগেশ বাবুর মতে ইহার ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ :— "ঘা—ঘাগী—হি ঘাগ। যে পুনঃ পুনঃ আঘাত খাইয়াছে। চতুর।" এই ব্যুৎপত্তি সম্ভবপর মনে হয় না। যে-সকল শব্দ হিন্দী ও বাঙ্গালাতে প্রায় একইরূপ, তাহাদের ব্যুৎপত্তি স্থির করিতে হইলে যে ব্যুৎপত্তি উভয় ভাষাতেই খাটিবে, তাহাই ঠিক। এখানে 'ঘাগী' শব্দের যে ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন তাহা বাঙ্গলা 'ঘাগী' সম্বন্ধে খাটিলেও খাটিতে পারে, কিন্তু উহাই হিন্দী প্রতিরূপ "ঘাগ" সম্বন্ধে খাটিবে না। কারণ 'ঘাগী' শব্দটা বাঙ্গলা, হিন্দীতে এরূপ কোন শব্দ নাই।

ঘেঙ্গা, ঘেঙ্গাই—"হেঁগো হইতে। হেঁগো, হেঁগো রবে অতি নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করা।" যোগেশ বাবুর মত ঐরূপ। কিন্তু ঘেন্ ঘেন্ কিম্বা গেঁ গেঁ হইতে হইয়াছে বলিলে দোষ কি?

ঘেন্ ঘেন্—যোগেশ বাবু বলেন, ইহা তাড়নার্থক হন্ ধাতু হইতে

চাকমা বেবুন বানরের রক্তদানা।

উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এ প্রকার শব্দ onomatopoetic বলিয়াই মনে হয়।

চাকর বাকর- যোগেশ বাবু বাকরের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা কি ভিখার বা বেগার শব্দ? কিন্তু এখানে 'বাকর'কে 'চাকরের' reduplication বলিলে দোষ কি? বাঙ্গলাতে ত প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে। যেমন, ভাতটাত, বইটই। এখানে 'টাত' বা 'টই'এর ব্যুৎপত্তি নিরূপণের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

চৌ-গোঁপ্পা—বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার নিম্নলিখিত রূপ ব্যুৎপত্তি ও অর্থ লিখিয়াছেন। "(চোবে হইতে চৌ; গোঁফ+আ=গোঁপ্পা) বৃহৎ গোঁপবিশিষ্ট।" গ্রন্থকার সর্ব্বত্র দেখাইয়াছেন যে 'চতুরং' হইতে চৌ হইয়াছে, কিন্তু এখানে অন্যরূপ হইল কেন? আর 'চোবে'র মানেই বা এখানে কি? স্থানান্তরে তিনি লিখিয়াছেন যে 'চতুর্ব্বেদী' হইতে 'চোবে' হইয়াছে। তাহা হইলে চৌ-গোঁপ্পার অর্থ হইল কি? যাহার চোবের ন্যায় অর্থাৎ চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের ন্যায় গোঁপ? চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের কি বৃহৎ গোঁপ আছে না কি?

ছয়লাপ—বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে সংস্কৃত 'সুপ্লাবিত' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ইহা ফারসী সয়্‌লাব্ (—জলপ্লাবন) শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

ছিচ্‌কা চোর—যে সিঁদকাটি দিয়া চুরি করে। ছোট জিনিষের চোর। যোগেশ বাবু ইহার উল্লিখিত দুই প্রকার অর্থই লিখিয়াছেন। কিন্তু আমরা ত জানিতাম যে ছিচ্‌কা চোর বলিলে ছোট জিনিষের চোরই বুঝায়; যাহারা সিঁদ দিয়া চুরি করে তাহাদিগকে সিঁদেল চোর বলে।

জিরা—ইহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। "সং বিশ্রাম—প্রা বিচরাম, ইহা হইতে চিরাই-জিরাই।" এরূপ ব্যুৎপত্তি নিতান্তই কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়।

ঝিনুক—ইহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। "যথা শম্বুক হইতে শামুক, তাহা হইতে ছামুক, ছিমুক, ঝিনুক।" শম্বুক হইতে শামুক সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু শামুক হইতে ঝিনুক উৎপন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইলে অনেকটুকু কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। আর একটা জিজ্ঞাস্য এই যে [illegible] হইল, কিন্তু শামুক একার্থ-বোধক ও ঝি[illegible]

টাকরা [illegible] তালুক হইতে টাকরা আসা [illegible] ব্যুৎপত্তি

নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে তালুক হইতে টাকরা অতি সহজেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। যথা, তালুক হইতে বর্ণ বিপর্য্যয়ে তাকুল, উ লোপ হইয়া তাকল, আ যুক্ত হইয়া তাকলা, ল স্থানে র ও ত স্থানে ট হইয়া টাকরা নিষ্পন্ন হইল। 'সমাধি' হইতে যদি 'ঝিমা' হইতে পারে, অথবা 'অধ্বলক্ষ্য' হইতে যদি 'ঝরকা' হইতে পারে, তাহা হইলে 'তালুক' হইতে 'টাকরা' কেন হইবে না তাহা বুঝা কঠিন।

টেঁস টেঁস– বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার নিম্নলিখিত রূপ ব্যুৎপত্তি ও অর্থ লিখিয়াছেন। "(টস্ টস্ হইতে অশিষ্টতা ও গ্রাম্যতায় টেঁস্ টেঁস্)। রসপূর্ণ ভাবে, প্রঃ—টেঁস টেঁস করিয়া কতকগুলা কথা শুনাইল—এমন রস দিয়া যে তাহাতে ক্রোধ জন্মে। টেঁস্ টেঁসাঃ—টেঁস টেঁসিয়া,—রসযুক্ত, ছলপূর্ণ। প্রঃ টেঁস টেঁসা কথা।" বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে টেঁস টেঁস মানে রসপূর্ণভাবে, টেঁস টেঁসিয়া মানে রসযুক্ত। কিন্তু আমরা ত টেঁস টেঁস বা টেঁস টেঁসিয়ার অর্থ ইহার বিপরীত বলিয়াই জানি। অর্থাৎ টেঁস টেঁসে মানে নীরস। যেমন জলটা টেঁস টেঁস কচ্চে অর্থাৎ বিস্বাদ। সেইরূপ টেঁস টেঁস ক'রে দুকথা শুনাইল, তার অর্থ নীরস বা কর্কশভাবে দুকথা শুনাইল। রসপূর্ণ করিয়া কথা শুনাইলে তাহাতে ত ক্রোধ হইবার কথা নয়, বরং তাহাতে সন্তুষ্ট হইবারই কথা।

টেঁস ফিরিঙ্গি—ইহার ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে। "যে ফিরিঙ্গি ইংরেজীতে অনর্গল রসিকতা করে (উপহাসে) অর্থাৎ পারে না।" এ ব্যুৎপত্তি কতদূর সম্ভবপর ও সঙ্গত তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

ট্রাম—যোগেশবাবু ইহার এই অর্থ লিখিয়াছেন ;—"লোহার রেলে চালিত ঘোড়ার গাড়ী।" তাহা হইলে কলিকাতার রাস্তায় যে ইলেক্‌ট্রিক গাড়ী চলে তাহাকে কি বলা যাইবে ?

ডাক—যোগেশবাবু ইহার এইরূপ অর্থ ও ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন, "পত্র বহন, পত্র প্রেরণ, পত্র। পূর্ব্বকালে পথে বাঘ ভালুক ও দস্যুর ভয়ে পত্রবাহক চীৎকার করিতে করিতে পত্র লইয়া যাইত।" দস্যুর ভয়ে চীৎকার করিয়া কি ফল হইত তাহা ত বুঝা যায় না। বাঘ ভালুক না হয় চীৎকারে পলাইতে পারে, কিন্তু চীৎকার করিলে দস্যুও কি ভয় পাইয়া পলায় ? সে যাহা হউক, "ডাকে"র আর একটা অর্থ আছে, সেখানে এই ব্যুৎপত্তি কিরূপে খাটিবে ? যেমন, ঘোড়ার ডাক বা মানুষের ডাক বসান হইয়াছে। এখানে ডাকের অর্থ relay. এইরূপ relay দ্বারা পত্র প্রেরণ করা হইত বলিয়া পত্র প্রেরণ, পত্র বহন বা পত্র "ডাক" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, পত্রবাহক চীৎকার করিত বলিয়া নহে।

ডামাডোল—বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার অর্থ লিখিয়াছেন, "ধামা ও ডোল ; ডোলের মত স্ফীত বা বৃহৎ।" কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলে ডামাডোলের অর্থ কি হইবে ?

"কামিনী। বাথা পেলে, ব্যথাও নিবারণ করে' রাত্রিটী পোহাল ; সকালে দোর খুলে দেখি, মেঝদিদি গলায় খুর দিয়ে ম'রে রয়েছে—রক্ত ঢেউ খেলছে। বেঁচেছে ঘর-জামায়ের হাত এড়িয়েছে।

ভবী। বড় ডামাডোল হ'লো ?

কামিনী। হ'লোনা ? বাবার হাতে দড়ী পড়ে পড়ে। কত লোক কত কথা বল্‌তে লাগ্‌লো। ইত্যাদি" (জামাই বারিক)

এখানে ডামাডোলের অর্থ কি ধামা ও ডোল ? না ডোলের মত স্ফীত ?

ডোকরা—ভা[illegible] জর [illegible] (এক ডোকরা বামণ।' বিদ্যা[illegible] [illegible] কজন [illegible]) এখানে ভ্রমক্রমে 'ডে[illegible] বাজ হোমার ও তাঁহার মতে ডোকরা কথাটা ঠিক নহে, 'ডেকরা' ঠিক। কিন্তু আমরা ত 'বুড়ো ডোকরা' এরূপ কথা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই। এখানে 'ডোকরা' ও 'বুড়ো' একার্থবোধক। 'ডেকরা' ভিন্ন কথা—উহা স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রচলিত একটী সাধারণ গালি। হিন্দীতেও বৃদ্ধ অর্থে 'ডোকরা' প্রচলিত আছে। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে 'বূঢ়া' বা 'বুঢ়িয়া' অপেক্ষা 'ডোকরা' 'ডোকরী'ই অধিক প্রচলিত। অতএব ভারতচন্দ্র ভুল করেন নাই—ভুল যোগেশ বাবুই করিয়াছেন।

তাঁইস—যোগেশবাবু বলেন ইহা আরবী 'তাসীর' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার অর্থ প্রভাব, ফল, শাস্তি। তাঁইস যে প্রভাব বা ফল অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা আমরা শুনি নাই। তিরস্কার অর্থে ব্যবহৃত হইতে শুনিয়াছি। শাস্তি অর্থ অনেকটা সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু 'তাসীর' হইতে শাস্তি অর্থ পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ ইহা 'তাসীর' হইতে উৎপন্ন হয় নাই। আরবী তঈশ্‌ (ক্রোধ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তাঁইস মানে ক্রোধপূর্ব্বক তিরস্কার করা।

তুৎ-বলাঙ্গা—যোগেশবাবু ইহার ব্যুৎপত্তি স্থির করিতে পারেন নাই। কথাটা ফারসী তুখ্‌ম্‌-এ-বালিঙ্গা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তুখ্‌ম্ মানে বীজ।

তোতা—ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, "ময়না, শালিক, টিয়া, তোতা, কাকাতুয়া"। বিদ্যানিধি মহাশয় তাহার উপর টিপ্পনী করিতেছেন, "টিয়া আবার তোতা ? ভারতে এমন ভুল আরও আছে। সেজারু দেখ।" 'সেজারু' প্রসঙ্গে যোগেশবাবু ভারতচন্দ্রের কি ভুল দেখান তাহা দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। তবে এ পর্য্যন্ত তিনি ভারতচন্দ্রের যে ভুল দেখাইয়াছেন তাহা যে ভারতচন্দ্রের ভুল নয়, যোগেশবাবুর ভুল তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত, বাঙ্গলা, পার্শী, উর্দ্দু, হিন্দী প্রভৃতি ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে টিয়া এবং তোতা বলাতে ভারতচন্দ্রের পুনরুক্তি দোষ হইয়াছে, বিদ্যানিধি মহাশয় এইরূপ মনে করিয়াছেন। কিন্তু খুব সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের সময়ে টিয়া এবং তোতা ঠিক এক অর্থে ব্যবহৃত হইত না। শুকপক্ষী নানা জাতীয় আছে। সাধারণতঃ যে-সকল শুকপক্ষী দেখা যায়, তন্মধ্যে এক জাতীর ছোট ও এক জাতীয় বড় আছে। ছোটগুলিকে হিন্দীতে টুইআঁ বলে। টুইআঁ মানে ছোট। এই টুইআঁ হইতে বাঙ্গলা টিয়া হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের সময়ে হিন্দীর ন্যায় বাঙ্গলাতেও টিয়া ও তোতা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইত অর্থাৎ টিয়া ছোট জাতীয় শুক ও তোতা বড় জাতীয় শুক বুঝাইত। বর্ত্তমানে তোতা শব্দের প্রচলন বাঙ্গলায় খুব কম হইয়া গিয়াছে। টিয়া বলিলে উভয় জাতীয় শুকই বুঝায়।

ধড়ীবাজ—বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে আসল কথা দোড়ীবাজ, তাহা হইতে অপভ্রংশ ধড়ীবাজ। অর্থাৎ দোড়ীর উপর বাজী করে যে, অত্যন্ত শঠ। কিন্তু হিন্দীতেও ধড়ীবাজ শব্দ আছে, অথচ হিন্দীতে দোড়ী শব্দ নাই। আর ঐ ভাষায় কেবল ধড়ীবাজ শব্দই যে ব্যবহৃত হয় এমন নহে ; শুধু ধড়ী শব্দেরও ব্যবহার আছে, তাহার অর্থ ধাপ্পা। যেমন ধোঁকা ধড়ী। এখানে ধড়ী শব্দ দোড়ী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কি করিয়া বলা যাইবে ?

পগার—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন পগারের অর্থ জাঙ্গাল, উদ্যানের উঁচা সীমা আলি। কিন্তু 'পগার' অর্থে আমরা 'খানা' বুঝি। "পগার, খন্দক, খানা", এখানে তিনটী শব্দই একার্থবোধক। "এক লাফে পগার পার" ইত্যাদি স্থলেও খানা অর্থই প্রকাশ পায়। নবদ্বীপ অঞ্চলে 'পগার কাটা' এরূপ ব্যবহার আছে। পগারের অর্থ

জাঙ্গাল বা আলি হইলে 'কাটা' শব্দের ব্যবহার হইতে পারে না। বস্তুতঃ পা এবং গার (—গর্ত) এই দুই ফারসী শব্দ যোগে পায়গার সংক্ষেপে পগার হইয়াছে। Craven সাহেব প্রণীত Royal Dictionaryতেও Paigar মানে ditch লেখা আছে। [বাঁকুড়া জেলায় আলি অর্থেই পগার ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আবার হুগলি প্রভৃতি অঞ্চলে খানা অর্থেও ব্যবহার শুনা যায়।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

শ্রীকালীপদ মৈত্র।

অবিমারক

মহাকবি ভাস-বিরচিত নাটক।

তৃতীয় অঙ্ক

কুরঙ্গী ও দুই জন দাসী।

কুরঙ্গী

হ্যাঁলা, সে কি বল্লে ?

দাসী

কে রাজকুমারী ?

কুরঙ্গী

(স্বগত) হতভাগিনী আমি। (প্রকাশ্যে) কন্যান্তঃপুরের চাকর।

মাগধিকা

তার সঙ্গে দেখা করেছি, বলেওছি। সে কিছু বল্লে না।

কুরঙ্গী

আচ্ছা, আমি মহারাণীকে বলে দেবো যে, কন্যান্তঃপুরের চাকরটা আমার টিয়া পাখীর পিঁজরা করে দিচ্ছে না।

মাগধিকা

রাজকুমারীর টিয়ার পিঁজরা ত করে দিয়েছে।

কুরঙ্গী

পোড়ারমুখী! আর একটা কি হতে নেই ?

মাগধিকা

তা হতে পারে বৈ কি।

কুরঙ্গী

হ্যাঁলা, কত বেলা হল ?

মাগধিকা

সন্ধ্যা ঘন হয়ে এসেছে।

কুরঙ্গী

তবে এখন চল ছাতে যাই।

মাগধিকা

ওলো বিলাসিনী, আগে যা, বিছানা আসন পেতে রাখগে যা !

বিলাসিনী

তুই কি ঘুমুচ্ছিলি লা ? কোন্ কালে বিছানা আসন পাতা হয়ে গেছে।

মাগধিকা

হ্যাঁলা হ্যাঁ, তোর আলস্যে কুড়েমি আমার ত জানা আছে। দিনের বিছানাই পড়ে আছে, তাই বলছিস বিছানা আসন পেতে এসেছি।

বিলাসিনী

দেখ্ মিছে-কথা বলিসনে বলছি! রাজকুমারীর মনে হবে সত্যিই বা।

মাগধিকা

আচ্ছা গিয়ে দেখ্‌লেই টের পাব।

(সকলে বেড়াইতে লাগিল)

মাগধিকা

এই ত ছাত।

কুরঙ্গী

তুই আগে চল।

(আরোহণের অভিনয় করিল)

মাগধিকা

বাহবা বিলাসিনী! বেশ! আপনার নামের যোগ্য কামই করেছিস! এই তোর পাথরের ওপর বিছানা পাতা হয়েছে ?

বিলাসিনী

ভিতরের মণ্ডপে পেতেছি গো! মাগধিকে, দেখ লো দেখ, কেমন আমার অলসত্ব।

মাগধিকা

তুই যে পণ্ডিতানী হয়ে উঠেছিস দেখ্‌ছি। আহা তোর যোগ্য একটি পণ্ডিত খানসামার সঙ্গে তোর বিয়ে হোক!

ওলো! কর গি... শ্রীরা...
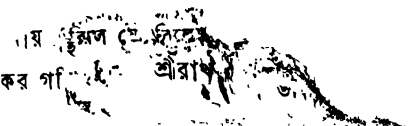
মাগধিকা

রাজকুমারীর যেমন খুসী। বস।

(সকলে উপবেশন করিল)

রাজকুমারী, আমি রূপকথা বলি, শোন।

কুরঙ্গী

জানি লো জানি তোর রূপকথার যে ছিরি। আবোল-তাবোল বকুনি বই ত নয়।

মাগধিকা

না রাজকুমারী, এটা নতুন গল্প।

কুরঙ্গী

ওলো তোরে ব্যগর্ত্তা করছি, আর জ্বালাস নে। আমি একটু শুই।

বিলাসিনী

শোও দিদিমণি শোও, শোবে বৈ কি। তুমি আমার সঙ্গে কথা কও।

কুরঙ্গী (স্বগত)

হায়! না জানি কি হবে?

মাগধিকা

ওলো বিলাসিনী, রাজকুমারীর কাছে থেকে সরে এসে একটা কথা শোন।

(দূরে সরিয়া গেল)

কুরঙ্গী (স্বগত)

হুঁ! সব বুঝেছি। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

বিলাসিনী

হ্যালা কোথায় শুনলি তুই?

মাগধিকা

মহারাণীর দাসী বসুমিত্রা বলেছে।

বিলাসিনী

তা হলে খোদ গিন্নিই বলে থাকবেন।

মাগধিকা

কাশীরাজের জয়বর্ম্মা নামে এক ছেলে আছে। তার সঙ্গেই রাজকুমারীর বিয়ে হবে। তার দূত এসেছে, মহারাজও খুব খাতির করেছেন। পত্রও গ্রহণ করেছেন।

[illegible] দিদিকে [illegible] কজন [illegible]

না, এ [illegible] রাজ[illegible] তোমার [illegible]

মাগধিকা

তারপর মহারাণী বলেছেন—আমার মেয়ে ছেলে-মানুষ, আমি তাকে ছেড়ে এক দিনও থাকতে পারব না। মহারাজ যদি অনুগ্রহ করে' জামাইকেই এখানে আনেন ত ভালো হয়।

বিলাসিনী

তারপর, তারপর।

মাগধিকা

মহারাজের তাতে মত হয়েছে। আজকে শুভ-নক্ষত্র-যোগ আছে বলে' দূতের সঙ্গে মন্ত্রী ভূতিককে পাঠানো হয়েছে।

কুরঙ্গী (স্বগত)

হায়! না জানি আমার কি হবে?

বিলাসিনী

রাজকুমারীর প্রিয় রূপযৌবন সার্থক হবে।

(নলিনিকার প্রবেশ)

নলিনিকা

আমার মা আমাকে বলে দিলে—যা, তুই গিয়ে এই কথা রাজকুমারীকে বলগে যা। প্রিয়জন যদি প্রিয়কথা বলে ত বেশী প্রিয় মনে হয়। রাজকুমারী বিশ্বাস করে' আমায় সব কথা বলেন না। এইবার আমি তাঁকে তাঁর প্রিয়জনের প্রিয়কথা শুনিয়ে তাঁর সুনজরে পড়তে পারব।

কুরঙ্গী

এ কী অজানা এক চিন্তা-রোগ আমাকে পাগল করে' তুললে। ফুলের মালা, চন্দন, কিছুই ভালো লাগ্‌ছে না। লোকের কাছে থাকতে ইচ্ছে হয় না। এ কী বি-সম দারুণ অথচ মনোহর অবস্থা! (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নলিনিকা, এ কি?

মাগধিকা

রাজকুমারী, আমি মাগধিকা।

বিলাসিনী

রাজকুমারী, আমি বিলাসিনী।

নলিনিকা (নিকটে আসিয়া)

রাজকুমারী, আমি নলিনিকা। রাজকুমারীর সিঁড়ি-ওঠা শব্দেই আমি টের পেয়ে ছুটে এসেছি। মহারাণী বলেছেন—

কুরঙ্গী

কি ?

(নলিনিকা কানে কানে বলিল,)

কুরঙ্গী

অ্যাঁ মন্দচরিত্র সে ?

নলিনিকা

হতেও পারে। কারণ, সে ত সেই।

কুরঙ্গী

নলিনিকা, আমার পা চেপে দে ত।

নলিনিকা

যে আজ্ঞা রাজকুমারী।

বিলাসিনী

নলিনিকে, বিয়ের দিন কবে ঠিক হল ?

নেপথ্যে

আজ—

নলিনিকা

চিরজীবী হও, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

নেপথ্যে

আজ মন্ত্রী চলে গেছেন। মন্ত্রীর কোনো চাকর ত আজ কন্যান্তঃপুর পাহারা দিতে এল না। খুব হয়েছে। রোসো, মহারাজকে বলে দিচ্ছি।

বিলাসিনী

ওলো নলিনিকে, তুই কি বল্‌লি ?

নলিনিকা

যখন আমাদের জামাইবাবুটি আসবেন, তখন বিয়ে হবে।

বিলাসিনী

আহা, নির্বিঘ্নে যেন আস্‌তে পারেন !

নলিনিকা

ভগবান্ করুন তাই হোক।

মাগধিকা

ওলো, আয়, চতুঃশালে বসি আমরা।

বিলাসিনী

সেই বেশ। সন্ধ্যা ত উৎরে গেল, জ্যোৎস্না উঠেছে।

নলিনিকা

ওলো, আমার বিছানাটাও একটু পাতিস ভাই।

মাগধিকা

ঢের জায়গা আছে। তুই এখন রাজকুমারীর পা চেপে ঘুম পাড়িয়ে দে।

নলিনিকা

আচ্ছা।

(মাগধিকা ও বিলাসিনীর প্রস্থান)

(তরবারি ও দড়ি হাতে করিয়া চোরের বেশে অবিমারকের প্রবেশ)

অবিমারক (বিমর্ষ ভাবে)

হায় ! যৌবনের নামই কষ্ট। কারণ,

প্রণয় উপজে মনে,　　প্রমাদ নাহিক গণে,
　দোষাদোষ চিন্তা ছাড়ি আশ্রয় সাহসে ;
যথা ইচ্ছা গতায়াত,　　নীতিপথে পদাঘাত,
　বিচক্ষণ শুভবুদ্ধি নাহি থাকে বশে।

আপনার অধীন যে কাজ তার অনুষ্ঠানে আমি মন্দ হব কেন ? কারণ—

নগরে আমায়　　সকলেই চেনে,
　দারোয়ানগুলো জানে,
অর্দ্ধরাত্রি　　ঘন তিমিরের
　গুণ্ঠন মুখে টানে ;
তরোয়াল আছে　　আমার সহায়,
　মন সে সাহসে ভরা,
মিছাই চিন্তা　　আমার এখন,
　কিবা দুষ্কর করা ?

গভীর রাত্রির কি ভয়ানকতা। এখন—

ঘুমের গর্ভে ভ্রূণের মতন
　নিদ্রিত যত পৌরজন ;
সুপ্তমানব বাড়ীগুলি যেন
　ধ্যান-স্তিমিত যোগী মতন ;
পুঞ্জ আঁধারে ভূতে-পাওয়া মতো
　গাছগুলো আছে স্তব্ধ হয়ে,
জগৎটা যেন উবে গেছে গোটা,
　তাহার সকল বিভব ল'য়ে।

আজ এ কী কালরাত্রি !

পথের নদীতে তিমিরের স্রোত
　[illegible] বহিয়া যায়,
তিমি[illegible]
　কর গ[illegible] শ্রীরা[illegible]

তিমিরের স্রোতে জেগেছে জোয়ার
বানে ভেসে গেল সকল দেশ,
ভেলায় চড়িয়া দিতে পারি পাড়ি,
কোথা এর কূল কোথায় শেষ!

(অগ্রসর হইয়া, কান পাতিয়া) বাঃ! কোথায় গান শোনা যাচ্ছে! কে এই চিরসুখী পুরুষ, যে প্রেয়সীর সঙ্গে সঙ্গীত সম্ভোগ করছে। বোধ হচ্ছে যেন সে নিজে বীণাও বাজাচ্ছে। কারণ—

উঁচু বাড়ীর জানলা-দেওয়া
কোন্ সে গোপন ঘরে
বাজছে বীণা নাই ঠিকানা
কাহার পরশ ভরে।
নারীর কর-পরশ ভরে
বাজছে না এই তার,
কোমল নারী তুলতে নারে
এমন ঝঙ্কার।

গান কিন্তু নারীকণ্ঠের। কারণ—

গানের তানে মিহিন মিঠে
নাকী সুরের খেলা,
তালে তালে তাল রাখিয়ে
বাজছে হাতের বালা।

(অগ্রসর হইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া) হায় হায়! এখানে আবার একজন তার মানিনী প্রেয়সীর মানভঞ্জন করছে। এর নিশ্চয় অতি কঠিন অপরাধ হয়েছে, নইলে এত রাত্রেও মান ভাঙল না! কিংবা হয়ত নারী প্রসন্ন হয়েও ছল করে আছে। কারণ—

বাষ্পরুদ্ধ গদ্গদ ভাষে
বলিছে রুষ্ট কথা—
কেবা আমি তব, আমার প্রসাদ-
লাগি কেন মাথাব্যথা!
লীলা-সুচতুর রমণী-প্রকৃতি,
মুখেতে রুষ্ট ভাষা,
এদিকে কিন্তু প্রণয়ীর বুকে
[illegible]
এমন বিকট [illegible] হুতুম-পেঁচা
[illegible]

নিশ্চয়। এটা অমন হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল কেন? এই শব্দ শুনে ভীত হয়ে সেই মানিনী নিশ্চয় তার প্রসাদপ্রার্থী স্বামী বেচারাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আশ্রয় করে থাকবে। একবয়সী লোকের পরের প্রণয়ব্যাপার অনুমান করে দেখতে হয় না, সকলেই সমান কাজের কাজী। (পরিক্রমণ করিয়া) এ কে এই নগরের বাজারের চকে দোকানের বারান্দায় বসে' এমন ভয়ে ভয়ে মৃদু কণ্ঠে কথা বলছে? এ বেচারা বোধ হয় আমারই মতন একজন মিলনোৎসুক বিরহী।

পরিজনের ভয়ে ভয়েই
বাক্য মৃদু মন্দ,
চমকে ওঠে ব্যাকুল হয়ে
বাজলে বাজু-বন্ধ।
মদন রাজা একলা মালিক
সইতে নারে সঙ্গ,
অনঙ্গেরই শাসন বলে'
জ্বলছে এরও অঙ্গ।
ইচ্ছে বটে প্রিয়ার পাশে
ছুটতে পেলে বাঁচে,
লজ্জা ভয়ে পারছে না, তাই
ধৈর্য্য ধরে আছে।

(পরিক্রমণ করিয়া) এ কি জ্যোৎস্না উঠল? না না, এ ত জ্যোৎস্না নয়—দু-সারি বাড়ী হ'তে জানলা দিয়ে দীপের আলো পথে পড়েছে। এখানে খুব সাবধানে আত্মগোপন করতে হবে। এখানে—

দৃঢ় পণে যবে চলি খুসী মনে
পরগৃহ-পানে দৃষ্টি রাখি,
ঘন আঁধারের আঁচলে লুকালে
উঁকি মেরে ফিরে দীপের আঁখি।
অতি দ্রুতগতি পালাতে চাহিলে
আপন পায়ের শব্দ পিছে
অপরের পদশব্দ ভাবিয়া
নিজেরে নিজেই ডরাই মিছে।

ঐ কে একজন আসছে, এটাকে পাশ কাটাই। (এক-পাশে লুকাইয়া) আঃ নৃশংস লোকটা গেল চলে, বাঁচা

গেল। (পরিক্রমণ করিয়া) ওরে ঐ-সব পাহারাওলা আসছে। এখন কি করি? ঠিক হয়েছে। এই চৌমাথার তাড়িখানায় ঢুকে পড়ি। (প্রাচীর টপকাইয়া।

এইসব হীনবল রক্ষীভয়ে পলাতক মোরে
মোরই পাশে বদ্ধ এই তরবারি উপহাস করে।
এই ক'টা প্রহরী ত অতি তুচ্ছ নগণ্য আমার;
আমার উদ্দেশ্য লাগি প্রয়োজন আছে লুকাবার।

পাহারাওলাগুলো গেল। আপনাকে পাহারা দেয় যে পাহারাওয়ালা তার কি করবে?

রাত্রির কালে লোভ আর মোহ
অনুরাগে করি সাথী
গলি গলি ফিরে গভীর তিমিরে
দর্পে রঙ্গে মাতি'।
সাহসিক এই রাত-চরা রোগ
কষ্টে ও সুখে মেশা,
মত্ততা আছে লাঞ্ছনা পাছে,
যেমন মদের নেশা।

এই ত রাজবাড়ী। উঃ! কী কঠিন উচ্চ প্রাচীর! এইখানে পুরুষের বুকের জোরের পরখ হয়। কিন্তু যদি প্রাচীরের মাথা বেশ শক্ত থাকে, তবে ত আমি উল্লঙ্ঘন করে' প্রবেশ করেছি, ধরে' নিতেই পারি। এইখান থেকে দড়ি ছুড়ে ফেলে প্রাচীরের মাথায় আটকে দি। হে প্রজাপতি, তোমাকে নমস্কার, সর্ব্বসিদ্ধি কর ঠাকুর! দোহাই বলির, দোহাই শম্বরের, দোহাই মহাকালের, প্রসন্ন হও ঠাকুর! রাত্রি বর্দ্ধিত হোক, ঘুম গাঢ় হোক সকলকার। মা লক্ষ্মী, তোমার অনুমতি হোক, রাগ কোরো না যেন মা! সমস্ত বিঘ্ন দূর হোক, সমস্ত বাধা নষ্ট হোক। জয় মা ভগবতী কত্যায়নী! (রজ্জু নিক্ষেপ) যাক, দড়িতে-বাঁধা কাঁকড়ার দাড়ার মতন আঁকড়া প্রাচীরের মাথায় আটকে গেছে, ভবিতব্যের জয়জয়কার! মূর্ত্তিমতী কার্য্যসিদ্ধি বলে' মনে হচ্ছে। প্রজাপতি ঠাকুরের কি শক্তি!

যত্ন করিয়া করিলেও যদি নিষ্ফল হয় কাজ,
নাহিক তাহাতে ক্ষোভের কারণ নাহিক তাহাতে লাজ।
নিষ্ফলতা ত নিষ্ফল নহে পরের কার্য্যে লাগে,
মঙ্গল সাথে ফল-নিষ্ফল চলে যত্নের আগে।

এইবার দড়ি বেয়ে উঠে পড়ি। (আরোহণ করিয়া, চারিদিকে দেখিয়া) বাঃ কি সুন্দর রাজবাড়ীর শোভা!

বিপুল হলেও ক্রমোন্নতিতে হয়েছে মানানসই,
ধরণী যেন রে বাহু বাড়াইয়া আকাশের মাপে থই।

এখানে আর থাকা নয়। অট্টালিকার পথে কুকুরের বিঘ্ন সঞ্চরণ করে। এই দড়ি ঝুলিয়ে ভিতরে নেমে পড়ি। (অবতরণ করিয়া) এখন দড়া গাছটা কোথায় লুকিয়ে রাখি? (এদিক ওদিক দেখিয়া) হয়েছে। এই হাতীশালে ফেলে দি। (নিক্ষেপ ও পরিক্রমণ)

যুবতীকণ্ঠে কলসঙ্গীত বীণা-সঙ্গতে উঠে,
কি মধু গন্ধ শীতল স্নিগ্ধ বাতাসের বুকে ছুটে।
দীপের প্রভায় উজ্জ্বল এই রাজার প্রাসাদ খানি
কমল-বনের সহিত এখন শান্তিমগন মানি।

যাই তবে। এই সেই পথ, যার কথা ধাত্রী আমায় বলে দিয়েছিল। এই ত মন্দাকিনী ক্রীড়াসরিৎ, ঐ ত দারু-পর্ব্বত, এই ত দরবার-ঘর; তবে এই কন্যাপুরপ্রাসাদ। এখানকার কাঠের গায়ে খোদকারী নক্সা আর জালী বেশী থাকায় স্বচ্ছন্দেই উপরে চড়তে পারব। তবু দুরারোহ বলেই মনে হচ্ছে।—

প্রেয়সী-মিলন লাগি প্রাচীর ডিঙায়ে এসে
এখন মানায় না'ক শঙ্কা করা অবশেষে।
তৃষায় কাতর জন সরোবর-তটে গিয়া
কমলের কাঁটা হেরি ফিরে জল নাহি পিয়া?

যা থাকে কপালে চড়ে পড়ি। (আরোহণ করিয়া) এই যে জাল-যন্ত্র, যার কথা ওরা আমায় বলে দিয়েছিল। (উদ্ঘাটন করিয়া প্রবেশ করিয়া) বাঃ কুন্তিভোজ! সাবাস! তোমার এই প্রাসাদ যেন স্বর্গকে উপহাস করছে!

মণিরত্নশিলা-পরে হংসকুল নিদ্রায় কাতর,
বৈদূর্য্য মণিতে গাঁথা পথে পাতা মুকুতার থর,
স্তম্ভ সব প্রবালের, ইহা নয় প্রলাপ-বাখান,
মণিপাত্র প্রদীপের মণি-আভা শিখা করে ম্লান।

যাক, আর [illegible] নেই। (চোরের বেশ খুলিয়া [illegible] শ্রীরা[illegible])

নলিনিকা

আমাদের ছোট কর্ত্তাটির খবর কি? আজ প্রিয়তম আসবে শুনেই রাজকুমারী কতকাল পরে একটু দুর্লভ নিদ্রায় নিমগ্ন হয়েছেন। কিন্তু তাঁর খবর কি?

অবিমারক (নলিনিকার কথা শুনিয়া, সহসা উপস্থিত হইয়া)

এই যে আমার খবর।

নলিনিকা (দেখিয়া, সহর্ষে)

আসুন আসুন।

অবিমারক (কুরঙ্গীকে দেখিয়া, সহর্ষে)

এই এই যে আমার সে!—
অঙ্গে ইহার দৃষ্টি পড়িয়া ফিরিতে চাহে না আর,
অঙ্গে অঙ্গে বুলিয়া বুলায়ে ফিরিতেছে বার বার।
নিদ্রামগন প্রিয়ারে জাগাতে চাহে মোর ব্যাকুলতা,
অনুরাগ মোর মাগিছে বক্ষে প্রেয়সীর তনুলতা।
হর্ষে আমার অবশ অঙ্গ, অন্তর মোহগত,
মিলনব্যগ্র দেহ মন মোর দ্বিধাতেই বিব্রত।

নলিনিকা

(স্বগত) অনুরাগের স্রোতধারা উভয় কূলেই সমান আঘাত করছে দেখছি। (প্রকাশ্যে) ভর্ত্তৃদারক, শয্যাকে অলঙ্কৃত করুন।

অবিমারক

হাঁ এই বসি। (উপবেশন করিল)

নলিনিকা

দাদাবাবু, রাজকুমারীকে জাগিয়ে দেবো কি?

অবিমারক

ভদ্রে, ছেলেমানুষী করো না। দেখ—
বিধাতা আমারে করেছে কাঙাল দুইটি নয়ন দিয়া,
হাজার নয়নে লুটিতে পারিলে জুড়াইত তবু হিয়া;
দীর্ঘ দিনের বিরহব্যাকুল আমার ভিখারী মতি
মিলনের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়ে মোহ পায় সম্প্রতি।
দেখিতে পেয়েছি আজিকে যদি বা সুখার্ণবের পার,
তবে ত্বরা কিবা, আঁখি দুটি মোর শিখুক তাহে সাঁতার।

[illegible]

জানি [illegible] যথ[illegible]ক পরিশ্রম!

অবিমারক

আজ আমার সকল পরিশ্রম সার্থক।

কুরঙ্গী (জাগ্রত হইয়া)

ওলো, সেই নির্দ্দয় নিষ্ঠুর কি বলেছিল?

নলিনিকা

আমি ত রাজকুমারীকে তা বলেছি।

অবিমারক

একে এমনতর ব্যাকুল দেখে জীবনের ফল আজ হাতে হাতে পেলাম।

কুরঙ্গী

(স্বগত) হুঁ, আমি বঞ্চিত হয়েছি। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁলা, আমি তোকে কি বললাম?

নলিনিকা

রাজকুমারী, কিছুই ত বলেন নি।

অবিমারক

এর এমন মোহ দেখে আমারও মোহ আসছে!

কুরঙ্গী

নলিনিকে, অনেকক্ষণ থেকে তুই বসে আছিস। কত রাত হল?

নলিনিকা

অর্দ্ধরাত্রি হয়েছে।

কুরঙ্গী

আহা তুই বড় পরিশ্রান্ত হয়েছিস, আয়, আমাকে আলিঙ্গন করে' তুই যা।

নলিনিকা (মুখ ফিরাইয়া)

আমি পা চেপে দি।

কুরঙ্গী

তোর অত আদরে সম্ভ্রমে কাজ নেই, তুই আয় আমার বুকের কাছে সরে আয়।

নলিনিকা

রাজকুমারী, এই যে যাই।

কুরঙ্গী

ওরে, এখনো আমার পা চাপে কে রে?

নলিনিকা (কানে কানে কথা বলিয়া)

বুঝলে?

কুরঙ্গী (ব্যস্ত ভাবে)

ছিঃ কি ঘেন্না! আমার বড় ভয় করছে!

অবিমারক

প্রেয়সী আমার তুমি জীবনে জীবনে গো !—
কাঁপিছ ক্রোধে পবন-বেগে দোদুল-দোলা লতার মতো,
করুণাময়ী প্রসাদ দেহ চরণে তব শরণাগত !

কুরঙ্গী (সলজ্জ ভাবে নলিনিকার দিকে চাহিল)

নলিনিকা

দাদাবাবু, ওঠ ওঠ, রাজকুমারী তোমায় পা ছেড়ে উঠতে বলছেন, ওঠ ওঠ।

অবিমারক

যে আজ্ঞা। (উঠিল)

(ধাত্রীর প্রবেশ)

ধাত্রী

জয় হোক ভর্ত্তৃদারকের।

অবিমারক

কে ? আপনি !

ধাত্রী

নলিনিকে, এঁদের অভ্যন্তরমণ্ডপে নিয়ে যা।

নলিনিকা

আচ্ছা।

(ধাত্রীর প্রস্থান)

নলিনিকা

দাদাবাবু, রাজকুমারীকে নিয়ে অভ্যন্তর-মণ্ডপে চলুন।

অবিমারক

তুমিও যেন এমনিতর শত শত প্রিয়বাক্য শুনতে পাও।

(কুরঙ্গীর হস্ত ধারণ করিয়া উঠিল)

নলিনিকা

আসুন আসুন দাদাবাবু, এই দিকে এই দিকে।

অবিমারক

চল, এই যে যাচ্ছি।

(উভয়ে অগ্রসর হইল)

অবিমারক (সহর্ষে)

আজ যৌবনের ঋণ শোধ হল ! কারণ—
হাতখানি ধরিতেই অশ্রুভরা নেত্রপুট,
বুকে জাগে ঘন শিহরণ,
অবসন্ন দেহ তার অধিক হয়েছে ভার,
স্বেদাপ্লুত অবশ চরণ !
বিবাহের সপ্তপদী চলিতে চলিতে যদি
আজি রাত্রি শতযুগ হয়,
জীবনের অভিলাষ পরিপূর্ণ হয় তবে,
অন্য কিছু চাহে না হৃদয় !

(সকলের প্রস্থান)

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেকেলে দুইটি কবিতা

বউ কথা কও

ব্রাহ্মণ গিয়াছে হাটে,　　ব্রাহ্মণী জলেরি ঘাটে,
ঘরে মাত্র রহিয়াছে বউ।
হেন কালে ব্রহ্মচারী　　ঘন ডাকে তাড়াতাড়ি—
গৃহস্থরা বাড়ী আছ কেউ॥
আমি ত রসিকানন্দ　　ভিক্ষাতে করহ বন্ধ
কাল গেছে একাদশী ব্রত।
অন্নেতে নাহিক রুচি,　　খাই সদা ক্ষীর লুচি
দধি দুগ্ধ চিনি কিম্বা ঘৃত॥
ওল আলু কাঁচকলা　　সৈন্ধবের দুই তোলা
অভাবেতে সিদ্ধ করি খাই।
ইহা যদি দিতে পার　　সকালে বিদায় কর
তবে আমি অন্য গৃহে যাই॥
বধূ বলে হায় হায়　　একি মম হল দায়—
শ্বশুর শাশুড়ী নাহি ঘরে।
রসনা দশনে তুলি　　নাকে দিয়া অঙ্গুলি
লজ্জায় বচন নাহি সরে॥
অতিথি ফিরিয়া যায়　　কেমনে রাখিব তায়
হেন জন নাহি বলে রও।
অতিথে বিমুখ দেখি　　গাছ হতে বলে পাখী
বউ কথা কও॥

এই কবিতাটিতে তাৎকালিক সমাজের বঙ্গবধূর চিত্র ও অতিথি-সেবার আগ্রহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। উক্ত কবিতা ত্রিপুরা জিলার অন্তঃর্গত কুণ্ডা-গ্রাম-নিবাসী স্বর্গীয় রামগতি দত্ত রায় কর্ত্তৃক ১২৪৪ বাং রচিত। তাঁহার তুলট কাগজে লিখিত "নল-দময়ন্তী" নামক প্রায় ২০০ শত পৃষ্ঠার পদ্যময় একখানা পুথিও আমাদের হস্ত-গত হইয়াছিল। [illegible] দুঃখের বিষয় তাহা একবারে কীটদষ্ট হ[illegible] গিয়াছে। খুব প্রাচীন লে[illegible] [illegible]কের গা[illegible] শ্রীরা[illegible] [illegible]খা মেয়েদের

নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহা পদ্যে "পাঁচালী" প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এখনও আমাদের গৃহে তাঁহার স্বহস্তে লিখিত "কর্ম্মপুরুষ" ব্রতকথার পাঁচালী এক খণ্ড রহিয়াছে।

শীত

কুমারীর গর্ভে যেন কুমার জন্মিল।
শাল্মলী পাইয়া সে অস্ত্র শিক্ষা কৈল ॥
সরীসৃপ পাইয়া সে বাড়াল শরীর।
কার্ম্মুক হস্তে করি গর্জ্জে মহাবীর ॥
গঙ্গারথে ভর করিয়া আরম্ভিল রণ।
ধনঞ্জয় বিনা যুদ্ধ না যায় সহন ॥
কুম্ভের তৃতীয় অংশ বল আছে তার।
মীন মেষে নাগাল পাইয়া চূর্ণ কৈল হাড় ॥

এই কবিতাটি কাহার রচিত তাহা জানিতে পারি নাই। একদিন শীতের প্রভাতে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব শিবগতি দত্ত রায় মহাশয় উক্ত কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি তাহাদিগকে উহা যেরূপ বুঝাইয়াছিলেন তাহাই এখানে লিখিলাম।

দ্বাদশ মাসের দ্বাদশটি রাশি। কুমারী অর্থে কন্যাকে বুঝায়, আশ্বিন মাসের রাশি কন্যা, আশ্বিনেই শীতের জন্ম, তাই "কুমারীর গর্ভে যেন কুমার জন্মিল।" আবার শাল্মলী অর্থে তুলা, কার্ত্তিক মাসের রাশি তুলা, ঐ কার্ত্তিক মাসে শীত বলসঞ্চার করিল, তাই "শাল্মলী পাইয়া সে অস্ত্র শিক্ষা কৈল।" ঐরূপ সরীসৃপ এখানে বৃশ্চিক অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, অগ্রহায়ণ মাসের বৃশ্চিক রাশি, অগ্রহায়ণ মাসে শীত বাড়িয়া উঠিল, তাই "সরীসৃপ পাইয়া সে বাড়াল শরীর।" কার্ম্মুক মানে ধনু; পৌষ মাসের ধনু রাশি, পৌষ মাসেই শীত গর্জ্জিয়া উঠিল তাই "কার্ম্মুক হস্তে করি গর্জ্জে মহাবীর।" গঙ্গারথ এখানে মকর অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে, মকর-রাশি-যুক্ত মাঘ মাসেই শীত পূর্ণ পরাক্রমে সকলকে আক্রমণ করে, তাই "গঙ্গারথে ভর করিয়া আরম্ভিল রণ।" ধনঞ্জয় অর্থে এখানে ধনকে যে জয় করিয়াছে, সেই ধনী [illegible] কেহ শীতের এ যুদ্ধ সহিতে পা[illegible] যুদ্ধ না যায় সহন"। [illegible] অংশ পর্য্যন্ত শীতের বল থাকে, তাই "কুম্ভের তৃতীয় অংশ বল আছে তার।" মীনরাশি-যুক্ত চৈত্র ও মেষ-রাশি-যুক্ত বৈশাখ শীতের হাড় চূর্ণ করিয়া দিল।

এই কবিতা অতিশয় কষ্টকল্পনা ও দুর্ব্বোধ্যতা দোষে দুষ্ট হইলেও সেই প্রাচীন যুগের রচনাভাস উহাতে বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীশশিভূষণ দত্ত।

নীহারিকা ও সৃষ্টিতত্ত্ব

গ্রীসদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত দেমক্রিতাস এবং এনাক্সাগোরাস (Democritus and Anaxagoras) দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহাদের স্বদেশবাসীগণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন যে, আকাশে পরিদৃশ্যমান দুগ্ধফেননিভ ছায়াপথ অগণিত নক্ষত্ররাজির সম্মিলন ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই-সকল নক্ষত্র অতি ক্ষুদ্র এবং ঘনসন্নিবিষ্ট বলিয়া উহাদিগকে পৃথক পৃথক দেখা কষ্টসাধ্য। পরমাণু সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত, সূর্য্য ও নক্ষত্রগণের স্বরূপ প্রভৃতি আরও কতিপয় বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচার করার জন্য দেমক্রিতাসকে তদানীন্তন গ্রীসের জনসাধারণ ঔপহাসিক দার্শনিক বলিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত মত সমূহ পরবর্ত্তী কালের বৈজ্ঞানিকগণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

চন্দ্রালোকবিহীন নির্ম্মল নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে ছায়াপথ ব্যতীত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘনীভূত কুজ্ঝটিকাবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও অনেক চিহ্ন আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। উহারা সাধারণতঃ নক্ষত্রপুঞ্জ ও নীহারিকা নামে পরিচিত। এই-সকল চিহ্নের অধিকাংশই ছায়াপথের ন্যায় অগণিত ও অস্পষ্ট বিন্দুসমবায় সদৃশ নক্ষত্রসংহতি বলিয়া জানা গিয়াছে। আর কতকগুলিতে নক্ষত্রের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। ঐ-সকল স্থানে সৃষ্টির নিদান স্বরূপ পরমাণু পুঞ্জীভূত হইয়া বাষ্পাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। উহারা বাষ্পস্তবক নামে পরিচিত। অধিকাংশ নক্ষত্রপুঞ্জ ও নীহারিকার নক্ষত্রসমূহ মানবচক্ষের অগোচর হইলেও উহাদের
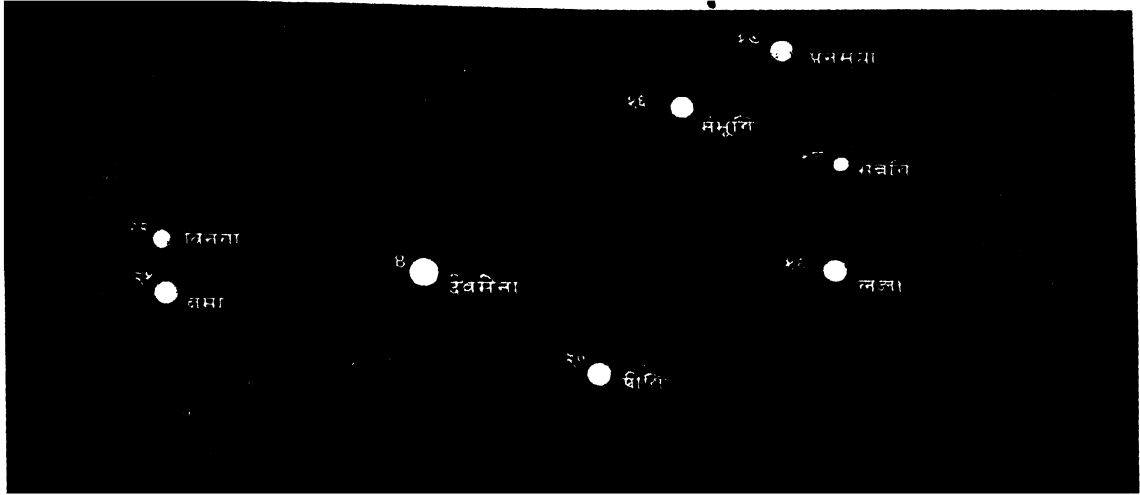
কৃত্তিক নক্ষত্র।

তারাদর্শক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এল-কৃত ভূগোলচিত্র হইতে তাঁহার অনুমতিক্রমে গৃহীত।

ভ্রম সংশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭ অনসূয়া	১৭ প্রীতি
২০ প্রীতি	২০ অনসূয়া

কতকগুলিতে কতিপয় অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং পরস্পর হইতে বহু দূরে অবস্থিত নক্ষত্র আমাদের নয়নগোচর হইয়া থাকে। এই প্রকারের নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ বাংলার নরনারী সকলেরই নিকট বিশেষ পরিচিত, উহারা দেশভেদে "সাতভেয়ে" "সাতভাইচম্পা" "ষট্‌মাতৃকা" প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। আজকাল সন্ধ্যার পর ক্ষিতিজ ও খ-মধ্য বিন্দুর অর্দ্ধপথে পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই কুঠারাকৃতি (কাটারি দায় ন্যায়) কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ পাঠকের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। কৃত্তিকার কিঞ্চিৎ নিম্নে ও কিঞ্চিৎ দক্ষিণে গো-শকটাকৃতি রোহিণীনক্ষত্র, রোহিণীশকটের নিম্ন (পূর্ব্বদিকের) বাহুর উত্তর প্রান্তে হলদীবর্ণ (Aldebaran) নামক অত্যুজ্জ্বল রক্তবর্ণ নক্ষত্র দর্শকের নয়নপথে পতিত হইবে। উহার কিঞ্চিং নিম্নে বামদিকে বলয়ত্রয়-পরিশোভিত অষ্ট চন্দ্রের অধীশ্বর অতিবিচিত্র গ্রহরাজ শনৈশ্চর স্বীয় প্রভায় গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া বিদ্যমান আছেন। কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে উজ্জ্বলতম সাতটী নক্ষত্র মানবচক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্জন্য আমাদের দেশে উহাকে সাতভেয়ে বলে। কিন্তু একটু মনোযোগের সহিত দেখিলে উহাতে আটটী নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। উহাদের পৌরাণিক নাম সংভূতি, অনসূয়া, সন্মতি, লজ্জা, প্রীতি, ক্ষমা, বিনতা ও দেবসেনা; উহাদের পাশ্চাত্য নাম Maya, Taygete, Caeleno, Electre, Merope, Atlas, Pleione and Alcyone. ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ছয়টী কৃত্তিকানক্ষত্র এবং প্রীতি (23 Tauri) উহার যোগতারা। তারাদর্শক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে "আদিযুগে কৃত্তিকার ছয়টী তারাই দেখা যাইত, পরে কালক্রমে দেবসেনা তারা বড় হইয়া লোকের দৃষ্টি-গোচর হয়, এবং মাতৃমণ্ডল সপ্তশীর্ষ, সাতভেয়ে বা সাত ভাই চম্পা আখ্যা গ্রহণ করে। ষট্‌কৃত্তিকার স্তন্য প্রবাহিত হইয়া [illegible] শ্রী[illegible] দুই স্তন্য-পানে দেবসেনাপতি [illegible] অতঃ-

নক্ষত্রপুঞ্জ

এই নক্ষত্রপুঞ্জের কেন্দ্রস্থল সংহত ও পরিধির দিকে ছড়ানো।

পর দুরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হইলে কৃত্তিকানক্ষত্রে শতাধিক তারার দর্শন পাওয়া যায়, পরে আরও শক্তিশালী দুরবীক্ষণের আবিষ্কার হওয়ায় উহাতে চারিশত তারার দর্শন পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানকালে ফটোগ্রাফের যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্তিকানক্ষত্রের ফটোচিত্র গ্রহণ করা হইতেছে, তাহাতে আরও অত্যাশ্চর্য্য ও অদ্ভুত বিবরণাদি জানা গিয়াছে। অসংখ্য নক্ষত্র ব্যতীত কৃত্তিকার দুরতম প্রদেশে ঘনীভূত হিমকণার ন্যায় বাষ্পস্তবকের অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। আজকাল এই প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত রোহিণীনক্ষত্র (Hyades) পুষ্যা (Praesepe মধুচক্র) প্রভৃতি বহু তারাস্তবকের ফটোচিত্র গ্রহণ করা হইতেছে।

বহু নক্ষ[illegible] কুলেশ রাশির (গো[illegible]rculis) এবং দক্ষিণাকাশের মহিষাসুর রাশির তারাস্তবক (H 3531 Centauri) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশু রাশির অতিবিচিত্র নক্ষত্ররাজিসমন্বিত তারাগুচ্ছ (M 34 Perseus) সারমেয়যুগল রাশির বাষ্পস্তবক (M Canum venaticorum) এবং বীণারাশির অঙ্গুরীয়কাকৃতি বাষ্পস্তবক (M 57 Lyrii or ring nebula) ছোটখাট দুরবীণে বেশ দেখা যায় কিন্তু অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দুরবীণে উহারা বড়ই মনোরম দেখায়। পশু রাশির নক্ষত্রপুঞ্জ, (M 34 Perseus) পুষ্যানক্ষত্রপুঞ্জ (M 44), বৃশ্চিক রাশির (H 4340 Scorpii) করিমুণ্ড রাশির তারাগুচ্ছ (M 53 Coma Berenicii) খালি চক্ষে বেশ দেখা যায়। বাষ্পস্তবকের মধ্যে একমাত্র ধ্রুবমাতা রাশির বাষ্পস্তবক (M 31 Andromedae or Queen of the nebulae) খালি চক্ষে বেশ সুন্দর দেখা যায়। আবার এমন অনেক নক্ষত্রপুঞ্জ ও নীহারিকা আছে যাহার নক্ষত্রাবলি অত্যন্ত

বাষ্পস্তবক, নীহারিকার নিদান।

শক্তিশালী দুরবীক্ষণ ব্যতীত পৃথক্ বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। আর কতকগুলি নীহারিকা আছে যাহাদের নক্ষত্র, পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত শক্তিশালী দুরবীণ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার কোনটীতেই পৃথক দেখা যায় নাই। তথাপি নানা কারণে জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী দুরবীণ

অভিজিৎ নক্ষত্রসন্নিহিত বৃহৎ বাষ্পস্তবক।

ঘূর্ণকুণ্ডল নীহারিকা, সারমেয় রাশির সন্নিকট।
খুব সম্ভব দুইটি নীহারিকায় তেরছা ভাবে ঠোকাঠুকি লাগিয়া উভয়ে মিলিয়া ঘুরপাক খাইতেছে ; ঘূর্ণাচক্রের প্রান্তে একটি নীহারিকার অধিকাংশ লাগিয়া রহিয়াছে।
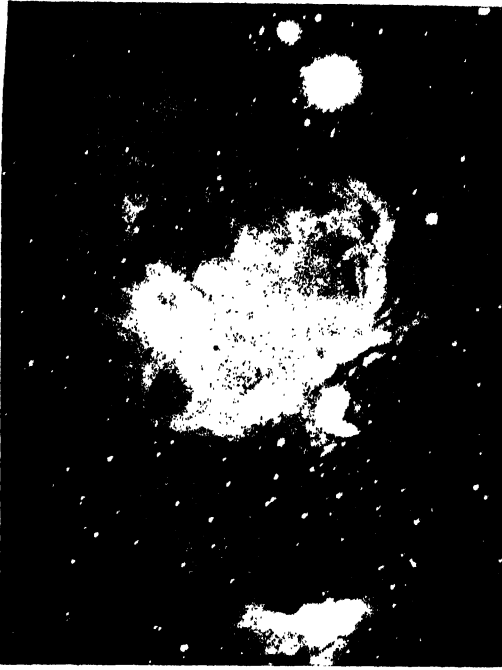
নির্ম্মিত হইলে ঐ-সকল নীহারিকার অধিকাংশেরই অন্তরলিখিত রহস্যের উদ্ভেদ হইবে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিষ্ক পর্য্যবেক্ষণে আলোক-বীক্ষণ যন্ত্রের (Spectroscope) প্রচলন আরম্ভ হওয়ার পর জানা গিয়াছে যে, কালপুরুষ রাশির কৃপাণ-মুষ্টিতে (sword handle) যে জগতের অত্যাশ্চর্য্যতম নীহারিকা বিদ্যমান আছে (M 42 Orioni) তাহাতে এবং ধ্রুবমাতা রাশির স্তবক রাজ্ঞী নামধেয় কুণ্ডলাকৃতি নীহারিকাতে (M 31 Andromedae or Queen of the nebulae) এই প্রকার নক্ষত্র দর্শনের সম্ভাবনা নাই, কারণ উহারা সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় পদার্থে পরিপূর্ণ। আলোকবীক্ষণ যন্ত্রে সূর্য্য এবং বড় বড় নক্ষত্রগুলির রশ্মি বিশ্লেষণ করিয়া যেরূপ অবস্থা জানা গিয়াছে, নীহারিকা ও বাষ্পস্তবকগুলির মধ্যে যাহাদের ঠিক সেই প্রকার অবস্থা পাওয়া গিয়াছে, সেইগুলিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের সমষ্টি। উহাদের যেগুলির নক্ষত্র এখনও পৃথক্ দেখা যায় নাই তাহাদিগকে ফটোগ্রাফের প্লেটে অথবা পরবর্ত্তীকালের আরও অধিকতর শক্তিশালী দূরবীণে পৃথক্ দেখা যাইবে। কিন্তু যে নীহারিকাগুলিতে ঐ প্রকার অবস্থা অবগত হওয়া যায় নাই, তাহাদের মধ্যে নক্ষত্রের অস্তিত্ব নাই। এইরূপে স্তবক-রাজ্ঞীর রশ্মি বিশ্লেষণে ঘনীভূত বাষ্পের অস্তিত্ব ব্যতীত আর কিছুই জানা যায় নাই ; লর্ড রস্ (Lord Rosse) নামক বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ তাঁহার বিশাল দর্পণ-যুক্ত দূরবীণের সাহায্যে কালপুরুষের নীহারিকা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের দর্শন পাইয়াছেন বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু পরে তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পঞ্চাশ কি ষাট বৎসর পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন এই প্রকার ঘনীভূত তুহিন-কণা সদৃশ চিহ্নগুলি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রে পরিপূর্ণ এবং উহারা আমাদের গ্রহরাজ [illegible] সীমার বাহিরে কোন অনানুধাবনীয় [illegible] আছে। আলোকের গ[illegible] গার

মাইল, কিন্তু ঐ-সকল সুদূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসরেও আলোক আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিতে পারে না। ইহাও অনুমিত হইত যে উহাদের অনেকে বহুকাল পূর্ব্বেই নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। এবং অনেকের আলোক আমাদের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহারাও নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। এক্ষণে সার উইলিয়ম হর্শেল ও তাঁহার পরবর্ত্তী কালের জ্যোতিষিগণের এতদ্বিষয়ক গবেষণার ফলে ঐ-সকল ভ্রমাত্মক ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য ঐ-সকল বাষ্পস্তবক ব্যতীত আকাশের বিভিন্ন স্থানে এরূপ নক্ষত্রপুঞ্জের অভাব নাই।

করিমুণ্ড রাশিস্থ ঘূর্ণকুণ্ডল নীহারিকা।

খুব সম্ভব দুইটি নীহারিকার সংঘর্ষে এই দারুণ বেগবতী ঘূর্ণা উৎপন্ন হইয়াছে। নীহারিকার প্রান্ত ভাগে ধাক্কা না লাগাতে উহা ঘোলাটে অনুজ্জ্বল ধূলিরাশির ন্যায় নীহারিকা-পিণ্ডকে ঘিরিয়া আছে।

হর্শেল পূর্ব্বতন যাবতীয় দূরবীক্ষণ হইতেও অধিকতর শক্তিশালী স্বহস্তনির্ [illegible] যন্ত্রের সাহায্যে গহন গগনের অভ্য [illegible] ছিলেন, যাহার ফলে [illegible] অভিনব গ্রহের [illegible]

আবিষ্কার করিয়া তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নাম ক্ষিতিমণ্ডলে যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর প্রচারিত থাকিবে সন্দেহ নাই। তাঁহার সময়ের পূর্ব্বে নীহারিকা এবং বাষ্পস্তবকের সংখ্যা দেড় শতের অধিক জানা ছিল না। এবং ইহাদের অধিকাংশই ফরাসী জ্যোতিষিক মেসিয়ে কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। পূর্ব্বোল্লিখিত নক্ষত্রপুঞ্জ ও নীহারিকাগুলির পূর্ব্বে সংযুক্ত M অক্ষর তাঁহারই নামের নির্দ্দেশক। সার উইলিয়ম হর্শেলের পুত্র সার জন হর্শেল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ সহস্র উন-আশীটী নীহারিকা ও নক্ষত্র-পুঞ্জের নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডাক্তার ড্রেয়ার এক সহস্র নীহারিকার কথা বলিয়া গিয়াছেন। ইহার অধিকাংশই ফটোগ্রাফের যন্ত্রের এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কৃত। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে গগনমণ্ডলে বহুসংখ্যক কুণ্ডলাকৃতি ঘূর্ণায়মান নীহারিকার (spiral) আবিষ্কার জ্যোতিষশাস্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। লর্ড রসই সর্ব্বপ্রথম সারমেয়যুগল রাশিতে (M Canum venaticorum) এই প্রকার নীহারিকার প্রথম আবিষ্কার করেন।

সার উইলিয়ম হর্শেল এই প্রকার নীহারিকা-গুলিকে ছয়টী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ১ম নক্ষত্র-পুঞ্জ, ইহাদের নক্ষত্রাবলি সহজেই পৃথক্ দেখা যায়। ২য় Resolvable (বিশ্লেষণ-সম্ভব নীহারিকা), ইহাদের মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের দর্শন সম্ভব। ৩য় বাষ্পস্তবক, ইহাদের মধ্যে ঐ প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই; উহারা ঘনীভূত কুজ্ঝটিকাবৎ পদার্থে পরিপূর্ণ; উহারা আবার উজ্জ্বলতা ও আকৃতি প্রকৃতি অনুসারে নানাভাগে বিভক্ত। ৪র্থ Planetary nebulae। ৫ম Stellar nebulae। ৬ষ্ঠ Nebulous stars অর্থাৎ গ্রহ বিষয়ক, নক্ষত্র বিষয়ক, এবং তুহিনাবৃত তারাগুচ্ছ বিষয়ক নীহারিকা। এই প্রকার নীহারিকা হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়। উহারাই আমাদের পুরাণ-বর্ণিত কারণ-বারিধিতে ভাসমান পরমাণুময়ী মহী।

সার উইলিয়ম হর্শেলের জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতে দার্শনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন যে সৃষ্টির নিদান-

নারিকেল বৃক্ষের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত আছে যে— "একদা জলাভাব হওয়াতে জনৈক ব্যক্তি ইন্দ্রজালপ্রভাবে তাহার কনুই হইতে জল সৃষ্টি করিয়াছিল। লোকে তাহাকে সয়তান ভাবিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিল। যেখানে কাটা মুণ্ডটি পড়িয়াছিল সেখানে একটি বৃক্ষ গজাইয়া উঠিল। কিছুকাল পরে বৃক্ষটি প্রকাণ্ড হইয়া উঠিল এবং তাহাতে নিহত ব্যক্তির মস্তকের ন্যায় ফল ফলিতে লাগিল। বহুদিন পর্যান্ত লোকে ভয়ে বৃক্ষের নিকটে যায় নাই বা তাহার ফল ভক্ষণ করে নাই। বৃক্ষতলে ফল পড়িয়া পড়িয়া একটা নারিকেল বৃক্ষের অরণ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে জনৈক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এক মরণাপন্ন বৃদ্ধকে ঐ ফলের গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য ফল ভক্ষণ করাইল। বৃদ্ধ পরম পরিতোষের সহিত উহা ভক্ষণ করিল এবং নিয়মিত ঐ ফল ভক্ষণ করিয়া করিয়া কিছুকালের মধ্যে খুব বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল; তাহাকে যুবকের ন্যায় দেখাইতে লাগিল।

এই দ্বীপপুঞ্জের নারিকেল বড় সুস্বাদু। এই নারিকেলই এ দেশের প্রধান পণ্য, এবং বিদেশী দ্রব্য কিনিতে হইলে নারিকেলের বিনিময়ে ক্রয় করে। বৎসরে প্রায় ১৫ লক্ষ নারিকেল উৎপন্ন হয়। কোন্ দ্রব্যের দর কত নারিকেল তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

রূপালি হল করা হাতা	৫০০	জোড়া নারিকেল।
ঐ বড় চামচে	৫০০	"
ঐ কাঁটা চামচে	৫০০	"
ঐ ছোট চামচে ও কাঁটা	৩০০—১২০	"
ঐ অতি ছোট চামচে	২০০	"
গেলাস	২০— ৪০	"
ঘটী	৬০— ৮০	"
সানক	৪০— ৮০	"
বাটি	৪০— ৮০	"
এনামেল প্লেট	৪০— ৮০	"
এনামেল চায়ের বাটি	৪০— ৮০	"
এক ডজন দেশলাই	২০	"
এক ডজন গুলি সুতা	১২	"
এক আঁটি তামাক পাতা	১০০	জোড়া নারিকেল।
লাল সালু কাপড় ১ খানা	১২০০	"
ছিটের কাপড়	১৬০০	"
শাদা থান কাপড়	৮০০	"
চাল ২ মণের বস্তা	৪০০—৫০০	"
চাকু ছুরী	৮০—১২০	"
বড় ছুরী	২০— ৬০	"
বড় দা	৫০—২০০	"
খানা খাবার ছুরী	৪০—১৬০	"
দুয়ানি	৩৮	"
টাকা	৩০— ৮০	"

ইহা ভিন্ন কাঠের ও টিনের তোরঙ্গ, বাক্স, আয়না, চিনি, কর্পূর, তার্পিন তেল, রেড়ির তেল, বিস্কুট, মিঠাই প্রভৃতির বদলেও নারিকেল পাওয়া যায়। কোনো উদ্যোগী ব্যবসায়ী সেখানে বিবিধ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বিনিময়ের নারিকেল, কাঠ, বেত, গর্জন তেল প্রভৃতি আনিয়া এ দেশে বেশ বাণিজ্য করিয়া লাভ করিতে পারে। ব্যবসার জন্য যাইতে হইলে মাথা পিছু একটাকা কর দিয়া পোর্ট ব্লেয়ারে লাইসেন্স লইতে হয়।

মাছ ধরিবার জন্য নিকোবারীরা এক প্রকার মাদক-বীজ বাটিয়া বদ্ধ জলের মধ্যে ফেলে। মাছগুলা উহার প্রভাবে অচেতন হইয়া ভাসিয়া উঠে।

শূকর, বিড়াল, কুকুর এবং মুরগী গৃহে পালিত হয়।

পানীয়ের মধ্যে ডাবের জল ও তাড়ি প্রধান। সাধারণ জল কেবল রাঁধিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

অল্পবয়স্ক ও বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলেই ধূমপান করে।

সকলেই পান খায়। সর্ব্বদা পান ও দোক্তা চিবাইয়া তাহাদের দাঁত কৃষ্ণ বা বাদামি বর্ণ ধারণ করে।

সু।

প্রতীক্ষা

সে ছিল জাতিতে মুচি!

লোকে তাহাকে 'দুখী' বলিয়া ডাকিত। পথের পার্শ্বে একখানি [illegible] কুটিরে সে বাস করিত। পথের দিকে [illegible] শ্রীরাধা [illegible] ক্ষুদ্র জানালা;

দুখী এই জানালার ধারে বসিয়া কাজকর্ম্ম করিত। কাজের সময় চোখ তুলিলেই সে দেখিতে পাইত তাহারই প্রস্তুত জুতা পায়ে দিয়া বাবুরা দলে দলে অফিস, স্কুলে যাইতেছেন। দুখী আজীবন সেই গ্রামে বাস করিতেছে; গ্রামের প্রায় সকলেই তাহাকে চিনিত এবং তাহাকেই কাজ দিত। তাহার এক-কথা. কম দর ও মজবুৎ কাজের জন্য সকলেই প্রায় তাহাকে দিয়া জুতা প্রস্তুত করাইত। পূজার প্রায় তিনমাস পূর্ব্বে হইতে দুখীর কাজের ভীড় বাড়িয়া যাইত; তখন তাহার স্নান আহারের পর্য্যন্ত সময় থাকিত না। সে যেদিন জুতা দিবে বলিয়া কড়ার করিত তাহার একদিনও নড়চড় হইত না; খরিদদারকে হাতে রাখিবার জন্য সে কখনও কাহারও মনযোগান কথা বলিতে পারিত না। কাজেই একশ্রেণীর লোকের সে বড় প্রিয় ছিল।

দুখী, মানুষটা বেশ ভালই ছিল। সরল মন,—কপটতা সে মোটেই ভালবাসিত না; সাধ্যমত লোকের হিত ভিন্ন অহিত করিত না। তাহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ষাটের কাছাকাছি; বৃদ্ধ বয়সে তাহার ইহকালের চেয়ে পরকালের কথাটাই বেশী করিয়া মনে জাগিতেছিল;—সে ঈশ্বরের সহিত একটা রফা করিবার মতলবে ছিল। স্ত্রী তাহাকে ফেলিয়া বহুদিন পূর্ব্বে পরলোকে চলিয়া গিয়াছিল;—সংসারে তাহার একমাত্র বন্ধন ছিল দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র ছিদাম। একবার সে মনে করিল পুত্রকে ভগ্নীর বাড়ি পাঠাইয়া সে তীর্থে তীর্থে জীবনের শেষদিন কয়টা কাটাইয়া দিবে; কিন্তু পুত্রকে আপনার কাছছাড়া করিতে তাহার প্রাণ সরিল না। অবশেষে স্থির করিল পুত্রকে লইয়া কাজ করিতে করিতেই জীবনের শেষ দিন কয়টা কাটাইয়া দিবে।

দৃষ্টির অন্তরালে বসিয়া বিধাতা যে মানুষের ভাগ্যসূত্র লইয়া জাল বুনিতেছেন তাহা হইতে কোন মানবই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ নহে; দুখী বড় আশা করিয়াছিল যে বৃদ্ধবয়সে পুত্রটীকে লইয়া কোনরূপে দিন কয়টা কাটাইয়া দিবে; কিন্তু বিধাতা তাহার সে আশায় বজ্র হানিলেন [illegible] ছিলেন. একটু মানুষের মত হইয়া [illegible] দিবে [illegible] অভিনব প্রকটু করিয়া [illegible] সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় হঠাৎ এক দিনের জ্বরে তাহার ক্ষুদ্র জীবন-দীপটী নিভিয়া গেল; দুখী শোকে দুঃখে হাহাকার করিয়া গগন বিদীর্ণ করিতে চাহিল, কিন্তু তাহার স্বর মেঘে ঠেকিয়া আবার পৃথিবীতে নামিয়া আসিল. দেবতার কানে সে আবেদন পৌঁছিল না। তাহার মনে হইল পৃথিবীতে বিচার নাই, ধর্ম্ম নাই, আকাশে দেবতা নাই। সে আর দেবতার নাম করা বন্ধ করিয়া দিল। কি হইবে নিষ্ঠুরের উপাসনা করিয়া? দারুণ দুঃখে বেচারার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল! দেবতার কাছে সে এখন চাহিত শুধু মৃত্যু; কি সুখে আর সে বাঁচিতে চাহিবে? দেবতা যে তাহার শেষ অবলম্বন কাড়িয়া লইয়াছেন—তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

সেদিন তাহার এক বৃদ্ধ প্রতিবেশী তীর্থ হইতে ফিরিয়া দুখীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। দুখী প্রাণ খুলিয়া তাহার কাছে কাঁদিল; দেবতার অবিচারের কথা, আপনার দুর্ভাগ্যের কাহিনী একটী একটী করিয়া তাহাকে বলিল। উপসংহারে বলিল,—

"আর বাঁচতে একটুও সাধ নেই। দেবতার কাছে এখন একমাত্র প্রার্থনা আমাকেও টেনে নিন তিনি। কোন আশা নেই আর আমার এ পোড়া পৃথিবীতে, কি নিয়ে বেঁচে থাকব?"

"অমন কথা ব'লনা দুখী অমন কথা ব'লনা। ভগবানের কাজের আমরা কি বুঝি যে তার বিচার করব? কোন হেতু খুঁজতে যেয়ো না, তাঁর ওপর নির্ভর কর, তাঁরই ইচ্ছেয় আত্মসমর্পণ কর, প্রাণে শান্তি পাবে। ভগবান যখন তোমার ছেলেটীকে নিয়ে তোমাকে একা পৃথিবীতে ফেলে রেখেছেন তখন নিশ্চয় জেনো যে সে তোমারই ভালর জন্যে,—ইহকালে না বুঝতে পার পরকালে বুঝবে। জিজ্ঞেস করতে পার তবে প্রাণের মধ্যে এ হাহাকার এ অশান্তি এ দুঃখ কেন?—সেটা শুধু তোমার স্বার্থচিন্তার ফল। নিজের সুখের চেষ্টায় ফের তাই তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।"

"তবে মানুষ বাঁচে কেন?"

"ভগবানের জন্যে দুখী, শুধু ভগবানের জন্যে!

তাঁরই দেওয়া প্রাণ নিয়ে তোমায় তাঁরই প্রতীক্ষা কর্‌তে হবে। সে প্রতীক্ষা যখন করতে শিখবে তখন আর প্রাণে দুঃখ থাকবে না, অশান্তি থাকবে না,—চারিদিকে দেখবে শুধু অনাবিল শান্তি!"

"কিন্তু ভগবানের প্রতীক্ষা কি রকম? তাঁরই প্রতীক্ষায় জীবন কাটাব কি ক'রে?"

"কি ক'রে জিজ্ঞেস করছ দুখী? ভগবান ত' নিজেই ব'লে গেছেন যে 'আমি' কথাটা মন থেকে তাড়িয়ে দাও; মনে ভাব তুমিই আমায় প্রাণ দিয়েছ, তুমি আমার হৃদয়ে রয়েছ, তুমিময় জগৎ, আমি তোমারই নিয়োগ-মত কাজ ক'রে যাচ্ছি, যেমন আমায় নিয়োগ করবে আমি তেমনি ক'রে যাব। পড়তে জান তুমি? বেশ, একখানা রামায়ণ কিনে অবসরমত পড়', প্রাণে অনেকটা শান্তি পাবে।"

কথাটা দুখীর মনে লাগিল। সে ভাবিল তাহাই করিবে। পরদিনই সে একখানি রামায়ণ কিনিয়া আনিল। অবসরমত পড়িবে বলিয়া সে সেখানি তাকের উপর তুলিয়া রাখিয়া দিল।

সে প্রথমে মনে করিয়াছিল মাঝে মাঝে মনের অবস্থা বুঝিয়া বইখানা এক আধদিন পাঠ করিবে। কিন্তু পড়িতে আরম্ভ করিয়া অবধি প্রাণে সে এমন একটা শান্তি উপলব্ধি করিতে লাগিল যে নিত্য না পড়িয়া থাকিতে পারিত না। এক একদিন পড়িতে পড়িতে সে এতই তন্ময় হইয়া যাইত যে বই মুড়িয়া শয়ন করিতে একেবারে ভুলিয়া যাইত; অবশেষে প্রদীপের তেলটুকু শেষ হইয়া দীপ নিভিয়া গেলে তবে তাহার চৈতন্যের উদয় হইত। যতই সে পড়িতে লাগিল বইখানা তাহার ততই ভাল লাগিল, ক্রমেই সে ভগবানের প্রতীক্ষায় জীবন ধারণ কথাটার অর্থ উপলব্ধি করিতে লাগিল। প্রাণেও তাহার শান্তির রেখা ততই স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। পূর্ব্বে শয়ন করিলেই তাহার সংসারের শেষ সম্বল ছিদামের কথা মনে পড়িত, দুইগণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা ছুটিত, কিন্তু এখন আর সে জন্য সে শোক করিত না, বলিত,—"জগতের নিয়ন্তা তুমি, প্রভু তুমি, তোমারই মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"

এই সময় হইতে দুখীর জীবনের গতিও অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। পূর্ব্বে সে রবিবারে পাড়ার দুই জন কলের লোকের সহিত গিয়া পোলের ধারে তাড়ি-খানায় তাড়ি খাইয়া আসিত; কোন কোন দিন মাত্রাটা একটু বেশী হইয়া গেলে পথে দুইচারি জনকে গালাগালি দিত, কোন দিন বা মাতাল হইয়া টলিতে টলিতে খানার মধ্যে পড়িয়া যাইত; কিন্তু এখন সে এসকল অভ্যাস ত্যাগ করিল। তাহার প্রাণ শান্ত ও নিরুদ্বেগ হইল। প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই আপনার দৈনিক কর্ম্ম আরম্ভ করিত; সারাদিন কর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যার সময় সে একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালিয়া তাক হইতে বইখানি পাড়িয়া লইয়া বসিত এবং আপনার চশমা-খানি তৈলমলিন বস্ত্রে একবার মুছিয়া লইয়া রামায়ণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিত; যতই পড়িত ব্যাপারটা তাহার নিকট ততই স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিত এবং হৃদয়ে শান্তিও ততই অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করিত।

একদিন সে অরণ্যকাণ্ড পড়িতেছিল। পড়িতে পড়িতে সে 'সীতাহরণ' অধ্যায়ে আসিয়া পড়িল। বই হইতে মুখ তুলিয়া সে একবার কবাট খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল। উদ্দেশ্য, দেখিবে কত রাত্রি হইয়াছে—নূতন অধ্যায়টা আরম্ভ করিবে কি না। সে দেখিল অন্ধকার শীত রজনী স্তব্ধ। কোথাও জনমানবের সাড়াটী অবধি নাই। সে জানিত না যে তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে—বেচারা একান্তে পুস্তক পড়িতেছিল, বাহিরের কোন কিছুতেই তাহার খেয়াল ছিল না। বাহিরের অবস্থা দেখিয়া সে সহজেই বুঝিতে পারিল রাত্রি একটু অধিক হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও বিশেষ কোন ফল হইল না, বইখানা পড়িবার জন্য তখন তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল। অর্দ্ধভগ্ন সূতা-বাঁধা চশমাটী একবার মুছিয়া লইয়া সে আবার পড়িতে আরম্ভ করিল। ক্রমে অমর কবির সেই অমর গাথা তা[illegible]িল,—

" [illegible]

যেরূপ গগনে বুধ ধরে রোহিণীরে
সেরূপ ধরিল দুষ্ট সীতা জানকীরে।"

এইখানে সে পাঠ বন্ধ করিল। ক্রোধে ক্ষোভে তাহার দুই চক্ষু দিয়া আগুনের হল্কা বাহির হইতেছিল। কি স্পর্দ্ধা!...ধর্ম্মজ্ঞানহীন রাবণের মাথায় সেই সময় বজ্রাঘাত হইল না কেন? মরিল না কেন সে?... সতীর ক্রোধাগ্নিতে তখনই দুর্ম্মতি ভস্ম হইয়া গেল না কেন? ক্রোধে তাহার শীতল রক্তও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

দুখী সেই কথাগুলা বার বার আপন মনে ভাবিতেছিল। একটার পর একটা করিয়া ক্রমেই তাহার চিন্তাস্রোত বাড়িয়া চলিতেছিল; ক্রমে একথা হইতে অন্য কথাও তাহার মনে আসিল। হঠাৎ সে পাপী ও পুণ্যাত্মার মধ্যে পার্থক্যটা বিশদভাবেই উপলব্ধি করিল। গুহকচণ্ডাল ও রাবণকে পাশাপাশি রাখিয়া সে তুলনা করিতে লাগিল। একজন ক্ষুদ্র রাজা হইয়াও মহৎ; অন্যজন সসাগরা পৃথিবী ও ত্রিদিব জয় করিয়াও নীচ, পাপাচারী। ওঃ কি পার্থক্য দুইজনের মধ্যে! গুহকের রাজ্যে রামচন্দ্র যখন পদার্পণ করিয়াছিলেন তখন সে কি সমাদরেই তাঁহাকে আপনার প্রাসাদে বরণ করিয়া লইয়াছিল, কত ভক্তি, সেবা, কি সুন্দর সোপচার পূজাই সে করিয়াছিল! আর রাবণ! দুর্ম্মতি, পাষণ্ড, রাজকুলের কলঙ্ক সে! অতিথি তিনি, ধার্ম্মিক তিনি, এমন লোকেরও মানুষে এমন সর্ব্বনাশ করে! ফলও তেমনি পাইল। গুহকের আতিথ্যের পরিবর্ত্তে বন্ধুত্ব, আর রাবণের শত্রুতার পরিবর্ত্তে মৃত্যু! ঠিকই শাস্তি হইয়াছে!

হঠাৎ তাহার মনে হইল, আচ্ছা, রামচন্দ্র যদি আমার গৃহে আসিতেন তবে আমি কি করিতাম?...কি করিতাম?...কি করিতাম? গুহকের মত তাঁহার চরণতলে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া বলিতাম,—"প্রভু তুমি, স্বামী তুমি, আমি শুধু তোমারই নিয়োগমত কাজ ক'রে যাচ্ছি; দয়া কর প্রভু, দা[illegible] উপহার তোমার চরণতলে গ্রহণ কর[illegible] করিতাম কি? ...পাপী [illegible] কি আমার হইত? তাহার মন উত্তর দিল,—"হ্যাঁ পাপী বটে আমি, কিন্তু তা' ব'লে রাবণের মত অন্ধ নই, তার মত পাপী নই যে প্রভুর সেবার পরিবর্ত্তে তাঁকে অপমান করব, তাঁর প্রাণে দাগা দেব!"...হ্যাঁ মন ঠিকই বলিয়াছে অত পাপী আমি নই...না না কিছুতেই না, অত পাপী আমি নই!...না নিশ্চয়ই না...ওগো না—না—না অত পাপী আমি নই.. তুমি বরং একদিন এ দাসের ভাঙ্গা কুটীরে আসিয়া দেখ, অত পাপী আমি নহি।...কিন্তু প্রভু...নীচ আমি, ক্ষুদ্র আমি, পাপী আমি, তুমি এ পাপীর কুটীরে আসিবে কি?...প্রভু...প্রভু.. দয়াময়...!

চুপ ঐ কে ডাকিতেছে—"দুখী!"

দুখী চমকিয়া উঠিল। তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। সে স্পষ্ট শুনিয়াছিল কে তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়াছে; কিন্তু এই গভীর রাত্রে ডাকিল কে? দুখী দ্বার খুলিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তথাপি জিজ্ঞাসা করিল,—"কেগা? কে ডাক্‌লে দুখী ব'লে?"

কেহ তাহার প্রশ্নের উত্তর দিল না; কেবল একরাশ কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস তাহার মুখের উপর দিয়া ছুটিয়া গেল। ত্রস্তে সে দ্বারবন্ধ করিয়া দিল।

সে আবার আসিয়া পূর্ব্বস্থলে বসিল। ঠিক সেই সময়ে কে যেন বলিয়া উঠিল,—"আমি তোমার ঘরে আসব দুখী, আমার জন্যে কাল সকালে প্রতীক্ষা কোরো।"

দুখী চমকিয়া উঠিল। সে ঠিক বুঝিতে পারিল না যে কথাগুলো জাগ্রতে না স্বপ্নে শুনিল! হাত দিয়া উত্তমরূপে নেত্র মার্জ্জনা করিয়া লইল। স্বপ্ন দেখে নাই ত?...কে জানে!

সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। আলোটা নিভাইয়া সে আপন ক্ষুদ্র শয্যায় শুইয়া পড়িল। সারা রাত্রি উৎকণ্ঠায় তাহার ভাল নিদ্রা হইল না। শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাতের অস্পষ্ট আলোক গবাক্ষের ছিদ্রপথে প্রবেশ করিতেই সে উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি করিয়া স্নান করিয়া নিজের কুটিরের পার্শ্বস্থ গাছ হইতে

কয়েকটা ফল পাড়িয়া আনিল এবং সেগুলি সযত্নে একখানি সদ্যধৌত পাত্রে রাখিয়া দিল; তাহার পর নিজে হাতে গরু দুইয়া সেই দুধ ঢাকিয়া রাখিয়া দিল। তারপর সে নিত্যকার মত সেদিনও কাজে বসিল।

দুখী কাজে বসিল বটে কিন্তু তখনও তাহার মন গত রাত্রের ঘটনার কথায় পূর্ণ! চেষ্টা করিয়াও মন হইতে সে কথা সে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিল না। কেবলি তাহার মনে হইতেছিল সে স্বপ্ন দেখে নাই ত? কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইতেছিল কিছুতেই সে স্বপ্ন হইতে পারে না, কথাগুলি সে যে স্পষ্ট শুনিয়াছে, স্বপ্ন বলিয়া অবিশ্বাস করিবে কি করিয়া? কতক্ষণ পরে তাহার মনে হইল,—"হয়ত সত্যিই দয়াময় আস্‌বেন, এমন আসেনও ত?"

অন্যদিনের মত সেদিনও সে সেই জানালার পার্শ্বে বসিয়া কাজ করিতেছিল; আজ কিন্তু তাহার কাজে একটুও মন লাগিতেছিল না, কেবলই সে জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিতেছিল; মধ্যে মধ্যে তাহার অপরিচিত কোন লোককে যাইতে দেখিলে সে ভাল করিয়া তাহার মুখ দেখিতেছিল।

কতক্ষণ পরে একজন ভিক্ষুক আসিয়া তাহার দ্বারে দাঁড়াইল,—"জয় রাধে কৃষ্ণ! দুটী ভিক্ষে পাই বাবা!"

দুখী চমকিয়া নবাগতের দিকে চাহিল। দেখিল শীর্ণ কঙ্কালসার এক ভিক্ষুক তাহার দ্বারপ্রান্তে অনাবৃত দেহে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে।

চাকতে তাহার একটী কথা মনে পড়িয়া গেল। আপন নির্ব্বুদ্ধিতায় বিরক্ত হইয়া সে মনে মনে বলিল, —"বুড়ো হয়েছি কি না, বাহাত্তুরেয় ধরেছে! এ সাদা কথাটা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি! দেবতা যদিই বা দয়া ক'রে এ দরিদ্রের কুটীরে আসেন তবে দেবতার মত দীপ্তিময় দেহে আসবেন নাকি?—ছদ্মবেশেই ত তাঁর আসবার কথা। তাই বোধ হয় এই অপরিচিত ভিখারী আমার দ্বারে এসেছে, আমি কিন্তু রামচন্দ্রের মতই যত্ন করব একে!"

তখনই সে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। বলিল,— "এস বাবা, এস! বড় শীত, বৃষ্টি পড়ছে, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমি মুচি, আমার ঘরে পায়ের ধুলো দিতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে ত ঘরে এসে বোস।"

সঙ্কুচিতভাবে দরিদ্র ভিক্ষুক বলিল—"বাবা আমরা জাতে মুদ্দোফরাস। ঘরে তোমার কেমন করে উঠি?"

দুখী তাড়াতাড়ি বলিল—"তা হোক ভাই, তুমি এস এস, ঘরে উঠে এস।"

ভিক্ষুক কুণ্ঠিত চরণে কুটীরে প্রবেশ করিল। এমন যত্ন সে অন্য কোথাও পায় নাই।

"এস, এস, এই মাদুরে ব'স! আচ্ছা, তোমার বোধ হয় বড় শীত কচ্ছে নয়? এক কাজ কর না, ঐ উনুন জ্বলছে, যাও ঐখানে গিয়ে হাত-পাগুলো একটু গরম ক'রে নাওগে! যাও না, যাও! কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

সঙ্কুচিতভাবে ভিক্ষুক বলিল,—"আমার পা'ময় কাদা এখুনি আপনার সারা ঘর নোংরা হয়ে যাবে..."

"যাক না, তাতে কিছু ক্ষেতি নেই। ধুলোকাদার কথা ব'লচ? রোজই ত কাজকর্ম্ম সেরে ঘর ঝাঁট দি, হলেই বা ধুলো কাদা; যাও যাও তুমি আগে একটু সুস্থ হও, শীতে যে একেবারে ফেকাসে হয়ে গেছ!"

"ভগবান তোমার ভাল করুন বাবা, শীতে আমার হাড়গুলো অবধি কাঁপছে!"

ভিক্ষুক অগ্নিতাপে অনেকটা সুস্থ হইল। দুখী আপনার একটা পুরাতন জামা তাহাকে দিয়া বলিল,— "এইটে পর, শীতে মারা যাবে যে!"

তাহার পর সে সযত্নে কিছু ফলমূল এবং খানিকটা দুধ আনিয়া তাহাকে আহার করিতে দিল। দরিদ্র বুভুক্ষুর পূর্ব্বদিনে একমুষ্টি অন্নও জুটে নাই; সে দারুণ আগ্রহে সেগুলা খাইয়া ফেলিল। দুখী তাহাকে কিছু ছাতু ও একটু গুড় আনিয়া দিল। সে ব্যক্তি তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিয়া একঘটী জল পান করিল। দুখী এক কলিকা তামাক সাজিয়া তাহাকে খাইতে দিল; তাহার পর আবার সে নিজের কাজে বসিল।

তামাক খা[illegible] [illegible]ক্ষুক লক্ষ্য করিল দুখী জানালা দিয়া [illegible] শ্রীরা[illegible]ছে, যেন সে

কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তামাক খাওয়া হইলে কলিকাটা দুখীকে দিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ বাবা! কেউ আসবে নাকি গা, খালি খালি পথের দিকে কি দেখচ!"

দুখী অপ্রস্তুতের একটু ক্ষীণ হাসি হাসিল, আপনার দুর্ব্বলতায় সে যে একটুও লজ্জিত হয় নাই এমন কথাও বলা যায় না! অতিথির দিকে চাহিয়া বলিল,—"কেউ আসবে?—হ্যাঁ—না, এমন বিশেষ কেউ আসবে না, তবে এটা আমার দুর্ব্বলতা মাত্র। তবে তোমার কাছে সব কথা ভেঙ্গেই বলি শোন। কাল রাত্রে রামায়ণখানা পড়ছিলাম;—আচ্ছা তুমি প'ড়তে জান?"

"না বাবা গরিবের ছেলে আমি, ভিক্ষে কত্তেই দিন কেটে গেছে, কখনও পড়বার শোনবার অবসর পাইনি।"

"আচ্ছা তবে সব কথাই তোমায় বলছি। আমি পড়ছিলাম রামচন্দ্র, সীতা আর লক্ষ্মণকে নিয়ে পঞ্চবটীতে এসেছেন, তারপর মায়ামৃগ দেখে সীতাদেবীর ভারি নিতে ইচ্ছে হ'ল, রামচন্দ্র সেই হরিণটা মারতে গেলেন। খানিক পরে তাঁর গলা শুনে লক্ষ্মণও ছুটে গেলেন। কুটীরে রইলেন একা সীতা। এই সময় পাপী রাবণ এসে তাঁকে জোর ক'রে হরণ ক'রে নিয়ে গেল। কি প্রবৃত্তি বল দেখি! রামচন্দ্র যখন রাবণের রাজ্যের মধ্যে কুটীর বেঁধেছেন তখন তিনি ত অতিথি বটে, কি ব্যাভারটাই না রাবণ করলে তাঁর ওপর! আমার রাবণটার ওপর ভারি রাগ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে মনে প'ড়ে গেল গুহকের কথা! তাঁর রাজ্যে রামচন্দ্র যখন গেছলেন তখন সে কি যত্নটাই না করেছিল, আর রাবণের রাজ্যে আসতে তিনি তেমনি দুর্ব্যবহার পেলেন! বল দেখি এতে রাগ হয় না, আমি হাতে পেলে তার মুণ্ডপাত করতাম! আহা বেচারী সীতার করুণ বিলাপ যদি শুনতে!"—বলিতে বলিতে দুখীর উভয় চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

ভিক্ষুকের নেত্রদ্বয়ও শুষ্ক [illegible] না।

[illegible] ছিলেন,

দুখী আবার ব[illegible] "এই-সব কথা ভাবতে ভা[illegible] কজন অভিনব [illegible] বাজে [illegible] হ'ল—আচ্ছা, দেবতা যদি আমার ঘরে আসতেন তবে আমি কি করতাম? গুহকের মত সেবা করতাম, না, রাবণের মত শত্রুতা করতাম! আমার মন ব'লে উঠল গুহকের মত; যদিও আমি রাজা নই, লোকবল আমার নেই, তবুও এ বুড়ার ক্ষুদ্র সামর্থে যতটুকু কুলাত ততটুকুই সেবা ক'রে কৃতার্থ হতাম। ঠিক এই সময়ে আমার মনে হ'ল কে যেন বললে,—"আমি তোমার ঘরে আসব দুখী, আমার জন্যে কাল সকালে প্রতীক্ষা কোরো।"—আমি দোর খুলে ডাকলাম কারো সাড়া পেলাম না, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম; তারপর সকালে উঠেই প্রভুর সেবার জন্যে সামান্য যোগাড় ক'রে তাঁরই প্রতীক্ষা করছিলাম, এমন সময় তুমি এলে।"

অতিথি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দুখীর কথা শুনিতেছিল। তাহার সরল বিশ্বাসে সে মুগ্ধ হইল। যাইবার জন্য উঠিয়া সে দুখীকে একটা নমস্কার করিয়া বলিল,—"যাই বাবা; আজ তোমার দোরে এসে পেট আর মন দুই তৃপ্ত হয়েছে। ভগবান নিশ্চয় তোমার ভালো করবেন।"

"আচ্ছা আজ তবে এস, মাঝে মাঝে এদিকে এসো কিন্তু, আমি অতিথ অভ্যাগত খুব ভালবাসি।"

"আজ্ঞে আসব বই কি বাবা!"—বলিয়া সে চলিয়া গেল। দুখী আবার নিজের কাজে মন দিল।

সে দিন সে কিছুতেই একমনে কাজ করিতেছিল না। চেষ্টা করিয়াও সে চক্ষু দুইটাকে জুতার উপর নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, কেবলই জানালা দিয়া পথের দিকে চাহিতেছিল। বাহিরে কন্‌কনে উত্তরে হাওয়া বহিতেছিল; কুয়াশাটা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল; বহুদূরে একটা ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট রেখা তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছিল। এমনি সময়ে তাহার ঘরের সম্মুখে পথের উপর একজন অপরিচিতা দরিদ্রা আসিয়া দাঁড়াইল, হাওয়ায় তাহার শিশুপুত্রের গাত্র হইতে তাহার ছেঁড়া আঁচলটা খুলিয়া গিয়াছিল; হাওয়ার বিপরীতদিকে মুখ ফিরাইয়া সে সেইটা ঠিক করিয়া লইতে চাহিতেছিল, কিন্তু কোন মতেই পারিয়া উঠিতেছিল না। দুখীর মনে বড় দয়া হইল; রমণী নীচ
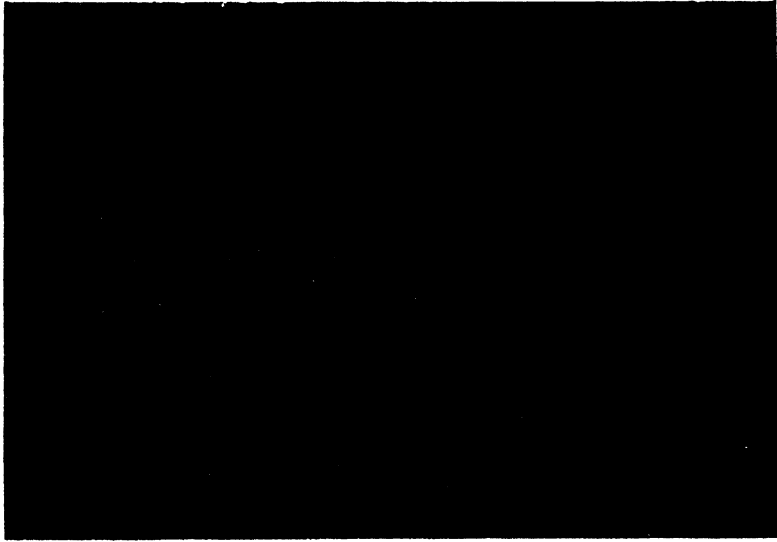
"বেলা যায়, বৃষ্টি বাড়ে, বসি আলিশার আড়ে
ভিজে কাক ডাক ছাড়ে মনের অসুখে।"
[শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত।]

শ্রেণীর দেখিয়া সে সাহস করিয়া ডাকিল,—"ওমা !—মা জননী !"

কেহ ডাকিতেছে শুনিয়া রমণী ফিরিয়া চাহিল।

"ওখানে দাঁড়িয়ে কেন মা, ভারি ঠাণ্ডা, বৃষ্টিতে ছেলেটা ভিজে গেছে যে একেবারে! যদি কিছু মনে না কর ত' তোমার ছেলের এই ঘরে এ'স ? এস না মা,এস !"

রমণী সেই চশমাধারী বৃদ্ধকে তাহাকে ডাকিতে দেখিয়া বিস্মিতা হইল। কিন্তু তখন তাহার একটু গরম স্থানের বিশেষ আবশ্যক, কাজেই সে বিনা প্রশ্নে দুখীর গৃহে প্রবেশ করিল।

দুখী তাহাকে মাদুরখানি দেখাইয়া দিয়া বলিল,—"বোস। ঐ উনুন-গোড়ায় বসে কাপড়-চোপড়-গুলো একটু সেঁকে শুকিয়ে নাও, তোমার ছেলেটীর বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে, একটু দুধ দেব ?"

"হ্যাঁ কাল থেকে আমি উপবাসী, ছেলেটাও মাই-দুধ ছাড়া আর কিছু পায়নি, একটু দুধ পেলে বড় ভাল হয়!"

দুখী তাহাকে অবশিষ্ট দুধটুকু আনিয়া দিল। সে শিশুকে তাহা খাওয়াইতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে বালকের দুগ্ধপান শেষ হইলে দুখী প্রশ্ন করিল,—"তোমরা কি জাত বাছা, আমার রান্না খাবে ?"

"হ্যাঁ কেন খাব না, আমরা জাতে ডোম।"

দুখী তাহাকে আপনার ভাতের থালা আনিয়া দিল। ক্ষুধার্ত্ত রমণী তৃপ্তির সহিত আহার করিতে লাগিল। দুখী এই সময়ে তাহাকে প্রশ্ন করিল, —"এত শীতে বৃষ্টিতে এই কচিছেলে নিয়ে আদুড় গায়ে কোথা যাচ্ছিলে বাছা ?"

"সে বাবা অনেক কথা। আজ দুদিন হ'ল আমার সোয়ামী মারা গেছে। তার সৎকার করতেই বাড়ীতে যে দু'একখানা বাসন ছিল তা শেষ হ'য়ে গেল। এদিকে জমিদারের খাজনা বাকি পড়েছিল, চালাখানা বেচে তার পাওনা চুকুলুম। তারপর মায়ে-পোয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম। এমন এক-টুকরো কাপড় নেই যে গায়ে দি'। আঁচল গায়ে দিয়েই তাই ছেলেটাকে নিয়ে যাচ্ছিলুম; আহা বাছা আমার শীতে কুঁকড়ে পড়েছে।" এই সময়ে রমণীর আহার শেষ হইল।

দুখী তাহাকে হাত ধুইবার জল দিয়া একবার নিজের বাক্সটা খুলিল। খুঁজিয়া-পাতিয়া সে একখানা পুরাতন গায়ের কাপড় বাহির করিল।

"এইটে নাও মা, ছেঁড়া হ'লেও অনেকটা শীত ভাঙবে।"

রমণী গাত্রবস্ত্র পাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হইল। সাগ্রহে বলিল,—"হলেই বা ছেঁড়া বাবা, গরীব আমরা, শীত ভাঙলেই হ'ল। যার কিছু নেই তার আবার ছেঁড়া ভাল কি ?—যা হয় একখানা পেলেই যথেষ্ট।"

গাত্রবস্ত্রে পুত্র ও আপনার দেহ ঢাকিয়া বলিল,—"আমি আর কি বলব বাবা, গরীবকে যে যত্ন তুমি করেছ ভগবান তা দেখেছেন, তিনিই তার প্রতিদান দেবেন।"

রমণী চলিয়া গেল।

দুখী আবার আপনার কাজে বসিল এবং পূর্ব্বের মত বারম্বার বাহিরের দিকে চাহিতে লাগিল। তখনও তাহার মনে এক এক বার আশা হইতেছিল প্রভু আসিবেন,—সে যে তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছে!

দুপ্রহর সময়ে সে আবার রন্ধনাদি করিয়া আহার করিল। তাহার পর আবার কাজ। সারা বৈকালটা এমনিভাবে কাটিয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নববধূর মত সভয়-ধীরপাদক্ষেপে পৃথিবীতে আসিয়া দাঁড়াইল। দুখী তখন একজোড়া নূতন জুতা শেষ করিয়াছে।

অজ্ঞাতে তাহার একটা দীর্ঘনিশ্বাস বহিয়া গেল। প্রাণের মধ্যে নিরাশা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। কই তিনি ত আসিলেন না ?

প্রতিদিনের মত সে ঘর ঝাঁট দিয়া আলো জ্বালিল এবং আপন মনে রন্ধন করিতে লাগিল। তখনও এক এক বার তাহার মনে হইতেছিল,—"এইবার বোধ হয় আসবেন। ঐ না কার পায়ের শব্দ ?—না, চ'লে গেল, ও আর কেউ হবে! ঐ আবার। এবার নিশ্চয়ই তিনি। কিন্তু না।"...

এমনি করিয়া ক্রমে রাত্রি হইয়া গেল। দুখীর সে দিন আর [illegible] ভাল লাগিতেছিল না। সকাল সকাল [illegible] শ্রীরা[illegible]ইয়া পড়িল।

রামায়ণ পড়িতেও সেদিন তাহার ইচ্ছা হইল না। নিরাশাটা এমনি তাহার বুকে বাজিয়াছিল!

রাত্রে দুখী স্বপ্ন দেখিল। দেখিল সেই কঙ্কালসার ভিক্ষুক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, দৃষ্টি তাহার উপর নিবদ্ধ! স্বপ্নে দুখী প্রশ্ন করিল,—"কি চাও?" মূর্ত্তি ঈষৎ হাসিয়া মিলাইয়া গেল; তাহার পর আসিল শিশু-ক্রোড়ে সেই রমণী; মুখে তাহার শান্তির রেখা, তাহার নয়নের শান্ত দৃষ্টি যেন নীরব ভাষায় আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে সে মূর্ত্তিও মিলাইয়া গেল। তাহার পর আসিল জ্যোতির্ম্ময় শান্তগম্ভীর-মূর্ত্তি এক সন্ন্যাসী। তাঁহার দক্ষিণে অন্নপূর্ণা, বামে জগদ্ধাত্রী, শিরে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা। জলদমন্দ্ররবে তিনি বলিলেন,—"তোমার ভক্তিতে বড় সন্তোষলাভ করেছি দুখী, পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ, এই নাও তার পুরস্কার,—শান্তি! তোমার প্রতীক্ষা সফল হয়েছে।"

সেই দেবতা ধীরে ধীরে আসিয়া দুখীর বুকের মধ্যে মিলাইয়া গেল। দুখী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

জাগিয়া উঠিয়া দুখী দেখিল শয্যার উপর সে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিবার ভঙ্গিতে শুইয়া আছে।

বাহিরে তখন কুয়াশার আবরণজাল ঈষৎ অপসৃত করিয়া উষাদেবী উঁকি মারিতেছিলেন। শান্তিতে দুখীর সারা হৃদয়খানি পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। সে সেই স্বপ্নের দেবতার উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িল। আজ তাহার প্রতীক্ষা সফল হইয়াছে। দেবতা তাহার প্রাণে আসিয়াছেন! তার মত আজ সুখী কে? *

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কষ্টিপাথর

ভারতী (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ)

চিত্রের পরিচয়—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

বাৎস্যায়ন-কামসূত্রের প্রথম অধিকরণ তৃতীয় অধ্যায়ের টীকায় যশোধর পণ্ডিত আলেখ্যের ছয় অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—প্রথম রূপভেদ, দ্বিতীয় প্রমাণ, তৃতীয় ভাব, চতুর্থ লাবণ্যযোজন, পঞ্চম সাদৃশ্য, ষষ্ঠ বর্ণিকাভঙ্গ।

* [illegible] অভিনব [illegible]

কামসূত্রের রচনাকাল কাহারো মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৭১, কাহারো মতে বা খৃঃ পূর্ব্ব ৩১২, আবার কাহারো মতে ২০০ খৃঃ অব্দ বই নয়। যশোধর পণ্ডিত কামসূত্রের টীকা রচনা করেন ১১ শত হইতে ১২ শত খৃষ্ট অব্দের মধ্যে।

চিত্রে এই ষড়ঙ্গ যে কত প্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল তাহা বলা কঠিন; তবে কামসূত্রে যখন চিত্রকলার উল্লেখ আছে তখন বাৎস্যায়নের পূর্ব্ব হইতেই চিত্রবিদ্যার সহিত চিত্রের ষড়ঙ্গও এদেশে প্রচলিত ছিল।

আমাদের ষড়ঙ্গ, যশোধরের বহু পূর্ব্বে প্রাচীন কাল হইতেই ভারতশিল্পীগণের নিকট সুবিদিত ছিল;—কেননা দেখিতে পাই, খৃষ্টীয় ৪৭৯ হইতে ৫০১ শতাব্দীর মধ্যে চীন দেশে শিল্পাচার্য্য Hsieh Ho চিত্রের যে ষড়ঙ্গ—Six canons লিপিবদ্ধ করেন তাহা কার্য্যত আমাদের ষড়ঙ্গেরই অনুরূপ। ইহা ছাড়া আমরা আরও দেখি যে, চীন দেশে ৩০০ খৃঃ অব্দে অমিতাভ বুদ্ধমূর্ত্তি সবপ্রথম চীন শিল্পী Tai Kuei গঠন করেন। সুতরাং Hsieh Hoর পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধ শিল্পপদ্ধতি ও তাহার সহিত আমাদের চিত্রের ষড়ঙ্গও চীন দেশে নীত হওয়া আশ্চর্য্য নয়। চীন চিত্র-বিদ্যাটি Hsieh Ho তিন কিম্বা চার কি পাঁচ ভাগে বিভক্ত না করিয়া ষড়ঙ্গে বিভক্ত করেনই বা কেন তাহাও দেখিবার বিষয়। Hsieh Hoর লিখিত ষড়ঙ্গ চীনে জাপানে এবং ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজে প্রাচ্য শিল্পের মুলমন্ত্ররূপে যেরূপ আদর পাইয়াছে ও পাইতেছে, আমাদের ষড়ঙ্গের অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটে নাই, এমন কি যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রাচ্য শিল্প লইয়া আজকাল বিশেষ আলোচনা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যেও কেহই ভারতীয় চিত্রের ষড়ঙ্গটির এপর্য্যন্ত কোনোও উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, অথচ প্রায় সমস্ত ভাষাতেই কামসূত্র ও তাহার টীকার অনুবাদ হইয়া গেছে। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি ভারতবর্ষ ও চীন এই দুই মহাদেশে প্রচলিত চিত্রের ষড়ঙ্গ দুইটি যে নিকট-আত্মীয় তাহা চীন-ষড়ঙ্গের সহিত আমাদের ষড়ঙ্গটি মিলাইলেই বোঝা যায়।

পঞ্চদশীর চিত্রদীপ অধ্যায়ে শাস্ত্রকার চিত্রপটের অবস্থা-চতুষ্টয় দিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ ও ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য নির্ণয় করিতেছেন। চিত্রকলা নিশ্চয়ই আমাদের দেশে সখের খেলা ছিল না,—আমাদের জ্ঞানের ও কর্ম্মের সহিত তাহার নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল। চিত্রকলাকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে চক্ষে দেখিতেন এক চীন ও জাপান ছাড়া আর কোনো জাতি যে সে চক্ষে দেখিয়াছে এমন মনে হয় না। আমাদের নিত্য-কর্ম্মের ভিতরে চিত্র ও আলিম্পন ইত্যাদির যেরূপ অধিকার দেখা যায় তাহাতে চিত্রের এই ষড়ঙ্গটির প্রয়োগ বহুকাল হইতে যে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল এবং সেটার সম্বন্ধে একটা চর্চ্চা এখনকার কালেও যে আমাদের প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য; এবং আমরা নূতন করিয়া যেমন চিত্রবিদ্যার চর্চ্চা করিতে অগ্রসর হইয়াছি তেমনি চিত্রের ষড়ঙ্গটির সঙ্গেও নূতন করিয়া আর একবার পরিচয় করিয়া লওয়া আমাদের আবশ্যক।

আমরা দেখিতেছি চীন ও ভারতের ষড়ঙ্গ দুইটি পর্য্যায়ক্রমে পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে মিল না থাকিলেও দুয়ের একটা সামঞ্জস্য ধরিয়া লওয়া চলে। কিন্তু তাহা হইলেও দুইটিই যে একই বস্তু তাহা বলা চলে না। নদীর এপার ওপার দুই পারকে যেমন একই পার বলিতে পার না, তেমনি চিত্রসম্বন্ধে চিন্তা-প্রবাহটির দুই পারে যে এই দুইটি ষড়ঙ্গ, তাহাদের একই বস্তু বলা যায় না। আমাদেরটি যেন কর্ম্মের পার ও তাহাদেরটি

এপার কখনো ওপার স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে। আমাদের পারের পথটি রূপনারায়ণের বাঁধা ঘাটে গিয়া মিলিয়াছে, আর ওপারের পথ সেই আপাটাতে গিয়া মিশিয়াছে জীবনের অপরূপ ছন্দটি যেখানে উঠিতেছে, পড়িতেছে। ভারতের ষড়ঙ্গটি যেমন বাঁধা-ঘাটের মত সুচারুভাবে ধাপে ধাপে সজ্জিত ও সুনির্মিত—চিত্রের সবটুকু সেখানে যেমন বাঁধিয়া ছাঁদিয়া যেটির পর যেটি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে, চীন ষড়ঙ্গটি মোটেই সেরূপ নয়। সেখানে ছাঁদের সঙ্গে বাঁধকে জুড়িয়া দেওয়া হয় নাই, কাজেই আমাদের মন সেখানে অনেকটা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে এবং একটা বাঁধা-গণ্ডির ভিতরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। ভারতের ষড়ঙ্গটি যেন চিত্রের দিক দিয়া, আর চীন ষড়ঙ্গটি যেন চিত্রকরের দিক দিয়া ব্যাপারটার মীমাংসা করিতে চলা। চিত্র যখন আমাদের সম্মুখে রূপ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ভারত ষড়ঙ্গটি যেন তখনকার ইতিহাস; আর, চীন ষড়ঙ্গটি যেন সেখানকার কথা যেখানে চিত্রটির প্রাণের ছন্দ মহাশক্তিরূপে বিদ্যমান আছেন।

দুইটি ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ এই পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে যেটুকু মিল বা যেটুকু অমিল দেখা যায় তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য হয় না কিন্তু ষড়ঙ্গ দুইটির শীর্ষস্থান যেমন—'রূপভেদাঃ' এবং Rhythmic Vitality (প্রাণছন্দ)—এই দুইটিতে যে আড়াআড়ি তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এখন এই দুই একই পদার্থ কি না, অথবা একই পর্ব্বতের এপিঠ ওপিঠ কি না—সেটাই জানা আবশ্যক। 'রূপভেদ' আমাদের এবং 'জীবন-ছন্দ' চীনের যে মূলমন্ত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। রূপ এবং প্রাণ এই দুইটিই চিত্রের গোড়া এবং শেষ;—প্রাণ প্রকাশ পাইবার জন্য রূপের আকাঙ্ক্ষা রাখে, রূপ বর্ত্তিয়া রহিবার জন্য প্রাণের প্রতীক্ষা করে। শুধু রূপ লইয়া চিত্র হয় না, শুধু প্রাণ লইয়াও চিত্র হয় না। যদি বলা যায় শুধু রূপ তবে ভুল হয়, যদি বলা যায় শুধু প্রাণ তবেও ভুল হয়। এই জন্য চীন ষড়ঙ্গকার Vitality বা প্রাণের সঙ্গে Rhythm অর্থাৎ ছন্দ বা ছাঁদটি জুড়িয়া উভয় দিক বজায় রাখিয়াছেন, আর আমাদের ষড়ঙ্গকার শুধু 'রূপ' বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন না, বলিলেন 'রূপভেদাঃ'!

এখন এই 'ভেদ' কথাটি প্রয়োগের সার্থকতা বুঝা অথবা না-বুঝার উপরে আমাদের ষড়ঙ্গের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে।

যদি আমরা রূপভেদের অর্থ ধরি তাবৎ সৃষ্টবস্তুর বিভিন্নতা, তবে আমাদের ষড়ঙ্গটি নির্জীব ও জড়সাধনার উপায় হইয়া পড়ে; কিন্তু চিত্র তো জড় সামগ্রী নহে। চিত্র যে রচে এবং চিত্র যে দেখে উভয়ের জীবনের সহিত চিত্রিতের আত্মীয়তা; তা ছাড়া চিত্রের নিজেরও একটা সত্তা আছে; সুতরাং রূপভেদের অর্থ রূপের মর্ম্মভেদ বা রহস্য-উদ্‌ঘাটন।

চিত্রকে আমাদের ষড়ঙ্গকার যে সজীব বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতেন তাহার প্রমাণ ষড়ঙ্গেই বিদ্যমান,—চিত্রের ছয় অংশ নয়, ছয় দিকও নয়, ছয় অঙ্গ। অঙ্গের সহিত সকলের একটি অকাট্য ও অবিরোধ সম্বন্ধ ঘটাইয়া ষড়ঙ্গটিকে এমন একটা পরিমিত গতি ও ভঙ্গী দেওয়া হইয়াছে যে ষড়ঙ্গটি একটা ছন্দে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবন্তরূপে আমাদের কাছে প্রকাশ না পাইয়া থাকিতে পারে না। তা ছাড়া ষড়ঙ্গকার 'যোজনম্' এই শব্দটি ষড়ঙ্গের ঠিক হৃদয়ের মাঝখানটিতে বসাইয়াছেন; ষড়ঙ্গের মস্তিষ্কে ভেদাভেদ জ্ঞান, দুই পায়ের গতি স্থিতি মাঝে, যোগানন্দের হৃদয়-গ্রন্থিটি দিয়া দুইকে এক করা হইয়াছে। ইউরোপীয় প্রণালীতেও আলেখ্যের গোড়ার কথা হচ্ছে,—Contrast, Unity, Variety, অথবা ভেদ, যোজন ও ভঙ্গ বা ভেদ ও ভঙ্গের যোগসাধন পরিণয়।

সারথি যেমন লাগামের ভিতর দিয়া নিজের ইচ্ছাশক্তিটুকু সঞ্চালিত করিয়া দুই অশ্বের উদ্দাম গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া, যান, বাহন ও নিজের মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক স্থাপন করেন, শিল্পীও তেমনি বর্ণিকা বা বর্ণবর্ত্তিকা—আমরা যাহাকে বলি তুলি তাহারই টান-টোনের ভিতর দিয়া নিজের ইচ্ছা-শক্তি বা বাসনাকে প্রবাহিত করিয়া বিশ্বচরাচরের সহিত নিজের সৃষ্টি যে চিত্র এবং নিজেকেও এক ছাঁদে বাঁধিয়া চলেন; এই কথা চীন ষড়ঙ্গকার স্পষ্ট করিয়া জোর করিয়া বলিয়াছেন, আর আমাদের ষড়ঙ্গকার সেই কথাটাই একটু ঘুরাইয়া ঠারে ঠোরে বলিতেছেন। চিত্রের সহিত, চিত্র যে দেখে, চিত্র যে লেখে, এবং চিত্রে যাহাদের লেখা যায় তাহাদের পরস্পরের প্রাণের পরিচয় ঘটানোই দুই ষড়ঙ্গ সাধনারই চরম লক্ষ্য।

এখন দেখা যাক্ চিত্র কাহাকে বলি। যাহাতে রূপের ভেদাভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ এই ছয়টি বর্ত্তমান তাহাই চিত্র যদি, তবে আমার ঘরের মেঝেতে পাতা এই বিলাতি গালিচাখানিকেও চিত্র বলিতে হয়। তুলির দ্বারা যাহা চিত্রিত হয় তাহাই চিত্র? তুলির দ্বারা লাঠিমটি চিত্রিত হইয়াছে, তাহাও কি চিত্র? যাহাই তুলি দিয়া চিত্রিত হয় তাহাই চিত্র নয়: কিম্বা বাহ্য বস্তুর নকল যেমন ফটোগ্রাফ, বা এই বিলাতি গালিচা, ইহাও চিত্র নয়।

অভিধান লিখিলেন 'চীয়তে ইতি চিত্রম্'। চিত্রকর চয়ন করেন সত্য;—বহির্জগৎ অন্তর্জগৎ উভয়ের ভাব চয়ন করেন, লাবণ্য চয়ন করেন, রূপ প্রমাণ সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ চয়ন করেন। কিন্তু এই চয়ন কার্য্য কিম্বা এই চয়নের সমষ্টিকেও তো চিত্র বলিতে পারি না;—ফুল বাছিয়া সাজি ভরান মালীর বাহাদুরি কিন্তু সেই বাহাদুরিটুকু তো চিত্রের সব নয়। চিত্রকরের চয়নের স্বাভাবিক পরিণতি যে চিত্ত-হরণ অকৃত্রিম ষড়ঙ্গমালা তাহাই চিত্র।

বাহিরে বিশ্বজগৎ, রূপে রসে শব্দে স্পর্শে গন্ধে ছায়াতপে আলোআঁধারে পাঁচ-ফুলের মালঞ্চের মত প্রকাশ পাইতেছে, অন্তরে পদ্মসরোবর, সুখ-দুঃখ আনন্দ-অবসাদ ভাবভক্তির সুরে লয়ে লহরীতে ভরপুর রহিয়াছে; চিত্রকর এতদুভয়ের মধ্যে যাতায়াত করিয়া পুষ্প চয়ন করিতেছেন ও মনন-সূত্র দিয়া অপূর্ব্ব হার গাঁথিতেছেন এবং সেই হারে সাজাইয়া পুষ্পক-রথ নির্ম্মাণ করিতেছেন। কিন্তু কাহাকে বহন করিবার জন্য? আত্ম-দেবতাকে;—চিত্রকরের নিজের আত্মাকে। এই আত্মা যদি পটে চিত্রিত বা অধিষ্ঠিত রহেন তবে তাহাই চিত্র,—যদি গালিচায় অধিষ্ঠিত হয়েন তবে তাহাই চিত্র,—যদি গৃহভিত্তিতে অথবা যদি গ্রন্থের কাগজে অধিষ্ঠিত হয়েন তবে তাহাও চিত্র।

আত্মা আত্মীয়তার জন্য ব্যাকুল;—চারিদিকের আত্মীয়তার ভিতর আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহার ভিতরে বিপুল একটা প্রকাশ-বেদনা উদয় হইয়া নিয়ত কার্য্য করিতেছে। এই প্রকাশ-বেদনের—এই উদয়ের অভিব্যক্তিই হচ্ছে চিত্র। এই উদয়ের রং, এই বেদনের শোণিমা যখন আসিয়া সাদা কাগজকে রাঙাইতেছে;—তাহাকে রূপ দিতেছে, প্রমাণ দিতেছে, ভাব লাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ দিতেছে, তখনই হইতেছে চিত্র। সুতরাং দেখিতেছি চিত্র যাহা তাহার গোড়াতে হচ্ছে গোপন একটি উদয়-উৎস যাহার ভিতরে প্রকাশ-বেদন আছে; আর শেষ একটি অনির্ব্ব[illegible] [illegible]সাদয় যেখানে হচ্ছে চিত্রের পরিণতি। এবং এই [illegible] আছে রূপ ভাব লাবণ্য ইত্যাদির ছন্দ ছাঁদ [illegible] তখন যখন চিত্রকরের অন্তর্নিহিত [illegible] ছন্দের নিয়মে

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ [illegible]

আপনাকে বাঁধিয়া অন্তর্বাহ্য দুই রূপে নিজেকে সঙ্গত করিয়া রসোদয়ে পরিণত হয়। শব্দচিত্র, সঙ্গীত, বাদ্য-চিত্র, কবিতা, দৃশ্যচিত্র, পট ও মূর্ত্তি ইত্যাদি কেহই সৃষ্টির এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অনুসরণ না করিয়া প্রকাশ পাইতেই পারে না। পাগলের এবং মাতালের অন্তরের উৎকট প্রকাশ-বেদনা, উদয়-বাসনা কিছুতেই আপনাকে ছন্দে বাঁধিতে পারিতেছে না;—ছন্দের আবরণ ও আচ্ছাদন সে দূরে ফেলিয়া উলঙ্গ হইয়া দেখা দিতেছে; কাজেই বেদনাতেই তাহার পরিসমাপ্তি রসোদয়ের আনন্দে নয়। চিত্র প্রথমোদয়ে বা প্রকাশ-বেদনের অবস্থায় অরুণ বা অব্যক্তরাগ শব্দরহিত; উদয়ের দ্বিতীয় অবস্থায় সে প্রনূন,—ছন্দের মধ্যে সংপ্রেষিত প্রচলিত বা কল্পিত: আর উদয়ের তৃতীয় অবস্থায় সে অনূন, অখণ্ড সমগ্র অর্থাৎ রূপে প্রমাণে ভাবে লাবণ্যে সাদৃশ্যে বর্ণিকাভঙ্গে পরিপূর্ণ সূর্য্যের ন্যায় অখণ্ডমণ্ডলাকারে উদিত। চিত্রের প্রথমোদয় এবং পূর্ণোদয়ের ঠিক মর্ম্মস্থানটিতে আছেন ছন্দ—এই জন্য ছন্দকে বলা হইয়াছে 'চন্দয়তি ইতি ছন্দ'। কেননা ইনি আনন্দিত করেন। ইনি উদয়ের উন্মেষ এবং উদয়ের শেষ এই দুয়ের শুভদৃষ্টির উপরে প্রচ্ছদ-পটখানির মত দোদুল্যমান; সেই জন্য বলা হইয়াছে 'আচ্ছাদয়তি ইতি ছন্দ'। উষার ভিতরে যেমন উদয়ের অভিপ্রায় নিহিত রহে, তেমনি ছন্দের ভিতর দিয়া চিত্রকরের মনোভিপ্রায় আপনাকে ব্যক্ত করে; সেই জন্য ছন্দকেই বলা হয় 'অভিপ্রায়'। ছন্দ বহুবিধ:—রূপের প্রমাণের ভাবের লাবণ্যের সাদৃশ্যের বর্ণিকাভঙ্গের ছন্দ। ছন্দ—ছাঁদ্ বা ছাঁচ। ছন্দ—ছাঁদিয়া বাঁধা বা ছাঁদা।

কবি ও চিত্রকার এই তরঙ্গিত ঝঙ্কৃত রেখা ও লেখার বর্ণ-মালার বরমাল্যে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রূপে রস, রসে রূপ সম্প্রদান করেন। অন্তর বাহিরের দিকে এবং বাহির অন্তরের দিকে হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিতেছে;—এই দুই হাত যেখানে আসিয়া বাঁধা পড়িতেছে সেখানেই রহিয়াছে, ছন্দ-মালাটি দোদুল্যমান। এই ছুটিয়া-বাহির-হওয়া ও ছুটিয়া-ভিতরে-আসার মধ্যে যে দোল, দোলা বা দোললীলা তাহাকেই বলি ছন্দ।

আমরা যে লোকে বাস করিতেছি তাহাকে বলা হয় ব্রহ্মলোক। এখানকার যাহা কিছু সকলি ছায়াতপ দিয়া আমাদের গোচরে আসে। 'ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে'। সুতরাং ছন্দটিও দেখি ছাঁদ এবং বাঁধ এই ছায়াতপে আমাদের নিকট প্রকাশ পাইতেছে। এই ছন্দের শক্তি বোধ করা ও বোধ করানই হচ্ছে ছন্দ-বোধ এবং এই ছন্দ-শক্তিকে রূপ প্রমাণ ভাব লাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গে উদ্বোধিত করিয়া তোলাই হচ্ছে চিত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।

এখন চিত্রের যে প্রাণের প্রাণ যে রস তাহা কি? ছন্দ। যাহাকে চিত্রকারের চিত্ত হইতে চিত্রে এবং চিত্র হইতে আবার আমার চিত্তে বাহিত করিতেছে। 'রসো বৈ সঃ!' ছন্দের পরিণতি রসে, কিন্তু রসের পরিণতি কিসে? বলিতে হয় তাই বলি 'ব্যস্'এ,—নয় তো দুই ফোঁটা অশ্রুজলে। ইহা অপেক্ষা রসকে অধিকতর পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জো নাই। এই হ'ল রস—একথা বলা চলে না, কেননা 'স চ ন কার্য্যঃ নাপি জ্ঞাপ্য'। তবে কি সে আকাশ-কুসুমের মত অলীক? কখনই না। রস যে হচ্ছে। রস যে পাচ্ছি। রস যে রয়েছে দেখছি। 'পুরইব পরিস্ফুরণ্'—যেন সম্মুখে। 'হৃদয়মিব প্রবিশন্'—যেন বুকের ভিতরে, 'সর্ব্বাঙ্গীনমিব-মালিঙ্গন্' সর্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন [illegible] আছিলেন।

'অয়ম্ শৃঙ্গার[illegible] 'অভিনব [illegible]নী'—সে অলৌকিক এক চমৎকার[illegible] আসিতেছে। 'অন্যৎ [illegible] বার

সর্ব্বমিব তিরোদধৎ'—তাহার সম্মুখে কিছু আর তিষ্টিতে পারিতেছে না, রসে সব ভাসাইয়া লইতেছে, রসের মধ্যে সকলি ডুবিয়া যাইতেছে। বিরাট প্লাবনের মত সকলের উপরে 'ব্রহ্মস্বাদমিব অনুভাবয়ন্'—যেন বৃহতের আস্বাদে আমাদেরও বড় করিয়া তুলিয়া রহিয়াছে সেই প্রকাণ্ড আস্বাদরস।

রস যখন চিত্রের সর্ব্বস্ব, তাহার প্রাণেরও প্রাণ, তখন এক প্রাণ রসনা ব্যতিরেকে আর কোন ইন্দ্রিয়—না চক্ষু না শ্রোত্র—চিত্রের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছে, চিত্রিতব্যের স্বাদ পাইতেছে। চিত্রের উৎপত্তি চিত্রের পরিণতি এই দুইটিই যখন রহিল প্রাণের ভিতরে তখন প্রাণ দিয়াই তাহাদের উভয়কে দেখিতে হয়, শুধু চোখ দিয়া নয়,—এমন কি যেটুকু চোখে দেখিতেছি, হাতে ধরিতে পারিতেছি তাহাকেও চোখ দিয়া দেখা শুধু নয়, হাত দিয়া ছোঁয়া শুধু নয়,—প্রাণ দিয়া দেখা, প্রাণ দিয়া স্পর্শ করা।

"চোখে দেখে গায়ে ঠেকে ধূলা আর মাটি।
প্রাণ-রসনায় দেখরে চাইখা রসের সাঁই খাটি।
চোখে ধূলা আর মাটি, প্রাণে রসের সাঁই খাটি।
রূপের রসের ফুল ফুইটা যায়
আমার পরাণ-সূতা কই।
বাইরে বাজে সাঁইয়ের বাঁশি
আমি শুইনা আকুল হই।
আমার মিলন-মালা হইল নারে
লাজে পথ হাঁটি
কেবল হাঁটি আর হাঁটি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—

জ্যোতিবাবুদের বাড়ীতে একজন গুরুমহাশয় ছিলেন, তাঁহার নিকটই ইঁহার হাতেখড়ি হয়। সেই পাঠশালায় পাড়াপ্রতিবেশী-দিগের অন্যান্য ছেলেরাও পড়িতে আসিত। এই গুরুমহাশয়টি একবারে সেকেলে গুরুমহাশয়ের জ্বলন্ত আদর্শ। রং কালো, গোঁপযোড়া মুড়া-খ্যাংরার ন্যায়, কাঁচা পাকায় মিশ্রিত। চুল লম্বা, উড়েদের মত পিছন দিকে গ্রন্থিবদ্ধ। গুরুমহাশয়ের মুখে কখনও হাসি দেখা যাইত না, যদি বা ওষ্ঠপ্রান্তে কখনও একটু হাসির বক্ররেখা দেখা দিত ত' সে সুতীব্র কুটিল হাসি। ছাত্রদের বেত মারিবার সময় সে হাসিটুকু ফুটিত। গুরুমহাশয় পড়াইবার সময় অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় পা ছড়াইয়া "গুরুচ্ছাদি" তৈল মর্দ্দন করিতেন। সে তৈলের কি-এক বিট্কেল গন্ধ। তাঁর এক গাছি ছোট বেত ছিল, নিজের দেহের সঙ্গে সঙ্গে সেটিকেও তিনি সযত্নে তৈল মাখাইতেন। নিয়মিত তৈলমর্দ্দনে বেত-গাছটিতেও বেশ একটা পাকা রং ধরিয়াছিল। এই বেত্রটির উপর গুরুমহাশয়ের পুত্র-বাৎসল্য ছিল। একবার জ্যোতি বাবুর সেজদাদা ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দুষ্টামি করিয়া এই বেতখানিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে গুরুমহাশয়ের ঠিক যেন পুত্রশোক উপস্থিত হয়। পরে অনেক খোসামুদি, সাধ্যসাধনা করিয়া বেতটি তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া পাইয়া তবে তিনি প্রকৃতিস্থ হয়েন। অপরাধে, বিনা অপরাধে, যখন-তখন, এই বেতগাছটি ছাত্রদিগের পৃষ্ঠসংস্পর্শে আসিত। আশ্চর্য্য এমনি তাঁহার হস্তকণ্ডূয়ন যে, যখন ছুটি দিতেন তখনও দুই চারি ঘা পটাপট্ বেত্রাঘাত না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না, আর সেই সঙ্গে কতকগুলা অকথ্য গালিবর্ষণও যে

না হইত, তাহাও নয়। ইহার পর বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে ইংরেজী পড়া আরম্ভ হইল। তখন জ্যোতিবাবুর অভিভাবক তাঁহার সেজদাদা (স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। তাঁহার শিক্ষারীতিও সেকালের অনুরূপ অতি কঠোর ছিল। অষ্টপ্রহর ঘাড় গুঁজিয়া টেবিলে বসিয়া পড়িতে হইত। মিছামিছি সময় নষ্ট হইবে বলিয়া, তিনি খেলিতেও ছুটি দিতেন না। কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত হইল। লেখাপড়ার উপর তাঁর একটা বিষম বিতৃষ্ণা জন্মিল। হেমেন্দ্রবাবু জ্যোতিবাবুকে মুগুর-ভাঁজা, ডন্ ফেলা প্রভৃতি অভ্যাস করাইতেন, এবং তাঁহাকে সন্তরণ-বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়াছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল, তিনি অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও লিখিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সদা সর্ব্বদাই তিনি সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদির আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং আপন-মনে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতেন। এই সময়ে তিনি ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিতেছিলেন—বেশ ব্যুৎপত্তিও জন্মিয়াছিল। হেমেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত অম্বু গুহ সেই সময়কার নামজাদা পালোয়ান ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্কুলে ভর্ত্তি হইলে বাড়ীর কঠোর শিক্ষাশাসন হইতে তিনি কতকটা অব্যাহতি পাইলেন। তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে খুব ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব হইত। কুমোরেরা বাড়ীতেই প্রতিমা নির্ম্মাণ করিত। প্রতিমা নির্ম্মাণের কাঠাম হইতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঔৎসুক্য আরম্ভ হইত। তারপর খড়বাঁধা, একমাটি, দোমাটি, রং দেওয়া, মুণ্ড বসান প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিমাখানি যখন ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিত তখন তাঁহার ঔৎসুক্য এবং আনন্দের আর সীমা থাকিত না। এক বৎসর "চালচিত্রের" সময় একটা কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঠাকুরদালানেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বসিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভগিনী ঐ পাঠশালায় তালপাতায় "ক" "খ"র দাগা বুলাইতেন। (সে ভগিনীর অল্পবয়সেই মৃত্যু হয়।) পটুয়ারা চালচিত্র সম্পূর্ণ করিয়া কাপড় ঢাকা দিয়া চলিয়া গিয়াছে,—পূজার আর দুই এক দিন মাত্র বাকী,—এমন সময় সেই ভগ্নীটির কি এক খেয়াল চাপিল, তিনি চাল হইতে কাপড়খানার ঢাকা খুলিয়া ফেলিয়া, দোয়াতের কালিতে কলম ডুবাইয়া সমস্ত চালখানি কালির পোঁচে চিত্রবিচিত্র করিয়া দিলেন! এতদিনকার সযত্ন-সম্পাদিত চিত্রকর্ম্ম সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল। বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। তখন আবার পটুয়াদিগকে ডাকাইয়া যেমন-তেমন করিয়া চাল চিত্রিত হইল। তারপর পূজার তিন দিন বাড়ীর উঠানে যাত্রার আয়োজন ও আনন্দ। বৈঠকখানায় অভিভাবকদের মজলিশ্। সেখানে বাইনাচ চলিত। ছেলেদিগকে লইয়া যাত্রা দেখাইবার ভার ছিল দীনু ঘোষালের উপর। দীনু ঘোষাল জ্যোতিবাবুর পিতৃব্যমহাশয়দের একজন মোসাহেব—সে ছেলেদেরও খুব প্রিয়পাত্র ছিল। দীনু ছেলেদের লইয়া ঠাকুরদালানের রোয়াকে মজলিশ্ করিয়া বসিত এবং মধ্যে মধ্যে রুমালে টাকা বাঁধিয়া ছেলেদের হাত দিয়া "পেলা" দেওয়াইত। তখনকার শ্রেষ্ঠ যাত্রাওয়ালা নিমাই দাস এবং নিতাই দাসের যাত্রাই এ বাড়ীতে হইত। যাত্রাওয়ালা ছোকরাদের পোষাক ছিল জরির চাপ্‌কান, জরির কোমরবন্ধ, পালকওয়ালা মুকুটের মত জরির টুপী। জরি অবশ্য ঝুটা। যে কালে যে পোষাকের ফ্যাশান্, যাত্রাওয়ালারাও তাহাই অনুকরণ করিয়া থাকে।

"বিজয়ার দিন প্রাতে আমাদের বাড়ীতে বিষ্ণু গায়কের বিজয়া গান হইত। আমরা সকলে বসিয়া শান্তির জল লইতাম, তারপর প্রতিমা বাহির করা হইত। অপরাহ্নে আমরা অভিভাবকগণের সহিত ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে বসিয়া প্রতিমা ভাসান দেখিতাম। প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর বাড়ী আসিয়া বড়ই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিত—মনটাও কেমন একটু খারাপ হইয়া যাইত। এই দুর্গোৎসবে—দেব, মানব ও দানব এই তিন ভাবের দৃশ্যই দেখা যাইত। আমাদের বাড়ীতে পশুবলি হইত না, কুমড়া বলিতেই কায হইত। পূজার সময় আমার পিতৃদেব কখনও বাড়ীতে থাকিতেন না। কোথাও না কোথাও ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। পূজার ভার আমার দুই কাকা স্বর্গীয় গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপরই ন্যস্ত থাকিত।

"মেজ' কাকা (৺গিরিন্দ্রনাথ) বিজ্ঞানে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার একটি পরীক্ষাগার (Laboratory) ছিল। তিনি খুব ভাল গান রচনাও করিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত "বাবুবিলাস" নামে যাত্রা আমাদের বাড়ীতে অভিনীত হইয়াছিল। উদ্যানরচনাতেও তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল। শেষোক্ত সখটি শেষে গুণদাদাতেও (তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়) বর্ত্তাইয়াছিল। তিনিও খুব সুন্দররূপে বাগান গড়িতে পারিতেন। ছোট কাকামহাশয় ৺নগেন্দ্র-নাথ ঠাকুর আমার দাদামহাশয় ৺দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাত গিয়াছিলেন। সেইখানেই তাঁহার শিক্ষা হয়। ইংরাজী সাহিত্যে তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অতিশয় কোমল এবং পরদুঃখকাতর ছিল। কেহ কোনও বিপদে পড়িলে অথবা ঋণ-জালে জড়িত হইলে তিনি তাহাকে মুক্ত করিতে ব্যস্ত হইতেন। এই পরোপচিকীর্ষায় তিনি একবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। নিজে ঋণ করিয়া অপরকে ঋণমুক্ত করিতেন। এইরূপে পরের জন্য তিনি বিষম ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজে যখন এমনি বিপন্ন, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি Customs Houseএ Collectorএর কার্য্য গ্রহণ করেন। বাঙ্গালীকে তখন এ পদ দেওয়া হইত না। ছোট কাকা মহাশয়ই এ কার্য্যে প্রথম নিযুক্ত হয়েন।

"আমার বেশ মনে আছে একবার বর্দ্ধমানের মহারাজা শ্রীযুক্ত মহাতাব্‌চাঁদ বাহাদুর আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। মহারাজকে দেখিবার নিমিত্ত সদর রাস্তা ও আমাদের গলি একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। এখন দেখা যায় রাজাদের মধ্যে একটা Democracyর Spirit জাগিয়াছে, তাঁহারা অনেক স্থলেই গমন করেন। ইহা অবশ্য ভালই তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তখন এ ভাব ছিল না। মহারাজ মহাতাব্‌চাঁদের ব্রাহ্মসমাজের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল। তিনি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের (মহর্ষির) একজন খুব প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি বর্দ্ধমানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়া মহর্ষির নিকট আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন এমন একটি লোক প্রার্থনা করেন। মহর্ষি ইতিপূর্ব্বে যে চারিজন পণ্ডিতকে বেদশিক্ষার জন্য কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই একজনকে আচার্য্যের পদে বৃত করিয়া বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া দেন। বর্দ্ধমানে ব্রাহ্মসমাজের কাজকর্ম্ম বেশ সুচারু-রূপেই চলিতেছিল, এমন সময় কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। কেশব বাবুর কার্য্যকলাপ এবং আচার ব্যবহারে মহারাজা কেমন বিরক্ত হইয়া, বর্দ্ধমান হইতে ব্রাহ্মসমাজ উঠাইয়া দিয়া, সমাজের সহিত সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ [illegible]"

জ্যোতিবাবু তখন [illegible] শ্রীরাম[illegible] পড়িতেন। যে রেখা-চিত্রকলার জন্য [illegible] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

প্রশংসিত হইতেছেন তাহার বীজ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের সেই বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথেও পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ক্লাসে বসিয়া তিনি একবার তাঁহাদের মাষ্টার জয়গোপাল শেঠের ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাঁহার যে চিত্র অঙ্কিত হইতেছিল, এ ব্যাপার মাষ্টার মহাশয় কিছুই জানিতেন না। সে ছবি শেষে এমন ঠিক হইয়াছিল যে মাষ্টারদের মধ্যেও তাই লইয়া একটা খুব হাসি তামাসা পড়িয়া গিয়াছিল। ব্যারিষ্টার শ্রীযুত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের পিতৃব্য শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের ছবি তিনি প্রথম আঁকেন। তখন হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ছবি আঁকিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। তাহার উপর তাঁহার প্রথম চিত্র দেখিয়াই যখন সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে বাড়ীর লোকদের চেহারা আঁকিতেন। সে-সকল চিত্র চোতা কাগজে অঙ্কিত হইত, এবং তাহা সযত্নে রক্ষা করাও আবশ্যক মনে করিতেন না, কাজেই সেগুলি এখন সব হারাইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি ছবি হারানোতে তিনি বিশেষ দুঃখিত—সে ছবি ব্রহ্মানন্দ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের। রীতিমত শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পান নাই বলিয়া তিনি এখন দুঃখ করেন। ব্যারিষ্টার ৺মনোমোহন ঘোষের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান তাঁহার একটি সুখের স্মৃতি। বারাণ্ডায় মাদুর পাতিয়া মিসেস ঘোষের সঙ্গে বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাস খেলিতেন। তিনি লালমোহন বাবুর সঙ্গে একটা বড় খাটে একসঙ্গে শয়ন করিতেন। একদিন মনোমোহন বাবু ও সত্যেন্দ্র বাবু দুইজনে বিলাত যাইবার মতলব আঁটিতেছিলেন—লালমোহন বাবু তাই শুনিয়া অমনি হাসিতে হাসিতে আসিয়া পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন "দাদা, the steamer is ready !"

তখন কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কি উৎসাহ ও আনন্দ! কেশব বাবুর সহিত খৃষ্টান পাদ্রী লালবিহারী দে ও কৃষ্ণনগরের Dyson সাহেবের সহিত খুব বাগ্‌যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল! লালবিহারী দে সুন্দর ইংরাজীতে কেশববাবুকে ঠাট্টা করিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পরিহাস-বাণ প্রয়োগে কেশববাবুও কম দক্ষ ছিলেন না। লালবিহারীর বক্তৃতা লিখিত, কেশব বাবুর মৌখিক, সুতরাং সেই বক্তৃতার তোড়ে বেচারা লালবিহারীর সমস্ত ঠাট্টা মস্করা ভাসিয়া যাইত। কেশব বাবুর দলই জয়লাভ করিত। তাঁহার ছেলের দল, এই জয়োল্লাসে মাতিয়া উঠিতেন।

এই সময়ে ১১ই মাঘে ইঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ব্রহ্মোৎসবের ঘটা হইত। আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাতঃকালের উপাসনা হইয়া গেলে দলে দলে ব্রাহ্মেরা জোড়াসাঁকোর বাটীতে আসিয়া সমবেত হইতেন। ইঁহাদের উৎসাহদীপ্ত আনন্দ-বিকশিত মুখ, গগনভেদী উচ্চকণ্ঠে "সবে মিলে গাও" "আজ আনন্দের সীমা কি" "আজি সবে গাও আনন্দে" প্রভৃতি সত্যেন্দ্রনাথের রচিত গান সকলে মিলিয়া গাওয়া হইত। "তারপর হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন মহা উৎসাহের সহিত স্বরচিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের ডঙ্কা বাজিল" প্রভৃতি গান গাহিতেন, তখন যে কি পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দে আমাদের মন ভরিয়া উঠিত তাহা বর্ণনাতীত। সেকালের সেই দুর্গাপূজার আনন্দ এবং এ কালের এই ব্রহ্মোৎসবের আনন্দ—এ উভয়ের মধ্যে যেন স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রভেদ। এ এক ছবি আর সে এক ছবি।"

হরদেব প্রাচীন তন্ত্রের লো[illegible] খুব সৎসাহসী ও সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন [illegible] ৺অভিনব ব[illegible] শিক্ষার জন্য বেথুন স্কুল খোলা হয় [illegible] হার কন্যাকে বেথুন [illegible] বা[illegible] স্কুলে পাঠাইয়া দেন। ইনি গৃহী হইয়াও ভগবদ্ভক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন [illegible] ভূতে দয়া এবং বিশ্বপ্রেমে তাঁহার চক্ষুদুইটি যেন জ্বল্ জ্বল্ করিত একটা ঔষধের কৌটা সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। তি[illegible] দীন দুঃখীগণকে ঔষধ বিতরণ করিয়া বেড়াইতেন। তিনি ধর্ম্ম সামাজিক গান নিজেই রচনা করিয়া গাইতেন। বাঙ্গালীদের ম[illegible] যাহাতে সৎসাহসের আবির্ভাব হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন দেশে সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গান বাঁধিতেন; যথা—

> "ব্যাটা ছেলের * * * কড়ি সর্ব্বলোকে কয়
> কলম্বস্ নাবিক ছিল সাহসে আমেরিকা গেল
> দেশের বার্ত্তা জেনে শেষে দেশটি কর্‌লে জয়।"
>
> ইত্যাদি।

ইঁহার রচিত গানগুলি শেষে ৺প্যারিচাঁদ মিত্র নিজ ব্যয়ে ছাপাই[illegible] দেন।" ইঁহার দুই কন্যার সহিত শেষে পর পর ৺হেমেন্দ্রনাথে[illegible] সহিত এবং বীরেন্দ্রনাথের (জ্যোতিবাবুর ন' দাদা) সহিত বিবা[illegible] হয়।

ব্রাহ্মণ মহাসভা—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী—

কালীঘাটে সম্প্রতি বাঙ্গলার মহাব্রাহ্মণমণ্ডলী যে মহাগর্জ্জ[illegible] করেছেন তাতে আমাদের ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। কি[illegible] লজ্জিত হবার কারণ আছে, কেননা শাস্ত্রে বলে—বহ্বারম্ভে ল[illegible] ক্রিয়া অজা-যুদ্ধেই শোভা পায়।

আমি বিলেত-ফেরৎ হলেও ব্রাহ্মণ; ইংরাজি-শিক্ষিত এব[illegible] বাঙ্গালী; এই তিন কারণেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের এই প্রহসনে[illegible] অভিনয় দেখে আমি লজ্জিত ও স্তম্ভিত হয়ে গেছি। (১) এ সত্য কারও অস্বীকার করবার যো নেই যে, ভারতবর্ষের ঘোর অমানিশা[illegible] মধ্যে যে জাতি বিদ্যার প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, অশে[illegible] দুঃখ দৈন্য নৈরাশ্যের মধ্যে যে জাতি সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন, সে জাতির নিকট ভারতবর্ষ চিরঋণী হয়ে থাকবে। হিন্দুজাতির মন নামক পদার্থটি যে এতদিন রক্ষিত হয়েছে, সে হচ্ছে ব্রাহ্মণের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের, গুণে। সুতরাং হিন্দুমাত্রেরই নিকট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কথা প্রামাণ্য না হলেও মান্য। সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা যে আজ অনাবশ্যকে নব্যশিক্ষিতসম্প্রদায়ের নিকট নিজেদের উপহাসাস্পদ করেছেন, এতে আমার জাত্যভিমানে আঘাত লাগে। এ ভুল তাঁরা কখনও করতেন না, যদি না এ ব্যাপারে জনকয়েক ইংরাজি-শিক্ষিত বিষয়ী ব্রাহ্মণের প্ররোচনা এবং পৃষ্ঠপোষকতা থাকত। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা অবশ্য জানেন যে তাঁরা সমাজের শাসক নন, শাস্ত্রী,—তাঁরা ধর্ম্মের রক্ষক নন, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের রক্ষক। এক কথায় তাঁরা শুধু সমাজের Books of Reference, বড় জোর Guide Book—কারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা যা খুসি তাই ডিক্রী দিতে পারেন, কিন্তু সে ডিক্রী সমাজের উপর জারি করবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। অধিকন্তু বিষয়ী ব্রাহ্মণের জীবনযাত্রা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের জীবনযাত্রা, বিষয়ী ব্রাহ্মণের দক্ষিণার উপরে নির্ভর করে।

(২) আমি ইংরাজি-শিক্ষিত বলে' এ ব্যাপারে লজ্জিত, কেননা আমাদের একদলের প্রলোভনে পড়েই পণ্ডিত-সম্প্রদায় এই সব অযথা তর্জ্জন গর্জ্জন করেছেন।

ইংরাজি-শিক্ষিত ধর্ম্ম-রক্ষকেরা নিজ নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, রুচি,

চরিত্র এবং অবস্থা অনুসারে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু মোটামুটি ধরতে গেলে এঁদেরও চার বর্ণে বিভক্ত করা যায়।

(ক) যাঁরা হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন তাঁরা হচ্ছেন ব্রাহ্মণ। শুনতে পাই হাবার্ট স্পেন্সর এঁদের গুরু। এঁরা প্রচার করেন যে, মনোজগৎ জড়জগতের অধীন, জড়জগৎ মনোজগতের নয়; অতএব যে সমাজ যত জড় সে সমাজ তত আধ্যাত্মিক। সুতরাং জড় বস্তুর নিয়মে এঁরা সমাজকে বাঁধতে চান, মানুষকে জড়ে পরিণত করতে চান। সাহিত্যে এই ব্রাহ্মণ পাচকের দল, সংস্কৃত শাস্ত্র এবং ইংরাজি বিজ্ঞান একত্র ঘেঁটে নিত্য খিচুড়ি পাকান, যাতে না আছে নুন, না আছে ঘী, না আছে মশলা। সে খিচুড়ি গলাধঃকরণ করা, আর না-করা, আমাদের স্বেচ্ছাধীন। এঁদের পাণ্ডিত্যের উপদ্রব, বাঙ্গালীর মনের উপর, সমাজের উপর নয়। এঁরা যে-কথা নিজে বিশ্বাস করেন না তাই অপরকে বিশ্বাস করাতে চান;—অবশ্য লোক-হিতের জন্য। (খ) আর একদল আছেন, হিঁদুয়ানি করা যাঁদের ব্যবসা। এঁরা হচ্ছেন বৈশ্য। তবে কালের গুণে এঁদের ব্যবসা নতুন আকার ধারণ করেছে। এঁরা হিঁদুয়ানির লিমিটেড কোম্পানী করে বাজারে ধর্ম্মের সেয়ার বেচেন; —অবশ্য গো ব্রাহ্মণের হিতের জন্য। (গ) আর একদল আছেন, যাঁদের পক্ষে সমাজের বিধি-নিষেধের দাসত্ব করা স্বাভাবিক;—এঁরা শূদ্র। এঁরা একটা কিছু না-মেনে চল্‌লে, চলতে পারেন না; এঁরা ভালবাসেন পরের দ্বারা যন্ত্রের মত চালিত হওয়া। এঁরা তর্কযুক্তিকে ভয় পান; এঁরা আদেশের বশবর্ত্তী বলে কারও উপদেশ কানে তোলেন না। এঁরা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করেন,—নির্ব্বিচারে তার নিয়ম পালন করে'। এঁরা নিজে শাসিত হতে চান্‌, পরকে শাসন করতে চান না। (ঘ) আর একদল হচ্ছেন নব্য-ক্ষত্রিয়; এঁরাই হচ্ছেন সকল নাটের গুরু। এঁরা শূদ্রের ন্যায় স্বর্গে যাবার সস্তা টিকিট স্বরূপে টিকি শিরোধার্য্য করেন না—করেন ধর্ম্মের ধ্বজা স্বরূপে, এবং তারই আস্ফালন করে' বীরত্বের পরিচয় দেবার জন্য। এঁদের ধর্ম্ম হচ্ছে, শুধু ভ্রাতৃবিরোধের সৃষ্টি করা। ধর্ম্মক্ষেত্রে একটা কুরুক্ষেত্র না বাধিয়ে এঁরা স্থির থাক্‌তে পারেন না। এঁরা সভা করে এই মতের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করতে চান যে, সামাজিক কপটতাই হচ্ছে সামাজিক ধর্ম্ম, অতএব আচরণীয়। যে যুগে সমগ্র শিক্ষিত সমাজের সকল চিন্তা, সকল যত্ন হচ্ছে জাতি গঠনের দিকে, সেই যুগের সেই সমাজের জনকয়েকের চেষ্টা যে শুধু জাত মারবার দিকে, এর চাইতে ক্ষোভের বিষয় আর কি হতে পারে! তাঁদের হাতেই হিন্দু সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, যাঁদের চেষ্টা হচ্ছে সমগ্র হিন্দু সমাজকে একটি একান্নবর্ত্তী পরিবার করে তোলা। আর যাঁরা ছোঁয়ানাড়ার বিচার নিয়েই আছেন, যাঁদের চেষ্টা হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে চুলো পৃথক করে নেওয়া, তাঁদের হাতে পড়লে সমাজ চুলোয় যাবে।

(৩) আমার লজ্জিত হবার তৃতীয় কারণ যে, আমি বাঙ্গালী। এই সব ছেলেখেলা আর-যারই পক্ষে শোভা পাক না কেন, বাঙ্গালীর পক্ষে শোভা পায় না। কারণ একথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, বাঙ্গালী ভারতবর্ষে নূতন প্রাণ এনেছে, সমগ্র ভারতবাসীকে নতুন সুর ধরিয়ে দিয়েছে।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা তিনটি মনোভাবের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সে হচ্ছে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা! এ তিনেরই বীজমন্ত্র, চৈতন্যদেব বাঙ্গালীর কানে দিয়ে গেছেন। তিনি আপামরচণ্ডালকে কোল দিয়ে সাম্যের প্রতি, প্রেম ভক্তির উদ্বোধন করে মৈত্রীর প্রতি, এবং লোকাচারের অধীনতা থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে স্বাধীনতার প্রতি বাঙ্গালীর মনকে অনুকূল করে গেছেন। চৈতন্য যে-ভাবের বন্যা এনেছিলেন তাতে সমগ্র দেশ ভেসে গেছে;—শাস্ত্রের বাঁধ তাকে আটকে রাখ্‌তে পারে নি। ভারতবর্ষে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে 'যুগধর্ম্ম' বলে যে একটি জিনিষ আছে সে কথা স্বজাতিকে বুঝিয়ে দেন। এই "যুগধর্ম্ম" অতীতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন না হলেও বিভিন্ন। শাস্ত্রের ধর্ম্ম হচ্ছে অতীতের "যুগধর্ম্ম"; সুতরাং বর্ত্তমানের "যুগধর্ম্ম" শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অধীন হতে পারে না। আমরা বাঙ্গলা দেশের নব্য-তান্ত্রিকেরা বর্ত্তমানের "যুগধর্ম্ম" অনুসারেই জীবন গঠন করবার চেষ্টা করছি। সে জীবন শাস্ত্রের দ্বারা কেউ সম্পূর্ণ শাসিত করতে পারবে না। কিন্তু কেবল মাত্র মনের জোরে সমাজের সম্পূর্ণ বদল করা যায় না,—যদি না সামাজিক অবস্থা সেই মনের সহায় হয়। চৈতন্যর সময় এমন কোনও বাহ্য ঘটনা ঘটে নি, যাতে করে সমাজকে পরিবর্ত্তিত হতে বাধ্য করতে পার্‌ত। তখনকার সমাজের গায়ে কর্ম্ম-জীবনের প্রবল ধাক্কা লাগেনি। কিন্তু আমাদের অবস্থা স্বতন্ত্র। একদিকে ইংরাজি শিক্ষা আমাদের মনের বদল করছে, অপর দিকে ইংরাজের শাসন আমাদের কর্ম্মজীবনে অভূতপূর্ব্ব নূতনত্ব দিচ্ছে।

আমাদের কর্ম্মজীবনের সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কোনই যোগ নেই। ওকালতি, জজিয়তি, ডাক্তারি, মাষ্টারি, এঞ্জিনিয়ারি, কেরাণিগিরিতে বর্ণভেদ নেই, আশ্রমভেদ নেই। বিদ্যালয়ে ও কর্ম্মক্ষেত্রে সকলে সমান,—সেখানে ছোট বড়র প্রভেদ ব্যক্তিগত;—জাতিগত নয়। সে প্রভেদ কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে;—জন্মের উপরে নয়। সুতরাং জাতিভেদ এখন সমাজে নেই;—আছে শুধু ঘরে। তার পর তুমি চাও, আর না-চাও, কর্ম্মজীবনের বাধাস্বরূপ অশনবসনের সামাজিক নিয়ম, নিষ্কর্ম্মা ছাড়া অপর সকলেই লঙ্ঘন করতে বাধ্য। সেই কারণে বাঙ্গলাদেশের যত নিষ্কর্ম্মার দলই, অর্থাৎ, জমিদার ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের দলই খাদ্যাখাদ্যের বিচাররূপ অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে বৃথা কালক্ষেপ করতে পারেন। সুতরাং শুধু জ্ঞানে নয়, কর্ম্মেও—এই নবযুগ আমাদের সমাজ-শাসনের বহির্ভূত করে স্বাধীন করে দিচ্ছে। যে-জ্ঞানের ও যে-কর্ম্মের স্রোত আমাদের সমাজের ভিতর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে—তার গতি কেউ ফেরাতে পারবেন না। তার পূর্ব্বকূলে যা শিকস্তি হবে, পশ্চিম কূলে আবার তাই পয়স্তি হবে। এই নূতন জীবনের স্রোত সামাজিক মনের ও চরিত্রের ক্ষুদ্রত্ব ভেঙ্গে, কি মহত্ব গড়ে তুলছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দামোদরের বন্যার সময় পাওয়া গেছে। আমাদের যুবকসম্প্রদায়, ভাইকে অদৃশ্য করে তুলতে চায় না; ছত্রিশ জাতকে ভাই করে নিতে চায়। যে-সাম্য, যে-মৈত্রী ও যে-স্বাধীনতার ভাব চৈতন্য প্রথমে এদেশে প্রচার করেন—সেই ভাবের উপরেই বাঙ্গালীর নবজীবন গঠিত হয়ে উঠছে। ইউরোপীয় সভ্যতার উত্তর-সাধকতায়, নব্য-তান্ত্রিকেরা যে-সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, সমাজ কোন ছায়াময়ী বিভীষিকা দেখিয়ে তাদের সে সাধনা থেকে বিচলিত করতে পারবে না।

(৪) ব্রাহ্মণ-মহাসভা যে নিজেদের হাস্যাস্পদ করেছেন, তার বিশিষ্ট কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষে নিজের ক্ষমতার সম্পূর্ণ অতিরিক্ত কাজ করতে গেলে নিজে কাঁদতে পারে, কিন্তু অপরকে হাসায়।

প্রথমতঃ হিন্দুসমাজ শাস্ত্রশাসিত নয়; লোকাচার-চালিত। সমাজ আবহমানকাল যে এইভাবে চলে আসছে তার প্রমাণ ধর্ম্মশাস্ত্রেই পাওয়া যায়। মনু একথা স্বীকার করেছেন; তাঁর মতে লোকাচার এত প্রবল যে তার উপর হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা রাজারও নেই। বর্ত্তমান শ্রীরাঘুরাজ-মনুর শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ শতকরা পাঁচটা [illegible] লোকসমাজ,

—লোকাচার, দেশাচার ও কুলাচারের বশবর্ত্তী। বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজ এই তিনটির উপর আর একটিরও বিশেষ অধীন—সেটি হচ্ছে স্ত্রী-আচার। সুতরাং হিন্দুসমাজের বিধি-নিষেধ পুঁথিতে নেই, আছে পাঁজিতে। এ অবস্থায় শাস্ত্রের সাহায্যে সমাজকে কি করে শাসন করা যেতে পারে? লোকাচার রক্ষা কর্‌বার জন্য শাস্ত্রের আবশ্যক নেই; লোকাচার নষ্ট কর্‌বার জন্য শাস্ত্র অনেক সময়ে আমাদের হাতে অস্ত্র। শাস্ত্রকে এই অস্ত্র হিসেবেই রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং দয়ানন্দ স্বামী ব্যবহার করেছেন। ব্রাহ্মণ মহাসভার প্রথম ভুল এই যে, তাঁরা শাস্ত্রের সাহায্যে লোকাচারের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চান।

এঁদের দ্বিতীয় ভুল এই যে, এঁরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দ্বারা সমগ্র হিন্দুসমাজকে শাসন কর্‌তে চান। হিন্দুসমাজ বলে' কোনও একটা সমগ্র সমাজ নেই। আমাদের হাজারো-এক জাতির এবং তাদের শাখা উপশাখার সমাজ সব স্বতন্ত্র সমাজ। এই অসংখ্য খণ্ডসমাজ সব স্বপ্রধান, কোনও বিশেষ জাতির কিম্বা কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকের শাসনাধীন নয়। অবশ্য এ-সকল সমাজেই ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব আছে। কিন্তু সে হচ্ছে ধর্ম্মযাজক হিসেবে;—সমাজের শাসনকর্ত্তা হিসেবে নয়। ব্রাহ্মণেতর বর্ণের নিকট ব্রাহ্মণের মত, ক্রিয়া-সম্বন্ধে গ্রাহ্য; কর্ম্ম সম্বন্ধে নয়। হিন্দুদের জাতমারা বিদ্যে এমনি যে, ব্রাহ্মণের মধ্যেও অধিকাংশ লোককে আমরা জাতিভ্রষ্ট করে রেখেছি। আমরা যে-শূদ্রের হাতে জল খাই সেই শূদ্র-যাজক ব্রাহ্মণের হাতে জল খাইনে। শুধু তাই নয়, বর্ণ-ব্রাহ্মণেরা যে-দেবতার পূজা করেন সে দেবতারও আমরা জাত মারি। শূদ্রের ঠাকুরের সুমুখে আমরা মাথা নীচু করি নে; তার ভোগ আমরা স্পর্শ করিনে। যদি ব্রাহ্মণমাত্রকে একত্র করে' আমরা একটি সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজ গড়ে তুলতে পারতুম, তা হলেও নয় হিন্দুসমাজকে শাসন কর্‌বার কথা বলা চল্‌ত। কিন্তু আমরা আমাদের জাত-মারা-বিদ্যের গুণে পারি শুধু সমাজকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেল্‌তে। আমাদের গুণীপনার পরিচয় গুণে নয়, ভাগে। ব্রাহ্মণ-সভা কালীঘাটে শুধু সেই বিদ্যেরই পরিচয় দিয়েছেন। বিলেত-ফেরত প্রভৃতি অনাচারীদের জাত মেরে তাঁরা আর একটি খণ্ড-সমাজ গড়ে তুল্‌তে চান। তাতে আর যার ক্ষতি হোক, আর না-হোক্, এই নূতন খণ্ডের কোনও ক্ষতি হবে না। হিন্দুসমাজ পুরুভুজের ন্যায় জীব,—তার খণ্ডিত অঙ্গগুলি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে বেড়ায়।

ইউরোপের সমাজের সকল আচার পদ্ধতি যে নির্ব্বিচারে গ্রাহ্য করা আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য কিম্বা মঙ্গলকর তা অবশ্য নয়। জীবনের ধর্ম্মই হচ্ছে যে, তা মানুষকে ভালর দিকেও এগিয়ে দিতে পারে মন্দের দিকেও এগিয়ে দিতে পারে। জীবন্ত পদার্থের স্বেচ্ছা বলে' একটা জিনিষ আছে;—জড়পদার্থই কেবল ষোল আনা জড়জগতের নিয়মাধীন। কিন্তু স্বজাতির রক্ষা ও উন্নতির জন্য কি ভাল, আর কি মন্দ, সে বিচার কর্‌বার শক্তি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নেই। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিচার—সে ত পুঁথিগত-বিদ্যার মল্লযুদ্ধ—তার উদ্দেশ্য সত্যনির্ণয় করা নয়, বিপক্ষকে চিৎ করা। পণ্ডিতেরা শিক্ষা করেন শুধু ন্যায়ের প্যাঁচ ও কাটান্। এ মল্লযুদ্ধ দেখতে আমোদ আছে কিন্তু করে' কোনও ফল নেই। কুস্তিগির পালোয়ানেরা যেমন আখ্‌ড়ার বাইরে অকর্ম্মণ্য, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাও তেমনি শাস্ত্রের গণ্ডির বাইরে অকর্ম্মণ্য। যে [illegible]নের দ্বারা, যে বিচার-বুদ্ধির দ্বারা আমাদের নব-জীবনকে [illegible] পথে চালিত করা যায়—সে জ্ঞান, সে বু[illegible]। সে বিচার নব্য-তান্ত্রিকদেরই করতে হবে, যখন তা করা আবশ্যক হবে। এখন হচ্ছে আমাদের বাইরে থেকে শক্তি সঞ্চয় করবার যুগ;—ঘরে বসে ভয়ে ভাবনায় শক্তি অপব্যয় করবার নয়। যদি প্রথম ঝোঁকে ভুল পথে যাই তবে ঠেকে শিখে সে পথ ছাড়ব। উচ্ছৃঙ্খলতার অপবাদের ভয়ে ভীত হয়ে নব্য-তান্ত্রিকেরা যে সামাজিক শৃঙ্খল হতে মুক্তি লাভ করেছেন, সাধ করে আর তা পায়ে পরবেন না। জ্ঞানের অভাবে, কর্ম্মের অভাবে আমরা শত শত বৎসর ধরে শুকিয়েছিলুম। সুতরাং যে জ্ঞানের ও কর্ম্মের স্রোত আমাদের দুয়োর দিয়ে বয়ে যাচ্চে আমরা অঞ্জলি ভরে তার জীবন পান করব। জাতি বিচার হবে এখন নয়, তখন—যখন জাতির বিচারবুদ্ধি পরিপক্ব হবে। শাস্ত্র আজও ব্রাহ্মণের হাতের অস্ত্র। সেই অস্ত্র দিয়ে যদি আত্মহত্যা করতে চেষ্টা না করে' ব্রাহ্মণেরা প্রচলিত হিন্দু-সমাজের লোকাচারের নাগপাশ ছিন্ন করেন তাহলেই তাঁরা তাঁদের বর্ণোচিত কাজ করবেন। শাস্ত্রের ভাষায় বল্‌তে গেলে, হিন্দুসমাজে মানবজাতির "সামান্য ধর্ম্মের" পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর্‌তে হলে, ছত্রিশ জাতির ছত্রিশ রকমের "বিশেষ ধর্ম্ম" নষ্ট করতে হবে। ব্রাহ্মণ সমাজে আজও যে এমন অনেক যথার্থ বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সত্যবাদী ও নির্ভিক পণ্ডিত আছেন, যাঁদের সাহায্যে পূর্ব্বোক্তরূপ সমাজসংস্কার সাধিত হতে পারে, তার প্রমাণ এই ব্রাহ্মণ-মহাসভাতেই পাওয়া গেছে। কিন্তু এই আর একটি মহা লজ্জার কথা যে, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা উক্ত সভায় ধর্ম্মধ্বজী "বৈড়ালব্রতিক" এবং "বক-ব্রতিক" ব্রাহ্মণদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হয়েছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (২০।৪)

কৃত্তিবাসের জন্ম-শক—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে আছে,—

আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

ইহা হইতে জ্যোতিষ-গণনা দ্বারা চারিটি সম্ভাব্য শক পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, তিনি শ্রীপঞ্চমীতে জন্মিয়াছিলেন; লেখেন নাই যে, তিনি সরস্বতী পূজার দিন জন্মিয়াছিলেন। শ্রীপঞ্চমী ও সরস্বতীপূজা যে একই দিনে হইবে, এমন বিধি নাই। শ্রীপঞ্চমী চতুর্থীযুক্তা গ্রাহ্য। যদি পঞ্চমী উভয় দিন পূর্ব্বাহ্ণ-মুহূর্ত্তব্যাপিনী হয়, তবে পূর্ব্বদিনে সরস্বতীপূজা বিহিত। যে স্থলে পূর্ব্বদিনে পূর্ব্বাহ্ণের পর কিংবা পূর্ব্বদিনে পূর্ব্বাহ্ণে মুহূর্ত্তভঙ্গ হইয়া পঞ্চমী লাগিয়াছে, সে স্থলে সরস্বতীপূজা ষষ্ঠীযুক্ত পরদিনে হইবে। কৃত্তিবাস শ্রীপঞ্চমী তিথিতে জন্মিয়াছিলেন। ১২৫০ শক হইতে ১৪৫০ শকের মধ্যে ১২৫৯ শকে ৩০ মাঘ রবিবার চতুর্থী ৫৫ দণ্ড এবং ১৩৫৪ শকে ২৯ মাঘ রবিবার চতুর্থী ২৮ দণ্ড ছিল। অতএব এই দুই দিনের মধ্যে একদিন কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়াছিল।

১২৫৯ শকে ভোরে এবং ১৩৫৪ শকে রাত্রে এক সময়ে জন্ম হইলে, কৃত্তিবাসের লিখিত যোগ মেলে। ১২৫৯ শকে ৩০ দিনে মাঘ মাস শেষ, ১৩৫৪ শকে ২৯ দিনে শেষ। 'পূর্ণ মাঘ মাস' বলিলে দুই-ই বুঝায়; ইহা দ্বারা ৩০ দিনে শেষ হইয়াছিল, এমন বুঝায় না। বস্তুতঃ মাঘ মাসের পরিমাণ ২৯ দিন। বর্ষ-প্রবৃত্তির দণ্ডানুসারে কুম্ভসংক্রমণ ৩০ দিনে ঘটে। পণ্ডিতবংশে শ্রীপঞ্চমী একটা স্মরণার্হ দিন। পণ্ডিতবংশ না হইলেও পরদিন সরস্বতীপূজা বলিয়া জননী পুত্রের জন্মদিন অনায়াসে স্মরণ রাখেন

আত্মবিবরণে আছে ;—

এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তরদেশ॥
বৃহস্পতিবারের ঊষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গা পার॥

কৃত্তিবাস দ্বাদশবর্ষারম্ভে উত্তর-দেশে পড়িতে গিয়াছিলেন। বৃহস্পতিবার রাত্রিতে যাত্রা করিয়াছিলেন। কবে? মনে করি, তিনি ১৩৫৪ শকে (রেবতী নক্ষত্রে) জন্মিয়াছিলেন। ১৩৬৫ শকের ২৮ মাঘ শনিবার তাঁহার একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছিল। ২৯ মাঘ রবিবার ষষ্ঠী: ১ ফাল্গুন সোমবার অগস্ত্যদোষ; ২ ফাল্গুন মঙ্গলবার নক্ষত্রাদি-দোষ; ৩ ফাল্গুন বুধবার নবমী—রিক্তা-দোষ; ৪ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার দশমী ৩০ দং, মৃগশিরা নক্ষত্র ৪৩ দং, বিষ্কুম্ভযোগ ৩৯ দং। দশমী গতে একাদশী তিথিতে মৃগশিরানক্ষত্রে চন্দ্রতারা-শুদ্ধ বৃহস্পতিবার রাত্রিতে উত্তরে বিশেষতঃ পাঠার্থ যাত্রা শুভ ছিল। পরদিন শুক্রবারও বিদ্যায় শুভ তিথি নন্দা, প্রীতিযোগ। কৃত্তিবাস পাঠার্থ নিশ্চয় শুভদিনে যাত্রা করিয়াছিলেন। আত্মবিবরণ কৃত্রিম হইলে এখানে একটা অশুভ দিনের উল্লেখ থাকিতে পারিত।

এখন ১২৫৯ ও ১৩৫৪ শকের মধ্যে একটি ধরিতে হইবে। ১২৫৯ শক=খ্রীষ্টাব্দ ১৩৩৭, ১৩৫৪ শক=খ্রীষ্টাব্দ ১৪৩২। দীনেশ বাবু ঐতিহাসিক প্রমাণে খৃষ্টাব্দ ১৪৪০ মনে করিয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণের মধ্যে একটি প্রধান। "কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র মালাধর খানকে লইয়া ১৪৮০ খৃঃ অব্দে মালাধরী মেল প্রবর্ত্তিত হয়, এই সময়ে কৃত্তিবাসের বিদ্যমান থাকা সম্ভব।" কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন,—"ভাই মৃত্যুঞ্জয়।" ইহাতে ঠিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বুঝায় না। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের বয়স ৪৮ বৎসর। সে সময়ে তিনি জীবিত থাকিলে, তাঁহাকে ছাড়িয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে মেলের নাম কেন হইয়াছিল? হয় ত মালাধর রাজসরকারে থাকিয়া খাঁ উপাধি পাইয়া সমাজে অগ্রণী হইয়াছিলেন কিংবা কৃত্তিবাস নিঃসন্তান ছিলেন। সে যাহা হউক, এই প্রমাণের দ্বারা ১২৫৯ শক নিরাকৃত হইতেছে। অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে, কৃত্তিবাস ১৩৫৪ শকে, ২৯ মাঘ, (১৪৩২ খৃষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুয়ারি) রবিবারের রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন (বৈশাখ)।

বঙ্গভাষার গতি—শ্রীসৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী—

সকল ভাষাতেই লিখিবার ও কহিবার ভঙ্গী কিছু স্বতন্ত্র। কতকগুলি শব্দ কথাবার্ত্তায় সংক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চারণ করা হয়; কোন কোন স্থলে দুই বা ততোধিক শব্দ একত্রে একটি ছোট শব্দে পরিণত করা হয়, যেমন 'ভাই শ্বশুর' হইতে 'ভাশুর'। কতকগুলি শব্দ অশ্লীল বা অসভ্যতাব্যঞ্জক বিবেচনায় লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না; কতকগুলি শব্দ এরূপ আছে, যাহা কেবল লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই প্রভেদ যত অধিক, এরূপ আর কোন ভাষাতেই নহে। আরবী, পারসী প্রভৃতি ভাষা হইতে যে-সমস্ত শব্দ বঙ্গভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহাদের প্রায় সকলগুলিই এখনও পরগাছার মত বঙ্গভাষার দেহে লাগিয়া আছে। আমাদের সাহিত্যের ও ভাষার গতি ও প্রকৃতি এক হইলে, বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানের সাহিত্য ও ভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকিলে, ভাবের আদান প্রদানের পক্ষে যে সুবিধা হইবে, তাহাতে অনেক প্রকৃত বা কল্পিত বিরোধ বিপ্লব যে কমিয়া যাইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

মুসলমানের আদব কায়দা, ধর্ম্ম এবং সম্পর্কসূচক কয়েকটি শব্দ ত্যাগ করিলে মুসলমানের কথিত বাংলাও যা, হিন্দুরও তাই: যা কিছু প্রভেদ কৃত্রিম ভাষায়, মাতৃভাষায় নহে; যেখানে মুসলমান বা হিন্দু মাতৃভাষা না লিখিয়া পারসী বা সংস্কৃত-পড়া বিদ্যা ফলান সেখানে।

প্রাচীনকালে পণ্ডিতেরা কঠিন সংস্কৃত ভাষারই আলোচনা করিতেন, ঐ ভাষাতেই পুস্তকাদি লিখিত হইত এবং সভ্যসমাজে কথাবার্ত্তাও চলিত। অপেক্ষাকৃত সরল প্রাকৃত ভাষা নিম্নশ্রেণীর এবং স্ত্রী সমাজেরই ভাষা ছিল। পূর্ব্বে বাংলা ভাষাকেও প্রাকৃত বা প্রাকৃত বলা হইত। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণ বাংলা ভাষাকে আদরের চক্ষে দেখিতেন না। যখন হইতে নসরৎ শাহ, হোসেন শাহ প্রমুখ মুসলমান রাজগণ বাংলার প্রতি নেক নজর করিতে লাগিলেন তখন বাংলা ভাষা আর উপেক্ষার জিনিষ রহিল না। চৈতন্যদেবের সময় হইতে বাংলা আপনার ভিখারিণী-মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া সগর্ব্বে দেব-ভাষার সিংহাসনে বসিলেন! তাই আমরা দেখিতে পাই রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় "পদামৃতসমুদ্রের" সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করিতেছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উত্থানের সহিত সংস্কৃতের আদর আবার বাড়িয়া যায়। তাহার ফলে বাংলা ভাষা, মাতা প্রাকৃতের বেশ পরিত্যাগ করিয়া, সংস্কৃতের জমকাল পরিচ্ছদ পরিতে থাকেন। এ দিকে মুসলমান অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে আর এক নূতন উপকরণ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে: তাহা পারসী এবং পারসী ভাষায় প্রচলিত আরবী। যাহা হউক, বাংলা ভাষা আসলে ইতর প্রাকৃতের ঘরে জন্মিয়া, সংস্কৃতের ধুতি চাদরের সহিত মুসলমানী কামিজ পরিয়া এক্ষণে ভদ্রভাষার সমাজে আপন আসন পাতিয়া লইয়াছে।

ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনার মধ্যে দিয়াই বাংলাভাষার ক্রমোন্নতি হইয়াছে। হিন্দুর মূল শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, কিন্তু উহা সাধারণের বুঝিবার পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। এই অভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যই প্রাকৃতের সহিত সংস্কৃতের যোগ সাধন করিয়া বাংলাভাষাকে সংস্কৃতানুগতা করা হইয়াছে। সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃতের নাগপাশ হইতে বাংলাভাষাকে মুক্ত করিতে প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার প্রসাধনের জন্য সংস্কৃতের একান্ত দরকার। কিন্তু বঙ্গভাষা তাহা দাসীর মত হাত পাতিয়া লইবে না; সে তাহা তাহার আত্মমর্য্যাদার দিকটা বজায় রাখিয়াই লইবে। তেমনি মুসলমানও পারসী আরবী শব্দের বেলা করিবেন। সাধারণ লোক ধর্ম্মপ্রাণ, সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্র যে ভাষায় লিখিত সেই ভাষার প্রতি তাহাদের একটা ভক্তিমূলক অনুরাগ আছে। তা সেসব কথার মর্ম্ম তাহারা বুঝুক আর না বুঝুক। কিন্তু যদি ঐরূপ সংস্কৃত- বা আরবী-মূলক শব্দে পরিপূর্ণ ভাষায় লিখিয়া, 'গ্রামাস্বাস্থ্যবিধান,' 'কৃষি-উন্নতি', 'গোপালন', 'সরল বিজ্ঞান' প্রভৃতি সাধারণের অতি দরকারী বিষয়ের পুস্তক পড়িতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, ঐ জাতীয় শব্দের প্রতি তাহাদের প্রকৃত টান কতখানি। তাই বলিতেছিলাম যে বাংলাভাষাকে একদিকে সংস্কৃতাত্মিকা ও অপরদিকে পারসীশব্দবহুল করিবার চেষ্টাটা কিছু বেশীদূরে গড়াইয়াছে। মুসলমান রাজত্বের অবসানকালে লিখিত ভাষার মধ্যে বহু আরবী ও পারসীমূলক শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল, কথিত ভাষায় ত কথাই নাই। কিন্তু ইং[illegible]ত্বের আরম্ভ হইতে যখন বঙ্গভাষার পুনর্গঠন হই[illegible] শ্রীরাধ[illegible]ন [illegible]রবী ও পরসীমূলক শব্দগুলির দুর্দ্দশা আরম্ভ [illegible] রবিবাবু প্রমুখ

প্রতিভাশালী লেখকগণ কথিত ভাষার প্রচুর শব্দ লিখিত ভাষায় প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইয়াছে অথচ উচ্চভাব প্রকাশের কোন বাধা নাই। অধিকন্তু, লিখিত ও কথিত ভাষার পার্থক্য অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আরও কমা দরকার, অন্যথা ভাষার সম্প্রসারণ হইবে না। অনেকে মনে করেন, গভীর ভাব প্রকাশের জন্য কটমট শব্দের দরকার; অর্থাৎ দুর্ব্বোধ হইলেই ভাব গভীর হইল। কিন্তু আজকাল কয়েকজন যশস্বী লেখক কথিত ভাষাতেই গভীর দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ঐ-সকল আলোচনা যেমনই সুখপাঠ্য, তেমই গভীর ভাবপূর্ণ। এক শ্রেণীর পাঠক আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে বাংলা ভাষার বাহিক আবরণটাকে এইরূপে হালকা করিয়া ঐ-সকল লেখক এমন সুন্দর ভাষাটাকে মাটি করিয়া ফেলিতেছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা এই হিসাবে দেশের মহদুপকার সাধন করিতেছেন। যে সাধু রচনা কেবল পণ্ডিতমণ্ডলীকেই তুষ্ট করে না, সর্ব্বসাধারণের অন্তরের মধ্যেও নিজের আসন সংস্থাপিত করিয়া লইবার ক্ষমতা রাখে, তাহার যে সকলের চেয়ে বেশী সার্থকতা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত-বহুল শব্দ যে-বাংলার আদর্শ, তাহা সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতের নিকট সহজ ও সরল বলিয়া বোধ হইলেও, সংস্কৃতানভিজ্ঞ মুসলমানের নিকট উহা পরের ভাষাই রহিয়া যায়। এই জন্যই কথিত ভাষাকে একটু মার্জ্জিত করিয়া আজকাল যে রচনা-রীতির প্রচলন হইতেছে তাহাই আমাদের নিজের ভাষা বলিয়া স্নেহপুষ্পাঞ্জলির অধিকারী। বঙ্গদেশের কোন কোন সহরে উর্দ্দুভাষী মুসলমান থাকিলেও, বিশাল বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের মাতৃভাষা নিশ্চয়ই বাংলা। ইহাতে যাঁহারা দ্বিধা প্রকাশ করিবেন, হয় তাঁহারা সত্যের অপলাপ করিবেন, নতুবা বঙ্গভাষার উপর মমতাবিহীন হইয়াই ঐরূপ কথা বলিবেন। হৃদয়বান মুসলমান বাংলার মাটিতে জন্মিয়া, বাংলার আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হইয়া, কখনই বাংলাভাষাকে অবজ্ঞা করিতে পারিবেন না। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে বঙ্গীয় মুসলমানের মধ্যে অল্প সংখ্যকই বিদেশাগত বংশসম্ভূত। অবশিষ্ট মুসলমানগণের পূর্ব্বপুরুষ এই বঙ্গেরই অধিবাসী হিন্দু ছিলেন। ইহাতে অগৌরবের কিছুই নাই। ইস্‌লাম গ্রহণ করিলেই উচ্চনীচভেদ তিরোহিত হয়, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারের কোন আবশ্যকতা থাকে না, ধর্ম্ম ও সমাজ উভয়ের চক্ষেই সকলে একশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে, এবং এক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে সকলে আবদ্ধ হইয়া যায়। এই-সকল দেখিয়া শুনিয়া বহু হীন অবস্থার, এবং কোন কোন স্থলে অবস্থাপন্ন হিন্দুরও মুসলমান ধর্ম্মের উপর টান পড়িয়াছিল। অত্যাচারী রাজশক্তি কৃপাণের বলে এই ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই। অতএব বঙ্গভাষা তাহার আবির্ভাব-কাল হইতেই অধিকাংশ বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা রূপে অধিষ্ঠিতা আছেন। বাঙ্গালী মুসলমানেরা বিদেশী মুসলমানদিগের সহিত আদান প্রদান ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠের ফলে বাঙ্গলা ভাষার সহিত আরবী পারসী শব্দ মিশ্রিত করিতে আরম্ভ করেন; অধিকন্তু সেকালে পারসী ভাষা জানার পরিচয় দেওয়া ভদ্রতার লক্ষণ ছিল; এখন মুসলমানের উর্দ্দু ও সকলেরই ইংরেজি জানা ভদ্রতার লক্ষণ হইয়াছে। মুসলমান বাদশাহদিগের আমলে হিন্দুগণও আরবী ও পারসী ভাষার বিস্তর আলোচনা করিতেন। এই কারণে তাঁহাদেরও কথিত ভাষায়, এবং ক্রমে লি[illegible]তেও প্রচুর আরবী ও পারসী শব্দ দাখিল হইয়া[illegible]ক [illegible]বলেন,—"No people can have n[illegible] বা। [illegible]at receiving from them in the shape of inventions, products or social institution, and these, almost inevitably, are adopted under their foreign names." এখনও ইংরেজীশিক্ষিতগণ কথিত ভাষায় অযথা ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

এই মিশ্রিত ভাষাতেই অনেক মুসলমান গ্রন্থকার ষোড়শ শতাব্দী হইতে গ্রন্থ রচনা করিয়া আসিয়াছেন। আলাওলের পদ্মাবতীর ভাষা যেমন কৃত্রিম, হিন্দুলেখকগণের ভাষাও তেমনি কৃত্রিম। কিন্তু হিন্দু পণ্ডিতগণ কথিত ভাষা হইতে ইহাদিগকে তাড়াইতে না পারিলেও, লিখিত ভাষা হইতে অসাধু বা "যাবনিক" বলিয়া বর্জ্জন পূর্ব্বক বাংলাভাষাকে একরূপ মুসলমানী গন্ধশূন্য করিয়া তুলিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বর্ত্তমান বাংলাভাষাটি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে উহা মুসলমানদের ধর্ম্ম ও রীতিনীতি, গার্হস্থ্য জীবন প্রভৃতি আলোচনা করিবার উপযুক্ত নহে। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং আচার ব্যবহারেও অনেক প্রভেদ। অতএব উভয়ের মনের ভাব ব্যক্ত করিবার ধারায়ও পার্থক্য আছে; এবং উভয়ের ভাষার গতি স্বতন্ত্র পথে ধাবিত হওয়াও বিচিত্র নহে। কিন্তু স্বতন্ত্র পথে ধাবিত হওয়ার জন্য ইহাদের মধ্যে যে উদ্দাম আকাঙ্খা দেখা যায়, তাহার সংযম সাধন করিয়া বাংলাদেশে, আমাদের মাতৃভূমিতে, একই ভাষা প্রচলন করা একান্ত কর্ত্তব্য; কেননা, এই ভাষাসমন্বয়ের উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করিতেছে।

বর্ত্তমানে লিখিত বাংলাভাষায়, যতদূর সম্ভব, হিন্দু মুসলমানের ব্যবহৃত কথিত বাংলার প্রচলন করিতে হইবে। বাংলাভাষাকে প্রাণহীন, গৌরবহীন করিয়া আমরা কোন পরিবর্ত্তন চাহিনা। এই পরিবর্ত্তন-চেষ্টার ফলে অনেক আরবী ও পারসী শব্দ বাংলাভাষায় স্থান পাইবে। আমাদের হিন্দু ভ্রাতাদের তাহা সহিয়া লইতে হইবে। আমরাও বর্ত্তমান মুসলমানী বাংলা হইতে অনেক অনাবশ্যক আরবী পারসী শব্দ ত্যাগ করিয়া বহু সংস্কৃত শব্দ আদরের সহিত গ্রহণ করিব।

আমাদের বর্ত্তমান বাংলাভাষায় এ পর্য্যন্ত যে-সমস্ত উপন্যাস, নাটক, গল্প ইত্যাদি রচিত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুতে হিন্দুতে, হিন্দুতে মুসলমানে, এবং মুসলমানে মুসলমানে যে-সব কথাবার্ত্তা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, তদ্দ্বারা হিন্দু মুসলমানে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করিবার কোন উপায় নাই। প্রত্যেক সমাজের, প্রত্যেক জাতিরই একটা বিশেষত্ব আছে। কথোপকথনের ভাষা পড়িয়া যদি লোক না চেনা যায়, টিকেট দেখিয়া যদি জাতি নির্ণয় করিতে হয়, তবে সে রচনা যে নিশ্চয়ই ব্যর্থ রচনা, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।

বঙ্গভাষাকে হিন্দু মুসলমানের উপযোগী করিতে হইলে তাহাদের এই কৃত্রিমতা দূর করিতে হইবে। মুসলমানের সামাজিক বা ধর্ম্মজীবনে বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশার্থে আমরা এখন যে-সব শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি যাহা ভাষান্তরিত করা যায় না, এবং যাহা আমরা কোনরূপেই ত্যাগ করিতে পারি না, কেবল সেইগুলিকেই বাংলাভাষার বুকে স্থান দেওয়া; এবং হিন্দুগণ যে-সব মুসলমানী শব্দ পূর্ব্ব হইতেই কথিত ভাষায় ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, বিচার ও বিবেচনা পূর্ব্বক তাহা লিখিত ভাষায় প্রচলিত করিয়া বাংলাভাষার সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা করা—ইহার বেশী আর কিছু আবশ্যক হইবে না।

আমরা হিন্দু বাংলাও চাহি না, মুসলমানী বাংলাও চাহি না; আমরা চাই খাঁটি বাংলা, যাহা বাংলার হিন্দু মুসলমান উভয়ে বুঝে। আমরা আরও কিছু চাই। আমরা চাই ভাষায় সরলতা। ভাষার

উদ্দেশ্য মনোভাব প্রকাশ; যে প্রকার বাক্যবিন্যাস দ্বারা সুললিত-রূপে মনোভাব প্রকাশিত হয়, তাহাই উত্তম রীতির অনুযায়ী (Style)। শব্দের কাঠিন্য বা সমাস ও সন্ধির বাহুল্য ভাষাকে অনর্থক জটিল করিয়া তুলে। ভাষায় জটিলতা মনুষ্যের মনের কুটিলতা। যেমন, যাহারা কড়া তামাক খাইতে অভ্যস্ত, তাহাদের নিকট মিঠে-কড়া ভাল লাগে না, সেইরূপ ভাষার অযথা বাহুল্যে অভ্যস্ত আমাদের কানে হয়ত সরল ভাষা ভাল না শুনাইতে পারে। কিন্তু বিবেচকের পক্ষে তাহা নয়। তবে এ কথা কেহ যেন না বুঝেন যে, যে-সকল শব্দ কথিত ভাষায় অপ্রচলিত, আমরা তাহাদের ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি। যে-সকল ভাব প্রকাশের উপযুক্ত শব্দ বাংলায় প্রচলিত নাই, তাহা আমাদিগকে অবশ্যই সংস্কৃত বা অন্য কোন ভাষা হইতে ধার করিতে হইবে। তবে কথা এই, আমরা অযথা ধার করিব না। যেমন একই মালমসলা লইয়া পাকা ও আনাড়ি দুই মিস্ত্রি সুন্দর ও কুৎসিত দুই রকম ইমারত গড়ে, সেইরূপ লেখকের শক্তিভেদে এই সরল ভাষা দ্বারা সুন্দর বা কর্কশ রচনার সৃষ্টি হইবে। রচনা যদি অসুন্দর হয়, তাহা সরল ভাষার দোষ নহে।

আর এক কথা। শব্দের অন্যায় বাড়াবাড়ি যেমন খারাপ, অক্ষরেরও তাই। বাংলায় যখন শ, ষ এবং হস্ত স্বাব ইত্যাদি শব্দে ছাড়া স-এর, ণ ন-এর, ঙ, ঞ, ং এর উচ্চারণের কোন তফাৎ নাই, তখন সেগুলিকে রাখিয়া ছেলেপিলের অনর্থক মাথা খাওয়া কেন, তাহা বুঝি না। যখন প্রাকৃতে উচ্চারণ অনুসারে বানান হয়, তখন তাহার কন্যা বাংলায় কেন হইবে না? তবে বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত লিখিবার জন্য এই অক্ষরগুলির অবশ্যই দরকার আছে। বস্তুতঃ, বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্গীয় 'ব' ও অন্তস্থ 'ব' এর একরূপ আকৃতি করিয়া এবং ঌ ও ৡকে বর্ণমালা হইতে বাদ দিয়া আমাদের প্রস্তাবিত বানান সংস্কারের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। যাঁহারা এই নূতন কার্য্যে ব্রতী হইবেন, প্রথম প্রথম তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা খুব ভাল জিনিষ না পাইতে পারি। কিন্তু তাঁহারা ঝাড় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া যখন রাস্তা করিয়া দিবেন, তখন সেই পথ দিয়া বড় বড় সেনাপতিরা অবলীলাক্রমে প্রবেশ করিয়া আপনাদের প্রতিভাবলে বাংলা সাহিত্যের বুকে চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিতে পারিবেন। আপনারা সকলেই জানেন, মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা যখন বাংলা গদ্যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তখন যদি বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইত, তবে তাঁহারা মৃত্যুঞ্জয়ই হইতেন। মৃত্যুঞ্জয় হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যিক মনস্বীরা অনবরত পাথর কাটিয়া বন জঙ্গল ছাঁটিয়া, রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা বঙ্কিম ও রবীন্দ্রকে পাইয়া ধন্য হইয়াছি।

ধর্ম্মপাল

[বরেন্দ্রমণ্ডলের মহারাজ গোপালদেব ও তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক ভগ্নমন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে দস্যুলুণ্ঠিত এক গ্রামের ভীষণ দৃশ্য দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন দুর্গে লইয়া যান।

সন্ন্যাসীর নিকট সংবাদ আসিল যে গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্যে আসিতেছেন; অথচ দুর্গে সৈন্যবল নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার এক অনুচরকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধর্ম্মপালদেব দুর্গরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্গ শীঘ্রই শত্রুর হস্তগত হইল। তখন দুর্গস্বামিনীর কন্যা কল্যাণী দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পিঠে বাঁধিয়া ধর্ম্মপাল দেব দুর্গ হইতে লম্ফ দিয়া পলায়ন করিলেন।]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিপদুদ্ধারে।

নারায়ণ ঘোষের সেনা যখন জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া লুণ্ঠন করিতেছে, তখন দুর্গের বাহিরে দুই তিন বার বংশীধ্বনি হইল, শত্রুসেনা তাহা শুনিয়াও শুনিল না। তাহারা দুর্গ অধিকার করিয়া সেতু নামাইয়া দিয়াছিল, বাহিরে অধিক লোক ছিল না। সন্ন্যাসী, গোপালদেব ও উদ্ধবঘোষ রমণী ও শিশুগণকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে নয়-দশ জন দুর্গরক্ষীসেনাও যুদ্ধ করিতেছিল। শত্রুসেনা তাহাদিগের প্রতি মনোযোগ না করিয়া লুণ্ঠনে ব্যাপৃত ছিল এবং সেই জন্যই তাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তৃতীয় বারের বংশীরব ক্ষান্ত হইবামাত্র দুর্গের বাহিরের শত্রুসেনা চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহাদিগের কণ্ঠস্বর ডুবাইয়া শত শত অশ্বের পদশব্দ দুর্গবাসীগণের কর্ণে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, জেতা ও পরাজিত এক নিমেষের জন্য নবাগত সেনার দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর জেতৃগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ও পরাজিতগণ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। অশ্বারোহীদলের সম্মুখে একজন গৈরিক-বসন-পরিহিত যোদ্ধা অশ্বের উপরে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিলেন "ভয় নাই, ভয় নাই, দুর্গ রক্ষা হইয়াছে।" বাতায়ন হইতে লম্ফ-প্রদানকালে ধর্ম্মপাল ইহাঁরই কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "অমৃত! কেহ যেন না পলাইতে পারে, দুর্গের তোরণ রক্ষা কর।" অশ্বারোহী তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া নিকটে আসিয়া ও অশ্ব হইতে অবতরণ

করিয়া প্রণাম করিলেন। আগন্তুক সন্ন্যাসীকে জানাইলেন যে, সহস্র অশ্বারোহীর তৃতীয়াংশ মাত্র দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, অবশিষ্ট সেনা লইয়া উদ্ধারণপুরের কমলসিংহ দুর্গের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। মঠের সেনা ভাগীরথী-পার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহারা পদব্রজে আসিতেছে।

অসম দ্বন্দ্ব তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। অতর্কিত আক্রমণে নারায়ণ ঘোষের সেনা মুহূর্ত্ত-মধ্যে পরাজিত হইয়াছে। যাহারা জীবিত আছে, তাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছে, কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত অশ্বারোহীগণ তাহাদিগকে অস্ত্রহীন অবস্থায় হত্যা করিয়াছে। গোপালদেব, উদ্ধবঘোষ, অমৃতানন্দ ও সন্ন্যাসী স্বয়ং তাহাদিগকে বহুকষ্টে নিবারণ করিয়াছেন। হতাবশিষ্ট সেনার সহিত নারায়ণ ঘোষও বন্দী হইলেন।

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক উষার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, গোপালদেব বর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষতস্থানগুলি বন্ধন করিতে করিতে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু! ধর্ম্ম কোথায়?" সন্ন্যাসী চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "কই তাহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না?"

গোপাল।— যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহাকে অন্তঃপুর রক্ষা করিতে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহার পর আর তাহাকে দেখি নাই।

সন্ন্যাসী।— অন্তঃপুরে ত কেহ নাই। অগ্নি লাগিলে পুরমহিলাগণ অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। আমি উদ্ধবকে ডাকিয়া আনি।

সন্ন্যাসী উদ্ধবঘোষের সন্ধানে গেলেন। গোপালদেব নানাবিধ দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসী অমৃতানন্দ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি গোপালদেবের অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?"

গোপাল।— আমার পুত্র ধর্ম্মপালকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

অমৃত।— তিনি কি যুদ্ধের সময়ে উপস্থিত ছিলেন?

করিবার জন্য তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়াছিলাম, এখন আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

অমৃত।— আমি তাঁহার সন্ধানে যাইতেছি। প্রভু আসিলে বলিবেন যে দুর্গদ্বারে কমলসিংহ অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত দুর্গে প্রবেশ করিবেন না।

গোপাল।— আপনি কি আমার পুত্রকে চিনিতে পারিবেন?

অমৃত।— আমি ত তাঁহাকে দেখিয়াছি।

গোপাল।— সে কেবল দুই এক মুহূর্ত্তের জন্য। তাহার বর্ম্মে সুবর্ণ রেখায় ধর্ম্মচক্র অঙ্কিত আছে।

অমৃত।— আপনার বক্ষে যেরূপ ধর্ম্মচক্র দেখিয়াছি এইরূপ কি?

গোপাল।— হাঁ, ইহাই পালবংশের লাঞ্ছন।

সন্ন্যাসী অমৃতানন্দ ধর্ম্মপালের অন্বেষণে চলিয়া গেলেন, গোপালদেব নিশ্চেষ্টভাবে সেইস্থানে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন "ধর্ম্মপালদেব ত অন্তঃপুরে নাই!" তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া গোপালদেবের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন "প্রভু। চলুন একবার মৃতদেহগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখি।" সন্ন্যাসী উত্তর না দিয়া তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। যুদ্ধান্তে হতাবশিষ্ট দুর্গরক্ষীসেনা মৃতদেহগুলি একত্র করিয়া নদীতীরে চিতা প্রস্তুত করিতেছিল, উভয়ে দুর্গদ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে অমৃতানন্দ শবগাত্র হইতে বর্ম্ম মোচন করিয়া বর্ম্মগুলি পরীক্ষা করিতেছেন। পরিখার পরপারে বহু অশ্বারোহী অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তাহারা সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাদিগের মধ্যে একজন দূর হইতে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "কে, কমলসিংহ?"

আগন্তুক।— আজ্ঞা হাঁ।

সন্ন্যাসী।— তুমি দুর্গে প্রবেশ করিলে না কেন?

কমল।— প্রভু! সিংহবংশীয় কোন ব্যক্তির মিত্রভাবে গোকর্ণ দুর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ, তাহা ত প্রভুর

সন্ন্যাসী।— কমল! এখন পূর্ব্ববিবাদ বিস্মৃত হও। দেশের এখন বড়ই বিপদ, আত্মবিরোধেই দেশের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। দুর্গরক্ষা করিতে আসিলে, দুর্গরক্ষা করিলে, অথচ দুর্গে প্রবেশ করিবে না কেন?

কমল।— প্রভুর আদেশে দুর্গরক্ষা করিতে আসিয়াছি, প্রভু আদেশ করিলে দুর্গে প্রবেশ করিতে পারি, নতুবা নহে।

সন্ন্যাসী।— আমি আদেশ করিতেছি দুর্গে প্রবেশ কর। রঘুসিংহের যদি পুত্র থাকিত তাহা হইলে সে বংশগত কলহ জীবিত রাখিত। কিন্তু কমল! রঘুসিংহের বিধবা বা কুমারী কন্যার সহিত তোমার কি কলহ থাকিতে পারে? ইহা ক্ষত্রোচিত বাক্য নহে, কমলসিংহ! তুমি বীর, বীরবংশজাত, তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না। তুমি পতিহীনা বিধবাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছ, ভবিষ্যতে ইহাদিগকে রক্ষার ভার তোমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে জানিয়া রাখ, ক্ষাত্রধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইও না।

তিরস্কৃত হইয়া কমলসিংহ অবনত মস্তকে তোরণের নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গোপালদেব তখন চিন্তামগ্ন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত, বর্ম্মের স্থানে স্থানে ভগ্ন শরফলক লাগিয়া রহিয়াছে। কমলসিংহ তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে অস্ফুটস্বরে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু! ইনি কে?" সন্ন্যাসী লজ্জিত হইয়া কহিলেন "কমল! আমি দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তোমাদিগকে পরিচিত করিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ইনি বরেন্দ্রীমণ্ডলের অধীশ্বর গোপালদেব।"

কমল।— প্রভু! আর অধিক পরিচয়ে আবশ্যক নাই, বাল্যকালে উদ্ধারণপুরে বহুবার মহারাজকে দেখিয়াছি।

গোপাল।— আমি ত আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না।

কমল।— আমি উদ্ধারণপুরের অধীশ্বর স্বর্গীয় পুরুষোত্তমসিংহের পুত্র।

গোপাল।— আপনি—তুমি পুরুষোত্তমের পুত্র?

এই সময়ে অমৃতানন্দ আসিয়া কহিলেন "প্রভু! ধর্ম্মপালদেব নিশ্চয়ই নিহত হন নাই, মৃতদেহের মধ্যে তাঁহার শরীর নাই।"

সন্ন্যাসী।— অমৃত! ধর্ম্মপালদেবের মৃত্যুর বহু বিলম্ব আছে, তোমাকে তাহার মৃতদেহের সন্ধান করিতে বলিল কে?

অমৃত।— আমি গোপালদেবকে চিন্তাকুল দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার পুত্রের অনুসন্ধানে গিয়াছিলাম।

গোপাল।— প্রভু, আমিও ধর্ম্মের মৃতদেহের সন্ধানেই বাহিরে আসিতেছিলাম। আপনাকেও সে কথা নিবেদন করিয়াছি।

সন্ন্যাসী।— আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন দেখিয়া আপনার কথার প্রতিবাদ করি নাই। দেব! গণনা কখন মিথ্যা হয় না, ধর্ম্মপালদেবের মৃত্যুর এখনও বহু বিলম্ব আছে।

এই সময়ে উদ্ধবঘোষ দ্রুতবেগে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সন্ন্যাসীকে কহিলেন "প্রভু! ধর্ম্মপাল-দেবের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, মহারাণী আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।" তাঁহার কথা শুনিয়া সকলে দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সন্ন্যাসী পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন কমলসিংহ অবনত মস্তকে সকলের পশ্চাতে দুর্গে প্রবেশ করিতেছেন।

গোকর্ণ দুর্গে অন্তঃপুরের অঙ্গাররাশির মধ্যে বিধবা দুর্গস্বামিনী তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি দূর হইতে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসী দূর হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, তুমি কি যুব-রাজ ধর্ম্মপালের সংবাদ পাইয়াছ? যুদ্ধাবসানে পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া গোপাল অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন।" দুর্গস্বামিনী মস্তকে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া উদ্ধবঘোষকে কহিলেন "উদ্ধব! প্রভুকে নিবেদন কর যে যুদ্ধের সময়ে যুবরাজ অন্তঃপুর রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, যুদ্ধে তিনি আহত হন নাই। দস্যুসেনা যখন দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে, তখন আমি কল্যাণীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে তাহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া-ছিলাম। নারায়ণ শ্রীরাম সেন অন্তঃপুরে আসিয়া

পড়িয়াছে দেখিয়া যুবরাজ কল্যাণীকে স্কন্ধে লইয়া দক্ষিণের বাতায়নপথে পরিখায় লম্ফ প্রদান করিয়াছেন।

সন্ন্যাসী।— গোপালদেব! পুত্রের জন্য আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। আমি এখনই তাহার অনুসন্ধান করিতেছি। অমৃত! দুর্গের দক্ষিণে একজন লোক প্রেরণ কর, তাহাকে পরিখার তীরে মনুষ্যপদচিহ্নের অনুসন্ধান করিতে আদেশ কর।

দুর্গস্বামিনী।— উদ্ধব, প্রভুকে নিবেদন কর, কেদার ও দুই জন বৃদ্ধ সৈনিক পরিখার অপর পারে দুই তিনটি অশ্ব লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

সন্ন্যাসী।— মা! পরিখার পারে কাহার জন্য অশ্ব রাখিয়াছিলে?

দুর্গস্বামিনী।— প্রভু! স্থির করিয়াছিলাম যে যদি দুর্গরক্ষা না হয় তাহা হইলে কেদারের সহিত কল্যাণীকে গোবর্দ্ধনে পাঠাইয়া দিব।

সন্ন্যাসী।— আর তুমি?

দুর্গস্বামিনী।— আমি কোথায় যাইব প্রভু? আমি আমার শ্বশুরগৃহ, স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?

সন্ন্যাসী।— মা! ইহা তোমার উচিত কথা বটে কিন্তু রমণীর কথা! তুমি মরিলে কি গোকর্ণদুর্গ রক্ষা হইত?

দুর্গস্বামিনী।— পিতা, আমি সামান্যা রমণী, আমি ইহার অধিক বুঝিতে পারি না।

সন্ন্যাসী।— মা! তর্ক করিয়া তোমার সহিত পারিব না। সম্প্রতি তোমার গৃহে একজন নূতন অতিথি উপস্থিত, উদ্ধারণপুরের দুর্গস্বামী কমলসিংহ তোমার দুর্গরক্ষা করিবার জন্য সসৈন্যে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার অশ্বারোহী সেনাই শেষ রক্ষা করিয়াছে। তিনি না আসিলে এতক্ষণ নারায়ণ ঘোষের সেনা কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিত না।

দুর্গস্বামিনী।— পিতা! ভরসা করি পুরুষোত্তম সিংহের পুত্র জ্ঞাতি-বিরোধ বিস্মৃত হইয়াছেন। আমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার বৈরিভাব দূর হইয়াছে, আমার শ্বশুরবংশের আর কেহ নাই। গোকর্ণদুর্গ তাঁহারই।

সন্ন্যাসী ডাকিলেন।—

কমলসিংহ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বিধবাকে প্রণাম করিলেন, রঘুসিংহের পত্নী নীরবে তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তখন নদীতীরে বিশাল চিতা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, অসংখ্য নরনারীর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইতেছে। গোপালদেব, কমলসিংহ, অমৃতানন্দ ও উদ্ধব ঘোষ ধীরে ধীরে দুর্গের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "গোপালদেব! কি দেখিতেছ?"

গোপাল।— নরদেহের পরিণাম।

সন্ন্যাসী।— আর কিছু দেখিতেছ না কি?

গোপাল।— আর কি প্রভু?

সন্ন্যাসী।— মাৎস্যন্যায়ের দ্বিতীয় প্রকরণ?

গোপাল।— কোথায়?

সন্ন্যাসী।— কেন, দুর্গের অভ্যন্তরে! দুর্গের বহির্দ্দেশে! যে দিকে দুনয়ন ফিরাইবে সেই দিকেই!

গোপাল।— সত্য। প্রভু! ইহার কি প্রতীকার নাই?

সন্ন্যাসী।— অবশ্যই আছে। ভগবান যখন ব্যাধির সৃষ্টি করেন, প্রতীকারও সেই সময়ে সৃষ্ট হয়।

গোপাল।— কি প্রতীকার?

সন্ন্যাসী।— প্রতীকার স্বয়ং তুমি।

গোপাল।— আমি?

সন্ন্যাসী।— তুমি। তুমি ব্যতীত গৌড়বঙ্গের আর উপায়ান্তর নাই—

সন্ন্যাসীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে একজন সৈনিক আসিয়া সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিয়া কহিল "প্রভু! দুর্গের দক্ষিণে পরিখার তীরে এই শিরস্ত্রাণ ও বর্ম্ম পাইয়াছি। পরিখার অপর পারে অশ্বের পদচিহ্ন আছে, কিন্তু অশ্ব বা মনুষ্য নাই।"

সন্ন্যাসী।— ইহা ধর্ম্মপালের বর্ম্ম। গোপালদেব! আপনি দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন, আপনার পুত্র কুশলে আছেন। অমৃত।

অমৃত।— প্রভু!

সন্ন্যাসী।— চারিজন অশ্বারোহী সেনা লইয়া যুবরাজ ধর্ম্মপাল ও কল্যাণীদেবীর অনুসন্ধানে চলিয়া যাও।

অমৃতানন্দ প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গৌড় রাজ্য।

মহানদীতীরে গৌড় নগরের অনতিদূরে একটি প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া এক ব্রাহ্মণ এক মনে খরস্রোতা মহানদীর জলপ্রবাহ দেখিতেছিল। তখন দিবসের দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, প্রখর সূর্য্যরশ্মি অশ্বত্থবৃক্ষের পত্রপল্লবের ঘন আবরণ ভেদ করিয়া তাহার ছায়া ক্ষীণ করিয়া তুলিতেছে। স্থানটি অত্যন্ত নির্জ্জন, নিকটে মনুষ্যের বসতি নাই। বৃক্ষের অনতিদূরে একটি মন্দির, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মন্দিরটি প্রাচীন, কেহ তাহার জীর্ণ সংস্কার করিয়াছে। পূর্ব্বে মন্দিরের চারিদিকে ইষ্টকের প্রাচীর ছিল কালবশে তাহা ভগ্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তি মন্দিরের সংস্কার করাইয়া দিয়াছে, সে প্রাচীর-বেষ্টনী সংস্কার করে নাই। অশ্বত্থবৃক্ষটি প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষের উপরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহার শাখা প্রশাখা বহুদূরবিস্তৃত, মূলদেশে কতকগুলি শিবলিঙ্গ ও অর্ঘ্যপট্ট পতিত আছে।

মন্দিরের ভিতর হইতে বামাকণ্ঠে কে ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিল "ঠাকুর! বেলা যে বহিয়া যায়, পূজা করিবে কখন?" ব্রাহ্মণ মুখ না ফিরাইয়াই বলিল "ব্যস্ত হইতেছ কেন?" রমণী পুনরায় বলিল "তোমার পেটের আগুন কি নিভিয়া গিয়াছে? অন্য দিন যে বেলা হইয়া গেলে লাফাইয়া বেড়াও?"

ব্রাহ্মণ।— আজ যে একাদশী।

রমণী।— তোমার মুণ্ড! রাজা আর দেশে ব্রাহ্মণ পায় নাই তাই তোমাকে এই মন্দিরের পুরোহিত করিয়া গিয়াছে। আজ সবে তৃতীয়া, বলে কি না আজ একাদশী।

রমণী এই বলিতে বলিতে মন্দির হইতে বাহির হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট আসিল। ব্রাহ্মণ তাহার দিকে ফিরিয়া হাসিল এবং কহিল "ছি মাধবি, রাগ করিতে আছে কি? পূর্ব্বে মাসে দুইবার একাদশী হইত কিন্তু এখন একাদশীর সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে।"

রমণী।— কেন? তোমার কি যকৃতের পীড়া হইয়াছে?

ব্রাহ্মণ।— যকৃতের পীড়া তোমার হউক—থুড়ি—কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছি, যকৃতের পীড়া তোমার শত্রুর হউক।

ব্রাহ্মণ পুনরায় বলিল "দেখ মাধবি, তুমি আমার রামায়ণের শকুন্তলা! তোমাকে যখন মন্দিরে দেখিতে পাই তখন আমার মনে হয় যে তোমাকে লইয়া পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে আসিয়াছি।"

রমণী ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল এবং কহিল "ঠাকুর, এমন রামায়ণখানি কোথায় পাইয়াছিলে?"

ব্রাহ্মণ।— কেন, গুরুর নিকটে? পঞ্চদশবর্ষ অধ্যয়ন করিয়া তবে উপাধি পাইয়াছি।

রমণী।— গুরু কোথায় পাইলে?

ব্রাহ্মণ।— বহুদূরে, যমুনাতীরে কৈলাসপর্ব্বতে। শকুন্তলে, মনে বড়ই ভয় হয় কোন্ দিন দুর্য্যোধন, আসিয়া তোমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে।

রমণী ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। তাহাতে ব্রাহ্মণ উৎসাহিত হইয়া আরও নানাবিধ ভাঁড়ামি জুড়িয়া দিল।

রমণী।— বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিল—"দেখ ঠাকুর! তুমি বড়ই বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিয়াছ, আমাকে একা পাইয়া তুমি যখন-তখন অকথা কুকথা কেন বল, বল দেখি? আমি আজই মহারাণীকে সমস্ত কথা বলিয়া দিব।"

ব্রাহ্মণ।— ছি মাধবি! এমন কাজ করিও না, তাহা হইলে তোমার ব্রহ্মহত্যার পাতক হইবে, কারণ আমি ভয়েই মরিয়া যাইব।

রমণী।— আর কখন এমন করিবে না প্রতিজ্ঞা কর।

ব্রাহ্মণ।— কি করিব না?

রমণী।— যাহা করিতেছিলে?

ব্রাহ্মণ।— কি?

রমণী।— অভিনয়?

ব্রাহ্মণ।— সে কি প্রকার?

রমণী।— তোমার মুণ্ডের প্রকার। এখন পূজা করিতে যাইবে কি?

শ্রীরাখ

ব্রাহ্মণ।— ব্যস্ত কেন? দেখ দেখি কেমন নদীর জল কল্ কল্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে?

রমণী।— নদীর জল দেখিলে ত আমার পেট ভরিবে না? তুমি বসিয়া বসিয়া নদীর জল দেখ, আমি গৃহে চলিলাম। মন্দিরে পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি, প্রভুর যখন অভিরুচি হইবে তখন উঠিয়া পূজায় বসিও।

রমণী এই বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। ব্রাহ্মণ হতাশ হইয়া ডাকিল "মাধবি! অয়ি শকুন্তলে! যাইও না—মাধবি—বলি ও মাধবি!" রমণী মুখ ফিরাইল না দেখিয়া ব্রাহ্মণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "তবে যাও, কালি ত আবার আসিতে হইবে!" ব্রাহ্মণ মুখ ফিরাইয়া নদীর জলস্রোত দেখিতে বসিল। এইরূপে অর্দ্ধদণ্ড অতিবাহিত হইল, এমন সময়ে দূরে কে চীৎকার করিয়া উঠিল "ঠাকুর, শীঘ্র এস, দস্যু আসিয়াছে—ওগো বাবা গো—কে আছ গো—।"

ব্রাহ্মণ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দেখিল রমণী ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে। সে আর কালবিলম্ব না করিয়া অশ্বত্থবৃক্ষে আরোহণ করিয়া বসিল। রমণী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ বৃক্ষশাখা হইতে দেখিল যে একজন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে মন্দিরের দিকে আসিতেছে। ইহা দেখিয়া সে ক্রমশঃ উচ্চে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল।

অশ্বারোহী মন্দিরের নিকটে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইল। মন্দিরের চারিদিক ঘুরিয়া দ্বারের সম্মুখে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল ও রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিল। শব্দ শুনিয়া মন্দিরাভ্যন্তর হইতে রমণী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। আগন্তুক কহিল "তোমার কোন ভয় নাই আমি শত্রু নহি, গৌড়ের লোক।" কিন্তু রমণী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আর্ত্তনাদের মাত্রা বাড়াইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আগন্তুক হতাশ্বাস হইয়া মন্দিরের ছায়ায় উপবেশন করিল। আগন্তুক বসিয়া বসিয়া দেখিতে পাইল যে অশ্বত্থবৃক্ষের উচ্চশাখায় একব্যক্তি আত্মগোপন করিয়া আছে। সে তখন বৃক্ষতলে [illegible] ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া কহিল "তুমি কে?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিল না। আগন্তুক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "তুমি গাছের উপরে কি করিতেছ শীঘ্র বল।" ব্রাহ্মণ তথাপি কথা কহিল না। আগন্তুক তখন বিরক্ত হইয়া পৃষ্ঠ হইতে ধনু ও শর গ্রহণ করিয়া কহিল "শীঘ্র উত্তর দাও, নতুবা তোমাকে শরবিদ্ধ করিব।" ব্রাহ্মণ ধনুর্ব্বাণ দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং ক্রন্দনবিজড়িত স্বরে বলিল—"আমি কেহ নহি বাবা, আমি —আমি—।" আগন্তুক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?" ব্রাহ্মণ নীরব। আগন্তুক ধনুতে শর যোজনা করিল, তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ ভয়ে বলিয়া উঠিল "বলিতেছি— বাবা বলিতেছি, মারিও না আমি ব্রাহ্মণ।" আগন্তুক তীব্রস্বরে বলিল "শীঘ্র নামিয়া আইস।" ব্রাহ্মণ কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বৃক্ষশাখাতেই বসিয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল, পড়িয়া মরে আর কি। তাহার অবস্থা বুঝিয়া আগন্তুক কহিল "তোমার মরিতে বড়ই সাধ হইয়াছে দেখিতেছি।" ব্রাহ্মণ ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল "মারিও না বাবা, দোহাই তোমার। আমার নিকটে পরিধেয় বস্ত্রখানি ছাড়া আর কিছুই নাই।" আগন্তুক তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু হাস্য দমন করিয়া কহিল "শীঘ্র নামিয়া এস—নতুবা।" ব্রাহ্মণ ব্যস্ত হইয়া বৃক্ষ হইতে নামিতে আরম্ভ করিল এবং কহিল "নতুবার কাজ নাই, যাইতেছি।" কিয়দ্দূর নামিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল "আরও নামিতে হইবে কি?" আগন্তুক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "থাক্ তোমাকে আর নামিতে হইবে না, আমিই নামাইতেছি," এই বলিয়া পুনরায় শরাসন উত্তোলন করিল। ভয়ে ব্রাহ্মণের পদস্খলন হইল, সে সশব্দে ভূমিতে পতিত হইল ও মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

আগন্তুক ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়া বলিল "ঠাকুর, বড় লাগিয়াছে কি?" ব্রাহ্মণ নীরব। আগন্তুক পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে ব্রাহ্মণের অধিক আঘাত লাগে নাই, ভয়ে অজ্ঞানতার ভান করিয়া পড়িয়া আছে, পরীক্ষাকালে একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখিয়া আবার চক্ষু মুদিয়াছে। সে তখন কহিল "ঠাকুর, ভয় নাই, চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ, আমি নন্দলাল।" ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ

পড়িয়া রহিল। নন্দলাল বুঝিল যে ব্রাহ্মণের ভয় ভাঙ্গে নাই। তখন তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল "ও পুরুষোত্তম ঠাকুর, আমায় চিনিতে পারিতেছ না?" ব্রাহ্মণ চাহিয়া বলিল—"কই—না।"

নন্দ।— সে কি ঠাকুর!—ফলাহারে এক এক দফায় যে আমার সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছ!

ব্রাহ্মণ।— সে আমি নয় বাপু—আর কেহ হইবে।

নন্দ।— তুমি কি পুরুষোত্তম ঠাকুর নহ?

ব্রাহ্মণ।— আমার চতুর্দ্দশ পুরুষেও কাহারও পুরুষোত্তম নাম ছিল না। আমাকে ছাড়িয়া দাও বাবা আমার কাছে কিছুই নাই।

নন্দ।— ঠাকুর তুমি জ্বালাইলে দেখিতেছি, আমি যে নন্দলাল, কৌশাম্বীগুল্মের নায়ক। এখনও চিনিতে পারিলে না?

ব্রাহ্মণ।— ঠিক চিনিয়াছি বাবা। এই এক বৎসরে তোমার মত দশ বিশ হাজার দেখিলাম, আর চিনিতে পারিব না? একবার কামরূপ হইতে আসিয়াছিলে, আর একবার গুর্জ্জরদেশ হইতে আসিলে, এখন কি দ্রবিড় রাজ্য হইতে আসিলে? কিন্তু আমায় ছাড়িয়া দাও বাবা, দোহাই তোমার, আমার কাছে কিছুই নাই।

নন্দ।— ভাল তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি। তুমি উঠিয়া দাঁড়াও।

ব্রাহ্মণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িল, তাহার পর বলিল "তোমার জয় হউক বাপু, তবে এখন আসি?" আগন্তুক হাসিয়া বলিল "কোথায় যাও?" ব্রাহ্মণ পলায়নের উপক্রম করিতেছিল, তাহার কথা শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, অত্যন্ত কাতর ভাবে কহিল "এই যে বলিলে ছাড়িয়া দিবে?"

নন্দ।— দাঁড়াও এতদিন পরে দেখা হইল, দুইটা সুখ-দুঃখের কথা কহিব না?

ব্রাহ্মণ বিষণ্ণ বদনে দাঁড়াইয়া রহিল। নন্দলাল তাহার ভাব দেখিয়া আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না, সে বলিল "ঠাকুর, আজ কি আহার হয় নাই?" ব্রাহ্মণ মস্তক সঞ্চালন করিল। নন্দলাল পুনরায় কহিল "ভাল, আমার গৃহে আজ তোমার নিমন্ত্রণ, তোমাকে উত্তমরূপে ভোজন করাইব।" ব্রাহ্মণ আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আর ফলাহার করিব না বাবা, এই যাত্রা ছাড়িয়া দাও।" নন্দলাল তাহাকে আশ্বস্ত করিতে বহু চেষ্টা করিল কিন্তু কোন ফল হইল না।

মাধবী মন্দিরে থাকিয়া ইহাদিগের কথোপকথন শুনিতেছিল। সে বারবার নন্দলালের নাম শুনিয়া বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইল। নন্দলাল গৌড়ের একজন বিশ্বস্ত সেনানায়ক, সে তাহাকে ভাল রকম চিনিত। সে বাতায়নে দাঁড়াইয়া দেখিল যে আগন্তুক নন্দলালই বটে। তখন সে মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিল এবং ব্রাহ্মণকে কহিল "ও ঠাকুর, ভয় নাই, এ সত্য সত্যই নন্দলাল।" ব্রাহ্মণ তখন চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিল এবং কহিল "তাইত, এ ত সত্যই নন্দলাল!" নন্দলাল হাসিয়া বলিল "ভাল তবু! এতক্ষণে চিনিতে পারিলে? মহারাজ কোথায়?"

ব্রাহ্মণ।— তাহা তুমিই জান।

নন্দ।— তিনি কি ফিরিয়া আসেন নাই?

ব্রাহ্মণ।— তিনি ফিরিলে ত গৌড়ের সকলকে রাম-কবচ লইতে হইবে?

নন্দ।— মহারাজ মরেন নাই, জীবিত আছেন।

মাধবী।— সে কি? নাবিকেরা আসিয়া বলিয়াছে যে চোলসমুদ্রের ঝড়ে নৌকা ডুবিয়াছে, মহারাজ ও কুমার রক্ষা পান নাই।

নন্দ।— নৌকা ডুবিয়াছিল সত্য কিন্তু তাঁহারা রক্ষা পাইয়াছেন। এক বণিকের নৌকায় মহারাজ যুবরাজ ও আমি সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলাম। বন্দর হইতে স্থলপথে আসিবার কথা ছিল। আমি বন্দরে তাঁহাদিগের সঙ্গ ছাড়িয়া আর তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া পাই নাই।

মাধবী।— মহারাজ ও যুবরাজ তবে জীবিত আছেন?

নন্দ।— নিশ্চয়ই।

মাধবী।— নন্দলাল, তোমার আর বিশ্রাম করিয়া কাজ নাই। এখনই মহারাণীকে সংবাদ দিতে হইবে।

সকলেই মন্দির ত্যাগ করিয়া নগরাভিমুখে চলিল। সে দিন আর মহাদেবের পূজা হইল না। (ক্রমশ)

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

দোসর *

পিছল পথের পথিক ওগো দীঘল্ পথের যাত্রী!
কোথায় যাবে কোথায় যাবে? সাম্‌নে মেঘের রাত্রি।
বাদ্‌লা দিনের উদ্‌লা ঝামট্ ভাসিয়ে দেবে সৃষ্টি;
লাগ্‌বে উছট; ছাটের জলে ঝাপ্‌সা হবে দৃষ্টি।

* * * *

"পিছন হ'তে কে ডাকে গো পিছল পথের যাত্রীরে?
দোসর হিয়ার খোঁজ পেয়েছি, ভয় করিনে রাত্রিরে।
পিছল পথে বিচল গতি পারব এখন আট্‌কাতে
পরস্পরে করব আড়াল ঝড়-বাদলের ঝাপ্‌টাতে।"

* * * *

উচল পথের পথিক ওগো অচল পথের যাত্রী!
পায়ের পাশে খাদের আঁধার ভীষণ ভয়ের ধাত্রী;
সাম্‌নে বাঁকা শালের শাখা; উদ্‌ঘাতিনী পন্থা,
কই তোমাদের যষ্টি, বন্ধু! কই তোমাদের কন্থা?

* * * *

"খাদের ধারে আল্‌গা মাটি আমরা চলি রঙ্গে,
হাওয়ায় পাতি পায়ের পাতা,—দোসর আছে সঙ্গে।
দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষা যে মন পরখের কষ্টি,
পরস্পরের প্রেম আমাদের জীবন-পথের যষ্টি।
পরস্পরের প্রেম আমাদের যাত্রা-পথের কন্থা,
হোক্ না বাতাস তুষারস্পর্শ,—উদ্‌ঘাতিনী পন্থা।
সঙ্কটেরে করব সহজ, কিসের বা আর শঙ্কা?
সঙ্গে দোসর,—ওই আনন্দে বাজিয়ে দেব ডঙ্কা।"

* * * *

জীবন-পথের পথিক ওগো অসীম পথের যাত্রী।
আশিষ করেন আদিম দোসর ধাতা এবং ধাত্রী;
ধাতা—সে যে বিশ্বধাতা, অন্তরে যাঁর স্ফূর্ত্তি,
ধাত্রী—সে যে এই বসুধা, স্বদেশ যাঁহার মূর্ত্তি।
আলোক-পথের পথিক ওগো আশিষ-পথের যাত্রী,
শিবতর শিবের লাগি যাপন কর রাত্রি।
শুভ হউক পন্থা ওগো! ধ্রুব হউক লক্ষ্য,
বিশ্বে হের বিস্তারিত পক্ষীমাতার পক্ষ!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

* শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র বি-এ সরস্বতীর বিবাহ উপলক্ষে রচিত।

দেশের কথা

গতবারে যখন আমরা "প্রবাসীর" কলেবরে "দেশের কথা" এই নূতন অঙ্গটি যোগ করি তখন বলিয়াছিলাম যে—"মফঃস্বল ও পল্লীগ্রামের সহিত প্রবাসী-পাঠকদের অন্ততঃ কতকটা যোগ যাহাতে স্থাপিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই বিভাগে মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাদি হইতে তথাকার কার্য্যকলাপ, মতামত, অভাব অভিযোগ, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ সংকলন করিয়া দিব।"

কথাটি যখন লিখিয়াছিলাম তখন ঠিক ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই কাজটি কত দুরূহ হইতে পারে। এখন কাজটি আরম্ভ করিয়া অনেকটা বুঝিতে পারিতেছি ব্যাপারটি যত সহজ ভাবিয়াছিলাম তত সহজ একেবারেই নহে। কেন তাহা বলিতেছি।

আমাদের দেশের মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলিতে সাধারণতঃ মফঃস্বলের সংবাদ প্রভৃতি কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্রাদি অপেক্ষা বেশী থাকে বটে; কিন্তু সে-সব সংবাদ সচরাচর চুরি, নরহত্যা, ডাকাতি কিম্বা অন্য কোন দুর্ঘটনার। তাহা আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোনই সহায়তা করে না। অবশ্য স্থানীয় অভাব অভিযোগ প্রভৃতির কথা কিছু-না-কিছু অনেক কাগজেই থাকে, কিন্তু তাহার মধ্যে কখন কখন ব্যক্তিগত আক্রমণ ঈর্ষা ও কুৎসা এমন ভাবে বর্ত্তমান দেখিতে পাই যে তাহা হইতে সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিয়া কিছু সংকলন করিয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ হইয়া পড়ে। তাহার পর আবার অধিকাংশ মফঃস্বলের কাগজই দেখি অনেক বড় বড় বিষয়ের আলোচনায় কলেবর পূর্ণ করেন। "হোমরুল", "আলষ্টার-বিদ্রোহ", "সাফ্রেজীট-বিপ্লব", "ইণ্ডিয়া-কাউন্সিল-সংস্কার" প্রভৃতি ব্যাপারের চর্চ্চা না করিয়া মফঃস্বলের সম্পাদকগণ যদি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব-স্থাপন, অনুন্নত জাতির উন্নতির জন্য প্রয়াস পান, এবং বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে স্থানীয় যে-সমস্ত অভাব আছে তাহার প্রতিকারের

জন্য দেশবাসীদিগের মধ্যে যাহাতে একটা স্বাবলম্বন-চেষ্টা জাগে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পত্রিকা পরিচালন করেন তাহা হইলে মফঃস্বলের সংবাদপত্রিকাদি আপন সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে। দেশ-বিদেশের বড় বড় সমস্যা-সমাধানের ভার বড় বড় পত্রিকার হাতে দিয়া মফঃস্বলের পত্রিকাগুলি যদি বাংলার পল্লী-সমস্যা-সমাধানের মহদুদ্দেশ্য গ্রহণ করেন তাহা হইলে বাস্তবিকই দেশের মধ্যে তাঁহারা একটা শক্তি হইয়া দাঁড়াইতে পারেন। তখন তাঁহাদিগকে আর কেহ অবহেলার চক্ষে দেখিতে পারিবেন না, আর আমাদিগকেও তাঁহাদের অঙ্গ হইতে "দেশের কথা" বিভাগে কোন্ জিনিসটি চয়ন করিয়া দিলে বাংলার মফঃস্বল ও পল্লী-গ্রামের সহিত দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কতকটা যোগ স্থাপিত হইবে, সে কথা ভাবিতে হইবে না।

পল্লী-প্রসঙ্গ—

সম্প্রতি এক পল্লীগ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে কয়দিন থাকিয়া যে অবস্থা দেখিয়া আসিলাম তাহাকে শোচনীয় ভিন্ন আর কি বলিব জানি না।

জঙ্গলে, ঝোপেঝাড়ে, অস্বাস্থ্যকর পূতিগন্ধময় ডোবায়, নালায় সমস্ত পল্লীগ্রাম আচ্ছন্ন হইয়া আছে। সম্মুখে বর্ষা এবং তাহার সঙ্গের সাথী হইয়া জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি ব্যাধি আসিতেছে।

আহার্য্য বস্তু মিলেনা বলিলেই হয়। যাহা পাওয়া যায় তাহা সমস্তই দুর্ম্মূল্য; ধনী ভিন্ন অপর কাহারও ভোগ করিবার শক্তি নাই। টাকায় তিন সের দুধ, তাহাও পাওয়া যায় না। আর পাওয়াই বা যাইবে কোথা হইতে? পূর্ব্বে গ্রামে যে-সমস্ত গোচারণ ভূমি ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। সুতরাং খাদ্যাভাবে গরুগুলিও রুগ্ন, শীর্ণ ও দুগ্ধহীন হইতেছে। মাছ গ্রামের বাজারে বিক্রয়ার্থ আসে না, সমস্তই কলিকাতাতে রপ্তানী হইয়া যায়। যে সামান্য মাছ পাওয়া যায় তাহা এত সামান্য যে তাহাতে গ্রামের প্রয়োজনের শতাংশের একাংশও মিটে না। বাজারে মাছ বিক্রয়ের স্থলে দস্তুরমত কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, ক্রেতাদিগের মধ্যে নীলামের ডাকের মত ডাক চলিতে থাকে। তরী তরকারী পর্য্যন্ত কলিকাতার দরে বিক্রীত হয়। তবে পল্লীগ্রামের প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই গৃহ-সংলগ্ন জমিতে অল্প স্বল্প কিছু তরী তরকারী উৎপন্ন হয় বলিয়া কোন মতে চলিয়া যায়। ওদিকে চালের দর তো দিন দিনই বাড়িয়া চলিতেছে।

তাহার পর জলকষ্ট তো আছেই—বৃহৎ পল্লীগ্রামের মধ্যে হয়তো বড় জোর দুইটি বিশুদ্ধ পানীয় জলের পুষ্করিণী আছে। বাদবাকী প্রায় অপর সমস্তগুলিই কর্দ্দমাক্ত ও পানায় পূর্ণ। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ—সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন গ্রামবাসীগণ পানীয় জলের নামে ঐ রোগবীজাণুপূর্ণ পানাপুকুরের জলই উদরস্থ করিতেছেন।

পল্লীবাসীগণের মধ্যে একতা নাই; কেবল সংকীর্ণতা ও দলাদলি। মামলা মোকর্দ্দমা লাগিয়াই আছে। কথায় কথায় লোকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে; কেহ কাহারও মধ্যস্থতা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়। গ্রামে একটি মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইলেই অমনিই ঐ মোকর্দ্দমা লইয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বপক্ষ, বিপক্ষ দুই দলের সৃষ্টি হয়।

এইরূপে বাংলার পল্লীগ্রামগুলি উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে। এমন কি মফঃস্বলের যে-সমস্ত শহরে ও পল্লীগ্রামে মিউনিসিপালিটি পর্য্যন্ত আছে তাহাদেরও পথ ঘাট, স্বাস্থ্যের অবস্থা মিউনিসিপ্যালিটিহীন পল্লী অপেক্ষা কোন অংশে উন্নত নহে। কেননা সেখানে মিউনিসি-প্যালিটির কর্ত্তৃত্ব লইয়া শুধু দলাদলি রেষারেষি। তাহাতে আর কাজ চলে কি করিয়া? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থ এবং প্রতিপত্তিশালী কিন্তু অতি অযোগ্য লোকের হস্তে মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃত্বের ভার পড়ে; সুতরাং কাজও হয় তদ্রূপ।

ম্যালেরিয়া তো বাংলার প্রত্যেক পল্লীতে বারো-মাস লাগিয়া আছে। চতুর্দ্দিকে রেলওয়ে লাইনের সৃষ্টি হওয়ায় এবং নদীতে পলি পড়িয়া জল চলাচলের পথ বন্ধ হওয়াতে রেলওয়ে লাইন ও নদীতটের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি হইয়া পড়িয়াছে।

নিম্নে মফঃস্বলের পত্রিকাদি হইতে যে কয়টি অংশ সংকলন করিয়া দেওয়া হইল তাহা হইতে উপরি-লিখিত আমাদের কথাগুলি অনেকটা প্রমাণিত হইবে।

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়।—ডাক্তার বেণ্টলী বলিয়াছেন যে বঙ্গদেশের যে-সকল স্থান অধুনা ম্যালেরিয়ায় উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে, সেই-সকল স্থান পূর্ব্বে স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তৎকালে বন্যার জলে বর্ষাকালে দেশ ভাসিয়া যাইত, ফলে দেশের স্বাস্থ্য ভাল থাকিত এবং জমির উপর নূতন পলি পড়ায় জমির উর্ব্বরতা-শক্তিও বৃদ্ধি পাইত। এ কথা সত্য। অধুনা নদ নদী সব শুখাইয়া গিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে কাটা খালের আধিক্য বঙ্গে জলাভাবের একটি কারণ। দ্বিতীয়তঃ বঙ্গে রেল-পথের বৃদ্ধি-হেতু জলের আগম- ও নির্গম-পথের অভাবও জলাভাবের অপর কারণ। রেল-পথে পুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। রেল-পথে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বর্ষার জল যে শুধু শস্যক্ষেত্র প্লাবিত করিতে পারে না তাহা নহে, অনেক স্থলে বৃষ্টির জল আবদ্ধ হইয়া ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করে। মিঃ লিজ মহোদয়ের প্রস্তাব-মত পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সংযোগের নিমিত্ত যে খাল কাটার কথা চলিতেছে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে ১৮ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। অধুনা এ কার্য্যে এত টাকা খরচ না করিলে সেই টাকায় যাহাতে পূর্ব্ব বঙ্গের ভরাট নদীগুলির পঙ্কোদ্ধার হয় তাহার ব্যবস্থা করা হউক। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, যে-সকল নদীতে পলি পড়িয়া জল চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার তটবর্ত্তী গ্রাম-সমূহে ম্যালেরিয়া আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সুতরাং সেই-সকল স্থান হইতে ম্যালেরিয়া তাড়াইতে হইলে সর্ব্ব-প্রথমে নদীগুলির পঙ্কোদ্ধার করা কর্ত্তব্য। ম্যালেরিয়া দেশ হইতে তাড়াইতে না পারিলে এ বাঙ্গালী-জাতির উন্নতির কোনই আশা নাই।—রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ, ১৩ই বৈশাখ, ১৩২১।

দেশের দুর্দ্দশা।—এবার দেশে নানা কারণে মনুষ্যের কষ্টের একশেষ হইতেছে। বসন্ত কলেরা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে বঙ্গদেশের অধিকাংশ সহর ও পল্লী জর্জ্জরিত হইতেছে। পল্লীগ্রাম সমস্তই জঙ্গলে পরিপূর্ণ, জলের অত্যন্ত অভাব, রাস্তা-ঘাট-বিবর্জ্জিত; শৈবাল-দাম-পরিবৃত জলাশয়ের ও মরানদীর অপেয় জল পান ব্যতীত উপায় নাই। জঙ্গলপরিপূর্ণ গ্রামে বন্যজন্তুর ন্যায় বিচরণ করিতে হয়। পল্লীর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ভাবিতে গেলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, পল্লীর অবস্থা রাজ-সদনে প্রকাশের জন্য ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে কথা থাক, সহরের কথা ভাবিয়া দেখিলেও দেখা যায় গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিয়া যাঁহাদের হস্তে সহরের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছেন হায় অদৃষ্ট তাঁহারা কেবলমাত্র ফরমপূর্ণ করিয়া প্রজার করবৃদ্ধি করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য না করিয়াও কার্য্যের তৎপরতা দেখাইতেছেন, চক্ষুতে ধূলি দিয়া কার্য্য সমাপন করার ন্যায় কার্য্যের বাহবা লইতেছেন, কিন্তু প্রকৃত কার্য্য কি হইতেছে? এইত সহরে অনেক দিন হইতে বসন্তের প্রবল প্রকোপ আরম্ভ হইয়াছে, প্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্যরক্ষকগণ কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন? ড্রেন পূর্ব্ববৎ, কোনও দিন পরিষ্কার হয়, কোনও দিন হয় না, পায়খানা পরিষ্কারের ব্যবস্থাও তদ্রূপ, রাস্তার পার্শ্বের জঙ্গল সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয় না, বসন্তরোগে মৃত রোগীগণের সমাধির স্থান সহরের অতি নিকটে থাকায় সংক্রামকতা বহু প্রকারে হইতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি-বিহীন; রোগীগণের বস্ত্রাদি রীতিমত পুড়াইয়া দেওয়া হইতেছে কি না, শুদ্ধ ঢেঁড়া দ্বারা নিষেধ করিয়া দিলেই যে কার্য্য হয় না তাহা কি কেহ ভাবিয়া থাকেন? কেবলমাত্র টিকা দ্বারা সব সময় বসন্তরোগ কমিয়া যায় না, ইহা কি কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া বসন্তরোগ চিকিৎসা করার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য তাহা কি ভাবিয়াছেন? লালবাগ মিউনিসিপালটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ একবার উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন, সম্ভবত সকলেই তাহা অবগত আছেন। সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলেই ড্রেনে ফিনাইল দিলে, প্রতি রাস্তায় গন্ধক ধুনার ধূম দিলে অনেকটা উপশম হইতে পারে কিন্তু কৈ সে দিকেও কর্ত্তৃপক্ষদের দৃষ্টি নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা তাঁহারা কি করিয়া করিতেছেন তাহা সাধারণের অগোচর।—মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী, ২৩শে বৈশাখ, ১৩২১।

বঙ্গে গো-জাতি—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এবার পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিলাম যে সেখানে দুগ্ধ দিন দিনই দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে। ইহার নানা কারণ বর্ত্তমান। প্রথম—গোচারণ-ভূমির অভাব এবং দ্বিতীয় আমাদের গো-পরিচর্য্যার ত্রুটি। এদেশে লোকে গরুকে সাক্ষাৎ ভগবতীজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন বটে কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে গরু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছন্দভাবে গোশালায় বাস করিবে, এবং নীরোগ থাকিয়া সুস্থ ও সবল বৎস প্রসব করিবে সে দিকে বিশেষ কোন দৃষ্টি নাই। সেই মান্ধাতার আমলে গো-পরিচর্য্যার যে ব্যবস্থা ছিল এখনো পর্য্যন্ত তাহাই চলিয়া আসিতেছে; কোন পরিবর্ত্তন নাই, কোন উন্নতি নাই। এবং সে ব্যবস্থা অনুসারেও লোকে চলে না। অথচ গো-খাদকের জাত বলিয়া যাহাদিগের নাম স্মরণে আমরা ঘৃণায় নাসাকুঞ্চন ও নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করি সেই য়ুরোপীয়ান ও মার্কিনেরা গোতত্ত্ব, গো-চিকিৎসা, গো-পালন সম্বন্ধে প্রতিদিন কত নব নব তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করিয়া গো-জাতিকে নীরোগ সুস্থ ও দীর্ঘজীবী করিয়া তুলিতেছেন। বকরীদের সময় গো-বধ হইলে বৎসরের মধ্যে একবার আমরা একেবারে অস্থির হইয়া পড়ি; কিন্তু আমাদেরই স্বার্থে ও লোভে দেশে গো-চারণ-ভূমি লোপ পাওয়াতে খাদ্যাভাবে যে প্রতিদিন কত গরু তিলে তিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই।

গো-জাতির অবনতিতে শুধু যে দেশে দুগ্ধ ও ঘৃতের

অভাব ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও ঘটিবে তাহা নয় ; এ দেশের প্রধান উপজীবিকা কৃষিরও বিস্তর ক্ষতি সাধিত হইবে।

আমাদের গো-রক্ষিণী সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি যদি, মুসলমানেরা কয়টি গরু জবাই করিল কেবল তাহার হিসাব না রাখিয়া, গো-পালন গো-পরিচর্য্যা সম্বন্ধে আধুনিক তত্ত্বগুলি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তিকাকারে দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের এবং পল্লীতে পল্লীতে প্রচারক পাঠাইয়া কৃষকদিগের মধ্যেও সেই-সব তত্ত্বের প্রচারের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে প্রভূত কল্যাণ হয়।

গোধনের অবস্থা।—প্রাচীন কালে (৩০।৪০ বৎসরের পূর্ব্বে) আমাদের দেশে গরু ও মহিষের শারীরিক অবস্থা যেরূপ ছিল, বর্ত্তমানের সহিত তাহার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাহার কারণ, পূর্ব্বে আমাদের দেশে যেরূপ ঘাস ছিল গরু মহিষাদি তাহা খাইয়া ফুরাইতে পারিত না। কিন্তু বর্ত্তমানে যে ঘাস আছে, গরু মহিষাদি তাহা খাইয়া উদর পূর্ণ করিতে পারিতেছে না। পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে পরিমাণ গরু ও মহিষ ছিল, বর্ত্তমানে তদপেক্ষা অনেক কম। তাহার কারণ, পূর্ব্বে যে পরিমাণ গরু মহিষ মরিত, বর্ত্তমানে তাহার চেয়ে অনেক বেশী মরে। কেননা যাহা মরিত কেবল ব্যারামেই ; কিন্তু বর্ত্তমানে ব্যারামে যে পরিমাণ মরিতেছে, ঘাস খাইতে না পাইয়া তদপেক্ষা অনেক বেশী মরিতেছে। এই হেতু পূর্ব্বাপেক্ষা গরু মহিষের সংখ্যা বর্ত্তমানে অনেক কম। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে যে পরিমাণ দুগ্ধ ঘৃতাদি পাওয়া যাইত, বর্ত্তমানে তদপেক্ষা অনেক কম পাওয়া যায়। কেননা একে ত গরু মহিষের সংখ্যা কম, তাহাতে আবার গরু মহিষাদি উপযুক্ত খাদ্য পায় না। আবার দেখা যায় পূর্ব্বে দুগ্ধের সের ১৫ তিন পয়সা ও ঘৃতের সের ৷৹ বার আনা কি ১৲ এক টাকা বিক্রয় হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে দুগ্ধের সের ৵৹ দুই আনা ও ঘৃতের সের ২৲ দুই টাকা বিক্রয় হইতেছে। আর পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই দুগ্ধ দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু বর্ত্তমানে এমন কি অনেক গ্রামের মধ্যে দুগ্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গরু ও মহিষের সুবিধার জন্য সরকার বাহাদুর আমাদের দেশে হাসপাতাল বসাইয়াছেন, ও গোচর-ভূমি খাস হইতে আদেশ দিয়াছেন। পূর্ব্বে আমাদের দেশে হাসপাতাল ছিল না বলিয়া যে গরু মহিষাদি অধিক পরিমাণে মরিয়া যাইত তাহা নহে, বরং বর্ত্তমানের চেয়ে পূর্ব্বে ব্যারামের সংখ্যা বেশী ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে যে গরু মহিষাদি বেশী মরিতেছে তাহা কেবল ব্যারামে মরিতেছে না। উপযুক্ত ঘাস না পাইয়া গরু মহিষাদি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে হইতে অবশেষে মরিয়া যায়। গরু মহিষাদির হাসপাতাল হওয়ায় আমাদের অনেক উপকার হইয়াছে।—সুরমা, শিলচর, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১।

আসাম-গভর্ণমেণ্ট "নানাস্থানে গো-চারণের জন্য ভূমি খাস হইতে আদেশ দিয়া" বাস্তবিকই বড় উপকার করিয়াছেন। আমাদের বাংলা-গভর্ণমেণ্টও যদি এ বিষয়ে তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়।

অভাব অভিযোগ—

কাঁথির গ্রাম-ভেড়ী।—আমরা গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া অসংখ্য ভেড়ী ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া থাকার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। আজ আর কয়েকটি ভগ্ন ভেড়ীর কথা বলিতেছি।

মাজনামুঠা পরগণার কুসুমপুর মৌজায় ১৫৯৭ ফুট দীর্ঘ পূর্ব্ব ভেড়ী যাহা গ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে দক্ষিণগামী হইয়া সেরপুর মৌজার ভেড়ীর সহিত মিলিত হইয়াছে তাহা এমন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যে অধিকাংশ স্থল মাঠের সহিত এক সমতল হইয়াছে। ইহা মেরামত না হইলে ইহার পূর্ব্বপার্শ্বস্থ হৈবৎপুর মৌজার উচ্চ জমির জল এই মৌজার মাঠে চাপিয়া পড়িয়া মাঠ জলপ্লাবিত করিয়া দিবে। এই মৌজায় ৫৮৮০ ফুট দীর্ঘ পশ্চিম ভেড়ী যাহা গ্রামের উত্তর সীমা হইতে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত প্রধাবিত, তাহাও ভয়ঙ্কর রূপে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভেড়ী ভাঙ্গিয়া অনেক স্থলে মাঠের সমান, অনেক স্থলে মাঠ অপেক্ষা গভীর হইয়া পড়িয়াছে। কবালদা খাল ইহার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত। এই খালের মুখে সুলুশের কপাট না থাকায়, জোয়ারের সময় লোণা জল খালে প্রবেশ করে ও সেই জল গ্রামের জমী ছাপাইয়া উঠিয়া ভাঙ্গা বাঁধ-পথে মাঠে আসিয়া মাঠ জলপ্লাবিত করিয়া দেয়। সুতরাং এ ভেড়ীর সংস্কার-কার্য্য আশু সম্পন্ন না হইলে লবণ-জলের প্রভাবে জমির উৎপাদিকা-শক্তি বিনষ্ট হইবে, সুবৃষ্টি হইলেও প্রজাগণকে চাষের আশা ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই গ্রামের ২২৬৫ ফুট দীর্ঘ উত্তরের ভেড়ী যাহা পশ্চিম ভেড়ী হইতে গ্রামের ঈশান কোণ পর্য্যন্ত প্রসারিত, তাহাও অল্পবিস্তর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহারও সংস্কার অত্যাবশ্যক।
—নীহার, ২৯শে বৈশাখ, ১৩২১।

আমরা দেখিতেছি বহুদিন ধরিয়া "নীহার" পত্রিকায় কাঁথির গ্রামভেড়ীর ভগ্নাবস্থা বিষয়ে আলোচনা হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে পতিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মেদিনীপুর মিউনিসিপালিটী—মেদিনীপুর-মিউনিপালিটীর আয় এ বৎসর এক লক্ষের উপরে উঠিয়াছে। বর্ত্তমান ১৯১৪-১৫ খৃঃ অব্দের জন্য যে বজেট প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে মিউনিসিপালিটীর ঠিক আয় দাঁড়াইয়াছে ১, ১৫, ৪২০৲—এক লক্ষ পনের হাজার চারি শত কুড়ি টাকা। আয় বাড়িয়াছে, কিন্তু কর্ম্মবীর বাবুদের এমনই কর্ম্ম-নৈপুণ্য যে মিউনিসিপালিটীতে কুলীমেথরের অভাব হইয়াছে! মেথর না থাকিলে, পাইখানা পরিস্কৃত না হইলে, ঝোপের আড়ালে ময়লা স্তূপীকৃত করিয়া রাখিলে, করদাতৃগণকে কিরূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।—মেদিনীপুর-হিতৈষী ১১শে বৈশাখ, ১৩২১।

জলকষ্ট।—গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব সহ পুরুলিয়া সহরে ও মানভূম জেলার সর্ব্বত্র ভীষণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ পুরুলিয়ার সাহেব বাঁধের সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এই কার্য্যে দশ হাজার টাকা ব্যয় করা হইতেছে। সাহেব বাঁধের অনেক জল বাহির করিয়া দিয়া ইহার চতুষ্পার্শ্বের পঙ্কোদ্ধার করা হইতেছে। সাহেব-বাঁধের প্রতিষ্ঠা-কালের পর হইতে অদ্যাবধি তাহার সংস্কার করা

হয় নাই। তবে যেরূপ ভাবে এত অধিক টাকা কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহা সাধারণের সন্তোষজনক হইতেছে না। স্থানীয় জলের বাঁধ, পুষ্করিণীগুলিরও কোনকালে সংস্কার না করায় সাধারণের বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। সহরের প্রায় সকল বাঁধই মিউনিসিপালিটীর সম্পত্তি ও প্রত্যেক পুষ্করিণীর বাৎসরিক আয় যথেষ্ট আছে। যদি বাঁধের আয় বাঁধের সংস্কারেই ব্যয় করা হয় তবে আর কোন সাহায্যের আবশ্যক করে না। সহরের মধ্যে মিউনিসিপালিটীর দশের বাঁধ, গোবরা গড়ে, পোকাবাঁধ প্রভৃতি পুষ্করিণীগুলির গ্রীষ্মকালে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে। সংস্কারের অভাবে চিরদিনের সঞ্চিত পাঁক গ্রীষ্মে জলাভাব সহ পচিয়া পুষ্করিণীর পাড় দিয়া যাতায়াত করাও দুঃসাধ্য করিয়া তুলে। তীরবর্ত্তী অধিবাসীদিগের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই সমস্ত পুষ্করিণীর অবস্থার তুলনায় সাহেব-বাঁধের সংস্কারের তাদৃশ প্রয়োজন ছিল না। কর্তৃপক্ষ যদি এই টাকা পোকা-বাঁধ ও আরও দুই একটি বাঁধের সংস্কারে ব্যয় করিতেন তবে প্রকৃত পক্ষে সাধারণের উপকার করা হইত। —পুরুলিয়া-দর্পণ, ২৮শে বৈশাখ, ১৩২১।

কাঁথিতে তগাবী ঋণ।—কাঁথি-মহকুমার প্লাবন-পীড়িত অধিবাসীগণকে গৃহ-নির্ম্মাণ, বীজ-ধান্য সংগ্রহ এবং চাষের গরু ক্রয় ইত্যাদি অত্যাবশ্যক প্রয়োজন-সাধনের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রায় দুই লক্ষ টাকা তগাবি-ঋণ প্রদান করিয়াছেন। সম্প্রতি এই তগাবি-দাদন বন্ধ করা হইয়াছে। কাঁথি মহকুমায় আগামী আশ্বিন মাসের শেষ পর্য্যন্ত তগাবী-ঋণ প্রদান একান্ত কর্ত্তব্য। -মেদিনীপুর-হিতৈষী, ২১শে বৈশাখ, ১৩২১।

সকলেই অবগত আছেন যে গত বন্যাতে বাংলাদেশের আর আর সকল স্থান অপেক্ষা কাঁথি মহকুমাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। গত চৈত্রমাস পর্য্যন্ত সেখানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মণ্ডলী ও 'সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটি' সাহায্য-কার্য্য করিয়াছেন। ইহা হইতেই সহজে বুঝা যায় কাঁথি মহকুমার অধিবাসীগণ কতদূর দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টও তাগাবি-দাদন দানে কাঁথির বন্যাপীড়িত কৃষককুলকে এতদিন যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন বটে কিন্তু আরও কিছুদিন যদি এই সাহায্যটি চালান তাহা হইলে, আমাদের বিশ্বাস, কৃষকদের অবস্থা আরও একটু ভাল হয়। গত বন্যাতে তাহাদের সকলেই প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বাংলায় মৎস্যাভাব—

মাছ আমাদের বাংলাদেশের একটি প্রধান ও বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্য। কিন্তু ক্রমেই এদেশে মাছ বড়ই দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে হাটে বাজারে যে পরিমাণ মাছ পাওয়া যাইত এখন আর সে পরিমাণ পাওয়া যায় না; মাছের দরও পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হই য়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজি "Fisheries Commission" বাংলাদেশে মৎস্য-সংক্রা সমুদয় তথ্য আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে এদেশে যেরূপ দ্রুতগতিতে মৎস্যের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে তাহাতে যদি কোন প্রতিবিধায়ক উপায় অবলম্বিত ন হয় তবে মৎস্য-কুল একপ্রকার নির্ম্মূল হইয়া যাইবা আশঙ্কা আছে। মৎস্যের মত প্রয়োজনীয় খাদ্যে অভাব ঘটিলে লোকের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহ সহজেই অনুমেয়। আমাদের মনে হয় পল্লীগ্রামে ভদ্র লোকেরা যদি পুকুরে মৎস্য পালন আরম্ভ করেন তাহ হইলে এ বিষয়ে কতকটা কাজ হইতে পারে। এ সম্বন্ধে মফঃস্বলের একটি পত্রিকাতে যে প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছে তাহা আমরা নিম্নে সংকলন করিয়া দিলাম। এ প্রবন্ধ হইতে মৎস্য পালন সম্বন্ধে অনেক আবশ্যকীয় তথ্য পাওয়া যাইবে।

পুকুরে মাছের চাষ।—পুকুরে অনেক রকমের মাছের চাষ করি বেশ ফল পাওয়া যায়, এবং উহাতে লাভ আছে। কিন্তু রু কাতলা, মৃগেল এবং কালবোস্ এই কয়েকটী মাছের চাষেই স চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশের প্রায় প্রত্যে পুকুরেই বোয়াল, কই এবং সোল মাছ প্রচুর পরিমাণে দেখি পাওয়া যায়। বোয়াল এবং সোল মাছ অত্যন্ত পেটুক। ইহা অন্য মাছ খাইয়া ফেলে।

রুই, কাতলা, মৃগেল এবং কালবোস পুকুরে ডিম পাড়ে জুন এবং জুলাই মাসেই ডিম পাড়িবার সময়। যেমন ব আরম্ভ হয় অমনি মাছেরা ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। এ ডিমগুলি সচরাচর নদীর তীরের দিকে ভাসিয়া যায়; জেলে কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া ইহাদিগকে সংগ্রহ করে এবং জলপূ হাঁড়ির মধ্যে রাখে। ডিমগুলি ছোট হাঁড়িতে বাঁচিয়া থাকি পারে ও বাড়িতে পারে, তবে দিনের মধ্যে অনেকবার (অন্ত ত্রিশ বার) হাঁড়ির জল বদলান দরকার। ডিম পাড়িবার প প্রায় দশ দিনের মধ্যে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। এই-সক মাছের ডিম জলপূর্ণ হাঁড়িতে বাঁচিয়া থাকিতে ও বাড়িতে পা বলিয়া, ইহাদিগকে রেল বা নৌকা করিয়া দূরবর্ত্তী স্থানে পাঠা যাইতে পারে। ডিমের দাম কিছু কমে বাড়ে। ডিম যদি টাটব হয়, এবং বেশী বড় না হয়, তাহা হইলে, ১ কুনিকার দাম কিম্বা ৬৲ টাকা। এক কুনিকায় প্রায় ৫০০০ ডিম থাকে। য ডিম, ধর, পাঁচদিনের হয়, তাহা হইলে উহার দাম আরও বে হইবে। আর যদি ছোট চারা মাছ কেনা যায়, তাহা হইলে উহার দাম হাজারকরা ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকা। বাঙ্গালা দে সচরাচর পুকুরে রুই এবং এই প্রকারের অন্য মাছের ডিম ভা করিয়া রাখা হয়। এই প্রথা বিহার উড়িষ্যায় এত প্রচলি নহে। এই কার্য্য অতি লাভজনক।

যে পুকুরে ডিম বা ছোট মাছ ছাড়া হয় তাহা খুব বড় বা খুব গভীর হইবে না। কারণ তাহা হইলে দরকার মত মাছ ধরিতে পারা যাইবে না।

কোন কোন পুকুরে বোয়াল, সোল প্রভৃতি পেটুক মাছ থাকে। এইরূপ পুকুরে ডিম ফেলা হইলে বোয়াল সোল মাছে সমস্ত কিম্বা প্রায় সমস্ত রুই মাছের ডিম খাইয়া ফেলে। সুতরাং পুকুরে ডিম ফেলিবার পূর্ব্বে যত্নের সহিত পুকুর হইতে সমস্ত পেটুক মাছ তুলিয়া ফেলা আবশ্যক। আবার অনেক সময়ে রুই মাছের ডিমের সঙ্গে বোয়ালাদি পেটুক মাছের ডিমও আসিয়া পড়ে। এরূপ স্থলে একমাত্র উপায় এই যে, যতদিন ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির না হয়, ততদিন ডিমগুলিকে একটা বড় হাঁড়িতে রাখিয়া বাড়িতে দিতে হয়। ইহাতে ৭।৮ দিন মাত্র সময় লাগে। যদি কোন পেটুক মাছ থাকে, তবে তখন তাহারা ধরা পড়িতে পারে ও তাহাদিগকে বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তার পর ভাল মাছগুলিকে পুকুরে ছাড়িতে পারা যায়। আবার যাহাতে বর্ষাকালে বৃষ্টির জলের সঙ্গে পুকুরে পেটুক মাছের ডিম আসিতে না পারে সে বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

সমুদায় কাছিম এবং কচ্ছপগুলিকে পুকুর হইতে তুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং বেঙ-সকল যাহাতে মাছের ডিম খাইতে না পারে, যতদুর সম্ভব, সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে। কিছু কিছু সবুজ আগাছা জলে জন্মিতে দিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে পুকুরের আগাছাগুলিকে পাতলা করিয়া দিতে হইবে। পুকুরে নিম্নলিখিত আগাছাগুলি জন্মিতে দেওয়াই ভাল—

(১) জঙ্গী (বাঙ্গালা), ঝঙ্গী, কুরক্রী (হিন্দি) ; (২) পাটা (বাঙ্গালা), সায়য়ালা স্যালা (হিন্দি) ; (৩) উক্তি পানা (বাঙ্গালা) ; কেশব দাম (বাঙ্গালা) ; (৫) কলমী শাক (বাঙ্গালা), নরী (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ), নলিচী বগা (বোম্বাই), কৈলঙ্গু (তামিল), তুটিকরা (তেলেগু), কলম্বী (সংস্কৃত) ; (৬) মথ (বাঙ্গালা), তাঁদসুরা (সাঁওতাল), মুস্তা গুণ্ডা, মুষক (সংস্কৃত), কোরাই (তামিল), গুণ্ডলা (তেলেগু)মুস্তা বারিখমথ (বোম্বাই), বিলম্ব (মারাঠি), মোথা (গুর্জ্জর), কাসগুরা (Sing)।

মাছের বৃদ্ধি, খাদ্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যে পুকুরে খাদ্যের পরিমাণ বেশী সে পুকুরে এক বৎসরে রুই মাছ বেশী বাড়ে ও উহার ওজন আরও অধিক হয়। বাঙ্গালা দেশে ও অন্যান্য স্থানের প্রত্যেক পুকুরে এক প্রকার ছোট প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা খুব বেশী জন্মায় এবং দেখিতে মাছের মত। কেবলমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ছোট চিংড়ীগুলি বোধ হয় সারা বৎসর ধরিয়াই ডিম পাড়ে। রুই মাছেরা এই ছোট চিংড়ী খায়। রুই মাছেরা আগাছাও খায় কিন্তু তাহারা অন্য মাছ খায় না সাধারণতঃ মাছদের খাইবার জন্য কৃত্রিম কোন খাদ্য পুকুরে ফেলিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু কখনও কখনও এইরূপ উচিত মনে হয়, বিশেষতঃ যদি এক বৎসরের শেষে দেখা যায় যে মাছেরা যেরূপ বাড়া উচিত ছিল সেই পরিমাণে বাড়ে নাই, তাহা হইলে এরূপ করা উচিত। তখন কিছু ভাত, রুটির টুকরা, স্বল্পপরিমাণ তরকারী ইত্যাদি মাছের মধ্যে পুকুরে ফেলা যাইতে পারে। কিন্তু এমন পরিমাণে ফেলা উচিত নহে, যাহাতে পরিশেষে জল খারাপ হইয়া যায়।

মাছের প্রচুর খাদ্য থাকিলে প্রত্যেক মাছের ওজন এক বৎসরে তিন পোয়ার কম হওয়া উচিত নহে। দ্বিতীয় বৎসরের শেষে রুই মাছ ওজনে একসের হইতে দুই সের হওয়া উচিত। তৃতীয় বৎসরের শেষে উহাদের প্রত্যেকের ওজন তিন সেরের কাছাকাছি হওয়া উচিত। তিন বৎসরে তাহারা ওজনে তিন সেরের অধিক হইতে পারে।

পুকুরে কত ডিম ফেলিতে হইবে তাহা পুকুরের আকারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদি পুকুরে চারা মাছের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হয়, তাহা হইলে মাছেরা ভাল বাড়িতে পারিবে না, অনেকই মরিয়া যাইবে এবং যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাদের আকার ছোট হইবে। আরও যে পুকুর গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায় কিম্বা যাহাতে জল তিন ফুটের কম হইয়া যায়, সে পুকুরে মাছের ডিম ছাড়ায় কোন ফল নাই। আবার, যদিও একটী পুকুরে ২০০০ অতি ক্ষুদ্র মাছের পক্ষে যথেষ্ট খাদ্য থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ-সকল মাছ যখন বাড়িবে তখন ঐ খাদ্যে তাহাদের কুলাইবে না। যাহাতে অত্যন্ত ঘেঁসাঘেঁসি না হয় সে জন্য অধিকাংশ মাছকেই পুকুর হইতে উঠাইয়া অন্য পুকুরে ফেলিতে হইবে। “দুই বৎসরের রুই মাছের ওজন গড়ে দেড় সের হয়”। যদি কোন পুকুরে ১০০০ ডিম ছাড়া যায়, মনে কর, তাহাদের মধ্যে ৫০০ মরিয়া গেল—তাহা হইলে ২ বৎসরের পরে ৫০০ মাছ প্রত্যেকে দেড় সের ওজনের হইবে। মাছের সের ।০ আনা ধরা গেল। ৫০০ মাছের প্রত্যেকের ওজন দেড় সের হিসাবে ৭৫০ সের। ।০ আনা করিয়া সের হইলে মোট দাম ১৯০৲ টাকা হইল। খরচার মধ্যে ছানা মাছের দাম, জেলের খরচা এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচা আছে। নিম্নের তালিকায় তাহা দেখান হইতেছে :—

জমা।	খরচ।
৭৫০ সের মাছের মূল্য প্রতিসের ।০ হিসাবে ১৯০৲ টাকা।	১,০০০ ছানা মাছের দাম ১৫৲, জাল টানা ইত্যাদি বাবদ জেলে খরচা ৩০৲, আনুসঙ্গিক খরচা ৫৲ মোট ৫০৲।

তাহা হইলে দেখা গেল খরচা বাদে ১৪০৲ টাকা লাভ হইবে। ইহাতে কম লাভই ধরা হইয়াছে, অনেক স্থলেই ইহা অপেক্ষা বেশী লাভ হয়।

বোয়াল ও সোল উভয়ই পেটুক মাছ ; পুকুরে তাহাদেরও চাষ হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের চাষ রুই মাছের চাষের অপেক্ষা কঠিন। বোয়াল ও সোলের ডিম পাওয়াই দুষ্কর ; আবার যদি পাওয়া যায়, তবে ঐ-সকল মাছ যখন বাড়িতে থাকে, তখন তাহাদিগকে অন্য মাছ খাওয়াইবার আবশ্যক হয়।

জল ছাড়িয়া কই মাছ অনেকক্ষণ বাঁচিতে পারে। এই মাছ যে পুকুরে থাকে সময়ে সময়ে তাহা ছাড়িয়া অতি নিকটবর্ত্তী অন্য পুকুরে যাইয়া থাকে। যে পুকুরে রুই, কাতলা, মৃগেল এবং কালবোস্ মাছ থাকে সেখানে বোয়াল, সোল, কই ও চিতল মাছের ন্যায় মাছ-সকলকে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। এ কথা যেন মনে থাকে। —বরিশালহিতৈষী হইতে উদ্ধৃত ২১শে বৈশাখ, ১৩২১ সালের সুরমা হইতে।

আশা করা যায় যে, যাঁহাদের পুকুর আছে তাঁহারা এই প্রবন্ধে লিখিত প্রণালী অনুসারে রুই ও তদ্রূপ অন্যান্য মাছের চাষ করিবেন। এইরূপে বঙ্গদেশে মাছের সরবরাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। যাঁহারা রুই,

কাতলা প্রভৃতি মাছের চাষে নিযুক্ত বা এরূপ চাষ আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে কলিকাতার রাইটার্স বিলডিংস ভবনে অবস্থিত মৎস্যসংক্রান্ত বিভাগ আনন্দের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ ও সংবাদ প্রদান করেন।

মফঃস্বলের মতামত—

দেশ-সেবা।—দেশ-সেবার কথা লইয়া আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি। প্রকৃত দেশসেবক কোথায়? যাঁহারা স্বার্থ ভুলিয়া দেশের কল্যাণকে বড় করিয়া লইয়াছেন তেমন আত্মত্যাগী সেবকের সংখ্যা যেন দিন দিন কমিয়া যাইতেছে।

ভারত ব্যতীত অন্যান্য দেশে দেশের সেবার জন্য বহু লোক বহু উপায়ে আত্মশক্তির নিয়োগ করিতেছেন। তাঁহাদের সংখ্যা বিপুল। এদেশে কথার বাহুল্যই অধিক, কথার পশ্চাতে মানুষ খুব কমই পাওয়া যাইতেছে।

আমরা কর্ম্মভূমির সৃষ্টি না করিয়া আত্মঘোষণার কোলাহলে দেশ বধির করিয়া তুলি, লোকে মনে করে আমরা কতই গুরুতর কাজ করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু কাজের মধ্যে কেবল সময় ও শক্তির অপচয় হইয়া গেল!

চট্টগ্রামে একবার কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য চট্টগ্রামবাসীর কয়েক সহস্র মুদ্রাও ব্যয় হইয়াছে। আজ যদি চট্টগ্রামের অগ্রণীদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হয় "দেশের মধ্যে সেই কনফারেন্সের ফলে কোন্ শুভ চেষ্টা, কল্যাণ অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে?" কি উত্তর পাইব?

আমাদের কর্ম্ম করিবার ক্ষেত্র এখন কেবল কংগ্রেস কনফারেন্স নহে; আমাদের গৃহ এবং পরিবার অতিশয় শোচনীয় ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে! এক এক গ্রামের মধ্যে যদি একমাস থাকিয়া গ্রাম্য লোকদিগের শতমুখী গতি লক্ষ্য করি, যদি তাহাদের জীবিকা-প্রণালীর শত শত ব্যভিচার পরিদর্শন করি, যদি তাহাদের অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস, কদাচার প্রত্যক্ষ করি, স্পষ্টই বুঝিতে পাইব, দেশের কল্যাণসাধন করা সহরের নৈমিত্তিক রাজনৈতিক উচ্ছ্বাসের দ্বারা কোনও দিন সম্পন্ন হইবে না, হইতেও পারে না। পল্লীগ্রামের মধ্যে যেরূপ অসহায় ভাবে লোকগুলি জীবন যাপন করে, যেরূপ মূর্খতা ও অজ্ঞতা লইয়া তাহার জীবন দিন দিন ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে, তাহার কথা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। একহাত মাটির জন্য ভাই ভাইয়ের গলায় ছুরি বসাইতে কুণ্ঠিত নহে; পানীয় জল, খাদ্য দ্রব্য নিজেরাই কত রূপে কলুষিত করিয়া আবার তাহাতেই শুদ্ধিতত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছে। দুই পয়সা সুদের জন্য একজন আর একজনকে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে; শিক্ষিত ব্যক্তি নিরক্ষর লোকগুলিকে সর্ব্বদা প্রতারণা করিয়া আত্মোদর পুষ্ট করিতে উদগ্র হইয়া রহিয়াছে। এই-সকল দেখিয়া কেবল কংগ্রেস কনফারেন্সের প্রস্তাবের উপর চরম নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় কি না সকলেরই বিবেচ্য।

সাধারণ লোকের মধ্যে যাঁহারা একটু বড় হইতেছিলেন তাঁহারা পল্লীজীবন ত্যাগ করিয়া সহরে আশ্রয় নিতেছেন বটে, কিন্তু পল্লীজীবনের স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখার যে একটা গুরুতর দায়িত্ব তাঁহাদের উপর রহিয়াছে, তাহা কাহারও মনে থাকে না। আমাদের এমনই শোচনীয় অবস্থা!

এই দুর্গতির দিনে আমরা দেশ-সেবক যদি না পাই তবে দেশের আর উপায় নাই। যাঁহারা দেশকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে চাহেন, তাঁহারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লৌকিক আচার ব্যবহারের সংস্কার সাধন করিয়া আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থকে দেশে কল্যাণের মধ্যে বিসর্জ্জন দিতে শিক্ষালাভ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।—(চট্টগ্রাম জ্যোতিঃ, ১৪ই বৈশাখ, ১৩২১।

কনফারেন্সের কথা।—অল্প কয়েক বৎসর হইতে ইষ্টার পর্ব্বোপলক্ষে ছুটীর সময়েই বড় রকমের প্রায় সমস্ত সভা সমিতির অধিবেশন হইতেছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনী, সাহিত্য সম্মিলনী, মোসলেম লিগ, কায়স্থ সম্মিলনী প্রভৃতির বৈঠক ইষ্টার বন্ধের সময়েই হইয়া থাকে। এইরূপ একই সময়ে সকল প্রকারের সমিতির বৈঠক হওয়াতে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। একই ব্যক্তির পক্ষে একাধিক সমিতির আলোচ্য বিষয়ে আগ্রহ ও উৎসাহ থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু কাহারও ভাগ্যে একাধিক সমিতির অধিবেশনে যোগদান করা সম্ভব হয় না, ইহাতে দেশের সকল বড় লোকের একত্রিত হইয়া কোনও বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয় না। ফলে সমিতির শক্তি খর্ব্ব হয় এবং উহার আকর্ষণও অনেক কমিয়া যায়। যাঁহার যে সমিতির দিকে অধিকতর ঝোঁক থাকে তিনি সেই সমিতিতেই যোগদান করেন। ইহার উপরে আবার একই সমিতির চারি পাঁচটী শাখার একই সহরে পৃথক পৃথক বৈঠক হয়। যদি বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমিতির অধিবেশন না হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে অনেক অসুবিধা হইবে। সব দিক রক্ষা হয় এইরূপ ব্যবস্থা করা কি অসম্ভব? দেশে বহুদিন হইতেই নানা প্রকারের কনফারেন্সের বৈঠক হইতেছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল এ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। কনফারেন্সগুলি যে লোকমত গঠনে কিছু সহায়তা করিয়াছে এবং জনসাধারণকে বহুবিধ সমস্যার সহিত কথঞ্চিৎ পরিচিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বৎসরে কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে দুই তিন দিনের জন্য আলোচনা হইলেই যে কার্য্য সিদ্ধি হইবে এইরূপ মনে করা বাতুলতা মাত্র। যাহাতে সমস্ত বৎসর ধরিয়া লোকের মনের উপরে উহার প্রভাব থাকে এবং কনফারেন্সে স্থিরীকৃত বিষয়গুলি কার্য্যে পরিণত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাও সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সমস্ত বৎসর নিজের নিজের ব্যবসা চালাইয়া ও স্বার্থ চিন্তা করিয়া দুই একদিন কনফারেন্সে বক্তৃতা করিলে দেশের কোনও উপকার করা যায় না। যে পর্য্যন্ত আত্মোৎসর্গের ভাব জাগ্রত না হইবে এবং স্বদেশীয় লোকের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা না জন্মিবে সে পর্য্যন্ত দেশের কোন উন্নতি সম্ভব হইবে না।—রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ, ২০শে বৈশাখ, ১৩২১।

কবির স্মৃতিরক্ষা—

গুণের পূজা।—যশোহর জেলায় একটী শুভ অনুষ্ঠানের সূচনা হইতেছে। "সদ্ভাবশতক" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা হাফেজের প্রিয়ভক্ত কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের নিবাস খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাটী, কিন্তু যশোহরই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র। যশোহর জিলাস্কুলে অধ্যাপনা কার্য্যে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠভাগ ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি যশোহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তাই যশোহরবাসী তাঁহার স্মৃতি সংরক্ষণে যত্নবান হইয়াছেন। কবি কৃষ্ণচন্দ্রের নামে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের জন্য শীঘ্রই যশোহরে এক সভার অধিবেশন হইবে।

কৃত্তিবাস-স্মৃতিরক্ষা—কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি, নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে, তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত কার্য্যটী অসম্পন্ন রহিয়াছে। সম্প্রতি নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি মুখার্জ্জি মহোদয় কৃত্তিবাস সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করায়, সমিতি নূতন উদ্যমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৃত্তিবাস সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মহাকবি। ধনীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্র কৃত্তিবাসের রামায়ণ সাদরে পঠিত হইয়া আসিতেছে। কৃত্তিবাসের ন্যায় কবি অন্য সভ্য দেশে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার জন্মভূমি এতদিনে সাহিত্য-তীর্থে পরিণত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু ফুলিয়া গ্রামে কৃত্তিবাসের ভিটায় কবির স্মৃতিরক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই—ইহা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে একান্ত লজ্জার বিষয়।

কৃত্তিবাস-সমিতি প্রত্যেক বাঙ্গালী, প্রত্যেক বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তির নিকট কবি কৃত্তিবাসের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই কার্য্যে অনুমান দশ সহস্র টাকার প্রয়োজন। যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, রাণাঘাটের সবডিভিসন্যাল অফিসারের নামে পাঠাইয়া দিবেন।

ভ্রম-সংশোধন—

গতবারের "দেশের কথার" মধ্যে "সৎকর্ম্মের" উল্লেখকালে বরিশালের জনৈক পতিতা-রমণীর দানের পরিমাণ ২০০০০৲ টাকার স্থলে ১২৫৲ টাকা হইবে। "বরিশালহিতৈষীর" সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে এই সংবাদটি জানাইয়াছেন। আমরা "ত্রিপুরা-হিতৈষী" পত্রিকা হইতে ঐ সংবাদটি সংকলন করিয়াছিলাম। উহাতে দানের পরিমাণ উক্তরূপ উল্লিখিত ছিল। বরিশাল-হিতৈষীতেই দানের সংবাদ ও সঠিক পরিমাণ সর্ব্ব-প্রথম বাহির হয়।

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম।

চিত্রপরিচয়

'বিষয়াসক্ত' নামক চিত্রখানিতে শিল্পী এই ভাবটি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন—বিষয়াসক্ত সিন্ধুক ও টাকার তোড়া লইয়া ঘরের মধ্যে বন্দী অন্ধ; তাহার ঘরের বাহিরে প্রকৃতি-সুন্দরীর বীণায় যে বিচিত্র রাগিণী অনুক্ষণ ধ্বনিত হইতেছে, তাহার দিকে তাহার কান নাই, লক্ষ্য নাই, সে দিকে সে পিঠ ফিরাইয়া আছে; তবু প্রকৃতি-সুন্দরী এই বিমুখ চিত্তটিকে বশ করিবার আশা ছাড়িতে পারেন নাই, দৃষ্টি পালটিয়া ঘন ঘন তাহার দিকে চাহিয়া তাহারই অতি নিকটে বাতায়ন-তলে অপেক্ষা করিতেছেন।

অন্য চিত্রগুলির বিষয় সুস্পষ্ট।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাকবি মধুসূদন

পয়ার পায়ের বেড়ী ভাঙি কবিতার
উড়ালে বিদ্রোহধ্বজা, হে কবি বিদ্রোহী!
কত দুঃখে দহি আর কী লাঞ্ছনা সহি
করিলে হে মুক্তিপন্থা তুমি আবিষ্কার!
সাহিত্য-সাগর-খাতে ভাগীরথী-ধার
দিলে আনি; মৃত্যু যাহা গিয়াছিল দহি,
জীবন জাগালে তাহে; বিমোহিলে মহী;
দেখালে ভাস্বর মূর্ত্তি কুণ্ঠিত ভাষার।
শৃঙ্খলে শৃঙ্খলা বলি মান নাই মনে,
মূঢ় জনে তাই তোমা কহে উচ্ছৃঙ্খল;
প্রবল জীবন-বেগ জাতির জীবনে
মূর্ত্ত তুমি মহাসত্ত্ব! ওগো মহাবল!
দীপ্ত শিখা তুমি সুপ্ত আগ্নেয় পর্ব্বতে,
অরুণ সারথি তুমি আলোকের রথে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পুস্তক-পরিচয়

খোকার গান—

প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ; ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্, কলিকাতা। ১৩২০। মূল্য আট আনা।

এই ৩২ পৃষ্ঠার বহিখানিতে ৩০ খানি ছবি আছে। প্রত্যেকটি নানা রঙে মুদ্রিত। "ভাতের জন্মকথা" ব্যতীত এইরূপে মুদ্রিত বাংলা বহি আর একখানিও দেখি নাই। ছাপা বেশ পরিষ্কার। কাগজ পুরু ও টেকসই। বাঁধাই সুন্দর। মলাটে একটি নানাবর্ণে মুদ্রিত শিশুচিত্র আছে।

ছবি ও কবিতা—

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরিতলেখক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, প্রণীত। শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসের অঙ্কিত চিত্রে শোভিত। প্রত্যেক ভাগের মূল্য আট আনা।

প্রত্যেক ভাগে দশটি করিয়া কবিতা ও দশটি করিয়া ছবি আছে। তদ্ভিন্ন মলাটের উপর একখানি করিয়া সুদৃশ্য তিন রঙে ছাপা ছবি আছে।

যোগীন্দ্রবাবু পদ্যছন্দে যে গল্পগুলি লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি মনোরম ও উপদেশপূর্ণ। "উপদেশপূর্ণ" বলিলেই অনেকে নীরস কিছু একটা বুঝেন। এই কবিতাগুলি তেমন নয়। ইহার প্রত্যেকটি শিশুরা আনন্দের সহিত পড়িবে। আজকাল শিশুদের জন্য লিখিত কবিতা অনেক সময় যেরূপ কবিত্ববর্জ্জিত হয়, যোগীন্দ্রবাবুর কবিতাগুলি সেরূপ নহে। তাঁহার সকল কবিতাতেই কবিত্ব আছে।

শিশুদের জন্য লিখিত আধুনিক অনেক পুস্তক পড়িয়া ছেলে-মেয়েদের "জ্যেঠা" হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। "ছবি ও কবিতা" পাঠে সেরূপ কুফল জন্মিবার কোন সম্ভাবনা নাই। শিশুদের জন্য লিখিত আর এক শ্রেণীর বহিতে কেবল দৈত্যদানা রাক্ষস রাক্ষসী প্রভৃতির অসম্ভব গল্প থাকে। এরূপ গল্প যে একেবারে অনাবশ্যক তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু কেবল মাত্র এইরূপ খোরাকে শিশুর মন সবল ও সুস্থ হইতে পারে না। "ছবি ও কবিতায়" এরূপ গল্প একটিও নাই, অথচ সবগুলিই চিত্তাকর্ষক।

শিশুদের জন্য লিখিত অনেক বহির ছবি, হয় বিলাতী ছবির অবিকল নকল, নয়, বিলাতী ছবির পোষাক বদলাইয়া ধুতি জামা বা সাড়ী পরিহিত। যোগীন্দ্র বাবুর বহি দুখানির ছবি বিশেষ ভাবে বাঙ্গালী চিত্রকরের দ্বারা বাঙ্গালী বালক বালিকাদের জন্য অঙ্কিত। আঁকা ভালই হইয়াছে।

যোগীন্দ্রবাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"বালকবালিকারা সর্ব্বদা যে-সকল ঘটনা দেখিতেছে, যাহার মধ্যে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, আমি তাহাই আমার কবিতার বিষয়রূপে নির্ব্বাচন করিয়াছি। তাহাদিগকে "পরীর রাজ্যে" লইয়া যাওয়া আমার অভিপ্রেত নয়। আমাদের সমাজে যে, বালকের সঙ্গে বালিকা আছে, হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান আছে, ধনীর সঙ্গে দরিদ্র আছে এবং নগরবাসীর সঙ্গে পল্লীবাসী আছে, ইহাও বিস্মৃত হইয়া আমি ছবি ও কবিতা রচনা করা সঙ্গত বোধ করি নাই।" সর্ব্ব-শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে সদ্‌গুণ আছে, তাহা জানিয়া তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হওয়া শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। যোগীন্দ্রবাবুর বহি দুখানি এইরূপ শিক্ষাদানে সাহায্য করিবে। বহি দুটি আত্মীয় স্বজন দাসদাসী পাড়াপ্রতিবেশী ও ইতর প্রাণীর প্রতি কর্ত্তব্য শিক্ষারও উপায় হইবে।

আমাদের অভিজ্ঞতা এইরূপ যে, যে-সকল পুস্তকের সঙ্গে পরীক্ষার বিভীষিকা থাকে, তৎসমুদয় খুব উৎকৃষ্ট ও আনন্দদায়ক হইলেও, পাঠকেরা তাহাতে রস পায় না, এবং সম্ভবতঃ তাহার শিক্ষা ও চরিত্রের মধ্যে বেমালুম মিশিয়া যায় না। এই জন্য "ছবি ও কবিতা"র প্রত্যেক কবিতার পরে "প্রশ্ন" সন্নিবেশ আমরা অনুমোদন করিতে পারিলাম না।

সম্পাদক।

সাধন-সঙ্কেত—

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রণীত। প্রাপ্তিস্থল ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় এবং ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীবঙ্কবিহারী কর। পৃঃ ৭৪; মূল্য ।০ আনা।

প্রথমেই গ্রন্থকারের 'নিবেদন।' তিনি লিখিয়াছেন—'গ্রন্থ লেখার পরিশ্রম সহ্য করিতে পারে শরীরে সে শক্তি নাই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মসাধনার্থীর সেবা করিবার ইচ্ছা প্রাণকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আর উহা নানা চিন্তা ও ভাব মনে উপস্থিত করিতেছে। এজন্য প্রাণের ব্রাহ্মসাধনার্থীর জন্য কয়েকটী চিন্তা সংক্ষেপে সাধন-সঙ্কেতে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম। পূর্ব্বে যাহা সাধকসঙ্গী নামে প্রকাশিত হইয়াছিল এই সঙ্গে তাহাও প্রকাশিত হইল।"

পুস্তিকার প্রথম পৃষ্ঠাতে একটী প্রার্থনা (মহর্ষির)। ইহার পর এই-সমুদয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে—সৃষ্টিতত্ত্ব, শিক্ষক ও গুরু, সাধন, সাধ্য বস্তু, সাধক, নিষ্ঠা, অভ্যাস, বৈরাগ্য, সাধুসঙ্গ, সমসাধকসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, আসন, প্রাণায়াম, তীর্থভ্রমণ, ব্যাকুলতা, নামসাধন, আত্মসমর্পণ, উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনা, ধ্যান, প্রিয়কার্য্য, যোগ, ভক্তি, প্রেম, সেবা, সঞ্চয়, পূর্ণাঙ্গ উপাসনা।

পুস্তকের শেষ ভাগে (পৃঃ ৫৯ হইতে ৭৪) 'ব্রাহ্মসাধকের উক্তি' সংকলিত।

গ্রন্থকার একজন সাধক। যাঁহারা সাধন-জগতে প্রবেশ করিতে চাহেন, তাঁহারা এই পুস্তক পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

প্রহ্লাদ—

শ্রীশশিভূষণ বসু বিরচিত। ৫৪।৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, দাসগুপ্ত কোং হইতে শ্রীগিরিশচন্দ্র (?) দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ১০৩ পৃষ্ঠা। সচিত্র। মূল্য ।৵০ আনা, গার্হস্থ্য সংস্করণ ॥০ আনা, রাজসংস্করণ ৸০ আনা।

হিন্দু পুরাণোক্ত প্রহ্লাদ-চরিত্রের আখ্যানবস্তু অবলম্বনে এই পুস্তক রচিত। পুস্তকের প্রথম চারি পরিচ্ছেদে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্য-কশিপুর স্বতন্ত্র বিবরণী এবং পরবর্ত্তী সাতটী পরিচ্ছেদে মূল আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। আজকাল শিশুসাহিত্যের বাজারে অনেকেই গ্রন্থকার হইয়া দেখা দিতেছেন। তাঁহাদের অধিকাংশেরই গ্রন্থ শিশুপাঠ্যের অনুপযোগী। অথচ, বিজ্ঞাপন বা ছবির জোরে কাহারই গ্রন্থের কাটতি কম নহে। গ্রন্থকারদের পক্ষে ইহা সৌভাগ্যের বিষয় হইলেও, শিশুপাঠ্য-নির্ব্বাচনকারী অভিভাবক-গণের বিচার ও বিবেচনাশক্তি-সম্পর্কে ইহাকে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। আমোদের সঙ্গে শিক্ষাদানই শিশুসাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। যে গ্রন্থকার আমোদ ও শিক্ষার মাত্রা ঠিক রাখিতে পারেন তাঁহারই রচনা সার্থক; কিন্তু যিনি একের প্রতিষ্ঠার তলে অপরের মাত্রার সমতা বিসর্জ্জন দিয়া বসেন তাঁহার রচিত পুস্তককে শিশুসাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা ভুল। আলোচ্য গ্রন্থ-খানিতে গ্রন্থকার প্রহ্লাদ-চরিত্রের শিক্ষাপ্রদ সুন্দর আখ্যায়িকাকে বর্ণনা-নৈপুণ্যে মনোরম করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তিনি নিজেও হয়ত পূর্ব্ব হইতেই একথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই ভূমিকায় ইহাকে "বালক বালিকার" সহিত "সাধারণেরও পাঠোপযোগী" বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু "বালক বালিকা ও সাধারণের পাঠোপযোগী" গ্রন্থের সমগ্রসীভূত লক্ষণেরও অনেক অভাব ইহাতে পরিলক্ষিত হয়। "ক্রিয়া" শব্দটী পুনঃ পুনঃ "ক্রীয়া" রূপে লিখিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত "অনুকূল", "চীৎকার" প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের বানানেও ঐরূপ ভুল রহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থানু-ষঙ্গিক চিত্রগুলি ভাল হয় নাই।

উপমন্যু—

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার প্রণীত। কলিকাতা ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ৵০ আনা।

ইহা একখানি ক্ষুদ্র নাট্যকাব্য। উপমন্যুর গুরুভক্তির কাহিনী ইহার আখ্যানবস্তু। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যের ভাব ও মধুকণ্ঠ চরিত্রটী Sorrows of Satan নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রচনা নিতান্ত সাধারণ ধরণের, গানগুলি ভাবরসহীন।

খাতির-নদারত।

অন্নপূর্ণার মন্দির—

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত ও ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা। ডবল ক্রাউন, ষোল পেজী, ১১৬ পৃষ্ঠা। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ বেশ পরিষ্কার।

এই উপন্যাসখানি পূর্ব্বে ধারাবাহিকরূপে ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাংলা উপন্যাস বলিতে সচরাচর যাহা বুঝি এই উপন্যাসখানি সে শ্রেণীর নহে। ইহাতে "লোমহর্ষণ", "রোমাঞ্চকর" কিছুই নাই; আছে শুধু বাংলাদেশের একখানি সকরুণ পল্লীচিত্র।

দরিদ্র ভট্টাচার্য্য পরিবারের মর্ম্মন্তুদ দারিদ্র্যকাহিনী, অশেষ পাপ প্রলোভনের মধ্যে "সতীর" অপূর্ব্ব সতীত্বতেজ, "বিশ্বেশ্বর" ও "অন্নপূর্ণার" মন্দিরে, ব্যথিত ও নিরাশ্রয়ের দুঃখমোচনের কথা, লেখিকা বেশ প্রাণস্পর্শী ভাবে, সরল ঘরের কথায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেখিবার ও বর্ণনা করিবার শক্তি আজকাল অনেক লেখক ও লেখিকার মধ্যে দেখা যায়; কিন্তু প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, স্ব-অঙ্কিত চরিত্রগুলির সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া খুব অল্প লোকেই লিখিয়া থাকেন। আর সেই জন্যই অনেকের লেখা পাঠকের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। "অন্নপূর্ণার মন্দিরের" লেখিকা এমন আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার সহিত তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন যে সেগুলি অতি সহজেই পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। তাঁহার প্রায় সকল চরিত্রগুলিই বেশ জীবন্ত ও সত্য মানুষ; তাহারা বেশ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করে, কথাবার্ত্তা বলে। এইখানেই লেখিকার কৃতিত্ব।

কিন্তু তবুও বোধ হয় লেখিকা অস্বাভাবিকতার হাত একেবারে এড়াইতে পারেন নাই। প্রথম পরিচ্ছেদে ত্রয়োদশবর্ষীয়া অনূঢ়া বালিকা কমলার কথোপকথন এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে কমলার হইয়া বিশ্বেশ্বরের নিকট সতীর দৌত্যব্যাপারটা যেন কেমন একটু নভেলী ছাঁদের হইয়া পড়িয়াছে। ওটুকু বাদ দিলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হইত না বলিয়াই মনে হয়।

তারপর দু'একটি অনাবশ্যক চরিত্রও যেন উপন্যাসখানিকে অনর্থক ভারাক্রান্ত করিয়াছে; যেমন জ্যাঠাই মা। উপন্যাসের মধ্যে অনাবশ্যক চরিত্র সৃষ্টি মূল ঘটনাটিকে ক্ষুণ্ণ করে।

"অন্নপূর্ণার মন্দিরে" আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে তাহার ভাষাটি। এই অতিরিক্ত পল্লবিত ও উচ্ছ্বসিত ভাষার দিনে লেখিকার সহজ-সুন্দর, অনাড়ম্বর ভাষার ভঙ্গীটি বাস্তবিকই উপভোগ্য। লেখিকা এমন সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত ভাষাবিন্যাস করিয়াছেন যে কোথাও একটি অনর্থক শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই।

আমরা যতদূর জানি তাহাতে "অন্নপূর্ণার মন্দিরই" লেখিকার প্রথম উপন্যাস রচনা। এই প্রথম উদ্যমেই লেখিকা যে আশাতীত সফলতালাভ করিয়াছেন একথা বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে শক্তির পরিচয় "অন্নপূর্ণার মন্দিরে" পাইয়াছি তাহাতে অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে ভবিষ্যতে লেখিকার নিপুণ হস্তের পরিবেষণে বাংলা গল্প-পাঠকের চিত্ত পরিতৃপ্তি লাভ করিবে।

কর্ম্মফল—

'স্বরাজ'সম্পাদক শ্রীকিশোরীমোহন রায় প্রণীত ও রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, কর্ত্তৃক ৭৫।১।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ষোলপেজী, ২১৮ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট 'এণ্টিক' কাগজে 'পাইকা' হরপে পরিষ্কার ছাপা। মূল্য দেড় টাকা।

"কর্ম্মফল" একটি ঐতিহাসিক বৌদ্ধ আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। পুস্তকের প্রারম্ভে গ্রন্থকার বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সারতত্ত্ব "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" সম্বন্ধে তাঁহার যে প্রবন্ধটি সন্নিবেশ করিয়াছেন তাহা কি চিন্তাশীলতায়, কি ভাষামাধুর্য্যে, কি স্বাধীনচিত্ততায়—সকল দিক দিয়াই বিশেষভাবে পঠনীয় ও উপভোগ্য হইয়াছে। আমাদের দেশে যাঁহারা বুদ্ধকে নাস্তিক, জড়বাদী বলিয়া অভিহিত করেন আমরা তাঁহাদিগকে এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। লেখকের অহিংসা তত্ত্বের ব্যাখ্যাটি আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে যে অন্ততঃ তাহার কিয়দংশ প্রবাসী-পাঠকদিগকে উপহার দিবার বড়ই ইচ্ছা ছিল কিন্তু স্থানাভাববশতঃ সে ইচ্ছা সম্বরণ করিতে হইল। যাহা হউক আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণা—যাহা বহুদিন হইতে আমাদের অনেকের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে তাহা- এই প্রবন্ধ পাঠে বহুল পরিমাণে অপসারিত হইবে।

কর্ম্মফল আখ্যায়িকাটিতে জনৈক নবীন বৌদ্ধ শ্রমণের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম্মের অমৃত উপদেশ লাভ করিয়া একটি মুমূর্ষু দস্যুর অনুতাপ-দগ্ধ হৃদয়পরিবর্ত্তনের করুণ কাহিনীটি অতি নিপুণ ভাবে ও ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই কাহিনীটি শুধু দয়া-ধর্ম্মের একদেশদর্শী বর্ণনা নহে—ইহা একই প্রসঙ্গে মানবের ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির আদর্শ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করিতেছে। সে আদর্শ বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজেরও শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। তাহাতে আমরা কর্ম্ম, জ্ঞান এবং দয়ার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সামঞ্জস্য দেখিতে পাই।

পাষাণী—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু, এম্‌-এ প্রণীত। প্রকাশক -গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ডিমাই, ষোল পেজী, ১১৯ পৃষ্ঠা। মূল্য বার আনা।

"পাষাণী" সাতটি ছোট গল্প ও একটি ক্ষুদ্র নাটিকার সমষ্টি। প্রথম গল্পটির নামানুসারে পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে "পাষাণী"; কিন্তু এমন অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত গল্প কখনো পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। "ভিখারী" গল্পটি ছাড়া পাসাণীর সমস্ত গল্পই নিতান্ত ব্যর্থ হইয়াছে। "দস্যুর পুরস্কার" ইংরাজী হইতে অনূদিত এবং আরো দু-একটি গল্প বিদেশী গল্পের আখ্যানবস্তু অবলম্বনে রচিত বলিয়া মনে হয়; অথচ এ ঋণ কোথাও স্বীকৃত হয় নাই।

লেখকের ভাষাটি বেশ মনোজ্ঞ ও কৃত্রিমতা-দোষ-লেশ-শূন্য। ঘটনাবাহুল্য ও লোমহর্ষক ব্যাপারই যে ছোট গল্পের প্রাণ নহে এ কথাটি বুঝিতে পারিলে ভবিষ্যতে গল্পরচনায় লেখক অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

"পাসাণীর" ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই বেশ পরিপাটী।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন—

চতুর্থ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। মালদহ। ১৩১৮ বঙ্গাব্দ। ডবল ক্রাউন, ষোল পেজী, ২০২ পৃষ্ঠা। মূল্যের উল্লেখ নাই।

এই কার্য্যবিবরণীখানি বহুদিন হইতে সমালোচনার্থ প্রাপ্ত নানা পুস্তকের মধ্যে চাপা পড়িয়া ছিল; সম্প্রতি আবার আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

কার্য্যবিবরণীর প্রথম খণ্ডে সম্মিলনের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অভিভাষণ ও সভায় পঠিত প্রবন্ধাবলীর ও গৃহীত প্রস্তাবগুলির তালিকা ইত্যাদি প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রবন্ধগুলি স্থান পাইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অভিভাষণ ও শ্রীযুক্ত আমানত উল্লার "উত্তরবঙ্গের পীরকাহিনী" তৎকালে 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। অন্যান্য প্রবন্ধাদির মধ্যে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সরকার মহাশয়ের সাহিত্যসেবী -এই প্রবন্ধটিও প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল,—

শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের "বৈদিক সাহিত্য', শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের "প্রাচীন ন্যায়", শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের "সংস্কৃতে প্রাকৃত প্রভাব" ও শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের "মালদহের কয়েকটি ঐতিহাসিক পল্লী"—পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচায়ক।

সতীর তেজ—

"অর্থাৎ ধর্ম্মমূলক অপূর্ব্ব স্ত্রীপাঠ্য সচিত্র উপন্যাস। যোগভক্ত শ্রীদেবচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—ডি, এন, গাঙ্গুলী। প্রাপ্তিস্থান—২৬৪।৩ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য ১।০; বিলাতী বাঁধাই ১৸০।" ডিমাই ষোলপেজী, ৩২৬ পৃষ্ঠা। ছাপা কাগজ ভাল নহে।

প্রথমেই যখন লেখক "নিবেদন" করিয়াছেন, "এ ভব-সংসারে এক ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই উচ্ছিষ্ট;—সকলই পুরাতন সুতরাং নূতন দেখাইবার কিছুই নাই" তখন কেনই বা অনর্থক অর্থব্যয় করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিলেন আর কেনই বা সমালোচনার জন্য পুস্তক পাঠাইয়া আমাদের এই কষ্টটা দিলেন?

পুস্তকের ভূমিকাতে দেখিতে পাইতেছি—"লেখক অতিশয় আনন্দে, আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় বাসনার প্রলোভনে আজ সেই পুরাতন-নূতন ও নূতন-পুরাতন মিশ্রিত উপহার লইয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত" করিয়াছেন—* * "অকার উকার মকাররূপ ত্রিপত্র বিল্বপত্র বর্ণত্রয়-সংযোগ-সমুদ্ভূত প্রণবমন্ত্র ওঁকার সতীর তেজ।" কেহ যদি এই অপূর্ব্ব হেঁয়ালির অর্থ নির্ণয় করিয়া দেন তাহা হইলে তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

ভূমিকাতে যেমন পুস্তকের ভিতরেও তেমনি আগাগোড়া অসম্বদ্ধ প্রলাপ। ভাষার অর্থ নাই, বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত নহে। আবার শুধু তাহাই নয়;—সতীত্বের মহিমা কীর্ত্তনচ্ছলে ভদ্রলোকের অপাঠ্য যত কুৎসিত কাহিনী ও কথাবার্ত্তা! পুস্তকের প্রথমে 'বিদ্যা,' 'অবিদ্যা,' 'মায়া,' 'সুপ্তি' 'সুষুপ্তি' প্রভৃতির খুব কতকটা ফলাও ব্যাখ্যা করিবার পর—"পাঠক! আপনারা আমার এই নীরস কাহিনী শুনিতে বড়ই বিরক্ত হইতেছেন; আসুন এইবার একটা আমার স্বচক্ষে দেখা প্রেম-কাহিনী-বিবৃত-করি"—এই বলিয়া লেখক অবলীলাক্রমে রবীন্দ্রনাথের "মধ্যবর্ত্তিনী" গল্পটিকে পাত্র ও পাত্রীর নাম বদলাইয়া বেমালুম চালাইয়া দিয়াছেন। "ধর্ম্মমূলক অপূর্ব্ব স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাসই" বটে! এমন বেমালুম আত্মসাৎ "ধর্ম্মমূলক" ভিন্ন আর কি বলুন?

কমলিনী—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, বি, এল প্রণীত। প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থানের উল্লেখ নাই। মূল্য এক টাকা। ডিমাই ষোলপেজী, ২৮৫ পৃষ্ঠা। ছাপা কাগজ পরিষ্কার।

সমালোচ্য পুস্তকখানি সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসের আখ্যান-বস্তুটি ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে মন্দ জমে নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে চরিত্র বর্ণনা অত্যন্ত উচ্ছ্বাসপূর্ণ হওয়াতে চরিত্রসৃষ্টি বড় ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। চরিত্রগুলির মধ্যে 'মনোরঞ্জন' ও 'রামদাস খুড়োর' চরিত্রটি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফুটিয়াছে; তারপর 'কাব্যতীর্থ' ও 'কমলিনী'। নবকুমারের চরিত্রটি নিতান্ত ক্ষীণ ও বিশেষত্ববর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে; তাহার কোনই ব্যক্তিত্ব নাই। 'মনোরমার' চরিত্র অঙ্কণে লেখক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় না দিলেও ঐ ধরণের চরিত্র সচরাচর যেরূপ ভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট করিয়া ফেলেন নাই। রমণীমোহনের চরিত্রে সহসা এত পরিবর্ত্তন একটু অস্বাভাবিক হইয়াছে। নারায়ণী, রেবতী ইত্যাদি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক চরিত্রসৃষ্টি।

লেখকের ভাষা মন্দ নহে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিষয়-বহির্ভূত অনাবশ্যক টিপ্পনী কাটিয়া অসহ্য করিয়া তুলিয়াছেন। পাত্র-পাত্রী-দিগের কথোপকথনও স্থলে স্থলে অতিরিক্ত হইয়া পল্লবিত বক্তৃতার আকার ধারণ করাতে বড়ই বিরক্তি বোধ হয়; দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৩২ ও ১৩৩ পৃষ্ঠায় রমণীমোহনের কথাবার্ত্তার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আজকালকার অপাঠ্য 'নভেলের' দিনে ষোটের উপর উপন্যাস-খানি চলনসই হইয়াছে।

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল [৺ঘনরাম চক্রবর্ত্তী-কবিরত্ন প্রণীত 'শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গল' কাব্যের উপাখ্যানাংশ]—শ্রীচন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। শিলচর এরিয়েন-ট্রেডিং এণ্ড ইন্সিওরেন্স কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত। শিলচর এরিয়েন-প্রেসে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ২০৪+।৵০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থে শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের উপাখ্যানাংশ কবির ভাষা পদ্য ও গ্রন্থ-কারের ভাষা গদ্যের সংমিশ্রণে বিবৃত হইয়াছে এবং কাব্যাংশের অপ্রচলিত বা প্রাদেশিক শব্দের অর্থ যথাস্থলে পৃষ্ঠার নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের রচনা-মাধুর্য্যের সহিত প্রবীণ সাহিত্যি-কের লিপি-নৈপুণ্য সম্মিলিত হইয়া গ্রন্থখানিকে সুখপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহা পাঠে প্রাচীন সাহিত্য সম্ভোগের সঙ্গে উপন্যাস-রসাস্বাদনের সুযোগ পাওয়া যায়। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের কবির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় ভূমিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ পরিচয়প্রসঙ্গটী আরো একটু বিশদ এবং গ্রন্থভাগের পদ্যাংশ কিছু কিছু হ্রাস করিলে গ্রন্থখানি আরো উপাদেয় হইত।

কায়স্থ-সংহিতা—শ্রীযুক্ত কালীকিশোর রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত, সঙ্কলিত, সমালোচিত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, দাস-যন্ত্রে শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৭৩ পৃষ্ঠা। গ্রন্থকারের হাফটোন চিত্রসম্বলিত। মূল্য ৷৷০ আনা।

ভূমিকায় প্রকাশ—"মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, হারীত, বিষ্ণু, উশনা, পরাশর প্রভৃতি সংহিতাদির বচন-প্রমাণের দ্বারাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের কলেবর গঠিত সুতরাং ইহার 'কায়স্থ-সংহিতা' নাম।" এই সংহিতায় নানাবিধ বচন-প্রমাণাদি দ্বারা গ্রন্থকার বুঝাইতে চাহিয়াছেন—"কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, শূদ্রবর্ণ নহেন এবং তাঁহারা উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কারসম্পন্ন ও ত্রিপাদ গায়ত্রীর অধিকারী।" ইহা প্রামাণিক গ্রন্থরূপে ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থদের নিকট আদৃত হইতে পারে; কিন্তু আজকাল এইরূপ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টায় ফল কি?

মা ও ছেলে—শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র আধ্যাত্মিক রহস্য (২)—শ্রীমতী মহামায়া দেবী। ৮৮নং পুলিশ হস্‌পিটাল রোড হইতে "পাগল অতুলকৃষ্ণ, এফ সি" দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য 'হৃদয়' মাত্র। "দুষ্টু ছেলে" ও "লক্ষ্মী মেয়ে"র দুইখানি চিত্রসম্বলিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ১০৮ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থকার ইতিপূর্ব্বে একখানি পুস্তক লিখিয়া "মহাজ্ঞানী"দের নিকট হইতে "পাগল আখ্যা" পাইয়াছিলেন। তদবধি তিনি "মানবের অন্তর্দৃষ্টি" সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সন্দিহান হইয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে তাই ভূমিকা গাহিয়াছেন—"মানব অন্তর্দৃষ্টির অভাবে প্রকৃত ভিতরের রহস্য না জানিয়া নিজের সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ

জ্ঞানানুযায়ী বুঝিয়া কত যে অন্যায় ও অবিচার করে তাহা হইতে ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া সকল বিষয়ে আদর্শ হইবার জন্য, নিরপেক্ষ উদার ধর্ম্মমতাবলম্বী হইবার জন্য অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা উপস্থিত ধর্ম্ম-সমাজে যে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা দেখানই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।" কিন্তু এই উদ্দেশ্য সফল করিবার পক্ষে আশান্বিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার স্পষ্টতঃ ইহাও বলিয়া রাখিয়াছেন, "যে আত্মীয় স্বজনেরা আমার প্রাণ, যাহাদের সঙ্গে আমার কখনও কোনও বিষয়ে শত্রুতা ছিল না, তাঁহারা ইহার কিছুমাত্র না বুঝিয়া বা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া আমাকে পুলিশে অথবা পাগলা গারদে দিবার ব্যবস্থা করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন।" গ্রন্থকারের আশঙ্কা অমূলক নহে। তাঁহার অদ্ভুত পাগলামীর কথা ছাড়িয়া দিলেও, তিনি সম্প্রদায় বিশেষের কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সম্বন্ধে যেরূপ অশ্লীল ও ঈর্ষ্যামূলক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্যও তাঁহার প্রতি তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থার বিধান হওয়া আবশ্যক।

বাঙ্গালীর কথা—প্রকাশক শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৬৬ পৃষ্ঠা। মূল্য অনুল্লিখিত।

পুস্তকের নামের নীচেই প্রকাশ—ইহা একখানি "একাঙ্ক নাটিকা।" সুতরাং পাত্রপাত্রী, কবিতা গান প্রভৃতি নাটিকার আনুষঙ্গিক কোন জিনিসেরই ইহাতে অভাব নাই, না বলিয়া দিলেও তাহা হয়ত কাহারও পক্ষে বুঝিবার বাধা হইত না। ঈশ্বরচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি স্বর্গগত মহাপুরুষগণের ব্রহ্মার মারফতে শ্রীকৃষ্ণের সকাশে ডেপুটেশন, মদন রতির "দ্বৈত" "গীত", ফুলমালা হস্তে বঙ্গবালাগণের "শাঁক" বাজানো "উলু" দেওয়া প্রভৃতি হরেক রকম ব্যাপারের পরিচয়ই ইহাতে পাওয়া যায়। এই-সকল বৈচিত্র্যের অন্তরালে নাট্যকার বলিতে চাহিয়াছেন—

"পুনঃ জ্ঞানধর্ম্মবলে
জাগিবে বাঙ্গালী।..............
....
আবার জাগিবে বঙ্গ বিমল পুলকে।"

নাটিকার রচনায় তেমন কোন গুণের পরিচয় পাওয়া যাক্ কি না যাক্, ইহাতে রচয়িতার রস-প্রগল্‌ভতার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। পাত্রপাত্রীর কথার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকারের ফুটনোট এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে "বাঙ্গালীর কথা"য়ই সর্ব্বপ্রথম পরিলক্ষিত হইতেছে। এই ফুটনোটে নাট্যকার যে রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাই আমাদের মতে তাঁহার রস-প্রগল্‌ভতা। নাটিকাখানির আগাগোড়া বহুসংখ্যক বর্ণাশুদ্ধিতে পূর্ণ। নাট্যকার ইহাকে Printer's Devilই বলেন, আর কুন্তলীন প্রেস ইহাকে গ্রন্থকারের প্রমাদ বলিয়াই বুঝাইতে চান, আমরা মোটেই মানিতে রাজী নহি যে ইহা কোনো একপক্ষের অজ্ঞতাসম্ভাত নহে; কারণ, ঐরূপ বর্ণাশুদ্ধির মধ্যেও সর্ব্বত্র একটা সামঞ্জস্য রহিয়া গিয়াছে!

আধুনিক সভ্যতা—শ্রীশিবেন্দ্রকিশোর রায় প্রণীত। লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ১১৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ॥০ আনা।

বিবিধ সম্প্রদায়ের সামাজিক ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও আদবকায়দা সম্বন্ধীয় কতকগুলি স্থূল তথ্যের পরিচয় প্রদান করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সাধু এবং তৎসাধন সম্পর্কে গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা ও পর্য্যবেক্ষণ প্রশংসনীয়। গ্রন্থের ভাষার প্রাঞ্জলতা সর্ব্বত্র রক্ষা করিয়া বিষয় সন্নিবেশের পারম্পর্য্য আর একটু নৈপুণ্যের সহিত ধার্য্য হইলে রচনা অধিকতর সুষ্ঠু হইত।

খাতির-নদারত।

বিবাহ ও তাহার আদর্শ—শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত বি. এ., প্রণীত। পৃঃ ১৫৮; মূল্য ॥০ আনা (ঢাকা এলবার্ট লাইব্রেরির প্রোপ্রাইটার বি, সি, বসাক কর্তৃক প্রকাশিত)।

গ্রন্থ দুই অংশে বিভক্ত। পূর্ব্বার্দ্ধে ৯টী অধ্যায়। এই অংশে গ্রন্থকার যম, সম্বর্ত্ত, পরাশর, অঙ্গিরা, ব্যাস, শঙ্খ, লঘুশাতাতপ, নারদ, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, বসিষ্ঠ, বোধায়ন, মনুস্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্রবচন এবং রঘুনন্দনের মতামত আলোচনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয়াংশেরও ৯টী অধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কয়েকটী বৈদিক মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় 'বিবাহ অনুষ্ঠান।' এ অধ্যায়েও শ্রুতি হইতে বিবাহ-বিষয়ক মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় -- 'বিবাহের দুইটী মন্ত্র'। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম "চতুর্থী হোমাদি।" সপ্তম অধ্যায়ে আপস্তম্ব গৃহ্যের মত আলোচিত হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়—'কন্যা-লক্ষণ।' পুরাণাদি গ্রন্থে এবিষয়ে কি প্রকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, নবম অধ্যায়ে তাহাই আলোচিত হইয়াছে।

উপসংহারে গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"বেদে বাল্যবিবাহ-সমর্থক কোনও বিধির স্পষ্টতঃ উল্লেখ নাই, পরন্তু বৈদিক মন্ত্রাদিতে দৃষ্টরজস্কার বিবাহই সমর্থিত হইয়াছে। যদ্দারা বয়স্থা, দৃঢ়রজস্কার বিবাহই সমর্থিত হইয়া থাকে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বৈদিক মন্ত্রাদির আলোচনায় তাহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। মন্ত্রে সকল স্থলে বিবাহার্থিণী কন্যাকে 'যুবতী' 'রাগ-প্রাপ্তা' 'সকামা' 'গর্ভধারণার্থিণী' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। স্মৃতির মধ্যেও অনেক স্মৃতিকার এই ভাব সমর্থন করেন। যে-সকল স্মৃতির মধ্যে প্রতিকূল বচন দেখা যায়, তাহাদের অসারতাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

"হিন্দু-সমাজ বাল্যবিবাহ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আজ ভারতে এক বৎসর বয়সের বিধবা ১০৬৪, বিপত্নীক ৩২৬ জন; ২ বৎসর বয়সের বিধবা ১২৬৪ ও বিপত্নীক ৪৪৬ জন; ৩ বৎসর বয়সের বিধবা ২২৭১ ও বিপত্নীক ৭৯৭ জন; ৪ বৎসর বয়সের বিধবা ৪৫১৩ ও বিপত্নীক ১৬৫৬ জন; ৫ বৎসর বয়সের বিধবা ১০৪২২ ও বিপত্নীক ২৭৬১ জন; এবং ৫ হইতে ১০ বৎসরের বিধবা ৯৫৭৯৮ ও বিপত্নীক ৩৬৯৬৩ জন; স্থূলতঃ বলিতে গেলে দেখা যায় যে, ৫ বৎসরের ন্যূন-বয়স্ক বিধবা ও বিপত্নীকের সংখ্যা ২৫৪৫৩ জন এবং ৫ হইতে ২০ বৎসর বয়সের বিধবা ও বিপত্নীক ১২ লক্ষ ৫০ হাজার ৬৭৬ জন।

"আমাদিগকে যদি উঠিতে হয় তবে হিন্দুর যাহা প্রধান সংস্কার সর্ব্বাগ্রে তাহার শোধন করাই একান্ত প্রয়োজন। তাহাকে পবিত্রতর কল্যাণতর করিয়া না তুলিতে পারিলে আমাদের আর উপায় নাই। বিবাহের বয়সের সীমা বাড়াইয়া দেওয়া যেরূপ প্রয়োজন, তেমনি সন্তানদিগের অকালবুদ্ধিকে খর্ব্ব করিবার, ভোগ-তৃষ্ণার ভ্রূণভাবগুলির অকাল বোধনের পথ নিরুদ্ধ করিয়া দিবার উপায় করাও আবশ্যক। এমন একটী শাস্ত্রবচন পাওয়া যায় না যদ্দারা ঊনচতুর্ব্বিংশ বয়স্ক যুবকের বিবাহ সমর্থন করা যায়। অথচ হিন্দু সমাজের মধ্যেই ২৪ বৎসরের মধ্যেই বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা সওয়া তিন কোটীরও অধিক। এই যে সওয়া তিন কোটী যুবক

অকাল ভোগসুখের দুর্ভর বন্ধনে জড়িত ও শৃঙ্খলিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ভারতের কি ভবিষ্যৎ দিন দিন অন্ধকারময় হইয়া উঠিতেছে না। শিশুকালে বিবাহ এবং তাহার আনুসঙ্গিক দুর্ভর ভারে উত্তরোত্তর জড়িত হইয়া আমাদের যুবকেরা মাথা তুলিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

"যদি সমস্ত দেশের মধ্যে স্বাস্থ্য আনিতে হয়, যদি শিশুকাল হইতেই জীবনকে দুর্গত ও দুর্ভর করিবার পথ বর্জ্জন করিতে হয়, তবে যে অবৈধ অনাচার ও অধর্ম্ম, ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া আমাদের মধ্যে চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে, তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। সকল প্রাণীরই মুখ্য যৌনসংস্কার বিবাহ; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। যৌবনে স্ত্রী পুরুষের দেহ এবং ওজবীর্য্যাদি পরিপক্বতা লাভ করে; তৎপূর্ব্বে বিবাহে ভোগের ভাবগুলি অকালে পরিপক্বতার দিকে অগ্রসর করাইয়া দেওয়া হয় মাত্র। শুধু তাহা নহে। আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূলে জীবন চালিত করিয়া অকাল মৃত্যুর পথ সুগম করিয়া থাকি মাত্র। শুধু আমাদের নহে, ক্ষীণজীবী সন্তানদিগেরও স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ দিন দিন অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। ৪০-৪৫ বৎসরের হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ, আর ৪৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের লোকসংখ্যা ৭৫ লক্ষ মাত্র। কেন এমন হইতেছে? দাম্পত্য জীবনের অকাল বোধনই এক পক্ষে ইহার মুখ্য কারণ; পক্ষান্তরে আমাদিগের বালিকাগণের মধ্যেও সংযমের, ব্রহ্মচর্য্যের কোনও অনুষ্ঠান নাই; বাল্য কাল হইতে নৈতিক ও ধর্ম্মজীবন গঠিত করিবারও কোনও সুনির্দ্দিষ্ট বিধান দেখা যায় না।

"যাহাতে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে কোন যুবকের বিবাহ না হয় এবং ১৫ কি ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে কোনও কুমারীর বিবাহ হইতে না পারে, যাহাতে শিক্ষার দ্বারা, সংযমের দ্বারা, নানা কল্যাণ অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাদের পুত্র-কন্যাগণ যথাক্রমে ২৫ এবং ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত অক্ষত অখণ্ড-হৃদয় হইয়া থাকিতে পারে, তদ্বিষয়ে এখন হইতেই আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন, অন্যথা আমরা উৎসন্ন যাইব সন্দেহ নাই। "বসুন্ধরা বীরভোগ্যা।" যতদিন আমরা নিষ্ঠার দ্বারা, আচারের পবিত্রতা রক্ষার দ্বারা, বাক্য, মন ও অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্যের দ্বারা, সমর্থ ও সুস্থ হইয়া উঠিতে না পারি, ততদিন বাস্তব উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যদি আমাদিগকে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইতে হয়, যদি প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন দ্বারা সমাজের প্রাণবেদী সুগঠিত ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে হয়, তবে আমাদের সমাজের মর্ম্মে মর্ম্মে শিরায় উপশিরায় বহুদিনের ঔদাসীন্যে ও কদর্থনায় যে-সকল গ্রন্থি পড়িয়াছে—তাহাই সর্ব্বাদৌ ছিন্ন করিতে হইবে। যে-সকল সংস্কার কেবল অন্ধ আচারে পরিণত হইয়াছে, তাহাদিগকে বর্ত্তমানের রৌদ্রবৃষ্টি দ্বারা সুনির্ম্মল করিয়া, সজীব-জাগ্রত করিয়া আমাদের জীবনের প্রত্যেক পর্য্যায়ের মধ্যে ভাবের নূতন উৎসাহ, প্রাণবলের নবীন গতি, সমাজ-হৃদয়ের নিত্য-নব রস সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে। আমাদের ভিতরের মলিনতা কাটিয়া গেলে, আমাদের গৃহ-ভূমি, চত্বর, অঙ্গনাদি পরিষ্কৃত হইলে শ্রেয়ের অখণ্ড মহিমা আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিভাত হইবে।"

এই গ্রন্থ গ্রন্থকারের শাস্ত্রজ্ঞান এবং বিচারশক্তির পরিচয় দিতেছে। শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়াই গঙ্গাচরণ বাবু এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং তিনি যাহা প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রসঙ্গত।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

নারীর জীবন

নারীর জীবনে নাই প্রয়োজন
স্বাধীনতা, হেন সুখের কথা
বলেছিল সে গো কোন্ মহাজন?
বুঝেছিল সে কি নারীর ব্যথা?
জেনেছিল সে কি নারীর জীবনে
মরেছে গুমরি বেদনা কত;
কত দিবসের কত কল্যাণ
দিনে দিনে সেথা হয়েছে হত?
হেরেছে কি সে গো নারীর ললাট
কুঞ্চিত কত করেছে কালে;
কত জনমের বঞ্চনা-রেখা
সঞ্চিত তার হয়েছে ভালে?
বিধাতার বল, নাহি যাহে ছল,
নাহি যাহে হেলা কাহার তরে,
যার মহা দান সবারে-সমান,
কহে নারী আজি তাহারি ভরে—
নারী কি মায়ার ছলনা-মূর্ত্তি?
নারী কি কেবলি নরের ভোগ্যা?
নহে কি জননী, নহে কি ভগিনী,
নহে কি বিশ্বহিতের যোগ্যা?
নারীর জীবনে নাই কি সাধনা?
পশে না কি সেথা জ্ঞানের রশ্মি?
জানে না কি নারী জ্ঞানের আলোকে
ফেলিতে আপন কামনা ভস্মি?
নারী কি তাহার বাসনা-বিকার
জানে না ঊর্দ্ধে করিতে লয়?
সে কি গো জানে না আপন চেতনা
করিতে ব্যাপ্ত বিশ্বময়?
নারীর জীবনে প্রেমের বসতি,
এ কথা জানে না আছে কি কেহ?
ক্ষণকাল ধরা পারে না রহিতে
না থাকিলে হেথা নারীর স্নেহ।
নারীর হৃদয়ে প্রেমের জনম;
সেথা আসি, প্রেম, প্রকাশ তুমি!
প্রেম কহে, আমি ফুটিতে পারি না
না পেলে মুক্ত স্বাধীন ভূমি।

শ্রীহেমলতা দেবী

আহিরিণ গোয়ালিনা মাঝে কোন ভাব

সবারে নিছিয়া দেই চরণে তোমার ॥

[illegible]

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩২১

৪র্থ সংখ্যা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশুরাজ। সিংহকে আমাদের দেশে ও বিলাতে এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য অনেক দেশেও পশুদের রাজা বলা হয়। কেন বলা হয়, বুঝিতে গেলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে। সিংহ অন্য সকল পশুর চেয়ে বলবান্ নহে; হাতীর বল বেশী। সে অন্য সকল পশুর চেয়ে দ্রুতগামীও নহে। অনেক হরিণ তার চেয়ে দ্রুত দৌড়িতে পারে। তার চেয়ে সুন্দর পশু বা বুদ্ধিমান্ পশু আর নাই, এমন কথাও বলা যায় না। সে যে আর সকলের চেয়ে সাহসী তাহাও নয়। বাঘ কম সাহসী নহে। পশুদের বা মানুষের সকলের চেয়ে বেশী উপকার সিংহ করে, তাহাও নয়। পশুদের উপকার সকলের চেয়ে কোন্ জন্তু করে জানি না; কিন্তু মানুষের উপকার করে সকলের চেয়ে বেশী উট, ঘোড়া, গোরু, প্রভৃতি পশু। তবে কোন্ গুণে সিংহ পশুরাজ হইলেন? তাহা বুঝিতে হইলে পুরাকালে রাজাদের প্রকৃতি সাধারণতঃ কিরূপ ছিল, তাহার আলোচনা করিতে হয়।

পুরাকালে মানুষের রাজা। সেকালে এইরূপ ধারণা ছিল যে যে রাজা লোককে যত ভীত করিতে পারে, যুদ্ধে যত মানুষ খুন করিতে পারে, যে যে পরিমাণে দিগ্বিজয়ী, সে তত বড় রাজা। পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে আমাদের উক্তির অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইবে। অতএব সিংহকে পশুদের রাজা এইজন্য সম্ভবতঃ বলা হইয়াছে যে তাহার চেহারাটা বেশ জমকাল, ডাকহাঁকও বেশ আছে, এবং সর্ব্বোপরি তাহার অন্যান্য প্রাণীর প্রাণবধ করিবার খুব ইচ্ছা ও শক্তি আছে।

মানুষের রাজাদের মধ্যে বড় রাজা সে, যাহার হত্যা করিবার ক্ষমতা বেশী, যে হত্যা করিয়াছে বেশী, এবং পরদেশ জয় যে বেশী করিয়াছে, সে-কালের এই ধারণা ক্রমে ক্রমে দূর হইতেছে। এই ধারণা যে দূর হইবে তাহার পূর্ব্বাভাস শত শত বৎসর পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছিল। যখন দিগ্বিজয়ী নরহন্তা চণ্ডাশোক প্রিয়দর্শী ধর্ম্মাশোক হইয়া সাম্রাজ্যময় অহিংসা ও শান্তির বাণী প্রচার করিলেন, তখন মানুষ বুঝিল, তরবারি দ্বারা যে জয় করে তাহা অপেক্ষা বড় রাজা সে, যে সেবা দ্বারা জয় করে।

আধুনিক যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাট্ সপ্তম এডোআর্ড শান্তিরক্ষক বলিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। জার্ম্মেনীর বর্ত্তমান সম্রাটেরও এই যশ আছে।

সেকালের সম্ভ্রান্ত ব্যবসা। বাস্তবিক সে-কালে রাজারাই যে হত্যা ও লুটপাট করিয়া বিখ্যাত হইত, তাহা নয়। সে-কালে এখনকার চেয়ে মানুষের প্রকৃতি হিংস্র পশুর প্রকৃতির আরও কাছাকাছি ছিল। সে-কালে দস্যুতা, খুন ও লুটপাট সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত কাজ ছিল। যেমন এক-একটা দেশ, এক-একটা সাম্রাজ্য সুশাসিত হইতে লাগিল, অমনই দস্যুতা গর্হিত কাজ বলিয়া রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে লাগিল। দস্যুতা যে অধর্ম্ম ও আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ, এই

জ্ঞান সভ্য মানবসমাজে বদ্ধমূল হওয়ায় একএকটি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, মানুষের সুখ সমৃদ্ধি বাড়িতেছে। একই দেশের কতকগুলি অধিবাসী অন্য কতকগুলি অধিবাসীর সম্পত্তি কাড়িয়া লইলে ও তাহাদের প্রাণবধ করিলে, যদিও তাহা অপরাধ বলিয়া লোকে বুঝিয়াছে; কিন্তু এক দেশ বা এক জাতি কর্তৃক অন্য দেশ ও জাতিকে আক্রমণ এখনও ঠিক্ তেমনি গর্হিত বলিয়া প্রবল জাতিরা মনে করে না। কিন্তু এদিকেও আশার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। হেগ্ সহরে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে শান্তিরক্ষার জন্য পরামর্শসমিতির প্রথম বৈঠক হয়। ইহার উদ্দেশ্য এখন সালিসী দ্বারা কেবল "সভ্য" জাতিদের মধ্যে যুদ্ধ নিবারণ। "অসভ্য"রা এখনও কতকটা "সভ্য"দের শিকারের জন্তুর মতই আছে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে "সভ্য" জাতিরা যখন বুঝিবে যে নিজেদের মধ্যে রাজ্যবৃদ্ধি, সম্পত্তিবৃদ্ধি বা সম্মানবৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ বড় রকমের দস্যুতা ভিন্ন আর কিছুই নয়, তখন ক্রমে ক্রমে "অসভ্য" জাতিরাও এই ধর্ম্মসঙ্গত ধারণার উপকার ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে না।

ইহার অর্থ এ নয় যে সমস্ত পৃথিবীর সকলদেশের আদিম অধিবাসীদিগকে নিজ নিজ দেশের মালিক করিয়া দেওয়া হইবে। কারণ, তাহাতে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লব উপস্থিত হইবে। আমেরিকার সমুদয় শ্বেতকায় ও নিগ্রোদিগকে কে তথা হইতে তাড়াইয়া দিবে? বিলাতের নর্ম্ম্যান ও এংলোসাক্সনদের বংশধরদিগকে তাড়াইয়া দিয়া কে কেল্ট্ ও পিক্টদিগের বংশধরদিগকে রাজা করিবে? অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীদিগকে কে খুঁজিয়া পাইবে? আমরা যে দেশে যে জাতিকে আদিম নিবাসী বলিয়া জানি, তাহারাও প্রাচীনতম অধিবাসী নহে। ভারতবর্ষে যাঁহাদিগকে আর্য্যজাতির বংশধর মনে করা হয়, তাঁহাদের পূর্ব্বে সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতিরা ছিল। আবার তাহাদেরও আগে নবপ্রস্তরযুগের এবং তারও পূর্ব্বে প্রাচীন প্রস্তরযুগের লোকেরা ছিল।

পৃথিবীব্যাপী শান্তির আদর্শ এই যে আর নূতন করিয়া যুদ্ধ ও দেশজয় হইবে না। সেই আদর্শ অনুসারে বিনাযুদ্ধে প্রত্যেক দেশের লোকেরা নিজ নিজ দেশের রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহের সম্পূর্ণ অধিকার লাভের চেষ্টা করিবে, এবং সে চেষ্টা সফল হইবে।

আদর্শ গ্রাম। বাঙ্গলাদেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। হাজারের মধ্যে কেবল ৬৪ জন সহরে বাস করে; বাকী ৯৩৬ জন গ্রামের অধিবাসী। সুতরাং দেশের ও দেশবাসীর উন্নতির মানেই যে গ্রামের ও গ্রামবাসীর উন্নতি, ইহা সহজেই বুঝা যায়; এবং একথা অনেকেই অনেকবার বলিয়াছেন। এখন অন্ততঃ একটি গ্রামকেও কেহ যদি আদর্শ গ্রামে পরিণত করিতে পারেন, কিম্বা কেহ যদি নূতন একটি আদর্শ গ্রাম স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে, গ্রামের উন্নতির একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা সকলেই উৎসাহিত হইতে পারি। নতুবা এখন কেবল কল্পনা, অনুমান এবং প্রস্তাবই চলিতেছে।

ইংলণ্ডের অবস্থা বাঙ্গলাদেশ হইতে স্বতন্ত্র; তথাকার শতকরা ৭৭ জন সহরে ও ২৩ জন গ্রামে বাস করে। তথাচ সেখানে গ্রাম ও নগরের উন্নতির জন্য যে-সকল চেষ্টা হইতেছে, তাহা হইতে আমাদের অনেক শিখিবার আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তথায় উদ্যানপুরী (Garden City) স্থাপনের যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। উদ্যোক্তারা কেবল প্রবন্ধ লিখিয়া ও প্রস্তাব করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। লণ্ডন হইতে ৩৪ মাইল দূরে লেচ্ওআর্থ নামক স্থানে প্রথম উদ্যানপুরী স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে ৩০,০০০ লোকের স্থান হইবে। এখন অধিবাসীর সংখ্যা ৫,০০০। মধ্যে, সহরে, ৩৬০০ বিঘা জমীতে, অনেকগুলি উদ্যানপরিবৃত আদর্শ কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে; বাহিরে সহরের চারিদিকে, ৭৮০০ বিঘা জমীতে চাষবাস হয়। এইরূপ উদ্যানপুরীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত আমাদের জানা উচিত।

বাঙ্গলাদেশের গ্রামসকলের উন্নতির জন্য নানাবিধ প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে। বিশুদ্ধ পানীয়জলের ব্যবস্থা; মানুষের স্নানের জন্য জলাশয়ের ব্যবস্থা এবং তাহাতে স্ত্রীলোক ও পুরুষদের জন্য স্বতন্ত্র ঘাট; গবাদি পশুর জন্য স্বতন্ত্র জলাশয়; বৃষ্টির জল এবং মনুষ্যের
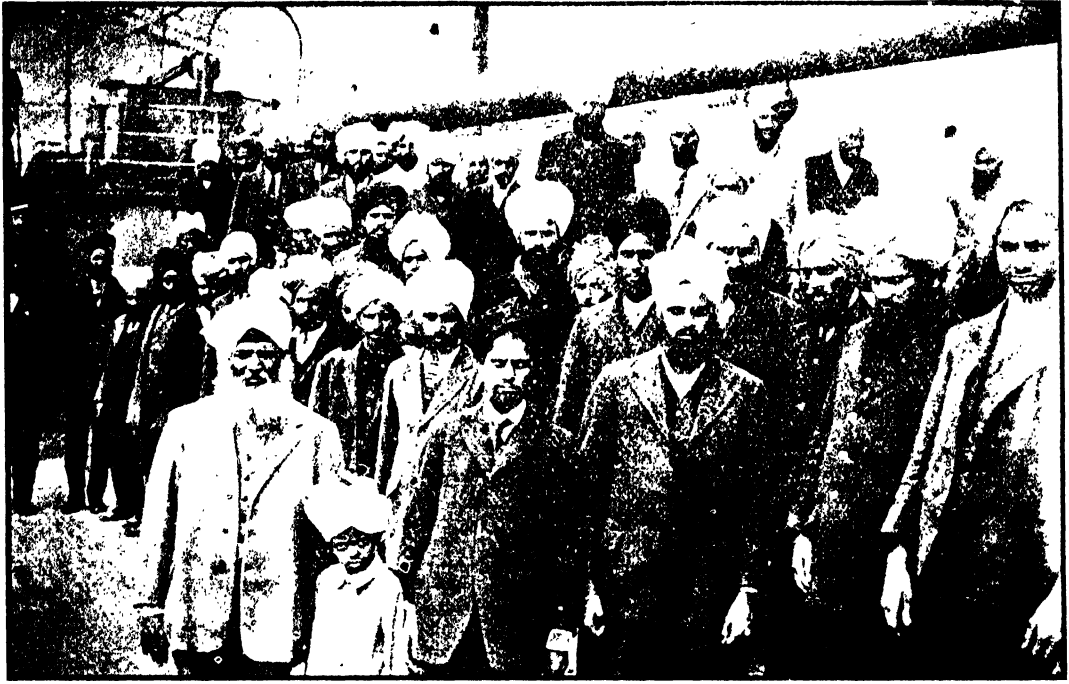
কোমাগাতা মারু জাহাজে ভাই গুরুদিৎ সিংহ ও কানাডায় তাঁহার সহযাত্রী হিন্দুগণ।

ব্যবহৃত ময়লা জল নিঃসারণের জন্য ভাল নর্দ্দমা; নানাপ্রকারের আবর্জ্জনা ও ময়লা গ্রামের বাহিরে মাঠে ফেলিবার ব্যবস্থা; ময়লাজলপূর্ণ অনিষ্টকর খানা ডোবা বুজাইবার বন্দোবস্ত; আগাছার জঙ্গল মধ্যে মধ্যে কাটিয়া ফেলিয়া গ্রামে বায়ু চলাচলের ও গ্রামকে শুষ্ক রাখিবার বন্দোবস্ত; গ্রামে চলাফিরার জন্য ভাল রাস্তা; গ্রামের সমুদয় বালকবালিকার শিক্ষার জন্য শিক্ষালয়, নিঃস্ব ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতাল; ঔষধালয়; একটি পাঠাগার ও লাইব্রেরী; খেলা ও ব্যায়ামের জায়গা; গোচারণের মাঠ; চাষের জন্য উৎকৃষ্ট বীজ যোগাইবার বন্দোবস্ত; মুদির দোকান, কাপড়ের দোকান, বহি ও কাগজ কলম আদির দোকান, কিম্বা সকল প্রকার জিনিসের একটিমাত্র সম্মিলিত দোকান, গ্রাম নিতান্ত ক্ষুদ্র না হইলে একটি ডাকঘর; গ্রামবাসীদের সমবেত-ঋণদান-সমিতি; কথকতা, যাত্রা, বক্তৃতাদির স্থান; গ্রামের এক বা একাধিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দেবমন্দির বা ভজনালয়; ইত্যাদি।

সহরের নক্সা আঁকিয়া সহরনির্ম্মাণ (town planning) পূর্ত্তবিদ্যার (engineeringএর) একটি প্রধান অঙ্গ। যাঁহারা আদর্শগ্রামের জন্য সচেষ্ট হইবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এঞ্জিনীয়ারদিগের সাহায্যে এই অঙ্গের জ্ঞান অর্জ্জন করিবেন।

"কোমাগাতা মারু।" কোমাগাতা মারু জাহাজে করিয়া ভাই গুরুদিৎ সিং যে ৩৭৫ জন ভারতবাসীকে লইয়া কানাডা গিয়াছিলেন, তাহারা জাহাজ হইতে নামিয়া কানাডায় প্রবেশ করিতে পারিবে না, তথাকার উচ্চ আদালত এই রায় দিয়াছেন। সুতরাং তাহাদিগকে এখন ফিরিয়া আসিতে হইবে। এই কার্য্যে দুইলক্ষ দশ হাজার টাকা লোকসান হইল।

যে সময়ে কোমাগাতা মারু বন্দরে পৌঁছিয়াছিল, তখন আর একখানি জাহাজে ৬৫০ জন চীন যাত্রী উপস্থিত হয়। তাহারা ডাঙ্গায় নামিতে কোন বাধা পায় নাই। কারণ চীনেরা মাথাপিছু পনের শত টাকা দিলেই

কানাডায় বসবাস করিতে পায়। জাপানীরাও বৎসরে ৪০০ জন করিয়া ঐদেশে যাইতে পারে; প্রত্যেকের নিজস্ব ১৫০৲ টাকা আছে দেখাইতে পারিলেই হইল। কড়া নিষেধ কেবল ভারতবাসীর জন্য। এই কারণে হিন্দুদের আগমনের বিরুদ্ধে কানাডা-বাসীদের কোন যুক্তি খণ্ডন করা অনাবশ্যক মনে হয়, যদিও পুনঃ পুনঃ তাহাদের সমস্ত যুক্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। কারণ, যে-সব যুক্তি হিন্দুদের বিরুদ্ধে খাটে, সেগুলা চীন ও জাপানীদের বিরুদ্ধেও খাটে। চীন ও জাপানী, এবং ভারতবাসীদের মধ্যে একটা প্রধান প্রভেদ এই যে চীনা ও জাপানীরা রাষ্ট্রীয়শক্তিশালী, ভারতবাসীরা রাষ্ট্রীয়শক্তিহীন। ভারতবাসীর প্রতি অন্যায্য ব্যবহারের ইহাই প্রধান কারণ।

উত্তর আমেরিকার ব্রিটিশ হণ্ডুরাস্ প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা ভারতপ্রত্যাগত সেনাপতি সোয়েনের একটি মন্তব্য ১৯০৮ সালে ভ্যাঙ্কুবারের ওয়ার্ল্ড্ কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা হইতে বুঝা যায়, কানাডা বা অন্য কোন বৃটিশ উপনিবেশে ভারতবাসীদের গমন কোন কোন ইংরেজ কেন পছন্দ করে না। সোয়েনের ঠিক কথাগুলি এই:—

"One of those things that make the presence of East Indians here, or in any other white colony, politically inexpedient, is the familiarity they acquire with whites. An instance of this is given by the speedy elimination of caste in this Province as shown by the way all castes help each other. These men go back to India and preach ideas of emancipation which if brought about would upset the machinery of law and order. While this emancipation may be a good thing at some future date, the present time is too premature for the emancipation of caste."

তাৎপর্য্য:—কোন বৃটিশ উপনিবেশে ভারতবাসীদের বসবাস এই একটা কারণে অবাঞ্ছনীয় যে লোকগুলা শ্বেতকায়দের বড় গাঘেঁসা ও পরিচিত হইয়া পড়ে। (অর্থাৎ দূরে দূরে থাকিলে তাহারা শ্বেতকায়দিগকে যেরূপ ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রমের চক্ষে দেখে, সে ভাবটা আর থাকে না।) তাদের মধ্যে জাতিভেদের গণ্ডিটা মুছিয়া যায়, এবং সব জাতি পরস্পরকে সাহায্য করিতে থাকে। ইহারা ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়া মুক্তির কথা বলিতে থাকে। তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে আইনের কল বিগড়িয়া যাইবে এবং দেশে শৃঙ্খলা থাকিবে না (অর্থাৎ কি না ইংরেজের প্রভুত্ব টিকিবে না)। এরূপ মুক্তি ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল হইতে পারে কিন্তু এখন তাহার সময় আসে নাই।"

অত্যাচার দুর্ব্বলের পরম বন্ধু। ধন যেমন মন্দ জিনিষ নয়, উহার অপব্যবহারই মন্দ, শক্তিরও অপব্যবহারই তেমন মন্দ; শক্তি মন্দ নহে। অত্যাচার ও অন্যায় কখনও ভাল নয়। শক্তি আছে বলিয়া যাহারা অপরের প্রতি কুব্যবহার করে, তাহারা নিন্দনীয়; তাহাদের অধোগতি অনিবার্য্য। তাহারা যে এরূপ ব্যবহার করে, ইহাই তাহাদের নিকৃষ্ট-তার যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু অত্যাচার জিনিষটা যে একেবারে অকেজো তাহা নয়। বাস্তবিক যদি সংসারে এরূপ দেখা যাইত যে সবল যে-অধিকার পায়, দুর্ব্বলও সেই অধিকার পায়, সবল যেরূপ ব্যবহার পায়, দুর্ব্বলও সেইরূপ ব্যবহার পায়, তাহা হইলে দুর্ব্বল চিরকাল দুর্ব্বলই থাকিয়া যাইত। শক্তিমান্ হওয়া যে আবশ্যক, সে কথাটা হয়ত তাহার মনেই হইত না। সবলের পদাঘাত ও চাবুক দুর্ব্বলের পিঠে পড়ে বলিয়াই দুর্ব্বলের শক্তিমান্ হইতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হইতে চেষ্টা আসে, সাধনা আসে; তাহা হইতেই পরিণামে সিদ্ধিলাভ হয়। অতএব চাবুক দুর্ব্বলের পরম বন্ধু।

অন্নপূর্ণা ও রুদ্র। দুর্ব্বল আলস্যভরে ব্রহ্মের কেবল অন্নপূর্ণামূর্ত্তিই দেখিতে চায়। আদুরে ছেলের মত কেবলই হাত বাড়ায়, আর সংসারের সব ভাল জিনিষ বসিয়া বসিয়া ভোগ করিতে চায়। সে জানে না, বুঝে না, রুদ্র অন্নপূর্ণার স্বামী। রুদ্রকে বাদ দিয়া অন্নপূর্ণার অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। যদি তাঁহার প্রসাদ চাও, সংসারে যাহা কিছু শ্রমসাপেক্ষ, যাহা কিছু কঠোর, যাহা কিছু ভীষণ, তাহার মধ্যে রুদ্রকে দেখ ও পূজা কর। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রসাদ না পাইলে অন্নপূর্ণার প্রসাদ পাওয়া যায় না।

যখন দুর্ব্বল কেবল অন্নপূর্ণাকে দেখিতে চায়, রুদ্রকে ভুলিয়া থাকে, তখন সবলের দৌরাত্ম্য ও উপদ্রব আসিয়া তাহাকে মর্ম্মে মর্ম্মে সমঝাইয়া দেয় যে বিশ্বে কেবল যে অন্নপূর্ণাই আছেন তা নয়, রুদ্রও আছেন। সুখ ও সংগ্রাম (struggle) বিশ্বের দুটা দিক্। একটাকে ছাড়িয়া আর একটাকে পাইবার যো নাই।

দুর্ব্বল আমরা যে-সকল শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকের সমান হইতে চাই, তাহারা নিজ শক্তির দ্বারা অধিকৃত দেশে আমাদিগকে সমান অধিকার দেয় না বলিয়া যাহাদের নিন্দা করি, তাহারা যে দিক্ দিয়া আমাদের শক্তির ও পৌরুষের প্রমাণ চায়, সে প্রমাণ কোথায়? শ্বেতকায়দের খেয়ালগুলা, বাসনগুলা, খেলাগুলাও পুরুষের মত। আকাশযানের দ্বারা ভবিষ্যতে যুদ্ধ করা চলিবে, যাত্রী ও মাল লইয়া যাওয়া চলিবে বটে; কিন্তু এই যে প্রতি সপ্তাহে কত লোক আকাশে উড়িতে গিয়া পড়িয়া মরিতেছে, তাহারা ত সকলে ওরূপ কোন একটা উদ্দেশ্যের জন্য উড়ে না; তাহাদের সখ্ হয়, তজ্জন্য উড়ে। আমাদের সখ্ হইলে আমরা তাস পাশা খেলি, কিম্বা ঘরে বসিয়া রাজা উজীর মারি। বামুনের বাড়ীর বাছুর গোয়ালার বাড়ীর বাছুরের কাছে প্রস্তাব করিয়াছিল, এস ভাই এই খোলা মাঠে লেজ তুলিয়া খুব একদম্ দৌড়িয়া আসি। গোয়ালার বাছুর বড় সুবোধ; সে বলিল, না ভাই, এস শুয়ে শুয়ে ন্যাজ নাড়ি। শক্তির পরিচয় সখে। সুমেরু কুমেরু আর পৃথিবীর যত মরুময় অরণ্যময় দুর্গম স্থান তাহাতে গিয়া পৌঁছা পৃথিবীর শক্তিশালী জাতির লোকেরা একটা সখে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। ঐ-সব যায়গায় গিয়া রাজ্যবৃদ্ধির, বাণিজ্যবিস্তারের, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের, সম্ভাবনা আছে বটে; কিন্তু তাহা যে হইবেই এমন ত বলা যায় না; এবং সকলে সে উদ্দেশ্যে যায়ও না। আর যদি ওরূপ উদ্দেশ্যই থাকে, তাহা হইলে কি কঠোর পণ, কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা, কি প্রবল চেষ্টা, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। আমরা বড় জোর সাহসে ভর করিয়া একেবারে দার্জ্জিলিঙে লাউইস্ জুবিলী স্যানিটেরিয়ম নামক হাঁসপাতালে গিয়া উপস্থিত হই।

অপমানবোধ। সর্ব্বত্র সকলে আমাদিগকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতেছে বলিয়া আমাদের কি অপমান বোধ হইতেছে? তাহা যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল সমুদয় খবরের কাগজে আমাদের বিদ্বেষ্টাদের বিরুদ্ধে লিখিলে চলিবে না। কাগজ কয়জনে পড়ে? দেশের অধিকাংশ লোক যে নিরক্ষর। সর্ব্বত্র সভা করিয়া দেশবাসীকে জাগাইয়া তুলা দরকার। তাহার পর ব্যবস্থাপক সভায় পুনঃ পুনঃ নানা আকারে আমাদের বিদ্বেষ্টাদের বিরুদ্ধে বর্জ্জন ও বহিষ্কার নীতি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যে যে দেশের লোকে ভারতবাসীকে প্রবেশ করিতে দেয় না বা দিবে না বলিতেছে, তাহাদিগকে আমরাও ভারতে আসিতে দিব না; তাহারা যে যে ভাবে বাধা দেয়, আমরাও সেই সেই ভাবে বাধা দিব। তাহারা কেহ কেহ বলে, ইউরোপীয় যে-কোন ভাষার বহি পড়িতে না পারিলে তোমাদিগকে আমাদের দেশে ঢুকিতে দিব না। আমরাও বলিব, ভারতবর্ষীয় যে-কোন ভাষার বহি পড়িতে না পারিলে তোমাদিগকে ভারতে ঢুকিতে দিব না। তাহার পর আর এক প্রস্তাব এই হওয়া উচিত যে, ঐসব দেশের কোন লোক ভারতবর্ষের কোন রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। আর এক প্রস্তাব এই হওয়া কর্ত্তব্য যে ঐসব দেশের কোন জিনিষ ভারত-গবর্ণমেণ্ট কিনিবেন না। ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের কোন প্রস্তাব গৃহীত না হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু লর্ড হার্ডিং যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে আমাদের জাতীয় সম্মানের রক্ষক হইয়াছিলেন, অন্যান্য দেশের দুর্ব্যবহার সম্বন্ধেও সেইরূপ আমাদের সহিত একমত হইতে পারেন, যদি তাঁহাকে আমরা বুঝাইতে পারি যে বাস্তবিকই আমাদের আত্মসম্মান বলিয়া একটা জিনিষ আছে ও তাহাতে ঘা লাগিয়াছে বলিয়া আমরা সত্যসত্যই বেদনা অনুভব করিতেছি। আগে এই-সব প্রস্তাব করা হউক। তাহাতে কোন ফল না হইলে গবর্ণর-জেনেরালেরই সমর্থিত অন্য আইনসঙ্গত উপায় আছে।

তাহার পর গবর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যে আমরা কিরূপ চেষ্টা করিতে পারি তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। যে

যে দেশে আমাদের লাঞ্ছনা হইতেছে বা নূতন করিয়া হইবার সম্ভাবনা হইতেছে (যেমন আমেরিকার যুক্তরাজ্যে), প্রবেশাধিকার লুপ্ত হইয়াছে বা লুপ্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে (যেমন আমেরিকার যুক্তরাজ্যে), সেই সেই দেশ হইতে কি কি জিনিষ ভারতবর্ষে আসে, তাহার তালিকা বাণিজ্যরিপোর্ট হইতে সংগ্রহ করিয়া, তৎসমুদয়ের ব্যবহার বন্ধ করিবার চেষ্টা করা উচিত। যদি কোন কানাডাবাসী বা অষ্ট্রেলিয়াবাসী ভারতে বিচারকের বা অন্য কোন প্রকারের কাজ করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের নিকট এই বলিয়া আবেদন করা কর্ত্তব্য যে তিনি যে দেশের ও যে জাতির লোক, তাহাতে তাঁহার দ্বারা ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষিত ও মঙ্গল সাধিত হইবার সম্ভাবনা কম। অতএব তাঁহাকে পেন্সান দেওয়া হউক। যদি কোন কলেজে বা ইস্কুলে ঐ-সব দেশের কোন অধ্যাপক বা শিক্ষক থাকেন, তাহা হইলে তথায় কাহারও নিজ সন্তানকে শিক্ষার জন্য পাঠান উচিত নয়। দেশের সব কাগজে ঐসব দেশ হইতে আগত বিচারক বা অন্য কর্ম্মচারী, অধ্যাপক, শিক্ষক, প্রভৃতির তালিকা মুদ্রিত করা হউক; যাহাতে তাহাদের সঙ্গে কোন ভারতবাসী কোন প্রকার সামাজিক সম্পর্কও না রাখে। ঐসব দেশের বণিকদের দ্বারা চালিত দোকানের নাম ও ঠিকানাও মুদ্রিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে ঐসব দোকানে কেনা বেচা বন্ধ করা যাইতে পারিবে।

কাহারও প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করা উচিত নহে, কিন্তু যে আমাকে অবজ্ঞা করে ও আমার শত্রুতা করে, তাহার সঙ্গে কোন প্রকারের সামাজিক ব্যবহার কেমন করিয়া চলিতে পারে?

আমরা স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেখিয়াছি, কোন দেশের কোন একটি জিনিষের ব্যবহার ছাড়িতে বলিলেই ছাড়া যায় না। অন্য দেশে বা ভারতবর্ষে উৎপন্ন ঐরূপ জিনিষটিও দেখাইয়া দেওয়া দরকার। সুতরাং যে-সকল জিনিষ বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব হইবে, সেগুলি নিতান্ত অনাবশ্যক বিলাসদ্রব্য না হইলে তাহার পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য অন্য দেশের জিনিষও নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।

বিরলবসতি বৃটিশ উপনিবেশসমূহ। বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে ভারতবাসীদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। অথচ তাহাদের জনসংখ্যা খুব কম। কানাডার প্রতি বর্গমাইলে দেড় জন মানুষের বাস। অষ্ট্রেলিয়ায় প্রতি বর্গমাইলে সওয়া জন লোকের বাস; এবং এই সুবৃহৎ মহাদ্বীপের বিস্তর স্থান এরূপ উষ্ণ ও মরুময় যে তাহা শ্বেতকায়দিগের বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। নিউ জীল্যাণ্ডে প্রতিবর্গ মাইলে ৮ জন লোক বাস করে।

ভারতসাম্রাজ্যে (ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে) প্রতি বর্গ মাইলে ১৭৫ জন লোক বাস করে; বৃটিশ শাসিত অংশে প্রতিবর্গ মাইলে ২২৩ এবং দেশীয় রাজ্যসকলে ১০০। বাঙ্গলা দেশে প্রতিবর্গমাইলে ৫৫১ জনের বাস। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন অংশে কোন দেশের কোন জাতির লোককে আসিতে বাধা দেওয়া হয় না।

সার্জ্জন-মেজর শ্রীযুক্ত বামনদাস বসু।

"হিন্দুসাহিত্য।" সাহিত্য কথাটি ইংরেজী লিটারেচার (literature) কথাটির মত নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপকতম অর্থে, বাক্যের সাহায্যে মানুষের কোন প্রকারের জ্ঞান, চিন্তা, ভাব বা কল্পনা প্রকাশ পাইলে, সেই বাক্যসমষ্টিকে সাহিত্য বলা যাইতে পারে। ইহা লিখিত বা অলিখিত উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। এই অর্থে গণিতাদি বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, লোকমুখে শ্রুত ছড়া, গান, কাহিনী, প্রভৃতি সমস্তই সাহিত্য।

সংকীর্ণ অর্থে সাহিত্য বলিতে সেই-সকল গদ্য বা পদ্য রচনা বুঝায়, যাহাতে রস আছে, হৃদয় যাহার সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছে। "হিন্দুসাহিত্য" কথাটি ব্যাপক বা সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু যেরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হউক, ইহার অর্থ, "হিন্দুজাতি যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।" বর্ত্তমান কালে হিন্দুধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায় (কারণ হিন্দু কথাটি বিদেশীর সৃষ্ট, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে উহার চলন ছিল না), তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য যদি কিছু লিখিত হয়, তাহাও একপ্রকার সাহিত্য বটে; কারণ তাহাতেও বাক্যসমষ্টি দ্বারা একপ্রকার জ্ঞান ও চিন্তা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এইরূপ পুস্তকাদি বুঝাইবার জন্য "হিন্দু-সাহিত্য" শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। প্রয়াগের পাণিনি কার্য্যালয় যে হিন্দুসাহিত্য প্রচার করিতেছেন, তাহা সাহিত্য শব্দের ব্যাপকতম ও অসাম্প্রদায়িক অর্থেই বুঝিতে হইবে। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বামনদাস বসু, এই দুই বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত, অন্যান্য বিদ্বান্ লোকের সাহায্যে, এই কার্য্যালয় হইতে হিন্দুজাতির নানা দার্শনিক, আধ্যাত্মিক, পৌরাণিক, বৈজ্ঞানিক, প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। এই কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হিউম্যানিটী এণ্ড হিন্দু লিটারেচার (Humanity and Hindu literature) "বিশ্ব-মানব ও হিন্দুসাহিত্য" নামক ইংরেজী পুস্তিকাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। পুস্তিকাটি আদ্যন্ত ইংরেজী ভাষায় লিখিত এবং কেবল ৩৫ পৃষ্ঠা পরিমিত। কিন্তু ইহার বিষয়গৌরব এবং এতন্নিহিত জ্ঞানগৌরব তদপেক্ষা অনেক অধিক।

প্রথমেই পণ্ডিতাগ্রগণ্য দর্শনাচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের লিখিত "Hindu Ideas on Mechanics (Kinetics)" "গতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে হিন্দুদিগের ধারণা" নামক একটি ১১-পৃষ্ঠাব্যাপী সাতিশয় সারবান্ প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। হিন্দুদিগের গণিতজ্ঞান কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, ইহা হইতে তাহা কতকটা বুঝা যাইবে। তৎপরে দেশীয় চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে সার্জ্জন মেজর বামনদাস বসুর অভিভাষণ, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের লেখা "হিন্দুদের অর্থনৈতিক আদর্শ", "রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আদর্শপন্থিতা" নামে একটি প্রবন্ধ, এবং হিন্দুসমাজ-বিজ্ঞানের মূলে যেসব তথ্য আছে, তদ্বিষয়ে বিনয়বাবুর লেখা একটি সন্দর্ভ আছে।

হিন্দুসাহিত্যপ্রচার দ্বারা পাণিনি কার্য্যালয় জনসমাজের মঙ্গলসাধন করিতেছেন।

মর্লীকে তদীয় চিত্র উপহার।

লর্ড মর্লীকে তাঁহার একটী তৈলচিত্র উপহার দিবার জন্য ২২,৫০০, টাকা সংগ্রহার্থ সার্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, মিঃ আব্বাস্ আলী বেগ্, সার্ মাঞ্চার্জি ভাবনগরী, মিঃ লোকেন্দ্রনাথ পালিত এবং সার্জ্জন্-মেজর নরেন্দ্র-প্রসন্ন সিংহকে লইয়া একটি কমীটী গঠিত হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের ভক্তেরা তদীয় ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে কিছু উপহার দিলে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে মর্লী-ভক্ত কমীটী তাঁহাকে উপহার দিতে চাহিতেছেন, 'as a mark of the esteem and affection entertained throughout India for one of her greatest friends"—"ভারতবর্ষের একজন মহত্তম বন্ধুর প্রতি সমগ্র ভারতে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব পোষিত হইতেছে, তাহার চিহ্নস্বরূপ।" কিন্তু ইহা ত সত্য নহে যে ভারতের সর্ব্বত্র লোকে লর্ড মর্লীকে শ্রদ্ধা করে ও ভাল বাসে। সুতরাং ভারতবাসীর নামে তাঁহাকে কোন উপহার দেওয়ার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি একটি কাজ এই করিয়াছেন যে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভা এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সভ্যসংখ্যা বাড়াইয়া দিয়াছেন, এবং সভ্যগণকে তাহাতে প্রস্তাব উপস্থিত করিবার অধিকার দিয়াছেন। ইহাতে এপর্য্যন্ত আগেকার ব্যবস্থাপক সভাগুলি অপেক্ষা বেশী কিছু উপকার হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যদি ধরা যায় যে কিছু উপকার হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার বিপরীতদিকে অনিষ্ট যাহা হইয়াছে, তাহাও ধরা উচিত। ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানকে স্বতন্ত্র প্রতি-নিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়ায় হিন্দুমুসলমানের দলাদলি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে, এবং

তাহার ফলে এখন মুসলমানেরা গ্রাম্য ইউনিয়ন ও মিউ-নিসিপালিটী লোক্যাল বোর্ড হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্র স্বতন্ত্র প্রতিনিধি চাহিতেছেন। এইরূপ স্বায়ত্তশাসনে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট অধিক। এইরূপ দলাদলি দেশে থাকিলে প্রজাশক্তি কখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে কি না সন্দেহ। তদ্ভিন্ন, মুসলমানদিগকে যে ভাবে নির্ব্বাচনাধিকার দেওয়া হইয়াছে, হিন্দু প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোককে তাহা না দেওয়ায় তাহাদের অগৌরব হইয়াছে। তাহারা যেন মনুষ্যত্বে মুসলমান অপেক্ষা হীন। লর্ড মর্লীর আমলে ও তাঁহার সম্মতিক্রমে বিনা অভিযোগে ও বিনা বিচারে দুইজন পঞ্জাবী ও নয়জন বাঙ্গালীর নির্ব্বাসন হইয়াছিল। তাঁহার আমলে ও তাঁহার সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে সংবাদপত্র-সকলকে কঠিন আইনের নিগড়ে বাঁধিয়া যুক্তিসঙ্গত স্বাধীনতার সহিত মত প্রকাশের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। বঙ্গবিভাগের পর, উহা যে একটা ভ্রম এবং অন্যায় কাজ তাহা বুঝিতে পারা সত্ত্বেও লর্ড মর্লী পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, ভাঙ্গা বঙ্গ আর জোড়া লাগিবে না, যা হবার তা চিরদিনের মত হইয়া গিয়াছে। তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে "fur-coat theory" নামক একটি নূতন অদ্ভুত মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। তাহার ব্যাখ্যা এই-রূপ। কানাডা শীতপ্রধান দেশ; সেখানকার লোকেরা শীতনিবারণের জন্য লোমাবৃত পশুচর্ম্মের পোষাক পরে। কিন্তু ভারতবর্ষের গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশসমূহের লোকদিগের পক্ষে সেরূপ পোষাক উপযোগী নহে। কানাডার লোকেরা নিজেদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া ঐ প্রতি-নিধিদিগের দ্বারা দেশের কার্য্য চালায়; অর্থাৎ তথাকার শাসনপ্রণালী প্রজাতন্ত্র। অতএব শীতপ্রধান কানাডার লোমশ পশুচর্ম্মের পরিচ্ছদ যেমন ভারতবর্ষের উপযোগী নয়, তেমনি তথাকার প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীও ভারতের উপযোগী নহে। ইহাই লর্ড মর্লীর যুক্তি। এই চমৎকার যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া ইহাও বলা চলে যে বিলাতের লোক রুটি খায় এবং জাপানের লোক ভাত খায়। অতএব বিলাতে যেমন পার্লেমেণ্ট আছে, জাপানে সেরূপ থাকিতে পারে না। অথচ বাস্তবিক জাপানে পার্লেমেণ্ট আছে, তথাকার শাসনপ্রণালী প্রজাতন্ত্র। প্রকৃত কথা এই, লর্ড মর্লীর মত লোকেরা ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাঁহারা জানেন না যে বহু প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং এখনও ভারতের নানা জাতির(caste) সামাজিক কাজ সাধারণতন্ত্রের প্রণালী অনুসারে নির্ব্বাহিত হয়। তাঁহারা মনে করেন, আমরা সৃষ্টিছাড়া ও মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন একটা নিকৃষ্ট জাতি। অন্য মানুষ স্বাধীনতার উপযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু আমরা কখনও বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াও স্বায়ত্ত শাসনের উপযুক্ত হইতে পারি না। এইজন্য মর্লী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে "যদি আমি ভাবিতাম যে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলির দ্বারা ভবিষ্যৎ ভারতীয় পার্লেমেণ্ট বা প্রজাপুঞ্জের প্রতিনিধিসভার সূত্রপাত করা হইতেছে, তাহা হইলে আমি কখনই সেগুলিকে বৃহত্তর করিতাম না। আমার কল্পনা সুদূর ভবিষ্যতে যতদূর যায়, তাহাতেও আমি ভারতে একনায়কত্ব (personal rule) ব্যতীত অন্য কোন প্রকার শাসনপ্রণালী দেখিতে পাইতেছি না।"

ইহঁার পদারবিন্দে যাঁহারা ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিতে চান, তাঁহারা দিতে পারেন, কিন্তু তাহা সমগ্র ভারতবাসীর ভক্তি ও প্রীতির চিহ্ন বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে।

বড়োদায় শিল্পোন্নতির সাহায্য।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে বড়োদায় সমবেত-ঋণদান-সমিতি-সকলের যে পরামর্শসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে মহারাজা গাইকবাড় শিল্পদ্রব্যনির্ম্মাণের চল্‌তি কারখানা-সকলকে ধার দিবার জন্য পনের লক্ষ টাকা মঞ্জুর করি-য়াছেন। পাশ্চাত্য অনেক দেশে এইরূপ ধার দেওয়া হইয়া থাকে। বৃটিশ ভারতে এই রীতি প্রবর্ত্তিত হইলে ভাল হয়। যে-সকল শিল্পদ্রব্য বিলাত হইতে আসে না, প্রধানতঃ অন্যান্য দেশসকল হইতে আসে, তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য বিশ্বাসযোগ্য ও বিশেষজ্ঞ লোকেরা কার-খানা স্থাপন করিতে চাহিলে, গবর্ণমেণ্টের এইরূপ সাহায্য দিতে কোন আপত্তি হওয়া উচিত নহে।

"ভেতো"। বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে অবজ্ঞা করিয়া বহুকাল হইতে ভেতো বাঙ্গালী বলিয়া থাকে; এখন হয় ত কিছু কম বলে। আবার বেহার ও হিন্দুস্তানের ছাতু, ভুট্টা ও গমভোজী ব্যক্তিরাও বাঙ্গালীকে অবজ্ঞার সহিত "ভাৎ-খাউআ" বলে। কোন কোন কারণে এখন বোধ হয় তাহাদের চক্ষে বাঙ্গালীর ভাত-খাওয়াটা আর নিকৃষ্টতার পরিচায়ক বলিয়া গৃহীত হয় না। ভাতভোজী জাপানীরা রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করার পর ভাতের অপমান কেহ বড় একটা করিত না। কিন্তু সম্প্রতি সার্ আয়েন হ্যামিল্টন নামক একজন ইংরেজ সেনাপতি "ভাত-খেকো" লোকদের বিরুদ্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন! তিনি বলেন যে, এই ভাতখেকো "বিদেশীরা" ইংরেজাধিকৃত দেশসকলে আবির্ভূত হইতেছে, এবং কাজকর্ম্ম একচেটিয়া করিতেছে; ইহা বাস্তবিকই একটা বিপদ।

অল্পব্যয়ে বাঁচিয়া থাকাটাও, দেখিতেছি, অনেকের চক্ষে একটা পাপ! বুদ্ধিবলে, বাহুবলে ও অস্ত্রবলে ইউরোপের লোকেরা বীরভোগ্যা বসুন্ধরার ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিতেছে। অন্য লোকেরা এক মুঠা ভাত খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাতেও যাহাদের গাত্রদাহ হয়, না জানি তাহারা কতই সভ্য ও খৃষ্টভক্ত! যাহা হউক, যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি তাহাতে সেনাপতি মহাশয়কে কোন প্রকারে মনোবেদনাটা বরদাস্ত করিতেই হইবে। কারণ ভাতখেকো জাপানীরা তাঁহার বক্তৃতায় ক্ষেপিয়াছে। তাহাদিগকে তাঁহার দেশের লোকেরা ভয় করে; নতুবা তাহাদের সহিত সন্ধি রক্ষা করিতে এতটা ব্যগ্রতা দেখা যাইত না।

ওট্ এক রকম শস্য, গমের চেয়ে সস্তা। স্কট্‌ল্যাণ্ডের লোকেরা আগে খুব দরিদ্র ছিল। তখন তাহারা লণ্ডনে ও ইংলণ্ডের অন্যান্য সহরে আসিয়া কম বেতনে মজুরী ও অন্যান্য কাজ করিত এবং ওটের ময়দা সিদ্ধ করিয়া খাইয়া সস্তায় দিন গুজরান করিত। এইজন্য মাংসভোজী ইংরেজেরা তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পারিয়া তাহাদিগকে কৃপণ, ছোটলোক, প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিত! কিন্তু চতুর স্কচ্ তাহা গ্রাহ্য না করিয়া ক্রমশ বেশ গুছাইয়া উঠিয়াছে। গোলআলুগত-প্রাণ আইরিশদিগকেও ইংরেজেরা দেখিতে পারে না। কিন্তু আইরিশদেরও দিন আসিতেছে। অতএব ভাতের উপরই যে বিধাতার বিশেষ অভিশাপ আছে, এমন না হইতেও পারে। ইউরোপ আমেরিকায় চাউলের কাট্‌তিও বাড়িতেছে।

ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের বলকারিতার তারতম্য আছে। কিন্তু যে খাদ্য যত সহজে হজম হয়, তাহা দ্বারা মস্তিষ্কের কাজ করিবার সুযোগ তত বেশী পাওয়া যায়। ইহাও বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

বলিষ্ঠ দেহের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে! কিন্তু বলিষ্ঠ সাহসী আত্মার প্রভুত্ব অনিবার্য্য, ইহা কেহ যেন বিস্মৃত না হন।

চাউল। ভারতবর্ষের বাণিজ্যসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন তাহাতে চাউল সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে চাউল সকল দেশের চেয়ে বেশী উৎপন্ন এবং খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইউরোপ আমেরিকাতেও চাউলের কাট্‌তি ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ইংরেজ-শাসিত ভারতে চাষের জমীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশে ধানের চাষ হয়। গড়ে ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় ছিয়াত্তর কোটি মণ চাউল উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক প্রদেশেরই প্রধান ফসল ধান। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় এগার কোটি বিঘারও অধিক জমীতে ধানের চাষ হয়। তাহার পরে ক্রমান্বয়ে মান্দ্রাজ, আগ্রা-অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম ও বোম্বাইয়ে ধানের চাষ বেশী হয়। বিঘাপ্রতি গড়ে চারিমণ করিয়া উৎপন্ন ধরা হয়; আউশ, আমন সব ফসল ধরিয়া। ভারতবর্ষের কৃষিজাত দ্রব্যের বার্ষিক মূল্য আনুমানিক ৫২৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে চাউলের মূল্য ২৮৫ কোটি টাকা।

জাপান, শ্যাম, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, চীন, মিশর, এবং মেক্সিকোতেও ধানের চাষ হয়। কিন্তু অন্যান্য দেশে ধানের চাষের এবং ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করিবার উপায়ের অনেক উন্নতি হইয়াছে। আমাদের দেশে সাবেক প্রথাই এখনও চলিতেছে। উন্নতি করি-

বার জন্য অন্যান্য দেশের প্রণালীর বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া দেশ-মধ্যে প্রচার করিতে পারিলে ভাল হয়।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে স্বাধীনতার ক্রমবিকাশ। তারে খবর আসিয়াছে যে আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রের (United Statesএর) প্রতিনিধি-সভায় একটি আইনের খসড়া উপস্থিত করা হইয়াছে, যাহা দ্বারা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে বহুপরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা দেওয়া হইবে। ফিলিপিনোরা আমেরিকান্‌দের অধীন। আমেরিকান্‌রা এখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ফিলিপেনোদিগকে ক্রমশঃ আত্মশাসনক্ষম করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিবেন। বিলাতে যেমন ব্যবস্থাপক সভার দুটি শাখা আছে, হাউস অব্‌ লর্ডস্‌ ও হাউস্‌ অব্‌ কমন্‌স্‌, অর্থাৎ অভিজাতদিগের সভা এবং প্রজাদিগের প্রতিনিধিদের সভা, তেমনি ফিলিপিনোদিগকেও দেশশাসনের জন্য সেনেট এবং প্রতিনিধিসভা দেওয়া হইবে। প্রভেদ এই যে বিলাতে অভিজাতদের সভার সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হন না, বংশানুক্রমে সভ্য হন; কিন্তু ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে সেনেট ও প্রতিনিধি-সভা উভয়েরই সভ্যেরা প্রধানতঃ নির্ব্বাচিত হইবে। ফিলিপিনোদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন খৃষ্টিয়ান। ইহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য। ইহারা ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখায় আপনাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে। বাকী শতকরা ১০ জন অধিবাসী এখনও সভ্য হয় নাই। ইহাদের প্রতিনিধি গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন।

ভিন্নজাতির দেশ জয় করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে উহা স্বাধীন করিয়া দিবার অঙ্গীকার জগতের ইতিহাসে আমেরিকানরাই প্রথম করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল কথা বলিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই। যথাসম্ভব শীঘ্র শীঘ্র অঙ্গীকার পালনের জন্য উত্তরোত্তর ফিলিপিনোদিগের রাষ্ট্রীয় অধিকার বাড়াইয়া দিতেছেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিজিত জাতির প্রতি এরূপ সদাশয়তার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে আর একটিও নাই।

এই দৃষ্টান্ত আরও চমৎকার বোধ হয় যখন দেখা যায় যে ফিলিপিনোরা প্রাচীন কাল হইতে সভ্য বলিয়া পরিচিত জাতি নহে। তাহারা কখনও প্রবল পরাক্রান্ত স্বাধীন জাতি ছিল না। তাহাদের নিজের কোন প্রাচীন সভ্যতা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান বা শিল্প ছিল না। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া স্পেনদেশের লোকেরা তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে থাকে, এবং কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যও করে। তার আগে তাহারা অসভ্য ছিল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকানরা স্পেনিয়ার্ডদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করে এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে স্পেনের অধিকার ও শাসন লুপ্ত হয় ও আমেরিকার শাসন আরম্ভ হয়। আমেরিকার অধীনস্থ হইবার ১৬ বৎসর পরেই ফিলিপিনোরা আপনাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত পার্লেমেণ্ট পাইতে যাইতেছে!

এখনও সে দেশে অনেক স্থানে এরূপ অসভ্য লোক আছে যে তাহাদের মধ্যে শত্রুর মাথা কাটিয়া তাহা বিজয় নিশানের মত গৌরবের সহিত আনা একটা প্রচলিত প্রথা। ফিলিপিনোদের মোরো নামধারী একটা জাতির মধ্যে এখনও দাসত্ব খুব চলিত। ফিলিপিনোরা সকলে একজাতীয় নহে; তাহারা ২৫।৩০ টা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। তাহাদের ভাষা, চেহারা, গায়ের রং, প্রভৃতিতে বিস্তর প্রভেদ আছে। সকলে সমান সভ্যও নহে। কৃষ্ণকায়েরা নিতান্ত বর্ব্বর অবস্থায় জীবনযাপন করে, দেহে উল্কী ধারণ করে, এবং কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাসগৃহ না থাকায় নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফিলিপিনোদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন খৃষ্টিয়ান।

আমেরিকানদের মধ্যে উদারমতাবলম্বীরা মনে করিতেছেন যে এ হেন জাতিকে আর আট বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন করা চলিবে। কিন্তু যে-সকল আমেরিকান্‌ ফিলিপিনোদের আত্মশাসনক্ষমতা সম্বন্ধে খুব বেশী সন্দিহান, তাঁহারাও মনে করেন যে বড় বেশী আর চল্লিশ বৎসর পরে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করা চলিবে।

আমেরিকান্‌রা গত বার বৎসরের মধ্যে ফিলিপিনোদিগকে প্রভূত ক্ষমতা দিয়াছে। এই বার বৎসরে মিউনিসিপালিটীগুলিকে ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ স্বাধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মিউনিসিপালিটীর সমুদয় সভ্য ও সভাপতি ফিলিপিনোরাই নির্ব্বাচন করে। মিউনিসিপাল ট্যাক্স

ধার্য্য, আদায়, ও ব্যয় করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাহাদেরই আছে, আমেরিকান্ গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটীর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। এক একটি প্রদেশের শাসক-সমিতির (governing boardএর) দুই-তৃতীয়াংশ ফিলিপিনোরা নির্ব্বাচন করে। ব্যবস্থাপক সভার উর্দ্ধতন শাখার ৯ জন সভ্যের মধ্যে ৪ জন ফিলিপিনো, এবং অধস্তন শাখার সমুদয় সভ্যই তাহাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত। উচ্চতম বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি এবং আর দুইজন বিচারপতি ফিলিপিনো। বাকী চারিজন আমেরিকান। অন্যান্য বিচারালয়ের প্রায় অর্দ্ধেক-সংখ্যক বিচারক দেশীয়। জষ্টিস্ অব দি পীস্ নামক সমুদয় বিচারক দেশীয়। সিবিলিয়ানদের মধ্যে ১৯০৪ সালে শতকরা ৫১ জন ফিলিপিনো ছিল; ১৯১১ সালে তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া শতকরা ৬৭ জন হইয়াছে। এই প্রকারে দেখা যাইতেছে এখন সমুদয় মিউনিসিপাল সভ্য ও কর্ম্মচারী, শতকরা ৯০ জনেরও উপর প্রাদেশিক কর্ম্মচারী, এবং শতকরা ৬০ জনের উপর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ফিলিপিনো। এক্ষণে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে অনেক আমেরিকান্ স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেছে, কারণ তাহারা যে কাজ করিত তাহা ফিলিপিনোদিগকে দেওয়া হইতেছে।

লর্ড মর্লী এরূপ কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে এমন সময় কখনও আসিবে যখন ভারতবাসীরা নিজের দেশের কাজ নিজে চালাইতে পারিবে!

খাদ্য ও শ্রমসহিষ্ণুতা। শারীরিক বল, ও শ্রমসহিষ্ণুতা বা শ্রম করিবার শক্তিতে প্রভেদ আছে। কাহারও শারীরিক বলের পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হয় যে মানুষটি তাহার সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া একবার কিরূপ কঠিন কাজ করিতে পারে; অর্থাৎ কত ওজনের কিরূপ ভারী জিনিষ তুলিতে পারে, কত মোটা শিকল ছিঁড়িতে পারে, কত মোটা কয়জন লোককে গাড়ীতে চড়াইয়া গাড়ী টানিতে পারে, ইত্যাদি। শ্রম করিবার শক্তি পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে মানুষটি অল্পায়াসসাধ্য কোন কাজ কতক্ষণ কত বার করিতে পারে; অর্থাৎ কতক্ষণ ধরিয়া সে কোদাল পাড়িতে পারে, কতক্ষণ ধরিয়া ঝুড়িতে করিয়া মাটি বহিতে পারে, কতবার সিঁড়ি উঠানামা করিতে পারে, ইত্যাদি। স্যাণ্ডো, রামমূর্ত্তি, ভীম ভবানী বা গোবর হওয়ার প্রয়োজন ত সকলের হয় না, খুব অল্প-লোকেরই সেরূপ হওয়া দরকার। কিন্তু সকলেরই সুস্থ-দেহ ও শ্রমপটু হওয়া চাই। এইজন্য জানা প্রয়োজন যে কিরূপ খাদ্যে মানুষের শারীরিক শ্রম করিবার ক্ষমতা বাড়ে।

আমেরিকার বিখ্যাত য়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্ভিং ফিশার এবিষয়ে কতকগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন। ৪৯ জন লোককে লইয়া পরীক্ষা করা হয়। তাহার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক য়েলের ছাত্র, বাকী দেশের নানা স্থান-বাসী নানা কাজে ব্যাপৃত লোক। কেহ বা মাংস ও ডিম প্রচুর পরিমাণে খায়, কেহবা ওরূপ খাদ্য খুব কম খায় কিম্বা মোটেই খায় না। নানা প্রকারের ব্যায়াম দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যাহাকে আমাদের দেশের কুস্তিগীররা বৈঠকী বলে। না থামিয়া ক্রমাগত বসা ও সোজা হইয়া দাড়ানর নাম বৈঠকী। পরীক্ষায় দেখা গেল যে যাহারা প্রচুর পরিমাণে মাংসডিম্বভোজী তাদের মধ্যে খুব অল্প লোকেই ৫০০ বারের বেশী বৈঠকী করিতে পারে। ৫০০ বার হইবার আগেই কেহ কেহ অজ্ঞান হইয়া পড়ে, কেহ কেহ উহা অপেক্ষা কম বার করিয়াই আর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। তাহারা এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে ব্যায়ামশালার সিঁড়ি নামিবার সময় তাহাদিগকে ধরিয়া নামাইতে হইয়াছিল।

যাহারা মাংস ও ডিম কম খাইত বা খাইতই না, তাহারা কেহই এই পরীক্ষা দ্বারা নিজেদের কোন শারীরিক ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে করে নাই। তাহাদের অধিকাংশ ৫০০ বারের উপর বৈঠকী করিতে পরিয়াছিল, এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তি হাজার বারেরও বেশী করিয়াছিল। একজন য়েলের ছাত্র, যে দুইবৎসর মাংস ও ডিম স্পর্শ করে নাই, আঠারশত বার বৈঠকী করিয়াছিল, এবং তাহাতেও ক্লান্ত না হইয়া ব্যায়ামশালার দৌড়ের রাস্তায় কয়েক পাক দৌড়িয়া ঈষ্ট রক নামক শৈলে উঠিয়া নামিয়া আসে। আর একজন লোক ২৪০০ বার বৈঠকী করে। অপর একজন, যে মাংস খায় না এবং ডিম অল্প পরিমাণে খায়, ৫০০০ বার বৈঠকী করিয়া লোককে অবাক্ করিয়া দিয়াছে।

যাঁহারা এই প্রকারে শ্রমশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বেশ ভাল করিয়া চিবাইয়া আহার করেন।

লেডী হার্ডিং। স্বর্গীয়া লেডী হার্ডিংএর জন্য ভারতবাসীর শোক অকৃত্রিম। তিনি সাধ্বী পতিব্রতা ছিলেন। পতিব্রতাকে ভারতবর্ষ চিরকাল ভক্তি করিয়া আসিয়াছে। দিল্লীতে দরবারের সময় যখন লর্ড হার্ডিং বোমা দ্বারা আহত হন, তখন লেডী হার্ডিং অসামান্য ধৈর্য্য ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। স্বামী যতদিন শয্যাগত ছিলেন, ততদিন সতত তাঁহার শয্যাপার্শ্বে

থাকিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বামীর মত সদাশয় ও দয়ালু ছিলেন, এবং ভারতবর্ষকে ভালবাসিতেন। সমগ্র ভারতে বালকবালিকাদের একদিন আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছিলেন। তাহাতে হাঁসপাতালের বালকবালিকাদের এবং অন্ধ, বোবা কালা, খঞ্জ ও আতুরদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পীড়ার সময় অসহায়া দরিদ্রা ভারতনারীদের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার বন্দোবস্তের জন্য তিনি সর্ব্বদা চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে ভারতনারীদিগের চিকিৎসার জন্য কেবল মহিলা-ডাক্তারদিগকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসাবিভাগ গঠিত হইয়াছে। ইহার নিয়মাবলী প্রথমে এরূপ হইয়াছিল যে তাহাতে ভারতীয় মহিলা-ডাক্তারদের উহাতে প্রবেশলাভ কঠিন হইত। কিন্তু লেডী হার্ডিং পরে এই বাধা দূর করিয়াছেন। দিল্লীতে নারীদের শিক্ষার জন্য মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ তিনিই করেন। লর্ড হার্ডিংএর এই গভীর শোকের সময় তাঁহার জন্য প্রাণে বেদনা বোধ সকলেই করিবেন।

লেডী হার্ডিং।

তাতার বিজ্ঞানমন্দির। এলাহাবাদের ইংরাজী দৈনিক লীডার বলেন যে প্রধানতঃ জামসেদজী তাতার প্রদত্ত অর্থে স্থাপিত বাঙ্গালোর বিজ্ঞানশিক্ষালয়ের প্রথম পরিচালক (director) বিজ্ঞানাচার্য্য মরিস্ ট্রেভার্স সাহেব উহার কাজ বিশেষ কিছু অগ্রসর হইবার আগেই মাসিক ৬২৫্ টাকা পেন্সনে অবসর লইয়াছেন। অধ্যাপক ট্রেভার্সের বৈজ্ঞানিক বলিয়া খ্যাতি আছে; কিন্তু তিনি যে কাজের জন্য আসিয়াছিলেন তাহাতে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। শিক্ষালয়ের বৈষয়িক কার্য্যে তাঁহার আমলে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, ছাত্রেরাও বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। লীডার বলেন যে এই কাজে একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে নিযুক্ত করিলে ভাল হয়, এবং বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম করিয়াছেন। লাহোরের পঞ্জাবী নামক ইংরাজী সংবাদপত্রও এই মতের সমর্থন করেন। কিন্তু একথাও বলিয়াছেন যে অধ্যাপক রায় মহাশয়কে নিযুক্ত করার পক্ষে একমাত্র ব্যাঘাত এই যে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানকলেজের রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, চেষ্টা করিলে উভয় কাজের জন্যই যে ভারতীয় অধ্যাপক পাওয়া যায় না, এরূপ বোধ হয় না। তাতার বিজ্ঞানমন্দিরের উদ্দেশ্যসিদ্ধি, ভারতীয় রাসায়নিক নিয়োগ না করিলে, সুদূর-পরাহত বলিয়া বোধ হয়। যে যে দেশে রাসায়নিক নানা শিল্পের উন্নতি হইয়াছে, তাহারা সকলেই ভারতবাসীদিগকে ক্রেতা রাখিতেই ব্যগ্র। সে-সব দেশের কোন অধ্যাপক সমস্ত হৃদয়ের সহিত ভারতীয় ছাত্রদিগকে রাসায়নিক শিল্প শিখাইয়া স্বজাতির মুখের অন্ন কাড়িয়া লইবার সাহায্য করিবেন, ইহা খুব সম্ভব মনে হয় না। অধ্যাপক রায় মহাশয় বিস্তর নূতন রাসায়নিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে যেমন তাঁহার দক্ষতা, তেমনি তাঁহার উৎসাহ। তাঁহার অনেক ছাত্রও রাসায়নিক আবিষ্কার দ্বারা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাহার পর তিনি একটি প্রসিদ্ধ রাসায়নিক কারখানার স্থাপনকর্ত্তা ও পরামর্শদাতা। কেমন করিয়া নানা রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা তিনি বেশ শিখাইতে পারেন। তাঁহার স্বদেশহিতৈষণা ও নানাপ্রকারের ছাত্রহিতৈষণার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। কলিকাতা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিবে না। কিন্তু তিনি বাঙ্গালোরের বিজ্ঞানমন্দিরের পরিচালক হইলে আমরা আনন্দিত হইব না, এ কথাই বা কেমন করিয়া বলি?

অধ্যাপকের প্রতি অবিচার। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার পনের বৎসর পাটনা কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকতা করিতেছেন। তিনি তথায় এম্ এ পর্য্যন্ত পড়ান। অধ্যাপনা-কার্য্যে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের নানা প্রাচীন সহরে ঘুরিয়া মোগল রাজত্বকাল সম্বন্ধে প্রাচীন বহুসংখ্যক ফারসী হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য নানা দেশে এইরূপ যত হস্তলিপি নানা পুস্তকালয়ে ও মিউজিয়মে রক্ষিত আছে, তিনি বহু চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে সে সকলের নকল আনাইয়াছেন। তাহার পর তৎসমুদয় বহুশ্রমে পাঠ করিয়া তাহা হইতে ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার করিয়া ঐতিহাসিক প্রবন্ধ

ও পুস্তক লিখিয়াছেন। স্বদেশে বিদেশে ঐতিহাসিক বলিয়া তাঁহার প্রভূত খ্যাতি হইয়াছে। মোগল শাসনকাল সম্বন্ধে জীবিত ঐতিহাসিকগণের মধ্যে তাঁহার কথা এখন স্বদেশে বিদেশে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়। তিনি যে অতি সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারেন, ইহা ইংরাজেরাও স্বীকার করেন। এম্‌,এ, পরীক্ষায় ইংরাজী রচনায় ১০০ নম্বরের মধ্যে অধ্যাপক জেম্‌স্ যখন তাঁহাকে ৯৫ দিয়াছিলেন, তখনই বুঝা গিয়াছিল, কালে তিনি কিরূপ সুলেখক হইবেন। তিনি যে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়াছিলেন, তাহা শিক্ষিত বাঙ্গালীর অজ্ঞাত নহে। তিনি এম্‌ এ পরীক্ষায় পর্য্যন্ত পরীক্ষকের কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ পাণ্ডিত্য, ঐতিহাসিক গবেষণাশক্তি, অধ্যাপনায় দক্ষতা এবং ইংরেজী লেখায় কৃতিত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে কাজ করেন; ইংরেজদের প্রায় একচেটিয়া, উচ্চতর, "ভারতীয়" শিক্ষাবিভাগে স্থান পান নাই। এই ত এক অবিচার। তাহার উপর আর এক অবিচার এই হইতেছে যে পাটনা কলেজেই তাঁহার উপর একজন ইংরেজকে ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইতেছে। তাঁহার নাম ডবলিউ আউষ্টন্ স্মিথ্। তিনি যে যোগ্য লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যদুবাবুর সমান যোগ্য নহেন, যোগ্যতর ত নহেনই। স্মিথ সাহেবের বন্ধুগণ বলেন, তিনি কেম্ব্রিজের বি এ পরীক্ষায় ইতিহাসে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। যদুবাবু কলিকাতার এম্ এতে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও তৎপরে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। যখন আমরা পৃথিবীর কোন খবর রাখিতাম না, তখন কেহ বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই দেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকৃষ্টতম ছাত্র অপেক্ষা তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া ধরিয়া লইতাম। এখন কিঞ্চিৎ খবর রাখি, এবং দেশী বিলাতী দুরকম গ্রাজুয়েটের নমুনাও দেখিয়াছি। সুতরাং কেম্ব্রিজের বিএতে দ্বিতীয় হইলেই তাহাকে কলিকাতার এম-এতে প্রথমস্থানীয় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারি না। স্মিথ সাহেবের বন্ধুগণ আর এক কথা এই বলেন যে কেম্ব্রিজের পরীক্ষায় তাঁহার নীচে হইয়াছিল এমন একজন সিবিল সার্বিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিবিলিয়ান হইয়াছেন। পরীক্ষায় যদুবাবুর অনেক নিম্নস্থানীয় একজন লোকও সিবিলিয়ান হইয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়েও স্মিথ্ সাহেব যদুবাবু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। মিঃ স্মিথ এম্ এর পরীক্ষক হইয়াছেন। এ কাজ যদুবাবু তাঁহার চেয়ে অনেক আগে হইতেই করিতেছেন। স্মিথ্ সাহেব ১৯০৯ সাল হইতে ৫ বৎসর অধ্যাপকতা করিতেছেন। কিন্তু যদুবাবু ২১ বৎসর অধ্যাপকতা করিতেছেন; তন্মধ্যে ১৬ বৎসর গবর্ণমেণ্ট কলেজে কাটাইয়াছেন। স্মিথ্ সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো; যদুবাবু নহেন। কিন্তু সকলেই জানেন, কেবল বিদ্যাবত্তার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হওয়া যায় না। তাহা হইলে, জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ফেলোও নহেন, এমনটি ঘটিত না। স্মিথ্ সাহেব এম্-এ পড়ান নাই, যদুবাবু অনেক বৎসর ধরিয়া এম্-এ পড়াইতেছেন। যদুবাবু ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়া ও পুস্তক লিখিয়া যোগ্য ইংরেজ লেখক ও সমালোচকদিগের দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছেন, স্মিথ সাহেবের এরূপ কোন কৃতিত্ব নাই।

ইংরাজী গীতাঞ্জলি। রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলি আট লক্ষের উপর বিক্রী হইয়াছে। ইহা ছোট গল্প নয়, উপন্যাস নয়, নাটক নয়, কতকগুলি ভগবদ্বিষয়ক কবিতার গদ্যানুবাদ। ইহার এত বিক্রী দ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যায় যে ইংরেজী যাহাদের মাতৃভাষা তাহারা সকলেই বিষয়সুখে মত্ত বা বিষয়সুখের জন্য লালায়িত নহে। অনেকের ধর্ম্মপিপাসা আছে, এবং ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা উচ্চতর আনন্দ তাঁহারা বুঝেন।

বাঙ্গলা গীতাঞ্জলি আনুমানিক চারি হাজার বিক্রী হইয়াছে।

স্বাবলম্বী ছাত্র। আমেরিকার সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেক ছাত্র আছে যাহারা দরিদ্র, নিজে পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা হইতেই পড়াশুনার ব্যয় নির্ব্বাহ করে। ভারতীয় কতকগুলি ছাত্রও এই ভাবে আমেরিকায় শিক্ষালাভ করিয়াছে; অনেকে এখনও করিতেছে। সেখানে ছাত্রেরা কোন কাজকেই তুচ্ছ মনে করে না। ঘর ঝাঁট দেওয়া ও সাফ্ করা, মাঠে চাষের কাজ করা, দোকানে জিনিষ বিক্রী করা বা খাতা লেখা, হোটেলে খাদ্য পরিবেষণ করা বা বাসন মাজা, রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বালা ও নিবান, প্রভৃতি নানাবিধ কাজ তাহারা করে। সে-কালে আমাদের দেশের অনেক কৃতী লোক ছাত্রাবস্থায় কোন সচ্ছল অবস্থার লোকের বাড়ীতে রাঁধিয়া বা বাসন মাজিয়া ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। পুরাকালে গুরুর জন্য ভিক্ষা করা ছাত্রদের নিত্যকর্ম্ম ছিল। অনেককে গোরু চরাইতে হইত। রন্ধনের ও যজ্ঞের জন্য বন হইতে কাঠ কাটিয়া কুড়াইয়া আনাও তাহাদের একটা কাজ ছিল। সুতরাং ছাত্রজীবনে শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজ করা আমাদের দেশেও একটি প্রাচীন রীতি।

বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতায় ও অন্যান্য যে-সকল যায়গায় কলেজ আছে তথায় অনেক দরিদ্র ছাত্র পড়িতে আসে। তাহারাও উপার্জ্জন করিতে প্রস্তুত। কিন্তু এক গৃহশিক্ষকতা ভিন্ন আর কোন রকমের কাজ তাহাদের জুটে না। তাহাও ত সকলের জুটিতে পারে না। প্রতি বৎসরই অনেক ছাত্র আমাদিগকে গৃহ-শিক্ষকতা জুটাইয়া দিতে অনুরোধ করেন, কারণ আমরা প্রায় বিশ বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আর সে কাজ করি না, গৃহশিক্ষক কাহার প্রয়োজন সে সংবাদও বড় একটা আমাদের নিকট পৌঁছে না। ২।১ বৎসর আগে আমাদের কয়েক জন বন্ধু, গৃহশিক্ষকতা ছাড়া আর কি কি কাজ ছাত্রেরা রোজ ২।১ ঘণ্টা করিয়া পড়াশুনার খরচ চালাইতে পারে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ করিবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু এই চেষ্টা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। অথচ ইহা করা খুব দরকার।

কুলি আইন। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে গত ১লা জুলাই হইতে, যে আইনের জোরে কুলিদিগকে চুক্তিবদ্ধ করিয়া আসামের চা-বাগানে লইয়া যাওয়া হইত, তাহা উঠিয়া গিয়াছে। সংবাদ-পত্রের মধ্যে "সঞ্জীবনী" এই আইনজনিত অত্যাচার প্রকাশ ও দমন করিবার জন্য ও তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করিয়াছেন। ভারত-সভার পক্ষ হইতে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিপদ সম্ভাবনা সত্ত্বেও স্বয়ং চাবাগানে গিয়া কুলিদের দুর্দ্দশার কথা জানিয়া আসিয়া প্রকাশ করেন। ভারতসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও এইরূপ কাজ কিছু করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ও কুলিদের অবস্থা দেখিয়া কুলিকাহিনী লিখিয়া-ছিলেন।

চুক্তিবদ্ধ কুলিদের কয়জন যে চুক্তিটার কথা জানিত বা বুঝিত, বলা যায় না। হাজার হাজার নরনারীকে ভুলাইয়া বা ভয় দেখাইয়া কুলির আড়কাটিরা চাবাগানে লইয়া যাইত। তথায় তাহারা বাজার-দর অনুসারে যথেষ্ট মজুরী পাইত না, অধিকন্তু অনেকের উপর নানাবিধ অত্যাচার হইত। কিন্তু যদি এই আইন-অনুসারে চুক্তিবদ্ধ কুলিরা বেশী মজুরী পাইত, যদি তাহাদের প্রতি কোন অত্যাচার না হইত, তাহা হইলেও স্বাধীনতাহীন দাসের মত মজুরী কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। মানুষ পশু নহে। তাহার শরীরটি হৃষ্টপুষ্ট থাকিলেই তাহার পরমমঙ্গল হয় না। তাহার আত্মার, হৃদয় মনের, উন্নতি চাই। কিন্তু স্বাধীনতা ভিন্ন এই উন্নতি হইতে পারে না। সাংসারিক কোন সুবিধার জন্যই স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না।

শিক্ষার্থী যায় কোথা? জার্মেনীর নিম্ন প্রাথমিক ইস্কুলগুলিতে যাহা শিখান হয়, আমাদের এণ্ট্রেন্স স্কুলগুলিতে প্রায় ততদূর শিখান হয়। জার্মেনীর উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের উপরের ক্লাসগুলিতে আমাদের বি-এ, বি-এস্‌সী ক্লাসের সমান পড়ান হয়। জার্মেনীর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা পড়িতে যায়, তাহারা আমাদের দেশের গ্রাজুয়েটদের সমান শিখিয়া তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত ৫১,৭০০ জন ছাত্র জার্মেনীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়ে। ইহারা কতকটা আমাদের দেশের এম্-এ ক্লাসের ছাত্রদের মত। জার্মেনীর লোকসংখ্যা ৬ কোটি, ৪৯ লক্ষ, ২৫ হাজার, ৯৯৩। বাঙ্গলার লোকসংখ্যা ৪ কোটি, ৬৩ লক্ষ, ৫ হাজার ৬৪২। মোটামুটি ধরা যাক্ যে জার্মেনীর লোকসংখ্যা বাঙ্গলার দেড়গুণ। অতএব, বঙ্গের এম্-এ ক্লাসগুলিতে যদি ৩৪,০০০ ছাত্র থাকিত, তাহা হইলে মনে করা যাইতে পারিত যে দেশে বেশ উচ্চশিক্ষার বিস্তার হইতেছে। কিন্তু এত বড় দুরাশা সম্প্রতি করা ভাল নয়। অতএব মানিয়া লওয়া যাক্ যে জার্মেনীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা শিক্ষায় সমান অগ্রসর। তাহা হইলে বঙ্গের কলেজগুলিতে যদি ৩৪,০০০ ছাত্র থাকে, তবে মনে করিতে পারা যায় যে আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার মন্দ হইতেছে না। কিন্তু বঙ্গে কলেজগুলির ছাত্রসংখ্যা মোট ১৫,৭৩৮। দেখা যাইতেছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত উচ্চ শিক্ষার বিস্তার বাঙ্গলাদেশে জার্মেনীর অর্দ্ধেকও হয় নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে জার্মেনীতে সব শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় না। নানারকম শিল্প, নানারকম ব্যবসা, নানারকম বৃত্তি (যেমন স্থলসৈনিকের, নৌযোদ্ধার, বনরক্ষকের, খনিকারের), হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষা করে। সে সব আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়।

এই ত উচ্চশিক্ষার অবস্থা। ইহাতেই একটা মহা চীৎকার উঠিয়াছে, বড় বেশী ছেলে শিক্ষা পাই-তেছে। তাহা সত্য নহে। জিজ্ঞাসা করা হয়, এত ছেলের লেখা পড়া শিখিয়া কি হইবে? আমরা জানি সবাই চাকরী পাইবে না, উকীল হইলেও সকলের মক্কেল জুটিবে না। কিন্তু যেই লেখা পড়া শিখিবে তাহার চোখ ফুটিবে। শিক্ষার সেইটাই একটা প্রধান কথা। সেইজন্য সকলেরই শিক্ষা পাওয়া আবশ্যক।

আজকাল প্রতি বৎসরই কতকগুলি ছাত্র কলেজে স্থান পায় না। ইহা শুধু যে বাঙ্গালা দেশেই ঘটিতেছে, তাহা নয়; ভারতবর্ষের আরও অনেক প্রদেশের অবস্থা এইরূপ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম এই যে এক এক শ্রেণীতে ১৫০র বেশী ছাত্র হইলে একটি শ্রেণীর

দুটি বিভাগ খুলিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু একটি নূতন বিভাগ খুলিতে হইলেই তাহার জন্য একটী বড় কামরা ও তাহার মত আসবাব চাই। এবং কয়েকটি ছোট কামরা চাই; কেন না ছাত্রেরা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা করে। তাহার পর বিভাগ বাড়াইলেই অধ্যাপকও বাড়াইতে হয়। যদি বিজ্ঞানের ছাত্র বেশী হয় তাহা হইলে ত সমস্যা আরও গুরুতর। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার বড় করা, তাহার সরঞ্জাম বাড়ান আরও কঠিন। যাহা হউক, এক এক শ্রেণীর বিভাগ বাড়ান, বা নূতন কলেজ স্থাপন, ইহা ভিন্ন আর তৃতীয় উপায় নাই। দুটি উপায়ের মধ্যে বিভাগ বাড়ানই অপেক্ষাকৃত সহজ কারণ, নূতন কলেজ করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আইন ও নিয়মাবলী অনুসারে এরূপ কঠিন করা হইয়াছে, যে ন্যূনকল্পে এখন আর ৩।৪ লক্ষ টাকা মূলধন ব্যতিরেকে উহা সম্ভবপর নহে। এই টাকা কে দিবে? তদ্ভিন্ন, কলিকাতায় তবু টাকা হইলেই চলে। মফঃস্বলে টাকা যিনিই দেন না কেন, কার্য্যতঃ কর্তৃত্ব জেলার মাজিষ্ট্রেট করিবেন। তাঁহার কাছে কলেজের উদ্যোক্তাদিগকে নানাবিধ বচন শুনিতে হইবে, ইহাও নিশ্চিত। ইহাও ক বিভীষিকা। কিন্তু অসুবিধা ও লাঞ্ছনা যত প্রকারই থাক্ না কেন, ছাত্রেরা ত আমাদেরই ছেলে। তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

পরিতাপের বিষয় এই যে কোন কোন কলেজে স্থান থাকিলেও কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক শ্রেণীতে ১৫০ করিয়া ছাত্র ভর্ত্তি করেন না।

যে-সকল কলেজ ঘর বাড়াইবার টাকা পাইলেই বিনা বাধায় নূতন বিভাগ খুলিতে পারেন, তাঁহাদের সাহায্য করা সর্ব্বসাধারণের একান্ত কর্ত্তব্য।

শিক্ষার আর এক পথ জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ খুলিয়াছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এই পরিষদের অধীন শিক্ষালয়গুলির প্রতি পুলিসের দৃষ্টি পড়িবার সুবিধা ও সুযোগ হওয়ায়, এবং আমাদের দেশে, গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত, সাহায্যপ্রাপ্ত বা জানিত (recognised) শিক্ষালয়ে শিক্ষা না পাইলে, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত পরীক্ষায় পাশ না হইলে, জীবিকানির্ব্বাহের উপায় সহজ হয় না বলিয়া, পরিষদের কার্য্য সামান্য ভাবে চলিতেছে। স্বাধীন বৃত্তি ও ব্যবসা দেশে যদি বেশী রকমের থাকিত তাহা হইলে এরূপ হইত না। সরকারী শিক্ষাপ্রণালীর অনেক দোষ ত্রুটি আছে। সে কারণে অন্য নানা রকমের শিক্ষাপ্রণালীর আবশ্যক ত আছেই! কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিলেও, দিন কাল যেরূপ পড়িতেছে, তাহাতে জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎকে বাঁচাইয়া রাখা দরকার। ক্রমে ক্রমে ইহার কার্য্যক্ষেত্রও বিস্তৃত করিতে হইবে। আমরা রাষ্ট্রীয় অধিকার ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বপ্রকার বৈধ চেষ্টার পক্ষপাতী। যাঁহারা সেরূপ চেষ্টা করেন, তাঁহারা দেশের বন্ধু। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, যে-কোন কাজের মধ্যে রাজকর্ম্মচারীরা রাজনৈতিক গন্ধ পান, তাহা চালান কঠিন হইয়া উঠে। এই জন্য, দেশে এমন একদল লোক হইলে ভাল হয়, শিক্ষার বিস্তারই যাঁহাদের একমাত্র জনহিতকর কার্য্য হইবে। এই কাজ এত বড় যে তাহাতে এক এক জন মানুষের সমস্ত জীবন ব্যয়িত হইতে পারে।

ইস্কুলের ছাত্রসংখ্যা। ঢাকা বিভাগের ইন্‌স্পেক্‌টর ষ্টেপলটনসাহেব কতকগুলি বড় ইস্কুল সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন যে তাহার অর্থ এই যে ইস্কুলগুলিতে পাঁচ ছয় শতের বেশী ছাত্র রাখা চলিবে না। কোথাও ব'লতেছেন, নীচের কয়েকটি ক্লাস তুলিয়া দাও, কোথাও বলিতেছেন, প্রথম শ্রেণীতে ৪০টির বেশী ছাত্র লইতে পারিবে না; একটি নূতন বিভাগ খুলিয়াও ছাত্র লইতে পারিবে না; যদি বিভাগ খোল, ত, নির্দ্দিষ্ট ২।০ টাকা বেতনের পরিবর্ত্তে ৪৲ টাকা করিয়া লইতে হইবে; ইত্যাদি। কিন্তু ইস্কুলগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন, বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাসে যত ছাত্র লইবার নিয়ম করিয়াছেন, বিভাগ খুলা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাদের তাহাই মানা উচিত। ষ্টেপল্টন সাহেবের জানা উচিত যে স্কুলে উর্দ্ধসংখ্যা কত ছাত্র থাকিতে পারে, সে বিষয়ে কোন প্রাকৃতিক নিয়ম নাই, বিলাতে কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারত-গবর্ণমেণ্ট বা বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কোন সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই। তিনি কেন প্রভুত্ব ফলাইতেছেন? তিনি যদি নূতন ইস্কুল খুলিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে না হয়, পুরাতন বড় ইস্কুলগুলির কতক ছাত্র নূতন ইস্কুলে যাইতে পারে। সেরূপ বন্দোবস্ত না হইলে পুরাতন ইস্কুল হইতে যে-সব ছেলের নাম কাটা যাইবে, তাহারা কোথায় পড়িবে, কি করিবে? তাহারা যদি অকর্ম্মা অবস্থায় এনার্কিষ্ট বা "রাজনৈতিক" ডাকাইতদের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া তাহাদের দলে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে এই শোচনীয় পরিণামের জন্য কে দায়ী হইবে? দায়ী যেই হউক, এই অনিষ্টাশঙ্কার প্রতিষেধ কিরূপে সম্ভব, এই কুফলের প্রতিকার কেমন করিয়া করা যায়, তাহাও ত ভাবা উচিত।

বিলাতের বিখ্যাত রাগবী, হেরো এবং সেণ্টপল্‌স্ স্কুলগুলির প্রত্যেকটিতে প্রায় ৬০০ ছাত্র আছে। ঈটন্ স্কুলে এক হাজারের উপর ছাত্র পড়ে। জাপানের কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় খুব বড়। কয়েকটিতে ১০০০এর বেশী করিয়া ছাত্র আছে। বৃহত্তমটিতে
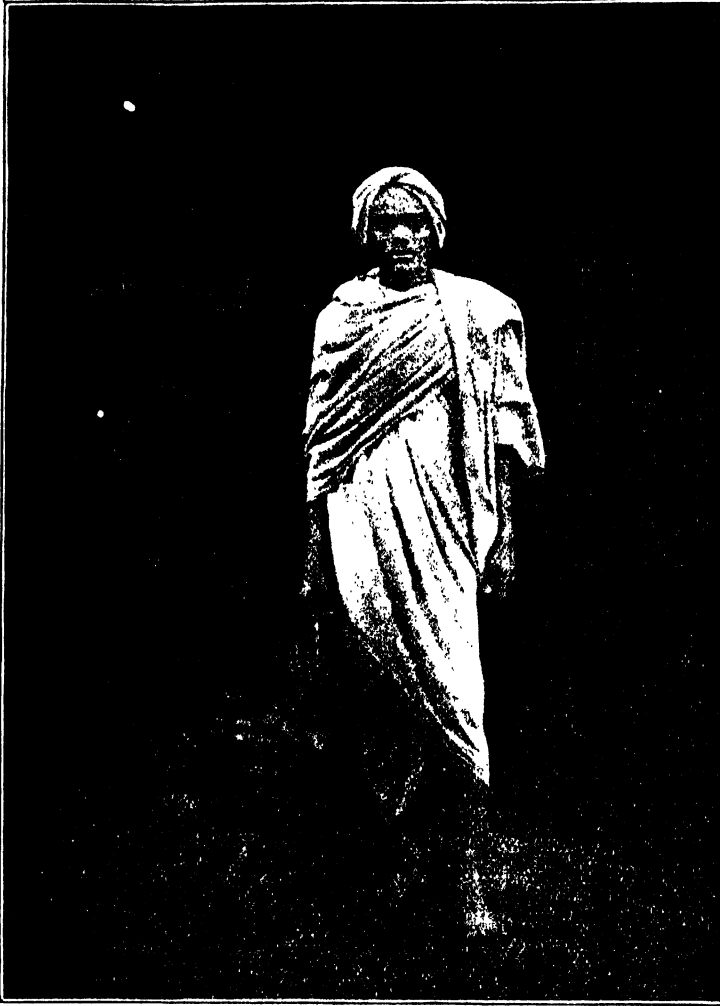
সাধু নিত্যানন্দ দাস। (বীরভূমি হইতে গৃহীত)

সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় শিখে ২৩০০ ছাত্র এবং উচ্চতর বিষয় শিখে ১২৭০ জন ছাত্র; মোট ছাত্রসংখ্যা ৩৫৭০, এবং শিক্ষকের সংখ্যা ৪৯! য়োকোহামার একটি সাধারণ উচ্চতর বিদ্যালয়ে ২১০০ ছাত্র পড়ে, আর একটিতে ১২৫০ পড়ে। অনেক মধ্যম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ছয় শত সাত শত আট শত ছাত্র পড়ে।

এক এক ক্লাসে ১০।১২টি ছেলে থাকিলে পড়ান খুব ভাল হয় সত্য; কিন্তু প্রত্যেক ক্লাসে কত ছাত্র থাকিবে, সে বিষয়ে অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। ইংলণ্ডে যখন জোসেফ ল্যাঙ্কেষ্টার শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক ইস্কুল খুলেন, তখন প্রত্যেক ক্লাসে ৬০ হইতে ৮০ জন ছাত্র ছাত্রী পড়িত। জাপানের সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে এক এক ক্লাসে ৭০ জনের বেশী এবং উচ্চতর-গুলিতে ৬০ জনের বেশী ছাত্র থাকা অবাঞ্ছনীয় মনে করা হয়। এই সংখ্যা বেশী, কিন্তু ব্যয়সংক্ষেপের জন্য জাপানীরা এইরূপ করিতে বাধ্য হয়। আমরা কি তাহাদের চেয়ে ধনী, না শিক্ষার বিস্তার আমাদের দেশে বেশী হইয়াছে?

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ মাতৃমন্দির। বৈধব্য অবস্থায় সন্তান-সম্ভাবনা হইলে অনেক স্ত্রীলোক কোন তীর্থস্থানে গিয়া নানা উপায়ে নিজের কলঙ্ক গোপন করিতে চেষ্টা করে। নবদ্বীপে প্রতি বৎসর এইরূপ প্রায় ৬০০ স্ত্রীলোক আসে। দুর্ব্বৃত্ত-দের সাহায্যে অনেকের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে নষ্ট হয়, কাহারও বা ভূমিষ্ঠ হইবার পরে নষ্ট হয়। যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারা বালিকা হইলে পতিতা নারীদের নিকট বিক্রীত হয় এবং বড় হইয়া পাপ-ব্যবসা করে। বালক হইলে তাহারা ভিক্ষা ও নানা প্রকার দুর্ব্বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

স্বর্গীয় সাধু নিত্যানন্দ দাস এই প্রকারের বিধবা স্ত্রীলোক ও তাহা-দের সন্তানগণের দুর্দ্দশা নিবারণের জন্য একটি মাতৃমন্দির স্থাপিত করেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসের ১৪ই তারিখে মাঘী মেলায় ওলাউঠারোগীদের সেবা করিতে করিতে তিনি স্বয়ং ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারান। এক্ষণে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মাতৃমন্দির একটি কমিটি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। নদিয়ার মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার সভাপতি, এবং শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ইহার সম্পাদক। বর্ত্তমানে মাতৃমন্দিরে ৮ টি শিশু, ৩ জন প্রসূতি ও শিশু পালনের জন্য ৫ জন ধাত্রী আছেন। সন্তান প্রসবের পর প্রসূতিগণকে তিনমাস রাখা হয়। এই সদনুষ্ঠানে সকলেরই সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

যীশুমাতা মেরী ও স্বর্গদূত

ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব

আমাদের বেদান্ত দর্শন ব্রহ্মের সগুণত্ব-নির্গুণত্বের বিচারে পরিপূর্ণ। বিষয়টি জটিল। শঙ্করাচার্য্যও যেন এ বিষয়ের বিচারে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিতেছেন :—"ব্রহ্ম কি তবে দুই? পর এবং অপর (নির্গুণ এবং সগুণ)? হয় হউক দুই।" (ব্রহ্মসূত্র ৪-৩-১৪)। "ব্রহ্ম এক।" "শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দ প্রমাণকং।" (২-১-২৭)। আমাদের পক্ষে এ আলোচনা "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" বামনের চাঁদ ধরার সাধের তুল্য মনে হইলেও আমরা তাহা করাই কর্ত্তব্য মনে করিতেছি, কারণ ইহা ভিন্ন আমাদের শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা অসম্ভব। তবে হয়ত আমাদের এই প্রয়াসকে অনেকে ঔদ্ধত্য অথবা দুর্ব্বিনয় মনে করিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন।

গুণ* শব্দকে প্রচলিত (attribute) অর্থে গ্রহণ করিয়া 'সগুণ ব্রহ্ম' এবং 'নির্গুণ ব্রহ্ম' এই পদদ্বয় সম্বন্ধে বিচার করিলে কি দাঁড়ায়, প্রথমে তাহাই দেখা যাউক। ব্রহ্ম সম্বন্ধে ন্যায়ের পদার্থ-বিচার প্রয়োগ করিলে বলিতে হয় ব্রহ্মও দ্রব্য পদার্থ। তবে ব্রহ্ম নিরবয়ব : সাবয়ব (extended) দ্রব্য পদার্থের ন্যায় ব্রহ্মেতে বিভাজ্যত্ব (Divisibility) গুণ নাই। ব্রহ্ম আত্মা। আমাদের আত্মাও অবিভাজ্য। তথাপি আত্মা স্বপ্নকালে যুগপৎ নানারূপে প্রকাশিত হয়। সেইরূপ ব্রহ্মেরও বিভাজ্যত্বের পরিবর্ত্তে যুগপৎ নানারূপে প্রকাশের শক্তি রহিয়াছে। সেই শক্তিই বেদান্তে মায়া নামে অভিহিত। "য একোঽবর্ণো বহুধা-শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।" (শ্বেতাশ্বতার ৪-১)। আবার ন্যায়ে দ্রব্য পদার্থের (substance) সহিত গুণ (attribute) এবং কর্ম্মের (acts) সম্বন্ধের নাম, সমবায় সম্বন্ধ (Different but not separable)। সমবায় সম্বন্ধ সাবয়ব ভৌতিক দ্রব্য সম্বন্ধে যেরূপ, নিরবয়ব আত্মা বা ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপই হইবে। পুষ্পাদি সাবয়ব দ্রব্য যেমন গুণী, এবং সৌন্দর্য্য সৌগন্ধাদি তাহার গুণ; ব্রহ্মও সেইরূপ গুণী, এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্তাদি তাঁহার গুণ। গুণী হইতে গুণকে পৃথক করা যায় না। গোবিশেষ হইতে গোত্বকে, জ্ঞানী-বিশেষ হইতে জ্ঞানকে পৃথক্ করিয়া প্রদর্শন করা যায় না, অথচ আমরা সর্ব্বদাই গোবিশেষকে স্মরণ না করিয়া গোত্বের এবং জ্ঞানীবিশেষকে স্মরণ না করিয়া জ্ঞানের আলোচনা করিয়া থাকি। বস্তুতঃ এই পৃথক্-করণ লোক-কল্পনা-সম্বন্ধী বা পুরুষতন্ত্র (mental abstraction), বস্তুতন্ত্র (concrete reality) নয়। শঙ্করাচার্য্য নিজে বস্তুতন্ত্র জ্ঞান এবং পুরুষতন্ত্র জ্ঞান বা কল্পনার ভেদ দৃষ্টান্ত দ্বারা এইরূপে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন :—

> "শ্রুতি বলিতেছে, হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি। এস্থলে পুরুষ বা মানুষেতে অগ্নিবুদ্ধি উপদেশজনিত মানসক্রিয়া বা কল্পনা মাত্র, বা পুরুষতন্ত্র। কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধ অগ্নিতে অগ্নিবুদ্ধি উপদেশজনিত মানসক্রিয়া বা কল্পনা মাত্র নয়। তবে কি? তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বা বস্তুতন্ত্র। অগ্নিতে অগ্নিবুদ্ধিকেই জ্ঞান বলা যায়। মানুষেতে অগ্নি-কল্পনার ন্যায় তাহাকে মানস-ব্যাপার মাত্র বলা যায় না। সকল প্রকার প্রমাণগম্য বস্তুজ্ঞান সম্বন্ধেই একথা সত্য যে তাহা বস্তুতন্ত্র, উপদেশজনিত মানসক্রিয়া মাত্র বা পুরুষতন্ত্র নয়।" ব্রহ্মসূত্র ১—১—৪ ॥

বস্তুতঃ গুণ-গুণী বা ক্রিয়া-ক্রিয়াবান্ পরস্পর অভিন্ন বা অবিভাজ্য, তাহাদের ভেদ বা বিভাগ কার্য্যোপযোগী লৌকিক কল্পনা মাত্র, বস্তুতন্ত্র নয়। শঙ্কর নিজেও তাঁহার সূত্রভাষ্যে "গুণ-গুণিনোরভেদাৎ"—গুণ-গুণীর অভেদের স্বতঃসিদ্ধ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন। গুণ-গুণীর অভেদ, পুষ্পাদি এবং তাহাদের সৌন্দর্য্য-সৌগন্ধাদি সাবয়ব সম্বন্ধে যেরূপ, নিরবয়ব ব্রহ্ম এবং তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্তাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদিযুক্ত পঞ্চভূত সম্বন্ধে যেরূপ, অশব্দ-অস্পর্শ-অরূপ-অব্যয় ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। নির্গুণ পুষ্প বলিলে যেমন শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-রহিত পুষ্প বুঝাইবে, নির্গুণ ব্রহ্ম বলিলেও সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্তাদি গুণরহিত ব্রহ্ম বুঝাইবে। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধরহিত বা নির্গুণ পুষ্প যেরূপ পুষ্প নামের অযোগ্য এবং অর্থশূন্য, সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বশক্তিমত্তাদি-রহিত বা নির্গুণ ব্রহ্মও সেইরূপ ব্রহ্ম নামের অযোগ্য এবং অর্থশূন্য। আবার প্রচলিত অর্থে সত্তা-চৈতন্যও কি গুণ নয়? নির্গুণ ব্রহ্ম বলিলে সত্তা

---

* গুণ শব্দ সত্ত্বাদি গুণত্রয় অর্থে অথবা বন্ধন-রজ্জু অর্থেও গ্রহণ করা যায়।

যীশুমাতা মেরী ও স্বর্গদূত।

লাহোর মিউজিয়মে রক্ষিত প্রাচীন চিত্র হইতে

ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব

আমাদের বেদান্ত দর্শন ব্রহ্মের সগুণত্ব-নির্গুণত্বের বিচারে পরিপূর্ণ। বিষয়টি জটিল। শঙ্করাচার্য্যও যেন এ বিষয়ের বিচারে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিতেছেন :—"ব্রহ্ম কি তবে দুই ? পর এবং অপর (নির্গুণ এবং সগুণ)? হয় হউক দুই।" (ব্রহ্মসূত্র ৪-৩-১৪)। "ব্রহ্ম এক।" "শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দ প্রমাণকং।" (২-১-২৭)। আমাদের পক্ষে এ আলোচনা "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" বামনের চাঁদ ধরার সাধের তুল্য মনে হইলেও আমরা তাহা করাই কর্ত্তব্য মনে করিতেছি, কারণ ইহা ভিন্ন আমাদের শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা অসম্ভব। তবে হয়ত আমাদের এই প্রয়াসকে অনেকে ঔদ্ধত্য অথবা দুর্ব্বিনয় মনে করিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন।

গুণ* শব্দকে প্রচলিত (attribute) অর্থে গ্রহণ করিয়া 'সগুণ ব্রহ্ম' এবং 'নির্গুণ ব্রহ্ম' এই পদদ্বয় সম্বন্ধে বিচার করিলে কি দাঁড়ায়, প্রথমে তাহাই দেখা যাউক। ব্রহ্ম সম্বন্ধে ন্যায়ের পদার্থ-বিচার প্রয়োগ করিলে বলিতে হয় ব্রহ্মও দ্রব্য পদার্থ। তবে ব্রহ্ম নিরবয়ব ; সাবয়ব (extended) দ্রব্য পদার্থের ন্যায় ব্রহ্মেতে বিভাজ্যত্ব (Divisibility) গুণ নাই। ব্রহ্ম আত্মা। আমাদের আত্মাও অবিভাজ্য। তথাপি আত্মা স্বপ্নকালে যুগপৎ নানারূপে প্রকাশিত হয়। সেইরূপ ব্রহ্মেরও বিভাজ্যত্বের পরিবর্ত্তে যুগপৎ নানারূপে প্রকাশের শক্তি রহিয়াছে। সেই শক্তিই বেদান্তে মায়া নামে অভিহিত। "য একোঽবর্ণো বহুধা-শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।" (শ্বেতাশ্বতর ৪-১)। আবার ন্যায়ে দ্রব্য পদার্থের (substance) সহিত গুণ (attribute) এবং কর্ম্মের (acts) সম্বন্ধের নাম, সমবায় সম্বন্ধ (Different but not seperable)। সমবায় সম্বন্ধ সাবয়ব ভৌতিক দ্রব্য সম্বন্ধে যেরূপ, নিরবয়ব আত্মা বা ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপই হইবে। পুষ্পাদি সাবয়ব দ্রব্য যেমন গুণী, এবং সৌন্দর্য্য সৌগন্ধাদি তাহার গুণ ; ব্রহ্মও সেইরূপ গুণী, এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্তাদি তাঁহার গুণ। গুণী হইতে গুণকে পৃথক করা যায় না। গোবিশেষ হইতে গোত্বকে, জ্ঞানী-বিশেষ হইতে জ্ঞানকে পৃথক্ করিয়া প্রদর্শন করা যায় না, অথচ আমরা সর্ব্বদাই গোবিশেষকে স্মরণ না করিয়া গোত্বের এবং জ্ঞানীবিশেষকে স্মরণ না করিয়া জ্ঞানের আলোচনা করিয়া থাকি। বস্তুতঃ এই পৃথক্-করণ লোক-কল্পনা-সম্বন্ধী বা পুরুষতন্ত্র (mental abstraction), বস্তুতন্ত্র (concrete reality) নয়। শঙ্করাচার্য্য নিজে বস্তুতন্ত্র জ্ঞান এবং পুরুষতন্ত্র জ্ঞান বা কল্পনার ভেদ দৃষ্টান্ত দ্বারা এইরূপে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন :—

> "শ্রুতি বলিতেছে, হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি। এস্থলে পুরুষ বা মানুষেতে অগ্নিবুদ্ধি উপদেশজনিত মানসক্রিয়া বা কল্পনা মাত্র, বা পুরুষতন্ত্র। কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধ অগ্নিতে অগ্নিবুদ্ধি উপদেশজনিত মানসক্রিয়া বা কল্পনা মাত্র নয়। তবে কি ? তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বা বস্তুতন্ত্র। অগ্নিতে অগ্নিবুদ্ধিকেই জ্ঞান বলা যায়, মানুষেতে অগ্নি-কল্পনার ন্যায় তাহাকে মানস-ব্যাপার মাত্র বলা যায় না। সকল প্রকার প্রমাণগম্য বস্তুজ্ঞান সম্বন্ধেই একথা সত্য যে তাহা বস্তুতন্ত্র, উপদেশজনিত মানসক্রিয়া মাত্র বা পুরুষতন্ত্র নয়। ব্রহ্মসূত্র ১—১—৪ ॥

বস্তুতঃ গুণ-গুণী বা ক্রিয়া-ক্রিয়াবান্ পরস্পর অভিন্ন বা অবিভাজ্য, তাহাদের ভেদ বা বিভাগ কার্য্যোপযোগী লৌকিক কল্পনা মাত্র, বস্তুতন্ত্র নয়। শঙ্কর নিজেও তাঁহার সূত্রভাষ্যে "গুণ-গুণিনোরভেদাৎ"—গুণ-গুণীর অভেদের স্বতঃসিদ্ধ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন। গুণ-গুণীর অভেদ, পুষ্পাদি এবং তাহাদের সৌন্দর্য্য সৌগন্ধাদি সাবয়ব সম্বন্ধে যেরূপ, নিরবয়ব ব্রহ্ম এবং তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্তাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধাদিযুক্ত পঞ্চভূত সম্বন্ধে যেরূপ, অশব্দ-অস্পর্শ-অরূপ-অব্যয় ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। নির্গুণ পুষ্প বলিলে যেমন শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-রহিত পুষ্প বুঝাইবে, নির্গুণ ব্রহ্ম বলিলেও সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্তাদি গুণরহিত ব্রহ্ম বুঝাইবে। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধরহিত বা নির্গুণ পুষ্প যেরূপ পুষ্প নামের অযোগ্য এবং অর্থশূন্য, সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বশক্তিমত্তাদি-রহিত বা নির্গুণ ব্রহ্মও সেইরূপ ব্রহ্ম নামের অযোগ্য এবং অর্থশূন্য। আবার প্রচলিত অর্থে সত্তা-চৈতন্যও কি গুণ নয় ? নির্গুণ ব্রহ্ম বলিলে সত্তা

---

* গুণ শব্দ সত্ত্বাদি গুণত্রয় অর্থে অথবা বন্ধন-রজ্জু অর্থেও গ্রহণ করা যায়।

এবং চৈতন্যরহিত ব্রহ্মই বা না বুঝাইবে কেন? আবার, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-যুক্ত বা সগুণ পুষ্প,—এ কথা যেরূপ পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট, সর্ব্বজ্ঞত্বাদিযুক্ত বা সগুণব্রহ্ম—একথাও সেইরূপ পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট। এইরূপে আমরা দেখিতেছি ব্রহ্মের সগুণ-নির্গুণ ভেদ বিচারকর্ত্তা পুরুষের মানসক্রিয়া বা কল্পনা মাত্র (mental abstraction)। তাহা বস্তুতন্ত্র (objective reality) হইতে পারে না। একই ব্রহ্মের মধ্যে সগুণ-নির্গুণের কোন ভেদরেখা থাকিতে পারে না। "গুণ-গুণিনোরভেদাৎ।"

আরো একটি কথা। সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে আমাদের সমস্ত জ্ঞান—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণজনিতই হউক, অথবা মানসক্রিয়ামাত্রই হউক, আমাদের সমস্ত জ্ঞানই—পুরুষ-তন্ত্র (Relativity of all knowledge)। বস্তু-তন্ত্রজ্ঞান (Dingan sich) আমাদের ইন্দ্রিয়-মনের অগোচর। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, শব্দ কর্ণসম্বন্ধী, স্পর্শ ত্বকসম্বন্ধী, রূপ চক্ষুসম্বন্ধী, রস জিহ্বাসম্বন্ধী, গন্ধ নাসিকা-সম্বন্ধী। যাহার শ্রোত্র-ত্বক-চক্ষুরাদি নাই—যেমন ঈশ্বর—তাহার সম্বন্ধে শব্দস্পর্শরূপাদি কেমন কে বলিবে। তিনি যাহা জানেন তাহাই পারমার্থিক সত্য, তাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর। আবার বিভিন্ন প্রাণী বা ব্যক্তির ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা লব্ধ জ্ঞান বিভিন্ন প্রকার, কিন্তু বস্তু এক। এজন্য বলা হয় চিনিতে কোন মিষ্টতা নাই, বিষ্ঠাতে কোন দুর্গন্ধ নাই, সঙ্গীতে কোন লালিত্য নাই; মিষ্টতা, দুর্গন্ধ, এবং লালিত্য সকলই আমাদের জিহ্বা, নাসিকা, এবং কর্ণের মধ্যে। চিনি আছে, বিষ্ঠা আছে, এবং সঙ্গীতও আছে, কিন্তু স্বতঃ তাহা কিরূপ আমরা জানি না। এজন্য বলা যায় বস্তু সকলের পরস্পর ভেদাভেদ সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত জ্ঞানই পুরুষতন্ত্র (Relative)। ইহারই বৈদান্তিক নাম অবিদ্যা (স্থানান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে)। বস্তুতন্ত্র জ্ঞান (absolute) আমাদের এইমাত্র যে বস্তু আছে, কিন্তু স্বতঃ সেই বস্তু কিরূপ, তাহা আমরা জানি না। (We know that it is, but not what it is)। এই অর্থে সকল বস্তু সম্বন্ধেই সগুণ নির্গুণ ভেদ সম্ভব, এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সম্ভব। আমাদের ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা পুষ্প যেরূপে গৃহীত হয়, তাহাই সগুণ পুষ্প, আর আমাদের ইন্দ্রিয়াদির অতীত পুষ্প স্বতঃ যেরূপ আছে, তাহাই নির্গুণ পুষ্প, নেতি-নেতি-স্বরূপ, সর্ব্ব-বিশেষ-বর্জ্জিত। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। ভক্তি উপসনাদি অথবা দর্শন, শ্রবণ, মনন, এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্মকে যতদূর উপলব্ধি করা যায়, তাহাই সগুণ ব্রহ্ম। আর যাহা আমাদের জ্ঞান ভক্তির অগোচর, তাহাই নির্গুণ ব্রহ্ম—"নেতি-নেতি-স্বরূপ সর্ব্ব-বিশেষ-বর্জ্জিত।" শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে বলিতেছেন—"পরব্রহ্ম কি? এবং অপরব্রহ্ম কি? যে স্থলে অবিদ্যাকৃত নামরূপাদি-বিশেষত্ব-প্রতিষেধ-পূর্ব্বক অস্থূলাদি শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাই পর (বা নির্গুণ)। আর যে স্থলে উপাসনার উদ্দেশ্যে সেই ব্রহ্মনাম রূপাদি বিশেষত্ব-যুক্ত বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে,—যথা "মনোময়, প্রাণ-শরীর, ভা-রূপ" ইত্যাদি, তাহাই অপর (বা সগুণ) ব্রহ্ম। (আপত্তি) এরূপ হইলে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব শ্রুতি বাধিত হয়। (উত্তর) তাহা নয়। নামরূপাদি উপাধির যোগ অবিদ্যাজনিত। এ কথাতেই বিরোধ পরিহৃত হইতেছে।" ৪—৩—১৪॥ শঙ্কর স্থানান্তরে অবিদ্যার এইরূপ সংজ্ঞা করিতেছেন:—"সতাং পরিদৃশ্যমানকার্য্যাণাং কারণানাং প্রত্যক্ষেণাগ্রহণং অবিদ্যা।"—ব্রহ্মসূত্র ২—২—১৫॥ যে-সকল কারণ বর্ত্তমান, এবং যে-সকল কারণের কার্য্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে, সেই-সকল কারণকে প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি না করার নাম অবিদ্যা।

আমরা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, অথবা মন দ্বারা চিন্তা করি,—বাহ্যই হউক অথবা মানসই হউক সকল ব্যাপারেরই দুইটি দিক্ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ,—চুম্বকের উত্তর এবং দক্ষিণ কেন্দ্রের ন্যায় একদিকে গ্রাহক আত্মা, অপরদিকে গ্রাহ্য বিষয়—বাহ্য অথবা মানস। গ্রাহ্য এবং গ্রাহক এই উভয় সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ। গ্রাহ্য বিষয় কোন বাহ্য বস্তুই হউক, অথবা বাসনা, ক্রিয়া, স্মৃতি, কল্পনা অথবা বিচার প্রভৃতি কোন মানস ব্যাপারই গ্রাহ্য বিষয় হউক—তাহাতে গ্রাহ্য-গ্রাহকের (object and subject) সম্বন্ধী সেই আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ ভেদ-জ্ঞানের কোন বিশেষ

নাই। আবার সেই গ্রাহকাত্মার প্রতি সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে তাহারা নেতি-নেতি-স্বরূপ বা সর্ব্ব-বিশেষ-বর্জ্জিত। * মণিহারের গ্রথনসূত্র যেমন মণি-গণ হইতে ভিন্ন, গ্রাহকাত্মাও সেইরূপ বাহ্য এবং মানস সর্ব্বপ্রকার গ্রাহ্য বিষয় হইতে ভিন্ন। আবার গ্রাহ-কাত্মা সর্ব্বপ্রকার গ্রাহ্যবিষয় হইতে ভিন্ন হইলেও সর্ব্ব-বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট 'সমস্তেষু বস্তুষনুস্যূতমেকং", এবং সর্ব্বপ্রকার বিষয় দ্বারা নিয়ত অনুরঞ্জিতের ন্যায় দেখায়। সর্ব্বপ্রকার অনিত্য বিষয়—বাহ্য এবং মানস—জল-প্রবাহের ন্যায় সেই গ্রাহকাত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে—"সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।" স্বচ্ছ কাচখণ্ড যেমন জবাদি যখন যে বর্ণের পুষ্পের সন্নিহিত থাকে, তাহারই বর্ণ গ্রহণ করে, সেই নির্ব্বিশেষ গ্রাহ-কাত্মাও সেইরূপ স্বয়ং স্বচ্ছ, বর্ণহীন স্ফটিকের ন্যায় হইয়াও "লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ" বা রাজসিক সাত্ত্বিক এবং তামসিক নানাপ্রকার বাহ্য এবং মানস অনুভূতি এবং ক্রিয়াত্মক গ্রাহ্য বিষয়ের যোগে "লোহিত—শুক্ল—কৃষ্ণ" নানাপ্রকার বর্ণ গ্রহণ করে। নির্ব্বিশেষ গ্রাহকাত্মার এই অনুরঞ্জিত অবস্থারই নাম সগুণ (relative) এবং তাহার স্বকীয় নির্ব্বিশেষ বা স্বচ্ছ এবং বর্ণরহিত অবস্থার নাম নির্গুণ (absolute)। নির্গুণ এবং সগুণ উভয় অবস্থাতেই সেই গ্রাহকাত্মা এক, পার্থক্য কেবল বিচারকর্ত্তার দৃষ্টিসম্বন্ধী বা পুরুষতন্ত্র মাত্র, বস্তুতন্ত্র বা নির্ব্বিশেষ আত্মাসম্বন্ধী নয়। বৃহদারণ্যকে যে আত্মা "অস্থূলমনণু" 'নেতি নেতি'-স্বরূপ বা নির্ব্বিশেষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, বৃহদারণ্যকেই আবার সেই আত্মার এইরূপ বর্ণনাও দৃষ্ট হয় ঃ—

"হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্রের ন্যায়, মেষলোমের পাণ্ডর বর্ণের ন্যায়, অগ্নির শিখার ন্যায়, অথবা পুণ্ডরীকের ন্যায় শুভ্র বলা হইয়াছে।"

ইহার উপরে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন ঃ—

"বস্ত্র যেমন হরিদ্রা দ্বারা রঞ্জিত হয়, চিত্তও সেইরূপ বস্ত্রাদি-বিষয়-সংযোগে তত্তদ্বিষয়ক বাসনা দ্বারা রঞ্জিত হয়। এই কারণে জীবকেও বস্ত্রাদির ন্যায় রঞ্জিত বলা যায়। বাহ্যবিষয়-অনুসারে অথবা চিত্ত-বৃত্তি অনুসারে কখনো কখনো এই রঞ্জনের ভাল মন্দ তারতম্য দৃষ্ট হয়—যেমন কাহারো কাহারো বাসনার রূপ জ্ঞানবিকাশের বৃদ্ধির অনুকূল।" জীবানন্দ পৃঃ ৪৩৩।

যদিও ব্রহ্মের এই সগুণ এবং নির্গুণ স্বরূপের বিভাগ পরবর্ত্তী দার্শনিকদিগের হস্তেই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি এই বিভাগের মূল আমরা ঋগ্বেদেই দেখিতে পাই। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে (১০-৯০-১, ৩, ৪) আমরা বিশ্ব-পুরুষের বিশ্ব সম্বন্ধী (Immanent) এবং বিশ্বাতীত (Transcendent) স্বরূপের বিভাগ দেখিতে পাই। তাহাই যে পরবর্ত্তী দার্শনিকদিগের হস্তে ব্রহ্মের সগুণ এবং নির্গুণ স্বরূপের বিভাগের ভিত্তি হইয়াছে—তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরুষ সূক্তে বলা হইতেছে—(১) "স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং।" এই ঋকের সায়ণ-ভাষ্যের অনুবাদ এইরূপ ঃ—

"সেই পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডগোলকস্বরূপ ভূমিকে সর্ব্বদিকে পরিবেষ্টন করিয়া দশাঙ্গুল পরিমিত স্থান অতিক্রম করিয়া ব্যবস্থিত আছেন। দশাঙ্গুল শব্দ উপলক্ষণার্থক। ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও সর্ব্বতঃ-ব্যাপী হইয়া তিনি ব্যবস্থিত আছেন।"

(২) "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতঃ দিবি"—

(৩) "ত্রিপাদ্ উর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ"—এই দুই ঋকের সায়ণ-ভাষ্যের অনুবাদ এইরূপ ঃ—

"কালত্রয়বর্ত্তী সমস্ত প্রাণীজাত সেই পুরুষের চতুর্থাংশ মাত্র। সেই পুরুষের অপর অংশত্রয় স্থানীয় অবশিষ্টভাগ অমৃতরূপে দ্যোতনাত্মক (স্বপ্রকাশ) লোকে ব্যবস্থিত আছেন। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" রূপে শ্রুতিতে উক্ত হওয়াতে সেই পরব্রহ্মের ইয়ত্তার অভাব। অতএব পাদচতুষ্টয়রূপে তাহার নির্দ্দেশ করা অসাধ্য। তথাপি এই জগৎ (যাহা তাঁহারই মহিমামাত্র এতাবানস্য মহিমা) ব্রহ্মস্বরূপের তুলনায় অত্যল্পমাত্র। ইহা বলিবার অভিপ্রায়েই পাদত্বের উল্লেখ করা হইতেছে।"

"সংসার-সংস্পর্শ রহিত সেই ত্রিপাৎ পুরুষ উর্দ্ধে অবস্থান করেন। তিনি অজ্ঞান কার্য্যভূত এই সংসারের বহির্ভূত, এবং তাহার দোষগুণ দ্বারা অসংস্পৃষ্ট। তিনি স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ উৎকর্ষের সহিত ব্যবস্থিত আছেন। এইরূপে ব্যবস্থিত সেই পুরুষের পাদমাত্র বা লেশমাত্র সৃষ্টি এবং সংহার-হেতু এই মায়াময় সংসার-মধ্যে পুনঃ পুনঃ আসিতেছে। এই-সমস্ত জগতের পরমাত্মলেশত্ব ভগবান্ কৃষ্ণও উপদেশ করিতেছেন ; বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।"

আমরা দেখিতেছি ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে পরব্রহ্ম বা বিশ্বপুরুষ এক,—বিশ্বসম্বন্ধী (Immanent) এবং বিশ্বাতীত (Transcendent) এই দুই রূপে বর্ণিত মাত্র। পর-ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ রেখা নাই, বা কোন বস্তুতন্ত্র ভেদ নাই। বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বাতীত ভেদ পুরুষতন্ত্র বা বৈদিক ঋষির ধারণা-সম্বন্ধী মাত্র। এই বৈদিক ভিত্তির উপরেই পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ ব্রহ্মের সগুণ এবং নির্গুণ

* "অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়-সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং"। মাণ্ডূক্য ১—৭॥

ভেদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহারা নানার্থক গুণ-শব্দ ব্যবহার করিয়া বিষয়টি অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। সায়ণ সংসারকে "অজ্ঞানকার্য্য", ("অস্মাৎ অজ্ঞান-কার্য্যাৎ সংসারাৎ") বা অবিদ্যা-জনিত বলিতেছেন, এবং তাহাকেই "মায়া" ("ইহ মায়ায়াং) নামে অভিহিত করিতেছেন। সেই মায়া ত্রিগুণাত্মিকা বা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ স্বরূপ। কেহ বা সেই মায়াকে সাংখ্য প্রকৃতি বা প্রধানের সহিত এক করিয়া প্রকৃতিকে সত্ত্বাদি ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদিও ঋগ্বেদের বিশ্বপুরুষের বিশ্বব্যাপী স্বরূপই পরবর্ত্তী দার্শনিকদিগের সগুণব্রহ্ম, এবং তাঁহার বিশ্বাতীত স্বরূপই পরবর্ত্তী দার্শনিকদিগের নির্গুণব্রহ্ম,—তথাপি উল্লিখিত নানা কারণে পরবর্ত্তী দার্শনিকদিগের সগুণ-নির্গুণ ভেদ বৈদিক ঋষির বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বাতীত ভেদের তুলনায় অত্যন্ত জটিল।

উপনিষদে যদিও সগুণ-নির্গুণ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না, তথাপি উপনিষদেও ব্রহ্মস্বরূপের দুইটি দিকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—এক দিক্ তাঁহার সবিশেষ বা পাঞ্চভৌতিক উপাধি সম্বন্ধ স্বরূপ, এবং অপর দিক্ তাঁহার নির্ব্বিশেষ বা পাঞ্চভৌতিক সর্ব্বপ্রকার উপাধি-রহিত স্বরূপ। বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মের সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ স্বরূপ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

"দ্বেবাব ব্রহ্মণোরূপে মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ, মর্ত্ত্যঞ্চামর্ত্ত্যঞ্চ, স্থিতঞ্চ যচ্চ, সচ্চ ত্যচ্চ"—ব্রহ্মের দুইটি রূপ মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত, মর্ত্ত্য এবং অমর্ত্ত্য, চল এবং অচল, সৎ এবং অসৎ।"

একাধারে সর্ব্ববিধ বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ! ন্যায়োক্ত বিরোধ দোষের (Law of contradiction) তবে কি গতি হইবে? এ প্রশ্নের আলোচনা পরে করা যাইতেছে। উল্লিখিত শ্রুতিবচনের তাৎপর্য্য শঙ্কর এইরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

"কার্য্যকরণাত্মক এই পঞ্চভূতই সত্যরূপে প্রতীয়মান। এই পঞ্চভূতজনিত উপাধি-সকলের অপনয়ন দ্বারা নেতি-নেতি-স্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করাই অভিপ্রায়। পঞ্চভূতজনিত কার্য্যকরণ সম্বন্ধ হওয়াতে, ব্রহ্মের দুইটি রূপ মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত, মর্ত্ত্য এবং অমর্ত্ত্য। (ব্রহ্ম) একদিকে পঞ্চভূতজনিত বাসনা-সম্বন্ধ, অপর দিকে ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমৎ। এই কারণে (অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক কার্য্যকরণ সম্বন্ধ হওয়াতে) ব্রহ্ম (একদিকে) সোপাখ্য বা শব্দাদি প্রত্যয়ের বিষয়, এবং ক্রিয়াকারক ফলাত্মক সর্ব্ব ব্যবহারের আস্পদ হইতেছেন, (অপর দিকে) আবার পাঞ্চভৌতিক উপাধিজনিত সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব দূরীকৃত হইলে, সেই ব্রহ্মই অব্যয়, অজর, অমৃত, অভয়, এবং বাক্যমনের অগোচর রূপে সম্যক্ জ্ঞানের বিষয় হইতেছেন। অদ্বৈতত্ব হেতু তাহাকেই নেতি নেতি রূপে নির্দ্দেশ করা যায়।" জীবানন্দ পৃঃ ৪১৫।

"অতো আদেশো নেতি নেতি"—এই শ্রুতি বচনের ভাষ্যে শঙ্কর আবার বলিতেছেন :—

"এইরূপে পাঞ্চভৌতিক সত্যবস্তুর স্বরূপ বর্ণনা শেষ করিয়া যাহাকে সেই সত্যেরও সত্য বলা যায় সেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। সেই নির্দ্দেশ কি? নেতি নেতিই সেই নির্দ্দেশ। 'নেতি নেতি' বাক্য দ্বারা সত্যের সত্য সেই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ কিরূপে সম্ভব? সর্ব্বপ্রকার উপাধি-বিশেষের পরিত্যাগ দ্বারা। কারণ ব্রহ্মের মধ্যে কোনপ্রকার বিশেষত্ব নাই। নাম, রূপ, কর্ম্ম, পৃথকত্ব, জাতি, গুণ ইত্যাদি বিশেষত্ব দৃষ্টেই শব্দ প্রযুক্ত হয়। এ সকল বিশেষের মধ্যে কোন বিশেষই ব্রহ্মের মধ্যে বর্ত্তমান নাই। গো সম্বন্ধে যেমন লোকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে 'এইটি গো' 'ইহা চলিতেছে' 'ইহা শুক্লবর্ণ,' 'ইহা শৃঙ্গযুক্ত,' ইত্যাদি, ব্রহ্মের সম্বন্ধে 'ইদং তদ্'—'ইহাই সেই' এরূপ নির্দ্দেশ করা অসাধ্য, তবে অধ্যারোপিত নাম রূপ কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করাও সম্ভব; "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম," "বিজ্ঞানঘন এব ব্রহ্মাত্মা"—ইত্যাদি বাক্য দ্বারা।"

অধ্যারোপিত নাম রূপ কর্ম্ম কিরূপ? আমাদিগের আত্মার মধ্যে আমরা যাহা উপলব্ধি করি ব্রহ্মেতে তাহার আরোপ করার নাম অধ্যারোপ, যথা, ব্রহ্মের দর্শন, শ্রবণ, মনন, এবং নিদিধ্যাসনে আত্মা আনন্দে পূর্ণ হয়। সেই আনন্দ আমরা ব্রহ্মেতে অধ্যারোপ করিয়া বলিয়া থাকি "আনন্দং ব্রহ্ম।" আমাদের চৈতন্যময় আত্মারও অন্তরতম চৈতন্য রূপে আমরা ব্রহ্মের উপলব্ধি করিয়া থাকি, এজন্য সেই অন্তরতম চৈতন্য ব্রহ্মেতে অধ্যারোপ করিয়া বলিয়া থাকি "বিজ্ঞানঘন এব ব্রহ্মাত্মা।" আমাদের সকল প্রকার ক্রিয়া-শক্তির ভিতরে ব্রহ্মের মহাশক্তি দর্শন করিয়া ব্রহ্মেতে তাহার অধ্যারোপ করিয়া বলিয়া থাকি "পরাস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে।" ব্রহ্মের নির্দ্দেশকে অধ্যারোপিত নাম-রূপ-কর্ম্ম-মূলক বলা, আর সেই নির্দ্দেশকে পুরুষতন্ত্র বলা, এক কথা। উপনিষদের বর্ণনাতে স্থানে স্থানে মনে হয় যেন চরাচর বিশ্বকেই ব্রহ্মের সবিশেষ স্বরূপ বলা হইতেছে, এবং তাহার সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান আশ্রয় এবং নিয়ন্তাকে পৃথক্ ভাবে নির্ব্বিশেষ বা নেতি-নেতি-স্বরূপ ব্রহ্ম বলা হইতেছে।

কোনরূপ দার্শনিক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ না করিয়াই বেদোপনিষদের ঋষিগণ ব্রহ্মের বিশ্বব্যাপী বিশ্বাতীত ভেদ, সবিশেষ নির্ব্বিশেষ ভেদ, উপাদান-নিমিত্ত ভেদ অথবা সগুণ-নির্গুণ ভেদের উপদেশ করিয়াছেন। ঋষিগণ দ্রষ্টা ছিলেন, কিন্তু দার্শনিক ছিলেন না। দার্শনিক সূত্র-গ্রন্থাদি বৌদ্ধ সময়ের পরে রচিত সন্দেহ নাই। তখন হইতেই দার্শনিক সংজ্ঞার প্রচলন, এবং তখনি ব্রহ্মের সগুণত্ব-নির্গুণত্বভেদের ব্যাখ্যা এবং বিচারেরও প্রসার দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্যে বলা হইতেছে :—

"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ"—'হে সৌম্য একটি মৃৎপিণ্ড মাত্র দর্শন করিলে যেমন সমস্ত মৃন্ময় বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়"—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং"—'এই সমস্ত পূর্ব্বে সৎমাত্র ছিল,—এক এবং অদ্বিতীয়' (ছান্দোগ্য—৬-১.২)।

এই-সকল শ্রুতি-বচন অবলম্বন করিয়া বেদান্ত দর্শন সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে ব্রহ্মই জগতের উপাদান, যেমন ঘটের উপাদান মৃত্তিকা, এবং ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত, যেমন ঘটের নিমিত্ত কুম্ভকার। শ্বেতাশ্বতর ভাষ্যে ব্রহ্ম শব্দের উপরে শঙ্কর বলিতেছেন :—

"ব্রহ্ম বলা হয় কেন? 'বৃংহতি' বিস্তৃত হয় (মৃত্তিকাদির ন্যায়), 'বৃংহয়তি' বিস্তৃত করে (কুম্ভকারের ঘটাদি নির্ম্মাণ কার্য্যের ন্যায়),—এজন্য বলা হয় 'পরং ব্রহ্ম'। ব্রহ্মশব্দের উপাদান এবং নিমিত্তরূপ অর্থভেদ শ্রুতিই দেখাইতেছে।" ১—৩॥

সূত্রভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন :—

"প্রথমাধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে মৃত্তিকা যেমন ঘটের কারণ, অথবা সুবর্ণ যেমন স্বর্ণহারের কারণ, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বরও সেইরূপ জগতের উৎপত্তির কারণ। আবার মায়াবী বা ঐন্দ্রজালিক যেমন তাহার প্রসারিত মায়ার (ইন্দ্রজালের) স্থিতির কারণ, ঈশ্বরও সেইরূপ তাঁহা হইতে উৎপন্ন এই জগতের নিয়ন্তারূপে তাহার স্থিতির কারণ।" ২—১—১॥

যদিও অন্যত্র শঙ্কর বলিতেছেন :—

"রূপাদির অভাবহেতু ব্রহ্ম প্রত্যক্ষের অগোচর, এবং অনুমাপক লিঙ্গাদির অভাবহেতু ব্রহ্ম অনুমানের অগোচর,—কেবলমাত্র শ্রুতিগম্য" (২—১—৬)।

তথাপি তিনি এস্থলে ঘটাদি অথবা মায়াদিকার্য্য দৃষ্টেই সৃষ্টিরূপ কার্য্যের উপাদান-কারণ, এবং নিমিত্ত-কারণ রূপে ঈশ্বরের অনুমান করিতেছেন, ঈশ্বর এক এবং নিরবয়ব। অংশতঃ বিভাগ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। একই ঈশ্বর কিরূপে জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত উভয় প্রকার কারণ হইবেন, অথবা এক হইয়া ঈশ্বর কিরূপে সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আধারভূত ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান হইবেন। আবার নিরবয়ব ব্রহ্ম সম্বন্ধে সাবয়ব ঘটাদির উপাদানভূত সাবয়ব মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত ব্যবহারেও আপত্তি হইতে পারে। সেরূপ আপত্তির আশঙ্কা করিয়া শঙ্কর তাহা খণ্ডন করিতেছেন :—

"মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত ব্যবহারে আপত্তি হইতে পারে, যেহেতু মৃত্তিকাদি বস্তু সংসারে বিকারধর্ম্মী দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রের কি ইহাই অভিপ্রায় যে ব্রহ্মও বিকারধর্ম্মী। এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতেছে, তাহা নয়। সেই আত্মা 'ইহা নয়, উহা নয়' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্মসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার বিকারভাব প্রতিষিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার কূটস্থ স্বরূপই সিদ্ধ হইতেছে জানা যায়। আপত্তি হইতে পারে যে ব্রহ্ম এক, অতএব তাঁহাকে পরিণামধর্ম্মী এবং পরিণামধর্ম্মরহিত বা কূটস্থ স্বীকার করা যায় না, কারণ তাহা একই বস্তুর যুগপৎ স্থিতিগতিবৎ বিরুদ্ধ। তাহা নয়, 'কূটস্থ' বা সর্ব্বপ্রকার বিকারধর্ম্মের অতীত এই বিশেষণের প্রয়োগ হেতু কূটস্থ ব্রহ্মের সম্বন্ধে যুগপৎ স্থিতিগতিবৎ অনেকধর্ম্মাশ্রয়ত্ব সম্ভব হয় না।"

বস্তুতঃ পরিণামধর্ম্ম গ্রাহ্যবিষয়সম্বন্ধী—তদ্দ্বারা সকলের সাধারণআশ্রয়ভূত গ্রাহকাত্মারূপী ব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। জগৎরূপী দৃশ্যপ্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে, রূপান্তরিত হইতেছে, এবং বিনষ্ট হইতেছে, এবং তাহারই এক এবং অদ্বিতীয় আধাররূপে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম পদ্মপত্রের জলের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মাধর্ম্মবিমুক্ত থাকিয়া নিয়ত একইরূপে ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। সেই পরমাত্মাই আবার সকলের অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্তর্য্যামীরূপে সেই ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রবাহকে যেখানে যা সাজে, তাই দিয়া সব নিয়ত সাজাইতেছেন। শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন :—

"কূটস্থ ব্রহ্মের সম্বন্ধে যুগপৎ স্থিতিগতিবৎ অনেকধর্ম্মাশ্রয়ত্ব দোষ সম্ভব হয় না।"

এজন্যই 'ব্রহ্ম এক' হইলেও তাঁহাকে পরিণামধর্ম্মী এবং পরিণামধর্ম্মরহিত স্বীকার করাতে কোন দোষ হয় না। বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামী-বিদ্যার ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন :—

"অবস্থাভেদ অথবা শক্তিভেদ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা সঙ্গত হয় না,—কারণ শ্রুতি বলিতেছে অক্ষর ব্রহ্ম ক্ষুধা প্রভৃতি সংসারধর্ম্মের অতীত। একেরই পক্ষে যুগপৎ ক্ষুধাদি সংসারধর্ম্মের অতীত হওয়া এবং ক্ষুধাদি ধর্ম্মাত্মক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হয় না। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তিমত্তাও সেইরূপই বিরোধ দোষে দুষ্ট। অবয়ব-ভেদ বলিলে যে দোষ হয় তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (নিরবয়বের অবয়ব কথাই বিরুদ্ধ)। অতএব এই সমস্ত কল্পনাই অসত্য। তবে

উক্ত (অক্ষর ব্রহ্ম, অন্তর্য্যামী, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ) তিনের ভেদ কিরূপ? আমরা বলিতেছি উপাধি সম্বন্ধেই ভেদ। স্বতঃ এই তিনের ভেদ অথবা অভেদ কিছুই বলা যায় না, কারণ অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ সৈন্ধব-খণ্ডের ন্যায় প্রজ্ঞানঘন একরস।"

ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব, অন্তর্য্যামী ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্ম এবং অক্ষর বা নির্গুণ ব্রহ্ম এই তিনের ভেদকে ব্রহ্মের অবস্থাভেদ, অথবা শক্তিভেদ বলিতে শঙ্কর অনিচ্ছুক। কিন্তু উপাধিভেদ বলিতে তিনি ইচ্ছু। ইহার অর্থ এই—ব্রহ্মের অবস্থা বা শক্তিভেদ বলিলে সেই ভেদকে ব্রহ্মেরই ধর্ম্ম (Property) অথবা সেই ভেদকে ব্রহ্মসম্বন্ধী বা বস্তুতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা তিনি স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, কারণ তাহা হইলে ব্রহ্মকে আর কূটস্থ বা নেতি নেতি স্বরূপ বলা যায় না। জীব, ঈশ্বর, এবং ব্রহ্ম এই তিনের ভেদকে তিনি নিয়ত পরিবর্ত্তন-শীল উপাধি (separable accidents) বলিতে ইচ্ছু, কারণ তাহা হইলে সেই ভেদকে লোকবুদ্ধিসাপেক্ষ বা পুরুষ-তন্ত্র মাত্র বলা হয়। জর্ম্মান দার্শনিক কাণ্টেরও মতে সৃষ্টি এক প্রকার লোকবুদ্ধিসাপেক্ষ। শঙ্করের "নাম-রূপাত্মকং অবিদ্যা" এবং কাণ্টের "Forms of intuition" এবং "Categories of thought" উভয়ই লোকবুদ্ধি-সাপেক্ষ। শঙ্কর যাঁহাকে "নামরূপাত্মক অবিদ্যা" নামে অভিহিত করেন, কাণ্ট্ তাহাকেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (sensual apprehension) নানাত্বের (manifold of sense) সহিত বুদ্ধিজনিত একত্বের (unity of reason) যোগ বলিয়া অভিহিত করেন। আর এক দিকে দেখিতে গেলে কিন্তু কাণ্টের মতের সহিত শঙ্করের মতের আকাশ-পাতাল দূরতা; কারণ কাণ্ট এক প্রকার পারমার্থিক বাহ্য বস্তুর (Dingan sich) সত্তা কল্পনা করেন, যদিও সেরূপ কল্পনার কোন প্রমাণ অথবা ভিত্তি নাই, কিন্তু শঙ্কর লোকের আত্মপ্রত্যয়কে ভিত্তি করিয়া ("একাত্ম-প্রত্যয়সারং") সর্ব্বপ্রকার গ্রাহ্য বিষয়ের অতীত নেতিনেতি-স্বরূপ গ্রাহক আত্মা বা কূটস্থ ব্রহ্মেরই মাত্র সত্তা স্বীকার করেন—যিনি যাদুকরের যাদু বিস্তারের ন্যায় অথবা স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্ন দর্শনের ন্যায়, অথবা, লূতা-তন্তুবৎ বা মাকড়সার জাল বিস্তারের ন্যায় স্বীয় শক্তিবলে আপনার মধ্যেই এই বিচিত্র জগৎ প্রকাশ করিতেছেন।

এস্থলে বিরোধের আপত্তি সম্বন্ধে আরো কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। জর্ম্মান দার্শনিক স্পিনোজা দেখাইয়াছেন যে, পরিচ্ছিন্নাকারের জ্ঞান মাত্রেরই মূলে বিরোধ অন্তর্নিহিত। বৃক্ষাদি বস্তুবিশেষের আকার বস্তন্তর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্নাকারে বৃক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তাহার পরিচ্ছেদক বস্তন্তর বা শূন্যেরও জ্ঞানলাভ করিতে হয়। কোন পরিচ্ছিন্ন বস্তুর জ্ঞানের মধ্যেই সেই বস্তু যাহা নয়, তাহারও জ্ঞান অন্তর্নিহিত। এইরূপে আমরা দেখিতেছি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান মাত্রেরই মূলে বিরোধ রহিয়াছে, এবং গ্রাহকাত্মা প্রত্যেক পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের মধ্যে "যুগপৎ স্থিতিগতিবৎ" দুই বিরুদ্ধ বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতেছে, যথা, (১) বৃক্ষ, এবং (২) বৃক্ষের পরি-চ্ছেদক, যাহা বৃক্ষ হইতে অন্য, অথবা শূন্য। এজন্যই স্পিনোজা সূত্র করিতেছেন : প্রত্যেক পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের মধ্যে তাহার অভাবজ্ঞান অন্তর্নিহিত "Omnis determinatio est negatio"। এই মূল সূত্র অনুসারে কূটস্থ গ্রাহকাত্মাকে ও আপনাকে জানিতে হইলে, সেই কূটস্থ গ্রাহকাত্মা যাহা নয়, অর্থাৎ গ্রাহ্য অনাত্মাকেও জানিতে হইবে ("The determination of the ego involves the non-ego")। এইরূপে দেখা যায় আত্মা এবং অনাত্মা, গ্রাহক এবং গ্রাহ্য, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় আপাততঃ পরস্পর বিপরীত মনে হইলেও পরস্পর অচ্ছেদ্য (inseparable) সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। অনাত্মার তুলনায় আত্মার জ্ঞান পরিস্ফুট হয়, এবং আত্মার তুলনায় অনাত্মার জ্ঞান পরিস্ফুট হয়। তুলনা সম্ভব হয় না, যদি যুগপৎ আত্মা এবং অনাত্মা উভয়ই গ্রাহকাত্মা দ্বারা গৃহীত না হয়। বিরোধের আপত্তির অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য শঙ্করও বলিতেছেন :—

"ব্রহ্ম এক। কিন্তু সেই একত্বস্বরূপ পরিত্যাগ না করিলে ব্রহ্মের মধ্যে এই অনেকাকারা সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব? এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে বিবাদের কোন স্থান নাই, যেহেতু আমাদেরই মধ্যে দেখা যায় স্বপ্নকালে স্বপ্নদ্রষ্টা এক হইয়াও তাহার একত্ব স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই অনেকাকারা সৃষ্টি করিয়া থাকে। শাস্ত্রেও পাঠ করা যায়, 'তথায় রথ নাই, রথদণ্ড নাই, পথ নাই, অথচ স্বপ্ন-দ্রষ্টা রথ, রথদণ্ড, এবং পথ সৃষ্টি করে।' একই ব্রহ্মের মধ্যে স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া অনেকাকারা সৃষ্টিও সেইরূপই হওয়া সম্ভব।" ব্রহ্মসূত্র ২-১-১৮॥

পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভোজবৃত্তিকার শঙ্করাচার্য্যের

অদ্বৈত মত খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে বিরোধের আপত্তির এইরূপ উল্লেখ করিতেছেন ঃ—

"একই ব্যক্তি দ্বারা একই অবস্থাতে বা রূপে পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থার যুগপৎ অনুভব সম্ভব হয় না, যথা, আত্মসমবেত সুখ উৎপন্ন হইলে, যে অবস্থাতে আত্মার সুখানুভবিতৃত্ব সিদ্ধ হয়, সেই অবস্থা থাকিতেই তাহার পক্ষে দুঃখানুভবিতৃত্ব সম্ভব হয় না।" কৈবল্য—৩৩॥

এই আপত্তির উত্তরে সক্রেটিসের কথা আমাদের স্মরণ হইতেছে। আথেন্স্ নগরে কারাগারে অবরোধ কালে সক্রেটিসের পাদদ্বয় নিগড়বদ্ধ ছিল। মৃত্যুর সময় নিকট হইলে, তাঁহার পাদদ্বয় শৃঙ্খলমুক্ত করা হইয়াছিল। তখন তিনি পায়ের উপরে পা তুলিয়া ক্রাইটো প্রভৃতি শিষ্যদিগের নিকটে সুখ-দুঃখের প্রকৃত তত্ত্ব এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ঃ—

"পায়ের উপরে পা তুলিয়া বসিতে পারাতে, আমার কত সুখ বোধ হইতেছে! পূর্ব্বে ত কখনো আমার এরূপ হইত না। ইহার কারণ কি? শৃঙ্খলবন্ধনজনিত তীব্র দুঃখের স্মৃতি মোচনজনিত সুখের অনুভূতির সহিত মনের মধ্যে যুগপৎ বর্ত্তমান,—এই উভয় অনুভূতিকে পরস্পরের সহিত তুলনা করাতেই শৃঙ্খলমোচনজনিত সুখের অনুভূতি এত প্রবল হইতেছে।"

যে ব্যক্তি দন্তশূলের বেদনায় অথবা জ্বরের জ্বালায় অস্থির, সেই মুহূর্ত্তে যদি তাহার পুত্র দূরদেশ হইতে আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করে, তখন কি সে বেদনার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও অনুভব করে না। "জগামাথ সহসা দুঃখ-হর্ষয়োঃ"— যুগপৎ এরূপ বিরুদ্ধ অনুভূতি সময়ে সময়ে সকলেরই হইয়া থাকে। একই আত্মার মধ্যে যদি যুগপৎ নানারূপ অনুভূতি, কল্পনা, অথবা চিন্তার সমাবেশ অসম্ভব হইত,—যদি একটি কল্পনা বা চিন্তাকে মনে স্থান দিলে অপর সকল কল্পনা বা চিন্তার সম্পূর্ণ বিস্মৃতি হইত, তবে মানুষের পক্ষে উপন্যাস রচনা, অথবা দার্শনিক বিচার—অথবা স্বপ্নদর্শন,—অথবা দুই বা ততোধিক বস্তুর পরস্পর তুলনা করা অসম্ভব হইত। সামান্য জীবের মধ্যে যখন যুগপৎ বিরুদ্ধ অনুভূতি সকলের সমাবেশ সম্ভব হইতেছে, তখন কূটস্থ ব্রহ্ম সম্বন্ধে সে বিষয়ে প্রশ্নই হইতে পারে না। একখণ্ড কাগজ যুগপৎ সাদা এবং সাদা নয় হইতে পারে না। কিন্তু কাগজখণ্ড সাবয়ব,—তাহার বিভাজ্যত্ব গুণ রহিয়াছে,—অতএব যুগপৎ সেই কাগজখণ্ডের এক অংশ সাদা এবং অপর অংশ সাদা নয়—লাল, হইতে পারে। আত্মা নিরবয়ব,—তাহার বিভাজ্যত্ব গুণ নাই। অতএব সাবয়ব কাগজের ন্যায় আত্মার এক অংশ সুখী অপর অংশ সুখী নয় দুঃখী,—এরূপ বলা যায় না। কিন্তু সুখ-দুঃখের যুগপৎ অনুভূতি আত্মার প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহা আত্মার স্বভাব। সাবয়ব কাগজাদি হইতে নিরবয়ব আত্মার ইহাই বিশেষত্ব। স্পিনোজা জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার অনুকরণে ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি প্রমাণ করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন,—কারণ জ্যামিতি সাবয়বসম্বন্ধী, ঈশ্বর নিরবয়ব আত্মা। জ্যামিতির পথ অবলম্বন করিতে গেলে চিদাত্মাকেও বিভাজ্য কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু আত্মা "বিন্দুতে সিন্ধু-স্বরূপ" ("All in the whole, and all in every part")। পরমাত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" স্বীয় স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবেই আত্মা যুগপৎ বহু কার্য্য-সাধনে এবং বহু অবস্থা বা অনুভূতি লাভে সক্ষম।

জ্যামিতি যেমন সাবয়বসম্বন্ধী, আমাদের ন্যায়শাস্ত্রও (logic) সেইরূপ গ্রাহ্যসম্বন্ধী, দেশকালের সীমায় আবদ্ধ। কূটস্থ আত্মা দেশকালের (co-existence and sequence) সীমার অতীত। এজন্য ন্যায়ের তাদাত্ম্য (identity), বিরোধ (contradiction) এবং মধ্যাভাব (excluded middle) এই মৌলিক তিনটি স্বতঃসিদ্ধ গ্রাহক স্বরূপ আত্মা সম্বন্ধে অপ্রযোজ্য। এ-সকল স্বতঃ-সিদ্ধ স্বাতিরিক্ত গ্রাহ্য বাহ্যবস্তু অথবা মানস-ব্যাপার-সম্বন্ধী স্বপ্রকাশ স্বসম্বেদ্য গ্রাহক আত্মাসম্বন্ধী নয়। (১) যাহা যেরূপ সেরূপই (তাদাত্ম্য), (২) যাহা যেরূপে আছে যুগপৎ সেরূপে নাই (অস্তি-নাস্তিতা বা বিরোধ), এবং (৩) যে-কোন পদার্থ হয় এরূপে আছে, না হয় এরূপে নাই (মধ্যাভাব)—যাহা কিছু স্বাতিরিক্ত গ্রাহ্য—অর্থাৎ যাহার গ্রাহক তাহা হইতে ভিন্ন—যেমন রূপাদি বিশেষত্বযুক্ত বাহ্য বস্তু,—অথবা আগমাপায়ী মানস-সুখদুঃখাদি, তাহারই সম্বন্ধে এই-সকল স্বতঃসিদ্ধ প্রযোজ্য। স্বসম্বেদ্য বা স্বপ্রকাশ গ্রাহকস্বরূপ কূটস্থ আত্মা বা ব্রহ্ম,—যাহার নিজের কোন গ্রহণযোগ্য বিশেষত্ব নাই, যাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রবাহের ন্যায় সর্ব্ববিশেষত্ব আসি-তেছে ও যাইতেছে—যাহা স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, অর্থাৎ

যাহার গ্রহণ স্বতঃসিদ্ধ,—অপর সকল গ্রাহ্য বিষয়ের ন্যায় ইন্দ্রিয় অথবা মনের ব্যাপার দ্বারা যাহার আপনাকে আপনার গ্রহণ করিতে হয় না,—সেই নেতিনেতি-স্বরূপ কূটস্থ আত্মার সম্বন্ধে তাদাত্ম্য, বিরোধ, এবং মধ্যাভাব, ন্যায়ের এই-সকল স্বতঃসিদ্ধ প্রযোজ্য হইতে পারে না। যাহা এরূপ অথবা সেরূপ,—ইহা অথবা উহা, আছে অথবা নাই ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার অনুভূতির অদ্বিতীয় সাক্ষী এবং ভিত্তিস্বরূপ, যাহা সর্ব্বরূপে সকলের গ্রাহক, যাহা স্বতঃ এরূপও নয় সেরূপও নয়, ইহাও নয় উহাও নয়, 'অস্তি' —আছেন বলা ভিন্ন কোনপ্রকার বিশেষত্বযুক্ত অনুভূতি যাহার সম্বন্ধে অসম্ভব—"অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে," যিনি বিদিত এবং অবিদিত সকল হইতে ভিন্ন—অথচ বিদিত এবং অবিদিত উভয়ের ভিত্তিস্বরূপ গ্রাহক—"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি"— তাহার সম্বন্ধে তাদাত্ম্য (identity) বা যেরূপ সেরূপই, বিরোধ (contradiction) বা যেরূপে আছে যুগপৎ সেরূপে নাই, অথবা মধ্যাভাব (excluded middle)— বা হয় এরূপ, না হয় এরূপ নয়,—ইত্যাকার বাক্যই অপ্রযোজ্য। রূপাদি অথবা সুখদুঃখাদি কোন বিশেষত্বযুক্ত পদার্থ অস্তি বলিলে গ্রাহক চৈতন্য সম্বন্ধেই অস্তি; নাস্তি বলিলেও গ্রাহক চৈতন্য সম্বন্ধেই নাস্তি; যিনি সর্ব্বরূপের অস্তিতা-নাস্তিতার ভিত্তিস্বরূপ—তাঁহার সম্বন্ধে বিরোধের নিয়ম অপ্রযোজ্য। এইরূপে আমরা দেখিতেছি ন্যায়োক্ত বিরোধের নিয়ম স্বাতিরিক্ত গ্রাহ্যবিষয়সম্বন্ধী, স্বসম্বেদ্য বা স্বপ্রকাশ গ্রাহক জীবাত্মা অথবা পরমাত্মা-সম্বন্ধী নয়।

এইরূপে আমরা দেখিতেছি ব্রহ্মের সগুণ-নির্গুণভেদ, অথবা সবিশেষ-নির্ব্বিশেষভেদ ন্যায়োক্ত বিরোধ-দোষে দুষ্ট হইতেছে না। ব্রহ্মের একত্বেরও কোন হানি হইতেছে না। সগুণ এবং নির্গুণ একই ব্রহ্মের দুইটি দিক্‌মাত্র হইতেছে—গ্রাহ্যের দিক্ এবং গ্রাহকের দিক্— অথবা উপাদানের দিক্ এবং নিমিত্তের দিক্, যেমন ঘটাদির বাহিরের দিক্ এবং ভিতরের দিক্। বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামীবিদ্যার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য কূটস্থ ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বের সহিত অন্তর্য্যামী, ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং কূটস্থ ব্রহ্ম— এই ত্রিত্বের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্তর্য্যামী-বিদ্যায় যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—

"যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্‌, সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং, যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" "যিনি সকল ভূতে বর্ত্তমান, সর্ব্বভূতের অন্তরতম, ভূত-সকল যাঁহাকে জানে না, সর্ব্বভূত যাঁহার শরীর-স্বরূপ, যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন,—অমৃতরূপী সেই অন্তর্যামীই তোমারও আত্মা।"

শঙ্কর বলিতেছেন :—

যে অন্তর্যামী ঈশ্বরকে কেহ জানে না, পৃথিব্যাদি ভূত-সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (ক্ষেত্রজ্ঞ) যাহারা সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরকে জানে না, এবং সেই অক্ষর ব্রহ্ম যিনি দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব হেতু সকলের চেতনা-ধাতু-স্বরূপ।"

এই বলিয়া শঙ্কর এই তিনের পরস্পর সাদৃশ্য এবং পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। পৃথিব্যাদি ভূতসকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের শরীর এবং ইন্দ্রিয়বত্বের উল্লেখ করিয়া শঙ্কর বলিতেছেন :—"পৃথিবী-দেবতার কার্য্য এবং করণ স্বকর্ম্মজনিত"—অর্থাৎ পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ জীববিশেষমাত্র, এবং অপরাপর জীবগণের ন্যায় স্বীয় পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলের দাস। অন্তর্য্যামী বা ঈশ্বর সম্বন্ধে শঙ্কর বলিতেছেন :—

"অন্তর্যামী বা ঈশ্বরের নিত্যমুক্তত্ব-হেতু স্বকর্ম্মাভাব। পরার্থ কর্ত্তব্যতা-স্বভাবত্বহেতু সেই পরের যাহা কার্য্য এবং করণ তাহাও সেই অন্তর্যামীরই অন্তর্যামী বা ঈশ্বর স্বয়ং সাক্ষীমাত্র। তাঁহার সান্নিধ্যরূপ শাসন দ্বারাই পৃথিব্যাদি দেবতা-সকলের কার্য্য করণ স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত এবং তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। এইরূপ যে ঈশ্বর যাহাকে নারায়ণ বলা যায়, তিনিই পৃথিবী-দেবতাকে নিয়মিত করেন। তিনিই তোমার আমার এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা,— প্রত্যেকের স্ব স্ব ব্যবহারের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান। জীবানন্দ পৃঃ ৬১৫ ॥

অক্ষর ব্রহ্মসম্বন্ধে বলা হইতেছে যে তিনি

"দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব হেতু সকলের চেতনা-ধাতু-স্বরূপ।" "অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ সৈন্ধব খণ্ডের ন্যায় প্রজ্ঞানঘন একরস।" "নিরুপাখ্য নির্ব্বিশেষ এবং এক। নেতি নেতি রূপেই মাত্র তাঁহার উল্লেখ সম্ভব। সেই আত্মাই অবিদ্যাজনিত কাম্যকর্ম্মবিশিষ্ট এবং কার্য্যকরণরূপ উপাধিযুক্ত হইলে সংসারী জীব (ক্ষেত্রজ্ঞ) নামে অভিহিত হয়েন। নিত্য নিরতিশয় বা পূর্ণ জ্ঞানশক্তিরূপ উপাধিযুক্ত হইয়া সেই আত্মাই অন্তর্যামী ঈশ্বর বা নারায়ণ (সগুণ ব্রহ্ম) নামে অভিহিত হয়েন। আবার সর্ব্বউপাধিরহিত হইয়া শুদ্ধ এবং কেবল বা দ্বৈতাতীত হওয়াতে সেই আত্মাই স্বীয় স্বভাব অনুসারে অক্ষর বা পরব্রহ্ম (নির্গুণ) নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।" জীবানন্দ পৃঃ ৬৪০ ॥

আমরা দেখাইতে যত্ন করিয়াছি যে ব্রহ্মের পক্ষে (১) ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব, (২) সগুণব্রহ্ম, অন্তর্য্যামী, ঈশ্বর, বা নারায়ণ, এবং (৩) নির্গুণব্রহ্ম, অক্ষরব্রহ্ম, বা পরব্রহ্ম,—

এই তিনভাবে প্রকাশ হওয়াতে তাঁহার একত্বের হানি হইতেছে না, অথবা তাহা ন্যায়োক্ত বিরোধ-দোষে দূষিত হইতেছে না। আমরা ইহাও দেখাইতে যত্ন করিয়াছি যে ব্রহ্মের মধ্যে কোন বস্তুতন্ত্র বা পারমার্থিক ভেদ নাই। সর্ব্বপ্রকার ভেদ "অধ্যারোপ" বা লোককল্পনা-সাপেক্ষ এবং পুরুষতন্ত্র মাত্র। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠকের বিচার-সাপেক্ষ।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

মোগল ওস্তাদের অঙ্কিত খ্রীষ্টীয় চিত্র

মোগলদিগের চিত্রাবলীর মধ্যে কয়েকটি খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময় এই চিত্রগুলি অঙ্কিত হয় তখন ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচার আদপেই হয় নাই। কেমন করিয়া কি ঘটনার সহিত সংযুক্ত হইয়া এই চিত্রগুলি মোগল চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত হইতে আরম্ভ হয় এই প্রবন্ধে তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

বাবর ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের সংস্থাপক, কিন্তু মোগলশিল্পের প্রতিষ্ঠা তিনি করেন নাই। আকবরের রাজত্বকাল হইতে এই শিল্পের আরম্ভ। বাবর যোদ্ধা হইয়া জন্মিয়াছিলেন, যুদ্ধ করিয়াই সারা জীবন কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মজীবনী পড়িলে মনে হয় যেন তরওয়ালটা ছিল তাঁহার খেলনা, আর যুদ্ধটা ছিল তাঁহার একমাত্র খেলা। সে খেলাটা যখন বন্ধ থাকিত তখন তিনি সিরাজীর পেয়ালা ও ভাঙের পাত্র লইয়া উন্মত্ত থাকিতেন। এদিকে যখন প্রকৃতিস্থ থাকিতেন তখন কখন কখন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার আত্মজীবনীতে নানাবিধ ফুল ফল, জীবজন্তু, শিল্প ও স্থাপত্যের সুন্দর ও সরল বর্ণনা আছে। ইহাতে মনে হয় যে যদি তিনি সুবিধা পাইতেন তাহা হইলে হয়ত শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিলেও করিতে পারিতেন।

বাবরের পুত্র হুমায়ুঁরও সে সুবিধা হয় নাই। তাঁহার সময় মোগলরাজ্য দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয় নাই। বাবর মোগল রাজ্যের ভিত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তখনও মোগলদিগের আধিপত্য অত্যন্ত পরিমিত। শের শাহ হুমায়ুঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে হুমায়ুঁ পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষের নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে পারস্যদেশে পলায়ন করিলেন। কয়েক বৎসর পরে, হুমায়ুঁ নষ্টরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিলেন। প্রকৃতপক্ষে আকবর প্রথম মোগল সম্রাট। বাবর ও হুমায়ুঁ মোগলরাজ্য স্থাপন করিতে ব্যস্ত ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহই রাজ্য উপভোগ করিবার অবসর পান নাই। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় শিল্পচর্চ্চা হয় না। সেই জন্য মোগল-শিল্পের আরম্ভ আকবরের সময় হইতে। উদারচেতা আকবরের সহানুভূতি ও অকাতর উৎসাহে সেই শিল্প এত উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল যে ইহার স্মৃতি মোগলদিগের ইতিহাসের সহিত অভিন্নভাবে জড়িত।

কোরানে জীবের প্রতিমূর্ত্তি আঁকা নিষিদ্ধ। আকবর কিন্তু সে নিষেধ মানিলেন না। তিনি অনেক কুসংস্কারের গণ্ডি মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং শিল্পের কল্যাণ সাধনের জন্য কোরানের নিষেধ অগ্রাহ্য করিতে একটুও দ্বিধা করিলেন না। যে শিল্প এককালে নিতান্ত নিষিদ্ধ ছিল সেই শিল্পচর্চ্চাকে তিনি কি চক্ষে দেখিতেন এবং উহা তাঁহার কত প্রিয় ছিল, তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু ও জীবনীলেখক আবুল ফজল তাহা অতি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। আবুল ফজল এক দিবস বাদশাহ আকবরকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, "এমন অনেক লোক আছে যাহারা চিত্র-বিদ্যাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, কিন্তু আমি তাহাদের আদপেই পছন্দ করি না। আমার মনে হয় চিত্রকর বিশ্বস্রষ্টার অনন্তরূপ অতি সহজে ও সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। কারণ যখন সে কোন প্রাণীর সাদৃশ্য চিত্রে লিখিতে চেষ্টা করে তখন সে অতি সহজেই বুঝিতে পারে যে সে সেই প্রাণীর বিভিন্ন অবয়বগুলি চিত্রে যেমন সুদক্ষরূপেই নকল করিতে পারুক না কেন, তাহার প্রতিলিপিতে কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য থাকে না, কারণ তাহাতে জীবনীশক্তি থাকে না, এবং এইরূপে জীবনদাতা জগদীশ্বরের কথা তাহার মনে পড়ে এবং ভগবানের অসীম মহত্ত্বের কথা উপলব্ধি

খ্রীষ্টপন্থী সন্ন্যাসী প্রভৃতি।

করিয়া জ্ঞানলাভ করে।” আকবরের এই কথাগুলিতে কেবল যে তাঁহার শিল্পের উপর অনুরাগ প্রকাশ পায় তাহা নয়। ইহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে যে-শিল্প ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মতে অন্যায় বলিয়া নিষিদ্ধ ছিল, আকবরের মতে তাহাই ধর্ম্মের একটি বাহনস্বরূপ। এবং তাঁহার এই বিশ্বাস—যে, শিল্পের দ্বারা জগদীশ্বরের বিশ্বরূপ সহজেই অনুভূত হইতে পারে—এত দৃঢ় ছিল যে তিনি জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে অনেক চিত্রকরকে অকাতরে অর্থ ও সম্মান দ্বারা উৎসাহ দিতেন। তাঁহার দরবারে অনেক চিত্রকর নিযুক্ত ছিল এবং প্রতি সপ্তাহের শেষে তিনি নিজে তাহাদের কাজ দেখিয়া সকলকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিতেন। কিন্তু যদিও মোগলশিল্প প্রথমে ধর্ম্মানুগামী ছিল তথাপি কালে এই শিল্প একান্তই ঐহিক হইয়া পড়িয়াছিল। আকবরের পর কোন মোগল সম্রাটই তাঁহার মত বুদ্ধিমান ও প্রশস্তহৃদয় ছিলেন না। প্রায় সকলেই আমোদপ্রিয় ছিলেন এবং সেই জন্য তাঁহাদের সমসাময়িক শিল্পে কেবলই ঐহিক সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হইয়াছিল, অলৌকিক বা সাত্ত্বিকভাবের লেখামাত্র ছিল না।

আকবরের ধর্ম্মের বিষয়ে ইতিহাসে অনেকগুলি রহস্যপূর্ণ কথা পাওয়া যায়। তিনি ইসলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া “দীন-ই-ইলাহি” নামক একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম প্রচার করেন। ধর্ম্মটি একেশ্বরবাদী ও স্বয়ং সম্রাট্ তাহার একমাত্র “খলিফা” বা প্রতিনিধি ছিলেন। এই নূতন ধর্ম্মটি সনাতন ইসলাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী বলিয়া ইস্লাম-ধর্ম্মাবলম্বীগণ বাদশাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। কিন্তু আকবর সকল বাধাকে তৃণজ্ঞান করিয়া নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন।

ইহা ত গেল ইসলাম ধর্ম্মের কথা। আকবর হিন্দু-দিগকে প্রীতিচক্ষে দেখিতেন এবং হিন্দু ধর্ম্মের উপর তাঁহার বিশেষ আস্থা ও অনুরাগ ছিল। তাঁহার কয়েক-জন সচিব ও প্রধান রাজকর্ম্মচারী হিন্দু ছিলেন। তিনি একজন হিন্দু রমণীকে বিবাহ করেন। এই সম্রাজ্ঞীর পুত্রই জাহাঙ্গীর।

কথিত আছে আকবর হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধীয় কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া করিতেন। তিনি অগ্নি ও সূর্য্যের পূজা করিতেন। মুসলমানগণ ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইত, কিন্তু বাদশাহের উপর কে অভিযোগ করিবে? আকবর কেন অগ্নি ও সূর্য্যের পূজা করিতেন আবুল ফজল তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। যে মুসলমানগণ বাদ-শাহকে হিন্দুধর্ম্মের অনুরাগী বলিয়া নিন্দা করিত তাহাদের উল্লেখ করিয়া আবুল ফজল লিখিয়াছেন, “পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল আলোক সূর্য্যের নিকট হইতে আমরা যে অপরিমেয় উপকার পাই তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের সকলকারই কর্ত্তব্য। সকল সম্রাটেরই সূর্য্যের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখান উচিত, কারণ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়া গিয়াছেন যে নভো-মণ্ডলের জ্যোতিঃসম্রাট অর্থাৎ সূর্য্য পৃথিবীর সম্রাটগণের

প্রতি বিশেষরূপে নিজ আলোক প্রদান করেন। এই নিমিত্তই বাদশাহ আকবর অগ্নি ও সূর্য্যকে পূজা করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।"

আকবর কেবল অগ্নি ও সূর্য্যের পূজা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। বদৌনার মতে তিনি "সকলের নিকট হইতেই জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা করিতেন। এ বিষয়ে তিনি যাহারা মুসলমান নয় তাহাদেরই বিশেষরূপে পক্ষপাতী ছিলেন। যে দীপ্ত ও পবিত্র ইস্‌লামধর্ম্ম অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়, বাদশাহের অনুচর ও পারিষদ্‌বর্গ তাহারই নিন্দাবাদ করিত। বাদশাহ অম্লান বদনে সেই অযথা নিন্দাবাদ শুনিতেন এবং সময় সময় তাহাই অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিজের প্রচারিত নূতন ধর্ম্মের বিষয় উল্লেখ করিতেন।" কেবল যে রাজ-দরবারেই ধর্ম্মচর্চ্চা হইত এমন নয়। কথিত আছে আক-বরের শয়নাগারে একটি গবাক্ষের বহির্ভাগে রজ্জু-সংলগ্ন একটি 'চারপাই'এ বসিয়া দেবী নামক একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রত্যহ রাত্রিকালে বাদশাহকে হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যান শুনাইতেন এবং দেবদেবীর পূজার ব্যবস্থা দিতেন।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতিও আকবরের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ার পর্তুগীস রাজপ্রতিনিধিকে কয়েকজন পাদ্রীকে দিল্লীতে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অচিরে তিন জন প্রচারক দিল্লীর অভি-মুখে যাত্রা করিলেন। বাদশাহ তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং যীশুমাতা মেরীর চিত্র দেখিয়া সসম্ভ্রমে নতশিরে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাতে প্রচারকদিগের অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দ হয় এবং তাহারা ভাবিল যে আকবর নিশ্চয়ই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, এবং তখন তাহারা অনায়াসে সমগ্র মোগল-সাম্রাজ্যে তাহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিবে।

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ধর্ম্মালোচনা করান আকবরের দরবারে একটি পদ্ধতি ছিল। খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ আসিলে বাদশাহের আদেশে তাহাদের ও মোল্লাদিগের মধ্যে ধর্ম্মালোচনার ব্যবস্থা হইল। তর্ক আরম্ভ হইল। সে আলোচনা শাস্ত্রমূলক ও যুক্তিসঙ্গত হইবার কথা, কিন্তু দেখা গেল মোল্লা ও পাদ্রীদিগের মধ্যে কেবল প্রশ্নোত্তর ও কথা-কাটাকাটি হইতে লাগিল। ধর্ম্মচর্চ্চার নাম গন্ধ নাই; কেবল বাক্যযুদ্ধ। সে তর্কে না ছিল মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা, না ছিল অন্তর্জগতের তত্ত্বলাভের ইচ্ছা। ছিল কেবল বিরোধ ও স্বার্থের ছড়াছড়ি। ধর্ম্মের কথাই একেবারে উড়িয়া গেল। কোন্ ধর্ম্মটা বড়, কাহার মাহাত্ম্য অধিক ইহা

মাতা মেরীর কোলে যীশুখৃষ্ট ও সমবেত ভক্তবৃন্দ।

লইয়াই তর্ক চলিতে লাগিল। পাদ্রী যীশুখ্রীষ্টের নাম লইয়া কহিল, "আমার ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" মোল্লা গর্জ্জিয়া উত্তর দিল, "আল্লা নামের জয় হউক! ইস্‌লাম আদর্শ ধর্ম্ম; ইহার অপেক্ষা কোন ধর্ম্মই বড় নয়।" তর্কের গতি যখন এইরূপ হইল তখন বিবাদের অধিক বিলম্ব

রহিল না। এইরূপে জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য যে ধর্ম্মালোচনার অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহাতে কেবল ঈর্ষা ও উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া পড়িল। আকবর পাদ্রী ও মোল্লাদিগের কলহ দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন পাদ্রীদিগের ধর্ম্মালোচনা সরল, দ্বেষশূন্য ও যুক্তিসিদ্ধ হইবে। কিন্তু যখন তাহাদের গর্ব্বিত ও ভ্রান্তিমূলক তর্ক শুনিলেন তখন তাহাদের প্রতি তাঁহার কোন শ্রদ্ধাই রহিল না।

ভক্তমণ্ডলী-বেষ্টিত যীশুখৃষ্ট।

বাদশাহ প্রকাশ্যরূপে কিন্তু পাদ্রীদিগকে কিছু বলিলেন না। এদিকে পাদ্রীগণ ভাবিল বুঝি তাহাদের ধর্ম্মযুক্তি আকবরের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে। এই বিশ্বাস তাহাদের এত দৃঢ় হইল যে তাহারা বারম্বার বাদশাহকে ইসলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। সময়ে অসময়ে পাদ্রীগণ আকবরকে ক্রমাগত খ্রীষ্টান হইতে বলিত। ইহাতে আকবর তাহাদের উপর কতটা বিরক্ত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার ব্যবহারে অনুমান করা যায়। পাদ্রীগণ যখন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল তখন তিনি তাহাদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন যে একদল মুসলমান কোরান হাতে লইয়া একটি অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিবে স্থির করিয়াছে এবং তিনি জানিতে চাহিলেন যে পাদ্রীগণও তাহাদের ধর্ম্মপুস্তক লইয়া সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মাহাত্ম্য দেখাইতে সম্মত আছে কি না।* বাদশাহের কথা শুনিয়া পাদ্রীদিগের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে তাহাদের মধ্যে কেহই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে সম্মত হইল না। এবং অবশেষে ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বিফলমনোরথ হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে তাহারা গোয়ায় ফিরিয়া গেল। ইহার পরও দুইবার ১৫৯১ ও ১৫৯৫ সালে কয়েকজন পাদ্রী আকবরের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারাও বাদশাহকে দীক্ষিত করিতে বা মোগল সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই।

এই-সকল পাদ্রীদিগের আকবরের দরবারে আসার সহিত মোগল ওস্তাদের আঁকা খ্রীষ্টীয় চিত্রগুলির খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আকবর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন না বটে, কিন্তু তবুও সে ধর্ম্মের উপর তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ফারসী ভাষায় বাইবেলের সচিত্র অনুবাদ করাইলেন। আবুল ফজল এই অনুবাদ করেন। অনূদিত পুস্তকের নাম হইল, "কিতাবে মো এজিজাত মসি" অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্টের অলৌকিক জীবনী। পাদ্রীগণ যে-সকল ইউরোপীয় চিত্র আনিয়াছিল তাহার অনুকরণে মোগল চিত্রকরেরা এই পুস্তকের জন্য চিত্র আঁকিল। লাহোরের যাদুঘরে আকবরের মোহর-সংযুক্ত একখানি পারসিক ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ রক্ষিত আছে।

---

* "আকবর-নামা"র মতে পাদ্রীগণই এই অগ্নিপরীক্ষার প্রস্তাব করে, এবং মুসলমানেরা তাহাতে সম্মত হয় নাই। কিন্তু অগ্নি-পরীক্ষায় শুদ্ধির বিচার আমাদের দেশের পরম্পরাগত কথা। আকবর অগ্নিপূজাও করিতেন। ইহাতে মনে হয় অগ্নিপরীক্ষার কথা যদি উঠিয়াই ছিল তাহা আকবরের আদেশেই কোন মোল্লা এ প্রস্তাব করে।

পুস্তকখানি অত্যন্ত জীর্ণ এবং কোন কোন অংশ হারাইয়া গিয়াছে।

খানকয়েক চিত্রও এই পুস্তকে আছে। সেগুলি এককালে খুব সুন্দর ছিল, এখন একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই প্রবন্ধের সহিত তিনখানি চিত্র মুদ্রিত হইল। বিশেষ যত্ন করিয়াও প্রতিলিপি স্পষ্ট হইল না। কিন্তু অস্পষ্ট হইলেও সেগুলি যে ইউরোপীয় চিত্রের অনুকরণে অঙ্কিত তাহা বোঝা যায়। প্রথম চিত্রে একটি রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীর (Friar) প্রতিমূর্ত্তি বেশ স্পষ্ট লক্ষিত হইবে। অন্য কয়েকজনের ইউরোপীয় টুপিও দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় চিত্রে মেরী, যীশু ও কয়েকটি সাধু অঙ্কিত হইয়াছিল। মেরীর ক্রোড়ে বালক যীশু রহিয়াছেন ; দুঃখের বিষয় প্রতিলিপিতে চিত্রের এই অংশ অত্যন্ত অস্পষ্ট উঠিয়াছে। কয়েকজন ভক্তের মুখাবয়ব সম্পূর্ণই ইউরোপীয়। - তৃতীয় চিত্র ভক্তমণ্ডলী-বেষ্টিত যীশুখ্রীষ্টের। এই ছবিগুলি দেখিলেই বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে এগুলি ইউরোপীয় চিত্রের রীতি অবলম্বনে অঙ্কিত। এরূপ চিত্রের বর্ণেও ইউরোপীয় শিল্পের অনুকরণ দেখা যায়। বহুবর্ণে মুদ্রিত স্বর্গীয়-দূত-সমভিব্যাহারিণী মেরীর চিত্রে তাহার পরিচয় আছে।

খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় চিত্র যে কেবল বাইবেলের অনুবাদেই থাকিত এমন নয়। প্রাচীরে অঙ্কিত এইরূপ বড় ছবিও দেখিতে পাওয়া যায়। লাহোরের দুর্গপ্রাচীরে কয়েকটি টালি-নির্ম্মিত (tile-work) খ্রীষ্টীয় ছবি আছে। ফতেপুর সীক্রীতে 'সোনহরা মকান' বা 'মরীয়মের কুটীতে' * কয়েকটি প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্রের ভগ্নাংশ অবশিষ্ট আছে।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

* একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে যে এই 'মরীয়মের কুটী' আকবরের খ্রীষ্টান বেগম মরীয়মের আবাসস্থান। কিন্তু আকবর যে কোন খ্রীষ্টান রমণীকে বিবাহ করেন ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ নাই। তিনি যদি কোন খ্রীষ্টান রমণীকে বিবাহ করিতেন তাহা হইলে একথা আবুল ফজল বা পর্তুগীস প্রচারকগণ নিশ্চয়ই লিখিয়া যাইতেন। 'আইন-ঈ-আকবরী'তে "মরীয়ম উজ-জমানীর" উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি ত রাজা বিহারী মলের কন্যা। আমার বিশ্বাস 'মরীয়ম' কথাটার জন্যই সাধারণতঃ "মরীয়ম-উজ-জমানীকে" লোকে খ্রীষ্টান বলে। আরব্য ভাষায় 'মেরী' শব্দটার 'মরীয়ম' রূপান্তর হইয়াছে। "মেরী" ও "মরীয়ম"এ প্রভেদ নাই কিন্তু মরীয়ম সকল সময়ই যে 'মেরীর' স্থানে ব্যবহৃত হয় এমন নয়। সম্মানার্থ রমণীর নামের সহিত পারস্য ভাষায় ইহার ব্যবহার দেখা যায়, যথা "মরীয়ম-উজ-জমানী", 'মরীয়ম-মকানী' ইত্যাদি।

পানামা প্রদর্শনী

বহুদিন বহুচেষ্টা ও উদ্‌যোগের পর ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌স্ ১৯০৪ খৃঃ অঃ ৪ঠা মে হইতে পানামা-খাল খনন আরম্ভ করে। বাণিজ্যের উন্নতি ও সুবিধা করা এই খাল খনন করার প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো (San-Francisco) হইতে মাল-জাহাজ নিউইয়র্ক বা ইউরোপে যাইতে বহু সময় লাগিত এবং দেশের অভ্যন্তরে অনেক সময়ে বহু ব্যয়ে রেলযোগে মাল পাঠাইতে হইত। আমেরিকার পূর্ব্ব উপকূলের যে-কোন স্থানে যাইতে হইলে, মাল-জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরিয়া যাইত ; ইহাতে দেড়মাস সময় লাগিত। ইহাতে আমেরিকার পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্য ব্যবসায়ে অনেক ব্যাঘাত হইত। এতদ্ব্যতীত ইউরোপ এবং নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থান হইতে এসিয়াস্থিত প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে (চীন, জাপান ইত্যাদি স্থানে) বাণিজ্যেরও বিশেষ সুবিধা ছিল না ; কারণ রেল-সংযোগে নিউইয়র্ক হইতে সান-ফ্রান্‌সিস্কো সহরে মাল আনাইতে বা সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো হইতে নিউইয়র্কে মাল পাঠাইতে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী খরচ পড়ে। এখন খাল খনন দ্বারা যাতায়াত সহজ-সাধ্য ও অল্প-সময়-সাপেক্ষ হওয়াতে ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সের রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যপ্রভাব এসিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার উপর পূর্ণ-মাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে। সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো পূর্ব্বে বাণিজ্যে বিশেষ উচ্চস্থান পায় নাই, কিন্তু এই পানামা-খাল খনন করার পর ইহা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র স্বরূপ হইল। বিশেষতঃ এই খাল খনন করা উপলক্ষ্যে আগামী ১৯১৫ খৃঃ অব্দে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সহরে যে জগদ্বিখ্যাত প্রদর্শনী হইবে তাহা হইতে উহার ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য এতদূর বৃদ্ধি পাইবে যে ইহা পূর্ব্বে কেহই ভাবিতে পারে নাই।

আগামী ১৯১৫ খৃঃ অঃ ১লা জানুয়ারী পানামা-খালের
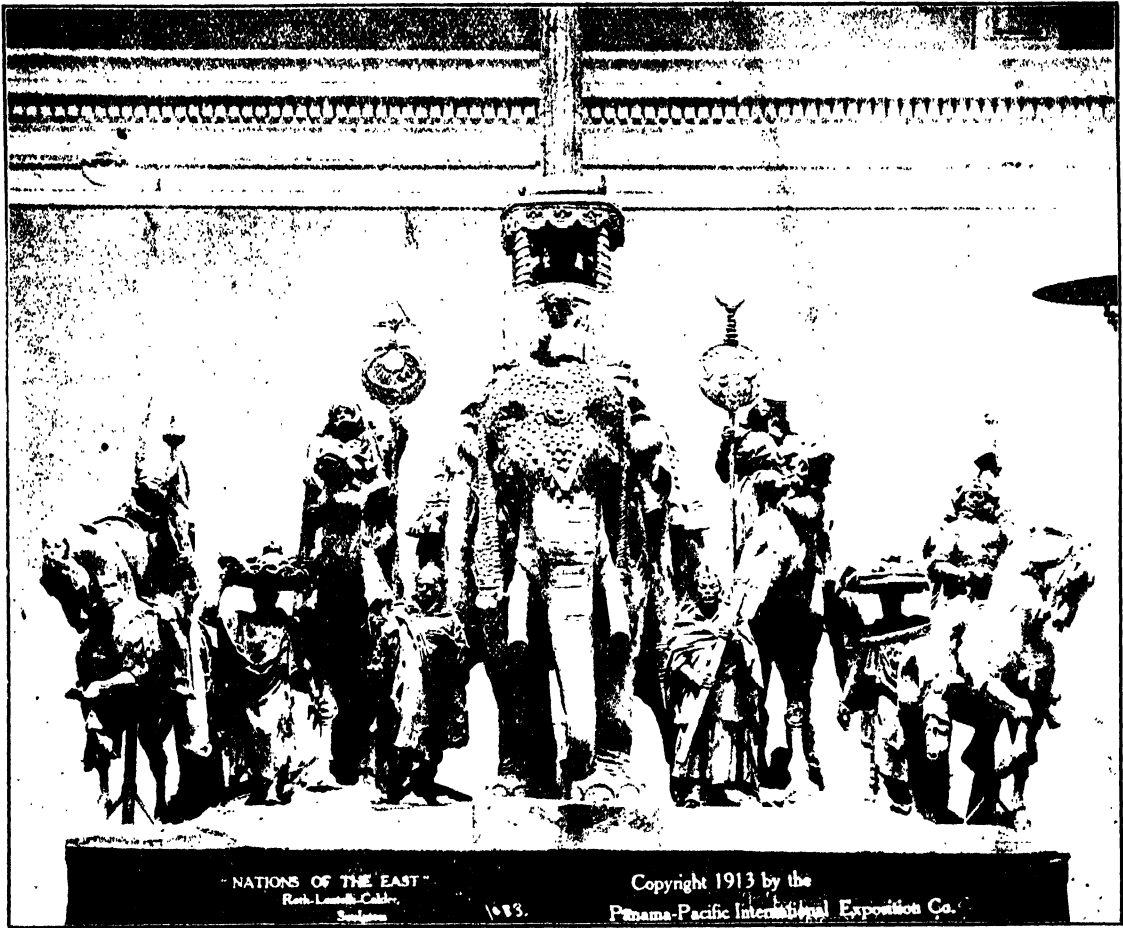
পানামা-প্রদর্শনীতে প্রাচ্য জাতি প্রদর্শন।

[পানামা-প্রদর্শনীর অনুমতি-অনুসারে মুদ্রিত। এই চিত্রের সর্ব্বস্বত্ব রক্ষিত]

খনন-কার্য্য সমাপ্ত হইবে। এতদিন আট্‌লাণ্টিক্ (Atlantic Ocean) ও প্রশান্ত মহাসাগর পরস্পর বহুদূরে ছিল, কিন্তু আজ ইহারা উভয়ে অতি নিকটে ও এক হইতে চলিল। পূর্ব্বে সুয়েজ-খালের কথা শুনিয়া বা দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইত; কিন্তু আজ পানামা-খাল তাহাকেও পরাস্ত করিয়াছে। যে অত্যাশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক কৌশলে এই পানামা-খাল খনন করা হইয়াছে তাহা আমেরিকার জাতীয় উন্নতি ও শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। জগতের উন্নতি সাধনে পানামা-খাল সুয়েজ খালের অপেক্ষা কোন অংশে কম ফলপ্রদ হইবে না। ইহা, আমেরিকা ও এসিয়া এই দুই মহাদেশের, অর্থাৎ নিউইয়র্ক ও ইয়োকোহামার দূরত্ব কমাইয়া ফেলিবে। ইহাতে এসিয়াস্থিত প্রশান্তসাগরোপকূলবাসী ও আটলাণ্টিকসাগরোপকূলবাসীদিগকে প্রতিবেশী করিয়া তুলিবে এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও এসিয়া এই তিন মহাদেশকে এক মহা-ভ্রাতৃপ্রেমশৃঙ্খলে চির-আবদ্ধ করিবে। ইহা হইতে বিশ্ব-বাণিজ্য, বিশ্ব-বন্ধুত্ব, ও বিশ্ব-শান্তির উচ্চতম সুখ-স্বপ্ন পূর্ণতার পথ পাইবে।

সকল দেশই এই জগদ্বিখ্যাত উৎসবের সাফল্য সাধনের জন্য বিশেষ যত্ন সহকারে কর্ম্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়াছে। এই মহাযজ্ঞ বিশ্বজনীন, ইহার শুভফল সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া থাকিবে। আমেরিকাতে পূর্ব্বে তিনটী

সার্ব্বজাতিক প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে; প্রত্যেকটীতেই সামরিক এবং জাতীয় কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে উৎসব করা হইয়াছে।—

১ম। ১৮৭৬ সালে ফিলাডেল্‌ফিয়াতে, স্বাধীনতার জন্ম (the Birth of Independence) ২য়। ১৮৯৩ সালে সিকাগোতে, আমেরিকা-আবিষ্কার (the Discovery of America) ৩য়। ১৯০৪ সালে সেণ্ট লুইসে, পাশ্চাত্যের শান্তিময় বিজয় (the peaceful conquest of the West)। পুনরায় ১৯১৫ সালে আমেরিকার ৪র্থ মহোৎসব হইবে। ইহাই প্রথম বিশ্ব-প্রদর্শনী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই বিশ্বপ্রদর্শনী সমাধানের জন্য আমেরিকার জাতীয় শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে। এই প্রদর্শনী ১৯১৫ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ হইবে এবং ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ইহার প্রবেশদ্বার সমস্ত জগতের জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। আমেরিকা এই বিশ্ব-প্রদর্শনীর প্রাসাদ-সমূহ প্রস্তুত করিবার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর হস্তেই অর্পণ করিয়াছে।

সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতীব হৃদয়-গ্রাহী। উদ্যান ও বিরাট অট্টালিকামালার দৃশ্য এত মনোমুগ্ধকর যে উহাকে City of the seven hills বলিয়া মনে হয় এবং এই সহর দর্শনে হৃদয়ে স্বভাবতই আনন্দের সঞ্চার হয়। সহরের তলদেশেই সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো উপসাগর এবং তাহার উপকূলে বিশাল মনোরম জনাকীর্ণ বন্দর। এই বৃহৎ বন্দরের বক্ষে পৃথিবীর সমস্ত জাতির রণতরী-সমূহ একত্রিত হইতে পারে এবং সকল সাগরের সমস্ত জাহাজ একত্রে নঙ্গর করিতে পারে। এই সহরের পশ্চাৎদেশে এক অত্যুচ্চ পাহাড়শ্রেণী পরিশোভিত এবং সম্মুখে সুবিখ্যাত মনোমুগ্ধকর গোল্ডেন্ গেট্ নামে অভিহিত বন্দরের প্রবেশপথ অতি সুন্দর ভাবে অবস্থিত হইয়া নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতেছে। সায়ংকালে যখন সূর্য্যদেব সেই গোল্ডেন্ গেট (Golden Gate)-স্থিত জলরাশির মধ্যে লুক্কায়িত হন তখন তাহার অপূর্ব্ব শোভা সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে ব্যক্তি-মাত্রেরই মন বিমোহিত হয়। ইহার বামে সুবিশাল প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো উপসাগর (Bay of San Francisco)। এই উপসাগরের অপর পারে পাহাড়ের পদতলে শোভিত ওক্‌ল্যাণ্ড (Oakland) ও বার্কলে (Berkeley University) সহর

পানামা-প্রদর্শনীতে স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি।
[পানামা প্রদর্শনীর অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত, চিত্রের সর্ব্বস্বত্ব রক্ষিত]

অতি রমণীয় ভাবে অবস্থিত। এই সহরেই ১৯১৫ সালে অভূতপূর্ব্ব প্রদর্শনী হইবে।

প্রদর্শনীর অট্টালিকাগুলি অতি সুন্দর ভাবে নানা প্রকার কারুকার্য্যে ভূষিত হইতেছে। কোন

কোন প্রাসাদের স্তম্ভশ্রেণী নানা প্রকার মূর্ত্তি দ্বারা অতি সুসজ্জিত করা হইয়াছে। কোন কোন প্রাসাদের প্রত্যেক মূর্ত্তির শিরোদেশে অনেকগুলি নক্ষত্র অতি সুন্দর ভাবে বসান হইয়াছে এবং সেগুলিকে বহুমূল্যবান পাথর দ্বারা সুসজ্জিত করা হইবে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের উপর নানা বর্ণে রঞ্জিত বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া হইবে। কতকগুলি প্রাসাদ ইতালী দেশীয় নীল, সিন্দুর, লাল, কমলা ইত্যাদি নানাবিধ অতি সুন্দর সুন্দর রং দ্বারা চিত্রিত করা হইবে। কোন প্রাসাদ গজদন্তের ন্যায়

পানামা-প্রদর্শনীর বিদ্যামন্দির, তালীচত্বর ও ফলচাষের গৃহ।

[চিত্র-স্বত্বাধিকারী পানামা-প্রদর্শনীর অনুমতি-অনুসারে।]

শুভ্র স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা শোভিত হইবে। আটটী বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদ কন্‌ষ্টান্‌টিনোপল্‌, দামস্কস্‌ ও কাইরো প্রভৃতি নগরের বাজারের আকারে প্রাকৃত সৌন্দর্য্যোচ্ছ্বাসে ভূষিত করিয়া অতি সুন্দর ভাবে নির্ম্মাণ করা হইবে। প্রাসাদের কার্নিশগুলি সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি দ্বারা সজ্জিত করা হইবে। ইহার বুরুজ ও চূড়া (tower and minaret) লাল, পীত এবং কমলা রঙ্গে রঞ্জিত হইবে ও ইহার গম্বুজগুলি স্বর্ণ এবং তাম্র দ্বারা অতি সুচারুরূপে সুসজ্জিত করা হইবে। এই প্রাসাদগুলির শিখরদেশে সহস্র সহস্র বিবিধ বর্ণের পতাকা প্রশান্ত মহাসাগরের ধীর বাতাসে যখন নৃত্য করিতে থাকিবে তখন কতই সুন্দর দেখাইবে! আর একটী প্রাসাদের চারিধারে এমন সুন্দর ভাবে জল রাখা হইবে, যে, দেখিলে একটী প্রকৃত জলাশয় বলিয়া ভ্রম হইবে। জলের মধ্যে যখন বিভিন্ন স্বাধীন জাতির সুরম্য অট্টালিকার সুন্দর স্তম্ভ, দেয়াল, পতাকা ও অপরাপর কারুকার্য্যময় অট্টালিকার প্রতিবিম্ব পড়িবে, তখন বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে উহার সৌন্দর্য্য অতুলনীয় হইবে। যখন এই প্রদর্শনীর প্রাসাদ-সমূহের কথা মনে হয় তখন ভারতের অতীত গৌরব এবং ইন্দ্রপ্রস্থের ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদ-সমূহের ও সেই রাজসূয় মহাযজ্ঞের কথা স্বতঃই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। বিশেষতঃ অতীত ভারতের কীর্ত্তি ও বর্ত্তমান ভারতের দৈন্য দুঃখ আর তত্তুলনায় এই সমৃদ্ধিসম্পন্ন মহান্‌ জাতির জাতীয় মহোৎসব দর্শনে প্রাণে মর্ম্মান্তিক বেদনা উপস্থিত হয়। যে-সমস্ত জাতির মধ্যে আত্মশক্তি, জ্ঞান এবং জাতীয় মর্য্যাদার অভিমান আছে তাহারা আজ এই সার্ব্বজাতিক বিরাট উৎসবের সংবাদ শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এবং আনন্দে ও আগ্রহে জাতীয় শক্তি, কারুকৌশল ও সভ্যতা ইত্যাদি নানা বিষয় প্রদর্শনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। ভারতবাসী আমরা, এখন এস্থলে আমাদের কি কর্ত্তব্য? আমরা কি জাগ্রত না নিদ্রিত? আমরা কি আজ আমাদের জাতীয় সম্মান সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হইতে পারি না? জগতকে দেখাইবার মত আমাদের কি এমন কিছুই নাই? ভারত-ভাণ্ডারে কি এমন কোন রত্ন মাণিক্যও নাই যাহা দেখাইয়া আমরা আজ জগতের সম্মুখে অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া মস্তক উত্তোলন করিতে পারি?

মহামেলার স্থানটী ৬৩৫ একর বা প্রায় দুই হাজার বিঘা জমি অধিকার করিয়াছে। স্থানটী দেখিতে অতি

সুন্দর! প্রদর্শনীর প্রাসাদের নক্সাগুলি পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারিকর দ্বারা তৈয়ারী করা হইয়াছে। প্রাসাদের ছবিগুলি ভালরূপে দেখিলে ভাবুক মাত্রেই অনায়াসে তৎসৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং আমেরিকা শিল্পে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে ও প্রদর্শনীর জন্য কত অগণ্য অর্থ ব্যয় করিতেছে তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রধান এগারটী প্রাসাদ নিম্নলিখিত বিভাগ অনুসারে নির্ম্মিত হইয়াছে:— ১। ললিতকলা, (Fine art), ২। শিক্ষা (Education), ৩। সামাজিক মিতব্যয়িতা (Social economy), ৪। বিবিধ শিল্প-কারখানা (Manufactures and Varied Industries), ৫। কৃষিবিদ্যা (Agriculture), ৬। গৃহপালিত পশু (Live-Stock), ৭। ফলচাষ (Horticulture), ৮। খনি- এবং ধাতু-বিদ্যা (Mines and Metallurgy), ৯। যন্ত্র-কৌশল (Machinery), ১০। চালানি ব্যবসা, (Transportation), ১১। উদার শিল্প (Liberal art)। এই সমস্ত বিভিন্ন বিভাগে যে-সমস্ত বিষয় প্রদর্শিত হইবে তাহার বিবরণ উল্লেখ করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব, কাজেই সব উল্লেখ না করিয়া কয়েকটী মোটামুটী নাম নিয়ে উল্লেখ করা গেল:—

নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষা, মধ্য-প্রাথমিক শিক্ষা, কলেজী শিক্ষা, শিক্ষাবিস্তার-প্রণালী, বাণিজ্যশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, খঞ্জ অন্ধ মূক বধির প্রভৃতির শিক্ষা, পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন, বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষা ও জাতীয় স্বাস্থ্যবিধান, বিভিন্ন দেশের আয়-ব্যয়-প্রণালী, মাদক দ্রব্য ব্যবহারের ফল, মানচিত্র প্রস্তুত করণ, রসায়ণ ও ভৈষজ্য বিদ্যা, যৌথ কারবার, ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্য বিদ্যা, মুদ্রা ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্ম্মাণ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাবলী, সঙ্গীতবিদ্যা, সর্ব্বপ্রকারের ইঞ্জিনিয়ারিং, কাচ নির্ম্মাণ, কার্পেট নির্ম্মাণ, বয়নবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, গ্যাসের আলো, কাপড় রং করা (Dyeing), রেশম প্রস্তুত করণ, সর্ব্বপ্রকারের পরিধেয় বস্ত্র নির্ম্মাণ, ফল রক্ষণ (Fruit preserving) ইত্যাদি বিষয় বিশেষ রূপে প্রদর্শিত হইবে।

প্রদর্শনীতে নিম্নলিখিত দেশগুলি সামরিক মিলনার্থে আপন আপন সেনাদল পাঠাইবেন:—যথা,

ইংলণ্ড, জারমানী, ফ্রান্স, রুষিয়া, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, দেনমার্ক, ইতালী, বেলজীয়ম্, পর্ত্তুগাল, স্পেন, সুইডেন, নরওয়ে, সুইজারল্যাণ্ড্ ও হলাণ্ড্। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর আর কোথায়ও এরূপ সামরিক মিলন হয় নাই। এই নানা দেশের সেনাদলের মধ্যে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেট্ হইতে তিনটী পদাতিক সৈন্যদল ও অন্যান্য কতকগুলি জাতীয় রক্ষক সৈন্যদল যোগদান করিবে। প্রত্যেক সেনাদল আপন আপন গুণ দেখাইয়া যশ গৌরব ও মান লাভ করিতে বিশেষ যত্নবান হইবে। ভারতের অতীত শৌর্য্য বীর্য্যের কথা যেন এখন কাহিনী বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু আজও শিখ্, গুরখা, রাজপুত, পাঠান সৈন্যের বীরত্বের কথা সভ্যজগতে অজ্ঞাত নহে। এই সার্ব্বজাতীয় সামরিক সম্মিলনে ভারতীয় সৈন্য আসিলে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি হইত!

নিম্নলিখিত দেশগুলি প্রদর্শনী-ভূমিতে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার জন্য আপন আপন দেশের নানাপ্রকারের জিনিষ দেখাইবার জন্য ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে:—

আর্জেন্টাইন্, চীন, জাপান, বোলিভিয়া, ব্রাজিল, ক্যানাডা, চিলি, কষ্টারিকা, কিউবা, দেনমার্ক, ডমিনিকান্-রিপাব্লিক্, ইকুয়াডর্, ফ্রান্স, গুয়াটেমালা, হেইটী, হলাণ্ড, হন্ডুরাস্, লাইবেরিয়া, মেক্সিকো, নিকারোগোয়া, পানামা, পেরু, পর্ত্তুগাল, সাল্ভাডর্, সুইডেন্, উরুগোয়ে, ভেনেজুয়েলা। ইহাদের মধ্যে জাপান ইতিপূর্ব্বেই তাহার মত প্রকাশ করিয়াছে যে প্রদর্শনী শেষ হইবার পর তাহার প্রাসাদ ও প্রদর্শিত বস্তু-সমূহ জাতীয় বন্ধুতাস্বরূপ কালিফোর্ণিয়াকে দান করিবে।

নিম্নলিখিত ষ্টেট্স্ এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের অধিকারভুক্ত কয়েকটী দ্বীপ প্রদর্শনীর জন্য নানাবিধ জিনিষ যোগাড় করিয়াছেন এবং অট্টালিকাসমূহ (State-buildings) সুসজ্জিত করিবার জন্য বিবিধ প্রকারের সুন্দর সুন্দর মূল্যবান জিনিষ সরবরাহ করিয়াছেন।

কেবল সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো নগরে জনসাধারণ হইতে প্রদর্শনীর জন্য পঁচাত্তর লক্ষ ডলার চাঁদা উঠিয়াছে। (এক ডলার তিন টাকা দুই আনা।):—

ফিলিপাইন্‌ দ্বীপ, হাওয়াই দ্বীপ, আইডাহো, ইলিনয়স্‌, ইণ্ডিয়ানা, কানসাস্‌, মাসাচোসেট্‌, মিসৌরি, নেভাডা, নিউইয়র্ক, নিউজারসিস্‌, নর্থডেকোটা, অরেগন, পেনসিলভেনিয়া, উটা, ওয়াসিংটন্‌, ওয়েষ্ট ভারজিনিয়া, উইস্‌কন্‌সিন।

এই জগদ্বিখ্যাত প্রদর্শনীতে অন্ততঃ দুইশত কংগ্রেস বসিবে। এই-সব কংগ্রেসের জন্য একটী প্রকাণ্ড সভাগৃহ নির্ম্মাণ করা হইবে; ইহাতে দশ লক্ষ ডলার ব্যয় হইবে। এই সভা-মন্দিরে দশ হাজার লোকের বসিবার স্থান হইবে। নিম্নে কতকগুলি কংগ্রেসের নাম দেওয়া গেল।

1. International Congress on Education. 2. International Efficiency Congress. 3. International Congress on Marketing and Farm Credits. 4. International Electro-technical Commission. 5. International Electrical Congress. 6 International Council of Nurses. 7. International Engineering Congress. 8. International Gas Congress. 9. International Congress of Authors and Journalists. 10. Woman's World Congress of Missions. 11. National Congress of Mothers. 12. National Drainage Congress, 13. Congress on Marriage and Divorce. 14. American Red Cross. 15 American Historical Association. 16. Association of Collegiate Alumni. 17. Association of American Universities. 18 American Society of Mechanical Engineers 19. American Gas Institute. 20 Astronomical and Astrophysical Society of America. 21. International Association of Labor Commissioners. 22. American Electrochemical Society. 23 National Association of Railway Commissioners. 24. American Society of Animal Nutrition. 25. American Institute of Electrical Engineers. 26. National Liberal Immigration League. 27. American Academy of Political and Social Science. 29 American Home Economic Association. 30. Insurance Commissioners' National Association. 31. American Academy of Medicine. 32. Associated Harvard Clubs of America. 33. American School Peace League. 34. National Education Association. 35. International Good Road Congress. 36. International Municipal Congress. 37. Panama Pacific Dental Congress. এই সঙ্গে আমাদের ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের ব্যবস্থা হইলে অতি সুন্দর হইত।

সূর্য্য ও নক্ষত্র ভবন (Court of the Sun and Stars) নামক প্রাসাদের উপরিভাগে একটী বৃহৎ ভারতীয় হস্তীমূর্ত্তি অতি সুসজ্জিতভাবে রাখা হইবে এবং তাহার উপরিস্থ হাওদার ভিতর বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি অতি সুন্দররূপে সংস্থাপিত হইবে। প্রাসাদের শিরোদেশে নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখিত হইবে।

Unto Nirbana. He is one with life
Yet lives not, He is blest ceasing
To be. Om Manipadme Om. The
Dewdrop slips into the shining sea.

সাজাহানের সময়কার ভারত-প্রস্তুত একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ এই প্রদর্শনীতে আনা হইবে। বর্ত্তমান সময়ে জাহাজখানি নিউইয়র্কের বন্দরে আছে। জাহাজটী দেখিতে অতীব সুন্দর। ভারতের শিল্প ভারত হইতে বিলুপ্ত হইলেও বিদেশীর হাত হইতে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

এই বিশ্বপ্রদর্শনীতে পৃথিবীর সকল দেশ হইতেই প্রতিনিধিগণ আসিবেন এবং নিজ নিজ দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি যাবতীয় বস্তু প্রদর্শন করাইবেন। এতদ্ব্যতীত প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ দেশের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার ইত্যাদি সকল বিষয়ই আলোচনা করিয়া আপন দেশকে অন্যান্য উন্নত ও শিক্ষিত দেশের সঙ্গে চিরসখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ করিবেন। একটু ভাবিলে সহজেই বুঝা যাইবে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে এই প্রদর্শনীতে এত অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহারা কেন আসিতেছেন এবং কেনই বা প্রদর্শনী-ভূমিতে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছেন। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর লোক শান্তি চায়; অনেক কাল ধরিয়া একদেশ অন্য দেশের সঙ্গে অশান্তির আগুন জ্বালিয়া পরস্পরকে ধ্বংস বিধ্বংস করিয়াছে; কিন্তু মানুষ এখন তাহা চাহে না। মানুষ এখন সুখ শান্তি চায়, তাই একটা সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছে। এই প্রদর্শনী-ভূমিতে সার্ব্বজাতিক শান্তি (Universal peace) স্থাপনের এক প্রশস্ত পথ উদ্ঘাটিত হইবে, তাই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এত লোক আসিতেছে।

বড়ই দুঃখের বিষয় জগতের অন্যান্য জাতির মধ্য হইতে এই প্রদর্শনীতে প্রতিনিধিগণ আসিয়া নানা প্রকার বহুমূল্যবান জিনিষ নিজ নিজ দেশ হইতে আনাইয়া পৃথিবীর লোকদিগকে দেখাইবেন, আর জলদগম্ভীরস্বরে বলিবেন আমরা উন্নত জাতি, আমাদের সবই আছে; কিন্তু আমরা ভারতবাসী, যাঁহাদের শিল্প, বিজ্ঞান, নীতি, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি বিদেশীদের তুলনায় হেয় নহে, আজ ঘরে বসিয়া কি করিতেছি? যে আর্য্য-জাতি এক সময় শিল্প, জ্ঞান ও সভ্যতায় পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতিকে অতিক্রম করিয়া উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া সমগ্র জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, সেই জাতির বংশধরগণের কি আজ নীরব থাকা উচিত? মহাত্মা অশোকের কীর্ত্তিকলাপ, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের কথা, আকবরের সভাসদগণের বিবরণ, আগ্রার তাজমহল প্রভৃতির কথা একবার প্রাণের মধ্যে জাগাইলেই ভারত-সন্তান সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে, "ভারতের সবই ছিল এবং এখনও আছে।" ভারতের এ-সব থাকা সত্ত্বেও আজপর্য্যন্ত পৃথিবীর উন্নত ও শিক্ষিত জাতির মধ্যে ভারত-সন্তান পরিচিত হয় নাই; কারণ ভারতসন্তান ঘরের বাহির হইতে পাঁজি খোঁজে, শাস্ত্র হাতড়ায়। যদি দেশের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই প্রদর্শনীতে ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া আসেন এবং দেশের বর্ত্তমান ও প্রাচীন শিক্ষা, শিল্প, বিজ্ঞান, নীতি, দর্শন, বাণিজ্য, কৃষি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, জাতীয় উন্নতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় আলোচনা করিয়া পৃথিবীর লোকদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন, তবে ভারতবাসীর গৌরব আবার বাড়িবে। দেশ হইতে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণের পানামা-মহামেলায় আসা নিতান্ত দরকার। যদি আমাদের ভারত-গৌরব সাহিত্য-মহারথী রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ও আমেরিকাতে না আসিতেন এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করিতেন, তবে তাঁহাকে আজ এ-সকল দেশে কে জানিত? তিনি এসব দেশে আসিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ তাঁহাকে সকলে জানে ও লোকমুখে তাঁহার গুণের কথা শুনিতে পাই। ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ যদি ১৯০১ খৃঃ অব্দে ধর্ম্মসংক্রান্ত মহাসভাতে (Parliament of Religions) আসিয়া সর্ব্বজগৎসমক্ষে ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যা না করিতেন তাহা হইলে কি ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শন আজ সভ্য জগতে এত মর্য্যাদা পাইত?

ভারতীয় বণিক-সম্প্রদায় ইচ্ছা করিলে এই জগদ্বিখ্যাত প্রদর্শনীতে ভারত হইতে শাল, বনাত, গজদন্ত, হীরা, পান্না, মুক্তা, প্রভৃতি মূল্যবান জিনিষ লইয়া আসিতে পারেন। প্রদর্শনীর সময় এখানে জিনিষ আনিতে কোনরূপ শুল্ক লাগিবে না, অথচ তাঁহারা তদ্বিনিময়ে অগাধ অর্থরাশি উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। ভারতীয় রাজন্যবর্গ, শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বণিক-সম্প্রদায় ইচ্ছা করিলে ভারত হইতে প্রতিনিধি এবং শিল্প ও বাণিজ্য-পদার্থ ও অন্যান্য বহুমূল্যবান জিনিষ অনায়াসে এখানকার প্রদর্শনীতে পাঠাইতে পারেন। যদি ভারতের এই তিন শ্রেণীর লোকদের কেহই এ বিষয়ে অগ্রসর না হন তবে আর কে হইবে? কিন্তু ভারতবাসী যদি ভারতের প্রাচীন ও বর্ত্তমান শিল্প, বাণিজ্যপণ্য ও বহুমূল্যবান জিনিষ নিজেরা প্রদর্শনীতে না আনেন তবে কি তাহা এখানে আসিবে না? বিদেশী বণিকগণ নিশ্চয়ই তাহা আনিবেন এবং তাঁহারা ভারতের নামে যশোলাভ করিবেন, কিন্তু ইহাতে ভারতবাসীদের কোন নাম কিম্বা যশ হইবে না। বিদেশী বণিকেরা পূর্ব্বে অনেক-স্থলে ভারতীয় শিল্প ইত্যাদি প্রদর্শন করিয়া নিজেরা যশস্বী হইয়াছেন, এক্ষেত্রেও তাহাই হইতে চলিল; কারণ সাধারণতঃ সংগ্রহকারকেরই নাম-যশ হইয়া থাকে। হায়, আমরা এমনই হতভাগ্য যে আমাদের নিজেদের ধন নিজেদের হাতে থাকিতেও কিছু করিতে পারি না, অথচ অপরে তস্করের ন্যায় আমাদের সম্মান হরণ করিয়া লইতেছে! ভারতসন্তান! একবার দেখ, ১৯১৫ সালের এই বিশ্ব-মহাসম্মিলন-সভাতে ভারতের স্থান কোথায়? এই যে ক্ষুদ্র শ্যামদেশ তাহারও এই সভাতে স্থান হইয়াছে, ঐ যে রাজনীতিক্ষেত্রে টলটলায়মান পারস্য দেশ তাহারও এই সভাতে স্থান হইয়াছে; ঐ যে দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রো-রিপাব্‌লিক্ (Liberia) তাহারও

কি না এই মহাসভাতে অতি সম্মানপূর্ব্বক স্থান হইয়াছে! ভারতসন্তান! আর মহানিদ্রায় অভিভূত থাকিও না, একবার আসিয়া নিজের দেশকে এই উন্নত ও শিক্ষিত দেশের সঙ্গে পরিচিত করাও। আজ যদি তুমি এই মহা সম্মিলনে যোগদান কর তবে দেখিবে তোমার দেশও এক সময় উন্নত ও শিক্ষিত দেশের মধ্যে স্থান পাইবে। যতদিন না ভারতবাসী নিজকে ও নিজের দেশকে ইউরোপ ও আমেরিকার সঙ্গে পরিচিত করাইবে এবং সখ্যতার সূত্রে আবদ্ধ হইবে ততদিন ভারতের কোন উন্নতি হইবে না। ভারতের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই প্রদর্শনীতে আসিয়া "ভারতবাসী কাহারা" এবং "তাহাদের কি আছে" একথা যদি কংগ্রেসে সম্যকরূপে জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন তবে ভারতের অনেক অপবাদ ঘুচিয়া যাইবে। বলিতে বড়ই দুঃখ হয় যে এখানকার থিয়েটারে, ভডেবিল্ (Vaudeville), বায়োস্কোপ (Bioscope) প্রভৃতি নানাপ্রকার দৃশ্যে আমাদের ভারতীয় আচারব্যবহার নানাপ্রকার কুৎসিত আকারে অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা করিয়া দেখান হয় এবং এসব ভারতবর্ষীয়দের রীতিনীতি বলিয়াই সাধারণ লোকদের নিকট পরিচিত হইয়া থাকে। এ-সব দেখিয়া শুনিয়া এখানকার লোকের মনে ভারতীয় লোকদের উপর এক মহা ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে। তাহার ফলেই আজ এই কালিফোর্ণিয়াতে ভারতবাসীদের প্রতি "হিন্দ" বলিয়া (আমেরিকাবাসীরা সমস্ত ভারতবাসীদেরই হিন্দু বলে, ইহা জাতীয় নাম, হিন্দু মুসলমান বলিয়া ধর্ম্মগত কোন প্রভেদ নাই) এত ঘৃণা! বিশেষতঃ ইহারই ফলে আজ আমাদের মজুরদের কথা আর কি বলিব, এমন কি স্বাবলম্বী ছাত্রদেরও অনেক কষ্টভোগ করিতে হয়। এখানকার সকল দেশ হইতে ভারতবাসীদের বিতাড়িত করিবার তুমুল আয়োজন চলিতেছে। খুব সম্ভব প্রদর্শনীর সময় এখানকার কোন থিয়েটার কোম্পানী ভারত হইতে কতকগুলি অশিক্ষিত লোক আনাইয়া "ইহাই ভারতবাসীর আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি" বলিয়া দর্শকমণ্ডলীকে নানাবিধ কুৎসিত আচরণ দেখাইয়া আমাদের কুৎসা ও কৌতুক করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবে। এখানকার লোকেরা ভারতবাসীর খারাপ দিকটা দেখিতে শুনিতেই বেশী পায়, ভালটা তত পায় না, কারণ এখানে ভারতীয় মজুরই অনেক আছেন। যদি ভারতের শিক্ষিত লোক এখানে আসিয়া বিশদরূপে আর্য্যসভ্যতার ব্যাখ্যা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন তাহা হইলে ভারতবাসীকে এদেশবাসীর নিকট হেঁটমুখ করিতে হইবে না। ভারত-সন্তান দেশে থাকিয়া বুঝিতে পারে না যে তাহার আপন-দেশবাসী বিদেশে কিরূপ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছে। ইহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় দলে দলে শিক্ষিত চরিত্রবান ব্যক্তিদের দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়া আপনাদের দৃষ্টান্তে ভারতবাসী সম্বন্ধে জগৎবাসীর ভ্রান্তধারণা অপনোদন করা। আমরা এখনো যদি সেকেলে শাস্ত্র ও পাঁজির ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকি তবে আমাদের আর রক্ষা নাই। বিদেশপ্রবাসী ভারতবাসীরা পরের দ্বারে কাঁদিয়া মরিতেছে, ফল হইতেছে না। ভারতবাসীর মান ভারতবাসীই রাখিবে, তাহা ভিন্ন আর কোনো পথ নাই।

বাকলে, কালিফর্ণিয়া, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।
ইউনাইটেডষ্টেট্স্, আমেরিকা।

ধর্ম্মপাল

[বরেন্দ্রমণ্ডলের মহারাজ গোপালদেব ও তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক ভগ্নমন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে দস্যুলুণ্ঠিত এক গ্রামের ভীষণ দৃশ্য দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন দুর্গে লইয়া যান।

সন্ন্যাসীর নিকট সংবাদ আসিল যে গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্যে আসিতেছেন; অথচ দুর্গে সৈন্যবল নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার এক অনুচরকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধর্ম্মপালদেব দুর্গরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্গ শীঘ্রই শত্রুর হস্তগত হইল। তখন দুর্গস্বামিনীর কন্যা কল্যাণী দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পিঠে বাঁধিয়া ধর্ম্মপাল দেব দুর্গ হইতে লম্ফ দিয়া পলায়ন করিলেন।

ঠিক সেই সময় উদ্ধারণপুরের দুর্গস্বামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ ঘোষকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। তখন সন্ন্যাসী তাঁহার শিষ্য অমৃতানন্দকে যুবরাজ ও কল্যাণী দেবীর সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। এদিকে গৌড়ে সংবাদ পৌঁছিল যে মহারাজ ও যুবরাজ নৌকাডুবির পর সপ্তগ্রামে পৌঁছিয়াছেন।]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রোষিত সংবাদে

গৌড় নগরের প্রধান রাজপথ দিয়া বেলা তৃতীয় প্রহরে রাজপুরোহিত পুরুষোত্তমদেবকে দ্রুতপদে চলিতে দেখিয়া নাগরিকগণ বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার পর যখন রাজ্ঞীর দাসী মাধবীকে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখিল তখন গৌড়বাসী ভীত হইল, দুই একজন বণিক ব্যস্ত হইয়া বিপণির দ্বার রুদ্ধ করিল, দুই একজন নাগরিক গৃহদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া পুত্র কলত্র রক্ষার জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিল এবং সকলেই সাগ্রহে পুরুষোত্তমদেবকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল 'ঠাকুর, কি হইয়াছে?" রাজপুরোহিত ঘর্ম্মাপ্লুতদেহে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে প্রাসাদাভিমুখে ছুটিতেছিলেন, নাগরিকগণের প্রশ্নের উত্তর দিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা তখন রাজপুরোহিতের পক্ষে অসম্ভব। কারণ দ্রুত গমনের জন্য তাহার প্রায় শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। গৌড়বাসীগণ সভয়ে ও সবিস্ময়ে দেখিল যে মাধবীর পশ্চাতে একজন ধূলিধূসর অশ্বারোহী একটি জীর্ণ পথশ্রান্ত অশ্বের বল্গা আকর্ষণ করিয়া পুরোহিত ও মাধবীর পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া প্রথমে সকলে দস্যু আসিয়াছে বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, যে যেখানে ছিল রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া পলাইল, গৃহস্থগণ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া গৃহরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদি ভূগর্ভে লুকাইতে ব্যস্ত হইল। এই গোলমালের মধ্যেও দুই একজন চিন্তাশীল নাগরিক আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ?" আগন্তুক উত্তর করিল "আমি গৌড়বাসী, সম্প্রতি সপ্তগ্রাম হইতে আসিতেছি। তোমরা উতলা হইতেছ কেন? কোন ভয় নাই।" কিন্তু গোলমাল না থামিয়া উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।

রাজপুরোহিত পুরুষোত্তমদেবকে রাজপথে দ্রুতপদে চলিতে দেখিয়া একটি তাম্বূলের বিপণি হইতে বিপণিস্বামী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'কি ঠাকুর, অত ব্যস্ত হইয়া কোথায় যাও?" তাহার প্রশ্ন শুনিয়া ব্রাহ্মণ বিষম বিপদে পড়িল, সে সর্ব্বাগ্রে রাজ্ঞীর নিকট এই মঙ্গল-সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য দ্রুতপদে ছুটিতেছিল, মনে করিয়াছিল যে এমন শুভ সংবাদ দিতে পারিলে মহারাণী অবশ্যই অতি বৃহৎ ফলাহারের আয়োজন করিবেন। সেই জন্যই শত শত নাগরিকের কথায় লক্ষেপ না করিয়া এক মনে প্রাসাদের দিকে ছুটিতেছিল, কিন্তু এইবার তাহাকে ফিরিতে হইল, কারণ তাম্বূলিক তাহাকে বড়ই অনুগ্রহ করে, নিত্যই বিনামূল্যে তাম্বূল যোগাইয়া থাকে এবং কখনও মূল্যের জন্য ব্যস্ত করে না। ব্রাহ্মণ অগত্যা ফিরিল, তাহা দেখিয়া তাম্বূলিক জিজ্ঞাসা করিল "অত দ্রুতপদে কোথায় যাইতেছিলে?"

ব্রাহ্মণ।— প্রাসাদে, মহারাণীকে সংবাদ দিতে।

তাম্বূলী।— কি সংবাদ, আমাদিগকে বলিয়া যাও।

ব্রাঃ।— অতীব শুভ সংবাদ, তুমি ভাল করিয়া গোটা দুই পান সাজিয়া রাখ, সর্ব্বপ্রথমে সংবাদটা দিতে পারিলে উত্তমরূপ ফলাহার পাওয়া যাইবে।

তাম্বূলী।— ভাল, পান সাজিয়া রাখিতেছি, সংবাদটা কি তাহা ভাঙ্গিয়া বল।

ব্রাঃ।— শুভ সংবাদ হে, শুভ সংবাদ। মহারাজ জীবিত আছেন।

তাম্বূলী।— বল কি? তোমাকে কে বলিল?

ব্রাঃ।— সেনানায়ক নন্দলাল, সে এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছে।

ব্রাহ্মণ আর অপেক্ষা না করিয়া প্রাসাদের দিকে ছুটিল। তাম্বূলিক এক লম্ফে বিপণি হইতে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল "জয়, মহারাজের জয়।" সেই জয়ধ্বনি শুনিয়া দেখিতে দেখিতে শত শত নরনারী তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "হরিনাগ, কি হইয়াছে?" হরিনাগ কেবল উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল "জয় মহারাজের জয়, জয় গোপালদেবের জয়। নাগরিকগণ আর ভয় নাই।" তাহা শুনিয়া সহস্র সহস্র নাগরিক নাগরিকা উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে গৌড়-নগরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। ভীতিবিহ্বল নরনারী

সকলে গৃহের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া রাজপথে দাঁড়াইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। গৌড়নগর কোলাহলে কম্পিত হইয়া উঠিল।

প্রাসাদের তোরণে উপস্থিত হইয়া পুরুষোত্তম দেখিল যে দ্বার রুদ্ধ, প্রতীহারীগণ বিশ্রাম করিতেছে। বারংবার বিদেশীয় শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রতীহাররক্ষীগণ প্রাসাদের তোরণ উন্মুক্ত রাখিতে ভরসা পাইত না। ব্রাহ্মণ তোরণের কপাটে সজোরে আঘাত করিল। একজন প্রতীহারী অন্তরালে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে?" ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল "আমি, শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও।"

প্রতী।— তুমি কে?

ব্রাহ্মণ।— আমি হে বাপু।

প্রতী।— নাম না বলিলে কি করিয়া চিনিব?

ব্রাঃ।— জ্বালাতন করিলে দেখিতেছি, আমি পুরুষোত্তম শর্ম্মা, রাজপুরোহিত।

প্রতী।— কি ঠাকুর, এত ব্যস্ত কেন? দাঁড়াও দ্বার খুলিয়া দিতেছি।

ব্রাঃ।— দাঁড়াইবার সময় নাই।

প্রতীহারী তোরণ উন্মুক্ত করিল, ব্রাহ্মণ ঝড়ের মত তাহার পার্শ্ব দিয়া ছুটিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিল। মহারাণী দেদ্দদেবী বোধিসত্ত্ব লোকনাথের মন্দিরে পূজা করিতেছিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মহাকুমার বাক্‌পাল মন্দিরের সম্মুখে ছায়ায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। পুরুষোত্তম রাজ্ঞীকে তাঁহার কক্ষে না পাইয়া পাগলের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, মন্দিরের বাহিরে মহাকুমারকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কুমার, মহারাণী কোথায়?" কুমার তাহার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর,—কি হইয়াছে? মাতা এইখানেই আছেন।" ব্রাহ্মণ তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া ছুটিয়া আসিয়া মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইল এবং রাজ্ঞীকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল "মা, শুভ সংবাদ, মহারাজ জীবিত আছেন।" রাজ্ঞী তাঁহার কথা শুনিয়া পূজা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর, কি বলিলেন?" অনভ্যাস হেতু দ্রুতগমনে ব্রাহ্মণের শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সে বহু কষ্টে বলিল "মহারাজ—জীবিত—।"

মহারাণী।— তোমাকে কে বলিল?

ব্রাহ্মণ।— নন্দলাল।

মহারাণী।— নন্দলাল কে?

ব্রাহ্মণ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মাধবী বেগে ছুটিয়া আসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিয়া উঠিল "মহারাজের জয় হউক। মা, মহারাজ জীবিত আছেন।" পুরুষোত্তম তাহার কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল "মহারাণীর জয় হউক, আমি সর্ব্বপ্রথমে সংবাদ আনিয়াছি।"

মহারাণী।— মাধবি, তুই কাহার নিকট সংবাদ পাইলি?

মাধবী।— গৌল্মীক নন্দলালের নিকট।

মহারাণী।— নন্দলাল কে?

মন্দিরের দ্বারে কোলাহল শুনিয়া পুরবাসীগণ রাণী ও পুরুষোত্তমকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মহারাণীর প্রশ্ন শুনিয়া পশ্চাৎ হইতে কে উত্তর করিল "নন্দলাল মহারাজের একজন সেনানায়ক, সে মহারাজ ও যুবরাজের সহিত নীলাচলে গিয়াছিল।" বক্তার কণ্ঠস্বর শুনিয়া পৌরজন সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল, মহারাণী দেখিলেন যে সে ব্যক্তি গৌড়রাজ্যের মহামন্ত্রী গর্গদেব শর্ম্মা। মহারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন "দেব, এই সংবাদ কি সত্য?"

গর্গ।— আপনি উতলা হইবেন না, আমি অনুসন্ধান করিয়া আসি নন্দলাল কোথায়।

মাধবী।— সে পশ্চাতে আসিতেছে।

গর্গদেব প্রাসাদের বাহিরে চলিয়া গেলেন। তিনি তোরণে গিয়া দেখিলেন যে নাগরিকগণ প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া তুমুল জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতেছে। গর্গদেব তিনচারিজন প্রতীহার সঙ্গে লইয়া নন্দলালের অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন। ইত্যবসরে মাধবী রাজ্ঞীকে জানাইল যে মহারাজের নৌকা সমুদ্রে ডুবিয়া গেলে তিনি ও যুবরাজ এক বণিকের পোতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, বণিক তাঁহাদিগকে সপ্তগ্রামের বন্দরে নামাইয়া

দিয়াছিল, সেই স্থান হইতে তাঁহারা স্থলপথে গৌড়ে ফিরিতেছেন। মহারাণী তাহার কথা শুনিয়া আশ্বস্তা হইয়া কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য মুক্তাহার লইয়া মাধবীকে প্রদান করিলেন। তাহা দেখিয়া পুরুষোত্তম আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে বলিয়া উঠিল "আর আমি ?"

মহারাণী।— আপনার কি ?

পুরুষোত্তম।— আমি সর্ব্বাগ্রে সংবাদ দিয়াছি, আমার —পুরস্কার ?

মহারাণী।— আপনাকে কি দিব ?

পুরু।— ভোজন এবং সুবর্ণ দক্ষিণা।

মহারাণী।— ভাল তাহাই হইবে।

ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হইয়া ভূমিতে উপবেশন করিল।

যে ব্যক্তি গোপালদেবের জীবন রক্ষার সংবাদ লইয়া গৌড়ে আসিয়াছিল, সে তখন অতি ধীরে ধীরে রাজ-পথের জনতা ভেদ করিয়া প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সে পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া সেই বিশাল জনসঙ্ঘ ভেদ করিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ করিতেছিল। এই সময় প্রাসাদের দিক হইতে একটি নূতন কলরব উত্থিত হইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল নাগরিকগণ পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "নন্দলাল কে, নন্দলাল কোথায় ?" তাহাদিগের মধ্যে একজন নন্দলালকে জিজ্ঞাসা করিল "নন্দলাল কোথায় বলিতে পার ?" নন্দলাল একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল "আমিই নন্দলাল।" তখন সে ব্যক্তি সত্যাসত্য বিচারের অপেক্ষা না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল "এই যে নন্দলাল, নন্দলাল এইখানে।" জন-সঙ্ঘ বিদ্যুদ্বেগে এই সংবাদ প্রাসাদের দিকে প্রেরণ করিল। গর্গদেব নন্দলালকে পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া তোরণ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, নাগরিকগণ সসম্ভ্রমে পথমুক্ত করিয়া দিল। তিনি নন্দলালের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমিই কি নন্দলাল ?" নন্দ-লাল মহামন্ত্রীকে চিনিত, সে প্রণাম করিয়া কহিল "আজ্ঞা হাঁ।"

গর্গ।— তুমিই কি মহারাজের সংবাদ লইয়া আসিয়াছ ?

নন্দ।— হাঁ !

গর্গ।— তুমি মহারাজের সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলে নয় ?

নন্দ।— হাঁ।

গর্গ।— তাহার পর কি হইল ?

নন্দ।— ঢোলসমুদ্রে ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া গিয়াছিল, এক বণিক তাহার নৌকায় মহারাজকে, যুবরাজকে ও আমাকে আশ্রয় দিয়া আমাদিগকে সপ্তগ্রামে পৌঁছিয়া দিয়াছে।

গর্গ।— মহারাজ কি তোমাকে সংবাদ দিতে পাঠাইয়াছেন ?

নন্দ।— না ; সপ্তগ্রামে আসিয়া মহারাজ আমাকে একটি অশ্ব কিনিয়া দিয়াছিলেন। সেই অশ্বে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছিলাম। কিন্তু জনতার মধ্যে তাঁহাদিগের সঙ্গছাড়া হইয়া আর তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া পাই নাই। আমি মনে করিলাম যে মহারাজ হয়ত আমার আগেই চলিয়া আসিয়াছেন, সেইজন্য আমিও বন্দর ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম।

গর্গ।— মহারাজ কোন্ পথে আসিবেন কিছু বলিয়াছিলেন কি ?

নন্দ।— তিনি বলিয়াছিলেন যে রাঢ়ের পুরাতন রাজপথ দিয়া গৌড়ে ফিরিবেন।

গর্গ।— তুমি কোন্ পথে আসিয়াছ ?

নন্দ।— আমি কিয়দ্দূর ভাগীরথীর পশ্চিমতীর ধরিয়া আসিয়াছিলাম. কিন্তু তাহার পরে এক বণিক, জলদস্যুর ভয়ে আমাকে তাহার নৌকা রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহার নৌকায় রাঢ়ের উত্তরসীমা পর্য্যন্ত আসিয়াছি। শেষের বিশক্রোশ ঘোড়ায় আসিয়াছি।

গর্গ।— পথে মহারাজের কোন সংবাদ পাও নাই ?

নন্দ।— না।

গর্গ।— তুমি আমার সহিত অন্তঃপুরে আইস। ও-হে, তোমরা কেহ ইহার ঘোড়াটা ধরিয়া রাখ।

একসঙ্গে দশজন নাগরিক অশ্বের বল্গা গ্রহণ করিল। নন্দলাল গর্গদেবের সহিত প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। মহারাণী তখনও লোকনাথের মন্দিরের সম্মুখে অপেক্ষা করিতেছিলেন। গর্গদেব নন্দলালকে

সেইস্থানে লইয়া আসিলেন। নন্দলাল তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিয়া শুনাইল, এবং প্রসাদস্বরূপ হীরকমণ্ডিত সুবর্ণবলয় পুরস্কার পাইল। তাহা দেখিয়া পুরুষোত্তম বলিয়া উঠিল "আর আমি?" গর্গদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার আবার কি?"

পুরু।— আমি যে সর্ব্বপ্রথমে সংবাদ দিয়াছি।

মহারাণী।— আপনি কি চান?

পুরু।— নন্দলালের ন্যায় সুবর্ণ বলয়।

মহারাণী বাক্যব্যয় না করিয়া অপর হস্তের বলয় খুলিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন, পৌরজন জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মহারাণী গর্গদেবকে কহিলেন, "দেব, মহারাজের অনুসন্ধানে কাহাকে প্রেরণ করিবেন? আপনি কিম্বা বাক্‌পাল যেন নগর পরিত্যাগ করিবেন না।"

গর্গ।— দেবি, আমি ভাগীরথীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম পারে এবং জলপথে মহারাজের সন্ধানে লোক প্রেরণ করিতেছি।

গর্গদেব বিদায় হইলে, মহারাণী পুরুষোত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, অদ্য কি আহার করিবেন?"

পুরু।— দধি, চিপিটক এবং শর্করা, অভাবে মধু, ইহাই প্রশস্ত ফলাহার।

মহারাণী প্রস্থান করিলে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর, আজ ফলাহার করিবে কি? আজ যে তোমার একাদশী?" ব্রাহ্মণ কহিল, "শকুন্তলে, এখন হইতে মাসে আবার দুইবার করিয়া একাদশী হইবে। কারণ মহারাজ ফিরিয়া আসিতেছেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গহন কাননে

কল্যাণীদেবীকে স্কন্ধে লইয়া যুবরাজ ধর্ম্মপাল যখন বাতায়নপথে লম্ফ প্রদান করিলেন, তখনও অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া আছে। দুর্গপ্রাকারের নিম্নে পরিখার জল শুকাইয়া ভূমি কর্দ্দমে পরিণত হইয়াছিল সুতরাং তাঁহার দেহে আঘাত লাগিল না। তিনি অনুভবে বুঝিলেন যে ভয়ে কল্যাণীদেবী মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। ধীরে ধীরে স্কন্ধ হইতে কুমারীর দেহ ভূমিতে নামাইয়া রাখিয়া ধর্ম্মপাল ক্ষিপ্রহস্তে বর্ম্মের বন্ধনী খুলিয়া শিরস্ত্রাণ, অঙ্গরক্ষ, জঙ্ঘত্র প্রভৃতি বর্ম্মের অংশগুলি খুলিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর পরিখার জল লইয়া কল্যাণীর জ্ঞান সঞ্চারণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কুমারীর চৈতন্য হইল না দেখিয়া পুনরায় তাঁহার দেহ স্কন্ধে লইয়া জলে নামিলেন। নিকটে দুই একখানি কাষ্ঠখণ্ড ভাসিতেছিল, তাহার একখণ্ড অবলম্বন করিয়া পরিখার পারে আসিলেন। নিকটে বেণুকুঞ্জের অন্তরালে তিনটি অশ্ব লইয়া একজন পরিচারক দাঁড়াইয়া ছিল, ধর্ম্মপাল তাহার নিকট হইতে একটি অশ্ব লইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন ও মূর্চ্ছিতা কল্যাণীদেবীর দেহ লইয়া অশ্ব চালাইয়া দিলেন।

চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, পথ নাই বা পথ চিনিবার উপায় নাই। ধর্ম্মপালদেব নিরুপায় হইয়া অশ্বের বল্গা শ্লথ করিয়া দিলেন, অশ্ব ইচ্ছামত চলিতে লাগিল। গোকর্ণ ছাড়িয়া এক ক্রোশ অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই রজনী শেষ হইয়া গেল। ঊষালোকে ধর্ম্মপাল দেখিতে পাইলেন যে অশ্বটি ভাগীরথীর পুরাতন খাদের পার্শ্ব দিয়া চলিতেছে। প্রভাতের শীতল বায়ু মস্তকে লাগিয়া কল্যাণীদেবীর চৈতন্য হইল, তিনি চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" ধর্ম্মপালের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন "দেবি, আপনার ভয় নাই, আমি ধর্ম্মপাল।" কল্যাণীদেবীর চক্ষুর্দ্বয় পুনরায় মুদ্রিত হইল, তিনি মস্তকের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন।

ধর্ম্মপালদেব অশ্বের মুখ ফিরাইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সূর্য্যোদয়ের সময়ে একটি জনমানবশূন্য গ্রামের সীমায় প্রবেশ করিলেন। গ্রামের বহির্দ্দেশে একটি বিশাল দীর্ঘিকা, তাহা কুমুদবনে পরিপূর্ণ, দীর্ঘিকার চারিদিকে চারিটি পুরাতন ঘাট, তাহা ব্যবহার অভাবে শ্যামল তৃণে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মপালদেব অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কল্যাণীদেবীকে নামাইয়া লইলেন। দীর্ঘিকায় অশ্বকে জলপান করাইয়া তাহাকে তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দিলেন। কল্যাণীদেবী দীর্ঘিকায় হস্তমুখ ধৌত করিয়া আসিলেন। ধর্ম্মপালদেব

জিজ্ঞাসা করিলেন "দেবি, আমি গ্রামে আশ্রয়ের সন্ধানে যাইব কি? আপনি একা থাকিতে পারিবেন?" কল্যাণী উত্তর না দিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। ধর্ম্মপাল কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি যাইব কি?" অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে অস্ফুটস্বরে উত্তর হইল "না।"

বেলা বাড়িয়া গেল তথাপি দীর্ঘিকায় কোন কুলাঙ্গনা কলস কক্ষে জল লইতে আসিল না, রাখাল গো মহিষের পাল লইয়া মাঠে চারণ করিতে গেল না। ধর্ম্মপালদেব ঘাটের উপরে শ্যামল তৃণশয্যায় বসিয়া রহিলেন। ঘাটের পার্শ্বে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে কল্যাণীদেবী বসিয়া ছিলেন, ক্রমশঃ তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই ধর্ম্মপাল দেখিলেন যে কল্যাণীদেবী বৃক্ষতলে শুষ্ক পত্ররাশির উপরে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

বহুক্ষণ অনাহার হেতু তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, তিনি কল্যাণীদেবীকে নিদ্রিতা হইতে দেখিয়া অতি সন্তর্পণে উঠিয়া আহারান্বেষণে গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া ধর্ম্মপাল দেখিলেন যে গ্রামে মনুষ্যাভাব। বোধ হয় অতি অল্পদিন পূর্ব্বে অধিবাসীগণ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছে, কারণ মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি তখনও সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় নাই। তৃণাচ্ছাদিত গৃহগুলি অগ্নিদাহে বিনষ্ট হইয়াছে কিন্তু ইষ্টকনির্ম্মিত কয়েকটি গৃহের বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাই। ধর্ম্মপাল একটি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে দুই একটি নরকঙ্কাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে, কিন্তু কক্ষান্তরে মনুষ্যের আহারোপযোগী সমস্ত দ্রব্যই সঞ্চিত আছে; কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করে নাই। অঙ্গনে দুই তিনটি কদলী বৃক্ষ আছে, তাহারা সুপক্ক ফলভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি গৃহ হইতে একটি মৃৎভাণ্ডে তণ্ডুল ও লবণ এবং বৃক্ষ হইতে এক ভার কদলী লইয়া দীর্ঘিকার দিকে ফিরিলেন।

ঘাটের নিকটে আসিয়া দেখিলেন যে কল্যাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু ভীতিবিহ্বলা কুমারী কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় অশ্বত্থতলে দাঁড়াইয়া আছেন। ধর্ম্মপাল তাঁহার অবস্থা দেখিয়া দূর হইতে ডাকিয়া কহিলেন "ভয় নাই, আমি ফিরিয়া আসিয়াছি।" তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কল্যাণীদেবী মুক্তকায় বসিয়া পড়িলেন। ধর্ম্মপাল নিকটে আসিলে কল্যাণীদেবী অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন, তাহা দেখিয়া ধর্ম্মপাল কহিলেন "দেবি, আমরা যে অবস্থায় পড়িয়াছি তাহাতে আপনার লজ্জা ত্যাগ করিয়া আমার সহিত কথা কহিতে হইবে, নতুবা বড়ই অসুবিধা হইবে।" কল্যাণী কোন কথা না কহিয়া মস্তক অবনত করিলেন। ধর্ম্মপাল পুনরায় কহিলেন "আমি একটা হাঁড়ি ও কিছু চাউল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, আপনার কোন ভয় নাই, আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আনি।" কল্যাণী মস্তক তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন "আপনি আমাকে ফেলিয়া যাইবেন না, আমার বড় ভয় হয়।" ধর্ম্মপাল দেখিলেন আকর্ণবিশ্রান্ত সুন্দর নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তিনি কহিলেন "ভয় কি? আমি শীঘ্রই আসিব।" কল্যাণী তথাপিও বলিলেন "না, আপনি যাইবেন না।"

ধর্ম্মপাল নিরুপায় হইয়া ভূমিতে উপবেশন করিলেন এবং কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "রাত্রি হইতে আহার হয় নাই, দিবসেও কি উপবাস করিবেন?" কল্যাণীদেবী কোন উত্তর দিলেন না। ধর্ম্মপালদেব দীর্ঘিকা হইতে দুইটি পদ্মপত্র সংগ্রহ করিয়া কদলীগুলি দুইভাগ করিয়া রাখিলেন এবং তাহার একভাগ কল্যাণীর সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে খাইতে অনুরোধ করিলেন, তিনি লজ্জায় অবগুণ্ঠন টানিয়া ফিরিয়া বসিলেন। ধর্ম্মপাল তাহা দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "তবে আমি অন্তরালে যাই?" তৎক্ষণাৎ উত্তর হইল "না।"

ধর্ম্ম।— আমি থাকিলে আপনি বোধ হয় আহার করিবেন না?" উত্তর নাই। ধর্ম্মপাল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "তবে আমি অন্তরালেই যাই।" একখানি সুগোল চম্পকবর্ণ হস্ত বস্ত্রের আবরণ হইতে বাহির হইয়া পদ্মপত্রের উপরে পতিত হইল। ধর্ম্মপাল তাহা দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু হস্ত আর উঠিল

না, পত্রের উপরে পড়িয়া রহিল। তাহা দেখিয়া ধর্ম্মপাল জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি খাইতেছেন কৈ? আমি তবে যাই।" একটি কদলী চম্পককলিকা সদৃশ অঙ্গুলিগুলি কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বস্ত্রাবরণের মধ্যে প্রবেশ করিল। ধর্ম্মপাল দেখিলেন যে একটি কদলী যথাস্থানে গিয়াছে বটে কিন্তু আর যাইতেছে না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কৈ, কি হইল?"

অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে উত্তর হইল "আমার ক্ষুধা নাই।"

ধর্ম্ম।— ক্ষুধা নিশ্চয়ই আছে, আপনি যদি আহার না করেন তাহা হইলে আমি চলিয়া যাইব।

আর একটি কদলী বস্ত্রাভ্যন্তরে অদৃশ্য হইল। এই-রূপে ধর্ম্মপালদেবের বহুচেষ্টায় কল্যাণীদেবী কিছু আহার করিলেন, কিন্তু তাহা যৎসামান্য। ধর্ম্মপাল স্বয়ং কতকগুলি কদলী ভক্ষণ করিয়া বিশ্রামার্থ অশ্বত্থতলে শয়ন করিলেন। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যের উত্তাপ বাড়িয়া উঠিল, মধুকরগুঞ্জনে পদ্মবন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। ক্রমে ধর্ম্মপালদেবের নিদ্রাকর্ষণ হইল, তিনি বৃক্ষের ছায়ায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া কল্যাণীদেবীর মনে ভয় হইল, একে নির্জ্জন বন, একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা তিনিও নিদ্রিত, সুতরাং সদ্যবিপৎপাত হইতে উদ্ধারপ্রাপ্তা বালিকা যে ভয় পাইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কল্যাণী ধর্ম্মপালের পৃষ্ঠের নিকটে আসিয়া বসিলেন। ক্রমে বৃক্ষের ছায়াতেও উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠিল, কল্যাণীদেবীর পুনরায় নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল ও ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তক ঢুলিয়া পড়িল, অবশেষে তিনিও ধর্ম্মপালদেবের পার্শ্বে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

দিবসের তৃতীয় প্রহর অতীত হইল, তথাপি ক্লান্ত, পথশ্রান্ত পান্থযুগলের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। জনশূন্য গ্রামের নির্জ্জন তৃণমণ্ডিত পথে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুত হইল, তথাপি যুবক-যুবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। অল্পক্ষণ পরেই যোদ্ধৃ-বেশধারী দুইজন মনুষ্য গ্রাম্যপথ অবলম্বন করিয়া ঘাটের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে একজন কহিল "ভাই, এই ত গ্রামের শেষ দেখিতেছি কিন্তু মানুষের ত চিহ্নও দেখিলাম না।" দ্বিতীয় সৈনিক বলিল "তাই ত, ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যাইতেছে।"

প্রথম সৈনিক।— আহারের ত কোন আয়োজনই দেখিতেছি না।

দ্বিতীয় সৈনিক।— ঘরগুলার ভিতরে কিছু পাওয়া যায় কি না একবার দেখিলে হইত না?

প্রঃ সৈঃ।— তোর বুদ্ধিটি হস্তীর মত সূক্ষ্ম। যাহারা ঘর জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাহারা তোর জন্য পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে আর কি?

দ্বিঃ সৈঃ।— কোঠা বাড়ীও ত দুইএকটা আছে।

প্রঃ সৈঃ।— তোর ইচ্ছা হয় তুই যা ভাই, আমি আর পারিতেছি না, এই অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায় একটু বসি—ওরে!—

সৈনিক বৃক্ষতলে ধর্ম্মপাল ও কল্যাণীদেবীকে দেখিতে পাইয়া দশহাত পিছু হটিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া দ্বিতীয় সৈনিক ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কিরে, বাঘ না কি?" সৈনিক ওষ্ঠে অঙ্গুলিস্থাপন করিয়া তাহাকে কথা কহিতে নিষেধ করিল এবং অতি ধীরে কহিল "গাছের তলায় বোধ হয় দুইটা মানুষ আছে।" তাহার সঙ্গী তাহার কথা শুনিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিল, উভয়ে অশ্বত্থতল হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। দ্বিতীয় সৈনিক বলিল "তোকে ত তখনই বলিয়াছিলাম যে ভূতের দেশে বনে ঢুকিয়া কাজ নাই।"

প্রঃ সৈঃ।— বনে না ঢুকিলে যে না খাইয়া মরিতে হইত।

দ্বিঃ সৈঃ।— বনে ঢুকিয়া ত শুধু হাওয়া খাইতেছি।

প্রঃ সৈঃ।— দেখ ভাই দূর হইতে উহাদিগকে দেখিয়া আয়—

দ্বিঃ সৈঃ।— তোর কথা শুনিয়া আমি কাঁচা মাথাটা দিই আর কি! উহারা কখনই জীবন্ত মানুষ নহে।

প্রঃ সৈঃ।— তোর যদি এত ভয় তাহা হইলে যুদ্ধ করিবি কি করিয়া?

দ্বিঃ সৈঃ।— জীয়ন্ত মানুষ হইলে যুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু ভূতের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার কর্ম্ম নহে।

প্রঃ সৈঃ।— তবে আমি গিয়া দেখিয়া আসি, তুই এখানে দাঁড়াইয়া থাক্।

দ্বিঃ সৈঃ।— ভাই আমিও তোর সঙ্গে যাইব।

প্রঃ সৈঃ।— কেন?

দ্বিঃ সৈঃ।— যদি ভূত আসে তাহা হইলে দুইজনেরই ঘাড় ভাঙ্গিবে।

প্রঃ সৈঃ।— তবে আয়।

উভয়ে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল। ধর্ম্মপাল ও কল্যাণী তখনও গভীর নিদ্রায় অভিভূত, ক্ষীণ পদশব্দে কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল না। সৈনিকদ্বয় অগ্রসর হইয়া দেখিল যে ঘাটের উপরে একটি মৃৎভাণ্ড রহিয়াছে। প্রথম সৈনিক অতি সন্তর্পণে উঠাইয়া লইয়া দেখিল যে উহা তণ্ডুলে পরিপূর্ণ এবং আনন্দে অধীর হইয়া তাহা তৎক্ষণাৎ সঙ্গীকে দেখাইল। দ্বিতীয় সৈনিক বাক্যব্যয় না করিয়া তাহার একমুষ্টি বদনে নিক্ষেপ করিল। তাহা দেখিয়া তাহার সঙ্গী ভ্রুকুটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "খাইলি যে?" উত্তর হইল "ভৌতিক কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি।" প্রথম সৈনিক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "সেনাপতির দুইদিন আহার হয় নাই স্মরণ আছে?" তাহার সঙ্গী বলিল "আপনি বাঁচিলে বাপের নাম।" প্রথম সৈনিক ভাণ্ডটি লইয়া অশ্বত্থ-বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিল যে যাহারা শয়ন করিয়া আছে তাহারা জীবিত বটে মৃত নহে, কারণ উভয়েরই নিশ্বাস বহিতেছে। সে নিকটে সরিয়া গিয়া দেখিল যে ঘাটের প্রথম সোপানের উপরে পদ্মপত্রে একরাশি পক্ক কদলী রহিয়াছে। দেখিয়া সে আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাটের কতকটা স্থানে তৃণ জন্মায় নাই, সেই স্থানে কতকগুলি কদলীর ত্বক পড়িয়া ছিল! সৈনিক তাহার উপর পদার্পণ করিবামাত্র পা পিছলাইয়া ধরাশায়ী হইল। পতনশব্দে ধর্ম্মপাল ও কল্যাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, তাহা দেখিয়া দ্বিতীয় সৈনিক "বাবারে" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

সৈনিক উঠিবার পুর্ব্বেই ধর্ম্মপাল তাহার গলদেশে অসি সংলগ্ন করিয়া কহিলেন "সাবধান, উঠিও না, উঠিলেই মরিবে।" সৈনিক অগত্যা মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। ধর্ম্মপাল জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে, যদি সত্য বল তাহা হইলে মারিব না।" সৈনিক কহিল "আমি গৌড়রাজ গোপালদেবের সেনাদলভুক্ত পদাতিক।" ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিলে?" সৈনিক ভাবিল যে তিনি তাহার কথায় অবিশ্বাস করিতেছেন, সে কহিল "প্রভু, আমি সত্য বলিতেছি, আমি গৌড়বাসী এবং গৌড়রাজ গোপালদেবের সেনা।" ধর্ম্মপাল তাহার স্কন্ধ হইতে অসি উঠাইয়া লইয়া কহিলেন "তুমি উঠিয়া বৈস।" সৈনিক উঠিয়া বসিয়া কহিল "প্রভু, আমি মিথ্যা বলি নাই, দেখুন আমার শূলের ফলকে ও অসিতে ধর্ম্মচক্র অঙ্কিত আছে, ইহা গৌড়রাজবংশের লাঞ্ছন।" ধর্ম্মপাল শূলফলক ও অসি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কোথায় যাইতেছিলে?"

সৈনিক।— আমরা প্রভুর অন্বেষণে গৌড় হইতে সপ্তগ্রামে যাইতেছি আমাদিগের দলে তিনশত অশ্বারোহী ও দুইশত পদাতিক আছে। রাঢ়দেশ এমন জনশূন্য হইয়াছে যে কোন স্থানে আহার মিলে না, সেইজন্য সেনাপতি দলে দলে পদাতিক সেনা আহার্য্যের অন্বেষণে প্রেরণ করিয়াছেন।

ধর্ম্ম।— তোমাদিগের সেনাপতি কে?

সৈনিক।— অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ প্রভুদত্ত, আমাদিগের অধ্যক্ষ বিমলনন্দী।

ধর্ম্ম।— তাহারা কতদূরে আছেন?

সৈনিক।— প্রাচীন রাজপথের নিকটে।

ধর্ম্ম।— তুমি ভাল করিয়া দেখ, আমাকে চিনিতে পার?

সৈনিক যখন পড়িয়া যায়, তখন ভাণ্ডটি তাহার হাত হইতে পড়িয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তণ্ডুলগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, ক্ষুধার্ত্ত সৈনিক তাহার এক মুষ্টি কুড়াইয়া লইয়া এই অবসরে মুখে ফেলিয়া দিল। ধর্ম্মপাল তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কি অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে?" সৈনিক উত্তর করিল "প্রভু, দুইদিন আহার হয় নাই।"

ধর্ম্ম।— চাউল খাইতেছ কেন? কদলী খাইবে?

সৈনিক আনন্দে হাসিয়া ফেলিল। ধর্ম্মপাল কদলী-সহিত পদ্মপত্রটি সৈনিকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সে এক নিমেষে কদলীগুলি ভক্ষণ করিয়া ফেলিল এবং দীর্ঘিকা হইতে অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিয়া আসিল। তখন ধর্ম্মপালদেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ কি?" সৈনিক উত্তর না দিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। ধর্ম্মপাল কোষ হইতে দীর্ঘ অসি বাহির করিয়া তাহার ফলক সৈনিকের হস্তে স্থাপন করিলেন। রজতশুভ্র খড়্গাগ্রে হৈম-রেখায় ষড়ভঙ্গ ধর্ম্মচক্র অঙ্কিত ছিল, সৈনিক তাহা দেখিয়া নিজের অসি মস্তকে স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিল এবং কহিল "প্রভু, আপনি নিশ্চয়ই একজন গৌড়ীয় মহাসামন্ত, কিন্তু আমি আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না।" ধর্ম্মপাল মস্তকের উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিলেন, দীর্ঘ কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশরাশি তাঁহার পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এইবার দেখদেখি।" সৈনিক অসি ফেলিয়া দিয়া নতজানু হইয়া করজোড়ে কহিল "দেব, এইবারে চিনিয়াছি, আপনি মহাকুমার যুবরাজ ধর্ম্মপালদেব। আমরা আপনার ও মহারাজের সন্ধানেই আসিয়াছি।"

ধর্ম্ম।— তুমি শীঘ্র আমাকে বিমলনন্দীর নিকটে লইয়া চল, মহারাজের বড় বিপদ্।

সৈনিক।— মহারাজা কোথায়?

ধর্ম্ম।— তিনি গোকর্ণদুর্গ রক্ষা করিতে গিয়া দস্যুহস্তে বন্দী হইয়াছেন।

সৈনিক গাত্রোত্থান করিয়া কহিল "আসুন, কিন্তু মহাদেবী যাইবেন কি করিয়া?"

ধর্ম্মপাল কল্যাণীর মহাদেবী আখ্যা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলেন কিন্তু বলিলেন "মহাদেবীকে অশ্বে উঠাইয়া আমি হাঁটিয়া যাইব।"

সৈনিক।— রাজপুত্রবধূ কি অশ্বে যাইতে পারিবেন?

ধর্ম্ম।— পারিবেন।

ধর্ম্মপাল ও সৈনিকের শেষ কথা শুনিয়া কল্যাণী-দেবীর মুখ লাল হইয়া উঠিল, তিনি মস্তকের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। অশ্বটি দীর্ঘিকার পাড়ে চরিয়া বেড়াইতে-ছিল, ধর্ম্মপাল তাহাকে ধরিয়া আনিয়া কল্যাণীকে আসনে স্থাপন করিলেন এবং স্বয়ং পদব্রজে অশ্বের বল্গা ধরিয়া চলিলেন। সৈনিক অগ্রসর হইয়া পথ দেখাইয়া চলিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পুনর্ম্মিলনে

গৌড় সপ্তগ্রামের রাজপথ জনশূন্য,—সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়, পথের উভয়পার্শ্বে বন হইতে অসংখ্য ঝিল্লীর রব নীরব নির্জ্জন প্রদেশটিকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। বন হইতে একজন মনুষ্য বাহির হইয়া একবার চারিদিক দেখিল এবং পরক্ষণেই পুনরায় বনের মধ্যে লুকাইল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই কয়েকজন অশ্বারোহী রাজপথ অবলম্বন করিয়া সেইদিকে আসিল। তাহারা সেইস্থানে আসিবামাত্র দলে দলে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহির হইয়া তাহা-দিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। আগন্তুকগণের নিকট অস্ত্র থাকিলেও তাহারা বিনাদ্বন্দ্বে বন্দী হইল। অশ্বারোহী ও পদাতিকের দল তাহাদিগকে লইয়া পুনরায় বনে প্রবেশ করিল। বনমধ্যে বস্ত্রাবাসের সম্মুখে কাষ্ঠাসনে বসিয়া একজন প্রৌঢ়বয়স্ক পুরুষ অপর কয়েকজনের সহিত কথালাপ করিতেছিল, সৈনিক বন্দী-পঞ্চককে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। প্রৌঢ়ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কে? কোথায় যাইতেছিলে?" বন্দীপঞ্চক সমস্বরে উত্তর করিল "আমরা নারায়ণী সেনা।" প্রৌঢ়-ব্যক্তি তাহা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন "বাপুহে, দ্বাপরের শেষে ত নারায়ণী সেনা শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন আবার নারায়ণী সেনা আসিল কোথা হইতে? সে যাহা হউক তোমরা কোথা হইতে আসি-তেছ এবং কোথায় যাইতেছ?" বন্দীগণের মধ্যে এক-জন উত্তর করিল "আমরা সচরাচর কাহারও প্রশ্নের উত্তর দিই না, কিন্তু এখন আমরা বড়ই বিপদে পড়ি-য়াছি, যদি সত্য কথা বলিলে ছাড়িয়া দাও তবে বলিতে পারি।"

প্রৌঢ়।— ভাল ছাড়িয়া দিব।

বন্দী।— আমরা গৌড়েশ্বর গোপালদেবের আদেশে যুবরাজ ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মপালের সন্ধানে গিয়াছিলাম।

প্রৌঢ়ব্যক্তি বন্দীর কথা শুনিয়া একলম্ফে কাষ্ঠাসন পরিত্যাগ করিয়া বন্দীর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিলে পুনরায় বল।" বন্দী যাহা বলিয়াছিল তাহা পুনরাবৃত্তি করিল। প্রৌঢ়ব্যক্তি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ কোথায়?"

বন্দী।— গোকর্ণদুর্গে।

প্রৌঢ়।— তোমাদিগের মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি যে তোমরা মিথ্যা বলিতেছ না। ইহাদিগের বন্ধন মুক্ত কর।

বন্দী।— অমৃতানন্দ কখনও মিথ্যা কহে নাই, এখন আমরা যাইতে পারি?

প্রৌঢ়।— অপেক্ষা করুন, আমরা গৌড় হইতে মহারাজ গোপালদেবের সন্ধানে আসিয়াছি, আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া চলুন। এই জনশূন্য প্রদেশে আমাদিগের দুইদিন আহার মিলে নাই, আমাদিগকে কিছু আহার্য্য দিতে পারেন?

অমৃত।— আহার্য্য মিলা কঠিন, গোকর্ণে অথবা গোবর্দ্ধনে না পৌঁছিলে মিলিবার উপায় নাই।

অমৃতানন্দকে দেখিয়া প্রৌঢ়ের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল কিন্তু তাহা নিবিয়া গেল, তিনি কাষ্ঠাসনের উপরে বসিয়া পড়িলেন। অমৃতানন্দ কহিলেন "এখানে বিলম্ব করিয়া ফল কি?"

প্রৌঢ়।— দলে দলে অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা আহার্য্যের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে, তাহারা ফিরিয়া না আসিলে যাইব কি করিয়া?

অমৃত।— তবে আমরা চলিয়া যাই, আমাদিগের একজনকে এইখানে রাখিয়া যাইতেছি, সে আপনাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে।

প্রৌঢ়।— উত্তম।

তিনজন সহচর লইয়া অমৃতানন্দ গোকর্ণদুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যার সময় চারিদিক হইতে গৌড়ীয় সেনা ফিরিয়া আসিতে লাগিল, কেহ দুইটী বার্ত্তাকু, কেহ একটি অলাবু, কেহ বা কতকগুলি কচু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। সৈনিকগণ স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহা রন্ধন করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রজনীর প্রথমদণ্ড অতীত হইলে একজন সেনা আসিয়া সংবাদ দিল যে দুইজন সেনা একটি রমণীকে লইয়া আসিতেছে। প্রৌঢ়ব্যক্তি আদেশ করিলেন "তাহাদিগকে এইস্থানে লইয়া আইস।" অনতিবিলম্বে ধর্ম্মপালদেব, সৈনিক ও কল্যাণীর সহিত সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মপাল জনৈক সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানে কে আছেন?" সৈনিক উত্তর করিল "সেনানায়ক প্রভুদত্ত।" ধর্ম্মপাল অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন "প্রভুদত্ত!" প্রৌঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?" উত্তর হইল "আমি, ধর্ম্মপাল।" প্রভুদত্ত ব্যগ্রভাবে ছুটিয়া গিয়া ধর্ম্মপালের স্কন্ধ ধারণ করিলেন, একবার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার পর তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে বাঁধিয়া ফেলিলেন। প্রথম সম্ভাষণ শেষ হইলে প্রভুদত্ত ধর্ম্মপালকে বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া কহিলেন "ভুলিয়া গিয়াছি ধর্ম্ম, তুমি এখন আর শিশু নও, তুমি এখন যুবরাজ, তোমাকে যথারীতি অভিবাদন করিতে হইবে।"

ধর্ম্ম।— পাগলের মত বকিও না। তোমার বস্ত্রাবাসে একটি অতিথি আনিয়াছি।

প্রভু।— কে? শুনিলাম তোমাদিগের সহিত একটি রমণী আসিতেছেন!

যে সৈনিক ধর্ম্মপালকে শিবিরে আনিয়াছিল সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল "নায়ক, ইনি রাজপুত্রবধূ।" প্রভুদত্ত সৈনিকের কথা শুনিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন "ধর্ম্ম, বিবাহের সময়ে বুড়াকে নিমন্ত্রণটাও করিলে না?" ধর্ম্মপাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন প্রভুদত্ত পুনরায় কহিলেন "দাঁড়াইয়া থাকিও না, মহাদেবী কোথায়? তাঁহাকে লইয়া আইস।" ধর্ম্মপাল অশ্বপৃষ্ঠ হইতে কল্যাণীদেবীকে ভূমিতে নামাইয়া দিলেন। প্রভুদত্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন "দেবি, আমি আপনার ভৃত্য, আপনার শ্বশুরকুলের বহুদিনের ভৃত্য, এখানে আপনার

উপযুক্ত অভ্যর্থনা করি এমন শক্তি আমার নাই। আপনি বোধ হয় পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছেন, এই বস্ত্রাবাসের মধ্যে বিশ্রাম করুন।" ধর্ম্মপাল কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন "প্রভু কি করিতেছ? পাগলের মত যাহা-তাহা কি বলিতেছ?" প্রভুদত্ত রাগিয়া উঠিলেন এবং ধর্ম্মপালদেবকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন "দেখ্ ধর্ম্ম, তুই যুবরাজই হ'স্ আর ধর্ম্মই হ'স্, আমার নিকট সেই ধর্ম্মই আছিস্। আমাকে এই জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে তোর বধূর মুখ দর্শন করিতে হইল, এ দুঃখ আমার মরিলেও যাইবে না।" তাহার পর কল্যাণীদেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "দেবী, আমাদিগের সহিত রমণী নাই, পরিচর্য্যা অভাবে আপনার বড়ই ক্লেশ হইবে। আপনি বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করুন, যুবরাজ আপনাকে বস্ত্রাদি দিয়া আসিবেন।" কল্যাণী বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিলেন।

শিবিরের সম্মুখে কাষ্ঠাসনে বসিয়া ধর্ম্মপাল প্রভুদত্তের সহিত কথালাপে মগ্ন হইলেন। ধর্ম্মপাল তাহাকে নৌকাডুবির কথা ও পথের বিপদের কথা শুনাইলেন। প্রভুদত্তও গৌড়ের কথা, নাবিকগণ ও নন্দলালের আগমনের কথা বলিলেন। তাহার পর ধর্ম্মপাল বলিলেন যে নারায়ণ যখন প্রায় দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন তিনি কল্যাণীদেবীকে লইয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার পিতার যে কি অবস্থা হইয়াছে তাহা তিনি অবগত নহেন। প্রভুদত্ত কহিলেন "এই মাত্র একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, তিনি বলিয়া গেলেন যে মহারাজ গোকর্ণদুর্গে আছেন, কিন্তু তিনি ত কোন বিপদের কথা বলিলেন না?"

ধর্ম্ম। সে সন্ন্যাসীর নাম কি?

প্রভু।— অমৃতানন্দ। আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার জন্য তিনি তাঁহাদিগের দলের একজন সেনা রাখিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্ম।— সে ব্যক্তি কোথায়?

প্রভুদত্তের আদেশে একজন গৌড়ীয় সৈনিক অমৃতানন্দের অনুচরকে ডাকিতে গেল। ধর্ম্মপাল জিজ্ঞাসা করিলেন "শুনিলাম তোমার সহিত বিমলনন্দী আসিয়াছে?"

প্রভু।— হাঁ! তোমাকে কে বলিল?

ধর্ম্ম।— যে সৈনিক আমাদিগকে লইয়া আসিয়াছে সেই বলিয়াছে। নন্দী কোথায়?

প্রভু। – সে জঠরজ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া শীকারে গিয়াছে।

ধর্ম্ম।— উত্তম। তাহা হইলে কিছু আহার মিলিবে।

প্রভু।— তোমাদেরও কি আমাদিগের দশা?

ধর্ম্ম।— কল্য মধ্যাহ্নে অন্ন জুটিয়াছিল; অদ্য প্রাতে চাউল, লবণ ও হাঁড়ি পাইয়াছিলাম। কিন্তু কাষ্ঠের অভাবে অন্ন জুটে নাই।

প্রভু।— বনে কি কাষ্ঠ খুঁজিয়া পাইলে না?

ধর্ম্ম।— না—তাহা নহে, দেবী বলিলেন যে তিনি একাকী থাকিতে পারিবেন না।

প্রভু।— যুগলে গেলে না কেন?

ধর্ম্ম।— তোমার সকল কথাতেই বিদ্রূপ। সত্য বলিতেছি কল্যাণীদেবীর সহিত আমার বিবাহ হয় নাই, কল্য রাত্রিতে গোকর্ণের দুর্গস্বামিনী আমাকে দেবীর রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন মাত্র।

প্রভু।— ভায়া হে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই বিবাহই যথেষ্ট। দুর্গস্বামিনী কন্যার ভার সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা হইলেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

ধর্ম্ম।— যাও, তুমি বড় দুষ্ট।

প্রভু।— মনের গোপন কথাটি বাহির করিয়া বলিলেই লোকে দুষ্ট হয়। যাহা করিয়াছ ভালই করিয়াছ। মহারাণীর নিকট বধূসমেত পুত্র উপস্থিত করিতে পারিলে রত্ন উপহার পাইব। ধর্ম্ম, কোথায় চাউল পাইয়াছিলে বলিতেছিলে? সেখানে কত চাউল আছে?

ধর্ম্ম।— অনেক।

প্রভু।— সে স্থান এখান হইতে কতদূর?

ধর্ম্ম।— তিন চারি ক্রোশ হইবে।

প্রভু।— কোন দিকে?

ধর্ম্ম।— ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয় উত্তর-পশ্চিম।

প্রভুদত্ত একজন সৈনিককে ডাকিয়া যুবরাজের পথপ্রদর্শককে সেইস্থানে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

সৈনিক আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি যে স্থানে যুবরাজকে দেখিতে পাইয়াছিলে, তাহা এখান হইতে কতদূর হইবে?

সৈনিক।— প্রায় তিন ক্রোশ।

প্রভু।— রাত্রিতে পথ চিনিয়া যাইতে পারিবে?

সৈনিক।— হাঁ।

প্রভু।— তোমরা একজন সেই সন্ন্যাসীর অনুচরকে ডাকিয়া আনিতে পার?

ইতিমধ্যে অমৃতানন্দের অনুচর আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভুদত্তের আদেশে সৈনিক তাহাকে জনশূন্য গ্রামের কথা বলিলে সে বলিল যে সেই পথেই গোকর্ণ যাইতে হইবে। তাহা শুনিয়া প্রভুদত্ত কহিলেন "ধর্ম্ম, নন্দী ফিরিলেই আমরা যাত্রা করিব। অদ্য আহার না পাইলে সৈন্যগণ পথ চলিতে পারিবে না। মহারাজের সন্ধান পাইয়া আর বিলম্ব করাও উচিত নহে, আরও দুইদল তাঁহার সন্ধানে ফিরিতেছে।"

ধর্ম্ম।— নন্দিপুত্র কি লইয়া আসে দেখা যাউক।

অবিলম্বে একজন সৈনিক সংবাদ দিল যে বিমলনন্দী দুইটি বৃহৎ মহিষ মারিয়া লইয়া আসিতেছেন। তাহা শুনিয়া ধর্ম্মপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, বৌদ্ধ কি মহিষ-মাংস খায়?

প্রভু।— বৌদ্ধের কথা আর বলিও না ভাই, স্বয়ং বুদ্ধদেব বুড়া বয়সে শূকর-মাংস খাইয়া মরিয়াছিলেন।

বিমলনন্দী পথেই যুবরাজের আগমনসংবাদ শুনিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া যুবরাজকে অভিবাদন করিলেন। তিনজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে তখনই গোকর্ণাভিমুখে যাত্রা করা বিধেয়। গৌড়ীয় সেনাদল দ্বিপ্রহর রজনীতে স্কন্ধাবার উঠাইয়া যাত্রা করিলেন। পরদিন প্রভাতে জনশূন্য গ্রামে পৌঁছিয়া ক্ষুধার্ত্ত সৈন্যগণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণ আহার করিয়া বাঁচিল। আহার করিয়া উঠিয়া তাহারা রাজপুত্রবধূর জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিয়া দিল, কারণ তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে শিবিরে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হওয়ায় তাহাদিগের অন্ন জুটিয়াছিল, নতুবা কখনই জুটিত না। ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন-দপ্তর

(১)

রচনায় শ্রম।

প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান-কালে প্রায়ই দেখা যায়— অনেকগুলি ক্ষুদ ক্ষুদ গ্রন্থ, একত্র কাষ্ঠ-চাপে আবদ্ধ রহিত। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের জন্য স্বতন্ত্র কাষ্ঠ-চাপ সংগ্রহ করা তত সুবিধাজনক হইত না। সংগ্রহকারগণ নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে গ্রন্থাবলী নির্ব্বাচন করিয়া স্বয়ং অথবা বেতনভোগী ব্যবসায়ী লিপিকারগণ দ্বারা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া লইতেন।

প্রাচীন দপ্তরে, গ্রন্থাবলীর প্রতিলিপি ব্যতীত, আমরা অনেক স্থলেই, গ্রন্থ-বহির্ভূত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খণ্ড-পত্রে নানারূপ কৌতুকপ্রদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনার সমাবেশ দেখিতে পাই —আমাদের নিকট এইরূপ বহু-সংখ্যক অপ্রকাশিত খণ্ড-রচনা সংগৃহীত আছে। এই-সকল রচনা প্রকাশের ত্রিবিধ সার্থকতা আছে— (১) অনেক অপ্রকাশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড-রচনার প্রচার (২) তৎকালের পাঠক ও সংগ্রহকারগণের রুচি ও প্রবৃত্তির নিদর্শন নির্ণয় এবং (৩) বর্ত্তমান পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তি।

অদ্য আমরা এই সংগ্রহ হইতে, একটি স্বতন্ত্র পত্রে লিখিত "রাজার প্রতি মন্ত্রীর উপদেশ" শীর্ষক একটি প্রাচীন খণ্ড-রচনা প্রকাশিত করিলাম। ইহার রচয়িতার পরিচয় আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এই ক্ষুদ্র কবিতায়, রচয়িতা স্বয়ং পরিশ্রমে যেরূপ গলদঘর্ম্ম হইয়াছেন, পাঠককেও ততোধিক বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব কবি গদানন্দ, দাশরথি রায় প্রভৃতির বহুতর রচনায় এইরূপ অযথা শ্রমের যথেষ্ট নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনুপ্রাসের খাতিরে তাঁহারা অর্থ থাক না থাক শব্দ জোগাইয়া চলিতেন। যাঁহারা অনুপ্রাসাদির আলোচনায় বিশেষরূপে অনুযুক্ত, তাঁহারা হয়ত, এই রচনা পাঠে, মল্লগণের শ্রমজনিত সুখ-প্রাপ্তির ন্যায়, যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিবেন। অপেক্ষাকৃত সুখী পাঠকগণেরও বোধ হয়, এই অনুপ্রাসের "আর্য্যা"টি বিলুপ্ত হউক, এইরূপ অভিপ্রায় নহে।

রাজার প্রতি মন্ত্রীর উপদেশ।

(ভূমিকা)

তদন্তর নৃপবর উঠিয়া প্রভাতে।
নিজ মন্ত্রী চিত্ররথে ডাকি গোপনেতে ॥
মন্ত্রণায় চিত্ররথ ধিসন (?) সমান।
ধরিতে তস্কর রাজা জিজ্ঞাসে বিধান ॥
পূর্ব্ব কথা শুনি মন্ত্রী কহিছে তখন।
তোমার যে কর্ম্ম নয় ধরিতে দুর্জ্জন ॥
যেই জন উপযুক্ত হয় যে কর্ম্মেতে।
সেই কর্ম্মে তারে ভূপ হয় নিয়োজিতে ॥
যার কর্ম্ম তারে সাজে বিদিত ভুবন।
অন্যের অসাধ্য তাহা করিতে সাধন ॥
তাহার কিঞ্চিৎ কহি শুনহ রাজন।
যাহে যেবা যেই তাহা শুনহ যোটন ॥

(বক্তব্য)

ধর্ম্মে ধর্ম্ম মর্ম্মে মর্ম্ম কর্ম্মে কর্ম্ম বাড়ে।
কুর্ম্মে কুর্ম্ম নর্ম্মে নর্ম্ম ঘর্ম্মে ঘর্ম্ম পড়ে ॥
রুদ্ধে রুদ্ধ শুদ্ধে শুদ্ধ হৃদ্যে হৃদ্য হয়।
বাধ্যে বাধ্য শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধ আদ্যে আদ্য কয় ॥
সভ্যে সভ্য নব্যে নব্য লভ্যে লভ্য হয়।
ভব্যে ভব্য কাব্যে কাব্য গর্ব্বে গর্ব্বোদয় ॥
রাজ্যে রাজ্য পূজ্যে পূজ্য সগ্যে সগ্য চান।
ধৈর্য্যে ধৈর্য্য ধার্য্যে ধার্য্য রাজ্যে রাজ্য জ্ঞান ॥
আদ্যে আদ্য যুদ্ধে যোদ্ধা বুদ্ধে বোদ্ধা বলে।
যোগ্যে যোগ্য বিজ্ঞে বিজ্ঞ প্রাজ্ঞে প্রাজ্ঞ মিলে ॥
কষ্টে কষ্ট নষ্টে নষ্ট দুষ্টে দুষ্ট নীতি।
দৃষ্টে দৃষ্ট শিষ্টে শিষ্ট নিষ্ঠে নিষ্ঠ মতি ॥
তুষ্টে তুষ্ট ওষ্ঠে ওষ্ঠ উষ্ণে উষ্ণ করে।
যন্ত্রে যন্ত্রী তন্ত্রে তন্ত্রী মন্ত্রে মন্ত্রী ফেরে ॥
রঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গে ভঙ্গ ভৃঙ্গে ভৃঙ্গ খুঁজে।
রঙ্গে রঙ্গী সঙ্গে সঙ্গী ভাঙ্গে ভাঙ্গী মজে ॥
দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্ব সন্দে সন্দ মন্দে মন্দ সৃষ্টি।
বন্ধে বন্ধ ধন্দে ধন্দ অন্ধে অন্ধ দৃষ্টি ॥
সান্তে সান্ত কান্তে কান্ত অন্তে অন্ত ঘটে।
শান্তে শান্তি প্রান্তে প্রান্তি শ্রান্তে শ্রান্তি বটে ॥
অণ্ডে অণ্ড চণ্ডে চণ্ড দণ্ডে দণ্ড হয়।
শক্তে শক্তি যুক্তি মুক্তি ভক্তে ভক্তি কয় ॥
কাজে কাজ সাজে সাজ লাজে লাজ বাড়ে।
ধনে ধন জনে জন মনে মন পুড়ে ॥
কুলে কুল মূলে মূল ভুলে ভুল বাড়ে।
সখ্যে সখ্য মুখ্যে মুখ্য যক্ষে যক্ষ পড়ে ॥
লগ্নে লগ্ন মগ্নে মগ্ন ভগ্নে ভগ্ন দশা।
নাশে নাশ ত্রাসে ত্রাস আশে আশে আশা ॥
সত্যে সত্য মত্তে মত্ত দৈত্যে দৈত্য চায়।
ভালে ভাল তালে তাল কালে কাল দায় ॥
বাদে বাদ সাধে সাধ বাদে বাদ সাধে।
হিতে হিত গীতে গীত রীতে রীত শোধে ॥
ফলে ফল বলে বল জলে জল টানে।
দলে দল কলে কল ছলে ছল আনে।
করে কর ডরে ডর জ্বরে জ্বর ঘেরে।
ঘোরে ঘোর জোরে জোর চোরে চোর ধরে ॥

(শেষ)

অতএব এ বিষয়ে বিজ্ঞ যেই জন।
তস্কর ধরিতে তারে কর নিয়োজন ॥
কোতোয়ালে কহিলে সকলে জ্ঞাত হবে।
তাহে আর দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে ॥
অর্থনাশ মনস্তাপ গৃহছিদ্র আর।
বুদ্ধিমানে অন্য জনে না করে প্রচার ॥
চিত্রাঙ্গদ নামে চিত্রভানুর তনয়।
চৌর্য্য গুণে গুণোত্তম সর্ব্ব মায়াময় ॥
সেই সে কর্ম্মের কর্ত্তা ভাবিলা রাজন।
দ্বিজ কহে ইথে কর্ম্ম হইবে সাধন ॥

শ্রীশিবরতন মিত্র।

পঞ্চশস্য

জাপানে চন্দ্রমল্লিকা (Japan Magazine) :—

ক্রিসান্থিমাম্ বা চন্দ্রমল্লিকা জাপানী শারদীয় পুষ্পের রাণী। দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া চীনদেশে উহার চাষ হইয়া আসিতেছে। প্রমাণ আছে যে মিশর দেশে তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই পুষ্পের আদর ছিল। চীনদেশ হইতে জাপানে উহার আমদানি হয় এবং জাপানেই উহা চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। চন্দ্রমল্লিকা জাপানী সম্রাটের কুলচিহ্ন। সম্রাটের তরবারির উপর, জাপানী রণ-পোতের উপর, সম্রাটের যা-কিছু সম্পত্তি সকলেরই উপর চন্দ্রমল্লিকার চিত্র খোদিত থাকে। প্রতি বৎসর নভেম্বর মাসে চন্দ্রমল্লিকার উৎসব হয়—ঐ সময়েই পুষ্পগুলির পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। সম্রাট ঐ সময়ে একটি বিরাট উদ্যান-সম্মিলনে সাম্রাজ্যের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিকে বৈদেশিক রাজদূতবৃন্দকে ও জাপ-সরকারে নিযুক্ত কয়েকজন বিদেশী লোককে নিমন্ত্রণ করেন।

এই চন্দ্রমল্লিকা উৎসবের জন্ম হেইয়ান যুগে। তখন সাম্রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণ রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া রাজপরিবারের 'স্বাস্থ্যপান' করিতেন। মদের পেয়ালায় চারু চন্দ্রমল্লিকার পাপড়ি ভাসিত।

চন্দ্রমল্লিকা যেমন জাপ-সম্রাটের নিদর্শন, চেরি পুষ্প তেমনি জাপ-জাতির নিদর্শন; এবং উদীয়মান সূর্য্য জাপ-জাতি ও সম্রাট উভয়েরই প্রতিনিধি স্বরূপ। চন্দ্রমল্লিকা এক অথচ বহু; বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য; এবং সকল বৈচিত্র্য একটি অখণ্ড কেন্দ্র হইতে বহির্গত। জাপ-জাতীয়-জীবনের নানান্ বৈচিত্র্যের মূলে সম্রাট বিরাজিত, তিনিই সকল বিচিত্রতার কেন্দ্রস্বরূপ। অপরদিকে চেরি পুষ্পের অজস্রতা ও উর্ব্বরতার সহিত জাপ-সন্তানের অনন্ত জন্মপ্রবাহের উপমা দেওয়া চলে। চেরি পুষ্প ও চন্দ্রমল্লিকা সূর্য্যের সন্তান। কারণ সূর্য্যের উত্তাপই উহাদিগকে প্রস্ফুটিত করে, বাঁচাইয়া রাখে। সেইরূপ সম্রাট ও তাঁহার প্রজাগণ সূর্য্য-দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই জন্য সূর্য্যই সমগ্র জাপানের নিদর্শন।

চন্দ্রমল্লিকার প্রতি জাপানীর যত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অন্য কোনো পুষ্পের প্রতি তত নহে। কারণ এটি একতার নিদর্শন পাপড়িগুলির মূল যেমন পরস্পর যুক্ত, বিচ্ছিন্ন নয়, তেমনি সম্রাট ও তাঁহার প্রজাবর্গও চিরকালের জন্য অচ্ছেদ্যবন্ধনে বদ্ধ।

প্রায় সকল জাপানী জিনিসের উপরই চন্দ্রমল্লিকার চিত্র দেখা যায়। উহা তরবারির খাপের উপর, ফুলদানের উপর, পেরেকের মাথার উপর, পেটা পিতলের উপর, পাথর, হাড় ও হস্তিদন্তের উপর খোদিত; চীনামাটি ও দারুময় পাত্রাদির উপর চিত্রিত: সর্ব্বপ্রকার কাপড়ের উপর বোনা: গৃহস্থালির আসবাবপত্র ও প্রসাধনে উহার ব্যবহার যে কত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু ষোল-পাপড়ি-বিশিষ্ট চন্দ্রমল্লিকার চিত্রই সম্রাটের নিদর্শন। ঐ চিহ্ন সম্রাট ব্যতীত অন্য কাহারো ব্যবহারের অধিকার নাই। সম্রাটের অধিকারভুক্ত যাবতীয় দ্রব্যাদির উপর ঐ চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, অন্য কোথাও উহা অঙ্কিত হয় না।

জাপানের চন্দ্রমল্লিকা।

একপুষ্পক চন্দ্রমল্লিকা।

সম্রাট যে-সকল মহোচ্চ সম্মানে গুণীজনকে ভূষিত করেন তন্মধ্যে "চন্দ্রমল্লিকার শ্রেণী" অন্যতম। জাপানী ভাষায় চন্দ্রমল্লিকাকে "কিকু" বলে। ঐ নামে বহু জাপ-নারী অভিহিত হয়।

পুষ্প-জনন-বিজ্ঞান কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা জাপানী চন্দ্রমল্লিকা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পুষ্প-জনন-বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ায় কেবল যে পুষ্পের আকৃতি ও আয়তন পরিবর্ত্তিত করা হয় তাহা নহে; এমন কি বর্ণ পর্য্যন্ত পরিবর্তন করা হইয়া থাকে। এক একটি গাছে এত পুষ্প ফোটানো হয় যে দেখিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। একটি গাছে ৭০০ সাত শত পুষ্প ফোটানো হইয়াছিল এবং কখনো কখনো এক গাছে একটি মাত্র ফুল ফোটানো হয়। এই চন্দ্রমল্লিকার রূপ যে কত প্রকারের করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন—ঝাউয়ের পাতার ন্যায় সরু-ঝালর-সদৃশ পাপড়ি হইতে গোলাপের পাপড়ির ন্যায় চওড়া-পাপড়িবিশিষ্ট চন্দ্রমল্লিকা দেখা যায়।

জাপানে চন্দ্রমল্লিকা-প্রদর্শনী একটি দেখিবার জিনিস। পুষ্পগুলি এমন দক্ষতার সহিত সজ্জিত হয় যে তাহা দিয়া পুরাতন নাটকের দৃশ্য বা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অতীতের যবনিকা সরাইয়া সজীব হইয়া উঠে। বিচিত্রবর্ণ পুষ্পগুলি এমন সুসন্নিবেশিত করা হয় যে দেখিলে মনে হয় যেন একখানি পটে-আঁকা চিত্র দেখিতেছি। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর শত্রুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য চন্দ্রমল্লিকা দিয়া একটি বীরত্বের চিত্র রচিত হইয়াছিল রুশ অ্যাড্‌মিরাল্ ম্যাকারফ্ তরবারি হস্তে নিমজ্জমান রণপোতের উপর দণ্ডায়মান: চতুর্দ্দিকে বিশাল সাগরোর্ম্মি ফুঁপিয়া উঠিতেছে: উর্ম্মিশীর্ষে শ্বেত চন্দ্রমল্লিকায় রচিত ফেনপুঞ্জের মধ্যে মধ্যে রক্তবর্ণ পুষ্পে রুধিরের আভাস সুস্পষ্ট।

জাপানের জাতীয় নিদর্শন চন্দ্রমল্লিকা, শিল্পের সাধন ও ইতিহাসের শিক্ষক। উহার পাপড়িগুলি জাপানীর আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

সৌন্দর্য্য যে কেবল উপভোগ করা যায় তাহা নহে, সৌন্দর্য্য সৃষ্টিও করা যায়। জাপানী চন্দ্রমল্লিকা এ কথার পরিপোষণ করে।

সু।

ভারতের বিভূষণ শিল্প (Ostasiatische Zeitschrift) :—

লোকের বিশ্বাস ছিল যে এসিয়ার তিনটি সভ্যতাকেন্দ্র—পারস্য, ভারত ও চীন—পরস্পর নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র ভাবেই আপনাদের সভ্যতা বিকাশ করিয়া তুলিয়াছিল। আধুনিক অনুসন্ধানে এই তিন কেন্দ্রের পরস্পর যোগ ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী গ্রীস, মিশর প্রভৃতি সভ্য জনপদগুলির সহিত ভাবের আদানপ্রদান ধরা পড়িয়াছে। এসিয়ার এই সভ্যতা বিকাশ তাৎকালীন সভ্য জগতের অঙ্গরূপেই হইয়াছিল।

বিভূষণ শিল্পে মিশরের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেও চীন ও ভারত, পারস্য ও মিশরের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ ছিল। সেই সূত্রে মিশরী শিল্পের বিবিধ রীতি চীন ও ভারতীয় শিল্পে প্রবেশ লাভ করে। ভারতের বিভূষণ শিল্প অর্থাৎ যে কারুকার্য্য দ্বারা কোনো বস্তু সুদৃশ্য করিয়া তোলা হয় তাহা যে আর্য্য শিল্প নহে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় কারণ আর্য্য উপনিবেশের পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে তাহা উদ্ভূত হইয়াছিল। ইমারতী শিল্পও একেবারে অনার্য্য। এই জন্য ভারতের সমস্ত শিল্পী কারিগরই শূদ্র। হাজার হাজার বৎসরের ব্যবধান সত্ত্বেও মিশর ও ভারতের বিভূষণ শিল্পের সাদৃশ্য অপরিবর্ত্তিত থাকিতে দেখা যায়। ভারত মিশরের শিল্পের ঠিক অনুকরণ না করিলেও, উভয়েই যে একই শিল্পধারা অনুসরণ করিয়াছে তাহা উভয়দেশের শিল্পের নমুনা
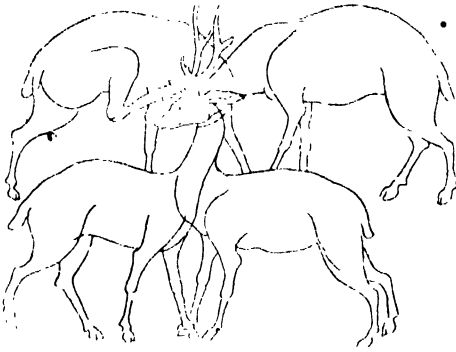
মৃগ-চতুষ্টয়।
তাঞ্জোরের একজন আধুনিক স্বর্ণকারের নক্‌সা।
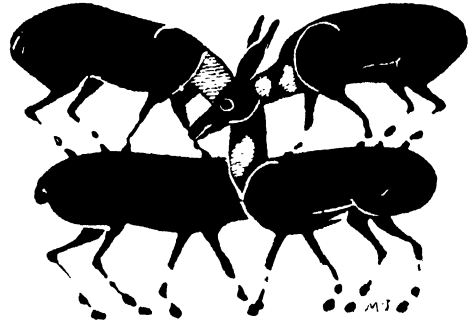
মৃগ-চতুষ্টয়।
খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর একটি গ্রীসীয় পাত্র-গাত্রের নক্‌সা।

দেখিলেই বুঝা যায়। পাঁচ হাজার বৎসরের শিল্প-সাধনার ধারা এখন পর্য্যন্ত ভারতের কারিগরেরা সমানভাবে প্রবাহিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছে; কিন্তু অন্য দেশে সে ধারা নূতনের তলে চাপা পড়িয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতের আলপনায় পদ্ম ও ভ্রমর, রাজহংস ও মৃণাল, চক্রবাক চক্রবাকী, অথণ্ড লতার পাতার ফুলের বিচিত্র মিলন-পর্য্যায় যেরূপ ভাবে এখনও অঙ্কিত হয় গ্রীসের ও ক্রীটের প্রাচীন শিল্পনমুনা সেইরূপই। ইহা ছাড়া রেখার আবর্ত্ত, সমতারক্ষিত বক্রগতি এবং গোলকধাঁদা অঙ্কন ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলিতে প্রাচীন কালে যেমন ভাবে অনুশীলিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষে এখনও তাহার অনুরূপ অঙ্কন অশিক্ষিত-পটু পুরনারীদের আলপনায় দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ গোলকধাঁদা জিনিসটা ক্রীটের নিজস্ব, অথচ তাহা ভারতেও অপরিজ্ঞাত নহে। ইহা হইতে ক্রীটসভ্যতার সহিত ভারত-সভ্যতার যোগ ছিল মনে হয়।

কেহ কেহ মনে করেন শেকেন্দর সাহের সঙ্গে গ্রীক শিল্পরীতি ভারতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এ অনুমান সত্য নহে; যে গান্ধার শিল্পে গ্রীক প্রভাব সুপরিস্ফুট, সেই গান্ধার শিল্পের বিভূষণ-রীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার (Current Opinion and Literary Digest):—

এতদিন বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি অসীম শূন্য, এবং তাহার মধ্যে গ্রহ উপগ্রহ দোদুল্যমান বস্তুপিণ্ড। কিন্তু সম্প্রতি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের অগ্রণী অসবোর্ণ রেনল্‌ড্‌স্‌ এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্‌টর অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌ প্ল্যাঙ্ক এই মতবাদ একেবারে ঠিক উণ্টা করিয়া দিতেছেন। রেনল্‌ড্‌স্‌ বলেন পৃথিবী প্রভৃতি শূন্যে দোদুল্যমান বস্তুপিণ্ড নহে; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই সংহত বস্তু-বিস্তার, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহ তাহার মধ্যকার ছিদ্র মাত্র—অর্থাৎ যেমন জলের মধ্যে বুদ্‌বুদ, অর্থাৎ যাহাকে আমরা শূন্য বা ঈথর বলি তাহার বস্তু গ্রহশরীরের বস্তু অপেক্ষা ঢের ঘন, ঢের সংহত; এবং এই বস্তুপিণ্ডের সংহত অবস্থার তারতম্যের ফলেই গ্রহে উপগ্রহে গতি সঞ্চারিত হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, বস্তু মাত্রেই আকর্ষণী শক্তি নাই; যাহা ছিদ্র মাত্র তাহাতে আকর্ষণী শক্তি বর্ত্তিয়া তিষ্ঠিয়া থাকিবে কোথায় কাহার আশ্রয়ে? অতএব সূর্য্য পৃথিবী চন্দ্র প্রভৃতির পরস্পরকে টানাটানি করার কথাটা মিলটনের কল্পনা মাত্র। বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত, জোয়ার ভাঁটা, এবং ঘনসংহত বস্তুপিণ্ডের গতি যেমন একটা চাপের ফল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থিত গ্রহবুদ্‌বুদগুলির গতিও তেমনি নানা দিককার বিভিন্ন প্রকারের চাপাচাপি ঠেলাঠেলির ফল। জলের মধ্যে বুদ্‌বুদ যেমন তলা হইতে উপরে ঠেলিয়া উঠে, আমাদের পৃথিবীও তেমনি সেকেণ্ডে ২০ মাইল গতিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঠেলিয়া চলিয়াছে।

এই মতবাদ যতই আজগুবি লাগুক অবিশ্বাস করিবার জো নাই। আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক সার টমসন ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; রয়াল সোসাইটি সম্ভব বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন; প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জন ম্যাকেঞ্জি তাহা প্রচারের ব্রত করিয়াছেন। সার টমসন বলিয়াছেন—And altho at first sight the idea that we are immersed in a medium almost infinitely denser than lead, might seem inconceivable, it is not so if we remember that in all probability matter is composed mainly of holes.

মহাকাশের বস্তুসংহতি সীসার চেয়েও ঘন। রেনল্‌ড্‌স্‌ পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন তাহা জল অপেক্ষা দশ হাজার গুণ ঘন, এবং পৃথিবীস্থ সর্ব্বাপেক্ষা ঘন পদার্থ প্লাটিনাম অপেক্ষা ৪৮০ গুণ ঘন। যেখানে আমরা মনে করি শূন্য, চোখে দেখি না কিছু, সেই স্থানটাই নিরেট; আর যাহাকে আমরা মনে করি নিরেট তাহা সেই নিরেটের মধ্যে শূন্য ছিদ্র মাত্র। অর্থাৎ মহাকাশ যেন পর্ব্বত আর গ্রহ উপগ্রহগুলি তাহার মধ্যকার গুহা গহ্বর।

এতদিন লোকে মনে করিত পরমাণুই বস্তুর অবিভাজ্য উপাদান। এখন ইলেক্‌ট্রন আবিষ্কারে জানা গিয়াছে যে এক একটি পরমাণুর মধ্যে অসংখ্য ইলেক্‌ট্রন বা বিদ্যুৎকণা রহিয়াছে; এই ইলেক্‌ট্রনের সমষ্টিই বস্তু; এই ইলেক্‌ট্রন-সংস্থান সৌরজগতের সংস্থান অপেক্ষাও জটিল; এই ইলেক্‌ট্রন মহাবেগে সদা ধাবমান।

সুতরাং যাহা শূন্য বা ঈথর তাহাও শূন্য নহে, তাহাও ইলেক্‌ট্রন-পূর্ণ, বিন্দুসমষ্টি। এই-সমস্ত বিন্দু সমান আকারের এবং অপরিবর্ত্তনীয়। এই বিন্দুগুলি শিশির মধ্যে হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউলের মতন ঠাসা আছে; তাহাদের সকলেই গতিবিশিষ্ট, কিন্তু এক অপরকে

ধাক্কা দিয়া স্থানচ্যুত করে না। এই বিন্দুগুলির ব্যাস ইলেকট্রন অপেক্ষাও অতি ক্ষুদ্র, এক ইঞ্চির ৪৯০০০০০০০০০০০০০০ ভাগের এক ভাগ। রেনল্‌ড্‌স অঙ্ক কষিয়া দেখাইয়াছেন যে জগতে ইহাই ক্ষুদ্রতম বস্তু। ইহাদের নিজস্ব গতিবেগই জগতে গতিশক্তির নিদান। দুর্গ মধ্যে যেমন ভাবে গোলা স্তূপ করা থাকে, এই বিন্দুগুলিও সেইরূপ শৃঙ্খলায় সজ্জিত থাকে; এক দিকে চাপ পড়িলে

সিংহদ্বয়।
সিংহলের আধুনিক নক্‌সা।

সিংহদ্বয়। ৬ষ্ঠ খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীর গ্রীসীয় দ্বীপপুঞ্জের একটি পাত্র-গাত্রের নক্‌সা।

সেই গোলাগুলি সরিয়া যায়, যেরূপে সজ্জিত ছিল সেরূপ আর থাকে না, অথচ একেবারে বিশৃঙ্খলও হয় না, বিশ্বের গতিরহস্যের মূলতত্ত্বও এইরূপ। একটা ছালার মধ্যে বালি ভরিয়া ঝাঁকড়াইয়া দিলে বালুকণাগুলি যেমন ভাবে ঠাসিয়া বসিয়া যায় বিশ্ববিন্দুগুলি সেইরূপে সংস্থিত আছে; বালুকণা সে অবস্থায় নড়িতে পারে না, কিন্তু ছালার উপরে এক স্থানে চাপ দিলে

মনসা দেবী।
প্রথম বাঁ দিকেরটি ১৯শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে প্রস্তুত একটি ধাতুমূর্ত্তি। দ্বিতীয় ডাহিনদিকেরটি ভূমধ্যসাগরস্থ ক্রীট দ্বীপের মনসা দেবী। উভয়ের বসন ভূষণ ভঙ্গী প্রায় একরূপ, বিশেষ করিয়া বাংলার মনসা দেবীর য়ুরোপীয় ধরণের ঘাগরা লক্ষ্য করিবার জিনিস।

সেখানটা বসিয়া যায় কিন্তু অন্য দিকটা ঠেলিয়া উঠে, বিশ্বের গতি-রহস্যও সেইরূপ। দুইটা ফাঁপা রবারের বল লও; একটার মধ্যে সীসার ছিটা পূর্ণ কর এবং ছিদ্র-মুখে একটা কাচের নল বসাও; সেই বলটিতে রং-গোলা জল ভর; অপর বলটিতে সাদা জল ভর। সাদা-জল-ভরা বলটিতে চাপ দিলে জল বাহির হইয়া পড়িবে, কিন্তু ছিটা-ভরা বলটিতে চাপ দিলে দেখা যাইবে যে কাচের নলের রঙিন জল নীচে নামিয়া যাইতেছে, অর্থাৎ ছিটাগুলির সংস্থান-পর্য্যায় পরিবর্ত্তিত হওয়াতে শূন্য স্থান পূরণ করিতে যাইতেছে নলের জল। ইহাই রেনল্‌ড্‌সের মতে মাধ্যাকর্ষণের কারণ; নিউটন শুধু নিয়ম আবিষ্কার করেন, কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন রেনল্‌ড্‌স্‌। বিশ্বশরীরের প্রত্যেক অণু গতিশীল, এবং সমস্ত অনু-সংহতি গতিশীল—যেমন ধরুন মৌমাছির ঝাঁক, প্রত্যেকটি মৌমাছি উড়িয়া চলিয়াছে বলিয়াই ঝাঁকটি অগ্রসর হইতেছে; অথবা ধূলার আঁধি, প্রত্যেক ধূলিকণা অগ্রসর হইতেছে বলিয়াই ধূলিরাশি গতি পাইয়াছে। এইরূপ বাতাস, জলস্রোত, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতির উদাহরণ হইতে রেনল্‌ড্‌সের তত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি—প্রত্যেক অংশ গতি-শীল বলিয়াই সমগ্রটি গতিশীল।

এই আমাদের এতটুকু পৃথিবীর পিঠে চড়িয়া আমরা যে সেকেণ্ডে ২০ মাইল করিয়া ছুটিয়া মহাশূন্যে পাড়ি দিয়াছি, সেই মহাকাশের একটা চাপ আছে। রেনল্‌ড্‌স্‌ মাপিয়া স্থির করিয়াছেন, সে চাপ এক বর্গ ইঞ্চির উপর ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন; ২৭ মণে এক টন। স্কটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ গণিতবিশারদ ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল বিভিন্ন পরীক্ষায় এই একই সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। যাহা শূন্য তাহা বাস্তবিক শূন্য নয়, তাহা বস্তুঘন, গতিশীল এবং ভারবিশিষ্ট। জলের তলা হইতে যেমন করিয়া বুদ্বুদ ভাসিয়া উঠে, ঠিক তেমনি ভাবেই মহাকাশের একদেশ হইতে পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগুলি অপর দিকে ঠেলিয়া চলিতেছে, তাহাই গ্রহগতি। কিন্তু এই যে গতি ইহা ক্রমাগত নয়, থাকিয়া থাকিয়া চিড়িক মারিয়া উঠার ন্যায়। নিম্ন-লিখিত উপায়ে এই ব্যাপারটি বুঝানো যাইবে। একটা লম্বা খাঁজ কাটা টেবিলের খাঁজের উপর ছয়টা বল্‌ পরস্পর ঠেকাঠেকি হইয়া সারবন্দি রাখা আছে। যদি আর ছয়টা বল একে একে একটা ঢালু স্থান হইতে সেই খাঁজের মধ্যে গড়াইয়া ফেলা যায় তাহা হইলে প্রথম বলটা গড়াইয়া গিয়া বল ছয়টার এপাশে ধাক্কা দিলেই ওপাশের বলটা গতি পাইয়া গড়াইয়া সরিয়া যাইবে এবং খাঁজের মধ্যে নবাগতকে লইয়া ছয়টি বলই থাকিবে; কিন্তু পূর্ব্বে যেখানে এই ছয়টি বল ছিল সেখান হইতে একটা বলের ব্যাসের মাপ-পরিমাণ স্থান সরিয়া বসিয়াছে দেখা যাইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ছয়টি বল গড়াইয়া ধাক্কা মারিলে দেখা যাইবে যে পূর্ব্বের ছয়টি বলই গতি পাইয়া গড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে আসিয়া বসিয়াছে সেই শেষের বল ছয়টি, কিন্তু ইহারা প্রথম ছয়টি বল যেখানে ছিল সেখান হইতে ছয়টি বলের ব্যাসের মাপে সরিয়া বসিয়াছে, অর্থাৎ আগেকার প্রথম বলটা যেখানে ছিল শেষের শেষ বলটা তাহার স্থানে আছে। এই বলের ধাক্কা যদি খুব দ্রুতগতি ও ক্রমান্বয়ে হইতে থাকে তবে একটি গতি-প্রবাহ সৃষ্টি করিবেই, কিন্তু সেই গতিপ্রবাহ যতই দ্রুত হৌক নিরন্তর নয়, সান্তর। জগতের সমস্ত গতিই, মাধ্যাকর্ষণজনিত গতি পর্য্যন্ত, এই নিয়মের বশবর্ত্তী। অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌ প্ল্যাঙ্ক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পরীক্ষায় এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সমুদ্রের ঢেউ

আলপনা ও ঘটচিত্রের নক্সা।
ভারতীয় ও ভূমধ্যসাগর সন্নিহিত দেশের প্রায় একইরূপ।

গোলকধাঁধা।
সিংহলের একখানি আধুনিক মাদুরে বোনা নক্সা।

৩টে আছাড় খাইয়া ক্রমে ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিতে পরিণত হয়; জগতের গতিও সেইরূপ প্রথমে বেগবান ক্রমে হ্রস্ববেগ হইয়া পড়ে এবং তাহারই ফল উত্তাপ, আলোক, গ্রহাবর্ত্তন ইত্যাদি। রবারের থলিতে বাতাস ভরিতে ভরিতে এক সময়ে সমস্ত বাতাসটা থলি ফাটাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়; তেমনি গতিশক্তি জমিতে জমিতে একবার মারে ধাক্কা; সেই ধাক্কা ক্রমাগত আসিতে থাকিলে গতি চলিতে থাকে, নতুবা সাময়িক হয় মাত্র। একটা জিনিসকে ০° হইতে ১° উত্তাপ দিতে যে তাপশক্তি আবশ্যক হয়, ২৪৯° হইতে ২৫০° করিতে তাহার ত্রিশগুণ তাপশক্তি কম লাগে; ইহা গতির ধর্ম্মেরই প্রমাণ মাত্র, একবার ধাক্কা দিয়া চালাইয়া দিতে পারিলে সে বস্তুকে সহজেই চালাইতে পারা যায়, প্রথম ধাক্কা যত জোরে দেওয়া আবশ্যক হয় পরে আর তত জোর দিতে হয় না।

জেনেভার লা শাজ বলেন যে প্রত্যেক পদার্থ তাহার নিকটবর্ত্তী পদার্থের দিকে স্বশরীর হইতে অণুকণা ফেলিয়া ফেলিয়া ধাক্কা মারিতে থাকে; এই ধাক্কা মারিবার জন্য নিকটস্থ হওয়ার চেষ্টাই মাধ্যাকর্ষণ। অধ্যাপক ডেভিড আলেন বলেন যে আমাদের চতুর্দ্দিকে অহরহ নিরন্তর ঈথর-তরঙ্গ প্রবহমান আছে; সেই তরঙ্গাঘাতই বস্তুর গতির কারণ। সম্প্রতি ভিয়েনা শহরে বৈজ্ঞানিকদের এক প্রকাণ্ড কংগ্রেস হইয়া গেছে; তাহাতে নিউটনের মতবাদ যে এখন আর মানা চলিবে না তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। এমন কি ঈথরের অস্তিত্বও কল্পনা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পাতলা হইয়া হইয়া ঊর্দ্ধে একস্থানে শেষ হইয়া গিয়াছে; এক গ্রহ হইতে অপর গ্রহের মধ্যবর্ত্তী স্থান শূন্য, সেখানে সূর্য্য হইতে বিকীর্ণ ইলেক্‌ট্রন পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহের অভিমুখে ছুটিতেছে। এই ইলেক্‌ট্রনই রেনল্‌ডসের বস্তুঘন শূন্যব্যাপী পদার্থ; ইহা লা শাজের ধাক্কা-মারার মতবাদের সমর্থক। সুতরাং দেখা যাইতেছে জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র ভাবে বহু বৈজ্ঞানিক একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অতএব এখন নিউটনের মতবাদ ছাড়িয়া দিয়া এই নূতন মত স্বীকার করিতে হইবে—যতদিন না আবার নূতনতর মতবাদ এই মতকে খণ্ডন ও বাতিল করিয়া দিতেছে।

গোলকধাঁধা, প্রাচীন ক্রীট দ্বীপের মুদ্রাচিহ্ন।

এতকাল ধারণা ছিল যে পৃথিবীর অভ্যন্তর গলা পদার্থে পূর্ণ। কিন্তু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ভূজঠর একেবারে কঠিন নিরেট, যেমন উপর তেমনি ভিতর! মাটিতে ৬ ফুট গর্ত্ত করিয়া সেখানে একটা ৫০০ ফুট লম্বা ও ৬ ইঞ্চি মোটা নলে জল রাখা হয়; তাহাতে দেখা যায় যে সূর্য্য চন্দ্রের আকর্ষণে এই নলের জলের মধ্যেও জোয়ার ভাঁটা হয়, যদিও এই পরিবর্ত্তন মাত্র ·০০১ ইঞ্চি। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ভূজঠর কঠিন, তরল হইলে জলের উত্থান পতন আরো বেশী হইত। তবে পৃথিবী কঠিন

নিরেট হইলেও স্থিতিস্থাপক; তাহাতে পৃথিবী-শরীরেও জোয়ার ভাঁটা হয়; সেই জোয়ার ভাঁটার পরিমাণ এক ফুট, পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে।

সমুদ্রের গ্রাসমুক্তি ও ভুক্তি (La Nature) :—

সমুদ্র অনেক জনপদ গ্রাস করে, কিন্তু গ্রাসমুক্ত করে কদাচিৎ। সম্প্রতি ইংলণ্ডের নরফোক কাউণ্টির উপকূলে সমুদ্র সরিয়া গিয়া একটি গ্রস্ত শহর প্রকাশ করিয়াছিল। এই শহর তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্র গ্রাস করে; তিন দিন মাত্র তাহার কঙ্কাল প্রকাশ করিয়া দেখাইয়া পুনরায় গ্রাস করিয়াছে। দুদিন খুব ঝড় হয়; সেই ঝড় ও ভাঁটার টানে সমুদ্রের পলি বালি সরিয়া যায়; তাহাতেই লুপ্ত শহরের কঙ্কাল প্রকাশ হইয়া পড়ে; দুদিন পরে বাতাসের গতির পরিবর্ত্তনে ও জোয়ারের টানে অপসৃত বালি সরিয়া

সমুদ্রের গ্রাসমুক্ত নগর-কঙ্কাল।

আসিয়া আবার সেই শহর ঢাকিয়া ফেলে। যে দিন প্রথম এই শহর প্রকাশ পায় সেদিন একজন জেলে আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হয়; মনে করে স্বপ্ন নাকি। সত্বর এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেলে দলে দলে চাষা জেলে প্রভৃতি আসিয়া প্রোথিত ধন লাভের আশায় খুঁড়িতে আরম্ভ করে। কিছু অস্ত্র শস্ত্র, চাবি, তৈজস ও মৃৎপাত্র ভিন্ন বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই। গির্জাঘরটি এখনও ৩০ ফুট খাড়া ছিল দেখা যায়; কিন্তু পুনরাগত জলের ধাক্কায় তাহা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ ঘটনা জগতে নিতান্ত বিরল নহে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিস দ্বীপপুঞ্জে সমুদ্র মাঝে মাঝে দু তিন মাইল সরিয়া যায়, তখন শান-বাঁধা চত্বর ও ইটের দেওয়াল প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

আয়ারল্যাণ্ডে স্বদেশী ভাবের অভ্যুত্থান (Current Opinion):—

আয়ারল্যাণ্ডে স্বদেশী প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রনীতিজ্ঞেরা স্বদেশকে স্ব-তন্ত্র করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন, বিজেতা ইংরেজ তাঁহাদিগকে স্বায়ত্ত শাসন Home Rule দিতে বাধা হইতেছেন; ইয়েটস্ প্রভৃতি কবিরা স্বদেশী ভাষায় স্বদেশী ভাবের উদ্বোধন আরম্ভ করিয়াছেন; শিল্পীরা সমারোহ অভিনয় করিয়া দেশের অতীত ইতিহাস ও সাধনা লোকের সম্মুখে জীবন্ত করিয়া তুলিতেছেন। প্রত্যেক দেশেই এমন এক এক জন মহাপুরুষের কাহিনী সৃষ্ট হইয়া উঠে যাঁহার মধ্যে সমস্ত জাতীয় ভাব যেন আকার পাইয়া সার্থক হয় এবং আবহমান কাল লোকের সম্মুখে তাহা আদর্শ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যেমন রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ, আয়ারল্যাণ্ডে তেমনি ফিন ম্যাক-কাম্হল। তিনি জাতীয় শৌর্য্যের অবতার। লোকে বিশ্বাস করে তিনি তাঁহার স্বদেশীদের মধ্যেই তাঁহার শঙ্খটি মাথায় দিয়া ঘুমাইয়া আছেন, জাতীয়তা রক্ষার দরকার হইলে তিনি আবার স্বদেশের অন্তর হইতেই অভ্যুত্থিত হইবেন। তিনি যেন স্বদেশবাসীর অন্তরে এই বাণী নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, যখনই দরকার হইবে, "তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।" তখনই তাঁহার পাঞ্চজন্য আবার নিনাদিত হইয়া উঠিবে। তিনি পৌরাণিক কালে যেমন অকুতোভয়ে শত্রুর ইন্দ্রজাল ও কুহকমন্ত্র ব্যর্থ করিয়া বিপদমূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া দেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এখনও তিনি সেইরূপ করিবেন। আর স্বদেশের অন্তরে সদা জাগ্রত আছেন সেই ঋষি প্যাট্রিক, যিনি অজ্ঞান ধর্ম্মহীনদের ধর্ম্মের অমৃত বাণী শুনাইয়া সত্য শিব মঙ্গলের পথ দেখাইয়াছিলেন। এইরূপ ভাবদ্যোতক কতকগুলি সুন্দর চিত্র একজন আইরিশ শিল্পী অঙ্কিত করিয়াছেন।

বায়োস্কোপের ইন্দ্রজাল (Literary Digest):—

আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির দুমুড়াতেই সীমা আছে। আমরা অতি মৃদু শব্দ যেমন শুনিতে পাই না, তেমনি অতি প্রবল শব্দও শুনিতে পাই না; অতি মৃদু গতি চোখে ঠেকে না, অতি দ্রুত গতিও চোখে ঠাহর হয় না। ফটোগ্রাফের ক্যামেরায় কিন্তু চোখের ক্ষমতাতীত অনেক জিনিষ ধরা পড়ে। চোখে ঘড়ীর বড় কাঁটার চলা বুঝিতে পারি, কিন্তু ছোট কাঁটার চলা বুঝা যায় না, অথচ আধ ঘণ্টা পরে দেখা যায় যে ছোট কাঁটাটা চলিয়া আসিয়াছে; বন্দুকের গুলি চোখের সামনে দিয়া ছুটিয়া যায়, গাছ তিলে তিলে বড় হয়, বেগে কুমোরের চাক ঘুরে, আমরা কিছুই ঠাহর করিতে পারি না। কিন্তু ক্যামেরায় এ সমস্তই ধরা পড়ে। অতি তাড়াতাড়ি মুহুর্মুহু ফটো তুলিয়া সেই ফটোগ্রাফশৃঙ্খলা বায়োস্কোপ যন্ত্রে ঘুরাইয়া চোখের সামনে ছবি ফেলিলে আমরা চোখের অনায়ত্ত অনেক তত্ত্ব দেখিয়া বুঝিতে পারি। গুলি যে বেগে ছুটিয়া গিয়াছে তাহার চেয়ে আস্তে বায়োস্কোপের ফটোফিল্মের ফিতা চালাইলে গুলির গমন স্পষ্ট আমরা দেখিতে পাই; আবার গাছ যে গতিতে বাড়ে তাহার অপেক্ষা দ্রুততর বেগে ফটোফিল্মের ফিতা চালাইলে চোখের সামনে গাছের বৃদ্ধি, পুষ্পোদ্গম, ফল-ধরা প্রভৃতি রহস্যময় ব্যাপার তখনি

দেশ-আত্মা বিপদমূর্ত্তির কুহকজাল ভেদ করিতে অকুতোভয়ে অগ্রসর হইতেছে। আইরিশ চিত্র।

তখনি স্পষ্ট হইয়া উঠে। ফটোগ্রাফের এইরূপ নানা বিচিত্র শক্তির সাহায্যে নানাবিধ দৃষ্টি-বিভ্রম রচনা করিয়া বায়োস্কোপে দেখানো হয়। একটা ফটোগ্রাফের সঙ্গে আর-একটা ফটোগ্রাফ জুড়িয়া তাহার আবার ফটোগ্রাফ লইয়া অদ্ভুত কাণ্ড দেখানো যায়। যেমন, একজন মানুষের ছবি, ধর ছয় ইঞ্চি লম্বা তোলা হইল, এবং একটা শশারও ছবি তোলা হইল ছয় ইঞ্চি মাপের; এই দুই ছবি পাশাপাশি রাখিলে দৃষ্টিবিভ্রম হইতে মনে হইবে শশাটা বুঝি এক-মানুষ লম্বা; একটা জাহাজের ছবির পাশে একটা ঘরের জানালার ছবি আঁটিয়া দিয়া পুনরায় উভয়ের একটা ছবি তুলিলে মনে হইবে জাহাজখানা বুঝি জানালার ফুকোরের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছে। দুর ফোকাস ও মোটা লেন্স দিয়া যেরূপ ছবি তোলা যায়, নিকট ফোকাস ও পাতলা লেন্স দিয়া সেই জিনিসেরই ছবি একেবারে চেহারা বদলাইয়া ফেলে; ইহাতে হয়কে নয়, ও নয়কে হয় করা দক্ষ ফটোগ্রাফারের একেবারে ইচ্ছাধীন। উইয়ের ঢিপিকে পর্ব্বত, ও পর্ব্বতকে উইঢিপি রূপে দেখানো কিছুমাত্র কঠিন নহে। ফোকাসের বাহির হইতে ফটোগ্রাফ তুলিলে বা যতক্ষণ ফটোগ্রাফের কাচের উপর আলোক লাগানো দরকার তদপেক্ষা কম সময় আলোক লাগাইলে একটা কেমন ঝাপসা ছবি উঠে। এই ঝাপসা ছবি কোনো একটা খুব স্পষ্ট ছবির উপর ছাপিলে স্পষ্ট ছবির গভীর রঙের পশ্চাৎদৃশ্যের (background) উপর সেই ঝাপসা ছবি উঠিয়া আর এক প্রকার দৃষ্টি-বিভ্রম উপস্থিত করে। এই উপায়ে বায়োস্কোপে স্বপ্নদৃশ্যগুলি সৃষ্টি করা হয়; এইরূপ উপায়ে ভূতের ফটোগ্রাফ বলিয়া অতিবিশ্বাসীদের ঠকানো হয়। ঝাপসা ফটোগ্রাফগুলির রং পাতলা হয় বলিয়া গভীর রঙের পশ্চাৎদৃশ্য ঝাপসা চিত্রের দ্বারা একেবারে ঢাকা পড়ে না; তাহাতে মনে হয় যেন স্বপ্নদৃষ্ট নরনারী বা ভূতগুলি স্বচ্ছ-দেহী, তাহারা বায়ুভূত নিরাশ্রয়, কাচের ন্যায় তাহাদের দেহের এপার হইতে ওপারের জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়। বায়োস্কোপে অধিকন্তু দেখা যায় জড়পদার্থও কখনো কখনো সচল চঞ্চল স্বয়ংক্রিয় হইয়া উঠে; চায়ের কেটলি আপনি উননে চড়ে, আপনি কাত হইয়া জল ঢালে, চা পরিবেষণ করে; টেবিল চেয়ার দৌড়াদৌড়ি করে, ঘটি বাটি ছুটোপাটি করে। খুব সূক্ষ্ম সূতায় সেই জিনিসগুলি বাঁধিয়া তাহাদিগকে ঐরূপ গতি দান করা হয়, এবং ফটোগ্রাফ তুলিয়া তাহাদের গতি ও কার্য্য-পরম্পরা আমাদের চোখের সামনে দিয়া দ্রুতগতিতে সঞ্চালিত হইলে আমরা একটি অখণ্ড গতি ও কার্য্যপ্রবাহ লক্ষ্য করি, তাহাদের সূতার নর্ত্তন আমাদের চোখে পড়ে না। বায়োস্কোপে কখনো কখনো রোমাঞ্চকর ভয়ানক দুর্ঘটনাও এইরূপ ফাঁকি দিয়া দেখানো হয়। একটা অভিনয় হইতেছে, আর তাহার ফটোগ্রাফ লওয়া হইতেছে প্রতি সেকেণ্ডে ২০।২৫ খানা করিয়া; যেই একটা দুর্ঘটনার ব্যাপার উপস্থিত হইল অমনি ফটোগ্রাফ লওয়া বন্ধ হইল, অভিনেতারা আড়ষ্ট হইয়া যে যেমন ছিল স্থির রহিল, তার পর মানুষের বদলে একটা নকল পুতুল রাখিয়া, চলন্ত এঞ্জিন বা মোটরের বদলে নকল আনিয়া আবার সেই দুর্ঘটনার অভিনয় ও ছবি তোলা হইল, দর্শক পর পর এই ব্যাপার দেখিয়া কার্য্য কারণ মিলাইয়া শিহরিতে লাগিল যে হায় হায় লোককে ক্ষণিক উত্তেজনা জোগাইবার জন্য লোকগুলা বুঝি বেঘোরে মারা পড়িল। কখনো কখনো স্বভাবের উল্টা ব্যাপার বায়োস্কোপের ছবিতে ঘটিতে দেখা যায়—চিমনি-পথে ধোঁয়া উপরে না উঠিয়া নীচের দিকেই নামিতেছে, একতলা হইতে দ্বিতলায় লম্ফ প্রদান ইত্যাদি। এ রকম দৃশ্য দুটি ছবির একত্র মিলন হইতে দৃষ্টিবিভ্রম ভিন্ন আর কিছু নয়। ক্যামেরা উল্টা করিয়া পাতিয়া ছবি তুলিয়াও অনেক অনাসৃষ্টি ব্যাপার দেখানো হয়। বায়োস্কোপে আমরা ঘটনার মধ্যে একটি ক্রমাগত প্রবাহ লক্ষ্য করি; কিন্তু বাস্তবিক উহা দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র; বায়োস্কোপের ফিল্ম বা ফটোগ্রাফ-মুদ্রিত লম্বা ফিতায় কর্ম্মপ্রবাহের এক একটি স্থির ছবি অঙ্কিত থাকে; সেইগুলির পারম্পর্য্য চোখের উপর পড়িয়া একটি ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে। চোখে যে জিনিসের ছাপ পড়ে তাহা মুছিতে কিছু সময় লাগে; এক জিনিসের ছাপ মুছিতে না-মুছিতে যদি অপর জিনিসের ছাপ আসিয়া পড়ে তবে উভয়কে যুক্ত ও সম্বদ্ধ বলিয়া ভ্রম হয়। একখানা তাসের এক পিঠে একটা পিঁজরা ও অপর পিঠে একটা পাখী আঁকিয়া সেই তাসখানি অতি দ্রুত পালটাইলে মনে হইবে খাঁচার মধ্যে পাখী রহিয়াছে দেখিতেছি। এইরূপে, ঘটনার স্থির অবস্থা-পরম্পরারও এক অংশ অপর অংশের সঙ্গে জুড়িয়া গিয়া ঘটনাপ্রবাহ উপস্থিত করে।

চারু।

শেষ বোঝা

(গল্প)

১

কোন রকমে সাধুচরণ বন্যার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল যদি, কিন্তু রাক্ষসের মত নির্ম্মম রক্তমুখো মহাজনটীর হাত হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইল না।

নিজের স্ত্রীপুত্রের জীবনকেও তুচ্ছ করিয়া যে বলদ দুইটাকে ঘরের চালের উপর তুলিয়া সে রক্ষা করিয়াছিল, কিছুই না পাইয়া অবশেষে নিমাই হালদার মহাশয়ের লোলুপ দৃষ্টি সাধুচরণের ঐ বলদ দুইটীর উপরে পতিত হইল।

সাধু অনেক মিনতি করিল। অনেক কাকুতি জানাইল। এবারকার চাষের সমস্ত ফশলই তাহাকে দিবে বলিয়া শপথ পর্য্যন্ত করিল। কিন্তু হালদার মহাশয়ের সঙ্কল্প তেমনি অটুট রহিল। কহিল, এই রকম করিয়া যদি সকলকেই করুণা করিতে থাকি, তবে আমার ব্যবসা চলে কি করিয়া। সে হইবে না, হয় টাকা, নয় বলদ, দুইএর এক চাইই।—

সাধুচরণ গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিতে বসিল। সাধু-জায়া ভাগ্যধরী কহিল "আমার রূপার পৈঁছা ত রহিয়াছে, সেইটেই না হয় এখন সুদের দরুণ দিয়া দাও। তার পর বোরো ধান্য হইলেই সব শোধ দিয়া দিব।"

সাধু তাহাই ঠিক বলিয়া, হালদার মহাশয়ের পায়ে হাতে পড়িয়া, পৈঁছা জোড়াটী সুদের দরুণ দিয়া সময় চাহিল।

সাধুর নিজের জমি জমা কিছুই ছিল না। ভাগে চষিয়াই খাইত। অর্দ্ধেক ফশল জমির স্বামীকে দিয়া বাকি অর্দ্ধেকে নিজের সন্তানদের ও অভ্যাগতদের ভরণ পোষণ চালাইয়া কোনগতিকে বৎসরটী কাটাইয়া দিত।

দেনাদুনি না থাকিলে একরকমে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন যায়। কিন্তু দেনার দায়েই সংসারটী সে কিছুতেই বাগাইয়া উঠিতে পারে না! কি যে হালদার মহাশয়ের টাকার সুদ, এ নাগাইদ লাগাড় শুধিয়াই আসিতেছে, তবু শোধ আর হইতেছে না, ঠিক দিয়া কত একশত হইয়া গিয়াছে, তবু এখনও হালদার মহাশয়ের হিসাবে একশতের জের বাকি। সাধু ইহার জন্য কতবার হালদার মহাশয়ের হাতে পায়ে ধরিয়াছে। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন লোক ডাকিয়া লইয়া আইস, লোকে যদি আমার হিসাবে ভুল ধরিতে পারে আমি টাকা ছাড়িয়া দিব। নিরক্ষর সাধুচরণ অবশেষে হালদার মহাশয়ের নির্ম্মম কারুণ্যের উপরেই আপনাকে সমর্পণ করিয়াছে, তিনি মারিলে মারিবেন, আর রাখিলে সে টিকিয়া যাইবে।

এত দুঃখ এত দুশ্চিন্তা, তবু তাহার সংসারে আনন্দের ও হাসির অভাব ছিল না। প্রভাতের সূর্য্যালোক জগতে আসিবার পূর্ব্বে যে হাস্যধারা তাহার গৃহে জাগিয়া উঠে, নিশীথের চন্দ্রালোকে আকাশ প্লাবিয়া আসিলে সেই হাস্যধারা তাহার বক্ষে ঘুমাইয়া পড়ে।

দুইটী শিশু পুত্র, ও একটী কন্যা তাহার বুক-জোড়া হইয়া ছিল। সাধু তাহাদের দিকে চাহিত আর আপনার সমস্ত দুঃখ, সমস্ত দৈন্য ভুলিয়া যাইত। আবার পত্নীটীও তাহার এমন ছিল যে সংসারের তেল নুন তরী তরকারীর ভার যাহা-কিছু নিজেই সে ধান ভানিয়া চাল কুটিয়া চালাইয়া লইত, সাধুচরণকে এবিষয়ে কিছু ভাবিতে দিত না—তাহার দুটী ধান জোগাড় করিয়া দিতে পারিলেই হইত।

এমন সময় বোরোয় জল লাগিয়া গেল। সাধু মনে করিল, বোরোতে নিশ্চয় কিছু সে পাইবে। কিন্তু ভগবানের কি যে খেলা—পাকিবার মুখে একপশলা বৃষ্টির অভাবে, সব বোরোই প্রায় মরিয়া গেল। অতি কষ্টে বিল হইতে ছেঁচিয়া যে দুই একবিঘা বাঁচিল তাহাতে চাষের খরচ উঠিবে কিনা সন্দেহ। সাধু সমস্যায় পড়িয়া গেল।

পত্নীর রক্ত অধরটীতেও যে একটা দুশ্চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাও সে দেখিল। তবু সাহস করিয়া একটা সান্ত্বনার কথাও বলিতে পারিল না। কি বলিবে? ভগবান যে মরার উপর খাঁড়া তুলিয়াছেন। গরিবের বক্ষ-রক্তটীর পানে তাঁহারও যে একটী লোলুপ দৃষ্টি

পতিত হইয়াছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বক্ষে উঠিয়া বক্ষেই *মিলাইয়া গেল।*

এমনি সময়ে আবার জমিদারের বাড়ীতে বেগারের ডাক পড়িল। তাঁহার সুধা-ধবলিত হর্ম্ম্যে নববৎসরের প্রারম্ভে কলি ফিরাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। গ্রামের সকলেই সাধুচরণকেই চায়। অথচ এদিকে সাধুচরণের বানে-ভাঙা ঘর যেমন হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া ছিল তেমনি পড়িয়া আছে;—পয়সা নাই, কড়ি নাই, গতরও ভাঙিয়া গিয়াছে।

শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া সাধু মনে করিল নমঃশূদ্রের ছেলে, নাহয় জন মজুর খাটিয়াই খাইবে। কিন্তু চারিদিকে জলের অভাবে জন মজুরও লোকে লইতে চাহে না। অবশেষে একদিন গ্রামের আমীন মণ্ডলের কাছে শুনিল, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী রেলোয়ে গুদামে মাল উঠানামার কার্য্যে বিস্তর কুলীর প্রয়োজন আছে, একটাকা করিয়া রোজ দিতেছে, যাইলেই কার্য্য হইবে। সাধুচরণ আর কালবিলম্ব না করিয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রটীর হাতে বলদ দুইটীর ভার দিয়া এবং কনিষ্ঠ পুত্রটীকে ও কন্যাটীকে তাহাদের মায়ের বাধ্য থাকিতে বলিয়া, দুর্গা দুর্গা বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ভাগ্যধরী উপার্জ্জনের নাম শুনিয়া এতদিন কিছু বলে নাই, কিন্তু স্বামীকে বিদায় দিবার সময় তাহার বুক ফাটিয়া চোখে জল আসিতে লাগিল।—এতদিন একসঙ্গে কাটিয়াছে, একটী দিনের তরে কেহ কাহারও বিরহ সহ্য করে নাই। চক্ষের জল আর রোধ মানিল না। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া হৃদয়ভার একটু লঘু করিয়া কহিল, যেখানেই থাকো কেমন থাকো রোজ একখানা করে যেন পত্র দিও।

সাধুচরণ তাহাই দিব বলিয়া চলিয়া গেল। সাধুচরণেরও এই প্রথম বিরহ।

রেলের গাড়ীতে উঠিয়া মনে হইল যেন কলের গাড়ী তাহাকে লইয়া কোন এক কলের জগতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। স্ত্রীপুত্রের জগৎ সেখান হইতে অনেক দূরে—অনেক দূরে অবস্থিত।—সাধুচরণের ইচ্ছা করিতে লাগিল গাড়ীর চালককে ডাকিয়া বলে, ওগো গাড়ী থামাও—গাড়ী থামাও।—ভাঙা ঘরে অনাহারে স্ত্রীপুত্রদের বক্ষে লইয়া জড়াজড়ি হইয়া মরিবে সেও ভাল, তবু সে বিদেশে যাইবে না!

কিন্তু মনের জগৎ আর সত্য জগৎ এক নহে। তাহাকে মাল গুদামে উপস্থিত হইতে হইল। এবং বড় বড় গাঁটগুলা বহিতেও হইল!

একমাস কাটিয়া গিয়াছে, স্ত্রী বার বার করিয়া মিনতি জানাইয়া লিখিয়াছে আর টাকার প্রয়োজন নাই তুমি বাড়ী চলিয়া আইস!

সাধুও তাহাই ঠিক করিয়াছে, বাড়ী যাইবে। গাঁট বস্তা বহাও তাহার দ্বারা ভাল হইয়া উঠে না। সে অসুরের বল তাহার আর নাই। সর্দ্দারের কাছে টাকা চাহিতে গেল। সর্দ্দার কহিল,—মাসটা কাবার করিয়া দিয়া টাকা লইয়া যাও। মাস কাবার হইতেও বেশী বিলম্ব ছিল না। সাধু কি করিবে অগত্যা তাহাতেই রাজী হইল—ভাবিল কিজানি সহায়সম্বলহীন সে, যদি মাসের খাটুনিটাই উড়াইয়া দেয়। কিছুই ত তাহার করিবার নাই! নাহলে একদণ্ড তাহার এখানে তিষ্ঠাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না। মাথাধরিলে একটী আহা বলিবার কেহ নাই। রোগে পড়িলে একটু জল দিবার কেহ নাই। আর তাহা না হইলেও স্ত্রীপুত্রকন্যার বিরহ তাহার সহ্য হইতেছিল না। মনটা সদাসর্ব্বদা তাহাদেরই দিকে পড়িয়া ছিল। রাত্রিতে যে চিন্তা লইয়া ছিন্ন শয্যায় ঘুমাইয়া পড়ে, প্রভাতে সেই চিন্তা লইয়াই জাগিয়া উঠে। আবার দ্বিপ্রহরে যখন সমস্ত পৃথিবী রৌদ্রকিরণে স্তব্ধ হইয়া রহে, তখন লোহায়-গড়া গাড়ীর ছায়ায় বসিয়া সেই চিন্তাই স্ফুটতর হইয়া চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। সাধু যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়, ভাগ্যধরী, পুত্রদের অন্ন পরিবেষণ করিতেছে; আর পুত্রেরা তাহাদের মায়ের দিকে চাহিয়া মায়ের অগাধ স্নেহের সঙ্গে সুধা খাইয়া হাসিতেছে।

ভাবিতে ভাবিতে তাহার হৃদয়টী অশ্রুতে ভাসিয়া যায়; শূন্যে দুই অধীর হস্ত বিস্তার করিয়া বলে, ভগবান্ মিলাও, মিলাও!—নয় এ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দাও।

এমন সময়ে ভগবান্ যেন তাহার কথা শুনিলেন।

সেদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। গুদামের বড় সাহেবের হুকুম হইল, বৃষ্টি আসিবার পূর্ব্বে বাহিরের সকল মাল গুদামজাত হওয়া চাই।

সাহেবের কড়া হুকুম। সর্দ্দার তাহার অধীন সকল কুলীকেই প্রাণপণে কাজে লাগিয়া যাইতে বলিল। সাধুও দয়ালের নাম লইয়া কাজে লাগিয়া গেল। বেলা দশটা পর্য্যন্ত খাটিয়া বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। আর তাহার সাধ্যে কুলাইতেছিল না। পাশ কাটিয়া বাহিরে বাহিরে দাঁড়াইতেছিল।

সর্দ্দার তাহার ফাঁকি ধরিয়া ফেলিয়া কাছে আসিয়া কহিল—সাধু, নাও দেখি, এই গোটা দুই গাঁট আছে, ঘাড়ে করে গুদামে দিয়ে এস।

সাধু একবার ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, এতটা ভারি গাঁট পারিব?

সর্দ্দার কহিল, সকলেই পারিতেছে, তুমি পারিবে না তার মানে কি?

সাধু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গাঁটটী ঘাড়ে তুলিয়া লইল। মনে মনে কহিল, ঠাকুর, নাও, এ ভার ঘুচিয়ে দাও, আর বইতে পারছি না প্রভু।

নীচে হইতে উপরটায় যেখানে মাল গুদামজাত করিতে হয়, সে জায়গাটী অনেক ঢালু। সহসা পা পিছলাইয়া সাধু এমন ভাবে পড়িয়া গেল, মাথার গাঁটটীর চাপে আর তাহাকে উঠিতে হইল না। এক মুহূর্ত্তে দম বন্ধ হইয়া প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল!

সকলে "কি হইল, কি হইল" বলিয়া ছুটিয়া আসিল কিন্তু সাধুচরণ আর কথাই কহিল না। ভাঙা নাও শেষ বোঝা বহিতে বহিতে দরিয়াতেই ভাঙিয়া গিয়াছিল।

লাস যখন পুলীশের হেপাজতে আসিল, তখন কোমরে জড়ান কাপড়ের মধ্য হইতে দুই খানা পত্র বাহির হইয়া পড়িল।—প্রথম খানায় পোষ্টাপিসের ছাপ মারা, সম্ভবত দেশ হইতে আসিয়া থাকিবে। দ্বিতীয় খানা সদ্য লেখা, এখনও ডাকে পাঠান হয় নাই। সাধু স্ত্রীকে লিখিয়াছে, মহাজনের দেনা শুধিতে যাইতেছি, ভাবিও না। পুলিশের ইনেস্পেক্টার দয়াপরবশ হইয়া চিঠিখানা আর ডাকে পাঠাইলেন না। সর্দ্দারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এর কিছু বাকী বকেয়া আছে?

সর্দ্দার অম্লান বদনে কহিল, না!

লাস জ্বালাইতে হুকুম হইল। তখন ভাগ্যধরী স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষায় ব্যস্ত হইয়া ঘর বাহির করিতেছে।

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ।

আলোচনা

ঐতিহাসিক ভ্রম সংশোধন।

প্রবাসী ১৩২০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন (আলোচনা) প্রবন্ধে লিখিয়াছি—ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন, ভবদেবের প্রশস্তি এবং পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকা পাঠে বুঝা যায়, শ্যামল বর্ম্মা হরি বর্ম্মার পুত্রের নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া অর্থাৎ জয় করিয়া লইয়াছিলেন (১৫৭ পৃষ্ঠা)।

শুভক্ষণে স্থাপিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সুযোগ্য সভ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় ১৩২০ সালের শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের সাহিত্য পত্রিকায় চন্দ্রদ্বীপের রাজা শ্রীচন্দ্রদেবের যে তাম্রশাসন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখিলাম শ্রীচন্দ্রদেব বিক্রমপুর জয় করিয়া তথা হইতে ঐ তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন।

রাধাগোবিন্দ বাবু লিখিয়াছেন—"এই লিপির কাল যেন বর্ম্মা-রাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পরে এবং সেন-রাজগণের লিপি-কালের অব্যবহিত পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ সেনরাজ বিজয় সেন দেবের বিক্রমপুর অধিকারের পূর্ব্বে এবং বর্ম্মরাজ হরি-বর্ম্ম দেবের পুত্রের রাজ্যনাশের পরেই কোনও সুযোগে চন্দ্রদ্বীপা-ধিপতি * * বিক্রমপুরে * * বৌদ্ধরাজ্য সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন!"

"বর্ম্মরাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পরে" বলা যায় না, কারণ হরিবর্ম্মার পরে শ্যামলবর্ম্মা ও ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তবে হরিবর্ম্মার পুত্রের পরে যে শ্রীচন্দ্রদেব বিক্রমপুরে রাজা হইয়াছিলেন তাহা ঠিক। উক্ত আলোচনায় আমি লিখিয়াছি "শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় লিখিয়াছেন, 'হরিবর্ম্মার পুত্রের পরে শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছেন' (সাহিত্য ১৩২০, শ্রাবণ ২২৮ পৃষ্ঠা), তাহা হইতে পারে না" (১৫৮ পৃষ্ঠা)। এক্ষণে দেখিতেছি রাধাগোবিন্দ বাবুর অনুমানই ঠিক। কিন্তু শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন দেখিয়া বোধ হয় তিনি "কিছু কালের জন্য বিক্রমপুরে এক অভিনব বৌদ্ধরাজ্য সংস্থাপিত করিতে" পারেন নাই, কারণ তাঁহার তাম্রশাসনে সন, তারিখ, রাজা বা প্রধান কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর নাই। সুতরাং তাম্রশাসন দানের পূর্ব্বেই যে তিনি বিক্রমপুর হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন এবং সেই জন্যই যে তাম্রশাসনখানি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহের কোন হেতু দেখা যায় না।

অতএব হরিবর্ম্মার পুত্রের নিকট হইতে শ্রীচন্দ্রদেব বিক্রমপুর কাড়িয়া লইবার পরেই শ্যামলবর্ম্মা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে শ্রীচন্দ্রদেবকে তথা হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন ধরিতে হইবে। অনুগ্রহ করিয়া সকলে উক্ত প্রবন্ধের এই অংশ সংশোধন করিয়া লইবেন।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

পাব্না জেলার প্রজাবিদ্রোহ।

পাবনা জেলার প্রজাবিদ্রোহ সম্বন্ধে আরও একটি গান আছে। গানটী উমাচরণ প্রণীত বিদ্রোহের সম-সাময়িক গ্রন্থ "গীতকৌমুদী" (চাটমোহর জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৮১ সাল। ২৮শে বৈশাখ) হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

রাগিণী কালেংড়া, তাল তেতালা।
কি বিদ্রোহী পরিত্রাহী বাপ্‌রে ও বাপ্, মলেম মলেম।
কি তামাসা, সকল চাসা, ভেবেছিল রাজা হলেম॥
হাতে পলো, কাঁধে লাঠি, লোটে যত ঘটি বাটি,
মাংনা খাব রাজার মাটী, ভয়ে ভীরু অবাক্ হলেম॥
দেশের যত ব্রাহ্মণ ভদ্র, তারা কি আর আছে ভদ্র,
বিদ্রোহীর দল দেখা মাত্র, নজর আর বাজায় সেলাম॥

শ্রীতারিণীচরণ চৌধুরী।

সমালোচনা

চরিতকথা—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত।

মানুষের মনকে কবিরা সুরে-বাঁধা বীণাযন্ত্রের সঙ্গে অনেক সময়ে তুলনা করিয়া থাকেন। কিন্তু মানুষের মনের সব তার তো সমান সুরে বাঁধা থাকে না। তার মধ্যে সুরের বৈচিত্র্য এবং বেসুরার বৈচিত্র্যও একসঙ্গে এক জায়গায় জটলা করিয়া আছে। আপনাকে আপনি প্রতিবাদ করিবার মত এমন ওস্তাদ মানুষের মত আর কে আছে! অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মানুষ নিজে সে খবরটি জানে না। তাহার ব্যক্তিত্বের চেতন, অৰ্দ্ধচেতন এবং মগ্নচেতন এই তিন-তলা প্রাসাদ হইতে মহারণ্যের মর্ম্মররোলের মত বিশ্বের আঘাতে কত বোল্‌ই যে কত সুরে ধ্বনিত হইতেছে, অথচ সে বোল্‌কে গণ্ডগোল বলিবার কোন উপায় নাই। তার বাহিরের সকল অসামঞ্জস্য সকল স্বতঃবিরোধ মানুষের অখণ্ড স্বরূপটির মধ্যে সুসঙ্গত এবং মিলিত হইয়া আছে।

মনস্বিতার একটা বড় লক্ষণই এই যে সে স্ববিরোধী কথা বলে অর্থাৎ তাহার বাণী একতারার একটি মাত্র তারের ঘ্যানৃঘ্যানানি নহে। বিশ্বপ্রকৃতির মত তাহার মধ্যে নানা বিরুদ্ধ শক্তি তাহার জীবনকে অবলম্বন করিয়া মিলিবার চেষ্টা করিতেছে। কখনো দেখি তাহার মধ্যে তুষার-মরুর স্থির শীত নিশ্চলতা, কখনো বা প্রবল আগ্নেয় উচ্ছ্বাস এবং শিবজটা হইতে নিঃসৃত গঙ্গার ন্যায় বিগলিত স্রোতের উদ্দাম নৃত্য-সচলতা। একই জায়গায় এই বিপরীতের সম্মিলন। মনস্বী চিত্তের নিশ্চলতার তলের মধ্যে যে একটি প্রচণ্ড গতিতত্ত্ব লুক্কায়িত থাকে, তাহা অল্প লোকেই দেখিতে পায়। তাহার গতিতত্ত্বের মধ্যেও স্থিতির তত্ত্ব বা সৃষ্টির তত্ত্ব অন্তর্নিহিত থাকে। তাহার সৃষ্টি এবং প্রলয় দুই ভিন্ন দেবতার মধ্যে বিভক্ত হইয়া বাস করে না; তাহারি ভিতরের এক দেবতারই লীলারূপে প্রতিভাত হয়।

ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পরের সম্বন্ধকে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধের সঙ্গে বোধ হয় তুলনা করা যাইতে পারে। ব্যক্তি পুরুষ এবং সমাজ প্রকৃতি। সমাজের সঙ্গে যোগে ব্যক্তি আপনাকে আপনি প্রকাশ করে। তাহার স্থির ও গম্ভীর বুদ্ধি সমাজের চঞ্চল জীবনের সঙ্গে মিলিত হইয়া নব নব সৃজনকে সম্ভব করে। কিন্তু আমাদের দেশে এই উপমাটি উল্টাইয়া লইলে তবে ইহাকে সম্যক্ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে ব্যক্তিই প্রকৃতি এবং সমাজ পুরুষ। কারণ সমাজ এখানে শুধু তত্ত্ব মাত্র, সে নড়ে চড়ে না। ব্যক্তি ক্রমাগত নড়িয়া চড়িয়া চঞ্চল হইয়া নানা শক্তির খেলা দেখাইতে থাকে। আমাদের দেশের সমাজ শিবের মত, ব্যক্তির খড়্গহস্তা করালী মূর্ত্তির পায়ের তলায় অসাড়বৎ পড়িয়া থাকে। ব্যক্তি যাহা কিছু অসাধ্য সাধন করে, তাহা তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই চিহ্নমাত্রে বিলুপ্ত হইয়া যায়—তাহার ধারাবাহিকতা থাকে না।

রামেন্দ্রসুন্দর বাবুর নবপ্রকাশিত দুইখানি গ্রন্থে অর্থাৎ "কর্ম্মকথা" এবং "চরিতকথায়" ব্যক্তি ও সমাজের এই বৈপরীত্য এতই স্পষ্ট যে মনে হয় যে একটি গ্রন্থ যেন আর একখানি গ্রন্থের প্রতিবাদ। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। কারণ 'কর্ম্মকথা'য় প্রধানতঃ সমাজতত্ত্বের আলোচনা আছে এবং 'চরিতকথা'য় ব্যক্তিত্বের আলোচনা আছে; একটিতে আছে তত্ত্বের কথা, জীবনের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অল্প—নাই বলিলেই হয়। অন্যটিতে আছে জীবনের কথা, সেখানে বাঁধা তত্ত্বের বাঁধ ক্রমাগতই বিপর্য্যস্ত। 'কর্ম্মকথা'র থিওরিগুলি যদি 'চরিতকথা'য় আলোচিত মানুষগুলির উপরে খাটাইতে হইত, তবে তাহাদের চরিতকথা লিখিবার আবশ্যকতাই থাকিত না। কারণ এই মানুষগুলির বিশেষত্বই এই যে ইহারা 'থিওরির' বাঁধা খাঁচায় বসিয়া খাঁচার বুলি আওড়ায় নাই; ইহারা জীবনের চঞ্চল আবেগে বড় বড় সংশয়-সমুদ্র পাড়ি দিয়া নব নব ভাবাকাশে আনন্দে বিহার করিয়াছে।

পুস্তকখানি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে গোড়ায় একটুখানি দোষের কথা বলিয়া লইব।

এই পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধই কোন-না-কোন স্মৃতিসভায় পঠিত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। সাময়িক কোন সভার অধিবেশনে দীর্ঘ বা বিস্তৃত আলোচনা পীড়াদায়ক হইবার সম্ভাবনা বলিয়া সেখানে সংক্ষেপে কাজ সারিতেই হয়। কিন্তু স্থায়ী সাহিত্যগ্রন্থে সেই সাময়িক প্রয়োজন সাধনের অস্থায়িত্বের ভাব বিদ্যমান থাকা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। আলোচিত গ্রন্থের অনেকগুলি 'চরিতকথা' ঐ নামের যোগ্য হয় নাই। তাহাতে দুএকটি রেখাপাতে সমগ্র চিত্রের আভাস ফুটাইবার চেষ্টা হইয়াছে—চরিত্রের বর্ণবৈচিত্র্য তাহাতে আদৌ ফুটে নাই। রেখাচিত্র অনেক সময় বর্ণচিত্রের অপেক্ষা মনোহর হয়, তাহাতে অধিক শক্তি প্রকাশ পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেরূপ চিত্রাঙ্কণ-শক্তি পৃথিবীতে অতি অল্প লেখকেরই থাকে। যে-সকল চরিত্রের কথা এই গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ চিত্র ধরিতে পারিলে এই গ্রন্থখানি একটি অমূল্য গ্রন্থ হইতে পারিত। ম্যাথু আরনল্ড, জন মর্লি বা ষ্টিভেন্‌সন্ চরিতকথা লিখিয়া পশ্চিম দেশের সাহিত্যকে যেরূপ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, রামেন্দ্র বাবুও সেইরূপ বঙ্গসাহিত্য-সরস্বতীর কণ্ঠে একটি মুক্তাহার পরাইয়া দিতে পারিতেন। 'বিদ্যাসাগর' ও 'বঙ্কিমচন্দ্র' এই দুইটি প্রবন্ধে সেই শক্তির পরিষ্কার নিদর্শন রহিয়াছে।

এইবার গ্রন্থালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক্।

আমি প্রবন্ধারম্ভেই 'কর্ম্মকথা' ও 'চরিতকথা' এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে তুলনা করিয়া বলিয়াছি যে একটির মধ্যে সমাজতত্ত্ব জীবন হইতে অবচ্ছিন্ন হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে এবং অন্যটির মধ্যে জীবন ঐ তত্ত্বকে পদে পদে বিপর্য্যস্ত করিয়া আপনার স্বাধীন স্ফূর্ত্তিরূপ প্রকাশ করিয়াছে। এই দুয়ের মধ্যে যে আত্যন্তিক বিরোধ আছে সে কথাটি লেখকের চেতনার ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছায় নাই। কারণ এই 'চরিতকথা'র মধ্যেই দেখি যে যেখানে চরিতালোচনা হইতেছে,

সেখানে ব্যক্তিত্বের প্রবল স্বাতন্ত্র্যপরায়ণতা, এমনকি কোথাও কোথাও সমাজবিরুদ্ধতা এবং বিদ্রোহ—লেখকের শ্রদ্ধার দীপ্তিতে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্বরূপে প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু যেখানেই মতামতের কথা আসিতেছে, সেখানেই নদীর পাশাপাশি নিশ্চল পাহাড়ের মত জীবনের পাশাপাশি থিওরি তর্জ্জনী তুলিয়া শাসন করিতেছে। প্রথম প্রবন্ধেই ইহার দৃষ্টান্ত আছে। "বিদ্যাসাগর" প্রবন্ধে লেখক লিখিতেছেন :

"বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রূকুটি-ভঙ্গীতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়।"

তাহার পরেই দেশাচার সম্বন্ধে ১৯।২০ পৃষ্ঠায় এক বিস্তৃত আলোচনায় তিনি সমাজ-শরীরের সহিত জীব-শরীরের তুলনা করিয়া বলিতেছেন যে প্রতিকূল শক্তির সহিত আত্মরক্ষার প্রয়াস-ফলে জীবশরীরে যেমন Vestigial Organ অর্থাৎ কতকগুলি অবয়বের চিহ্ন দেখা যায় যাহাদের এক সময়ে হয়ত প্রয়োজন ছিল কিন্তু এখন যাহারা জীবনের প্রতিকূল ও সময় সময় সংহারক—সমাজ-শরীরে দেশাচারগুলাও সেইরূপ। এক সময়ে তাহাদের প্রয়োজন ছিল, এখন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ভিন্ন তাহাদের উচ্ছেদসাধনও সম্ভাবনীয় নহে। অতএব এগুলিকে বিস্ফোটকের মত গণ্য করিয়া যেখানে-সেখানে ছুরি চালাইবার চেষ্টা করা চলে না। অর্থাৎ ইহাদের সঙ্গে আপোষ করিয়া চলাই ভাল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তো প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অপেক্ষায় থাকিয়া দেশের কুপ্রথার সঙ্গে বনিবনাও করেন নাই। মানবসমাজে তো প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই গড়ে না এবং ভাঙ্গে না—এখানে যে অহরহ বিপ্লব হয়। এখানে যে এক একবার সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধূলিসাৎ করিয়া তাহার পর নূতন সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া তোলা হয়। কোন্ অনাগত কালে কবে কোন্ কুপ্রথা আপনি খসিয়া যাইবে সেই অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে মানবসমাজ যে কবে পচিয়া মরিয়া ভূত হইয়া যাইত।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গে রামেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের মাহাত্ম্য এই যে,...তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার আকর্ষণ ও মোহপাশ সবলে ছিন্ন করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া আপন ঘরে ফিরিয়াছিলেন ও মাতৃ-মন্দিরে আনন্দমঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদিগকে তাহার ভিতর আহ্বান করিয়াছিলেন।"

ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক অংশে সকল ধর্ম্মেরই মধ্যে সাম্য আছে, কিন্তু ধর্ম্ম যেখানে লোকস্থিতির সহায় সেখানে দেশভেদে কালভেদে ইতিহাসভেদে ধর্ম্মের নানা রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। "আমাদের শাস্ত্রে.........মানুষের অনুষ্ঠেয় প্রত্যেক কর্ম্ম—দাঁতন-কাঠির ব্যবহার হইতে ঈশ্বরোপাসনা পর্য্যন্ত সমস্তই ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত।" রামেন্দ্র বাবু বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র গীতাশাস্ত্রের ভিতর হইতে এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও লৌকিক বা সামাজিক ধর্ম্ম বা যুগধর্ম্ম—এই দুই ধর্ম্মেরই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পরধর্ম্মের ভয়াবহ অনুকরণ হইতে দেশকে রক্ষা করিলেন।

যুগধর্ম্মের আবশ্যকতাকে অস্বীকার করার কোন প্রয়োজন দেখি না—কিন্তু এখানে এই একটি প্রশ্ন দুর্নিবার রূপে মনে জাগে যে যুগধর্ম্মের সঙ্গে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের কি অঙ্গাঙ্গী যোগ সকল সময় রক্ষিত হয়? "যিনি বিশ্বজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত করুণা-প্রবাহের একমাত্র উৎস, তিনি কি কারণে ও কি উদ্দেশ্যে নিষ্করুণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জীবরক্তে বসুধা সিক্ত দেখিতে বাধ্য হন্?" ইহাই আমাদের প্রশ্ন। যুগধর্ম্মে বসুধাকে জীবরক্তে সিক্ত করিবার প্ররোচনা থাকিতে পারে, কিন্তু সেই প্ররোচনা স্বয়ং বিধাতার প্রেরণা একথা মনে করিলেই ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা একেবারেই নস্যাৎ হইয়া যায়। তাহা হইলে মনুষ্য-সমাজের সকল অসম্পূর্ণতা সকল পাপ ও অন্যায় বিধাতৃবিধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ বা কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে কিন্তু আমার সন্দেহ আছে যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগধর্ম্ম' সংস্থাপনের আদর্শ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের চিরন্তন আদর্শের সঙ্গে অবিরোধী কি না। দেশপ্রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পরানুকরণের ব্যর্থতা হইতে দেশকে রক্ষা করিবার আগ্রহে বঙ্কিম যুগধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ধর্ম্মের নিত্য আদর্শকে তাহা যে কোথাও ক্ষুণ্ণ করে নাই এমন কথা বলিতে পারি না। দেশের দিক্ হইতে ধর্ম্মকে দেখিতে গেলেই 'দাঁতন-কাঠির ব্যবহার' এবং 'ঈশ্বরোপাসনা' যে একই পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে তাহার প্রমাণ এই যে, লেখক নিজেই এই দুইটি কথাকে এক সঙ্গে ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তখন বাহ্য পালনও ধর্ম্ম, জাতি রক্ষাও ধর্ম্ম, মূঢ় সংস্কারের অন্ধানুবর্ত্তিতাও ধর্ম্ম—কারণ ধর্ম্ম তো রিলিজন্ নহে—"মানুষের অনুষ্ঠেয় প্রত্যেক কর্ম্ম" যে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। তখন সমস্তেরই বিশেষ অর্থ বিশেষ তাৎপর্য্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে—ধর্ম্মের নিত্য আদর্শ সাময়িক প্রয়োজনের কারাগারে লোহার শৃঙ্খল পরিয়া তাহার নিত্যতাকে চিরদিনের তরে খোয়াইয়া বসে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর—শ্রীশ্রীনাথ চন্দ প্রণীত। পৃঃ ৪৪৬; মূল্য ১৲ এক টাকা।

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনিই এই গ্রন্থের লেখক। গ্রন্থের প্রথমে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"মহৎ ব্যক্তিদিগেরই আত্মচরিত লিখিত ও সাদরে পঠিত হইয়া থাকে। আমি সে শ্রেণীর লোক নহি। সুতরাং আমার আত্মচরিত লেখার কোনও প্রয়োজন নাই, তবে এ গ্রন্থ কেন লিখিলাম, তাহার কারণ প্রদর্শন করা আবশ্যক।

"ইংরেজ-রাজত্বে ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যে নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। বাক্যে স্বীকার করুন আর না করুন, কার্য্যতঃ ইহার প্রভাব অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই। ফলতঃ বিগত পঞ্চাশৎ বৎসরে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে এ দেশের ধর্ম্ম, সমাজ, পরিবার, শিক্ষা ও চিন্তার রাজ্যে মহা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে; আমরা সেই মাহেন্দ্র ক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রসাদে জীবনে যে অটল আশ্রয় ও পরা শান্তি লাভ করিয়াছি—এই অর্দ্ধশত বৎসর ব্রাহ্মসমাজের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া যে-সকল বিচিত্র ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এই গ্রন্থে তাহারই ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

"পরন্তু মানবজীবনই বিধাতার আশ্চর্য্য লীলাক্ষেত্র। ছোট বড় সকল জীবনের অন্তরালেই এক অদৃশ্য হস্ত নিয়ত কার্য্য করিতেছে। অতীত জীবনের দিকে চাহিয়া দেখি, ইহার ঘাটে ঘাটে ভগবানের অনন্ত লীলা ও অজস্র করুণার জয়স্তম্ভ-সকল দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সেই বিশ্বকর্ম্মা, পথের ধূলিমুষ্টি লইয়া কি বিচিত্র মন্দির নির্ম্মাণ

করিয়াছেন। এই জীবন-সন্ধ্যায় সেই কৃপার লীলা স্মরণ করিলে হৃদয়ে কি গভীর উচ্ছ্বাসই না উত্থিত হয়! সে প্রেমের কাহিনী, সে পরিত্রাণের ইতিহাস বলিতে গেলে আর কথা ফুরায় না! সেই কৃপাতত্ত্ব প্রকাশের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিয়াছি, আত্ম-গৌরব প্রচারের জন্য নহে।

"তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থের মুদ্রণ আরম্ভ হয়; মস্তিষ্কের গুরুতর পীড়াবশতঃ ধীরে ধীরে কার্য্য চলিতেছিল; কিন্তু গত বৎসর একেবারেই বন্ধ ছিল। অতঃপর আর কর্ম্মক্ষম হইবার আশা নাই দেখিয়া রুগ্নদেহে অতি কষ্টে গ্রন্থ শেষ করিতে হইল। শেষভাগে বহু ঘটনা পরিত্যক্ত হইল, যাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিতে হয় তাহা আর লেখা গেল না। ময়মনসিংহ জেলা ব্রাহ্মসমাজের অতি বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র; এই জেলা হইতে ১২ জন ব্রাহ্ম, প্রচারকার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন; তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে দিতে ইচ্ছা ছিল, কেহ কেহ দয়া করিয়া লিখিয়াও দিয়াছিলেন. কিন্তু শরীরের প্রতিকূলতায় সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।"

পূর্ব্ববঙ্গে এবং বিশেষ ভাবে ময়মনসিংহ জেলাতে কি প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল এ গ্রন্থে তাহা নিরপেক্ষ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের সুখের কথা ও দুঃখের কথা; শান্তির কথা ও অশান্তির কথা; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নব বিধানের কথা—এ সমুদয়ই গ্রন্থকার অল্পাধিক পরিমাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা ব্রাহ্ম এবং যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের খোঁজ খবর লইয়া থাকেন—তাঁহারা সকলেই এই গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। যাঁহারা প্রাচীন কালের ঘটনা জানেন তাঁহারাও আগ্রহের সহিত এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন; আর যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানেন না, তাঁহারাও এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রীত হইবেন।

গ্রন্থকার 'কুচবেহার বিবাহ' সংক্রান্ত ঘটনা বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

'কুচবিহার বিবাহের সবিস্তার বিবরণ আমরা লিখিতে চেষ্টা করিব না। অনেক যোগ্য ব্যক্তি এ বিষয়ের আমূল বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে বহু কথাই লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। উভয় পক্ষ পরস্পরকে আক্রমণ ও ভৎর্সনা করিতেও ত্রুটী করেন নাই। আমাদের ভক্তিভাজন উপকারী প্রচারক মহাশয়গণ এবং পরমাত্মীয় বন্ধু ও কুটুম্বগণ অনেকেই অপর পক্ষে রহিলেন, তথাপি আমরা সরল বিবেকবুদ্ধিতে যাহা সত্য ও ন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, যথাসাধ্য শান্তভাবে তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এ বিষয়ে যে আমাদের পক্ষে কার্য্যতঃ কোন ত্রুটী বা অপরাধ হয় নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, কোনরূপ স্বার্থ, বিদ্বেষবুদ্ধি বা দলাদলির ভাবে কখনও পরিচালিত হই নাই। সহজ ধর্ম্মবুদ্ধি ও কর্ত্তব্যজ্ঞানে যাহা উচিত বোধ হইয়াছে, তাহাই করিতে যত্ন করিয়াছি। একজন শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক লিখিয়া রাখিয়াছেন, "কি ছোট কি বড় কি বৃদ্ধ কি যুবক কি বালক সকলের নীতিজ্ঞান সেই সময়ে বিলুপ্ত হইয়াছিল।" আমরা যতদূর জানি, প্রতিবাদকারিগণের অধিকাংশের অবস্থা ওরূপ ছিল না। তাঁহারা অনেকেই প্রাণে গভীর বেদনা লইয়া কেবলই কর্ত্তব্য ও বিবেকের অনুরোধে এই দুঃখজনক কার্য্যে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা হউক সাময়িক উত্তেজনা ও কল্পিত কথা লুপ্ত হইয়া যাইবে, যাহা সত্য, ইতিহাস তাহাই সাদরে বহন করিবে।

'কুচবিহার বিবাহের সূচনা হইতেই এই তিনটী কারণে ব্রাহ্মদের মন উহার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল; (১) পাত্রপাত্রী অপ্রাপ্ত-বয়স্ক সুতরাং ইহা বাল্যবিবাহ দোষে দূষিত; (২) কেশববাবু স্বয়ং যে বিবাহ-আইনের প্রবর্ত্তক, যাহাকে তিনি ঈশ্বরাদেশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, এই বিবাহে সেই আইনের মূলভাব (Principle) নষ্ট হইল, (৩) রাজকুমার এবং রাজপরিবার ব্রাহ্ম নহেন, এরূপ স্থলে ব্রাহ্মসমাজের নেতার কন্যা পরিণীতা হইলে ব্রাহ্মসমাজের অপমান ও আদর্শ খর্ব্ব হইবে। প্রথম সময়ে ঈশ্বরাদেশ সম্বন্ধে কোন কথা উঠে নাই এবং তদ্বিষয়ে কোন বাদ প্রতিবাদও হয় নাই। ৬ই মার্চ্চ বিবাহ হইয়া গেলে মিরার ও ধর্ম্মতত্ত্বে যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহাতেই আমরা ঈশ্বরাদেশের কথা প্রথমে শুনিতে পাই। তখন সকলের চিত্ত এরূপ বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল যে, সে সময়ে আর উক্ত বিষয়ের বিচার চলে না। তবে অনেকে তৎকালে সে সম্বন্ধে নীরব ছিলেন, কেহ কেহ বা এরূপস্থলে ঈশ্বরাদেশ বলা সঙ্গত মনে করেন নাই, কেহ কেহ বা ঈশ্বরাদেশ যে সর্ব্ববাদীসম্মত হয় ও সহজজ্ঞানমূলক নীতির বিরোধী হয় না, এরূপ যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু ফলকথা এই, তখন প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মদিগের মনে আচার্য্যের প্রতি পূর্ব্বশ্রদ্ধা ও বিশ্বাস কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং এরূপস্থলে ঈশ্বরাদেশে এই কার্য্য করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাদের মন আর তুষ্ট হইতে পারে নাই।

'কুচবিহার-বিবাহের পরে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় ৭ই চৈত্রের এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "যদ্যপি এই বিবাহে পৌত্তলিকতার সংস্রব ও বাল্যবিবাহের দোষ ধরিয়াই প্রতিবাদ করা হইয়াছে ও হইতেছে, তথাপি দুঃখের বিষয় এই যে, ঈশ্বরাদেশে আচার্য্য মহাশয় এই কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশিত হওয়াতেও সেই কথার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয় নাই, এই দেখিয়া আমি প্রতিবাদীদের সঙ্গে কিছুমাত্র আন্তরিক সহানুভূতি রাখিতে অক্ষম হইয়াছি।"

'এদিকে কেশবচন্দ্রের একজন প্রধান অনুরাগী প্রচারক গোস্বামী মহাশয়, ১৯শে বৈশাখের এক পত্রে লিখিলেন, "ব্রাহ্মবিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হইলে কেশববাবু ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে উপদেশ দিলেন যে, ইহা কেবল রাজবিধি নহে, ইহা ঈশ্বরের আদেশে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এজন্য ঈশ্বরের বিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু কেশববাবু স্বীয় কন্যার বিবাহে ঈশ্বরের সেই বিধি প্রতিপালন করিতে অসম্মত হইলে চারিদিক হইতে প্রতিবাদ হইল, তিনি প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় প্রচারিত ঈশ্বরের বিধিকে লঙ্ঘন করিলেন।"

'এই উভয় পত্র হইতে এই বিষয়ে উভয় পক্ষের তৎকালীন মনোভাব অনেকটা বুঝা যাইবে। আমরা এ বিষয়ে আর কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে এস্থলে একথা স্পষ্ট উল্লিখিত থাকা আবশ্যক যে "কেশববাবু ঈশ্বরাদেশে এই কার্য্য করিয়াছেন শুনিয়াও যখন প্রতিবাদ তুলিয়া লওয়া হয় নাই, তখন প্রতিবাদকারিগণ ঈশ্বরাদেশে বিশ্বাসী নহেন" এরূপ কথা কখনও বলা যাইতে পারে না। ব্যক্তিবিশেষের কোন এক বিষয়ের প্রত্যাদেশ গ্রহণ বা স্বীকার করিতে না পারিলেই সে ব্যক্তি "ঈশ্বরাদেশের বিরোধী" এরূপ বলা ধর্ম্মানুগত নহে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন বিবেকবুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া সরল হৃদয়ে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাতে আপাততঃ অনৈক্য বা অসম্মিলন হইলেও পরিণামে কল্যাণই হইবে। এই ভাবে জীবনপথে অগ্রসর হইলে শত ভিন্নতা সত্ত্বেও অপ্রেম ও শত্রুভাব জন্মে না। যেখানে মত ও কার্য্যের বৈষম্যে অপ্রেম বা শত্রুতা জন্মিয়াছে, তথায়

ধর্ম্মই রক্ষা পায় নাই; সেরূপ স্থলে "ঈশ্বরাদেশ" লইয়া বিচার কথা বৃথা।'

শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" নামক গ্রন্থে এ বিবাহ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় বলেন—"ঐ গ্রন্থে শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের স্মৃতিলিপি বলিয়া যে অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি অযথা বর্ণনা, অন্যায় দোষারোপ এবং নিরর্থক কটু বাক্য লিখিত হইয়াছে। গিরিশবাবু আমার ভক্তিভাজন ও চির উপকারী শিক্ষক; আমি তাঁহার নিকট নানারূপে ঋণী ও কৃতজ্ঞ; কিন্তু যখন ধর্ম্মরাজ্যের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও সত্যেরই অনুসরণ করিতে হইবে। তজ্জন্যই অতিশয় দুঃখিত অন্তরে তাঁহার কতকগুলি অযথা দোষারোপের খণ্ডনার্থ এই অধ্যায় লিখিতে বাধ্য হইলাম। ঐ-সকল উক্তি যদি সাময়িক উত্তেজনার ফল মাত্র হইত, তবে উপস্থিত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা আবশ্যক হইত না, কিন্তু ঘটনার অনেক পরে একজন প্রবীণ ধর্ম্মপ্রচারক ব্রাহ্মসমাজের আদর্শব্যক্তির জীবনচরিতে উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আর সকলের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র উপাধ্যায় মহাশয় উহার অনুমোদন করিয়াছেন; সুতরাং ভাবী বংশ ঐ-সকল উক্তিতে সহজেই বিশ্বাস করিবেন; অথচ তাহা সত্য হইবে না। এজন্যই আমি এসম্বন্ধে কিছু লিখিয়া রাখা গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করিতেছি।"

স্থানাভাবে লেখকের মন্তব্য উদ্ধৃত করা সম্ভব হইল না। পাঠকগণ এবিষয়ে যদি কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, এই গ্রন্থ পড়িয়াই তাহা জানিয়া লইবেন।

এই অংশ পাঠ করিয়া কেহ কেহ হয়ত বিরক্ত হইবেন, কিন্তু বিরক্ত হইবার কোন কারণ নাই। মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। গ্রন্থকারের সহিত আমরা সকলেই যে একমত হইতে পারিব, ইহা আশা করা যায় না। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় চরিত্রগুণে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন এবং তিনি যেপ্রকার শান্ত ও মিষ্ট ভাবে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাতে লোকের শ্রদ্ধা যে আরও বর্দ্ধিত হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

গ্রন্থখানি মূল্যবান ও উপাদেয় হইয়াছে। সকলেই ইহা পাঠ করিয়া প্রীত হইবেন। আশা করি ব্রাহ্মগণ আদরের সহিত এই পুস্তক পাঠ করিবেন।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

সাহিত্যের প্রকাশ

যে-সকল লেখকের রচনায় যুক্তির শিকলের ঝন্‌ঝনানি অত্যন্ত বেশি শোনা যায়, তাহারা আপনাদের রচিত কারাগারে আপনারাই বন্দী থাকে—সাহিত্যের বড় দরবারে তাহাদের আর ডাক পড়ে না।

সাহিত্যে ভাবের সঙ্গে ভাবুকের কারবার কতকটা শিকারের সঙ্গে শিকারীর সম্বন্ধের মত। শিকারের সন্ধানে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘুরিয়া বেড়ানোতেই শিকারীর আসল মজা, আড়ালে আব্‌ডালে ঝোপেঝাপে শিকারের ছায়াটুকু দেখিতে পাইলেই তাহার আনন্দ। অত্যন্ত জানা এবং অত্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ভাবকে রচনার জালে বাঁধিতে কোন লেখকের মন সরে না। যাহা ক্ষণে ক্ষণে অভাবনীয় রূপে দেখা দেয়, যাহা অন্ধকার রাত্রের বিদ্যুৎচমকের মত কখন্ যে মনের আকাশে ঝলকিয়া উঠিবে তাহা কেহই জানে না, যাহা মনের অস্পষ্ট গোধূলি-আলোকে কুলায়গামী পাখীর মত রহস্য-নীড়ের সন্ধানে পাখা ঝট্‌পট্ করিয়া মরে, সেই-সকল আশ্চর্য্য, রহস্যময়, চঞ্চল ভাবকে কোন মতে বাঁধিতে পারিলে তবেই রচয়িতার আনন্দ হয়। যুক্তি ইহাদিগকে চেনে না, যুক্তির প্রখর আলোককে ইহারা ভয় করে। মনের উপর-তলায় যুক্তি যখন বাড়ীর কর্ত্তার মত সুপ্ত থাকে, তখন নীচের-তলায় এই চঞ্চলের দল খিড়কী দরজা খুলিয়া কে যে কোথায় বাহির হইয়া পড়ে তাহার ঠিকানা থাকে না। যুক্তিকে ঘুম পাড়াইতে না পারিলে ইহাদের স্ফূর্ত্তি হয় না! যুক্তির কাছে যে-সকল ভাব একবার ধরা দিয়াছে, তাহারা শিকল পরিয়াছে, তাহাদের আর নড়িবার জো নাই।

এইজন্য ভাল কবিতা, ভাল রচনা, বা ভাল ছবি পড়া বা দেখা শেষ হইলে, লোকে প্রশ্ন করে—কেমন লাগিল? কোন মানুষ তো একথা জিজ্ঞাসা করে না—কেমন বুঝিলে? কারণ, কবি বা চিত্রকর কবিতায় ও চিত্রে তাহার নিজের 'লাগা'টার কথাই বিশেষ করিয়া বলিয়াছে। কিন্তু কোন্ জিনিস ঠিক কেমনটি লাগে তাহা প্রকাশ করা সকলের চেয়ে দুরূহ। আমাদের মত সাধারণ মানুষেরা দু-কথায় কাজ সারিয়া দেয়—হয় বলে, বেশ লাগিয়াছে, নয় বলে, ভাল লাগে নাই। সেইজন্য কোন বাহিরের সৌন্দর্য্যের বা ঘটনার বা মানুষের বা সুখদুঃখের সমস্ত ছাপটি মনের গোচরে ও অগোচরে, চৈতন্যের উপরের স্তরে ও মগ্নচেতনার নিম্ন স্তরে কেমন করিয়া কতদূর পর্য্যন্ত পড়িয়াছে তাহা খোলসা করিয়া দেখানো যে-সে লোকের দ্বারা সম্ভাবনীয় নহে। এ কাজের জন্য কবির প্রয়োজন হয়, শিল্পীর প্রয়োজন হয়।

বাদ্‌লার দিন। আকাশে ঘননীল মেঘে মেঘে একে-

বারে ছয়লাপ করিয়া দিয়াছে। পৃথিবীর উপরে একটি অপরূপ আলোক পড়িয়াছে। পাখীর দল ত্রস্ত হইয়া কুলায়ের দিকে চলিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে আকাশের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎ তীক্ষ্ণ অসিলতার মত ঝলসিয়া উঠিতেছে। মেঘালোকে ভবতি সুখিনোপ্যন্যথা বৃত্তিচেতঃ। মনকে এই বাদলার ছবি নাড়া দিতেছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু মনের কথা কেমন করিয়া বলা যায়? কত ছেলেবেলার বাদলার দিনের ও রাতের স্মৃতি, কত রাজকন্যার কাহিনী শ্রবণের কল্পনার স্মৃতি, কবে কার সুন্দর মুখের মধ্যে দুটি কালো চোখের চাহনি ভাল লাগিয়াছিল, কার হাসিটি মনের মধ্যে চমক হানিয়াছিল, কার পরিধানের নীলাম্বরী মেঘের দিনে পুলক সঞ্চার করিয়াছিল,—সেই-সমস্ত স্মৃতি মনের কত গোপন স্তরে স্তরে মুদ্রিত হইয়া আছে। বাদলার দিনে সেই-সব স্মৃতি, কল্পনা, বেদনা, আনন্দ যখন বুদ্ধিকে পরাস্ত করিয়া চঞ্চল বালকদলের মত মনের অলিতে গলিতে আড়ালে অন্ধকারে ছুটাছুটি করিতে থাকে, তখন তাহাদের সেই অস্ফুট কলধ্বনির সঙ্গে বাহিরের বর্ষার রোল মিশ্রিত হইয়া যে সঙ্গীত জাগায় ভাষার জালে তাহাকে বাঁধার নামই কাব্য। বাহিরের বর্ষার রূপের সঙ্গে আর সেই অস্ফুট মানসলোকবিহারী ছায়া-রূপীদের মিলন হইলেই যে ছবিটি তৈরি হইয়া উঠে রেখার বন্ধনে ও বর্ণের আলিঙ্গনে তাহাকে বাঁধার নামই চিত্র।

বিশ্বের যে ছাপ মানুষের অন্তরের উপরে পড়ে, মানুষের প্রকৃতিভেদে তাহার বৈচিত্র্য ঘটে। কেউ বা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের বাহিরের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ, কেউ বা তাহার অন্তরের শান্তি ও কল্যাণের দিকে আকৃষ্ট। মনুষ্যসমাজে কেউ বা সমস্তই অন্যায় ও মিথ্যার দ্বারা জীর্ণ দেখিতে পায়, কেউ বা তাহার মধ্যে মহত্ত্ব ও প্রেমের অভিব্যক্তিই প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে বিশ্বের যেমনি রং পড়ুক, সোনার রংই পড়ুক্ বা কালির রংই পড়ুক; যেমনি সুর বাজুক্, সকল সুরের ঐকতান সঙ্গীত বাজুক্ বা বেসুরা বাজুক্—সেই সমস্ত রং ও সুরের সমাবেশে যে অখণ্ড ভাবটি মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহাকে পূরাপূরি প্রকাশ করিতে হইবে। বিশ্বে তুমি ভগবানকেই দেখ আর সয়তানকেই দেখ, ভগবানের ও সয়তানের গোটা মূর্ত্তিটা তোমাকে সাহিত্যে প্রকাশ করিতে হইবে। সাহিত্যের এই কাজ।

সেইজন্য প্রবন্ধারম্ভেই বলিতেছিলাম, যে, সাহিত্যে ভাবকে যুক্তির শিকল পরাইলে ভাবকে মারিয়া ফেলা হয়। তখন এই বিচিত্র মানবপ্রকৃতির দ্বারা প্রতিফলিত বিচিত্র আলোছায়াখচিত ছবি দেখা আর হয় না! কারণ যুক্তির মানদণ্ডে সত্য এবং অসত্য, ভাল এবং মন্দ—গঙ্গাযমুনার মত নির্দ্দিষ্ট রেখায় বিভক্ত। গ্যয়টের সঙ্গে হুইটম্যানের, হুইটম্যানের সঙ্গে এড্গার অ্যালেন-পো'র বৈসাদৃশ্য আছে। বিশ্বের ছাপ ইহাদের সকলের মনে একই রকম পড়ে নাই। গ্যয়টের কাছে বিশ্বের ও মানুষের যে মূর্ত্তিটি ধরা পড়িয়াছে, তাহা নানা বৈচিত্র্যের সুপরিণত সামঞ্জস্যের মূর্ত্তি। হুইটম্যান সেই সামঞ্জস্যকে একেবারে ভাঙিয়াচুরিয়া এক উচ্ছৃঙ্খল অথচ পরমসুন্দর জগতের চেহারা দেখিয়াছে। পো আবার বাস্তবজগতের অন্তরের মধ্যে এক স্বপ্নলোক আবিষ্কার করিয়াছে। এখন ইহারা কে যে "বস্তুতন্ত্র", আর কে যে নয়, তাহা বলা শক্ত। যুক্তির শৃঙ্খল হাতে করিয়া সাহিত্যের ভাবের দরজায় দাঁড়াইলেই এই-সব বাজে প্রশ্নের উদয় হয় এবং নিজের 'থিওরির' আওতার সমস্ত বৈচিত্র্যকে খাপ্ খাওয়াইবার জন্য প্রবল চেষ্টা জাগে। কিন্তু সাহিত্যের বৈচিত্র্য কোন থিওরির মধ্যে ধরা দেয় না। সে সরোবরের জল নহে যে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তাহাকে বেড় দিয়া রাখা যাইবে; সে আকাশের চিরচঞ্চল, চির-পরিবর্ত্তনশীল মেঘ। একই সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের আলো তাহার উপর পড়ে, কিন্তু মেঘের বিচিত্রতা অনুসারে মেঘের প্রতিফলিত রঙের কত বৈচিত্র্য দেখা যায়। সেইরূপ একই বিশ্বের আলো সকল ভাবুক-প্রকৃতির উপর পড়ে, কিন্তু প্রকৃতিভেদে যে বর্ণ-বৈচিত্র্য হয়, তাহাই সাহিত্য। কেহ বা আশার রক্তবর্ণ, কেহ বা নৈরাশ্যের পাংশু ও ধূম্রবর্ণ, কেহ বা আনন্দের গোলাপী বর্ণ, কেহ বা রহস্যগভীরতার সান্দ্রপীত, কেহ বা স্বপ্নের লঘু সোনালী!

যুক্তির ক্ষেত্র যেখানে, যেমন দর্শনে বিজ্ঞানে, সেখানে মানুষের তর্কের অন্ত নাই—পাঁচজন লোক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে পাঁচটি স্বতন্ত্র পথে চলিয়া যায়। কিন্তু সাহিত্যে—যেখানে মানুষের কোন্ জিনিস কেমন লাগিয়াছে, সেই কথাটা পুরাপুরি বলা হইয়াছে, সেখানে একজনের ভাললাগা বা মন্দলাগা অন্যের মনে সহজেই সঞ্চারিত হয়। পক্ষান্তরে, এই ক্ষেত্রে যদি ভাবকে যথাযথভাবে সমস্ত অন্তর হইতে না বাহির করিয়া কিছুমাত্র যুক্তির পোষাক পরাইবার বা একটা মত বা "থিওরি"রূপে দাঁড় করাইবার কোন প্রয়াস থাকে, তাহা হইলেই সাহিত্যে রসভঙ্গ হইয়া যায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলি, ব্রাউনিং তাঁহার শেষ বয়সের প্রায় সকল রচনায় তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতাকে তত্ত্বের মত করিয়া বলিতে গিয়াছেন বলিয়া সেগুলি আর কাব্য হয় নাই, গদ্য হইয়াছে! ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির সহবাস জিনিসটা মানুষের আত্মার পক্ষে ভারি কল্যাণকর—একথা যেখানেই "থিওরি" করিয়া বলিতে গিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার কাব্যের সৌন্দর্য্যহানি ঘটিয়াছে। গণতন্ত্রের দ্বারা সমস্ত মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্রমশঃ অব্যাহত-ভাবে প্রকাশ পাইতেছে,—হুইট্‌ম্যানের এই 'থিওরি' তাঁহার কাব্যের চৌদ্দআনা পরিমাণ অংশকে নষ্ট করিয়াছে। বিশ্বের ছাপ—সৌন্দর্য্যের ছাপ, মহত্ত্বের ছাপ—কবিতার ভাষায় কবির অজ্ঞাতসারে স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে যেখানেই উঠিয়া আসিয়াছে, সেইখানেই হুইটম্যানের কাব্যের মাধুর্য্যরস আস্বাদন করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্যে' ধর্ম্মের যে-সকল কথা আছে তাহা উপনিষদের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং কলা-সৌষ্ঠবমণ্ডিত হইলেও কাব্যহিসাবে নৈবেদ্যের স্থান তাঁহার পরবর্ত্তী অধ্যাত্মকাব্য 'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি'র অনেক নীচে। কারণ 'নৈবেদ্যে' তাঁহার অন্তরতর অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার ছাপ বিশেষ ভাবে পড়ে নাই, রবীন্দ্রনাথ কবিটির বিশেষ রং ধরে নাই।

পাঠক এখানে জিজ্ঞাসা করিবেন—তবে কি উচ্চ-অঙ্গের সাহিত্যে 'আইডিয়া'র কোন জায়গা নাই? অবশ্য আইডিয়া থাকিলেই তাহাকে বুঝিতে হইবে, সুতরাং সেখানে বুদ্ধির প্রয়োজন হইবে। আমি তো গোড়াতেই বলিয়াছি যে অত্যন্ত নির্দ্দিষ্ট, জানা-আইডিয়া, বোঝা-আইডিয়া লইয়া সাহিত্যের কারবার নয়। আইডিয়ার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য সাহিত্যের কোন মাথাব্যথা নাই। কিন্তু যে আইডিয়া একটা নূতন চেতনার মত, যাহা এক মুহূর্ত্তেই সমস্ত মনকে একটা অভাবনীয়তার আনন্দে কম্পিত তরঙ্গিত করিয়া দেয়, যাহার অভাবনীয়তাই যাহাকে ভাবনীয় করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, সেই আইডিয়া লইয়াই সাহিত্যের কারবার।

পাঠক পুনশ্চ বলিবেন, গীতিকাব্য সম্বন্ধে এই মত দিব্য খাটে, কিন্তু বৃহৎ কাব্য বা নাট্য বা উপন্যাসজাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে খাটে না। তুমি কি বলিতে চাও যে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য বা শেক্সপীয়রের হ্যামলেট, বা গ্যয়টের ফাউষ্টের ভিতরকার তত্ত্বটা অভাবনীয় রূপে আসিয়াছিল—তাহার তত্ত্বটাই কি গোড়া হইতেই কবির মনকে অধিকার করিয়া বসে নাই?

কিন্তু এখানেও সৃষ্টির ক্রিয়া সেই একই। শিশির-বিন্দুর সঙ্গে ঝরণার যে প্রভেদ, গীতিকাব্যের সঙ্গে এই বড় কাব্যের সেই প্রভেদ। অনেকখানি অস্পষ্ট বাষ্প জমিয়া শিশির-বিন্দুর আকার গ্রহণ করিয়াছে। এই ছোট কাব্যে বাহির হইতে কবির মনে বিশ্বের যেমন ছাপটি পড়িয়াছে, ঠিক তেমনি ভাবেই ভাষার মধ্য দিয়া তাহাকে প্রকাশ করা হইয়াছে। সে ছাপ একটি মাত্র ভাবের ছাপ। কিন্তু 'ফাউষ্ট' জাতীয় বড়কাব্যে বিচিত্র-ভাবের সমষ্টি ঝরণার জমাট্ রূপ লাভ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে! ঐ-সকল বড় কাব্যে বা নাট্যে তত্ত্বের একটা শুষ্ক ডোর যদি বা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তলায় থাকিয়া থাকে, তবে তাহার জন্যই ঐ-সকল কাব্য সমাদর পায় নাই। বিশ্বের ঘায়ে মনের গোপনে নানা ভাবের নানা রসের নানা অভিজ্ঞতার যে-সকল ফুল ফুটিয়াছে, সেইগুলিকে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে বলিয়াই ঐ-সকল কাব্যের এত আদর।

আমাদের দেশে আমাদের অধিকাংশ লেখকদের

মনের উপর বিশ্বের যে সজীব ছাপ পড়ে, তাহাকে সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে মেলিয়া ধরিতে তাঁহারা পারেন না। আমরা নিজের মনের কথা বলিতে সাহস পাই না। সেই জন্য অন্যের ছাঁদ নকল করিতে যাই, অন্যের ভাষায় কথা কহি, অন্যের চোখে দেখি এবং অন্যের কানে শুনি। অমুক কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এই রকম করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—কিন্তু তাহা দিয়া আমার কি প্রয়োজন? আমি কি দেখিতেছি? আমি যাহা দেখিব নিশ্চয় অন্য কবির দেখার সঙ্গে তাহার পার্থক্য আছে। সুতরাং তাহার প্রকাশের ধরণেরও পার্থক্য হইবেই। অমুকের গল্পের ছাঁদ এই রকম—তাহার গল্পে নায়ক নায়িকার প্রেমের কথার ছড়াছড়ি যায়। প্রেমের ছাপ যদি আমার মনে সত্যই পড়িয়া থাকে, তবে আমি তাহাকে প্রকাশ করিব বইকি। কিন্তু তাহা না পড়িলেও আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে যে রকমের মানুষ যে রকমের জীবন আসিয়া পড়িয়াছে,—তাহাকেই গল্পের সূত্রে ভরিয়া তুলিলে সে মালাও নিতান্ত অগ্রাহ্য হইবে না।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সফলতার মূল্য

"বিনা বেদনায় বিজয় কোথায়?
গৌরবও তার মূল্য বিধ।
যশের মুকুট চাও যদি শিরে
ক্রুশ পোষো বুকে অহর্নিশ।
কুসুমাকীর্ণ সিংহাসনেতে
বসিবারে তুমি যদিবা চাও,
কণ্টক শত চরণে দলিয়া
শোণিতের টীকা আঁকিয়া দাও!"

সফলতা লাভের একমাত্র উপায়, কঠিন পরিশ্রম।

কিন্তু যে পরিশ্রমে মস্তিষ্কের কোনো যোগ নেই তা একেবারেই ব্যর্থ।

মহাপুরুষগণের উক্তি থেকে আমরা তাঁদের সাফল্যের মূল কারণ জানতে পারি। স্যর জোশূয়া রেনল্ডস্‌, ডেভিড উইলকি প্রভৃতি মহাপুরুষগণ, যাঁরা জগতে কীর্ত্তির ছাপ রেখে গেছেন, তাঁদের সকলেরই মন্ত্র ছিল—"কাজ! কাজ! কাজ!"

স্বনামধন্য ভাস্কর মাইকেল এঞ্জেলো একজন অদ্ভুত কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন। নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই যাতে কাজ আরম্ভ করতে পারেন সেই জন্যে তিনি পোশাক পরেই ঘুমোতেন। শয়নকক্ষে এক চাঁই মার্ব্বেল পাথর রেখে দিতেন, রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত হলে উঠে কাজ করবেন এই উদ্দেশ্যে। বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়ালটার স্কটের অসাধারণ পরিশ্রম করবার শক্তি ছিল। ওএভার্লি নভেলগুলি প্রতি বৎসর বারো খানির হিসাবে তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর কর্ম্মজীবনে তিনি গড়ে দুমাস অন্তর এক খানি করে' বই লিখেছিলেন।

প্রকৃতির এক কথা—"হয় কাজ কর, নয় অনাহারে মর।" মানসিক, নৈতিক, শারীরিক সকল প্রকার কাজই করতে হবে, নচেৎ প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে যা-কিছু অব্যবহার্য্য হয়ে পড়ে থাকবে তারই মৃত্যু অনিবার্য্য।

মানুষ গ'ড়ে ওঠে তার চেষ্টার দ্বারা। বিধাতাও তাই চান।

তিনি ইচ্ছা করলে আমাদের মুখের কাছে অন্ন তুলে ধরতে পারতেন। তিনি ইচ্ছা করলে মানুষকে যুগ যুগ ধরে' বাইবেলে বর্ণিত সকল ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের আধার সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ঈডেন উদ্যানে রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি যখন মানুষ সৃষ্টি করলেন তখন কেবল মাত্র তার পেটের ও দেহের ক্ষুধা নিবৃত্তি করার চেয়েও উচ্চতর ও মহত্তর এক মৎলব তাঁর মনে মনে ছিল। মানুষের মধ্যে যে দেবত্বটি আছে সেইটিকেই জাগিয়ে তোলা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ঈডেন উদ্যানের প্রাচুর্য্যের মধ্যে সে দেবত্ব কোনো দিন জাগতে পারত না। যে অভিসম্পাতের ফলে সেই নন্দন-কানন থেকে মানুষ বিতাড়িত হয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অন্নসংস্থান করতে বাধ্য হয়েচে, তা যে বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ একথা আমরা কেন ভুলে যাই? সে অভিসম্পাতের ফলেই না বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে যায় নি! আমাদের চরম সুখ ও পরম মঙ্গল তিনি যে বড় আয়াসের দুর্ভেদ্য আবরণে ঘিরে রেখেচেন তার একটা অর্থ আছেই আছে।

কোনো ন্যায় কাজেই অসম্মান নেই। অন্যায় কাজ ব্যতীত কোনো কাজই হেয় নয়। আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধের সময় একদা কয়েকজন মার্কিন সৈনিক একখানি প্রকাণ্ড কাষ্ঠখণ্ড তোলবার চেষ্টা করছিল। সেটি অত্যন্ত ভারি, তাই তারা অনেক চেষ্টাতেও সেটিকে নড়াতে পারছিল না। নিকটে এক কর্পোরাল দাঁড়িয়ে তাদের উৎসাহবর্দ্ধনের জন্যে মধ্যে মধ্যে চীৎকার করছিলেন। এমন সময় জনৈক উচ্চ কর্ম্মচারী অশ্বারোহণে এসে উপস্থিত হলেন। অশ্ব থেকে অবতরণ করে' তিনি সৈনিকদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে কাঠ তুলে ফেল্লেন। তারপর তিনি সেই কর্পোরালকে জিজ্ঞাসা করলেন— তুমি ওদের সাহায্য করনি কেন? কর্পোরাল তো প্রশ্ন শুনে অবাক। সে বল্লে, আমি কর্পোরাল, আমি সামান্য সৈনিকের সঙ্গে একত্রে খাটবো? উচ্চ কর্ম্মচারী বল্লেন —অ! ঠিক বলেচ তুমি! তুমি কর্পোরাল, তুমি কেমন করে' সাধারণ সৈনিকের কাজ করবে! আমার কিন্তু কাজ কর্‌তে লজ্জা নেই। আমার নাম জর্জ্জ ওয়াশিংটন!

রোমানেরা যখন কর্ম্ম করতে কুণ্ঠিত হয় নি তখনি তারা উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করেছিল; কিন্তু একদিন প্রভূত ধন ও ক্রীতদাসের অধিকারী হয়ে তারা যখন কর্ম্মকে ঘৃণা করতে শিখ্‌ল তখনই আলস্য ও পাপ অচিরে সেই বিলাসী ধনোন্মত্ত জাতিকে দুর্গতির পঙ্কে নিমগ্ন করে' দিয়েছিল। রোমের যখন পতন হ'ল তখন যীশুখৃষ্ট তাঁর মহৎ জীবনের দ্বারা পরিশ্রমকে সম্মানের মহোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে' দিলেন। তিনি একথা বল্লেন না —আলস্যপরায়ণ সুখান্বেষী বিলাসীর দল তোমরা আমার কাছে এস," তিনি বলেছিলেন—"হে পরিশ্রমী শ্রান্ত মানব! এস, তুমি আমার কাছে এস।"

প্রকৃতি অন্বেষণ করে মনুষ্যত্ব, অর্থ বা যশ নয়। একজন মানুষের-মত-মানুষের জন্যে সে কত মূল্যই না দ্যায়! তার আগমনের প্রতীক্ষায়, জগতে বাস করা তার পক্ষে সম্ভব করে' তোলবার জন্যে সে যুগযুগান্ত ধরে' আয়োজন করেচে। বিশ্বজগৎ সে মানুষের হাতে তুলে দিয়েচে। তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির একটি আদর্শ গড়ে' তোলবার জন্যে সে কত না উপায় অবলম্বন করেচে! সেই জন্যেই সে মানুষকে নিজের খাদ্য নিজে আহরণ করতে বাধ্য করেচে। সেই জন্যেই সে মানুষকে কখনো ভুলতে দ্যায় না যে, কোনো-কিছু পাবার জন্যে সংগ্রামই তাকে উন্নত করে' তোলে—তাকে সার্থকতার পথে অগ্রসর করে' দ্যায়। অনেক সাধনা অনেক কষ্টের পর যেই একটি কাজ সমাধা হয় অমনি মানুষের মোহ কেটে যায়, প্রকৃতি আর একটি পুরস্কার মোহন সাজে সাজিয়ে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে, আমরাও লুব্ধ শিশুর ন্যায় সেটি পাবার আশায় পুনর্ব্বার সংগ্রামে মেতে উঠি। এইরূপে নব নব সংগ্রামের মধ্যে আমাদের কর্ম্মশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে; আমরা সহিষ্ণুতা, সংযম, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা শিক্ষা করি।

কর্ম্মই মানুষের প্রধান শিক্ষক, এবং কর্ম্মের পাঠশালাই জগতের শ্রেষ্ঠ পাঠশালা।

কিন্তু অন্ধের ন্যায় পরিশ্রম করায় কোনো লাভ নেই। পরিশ্রমের সঙ্গে মস্তিষ্কপরিচালনার বিচ্ছেদ ঘটলে সে পরিশ্রম কোনো কাজেরই হয় না।

কর্ম্মকার পাঁচ টাকার লৌহ থেকে ঘোড়ার নাল নির্ম্মাণ করে' দশ টাকা উপার্জ্জন করে। আবার সেই লৌহ থেকেই ছুরি নির্ম্মাণ করে' একজন দুইশত টাকা উপায় করে। এবং আর একজন সেই লৌহে ঘড়ির স্প্রীং নির্ম্মাণ করে' দুই লক্ষ টাকার অধিকারী হয়।

আমরা যে শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করি সেগুলি সম্বন্ধেও সেই এক কথাই খাটে। তা দিয়ে আমাদের কিছু-একটা করতেই হবে। কেহবা তার স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, প্রয়োজনীয় পদার্থ গড়ে। কারণ সে পরিশ্রমের সঙ্গে মস্তিষ্কপরিচালনা করেচে। অপর এক জন তুল্য শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে' বিনা উদ্দেশ্যে বিনা চিন্তায় খেটে খেটে কেবল ব্যর্থতার স্তূপ রচনা করে।

আমাদের জগৎ "হতে পার্ত্তাম"এর দলে পরিপূর্ণ। তারা কিছু একটা হতে পারত বা করতে পারত যদি না কতকগুলি প্রতিবন্ধক ঘটত। তারা সকলেই সফলতা চায় কিন্তু সস্তায় চায়—সফলতার পূর্ণ মূল্য দিতে কেহই প্রস্তুত নয়। তারা যুদ্ধ করতে অসম্মত অথচ জয়ের

আশা রাখে। তারা অন্বেষণ করে কোমল মসৃণ ভূমি, যার ওপর দিয়ে অতি সহজে অনায়াসে চলা যায়—কোথাও লেশমাত্র সংঘর্ষ হয় না। তারা ভুলে যায় যে সংঘর্ষই স্ফূর্তির প্রাণ।

যে যত মহৎ ফলের প্রয়াসী তাকে তত কঠিন পরিশ্রম করতে হবে। সফলতার উচ্চ শীর্ষে যে আরোহণ করতে চায় তাকে তার মূল্য নিজেই দিতে হবে। তার বংশগৌরব যতই থাকুক বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোম্পানির কাগজের তাড়া যতই বড় হোক তা দিয়ে সফলতা কেনা যাবে না। তাকে নিজের সামর্থ্যে মানুষ হতে হবে—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

সফলতা লাভে কেবল ইচ্ছুক হলেই চলবে না। যে-সফলতা ইচ্ছা করলেই মেলে তার মূল্য কতটুকু? মূল্য দিলে অবশ্য যা ইচ্ছা কর তাই পাবে। কিন্তু তুমি কি পরিমাণ সফলতা চাও? মূল্য কি দিবে? তোমার সহের সীমা কোথায়? কতদিন অপেক্ষা করবে?

তুমি বলচ তুমি শিক্ষালাভের জন্যে উদগ্রীব। তুমি কি থার্লো উইডের মত ইক্ষুক্ষেত্রে প্রজ্বালিত শুষ্ক পত্রের আলোকে পড়তে পারবে? তাঁর মত কি তুমি একখানি বই আনবার জন্যে নগ্নপদে কার্পেট-ছেঁড়া জড়িয়ে ক্রোশ-খানেক পথ বরফের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে পারবে? দারুণ দারিদ্র্যে নিপীড়িত হয়ে, খাদ্যাভাবে জরজর অবস্থায়, দেহের ওপর রজ্জুর তাগা বেঁধে ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্তি করেও লেখাপড়া চালাবার শক্তি আছে ত? জন স্কটের মত ভোর চারটায় উঠে রাত দশ এগারটা পর্য্যন্ত জেগে থাকবার জন্যে মাথায় ভিজে তোয়ালে জড়িয়ে পাঠাভ্যাস করতে পারবে? অথবা বিদ্যাসাগরের মত পাছে নিদ্রা আসে সেই ভয়ে চোখে সরিষার তৈল ঢেলে লেখাপড়া করবে? বিদ্যা কি তোমার এত প্রিয় যে যে-পুস্তক ক্রয় করবার সামর্থ্য নেই, সেখানি পাবার জন্যে অ্যাব্রাহাম লিংকলনের মত পদব্রজে বিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করতে পার? জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত নয়—সে পথে ফুলের পাপড়ি ছড়ানো নেই। প্রকৃত পথটি কণ্টকাকীর্ণ, তার ওপর দিয়ে চলতে গেলে প্রতি পদে দেহ ক্ষতবিক্ষত হবে—ব্যর্থতার ভারে নিত্য নিয়ত হৃদয় অবসন্ন হয়ে পড়বে।

বাগ্মী হয়ে কি লোকের মনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চাও? ডেমস্থেনিসের মত সাগরতীরে গিয়ে মাসের পর মাস কি তুমি গলা সাধা অভ্যাস করতে পারবে? একটি বিশেষ অঙ্গসঞ্চালনের মুদ্রাদোষ সারাবার জন্যে তাঁর মত তুমিও কি বিলম্বিত তীক্ষ্ণধার তরবারির মুখের তলে নগ্নস্কন্ধে আবৃত্তি অভ্যাস করবে? যখন তোমার প্রত্যেক কথার পর বিদ্রূপহাস্যে চতুর্দ্দিক মুখরিত হয়ে উঠবে তখন ডিস্‌রেলির সঙ্গে পার্লামেণ্ট মহাসভায় দাঁড়াবার শক্তি তোমার আছে কি? তাঁর মত তুমিও কি সকল অপমান সহ্য করে' জগতের সুধীগণের প্রশংসা লাভ করা পর্য্যন্ত অবিচলিত চিত্তে সাধনা করতে পারবে?

শিল্পী হবার ইচ্ছা হয়? অন্তর তোমার যে সৌন্দর্য্যে নিষিক্ত তাকে পাষাণের মধ্য হতে বা পটের ওপর ফুটিয়ে তুলতে চাও? দেওয়াল-চিত্রকরদের কাজ বা কথা হতে কিছু শিক্ষা পাবার জন্যে মাইকেল এঞ্জেলোর মত মাথায় করে' উঁচু মই বেয়ে চুনসুরকি যোগান দিতে পারবে?

সাহিত্য-সাধনায় যশস্বী হবে? বহু দিনের শ্রম ও বহু চিন্তার পর যে রচনা প্রসব হয়েছে সেটি যখন অমনোনীত হয়ে ফেরত আসবে তখন ভগ্নমনোরথ হবে না ত? অখ্যাত জীবন যাপন করে' অজানিতভাবে মরতে পারবে কি? সেক্সপীয়রের মত নাটক রচনা করেও খ্যাতি লাভের জন্যে দু শ বৎসর অপেক্ষা করতে পারবে? অন্ধ কবি মিল্টনের ন্যায় বহু পরিশ্রমের পর "Paradise Lost" মনে মনে রচনা করে' এবং সেটি অপরকে দিয়ে লিখিয়ে মাত্র দুই শত পঁচিশ টাকায় তা বিক্রয় করতে পার? সে পুস্তকখানি পাঠ করে' লণ্ডনের জনৈক বিদ্বান সমালোচক লিখেছিলেন—মানুষের পতন সম্বন্ধে অন্ধ ইস্কুলের শিক্ষক একটি একঘেয়ে কবিতা রচনা করেছে; কবিতার দৈর্ঘ্য যদি গুণ বলে' বিবেচিত হয় তবে তাহাই উহার এক মাত্র গুণ—অন্য গুণ নেই। অহরহ কারাদ্বারের ঘড়ঘড়ানি শুনে কারাকূপের মধ্যে দীর্ঘ রাত্রি যাপন করে'

"Pilgrims Progress"এর ন্যায় অমর পুস্তকেরও রচয়িতা হবার বা তিলকের ন্যায় সাহিত্যসাধনা করবার উৎসাহ তোমার থাকে কি? ডীকুইন্সের অতুলনীয় অলৌকিক-দর্শন ও বিশ্লেষণ লেখবার জন্যে তিনি যে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন তুমি তা করতে প্রস্তুত আছ কি?

য়রিপাইডিসের মত তুমি কি পাঁচ দিনে তিন লাইন রচনা করে' সন্তুষ্ট হতে পার? আইজাক নিউটন একটি জটিল গণনায় বহু বৎসর অতিবাহিত করার পর একদিন তাঁর কুকুর কাগজপত্রগুলি নষ্ট করে' দিল। তিনি নিরুৎসাহ হন নি, পুনরায় গোড়া থেকে গণনা আরম্ভ করলেন। তেমন জেদ তোমার আছে কি? কার্লাইল তাঁর "ফরাসীবিদ্রোহের" পাণ্ডুলিপি এক বন্ধুকে দেখতে দিয়েছিলেন। বন্ধুর ভৃত্য অসাবধানতাবশত সেখানি আগুন ধরাতে ব্যবহার করে' ধ্বংস করে' ফেললে। কার্লাইল অবিচলিত চিত্তে পুনরায় সেই ইতিহাসখানি রচনা করলেন! এমন অদম্য উৎসাহ তোমার আছে? ফ্রাঙ্কলিনের ন্যায় তুমি কি ফিলাডেল্‌ফিয়ার পথে পথে ঠেলাগাড়িতে জিনিস যোগান দিয়ে বেড়াতে পার?

উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের দ্বারা তোমার জাতির মুখ উজ্জ্বল করতে চাও? সর্ব্বস্ব যখন খোয়া গেছে, পত্নী পর্য্যন্ত যখন বিমুখ হয়েছেন, তখন প্যালিসির মত গৃহের বেড়া, ঘরের মেঝের তক্তা চেয়ার টেবিল আলমারি প্রভৃতি অগ্নিতে সমর্পণ করে' এনামেল প্রস্তুত করবার মনের বল ও অটল প্রতিজ্ঞা তোমার আছে কি?

প্রকৃতি সমাজসৃষ্ট উচ্চ নীচ শ্রেণী মেনে চলে না। রাজপ্রাসাদে মূর্খের জন্ম হতে পারে—জগতের ত্রাণকর্ত্তা আস্তাবলে জন্মগ্রহণ করতে পারেন! শতছিন্ন-মলিনবসন-পরিহিত ঐ যে পুরুষ ও রমণীর দল স্যাঁৎসেঁতে জীর্ণ কারখানাঘরে দিনের পর দিন দারুণ পরিশ্রম করচে ওরাই যথার্থ মহৎ। আর প্রাসাদে সাটিন ও রেশমে অঙ্গ মুড়ে যারা আলস্যে দিন কাটায় তারাই নিকৃষ্টশ্রেণীর জীব; তাদেরই অসাধুতা ও শঠতায় দরিদ্রের দল জীবনসংগ্রামে পরাস্ত হয়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করচে।

সফলতা যে লাভ ক'রতে চায় তাকে মূল্য দিতেই হবে। ফাঁকি চলবে না। যে কাজ তার অস্থিমজ্জাগত বলে' বোধ হবে তাঁর মধ্যে তার সমস্ত মনপ্রাণ ডুবিয়ে দিতে হবে। যে অটল প্রতিজ্ঞা পরাজয় জানে না, ক্ষুধা বা বিদ্রূপকে ভ্রূক্ষেপ করে না, সকল কষ্ট বিপদ ও অভাবকে তুচ্ছ করে, সেই প্রতিজ্ঞা তাকে করতে হবে। জগতকে যারা বিশৃঙ্খলা ও মূঢ়তার অন্ধকার থেকে উচ্চতম সভ্যতার আলোকে উন্নীত করেচে তারা সুবেশ-পরিহিত সৌভাগ্যবান ছিল না, পিতৃপিতামহের অর্জ্জিত অর্থে পুষ্ট কর্ম্মকুণ্ঠ অলস ছিল না; তারা দুঃখদারিদ্র্য অভাবের মধ্যে বর্দ্ধিত, জীর্ণ পরিচ্ছদ পরতে অভ্যস্ত; ন্যায়পথে থেকে দারিদ্র্য ভোগ করতে অকুণ্ঠিতচিত্ত। তারা নিজেদের অন্নসংস্থান নিজেরাই করেছিল।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঢ়ের সৈয়দ বংশ

বাঢ়ের সৈয়দবংশের গৌরব ও সৌষ্ঠব বহুকাল অবধি অন্তর্হিত হইয়াছে। এই বংশের নামও সাধারণ্যে অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এক সময়ে বাঢ়ের সৈয়দ-বংশীয়দের নাম প্রবাদবাক্যের ন্যায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উচ্চারিত হইত। গুণমুগ্ধ জনসাধারণ তাঁহাদের রণকুশলতা, সাহসিকতা এবং কর্ম্মপটুতা উপমাস্বরূপ ব্যবহার করিত। যুদ্ধাভিযানকালে তাঁহারা অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলের সৈনাপত্য গ্রহণ করিতেন। আকবর এবং তদীয় উত্তরাধিকারীগণ সৈয়দবংশীয়দের অতুল প্রতিপত্তি ও প্রভাব পরিজ্ঞাত ছিলেন, তজ্জন্য দুরূহ কার্য্য উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। মোগলশক্তির অধঃপতনকালে বাঢ়ের সৈয়দবংশীয়দের করধৃত সূত্রের পরিচালনে কত সম্রাটের উত্থান এবং পতন হইয়াছে।

সৈয়দগণ আপনাদিগকে ভারতবর্ষের অধিবাসীরূপে বিবেচনা করিতেন এবং ভারতীয় মুসলমান সমাজের সুখদুঃখের সহিত আপনাদের সুখদুঃখ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

হালাগু কর্ত্তৃক বোগদাদ নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে আবুল ফরাহ নামক একজন প্রখ্যাতনামা সৈয়দ দ্বাদশপুত্র

সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহারা স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করেন এবং তদানীন্তন সম্রাট বলবনের প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া বিশিষ্ট পদ প্রাপ্ত হন। তদবধি তাঁহারা ভারতবর্ষে সাতিশয় প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন এবং বংশবৃদ্ধি হওয়াতে নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। ইঁহাদের এক শাখা বিহারের অন্তর্গত বাঢ়নামক স্থানে আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

বাঢ়ের সৈয়দবংশীয়দের মধ্যে যিনি মোগল পাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া মোগল সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করেন তাঁহার নাম সৈয়দ মাহমুদ। সৈয়দ মাহমুদের মোগল সৈন্যে প্রবেশের বিষয় মোগল-ইতিহাসবেত্তা মাত্রেই উল্লেখযোগ্য ঘটনারূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনা পাঠ করিয়া অনুমিত হয় যে, তৎকালে সৈয়দ মাহমুদ দেশমধ্যে শক্তিশালী পুরুষ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। মোগল সৈন্যে প্রবেশের পূর্ব্বে তিনি সেকন্দরশূরের সেনাপতি ছিলেন; শূরবংশের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তোন্মুখ দেখিয়া তিনি উদীয়মান আকবর শাহের পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি বৈরামখাঁর সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

সৈয়দ মাহমুদ দিল্লীর অদূরে জায়গীর প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তা রূঢ়প্রকৃতির পরিচায়ক ছিল। কিন্তু তিনি সদাশয়তা এবং সাহসিকতার জন্য খ্যাত ছিলেন। মোগল দরবারে তাঁহার বীরত্ব প্রশংসিত হইত; আমীর ওমরাহগণ তাঁহার সালঙ্কার বাক্যালাপ এবং অকপট সরল ব্যবহারে আমোদ অনুভব করিতেন। তিনি পাদশাহের সাতিশয় প্রিয় ছিলেন। একবার মাহমুদ যুদ্ধজয় অন্তে দরবারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যুদ্ধের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং তৎপ্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ "আমি" শব্দের প্রয়োগ করেন। ইহাতে একজন আমীর বিরক্ত হইয়া বলেন "পাদশাহের সৌভাগ্যের (ইকবল-ই-পাদশাহী) বলেই আপনি রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মাহমুদ "ইকবল" একব্যক্তির নাম ধরিয়া লইয়া উত্তর করেন, আপনি কি জন্য মিথ্যা কথা বলিতেছেন? ইকবল-ই-পাদশাহী কখনও আমার সঙ্গে গমন করেন নাই; আমি রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম, আর আমার ভ্রাতৃগণ উপস্থিত ছিল; আমরাই তরবারি দ্বারা শত্রুপক্ষের রক্ত মোক্ষণ করিয়াছিলাম। এই উত্তরে পাদশাহ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার বীরত্বের প্রশংসাবাদ করিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন। মোসলমান ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, একবার একজন ঈর্ষ্যাকুল আমীর মাহমুদকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কতপুরুষ অবধি সৈয়দ হইয়াছেন? এই কুটিল প্রশ্নে মাহমুদ উত্তেজিত হইয়া সম্মুখবর্ত্তী অগ্নিকুণ্ডে পদ অর্পণ করিয়া বলেন, যদি আমি প্রকৃতই সৈয়দবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিতে অসমর্থ হইবে। তিনি একঘণ্টাকাল অগ্নিকুণ্ডমধ্যে দণ্ডায়মান ছিলেন, তারপর দর্শকদের অনুরোধে সেস্থান পরিত্যাগ করেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহার পদস্থিত পাদুকা সামান্য পরিমাণেও দগ্ধ হয় নাই।

সৈয়দ মাহমুদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ আহাম্মদও আকবর শাহের একজন মনসবদার ছিলেন। আকবর শাহের সেনাপতির তালিকায় তাঁহার দুইজন পুত্রের নামও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আকবর শাহের সময় হইতে বাঢ়ের বহুসংখ্যক সৈয়দ মোগলদরবারে কার্য্য করিয়াছেন। আলম নামক একজন সৈয়দ শাহসুজার সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সুদূর আরাকানে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। একজন পাদশাহ এই-সকল রাজকর্ম্মচারী সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, "তাঁহারা সৈয়দবংশোদ্ভব, তাঁহাদের অতুল শৌর্য্য ও বীর্য্য ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।" সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ এবং সৈয়দ হোসেনআলী খাঁ ভ্রাতৃযুগলের সময়ই বাঢ়ের সৈয়দবংশের গৌরবরবির মধ্যাহ্নকাল-স্বরূপ ছিল। কিন্তু তাঁহাদের কৃতকার্য্যেই সৈয়দবংশের প্রভাব প্রতিষ্ঠা সমস্তই অন্তর্হিত হয়। তাঁহারা উৎকট স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে পাঁচজন মোগলবংশধরকে রাজসিংহাসনে উত্তোলন করেন, দুইজন মোগলবংশধরকে সিংহাসনচ্যুত, এবং হত্যা করেন, পাঁচজন মোগলবংশধরকে অন্ধ এবং কারারুদ্ধ

করেন। অবশেষে পাদশাহ মোহম্মদশাহ তাঁহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিতে সমর্থ হয়েন এবং তৎসঙ্গে বাঢ়ের সৈয়দবংশের প্রভাব প্রতিপত্তি চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইয়া যায়। সৈয়দ ভ্রাতৃগণের বিবরণ আদ্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক এবং শিক্ষাপ্রদ। আমরা সে বিবরণ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলাম।

সম্রাট আওরঙ্গজেব স্বীয় পৌত্র (দ্বিতীয় পুত্রের পুত্র) আজিমওসসানকে বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যার সুবাদার এবং মুর্শিদকুলিখাঁকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। অল্পদিন মধ্যেই আজিমওস্‌সানের সঙ্গে মুর্শিদকুলিখাঁর মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। পাদশাহ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আজিমওস্‌সানকে দোষী ঠিক করেন। আওরঙ্গজেব মুর্শিদকুলিখাঁর কার্য্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গলা এবং উড়িষ্যার সহকারী সুবাদারের পদে নিযুক্ত করেন; আজিমওস্‌সান বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া পাটনা নগরে অবস্থিতি করিতে আদিষ্ট হন। ইহার কতিপয় বৎসর পরে পাদশাহ আজিমওস্‌সানকে আপন সকাশে আহ্বান করেন। তদনুসারে তিনি স্বীয় পুত্র ফরকশিয়রকে প্রতিনিধিরূপে রাখিয়া পাটনা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ইহার অত্যল্পকালের মধ্যেই পাদশাহ আওরঙ্গজেব পরলোকগত হন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বাহাদুরশাহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিনাশসাধন করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এই যুদ্ধকালে আজিমওস্‌সান পিতার প্রধান সহায় ছিলেন। তজ্জন্য তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আজিমওস্‌সানকে এলাহাবাদ, বিহার এবং বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া পুরস্কৃত করেন। কিন্তু পিতৃ-অভিলাষানুসারে তিনি রাজদরবারেই অবস্থিতি করিতে থাকেন। আজিমওস্‌সান বঙ্গ ও উড়িষ্যায় মুর্শিদকুলিখাঁকে, বিহারে হোসেনআলী খাঁকে এবং এলাহাবাদে আবদুল্লা খাঁকে নায়েবতি প্রদান করেন।

আবদুল্লা খাঁ এবং হোসেনআলী খাঁ সহোদর ভ্রাতা এবং বাঢ়ের সৈয়দবংশসম্ভূত ছিলেন। প্রাগুক্ত প্রদেশত্রয়ের উক্তরূপ বন্দোবস্ত হইলে রাজকুমার ফরকশিয়র পাটনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মুর্শিদাবাদে গমন করিয়া মুর্শিদকুলিখাঁর সহিত সম্প্রীতিসহকারে বাস করিতে থাকেন। রাজকুমার পিতার প্রতিনিধিরূপে পরিচিত ছিলেন।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে বাহাদুরশাহ পরলোকগত হয়েন এবং তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র জাহান্দর শাহ কনিষ্ঠভ্রাতা আজিমওস্‌সানকে হত্যা করিয়া রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সংবাদ মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলে রাজকুমার ফরকশিয়র প্রবলপ্রতাপান্বিত মুর্শিদকুলিখাঁর সাহায্যে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে সংকল্পারূঢ় হন। কিন্তু মুর্শিদকুলিখাঁ তাদৃশ সাহায্য করিতে অসম্মত হইলে তিনি অনন্যোপায় হইয়া বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিহার অভিমুখে যাত্রা করেন।

ফরকশিয়র পাটনায় উপস্থিত হইয়া নগরের বহির্ভাগে শিবির সংস্থাপন করিলেন এবং পিতার অনুগৃহীত পাটনার নায়েব হোসেনআলী খাঁকে সাদরে স্বীয় শিবিরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে তিনি ফরকশিয়রের শিবিরে উপনীত হইলেন। ফরকশিয়র স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তারপর আপন সম্মুখে আসন পরিগ্রহ করিতে বলিলেন।

অতঃপর ফরকশিয়র তাঁহার সঙ্গে বিনয়নম্র বচনে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে তিনি কাতরকণ্ঠে হোসেনআলী খাঁর সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু হোসেনআলী খাঁ সুপ্রতিষ্ঠিত জাহান্দর শাহের বিরুদ্ধে আপন পূর্ব্ব-প্রভুপুত্রের পক্ষাবলম্বন করিতে অসম্মত হইলেন। এই সময় পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ অনুসারে ফরকশিয়রের শিশুকন্যা পর্দ্দার অন্তরাল হইতে হোসেনআলী খাঁর সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন এবং বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আপনি পিতাকে রক্ষা না করিলে জাহান্দরশাহ তাঁহাকে হত্যা অথবা চিরজীবনের জন্য কারারুদ্ধ করিবেন। আপনি আমার পিতামহের নিকট কতদূর ঋণী, তাহা একবার স্মরণ করিয়া পিতার জীবন রক্ষা করুন। আপনি সৈয়দবংশোদ্ভব, আপনার আদিপুরুষ মহম্মদের এই আদেশ যে "উপকার বিস্মৃত হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য।" তাহার বাক্য শেষ হইলে ফরকশিয়রের মাতা সেখানে উপস্থিত হইয়া হোসেন কুলি-

খাঁকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। * পর্দ্দার অন্তরালস্থিতা রাজাঙ্গনাদের বিলাপধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। হোসেনকুলিখাঁ তাদৃশ দৃশ্যে অভিভূত হইয়া ফরকশিয়রের পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অতঃপর তিনি ফরকশিয়রকে সম্রাটরূপে অঙ্গীকার করিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন এবং সমস্ত অবস্থা ভ্রাতা আবদুল্লা খাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন। আবদুল্লা ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া ফরকশিয়রের সঙ্গে যোগদান করিতে স্বীকার করিলেন।

ভ্রাতৃযুগলের অশ্রান্ত সাধনায় অচিরকালমধ্যে বিপুল বাহিনী সংগৃহীত হইল। এলাহাবাদের পার্শ্বদেশে রাজসৈন্যের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সৈয়দদ্বয়ের যুদ্ধকৌশলে বিজয়লক্ষ্মী জাহান্দর শাহকে পরিত্যাগ করিলেন; তিনি ভয়ব্যাকুলচিত্তে স্বীয় প্রিয়তমা উপপত্নী লালকুয়রকে সঙ্গে লইয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্র হইতে গোপনে প্রস্থান করিলেন এবং শ্মশ্রুমুণ্ডন করিয়া ছদ্মবেশে দিল্লীতে উপনীত হইলেন।

রণক্ষেত্রে বিজয়শ্রী লাভ করিয়া ফরকশিয়র রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন। সৈয়দগণের পরামর্শে ফরকশিয়রের আদেশে জাহান্দরশাহ, প্রধান মন্ত্রী জুলফিকর খাঁ এবং তদীয় বৃদ্ধপিতা নৃশংসভাবে নিহত এবং রাজকুমার আজিজউদ্দিন আলীতাবর এবং হুমায়ুন নষ্টদৃষ্টি ও কারারুদ্ধ হইলেন। নৃশংস ঘাতকগণ জাহান্দরশাহের মুণ্ডপাত করিবার পূর্ব্বে রাজাদেশে তাহার চক্ষুদ্বয় তুলিয়া লইয়াছিল।

ফরকশিয়র রাজপদে আসীন হইয়া হোসেনআলী খাঁকে প্রধান সেনাপতির পদে এবং আবদুল্লাখাঁকে প্রধান উজীরের পদে নিযুক্ত করিয়া পুরস্কৃত করিলেন, সৈয়দযুগল তাঁহার রাজ্যলাভের মূলাধার ছিলেন, এই হেতু তাঁহাকে নামমাত্র সম্রাটরূপে সম্মান করিয়া আপনারাই শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

* The daughter of the prince being a child and his mother advanced in years, their appearance before a stranger and especially a Syad was not considered as any great departure from etiquette.

ভ্রাতৃযুগল তাদৃশ অখণ্ড ক্ষমতালাভ করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিলেন, রাজদরবারের বহুসংখ্যক অমাত্য ও পারিষদ তাঁহাদের শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। ফরকশিয়র অনভিজ্ঞ, ভীরুস্বভাব এবং বিলাসপ্রিয় ছিলেন। তিনি অমাত্য ও পারিষদবর্গকে যথাযোগ্য শাসনাধীন রাখিয়া রাজকার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলেন; রাজপুরুষগণের মধ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা তিনি অবাধে তাহাই করিতে লাগিলেন। একদিন অমাত্য ও পারিষদবর্গ পাদশাহকে হস্তগত করিয়া বসিলেন। পাদশাহ তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া সৈয়দগণের উচ্ছেদ সাধনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাদশাহের অস্থির মস্তিষ্ক ও ভীরুতাবশতঃ এই চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

এই ষড়যন্ত্রের বিষয় প্রকাশিত হইয়া পাড়লে ভ্রাতৃদ্বয় ফরকশিয়রকে সিংহাসনচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং সহজেই অরক্ষিত রাজপুরী অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহাদের আদেশে কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত অনুচর রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বাদশাহকে টানিয়া বাহির করিল। তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী পুরাঙ্গনাদের করুণ ক্রন্দনে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল।

তাঁহারা অনুচরদের পদধারণ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্ব্বৃত্তেরা তাদৃশ দৃশ্য দর্শন করিয়াও অবিচলিত রহিল; তাহারা ফরকশিয়রকে প্রাসাদের বহির্ভাগে আনয়ন করিল, তারপর দৃষ্টিশক্তি নাশ করিয়া তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিল। তিনি সেই কারাগারের ঘোর ক্লেশ এবং লাঞ্ছনা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া মুক্তিলাভের কল্পনায় প্রহরীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। এই ঘটনা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে সৈয়দযুগল আহার্য্যবস্তুতে বিষ মিশ্রিত করিয়া তাঁহার ইহলীলার অবসান করিলেন।

সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল ফরকশিয়রকে বন্দী করিয়া কারারুদ্ধ রফি-উদ্-দরজাতকে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়াছিলেন। তাঁহারা নবীন সম্রাটকে নামসর্ব্বস্ব সম্রাট করিয়া আপনারাই সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। কিন্তু তাদৃশ অবস্থা নবনিযুক্ত সম্রাটের মনের

সমস্ত শান্তি হরণ করিল। তজ্জন্য তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রফিউদ্দৌলার নামে শিক্কা ও খোতবা প্রচলনের প্রস্তাব করিয়া এই প্রহসন হইতে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। উজীর এবং তদীয় ভ্রাতা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তদীয় ভ্রাতা রফিউদ্দৌলার নামে শিক্কা ও খোতবা প্রচলিত করিলেন। রফিউদ্দৌলা রাজতক্তে আরোহণের পর অল্পকাল মধ্যেই দারুণ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

রফিউদ্দৌলার মৃত্যুর পর সৈয়দযুগল মোহাম্মদকে রাজপদ প্রদান করিলেন। মোহাম্মদশাহ বুদ্ধিমান ও তেজস্বী ছিলেন। তিনি তাঁহাদের হস্তক্রীড়নকে পরিণত হইতে অসম্মত হইলেন এবং মালবদেশের শাসনকর্ত্তা প্রতাপশালী চিনকিলিচ খাঁকে মুক্তিলাভের আশায় আহ্বান করিলেন। পাদশাহের ইঙ্গিতে তিনি বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া বিপুল বাহিনী সহ রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছিলে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বহু মন্ত্রণার পর আবদুল্লা খাঁ আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে গমন করিলেন, এবং হোসেনআলী খাঁ পাদশাহকে সঙ্গে লইয়া চিনকিলিচ খাঁর গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে পাদশাহের ষড়যন্ত্রে গুপ্তঘাতক হোসেনআলী খাঁর জীবনান্ত করিল। আবদুল্লা খাঁ ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ অবগত হইয়া রফি-উস-সানের পুত্র মোহাম্মদ এব্রাহিমকে রাজপদে বৃত করিয়া মোহাম্মদশাহ এবং তদীয় পক্ষাবলম্বী সৈন্যদিগকে বিধ্বস্ত করিবার মানসে সৈন্য সহ ধাবিত হইলেন। উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দুই দিনের যুদ্ধের পর মোহাম্মদ এব্রাহিম এবং আবদুল্লা খাঁ শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন ও তাঁহাদের অনুচরেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। অতঃপর মোহাম্মদশাহ রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন।

হোসেনআলী খাঁ এবং আবদুল্লা খাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ের সৈয়দবংশের গৌরব ও ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল। ইতিহাসবেত্তৃগণ তাঁহাদের পতনের দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম, সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য; দ্বিতীয়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ক্ষমতার অপব্যবহার এবং কার্য্যবিমুখতা। ভ্রাতৃযুগলের মনোমালিন্য সম্বন্ধে সায়েরমুতাক্ষরিণ-প্রণেতা গোলামহোসেন লিখিয়াছেন, ফরকশিয়রের সিংহাসনচ্যুতির পর ভ্রাতৃযুগল রাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া বিপুল ধনরত্ন লাভ করেন, এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক মূল্যবান আসবাব এবং হস্তী ও অশ্ব তাঁহাদের হস্তগত হয়। সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ রমণীবিলাসী ছিলেন, তিনি রাজান্তঃপুর হইতে কতিপয় অলোকসামান্যা রূপসীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে সৈয়দদ্বয়গণের সৌভ্রাত্র অন্তর্হিত হয়; তাঁহাদের মনোমালিন্য সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের স্বভাবজ্ঞ অন্তরঙ্গবর্গ অচিরেই ঐ বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের মনোমালিন্যের কারণসম্বন্ধে খাফিখাঁর গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পরের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে ঈর্ষ্যাকুল হইয়া উঠেন এবং একে অন্যকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করেন। হোসেনআলী খাঁ অনন্যসাধারণ গুণরাজির অধিকারী ছিলেন, এই গুণরাজি তাঁহাকে লোকপ্রিয় করিয়া তুলিতেছিল, তজ্জন্য রাজকার্য্যের সমস্ত ক্ষমতা স্বতঃই তাঁহার হস্তগত হইয়া পড়িতেছিল। এই হেতু আবদুল্লা খাঁ ঈর্ষ্যাকুল হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে তাঁহার কর্ম্মবিমুখ কর্ত্তৃত্বলাভপ্রয়াস হোসেনআলী খাঁকে অসন্তুষ্ট করে। এই ভাবে মনোমালিন্যের উদ্ভব হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের ঐক্যবন্ধন শিথিল করে এবং ফলে তাঁহাদের অপ্রতিহত ক্ষমতার ভিত্তিমূল কম্পিত হইতে থাকে। তদুপরি আবদুল্লা খাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার এবং কর্ম্মবিমুখতা নানাবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করে। উজীর আবদুল্লা খাঁ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিলাসপরায়ণতা তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য করে। ভোজ, নৃত্য এবং সঙ্গীত-উৎসবের প্রমোদতরঙ্গে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত; তিনি বিলাস-ব্যসনে প্রমত্ত হইয়া স্বকার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। শাসনসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের ভার তদীয় দেওয়ান রতনচাঁদের হস্তে সমর্পিত ছিল। এই রতনচাঁদ একজন সামান্য দোকানদার ছিলেন। তারপর সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাকটাক্ষলাভ করিয়া মোগল রাজ্যের শাসন

বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া তাদৃশ উন্নত পদ লাভ করিতে সমর্থ হন। গোলাম হোসেন রতনচাঁদ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি সঙ্কীর্ণচিত্ত ছিলেন, তদীয় স্বভাব তাদৃশ গুরুতর কার্য্য পরিচালনের অনুপযোগী ছিল। কিন্তু গুণাভাব সত্ত্বেও তিনি স্বীয় প্রভুর নামে যথেচ্ছভাবে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন এবং মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। একদিকে ঈদৃশ অপটুতা, অন্যদিকে দারুণ আলস্য এবং অসাবধানতা, ইহার ফলে প্রত্যহ শত্রুতার উদ্ভব হইতে আরম্ভ করে, এবং প্রত্যহ তদানুষঙ্গিক বিদ্বেষ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অবশেষে শত্রুতা এতদূর স্ফীত হইয়া উঠে যে, তাহা অত্যুচ্চ তৈমুর সিংহাসন নির্মজ্জিত করে। ইহার তরঙ্গাভিঘাতে সৈয়দের নিজের বংশও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; জ্যেষ্ঠ আবদুল্লা প্রথমতঃ কারারুদ্ধ, তারপরে বিষপ্রয়োগে নিহত হয়; কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেন গুপ্তঘাতুকের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

হোসেনআলী খাঁর ন্যায় বহুগুণসম্পন্ন রাজপুরুষের এইরূপ শোচনীয় পরিণামের বিষয় চিন্তা করিলে আমাদের সমবেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। খাফিখাঁ তাঁহাকে সাহসী, অভিজ্ঞ, সদাশয় এবং আত্মমর্য্যাদাশালী বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে তাদৃশ গুণালঙ্কৃত রাজপুরুষ সেকালে দুর্লভ ছিল। খাফিখাঁর প্রসংসাবাদ স্তাবকের অত্যুক্তি নহে।

সৈয়দ হোসেনআলী খাঁ স্বীয় পূর্ব্ব প্রভুপরিবারের কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে অসমর্থ হন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পাদশাহ জাহান্দরশাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া আপনাদের ধন মান প্রাণ বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলেন। এই ঘটনা চিরকাল তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়করূপে পরিকীর্ত্তিত হইবে। জাহান্দরশাহের সহিত যুদ্ধকালে হোসেনকুলিখাঁ অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া জয়শ্রী লাভ করেন। কিন্তু রাজসৈন্যের অস্ত্রাঘাতে বহুলোক হতাহত হইয়াছিল। স্বয়ং হোসেনকুলিখাঁ আহত হইয়া জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পতিত হন। যুদ্ধাবসানে সকলে তাঁহাকে মৃতদেহরাশির মধ্যে খুঁজিতে আরম্ভ করে। বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। জয়লাভের শুভসংবাদ তাঁহার অবসন্নদেহে সঞ্জীবনীশক্তি আনয়ন করে, তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট উপনীত হন। নূতন রাজত্বের দ্বিতীয়বর্ষে হোসেনকুলিখাঁ যোধপুরাধিপতি অজিত সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু অচিরে উভয়পক্ষে সন্ধি সংস্থাপিত হয় এবং অজিতসিংহ স্বীয় কন্যাকে পাদশাহের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য মোগল সেনাপতির সঙ্গে রাজধানীতে প্রেরণ করেন। হোসেনকুলিখাঁ কন্যারত্ন সহ রাজধানীতে উপনীত হইলে পাদশাহ বিবাহের আয়োজন করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে গৃহকর্ম্মচারীগণ অল্পসময়ের মধ্যে সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেন। কিন্তু এই সামান্য আয়োজন হোসেনআলী খাঁর মনঃপূত হয় নাই! তাঁহার কৃতকার্য্যেই রাজকন্যা আনীত হইয়াছিলেন, তাঁহার গৃহেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। হোসেনকুলিখাঁ স্নেহশীল ও সদাশয় ছিলেন, তিনি রাজকন্যাকে আপন পালিত কন্যারূপে বিবেচনা করিতেন। এজন্য তিনি বিবাহের সময় বিপুল সমারোহ করিতে উদ্যোগী হন। তাদৃশ বিপুল আয়োজন আর কখনও পরিদৃষ্ট হয় নাই। সমগ্র দিল্লীনগরী অপূর্ব্ব বেশে সুসজ্জিত হইয়াছিল। নিশাকালে সমস্ত রাজপথ বিচিত্র আলোকমালায় পরিশোভিত হইয়া নক্ষত্রখচিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভাধারণ করিত। এই উৎসব উপলক্ষে দিল্লীর সর্ব্বত্র আমোদপ্রমোদের প্রবাহ সঞ্চালিত হইয়াছিল; গৃহে গৃহে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। নাগরিকগণের বিচিত্র বসনভূষণ এবং নগরীর সমস্ত ক্রীড়াকৌতুক তাহাদের আনন্দের নিদর্শন প্রদর্শন করিত। একজন ইতিহাসবেত্তার কল্পনাকৌশলে গোলাপের রক্তিম-আভা আমোদপ্রমোদমত্ত নাগরিকগণের মুখের আনন্দশ্রীর নিকট পরাজিত হইয়া ঈর্য্যায় গোলাপকে কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছিল। ঈদৃশ আনন্দোৎসবে কতিপয় দিবারজনী অতিবাহিত হইলে পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই সময় স্বার্থপরতা সৈয়দ ভ্রাতৃগণের হৃদয় অধিকার করে, তাঁহারা ফরকশিয়রকে নিজেদের হস্তের ক্রীড়াপুত্তলে পরিণত করেন। পাদশাহ তাঁহাদের শত্রুপক্ষের মন্ত্রণায় হোসেনকুলিখাঁকে রাজ-

দরবার হইতে দূরে রাখিবার কল্পনায় তাঁহাকে দক্ষিণা-পথের শাসনকার্য্যে প্রেরণ করেন। হোসেনকুলিখাঁ নানা-কারণে অল্পদিনের মধ্যেই রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই প্রত্যাবর্ত্তনকালে একজন দুঃখিনী বিধবার একমাত্র কন্যা দৈবাৎ একজন সৈনিকপুরুষের হস্তগত হয়। সৈনিক পুরুষ তাহাকে লইয়া যাত্রা করেন। অনাথা বিধবা নিরুপায় হইয়া রাজপথপার্শ্বস্থ উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হয় এবং তারপর হোসেনকুলিখাঁর হস্তী দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে অভিযোগ উপস্থিত করে। অনাথা রমণীর অশ্রুজল তাহার হৃদয় সিক্ত করে; তিনি বিধবার অভি-যোগের প্রতীকার না হওয়া পর্য্যন্ত আহারীয় এবং পানীয় গ্রহণে বিরত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। অতঃপর বহু অনুসন্ধানের পর বালিকা তাহার মাতার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল! বস্তুতঃ হোসেনআলী খাঁর জীবনের ঘটনা-বলী আলোচনা করিলে তাঁহার বীরত্ব, কার্য্যকুশলতা এবং মহত্ত্ব আমাদের নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। *

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

অরণ্যবাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ :—কলিকাতাবাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটী বিক্রয় করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত পার্ব্বত্য বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই খানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাঁহাকে কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইল। গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। একদা মাধব দত্তের পত্নী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরী কন্যা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু সতীশবাবু পূজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্যা সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া সৌদামিনীর পিতা সতীশচন্দ্রকে কন্যাদানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কন্যা আশীর্ব্বাদ করিবেন স্থির হয়। সতীশচন্দ্র অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সৌদামিনীকে আশীর্ব্বাদ করিলে, দুই বন্ধুর মধ্যে কন্যাদের যৌবনবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহার ফলে, যৌবনবিবাহের অপ্রচলন সত্ত্বেও তাহার শাস্ত্রীয়তা সিদ্ধ হয়। ১৫ই ফাল্গুন তারিখে সতীশের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হইয়া গেল। সতীশের অনুরোধে ক্ষেত্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রকে পুরুলিয়া জেলা স্কুলে পড়িবার জন্য পাঠাইতে সম্মত হন। সতীশ সুরেন্দ্রকে আপনার বাসায় ও তত্ত্বাবধানে রাখিবার প্রস্তাব করেন। ক্ষেত্রনাথ অমরনাথ-নামক একজন দরিদ্র যুবককে আশ্রয় দিয়া বল্লভপুরে একটি পাঠশালা ও পোষ্ট-অফিস খুলিলেন, এবং সেই-সকল কর্ম্মে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। সতীশচন্দ্র ও সৌদামিনীর বিবাহ হইয়া গেলে পর ক্ষেত্রনাথ মাধব দত্তের সহিত পরামর্শ করিয়া বল্লভপুরে একটি হাট ও কয়েকটি দোকান প্রতিষ্ঠা করিলেন। ডেপুটি কমিশনর এই সংবাদ শুনিয়া হাট দেখিতে যাইবেন বলিলেন।

ষট্‌-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথ ডেপুটী কমিশনারের নিকট বিদায় লইয়া পার্ব্বত্য পথ অবলম্বন করিলেন। লখাই সর্দ্দার ও শিকারী কার্ত্তিক ভূমিজ দুই বন্দুক লইয়া তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ চলিল। হাকিমেরা সাইকেলে চাপিয়া অর্দ্ধঘণ্টা বা তিন কোয়ার্টারের মধ্যেই হাটে পঁহুছিবেন; এই কারণে, ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে শীঘ্র উপনীত হইতে উৎসুক হইলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার অনুচরদ্বয় একটী সরল অথচ দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অবলম্বন করিল। পথের উভয় পার্শ্বেই ঘনসন্নিবিষ্ট বন। দুর্গম বলিয়া, এই পথে কেহ বড় একটা গতায়াত করে না। অধিকন্তু এই পথে বন্য পশুর ভয়ও আছে। কিন্তু ক্ষেত্রনাথের অনুচরদ্বয় মনে করিল, দিনের বেলায় ভয়ের কোনও কারণ নাই। ক্ষেত্রনাথ অতিশয় কষ্টে কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে অনুচরদ্বয়ের সহিত পর্ব্বতশৃঙ্গে উপনীত হইলেন। পর্ব্বতা-রোহণে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হওয়ায়, তিনি অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিবার জন্য বৃক্ষচ্ছায়াসমন্বিত এক পরিচ্ছন্ন শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন।

মস্তকের উপরিভাগে বৃক্ষশাখায় বসিয়া আরণ্য পক্ষি-সমূহ কূজন করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে পবনহিল্লোলে বৃক্ষপত্রসকল মর্ম্মরিত হইতেছিল এবং বল্লভপুরের হাটের মহান্ কলরব দূরবর্ত্তী বারিধির অস্পষ্ট কল্লোলের ন্যায় তাঁহাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছিল। শীতল বায়ুস্পর্শে ক্ষেত্রনাথের কপোলদেশে শ্রমবিগলিত স্বেদ-

---

* নিম্নলিখিত গ্রন্থ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে ;

Seir Mutakherin. Ain-i-Akbari (Blochman). History of Bengal (Stewart). History of India (Elphinstone). Decline and Fall of the Moghul Empire (Keene). History of India Vol. VII. (Elliot).

বিন্দুচয় বিশুষ্ক হইয়া গেল; তাঁহার ক্লান্তি অনেকটা বিদুরিত হইল, এবং তাঁহার শ্রান্ত দেহে আবার বলসঞ্চার হইল। তখন তিনি পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিবার জন্য অনুচরদ্বয়ের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন।

সেই দুর্গম পথে কিয়দ্দুর অবতরণ করিতে না করিতে অগ্রবর্ত্তী লখাই সর্দ্দার সহসা নিশ্চল হইল, এবং বামহস্ত তুলিয়া সঙ্কেত করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী সঙ্গিদ্বয়কে অনুচ্চস্বরে বলিল "ঠহর যা।" কার্ত্তিক ভূমিজ মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহারা এবং ক্ষেত্রনাথ সভয়ে দেখিলেন যে, প্রায় একরশি নিম্নে, স্নিগ্ধ বৃক্ষচ্ছায়াতলে, তাঁহাদের গমনপথ অবরুদ্ধ করিয়া, এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রী বসিয়া আছে! তাঁহাদের দিকে ব্যাঘ্রীর পৃষ্ঠদেশ রহিয়াছে এবং তাহার সম্মুখে দুইটী শাবক ক্রীড়া করিতেছে। ব্যাঘ্রীকে দেখিবামাত্র ক্ষেত্রনাথের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, কণ্ঠ ও তালু বিশুষ্ক হইল, এবং চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। সেই মুহূর্ত্তেই শৃঙ্গাভিমুখে তাঁহার পলায়ন করিবার প্রবৃত্তি প্রবলা হইল। তাহা যেন বুঝিতে পারিয়াই লখাই অনুচ্চকণ্ঠে বলিল "গলা, তোর কিছু ডর নাই আছে; ঠহর যা।" ক্ষেত্রনাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভীতিবিহ্বল-নেত্রে কালান্তকতুল্য সেই ব্যাঘ্রীকে দেখিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে, লখাই ও কার্ত্তিক চুপি চুপি কি পরামর্শ করিয়া ব্যাঘ্রীর দিকে নিঃশব্দে দুই দশ পদ অগ্রসর হইল। সহসা একটা ব্যাঘ্রশাবক তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া একটী অস্ফুট ভয়সূচক চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকার শ্রবণ করিবামাত্র ব্যাঘ্রী ঘাড় ফিরাইয়া তাহার পশ্চাদ্দিকে চাহিল। নিমেষমধ্যে গুড়ুম্ শব্দে বন্দুকের আওয়াজ হইল। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে হৃৎকম্পকারী এক ভয়াবহ গর্জ্জন শ্রুত হইল। বন্দুকের ধূম অপসারিত হইলে, দেখা গেল ব্যাঘ্রী সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ধরাতলশায়িনী হইয়াছে, কিন্তু তাহার দেহ হইতে তখনও প্রাণ বিযুক্ত হয় নাই। লখাই অমনই লম্ফ দিয়া কতিপয় পদ ধাবিত হইয়া ব্যাঘ্রীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যাঘ্রী নিস্পন্দ হইয়া গেল।

এই ব্যাপারটি যেন চক্ষুর নিমেষের মধ্যেই সংঘটিত হইল। কিন্তু এই সামান্য মুহূর্ত্তটি ক্ষেত্রনাথের নিকট তীব্রযন্ত্রণাদায়ক অনন্ত কালের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। ব্যাঘ্রী নিস্পন্দ হইলে, লখাই ও কার্ত্তিক হর্ষে ও উৎসাহে লম্ফ দিয়া তাহার দিকে ধাবমান হইল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার সমীপবর্ত্তী হইল। শাবকদ্বয়ের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত কার্ত্তিক পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ক্ষেত্রনাথ সেই স্থলে একাকী দণ্ডায়মান থাকিতে অথবা অগ্রসর হইতেও সাহস করিলেন না। পরে লখাই সর্দ্দারের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে তিনি কম্পিত ও স্খলিত চরণে তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। ব্যাঘ্রীর লম্বিত দেহের উপর একটী পদ রক্ষা করিয়া লখাই তাহাকে উল্লাসপূর্ণ নয়নে দেখিতেছিল; তথাপি ক্ষেত্রনাথ ব্যাঘ্রীর সমীপবর্ত্তী হইতে সাহস করিলেন না। পরে হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করিয়া লখাইয়ের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং অনিমিষ লোচনে ব্যাঘ্রীকে দেখিতে লাগিলেন। তখনও ব্যাঘ্রীর আঘাতস্থলে ও মুখ হইতে উত্তপ্ত শোণিত-ধারা অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইতেছিল এবং সম্ভবতঃ তখনও তাহার দেহ উত্তপ্ত ছিল। তাহার হরিদ্রাভ লম্বিত দেহ, সুচিক্কণ লোমরাজি, ও দীর্ঘকৃষ্ণ রেখাচিহ্নিত গাত্র দেখিয়া তিনি তাহাকে "শালদা বাঘ" (Royal Bengal tigress) বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং অদ্য ইহার করাল গ্রাস হইতে যে রক্ষা পাইয়াছেন তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি এই ভীষণ স্থানে আর অধিকক্ষণ থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতে ব্যস্ত হইলেন। লখাই বলিল, তাহারা এই ব্যাঘ্রীকে না লইয়া যাইবে না। এই কারণে সে কার্ত্তিককে আহ্বান করিতে লাগিল। কার্ত্তিক অরণ্যের অভ্যন্তর হইতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সেই স্থানে উপনীত হইল। কার্ত্তিক অনেক চেষ্টা করিয়াও শাবকদ্বয়কে ধরিতে পারিল না। তাহারা কোথায় যে লুকাইল, তাহা সে জানিতে পারিল না। ক্ষেত্রনাথ গৃহে প্রত্যাগত হইতে ব্যস্ত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া লখাই তাঁহার সমভিব্যাহারে পর্ব্বতের তলদেশ পর্য্যন্ত গমন করিল; পরে ব্যাঘ্রীর দেহ বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য পুনর্ব্বার সেইস্থলে ফিরিয়া গেল। ইত্যবসরে কার্ত্তিক তাহার

ছোট কুঠারের দ্বারা একটী রোলা কাটিতে লাগিল এবং ব্যাঘ্রীর পদচতুষ্টয় বন্ধন করিবার জন্য আরণ্যলতা সংগ্রহ করিল।

ক্ষেত্রনাথ পর্ব্বতের পাদমূলের অরণ্য অতিক্রম করিয়া উন্মুক্ত স্থানে উপনীত হইয়া দেহে যেন পুনর্ব্বার প্রাণ পাইলেন। তখনও তাঁহার বক্ষ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল। তিনি ইতিপূর্ব্বে জীবনে কখনও অরণ্যে ব্যাঘ্র দেখেন নাই বা ব্যাঘ্রের সম্মুখে পড়েন নাই। লখাই ও কার্ত্তিক সঙ্গে না থাকিলে আজ তাঁহার কি যে দশা হইত, তাহা চিন্তা করিতেও তাঁহার দেহ শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। নন্দাজোড় পার হইবার সময়, তাহার শীতল জলে তিনি হাতমুখ প্রক্ষালন করিলেন ও মস্তক ধুইয়া ফেলিলেন। এইরূপে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া, তিনি হাটের সন্নিহিত হইলেন।

হাটে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, হাকিমেরা দশমিনিট পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন ও হাট দেখিয়া বেড়াইতেছেন। ক্ষেত্রনাথ অবিলম্বে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া পথের দুর্ঘটনার কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন। ডেপুটী কলেক্টার ও সতীশচন্দ্র তাহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু সাহেব ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ক্ষেত্রবাবু আজ আপনার কি সৌভাগ্য! নন্দনপুরে আজ তিন চার দিন থাকিয়াও আমি একটা শৃগাল দেখিতে পাইলাম না। আর আপনারা একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার মারিয়া ফেলিলেন! আমি সাইকেলে না আসিয়া আপনার সঙ্গে পার্ব্বত্য পথে বল্লভপুরে আসিলেই খুব ভাল করিতাম। তাহা হইলে, আজ ব্যাঘ্র শিকারের আমোদ অনুভব করিতে পারিতাম। যাই হোক, আপনার শিকারীরা যে খুব ক্ষিপ্রহস্ত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক সেকেণ্ড বিলম্ব করিলে, ব্যাঘ্রী তাহার শাবক সহিত অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইত। ব্যাঘ্রী অতিশয় সন্তানবৎসল। সন্তান রক্ষা করিবার জন্য সে অসমসাহসও প্রদর্শন করে। তাহার শাবক দুইটাকে ধরিতে পারিলে চমৎকার হইত। আপনি নিজে বন্দুক চালাইতে ও শিকার করিতে শিক্ষা করুন। আপনার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে, আপনি অদ্যকার ঘটনায় পড়িয়া যেন ভীত হইয়াছেন।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। আমি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এরূপ ঘটনার মধ্যে পড়ি নাই। কিন্তু আমি ভরসা করি যে, কালক্রমে আমিও শিকারে অভ্যস্ত হইব। আমার অনুচরদ্বয় নির্ভীকচিত্তে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং তাহাদের উল্লাস ও উৎসাহের সীমা নাই!"

সাহেব বলিলেন "প্রকৃত শিকারীর লক্ষণই তাই। যাই হোক, চলুন, এখন আপনার হাটের সকল স্থল দেখিয়া আসি।"

ক্ষেত্রনাথ তাঁহাদিগকে হাটের সর্ব্বস্থানে লইয়া গেলেন। সুবিন্যস্ত আপণ-শ্রেণী, মনোহারী দোকান, মশলার দোকান, বাসন-কাপড়ের দোকান, খাবারের দোকান, হাটে বিক্রয়ের জন্য আনীত অসংখ্য পশুপক্ষী ও নানাবিধ দ্রব্য, এবং পাঠশালা-গৃহ ও পোষ্ট-অফিস্ প্রভৃতি দেখিয়া সাহেব অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ক্ষেত্রনাথের উদ্যম, অধ্যবসায় ও ব্যবস্থা-শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, আপনার উদ্যম ও ব্যবস্থাশক্তি দেখিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। ইয়োরোপীয়দিগের ন্যায় আপনার চেষ্টা ও কার্য্যপ্রণালী। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আপনার ন্যায় উদ্যোগী বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমি অল্পই দেখিয়াছি। আপনি এই অল্পদিনের মধ্যে অসম্ভবকে সম্ভবপর করিয়াছেন। আপনাদের ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের জন্য কত কার্য্যই রহিয়াছে। আপনাদের এই দেশে কত প্রভূত ধনরত্ন সঞ্চিত রহিয়াছে! সেদিকে শিক্ষিত লোকের কোনও দৃষ্টি নাই। তাঁহারা কেবল চাকরী ও ওকালতীর জন্যই ব্যস্ত! চাকরী বা ওকালতী দ্বারা কেবল নিজের অবস্থার কিছু উন্নতি হইতে পারে তাহা সত্য বটে, কিন্তু দেশের লোকের তাহাতে কি উপকার হয়? ইংরাজ জাতি যদি শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি আসক্ত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা জগতে কদাপি এরূপ উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন না। ভাবিয়া দেখুন, ভারতবর্ষে এত বড় একটা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা একটী ব্যবসায়ী

কোম্পানী! এদেশের সমস্ত ব্যবসায়ই ইয়োরোপীয়গণের হস্তে রহিয়াছে। কয়লার খনি, অভ্রের খনি, লোহার খনি, স্বর্ণের খনি, পাটের ব্যবসায়, কল-কারখানা, চা-বাগান, হৌস ইত্যাদি অধিকাংশই ইংরাজের হস্তে। আর এদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কেবল তাঁহাদের অধীনে কেরাণীগিরি করিবার জন্য লালায়িত! স্বাবলম্বন-শক্তিকে জাগরিত না করিলে, জগতে কোনও জাতি বা ব্যক্তি উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হন না। স্বাবলম্বন-শক্তির আশ্রয়েই লোকে শ্রেষ্ঠত্বে উপনীত হয়। আমি বাঙ্গালীদের মধ্যে স্বাবলম্বন-শক্তির একান্ত অভাব দেখিয়া অনেক সময়ে বিস্মিত ও দুঃখিত হই। আপনারা শিল্প,কৃষি ও বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হউন; দেখিবেন, তদ্দ্বারা আপনাদের প্রভূত ধনসঞ্চয় হইবে, আপনারা বহুলোক পালন করিতে পারিবেন, আপনাদের দেশের অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন জনসঙ্ঘের মঙ্গলসাধন করিতে পারিবেন এবং সর্ব্বত্রই শক্তিমান্ লোক বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিবেন। তখন সকলেই আপনাদিগকে সম্মান করিবেন, এবং কেহই আপনাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। ক্ষেত্রবাবু, আমি আপনার উদ্যোগ ও অধ্যবসায় দেখিয়া মনের আনন্দে আজ অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। আপনি ভাবিয়া দেখিবেন, আমার কথা যথার্থ কিনা। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই কার্য্যে চরম উন্নতিলাভ করুন, এবং আপনার সাধু দৃষ্টান্ত দেখিয়া এদেশের শিক্ষিত যুবকগণ আপনার পদাঙ্কের অনুসরণ করুন।"

ডেপুটী কমিশনার সাহেবের বাক্য শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ অতিশয় আহ্লাদিত ও উৎসাহিত হইলেন এবং তাঁহার শুভকামনার জন্য কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাকে অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

হাট দেখিয়া সাহেব ক্ষেত্রবাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময়ে লখাই সর্দ্দার ও কার্ত্তিক ভূমিজ একটী সুদৃঢ় রোলাতে ব্যাঘ্রীর মৃত দেহ ঝুলাইয়া ও সেই রোলাটি স্কন্ধে বহন করিয়া হাটের বহির্ভাগে উপনীত হইল। শত শত নরনারী ব্যাঘ্রীর দেহ দেখিবার জন্য ছুটিল। ক্ষেত্রনাথের সমভি-ব্যাহারে হাকিমেরাও তাহা দেখিতে গেলেন। সাহেব ব্যাঘ্রীর দেহ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন "ইহা পূর্ণবয়স্ক ব্যাঘ্রী দেখিতেছি, এবং ইহা রয়াল বেঙ্গল জাতীয় বটে। ইহার চর্ম্ম কি সুন্দর!" এই বলিয়া তিনি ব্যাঘ্রীর গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আপনি অনুমতি করিলে, ইহার চর্ম্মটি প্রস্তুত করাইয়া আপনাকে উপহার প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।" সাহেব ক্ষেত্রবাবুকে তজ্জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, আমি নিজে যে ব্যাঘ্র না মারিয়াছি, তাহার চর্ম্ম কখনও গ্রহণ করি নাই। আপনার ও আপনার শিকারীদেরই ইহা প্রাপ্য। আপনি এই চর্ম্মটি আপনার কাছে রাখিবেন। ইহা আপনাকে অদ্যকার ঘটনা সর্ব্বদা স্মরণ করাইবে, এবং আপনার মনে শিকার করিবার প্রবৃত্তিও জাগরিত করিবে।" এই বলিয়া তিনি শিকারীদ্বয়ের ক্ষিপ্রহস্ততার প্রশংসা করিলেন এবং প্রত্যেককে পাঁচটাকা করিয়া অর্থপুরস্কার দিলেন। লখাই ও কার্ত্তিক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া দুই হাতে সাহেবকে সেলাম করিতে লাগিল।

শিকারীদের সহিত সাহেব যখন কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, সেই সময়ে সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "ক্ষেত্তর, এ যে ভয়ানক বাঘ দেখ্‌ছি! আজ খুব বেঁচেছ, যা হো'ক। আজকার দিনটি তোমার পক্ষে খুব শুভ। নন্দনপুর মৌজার যেরূপ বন্দোবস্ত হ'ল, তাও তোমার পক্ষে খুব ভাল। সাহেব কাল সকালে ক্যাম্প তুল্‌বেন। আমি বৈকালে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা ক'রে যাব। সাহেব তোমার উপর ভারি সন্তুষ্ট।"

অল্পক্ষণ পরেই হাকিমেরা ক্ষেত্রবাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বল্লভপুর ত্যাগ করিলেন।

লখাই ও কার্ত্তিক ব্যাঘ্রীর মৃতদেহ বহন করিয়া মনোরমাকে দেখাইল। লখাইয়ের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া মনোরমার হৃদয়ের ভাব যে কিরূপ হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। হাট ভাঙ্গিয়া গেলে, সন্ধ্যার পর ক্ষেত্রনাথ মনোরমাকে অদ্যকার ঘটনার কথা বিস্তারিত করিয়া বলিলেন। মনোরমাকে ভীত ও নির্ব্বাক্ দেখিয়া,

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "মনোরমা, আরণ্যজীবনের এইগুলি আনুসঙ্গিক ব্যাপার। এতে ভয় পেলে চল্‌বে না। ভয় কোথায় নাই? সহরেও আছে, বনেও আছে। ভগবান্ যাকে রক্ষা করেন, তাকে কেউ মার্‌তে পারে না; আর তিনি মার্‌লে, কেউ বাঁচাতে পারে না। তাঁর দয়ার উপর নির্ভর করেই আমাদের চলা উচিত।" কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন "দেখ, আজ্‌কের এই ব্যাপারের একটা দৃশ্য যেমন সুন্দর, তেমনই করুণ ও শোকাবহ হয়েছিল। সেটা আমি জীবনে কখনও ভুল্‌তে পার্‌বো না। যখন আমি দেখ্‌লাম, বাঘিনী সেই নির্জ্জন পাহাড়ে, নিবিড় ছায়ার মধ্যে, রাজরাণীর মত ব'সে তার বাচ্ছাদুটীর খেলা দেখ্‌ছে, তখন আমি যেন মা জগদ্ধাত্রীকে দেখ্‌তে পেলাম। এই পশুর হৃদয়েও জগন্মাতার মাতৃস্নেহ তখন পূর্ণমাত্রায় ফুটে উঠেছিল। মহামায়ার মায়ার খেলা দেখে ভয়ের সহিত আমি বিস্ময়ও অনুভব ক'রেছিলাম। আহা, বাঘিনীর মনের এমন কোমল ভাবের উচ্ছ্বাসের সময়,—যখন তার মাতৃস্নেহের অমিয়ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল, ঠিক্ সেই সময়ে, কার্ত্তিকের বন্দুকের সাংঘাতিক গুলি তাকে ধরাশায়িনী ক'রে ফেল্‌লে। এই দৃশ্যটি দেখে, আমার হৃদয়ে বড় আঘাত লেগেছে। আমি তার মৃতদেহটি দেখে দু'এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলে থাক্‌তে পারি নাই।"

মনোরমা সন্তানের জননী। স্বামীর এই কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহারও হৃদয় ব্যাকুল ও চক্ষুর্দ্বয় সজল হইয়া উঠিল।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতঃকালে, ক্ষেত্রনাথ লখাই সর্দ্দারকে বলিলেন "লখাই, নন্দনপুর মৌজা আমি সরকার বাহাদুরের কাছে বন্দোবস্ত ক'রে নিচ্ছি। ঐ মৌজাটি নিলে আমাদের লাভ হবে তো?"

লখাই বলিল "তুই লাভের কথা ব'লচুস্, গলা? লাভ খুব হ'ব্যেক্। অমন মৌজা ই তল্লাটে আর নাই আছে। কাল্ ওখাতেই তহশীলদারের কাছে শুন্‌লি যে সাহেব মৌজাটো তোকে দিব্যেক।" *

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তুমি লাভ হবে, বল্‌ছো; কিন্তু কাল তহশীলদার সাহেবকে বল্‌লে যে, নন্দনপুরে বাঘভালুকের ভয়ানক উপদ্রব। ভয়ে কোনও লোক সেখানে বাস কর্‌তে চায় না—এমন কি যেতেও চায় না। কেহ মহুয়া ফুল কুড়োতে বা লাহা ভাঙ্গতে যায় না।" গতকল্যকার ঘটনাটি ক্ষেত্রনাথের মনে আবার জাগিয়া উঠিল।

লখাইসর্দ্দার রাগিয়া বলিল "উটো মিছা কথা ব'লেছে, গলা। বাঘভালুক কুথায় নাই আছে? বাঘ তো বনকুকুর বটে; আর ভালগুলান্ তো বনছাগল বটে। ইগুলান্‌কে আবার কিসের ডর? তহশীলদারটো ভারি বজ্জাত লোক বটে। সে বরষ বরষ মোল, কঁচড়া, লা, তসর—সব ভিন গাঁয়ের লোককে বিকে কি ন? পর, এথার লোককে নাই বিকে; এথার লোককে সে নন্দনপুরে নাই সামাতে দেয়। কেহু একটা শালপাত টুকেচে কি অমনি তাকে ধরপাকড় করেছে। তহশীলদারের ডরে কেহু নন্দনপুরে নাই সামায়।" †

ক্ষেত্রনাথ সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন "নন্দনপুরের জমী বিলি কর্‌লে, লোকে তা' বন্দোবস্ত ক'রে নেবে তো?"

লখাই বলিল "কেনে নাই লিব্যেক্ হে? সবাই লিব্যেক্। নন্দনপুরের মাটীচলে ভাল মাটী ইতল্লাটে আর কুথায় পাবি। বাঘভালুকের কিসের ডর আছে? তোর রায়তগুলাই বাঘভালুক খেদ্দাড়ে দিবোক্।" কিয়ৎক্ষণ

* লখাই বলিল "প্রভু, আপনি লাভের কথা বল্‌ছেন? লাভ বিলক্ষণ হ'বে। এরূপ মৌজা এ অঞ্চলে আর নাই। কাল ওখানেই তহশীলদারের কাছে শুন্‌লাম যে, সাহেব মৌজাটি আপনাকে দিবেন।"

† লখাই বলিল "প্রভু, সে মিথ্যা কথা ব'লেছে। বাঘ ভালুক কোথায় নাই? বাঘ তো বনকুক্কুরের তুল্য, আর ভালুক তো বনছাগলের তুল্য। এদের আবার কিসের ভয়? তহশীলদার ভারি বজ্জাত লোক। সে প্রতি বৎসরই ভিন্ন গ্রামের লোককে মহুয়া, কঁচড়া, লাহা ও তসর বিক্রয় করে। কিন্তু এই গ্রামের লোককে কখনও বিক্রয় করে না বা নন্দনপুরে ঢুকতে দেয় না। কেউ একটী শালপাতা ছিঁড়লে, সে তাকে ধরপাকড় করে। তহশীলদারের ভয়ে কেউ নন্দনপুরে প্রবেশ করে না।"

পরে লখাই আবার বলিল "ঐ গাঁটোতে বহুত মোল, কুসুম, পলাশ, মুরগা, সৎসার—আর মন্ উটোর কি নাম বটে—ভাল পাশুরে গেলৃছি—হুঁ আসন—আসনই বটে—এই সব পেঁড় আছে। এই সব পেঁড়ে তোর বহুত টাকা হব্যেক্। এত টাকা তুই কুথায় রাখ্‌বি, গলা ?" *

ক্ষেত্রনাথ লখাইয়ের কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। তাহার সহিত আরও আলাপ করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, নন্দনপুর মৌজায় তিন চারি শত কুসুম-গাছ আছে। কুসুমগাছে লাহা লাগাইলে, এক এক গাছে অন্ততঃ দেড়শত টাকার লাহা উৎপন্ন হইবে। যদি গাছ খাশে রাখিয়া প্রজাদিগকে প্রতিবৎসর বন্দোবস্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহারা গাছ অনুসারে প্রতি গাছের জন্য পাঁচ টাকা হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত খাজনা দিবে। কুলগাছের সংখ্যা করা যায় না। কুলগাছেও বিস্তর লাহা উৎপন্ন হয়। মহুয়া গাছের সংখ্যা হাজারেরও অধিক হইবে। প্রতি গাছে বার্ষিক এক টাকা করিয়া খাজনা আদায় হইতে পারে। আসন গাছও দুই তিন শত আছে, তাহাতে তসরের গুটি হয়। সেই গাছগুলিও খাজনায় বিলি হইবে। এই-সমস্ত গাছ ছাড়া রাখা বন (অর্থাৎ সুরক্ষিত বড় শালগাছের বন) আছে, জঙ্গল আছে, আর পাহাড়ের উপর সৎসার, মুরগা প্রভৃতি অনেক বহুমূল্য বৃক্ষ আছে। সেই-সমস্ত বৃক্ষের কাষ্ঠে টেবিল, চেয়ার, আলমারী, পালঙ্ক প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। লখাইয়ের মুখে এই-সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ বিস্মিত হইলেন।

বৈকালে সতীশচন্দ্র আসিলেন। আসিবার সময় শ্বশুরবাড়ীতে নামিয়া সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি সাইকেলটি রাখিয়াই বলিলেন "ক্ষেত্তর, তোমার এখানে আসাও যা, আর ঢেঁকীশাল দিয়ে কটক যাওয়াও তা। সম্মুখের ঐ পাহাড়ের উপত্যকা-ভূমি থেকে বেরিয়েই তোমার বাড়ীটি নজরে পড়ে। সেখান থেকে তোমার বাড়ী এক মাইলেরও অধিক নয়, কিন্তু এদিকে মানুষ চল্‌বার সুড়ি রাস্তা ভিন্ন আর রাস্তা নাই। কাজেই ঐ দক্ষিণ দিকের পাহাড়ের কোলে কোলে এঁকে বেঁকে ঘুরে ফিরে তবে তোমার গ্রামের পশ্চিমভাগে উপনীত হওয়া যায়। তারপর সমস্ত গ্রামটি পার হ'য়ে তোমার বাড়ী আস্‌তে হয়। তোমার বাড়ীর পূর্ব্বদিকে ঐ পাহাড়ের কোলে কোলে একটা সোজা রাস্তা তৈয়ার হয় না কি ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তা হবে না কেন ? তবে তা বিলক্ষণ ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু এঁকে বেঁকে, ঘুরে ফিরে গ্রামের ভিতর দিয়ে আস্‌তে তোমার তো কষ্ট হওয়া উচিত নয় ? পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙ্গিয়েও শ্বশুরবাড়ী যেতে লোকের কষ্ট হয় না।" এই বলিয়া ক্ষেত্রনাথ চক্ষু মিটাইয়া একটু হাসিলেন।

সতীশচন্দ্রও ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন 'ওঃ, তা সত্য বটে! কিন্তু তুমি বুঝি সেই গানটা ভুলে গেছ;

'পিয়া বিনু সব শূন ভাওবে।'

প্রিয়া যেখানে নাই, তা বাড়ীই হোক্, আর শ্বশুর-বাড়ীই হোক্, সবই শূন্য। এ সত্যটা তুমিও বেশ বোঝ; সুতরাং এ সম্বন্ধে তোমায় আর বেশী কিছু বল্‌তে হবে না। থাক্ এখন সে কথা। এখন হচ্ছে এই সোজা রাস্তাটীর কথা। কাল সাহেব সাইকেলে তোমার এখানে আস্‌তে আস্‌তে এই সোজা রাস্তাটি প্রস্তুত করবার কথা বল্‌ছিলেন। সম্ভবতঃ এ সম্বন্ধে হরিগোপালের উপর শীঘ্র হুকুমজারী হবে।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তা হ'লে তো খুব সুখেরই বিষয় হয়। আমিও অনেকবার এই সোজা রাস্তাটির কথা ভেবেছি; কিন্তু এই রাস্তায় নন্দাজোড়টি দুইবার পার হ'তে হয়। নন্দার উপর দুইটী সেতু প্রস্তুত না হ'লে, এই রাস্তা প্রস্তুত করা বৃথা। কিন্তু দুইটী সেতু প্রস্তুত করা এখন আমার সাধ্যাতীত। তবে ডেপুটী কমিশনার সাহেব যদি অনুগ্রহ করেন, সে স্বতন্ত্র কথা। এই রাস্তাটি প্রস্তুত হ'লে নন্দনপুর যাওয়ার পক্ষেও

* লখাই বলিল "কেন নেবে না? সকলেই নেবে। নন্দনপুরের মাটীর চেয়ে এ অঞ্চলে ভাল মাটী আর কোথায় পাবেন? বাঘ ভালুকের কিসের ভয়? আপনার প্রজারাই বাঘ ভালুক তাড়িয়ে দেবে।" কিয়ৎক্ষণ পরে সে আবার বলিল "ঐ গ্রামে অনেক মহুয়া, কুসুম, পলাশ মুরগা, সৎসার—আর ওর কি নাম, ভুলে যাচ্ছি না—হাঁ—আসন—আসনই বটে—এই-সব গাছ আছে। এই-সব গাছে আপনার অনেক টাকা হবে। প্রভু, আপনি এত টাকা রাখ্‌বেন কোথা?"

আমাদের খুব সুবিধা হবে। পাহাড়ে পাহাড়ে ওঠা-নামা করা আমার অভ্যাস নাই। কাল পাহাড়ের রাস্তায় যাওয়া-আসা ক'রে আজ আমার সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ পায়ে, ভয়ানক বেদনা হ'য়েছে।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "সাহেব কাল নন্দনপুর সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত করলেন, তা চমৎকার হয়েছে। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, বন্দোবস্ত এমন সুবিধাজনক হবে। সাহেব তোমার উপর ভারি সন্তুষ্ট। কাল সন্ধ্যার সময় কেবল তোমার কথাই বল্‌ছিলেন। থাক্ সে-সব কথা। এখন নন্দনপুর বন্দোবস্ত ক'রে নেওয়া সম্বন্ধে আজই তোমার সম্মতি জানিয়ে সাহেবকে এক-খানা পত্র লিখে দাও ; আর তাঁকে লিখ, যে, পাট্টা-কবুলতী সম্পাদিত হ'তে যখন কিছু বিলম্ব হবে, তখন এখন থেকেই তিনি অনুমতি দিলে, তুমি এবৎসর নন্দনপুরের মহুয়ার ফশলটি আদায় করতে পার। নতুবা পরে তা আর আদায় হবে না। আমি শুন্‌লাম, মহুয়াফুল এবৎসর কিছু নামী হয়েছে, আর গাছে প্রচুর ফুলও ধরেছে। এই সবেমাত্র ফুল ঝরে পড়তে আরম্ভ হয়েছে। সাহেব তোমাকে বৈশাখের সুরু থেকেই মৌজা বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন, তা ডেপুটী কলেক্টার বল্‌ছিলেন। সুতরাং তাঁর কোনও আপত্তি না হবারই কথা। আমি দেখেছি যে, নন্দনপুরে অসংখ্য মহুয়া গাছ আছে। তুমি যদি মহুয়াফুল সংগ্রহ কর্‌তে পার, তা হ'লে প্রথমেই কিছু টাকা পাবে। তারপর মহুয়ার ফল পাক্‌লে, তার আঁটিগুলি সংগ্রহ কর্‌বে। আঁঠি থেকে চমৎকার তেল বা'র হয়। তার নাম কঁচড়া তেল। এদেশের লোক এই তেল মাখে, খায়, আর প্রদীপে জ্বালায়। কিন্তু ইয়োরোপে এই তেলের বিলক্ষণ আদর। জর্ম্মেণীতে এই তেল থেকে মাখন (butter) প্রস্তুত হয়। তা খেতে দুগ্ধের মাখনের মতনই উপাদেয় ও উপকারী। এই তেল কলকাতায় চালান দিলে বিলক্ষণ দুই পয়সা পাবে। যখন ব্যবসা আরম্ভ করেছ, তখন ব্যবসা ভাল করেই কর। আর যে-সুকল কুসুমগাছ আছে, তাদের ফলের আঁঠিগুলিও সংগ্রহ কর্‌তে ভুলো না। কুসুমের বীজ থেকেও সুন্দর তেল বা'র হয় ও অনেক কাজে লাগে। হরিতকী, বহেড়া, আমলার গাছও তো অনেক দেখ্‌লাম। তাদের তলায় ফল বিছিয়ে আছে। এদেরও দাম আছে, তা তোমার জানা উচিত। এক বনজ ফল থেকেই তুমি অনেক টাকা পাবে।

"এই গেল এক কথা ; আর এক কথা তোমায় আমি বল্‌তে চাই। মৌজাটি বন্দোবস্ত হ'য়ে গেলেই, তুমি সার্ভে নক্সা ও চিঠার নকল নেবে। সার্ভে নক্সা ও চিঠায় মৌজার মোটামুটি বিবরণ আছে ; কিন্তু মৌজাসম্বন্ধে তোমার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানা আবশ্যক। কত জমী আবাদযোগ্য, আর কত জমী আবাদের অযোগ্য, আর মৌজার কোন্ কোন্ অংশে সেইরূপ জমী আছে—তা জান্‌বার জন্য তোমাকে কিছু দিনের জন্য এক আমীন নিযুক্ত কর্‌তে হবে। আমি একজন ভাল আমীন ঠিক করেছি। তাকে বেতন কিছু দিতে হবে না ; কেবল বিনা সেলামীতে তাকে কিছু জমা বাৎসরিক খাজনায় বন্দোবস্ত করে দিতে হবে, আর তার সঙ্গে জন চার কুলি দিতে হবে। সেও এই অঞ্চলে বসবাস ক'রে কৃষিকাজ করতে চায়। আমীন নক্সা প্রস্তুত কর্‌লে, তুমি তা দেখে মৌজার অবস্থা এবং কোন্ স্থানে কি প্রকার জমী আছে ও কত জমী আছে, তা বুঝ্‌তে পার্‌বে। মৌজাতে প্রজা স্থাপন করা আবশ্যক। রঞ্জনীদাদার ছেলে নিশি তো এখানে আস্‌বেই। সে ছাড়া যতীন চারু এবং আরও অনেকে আস্‌বে। সকলেরই কাছ থেকে জমীর শ্রেণী অনুসারে প্রতি বিঘা পিছু সেলামী নিতে হবে ; আর তারা যেস্থানে বাড়ী প্রস্তত কর্‌বে, তাও নির্দ্দেশ ক'রে দিতে হবে। আমার ইচ্ছা, নন্দনপুরে তুমি একটী আদর্শ গ্রাম স্থাপন কর। রাস্তা ও জলনিকাশের পথ প্রভৃতি স্থির ক'রে, তার পর গ্রাম বসাবে। তা না হলে, যেখানে সেখানে লোকে ঘর প্রস্তুত কর্‌বে, আর স্থানটিকে অস্বাস্থ্যকর ক'রে ফেল্‌বে। এ বিষয়ে আমি আর হরিগোপাল তোমাকে পরামর্শ দেব। আগে এই-সমস্ত কাজ সম্পন্ন কর ; তার পর নন্দনপুরে যে-সকল খনিজ পদার্থ আছে, তার কথা আমি তোমাকে বল্‌বো। তুমি কাল সাহেবকে তল-

সত্বের কথা ব'লে ভালই করেছ। আর বাঘ ভালুকের ভয় তুমি করো না! কাল্‌কের ঘটনা দেখে মনে করো না যে, নন্দনপুর বাঘভালুকে পরিপূর্ণ। তহশীলদার তার প্রাণ বাঁচাবার জন্যই কাল অতিরঞ্জিত ক'রে বাঘভালুকের কথা বলেছিল। আর বাঘভালুক থাক্‌লেও, যারা সেখানে বাস কর্‌বে, তারাই তাদের তাড়াতে শিখ্‌বে। ঘরমুখো ভীরু বাঙ্গালীর আদর্শ এদেশ থেকে যত শীঘ্র তিরোহিত হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। সকলে সাহস শিক্ষা করুক; বিপদের সম্মুখীন হ'তে শিখুক, আর বিপদকে জয় করুক। মুস্কিলে না পড়্‌লে, কখনও সাহস ও বুদ্ধি স্ফূরিত হয় না। কল্‌কাতার ক্ষেত্রনাথ, আর বল্লভপুরের ক্ষেত্রনাথের মধ্যে অনেক তফাৎ। তুমি যেন একটা নূতন মানুষ হয়েছ। তোমার উদ্যোগ ও অধ্যবসায় দেখে আমিই বিস্মিত হ'য়ে পড়েছি; সাহেব তো হবেনই। যাই হোক্, তুমি অদম্য উৎসাহে কাজ করে যাও; কিছুতেই পেছ-পা হয়ো না।"

ক্ষেত্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে সৌদামিনী ও সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া এবং কিছু জলযোগ করিয়া, সতীশচন্দ্র বল্লভপুর হইতে রেলওয়ে ষ্টেশন-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ।

বল্লভপুরের প্রজাবর্গ ক্রমে ক্রমে শুনিতে পাইল যে, ডেপুটী কমিশনার সাহেব তাহাদের জমীদার ক্ষেত্রবাবুকে নন্দনপুর মৌজা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। শুনিয়া সকলে দলে দলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল ও আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল। নন্দনপুরের জমীর কতকাংশ তাহাদিগকে বিলি করিয়া দিবার জন্য অনেকে তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইল। ক্ষেত্রনাথ তাহাদিগকে বলিলেন যে, জমী লইলে তাহাদিগকে সেই মৌজায় গৃহ প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে হইবে। তদুত্তরে তাহারা বলিল, তাহাদের কোনও কোনও পুত্র বা ভ্রাতা নন্দনপুরে গিয়া বাস করিবে, আর কেহ বা বল্লভপুরেই থাকিবে। নতুবা তাহাদের শস্য রক্ষিত হইবে কিরূপে? অনেকে জমী বন্দোবস্ত করিয়া লইবার আশায় নন্দনপুরে গমন করিতে লাগিল ও আপনাদের সুবিধামত ভূমি নির্ব্বাচন করিল।

ক্ষেত্রনাথের পত্রের উত্তরে ডেপুটী কমিশনার সাহেব তাঁহাকে নন্দনপুরের মহুয়া বৃক্ষসমূহের ফুল কুড়াইবার এবং অন্যান্য বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। ক্ষেত্রনাথ লখাই সর্দ্দারের সহিত পরামর্শ করিয়া গ্রামের প্রজাদিগকে বলিলেন যে, তাহারা নন্দনপুরের মহুয়া ফুল কুড়াইলে, যে যত ফুল আনিবে, তাহাকে তিনি তাহার অর্দ্ধাংশ দিবেন। অনেক দরিদ্র প্রজা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ নন্দনপুরে মহুয়া ফুল কুড়াইতে আরম্ভ করিল। লখাইসর্দ্দার প্রভৃতি তাহাদের উপর তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। প্রত্যহ রাশি রাশি ফুল সংগৃহীত হইয়া ক্ষেত্রনাথের খামার বাড়ীতে বিশুষ্ক হইতে লাগিল। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ক্ষেত্রনাথ আমলকী ও হরিতকীও সংগৃহীত করিলেন। সকল দ্রব্যের ওজন হইলে দেখা গেল, মহুয়া সাত শত মণ, হরিতকী তিনশত মণ ও আমলকী দুইশত মণ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রজারা বলিল, দুরবর্ত্তী বা দুর্গম স্থানের ফুল বা ফল তাহারা কুড়াইতে পারে নাই। নতুবা তাহাদের পরিমাণ আরও অধিক হইত।

গো-মহিষের খাদ্যের জন্য পঞ্চাশ মণ মহুয়া রাখিয়া এবং লখাই সর্দ্দার ও মুনিষদিগকে পঞ্চাশ মণ মহুয়া পুরস্কার দিয়া ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরের হাটে অবশিষ্ট ছয়শত মণ মহুয়া প্রতিমণ বারআনা দরে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে তিনি ৪৫০৲ টাকা পাইলেন। হরিতকী এবং আমলকী বিক্রয় করিয়াও তিনি ৬০০৲ টাকা পাইলেন। সুতরাং কেবল মহুয়া এবং হরিতকী ও আমলকী বিক্রয় করিয়া তিনি ১০৫০৲ টাকা পাইলেন।

ক্ষেত্রনাথের মনে অতিশয় উৎসাহ হইল। তিনি প্রজাবর্গকে বলিলেন, নন্দনপুরে যখন কুসুমফল ও কঁচড়া পাকিবে, তখনও যদি তাহারা উক্ত ফলসমূহের বীজ সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে তাহাদেরও অর্দ্ধেকাংশ দিবেন।

অনেক কুসুমবৃক্ষে লাহা ধরিয়াছিল। তিনি অর্দ্ধেক ভাগ দিতে স্বীকৃত হইয়া প্রজাদের দ্বারা লাহা ভাঙ্গাইতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় পনর মণ লাহা সংগৃহীত হইল। ক্ষেত্রনাথ ২০্ টাকা দরে লাহা বিক্রয় করিয়া ৩০০্ টাকা পাইলেন।

জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথম সপ্তাহে ডেপুটী কমিশনার ক্ষেত্রনাথকে পুরুলিয়ায় আহ্বান করিলেন। পাট্টা ও কবুলতী সম্পাদিত হইয়া গেল। সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি মহুয়াফুল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না। তদুত্তরে ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে যথাযথ সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। সাহেব তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আমি যে ১৩৫০্ টাকা পাইয়াছি, তাহা নন্দনপুরের উন্নতিসাধনার্থ মৌজুৎ রাখিয়াছি। বল্লভপুর হইতে নন্দনপুর যাইবার জন্য পর্ব্বতের উপর দিয়া ব্যতীত অন্য কোনও সোজা পথ নাই। যে একটী পথ আছে, তদ্দ্বারা নন্দনপুর যাইতে হইলে, বহুদুর অতিক্রম করিতে হয়। আমি একটী সহজ পথ আবিষ্কার করিয়াছি। আপাততঃ সেই পথ প্রস্তুত করিবার জন্য এই টাকা খরচ করিব।"

সাহেব ক্ষেত্রনাথের অকপটতা ও কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, আমি আপনার নীতির সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। কোনও স্থানে প্রজাস্থাপন করিতে হইলে, সেই স্থানে গমনাগমনের পথ সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। আপনি যে সহজ পথটি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ইঞ্জিনীয়ার হরিগোপালবাবুকে দেখাইবেন। তিনি আপনাকে তৎসম্বন্ধে উপদেশ ও পরামর্শ দিবেন।"

বল্লভপুরের কাপাসক্ষেত্রে যে কাপাস উৎপন্ন হইয়াছে, ক্ষেত্রনাথ তাহার নমুনা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সাহেব তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। সতীশচন্দ্রও ইতিপূর্ব্বে তাহা দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় ক্ষেত্রনাথ হরিগোপালবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবগত হইলেন যে, সাহেব তাঁহাকে বল্লভপুর যাইতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এবং তাঁহার বাটী হইতে ঠিক দক্ষিণদিকে যে একটী সুঁড়িপথ সরলভাবে নন্দাজোড় দুইবার অতিক্রম করিয়া বল্লভপুরের পাকা রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহা প্রস্তুত করিতে কত ব্যয় হইবে, তাহা অবধারণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই বল্লভপুরে যাইবেন, এবং নন্দনপুরে যাইবার জন্য ক্ষেত্রবাবু যে সহজপথ আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাহাও দেখিয়া আসিবেন।

গ্রীষ্মাবকাশের জন্য সুরেন্দ্রনাথের স্কুল বন্ধ হইয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ তাহাকে সঙ্গে করিয়া বল্লভপুরে যাইতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্র বলিল যে, তাহার মাসীমাতা (সৌদামিনী) শীঘ্রই পিত্রালয়ে যাইবেন; সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গে সেও বল্লভপুরে যাইবে। সৌদামিনীরও সেইরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া ক্ষেত্রনাথ সুরেন্দ্রকে সঙ্গে লইলেন না।

নন্দনপুরের জরীপ করা আবশ্যক বুঝিয়া ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রের নির্ব্বাচিত আমীনকে সঙ্গে লইয়া বল্লভপুরে প্রত্যাগত হইলেন, এবং রক্ষকস্বরূপ বন্দুকসহ শিকারী কার্ত্তিক ভূমিজকে ও চারিজন কুলীকে তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আমীনের অবস্থানের জন্য বৈঠকখানার পার্শ্ববর্ত্তী একটী গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া লোকজনসহ নন্দনপুরে যাইতেন এবং মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে বল্লভপুরে প্রত্যাগত হইয়া স্নানাহার করিতেন।

একোনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

ইঞ্জিনীয়ার হরিগোপাল বাবু বল্লভপুরে আসিয়া নন্দাজোড়ের উপর দুইটী সেতু এবং কাছারীবাড়ীর দক্ষিণ দিকের সহজ রাস্তাটি প্রস্তুত করিতে কত টাকা ব্যয় হইবে, তাহা অবধারণ করিলেন। সেতুর গাঁথুনীর জন্য প্রস্তর এবং চুন বল্লভপুরে সুলভ; কেবল লোহার গার্ডার ও বীম ইত্যাদি ক্রয় করিতে হইবে এবং রাজমিস্ত্রী ও মজুরের বেতন লাগিবে। রাস্তাটি এবং দুইটী সেতু প্রস্তুত করিতে পাঁচশত টাকা খরচ হইবে, ইহা অবধারিত হইল।

কালী নদীর উপর সেতু প্রস্তুত করিতে যত টাকা

মঞ্জুর হইয়াছিল, তাহা হইতে তিন শত টাকা বাঁচিবার সম্ভাবনা। ডেপুটী কমিশনার সাহেব সেই তিন শত টাকার মধ্যে নন্দার উপরে দুইটী সেতু ও রাস্তাটি প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়াছেন। হরিগোপাল বাবু বলিলেন "আরও দুই শত টাকা না হলে, এই কার্য্য সম্পন্ন হ'বে না। কিন্তু এবৎসর আমাদের বজেটে আর অধিক টাকা নাই।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তজ্জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনি সাহেবকে বল্‌বেন যে, বাকী দুই শত টাকা আমি দেব। কালী নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ কর্‌তে আপনারা লোকজন লাগিয়েছেন; এখানেও লোক লাগিয়ে দিন। আমি সাহেবের নিকট দুই শত টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

হরিগোপাল বাবু বলিলেন "তা যদি দেন, তা হ'লে বর্ষার আগেই আমি সেতু প্রস্তুত করে দেব।"

বল্লভপুরের দক্ষিণ সীমায় যে স্থানে নন্দার উপর সেতু প্রস্তুত হইবে, সেই স্থানে নন্দা দক্ষিণ-পূর্ব্ববাহিনী হইয়া দুইটী গিরিশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী একটি সঙ্কীর্ণ উপত্যকার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র উপত্যকার উত্তরসীমায় যে গিরিশ্রেণী আছে, তাহা বল্লভপুরের পূর্ব্বসীমায় এবং বল্লভপুর ও নন্দনপুরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই গিরিশ্রেণী উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত, কিন্তু দক্ষিণ দিকে নন্দার নিকটে আসিয়া সহসা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। উপত্যকার দক্ষিণ সীমায় যে গিরিশ্রেণী আছে, তাহা দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে প্রলম্বিত; কিন্তু তাহাও উত্তর দিকে নন্দার নিকটে আসিয়া সহসা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। যেন দুই দিক্ হইতে দুইটী পর্ব্বতশ্রেণী আসিয়া এই সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্যবর্ত্তিনী নন্দার কোথাও শ্রুতিমধুর কুলু কুলু ধ্বনি, আর কোথাও অন্ধকারময় গভীর খাতের মধ্যে তাহার নিপতন-জনিত প্রচণ্ড নিনাদ শ্রবণ করিয়া সহসা স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, যেন তাহারা অনন্ত কাল ধরিয়া তাহার সেই মধুর অথচ ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়াও এখন পর্য্যন্ত অতৃপ্ত রহিয়াছে; এবং বিস্ময়ে যেন পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছে; এই উপত্যকার উভয় পার্শ্বে দুইটী গিরিশ্রেণীরই প্রান্তভাগ উচ্চ ও দুরারোহ; দুই চারিটী আরণ্য বৃক্ষ ও পার্ব্বত্য বাঁশের ঝাড় ব্যতীত তাহাদের উপর অন্য কোনও উদ্ভিদ্ নাই। কিন্তু নন্দার উভয় তটই নিবিড় শালবনে সমাচ্ছন্ন; সেই শালবনের মধ্যে নন্দা সহসা যেন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া মনে হয়, এই দুইটী প্রকাণ্ড ও রুক্ষ গিরিশ্রেণীর শীলতাবর্জ্জিত রূঢ় দৃষ্টি হইতে আপনাকে আবৃত করিবার জন্যই নন্দা যেন আপনার অঙ্গের উপর শালবন-রূপ হরিদ্বসন টানিয়া দিয়াছে, এবং গিরিশ্রেণীদ্বয়কে তিরস্কার করিবার ছলেই সহসা যেন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

নন্দার উত্তর তটে বল্লভপুরের গিরিশ্রেণীর পদতলে উপত্যকাভূমির যে অংশ উচ্চ, তাহা অসম হইলেও কিঞ্চিৎ প্রশস্ত। ক্ষেত্রনাথ এই অংশেই নন্দাতটের ধারে ধারে একটী পথ প্রস্তুত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। উপত্যকাভূমি দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্দ্ধ মাইল ছিল; সুতরাং প্রস্তাবিত পথও দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধ মাইল হইবে। এই পথ প্রস্তুত হইলে, বল্লভপুর হইতে অক্লেশে নন্দনপুরে গমন করিতে পারা যাইবে। ক্ষেত্রনাথ হরিগোপাল-বাবুকে তাঁহার আবিষ্কৃত এই পথ বা উপত্যকাভূমি দেখাইলেন। হরিগোপালবাবু তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং এই পথ প্রস্তুত করিতে কত টাকা খরচ হইবে, তাহা অবধারণ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

দুইদিন পরে হরিগোপালবাবু ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "এই পথ প্রস্তুত কর্‌তে আপনার ছয় শত টাকার অধিক খরচ হবে না। কেবল স্থানে স্থানে পাহাড়ের গা সামান্য রকম কেটে ফেল্‌তে হবে, আর অসম স্থানগুলিকে সমান কর্‌তে হবে। তা ছাড়া নন্দার তটের দিকে বড় বড় পাথর একত্র রাশীকৃত ক'রে একটী অত্যুচ্চ দেওয়ালের মত ক'রে দিতে হবে। তা হ'লে গাড়ী, গরু, ঘোড়া,—কার'ও নন্দার গর্ভে প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা থাক্‌বে না। আপনি সুন্দর পথ আবিষ্কৃত করেছেন, ক্ষেত্রবাবু। এই পথ দিয়ে বল্লভপুর থেকে নন্দনপুরে তো অনায়াসেই যাওয়া যাবে; তা ছাড়া যারা রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে নন্দনপুরে আস্‌বে, তারাও নন্দার প্রথম সেতুটি পার হ'য়েই এই রাস্তা পাবে। এ ভারি সুবিধা হয়েছে। মাধবপুরের পেছন দিক্ দিয়েও নন্দা পার হ'য়ে নন্দনপুরে

যাওয়া যায়; কিন্তু সে দিকের পথ কিছু দুর্গম, আর নন্দাও সেখানে বিলক্ষণ প্রশস্ত। সেখানে নন্দার উপরে সেতু নির্ম্মাণ করা আর সে দিক্ দিয়ে রাস্তা প্রস্তুত করাও বহুব্যয়সাপেক্ষ। এই কারণে, আমি আপনার এই পথটির সম্পূর্ণ অনুমোদন কর্‌ছি। এখন আপনি লোক লাগিয়ে এটি প্রস্তুত কর্‌তে পারেন। আমি ওভারসিয়রকে ব'লে দেব, তিনি আপনাকে এবিষয়ে সাহায্য কর্‌বেন। আমি এই রাস্তার একটী নক্সা ও এষ্টিমেট আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি।"

জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যেই নন্দার উপরে দুইটী সেতু প্রস্তুত হ'তে আরম্ভ হইল। লোহার গার্ডার ও বীম্ আসিয়া পড়িল এবং নির্ম্মাণকার্য্য খরবেগে চলিতে লাগিল। বর্ষার জলে ভূমি সিক্ত না হইলে, পর্ব্বতের গাত্র ও প্রস্তরময় দৃঢ় অসমভূমি খনন করা কঠিন কার্য্য হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া ক্ষেত্রনাথ নন্দনপুর গমনের নূতন পথটি প্রস্তুত করিবার আশায় বর্ষার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

জ্যৈষ্ঠমাসে সৌদামিনীর সহিত সুরেন্দ্র বল্লভপুরে আসিল। বল্লভপুরের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, বিশেষতঃ হাট দেখিয়া, তাহারা উভয়েই বিস্মিত হইল। সুরেন্দ্র অবকাশের সময়টি কেবল এখানে সেখানে বেড়াইয়া, কখনও নন্দার উপরে সেতু-নির্ম্মাণ-প্রণালী দেখিয়া, কখনও লখাইসর্দ্দারের সহিত পাহাড়ে উঠিয়া, কখনও নরুর সহিত ক্রীড়া করিয়া, এবং হাটের দিনে সমস্ত দিন হাটে ঘুরিয়া ফিরিয়া কাটাইয়া ফেলিল। কেবল প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় সে দুই এক ঘণ্টাকাল পড়িত মাত্র।

বলা বাহুল্য, সৌদামিনী তাহার প্রতিশ্রুতিমত নরুর জন্য একটী গাড়ী লইয়া আসিল; কিন্তু তাহা তাহার কাকাবাবুর মত গাড়ী নহে। ছোট তিনটি চাকার উপর কাষ্ঠের একটী ঘোড়া ছিল. নরু সেই গাড়ী দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল এবং ঘোড়ার পৃষ্ঠে চাপিয়া কাছারী বাটীর সম্মুখের মাঠে প্রত্যহ "ঘোড়-দৌড়" করিতে লাগিল।

(ক্রমশ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

গ্রামের কুমোর

গ্রামবাসীর ব্যয়-সংক্ষেপ করে বলিয়া গ্রামের কুমোর সাধারণতঃ গ্রামবাসীগণের নিকট সমাদৃত হইয়া থাকে। সে যে জিনিসগুলি গড়ে সেগুলি প্রত্যেক সংসারেই প্রয়োজন। যেমন—জলের কুঁজা, কলস, হাঁড়ি, ভাঁড়, খুরি, রেকাবি, জলের গেলাস, হুঁকার কলিকা, কূপের পাট প্রভৃতি। এই সমস্ত জিনিষ সস্তা বলিয়া গ্রামবাসীর নিকট সমাদৃত, কিন্তু তাহাতে কুমোরের উপার্জ্জন অত্যন্ত অল্পই হয়।

উপরোক্ত পদার্থগুলির গঠন যে কেবল সুন্দর তাহা নহে, খুব শিক্ষাপ্রদও বটে। ভাত রাঁধিবার জন্য, দুধ রাখিবার বা অন্যান্য কাজের জন্য আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক যে-সমস্ত পাত্র ব্যবহৃত হয় সেগুলি যদি জোগাড় করা যায়, তবে সেই-সকল দেশের শিল্প সম্বন্ধে যে কেবল শিক্ষা হয় তাহা নহে; ইতিহাস ও নরতত্ত্বের দিক দিয়াও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য শেখা যায়। কয়েকশত ক্রোশমাত্র ব্যবধানেই জিনিসগুলির গঠনে পরিবর্ত্তন দেখা যায়। জাতি ও ঐতিহ্যের পার্থক্য অনুসারেও গঠনের বৈলক্ষণ্য হয়। সেজন্য জিনিসগুলির গঠন ও তাহার উপরের চিত্রাঙ্কনের প্রাচীন প্রণালী আমাদিগকে ভারতবর্ষীয় প্রসাধন-শিল্পের পরিচয় প্রদানে যথেষ্ট সহায়তা করে।

কুমোরের প্রস্তুত জিনিসগুলি বড়ই ক্ষণভঙ্গুর। তথাপি, উহাদের মূল্য এত অল্প যে, কুমোরের উপার্জ্জন গড়ে মাসিক ৭ টাকা হইতে ১০ টাকার মধ্যে। বর্ষাকালে উহাদের কাজ থাকে না। মাটির জিনিসগুলি পুড়াইবার আগে রৌদ্রে শুকাইয়া কঠিন করা দরকার; বর্ষাকালে সেরূপ করিবার জো নাই; তাই উহারা ঐ সময়ে দিনমজুরি বা স্ব স্ব ক্ষেত্রে চাষের কাজ করে। আবার যখন মাটির কাজ আরম্ভ হয় তখন উহারা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠে, বাড়ীর ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত সে সময়ে তাহাদিগকে সাহায্য করে।

কুমোরেরা যে মাটি ব্যবহার করে তাহা সাধারণত বিল পুষ্করিণী বা নদীর পাড় হইতে লইয়া তাহাদের

কুমোর বাসন গড়িতেছে।

রঙের পাত্র নির্ম্মাণ করিতে হইলে কাদার সঙ্গে কয়েক মুঠা ছাই মিশানো হয়।

কুমোরের যন্ত্রপাতির মধ্যে একখানি চাকা আর কয়েকটি চ্যাপ্টা কাঠের মুগুর। চাকা খানি ২-৩ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট, হাল্কা কাঠে তৈরি; প্রান্তদেশে খড় ও কাদার কাই লেপা থাকে বলিয়া প্রান্ত ভারি হওয়াতে চাকাখানির ঘুরিবার শক্তি বাড়িয়া যায়, একবার ঘুরাইয়া দিলে কয়েক মিনিট ধরিয়া ঘুরিতে থাকে। এক-খানি সূক্ষ্মাগ্র পাথরের উপর একটি গর্ত্ত; সেই গর্ত্তের মধ্যে তেঁতুল-গাছের-গুড়ি-হইতে-কাটা একটি দৃঢ় গোঁজ আল্‌গা-ভাবে বসানো থাকে; সেই গোঁজের উপর চাকা ঘোরে। চাকাখানির এক ধারে একটা খাঁজ কাটা থাকে, সেই খাঁজের মধ্যে বাঁশের খোঁটা দিয়া চাকা ঘোরানো হয়। খানিকটা কাদা চাকার মাঝ-খানে গাদা করিয়া রাখা হয়। সেই কাদার ভিতরে একটি শক্ত কাদার ডেলা ভরিয়া রাখে।

কুঁড়ের এক কোণে জমা করিয়া জল দিয়া ভিজাইয়া রাখে। দিন দুই পরে কোদাল দিয়া ঐ মাটি ভালো করিয়া মিশাইয়া প্রায় আধ দিন ধরিয়া পা দিয়া চটকায়। তারপর কুমোর সেই চটকানো মাটি হইতে কাঁকর কুল্লুই খোলাম-কুচি বা শক্ত মাটি বাছিয়া বাছিয়া ফেলিয়া দ্যায়। তারপর উহার সঙ্গে মাপসই বালি মিশাইয়া শক্ত কাইয়ের মত তৈয়ার করে। কালো

তারপর বাঁশের খোটা দিয়া খুব জোরে চাকা ঘুরাইয়া দিয়া কুমোর বামহাতখানি কাদার মধ্যে ভরিয়া দেয় এবং ডাহিন হাত দিয়া বহির্ভাগে অল্প চাপিয়া রাখে। ডাহিন হাতে কেবলমাত্র কাদার চাঁইকে চাপিয়া রাখে, বাম হাতের চালনায় ভিতর হইতেই অধিকাংশ গঠনকার্য্য সম্পন্ন হয়। একখানি হাত ভিতরে এবং একখানি বাহিরে রাখিয়া আস্তে আস্তে কাদার চাঁইএ চাপ দিতে দিতে

উপরে উঠায় এবং অদ্ভুত নিপুণতায় কাদার মধ্য হইতে অভিলষিত পদার্থ গড়িয়া উঠে। নরম পাত্রটি যখন চাকার উপর ঘুরিতে থাকে তখন কখন কখন উহার উপর বিচিত্র রেখা টানিয়া কারুকার্য্য করা হয়। তারপর কুমোর এক টুকরা কাঠ দিয়া পাত্রের উপরিভাগ মসৃণ করে এবং পাত্রটির তলদেশে একটি ছোট কাঠি বা একখেই সুতা লাগাইয়া কাদার চাঁই হইতে পাত্রটি কাটিয়া ফেলে এবং দক্ষতার সহিত হস্তসঞ্চালন করিয়া রৌদ্রে শুকাইবার জন্য সেটি চাকার উপর হইতে তুলিয়া লয়।

কুমোর প্রতিমা গড়িতেছে।

রৌদ্রে শুকাইয়া শক্ত হইলে পাত্রগুলির তলা আঁটিয়া পালিশ করা হয়। পালিশ করিবার পূর্ব্বে দুমুখ-খোলা পাত্রগুলির তলদেশ কাদা দিয়া বন্ধ করা হয় এবং ছোট চাপটা মুগুর দিয়া পিটাইয়া পিটাইয়া পাত্রের দেহের গড়নের সঙ্গে তলা বেশ সুসমঞ্জস করিয়া মিলাইয়া আঁটিয়া দেয়। তারপর পালিশ ও রঙ করা হয়। পিয়ারিমাটি নামক একপ্রকার হরিদ্রাবর্ণের মাটি, আমগাছের ছালচূর্ণ এবং সাজিমাটি মিশাইয়া এই পালিশ তৈয়ারি হয়। বেল বা তেঁতুল বীচির আঠা দিয়া রঙ মেশানো হয়। সিন্দুর দিয়া লাল, সেঁকো বিষ ও নীল দিয়া হরিদ্রা এবং পোড়া বা লাল বীজ দিয়া কালো রঙ তৈয়ার হয়। চকচকে করিবার জন্য গর্জ্জন তৈল ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো মাটির খেলেনার উপর রঙ কাঁচা থাকিতে থাকিতে অভ্রচূর্ণ ছড়াইয়া একটি চাকচিক্য দান করা হয়।

টালি এবং ইট প্রস্তুত করিবার উপায় সরল। অর্দ্ধকঠিন কাদা সমতলভূমির উপর বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হয়। কয়েক দিন শুকানোর পর ধারালো কাঠের টুকরা দিয়া নির্দ্দিষ্ট মাপে ও আকারে ইট ও টালি কাটিয়া লওয়া হয়। এইরূপে প্রস্তুত ইট ও টালি আরো কিছুকাল রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়।

টালি ইট এবং মৃৎপাত্রগুলি একটি চতুষ্কের আকারে পাঁজা করা হয়। এক থাক করিয়া মাটির

জিনিস এবং এক থাক করিয়া ডালপালা, শুকনো পাতা, গোবর প্রভৃতি সহজদাহ্য পদার্থ সাজানো হয়। জিনিসগুলি কালো করিতে হইলে পাঁজার পোয়ানের মধ্যে ভিজাখড়, গোবর ও খোল রাখা হয়। এগুলি থাকাতে আগুন জ্বালাইলে যথেষ্ট ধূম উৎপন্ন হয়, তাহার ফলে জিনিসপত্রগুলি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। নতুবা নলখাগড়া বা বাঁশের কঞ্চিই সচরাচর জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। একদিন একরাত্রি ধরিয়া জ্বলিয়া আবার পাঁজা শীতল হইতে একদিন একরাত্রি লাগে। আমগাছের ছাল ব্যতীত 'কাবি' বা পালিশ তৈয়ার করিবার জন্য অন্যান্য অনেক উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয়, যেমন তেনসা গাছের ছাল, বাঁশের পাতা, বাকস পাতা ইত্যাদি। রঙ করিবার জন্য পুড়াইবার পূর্ব্বে পাত্রগুলির উপর গেরি, খড়ি প্রভৃতি রঙীন মাটি লেপা হয়। আগুনের তাতে রঙটি পাকা হইয়া যায় কিন্তু পালিশ হয় না। পুড়াইবার পর রুক্ষ মৃৎপাত্রগুলির উপর গালার পোঁচ লাগাইয়া পালিশ করা হয়, তাহাতে পাত্রগুলির মধ্য হইতে জলীয় পদার্থ চুঁআইয়া বাহির হইয়া পড়িতে পারে না।

কুমোরেরা যে কেবল সংসারে ও কৃষিকার্য্যে ব্যবহারের উপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে তাহা নহে, শিশুদিগের জন্য মাটির খেলেনাও তৈয়ার করে। স্ত্রীপুরুষ, ঘোড়া, বাঘ, হাতী প্রভৃতির মূর্ত্তির কাঠামো ছাঁচ দিয়া কাটিয়া লওয়া হয়। কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের কুমোরেরা দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়ে; তাহারা এ শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। ঐ-সকল কুমোরের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় দোলযাত্রার সময়। এ সময় তাহারা যে-সব মূর্ত্তি গড়ে সেগুলির কোনো নির্দ্দিষ্ট আদর্শ নাই। মূর্ত্তিগুলি সাধারণতঃ খুব বড় বড় হইয়া থাকে। নানান্ দেবদেবী, যোদ্ধা, গাভী, গোয়ালিনী প্রভৃতির মূর্ত্তি, এবং নানাবিধ সং দোলপ্রাঙ্গনের শোভাবর্দ্ধন করে।

জাতীয়জীবনের নানান্ বৈচিত্র্যকে কৃষ্ণনগরের কুমোরেরা ছোট ছোট মূর্ত্তিতে রূপদান করিয়াছে। সেগুলি সম্প্রতি খুব প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, উহাদের কাটতিও যথেষ্ট। ফলমূল, শাকসবজি, মাছ প্রভৃতির মাটি ও গালানির্ম্মিত কৃত্রিম অনুকরণ তিন টাকা ডজন হিসাবে বিক্রয় হয়। ছোট একটি গাভী বা মানুষের মূর্ত্তির মূল্য বারোআনা হইতে তিন টাকা।

হিন্দু রীতিনীতি ও সংস্কার কুমোরের শিল্পের উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ হইয়া আছে। হিন্দু রীতি অনুসারে মৃৎপাত্র অতি সহজেই অপবিত্র হইয়া পড়ে এবং অপবিত্র হইলেই উহা ফেলিয়া দেওয়া হয়, কারণ ধাতু-পাত্রের ন্যায় উহা পরিষ্কার করিয়া লইবার উপায় নাই। অধিকন্তু কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ব্যাপার উপলক্ষ্যে, যেমন সূর্য্য- বা চন্দ্র-গ্রহণের সময়, অথবা বাড়ীতে কাহারো জন্ম বা মৃত্যু ঘটিলে মৃৎপাত্র ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই-সকল কারণে হিন্দু পরিবারে সাধারণ রকমের শস্তা মৃৎপাত্রেরই ব্যবহার হইয়া থাকে, কারুকার্য্যখচিত উঁচুদরের মাটির বাসনের চলন নাই।

কুমোরেরা অধুনা যে-সকল অসুবিধা ভোগ করে, কিছু মূলধন বাড়াইলেই সেগুলি দূর হইতে পারে। প্রথম অসুবিধা হইতেছে, পা দিয়া কাদা মাখাতে কুমোরের যথেষ্ট সময় ও শক্তির অপব্যবহার হয়। এই অসুবিধা একটি সাধাসিধা ধরণের যন্ত্র ব্যবহারে দূর হইতে পারে। একটি তিন ফুট চওড়া চোঙের মধ্যে একটি দণ্ড ঘুরিতে থাকে। চোঙের মধ্যে কাদা থাকে এবং চোঙের তলায় একটি ছিদ্র দিয়া মাখা কাদা বাহির হইয়া যায়। দণ্ডটিতে একটি আড়াআড়ি হাতলের একপ্রান্ত সংলগ্ন থাকে, অপর প্রান্তে এক জোড়া বলদ জোতা থাকে। উহারা ঘানির বলদের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দণ্ডটি দিয়া কাদা মাখিয়া দ্যায়।

কুমোরের চাকা যে ঘোরায় তাহার আহত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। দ্রুত ঘূর্ণ্যমান চাকার খুব নিকটে দাঁড়াইলে বা বাঁশ দিয়া চাকা ঘুরাইবার সময় উল্টাইয়া পড়িয়া গেলে বিপদ ঘটে। চাকায় কয়েকটি জিনিস তৈয়ার করিতে যে সময় লাগে, আধুনিক উন্নত যন্ত্র ব্যবহার করিলে তাহার চেয়ে অল্প সময়ে সেগুলি তৈয়ার করা যায়। একটি নূতন পাত্র গড়িবার পূর্ব্বে চাকা প্রথম ঘুরাইতে কতকটা সময় বাজে খরচ হয়। পাত্র গড়িয়া

আবার পালিশ করিবার পূর্ব্বে চাকা ঘুরাইতে কতকটা সময় অতিবাহিত হয়। দিনের মধ্যে সাত ঘণ্টা কাজ হয়। উহার মধ্যে পৌনে পাঁচ ঘণ্টা মাত্র জিনিষ গড়িতে ব্যয় হইয়া থাকে, বাকি সময় বাজে কাজে নষ্ট হয়। এই সওয়াদুই ঘণ্টা সময় প্রকৃত কাজে লাগাইতে পারিলে কুমোর আরো ৫০টি জিনিস তৈয়ার করিতে পারে। দক্ষ কারিগিরও চাকাটি ঘুরাইতে গিয়া কাত করিয়া ফেলে, তাহা পুনর্ব্বার সোজা ও স্থির হইয়া ঘুরিতে কয়েক সেকেণ্ড অতিবাহিত হয়। এইরূপে অনেক সময় নষ্ট হয়।

সাধারণ ইট-প্রস্তুত-প্রণালীতেও অসুবিধা আছে। হাতে ইট প্রস্তুত করাতে ইটের ধারগুলি পরিষ্কার হয় না। সুগঠিত ছাঁচ ব্যবহার করিলে এবং ছাঁচ সামান্য খারাপ হইলেই তাহা বাতিল করিয়া দিলেই ইট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। অবশ্য কলে ইট প্রস্তুত করিলে ভালো ইট হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও একটি নূতন অসুবিধা আছে, কলে-তৈরি ইটগুলি কলের নিকট হইতে যেখানে বাড়ী হইবে সেখানে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয়, তাহাতে খরচ বেশী পড়ে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ যেখানে বাড়ী নির্ম্মিত হয় সেখানেই হাতে ইট প্রস্তুত করে। ইটের পাঁজাগুলি বড় বড় হওয়াতে এক সময়ে অনেক ভালো ইট পাওয়া যায় না। ঠাণ্ডা লাগিয়া এবং পরে রৌদ্র লাগিয়া অনেক ইট ফাটিয়া যায়, অনেক আমা ঝামা হয়। সেই হেতু হাতে ইট তৈরি করিয়া উহা পাঁজা করিয়া পোড়ানো ক্রমশ উঠিয়া যাইতেছে। আজ-কাল অনেক স্থলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইট প্রস্তুত হইতেছে। বালি ও সিমেণ্ট জমাইয়া আপোড়া কাঁচা টালি প্রস্তুত হইতেছে, সেই টালিতে ঘর ছাওয়া ও মেঝে সান বাঁধানো দুইই হইতে পারে। কলিকাতা চীনামাটির কারখানায় উৎকৃষ্ট চা'র বাটি, রেকাবি, দোয়াত, পুতুল প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। বিক্রয়ও ভালোই হইতেছে।

কল কারখানা হইয়া এই প্রকারের গৃহ-শিল্পের উন্নতির সুবিধা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। লোকে এনামেল ও চীনা-মাটির বাসন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। টীনের ল্যাম্প মাটির প্রদীপের স্থান অধিকার করিয়াছে। তবে দরিদ্র গ্রামবাসী লোহা কাঁসা বা তামার বাসন ব্যবহার করিতে পারে না; শাস্ত্রোল্লিখিত অনুষ্ঠানাদির জন্য ধনীকেও কিছু কিছু মৃৎ-পাত্র ব্যবহার করিতে হয়। সেই জন্য কুমোরদের শিল্প এখনো টিকিয়া আছে। কিন্তু ইহার উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি পড়া উচিত।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

কষ্টিপাথর

ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন (জ্যৈষ্ঠ)।

দেশীয় পুষ্পজাত রঞ্জন-উপকরণ—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার—

বর্ত্তমান সময়ে বস্ত্রাদি রঞ্জন কার্য্যের জন্য প্রায়শঃই কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত রং-সমূহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কৃত্রিম রং-সমূহের আবিষ্কারের পূর্ব্বে, এতদ্দেশে প্রচলিত রঞ্জন-উপকরণ-সমূহকে মোটামুটী পাঁচটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—১। পুষ্প—(পলাশফুল, কুসুমফুল প্রভৃতি)। ২। বৃক্ষলতাদির মূল—(হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, অল প্রভৃতি)। ৩। বৃক্ষকাষ্ঠ ও বল্কল—(কাঁঠাল, বাকম ও চন্দন কাষ্ঠ প্রভৃতি)। ৪। ফল বা বীজ (লটকান, কমলা প্রভৃতি)। ৫। বৃক্ষপত্র—(নীল, মেন্দী প্রভৃতি) ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশেই রঞ্জন-কার্য্যের জন্য এত প্রকার পুষ্পের ব্যবহার হয় না। পূর্ব্বে কুসুমফুল এবং কুমকুম ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে ইউরোপে প্রেরিত হইত। পরীক্ষা দ্বারা বহুস্থলে দেখা গিয়াছে যে অতি উজ্জ্বলবর্ণের পুষ্প হইতেও বস্ত্রাদি রঞ্জনের উপযোগী কোনও রং পাওয়া যায় না।

এদেশে যে-সমস্ত পুষ্প হইতে রং পাওয়া যায় তাহাদিগকে দুইটী সাধারণ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(ক) যে-সমস্ত পুষ্পের অংশবিশেষ হইতেই মাত্র রং পাওয়া যায়—(১) পলাশফুল, (২) কুসুমফুল, (৩) গেন্দাফুল, (৪) শেফালিকা, (৫) কুমকুম, (৬) মান্দারফুল—উক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। (খ) যে-সমস্ত পুষ্পের সমস্ত অংশ হইতেই রং পাওয়া যায়—(১) তুনফুল, (২) ধাইফুল, (৩) অমৃবার্গ, (৪) পাট্ বা পাটোয়া (রক্তজবা জাতীয় এক প্রকার ফুল) —শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত।

ক (১) পলাশফুলের কেবলমাত্র পাপড়ীসমূহ হইতে রং পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বাসন্তীপূর্ণিমায় হোলি উৎসবের সময় পীতবর্ণের রং প্রস্তুতের জন্য পলাশপুষ্পের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। বোধ হয় তাহা হইতে "বাসন্তী রং" কথাটার উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত পুষ্পজাত রং সহজেই ধৌত করিয়া ফেলা যায়। এখনও ভারতবর্ষ ও ব্রহ্ম-দেশের বহু স্থানে ইহা রঞ্জন-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

পলাশফুল দ্বারা বস্ত্রাদি রং করিতে হইলে এদেশে নিম্নোক্ত দুই প্রকার প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে :—১। প্রথমতঃ পুষ্প-গুলি কিছুক্ষণ উষ্ণজলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়; তাহা হইলেই জলে পুষ্প-মধ্যস্থ রং দ্রব হইয়া যায় এবং জল পীতবর্ণ ধারণ করে। পরে ঐ জল দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জন করিতে হয়। সমপরিমাণ পুষ্প ও জল

৩০ মিনিটকাল উত্তপ্ত করিলে রেশমী বস্ত্রাদি সুন্দর পাতলা হরিত্‌ বর্ণে রং করা যায়। রেশমখণ্ডকে পূর্ব্বে ফিটকারির জলে ডুবাইয়া, পরে পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে পলাশফুল দ্বারা রং করিলে পিঙ্গলবর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। উপরে লিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া কার্পাস বস্ত্রও পলাশপুষ্প দ্বারা রঞ্জন করা যায়। ২৫ ভাগ পুষ্পের ক্বাথের সহিত ৭ ভাগ ফিটকারী ও ১০০ শত ভাগ জল মিশাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিতে হয়, তাহা হইলেই ক্রমে একটা কঠিন পদার্থ জল হইতে পৃথক হইয়া আসে। পরে উক্ত কঠিন পদার্থটাকে ছাঁকিয়া ফেলিলে যে স্বচ্ছ জল পাওয়া যায় তাহাতে পশমী, বা কার্পাস বস্ত্র অর্দ্ধঘণ্টাকাল ডুবাইয়া রাখিলে বাদামীবর্ণে রঞ্জিত হইয়া যায়। পলাশপুষ্প দ্বারা উজ্জ্বলবর্ণে বস্ত্রাদি রং করা যায় না। প্রথমে কোনও মৃদু ধাতব-অম্লসহযোগে পলাশফুলের ক্বাথকে ফুটাইয়া পরে সাধারণ সোডা দ্বারা উহার অম্লগুণ নাশ করিয়া লইলে যে জল প্রস্তুত হয়, তৎসাহায্যে বিভিন্ন প্রকার রংবন্ধকারী (Mordant) সংযোগে নানা-প্রকার সুন্দর বর্ণে পশম রং করা যায়।—যথা, ফিটকারী সংযোগে উজ্জ্বল বাদামী বঙ্গ (টিন্) সংযোগে উজ্জ্বল পীত ; এবং লৌহ সংযোগে মেটে বাদামী। শুষ্ক এবং সদ্য পলাশফুল হইতে প্রাপ্ত রংএ কোনও প্রভেদ নাই।

২। মান্দারপুষ্প দ্বারা রঞ্জনপ্রণালী:—ফাল্গুনমাসের প্রথম ভাগে পুষ্পসমূহ সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়, এবং প্রয়োজন-মত ৪।৫ ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলেই সুন্দর লোহিতবর্ণের রং জলে নির্গত হইয়া আসে, তখন উহা দ্বারা বস্ত্রাদি সহজেই লোহিতবর্ণে রং করা যায়।

৩। গেন্দাফুল দ্বারা রঞ্জনপ্রণালী:—পলাশফুল হইতে যে উপায়ে রং প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, ঠিক তদনুরূপ পন্থা অনুসরণ করিতে হয়। গেন্দাফুল হইতে পীত রং প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৪। কুসুমফুল। পুষ্পজাত রঞ্জন-উপকরণ-সমূহের মধ্যে কুসুম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অতি প্রাচীন কাল হইতেই রঞ্জনশিল্পে বিশেষ আদৃত হইয়া আসিতেছে। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে মিশরদেশে প্রাচীন শবাধারসমূহে সংরক্ষিত শবপরিহিত বস্ত্র অনেক স্থলে কুসুমফুল দ্বারা রঞ্জিত। কোনও কোনও শবাধারে কুসুম-বৃক্ষাংশ ও কুসুম-বীজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বোম্বাই নগরে প্রতি টাকায় ১ সের হইতে সোয়া সের পর্য্যন্ত কুসুমফুলের পিষ্টক বা চাপ্‌টা কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি মণ ফুল ৫০ হইতে ৬০ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতে পারে।

রং-প্রস্তুত-প্রণালী :- দৈনিক সংগৃহীত পুষ্পসমূহকে হস্ত বা পদ দ্বারা উত্তমরূপে নিষ্পেষিত করিয়া ঝুড়িতে রাখিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধৌতজল বর্ণহীন ও স্বচ্ছ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ বা ঈষৎ-অম্ল জল দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিতে হয়। এইরূপ প্রক্রিয়ায় পুষ্পমধ্যস্থ ব্যবহার-অনুপযুক্ত পীত রং জলের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া চলিয়া যায়, অথচ প্রয়োজনীয় লোহিত বর্ণের রং পুষ্পমধ্যে থাকিয়া যায়। কিন্তু অম্ল-জলের পরিবর্ত্তে ক্ষার-জল ব্যবহার করিলে পুষ্পমধ্যস্থ লোহিত বর্ণের রংটাও জলে দ্রব হইয়া যায়। ধৌত করা হইলে পর উহাদিগকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চাপটা বা গুলি প্রস্তুত করা হয়। পূর্ব্বোক্ত পীতবর্ণের রংটাকে পরিত্যাগ করিয়া না লইলে রঞ্জনের উপকরণরূপে কুসুমফুলের মূল্য অনেকটা কমিয়া যায়। ঐ ধৌত-পুষ্প সহ ১॥০ তোলা সাজিমাটি এবং তিন পোয়া শীতলজল মিশাইয়া উহাদিগকে উত্তমরূপে নিষ্পেষিত করিয়া ৪ ঘণ্টা সময় রাখিয়া দিতে হয় ; পরে বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইলে যে লোহিতবর্ণের জল পাওয়া যায় তৎসঙ্গে কিছু লেবুর রস মিশাইয়া লইতে হয়। উক্ত উপায়ে প্রস্তুত জলমধ্যে কার্পাস বস্ত্র ১৫ মিনিটকাল ডুবাইয়া রাখিলে অতি উজ্জ্বল লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। পরিত্যক্ত পুষ্পগুলি পুনরায় তিনপোয়া জল সহ পূর্ব্ববর্ণিত পন্থানুসরণে রাখিয়া দিলে যে রঞ্জিত জল পাওয়া যায় তদ্দ্বারা কার্পাস বস্ত্র নাতিগাঢ় লোহিতবর্ণে রং করা যাইতে পারে। কুসুমফুল দ্বারা রেশম রং করিতে হইলে উহা ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলেই রেশম উজ্জ্বল পাটল (Pink) বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে।

৫। শেফালিকা পুষ্প দ্বারা রঞ্জনপ্রণালী:—শেফালিকার পাপড়ী হইতে কোনও রং পাওয়া যায় না। উহার পাদমূল বা নলই রংয়ের আধার। শেফালিকা বৃক্ষের বল্কল হইতেও একপ্রকার পীত বর্ণের রং প্রাপ্ত হওয়া যায়। পত্রেও পীত রং বর্ত্তমান আছে। শুষ্ক ফুল ফুটন্ত জলে ফেলিয়া জল গভীর পীতবর্ণ ধারণ করিলে সেই জলে রঞ্জনীয় বস্ত্র কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলেই উহা পিঙ্গল বা গন্ধকবৎ পীত (Golden yellow) বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। রং স্থায়ী করার জন্য নাইট্রিক এসিডের ব্যবহারই শ্রীহট্টে প্রচলিত প্রণালীর বিশেষত্ব। ভারঙ্গ জেলায় শেফালিকা ফুল দ্বারা কখনও কখনও রেশমীসূত্র রঞ্জিত হইয়া থাকে। ইহাতে জল মোটেই উত্তপ্ত করিতে হয় না। কিন্তু শেফালিকা-পুষ্পজাত রং মোটেই স্থায়ী নহে ; লেবুর রস ও ফিটকারী সহযোগে রঞ্জন করিলে রং অনেকটা উজ্জ্বল ও স্থায়ী হয়। ইহা সাধারণতঃ হরিদ্রা ও কুমকুম্ এবং কখনও কখনও নীল ও পলাশ-ফুলের সহিত একত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ফুল পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং পাঞ্জাবে প্রতি মণ দশ টাকা হইতে ৬০ টাকা পর্য্যন্ত, অযোধ্যায় প্রতি মণ ৬।৷০ টাকা হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত এবং বঙ্গদেশে প্রতিমণ ৭।৷০ টাকা হইতে ৭০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হইত।

৬। কুমকুম দ্বারা রঞ্জনপ্রণালী—পুষ্প রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পরে পুষ্পদল-মধ্যস্থ নলাকার দণ্ডত্রয় (stigma) পৃথক করা হয়। উহাদের অগ্রভাগস্থিত লোহিত পিঙ্গলবর্ণ মণ্ডলাকার অংশ হইতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বা "সহি জাফরান" প্রস্তুত হয়, এবং উহাদের শ্বেতবর্ণ নীচের অংশ হইতে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বা দ্বিতীয় নম্বর জাফরান প্রস্তুত হইয়া থাকে। "সহি জাফরান" অতি মূল্যবান এবং উৎকৃষ্ট জিনিষ। বাজারে উহা ক্রয় করিবার প্রয়াস দুরাশামাত্র। কুমকুম্ পুষ্পের পাপড়ীগুলি রঞ্জনকার্য্যোপযোগী বা গন্ধযুক্ত নহে, সাধারণতঃ পাপড়ীগুলিকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া কুমকুমের সহিত ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। কুমকুম্ দ্বারা বস্ত্রাদি উজ্জ্বল পীতবর্ণে রং করা যায়।

৭। চিঃ-চিয়-হুয়া দ্বারা রঞ্জনপ্রণালী।—উত্তর আরাকানের চীনাদিগের মধ্যে এবং আসামের কোনও কোনও পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে রঞ্জন-কার্য্যের জন্য উক্ত পুষ্পের ব্যবহার প্রচলিত আছে। ললনাগণ এই ফুলের পাপড়ীর ক্বাথ দ্বারা হস্ত ও পদনখ লোহিতবর্ণে রঞ্জিত করিয়া থাকেন বলিয়া ইহা "চিঃ-চিয়-হুয়া" (নখ পুষ্প) আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতী (আষাঢ়)।

মল্লিনাথ—শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল—

সংস্কৃত সাহিত্যে ভাষ্য, বৃত্তি ও টীকাকারগণ সর্ব্বদা সম্মানিত। কারণ তাঁহারা সকলেই মহামনীষী, যেমন—বেদের ভাষ্যকর্তা সায়ণাচার্য্য, উপনিষদ বেদান্ত গীতার ভাষ্যকর্তা শঙ্করাচার্য্য, ন্যায়-দর্শনের ভাষ্যকর্ত্তা বাৎস্যায়ন, কাব্যের টীকাকার মল্লিনাথ।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষে মনীষী মল্লিনাথ একে একে মহাকাব্যগুলির টীকা রচনা করেন। তাঁহার টীকাগুলি অভিনব প্রণালীতে রচিত, পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরাকাষ্ঠাপূর্ণ। মল্লিনাথেরও জীবনচরিতের বিশদ ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য। ভোজপ্রবন্ধে মল্লিনাথ-সম্পর্কে এক কাহিনী বর্ণিত আছে, কিন্তু ভোজপ্রবন্ধের উপাখ্যান বিশ্বাসযোগ্য নহে। দাক্ষিণাত্যদেশে প্রচলিত কানাড়ী ভাষায় রচিত কথাসংগ্রহ নামক গ্রন্থে পেদ্দভট্টচরিতম্ নামক এক উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। মল্লিনাথেরই অপর নাম পেদ্দভট্ট। সে কাহিনী এইরূপ—দেবপুর গ্রামে মল্লিনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম দেববর্ম্মণ। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু মল্লিনাথ এত স্থুলবুদ্ধি যে কিছুই শিক্ষা করিতে পারেন নাই। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মল্লিনাথ বিবাহ করিলেন। মল্লিনাথ পূর্ব্ব হইতেই নিজ মূর্খতার জন্য পেদ্দভট্ট নামে কথিত হইতেন। এখন শ্বশুরালয়ে বহুবিধ বিদ্রূপ তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। পত্নীর উপদেশে মল্লিনাথ শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে উপনীত হইলেন ও এক অধ্যাপকের গৃহে পাঠার্থে গমন করিলেন। অধ্যাপক তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন পথে বসিয়া "ওঁ নমঃ শিবায়" এই কয়েকটি কথার উপর দাগা বুলাও। মল্লিনাথ তাহাই করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক নিজ পত্নীকে আদেশ দিলেন মল্লিনাথের খাদ্যে ঘৃতের পরিবর্ত্তে নিম্বতৈল দিবে। দেখ সে ঘৃতের অভাব বুঝিতে পারে কি না। বহুদিনে মল্লিনাথ ক্রমশঃ বর্ণমালা শিখিলেন। নিম্বতৈল তখন তাঁহার বিস্বাদ লাগিল। তিনি গুরুপত্নীর নিকট এ কথা জানাইলেন। অধ্যাপক এ কথা শুনিয়া মল্লিনাথের বুদ্ধির উদয় হইয়াছে বুঝিয়া মহাআনন্দে তাঁহাকে সমীপে আহ্বান করিলেন ও প্রাণপণে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মল্লিনাথ মহাপণ্ডিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, তারপর প্রতিপক্ষ পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই তিনি অক্ষয় গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ইহা কালিদাসের জীবনের প্রবাদের অনুরূপ।

মল্লিনাথ প্রায় সকল টীকাতেই নিজনাম উল্লেখ করিবার সময় লিখিয়াছেন "মহোপাধ্যায়কোলাচলমল্লিনাথসূরি।" কোলাচল, কোলচল বা কোলচলম্ কাহারও মতে মল্লিনাথের বংশনাম, কাহারও মতে মল্লিনাথের বাসস্থলের নাম। নানা প্রমাণ হইতে জানিতে পারা যায় যে কোলচলম্ মল্লিনাথের বংশ-নাম।

প্রচলিত অভিধানে 'মল্লিনাথ' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না! কিন্তু মহাদেবের স্থানীয় নাম মল্লিনাথ হইতে তাঁহাদের বংশে অনেকেই মল্লি ও মল্লিয়া নামে আখ্যাত হইতেন।

মল্লিনাথ মহোপাধ্যায় নামক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

মল্লিনাথের দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম পেদ্দযার্য্য ও কুমারস্বামী।

কালিদাসকে তিনি কবিশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতেন। রঘুবংশ-টীকায় তিনি লিখিয়াছেন "সকলকবিশিরোমণিঃ কালিদাসঃ।" অন্যান্য কবিগণের বেলায় বলিয়াছেন "তত্রভবান্ মাঘকবিঃ" (শিশুপালবধ-টীকা) "তত্রভবান্ ভারবি-নামা কবিঃ (কিরাতার্জ্জুনীয়-টীকা)। একটী উদ্ভট শ্লোকও মল্লিনাথ-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে—"কালিদাস-কবিতা......সম্ভবন্তু মম জন্মজন্মনি" জন্ম জন্ম যেন কালিদাসের কবিতা পাই।

দক্ষিণাবর্ত্তনাথ প্রভৃতি কয়েকজন প্রশংসনীয় টীকাকারের কথা মল্লিনাথ উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি ইঁহাদেরই অনুসরণে টীকা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। কাজেই মহাকাব্যের টীকা রচনায় মল্লিনাথ প্রথম পথপ্রদর্শক নন। যে তিনখানি কালিদাসের কাব্য মল্লিনাথ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত। তিনখানি টীকার নামই সঞ্জীবনী। মহাকবি ভারবি-রচিত কিরাতার্জ্জুনীয় নামক মহাকাব্যের টীকা ঘণ্টাপথ নামে বিখ্যাত। মল্লিনাথের পঞ্চম টীকা মাঘকবি-রচিত শিশুপালবধকাব্যের সর্ব্বঙ্কষা নামক ব্যাখ্যা। মল্লিনাথের আর একখানি টীকা মহাকবি শ্রীহর্ষ-রচিত নৈষধীয়-চরিতের জীবাতু নামক ব্যাখ্যা। সম্প্রতি সর্ব্বপথীনা নামক মল্লিনাথকৃত ভট্টিকাব্যের টীকাও প্রচারিত হইয়াছে। মল্লিনাথ বিদ্যাধর-বিরচিত 'একাবলী' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার নাম তরল। এতদ্ব্যতীত তার্কিকরক্ষা নামক গ্রন্থের একখানি টীকাও মল্লিনাথ রচনা করিয়াছিলেন, ইহার নাম নিষ্কণ্টিকা। মল্লিনাথ ও তাঁহার পুত্র কুমারস্বামীর উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সিদ্ধাঞ্জন নামে তন্ত্রবার্ত্তিক গ্রন্থের ও স্বরমঞ্জরী-পরিমল নামক একখানি গ্রন্থের টীকা মল্লিনাথ কর্ত্তৃক রচিত হয়। প্রশস্তপাদভাষ্যের একখানি টীকাও মল্লিনাথ রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রশস্তপাদভাষ্য বৈশেষিক দর্শনের ব্যাখ্যা। তাঁহার মৌলিক কবিপ্রতিভাও অসাধারণ ছিল। তিনি টীকাগুলির মধ্যে মধ্যে মঙ্গলাচরণার্থ যে শ্লোক রচনা করিয়াছেন তাহা হইতেই তাঁহার কবিত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার প্রধান মৌলিক রচনা রঘুবীর-চরিত নামক কাব্য। শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী যিনি মহাকবি ভাসের বিলুপ্তপ্রায় নাটকগুলি আবিষ্কার করিয়া জগদ্বিদিত হইয়াছেন, তিনি মল্লিনাথরচিত "রঘুবীর-চরিতের" কয়েক পৃষ্ঠা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ছেলেদের জন্য একটী ধর্ম্মপাঠশালা খোলা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ পড়াইতেন। এই পাঠশালায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে জ্যোতিবাবুর বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। ছেলেবেলায় অক্ষয়চন্দ্রকে জ্যোতিবাবুদের বাড়ীর সকলেই "Poet" "Poet" বলিয়া ডাকিত। সেকালে কেবল শীতকালেই চায়ের বরাদ্দ ছিল। এ চা চীন-দেশের চা—তখনও আসামের চা আমাদের দেশে প্রচলিত হয় নাই। সে চা'য়ের কি সুগন্ধ! তখন বাহির মহলে হিন্দুস্থানী দরোয়ান্ ও অন্দর মহলে বাঙ্গালী সর্দ্দার পাহারা দিত। সাহেব ডাক্তারের উপর তখন সকলের অসীম বিশ্বাস ছিল। সৌভাগ্য-ক্রমে এখন সে বিশ্বাস অনেকটা চলিয়া গিয়াছে। জ্বর হইলে জ্যোতিবাবুদের গৃহচিকিৎসক দ্বারিবাবু প্রথম দিন আসিয়াই দীর্ঘ-চ্ছন্দে বলিতেন "তে—ল্"। অর্থাৎ Castor Oil।—এই তেলের নাম শুনিলেই রোগীর আতঙ্ক উপস্থিত হইত। চিকিৎসার ঔষধ যেমন তিক্ত, পথ্যও তেমনি অরুচিকর ছিল। আর তৃষ্ণা পাইলে গরম জল। চলিত কথায় দ্বারিকানাথ গুপ্তের জ্বরের ঔষধই এখন ডি, গুপ্তর মিক্শ্চার—ডি, গুপ্ত ঔষধ নামে বিখ্যাত। অপর গৃহচিকিৎসক বেলি সাহেবের ব্যবস্থাপত্র অনুসারেই দ্বারি বাবু নাকি জ্বরের এই ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ডাক্তার বেলি অতি সদাশয় লোক ছিলেন। রাত্রে কেহ তাঁহাকে ডাকিতে গেলে, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার উপর খড়্গ-হস্ত হইতেন, কিন্তু ইঁহাদের বাড়ী হইতে কেহ গেলে তিনি স্ত্রীর কথা শুনিতেন না, বলিতেন

'Governor তাঁহার হস্তে বাড়ীর স্বাস্থ্যরক্ষার ভার দিয়া শিমলা-পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি কিছুতেই কর্ত্তব্য অব-হেলা করিতে পারিবেন না।' বেলি সাহেব শিশু রবীন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন, দেখা হইলেই তিনি রবিকে "Robin, Robin" করিয়া আদর করিতেন। তখন কলিকাতায় খোলা নর্দ্দমা ছিল। চারিদিকেই দুর্গন্ধ। তখন গঙ্গায় সহরের ময়লা ফেলা হইত। সন্ধ্যার আরম্ভেই মশকের ঝাঁক চক্রাকারে মাথার উপর ঘুরিতে ঘুরিতে বোঁ বোঁ শব্দে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিত। তখন কলের জল ছিল না! লালদীঘি হইতে পানীয় জল আসিত। মাঘ মাসে গঙ্গা হইতে জল আনাইয়া বড় বড় জালা ভরিয়া রাখা হইত। তাহাতেই সম্বৎসর কাজ চলিয়া যাইত। তখনকার যোড়াসাঁকোর বাড়ীর পুকুরের সঙ্গে গঙ্গার যোগ ছিল। স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ ঠাকুর গবর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপ্যালিটির হস্তে এক থোকে কিছু টাকা দিয়া গঙ্গা হইতে সেই পুকুর পর্য্যন্ত একটা পাকা নহর কাটাইয়া লইয়াছিলেন। পুকুরের জল শুকাইলেই সেই নহর দিয়া গঙ্গার জল আনা হইত। এখনকার মুনিসিপ্যালিটি কিছু ক্ষতিপূরণের টাকা ধরিয়া দিয়া এই নহর এখন উঠাইয়া দিয়াছেন। এই সময়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে একজন মালিনী অন্তঃপুরের জন্য ফুলের মালা এবং বাবুদের গুড়্‌গুড়ির মুখনলের জন্য ফুলের ভূষণ নিত্যই প্রস্তুত করিয়া দিয়া যাইত। "হুঁকা বরদার" বলিয়া তামাক সাজিবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ ভৃত্য নিযুক্ত থাকিত, "বাস্তবিক তাহার-সাজা তামাকের ধূমোত্থিত সুগন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া উঠিত।" একজন ভবিয়ুক্ত তিলক-কাটা বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী অন্দরে মেয়েদের লেখা পড়া শিখাইতে আসিতেন। গিব্রেল্ নামে একজন ইহুদী আতর গোলাপ প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সরবরাহ করিত। 'বাচ্চা' বলিয়া একজন কাবুলীওয়ালা জ্যোতিবাবুদের বাড়ীতে বেদানা পেস্তা প্রভৃতি ফল সরবরাহ করিত। সে ছেলেদিগকে তাহার ঝুলির ভিতর ভরিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া ভয় দেখাইত—এজন্য ছেলেরা তাহাকে খুব ভয় করিত। সদর দেউড়ীতে দরোয়ান্ ছিল, কিন্তু প্রত্যেক বাবুর বসিবার ঘরের (Drawing Room) দরজায় এক একজন হর্‌করা থাকিত। কোনও ভৃত্যকে ডাকিতে হইলেও সেই ডাকিয়া দিত। বাবুদের প্রত্যেক বৈঠকখানাতেই ফরাশ বিছানা, মাঝখানে মছলন্দ-পাতা, তাকিয়া-দেওয়া, গদিওয়ালা একটা উচু বসিবার আসন থাকিত—তাহাতেই একেলা বাবু বসিতেন। নীচের ফরাশে অভ্যাগত ও মোসাহেবগণ বসিত। এরূপ বিছানা এখন বিবাহ-সভায় বরের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহাই হউক, এই-সবই ছিল সেকেলে নবাবী আমলের চাল ও কায়দা। কিন্তু মহর্ষির কক্ষটি অত্যন্ত সাদাসিদে রকমে সজ্জিত ছিল—সেখানে আসনের উচ্চ নীচ কোন পার্থক্যই ছিল না। "ব্রাহ্মসমাজই আমা-দের পরিবারের মধ্যে democracy-র ভাবটা আনিয়াছে।" "মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় তখন আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসিতেন। আমার ভগ্নিপতি শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার খুবই আলাপ-পরিচয় ছিল! রঙ ময়লা, চুলগুলি ইংরেজী ফ্যাশানে ছাঁটা বেশ কোঁকড়া কোঁকড়া, মাঝখানে সাঁথি। চোখ দু'টি বড় বড়, চেহারাটা দোহারা। তাঁর গলার আওয়াজ ছিল ভাঙা ভাঙা। আমার মনে পড়ে একদিন তিনি তাঁর "মেঘনাদবধ" কাব্যের পাণ্ডুলিপি তাঁহার সেই ভাঙাগলায় পড়িয়া সারদা বাবুকে শুনাইতে-ছিলেন। তাঁহার কবিতা পাঠের কায়দাই ছিল এক স্বতন্ত্র। প্রত্যেক কথাটি স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া, থামিয়া থামিয়া এবং পৃথক পৃথক করিয়া একটানে বলিয়া যাইতেন, যথা "সম্মুখ—সমরে—পড়ি—বীর—চূড়া—মণি—বীর—বাহু চলি—যবে—গেলা—যম—পুরে—অকালে—কহহে—দেবী—" ইত্যাদি। সে আবৃত্তিতে কোনপ্রকার ভাব প্রকাশের চেষ্টা থাকিত না। তিনি অতি সহৃদয়, আমুদে, এবং মজ-লিশি ব্যক্তি ছিলেন। গল্পগুজবও বেশ করিতে পারিতেন। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত এবং অনুগত লোক ছিলেন। যে কাযেই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ দিকে তিনি একজন কাব্যরসিক এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মাইকেলের নিকট হইতে "ব্রজাঙ্গনা" কাব্যের পাণ্ডুলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি, কাব্যখানির উপর তিনি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন; মাইকেল তাই জানিতে পারিয়া—"ব্রজাঙ্গনা"র সমস্ত স্বত্ব (copyright) সেই পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই বৈকুণ্ঠবাবুকে দান করেন। বৈকুণ্ঠবাবু নিজব্যয়ে কাব্যখানি প্রথম প্রকাশ করেন।"

ভারত ষড়ঙ্গ—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

১। রূপভেদাঃ—রূপে রূপে বিভিন্নতা, রূপের মর্ম্মভেদ বা রহস্য উদ্ঘাটন,—জীবিত রূপ, নির্জ্জিত রূপ, চাক্ষুষ রূপ, মানস রূপ, সু রূপ, কু রূপ ইত্যাদি। প্রথমে রূপের সহিত চোখের পরিচয়, ক্রমে তাহার সহিত আত্মার পরিচয়—ইহাই হচ্ছে রূপভেদের গোড়ার কথা এবং শেষের কথা। চক্ষু দিয়া যখন রূপভেদ বুঝিতে চলি তখন এক রূপের সহিত আর-এক রূপের তুলনা দিয়া দুয়ের পার্থক্য দেখিতে চলি। কার্য্যের ভিন্নতা, বেশের ভিন্নতা—এমন কি আকৃতির ভিন্নতা দিয়াও চিত্রিত রমণী-রূপটির সত্তা—যেমন তাঁহার মাতৃত্ব, ভগ্নীত্ব, দাসীত্ব ইত্যাদি—সপ্রমাণ করিতে পারি না। কাজেই কেবল দুই চোখের উপর, চিত্রে রূপভেদটি দেখাইবার সম্পূর্ণ ভার দিয়া, আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না; চিত্রকরের পক্ষে একমাত্র চক্ষুর পথই উত্তম পথ নয়; কেননা রূপের বহিরঙ্গীণ ভিন্নতা ধরিতে ও ধরিয়া দিতে পারিলেও চক্ষু বিভিন্ন রূপের আসল ভেদাভেদটাকে ধরিতে পারে না, ধরিয়া দিতেও পারে না। রূপের মর্ম্ম, কেবল জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারাই আমরা ধরিতে পারি। আমাদের রুচি অনুসারে আমরা রূপে সু কু দুই ভিন্নতা দিই। রুচি হচ্ছে আমাদের মনের দীপ্তি বা চিরযৌবন-শোভা। ইহারি দ্বারা রূপবান বস্তুমাত্রেরই রুচিরতা আমরা অনুভব করি। যাহারই মন আছে তাহারই রুচি আছে; তেমনি আকৃতিমাত্রেরই নিজের নিজের একটা রুচি বা দীপ্তি অথবা শোভা আছে; এই দুই রুচির মিলন যখনি হইতেছে তখনি দেখিতেছি সুরূপ; আর তদ্বিপরীতেই যেন দেখিতেছি রূপহীন। সুতরাং রূপ দেখিতে এবং রূপকে রেখাদির দ্বারা চিত্রিত করিয়া দেখাইতে হইলে এই রুচি—মনের দীপ্তি বা চির-যৌবনশোভাই হচ্ছে চিত্রকরের একমাত্র সহায় এবং চিরসঙ্গী। সকল মানুষের অন্তঃকরণে এই রুচি সমভাবে উজ্জ্বল নহে। এই জন্য তোমার দেখায় এবং আমার দেখায়, আমার চিত্রিতে ও তোমার চিত্রিতে রূপের প্রভেদ ঘটে ও উত্তমাধম ভেদাভেদ থাকে। এই মনের রুচি বা দীপ্তিকে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলাই হচ্ছে রূপ-সাধনা। এই দীপ্তির প্রেরণা দিয়া চিত্রের রেখা দীপ্তিমতী, লিখিত আকৃতির রূপ দীপ্তিমতী করিয়া তোলাই হচ্ছে ষড়ঙ্গের প্রথম ভেদা-ভেদ—রূপভেদ—দখল করা। আলোকের ন্যায়, সকল বস্তুর যাথার্থ্য-প্রকাশক অন্তঃকরণ যখন যে-বস্তুর উপরে পড়ে তখন সেই বস্তুরই আকার প্রাপ্ত হয়।

২। প্রমাণানি—বস্তুরূপটির সম্বন্ধে প্রমা বা ভ্রম ভিন্ন জ্ঞানলাভ করা, বস্তুর নৈকট্য, দূরত্ব ও তাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ইত্যাদির মান পরিমাণ—এককথায় বস্তুর হাড়হদ্দ।

কয়েক-অঙ্গুলী-পরিমিত পটখানিতে আমায় সমুদ্র দেখাইতে হইবে। সমস্ত কাগজখানিকে নীল বর্ণে ডুবাইয়া বলিতে পারিতেছি না যে, এই সমুদ্র। অনন্তের কিছুমাত্র আভাস তাহাতে নাই। এই সময়েই আমরা সমুদ্রের অনন্ত বিস্তারকে আকাশ এবং তট এই দুই সীমা দিয়া পরিমিতি বা প্রমিতি দিতে চলি। আমরা তটকে পটের এতখানি, আকাশকে এতখানি স্থান অধিকার করিতে দিব ও বাকি স্থানটি সমুদ্রের জন্য ছাড়িয়া দিব;—এই হইল আমাদের প্রমাতৃচৈতন্য বা প্রমার প্রথম কার্য্য। তাহার পরে প্রমা দ্বারা আমরা নিরূপণ করিতে বসি—বালুতটের সহিত সোনার-আলোয়-রঞ্জিত আকাশের পীতবর্ণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদ, দুয়ের মধ্যে স্বচ্ছতা ও কর্কশতার ভেদ এবং তট ও আকাশ দুয়ের সহিত জলের তরঙ্গিত-রূপ ও বর্ণের ভেদ, সমুদ্রের তরঙ্গমালার সহিত আকাশের মেঘমালার রূপভেদ ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকৃতিভেদ, বর্ণভেদ, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বিস্তারাদি ভেদ; শুধু ইহাই নয় ভাবের ভেদ পর্য্যন্ত! আকাশের নির্নিমেষ নীরবতা, সমুদ্রের সনির্ঘোষ চঞ্চলতা, এমন কি তটভূমির সসহিষ্ণু নিশ্চলতাটি পর্য্যন্ত! পরিষ্কার আকাশের দীপ্তির গভীরতা, সুনীল জলের দীপ্তির গভীরতা এবং তটভূমিতে যে সন্ধ্যার আলোটি দীপ্তি পাইতেছে বা সমস্ত ছবিটির উপরে রাত্রির যে গভীরতাটুকু ঘনাইয়া আসিতেছে সেটুকু পর্য্যন্ত প্রমার দ্বারা পরিমিতি দিয়া আমরা নিরূপণ করিয়া লই। তট, সমুদ্র এবং আকাশ—ইহাদের মধ্যে দূরত্ব ও নৈকট্য ইহাও আমরা প্রমার সাহায্যে অনুমান করিয়া লই। এই প্রমা হচ্ছেন, সান্ত এবং অনন্ত উভয়কে মাপিয়া লইবার, বুঝিয়া দেখিবার জন্য, আমাদের অন্তঃকরণের আশ্চর্য্য মাপকাঠিটি। ইহা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রেরও মাপ দিতেছে, বৃহৎ হইতে বৃহতেরও মাপ দিতেছে, গভীর অগভীর দুয়েরই মাপ দিতেছে;—রূপেরও মাপ দিতেছে, ভাবেরও মাপ দিতেছে, লাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ সকলেরই মাপ এবং জ্ঞান দিতেছে।

প্রমা যে কেবল দূর ও নৈকট্য বোঝায় তাহা নয়। সে কোন্ জিনিসটিকে কতখানি দেখাইলে সেটি মনোহর হইবে তাহাও নির্দ্দিষ্ট করে। তাজের মণিমাণিক্যের জন্য তাজ সুন্দর নয়; তাহার আশ্চর্য্য পরিমিতিই তাহাকে সুন্দর করিয়াছে। ইউরোপের বিখ্যাত মিলো'র "ভিনস" মূর্ত্তির হারানো দুটি হাত এ পর্য্যন্ত কেহ মিলাইয়া দিতে পারিল না—সহস্র চেষ্টাতেও। কি আশ্চর্য্য পরিমিতিই, অজ্ঞাত শিল্পীর প্রমা, ভিনস্ মূর্ত্তিটিকে দিয়া গিয়াছে!

সুতরাং দেখিতেছি "প্রমাণাণি" কেবল অঙ্কশাস্ত্রের ইঞ্চি গজ ও ফুট নয়। সে আমাদের প্রমাতৃচৈতন্য:—যাহা অন্তর বাহির দুইকেই পরিমিতি দিতেছে।

বস্তুরূপটি গোচরে আসিবামাত্র প্রমাতৃচৈতন্য হইতে অন্তঃকরণ-বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া প্রমেয় বা বস্তুরূপটিকে গিয়া অধিকার করে: তখন ঐ অন্তঃকরণ, প্রমেয় যে বস্তুরূপ তাহাতে সঙ্গত হইয়া তদাকারে পরিণত হয় অর্থাৎ মন বস্তুরূপ ধারণ করে এবং বস্তুরূপ মনোময় হইয়া উঠে। সুতরাং দেখিতেছি, একদিকে আমাদের অন্তরেন্দ্রিয় এবং বহিরিন্দ্রিয়সকল, আর একদিকে অন্তর্বাহ্য দুই দুই বস্তুরূপ;—এতদুভয়ের মধ্যে প্রমাতৃ-চৈতন্য হচ্ছেন যেন মানদণ্ড বা মেরুদণ্ড। এই মানদণ্ডটি আমরা শিশুকাল হইতেই নানা বস্তুর উপরে প্রয়োগ করিতে করিতে তবে উচ্চ নীচ, দূর নিকট, সাদা কালো, জল স্থল ইত্যাদির ভেদাভেদজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই: এবং নিত্য ব্যবহারের দ্বারা ইহাকে আমরা প্রখরতর করিয়া তুলি। প্রমাকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখাই হচ্ছে ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় সাধনা।

৩। ভাব:—আকৃতির ভাবভঙ্গী, স্বভাব ও মনোভাব ইত্যাদি এবং ব্যঙ্গ্য।

শরীর এবং ইন্দ্রিয়সকলের বিকারবিধায়ক হচ্ছেন ভাব: বিভাব-জনিত চিত্তবৃত্তি হচ্ছেন ভাব। নির্ব্বিকার চিত্তে ভাবই প্রথম বিক্রিয়া দান করেন।

চিত্ত স্বভাবত স্থির থাকিতে চাহিতেছে, সে স্বভাবত নির্ব্বিকার; তাহার নিজের কোনো বর্ণ নাই কিম্বা চঞ্চলতা নাই,—ভাবই তাহাকে বর্ণ দিতেছে, চঞ্চলতা দিতেছে। এই ভাবের কার্য্যটি আমরা চোখ দিয়া ধরিতে পারি। চোখে আমরা ভাবকে দেখি ও দেখাই ভঙ্গী দিয়া—ত্রিভঙ্গ, সমভঙ্গ, অতিভঙ্গ ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত এবং অগণিত শাস্ত্রছাড়া, সৃষ্টি-ছাড়া ভঙ্গী দিয়া। কিন্তু ভাবের ব্যঞ্জনা বা নিগূঢ় ভাবটি আমরা কেবল মন দিয়া অনুভব করিতে পারি। চিত্রিতের কেবল স্ফুট দিকটি অর্থাৎ ভঙ্গীর দিকটি দেখাইলে চলেনা: চিত্র অসম্পূর্ণ থাকে,—ইঙ্গিতের অভাবে, ব্যঙ্গের অভাবে। চিত্র করিবার সময়, দেখাইব কতখানি, এটাও যেমন ভাবিতে হইবে, দেখাইব না কতখানি, তাহাও বিচার করিতে হইবে।

কি দিয়া ভাবের প্রচ্ছন্নতাকে বুঝাইব? প্রচ্ছন্ন যাহা তাহাকে খুলিয়া দেখাইলে তো সে আর প্রচ্ছন্ন রহে না। ছায়া দেখাইতে হইলে আমরা যেমন আতপের সম্মুখে কোনো এক পদার্থ আড়াল করিয়া ধরিয়া দেখাই, এই ছায়া, তেমনি চিত্রেও ব্যঞ্জনা দিই আমরা, যেটা প্রচ্ছন্ন তাহার আর যেটা স্ফুট তাহার মাঝে কিছু-একটা আড়াল দিয়া। ভাবের ভঙ্গীর বা বাহিরের দিক, চিত্রের রেখা, বর্ণ ইত্যাদি দিয়া খুলিয়া বলা চলে কিন্তু ভাবের ব্যঙ্গের দিক বা অন্তরের দিক আবছায়া দিয়া ঢাকিয়া দেখানো ছাড়া উপায় নাই। টানে যেটা প্রকাশ হয় না, টোনে তাহা প্রকাশ করে। চিত্রে ভঙ্গী দিয়া ভাব প্রকাশ করা সহজ; কিন্তু চিত্রিতের মধ্যে ব্যঙ্গাটি দেওয়া সহজ কার্য্য নহে। এই ব্যঙ্গ্য যে-চিত্রকর যত সুচারুভাবে নিজের চিত্রে প্রকাশ করেন, ততই তাঁহার অধিক গুণপনা।

একবার এক জাপানসম্রাট চিত্রকরগণের এই ব্যঙ্গ্য-প্রয়োগ-শক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সকল চিত্রকরকেই একটি কবিতার এক ছত্র চিত্রিত করিতে দেওয়া হইল; যথা—"বিজয়ী বীরকে অশ্ব বহিয়া আনিয়াছে,—বসন্তের পুষ্পিত ক্ষেত্রসকলের উপর দিয়া।" কত চিত্রকর কত ভাবেই এই কবিতা চিত্রিত করিয়া দেখাইল কিন্তু সম্রাট কাহাকেও পুরস্কার দিলেন না, পুরস্কার পাইল সেই চিত্রকর যে ধূলায় সের অশ্বটির পদচিহ্নের কাছে একটি প্রজাপতি লিখিয়া ইঙ্গিতে জানাইল—অশ্বক্ষুরলগ্ন নানা পুষ্পরসের শেষ সৌরভটুকু!

ফুলের মধ্যে সৌরভটুকু যেমন, চিত্রের মধ্যে ব্যঞ্জনাটুকু তেমনি। রূপ আছে, ভাবভঙ্গী আছে, প্রমাণাদি সবই আছে, কিন্তু ব্যঞ্জনা নাই, সৌরভ নাই:—সে যেন গন্ধহীন পুষ্পমালা। এরূপ ব্যঞ্জনাবিহীন চিত্র যে কিছু নয় তাহা বলা যায় না: কিন্তু একথাও বলা চলেনা যে, তাহা উত্তম চিত্র; কেননা তাহা "অব্যঙ্গ্য" সুতরাং "অবর"। শুধু ভাবের ভঙ্গীটুকু দিয়া তুলি রাখিয়া দিলে দর্শকের মন যাইয়া চিত্রে মজে না। চিত্রের ভাবভঙ্গীটি হয় তো আমাদের মনকে তখনকার মত কাঁদাইয়া কিম্বা আনন্দ দিয়া ছাড়িয়া দেয়; কিন্তু মনটি গিয়া চিত্রে বসিয়া নব নব ভাবরস পাইয়া মুগ্ধ হইয়া যায় না। এমন কি, একরূপ চিত্র বারম্বার দেখিতে দেখিতে মনে একটা অরুচিও আসিয়া পড়া সম্ভব। ব্যঙ্গ্য এই অরুচির হাত হইতে চিত্রকে ও ভাবকে রক্ষা করে;—সেটিকে নব নব দিক দিয়া আমাদের নিকটে

উপস্থিত করিয়া তাহাকে পুরাতন হইতে দেয় না। ভাবের কার্য্য হচ্ছে রূপকে ভঙ্গী দেওয়া। এবং রূপের আড়ালে মনোভাবের ইঙ্গিতটিকে যেন অগুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে ব্যঙ্গ্যের কার্য্য।

৪। লাবণ্যযোজনম্ যথোপযুক্ত এবং যথাযথ মনোহর একটি সীমার মধ্যে আনিয়া—রূপকে যেমন পরিমিতি দেয় প্রমাণ, তেমনি অদ্ভুত ও উচ্ছৃঙ্খল ভঙ্গী হইতে নিরস্ত করিয়া লাবণ্য পরিমিতি দেন ভাবের কার্য্যকে বা ভঙ্গীকে—ভাবের তাড়নায় ভঙ্গী ছুটিয়া চলিয়াছে —লাবণ্য আসিয়া তাহাকে শান্ত করিতেছে। প্রমাণের বন্ধনে যে কঠোরতাটুকু আছে, লাবণ্যের বন্ধনে সেটুকু নাই; অথচ সেও বন্ধন;—সুনিশ্চিত, একটি সুন্দর, সুকুমার বন্ধন। প্রমাণ যেন মাষ্টার, বেত মারিয়া সবলে ছেলেকে সোজা করিতেছে; আর লাবণ্য যেন মা, নানা ছলে ছেলেকে ভুলাইয়া যথেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন। রুচি যেমন রূপে দীপ্তি দেয়, লাবণ্য তেমনি ভাবে দীপ্তি দিয়া থাকে। লাবণ্যরেখাটি হচ্ছেন সকল সময়ে শুচি এবং সংযতা। তিনি ভাবাদির সহিত যুক্তা হইতেছেন বটে কিন্তু সর্ব্বদা নিজের স্বাতন্ত্র্যবজায় রাখিয়া। লাবণ্য চিত্রের ভিতরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজ করে অথচ আড়ম্বরটি তাহার সবার অপেক্ষা কম। লাবণ্য নিজে শুদ্ধা এবং সংযতা, সুতরাং যাহাকেই স্পর্শ করেন তাহাকেই বিশুদ্ধি দেন, সংযম দেন।

৫। সাদৃশ্য—রূপে রূপে মিল অপেক্ষা সাদৃশ্যের পক্ষে ভাবে ভাবে সম্বন্ধ অধিক প্রয়োজনীয়। একের ভাব যখন অন্যে উদ্রেক করিতেছে তখনি হইতেছে সাদৃশ্য। সাদৃশ্যের অর্থ চাতুরীর সাহায্যে রূপের প্রতিরূপটি করিয়া—সোনার সাপ গড়িয়া—লোককে ভয় দেখানো নয়, ঠকানো নয়; কিন্তু কোনো-এক রূপের ভাব অন্য-কোন রূপের সাহায্যে আমাদের মনে উদ্রেক করিয়া দেওয়া। সেই জন্য সাদৃশ্য দেখাইবার বেলায় বস্তুর আকৃতি অপেক্ষা প্রকৃতি বা স্বধর্ম্মের দিক দিয়া সাদৃশ্য দেওয়াই ভাল। সেই সাদৃশ্যই উত্তম যাহা কোনো-এক রূপের ব্যঞ্জনাটুকু অন্য-এক রূপ দিয়া ব্যক্ত করে। মনোভাবের সদৃশ হওয়াই হচ্ছে সাদৃশ্য। মনোভাব রূপের এবং রূপ মনোভাবের ছাঁদ ছন্দ বা ছাঁচে পড়িয়া উভয়ে উভয়ের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইতেছে। কেবল রূপের সাদৃশ্য দিয়া লিখিতে গেলে লেখা মনোভাবের সদৃশ কিছুতেই হয় না। চিত্রের শতসহস্র রেখা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণভেদাদি যখন মানসমূর্ত্তির সদৃশ করিয়া অঙ্কন করি তখনই যথার্থ সাদৃশ্য দি। কাজেই ভাবের অনুরণন যাহা দেয় তাহা উত্তম সাদৃশ্য; আর কেবল আকৃতি বা রূপের অনুকরণ যাহা দেয় তাহা অধম সাদৃশ্য। রূপ-সাদৃশ্য চিত্রিতকে ফুটাইয়া তোলে না, বরং অনেক সময়ে তাহাকে লুপ্ত করিয়া দেয়।

৬। বর্ণিকাভঙ্গ—নানা বর্ণের সংমিশ্রণ ভঙ্গী ও ভাব; বর্ণ-বর্ত্তিকার টানটোনের ভঙ্গী, ইত্যাদি।

বর্ণজ্ঞান ও বর্ণিকাভঙ্গ ষড়ঙ্গ-সাধনা। শ্বেত রক্ত নীল পীত এই চার স্বভাবজ বর্ণ, এই চারের সংযোগে নানা উপবর্ণ সৃষ্টি হয়;—এইটুকু শিখিতে, অধিক সময় যায় না। কিন্তু নিজের হাতকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তুলিকে নিজের বশে আনাই বিষম ব্যাপার। বর্ণিকাভঙ্গের যে বর্ণপরিচয় তাহার একটিমাত্র পাঠ—সেটি হচ্ছে লঘুপাঠ বা হস্তলাঘবতা। হাত ছোঁয়-কি-না-ছোঁয় ভাবে তুলিকে কাগজের উপর দিয়া উড়াইয়া লইতেছে—ইহাই হচ্ছে আমাদের লঘুপাঠের পার্থ্য, ও বর্ণিকাভঙ্গের সারাংশ। চিত্রকরের রেখায় আর দপ্তরীর রুল টানায় প্রভেদ এই যে—একটি জীবন্ত আর একটি নির্জ্জীব! চিত্রকরের প্রাণের ছন্দ একই রেখাকে কখনো গড়াইয়া, কোথাও কাটিয়া বসাইয়া, কোথাও বা ছুঁইয়া-কি-না-ছুঁইয়া যেন উড়াইয়াই লইতেছে। কপাল হইতে আরম্ভ করিয়া চিবুক পর্য্যন্ত মুখের একপাশের রেখাটি টানিতে চেষ্টা কর, দেখিবে, তুলির তিন প্রকার ভঙ্গ ভঙ্গী বা স্পর্শ তোমায় প্রয়োগ করিতে হইবে। কপালের অস্থি সুদৃঢ়, সেখানে তোমায় তুলিতে দৃঢ়তা দিয়া, গাল সুকোমল, সেখানে তুলিকে গড়াইয়া দিয়া—কোমলতা দিয়া, নাতিদৃঢ় চিবুকের কাছে কোমলে কঠোরে মিলাইয়া রেখাটি টানিতে হইবে। একই রেখাকে কঠোর কোমল এবং নাতি-কোমল, একটি টানকেই স্থির ও বিগলিত এবং স্থিরবিগলিত করিয়া দেখানো আর বর্ণসম্বন্ধে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা এবং বর্ণবর্ত্তিকাপ্রয়োগসম্বন্ধে হস্তলাঘবতাই হচ্ছে বর্ণিকাভঙ্গের সমস্ত শিক্ষাটুকু।

তুলিটি ঠিক কতটা ভিজাইব, তাহার আগায় ঠিক কতটা রং তুলিয়া লইব ও ঝাড়িয়া ফেলিব এবং সেই রং সমেত ভিজা তুলিটি ঠিক কতটুকু চাপিয়া অথবা কতখানি না চাপিয়া কাগজের উপর বুলাইয়া দিব;—ইহারি সম্বন্ধে প্রমালাভ করা হচ্ছে ষড়ঙ্গের বর্ণিকা-ভঙ্গনামে শেষ শিক্ষা বা চরম শিক্ষা। চিত্রে মনের রংকে ফলাইয়া তোলা, মনের অন্ধকারকে ঘনাইয়া আনা, মনের আলোকে জ্বালাইয়া দেওয়া এবং মনের ষড়ঋতুর বিচিত্রচ্ছটাকে প্রকাশিত করাই হচ্ছে বর্ণিকাভঙ্গে বর্ণজ্ঞান। বর্ণজ্ঞান শুধু অক্ষরের অথবা রেখার বা বর্ণের রূপ জানা নয়, শুধু একবর্ণের সহিত অন্য বর্ণের সংমিশ্রণে নানা উপবর্ণাদি সৃষ্টি করাও নহে; কিন্তু বর্ণের তত্ত্ব এবং রূপ—দুয়েরই জ্ঞান। বর্ণের বিধি এবং আকৃতি অর্থাৎ কোন্ বর্ণ-আকৃতিকে গোপন করে, কে তাহা ফুটাইয়া তোলে ইহার বিধি: কোন্ বর্ণ আনন্দিত করে, কে বিষাদিত করে, কে বা বৈরাগ্য বুঝায়, কে বা অনুরাগ জানায় ইত্যাদি বর্ণের প্রকৃতি বুঝিয়া তবে অঙ্গ রচনা করিতে হয়। বর্ণ শুধু রঞ্জিত করে না; বর্ণ চিত্রকে রণিত করে। শুধু ফুলের রংটুকু নয়, তাহার সৌরভটিও; শুধু সূর্য্যকিরণের রংটুকুও নয় তাহার উত্তাপের স্পর্শটি পর্য্যন্ত সকালে কিরূপ, সন্ধ্যায় কিরূপ, দ্বিপ্রহরে কতটা:—বর্ণ দিয়া এ সমস্তই বর্ণন করিতে শেখা চাই। বর্ণ মেশায় না চোখ;—বর্ণ মেশায় মন। মন শরতের আকাশকে কতটা নীল দেখিতেছে বা কতটা উজ্জ্বল অথবা ম্লান দেখিতেছে তাহারি ওজনটুকু নীলে মেশানোই হচ্ছে বর্ণকে ভঙ্গী দেওয়া। আমি কালি দিয়াও শরতের আকাশ দেখাইতে পারি যদি মনের রংটুকু সেই কালিতে আনিয়া মেশাই। কালি তখন আর কালি থাকে না; যদি মন তাহাকে রাঙায়—আপনার বর্ণে।

শান্তি (জ্যৈষ্ঠ)।

বিলাতী উপন্যাসিকদের লিখিবার ক্ষমতা—

মিষ্টার এইচ্, জি ওয়েলস প্রতিদিন স্বহস্তে সাত হাজার শব্দ লিখিতেন। কিন্তু প্রৌঢ় অবস্থায় লিখিতেন প্রতিদিন এক হাজার শব্দ।

মিষ্টার এস্, আর্, ক্রসেট্ প্রত্যহ চার হাজার হইতে পাঁচ হাজার শব্দ লিখেন।

গায় বুথবি কোনো গ্রন্থই স্বহস্তে লেখেন নাই; তিনি বলিয়া যাইতেন, অন্যে তাহা লিখিয়া লইত: তাঁহার শেষ উপন্যাসগুলি তিনি ফনোগ্রাফের সম্মুখে বলিতেন,—ফনোগ্রাফ্ শুনিয়া কম্পোজিটারগণ কম্পোজ করিত। কোনো কোনো দিন তিনি দশ হইতে বারো হাজার শব্দ পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন। কোনো দিনই তিনি তিন হাজার শব্দের কম বলেন নাই।

মিষ্টার মুর প্রত্যহ ছয় হাজার শব্দ লিখিতেন। এক লক্ষ কুড়ি হাজার শব্দের একখানি উপন্যাস তিনি পাঁচ সপ্তাহে শেষ করিয়াছিলেন। এক ক্রমে এক বৎসর তিনি প্রত্যহ দুই হাজার করিয়া শব্দ লিখিয়াছেন।

জন ষ্ট্রেঞ্জ উইণ্টার একজন বিখ্যাত লেখিকা। তিনি প্রতিদিন তিন হাজার শব্দ লিখিয়া থাকেন। কোনো কোনো দিন সাত হইতে আট হাজার শব্দও লিখিয়াছেন।

হল কেন সপ্তাহে সাত হাজার শব্দ লিখেন। আজকাল তাঁহার মতো দ্রুত লেখক আর কেহ নাই। যৌবনে তিনি প্রত্যহ দশ হাজার শব্দ লিখিয়াছেন।

'সারলক হোম'-লেখক কোনাল ডয়েল দ্রুত লিখনের পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন,—"প্রত্যহ দুই হাজার শব্দ লেখাই আমি যথেষ্ট মনে করি।" তবে এক দিন তিনি একবার কলম ধরিয়া বারো হাজার শব্দের একটি গল্প লিখিয়া তবে কলম ছাড়িয়াছিলেন! কোনো দিনই তিনি এক হাজার শব্দের কম লেখেন না।

ল্য কিড আধুনিক একজন প্রধান উপন্যাসিক। কিন্তু দ্রুত লেখক নহেন। তথাপি তিনি কোনো দিনই দেড় হাজার শব্দ না লিখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না।

আয়ান ম্যাক্‌লারেন যদিও বহু গল্প লিখিয়াছেন, তবু তিনি দ্রুত লেখক নহেন,—বোধ হয় তিনি হাজার শব্দও কোনো দিন লিখিতে সমর্থ হন নাই।

আণ্টনি ট্রোলপ কুড়ি হইতে পঁচিশ হাজার শব্দ পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে লিখিতেন।

মিসেস হাম্‌ফ্রে ওয়ার্ড কোনো কোনো সপ্তাহে পঁচিশ হাজার শব্দ লিখিয়াছেন,—তবে সাধারণত তিনি প্রত্যহ প্রায় হাজার শব্দ লিখিয়া থাকেন।

ম্যাক্স পেম্বার্টন প্রতিদিন দেড় হাজার শব্দ লিখিয়া থাকেন।

মেরী করেলী নিয়মিতরূপে প্রত্যহ তিন ঘণ্টা লেখেন, এই তিন ঘণ্টায় তিনি প্রত্যহ তিন হাজার শব্দ লিখিয়া থাকেন।

মিষ্টার ডব্লু, ডব্লু, জেকব আদৌ দ্রুত লিখিতে পারেন না। তিনি প্রত্যহ আট শত শব্দ লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকেন।

বিখ্যাত লেখিকা 'জন ওলিভার হব্‌স' প্রত্যহ এক হাজার শব্দ লেখার কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠেন। তিনি বলেন,—"সপ্তাহে হাজার শব্দ লিখিতে পারিলে আমি নিজকে ভাগ্যবতী মনে করি।

সবুজপত্র।

সবুজের অভিযান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা!

* * * *

ঐ যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা,
চক্ষু কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়!
আয় জীবন্ত, আয়রে আমার কাঁচা!

* * * *

শিকল দেবীর ঐ যে পূজা-বেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া?
পাগ্‌লামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি'!
ঝড়ের মাতন। বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে,
ভুলগুলো সব আনরে বাছা বাছা!
আয় প্রমত্ত আয়রে আমার কাঁচা!

আনরে টেনে বাঁধা পথের শেষে!
বিবাগী কর অবাধ-পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে!
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে ত বক্ষে পরাণ নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধি-বিধান যাচা!
আয় প্রমুক্ত, আয়রে আমার কাঁচা!

* * * *

বিবেচনা ও অবিবেচনা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

বাংলা দেশে একদিন স্বদেশপ্রেমের বান ডাকিয়াছিল; তাহা যে সত্য তাহার প্রমাণ, সমাজটা আগাগোড়া নড়িয়া উঠিয়াছিল—ব্রাহ্মণের ছেলে তাঁতের কাজে লাগিল, ভদ্রসন্তান রাস্তায় মোট বহিল, হিন্দুমুসলমানে একত্র আহারের আয়োজন করিতে লাগিল। প্রাণ জাগিলেই কাহারো পরামর্শ না লইয়া আপনি সে চলিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে আপনি বুঝিতে পারে কোন্‌টা তাহার বাধা, এবং কোন্‌টা নহে।

সেই বন্যার বেগ, সমাজের চলার ঝোঁক, কমিয়া আসিয়া আবার বাঁধি বোল আওড়াইবার উপক্রম দেখা দিয়াছে—আমাদের কিছুই বানাইবার দরকার নাই, কেবল মানিয়া গেলেই চলে। আমাদের সমাজে যে-পরিমাণে কর্ম্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলি বাধে। খাঁচার বাহিরে অনন্ত আকাশভরা নিষেধ! খাঁচার শলা গড়িয়াছে যে কামার তাহারই হইল জয়, আর বিড়ম্বিত হইলেন বিধাতা—যিনি আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি দিয়াছেন, মানুষ বলিয়া বুদ্ধি দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে সমস্তকেই সে পরখ করিয়া দেখে, নূতন নূতন অভিজ্ঞতার পথ ধরিয়া সে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া চলিতে চায়; প্রাণ দুঃসাহসিক—বিপদের ঠোকর খাইলেও সে আপনার জয়যাত্রার পথ হইতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে চায় না। কিন্তু জীবের মধ্যে নবীন প্রাণের পাশে প্রবীণ ভয়ও আছে; বাধা দেখিলেই প্রবীণ ভয় বলিতেছে—রোস, রোস, কাজ কি! প্রাণ বলিতেছে—দেখাই যাক্ না!

নবীন প্রাণের রাজ্যে প্রবীণতাকে একেশ্বর করিবার ষড়যন্ত্র হইলেই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া বাহির হইবার দিন আসে। জীবনে দুর্ভাবনা ও নির্ভাবনা দুইই আছে, তবে নির্ভাবনা বেশী না থাকিলে স্রোত মন্দ হইয়া শেওলা জমিয়া যায়। পৃথিবীতে বারো আনা জল, চার আনা স্থল; এরূপ বিভাগ না হইলে বিপদ ঘটিত। জলই পৃথিবীতে গতি সঞ্চার করিতেছে, প্রাণকে বিস্তারিত করিয়া দিতেছে। স্থলের

একাধিপত্য যে কি ভয়ঙ্কর তাহা মধ্য এসিয়ার মরুপ্রান্তরের দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইবে। উলঙ্গ ধূর্জ্জটী সেখানে একা স্থাণু হইয়া উর্দ্ধনেত্রে বসিয়া আছেন, উমা নাই, দেবতারা তাই প্রমাদ গণিতেছেন—কুমারের নূতন প্রাণের জন্ম হইবে কেমন করিয়া!

নিজের সমাজের দিকে তাকাইলেও এই চেহারাই দেখিতে পাইব।—এ যে পঙ্ককেশের শুভ্র মরুভূমি! বিশ্বের সঙ্গে প্রাণ ও পণ্য বিনিময়ের ধারা বালু-চাপা পড়িয়া গেছে, সমস্ত সৃষ্টির স্রোত বদ্ধ। কিন্তু এই মরুভূমিই সনাতন নহে, ইহার বহু পূর্ব্বে এখানে প্রাণের নব নব লীলা চলিত, সেই লীলায় কত বিজ্ঞান দর্শন, শিল্প সাহিত্য, রাজ্য সাম্রাজ্য, কত ধর্ম্ম ও সমাজবিপ্লব তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। ঈজিপ্টের প্রকাণ্ড কবরগুলার তলায় যে-সমস্ত মমি মৃত্যুকে অমর করিয়া দাঁত মেলিয়া জীবনকে ব্যঙ্গ করিতেছে, তাহাদিগকেই কি বলিবে সনাতন? আমরা তারিখের হিসাব করিয়া বলিতেছি জগতে আমরা সব চেয়ে সনাতন; তাহা হইলে ত ভস্মও অঙ্ক গণনা করিয়া বলিতে পারে সেই সকলের চেয়ে প্রাচীন অগ্নি!

পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি—শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস,আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস! এই দুঃসাহসের মধ্যে একটা প্রবল অবিবেচনা আছে। যাহারা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া তাহারাই লক্ষ্মীকে দুর্গম অন্তঃপুর হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে। বিজ্ঞ মানুষদের নিয়ত ধমকানি খাইয়াও এই অশান্তের দল জীর্ণ বেড়া ভাঙিয়া পুরাতন বেড়া সরাইয়া কত উৎপাত করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। ইহারা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে, এবং মরিবার বেলায় ইহারাই মরে। কিন্তু বাঁচিবার পথ বাহির করিয়া দেয় ইহারাই। আমাদের দেশে সেই জন্ম-লক্ষ্মীছাড়া কি নাই? নিশ্চয়ই আছে। প্রাণ যে আপনার গরজেই তাহাদিগকে জন্ম দেয়। কিন্তু তাঁহাদের চারিদিকে শুধু মানা আর শাসনের তার জড়াইয়া আমাদের সমাজ একটা প্রকাণ্ড পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে -অভ্যাস-বশে মানিয়া চলা তাহাদের আশ্চর্য্য দুরুস্ত হইয়া উঠিয়াছে, যেখানে কাহাকেও মানিবার নাই সেখানে তাহারা চলিতেই পারে না। কিন্তু যাহাদের মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য্য আছে তাহাদিগকে চাপিয়া পিষিয়াও একেবারে নষ্ট করা যায় না; এইজন্য তাহারা আর কোনো কাজ না পাইয়া নিজেদের উদ্বৃত্ত উদ্যম ও তেজ সমাজের বেড়ি গড়িবার জন্যই প্রবল বেগে খাটাইতে থাকে। কাজ করিবার জন্যই যাহাদের জন্ম, কাজের ক্ষেত্র বদ্ধ বলিয়া কাজ বদ্ধ করিবার কাজেই তাহারা কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগে। সমাজের চোখে ঠুলি বাঁধিয়া মানার প্রকাণ্ড ঘানিতে জুড়িয়া একই চক্রপথে ঘুরাইয়া ইহারা বলেন, এ ঘানি সনাতন, ইহার পবিত্র স্নিগ্ধ তৈলে প্রকুপিত বায়ু একেবারে শান্ত হইয়া যায়! কিন্তু সকাল বেলায় জাগিয়া উঠিয়া যদি কেহ ঘরে আলো আসিতেছে বলিয়া বিরক্ত হইয়া দুড়দাড় শব্দে ঘরের দরজা জানালাগুলো বন্ধ করিয়া দিতে চায় তবে নিশ্চয় আরো অনেক লোক জাগিবে যাহারা দরজা খুলিয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিবে। জাগরণের দিনে দুই দলই জাগে। দেশের নবযৌবনকে তাঁহারা আর নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। অবিবেচনার বেগও বন্ধ করিব, আবার বিবেচনা করিতেও অধিকার দিব না—মানুষকে বলিব, তুমি শক্তিও চালাইয়ো না, বুদ্ধিও চালাইয়ো না, তুমি কেবল মাত্র ঘানি চালাও, এ বিধান কখনই চিরদিন চলিবে না।

বাংলা ছন্দ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

বাংলা বাক্যের অসুবিধা এই যে একটা ঝোঁকের টানে একসঙ্গে অনেকগুলা শব্দ অনায়াসে আমাদের কানের উপর দিয়া পিছলাইয়া চলিয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটার সঙ্গে সুস্পষ্ট পরিচয়ের সময় পাওয়া যায় না। এইজন্য কথকতার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে ঘনঘটাচ্ছন্ন সংস্কৃত সমাসের আমদানি করিয়া শ্রোতাদের মনটা ঝাঁকাইয়া জাগাইয়া তোলা হয়। কবিদিগকেও এইরূপ করিতে হয়। এইজন্যই যাত্রার ও পাঁচালির গানে ঘন ঘন অনুপ্রাস ব্যবহার প্রচলিত। বাংলা সমস্ত পুরাতন কাব্য গানের সুরে কীর্ত্তিত; তাহাতে শব্দের সমস্ত ক্ষীণতা ও ছন্দের ফাঁক গানের সুরে ভরিয়া উঠিত। বাংলার পয়ার ত্রিপদী ছন্দগুলিতে কোথাও ওঠানামা নাই, সকল শব্দই মাথায় সমান, প্রত্যেক অক্ষরটি এক মাত্রা বলিয়া গণ্য। গানের পক্ষে ইহাই সুবিধা, সমমাত্রিক ছন্দে সুর আপন প্রয়োজনমত যেমন-তেমন করিয়া চলিতে পারে, কথাগুলা মাথা হেঁট করিয়া সম্পূর্ণ তাহার অনুগত হইয়া থাকে। কিন্তু সুর হইতে বিযুক্ত করিয়া পড়িতে গেলে এই ছন্দগুলি একেবারে বিধবার মতো হইয়া পড়ে। এইজন্য আজ পর্য্যন্ত আমরা কবিতা ও গদ্য, ইংরেজি পড়িবার সময় পর্য্যন্ত, সুর করিয়া পড়ি। কিন্তু আমাদের প্রত্যেক অক্ষরটিই বস্তুত একমাত্রার নহে, যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের উচ্চারণে প্রভেদ আছে। কোনো কোনো কবি ছন্দের এই দীনতা দূর করিবার জন্য বিশেষ জোর দিবার বেলায় বাংলা শব্দগুলিকে সংস্কৃতের রীতি-অনুযায়ী স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ রাখিয়া ছন্দে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সেরূপ রচনা বাংলা নয়; বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘস্বরের পরিমাণভেদ সুব্যক্ত নহে বলিয়া সেরূপ ছন্দ বাংলায় চলিবে না। কিন্তু বাংলাতেও যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের মাত্রাভেদ না ঘটিয়া থাকিতে পারে না মনে রাখিয়া, আমি যুক্ত বর্ণকে দুইমাত্রা গণ্য করিয়া ছন্দ রচিবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি, এখন তাহা প্রচলিত হইয়াছে। বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই শব্দের অন্তস্থিত অ স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয় না। কিন্তু বাংলা সাধু-ছন্দে হসন্ত জিনিসটাকে একেবারে ব্যবহারে লাগানো হয় না, অথচ জিনিসটা ধ্বনি উৎপাদনের কাজে ভারি মজবুৎ। হসন্ত শব্দটি স্বরবর্ণের বাধা পায় না বলিয়া পরবর্ত্তী শব্দের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাকে ধাক্কা দেয় ও বাজাইয়া তোলে। বাংলার হসন্ত-বর্জ্জিত সাধু ভাষাটা বাবুদের আদুরে ছেলেটার মতো মোটাসোটা গোল-গাল, চর্ব্বির স্তরে তাহার চেহারাটা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেছে; এবং তাহার চিক্কণতা যতই থাক, তাহার জোর অতি অল্পই। কিন্তু বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো, তাহার চেহারা সুস্পষ্ট। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে অসাধু ভাষাকে আমল দেওয়া হয় নাই বলিয়া সে বাসায় গিয়া মরিয়া নাই -আউল ও বাউলের গানে, মেয়েদের ছড়ায় ঝরণার জলে নুড়ির মতো হসন্ত শব্দগুলা পরস্পরের উপর পড়িয়া ঠুনঠুন শব্দ করিতেছে, ভদ্র-সাহিত্য-পল্লীর গম্ভীর দীঘিটার স্থির জলে সে হসন্তের ঝঙ্কার নাই। আমার শেষ বয়সের কাব্য রচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কারণ তাহার নিজের একটি কলধ্বনি আছে। আমাদের চলতি ভাষার হসন্ত সুরের উদাহরণ—

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে।

এই ছন্দের প্রত্যেক গাঁঠে গাঁঠে একটি করিয়া হসন্তের ভঙ্গী আছে। এইটি সাধুভাষার ছন্দে হইতে পারে—

যত কাঁটা মম সফল করিয়া ফুটিবে কুসুম ফুটিবে।
সকল বেদনা অরুণ বরণে গোলাপ হইয়া উঠিবে।

অথবা যুক্ত বর্ণকে যদি এক মাত্রা বলিয়া ধরা যায় তবে এমন হইতে পারে—

সকল কণ্টক সার্থক করিয়া কুসুম-স্তবক ফুটিবে।
বেদনা যন্ত্রণা রক্তমূর্ত্তি ধরি গোলাপ হইয়া উঠিবে।

এমনি করিয়া ভাষার নিজের অন্তরের স্বাভাবিক সুরটাকে রুদ্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইতে সুর যোজনা করিতে হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার জরি-জহরতের ঝালরওয়ালা দেড় হাত দুই হাত ঘোমটার অড়ালে আমাদের ভাষাবধূটির চোখের জল মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা পড়িয়া গেছে, তাহার কালো কটাক্ষে যে কত তীক্ষ্ণতা তাহা আমরা ভুলিয়া গেছি। আমি তাহার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলিয়া দিবার কিছু সাধনা করিয়াছি, তাহাতে সাধুলোকেরা ছি ছি করিয়াছে। সাধুলোকেরা জরির আঁচলটা দেখিয়া তাহার দর যাচাই করুক; আমার কাছে চোখের চাহনিটুকুর দর তাহার চেয়ে অনেক বেশী; সে যে বিনামূল্যের ধন, সে ভট্টাচার্য্যপাড়ার হাটে-বাজারে মেলে না।

আমরা চলি সমুখ পানে—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

আমরা চলি সমুখ পানে
কে আমাদের বাঁধবে?
রৈল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।
ছিঁড়ব বাধা রক্তপায়ে,
চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলি ফাঁদ ফাঁদবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে
বাজিয়ে আপন তূর্য্য।
মাথার পরে ডাক দিয়েছে
মধ্য দিনের সূর্য্য।
মন ছড়াল আকাশ ব্যেপে,
আলোর নেশায় গেছি ক্ষেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে,
চক্ষু ওদের ধাঁধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

সাগর গিরি করব রে জয়
যাব তাদের লঙ্ঘি'।
একলা পথে করিনে ভয়,
সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী।
আপন ঘোরে আপ্‌নি মেতে
আছে ওরা গণ্ডি পেতে,
ঘর ছেড়ে আঙিনায় যেতে
বাধবে ওদের বাধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

জাগবে ঈশান, বাজবে বিষাণ
পুড়বে সকল বন্ধ।
উড়বে হাওয়ায় বিজয়-নিশান
ঘুচবে দ্বিধা দ্বন্দ্ব।
মৃত্যুসাগর মথন করে
অমৃতরস আনব হরে'
ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে
মরণ-সাধন সাধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

শঙ্খ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে'
কেমন করে' সইব?
বাতাস আলো গেল মরে'
এ কি রে দুর্দ্দৈব!
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠনা গেয়ে,
চলবি যারা চল্‌রে ধেয়ে,
আয় না রে নিঃশঙ্ক!
ধুলায় পড়ে' রইল চেয়ে
ঐ যে অভয় শঙ্খ!

* * *

জানি জানি তন্দ্রা মম
রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণধারা সম
বাণ বাজিবে বক্ষে:
কেউ বা ছুটে আসবে পাশে,
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে
সুপ্তির পালঙ্ক।
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে
তোমার মহাশঙ্খ!

বস্তু ও শূন্য—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

'আষাঢ়' প্রবন্ধের মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একস্থলে লিখিয়াছেন—

শুনিয়াছি অণু পরমাণুর মধ্যে কেবলি ছিদ্র,—আমি নিশ্চয় জানি সেই ছিদ্রগুলির মধ্যেই বিরাটের অবস্থান। ছিদ্রগুলিই মুখ্য, বস্তুগুলিই গৌণ। যাহাকে শূন্য বলি বস্তুগুলি তাহারই অশ্রান্ত লীলা। সেই শূন্যই তাহাদিগকে আকার দিতেছে, গতি দিতেছে, প্রাণ দিতেছে। আকর্ষণ বিকর্ষণ ত সেই শূন্যেরই কুস্তির প্যাঁচ। জগতের বস্তুব্যাপার সেই শূন্যের, সেই মহাগতির, পরিচয়। এই বিপুল বিচ্ছেদের ভিতর দিয়াই জগতের সমস্ত যোগ সাধন হইতেছে—অণুর সঙ্গে অণুর, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য্যের, নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের। সেই বিচ্ছেদ-মহাসমুদ্রের মধ্যে মানুষ ভাসিতেছে বলিয়াই মানুষের শক্তি, মানুষের জ্ঞান, মানুষের প্রেম, মানুষের যত কিছু লীলাখেলা। এই মহাবিচ্ছেদ যদি বস্তুতে নিরেট হইয়া ভরিয়া যায় তবে একেবারে নিবিড় একটানা মৃত্যু।

মৃত্যু আর কিছু নহে—বস্তু যখন আপনার অবকাশকে হারায় তখন তাহাই মৃত্যু। বস্তু তখন যেটুকু, কেবলমাত্র সেইটুকুই, তার বেশী নয়। প্রাণ সেই মহা-অবকাশ—যাহাকে অবলম্বন করিয়া বস্তু আপনাকে কেবলি আপনি ছাড়াইয়া চলিতে পারে।

বস্তুবাদীরা মনে করে অবকাশটা নিশ্চল; কিন্তু যাহারা অবকাশ-রসের রসিক তাহারা জানে বস্তুটাই নিশ্চল, অবকাশই তাহাকে গতি দেয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যের অবকাশ নাই; তাহারা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ব্যূহরচনা করিয়া চলিয়াছে। তাহারা মনে ভাবে আমরাই যুদ্ধ করিতেছি। কিন্তু যে-সেনাপতি অবকাশে নিমগ্ন হইয়া দূর হইতে স্তব্ধ ভাবে দেখিতেছে, সৈন্যদের সমস্ত চলা তাহারই মধ্যে। নিশ্চলের যে ভয়ঙ্কর চলা তাহার রুদ্রবেগ যদি দেখিতে চাও তবে দেখ ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্ত্তনে, দেখ যুগ যুগান্তরের তাণ্ডব-নৃত্যে। যে নাচিতেছে না তাহারই নাচ এই সকল চঞ্চলতায়।

পরম আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কবি যাহা ভাব-কল্পনায় দার্শনিক তত্ত্বরূপে অনুভব করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক মতবাদ। কবি যাহা অনুভবে কল্পনায় বুঝিয়া জোর করিয়া বলিয়াছেন 'নিশ্চয় জানি', আধুনিক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা-পরম্পরায় বহু ধীর গবেষণা দ্বারা সাবধানে সেই একই তত্ত্বে উপনীত হইতেছেন। পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের কবি-বরের এই উক্তির সহিত 'পঞ্চশস্য' বিভাগে প্রদত্ত 'নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের' তত্ত্বগুলি মিলাইয়া পড়িলেই মনীষী ঋষিকবির আত্মপ্রত্যয়লব্ধ (intuitive) জ্ঞানের সহিত বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের ঐক্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গৌরব অনুভব করিবেন নিশ্চয়।

মণিভদ্র।

দেশের কথা

এ কথা কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না যে আমাদের দেশের যা-কিছু সম্পদ, যা কিছু নিজস্ব, যা-কিছু সৌন্দর্য্য তাহা রথচক্রমুখরিত জনতারণ্য পণ্যের হাট নগরমালায় নহে—তাহা আমাদের সেই চিরদিনের ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলিতেই। আমাদের দেশের আনন্দ, আমাদের জাতির আনন্দ, আমাদের পিতৃপিতামহদের আনন্দ যেই পল্লীগ্রামের সরলসুন্দর জীবনের অনাবিলতায়—আমাদের সন্তান-সন্ততির আনন্দও সেই পল্লীজীবনের অনাড়ম্বর প্রশান্তির ভিতর দিয়াই অভিব্যক্ত হইবে। তাই যাঁহারা ভারতবর্ষকে দেখিবার জন্য, চিনিবার জন্য আসিয়া যখন পল্লীগ্রামের চিরানন্দ জীবনের কোনো সন্ধানই না লইয়া, ভারতের অন্তর্প্রকৃতির শিলমোহরটির ছাপ যাহার উপর কোনো দিনই অঙ্কিত হয় নাই সেই ভারতত্বলেশহীন নগরগুলির মত্ততায় মগ্ন হইয়া পড়েন এবং সেই অভিজ্ঞতা হইতে ভারতবর্ষের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লন, তখন তাঁহারা একটা গভীর ভুল করিয়া বসেন। এ কথা আমরা বার বার উপলব্ধি করিয়াছি যে আমাদের দেশমাতৃকার সে আনন্দময়ী শ্যামমূর্ত্তিখানি নগর-সৌধের বৈদেশিক বিলাসের মত্ততার ভিতর কোনো মতেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না; তাঁহার দর্শন লাভ করিতে হইলে যাইতে হইবে নগণ্য পল্লীর কোকিল পাপিয়ার কূজনমুখরিত আম্রকুঞ্জের শ্যামল-ঘন ছায়াতলে; সেখান ব্যতীত তাঁহার নিশীথ শীতল-স্নেহ-মাখানো কল্যাণ হস্তের স্পর্শ আর কোথাও মাতৃবৎসল সন্তানের দেহ প্রাণ পুলকাঞ্চিত করিয়া দিবে না! আমরা পদে পদে কি এই সত্যটি প্রত্যক্ষ করি নাই? ভারত-সভ্যতার আদিমতম কাল হইতে প্রত্যেক ঘটনাটিই কি ইহার সত্যতার সাক্ষ্য দেয় নাই; শিশু আর্য্য-সভ্যতার বংশাধিপত্য প্রথা পল্লীসমাজ-শাসনে রূপান্তরিত হইয়া নানা দ্বন্দ্ব-কলহ বাধাবিপর্য্যয় যুদ্ধ বিপ্লবের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের সত্তাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার অন্তরের আনন্দ-কমলের দলগুলি একে একে উদ্ঘাটিত করিয়াছে। ঐখানেই তাহার মহত্ত্ব। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ভাগ্য যে পরিমাণেই বিপর্য্যস্ত হোক না কেন, তাহার পল্লীর অন্তরে অন্তরে আনন্দ ও শান্তির যে অনাহত চিরন্তন ধারাটি নিত্য প্রবহমান তাহা কোনো দিনই ব্যাহত হয় নাই।

কিন্তু এ কথা স্মরণ করা একান্ত আবশ্যক যে, পল্লীগ্রাম-গুলি তাহাদের সেই চিরাধিকৃত আসন হইতে বিচ্যুত হইয়াছে—ভারতের উপর তাহাদের যে একটা শান্তিময় কুশল-প্রভাব ছিল তাহা ক্রমশ তিরোহিত হইয়াছে। আজ সেগুলি একে একে ধ্বংসের অতলতলে তলাইয়া যাইতেছে—পল্লীর সে আনন্দময় জীবন সেই সদাপ্রফুল্ল হৃষ্ট পুষ্ট সরলপ্রাণ লোকগুলি মারীদুর্ভিক্ষে ক্লিষ্ট হইয়া

উৎসাদিত হইয়া গিয়াছে। এখন আছে কেবল পল্লী-শ্মশানের মাঝে তাহাদের বিকট কঙ্কালগুলি। পল্লীগুলি সব বিজন বন—ম্যালেরিয়া মহামারী ও অন্নভাবে জীর্ণ শীর্ণ—দ্বন্দ্ব কলহ বিদ্বেষ ও কুসংস্কারে একেবারে দীর্ণ। সে দিনই চলিয়া গিয়াছে। কোথায় সে আনন্দময় পল্লীসমাজ, কোথায়ই বা সে পঞ্চায়েৎ, সে সরল সন্তুষ্ট পল্লীবাসীরাই বা কোথায়?

পল্লীসমাজের অপলাপের এই নিদারুণ দুর্ভাগ্য ও গভীর অমঙ্গল হইতে দেশকে সত্বর টানিয়া তুলিতে হইবে, আবার বাংলার পল্লীতে অপর্য্যাপ্ত স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য শান্তি ও সুখের ভাণ্ডার-দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া আজিকার স্তব্ধ আনন্দের কলমধুর স্রোত আবার উৎসারিত করিয়া দিতে হইবে।—তবেই দেশের ও জাতির প্রাণের আনন্দ পল্লীকাননের আলোছায়ার চঞ্চলক্রীড়ার মাঝখানে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইবে, তবেই আবার দেশের সুখসম্পদ ফিরিবে, আশা আকাঙ্খার পূরণ হইবে—নহিলে আর পরিত্রাণ নাই। ইহাই আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রথম ও সুগভীর কর্ত্তব্য—অন্যান্য কাজের ভিতর এরই প্রয়োজন সব চেয়ে তীব্র। এবং প্রত্যেক মানুষের এই কঠোর ব্রতের সহায়কের পদ জ্বলন্ত আগ্রহের দৃঢ়চিত্তে গ্রহণ করা উচিত আমাদের মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলির। এই কার্য্য তাঁহারাই দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিবেন। অনাবশ্যক সার্ব্বজনীন সংবাদে তাঁহাদের ক্ষুদ্র কলেবর অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া লাভ কি? তাহার জন্য তো বিশেষ বিশেষ সংবাদপত্র রহিয়াছে। একটা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ঐটিই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাহা হইলে শুধু আমাদের সহিত মফঃস্বলের নয়, সমস্ত দেশের ভিতর পরস্পরের মধ্যে অভিন্নস্বার্থ প্রীতি ও চিন্তার একটা অখণ্ড যোগ স্থাপিত হইবে, এবং ইহাই সে-ই আনন্দলোক হইতে একদিন সচ্চিদানন্দের আনন্দময় আশিস-বার্ত্তা বহন করিয়া আনিবে!

মফঃস্বলের স্বাস্থ্য—

সহরে কলেরা, বসন্ত ও জ্বর-রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। দিন দিন মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে: আশু প্রতীকার আবশ্যক। পরিদর্শক (শ্রীহট্ট) ১৫ই জ্যৈষ্ঠ।

বাশখালী ও সাতকানিয়া থানার নানা স্থানে বসন্তরোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।—জ্যোতিঃ (চট্টগ্রাম) ১১ই জ্যৈষ্ঠ।

নারায়ণগঞ্জে বসন্তের প্রকোপ দেখা দিয়াছে, সহরে বহুলোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।—ঢাকাপ্রকাশ, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ।

এবার বরিশালে বসন্তের অত্যন্ত প্রকোপ হইয়াছিল। সহরের অধিকাংশ লোকই সহর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। স্থূল সহরটা একেবারে জনশূন্য হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি বসন্তের প্রকোপ অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। আবার সহরে লোকজন আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।—ঢাকাপ্রকাশ, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ।

আমরা গত পূর্ব্ব সপ্তাহে লিখিয়াছিলাম, কামারের চর অঞ্চলে অত্যন্ত ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; প্রতিগৃহে রোগী; পথ্য দিবার লোক নাই; বিশেষতঃ এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত মুসলমান; এই স্থানে কোনো ডাক্তার নাই; মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে; আমরা অবিলম্বে ঐ অঞ্চলে কয়েকজন ডাক্তার প্রেরণের জন্য লিখিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে মনোযোগ দেন নাই। এখন যেরূপ মৃত্যু হইতেছে তাহাতে ডাক্তার প্রেরণে কালবিলম্ব করা বিধেয় নহে।—

চারুমিহির (ময়মনসিং) ১৯শে জ্যৈষ্ঠ।

এই মহামারী ও নানাবিধ ব্যাধির প্রকোপ দিন দিন বাড়িয়া চলিল—এ এখন শীতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লাগিয়া থাকিবে। বর্ষায় চারিদিকের খানা ডোবা ভরিয়া যাইবে—দেখিতে দেখিতে সর্ব্বত্র বন নূতন করিয়া যতই গজাইয়া উঠিবে ম্যালেরিয়া, কলেরা, জ্বর প্রভৃতি ততই জীর্ণ গ্রামবাসীগণের কণ্ঠ সবলে চাপিয়া ধরিবে। বৎসরের ভিতর ছ'মাস যদি এমনিতর পরিপূর্ণ বেগে ধ্বংসকার্য্য চলিতে থাকে তবে দেশ উজাড় হইতে আর কদিনই বা লাগিবে? বাংলা গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই প্রতীকারের আশা করিয়া বসিয়া থাকিলে শেষে বোধ করি আর প্রতীকারের আদৌ আবশ্যক হইবে না। ইহার প্রতীকার গ্রামবাসীদের সমবেত শক্তির উপরই নির্ভর করিতেছে—প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীরা যদি একযোগে কোমর বাঁধিয়া এই-সকল উপদ্রব দূর করিবার কার্য্যে লাগিয়া যান, তাহা হইলে পল্লীর এতখানি দুরবস্থা কয়দিন থাকিতে পারে? নিজের চেষ্টা না থাকিলে ভগবানও সাহায্য করেন না। সম্প্রতি কৃষ্ণনগরের এক স্থানের ভদ্রলোকেরা এইরূপ প্রকৃত পুরুষকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—নিম্নে সে সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ ও স্বাস্থ্যের উন্নতি-কল্পে কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত কোনও পাড়ার ভদ্রলোকেরা সমবেত হইয়া জঙ্গল

কাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্গের প্রতি পল্লীতে এ দৃষ্টান্তের অনুকরণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।—যশোহর, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ।

অবশ্য এই সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের উচিত এই নিপীড়িত দেশবাসীদিগকে সহায়তা করা। প্রতিবার এই সময়ে নানাপ্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। গভর্ণমেণ্ট যদি একটা বিশেষ বিভাগের সৃষ্টি করিয়া বৎসরের এই কয়মাস পল্লীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও ব্যাধির প্রতিরোধের জন্য চেষ্টিত হন, সুযোগ্য লোক পাঠাইয়া গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন ও সুচিকিৎসা সুলভ করিয়া দেন তাহা হইলে বাস্তবিকই দেশের প্রভূত উপকার করা হয়। এইরূপে কয়েক বৎসর এই সময়টা গ্রামের সন্নিকটস্থ বন জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া, খানা ডোবা ভরাট করিয়া, বা জল বাহির করিয়া দিয়া যদি ব্যাধির আবির্ভাব প্রতিরোধ করা যায় তাহা হইলে দেশের স্বাস্থ্য শীঘ্রই ভালো হইয়া উঠে। ব্যাধি প্রভৃতিতে দেশ তো উৎসন্ন করিয়া দিতেছেই, তাহার উপর অচিকিৎসা কুচিকিৎসায় ও ঔষধের নামে যা-তা ভক্ষণ করিয়া বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ গিয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নে দেখিতে পাইবেন।

দরিদ্র ও অশিক্ষিত মানভূমের পল্লীবাসীগণ অর্থাভাবে শিক্ষিত সুচিকিৎসকের সাহায্যে চিকিৎসা করাইতে পারেন না; ইতর ভদ্র সকলেই ওঝার জরী, বটী, তুকতাকের চিকিৎসার উপর নির্ভর করে। বিকারগ্রস্থ রোগী ডাইন-আক্রান্ত বলিয়া ধারণার বশে রোগীর উপর প্রহার ইত্যাদির কথা শুনা যায়। মানভূমের এই কুসংস্কার দূর হওয়া অধিবাসীদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও পাশ্চাত্য চিকিৎসার সুফল প্রদর্শনের উপর নির্ভর করে। কর্তৃপক্ষ দরিদ্র পল্লীবাসীদিগের ঔষধ ও ডাক্তার সুপ্রাপ্য করিবার জন্য একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইনি ঔষধ সহ মানভূমের প্রতি পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিবেন ও রোগীর চিকিৎসা করিবেন। একজন সেনিটারী ডাক্তার নিযুক্ত থাকায় এখানে ব্যাধির সংক্রামকতা অনেকাংশে বিদূরিত হইয়াছে। তদুপরি আর একজন ডাক্তার নিযুক্ত হইলে পল্লীগ্রামে চিকিৎসকের ও ঔষধের অভাব বিদূরিত হইবে।—পুরুলিয়া দর্পণ, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ।

এইরূপ শুধু মানভূমেই নয়, মারী দুর্ভিক্ষের উপর নানা জায়গায় নানারূপ কুসংস্কার দেশবাসীকে আরও দিন দিন জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিতেছে। শিক্ষা ব্যতীত এর উচ্ছেদ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। গোখলে মহোদয়ের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে উদ্যোগী পুরুষ ও মহিলাগণ শিক্ষা-প্রচারিণী সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া অশিক্ষিত নরনারীদের মধ্যে শিক্ষার আলোক বিতরণ করুন। বাংলার কয়েকটি জেলা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ও প্রকৃত কার্য্যও করিতেছেন। সর্ব্বত্রই তাহা অনুষ্ঠিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। অন্তত এক একজন শিক্ষিত নরনারী যদি এক একজন অশিক্ষিত নরনারী বা বালকবালিকার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন তবে দেশে শীঘ্রই শিক্ষা-বিস্তার হইতে পারে।

ডাকাতি—

আজ-কাল ম্যালেরিয়া কলেরার মত ডাকাতিও একটা সংক্রামক মহামারী হইয়া উঠিয়াছে। এমন দিন নাই যেদিন কাগজ খুঁজিলে কোনো-না-কোনো স্থানে ভীষণ ডাকাতির খবর দেখিতে না পাওয়া যায়! কাহারো ধন প্রাণ লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই। নিত্যই ইহা ঘটিতেছে, অথচ ইহার যথোচিত প্রতিকারের চেষ্টার কোনো লক্ষণই তো দেখিতে পাই না। ডাকাতিটা দেশে ক্রমশ ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছে, আর অবহেলা করিয়া উপেক্ষা করা কোনো মতেই চলে না; শীঘ্রই ইহার প্রতিকার দরকার। গভর্ণমেণ্টের সত্বর এবিষয়ে দৃষ্টি পড়া আবশ্যক। এমন কোনো ব্যবস্থা করা উচিত যে এইরূপ ডাকাতি আর আদৌ ঘটিতে না পারে। পেটের জ্বালায় লোক মরিয়া হইয়া এই-সব উপপ্লবের সৃষ্টি করিতেছে। উদরের ভিতর যখন খাণ্ডবদাহন আরম্ভ হয়, তখন কি আর মানুষের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে? দুটি ডাকাতির বিবরণ নীচে দেওয়া গেল।

সম্প্রতি কুমিল্লার নবীনগর থানার অন্তর্গত কোনও গ্রামের এক ধনাঢ্য লোকের বাটীতে প্রায় ৫০ জন ডাকাত প্রবেশ করিয়া অনুমান ৭০০০ টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। ইতিমধ্যে ঐ জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার গোঁসাইপুর গ্রামে শরৎচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে ১৫।২০ জন সশস্ত্র ডাকাত প্রবেশ করিয়াছিল, গ্রামবাসীরা বাধা প্রদানে অগ্রসর হইলে দুর্বৃত্তেরা বন্দুক ছুড়িয়াছিল। ইহাতে একজন সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া হাঁসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।—যশোহর, ৯ই জ্যৈষ্ঠ।

নিত্যনৈমিত্তিক ডাকাতির ফলে গ্রামবাসীদের রক্ত কতক পরিমাণে উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামে ডাকাত পড়িলে এখন দুইএকস্থলে গ্রামবাসীগণ কোমর বাঁধিয়া দুরাচারদিগের কার্য্যে

বাধা প্রদান করিতে অগ্রসর হয়। বিগত শনিবার হাবড়া থানার অন্তর্গত রাজপুর গ্রামের কোনও ব্যবসায়ীর বাড়ীতে অন্যূন ২০ জন ডাকাত প্রবেশ করে। গৃহস্বামী ক্ষণকাল পূর্ব্বে ইহাদের আগমন-বার্ত্তা অবগত হইয়া তাহার মূল্যবান অলঙ্কার ও অর্থাদি লইয়া গুপ্ত পথে পলায়ন করে। ডাকাতির সংবাদ পাইয়া গ্রামের ১২ জন যুবক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। গ্রামবাসীরাও যুবকদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিল। দস্যুগণ তাহাদের আহত সঙ্গীদিগের সহিত একটা বাক্স লইয়া প্রস্থান করে। বাক্সে মাত্র ১৩টী টাকা ছিল। গ্রামবাসীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ আহত হইয়াছে।—যশোহর, ৯ই জ্যৈষ্ঠ।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ডাকাতদের পক্ষে বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র সংগ্রহ করা যত সহজ, গ্রামবাসী নিরীহ ভদ্র প্রজার পক্ষে সেরূপ সহজ নহে। এই দুঃখের মধ্যেও আশা ও আনন্দের কারণ এই যে আজকাল যুবকেরা সকলপ্রকার সৎকার্য্যেই অগ্রণী এবং গ্রামবাসীরা তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। সম্মিলন, সহানুভূতি ও সহমর্ম্মিতা থাকিলে সকলপ্রকার অকল্যাণ অচিরেই বিদূরিত হইয়া যায়। তথাপি অস্ত্র অধিকারের জন্য আমাদিগকে নিয়ত রাজসরকারে আবেদন জানাইতে হইবে, নিশ্চিন্ত বা হতাশ হইলে চলিবে না।

পশুর অবস্থা—

পশু হত্যা—বিগত ১৯১২ অব্দে কলিকাতা, বোম্বে ও মান্দ্রাজে যে-সকল পশু হত্যা হইয়াছে তাহার তালিকা এই :—

১।	মেষ ও ছাগল	১২,১৫,৪৩৮
২।	গো	১,১১,৮৭২
৩।	গো-বৎস	১১,০২৪
৪।	শূকর	২,৮৬০
		১৩,৪১,১৯৪

—জ্যোতিঃ (চট্টগ্রাম) ১১ই জ্যৈষ্ঠ।

পশুহত্যার তালিকাটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই শরীর শিহরিয়া উঠে। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখিতে পাওয়া যায় যে অমুক স্থানে একটা নরখাদক বৃহৎ বাঘ শীকার করা হইয়াছে, সেটা এত দিনের ভিতর এতগুলা গরু ছাগল ও মানুষকে উদরসাৎ করিয়াছে। তখন আমরা বাঘকে কত গালাগালিই না দি, এবং বাঘটা মারা পড়িয়াছে বলিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলি। কিন্তু যখন মাঝে মাঝে মানুষেরও ঐরূপ পশুহত্যার তালিকা প্রকাশিত হয় তখন কাহাকে রাখিয়া কাহাকে দোষ দিব ভাবিয়া পাই না। এ কথা একাধিকবার প্রতিপন্ন হইয়াছে যে নিরামিষ আহারই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, তথাপি রসনা তৃপ্তির জন্য আমরা পশুহত্যা করিতে ক্ষান্ত হই না। মানুষের বর্ব্বরতার এই একটা দিক। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এই যে, মানুষ তাহাদের অপেক্ষা কিছু অধিক নৃশংস। কারণ পশুরা খাদ্যের জন্যই প্রাণী বধ করে, আর আমরা ধর্ম্মের নামে প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণী বধ করিয়া উদরের তৃপ্তি সাধন করিতেছি। ধর্ম্মের নামে এমনতর ধর্ম্মলোপ আর কি হইতে পারে? অহিংসা পরম ধর্ম্মকেই পদ-দলিত করিয়া আমরা ধর্ম্মসাধন করিতেছি! তবে এমন লোকও অনেক আছেন যাঁহারা ঐ নীতিবাক্য প্রতি-পালনে যথাসাধ্য যত্নবান। তাহারই ফলে পিঁজরাপোল গোশালা প্রভৃতির অনুষ্ঠান। সম্প্রতি চট্টগ্রামে এইরূপ একটি শুভ অনুষ্ঠান করিয়া তত্রত্য অধিবাসীরা উদার-হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন।

গত ২৯শে মে শুক্রবার বেলা ৫ ঘটিকার সময় চট্টগ্রাম পশুশালার প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভা আহূত হয়। ইউরোপীয়, বোম্বাইবাসী হিন্দু ও মুসলমান ধনী ব্যবসায়ী, মাড়োয়ারি এবং স্থানীয় হিন্দু মুসলমান অনেকেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই পশুশালার উদ্দেশ্য ৩টি। প্রথমতঃ উৎসর্গীকৃত গো মহিষাদি এবং স্থবীর ও বয়স্ক গৃহপালিত পশুদিগকে প্রতিপালন করা। দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব নিবারণ করা। তৃতীয়তঃ রুগ্ন পশুদিগের জন্য একটি চিকিৎসালয় খোলা। গত বৎসর সেনিটারী রিপোর্টে দেখা যায় বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবে শতকরা ১৩·৬ বালক বালিকা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। যদি বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাওয়া যায় তাহা হইলে ইহাদের মৃত্যুসংখ্যা অনেক হ্রাস হইবে।—জ্যোতি (চট্টগ্রাম), ১১ই জ্যৈষ্ঠ।

সর্ব্বত্রই এই দৃষ্টান্ত অনুসৃত হওয়া উচিত।

বালিকাদের শিক্ষার অবস্থা —

এদেশে বালিকাদের যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থার একান্ত অভাব। পল্লীগ্রামে বালিকাদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা তো নাই-ই এমন কি অল্প সহরেই এ ব্যবস্থা আছে। যদিই বা কোথাও থাকে সে শিক্ষা প্রায় অশিক্ষারই সমান। তাহা হইলেও বরঞ্চ ছিল ভাল কিন্তু অধিকাংশ স্থলে উহাকে কুশিক্ষা বলিলেই হয়। বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ অবহেলা নিতান্ত অনুচিত। তর্কের সময়ে না হয় মনু উদ্ধৃত করিয়াই একরূপ চলে কিন্তু কার্য্যকালে শুধু বাক্যবিন্যাসের দ্বারা তো আর কিছু সিদ্ধ

হয়না। সমাজের কল্যাণ, বালিকাদের বিবাহের সুবিধা ও জীবনের সুখের জন্য যে তাহাদের শিক্ষার প্রয়োজন আছে তাহা বহুবার মীমাংসিত হইয়াছে। সুতরাং সে-সকল যুক্তি তর্কের পুনরবতারণা করা নিষ্প্রয়োজন। বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা অনেক স্থানে থাকিলেও কি প্রণালীতে ও কোন্‌দিক দিয়া তাহাদের শিক্ষা দিলে বাস্তবিক সুফল ফলিবে তাহা সম্যকরূপে সর্ব্বত্র জানা নাই। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হয় নাই। তবু যিনি যেমন ভাবে পারেন তাঁহার সেইরূপ ভাবেই স্ত্রীশিক্ষার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করা উচিত।

স্বর্গীয় রামচরণ বাবু এখানকার বালিকা-বিদ্যালয়ের একমাত্র পরিপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তাঁহারই অর্থসাহায্যে বালিকা-বিদ্যালয়টি সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সতীশ বাবু যদি তাঁহার পরলোকগত পিতার এই অর্দ্ধসম্পন্ন কার্য্যটিকে পরিপূর্ণভাবে গঠন করিয়া তোলেন তাহা হইলে আমাদের মতে স্বর্গীয় রামচরণ বাবুর পূত স্মৃতির প্রতি বাস্তবিকই সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করা হইবে। এখানে বালিকাদিগের শিক্ষার্থে এখন যাহা আছে তাহা নিতান্তই সামান্য—নাই বলিলেই চলে!—মানভূম (পুরুলিয়া), ২৬শে জ্যৈষ্ঠ।

আমরা অবগত হইলাম, ভূতপূর্ব্ব মেজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের অনুরোধে শ্রীযুক্ত অনারেবল রাজা শশীকান্ত আচার্য্য বাহাদুর স্থানীয় [মুক্তাগাছা] বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য একটু স্থান দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কতিপয় ভদ্রলোক নাকি শ্রীযুতা রাণী লীলা দেবীর নিকট বালিকা-বিদ্যালয় সম্বন্ধে এক প্রার্থনাপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আবেদনের উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই। অন্যান্য প্রার্থনার মধ্যে একটী প্রার্থনা এই আছে যে, রাণী বালিকা-বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়া উহা নিজ নামে পরিচালন করেন। আমরা আশা করি, স্বগ্রামে শ্রীযুতা রাণী মহোদয়া স্ত্রী-শিক্ষার এই মহৎ আদর্শ দেখাইতে কখনও কুণ্ঠিত হইবেন না। সম্প্রতি বালিকা-বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটীতে কতিপয় অতিরিক্ত মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন। মেম্বরসংখ্যার আধিক্যে কোন শুভ ফল উৎপন্ন হইবে কি না বলিতে পারি না।—চারুমিহির (ময়মনসিং) ১৯শে জ্যৈষ্ঠ।

এইরূপ যাঁহাদের সামর্থ্য আছে তাঁহাদের বালিকা-শিক্ষার উন্নতি-কল্পে যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। আমাদের দেশের সাধারণ লোকে তো সকলেই নিতান্ত দরিদ্র, নিজেদের কিছু সদনুষ্ঠান করিবার তাহাদের তো সাধ্য নাই। যাঁহাদের অর্থ ও সামর্থ্য আছে তাঁহাদেরই মুখ চাহিয়া তাহারা আছে—সুতরাং তাহাদের ভগ্নমনোরথ করা অর্থশালীদের কখনো উচিত নহে। আমরা পুরুলিয়া ও মুক্তাগাছায় বালিকা-শিক্ষার উন্নতি দেখিলে পরম সুখী হইব।

নোয়াখালীর সঙ্কট—

নোয়াখালী সহরটীকে গ্রাস করিবার জন্য প্রলয়ঙ্করী মেঘনা মুখ ব্যাদান করিয়াছে। ইতিমধ্যেই সহরের বহুলাংশ ইহার বিরাট উদরে নীত হইয়াছে। পূর্ব্বে একবার শুনিয়াছিলাম, গবর্ণমেণ্ট নোয়াখালী সহরকে ত্রিপুরার চাঁদপুর মহকুমায় স্থাপন করিয়া ত্রিপুরার কতকাংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটা ভাঙ্গা গড়া করিবেন। এই সংবাদে চাঁদপুরবাসী উকিল মোক্তার প্রভৃতি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ এরূপ হইলে তাঁহাদের অনেকের সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এখন শুনিতেছি সরকারী পূর্ত্ত বিভাগের জনৈক ওভারসিয়ারের নায়কত্বে একদল আমিন দ্বারা সহরের অনধিক ৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী বেগমগঞ্জ নামক স্থানের জরীপ করার প্রস্তাব হইয়াছে। এই স্থানের নক্সা পাইলে কর্ত্তৃপক্ষ জেলা গঠন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন। প্রধান নগর জেলার মধ্যস্থলে সংস্থাপিত হইলে সমস্ত জেলাবাসীর তুল্যরূপ সুবিধা হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট যদি ফেণীতে সহর স্থাপন করেন তবে পশ্চিমাংশবাসীদিগের অসুবিধার একশেষ হইবে। কারণ ফেণী মহকুমাটী জেলার পূর্ব্ব সীমান্তে স্থাপিত।—যশোহর, ২০শে জ্যৈষ্ঠ।

নদীর ধারে গমন করিলে এবং নদীর অবস্থা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে, সাময়িক চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিলে নদী নিশ্চয়ই ফিরিয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন কি না জানি না কিন্তু নোয়াখালীবাসীর সেই সঙ্গে সঙ্গে চুপ করিয়া থাকিবার কোন কারণই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ঐ দিকে গবর্ণমেণ্ট চৌমুহনী ও ফেণীতে নূতন সহরের জন্য স্থান মনোনয়ন করিয়া জমি জরিপ করিতেছেন। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস গবর্ণমেণ্ট যত ব্যয়ে সহর স্থানান্তর করিবেন তদপেক্ষা বেশী খরচ লাগিলেও নদীর গতি পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। কারণ সহর ভাঙ্গিয়া গেলে অধিবাসী যেরূপ বিপদগ্রস্ত হইবে তাহার তুলনায় গবর্ণমেণ্টের কয়েক লক্ষ টাকা আমরা সামান্য বলিয়াই মনে করি। গবর্ণমেণ্ট টাকার জন্য প্রজাকে বিপদে ফেলিবেন ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। শীঘ্রই ন্যায়পরায়ণ গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয় পূর্ব্বাহ্নে বুঝাইয়া বলা উচিত। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট নোয়াখালীবাসীদিগের যুক্তিপূর্ণ প্রার্থনা ও পরামর্শে কর্ণপাত করিবেন ও সত্বর প্রতীকারের ব্যবস্থা করিবেন।—নোয়াখালী-সম্মিলনী, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ।

মানভূম সাহিত্য-পরিষৎ।—

বাংলার পুনর্বিভাগের সময় মানভূম বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিহার উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। কেন যে এরূপ হইল তাহা বুঝিয়া উঠা আমাদের পক্ষে সুকঠিন। মানভূমবাসীরা যে বাঙালী অর্থাৎ বিহার বা উড়িষ্যা হইতে বাংলার সহিতই যে তাহারা ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং বাংলার সহিত পুনর্মিলিত হইবার ন্যায্য দাবী মানভূমের যথেষ্ট আছে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মানভূমবাসীকে দেখাইতে হইবে যে তাঁহারা বাঙালী, বাঙালী ব্যতীত তাঁহারা কিছুই নহেন।

গভর্ণমেণ্ট মানভূমে যতই হিন্দী ভাষা চালাইতে চেষ্টিত হোন বাংলাই তাঁহাদের ভাষা থাকিবে ও একমাত্র তাহারই উন্নতির জন্য তাঁহারা যত্নবান হইবেন। সম্প্রতি পুরুলিয়ার কতিপয় উদ্যোগী শিক্ষিত ভদ্রলোক মিলিয়া মানভূম সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য বাংলাভাষার চর্চ্চা করা, মানভূমের সুষ্ঠু ইতিহাস সঙ্কলন ইত্যাদি। নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।—

আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে মানভূমের পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের লেখক শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন উদ্যোগী ব্যক্তিকে এখানে সাহিত্য চর্চ্চার উপযোগী একটা স্থায়ী সভা গঠন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমাদের সে ইঙ্গিত পরামর্শ ব্যর্থ হয় নাই দেখিয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। বিগত ২৭শে বৈশাখ তারিখের মানভূমেও ঐ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ইঙ্গিতের ফলে এখানকার পুরুলিয়া বারের নবীন সভ্য কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত অমৃতাক্ষ সরকার এম, এ, বি এল. লালসিংহের প্রশংসাপ্রাপ্ত লেখক শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ বি, এল প্রমুখ কয়েকজনে এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান হন। পুরুলিয়া বারের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহাশয় এ বিষয়ে প্রথম হইতে আন্তরিক সহানুভূতি ও ইহার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করেন। ইঁহাদের একান্ত চেষ্টার ফলে ও স্থানীয় অন্যান্য ভদ্রলোকদিগের সহানুভূতি ও সহায়তায় ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৬ই মে এখানকার মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুলের হলে একটি প্রকাণ্ড সভা আহূত হয়। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত সুলিখিত ও সুগম্ভীর অভিভাষণখানি পাঠ করিলেন। তিনি বলিলেন, প্রাচীন ভারতের শিক্ষা সভ্যতা ও আদর্শ আমাদের জীবনপথে অনন্ত কাল ধরিয়া উজ্জ্বল জ্যোতিশ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছে, তাহারই আলোকে আমাদের সম্মুখপানে অগ্রসর হইতে হইবে। তিনি যুবক ও বালকগণকে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা ভরসার স্থল বলিয়া উল্লেখ করিলেন ও তাঁহারা যাহাতে চিরন্তন আদর্শের উপর নূতন রূপে জীবন গঠন করিয়া মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সেবায় লাগিয়া যান এই জন্য তাঁহাদিগকে বার বার আবেগপূর্ণ ভাষায় অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অভিভাষণটি সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ মহাশয় সভার উদ্বোধন সম্বন্ধে তাঁহার অভিভাষণটি পাঠ করিলেন। তাঁহার সেই সুলিখিত অভিভাষণটিতে মানভূমের ইতিহাসের অনেক গুপ্ত কথারই আভাষ তিনি দিয়াছেন। মানভূমের ঐতিহাসিক তথ্য তিনি অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন ও এখনও বিশেষভাবে সেই চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। তাঁহার উদ্যম প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। তাঁহার এই কার্য্যাবলীর দ্বারা মানভূমের সম্পূর্ণ ইতিহাস সঙ্কলনের পথ অনেকটা সুগম হইবে সন্দেহ নাই।

মানভূম (পুরুলিয়া) ১৯শে জ্যৈষ্ঠ।

মানভূমের এই উদ্যম ও দৃঢ়তা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। চারিদিক হইতে একটা জাগরণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। নিরুদ্যম হইয়া কেহ আর বসিয়া নাই। আমরা অন্তরের সহিত মানভূম সাহিত্য-পরিষদের সত্বর উন্নতি কামনা করি। আশাকরি তাঁহারা প্রকৃত কাজ করিতে পারিবেন।

স্বদেশী।—৮ই আষাঢ়ের বরিশাল-হিতৈষী আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, দেশের মধ্যে স্বদেশী-প্রচেষ্টা এমন কমিয়া গিয়াছে যে এবার পূজার সময় দেশী কাপড় পাওয়া দুষ্কর হইবে। ইহা সম্পূর্ণ সত্য, এবং অত্যন্ত লজ্জা ও আক্ষেপের বিষয়। কিন্তু এখনো সময় আছে, আমাদের সকলেরই স্বদেশকল্যাণ জীবনের ব্রত করিয়া দেশের শিল্পবাণিজ্য সজীব ও উন্নত রাখিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই চিন্তা আমাদের নিশ্বাস ও আহার-গ্রহণের মতন অত্যাবশ্যক ও সহজ স্বভাবগত হইয়া যাওয়া উচিত। স্বদেশী-প্রচেষ্টার উদ্বোধনের দিনে যুবকেরা যেরূপ উদ্যমে কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, সেইরূপ উদ্যম উৎসাহ দেশের মধ্যে নিয়ত নিরন্তর প্রবহমান দেখিতে চাই।

শ্রীক্ষীরোদকুমার রায়।

স্বপ্নপ্রয়াণ

তরণীর নাহি সাড়া সে তরঙ্গ-পরে,
উদ্বেল আনন্দে শুধু ওঠে আর পড়ে
আপন আবেগে,
তারি মাঝে ঊর্দ্ধ মুখে জাগে শৈলরাজ
আলোর সঞ্চার-ক্ষেত্র, বাষ্প ছাড়ি লাজ
ভরি ওঠে মেঘে!
সেথায় বেঁধেছে নীড় নর্ম্মসখা মোর
সমুদ্রের পাখী,
চন্দ্রালোকে, রজনীর নাহি হ'তে ভোর
গাহে সে একাকী,
তারি নাম-ধরা ডাক আসে বার বার
ভাসিয়া পবনে,
সন্তরিয়া যাব আমি স্বপ্ন-পারাবার
সে স্বর্গ-ভবনে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

অবিমারক

মহাকবি ভাস-বিরচিত নাটক।

[পূর্ব্বকথার বস্তুসংক্ষেপ—কুন্তীভোজ রাজার কন্যা কুরঙ্গী উদ্যান-ভ্রমণে গিয়া মত্তহস্তী দ্বারা আক্রান্ত হন। অন্ত্যজ জাতি বলিয়া পরিচিত অবিমারক নামক এক যুবক রাজকুমারীকে রক্ষা করেন। প্রথম দর্শনেই উভয়ের মনে প্রণয় সঞ্চার হয়। রাজকুমারীর ধাত্রীর আমন্ত্রণে অবিমারক রাত্রিকালে গোপনে রাজান্তঃপুরে গিয়া রাজকুমারীর সহিত মিলিত হন।]

চতুর্থ অঙ্ক

(চাঙারী হস্তে মাগধিকার প্রবেশ)

মাগধিকা

আঃ বাড়ীর চাকর-দাসীগুলোর হয়েছে কি? সূর্য্যি উঠে গেল তবু বাড়ীতে পাট ঝাঁট পড়ল না। তাদের ত সাড়াশব্দও কোথাও শোনা যাচ্ছে না। হ'ল কি এদের? সমস্ত রাত জেগে সকাল পর্য্যন্ত ঘুম মারছে আর কি। যাই, রাজকুমারীকে ডেকে এদের কাণ্ডখানা একবার দেখাই। (পরিক্রমণ)

(পাখা হস্তে বিলাসিনীর প্রবেশ)

বিলাসিনী

মাগধিকে, দাঁড়া লো দাঁড়া।

মাগধিকা

হাঁলা পিছু ডাকছিস কেন? আমি রাজকুমারীর জন্যে ফুল চন্দন নিয়ে যাচ্ছি।

বিলাসিনী

রাজকুমারীর ফুল চন্দনেরই বা দরকার কি, আর গহনা-গাঁঠিরই বা আবশ্যক কি?

মাগধিকা

আ মর খরসামুখী! সক্কাল বেলা এমন অমঙ্গুলে কথা মুখে আনিস নে। রাজকুমারীর জন্মায়তি হোক, হাতের নো ক্ষয় যাক।

বিলাসিনী

না না, আমি ও কথা বলিনি। রাজকুমারীর রূপই যে তার অলঙ্কার।

মাগধিকা

পাগল কোথাকার! ফুলই ত তার যোগ্য।

বিলাসিনী

ঠিক বলেছিস! স্বভাব-রমণীয় ভূষণ অতি রমণীয়ই হয়।

মাগধিকা

রাজকুমারীর রূপের যোগ্যই স্বামী লাভ হয়েছে।

বিলাসিনী

অমন পক্ষপাত করিসনে। আমাদের জামাইবাবুর কাছে রাজকুমারীকে সূর্য্যের কাছে পদ্ম ফুলের মতন দেখায়।

মাগধিকা

ঠিক বলেছিস। আমারও মনে হচ্ছে—জামাইবাবুকে যেন সাক্ষাৎ কামদেবের মতন মনে হয়।

বিলাসিনী

সেইজন্যেই ত রাজকুমারী জামাইবাবুকে একদণ্ড দেখতে না পেলে আঁধার দেখে।

(সাশ্রুলোচনা নলিনিকার প্রবেশ)

নলিনিকা (শোকার্ত্ত ভাবে)

লোকে যে বলে সুখের পথে অনেক বিঘ্ন, তা সত্য। এক বৎসর হল রাজকুমারী অবিচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ করলেন। আমাদের উত্তরকুরুবাসের সময় এল। আজ আবার শুনছি যে মহারাজ সমস্ত ব্যাপার টের পেয়েছেন। শুনে অবধি গা কাঁপছে! রাজকুমারীও লজ্জায় ভয়ে দুঃখে সন্তাপে যেন মূর্চ্ছাগত হয়ে রয়েছেন। সমস্ত রাজবাড়ী যেন নির্ব্বাপিত প্রদীপের মতো হয়ে রয়েছে। জামাই-বাবু চলে' যাওয়াতে আমার কিছুই আর ভালো লাগছিল না। তিনি নির্ব্বিঘ্নে রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছেন, শুনে অবধি মন তবু খুসী হয়ে উঠেছে। এখন কন্যান্তঃপুরে কড়াক্কড় পাহারা বসেছে, আট ঘাট একে-বারে বন্ধ! (পরিক্রমণ)......ওমা! ঐ যে সখী দুজন যাচ্ছে......ওলো মাগধিকে, কি রে?

মাগধিকা

কি আবার জিজ্ঞাসা করছিস? রাজকুমারীর সাজবার সময় হয়েছে যে।

নলিনিকা

উৎসব সব চুকে গেছে। (ক্রন্দন)

মাগধিকা ও বিলাসিনী

স্বপ্নের মতো এ কি কথা! বল বল, শুনে আমরা সকলে সমান হই।

নলিনিক

জামাইবাবু চলে গেছে।

মাগধিকা ও বিলাসিনী

অ্যাঁ !

নলিনিকা

আমি রাজকুমারীর দুঃখ আর দেখতে না পেরে এখানে চলে এলাম।

মাগধিকা

রাজকুমারীর এ দশা দেখা যায় না বটে। তবু চল আমরা তাঁকে সান্ত্বনা দিইগে।

নলিনিকা ও বিলাসিনী

তাই চলু।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

(অবিমারকের প্রবেশ)

অবিমারক

সৌভাগ্যের যতটুকু ছিল অবশেষ
কোনো মতে করি অবলম্বন তাহায়,
রাজ-অন্তঃপুর হ'তে শরীর কেবল
বাহিরিয়া আসিয়াছে অতি অসহায়।
মন মোর ধরা পড়ি প্রিয়ার মন্দিরে
তারি কাছে আছে বন্দী, আজো নাহি ফিরে।

হায়, কুরঙ্গীর কি অবস্থা হবে !

পরিজনের নিন্দাভয়ে লজ্জা হবে ভয়ঙ্কর,
রাজার রোষে রুদ্ধ হয়ে কাঁপবে হিয়া নিরন্তর,
অক্ষি-যুগল বাষ্প-আবিল হবে আমার দরশ লাগি,
নিশার স্বপন আনবে মোহ,কাঁদবে হিয়া মিলন মাগি।

হায় এর প্রতিকারের উপায় ত জানাই আছে! আমার বিরহে তার প্রাণ ত বাঁচবে না। তবে আমিও তার জন্যে প্রাণ ত্যাগ করব। (পরিক্রমণ করিয়া) আজ কদিন হ'ল আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। আজ শরীর-মনের দুঃখ আমার একেবারে অসহ্য বলে' মনে হচ্ছে।

যে ভালো বাসিল মোরে হইতেই পরিচয়,
খেলে রূপ-যৌবনের ঢেউ যার দেহময়,
সে-মোর প্রিয়ারে ছাড়ি বেঁচে আছি এতদিন,
কৃতঘ্ন শুধিতে নারি প্রাণ দিয়ে প্রিয়-ঋণ।

এখন অন্তরে বিরহদুঃখের আগুন জ্বলছে, বাইরেও সূর্য্যের তাপে অঙ্গ ক্ষার হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। (চারিদিকে চাহিয়া) উঃ গ্রীষ্মকাল কি ভীষণ! আজকাল—

সূর্য্যের তাপে দগ্ধ ধরণী জ্বলিছে যেন গো জ্বরে,
যক্ষ্মারোগীর মতন শীর্ণ গাছেরা শুকায়ে মরে।
পর্ব্বতগুলো গহ্বর-মুখ ব্যাদান করিয়া শ্বসে,
চরাচর আছে শুব্ধ হৃদয়ে যেন মূর্চ্ছার বশে।

এখন করি কি ? আমি ত যেতেও পারছি না। কারণ,

তপ্তবালুকা-অগ্নিচূর্ণ ছড়ায় রুক্ষ বায়ু,
ক্ষীণছায়া তরু হইতে খসিয়া পড়িছে পত্র-আয়ু,
সূর্য্যের খর উত্তাপ লাগি এ গোটা বিশ্ব যেন
গুমিয়া গুমিয়া পাকিয়া উঠিছে জাগ-দেওয়া ফল হেন।

হায় প্রিয়ে! হায় সুন্দরি! আমার কথার উত্তর দাও। (মূর্চ্ছিত হইল। সংজ্ঞা পাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ঊর্দ্ধে তাকাইয়া) সহস্ররশ্মি সূর্য্য এইবার ঢাকা পড়ে গেছে।

বাতাস বহিয়া আনি মেঘের বিতান
তপনের তলে তাহা দিল বিছাইয়া ;
কোথাও আছে কি হেন মেঘের সন্ধান,
সন্তাপ ঢাকিয়া করে শান্ত এই হিয়া ?

এই জীবন্মৃত অবস্থায় থেকে আর কাজ কি ? এ প্রাণ ত্যাগ করাই ভালো। (উঠিয়া পরিক্রমণ করিতে করিতে) কিই বা করি ? হাঁ। ঠিক হয়েছে। এই বনের বিলের জলে ডুবে মরি। না না ছিঃ। আমার মরণের উপায় এ ঠিক হয়নি। অতি দুঃখের মোহে পথভুল হয়ে মহাপথের সন্ধান বিস্মৃত হয়েছি। অন্য উপায় ঠিক করবার চেষ্টা করি। (চারিদিকে চাহিয়া) ঠিক হয়েছে। ঐ যে নিকটেই দাবাগ্নি জ্বলে উঠেছে। তাতেই আমার এ প্রাণ আহুতি দেবো। (নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া) হে ভগবান্ অগ্নি !

একাগ্র চিত্তের মোর কোনো অভিলাষ
পরকালে যদি কর দয়ায় পূরণ,
এইটুকু কোরো যেন প্রত্যেক নিশ্বাস
প্রেয়সীর নামকীর্ত্তি করে সে কীর্ত্তন।

(অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া) ব্যাপার কি !

আগুন হইতে ফুল্‌কি উড়িয়া জ্বালাইছে তরুলতা,
আমার অঙ্গে লাগিছে অনল হিমচন্দন যথা !
অন্তরে মোর পুষিয়া রেখেছি অগ্নির জ্বালা শত,
সে-হেতু অগ্নি কোল দেয় মোরে পুত্রে পিতার মতো !

এর চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হতে পারে? আগুনে আমি পুড়লাম না। হয়ত এরও কিছু কারণ আছে। যা হোক অন্য চেষ্টা দেখি। (পরিক্রমণ করিয়া) এই ত প্রকাণ্ড পর্ব্বত রয়েছে।

পিঙ্গল মেঘ শৃঙ্গচূড়ায় মিশিয়া সমান লাগে,
গগনবিহারী বিশ্রাম পায় ইহারি ললাট-ভাগে;
সুকবি জনের মনের মতন বিচিত্ররূপধর,
হৃদ্য এ ঠাঁই, মিত্র-মিলনে যথা হয় অন্তর;
সফল বিফলে, ধনী দরিদ্রে যেমন চোখেতে চায়,
উপর তেমনি নীচেতে মেলিছে করুণ দৃষ্টিছায়।

যাক, এই পর্ব্বত থেকে পড়ে' আমি প্রাণ বিসর্জ্জন দেবো। বায়ুপ্রপাতে প্রাণবায়ু মিশিয়ে দিলে সব মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। তবে পর্ব্বতে উঠি। (আরোহণ করিয়া চারিদিকে চাহিয়া) এই কুণ্ডের জলে স্নান আচমন করে' মন্ত্র জপ করি। (সেইরূপ করিতে লাগিল)

(বিদ্যাধর প্রিয়ার সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল)

বিদ্যাধর

প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া এসেছি উত্তরকুরুবর্ষে,
স্নান সমাপন করেছি আমরা মানসের জলে হর্ষে,
মন্দর আর হিমালয়-গুহা ঘুরিয়া খেলিয়া ফিরি,
দুপুরে ঘুমাতে চলি চন্দন-স্নিগ্ধ মলয়-গিরি !

(আকাশযান থামাইয়া) সৌদামনী, দেখ দেখ, দেবী বসুন্ধরার আকৃতি দূর থেকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে! দেখ—

পাহাড়গুলি হাতীর ছানা, মেঘ সে তড়াগ যেন,
গাছগুলি সব শেওলা তাহে ভাসছে দেখায় হেন।
নদীর ধারা সীঁথির পারা, টিপের মতন বাড়ী,
সঙ্কুচিত পৃথ্বী যেন ঠিক একটি নারী।

ভদ্রে সাবধান হও। শীতল-চন্দন-নিলয় মলয় পর্ব্বতে আমরা যাব।

সৌদামনী

আর্য্য, তাই চল।

(উভয়ে আকাশযান চালাইল)

সৌদামনী

আর্য্য, বিশ্রাম না করে' একটানা যেতে আমি পারছি না।

বিদ্যাধর

তবে চল কোনো পর্ব্বতচূড়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে' যাব।

সৌদামনী

আর্য্য, আমি তাই চাই।

(উভয়ে অবতরণ করিতে লাগিল)

বিদ্যাধর

সৌদামনী, দেখ দেখ—

জলদ গহন ত্যজিয়া সবেগে
জলধি-মেখলা ধরা !
উচ্ছ্রিত হয়ে ফুটিয়া উঠিছে
দেখিতে দেখিতে ত্বরা।
ক্রমপ্রকাশ্য তরু পর্ব্বত
যেন বর্ষার মেঘ,
নিমেষে স্পষ্ট করিয়া তুলিছে
অবতরণের বেগ।

দেখ ওগো, এই পর্ব্বত মুহূর্ত্তের তরে আমাদের আতিথ্য করতে সমর্থ বলে মনে হচ্ছে। এখানেই বিশ্রাম করব চল।

সৌদামনী

আর্য্য, তাই চল।

বিদ্যাধর

সৌদামনী, পুষ্পিত তরু হতে ফুলের ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করা আমাদের অন্যায় হবে না, সে পরিমাণ ফুল আমাদের প্রাপ্য। অতএব এস তরুগুলিকে অঋণী করে যাই।

(পুষ্প চয়ন করিতে লাগিল)

বিদ্যাধর (অবিমারককে দেখিয়া)

আঁ্যা এ আবার কে? হ্যাঁ বুঝেছি। এ একজন মন্ত্র-ভ্রষ্ট বিদ্যাধর হবে, নইলে এমন অপরূপ রূপ কি আর-কারো হয়? বহু সৌভাগ্য ছিল তাই এ-কে দেখতে

পেলাম। যাক, এখন এই আত্মভোলা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।

অবিমারক

যাক, দেবকার্য্য করা হয়ে গেল। এখন লাফিয়ে পড়ি (পাশের দিকে চাহিয়া বিদ্যাধরকে দেখিয়া) অঁ্যা! এ আবার কে? এ কি স্বপ্ন? আমি ত ঘুমিয়ে নেই। হায়! অন্তকালে মানুষ কত কি দেখতে পায়! এও সেই রকম একটা কিছু হবে। কিন্তু সে ত মূঢ়দের বেলা; আমি ত সবই জানি। যাই হোক এ-কে জিজ্ঞাসা করি! মশায়! আপনি কোন্ কুল অলঙ্কৃত করেছেন?

বিদ্যাধর

শুনুন—আমি বিদ্যাধর, আমার নাম মেঘনাদ। ইনি আমার কুটুম্বিনী সৌদামনী। আজ মলয়পর্ব্বতে ভগবান্ অগস্ত্যকে পূজা করবার জন্যে বিদ্যাধরেরা এক উৎসব আরম্ভ করেছে। সেখানে আমরাও আহূত হয়েছি। এখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করে যাব বলে এখানে নেমেছি। এই আমাদের পরিচয়। এখন আপনি বলুন, আপনি কেন এই মর্ত্ত্যভূমিকে দেবভূমি করেছেন?

অবিমারক

(স্বগত) এখন কি বলি? এখন আমার অন্তিম কালে অসত্য কথা বলা উচিত নয়। (প্রকাশ্যে) আমি সৌবীর-রাজার পুত্র, আমার নাম অবিমারক।

বিদ্যাধর

(স্বগত) ডাহা মিথ্যে কথাটা বল্লে। এ কখনো মানুষের আকৃতি হতে পারে না। (প্রকাশ্যে) এখানে আপনি একলা এসেছেন কেন?

অবিমারক (স্বগত)

হায়! এ-কে কি বলি? (অধোমুখ হইয়া রহিল)

বিদ্যাধর

(স্বগত) আচ্ছা, আমি নিজেই জানছি। (বিদ্যা প্রয়োগ করিল) হায়! কি দুঃখ! এ যে অগ্নিদেবের পুত্র, আপনার পরিচয় এ জানে না; কুন্তিভোজের কন্যা কুরঙ্গীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল; লোক-জানাজানি হওয়াতে চলে এসেছে; পুনর্মিলনের উপায় ঠাহর করতে না পেরে মরুৎপ্রপাত দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করবার জন্যে এখানে এসে চড়েছে। সেও সেখানে জীবন্মৃত হয়ে আছে। আমি এদের এই মিলনের সহায় হব। (প্রকাশ্যে) দেখ ভাই অবিমারক! মিত্রতায় ছলনা করা সাজে না। আমার কাছে কোন কথা গোপন করা তোমার উচিত নয়।

অবিমারক

কি কথা বলুন।

বিদ্যাধর

আজ থেকে তোমায় আমায় বন্ধুত্ব হল। তোমার সকল ব্যাপারই আমরা জেনেছি। প্রাণ পরিত্যাগের জন্যে তুমি এখানে উঠেছ, কেমন্ ঠিক কি না?

অবিমারক

বন্ধু, ঠিক তাই।

বিদ্যাধর

এই বিশ্বাস করাতে আমি খুব খুসী হলাম। যদি লোকের অজ্ঞাতসারে সেখানে প্রবেশ করার উপায় হয় তা হলে তুমি কি কর?

অবিমারক

আর কি? সেখানে সরাসর চলে যাই। সেই জন্যেই ত এত দুঃখ!

বিদ্যাধর

তার উপায় এই অঙ্গুরীয় দেখ বন্ধু! (আংটি প্রদর্শন)

অবিমারক

বন্ধু, এতে কি হবে?

বিদ্যাধর

এই অঙ্গুরীয় ডাহিন হাতের আঙুলে পরলে অদৃশ্য হয়, বাঁ হাতের আঙুলে পরলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়।

অবিমারক

বন্ধু! এমনও হয়?

বিদ্যাধর

এই দেখ তোমার প্রত্যয় করাই। বন্ধু! আমায় দেখতে পাচ্ছ?

অবিমারক

হ্যাঁ।

বিদ্যাধর

এখন লক্ষ্য কর।

অবিমারক

লক্ষ্য করছি।

বিদ্যাধর (দক্ষিণাঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া)

বয়স্য! আমায় কি দেখতে পাচ্ছ?

অবিমারক

বয়স্য! ছায়াও দেখা যাচ্ছে না, শরীরের ত কথাই নেই।

বনিতারে পাশে লয়ে যে পারে উড়িয়া যেতে,
পর্ব্বত-তটে তটে খেলা করে সুখে মেতে,
মন্ত্রের বলে জানে যাহা আছে জানিবার,
অদৃশ্য বা দৃশ্য রূপে সুখে ভ্রমে অনিবার,
তার সম কেবা বল এ জগতে সুখী আর!

যাক, এর প্রভাবে আমি ত কুরঙ্গীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পেরেইছি।

বিদ্যাধর (বাম অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া)

তবে এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ কর।

অবিমারক (গ্রহণ করিয়া)

অনুগৃহীত হলাম।

বিদ্যাধর

না না, আমিই অনুগৃহীত হলাম। কারণ—
যেজন সুজন হয় তার তুষ্টি রত্ন পরি' নয়,
সৎপাত্রে দান করি তার প্রাণে হর্ষ উপজয়।

অবিমারক

এক বিষয়ে আমার সংশয় আছে। যদিও বলা সঙ্গত নয় তবু বলতে হচ্ছে যে আমার শরীরে এই অঙ্গুরীর প্রভাব পরীক্ষা করা ত হয়নি।

বিদ্যাধর

বেশ ত। দক্ষিণাঙ্গুলীতে ধারণ কর।

অবিমারক

আচ্ছা বেশ। (দক্ষিণাঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় পরিল)

বিদ্যাধর

বন্ধু, এই তরবারি গ্রহণ কর।

অবিমারক

বেশ। (তরবারি লইয়া সবিস্ময়ে) বাঃ! এই তরবারির কি প্রভাব!

নম্র-করা অশনিরে গড়েছে কি তরবারি করি,
বিদ্যুৎ-ঝলক কিংবা এল এই অসি-রূপ ধরি!
সূর্য্যের দীপ্তিরে ইহা লজ্জা দিয়া প্রদীপ্ত আকারে
দাবাগ্নির মতো জ্বলি উঠিল এ বনের মাঝারে।

বিদ্যাধর

আহা অগ্নিপুত্রের কি বীরত্ব! এই খড়্গের প্রভাব বিদ্যাধরের মধ্যেও অল্প লোকে সহ্য করতে সক্ষম। অগ্নিদেব নিশ্চয় এ-কে রক্ষা করেছেন।

অবিমারক (খড়্গের দিকে চাহিয়া)

আহা বিদ্যার কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা!

সেই আমি সেই আছি শরীরে আমার,
তাহারে বিশেষ করে দিব্য গুণে ভাবে।
শরীর রয়েছে মোর একই প্রকার,
অদৃশ্য এ মানবের, বিদ্যার প্রভাবে।

বন্ধু, আমার কাজ হয়ে গেছে, তুমি তরবারি গ্রহণ কর!

বিদ্যাধর

তোমার যেরূপ ইচ্ছা। বন্ধু, এই অঙ্গুরীর প্রভাবে অন্তর্হিত ব্যক্তি যাকে স্পর্শ করে' থাকে সেও অন্তর্হিত হয়, আবার সেই স্পৃষ্ট ব্যক্তিও যদি অপর কাহাকেও স্পর্শ করে তবে সেও অন্তর্হিত হয়।

অবিমারক

বন্ধু, বড়ই প্রীত হলাম। এ যে সৌভাগ্যের উপর চরম সৌভাগ্য! বন্ধু, আমার জন্যে তোমাদের বিলম্ব হয়ে গেল বোধ হয়। আর তবে বিলম্ব করা উচিত নয়।

বিদ্যাধর

আমি ত তোমার কাজ করে দিলাম, তুমি ত আমার কিছু করলে না?

অবিমারক

তার জন্যে অত কথায় কাজ কি?

তোমার মতন বিদ্যারে যেবা করিয়াছে নিজ দাসী
আমার মতন লোকের নিকটে সে কিসের প্রত্যাশী!
প্রাণ দিয়া তুমি কিনিয়া নিয়েছ, ক্রীতদাস আমি তব,
যা আছে করিতে কর হে আদেশ, আমি কৃতার্থ হব।

বিদ্যাধর

আমি তোমার অকুটিল সরল বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছি। যদি তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন কর, তবে—

সখীরে আমার করো নিবেদন—আমার ইহার কথা,
করিয়ো স্মরণ সুখে দুখে সখা---আমি তব সর্ব্বথা।
ক্রীড়া কৌতুকে তুষ্ট করগে রাজার কন্যাটিরে,
কার্য্য সারিয়া তোমাদের কাছে আবার আসিব ফিরে।

হায়! এই পুরুষশ্রেষ্ঠকে ছেড়ে যেতে মন সরছে না। বন্ধু, তবে এখন আসি।

অবিমারক

যাও বন্ধু পুনদর্শন দেবার জন্যে।

বিদ্যাধর

তাই হবে। (প্রিয়ার সহিত ঊর্দ্ধে উত্থান)

অবিমারক

(ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া) ঐ মেঘনাদ গগন-সমুদ্রে ভেসে চলেছে।

মাথার আগের চুলগুলি উড়ে পড়িছে পিছের দিকে,
মেঘ বিদারিয়া চলিতে অঙ্গ-রাগ হয়ে যায় ফিকে;
কষিয়া বেঁধেছে কক্ষের বাস অসিরে রাখিতে পাশে,
যুবতী প্রিয়ার বাহুলতা তারে আঁকড়ি' রয়েছে ত্রাসে!
বাতাসে উড়িছে উত্তরীয়ের আলগা আঁচল খানি,
মুকুটের মাঝে রত্ন মাণিক তারকার মতো মানি!
অতি বেগে ধায় উল্কার প্রায় আকাশে ঊর্দ্ধ পানে,
ক্রমে ক্ষীয়মান সে আকাশযান, আরোহী আকাশযানে।

বিদ্যাবলে বিদ্যাধর-বধূ তার প্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলেচে।

গমন-বেগে গিয়েছে খুলে চুলগুলি তার পিঠটি বেপে,
ক্ষীণ সে কটি খিন্ন অতি, স্তন দুটি তার উঠছে কেঁপে,
প্রিয়ের দেহ আলিঙ্গনে যুক্ত দেহ প্রিয়ের গায়,
আকাশপটে জলদজালে বিস্তারিত তড়িৎ-প্রায়।

যাঃ বিদ্যাধর দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে গেল। আমিও আজই নগরের দিকে যাত্রা করব। এখন অবতরণ করি। (অবতরণ করিয়া) বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আচ্ছা, এই শিলাপৃষ্ঠে ক্ষণকাল বিশ্রাম করে' তারপর যাব।

(উপবেশন)

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক

হায় হায়! পরম প্রসিদ্ধ সৌবীর রাজের কি দুর্ভাগ্য। অপুত্রক রাজা ব্রতনিয়ম পালন করে' দেবতার প্রসাদে মনুষ্যলোকে দুর্লভ সুপুত্র লাভ করেও আবার যে-কে-সেই অপুত্রকই হয়ে পড়লেন! নিশ্চয় আমারই বন্ধু-ভাগ্যের মন্দ ফল, আমার প্রিয়বন্ধু-বিরহে-মরণ-ভবিতব্য কুমারকে নিরুদ্দেশ করেছে! (পরিক্রমণ) আজ কিন্তু আমার মন বলছে যে কুমার কুশলে আছেন। কিন্তু কে জানে, অতি সুকুমার রাজকুমার অতি অকরুণ মন্মথ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হয়ে কুশলে আছেন কি না। আমি ত হয় কুমারকে না-হয় কুমারের শরীরকে খুঁজে খুঁজে সমস্ত দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। যদি না দেখা পাই, তবে কুমারের পরকালের সঙ্গী আমিও হব। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এই বৃক্ষছায়ায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করে' যাই। (নিদ্রিত হইল)

অবিমারক

আমার বন্ধু সন্তুষ্টের অবস্থা না জানি এখন কেমন। আমি রাজ-অন্তঃপুর থেকে ভালোয় ভালোয় বেরিয়ে আসতে পেরেছি, এ খবর সে যদি না শুনে থাকে তবে ব্রাহ্মণ বড় বিপদেই পড়বে। সে বিনা আমার কোনো কাজই ভালো লাগে না।

মজলিসে সে হাস্যরসিক, সমরে যোদ্ধা বীর,
শোকের সময় মূর্ত্ত শান্তি, শত্রু-সমুখে ধীর,
অন্তর মাঝে উৎসব সে যে আমার বন্ধু প্রিয়,
একই শরীর আছে দুই ঠাই নাহি সন্দেহ ইহ।

(চারিদিকে চাহিয়া) অ্যাঁ! ঐ ছায়ায় কে একজন পথিক ঘুমুচ্ছে? (নিকটে গিয়া) আমার হৃদয়ের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে সৌভাগ্য এসে উপস্থিত! এ-কে আলিঙ্গন করবার জন্যে মন উৎসুক হয়ে উঠেছে।

বিদূষক

(জাগ্রত হইয়া) খুব ঘুমিয়েছি। এখন যাই। ভ্রষ্ট-মনোরথ লোকের সুখ শান্তির আশা কোথায়? (উঠিয়া অবিমারককে দেখিয়া) একি অবিমারক যে!

অবিমারক

হাঁ বন্ধু সন্তুষ্ট।

(উভয়ের আলিঙ্গন)

বিদূষক (উচ্চ হাস্য করিয়া)

ভালো ত বন্ধু? বল বল এতকাল কোথায় কি করছিলে?

অবিমারক

বন্ধু, এই করছিলাম। (দক্ষিণাঙ্গুলীতে অঙ্গুরী ধারণ করিয়া অন্তর্ধান)

বিদূষক

হায় হায়! আবার বন্ধু কোথায় গেল? তাকে আমি দেখতে পাচ্ছিনে কেন? আহা! তারই কথা চিন্তা করতে করতে তাকেই আমি কল্পনায় দেখছিলাম। দেখি তাকে আবার প্রকাশিত করতে পারি কি না। ওহে বন্ধু! শাপ লাগে তোমায় যদি তুমি অমন করে লুকিয়ে থাক!

অবিমারক

বন্ধু, এই যে আমি।

বিদূষক

কৈ? কৈ তুমি?

অবিমারক (বাম অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী পরাইয়া)

বন্ধু, এই যে আমি।

বিদূষক

প্রথমে শুধু অবিমারক ছিলে, এখন মায়া-অবি-মারক হয়েছ! ওহে মায়াবী! এমনি করে' কন্যান্তঃপুরে যাতায়াত কর না কেন?

অবিমারক

বন্ধু, এ শক্তি সম্প্রতি পেয়েছি।

বিদূষক

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এর আমদানী কোথা থেকে হল?

অবিমারক

চল অন্তঃপুরে গিয়ে সব কথা বলব।

বিদূষক

সম্প্রতি তুমি ক্ষুধার্ত্ত হয়েছ।

অবিমারক

মূর্খ! এখন শীঘ্র চল, অন্তঃপুরে যাবে যদি আমার হাত ছেড়ো না যেন।

বিদূষক

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আমিও অদৃশ্য হয়ে গেছি! আমার শরীরটা আছে, না, নেই? শরীরটাকে উচ্ছিষ্ট করে রাখি বাবা! থু থু।

অবিমারক

মূর্খ! ফের বিলম্ব করছ? আমার মন প্রিয়ার দর্শনের জন্য ব্যগ্র ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। (বিদূষককে আকর্ষণ)

বিদূষক

আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।

অবিমারক

চল চল ভোজনের সময় বিশ্বাস করিয়ে দেবো।

বিদূষক

একটু বিশ্রাম করে যাই চল।

অবিমারক

কুরঙ্গী কি আমাকে স্মরণ করে না?

বিদূষক

আচ্ছা, সেই নগ্নান্ধ শ্রমণিকাটা বেচে আছে কি?

অবিমারক

বন্ধু, তোমায় মিনতি করি শীঘ্র এস!

বিদূষক

আঃ! তুমি সমাবর্ত্তন-সমাপ্ত যুবকের মতন এত তাড়াতাড়ি করছ কেন?

অবিমারক

মূর্খ! এদিকে এস।

বিদূষক

আহা টানো কেন? এই ত সঙ্গে সঙ্গে ছুটছি, তবু!

অবিমারক (অগ্রসর হইয়া)

এই নগর।

বিদূষক

হাঁ হাঁ নগরের শোভা বেশ দেখতে পাচ্ছি।

অবিমারক

এই যে রাজপ্রাসাদ।

একদিন এই গৃহে রাত্রিযোগে অতি ভয়ে ভয়ে
সাহসে বাঁধিয়া বুক এসেছিনু প্রাণ হাতে লয়ে।
আর আজ সেই গৃহে পশিতেছি সুস্পষ্ট দিবায়,
নির্ভয় হৃদয় লয়ে, যাই যেন সাধুর সভায়।

(পরিক্রমণ করিয়া) এখন কুরঙ্গী স্নান করে প্রাসাদের অভ্যন্তরে আছে বোধ হয়।

বিদূষক

আরে যেখানে খুসী সেখানে চল। ভিক্ষার বেলা অতিক্রম হচ্ছে।

অবিমারক

এস আমরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করি (প্রবেশ করিয়া)
আগে যেই দুঃখে ছিল, অচিন্ত্য উপায়ে এবে
সুকৃতার্থ-অভিলাষ, আর নাহি মরে ভেবে ;
প্রমুদিত অন্তরাত্মা, মন প্রাণ খুসী তার,
পাইয়াছে যথা-তথা বিচরণ-অধিকার।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্ব-বেদন

(Harold Johnson)

কেন পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে
প্রসবের ব্যথা জাগে ?
ত্রাণ-হেতু আজ কে মহাপুরুষ
ভুবনে জনম মাগে ?
পূরবে পছিমে এ কি লক্ষণ
জাগিছে নূতন রাগে ?

দীর্ঘ দিনের নিদ্রা ত্যজিয়া
হের জেগে ওঠে চীন,
জাপানের দৃষ্টান্তে সে আজ
শক্তিতে সুনবীন ;
পণ্য-জাহাজে কামানের কাজে
আর নহে ওরা হীন।

প্রাচ্য যে সমকক্ষ হইতে
পারে প্রতীচ্য সনে
উদয়-রবির মুলুক সে কথা
জানায়েছে জনে জনে,
কালা, গোরা, মেটে, পাঁশুটে সমান
বোঝা গেছে লক্ষণে।

কে করিবে আজ পূরবে পছিমে
প্রেমের হুকুম জারি ?
বোধিবৃক্ষের মালিক ?—কিবা সে
জর্ডন-তীর-চারী ?
কিবা আল্লার প্রেরিত পুরুষ
অমিলে মিলন-কারী ?

কিবা ইরাণের দেবোপম ছেলে ?
কিবা সে নদীয়াবাসী ?
কিবা কার্শ্মেল্-বিহারী সাধক ?
পুণ্য যাহার হাসি।
পূরবে পছিমে মিলনের রাখী
কে পরাবে আজ আসি ?

গড়িতে হইবে নূতন স্বর্গ
নূতন পুরাণ-গানে,
বাহিরিতে হবে আবার নূতন
ইষ্টের সন্ধানে ;
নহিলে পূরবে পশ্চিমে মিল
হবে নাকো প্রাণে প্রাণে।

মোস্লেম্ জানে কোরান কেবল,
হিন্দু সে বেদ মানে,
মুশার বচন মানে ইহুদীরা,
বাইবেল খ্রীষ্টানে,
একটি রাগিণী গড়ি' উঠে তবু
নানা যন্ত্রের তানে।

চরমে পরম ঐক্যে মিলিছে
সব শাস্ত্রের পাঁতি,—
ঈশ্বর এক, বিশ্বাস এক,
অভেদ মানুষ-জাতি ;
হাব্সী, হিন্দু, মোঙ্গোল, মূর
ভাবের ভুবনে সাথী।

সকল সাধক নিখিল ভক্ত
গাহিতেছে অবিরাম
"অজানার মোরা এইটুকু জানি
প্রেমময় তাঁর নাম।"
পশ্চিম-পূবের এই বিশ্বাস—
বিশ্বাস প্রাণারাম।

প্রাণের গভীরে যেজন ডুবেছে
সেই সে একথা জানে,
চির-আশ্বাস চির-বিশ্বাস
এ যে বিশ্বের প্রাণে,
বাইবেল-তালমুদে নাই ভেদ
কোরানে বেদের গানে।

বিশ্বাস চির কর্ম্ম-সারথি
জীবনে প্রকাশ তার;
বিশ্বাস যদি ব্যাভারে না ফোটে
সে শুধু বাক্য-সার,
যার লীলা শেষ জিহ্বাতালুতে
সেই বিশ্বাস ছার।

প্রাণের গভীরে ঐক্য রয়েছে,
বাহিরে ভিন্ন ভাঙা;
শ্রান্ত নাবিক! অকূল পাথারে
হের—দেখা যায় ডাঙা।
বাহিরে মানুষ কালা, গোরা, মেটে;
কলিজা সমান রাঙা॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পুস্তক-পরিচয়

শক্তি—

শ্রীমতী অমলা দেবী প্রণীত। প্রকাশক মডার্ণ পাবলিশিং কোম্পানী, ১।১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ২১৭ পৃষ্ঠা, এন্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য বারো আনা।

এখানি নাটক, উইলসন ব্যারেট প্রণীত Sign of the Cross নামক নাটকের ছায়া অবলম্বনে লিখিত। ইহাতে প্রচলিত ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মধ্যে নূতন ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের দ্বন্দ্ব ও প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসী-দিগের প্রবলতা-সঞ্জাত অত্যাচার ও নবীন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিষ্ঠার সহিত সকল প্রতিকূলতার মধ্যে জীবন পণ করিয়া বিশ্বাস সংরক্ষণ ব্যাপারটি কথোপকথনের মধ্য দিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ব্যাপারটি বিশেষ করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাসের জিনিস। অথচ ধর্ম্মের নামে এই ক্ষুদ্রতা ও নৃশংসতা এক দিকে এবং বিশ্বাস ও নিষ্ঠা অপর দিকে থাকিয়া যে দ্বন্দ্ব কালে কালে ও দেশে দেশে অল্পবিস্তর সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার মধ্যে একটি এমন romance ও চিত্তহরণের শক্তি আছে যে উহাকে আমাদের সাহিত্যেও স্থান দিতে ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া লেখিকা এই নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে এদেশী আকার ও রং দিবার জন্য কোথায় কেমন করিয়া ঘটনা সংস্থান করিবেন তাহা লইয়া বিপদে পড়িতে হইয়াছিল; তিনি চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের কাহিনী লইতে পারিতেন, কিন্তু তখন দেশে রাজশক্তির ধর্ম্ম ছিল ইসলাম; সুতরাং উহা হিন্দু মুসলমানের বিবাদ হইয়া দাঁড়াইয়া অপ্রীতিকর হইয়া পড়িত। এইজন্য লেখিকা যথেষ্ট বিচক্ষণ বিবেচনায় হিন্দু শৈব রাজার রাজ্যে রামানুজাচার্য্যের বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারের উদ্যোগে দ্বন্দ্ব কল্পনা করিয়া বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচনা সে পরিমাণে সফলতা লাভ করে নাই বলিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। নাটকীয় কোনো পাত্র পাত্রীর চরিত্রই সত্য জীবন্ত মানুষ হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই,—গ্রন্থের কেন্দ্রচরিত্র রামানুজাচার্য্য পর্য্যন্ত কেমন নির্জীব পুতুলের মতন, কেবল কথার পর কথা বলিয়া গেছে, সে কথায় না আছে বেগ, না আছে সরসতা, আর না-আছে প্রকাশে কৃতিত্ব ও মাধুর্য্য। গ্রন্থখানিতে নাটকত্বের এত অভাব যে ঘটনা-সংস্থান আপন গতিবেগেই পাঠককে শেষের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায় না। অধিকন্তু একদিকে প্রচলিত ধর্ম্মের জড়তা কলুষতা মিথ্যাচার এবং তাহারই প্রতিবাদ স্বরূপ সত্য সবল নিষ্কলুষ নূতন ধর্ম্মের অভ্যুত্থান এ নাটকে আপনার রূপটিকে সুপরিস্ফুট করিতে পারে নাই; এক দল শৈব বলিয়াই হরিনামের বিরোধী, আর এক দল হরিনাম করে বলিয়াই মৃত্যুপণ করিয়া নিজেদের বিশ্বাস আঁকড়াইয়া আছে।—প্রচলিত ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রতিবাদী ধর্ম্ম কিসে শ্রেষ্ঠ তাহা বিশ্বাসীর মনে স্পষ্ট হইয়া না উঠিলে সে ধর্ম্ম পালন করা ত কুসংস্কারেরই নামান্তর। এই নাটকের প্রতিবাদী-ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকেরা গোঁড়া অন্ধবিশ্বাসী, কোথাও তাহাদের সত্যধর্ম্ম তাহাদের মনের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া ধরা দেয় নাই, সমস্ত আবছায়া ঝাপসা। প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসীদের অনাচার-ব্যাপারও স্পষ্ট হয় নাই। কুচক্রী কূটরাজনীতি-বিশারদ মন্ত্রী, স্ত্রৈণ রাজা, ভ্রষ্টচরিত্র রাণী ও একটা মাতাল একটা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিভূ নহে, এবং তাহাদিগকে সেরূপ ভাবেও চিত্রিত করিতে লেখিকা সক্ষম হন নাই। প্রতিবাদী-ধর্ম্মসম্প্রদায় যে এই-সমস্ত অনাচার নষ্ট করিবার জন্যই বিদ্রোহী তাহাও কোথাও ইঙ্গিত মাত্র করা হয় নাই। দুষ্ট চরিত্রগুলি সত্য জীবন্ত হয় নাই বলিয়া তাহাদের কথা পড়িতে বিরক্তি বোধ হয়। রচনার ভাষাও সর্ব্বত্র আড়ষ্ট, নীরস ও দুর্ব্বল এবং কোনো কোনো স্থানে তাহা সুরুচি-সঙ্গত বলিয়া মনে হইল না।

গোবিন্দ-গীতিকা—

শ্রীগণেশগোবিন্দ দাস বৈষ্ণব প্রণীত, ভাদগ্রাম, আটঘড়ী, টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশিত। মূল্য চার আনা। ইহাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মসঙ্গত ৪৮টি রাধাকৃষ্ণ- ও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক ভজন-সঙ্গীত আছে।

হিন্দোলা—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত, প্রকাশক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, ৯০ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানি খণ্ড কবিতার পুস্তক। অধিকাংশই সনেট। গ্রন্থকার কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের ভ্রাতা; এজন্য ইহার কাব্যে তাঁহার ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়িয়া বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও কবিত্বে কবিতাগুলিকে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে—দেবেন্দ্রনাথের ঘরোয়া উপমা, ভাব প্রকাশের বিচিত্র কারুখচিত ভাষা ইনি সুন্দর ভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার কবিতাগুলি ঐশ্বর্য্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে; অথচ কবিতার যাহা প্রাণ, সেই ভাব ইঁহার নিজস্ব। কবিতাগুলি সুখপাঠ্য, সরস, এবং দিব্য উপভোগ্য হইয়াছে। উদ্ধৃত করিয়া সৌন্দর্য্যের পরিচয় দেওয়া কষ্টসাধ্য, কারণ ইহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের এত প্রাচুর্য্য আছে যে তাহার কোনটা ছাড়িয়া কোনটা তুলিব স্থির করা দুরূহ। কবিত্বপিপাসু পাঠক পুস্তকখানি পাঠ করিলে প্রীত হইবেন।

কিসলয়—

শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত। প্রকাশক S. C. Dutt & Bros. ৮৪ বেচু চাটুজ্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত সম্পাদিত। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ভূমিকা লিখিয়াছেন। ডবল ক্রাউন ৩২ অং ৫৬ পৃষ্ঠা। মূল্য চার আনা মাত্র।

পুস্তিকাখানির ছাপা ভালো নয়। কবিতার বই কুদৃশ্য করিয়া ছাপানো রসজ্ঞতার পরিচায়ক নহে।

এই পুস্তিকায় গুটি কয়েক কবিতাকণিকা বা epigrams আছে; কবিতাকণিকা রচনার উদ্দেশ্য একটি তথ্য, তত্ত্ব, বা ক্ষুদ্র ঘটনা প্রত্যক্ষ ভাবে অথচ উপমা অলঙ্কার রূপকে মণ্ডিত করিয়া পাঠকের সম্মুখে সরস করিয়া উপস্থিত করা। এই কবিতাগুলির মধ্যে সেই-রূপ সফলতা ও নিপুণতার যথেষ্ট পরিচয় আছে। এসব কবিতা-কণিকায় কবিত্বের অবকাশ অল্প; সেইজন্য খুব দক্ষ কারুকর না হইলে সফলতা আশা করা যায় না। এই নবীন কবি এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, অধিকাংশ কবিতাই কবিত্ব সংযোগে রসমধুর হইয়াছে। প্রথমে একটি ও শেষে দুটি বড় কবিতা আছে। আগমনী ও পূজার আহ্বান দুটি কবিতা বেশ সুন্দর সুমিষ্ট।

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার অভ্যন্তরের সৌন্দর্য্যের অনুরূপ বাহ্যসৌষ্ঠবও দেখিতে পাইব আশা করি।

বীণা—

শ্রীবিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, তাজহাট, রংপুর। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ৭১ পৃষ্ঠা। মূল্য অনুল্লিখিত।

লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"এক শ্রেণীর ভিক্ষুক আছে, তাহারা মন্দিরা, একতারা, প্রভৃতি হাতে করিয়া গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। কোথাও বা উপস্থিত হইয়া "হরি বল মন" বলিলেই ভিক্ষা পায়, কোথাও বা নেহাৎ নাচার ২।১টী গানও গাহিতে হয়। গান তারা গায়, কিন্তু ভাব ভাষার বড় ধার ধারে না। উদ্দেশ্য কিছু পাওয়া,—তা' কতক্ষণে পাবে, সেদিকেই থাকে মন।

"'বীণা' হাতে করিয়া ঘুরিবার উদ্দেশ্যও তাই—মাঘ মাসের প্রবাসী পাঠ করিয়া বিদেশবাসী বিপন্ন ভাইদের দুঃখে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিলে, বাদক নিজের খেয়াল-মত তাড়াতাড়ি ২।৪টী গৎ বাঁধিয়া—দেশবাসীর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন।

"প্রেস মহাজনের ঋণ শোধ করিয়া ভিক্ষালব্ধ সমস্ত অর্থ বিপন্ন আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতসন্তানগণের সাহায্যার্থ "প্রবাসীর" মারফতে দান করা হইবে। সম্পাদক মহাশয় পত্রিকায় দান স্বীকার করিয়া তাহা নিজব্যয়ে যথাস্থানে পাঠাইয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এখন দেশবাসী মুক্ত হস্তে সাধ্যমত দান করুন ইহাই প্রার্থনা—দেশের জন্য, সমাজের জন্য, জাতির জন্য, মানের জন্য, এ দান,—যতই কেন ক্ষুদ্র না হউক তাহাই অনন্ত—তাহাতেই পরম-ব্রহ্ম তৃপ্ত।

"বীণার কোন মূল্য নির্দ্ধারিত হইল না, যিনি অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিবেন তাহাই শির পাতিয়া লওয়া হইবে। তবে ৷৷৹ আনার কম হইলে দাতাদের নামে নামে প্রাপ্তিস্বীকার-স্তম্ভে জমা দেওয়া সম্ভবপর হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

"এ গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাগুলিই বর্ত্তমান বর্ষের মাঘের ১০ ১৫ই তারিখের মধ্যে রচিত।"

এই গ্রন্থে অনেকগুলি গীতিকবিতা আছে। আশা করি পাঠক-সাধারণ এই সৎকার্য্যের সহায় হইবেন।

তুলসী—

শ্রীনারায়ণহরি বটব্যাল প্রণীত, প্রকাশক মডেল লাইব্রেরী, ২৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ডঃ ক্রাঃ ১৪ অং ৯৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

অনেকগুলি খণ্ড কবিতা আছে। কিন্তু কবিত্ব, ছন্দ, মিল, ভাব, ভাষা কিছুরই প্রশংসা করা যায় না।

মুরলী—

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। প্রকাশক কান্তিক প্রেস, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১১২ পৃষ্ঠা মূল্য বারো আনা।

এখানিও কবিতাপুস্তক। গ্রন্থকার ব্রহ্মদেশে রেঙ্গুনে প্রবাসী; সেখানে বঙ্গসাহিত্যের আবহাওয়া না থাকিবারই কথা; বঙ্গসাহিত্য অনুশীলনের অবকাশও সেখানে কম। সেই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে লেখকের এই কবিতা রচনার প্রয়াস বিশেষ প্রশংসার্হ। এ কবিতা-গুলির জন্মপরিবেশ স্মরণ করিয়া বিচার করিলে এগুলি যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য বলিয়া মনে হয়। কবিতাগুলির ভাষা, ছন্দ, ভাব প্রায়ই সুন্দর; সুমিষ্ট কবিত্ব উপযুক্ত ভাষার পরিচ্ছদে ও ছন্দের বাহনে সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতিতে গ্রন্থের এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, ইহা কম প্রশংসা ও আনন্দের কথা নহে। ছন্দের ও ভাষার যে অল্প স্বল্প ত্রুটি স্খলন ও পতন আছে, তাহা সাহিত্যিক আবহাওয়ার বাহিরে থাকার দরুন হইয়াছে, সুতরাং তাহা উপেক্ষণীয়।

পল্লী—

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী দেবশর্ম্মা প্রণীত। প্রকাশক শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুশারী, বেলতলি-আটপাড়া, ঢাকা। ঢাকা ভারত-মহিলা প্রেসে মুদ্রিত। ১৪৩ পৃষ্ঠা। মূল্য সাধারণ ৸৹ আনা, বাঁধাই ১৲ টাকা।

ইহা খণ্ড-কবিতার পুস্তক। কবিতাগুলি পল্লী সম্পর্কীয় বলিয়া পুস্তকের নাম পল্লী। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী দুর্গা-মোহনের কবি-স্বভাবের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এই কবিতা-গুলি কিশোর বয়সের রচনা। এই কিশোর কবির রচনায় রবীন্দ্র-নাথের প্রভাব অত্যন্ত বেশী; সে প্রভাব কাটাইয়া কবির নিজস্ব শক্তি এখনো আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। ছন্দেও ত্রুটি আছে, ভাবও সুপুষ্ট হইয়া উঠে নাই; পল্লীর শান্ত শ্রী, ও অনাড়ম্বর স্নিগ্ধ জীবন-যাত্রার ছবিও সুস্পষ্ট হয় নাই। কিন্তু তবুও এই নবীন কবির সাধনার এই প্রথম নিদর্শন ভবিষ্যৎ সিদ্ধির সূচনা জানাইতে পারিয়াছে। কবির সহানুভূতিপূর্ণ প্রাণের পরিচয়, স্থানীয় রঙে রঞ্জিত

করিয়া ভাব প্রকাশের চেষ্টা, এবং সরস সুমিষ্ট শব্দ যোজনার ক্ষমতা প্রত্যেক কবিতাতেই দেখা যায়। কবিত্বমণ্ডিত পদবিন্যাসেরও শক্তির পরিচয় যথেষ্ট আছে। অতএব 'পরের প্রভাব কাটাইয়া উঠিয়া আপন শক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা এই নবীন কবির সম্পূর্ণই আছে। তাঁহার সাধনা জয়যুক্ত হইবে আশা করি।

পরাগ—শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত প্রণীত, প্রকাশক এলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা। ২০৩ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা; ছাপা কাগজ ভালো। মূল্য উল্লেখ নাই।

ইহা খণ্ডকবিতার বই। কবিতাগুলির ভাষা সুমার্জ্জিত, বলিষ্ঠ, বেগবান; ভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু তত্ত্বমূলক। প্রকাশ সর্ব্বত্র কবিত্বময় না হইলেও নীরস নহে, উপমা ও অলঙ্কার সুন্দর সুসঙ্গত; ছন্দ অনাহত, প্রবহমান। এই গ্রন্থে অনেকগুলি গাথা বা কবিতায় গল্প আছে, সেগুলি তত্ত্ব বা উপদেশমূলক হইলেও সরস ও সুখপাঠ্য। এই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সরস কবিতাগ্রন্থখানির আদ্যন্ত স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারা যায়, ইহার কোথাও যেন কোনো বাহুল্য নাই, সর্ব্বত্র সংযত রচনার পরিচয় সুস্পষ্ট। আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। কবিতাগুলির সুরে যেন একটি গ্রাম বাঁধা আছে, একটি পর্দ্দার নীচে তাহা যেন কখনো নামে নাই। ইহা শক্তি-পরিণতির প্রকৃষ্ট পরিচয়। মুদ্রা-রাক্ষস।

মহম্মদ-চরিত—শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ; ২৩৩ পৃঃ; মূল্য ১৲ এক টাকা।

অনেকে ইতিহাস লেখেন, তাহা কেবল কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি; কখন্ কোন্ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করাই যেন ইতিহাস লেখার উদ্দেশ্য। অনেক জীবনচরিতও ঠিক এই প্রকার। সন্তান কখন্ জন্মগ্রহণ করিল, তাহার মাতা পিতার নামধাম কি, তাহার জীবনে কখন্ কোন্ ঘটনা ঘটিল, তাহার কোন্ কার্য্যটা ভাল, আর কোন্ কার্য্যটা মন্দ ইত্যাদি লিখিলেই যেন জীবনচরিত লেখা হইল। প্রচলিত অধিকাংশ জীবনচরিতই এই প্রকার এবং এ জন্যই এই সমুদয় জীবনচরিত দ্বারা আশানুরূপ ফল ফলিতেছে না।

কিন্তু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় যে জীবনচরিত লিখিয়াছেন তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ। লেখক বাহিরের কয়েকটা ঘটনা দেখিয়া এবং তাহার সমালোচনা করিয়াই নিজ কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। বাহিরে থাকিয়া, বাহিরের ঘটনা দেখিয়া তিনি মহম্মদকে চিনিতে চেষ্টা করেন নাই,—তিনি মহম্মদের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন—প্রবেশ করিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন এই মহাপুরুষ কোন্ ধাতুতে গঠিত, বুঝিয়া লইয়াছেন ইঁহার জীবনের লক্ষ্য কি, ইঁহার জীবনের ব্রত কি। এমনি করিয়াই লোককে চিনিতে হয় এবং এমনি করিয়া চিনিয়াছেন বলিয়াই এই গ্রন্থ এমন মধুর, এমন উপাদেয় হইয়াছে। মহম্মদের ধর্ম্মজীবন কি ভাবে বিকশিত হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহা অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ধর্ম্মার্থিগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অত্যন্ত উপকৃত হইবেন। আশা করি এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ বহুল প্রচারিত হইবে।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

বর্ষাপ্রভাতে

হরষে-ভরা বরষা-প্রাতে সজল সুশীতল হাওয়া
আকুল তানে গাহিয়া কিবা গান,
কতনা ফুল-গন্ধ এনে নবীন-মেঘ-জল-নাওয়া
সাজায়ে দেয় ধরার দেহ খান;
ভুবন ভরি করিয়া দান সকলি তার নিঃশেষে,
সবারি প্রাণে পশিয়া গান গায়,
পরাণ খুলি আপনা ভুলি মিলিয়া গেছে বিশ্বে সে,
সীমানা তার নাহি ত পাওয়া যায়!

শোভিছে সারা পূরব-নভে ধবলতনু অভ্র অই,
রজনী ভরি করিয়া বারি দান;
আপনারে যে বিলিয়ে দেয়—তাহার সম শুভ্র কই,
সবারি কাছে খোলা যে তার প্রাণ!
বিশাল এই ভুবন-মাঝে কিছুই নাহি চাহেগো তাই,
মিলন যে রে সবারি সাথে ওর,
ইচ্ছা হয়—উহারি মত শুভ্র শুধু হইয়া যাই
রিক্ত করে' নিজেরে আজি মোর।

ব্যাকুল বেগে ছুটিছে নদী, দুকূল পরিপূর্ণ রে
বিশ্বময় প্লাবনে আজি হায়,
ধবল পাল-পক্ষ মেলি লক্ষ তরী তূর্ণরে
বক্ষ তারি দলিয়া চলে যায়!
আপনারে যে বেদনা দিয়ে বহিয়া নেয় অন্যেরে
পরশে তার তাপিত সুশীতল,
নিঃসহায় বিশ্ববাসী মরে গো তারি দৈন্যেরে
বিহনে সে যে মরুভূ ধরাতল।

আজিকে এই বরষা-প্রাতে ধরণীময় আনন্দেতে
খুলিয়া গেল, গলিয়া গেল প্রাণ,
কে তুমি কবি লিখিছ বসে আত্মদান-ছন্দেতে
বিরাট এই ভুবন-পুথী খান!
ভাঙিয়া মোরে গড়িয়া দাও একটী তারি অক্ষরে
সবারি সাথে যুক্ত হয়ে' রই।
কি এক মহা গরবে মোর ভরিয়া ওঠে বক্ষ রে
তোমারি আজি কেমন করে' কই!

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বনি ভারতী

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে সব খানে স

Colour Blocks and Printing by
U. RAY & SONS, Calcutta.

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩২১

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

আমরা কি অর্থে নিকৃষ্ট নহি। আমরা স্বায়ত্ত শাসন চাহিলে প্রকারান্তরে আমাদিগকে বলা হয়, "তোমরা নিকৃষ্ট জাতি ; ইহার উপযুক্ত নও।" ব্রিটিশ উপনিবেশ-সকলে ঐ ওজুহাতে আমাদিগকে ঢুকিতে দেওয়া হয় না। আমরা কোন বড় সরকারী চাকরী চাহিলেও ঐরূপ উত্তর পাই। উত্তর পাইয়া আমরা গরম হইয়া বলি, "আমরা নিকৃষ্ট জাতি নহি, আমরা তোমাদের সমান।" তাহার পর এমন ভাবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বড়াই করিতে আরম্ভ করি, যে, তাহাতে প্রকারান্তরে, এবং কখন কখন স্পষ্টই, বলা হয়, আমরা পৃথিবীর সকল জাতির চেয়ে বড়।

বিষয়টির বিচার এ প্রকারে করা যায় না ; ধীর ঠাণ্ডা ভাবেই করা উচিত।

সংস্কৃত কলেজে যদি একজন সুপণ্ডিত অধ্যাপকের প্রয়োজন হয়, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা-পড়া কোন ব্যক্তি যদি এই বলিয়া দরখাস্ত করে যে তাহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় ছিলেন, তাহা হইলে আবেদনকারীর ঐ পদটি পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে অনেক সৈন্য ও সেনানায়কের আবশ্যক দেখিয়া যদি কেহ এই বলিয়া আবেদন করেন যে আমার পূর্ব্বপুরুষ ভারী যোদ্ধা ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার কোন কাজ পাইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। কাহারও পূর্ব্বপুরুষ কি ছিলেন, তাহা বর্ত্তমানে তাহার কেবল একটি উপকার করিতে পারে। পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি তাহাকে এই বলিয়া দেয়, "তোমাদের বংশে যখন এরূপ বড় কাজ হইয়াছে, তখন এখনও সেরূপ কাজ হইতে পারে। অতএব তুমি উৎসাহের সহিত লাগিয়া যাও। মহৎ বংশে জন্মিয়া ক্ষুদ্র হওয়া সম্মানের বিষয় নহে।" কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা পূর্ব্বপুরুষদের খ্যাতিটিকে সুখশয্যায় পরিণত করিয়া তাহার উপর দিব্য আরামে নিদ্রা যাইতেই ভাল বাসি।

তবে কি আমরা আপনাদিগকে নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া স্বীকার করিতেছি? তাহা নয়। কিন্তু আমরা আধুনিক বড় জাতিদের সমান কিসে, তাহা বুঝা দরকার। আমরা বর্ত্তমানে এ পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছি, বা যে অবস্থায় আছি, তাহাতে আমরা সকল বিষয়ে বর্ত্তমান বড় জাতিদের সমান নহি। আমরা সম্ভাবনায় সমান। আমাদের মধ্যে সেই শক্তির বীজ আছে, যাহার বলে আমরা অন্য যে-কোন জাতির সমান হইতে পারি। কিন্তু সম্ভাবনায় সমান হইলেও বস্তুতঃ আমরা এখনও সমান হই নাই। হইতে পারে যে আমরা গার্হস্থ্য কোন কোন গুণে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয়তা, স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন, প্রভৃতিতে আমাদের বিস্তর উন্নতির আবশ্যক। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যে, আমাদের দেশে অন্যান্য সভ্য দেশের মত জীবনের সকল বিভাগে যথেষ্টসংখ্যক

প্রতিভাশালী শক্তিমান কৃতী লোক নাই। একটা দেশের, দেশরক্ষা, রাজস্ব, বিদেশের সহিত যথাযোগ্য সম্বন্ধ রক্ষা, শিক্ষা, জ্ঞানোন্নতি ও জ্ঞানবিস্তার, নূতন ভৌগোলিক আবিষ্কার, প্রভৃতি নানা কাজের জন্য যত উপযুক্ত লোকের দরকার, তাহা কি আমাদের আছে? জগতের মনস্বীদের সভায় স্থান পাইতে পারেন, বিদ্যার নানা শাখায় এমন কয়জন লোক আমাদের আছেন? ইহার উত্তরে কেহ হয় ত বলিবেন, আমরা যথেষ্ট সুযোগ পাই নাই। কিন্তু সুযোগ ত কেহ কাহাকেও দেয় না; সুযোগ করিয়া লইতে হয়। অন্যান্য জাতিরা সুযোগ পাইল, আমরা পাইলাম না ইহার মধ্যে আমাদের কি কোন ত্রুটি বা অযোগ্যতা নাই?

আমরা সম্ভাবনায় যে অন্য জাতিদের সমান, তাহার প্রমাণ আছে। সাহিত্য ও বিজ্ঞানে ভারতের বহু কর্ম্মী জগতে পরিচিত হইয়াছেন, এ কথা বলা যায় না। কিন্তু যে দু এক জন হইয়াছেন, তাহাতে জাতীয় শক্তির নমুনা পাওয়া যাইতেছে। কোন দেশেই হঠাৎ একজন বড় লোকের আবির্ভাব হয় না, যদিও বাহ্যতঃ তেমনি দেখায় বটে। একটা দেশে আর সর্ব্বত্র মরুভূমির বালুকা চিরকাল ধূ ধূ করে, বা আর সব জায়গায় ছোট ছোট আগাছাই চিরকাল জন্মে, কেবল এক জায়গায় একটি বিশাল বনস্পতি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, পৃথিবীতে এরূপ দেখা যায় না। শেক্সপীয়ার যে যুগে ইংলণ্ডে জন্মিয়াছিলেন, সে যুগে ঠিক্ তাঁহার সমান না হইলেও কতকটা তাঁহারই ধরণের ইংরেজ কবি আরও ছিলেন। আমাদের দেশেও, সমস্ত জাতিটা অপদার্থ, আর ব্যতিক্রম স্থলস্বরূপ দুএক জন প্রতিভাশালী লোক জন্মিয়াছেন, তাহা নয়। তাঁহারা জাতীয়-শক্তিরই ফল ও নমুনা।

আর এক প্রমাণ এই যে আমাদের দেশে যে-সকল লোক কোন-না-কোন রকমের বৃহৎব্যাপারের ভার পাইয়াছেন বা লইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; অন্ততঃ, সকলেই বা অনেকেই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, এরূপ বলা যায় না।

অতএব, আমরা জগতের সেরা ছিলাম বা আছি, এই ভাবিয়া যেন না ঘুমাই। এরূপ আত্মপ্রতারণা আত্ম-হত্যা ভিন্ন আর কিছুই নয়। বর্ত্তমানে আমরা অন্য বড় জাতিদের সমান, ইহা মনে করা মহা ভ্রম। আমরা কেবল সম্ভাবনায় সমান। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অদম্য উৎসাহ, অবিচলিত অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রমের দরকার। বাধাবিঘ্নের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়াই মানুষ বড় হয়। বিলাসিতা, আমোদপ্রমোদ, ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব, কোন মানুষকে, কোন জাতিকে বড় করিতে পারে না। কেবল মাত্র বড় হইবার স্বপ্ন দেখিয়াও বড় হওয়া যায় না। কিন্তু কেহ যদি একঘণ্টা স্বপ্ন দেখিয়া দিনের পর দিন সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য খাটিতে থাকে, তবেই সে স্বপ্নদেখা সার্থক হয়।

লেখিকার আদর। দর্শনাচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের কন্যা কিছু মর্ম্মকথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; আন্তরিক প্রেরণায় লিখিয়াছিলেন, প্রকাশ করিবার জন্য নহে। শীলমহাশয় যখন গ্রীষ্মাবকাশে বিলাত যান, তখন জাহাজে একজন ইংরেজ অধ্যাপক তাঁহাকে ২।৩টি লেখা পড়িতে অনুরোধ করেন। তাহা শুনিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের এত ভাল লাগে যে তিনি লেখাগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন, এবং অনুবাদ সমাপ্ত করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিখ্যাত প্রকাশক ম্যাক্‌মিলান কোম্পানীকে দেখান। তাঁহারা নিজ ব্যয়ে এই অনুবাদ ছাপাইতেছেন। বাংলা রচনাগুলিও ছাপা হইতেছে। রবিবাবু তাহার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। এই ভূমিকারও অনুবাদ রচনাগুলির ইংরেজী অনুবাদের সঙ্গে ছাপা হইবে।

লেখিকা ইতিপূর্ব্বে আর কোন গ্রন্থ রচনা বা প্রকাশ করেন নাই। ইহাই তাঁহার প্রথম উদ্যম।

বাঙ্গালীর সংখ্যা। বাঙ্গলা যাহাদের ভাষা, তাহারাই বাঙ্গালী। এই সংজ্ঞা অনুসারে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মানুষগণনা অনুসারে ৪ কোটি ৮৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯ শত ১৫ জন বাঙ্গালী ছিল। তাহার মধ্যে পুরুষ ২,৪৫,৩৮,৬০৩ এবং স্ত্রীলোক ২,৩৮,২৯,৩১২। ১৯০১ সালের মানুষ-গণনা অনুসারে বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ ২৪ হাজার

৪৮ জন। দশবৎসরে ৩৭ লক্ষ ৪৩ হাজার ৮ শত ৮৭ জন বাঙ্গালী বাড়িয়াছে। ১৯০১ ও ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের বাহিরে কতকগুলি প্রদেশে কত বাঙ্গালী ছিল, তাহা নীচে দেওয়া যাইতেছে।

প্রদেশ	১৯১১	১৯০১
আজমীর-মারোয়ারা	২৯১	২৮১
আণ্ডামান	১৬৪৮	১৪৪১
আসাম	৩২২৪১৩০	২৯৪৯২৮৭
বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুর	২১৮৬০২০	২১১২৯২৭
বোম্বাই	১৭৫২	১৬৩১
ব্রহ্ম দেশ	২৪৮৩১০	২০৮০৭৮
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	২৩৮৬	১৫৫৬
মান্দ্রাজ	১১৬৬	৬২৬
পঞ্জাব	২১১৬	২৩৩০
আগ্রা ও অযোধ্যা	২২৫০০	২৪৫২০
মধ্যভারত-এজেন্সী	৮৯৪	৪১৫
রাজপুতানা	৬১৯	৪৭০
হাইদরাবাদ	১৯৪	৬৬

১৯০১ সালে বালুচীস্তানে ২০, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৮৯, বড়োদায় ৯৫, কাশ্মীরে ৬২, কোচীনে ২, ত্রিবাঙ্কুড়ে ৯৮ এবং মহীশূরে ২০ জন বাঙ্গালী ছিল। কিন্তু ১৯১১ সালের সমগ্র-ভারতের মানুষ-গণনার রিপোর্টে ঐ ঐ প্রদেশে ও রাজ্যে কত বাঙ্গালী আছে, তাহার উল্লেখ নাই।

প্রবাসী বাঙ্গালী। যে-সকল বাঙ্গালী আসামে বাস করেন, তাঁহাদের অধিকাংশকেই প্রবাসী বলা যায় না। কারণ, আসামের গোয়ালপাড়া, কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলাগুলি বাস্তবিক প্রাকৃতিক-বঙ্গেরই অন্তর্গত। তথায় বঙ্গভাষীর সংখ্যাই অধিক। অন্যান্য অনেক জেলাতেও হাজার হাজার বাঙ্গালী পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর একটি স্বতন্ত্র সুবা। ইহাতে কিন্তু প্রাকৃতিক-বঙ্গের অনেক অংশ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণা জেলায় শতকরা ১৫ জন বাঙ্গলা বলে। জামতাড়া মহকুমায় শতকরা ৩৪ এবং পাকুড়ে শতকরা ৩০জন বাঙ্গলা বলে। মানভূম জেলায় শতকরা ৬৪ জন এবং সিংভূম জেলার ধলভূম মহকুমায় শতকরা ৪০ জন বাঙ্গলা বলে। পূর্ণিয়া জেলার কিষনগঞ্জ মহকুমায় শতকরা ৯৭ জন বাঙ্গলা বলে। ছোটনাগপুরের দেশী রাজার অধীন রাজ্যগুলিতে প্রতি দশহাজারে ১৮৫৯ জন এবং উড়িষ্যার দেশী রাজ্যগুলিতে প্রতি দশহাজারে ২১৪ জন বাঙ্গলা বলে। ইহাদের মধ্যে অল্পলোককেই প্রবাসী বলা যায়।

বঙ্গের সীমার সহিত যে-সকল প্রদেশের সীমা সংলগ্ন নহে, সেই-সকল প্রদেশের বাঙ্গালীরা যে সকলেই প্রবাসী, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায়। তন্মধ্যে দেখা যাইতেছে যে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা দশবৎসরে ২৪৫২০ হইতে কমিয়া ২২৫০০ হইয়াছে, এবং পঞ্জাবে দশবৎসরে ২৩৩০ হইতে কমিয়া ২১১৬ হইয়াছে। অন্যত্র বাড়িয়াছে। এই দুই প্রদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা কেন কমিল, তাহা তথাকার প্রবাসী বাঙ্গালী কেহ কেহ যদি অনুসন্ধানপূর্ব্বক নির্ণয় করিতে পারেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।

বঙ্গের বাহিরে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে আর সর্ব্বত্র পুরুষের সংখ্যা অধিক এবং তাহাই স্বাভাবিক, কারণ জীবিকার জন্য অধিকাংশ স্থলে পুরুষেরাই বিদেশে যায়; কেবল আজমীর-মারোয়ারায়, মধ্য-ভারত এজেন্সীতে এবং আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। শেষোক্ত প্রদেশে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণ সহজেই বুঝা যায়। স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় কাশী, বৃন্দাবনাদি তীর্থস্থানে গিয়া বাস করে। আজমীর-মারোয়ারাতেও ১৩২ জন পুরুষ এবং ১৫৯ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে সংখ্যার ন্যূনাধিক্য কোন আকস্মিক কারণে ঘটিয়া থাকিতে পারে;—পুষ্কর তীর্থের জন্য কি না তাহা নির্ণয়যোগ্য। মধ্য-ভারত এজেন্সীতে মাত্র ২৮৯ জন পুরুষ, এবং ৬০৫ জন স্ত্রীলোক কি কারণে হইয়াছে, তাহা স্থানীয় কেহ নির্দ্ধারণ করিয়া লিখিলে ভাল হয়।

অনেকের নিকট এসকল বড় তুচ্ছ ব্যাপার মনে

হইতে পারে। আমরা তাহা মনে করি না। প্রথমতঃ, জীবিকানির্ব্বাহের কথা আছে। পৈত্রিক ভিটায় বসিয়া সকলের জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না। তাহাদের নানাস্থানে যাওয়া আবশ্যক,—তা বঙ্গের ভিতরেই হউক বা বাহিরেই হউক। বাহিরে গিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে জাতির এই একটা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, যে, তাহারা অন্য প্রদেশের লোকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কোন কোন কার্য্যক্ষেত্রে জিতিতেছে ও টিকিয়া থাকিতেছে। যদি বাঙ্গালী ভারতসাম্রাজ্যের বাহিরে গিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহা হইলে এই শক্তির পরিচয় আরও ভাল করিয়া পাওয়া যায়। তাহার পর আর একটা কথা এই যে, যেমন কেহ ঘরের বাহিরে না গেলে, ঘরকুনো হইয়া বসিয়া থাকিলে, তাহার প্রকৃতিতে সংকীর্ণতা, জড়তা, উদ্যমহীনতা, ভীরুতা, কূপমণ্ডুকতা, প্রভৃতি দোষ আসিয়া পড়ে, সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারে না, নানা বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া শক্তসমর্থ হইতে ও মনুষ্যত্বলাভ করিতে পারে না; তেমনি ঘরকুনো জাতিরও ঐরূপ দশা ঘটে। অতএব জাতীয় চরিত্রের উন্নতির জন্য সকল জাতিরই, বাহিরে যাওয়া দরকার।

বাঙ্গালীরা এক সময়ে হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া, সমুদ্র পার হইয়া, কত জাতিকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছে, সভ্য করিয়াছে। ইতিহাস হইতে তাহার চিহ্ন সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। এখন আমরা প্রধানতঃ, অন্যান্য জাতির মত, জীবিকা উপার্জ্জনের জন্যই বঙ্গের বাহিরে যাই। কিন্তু তা বলিয়া, অর্থের বিনিময়ে আমরা যে কাজ দি, তা ছাড়া আমাদের যে আর কিছু দিবার নাই, তা নয়। বিধাতার বিধানে যেমন ভিন্ন ভিন্ন মানুষে ভিন্ন ভিন্ন গুণের ও শক্তির বিকাশ কমবেশী হইয়া থাকে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যেও সেইরূপ দেখা যায়। মরাঠাতে যাহা যে পরিমাণে আছে, বাঙ্গালীতে তাহা ঠিক সে পরিমাণে নাই; আবার বাঙ্গালীর প্রকৃতিতে যে বস্তুর বিকাশ যতখানি দেখা যায়, মরাঠার প্রকৃতিতে ঠিক্ ততখানি দেখা যায় না। ভারতের সমস্ত জাতির পরস্পর সংস্পর্শের প্রয়োজন আছে. তাহাতে লাভ আছে, সকলের মধ্যে ভাবচিন্তা আদর্শের আদানপ্রদানের এবং পরস্পরের উপর প্রভাবের প্রয়োজন ও উপকারিতা আছে।

এক ভারতীয় জাতি গড়িতে হইলে এইরূপ সংস্পর্শ, আদানপ্রদান ও পরস্পরের উপর প্রভাব আবশ্যক।

যাহারা এক হইবে, তাহারা পরস্পরকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে না পারিলে, কেমন করিয়া এক হইতে পারে? প্রবাসীরা নমুনার কাজ করেন। পশ্চিমের লোক বাঙ্গলায় আসিয়া বাঙ্গালীকে দেখে বটে, কিন্তু আরও ভাল করিয়া দেখে প্রবাসী বাঙ্গালীকে। প্রবাসী বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালীর ভাল নমুনা হন, তাহা হইলে তিনি যে প্রদেশে প্রবাসী তথাকার লোকদের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহারা জাতির সহিত জাতি বাঁধিবার বন্ধনরজ্জুর কাজ করিতে পারেন।

ভাল নমুনা সকলেই হইতে পারেন। ধনীব্যক্তি উচ্চপদস্থ হইতে দরিদ্র কর্ম্মচারী, সম্পন্ন সওদাগর হইতে অল্প আয়ের দোকানদার, উকীল, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক, শিক্ষক, ডাক্তার, রেলের বাবু, প্রভৃতি সকলেরই ভাল বা মন্দ নমুনা হইবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের দেশে রেলে যাতায়াত করাও একটা বিপদের মধ্যে। পশ্চিমের কোথাও কোন বাঙ্গালী টিকিট-বাবু যদি যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাহার দ্বারা তাঁহার নিজের ক্ষতি ত হয়ই, অধিকন্তু সমস্ত বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধে হাজার হাজার লোকের ধারণা খারাপ হয়। কিন্তু যদি কেহ সজ্জন হন, তাহা হইলে তিনি নিজের, স্বজাতির ও সমগ্র ভারতের মঙ্গলের কারণ হন। শিক্ষক ও অধ্যাপকদের হাতে বালক ও যুবকদিগকে গড়িয়া তুলিবার ভার। তাঁহারা যদি স্নেহশীলতার, সাধুচরিত্রের, কর্ত্তব্যপরায়ণতার, জ্ঞানতপস্বিতার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে যে প্রদেশে কাজ করেন, তথাকার মঙ্গল ত হয়ই, অধিকন্তু বাঙ্গালীর নাম উজ্জ্বল হয়। লোকে বিপন্ন হইয়া চিকিৎসকের আশ্রয় লয়। মোকদ্দমায় একপক্ষ বিপন্ন বা অত্যাচরিত হইয়া উকীল ব্যারিষ্টারের সাহায্য চায়, এবং আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রবাসী বাঙ্গালী চিকিৎসক, ব্যবহারাজীব ও

বিচারক ভাল হইলে লোকের কল্যাণ ত হয়ই, অধিকন্তু তাঁহাদের মধ্যে ভিন্ন প্রদেশের লোকে বাঙ্গালীর ভাল নমুনা দেখিয়া বাঙ্গালীকে আত্মীয় জ্ঞান করিতে শিখে। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, এবং শিক্ষা-ও-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আদর্শের প্রচার সংবাদপত্রসম্পাদকদিগের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। যখন প্রবাসী বাঙ্গালী সম্পাদকেরা কোনও প্রদেশকে খাট না করিয়া, কাহারও প্রতি অবজ্ঞা বা বিদ্বেষকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া, প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া, ভারতীয় জাতি গঠনের পথ দেখাইয়া দেন, কেমন করিয়া ভারতের সকল প্রদেশের, সকল ধর্ম্মের ও শ্রেণীর লোকেরা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইতে পারে, তাহা দেখাইয়া দেন, তখন তাঁহারা যে প্রদেশ-বিশেষের ও সমগ্রভারতের হিতসাধন করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা হইতে রাজধানী উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সকল প্রদেশের প্রতিনিধি ও অন্যান্য অনেক প্রধান প্রধান লোক এবং সামন্ত অমাত্য প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত দেশীয় রাজন্যবর্গ কলিকাতায় আসিতেন। তাহাতে তাঁহাদের সঙ্গে বাঙ্গালীর কিছু কিছু পরিচয় ঘটিত। ভারতীয় একতার স্বপ্ন বাঙ্গালীই আগে দেখিয়াছে, বাঙ্গালীই এই একতার মন্ত্র আগে প্রচার করিয়াছে। বাঙ্গালীর সঙ্গে সমগ্র ভারতের বহু নেতার এই পরিচয়ে বঙ্গের ও ভারতের উপকার হইত। এখন দিল্লীতে রাজধানী উঠিয়া গিয়া সে পরিচয়ের পথ বন্ধ হইয়াছে। সমগ্র ভারতের রাজস্ব, সমগ্র ভারতের সেনাদল, প্রভৃতি সাম্রাজ্যিক সমুদয় রাজকীয় ব্যাপারের কেন্দ্রস্থল কলিকাতায় থাকায়, তৎসম্পর্কীয় সমুদয় আফিসে প্রধানতঃ বাঙ্গালী নিযুক্ত হইত। ইহা দ্বারাও বাঙ্গালী উপকৃত হইত এবং তাহার দ্বারা সমগ্র ভারতের কিছু কাজ হইত। ক্রমে সে সুবিধা ও সুযোগও বাঙ্গালী হারাইবে, এবং দিল্লীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশের লোকেরা তাহা পাইবে।

সুতরাং এখন বাঙ্গালীদের মধ্যে, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ-ভাবে, বাঙ্গলা ছাড়া ভারতবর্ষের বাকী অংশের কাজ করিতে প্রবাসী বাঙ্গালীরাই প্রধানতঃ পারিবেন। অবাঙ্গালীদের সঙ্গে সংস্পর্শ, ভাব চিন্তা আদর্শের আদান প্রদানআদির প্রধান উপায় তাঁহারা। বাঙ্গালীর নমুনা অবাঙ্গালীরা সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহাদের মধ্যেই দেখিবে। তাঁহাদের দায়িত্ব গুরুতর। কোন প্রবাসী বাঙ্গালীই আপনাকে সামান্য মনে করিবেন না। আমরা কাহাকেও সামান্য মনে করি না। প্রত্যেকেই বাঙ্গালীর প্রতিনিধি।

তাঁহাদের কাজ বড় কঠিন। তাঁহারা যে প্রদেশের অন্নজলে পুষ্ট, তাহার মঙ্গলসাধনে তৎপর তাঁহাদিগকে থাকিতেই হইবে। সুখের বিষয় বাঙ্গালী যে প্রদেশেই গিয়াছেন, অর্থোপার্জ্জন লক্ষ্য বা উপলক্ষ্য হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তাহার জনহিতকর কার্য্যে সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু আবার তাঁহারা অবাঙ্গালী হইয়া গেলেও চলিবে না। তাঁহাদের একটি জাতীয় বিশেষত্ব জন্মিয়াছে। তাহার ছায়া ও ছাপ বাঙ্গলা সাহিত্যে পড়িয়াছে। প্রবাসী বাঙ্গালীকে বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রাখিতে হইবে, বঙ্গের মানসিক ও আধ্যাত্মিক নানা চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত থাকিতে হইবে।

প্রবাসী বাঙ্গালীর মুখপত্র। এক এক প্রদেশে, প্রাকৃতিক বঙ্গের কোন কোন খণ্ড অন্তর্ভুক্ত হইয়াই হউক, বা বঙ্গ হইতে বাঙ্গালী গিয়া তথায় স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বসবাস করিয়াই হউক, এত বাঙ্গালীর বসতি যে তাঁহাদের মুখপত্র স্বরূপ অন্ততঃ একখানি করিয়া সুপরিচালিত সংবাদপত্র থাকা দরকার। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রবাসীদের স্বার্থ বাস্তবিক সেই সেই প্রদেশের প্রাচীনতর অধিবাসীদের স্বার্থের সঙ্গে এক। কিন্তু অল্পবুদ্ধি লোকেরা অনেক সময় ঈর্ষ্যাবিদ্বেষ দ্বারা চালিত হয়। কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারীও প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করেন না। এই জন্য প্রবাসী বাঙ্গালীদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ যাহাতে সংকীর্ণ বা লুপ্ত না হয়, প্রবাসীদের উপার্জ্জনের পথ বন্ধ না হইয়া আসে, তাহাদের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল যাহাতে হয়, তাহা দেখিবার জন্য, এইরূপ মুখপত্রের প্রয়োজন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন, বেহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর

প্রদেশে এবং তদন্তর্গত দেশী রাজ্যগুলিতে ২২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯ শত ৪৪ জন অর্থাৎ মোটামুটি তেইশ লক্ষ বাঙ্গালীর বাস। ইহাঁদের মধ্যে সুশিক্ষিত ও ধনী লোক আছেন, শিক্ষিত সচ্ছল অবস্থার লোক অনেক আছেন। ইহাঁদের একটি সুপরিচালিত মুখপত্র থাকা যেমন দরকার, তাহা চালানও তেমনি সুসাধ্য। সুসাধ্য, যদি তাঁহারা স্বশ্রেণীর লোকদের মঙ্গল চান। কিছু মূলধন সংগ্রহ করিলে বাঁকীপুরের বেহার হেরাল্ডের, কটকের ষ্টার-অব্-উৎকলের অনেক উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। তাহা হইলে, বাঙ্গলা দেশের যে সব বাঙ্গালী বেহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুরের বাঙ্গালীদের খবর রাখিতে চান, তাঁহারাও এরূপ কাগজের গ্রাহক হইতে পারেন। তাঁহাদের খবর রাখা স্বজাতিপ্রিয় প্রত্যেক বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মদেশে দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার তিন শত দশ জন বাঙ্গালীর বাস। তাঁহাদের অনেকের অবস্থা সচ্ছল। তাঁহারা একখানি মুখপত্রের অভাব বোধ করেন কি?

আগ্রা-অযোধ্যার ২২,৫০০ বাঙ্গালীর জন্য একখানি মুখপত্র চালান অসম্ভব না হইলেও, সুসাধ্য না হইতে পারে। কিন্তু যদি কোন সংবাদপত্রকে প্রবাসী বাঙ্গালীরা অংশতঃ মূলধন যোগান, তাহা হইলে তাহার দ্বারা বাঙ্গালীর অনিষ্ট, অসম্মান, বা প্রভাবনাশের সহায়তা যাহাতে না হয়, তাহা তাঁহাদের দেখা কর্ত্তব্য।

অনেক প্রদেশেই, "বেহারীর জন্য বেহার," "ওড়িয়ার জন্য উড়িষ্যা," এইরূপ ধুয়া উঠিয়া ভারতীয় একতার পথে বিঘ্ন জন্মাইতেছে। যে কারণেই হউক, বঙ্গে এ ধুয়া উঠে নাই এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভারতীয় একতার স্বপ্ন বাঙ্গালীই প্রথমে দেখিয়াছে ও প্রকাশ করিয়াছে। অতএব সম্পাদকরূপে ভারতীয় একতার আদর্শ প্রচার করিবার যোগ্যতা বাঙ্গালীর বিশেষ ভাবে আছে। সুতরাং প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে সম্পাদকের সংখ্যা বাড়া দরকার। কিন্তু না বাড়িয়া কমিতেছে। আগে যে-সব প্রদেশে বাঙ্গালী সম্পাদক ছিলেন, তথাকার চিরন্তন অধিবাসীরা যোগ্য হইয়া যদি নিজেদের কাগজ নিজেরা চালান, তাহা হইলে কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু প্রবাসী-বাঙ্গালী সম্পাদকের বদলে যদি অন্য কোন কোন প্রদেশের প্রবাসী লোকে সম্পাদক হন (কয়েক স্থলে এরূপ ঘটিয়াছে), তাহা হইলে বাঙ্গালীর এই পরাজয় গৌরব বা সুখের বিষয় হয় না। বিশেষতঃ যখন বাঙ্গালী উত্তর-ভারতের ভাষা যত সহজে বুঝেন, দক্ষিণের লোকেরা তত সহজে বুঝেন না।

বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকে হিন্দী-উর্দ্দু শিখিলে উত্তর-ভারতে সম্পাদকতা করিবার সুবিধা হয়।

বঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের লোক।

প্রাকৃতিক বঙ্গের বড় বড় অনেক খণ্ড আসাম ও বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এখন এক দার্জ্জিলিং জেলা বাদ দিলে, বঙ্গের এলাকা-ভুক্ত সমস্ত স্থানই প্রাকৃতিক-বঙ্গের অংশ। দার্জ্জিলিঙেরও ২,৬৫,৫৫০ জন অধিবাসীর মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী লোকে (৫৬,৭৮৬ জন) নেপালী ভাষায় কথা বলে; তাহার নীচেই বাঙ্গালীর সংখ্যা, ৪৫,৯৮৫ জন। সুতরাং দার্জ্জিলিংকেও বাঙ্গালা নিজের করিয়া লইয়াছে।

আসামের বাঙ্গালীদের অল্প লোককেই প্রবাসী বলা যায়। বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুরের মানভূম, সিংহভূম, সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলার বাঙ্গালীরা প্রবাসী নহে। ১৯১১র বঙ্গের সেন্সস্-রিপোর্টে লেখা হইয়াছে যে 'In Bihar and Orissa it [Bengali] is spoken by 2,295,000 or 6 per cent. of the total population, the border districts of Purnea, the Sonthal Parganas, Manbhum and Singhbhum accounting for over nine-tenths of the total number." অর্থাৎ মানভূম, সিংহভূম, সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়াতেই এই ২২ লক্ষ ৯৫ হাজারের নয়-দশমাংশের অধিক বাঙ্গালী বাস করে। তা-ছাড়া আরও কোন কোন ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের মাতৃভাষা বাঙ্গলা। তথাকার বাঙ্গালীদিগকেও প্রবাসী বলিয়া ধরিলেও বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুর প্রদেশে প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা তেইশ লক্ষের এক দশমাংশ অর্থাৎ দুই লক্ষ ত্রিশ হাজারের অধিক হয় না। ইহার সহিত অন্যান্য

প্রদেশের প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সংখ্যা যোগ করিলে মোট প্রবাসী-বাঙ্গালীর সংখ্যা হয় ৫ লক্ষ ১১ হাজার মাত্র। অর্থাৎ পাঁচলক্ষ এগারহাজার বাঙ্গালী প্রাকৃতিক-বঙ্গের বাহিরে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

এখন দেখা যাক্, অন্যভাষাভাষী কত লোক বাঙ্গলা-দেশে আসিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহা হইলে বুঝা যাইবে, যে, বাঙ্গালীরা অন্য সব প্রদেশ, বিশেষতঃ পশ্চিম, লুটিয়া খাইতেছে, এই ধারণামূলক ঈর্ষ্যা কিরূপ ভিত্তিহীন।

প্রথমতঃ, যাঁহারা বেশী মন-কষাকষি করেন, সেই বেহার ও আগ্রা-অযোধ্যার হিন্দীভাষী ১৮ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭৭৯ জন লোক বাঙ্গলাদেশে বাস করেন। অর্থাৎ সমুদয় ভারত ও ব্রহ্মদেশে প্রবাসী-বাঙ্গালীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ১১ হাজার। কিন্তু বঙ্গে শুধু হিন্দীভাষীই আছে প্রায় ১৯ লক্ষ। বেহার, ছোটনাগপুর ও আগ্রা-অযোধ্যার ভাষা হিন্দী। এই-সব প্রদেশে প্রবাসীবাঙ্গালীর সংখ্যা মোটামুটি একলক্ষ তিপ্পান্নহাজারের বেশী নহে। অর্থাৎ বাঙ্গলাদেশ এই হিন্দীভাষী প্রদেশগুলিতে ১,৫৩,০০০ বাঙ্গালী রপ্তানী করিতেছেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে ১৯,০০,০০০ হিন্দীভাষী আমদানী করিতেছেন। প্রবাসী-বাঙ্গালাদের অধিকাংশ অল্পবেতনের কেরানী। হিন্দী-ভাষীদের অধিকাংশ দৈহিকশ্রমজীবী, কিন্তু সকলে নহে; তাহাদের মধ্যে সচ্ছল অবস্থার মধ্যবিত্ত লোক হইতে লক্ষপতি সওদাগর অনেক আছে। যাহাই হউক, বাঙ্গালী হিন্দীর দেশে যাহা উপার্জ্জন করে, হিন্দী-ভাষীরা বাংলাদেশে তদপেক্ষা অনেক বেশী উপার্জ্জন করে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাহার পর অন্যান্য কয়েকটি প্রধান প্রধান ভাষা ধরা যাক্।

বঙ্গে গুজরাতী-ভাষী ৪১৯৫ এবং মরাঠীভাষী ২৪০৩ জন বাস করে। এই দুটি ভাষা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে প্রচলিত। ঐ প্রদেশে বাঙ্গালী আছে ১৭৫২ জন মাত্র। মধ্যপ্রদেশ, বেরার এবং মধ্য-ভারত এজেন্সীতেও মরাঠী অন্যতম ভাষা। এই-সব স্থানে ৩২৮০ জন বাঙ্গালী আছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর জিত নহে। বঙ্গে ওড়িয়া বলে, ২৯৩১৬৮ জন। উড়িষ্যা ও উড়িষ্যার করদ-রাজ্যসকলে বাঙ্গালীর সংখ্যা একলক্ষের সামান্য বেশী। মনে রাখিতে হইবে যে সব উড়িয়াই পাল্কী-বেহারা বা কুলী নহে। গ্যাস-জল-ড্রেনের উড়িয়া মিস্ত্রীরা বাঙ্গালী কেরানী অপেক্ষা কম রোজগার করে না। আমাদের প্রদেশে পঞ্জাবী বলে ৫৫৩৩। পঞ্জাবে বাঙালী আছে ২১১৬। বাঙ্গলায় রাজপুতানার ভাষা রাজস্থানী বলে ১৮৩৩৬; তাহাদের মধ্যে লক্ষপতি মাড়োয়ারী বিস্তর, হাজার হাজার টাকা রোজগার করে প্রায় সকলেই। রাজপুতানায় বাঙ্গালী আছে মাত্র ৬১৯ জন। তামিল তেলুগু ও মলয়ালম মান্দ্রাজ প্রদেশের ভাষা। বঙ্গে আছে তামিল-ভাষী ২৯৫৩, তেলুগু-ভাষী ১০২৩২ এবং মলয়ালম-ভাষী ১৫৫, মোট ১৩৩৪০। মান্দ্রাজপ্রদেশে বাঙ্গালী আছে কেবল ১১৬৬ জন।

এই দৃষ্টান্তগুলি হইতেই বুঝা যাইবে যে বাঙ্গালী অন্য সব প্রদেশে যাহা রোজগার করে, অন্য সব প্রদেশের লোকেরা তদপেক্ষা অনেক বেশী টাকা বাংলাদেশে আসিয়া উপার্জ্জন করে। অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগত কুলিমজুর দারোয়ান কন্‌ষ্টেবল দোকানদার মিস্ত্রী বড় বড় সওদাগর, বড় বড় ঠিকাদার প্রভৃতির ঈর্ষ্যা আমরা করি না। প্রবাসী-বাঙালী কেরানী শিক্ষক উকীল ডাক্তার আদির হিংসা অন্য প্রদেশের লোকেরা না করিলে ভাল হয়।

বঙ্গে এশিয়া ও ইউরোপের ভাষা।

বাঙ্গলা দেশে এশিয়ার যে-সকল দেশের ভাষায় যত লোক কথা বলে, তাহার তালিকা এই :—আরবী ৮৪০, আর্মানী ৩৫৪, চীন ৩৪ ৭, হিব্রু ৬১৮, জাপানী ১২৬, পারসী ১১৬১। যে-সব দেশের মাতৃভাষা এইগুলি, তথায় কয়জন বাঙালী রোজগার করিয়া খায়? ৪।৫ জনও হইবে কি?

ইউরোপের যে যে ভাষা-ভাষী যত লোক বাংলাদেশে আছে তাহাদের সংখ্যা :—ডচ্ বা ওলন্দাজ ৩০, ইংরেজী ৪৪,৬০২, ফরাসী ১৫০, জার্ম্মেন ৩২২, গ্রীক ৯৪, ইতালীয় ১০৭, পোর্ত্তুগীজ্ ৩৯২, রুশীয় ৪৮। যাহারা ইংরাজী বলে, তাহাদের মধ্যে ৩১২ জন আমেরিকার এবং ৩০৬ জন অষ্ট্রেলেশিয়ার লোক। ইউরোপে কয়জন

বাঙালী অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে? আফ্রিকারও• ২৩২ জন বাংলা দেশে বাস করে।

বাঙালী এশিয়া ইউরোপের জাতিদের মধ্যে ত উদ্যমশীলতার বড়াই করিতেই পারে না, ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিদের তুলনাতেও বাঙালী কম বই বেশী উদ্যমশীল নহে। আমাদের মাতৃভূমি উর্ব্বরা বলিয়াই কি আমাদের এই দশা? কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্যের সব বা অধিকাংশ লাভও ত আমরা নিজস্ব করিতে পারিতেছি না। পাটের ব্যবসায়ে কোটি কোটি টাকা বিদেশী পাইতেছে; বঙ্গের কৃষাণ ও দালাল ক'টি টাকাই বা পায়? দেশে সকলেই যে-খাইতে পরিতে পায়, বা সকলেই নিজের রোজগার খায়, তাহাও নয়। গলগ্রহের ও কুপোষ্যের সংখ্যা বিস্তর। ভিক্ষুকই আছে কয়েক লক্ষ।

আমেরিকার রাষ্ট্রীয় অধিকার।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার মজুমদার নামক একজন বাঙালী যুবক আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্রের (U. S. A.) বাসিন্দা বলিয়া গৃহীত এবং তথাকার সমুদয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই অধিকার পাইয়াছেন। এ বৎসর তারকনাথ দাস নামক আর একজন বাঙালী এইরূপ অধিকার পাইয়াছেন। আমেরিকার জজ্ ডুলিং তাঁহার সম্বন্ধে এই রায় দিয়াছেন, যে, "ক্রীতদাস নহে, এরূপ যে-কোন শ্বেত মানুষে (free white person) সম্মিলিত-রাষ্ট্রের পৌরজন (citizen) বলিয়া গণ্য হইতে পারে। শ্বেত মানুষ মানে ককেশীয় জাতির লোক। উচ্চশ্রেণীর (high caste) আর্য্যজাতীয় হিন্দুরা ককেশীয়। তারকনাথ দাস উচ্চশ্রেণীর হিন্দু। অতএব তাহাকে আমেরিকার পৌরজন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।" তারকনাথ দাস ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পাস করিয়াছেন, এবং কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পীএইচ-ডী উপাধি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

অক্ষয়কুমার মজুমদার।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস।

এই দুজন বাঙালী ছাড়া সখারাম গণেশ পণ্ডিত নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় আমেরিকার প্রজা হইয়াছেন। তিনি থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর একজন প্রচারক।

যাঁহারা আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্রের প্রজা হন, তাঁহারা তথাকার সমুদয় অধিকার পান। ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারেন, নিজেরা প্রতিনিধি হইতে পারেন, এক এক রাষ্ট্রের গবর্ণর হইতে পারেন, সৈনিক ও সৈনিক-কর্ম্মচারী এবং সেনানায়ক হইতে পারেন, এমন কি দেশনায়ক (President) পর্য্যন্ত হইতে পারেন,—অবশ্য যদি তেমন গুণ ও শক্তি থাকে।

মূর্ত্তি-নির্ম্মাতা। শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায়চৌধুরী কলিকাতায় থাকিতে মূর্ত্তিনির্ম্মাণ শিল্পে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। লণ্ডনের রয়্যাল কলেজ অব্ আর্টস্

শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় চৌধুরী।

হইতে তিনি উহার এসোসিয়েটের (Associate of the Royal College of Arts) ডিপ্লোমা পাইয়াছেন। ভারতবাসীদের মধ্যে সম্প্রতি কেবল তিনিই এই উপাধি পাইয়াছেন। তিনি এখন ধাতুর মূর্ত্তি ঢালিতে শিখিতেছেন, ডিসেম্বর মাসে দেশে ফিরিয়া আসিবেন।

লণ্ডনের রয়্যাল একাডেমীর তক্ষণ-বিভাগে শ্রীযুক্ত এফ্, এম্, (ফণীন্দ্রমোহন ?) বসু নির্ম্মিত একটি "ক্লিষ্ট বালকে"র ক্ষুদ্র ধাতব মূর্ত্তি দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই সংবাদটি মান্দ্রাজের দৈনিক নিউ ইণ্ডিয়ায় বাহির হইয়াছে। তাহাতে শিল্পীর কোন পরিচয় নাই।

ইউরোপে যুদ্ধ। ইউরোপের প্রধান প্রধান জাতিদের মধ্যে যে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে, তাহার অব্যবহিত কারণ অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব যুবরাজ ফ্রান্সিস্ ফার্ডিনাণ্ড ও তাঁহার পত্নীর হত্যা। কিন্তু যুদ্ধের নানা কারণ আগে হইতেই ছিল। এই হত্যাকাণ্ডটি বারুদখানায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রয়োগ মাত্র।

যে সহরে এই হত্যা হয়, তাহার নাম সেরাজেভো অর্থাৎ প্রাসাদ-নগরী। উহা বস্নিয়া-হের্জেগোবীনা প্রদেশের রাজধানী। এই দুই প্রদেশ পূর্ব্বে তুরস্ক-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সেরাজেভো নামটির 'সেরা' অংশটিতে মুসলমান প্রভাবের চিহ্ন রহিয়াছে। উহা ফারসী প্রাসাদার্থক সরাই শব্দের রূপান্তর মাত্র। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের বার্লিন সহরের সন্ধি অনুসারে অষ্ট্রিয়াকে বস্নিয়া ও হের্জেগোবীনা প্রদেশদ্বয়ে আড্ডা গাড়িতে দেওয়া হয়। কথা ছিল যে অষ্ট্রিয়াকে তথায় থাকিতে দেওয়া হইবে কেবল শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য। অষ্ট্রিয়ার কিন্তু বাস্তবিক মতলব ছিল অন্য রকম। অষ্ট্রিয়ার লোকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, একটু হাত পা ছড়াইবার জন্য, বাণিজ্যবিস্তারের জন্য, পূর্ব্বদিকে রাজ্যবিস্তারের দরকার ছিল। সুতরাং অষ্ট্রিয়া ত ঐ দুই প্রদেশের লোকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তথায় আড্ডা গাড়িলেন, এবং তাহাদের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া ও সামরিক আইন অনুসারে তাহাদের অনেকের প্রাণদণ্ড দিয়া, "শান্তি" স্থাপন করিলেন; কিন্তু তাহার পর আর তথা হইতে নড়িবার নামটি পর্য্যন্ত করিলেন না। অধিকন্তু যেখানে শান্তিস্থাপক বলিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথায় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা রাজা হইয়া বসিলেন। মধ্যে ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে ঐ দুই প্রদেশে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়, এবং অষ্ট্রিয়া কঠোর ভাবে অনেক রক্তপাত করিয়া তাহা

দমন করেন। এই-সব কারণে তথাকার লোকদের মনে অষ্ট্রিয়ার উপর রাগ ছিল।

বস্নিয়া-হের্জেগোবীনার প্রধান অধিবাসীরা যে-জাতীয়, সার্বিয়ার অধিবাসীরাও সেই-জাতীয়। নিহত যুবরাজের এই দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল যে তিনি সার্বিয়া ও বল্কান উপদ্বীপের আরও কোন কোন অংশ অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত করিবেন। অন্যদিকে সার্বিয়ার লোকদের মধ্যে একটি প্রচেষ্টা (Pan-Servian movement) আছে, তাহার উদ্দেশ্য সমুদয় সার্বীয় জাতির লোককে এক-রাজ্য-ভুক্ত করা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক দিকে বস্নিয়া-হের্জেগোবীনার সার্বরা নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার অধীন আছে, ও হত যুবরাজ সার্বিয়া ও অন্যান্য প্রদেশ-বাসী সার্বদিগকে অধীন করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং অন্যদিকে স্বাধীন সার্বরা অষ্ট্রিয়ার অধীন সার্বদিগকেও নিজের দলে টানিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং উভয় পক্ষের মধ্যে বিদ্বেষ থাকা অনিবার্য্য। এই অবস্থায় যুবরাজ সেরাজেবো দর্শন করিতে যান। তখন তাঁহার উপর সার্ব চক্রান্তকারীরা বোমা ছুড়ে; তাহা ব্যর্থ হয়। তাহার পর গাব্রিও প্রিঞ্জিপ্‌স্ নামক এক সার্ব ছাত্র তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রীকে রিভল্‌ভারের গুলি দ্বারা খুন করে।

অষ্ট্রিয়ার বিশ্বাস সত্য কি না জানি না, কিন্তু অষ্ট্রিয়া মনে করেন যে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সার্বিয়ার গবর্ণমেন্টের যোগ ছিল, এবং সকল সার্বকে এক-রাষ্ট্রভুক্ত করিবার প্রচেষ্টা ইহার মূল। এই জন্য সার্বিয়াকে, কতকগুলি রাজপুরুষকে পদচ্যুত, কতকগুলি লোককে দণ্ডিত, এবং ঐ প্রচেষ্টার মূলোচ্ছেদ করিতে কঠোর ভাবে অনুরোধ করেন; তা ছাড়া বলেন, যে ঐ হত্যা সম্বন্ধে যে তদন্ত হইবে, তাহাতে অষ্ট্রিয়ার নিযুক্ত লোকও তদন্তকারী হইবেন; নতুবা অষ্ট্রিয়া যুদ্ধ করিবেন। সার্বিয়া অনেকটা নরম জবাব দেন, কিন্তু অষ্ট্রিয়ার সমুদয় সর্ত্তে রাজি হন নাই। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

ইউরোপে প্রধান ছয়জাতির দুটি দল আছে। ট্রিপল্ এলায়েন্স (Triple Alliance) বা তিনের মিত্রতা দ্বারা অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মেনী ও ইতালী একদলভুক্ত, এবং ট্রিপল্ আঁতাঁত্ (Triple Entente) বা তিনের বুঝাপড়া দ্বারা রুশিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অপর দলভুক্ত। রুশিয়ার লোকেরা প্রধানতঃ স্লাবজাতীয়; সার্বিয়া, বস্নিয়া, প্রভৃতির অধিকাংশ লোকও স্লাব্‌জাতীয়। রুশিয়া নিজেকে সমুদয় স্লাব্‌জাতীয়লোকের মুরুব্বি মনে করেন, এবং সমুদয় স্লাব্‌দিগকে একজোট করিবার জন্য একটা প্রচেষ্টাও (Pan-Slavism) আছে। অষ্ট্রিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করায় রুশিয়া নিজের মুরুব্বিপদ ও ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য সার্ভিয়ার সঙ্গে যোগ দিলেন। জার্ম্মেনী বন্ধু অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগ দিলেন, এবং রুশিয়ার বন্ধু ফ্রান্সকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। বেলজিয়ম নিজ নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিলেন। বেলজিয়মের ভিতর দিয়া ফ্রান্সকে আক্রমণ করা জার্ম্মেনীর সুবিধা। জার্ম্মেনী বেলজিয়মকে বলিলেন, "তুমি আমাদিগকে তোমার ভিতর দিয়া যাইতে দাও; নতুবা আমরা জোর করিয়া যাইব।" ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুশিয়ার বন্ধু। তিনি জার্ম্মেনীকে বলিলেন, "তুমি যদি ফ্রান্সের উত্তর উপকূল আক্রমণ না কর এবং বেল্‌জিয়মকে নিরপেক্ষ থাকিতে দাও, তাহা হইলে আমরা কোন পক্ষেই যুদ্ধ করিব না।" কিন্তু জার্ম্মেনীর মত অন্যরূপ দেখিয়া ইংলণ্ড কাজে কাজেই অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মেনীর বিপক্ষতা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে জার্ম্মেনী ফ্রান্সের উপকূল আক্রমণ করিলে ফ্রান্সকে আত্মরক্ষার্থ ভূমধ্যসাগর হইতে নিজের রণতরীগুলি আনিতে হইবে। তাহা হইলে ভূমধ্যসাগর কতকটা অরক্ষিত হইবে। কিন্তু উহা ইংরেজের ভারতবর্ষ ও মিশর আসিবার পথ। সুতরাং সেখানে ইংলণ্ডকে অনেক রণতরী পাঠাইতে হইবে। তাহা করিলে আবার ইংলণ্ডের নিজের এবং ফ্রান্সের কতকটা অরক্ষিত হয়। শান্তিরক্ষাই ইংলণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু নিজ স্বার্থরক্ষার্থ, ক্ষুদ্র বেলজিয়মের সাহায্যার্থ এবং "তিনের বুঝাপড়ার" (Triple Entente) মর্য্যাদা রক্ষার্থ তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। ইতালী এখনও নিরপেক্ষ আছেন।

এই ত গেল যুদ্ধের আপাত-প্রতীয়মান কারণ। ভিতরে আরও গুরুতর কারণ আছে। জার্ম্মেনীর লোক-সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। তথাকার কলকারখানায়

নানাপ্রকারের জিনিস অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। দেশে থাকিয়া সকল লোকের ভরণপোষণ ভাল করিয়া হয় না; উৎপন্ন দ্রব্যের কাট্‌তিও আরও হওয়া দরকার। এইজন্য জার্ম্মেনীর উপনিবেশ, জার্ম্মেনীর সাম্রাজ্য বিস্তার আবশ্যক। সমুদ্রে অবাধ গতিবিধি, সমুদ্রে প্রভুত্ব ভিন্ন বাণিজ্যবিস্তারও আশানুরূপ হয় না, উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবৃদ্ধিও আকাঙ্ক্ষার মত হয় না। কিন্তু সমুদ্রে, কি রণতরী, কি বাণিজ্যজাহাজ, উভয়েই, ইংলণ্ডের প্রভুত্ব রহিয়াছে। রণতরীতে ইংলণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ;

নিহত যুবরাজ ফ্রান্সিস্ ফার্ডিনাণ্ড ও তাঁহার পরিবারবর্গ।

তাহার পর যথাক্রমে জার্ম্মেনী, ফ্রান্স, আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্র, অষ্ট্রিয়া, ইতালী ও জাপান। সুতরাং সমুদ্রে ইংলণ্ডকে খাট করিতে না পারিলে জার্ম্মেনীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না। তজ্জন্য জার্ম্মেনী রণতরীর সংখ্যা খুব বাড়াইয়া চলিতেছে। এদিকে ইউরোপের মহাদেশে, টিউটন বড় হইবে, না স্লাব্ বড় হইবে, অর্থাৎ জার্ম্মেনরা যে জাতির লোক তাহারা বড় হইবে, না রুশরা যে জাতির লোক তাহারা বড় হইবে, তলে তলে এই সমস্যা সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে। উভয়জাতিই প্রাধান্যের জন্য ব্যগ্র। উভয়েরই সমরসজ্জা বাড়িয়া চলিতেছে। এখন, ইউরোপে যখন জলে, স্থলে (এবং কিছুকাল হইতে আকাশযান দ্বারা আকাশেও বটে) যুদ্ধের এত আয়োজন হইয়াছে,—কাহারও ৫৫লক্ষ, কাহারও ৪৫লক্ষ, কাহারও ৪০ লক্ষ, কাহারও বা ২৫ লক্ষ সৈন্য এবং তদনুরূপ গোলাগুলি কামানআদি মজুত,—তখন যুদ্ধ না হইয়া যায় না। জার্ম্মেনীর স্থলযুদ্ধের আয়োজন সকলের চেয়ে বেশী, ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সকে হারাইয়া দিবার পর হইতে জার্ম্মেনীর একটা অজেয়তার অহঙ্কারও বাড়িয়া চলিয়াছে। এইজন্য যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত জার্ম্মেনীর হাত চুলকাইতেছিল। তাই, সে সম্প্রতি আততায়ী হইয়া ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, সুইটজারল্যাণ্ডকে খোঁচা দিয়াছে।

ইউরোপের প্রধান জাতিসকলের অবস্থা এখন এরূপ, যে, কাহারও ক্ষমতা বাড়িয়া গেলে, বিরুদ্ধদলের সকলকে প্রমাদ গণিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ জার্ম্মেনী (অষ্ট্রিয়া ও ইটালী)র সামুদ্রিক শক্তি বাড়িলে, ইংলণ্ডের নিকটস্থ সমুদ্র নর্থ সীতে সমূহ বিপদ; আবার ভারতবর্ষে আসিবার পথ যে ভূমধ্যসাগর, সেখানেও বিপদ। সুতরাং একারণেও ইংলণ্ডকে যুদ্ধ করিতে হইতেছে।

যাহা হউক, এক্ষেত্রে ইংলণ্ড ন্যায়যুদ্ধ করিতেছেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও বেলজিয়মের জয় হইলে লোকে সন্তুষ্ট হইবে।

ক্ষুদ্রদেশের বীরত্ব। বেলজিয়ম উর্দ্ধসংখ্যা তিন লক্ষ সৈন্য ও ২০৪টি কামান যুদ্ধক্ষেত্রে আনিতে পারে; জার্ম্মেনী পারে ৫৫ লক্ষ সৈন্য ও ৪০০০ কামান। তথাপি সে জার্ম্মেনীকে হারাইয়া দিতেছে, অগ্রসর হইতে দেয় নাই; জার্ম্মেনীর অজেয়তার ধারণা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। সার্বিয়া উর্দ্ধসংখ্যা তিন লক্ষ সৈন্য ও ৪০০ কামান যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির করিতে পারে; অষ্ট্রিয়া পারে ২৫ লক্ষ সিপাহী ও ২০০০ কামান। কিন্তু সার্বিয়া উপর্য্যুপরি অনেকগুলি

যুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়াছে, এখন একজনও অষ্ট্রিয়ার সৈন্য সার্বিয়ার মাটিতে নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের এই বীরত্বে, স্বাধীনতা-রক্ষার চেষ্টার এই সাফল্যে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

ফ্রান্সের পরাজয়ের প্রতিশোধ। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স জার্মেনীকে এলসাস্-লোরেন প্রদেশদ্বয় দিতে বাধ্য হন। বর্ত্তমান যুদ্ধে স্থায়ী ভাবে ফ্রান্স আবার হারা নিধি দখল করিতে পারিবেন, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহা আনন্দের বিষয়। সমুদয় ফরাসীর ফ্রান্সের অঙ্গীভূত থাকাই উচিত। তাহাদিগকে জার্মেনীর অধীন করা অন্যায়। ফ্রান্স ইতি মধ্যেই কতিপয় যুদ্ধে জার্মেনীকে পরাস্ত করিয়াছে। ফ্রান্সের সৈন্যবল ও কামান-সংখ্যার উর্দ্ধসীমা যথাক্রমে ৪০ লক্ষ ও তিন হাজার; রুশিয়ার ৪৫ লক্ষ এবং ৩৫০০।

অষ্ট্রিয়ার বর্ত্তমান যুবরাজ। পাঠশালাবিমুখ এক দুরন্ত বালক গুরু মহাশয়ের মৃত্যুতে এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করে যে এখন আর পাঠশালা যাইতে হইবে না। তাহার বুদ্ধিমান্ ভাই বলে, গুরু মহাশয় মরিয়াছে বটে, বাবা ত মরে নাই; বাবা আবার একটা গুরু মহাশয় আনিবে। বাস্তবিক বালকদের স্বাধীন হইতে হইলে গুরু মহাশয়ের মৃত্যু দ্বারা, এমন কি বাবার মৃত্যু দ্বারাও, সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না; বয়সে সাবালক হইলেও যতক্ষণ না মানুষ সামর্থ্যে সাবালক হয়, ততক্ষণ সে কেমন করিয়া স্বাধীন হইবে? একটা জাতির স্বাধীন হওয়া ও একজন মানুষের স্বাধীন হওয়া সব বিষয়ে তুলনীয় নহে বটে, কিন্তু কতকটা সাদৃশ্য আছে। মনুষ্যবিশেষকে খুন করিয়া স্বাধীন হইতে পারিব বা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিব, মনে করা ভুল। সার্বিয়া যে শক্তি-সামর্থ্য দেখাইতেছে, তাহাতেই তাহার স্বাধীনতা রক্ষার অধিকতর সম্ভাবনা। সার্বিয়ার চক্রান্তকারীরা ভাবিয়াছিল যে যুবরাজ ফ্রান্সিস্ ফার্ডিন্যাণ্ড যখন সম্রাট হইবে, তখন তাহার মত একরোখা, দুর্দ্দান্ত, দুরাকাঙ্ক্ষ লোকের হাত হইতে বস্নিয়া-হের্জেগোবীনার স্বজাতীয়দিগকে উদ্ধার করা ত দূরের কথা, সার্বিয়াকেই হয়ত তাহার পদানত হইতে হইবে; অতএব তাহাকে

অষ্ট্রীয়ার নূতন যুবরাজ চার্লস্ ফ্রান্সিস্ জোসেফ ও তাঁহার পরিবারবর্গ।

মারিয়া ফেলা যাক্। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চার্লস ফ্রান্সিস্ জোসেফ যুবরাজ হইলেন। কাহারও কাহারও মতে ২৭-বৎসর-বয়স্ক এই যুবক তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত অপেক্ষা অধিক গুণশালী ও যোগ্য। তিনি যুবরাজ হওয়ায় আর একটা সুবিধা এই হইল, যে, তাঁহার সন্তানেরা তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে; কারণ তিনি বোর্বোঁ বংশের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। মৃত যুবরাজ সমান ঘরে, রাজবংশে, বিবাহ করেন নাই; এই জন্য তাঁহার পুত্র যুবরাজ না হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ হইলেন। অষ্ট্রিয়া ও জার্মেনীতে রাজবংশীয় কেহ রাজকুলে বিবাহ না করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় ও সে বিবাহের সন্তানরা বৈধ বলিয়া গণ্য হয় বটে; কিন্তু তাহারা পিতার উচ্চ পদবী বা ধনসম্পত্তির অধিকারী হয় না। এরূপ বিবাহে স্বামী স্ত্রীর "পাণি" "গ্রহণ" করিবার সময় নিজের

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

U. RAY & SONS
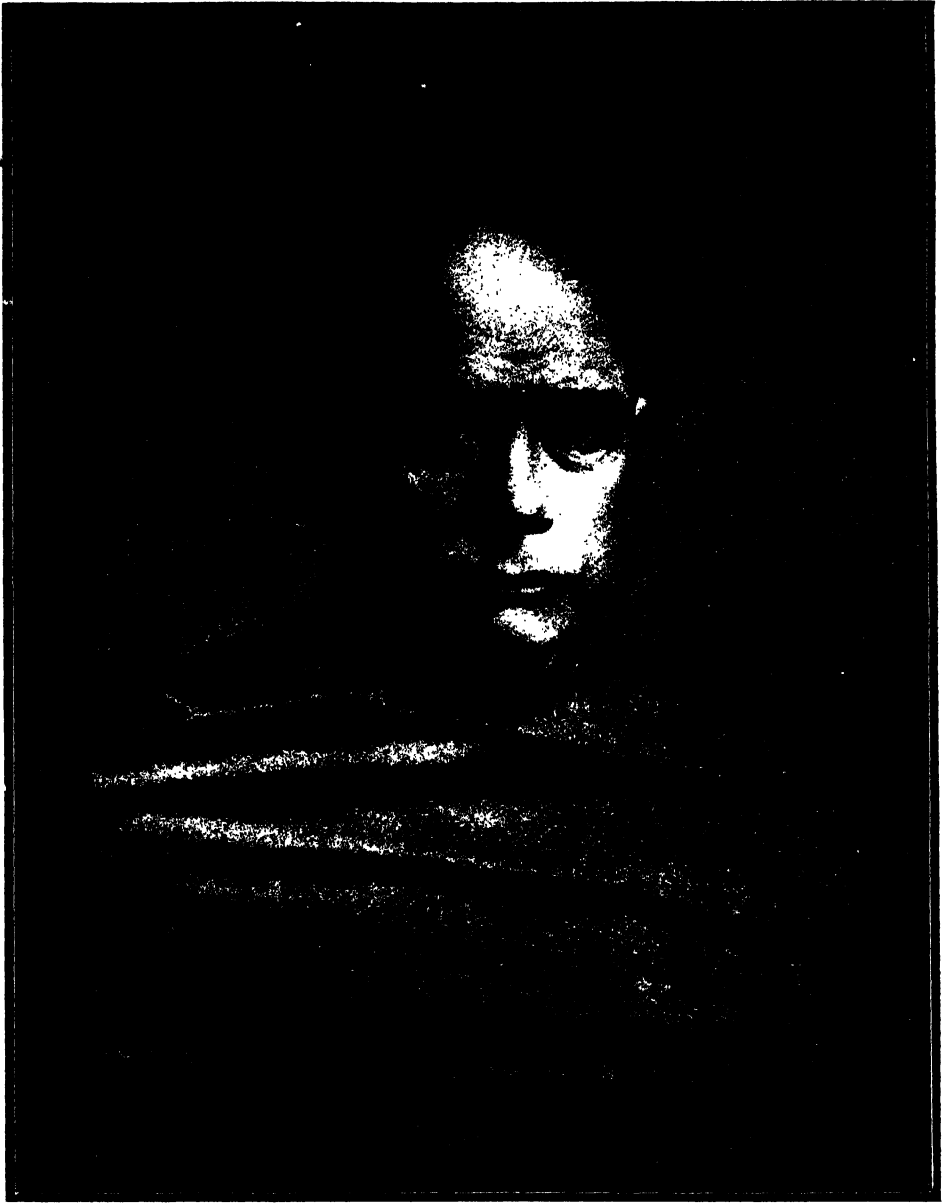
বাম হস্ত দ্বারা স্ত্রীর হস্ত ধারণ করেন। তজ্জন্য এইরূপ বিবাহকে বাম হস্তের (left-handed) বিবাহ বলে।

আধুনিক কুরুপাণ্ডব। একটা চলিত কথা আছে যে কুরুপাণ্ডবেরা পরস্পর যুদ্ধ করিবার সময় কৌরবেরা এক শত ভাই এবং পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই এইরূপ গণনা হইত। কিন্তু উভয় দলেরই শত্রু কাহারও সঙ্গে বিরোধ হইলে তাঁহারা মিলিয়া একশত পাঁচ ভাই হইতেন। ইংলণ্ডেও এখন তাহাই দেখা যাইতেছে। আয়র্লণ্ডকে উদারনৈতিকেরা স্বায়ত্ত শাসন দিতে যাওয়ায় অন্তর্বিপ্লবের উপক্রম হইয়াছে; অলষ্টারের দল ও ন্যাশানালিষ্ট দল উভয়েই যুদ্ধসজ্জা করিয়াছেন। সফ্রাজেট্ দলের নারীরা রাজনৈতিক অধিকার পাইবার জন্য মরিয়া হইয়া দেশের ঘর বাড়ী জানালা পুড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছিলেন। কিন্তু এখন সমুদয় দেশবাসীর সাধারণ শত্রু জার্মেনীর বিরুদ্ধে সকলে একজোট হইয়াছেন। পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

শক্তিশালী জাতির ইহা একটি লক্ষণ।

বিপদ্‌ভঞ্জনের বিপদ্। ইউরোপে জার্মেনী, অষ্ট্রীয়া, রুশিয়া, প্রভৃতি সব জাতিই যুদ্ধে ভগবানের সাহায্য চাহিতেছে। অথচ সকলেই যে ধর্ম্ম-যুদ্ধ করিতেছে তাহা নয়। বিপদভঞ্জন যিনি, দর্পহারীও তিনি। তাঁহাকে প্রবলের মুখ চাহিয়া কিছু করিতে হয় না। নতুবা তাঁহাকে এ ক্ষেত্রে বিপন্ন হইতে হইত।

বিদ্যাসাগর শ্রাদ্ধসভা। তেইশ বৎসর পূর্ব্বে সন ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় দেহত্যাগ করেন। প্রতি বৎসর ঐ তারিখে দেশের নানা স্থানে তাঁহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রদর্শনার্থ সভা হইয়া থাকে। সভাতে তাঁহার অসামান্য দেবোপম চরিত কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্কুল কলেজ স্থাপনাদি দ্বারা তিনি শিক্ষা বিস্তারের যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছেন, স্ত্রীশিক্ষার জন্য যাহা করিয়াছেন, লোকসেবার জন্য যাহা করিয়াছেন, সমস্তই বর্ণিত হয়। তাঁহার স্বাবলম্বন, দৃঢ়চিত্ততা, বিলাস-বিমুখতা, দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতির উল্লেখ হয়। কিন্তু বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তনের সমুচিত উল্লেখ অনেক সভায় হয় না, কোথাও কোথাও তাহার উল্লেখ হয়ই না, আবার কোথাও বা তাহার নিন্দাও হয়। বিধবাবিবাহ-প্রবর্ত্তনকে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে স্বীয় নানা কার্য্যের মধ্যে কিরূপ স্থান দিতেন, তাহা তাঁহার তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে লিখিত নিম্নে মুদ্রিত পত্রখানি হইতে বুঝা যাইবে ঃ—

শ্রীশ্রীহরি শরণং

শুভাশিষঃ সন্তু—

২৭ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এই সংবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।

ইতিপূর্ব্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম সে বিবাহ স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা আমার পক্ষে কোনও মতে উচিত কার্য্য হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা-বিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না,* ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে। **বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম, জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই;** এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি; সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি তুচ্ছ কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।

অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আহার ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবেক, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সে জন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেক এরূপ বোধ হয় না এবং আমিও তজ্জন্য বিরূপ বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায়, এরূপ বিষয়ে সকলেই স্বতন্ত্রেচ্ছ; অন্মদীয় ইচ্ছার অনুবর্ত্তী বা অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া চলা কাহারও উচিত নহে। ইতি ৩১ শ্রাবণ।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।*

---

* শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বিদ্যাসাগর", তৃতীয় সংস্করণ, ২৯৬-২৯৭ পৃষ্ঠা।

স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী নহে। অনেকে এইরূপ তর্ক করেন যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক; অতএব বিধবার বিবাহ দিলে অনেক কুমারী অবিবাহিত থাকিয়া যাইবে। এই তর্কের মূল্য যাহাই হউক, বাস্তবিক ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী নয়, কম। ১৯১১ সালের সেন্সস্ অনুসারে ভারতে সকল ধর্ম্মের ও জাতির মোট পুরুষ ১৬১৩৩৮৯৩৫, মোট স্ত্রীলোক ১৫৩৮১১৪৬১; হিন্দু পুরুষ ১১০৭৭৩৯৪৪, হিন্দু স্ত্রীলোক ১০৬৬৪৭৯৩৪, হিন্দু অবিবাহিত পুরুষ ৫২০৭৬৪৮৭, হিন্দু অবিবাহিতা স্ত্রীলোক ৩৩৮৭৫৩১০ জন। বঙ্গে সকল ধর্ম্মের ও জাতির মোট পুরুষ ২৩৩৬৫২২৫, মোট স্ত্রীলোক ২২১১৭৮৫২; হিন্দু পুরুষ ১০৫৪৫৭১৭, হিন্দু স্ত্রীলোক ৯৮৩২০৭৯; অবিবাহিত হিন্দু পুরুষ ৪৯০৯৩১৪, অবিবাহিতা হিন্দু স্ত্রীলোক ৪৪৪৩৫১২। বাংলায় অবিবাহিত বৈদ্য পুরুষ ২০৮৫৮, অবিবাহিতা বৈদ্য নারী ১৩১৯০; অবিবাহিত ব্রাহ্মণ পুরুষ ৩০৮৯২৮, অবিবাহিতা ব্রাহ্মণ নারী ১৬৫৯৫৮; অবিবাহিত কায়স্থ পুরুষ ২৯৮৪৭৫, অবিবাহিতা কায়স্থ স্ত্রীলোক ১৬৯০৭৩; ইত্যাদি। বাহুল্যভয়ে অন্যান্য জাতির উল্লেখ করিলাম না।

পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক কম থাকায় বরং বালবিধবার বিবাহ হওয়াই আবশ্যক।

দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা কোন বালিকা-বিধবার ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকিলে এবং তিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সৎকার্য্যে জীবনযাপন করিতে পারিলে তিনি তাহা করিতে পারেন; এমন কি ব্রহ্মচর্য্য-পালন-সমর্থা কুমারীও আজীবন কুমারী থাকিতে পারেন। কিন্তু এসকল বিশেষস্থল, সাধারণতঃ বালবিধবা ও কুমারীদের বিবাহই বিহিত। সাধুশীলা পত্নীর ও সুসন্তানের জননীর গৌরব ব্রহ্মচারিণী বালবিধবার ও কুমারীর গৌরব অপেক্ষা কম নহে।

ভারতীয় চিত্রকলা। আধুনিক সময়ে যখন বাঙালী কাব্য লিখিতে আরম্ভ করে, তখন কাব্যের বিষয় অধিকাংশস্থলে পৌরাণিক, এবং কোন কোন স্থলে ঐতিহাসিক হইত। বাঙালীর বর্ত্তমান জীবনে যে কবিতা লিখিবার জিনিষ আছে, তাহা বাঙালী কবিগণ ভাল করিয়া পরে বুঝিয়াছেন; তাহাতে রস পাইয়া অপরকেও সেই রসের আনন্দ দিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। নূতন ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসেও প্রথমে দেখা যাইতেছে যে অধিকাংশ চিত্রেরই বিষয় পুরাণ এবং প্রাচীন কাব্যনাটকাদি হইতে গৃহীত। অল্পসংখ্যক চিত্রের বিষয় ঐতিহাসিক। বর্ত্তমান বাঙালীসমাজ ও বাঙালীজীবন যে একেবারে বাদ পড়িয়াছে, তাহা নয়,—বিশেষতঃ পরিহাস ও বিদ্রূপের দিক্ দিয়া। কিন্তু যখন বাঙালী চিত্রকরগণের নানা চিত্র হইতে ইহা বুঝা যাইবে, যে, তাঁহারা অতীতের মত বর্ত্তমানেও রস পাইতেছেন, তখনই নূতন চিত্রকলার স্থায়িত্ব ও সজীবতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবে না। দূরের জিনিষ যেমন সকলের চক্ষেই স্বভাবতই সুন্দর দেখায়, অতীতেরও তেমনি সকলেরই পক্ষে একটা স্বাভাবিক মোহ আছে। কিন্তু নিকট যাহা, বর্ত্তমান যাহা, তাহার মধ্যে রূপরসের সন্ধান পাওয়া ও দেওয়া প্রতিভার কার্য্য।

বেহার ও উড়িষ্যায় বাঙ্গালী। বেহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বাংলা হইতে একটী স্বতন্ত্র সুবা হওয়ায় এবং তাহাতে প্রাকৃতিক-বাংলার কোন কোন স্থান অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তথাকার বাঙালীদের কোন কোন বিষয়ে অসুবিধা হইয়াছে। সেই-সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য এবং বাঙালীদের আর্থিক, নৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির জন্য বেঙ্গলী সেট্‌লার্স্ এসোসিয়েশ্যন নামক একটি সমিতি আছে। এই সমিতির উদ্যোগে ২৮শে ও ২৯শে শ্রাবণ তারিখে বাঁকিপুরে প্রবাসী বাঙালীদের একটি পরামর্শ-সভা হয়। রাঁচির উকীল শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ, এম্-এ, বি-এল্, ইহার সভাপতি-পদে বৃত হইয়া সংযতভাবে একটি বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে চিন্তাশীল বেহারী জননায়কগণ স্বীকার করেন যে বাঙালীদের দ্বারা বেহারের উন্নতির সাহায্য হইয়াছে, এবং এখনও তাঁহারা বেহারের উন্নতি-সাধনে বাঙালীর সহযোগিতা চান। কালীপদ বাবু বলেন, বাঙালীদের চেষ্টা আত্মরক্ষামূলক, তাঁহারা বেহারীদের ক্ষতি করিতে চান না। বেহারের ছোটলাট সার্ চার্ল্‌স্ বেলী বলিয়াছেন যে, যে-সকল বাঙালী তাঁহার সুবার স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছেন, তাঁহাদের ও বেহারীদের মধ্যে চাকরীতে নিয়োগ সম্বন্ধে তিনি কোন প্রভেদ করিবেন না। তজ্জন্য বাঙালীরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বাঙালীরা এইজন্যও কৃতজ্ঞ যে তিনি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় রায় নিশিকান্ত সেন বাহাদুরকে সভ্য নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়কে

অস্থায়ী মাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য অনেক স্থলে পক্ষপাতশূন্যতার প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নাই। কালীপদবাবু তাহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

তিনি যথার্থই বলিয়াছেন যে বাঙালীদের বিপদ ও আশঙ্কার প্রধান কারণ এই যে স্থায়ী বাসিন্দা (domiciled Bengali) যে কে তাহার সংজ্ঞা সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের মত এই যে, যে-সব বাঙালী জীবনের শেষকাল তথায় যাপন করিবার জন্য ঐ প্রদেশে বাড়ীঘর নির্ম্মাণ বা ক্রয় করিয়াছেন, এবং স্থানীয় স্কুল কলেজে সন্তানদের শিক্ষা দিয়াছেন বা দিতেছেন, তাঁহারাই স্থায়ী বাসিন্দা, কিন্তু সংজ্ঞাটির শেষ অংশটি সম্বন্ধে আপত্তি এই যে স্থানীয় শিক্ষালয়সকলে স্থায়ী বাসিন্দা ভিন্ন অন্য বাঙালীর সন্তানদের লওয়া হয় না। এ এক মহাসঙ্কট। স্থানীয় শিক্ষালয়ে ছেলেরা না পড়িলে স্থায়ী বাসিন্দা বলিয়া গণ্য হওয়া যায় না, আবার স্থায়ী বাসিন্দা না হইলে ছেলেরা তথায় পড়িতে পাইবে না। কোন্ সর্ত্তটার উপর কোনটা নির্ভর করিবে, বলা যায় না। দুজন লোক একই সময়ে যদি পরস্পরের কাঁধে চড়িতে চায়, তাহা হইলে যেমন একটা হাস্যকর অসম্ভব ব্যাপার হয়, ইহাও তেমনি। কালীপদবাবু প্রস্তাব করেন যে যে-কেহ বাস করিবার জন্য বাড়ী নির্ম্মাণ বা ক্রয় করিয়াছে এবং তাহাতে ন্যূনকল্পে তিনবৎসর বাস করিয়াছে, তাহাকেই স্থায়ী বাসিন্দা বলিয়া ধরা উচিত। আমাদের বিবেচনায় ইহা খুব ন্যায়সঙ্গত।

বাস্তবিক বাঙালীর ছেলেরা যে বেহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুরের শিক্ষালয়-সকলে তথাকার প্রাচীনতর অধিবাসীদের ছেলেদের মত অবাধে ভর্ত্তি হইতে পারিতেছে না, ইহাই বাঙালীদের গভীরতম আশঙ্কা ও দুঃখের কারণ। অন্য বাঙালীর ত কথাই নাই, স্থায়ী বাসিন্দা যাহারা তাহাদের ছেলেদের চেয়েও সর্ব্বত্রই বেহারী ও উৎকলীয় ছেলেদের সুযোগ বেশী। ইহা বড়ই অবিচার। কালীপদবাবু ইহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বেহারী বা উৎকলীয়গণ যেমন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের প্রজা, বাঙালীরাও তেমনি প্রজা। তাহারাও ট্যাক্স দেয়, এবং অন্যান্য অধিবাসীদের সমান হারেই দেয়। কোন স্কচ্ বা আইরিশ পরিবার লণ্ডনে বাস করিলে, তাহার ছেলেরা ইংরেজের ছেলের মতই লণ্ডনের যে কোন শিক্ষালয়ে অবাধে ঢুকিতে পায়। প্রবাসী-বাঙালীর বেলাই এত অসুবিধাজনক নিয়ম কেন? ইহাও মনে রাখা উচিত যে প্রাকৃতিক-বঙ্গের অনেক স্থান সুবে বেহারে গিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আরার বেহারী পাটনায় গেলে যদি পড়িতে পায়, তাহা হইলে মানভূম বা ধলভূমের বাঙালী পাটনায় গেলে কেন পড়িতে পাইবে না? শিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ লাভের জন্য প্রবাসী বাঙালীরা আপনাদের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করুন।

কালীপদবাবু দেখাইয়াছেন যে এখন সুবে বেহারে যত কলেজ আছে বা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে যত হইবে, তাহা প্রদেশস্থ যুবকদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট নহে। বেহারী, উৎকলীয় ও বাঙালী একজোট হইয়া কলেজের সংখ্যা বাড়াইতে চেষ্টা করুন। যদি বাঙালীরা কোথাও অন্যদের সমান সুযোগ না পান, তাহা হইলে আপনাদের স্বতন্ত্র কলেজ করুন। কেহ এই কাজটি হাতে লইয়া ভিক্ষা করিলে নিশ্চয়ই সফলকাম হইবেন। যদি কলেজস্থাপন একান্তই দুঃসাধ্য হয়, তাহা হইলে

শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ, এম্-এ, বি-এল্।

বঙ্গের বেসরকারী কলেজসকলে পড়িবার জন্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত প্রবাসী বাঙালী ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিবার নিমিত্ত ফণ্ড স্থাপন করা হউক। বাঙালী জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইলে নগণ্য, এমন কি, বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। অতএব জ্ঞানমন্দিরের দ্বার বাঙালীর জন্য উন্মুক্ত রাখিতে সকলে উঠিয়া পড়িয়া লাগুন।

আর এক গুরুতর অভিযোগ এই যে গবর্ণমেণ্ট স্কুলসকলে বাঙলা পড়াইবার বন্দোবস্ত নাই। বাঙালীর ছেলে বাংলা পড়ে বা পড়িতে চায়; অথচ তাহার মাতৃভাষা বাংলা, শিখিবার ব্যবস্থা নাই, ইহার প্রতিকার আবলম্বে হওয়া উচিত। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার পরীক্ষা হয়। আর বিহার উড়িষ্যা ছোটনাগপুরে বাংলা পড়ান হইবে না!

কালীপদ বাবু আরও দেখাইয়াছেন যে প্রায় তিন লক্ষ

লোকের ভাষা বাংলা, অথচ তাহা সেন্সাসে হিন্দী বলিয়া লেখা হইয়াছে। যেমন ছোটনাগপুরের কুর্মিদের ভাষা কুর্মালীকে হিন্দী বলা হইয়াছে। অনেক স্থানে বরাবর বাংলাই আদালতের ভাষা ছিল, এখন তথায় হিন্দী ও চালান হইতেছে; যেমন পাকুড়, রাজমহল, জামতড়া ও ধানবাইদ্।

বাঙালীরা সর্ব্বত্র বাংলা-সাহিত্যের সহিত আপনাদের ও সন্তানদের যোগ রাখিতে সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করুন। শিক্ষালয়ে যদি একান্ত নাই হয় তাহা হইলে গৃহে এবং সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগারে যাহাতে বাংলা শিখিবার সুযোগ থাকে, সেদিকে দৃষ্টি থাকা উচিত।

স্কুল কলেজে অভিনয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজ সকলের প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে তাঁহাদের শিক্ষালয়ে বৎসরে কতবার অভিনয় হয়, কিরূপ নাটক অভিনয় হয়, এবং কোন্ কোন্ শ্রেণীর ছাত্রেরা অভিনয় করে। এই জিজ্ঞাসার কারণ এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ অবগত হইয়াছেন যে অভিনয়ের বাড়াবাড়িতে ছাত্রদের মন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয় এবং তাহাদের পড়া শুনার ক্ষতি হয়। ইহা বাস্তবিক সত্য কথা। অভিনয়ের জন্য অনেক সময় এরূপ নাটক নির্ব্বাচিত হয় যে তাহা বালক ও যুবকগণ কি প্রকারে তাহাদের শিক্ষক, গুরুজন বা অপর বয়োবৃদ্ধদিগের সম্মুখে অভিনয় করে, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কখন কখন প্রহসন পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত হয়। বহুসংখ্যক আধুনিক প্রহসনের উদ্দেশ্য স্ত্রীশিক্ষার শত্রুতা করা এবং শিক্ষিতা নারীগণকে হাস্যাস্পদ ও অবজ্ঞার পাত্র করা এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে কল্পিত কুৎসা রটনা করা। বিশ্ববিদ্যালয় কিরূপ জবাব পাইয়াছেন জানি না; কিন্তু অভিনয়ের জন্য কিরূপ নাটক ও প্রহসন নির্ব্বাচিত হয়, তাহার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।

নানাকারণে আমাদের চরিত্রে পৌরুষের অভাব দৃষ্ট হয়। ইহার উপর, বালক ও যুবকগণ অভিনয়ের সময় নারী সাজিয়া মেয়েলি ঢং এবং মেয়েলি চলন, ভঙ্গী ও সুরের নকল যত কম করে, ততই মঙ্গল। কারণ শুধু সেই অভিনয়ের রাত্রি ত নয়, প্রস্তুত হইবার জন্য অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই রিহার্স্যাল আরম্ভ হয়; এবং অভিনয় হইয়া যাইবার পরও তাহার ঢেউ থামে না।

অভিনয়ে সময় নষ্ট, শক্তি নষ্ট, এবং ক্রমশঃ পোষাক, দৃশ্যপট আদি সব বিষয়ে ব্যবসাদার থিয়েটারগুলির মত করিবার চেষ্টায় অর্থ নাশও বেশ হয়। কিন্তু সকলের চেয়ে অমঙ্গল এই হয় যে ছাত্রেরা খুব ভাল অভিনয় শিখিবার চেষ্টায় অনেক এমন পেশাদার অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে, যাহাদের চরিত্র অতি জঘন্য।

আমাদের ইংরাজী দৈনিকগুলি ব্যবসাদার থিয়েটারগুলির বিরুদ্ধে লেখেন না। আর লিখিবেনই বা কেমন করিয়া? তাহাদের লম্বা লম্বা বিজ্ঞাপন ছাপা ও তাহাদের অশুভ প্রভাবের বিরুদ্ধে লেখা একত্রে ত চলিতে পারে না। যদিও এমন দৃষ্টান্ত আছে যে সম্পাদকীয় স্তম্ভে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে ও গবর্ণমেণ্টের আবকারী আয়ের তীব্র সমালোচনা চলিতেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনস্তম্ভে কেল্‌নারের হুইস্কী ও ব্রাণ্ডীর মহিমাও ঘোষিত হইতেছে।

মহীশূরে সার্ব্বজনীন শিক্ষা। মহিশূর গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন যে অভিভাবকগণ ৭ হইতে ১১ বৎসর বয়সের মধ্যে তাঁহাদের বালকগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে আইন অনুসারে বাধ্য থাকিবেন। আপাততঃ কতকগুলি সহর ও জেলায় এই আইন জারী করা হইবে। তজ্জন্য সেখানে যথেষ্টসংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

ভারতের ব্যয়ে ইংলণ্ডের জ্ঞানলাভের সুবিধা। সার্ ঔরেল্ ষ্টাইন্ মধ্য এশিয়ায় কয়েকবার দীর্ঘকাল ধরিয়া ভ্রমণ করিয়া বহুপুস্তক, চিত্র, মূর্ত্তি, ইত্যাদি আবিষ্কার ও সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণ হইয়াছে যে পুরাকালে ভারতীয়সভ্যতা মধ্যএশিয়ার সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়াছিল, অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে তখন ভারতবর্ষ হিমালয়েরও উত্তরে বহুশত ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ষ্টাইন সাহেবকে ভারতবর্ষের খরচে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট ভ্রমণ ও আবিষ্কার করিতে পাঠান। কিন্তু তাঁহার সংগৃহীত সমুদয় অমূল্য ঐতিহাসিক উপকরণ বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রেরিত হইয়াছে এবং ডাক্তার ডেনিসন রস তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। আশা করি রস সাহেবের বেতনটাও ভারতবর্ষ হইতে দেওয়া হইবে। নতুবা ভারতবর্ষের প্রতি কৃপার মাত্রা পূর্ণ হইবে না!

ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপকরণ বিলাতে যত আছে, এখানে তাহার সিকিও নাই। অজণ্টাগুহা-চিত্রাবলী যখন অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় ছিল, তখন তাহার বড় বড় প্রতিলিপি ভারতের ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়া বিলাতে প্রেরিত হয়। সেখানে সেগুলি পুড়িয়া যায়। এদিকে মূল ছবিগুলিরও অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত বিস্তর আছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের প্রমাণগুলি পর্য্যন্ত এরূপভাবে দূরে চালান করিয়া দেওয়া কি ন্যায়সঙ্গত?

তরমুজের মজা

জন্মান্তরবাদ

সকলেই দেখিতেছেন যে কেহ জ্ঞানী কেহ অজ্ঞান, কেহ সাধু কেহ বা অসাধু। বিধাতার জগতে এ বৈষম্য কেন? তিনি ত ন্যায়বান, তিনি ত সকলেরই পিতা, সকলেরই সুহৃদ্, তবে সকল মানুষ একপ্রকার হয়না কেন? ধর্ম্মজগতের ইহা বিষম একটী সমস্যা; এই বিষম সমস্যা পূরণ করিবার জন্য কত মতই না প্রচারিত হইয়াছে! ভারতের শাস্ত্রকার এবং দার্শনিকগণ জন্মান্তরবাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দেখা যাউক এই চেষ্টা কতটুকু ফলবতী হইয়াছে।

এ জগতে বৈষম্য কেন? ইহার উত্তর পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল; অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিয়াছিল, এই বর্ত্তমান জন্মে ইহার ফলস্বরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির জীবন লাভ করিয়াছে। যে সাধু-কর্ম্ম করিয়াছিল সে সাধু-জীবন পাইয়াছে, যে অসাধু-কর্ম্ম করিয়াছিল সে অসাধু-জীবন লাভ করিয়াছে। সাধারণ লোকে এই উত্তরেই সন্তুষ্ট রহিয়াছে এবং ভারতীয় জ্ঞানীগণও ভাবিতেছেন বেশ সদুত্তর দেওয়া গিয়াছে। আমাদিগের বিশ্বাস কিন্তু অন্যরূপ। আমরা জিজ্ঞাসা করি পূর্ব্বজন্মে কেন একজন সাধু-জীবন যাপন করিল এবং অন্য জনই বা কেন অসাধু-কার্য্য করিল? প্রশ্ন করিয়াছিলাম—'এ জগতে বৈষম্য কেন?'—উত্তর দেওয়া হইয়াছিল যে 'পূর্ব্বজন্মে বৈষম্য ছিল।' পূর্ব্বজন্মে কেন বৈষম্য ছিল? ইহার উত্তর কি? না—তার পূর্ব্ব জন্মের বৈষম্য। এ বৈষম্যের কারণ কি? না—তার পূর্ব্বজন্মের বৈষম্য। ইহাতে প্রশ্নের মীমাংসা হইতেছে না। এক মাঠের জঞ্জাল, সংলগ্ন আর এক মাঠে ফেলিয়া দেওয়া হইল। জঞ্জাল কিন্তু রহিয়াই গেল। যাঁহাদের দৃষ্টি কেবলমাত্র মাঠেই আবদ্ধ, তাঁহারা বলিতে পারেন জঞ্জাল ত পরিষ্কার হইয়া গেল; কিন্তু যাঁহারা দূরদর্শী, তাঁহারা দেখিতেছেন কই জঞ্জাল ত পরিষ্কার হইল না, ঐ যে আর এক মাঠে জঞ্জালগুলি পড়িয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান জন্মের বৈষম্যের মীমাংসা করিবার জন্য পূর্ব্ব-হইতে পূর্ব্বতর জন্মের বৈষম্যের কথা বলা হইতেছে—এইরূপ শত, সহস্র, লক্ষ জন্মের কথা বলা যাইতে পারে কিন্তু ইহাতে প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া হয় না। উত্তরদাতা যতই জন্মের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন, প্রশ্নকর্ত্তাও প্রশ্নের সংখ্যা ততই বাড়াইবেন। অতীতের দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যাইতেছে, প্রশ্ন ততই জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে, কিন্তু মীমাংসার দিকে একপদও অগ্রসর হওয়া যাইতেছে না। আমরা দেখিতেছি একটা পূর্ব্বজন্মের কল্পনা করিলেও যে ফল, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জন্মের কল্পনাতেও সেই ফল—জন্মের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কোন লাভ নাই। আমরা অনুরূপ একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব। মনে করা যাউক আমাদের সম্মুখে একটা ডিম্ব রহিয়াছে এবং ইহার কারণ দ্বিতীয় একটী ডিম্ব। এই দ্বিতীয় ডিম্বের কারণ তৃতীয় একটী ডিম্ব, এই তৃতীয় ডিম্বের কারণ চতুর্থ একটী ডিম্ব। এইরূপ অগ্রসর হইলে ডিম্বের সংখ্যা অনন্ত হইয়া পড়িবে; কিন্তু ডিম্বসৃষ্টির কোন মীমাংসাই হইবে না। প্রথম ডিম্বের উৎপত্তি-বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত উত্তরে আমরা যতদুর অগ্রসর হইয়াছিলাম, ডিম্বের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াও আমরা তাহা অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইতে পারি নাই। ডিম্বের কারণ অমীমাংসিতই রহিয়া গেল। ডিম্ব বিষয়ে উত্তরটী যেমন সন্তোষদায়ক নহে, বৈষম্য-বিষয়েও ঠিক তেমনি। অনেকে মনে করেন জন্মের সংখ্যা অনন্ত করিলেই বুঝি প্রশ্নের মীমাংসা হইল। ইঁহারা বুঝেন না যে একমাত্র সময় লাঘব করিবার জন্যই পূর্ব্বোক্ত উত্তরে 'অনন্ত' এই কথাটী ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনা এই—একজন লোক ক্রমাগতই ভাবিতেছে যে প্রথম ডিম্বের কারণ দ্বিতীয় ডিম্ব, দ্বিতীয় ডিম্বের কারণ তৃতীয় ডিম্ব, তৃতীয় ডিম্বের কারণ চতুর্থ ডিম্ব ইত্যাদি। এমন সময় আসিবে না, যখন সে এই চিন্তার শেষ সীমায় পদার্পণ করিবে। আদি কারণে সে কখনই পৌঁছিতে পারিবে না। সে অনন্ত কালই 'এক ডিম্বের কারণ অপর ডিম্ব' এই প্রকার ভাবিতে থাকিবে। এই ঘটনাকেই সংক্ষেপে বলা হয় ডিম্বের সংখ্যা অনন্ত। বৈষম্যের ঘটনায় বলা হয় 'জন্মের সংখ্যা অনন্ত'। জন্মের সংখ্যা অনন্ত করিলেও প্রশ্নের কোন মীমাংসা

হয় না। অনন্ত জন্ম চলিয়া আসিতেছে বলাও যাহা, বৈষম্যও অনন্ত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলাও ঠিক তাহাই। বৈষম্য অনন্ত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ইহার অর্থ,—"বৈষম্য চিরকালই আছে, কিন্তু ইহার কারণ জানি না।" নিজের অক্ষমতা, অজ্ঞানতা চাপা দিবার জন্যই যেন 'অনন্ত' এই কথাটা ব্যবহার করা হইয়াছে। শঙ্করাদি দার্শনিক পণ্ডিতগণ যে কেমন করিয়া এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ইহাই আশ্চর্য্য। যদি কেহ বলেন ডিম্ব আপনা আপনি উৎপন্ন হইয়াছে, তবে ইহা শুনিয়া লোকে বলিবে "লোকটা কি মূর্খ!" কিন্তু মূর্খতা ঢাকিবার জন্য পাণ্ডিত্যের আশ্রয় লইয়া যদি বলা হয় যে, "সৃষ্টিপ্রবাহ অনন্ত; অনন্তকাল হইতেই অণ্ড হইতে অণ্ড প্রসূত হইয়া আসিতেছে," তাহা হইলে সকলে বলিবেন "কি পাণ্ডিত্য!" কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে প্রথম ব্যক্তির মূর্খতা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির পাণ্ডিত্য একই শ্রেণীভুক্ত। শেষে দাঁড়াইল এই—লক্ষ লক্ষ জন্মের কথাই বল, আর কোটি কোটি জন্মের কথাই বল, কোন সদুত্তর পাওয়া যাইতেছে না, বৈষম্যের কারণ স্থির হইতেছে না।

অনেক পুনর্জ্জন্মবাদী আছেন, যাঁহারা এ জীবনকে প্রথম জীবন বলিতে প্রস্তুত নহেন, আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম যে অনন্ত ইহাও স্বীকার করেন না। ইঁহারা মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের মতে এ জীবন অনন্ত জীবনের কর্ম্মফল নহে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি জীবনের কর্ম্মফল। এস্থলে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই—এজন্ম যদি সপ্তম, দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, বিংশতিতম, শততম, বা সহস্রতম জন্ম হইতে পারে, তবে কাহারও কাহারও জন্ম প্রথম জন্মই বা হইতে পারিবে না কেন? দ্বিতীয় বক্তব্য এই- জন্মের আরম্ভই যদি স্বীকার করা হয়, তবে এই জন্মকেই প্রথম জন্ম বলিয়া স্বীকার করনা কেন? পৃথিবীর অবস্থিতির বিষয়ে এইরূপ একটী কথা আছে—পৃথিবী কাহার উপরে? না—সর্পের উপরে। সর্প কাহার উপরে? না—হস্তীর উপরে। হস্তী কাহার উপরে? না—কূর্ম্মের উপরে। কূর্ম্ম কাহার উপরে? না—জলের উপরে। জল কাহার উপরে? না—শূন্যে। এত গোলমালের পরে শূন্যকে প্রতিষ্ঠা-ভূমি বলিয়া নির্ণয় করা হইল। আমরা জিজ্ঞাসা করি 'পৃথিবী শূন্যে রহিয়াছে' প্রথমেই এই কথাটী বলিলে কি হইত না? 'পৃথিবী শূন্যে রহিয়াছে' এপ্রকার কল্পনা করা যদি কোন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব হয়, তবে 'জল শূন্যে রহিয়াছে,' এরূপ কল্পনাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। আর যদি বলিতেই হয় যে 'জল শূন্যে রহিয়াছে' তাহা হইলে "পৃথিবী শূন্যে রহিয়াছে," ইহা বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তর্কশাস্ত্রে Law of Parsimony বলিয়া একটী নিয়ম আছে—যেখানে একটী কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সহজে কোন একটী বিষয়ের মীমাংসা হয়, সেখানে একাধিক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা অনাবশ্যক। 'পৃথিবী শূন্যে রহিয়াছে' এই একটী কল্পনাই যথেষ্ট। সর্প, হস্তী, কূর্ম্ম ও জল ইত্যাদি কতকগুলি মধ্যবর্ত্তী কারণের অবতারণা করাতে কোন লাভ নাই; বরং ইহাতে যুক্তিপ্রণালী জটিলই হইয়া পড়ে। আর "পৃথিবী শূন্যে রহিয়াছে" এপ্রকার বলিলে যদি কোন দোষ হয়, কিংবা ইহাতে যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে "জল শূন্যে রহিয়াছে" এপ্রকার বলিলেও ঠিক তাহাই হইবে। মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি কারণ স্বীকার করাতে লাভ ত নাইই, বরং কতকগুলি নূতন অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর অবস্থান-বিষয়ে যাহা বক্তব্য, জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধেও আমাদিগের বক্তব্য ঠিক তাহাই। যদি একটা প্রথম জন্ম স্বীকার করিতেই হয় তবে জন্মটাকেই প্রথম জন্ম বলিয়া স্বীকার কর না কেন? অনর্থক কয়েকটা জন্মের সংখ্যা বাড়াইয়া লাভ কি? বর্ত্তমান জন্মকে প্রথম জন্ম বলিলে যদি কোন দোষ হয়, তবে যে-জন্মকেই প্রথম জন্ম বলিবে, সেই দোষই ঘটিবে। বিংশ শতাব্দীতে প্রথম জন্ম হইয়াছে বলিয়া যে এই দোষ তাহা নহে, যখনই প্রথম জন্ম স্বীকার কর না কেন, দেখিবে সেই দোষই হইবে। প্রথম জন্ম স্বীকার করিলে যে দোষ হয়, এ দোষ সেই দোষ—সেই প্রথম জন্ম এই যুগেই হউক বা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই হউক।

এস্থলে একটী সূক্ষ্ম তর্ক উপস্থিত হইতে পারে। পূর্ব্বজন্মবাদীগণ বলিতে পারেন "বর্ত্তমান জন্মকে প্রথম

জন্ম বলিলে যে দোষ হয়, বহুপূর্ব্বে প্রথম জন্ম হইয়াছিল বলিলে সে দোষ ঘটে না। বর্ত্তমান যুগে বৈষম্য রহিয়াছে কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন বৈষম্য ছিল না। বর্ত্তমান যুগে মানুষকে এমন ফলভোগ করিতে হয়, যাহা এজীবনের কর্ম্মের ফল নহে—কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন সকলে এই জীবনেই এই জীবনের কর্ম্মফল ভোগ করিত।"

এখানে আমাদের বক্তব্য এই—ঐতিহাসিক যুগে যে এপ্রকার সময় ছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু সর্ব্বসময়েই যে বৈষম্য ছিল, ইতিহাস সাহিত্য ও ধর্ম্মগ্রন্থে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে-সময়ে ইতিহাসাদির জন্ম হয় নাই, হয়ত সেই সময়ে বৈষম্য ছিল না। আচ্ছা কল্পনা করা যাউক এই সময়ে একই ক্ষণে দুই ব্যক্তির জন্ম হইল। আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছে যে, এই দুইজন সর্ব্বাংশেই একপ্রকার। কেবল ইহাদিগের আত্মার অবস্থাই যে একপ্রকার তাহা নহে, ইহাদিগের নিকটে এই জগৎ এবং জগতের ঘটনাও একপ্রকার এবং ইহাদিগের দেহ—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চক্ষুকর্ণ নাসিকাদি, স্নায়ু, শিরাদি—সম্পূর্ণ রূপেই একপ্রকার। ইহাদিগের নিকট যে জগৎ প্রকাশিত হইতেছে তাহা ঠিক একই কিংবা একই প্রকার; এবং চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহও এই জগৎকে একইভাবে প্রকাশিত করিতেছে। স্বীকার করিতেই হইতেছে যে এই দুইজন একই সময়ে একই ভাবে একই বস্তু দর্শন করিতেছে; একই বিষয় শ্রবণ করিতেছে, একই বস্তু আঘ্রাণ করিতেছে, একই বস্তু স্পর্শ করিতেছে; একই সময়ে ক্ষুধিত হইতেছে, একই সময়ে একই খাদ্য গ্রহণ করিতেছে, একই সময়ে তৃষিত হইতেছে এবং একই সময়ে একই জল পান করিতেছে। ইহারা একই সময়ে নিদ্রিত হইতেছে, একই সময়ে জাগ্রত হইতেছে, ইহাদিগের শয্যা ও বসিবার আসন একই প্রকার। ইহারা একই সময়ে একই ব্যাধি ভোগ করিবে, একই সময়ে উভয়ের একই প্রকার সুঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটিবে, একই সময়ে গিরি, অরণ্য বা প্রান্তরে ভ্রমণ করিবে; একজন চলিতে চলিতে যদি গর্ত্তে নিপতিত হয়, অপরকেও সেই সময়ে সেই গর্ত্তে কিংবা অনুরূপ গর্ত্তে পতিত হইতে হইবে; একই সময়ে উভয়ের একই হাসি, একই ক্রন্দন, একই সুখ একই দুঃখ; প্রতিনিমিষে ইহারা একই চিন্তা করিবে, একই বাক্য উচ্চারণ করিবে, একই ভাবে নিমগ্ন হইবে, এবং উভয়ের ইচ্ছা একই প্রকারের হইবে। উভয়ে একই সময়ে একই বস্তু লইয়া ক্রীড়া করিবে, ও একই বিষয়ে কলহ করিবে। উভয়ে একই গুরুর কিংবা অনুরূপ গুরুর শিষ্য হইবে, একই বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে, একই সময়ে পরীক্ষা দিবে। দোয়াত, কলম, কাগজ, বসিবার স্থল এবং প্রশ্নের উত্তর একই হইবে এবং উভয়ে একই 'নম্বর' পাইবে। উভয়ে একই রমণীকে (কিংবা অনুরূপ রমণীকে) বিবাহ করিবে, একই সময়ে একই ভাবে কর্ম্মচর্য্যা বা অধর্ম্মাচরণ করিবে—সংক্ষেপে উভয়ে সর্ব্বাংশে একই প্রকার হইবে। সর্ব্বশেষে একই সময়ে, একই স্থলে উভয়ের মৃত্যু হইবে।

প্রথম জন্মে এরূপ না হইলে চলিবে কেন? যদি সামান্য ইতরবিশেষও হয়, আমরা প্রশ্ন করিব—"এ বৈষম্য হইল কেন?" জন্মান্তরবাদীগণ হয়ত বলিবেন যে এসমুদয় পার্থক্য অতি তুচ্ছ, সুতরাং নগণ্য। কিন্তু 'তুচ্ছ' বস্তুও তুচ্ছ নহে,—'তুচ্ছ' বস্তুও কি অতি সুফল কিংবা কুফল প্রসব করে নাই। ক্ষুদ ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়াই মানবজীবন গঠিত;—এই-সমুদয় ক্ষুদ্র ঘটনা বাদ দিলে জীবনের কি থাকে? জগতে যে-সমুদয় মহৎ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার আরম্ভও ক্ষুদ্র বিষয়ে। ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া কি প্রকার গুরুতর ঘটনা ঘটিতে পারে বাল্মীকি তাহা অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। রাম লক্ষ্মণের সহিত সুর্পণখার হাস্য পরিহাস একটা সামান্য ঘটনা কিন্তু ইহার পরিণাম লঙ্কাকাণ্ড। আমরা প্রতিজনেই দেখিতেছি প্রথমে একটী ক্ষুদ্র চিন্তা প্রাণে আসে—ইহাই বিকশিত হইয়া জীবনকে অতি মধুর কিংবা অতি বিষাক্ত করিয়া ফেলে। প্রাণে একটা তুচ্ছ পাপ-চিন্তা আসিল; তখনই ইহাকে বিনাশ করিলে ত বাঁচিলে, নতুবা কালে রসাতলে যাইতে হইবে। একটী সামান্য পুণ্য-চিন্তা আসিল, তাহাকে পোষণ কর, কালে দেখিবে ইহা হইতে কি মহৎ ফল

উৎপন্ন হইবে। 'ক্ষুদ্র'ও নগণ্য নহে। ক্ষুদ্রেই মহতের আরম্ভ; ক্ষুদ্রই বিকশিত হইয়া মহৎ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় কথা এই—কোন্ পার্থক্য অকিঞ্চিৎকর, কোন্ পার্থক্য গুরুতর—ইহা কে নির্ণয় করিবে? একজন লক্ষপতি আর একজন ফকির—এতদুভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা কে বলিতে পারে?

তৃতীয় কথা এই—সামান্য পার্থক্যই বা হইবে কেন? যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে প্রথম জন্মে সব মানুষই সমান প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকের জীবন স্বকৃত কর্ম্মেরই ফল—তাহা হইলে বলিতেই হইবে প্রথম জন্মে সকল মনুষ্যকেই সম্পূর্ণরূপে একপ্রকার হইতে হইবে।

দেখা গেল সেই দুই জন মনুষ্য একই সময়ে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে একই সময়ে উভয়ে আবার জন্মগ্রহণ করিবে। দ্বিতীয় জন্মেও উহারা সম্পূর্ণ একই প্রকার হইবে। তৃতীয় জন্মেও সেই প্রকার এবং ইহার পরবর্ত্তী প্রত্যেক জন্মেই সেই একই প্রকার ঘটনা ঘটিবে। এরূপ হইলে জগতে আর বৈষম্য আসিতে পারিল না। সুতরাং দেখা যাইতেছে এস্থলে জন্মান্তরবাদ দ্বারা বৈষম্যের মীমাংসা করা গেল না।

পূর্ব্বোক্ত কল্পনাকে একটুকু পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া যাউক। উভয়েরই প্রথম জন্ম কিন্তু এক সময়ে নহে; একজন আর এক জনের পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মনে করা যাউক ১০ বৎসর পরে দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে। এখন যদি প্রথম ব্যক্তি ১০০ বৎসর বাঁচিয়া থাকে, দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও ১০০ বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। প্রথম ব্যক্তি যেভাবে জীবন যাপন করিবে, দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও ঠিক সেই ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে! দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির দশবৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং প্রথম ব্যক্তির জীবনে যখন যে ঘটনা ঘটিবে, ইহার ঠিক ১০বৎসর পরে দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবনে সেই ঘটনা ঘটিবে। প্রথম ব্যক্তির জীবনে যদি লক্ষ ঘটনা ঘটে, দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবনেও ঠিক সেই লক্ষ ঘটনাই ঘটিবে। পার্থক্য এইটুকু যে—দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবনে ঘটনাগুলি ১০ বৎসর পরে পরে ঘটিবে। প্রথম ব্যক্তি যদি নিউটন হন, দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও নিউটন্ হইতে হইবে। এক নিউটন্ যে-বয়সে মহাকর্ষণের বিষয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় নিউটন্‌কেও ঠিক সেই বয়সে অনুরূপ ঘটনাতে পতিত হইয়া সেই সত্যই আবিষ্কার করিতে হইবে। প্রথম নিউটন্ যে-বয়সে যে-অবস্থায় মানবলীলা সংবরণ করিবেন, দ্বিতীয় নিউটন্‌কেও সেই বয়সে সেই অবস্থায় পৃথিবী ত্যাগ করিতে হইবে। প্রথম নিউটন্ যে-অবস্থা লইয়া দ্বিতীয়বার দেহ পরিগ্রহ করিবেন, দশ বৎসর পরে দ্বিতীয় নিউটনকেও সেই অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই দ্বিতীয় জন্মেও উভয়েই একই বিষয়ের অভিলাষ করিবেন—তবে দশবৎসর পরে পরে। তৃতীয় চতুর্থ এবং পরবর্ত্তী অন্যান্য জন্মেও ঠিক এই প্রকারই ঘটিবে।

মনে করা যাউক দুইটী বালক একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। উভয়েই প্রায় সমকক্ষ। জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে প্রথম জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উভয়ের বয়স প্রায় এক। হয়ত ২।৪ মাস কিংবা ২।১ বৎসরের পার্থক্য। মনে করা যাউক একটী বালকের বয়স প্রথম জন্ম হইতে ১০০০ বৎসর এবং দ্বিতীয়টীর বয়স ৯৯৯ বৎসর। এখানে বলিতে হইবে প্রথম বালকটীর এখন যে-প্রকার বিদ্যাবুদ্ধি, একবৎসর পরে দ্বিতীয় বালকটীরও বিদ্যাবুদ্ধি ঠিক সেই প্রকার হইবে। কোন পরীক্ষাতে প্রথম বালক এখন যত 'নম্বর' পাইবে, একবৎসর পরে দ্বিতীয় বালককেও সেই পরীক্ষা দিতে হইবে এবং তত 'নম্বর' পাইতে হইবে। জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করিলে এপ্রকার হইতেই হইবে কিন্তু এপ্রকার ঘটে না কেন? পুনর্জ্জন্মবাদী হয়ত বলিবেন একবৎসর পরে দ্বিতীয় বালক বস্তুতঃ প্রথম বালকেরই অনুরূপ হইবে; পার্থক্য যাহা কিছু তাহা বাহ্যতঃ। এখানে প্রশ্ন এই—এই আপাত পার্থক্যই বা কেন? যদি পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করা সম্ভবই না হইল, তবে জন্মান্তরবাদ কল্পনা করায় লাভ কি? জন্মান্তরবাদের বিরোধীগণও কি বলিতে পারেন না যে "উভয়ের মধ্যে বাহিরে বাহিরে পার্থক্য দেখিতেছ বটে, কিন্তু বস্তুতঃ

উভয়েরই অন্তরে অনন্ত উন্নতির বীজ নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং বৈষম্য থাকিয়াও নাই।"

প্রকৃত কথা এই—জগতের ইতিহাসে কস্মিন্ কালেও দুইজন মানুষ সম্পূর্ণরূপে এক হইতে পারে না। প্রথমতঃ ইহাদিগের দেহ ভিন্ন ভিন্ন। কেবল দেহ যে দুইটী তাহা নহে, ভিতরে ও বাহিরে উভয় দেহে পার্থক্য অনেক; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দুই জনের এক প্রকার নহে। দ্বিতীয়তঃ এই জগৎ—জড়জগৎ, উদ্ভিদ্-জগৎ, প্রাণী-জগৎ, মানব-জগৎ—দুই জনের নিকট এক নহে। একজন যে বস্তু দেখে, অপরে সে বস্তু দেখে না, দেখিলেও সে-চক্ষে দেখে না। দেহও ভিন্ন, জগৎও ভিন্ন—অথচ এই দুই ভিন্ন জীবন-গঠন অসম্ভব। এই দুইই যদি ভিন্ন হইল, আত্মার অবস্থা ত ভিন্ন হইবেই। ইহা যে কেবল বর্ত্তমান যুগেই সত্য তাহা নহে চিরকালই ইহা সত্য। যদি জন্মান্তর-বাদ গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে দুই জন মানুষের প্রথম জন্মেও এই প্রকার বৈষম্য থাকিবে।

জন্মান্তরবাদীগণ এই জন্মান্তরবাদ দ্বারা এই বৈষম্যের মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না। সকলেই যদি প্রথম জন্মে এক প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, ভবিষ্যতে কোন সময়েই এক বয়সে ইহাদিগের মধ্যে পার্থক্য আসিতে পারে না। এই হইতে পারে যে এক জন আগে জন্মগ্রহণ করিল, আর একজন জন্মগ্রহণ করিল ইহার পরে। নতুবা আর কোন পার্থক্য থাকা সম্ভব নহে। নির্দ্দিষ্ট জন্মে এক বয়সে প্রত্যেককেই একপ্রকার হইতে হইবে; ইহাদিগের মতি, গতি, নতি, রতি, সমুদয়ই এক হইবে। পূর্ব্বজন্ম কোথায় বৈষম্যের কারণ হইবে, না, দেখা যাইতেছে ইহা বিকট সাম্যবাদের কারণ হইয়া গেল।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে এই সংক্রান্ত অপরাপর যুক্তির সমালোচনা করা যাইবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

অরণ্যবাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ :—কলিকাতাবাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটী বিক্রয় করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত পার্ব্বত্য বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই খানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাঁহাকে কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইল। গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। একদা মাধব দত্তের পত্নী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরী কন্যা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু সতীশবাবু পূজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্যা সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া সৌদামিনীর পিতা সতীশচন্দ্রকে কন্যাদানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কন্যা আশীর্ব্বাদ করিবেন স্থির হয়। সতীশচন্দ্র অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সৌদামিনীকে আশীর্ব্বাদ করিলে, দুই বন্ধুর মধ্যে কন্যাদের যৌবনবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহার ফলে, যৌবনবিবাহের অপ্রচলন সত্ত্বেও তাহার শাস্ত্রীয়তা সিদ্ধ হয়। ১৫ই ফাল্গুন তারিখে সতীশের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হইয়া গেল। সতীশের অনুরোধে ক্ষেত্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রকে পুরুলিয়া জেলা স্কুলে পড়িবার জন্য পাঠাইতে সম্মত হন। সতীশ সুরেন্দ্রকে আপনার বাসায় ও তত্ত্বাবধানে রাখিবার প্রস্তাব করেন। ক্ষেত্রনাথ অমরনাথ-নামক একজন দরিদ্র যুবককে আশ্রয় দিয়া বল্লভপুরে একটি পাঠশালা ও পোষ্ট-অফিস খুলিলেন, এবং সেই-সকল কর্ম্মে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। সতীশচন্দ্র ও সৌদামিনীর বিবাহ হইয়া গেলে পর ক্ষেত্রনাথ মাধব দত্তের সহিত পরামর্শ করিয়া বল্লভপুরে একটি হাট ও কয়েকটি দোকান প্রতিষ্ঠা করিলেন। ডেপুটি কমিশনর এই সংবাদ শুনিয়া হাট দেখিতে যাইবেন বলিলেন। তিনি হাট দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং ক্ষেত্রনাথকে নন্দনপুর মৌজা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ক্ষেত্রনাথ নন্দনপুরে যাইবার পথ ও পুল করিয়া সেখানে প্রজা বসাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে তাঁহার বিলক্ষণ অর্থলাভ হইতে লাগিল।

পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

বর্ষাসমাগমে সকলেই কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। ক্ষেত্রনাথ কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত রহিলেন। নগেন্দ্রও হাট-বার ব্যতীত অন্য বারে কৃষিকার্য্যের তত্ত্বা-বধানে পিতার সহায়তা করিতে লাগিল। বর্ষার সময়ে

হাটে দর্শকবৃন্দের সংখ্যা কিছু অল্প হইলেও, দোকানসমূহে ক্রয় বিক্রয় মন্দীভূত হইল না।

নন্দাজোড়ের উপর দুইটী সেতু প্রস্তুত হইয়া গেল। কাছারীবাড়ীর দক্ষিণ দিকের রাস্তাও প্রস্তুত হইল। নন্দনপুর গমনের নূতন রাস্তায় জনমজুর নিযুক্ত হইল।

নন্দনপুর হইতে কঁচড়ার (মহুয়া ফলের) আঁঠি সমূহ সংগৃহীত হইয়া স্তূপীকৃত হইল; কুসুম ফলের বীজও সংগৃহীত হইল। যথাসময়ে সেই বীজগুলি চূর্ণীকৃত ও জলে সিদ্ধ হইলে, স্থানীয় এক প্রকার পেষণ-যন্ত্র দ্বারা তৎসমুদায় হইতে তৈল নিষ্কাশিত হইল। এইরূপে প্রায় পঞ্চাশ মণ কঁচড়া তৈল ও দশ মণ কুসুম তৈল হইল। এই সমস্ত তৈল কলিকাতায় চালান দিয়া ক্ষেত্রনাথ প্রায় ৬০০৲ টাকা পাইলেন। তিনি বল্লভপুরের হাটে প্রায় পাঁচ শত মণ কঁচড়া তৈল ক্রয় করিয়া তাহাও কলিকাতায় চালান দিলেন; তাহা হইতেও প্রায় সহস্র টাকা লাভ হইল।

বর্ষা উপস্থিত হইলে, তিনি নন্দার বাঁধ খুলিয়া দিলেন, নন্দার মুক্ত জলরাশি কাছারীবাটীর নিকটবর্ত্তী সেতুর অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গ্রামের ধারে ধারে ছুটিতে লাগিল; পরে দ্বিতীয় সেতুর ভিতর দিয়া উল্লাসে ছুটিতে ছুটিতে দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী সেই সঙ্কীর্ণ উপত্যকার বনাছন্ন ভূমিতে উপনীত হইল, এবং সেই স্থানে সকলের অলক্ষিতে প্রচণ্ড কলনাদে প্রস্তর হইতে প্রস্তরান্তরে লম্ফ প্রদান করিতে করিতে কিয়দ্দূরে কালী নদীর জলরাশির সহিত মিলিত হইতে লাগিল।

বর্ষার জল পাইয়া গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত নির্জ্জীব ধরা যেন সজীবতা লাভ করিল। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নব শস্যের অঙ্কুরোদ্গম হইল; প্রান্তর ও পর্ব্বতগাত্রসমূহ শ্যামল তৃণে আচ্ছাদিত হইল; বৃক্ষ সরস সবল ও সতেজ হইল; কদম্ব, কেতকী ও কুটজ পুষ্পসমূহ বিকশিত হইল, এবং ময়ূরের অনবরত কেকারবে চতুর্দ্দিক্ ধ্বনিত হইতে লাগিল। জলদজাল পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে সংলগ্ন হইতে লাগিল, এবং মেঘের গুরুগর্জ্জনে পর্ব্বতের গুহাসকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই সময়ে কৃষকেরা আহার নিদ্রা ও বর্ষার ধারা উপেক্ষা করিয়া কৃষিকার্য্যে একান্ত মনোনিবেশ করিল।

বর্ষার পর শরৎ সমাগত হইল। আকাশ নির্ম্মল হইল। রবিকর আবার প্রখর হইল। পথের কর্দ্দম বিশুষ্ক হইল। কুশ ও কাশ বিকশিত হইয়া চতুর্দ্দিকে শুভ্র শোভা বিস্তার করিতে লাগিল; বনে বনে অসংখ্য শেফালিকা বৃক্ষ পুষ্পিত হইল; শস্যক্ষেত্রে আশুধান্য পক হইল, এবং হরিণের উপদ্রব হইতে শস্য রক্ষার জন্য গত বৎসরের ন্যায় অদ্ভুত উপায়সমূহ অবলম্বিত হইল। ক্ষেত্রনাথ গত বৎসর অপেক্ষা আরও অধিক ভূমিতে আলুর বীজ বপন করাইলেন এবং প্রজাদিগকেও আলুর চাষ করিবার জন্য সমুচিত উৎসাহ প্রদান করিলেন। তিনি আবার কার্পাস-বীজ বপন করিলেন এবং অনেক প্রজাকেও তাহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে উক্ত বীজ বপন করাইলেন। মাধবদত্ত মহাশয়ও মাধবপুরে কার্পাসের বীজ বপন করিলেন।

বর্ত্তমান বর্ষে যথাসময়ে সুচারু বৃষ্টিপাত হইতে থাকায়, গত বর্ষের ন্যায় অনাবৃষ্টির জন্য কোনও হাহাকার উঠিল না। হৈমন্তিক ধান্যের অবস্থা অতিশয় আশাপ্রদ হইল এবং সকলেই প্রচুর ফসলের আশায় উৎফুল্ল হইল।

এইবৎসর বল্লভপুরে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে হরিণের উপদ্রব না হইলেও, বন্য হস্তীর ভয়ানক উপদ্রব হইল। বল্লভপুরের উত্তরসীমাবর্ত্তী নিবিড় বনাচ্ছন্ন একটী পর্ব্বতে বৃহদ্দন্তবিশিষ্ট এক হস্তী ও দুইটী হস্তিনী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। রাত্রিতে দুন্দুভির ভীষণ শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া তাহারা ধান্যক্ষেত্রে অবতরণ করিত না বটে; কিন্তু দিনের বেলায় পর্ব্বতের পদতলবর্ত্তী ধান্যক্ষেত্রসমূহে নামিয়া প্রভূত ধান্য নষ্ট করিতে লাগিল। একদিন জনৈক কৃষক যুবক পর্ব্বতের সন্নিহিত একটী টাঁড়ে লাঙ্গল দিতেছিল, এমন সময়ে হস্তী ও হস্তিনীদ্বয় পাহাড় হইতে নামিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। হস্তী একটী বলদকে শুণ্ড দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিল; তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ গতাসু হইল। অপর বলদটি কোনওরূপে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। কৃষক যুবক হস্তীদিগকে আসিতে

দেখিয়াই লাঙ্গল ফেলিয়া কিঞ্চিদ্দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সভয়ে চীৎকার করিতে করিতে এই বীভৎস দৃশ্য দেখিতেছিল। হতভাগ্য যুবক সেই ক্রুদ্ধ হস্তীর নয়নপথে পতিত হইল। অমনই হস্তী ভীম হুঙ্কার করিতে করিতে রুষিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইল। যুবক প্রাণভয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে লাগিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে একটী প্রান্তরের উপর হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া গেল। সে সম্‌লাইয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে সেই কালান্তক তুল্য হস্তী তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে শুণ্ডদ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া একবার আকাশে উঠাইল এবং পরমুহূর্ত্তে তাহাকে সেই প্রান্তরের উপর আছাড়িয়া ফেলিল। বলা বাহুল্য, সেই হতভাগ্য যুবক তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। কিন্তু দুর্দ্দান্ত হস্তী তাহাতেও যেন সন্তুষ্ট না হইয়া তাহাকে তাহার ভীষণ পদতলে ফেলিয়া পিষ্ট করিয়া দিল, এবং তাহার দেহটি একটী মাংসপিণ্ডে পরিণত করিয়া ফেলিল। নিকটে ও দূরে অনেক কৃষক নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্বচক্ষে এই লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইতে দেখিল। কিন্তু কেহই হস্তীর সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না; সকলেই প্রাণভয়ে পলাইতে লাগিল। হস্তী হতভাগ্য যুবকের মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া অধিকদূরে অগ্রসর হইল না, তাহার নিকটেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আর হস্তিনীদ্বয় ইচ্ছামত ধান্য খাইতে ও নষ্ট করিতে লাগিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে এই শোকাবহ দুর্ঘটনার সংবাদ গ্রামের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইল। হতভাগ্য যুবকের বৃদ্ধা জননী ও যুবতী ভার্য্যা শোকে বিহ্বল হইয়া হাহাকার করিতে করিতে উন্মাদিনীর ন্যায় ঘটনাস্থলের দিকে দৌড়িতে লাগিল। গ্রামের লোকেরা বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে ধরিয়া না রাখিলে তাহারা শোকের প্রথম উচ্ছ্বাসে হস্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া নিশ্চিত প্রাণ হারাইত। তাহাদের আর্ত্তনাদ শুনিয়া কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে সমর্থ হইল না।

এই দুর্ঘটনায় সকলে যেরূপ শোকসন্তপ্ত হইল, তদ্রূপ ভীতও হইল। হস্তীদিগকে তাড়াইতে না পারিলে, তাহারা সকলের ক্ষেত্রের ধান্য তো নষ্ট করিবেই, অধিকন্তু আরও বহুলোকের প্রাণনাশ করিবে। গ্রামের প্রধান প্রধান প্রজাবর্গ জমীদারের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কাছারীবাটীতে উপনীত হইল। ক্ষেত্রনাথ, স্ত্রী ও পুত্রদের সহিত ছাদে উঠিয়া এই লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রজাদের আহ্বানে নীচে নামিয়া আসিলেন। তাহারা সকলেই কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। পরে ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "হাতীর যেরূপ উপদ্রব দেখ্‌ছি তা'তে ঐ দাঁতালো হাতীটাকে মেরে ফেল্‌তে না পার্‌লে আর রক্ষা নাই। কিন্তু আমাদের হাতী মার্‌বার যো নাই; আর আমাদের কাছে হাতীমারা বন্দুকও নাই। আমি মনে কর্‌ছি ডেপুটী কমিশনার সাহেবের নামে একটা পত্র লিখে এখনই অমরকে পুরুলিয়ায় পাঠিয়ে দিই। তিনি হাতীমারা বন্দুক নিয়ে এসে হাতীটাকে মেরে ফেলুন। তা নইলে তো আর কোনও উপায় দেখ্‌ছি না।" উপস্থিত বিপদে এই প্রস্তাব অনেকেরই অনুমোদিত হইলে, অমর তৎক্ষণাৎ পত্র লইয়া পুরুলিয়া যাত্রা করিল।

হস্তী ও হস্তিনীদ্বয় বৈকাল পর্য্যন্ত ধান্যক্ষেত্রের ধান্য দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া পরিশেষে সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বতাভিমুখে প্রস্থান করিল। গ্রামের সাহসী লোকেরা রাত্রিতে মঞ্চে আরোহণ করিয়া সকল মঞ্চ হইতে একযোগে ভীষণ ভাবে দুন্দুভি-বাদন করিতে লাগিল। ভোরের সময় পুরুলিয়া হইতে অমরনাথ এবং পুলীশ ইন্সপেক্টার ও দুজন কনেষ্টবল একটা হাতীমারা বন্দুক লইয়া বল্লভপুরে উপস্থিত হইল। সাহেব অসুস্থ থাকায়, তিনি স্বয়ং আসিতে অক্ষমতা জানাইয়া ক্ষেত্রনাথকে পত্র লিখিয়াছিলেন। হস্তীকে না মারিয়া যদি তাড়াইয়া দিতে পারা যায়, তজ্জন্যই তিনি তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে না মারিলে যদি প্রজাদের প্রাণরক্ষার উপায় না থাকে, তাহা হইলে অগত্যা তাহাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে নিকটবর্ত্তী পুলীশ ষ্টেশন হইতে এই দুর্ঘটনার তদন্ত করিবার জন্য কতিপয় কনেষ্টবল সহ দারোগা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুলীশ ইন্সপেক্টর

দারোগার সহিত ঘটনাস্থলে গমন করিলেন। হতভাগ্য যুবকের লাস্ তখনও সেখানে পড়িয়া ছিল। কোনও কার্য্যবিশেষে ক্ষেত্রনাথ ব্যস্ত থাকায় তিনি তাঁহাদের সহিত সেখানে যাইতে পারিলেন না। পুলীশের কর্ম্মচারী-বর্গ ও গ্রামের বহুলোক ঘটনাস্থলে সমবেত হইয়া লাস্ দেখিতেছিল, এমন সময়ে সহসা পর্ব্বতের দিক্ হইতে হস্তীর ভীষণ হুঙ্কার শ্রুত হইল। হস্তী আসিতেছে, এই আশঙ্কা করিয়া সকলেই প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে সত্য সত্যই দেখা গেল যে করী ও করিণী-দ্বয় দ্রুতপদে ঘটনাস্থলাভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। হস্তী সেখানে উপস্থিত হইয়াই সেই মাংসপিণ্ডকে শুণ্ডদ্বারা উঠাইয়া আবার সেই প্রস্তরের উপর আছড়াইতে লাগিল এবং ক্রোধে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পুলীশের কর্ম্মচারীদ্বয় ও কনেষ্টবলেরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাছারীবাটীতে উপনীত হইল। অনেক প্রজাও সেখানে সমবেত হইল। পুলীশ ইন্সপেক্টার কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন "আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, এই হাতীটাকে মেরে না ফেল্‌লে, আপনারা এখানে টিক্‌তে পার্‌বেন না। একে তাড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব; একে মেরে ফেলাই কর্ত্তব্য।" কেহ হাতী মারিতে যাইতে সাহস করিল না। অবশেষে কার্ত্তিকভূমিজ বলিল, সরকার বাহাদুর তাহাকে যদি বিলক্ষণ পুরস্কার দেন, তাহা হইলে, সে আগামী কল্য প্রাতঃকালে তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। ডেপুটী কমিশনার সাহেব একশত টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা বলিয়াছিলেন; তাহা ইন্সপেক্টার সকলকে জানাইয়া দিলেন। পুরস্কারের কথা শ্রবণ করিয়া কার্ত্তিকভূমিজ বলিল "বহুত আচ্ছা, হুজুর; কাল বিহানে হাতীটাকে আমি ঠোর মরাঁই দিব।"* এই বলিয়া সে হাতী-মারা জোড়া-নলী বন্দুকটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিল, এবং টোটাগুলিও দেখিল।

হস্তী ও হস্তিনীদ্বয় প্রায় সমস্ত দিন ধান্য খাইয়া ও নষ্ট করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে পর্ব্বতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। কর্ত্তিকভূমিজ বন্দুক ও টোটা লইয়া একটী মঞ্চের উপর উঠিয়া রাত্রি যাপন করিল। সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া সকল মঞ্চেই দুন্দুভি বাদিত হইল। প্রত্যুষে দুন্দুভি-ধ্বনি নীরব হইবার পূর্ব্বেই, মঞ্চ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কার্ত্তিক ভূমিজ বন্দুক ও টোটা লইয়া পর্ব্বতাভিমুখে প্রস্থান করিল হস্তীগণ যে পার্ব্বত্যপথ ধরিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করে, নির্ভীক কার্ত্তিক সেই পথ ধরিয়াই পর্ব্বতের উপর কিয়দ্দূর আরোহণ করিল। পরে পথপার্শ্বে ঘন শাখাপল্লব সমন্বিত একটী বড় মহুয়া বৃক্ষ দেখিয়া নিঃশব্দে তাহাতে উঠিয়া একটী বিভক্ত শাখার সন্ধিস্থানে উপবিষ্ট হইল; অশ্বারোহী অশ্বের উপর যেরূপ আরূঢ় হয়, কার্ত্তিক সেই বৃক্ষ-শাখার উপর তদ্রূপ আরূঢ় হইয়া বসিল এবং পশ্চাদ্ভাগের বৃক্ষশাখায় পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিল। প্রভাত হইল এবং আকাশে সূর্য্যদেবও উদিত হইলেন; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত হস্তীগণ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা মস্ মস্ শব্দ সহসা কার্ত্তিকের শ্রুতিগোচর হইল। কার্ত্তিক চাহিয়া দেখিল, প্রকাণ্ডকায় দন্তী হেলিয়া দুলিয়া অগ্রে অগ্রে আসিতেছে এবং তাহার অব্যবহিত পশ্চাতে করিণীদ্বয় আসিতেছে। কার্ত্তিক বন্দুক উঠাইয়া প্রস্তুত রহিল। হস্তী বৃক্ষতলে আসিবা মাত্র কার্ত্তিক তাহার কণ্ঠ হইতে একটী কর্কশ শব্দ নিঃসৃত করিল। হস্তী চকিতের ন্যায় সহসা গতিরোধ করিয়া বৃক্ষের দিকে ঘাড় ঘুরাইয়া চাহিল। অমনি দুড়ুম্ শব্দে বন্দুকের আওয়াজ হইয়া তাহার মস্তকের দুই কুম্ভের নিম্নে কপালের মধ্যবর্ত্তী স্থলে সংঘাতিক গুলি প্রবিষ্ট হইল। সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় এক ভয়ঙ্কর শব্দ হইল এবং পর মুহূর্ত্তেই হস্তী "কড় গাড়িয়া" ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। হস্তী এরূপ বেগে পতিত হইল যে, তাহার বৃহৎ দন্তদ্বয়ের কিয়দংশ মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইয়া গেল। হস্তিনীদ্বয় নিমেষমধ্যে ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বিকট আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সহসা গন্তব্য পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং পর্ব্বতের শিখরদেশের দিকে ধাবমান হইল। কার্ত্তিকের বন্দুকের আর একটী নলে টোটা ছিল। সে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হস্তিনীকে লক্ষ্য করিয়া তাহাও ছুড়িল। হস্তিনীর পশ্চাদ্ভাগের বামপদে গুলি লাগিবামাত্র সে ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে একবার বসিয়া পড়িল; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে

* কাল সকালে আমি হাতীটাকে একেবারে মেরে ফেল্‌বো।

আবার উঠিয়া অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিল। কার্ত্তিক দেখিল, তাহার সেই পদটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং তাহা হইতে রুধিরধারা ছুটিতেছে।

বৃক্ষের নীচে একটী বৃহৎ শৈলের ন্যায় প্রকাণ্ডদেহ করিবর নিস্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট ভাবে আসীন রহিয়াছে। কার্ত্তিক বুঝিল, এক গুলিতেই তাহার প্রাণ নষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তথাপি প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল সে বৃক্ষের শাখা হইতে অবতরণ করিতে সাহস করিল না। যখন তাহার কপাল-নিঃসৃত প্রবল রক্তধারা মৃত্তিকা সিক্ত করিয়া শুকাইয়া গেল এবং ক্ষতস্থানে ঝাঁকে ঝাঁকে মক্ষিকা আসিয়া বসিতে লাগিল, তখন তাহার মৃত্যুসম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনও সংশয় রহিল না। সে বৃক্ষ হইতে নামিয়া একবার তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইল, পরে লম্ফ দিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। পুনর্ব্বার সেখান হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে নামিয়া বন্দুক ঘাড়ে করিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিল।

দূর হইতে কার্ত্তিক ভূমিজকে বন্দুক ঘাড়ে করিয়া আসিতে দেখিয়া সকলেই হস্তীর বিনাশ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইল। কার্ত্তিক কাছারীবাড়ীতে উপনীত হইয়াই ক্ষেত্রনাথকে এবং ইন্‌স্পেক্টার ও দারোগাকে সেলাম করিল। সকলের সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে কার্ত্তিক আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল বৃত্তান্ত বলিল। শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইল।

অনেকে মৃত হস্তীকে দেখিতে যাইবার জন্য উৎসুক হইল; কিন্তু হস্তিনীদ্বয়ের আশঙ্কায় সেখানে যাইতে কাহারও সাহস হইল না। কার্ত্তিক ভূমিজ বলিল তাহারা পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া এতক্ষণ নিশ্চয়ই পলাইয়া গিয়াছে। সেই সময়ে সোনাবুরু হইতে এক পথিক কাছারীবাড়ীতে উপনীত হইয়া বলিল যে, সে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে দুইটা হস্তিনীর সম্মুখে পড়িয়াছিল; তাহাদের মধ্যে একটার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও সে অতিকষ্টে চলিতেছে। সেই দুইটা হস্তিনী বল্লভপুরের পাহাড় ত্যাগ করিয়া সোনাবুরু পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেল। পথিকের বাক্যে সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া মৃত হস্তী দেখিতে ছুটিল।

ইন্সপেক্টার বাবু কার্ত্তিক ভূমিজকে হস্তী-মারা বন্দুকে আবার টোটা দিতে বলিয়া এবং ক্ষেত্রবাবুর তিনটি বন্দুকও সঙ্গে লইতে উপদেশ দিয়া, ক্ষেত্রবাবু প্রভৃতির সহিত মৃত হস্তী দেখিতে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর হইতে মনে হইতে লাগিল, হস্তী যেন পথের উপর বসিয়া রহিয়াছে; সুতরাং কেহই অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। তাহা দেখিয়া কার্ত্তিক ভূমিজ অগ্রসর হইয়া লম্ফ দিয়া হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিল এবং হস্তীর নিকটে আসিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিল।

ঐরাবতের ন্যায় প্রকাণ্ড হস্তী দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। তাহার প্রত্যেক দন্ত দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন হাত হইল। সকলেই কার্ত্তিক ভূমিজের সাহস ও হাতের "ইস্তমালে"র প্রশংসা করিতেছে এমন সময়ে পুরুলিয়া হইতে ডেপুটী কমিশনার সাহেব সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, গতকল্য ইন্সপেক্টারের কোনও রিপোর্ট না পাইয়া তিনি স্বয়ং বল্লভপুরে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি হাতী-মারার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কার্ত্তিক ভূমিজের প্রশংসা করিলেন এবং তাহাকে এক শত টাকা নগদ ও একটী টোটাদার বন্দুক পুরস্কার দিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। পুলীশ ইন্‌স্পেক্টারকে তিনি বলিলেন "আপনি এই হস্তীর দন্ত দুইটী ছাড়াইয়া পুরুলিয়াতে লইয়া আসিবেন এবং হস্তীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটাইয়া তৎসমুদয় একটা গর্ত্তের মধ্যে নিক্ষেপ করাইবেন ও তাহাদের উপর পাঁচ সাত মণ লবণ ছিটাইয়া মাটি দিয়া উত্তমরূপে ঢাকাইবেন। নতুবা হস্তীর গলিত মাংসের দুর্গন্ধে এই স্থানের বায়ু দূষিত হইয়া উঠিবে।" ক্ষেত্রবাবুর সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর সাহেব বল্লভপুর ত্যাগ করিয়া ষ্টেশন অভিমুখে গমন করিলেন।

একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

হস্তীর উপদ্রব নিবারিত হইল, সকলে আবার নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। আমীন নন্দনপুরের জরীপ শেষ করিয়া চিঠা প্রস্তুত করিলেন। অনেক প্রজা প্রতি বিঘায় দুই টাকা সেলামি দিয়া উক্ত মৌজার জমা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে লাগিল। তিন বৎসর পরে,

তাহারা প্রতি বিঘায় এক টাকা হিসাবে খাজনা দিতে স্বীকৃত হইল। অনেকে জমীর মাটী কাটাইয়া ক্ষেত্র প্রস্তত করিতে প্রবৃত্ত হইল। যাহারা উক্ত মৌজায় গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিল, ক্ষেত্রনাথ তাহাদিগকে তজ্জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, এবং যে প্রণালীতে গৃহ প্রস্তত করিতে হইবে, তাহাও দেখাইয়া দিলেন। প্রজাবর্গ জমীর সন্নিকটে গৃহ প্রস্তত করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় নন্দনপুরের স্থানে স্থানে এক একটী মনোহর পল্লীর সৃষ্টি হইল। এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে গমনাগমনের জন্য সুগম পথও প্রস্তত হইতে লাগিল। নন্দনপুরে যাইবার জন্য সহজ পথ ও নন্দার উপর সেতু প্রস্তত হওয়ায়, দূরবর্ত্তী বিভিন্ন গ্রামের প্রজাবর্গও সেখানে আসিয়া গৃহ বাটী নির্ম্মাণ করিল এবং জমা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে লাগিল। পল্লীতে পল্লীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানও বসিল।

অনেক নিবিড়বনাচ্ছন্ন ভূমির বৃক্ষাদি কর্ত্তিত হওয়ায়, সেই-সমস্ত ভূমি পরিষ্কৃত হইল, এবং তজ্জন্য বন্য পশুর ভয়ও অনেকাংশে তিরোহিত হইল। গোমহিষাদি গৃহপালিত পশুগণ স্বচ্ছন্দে নন্দনপুরের বিস্তৃত তৃণাচ্ছন্ন ভূমিসমূহের উপর বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মৃগপাল ক্রমে ক্রমে সেই বিচরণভূমিসমূহ পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল।

শিকারী কার্ত্তিক ভূমিজ অন্যান্য শিকারীদের সহিত মিলিত হইয়া নন্দনপুরের বনসমূহে কতিপয় ব্যাঘ্র নিহত করিল, এবং প্রজাবর্গকে কিয়ৎপরিমাণে নিরুপদ্রব করিয়া দিল। ক্ষেত্রনাথ তজ্জন্য তাহাদিগকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার প্রদান করিলেন। বন্যপশুবধে তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি প্রচারিত করিয়া দিলেন যে, নন্দনপুরে কেহ একটী বড় ব্যাঘ্র বধ করিলে সাত টাকা, একটী ছোট ব্যাঘ্র বধ করিলে পাঁচ টাকা এবং একটী ভল্লুক বধ করিলে তিন টাকা পুরস্কার পাইবে। কিন্তু তিনি সকলকেই বিনা কারণে মৃগবধ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। একে পুরস্কারের লোভ, তাহার উপর মৃগয়ার আনন্দ। এই উভয়বিধ আকর্ষণে, অনেক শিকারী শিকারের অন্বেষণে নন্দনপুরের বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বন্যপশুগণ তাহাদের নিরুপদ্রব বিহারভূমিতে জনসঞ্চার হইতে দেখিয়া ধীরে ধীরে তাহা পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লইতে লাগিল।

নন্দনপুর প্রকৃতিদেবীর ভীম ও কান্ত সৌন্দর্য্যের আধার। ইহার উত্তরসীমায় নিবিড়বনাচ্ছন্ন উন্নত পর্ব্বতরাজি। একটী পর্ব্বতের উপর আর একটী পর্ব্বত উঠিয়াছে। তাহার উপর আর একটী উঠিয়াছে—এইরূপ পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত উঠিয়া সর্ব্বোচ্চ শিখর যেন গগন স্পর্শ করিয়াছে; এই সর্ব্বোচ্চশিখরের নাম কালাবুরু। কিন্তু এই নামানুসারেই সমগ্র পর্ব্বতরাজি "কালাবুরুর পাহাড়" নামে অভিহিত হয়। বহুক্রোশ ব্যাপিয়া এই পর্ব্বতরাজি অবস্থিত। এই পর্ব্বতরাজির নিম্নস্তরসমূহে কোল মুণ্ডারী প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতিগণের বাস আছে; কিন্তু উচ্চস্তরসমূহ অতীব দুরারোহ, দুর্গম এবং মহারণ্যে সমাচ্ছাদিত। সেই অরণ্যসমূহে হস্তিযূথ, মৃগযূথ ও বৃহদাকার ভীষণ ব্যাঘ্রসমূহ বাস করে। বহুদূর হইতে এই পর্ব্বতরাজি ও ইহাদের সর্ব্বোচ্চশিখর কালাবুরু ঘনকৃষ্ণ নিবিড় মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। নন্দনপুর হইতে সর্ব্বোচ্চ শিখর প্রায় পনর ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই উচ্চ শিখর হইতে গিরিমালা ক্রমশঃ আনত হইয়া নন্দনপুরের নিকটে আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে এবং একটী শাখা উত্তরদক্ষিণে প্রলম্বিত হইয়া বল্লভপুর ও নন্দনপুরের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এই গিরিশাখা নন্দাতটিনীর দ্বারা বিভক্ত হইয়া নন্দা অতিক্রম পূর্ব্বক দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে প্রধাবিত হইয়াছে। অপর কতিপয় শাখা বল্লভপুরের উত্তর দিক্ বেষ্টন করিয়া পশ্চিম দিকে প্রলম্বিত হইয়াছে; তাহা হইতে আর একটী শাখা বহির্গত হইয়া বল্লভপুরের দক্ষিণ দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অপর গিরিশ্রেণীর সমান্তরালে ধাবমান হইতেছে। নন্দনপুরের উত্তর সীমায় গিরিরাজি যেস্থানে সহসা সমাপ্ত হইয়াছে সেইস্থানের কিয়দংশ নৈসর্গিক কারণে যেন হঠাৎ বসিয়া গিয়া একটি সুগভীর খাতের সৃষ্টি করিয়াছে। এই খাতের অব্যবহিত উত্তর সীমায় পর্ব্বতের ধূসর-কৃষ্ণ প্রস্তররাজি সুবৃহৎ উচ্চ ভিত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। দেখিয়া মনে হয়, যেন কোনও অতীত যুগে পর্ব্বতের পাদমূল কোনও কারণে

দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেলে, তাহার বহির্দ্দিকের ভগ্নখণ্ডটি খাতের মধ্যে নিপতিত হইয়াছে। এই খাতটি গভীর জলে পরিপূর্ণ ও প্রায় তিন শত বিঘা স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে কালিঞ্জরের খাত বলে। প্রবাদ এই যে, পূর্ব্বকালে কালিঞ্জর নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্য ছিল। সে কালাবুরু পর্ব্বত-বাসী ইন্দ্রদেবতার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। বহুকাল ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। যুদ্ধের সময় দৈত্যের পদভরে মেদিনী ঘন ঘন বিকম্পিত হইত। এইরূপ বহুকালব্যাপী যুদ্ধের পর, কালাবুরুর দেবতা কালিঞ্জরকে বিনষ্ট করিবার জন্য তাহার উপর বজ্রবাণ নিক্ষেপ করেন। সেই বজ্রবাণে কালিঞ্জরের প্রাণনাশ হয়; কিন্তু তাহার প্রকাণ্ড দেহ পর্ব্বত-শিখর হইতে নীচে গড়াইয়া পড়িবার সময় পর্ব্বতের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলে। যে স্থানে কালিঞ্জরের প্রকাণ্ড দেহ পতিত হয়, দেহের ভারে সেই স্থানে একটী গভীর খাত হয়। অবশেষে দৈত্য-সৈন্যেরা কালিঞ্জরের মৃতদেহ লইয়া পাতালে প্রবিষ্ট হয়। সেই কারণে প্রবাদ এই যে, কালিঞ্জরের খাত পাতাল-পর্য্যন্ত গভীর। এই কালিঞ্জরের খাত নন্দনপুর মৌজার অন্তর্গত। ভয়ে কেহ ইহার জলে অবতরণ করে না। এই বৃহৎ সরোবরের মধ্যস্থলে ঘনকৃষ্ণ জলরাশি; কিন্তু ইহার চতুর্দ্দিকেই কমল বন; সুতরাং ইহার চতুর্দ্দিক অগভীর। কখনও কখনও আরণ্য হস্তীযূথ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া কালিঞ্জরের জলে অবগাহন পূর্ব্বক জলক্রীড়া করে এবং কমলবন ভগ্ন করে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, কালাবুরু দেবতার বাহন আরণ্য গজসমূহ কালিঞ্জর দৈত্যের সেই পুরাতন শত্রুতা এখনও ভুলিতে না পারিয়া তাহার মৃতদেহের অনুসন্ধানের জন্য সময়ে সময়ে তাহার খাতে অবতীর্ণ হয়।

কালিঞ্জরের খাতের সহিত স্থানীয় লোকের এইরূপ একটী ভীতিজনক কিম্বদন্তী বিজড়িত থাকিলেও, তাহা দেখিতে পরম রমণীয়। তাহার জল স্বাদু ও কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। মরাল, হংস প্রভৃতি বহুবিধ জলচর পক্ষী তাহার জলে বিচরণ করে, এবং তাহাদের চীৎকার দ্বারা এই নির্জ্জন স্থানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য, কচ্ছপ প্রভৃতি জলচর জন্তুসকলও ইহার জলে নির্ব্বিঘ্নে বাস করে। শরৎকালে ইহার জলে যখন কমল-রাশি বিকশিত হয়, তখন ইহাকে "কালিঞ্জরের খাত" না বলিয়া "নন্দন-সরোবর" বলিতে ইচ্ছা হয়। এই সরোবরের পশ্চিম দিকে কতিপয় বনাচ্ছন্ন ও নগ্নদেহ কৃষ্ণ শৈল; নিবিড় শালবন ও পূর্ব্বদিকে একটী অনুচ্চ গিরিস্কন্ধ ও তাহার পাদমূলে একটী ক্ষুদ্র খাল বা জোড়; বর্ষাকালে কালিঞ্জর স্ফীত হইয়া উঠিলে, তাহার অতিরিক্ত জলরাশি সেই খাল দিয়া বহির্গত হইয়া অদূরে কালীনদীর সহিত মিলিত হয়।

নন্দনপুর মৌজার পূর্ব্বসীমায় কালীনদী। কালাবুরু পর্ব্বত হইতে ইহা নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম কালী হইয়া থাকিবে। উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া ইহা দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হইতেছে। নদীর বামভাগে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে বনাচ্ছন্ন অবিরল গিরিশ্রেণী এবং পশ্চিম দিকে বনাচ্ছন্ন অনুচ্চ শৈলরাজি। এই শৈলরাজি হইতে ভূমি আনত হইয়া আসিয়া নন্দনপুরের মধ্যভাগে একটী সুবিস্তৃত অধিত্যকা ভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। এই অধিত্যকা ভূমি সুরক্ষিত বৃহৎ শালবৃক্ষে এবং মধুক কুসুম্ব প্রভৃতি আরণ্যবৃক্ষে পরিশোভিত হইয়া একটী প্রকাণ্ড কানন বা উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। এই অধিত্যকা ভূমি উত্তরদিকে আনত হইয়া কালিঞ্জরের ধারে মিলিত হইয়াছে এবং দক্ষিণ দিকে আনত হইয়া নন্দার তটভূমির সহিত মিলিত হইয়াছে। নন্দার অপর পারে অর্থাৎ দক্ষিণ-ভাগে অনুচ্চ বনাচ্ছন্ন শৈলমালা; সেই অনুচ্চ শৈলমালার তলদেশে প্রবাহিত হইয়া নন্দা কিয়দ্দূরে কালী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

নন্দনপুরের পশ্চিম সীমায় বল্লভপুরের গিরিমালা। সেই গিরিমালার পদতলে একটী ক্ষুদ্র জোড় গিরিগাত্র হইতে বর্ষার জল বহন করিয়া নন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র জোড়ের উপরে ক্ষেত্রনাথ একটী প্রস্তরময় সেতু প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

নন্দনপুরের অধিত্যকাভূমি মৃৎ-প্রস্তরময়; কিন্তু তাহার দুই পার্শ্বে যে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডদ্বয় আনত হইয়া এক-দিকে কালিঞ্জর ও অপর দিকে নন্দার অভিমুখে প্রসারিত

হইয়াছে, তাহা অতিশয় উর্ব্বর। এই অধিত্যকা হইতেও উভয় দিকে কতিপয় ক্ষুদ্র খাল যথাক্রমে নন্দা ও কালিঞ্জরের সহিত মিলিত হইয়াছে। অধিত্যকাভূমি হইতে নন্দনপুরের চারিদিকের শোভা মনোহারিণী। কিন্তু বল্লভপুরের গিরিমালার শিখরদেশ হইতে নন্দনপুর একটী সুবৃহৎ চিত্রপটের ন্যায় চক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়। সেই স্থান হইতে চক্ষু ইহার বিচিত্র ও রমণীয় দৃশ্যাবলী, এবং ভীম ও কান্ত সৌন্দর্য্যরাশি একেবারে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, এবং মন বিস্ময়মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে সিক্ত হইতে থাকে।

এই প্রদেশের প্রজাবর্গ প্রায় সহস্র বিঘা ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া তাহাদের মনোরম পল্লীসমূহে বাস করিতে লাগিল। আমীন ভৈরবচন্দ্র মিত্রের উপর সুব্যবস্থামত প্রজাস্থাপনের ভার অর্পিত হইল। তিনি একটী পল্লীর নিকটে অধিত্যকার উপর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং সেই স্থানে বাস করিয়া সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

সতীশচন্দ্রের পরামর্শক্রমে, নন্দনপুরের অধিত্যকাভূমির পূর্ব্ব প্রান্তে ও কালী নদীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী একটী উচ্চ শৈলের উপরে, ক্ষেত্রনাথ কাছারী-বাটী নির্ম্মাণ করিবার অভিপ্রায় করিলেন। সেই স্থান হইতে মৌজার প্রায় সমগ্র স্থল দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। গৃহনির্ম্মাণের উপযুক্ত প্রস্তররাশি এই স্থানে সুলভ দেখিয়া তিনি সেই প্রস্তরেই গৃহের ভিত্তি গাঁথাইবার সঙ্কল্প করিলেন। নিকটে কালী-নদীর সমীপবর্ত্তিনী এবং অদূরে নন্দার তটবর্ত্তিনী ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা দেখিয়া, খাস দখলে রাখিবার জন্য তিনি ছয়শত বিঘা ভূমি নির্ব্বাচন করিলেন। এই ভূমি বনাকীর্ণ ছিল না। সুতরাং তাহাতে যে অনায়াসে শস্যক্ষেত্র-সমূহ প্রস্তুত হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন।

দ্বি-পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

আশ্বিন মাসে পূজাবকাশের সময় রজনীবাবু বল্লভপুরে আগমন করিলেন। তাঁহার পুত্র নিশিকান্ত এবং যতীন্দ্র, চারু প্রভৃতি আরও কতিপয় যুবক তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিলেন। সকলেই বল্লভপুরের শরৎকালীন রমণীয় শোভা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। একবৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে বল্লভপুরের শ্রী একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া রজনীবাবুর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। বল্লভপুরের হাট একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার বলিয়া তাঁহার মনে হইল। নন্দার উপর দুই সেতু এবং তাহাদের উপর দিয়া যে সরল পথ প্রস্তুত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বল্লভপুরের শ্রী যে শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন।

রজনীবাবু বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, জমীদার ও বড় লোকের কথা ছেড়ে দিন, বড় বড় সম্রাটেরও প্রমোদ-উদ্যানের যে শোভা, আপনার এই বল্লভপুরের তার চেয়ে অধিক শোভা। প্রমোদ-উদ্যানে কেহ একটী কৃত্রিম খাল কেটে তার উপর একটী সেতু নির্ম্মাণ করেন; কোথাও মাটী একটু উঁচু আর কোথাও মাটী একটু নীচু ক'রে উন্নতানত ভূমির অনুকরণ করেন; কোথাও কতকগুলি পাথর একত্র সাজিয়ে রেখে শৈল দেখার সাধ মেটান; কোথাও কতকগুলি বৃক্ষ একত্র রোপণ ক'রে কুঞ্জবনের সৃষ্টি করেন; কোথাও একটী ফোয়ারা বসিয়ে নির্ঝরের অনুকরণ করেন; আর কোথাও বা দুই একটী বন্য পশু পিঞ্জরের মধ্যে আটক ক'রে, কিম্বা দুই দশটি পাখী খাঁচার মধ্যে ধ'রে রেখে বন্য পশুপক্ষী দেখার আমোদ অনুভব করেন। এইরূপ একটী প্রমোদ-উদ্যান প্রস্তুত করতে তাঁদের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যায়। কিন্তু আপনার এই প্রমোদ-উদ্যানের সহিত কি সেই-সব প্রমোদ-উদ্যানের তুলনা হয়? তাঁদের প্রমোদ-উদ্যান সামান্য মালীতে প্রস্তুত করে; আর স্বয়ং প্রকৃতিদেবী আপনার জন্য এই প্রমোদ-উদ্যানের রচনা করেছেন! তিনি এখানে কেমন উন্নতানত ভূমির সৃষ্টি করেছেন; চারিদিকে কেমন পাহাড় সাজিয়ে রেখেছেন; পাহাড়ের গাত্র শ্যামল বন দিয়ে কেমন ঢেকে রেখেছেন; আপনার সমতল ক্ষেত্রে কেমন কানন, উপবন ও কুঞ্জবনের রচনা করেছেন; গিরিনন্দিনী নন্দা কুলুকুলু তানে কেমন অনবরত প্রবাহিত হ'য়ে যাচ্ছে; তার উপরে ঐ দুইটী প্রস্তর-সেতু কেমন রমণীয় হয়েছে! কি সুন্দর, কি অপূর্ব্ব, কি চমৎকার! আপনার অরণ্যসমূহে ও গিরিকন্দরে

কত বন্যপশু, বাঘ, ভালুক, হরিণ, খরগোশ, বন্যবরাহ, হস্তী—আর ঐ বন ও উপবনসমূহে কত মধুরকণ্ঠ পক্ষী মুক্তভাবে ও স্বচ্ছন্দে বিহার করছে! অরণ্যে, পর্ব্বতে ও প্রান্তরে কত বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের সমাবেশ হয়েছে! প্রকৃতিদেবীর উদ্যানে কত সুরভি কুসুম নিত্য প্রস্ফুটিত হচ্ছে! এমন প্রমোদ-উদ্যান কার আছে? পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটেরও নাই। এরূপ একটী প্রমোদ-উদ্যান প্রস্তুত করতে খর্ব্ব-নিখর্ব্ব পদ্ম-মহাপদ্ম টাকারও অধিক টাকা খরচ হ'য়ে যায়, অথচ এমনটি হয় না! তাই বলছি, ক্ষেত্রবাবু, আপনি সম্রাট্; অথবা সম্রাটের চেয়েও অধিক।"

রজনীবাবুর ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ বিস্ময়ের সহিত প্রচুর আমোদ ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক বস্তুর সৌন্দর্য্য ও অভিনবত্ব রজনীবাবুর হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়া তাঁহার ভাবুকতাকে জাগাইয়া তুলিতেছিল। ক্ষেত্রনাথ বুঝিলেন, রজনীবাবু যে-চক্ষে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দরসে নিমগ্ন হইতেছেন, সেই চক্ষেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পারিলে, তবে তাহার যথার্থ রসাস্বাদ হয়। তিনি রজনীবাবুর বাক্যের কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া কেবল ঈষৎ হাস্য করিলেন। নিশিকান্ত, যতীন্দ্র ও চারু এই প্রদেশে বসতি করিয়া ক্ষেত্রনাথের ন্যায় কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সম্মত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, বল্লভপুরে বিলি করিবার মত আর জমী নাই। তবে নন্দনপুরে বহু জমী আছে; সেই জমী তিনি বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন। তাঁহারা নন্দনপুর দেখিতে যাইবার অভিপ্রায় করিলে, ক্ষেত্রনাথ পরদিন প্রাতঃকালে সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া নন্দনপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সকলেই পদব্রজে চলিলেন। বন্দুক লইয়া লখাই সর্দ্দার ও কার্ত্তিক ভূমিজ সঙ্গে সঙ্গে চলিল। নন্দনপুর যাইবার নূতন পথের পার্শ্বে উপত্যকা-মধ্যবর্ত্তী শালবনের অভ্যন্তরে নন্দার অপূর্ব্ব শ্রী দেখিয়া ও কুলুকুলুধ্বনি শ্রবণ করিয়া একটী নবাগত যুবক বিস্ময়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

যুবকটি কবিত্বভাবাপন্ন; নাম অতুলচন্দ্র ঘোষ। তিনি সেই বৎসর বি, এ, পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া এম-এ পড়িতেছিলেন। নন্দাতটের পার্শ্বে তাঁহাকে একাকী দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। অতুলচন্দ্র বলিলেন "আপনারা চলুন, আমি যাচ্ছি; এখানকার যা সৌন্দর্য্য, তা জগতে দুর্লভ। এই সৌন্দর্য্য আমায় একটু উপভোগ করতে দিন।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "সৌন্দর্য্য উপভোগ করুন, তায় কোনও ক্ষতি নাই। কিন্তু আপনি একলা থাকলে, হয়ত কোনও বন্য জন্তু এসে আপনার উপভোগে বাধা দেবে।"

বন্যজন্তুর কথা শুনিয়া যুবকের কবিত্ব-প্রস্রবণ সহসা বিশুষ্ক হইল। তিনি দ্রুতপদে তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন "বলেন কি মশাই! বন্য জন্তু! কি রকম বন্যজন্তু?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "কি রকম বন্য জন্তু? এই—বাঘ ভালুক বন্যশূকর—এই-সব আর কি!"

যুবকের মুখমণ্ডল বিশুষ্ক হইল। যাইতে যাইতে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন "দেখছি, এই জগতের মধ্যে কোথাও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগের স্থান বা অবসর নাই! সবুজ ও সুকোমল ঘাস দেখে যদি তার উপর বসতে যাই, অমনি সাপ ও বিছার কথা মনে হয়। রাত্রিকালে তারকাখচিত নীল নভোমণ্ডল দেখবার জন্য যদি ছাদে গিয়ে বসি, অমনি হিম লেগে সর্দ্দি হয়। গোলাপ ফুলটি তুলতে গেলে হাতে কাঁটা ফুটে। আজ একটী নধর শিশুকে দেখে যদি আনন্দিত হই, দেখি যে কাল তার অসুখ! এই আপনার এখানে এসে ঐ ছোট নদীটি দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছি, আর অমনি আপনি বন্য জন্তুর ভয় দেখালেন! এখন যাই কোথায়, দেখি কি, আর করি কি, বলুন দেখি? তবে কি জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও আনন্দ নাই?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। এই জগৎ সেই আনন্দময়েরই বিকাশ। কিন্তু তিনি স্বয়ং নির্দ্বন্দ্ব; এই কারণে মনে হয় কেবল একমাত্র তিনিই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করতে সমর্থ

হন। আর আমরাও যদি নির্দ্বন্দ্ব হ'তে পারি, তা হ'লে আমরাও সেই আনন্দ উপভোগের যোগ্য হ'তে পারি।"

অতুলচন্দ্র বলিলেন "আপনার কথা ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "ধরুন, এই নন্দার শোভা দেখে আপনি আনন্দিত হচ্ছিলেন; কিন্তু সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে বন্যজন্তুরও ভয় এসে পড়্‌লো। সুতরাং এই স্থানে যেমন আনন্দ আছে তেমনই ভয়ও আছে। এরই নাম হ'ল দ্বন্দ্ব। যদি ভয়ের কারণ তিরোহিত হয়, তা হ'লে আর দ্বন্দ্ব থাকে না; থাকে কেবল একটি জিনিষ—তার নাম হচ্চে আনন্দ। এই দেশের এমন সুন্দর শোভা, এমন উর্ব্বর মাটী, যে, এখানে বাস কর্‌লে মানুষের খুব সুখ ও আনন্দ হ'তে পারে; কিন্তু এদেশে বন্যজন্তুর ভয়ানক উপদ্রব। কাজেই লোকে এদেশে বাস করার সুখ ও আনন্দ উপভোগ কর্‌তে পারে না। আমরা বন্য জন্তু-গুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে, নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় উপনীত হ'তে চেষ্টা কর্‌ছি। বাঘ-ভালুকের ভয় না থাক্‌লে, আপনি এই মনোহর দেশের সৌন্দর্য্য দেখ্‌বার আনন্দ ভোগ কর্‌তে পার্‌বেন। এদেশে আমি প্রথম এসে যেমন একদিকে জীবনযাত্রার সুবিধা দেখ্‌লাম, তেমনই অসুবিধাও দেখ্‌তে পেলাম। অসুবিধাগুলিকে দূর করে আমি নির্দ্বন্দ্বে উপনীত হবার চেষ্টা কর্‌ছি। বাহ্য জগতের যে নিয়ম, মনোজগতেরও তাই। মনের বাঘ-ভালুক-গুলিকে তাড়াতে পার্‌লে, আমরা বিমল আনন্দ উপভোগ কর্‌তে সমর্থ হই। অধ্যাত্ম-জগতেরও এই নিয়ম, তা শুনেছি। সে জগৎটি আমার কাছে তত পরিচিত নয় ব'লে, আমি তার সম্বন্ধে বেশী কিছু বল্‌তে পার্‌বো না। কিন্তু সব জগৎ যে একই নিয়মে বাঁধা, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই। যথার্থ আনন্দকে লক্ষ্য রেখে, আমরা তা লাভ কর্‌বার জন্য যা-কিছু করি, সবই সেই আনন্দময়কে লাভ করবারই উপায়; এজগতে, এইরূপ কোনও কাজই নিকৃষ্ট নয়। সম্মুখে ঐ যে কুলী মাটী কেটে পথ সুগম ক'রে আমাদের গমনের সুবিধা ক'রে দিচ্ছে, সেও এইরূপ মহৎ কাজেই নিযুক্ত। যে কাজে নিজের সুখ, সুবিধা ও মঙ্গল হয় এবং অপর দশজনেরও সুখ, সুবিধা ও মঙ্গল হয়, সেইরূপ কাজ মাত্রই মহৎ, এবং আনন্দময়কে লাভ কর্‌বার একটী উপায়। আমি তো এই ভাবে প্রণোদিত হ'য়েই কাজ কর্‌বার চেষ্টা করি।"

রজনীবাবু ক্ষেত্রনাথের কথা শুনিয়া আনন্দিত হই-লেন এবং নিশিকান্ত, যতীন্দ্র ও চারুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তোমরা ক্ষেত্রবাবুর কথাগুলি মন দিয়ে শুন্‌লে আর বুঝ্‌লে? এদেশে সুখ ও সুবিধালাভের আশায় তোমরা এসে বাস কর্‌তে চাও, কিন্তু তা লাভ কর্‌বার আগে অনেক প্রকার দুঃখ ও অসুবিধার মধ্যে পড়তে হ'বে। সেই দুঃখ ও অসুবিধা-সকলকে জয় কর্‌তে না পার্‌লে, তোমাদের সুখ ও সুবিধা হবে না। নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় তোমাদের উপনীত হ'তে হবে। ক্ষেত্রবাবু যে ভাবে প্রণোদিত হ'য়ে কাজ ক'রে সুখ ও আনন্দলাভে অনেকটা কৃতকার্য্য হয়েছেন, তোমরাও যদি সেই ভাবের সাধনা কর্‌তে পার, তা হ'লে তোমাদেরও চেষ্টা সফল হবে; নতুবা তোমরা কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না; কেবল পণ্ডশ্রম ও অর্থনাশ হবে মাত্র। তোমরা বেশ করে নিজের নিজের মন বুঝে দেখ। ক্ষেত্রবাবু তোমাদের সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রয়েছেন। এঁর দৃষ্টান্তের যদি অনুসরণ কর্‌তে পার, তা হ'লে তোমাদের চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হবে। ক্ষেত্র-বাবু এক কথায় চমৎকার উপদেশ দিয়েছেন—'সকল কাজেই নির্দ্বন্দ্ব হবার চেষ্টা কর।' এই উপদেশটি সকলেরই পক্ষে অমূল্য।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা নন্দনপুরে উপনীত হইলেন। নন্দনপুরের সুরবিন্যস্ত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত, পুলকিত ও চমৎকৃত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ তাঁহাদিগকে অধিত্যকার উপরে লইয়া গিয়া সেখান হইতে বিশালকায় গগন-স্পর্শিনী গিরিমালা ও শুভ্র জলদজালবিজড়িত কালাবুরু পর্ব্বত-শিখর, গিরিমালার পদতলে কুমুদ-কহ্লার-শোভিত প্রকাণ্ড কালিঞ্জর হ্রদ, চারিদিকের গিরিশ্রেণী, তৃণাচ্ছাদিত বিশাল প্রান্তর, বনাচ্ছন্ন শৈলমালা, অরণ্য, বন, কানন, উপবন, উপত্যকা, অধিত্যকা, পার্ব্বতীয় নদী

এবং নবস্থাপিত প্রজাপল্লী প্রভৃতি দেখাইলেন। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া রজনীবাবু ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, সতীশ সেবার যথার্থই বলেছিল, নন্দনপুর যেন স্বর্গের নন্দন-কানন। বল্লভপুরের সৌন্দর্য্য দেখে কাল আমি বলেছিলাম, আপনি সম্রাটের চেয়েও শ্রেষ্ঠ; কিন্তু এই নন্দনকানন-তুল্য নন্দনপুর দেখে, আমি বল্‌ছি—আপনি ইন্দ্র, অথবা মহেন্দ্র! আমি জীবনে কখনও কোথাও এরূপ স্থান দেখি নাই। এর সঙ্গে আপনার বল্লভপুরের তুলনাই হয় না। পদ্মফুল ও ঘেঁটু-ফুলের মধ্যে যে প্রভেদ, ময়ূর ও দাঁড়কাকের মধ্যে যে প্রভেদ,—নন্দনপুর ও বল্লভপুরের মধ্যেও সেই প্রভেদ! কার সঙ্গে কার তুলনা! আহা, ভগবান্ কত স্থানে যে কত সৌন্দর্য্য ও কত অপূর্ব্ব দৃশ্য সঞ্চিত ক'রে রেখেছেন, তা মানুষের স্বপ্নেরও অগোচর। হত-ভাগা মানুষ এই-সব স্থান ছেড়ে সহরে বাস করে কেন? তা হ'লে যে অনায়াসে সে ভগবানকে জান্‌তে পারে, আর শোকদুঃখের তাপ থেকে মুক্তিলাভ কর্‌তে পারে। আজ এই নন্দনপুরে এসে আমি ধন্য হলাম ও আমার জীবন সার্থক হ'ল! ভগবান্—ভগবান্—কি অপূর্ব্ব লীলা তোমার! আর কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যই তোমার! আচ্ছা, এই স্থানটিকে বাসযোগ্য ও কৃষিযোগ্য ক'রে আপনি যে কি মহৎ পুণ্যের অধি-কারী হচ্ছেন, তা আমি একমুখে বল্‌তে পারি না! ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন ও আপনি দীর্ঘজীবী হউন। পৃথিবীর পাপময় কোলাহল থেকে ভগবান্ এই স্থানটিকে যেন আড়াল ক'রে রেখে, এর মধ্যে স্তরে স্তরে সৌন্দর্য্যরাশি সাজিয়ে রেখেছেন! ক্ষেত্রবাবু, আমি বার্দ্ধক্যসীমায় উপনীত হয়েছি; কিন্তু এই স্থানটি দেখে আমারই হৃদয়ে যৌবনের বল ও উৎসাহ ফিরে আস্‌ছে। আপনি আমাকে এখানে একটু স্থান দেবেন; আমি এখানে একটী কুটীর বেঁধে আপনার এই মহৎ কার্য্যে আপনাকে সাধ্যমত সহায়তা কর্‌বো।"

ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বলিলেন "আমি এই মৌজায় সামান্য অংশমাত্র প্রজাগণকে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছি। অবশিষ্ট সমস্ত স্থানই প'ড়ে আছে। যে স্থান আপনি নির্ব্বাচন কর্‌বেন, তাহাই পাবেন। আপনাদের ন্যায় প্রতিবাসী পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা?"

অতুলচন্দ্র দেখিয়া শুনিয়া বিস্ময়ে ও ভাবাবেশে অনেকক্ষণ নির্ব্বাক্ ছিলেন। পরে ক্ষেত্রবাবুকে বলি-লেন "মশায়, আমরা যে কবিত্বের সেবা করি, সে কবিত্বে প্রাণ নাই। আপনার যে কার্য্য, তাহাই প্রকৃত কবিত্ব, এবং আপনার কবিত্বই যথার্থ প্রাণময়। বিদ্যা-শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে একটা চাকরী কিম্বা ওকালতী কর্‌বো মনে করেছিলাম, কিন্তু আজ থেকে সে সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌লাম। এবৎসর এম্, এ, পরীক্ষা দিয়ে, আমিও এই নন্দনপুরে এসে বাস করবো, আর আপনার ন্যায় কৃষিকাজ কর্‌বো। আজ আমার জীবনে যেন একটা নূতন আলোকের ছটা এসে পড়েছে! ধন্য আপনি, আর ধন্য আপনার কার্য্য! আজ থেকে আপনি আমা-দের গুরু হলেন। নিজ হাতে লাঙ্গল ধর্‌তেও আমার আর লজ্জা নাই। আপনি কোন্ জমী আমাকে দেবেন, তা আজই আমাকে দেখিয়ে দিন্। আমি তা চিহ্নিত ক'রে যাব। আর কৃষিকাজ কর্‌তে কত টাকা মূলধন আবশ্যক, তাও আমাকে ব'লে দিন। আমি এম্-এ পরীক্ষা দিলেই এখানে চ'লে আস্‌বো, আর এই স্থানে বাস কর্‌বো। আমি যেন ঐ কালাবুরুর শিখর আর আপনার ঐ কালিঞ্জর হ্রদ দেখ্‌তে দেখ্‌তে শেষে প্রাণ-ত্যাগ কর্‌তে পারি। তা হ'লেই আমার জীবনধারণ করা সার্থক হবে।"

ক্ষেত্রনাথ তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং সকলকে কৃষিযোগ্য ভূমিসমূহ দেখাইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে অধিত্যকার উপরে বাসযোগ্য ভূমিও দেখাইলেন। সকলেই তাহা দেখিয়া তাহার অনুমোদন করিলেন। ক্ষেত্রবাবুর প্রস্তাবিত নূতন কাছারীবাটীর নিকটে রজনীবাবু নিজের জন্য একটী কুটীর নির্ম্মাণের অভিপ্রায় জানাইলেন।

এইরূপে নন্দনপুর পরিদর্শন করিয়া মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে সকলে বল্লভপুরে উপনীত হইলেন।

ত্রি-পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার সময় বল্লভপুরের কাছারীবাটীর বারাণ্ডায় বসিয়া সকলে গল্প করিতেছিলেন। শুক্লাত্রয়োদশীর চন্দ্র শুভ্র জ্যোৎস্নাজাল বিকীর্ণ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর উপর একটি অপার্থিব শোভার সঞ্চার করিতেছিলেন। অদূরে কতিপয় সেফালিকা বৃক্ষের প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি হইতে সুমধুর গন্ধ আসিয়া সকলের চিত্ত প্রফুল্ল করিতেছিল, এমন সময়ে রজনীবাবু ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"ক্ষেত্রবাবু, আজ সমস্ত দিন আমি আপনার 'নির্দ্বন্দ্ব-ভাবের সাধনা'র কথা চিন্তা কর্‌ছিলাম। আমার মনে হচ্ছে, আপনার কথাটি অমূল্য। যতই ভাব্‌ছি, ততই আমার মনে বড় আনন্দ হচ্ছে। নির্দ্বন্দ্ব হবার জন্য অনেকে সংসার ত্যাগ ক'রে বনে যেতে চান। ভগবান্‌কে লাভ কর্‌বার পথে সংসারের কোলাহল যে একটী ভয়ানক অন্তরায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ভগবান্ যদি সংসার-ছাড়া হ'ন, আর সংসারে বাস ক'রে তাঁকে পাওয়া না যায়, তা হ'লে তিনি এই সংসারটি সৃষ্টি কর্‌লেন কেন? সেই আনন্দময়কে লাভ করাই যদি মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লে যেখানে থাক্‌লে, আমরা তাঁকে পাব না, সেখানে আমাদের ফেলে রাখা কি তাঁর উচিত হয়েছে? কেহ সংসারের নিন্দা কর্‌লে, আমার মনে হয়, তিনি যেন ভগবানের চেয়ে বেশী জ্ঞানী, আর ভগবান যেন এই সংসারটি সৃষ্টি ক'রে একটা ভয়ানক নির্ব্বোধের মত কাজ করেছেন! শুধু তাই নয়, তিনি যেন একজন মস্ত ঠক্, কেননা তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক সকলকে ভ্রান্তির মধ্যে ডুবিয়ে রেখে ব'সে ব'সে কেবল মজা দেখ্‌ছেন! বলা বাহুল্য যে, পরমেশ্বরের এইরূপ চিত্র কখনই সত্য নয়, এবং কখনই সত্য হতেও পারে না। তাঁর অনন্ত জ্ঞানের পরীক্ষা করতে পারে এমন কে আছে? তিনিই এই সংসার সৃষ্টি ক'রে, তার মধ্যে আমাদিগকে রেখে দিয়েছেন। এর ভিতর কি তাঁর কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য নাই? অবশ্যই আছে। আমার মনে হয়, সেই উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, আপনার ঐ নির্দ্বন্দ্ব ভাবের সাধনা। জীবমাত্রই স্বভাবতঃ আনন্দের অন্বেষণ করে, কেননা ভগবান্ স্বয়ং আনন্দময়, আর এই সংসারটি তাঁর আনন্দ হতেই স্ফুরিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত আনন্দ খুঁজে নেবার জন্য তিনি কৌশলক্রমে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আমরা চাই সুখ, কিন্তু সুখের পাশেই তিনি দুঃখ দিয়েছেন। দুঃখটিকে জয় না কর্‌তে পার্‌লে আমরা কিছুতেই দুঃখবর্জ্জিত খাঁটি সুখ লাভ বা আস্বাদন কর্‌তে পারি না। যে সুখের নিত্য সহচর দুঃখ, তাহা সুখই নহে, তাহা দুঃখের নামান্তর মাত্র। দুঃখাতীত যে সুখ তাহাই প্রকৃত সুখবাচ্য। কিন্তু তাহা লাভ কর্‌তে হ'লে সুখজড়িত দুঃখ, আর দুঃখজড়িত সুখ এই উভয়ের, অর্থাৎ এই দ্বন্দ্বের অতীত হতে হবে। এরই নাম হচ্ছে, আপনার 'নির্দ্বন্দ্ব ভাবের সাধনা।' আমরা আমাদের জীবনের সামান্য সামান্য কার্য্যে ও ব্যাপারে যদি নির্দ্বন্দ্ব ভাবের সাধনা কর্‌তে পারি, তা হ'লে সেই সাধনায় সিদ্ধ হ'য়ে আমরা একদিন সেই পূর্ণানন্দকেও লাভ কর্‌তে সমর্থ হব। এই কারণে, আমাদের সংসার আর সাংসারিক ব্যাপার উপেক্ষার বস্তু নয়। সংসার শিক্ষার ও সাধনার স্থল, এইখানে আমরা যদি নির্দ্বন্দ্ব ভাবের সাধনা ক'রে ছোট ছোট পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হ'তে পারি তা হ'লে বড় পরীক্ষাতেও সমুত্তীর্ণ হ'তে পার্‌বো। সেই পূর্ণানন্দকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রেখে যিনি সাংসারিক ব্যাপারে সফলতা লাভ করেন ও জীবন-সংগ্রামে জয়ী হ'ন, আমার মনে হয়, তিনিই যথার্থ সাধক ও ভক্ত। আমিও আপনাকে সেই সাধক ও ভক্ত-দলের মধ্যেই ফেলেছি।"

ক্ষেত্রনাথ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "আপনি আমায় কি বল্‌ছেন? শুনে আমার বড় লজ্জা হচ্ছে। আমার মত ঘোর সংসারী আর কেউ নাই। আমি বাল্যকাল থেকে এই কঠোর জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছি। কেমন ক'রে সংসার প্রতিপালন কর্‌বো, কি উপায়ে স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গকে পোষণ কর্‌বো, অহরহঃ আমার কেবল সেই চিন্তা। আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভগবানের নাম নেবারও সময় পাই না। দিন রাত কেবল কাজ আর কাজ।

আমি একএকবার ভাবি, ভগবান এতগুলি জীবের পালন-ভার আমার উপর অর্পণ করেছেন, তাদের জন্য আমি যদি না খাটি তা হ'লে আমার কর্ত্তব্য করা হবে না। সেইজন্য সর্ব্বদা কেবল কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকি। ভগবান্‌কে লাভ কর্‌বার জন্য কখনও আমি সাধনা করি নাই; সাধনা করবার ইচ্ছা থাক্‌লেও আমি সাধনার সময় পাই না।"

রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন "আপনার কথা শুনে দেবর্ষি নারদের সেই গল্পটি আমার মনে পড়ছে। গল্পটি নূতন নয় পুরাতন; অনেকেই তা শুনেছেন, আপনিও শুনে থাক্‌বেন। কিন্তু তথাপি প্রসঙ্গক্রমে এইখানে তার উল্লেখ না ক'রে থাক্‌তে পারছি না। সকলেই জানেন, দেবর্ষির মত ভগবদ্ভক্ত কেউ ছিলেন না। তিনি সকল কাজ পরিত্যাগ ক'রে তাঁর বীণাযন্ত্রটি নিয়ে দিনরাত কেবল ভগবানের নাম কীর্ত্তন কর্‌তেন। নাম কীর্ত্তনে যে কি আনন্দ, তা তিনিই বুঝেছিলেন। এমন সাধনা কেউ কখনও করেন নাই। সেই সাধনার ফলে তিনি ভগবানের দর্শন পেলেন ও তাঁর প্রিয়পাত্র হলেন। কিন্তু অত্যুন্নত আধ্যাত্মিক জগতেও জীবের শত্রু আছে। অভিমান, গর্ব্ব, অহঙ্কার এইগুলি জীবের পরম শত্রু। নারদ মনে কর্‌লেন, বুঝি তাঁর মত ভগবানের ভক্ত আর কেউ নাই। সর্ব্বান্তর্যামী নারায়ণ তা জান্‌তে পার্‌লেন। একদিন নারদ নারায়ণকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন 'প্রভু, আপনার শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে?' নারায়ণ হেসে বল্‌লেন 'অমুক গ্রামের অমুক লোক আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।' ভগবানের এই শ্রেষ্ঠ ভক্তটিকে দেখ্‌বার জন্য নারদের বড় কৌতূহল হ'ল। তিনি সেই গ্রামে উপস্থিত হ'য়ে জান্‌লেন যে, সে লোকটি একজন সামান্য কৃষক মাত্র। নারদ কৃষকের বাড়ী গিয়ে দেখ্‌লেন, কৃষক তার ক্ষেতে লাঙ্গল নিয়ে গেছে। কৃষকপত্নী মুনিকে দেখে পরম যত্নে তাঁর সৎকার কর্‌লেন। যথাসময়ে কৃষক লাঙ্গল নিয়ে বাড়ী এল; এসে তার গরুগুলিকে খেতে দিলে; তার পর মুনিকে দেখে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে তাঁর যথোচিত সৎকার করা হয়েছে কি না, তা জিজ্ঞাসা কর্‌লে। মুনি বল্‌লেন যে, তাঁর সৎকারের কোনও ত্রুটি হয় নাই। তখন কৃষক বাড়ীর ভেতরে গিয়ে দেখ্‌লে যে, তার একটি ছেলের অসুখ হ'য়েছে। তখনি সে ছুটে গিয়ে কবিরাজ ডেকে এনে তার ঔষধের ব্যবস্থা করলে। তার পর সে হাত-পা ধুয়ে, তেল মেখে স্নান করে এল, আর তার স্ত্রী সামান্য যা রেঁধেছিল, তাই খেলে! কৃষক তারপর আবার গৃহ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ল। গরুগুলিকে সে আর একবার ঘাস খড় খেতে দিয়ে কোদালি নিয়ে আবার ক্ষেতে কাজ কর্‌তে গেল। সেখান থেকে সন্ধ্যার পর বাড়ী এসে আবার গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ল। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কাজ-কর্ম্ম ক'রে এবং অতিথির সম্যক সৎকার ক'রে ও তাঁর অনুমতি নিয়ে সে শয়ন কর্‌তে গেল। কৃষক অতি প্রত্যূষে উঠেই লাঙ্গল নিয়ে আবার জমী চষ্‌তে গেল। এই-সব দেখে নারদ ভাবতে লাগ্‌লেন 'এই কৃষকটি ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত কিরূপে হ'ল? সে তো সমস্ত দিন সংসারের কাজ নিয়েই ব্যস্ত; কখনও তো একবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে ভগবানের নাম গ্রহণ করে না; আর আমি সমগ্র জীবন ভগবানের নাম কীর্ত্তন ক'রেও তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত হ'তে পারলাম না! জানি না, লীলাময় ভগবানের কিরূপ বিচার।' এইরূপ ভাবতে ভাবতে নারদ সেখান থেকে চ'লে গেলেন। কিয়দ্দূর গিয়ে তাঁর মনে হ'ল, সে লোকটি ভগবানের নাম করে কি না, আর কর্‌লে কখন করে, তা তো তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই! সে কথাটা তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। এই ভেবে, তিনি মধ্যাহ্নের সময় আবার সেই কৃষকের বাড়ীতে ফিরে এলেন। কৃষক তাঁকে দেখে আহ্লাদিত হ'ল ও তাঁর সৎকার কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'ল। নারদ বল্‌লেন 'বাপু, তুমি থাম; আমার সংকারের জন্য ব্যস্ত হয়ো না; আমি আজ আর তোমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ কর্‌ব না। আমি কেবল একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌তে এলাম;—তুমি তো সমস্ত দিন কাজকর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত থাক, তা দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি ভগবানের নাম কর কখন? কৃষক হেসে বল্‌লে 'ঠাকুর, ভগবান্ এত কাজের ভার আমার উপর দিয়েছেন যে, আমি সমস্ত দিন তাঁর কাজেই ব্যস্ত থাকি; তাঁর নাম কর্‌বার জন্য একটুও সময় পাই না। সর্ব্বদা তিনি ও

তাঁর কাজ মনের মধ্যে জাগরূক থাকে।' কৃষকের কথা শুনে নারদের চৈতন্য হ'ল। তিনি ভাবলেন, কৃষক সত্য সত্যই ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। সে আপনাকে প্রভুর দাস মনে ক'রে সর্ব্বদাই তাঁর কাজ করছে। তার নিজের কাজ কিছুই নাই, সবই প্রভুর কাজ! যার প্রাণ এমন প্রভুময়, যে সর্ব্বদাই প্রভুকে মনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে, যে প্রভুর কাজেই দিন রাত ব্যস্ত, যার আমিত্বের কোনও জ্ঞান নাই, ও প্রভুই সব, এবং প্রভুর কাজে ব্যস্ত থেকে প্রভুর নাম করবার যার সময় হয় না, সে প্রভুর শ্রেষ্ঠ ভক্ত হবে না তো কে হবে? নারদ এইরূপ চিন্তা করতে করতে সেই স্থান হ'তে চলে গেলেন।

"ক্ষেত্রবাবু, নারদের এই গল্পটি শুনলেন তো? আমরা যদি জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করতে পারি, আর সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মকেই ভগবানের কাজ ব'লে মনে করতে পারি, তা হ'লে নির্জ্জনে ব'সে ভগবানের নাম নিতে না পারলেও আমরা তাঁর ভক্ত। সংসারটি মায়ার ক্ষেত্র নয়; এই সংসারেই ধর্ম্মের উচ্চসাধনা হয়। ভেবে দেখুন, আমাদের কত কাজ রয়েছে। সবই কি আমরা পালন করতে পারি? কিন্তু সাধ্যানুসারে যিনি যত কর্ত্তব্য পালন করতে পারেন, তিনিই আমাদের মধ্যে তত শ্রেষ্ঠ। আত্মোন্নতি সাধন করে, অপর দশজনের উন্নতিসাধনের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। দেখুন এই প্রদেশের—কেবল এই প্রদেশের কেন?—আমাদের সমগ্র দেশের লোক কত অজ্ঞ। এদের মধ্যে জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ করা শিক্ষিত লোকের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। লোকসেবাই ভগবানের সেবা; দশজনের মঙ্গলের মধ্যেই আত্মমঙ্গল নিহিত আছে। যেখানে দুঃখ ও দারিদ্র্য আছে, সেখানে আমরা যদি সুখ ও স্বচ্ছন্দতা আনতে পারি; যেখানে অজ্ঞানান্ধকার ঘনীভূত, সেখানে যদি একটী জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালতে পারি; যেখানে এক গাছি তৃণ জন্মে, সেখানে যদি দুই গাছি তৃণ জন্মাতে পারি, তা হ'লেই আমাদের জন্মগ্রহণ ও জীবনধারণ করা অনেকটা সার্থক হয়। নতুবা কতকগুলি টাকা উপার্জ্জন ক'রে যদি নিজেরই সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও সুবিধা দেখি, আর কারও মুখপানে না চাই,—আত্মোন্নতি সাধনেই যদি আমাদের সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয়, তা হ'লে পশু ও আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট প্রভেদ কি?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আপনার আদর্শ উচ্চ ও মহান্। এই আদর্শ সম্মুখে রেখে আমাদের সকলেরই যে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই; আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার এই উচ্চ আদর্শ মনের মধ্যে সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারি।"

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

জীবনের মূল্য

(গীদে মোপাসার ফরাসী গল্প অবলম্বনে)

ফ্রান্স ও ইটালীর সীমান্তপ্রদেশে ভূমধ্যসাগরের তীর-বর্ত্তী ভূভাগে এক অতি ক্ষুদ্র রাজ্য আছে—তাহার নাম মোনাকো। এই রাজ্য হইতে অনেক ছোট সহরও জনসংখ্যায় অধিকতর গৌরবশালী। রাজ্যের লোক গণনা করিলে সাতহাজারের বেশী কিছুতেই হইবে না। সমগ্র রাজ্যটী সমভাবে বণ্টন করিলে জন প্রতি এক একার ভূমিও হইবে না। এ হেন খেলানার রাজ্যেও এক রাজা ছিলেন। সেই রাজার সুন্দর প্রাসাদ, পরি-ষদ, সভাসদ, যাজক, সৈন্যাধ্যক্ষ ও এক দল ফৌজও ছিল।

ফৌজের দল যে খুব বড় ছিল এমন নহে, মোটের উপর ষাটজন সৈন্য হইবে। তবু তো ফৌজ! অন্যান্য দেশের ন্যায় এ রাজ্যেও প্রজাদিগকে কর দিতে হইত —মাথা-প্রতি কর নির্দ্ধারিত ছিল। তামাক ও মাদক দ্রব্যের উপরও শুল্ক আদায় হইত। যদিও সেখানকার লোক অন্যান্য দেশের মত মদ্যপান ও ধূমপান করিত, তবু তাহারা সংখ্যায় এত অল্প ছিল যে, রাজ্যের আয় হইতে রাজার ঠাট বজায় রাখা কঠিন হইত। কাজেই রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য রাজাকে এক নূতন পন্থা খুঁজিতে হইল। রাজ্য মধ্যে এক জুয়ার আড্ডা স্থাপিত হইল, সেখানে লোকে বাজী রাখিয়া রুলেট (Roullete)

খেলিত। অনেক লোকেই খেলিতে আসিত. কেহ হারিত কেহ বা জিতিত, কিন্তু জুয়ারীর লাভ হইতই। সেই লভ্যাংশ হইতে রাজসরকারে ভূয়োভাগ সেলামী দিতে হইত। ইহা হইতে যে পরিমাণ আয় হইত সেটা সামান্য নহে। ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যে জুয়া খেলা নিষিদ্ধ ছিল। জর্ম্মাণীর কোনো কোনো সামন্ত রাজা জুয়াখেলার প্রশ্রয় দিতেন, কিন্তু পরে তাঁহারাও জুয়ার আড্ডা তুলিয়া দিতে বাধ্য হন। জুয়ার পরিণাম যে অনিষ্টজনক ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কেহ ভাগ্যপরীক্ষার জন্য খেলিতে আসিত। ফলে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ঘরে ফিরিত। খেলায় প্রমত্ত হইয়া যাহা তাহার নিজের নয়, তাহা খোয়াইতেও পশ্চাৎপদ হইত না। অবশেষে হতাশ হইয়া হয় জলে ডুবিয়া, নয় বন্দুক ছুড়িয়া আত্মহত্যা করিত। এই জন্য জর্ম্মানগণ দেশের শাসকসম্প্রদায়কে এই জঘন্য উপায়ে রাজস্ব-বৃদ্ধি করিতে বাধা দেন। কিন্তু মোনাকোর রাজাকে বাধা দিতে কেহই প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং এবিষয়ে তাঁহার অবাধ ক্ষমতা ছিল।

যাহারই জুয়াখেলার নেশা থাকিত সে-ই মোনাকোতে যাইত। তাহার হার বা জিত হউক, রাজার লাভ নিশ্চিতই ছিল। "ন্যায় পথে থাকিয়া পরিশ্রম করিলেও কখনো মর্ম্মর প্রাসাদ তুলিতে পারিবে না" এইরূপ একটা প্রবাদ আছে। মোনাকোর রাজাও জানিতেন যে ইহা তাঁহার পক্ষে গৌরবজনক নহে কিন্তু তিনি নিরুপায়। তাঁহাকেও তো বাঁচিয়া থাকিতে হইবে! তাই তিনি "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া অর্থ অর্জ্জনের এই অভিনব সুযোগ ছাড়িতে পারেন নাই। জীবনটাও রাখিতে হইবে, রাজত্বটাও অচল না হয়!

মোনাকোতেও অভিষেকোৎসব হইত, দরবার বসিত। প্রজাপুঞ্জ দোষগুণানুযায়ী তিরস্কার ও পুরস্কার লাভ করিতেন। সৈন্যগণ রাজার সম্মুখে কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় করিত। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আইন আদালতের অভাব ছিল না। ঠিক রাজারই মতো সব ছিল, যদিও ছোট আকারে!

কিছুদিনের ঘটনা—এই খেলানার রাজ্যে একটা খুন হইল। মোনাকোর অধিবাসীগণ খুব শান্তিপ্রিয়, এমন ঘটনা আর কখনো হয় নাই। খুনের বিচার করিবার জন্য জজসাহেব গাম্ভীর্য্যের সহিত বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলেন—তাঁহার সাহায্যের জন্য কয়েকজন জুরীও নির্ব্বাচিত হইল। আসামীর সপক্ষে ও বিপক্ষে আইনজ্ঞ উকীল বেশ তেজের সহিত বক্তৃতা জুড়িলেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া জুরীগণ নির্ব্বিবাদে এই রায় দিলেন যে, আইনের নির্দ্দেশানুযায়ী খুনী আসামীর মস্তকটা স্কন্ধচ্যুত করা হইবে।

রাজা দণ্ডাদেশের অনুমোদন করিলেন। "যদি লোকটাকে মারতেই হয়, তবে মারো।"

এপর্য্যন্ত চলিল ভালোই।

এখন দণ্ড প্রদানের এক অন্তরায় উপস্থিত হইল—সে রাজ্যে না ছিল জল্লাদ, না ছিল (Guillotine) শিরশ্ছেদনের যন্ত্র। অমাত্যগণ কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া ফরাসী গভর্ণমেণ্টের শরণাগত হইলেন—যদি তাঁহারা একটা শিরশ্ছেদন-যন্ত্র ও আসামীর মাথা কাটিবার জন্য একটা লোক হাওলাত দেন। খরচ যাহা লাগিবে তাহা দিতে মোনাকোর রাজা প্রস্তুত। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট উত্তর দিলেন, একটা যন্ত্র ও জল্লাদ তাঁহারা সরবরাহ করিতে পারেন, তাহাতে খরচ পড়িবে ১৬০০০ হাজার রৌপ্য মুদ্রা। রাজার নিকট খবর পৌঁছিল। তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করিলেন। একটা মানুষের মাথার জন্য ১৬০০০ টাকা খরচ! রাজা বলিলেন, না, লোকটার মাথার মূল্য এত হইবে না। এর চেয়ে সস্তায় হয় কি না? ১৬০০০ টাকা আমার রাজ্যের লোক-পিছু ভাগ করিয়া হিসাব ধরিলে দুই টাকারও বেশী! এ জন্য নূতন কর ধরিতে হইবে?—প্রজারা কিছুতেই এ অপব্যয় সহ্য করিবে না। কি জানি দাঙ্গা হাঙ্গামা হইবে কি না কে বলিতে পারে।

তখন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য সভা আহূত হইল, স্থির হইল ইটালীর রাজার নিকট চিঠি লেখা হউক। ফরাসীদেশে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত—রাজার সম্মান রক্ষা করিতে সে দেশের লোক অভ্যস্ত নহে। ইটালীর

রাজা তো তাঁহারই জাত-ভাই—তিনি মোনাকোর রাজাকে সস্তায় যন্ত্র ও লোক দিলেও দিতে পারেন। ইটালীর রাজা চিঠির উত্তর দিলেন। খুসী হইয়া তিনি লিখিলেন যে একটা যন্ত্র ও জল্লাদ পাঠাইতে ১২০০০ লাগিবে। মোনাকোর রাজা মুস্কিলে পড়িলেন। যদিও দরে সস্তা তবু তো গড়ে কম নয়। পাজি বেটার মাথার মূল্য এত হইবে না। ইহাতেও জন প্রতি কিঞ্চিন্ন্যূন ২৲ টাকা হারে কর আদায় করিতে হইবে। আবার বৈঠক বসিল—কিসে কম খরচে কাজ হয়। কোনো সৈনিক কাজটা যেমন-তেমন ভাবে শেষ করিতে পারে না কি? সেনাপতিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে তো সৈনিকেরা কত লোকের প্রাণনাশ করে—বস্তুতঃ তাহারা এ কাজের শিক্ষাও পাইয়াছে। সেনাপতি সৈনিকদের সহিত আলাপ করিয়া দেখিবেন এইরূপ আশ্বাস দিলেন। সৈনিকেরা কেহই সম্মত হইল না। তাহারা বলিল, "জল্লাদের কাজ তো আমরা শিখি নাই।"

কি করা যায় এখন? আবার পাত্র মিত্র মাথা ঘামাইতে লাগিলেন। নানা আন্দোলন ও আলোচনার পর স্থির হইল যে, জীবনদণ্ডের পরিবর্ত্তে আসামীকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। ইহাতে রাজারও অনুকম্পা প্রকাশ পাইবে, খরচও কম।

এই প্রস্তাবে রাজা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। প্রস্তাবানুযায়ী আয়োজন উদ্যোগ চলিতে লাগিল। নূতন এক বিঘ্ন উপস্থিত হইল—যাবজ্জীবন রুদ্ধ রাখিবার উপযুক্ত সুদৃঢ় কারাগার কোথায়? যে ফাটক ছিল তাহাতে কয়েদীদিগকে অস্থায়ীভাবে আটক রাখা হইত। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী কয়েদীর বাসোপযোগী কারাগার ছিল না। অবশেষে একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল যেখানে সেই তরুণবয়স্ক খুনী আসামীকে রাখা যাইতে পারে। কয়েদীর খবরদারী করিবার জন্য একজন প্রহরীও নিযুক্ত হইল—সে রাজবাড়ীর রসুইখানা হইতে তাহার খাবারও আনিয়া দিত।

বন্দী মাসের পর মাস সেই স্থানে কাটাইতে লাগিল—এভাবে এক বৎসর অতীত হইল। বৎসরান্তে এক দিন রাজা হিসাবের খাতা খুলিয়া খরচের এক নূতন দফা দেখিতে পাইলেন। বন্দীর খোরাক ও প্রহরীর বেতন বাবদ বৎসরে প্রায় ৬০০৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। বিশেষ আশঙ্কার কথা এই যে, তরুণ বন্দীর স্বাস্থ্য নিরাময় ছিল—সে আরও ৫০ বৎসর বাঁচিতে পারে। ইহার হিসাব ধরিতে গেলে বিষয়টা গুরুতর বলিতে হয়। রাজা তখন মন্ত্রীকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই পাজী বেটার সহিত এরূপ ব্যবহার করা চলে না। বর্ত্তমান বন্দোবস্ত বহু ব্যয়-সাপেক্ষ! অন্য উপায় নির্দ্ধারণ করুন।"

রাজসভায় তর্ক বিতর্কের পর তুমুল তরঙ্গ উঠিল। জনৈক সদস্য প্রস্তাব করিলেন, প্রহরীকে বরতরফ করা যাইতে পারে। অপর একজন প্রতিবাদ করিলেন, "তাহা হইলে বন্দী পলাইবে।" প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, "বেশ, বন্দী পলাইয়া যাইবে কোথায়, গলায় দড়ি দিয়া মরিতে?" আর কেহ এ বিষয়ে উচ্চ-বাচ্য করিলেন না—নূতনত্বের দাবীতে উক্ত প্রস্তাবই গৃহীত হইল। প্রহরীকে বরখাস্ত করিয়া কি অবস্থা হয়, তাহা পরীক্ষা-যোগ্য বটে।

বন্দী যখন প্রহরীর খোঁজ পাইল না অথচ ক্ষুধার তাগিদ বাড়িল তখন নিজেই রাজবাড়ীতে খাবার আনিতে চলিল। খাবার আনিয়া কারাগারের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কারাগার হইতে তাহার পলায়নের কোনই তাগাদা দেখা গেল না। বন্দী বেশ আরামেই দিন কাটাইতে লাগিল—ক্ষুধা পাইলে রাজবাড়ী যাইয়া খাবার আনিত, পরে সারাদিনই অবসর। এবার কি করা যায়? আবার মন্ত্রীর ডাক পড়িল।

সভাসদগণ বলিলেন, "এবার ওকে স্পষ্ট বলা হউক যে আমরা তোমাকে কয়েদ রাখিতে চাহি না।" আইন-সচিব তখন বন্দীকে ডাকাইয়া আনিলেন। মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পলাইয়া যাও না কেন? এখন তো আর প্রহরী নাই। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার, রাজার কোন আপত্তি নাই।"

বন্দী বলিল, "রাজার যে আপত্তি নাই তাহা আমিও সাহস করিয়া বলিতে পারি, কিন্তু আমার যাওয়ার জায়গা কোথায়? আমি নিরুপায়। আপনারা দণ্ডাজ্ঞা

করিয়া আমার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন। আমি এখন যেখানেই যাইব সেখানেই তাড়না ভোগ করিব। ইহা ছাড়া, বসিয়া বসিয়া খাইয়া আমার কাজ করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে। আপনারা আমার প্রতি অতি অবিচার করিতেছেন। আমাকে যখন জীবনদণ্ডাদেশ করিয়াছিলেন তখন মারিয়া ফেলাই উচিত ছিল। আপনারা কিন্তু তাহা করেন নাই। আমিও এই বিষয়ে কোন অভিযোগ করি নাই। তারপর আপনারা আমাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন, কড়া পাহারার হুকুম হইল। প্রহরী আমার খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দিত—পরে সেও অন্তর্হিত হইল। আমি নিজেই ক্লেশ স্বীকার করিয়া রাজবাড়ী যাইয়া খাবার আনিতাম। তখনও আমি কোন অভিযোগ করি নাই। এখন আপনারা আমাকে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমি ইহাতে রাজী নহি। হুজুরের যাহা খুসী করিতে পারেন, আমি যাইতে নারাজ।"

মন্ত্রী আবার সমস্যায় পড়িলেন। লোকটা কিছুতেই যাইবে না? পাত্রমিত্র গভীর চিন্তা করিয়াও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। লোকটার দায় হইতে কোন প্রকারে মুক্ত হইতে পারিলেই বাঁচা যায়। বন্দীকে পেন্সন দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হইল—ইহা ব্যতীত আর উপায় নাই। যে-কোন প্রকারে পাজী বেটার দায় এড়াইতে পারিলে হয়। রাজা নিরুপায় হইয়া তখন বন্দীকে ৬০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় দেখিলেন না।

বন্দী ইহা শুনিয়া বলিল, "তা বেশ, যদি আমি নিয়মিতরূপে বৃত্তি পাই, তবে আমার আপত্তি নাই।"

সুতরাং এইবার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল। বন্দী তাহার বার্ষিক বৃত্তির এক তৃতীয়াংশ অগ্রিম পাইয়া সেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গেল। রেলগাড়ীতে চড়িয়া পনের মিনিটেই সে রাজ্যের সীমা পার হইল। সীমান্তদেশে এক জায়গায় একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া সে তথায় বাস করিতে লাগিল। নিজের জমীতে যে শাকসবজী জন্মিত তাহা বাজারে বেচিয়া সে বেশ দু'পয়সা রোজগার করিত। এখন সে বেশ আরামে কাল কাটাইতেছে। পেন্সনের টাকা আদায় করিতে সে ঠিক সময়েই রাজবাড়ীতে উপস্থিত হয়। টাকা আদায় হইলে জুয়ার আড্ডায় যাইয়া সে বাজী রাখিয়া খেলে। খেলায় কখন হারে কখন জিতে। পরে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া যায়। সে সুখে শান্তিতেই দিন-যাপন করিতেছে।

যে-সব রাজ্যে একজন অপরাধীকে নিহত করিতে বা যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখিতে রাশি রাশি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা আছে এমন দেশে পূর্ব্বোক্ত বন্দী যে নরহত্যা করে নাই, ইহাই তাহার শুভগ্রহের ফল।

শ্রীমাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

স্মৃতি-রক্ষা

(গল্প)

একদিন সন্ধ্যার সময় একটি সভা ভঙ্গের পর দলে দলে লোক আসিয়া গোলদীঘির পাড়ে সমবেত হইতেছিল। অনেকের মুখে অপ্রসন্নতা ও ক্রোধের চিহ্ন। কেহ কেহ গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। কেহ বা মৃদুস্বরে বন্ধুর সঙ্গে সভার বিষয় কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। ছাত্রের দলে এই সভা সম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল।

সভার উদ্দেশ্য একজন অধ্যাপককে সম্বর্দ্ধনা করা। সংস্কৃত কলেজের একজন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভবভূতি ভট্টাচার্য্য বিলাতের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসূচক পদবীলাভ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণামূলক গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হওয়াতে তিনি ইউরোপের বহুবিধ প্রাচ্যজ্ঞান-সভার সভ্যও মনোনীত হইয়াছেন। কলিকাতার বন্ধুবর্গ, শিক্ষিত জনগণ ও ছাত্রবৃন্দ তাই আজ একটি সভা করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিল। সেই সভা ভঙ্গের পরই সভায় উপস্থিত জনগণের মনে এই অপ্রসন্নতার উদ্ভব।

গোলদীঘির এক কোণে ঘাসের উপর কতকগুলি ছাত্র বসিয়া ছিল। আর একজন ছাত্র সেখানে আসিতেই

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল "কি কালী! এত দেরী যে! সভায় গেলে না?"

কালী। না ভাই, আস্‌তে পারি নি। বাড়ীতে কাজ ছিল। সভায় কি হ'ল?

"সভায় ত হুলুস্থুল। পণ্ডিতমহাশয় যে এত বড় দাম্ভিক তা আমরা আগে জান্‌তুম না। তা হলে সভা করে এ রকম অপদস্থ হতুম না।"

"কেন? কি হয়েছে?"

"দস্তুরমত অপমান। আমাদের সম্বর্দ্ধনা তিনি উপেক্ষা করেছেন।"

"কি ব্যাপারটা খুলেই বলনা।"

"ব্যাপার আর কি? আমরা আজ তাঁকে দেওয়া হবে বলে, ফুলের মুকুট আর ফুলের হার আনিয়েছিলুম, জান ত? জরির-কাজ করা এই ফুলের মালা আর মুকুট তৈরি করাতে কত হাঁটাহাঁটি তাও ত তুমি জান। আজ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি যখন বল্‌লেন, আমাদের স্বর্ণ রৌপ্য আভরণ দিবার ক্ষমতা নাই, সামান্য ফুলের আভরণ গ্রহণ করুন, তখন পণ্ডিত মহাশয় ব্যস্তসমস্ত হয়ে বল্‌লেন 'থাক্ থাক্ ফুল আমায় দেবেন না। ফুল আমি নিতে পার্‌বো না। এমন হবে আমি পূর্ব্বে বুঝ্‌তে পারি নি। তা হলে আগে থেকেই আপনাদের বারণ কর্‌তুম।' তখন সভার চারদিকে একটা মহা গোলযোগ উপস্থিত হ'ল। এই অবিনয়, অশিষ্টাচার দেখে সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। সভাপতি মহাশয় না থাক্‌লে শৃঙ্খলা রক্ষা করা দুষ্কর হ'ত।"

কালী। তা এরকম বলার কারণ কি তা বুঝ্‌তে পার্‌লে কি? পণ্ডিত মহাশয় আর কিছু বল্‌লেন না?

"হাঁ, তিনি পরে বল্‌লেন যে কোনও বিশেষ কারণে আমি জীবনে ফুল স্পর্শ কর্‌ব না প্রতিজ্ঞা করেছি, তাই ফুলের মালা ও মুকুট নিতে অসম্মতি স্বীকার করেছিলুম, কিন্তু তাড়াতাড়ি বল্‌তে গিয়ে কথাটা স্পষ্ট করে বল্‌তে পারিনি। তার জন্যে আমার অবিনয় ও অসৌজন্য প্রকাশ হয়েছে। আপনারা আমাকে মার্জ্জনা করুন।"

কালী। তবে আর কি? এই ত কারণ বোঝা যাচ্ছে।

"আরে তুমিও যেমন! এ কথা তুমি বিশ্বাস কর? কি এমন কারণ যে ফুল স্পর্শ কর্‌বেন না। ওসব কিছু নয়। প্রথমে স্পষ্ট মনের ভাবটা বেরিয়ে পড়েছিল, পরে সভায় গোলযোগ দেখে কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন।"

কালী। নিন্দা কর্‌তেই হবে? ভালটা বুঝি আর ভাব্‌তে নেই?

"কারণ থাক্‌লে তিনি তা বল্‌বেন না কেন? জ্ঞানবাবু সভাতেই বল্‌লেন, আমরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ফুল স্পর্শ না করার কারণ জান্‌তে চাই। প্রকাশ্য সভাতেই তিনি তার উত্তর দিন। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় বল্‌লেন, সভায় সে কথা বলা অসম্ভব; সে সময়ও নাই, আমার সে কথা প্রকাশ্য সভায় বলবার সামর্থ্যও নাই। আপনারা আমায় বিশ্বাস করুন আমি আপনাদের অসম্মান কর্‌বার জন্যে ফুল প্রত্যাখ্যান করি নি।"

কালী। এইতেই কি প্রমাণ হয়ে গেল যে তিনি অহঙ্কৃত, গর্ব্বিত, বিনা কারণে তোমাদের অপমান করেছেন? দেখ, বাঙ্গালীর স্বভাব পরশ্রীকাতরতা, কিন্তু তোমরা তার চরমে উঠেছ।

"আচ্ছা, তোমার মত অন্ধ ভক্ত আমরা নই। কি দম্ভ! আর কি গবেষণাই বা করেছেন? সবই ইংরেজির তর্জ্জমা ত? উল্‌টে পাল্‌টে লেখা বৈ ত নয়।"

কালী। দেখ্ নৃপেন, তুই বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস্। পণ্ডিত মহাশয়ের এই সমালোচনা করবার ক্ষমতা তোর এ জন্মে হবে কি না সন্দেহ। মিছে বকিস নি। নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ আছে, না হলে পণ্ডিত মহাশয় কখনও এমন বল্‌তেন না।

নৃপেন। কি! কারণটা কি?

"কারণ শুন্‌বে নৃপেন—"

ছাত্রেরা চমকিয়া পিছনে চাহিয়া দেখিল প্রসন্নমুখে অধ্যাপক ভবভূতি ভট্টাচার্য্য দাঁড়াইয়া আছেন, নৃপেন ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, কোনও উত্তর দিল না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘাসের উপরই বসিলেন। ছাত্রেরা সসম্ভ্রমে সরিয়া বসিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "দেখ, কেন আমি ফুলের মালা নিতে পারি নি তা সভাতে বল্‌তে পারি নি। আমি বেশী কথা বলি, গুছিয়ে

সংক্ষেপে সে কথা বলা আমার ক্ষমতায় হ'ত না। আর যে জন্য আমার এই প্রতিজ্ঞা সে কথা ভাবতে এখনও আমার চোখে জল আসে। আমি তা সভায় কি বল্‌তে পারি? তোমরা আমার ছাত্র। তোমাদের কাছে আজ আমি আমার জীবনের কথা প্রকাশ করছি।"

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রাজপথে ও বাগানের ভিতর গ্যাস জ্বলিতেছে। ছোট ছোট ছেলেরা ঝি চাকরদের সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া গেছে। স্থলে স্থলে ছাত্রের দল বিচরণ করিতেছে, কোথাও বা মণ্ডলাকারে বসিয়া নানা কথা বলিতেছে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন ধীরে ধীরে তাঁহার কাহিনী আরম্ভ করিলেন।

আমার বাবার চতুষ্পাঠীতে যাহারা পড়িত, তাহাদের মধ্যে বিদ্যালঙ্কার দাদার সঙ্গেই আমার বেশী ভাব ছিল। তাঁহার পুরা নাম কাহাকেও বলিতে শুনি নাই। চতুষ্পাঠীর সকলে তাঁহাকে 'বিদ্যালঙ্কার' বলিয়া ডাকিত। আমি শুধু 'দাদা' বলিতাম। আমি জন্মাবধি বিদ্যালঙ্কার দাদাকে আমাদের চতুষ্পাঠীতে পড়িতে দেখিয়া আসিতেছিলাম। চতুষ্পাঠীতে কত ছাত্র আসিত। কেহ কাব্য, কেহ দর্শন পড়িত। পড়া শেষ হইয়া গেলে তাহারা গৃহে যাইত। আবার নূতন ছাত্র আসিত। বিদ্যালঙ্কার দাদার কিন্তু পড়া শেষ হইত না। বাবা আর আর সকল ছাত্রকে পড়াইতেন। দাদা কিন্তু কোনও দিন বাবার কাছে পড়া বুঝাইয়া লইতে যাইতেন না। চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের মধ্যে যাহারা কাব্য পড়িত, দাদা তাহাদেরই একজনের নিকট নিজ পাঠ বুঝাইয়া লইতেন। দাদা সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের একটি দপ্তরের অধিকারী ছিলেন। তাহাতে নৈষধচরিত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, কিরাতার্জ্জুনীয় প্রভৃতি বহু পুরাতন মলিন জীর্ণশীর্ণ পুঁথি ছিল। নিত্যই সে দপ্তর হইতে এক একখানি পুঁথি বাহির হইত। দাদা ধীরে ধীরে দপ্তরটি খুলিয়া টিপ্পনীযুক্ত মলিন নৈষধচরিত বা শিশুপালবধ বাহির করিয়া পড়িতে বসিতেন, কত যুক্তাক্ষরবহুল শ্লোক, কত অনুপ্রাস-যমক-যুক্ত শ্লোক দাদা পড়িতেন। আমি গেলে দাদার আর পড়া হইত না। "আজ এই পর্য্যন্ত থাক্‌" বলিয়া পুঁথিগুলি সযত্নে দপ্তরে বাঁধিয়া আমায় বলিতেন "কি চাই ভবভূতি?" তাঁহার কাছে আমারও আবদারের অন্ত ছিল না।

বাবা বা মার কাছে আবদার করিবার সুযোগ পাইতাম না। বাবা সারা দিন অধ্যাপনা লইয়াই ব্যস্ত। চতুষ্পাঠীতে প্রায় ত্রিশ জন ছাত্র ছিল। তাহারা আমাদের বাড়ীতেই থাকিত। এতগুলি ছাত্র পড়ান, তার উপর নিজের সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা প্রভৃতিতে বাবার এক মুহূর্ত্তও অবকাশ থাকিত না। আমায় আদর করিবেন কখন? মাও সমস্ত দিন কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। এতগুলি ছাত্রের জন্য তিনি একেলাই রন্ধন করিতেন। তার উপর সংসারের সমস্ত ভার। কোন্‌ জিনিষটা ফুরাইয়া গেল, কি আনিতে হইবে প্রভৃতি সমস্ত বন্দোবস্ত মা-ই করিতেন। বিদ্যালঙ্কার দাদা জিনিসপত্র কিনিয়া আনিতেন। অন্যান্য ছাত্র কেহ মধ্যে মধ্যে সঙ্গে যাইত। বাবার পূজার সমস্ত যোগাড় মাকে করিতে হইত। দূর্ব্বা বাছা, ফুল সাজান, চন্দন ঘষা প্রভৃতি সমস্ত কাজ তিনি নিজহাতে করিতেন। কাজেই মার কাছেও আবদার করিবার অবসর আমি মোটেই পাইতাম না। কেবল সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে আমি মায়ের কোলের কাছে শুইয়া পড়িতাম। মা আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে গল্প বলিতেন। গল্পের কিয়দংশ শুনিতে শুনিতে অতর্কিতে আমার নিদ্রালস-নয়ন ঢুলিয়া আসিত। স্বপ্নে সোনার কাঠি রূপার কাঠি শিয়রে রাজকন্যা, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র প্রভৃতি ছায়ার ন্যায় ভাসিয়া উঠিত।

মা ও বাবার কাছে সুযোগ পাইতাম না বলিয়া বিদ্যালঙ্কার দাদার কাছে অজস্র আবদার করিতাম। নিত্যই আমার লিখিবার তালপত্র, কলম দাদাই সংগ্রহ করিয়া দিতেন। ভূষা হইতে মসী প্রস্তুত দাদা না হইলে হইত না। কোনও দিন দাদাকে ধরিতাম "দাদা একটা ধনুক নেবো।" দাদা অমনি কাটারি লইয়া বাঁশ চিরিয়া বাঁকারি প্রস্তুত করিয়া ধনুক নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইয়া যাইতেন। দীঘির দূরতম বা বৃহত্তম শালুকটি দাদা আমার জন্য সাঁতার দিয়া তুলিয়া আনিয়া দিতেন;

ময়রার দোকান হইতে বাতাসা বা খইচুরও দাদাকে মধ্যে মধ্যে কিনিতে হইত, নহিলে আমার ক্রন্দন থামিত না। বাবাকে লুকাইয়া যাত্রা শুনিতে যাওয়াও বিদ্যালঙ্কার দাদার সাহায্য ব্যতিরেকে অসম্ভব ছিল।

উপনয়ন হইবার বহুপূর্ব্বেই আমি বাবার কাছে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। বাবা সেকেলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। তাঁহার ইচ্ছা ছিল আমি ষড়দর্শন অধ্যয়ন করিয়া একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন অধ্যাপক হইয়া পড়ি। বিশেষতঃ ন্যায়শাস্ত্রে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যে আমাকে হইতেই হইবে তাহা আমার অক্ষরপরিচয়ের পর হইতেই শুনিয়া আসিতেছিলাম। বাবা প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। বহুদূর হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণপত্র আসিত। বড় বড় সভায় কূটতর্কে শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকগণকে পরাস্ত করিয়া তিনি কতবার সর্ব্বোচ্চ বিদায় ও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আমাকে পাঠে মনোযোগী করিবার জন্য বহুবার তাহা বলিতেন, আমার মনেও যে উচ্চ আশা জাগিয়া উঠিত না তাহা নহে। কিন্তু আমার লেখাপড়ার উৎসাহ যে বাবার আশানুরূপ ছিল না তাহা বেশ বুঝিতে পারিতাম।

পরিচিত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বাবা বলিতেন "ভবভূতি আমাদের বংশের মর্য্যাদা রাখিবে।" পণ্ডিত-বর্গও আমার প্রণতশীর্ষে পদধূলি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেন "ভবভূতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইবে।" তর্কবাগীশ মহাশয় নস্য লইয়া বলিতেন "সর্ব্বতো জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাদ্‌-ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্।" কিন্তু পণ্ডিতদের কাছে এইরূপভাবে আমার প্রশংসা করিলেও অন্তরালে বাবা আমাকে স্পষ্ট বলিতেন যে আমি অলস। লেখাপড়ায় আমার মন আদৌ নিবিষ্ট হয় না।

বাস্তবিকই প্রত্যূষে উঠিয়া পুষ্পচয়ন আমার খুব প্রিয় ছিল বটে কিন্তু তারপর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া মুগ্ধবোধ খুলিয়া আবৃত্তি করিবার সময় অজ্ঞাতে আমার মন সম্মুখবর্ত্তী দীঘির জলের দিকে আকৃষ্ট হইত। ঘোষেদের হাঁসগুলি সূর্য্যকিরণে রঞ্জিত দীঘির জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার দিত, ডানা ঝাড়িত। বৃদ্ধ ঘোষজা মহাশয় ঘাটে বসিয়া অপরূপ ভঙ্গীতে দন্তধাবন করিতেন। কখনও কখনও দু একটি অচেনা পাখী রঙ্গিল ডানা মেলিয়া উড়িয়া আসিয়া দীঘির পাড়ে নারিকেল গাছের উপর বসিত। কখনও কখনও ছোট ছোট মেয়েরা কলসী কাঁখে লইয়া জল লইতে আসিত। আমার মুগ্ধবোধ আবৃত্তি অজ্ঞাত-সারে কখন যে বন্ধ হইয়া যাইত তাহা বুঝিতে পারিতাম না। বাবার গম্ভীর তিরস্কারব্যঞ্জক স্বর কর্ণে পৌঁছিলে সহসা চমক ভাঙ্গিয়া যাইত। কিছুক্ষণের জন্য আবার বিষম উৎসাহের সহিত কঠোর সূত্রগুলি উচ্চস্বরে পড়িতে থাকিতাম।

এইরূপ ভাবে সকালবেলার পাঠ সাঙ্গ হইত। তাহার পর ছুটি। তখন মহা আনন্দে বিদ্যালঙ্কার দাদাকে ধরিতাম "নাইতে যাবে চল।" বিদ্যালঙ্কার দাদা আমায় লইয়া গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী সুবিশাল দীর্ঘিকায় স্নানার্থ গমন করিতেন। তীরে একটি সুন্দর শিবের মন্দির। দীঘির জলে শালুক ফুটিত। বিদ্যালঙ্কার দাদা সাঁতার দিয়া আমায় শালুক ফুল আনিয়া দিতেন। আমি তখনও ভাল সাঁতার শিখি নাই। দাদাকে ধরিয়া এক একবার সাঁতার দিবার চেষ্টা করিতাম। স্নানান্তে শিবকে প্রণাম করিয়া স্তব আবৃত্তি করিতে করিতে বিদ্যালঙ্কার দাদা বাড়ী ফিরিতেন। শুনিয়া শুনিয়া আমারও স্তবটি মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। আমিও দাদার সঙ্গে বলিতে বলিতে আসিতাম "প্রভুমীশমনীশমশেষগুণম্।"

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে আমার কোনও কাজ ছিল না। তখন গাছে ওঠা ও ফল পাড়া আমার প্রধান কাজ ছিল। গ্রামের যত দুরন্ত ছেলের সর্দ্দার ছিলাম—আমি। যাহাদের ফলবান্ বৃক্ষ ছিল তাহারা প্রায়ই বলিত "ভট্‌চায্‌দের ছেলেটার জ্বালায় গাছে কিছু থাক্‌বার যো নেই। যত বদ্ ছেলেকে জুটিয়ে যেন ডাকাতের দল করেছে।" কিন্তু বাবাকে সকলে সম্মান করিত বলিয়া আমার উপদ্রবের কথা বলিয়া কেহ কখন বাবার কাছে নালিশ করিত না।

বিকাল হইলেই ভয়ে আমার মুখ শুকাইয়া যাইত, বুক কাঁপিত। কেননা সেই সময় সকালে যাহা পড়িতাম বাবা তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন। জন্মে কখনও বাবা প্রহার করেন নাই, কিন্তু পড়া বলিতে না পারিলে তাঁহার মুখে যে অপ্রসন্নভাব দেখিতে পাইতাম তাহা নিষ্ঠুর প্রহার

অপেক্ষাও আমার কাছে অধিক যন্ত্রণাদায়ক ছিল। কদাচিৎ বাবাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে যে আনন্দ হইত, বড় হইয়া কোনও কৃতকার্য্যতায় কখনও সেরূপ আনন্দ অনুভব করি নাই। বিদ্যালঙ্কার দাদা এই সময় প্রত্যহ উপস্থিত থাকিতেন। আমাকে উত্তর সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে একটু ইঙ্গিত আভাস দিবার চেষ্টা করিতেন। যেদিন পড়া বলিতে পারিতাম সেদিন বিদ্যালঙ্কার দাদার উল্লাস দেখে কে? বাবাকে বলিতেন "ভবভূতির কি অসাধারণ স্মৃতিশক্তি!" আবার যেদিন আমি একটিও উত্তর দিতে পারিতাম না, সেদিন বিদ্যালঙ্কার দাদা অমনি আমার পক্ষ সমর্থন করিতেন। বাবাকে বুঝাইতেন "এই অল্প বয়স, এর মধ্যে ভবভূতি যা শিখেছে তা ঢের।" পড়া জিজ্ঞাসা হইয়া গেলে সন্ধ্যার সময় শিবালয়ে আরতি দেখিতে যাইতাম। ফিরিতে অন্ধকার হইত। বিদ্যালঙ্কার দাদা সাবধানে আমাকে লইয়া বাড়ী ফিরিতেন। পথে কত কথা। দাদা মুখে মুখে আমাকে চাণক্যশ্লোক শিখাইয়াছিলেন। দুই-চারিটি উদ্ভট শ্লোকও শিখিয়াছিলাম। সেগুলির অর্থ বুঝিতে পারি নাই। কেবল তাহাদের ছন্দের ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া সেগুলি কণ্ঠস্থ করিয়াছিমাম।

দাদা পড়িতেন, আমিও পড়িতাম। একদিন দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আচ্ছা দাদা, তোমার পড়া কতদিনে শেষ হবে?" দাদা সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না। একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "চল তোমার গাড়ী বাহির করে দিই।" কাঠের একখানি ছোট গাড়ী দাদাই আমায় তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। আমি আবার জিসা করিলাম "আচ্ছা দাদা, আমি যে-বই পড়ি তার চেয়েও খুব শক্ত বই বুঝি তুমি পড়, না?" দাদা সংক্ষেপে বলিলেন "হুঁ।" আমার খেলিবার গাড়ী বাহির হইল। দাদা টানিতে লাগিলেন। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আমি ওসব কথা শীঘ্রই ভুলিয়া গেলাম।

দাদাকে সকলেই ভালবাসিত। "বিদ্যালঙ্কার, আমার সঙ্গে চল না" বলিলেই দাদা অমনি তাহার সঙ্গে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতেন। চতুষ্পাঠীর সমস্ত বন্দোবস্ত, খাদ্যের যোগাড়, হাটবারে হাটে যাওয়া প্রভৃতি কার্য্য বিদ্যালঙ্কার দাদা ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যে-কেহ ডাকিত "বিদ্যালঙ্কার" অমনি "কি ভাই" বলিয়া দাদা সহাস্যে উত্তর দিতেন।

একবার নূতন একজন ছাত্র আসিয়াছে। শুনিলাম ছাত্রটি খুব মেধাবী। অল্পবয়সেই কাব্য ব্যাকরণ সমগ্র শেষ করিয়া বেদান্ত পড়িতেছে। সে আসিবার দিন-দুই পরে একদিন দাদা দপ্তরটি খুলিয়া পুঁথি বাহির করিয়া একজন ছাত্রের নিকট একটি শ্লোক বুঝাইয়া লইতেছেন, এমন সময় সেই নবাগত ছাত্র আসিয়া উদ্ধতস্বরে বলিল "এই যে বিদ্যালঙ্কার, চল, একবার আমার সঙ্গে তোমার সিউড়ি যেতে হবে!" সিউড়ি আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় চারক্রোশ দূরে অবস্থিত। দাদা বলিলেন "এই শ্লোকটার মীমাংসা করে যাচ্ছি।" নবাগত ছাত্র ক্রুদ্ধস্বরে বলিল "আরে রেখে দাও ও শ্লোক। বিশ বচ্ছর পড়্ছ। এখনও শিশুপালবধের প্রথম সর্গের একটা শ্লোক বুঝ্তে এত কাণ্ড কর্তে হয়। চল, চল, আমি যেতে যেতে মুখে মুখে তোমায় সব বুঝিয়ে দেব এখন। কোন্ শ্লোকটা? ওঃ—

সটাচ্ছটাভিন্ন-ঘনেন বিভ্রতা
নৃসিংহ সৈংহীমতনুং তনুং তয়া।

ও আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। নাও, ওঠ! আর ছেড়ে ছুড়ে দাও না। কতকাল আর এই কাব্য পড়্বে? বয়সও ত নেহাৎ কম হয় নি। তোমার ছেলের বয়সী যারা, তারা কাব্য শেষ করে দর্শন পড়্ছে।"

দাদা কোনও কথা বলিলেন না। আস্তে আস্তে পুঁথি মুড়িয়া দপ্তরে বাঁধিলেন। চটি পায়ে দিয়া চাদর লইয়া বলিলেন "চল।" আর কেহ দেখিয়াছিল কি না জানি না কিন্তু আমি দেখিলাম দাদার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাঁদকাঁদ মুখে বাবার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। বাবা গাড়ু করিয়া জল লইয়া হাত পা ধুইতেছিলেন। বলিলেন "কি হয়েছে রে?" আমি রোরুদ্যমানস্বরে এই ঘটনা বর্ণনা করিলাম। বাবা বলিলেন "আচ্ছা, যা। বিদ্যালঙ্কারকে কিছু বলিস নি। সে বড় অভিমানী। মনে বড় কষ্ট পাবে।"

তাহার পরে বাবা কি করিলেন জানি না কিন্তু নবাগত ছাত্র আর কখনও দাদাকে কিছু বলিতে সাহস করে নাই। আমার মনে কিন্তু বাবার একটী কথা জাগিয়া রহিল "বিদ্যালঙ্কার বড় অভিমানী।" তখন ছেলেমানুষ ছিলাম। অনেক কথা ভাবিতে লাগিলাম। দাদা বাবার কাছে পড়িতেন না কেন? নূতন নূতন ছাত্র আসিলে দাদা তাহাদের মধ্যে একজনকে বাছিয়া লইয়া তাহার কাছেই নিত্য পড়িতেন। অন্যান্য ছাত্রেরা কি দাদার মনে আঘাত দিত? বাবার কাছে পুনঃ পুনঃ একই শ্লোক পড়িতে কি দাদার অনিচ্ছা হইত? আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিলাম, কিছুরই মীমাংসা হইল না।

একদিন বিকালবেলা বাড়ীতে আসিয়া শুনিলাম বাবার বড় অসুখ। আমি দেখিতে যাইতেছিলাম, বিদ্যালঙ্কার দাদা যাইতে দিলেন না, বাহিরে ছাত্রদের কাছে বসিয়া রহিলাম। তাহারাও পীড়ার বিষয়েই কথোপকথন করিতেছিল। একজন বলিল "বিসূচিকা, বড় সাঙ্ঘাতিক।" আর একজন বলিল "কবিরাজ মহাশয় ত কোনও আশা দেন না।" আমি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলাম। বড় কান্না পাইতেছিল। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম, সন্ধ্যা হইয়া গেল। মা একবারও ডাকিলেন না, বিদ্যালঙ্কার দাদাও আসিলেন না। আমি দু-একবার বাড়ীর ভিতর যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, ছাত্রেরা ধরিয়া রাখিল। কত রাত্রি জানি না, দাদা আসিয়া ডাকিলেন "ভবভূতি, এস।" আমি একেবারে বাবার ঘরে গিয়া দাঁড়াইলাম।

শয্যার পাশে মা কাঁদিতেছেন। বাবা শয়ন করিয়া আছেন। বাবা বলিলেন "ভবভূতি এসেছিস্। বিদ্যালঙ্কারের কথা শুনে চলিস্। কখনও অবাধ্য হস্ নি! বিদ্যালঙ্কার, তোমায় আর কি বল্‌ব? আমার বংশের মর্য্যাদা আজ তোমার হাতে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি।" মা উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। চোখের জলে আমিও কিছু দেখিতে পাইলাম না।

বাবাকে হারাইলাম। চতুষ্পাঠী উঠিয়া গেল। ছাত্রগণ সকলেই চলিয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপ, ছাত্রদের বৃহৎ আটচালা শূন্য। সমস্ত দিন নীরবতার আধিপত্য। কেবল গেলেন না বিদ্যালঙ্কার দাদা। মা আর সংসারের কিছু দেখিতেন না। সকল বন্দোবস্ত করিতেন বিদ্যালঙ্কার দাদা। আমি চুপ করিয়া বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থাকিতাম। ফল চুরি করা আর হইত না। নিদাঘের দীর্ঘ দ্বিপ্রহর একাকী চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। কত কি ভাবিতাম, মধ্যে মধ্যে বিচিত্রবর্ণরঞ্জিতপক্ষ প্রজাপতি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিতাম। কখনও দূর হইতে বিহঙ্গের কূজনধ্বনি কানে ভাসিয়া আসিত।

দাদা প্রায়ই ব্যস্ত থাকিতেন। বাবার মৃত্যুর পর দাদার সহসা কি একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সেই সদাপ্রফুল্ল মুখ আর নাই। সর্ব্বদাই বদন চিন্তাক্লিষ্ট। দাদার দপ্তরটিও আর খোলা হয় না। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আচ্ছা, দাদা, সবাই বাড়ী চলে গেল, তুমি কেন গেলে না?" দাদা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন "আমার বাড়ী নেই যে ভাই।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার বাবা নেই, মা নেই?" দাদা অস্পষ্টস্বরে বলিলেন "কেউ নেই।" আমার বুদ্ধি কিছু কিছু হইতেছিল। সহসা চুপ করিলাম। বাবার কথা মনে পড়িল "দাদা বড় অভিমানী।" এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া হয়ত দাদার মনে কষ্ট দিয়াছি। আমার গম্ভীর মুখ দেখিয়া দাদা বলিলেন "ভবভূতি, চ, ঘোষেদের বাড়ী যাই।" আমি বলিলাম "না।"

বিদ্যালঙ্কার দাদা একদিন মাকে বলিলেন "ভবভূতিকে নিয়ে আমি নবদ্বীপে যাই। সেখানে টোলে ভবভূতি পড়াশোনা করুক। এখানে থাক্‌লে আর ত কিছু হবে না।" মা কিন্তু সহজে আমাকে ছাড়িতে চাহিলেন না। চতুষ্পাঠী উঠিয়া যাওয়ার পর মা সংসারের কিছুই দেখিতেন না। সমস্ত দিন আমায় চোখে চোখে রাখিতেন। আমিও মাকে ছাড়িয়া যাইতে রাজী হইলাম না। মাতৃস্নেহের সুশীতল ধারায় আমি প্রাণ ভরিয়া অবগাহন করিতেছিলাম। এতদিন তাহা পাই নাই। আজ তাই এ স্নেহ আমার বড় প্রিয়। কিন্তু তবু মাকে সম্মত হইতে হইল, তবু আমায় মাকে ছাড়িতে

হইল। "বংশের মর্য্যাদা রাখিতে হইবে" বিদ্যালঙ্কার দাদার এ কথা কাটান যায় না।

শেষে একদিন গাছের ডগায় রৌদ্র না পড়িতে পড়িতে আমি দাদার সঙ্গে গ্রাম পরিত্যাগ করিলাম। দ্বারপথে অর্দ্ধদৃশ্যমান মাকে দেখিলাম—তাঁহার নয়নে অবিরাম অশ্রুবর্ষণ দেখিলাম। আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। বিদ্যালঙ্কার দাদা আমার চোখ মুছাইয়া দিলেন। মাঠে কৃষাণ লাঙ্গল দিতেছে দেখাইলেন, ধানের গোলা দেখাইলেন, বৃহৎ শকুনি উড়িতেছে দেখাইলেন। আমি দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাম। কান্না তখন থামিয়া গিয়াছে। কেবল এক-একবার রুদ্ধ শোক সমস্ত দেহখানিকে কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া তুলিতেছিল।

নবদ্বীপের প্রধান অধ্যাপকের টোলে স্থান পাইলাম। তিনি আমার পিতার সুপ্রসিদ্ধ নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন। বিদ্যালঙ্কার দাদাও এই টোলের একজন ছাত্র হইলেন। কিন্তু দাদার বিমর্ষভাব আর ঘুচিল না। পড়া-শোনাতেও আর দাদার সেরূপ উৎসাহ দেখিতে পাইতাম না। বৃহৎ আটচালায় ছাত্রদের পাঠের গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে দাদা বসিয়া থাকিতেন, সামনে পুঁথিও খোলা থাকিত, কিন্তু দাদার চোখ সে দিকে থাকিত না। আমাকেও যেন এই সময় কিসে পাইয়াছিল। পড়াশোনায় আগে হইতেই খুব অল্পই উৎসাহ ছিল। এখানে আসিয়া একরকম উৎসাহের লোপ হইল বলিলেই হয়। নবদ্বীপে আমার সমবয়সী বহু দুরন্ত বালকের সহিত আমার সদ্ভাব হইল। আমাদের উপদ্রবে গ্রামখানি সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

গঙ্গাতীরে মাঝিরা নৌকা বাঁধিয়া চাল ডাল সংগ্রহে বাজারে গিয়াছে, একজন দাঁড়ী নৌকার ভিতর বসিয়া গুন গুন করিয়া গান করিতেছে, হঠাৎ আমাদের বালকের দল গিয়া নৌকার কাছি কাটিয়া দিল। স্রোতে নৌকা ভাসিয়া যাইতে লাগিল। দাঁড়ীর চীৎকারের সহিত আমাদের উচ্চহাস্য নদীর কূলে কূলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

কামারগিন্নি কলসীকক্ষে জল লইয়া গৃহে ফিরিতেছে। 'টং' করিয়া কোথা হইতে একখণ্ড ইষ্টক কলসীর উপর আসিয়া পড়িল! কামারগিন্নির অজস্র গালি আমরা মহানন্দে শ্রবণ করিতে লাগিলাম ও লক্ষ্য ঠিক হইয়াছে বলিয়া গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।

বৃদ্ধ ঘোষজা মহাশয় বড় ভূতের ভয় করিতেন। সন্ধ্যার পর লাঠিগাছটি লইয়া ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে আসিতেছেন। একটা বাঁশঝাড়ের নিম্ন দিয়া যাইতে হইবে। দেখিলেন, একটা বাঁশ রাস্তার উপর পড়িয়া আছে! আমি তখন দড়ি দিয়া প্রাণপণে বাঁশটাকে টানিয়া বাঁধিয়াছি। ঘোষজা মহাশয় আর একটু অগ্রসর হইলেই দড়ি খুলিয়া দিলাম। সটাৎ করিয়া বাঁশটা উপরে উঠিয়া গেল। ঝর্ ঝর্ করিয়া শুকনো পাতায় ঘোষজা মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া গেল। আতঙ্কে তিনি তিন হাত পিছাইয়া গেলেন। আমরা আহ্লাদে আত্মহারা।

কাহারও বড় যত্নের কলমের চারার আম্র, অতি সাবধানে রক্ষিত হইত। রাত্রির মধ্যেই তাহা লুণ্ঠিত হইল। কেহ আমাদের গালি দিয়াছে, তাহার সাধের লাউগাছটির গোড়া ছুরি দিয়া কে কাটিয়া দিয়া গেল। বর্ষাকালে পথিক পথ দিয়া যাইতেছে একস্থানে একটু গর্ত্তে খানিকটা কাদামাখা জল জমিয়া ছিল। পথিক আসিতেই কোথা হইতে একখানা ইট ঝপ করিয়া সেই জলের উপর পড়িল। পথিকের সর্ব্বাঙ্গ কাদায় ভরিয়া গেল।

এইরূপ ভয়ানক উপদ্রব চলিতে লাগিল। সাহসে ও বলে আমি শ্রেষ্ঠ ছিলাম। তা ছাড়া নূতন নূতন দুষ্টামির বুদ্ধি আমার মাথায় যেরূপ খেলিত সেরূপ আর কাহারও হইত না, কাজেই আমি ছিলাম দলপতি। এখানে আমার গুরুদেবের কাছে আমার নামে প্রায়ই নালিশ পৌঁছিত। তিনিও অতিশয় কঠোরপ্রকৃতিব ছিলেন। কেহ আসিয়া নালিশ করিলেই আমাকে কঠোর তিরস্কার ও সময় সময় চড়টা চাপড়টাও দিতেন। কিন্তু তাহাতে ফল এই হইত যে যাহার জন্য আমি তিরস্কার বা প্রহার সহ্য করিতাম প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তাহার উপর আমার অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিত।

বিদ্যালঙ্কার দাদা সস্নেহে অনেকবার আমায় নিষেধ করিতেন। আমি শুনিতাম না। কেহ নালিশ করিতে আসিলে তিনি তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বিদায় করিতেন, গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না। যদি কেহ নিতান্তই তাহার কথা না শুনিত, তাহা হইলে তিনি গুরুদেবের কাছে গিয়া আমার দোষস্খালনের জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতেন। মিথ্যাকথা পর্য্যন্ত বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহাতে আরও আমার সাহস বাড়িতে লাগিল।

সরস্বতী পূজা আসিল। আমাদের টোলে পূজা। ছেলের দলে মহা উল্লাস। ফুলসংগ্রহের ভার আমি গ্রহণ করিলাম। ছেলেদের দলে প্রচার করিয়া দিলাম ডাক্তার সাহেবের বাগান হইতে ফুল সংগ্রহ করিব।

সাহেবের বাগানে অতি সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিত। আমাদের মনে অনেক দিন হইতে উহা সংগ্রহ করিবার স্পৃহা জাগিতেছিল। কিন্তু সাহেব বড় রাগী বলিয়া কেহ সাহস করিয়া সে বাগানে এ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই। কাজেই আমি যখন ছেলেদের কাছে এ প্রস্তাব করিলাম, তখন তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেল। দুই-একজন নিষেধও করিল। কিন্তু আমি বলিলাম যে আমি একাই যাইব। কাহারও সাহায্যে প্রয়োজন নাই। তখন তাহারা আমার সাহসে বিস্মিত হইয়া রহিল। ঠিক করিলাম ভোর না হইতেই ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিব।

সন্ধ্যার পর শয়ন করিলাম, কাহাকেও কিছু বলিলাম না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম ভোর হইবার পূর্ব্বেই উঠিতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, একবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিলাম ঘর অন্ধকার। পাশের ঘরে দীপ জ্বলিতেছে। গুরুদেব ও বিদ্যালঙ্কার দাদার কণ্ঠস্বর শুনিলাম। আমার বড় কৌতূহল হইল। পা টিপিয়া টিপিয়া সেই ঘরের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলাম।

বিদ্যালঙ্কার দাদা বলিতেছেন "এবারকার মত ভবভূতিকে মাপ করুন। ছেলেমানুষ, এখনও বুদ্ধি হয় নি। না হ'লে আর এমন উপদ্রব করে? আমি জেলেনীকে তার সমস্ত মাছের দাম চুকিয়ে দোব।"

সেইদিন সকালে এক জেলেনীর মাছের চুপড়ী উল্‌টাইয়া দিয়াছিলাম। বুঝিলাম সে নালিশ করিয়াছে।

গুরুদেব বলিলেন "দেখ বিদ্যালঙ্কার, তুমি এখান থেকে কিছুদিনের জন্য সরে যাও, না হলে ভবভূতির ভাল হবে না। আমি তাকে শাসন করতে চাই, তোমার আদরে সে শাসনের ফল হয় না। তুমি চলে গেলে ও নিশ্চয়ই ভাল হবে।"

দাদা বলিলেন "দেখুন, ছেলেবেলা থেকে ওকে বড় ভালবাসি। ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। আর ও শুধ্‌রে যাবে। আপনি ওকে বেশী কিছু বল্‌বেন না। আহা, এই বয়সেই পিতৃহীন। ওর বাপ বেঁচে থাকলে আজ ওর ভাবনা কি?"

গুরুদেব বলিলেন "বিদ্যালঙ্কার তুমি আমায় কি মনে কর? ভবভূতির বাপ আমার কতদূর আপনার ছিল তা কি তুমি জান? আমার পিতৃশ্রাদ্ধের সময় এক পয়সাও সঙ্গতি ছিল না। আমি ভবভূতির পিতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করি। আমি কি ভবভূতিকে অযত্ন করি? আমার সমস্ত কাজ এক দিকে ভবভূতি একদিকে। কেবল মুখে শাসন করি বৈ ত নয়। তুমি জেলেনীকে পয়সা দিবে কি বল্‌ছ? আমি তা আগেই দিয়েছি। কিন্তু তুমি থাক্‌লে ভবভূতি অন্যায় আদর পাবে। সেইজন্যই তোমায় তফাতে যেতে আমার অনুরোধ।"

দাদা গুরুদেবের পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন "আমায় মাপ করুন। আমি আপনাকে চিন্‌তে পারি নি। আমি কালই চলে যাব। ভবভূতিকে বল্‌বেন আমি তীর্থে গেছি। তার সঙ্গে আর দেখা কর্‌বো না। আজ রাত থাক্‌তে থাক্‌তে আমি চলে যাব।"

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ঢুকিয়া গুরুদেব ও দাদার পায়ে ধরিয়া বলিলাম "দাদা তুমি আমায় ছেড়ে যেওনা। আমি আজ থেকে আর কোনও উপদ্রব কর্‌বো না প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি। আমায় বিশ্বাস কর।"

দাদা আমার চোখ মুছাইয়া দিলেন। গুরুদেব সস্নেহে

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "ভয় কি? বিদ্যালঙ্কার কোথা যাবে? শোও গে যাও।"

দাদা আমাকে আনিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বার বার দাদাকে বলিতে লাগিলাম "দাদা আমায় ছেড়ে যেও না।" দাদা বলিলেন "পাগল নাকি, আমি কোথায় যাব?"

কিছুক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িলাম। একবার রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। হঠাৎ মনে হইল ফুল আনিতে হইবে যে! কাল সরস্বতী পূজা। ছেলেদের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আজ সাহেবের বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আনিব। তখন গুরুদেব ও দাদার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি তাহাও মনে পড়িল। একবার ভাবিলাম আর ফুল তুলিতে যাইব না। আজ হইতে আর কোনও দুষ্টামি করিব না। আবার ভাবিলাম ছেলেরা তাহা হইলে কি বলিবে? তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে ভয়ে আমি ফুল আনিতে সাহস করি নাই। না—ফুল আনিতেই হইবে। কাল ছেলেদের ফুল দেখাইয়া স্পষ্ট করিয়া বলিব যে আমার দ্বারা আর কোনও উপদ্রব হইবে না।

এই সঙ্কল্প করিয়া ধীরে ধীরে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম। আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ীর বাহির হইলাম। তখন কত রাত্রি জানি না। আকাশ-ভরা তারা ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। শীতকাল, খুব ঠাণ্ডা বাতাসে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। র্যাপারখানি গায়ে জড়াইয়া সাহেবের বাগানের দিকে দ্রুতবেগে চলিলাম।

সাহেবের বাগানের ফটক ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। প্রচীর বেশী উঁচু নয় । বাগানের মাঝখানে একটি ছোট বাঙ্গলা। চারিদিক নিস্তব্ধ। সকলেই ঘুমাইতেছে! আমি প্রাচীরে উঠিয়া ভিতরে লাফাইয়া পড়িলাম।

ঘড়্ ঘড়্ করিয়া কতকগুলি টিন্ নড়িয়া উঠিল। রান্নাঘরের ছাউনির জন্য সাহেব টিন্ আনাইয়াছিলেন লাফাইতে গিয়া তাহার উপরই পড়িয়াছি। পায়ে দারুণ আঘাত লাগিল। অতি কষ্টে দু এক পা অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি একটা চাঁপাগাছের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। কুকুরটা ছুটিয়া আসিল। তীব্রকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল। পিছনদিকে ঝপ্ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। কুকুরের ভয়ে আমি গাছে উঠিয়া পড়িলাম। কুকুরটা গাছের গোড়ায় দাঁড়াইয়া উর্দ্ধমুখে ডাকিতে লাগিল।

কে একজন সাদা কাপড় গায়ে গাছের দিকে আসিল। বাড়ীর একটী জানালা খুলিয়া গেল। সাহেব হাঁকিলেন "কোন্ হ্যায়?" বাগানের অপর প্রান্ত হইতে কে বলিল "হুজুর, ডাকু হোগা।"

গাছের নিম্নে যে আসিয়াছিল, সে বলিল "ভবভূতি, পালিয়ে আয়।" কি সর্ব্বনাশ! এ যে বিদ্যালঙ্কার দাদা। কুকুরটা তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সহসা গুড়ুম করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল। বিদ্যালঙ্কার দাদা পড়িয়া গেলেন। আমি গাছ হইতে লাফাইয়া তাঁহার উপর পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। কুকুরটা ক্ষিপ্তভাবে ডাকিতে লাগিল।

আলো লইয়া সাহেব, চাপ্‌রাসী প্রভৃতি আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। দাদা বলিল "ভবভূতি, আর এ রকম করিস্ নি। আমায় মনে রাখিস্। বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিস্।"

সেই মুহূর্ত্তে আমার জীবনের পরিবর্ত্তন—সেই মুহূর্ত্তে দাদার জীবনশূন্য দেহ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম জীবনে আর ফুল স্পর্শ করিব না।—দাদার স্মৃতিরক্ষা করিয়াছি—এতে আমার অখ্যাতি হয় হোক্—সর্ব্বনাশ হয় হোক্—

ছাত্ররা আর বলিতে দিল না। নৃপেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "পণ্ডিত মহাশয় আমাকে মাপ করুন। আমি নরাধম।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সস্নেহে নৃপেনের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "রাত হয়েছে। বাড়ী যাও।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

চিরগত

তীরের মতন তূর্ণ, অন্তর ছাড়িয়া
আমার সকল চিন্তা গিয়াছে উড়িয়া
তোমারি সন্ধানে, হায়, ফিরিবে না আর
শূন্য বক্ষ-তুণ পূর্ণ করিয়া আবার।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

শতবার্ষিকী

[৺প্যারীচাঁদ মিত্রের শততম
জন্মদিনে রচিত]

সোজাসুজি শাঁখা শাড়ী সিঁদুরে কাজলে
সাজালে হে স্বদেশের সরস্বতীটিরে,
বিনা আড়ম্বরে আহা নিজ বুক চিরে
আলতা পরালে দুটি চরণ-কমলে।

আনন্দ-কুন্দের মালা গেঁথে কুতূহলে
দিলে গলে ; কুন্দফুলে অঙ্গ দিলে ঘিরে ;
আয়ীর বাউটি খুটে দেখিলে না ফিরে
রহিল সে সংস্কৃতের সিন্দুকের তলে।

যে বলে গো বাঙ্‌লা বুলি বোঝে সে তোমারে,
তোমারে দলিতে নারে সময়ের চাকা ;
বাঙালীর সরস্বতী-মন্দিরের দ্বারে
বিদেশী যাত্রীর পক্ষে পাণ্ডা তুমি পাকা।

সহজে নিয়েছ কেড়ে স্বদেশের হিয়া,
সহজ ভাষার প্রেমে তুমি সহজিয়া।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর)।

বাঙ্গালীর কয়েকটি বিশেষত্ব

ভারতের অন্য জাতির সহিত তুলনায় বাঙ্গালীদিগের অনেক বিষয়ে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রথমতঃ ভাষায়। ভারতের প্রায় সব প্রচলিত ভাষার বিশেষণ-শব্দের লিঙ্গভেদ আছে। কোন কোন ভাষায় ক্রিয়াপদের বা তাহার অংশের লিঙ্গভেদ আছে। খাঁটী বাঙ্গলা ভাষায় সেরূপ নাই। এই কারণে বাঙ্গলা-ভাষার ব্যাকরণ অত্যন্ত সরল। যে-সকল ভাষায় লিঙ্গভেদের আতিশয্য নাই, প্রায় সেই-সকল ভাষাই দুরব্যাপী হয়। ইংরেজী ও পারসী ভাষা ইহার প্রমাণ। বাঙ্গলা ভাষায় যাহাতে লিঙ্গভেদের বাহুল্য না ঘটে তাহার জন্য বাঙ্গালীদিগের সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালীদিগের পরিচ্ছদ। বাঙ্গালী ভিন্ন ভারতের সব জাতির মস্তকাবরণ আছে। প্রাচীনকালে রোমবাসীদিগের মস্তকাবরণ ছিল না। মস্তকাবরণের কোন প্রয়োজন নাই। ইহাতে কেবল অযথা ব্যয় হয়। মস্তকাবরণ স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকারী নহে।

তৃতীয়তঃ, বঙ্গদেশে সংস্কৃত-চর্চ্চা। বঙ্গদেশের বাহিরে সব প্রদেশে পাণিনির ব্যাকরণ পঠিত হয়। কিন্তু বঙ্গদেশে মুগ্ধবোধ ও কাতন্ত্র-ব্যাকরণ পড়িয়া লোকেরা

সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যলাভ করে। পাণিনির ব্যাকরণে অধিকার লাভ করিতে হইলে জীবনের ১২ বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। কিন্তু অত পরিশ্রমের যে কি ফল তাহা কাশীর পণ্ডিতদিগকে দেখিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। যত সহজে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতে পারা যায়, ততই ভাল। এবিষয়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ব্যাকরণ-কৌমুদীর মত ভারতের অন্য কোন ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ রচিত হয় নাই ইহাতে যে তিনি বঙ্গদেশের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। শিক্ষিত বাঙ্গালীরা মৃত সংস্কৃতভাষায় রচনাদি না করিয়া প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তাহার ইহা একটী অন্যতম কারণ।

চতুর্থতঃ, বঙ্গদেশে নব্য ন্যায়ের সৃষ্টি। ভারতের অন্যত্র সর্ব্বস্থানে গৌতমের ন্যায়সূত্রের প্রচলন। কিন্তু বঙ্গদেশে নব্যন্যায়ের। এই নব্যন্যায় বাঙ্গালীদিগের বিশেষ গৌরবস্থল।

পঞ্চমতঃ, বাঙ্গালী হিন্দুদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় আইন, অন্যান্য প্রদেশ হইতে ভিন্ন। বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে মিতাক্ষরা প্রচলিত। কিন্তু বঙ্গদেশে উহার প্রচলন না থাকাতে বাঙ্গালীদিগের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

ষষ্ঠতঃ, বর্ষ ও মাসগণনা। বঙ্গদেশের পঞ্জিকা অন্য প্রদেশের পঞ্জিকা হইতে স্বতন্ত্র। অন্যদেশের পঞ্জিকা চন্দ্রের গতির উপর স্থাপিত। কিন্তু আমাদের তাহার বিপরীত। ইহা সূর্য্যের গতির উপর স্থাপিত। এই জন্য ইহা বেশী বিজ্ঞান-সম্মত।

সপ্তমতঃ, ধর্ম্ম। ভারতের অন্যত্র প্রায় বেশীরভাগ অদ্বৈতবাদ দেখা যায়। বঙ্গদেশ দ্বৈতবাদী। এই জন্য এই প্রদেশে ভক্তিমার্গ যত অগ্রসর, অন্য কুত্রাপি তত নহে।

বাঙ্গালীদিগের যে উন্নতি আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূলে এই-সকল কারণ বিদ্যমান থাকিতে পারে।

শ্রীবামনদাস বসু।

সিয়াপা

কানপুরের ক্ষেত্রীসমাজে কোন ভাগ্যবান বৃদ্ধ বা ভাগ্যবতী বৃদ্ধা সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত হইলে শবাধার প্রস্তুতের ফরমাস দেওয়া হয়। এইরূপ শবাধার কেবল দিল্লীতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। শবাধারটি দেখিতে অতি সুদৃশ্য, নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত, কৃত্রিমপুষ্পশোভিত, ঠিক একখানি চিত্রের মত। বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার মৃত্যু হইলে তাহার যে-যেখানে আত্মীয়-স্বজন আছে সকলে আসিয়া সমবেত হয়, এবং নানারূপ ছদ্মবেশে সাজিয়া শবের সহিত শোভাযাত্রা করে। কেহবা সাজে রাজা, কেহবা রাণী—ঝাঁসির রাণী এদেশে অতি পূজনীয়া; রাণী সাজিতে হইলে ঝাঁসীর রাণীই সাজে—কেহবা আর কিছু সাজিয়া, চার পাঁচ দল বাজনা বাজাইয়া শবের অগ্রে ও পশ্চাতে যায়। বাড়ীর রমণীগণও আপাদমস্তক আভরণে ভূষিতা হইয়া নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত বহুমূল্য বসন পরিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে পশ্চাতে যান। কানপুর ভিন্ন আর কোথাও বাড়ীর রমণীগণকে শবের সহিত যাইতে দেখি নাই, বা এ প্রথা অন্য কোন স্থানে প্রচলিত আছে এমনও শুনি নাই।

দাহান্তে সকলে স্নান করিবার পর রমণীগণ হাতের চুড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এস্থলে বলা আবশ্যক পশ্চিম প্রদেশে ধনী রমণীরাও হাতে দুই-চারি গাছি কাঁচের চুড়ী পরেন। দশ দিন পর্য্যন্ত অশৌচ থাকে। শোকগ্রস্ত পরিবারে মাতা বা জননীস্থানীয়া অন্যান্য নারীগণ বারো দিন পর্য্যন্ত মলিন বস্ত্র পরিয়া থাকেন। যদি কেহ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি পরেন তাহা হইলে তাঁহাকে নারীসমাজে অত্যন্ত নিন্দনীয় হইতে হয়। অশৌচের দশদিন বাড়ীতে রন্ধনাদি হয় না; যে-সকল আত্মীয় সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তাঁহারা এত প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন লইয়া আসেন যে তাহাতেই দুই বেলার আহার চলে। মিষ্টান্ন আনিতেই হয়, ইহাই বিধি।

বিবাহিতা কন্যার মাতৃবিয়োগ হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কন্যা বক্ষে

করাঘাত করিতে করিতে নিম্নলিখিত কথায় শোক প্রকাশ করে। "ওমা তুমি কোথায় গেলে? অন্যবারে আমি আসিলে যে তুমি দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতে; আসিবামাত্র আমাকে আদর করিতে! আজ আমি তোমার জন্য এত কাঁদিতেছি একবার আসিতেছ না কেন? একবার এস, তোমার অভাগিনী কন্যাকে একবার আদর কর! মাগো, তুমি ত এত নিষ্ঠুর ছিলে না, তবে আজ এত কাঁদিতেছি একবারও আসিতেছ না কেন?" ইত্যাদি। উপস্থিত আত্মীয়গণ ও নাপিতানী নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিতে থাকে কিন্তু শোককাতরা বালিকার মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না।

এইরূপে সাক্ষাৎ করিতে আসায় যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ পায় স্বীকার করি, কিন্তু ইহাতে একটি অনিষ্টজনক ফল ফলে। কোন সংক্রামক রোগে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার মৃত্যু হইলেও কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসা বন্ধ করেন না। আত্মীয় যদি দূরদেশে থাকেন তাহা হইলেও এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহাকে আসিতেই হইবে। মৃতব্যক্তির জীবদ্দশায় যাঁহারা তাঁহার সাহায্য করিতে বিমুখ ছিলেন মৃত্যুর পর তাঁহারাও মহোৎসাহে "সিয়াপা" করিতে যান। জননী ও গৃহিণীগণ আপনাদের কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়াও "সিয়াপা"তে যোগ দেন। সেখানে বসিয়া তাঁহারা পরনিন্দা পরচর্চ্চা করিতেও ত্রুটী করেন না। কিন্তু কেহ যদি সংবাদ পাইয়াও "সিয়াপা" করিতে না আসে তাহা হইলে তাহার আর কলঙ্কের অবধি থাকে না। এজন্য সহানুভূতি জানাইতে গিয়া অনেকেই রোগের বীজ লইয়া আসেন এবং আত্মীয়-পরিজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালে দেহত্যাগ করেন। এই প্রথা সমাজে এত অধিক প্রচলিত যে তাঁহারা ইহার অনিষ্টকর ফল বুঝিতে পারেন না। আজকাল অনেক বিবেচক ব্যক্তি সমাজের এই-সকল অনিষ্টকর প্রথা দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীকাননকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভীমের পা

দিল্লীনগরীর উত্তর প্রান্তে একটী নাতিক্ষুদ্র পাহাড় দৃষ্ট হয়। এই পাহাড় সহরের পশ্চিমপার্শ্ব ভেদ করিয়া বক্রগতিতে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। সহরের পুরোভাগে অবস্থিত বলিয়া এস্থান হইতে সহর ও চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের দৃশ্য অতিশয় সুদৃশ্য ও মনোরম। সম্প্রতি এই পাহাড়ের একস্থানে শিলাপৃষ্ঠে এক মনুষ্য-পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। চিহ্নটী দক্ষিণপদের। হঠাৎ দৃষ্টিতেই পাঁচটি আঙ্গুল, চরণের মধ্যভাগ ও গোড়ালীর চিহ্ন বেশ গভীর ও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পদচিহ্নটীর দৈর্ঘ্য ৩২ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১০ ইঞ্চি। যে বৃহৎ শিলাখণ্ড এই বিরাট পদচিহ্ন বুকে ধারণ করিয়া এতকাল লোকলোচনের অন্তরালে ছিল তাহা পাহাড়ের সর্ব্ব প্রান্তভাগে উজিরাবাদ রোডের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। ইহার আকৃতি এমন স্বাভাবিক রকমের যে দেখিয়া কোনো মতেই কৃত্রিম বলিয়া ধারণা হয় না। অনেকের ধারণা উহা মধ্যম পাণ্ডব মহাবীর ভীমসেনের পদচিহ্ন, এবং জনসাধারণ উহাকে এই নামেই অভিহিত করিতেছেন। এইরূপ ভীম-পদ মহাকায় ভীমসেনের না হইয়া আর কাহার হইতে পারে? সাধারণের বিশ্বাস, মধ্যম পাণ্ডব এই শিলাতলে একপদের উপর দাঁড়াইয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। একাদিক্রমে দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান থাকায় প্রস্তরে তাঁহার পদচিহ্ন অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।

সকলেই কিন্তু ইহা স্বীকার করেন না। দিল্লীর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বাঁকেরায় নবল গোস্বামী মহোদয় যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে চান যে, চিহ্নটী পাণ্ডবগণের সময়কালীন বটে, কিন্তু উহা পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন—ভীমের নহে। ঠিক ঐ প্রকারের একটী চিহ্ন গয়ার পাহাড়ে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বিষ্ণুপদ নামে অভিহিত। এবং চিত্রকূটেও আর একটী চিহ্ন আছে, তাহাকে কৃষ্ণপদ বলা হয়। তাহার সহিতও বর্ত্তমান এই চিহ্নটীর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। সুতরাং উহাকে ভীমের পদচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার কোনোও হেতু নাই।

ভীমের পা।

অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া বনবিহার মানসে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন, এবং ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনাতীরে এক রমণীয় স্থানে উপনীত হন। তথায় কালিন্দীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও মিলন হয়। যে স্থানে তাঁহাদের মিলন হইয়াছিল বলিয়া কথিত, তথায় বর্ত্তমানে একটী ক্ষুদ্র-গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা যেখানে পদচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই গ্রামটী তাহার উত্তরভাগে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ বরবেশ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই গ্রামের নাম বরমুরারী—বর্ত্তমানে উহাকে বুরারী বলা হয়। গোস্বামী মহাশয় বলেন এই পদচিহ্নটী শ্রীকৃষ্ণ-কালিন্দীর মিলন উপলক্ষ্যেও প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

এই বিষয় লইয়া এখন নানা মুনির নানা মত। মতামত যাহাই হউক, লোকে কিন্তু ইহাকে ভীমের পদচিহ্ন বলিয়াই বিশ্বাস করে।

এই পদচিহ্নের সন্নিকটে আরও দুই একটী প্রাচীন কীর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্থানের প্রায় ৪০০ গজ দূরে যমুনাতীরে শিখদিগের একটী প্রাচীন মঠ আছে।

ইহা যে শ্রীকৃষ্ণেরই পদচিহ্ন, সে বিষয়ে তিনি আরও দুইটী যুক্তি দেখাইতেছেন। তিনি বলেন, কোনোও অবতার বা বীরবিশেষের স্মৃতি তাঁহার মূর্ত্তি বা পদচিহ্ন প্রভৃতি স্থাপন দ্বারা স্মরণীয় করিয়া রাখা হিন্দুদিগের এক প্রাচীন রীতি। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ নানা স্থানে নানা লীলা দেখাইয়াছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বপ্রথমে পূজা পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই লীলা স্মরণ করিয়া রাখিবার জন্য ভক্তগণ-কর্ত্তৃক এইভাবে তাঁহার চরণ প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখা আদৌ বিস্ময়কর ছিল না।

কালিন্দীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ শ্রীকৃষ্ণের এক ক্ষুদ্র লীলা। পুরাণে উক্ত আছে যে, ভগবান সূর্য্যের কন্যা কালিন্দী শ্রীকৃষ্ণকে পতি কামনা করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি যমুনাগর্ভে নির্ম্মিত এক ভবনে বাস করিতেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে কিছুকাল অবস্থান করেন। বর্ষার এক শান্ত নির্ম্মল দিবসে তিনি প্রিয় সখা

মজনুকা টীলা।

এই মঠটীকে "মজ্‌নু কা টীলা" (মজ্‌নুর মঞ্চ) বলা হইয়া থাকে। মজ্‌নুর নাম করিলে, আরবদেশের উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক-প্রেমিকা লয়লা-মজ্‌নুর কথা মনে পড়ে। সাধারণতঃ লোকে ইহাকে তাহাদেরই স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া ভ্রমে পড়িয়া থাকে। ভ্রম হইবার কারণও আছে। মজ্‌নু নাম যাবনিক। শিখসম্প্রদায়ের মঠ এই যাবনিক নামে কেন অভিহিত করা হয় তাহাও এক সমস্যার বিষয়। ইতিহাস এই সামান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু লেখে না, মঠের বর্ত্তমান অধিস্বামী এ সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা বলেন তাহা এই।

শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা গুরুনানক এক সময়ে দিল্লীতে আগমন করেন। তাঁহার এই আগমনবার্ত্তা কেহ জানিত না। তিনি যমুনার তীরদেশে এক জঙ্গলাবৃত স্থানে কতিপয় অনুচর সহ অবস্থান করিতে থাকেন। নিকটে এক খেয়াঘাট ছিল। যে ব্যক্তি তথায় নৌকা চালাইত, ভাগ্যক্রমে সে একদিন তাঁহার দর্শন পায়। মহাপুরুষের দর্শনে তাহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, ও সে তাহার নৌকা এবং গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করে। ঘটনাক্রমে একদিন বাদশাহের হস্তী এই অরণ্যে আসিয়া হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হস্তীচালক হস্তীর আকস্মিক মৃত্যুতে নিজের বিপদাশঙ্কা করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। তাহার ক্রন্দনধ্বনি গুরুনানকের কর্ণগোচর হয়। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া হস্তীচালকের কাতর-ক্রন্দনে বিচলিত হইলেন ও মৃতহস্তী পুনরুজ্জীবিত করিলেন। এই সংবাদ বাদশাহের গোচর করা হইলে তিনি এই অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, হস্তী স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু যাহাকে তিনি দেখিতে চান তিনি নাই। তখন চারিদিকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করা হইল, কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি তখন ভক্তগণে বেষ্টিত হইয়া নাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন। বাদশাহ তাঁহার সম্মুখীন হইয়া করযোড়ে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন। গুরুজী তাঁহার উপর প্রসন্ন হইলেন। বাদশাহ অশেষপ্রকারে তাঁহার স্তুতিবন্দনা করিয়া তাঁহাকে সাত খানি গ্রাম জায়গীর লইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এই ভূসম্পত্তিতে তাঁহার কোনোও প্রয়োজন ছিল না। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু বাদশাহ কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। এই মহাত্মার সেবায় কিঞ্চিৎ অর্পণ না করিয়া কোনোমতেই তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। সাত খানি গ্রামের পরিবর্ত্তে সাত বিঘা ভূমি একখানি দানপত্রে লিখিয়া তিনি গুরুজীর চরণে অর্পণ করিলেন। বাদশাহের দান পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। এইবার তিনি উহা গ্রহণ করিলে বাদশাহ হৃষ্টচিত্তে বিদায় হইলেন। কিন্তু তিনি বিষয়লালসা-শূন্য সংসারমুক্ত পুরুষ—বিষয়ে তাঁহার কি প্রয়োজন! দানপত্রাদি তিনি তাঁহার প্রধান অনুচর বালার হস্তে প্রদান করিয়া তাঁহাকে এই সম্পত্তি গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ বালা এই আদেশে প্রমাদ গণিলেন। গুরু ভিন্ন তিনি কিছুই জানেন না—গুরুধ্যান, গুরুজ্ঞান—গুরুর অদর্শনে তাঁহার পলকে প্রলয়জ্ঞান হয়। তিনি কিরূপে গুরুর সঙ্গ ছাড়িয়া এই তুচ্ছ ভোগে লিপ্ত হইতে পারেন। নয়নের অশ্রু ও মুখের কাতরতা তাঁহার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিল। ভক্তের মনোভাব গুরু বুঝিতে পারিলেন। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি নৌচালকের কাজ করিত এবং যে নৌকা ও গৃহ পরিত্যগ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিল, গুরুজী তখন তাহার হস্তে দানপত্র দিলেন ও তাহাকে উহা লইতে আদেশ করিলেন। সে ত কাঁদিয়াই আকুল হইল। "প্রভু যদি দয়া করিয়া চরণে স্থান দিয়াছেন, আবার কেন বিমুখ হন। আমি যে আপনার চিরসহচর হইব বলিয়া জন্মের মত গৃহত্যাগ করিয়াছি।" গুরুজী তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন "আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি ভগবৎ-প্রেমে 'মজ্‌নু*' হইয়া যাও। আজ হইতে তোমার নাম মজ্‌নু। কাল যখন বাদশাহ আসিবেন তখন তাঁহাকে বলিবে তোমার নাম মজ্‌নু। অতঃপর তুমি এই নামেই অভিহিত হইবে। আমার ইচ্ছায় তুমি এইখানেই থাক। এই স্থানেই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ

* 'মজ্‌নু' পারসী শব্দ—অর্থ পাগল। যে ব্যক্তি প্রেমে পাগল হয় তাহাকে মজ্‌নু বলে।

হইবে ও তুমি শান্তি পাইবে।" এই বলিয়া তিনি অন্যান্য সহচরদিগকে লইয়া তদ্দণ্ডে সেইস্থান ত্যাগ করিলেন। পরদিন বাদশাহ আসিয়া দেখিলেন সব শূন্য—কেবল একজন মাত্র রহিয়াছেন—তিনি মজনু। মজনু তাঁহাকে গুরুজীর প্রস্থানবার্ত্তা শুনাইয়া দানপত্রখানি দেখাইলেন। গুরুর আদেশে ও বাদশাহের অনুরোধে মজনু এইখানে মঠস্থাপনা করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তদবধি সেইস্থান 'মজনু কা টীলা' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মজনুর দেহত্যাগের পর এখানে তাঁহার সমাধিভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। সমাধিভবনটী আকারে ক্ষুদ্র হইলেও প্রাচীন স্থাপত্যপ্রণালী অনুসারে নির্ম্মিত। ইহার ছাদ ইষ্টকনির্ম্মিত ও সমতল, কিন্তু তাহাতে লৌহ বা কাষ্ঠের অবলম্বনমাত্র নাই। গৃহাভ্যন্তরে ঠিক মধ্যস্থলে প্রস্তর-গঠিত মজনুর সমাধি। গৃহটী সমচতুষ্কোণ এবং উপরিভাগে মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র গম্বুজ আছে। ইহা যমুনার তীরদেশে উচ্চভূমির উপর অবস্থিত। ইহার সংলগ্ন অন্যান্য গৃহ মঠরূপে ব্যবহৃত হয়। এখানে মঠের বর্ত্তমান অধিস্বামী বাস করিয়া থাকেন।

এখানে প্রাচীন কীর্ত্তি আর কিছুই বর্ত্তমান নাই। কেবল মজনুর সমাধি-ভবনের পশ্চাদ্ভাগে একটী কূপ বিদ্যমান আছে। শিখসম্প্রদায় এই কূপটীকে অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কথিত আছে শিখদের ষষ্ঠগুরু হররায়ের পুত্র রামরায় এক সময়ে দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। সম্রাট ঔরংজীব তখন দিল্লীর সিংহাসনে। তিনি শুনিয়াছিলেন রামরায় অনেক অমানুষী কার্য্য দেখাইতে পারেন। তিনি তাঁহার অজ্ঞাতে এই কূপের উপরিভাগ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট করেন। উদ্দেশ্য, তাঁহার শক্তি পরীক্ষা করা—তিনি যদি অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন না হন, তবে আসন গ্রহণ করিতে গিয়া কূপমধ্যে নিপতিত হইবেন। কিন্তু সম্রাটের এই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। তিনি নির্ব্বিঘ্নে কূপের উপর আসন গ্রহণ করিলে সম্রাট তাঁহার এই দৈবশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত ও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কথিত আছে রামরায় বাদশাহকে এই-প্রকারের আরও অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইয়া-ছিলেন। শিখদের ধর্ম্মগ্রন্থে উক্ত আছে যে তিনি এইসময় সর্ব্বসুদ্ধ ৭২টী 'কেরামাৎ' দেখাইয়াছিলেন। বাদশাহ এই উপলক্ষে অতিশয় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বিস্তর জায়গীর দান করেন। কিন্তু এই ঘটনার পরেই রামরায় শিখ-সম্প্রদায়-চ্যুত হন।

'মজনু-টীলা'র প্রায় ২০০ গজ উত্তরে একটী ক্ষুদ্র আকারের মিনার দৃষ্ট হয়। মজনু-টীলার অতি সন্নিকটে বলিয়া ইহাকে প্রসিদ্ধ লয়লা মজনুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য লয়লার সমাধিমঞ্চ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ লয়লার সঙ্গে ইহার কোনোও সম্পর্ক নাই।

প্রাচীন মসজিদের ভগ্নাবশেষ।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তৈমুরলঙ্গ দিল্লী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া তথায় তাঁহার উজীরকে রাখিয়া যান। সেই সময় এখানে একটি মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়, এবং তৈমুরলঙ্গের নামানুযায়ী এ স্থানের নাম টিমারপুর রাখা হয়। যে মিনারটী এখন বিদ্যমান আছে, অনেকের বিশ্বাস ইহা সেই মস্‌জিদেরই ভগ্নাবশেষ। কালপ্রভাবে মস্‌জিদটী ধ্বংস হইয়া এক্ষণে মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইয়াছে, কেবল এই মিনারটী প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ এখনও দাঁড়াইয়া আছে। বাস্তবিক ইহার আকার ও গঠন দেখিয়া ইহাকে

কোনোও এক মস্‌জিদের মিনার বলিয়াই মনে হয়। শুনা যায় তৎকালে যমুনার গতি এস্থানের 'অনেক দূরে ছিল। এখন এই মিনারটীর মূলদেশ দিয়া যমুনা প্রবাহিতা হইতেছে, এবং বর্ষার প্লাবনে ইহার ভিত্তিগাত্র ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আরও কিছুকাল এইরূপ অবস্থায় থাকিলে ইহা যমুনা-গর্ভে বিলীন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বে এই-সকল স্থান ভীষণ জঙ্গলপূর্ণ ছিল। হিংস্রজন্তুর ভয়ে তখন এ অঞ্চলে কেহ যাতায়াত করিত না। এখন কিন্তু জঙ্গলের চিহ্নমাত্রও নাই। যে স্থানে পদচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অতি সন্নিকটে পশ্চিম ভাগের সমতলভূমিতে বহুদূর ব্যাপিয়া দেশীয় কেরাণীগণের জন্য বিস্তর আবাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং ইহার দক্ষিণদিকে কিছুদূরে সরকার বাহাদুরের নবনির্ম্মিত বিরাট 'সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং' (Secretariat Buildings) শোভা পাইতেছে।

প্রস্তরগাত্রে পদচিহ্ন দেখিবার জন্য প্রত্যহ বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে এবং অনেকে ভক্তিভাবে উহার পূজা-বন্দনাও করিয়া থাকে। সরকার হইতে এই স্থানটী সুরক্ষিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইবে।

দিল্লী হিন্দুর কীর্ত্তিস্থল—মুসলমানের লীলাভূমি। এখানে বহুজাতির উত্থান ও পতন হইয়াছে, কালপ্রভাবে ইহার চতুঃপার্শ্ব এখন মহাশ্মশানে পরিণত। এই মহাশ্মশানের প্রতি চাহিয়া অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিলে চক্ষে জল আসে—হৃদয় বিকম্পিত হয়। ইহার কোন্ স্থানে কোন্ প্রাচীন স্মৃতি কি ভাবে রহিয়াছে কে তাহার নির্ণয় করিবে! নব-রাজধানী নির্ম্মাণের জন্য ইহার বহুস্থান এক্ষণে ভগ্ন ও খনন করা হইতেছে—এই সুযোগে অনুসন্ধান করিলে বহুতথ্যের আবিষ্কার হইতে পারে।

দিল্লী। শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

ধর্ম্মপাল

[বরেন্দ্রমণ্ডলের মহারাজ গোপালদেব ও তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক ভগ্নমন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে দস্যুলুণ্ঠিত এক গ্রামের ভীষণ দৃশ্য দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন দুর্গে লইয়া যান।

সন্ন্যাসীর নিকট সংবাদ আসিল যে গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্যে আসিতেছেন; অথচ দুর্গে সৈন্যবল নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার এক অনুচরকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধর্ম্মপালদেব দুর্গরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্গ শীঘ্রই শত্রুর হস্তগত হইল। তখন দুর্গস্বামিনীর কন্যা কল্যাণী দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পিঠে বাঁধিয়া ধর্ম্মপাল দেব দুর্গ হইতে লম্ফ দিয়া পলায়ন করিলেন। ঠিক সেই সময় উদ্ধারণপুরের দুর্গস্বামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ ঘোষকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। তখন সন্ন্যাসী তাঁহার শিষ্য অমৃতানন্দকে যুবরাজ ও কল্যাণী দেবের সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। এদিকে গৌড়ে সংবাদ পৌঁছিল যে মহারাজ ও যুবরাজ নৌকাডুবির পর সপ্তগ্রামে পৌঁছিয়াছেন গৌড় হইতে মহারাজকে খুঁজিবার জন্য দুই দল সৈন্য প্রেরিত হইল। পথে ধর্ম্মপাল কল্যাণী দেবীকে লইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

বিচার ও দণ্ড

দুই দিনের মধ্যে ধর্ম্মপালদেবের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অমৃতানন্দ প্রভৃতি যাহারা তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে গিয়াছিল, তাহাদিগের অনেকেই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু অমৃতানন্দ তখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। প্রভাতে দুর্গদ্বারের সম্মুখে বৃক্ষতলে গোপালদেব, সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ, উদ্ধবঘোষ ও কমলসিংহ উপবেশন করিয়া আছেন। গোপালদেব চিন্তাকুল, অপর সকলেই বিষণ্ণ। কিয়ৎক্ষণ পরে গোপালদেব কহিলেন "প্রভু, আর কতদিন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব। ধর্ম্ম নাই। সে জীবিত থাকিলে ফিরিয়া আসিত, না হয় সংবাদ দিত।" সন্ন্যাসী কহিলেন "মহারাজ! আর একদিন অপেক্ষা করুন, অমৃত ফিরিয়া আসুক।" গোপালদেব অত্যন্ত হতাশভাবে কহিলেন "তবে তাহাই হউক।" এবং পরক্ষণেই গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। তাহা দেখিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন "মহারাজ! একটি কার্য্য স্থগিত রাখা উচিত হইতেছে না।" গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "কি?"

"নারায়ণ ঘোষের বিচার।"

"কিসের বিচার প্রভু? কেমন করিয়া বিচার হইবে?"

"এই অরাজকদেশে রাজশক্তি অবসন্ন দেখিয়া দুর্ব্বৃত্ত ভূস্বামীগণ যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে তাহার ফল স্বচক্ষে বার বার দেখিয়াছেন। দুরাচার হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য আমরা সুযোগ পাইলেই ইহাদিগকে দণ্ড দিয়া থাকি। অপরাধীর সমপদস্থ দুই তিনজন ভূস্বামী বিচার করিয়া থাকেন এবং সাধারণের সমক্ষে দণ্ডবিধান হইয়া থাকে। নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও দেশে শান্তিস্থাপন করিতে পারি নাই। দক্ষিণে ঢেক্করীয়রাজ ও উত্তরে বনবাসী বর্ব্বরজাতি অপরাধীগণকে আশ্রয় দিয়া তাহাদিগের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি করে। বিলম্ব হইলে নূতন বিপদ আসিতে পারে, অতএব অনুমতি করুন অদ্যই বিচার হউক।"

"আমার অনুমতির কি আবশ্যক প্রভু? আমি অতিথি মাত্র।"

"মহারাজ, আপনি একজন প্রধান সাক্ষী।"

"উত্তম, যাহা দেখিয়াছি তাহা বিচারকের সম্মুখে জানাইব।"

সন্ন্যাসীর আদেশে গঙ্গাতীরে অশ্বত্থবৃক্ষতলে আসন বিস্তীর্ণ হইল, কমলসিংহ, বিশ্বানন্দ ও উদ্ধবঘোষ তাহার উপরে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদিগের সম্মুখে দ্বিতীয় আসনে গোপালদেব উপবেশন করিলেন। কয়েকজন সেনা দুর্গমধ্য হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ নারায়ণ ঘোষকে লইয়া আসিল। বন্দী আসিলে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নারায়ণ, আমরা তোমার বিচার করিব, তুমি শপথ কর মিথ্যা কহিবে না।" নারায়ণঘোষ বিকট হাস্য করিয়া কহিল, "তুই বিচার করিবার কে?" কমলসিংহ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "শপথ করিবে কিনা বল।" নারায়ণ ঘোষ শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্ত দেখাইয়া কহিল, "শিকল ছুঁইয়া শপথ করিব না কি?" সন্ন্যাসীর আদেশে নারায়ণ ঘোষ বন্ধনমুক্ত হইল, কিন্তু শপথ করিল না। তখন গোপালদেব কহিলেন, "আমরা ত গঙ্গাগর্ভে বসিয়া রহিয়াছি, শপথ করিবার আবশ্যকতা কি?" নারায়ণ ঘৃণার সহিত নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিল। গোপালদেব তাহার রকম দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, ঐই ব্যক্তি কি পাগল?" সন্ন্যাসী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "পাগল নহে, কৃষ্ণসর্প।"

"গঙ্গাজলের প্রতি এরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে কেন?"

"নারায়ণ বজ্রজ্ঞানীয় বৌদ্ধ।"

"আমরা কি বৌদ্ধ নহি?"

"তোমরা যে মহাযান মতাবলম্বী।"

"তবে বোধ হয় এই ব্যক্তি শপথ করিবে না।"

"না করুক।"

অতঃপর সন্ন্যাসী নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি জন্য গোকর্ণে আসিয়াছিলে?"

"কল্যাণীকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য।"

"কি জন্য ধরিয়া লইয়া যাইতে চাহ?"

"তাহাকে দাসী করিব বলিয়া।"

"তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে না কেন?"

"অনেকগুলা বিবাহ করিয়াছি, এখন আর বিবাহ করিব না।"

কমলসিংহ বলিয়া উঠিলেন, "তুই ভাবিয়াছিস্ যে রঘুসিংহের কন্যা তোর দাসী হইবে?" নারায়ণ ঘোষ হাসিয়া কহিল, "তোদের কন্যাগুলা ত দাসী হইবারই যোগ্য।" কমলসিংহ রোষে উন্মত্ত হইয়া নারায়ণ ঘোষকে প্রহার করিতে উদ্যত হইতেছিল, কিন্তু সন্ন্যাসী তাহার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, "কমল, নিরস্ত হও। স্মরণ রাখিও যে তুমি বিচার করিতে বসিয়াছ।" কমলসিংহ উপবেশন করিলে সন্ন্যাসী গোপালদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি কি দেখিয়াছেন?" গোপালদেব কহিলেন, "এই ব্যক্তি প্রায় সহস্র সেনা লইয়া গোকর্ণদুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল।"

"দুর্গমধ্যে কত সেনা ছিল?"

"ষষ্টি কি সপ্ততিজন।"

এই সময়ে দূরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল, অবিলম্বে তিনজন অশ্বারোহীর সঙ্গে অমৃতানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী ও গোপালদেব ব্যস্ত হইয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,

"অমৃত, সংবাদ কি ?" অমৃতানন্দ প্রণাম করিয়া কহিলেন, "যুবরাজের সন্ধান পাই নাই।" গোপালদেব হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া অমৃতানন্দ কহিলেন, "মহারাজ, গৌড় হইতে একজন সেনানায়ক বহু সেনা লইয়া আপনার অন্বেষণে ফিরিতেছে।" গোপালদেব নিরুত্তর, কিন্তু সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহারা কোথায় ?"

অমৃত।— পার্থসারথি মন্দিরের নিকটে।

সন্ন্যাসী।— তাহাদিগকে লইয়া আসিলে না কেন ?

অমৃত।— দুইদিন আহার না পাইয়া তাহারা বিকল হইয়াছে, তাহাদিগের দলের বহু সৈন্য আহারান্বেষণে নির্গত হইয়াছিল ; সকলে ফিরিয়া আসিলে তাহারা এখানে আসিবে। পথ দেখাইবার জন্য আমাদিগের একজনকে রাখিয়া আসিয়াছি। বোধ হয়, সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা উপস্থিত হইবে।

সন্ন্যাসীর আদেশে অমৃতানন্দ সেইস্থানে উপবেশন করিলেন, তিনিও একজন সাক্ষী। তিনি কহিলেন যে একদিন পূর্ব্বে নারায়ণ ঘোষ গোকর্ণদুর্গ আক্রমণের কথা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু দূতমুখে কল্যাণীদেবীর কথা বলিয়া দেন নাই। তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, "বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে।" কমলসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দণ্ডবিধান করিবেন ?"

সন্ন্যাসী।— এই অপরাধে প্রাণদণ্ড ব্যতীত অন্য দণ্ড নাই। তুষানল, এবং তাহাতে অস্বীকৃত হইলে উদ্বন্ধন।

গোপালদেব বিষণ্ণবদনে বসিয়া ছিলেন, তিনি দণ্ডের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "আপনারা কি সামান্য দস্যু তস্করের ন্যায় নারায়ণ ঘোষকে হত্যা করিবেন ? ক্ষাত্রধর্ম্মের বিধিবদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করিলে কি ভাল হইত না ?"

সন্ন্যাসী।— মহারাজ, নারায়ণ ঘোষ রাজা হইয়াও দস্যু। নিরপরাধের উচ্ছেদসাধন কি রাজধর্ম্ম ? রমণী ও বালক, অসহায় ও বৃদ্ধের প্রতি নৃশংস অত্যাচার কি ক্ষাত্রধর্ম্ম ?

গোপালদেব নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসী নারায়ণ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নারায়ণ, তুমি কি তুষানলে প্রবেশ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে ?" নারায়ণ ঘোষ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "তুষানলে প্রবেশ করিব কি দুঃখে ? বৃদ্ধ শৃগাল, তোর যদি সাহস থাকে তাহা হইলে বাসুদেব ঘোষের পুত্রকে হত্যা কর। কিন্তু জানিয়া রাখিস্ যে তাহা হইলে শ্রীপুরের সেনা তোর গোবর্দ্ধনের একখানি ইষ্টকও রাখিবে না।" সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "যাহা করিতে হয় পরে করিও, এখন ভগবানের নাম স্মরণ কর।"

গঙ্গাতীরে বৃক্ষশাখায় রজ্জুবন্ধনে নারায়ণ ঘোষ স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিল। গোপালদেব নদীতীর পরিত্যাগ করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

মধ্যাহ্নের কিঞ্চিৎপূর্ব্বে কেদার আসিয়া উদ্ধবঘোষকে জানাইল যে বহু অশ্বারোহীসেনা নদীতীরের পথ অবলম্বন করিয়া দুর্গের দিকে আসিতেছে, একজন সন্ন্যাসী তাহাদিগের সহিত আসিতেছেন। উদ্ধবঘোষ ব্যস্ত হইয়া গোপালদেবকে জানাইলেন যে গৌড়ীয়সেনা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গোপালদেব তখন পরিখাতীরে সেতুর উপরে বসিয়া ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ধর্ম্মপাল, প্রভুদত্ত ও বিমলনন্দী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ধর্ম্মপালকে দেখিয়া গোপালদেব প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহার পরেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। উদ্ধবঘোষ আনন্দে বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "যুবরাজ আসিয়াছেন—ধর্ম্মপালদেবকে পাওয়া গিয়াছে—আনন্দ করিতে বল—মঙ্গলধ্বনি করিতে বল।"

পিতাপুত্রের মিলনের প্রথম আবেগ প্রশমিত হইলে প্রভুদত্ত অত্যন্ত বিনীতভাবে গোপালদেবকে কহিলেন, "মহারাজ, ধর্ম্মের বিবাহ হইয়াছে তাহা আমি জানিতাম না। বনমধ্যে নববধূ লইয়া ধর্ম্ম যখন আমার নিকটে আসিল, তখন বধূ অশ্বপৃষ্ঠে। জনশূন্যদেশে শিবিকা কোথায় পাইব ? সেইজন্য তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠে এতদূর আসিতে হইয়াছে।" গোপালদেব বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "বিবাহ !—বধূ ! প্রভু, তুমি কি বলিতেছ ?"

প্রভু।— মহারাজ, ধর্ম্ম নববধূ লইয়া যাইতেছিল,

পথে আমাদিগের সন্ধান পাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে।

গোপাল।—ধর্ম্ম, তুমি কি দুর্গ ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিয়াছ ?

লজ্জায় ধর্ম্মপাল অধোবদন হইয়া রহিলেন, তাঁহার কর্ণমূল রক্তিম হইয়া উঠিল। গোপালদেব প্রভুদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, বধূ কোথায় ?"

প্রভু।— দুর্গদ্বারে।

গোপাল।— তাঁহাকে শীঘ্র লইয়া আইস, তোমরা চলিয়া আসিলে, আর তাঁহাকে রাখিয়া আসিলে কি বলিয়া ?

প্রভুদত্ত অবিলম্বে অবগুণ্ঠনাবৃতা কল্যাণীদেবীকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "দেবী, ইনি তোমার শ্বশুর, ইঁহাকে প্রণাম কর।" কল্যাণী লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর্ম্ম, ইনি কাহার কন্যা ?"

ধর্ম্মপাল অবনতবদনে মৃদুস্বরে কহিলেন, "পিতা, ইনি কল্যাণীদেবী।" উদ্ধবঘোষ ইহা শুনিয়া কল্যাণীর অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া কহিলেন, "কল্যাণীই ত বটে।" গোপালদেব কহিলেন, "আমরা ত কল্যাণীর কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।" উদ্ধবঘোষ কল্যাণীকে লইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। প্রভুদত্ত ও বিমলনন্দীকে গোপালদেব গৌড়ের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

অনতিবিলম্বে উদ্ধবঘোষ ফিরিয়া আসিয়া গোপালদেবকে কহিলেন, "মহারাজ, কল্যাণী সত্য-সত্যই আপনার পুত্রবধূ, দুর্গস্বামিনী বলিলেন যে তিনি যুদ্ধের রাত্রিতে যুবরাজের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহার বৈবাহিককে বধূ লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন।"

গোপালদেব হাসিয়া উঠিলেন, ধর্ম্মপাল লজ্জায় সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গৌড়ে অতিথি

গৌড়ে আজি মহা সমারোহ, বহুদিন পরে রাজা গোপালদেব দেশে ফিরিয়াছেন। নগরের তোরণে তোরণে মঙ্গলবাদ্য বাজিতেছে, নাগরিকগণ রাজপথে বৃক্ষশাখা ও পল্লব দিয়া বহু তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছে। চিত্র-বিচিত্র বসন পরিধান করিয়া দলে দলে লোকে রাজপ্রাসাদের দিকে চলিয়াছে। দেবতুল্য গোপালদেবের দর্শন দুর্লভ ছিল না, প্রজাবৃন্দ সেইজন্য প্রবাস-প্রত্যাগত রাজাকে দর্শন করিতে চলিয়াছে।

প্রাসাদের অঙ্গনে বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপ-তলে রাজসভা বসিয়াছে। মধ্যস্থলে উচ্চ রৌপ্যসিংহাসনে গোপালদেব বসিয়া আছেন। তাঁহার পদতলে একখানি চন্দনকাষ্ঠের আসনে যুবরাজ ধর্ম্মপালদেব উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার পার্শ্বে ভূতলে মহাকুমার বাক্‌পাল, মহাসেনাধ্যক্ষ, দণ্ডপাশিক, চৌরদ্ধরণিক, নাবাধ্যক্ষ, তরিক প্রভৃতি রাজপুরুষগণ আসনে উপবিষ্ট আছেন। বামদিকে দূরে কুশাসনে গর্গদেব বসিয়া আছেন।

সভামণ্ডপের চারিপার্শ্বে দৌবারিকগণ প্রজাবৃন্দকে বাধা দিতেছে, একজন আসিয়া রাজদর্শন করিয়া গেলে তবে আর একজনকে ছাড়িয়া দিতেছে। প্রজাগণ কেহই রিক্তহস্তে আসে নাই। ধনীগণ সুবর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা, দরিদ্রগণ গৃহজাত খাদ্যদ্রব্য, ফল অথবা শাক লইয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ নারিকেল হস্তে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন। সিংহাসনের চারিপার্শ্বে গৌড়ের বিষয়পতি মহোত্তর ও মহোত্তমগণ দণ্ডায়মান। দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, এখনও বহুপ্রজা রাজদর্শন পায় নাই। পথশ্রান্ত গোপালদেবের মুখে ক্লান্তির চিহ্ন দেখা যাইতেছে। সচিব গর্গদেব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এই সময়ে মণ্ডপের তোরণ হইতে মহাপ্রতীহার আসিয়া গর্গদেবের কর্ণমূলে অস্পষ্টস্বরে কি বলিয়া গেলেন। সচিবপ্রধান তাহা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া আসন ত্যাগ করিয়া গোপালদেবের নিকটবর্ত্তী হইলেন। রাজা ও

মন্ত্রী বহুক্ষণ ধরিয়া অস্ফুটস্বরে পরামর্শ করিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে গোপালদেবের আদেশে ধর্ম্মপালদেব ও মহাসেনাপতি সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করিলেন। কি হইয়াছে জানিবার জন্য সভাস্থ জনসঙ্ঘ উৎসুক হইয়া উঠিল।

দুই দণ্ড পরে, সভার কার্য্য তখনও শেষ হয় নাই, মহাপ্রতীহার আসিয়া জানাইলেন যে যুবরাজের সহিত একজন সন্ন্যাসী আসিয়া মণ্ডপের তোরণে অপেক্ষা করিতেছেন, তিনি রাজদর্শন প্রার্থনা করেন। গোপালদেব তখন একজন সামান্য প্রজার সহিত কথা কহিতেছিলেন, মহাপ্রতীহারের উক্তি সম্পূর্ণভাবে তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল কি না সন্দেহ, তিনি অন্যমনস্ক থাকিয়াই কহিলেন "লইয়া আইস।" মহাপ্রতীহার অভিবাদন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

যুবরাজের সহিত একজন দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ গৈরিকধারী সন্ন্যাসী সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রভুদত্ত ও বিমলনন্দী আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন, গোপালদেব প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, তিনি যাহার সহিত আলাপ করিতেছিলেন সে বিদায় হইলে, তোরণের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পাইলেন যে সন্ন্যাসী সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। গোপালদেব সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন, তাহা দেখিয়া সভাস্থ সকলেই আসন ত্যাগ করিল। রাজা অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। তিনি আশীর্ব্বাদ না করিয়া গোপালদেবকে আলিঙ্গন করিলেন। সন্ন্যাসী গোবর্দ্ধন মঠের বিশ্বানন্দ।

গর্গদেবের আদেশে সেদিনকার মত প্রজাগণের রাজদর্শন বন্ধ হইল। যাহারা দর্শন পায় নাই তাহারা মণ্ডপের বাহিরে দাঁড়াইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। অবশেষে ধর্ম্মপাল তাহাদিগকে বলিয়া আসিলেন যে সন্ধ্যাকালে রাজা পুনরায় সভায় আসিবেন, তাহারা তাঁহার দর্শন পাইবে। প্রজাবৃন্দ কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। সন্ন্যাসী গর্গদেবের পার্শ্বে কুশাসনে উপবেশন করিলেন গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু যদি গৌড়ে পদার্পণ করিলেন, তবে পূর্ব্বাহ্নে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেন?" সন্ন্যাসী কহিলেন "কেন মহারাজ, গোকর্ণে ত আপনাকে বলিয়াছিলাম যে গৌড়ে আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।" গোপালদেব ক্ষুণ্ণস্বরে কহিলেন "প্রভু, আপনি কবে আসিবেন তাহা জানিতে পারিলে দাস আপনাকে গৌড়ের প্রান্তে দর্শন করিয়া নগরে লইয়া আসিত।"

সন্ন্যাসী।— মহারাজ ক্ষুণ্ণ হইবেন না, আজি আমি গৌড়পতির সকাশে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি. আজি আমার মাননীয় অতিথিরূপে আসা কি উচিত হইত?

গোপাল।— প্রভু, আপনাকে অদেয় আমার কি আছে। আপনি বার বার আমাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

সন্ন্যাসী।— কে কাহার জীবনরক্ষা করিয়াছে তাহার বিচার ভগবান করিবেন। মহারাজ, সম্প্রতি নগরের দুয়ারে ও রাজ্যের সীমান্তে বহু অতিথি আপনার দর্শন মানসে অপেক্ষা করিতেছেন।

গোপাল।— প্রভু, আপনার সহিত কে কে আসিয়াছেন?

সন্ন্যাসী।— নগর-তোরণে গোবর্দ্ধন মঠের সহস্র সন্ন্যাসীর সহিত অমৃতানন্দ অপেক্ষা করিতেছে।

গোপাল।— ধর্ম্ম, তুমি তাঁহাদিগকে আন নাই কেন?

ধর্ম্ম।— দেব! প্রভু আমাকে তাঁহাদিগের কথা ত বলেন নাই; আমি এখনই তাঁহাদিগকে আনিতে যাইতেছি।

সন্ন্যাসী।— যুবরাজ, অপেক্ষা কর। মহারাজ, গৌড়রাজ্যের সীমায় পদ্মবন্মারাজ জয়বর্দ্ধন, দণ্ডভুক্তিরাজ রণসিংহ, ঢেকরীয়রাজ প্রমথসিংহ, উদ্ধারণপুররাজ কমলসিংহ, দেবগ্রামের বীরদেব ও উদ্দণ্ডপুরের ভীষ্মদেব অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা সামান্য সেনা লইয়া রাজদর্শনে আসিয়াছেন। আপনার অনুমতি ব্যতীত গৌড়ে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না।

বিশ্বানন্দের কথা শুনিয়া গোপালদেব স্তম্ভিত হইয়া সিংহাসনে বসিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া গর্গদেব আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং সিংহাসনের নিকট

গিয়া কহিলেন "মহারাজ! এখনই ইঁহাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করা আবশ্যক।" গোপালদেবের চমক ভাঙ্গিল, তিনি অমাত্যের কথার উত্তর না দিয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু! ইঁহারা কি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন?" সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন "আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাঁহারা সেই উদ্দেশ্যেই গৌড়ে আসিয়াছেন।"

গোপাল।— আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গৌড়ে আসিবার আবশ্যক কি প্রভু? সংবাদ দূতমুখে জ্ঞাত করিলেই ত হইত! আমি কিছু ত বুঝিতে পারিতেছি না!

সন্ন্যাসী।— আমি ইহার অধিক আর কিছুই জানি না।

গোপাল।— প্রভু! দেশের এই দুর্দ্দিনে, এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া আবার কি চক্রান্তে আবদ্ধ হইব তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না!

সন্ন্যাসী।— চক্রান্ত চক্রীর, তুমি আমি সামান্য মানুষ মহারাজ! আমরা তাহার কি বুঝিব?

এই সময়ে গর্গদেব পুনরায় কহিলেন "মহারাজ! আর বিলম্ব করিবেন না, ইঁহাদিগের অভ্যর্থনার আয়োজন করুন।" গোপালদেব কহিলেন "কিরূপ অভ্যর্থনা করিব কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না।"

গর্গ।— রাজগণ সামান্য সেনা লইয়া মিত্রভাবে আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করা আবশ্যক।

গোপালদেব।— গুর্জ্জরপতি মিত্রভাবে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ফিরিয়া গিয়াছিলেন তখন প্রজাবৃন্দের শোণিতস্রোত ও দগ্ধ গ্রামসমূহ ধরিত্রীবক্ষে পথের রেখাঙ্কন করিয়া গিয়াছিল। তবে প্রভু বিশ্বানন্দ আছেন এই ভরসা।

সন্ন্যাসী।— মহারাজ! অদ্য এ-সকল কথা মুখে আনিবেন না, দ্রবিড় গুর্জ্জরপতির মিত্রতার কথা বিস্মৃত হউন।

গোপাল।— অমাত্য! আপনি ধর্ম্মকে লইয়া প্রান্তে যাত্রা করুন, আমি নগরে অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেছি। প্রভু! সর্ব্বসমেৎ কত সেনা আসিয়াছে?

সন্ন্যাসী।— সর্ব্বসমেৎ দুই সহস্রের অধিক হইবে না।

গর্গদেব ও ধর্ম্মপাল যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, সন্ন্যাসী তাহাদিগকে বাধা দিয়া কহিলেন "অপেক্ষা কর আমিও তোমাদিগের সহিত যাইব।" গোপালদেব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি যাইবেন কেন?"

সন্ন্যাসী।— আমার বিশেষ আবশ্যক আছে।

গোপালদেব আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। গর্গদেব, বিশ্বানন্দ ও ধর্ম্মপাল সভামণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেদিনকার মত সভাভঙ্গ হইল।

অপরাহ্নে বিচিত্র পট্টাবাসে নদীতীরস্থ প্রান্তর ভরিয়া গেল। নগর উৎসবসজ্জায় সজ্জিত হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পদ্ভবম্মারাজ আসিয়া পৌঁছিলেন, নগর-তোরণে গোপালদেব তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পরে একে একে সমস্ত রাজগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, গর্গদেব বিশ্বানন্দ ও ধর্ম্মপাল ফিরিয়া আসিলেন। গোপালদেব অজ্ঞাতের আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া রহিলেন, কিন্তু গৌড়বাসী আনন্দ উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

প্রত্যূষে সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই সভামণ্ডপ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, গৌড়বাসীগণ নানা দেশের রাজগণের আগমনসংবাদ শুনিয়া কৌতুহলী হইয়া সভামণ্ডপে আসিয়াছে। মণ্ডপের মধ্যস্থলে উচ্চ বেদীর উপরে আটখানি সুবর্ণসিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে, চারিদিকে রাজামাত্য ও রাজপুরুষগণের জন্য বহু বিচিত্র আসন সভাক্ষেত্রে সজ্জিত হইয়াছে। গর্গদেব মহাপ্রতীহার ও নগরপালের সহিত ত্রস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সুসজ্জিত হইয়া রাজপুরুষ মহত্তর ও মহত্তমগণ একে একে আসিয়া পৌঁছিতেছেন।

সভামণ্ডপের বাহিরে সহস্র সহস্র নাগরিক সমবেত হইয়াছিল, দলে দলে গৌড়ীয় সেনা আসিয়া দলবদ্ধ

হইয়া দাঁড়াইল, প্রতীহারগণ রাজপথের উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঘন জনতা সরাইবার চেষ্টা করিতেছিল। সময়ে সময়ে এক একদল বিদেশীয় সেনা আসিয়া গৌড়ীয় সেনার পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতেছিল, গৌড়ীয় নাগরিকগণ বিস্মিত হইয়া তাহাদিগকে দেখিতেছিল। ইহাদিগকে দেখিয়া নাগরিকগণ ভাবিতেছিল যে বোধ হয় কোন বিদেশীয় রাজা আসিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে শান্ত ভাবে গৌড়ীয় সেনার পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিতে দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িতেছিল।

সূর্য্যোদয়ের একদণ্ড পরে গোপালদেব সভামণ্ডপের তোরণে পৌঁছিলেন, নাগরিকগণ ও সৈনিকগণ তাঁহাকে দেখিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তিনি গজপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া তোরণে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দলের পর দল দেশীয় ও বিদেশীয় সেনা আসিয়া সভামণ্ডপের চারিপার্শ্বে দাঁড়াইতে লাগিল। গোপালদেব তাহা দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি গর্গদেবকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর! রাজগণের সহিত কত সেনা আসিয়াছে?"

গর্গ।— দুই সহস্রের অধিক নহে।

গোপাল।— গোবর্দ্ধনের সন্ন্যাসী সেনা কত?

গর্গ।— এক সহস্র।

গোপাল।— আমাদিগের কত সেনা উপস্থিত আছে?

গর্গ।— অশ্বারোহী ও পদাতিক সর্ব্বসমেত পঞ্চদশ সহস্রের অধিক হইবে।

গোপাল।— প্রত্যন্তের সংবাদ আসিয়াছে?

গর্গ।— আসিয়াছে, চারিদিক হইতে দূত সংবাদ লইয়া আসিয়াছে যে কোন দিকে সৈন্য সমাবেশের চিহ্ন নাই। মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত হউন। রাজগণের আগমনের কারণ বুঝিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু ইহা স্থির যে তাঁহাদিগের মনে কোন দুরভিসন্ধি নাই। যে সামান্য সেনা আসিয়াছে, আমাদিগের সেনা অনায়াসে তাহাদিগকে টিপিয়া মারিতে পারিবে। নন্দলাল ও প্রভুদত্তকে লইয়া বাক্‌পাল সৈন্য পরিচালনা করিতেছেন। বিমলনন্দী নগরপ্রাকার রক্ষায় নিযুক্ত আছে। ইহা ব্যতীত অস্ত্রধারণক্ষম গৌড়বাসী মাত্রেই সশস্ত্র হইয়া আসিয়াছে।

গোপালদেব নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার দুশ্চিন্তা দূর হইল না। গর্গদেব পুনরায় সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে অশ্বপৃষ্ঠে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তোরণের নিকটে অবতরণ করিল। গোপালদেব তাহাকে দেখিয়াই চিনিলেন—সে অমৃতানন্দ। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "সংবাদ কি?" অমৃতানন্দ কহিল "মহারাজ আপনি তোরণে দাঁড়াইয়া কেন?"

গোপাল।— রাজগণের আগমন প্রতীক্ষায়।

অমৃত।— প্রভু বলিয়া দিলেন যে আপনি হয়ত রাজগণের জন্য তোরণে দাঁড়াইয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহার আবশ্যক নাই। তাঁহাদিগের আসিতে বিলম্ব হইবে। সভায় আসন গ্রহণ করুন। যুবরাজ সেখানে উপস্থিত আছেন, রাজগণের সভাগমনের সময় হইলে আপনাকে সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন।

অমৃতানন্দ এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। গোপালদেব মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। কল্য যাহারা রাজদর্শন পায় নাই তাহারা একে একে প্রবেশ করিয়া মহারাজের দর্শনলাভ করিল। দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইল, মঙ্গল বাদ্য বাজিয়া উঠিল। নাগরিকগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। গোপালদেব ব্যস্ত হইয়া কারণ জানিবার জন্য গর্গদেবকে মণ্ডপের বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন।

মন্ত্রী।— তোরণে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সভাসদগণ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঢেকরীয়রাজ প্রমথসিংহ ও দণ্ডভুক্তিরাজ রণসিংহ সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। গোপালদেব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রমথসিংহ ও রণসিংহের পশ্চাতে বৃদ্ধ ভীষ্মদেব ও অসুরতুল্য বলশালী জয়বর্দ্ধন, তরুণবয়স্ক কমলসিংহ ও ক্ষীণকায় বীরদেব এবং সর্ব্বশেষে বিশ্বানন্দ ও ধর্ম্মপালদেব মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। গোপালদেব দ্রুতপদে বেদী হইতে অবতরণ করিতেছিলেন, মহারাজ প্রমথসিংহ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া উচ্চস্বরে কহিলেন "মহারাজাধিরাজ! আপনি আসন ত্যাগ করিবেন না।"

গোপালদেব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন মহারাজ ?"

প্রমথ।— বিশেষ কারণ আছে।

গোপালদেব নিম্নে দাঁড়াইয়া কহিলেন "তাহাও কি সম্ভব মহারাজ! আপনারা অনুগ্রহ করিয়া অধীনের গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, আমি কেমন করিয়া সিংহাসনে বসিয়া থাকিব ?" প্রমথসিংহ উত্তর না দিয়া বেদীর নিকটে আসিলেন এবং ভীষ্মদেবের সাহায্যে গোপালদেবের হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে বেদীতে আরোহণ করাইলেন। কিন্তু গোপালদেব কোনমতেই সিংহাসনে উপবেশন করিতে সম্মত হইলেন না। তখন রাজগণ বেদীর নিম্নে সমরেখায় দাঁড়াইয়া কোষ হইতে অসি মুক্ত করিলেন এবং তাহা ললাটে স্পর্শ করিয়া গোপালদেবের চরণতলে রক্ষা করিলেন। গোপালদেবও অসি কোষমুক্ত করিতেছিলেন কিন্তু বিশ্বানন্দ তাঁহার হস্তধারণ করিলেন। তখন সপ্তজন সামন্তরাজ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "মহারাজাধিরাজের জয়।"

সভাসদগণ কারণ না বুঝিয়া বলিয়া উঠিল "মহারাজাধিরাজের জয়।" মণ্ডপের বাহিরে যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল "মহারাজাধিরাজের জয়।" দেশীয় বিদেশীয় যত সেনা মণ্ডপের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল তাহারাও জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। রাজগণের পশ্চাতে ধর্ম্মপাল ও গর্গদেব স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। জন-কোলাহল ঈষৎ প্রশমিত হইলে বিশ্বানন্দ ধর্ম্মপালদেবকে কহিলেন "যুবরাজ, ছত্র লইয়া আইস।" ধর্ম্মপাল সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন "ছত্র কোথায় ?" বিশ্বানন্দ কহিলেন "তোরণে, অমৃতের নিকটে, শীঘ্র যাও।" ধর্ম্মপালদেব মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেন।

গোপালদেব পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় বেদীর উপরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভীষ্মদেব অগ্রসর হইয়া করযোড়ে কহিলেন "মহারাজাধিরাজ আমি গৌড়বঙ্গের সামন্তরাজগণের পক্ষ হইতে আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। দেশ অরাজক, প্রাচীন রাজবংশ নির্ম্মূল, মাৎস্যন্যায়ে দরিদ্র প্রজাবৃন্দ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। আপনি রক্ষা না করিলে আর উপায় নাই।" বৃদ্ধ মস্তক হইতে উষ্ণীষ লইয়া গোপালদেবের চরণতলে স্থাপন করিলেন। তাহা দেখিয়া বিশ্বানন্দ ও অপরাপর রাজগণ উষ্ণীষ খুলিয়া সিংহাসনতলে স্থাপন করিলেন। গোপালদেব কাঁপিতে কাঁপিতে সিংহাসনে বসিয়া পড়িলেন এবং ক্ষীণস্বরে কহিলেন "ভীষ্মদেব, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানবৃদ্ধ, আপনি এ কি করিতেছেন ?" ভীষ্মদেব কহিলেন "মহারাজাধিরাজ আমি বৃদ্ধ, আত্মরক্ষায় অশক্ত, আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছি।"

সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ বেদীর পাদমূলে অগ্রসর হইয়া কহিলেন "মহারাজাধিরাজ, রাজগণ আপনার আশ্রয়-ভিখারী, ইঁহাদিগের প্রার্থনা কি পূর্ণ করিবেন না ?" গোপালদেব কহিলেন 'প্রভু. একি স্বপ্ন ? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

সন্ন্যাসী।— স্বপ্ন নহে গোপালদেব, ধ্রুব সত্য।

গোপালদেব সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন, "আপনারা আসন গ্রহণ করুন।"

ভীষ্ম।— আপনি যদি আশ্রয় প্রদান করেন তাহা হইলে আসন গ্রহণ করিতে পারি।

গোপাল।— ভীষ্মদেব, আপনি অন্যায় কথা বলিতেছেন। আপনারা সকলেই প্রবল পরাক্রান্ত, পদমর্য্যাদায় কেহই আমা অপেক্ষা হীন নহেন, আমি আপনাদিগকে কি আশ্রয় প্রদান করিব ?

ভীষ্ম। – মহারাজাধিরাজ, আমরা গৃহবিবাদে পটু, কিন্তু আত্মরক্ষায় অসমর্থ। আমরা প্রতিবেশীর গৃহ লুণ্ঠন করিতে পারি বটে, কিন্তু বিদেশীরা যখন আক্রমণ করে তখন আত্মরক্ষা করিতে পারি না। দেশে রাজা নাই, রাজশক্তির অভাবে দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে।

গোপাল।— আমি কি করিব ?

ভীষ্ম।— আশ্রয় দিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

গোপাল।— আমার কি সে শক্তি আছে ?

পশ্চাৎ হইতে বিশ্বানন্দ বলিয়া উঠিলেন "আছে।"

গোপালদেব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন "আপনারা সমবেত হইলে কি দেশরক্ষা হয় না ?" সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন "বিলক্ষণ হয়,—কামরূপের

সেনা আসিয়া যখন বরেন্দ্রমণ্ডল, উত্তররাঢ়া ও দক্ষিণরাঢ়া জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছিল তখন জয়বর্দ্ধন ও প্রমথসিংহ যেভাবে রাজ্য রক্ষা করিয়াছিল, সেইভাবে রক্ষা হইতে পারে।" জয়বর্দ্ধন ও প্রমথসিংহ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন, সন্ন্যাসী বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "হর্ষদেব যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, তখন গৌড়বঙ্গের সমস্ত সামন্ত রাজা কেমন একত্র হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল তাহা গোপালদেব দেখিয়াছেন। গুর্জ্জরগণ যখন আর্য্যাবর্ত্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রাম, নগর ধ্বংস করিয়া গেল, তখন কে তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিল?"

কেহই সন্ন্যাসীর প্রশ্নের উত্তর দিল না দেখিয়া সন্ন্যাসী স্বয়ং বলিয়া উঠিলেন "যে বাধা প্রদান করিয়াছিল, রাজগণ আজি তাঁহারই আশ্রয় লইয়াছেন।" সভাসদগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। কোলাহল প্রশমিত হইলে গোপালদেব কহিলেন "আমি চিরকাল গৌড়ীয়সেনার সেনাপতিত্ব করিয়াছি, সেইভাবে আমার অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইতে পারিলে সুখী হইব।"

সন্ন্যাসী।— তাহা হয় না গোপালদেব? আপনার অদ্ভুত বীরত্ব সত্ত্বেও বীরদেব সৈন্য লইয়া পলায়ন করিলে গুর্জ্জরের হস্তে গৌড়বঙ্গের সেনা পরাজিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব দয়া করিয়া রক্ষা না করিলে এতদিন গৌড়বঙ্গ মরুভূমি হইয়া উঠিত। ভূমিতে আপনার অধিকার না জন্মাইলে সামন্তগণ আপনার আদেশ পালন করিবে না এবং তাহা না করিলে দেশ রক্ষা অসম্ভব।

গোপাল।— প্রভু, সম্রাট-বংশের কি কেহই জীবিত নাই?

সন্ন্যাসী।— গোপালদেব, প্রাচীন গুপ্তবংশের পিণ্ড লোপ হইয়াছে। যশোবর্ম্ম যখন পাটলিপুত্র ধ্বংস করে, তখন সে সমুদ্রগুপ্তের বংশধরগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া গিয়াছে। শ্বেতছত্রদ্বয় এতদিন গদাধরের মন্দিরে পড়িয়া ছিল। মণিমুক্তা ও সুবর্ণের লোভে চন্দ্রাত্রেয়রাজ গরুড়ধ্বজ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, সিংহাসন শূন্য, প্রাসাদ শূন্য, পাটলিপুত্র শূন্য

গোপাল।— প্রভু আর কি কেহ নাই?

ভীম।— মহারাজাধিরাজ, আমরা আত্মরক্ষায় অসমর্থ, আমরা আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি।

গোপালদেব নীরব নিরুত্তর।

এই সময়ে ধর্ম্মপাল ছত্র লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। প্রমথসিংহ জীর্ণ শ্বেতছত্রদ্বয় উন্মুক্ত করিয়া গোপালদেবের শিরে ধরিয়া দাঁড়াইলেন, জয়বর্দ্ধন ও বীরদেব দাসগণের হস্ত হইতে চামর লইয়া ব্যজন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশ্বানন্দ ভৃঙ্গার হইতে গঙ্গোদক লইয়া গোপালদেবের মস্তকে সিঞ্চন করিলেন, সভাসদগণ মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন, অন্তঃপুরে শত শত শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। গোপালদেব সম্রাট-পদবী লাভ করিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় সিংহাসনে বসিয়া রহিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চশস্য

অক্ষমের পক্ষ—

প্রাচীনকালে রাজারাজড়া না হইলে গল্প জমিত না, কবির কলম সরিত না, মজলিসে রাজা উজির মারাটাই ছিল বাহাদুরীর সেরা বাহাদুরী। এখন রাজারাজড়ার যুগ বিদায় লইয়াছে, এখন প্রধান হইয়া উঠিয়াছে প্রজা। এটা বিশেষ করিয়া হইয়াছে গণতন্ত্রের

শ্রমবেদনা।

কন্‌স্তান্ত্যাঁ মোনিয়ে কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ। মোনিয়ের রচনার বিশেষত্ব এই যে তিনি সর্ব্বত্র প্রাকৃতিক শক্তির সহিত মানবের সংঘাতে মানবের জয় অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়া থাকেন।

যুগ। তাই এখনকার কবিরা লম্বশাটপটাবৃত রাজারাজড়াকে নায়ক খাড়া করিয়া বাইশ সর্গে মহাকাব্য রচনাকে পণ্ডশ্রম বিবেচনা করেন; এখন তাহার স্থানে গরিবের প্রাত্যহিক জীবনের হাজার রকমের সুখ দুঃখ, কুসংস্কার অশিক্ষা কুশিক্ষা, অত্যাচার অবিচার প্রভৃতির কথা গানে, গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জগতের দরিদ্র দুঃখীর আর্ত্তনাদে দেশে দেশে মহাপ্রাণ মনীষীরা জাগিয়া বলিতেছেন—

"ওরে তুই ওঠ আজি!
আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে? কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল? কোন্ অন্ধকার মাঝে জর্জ্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়? স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার। সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে। ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে,—ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার—
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি;
নাহি ভৎর্সে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।—এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে।
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে;
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মতো সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে;
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।—
কবি, তবে উঠে এস,—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই কর আজি দান।
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।—
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।"

য়ুরোপের প্রত্যেক প্রদেশে কোনো-না-কোনো লেখক হয় পদ্যে, নয় গদ্যে, গল্পে নাটকে উপন্যাসে এই দরিদ্র-জীবন অঙ্কিত করিয়া অবোলের মুখে বোল জোগাইতেছেন।

কামার।
মেনিয়ের কামার প্রথম নামকরা মূর্ত্তিরচনা। ইহা ২১ বৎসর পূর্ব্বে পারী সালোঁতে প্রদর্শিত হয়। এই মূর্ত্তিতে একদিকে দারিদ্র্য ও শ্রমবেদনা, অপর দিকে বলিষ্ঠ ধৈর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে।

লেখকদের দোসর হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা দিয়াছেন কয়েকজন চিত্রকর ও ভাস্কর। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন বেলজিয়মের ভাস্কর ও চিত্রকর কন্‌স্তাঁতাঁ মেনিয়ে। তিনি চিত্র করিয়া, পাথর খুদিয়া দরিদ্র শ্রমজীবীদের জীবনযাত্রার দুঃখ প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার শিল্পসৃষ্টিকে একজন সমালোচক The Epic of modern industrialism অর্থাৎ আধুনিক কর্ম্মসংঘাতের মহাকাব্য বলিয়াছেন। মেটারলিঙ্কের মতে রোদাঁ ও মেনিয়ে আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ ভাবুক শিল্পী, তাঁহারা জীবনের পলায়মান বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত্তগুলিকে ধরিয়া আকার দিতে পারিয়াছেন। এই ক্ষণিককে স্থায়ী করিয়া তোলার ক্ষমতায় ইঁহারা মাইকেল এঞ্জেলোর প্রতিস্পর্দ্ধী। বরং মেনিয়ের দুঃখীরা অধিকতর দৃঢ় ধৈর্য্যশীল মহৎ বীরের তুল্য বলিয়া তাহাদের যে সহগুণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা পূর্ব্ব ওস্তাদদের দুঃখকাতর দরিদ্রদের চিত্র অপেক্ষা অধিকতর করুণ

ও মর্ম্মস্পর্শী। তিনি শ্রমসাধনাকে মহত্ত্ব ও গৌরব দান করিয়া গিয়াছেন। জগতের ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও দৈবপ্রতিকূলে সংগ্রামের নীরব সঙ্গীতধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, ম্যোনিয়ের চিত্র ও ভাস্কর্য্য তাহাকেই ভাষা দিয়া সরব করিয়া তুলিতে পারিয়াছে। ইহারা যেন দরিদ্র কর্ম্মজীবীদের সমারোহ-যাত্রার অগ্রণী—"দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ" বীর। ম্যোনিয়ের যে শিল্পসাধনা তাহা কেবলমাত্র কারুশিল্প নয়, তাহা নয়নাভিরাম ও আত্মারাম উভয়ই। তিনি অবনতদের মহত্ত্বের পূজারী। এজন্য অনেকে ইঁহার শিল্প মিলেটের

মজুর।
ম্যোনিয়ের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম। এই মূর্ত্তিটিতে মজুর আপনার স্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছে—সে কাহারো মনে করুণা জাগাইতে চাহে না, আপনার অবস্থার প্রতিবাদ করিতেও চাহে না, সে আপন অবস্থায় অটল ধৈর্য্যশীল অকুতোভয় বীর।

শিল্পের সহিত তুলনা করিয়া সমকক্ষ বিবেচনা করেন। মিলেটও চাষাভুষা, মুটেমজুর, উঞ্ছবৃত্তি প্রভৃতির ছবিতে তাহাদের কর্ম্মের মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহারা কেবলমাত্র রসবিলাসী নহেন, ইঁহারা মানবজীবনের দিকে চোখ খুলিয়া তাকাইয়া যাহা সত্য ও স্পষ্ট তাহা অকুতোভয়ে কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ম্যোনিয়ে বলিতেন যে প্রকৃতি অবশ্য সমস্ত শিল্পসৃষ্টির মূল আদর্শ বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক ব্যাপারকে শিল্পের অঙ্গীভূত করিতে হইলে তাহাতে শিল্পীর একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা একটি বিশেষ দ্যোতনা যোগ করা নিতান্ত আবশ্যক। অতএব কেবলমাত্র প্রকৃতির নকলই শিল্প নহে।

খনির ফেরত কুলি।
খনির তিমিরগর্ভে সমস্ত দিন খাটিয়া পরের পকেট পূর্ণ করিয়া কুলিরা নিজেদের ভগ্ন কুটিরে ফিরিতেছে। ম্যোনিয়ের চিত্র হইতে, যাঁহারা গিরিধি ঝেরিয়া অঞ্চলে কয়লার খনি দেখিয়াছেন তাঁহারা এই চিত্রের করুণ কাহিনী অনুভব করিতে পারিবেন।

সর্ব্বনাশের মুখে।
ইনোকান্তি য়ুকফ কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ। হতভাগ্যেরা সর্ব্বনাশের ভাঙনের উপর দাঁড়াইয়া মরণান্ত আশায় নিষ্ঠুর অদৃষ্টের প্রসন্নতা পাইবার জন্য ব্যাকুল আর্ত্তনাদ করিতেছে।

রুষিয়ার একজন ভাস্কর, Innokenti Ioukoff, এইরূপ দুঃখের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়া ক্রমশ বিখ্যাত হইয়া উঠিতেছেন। তিনি বৈকাল হ্রদের তীরবর্ত্তী এক প্রদেশের লোক। তিনি বারো বৎসর বয়সেই গাছের গায়ে মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিতেন। তিনি অশিক্ষিতপটু। তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হইতেছে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। এজন্য তিনি অন্যায়, অত্যাচার, দম্ভ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁহার বাটালি চালাইয়া
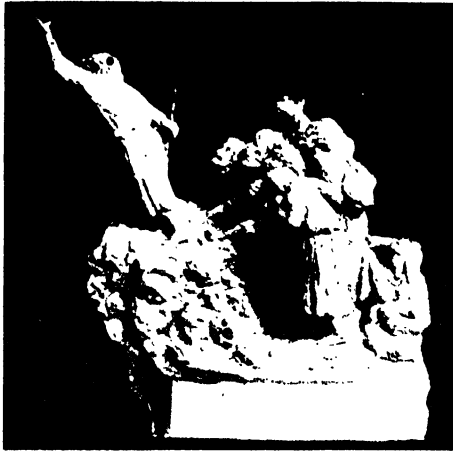
ইকে ধিক্কার।
যুকফের তক্ষিত মূর্ত্তি। হতভাগ্যদের মধ্যে একজন সাহস করিয়া অগ্রসর হইয়া মূক দুঃখীদের মুখপাত্র রূপে নিষ্ঠুর অদৃষ্ট-বিধাতাকে ধিক্কার দিতেছে।

দুঃখীর দুয়ারে
শ্রমকাতর অবসন্ন পুরুষদের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব তাহাদের প্রত্যাগমনপ্রীত মাতা পত্নী প্রভৃতি। যুকফের তক্ষিত মূর্ত্তি।

বহু ভীষণ-করুণ ও হাস্য-করুণ মূর্ত্তি কুঁদিয়া তুলিয়াছেন। ডষ্টয়েভস্কীর The Karamazov Brothers পড়িয়া তিনি কয়েকটি মূর্ত্তি তক্ষণ করিয়াছেন। ইঁহারা দুঃখবাদী। ইঁহাদের মতে—ঈশ্বর যদিও মানুষকে দুঃখে নিপীড়িত কুশ্রী দুর্ব্বল করিয়া পাঠাইয়াছেন, তবু তাহার দুঃখমুক্তির উপায় তাহার নিজের হাতেই আছে; সে কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইলেই আনন্দের স্বর্গলোকে প্রবেশ করিতে পারিবে। প্রস্ফুরিত মনুষ্যত্বই তাঁহাদের দেবতা। যুকফ এই ভাবকে মূর্ত্তি দিয়াছেন। —তাঁহার মানব-দেবতার মুখ বুদ্ধিলেশশূন্য পাশবিক রকমের; তাঁহার হাতে একটি রবারের বেলুন ও পদতলে পুষ্প বিকীর্ণ। ইনি এখনো শিশু, পরে ইনিই ক্রমে স্ফুটতর হইয়া পূর্ণ সৌন্দর্য্যে ও জ্ঞানে প্রতিভাত ও পূজিত হইবেন। মানুষের ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান অপেক্ষা উজ্জ্বলতর;

অন্নচিন্তা
দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, মৃত্যুশোক, অত্যাচার, অবিচার, মনের মধ্যে ভিড় করিয়া মানুষকে এমনি উদ্যমহীন মুহ্যমান আড়ষ্ট করিয়া তুলে। এমন শোকাবহ মূর্ত্তি আধুনিক কালে আর রচিত হয় নাই। সমজদারেরা এই মূর্ত্তিটিকে মাইকেল এঞ্জেলো ও রুষিয়ার Tschaikowskyর রচনার সহিত সমতুল্য মনে করেন। স্যাঁ গোদাঁ কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ।

অতএব ভবিষ্যতের পূর্ণ সৌন্দর্য্য লাভের জন্য তাহাকে বর্ত্তমানের পাশবিক কদর্য্যতাকে পরিহার করিয়া শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হইতে হইবে।

শ্রেণীতে শ্রেণীতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সংগ্রাম করিয়া ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না; আপনার মধ্যেকার ভাবকে উন্নত সুপুষ্ট করিয়া আত্মার আবরণ উন্মোচন করিতে পারিলেই সত্য শিব সুন্দরের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে। মানবাত্মা বহু হইয়াও এক; সেই একের বিচিত্র লীলাতেই তাহার সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতা।

ইঁহাদের চিত্র ও তক্ষিত মূর্ত্তি য়ুরোপ আমেরিকার প্রধান প্রধান চিত্রশালা ও মিউজিয়মে সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হইতেছে।

উড়ন্ত রেলগাড়ী—

তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়া তাড়িৎ প্রবাহিত হইলে সেই তারে চৌম্বক-শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তিটাকে দ্রুতগতি-প্রজননে কাজে লাগাইবার চেষ্টা বহু দিন হইতে বৈজ্ঞানিকেরা করিয়া
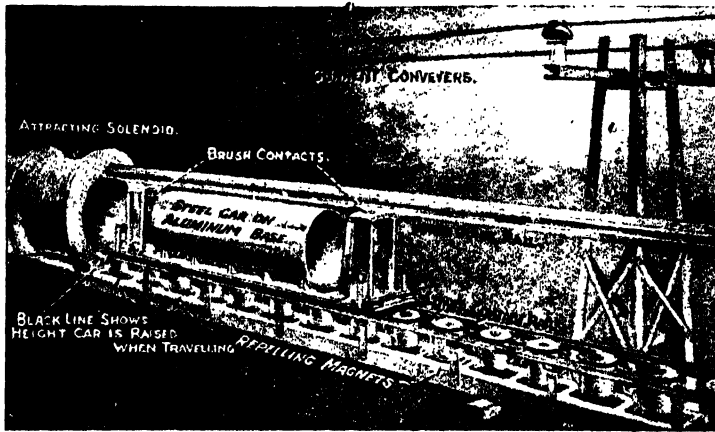
উড়ন্ত রেলগাড়ীর কলকৌশল।
নীচে রেলের তলে সারবন্দি তারকুণ্ডলীর কাঠিম; মাথার উপরে রেল ও বিদ্যুৎবহ তার, গাড়ীর নীচে কালো দাগটা রেল ও গাড়ীর ব্যবধানসূচক; গাড়ীর সম্মুখে চৌম্বক-খিলান।

ধাতু খুব হাল্কা বলিয়া তাহাতে ধাক্কা খুব জোরে লাগে। এজন্য মাটিতে পাতা রেলের নীচের তাড়িৎকুণ্ডলী গাড়ীর নীচের এল্যুমিনিয়ম পতরে পর্য্যায়গত (alternating) ধাক্কা দিয়া দিয়া সমস্ত গাড়ীখানা রেলছাড়া করিয়া শূন্যে ঠেলিয়া তুলিবে, এবং মাথার উপরকার চৌম্বক-খিলানও উপরে টানিয়া তুলিবার সাহায্য করিবে; গাড়ী শূন্যে উঠিলেই চৌম্বক-খিলানের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চুম্বকশক্তিহীন হইয়া যাইবে, এবং তখন সম্মুখের চৌম্বকখিলান গাড়ীখানাকে সম্মুখে টানিবে। এল্যুমিনিয়ম পতরের সঙ্গে একপ্রকার বুরুশ সংলগ্ন থাকিয়া, তাহা স্বয়ংক্রিয় স্প্রিং দ্বারা চালিত হইয়া, মধ্যে মধ্যে নীচের তাড়িন্ময় রেলের সঙ্গে ঠেকিয়া ঠেকিয়া তারকুণ্ডলীতে পর্য্যায়গত চৌম্বকশক্তি সঞ্চারিত ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে থাকিবে। এইরূপে ক্রমাগত নীচে ধাক্কা ও উপরে সম্মুখে টান পাইতে পাইতে গাড়ী শূন্য দিয়া দ্রুত বেগে অগ্রসর হইতে থাকিবে। গাড়ী শূন্যে চলিবে বলিয়া ঘর্ষণজনিত বাধা অল্পই অতিক্রম

আসিতেছিলেন। মধ্যে একবার এই শক্তিতে চালিত বৈদ্যুতিক কামানের রব উঠিয়াছিল; এই কামানে অতি প্রকাণ্ড গোলা অনেক দূরে ফেলিতে পারা যাইবে এরূপ আশা ও আশঙ্কা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু সেরূপ কামান এখনো ত কৈ কোনো 'সুসভ্য' দেশের যুদ্ধসরঞ্জামভুক্ত হয় নাই।

সম্প্রতি মাস দুই হইতে খবরের-কাগজে উড়ন্ত রেল-গাড়ী সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইতেছে। এই রেলগাড়ী তাড়িৎ-বহ তার-কুণ্ডলীর চৌম্বকশক্তিতেই চালিত হইবে।

ইহার উদ্ভাবক একজন ফরাশী, এখন ইংলণ্ডের বাসিন্দা, নাম বাশ্‌লে (Bachelet) তিনি বলেন যে এই উড়ন্ত রেলগাড়ী ঘণ্টায় ৩০০ মাইল পথ চলিতে পারিবে, অর্থাৎ আমাদের দেশের অতিদ্রুত মেল ট্রেন অপেক্ষা দশ গুণ জোরে চলিবে, অর্থাৎ কলিকাতা হইতে বৈদ্যনাথ যাইতে এক ঘণ্টাও লাগিবে না, দেড় ঘণ্টায় কাশী, ও দুই ঘণ্টার মধ্যে এলাহাবাদ পৌঁছানো যাইবে।

উড়ন্ত রেলগাড়ীর নমুনা।
১১ সের ওজনের এল্যুমিনিয়ম গাড়ী ৩৩ সের ওজনের একটি বালককে লইয়া রেল ছাড়িয়া এক ইঞ্চি উর্দ্ধে উঠিয়া চলিতেছে।

লণ্ডন টাইমস্ প্রভৃতি সংবাদপত্রে ইহার গঠন ও চালন-কৌশলের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। রেল লাইনের তলায় অল্প দূরে দূরে বরাবর তারকুণ্ডলী সারবন্দি বসানো থাকিবে। গাড়ীর তলায় এল্যুমিনিয়ম ধাতুর পতর আঁটা থাকিবে, এবং গাড়ীর মাথার উপরে নীচের রেলের মতো একজোড়া রেল বরাবর বিস্তৃত থাকিবে—যেমন ভাবে কলিকাতার রাস্তায় তাড়িৎ-ট্রামের মাথার উপর দিয়া তার লম্বিত আছে। উপরের রেলের মধ্যে মধ্যে এক একটা তাড়িৎ-চৌম্বক খিলান থাকিবে। তাড়িৎ-কুণ্ডলীর চৌম্বকশক্তি লোহাকে আকর্ষণ করে: কিন্তু লোহার তলায় তামা বা এল্যুমিনিয়মের পতর আঁটা থাকিলে লোহাকেও ঠেলিয়া ফেলিতে চাহে। এল্যুমিনিয়ম

করিতে হইবে; অধিকন্তু গাড়ীর মুখ ছুচলা হইবে বলিয়া বাতাসের বাধাও অল্প লাগিবে। ইহাতে রেলের উপর দিয়া চাকা গড়াইয়া যাওয়া অপেক্ষা দ্রুততর বেগে গাড়ী উড়িয়া চলিতে পারিবে।

বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে এই উড়ন্ত রেলের প্রক্রিয়া প্রদর্শন করা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে শুধু খেলনা ছোট গাড়ী নহে, বড় বড় মালগাড়ীও যে চালিত হইতে পারিবে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু অনেকে এই প্রক্রিয়ায় বড় গাড়ী চালাইতে অত্যন্ত অর্থ ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন। কিন্তু উদ্ভাবক বলেন যে ব্যয় যেমন বেশি হইবে, তেমনি সময় সংক্ষেপ হওয়াতে হরেদরে পোষাইয়া যাইবে।

চারু।

গাধা বড় উপকারী জানোয়ার—

পশুদের মধ্যে, মানুষ গাধাকে যেমন উপহাসের চোখে দেখে, এমন বোধ করি আর কোন জন্তুকে নয়। গর্দ্দভের ভাগ্য চির দিনই কিছু এমন ছিল না। এক সময়ে চিকিৎসক সম্প্রদায়ের কাছে মা শীতলার এই নিরীহ বাহনটির খুবই খাতির ছিল। সে সময় গাধা না হইলে তাঁহাদের প্রায় কোন ঔষধই প্রস্তুত হইত না। ডাক্তার জুলিয়ান্ রোশেম (Dr. Julien Roshem) ১৯১৩ সালের ১লা নভেম্বরের পারী মেডিক্যাল্ (Paris Medical) পত্রিকায় প্রাচীন কালে গর্দ্দভ হইতে যে-সকল ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া ব্যবহৃত হইত, তাহার একটা বিবরণ লিখিয়াছেন, আমরা এ স্থলে, তাহার সারাংশ প্রদান করিলাম। শিশুদের মধ্যে অনেকেই ঘুমের অবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। সে কালে গাধার লোম ইহার একটা ভাল ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইত। শিশুর মাথার বালিশে শিমুলের তুলা না দিয়া গাধার লোম দেওয়া হইত। গাধার মত নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতি জীব আর দ্বিতীয়টি নাই। এই কারণে সেকালের লোকেরা উন্মাদ রোগে, এবং উদ্ধত প্রকৃতিকে প্রশান্ত করিতে গাধার শরণাপন্ন হইত। এতদভিপ্রায়ে সাধারণতঃ গাধার রক্তই ব্যবহার হইতে দেখা যাইত। গর্দ্দভের কর্ণমূল হইতে রক্ত বাহির করিয়া, তাহার দ্বারা এক খণ্ড বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া, সেই বস্ত্রখণ্ড টুকুকে এক পাত্র জলে ফেলিয়া, সেই জল রোগীকে ইচ্ছামত পান করিতে দেওয়া হইত। ভূতে-পাওয়া রোগীর পক্ষেও গাধার রক্ত অব্যর্থ বলিয়া বিবেচিত হইত। ঔষধার্থ কেবলই যে গাধার লোম আর রক্তেরই ব্যবহার হইত তাহা নহে। গাধার মেদ মাংস ত্বক্ প্রভৃতিরও যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। এককালে চীনদেশে Ngo Kiao বলিয়া একটা মলমের খুবই প্রচলন ছিল: এ মলমটার প্রধান উপাদান হইতেছে কালো রঙের গাধার চামড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। গাধার চামড়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া জলে ভিজাইয়া, সেই জল পান করিলে, নাকি সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়কাশ রোগ অবিলম্বে ভাল হয়। ক্ষত স্থানের দাগ মিলাইবার পক্ষে গাধার চর্ব্বি নাকি খুবই ভাল ঔষধ। গর্দ্দভের মেদ মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার বাত রোগ বিদূরিত হয়। ক্ষয়কাশ রোগে গাধার দুধ এবং মাংসও নাকি পরম উপকারী। যক্ষ্মা রোগে গাধার দুধ যে উপকারক এ বিশ্বাস স্বধু যে প্রাচীন কালের লোকদের ছিল তাহা নহে, উনবিংশ শতাব্দীর চিকিৎসকগণও তাহা বিশ্বাস করিতেন। একালেও দুই একজন ডাক্তার উক্ত রোগে গাধার দুধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে বহু প্রাচীন কাল হইতেই যক্ষ্মা রোগে গাধার দুধের উপকারিতা সম্বন্ধে মানুষের একটা বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে। এ বিশ্বাসের মূলে কি কোনই সত্য নাই? প্রাচীনদের আমরা যতই উপহাস করি না কেন, তাঁহারাও আমাদের চেয়ে কম যোগ্য চিকিৎসক ছিলেন না। এ কথা সত্য, আমাদের মতো তাঁহাদের কোন বীক্ষণাগার (লেবরেটারী) ছিল না। ইহার অভাবে যে-সকল অসুবিধা ঘটার কথা, তাঁহাদের বেলায় সে-সকল নিশ্চয় ঘটিত। তথাপি এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি, ভূয়োদর্শন এবং লক্ষণাদি পর্য্যবেক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহারা এ কালের ডাক্তারদের অপেক্ষা উঁচু ভিন্ন কোন অংশেই নীচু ছিলেন না। সেকালে ক্ষয়কাশ রোগে চিকিৎসকগণ রোগীকে কিছুতেই গোদুগ্ধের ব্যবস্থা করিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহাদের যেন একটা কুসংস্কারের মতো ছিল। কিন্তু সে সংস্কারটা যে অহেতুক এবং মিথ্যা নহে আজ এই পরীক্ষার দিনে তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়া গেল। গরুর বাঁটে tuberculosis (টিউবারকিউলোসিস্) থাকা খুবই সম্ভব, কিন্তু গাধার বাঁটে তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই। এ সত্যটির বিন্দুবিসর্গ অবশ্য সেকালের চিকিৎসকদের জ্ঞানগোচরে ছিল না, তথাপি বহুদর্শিতার গুণে তাঁহারা সতর্ক হইতে শিখিয়াছিলেন। গোদুগ্ধের অপেক্ষা গর্দ্দভ-দুগ্ধ যে সহজে জীর্ণ হয়, একথাটিও তাঁহাদের অবিদিত ছিল না, এই কারণে পাকাশয়ের রোগে তাঁহারা গর্দ্দভ-দুগ্ধের ব্যবস্থা করিতেন। সেকালে স্ত্রীলোকের কষ্টরজঃ নামক রোগে গাধার দুধের ব্যবস্থা থাকিতে দেখা যাইত। সর্ব্বপ্রকার রক্তস্রাব রোগে গর্দ্দভের বিঠা পরম উপকারক বলিয়া ব্যবহৃত হইত। যাহাদের নাসিকা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নির্গত হয়, তাহাদের পক্ষে গর্দ্দভের মূত্র প্রাচীন চিকিৎসকদের মতে খুব ভাল ঔষধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। গর্দ্দভের খুর মৃগী, অপস্মারাদি রোগে আভ্যন্তরিক ব্যবহৃত হইত—১০ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ হইত। গাধার হাঁটুর কড়া টাকের মহৌষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত আছে কোন রমণী যদি তাঁহার চিবুকদেশে গাধার হাঁটুর কড়া মর্দ্দন করেন, তাহা হইলে, দু চার দিনের মধ্যেই সেখানে দাড়ি গজাইয়া থাকে। বেচারা গাধার এত রকম রোগ সারাইবার কোন শক্তি আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি?

চতুষ্পদের জন্যই তো এই পৃথিবী (B. M. J.) :—

বর্ত্তমান যুগের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এ সময় মানুষ পরকালের কথা যত ভাবুক্ না ভাবুক্, ইহ কালের সুবিধা অসুবিধার কথা বিলক্ষণই চিন্তা করিয়া থাকে। তাই সম্প্রতি একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে—আমরা যে চার পায়ে না হাঁটিয়া দু পায়ে হাঁটি, তাহাতে আমাদের সুবিধা হইতেছে, না অসুবিধা হইতেছে। য়ুরোপে প্রশ্নটা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। ইঁহাদের কাহার কাহার মতে দু পায়ে হাটিতে ধরিয়াই মানুষের যত বিপদ—যত দুঃখ! অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুও এই দু পায়ে হাঁটা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মানুষের পাকযন্ত্রে আর একটা বাঁদরের পাকযন্ত্রে বড় বেশী প্রভেদ নাই। পাকযন্ত্রের যে অংশটাকে বৃহদন্ত্র (large intestine) বলে, সেটা মলাধার বা মলভাণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে—ঠিক যেন কুয়োপায়খানা-বিশেষ। এই পায়খানা হইতে নিয়ত বিষ শোষিত হইয়া মানুষকে অকালে জরাগ্রস্ত এবং বিবিধ রোগগ্রস্ত করিতেছে। বাঁদরের বেলায় ইহা হইবার জো নাই—কেননা সে যে চতুষ্পদ, তাহার বৃহৎ অন্ত্রে ময়লা সঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারে না। এই কারণে কোন কোন সার্জ্জন্ (অস্ত্র-চিকিৎসক) মানুষের বৃহৎ অন্ত্রটা একেবারে কাটিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। কিন্তু অতদূর না গিয়া, আর একটি উপায় অবলম্বন করিলেও তুল্য ফল পাওয়া যাইতে পারে। সে উপায়টির কথা সম্প্রতি লিপ্‌জিগ্ (Leipzig) নগরে Dr. Klotz কর্ত্তৃক একটি পণ্ডিত-সভায় ঘোষিত হইয়াছে। সে উপায়টি হইতেছে—মানুষ তাহার দূর আত্মীয় মর্কটদের দৃষ্টান্তে আবার হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করুক। দুপায়ে হাঁটিতে থাকায় মানুষের জীবন-রক্ষার্থ অত্যাবশ্যক যন্ত্রগুলির (vital organs) কাযের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটিতেছে। রক্তসঞ্চালন অবাধে হইতে পারিতেছে না, তাহার জন্য ধমনীগুলি ব্যাধিগ্রস্ত (arterio-scelerosis)। অতএব মানুষ যদি আবার চার পায়ে হাঁটিতে ধরে, তাহা হইলে তাহার রক্তসঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস, পরিপাকক্রিয়াদি অধিকতর সহজে ও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে থাকিবে, ইহার ফলে তাহার জীবনটা অধিকতর

সুখকর ও দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারিবে। ডাক্তার সাহেবের মতে মানুষের ভবিষ্যৎ শুভ যেন এই চার পায়ে হাঁটারই উপর নির্ভর করিতেছে। হ্যামলেটের (Hamlet) কথায় আমাদের বুঝি—"Crawling twixt earth and heaven" চলিতে হইবে দেখিতেছি। ডাক্তার সাহেবের ভবিষ্যৎবাণী যদি সত্যই ঘটে, তাহা হইলে মেমদের গাউনে চলিবে না বোধ করি। আমাদের সকলেরই বেশভূষার পরিবর্তন করিতে হইবে—সুধু বেশভূষা কেন, আচার-ব্যবহারাদিরও পরিবর্তন আবশ্যক হইবে। Scala Santa তীর্থে উঠিতে হইলে, হামাগুড়ি দিয়া না গেলে উঠা যায় না। ইহাতে অতিবড় ভক্তেরও বড় কম কষ্ট হয় না। জনাকীর্ণ বলনাচঘরে চতুষ্পদ নরনারীর নৃত্যটা সুখকর না দুঃখকর সেটাও ভাবিয়া দেখিবার কথা।

কোকেনখোর বাঁদর—

বাঁদরের অনুকরণপ্রবৃত্তি চিরপ্রসিদ্ধ। ইহারা তাহাদের দূর আত্মীয় মানুষের অনুকরণ করিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত—এমনকি তাহার দোষগুলি পর্য্যন্ত। বাঁদরে সিগার্ ফুঁকিতেছে—শ্যাম্পেন পান করিতেছে, এমন ঘটনা সার্কাস্‌ওয়ালারা প্রায়ই দেখাইয়া থাকে। এ-সব ক্ষেত্রে ইহাদের জোর করিয়া এ-সব অভ্যাস করান হয়, সুতরাং ইহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু মানুষের দেখাদেখি ইহারা নিজে হইতেই নেশা ভাঙ্ অভ্যাস করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নহে।

পারী নগরীর Saint Anne Asylumএর ডাক্তার Marcel Briand সম্প্রতি Societe Cliniqueএর একটা বৈঠকে একটি বাঁদর উপস্থিত করিয়াছিলেন—সেটা বিলক্ষণ কোকেনখোর। বাঁদরটার নাম ছিল টোবী (Toby)। একটি রমণী তাহাকে পালন করিতেছিলেন। মহিলাটি আবার বিলক্ষণ মর্ফিয়া-ভক্ত ছিলেন। ইঁহার একটি বন্ধু ছিলেন তিনি নস্য স্বরূপ কোকেন ব্যবহার করিতেন। বন্ধুটি মধ্যে মধ্যে রমণীর সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং টোবীর সামনে কোকেনের নস্যও গ্রহণ করিতেন। এক দিন তাঁহার কি খেয়াল হইল কোকেনের ডিবাটা তিনি টোবীর হাতে দিলেন। টোবী ডিবাটা নাকের কাছে ধরিয়া, ঘ্রাণ লইয়া দূরে ফেলিয়া দিল। ডিবাটায় যে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, সেদিন তাহার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। কিন্তু ইহার পর হইতে মহিলাটি যখনই বাঁদরটার কাছে আসিতেন, টোবী তাঁহার পকেটের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া কোকেনের ডিবাটা বাহির করিত এবং সেটাকে খুলিয়া তাহার মধ্যে নাকটা রাখিয়া খুব জোরে নাস লইত এবং অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিত। ক্রমে ক্রমে বাঁদরটার কোকেনের মৌতাত এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সে শিকল ছিঁড়িয়া ঘরে ঢুকিত এবং দেরাজের মধ্য হইতে কোকেনের ডিবাটা বাহির করিয়া, তাহার নস্য লইত। দেরাজের ভিতর কোকেনের ডিবা না থাকিলে, সে মহিলাটির ব্যাগ্ খুলিয়া, তাহার মধ্যে হইতে কোকেন বাহির করিয়া তবে ছাড়িত। ক্রমে ক্রমে টোবী একটা পাকা কোকেন-ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মহিলাটী তাঁহার মর্ফিয়া সেবনের অভ্যাস সংশোধনের জন্য ডাক্তার মার্সেল্ ব্রিয়াঁর তত্ত্বাবধানে হাঁসপাতালে ভর্তি হ'ন; তিনি টোবীকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। হাঁসপাতালে টোবী ও তাহার কর্ত্রী ঠাকুরাণী উভয়েরই চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ব্রিয়াঁ বলেন, বাঁদরের নেশাদোষ ছাড়ান যত সহজ এমন মানুষের বেলায় নয়। গুঁড়া সোডা বাহ্যতঃ দেখিতে অনেকটা কোকেনেরই মত। টোবীকে কোকেন্ না দিয়া সোডা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। সে উহা লইয়া নাকে রগড়াইয়া শেষে বিরক্তির সহিত দূরে নিক্ষেপ করিল। ইহার পর হইতে যখনই তাহাকে কোন সাদারঙের গুঁড়া দেওয়া হইত, সে সেটা খুলিয়া একবার দেখিয়া দূরে ফেলিয়া দিত। ইহা স্পষ্ট দেখা গেল টোবী কোকেনই চায় অন্য কিছু নহে। কোকেনের নস্য লওয়ার পর তাহার বেশ একটু নেশার মত ভাব হইত। মাদকদ্রব্য মাত্রেরই ধর্ম্ম এই যে, প্রথম অবস্থায় ইহারা উত্তেজনা উপস্থিত করে। টোবীর বেলাতেও ঠিক তাহাই হইত। কখন কখন তাহার উত্তেজনার মাত্রা এত বেশি হইত যে, তাহাকে স্থির রাখা কঠিন হইয়া পড়িত। সে যাহাকে পাইত কামড়াইয়া বা আঁচড়াইয়া দিত। ইহার পর তাহাকে যদি আর একমাত্রা কোকেন দেওয়া হইত, তাহা হইলে, তাহার পিপাসার লক্ষণ দেখা দিত। সেই সঙ্গে শরীরের নানা স্থানের লোম ছিঁড়িতে আরম্ভ করিত। মানুষ কোকেনখোর লোম না ছিঁড়ুক গা যে চুলকায় এ অবশ্য অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। কোকেনের নেশার এ একটা লক্ষণ। কোকেনের নেশা ধরিলে মনে হয়, গায়ের উপর দিয়া কি যেন চলিয়া বেড়াইতেছে। ডাক্তার ব্রিয়াঁ মানুষের নেশায় ও বাঁদরের নেশায় একটা পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন বাঁদর যতই নেশা-খোর হোক্ না কেন, তাহার একটা দিব্য মাত্রাজ্ঞান আছে। কখন থামিতে হইবে সে তাহা বেশ বুঝিতে পারে। মানুষের বেলায় কিন্তু সে কথা বলা যাইতে পারে না। মানুষ নেশা করিতে ধরিলে তাল সামলাইতে পারে না—প্রায় মাত্রাধিক্য করিয়া বসে। মদ খাইতে বসিলে, কেন মাত্রা ঠিক থাকে না ডিকুইন্সী তাঁহার একটা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের নিকট কারণটি খুবই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ডিকুইন্সী বলেন মদ খাইলে প্রথমত শরীর ও মন উভয়ই খুব প্রফুল্ল হয়। মানসিক স্ফূর্ত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া শেষে চরম সীমায় উপস্থিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে নিস্তেজ ও অবসাদের ভাব আসে, শরীর ও মন দুই একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই অবসাদ ও স্ফূর্ত্তিহীনতা দূর করিবার জন্য আবার মদ খাওয়ার আবশ্যক হয়, শেষে মদের পরিমাণ এতটা বাড়িয়া উঠে যে তাহার দ্বারা চৈতন্য পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া পড়ে।

খুড়তুতো জেঠতুতো ভাই ভগ্নীদের মধ্যে বিবাহ ও তাহাদের সন্তানগণ (B. M. J.) :—

খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে খুড়তুতো, জেঠতুতো ভাই ভগ্নীদের মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা থাকায়, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ওরূপ বিবাহের খুবই প্রচলন থাকিতে দেখা যায়। এরূপ এক রক্তের মধ্যে বিবাহের ফল ভাল হয় কি মন্দ হয়,—সে বিষয়ে মধ্যে মধ্যে খুবই তর্কবিতর্ক হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের মতে এরূপ বিবাহে সন্তানেরা রুগ্ন বিকলাঙ্গ ও বুদ্ধিহীন হয়। অপর শ্রেণী আবার স্বীকার করেন না। ডাক্তার যোজেফ্ স্কট্ বহু দিন ধরিয়া তিহারণ সহরে বাস করিতেছেন। পারস্য দেশ ও তাহার অধিবাসীদের সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। তিনি বলেন পারস্য দেশে মুসলমান ও অন্যান্য জাতিদের মধ্যেও খুড়তুতো জেঠতুতো ভাই ভগ্নীদের মধ্যে খুবই বিবাহ হয়। সে দেশে বখতিয়ারী বলিয়া একটা জাতি আছে। ইহারাও খুড়তুতো ভাই ভগ্নীদের মধ্যে বিবাহ করিয়া থাকে। এই বিবাহে

যে-সব সন্তান হয়, তাহারা অন্য সন্তানদের অপেক্ষা কোন বিষয়ে যে অধিকতর উন্নত ডাক্তার স্কটের তাহা মনে হয় না। কোজার জাতির মধ্যে স্ববংশে বিবাহ ছাড়া অন্য বিবাহ নাই বলিলেই হয়। ইহাদের সন্তানেরাও কোন অংশেই অপর সকলের অপেক্ষা উন্নত নয়। স্ববংশে বিবাহ করিলে, সন্তানেরা অধিক বলবান ও বুদ্ধিমান হয়, ইহার স্বপক্ষে পারস্য দেশে ডাক্তার স্কট কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ পান নাই। তিনি বলেন, শিক্ষিত, এবং বুদ্ধিমান পারস্য-বাসীদের মধ্যে এরূপ বিবাহের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। পারস্যের হকিমগণও এরূপ বিবাহের অনুমোদন করেন না। তাঁহারা এ-সকল বিবাহের ফল খুবই অনিষ্টকর বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পারস্য দেশে বাহাই জাতি খুবই বুদ্ধিমান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারা কিন্তু স্ববংশে বিবাহ অনুমোদন করে না। ইহাদের বিশ্বাস এরূপ বিবাহে যে-সব সন্তান হয়, তাহারা শারীরিক কি মানসিক উভয় বিষয়েই অতিশয় দুর্ব্বল হয়। পারস্যের রাজধানী তিহারণ নগরের অধিবাসীরা অন্যান্য স্থানসমূহের লোকদের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত। ইহাদের ধর্ম্মবন্ধনও তেমন দৃঢ় নহে। ইহারা কিন্তু স্ববংশে বিবাহের পক্ষপাতী নয়। ফলতঃ ভাই ভগ্নীদের মধ্যে বিবাহ-প্রথা পারস্য দেশ হইতে ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

সহজে মৃত্যু উৎপাদনের প্রতিকূলে বৈজ্ঞানিক যুক্তি—

যে-সকল রোগী দুরারোগ্য ভীষণ যন্ত্রণাকর রোগে কষ্ট পাইতেছে—যাহাদের রোগ মোচন করা দূরে থাক্, রোগ-যন্ত্রণা নিবারণ করাও চিকিৎসকদের সাধ্যাতীত—তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই একমাত্র মহৌষধ। কেহ যদি এরূপ রোগীর মৃত্যুর ব্যবস্থা করেন—তাহাতে তিনি ন্যায় করেন কি অন্যায় করেন—সে কথা সহসা বলা বড় কঠিন। এ বিষয়ে সংবাদপত্রাদিতে মধ্যে মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন হইতে দেখা যায়। এরূপ রোগীর সহজমৃত্যু সংঘটনের পক্ষে অনেকগুলি খ্যাতনামা লোকের নাম করিতে পারা যায়। এরূপ সুখকর মৃত্যু সম্পাদনের ভার অবশ্য ডাক্তার মহাশয়দের হস্তেই নিপতিত হইবার কথা। এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা সত্য সত্যই মনে করেন, ডাক্তারেরা যে স্থলে রোগীর যন্ত্রণা নিবারণ করা বা হ্রাস করা একবারেই অসম্ভব মনে করে, সেরূপ স্থলে কখন কখন ক্লোরোফর্ম্ (chloroform) সাহায্যে বা অন্য কোন উপায়ে রোগীর প্রাণবিয়োগ করিয়া বিশেষ দয়ার কাযই করিয়া থাকে। এইরূপ সহজমৃত্যু সংঘটন করা উচিত কি অনুচিত আমরা সে বিষয়ে এ স্থলে কোন কথা বলিব না। এ প্রসঙ্গে আমরা দুটি বিষয়ের উল্লেখ করিব মাত্র। প্রথম- মৃত্যু যে অতিশয় যন্ত্রণাকর এ কথা ঠিক নহে। মৃত্যুর কোন কষ্ট নাই, থাকিতেও পারে না। আমরা যাহাকে মৃত্যুযন্ত্রণা বলিয়া থাকি—সেটা রোগীর প্রাণ বিয়োগের চেষ্টা মাত্র। ইহাতে উপস্থিত সকলের মনে কষ্টের উদয় হয় বটে কিন্তু রোগীর কোন যন্ত্রণা হয় না। এ সময় তাহার ইন্দ্রিয়-গুলির চেতনা থাকে না—কাযেই সে কিছুই অনুভব করিতে পারে না। কবির কথায় বলিতে গেলে, সে সময় তাহার অবস্থা—

Craving naught nor fearing,
Drift on through slumber to a dream
And through a dream to death.

তারপর দ্বিতীয় কথাটি হইতেছে—যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। এই সকল-দেশ-প্রচলিত প্রবাদবাক্যটি একবারে মিথ্যা এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। সার জেমস্ প্যাগেট বলিতেন—চিকিৎসকের কর্ত্তব্য শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও রোগীকে বাঁচাইতে চেষ্টা করা। মৃত্যু অবধারিত মনে হইয়াছে—অথচ এমন রোগীকেও বাঁচিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। চিকিৎসকেরা এমন শত শত রোগীর কথা অবগত আছেন। সম্প্রতি Journal of the American Medical Association পত্রিকায় এ বিষয়ে একটি ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে। আমেরিকায় কোন এক ধর্ম্মযাজকের স্ত্রী দুশ্চিকিৎস্য রোগে নিরতিশয় যন্ত্রণা পাইতেছিলেন। চিকিৎসকগণ তাঁহার রোগ দুরারোগ্য বলায় এবং রোগযন্ত্রণা সহ্য করা একবারে অসম্ভব হওয়ায় মহিলাটি আমেরিকার প্রায় সকল সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে চিকিৎসকগণ যদি সহজমৃত্যু ঘটাইয়া তাঁহাকে এই দুঃসহ যন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহার আত্মা তাঁহাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে; এই কাযে তাঁহাদের বিশেষ দয়াই প্রকাশ পাইবে। সৌভাগ্যের বিষয় কোন ডাক্তারই রমণীটির করুণ আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই। পরে জানিতে পারা গিয়াছিল—অস্ত্রচিকিৎসা করাইয়া মহিলাটি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। St. Louis Medical Review পত্রিকায় Mr. Edmund Owen আরও ঐরূপ দুইটি রোগীর কথা বলিয়াছেন। ইহাদের রোগও সুদক্ষ চিকিৎসকগণ দুরারোগ্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা উভয়েই আশ্চর্য্য ভাবে রোগমুক্ত হইয়া, চিকিৎসকেরা যে অভ্রান্ত নয়—সে কথা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিল। অতএব চিকিৎসাবিজ্ঞান যতদিন নিঃসংশয়রূপে কোন রোগীর রোগপরিণাম বলিতে পারার মত অবস্থায় না আসিতেছে ততদিন সহজ-মৃত্যুবাদীদের কথা অনুসারে কায করা খুব যে নিরাপদ তাহা বলিতে পারা যায় না। ততদিন "যতক্ষণ শ্বাস—ততক্ষণ আশ" নীতিরই অনুসরণ করা সর্ব্বতোভাবে সুবিধাকর ও কর্ত্তব্য এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই।

বিবাহিত না অবিবাহিত ?—

পূর্ব্বে যে-সব কাজকর্ম্ম পুরুষদের একচেটে ছিল, এখন সে-সব কাযে রমণীরাও যে ভাগ লইতে উদ্যত হইয়াছেন, এ কথা কাহারও অবিদিত নাই। দুদশ বৎসর পূর্ব্বে আফিসগুলিতে কেবল মাত্র গুম্ফ-শ্মশ্রুধারী বদনমণ্ডল বিরাজিত থাকিতে দেখা যাইত; এখন সে-সব স্থানে কচিৎ দুচারিটি চারুহাসিনী, শোভনবদনা রমণীর দর্শন লাভ না হয় এমন নয়। স্বাধীন ব্যবসা খুলিতেও রমণীগণ পুরুষের প্রতি-যোগিতা না করিতেছেন, তাহা নহে। মেয়ে উকীল বিরল হইলেও পৃথিবীতে মেয়ে ডাক্তার বড় কম নাই। বিলাতে সরকারী কাজে যে-সব মহিলা নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা সকলেই কিন্তু কুমারী। সে দেশে সম্প্রতি একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে—বিবাহ করিলে, এসব কুমারীদের চাকরী থাকিবে কি না? London County Council প্রশ্নটা লইয়া বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। লণ্ডনে স্কুল মেডিক্যাল সার্ভিসে অনেকগুলি রমণী নিযুক্ত আছেন। ইঁহাদের কেহ বা ডাক্তার, কেহ বা ধাত্রী, কেহ বা আর কিছু। ইঁহারা এই সর্ত্তে কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছেন যে, বিবাহ করিলে, ইঁহাদের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। এই সর্ত্তের বিরুদ্ধে ইঁহারা County Councilএর নিকট একটা আবেদন করিয়াছেন। কাউন্সিলে দুদিন ধরিয়া এ বিষয়ে বিস্তর বাদানুবাদ হইয়াও কোন একটা শেষ সিদ্ধান্ত হয় না। উপায়ান্তর না দেখিয়া কাউন্সিল্ (General Purpose Committe) জেনারেল্ পারপাস্

কমিটির শরণ লইয়াছেন। আশ্চর্য্য এই যে, ঠিক একই সময়ে রুষিয়ার Holy Synodএর নিকটও এই প্রশ্নটা উত্থাপিত হইয়াছে। সেখানে ইহার একটা মাঝামাঝি-গোচের নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। সেণ্টপিটার্স্‌বার্গের Times পত্রিকার সংবাদদাতা এই সংবাদ দিয়াছেন যে, সেখানে School Council of the Synod এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গ্রাম্য বিদ্যালয় সমূহে বিবাহিতা রমণীগণ অবাধে শিক্ষয়িত্রীর কাযে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। কুমারী শিক্ষয়িত্রীরা ইচ্ছা করিলে, বিবাহপাশে বদ্ধ হইতে পারিবেন। কিন্তু বিবাহিতাদের সন্তানসংখ্যা যদি এত বেশি হয় যে, তাহাদের পক্ষে শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব বহন করা অসম্ভব, তাহা হইলে, তাঁহাদের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। এতদ্‌প্রসঙ্গে Royal Civil Service Commissionএর চতুর্থ বিবরণীটি (report) উল্লেখযোগ্য। যে-সব সরকারী কাযে রমণীরা এখন পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার পান নাই সিভিল্ সার্ভিস্ কমিশনের মতে, সে-সব কাযে রমণীদের অধিকার না দেওয়াই উচিত। যে-সব কাযে রমণীদের নিয়োগ করিলে সাধারণের সুবিধা হইবার কথা, সেরূপ কাযেই ইঁহাদের নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। পুরুষদের কাযে মেয়েদের নিয়োগ করিলে তাঁহাদের বেতনও অনেকটা পুরুষেরই তুল্য হওয়া উচিত। তবে পুরুষের যোগ্যতা নারীর অপেক্ষা চিরকালই বেশি, সেই কারণে নারী ও পুরুষের বেতন ঠিক এক হওয়া উচিত নয়। মেয়ে ডাক্তার নিয়োগ সম্বন্ধে কমিশন বলেন চিকিৎসা বিভাগের কোন কোন শাখা মেয়ে ডাক্তার দ্বারাই পূর্ণ হওয়া উচিত। কমিশনের প্রায় সকল সভ্যকেই এ-সকল বিষয়ে একমত হইতে দেখা যায়। কমিশনের সভ্যদের মধ্যে অনেকগুলি সুযোগ্য লোকের নাম থাকিতে দেখা যায়। যথা—General Medical Councilএর প্রেসিডেণ্ট Sir Donald Mac Alister (সার্ ডোনাল্ড্ ম্যাক এলিষ্টার্), সুবিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্ Mr. A. E. Shipley (এ, ই, শিপ্‌লি) Miss Halden (কুমারী হ্যাল্‌ডেন্) প্রভৃতি। ইঁহাদের মত যে উপেক্ষার জিনিস, একথা কেহই বলিতে পারেন না।

বংশগত রোগদুষ্ট পরিবারের উৎপাদিকা শক্তি

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক কার্ল্ পিয়ার্সন্‌স্ (Karl Pearsons) যখন বলেন, সাধারণ সুস্থ পরিবারের অপেক্ষা রোগদুষ্ট পরিবারের উৎপাদিকা শক্তি অনেক বেশি এবং এই-সব বংশে প্রথম দিককার সন্তানদের মধ্যে বংশগত রোগের যতটা সম্ভাবনা এমন পরবর্ত্তীদের মধ্যে নহে, সে সময় কথাটা লইয়া ইয়ুরোপে ভারি একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। অনেকে ইহার তীব্র প্রতিবাদও করিয়াছিলেন। Ploetz, Weinberg, Maeanly প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তো মতটাকে একবারেই উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সম্প্রতি Royal Statistical Societyর সম্মুখে Mr. Major Greenwood (মেজর্ গ্রীন্‌উড্) এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ইঁহার মত অনেকটা Weinbergএর তুল্য। ইনি বলেন বংশগত রোগদুষ্ট পরিবারের উর্ব্বরত্ব যে বেশি, আর সেই বংশের প্রথমজাত সন্তানেরা অধিক রোগগ্রস্ত হয়—এ কথার মূলে কোনই সত্য নাই। সংখ্যা-তালিকা (statistics) হইতেও ইহা প্রমাণ করিতে পারা যায় না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

দশ অবতার প্রস্তর

১৩১৫ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের উত্তরবঙ্গে পুরাতত্ত্বসংগ্রহ নামে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গের প্রত্ন-সম্পদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া প্রবন্ধটির আর এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই প্রমাণ করা যে—বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে অগ্নি ও তরবারির সাহায্যে দূরীকৃত হয় নাই। প্রবন্ধমধ্যে তিনি উত্তরবঙ্গ হইতে আবিষ্কৃত অনেকগুলি অক্ষত বৌদ্ধ-কীর্ত্তিচিহ্নের পরিচয় দিয়া, বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে এই-সকল অক্ষত বৌদ্ধ-কীর্ত্তিচিহ্নের আবিষ্কারের সঙ্গে অগ্নি ও তরবারির কাহিনীর সামঞ্জস্য নাই।

রাজশক্তি যেই ধর্ম্মাবলম্বী, তদিতর-ধর্ম্মাবলম্বী জন সমূহের উপর সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই কিছু-না-কিছু অত্যাচার হইয়াছেই। ভারতবর্ষে এই অত্যাচার যত কম হইয়াছে, তত কম বোধ হয় আর পৃথিবীর অন্য কোন দেশে হয় নাই। ভারতবর্ষ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ও পরধর্ম্ম-সহিষ্ণুতার দেশ। কিন্তু তবু এই দেশেও পরধর্ম্মের উপর যে কিছুমাত্র অত্যাচার কোন কালে হয় নাই এমন কথা বলা যায় না। অশোকাবদানে পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক অশোকস্তূপ ধ্বংসের কাহিনী, শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের বোধিদ্রুম উৎপাটনের কাহিনী, বল্লাল-চরিতে রাজকোপে যোগীসম্প্রদায়ের পতনকাহিনী, ভুবনেশ্বর-প্রশস্তিতে ভবদেব ভট্টের বৌদ্ধ-ও-জৈন-সাগরের অগস্ত্য স্বরূপে পরিচিত হইবার প্রয়াস, শূন্যপুরাণে ধর্ম্মের যবনরূপ পরিগ্রহ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের বিনাশ করার কথা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে রেষারেষির ভাবটা ভারতবর্ষে একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। দুই চারিটি ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, আর কতশত অনুরূপ ঘটনা হয়ত বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে। যাহা হউক মোটের উপর ইহা স্বীকার্য্য যে ধর্ম্মকলহ ভারতবর্ষে রক্ত-রাঙ্গাচরণে উন্মুক্ত অসি ও প্রজ্বলিত মশাল হস্তে খুব বেশী দেখা দেয় নাই—অবশ্য মুসলমান আগমনের পূর্ব্বের হিন্দু ও

বৌদ্ধ প্রাচীন ধর্ম্মস্থলীগুলি অবশেষে অগ্নি ও তরবারিতেই বিনষ্ট হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা হিন্দু ও বৌদ্ধদের পরস্পরের ধর্ম্মকলহের ফল নহে,—তাহাতে নবাগত ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী আক্রমণকারীগণের হস্তচিহ্ন স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান—সে হস্ত হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শৈব বৈষ্ণব, কাহারও প্রতি পক্ষপাত দেখায় নাই। দেশব্যাপী বিরাট কীর্ত্তিচিহ্নাবলির ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে দৈবাৎ দুইএকটা অক্ষত বৌদ্ধকীর্ত্তি বাহির হইলে তাহাই অত্যাচারের অভাবের প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত হইতে পারে না।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে ও বৌদ্ধধর্ম্মে সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছিল ইহা ঠিক। তাহার নানা প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু মৈত্রেয় মহাশয় সমন্বয়ের যে প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন আজ তাহারই আলোচনা করিব। তিনি লিখিয়াছিলেন—(প্রবাসী ৮ম ভাগ ৩৮৭ পৃষ্ঠা)

"বেল আমলা একটি পুরাতন গ্রাম (বগুড়া জেলায়)। তথায় কতকগুলি পুরাতন দেবমন্দির বর্ত্তমান আছে। * * যেখানে মন্দির ছিল, সেখানে এখনও ইষ্টক প্রস্তরের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় অনুসন্ধান-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শ্রীমান রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য একখানি খোদিত প্রস্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা প্রায় সমচতুষ্কোণ ;—তাহার উভয় পৃষ্ঠে নানা মূর্ত্তি খোদিত আছে।"

"একপৃষ্ঠে কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রকোষ্ঠ অঙ্কিত আছে। তাহার প্রধান প্রকোষ্ঠে একটি যোগাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ;—উপরের দুই হস্তে গদাপদ্ম, —নীচের দুইহস্ত জানুবিন্যস্ত,—দেখিবামাত্র বুঝিতে পারা যায় বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত দুইটি অতিরিক্ত হস্ত যোজনা করিয়া তাহাকে শ্রীমন্নারায়ণ-মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তির পদতলের প্রকোষ্ঠে যে-সকল বিচিত্র কারুকার্য্য খোদিত ছিল, তাহারই অংশবিশেষ পরিবর্ত্তিত করিয়া একটি গরুড়মূর্ত্তির আভাস প্রদান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু উভয় পার্শ্বের বা শীর্ষদেশের প্রকোষ্ঠগুলির অন্যান্য খোদিত মূর্ত্তির কোন পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। তাহাতেই এই প্রস্তরফলকের বৌদ্ধকীর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। শ্রীমূর্ত্তির শীর্ষদেশে আর একটি যোগাসনে উপবিষ্ট ত্রিভুজ মূর্ত্তি ; দুইদিক হইতে দুইটি হস্তী তাহার মস্তকে জলসেক করিতেছে। ঠিক এইরূপ একটি চিত্র সাঁচি স্তূপের পূর্ব্বদ্বারে সংযুক্ত আছে। সুতরাং ইহা যে বৌদ্ধ কীর্ত্তির চিহ্ন তাহাতে সংশয় নাই। তাহাকে সমন্বয়-যুগে নারায়ণ-বিগ্রহের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার্থ যথাসাধ্য রূপান্তরিত করা হইয়াছে। অপর পৃষ্ঠে একটি দশদল পদ্ম :—তাহার প্রতিদলে বিষ্ণুর দশাবতারের এক একটি চিত্র খোদিত করা হইয়াছে। * * *।"

"উভয় পৃষ্ঠের শিল্পকৌশলের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—দশাবতার অঙ্কনের শিল্পকৌশল অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ; বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত যে দুইখানি অতিরিক্ত হস্ত সংযুক্ত হইয়াছে তাহার শিল্পকৌশলও তদ্রূপ। ইহাতে ধর্ম্মসমন্বয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। পাল নরপালগণের শাসন-সময়ে ধর্ম্মসমন্বয় সাধিত হইবার প্রমাণ-পরম্পরার অভাব নাই। তাঁহারা মহাভারত পাঠ করাইয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান করিতেন ; মহা সামন্তাধিপতির আবেদনে শ্রীমন্নারায়ণ-বিগ্রহ স্থাপনার জন্য ভূমি দান করিতেন :—এইরূপ নানা প্রমাণ তাম্রশাসনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার সহিত "অগ্নি ও তরবারি"র আখ্যায়িকার সামঞ্জস্য নাই।"

আমরা মৈত্রেয় মহাশয়ের রচনা আলোচনার সুবিধা হইবে বলিয়া সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যে প্রস্তরখানি লইয়া মৈত্রেয় মহাশয় বিচার করিয়াছেন তাহাকে আমরা **দশ অবতার প্রস্তর** নামে অভিহিত করিতে চাহি। মৈত্রেয় মহাশয় একখানা মাত্র প্রস্তর দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং সেই-সকল সিদ্ধান্ত প্রচারিত করিয়াছিলেন। আমি উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে এরূপ অনেক প্রস্তর পাইয়াছি। এরূপ প্রস্তর ঢাকা মিউজিয়মে দুইখানা, ঢাকা সাহিত্য-পরিষদে একখানা, আমার নিকট দুইখানা ও আমার এক বন্ধুর নিকট একখানা আছে। আমি দিনাজপুর বালুরঘাট সবডিভিসনের নিকটবর্ত্তী এক গ্রাম হইতে এরূপ একখানি দশ অবতার প্রস্তর সংগ্রহ করিয়াছিলাম—বালুরঘাট-বাসী সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রগতি রায় মহাশয় তাহা আমার নিকট হইতে চাহিয়া বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতির মিউজিয়মে দিবার জন্য লইয়া যান। বোধ হয় সেই প্রস্তরখণ্ড এখন সেইখানেই আছে।

এতগুলি প্রস্তর মিলাইয়া দেখিয়া আমাদের মনে হইতেছে যে মৈত্রেয় মহাশয় একখানামাত্র প্রস্তর দেখিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা বোধ হয় ঠিক হয় নাই। মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার আলোচ্য প্রবন্ধে প্রকাশিত সিদ্ধান্তাবলি কোথাও প্রত্যাহার করিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি। অথচ দেখিয়াছি অনেক ইতিহাসানভিজ্ঞ লোকে মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রাগুক্ত দশ অবতার প্রস্তরের প্রমাণকে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের সমন্বয়ের শক্ত প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করে। মৈত্রেয় মহাশয়ের মত প্রবীণ ঐতিহাসিকের ভ্রমগুলি পর্য্যন্ত সাধারণ লোকে সত্য বলিয়া অনুসরণ করে। এই হেতু এবিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য দশ অবতার প্রস্তরের বিষয়ে আমাদের যথাজ্ঞান অভিমত নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

দশ অবতার প্রস্তরগুলি প্রায়ই প্রাচীন দেবালয়াদির ধ্বংসাবশেষের নিকট পাওয়া গিয়াছে। সহজে স্থানান্তরে বহিয়া লইয়া যাওয়া যায় বলিয়া সময় সময় দেবালয়াদির চিহ্ন হইতে বহুদূরেও পাওয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, যে-সমস্ত দেবালয়ের ভগ্নাবশেষের নিকট এই দশ অবতার প্রস্তরগুলি পাওয়া গিয়াছে—তাহা প্রায়ই বিষ্ণুর মন্দির ছিল—কারণ তাহার নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে বিষ্ণুবিগ্রহসকল উত্তোলিত হইয়াছে। কাজেই এইগুলি বিষ্ণুপূজারই অঙ্গীয় ছিল বলিয়া অনুমিত হইতেছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে দেখা যায় যে চণ্ডীর মন্দিরে সিংহমূর্ত্তি উপহার দেওয়া, শিবের মন্দিরে বৃষ উপহার দেওয়া, বিষ্ণুর মন্দিরে গরুড়মূর্ত্তি উপহার দেওয়া বিশেষ পুণ্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। যথা :—

> দেব্যাগারে মহাসিংহং বৃষভং শঙ্করালয়ে।
> গরুড়ং কৈশবে গেহে প্রদদ্যাৎ সাধকোত্তম ॥
> ত্রয়োদশ উল্লাস—৩২ শ্লোক।

এই দশ অবতার প্রস্তরগুলিও হয়ত বিষ্ণুমন্দিরে মানসিক করিয়া উপহার প্রদত্ত হইত। এই বিষয়ে কোন শাস্ত্রীয় নির্দেশ খুঁজিয়া পাই নাই—কেহ পাইয়া থাকিলে জানাইলে বাধিত হইব। মাদ্রাজের অমরাবতী স্তূপের বর্ণনায় পড়িয়াছি যে স্তূপের গাত্রে অসংখ্য ছোট ছোট প্রস্তর সংলগ্ন ছিল—সেই প্রস্তরগুলিতে বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনাবলি খোদিত ছিল। ভক্তগণ সেগুলি স্তূপে দান করিয়াছিলেন। গতবৎসর রামপালে একটি পুকুর খনন করিবার সময় পুকুর হইতে একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি, একখানি সূর্য্যমূর্ত্তি, দুইখানি দশ অবতার প্রস্তর এবং একখানি বুদ্ধমূর্ত্তি-অঙ্কিত "যে ধর্ম্মা" ইত্যাদি বৌদ্ধমন্ত্র-খোদিত ক্ষুদ্র বুদ্ধ-প্রস্তর পাওয়া যায়। মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে দুইখানা দশ অবতার প্রস্তর ও একখানা বুদ্ধপ্রস্তরের আবিষ্কার দেখিয়া মনে হয় যে এগুলি মন্দিরে উপহারদত্ত জিনিষ।

এ প্রস্তরগুলির গঠনভঙ্গি ও অঙ্কিত চিত্রাবলি দেখিয়া এগুলি আর এক ব্যবহারে লাগিত বলিয়া মনে হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে লক্ষ্মীপূজার সময় আজকাল একটী মৃত্তিকার শরারও পূজা দেওয়া হয়— এই শরার পৃষ্ঠে লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা ইত্যাদি দেবদেবীমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। লক্ষ্মীপূজার সময় কুম্ভকার ও লগ্নাচার্য্য ব্রাহ্মণগণ এইরূপ চিত্রাঙ্কিত শরা হাজার হাজার বিক্রয়ার্থ বাজারে লইয়া আসে। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ এক একখানা করিয়া এই শরা কিনিয়া লইয়া যায়। সাধারণতঃ এইরূপ চিত্রাঙ্কিত শরা ৶০ আনা বা ।০ আনা করিয়া বিক্রয় হয়। কিন্তু প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের অবশ্যক্রেতব্য বলিয়া লক্ষ্মীপূজার হাটে উহার মূল্য সময় সময় ১৲—১।৵০ টাকা পর্য্যন্ত হয়!

এই চিত্রাঙ্কিত শরাগুলির সাধারণতঃ লক্ষ্মীশরা নামে অভিহিত হয়। আমার মনে হইতেছে যে এই দশ অবতার প্রস্তরগুলি হয়ত প্রাচীনকালে লক্ষ্মীশরার কায করিত। প্রমাণ কিছুই নাই, তবে সাদৃশ্য দেখিয়া

দশ-অবতার প্রস্তর নং ১
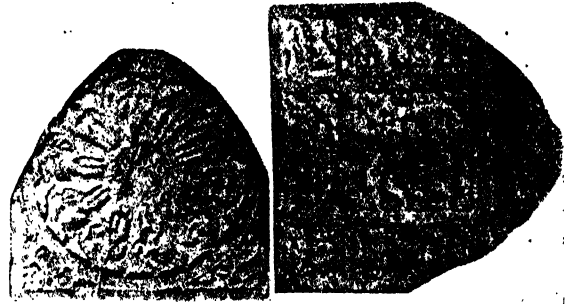
দশ অবতার পৃষ্ঠ।

কমলা-নারায়ণ পৃষ্ঠ।

এইরূপ মনে হয় এইমাত্র। লক্ষ্মীশরায় লক্ষ্মীসরস্বতীর মধ্যে দশভুজা দুর্গার মূর্ত্তি অঙ্কিত, দশ অবতার প্রস্তরে লক্ষ্মীসরস্বতীর মধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মূর্ত্তি অঙ্কিত। দশ অবতার প্রস্তরগুলি অতি নিকৃষ্ট ভাস্কর্য্যশিল্পের নমুনা—মনে হয় যেন শিক্ষানবীসগণকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। তাহারাও যেমন-তেমন করিয়া ইহা সম্পন্ন করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে শত শত প্রস্তর তৈয়ার করিয়া ফেলিত এবং অল্পমূল্যে বাজারে বিক্রয় করিত।

মৈত্রেয় মহাশয় প্রবন্ধের সঙ্গে যে দশ অবতার প্রস্তরের চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা ফটোগ্রাফ বলিয়া বোধ হইতেছে না—বোধ হয় যেন প্রস্তরখানির উপর শাদা কাগজ ফেলিয়া তাহার উপরে রোলার দিয়া

কালি দিয়া চিত্রখানি প্রস্তুত হইয়াছিল। এই অস্পষ্ট চিত্রে দশ অবতার প্রস্তরের সূক্ষ্মাংশগুলি কিছুই উঠে নাই। এই প্রবন্ধের সঙ্গে আমার নিকট যে দুইখানা দশ অবতার প্রস্তর আছে তাহাদের চিত্র দেওয়া গেল। আমার ১নং প্রস্তরের সঙ্গে মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রস্তরখানির অবিকল মিল আছে—কেবল মধ্যের বিষ্ণুমূর্ত্তিটি যোগাসনে উপবিষ্ট না হইয়া অর্দ্ধোপবিষ্ট। দ্বিতীয় নম্বর মূর্ত্তিখানির দশ অবতার পৃষ্ঠে অন্যান্য প্রস্তরের মতই দশ অবতার অঙ্কিত—কিন্তু বিপরীত পৃষ্ঠে অনেক বিশেষত্ব আছে। সেগুলি সাবধানে আলোচ্য।

এই আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মৈত্রেয় মহাশয়ের যে সিদ্ধান্তটির সহিত একমত হইতে পারি নাই তাহার উল্লেখ করিতেছি। এই দশ অবতার প্রস্তরগুলি বৌদ্ধ-

দশ অবতার প্রস্তর নং ২
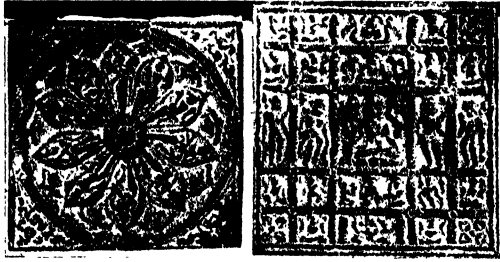
দশ অবতার পৃষ্ঠ। কমলা-নারায়ণ পৃষ্ঠ।

কীর্ত্তি নহে—ইহাতে অঙ্কিত কোন মূর্ত্তিতেই বৌদ্ধসংশ্রবের নিদর্শন নাই। মধ্যস্থ নারায়ণমূর্ত্তির বর্ণনায় মৈত্রেয় মহাশয় একটু অসাবধানতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে যোগাসনস্থ মূর্ত্তির নিম্ন দুই হস্ত জানুবিন্যস্ত, উপরের দুই হস্তে গদাপদ্ম, দেখিবামাত্র বুঝা যায় যে বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত দুইটি অতিরিক্ত হস্ত যোজনা করিয়া তাহাকে নারায়ণে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এই বর্ণনায় দুইটী ভুল হইয়াছে;—প্রথম, মৎসংগৃহীত ও অন্যান্য দশ অবতার প্রস্তরগুলির সহিতও মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে মৈত্রেয় মহাশয়ের মূর্ত্তিরও নিম্নহস্তদুটী জানুর উপর সংস্থিত বটে কিন্তু বুদ্ধমূর্ত্তির হস্তের মত খালি নহে। তাহার দক্ষিণ হস্তে পদ্মযুক্ত বরাভয় মুদ্রা এবং বাম হস্তে শঙ্খ, যেমন সমস্ত বিষ্ণুমূর্ত্তিরই থাকে। হস্তদ্বয় জানুর উপর চাৎ করিয়া বিন্যস্ত,—উপুড় করিয়া নহে। দ্বিতীয়তঃ অতিরিক্ত দুইটি হস্ত যোজনা করার কথা একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পারা যাইবে যে-মূর্ত্তি যেখানে relief প্রথায় অর্থাৎ উঁচু করিয়া অঙ্কিত—নিম্ন করিয়া খোদিত নহে—সেখানে একবার দুই-হস্তযুক্ত করিয়া মূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া পরে আবার অতিরিক্ত দুই হস্ত যোগ করা অসম্ভব। আমার মূর্ত্তিদ্বয় দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে অতিরিক্ত দুই হস্ত যোজনার কথা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

বুদ্ধ-প্রস্তর।
রামপালের নিকটে এক পুষ্করিণী খনন-কালে প্রাপ্ত।

মৈত্রেয় মহাশয়ের মূর্ত্তিতে কালক্রমে হয়ত উপরের হস্তদুটি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া থাকিবে। আমার মূর্ত্তিদ্বয়ে হস্তদ্বয় বেশ স্বাভাবিক ভাবেই সুসংলগ্ন আছে। কাজেই দেখা গেল যে অন্ততঃ এই মূর্ত্তিখানিতে মৈত্রেয়মহাশয়-কথিত সমন্বয়-চেষ্টা কিছুই নাই। বিষ্ণুর মূর্ত্তিখানি অন্যান্য বিষ্ণুর মতই শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী—বিশেষত্বের মধ্যে উপবিষ্ট। উপবিষ্ট বিষ্ণু-মূর্ত্তি সাধারণতঃ পাওয়া যায় না—বাদামী গিরিগুহায়

একখানা উপবিষ্ট বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। আর এক ভুল হইয়াছে মৈত্রেয় মহাশয়ের গরুড়মূর্ত্তি বর্ণনায়। তিনি মনে করিয়াছেন যে বুদ্ধকে নারায়ণে পরিবর্ত্তিত করিয়া নিম্নস্থ কারুকার্য্যগুলিকে গরুড়ে পরিণত করা হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এগুলি অত্যন্ত অসাবধানে খোদিত ভাস্কর্য্য-নিদর্শন—তাই মৈত্রেয় মহাশয় এইরূপ কল্পনা করিবার অবসর পাইয়াছেন। গরুড়মূর্ত্তি কারুকার্য্যগুলি পরিবর্ত্তিত করিয়া করা হয় নাই। গরুড়মূর্ত্তি প্রথমেই ছিল—আমার মূর্ত্তিদ্বয়ে গরুড় অত্যন্ত স্পষ্ট।

নারায়ণের মস্তকোপরিস্থিত করিকরোত্থিত কুম্ভের জলে অভিসিচ্যমানা যে দেবীটিকে সাঁচিস্তূপে দেখা যায় বলিয়া মৈত্রেয় মহাশয় উহাকে বৌদ্ধ-নিদর্শন বলিয়া মনে করিয়াছেন—তাহা বৌদ্ধ-নিদর্শন নহে—উহা ভারতের আদি দেবী শ্রী বা কমলার মূর্ত্তি! বুদ্ধ জন্মিবার বহু পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি ভারতবর্ষে পূজিত হইত। সম্প্রতি পত্রান্তরে (প্রতিভা—বৈশাখ ১৩২১) "ভারতে মূর্ত্তিপূজার আদিযুগ" নামক প্রবন্ধে এই শ্রী-দেবীর পূজার ইতিহাস প্রকাশিত করিয়াছি। এই শ্রী-দেবী প্রাচীনকালে বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য সমস্ত সম্প্রদায়ে সমান পূজা প্রাপ্ত হইতেন। বলিতে গেলে ইনিই প্রাচীন ভারতের জাতীয় দেবী ছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে ইহাঁকে বৈদিক দেবতা বিষ্ণুর স্ত্রী কল্পনা করিয়া বোধ হয় একটা মস্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল। বেদে শ্রীদেবীর অস্পষ্ট উল্লেখ আছে, তথায় তিনি যে নারায়ণের স্ত্রী এমন কোন কথা নাই। সমুদ্রমন্থনে শ্রীর উৎপত্তি হয়। সমুদ্রমন্থন-বর্ণনায় বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে সুরাসুর সমুদ্রমন্থন করিলে শ্রী উদ্ভূত হন এবং যাইয়া নারায়ণের কণ্ঠলগ্ন হন। শ্রী প্রথমে অনার্য্য নাগ, যক্ষ প্রভৃতি জাতিকর্ত্তৃক পূজিত হইতেন। সমুদ্র মন্থনে * প্রথম শ্রী নারায়ণের স্ত্রী বলিয়া প্রচারিত হন এবং আর্য্যদের মধ্যে পূজা পান! শ্রীকে নারায়ণের স্ত্রী বলিয়া কল্পনা করিবার সময় তাঁহার এক হস্তে পদ্ম ও এক হস্তে সেবাব্রতসূচক চামর দেওয়া হইয়াছিল—পূর্ব্বে তাঁহার হস্তে শুধুই পদ্ম ছিল। শ্রীকে এইরূপে নারায়ণের স্ত্রী বলিয়া কল্পনা করিয়া লইলেও এই মহিমাময়ী যুগল-করি-সেবিতা দেবী যে চামরধারিণী সেবাপরায়ণা নম্রমূর্ত্তি লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে আজ পর্য্যন্তও একেবারে মিশিয়া যান নাই, আমাদের দশমহাবিদ্যা কল্পনা হইতে তাহা বুঝিতে পারি। দশ মহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা কমলা—এই কমলা-মূর্ত্তির ছবি যে-কোন ছবির দোকানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহার সহিত সাঁচি বা বারহুত স্তূপের অথবা আলোচ্য দশ অবতার প্রস্তরগুলির শীর্ষদেশে স্থাপিত কমলা-মূর্ত্তির কোন প্রভেদই নাই। এই দশ অবতার প্রস্তরগুলিতে কমলার এই আশ্চর্য্য স্বাধীনতার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাই। নারায়ণের দুই পার্শ্বে দুইটি দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্ত্তি আছে—মৈত্রেয় মহাশয় তাহা চিনিতে পারেন নাই—তাহা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্ত্তি। বীণাধারিণী সরস্বতী বাম পার্শ্বে এবং চামর-ও-পদ্মধারিণী লক্ষ্মীদেবী দক্ষিণপার্শ্বে দাঁড়াইয়া। ইহা হইতেই দেখিতে পাইতেছি লক্ষ্মী বিষ্ণুর স্ত্রীরূপে দক্ষিণপার্শ্ব অধিকার করিয়া আছেন—ইহাই সমস্ত বিষ্ণুমূর্ত্তিতে তাঁহার স্বাভাবিক স্থান—আবার কমলা-মূর্ত্তিতে তিনি বিষ্ণুর মাথার উপরও স্থান পাইয়াছেন। সমস্ত দশ অবতার প্রস্তরগুলির একপৃষ্ঠে দশ অবতার অঙ্কিত। দশ অবতার—যথা,—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বুদ্ধ, কল্কি। ঠিকমত অঙ্কিত হইলে পরশুরামের পরে রামের মূর্ত্তি অঙ্কিত হওয়া উচিত ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে।

বিপরীত পৃষ্ঠে সমস্ত প্রস্তরগুলিতেই মধ্যে বিষ্ণু, দক্ষিণে সরস্বতী, বামে লক্ষ্মী, নিম্নে গরুড় এবং উপরে কমলামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে। এ ছাড়া কোন কোন প্রস্তরে অন্যান্য মূর্ত্তিও থাকে। আমার ১নং প্রস্তরখানিতে নয়টি প্রকোষ্ঠ; তাহাতে নিম্নলিখিতরূপ মূর্ত্তিগুলি আছে। ১। উপহারবাহী গন্ধর্ব্ব। ২। কমলা। ৩। ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—বোধ হয় গন্ধর্ব্ব ছিল। ৪। লক্ষ্মী—চামর- ও পদ্মহস্তা। ৫। বিষ্ণু—অর্দ্ধোপ

* সমুদ্র মন্থন একটি প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া আমার বিশ্বাস। এ বিষয়ে প্রমাণপ্রয়োগ সহ শীঘ্রই প্রবন্ধ লিখিব ইচ্ছা আছে।—লেখক।

বিষ্ট, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। ৬। বীণাধারিণী সরস্বতী। ৭। নর্ত্তনশীল বামনমূর্ত্তি। ৮। গরুড়—দুইধারে দুইজন সেবক। ৯। ভগ্ন—বোধ হয় ৭মএর মতই ছিল। ২নং প্রস্তরখানিতে ২৫টি প্রকোষ্ঠ—তাহার অষ্টমে কমলা, ১২তে লক্ষ্মী, ১৩তে বিষ্ণু, ১৪তে সরস্বতী, ১৮তে গরুড়মূর্ত্তি আছে। অন্যান্য কতকগুলি সেবকমূর্ত্তি কতক কালবশে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবল তৃতীয় কোঠার মূর্ত্তিখানি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই প্রস্তরে ইহাকে সমস্তের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। আমি যতদূর বুঝিতে পারিতেছি—ইহা বোধহয় মাতৃকা ষষ্ঠী-দেবীর মূর্ত্তি। অর্দ্ধশরীরিণী ছটাসমন্বিতা ষষ্ঠীদেবী একটি ময়ূরপঙ্ক্ষী নৌকার মধ্যে স্থাপিতা। গৃহস্থঘরে ষষ্ঠীপূজার সময় ষষ্ঠীদেবীর ঠিক এই রকম মূর্ত্তি তৈয়ার করা হয়। একখানা সদ্যপ্রসূত বুদ্ধের মূর্ত্তিযুক্ত শয়ান মায়াদেবীর মূর্ত্তির নীচে এবং সপ্তমাতৃকা-মূর্ত্তি-সমন্বিত একখানা প্রস্তরের একধারে এইরূপ মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিয়াছি। মূর্ত্তি দুইখানার ফটোগ্রাফ আমার কাছে না থাকায় এই সঙ্গে দিতে পারিলাম না।

দশ অবতার প্রস্তরগুলির বয়স বেশী নহে, কারণ ৮ম ৯ম শতাব্দীর পূর্ব্বে দশ অবতারই পূর্ণ হয় নাই। দশ অবতারের অভিব্যক্তির ইতিহাস অতি কৌতূহলপ্রদ—বারান্তরে তাহার আলোচনা করিব।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

মানভূমের কুর্ম্মি-জাতি

গত লোকগণনায় জানা গিয়াছে মানভূম জেলায় মোট ১৫৪৭৫৭৬ জন লোকের বাস। ইহাদের মধ্যে কুর্ম্মি-জাতীয় অধিবাসীর সংখ্যা ২৯১৬৭১ জন। এই হিসাবে অধিবাসীগণের মধ্যে প্রতি শতকরা ১৮·৮ জন কুর্ম্মি। অন্যান্য জাতির অনুপাতে কুর্ম্মিজাতীয় অধিবাসীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মোট কুর্ম্মি-অধিবাসীর মধ্যে ১৪৭৫৭৮ জন পুরুষ; এবং ১৪৪০৯৩ জন স্ত্রী। নবগঠিত বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে ১৩১২৮৩২ জন কুর্ম্মির বাস। বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশে ১৭৬৭৭৯ জন কুর্ম্মি আছে। বিহার ও উড়িষ্যা বিভাগের অধিবাসী কুর্ম্মিগণ দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি। নাম-সাদৃশ্যে সমস্ত কুর্ম্মিগণকে এক জাতীয় বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে।

মানভূম জেলার অধিবাসী কুর্ম্মিগণ খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ ও সবলদেহ। এই কুর্ম্মিগণের সহিত দেহের গঠন সম্বন্ধে সাঁওতাল, ভূমিজ প্রভৃতি কোলবংশীয় অপর জাতির কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। দেহের গঠন দৃষ্টে বিহারবাসী কুর্ম্মিগণকে রীজলি সাহেব-প্রমুখ পণ্ডিতগণ আর্য্যবংশীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মানভূমের কুর্ম্মিগণ কোলবংশীয়।* মানভূম-বাসী কুর্ম্মিগণের জাতিনির্দ্দেশ সম্বন্ধে সাহেবগণের সিদ্ধান্ত ভ্রমমূলক বলিবার কোন উপযুক্ত কারণ নাই।

এতদ্দেশীয় সাঁওতাল ও কুর্ম্মিগণের মধ্যে এই প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে যে তাহারা উভয়েই এক আদি পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সাঁওতালগণ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দুর অন্নগ্রহণ করে না। কিন্তু উপরোক্ত প্রবাদে বিশ্বাস করিয়া তাহারা কুর্ম্মির অন্নগ্রহণ দোষাবহ মনে করে না। কুর্ম্মিরা সাঁওতাল জাতির অপেক্ষা বহুপরিমাণে সুসভ্য। কিন্তু তথাপি সামাজিক রীতি অনুসারে বিবাহকালে মিষ্টান্ন-বহনের জন্য সাঁওতাল বাহক নিযুক্ত করা তাহারা সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। সাঁওতাল ও কুর্ম্মির এইপ্রকার পরস্পরের প্রতি প্রীতি উপরোক্ত প্রবাদের সমর্থন করিয়া থাকে।

বিহার অঞ্চলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চজাতি কুর্ম্মির আনীত জল পান করিয়া থাকে। কিন্তু মানভূম অঞ্চলে কুর্ম্মির আনীত জল উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দুদিগের অস্পৃশ্য। তদ্ব্যতীত এদেশের কুর্ম্মিরা কুক্কুটপালন ও কুক্কুটমাংস ভক্ষণ দোষাবহ মনে করে না; ও তাহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু বিহার অঞ্চলে কুর্ম্মিজাতির ভিতর সে প্রকার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। বিহারী কুর্ম্মিগণ কনোজিয়া ও আউধিয়া এই দুই ভাগে বিভক্ত। বোধ হয় তাহারা কান্যকুব্জাগত ও অযোধ্যা-প্রদেশাগত বলিয়া এই প্রকারে বিভক্ত

* Risley's Castes and Tribes, Vol. 1, p. 529.

হইয়াছে। কিন্তু মানভূমবাসী কুর্ম্মিগণের মধ্যে সে প্রকার কোন সামাজিক বিভাগ নাই।

এই কুর্ম্মিজাতির আদি বাসস্থান সম্বন্ধে জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ জেলার বাহিরে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে কখন বাস করিয়াছিল সে সংবাদ অবগত নহে। তাহারা মানভূম জেলার পূর্ব্বাংশস্থিত শিখরভূম নামক স্থানে তাহাদের আদি বাস থাকার কথা স্বীকার করে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত শিক্ষার-আলোক-প্রাপ্ত কুর্ম্মিগণ অনুসন্ধানে তাহাদের বিহারবাসী জাতিবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়াছে। দুঃখের কথা, বিহারী কুর্ম্মিগণ এপ্রকার জাতিগত ঐক্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

শেষোক্ত কুর্ম্মিগণ বলিয়া থাকে যে বাদসাহের আমলে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিহার প্রদেশের অন্তর্গত গয়া ও পাটনা জেলায় বাস করিত। একদা জনৈক মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষ তাহাদের দেশ আক্রমণ করিয়া কুর্ম্মিরমণীগণের উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কুর্ম্মিগণ এই প্রকার অত্যাচারের ভয়ে ভীত হইয়া সপরিবারে তাহাদের আদি বাসস্থান হইতে পলাইয়া আইসে। আক্রমণকারীর দল তথাপি তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হইল না। কুর্ম্মিগণ ক্রমশঃ বহু দেশ ও জনপদ ছাড়াইয়া শিখরভূমে উপস্থিত হইল। তৎকালে শিখরভূমের সাঁওতালগণ ধর্ম্মদেবের নিকট শূকর বলি দিবার আয়োজন করিতেছিল। আক্রমণকারীগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর না দেখিয়া কুর্ম্মিগণ সাঁওতালগণের সহিত সখ্যস্থাপন করিল। কুর্ম্মিরাও ধর্ম্মদেবের নিকট শূকরবলি দিবার উদ্যোগ করিল। কুর্ম্মিগণের এই প্রকার পরিবর্ত্তনে, বিশেষতঃ তাহারা শূকরমাংস ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে, মুসলমানগণ ঘৃণায় তাহাদের অনুসরণে বিরত হইল। এই প্রকারে জাতি ও আচারভ্রষ্ট হইয়া কুর্ম্মিগণ শিখরভূমে সাঁওতালগণের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিল। ক্রমশঃ শিখরভূম হইতে কুর্ম্মিগণ এই জেলার ও সীমার সমীপবর্ত্তী বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও সিংহভূম জেলার বহুস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মানভূমবাসী কুর্ম্মিগণ যে পূর্ব্বে শূকরমাংস ভক্ষণ করিত, উপরোক্ত প্রবাদ তাহার সমর্থন করে। অনেকে বলেন অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এদেশের যাবতীয় কুর্ম্মি শূকরবলির অনুষ্ঠান ও শূকরমাংস ভোজন করিত। এখন কিন্তু কুর্ম্মিগণের ভিতর আর সে প্রকার প্রথা প্রচলিত নাই।

এই জেলার অধিবাসী কুর্ম্মিগণের সাধারণ উপাধি 'মাহাত'। সম্ভবতঃ কোন সময়ে এই জাতীয় ব্যক্তিগণ 'মাথট বা রাজকর' আদায়ের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তদবধি তাহারা মাহাত উপাধিতে আত্মপরিচয় দিয়া আসিতেছে। অদ্যাপি কোন কোন স্থলে 'মাহাত' শব্দে গ্রামের ইজারদার বা প্রধানকে বুঝায়। কুর্ম্মিজাতীয় মাহাত ব তীত স্থানে স্থানে কুম্ভকার বা অন্য জাতীয় ইজারদারেরও মাহাত উপাধি আছে। কিন্তু এই জেলার প্রত্যেক কুর্ম্মি আপনাকে 'মাহাত' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

বঙ্গ ও বিহার প্রদেশাগত পতিত ব্রাহ্মণগণ কুর্ম্মি জাতির পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। কুর্ম্মির ব্রাহ্মণগণ অদ্যাবধি এক স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয় নাই। বাঙ্গালী ও বিহারী ভেদে কুর্ম্মির ব্রাহ্মণগণ দুই জাতিতে বিভক্ত। কুর্ম্মির ব্রাহ্মণের মধ্যে এইপ্রকার বিভাগ দৃষ্টে অনুমান হয় যে, এই জাতির সহিত ব্রাহ্মণের সংস্রব দীর্ঘ দিনের নহে। দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন ব্রাহ্মণ শ্রেণী এই জাতির পৌরোহিত্য করিতে থাকিলে, এতদিনে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণগণের ভিতর জাতিগত একতা সম্পাদিত হইত।

পূর্ব্বপ্রদেশাগত বৈষ্ণবগণ কুর্ম্মিজাতির দীক্ষাগুরু। সম্ভবতঃ এই বৈষ্ণবগণই এতদ্দেশীয় অপরাপর অনার্য্য জাতির ন্যায় কুর্ম্মিগণকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে। যে-যে স্থানে অনার্য্য জাতিগণ হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই, সেই সেই স্থানে বিস্তর লোক খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে ও হইতেছে। পূর্ব্বদেশাগত নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবগণ বিচ্ছিন্নভাবে অনার্য্য সমাজে প্রবেশ করিয়া অনার্য্যগণের ভিতর হিন্দুধর্ম্মের আলোক আনয়ন করিয়াছে। এজন্য হিন্দুসমাজ এই বৈষ্ণব শিক্ষকগণের নিকট বহুপরি-

মাণে ঋণী। এদেশের অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় যে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণবের সহিত কুর্ম্মি প্রভৃতি অনার্য্য জাতির ঘনিষ্ঠতর সামাজিক বন্ধন বিদ্যমান আছে।

কুর্ম্মিজাতির মধ্যে আজকাল দায়ভাগের বিধান অনুসারে দায়াধিকারের বিধান প্রচলিত হইয়াছে। কুর্ম্মিগণের জাতীয় বিশ্বাস যে তাহাদের সমাজে কন্যা যে-কোন অবস্থায় পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হয় না। আদালতের বিচারে দায়ভাগের বিধান অনুসারে কন্যা সম্পত্তি পাইতেছে। কিন্তু পল্লীগ্রামে সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে আদালতের বিচার তাহাদের জাতীয় প্রথার প্রতিকূল। এই প্রকার বিশ্বাস ভূমিজ, সাঁওতাল প্রভৃতি জেলার অপর অনার্য্য সমাজের ভিতরও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকার বিশ্বাস ও জাতীয় রীতির মূল অনুসন্ধান করিয়া দায়াধিকার সম্বন্ধে সমুচিত ব্যবস্থা করা সরকারবাহাদুরের কর্ত্তব্য।

কুর্ম্মিজাতির বিবাহের সময় পুরোহিত বা ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। বর ও কন্যাপক্ষের আত্মীয়গণ সমবেত হইলে সমবেত স্ত্রীলোকগণ গান করিয়া থাকে। তাহার পর বর কন্যার হাতে লোহার বালা পরাইয়া দেয়। এই সময়ে শালপত্রে তৈল বা ঘৃতের সহিত সিন্দূর মাড়িয়া দিতে হয়। বর ঐ সিন্দূর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া স্পর্শ করে। তাহার পর স্বজাতীয় কোন বিধবা স্ত্রীলোক ঐ সিন্দূর লইয়া কন্যার কপাল ও সীমন্তে লেপিয়া দেয়। সেই সময়ে সমবেত পুরুষগণ হরিধ্বনি করিতে থাকে। এই প্রকারে সিন্দূরদান নিষ্পন্ন হইলেই বিবাহবন্ধন সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। এতদ্‌ব্যতীত কতকগুলি আচার উভয় পক্ষকে সম্পন্ন করিতে হয়। কুর্ম্মিবিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠান প্রবন্ধান্তরে বিবৃত করিব। মোটের উপর সিন্দূরদান ও স্ত্রীলোকের সঙ্গীত বিবাহের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। হিন্দু-সমাজের নিকট হইতে কুর্ম্মিগণ গাত্রহরিদ্রা প্রভৃতি আচার শিক্ষা করিয়াছে। কুর্ম্মি স্ত্রীলোকগণের গান অতি সহজ ও সামান্য। কিন্তু তাহারা দলবদ্ধ হইয়া বিবাহের সময় দিবারাত্রি আগ্রহসহকারে ঐ-সকল গান গাহিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি গানের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গাত্রহরিদ্রার গান,

হর্‌দি হর্‌দি পুরা পাট্‌না—
অগুরু চন্দনা।

এই সামান্য কয়টি কথাই সম্পূর্ণ গান। ইহাই কুর্ম্মিরমণীগণ অক্লান্ত পরিশ্রমে সারাদিন চীৎকার করিয়া গাহিবে।

বরকন্যাকে পাল্‌কী বা চতুর্দ্দোলে চাপাইয়া দিয়া কন্যাপক্ষীয় স্ত্রীলোকেরা গাহিবে,

মায়ে বাপেক বাড়ীতে
ঘুঁইটা কুড়াওই ;
আজু ধনি চড়্‌লেক উপর।

অর্থাৎ পিত্রালয়ে ঘুঁটিয়া কুড়াইয়া বেড়াইত। কিন্তু আজ ধনী উপরে উঠিয়া বসিয়াছে।

বরের বাড়ীতে কন্যা আসিয়া পৌঁছিলে সেখানকার স্ত্রীলোকেরা গাহিবে,

আওইতে যাওইতে
দশ জোড়া জুতায়ে খেয়াই গেল—
তোরে লাগিন, ধনি!

অর্থাৎ হে ধনি! তোমার জন্য যাওয়া আসা করিতে করিতে আমাদের বাড়ীর লোকের দশ জোড়া করিয়া জুতা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

ঐ সময়ের অপর একটি গান এইরূপ,

আওইতে যাওইতে
দশ কোশ পথ,
তোর মায়ে বাপে, ধনি,
খাইতে নাহি দে'ল।

অর্থাৎ হে ধনি, তোমার বাপের বাড়ী যাতায়াত করিতে দশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু তোমার বাপ-মা আমাদের লোককে খাইতে দেয় নাই।

গানের অর্থ যাহাই হউক, কয়েকদিন ধরিয়া কুর্ম্মিরমণীগণ এইপ্রকার গানে গ্রাম মুখরিত করিয়া রাখিবে। এই গান গাহিবার জন্য তাহাদের অদম্য আগ্রহ।

আজকাল কোন কোন স্থানে পুরোহিত লইয়া মন্ত্রপাঠ করাইয়া বিবাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিয়া যে কন্যার বিবাহ দিবেন, সে কন্যা আর স্বামীত্যাগ বা পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিবে না। সেরূপ করিলে জাতিচ্যুত হইবে।

কুর্ম্মিজাতির যাবতীয় সামাজিক ব্যাপার পরিদর্শনের জন্য প্রত্যেক পরগণায় এক একজন দেশমণ্ডল ও এক একজন মহারায় আছে। দেশমণ্ডলের বংশের যে-

কোন ব্যক্তি পরগণার জমীদার কর্ত্তৃক দেশমণ্ডল নিযুক্ত হইতে পারে। মহারায়ের নিয়োগকার্য্যে জমীদারের কোন হাত নাই। মহারায়বংশের সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি মহারায় হইবে।

যে-কোন পুরুষ কি স্ত্রী উপযুক্ত কারণে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিতে পারে। যাহার ইচ্ছায় বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবে সেই ব্যক্তি দেশমণ্ডলকে ১।০ টাকা প্রণামী দিবে। তাহার পর জাতীয় লোকের সাক্ষাতে বর কন্যার হাত হইতে লোহা খুলিয়া লইবে অথবা কন্যা হাতের লোহা খুলিয়া বরের গায়ে ফেলিয়া দিবে। এই সময়ে বর অথবা কন্যা সীমন্তের সিন্দূর মুছিয়া দিবে। এই প্রকারে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেলে কন্যা পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। সামাজিক অন্যান্য বিচার আচার কার্য্যে মহারায় ও দেশমণ্ডল যাবতীয় বিচার-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই-সকল কার্য্যে জরিমানা, সেলামী প্রভৃতিতে যে টাকা আদায় হয়, তাহা দেশমণ্ডল ও মহারায় ভাগ করিয়া লয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক কুর্ম্মিপরিবার বাৎসরিক অর্দ্ধআনা হিসাবে দেশমণ্ডলকে আদায় দিয়া থাকে। কুর্ম্মিগণের ভিতর অপর কোনপ্রকার কৌলীন্য বা শ্রেণীবিভাগ নাই।

অপরাপর হিন্দুজাতির ন্যায় কুর্ম্মিগণ ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। কুর্ম্মিজাতির ভিতর স্বগোত্রে বিবাহ হয় না। গোত্রের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কোন প্রকার ফল, মূল, প্রাণী বা পদার্থের নাম-অনুসারে এই-সকল গোত্রের নামকরণ হইয়াছে। অন্যান্য অনার্য্য জাতির ন্যায় কুর্ম্মিগণ নিজগোত্রের নামের প্রাণী বা পদার্থকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। বিভিন্ন গোত্রের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। কেশরিয়া, ২। বনওয়ার, ৩। ডুমরিয়া, ৪। টীর-য়ার, ৫। বাঁশওয়ার, ৬। কমুড়িয়া, ৭। কাঠিয়ার, ৮। শাঁখোয়ার, ৯। জালবানোয়ার, ১০। ছঁচ-মুৎরুয়ার, ১১। গুলিয়ার।

কেশরিয়া গোত্রের লোক কেশুরমূল খাইবে না বা স্পর্শ করিবে না। তাহারা কেশুরকে অতি পবিত্র জিনিস বলিয়া মনে করে। এইপ্রকার ডুমরিয়া গোত্রের লোক ডুমুরকে পবিত্র বলিয়া মনে করে। টীরুয়ার এতদ্দেশীয় এক প্রকার পক্ষীর নাম। টীরুয়ার, বাঁশওয়ার, কাঠিয়ার ও শাঁখোয়ার গোত্রের লোক যথাক্রমে টীরুয়ার পক্ষী, বাঁশ, কাঠিয়া নামক বস্ত্র ও শাঁখকে অতিশয় পবিত্র বলিয়া মনে করে।

করমপূজা কুর্ম্মিজাতির সর্ব্বপ্রধান জাতীয় উৎসব। তদ্ব্যতীত ধর্ম্মপূজা ও গোবর্দ্ধন পূজা তাহাদের অন্যতম উৎসব।

কুর্ম্মিগণ সকলেই কৃষীজীবী। তাহারা জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে বহু পরিশ্রমে কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। কুর্ম্মিজাতির ভিতর পানদোষ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্যান্য অনার্য্য জাতির অপেক্ষা কুর্ম্মি জাতির ভিতর লেখাপড়ার চর্চ্চা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কুর্ম্মিজাতি তাহাদের সমাজকে সংস্কৃত করিয়া দ্রুতগতিতে হিন্দুসমাজের একাঙ্গীভূত হইতেছে।

মানভূম। শ্রীহরিনাথ ঘোষ।

অবিমারক

মহাকবি ভাস-বিরচিত নাটক।

[কুন্তীভোজ রাজার কন্যা কুরঙ্গীকে অবিমারক নামক অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবক হস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করাতে উভয়ে প্রণয়াসক্ত হন। অবিমারক গোপনে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করেন কিন্তু শেষে রাজা জানিতে পারায় পলায়ন করিয়া আত্মহত্যা করিতে যান। এক বিদ্যাধর তাঁহাকে অদৃশ্যকারী এক অঙ্গুরীয় উপহার দিয়া প্রিয়ার সহিত পুনর্মিলিত হইতে প্রেরণ করেন।]

পঞ্চম অঙ্ক

(কুরঙ্গী ও নলিনিকার প্রবেশ)

নলিনিকা

রাজকুমারী! দুঃখ করে' আর ফল কি? চল কন্যাপুর-প্রাসাদে আরোহণ করে' দৃষ্টিকে তৃপ্ত করি।

কুরঙ্গী

ওরে! তুই আমার মনের বাসনা কি করে' বুঝলি? আমার পরিজনেরা আমার মনের অবস্থা না জেনে বর্ষা-কালের প্রিয় ভূষণ বকুল দেবদারু শাল অর্জ্জুন কদম্ব অশোক বেতস প্রভৃতি পরম সুরভি ফুল এনে আমাকে পাগল করে' তুলছে। তারপর এই ময়ূরগুলো আমাদের

রাজপ্রাসাদে একেবারে গুণ্ডামি করে ফিরছে—আমাদের দ্বারা সতত লালিত হয়েও বেতালা রকমে অসময়ে অস্থানে আপনাদের বাহাদুরী দেখাচ্ছে। শুক শারিকাও গল্প বলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। আমার দুঃখের কথা না জেনে ভূতিক-মন্ত্রীর শারিকা এসে বলছে যে বিয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত বলবে। আমার রোগের খবর জিজ্ঞাসা করতে এসে আমার আত্মীয়েরা বকে' বকে' আমায় বধ করবার উপক্রম করে। তাই ইচ্ছে করছি কিছুক্ষণ প্রাসাদের ছাদে গিয়ে থাকব।

নলিনিকা

ভর্ত্তৃদারিকার যেরূপ অভিরুচি। তাই চল।

(উভয়ে আরোহণ করিল)

কুরঙ্গী

ওলো! এখানেও ত মহা বিপদ দেখছি—বিদ্যুৎপ্রদীপ হাতে নিয়ে কালমেঘ উঠেছে।

নলিনিকা

রাজকুমারী, উৎকণ্ঠিত হয়ো না। দেখ দেখ, নবজলধর-জালে সূর্য্য আচ্ছাদিত হয়ে গেছে, আসন্ন জলবর্ষণের আয়োজনে গগনতল নয়নরঞ্জন হয়েছে।

কুরঙ্গী

হাঁ! আমি এই রমণীয় আকাশশ্রী দেখছি।

(অবিমারক ও বিদূষকের প্রবেশ)

অবিমারক

বন্ধু, কুরঙ্গীকে দেখতে পেলাম।

শোকে তাহার অঙ্গে নাহি চন্দনেরি পত্রলেখা;
রিক্তভূষণ প্রিয়ার আমার হাবভাবও আর
যায় না দেখা।

সুন্দরী এই অসামান্য দেখায় এখন তেমন-ধারা
বেদশ্রুতি হয়েছে যেন অর্থ-এবং-কারণ-হারা।

বিদূষক

বাঃ! মনটা খুসী হয়ে গেল। তুমি নিজেকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুরূপ মনে করে' অহঙ্কার করে' থাক। কিন্তু এই স্বভাবরমণীয়া রমণীর কাছে তোমার হার মানতে হয়েছে। বোধ হয়'তোমার বিরহে এই সুন্দরী তন্বী কৃশ হয়ে গেছে। তবুও এই তন্বী তরুণী ইন্দুলেখার ন্যায় দৃষ্টিকে পরিতৃপ্ত করছে।

অবিমারক

বাঃ! আজ যে তোমার মুখ থেকে অতিপণ্ডিতের মতো কথা বেরুচ্ছে! ব্যাপার কি?

বিদূষক

রোজ রোজ আমায় দেখছ কিনা, তাই অতি পরিচয়ে আমাকে ঠাট্টা করছ। যারা আমার বুদ্ধির পরিচয় পায়নি এমন সব অজানা লোকে আমার খুব প্রশংসা করে' থাকে, তার খোঁজ রাখ? আমিও সেইজন্যে এই নগরে কারো সঙ্গে সহজে আলাপ করতে ভিড়িনে।

অবিমারক

আর আমার দূরে দূরে থাকা উচিত নয়। প্রেয়সী আমার বহু পরিবারে পরিবৃত থাকতেন বলে আমি তাঁকে প্রবোধ দেবার ক্ষণমাত্রও অবসর পেতাম না। আর আজ এঁকে প্রাসাদের মধ্যেই প্রবোধ দেবো।

বিদূষক

তুমি ঠিক বলেছ বন্ধু। চল প্রাসাদে আরোহণ করি।

অবিমারক

বন্ধু, যে অট্টালিকায় কষ্টে আরোহণ করা যায় তাকেই প্রাসাদ বলে, যে-সে বাড়ীকে প্রাসাদ বলা চলে না।

বিদূষক

বাঃ! উঁচুতে উঠব অথচ কষ্ট হবে না, এও কি হয়? উচ্ছিষ্ট না করে' খাওয়া কি সম্ভব? আমি ভাই এইখানেই থাকি। তুমি প্রাসাদে ওঠ গে।

অবিমারক

যদি তোমায় ছেড়ে যাই তবে যে তুমি ধরা পড়ে' যাবে।

বিদূষক

আহা তাইত! একেবারে সে কথা ভুলে মেরে দিয়েছি। আমার স্মরণ রাখবার শক্তি কত তা ত জান, আমাকে বার বার বলে' বলে' স্মরণ করিয়ে দিয়ো।

অবিমারক

এই দিকে এস। (আরোহণ করিয়া দেখিয়া) বন্ধু, এই ইনিই আমার প্রিয়া, নলিনিকার সঙ্গে শিলাসনে উপবেশন করে আছেন।

শিলাতলে সে যে বসে আছে,
বাম করে রাখি মলিন মুখ,
প্রসাধন তার ঘুচে গেছে,
মন মথি তার উঠিছে দুখ।

ভাবনায় মন গেছে ডুবে
চঞ্চল দিঠি হয়েছে থির,
'অবনত মুখে আছে বসে'
লুকাতে তাহার নয়ন-নীর।

কুরঙ্গী

(স্বগত) এমন জীবন্মৃত হয়ে থাকায় ফল কি? (প্রকাশ্যে) নলিনিকে, যাও মাগধিকাকে ডেকে আন, আমি উপস্নান করব।

নলিনিকা

রাজকুমারীকে একলা রেখে আমি কেমন করে যাই, এখানে কেউ আর নেই।

(হরিণিকার প্রবেশ)

হরিণিকা

রাজকুমারীর জয় হোক। রাজকুমারী, মহারাণী বল্লেন—এখন আপনার মাথার ব্যথা কেমন আছে? এই ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন, কপালে লাগাতে হবে।

কুরঙ্গী

নলিনিকে, এইবার তুমি যাও। দেবতা বর্ষাবে বলে' মনে হচ্ছে। এই নববর্ষার বৃষ্টিধারায় স্নান করতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে। আমার উপস্নানের জোগাড় সত্বর করে' দাও।

নলিনিকা

ভর্ত্তৃদারিকার যেমন আদেশ।

অবিমারক

এঁর উদ্দেশ্য কি?

কুরঙ্গী

ওলো! একবার কাছে আয়।

নলিনিকা

রাজকুমারী, এই এসেছি।

কুরঙ্গী

তোর গা কি বেশ ঠাণ্ডা?

নলিনিকা

তা ত জানিনে রাজকুমারী।

কুরঙ্গী

আচ্ছা আয় আমায় একবার আলিঙ্গন কর।

নলিনিকা

রাজকুমারী, এই করি। (আলিঙ্গন করিল)

কুরঙ্গী

আঃ! অতিশীতল মনোহর তোর অঙ্গ।

নলিনিকা

অনুগৃহীত হলাম।

কুরঙ্গী

আঃ! আমার অঙ্গ যেন জুড়িয়ে গেল! (স্বগত) সখীর প্রতি প্রণয়প্রদর্শন করা ত হল, এর আলিঙ্গনও পেলাম। (প্রকাশ্যে) এখন তুমি যাও।

নলিনিকা

যে আজ্ঞা রাজকুমারী।

হরিণিকা

ভর্ত্তৃদারিকে, ভর্ত্রীকে কি নিবেদন করব?

কুরঙ্গী

আজকে আমার সকল রোগ বালাই দূর হয়ে যাবে।

হরিণিকা

তুমি কেমন করে জানতে পারলে, জিজ্ঞাসা করলে কি বলব?

কুরঙ্গী

ভালো কথা বলেছ। ব'লো এই ওষুধেই ভালো হয়ে গেছে।

হরিণিকা

ভর্ত্তৃদারিকা যেমন আজ্ঞা করেন। (নিষ্ক্রান্ত)

অবিমারক

এঁর মতলব কি?

তন্বী ফেলিছে উষ্ণ নিশ্বাস, মুহু চাহে চারিদিক পানে,
নেত্রযুগল অশ্রুপূরিত, মনে কিবা আছে কেবা জানে?

কুরঙ্গী

এইবার, আমার এই ওড়না গলায় দিয়ে প্রাণত্যাগ করি। (উঠিয়া সেইরূপ করিতে গিয়া মেঘগর্জ্জন শুনিয়া) বাবা রে! রক্ষা কর রক্ষা কর আমাকে।

অবিমারক

বন্ধু এর পর আর উপেক্ষা করা চলে না। (বাম অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী ধারণ করিয়া) প্রেয়সী! ভয় কি, ভয় কি? (কুরঙ্গীকে ধরিয়া তুলিল)

কুরঙ্গী (সহর্ষে)

একি সত্য! আমি যে অবাক হয়ে গেলাম!

অবিমারক

প্রিয়ে! শঙ্কা দূর কর। (আলিঙ্গন করিল)

কুরঙ্গী

আশ্চর্য্য! ক্ষণমধ্যে আমার শরীরদাহ দূর হয়ে গেল!

অবিমারক

এঁর আলিঙ্গন এমনি!

প্রিয়ার অঙ্গ-পরশ আমার প্রাণের প্রাণে আছে জানা,
তবুও আজি বক্ষে আমার বাঁধল অধিক রসের দানা!
রাজার ভাগ্যে বিজয় লাভ ত নূতন কথা মোটেই নয়,
নূতন বিজয় লাভের হর্ষ তবুও তাহার হয়ই হয়।

বিদূষক

এরা আবার কাঁদতে আরম্ভ করলে কেন? অতিমাত্র দুঃখ করাটা কিছু নয়। তা হলে আমাকেও কান্নায় যোগ দিতে হয়। কিন্তু আমার চোখে অশ্রু জিনিসটা বড়ই দুর্লভ, কিছুতেই এক ফোঁটা পড়তে চায় না। যবে আমার বাবা মারা গেলেন তবে অনেক চেষ্টা চরিত্তির করে অনেক কষ্টে একটু কাঁদতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু চোখ নিংড়ে এক ফোঁটা জল কিছুতেই বা'র করতে পারলাম না। অন্যের দুঃখ দেখে যা বেরুবে তা ত জানাই আছে। তবু চেষ্টা যত্ন করে একটু কাঁদতেই হয়।

অবিমারক

বন্ধু, তোমার ঠাট্টা রাখ। স্নেহের নাম সরলতা।

আমায় দেখে হাসছ তুমি তোমায় নাহি দুষি,
বুদ্ধি আমার বিরুদ্ধে তার নিন্দা নাহি পুষি;
বুদ্ধিমান ও মূর্খে দিলে একই কাজে যোগ,
দুইয়ের বুদ্ধি এক হয় না, দেহের কর্ম্মভোগ।

নলিনিকা (ফিরিয়া আসিয়া)

হরিণিকে, হরিণিকে! দুয়ার বন্ধ করেছিস কেন? হায় হায়! দুয়ার বন্ধ করে বুঝি সকল জ্বালা জুড়াল? হরিণিকে, হরিণিকে! হায় হায়! তাই হয়েছে বোধ হয়।

অবিমারক

নলিনিকার স্বরের মতন লাগছে। বন্ধু, দ্বার খুলে দাও।

বিদূষক

তোমার যেমন অভিরুচি। (উদ্‌ঘাটন করিয়া) আসুন আসুন আপনি।

নলিনিকা

এ মিন্‌সে আবার কে!

বিদূষক

ঠিক বুঝেছ তুমি ঠাকরুণ! বাঃ রাজার বাড়ীর কি মহিমে! রাজবাড়ীর লোক না হলে আমায় কি আর কেউ মিন্‌সে মনে করত? ওগো আমি ইস্তিরী লোক!

অবিমারক

নলিনিকে, এস এদিকে।

নলিনিকা

কি ভর্ত্তৃদারক! ভর্ত্তৃদারক, প্রণাম হই। ভর্ত্তৃদারক, এ মিন্‌সে কে?

বিদূষক

আমি পুষ্করিণী নামে এঁর দাসী।

অবিমারক

আমরা যে সন্তুষ্টের গল্প সদাসর্ব্বদা করি, এ সে-ই ব্রাহ্মণ।

নলিনিকা

হ্যাঁ হ্যাঁ, এ বামুনকে ত আমি আগে নগরের চক-বাজারে দেখেছি।

বিদূষক

তুই ছুঁড়ি একেবারে কাঁচা! পৈতে পরলে বামুন, কপ্‌নি পরলে সন্ন্যাসী, আর সেটুকু ফেললে হই শ্রমণ, এও কি আবার বলে' দিতে হয়? তোর হাতে কি?

নলিনিকা

ভর্ত্তৃদারিকার উপস্নানের আয়োজন।

বিদূষক

আ মলো! দেখছিস না এঁর খিদে পেয়েছে বলে' ইনি কাঁদছেন, আর নিয়ে এল কিনা উপস্নানের আয়োজন। যা যা শীগ্‌গির খাবার নিয়ে আয়। আমি তা হলে এঁর গ্রাস থেকে বেঁচে যাব।

নলিনিকা

দুর্ব্রাহ্মণ! এমন অবস্থাতেও সেই পেটেরই ধান্দা! থাম থাম এখন। দিনের বেলা রাজপথে অনেক পুরুষ গতায়াত করছে, এমন সময় ভর্ত্তৃদারক এখানে এলেন কেমন করে'?

অবিমারক

তোমাকে সন্তুষ্ট সব কথা বলবে।

নলিনিকা

ইনি আমায় ত মান্য করে' মিষ্টমধুর বচনে তাড়াবার জোগাড়ে ছিলেন। যাই হোক, এঁকে নিয়ে চতুঃশালে গিয়ে সকল পরিজনের সঙ্গে সব কথা শুনব। এস ঠাকুর, এস। (আকর্ষণ করিতে লাগিল)

বিদূষক

দোহাই তোমার, রক্ষা কর, ছেড়ে দাও।

কুরঙ্গী

এ ব্রাহ্মণ খুব মস্করা!

অবিমারক

বন্ধু, তুমি খুব মস্করা।

বিদূষক

অ্যাঁ! কে আমাকে এমন অশ্রদ্ধার কথা বলে? আমি মস্করা? কক্‌খনো না, যে বলে সে মস্করা! যে নিজের অবস্থা বুঝে সুঝে একটা কিছু করতে গিয়ে মেঘের শব্দ শুনে সব ভুলে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে, সে মস্করা, না আমি মস্করা?

কুরঙ্গী

ওমা! এ সব দেখেছে?

নলিনিকা

ওগো ব্রাহ্মণ, তোমায় মিনতি করি, এই দিকে এস এখন।

বিদূষক

যদি ভোজন করাও তা হলে যাই। কেউ বাড়ীতে এলে তাকে আগে খাওয়াতে হয়, জান ত?

নলিনিকা

এস এস, আমার সমস্ত আভরণ তোমায় দেবো।

বিদূষক

মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজে না চাঁদ, ঘি-মাখা কথায় পিত্ত নষ্ট হয় না, আগে আমার হাতে দাও।

নলিনিকা

এই নাও। (আভরণ সমস্ত খুলিয়া দিল)

বিদূষক

শোন তবে বলি।

নলিনিকা

মূঢ় ব্রাহ্মণ কোথাকার! চতুঃশালে গিয়ে সকল পরিজনের সঙ্গে শুনব।

বিদূষক

আচ্ছা, ওঁকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

নলিনিকা

আরে আমার কে রে! আমার সমস্ত আভরণ নিয়ে তুমি ত আমার বল্লভ হয়েছ। এস বলছি। (বিদূষকের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল)

বিদূষক

ওগো! না না অমন কথা বলো না। আমি অতি ছেলেমানুষ।

নলিনিকা

জানি জানি তোমার ছেলেমানুষি। ছেলেমানুষ যদি ত শীগগির এস, ছেলেমানুষের কথা শুনতে হয়।

বিদূষক

যে আজ্ঞে। চল তবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

অবিমারক

প্রিয়ে, দেখ দেখ পরম দর্শনীয় বর্ষাবল্লভ কালো মেঘ উঠেছে।

বর্ষাকালের নকিব ইহারা ঘোষিছে আড়ম্বরে;
সঙ্গীতপটু নৃত্যকুশল বিচিত্র লীলা করে।
বজ্রগর্ভ, এক-বাছুরিয়া গাভীর মতন ঠিক;
তড়িৎ-সাপের বাস করিবার বিবরের বল্মীক।
আকাশে টাঙানো কালো যবনিকা, গাছের ঝাঁপালো ঝাড়;
মদনের শর শানাবার শিলা প্রকাণ্ড এ পাহাড়।
রুষ্ট নারীর তুষ্টি-ঘটক; গিরির স্নানের ঘড়া;
জলধি সলিল ভিক্ষার লাগি ভিক্ষাপাত্র গড়া।
রবি ইন্দুর মুখ ঢাকিবার উত্তরীয়ের মতো;
দেবতার ধারা-যন্ত্র, সলিল ছিটায় সে অবিরত।

কুরঙ্গী

আর্য্যপুত্র, হাঁ ঠিক তেমনই দেখাচ্ছে বটে।

অবিমারক

বাঃ! কেমন বড় বড় ফোঁটায় ছাড়া ছাড়া ধারা পড়ছে!

আকাশ-সাগরে উর্ম্মির মতো গর্জ্জিয়া উঠে মেঘ,
মেঘের নাম্‌না ঝুরির মতন ঝরিছে ধারার বেগ।
রাক্ষসীদের ভ্রূকুটির মতো তড়িৎ স্ফুরিয়া উঠে,
যৌবন-ঘন আনন্দরস বর্ষায় লও লুটে।

কুরঙ্গী

আর্য্যপুত্র, দেবতা বর্ষণ করতে আরম্ভ করলে।

অবিমারক

প্রিয়ে, চল ভিতরে যাই।

কুরঙ্গী (সহর্ষে)

আর্য্যপুত্র যেমন আজ্ঞা করেন।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ অঙ্ক

(ধাত্রীর প্রবেশ)

ধাত্রী

আঃ! পোড়া দেবতার কি অব্যবস্থা! প্রথমে মহারাজ আর সৌবীররাজ কুমার বিষ্ণুসেনের সঙ্গে আমাদের রাজকন্যার বিয়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন। এখন এমন এক জনের সঙ্গে রাজকুমারীর মিলন ঘটেছে, যার মতন রূপ গুণ মানুষের ত দেখা যায় না; কিন্তু সে যে কে, কোন্ বংশে তার জন্ম তার কিছুই জানা নেই। আজকে আবার মহারাণী সুদর্শনা আর মন্ত্রী ভূতিক জোট করে' কাশীরাজের পুত্র জয়বর্ম্মাকে এনে রাজবাড়ীতে ঢুকিয়েছেন। স্বয়ং কাশীরাজ যজ্ঞে ব্যাপৃত থাকায় আসতে পারেন নি। এখন কি যে হবে তার ঠিক নেই!

(বসুমিত্রার প্রবেশ)

বসুমিত্রা

আ মলো! দৈবজ্ঞ মিনসেগুলোর কি বেয়াড়া আক্কেল! তারা শুধু নিজেদের তিথি নক্ষত্র যোগ নিয়েই আছে, কিন্তু কাজ যে কি করে' হবে সে হুঁস তাদের এক কড়াও যদি থাকে! কুমার জয়বর্ম্মা আজকেই এসে রাজবাড়ীতে ঢুকলেন, আর আজকেই ঠিক হলো বিয়ের দিন! এ যেন ঠিক ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে! ওমা! হাজার হোক রাজার মেয়ে ত! (পরিক্রমণ) ঐ যে জয়দা ধাত্রীও মুখ ভার করে' ব্যস্ত হয়ে কি যেন ভাবছে! জয়দা, ভর্ত্রী তোমাকে ডাকছেন।

ধাত্রী

কেন লা? কিছু জানিস?

বসুমিত্রা

আবার কেন? এই কাজের সব বিধি-ব্যবস্থা ঠিক করবার জন্যে।

ধাত্রী

ভর্ত্রীর অভিপ্রায়টা কি রকম বুঝলি?

বসুমিত্রা

আপনার বংশের বিষ্ণুসেনের খবর না জেনে জয়বর্ম্মাকে মেয়ে দিতে তাঁর ইচ্ছে নেই। অধিকন্তু মহারাজ সৌবীররাজের ছেলে বিষ্ণুসেনের খবর না জানতে পেরে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন।

(নলিনিকার প্রবেশ)

নলিনিকা

সঙ্কেতস্থানে প্রিয়ার সঙ্গে মিলনোৎসুক লোকেদের মতন আজকে আমাদের বিপদ চারিদিকে ঘিরে এসেছে। (পরিক্রমণ করিয়া দেখিয়া) আমার মা বসুমিত্রার সঙ্গে কি আবার পরামর্শ করছে? ওদের কাছে গিয়ে দুঃখের সকল কথা শুনিগে।

বসুমিত্রা

ওলো নলিনিকে, আয় লো আয়। তুই কঞ্চুকীর কাছে থাকিস, রাজবাড়ীর সকল খবরই বেশ জানিস।

নলিনিকা

খবর খুব জবর! কিন্তু তা বলে তোমায় বলতে আমি আসিনি।

বসুমিত্রা

জাদু আমার, লক্ষীটি, বল।

নলিনিকা

আজকে সৌবীররাজের মন্ত্রীরা দূত পাঠিয়েছেন, এই বলে' যে—আমাদের প্রভু আপনাদের নগরে স্ত্রীপুত্র নিয়ে লুকিয়ে আছেন; আমাদের গুপ্তচরের মুখে আপনারা সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে পারবেন।

ধাত্রী ও বসুমিত্রা

লুকিয়ে আছেন কেন? তারপর তারপর?

নলিনিকা

এই কথা শুনে মহারাজ আর্য্য ভূতিককে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের খুঁজতে বেরিয়েছেন।

ধাত্রী

কি হবে না জানি।

বসুমিত্রা

নলিনিকে, তুই এখন এখান থেকে যা।

নলিনিকা

আর্য্যা যেরূপ বলেন। (প্রস্থান)

বসুমিত্রা

চল আমরা ভর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিগে।

ধাত্রী

তাই চল।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

(সৌবীররাজ, ভূতিক প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া রাজা কুন্তিভোজের প্রবেশ)

কুন্তিভোজ

বহুবার-দেখা মুখেতে আমার দেখিছ কিবা ?
স্মরিয়া বাল্য-প্রণয় বন্ধু ধরহ গ্রীবা।
অনিমেষ আঁখি আমার হে প্রিয় প্রণয়ে তব,
নেহারে তোমার বদন মধুর যেন সে নব।

সৌবীররাজ

তোমার যেমন অভিরুচি। (আলিঙ্গন করিল)

কুন্তিভোজ

চিন্তা-আকুল চিত্ত তোমার অতি,
বুদ্ধি বিকল, চঞ্চল তব মতি,
বাক্য তোমার বাষ্প-আহত যেন,
মুখ বিষণ্ণ, নেত্রে অশ্রু কেন ?
হর্ষের কালে বিকার কেনবা মনে,
প্রকাশিয়া বল রেখনা সঙ্গোপনে।

সৌবীররাজ

আমি তোমার সঙ্গে মিলন হওয়াতে অপ্রসন্ন হইনি। কিন্তু পুত্রস্নেহ বড় বলবান্।
পুত্রের লাগি হৃদয়ে আমার যে শোক জাগে,
তোমার মিলনে অশ্রুর রূপে প্রকাশ মাগে।

কুন্তিভোজ

পুত্রের শোক—সে আবার কি ?

ভূতিক

প্রভূকে নিবেদন করি—এক বৎসর হ'ল কুমারের কোনো উদ্দেশ পাওয়া যাচ্ছে না।

সৌবীররাজ

পুত্রস্নেহ বড় প্রবল। দেখ—
অনুপম যার রূপ ও বীর্য্য বল,
সে মোর পুত্রে স্মরিয়া মন বিকল।
তোমার-চরণ-ধূলি-দূসরিত-কেশ
যদি সে হইত, না থাকিত দুখ-লেশ।

ভূতিক

(স্বগত) কুমারের অদর্শনে এই বিষম শোক ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এ নিবারণ করতে হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) প্রভুর এই বিপদ কি করে' ঘটল ?

কুন্তিভোজ

সত্যিই ত, আমিও এই শোকে বিক্ষিপ্তমন হয়ে এ কথাটা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি।

সৌবীররাজ

শোন বলি। ভূতিক ত সমস্তই জানেন। তবু আমার মুখ থেকে সব শুনতে চাচ্ছেন।

কুন্তিভোজ

আমরা শুনবার জন্য উৎসুক হয়েছি।

সৌবীররাজ

চণ্ডভার্গব নামে অত্যন্ত ক্রোধন ব্রহ্মর্ষির নাম ত জানা আছে।

কুন্তিভোজ

হাঁ, সেই তপস্বীর কথা শুনেছি।

সৌবীররাজ

তিনি আমার রাজ্যে এসেছিলেন। বনে তাঁর শিষ্যকে ব্যাঘ্র আক্রমণ করে' বধ করেছিল।

কুন্তিভোজ

তারপর, তারপর ?

সৌবীররাজ

আমিও সেই সময় মৃগয়া করতে করতে সেই স্থানে গিয়ে পড়েছিলাম।

কুন্তিভোজ

তারপর, তারপর ?

সৌবীররাজ

আমায় দেখে সেই ঋষি ক্রোধে যেন জ্বলে উঠলেন; জটাভার খুলে এলিয়ে ঝুলে ছড়িয়ে পড়ল; তিনি শিষ্যের গায়ে হাত রেখে ক্রমবর্দ্ধিত রোষে ভ্রুকুটিবিকট মুখে স্খলিত বচনে আমাকে যাচ্ছে-তাই তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন; আমার একটা কথাও শুন্‌তে চাইলেন না।

কুন্তিভোজ

তারপর, তারপর ?

সৌবীররাজ

তখন আমিও ভবিতব্যের প্রবল তাড়নায় অধৈর্য্য হয়ে বলে উঠলাম—কি হয়েছে বলবে না, শুধু শুধু ক্ষেপে উঠে তিরস্কার করছ, ব্যাপার কি ?

ব্যাপারটা না বলে, তুমি করছ শুধুই রোষ,
শুধু শুধুই রাগছ তুমি না দেখিয়ে দোষ,
ক্রোধের যে দাস সে ত ঋষির ওঁচাটে জঞ্জাল,
মুনিঋষি খোড়াই তুমি, স্বভাবে চণ্ডাল !

কুন্তিভোজ

ছি ছি ! তোমার এমন বলা উচিত হয়নি।

সৌবীররাজ

আমার সেই কথা না শুনে, তিনি ঘৃতধারায় নিষিক্ত অগ্নিশিখার মতন প্রজ্বলিতনেত্রে বারম্বার মাথা নেড়ে 'কী ! কী ! কি বল্লি !' বলে' আমাকে শাপ দিলেন—

ব্রহ্মর্ষির শ্রেষ্ঠ আমি ! মোরে তুই বলিলি চণ্ডাল !
দারাপুত্র সহ তুই তাই হয়ে র'বি কিছু কাল।

কুন্তিভোজ

হায় ! মহৎ ব্যক্তিদের বিপদ এমনই অল্প কারণেই ঘটে !

ভূতিক

সৌবীররাজবংশের সৌভাগ্য চিরকালই প্রবল। তাইতে

অতি রুষ্ট ব্রহ্মর্ষি সে শাপ দিয়া করিল চণ্ডাল,
সেইক্ষণে ভস্মসাৎ করে নাই, কি জোর কপাল !

কুন্তিভোজ

ঠিক বলেছ তুমি। তারপর, তারপর ?

সৌবীররাজ

তখন শাপগ্রস্ত হয়ে আমার মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। আমি অনেক অনুনয় বিনয় মিনতি করাতে আস্তে আস্তে তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে অনুগ্রহ করলেন—

বৎসরকাল থাকিয়া ছদ্মবেশে
শাপেতে মুক্ত ফিরিবে আপন দেশে।—

এই কথা বলে' প্রসন্ন মনে তিনি আহ্বান করলেন—বৎস কাশ্যপ ! এস। অমনি সেই ব্যাঘ্রের দ্বারা নিহত বালক তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে প্রস্থান করল। আমি সম্বৎসরকাল চণ্ডালব্রত পালন করলাম। আজ আমার শাপ থেকে মুক্তির দিন।

কুন্তিভোজ

প্রবৃত্তির নিবৃত্তিই বিপদ থেকে মুক্তি ! ভাগ্যবলে তুমি বেঁচে গেছ।

ভূতিক

প্রভুর জয় হোক।

কুন্তিভোজ

বিষ্ণুসেনের মা সমস্ত পরিজনের সঙ্গে অন্তঃপুরে গেছেন বোধহয়।

ভূতিক

তিনি অন্তঃপুরে গিয়ে বহুকালের প্রসুপ্ত প্রণয়কে উদ্বোধিত করছেন।

কুন্তিভোজ

আচ্ছা, বিষ্ণুসেনের নাম আজকাল অবিমারক হ'ল কেমন করে ?

ভূতিক

প্রভু শুনুন—ধূমকেতু নামে এক অসুর আছে। সে সমস্ত লোককে মারবার জন্যে ভ্রমণ করতে করতে এসে সৌবাররাজ্য ধ্বংস করতে আরম্ভ করলে।

কুন্তিভোজ

ভারি আশ্চর্য্য কথা ত ! তারপর তারপর ?

ভূতিক

তখন স্বদেশের সমস্ত প্রজার দুঃখ দেখে সেই রাক্ষস-উপদ্রবের প্রতিকারের উপায় স্থির করতে না পেরে মহারাজ অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করতে লাগলেন।

কুন্তিভোজ

তারপর, তারপর ?

ভূতিক

তারপর কুমার বিষ্ণুসেন সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পেরে গায়ে ধূলো কাদা মেখে মাথার চুল এলিয়ে সমান বয়সের ছেলেদের সঙ্গে আনন্দে খেলা করতে করতে যেখানে রাক্ষস ছিল সেখানে সহসা গিয়ে উপস্থিত হলেন। কুমারের সমস্ত রক্ষিপুরুষেরা নেশায় মত্ত হয়ে পড়ায় তাঁকে বারণ করতে পারেনি।

কুন্তিভোজ

অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! তারপর, তারপর ?

ভূতিক

তখন সেই রাক্ষস চমৎকার আহার জুটেছে মনে করে' কুমারকে দেখে খুসী হয়ে স্বকর্ম্ম সম্পাদন করতে উদ্যত হ'ল।

কুন্তিভোজ

উঃ রাক্ষসটা কি নিষ্ঠুর ! তারপর তারপর ?

ভূতিক

তখন কুমার একটু হেসে—

গিরি সে যেমন অশনি-আঘাতে ভাঙিয়া পড়ে,
বন সে যেমন হয় বিনষ্ট আগুনে ঝড়ে,
ললিত কিশোর অনায়ুধ সেই কুমার তারে
অনায়াসে একা পাঠাইয়া দিল মরণ-পারে।

কুন্তিভোজ

হাতীর হাঙ্গামার দিন প্রথমেই আমি বলেছিলাম—এ লোক ক্ষণজন্মা পুরুষ, যে-সে মানুষ নয়!

সৌবীররাজ

আচ্ছা আপনি সহস্রনেত্র চরদিগের নিকট অবিমারকের কি সংবাদ পেয়েছেন?

ভূতিক

প্রভু,

গম্য দেশেতে খুঁজেছি কুমারে কোথাও নাই,
মায়াতে আবৃত রয়েছে. চিত্তে লাগিছে তাই।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ

বেদগান করি' ব্রহ্মারে আমি তুষিয়া থাকি,
গানেতে হরির রোমহর্ষণ সজল আঁখি।
বীণা-ঝঙ্কারে উপজে কলহ এবং গান,
অহরহ ফিরি লোকে লোকে তাই করিয়া দান।

আহা! কুন্তিভোজের বাবা দুর্যোধন আমাদের যথেষ্ট খাতির করতেন! কুন্তিভোজও মনুষ্যজন্ম লাভ করার পর থেকে আমাদের কাছে ভৃত্যের ন্যায় আচরণ করে' থাকেন। আজ অবিমারকের অদর্শনে কুন্তিভোজ আর সৌবীররাজ বিষম কার্যসঙ্কটে পড়েছেন। আজ আমি অবিমারককে দেখিয়ে ওঁদের মনের ক্লেশ দূর করব বলে' পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছি।

(কুন্তিভোজ ও সৌবীররাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন)

কুন্তিভোজ

অ্যাঁ এ যে ভগবান্ দেবর্ষি নারদ! ভগবন্! প্রণাম করি।

নারদ

তোমার শুভ হোক।

কুন্তিভোজ

আপনার বিশেষ অনুগ্রহ।

সৌবীররাজ

ভগবন্! প্রণাম করি।

নারদ

তোমার শান্তি হোক।

সৌবীররাজ

অনুগৃহীত হলাম।

কুন্তিভোজ (ভূতিকের কানে কানে)

ভূতিক, পূজার সামগ্রী আনয়ন কর।

ভূতিক

যে আজ্ঞা প্রভু! (বাহিরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) এই নিন অর্ঘ্য আর পাদ্য।

কুন্তিভোজ

ভগবন্ অনুগ্রহ করুন।

নারদ

আচ্ছা।

কুন্তিভোজ (অর্চনা করিয়া)

ভগবন্! আপনার পদার্পণে আমাদের গৃহ আজ পবিত্র হল।

সৌবীররাজ

দেবর্ষির দর্শনে আমি শাপমুক্ত হলাম।

নারদ

আমি তোমাদের দর্শন দেবার জন্যে এখানে আসিনি। অবিমারকের অদর্শনে তোমাদের দুঃখের কথা জেনে আমি অবতীর্ণ হয়েছি।

কুন্তিভোজ ও সৌবীররাজ

যদি সেইজন্যে এসে থাকেন, তবে ত আমাদের সন্তাপ দূর হয়ে গেছেই।

নারদ

সুদর্শনাকে ডাক।

ভূতিক

ভগবান্ যেরূপ আজ্ঞা করেন।

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুদর্শনাকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল)

সুদর্শনা

দেবর্ষি এসেছেন?

ভূতিক

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুদর্শনা

আমার পুত্রের বিবাহ তাহলে সনাথ হল। (অগ্রসর হইয়া) ভগবন্! প্রণাম করি।

নারদ

শুন গো ভাগ্যবতী তোমাদের এমনি প্রীতি হউক নিতি ।
তোমার প্রীতির উপদ্রবের পাউক সাজা নিত্য রাজা ।

সুদর্শনা

আপনার বিশেষ অনুগ্রহ ।

নারদ

এখন জিজ্ঞাস্য যা আছে জিজ্ঞাসা কর তোমরা ।

সকলে

আপনার অপার অনুগ্রহ ।

কুন্তিভোজ

ভগবন্ ! সৌবীররাজপুত্র কি জীবিত আছেন ?

নারদ

আছেন ।

সৌবীররাজ

তবে তার উদ্দেশ পাওয়া যাচ্ছে না কেন ?

নারদ

বিবাহে ব্যস্ত আছেন কি না তাই ।

সৌবীররাজ

কুমারের বিবাহ হচ্ছে ?

কুন্তিভোজ

কোন্ দেশে ?

নারদ

বৈরন্ত্য নগরে ।

কুন্তিভোজ

বৈরন্ত্য বলে' আর কোনো নগর আছে না কি ? কুমার কার জামাতা হলেন ?

নারদ

কুন্তিভোজের ।

কুন্তিভোজ

সে কে ?

নারদ

কুরঙ্গীর পিতা সেই, রাজা সেই বৈরন্ত্য নগর,
দুর্যোধনপুত্র সে যে, কুন্তিভোজ তোমারি সোসর ।

কুন্তিভোজ

বহু প্রশ্ন থাক । আপনি কি বলতে চান যে আমার কন্যা কুরঙ্গীর সঙ্গে কুমারের বিবাহ হয়েছে ?

নারদ

হ্যাঁ, তাই ।

কুন্তিভোজ

আমি অত্যন্ত লজ্জিত হচ্ছি ! এ যে বড় লজ্জার কথা ! কে সম্প্রদান করলে, কবে বা, ঐ বা কেমন করে' কবে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করলে !

নারদ

গজের ব্যাপার-দিনে　শুভদৃষ্টি দুই জনে,
মদন ঘটক হল, দাতা প্রজাপতি ;
প্রথমে পৌরুষ-বলে　অবশেষে মায়া-ছলে
অন্তঃপুরে অব্যাহত তার গতায়তি ।

কুন্তিভোজ

ঋষিবাক্য প্রতিবাদের যোগ্য নয় । এইরূপই হবেও বা । ভগবন্ ! কুমার ও কুরঙ্গীর কি উপযুক্ত অবসর হয়েছে ? এখন বিবাহ কি দেওয়া যেতে পারে ?

নারদ

তারা গান্ধর্ব্ব বিবাহ নিজেদের সুবিধা-মত সেরে নিয়েছে ।

কুন্তিভোজ

আমি অগ্নিসাক্ষী করে' বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি ।

নারদ

অগ্নি নিত্য সাক্ষীই আছেন । তথাপি আত্মীয় স্বজনের পরিতোষের জন্য পুরোহিতের দ্বারা বিবাহের আয়োজন করিয়ে শীঘ্র কুমার ও তার পত্নীকে এখানে আনয়ন করুন ।

কুন্তিভোজ

ভগবন্ ! এই আমি চললাম ।

নারদ

আপনি অপেক্ষা করুন । ভূতিক, তুমি যাও ।

ভূতিক

যে আজ্ঞা ভগবানের । (প্রস্থান)

কুন্তিভোজ

ভগবন্ ! আমার কিছু বলবার আছে ।

নারদ

বেশ । বলুন ।

কুন্তিভোজ

ভগবন্ ! সুদর্শনার পুত্র জয়বর্ম্মাকে কুরঙ্গী দা

বলে আমি সুদর্শনাকে তার স্বামীর সহিত পূর্ব্বেই এখানে আনিয়েছি, এখন কি করা যায়, আপনিই পরামর্শ দি'ন।

নারদ

আচ্ছা সব ঠিক করে দিচ্ছি। আপনি ক্ষণকাল একটু সরে থাকুন।

কুন্তিভোজ

যে আজ্ঞা। (সরিয়া দাঁড়াইল)

নারদ

সুদর্শনা, এদিকে এস।

সুদর্শনা

ভগবন্, এই এলাম।

নারদ

তুমি আমাদের সব কথা শুনেছ ত?

সুদর্শনা

সৌবীররাজপুত্রের গুণসঙ্কীর্ত্তন শুনেছি।

নারদ

না না এমন বলোনা। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে অগ্নিদেব হ'তে উৎপন্ন সে তোমারই জ্যেষ্ঠ পুত্র।

সুদর্শনা

অ্যাঁ! ভগবান্ এও জানেন?

নারদ

আমার আজ্ঞা পালন কর তবে।

সুদর্শনা

ভগবান আদেশ করুন, আমি তাই করব।

নারদ

তোমার এই পুত্র অগ্নি হ'তে উৎপন্ন। তোমার ভগিনী সুচেতনার পুত্র প্রসবসময়েই স্বর্গে গিয়েছিল, তুমি তোমার এই পুত্র তোমার ভগিনীকে দান করেছিলে। সৌবীররাজও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে আনন্দের উপযুক্ত অনুষ্ঠান করে' তার নাম রাখলেন বিষ্ণুসেন। সে ছেলে অমানুষসদৃশ বলবীর্য্য পরাক্রমে বড় হয়ে উঠে অবি নামে অসুরকে মেরেছিল বলে' লোকে বিষ্ণুসেনকে বলে অবিমারক। তারপর সে ব্রহ্মশাপে হীনদশা প্রাপ্ত হয়ে হস্তীবিপ্লবের দিন কুরঙ্গীকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল; তারপর কুরঙ্গীর সহিত সম্মিলিত হয়েছিল; কন্যাপুর-রক্ষীরা জানতে পেরে অন্তঃপুর অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করলে তার ধরা পড়বার খুব ভয় হয়; তখন অগ্নিদেব তাকে লুকিয়ে বা'র করে দ্যান। তখন সে দুঃখে অগ্নিপ্রবেশ করে; কিন্তু পিতা অগ্নি তাকে স্নেহালিঙ্গনে গ্রহণ করাতে অগ্নিতে আমি দগ্ধ হলাম না বলে' মরুৎপ্রপাতের জন্য এক পাহাড়ে গিয়ে ওঠে।

সুদর্শনা

উঃ! সমস্তই আশ্চর্য্য!

নারদ

সেখানে কোনো একজন বিদ্যাধর তার রূপ দেখেই খুসী হয়ে প্রীতিবশে তাকে অন্তর্দ্ধান হবার উপায় স্বরূপ এক অঙ্গুরী দান করে,—সে অঙ্গুরী দক্ষিণ অঙ্গুলীতে ধারণ করলে লোক অদৃশ্য হয়, বাম অঙ্গুলিতে ধারণ করলে আবার তাকে দেখতে পাওয়া যায়।

সুদর্শনা

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

নারদ

তখন সে দক্ষিণাঙ্গুলীতে অঙ্গুরী ধারণ করে সন্তুষ্ট নামে এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে কুন্তিভোজের কন্যান্তঃপুরে নিজের বাড়ীর মতো অবাধে প্রবেশ করে' সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। এই ত বৃত্তান্ত। এখন কর্ত্তব্য কি বল।

সুদর্শনা

আমার ভগিনীর দ্বারা বঞ্চিত হয়ে আমার মন ক্ষুব্ধ হচ্ছে, কিন্তু কৌতূহলে আনন্দিতও হচ্ছে। ভগবন্! এই কয়দিন কুরঙ্গী জয়বর্ম্মার স্ত্রী বলেই পরিচিত হচ্ছিল। আজ থেকে সে হঠাৎ তার পূজনীয় ব্যক্তি হয়ে উঠল!

নারদ

অভিজ্ঞনের উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছ! জ্যেষ্ঠের পত্নী কনিষ্ঠকে ত আর দেওয়া যায় না! সুদর্শনা, তুমি কাশী-রাজকে বলো যে কুরঙ্গী জয়বর্ম্মার চেয়ে বয়সে বড়। কুরঙ্গীর ছোট বোন সুমিত্রা আছে, তার সঙ্গে জয়বর্ম্মার বিবাহ হ'তে পারবে।

সুদর্শনা

ঋষিবাক্য শিরোধার্য্য।

নারদ

যাও কুন্তিভোজের কাছে।

সুদর্শনা

যে আজ্ঞা ভগবানের।

(বরবেশে অবিমারক, কুরঙ্গী ও ভূতিকের প্রবেশ)

অবিমারক

ছিঃ ! এইসব বৃত্তান্তের পর বড় লজ্জা বোধ হচ্ছে।

ক্ষেপা হাতীটার উপদ্রবের ব্যাপার শুনে
বিক্রম মোর বাখানে সবাই মুগ্ধ গুণে।
এই ব্যাপারটা শুনিয়া তারাই হাসিবে আজ,
আমার উপরে দিবে চারিত্র-দোষের লাজ !

(পরিক্রমণ করিয়া দেখিয়া) ওমা ! এ যে ভগবান্ নারদ ! ইনি তিনিই—

শাপে ও প্রসাদে বুদ্ধি যাহার এক সমান,
কণ্ঠে যাহার খেলে কৌতুকে বেদ ও গান,
বৈর আগুন নিভায় যেজন স্নেহের জলে,
নষ্ট কর্ম্ম উদ্ধার করে সুকৌশলে।

কুন্তিভোজ

কুমার, এইদিকে এস এইদিকে। কুলদেবতা দেবর্ষিকে প্রণাম কর।

অবিমারক

ভগবন্ ! প্রণাম হই।

নারদ

পত্নীর সহিত তোমার মঙ্গল হোক।

অবিমারক

আমি অনুগৃহীত হলাম। মামা, প্রণাম করি।

কুন্তিভোজ

এস বৎস এস।—

ব্রাহ্মণেরে জয় কর বিনয়ে ক্ষমায়,
আশ্রিতেরে জয় কর স্নেহ ও দয়ায়,
তত্ত্ববুদ্ধি দিয়া জয় কর আপনারে,
তেজে বলে জয় কর যতেক রাজারে।

অবিমারক

অনুগৃহীত হলাম।

কুন্তিভোজ

বৎস, এইদিকে এস এইদিকে, পিতাকে প্রণাম কর।

অবিমারক

বাবা প্রণাম করি।

সৌবীররাজ

এস বাবা এস।

সুন্দর তুমি বরের বেশেতে সেজেছ ভালো,
গুরুজনদের বন্দনা করি বদন আলো।
আমাদের মতো ঝরে যেন তব অশ্রু সুখে
দেখিয়া তোমার প্রিয় নন্দন পুত্র-মুখে।

পুত্র মাতুলকে অভিবাদন কর।

অবিমারক

মামা, প্রণাম করি।

কুন্তিভোজ

এস বৎস, এস।—

শুভ যজ্ঞেতে ব্যাপৃত থাক হরির মতো,
দশরথ সম হও সদা দৃঢ় সত্যব্রত,
পিতার সমান মুক্ত হস্তে করিয়ো দান,
বলবিক্রমে অটুট রাখিয়ো আপন মান।

সৌবীররাজ

পুত্র, সুদর্শনাকে প্রণাম কর।

কুন্তিভোজ

সুচেতনাকে প্রণাম না করে' আগে সুদর্শনাকে প্রণাম করা উচিত হবে না।

নারদ

কারণ আছে। সুদর্শনাকে প্রণাম কর।

সৌবীররাজ ও কুন্তিভোজ

তবে তাই কর।

অবিমারক

মা, আমি প্রণাম করি।

সুদর্শনা

পুত্র, বধূর সঙ্গে চিরজীবী হয়ে থাক। কতকাল পরে তোমায় দেখলাম। আজ আমি পুত্রসম্পত্তিরস অনুভব করলাম। (ক্রন্দন করিতে লাগিল)

কুন্তিভোজ

ইহারে দেখিতেছি সজল-চোখ, স্তনেতে ঝরিতেছে ধারা,
জননী এই তবে, গোপনে ছিল ; মা এর ধাত্রী পারা।

নারদ

স্নেহাতিশয্য ভালো নয়। সুচেতনা আর সুদর্শনা পুত্র আর বধূ নিয়ে অন্তঃপুরে গমন করুন।

কুন্তিভোজ

যে আজ্ঞা ভগবান্।

সুদর্শনা

ভগবানের যেরূপ আজ্ঞা।

নারদ

অবিলম্বে সৌবীররাজকে স্বদেশে পাঠিয়ে দাও। কাশী-রাজকে জয়বর্ম্মার জন্য সুমিত্রাকে দান কর। তুমিও স্থির হও।

কুন্তিভোজ

অনুগৃহীত হলাম।

নারদ

কুন্তিভোজ! তোমার আর কি প্রিয়কার্য্য করব?

কুন্তিভোজ

ভগবান্ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে এর পরে আর আমি কি চাইব?—

গো ব্রাহ্মণ নিত্য থাকুক কুশলে,
সুখেতে থাকুক আমার প্রজারা সকলে।

নারদ

সৌবীররাজ, তোমার কি প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করতে পারি?

সৌবীররাজ

যদি ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে এর চেয়ে আমি বেশী আর কি চাইব—

উদার পৃথিবী অর্ণব-নীল-বসনে
থাকুক মোদের নরেশ্বরের শাসনে।

ভরতবাক্য

অরোগী হউক গাভী, দূর হোক শত্রুদের
রাষ্ট্র আক্রমণ,
সমগ্র এ ধরণীরে একচ্ছত্র রাজসিংহ
করুন পালন॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি ষষ্ঠ অঙ্ক।

অবিমারক নাটক সমাপ্ত।

শুভমস্তু।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

কষ্টিপাথর

স্ত্রীর পত্র

শ্রীচরণকমলেষু—

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে আজ পর্য্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখিনি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি—মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি: চিঠি লেখবার মত ফাঁকটুকু পাওয়া যায়নি।

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে সম্বন্ধ, কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই; সে তোমার দেহমনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে। তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।

আমি তোমাদের মেজ বৌ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জান্‌তে পেরেছি আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে! তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখ্‌চি, এ তোমাদের মেজ-বৌয়ের চিঠি নয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জান্‌তনা সেই শিশু-বয়সে আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সান্নিপাতিক জ্বরে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠ্‌লাম। পাড়ার সব মেয়েরাই বল্‌তে লাগ্‌ল, মৃণাল মেয়ে কিনা তাই ও বাঁচ্‌ল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত? চুরিবিদ্যাতে যম পাকা; দামী জিনিষের পরেই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখ্‌তে বসেছি।

যেদিন তোমাদের দূর-সম্পর্কের মামা তোমার বন্ধু নীরদকে নিয়ে কনে দেখ্‌তে এলেন তখন আমার বয়স বারো। দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের-বেলা শেয়াল ডাকে। ষ্টেশন থেকে সাত ক্রোশ শ্যাকড়া গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পাল্কী করে তবে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছন যায়। সেদিন তোমাদের কি হয়রানি! তার উপরে আমাদের বাঙাল-দেশের রান্না,—সেই রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোলেননি!

তোমাদের বড়-বৌয়ের রূপের অভাব মেজ-বৌকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট করে আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন? বাংলা দেশে পিলে যকৃৎ অম্লশূল এবং কনের জন্যে ত কাউকে খোঁজ করতে হয় না—তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

বাবার বুক দুরদুর করতে লাগ্‌ল, মা দুর্গানাম জপ করতে লাগ্‌লেন। সহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারী কি দিয়ে সন্তুষ্ট করবে? মেয়ের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু সেই রূপের গুমর ত মেয়ের মধ্যে নেই—যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে দামই দেবে সেই তার দাম। তাই ত হাজার রূপে গুণেও মেয়েমানুষের সঙ্কোচ কিছুতে ঘোচে না।

সমস্ত বাড়ির, এমন কি, সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে পাথরের মত চেপে বস্‌ল। সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুই-জোড়া চোখের সামনে শক্ত করে

তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল—আমার কোথাও লুকোনার জায়গা ছিল না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজ্‌তে লাগল—তোমাদের বাড়িতে এসে উঠ্‌লুম। আমার খুঁৎগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন মোটের উপর আমি সুন্দরী বটে। সে কথা শুনে আমার বড় জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু আমার রূপের দরকার কি ছিল তাই ভাবি। রূপ জিনিষটাকে যদি কোনো সেকেলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন তাহলে ওর আদর থাকৃত—কিন্তু ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন তাই তোমাদের ধর্ম্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রূপ আছে সে কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগেনি—কিন্তু আমার যে বুদ্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিঁকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে বিষম উদ্বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চল্‌তে হবে সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চল্‌তে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু কি করব বল? তোমাদের ঘরের বৌয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে? তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্চে অক্ষমের সান্ত্বনা—অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম।

আমার একটা জিনিষ তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল সেটা কেউ তোমরা জাননি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখ্‌তুম। সে ছাই পাঁশ যাই হোক্ না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠেনি। সেইখানে আমার মুক্তি—সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা কিছু তোমাদের মেজ-বৌকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ করনি, চিন্‌তেও পারনি;—আমি যে কবি সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়েনি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সব চেয়ে যেটা আমার মনে জাগচে সে তোমাদের গোয়াল ঘর। অন্দরমহলের সিঁড়িতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোরু থাকে, সামনের উঠোনটুকু ছাড়া তাদের আর নড়বার জায়গা নেই। সেই উঠোনের কোণে তাদের জাবনা দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ—উপবাসী গরুগুলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব্‌লা করে দিত। আমার প্রাণ কাঁদত। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলুম সেদিন সেই দুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত সহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত আমার চোখে ঠেকল। যতদিন নতুন বৌ ছিলুম নিজে না খেয়ে লুকিয়ে ওদের খাওয়াতুম—যখন বড় হলুম তখন গোরুর প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করে আমার ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা আমার গোত্রসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগ্‌লেন।

আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। আমাকেও সে সঙ্গে যাবার সময় ডাক দিয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকৃত তাহলে সেই আমার জীবনে, যা কিছু বড়, যা কিছু সত্য, সমস্ত এনে দিত; তখন মেজ-বৌ থেকে একেবারে মা হয়ে বস্‌তুম। মা যে এক-সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্বসংসারের। মা-হবার দুঃখটুকু পেলুম কিন্তু মা-হবার মুক্তিটুকু পেলুম না।

মনে আছে ইংরেজ ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল। সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান আছে। ঘরে সাজসজ্জা আসবাবের অভাব নেই। আর অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্টো পিঠ—সেদিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সেদিকে আলো মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলে; হাওয়া চোরের মত প্রবেশ করে, উঠোনের আবর্জ্জনা নড়তে চায় না; দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু ডাক্তার একটা ভুল করেছিল, সে ভেবেছিল এটা বুঝি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ দেয়। ঠিক উল্টো; অনাদর জিনিষটা ছাইয়ের মত; সে ছাই আগুনকে হয়ত ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে বুঝতে দেয় না। আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে ত অন্যায্য বলে মনে হয় না। সেই জন্যে তার বেদনা নেই। তাই ত মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ করতেই লজ্জা পায়। আমি তাই বলি মেয়েমানুষকে দুঃখ পেতেই হবে এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয়—তাহলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো। আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে।

যেমন করেই রাখ দুঃখ যে আছে এ কথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসেনি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়াল, মনে ভয়ই হল না। জীবন আমাদের কিইবা, যে মরণকে ভয় করতে হবে? আদরে যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে, মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তাহলে আলগা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপ্‌ড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়সুদ্ধ আমি তেমনি করে উঠে আস্‌তুম। বাঙালীর মেয়ে ত কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু এমন মরায় বাহাদুরিটা কি। মরতে লজ্জা হয়,—আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।

আমার মেয়েটি ত সন্ধ্যাতারার মত ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল। আবার নিত্যকর্ম্ম এবং গোরুবাছুর নিয়ে পড়লুম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্য্যন্ত কেটে যেত, আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথগাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালে সেইটুকু থেকে ইটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোট একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল, তার পর থেকে ফাটল সুরু হল।

বিধবা মার মৃত্যুর পরে আমার বড় জায়ের বোন বিন্দু তার খুড়তত ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে যেদিন আশ্রয় নিলে তোমরা সেদিন ভাবলে এ আবার কোথাকার আপদ! আমার পোড়া স্বভাব, কি করব বল, দেখ্‌লুম তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ সেইজন্যেই এই নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সমস্ত মন যেন একেবারে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া—সে কত বড় অপমান! দায়ে পড়ে সেও যাকে স্বীকার করতে হল তাকে কি একপাশে ঠেলে রাখা যায়?

তার পরে দেখলুম আমার বড় জায়ের দশা। তিনি নিতান্ত দরদে পড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন। কিন্তু যখন দেখ্‌লেন স্বামীর অনিচ্ছা, তখন এমনি ভাব করতে লাগ্‌লেন যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই—যেন এ'কে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।

তাঁর এই সঙ্কট দেখে আমার মন আরো ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। দেখলুম বড় জা সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়া-পরার এম্‌নি মোটা রকমের ব্যবস্থা করলেন, এবং বাড়ির সর্ব্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে এমন ভাবে নিযুক্ত করলেন যে আমার, কেবল দুঃখ নয়, লজ্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত যে আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তর অথচ খরচের হিসাবে বেজায় শস্তা।

আমাদের বড় জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড় কিছু ছিল না। রূপও না টাকাও না। আমার শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে ত সমস্তই জান। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন। সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জুড়ে থাকেন।

কিন্তু তাঁর এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড় মুস্কিল হয়েছে। আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারিনি। আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি আর-কারো খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম্ম নয়—তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছ।

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুম। দিদি বল্লেন, "মেজ-বৌ গরীবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বস্‌লেন।" আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটালুম এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেন। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন। এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজে যে স্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হাল্‌কা হল। আমার বড় জা বিন্দুর বয়স থেকে দুচারটে অঙ্ক বাদ দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তার বয়স যে চোদ্দর চেয়ে কম ছিল না একথা লুকিয়ে বল্‌লে অন্যায় হত না। তুমি ত জান সে দেখ্‌তে এতই মন্দ ছিল যে, পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেজেটার জন্যেই লোকে উদ্বিগ্ন হত। কাজেই পিতামাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিল না, এবং তাকে বিয়ে করবার মত মনের জোরই বা ক'জন লোকের ছিল।

বিন্দু বড় ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এল। যেন আমার গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগ্‌লে আমি সইতে পারব না। বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মাবার কোনো সর্ত্ত ছিল না—তাই সে কেবলি পাশ কাটিয়ে চোখ এড়িয়ে চল্‌ত। তার বাপের বাড়িতে তার খুড়তত ভাইরা তাকে এমন একটু কোণও ছেড়ে দিতে চায়নি যে কোণে একটা অনাবশ্যক জিনিষ পড়ে থাকতে পারে। অনাবশ্যক আবর্জ্জনা ঘরের আশেপাশে অনায়াসে স্থান পায় কেননা মানুষ তাকে ভুলে যায়, কিন্তু অনাবশ্যক মেয়েমানুষ যে একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শক্ত সেইজন্যে আঁস্তাকুঁড়েও তার স্থান নেই। অথচ বিন্দুর খুড়তত ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জো নেই। কিন্তু তারা বেশ আছে।

তাই বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আনলুম তার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগ্‌ল। তার ভয় দেখে আমার বড় দুঃখ হল। আমার ঘরে যে তার একটুখানি জায়গা আছে সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিলুম।

কিন্তু আমার ঘর শুধু ত আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজটি সহজ হল না। দুচার দিন আমার কাছে থাক্‌তেই তার গায়ে লাল-লাল কি উঠ্‌ল—হয় ত সে ঘামাচি, নয় ত আর কিছু হবে। তোমরা বল্‌লে বসন্ত। কেননা ও যে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাক্তার এসে বল্‌লে, আর দুই একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু সেই দুই একদিনের সবুর সইবে কে? বিন্দু ত তার ব্যামোর লজ্জাতেই মরবার জো হল। আমি বললুম, বসন্ত হয় ত হোক্—আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাক্‌ব, আর কাউকে কিছু করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারমূর্ত্তি ধরেছ, এমন কি বিন্দুর দিদিও যখন অত্যন্ত বিরক্তির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাঁসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করচেন এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরো ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লে। বল্‌লে, নিশ্চয়ই বসন্ত বসে গিয়েছে। কেননা, ও যে বিন্দু।

অনাদরে মানুষ হবার একটা মস্ত গুণ, শরীরটাকে তাতে একবারে অজর অমর করে তোলে। ব্যামো হতেই চায় না—মরার সদর রাস্তাগুলো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল, কিছুই হল না। কিন্তু এটা বেশ বোঝা গেল পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন। আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তার তেমনি বিষম।

আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙল তখন ওকে আর-এক গেরোয় ধরল। আমাকে এমনি ভালবাস্‌তে সুরু করলে যে আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালবাসার এ রকম মূর্ত্তি সংসারে ত কোনোদিন দেখিনি। বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে পুরুষের মধ্যে। আমার যে রূপ ছিল সে কথা আমার মনে করবার কোনো কারণ বহুকাল ঘটেনি—এতদিন পরে সেই রূপটা নিয়ে পড়ল এই কুশ্রী মেয়েটি। আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত না। বল্‌ত, "দিদি তোমার এই মুখখানি আমি-ছাড়া আর কেউ দেখ্‌তে পায়নি।" যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধতুম সেদিন তার ভারি অভিমান। আমার চুলের বোঝা দুই হাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে তার ভারি ভালো লাগ্‌ত। কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের ত দরকার ছিল না—কিন্তু বিন্দু আমাকে অস্থির করে রোজই কিছু-না-কিছু সাজ করাত। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠ্‌ল।

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তর দিকের পাঁচিলের গায়ে নর্দ্দমার ধারে কোনোগতিকে একটা গাব গাছ জন্মেছে। যেদিন দেখ্‌তুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠেচে সেইদিন জান্‌তুম ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে। আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙীন হয়ে উঠ্‌ল সেদিন আমি বুঝলুম হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে—সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।

বিন্দুর ভালবাসার দুঃসহবেগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল—এক একবার তার উপর রাগ হত সে কথা স্বীকার করি—কিন্তু তার এই ভালবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখিনি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ।

এদিকে, বিন্দুর মত মেয়েকে আমি যে এতটা আদর যত্ন করচি এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে খুঁৎখুঁৎ খিটখিটের অন্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি গেল সেদিন সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনোরকমের হাত ছিল

এ কথার আভাস দিতে তোমাদের লজ্জা হল না। যখন স্বদেশী হাঙ্গামায় লোকের বাড়িতল্লাসী হতে লাগ্‌ল তখন তোমরা অনায়াসে সন্দেহ করে বস্‌লে যে, বিন্দু পুলিষের পোষা মেয়ে-চর। তার আর কোনো প্রমাণ ছিল না, কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।

তোমাদের বাড়ির দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি করত,—তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাস করলে ও মেয়েও একেবারে সঙ্কোচে যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠ্‌ত। এই-সকল কারণেই ওর জন্যে আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখ্‌লুম। সেটা তোমাদের ভালো লাগেনি। বিন্দুকে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলে যে আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচশিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম। আর মতির মা যখন আমার এঁটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এল তাকে বারণ করে দিলুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই দৃশ্যটি দেখে তুমি খুব খুসি হওনি। আমাকে খুসি না করলেও চলে আর তোমাদের খুসি না করলেই নয় এই সুবুদ্ধিটা আজ পর্য্যন্ত আমার ঘটে এল না।

এদিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিব্রত হয়ে উঠেছিলে। একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য্য হই তোমরা জোর করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় করে দাওনি। আমি বেশ বুঝি তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় কর। বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচ না।

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় করতে না পেরে তোমরা প্রজাপতি-দেবতার শরণাপন্ন হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল। বড় জা বল্‌লেন, বাঁচ্‌লুম, মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা কর্‌লেন।

বর কেমন তা জানিনে; তোমাদের কাছে শুনলুম সকল বিষয়েই ভালো। বিন্দু আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগ্‌ল—বল্লে, "দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন?"

আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বল্‌লুম,—"বিন্দু, তুই ভয় করিস্‌নে শুনেছি তোর বর ভালো।"

বিন্দু বল্‌লে—"বর যদি ভালো হয় আমার কি আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে?"

বরপক্ষেরা বিন্দুকে ত দেখ্‌তে আসবার নামও করলে না। বড় দিদি তাতে বড় নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু দিনরাত্রে বিন্দুর কান্না আর থাম্‌তে চায় না। সে তার কি কষ্ট সে আমি জানি। বিন্দুর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি কিন্তু ওর বিবাহ বন্ধ হোক্‌ এ কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বল্‌ব? আমি যদি মারা যাই ত ওর কি দশা হবে?

একে ত মেয়ে, তাতে কালো মেয়ে—কার ঘরে চল্‌ল, ওর কি দশা হবে—সে কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে।

বিন্দু বল্লে,—"দিদি, বিয়ের আর পাঁচদিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে না কি?"

আমি তাকে খুব ধমকে দিলুম কিন্তু অন্তর্যামী জানেন যদি কোনো সহজভাবে বিন্দুর মৃত্যু হতে পারত তাহলে আমি আরাম বোধ করতুম।

বিবাহের আগের দিন বিন্দু তার দিদিকে গিয়ে বল্লে,—"দিদি, আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বল্‌বে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।"

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু শুধু হৃদয় ত নয় শাস্ত্রও আছে; তিনি বল্লেন, "জানিস্‌ ত, বিন্দী, পতিই হচ্চে স্ত্রীলোকের গতিমুক্তি সব। কপালে যদি দুঃখ থাকে ত কেউ খণ্ডাতে পারবে না।"

আসল কথা হচ্চে কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই—বিন্দুকে বিবাহ করতেই হবে—তার পরে যা হয় তা হোক্‌।

আমি চেয়েছিলুম বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু তোমরা বলে বস্‌লে বরের বাড়িতেই হওয়া চাই সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি বুঝলুম বিন্দুর বিবাহের জন্যে যদি তোমাদের খরচ করতে হয় তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই সইবে না। কাজেই চুপ করে যেতে হল। কিন্তু একটি কথা তোমরা কেউ জানো না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাইনি কেননা তাহলে তিনি ভয়েই মরে যেতেন,—আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাক্‌বে কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেননি। দোহাই ধর্ম্মের, সেজন্যে তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরো।

যাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্লে,—"দিদি, আমাকে তোমরা তাহলে নিতান্তই ত্যাগ করলে?"

আমি বল্লুম,—"না বিন্দী, তোর যেমন দশাই হোকনা কেন, আমি তোকে শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করব না।"

তিন দিন গেল। তোমাদের তালুকের প্রজা খাবার জন্যে তোমাকে যে ভেড়া দিয়েছিল তাকে তোমার জঠরাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে আমি তোমাদের একতলার কয়লা-রাখবার ঘরের একপাশে বাস করতে দিয়েছিলুম। সকালে উঠেই আমি নিজে তাকে দানা খাইয়ে আস্‌তুম;—তোমার চাকরদের প্রতি দুই একদিন নির্ভর করে দেখেছি তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক।

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢুকে দেখি বিন্দু এককোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগ্‌ল।

বিন্দুর স্বামী পাগল।

"সত্যি বলছিস্‌ বিন্দী?"

"এত বড় মিথ্যা কথা তোমার কাছে বল্‌তে পারি দিদি? তিনি পাগল। শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না—কিন্তু তিনি আমার শাশুড়িকে যমের মত ভয় করেন। তিনি বিবাহের পূর্ব্বেই কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।"

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর বসে পড়লুম। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ দয়া করে না। বলে, ও ত মেয়েমানুষ বই ত নয়। ছেলে হোকনা পাগল, সে পুরুষ বটে।

বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না—কিন্তু এক-একদিন সে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে যে তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখ্‌তে হয়। বিবাহের রাত্রে সে ভালো ছিল কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে উঠ্‌ল। বিন্দু দুপুরবেলা পিতলের থালায় ভাত খেতে বসেছিল, হঠাৎ তার স্বামী থালাসুদ্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে, বিন্দু স্বয়ং রাণীরাসমণি; বেহারাটা

নিশ্চয় সোনার থালা চুরি করে রাণীকে তার নিজের থালায় ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিন্দু তো ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শুতে বল্‌লে বিন্দুর প্রাণ শুকিয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরো ভয়ানক। বিন্দুকে ঘরে ঢুকতে হল। স্বামী সে রাত্রে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু ভয়ে বিন্দুর শরীর যেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যখন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।

ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্বলতে লাগল। আমি বল্লুম, এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দু তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে।

তোমরা বল্লে, বিন্দু মিথ্যা কথা বল্‌চে।

আমি বল্লুম, ও কখনো মিথ্যা বলেনি।

তোমরা বল্লে, কেমন করে জান্‌লে?

আমি বল্লুম, আমি নিশ্চয় জানি।

তোমরা ভয় দেখালে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকে পুলিস্‌-কেস্ কর্‌লে মুস্কিলে পড়তে হবে।

আমি বল্লুম, ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে এ কথা কি আদালত শুন্‌বে না।

তোমরা বল্লে, তবে কি এই নিয়ে আদালত কর্ত্তে হবে নাকি? কেন আমাদের দায় কিসের?

আমি বল্লুম, আমি নিজের গয়না বেচে যা করতে পারি করব।

তোমরা বল্লে, উকীলবাড়ি ছুটবে না কি?

এ কথার জবাব নেই। কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কি করব?

ওদিকে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ি থেকে ওর ভাস্থর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছে। সে বল্‌চে থানায় খবর দেবে।

আমার যে কি জোর আছে জানিনে কিন্তু কশাইয়ের হাত থেকে যে গোরু প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে তাকে পুলিসের তাড়ায় আবার সেই কশাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে একথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল না। আমি স্পর্দ্ধা করে বল্লুম, তা দিন্ থানায় খবর!

এই বলে মনে করলুম, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে বসে থাকি। খোঁজ করে দেখি, বিন্দু নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার বাদ প্রতিবাদ যখন চলছিল তখন বিন্দু আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাস্থরের কাছে ধরা দিয়েছে। বুঝেছে এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেল্‌বে।

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দু আপন দুঃখ আরো বাড়ালে। তার শাশুড়ির তর্ক এই যে, তার ছেলে ত ওকে খেয়ে ফেল্‌ছিল না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ নয় তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড় জা বল্লেন, ওর পোড়াকপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কি করব? তা পাগল হোক্ ছাগল হোক্ স্বামী ত বটে।

কুষ্ঠ রোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পৌঁছে দিয়েছে সতী সাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল: জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আস্‌তে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্য্যন্ত একটুও সঙ্কোচ বোধ হয়নি, সেইজন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাথা হেঁট হয়নি। বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেল কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিলনা। আমি ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন? তোমাদের এই সব ধর্ম্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম না!

আমি নিশ্চয় জানতুম, মরে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আস্‌বে না। কিন্তু আমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশা দিয়েছিলুম যে, তাকে শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করব না। আমার ছোট ভাই শরৎ কলকাতায় কলেজে পড়ছিল; তোমরা জানই ত যত-রকমের ভলাণ্টিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার ইঁদুর মারা, দামোদরের বন্যায় ছোটা, এতেই তার এত উৎসাহ যে উপরি উপরি দুবার সে এফ, এ, পরীক্ষায় ফেল করেও কিছুমাত্র দমে যায়নি। তাকে আমি ডেকে বল্লুম বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবস্ত করে দিতে হবে শরৎ। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না—লিখ্‌লেও আমি পাব না।

এ রকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম বিন্দুকে ডাকাতি করে আন্‌তে কিম্বা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তাহলে সে বেশি খুসি হত।

শরতের সঙ্গে আলোচনা করচি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বল্লে আবার কি হাঙ্গামা বাধিয়েছ?

আমি বল্লুম, সেই যা সব গোড়ায় বাধিয়েছিলুম, তোমাদের ঘরে এসেছিলুম,—কিন্তু সে ত তোমাদেরই কীর্ত্তি।

তুমি জিজ্ঞাসা করলে,—"বিন্দুকে আবার এনে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?"

আমি বল্লুম,—"বিন্দু যদি আস্‌ত তাহলে নিশ্চয় এনে লুকিয়ে রাখতুম। কিন্তু সে আস্‌বে না, তোমাদের ভয় নেই।"

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরো বেড়ে উঠল। আমি জানতুম শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভয় ছিল ওর পরে পুলিসের দৃষ্টি আছে—কোন্‌দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মামলায় পড়বে তখন তোমাদের সুদ্ধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্যে আমি ওকে ভাইফোঁটা পর্য্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম না।

তোমার কাছে শুনলুম বিন্দু আবার পালিয়েছে তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাস্থর খোঁজ করতে এসেছে। শুনে আমার বুকের মধ্যে শেল বিঁধল। হতভাগিনীর যে কি অসহ্য কষ্ট তা বুঝলুম অথচ কিছুই করবার রাস্তা নেই।

শরৎ খবর নিতে ছুটল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বল্লে, বিন্দু তার খুড়তত ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল কিন্তু তারা তুমুল রাগ করে তখনি আবার তাকে শ্বশুড়বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। এর জন্যে তাদের খেসারৎ এবং গাড়িভাড়া দণ্ড যা ঘটেছে তার ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরেনি।

তোমাদের খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বল্লুম, আমিও যাব।

আমার হঠাৎ এমন ধর্ম্মে মন হয়েছে দেখে তোমরা এত খুসি হয়ে উঠলে যে কিছুমাত্র আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল যে, এখন যদি কলকাতায় থাকি তবে আবার কোন্‌দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বস্‌ব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাটা।

বুধবারে আমাদের যাবার দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক হল। আমি শরৎকে ডেকে বল্লুম, যেমন করে হোক্ বিন্দুকে বুধবারে পুরী-যাবার গাড়ীতে তোকে তুলে দিতে হবে।

শরতের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল,—সে বল্লে, ভয় নেই দিদি, আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্য্যন্ত চলে যাব—ফাঁকি দিয়ে জগন্নাথ দেখা যাবে।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এল। তার মুখ দেখেই আমার বুক দমে গেল। আমি বল্লুম,—"কি শরৎ, সুবিধা হল না বুঝি?"

সে বল্লে,—"না।"

আমি বল্লাম,—"রাজি করতে পারলিনে?"

সে বল্লে,—"আর দরকারও নেই। কাল রাত্তিরে সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মরেছে। বাড়ির যে ভাইপোটার সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিলুম, তার কাছে খবর পেলুম তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল কিন্তু সে চিঠি ওরা নষ্ট করেছে।"

যাক্, শান্তি হল!

দেশসুদ্ধ লোক চটে উঠল। বল্‌তে লাগল, মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাসান্ হয়েছে।

তোমরা বল্‌লে, এ সমস্ত নাটক করা। তা হবে। কিন্তু নাটকের তামাসাটা কেবল বাঙালী মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালী বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন সেটাও ত ভেবে দেখা উচিত।

বিন্দীটার এম্‌নি পোড়াকপাল বটে! যতদিন বেঁচে ছিল রূপে গুণে কোনো যশ পায়নি—মরবার বেলাও যে একটু ভেবে চিন্তে এমন একটা নতুন ধরনে মরবে যাতে দেশের পুরুষরা খুসি হয়ে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না। মরেও লোকদের চটিয়ে দিলে!

দিদি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদলেন। কিন্তু সে কান্নার মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল। যাই হোক্ না কেন, তবু রক্ষা হয়েছে, মরেছে বইত না; বেঁচে থাকলে কি না হতে পার্‌ত!

আমি তীর্থে এসেছি। বিন্দুর আর আসবার দরকার হল না কিন্তু আমার দরকার ছিল।

দুঃখ বল্‌তে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক্ তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বল্‌তে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতই হত তাহলেও হয়ত মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাধ্বী বড় জায়ের মত পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার চেষ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাইনে—আমার এ চিঠি সেজন্যে নয়।

কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

তারপর এও দেখেছি ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাক না কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগা মানবজন্মের চেয়ে বড়। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান—যেখানে বিন্দু কেবল বাঙালী-ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুত ভাইয়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম জগতের মধ্যে যা কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন? এই গলির মধ্যকার চরিদিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদ্বুদটা এমন ভয়ঙ্কর বাধা কেন? তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে করে যেমন করেই ডাক্ দিক না—একমুহূর্ত্তের জন্যে কেন আমি এই অন্দরমহলটার এইটুকুমাত্র চৌকাঠ পেরতে পারি নে?—তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইঁটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে। কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, কত তুচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলি, এর সমস্ত বাঁধা মার—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশবন্ধনেরই হবে জিত, আর হার হল তোমার নিজের সৃষ্টি ঐ আনন্দলোকের?

কিন্তু মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল,—কোথায় রে রাজমিস্ত্রীর গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া! কোন্ দুঃখে কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে! ঐ ত মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়চে! ওরে মেজ-বৌ, ভয় নেই তোর! তোর মেজ-বৌয়ের খোলষ ছিন্ন হতে একনিমেষও লাগে না!

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিল। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে, সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজ বৌ।

তুমি ভাবচ আমি মরতে যাচ্ছি—ভয় নেই, অমন পুরোণো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাইও ত আমারি মত মেয়েমানুষ ছিল—তার শিকলও ত কম ভারি ছিল না, তাকে ত বাঁচবার জন্যে মরতে হয়নি। মীরাবাই তার গানে বলেছিল, "ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে; মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু, তাতে তার যা হবার তা হোক্!" এই লেগে থাকাই ত বেঁচে থাকা।

আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।

তোমাদের চরণতলাশ্রয়চ্ছিন্ন—মৃণাল।

(সবুজপত্র, শ্রাবণ)　　　　শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সর্ব্বনেশে

এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো!
　বেদনায় যে বান ডেকেছে
　　রোদনে যায় ভেসে গো!
রক্ত-মেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গহন-পারে,
কোন্ পাগল ঐ বারে বারে

উঠ্‌ছে অট্ট হেসে গো।
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো!

জীবন এবার মাতল মরণ-বিহারে!
এই বেলা নে বরণ করে
সব দিয়ে তোর ইহারে।
চাহিস্‌নে আর আগু-পিছু,
রাখিস্‌নে তুই লুকিয়ে কিছু,
চরণে কর্ মাথা নীচু
সিক্ত আকুল কেশে গো।
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো!

পথটাকে আজ আপন করে নিয়ো রে!
গৃহ আঁধার হল, প্রদীপ
নিবল শয়ন-শিয়রে।
ঝড় এসে তোর ঘর ভরেছে,
এবার যে তোর ভিত নড়েছে,
শুনিস্ নি কি ডাক পড়েছে
নিরুদ্দেশের দেশে গো!
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো!

ছি ছি রে ঐ চোখের জল আর ফেলিস্‌নে।
ঢাকিস্ নে মুখ ভয়ে ভয়ে
কোণে আঁচল মেলিস্ নে।
কিসের তরে চিত্ত বিকল,
ভাঙুক না তোর দ্বারের শিকল,
বাহির পানে ছোট্ না, সকল
দুঃখ সুখের শেষে গো;
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো!

কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুট্‌বে না?
চরণে তোর রুদ্র তালে
নূপুর বেজে উঠ্‌বে না?
এই লীলা তোর কপালে যে
লেখা ছিল,—সকল ত্যেজে
রক্তবাসে আয়রে সেজে
আয় না বধূর বেশে গো!
ঐ বুঝি তোর এল সর্ব্বনেশে গো।

(সবুজপত্র, শ্রাবণ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাস্তব

এমন কথা কেহ কেহ বলিতেছেন যে আজকাল বাংলা দেশে কবিরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোক-শিক্ষার কাজ চলিবে না। সমালোচকদের উচিত পাঠকদিগকে স্পষ্ট করিয়া সমজাইয়া দেওয়া কোন্‌টা বস্তু নয়। মুস্কিল এই যে, বস্তু একটা নহে এবং সব জায়গায় আমরা একই বস্তুর তত্ত্ব করি না। মানুষের বহুধা প্রকৃতি, তাহার প্রয়োজন নানা, এবং বিচিত্র বস্তুর সন্ধানে তাহাকে ফিরিতে হয়। এখন কথা এই, সাহিত্যের মধ্যে কোন্ বস্তুকে আমরা খুঁজি। ওস্তাদেরা বলিয়া থাকেন সেটা রস-বস্তু। বলা বাহুল্য এখানে রস-সাহিত্যের কথাই হইতেছে। রস জিনিষটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না। সংসারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, লোকহিতৈষী প্রভৃতি নানা প্রকারের ভালো ভালো লোক আছেন। কিন্তু রস-ভারতী স্বয়ম্বরসভায় আর সকলকেই বাদ দিয়া কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন। সমালোচক বুক ফুলাইয়া তাল ঠুকিয়া বলেন, আমিই সেই রসিক। প্রতিবাদ করিতে সাহস হয় না কিন্তু অরসিক আপনাকে অরসিক বলিয়া জানিয়াছে সংসারে এই অভিজ্ঞতাটা দেখা যায় না। আমার কোন্‌টা ভালো লাগিল এবং আমার কোন্‌টা ভালো লাগিল না সেইটেই যে রসপরীক্ষার চূড়ান্ত মীমাংসা, পনেরো আনা লোক সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়। এই জন্যই সাহিত্য-সমালোচনায় বিনয় নাই। মূলধন না থাকিলেও দালালীর কাজে নামিতে কাহারো বাধে না।

রস-বিচারে ব্যক্তিগত এবং কালগত ভুল সংশোধন করিয়া লইবার জন্য বহুব্যক্তি ও দীর্ঘ সময়ের ভিতর দিয়া বিচার্য্য পদার্থটিকে বহিয়া লইয়া গেলে তবে সন্দেহ মেটে। কোনো কবির রচনার মধ্যে সাহিত্য-বস্তুটা আছে কি না তাহার উপযুক্ত সমজদার, কবির সমসাময়িকদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক আছে কিন্তু তাহারাই উপযুক্ত কি না তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দাবী করিলে ঠকা অসম্ভব নয়।

নিশ্চয়ই রসের একটা আধার আছে। সেটা মাপকাঠির আয়ত্তাধীন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেইটেরই বস্তুপিণ্ড ওজন করিয়া কি সাহিত্যের দর যাচাই হয়? রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মান্ধাতার আমলে মানুষ যে রসটি উপভোগ করিয়াছে আজও তাহা বাতিল হয় নাই। কিন্তু বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা ওবেলা বদল হইতে থাকে। সরস্বতী বস্তু-পিণ্ডের উপরে তাঁহার আসন রাখেন নাই, রাখিয়াছেন পদ্মের উপরে। কাব্য যে গুণে টিঁকিবে তাহা নিত্য-রসের গুণে। তাহাতে বিশেষ যুগের ইতিহাস-বস্তু বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া নহে;—সেই স্থূল বস্তুটাই প্রতিদিন খসিয়া পড়ে।

আমাদের কালের লেখকদের মোটা অপরাধটা এই যে আমরা ইংরেজি পড়িয়াছি; ইংরেজি শিক্ষা বাঙালীর পক্ষে বাস্তব নহে অতএব তাহা বাস্তবতার কারণও নহে, আর সেই জন্যই এখনকার সাহিত্য, দেশের লোকসাধারণকে শিক্ষা ও আনন্দ দিতে পারে না। উত্তম কথা—কিন্তু দেশের যে-সব লোক ইংরেজি শেখে নাই তাহাদের তুলনায় আমাদের সংখ্যা ত নগণ্য। কেহ তাহাদের ত কলম কাড়িয়া লয় নাই। আমরা কেবল আমাদের অবাস্তবতার জোরে দেশের সমস্ত বাস্তবিকদের চেয়ে জিতিয়া যাইব ইহা স্বভাবের নিয়ম নহে।

অথচ এদিকে ইংরেজি-পোড়োরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিল, রাগিয়া তাহাকে গালি দিলেও সে বাড়িয়া উঠিতেছে; নিন্দা করিলেও তাহাকে অস্বীকার করিবার জো নাই। ইহাই বাস্তবের প্রকৃত লক্ষণ। দেখ নাই কি, এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজরা কথায় কথায় বলিয়া থাকে ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালী জাতটা গণ্যই নহে? তাহাদের কথার ঝাঁজ দেখিলেই বুঝা যায় তাহারা বাঙালীকেই বিশেষভাবে গণ্য করিয়াছে, কোনো মতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মত আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে, সে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই জাগাইল। এই বাস্তবকে যে লোক ভয় করে, যে লোক বাঁধা-নিয়মের শিকলটাকেই

শ্রেয় বলিয়া জানে তাহারা, ইংরেজই হউক আর বাঙালীই হউক, এই শিক্ষাকে ভ্রম এবং এই জাগরণকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিবার ভান করিতে থাকে। যেখান হইতে যেমন করিয়াই হউক জীবনের আঘাতে জীবন জাগিয়া উঠে, মানব-চিত্ত-তত্ত্বে ইহা একটি চিরকালের বাস্তব ব্যাপার।

কিন্তু লোকশিক্ষার কি হইবে? সে কথার জবাবদিহি সাহিত্যের নহে। লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে, কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাষ্টারির ভার লয় নাই। রামায়ণ মহাভারত দেশের সকল লোকে পড়ে তাহার কারণ এ নয় যে তাহা কৃষাণের ভাষায় লেখা বা তাহাতে দুঃখী-কাঙালের ঘরকন্নার কথা বর্ণিত। তাহার আগাগোড়া সমস্তই অসাধারণ। সাধারণ লোক আপনার গরজে এই সাহিত্যকে পড়িতে শিখিয়াছে।

কালিদাস যদি কবি না হইয়া লোক-হিতৈষী হইতেন তবে সেই পঞ্চম শতাব্দীর উজ্জয়িনীর কৃষাণদের জন্য হয় ত প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানা বই লিখিতেন,—তাহা হইলে তারপর হইতে এতগুলা শতাব্দীর কি দশা হইত? তুমি কি মনে কর লোক হিতৈষী তখন কেহ ছিল না? লোকসাধারণের নৈতিক ও জাঠরিক উন্নতি কি করিয়া হইতে পারে সে কথা ভাবিয়া কেহ কি তখন কোনো বই লেখে নাই? কিন্তু সে কি সাহিত্য? ক্লাসের পড়া শেষ হইলেই বৎসর-অন্তর ইস্কুলের বইয়ের যে দশা হয় তাহাদেরও সেই দশা হইয়াছে, অর্থাৎ স্বেদ-কম্প-রোমাঞ্চের ভিতর দিয়া একেবারেই দশম দশা।

যাহা ভালো তাহাকে পাইবার জন্য সাধনা করিতে হইবে—রাজার ছেলেকেও করিতে হইবে, কৃষাণের ছেলেকেও। রাজার ছেলের সুবিধা এই যে তাহার সাধনা করিবার সময় আছে, কৃষাণের ছেলের নাই। কিন্তু সেটা সামাজিক ব্যবস্থার তর্ক,—যদি প্রতিকার করিতে পার, করিয়া দাও কাহারো আপত্তি হইবে না। তানসেন তাই বলিয়া মেঠো-সুর তৈরি করিতে বসিবেন না। তাঁহার সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই, আর-কোনো মৎলবে সে আর-কিছু হইতে পারেই না। যাহারা রসপিপাসু তাহারা যত্ন করিয়া শিক্ষা করিয়া সেই রূপদগুলির নিগূঢ় মধুকোষের মধ্যে প্রবেশ করিবে। অবশ্য লোক-সাধারণ যতক্ষণ সেই মধুকোষের পথ না জানিবে ততক্ষণ তানসেনের গান তাহাদের কাছে সম্পূর্ণ অবাস্তব একথা মানিতেই হইবে। তাই বলিতেছিলাম কোথায় কোন্ বস্তুর খোঁজ করিতে হইবে, কেমন করিয়া খোঁজ করিতে হইবে, কে তাহার খোঁজ পাইবার অধিকারী, সেটা ত নিজের খেয়াল-মত এক কথায় প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না।

তবে কবিদের অবলম্বনটি কি? সেটা অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ। কবি যদি একটি বেদনাময় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়া থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া থাকেন, যদি শিক্ষা, অভ্যাস, প্রথা, শাস্ত্র প্রভৃতি জড় আবরণের ভিতর দিয়া কেবলমাত্র দশের নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন, তবে তিনি নিখিলের সংস্রবে যাহা অনুভব করিবেন তাহার একান্ত বাস্তবতাসম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনো সন্দেহ থাকিবে না। বিশ্ব-বস্তু ও বিশ্ব-রসকে একেবারে অব্যবহিত ভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, এই-খানেই তাঁহার জোর। বাহিরের হাটে বস্তুর দর কেবলই উঠা-নামা করিতেছে—সেখানে নানা মুনির নানা মত, নানা লোকের নানা ফরমাস, নানা কালের নানা ফেশান্। বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে। তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তাহারই পরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। সে আদর্শ হিন্দুর আদর্শ বা ইংরেজের আদর্শ নয়, তাহা লোকহিতের এবং ইস্কুল-মাষ্টারীর আদর্শ নহে। তাহা আনন্দ-ময় সুতরাং অনির্বচনীয়। কবি জানেন যেটা তাঁহার কাছে এতই সত্য সেটা কাহারো কাছে মিথ্যা নহে। যদি কাহারো কাছে তাহা মিথ্যা হয় তবে সেই মিথ্যাটাই মিথ্যা,—যে লোক চোখ বুজিয়া আছে তাহার কাছে আলোক যেমন মিথ্যা, এও তেমনি মিথ্যা। কাব্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে কবির নিজের মধ্যে যে প্রমাণ, তিনি জানেন বিশ্বের মধ্যেই সেই প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণের অনুভূতি সকলের নাই—সুতরাং বিচারকের আসনে যে-খুসি বসিয়া যেমন-খুসি রায় দিতে পারেন কিন্তু ডিক্রিজারির বেলায় যে তাহা খাটিবেই এমন কোনো কথা নাই।

কবির আত্মানুভূতির যে উপাদানটার কথা বলিলাম এটা সকল কবির সকল সময়েই যে বিশুদ্ধ থাকে তাহা নহে। তাহা নানা কারণে কখনো আবৃত হয়, কখনো বিকৃত হয়, নগদ মূল্যের প্রলোভনে কখনো তাহার উপর বাজারে-চলিত-আদর্শের নকলে কৃত্রিম নক্সা কাটা হয়—এই জন্য তাহার সকল অংশ নিত্য নহে এবং সকল অংশের সমান আদর হইতেই পারে না। অতএব কবি রাগই করুন আর খুসিই হউন তাঁহার কাব্যের একটা বিচার করিতেই হইবে—এবং যে-কেহ তাঁহার কাব্য পড়িবে সকলেই তাঁহার বিচার করিবে—সে বিচারে সকলে একমত হইবে না। মোটের উপরে যদি নিজের মনে তিনি যথার্থ আত্মপ্রসাদ পাইয়া থাকেন তবে তাঁহার প্রাপ্যটি হাতে হাতে চুকাইয়া লইয়াছেন। অবশ্য পাওনার চেয়ে উপরি-পাওনায় মানুষের লোভ বেশি। সেই জন্যই বাহিরে আশে-পাশে আড়ালে-আবডালে এত করিয়া হাত পাতিতে হয়। ঐখানেই বিপদ। কেননা লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

(সবুজপত্র, শ্রাবণ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাংলা ছন্দ

আমরা নিশ্বাসটার বাজেখরচ করিতে নারাজ,—এক নিশ্বাসে যতগুলা শব্দ সারিয়া লইতে পারি ছাড়ি না। ইংরেজি বাক্যে সেটা সম্ভব হয় না—কেননা ইংরেজি শব্দগুলা প্রত্যেকেই ঢুঁ মারিয়া নিশ্বাসের শাসন ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গী আছে। সেই ভঙ্গীটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়। এখন দেখা যাক্ আমাদের ভাষার চাল-চলনটা কি রকম।

বাংলা-বাক্য উচ্চারণে বাক্যের আরম্ভে আমরা ঝোঁক দিয়া থাকি। এই ঝোঁকের দৌড়টা যে কতদূর পর্য্যন্ত হইবে তাহার কোনো বাঁধা নিয়ম নাই,—সেটা আমাদের ইচ্ছা। যদি জোর দিতে না চাই তবে সমস্ত বাক্যটা একটানা বলিতে পারি—যদি জোর দিতে চাই তবে বাক্যের পর্ব্বে পর্ব্বেই ঝোঁক দিয়া থাকি। বাংলা-শব্দ-গুলির নিজের কোনো বিশেষ দাবী নাই—আমাদের মর্জ্জির উপরেই নির্ভর।

বাংলা ছন্দে যে পদবিভাগ হয় সেই প্রত্যেক পদের গোড়াতেই একটি করিয়া ঝোঁকালো শব্দ কাপ্তেনি করে এবং তাহার পিছন পিছন কয়েকটি অনুগত শব্দ সমান-তালে পা ফেলিয়া কুচ করিয়া

চলিয়া যায়। এইরূপ একএকটি ঝোঁক-কাপ্তেনের অধীনে কয়টা করিয়া মাত্রা-সিপাই থাকিবে ছন্দের নিয়ম-অনুসারে তাহার বরাদ্দ হইয়া থাকে।

পয়ারের রীতিটা দেখা যাক্। পয়ারটা চতুষ্পদ ছন্দ। আমার বিশ্বাস, পয়ার শব্দটা পদ-চার শব্দের বিকার। ইহার এক-একটি পদ এক একটি ঝোঁকের শাসনে চলে। এক-একটি ঝোঁকে কয়টি করিয়া মাত্রা আগলাইতেছে তাহা দেখিয়াই ছন্দের বিচার করিতে হয়। নতুবা যদি মোটা করিয়া বলি যে, একএক লাইনে চোদ্দটা করিয়া অক্ষর থাকিলে তাহাকে পয়ার বলে তবে নানা ভিন্ন প্রকারের ছন্দকে পয়ার বলিতে হয়। আটমাত্রার ছন্দকেই পয়ার বলে। আট মাত্রাকে দুখানা করিয়া চারমাত্রার ভাগ করা চলে, কিন্তু সেটাতে পয়ারের চাল খাটো করা হয়। বস্তুত লম্বা নিশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদমর্য্যাদা। চার চার মাত্রায় পা ফেলিয়া পয়ার যখন দুল্‌কি চালে চলে তখন তাহার পায়ে পায়ে মিল থাকে। যেমন—

বাজে তীর, পড়ে বীর ধরণীর পরে।

এরূপ ছন্দ হাল্‌কা কাজে চলে, ইহা যুক্ত-অক্ষরের ভার সয় না এবং সাতকাণ্ড বা অষ্টাদশ পর্ব্ব জুড়িয়া দৌড় ইহার পক্ষে অসাধ্য। চৌপদীটা পয়ারের সহোদর বোন্। আটমাত্রায় তাহার পা পড়ে—কেবল তাহার পায়ে মিলের মল-জোড়ার ঝঙ্কারটা কিছু বেশি। অতএব বাহিরের চেহারা দেখিয়া ছন্দের জাতিনির্ণয় করায় প্রমাদ ঘটিতে পারে।

ত্রিপদীরও মোটের উপর আটমাত্রার চাল। তৃতীয় পদে দুটামাত্রা বেশি আছে, তাহার কারণ, যে চতুর্থ পদটি থাকিলে এই ছন্দের ভার-সামঞ্জস্য থাকিত সেটি নাই।

এইরূপ অনেকগুলি ছন্দ দেখা যায় যাহাতে খানিকটা করিয়া বড় মাত্রাকে একটি করিয়া ছোট মাত্রা দিয়া বাধা দিবার কায়দা দেখা যায়। দশ মাত্রার ছন্দ তাহার দৃষ্টান্ত—ইহার ভাগ আট+দুই, অথবা, চার+চার+দুই।

ছয়মাত্রার ছন্দেও এরূপ বড়-ছোটর ভাগ চলে। সেই ভাগ ছয়+দুই, অথবা, তিন+তিন+দুই। এই ছন্দে তিনের দল বুক ফুলাইয়া চলিতেছিল,—হঠাৎ মাঝে মাঝে একটা খাপছাড়া দুই আসিয়া তাহাদিগকে বাধা দিতেছে। এইরূপে গতি ও বাধার মিলনে ছন্দের সঙ্গীত একটু বিশেষভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে। এই বাধাটি গতির অনুপাতে ছোট হওয়া চাই! কারণ, বড় হইলে সে বাধা সত্য হয় এবং গতিকে আবদ্ধ করে, সেটা ছন্দের পক্ষে দুর্ঘটনা। তাই উপরের দুইটি দৃষ্টান্তে দেখিয়াছি চারের দল ও তিনের দলকে দুই আসিয়া রোধ করিয়াছে,—সেই জন্য ইহা বন্ধনের অবরোধ নহে, ইহা লীলার উপরোধ। দুইয়ের পরিবর্ত্তে এক হইলেও ক্ষতি হয় না।

বাংলা ছন্দকে তিন প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। দুই বর্গের মাত্রা, তিন বর্গের মাত্রা এবং অসমান মাত্রার ছন্দ। দুই বর্গ মাত্রার ছন্দ, যেমন পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী। এই সমস্ত ছন্দ বড় বড় বোঝা বহিতে পারে, কেননা দুই, চার, আট মাত্রাগুলি বেশ চৌকা। বাংলা-সাহিত্যে ইহারাই মহাকাব্যের বাহন।

তিন মাত্রার ছন্দ চাকার মত, একবার ধাক্কা পাইলে সেই ঝোঁকে সে গড়াইয়া চলে, থামিতে চায় না। দুই সংখ্যাটা স্থিতি-প্রবণ, তিন সংখ্যাটা গতিপ্রবণ।

দুই মাত্রার সঙ্গে তিনমাত্রার মিলনে অসম-মাত্রার ছন্দের উৎপত্তি। ৩+২, ৩+৪, ৫+৩ মাত্রার ছন্দ তাহার দৃষ্টান্ত।

তিন মাত্রার ছন্দের ন্যায় অসম-মাত্রার ছন্দ স্বভাবত চঞ্চল। মাত্রার অসমানতাই তাহাকে কেবল টলাইতে থাকে। প্রত্যেক পদ পরবর্ত্তী পদের উপর ঠেস দিয়া আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করে। বস্তুত তিনমাত্রাও অসম-মাত্রা, তাহার উপাদান দুই+এক।

কারণ ছন্দের মূল মাত্রা দুই, তাহা এক নহে। নিয়মিত গতিমাত্রই দুই সংখ্যাকে অবলম্বন করিয়া। সেই দুইয়ের নিয়মিত গতির উপরে যদি একটা একের অতিরিক্ত ভার চাপানো যায় তবে সেই গতিতে একটা অনিয়মের বেগ পড়ে—সেই অনিয়মের ঠেলায় নিয়মিত গতির বেগ বাড়িয়া যায় এবং তাহার বৈচিত্র্য ঘটে।

অতএব বাংলা ছন্দকে সমমাত্রা, অসমমাত্রা এবং বিষমমাত্রায় শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। শুধু বাংলা কেন, কোনো ভাষার ছন্দের আর কোনো প্রকার ভাগ হইতে পারে বলিয়া মনে করিতে পারিনা। তবে প্রভেদ হয় কিসে? মাত্রাগুলির চেহারায়।

সংস্কৃত ভাষায় অসমান স্বর ও ব্যঞ্জনগুলিকে কৌশলে মিলাইয়া সমান মাত্রায় ভাগ করিতে হয়, তাহাতে ধ্বনির বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্য্য ঘটে। বাংলাভাষার সাধুছন্দে একের মাঝে মাঝে দুই বসিবার জায়গা পায় না।

বাংলার সঙ্গে ইংরেজির প্রধান প্রভেদ এই যে, বাংলা শব্দগুলিতে স্বরবর্ণের টান ইংরেজির চেয়ে বেশি। কিন্তু সেটা কেবল সাধু-ভাষায়,—বাংলার চল্‌তি ভাষায় ঠিক ইহার উল্টা। চলতি ভাষার কথাগুলি শুচিভাবে পরস্পরের স্পর্শ বাঁচাইয়া চলে না—ইংরেজি শব্দেরই মত চলিবার সময় কে কাহার গায়ে পড়ে তাহার ঠিক নাই। বাংলা চল্‌তি ভাষার ধ্বনিটা হসন্তের সংঘাতধ্বনি—এই জন্য ধ্বনি-হিসাবে সংস্কৃতের চেয়ে ইংরেজির সঙ্গে তাহার মিল বেশি। তাই এই চল্‌তি ভাষার ছন্দে মাত্রাবিভাগ বিচিত্র। বাংলা প্রাকৃতের একটা চৌপদী নীচে লিখিলাম:—

কই পালঙ্ক, কইরে কম্বল,
কপ্‌নি-টুক্‌রো রইল সম্বল,
এক্‌লা পাগ্‌লা ফিরবে জঙ্গল,
মিট্‌বে সঙ্কট ঘুচ্‌বে ধন্দ।

ইহার সাধু পাঠ এইরূপ:—

শয্যা কই বস্ত্র কই
কি আছে কৌপীন বই
একা বনে ফিরে ঐ
নাহি মনে ভয় চিন্তা।

সাধুভাষার ছন্দটি যেন মোটা মোটা ফাঁকওয়ালা জালের মত—আর অসাধুটির একেবারে ঠাসবুনানি।

ইংরেজি ছন্দে ঝোঁক পদের আরম্ভে পড়িতে পারে, পদের শেষেও পড়িতে পারে। বাংলায় আরম্ভে ছাড়া পদের আর কোথাও ঝোঁক পড়িতে পারে না।

(সবুজপত্র, শ্রাবণ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শৈশবসঙ্গী ছিলেন ৺ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইঁহার তিন পুত্র বর্ত্তমান—গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ। তিনি অত্যন্ত পরদুঃখকাতর, স্নেহশীল এবং উদারহৃদয় ছিলেন। তিনি বড় বড় কল্পনায় বড় আমোদ পাইতেন।

"একদিন কথা উঠিল আমাদের ভিতর Extravaganza নাট্য নাই। আমি তখনই Extravaganza প্রস্তুত করিবার ভার লইলাম। পুরাতন সংবাদ-"প্রভাকর" হইতে কতকগুলি মজার কবিতা জোড়াতাড়া দিয়া একটা "অদ্ভুত নাট্য" খাড়া করিয়া তাহাতে সুর বসাইয়া ও-বাড়ীর বৈঠকখানায় তাহার মহলা আরম্ভ করিয়া দিলাম। একটা গান ছিল,—

ও কথা আর ব'লোনা, আর ব'লোনা,
বলছো বঁধু কিসের ঝোঁকে?
ও বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে, হাসবে লোকে —
হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে।—

হাঃ হাঃ হাঃ—এ জায়গাটাতে সুর হাসির অনুকরণে রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। বৈঠকখানায় ঐরূপ "হা হা হা" সুরে অট্টহাস্য হইত আর ধুপধাপ্ শব্দে তাণ্ডব নৃত্য চলিত। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় এই "অদ্ভুত নাট্য" বড় দাদার নামে আরোপ করিয়াছেন: কিন্তু বড়দাদা (শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

"একদিন আমাদের বারাণ্ডার আড্ডায় কথা উঠিল—সেকালে কেমন "বসন্ত-উৎসব" হইত। আমি বলিলাম—এসোনা আমরাও একদিন সেকেলে ধরনে বসন্ত-উৎসব করি। গুণুদাদার কল্পনা খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কোনও এক বসন্ত-সন্ধ্যায় সমস্ত উদ্যান বিবিধ রঙীন্ আলোকে আলোকিত হইয়া নন্দন কাননে পরিণত হইল। পিচ্‌কারী আবীর কুঙ্কুম সমস্ত সরঞ্জাম উপস্থিত হইয়া গেল। খুব আবীর খেলা হইতে লাগিল। তারপর গান বাজনা আমোদপ্রমোদও বাদ গেল না। ইহাতে অনেকগুলি টাকাও খরচ হইয়া গেল।

"আর একদিন আমাদের বারাণ্ডার আড্ডায় কথা উঠিল—আমাদের মধ্যে Freemasonএর মত একটা কিছু করিলে হয় না? এই কল্পনাটা গুণুদাদার খুব লাগিল ভাল। কিন্তু কাজ আর বেশী অগ্রসর হয় নাই।"

সেকালে জ্যোতিবাবুদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এঁদের বন্ধু বান্ধবগণ অথবা বন্ধুপুত্রেরা অনেকে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ও ইঁহাদের বাড়ীতে থাকিয়া কলিকাতায় পড়িয়াছিলেন। "আমাদের যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তিনি যে ঘরটীতে থাকিতেন, সেই ঘর (তিনি চলিয়া গেলেও) অনেক দিন পর্য্যন্ত "মনমোহনের ঘর" বলিয়া অভিহিত হইত। সকালে দেখিতাম, একটা ধুতি পরিয়া ও গায়ে একটা গুল্‌বাহার চাদর জড়াইয়া তিনি পাঠাভ্যাস করিতেছেন। কখন কখন দেখিতাম, বারাণ্ডায় বেড়াইতে বেড়াইতে একজায়গায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া মস্তক উন্নত করিয়া, পকেটে দুই হাত দিয়া, ভাবে ভোর হইয়া অস্ফুট স্বরে সেক্‌স্‌পিয়ার আবৃত্তি করিতেছেন। একটা আবৃত্তির দুই একটা কথা আমার এখনও মনে পড়ে—যথা—"Nor poppy nor Mandagora" ইত্যাদি। এই কথাগুলা তিনি কতকটা সংস্কৃত-ছন্দের টানে পড়িতেন;—"নর্" এই শব্দটির র্-কে অকারান্ত করিয়া "নর" এইরূপ পড়িতেন, এবং সমস্তই একটু টান দিয়া পড়িতেন যথা—"নরপপী নরম্যান ডাগোরা"—আমার বেশ লাগিত। তখন হইতেই আমাদের রাষ্ট্রিক উন্নতিসাধনের দিকে তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল, এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি পিতৃদেবের অর্থসাহায্যে "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামক ইংরাজি সংবাদপত্র বাহির করেন। এবং তিনিই তাহার প্রথম সম্পাদক হন। তিনি তখনই বেশ ইংরাজি লিখিতে পারিতেন। এই সময়ে Captain Palmer বলিয়া একজন সুলেখক জুটিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে পারিশ্রমিক দিয়া কাগজে লেখান হইত। তিনিই সমস্ত লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন।

নানা স্কুল পরিবর্ত্তন করিয়া শেষে হিন্দু স্কুল হইতে জ্যোতিবাবু কেশব বাবুর স্থাপিত "কলিকাতা কলেজে" ভর্ত্তি হয়েন। কেশব বাবুর ইচ্ছা ছিল এই বিদ্যালয়টিকে তিনি কলেজে পরিণত করিবেন, তাই Calcutta College নাম রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। যাহাই হউক এ স্কুলে তখনকার সব কৃতবিদ্য মনীষীরা অবৈতনিকভাবে শিক্ষকতা করিতেন, যেমন আচার্য্য কেশবচন্দ্র, প্রতাপ মজুমদার, উকীল ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরু তারকনাথ পালিত প্রভৃতি। কেশব বাবু নীতি উপদেশ দিতেন। বোর্ডে নানারূপ চিত্র বৃত্ত ও শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত বৃক্ষ আঁকিয়া কর্ত্তব্যবিভাগ—ঈশ্বরের প্রতি, মানুষের প্রতি, আপনার প্রতি—বুঝাইয়া দিতেন, আরও নৈতিক উৎকর্ষসাধনের জন্য নানাবিধ বক্তৃতা দিতেন। তাঁহার সচিত্র উপদেশ ছাত্রদিগের খুব হৃদয়গ্রাহী হইত। ক্লাস বসিবার আগে সমস্ত ছাত্রেরা একটি ঘরে সমবেত হইত। যে শিক্ষক আগে আসিতেন তিনি ছাত্রদিগকে বাইবেল-উক্ত Lord's Prayerটি বলাইতেন। বোধহয় উপনিষদ্ ও বেদের উপর তাঁহাদের তত আস্থা ছিল না। অথবা অনুশীলনের অভাবের ফলেই উপনিষদের ওঁ পিতা নোঽসি প্রভৃতি সুন্দর প্রার্থনা তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়াছিল।

এই Calcutta College হইতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন পরীক্ষার শেষ দিনে যেদিন ইতিহাস ও ভুগোলের পরীক্ষা হইতেছিল সেদিন যখন ঘণ্টা বাজিল তখনও জোতিরিন্দ্রনাথ উত্তর লিখিতেছেন, এমন সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাটক্লিফ সাহেব পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া কাগজগুলি তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াই টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তখনও আরও কয়েকটী ছেলে লিখিতেছিল, ঘণ্টা বাজিয়া তখন এক মিনিটও হয় নাই। শেষে কিন্তু জানা গেল যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ হওয়ার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। জ্যোতিবাবু প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর A. Sectionএ পড়িতেন, B. Sectionএ পড়িতেন বিহারীলাল গুপ্ত এবং রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়েরা। Rees সাহেব গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি চাটগাঁয়ের ফিরিঙ্গি। তাই তাঁহার ইংরাজিতেও পূর্ব্ববঙ্গের টান্ ছিল। বাস্তবিক তিনি গণিতে পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার গর্ব্বটা আরও অধিক ছিল। কোন একটা দুরূহ গণিত-সমস্যার সমাধান করিয়া বলিতেন, এরূপ ভাবে সমাধান আর কেহ করিতে পারিবে না—এমন কি "The man of upstairs" অর্থাৎ উপরিওয়ালা সাটক্লিফ সাহেবও পারিবেন না। তিনি কাহাকেও বড় প্রশংসা করিতেন না কেবল একবার জ্যোতিবাবুর বড়দাদার (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার বড়দাদা সেই সময়ে নূতন প্রণালীর এক জ্যামিতি ছাপাইয়াছিলেন। ছাত্রেরা মজা দেখিবার জন্য তাঁহার হস্তে একখণ্ড দিল—তিনি খানিকটা পড়িয়া বলিলেন "This man has brains"। ৺রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু যখন পড়াইতে আসিতেন তখন ক্লাসে হট্টগোল হইত, কিন্তু কৃষ্ণকমল বাবু যখন আসিতেন তখন টুঁ-শব্দ হইত না। Lt. Ives ইংরেজী পড়াইতেন। জ্যোতিবাবু Mont Blancএর প্রকৃত

উচ্চারণ ঘ্র ব্র্ বলিতে পারায় তিনি অধ্যাপকের খুব প্রিয় হইয়া উঠেন। কিন্তু ক্লাসে তিনি নিয়মিতরূপে যাইতেন না, যদিবা যাইতেন ত' পলাইয়া আসিতেন। তখন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নীচের একটা ঘরে ইঁহাদের আড্ডা বসিত, সেখানে গান বাজনা গল্পগুজব খুব পুরাপুরিই চলিত। First Year এমনি করিয়া গান বাজনা প্রভৃতিতেই কাটিয়া গেল। Second Yearও যায় যায়। পরীক্ষার সময় যখন খুব নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন খুব মনোযোগ দিয়া পড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিলিয়ান হইয়া এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়া কাশীপুর বাগান-বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও আসিয়া এইখানে ইঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা ক্রমশ তাঁহার শিথিল হইয়া আসিল। তিনি মিষ্টার ঘোষের নিকট ফরাসী শিক্ষা আরম্ভ করিয়া দিলেন। যাঁহার অক্লান্ত লেখনী বার্দ্ধক্য জরার ভীষণ ভাব অবহেলা করিয়া আজিও ফরাসী ভাষা হইতে অমূল্যরত্নরাজি আনিয়া বঙ্গভারতীর সাহিত্য-মঞ্জুষা পরিপূর্ণ করিতেছে, সেই ফরাসী ভাষায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ হইল এই কাশীপুর-উদ্যানবাটিকায়। মনোমোহন ঘোষ-মহাশয় প্রথমেই ভল্টেয়ার কৃত নাটক "সীজার" (Cæsar) তাঁহাকে পড়ান। এইখানে জ্যোতিবাবু তাঁহার মেজ বৌ-ঠাকুরাণীর নিকট বোম্বাইয়ের গল্প শুনিতেন। বোম্বাইয়ের গল্প, সমুদ্র ও দৃশ্যাবলীর কথা শুনিতে শুনিতে বোম্বাইয়ের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইলেন। পরীক্ষা না দেওয়াই স্থির করিলেন এবং বোম্বাই যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। পরীক্ষা দিবেন না, কাজেই ফীও দাখিল করা হইল না। বোম্বাই যাত্রার সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। ইতিমধ্যে পালিতমহাশয় (স্যর তারকনাথ পালিত) তথায় গিয়া উপস্থিত। তিনি তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধরনে থান্ ধুতি আপাদ-লম্বিত মোটা চাদর পরিতেন। সে পরিচ্ছদের বেশ একটা শোভন গাম্ভীর্য্য ছিল। সেই পরিচ্ছদে তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত রোম সেনেটার বলিয়া মনে হইত। এইবার হয়ত পড়াশুনার সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে মনে করিয়া তাঁহাকে দেখিবামাত্র জ্যোতিবাবু ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি জ্যোতিবাবুকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করিতেন—তিনি জ্যোতিবাবুকে পরীক্ষা দিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন। ফী দেওয়া হয় নাই শুনিয়া তিনি বলিলেন, "সেজন্য কোনও চিন্তা নাই, আমি সাট্‌ক্লিফকে বলিয়া তোমার ফী জমা করাইয়া দিব।" জ্যোতিবাবু মহা মুস্কিলে পড়িলেন, কিন্তু শেষে তাঁহারই জিত হইল। পরীক্ষা না দিয়াই সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বোম্বাই যাত্রা করিলেন।

(ভারতী, শ্রাবণ) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

চট্টগ্রামে জাহাজ নির্ম্মাণ

গত ১লা চৈত্র রবিবার চট্টগ্রামের ধনীশ্রেষ্ঠ সওদাগর শ্রীযুক্ত আবদুল রহমান দো'ভাষী সাহেবের "আমীনাখাতুন" নামক এক-খানা বৃহৎ নূতন দেশীয় জাহাজ (Brig) জলে ভাসান (Launch) হইয়াছে। দোভাষী সাহেবের কন্যা আমীনা খাতুনের নামানুসারে এই জাহাজের নামকরণ হইয়াছে। বাণিজ্য-পোতাদির নামকরণ-ব্যবস্থা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ধনপতি, ও মনসা-পুঁথির চাঁদ সওদাগর প্রভৃতির প্রত্যেক সমুদ্রগামী পোতের বিশেষ বিশেষ নাম ছিল। ধনপতির সপ্ত ডিঙ্গার নাম "নাটশাল", "চন্দ্রবাল", "দুর্গাবর", "মধুকর", "শঙ্খচূড়", "গুয়ারেখী" ও "ছোট মুখী" ছিল। এই-সমস্ত পোতারোহণে ধনপতি ও তৎপুত্র শ্রীমন্ত সিংহল গমন করিয়াছিলেন।

এই জাহাজ ভাসানর দৃশ্য দর্শনের জন্য বহুল জনসমাগম হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে বোমের কানফাটা আওয়াজ হইতেছিল। পূর্ব্বে কামান দাগা হইত। মঙ্গল বাদ্যের মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানবাসী ডোম রমণীরা "বরণকুলা" নিয়া "জয়কার" রবে শুভ কার্য্যের শুভ কামনা করিতেছিল।

কর্ণফুলী নদীতীরবর্ত্তী এক উচ্চ ভূমিখণ্ডে (কোন 'ডকে' নহে) উক্ত জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে সাধারণতঃ বড় বড় নৌকাদি যে ভাবে প্রস্তুত হয়, ইহাও সেই প্রকরণেই প্রস্তুত হইয়াছে। বড় বড় গাছের ঠেক্‌না দিয়া জাহাজকে খাড়া রাখা হইয়াছিল। কোন ডককারখানা হইতে জাহাজাদি জলে ভাসান যেমন সহজ, ইহা তেমন সহজ বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য! বেলা ৩টার সময় কর্ণফুলী পূর্ণ জোয়ারে ভরিয়া উঠিলে মিস্ত্রিরা ক্রমে ক্রমে সবগুলি ঠেক্‌না ফেলিয়া দিতে লাগিল। লোকে মনে ভাবিল এত বড় জাহাজ ঠেক্‌না ছাড়া কেমন করিয়া থাকিবে—এক দিকে হেলিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু তাহা হইল না। মিস্ত্রিরা জাহাজের তলা হইতে দুইখানা খুব পালিশ লম্বা তক্তা ঢালু ভাবে নদীর ধার পর্য্যন্ত সাজাইয়া রাখিয়াছিল এবং তাহার ঠিক সমভাবে দুইখানা চৌকা গাছ পালিশ করিয়া জাহাজের দৈর্ঘ্যের সমানে বড় বড় কড়া সংযোগে দড়ি দিয়া জাহাজের তলার দুই পার্শ্বে বাঁধিয়া দিয়াছিল। এই কাঠপাতগুলি এমনি ভাবে কুলুপ করা ছিল যে একটী অন্যটার উপর দিয়া পিছলাইয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু এ পাশে ও পাশে সরিয়া যাইতে পারিবে না। উক্ত তক্তা ও গাছগুলিকে চর্ব্বি দ্বারা অত্যন্ত পিচ্ছিল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে এমন একটী কৌশলপূর্ণ কাষ্ঠনির্ম্মিত "চাবি" ছিল যে বিনা ঠেক্‌নায়ও জাহাজ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। ডাক্তার গোরলে ও তাঁহার পত্নী দুইটী দুগ্ধপূর্ণ বোতল জাহাজের অগ্রভাগে (গলুই) ভাঙ্গিয়া দিবামাত্র প্রধান মিস্ত্রি একটা হাতুড়ির আঘাতে উক্ত "চাবি" ভাঙ্গিয়া দিল এবং এক মিনিটের মধ্যে জাহাজ যাইয়া জলে পড়িল,—যেন একটা উড়ন্ত চিল মৎস্য-লোভে যাইয়া জলে ছোঁ মারিল। এইরূপ একখানা বিরাটকায় জাহাজ এক মিনিটের মধ্যে ডাঙ্গা হইতে জলে ভাসান যে কি কৌতুক-জনক ব্যাপার তাহা যিনি চাক্ষুষ করিয়াছেন তিনি ভিন্ন অন্যের বোধগম্য হইবে না। ১৪টী হাতীর সমবেত শক্তিতে যে কার্য্যসাধন সম্ভব নহে, তাহা যে কি কৌশলে সাধিত হইল তাহা চিন্তার বিষয়। অশিক্ষিত কারিগর দ্বারা এই প্রকার বৃহৎ জাহাজাদি নির্ম্মাণ-ব্যাপার ও জলে ভাসাইবার কৌশল যে অতীব প্রশংসনীয় তাহা বলাই বাহুল্য। যাহারা কস্মিন কালেও কোন ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নাই, এমন কি কোন প্রকার কলের যন্ত্রাদির সাহায্য বিনা, মাত্র দেশীয় হাতুড়ি, বাটালী ও করাতের সাহায্যে এরূপ বিরাট জলযানসমূহ যাহারা নির্ম্মাণ করিতে পারে, তাহারা ঐশীশক্তি-সম্পন্ন সন্দেহ নাই। ইহারাই পুরাকালের "বিশ্বকর্ম্মা"। অসাধারণ শক্তির দ্বারা যাহারা পূর্ব্বকালে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য শিল্পদ্রব্যসকল নির্ম্মাণ করিত, আজকালের "ইঞ্জিনিয়ার" কথার ন্যায় "বিশ্বকর্ম্মা" শব্দ তাহাদেরই খেতাব (Title) ছিল। এই জাহাজ-নির্ম্মাণকার্য্য উক্ত অশিক্ষিত কারিগরদিগের পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায়। পিতার নিকট পুত্র,—মামার নিকট ভাগিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এই কার্য্য শিক্ষা করিয়া আসিতেছে—ইহাই তাহাদের কলেজ, ইহাই তাহাদের ইউনিভার্সিটি। অথচ এই জাহাজ দর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টের মেরিন
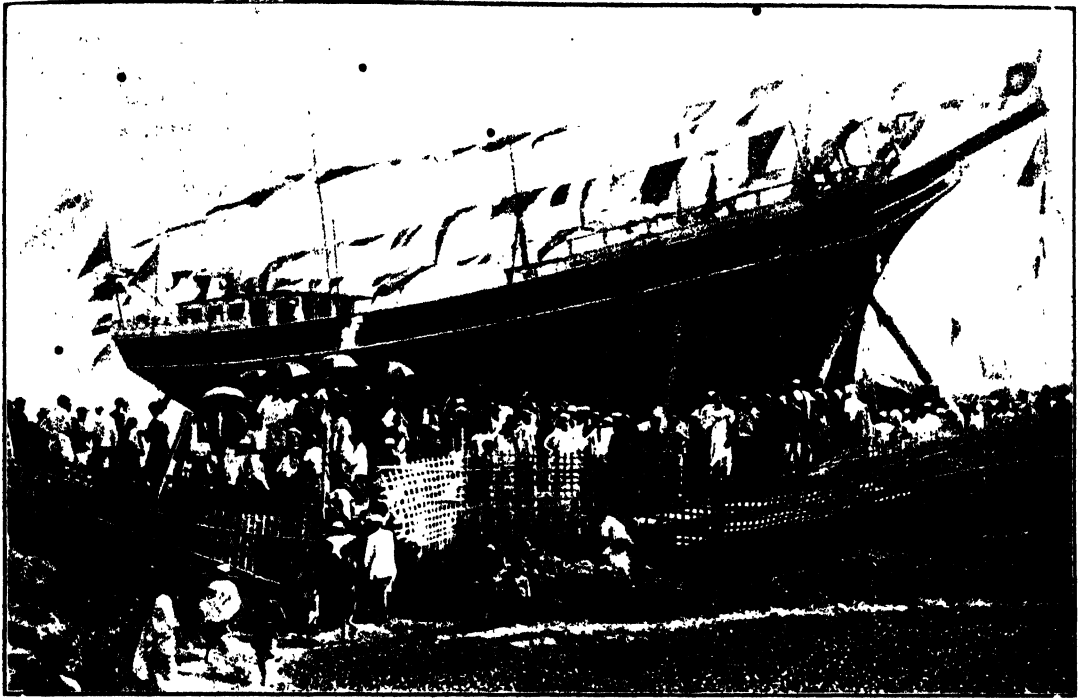
"আমিনা-খাতুন" —জলে ভাসাইবার পূর্ব্বের দৃশ্য।

সারভেয়ার স্বয়ং বলিয়াছেন যে "ইহা কোন অংশে বিলাতি জাহাজ (Ship) অপেক্ষা নির্ম্মাণকৌশলে হীন নহে। গঠন এবং পারিপাট্যও তদনুরূপ। ইহাতে মোটর বা ইঞ্জিন সংযোগ করিলেই ষ্টিম-শিপ্ (Steamship) বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।"

এই প্রশংসা চট্টগ্রাম আজ নূতন লাভ করে নাই। সমুদ্রসেবা, জাহাজনির্ম্মাণ এবং সমুদ্র-তৎপর বাণিজ্যের জন্য এই দেশ আবহমান কাল হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। এখনো এই দেশের উপকূল বিভাগে অনেক লোক আছে, যাহারা জলপথে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া, পৃথিবীর যাবতীয় বড় বড় বন্দর স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে। ভারত-মহাসমুদ্রের মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, আণ্ডামান, নিকোবার, যাবা, সুমাত্রা, পিনাং, সিংহল, বর্ম্মা প্রভৃতি ত সাধারণের চলিত-কথায় নাবিকদিগের "শ্বশুর-বাড়ী" ছিল। ভারত-সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া চীন, ব্রহ্মদেশ এবং মিশর পর্য্যন্ত তাহাদের বাণিজ্য-সম্পর্ক অবারিত ছিল। এবং তাম্রলিপ্তিকে অতিক্রম পূর্ব্বক চট্টগ্রাম বাণিজ্য-সম্পর্ক একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। রুমের সম্রাট সেকেন্দরিয়ার (Alexandria) ডক-কারখানায় প্রস্তুত জাহাজ না-পছন্দ করিয়া এই চট্টগ্রাম হইতেই জাহাজ প্রস্তুত করাইয়া লইতেন। বিশ বাইশ বৎসর পূর্ব্বেও এই কর্ণফুলী নদী সারিবদ্ধ সমুদ্র-হংসীর ন্যায় দেশীয় জলযানে সমাচ্ছন্ন থাকিত।

এই সহরের দক্ষিণ দিকস্থ হালিসহর, পতেঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে দেশীয় শিল্পীগণের অনেকগুলি জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানা ছিল। এই-সমস্ত কারখানা দিবারাত্রি শিল্পীগণের হাতুড়ির ঠক্ ঠক্ শব্দে মুখরিত থাকিত। এই শিল্পীগণের পূর্ব্বপুরুষ ঈশান মিস্ত্রি একজন দক্ষ ও প্রসিদ্ধ কারিগর ছিল। তাহার নামানুসারে একটি হাটের নাম আজও "ঈশান মিস্ত্রির হাট" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। উহা চট্টগ্রাম বন্দরের হালিসহরের নিকটবর্ত্তী। এতদ্ব্যতীত আমরা একজন মুসলমান মিস্ত্রির কথা শ্রুত হইয়াছি। তাহার নাম ইমাম আলী মিস্ত্রি ছিল। চট্টগ্রাম সহরের আগ্রাবাদ মৌজায় তাহার বাড়ী ছিল। অদ্যাপি আগ্রাবাদে তাহার ইষ্টকগ্রথিত কবর-স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। লোকে বলে, সে এমন ওস্তাদ কারিগর ছিল যে, মানুষ কাটিয়াও জোড়া দিতে পারিত। প্রসিদ্ধ হাণ্টার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন,—"এই জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানা ১৮৭৫ সন পর্য্যন্ত নিজের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।" ঐ সময়ের কিছু পূর্ব্বে এক হিন্দু সওদাগরের "বকলণ্ড" নামক জাহাজ এদেশের নাবিক দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্কটলণ্ডের "টুইড" পর্য্যন্ত সফর দিয়া আসিয়াছে। ইংরেজ-রাজত্বের উষাসময়ে যখন এদেশীয় জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ড দেশের বন্দরে উপস্থিত হইয়া নঙ্গর ফেলিল, তখন ইংলণ্ডের বিস্মিত নরনারীর কণ্ঠ হইতে যে পরিব্যক্ত নিরাশায় এবং ঈর্ষার আওয়াজ বাহির হইয়াছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাসের এক কোণায় তাহা লিখিত আছে। আমাদের মস্তিষ্কের প্রসার ও বাহুর শক্তি এবং আত্মিক সাহসের পালতোলা মাহাত্ম্য-তরণী এখন অদৃশ্য হইয়াছে। কলের জাহাজের প্রতিযোগিতায়, ভারতবর্ষের চিরকালের অভ্যাসজনিত শৈথিল্য এবং নিশ্চিন্ত নিদ্রাবশতায় তাহা অতর্কিতে অদৃশ্য হইয়াছে।

আমাদের বর্ণিত "আমীনাখাতুন" নামক জাহাজ ৪০ জন শূদ্রজাতীয় মিস্ত্রি অবিরত এক বৎসর পরিশ্রম করিয়া প্রস্তুত করিয়াছে। ইহাদের সকলেরই বাড়ী উক্ত হালিসহর গ্রামে।

"আমিনা-খাতুন"—জলে ভাসাইবার পরের দৃশ্য।

প্রধান মিস্ত্রির নাম শ্রীকালীকুমার দে। গত ১৯১৩ ইং এপ্রিল মাসে তাহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১৯১৪ ইং মার্চ্চ মাসের ১৫ই তারিখে জলে ভাসান হইল। আনুমানিক ৩০,০০০৲ ত্রিশ সহস্র টাকা এই জাহাজ-নির্ম্মাণে ব্যয় হইয়াছে। ইহা ৫।৬ হাজার মণ মাল বহন করিতে সক্ষম। ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বৃহৎ জাহাজ অদ্যাপি চট্টগ্রামের সওদাগরগণের অধিকারে থাকিয়া বন্দরের শোভাসম্পদ জ্ঞাপন করিতেছে। যে-সমস্ত তক্তা দ্বারা এই জাহাজ তৈয়ারী হইয়াছে তাহা ৪।৫ ইঞ্চি পুরু। প্রবল আঘাতে বা সাধারণ কামানের গোলাতেও তাহা সহজে ভগ্ন হইবার নহে। স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও নাকি বিলাতি জাহাজ অপেক্ষা আমাদের দেশীয় জাহাজই শ্রেষ্ঠ।

জাহাজ প্রস্তুতকালে সর্ব্বপ্রথমে এই কারিগরেরা যে নক্সা (Plan) প্রস্তুত করে, তাহা এক বিরাট ব্যাপার। স্কেল করিয়া কাঁটা, কম্পাস, সেটস্কোয়ার দিয়া, পার্চ্চমেণ্ট বা ড্রয়িং কাগজে রং বেরংএর চিত্র করিয়া প্ল্যান করা তাহাদের সাধ্যে নাই, কাজেই যত বড় জাহাজ তৈয়ার হইবে তত বড় একখানা বাঁশের চাটাই (এক্ষেত্রে ৮০ ফুট লম্বা ও ৪০ ফুট চওড়া একখানা চাটাই ব্যবহৃত হইয়াছিল) মাটীতে বিছাইয়া তাহার উপর চক খড়ি দ্বারা জাহাজের নক্সা-চিত্র অঙ্কিত করে এবং পুনরায় তাহাতে পাকা রং (Paint) দিয়া দাগগুলি ফুটাইয়া তুলে। তৎপর সেই দাগে দাগে পিজ-বোর্ডের (Paste-board) ন্যায় পাতলা তক্তা দ্বারা ফরম-সকল তৈয়ার করিয়া লয় এবং সেই ফরমার মাপে জাহাজ তৈয়ার করে। অথচ জাহাজ গড়িতে ইহাদের কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় না। পাশ্চাত্য শিক্ষিত "বিশ্বকর্ম্মা" (Engineer)-গণের ন্যায় একবারের কাজ তিনবার ভাঙ্গিয়া গড়া তাহাদের অভ্যাস নাই।

সর্ব্বপ্রথমে জাহাজের দাঁড়া বা মেরুদণ্ড (keel) পত্তন করিয়া তাহা হইতে তক্তা গাঁথিয়া ক্রমে জাহাজের গর্ভ (hold) তৈয়ার হইলে পরে পাটাতন (deck), কেবিন (cabin) ইত্যাদি ও হাল, মাস্তুল প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। এই জাহাজগুলির (Brig) সাধারণতঃ ২টী মাস্তুল থাকে; মধ্যেরটী main-mast, সম্মুখেরটী fore-mast। আবশ্যক-মত বাতাসের অবস্থা বুঝিয়া মাস্তুলের উপরও মাস্তুল চড়ান হয়। তাহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক নাম আছে। তাহার উপর রশারশি ইত্যাদি বাঁধিয়া পাল খাটানের বন্দোবস্ত করা হয়।

এই-সমস্ত জাহাজ সর্ব্বদাই দক্ষ নাবিকদিগের দ্বারা কেবল পাল খাটাইবার কৌশলে চালিত হইয়া থাকে। ইহা কেবল বাহির সমুদ্রেই (Sea and ocean) চালিত হইয়া থাকে। গভীর ও বৃহৎ নদীপথেও কখনও কখনও দেখা যায়। কেবল পালের দ্বারা এই-সমস্ত জাহাজ সময় সময় কলের জাহাজকেও পরাস্ত করিতে দেখা গিয়াছে। আমরা হালিসহরনিবাসী শ্রীযুক্ত উজীর আলী সওদাগরের নিজ মুখে শ্রুত হইয়াছি যে, তিনি তাঁহার সুবৃহৎ "রহেমানী" নামক জাহাজে চড়িয়া বহুবার ভারত-মহাসাগরের উপকূলস্থ প্রায় সমস্ত বন্দর ও দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। একদা তিনি তাঁহার এই "রহেমানী" লইয়া অনুকূল বায়ুভরে চট্টগ্রাম বন্দর হইতে এক দিবসে রেঙ্গুন পৌঁছিয়াছিলেন। অতি দ্রুতগামী কলের জাহাজও তিন দিন রাত্রির কমে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে পারে না। একথা স্মরণেও শরীর পুলকে নাচিয়া উঠে—কিন্তু হায়, কোথায় সেই দিন! পূর্ব্বকালে সমস্ত জাহাজই বিপক্ষের আক্রমণ ও জলদস্যুগণের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য কামান-বন্দুক ও বারুদ-গোলায় পূর্ণ থাকিত। আজকালও চট্টগ্রামের প্রাচীন সওদাগরগণের গৃহে ভগ্ন ও অব্যবহার্য্য কামানসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভারতীয় বন্দর সমূহের অধিকাংশ দেশীয় এবং বিলাতী কলের জাহাজেই চট্টগ্রাম ও পূর্ব্ববঙ্গের "লস্করের" বাহুল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। নাবিকবিদ্যায় যে ইহারা খুব দক্ষ এবং কর্ম্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পূর্ব্ববঙ্গের লস্করেরা নৌচালনবিদ্যায় যেরূপ পারদর্শী অন্য কোন দেশের লোক তেমন নহে। পূর্ব্বকালে প্রত্যেক ক্ষমতাশালী রাজা রাজড়াদিগের "পাইক, শিক, সাদী, লস্কর" থাকিত। পুরাতন পুস্তকাদিতেও এই কথা দৃষ্ট হয়। এই "পাইক শিক, সাদী, লস্কর" কথাটা কি? "পাইক" অর্থ পদাতিক;—শিক বা শিকদার অর্থ বন্দুকধারী সৈন্য। সে সময়ে যে-সব বন্দুক ব্যবহৃত হইত, তাহাকেই সাধারণতঃ "ছড়ি বন্দুক বা শিক বন্দুক" বলিত এবং তাহা ব্যবহারে যাহারা সক্ষম ছিল তাহাদের উপাধিই শিক বা শিকদার। এই বন্দুক আমরা দেখিয়াছি; তাহা একটী লোহার নলবিশেষ। এই "নালিকার" ভিতর,বারুদ পূর্ণ করিয়া একটী

ছিদ্রপথে পলিতা দ্বারা আগুন দিয়া আওয়াজ করা হইত। দেখিতেও ইহা একটী শিক বা ছড়ির ন্যায়ই ছিল। এক হাতে ধরিয়া অন্য হাতে তাহাতে আগুন দেওয়া হইত। ক্যাপ বা কার্টিজ তখন ছিল না। এই 'শিকদার' কথা ক্রমে দেহরক্ষী হইতে ঘরের গোলামে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সাধারণ কথায় "সিং" শিকদাররূপে ব্যবহৃত হয়। আর সাদী মানে অশ্বারোহী এবং "লস্কর" নৌসৈন্য। এক্ষন এই লস্কর মানে হইয়াছে সাধারণ নাবিক। Lascar—A Native Sailor; শ্রেণীর ফৌজ বা সৈন্য। বঙ্গদেশ হইতে নৌ-যুদ্ধ তিরোহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় "লস্কর" শব্দের নৌ-সৈন্য অর্থের সৈন্য কথাটুক বাদ পড়িয়া গিয়া থাকিবে। তখন লস্করদিগকেও যুদ্ধবিদ্যাপারদর্শী হইতে হইত, নতুবা বিপক্ষ বা দস্যুর আক্রমণ হইতে জাহাজ রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার ছিল। পাশ্চাত্য নাবিক (Sailor)-সকলেই নৌসৈন্য বিশেষ। আমাদের কায়স্থ ভদ্রদিগের মধ্যেও "লস্কর" উপাধি দেখা যায়। তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ নৌবিদ্যাবিশারদ ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় এই পদবী লাভ হইয়া থাকিবে।

নাবিকদিগের মধ্যে প্রধান বা প্রথম,—"মালুম" যন্ত্রসাহায্যে দিক্ নিরূপণ ও সময় এবং স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; দ্বিতীয়, "সারেং" জাহাজ পরিচালনা করে; তৃতীয়, "শুকানি বা ছয়ানী" হাইল ঠিক রাখে, এবং চতুর্থ, "খালাসীগণ" অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে।

কেবল চট্টগ্রাম কেন, সমস্ত ভারত হইতে এই শিল্প ক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। বিগত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে চট্টগ্রামে এই একখানা জাহাজ তৈয়ার হইল।

(বিজয়া, আষাঢ়)　　শ্রীমোহিনীমোহন দাস।

রাখালের গান

(১)

আরে শোন রাখাল ভাই ও রে,
তোর মারে কইছে রে,
গাঙ্গের জলে হাত মুখ ধুইয়া
গাছের তলাত্ বৈতে রে।
খিদা লাগলে টোপলা খুইল্যা
মুড়ি চিড়া খাইতে রে।
'মায়ের বুকের দুধ খাই' কইয়া,
হাতের আজলায় পানি লইয়া,
আড়াই চুমুক খাইও রে।
ছেঁওয়ার মধ্যে লেংটি পাইত্যা
পুব শিওরে শুইও রে।
সন্ধ্যার আগে গরু লইয়া—
বাড়ীত্ ফিইরা যাইও রে।

(২)

মনটা কেমন করে আমার
　　বাড়ীত্ ফিইরা যাইত চায়।
বন্দের পাই চাইয়া রইছে
আমার কাঙ্গালিনী মায় গো—
　　আমার দুক্ষিনী মায়।
ক্ষেণে যায় মা রান্ধা-ঘরে
ক্ষেণে যায় মা দীঘির পাড়ে
উকো মাইরা চাইয়া দেখে
দেখা যায় কি নাই ও যায়—
　　আমারে দেখা যায় কি না যায় গো।
বাইগুন পোড়া ভাত খাইয়া মায়
ঘরের মাইঝে শুইতে যায়;
ক্ষেণে আইসা পীড়ার উপর
উকি-মাইরা চায়।
এরই লাইগা পানি খাইতে
আইজ আমার 'বিষম' যায়॥

(৩)

গাই বাছুরের পেট ভইরাছে
　　বেলাও ত আর নাই,
মায়ে জ্বালাইছে বাতি
　　চল গৃহে যাই।
গোয়াইল ঘরে ধোঁয়া দিয়া
　　তপ্তা ভাত গিয়া খাই।
মায়ের বুকে মাথা রাইখা—
　　শুইয়া নিদ্রা যাই রে।

(৪)

দিবা গেল সন্ধ্যা হইল রবি গেল দূর;
কানাইয়া ডাক দিয়া বোলে
　　হারাইলাম বাছুর।
বে-ওর বন্দ আন্ধার রাইত,
　　উরাত উচা ঘাস—
কৈ পাইবাম বাছুর আমার
　　লাগবো বার মাস।
খাড়াও তোমরা রাখাল ভাইরে—
　　বাছুর দেইখা লই,
উচা আইল উইঠা ডাকি
　　হাঁরৈ হাঁরৈ।

(প্রতিভা, শ্রাবণ)　　শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রবাসী বাঙ্গালী

ডাক্তার শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ত্তমান এলাহাবাদ-প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সুচিকিৎসক বলিয়া যাঁহারা খ্যাত হইয়াছেন এবং স্বাবলম্বনবলে প্রবাসে প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তিতে অগ্রণী হইয়াছেন, ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে কি কি সদ্গুণের বলে এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা ক্রমোন্নতি করিয়া এক্ষণে লক্ষপতি হইয়াছেন, তাহা দেশের যুবকগণের চিন্তা ও শিক্ষার বিষয়।

১২৬২ সালের বৈশাখ মাসে ২৪ পরগণার অন্তর্গত পানিহাটি গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে অবিনাশবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অবিনাশবাবুর পিতামহ মালদহ জেলায় একজন ইংরেজ সিবিলিয়ানের নিকট এবং পিতা কলিকাতা হাইকোর্টে কর্ম্ম করিতেন। উমাচরণবাবু পেন্সন লইয়া প্রয়াগধামে আসিয়া বাস করেন। তিনি অতিশয় পরোপকারী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন।

অবিনাশবাবু বাল্যকালে পানিহাটি গ্রামের পাঠশালায় বাঙ্গলা এবং পরে কলিকাতা ভবানীপুরের "লণ্ডন মিশনরি ইনষ্টিটিউসন" বিদ্যালয়ে ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। মেধা- ও অধ্যবসায়-গুণে তিনি ছয় বৎসরের মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চমস্থান অধিকার করিয়া দুই বৎসরের জন্য কুড়ি টাকা করিয়া বৃত্তিলাভ করেন। লণ্ডন মিশনরী স্কুলে পড়িবার সময় অবিনাশবাবুর প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তদানীন্তন প্রিন্সিপাল সাহেব অবিনাশবাবুকে উচ্চশ্রেণীতে মনিটরি অর্থাৎ সর্দ্দার পোড়োর কাজ করিতে দিতেন এবং তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন।

ইংরেজী ১৮৭৩ অব্দের জুন মাসে অবিনাশবাবু কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি শিক্ষা করিবার জন্য প্রবেশ করেন। এই খানেই তাঁহার প্রতিভা সম্যক রূপে প্রকাশিত হয়। প্রথম বৎসরেই তিনি রসায়নতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব এবং শরীরতত্ত্ব এই তিনটি পরীক্ষায় তিনটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন এবং দ্বিতীয় বৎসরে ভৈষজ্যতত্ত্ব পরীক্ষায় আরও একটী স্বর্ণ পদক ও আট টাকা করিয়া দুই বৎসরের জন্য বৃত্তি লাভ করেন। পরে তিনি তৃতীয় বৎসরের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দুই বৎসরের জন্য বারটাকা বৃত্তি এবং চতুর্থ বৎসরে স্বাস্থ্য-বিধানের পরীক্ষায় একটী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। চতুর্থ বৎসরেও অবিনাশবাবু প্রথম স্থান অধিকার করাতে এক বৎসরের জন্য ২৬ টাকা করিয়া ঢাকার গনি মিঞার বৃত্তি লাভ করেন এবং প্যাথোলজিক্যাল মিউজিয়মের সহকারী কিউরেটর হইয়া আরও দশটাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পঞ্চম বৎসরে তিনি সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া তদানীন্তন ডাঃ চন্দ্র সাহেবের সহকারী হন। অবিনাশবাবু তাঁহাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিতেন। এই পঞ্চম বৎসরে মেডিকেল কলেজের সকল অধ্যাপকই অবিনাশবাবুর বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায় ও কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। মেডিকেল কলেজের ওয়ার্ডের কার্য্য করিবার সময় তিনি রোগীদের সহিত যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতেন এবং রোগীদিগকে আপনার আত্মীয় জ্ঞানে তাহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। দুই বৎসর কাল ডাঃ চন্দ্র সাহেবের সহকারীরূপে কার্য্য করিবার পর অবিনাশবাবু ১৮৮০ সালে জনৈক প্রয়াগপ্রবাসী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাঁহার ঔষধালয়ে বসিয়া চিকিৎসা করিবার জন্য এলাহাবাদে গমন করেন। যে সময়ে অবিনাশবাবু এলাহাবাদে গিয়াছিলেন, তখন সেখানে এক সহস্রাধিক বাঙ্গালী বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট বাঙ্গালী তথায় স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মান সম্ভ্রমও যথেষ্ট ছিল। দেশবাসী-গণের ত কথাই নাই, তদানীন্তন ইংরেজ রাজপুরুষগণও তাঁহাদের বিলক্ষণ খাতির করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বাবু রামকালী চৌধুরী, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলকমল মিত্র, ঈশানচন্দ্র দাস, প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (হাইকোর্টের বর্ত্তমান জজ্ স্যার প্রমদা-চরণ), আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী, যদুনাথ গাঙ্গুলী, প্যারীমোহন গাঙ্গুলী, হরিমোহন ঘোষাল, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, অপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, নবীনচন্দ্র গাঙ্গুলী, যদুনাথ হালদার, ডাঃ কালীপদ নন্দী, ডাঃ গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উমাচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী ও যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি অনেকের নাম করা যাইতে পারে।

বাল্যকালে অবিনাশবাবুর সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। এমন কি তাঁহার লেখাপড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ করাও কঠিন ছিল। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে নানা কষ্ট সহ্য করিয়া অধ্যয়নের সকল অসুবিধা দূর করিতে হইয়াছিল। এমন কি সময়ে সময়ে তৈলের

অভাবে সন্ধ্যার পর তিনি অধিকক্ষণ গৃহে পাঠাভ্যাস করিবার সুযোগ পাইতেন না। তাঁহার বাটীর সন্নিকটেই টিপু সুলতানের বংশের এক জনের কবর ছিল। সেই কবরের উপর প্রতি সন্ধ্যাকালে মুসলমানেরা প্রদীপ জ্বালিয়া দিত ; অবিনাশবাবু প্রত্যহ সেই কবরস্থ প্রদীপের আলোকে বসিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পাঠ অভ্যাস করিতেন। পাছে অধিক রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়েন, এই ভয়ে তিনি বাড়ীতে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি দুইটী কাঠি দেওয়ালে পুঁতিয়া তাহার উপর একটুকরা কাষ্ঠ রাখিতেন এবং কবরস্থান হইতে বাড়ী ফিরিয়া তাহার উপর পুস্তক রাখিয়া পড়া করিতেন। এই সময় তিনি কতকগুলি কড়াইভাজা লইয়া বসিতেন এবং যখনই নিদ্রা আসিত তখনই ঐ কড়াইভাজা চিবাইলে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। বাল্যকালে অর্থাভাবে তিনি জামা কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে ক্রমাগত তাহা স্বহস্তে সেলাই করিয়া পরিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে উপহাস করিলে তিনি তাঁহার স্বাভাবিক হাস্যমুখে বলিতেন—"ছেঁড়া ত দেখা যাইতেছে না ; দেখ দেখি কেমন পরিষ্কার সেলাই করিয়াছি।" বাস্তবিক সীবন কার্য্যে অবিনাশবাবু বড় দক্ষ ছিলেন।

শৈশব হইতে অবিনাশবাবুর মাতৃভক্তি অতিশয় প্রবল ছিল, মাতৃ-আজ্ঞা তিনি দৈববাণী স্বরূপ এবং মাতৃ-বাক্য বেদবাক্য স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাঁহার কাছে তাঁহার গৃহে পরিচিতের যেমন সম্মান ও আদর অপরিচিতেরও তেমনি সম্মান ও আদর। ধনীরও যেমন দরিদ্রেরও তেমনি সম্মান ও আদর, বরং দরিদ্রের বেশী। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে তাঁহার ঔষধালয়ে তিনি সমাগত দীন দরিদ্র রোগীদিগকে ব্যবস্থা প্রদান করেন। কতদিন দেখা গিয়াছে যে সেই সময়ে কোন ধনীর বাটী হইতে চিকিৎসার জন্য ডাকিতে আসিলে তিনি বলিয়াছেন যে এই-সকল লোক আমার নিকট চিকিৎসিত হইবার জন্য কত দূর দেশ হইতে আসিয়াছে ইহাদিগকে না দেখিয়া আমি এখন কোথাও যাইতে পারিব না।

খেরি জেলার অন্তর্গত পামাপুর নামক গ্রামে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া অবিনাশবাবু একখানি বড় বাড়ী সমেত এক খণ্ড জমি খরিদ করিয়াছেন এবং তাহাতে একটী প্রিভেনটোরিয়ম (রোগ-প্রতিষেধ ভবন) খুলিয়া ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের থাকিবার জন্য নানা-প্রকার সুবন্দোবস্তও করিয়াছেন। যে-সকল মধ্যবিত্ত গৃহস্থ অর্থাভাবে আলমোড়া বা ধরমপুর স্বাস্থ্যনিবাসে যাইতে অসমর্থ, তাঁহারা অবিনাশবাবুর প্রতিষ্ঠিত এই প্রিভেনটোরিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে এবং অবিনাশবাবুর ন্যায়

ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুদক্ষ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকিলে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে রোগমুক্ত হইতে পারেন এরূপ আশা করা যায়। তিনি সিমলা পাহাড়ের নিকট ধরমপুর ক্ষয়রোগ-চিকিৎসা-আশ্রমে অনেকদিন পর্য্যন্ত বিনাবেতনে রোগীদিগের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। যখন লর্ড হার্ডিং গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর ঐ আশ্রম সাধারণের জন্য খুলিতে আইসেন, অবিনাশবাবু তখন ঐ আশ্রমেই কাজ করিতেছিলেন ; তিনি লেডি হার্ডিংকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত দেখান এবং

আশ্রমের কার্য্যকলাপ সমস্তই বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। সেই সময় তাঁহার মনে নিম্নপ্রদেশে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে মধ্যবিত্ত লোকদিগের জন্য এইরূপ একটী আশ্রম খুলিবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। রোগীর অবস্থা দেখিয়া রোগের নিদান অনুমান করিতে অবিনাশবাবুর বিশেষ দক্ষতা আছে। এবং প্রায়ই সে অনুমান সত্য হইতে দেখা গিয়াছে। প্রায়ই দেখা যায় যে অবিনাশবাবু পথ্যাদির গুণে অর্দ্ধেক রোগ আরাম করেন। এ প্রদেশে তাঁহার উপর লোকের প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে।

অবিনাশবাবুর উপর স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের এতদূর বিশ্বাস ছিল যে তিনি প্রায় এক বৎসর কাল তাঁহাকে তাঁহার চিকিৎসার জন্য মাসিক দেড় হাজার টাকা দিয়া নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় যেখানে যাইতেন, অবিনাশ বাবুকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামখ্যাত জজ মাননীয় ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরও অবিনাশবাবুর চিকিৎসার উপর যথেষ্ট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে। এমন কি তাঁহার অথবা তাঁহার বাটীর কাহারও কঠিন পীড়া হইলে অবিনাশ বাবুকে কলিকাতায় যাইতে হয়। কলিকাতা নগরীতে অনেক গণ্যমান্য চিকিৎসক থাকা সত্বেও যে, জজ মহোদয় তাঁহার চিকিৎসাধীন হয়েন, ইহা অবিনাশ বাবুর পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে। অবিনাশবাবুর চিকিৎসা যুক্তপ্রদেশেই বদ্ধ নহে; বেহারের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও তাঁহার চিকিৎসার পক্ষপাতী। দ্বারবঙ্গের মহারাজা, বেথিয়ার মহারাণী, রাজাসাহেব মহম্মদাবাদ, বস্তি জেলার সন্নিকটস্থ বাঁশীর রাজা, মাড়ার রাজা, মঝৌলির রাণী, প্রতাপগড়ের রাণী, প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার চিকিৎসাধীন থাকেন।

ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতী পুরুষ, বার্দ্ধক্যেও তাঁহার শিখিবার চেষ্টার শেষ নাই। রোগের উৎপত্তি ও তাহার প্রতিকার নির্দ্ধারণ বিষয়ে নিয়তই তাঁহার চিত্ত ব্যাপৃত আছে। অধ্যয়নস্পৃহা তাঁহার অত্যন্ত বলবতী; তাঁহার অধ্যয়ন কেবল চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। সাধারণ সাহিত্য এবং শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠে তিনি অবসর-কাল অতিবাহিত করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। প্রতি বৎসর ঐ টাকায় যাহা কিছু সুদ হইবে তাহা বি, এস্ সি পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্ব্বপ্রথম ছাত্রের প্রাপ্য হইবে।

প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য-মন্দিরের একটী বৃদ্ধ ভৃত্য ছিল। একবার সে ব্যক্তি কঠিন নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। দরিদ্র অর্থাভাবে সুচিকিৎসার অধীন হইতে না পারিয়া রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাসায় পড়িয়া থাকে। হাঁসপাতালেও যাইতে চাহে নাই। ভৃত্যটী অতিশয় সৎস্বভাব এবং বিশ্বাসী ছিল। প্রথমাবধি সে অক্লান্ত ভাবে সাহিত্যমন্দিরের সেবা করিয়া আসিয়াছিল। তাহার ওরূপ অবস্থার সংবাদ পাইয়া আমি ডাক্তার অবিনাশ বাবুকে জানাই এবং বৃদ্ধের চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করি। দরিদ্রের অবস্থা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হয়। তখন তাঁহার গাড়ী কোন কারণে ঔষধালয়ের সম্মুখে উপস্থিত না থাকায় তিনি তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আমার সহিত ভৃত্যের বাড়ী উপস্থিত হন এবং অতি যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া নিজের ঔষধালয় হইতে বিনামূল্যে ব্যবস্থামত সমস্ত ঔষধ দান করেন; বৃদ্ধ সে-যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল।

প্রবাসীর সম্পাদক তের বৎসর এলাহাবাদে ছিলেন। অবিনাশ বাবুর সঙ্গে তাঁহার প্রায় দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হইত। তিনি বলেন, "অবিনাশ বাবুর মুখে কখনও পরনিন্দা শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। পরনিন্দাবিমুখতা বেশী লোকের মধ্যে দেখা যায় না।"

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

অধ্যাপক শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার সন্নিকট উত্তরপাড়া সহরে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরপাড়ায় তাঁহাদের পরিবার "আগুনখাকীর

অধ্যাপক শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বংশ" বলিয়া পরিচিত। তাহার কারণ শরৎবাবুর প্রপিতামহী সহমৃতা হইয়াছিলেন। এই সতীর সময়ে ও তাঁহার পর আর কেহ উত্তরপাড়ায় সহমৃতা হন নাই। শরৎবাবুর পিতামহ ৺তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় গোয়ালিয়র রেসিডেণ্টের প্রধান সহকারী ছিলেন। লর্ড মেটকাফ্ গবর্ণর জেনারেলের পদ পাইবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রভু ছিলেন, এবং তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসাপূর্ণ সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন। গোয়ালিয়রের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি যে অর্থ আনিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই কোন আত্মীয়ের জামীন হইয়া নষ্ট করেন। এমন কি যত টাকার জন্য প্রতিভূ ছিলেন, তাহার সমুদয় দিতে না পারায় তাঁহাকে দেওয়ানী জেলে কয়েদ হইতে হয়। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া উত্তরপাড়ার কোন কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি ছাত্রাবস্থায় শরৎবাবুর বিদ্যানুরাগ এবং স্কুল কলেজে প্রতিষ্ঠা দেখিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিতেন, "বাবা, তারিণী মুখুজ্যে পরের দায়ে জেল খাটিয়াছিলেন; এ পুণ্য তাঁহার পৌত্রে ফলিতেছে।"

শরৎবাবু বাল্যে উত্তরপাড়ার গবর্ণমেণ্ট বঙ্গবিদ্যালয় হইতে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া তৎপরে গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। এখানে প্রতি শ্রেণীতে সর্ব্বোচ্চ পদ অধিকার করায় শিক্ষক ও গ্রামস্থ যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্নেহ ও আদর লাভ করেন। তাঁহার পিতার আয় ভাল ছিল না বলিয়া উচ্চশ্রেণীতে অধ্যয়নের ব্যয় গুরুভার বলিয়া বোধ হইত। এইজন্য এই সময়ে তিনি, বর্ত্তমানকালে রাজা প্যোৎকুমার, রায় বাহাদুর, নামে যিনি খ্যাত, সেই বালকের গৃহশিক্ষকতা করিতেন। ১৮৬৮ সালে শরৎবাবু উত্তরপাড়া স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন ও মাসিক ১৮৲ বৃত্তি পাইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। এফ্-এতে গোয়ালিয়র পদক ও ইংরাজীতে পারদর্শিতার জন্য ডফ্ বৃত্তি, এবং বি-এতে বিজয়নগরম্ ও ঈশান বৃত্তিদ্বয় প্রাপ্ত হন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সম্মানের সহিত ইংরাজীতে এম্ এ পাশ করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বি-এল্ পাশ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ হাইকোর্টের ওকালতী পরীক্ষা দেন এবং সর্ব্বোচ্চ-শ্রেণীর উকীলদের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

বি, এ, পাস করিবার পর তিনি ৫।৬ মাস অস্থায়ীরূপে উত্তরপাড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের কাজ করেন। এম্ এ পাশ করিবার পর হাবড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ২য় শিক্ষক নিযুক্ত হন। প্রায় এক বৎসর কাল তথায় কর্ম্ম করিয়া লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া যান। সেই ১৮৭৫ সাল হইতে তিনি এ পর্য্যন্ত ঐ কলেজে এই ৩৯ বৎসর ৩ মাস অধ্যাপনা করিয়াছেন। এখন তিনি অর্দ্ধ বেতনে দুই বৎসরের ছুটি লইয়াছেন। তাহার পর অবসর লইবেন।

ক্যানিং কলেজে তিনি বহু বৎসর প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে গণিত, ইতিহাস ও ইংরেজী ন্যায় এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে গণিত পড়াইয়াছেন। অধ্যাপনায় এবং ছাত্রগণকে নিয়মাধীন রাখিবার সামর্থ্যে তাঁহার সুখ্যাতি আছে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

দুইবার এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ বৎসর পরীক্ষকের কাজ করিয়াছেন। অযোধ্যা প্রদেশে ভাষা-পারদর্শিতার বিচার করিবার যোগ্য বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যাঁহাদের তালিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে শরৎবাবুর নাম আছে। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য।

হাবড়া স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সময় তিনি Algebraical Exercises with Solutions নামে একখানি পুস্তক লেখেন এবং ক্যানিং কলেজে কাজ করিবার সময় উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। সেকালের ছাত্রদের মধ্যে উহা Sarat Chandra's Solutions নামে প্রসিদ্ধ ছিল। উহা হইতে তাহারা বীজগণিতের অঙ্ক কষিবার কৌশল শিক্ষা করিত। অর্থপুস্তক, গণিতের প্রশ্ন সমাধানের পুস্তক প্রভৃতি লেখা সম্বন্ধে শরৎ বাবুর মতের পরিবর্ত্তন হওয়ায় তিনি ঐ পুস্তক নিঃশেষ হইলেও আর ছাপান নাই। তিনি ত্রিকোণমিতি ও কো-অর্ডিনেট জ্যামিতির ভাল ভাল প্রশ্ন সংগ্রহ করিয়া কিরূপে তাহা কষিতে হয়, লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার অধ্যাপনার শ্রমের লাঘব হইয়াছে। কিন্তু সেগুলি ছাপাইবার ইচ্ছা নাই।

শরৎ বাবুর সহপাঠীদের মধ্যে আলিপুরের উকীল ৺আশুতোষ বিশ্বাস, বিখ্যাত ডাক্তার ৺ ভগবৎচন্দ্র রুদ্র, এম্, ডি, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ রায় বাহাদুর বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, আলিপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেসন্স জজ শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম করা যাইতে পারে। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে অনেকে কৃতী ও উচ্চপদস্থ হইয়াছেন। বঙ্গের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরাল অব রেজিষ্ট্রেশন রায়বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, হাইকোর্টের উকীল রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ রায়, সি, আই, ই এবং যশোরের প্রসিদ্ধ উকীল ও হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার তাঁহার ছাত্র। তা ছাড়া আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের দেশীয় জজ, মুন্সেফ ও উকীলদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিকট পড়িয়াছেন।

লক্ষ্ণৌয়ে তিনি রবার্ট নাইট সাহেবের সহিত পরিচিত হন, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের একজন লেখক হইয়া ৪ বৎসরকাল ঐ কাগজে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন। অযোধ্যা প্রদেশের চীফ্ কমিশনার সার্ জর্জ কুপার সাহেবের দুর্ভিক্ষ-নীতির বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তিনি তাঁহার বিরাগভাজন হন। তখন কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সংবাদপত্রে লিখিতে নিষেধ করেন।

পূর্ব্বে ক্যানিং কলেজের সহিত একটি বড় স্কুল সংলগ্ন ছিল। তাঁহাকে আট বৎসরকাল এই স্কুলের তত্ত্বধান করিতে হইয়াছিল, এবং কলেজের সঙ্গেও যোগ রাখিতে হইয়াছিল। ঐ স্কুলটি উঠিয়া গেলে, অনেকের শিক্ষাসম্বন্ধীয় অসুবিধা দূর করিবার জন্য দুইজন উদারহৃদয় বন্ধুর সাহায্যে তিনি কুইন্‌স্ এংলোসংস্কৃত স্কুল স্থাপন করেন, এবং ২০ বৎসর ধরিয়া তাহার সম্পাদকতা করিয়া আসিয়াছেন। উহা এখন খুব বড় স্কুল, এবং উহা হইতে অনেক ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ক্যানিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল হোয়াইট সাহেব বলেন, যে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় লক্ষ্ণৌয়ে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি, এবং তজ্জন্য তিনি বহু বৎসর মিউনিসিপাল কমিশনার এবং অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের কাজ করিয়াছেন। তিনি দরবারী, অর্থাৎ আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের ছোট লাটের দরবারে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় গার্হস্থ্য জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার একমাত্র পুত্রের বিবাহের আয়োজন হইতেছিল, এমন সময়ে তাঁহার উত্তরপাড়াস্থ ভবনে ওলাউঠা রোগে পুত্রটি মারা যায়। সেই গভীর শোকের স্মৃতির সহিত জড়িত বলিয়া তিনি জন্মের মত পৈত্রিক বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছেন। জীবনের শেষ সময় তিনি কাশীতে স্বনির্ম্মিত একটি গৃহে যাপন করিবেন। তাঁহার চারিটি কন্যার মধ্যে তিনটি বিধবা। তিনি ৯টি দৌহিত্রীর ভরণপোষণ করিয়া বিবাহ দিয়াছেন; এবং ৫টি দৌহিত্রকে লালনপালন করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। কন্যা ও দৌহিত্রগণ তাঁহার লক্ষ্ণৌয়ের বাটীতে থাকিবে।

শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়।

লাহোরের "পঞ্জাবী" একখানি প্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদ-পত্র। ইহা সপ্তাহে দুইবার করিয়া বাহির হয়। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় বাঙ্গলা ১২৮৫ সালের কার্ত্তিক মাসে যশোহরের অন্তর্গত পারনাদাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরা জাতিতে বৈদ্য। ইহাঁর পিতা স্বর্গীয় সারদাচরণ রায় মহাশয় কবিরাজ ছিলেন।

কালীনাথ বাবু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০্ টাকা বৃত্তি পান; তাহার পর জেনেরাল এসেম্ব্লীর কলেজে ২ বৎসর পড়েন; এফ্ এ

শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই। কলেজ ছাড়িয়া তিনি কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন লাইব্রেরীতে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন।

কলেজে পড়িবার সময় হইতেই তাঁহার খবরের কাগজ চালাইবার দিকে ঝোঁক ছিল। এখন অনেক কলেজ হইতে এক একখানি সাময়িক পত্র বাহির হয়। তখন সেরূপ ছিল না। কালীনাথ বাবুরা ৪।৫ জন বন্ধু মিলিয়া জষ্টিস্ নামক একখানি ইংরাজী কাগজ বাহির করেন। ইহা হাতে লেখা, ছাপা হইত না। লেখকেরা ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবেরাই ইহার পাঠক ছিলেন। তাহার পর নিউ ইণ্ডিয়া এবং লার্নার নামে আরও দুখানি এই রকম হাতে লেখা কাগজ বাহির করেন।

বেঙ্গলী যখন দৈনিক হয়, তাহার দু এক মাসের মধ্যেই তিনি উহার একটি অধস্তন সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হন। চারি পাঁচ মাস পরে উহা ছাড়িয়া দেন। অতঃপর কলিকাতার কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত কলিকাতা-টাইম্‌স্ নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করেন। তার পর আবার বেঙ্গলীর কাজে প্রবৃত্ত হন। তথা হইতে ডিব্রুগড়ে সিটিজেন নামক ইংরাজী কাগজের সম্পাদকতা করিতে যান। দেড় বৎসর পরে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার বেঙ্গলীর কাজে প্রবৃত্ত হন। এবার একক্রমে সাড়ে সাত বৎসর বেঙ্গলীর কাজ করেন। আনুমানিক পাঁচ বৎসর ইহার প্রধান সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু যখন বিলাত যান, তখন বেঙ্গলীর সম্পূর্ণ ভার কালীনাথ বাবুর হাতে রাখিয়া যান। সুরেন্দ্রবাবু যখনই কলিকাতা হইতে অনুপস্থিত থাকিতেন. তখনই কালীনাথ বাবুর উপর পূরা ভার পড়িত; এবং তিনি যোগ্যতার সহিত এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মে মাস হইতে তিনি লাহোরের পঞ্জাবীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

কালীনাথ বাবুর লেখা চিন্তাপূর্ণ ও সংযত। তিনি যে বিষয়ে লেখেন, তাহার সম্বন্ধে কতকগুলি "বাঁধি বোলের" পুনরাবৃত্তি করেন না, যথাসাধ্য খবর রাখিয়া স্বাধীন ভাবে লেখেন। তিনি মানুষটি যেমন খাঁটী, তাঁহার স্বদেশহিতৈষণাও তেমনি অকৃত্রিম। চালচলন সাদাসিধা।

শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী।

শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী স্বর্গীয় শশিভূষণ লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র, এবং শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয়ের ভাগিনেয়। তিনি ১২৭৯ সালের ২১শে আশ্বিন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত জপশাই গ্রামে। তিনি কলিকাতার সিটিকলেজে শিক্ষা লাভ করেন।

শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী।

তিনি প্রথমে প্রায় এক বৎসর কোনও সরকারী আফিসে অস্থায়ী ভাবে কেরাণীর কাজ করেন। তাহার পর কলিকাতা মিউনিসিপাল আফিসে প্রায় পাঁচ বৎসর কেরাণীগিরি করেন। এই কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৯০৭ পর্য্যন্ত মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপাল কৃষ্ণ গোখলে মহোদয়ের খাস্ সহকারীর কাজ করেন। ১৯০৮ হইতে ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতার বেঙ্গল টেক্নি-ক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্ শিল্প-শিক্ষালয়ের সহকারী তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৯ হইতে ১৯১০ এর ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সুধীর বাবু কলিকাতার ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন। সেই সময়ে আমরা মধ্যে মধ্যে তাঁহার কাজ দেখিয়াছিলাম। তাহাতে এই ধারণা হয় যে তিনি সুবিবেচক, এবং সকল দিক্ দেখিয়া ওজন করিয়া লিখিতে পারেন।

ইহার পর তিনি বাঙ্গলাদেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে লক্ষ্ণৌসহরের এড্‌ভোকেট কাগজের সহযোগী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য্য তিনি ১৯১০এর মার্চ্চ হইতে ১৯১২র সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর অযোধ্যা ছাড়িয়া তিনি পঞ্জাবে গমন করেন। তথায় লহোরের ট্রিবিউনের প্রধান সহকারী সম্পাদক হন। এই কার্য্য ১৯১২র অক্টোবর হইতে ১৯১৩র মার্চ্চ পর্য্যন্ত করিয়া তাহার পর হইতে "পঞ্জাবী" সহযোগী সম্পাদকের কাজ করিতেছেন। কালীনাথ বাবুর ও তাঁহার সম্পাদকতায় "পঞ্জাবী" সুপরিচালিত হইতেছে।

ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঈর্ষ্যাবিবাদ না ঘুচিলে সমুদয় ভারতবাসী একজাতি হইয়া উন্নতি করিতে পারিবে না। খবরের কাগজে যেমন ঈর্ষ্যাবিবাদ বাড়াইয়া তুলিতে পারে, তেমনি তাহা নির্ব্বাপিত করিতেও পারে। পঞ্জাবের মত সাম্প্রদায়িকতার উষরক্ষেত্রে কালীনাথ বাবু ও সুধীর বাবুর মত সচ্চরিত্র, ধীরবুদ্ধি, বিবেচক ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষশূন্য সম্পাদকেরই প্রয়োজন।

বাঙ্গালা শব্দ-কোষ

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম-এ বিদ্যানিধির সঙ্কলিত বাঙ্গালা শব্দ-কোষের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে প হইতে য-এর কিয়দংশ মাত্র আছে। সুতরাং আমরা আমাদের আলোচনা আপাতত প হইতে ম পর্য্যন্ত করিব।

কাজ করা বড় কঠিন। কৃত কর্ম্মের খুঁত বাহির করিয়া পাণ্ডিত্যের সরফরাজি করা খুব সহজ। যোগেশ বাবুর ন্যায় বহু ভাষায় ও বহু বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য পণ্ডিতের বহু বর্ষের সাধনার বিষয়ে দুই চারিটা উপর চাল মারিয়া পাণ্ডিত্য ফলাইবার ধৃষ্টতা আমার নাই। আমি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার শব্দকোষে যে-সমস্ত শব্দ ছাড় পড়িয়াছে, বা যে-সমস্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি বা অর্থ আমার অন্যরূপ বলিয়া জানা আছে, তাহাই তাঁহার আরব্ধ কর্ম্মের সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া যাইব মাত্র। এক 'পড়' বা 'পাক' শব্দের বিচিত্র অর্থসংগ্রহ দেখিলেই তাঁহার অন্বেষণ ও পাণ্ডিত্যে অবাক হইতে হয়।

পড়-পড়—পতিতোন্মুখ, পতিতস্থু।

পতিঙ্গা—গেলাসে জলের উপর তৈল দিয়া, আলো জালিবার জন্য টিনের জিব-ছোলার আকারের যে বর্ত্তিকাশ্রয় থাকে ; তাহার আকার পক্ষীর ন্যায় বলিয়া কি পত্রিঙ্গা বা পতিঙ্গা হইয়াছে ?

পদ্ম ফোটা গোবরে—কদর্য্য স্থানে সুন্দরের আবির্ভাব এই লক্ষণায়।

পয়রা—পাতলা গুড়। ফার্সী শব্দ ? ফাঃ ধাতু পরিদন—উড়া, তাহা

জন্মাষ্টমী

৺সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

U. RAY & SONS.

হইতে ? শুনিয়াছিলাম সাঁতার-বাচক কোনো ফারসী শব্দ হইতে হইয়াছে। কিন্তু শব্দটির নাগাল পাইতেছি না।"

পোলিয়া—মালদহে পোলো-ওয়ালা কোচ জাতি।

প-এ আকার—পালানো, পলায়নের ইঙ্গিত।

পায়জেব—ফাঃ, পদভূষণ। শব্দকোষে পাঞ্জর ; কখনো শুনি নাই, পায়জেব শুনি।

পাঁজা-কোলা হস্তবেষ্টনে গলা ও হাঁটু জড়াইয়া তুলিয়া ধরা।

পাটটি—(শব্দকোষে)। হুগলি জেলার গঙ্গার ধারে ঐ অর্থে পেনেটি করা বলে।

পাটনী—মালদহে নাবিক জাতি বিশেষ।

পাথরকুচি—অপর নাম হিমসাগর। হেমসাগর শুনি নাই।

পানসী—ইং pinnace, ফরাসী pinasse—sloop বা সুলুপ নৌকা।

পা-পোষ—পা মুছিবার নারিকেল-ছোবড়ায় নির্ম্মিত কর্কশ পাতঞ্চে বিশেষ, দ্বার-সম্মুখে পাতা থাকে। পা-পোঁছ শব্দের বিকার। পূর্ব্ববঙ্গে স স্থানে ছ লেখা হয়; পশ্চিম বঙ্গে তাহার প্রতিক্রিয়ায় ছ স্থানে স হইয়া থাকিবে। ইহার সহিত ফার্সী পোষ (যেমন, বালা-পোষ, থাকা-পোষ, তখৎ-পোষ, প্রভৃতি) শব্দের কোনো সম্পর্ক নাই। ফার্সী ধাতু পুষিদন্ মানে ঢাকা।

পলিতা—ফারসী হুবহু পলিতা শব্দ আছে, অর্থ—বর্ত্তী।

পিটপিট—ক্ষুদ্র বিষয় বিচারে; শুচিবেয়ে লোক সর্ব্বদা পিটপিট করে; তাহা হইতে পিটপিটে শুচিবায়ুগ্রস্ত।

পিটটান—পিট টান দেওয়া—পৃষ্ঠ সরাইয়া লওয়া হইতে প্রস্থান বা পলায়ন।

পিঁপড়া—কাঠ পিঁপড়া—লোহার মরিচার মতন রং, সরু ঢ্যাঙা গোছের; গাছে থাকে; কামড়াইলে দষ্ট স্থান ফুলিয়া উঠে। সরসরে পিঁপড়া—দুই রকম ; এক ডেয়ে পিঁপড়ার ছোট ভাইয়ের মতন, ডেয়ের অপেক্ষা ধূসর, লম্বাটে, দ্রুত চলে, কামড়ায় না; অপর ক্ষুদে পিঁপড়ের সহোদরের মতন ঈষৎ লাল-আভার কৃষ্ণ বর্ণ দ্রুত চলে, কামড়ায় না। কটকটে পিঁপড়ে—খুব গাঁটাগোটা বলিষ্ঠ রকমের, তাম্র বর্ণ, কামড়ে খুব জ্বালা। চচ্চা পিঁপড়ে—সূক্ষ্মস্থুল, অতি ক্ষুদ্র, লঘুগতি, কৃশকায়, পুনঃপুনঃ নানা স্থানে কামড়ায়: কামড়ে জ্বরের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে শিব্ শিব্ করে; কোনো কোনোটার ডানা থাকে।

পিরান—ফারসী পিরাহান, পিরাহন, পিরহন তিনটি শব্দ হইতে।

পিসু—ফাঃ পশ্‌শা—ডাঁশ।

পেরোজা—ফাঃ পীরুজা শব্দও আছে। সুতরাং ফীরোজা হইতে বলা ঘুরাইয়া বলা হয়।

পোষানি—পালনার্থ কাহারো জিম্মা দেওয়া। গরু পোষানি দেওয়া হয়।

পোঁচড়া, পোঁচরা—চুনকাম করা অর্থে বাংলায়ও প্রচলিত আছে, রাজমিস্ত্রী-ভাষায়। বাঁকুড়ায় পচ্‌রা।

পোয়ান—বড় মাছের ঘুণী বাচ্চার ঝাঁক।

পাট—কাপড়ের ভঙ্গ বা ভাঁজ।

পেট নামা, পেট চলা, পেট নরম হওয়া—উদরাময় হওয়া। বাঁকুড়ায় পেট নামানা সম্পূর্ণ পৃথক্ এক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

প্যাচ্‌প্যাচ্—ক্লিন্ন বস্তুর ভাব; যথা, কাদা প্যাচ্‌প্যাচ্ করছে, তেল প্যাচ্‌প্যাচ্। বিশেষণ প্যাচপেচিয়া বা প্যাচপেচে।

প্যানপ্যান—কান্নার ভাব। প্যানপেনে—কাঁদুনে, যে সর্ব্বদা প্যাঁ প্যাঁ শব্দ করিয়া কাঁদে।

পগা—ধাতু, প্রহারার্থক, পীড়নার্থক।

পাই—নির্দ্দিষ্ট কাজ (বাঁকুড়া জেলার কোনো কোনো অংশে প্রচলিত। কোনো কোনো অংশে পাইট বলে।)

পিঠ চাপড়ানো—মুরুব্বিয়ানা করিয়া কাহাকেও উৎসাহ দেওয়া।

পাড়া-কুঁদুলী—যে নারী সমস্ত পাড়ার লোকের সঙ্গে কোন্দল করিয়া বেড়ায়।

পালের গোদা—দলের সর্দ্দার; বানরী দলের মধ্যে একটা মদ্দা বানর যেমন দলপতি থাকে, তেমনি ধরণের লোক।

পীড়াপীড়ি—সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, পুনঃপুনঃ অনুরোধ।

পাঁচই—মাসের পঞ্চম দিন।

পঁচিশে—মাসের ২৫ দিন।

পনরই—মাসের ১৫ দিন।

পিকলি—সানের উপর সাঁৎসেতা হইয়া যে পিছল হয়।

পাঁজালি—কৃষকেরা খড়ের বিননী করিয়া তাহার মুখে আগুন জ্বালিয়া মাঠে লইয়া যায়, এই নুড়োর আগুনকে পাঁজালি বলে।

পাটিসাপটা—যে পিষ্টকের পুর ময়দা-গোলার রুটির মধ্যে সাপটাইয়া পাট করিয়া রাখা হয়।

প্লেট—ইং plate, রেকাবি, ফলক, জামার সম্মুখের শক্ত বক্ষা-বরক অংশ।

পেণ্ডুলম—ঘড়ীর দোলন। ইং pendulum।

পাল্‌টি—এক কুলীনের বিবাহযোগ্য অপর কুলীন বংশ।

পেড়—হিন্দী, গাছ।

পিতলা—ধাতু, পিতলের পাত্রে রক্ষিত সামগ্রীতে পিতলের কষ লাগা। যথা, খাবারটা পিৎলে উঠেছে।

পেটো—কলার বাসনার খোলা।

প্রাতঃপ্রণাম—শূদ্রদের ব্রাহ্মণকে প্রাতঃকাল ভিন্ন অন্য সময়ে প্রণাম করার অধিকার ছিল না; অর্থাৎ প্রভাতে উঠিয়াই ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া আসা শূদ্রের কর্ত্তব্য ছিল। এজন্য শূদ্র যখনই প্রণাম করুক তাহা তাহার প্রাতঃকৃত্য।

পাটোয়ার—যাহারা সূতা রেশম জরী দিয়া গহনা গাঁথে। জাতি বিশেষ।

পাছড়া—ধাতু, ঝাড়া, পরিষ্কার করা, নিক্ষেপ করা। যথা ঝাড়া পাছড়া চাল ডাল ঘর ইত্যাদি। শব্দকোষে পাছুড়া।

পেচকা—ধাতু, চটকানো। যথা, আমটা ফুটিটা চাপ লেগে পেচকে গেছে।

পাঁচমিশালি—যাহাতে পাঁচ রকম জিনিস মিশ্রিত হইয়াছে। অনুরূপ—পাঁচগেছে আম।

পুষি—বিড়াল, ইং Puss হইতে বোধহয়।

পিছটান—পশ্চাতে স্নেহের আকর্ষণ। যথা বিদেশে থাকতে পারব না কেন, আমার ত আর পিছটান নেই।

পালানি—যে নারী শ্বশুরবাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করে।

পাতাসি—পাতার তুল্য কৃশা নারী।

পাইকা—হরপের আকারের নাম।

পাকা দেখা—বিবাহের কথা বার্ত্তা স্থির হওয়া।

পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া খাওয়া—অপরকে Cat's paw করা, পরের পীড়া জন্মাইয়া নিজের কার্য্যসিদ্ধি করা।

পেতন—পেত্নীর পুং।

পাতুঞ্চে—যাহা শয্যাবৎ পাতা যায়।

পালনি—ব্রত নিয়ম করিয়া বিশেষ রকমের আহারের নিয়ম পালন।

পাঁড়—বুড়ো পাকা বড় শশা। তাহা হইতে লক্ষণায় বৃদ্ধ মোটা লোক। বদ্ধ মাতাল।
পিঠ চুলকানো—মার খাইবার জন্য স্পৃহা।
পেট পড়া—ক্ষুধা লাগা।
পেট-পোড়া—গর্ভধারণ-প্রতিষেধক ঔষধ।
পচা-পাচকো, পচা-পড়া—অতি পচা এবং চটকানো। তুলনীয় শব্দকোষে পচা-গলা।
পচানি—পচা দ্রব্যের ক্লেদ রস কষ ইত্যাদি।
পটপটি—পটহ, ঝিল্লি।
পথ-খরচ—পথের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ এবং কদাচিৎ খাদ্য।
পদ—এ ত তবু পদে আছে ও আরো খারাপ। এই উদাহরণে পদ শব্দের অর্থ তুলনায় শ্রেষ্ঠ। বাঁকুড়ায় পথে ব্যবহৃত হয়।
পদে পদে—প্রত্যেক পদক্ষেপে, অর্থাৎ বার বার।
পদ্দী—পদ্ধতি শব্দের গ্রাম্য অপভ্রংশ রূপ।
পর—বিলম্ব। যথা, একটু পরে যাব।
পরপর—একের পশ্চাতে অপর।
পাইকস্তা—অপর জমিদারের প্রজাকে জমি বিলি।
পাঁচিল—প্রাচীর। বাঁকুড়ায় পাঁচীর।
পাড়ু—কাবু, কাতর, পীড়ায় অশক্ত। যথা, লোকটা এক দিনের জ্বরে পাড়ু হয়ে পড়েছে।
পাঁড়ঘুঘু—অতি ধূর্ত্ত।
পাচার—ধ্বংস করিয়া গোপন করিয়া ফেলা; চালান।
পাক পাড়া—ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো।
পাগলাটে—ঈষৎ পাগলের ছিট আছে যাহার।
পাটনাই—পাটনা জেলায় জাত; বৃহৎ।
পাড়া-গেঁয়ে—পল্লীগ্রাম-সম্পর্কীয়; পল্লীবাসী।
পাড়ানি—যে পাড়ায়, যথা, ঘুম-পাড়ানি মাসি পিসি।
পানিশঙ্খ—আরতির সময় যে অচ্ছিদ্র শঙ্খে জল রাখা হয়।
পাৎড়া—পাতায় বাড়িয়া দেওয়া ঠাকুরের ভোগ। তাহা হইতে পাৎড়া-মারা—ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়া। লক্ষণায়, অনায়াসে আহার প্রাপ্তি। হুগলি জেলার জিরেট বলাগড়ের গ্রাম্য বিগ্রহ গোপীনাথের পাতায়-বাড়া ভোগকে পানোড়া বলে। কেন?
পাতিমোর } —ছোট মুকুট, বিবাহে কন্যার কপালে সোলার যে
পাতিমোড় }
পত্র বাঁধিয়া দেওয়া হয়।
পাতোয়াল—হিন্দী, নৌকার হাল। মালদহে বাঙালীরাও বলে।
পাতকুড়ি—পত্রকলিকা।
পান-চক্কী, পানিচরকী—Water mill.
পানি-তরাস—The keel of a ship or a boat.
পায়রা চাঁদা—সমুদ্রের বড় চাঁদা মাছ।
পার্শে, পারিশা—মাছ।
পাশ-কথা—অবান্তর কথা, incidental কথা, an episode.
পাশাপাশি—একের পার্শ্বে অপর।
পাশটি পাশা খেলার অক্ষ বা শারি।
পাহাড়তলী—তরাই, পর্ব্বতপদদেশ।
পিঠবোচকা—ছোট বোচকা যাহা পথিক পিঠে বাঁধিয়া লইয়া যায়।
পুঁচ—ধাতু, ধারালো অস্ত্র দিয়া এক টানে নির্ম্মূল করিয়া কাটা। পোঁচ—তীক্ষ্ণ অস্ত্রের ঘর্ষিত আকর্ষণ। যথা, এক পোঁচে কেটে ফেল; পুঁচিয়ে কুকুরের ল্যাজ কাট।
পুঁজ—পূয।
পেকনা—ওজর, অছিলা, excuse.
পিটন চণ্ডী—চণ্ড রূপে প্রহার, প্রচুর প্রহার।
পোকা-কাটা } —পোকায় খাওয়া বস্তু।
পোকা-খেকো }
পোড়ানি—জ্বালা, দগ্ধানি।
পাজী—হিন্দী নহে, ফার্সী শব্দ, বানান পে আলিফ জিম য়ে।
পারা—তুলা অর্থে, ফার্সী পারা শব্দ হইতেও আসিয়া থাকিতে পারে; ফার্সী পারা—খণ্ড, অংশ।
পাশ—ফার্সী, ছিটানো। যথা, গোলাপ-পাশ।
পাশা কানের চৌরীর তুলা গহনা।
পালান—সং পর্য্যাণ; কিন্তু ফাঃ পালান—a pack saddle. অতএব পর্য্যাণের অপভ্রংশ অপেক্ষা ফার্সী পালান হওয়াই সম্ভব।
পুরিয়া—ফাঃ পুর—পূর্ণ হইতে?
পাঞ্জা—পাঁচ-ফোঁটাযুক্ত তাস। ফারসী পঞ্জ—পাঁচ।
পয়-পয়—ফাঃ পয়-আ-পয়—পুনঃ পুনঃ। অনেক শব্দ আমরা ফারসীর নিকট হইতে হুবহু লইয়াছি; সেগুলিকে সংস্কৃতের অপভ্রংশ ব্যবহার বলিলে বোধহয় ঠিক হইবে না। এমন অনেক শব্দ নাম করা যাইতে পারে—পহর, পাহারা, পলক, পালান।
পয়স্তী—নদীর চর। ফাঃ।
পলু—ফাঃ পিলা—রেশম কোষ।
ফংফং—যাহা ফাঁপা হাল্কা ও ভঙ্গপ্রবণ তাহার ভাব। বিশেষণ ফংফঙে।
ফম—মালদহে স্মরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।
ফরকা—ধাতু, অর্থান্তর দ্রুত ভাবে হঠাৎ চলিয়া যাওয়া। লোকে রাগ করে ফরকে চলে যায়।
ফরাসী—ইং ফ্রান্স হইতে নহে, ফরাসী ফ্রাসে—ফ্রান্সদেশবাসী হইতে হইয়াছে।
ফর্দ্দ—খণ্ড, যথা এক ফর্দ্দ কাগজ দাও ত।
ফল দেখা—পুষ্পবতী হওয়া। শব্দকোষে ফুল দেখা।
ফলকর—ফল ভোগের জন্য দেয় কর। তুঃ জলকর, পথকর।
ফাঁদ ফাঃ ফন্দা।
ফড়ে—ফাঃ ফরোশ—বিক্রেতা।
ফু—ফাঃ অর্থ মুখ। তাহা হইতে মুখমারুত।
ফন—আরবী। Art, artifice, ফন্দি, অছিলা, ছল।
ফিলহাল—আরবী, এতৎ ক্ষণেই।
ফেশান—ইং Fashion.
ফুকো—বিশেষণ, ফু দ্বারা প্রস্তুত সুতরাং ভঙ্গুর, যথা ফুকো শিশি।
ফেড়েঙ্গা—Bifurcated; যথা তেফেড়েঙ্গা ডাল (গাছের)। ফাড়া হইতে?
ফাঁদালো—বিশেষণ, বিস্তৃতমুখবিশিষ্ট।
ফস—শীঘ্র।
ফিটন—খোলা গাড়ী। ইং Phaeton.
ফনোগ্রাফ—ইং Phonograph, গানের কল।
ফুলো—স্ফীত।
ফুলকি—স্ফুলিঙ্গ।
ফনেল—ইং Funnel.
ফাঁদি—যাহার ফাঁদ বা বিস্তৃতি আছে। ফাঁদি কথা—চেদো কথা বিস্তারিত কথা। ফাঁদি গহনা।
ফরাকৎ—আরবী, বিস্তৃত ও ফাঁকা স্থান।

ফরকি, ফিরকি—অতি সরু গাছের ডাল।
ফেরাফিরি—বার বার ফেরত দেওয়া ও লওয়া।
　ফাষ্ট—ইং Fast, দ্রুত ঘড়ী ফাষ্ট বা স্লো চলে।
ফুটাফাটা—ভগ্ন।
ফাঁকতাল—বাজনার তালবিশেষ। অবসর বা সুযোগ। যথা আমি ফাঁকতালে খেয়ে নিয়েছি।
ফেরফের—অতি পাতলা, জালের তুল্য। যথা, ফ্যারফেরে কাপড়।
ফুঙ্গি—বৌদ্ধ শ্রমণ, বর্ম্মা ভাষায়। তাহা হইতে পূর্ব্ব বঙ্গে গালি ফুঙ্গির পুত।
ফোমেণ্ট—ইং Fomentation.
ফাণ্ট—কবিরাজী শব্দ, বোধহয় গাছড়ার ক্বাথকে বলে। ঠিক মনে নাই।
ফ্রি—ইং Free. তাস খেলায় বা স্কুলে অবৈতনিক ছাত্র সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, তাস খেলায় প্রায়ই অপভ্রংশ ফেরাই, অর্থাৎ যাহাকে বাধা দিবার কেহ উপস্থিত নাই। তাসের ফেরাইটা বোধ হয় fry হইতে হইয়া থাকিবে। Fry টা freeর একটা পুরাতন form.
ফেচা—লেজ। ফেচাকোণা—পাখীর লেজের ন্যায় অসম-কোণ-বিশিষ্ট।
ফল নাবা—গাছে ফল ধরা।
ফাঁকা—ধাতু, আলগোছে মুখে ফেলিয়া গিলিয়া খাওয়া (হিন্দী?) ফাঁকে ফাঁকে পলাইয়া বেড়ানো।
ফিরা—ভ্রমণ। পূর্ব্ববঙ্গের গুরুঠাকুরেরা ফিরায় বাহির হন, অর্থাৎ শিষ্যদের বাড়ী বাড়ী ফিরিয়া প্রণামী আদায় করিয়া বেড়ান।
ফাওড়া—বড় বাঁটওয়ালা কোদাল, যাহা আস্ফালন করিয়া মাটিতে নিক্ষেপ করিতে হয়।
ফাটাফাটি—পরস্পরে আঘাত করিয়া উভয় পক্ষকেই বিদারণ করা।

ছিপ—মাছ ধরিবার বংশদণ্ড। এ শব্দটি কি শেফ—লেজ হইতে হইয়াছে?
চাঙ্গারী—ভাসের অবিমারক নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে আছে—ততঃ প্রবিশতি চাঙ্গেরিকাহস্তা মাগধিকা। অতএব চাঙ্গেরিকা সংস্কৃত শব্দরূপে পাইতেছি। তাহারই অপভ্রংশ চাঙ্গারী।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুস্তক-পরিচয়

ছায়াপথ শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীদুর্ল্লভকৃষ্ণ চৌধুরী, বি-এল, বসিরহাট। কলিকাতা নববিভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত।

এখানি খণ্ড-কবিতার বই। চারিটি 'বিলাস' বিভক্ত—(১) সদ্বিলাস (২) চিদ্বিলাস (৩) আনন্দবিলাস (৪) হৃদ্বিলাস (ক) ভাব (খ) বৈরাগ্য (গ) ভজন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে গ্রন্থখানি তত্ত্বমূলক; সৎ চিৎ আনন্দের হৃদয়ে প্রকাশ পাওয়ার ভাবগুলিকে ছন্দে গাঁথিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। কবি হিন্দুশাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব ছন্দে গাঁথিয়া ব্রহ্মলোকের সন্ধান এই ছায়াপথের ভিতর দিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সেইজন্য সকল কবিতা বেশ স্বচ্ছ সহজবোধ্য হয় নাই। ভাব বোধগম্য না হইলেও ভাষা ও ছন্দের গাম্ভীর্য্য, শব্দের ঝঙ্কার এবং কবিত্বময় প্রকাশ সমস্ত কবিতাগুলিকেই সুখপাঠ্য করিয়াছে। যে-সমস্ত সংস্কৃত স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনো কোনোটিতে কিন্তু মূলের গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হয় নাই। মোটের উপর ইহা দর্শন-গ্রন্থ হইয়াছে, কবিতাগ্রন্থ নহে; তবে শুষ্ক দর্শনকে এমন সরস করিয়া যিনি ছন্দোময় করিতে পারিয়াছেন তিনি শক্তিমান কবি তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। গ্রন্থভূমিকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত হিন্দুদর্শন ও থিঅজফির সাহায্যে গ্রন্থবস্তু বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করা যাইতে পারে। দার্শনিকতত্ত্বশূন্য বিমল কবিতাও কয়েকটি ইহাতে স্থান পাইয়াছে; তাহা কবিত্বে ও সরস দ্যোতনায় মণ্ডিত।

রস-মঞ্জরী—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম-এ কর্ত্তৃক ভানুদত্তের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ, বিস্তৃত ভূমিকা, ব্যাখ্যা ও বিষয়সূচী সম্বলিত। মডেল লাইব্রেরী, ২১।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য ৸৹ আনা, বাঁধাই ১৲ টাকা।

ইহাতে সংস্কৃত বাক্যালঙ্কার-অনুমোদিত নবরস ও নায়ক-নায়িকার বিবিধ ভাবাবস্থার বর্ণনা আছে। ভূমিকায় ভানুদত্তের পরিচয় প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। অনুবাদ নীরস ও আড়ষ্ট।

মহাত্মা ৺ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন-চরিত—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপৃথ্বীনাথ শাস্ত্রী, ২১ বালিগঞ্জ ষ্টেসন রোড, কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৸৹ আনা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবনের সহিত তাঁহার এই প্রিয় ভক্তের জীবন বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিল; এই জন্য এই গ্রন্থ কৌতূহলী পাঠকের নিকট সমাদৃত হইবার যোগ্য। এই জীবন-চরিত অতি সংক্ষিপ্ত; ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ অংশিত আড়াই ৩০ পৃষ্ঠায় পাইকা টাইপে মুদ্রিত; বাকী ১৪০ পৃষ্ঠায় শাস্ত্রী মহাশয়ের অপ্রকাশিত রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত মহর্ষিদেবের আত্মজীবনীর পরিশিষ্টের পরিশিষ্ট রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে যাঁহার জীবনের পরিচয় দিতে চাওয়া হইয়াছে, তাঁহার পরিচয় বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী শাস্ত্রী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী—'আমার খাতা' রচয়িত্রীর নিকট হইতে আমরা তাঁহার স্বামীর জীবনীতে ইহার অধিক প্রত্যাশা করিয়াছিলাম।

কেশব-জননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা—শ্রীযোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ঢাকা ভারতমহিলা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। প্রচারক ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের দেবী সারদাসুন্দরী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ভূমিকা স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। এবং অনেক লোকের অনেকগুলি চিঠি পরিশিষ্টরূপে প্রদত্ত হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পিতৃকুলের, পিতা মাতা ভাই ভগিনী প্রভৃতি সমস্ত পরিবারের, সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার এবং কেশবচন্দ্রের ও তাঁহার মাতার সদাশয়তা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, উদার মত, ঈশ্বরে নির্ভর প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তকের মধ্যে নানা তীর্থভ্রমণকাহিনীর সহিত ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ থাকাতে ইহা অতীব কৌতূহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই পুস্তকের ভাষা খুব সহজ অনাড়ম্বর এবং ঘরোয়া ভাবে অনুপ্রাণিত, এজন্য সুখপাঠ্য। যাঁহারা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পারিবারিক পরিচয় পাইতে চাহেন তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া অনেক

তথ্য জানিতে পারিবেন এবং আনন্দিত হইবেন। গ্রন্থের মধ্যে অনেকগুলি ফটোগ্রাফ চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

হিমালয়-ভ্রমণ—পরিব্রাজক শ্রীশুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত, প্রাপ্তিস্থান—দেবালয়, ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৫৬ পৃষ্ঠা পাইকা হরপে ছাপা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১৲ টাকা।

দৈনিক ডায়ারি হইতে হিমালয়ের বহু তীর্থস্থান পর্য্যটনের বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। এই-সকল বিবরণ সুখপাঠ্য ও তথ্যপূর্ণ হইলেও নূতন নহে, হিমালয়তীর্থযাত্রী বহু ব্যক্তি এরূপ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকের বিশেষত্ব ইহার পরিশিষ্ট এবং সেইটি থাকাতেই ইহা প্রত্যেক হিমালয়-পর্য্যটকের বিশেষ সমাদরের সামগ্রী হইবে। পরিশিষ্টে পাণ্ডাদের বিবরণ, চড়াই উৎরাই ও ভ্রমণ সম্বন্ধে মন্তব্য, হিমালয়-ভ্রমণের সময় ও পর্য্যটনকারীর সতর্ক হইবার বিষয় নির্দ্দেশ, যান ও বাহন, পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিসের সন্ধান, এক স্থান হইতে অন্য স্থানের দূরত্ব ও পথে চটি প্রভৃতি আশ্রয়স্থানের সংবাদ প্রভৃতি থাকাতে এই গ্রন্থের উপাদেয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা সুন্দর guide-book, পথপ্রদর্শক পুস্তক। হিমালয়যাত্রী মাত্রেই ইহার সাহায্যে পথে বিশেষ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থশেষে যান বাহনের দুখানি চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অশ্রুধারা—শ্রীঅনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ৫৬।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ইউনিভার্স্যাল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ১০০ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় আনা।

ইহা "উদ্ভ্রান্ত প্রেমের" ব্যর্থ নকল, হাহুতাশের ন্যাকামি উচ্ছ্বাসের বই। অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ অসম্বদ্ধ প্রলাপের মধ্যে কবিত্ব, দার্শনিকতা, বৈজ্ঞানিকতা প্রভৃতির পরিচয় দিবার চেষ্টা আছে।

সীতা নির্ব্বাসন—শ্রীবেণীমাধব চাকী প্রণীত, প্রকাশক সিদ্ধেশ্বর পান, ৬৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৮৪ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। মূল্য অনুল্লিখিত।

এখানি সীতার বনবাসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক। প্রায় সমস্তই অমিত্র ছন্দে বিরচিত। মধ্যে মধ্যে মিত্র ছন্দ বা গদ্যও আছে। মূল বাল্মীকি রামায়ণ ও কল্পনার অনুসরণে লিখিত। গানগুলি কবিত্বলেশবৰ্জ্জিত। অমিত্র ছন্দ অনায়ত্ত বলিয়া আড়ষ্ট, কবিত্বশূন্য। ঘটনা-সন্নিবেশেও নাটকত্বের কলাকৌশল পরিলক্ষিত হয় না; কেবল বাক্যের পর বাক্য যোজনা এবং কথোপকথন যে নাটক নয়, তাহাতে যে স্বতন্ত্র নিপুণতার আবশ্যক, নাটককার রচনায় তাহার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

বুকের বোঝা—শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা। উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার নির্ভুল ছাপা ও রেশমী কাপড়ে সুদৃশ্য বাঁধাই।

এখানি পত্রোপন্যাস। কেবলমাত্র চিঠিপত্র সাজাইয়া তাহারই মধ্য হইতে সুকৌশলে একটি প্লট খাড়া করিয়া কয়েকটি চরিত্র ফোটাইয়া তোলা পত্রোপন্যাসের কার্য্য। তাহাতে সাধারণ উপন্যাসের মতো আর সমস্তই থাকে, কেবল লেখক কিংবা পাত্রপাত্রীদের মধ্যে কেহ বক্তা না হইয়া নানান্ জনের চিঠিপত্রগুলিই বক্তার কাজ করে।

এই গ্রন্থের পত্রগুলির লেখক একজন মাত্র। তিনিই উপন্যাসের নায়ক। এইরূপ একজনের চিঠিতেই উপন্যাস গড়িয়া তোলা বাংলায় হয়ত এই নূতন, কিন্তু য়ুরোপীয় সাহিত্যে ইহার নমুনা আছে গ্যয়টের Sorrows of Werter এবং গ্যতিয়ের Mademoiselle de Maupin নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ে।

'বুকের বোঝা'র নায়কটি সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসী। বনবাস হইতে আপনার বিচিত্র কার্য্যকলাপের তথ্য নানা তত্ত্বকথায় মিশাইয়া কোনো সংসারী বন্ধুর নিকট পত্রে লিখিয়া জানাইতেছে। পুস্তকের প্রথমাংশ জুড়িয়া শুধু এইরূপ ধারাবাহিক তত্ত্বকথার অসম্বদ্ধ প্রলাপ। তাহার পর সহসা দেখি বনবাসী সন্ন্যাসী নায়ক এক পার্ব্বতীর প্রেমে পাগল। কিছুদিন পরে প্রেম প্রকাশ ও প্রতিদান লাভ। কিন্তু সন্ন্যাসীর ভাগ্যে আর গৃহী হওয়া ঘটিল না। নায়িকার পিতামাতা তাঁহাদেরই এক স্বজাতীয়ের হস্তে কন্যাসমর্পণ করিলেন। তখন নায়ক হতাশ প্রণয়ে মর্ম্মাহত হইয়া নায়িকার নিকট হইতে পিস্তল চাহিয়া আনিয়া প্রণয়িনীর স্বহস্তের দান পিস্তল দাগিয়া আত্মহত্যা করিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চিঠি লিখিয়া সে উপন্যাসখানির অঙ্গহানি নিবারণ করিয়া গিয়াছিল।

ডবল ক্রাউন ষোল পেজী দুইশত পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া লেখক তাঁহার সন্ন্যাসী নায়ককে দিয়া পত্র লিখাইয়াছেন। আর এক একখানি পত্র কি! তাহাতে না আছে এমন জিনিস নাই। উহাতে বেদ আছে, বেদান্ত আছে, অদৃষ্ট আছে, পুরুষকার আছে, বিজ্ঞান আছে, দর্শন আছে, সমাজতত্ত্ব আছে, এমন কি ওঙ্কারের ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত আছে। আর সর্ব্বোপরি সর্ব্বত্র আছে অসহনীয় ন্যাকামি ও কৃত্রিমতা। ভাষা অত্যন্ত ফেনানো, প্রলাপের প্রায় কাছাকাছি।

অবশেষে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে এই বুকের বোঝা গ্যয়টের Sorrows of Werter নামক উপন্যাসের অবিকল নকল—শুধু বাহিক রচনা-প্রণালীতে নয়, প্লটটি পর্য্যন্ত হুবহু এক, স্থানে স্থানে অনুবাদ বলিলেই হয়। কিন্তু ইহা কোথাও ঘুণাক্ষরেও স্বীকৃত হয় নাই। গ্যয়টের ন্যায় অশেষ প্রতিভাশালী লেখকের হাতে যে-সব তত্ত্বালোচনা উপন্যাসে খাপ খাইয়াছিল তাহা বুকের বোঝায় বোঝা হইয়া উঠিয়াছে।

চারু।

অভিশাপ—

নাটক। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীরমণীমোহন সিংহ। মূল্য ১৲ একটাকা। ডবল ক্রাউন, ষোল পেজী, ২৩২ পৃষ্ঠা।

এই নাটকখানি আলাউদ্দীনের গুজরাট বিজয় ও গুজরাটের রাণী কমলাদেবী ও তাঁহার কন্যা দেবলা দেবীর ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

প্রবন্ধ পরিচয়—শ্রীলক্ষ্মীচরণ দাসগুপ্ত, বি-এ, প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বসু, রায় এণ্ড কোং, ঢাকা। ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউসে মুদ্রিত। মহর্ষি, মহসিন, বিদ্যাসাগর ও সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রতিকৃতি সম্বলিত। চতুর্থ সংস্করণ। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ২১৩ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা মাত্র।

ইহা একখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ। পাঠ্যপুস্তক-রচনার নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে ইহার কতকাংশ গদ্যে ও কতকাংশ পদ্যে নিবদ্ধ। গদ্যভাগের প্রবন্ধগুলি ছাত্রসম্প্রদায়ের উপযোগী নীতি, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিবিধ-তত্ত্ববহুল এবং দৃষ্টান্ত-কথায় বশদীকৃত। রচনা সংযত ও সরস। পদ্যাংশের অধিকাংশ

কবিতাই বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিগণের রচনা হইতে উদ্ধৃত। পাঠ্য-পুস্তককার অন্যান্য লেখকগণের ন্যায় গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন না করিয়া গ্রন্থকার এক্ষেত্রে বিভিন্ন সাহিত্যিকের বিভিন্ন রচনা উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের এই অংশটি বিচিত্ররসমধুর করিয়া তুলিয়াছেন।

অকিঞ্চন—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র-প্রণীত। কলিকাতা, "দীন-ধাম" হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবিহারীলাল নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ১২২ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

ইহা একখানি কবিতা-পুস্তক। কবিতাগুলির অধিকাংশই ধর্ম্ম-মূলক। স্থলে স্থলে ভাব ও ভাষার সমতা রক্ষা না হইলেও, মোটের উপর কবিতাগুলি চলনসই। লেখকের ভাবুকতা আছে।

খাতির-নদারত।

শিখের কথা—

ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। মূল্য বার আনা। ডবল ক্রাউন ষোল পেজী, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

শিখ ইতিহাসের একটি অধ্যায় অবলম্বনে এই নাটক রচিত। সম্রাট ঔরঙ্গজীবের শাসনকালে গুরুগোবিন্দের নেতৃত্বে শিখদিগের উত্থানকাহিনী, স্বধর্ম্ম ও স্বদেশের জন্য তাঁহাদের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের কথা আরো কয়েকটি ঘটনার সহিত মিশাইয়া "শিখের কথায়" নাটীকৃত হইয়াছে।

গুচ্ছ—

(ছোট গল্প)—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী প্রণীত ও বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০ টাকা। ডবল ক্রাউন, ষোলপেজী, ১৭২ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালীতে ছাপা ও স্বর্ণাক্ষরে নামাঙ্কিত রেশমী মলাটে বাঁধাই।

"গুচ্ছে" বারোটি গল্প আছে। ইহার অধিকাংশ গল্পই ইতিপূর্ব্বে একাধিক বাংলা মাসিকে প্রকাশিত হইয়া বাংলা গল্প-পাঠকদিগের নিকট স্বল্পবিস্তর পরিচিত হইয়াছে।

গল্পগুলির আখ্যানবস্তুর মধ্যে সংযমের অভাব এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক ত্রুটি থাকিলেও লিখিবার ভঙ্গীটি বেশ সরল এবং সুখপাঠ্য হওয়াতে বইখানি চলনসই হইয়াছে। "গুচ্ছের" মধ্যে "অভাগিনী" ও "পাগলের কথা" আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে; ঐ দুইটি গল্পতে লেখিকার একটু শক্তির আভাস পাওয়া যায়। কয়েকটি গল্প বড় 'sensational';—যেমন "প্রতীক্ষা" ও "বিজয়া"। 'বিজয়া' গল্পে একেবারে এক দফায় তিন তিনটি খুন ডিটেকটিভ নভেলের অনুপাতেও বেশী বলিয়া মনে হয়। 'আহ্বান' ও আরো দু'একটি গল্প অতিরিক্ত 'সেণ্টিমেণ্টাল'।

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম

বুদ্ধের জীবন ও বাণী—

শ্রীশরৎকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ১৩৮ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা। ছাপা, কাগজ ভালো। কয়েক খানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য বারো আনা।

এই গ্রন্থে মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁহার অমৃতমধুর উপদেশবাণী অতি শৃঙ্খলায় ও সাবধানে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের অতি উপাদেয় ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন যথার্থই বলিয়াছেন যে "ইতিহাসে বুদ্ধের এক রূপ, বৌদ্ধ সাধকদের কাছে আর এক রূপ ......। এই দুই রূপে সামঞ্জস্য কোথায়? সামঞ্জস্য করা কি কঠিন, সত্যের জরীপে মহাপুরুষের চরিত্র যায় শুকাইয়া, ভক্তের প্রেমবারি সেচনে অনেক সময় যায় পচিয়া।......এই গ্রন্থে সেই সামঞ্জস্যের জন্য গ্রন্থকার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। বড় কঠিন কাজ, সত্যকে রক্ষা করিতে হইবে, অথচ ভক্ত মহাপুরুষের জীবনকে প্রাণহীন করাও হইবে না, বড় কঠিন ব্রত।" এই কঠিন ব্রতে গ্রন্থকার সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছেন; নিরপেক্ষ শ্রদ্ধা ও বিচক্ষণতা দ্বারা অপ্রমত্ত ভাবে তিনি যাথাতথ্য নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগ্রন্থ ও ইতিহাস একাধারে বলিয়া ইহা সকলের নিকট সমাদৃত হইবার যোগ্য। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন লিখিয়াছেন "গ্রন্থকার গ্রন্থের সমস্ত বস্তুই বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে বা ভক্তদের লেখা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। নিজ-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই।" এই গ্রন্থে সাধারণত অপরিজ্ঞাত অনেক নূতন তথ্য ও মত, বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বাণী সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের মধ্যে যেন একটি বৌদ্ধ আবহাওয়া বহিয়া গিয়াছে বলিয়া বড়ই মনোরম ও সুখপাঠ্য বোধহয়। গ্রন্থের ভাষা সংযত, মার্জ্জিত, সরস, প্রাঞ্জল। এই গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। মুদ্রারাক্ষস।

পাষাণের কথা

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, কলিকাতা ১৩২১। মূল্য এক টাকা।

পুস্তকখানি ১৬৭ পৃষ্ঠা পরিমিত। তদ্ভিন্ন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লিখিত ৪ পৃষ্ঠা ভূমিকা, এবং গ্রন্থকারের লিখিত ৮ পৃষ্ঠা পরিশিষ্ট আছে। এই পরিশিষ্টে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের অর্থ এবং প্রাচীন দেশ, নগর ও মানুষের পরিচয় আছে। একটি স্তূপের তোরণের ছবি আছে। পুস্তকখানি এণ্টিক্ কাগজে সুমুদ্রিত। বাঁধাই সুন্দর। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—

"অন্য দেশে বরং ৩।৪ হাজার বৎসরের খবর পাওয়া যায়, কেননা সেখানকার পণ্ডিতেরা যে-সকল পুঁথি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বার বার নকল হইয়া আজ পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিয়াছে। আমাদের দেশেও এ রকম অনেক পুঁথি আসিয়া পঁহুছিয়াছে; তাহাতেও আছে সবই, যাগ আছে, যজ্ঞ আছে, আইন আছে, কানুন আছে, চিকিৎসা আছে, জ্যোতিষ আছে, ব্যাকরণ আছে, কাব্য আছে, অলঙ্কার আছে, বিজ্ঞান আছে—আছে সবই, নাই কেবল সেকালের পুরাণ কথা। পুরাণ কথা কহিতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভাল বাসিতেন না; ঐ কথাটি কহিতে ঋষিদের মুখ বন্ধ, মুনিদের মুখ বন্ধ, কবিদের মুখ বন্ধ, দর্শনের মুখ বন্ধ, বিজ্ঞানের মুখ বন্ধ, জ্যোতিষের মুখ বন্ধ। সুতরাং আমাদের দেশে পুরাণ কথা যদি শুনিতে চাও, তাহা হইলে পাথরকে কথা কহাও, নহিলে ভারতের পুরাণ কাহিনী বলিবার আর লোক নাই।

"যখন বৌদ্ধধর্ম্মের বড়ই প্রভাব তখন বুদ্ধ দেবের পরম ভক্তেরা চাঁদা করিয়া পাথর কাটিয়া আনিয়া বড় বড় স্তূপ নির্ম্মাণ করিত, এবং তাহার ঠিক মাঝখানে বুদ্ধদেবের অস্থি রক্ষা করিত এবং......তাহার পূজা করিত; সেই স্তূপের চারিদিকে বড় বড় পাথরের রেল দিত। টোকা টোকা থামের উপর রেলিং, আর দুই দুইটা থাম মিলাইবার জন্য তিনটী করিয়া সূচী।......প্রত্যেক থামে, প্রত্যেক সূচীতে ও রেলের প্রত্যেক পাথরে যে চাঁদা দিত তাহার নাম লেখা থাকিত। ভারতবর্ষে এরূপ স্তূপ অনেক ছিল, দুই চারিটী এখনও আছে। এই

স্তূপে অনেক পাষাণ আছে, তাহারা সকলে মিলিয়া অনেক কথা কয়, আমাদের অনেক পুরাণ কথা শুনায়. আমাদের যে গৌরব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা আবার মনে করাইয়া দেয়।

"বাঘেলখণ্ডে বেরুট নামক স্থানে এইরূপ একটি প্রকাণ্ড স্তূপ ছিল, কালের কুটিল গতিতে বৌদ্ধদ্বেষীদের উৎপীড়নে সে স্তূপের অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রেলিংয়ের যে অংশটুকু আভাঙ্গা টাট্‌কা ছিল, কনিংহাম সাহেব তাহা তুলিয়া আনিয়া কলিকাতার বড় যাদুঘরে আবার সেইরূপে খাটাইয়া রাখিয়াছেন। এ স্তূপেরই একখানি পাথর কি কি পুরাণ কথা কহিতে পারে, আপনারা শুনুন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এই-সকল পাষাণের কথা অনেক পরিশ্রমে, অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া বুঝিতে শিখিয়াছেন, এবং আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন।"

"গ্রন্থকারের নিবেদনে" রাখাল বাবু লিখিয়াছেন:—

"পাষাণের কথা' প্রাচীন পাষাণের কথা হইলেও ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে লিখিত আখ্যায়িকা, ইহা বিজ্ঞান-সম্মত-প্রণালীতে রচিত ইতিহাস নহে।"

ইহা যদিও বিজ্ঞানসম্মতপ্রণালীতে রচিত ইতিহাস নহে, যদিও ইহাতে কবে কোন্ রাজা কোথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন, কবে কোথায় কাহাদের সঙ্গে কাহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল, ইত্যাদি কথা লিখিত নাই, তথাপি ইহা হইতে বৌদ্ধযুগের ধর্ম্ম, ধর্ম্মযাজক, সমাজ, যুদ্ধ, হুনদের ভারত আক্রমণ, স্থাপত্য, তক্ষণ শিল্প, প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। অথচ সমস্তই পরোক্ষ ভাবে একটি গল্পের মধ্য দিয়া পাওয়া যায়। রাখালবাবু যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে যেরূপ স্পষ্ট দেখিয়াছেন, পাঠককেও তেমনি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

গ্রন্থে নাগরিক ও বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজকদের বিলাসিতা ও কলুষিত চরিত্রের যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে ভারতবর্ষের দুর্ব্বলতা, অধঃপতন ও পরাধীনতার কারণ অনেকটা বুঝা যায়।

ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, প্রাচীন কালে যে-সব বিদেশী জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহাদিগকে হজম করিয়া ভারতীয় করিয়া লইয়াছেন। হুন প্রভৃতির সহিত যুদ্ধের বর্ণনা খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

রাখালবাবু বিজ্ঞানসম্মতপ্রণালীতে একখানি ইতিহাস লিখিলে ভাল হয়।

সম্পাদক।

দেশের কথা

গতবার 'দেশের কথায়' আমরা পল্লীগ্রাম ও মফঃস্বল সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি কর্ত্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। 'বরিশালহিতৈষী' 'নীহার' প্রভৃতি কয়েকটি মফঃস্বলের সংবাদপত্র আমাদের সহিত একমত হইয়া আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক সংবাদপত্রই আমাদের আবেদনে কর্ণপাত করিয়াছেন কি না তাহার কোনোপ্রকার পরিচয় পাইলাম না। অনেক কাগজই যে একান্ত অনাবশ্যক কথা ও বিষয়ের ভারে আক্রান্ত থাকে ও দেশের প্রকৃত অভাব ও অভিযোগের জন্য অল্পসংখ্যক পত্রই চিন্তিত তাহা বোধ করি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। একথা স্বীকার করিতে আমরা বাস্তবিকই ক্লেশ বোধ করিতেছি।

সংবাদপত্রের দায়িত্ব কতখানি! আর সেই গভীর দায়িত্বের কতটুকুই বা আমাদের মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলি পালন করিতেছেন? একএকটি বিভাগ বা স্থানের সংবাদপত্র সেখানকার অধিবাসীগণের সমবেত কণ্ঠস্বরের মত কাজ করিবে অথচ ঐ সংবাদপত্রই আবার অশিক্ষিত অধিবাসীগণকে শিক্ষা দিবে কিসের জন্য কিপ্রকারে তাহাদের কণ্ঠস্বর শাসকসম্প্রদায়ের শ্রুতিগোচর করা কথন প্রয়োজন হয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের—শতকরা নব্বইএর অধিক লোকের দেশের অবস্থা ও বর্ত্তমানে সে সম্বন্ধে কি করা উচিত বা অনুচিত এবিষয়ে জ্ঞান নাই। প্রত্যেক দেশের সংবাদপত্রই এই-সকল অশিক্ষিত জনসাধারণকে তাহাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধীয় জ্ঞান আয়ত্ত করিবার কার্য্যে সহায়তা করে। কিন্তু আমাদের দেশের কয়খানি সংবাদপত্র, এই অবশ্যকর্ত্তব্যগুলি অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, ইহার কথা একবারও ভাবিয়া থাকেন? এই কর্ত্তব্যগুলির প্রতি আদৌ দৃষ্টি না রাখিয়া, লোক-সাধারণের উন্নতি, নৈতিক আর্থিক ও শিক্ষার উৎকর্ষ সম্পাদনের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, ভবিষ্যতের কথা অতি সূক্ষ্ম বিশদভাবে চিন্তা না করিয়া হাতে একখান কাগজ আছে বলিয়া যদি তাহা যদৃচ্ছভাবে পরিচালন করা হয় তাহা হইলে লেখক বা সম্পাদকগণের মনে একটু তৃপ্তি হইলেও হইতে পারে কিন্তু দেশের তাহাতে কোন উপকারই হয় না।

আমরা জানি, অধিকাংশ লোকে সংবাদপত্রের কথাকে বেদবাক্য বলিয়া মনে করে। সংবাদপত্রে যাহা থাকে তাহার যে প্রতিবাদ করা যাইতে পারে বা তাহা ভুল হইতে পারে সে ধারণা অনেকে করিতে পারে না।

এরূপ ক্ষেত্রে যদি মফঃস্বলের সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের চোখ খুলিয়া দেন—যে তোমাদের এই চাই—তোমরা এই কর—তোমরা এই করিও না—তোমরা একতা-ব্রত গ্রহণ কর—এস, শিক্ষার উজ্জ্বল আলোকে তোমরা সকলে বাহির হইয়া এস—তাহা হইলে কত মঙ্গল হয়।

ইহাই যদি না করিলেন—একটা নূতন জীবনের স্পন্দনের অনুভূতি যদি সাধারণের বিরাট কলেবরের ভিতর আনিয়া দিতে না পারিলেন, তবে সংবাদপত্রগুলি করিলেন কি? অনেক সংবাদপত্রই বিশেষ চিন্তা করিয়া বা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে লিখিয়া থাকেন না বলিয়াই মনে হয়। অনেকে লিখিবার বিষয় পান না। প্রত্যেক বারেই 'দেশের কথা'য় সংবাদ ও মতামত উদ্ধৃত করিবার সময় আমরা বিষম বিপদে পড়ি। বহুসংখ্যক সংবাদপত্রের মধ্যে মাত্র দুইচারি খানি দেশের প্রকৃত অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করেন—চারিপাঁচ খানি মাত্র পল্লীগ্রামের বাস্তবিক প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রকাশ করেন—দেশের ও দশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য একাগ্র চেষ্টা অল্প পত্রেরই আছে। অথচ প্রাচীন বিষয় লইয়া যথেষ্ট অনাবশ্যক গবেষণায় অনেক সংবাদপত্র ভারাক্রান্ত। তাঁহারা ভারতের পূর্ব্বগৌরবের কথা লইয়াই মগ্ন—বর্ত্তমানের উপর তাঁহাদের বড় একটা কৃপা-কটাক্ষ পড়ে না! সমুদ্রযাত্রার নিষেধ, স্ত্রীলোকগণ যেরূপ আছেন তাঁহাদের সেরূপ থাকার শাস্ত্রীয় যৌক্তিকতা, "পতিত" সম্প্রদায়ের পতিতই থাকা উচিত, প্রভৃতি বিধি বিধান পালন করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা লইয়া মহা হৈ চৈ করিয়া থাকেন—অথচ বাঁচিবার প্রয়োজনীয়তা ও বাঁচিতে হইলে যাহা যাহা করিতে হয় তাহার প্রয়োজনের কথা একবারও বলিতে শুনি না।

মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলির প্রতি আমাদের নিবেদন—তাঁহারা ঐ-সকল অনাবশ্যক বিষয়ের তর্ক ছাড়িয়া দিয়া দেশের প্রকৃত কাজে—হিতকাজে লাগুন, দেশের মঙ্গল হইবে, ভগবানের আশীর্ব্বাদ তাঁহাদের উপর বর্ষিত হইবে, সাধারণের বন্ধুর কাজ করা হইবে। উদার পন্থা অবলম্বন করিয়া পল্লীগ্রাম ও দেশের শিক্ষা লইয়া, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও সে সম্বন্ধে কি করা উচিত বা অনুচিত, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি, আর্থিক উন্নতি, নৈতিক উন্নতি, ধর্ম্মবিশ্বাসের উন্নতি, এক কথায় সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগুন ও সেই উদ্দেশ্যে আপনাদের সমস্ত শক্তি, সাধনা ও মনপ্রাণ নিয়োজিত করুন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতদ্বৈধ ও অসামঞ্জস্যের কথা ভুলিয়া যান—সকল দেশবাসীর কল্যাণসাধনের বিরাট উদ্দেশ্যের ভিতর সে-সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিমজ্জিত করিয়া দিয়া সকলে এক হইয়া এক উদ্দেশ্য লইয়া দাঁড়াইয়া দেখুন—আমরা কি না করিতে পারি।

শিক্ষা :—

দেশের চারিদিকে শিক্ষার জন্য যেমন একটা প্রবল তৃষা ও আগ্রহ দেখা দিয়াছে—তাহা মিটাইবার চেষ্টাও ঠিক সেই পরিমাণেই ক্ষীণ বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহা দেখিয়া বাস্তবিকই আমরা বিস্মিত হইয়াছি। বর্ত্তমানে চারিদিকে শিক্ষার প্রসারকে বাঁধিবার জন্য যেরূপ নানা-প্রকার আইন কানুনের আবির্ভাব হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, হয় শিক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত অনাবশ্যকরূপ অধিক মাত্রায় অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, আর নয় শিক্ষার প্রসার হইতে দেওয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীদের উদ্দেশ্য নয়—পরন্তু শিক্ষার সঙ্কোচ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। বাস্তবিকই "বরিশাল-হিতৈষী" যথার্থই বলিয়াছেন যে "সমস্ত শিক্ষাগারগুলি আমাদের একশ্রেণীর ছাত্রের পক্ষে ক্যানাডা বা দক্ষিণ আফ্রিকা হইয়া উঠিয়াছে।" কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়, অন্ততঃ উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কথাটা খুবই খাটে। বরিশালহিতৈষীই তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন।—

বরিশালের অন্যতম চিকিৎসাব্যবসায়ী বাবু অন্নদাচরণ গাঙ্গুলী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"এবার ব্রজমোহন কলেজে প্রায় ৩০০ শত ছাত্র আই এ, ক্লাশে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য দরখাস্ত দিয়াছে; তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৮৩ জন, ২য় বিভাগে অধিক, তৃতীয় বিভাগের সংখ্যা অতি অল্পই। বরিশাল জিলার সদর মফঃস্বলের ছাত্র ভর্ত্তি হওয়ার পর স্থান থাকিলে অন্য জিলার ছাত্র ভর্ত্তি করিবেন এইরূপ প্রকাশ। ভিন্ন জিলা হইতে যে-সকল ছাত্র আসিয়াছে তাহাদের দুর্দ্দশা এবার যথেষ্ট। ইতঃভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হইয়া যা হবার তাই হইল। বিশেষ গতবারে এই কলেজে ২টী ক্লাশ ছিল, তাহাতে ৩০০ ছাত্র

ভর্ত্তি হইয়াছিল। এবার মাত্র একটী ক্লাশ খুলিবে সুতরাং ১৫০ ছাত্রের ভর্ত্তি হওয়ার পর ভিন্ন জেলার যে ছাত্র আসিয়াছে তাহাদের লাঞ্ছনার কথা ভাবিয়া কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ সু-বিধান করিলে ভাল হয়। পূর্ব্বে যদি একটী ক্লাশের কথা ঘোষণা থাকিত তবে নিজ নিজ পথ অনেকেই দেখিত। এখন অনুপায়।"

কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ বলেন স্থানাভাব। তেমন স্থানাভাব কিন্তু সর্ব্বত্র। এই স্থানাভাব হয় কেন? একদিকে নিয়ম করা হইয়াছে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অধিক ছাত্র ভর্ত্তি করা যাইবে না। অপর দিকে নূতন স্কুল কলেজ স্থাপন এত অধিক ব্যয়সঙ্কুল হইয়াছে যে কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তিও এখন আর সে দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন না। ঘর হইতে সহস্র সহস্র টাকা ঢালিয়া দিয়া কে নিত্য ঊর্দ্ধতন রাজপুরুষগণের ভ্রূকুটীভঙ্গী সহিতে যাইবে? সম্রান্ত ধনী বলেন অর্থ থাকিলে ব্যয় করিবার কত পথ আছে, স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া কেন অপমানিত, লাঞ্ছিত হইব? এই সহরে বাউফলের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীগণ সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া হাট বসাইয়াছেন, রামচন্দ্রপুরের জমিদারগণ সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া বাজার বসাইয়াছেন, অথচ ইঁহারা প্রত্যেকেই জানেন সহরে আর একটী স্কুলের অভাবে ছাত্রগণ পড়িতে পারিতেছে না। কিন্তু সে পথে গমন করিতে তাঁহারা নানা কারণে প্রস্তুত নহেন।

কোথাও স্থান নাই। আর্ট কলেজের অবস্থা এই, মেডিকেল কলেজের অবস্থা ততোধিক শোচনীয়। অমৃতবাজার পত্রিকার জনৈক পত্রলেখক লিখিয়াছেন এ বৎসর ৩৪৩ জন ছাত্র মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য আবেদন করিয়াছিল, তন্মধ্যে মাত্র ১৫০ শত গৃহীত হইয়াছে। অপর ছাত্রগুলি কোথায় যাইবে। সমগুকে গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার দিয়া দ্বার রুদ্ধ করা হইতেছে। একজন বলেন সমস্ত শিক্ষাগারগুলি আমাদের এক শ্রেণীর ছাত্রের পক্ষে ক্যানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকা হইয়া উঠিয়াছে। সত্য মিথ্যা জানিনা, স্থানীয় কোনও ভদ্রলোক তাহার দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ পুত্রকে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইতে অনেক অনুরোধ উপরোধের চিঠি সহ গিয়া ২০০ শত টাকা সেলামী দিতে প্রস্তুত হইয়াও সফলকাম হন নাই। অতএব একবার ভাবুন অবস্থা কি ভীষণ—কি শোচনীয় হইতেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেরও এই ভাব। তাই হতাশে ক্ষোভে আজ সহস্র সহস্র দেশবাসী জিজ্ঞাসা করিতেছে "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।"

বিগত ১৯১২ সনে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় ট্রাষ্টডিড করিয়া ব্রজমোহন কলেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন—তদবধি নূতন জমি গ্রহণ করিয়া কলেজের বাড়ী প্রভৃতি তৈয়ারী করার ভার গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। আজ ১৯১৪ সন বিগত প্রায়—অথচ সে দিকে কোনও উচ্চবাচ্য নাই? আর সেই উচ্চবাচ্য নাই বলিয়া ব্রজমোহন কলেজে অনার ক্লাস সকলগুলি এবং আই এ ক্লাসের প্রথম বার্ষিকের শাখা শ্রেণী তুলিয়া দিয়া ছাত্রগণের জন্য অশেষ লাঞ্ছনা সৃষ্টি করা হইতেছে!

এ জন্য কে দায়ী? আমরা দেখিলাম কতক জমি গ্রহণ করার প্রস্তাব হইল—মিঃ হলওয়ার্ড প্রভৃতি শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারীগণ তাহা পছন্দ করিলেন—সহসা মিঃ হর্ণেল আসিয়া বলিলেন ২৭ বিঘা জমিতে কাজ হইবে না -১০০ বিঘা জমি চাই! ইহা কেমন অবস্থা আর কেমন ব্যবস্থা তাহা আমরা বলিতে পারি না। যাহা হউক ২৭ অথবা ১০০শত বিঘা যত জমিই আবশ্যক হউক ট্রাষ্টডিডের সর্ত্তানুসারে গবর্ণমেণ্ট সমস্ত জমিই গ্রহণ করিতে বাধ্য—কিন্তু সে সর্ত্ত কেন এতদিনে পালিত হইতেছে না এবং পালিত না হওয়ায় আজ যে শত শত ছাত্রকে ভয়ানক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে—তজ্জন্য আমরা কাহার নিকটে বিচারপ্রার্থী হইব?

এই তো গেল উচ্চশিক্ষার বিপদ। ছেলেরা কলেজে স্থান পাইতেছে না—প্রতি বৎসর শত শত শিক্ষার্থীকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইতেছে—স্বভাবতঃই লোকের মনে হইবে আর দুই চারিটা কলেজ করিলেই তো গোল চুকিয়া যায়। সে তো ঠিক কথা—কিন্তু তাহাতেও কতখানি বাধা তাহা নীচের 'বরিশাল হিতৈষী' হইতে উদ্ধৃত অংশটুকু পড়িলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন—

শিক্ষার বিপদ। রঙ্গপুরের জনসাধারণ কলেজ স্থাপন করিবার জন্য অর্থদান করিতেছেন, উৎসাহের সহিত অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, কিন্তু আমরা অবগত হইলাম, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের একজন মন্ত্রী বলিয়াছেন, এই কার্য্যের সহিত তাঁহার সহানুভূতি নাই। তিনি নাকি অর্থকরী বিদ্যার খুব পক্ষপাতী—কলেজ টলেজ পছন্দ করেন না। এইরূপ মন্ত্রীর আমলে বঙ্গদেশে নূতন কলেজ স্থাপন করা সহজ ব্যাপার হইবে না। অথচ গত ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে বক্তৃতা কালে লর্ড কারমাইকেল যে কথা বলিয়াছেন তাহার ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত।

পুরুলিয়ার 'মানভূম' বলেন ঃ—

বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে মানভূম জেলার অধিবাসীগণের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত কম। বর্ত্তমান সময়ে কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর স্কুল হওয়াতে ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত অনেকেই অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু অর্থাভাবে তাহার পর তাহাদের অধ্যয়ন সাধ্যাতীত হইয়া পড়িতেছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নূতন আইন প্রচারিত হইবার পর হইতেই মফঃস্বল কলেজগুলিতেও অধ্যয়ন করা তাহাদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। মানভূমের ভদ্রসম্প্রদায় এরূপ নিঃস্ব যে ছেলেদের পড়াইবার জন্য মাসিক ২৫।৩০ টাকা করিয়া খরচ করা তাঁহাদের পক্ষে কল্পনাতীত। এই সময় যদি তাহাদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য কোন বন্দোবস্ত না হয়, তাহা হইলে আর তাহাদের উন্নতির আশা কোথায়? বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে (কেবল কলিকাতা বাদ দিয়া মফঃস্বলে) ১৮টি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বেসরকারী কলেজ আছে, তন্মধ্যে বঙ্গ দেশেই ১৩টি এবং বিহার প্রদেশে মাত্র ৫টি; সুতরাং কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে বিহার প্রদেশে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার আশাও সুদূরপরাহত।

প্রত্যেক সহরেই ১০০৲ টাকার নিম্নের বেতনের কর্ম্মচারীই অধিক। অধিকাংশ ব্যবসায়ীর আয়ও প্রায় ঐরূপ। ইঁহাদের সমুদায়ই ভদ্রলোক কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহারা ছেলেদের উচ্চশিক্ষা দিতে একরূপ অক্ষম হইয়া পড়েন। এরূপ স্থলে যদি জেলায় একটি কলেজ হয় তবে অনেকেরই ছেলেদের শিক্ষার জন্য আর কাতর হইতে হয় না। মানভূম জেলার প্রকৃত উন্নতিসাধন করিতে হইলে আমাদের গণ্য মান্য ব্যক্তিগণের অন্য দিকে মনোনিবেশ না করিয়া

যাহাতে অতি শীঘ্র পুরুলিয়াতে একটি কলেজ করিতে পারেন সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করুন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে কখনই অকৃতকার্য্য হইবেন না।

ময়মনসিংহের উচ্চশিক্ষার বিপদের কথা "চারুমিহির" হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে ছাত্র ভর্ত্তি উপলক্ষে কর্ত্তৃপক্ষ যে ব্যবহার করিতেছেন তাহাতে ময়মনসিংহের জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা এই কলেজের জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কত বাদানুবাদ করিয়াছেন, কত আয়াস সহ্য করিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন, অবশেষে লোন আফিস হইতে সুদ দেওয়ার নিয়মে ঋণ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে টাকা প্রদান করিয়াছেন। এমতাবস্থায় যদি তাঁহারা দেখিতে পান য তাঁহাদের আত্মীয় ছাত্রগণ এই কলেজে সামান্য কারণে ও ব্যক্তিবিশেষের খামখেয়ালিতে ভর্ত্তি হইতে পারিতেছে না, তাহা হইলে তাঁহাদের চঞ্চলতা প্রদর্শন স্বাভাবিক।

কলেজের প্রিন্সিপাল এবং ম্যাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেণ্ট বলিতেছেন যে, কলেজে আর অধিক ছাত্র লইবার স্থান নাই। কলেজের অন্য যে নূতন অট্টালিকা প্রস্তুত হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু সে জন্য দায়ী কে? জননায়কগণ জুনমাস মধ্যে কলেজগৃহ প্রস্তুত করিয়া দিবেন বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বার বার জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে কথায় তখন কর্ণপাত না করিয়া দুই দিন মধ্যে তাঁহাদিগের নিকট নগদ ৫০০০০৲ টাকা তলব করিয়া বসেন এবং তাহা না দিতে পারিলে কলেজ হইবার সম্ভাবনা নাই ইহাও জানান। জননায়কগণ অগত্যা স্থানীয় লোন আফিস হইতে সুদ দেওয়ার নিয়মে টাকা কর্জ্জ করিয়া যথা সময়ে তাঁহাকে নগদ ৫০০০০৲ টাকা প্রদান করেন। কলেজগৃহ উপযুক্ত সময়ে প্রস্তুত করার দায়িত্ব সেই দিন হইতেই অবশ্য তাঁহার প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে। গৃহ প্রস্তুত হয় নাই সুতরাং অধিক ছাত্রের স্থান হইবে না ইত্যাদি অজুহাতে ময়মনসিংহের ছাত্রদিগকে ভর্ত্তি না করা কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের মুখে শোভা পায় না।

এই তো গেল উচ্চশিক্ষার হাল। চারিদিকেই লোকে উচ্চশিক্ষা চায় কিন্তু নানা ওজরে কলেজে স্থান হয় না। লোকে নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাহারও বিঘ্ন অনেক। এর জন্য দেশময় যতদূর সম্ভব আন্দোলন হওয়া দরকার। প্রত্যেক সংবাদপত্র এই লইয়া প্রবল আন্দোলন করুন—প্রত্যেক দেশবাসী আন্তরিক চেষ্টা করুন—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেই হইবে। দেশের সমস্ত লোকে যদি সমস্বরে শিক্ষা চায় তবে তাহাদের চিরদিন ঠেকাইয়া রাখা সম্ভবপর হইবে না—আজ না হয় কাল দিতেই হইবে।

তারপর প্রাথমিক শিক্ষার কথা। চারুমিহিরে প্রকাশ :—

ময়মনসিংহের পরিমাণ ফল ৬০০০ বর্গ মাইলের উপর, জনসংখ্যা ত্রিতাল্লিশ লক্ষের অধিক; ঢাকার পরিমাণ ফল ২৭৭৭ বর্গমাইল, জনসংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ; ফরিদপুরের আয়তন ২৫৭৬ বর্গমাইল, জনসংখ্যা একুশ লক্ষ; বাখরগঞ্জের আয়তন ৪৬৫২ বর্গমাইল, জনসংখ্যা চব্বিশ লক্ষ। ময়মনসিংহে হাজার-করা ৪৬ জন লিখিতে পড়িতে জানে। ঢাকায় হাজার-করা ৭৫ জন, ফরিদপুরে ৬২ জন, বাখরগঞ্জে ৮৬ জন। ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জের তুলনায় ময়মনসিংহ আয়তনে এবং জনসংখ্যায় সর্ব্বপ্রধান কিন্তু শিক্ষায় সর্ব্বনিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে।

বীরভূমের শিক্ষার অবস্থা কিরূপ তাহা 'বীরভূম-বার্ত্তায়" প্রকাশিত নিম্নে উদ্ধৃত প্রবন্ধটি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে—

বীরভূম জেলার লোকগণ অধিকাংশই চাষ বাস লইয়া দিন যাপন করে, তাহারা লেখাপড়ার বড় ধার ধারেনা। অর্থ ব্যয় করিয়া পড়িতে পারে এমন লোকও এখানে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই সবরেজেষ্টারী আফিসে যাহারা দলিল রেজেষ্টারী করিয়া দিতে আসেন এমন লোকের মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থও লেখা পড়া না জানায় কেবল টিপসহি ও ঢেড়া টানিয়া কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

বীরভূমে প্রায় তিন সহস্র খানা গ্রাম আছে। ইহার মধ্যে জেলা স্কুল লইয়া সাতটী ম্যাট্রিকিউলেসন স্কুল বর্ত্তমান। মধ্য-ইংরেজী ও মধ্য-বঙ্গ স্কুলের সংখ্যা মোটের উপর ত্রিশ পঁয়ত্রিশের বেশী হইবে না। প্রাইমারী স্কুলও আটশতের বেশী হইবে না। এই ত মধ্য শিক্ষা ও নিম্ন শিক্ষার অবস্থা। স্থানীয় অধিবাসীগণ এখানে যেমন লেখাপড়ায় উদাসীন, গবর্ণমেণ্ট হইতেও তেমন অন্যান্য জেলার ন্যায় এখানে প্রজাদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার কোনরূপ বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। নিম্ন প্রাইমারী ও উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের মধ্যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে যাহাদিগকে সাহায্য করা হয় তাহার পরিমাণ নিতান্তই সামান্য; গড়ে একএকটী শিক্ষককে মাসিক এক টাকার বেশী সাহায্য করা হয় না। একে গ্রাম্য-লোকগণ তাহাদের সন্তানগণের শিক্ষার জন্য মাসিক দুই চারি আনার বেশী ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত, তাহার উপর পাঠশালার শিক্ষকগণ বোর্ডের বা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য হইতে একরূপ বঞ্চিত। সে স্থানে এখন শিক্ষার আর উপায় কি? কাজেই বৎসর বৎসর অনেক পাঠশালা নূতন হইতেছে ও উঠিয়া যাইতেছে।

আমরা দেখিতে পাই একবৎসরে একশত বার নিত্য নূতন রকমের পরিদর্শক কর্ম্মচারী গ্রামে যাইয়া পাঠশালা দর্শন করতঃ এবং মন্তব্য লিখিয়া হায়রান হন। ইহাতে মূল কাজের যে কি উন্নতি হয় বুঝিতে পারি না। শিক্ষকগণ একে যে বেতন পান ও সরকারী সাহায্য পান তাহা উপরওয়ালাদের পান তামাক ও অনেক সময় আহারের বন্দোবস্ত করিতেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। ইহার উপর পান হইতে চুন খসিলে রক্ষা নাই। তাই গ্রাম্য পাঠশালার এই অধঃপতন।

গ্রাম্য লোকগণের তো স্কুলের প্রতি অনেকেরই তেমন আস্থা নাই। অনেকে যেস্থানে স্কুলের স্থান দিবেন, সেখানে কয়টা গরু বাঁধিলেও বেশী উপকৃত হইবেন বিবেচনা করেন। তাঁহারা নিজেরাও যেমন পণ্ডিত, ছেলেদিগকেও সেরূপ পণ্ডিত তৈয়ারী করিয়া থাকেন। তবে সকলেই এইরূপ তাহা নহে।

শ্রীহট্টের "সুরমা" বলেন—

লোকসংখ্যার অনুপাতে ও অন্যান্য জিলার তুলনায় শ্রীহট্টে উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ের নিতান্ত অভাব। আমার বোধ হয়, বর্ত্তমান জীবনসংগ্রামের যে বিষম সমস্যার অনুপ্রাণিত হইয়া, "সুষুপ্ত ভারতের" বিভিন্ন প্রদেশে নবজাগরণের "বিলুপ্ত ডমরু-ধ্বনি" শ্রুত হইতেছে, তাহাও নিদ্রালস শ্রীহট্টবাসীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই, নতুবা এ দ্বাবিংশতি লক্ষ লোকের অধ্যুষিত ভূমিতে মাত্র ৭টী বিদ্যালয়ে যে শিক্ষার অভাব থাকিতে পারে না বলিয়া ধরিয়া লওয়া ইহা কখনই সম্ভবপর নহে।

এই দৃষ্টান্তগুলি দৃষ্টিগোচর করিবার পর আর বোধ করি কেহ মনে করিবেন না যে আমরা শিক্ষায় কিছু অধিক মাত্রায় অগ্রসর হইয়া গিয়াছি—শিক্ষার বেগ একটু কমান দরকার। বঙ্গের প্রত্যেক জেলা হইতেই অভিযোগ উঠিতেছে—'এ জেলায় শিক্ষা আদৌ হইতেছে না—শিক্ষা চাই—শিক্ষা চাই,' অথচ এসকল দাবী পূরণ করিবার জন্য কাহারো কিছুমাত্র চাঞ্চল্য দেখিতে পাই না। বর্ত্তমানে শিক্ষাসমস্যা অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। লোকে শিক্ষার পথে এইরূপ যত বাধা পাইতে থাকিবে, ততই তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ করা হইতেছে—কলেজে বা স্কুলে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বেশী ছাত্র লওয়ার কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে—'স্কুলফাইন্যাল' প্রভৃতি নানাপ্রকার হাঙ্গামা লইয়া আসিবার প্রস্তাব হইতেছে! এ সকলেরই ফল হইবে, শিক্ষার সংকোচ। একথা কাহারো অজ্ঞাত নহে যে শিক্ষাই মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির একমাত্র উপায়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সুফল প্রসব করিল—আমরা তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। কেবল ভারতবর্ষের এখনো সময় আসে নাই, কেননা এযে ভারতবর্ষ! আমরা কি এমনই মানব-জগতের বাহিরে যে সকল মানুষের যাহাতে মঙ্গল, আমাদের তাহাতে অমঙ্গল?

স্বদেশী দ্রব্য :—

আজকাল অধিকাংশ স্থানে স্বদেশী জিনিসপত্রের নাম গন্ধও পাওয়া যায় না। একদল স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করেন না তাহার কারণ স্বদেশী জিনিস তাহাদের এনামেলের পালিস রুচি ও সখকে মিটাইতে পারে না। আর একদল স্বদেশী ব্যবহার করেন না তাহার কারণ বঙ্গভঙ্গ রহিত হইয়া গিয়াছে। শেষোক্ত যুক্তিটি যতই হাস্যজনক বোধ হোক না কেন উঁহাদের কাছে ইহা একেবারে অকাট্য। যেহেতু বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী ক্রয় করা আরম্ভ হয়, সেই কারণ উহা রহিত হইবার পর এ প্রথা থাকিবার আর কোন কারণ নাই! দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দুইটি ঘটনা এককালে ঘটিলেও ইহাদের ভিতর যে কোনোপ্রকার রক্তের সম্বন্ধ নাই ইহা অনেকের আদৌ বোধগম্য হয় না।

কিছুদিন হইতে দেখিতেছি মফঃস্বলে একমাত্র 'বরিশাল-হিতৈষী'ই স্বদেশীর আলোচনা করিয়া তিনি যে অপরাপর চঞ্চলচিত্ত সংবাদপত্রের মত নিজের পণ বিস্মৃত হন নাই তাহার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সমস্ত পত্রিকাগুলিকেই স্বদেশীর প্রচার ও প্রসারের জন্য আত্মনিয়োগ করিতে অনুরোধ করি। 'বরিশাল-হিতৈষীতে' প্রকাশ :—

বোম্বায়ের কাপড়ের বাজার—বোম্বায়ের কাপড়ের বাজারে মন্দা পড়িয়াছে। একে খরিদদারের অভাবে মাল বিকাইতেছে না, তাহার উপর গুদামজাত মালের জামিন রাখিয়া কাপড়ের কলের স্বত্বাধিকারীরা পূর্ব্বে যেমন ব্যাঙ্কওয়ালাদিগের নিকট হইতে টাকা পাইতেন, এখন সে সুবিধাও বিলুপ্ত হইয়াছে। বোম্বায়ে ক্রমে ক্রমে কয়েকটা বড় বড় ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়াতে ব্যাঙ্কের কর্ত্তারা বড় সাবধানে অর্থের আদান প্রদান করিতেছেন, বেশী টাকা ধার দেওয়া একরূপ বন্ধ করিয়াছেন। এই কারণে বোম্বায়ের পোর্টট্রাষ্টের মালগুদামে প্রায় একলক্ষ পঁচিশ হাজার গাঁইট কাপড় মজুত হইয়াছে। বোম্বায়ে এরূপ ব্যাপার ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। অসাধু ব্যক্তিদিগের দুষ্কর্ম্মের জন্য নিরীহ ব্যক্তিদিগকে কিরূপ ক্লেশ পাইতে হয়, এই ঘটনা তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

বাজারে বিদেশী মাল ছাড়া স্বদেশী মাল দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। যাঁহারা স্বদেশী আন্দোলনের সময় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাতিয়াছিলেন ও বাগ্মিতার ঝড় বহাইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকের মাথায় বিলাতি হ্যাট, পরণে বিলাতি কাপড়ের বিলাতি ঢপের পোষাক। এই কি আমাদের প্রতিজ্ঞার পরিণাম?

'বরিশালহিতৈষী' আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন :—

এই বাঙ্গালী জাতির তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া, দেশহিত ভুলিয়া, স্বীয় স্থায়ী স্বার্থ ভুলিয়া আবার মহামঙ্গলকর স্বদেশী ব্রত ভঙ্গ করিতেছে।

আর এই আত্মনিন্দা অর্থাৎ আত্মহত্যা করিয়া লাভ নাই, এখনও করণীয় অনেক আছে। যাহারা কর্ম্মক্লান্ত বা ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন তাহারা বিশ্রাম করুন। নূতন লোক কর্ম্মক্ষেত্রে

অগ্রসর হউন, আবার গুরুগম্ভীর স্বরে বলুন "ভাই, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার কর।" গুদামে স্বদেশী বস্ত্র জমিয়া যাইতেছে, এদিকে আমাদের বাজারে উহার একান্ত অভাব হইয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে আবার বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট স্বদেশী ব্যবহার করিতে কখনও নিষেধ করেন নাই সাধু স্বদেশী হওয়া দণ্ডনীয় করেন নাই—তবে সভা সমিতি করিয়া লোককে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে অনুরোধ করায় কোনও আশঙ্কাই নাই। কলিকাতায় যাঁহারা সভা করিতেছেন তাঁহারা কার্য্যকরী ব্যবস্থার চেষ্টা করুন—অন্যথা শুধু বক্তৃতায় কাজ হইবে না।

যাহারা নিজের দেশজাত জিনিস ক্রয় করিয়া মনে করে কাহারো বুঝি একটা মাথা কিনিতেছি—এত বড় স্বার্থান্বেষী যাহারা, তাহারা কখনো বড় একটা কিছু করিতে পারিবে সে বিষয়ে মাঝে মাঝে সন্দিহান হইতে হয়। আমরা সকলের সমবেত স্বার্থকে কোন দিনই অনুকূলদৃষ্টিতে দেখিতে শিখিলাম না।

যে দিন আমরা সেইটি পারিব সেদিন আমাদের পক্ষে স্বায়ত্তশাসন একটা অসম্ভব কিছু বোধ হইবে না। ইহারও পরিচয় আমরা সময়ে সময়ে দিয়াছি কিন্তু বরাবর ধৈর্য্য ধরিয়া লাগিয়া থাকিতে পারি নাই। এইখানেই আমাদের দুর্ব্বলতা। একতা চাই—নাছোড়বান্দা হওয়াও দরকার।

আজকাল য়ুরোপীয় অন্তর্জাতিক বিপ্লবের জন্য বিদেশীয় দ্রব্য আর আদৌ আমদানী হইতেছে না। যাহা এদেশে এখনো মজুত আছে তাহার দর অত্যন্ত অধিক মাত্রায় চড়িয়া গিয়াছে। তথাপি দলে দলে লোক এমন-সকল অনাবশ্যক বিদেশীদ্রব্য বেশী দাম দিয়া কিনিতেছে যাহা স্বদেশে পাওয়া যায় অথচ দামও বেশী নয়। এই স্পৃহাটাকে দমন করিতে হইবে। এখন আমরা বড় একটা বিদেশী জিনিস পাইব না। বাধ্য হইয়া বিদেশী-দ্রব্য-ক্রয়েচ্ছুদিগকেও স্বদেশী জিনিস কিনিতে হইবে। এই সময়ে আমরা যদি স্বদেশী জিনিসে নিজেদের অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে পারি, তবে বিদেশী জিনিস আবার যখন প্রবলবেগে আমদানী হইতে সুরু হইবে, তখন তাহা কেনা আর আবশ্যক বোধ করিব না। আর বিশেষতঃ স্বদেশী শিল্পী ও ব্যবসায়ীরাও যদি এই অবসরে স্বদেশী শিল্পের উন্নতি ও কাটতির জন্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশীয় শিল্প যথেষ্ট উন্নতি ও প্রসারলাভ করিতে পারে। আমাদের দেশের যেখানে যে জিনিস সর্ব্বাপেক্ষা ভালো প্রস্তুত হয়, সেখানকার শিল্পীরা সেই-সকল জিনিসের আদর্শ প্রস্তুত করিয়া পানামার আসন্ন অন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে পাঠাইবার চেষ্টা করুন।

ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি :—

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটী ভারতীয় স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি-ভূমি। যাঁহারা এই দুইটী বিভাগের পরিচালন করিতে পারেন তাঁহারা যথাকালে অপেক্ষাকৃত দুরূহ রাজ্যশাসন কার্য্যও সম্পন্ন করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায়। কিন্তু এই দুইটী বিভাগের সুপরিচালনের জন্য দুইটী বিশেষ গুণের আবশ্যক। একদিকে সদস্যগণকে উদ্যমশীল ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইতে হইবে; অপর দিকে করদাতৃগণকেও স্বাধীনচেতা ও নিজ নিজ প্রাপ্য আদায়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। কিস্তিতে কিস্তিতে দেয় সেস্ প্রদান বা তিন বৎসর অন্তর একবার জমীদারের ইঙ্গিতে সদস্য-নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে ভোট প্রদান করিলেই তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল না। যাহাতে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হয় ও যাহাতে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মিউনিসিপ্যালিটীর অর্থ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে ব্যয়িত না হইয়া দেশ-হিতকর কার্য্যে নিয়োজিত হয়, তাহা না করিলে তাঁহারা কর্ত্তব্য-অবহেলা-দোষে দোষী হইবেন সন্দেহ নাই। আমাদের ধারণা বর্ত্তমানে মিউনিসিপ্যালিটী ও বোর্ড সম্বন্ধে আমরা সদা সর্ব্বদাই যে নানা অভিযোগ শুনিতে পাই তজ্জন্য সদস্যগণ ও ভোটদাতৃগণ তুল্যরূপে দায়ী। ভোটদাতৃগণ যদি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হয়, যদি তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া পাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, যদি তাহারা স্বার্থানুরোধে বা বৃথা ভয়ে ভীত না হইয়া কেবল উপযুক্ত লোককেই ভোট দেয়, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের কার্য্যকলাপের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখে, আমাদের বিশ্বাস তাহা হইলে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ সাধারণের অর্থ লইয়া এরূপ ছক্কাপাঞ্জা খেলিতে সাহসী হইতেন না। কিন্তু আমাদের ভোটদাতৃগণের অধিকাংশই নিতান্ত অজ্ঞলোক। তাহারা তাহাদের ভোটের প্রকৃত মূল্য জানে না। এই ভোট-প্রদানের ক্ষমতা দ্বারা তাহাদিগকে যে কি পরিমাণ শক্তি প্রদান করা হইয়াছে অথবা তাহাদের প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে তাহা-দিগকে যে কতকগুলি অত্যাবশ্যক অধিকার (Rights and privileges) প্রদান করা হইয়াছে ইহা তাহারা আদৌ অবগত নহে। তাহারা অশিক্ষিত বলিয়া যে এই সমস্ত অধিকার পরিচালনে অসমর্থ তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। বরং আমাদের বিশ্বাস যদি তাহাদিগকে সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা ভালরূপ বুঝাইয়া দেওয়া হয় তবে তাহাদের দ্বারা অনেক কাজ হইতে পারে।

স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যদি তাঁহারা দেশের প্রকৃত মঙ্গল ইচ্ছা করেন তবে এখন হইতেই এজন্য সচেষ্ট হউন। কলিকাতায় একটী কেন্দ্র সভা স্থাপিত হউক; জেলায়, মহকুমায় শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হউক। যাহাতে অজ্ঞ করদাতৃগণ স্ব স্ব অধিকার ও ক্ষমতা বুঝিয়া পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে উপযুক্ত বিশ্বাসী প্রতিনিধিকে ভোট দিতে পারে তজ্জন্য সমবেত চেষ্টা করিতে হইবে। ভোটদাতৃগণের ঘরে ঘরে যাইয়া তাহাদের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিতে হইবে, দেখিতে হইবে নির্ব্বাচনব্যাপারে কেহ কোন অন্যায় ক্ষমতার প্রয়োগ না করিতে পারে।—সুরাজ, পাবনা।

ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতিকার :—

নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর সুযোগ্য বংশধর

কুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে গত ২০শে জুন শনিবার দিবা ৪॥ ঘটিকার সময় একটি বিরাট সভা আহূত হইয়াছিল। সভার উদ্দেশ্য ম্যালেরিয়ার মূল উৎপাটন। কুমার বাহাদুরের বয়স অনুমান সতর বৎসর। তাঁহাকে অল্প বয়সে এরূপ লোকহিতকর কার্য্যে ব্রতী দেখিয়া আমরা প্রকৃতই আহ্লাদিত হইয়াছি। যাহাতে আর নূতন মশার উৎপত্তি না হয়, তাহার প্রতিকারকল্পে এবং ম্যালেরিয়া-রোগগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তিগণকে যাহাতে ম্যালেরিয়ার তথাকথিত অব্যর্থ ঔষধ কুইনাইন বিনামূল্যে বিতরিত হয় তজ্জন্য কুমার বাহাদুর ৭৫০ সাড়ে সাত শত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানদাপ্রসাদ সুকুল ও বাবু চন্দ্রনাথ প্রামাণিক এবং শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন পাল প্রভৃতি কতিপয় ভদ্রলোকও উপযুক্ত সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। ডাক্তার বাবু অতুলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের সাধু চেষ্টায় এই সভা আহূত হইয়াছিল। শ্রুত হইলাম গত বৎসর নাটোরে ২০৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং মাত্র ১৪০ জন জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জন্মসংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা এরূপ প্রতিবৎসর বেশী হইতে থাকিলে নাটোর স্বল্পকাল-মধ্যে জনশূন্য হইবে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। ইহা নাটোরবাসীগণের প্রগাঢ় চিন্তার বিষয়।—হিন্দুরঞ্জিকা।

যাঁহাদের অর্থ আছে সামর্থ্য আছে তাঁহাদের এই সাধুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত।

বন্যার আশঙ্কা ঃ—

এবৎসর এ যাবৎ কোথাও বন্যার কথা ভগবানের কৃপায় শুনিতে পাওয়া যায় নাই—তথাপি এখনো সে আশঙ্কার কারণ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। কাঁথীতে বন্যার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে ও এ সম্বন্ধে কাঁথীর 'নীহার' পত্রিকা প্রাণপণে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। বিগত ১৬ই আষাঢ়ের নীহারে এসম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার ফলে অনেক কাজও হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ এসম্বন্ধে যথেষ্ট যত্ন করেন নাই। অগত্যা যাহাদের প্রাণ লইয়া টানাটানি প্রথমে হইবে সেই প্রজাদিগকেই বাঁধ-সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। নীহার বলিতেছেন ঃ—

আমরা বিগত ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ধারাবাহিক গ্রামভেড়ীর কথাপ্রসঙ্গে মাজনামুঠা ও কেওড়ামাল তঃ বিশুয়ান পরগণার ঘাটুয়া মৌজার, গাওমেস পরগণার কাড়ুয়া মৌজার, ভোগরাই পরগণার বেলবনী, মৈতনা, কলাপুঞ্জা, ডেমুরিয়া, চটাপদ্মপুর ও লালপুর মৌজার, এবং মাজনামুঠা পরগণার দক্ষিণ দারুয়া, বাড় চুণফলি, গোপীনাথপুর, বেণীপুর, চন্দনপুর, কন্দর্পপুর, সন্ন্যাসী বাড়, চুনফলী, মুড়াবনিয়া, পোতাপুখুরিয়া, সরিষাবেড়্যা, কুসুমপুর, কাঁড়গাঁ ও ধালবন্দমালীপুর মৌজার বন্যা-বিধ্বস্ত গ্রামভেড়ীগুলির বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে যে যে গ্রামের ভেড়ীর সংস্কার কার্য্য খাসমহাল করিয়া উঠিতে পারেন নাই, এখন সেই সেই মৌজার গ্রামভেড়ীগুলি পরিদর্শন করা, বিশেষ আবশ্যক বোধ হইলে এবং তাহাদের সংস্কার সম্ভবপর হইলে তাহাদের সংস্কার করা এবং সেই সমস্ত ভেড়ীর যেগুলি প্রজারা মেরামত করিয়া লইয়াছে, মেরামতকারী প্রজাগণকে মাটী হিসাব করিয়া তাহাদের মেরামতী খরচা দেওয়া খাসমহালের কর্ত্তব্য। যে সমস্ত প্রজা আপনাপন গ্রামের ভেড়ী আপনাপন ব্যয়ে মেরামত করিয়া লইয়াছে, তাহাদের ভেড়ী মেরামতের ব্যয় খ,সমহাল যদি দেন, তবে যে খাসমহালের কেবল দয়া ও সহানুভূতির পরিচয় দেওয়া হইবে, তাহা নহে; খাসমহালের পরিণামদর্শিতারও পরিচয় দেওয়া হইবে।

নীহারের কথার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না।

শ্রীক্ষীরোদকুমার রায়।

আলোচনা

বাঙ্গালাশব্দ-কোষ

গত আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে শ্রীকালীপদ মৈত্রমহাশয় আমার বাঙ্গালাশব্দ-কোষের কয়েকটি শব্দ সমালোচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার ও নিমিত্তভাগী গ্রন্থকারের সাহায্য করিয়াছেন। আমি সকলের নিকট এইরূপ আলোচনা বারবার প্রার্থনা করিতেছি। দশজনে যাহা সুসাধ্য, একজনে তাহা অসাধ্য কিংবা দুঃসাধ্য। মৈত্রমহাশয়ের অনুগ্রহে কয়েকটি ভুল দেখিতে পাইলাম, এবং কয়েক স্থলে সন্দেহ জন্মিল। বলা বাহুল্য, শব্দারণ্যে প্রবেশ করিয়া সকল শব্দের প্রতি সমান মনোযোগী হইতে পারি নাই; বাঁশ বনে ডোম বাস্তবিক কানা হয়, সমুখে যে বাঁশ দেখে পাকা বিবেচনায় তাহারই প্রতি ধাবিত হয়।

শব্দের ব্যুৎপত্তি নিরূপণে কোথাও কোথাও কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। এক হিসাবে যাবতীয় বস্তুর আদি-নিরূপণ কাল্পনিক বা আনুমানিক। অধিকাংশ স্থলে দুই এক সূত্র ধরিয়া অনুমানে আসিয়াছি। কোন কোন স্থলে সূত্র ক্ষীণ সন্দেহ নাই। অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সমালোচন নিমিত্ত একটা-না-একটা ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। এই কারণে আমি আবার প্রার্থনা করিতেছি যিনি পারেন তিনি আর কিছু না পারুন শব্দের প্রদত্ত ব্যুৎপত্তি ও অর্থে সন্দেহ জন্মাইয়া দিলেও বাঙ্গালা ভাষার হিত সাধন করিবেন। অতএব তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে আমার প্রণীত বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সমালোচনা করুন, আমি আনন্দিত হইব। তাঁহাদিগকে একটা অনুরোধ এই যে আমার প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা প্রথম ভাগের শব্দশিক্ষাধ্যায় ও ব্যাকরণাধ্যায় একবার অন্ততঃ চোখ বুলাইয়া শব্দকোষ সমালোচনা করিবেন।

এখন মৈত্র-মহাশয়-সমালোচিত কয়েকটা শব্দ সম্বন্ধে দুই এক কথা জানাইতেছি। অথব্ব বা অথর্ব্ব—এই শব্দ নিশ্চয় সং অথর্ব্বন্ হইতে আসিয়াছে। কিন্তু সং অথর্ব্বন্—চতুর্থবেদ, অথর্ব্বা—বেদের মুনিবিশেষ; বাং অথব্ব—স্থবির। এক হইতে অন্যের উদ্ভবে সন্দেহ হইতেছে। আমার ব্যাখ্যার দোষে সন্দেহ হইতেছে। উইলসন সাহেব-কৃত সংস্কৃত-ইংরেজী কোষে দেখিতেছি অথর্ব্বন্ শব্দের এক প্রাচীন ব্যুৎপত্তি ছিল,—অ—নিষেধে, থর্ব্ব ধাতু গমনে। বৈদিক অথর্ব্বা শব্দের অর্থ যে নড়িতে-চড়িতে পারে না। এই

প্রাচীন ব্যুৎপত্তি বিলসন সাহেব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ব্রিলিয়ম্‌স্ সাহেবও নিজরচিত কোষে অথর্ব্বা শব্দের অর্থে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি বাঙ্গালা ও ওড়িয়ায় চলিত অথর্ব্ব শব্দের অর্থ প্রাচীন ব্যুৎপত্তির অনুযায়ী। নড়ন-চড়নে অসমর্থ জরাজীর্ণকে আমরা অথর্ব বলি। সং অথর্ব্বা কিংবা অথর্ব্বা শব্দের এই প্রাচীন অর্থ বাঙ্গালায় চলিত আছে। এমন শব্দ আরও আছে, যাহা বৈদিক অর্থে বাঙ্গালায় চলিতেছে, বেদের পরবর্ত্তী কালের অর্থে চলিতেছে না। যেমন বৈদিক উখা যাহা হইতে বাং আখা—উনান। এই উখা শব্দ অমরকোষে অর্থ পাইয়াছে স্থালী বা হাঁড়ী।

সং অট্ট শব্দ হইতে আড্ডা শব্দ আসিতে পারে না, বলিতে পারি না। সং অট্ট শব্দের অনেক অর্থ আছে। হেমচন্দ্র দুই অর্থ দিয়াছেন। এক অর্থ, অট্টালক, অপর অর্থ হট্ট (হাট)। এইরূপ নানার্থ হইতে আড্ডা অর্থ আসিতে পারে। মনে হইতেছে তুলসী-দাসের রামায়ণে অটারি শব্দ আছে। সেখানে অর্থ ঠিক অট্টালিকা নহে।

আড়ে-হাত এবং আড়ে-হাতে লাগা এক না হইতে পারে। আড়ে-হাতে লাগা যেন গোড়ে (পায়ে) ও হাতে—দুই দিয়াই কাজ করা।

আর্দাস—ফাঃ অর্জ্জদাস্ত, ছয়লাপ—ফাঃ সয়লাব, তাঁইস—আঃ তোয়েশ, তুৎ-বলাঙ্গা—ফাঃ তুখম্-এ-বালিঙ্গা। মৈত্রমহাশয় ঠিক ধরিয়াছেন। আমার এক মৌলবি বলিলেন, আঃ আসর (আয়ন সোয়াদ রে) অর্থে সময়। আমি মনে করি সং অবসর—ক্ষণ হইতে। ক্ষণ—সময়, উৎসব। সং অবসর শব্দের পরিবর্ত্তে আমরা এখন উপলক্ষ্য শব্দ বলিতেছি। পূজা উপলক্ষ্যে গান হইবে—পূজাকে আশ্রয় করিয়া। পূজা অবসরে গান হইবে (অবসর occasion)—পূজার আসরে। বোধ হয় এইরূপে আসর শব্দের অর্থবিস্তর ঘটিয়াছে।

আলেমান—ফরাসী Allemand—German, এবং ওলন্দাজ—ফরাসী Hollandais—Dutchman। ইহাই ঠিক, কোষে ভুল হইয়াছে।

ঐছন—প্রাচীন বাঙ্গালায় এই শব্দ দুই অর্থে পাওয়া যায়। (১) সং এতস্মিন্ (সময়ে),—যথা ঐসন আয়লি তপনক গেহ (বিদ্যাপতি) ; (২) এতৎসদৃশ হিং ঐসা,—যথা, ঐসন রস নাহ পাওব আরা (বিদ্যাপতি)। এইক্ষণ হইতে ঐছন মনে না করিয়া সং এতস্মিন্ হইতে মনে করা সঙ্গত। বোধ হয় এই শব্দ হইতেই এ সদৃশ অর্থ আসিয়াছে। তুঃ প্রাচীন ওড়িয়া কেসনে—কি প্রকারে। ঐসন—এমন, কৈসন—কেমন, জৈসন—যেমন, বিদ্যা-পতিতে আছে। জ্ঞানদাসে, এমন কি দেড় শত বৎসরের পূর্ব্বের মাণিক গাঙ্গুলার ধর্ম্মমঙ্গলে এইক্ষণ অর্থে ঐছন আছে। আমার কোষে দুই ঐছন এক হইয়া পড়িয়াছে।

কাশীয়াল—যে কাশীবাসী, কাশী সম্বন্ধীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাই মুখ্য অর্থ। অপভ্রংশে কেশেল গাল-বিশেষ হইয়াছে।

কাষিস—বাঙ্গালায় চলিত নাই। কেন কোষে গিয়াছে, মনে হইতেছে না। অবশ্য কোষিষ্—চেষ্টা। (কাষিস—আকর্ষণ)।

কোর্ম্মা—বিনা হলুদে রাঁধা ঝোলশূন্য মাংস। এই অর্থ ফালোন সাহেবের অভিধানে আছে। দুই মৌলবিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহ ভুনী মাংস বলিলেন না। বলা বাহুল্য, মুসলমানী রান্নায় মাংসে হলুদ পড়ে না। আমার কোষে অর্থের এক অংশ গিয়াছে, বিশেষ অংশ বাদ পড়িয়াছে।

খোকা—সং খক্ ধাতু হাস্তে। বাং-তে খক্‌খক কাশি বটে।

গজল—গজব হওয়া সম্ভব। গজব—আশ্চর্য্য।

গন্না-কাটা—গ্রহণ-খণ্ডিত অর্থই ঠিক। তবে স্মরণ হইতেছে স্কন্ধ-কাটা অর্থেও শুনিয়াছি।

চাকর-বাকর—এখানে বাকর শব্দ ভাত-টাত শব্দের তুল্য নহে। আমার ব্যাকরণে ইত্যাদি অর্থে দোসর শব্দ দেখুন।

ছিচকা-চোর—ছোট ছোট জিনিষের চোর। কিন্তু ব্যুৎপত্তিতে সিঁদকাটি আসিতেছে।

ঝরকা—সং অধ্বলক্ষ্য অপেক্ষা এখন মনে হইতেছে সং জালিকা, জালক হইতে আসিয়াছে।

ঝিনুক—ওড়িয়াতে শামুকা-ছামুকা। সং শম্বুক আসিতেছে।

টেঁস-টেঁস—রস-রস হইতে। সময়বিশেষে রসের কথায় ক্রোধ জন্মে।

ট্রাম—ই tram। ইংরেজী অভিধান দেখুন।

ডামা-ডোল—স্ফীত অর্থে রাঢ়ে শুনিয়াছি। এখন দেখিতেছি নদীয়াতে অন্য অর্থে প্রয়োগ হয়। এই অর্থ যেন দামামা-ঢোল বাদ্য হইতে। স্থান ভেদে শব্দের যে অর্থান্তর হয়, তাহার বিশেষ দৃষ্টান্ত মৈত্র মহাশয় দিয়াছেন। পগার শব্দে সীমা আলি বুঝায় ; নদীয়ায় বুঝায় আলির পাশের লম্বা খানা। এক অর্থ হইতে অন্য অর্থে আসা অসম্ভব নয়।

ডোকরা—এ শব্দ আমার অজ্ঞাত। ডেকরা শব্দে প্রগল্‌ভ সন্দেহ নাই। বুড়া শব্দ উচ্চারণে বুড়ো (রাঢ়ে)—ও ; এই হেতু কি ডো-করা নহে ?

মৈত্রমহাশয় অন্য কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে আপত্তি তুলিয়াছেন। সেগুলির বিচার সম্প্রতি অনাবশ্যক। আশা করি, তিনি অন্যান্য শব্দও বিচার করিবেন। সম্প্রতি কোষের তৃতীয় খণ্ড (য শেষ) প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার ও চারুবাবুর সমালোচনা আকাঙ্ক্ষা করি। ইতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

পুস্তক-পরীক্ষা

ঊর্ম্মিকা—শ্রীরমণীমোহন ঘোষ প্রণীত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত ও তথা হইতে প্রকাশিত। কাগজের মলাট বারো আনা, বাঁধাই এক টাকা।

এখানি কবিতাপুস্তক। ইহাতে (১) ঊর্ম্মিকা, (২) অঞ্জলি, (৩) বরণ, (৪) স্মরণ, (৬) প্রকৃতি (৭) কবিকথা বিভাগে বহু খণ্ড কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলি সুখপাঠ্য।

মন্দিরে—শ্রীমোহিনীরঞ্জন সেন প্রণীত। চট্টগ্রাম, ক্যাণ্টনমেণ্ট রোড হইতে শ্রীমতিলাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা।

ইহাতে অনেকগুলি খণ্ড কবিতা আছে। কবিতাগুলির ছন্দে, ভাষায়, প্রকাশে কোনো বিশেষত্ব নাই ; সকল-কবিতারই উপজীব্য গম্ভীর দার্শনিকতত্ত্ব ; সেই তত্ত্ব ছন্দে গাঁথিয়া সরস ভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি গ্রন্থকার দেখাইতে পারিয়াছেন, এবং রচনা প্রবহমান হইয়াছে, ইহাই গ্রন্থকারের প্রশংসার বিষয়।

পুষ্পবাণবিলাসম্—মহাকবি-কালিদাস-বিরচিতম্, শ্রীবিধুভূষণ-সরকার-কৃত-পদ্যানুবাদ-সমেতম্। শ্রীগণপতি-সরকারেণ প্রকাশিতম্। প্রাপ্তিস্থান সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী। মূল্য চার আনা।

বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে থাকে ; এবং একই কালের ক্রিয়ারূপ একই প্রকার হয়। অতএব বাংলায় কবিতা লেখা খুব সহজ—করিছে, ধরিছে, রহিছে, কহিছে ইত্যাদি প্রকার মিলের অভাব কি ? গ্রন্থকার কালিদাসের কবিতার অনুবাদ এইরূপ সহজ উপায়েই সারিয়াছেন। গদ্য বেচারা কি অপরাধ করিল ?

তাপসকাহিনী—শ্রীমোজাম্মেল হক প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ২৯ ক্যানিং ষ্ট্রীট হইতে নাথ এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

এই গ্রন্থে আউলিয়া বা মুসলমান মহর্ষিগণের অলৌকিক জীবন সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থে মহাপুরুষদের জীবন-কাহিনীর প্রসঙ্গে এমন সমস্ত উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে যাহা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকের নিকট সমাদৃত হইবার যোগ্য। এই গ্রন্থের ভাষা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল—একটু অধিক সংস্কৃত-ঘেঁষা। ইহাতে সাতজন তাপসের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

হাল ফ্যাসান—শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ছয় আনা।

এখানি "কৌতুক নাটক"। গ্রন্থকার বড় বড় অক্ষরে নামের শেষে বি-এল উপাধি জুড়িয়া দেখাইয়াছেন যে তিনি বিদ্যা শিক্ষা সহবতের গর্ব্ব রাখেন। তিনি নাটক লিখিয়া কৌতুক করিয়াছেন কাহাদের লইয়া ? আমরা যাহাদিগকে মা বলি, দিদি বলি, কন্যা বলি, সহধর্ম্মিণী পত্নী বলি, অথচ যাহাদিগকে জগৎ সংসার জ্ঞান শিক্ষা যুক্তি বিচার আলোক বাতাস স্বাধীনতা হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে দূরে বাঁচাইয়া রাখি, সেই নারীজাতিকে লইয়া। কেন ? তাঁহাদের অপরাধ ? তাঁহাদের জনকয়েক মাত্র নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। অমনি পরম ঔদরিক পুরুষ মহলে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে—খোঁজ্ খোঁজ্ পাচক বাবর্চ্চি। শেষ-কালে ঠিক হইল মেয়েদের বিলাসে থাকিতে দেওয়া নয় : তাহারা রান্নাঘরের অন্ধকারে ধোঁয়ায় মরুক, বিলাস সম্ভোগ করিবার ভার লইবেন মহা-পুরুষেরা। বিলাসের জন্য যে-সমস্ত রমণী গৃহকর্ম্ম ত্যাগ করেন তাঁহারা নিন্দনীয়া নিঃসন্দেহ ; কিন্তু রন্ধনকার্য্যই তাঁহাদের কায়েমি পেশা ইহা কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি মনে করিতে পারেন, ইহাই আশ্চর্য্য ; গ্রন্থের দৃশ্যসংস্থান কদর্য্য স্থানে ; কথা-বার্ত্তা গান সমস্ত কদর্য্য। নাটকত্বেরও নিতান্ত অভাব। গ্রন্থকারের উচিত এরূপ পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়া নিজের সুরুচি, শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া।

অঞ্জলি—শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী-প্রণীত, বুবড়ি বিজয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে কুমার শ্রীবিপ্রনারায়ণ বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য অনুল্লিখিত।

ইহাতে কতকগুলি খণ্ড কবিতা আছে। লেখকের প্রথম রচনা। সুতরাং ছন্দে মিলে ও প্রকাশে ত্রুটি আছে যথেষ্ট। কিন্তু কবিতাগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় সাধনা করিলে চলনসই কবিতা রচনা করা তাঁহার পক্ষে দুর্ঘট হইবে না।

গুলবাহার—শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম-এ লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশক সাধনা লাইব্রেরী, উয়ারী, ঢাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য তিন আনা মাত্র।

এই ক্ষুদ্র নাটিকা খানিতে বঙ্গের শেষ নবাব মীর কাশিমের পরাজয়ে তাঁহার অসহায় পুত্রকন্যার সহিত বিচ্ছেদ ও শিশুদের স্নেহমমতা অকালমৃত্যু প্রভৃতির করুণ কাহিনী পদ্যে ও গানে বর্ণিত হইয়াছে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের উপযুক্ত।

বিবেকগাথা—হিমালয়বাসী পরমহংস সোহং স্বামী প্রণীত। শ্রীনগেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, বার্ত্তাবহ প্রেস, কলিকাতা। মূল্য চার আনা।

এই পুস্তকে এক একটি বৈরাগ্য-উদ্বোধক তত্ত্বকথা এক একটি সনেটের সম্পুটে ভরিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার কোনো তত্ত্বই হিন্দুর কাছে নূতন নয়, সকলেরই জানা কথা—যথা মানবদেহ ও মানবের রূপ যৌবন নশ্বর ; নিষ্কাম কর্ম্ম করা উচিত ; সময় গেলে আর ফিরে না ; ইত্যাদি। এই-সমস্ত কথা মামুলি উপমায় ও সাধারণ বালকপাঠ্য রকমের ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে।

নীরব সাধনা—স্বর্গগতা সুবোধবালা দেবী প্রণীত, আর্ট প্রেসে মুদ্রিত। সুবোধবালা দেবীর দুইখানি চিত্র সম্বলিত। মূল্যের উল্লেখ নাই।

প্রকাশক কে বুঝিতে পারা গেল না। প্রকাশক লিখিয়া জানাইয়াছেন যে এই পুস্তকের পদ্যগুলি সুবোধবালার বিবাহের পূর্ব্বেকার রচনা। শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী ভূমিকায় লেখিকার পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থে অনেকগুলি পদ্য আছে। সকল পদ্যেই লেখিকার শুদ্ধ পবিত্র ভগবদ্‌ভক্ত অন্তরের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

গীতা-বিন্দু—শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী বিরচিত। ৫ নং রামতনু বসুর লেন হইতে শ্রীনলিনীরঞ্জন রায় ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্যের উল্লেখ নাই।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন "মূল গীতার সঙ্গে, প্রত্যেক শ্লোকের ছত্রসংখ্যার সামঞ্জস্য রাখিয়া বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে। একটি ছত্রও অতিরিক্ত প্রদত্ত হয় নাই।......মূলের সহিত মিলাইবার সুবিধা হইবে এই বিবেচনায় বাম পৃষ্ঠায় মূল (লাল কালিতে) ও দক্ষিণ পৃষ্ঠায় তাহারই অনুবাদ (নীল কালিতে) ধারাবাহিকরূপে দেওয়া গেল।......এই গ্রন্থে যে কয়েকখানি চিত্র প্রদত্ত হইল তাহা আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্রয়োদশবর্ষীয় শ্রীমান্ পরিমল গোস্বামীর পরিকল্পিত।"

অনুবাদ সরস ও সহজ হয় নাই। ছন্দে ও ভাষায় লালিত্যের অভাব আছে। প্রথম চিত্রখানি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের "ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়" চিত্রের নকল। অন্যান্য ছবিগুলি চলনসই। তেরো বৎসরের বালকের পক্ষে চিত্রগুলি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। মলাটের উপর একপাল গরু, গীতার ভাবটা মোটেই প্রকাশ করিতেছে না ; বেদান্ত গোধেনু, গীতা দুগ্ধ ইত্যাদি উপমা খুব লাগসই হইলেও বেশ সুন্দর নহে—সুতরাং চিত্রের বিষয় হইলে হাস্যরসেরই কারণ হয়।

মুদ্রারাক্ষস।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'অন্তরে মোর বৈরাগী গায় তাইরে নাইরে
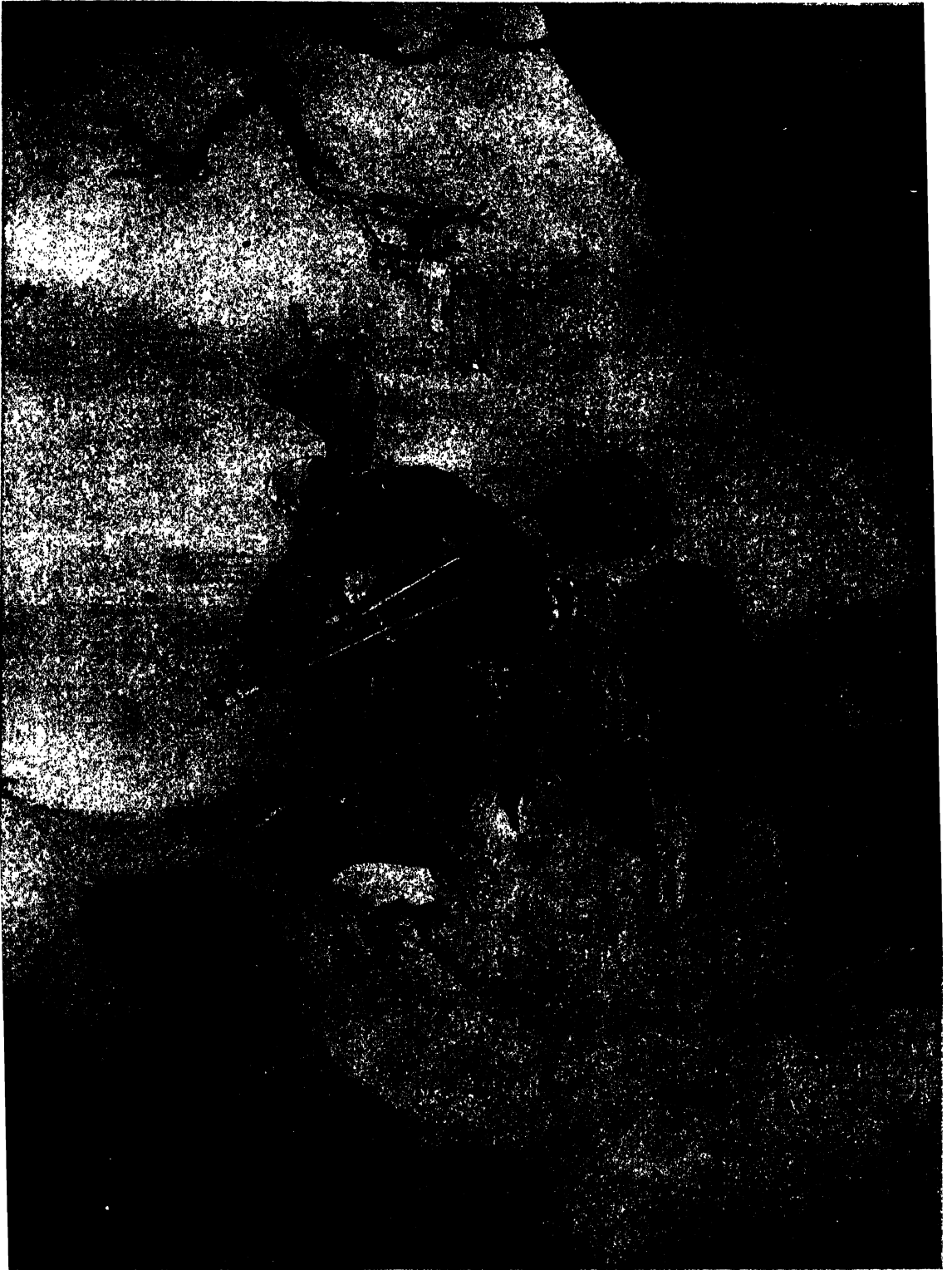
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

১৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩২১

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ইতিহাস নৈরাশ্যের ঔষধ। বর্ত্তমানে কান জাতি যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্তই থাকুক না, তাহাদের ত দুর্দ্দশা হইতে আবার উন্নতি করিয়াছে, এরূপ জাতির ষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়। এইজন্য ইতিহাস জাতীয় বসাদ ও নৈরাশ্যের ঔষধ। প্রসিদ্ধ লেখক জর্জ বার্নাড শ লখিতেছেন,

ত্যকথা এই যে সবজাতিই কোন-না-কোন সময়ে বিজিত হইছে :......ভারতের ইতিহাসে এমন কিছুই নাই, যাহার সমতুল্য াপার ইউরোপের ইতিহাস-সকলে না পাওয়া যায়।......যদি রতবর্ষ আত্মশাসনের অনুপযুক্ত হয় তাহা হইলে পৃথিবীর সব াতিই আত্মশাসনের অনুপযুক্ত ; কারণ ইতিহাসের সাক্ষ্য সর্ব্বত্র ক।"*

নৈরাশ্য-ও-অবসাদব্যাধিগ্রস্ত ভারতবাসীর খুব বেশী রিয়া ইতিহাস পড়া উচিত। দুঃখের বিষয় দেশীয় ষাগুলির মধ্যে সমধিক উন্নত বাঙ্গলা ভাষাতেও থিবীর প্রাচীন ও আধুনিক সমুদয় প্রধান প্রধান দেশের তিহাস নাই। কোন লোকহিতব্রত ধনী ব্যক্তি উপক্ত লেখকগণের দ্বারা এই কাজটি করাইতে পারেন না কি? যোগ্য লেখক নির্ব্বাচনের ভার কিন্তু স্বাধীনচিত্ত ইতিহাসজ্ঞদিগের উপর দিতে হইবে।

জাতীয় চরিত্রের পরিবর্ত্তন। আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে (২৫১ পৃঃ), জাতীয় চরিত্রের পরিবর্ত্তন সম্ভব কি না, তাহার আলোচনা করিয়া তাহার একটি অনুকূল দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম। আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সুলতান আবদুল মজীদ রাষ্ট্রীয় অনেক বিষয়ে উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া এক আদেশপত্র জারী করেন। তাহার এক অংশে মুসলমান অমুসলমান সমুদয় প্রজার সাম্য ঘোষিত হয়। কিন্তু অমুসলমান প্রজারা এরূপ দাসত্বের অবস্থায় অবনমিত হইয়াছিল, যে, তাহারা যে মুসলমানদের সমান হইবে তাহা তাহাদের পক্ষে চিন্তার অতীত হইয়া গিয়াছিল। তাহারা এরূপ অধঃপাতিত ও অত্যাচরিত হইয়াছিল যে মুখ তুলিয়া একজন তুর্কের মুখের দিকে তাকাইতেও তাহাদের সাহস হইত না! * অথচ সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই জানেন যে তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব প্রজা সার্ভিয়ার লোকেরা ক্ষুদ্র জাতি হইলেও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর

* "The truth is, all nations have been conquered : . .I know nothing in the history of India that cannot be paralleled from the histories of Europe........ India is incapable of self-government, all nations e incapable of it ; for the evidence of history is the me everywhere." G. B. Shaw in *The Commonweal.*

* The non-Mussulman subjects of the sultan had indeed early been reduced to such a condition of servitude that the idea of their being placed on a footing of equality with their Mussulman rulers seemed unthinkable......they had been so degraded and oppressed that they dared not look a Turk in the face." *Encyclopaedia Britannica*, Vol. XXVII, p. 458.

মত বড় সাম্রাজ্যকে কিরূপ সাহসের সহিত বিতাড়িত ও পরাজিত করিতেছে। তুর্কের ভূতপূর্ব্ব প্রজা বুলগেরীয়দের সাহসও দৃষ্টান্তস্থল।

যুদ্ধ। অন্তঃপুর হইতে রাস্তা-ঘাট হাট-বাজার সর্ব্বত্র যুদ্ধের আলোচনা হইতেছে। সকলেই যুদ্ধের সংবাদের জন্য ব্যস্ত। সংবাদ অল্প অল্প আসিতেছে। তাহার উপর মন্তব্য মুখে মুখে অতি বিশাল আকার ধারণ করিতেছে। গুজব এবং হুজুকের ত অন্তই নাই। আমরা অনেকে এরূপ গাম্ভীর্য্যের সহিত যুদ্ধের বিষয় আলোচনা করিতেছি যেন সারাজীবন সেনাপতিত্ব করিয়াই কাটাইয়াছি।

যুদ্ধের সংবাদ দেওয়া, সংবাদের উপর ক্রমান্বয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যাওয়া, কিম্বা গুজব লিপিবদ্ধ করা মাসিকপত্রের কাজ নয়। সে কাজ আমরা করিব না। তবে একটা কথা বলা হয় ত অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া বিবেচিত নাও হইতে পারে। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় যাহাই ঘটুক, ক্রমশঃ যে জার্ম্মেনীকে হটিয়া গিয়া শেষে পরাস্ত হইতে হইবে, এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে।

জার্ম্মেনীতে কন্স্‌ক্রিপ্সান্‌ আইন আছে। তদনুসারে সাবালগ পুরুষদিগকে তিনবৎসর সেনাদলে কাজ করিতে হয়। এইজন্য জার্ম্মেনী প্রথমেই ৫০ লক্ষ সৈন্য লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছে। জার্ম্মেন সম্রাট্‌ ভিতরে ভিতরে অনেকদিন হইতে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং একটা ছুতা খুঁজিতেছিলেন। এই হেতু প্রথমে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা জার্ম্মেনী যুদ্ধে বেশী জিতিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের সৈন্যসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিবে, ভারতীয় সৈন্যেরা শীঘ্রই রণস্থলে পৌঁছিবে, এবং ফ্রান্স্‌ও ক্রমেই যুদ্ধের জন্য অধিকতর প্রস্তুত হইতেছে। রুশিয়া অষ্ট্রিয়াকে একেবারে কাবু করিয়া জার্ম্মেনী আক্রমণে সম্পূর্ণ মন দিতে পারিবে। ইতিমধ্যেই জার্ম্মেন সাম্রাজ্যের প্রুশিয়া প্রদেশে রুশিয়া কতকদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে জার্ম্মেনীকে ক্রমেই তাহার শত্রুপক্ষের অধিকতর সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে।

জার্ম্মেনীর অধিকাংশ সৈন্য বাধ্য হইয়া, কন্স্‌ক্রিপ্সান্‌ আইন অনুসারে, সৈন্য হইয়াছে। যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক সৈন্য হয়, যেমন ইংরেজসৈন্য, তাহারা কন্স্‌ক্রিপ্সানের সৈন্য অপেক্ষা, অধিক উৎসাহী ও দক্ষ যোদ্ধা হইবার সম্ভাবনা।

যুদ্ধ করিতে হইলে আজকাল কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। বেশী দিন যদি যুদ্ধ চলে, তাহা হইলে জার্ম্মেনীর পুঁজি শেষ হইয়া আসিবে। অথচ ঐদেশে এখন নূতন করিয়া ধনের আমদানী হইতেছে না। কারণ যুদ্ধে সব দেশেরই বাণিজ্যব্যবসা খুব কমিয়া গিয়াছে। জার্ম্মেনীরও কমিয়াছে; এখন যদি বা কিছু আছে, পরে তাহাও আর থাকিবে না। বাণিজ্যজাহাজ অবাধে সমুদ্র দিয়া যাতায়াত করিতে না পারিলে কোন দেশেরই বাণিজ্য ভাল করিয়া চলিতে পারে না। এখন ইংরেজ ও ফরাশী রণতরী-সকলের শত্রুতায় জার্ম্মেন বাণিজ্যজাহাজের পক্ষে সমুদ্রে যাতায়াত অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ইংরেজেরা জার্ম্মেনদের অনেক বাণিজ্যজাহাজ ধরিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। ক্রমে এরূপ দাঁড়াইবে যে একখানি জার্ম্মেন জাহাজও আর বন্দর ছাড়িয়া সমুদ্রে বাহির হইতে পারিবে না। কারণ জার্ম্মেনী অনেক রণতরী নির্ম্মাণ করিয়া ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও এখনও উভয়দেশে এ বিষয়ে বিস্তর প্রভেদ আছে। এখনও ইংলণ্ডের রণতরীসকল আর যে-কোন দুই দেশের সম্মিলিত রণতরীসমূহের সমান। ইংলণ্ড এ বিষয়ে প্রথমস্থানীয়, জার্ম্মেনী দ্বিতীয় স্থানীয় এবং ফ্রান্স তৃতীয় স্থানীয়। নীচে যে তালিকা দেওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে যদি ফ্রান্স এবং জার্ম্মেনী একদিকে হইত তাহা হইলেও তাহারা ইংলণ্ড অপেক্ষা সমুদ্রে বলশালী হইত না; এখন ত ফ্রান্স ও ইংলণ্ড একদিকে, সুতরাং জার্ম্মেনীর সমুদ্রে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

কিরূপ জাহাজ	ইংলণ্ড	জার্ম্মেনী	ফ্রান্স
যুদ্ধ জাহাজ			
১ম শ্রেণী (ড্রেড্‌নট্‌)	৩২	১৯	১২
২য় শ্রেণী	১০	০	৯
৩য় শ্রেণী	৩০	২০	১১

কিরূপ জাহাজ	ইংলণ্ড	জার্মেনী	ফান্স
বর্ম্মাচ্ছাদিত ক্রুজার			
যুদ্ধ ক্রুজার	৯	৭	০
অন্য ক্রুজার	৩৪	৯	১৮
আধুনিক ক্রুজার	৫০	২৭	৩
ডিষ্ট্রয়ার্	১৬২	১১৬	৭৪
টর্পিডো বোট্	৩৬	০	৯৫
সব্মেরীন্	৯১	৪০	৯৪
খরচ (নিযুত পাউণ্ড)	৪৬.৩	২৩.৩	২০.৬
জাহাজীসৈন্য (শান্তির সময়)	১৪৬০০০	৭২ ৮৮৯	৬৩,০০০
জাহাজীসৈন্য (রিজার্ভ্)	৬২,৯০০	৮০,০০০	৭০,০০০

সমুদ্রে ইংলণ্ডের প্রাধান্যহেতু শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক জার্মেনীর বাণিজ্য বন্ধ হইবে। সুতরাং অর্থাগমও বন্ধ হইবে। তখন যুদ্ধ করিবার মত অর্থ জার্মেনী কোথায় পাইবে? অপর দিকে, ইতিমধ্যে জার্মেনীর বাণিজ্য তটা কমিয়াছে, ইংলণ্ডের বাণিজ্য ততটা কমে নাই। এখনও ফরমাইস্ অনুসারে ইংলণ্ড হইতে জিনিষপত্র কছু কিছু আসিতেছে; কেবল বিপদাশঙ্কা বেশী বলিয়া াহাজভাড়া ও বীমার খরচ বেশী লাগিতেছে। ক্রমে এই াপদ কমিয়া গেলে ইংলণ্ডের বাণিজ্য পূর্ব্ববৎ হইবে, সুবতঃ, জার্মেনীর প্রতিযোগিতা না থাকায়, কিছু াড়িবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জার্মেনী যুদ্ধের ারবহন করিতে ক্রমেই অসমর্থ হইয়া পড়িবে, কিন্তু লণ্ডের সেরূপ দশা ঘটিবে না; সুতরাং শেষে জার্মেনীরই রাজয় হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

যুদ্ধের বৈধতা। আমরা যুদ্ধের হুজুক লইয়া াছি। বাণিজ্যব্যবসার কিছু অসুবিধা হইতেছে, নিষপত্র মহার্ঘ হওয়ায় সংসারের খরচ চালাইতে কষ্ট াধ হইতেছে; কিন্তু আমাদের ইহার বেশী কষ্ট কিছু তেছে না। কিন্তু কেবল যুদ্ধের হুজুক লইয়া না কিয়া, যুদ্ধ জিনিষটা কি তাহা একবার ভাবা উচিত। দার হাজার লোক মরিতেছে, হাজার হাজার লোক হ বা সঙ্গীনে বিদ্ধ, কেহ বা গোলায় ছিন্ন ভিন্ন দেহ য়া, ভীষণরূপে আহত হইয়া যন্ত্রণা পাইতেছে, দার হাজার নারী বিধবা হইতেছে, হাজার হাজার গা পুত্রহারা হইতেছেন, হাজার হাজার বালক-লকা অনাথ হইতেছে, হাজার হাজার স্ত্রীলোকের ার পাশবিক অত্যাচার হইতেছে। যে-সব দেশে যুদ্ধ হইতেছে, তথাকার শস্যক্ষেত্র-সকল বিধ্বস্ত হইতেছে, ঘরবাড়ী ভস্মীভূত ও ধূলিসাৎ হইতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক নিরাশ্রয় হইয়া অনাহারে অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছে।

যাহারা রাজ্যবিস্তার করিবার জন্য, বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য, যোদ্ধা বলিয়া যশ লাভ করিবার জন্য, অন্যজাতির দেশ আক্রমণ করে, তাহারা অতি দুরাত্মা। তাহাদের পরাজয় কামনা সহজেই মনে আসে। জার্মেনী এইসব দোষে দোষী। অতএব জার্মেনীর পরাজয় হইলে ন্যায়ের পক্ষে যাঁহারা তাঁহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা বৈধ। ফ্রান্স ও বেল্জিয়মের যুদ্ধ করা ভিন্ন উপায় ছিল না। ফ্রান্স ও বেল্জিয়মকে কেহ দোষ দিতে পারে না। ক্ষুদ্র বা অল্পবল কোন জাতির উপর চড়াও করিয়া কেহ তাহাদের দেশ আক্রমণ করিলে, তাহাদের স্বাধীনতা-রক্ষা কার্য্যে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ড বেলজিয়মের এইরূপ সাহায্য করায় ইংলণ্ডের যুদ্ধকেও ন্যায়যুদ্ধ বলা যাইতে পারে। অবশ্য ইহাতে ইংলণ্ডের স্বার্থও আছে। কিন্তু তাহা অধর্ম্মমূলক স্বার্থ নহে। এখানে মনে রাখা উচিত যে ইটালী যখন অন্যায় করিয়া তুরস্কের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, তখন কেহই তুরস্কের সাহায্য করে নাই। এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্ব্বল দেশ বা জাতিকে সাহায্য করা যে কর্ত্তব্য, তাহা এপর্য্যন্ত ইউরোপের কোন জাতি কার্য্যতঃ স্বীকার করে নাই। কিন্তু একটা সুনিয়ম, সর্ব্বত্র প্রতিপালিত না হইলেও, যদি কোথাও প্রতিপালিত হয়, তাহাও ভাল। কারণ, তাহা হইলে উহা ক্রমশঃ সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইবে, এইরূপ একটা আশা থাকে। যখন গ্রীস্ স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করিয়াছিল, যখন ইটালী স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই সেই সময়ে ইংলণ্ডের অনেক লোক গ্রীস্ ও ইটালীর সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইয়াছিল এবং তাহাদের সাহায্য করিয়াছিল। ইহা হইতেও কোন কোন অবস্থায় যুদ্ধের বৈধতা সম্বন্ধে সভ্য লোকদের মত বুঝা যাইতেছে।

কিন্তু যে কারণেই যুদ্ধ হউক, উহাতে রক্তপাত ও পৈশাচিক ব্যাপার সমভাবেই থাকে। অতএব, পৃথি-

বীতে যাহাতে, যুদ্ধ না হয়, তাহার উপায় করিবার নিমিত্ত অনেক মনীষী চেষ্টা করিতেছেন। প্রত্যেক দেশেই, মানুষে মানুষে ঝগড়া বিবাদ হইলে, যেমন তাহার মীমাংসার জন্য আইন আদালত আছে, কেহ অপরাধ করিলে যেমন বিচার করিয়া তাহার দণ্ড দিবার ব্যবস্থা আছে, তেমনি দেশে দেশে বিবাদ বাধিলে তাহা মিটাইবার জন্য, একদেশ অন্যদেশের উপর অত্যাচার করিলে তাহার প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত যাহাতে অন্তর্জাতিক আইনআদালত থাকে, তাহার চেষ্টা অনেকদিন হইতে হইতেছে। হেগ সহরে ১৮৯৯ ও ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে, যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য বা উহার অনিষ্টের হ্রাস করিবার জন্য, অন্তর্জাতিক পরামর্শসমিতি বসে। উহাতে জাতিতে জাতিতে বিবাদ সালিসী দ্বারা মীমাংসা করিবার সপক্ষে, স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধের নিয়ম নির্দ্ধারণ ও বিধিবদ্ধকরণ এবং তৎসমুদয় অবশ্যপালনীয় বলিয়া ধার্য্য করিবার সপক্ষে, এবং অস্ত্রশস্ত্র, বন্দী, লুট, প্রভৃতি সম্বন্ধে, অনেক প্রস্তাব ধার্য্য হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে প্রায় ৫০টি অন্তর্জাতিক আদালতে ইংলণ্ড বাদীরূপে বা অন্যতম বিচারকরূপে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রায় ২০০ অন্তর্জাতিক মকদ্দমা এইরূপ আদালতে বিনাযুদ্ধে বিচারিত হইয়া নিষ্পত্তি হইয়াছে। ইহা হইতে আশা হয় যে কালে, অন্ততঃ সভ্যলোকদের মধ্যে, যুদ্ধ সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হইয়া যাইবে।

সুইডেনের রাসায়নিক নোবেল উইল করিয়া যে টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ও পৃথিবীতে শান্তিরক্ষা বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম প্রত্যেক কর্ম্মীকে প্রায় একলক্ষ বিশহাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইতেছে। তদ্ভিন্ন ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত এণ্ড্রু কার্নেগী পৃথিবী হইতে যুদ্ধ উঠাইয়া দিবার জন্য তিনকোটির উপর টাকা দান করিয়াছেন।

এরূপ আশা করা দুরাশা নয় যে ভবিষ্যতে কোন জাতিকে স্বাধীন হইবার জন্যও যুদ্ধ করিতে হইবে না। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নরওয়ে বিনাযুদ্ধে স্বাধীন হইয়াছে। খুব সম্ভব, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ বিনাযুদ্ধে স্বাধীন হইবে।

যুদ্ধের একটি স্থায়ী কারণ। প্রাচীনকাল হইতে যে-সব কারণে যুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তাহা ইতিহাসপাঠকেরা জানেন। আধুনিক সময়ে তাহার উপর আর একটি বাড়িয়াছে। তাহা দ্রব্যনির্ম্মাণে ও দ্রব্যসরবরাহে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার প্রয়োগ। ষ্টীমএঞ্জিন বা বাষ্পীয় কল দ্বারা নানাবিধ দ্রব্য নির্ম্মাণের কল চালিত হওয়ায়, ঐ-সব কলে অতি অল্পসংখ্যক মানুষের পরিশ্রমে রাশি রাশি জিনিষ প্রস্তুত হওয়ায়, এবং রাসায়নিক উপায়ে বহু স্বাভাবিক পদার্থের কৃত্রিম নকল প্রস্তুত হওয়ায়, এখন পাশ্চাত্য সভ্যদেশসকলে ও জাপানে বড় বড় কারখানায় এত বেশী জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে, যে, উৎপাদনের দেশে তৎসমুদয়ের কাট্‌তি হওয়া অসম্ভব। অথচ জিনিষ যত উৎপাদন হয়, সমস্তই বিক্রী না হইলে, কারখানায় যত মূলধন খাটান হইয়াছে, তাহার সুদ পোষাইয়া লাভ হয় না। যদি বল যে কম মূলধন খাটাইয়া কম জিনিষ উৎপন্ন করিলেই হয়। কিন্তু কম মূলধনে অনেক জিনিষের কারখানা হয়ই না; যদিই বা কোন কোন জিনিষের হয়, তাহা হইলে উহা লাভজনক হয় না, প্রতিযোগিতায় বড় বড় কারখানার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না, সুতরাং উঠিয়া যায়। তা ছাড়া, মূলধনী যাহারা, ছোট কারখানার অল্পলাভে তাহাদের অর্থের লালসা তৃপ্ত হয় না।

বড় বড় কারখানার উৎপন্ন জিনিষ বিক্রী করিতে হইলে উৎপাদনের দেশের মধ্যেই বাণিজ্যকে আবদ্ধ রাখা চলে না, বিদেশে কাটতির চেষ্টা দেখিতে হয়। কিন্তু যে-সব দেশের লোকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া চালাইতেছে, তথায় ত বেশী কাট্‌তির সম্ভাবনা নাই। এই জন্য যে-সকল দেশে ঐরূপ আধুনিক ধরণের কল কারখানা নাই, সেখানে, অর্থাৎ প্রধানতঃ এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে, বিক্রীর চেষ্টা দেখিতে হয়। এই-সকল মহাদেশের যে যে অংশ উৎপাদক দেশবিশেষের অধীন, সেই-সব অংশে জিনিষ বিক্রীর বেশী সুবিধা; কারণ ঐসকল অংশ শাসক ও উৎপাদক দেশের জিনিষের উপর শুল্ক বসাইয়া বা অন্য কোন উপায়ে উহার আমদানী কমাইতে পারে

না। পাচ্য দেশসকল জয় করিবার চেষ্টার ইহা একটি প্রধান কারণ। এই হেতু নানা পণ্যদ্রব্যোৎপাদক পাশ্চাত্য দেশসকলের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসকল ভাগাভাগি করিয়া লইবার জন্য একটা খুব রেষারেষিও আছে। এই রেষারেষির জন্য যুদ্ধসম্ভাবনা প্রায়ই থাকে। বর্ত্তমান যুদ্ধের মূলেও এই রেষারেষি আছে। জার্ম্মেনীতে কলকারখানার খুব উন্নতি ও সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে, পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে বিবিধ রাসায়নিক ও অপর বৈজ্ঞানিক প্রণালীর আবিষ্ক্রিয়া দ্রুতবেগে চলিতেছে, অথচ ইংলণ্ডের মত এশিয়ায় ও আফ্রিকায় তাহার এতবড় সাম্রাজ্য নাই; কাজেকাজেই জার্ম্মেনীকে ইংলণ্ডের হিংসা করিতে হয়।

বর্ত্তমান যুদ্ধের আরও কোন কোন কারণ। ইউরোপের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে জার্ম্মেনীর সমুদ্রোপকূল ইংলণ্ডের বা ফ্রান্সের মত বহুবিস্তৃত নহে। অথচ বাণিজ্যবিস্তারের জন্য মহাসাগরে জাহাজের সাহায্যে যাতায়াত একান্ত আবশ্যক এবং তাহার জন্য সমুদ্রের উপকূলে অনেক বন্দর থাকা প্রয়োজন। জার্ম্মেনীর সমুদ্রতটের অধিকাংশ বাল্‌টিক সাগরের কূলে। তথাকার বন্দর দিয়া বাহির হইতে হইলে রুশিয়া, সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্কের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসকল দিয়া যাতায়াত করিতে হয়, এবং অনেক ছোট ছোট দ্বীপ ও প্রণালী থাকায় উহাদের সমীপবর্ত্তী এই-সকল সমুদ্রপথ বেশ সরল ও নিরাপদ নহে। পক্ষান্তরে জার্ম্মেনী যদি বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড দখল করিতে পারে, তাহা হইলে অতি সুন্দর সুন্দর বন্দর তাহার হস্তগত হয়, এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা, এমন কি যুদ্ধ করিবার পর্য্যন্ত সুবিধা হয়। এই হেতু বেল্‌জিয়াম ও হল্যাণ্ডের প্রতি লোভ জার্ম্মেনীর অনেক দিন হইতেই আছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে যখন জার্ম্মেনী বেলজিয়ামকে বলিয়াছিল, "তোমাদের দেশের ভিতর দিয়া আমাদিগকে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য লইয়া যাইতে দাও; যুদ্ধান্তে আমরা তোমাদের দেশ দখল করিয়া থাকিব না, তোমাদের স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে না, তোমাদের দেশ তোমাদিগকেই ফিরাইয়া দিয়া চলিয়া আসিব"; তখন বেলজিয়াম এই কারণেই তাহার লোভী প্রবল প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও জার্ম্মেনীতে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে ফ্রান্স পরাজিত হওয়ায়, জার্ম্মেনী ফ্রান্সের এল্‌সাস, এবং লোরেনের পূর্ব্ব অংশ কাড়িয়া লয় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, স্বরূপ তিনশত কোটি টাকা ফ্রান্সের নিকট আদায় করে। এই দুই দেশের স্থায়ী অসদ্ভাবের ইহাও একটি গুরুতর কারণ।

জাপান কেন জার্ম্মেনীর সহিত লড়িতেছে। জাপান ও ইংলণ্ডের সঙ্গে সন্ধির এই এক উদ্দেশ্য লিখিত আছে যে পূর্ব্বএশিয়ায় ও ভারতবর্ষে শান্তিরক্ষা করিতে হইবে, এবং ঐ ঐ অংশে ইংলণ্ড ও জাপানের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইবে। তদনুসারে জাপান জার্ম্মেনীর সহিত লড়াই করিতেছে। কিন্তু এই উভয় দেশের মধ্যে সংগ্রামের ইহাই একমাত্র কারণ নহে। ইহা ছাড়াও দুই গুরুতর কারণ আছে।

প্রথম কারণ রাষ্ট্রনৈতিক। চীন ও জাপানের মধ্যে লড়াই যখন ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে শিমোনোসেকীর সন্ধি দ্বারা শেষ হয়, তখন সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে চীন জাপানকে ৭৫ কোটি টাকা, চীনের কোন কোন অংশ এবং চীনের অধীন কতকগুলি দ্বীপ প্রদান করে এবং বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে কতকগুলি সুবিধা দেয়। সন্ধির সর্ত্তগুলি প্রকাশিত হইবামাত্র রুশিয়া জার্ম্মেনী ও ফ্রান্স একসঙ্গে জাপানকে এক পত্র লিখিয়া জানাইল যে জাপান চীনের কোন অংশ দখল করিয়া থাকিলে শান্তি রক্ষা করা ভার হইবে। অগত্যা, এত অর্থব্যয় ও রক্তপাত করিয়া জাপান চীনের যে যে অংশ পাইয়াছিল, তাহা ছাড়িয়া দিতে হইল। কিন্তু মনে মনে তাহার বড় রাগ হইল। রাগ হইল বিশেষ করিয়া জার্ম্মেনীর উপর। জাপান বুঝিল যে চীন ও রুশিয়ার সাম্রাজ্যের সীমারেখা অনেকদূর পর্য্যন্ত এক। সুতরাং জাপানীদের মত রণকুশল ও উন্নতিশীল জাতিকে চীনসাম্রাজ্যে একটুও পা রাখিবার যায়গা দেওয়া রুশিয়ার স্বার্থের বিরোধী। জাপান ইহাও বুঝিল যে ফ্রান্স রুশিয়ার বন্ধু; সুতরাং তাহার পক্ষে

বীতে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তাহার উপায় করিবার নিমিত্ত অনেক মনীষী চেষ্টা করিতেছেন। প্রত্যেক দেশেই, মানুষে মানুষে ঝগড়া বিবাদ হইলে, যেমন তাহার মীমাংসার জন্য আইন আদালত আছে, কেহ অপরাধ করিলে যেমন বিচার করিয়া তাহার দণ্ড দিবার ব্যবস্থা আছে, তেমনি দেশে দেশে বিবাদ বাধিলে তাহা মিটাইবার জন্য, একদেশ অন্যদেশের উপর অত্যাচার করিলে তাহার প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত যাহাতে অন্তর্জাতিক আইনআদালত থাকে, তাহার চেষ্টা অনেকদিন হইতে হইতেছে। হেগ সহরে ১৮৯৯ ও ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে, যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য বা উহার অনিষ্টের হ্রাস করিবার জন্য, অন্তর্জাতিক পরামর্শসমিতি বসে। উহাতে জাতিতে জাতিতে বিবাদ সালিসী দ্বারা মীমাংসা করিবার সপক্ষে, স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধের নিয়ম নির্দ্ধারণ ও বিধিবদ্ধকরণ এবং তৎসমুদয় অবশ্যপালনীয় বলিয়া ধার্য্য করিবার সপক্ষে, এবং অস্ত্রশস্ত্র, বন্দী, লুট, প্রভৃতি সম্বন্ধে, অনেক প্রস্তাব ধার্য্য হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে প্রায় ৫০টি অন্তর্জাতিক আদালতে ইংলণ্ড বাদীরূপে বা অন্যতম বিচারকরূপে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রায় ২০০ অন্তর্জাতিক মকদ্দমা এইরূপ আদালতে বিনাযুদ্ধে বিচারিত হইয়া নিষ্পত্তি হইয়াছে। ইহা হইতে আশা হয় যে কালে, অন্ততঃ সভ্যলোকদের মধ্যে, যুদ্ধ সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হইয়া যাইবে।

সুইডেনের রাসায়নিক নোবেল উইল করিয়া যে টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ও পৃথিবীতে শান্তিরক্ষা বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম প্রত্যেক কর্ম্মীকে প্রায় একলক্ষ বিশহাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইতেছে। তদ্ভিন্ন ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত এণ্ড্রু কার্নেগী পৃথিবী হইতে যুদ্ধ উঠাইয়া দিবার জন্য তিনকোটির উপর টাকা দান করিয়াছেন।

এরূপ আশা করা দুরাশা নয় যে ভবিষ্যতে কোন জাতিকে স্বাধীন হইবার জন্যও যুদ্ধ করিতে হইবে না। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নরওয়ে বিনাযুদ্ধে স্বাধীন হইয়াছে। খুব সম্ভব, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ বিনাযুদ্ধে স্বাধীন হইবে।

যুদ্ধের একটি স্থায়ী কারণ। প্রাচীনকাল হইতে যে-সব কারণে যুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তাহা ইতিহাসপাঠকেরা জানেন। আধুনিক সময়ে তাহার উপর আর একটি বাড়িয়াছে। তাহা দ্রব্যনির্ম্মাণে ও দ্রব্যসরবরাহে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার প্রয়োগ। ষ্টীমএঞ্জিন বা বাষ্পীয় কল দ্বারা নানাবিধ দ্রব্য নির্ম্মাণের কল চালিত হওয়ায়, ঐ-সব কলে অতি অল্পসংখ্যক মানুষের পরিশ্রমে রাশি রাশি জিনিষ প্রস্তুত হওয়ায়, এবং রাসায়নিক উপায়ে বহু স্বাভাবিক পদার্থের কৃত্রিম নকল প্রস্তুত হওয়ায়, এখন পাশ্চাত্য সভ্যদেশসকলে ও জাপানে বড় বড় কারখানায় এত বেশী জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে, যে, উৎপাদনের দেশে তৎসমুদয়ের কাট্‌তি হওয়া অসম্ভব। অথচ জিনিষ যত উৎপাদন হয়, সমস্তই বিক্রী না হইলে, কারখানায় যত মূলধন খাটান হইয়াছে, তাহার সুদ পোষাইয়া লাভ হয় না! যদি বল যে কম মূলধন খাটাইয়া কম জিনিষ উৎপন্ন করিলেই হয়। কিন্তু কম মূলধনে অনেক জিনিষের কারখানা হয়ই না; যদিই বা কোন কোন জিনিষের হয়, তাহা হইলে উহা লাভজনক হয় না, প্রতিযোগিতায় বড় বড় কারখানার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না, সুতরাং উঠিয়া যায়। তা ছাড়া, মূলধনী যাহারা, ছোট কারখানার অল্পলাভে তাহাদের অর্থের লালসা তৃপ্ত হয় না।

বড় বড় কারখানার উৎপন্ন জিনিষ বিক্রী করিতে হইলে উৎপাদনের দেশের মধ্যেই বাণিজ্যকে আবদ্ধ রাখা চলে না, বিদেশে কাটতির চেষ্টা দেখিতে হয়। কিন্তু যে-সব দেশের লোকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া চালাইতেছে, তথায় ত বেশী কাট্‌তির সম্ভাবনা নাই। এই জন্য যে-সকল দেশে ঐরূপ আধুনিক ধরণের কল কারখানা নাই, সেখানে, অর্থাৎ প্রধানতঃ এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে, বিক্রীর চেষ্টা দেখিতে হয়। এই-সকল মহাদেশের যে যে অংশ উৎপাদক দেশবিশেষের অধীন, সেই-সব অংশেই জিনিষ বিক্রীর বেশী সুবিধা; কারণ ঐসকল অংশ শাসক ও উৎপাদক দেশের জিনিষের উপর শুল্ক বসাইয়া বা অন্য কোন উপায়ে উহার আমদানী কমাইতে পারে

না। প্রাচ্য দেশসকল জয় করিবার চেষ্টার ইহা একটি প্রধান কারণ। এই হেতু নানা পণ্যদ্রব্যোৎপাদক পাশ্চাত্য দেশসকলের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসকল ভাগাভাগি করিয়া লইবার জন্য একটা খুব রেষারেষিও আছে। এই রেষারেষির জন্য যুদ্ধসম্ভাবনা প্রায়ই থাকে। বর্ত্তমান যুদ্ধের মূলেও এই রেষারেষি আছে। জার্ম্মেনীতে কলকারখানার খুব উন্নতি ও সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে, পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে বিবিধ রাসায়নিক ও অপর বৈজ্ঞানিক প্রণালীর আবিষ্ক্রিয়া দ্রুতবেগে চলিতেছে, অথচ ইংলণ্ডের মত এশিয়ায় ও আফ্রিকায় তাহার এতবড় সাম্রাজ্য নাই; কাজেকাজেই জার্ম্মেনীকে ইংলণ্ডের হিংসা করিতে হয়।

বর্ত্তমান যুদ্ধের আরও কোন কোন কারণ। ইউরোপের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে জার্ম্মেনীর সমুদ্রোপকূল ইংলণ্ডের বা ফ্রান্সের মত বহুবিস্তৃত নহে। অথচ বাণিজ্যবিস্তারের জন্য মহাসাগরে জাহাজের সাহায্যে যাতায়াত একান্ত আবশ্যক এবং তাহার জন্য সমুদ্রের উপকূলে অনেক বন্দর থাকা প্রয়োজন। জার্ম্মেনীর সমুদ্রতটের অধিকাংশ বাল্‌টিক সাগরের কূলে। তথাকার বন্দর দিয়া বাহির হইতে হইলে রুশিয়া, সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্কের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসকল দিয়া যাতায়াত করিতে হয়, এবং অনেক ছোট ছোট দ্বীপ ও প্রণালী থাকায় উহাদের সমীপবর্ত্তী এই-সকল সমুদ্রপথ বেশ সরল ও নিরাপদ নহে। পক্ষান্তরে জার্ম্মেনী যদি বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড দখল করিতে পারে, তাহা হইলে অতি সুন্দর সুন্দর বন্দর তাহার হস্তগত হয়, এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা, এমন কি যুদ্ধ করিবার পর্য্যন্ত সুবিধা হয়। এই হেতু বেল্‌জিয়াম ও হল্যাণ্ডের প্রতি লোভ জার্ম্মেনীর অনেক দিন হইতেই আছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে যখন জার্ম্মেনী বেলজিয়ামকে বলিয়াছিল, "তোমাদের দেশের ভিতর দিয়া আমাদিগকে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য লইয়া যাইতে দাও; যুদ্ধান্তে আমরা তোমাদের দেশ দখল করিয়া থাকিব না, তোমাদের স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে না, তোমাদের দেশ তোমাদিগকেই ফিরাইয়া দিয়া চলিয়া আসিব"; তখন বেলজিয়াম এই কারণেই তাহার লোভী প্রবল প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও জার্ম্মেনীতে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে ফ্রান্স পরাজিত হওয়ায়, জার্ম্মেনী ফ্রান্সের এল্‌সাস, এবং লোরেনের পূর্ব্ব অংশ কাড়িয়া লয় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, স্বরূপ তিনশত কোটি টাকা ফ্রান্সের নিকট আদায় করে। এই দুই দেশের স্থায়ী অসদ্ভাবের ইহাও একটি গুরুতর কারণ।

জাপান কেন জার্ম্মেনীর সহিত লড়িতেছে। জাপান ও ইংলণ্ডের সঙ্গে সন্ধির এই এক উদ্দেশ্য লিখিত আছে যে পূর্ব্বএশিয়ায় ও ভারতবর্ষে শান্তিরক্ষা করিতে হইবে, এবং ঐ ঐ অংশে ইংলণ্ড ও জাপানের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইবে। তদনুসারে জাপান জার্ম্মেনীর সহিত লড়াই করিতেছে। কিন্তু এই উভয় দেশের মধ্যে সংগ্রামের ইহাই একমাত্র কারণ নহে। ইহা ছাড়াও দুই গুরুতর কারণ আছে।

প্রথম কারণ রাষ্ট্রনৈতিক। চীন ও জাপানের মধ্যে লড়াই যখন ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে শিমোনোসেকীর সন্ধি দ্বারা শেষ হয়, তখন সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে চীন জাপানকে ৭৫ কোটি টাকা, চীনের কোন কোন অংশ এবং চীনের অধীন কতকগুলি দ্বীপ প্রদান করে এবং বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে কতকগুলি সুবিধা দেয়। সন্ধির সর্ত্তগুলি প্রকাশিত হইবামাত্র রুশিয়া জার্ম্মেনী ও ফ্রান্স একসঙ্গে জাপানকে এক পত্র লিখিয়া জানাইল যে জাপান চীনের কোন অংশ দখল করিয়া থাকিলে শান্তি রক্ষা করা ভার হইবে। অগত্যা, এত অর্থব্যয় ও রক্তপাত করিয়া জাপান চীনের যে যে অংশ পাইয়াছিল, তাহা ছাড়িয়া দিতে হইল। কিন্তু মনে মনে তাহার বড় রাগ হইল। রাগ হইল বিশেষ করিয়া জার্ম্মেনীর উপর। জাপান বুঝিল যে চীন ও রুশিয়ার সাম্রাজ্যের সীমারেখা অনেকদূর পর্য্যন্ত এক। সুতরাং জাপানীদের মত রণকুশল ও উন্নতিশীল জাতিকে চীনসাম্রাজ্যে একটুও পা রাখিবার যায়গা দেওয়া রুশিয়ার স্বার্থের বিরোধী। জাপান ইহাও বুঝিল যে ফ্রান্স রুশিয়ার বন্ধু; সুতরাং তাহার পক্ষে

রুশিয়ার মতে সায় দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু জার্ম্মেনীর ত তখন চীনের কোন অংশে কোনই স্বার্থ ছিল না, এবং মুখে সে জাপানের খুব বন্ধু বলিয়াই পরিচয় দিত। এ অবস্থায় জাপানের রাগ হইবারই কথা। পরে জানা গিয়াছিল যে জার্ম্মেনীর সম্রাটের খুব "পীতাতঙ্ক" (fear of the yellow peril) আছে। তাঁহার ভয় যে কোন্ দিন হঠাৎ লক্ষ লক্ষ পীতকায় মনুষ্য পাশ্চাত্য মহাদেশে অভিযান করিয়া সমস্ত ইউরোপ তোলপাড় করিয়া ফেলিবে। সেই ভয়ে সম্রাট মহোদয় জাপানকে চীনে দখল দিতে চান নাই—পাছে সে চীনের অগণ্য লোককে আধুনিক রণকৌশলে নিপুণ করিয়া তুলিয়া একটা অনর্থ বাধাইবার সুযোগ পায়।

যাহা হউক, ইউরোপীয় তিন দেশের মহাত্মারা ত জাপানকে চীনে একটুও জায়গা লইতে দিলেন না। কিন্তু অবিলম্বেই প্রত্যেকে চীনে ভাগ বসাইতে লাগিলেন। জার্ম্মেনী ১৮৯৭ সালে কিয়াউচাউ উপসাগরের সমীপবর্ত্তী অনেকটা জায়গা ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা লইল; কিন্তু সর্ত্ত রহিল যে উহাতে সে সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করিতে এবং দুর্গ নির্ম্মাণাদি করিতে পারিবে। ইহার মানে যে প্রকারান্তরে স্থায়ী ভাবে দখল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এখন এই কিয়াউচাউ জাপান কাড়িয়া লইয়া পরে চীনের হাতে দিতে চাহিতেছে। সত্য সত্য দিবে কিনা, বলা যায় না। কারণ প্রবল পক্ষ একবার কিছু একটা করায়ত্ত করিতে পারিলে আপনা হইতে ফিরিয়া দিতে চায় না।

ইংলণ্ড অপর তিন ইউরোপীয় জাতির ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিল না, কিন্তু তাহারও চীনের কিঞ্চিৎ জায়গা দখল করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

বর্ত্তমান যুদ্ধে রুশিয়া ও ফ্রান্স, জাপানের বন্ধু ইংলণ্ডের মিত্র দেশ। জাপান তাহাদের সঙ্গে বিবাদ বাধাইবে না। জার্ম্মেনীর শত্রুতার প্রতিশোধ লইবে।

দ্বিতীয় কারণ বাণিজ্যিক। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাশ্চাত্য অনেক দেশের মত আজকাল জাপানেও নানা পণ্যদ্রব্য সস্তা দরে ও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে। তাহার কাটতির যায়গা চাই। জাপান মনে করে, জাপানের বিদেশী বাণিজ্যের বিস্তৃতি ভবিষ্যতে চীন ও ভারতবর্ষেই হইবে; কারণ ঐ দুই দেশের লোকেরা সর্ব্বদাই এরূপ সস্তা সব জিনিষ চায়, যেরূপ জিনিসের বেশী কাটতি কোন পাশ্চাত্য দেশে হইতে পারে না, এবং যেরূপ জিনিষ কোন পাশ্চাত্য দেশ উৎপাদন করিয়া ওরূপ সস্তা দরে চীন বা ভারতবর্ষে বিক্রী করিতে পারে না।*

জাপানীরা মনে করে এবং ইহা সত্যও বটে যে ভারতবর্ষে বাণিজ্যে জার্ম্মেনরাই তাহাদের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী। জার্ম্মেনরা ভারতবর্ষের লোকদের রুচিটি বেশ ভাল করিয়া জানিবার চেষ্টা করে, এবং সেই রুচি-মাফিক জিনিষ জোগায়। জাপানীরা মনে করে, তাহাদেরও এইরূপ করা আবশ্যক হইবে।†

এখন লড়াই উপস্থিত হওয়ায় আর নূতন করিয়া বাজারে জার্ম্মেন জিনিষের আমদানী হইতেছে না। সস্তা জিনিষ জোগাইতে এখন আছে কেবল জাপান। ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে এইরূপ সংবাদ বাহির হইয়াছে যে ইতিমধ্যেই জাপানী জিনিষের আমদানী দ্বিগুণ হইয়াছে। যুদ্ধের সুযোগে জাপান যদি ভারতের বাজার বেশ করিয়া দখল করিয়া বসিতে পারে, এবং ইংলণ্ডকে সংগ্রামে সাহায্য করিয়া জার্ম্মেনীর শক্তিকে একেবারে পিষিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে তাহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ ত হয়ই, অধিকন্তু ভারতে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ না থাকায়, তাহার অপর মনস্কামনাও পূর্ণ হয়।

জাপান ভারতের হিতৈষী নহে।

আমরা পূর্ব্বে একবার ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা

* "The future of Japan's foreign commerce no doubt lies in India and China, where there are immense populations constantly in demand of cheap manufactures, too cheap to find any great market in the West, and cheaper than Western goods, even of the same quality, can be put down in India or China, by any other country." *The Japan Magazine.*

† Perhaps Japan's most formidable competitors for the Indian market are the Germans, who are extremely active in trying to create a market for their goods in the country......the Germans cater carefully to Indian taste in such matters, and Japan will be obliged to make a closer study of the field also." *The Japan Magazine.*

করিয়াছিলাম যে জাপান ভারতের হিতৈষী নহে। তখন আমাদের লেখায় বেশী লোকে মন দেন নাই। এখন আর একবার সেই-সব কথাই বলিতেছি। আমরা বলি, যদি খাঁটি স্বদেশী জিনিষ পাও, ত ক্রয় কর। যদি তাহা না পাও, তাহা হইলে মনে করিও না যে জাপানী জিনিষ স্বদেশীরই কাছাকছি, অন্ততঃ মন্দর ভাল। তাহা কখনই নয়। জাপানী জিনিষও যা, অন্য যে-কোন বিদেশী জিনিষও তা। জাপানী ঠিক অন্যান্য বিদেশীরই মত ভারতের ধন নিজের সিন্দুকে পুরিতে চায়। আমরা শিল্পে বাণিজ্যে উন্নত হই, ইহা সে চায় না। প্রমাণ স্বরূপ পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

জাপানী ও স্বদেশী। স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেকে স্বদেশী জিনিষ না পাইলে আদর করিয়া জাপানী জিনিষ কিনিতেন, এবং এখনও কিনেন। অনেকে স্বদেশী ও জাপানী জিনিষ প্রায় সমান আদরণীয় মনে করেন। কিন্তু ইহা মহা ভ্রম। শিল্প বাণিজ্য বিষয়ে জাপান মোটেই আমাদের বন্ধু নহে, প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী। কারণ, জাপান ভারতবর্ষে তাহার শিল্পজাত দ্রব্য যত সস্তায় দিতেছে, ইউরোপের কোন জাতিই তত সস্তায় দিতে পারিতেছে না। সুতরাং জাপানের প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশী শিল্পসমূহের অনিষ্ট ও বিনাশ যেমন হইবে, পাশ্চাত্য দেশ সকলের প্রতিযোগিতায় সেরূপ হইবে না। জাপান ম্যাগাজিন নামক মাসিক পত্রে লেখা হইয়াছে যে জাপান ভারতবর্ষের বাজারে ইতিমধ্যেই দিয়াশলাই, কোন কোন কার্পাস বস্ত্র, কোন কোন রকমের কাচের জিনিষ প্রভৃতিতে ফ্রান্স, সুইডেন, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশকে পরাস্ত করিয়াছে। ভারতের বাজারে জাপানের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী জার্ম্মেনী। তাহার কারণ জার্ম্মেনরা, ভারতবর্ষের লোকেরা কিরূপ জিনিষ চায়, তাহা দেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেশ করিয়া জানিয়া লয়, এবং আমাদের রুচি অনুযায়ী জিনিষ জোগায়, এবং খুব সস্তা দরে বেচে। জাপান ম্যাগাজিন্ জাপানীদিগকেও এইরূপ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। জাপানীদের ধারণা যে তাহারা ভারতবর্ষে যেরূপ সস্তা দরে জিনিষ বিক্রয় করিতে পারিবে, আর কোনও দেশের লোকে সেরূপ পারিবে না।*

১৯০৮-০৯ খৃষ্টাব্দে জাপান হইতে ভারতবর্ষে ২,১৪,৭০,০০০ টাকার মাল আসিয়াছিল। পাঁচ বৎসরে এই আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়া ৪,৯৬,৬৭,০০০ টাকার অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। জাপানীরা বৎসরে চার কোটি টাকার উপর জিনিষ ভারতবর্ষে বেচিতেছে। সহজ কথা নয়। জাপানের দৃঢ়বিশ্বাস যে আমরা প্রতিযোগিতায় কোন মতেই তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিব না। আমাদের অকর্ম্মণ্যতা ও অপটুতায় যে জাপানীরা খুব আনন্দিত তাহা জাপান ম্যাগাজিনের ভাষা হইতেই বুঝা যায়। "Japan does not appear to be in any fear that Indian manufacturing industries will so far develop as to be able to meet the home demand. Neither in mechanical nor manual industry has India made the same progress that has marked the last few years in Japan: and no doubt the increasing importation of cheaper Japanese and German goods will still further retard the growth of Indian industries. At least Japan has no fear of meeting successful rivals in Indian trade." অর্থাৎ "জাপানের এরূপ কোনই আশঙ্কা নাই যে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন জন্য প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কল কারখানাদির এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইবে, যে তাহাদের দ্বারাই ভারতবর্ষের লোকদের যত জিনিষ দরকার, সমস্তই সরবরাহ হইবে। কি হাতের কারিগরী দ্বারা শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণে, কি কল কারখানা দ্বারা তদ্রূপ দ্রব্য উৎপাদনে, গত কয় বৎসরে জাপান যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, ভারতবর্ষ সেরূপ করিতে পারে নাই। এবং ইহা নিঃসন্দেহ যে সস্তা জাপানী ও জার্ম্মেন জিনিষের আমদানীতে ভারতীয় শিল্প-সকলের উন্নতিতে আরও বাধা পড়িবে অন্ততঃ ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে জাপানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কেহ সফলপ্রযত্ন হইতে পারিবে, জাপানের এরূপ কোন আশঙ্কা নাই।" অতএব ইহা আর ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে না যে জাপান আমাদের এমনই বন্ধু যে, যদি আমাদের শিল্পসমূহের শ্রীবৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে তাহা তাহার "আশঙ্কার" কারণ হইত; এবং সেই আশঙ্কা নাই বলিয়া জাপান আনন্দটা চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না। জাপানীদের প্রতি আমাদের বন্ধুভাব ও সহানুভূতির সুযোগে তাহারা কেমন আমাদের ক্ষতি করিবার সুবিধা পাইয়াছে জাপান ম্যাগাজিন হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। "There are other circumstances, too, which assist in brightening the future of Japan's trade with India. The people of India have a good deal of sympathy with the Japanese as a race and Japanese goods are popular and cheap."
অর্থাৎ—"আরও কতকগুলি অবস্থা আছে, যাহাদের আনুকূল্য ভারতবর্ষের সহিত জাপানের বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়াছে। জাতি হিসাবে জাপানীদের সহিত ভারতবর্ষের লোকদের খুব সহানুভূতি আছে, এবং লোকে জাপানী জিনিষ খুব ভাল বাসে ও উহা খুব সস্তা।"

জাপানীরা জাহাজ ভাড়া দিয়া তুলা এদেশ হইতে লইয়া যায়। তাহা হইতে জিনিষ প্রস্তুত করিয়া আবার জাহাজ ভাড়া দিয়া ভারতবর্ষে আনে। দুবার জাহাজ ভাড়া দিয়াও তাহারা ভারতের কাপাস হইতে ভারতে প্রস্তুত সূতী জিনিষের চেয়ে সস্তাদরে নিজেদের জিনিষ বিক্রী করে। ভারতবর্ষ হইতে কাঁচা মাল লইয়া গিয়া তাহারা এইরূপ আরও কোন কোন জিনিষ ভারতবর্ষেই আনিয়া দেশী জিনিষের চেয়ে সস্তায় বেচে। ইহা কেমন করিয়া হয়, তাহার অনুসন্ধান দেশের লোকের ও গবর্ণমেণ্টের করা উচিত। জাপানীদের শিক্ষা, সামাজিক রীতিনীতি, পারিবারিক ব্যবস্থা, জাতীয় চরিত্র, জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য, প্রভৃতি কি কি কারণে জাপানীরা আমাদের পরাস্ত করিতে পারিতেছে,

* The future of Japan's foreign commerce no doubt lies in India and China, where there are immense populations constantly in demand of cheap manufactures, too cheap to find any great market in the west, cheaper than western goods, even of the same quality, can be put down in India or China, by any other country." *The Japan Magazine.*

তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য শিল্পবাণিজ্যে বিচক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণদক্ষ কয়েকজন ভারতবাসীর জাপান যাওয়া উচিত, এবং তাহাদের রিপোর্ট সমুদয় দেশভাষায় মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হওয়া উচিত।

যুদ্ধে কাহার কি লাভ হইতেছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থাচক্রে কোন কোন দেশের কোন কোন বিষয়ে লাভ হইতেছে। ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার যে প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন সুযোগ জাপান পাইয়াছে, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তাহার পর

প্রথমলাভ পোল্যাণ্ডের। ইউরোপে পোল্যাণ্ড বলিয়া এখন আর একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ নাই। বহু বৎসর হইল রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রশিয়ার মধ্যে এই দেশ ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে। পোলরা বুদ্ধিমান্, স্বদেশপ্রিয়, এবং সাহসী যোদ্ধা; অথচ কেন যে তাহারা স্বাধীনতা হারাইল, তাহার কারণ আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে করা চলে না। স্বাধীনতা হারাইবার পর হইতে তাহারা উৎপীড়িত হইতেছে। রুশিয়ার অধীন অংশে স্কুল কলেজে পোলিশ ভাষা ব্যবহৃত হইতে পারে না, শিক্ষাদান রুশীয় ভাষায় হয়। স্কুলকলেজে যত ছাত্র ভর্ত্তি হইতে চায়, তাহার অর্দ্ধেকও যায়গা পায় না। প্রাইমারী ইস্কুলের সংখ্যা বৎসরের পর বৎসর কমিয়া চলিতেছে। আফিস আদালতে রুশীয় ভাষা ব্যবহার করিতে সকলে বাধ্য। সরকারী আফিস আদালত হইতে সমুদয় পোল কর্ম্মচারীকে ক্রমশঃ তাড়ান হইয়াছে। পোলিশ সহরগুলিকে রুশিয়া মিউনিসিপাল স্বায়ত্তশাসন দেয় নাই; এবং রুশীয় প্রতিনিধি সভা "ডুমা"তে প্রতিনিধিনির্ব্বাচনের নিয়ম এরূপ করা হইয়াছে যে পোল্যাণ্ডে যে-সব রুশীয় বাস করে, পোলদের চেয়ে তাহাদেরই প্রতিনিধি বেশী সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হয়। জার্ম্মেনীর ভাগে পোল্যাণ্ডের যে অংশ পড়িয়াছে, সেখানেও পোলরা উৎপীড়িত হয়। সেখানকার জমী যাহাতে পোলদের হাত হইতে জার্ম্মেনদের হাতে আসে তজ্জন্য আইন করা হইয়াছে, এবং পোলদের জমী কিনিয়া লইবার জন্যও কয়েকজন কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছে। এই আইন এরূপ কড়া যে পোলদিগকে নিজের জমীর উপর ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিতেও দেওয়া হয় না। এই অন্যায় আইনকে ফাঁকি দিবার জন্য অনেক পোল রেলগাড়ীর মত চাকাযুক্ত বড় বড় গাড়ীতে বাস করে। কিন্তু তাহাতেও রক্ষা নাই। তাহাতে তাহাদের সাজা হয়। এবম্বিধ নানা অত্যাচারেও পোলদের জাতীয় ভাব নিবিয়া যায় নাই। তাহাদের সাহিত্য সজীব ও সতেজ আছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাহাদের ঔপন্যাসিক শেন্‌কেভিচ Sienkiewicz সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইঁহার লিখিত "কো ভাডিস" (Quo vadis?) নামক উপন্যাস অনেকে বায়োস্কোপে দেখিয়াছেন।

এই পোলদিগকে রুশিয়ার সম্রাট স্বায়ত্তশাসন (autonomy) অঙ্গীকার করিয়াছেন। কেবল নিজের পোল প্রজাদিগকেই যে এই অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা নয়, প্রশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার পোল প্রজাদিগকেও বলিয়াছেন, যে, তোমরাও তোমাদের রুশিয়াস্থ ভ্রাতৃগণের সঙ্গে যোগ দিয়া এক অখণ্ড স্বশাসক পোল্যাণ্ডে বাস কর। ইহা যদি একটা কেবলমাত্র কূটরাজনীতির চাল না হয়, তাহা হইলে পোলদের বাস্তবিকই খুব লাভ হইল।

দ্বিতীয় লাভ রুশিয়ার ইহুদীদিগের। সম্রাট দুই শতের উপর ইহুদীকে সেনাচালক (military officer) পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহুদীরা পূর্ব্বে এরূপ কাজ পাইত না।

তৃতীয় লাভ ফরাসীদের প্রজা আলজীরিয়দিগের। অতীতকালে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, সর্ব্বত্রই শ্বেতকায় সৈন্যদের সঙ্গে অশ্বেতরা যুদ্ধ করিয়াছে। কখন শ্বেত কখন বা অশ্বেত জিতিয়াছে বা হারিয়াছে। শ্বেতকায়দের সঙ্গে অশ্বেতরা যুদ্ধ করিবার যোগ্যই নহে, তাহাদের এরূপ নিকৃষ্টতা কোন যুগে কোন দেশেই সপ্রমাণ হয় নাই। কিন্তু অধুনা এইরূপ যেন একটা দস্তুর দাঁড়াইতেছিল, যে, যখন শ্বেতে, শ্বেতে যুদ্ধ হইবে, তখন কোন পক্ষ অশ্বেত সৈন্যের সাহায্য লইয়া যুদ্ধ করিতে পারিবে না। কিন্তু গত বুয়ার যুদ্ধে ইংরেজকে পরোক্ষভাবে এই প্রথার বিরুদ্ধে যাইতে হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে ভারতীয় সিপাইরা আফ্রিকায় যুদ্ধ করে নাই বটে, কিন্তু পাহারা দিয়াছিল। তাহাও যুদ্ধেরই একটা অঙ্গ। কারণ কেহ সান্ত্রীর কাজ না করিলে যুদ্ধ চলিবে কেমন করিয়া? যাহা হউক, তখনও ভারতীয় সিপাহীর নিকট হইতে ইহার বেশী সাহায্য ইংরেজের লওয়া দরকার হয় নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধে ফ্রান্স দেখিয়াছে

যে তাহার সৈন্যসংখ্যা জার্মেনীর সমান নয়; এবং ফ্রান্সের জন্মের হারও কম বলিয়া লোকসংখ্যা বাড়িতেছে না। কিন্তু দেশরক্ষা করা ত চাই। এ দিকে আফ্রিকার লোকেরা যুদ্ধ করে ভাল; ইউরোপীয়রা যে তাহাদিগকে হারাইয়া দেয় সে কেবল উৎকৃষ্টতর ও অধিকসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্রের জোরে। তজ্জন্য ফ্রান্স দরকার বুঝিয়া জাতিগত অবজ্ঞা দ্বেষ ও কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া আফ্রিকার সৈন্য ও ফরাশী সৈন্য উভয়কেই একই যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত করিতেছে। আলজীরিয় সৈন্যেরা খুব ভালই লড়িতেছে।

চতুর্থ লাভ ভারতবাসীদের। যুদ্ধ জিনিষটা আমরা একটা সুসভ্য ব্যাপার মনে করি না, উহা পছন্দও করি না। তথাপি ভারতবাসীদের লাভ এই জন্য বলিতেছি, যে, ফরাশীদের দেখাদেখি, এবং আবশ্যক হওয়ায়, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় সিপাহীদিগকে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে একই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষীয় ইউরোপীয় শ্বেতকায় সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লইয়া যাওয়ায় ইহা স্পষ্টই স্বীকৃত হইতেছে যে কালা সিপাহী গোরা সৈন্যের সমকক্ষ। তাহারা যে নিকৃষ্ট নয়, এ বিশ্বাস আমাদের বরাবরই ছিল; কিন্তু ইহা ইতিপূর্ব্বে রাজপক্ষ হইতে এরূপ ভাবে স্বীকৃত হয় নাই।

যুদ্ধে ক্ষতি। যে-সকল দেশে যুদ্ধ হইতেছে তাহাদের লোকক্ষয় ধনক্ষয় হইতেছে, বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছে, স্ত্রীলোক শিশু বৃদ্ধের উপর পৈশাচিক অত্যাচার হইতেছে। মানুষের ক্রমোন্নতির পরিবর্ত্তে মানুষের মধ্যে যে পশু নিদ্রিত আছে, তাহা জাগিয়া উঠিয়া মানুষের বর্ব্বর অবস্থা আবার আনিয়া দিতেছে। কারণ যাহারা স্বদেশের বা অন্যদেশের রক্ষা, প্রভৃতি কোন ন্যায়সঙ্গত কারণে যুদ্ধ করে, তাহারাও লড়াইয়ের সময় আতর গোলাপজল দিয়া মৈত্রীর সহিত লড়ে না, বাঘের মত হিংস্র ভাব লইয়াই লড়ে।

যে-সকল দেশে যুদ্ধ হইতেছে না, তাহাদেরও বাণিজ্যের ক্ষতি হওয়ায় লোকের কষ্ট হইতেছে। সেখানেও মানুষের মন, যাহাতে কল্যাণ হয়, যাহাতে মানুষ সাত্বিক আনন্দ পাইতে পারে, এরূপ প্রসঙ্গ ও চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল কাটাকাটি মারামারির সংবাদের জন্য উৎসুক হইয়াছে, এবং তাহারই আলোচনা করিতেছে।

ভারতবর্ষে রাজপুরুষেরা, দেশবাসীরা যাহা কল্যাণকর মনে করে, সেরূপ কাজে হাত দিতে ও টাকা খরচ করিতে চান না বা বিলম্ব করেন; এখন যুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া, শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যের উন্নতি, প্রভৃতির জন্য টাকা খরচ না হইবারই সম্ভাবনা।

আমরা কাঁচা মাল হইতে জিনিষ প্রস্তুত করিয়া বিক্রীর জন্য বিদেশে বড় একটা পাঠাইতে পারি না; অধিকাংশ স্থলে কেবল কাঁচা মালই পাঠাই। কিন্তু কাঁচা মালও পূর্ব্বের মত রপ্তানী হইতেছে না। যেমন ধরুন পাট। পূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গের চাষারা অনেক স্থলে ধানের চাষ ছাড়িয়া পাটের চাষ ধরিয়াছে; তদ্ভিন্ন আগে হইতে পাটের চাষ ত ছিলই। যুদ্ধের জন্য পাটের কাটৃতি খুব কমিয়া গিয়াছে। কাহারও কাহারও মোটেই বিক্রী নাই, কেহ বা মাটির দরে পাট ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। এইরূপে অনেক জেলায় সাধারণ লোকদের মধ্যে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। সত্য বটে গবর্ণমেণ্ট এইরূপ একটি সাকুলার দিয়াছেন যে শীঘ্রই পাটের দর বাড়িতে পারে। এখন পাট বিক্রী না করিয়া পরে করিলে চাষাদিগের লোকসান হইবে না বটে, কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করিবার মত সঙ্গতি বেশী লোকের নাই।

সাধারণ লোকদের আয়ের পথ বন্ধ হইলে অন্য সকলেরও আয় কমিয়া যায়। কারণ, যাহারা খাটিয়া খায়, তাহাদেরই টাকা লইয়া অপরেরা বড়মানুষ।

আমাদের সুযোগ। যুদ্ধ ঘটায় কেবল একটি বিষয়ে আমাদের সুযোগ হইয়াছে। জার্মেন ও অন্যান্য পাশ্চাত্য কোন কোন বিদেশী মালের আমদানী বন্ধ হওয়ায় বা কমিয়া যাওয়ায় আমরা যদি সেই-সকল জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের অভাব দূর ত হয়ই, অধিকন্তু দেশী কোন কোন শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা হয়। এ পথে কিন্তু যে-সকল বিঘ্ন আছে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। আজকাল বেশী মূলধন ব্যতীত শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া প্রতিযোগিতায় দাঁড়ান দুঃসাধ্য। এত মূলধন শীঘ্র সংগ্রহ করা কঠিন। মূলধন সংগৃহীত হইলেও, কারখানার জন্য কল চাই। এই-সব কল বিদেশ হইতে আনাইতে হয়। শান্তির সময়েও কল আনাইতে দেরী হয়, এখন ত আরো দেরী হইবে। তাহার পর, শুধু মূলধন এবং কল হইলেও হইবে না, কল চালাইবার গৃহ নির্ম্মাণ করিলেও হইবে না, শিল্প দ্রব্য নির্ম্মাণে সুদক্ষ লোক চাই। দেশী লোক যদি পাওয়া যায়, ভাল, নতুবা বিদেশী নিযুক্ত করিতে হইবে। বিশেষজ্ঞ দেশী লোক থাকিলে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতে বাধা নাই। না থাকিলে বিদেশে পাঠাইয়া শিখাইয়া আনাইতে টাকা চাই, সময়ও চাই। বিদেশে শিক্ষিত কোন কোন শিল্পজ্ঞ ভারতবাসী বেকার বসিয়া থাকায় এ বিষয়ে যুবকদের উৎসাহ কিছু কমিয়াছে। এ অবস্থায় যদি বা কাহারও টাকা খরচ করিয়া কাহাকেও বিদেশে শিল্প শিখিতে পাঠাইতে উৎসাহ থাকে, এবং শিখিতে যাইবার লোকও পাওয়া যায়, তাহা হইলেও তাঁহার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইবে। বিদেশী লোক রাখিতে হইলে, তাহারা এরূপ

দেশের লোকই হইবে, যেখানে যে-শিল্পের জন্য লোক দরকার তাহার উন্নতি হইয়াছে। সে-রকম দেশের লোকেরা ভারতে ঐ শিল্পজাত দ্রব্য বেচিয়া অর্থলাভ করে। তথাকার মানুষে আমাদের কলকারখানার উন্নতি করিয়া দিবে কি না সন্দেহস্থল।

সমুদয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয় যে স্বদেশী আন্দোলনের সময় যেসকল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়া কোনও কারণে পরে বন্ধ হইয়া যায়, সেইগুলি আবার চালাইবার চেষ্টা প্রথমে করা হউক। কি কারণে বন্ধ হইয়াছিল, তাহা ধীরভাবে স্থির করিয়া তাহার প্রতিকার করা আবশ্যক। যদি জার্মেনী অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের সস্তা মালের প্রতিযোগিতায় বন্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখন খুব সুযোগ বলিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, যে ব্যবসা হইতে জার্মেন অষ্ট্রিয়ান্ সরিয়া গিয়াছে, সেখানে ইতিমধ্যেই জাপানীর আবির্ভাব হইতেছে। অতএব দেরী করিলে চলিবে না। যদি যথেষ্ট মূলধনের অভাবে বন্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরায় মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে। যদি কারখানা-সংসৃষ্ট কোন ব্যক্তির অকর্ম্মণ্যতায় কাজ নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেরূপ লোককে আর স্থান দিলে চলিবে না। যদি প্রতারণায় কারবার মাটি হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রবঞ্চকদিগকে দূর করিতে হইবে।

আরও একটি কারণে কোন কোন কারখানার বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে, আমরা তাহা ভুক্তভোগীর নিকট অবগত হইয়াছি। অধিকাংশ খুচরা বিক্রীর দোকানে দেশী বিদেশী দুই রকম জিনিষই থাকে। অনেক দোকানদার দেশী জিনিষ ধারে লয়, কিন্তু জিনিষ সমস্ত বিক্রী হইয়া গেলেও দেশী কারখানার মালিকের ঋণ যথাসময়ে শোধ করে না; দেশীদ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ টাকা দ্বারা বিদেশী দ্রব্যের পাইকারের ঋণ ঠিক্ সময়ে শোধ করে। অর্থাৎ দেশী জিনিষ বিক্রী করিয়া যে টাকা পায়, তাহা বিদেশী জিনিষের কারবারে পুনঃপুনঃ খাটায়। এ অবস্থায় দেশী জিনিষের উৎপাদককে অর্থাভাবে অসুবিধায় পড়িতে হয়। সুতরাং কারখানায় দেশী জিনিষ উৎপন্ন হইলেই চলিবে না, তাহার পাইকারী ও খুচরা বিক্রীর এরূপ বন্দোবস্তও করা চাই যাহাতে বিক্রীর পর উৎপাদক যথাসময়ে মূল্যটা পাইতে পারেন। ঠিক কিরূপ বন্দোবস্ত হইতে পারে, অব্যবসায়ী আমরা সে বিষয়ে কিছু বলিব না।

আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেখা গেল যে যাহার যে বিষয়ে কোন কার্য্যলব্ধ জ্ঞান নাই, তিনি তাহার এক কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছেন। অধ্যাপক, বক্তা, উকীল, খবুরে (journalist), চিকিৎসক, ভূত-জজ (ex-judge), লেখক, প্রভৃতি যাঁহারা শিল্পবিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারাও একএকটা কারখানার ডিরেক্টর বা পরিচালক হইয়া বসিলেন। কামারের কাজ বরং কুমারে করিতে পারে, কিন্তু ময়রার কাজ আনন্দে, বা তাঁতির কাজ সাংবাদিক (journalist) করিতে পারে না। স্বদেশী প্রচেষ্টা যে সম্যক্ ফলবতী হয় নাই, অনধিকারচর্চ্চা তাহার একটা কারণ। এই আনাড়ী অব্যবসায়ীর আক্রমণ হইতে কারখানাগুলিকে রক্ষা করিতে হইবে। অবশ্য কেহ কেহ যদি সম্পূর্ণ নিজেদের টাকায় কোন কারবার চালান, তাঁহাদের সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই। তাঁহারা সে কারবার বুঝেন কি না-বুঝেন, সে বিবেচনা তাঁহারাই করিবেন।

আর দেশবাসীকে রক্ষা করিতে হইবে জুয়াচোর তথাকথিত "স্বদেশী" জিনিষ বিক্রেতাদের হাত হইতে। আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম, দেশী চিনি খাইব। কোন কোন প্রবঞ্চক সুযোগ বুঝিয়া বিদেশী দানাদার চিনি ও জাভার বা অন্য জায়গার গুড় একত্র পিষিয়া ও মিশাইয়া কিছু মলিন করিয়া বেশী দামে বিক্রী করিতে লাগিল। আমরা দামেও ঠকিলাম, স্বদেশীর নামে বিদেশী জিনিষ খাইলাম, অধিকন্তু খারাপ জিনিষও খাইলাম। এইরূপ কোন কোন গন্ধদ্রব্যবিক্রেতা দেশী বলিয়া সম্পূর্ণ বিদেশী তেল ও অন্যান্য জিনিষ এখনও বিক্রয় করিতেছে। দেশী কাগজ বলিয়া বিদেশী কাগজ বিক্রীও অনেক স্থলে হয়।

স্বদেশী আন্দোলনে একটা পুরাতন সত্য কথা নূতন করিয়া শিখিতে হইয়াছে। সব সিদ্ধির গোড়ায় চরিত্র। হাজার অন্যগুণ থাকিলেও মানুষ যদি সৎ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, অধ্যবসায়ী না হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি কেমন করিয়া হইবে?

কলকারখানা ও হাতের শিল্প। কলকারখানায় যে-সব মজুর কাজ করে, তাহারা কলেরই একটা অঙ্গস্বরূপ হইয়া যায়। মানুষ যে কাজে আনন্দ পায়, যে কাজে তাহার সমস্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা দ্বারাই তাহার মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কারখানার মজুরেরা একটি জিনিষের কেবল এক একটি অংশ বা প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংসৃষ্ট। জিনিষটি আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করে না। সুতরাং তাহাদের বুদ্ধির চালনা ও উৎকর্ষসাধন, সৌন্দর্য্যবোধের উন্মেষ, সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও সুরুচির প্রয়োগ, একটা কিছু সৃষ্টি করিতেছি বলিয়া আনন্দ, এসব কিছুই কারখানায় হয় না। কারখানা-জীবনে মজুরদের অতিরিক্ত এক-

ঘেঁয়ে পরিশ্রম ও তজ্জনিত অবসাদের সময় তীব্র উত্তেজনার আকাঙ্ক্ষা, পারিবারিক-জীবনের কল্যাণকর প্রভাবের অভাব, স্ত্রীলোক ও পুরুষের অবাধ মিশ্রণ, প্রভৃতি কারণে নৈতিক অবনতি ঘটে। কলের দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রাশি রাশি জিনিষ অল্প সময়ে প্রস্তুত করিবার সপক্ষে এই বলা যায় যে উহাতে জিনিষ সস্তা হওয়ায় গরীবেরাও ব্যবহার করিতে পায়, এবং অল্প সময়ে অধিক জিনিষ প্রস্তুত হওয়ায় শ্রমজীবীদের আত্মোন্নতির অবসর পাইবার সম্ভাবনা ঘটে। কিন্তু জিনিষ সস্তা হইতেছে বটে, কিন্তু শ্রমজীবীদের শ্রমের লাঘব বিশেষ কিছু হইতেছে না।

এইরূপ নানাবিধ কারণে পাশ্চাত্য দেশসমূহে ও আমাদের দেশে হাতের নৈপুণ্যে যাহাতে নানা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে, অনেকে তাহার পক্ষপাতী হইতেছেন। কিন্তু এরূপ শিল্পদ্রব্য ঘরে বসিয়া কারিকর তৈয়ার করিবে অথচ তাহা কলের জিনিষের সঙ্গে উৎকর্ষ ও মূল্য দুইদিক্ দিয়া প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে কিরূপে, এ প্রশ্নের সমাধান এখনও হইয়াছে, বলা যায় না।

ইউরোপে নূতন মুসলমান রাজা। আলবেনিয়া পূর্ব্বে তুরস্কের অধীন ছিল। ১৯১২ সালের নবেম্বর মাসে উহার স্বাধীনতা ঘোষিত হয়, এবং ইস্মাইল কেমাল বের নেতৃত্বে পাকা বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দেশশাসনের একটা অস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। লণ্ডনে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজদূতেরা একত্র হইয়া স্থির করেন যে উইলিয়ম অব্ উইড্ উহার রাজা হইবেন। তিনি বর্ত্তমান বৎসরের মার্চ্চ মাসে রাজপদ গ্রহণ করেন। নামের দ্বারা যতটা বুঝা যায়, তাহাতে তাঁহার মন্ত্রীরা সকলে না হউক, অধিকাংশ মুসলমান—যথা, তুর্খান পাশা, এশাদ পাশা, মুফীদ্ বে, আস্মীজ বে, হাসান বে, আজিজ্ বে, এবং ডাক্তার টার্টালি বে। উইলিয়ম রাজা হইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রথম হইতেই বিদ্রোহী একদল প্রজা যুদ্ধ করিতেছে।

এক্ষণে রয়টার তারে সংবাদ দিয়াছেন যে তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সুলতান আবদুল হামিদের পুত্র বুর্হানউদ্দীনকে আলবেনিয়ার রাজা ঘোষণা করা হইবে, এইরূপ সম্ভাবনা হইয়াছে।

ইহা যদি সত্যসত্যই ঘটে, তাহা হইলে কিছু অন্যায় হইবে না, এবং তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয়ও কিছু নাই রাজা উইলিয়মের যে মন্ত্রীর তালিকা দিয়াছি, তাহা হইতেই অনুমান করা যায় যে আলবেনিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। মোট অধিবাসীর সংখ্যা আট হইতে সাড়ে-আট লক্ষ। দেশটির আয়তন সাড়েদশ হইতে সাড়েএগার হাজার বর্গমাইল। অধিবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশ মুসলমান। যে দেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান, তাহার রাজা মুসলমান হওয়াই স্বাভাবিক।

বাস্তবিক যদি সুলতান আব্দুল হামিদের পুত্র বুর্হান-উদ্দীন আলবেনিয়ার রাজা হন ও সিংহাসনে শক্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন, তাহা হইলে ইউরোপে দুজন স্বাধীন মুসলমান রাজা থাকিবেন—তুরস্কে একজন ও আলবেনিয়ায় একজন। আলবেনিয়ার রাজার যদি প্রজাহিতৈষণা থাকে এবং তিনি উন্নতিশীল ও বুদ্ধিমান হন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা দেশের অনেক উন্নতিও হইতে পারে। কারণ, আলবেনিয়ার সঙ্গে সকল বিষয়ে পৃথিবীর লোকদের আদানপ্রদানের সুবিধা সহজেই হইতে পারে। কেননা দেশটি চারিদিকেই ডাঙায় ঘেরা নহে; একদিকে সুদীর্ঘ সমুদ্রোপকূল; তাহাতে অনেক বন্দর নির্ম্মিত হইতে পারে। রাজধানী ডুরাট্‌সো (Durazzo) সমুদ্রের উপর।

আমাদের আশা এই, বুর্হান্‌উদ্দীন রাজা হইয়া প্রজাগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সভার মতানুসারে দেশের কল্যাণের জন্য রাজ্য শাসন করিবেন।

হেনিকার হীটন। সার্ হেনিকার হীটনের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি প্রধানতঃ ডাকবিভাগের সংস্কারের জন্য বিখ্যাত। এক পেনী অর্থাৎ এক আনা ডাকমাশুলে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র চিঠি যাইতে পারিবে, এইরূপ ব্যবস্থা তাঁহারই চেষ্টায় হয়। দূরত্বনির্বিশেষে সামান্য ডাকমাশুলে চিঠি যাওয়া যে সভ্যতার পক্ষে কত আবশ্যক, তাহা বলা যায় না; যদিও মধ্যে মধ্যে এমনও মনে হয় যে ডাক ও টেলিগ্রাফের সৃষ্টিতে মানুষকে একটু নিরিবিলি থাকিতে দেয় না, এ এক জ্বালা।

আমাদের দেশে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সরকারী ডাক প্রথম স্থাপিত হয়। তখন ডাক টিকিট ছিল না, দূরত্ব অনুসারে নগদ ডাকমাশুল দিতে হইত। এক তোলা ওজনের চিঠির জন্য কলিকাতা হইতে বোম্বাইয়ের ডাকমাশুল ছিল এক টাকা, কলিকাতা হইতে আগ্রার ছিল বার আনা। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাক টিকিট প্রবর্ত্তিত হয় এবং দূরত্বনির্ব্বিশেষে মাশুলের ব্যবস্থা হয়।

গবর্ণমেণ্ট স্বদেশীর জন্য কি করিতে পারেন। বঙ্গের লাট লর্ড কারমাইকেল দেশে নানা শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠা দেখিতে ইচ্ছা করেন। তজ্জন্য দেশের নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্যপ্রণালী স্থির করিবার জন্য তাঁহার ভূতপূর্ব্ব প্রাইভেট সেক্রেটরী সোয়ান সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কি কি উপায়ে দেশীয় শিল্পের সাহায্য করিতে পারেন, তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। (১) কোন কোন শিল্পে বিশেষজ্ঞ লোক আছেন, কিন্তু তাঁহারা মূল-

ধনের অভাবে কাজ করিতে পারেন না। যে-সব ধনী লোক দেশী জিনিষ নির্ম্মাণার্থ মূলধন দিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিবেন, এরূপ একটা ইঙ্গিত থাকিলে অনেক কাজ হয়। (২) কোন কোন শিল্পের কাজ হয় ত চলিতে পারে, যদি পরিচালকেরা ইংরেজ ব্যবসাদারদের মত ব্যাঙ্কগুলির কাছে মধ্যে মধ্যে টাকা ধার পায়। ইউরোপীয় ব্যাঙ্কগুলি দেশী লোকদের কারখানায় টাকা ধার দেয় না। গবর্ণমেণ্ট সরকারী ব্যাঙ্ক স্থাপন বা অন্য উপায়ে যদি সাহায্যের উপযুক্ত কারখানাগুলির ধার পাইবার ব্যবস্থা করেন, ত ভাল হয়। গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলে দেশের লোক অনেকে তাহাতেই টাকা গচ্ছিত রাখিবে। সেই টাকা দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে ধার দেওয়া যাইতে পারে। (৩) কোন কোন শিল্পের কারখানার জন্য দেশী বিশেষজ্ঞ নাই; তাহার জন্য, দেশী লোককে শিক্ষা দিবে এবং কাজও চালাইবে, এইরূপ বন্দোবস্তে বিদেশী বিশেষজ্ঞ যোগাড় করিয়া দিলে অনেক উপকার হয়। (৪) কাঁচা মাল, যেমন পেন্সিলের জন্য কাঠ, কাগজের জন্য ঘাস, সংগ্রহ ও অল্প ভাড়ায় তাহা রেল ও ষ্টীমারে কারখানায় আনিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া দরকার। (৫) সরকারী সমুদয় আফিসে দেশী জিনিষ কিনিবার সার্কুলার আছে। কিন্তু আফিসের কর্ত্তাদের বিরোধিতায় দেশী জিনিষ গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট পরিমাণে লন না। গুপ্ত কমিশন প্রথা ইহার একটি কারণ হইতে পারে। কারণ যাহাই হউক, দেশী জিনিষের দাম কিছু যদি বেশীও হয়, তাহা হইলেও কাজ চলিবার মত হইলেই উহা কিনিতে হইবে, এইরূপ আদেশ দেওয়া দরকার। (৬) রেলে বিদেশী যে জিনিষের ভাড়া কম, দেশী ঠিক্ সেই জিনিষই বহন করিবার ভাড়া তদপেক্ষা বেশী, অনেক জিনিষ সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম আছে। অথচ যদি প্রভেদ রাখিতে হয়, তাহা হইলে দেশী জিনিষই কম ভাড়ায় বহন করা রেলগুলির উচিত। তাহা যদি নাও করা যায়, ত অন্ততঃ পক্ষে এক রকমের দেশী বিদেশী উভয় দ্রব্যই সমান ভাড়ায় বহন করা রেলকোম্পানীগুলির কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা এই নিয়ম চালাইতে পারেন। (৭) যুদ্ধ চিরকাল চলিবে না। যখন যুদ্ধ শেষ হইবে, তখন জার্ম্মেনী ও অষ্ট্রিয়া লড়াইয়ে যে প্রভূত অর্থনাশ হইয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য দ্বিগুণ তেজে সস্তা জিনিষ তৈয়ার করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইতে আরম্ভ করিবে। যদিই বা আমরা শীঘ্র ২।৪টা কারখানা খাড়া করিতে পারি, তাহা হইলেও সেগুলা শীঘ্রই যে এরূপ ভাল হইয়া উঠিবে যে বিদেশী সস্তা মালের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবে, এমন বোধ হয় না। সুতরাং দেশী শিল্পের সংরক্ষণের জন্য বিদেশী মালের, বিশেষতঃ জার্ম্মেন ও অষ্ট্রিয়ান মালের উপর গবর্ণমেণ্টের কর বসান উচিত। নতুবা আমাদের কারখানাগুলির দীর্ঘজীবনলাভের বেশী সম্ভাবনা নাই। (৮) যাহারা স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে ও বিক্রয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছে, তাহাদের পশ্চাতে পুলিশ লাগিয়াই আছে এবং তাহাদের নামে নিয়মিতরূপে গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট যায়, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস আছে। পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরাল যে সার্কুলার বাহির করিয়াছেন যে পুলিশের লোকেরা যেন "স্বদেশী" ও "রাজদ্রোহী" এই দুটা কথা তাঁহাদের কাগজপত্রে এক অর্থে ব্যবহার না করেন, তাহাতেও লোকের বিশ্বাস যেন দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। যদি এই বিশ্বাস ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের এই ভ্রম দূর করা কর্ত্তব্য। আর যদি উহা সত্য হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট যে স্বদেশীর খুব সপক্ষে তাহা কার্য্যতঃ দেখাইবার জন্য যে-সব স্বদেশীওয়ালার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সন্দেহের কোনই কারণ নাই, তাহাদের উপর যাহাতে পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকে, তদ্রূপ আদেশ দেওয়া আবশ্যক।

দেশী নাম ও বিদেশী নাম। রুশিয়ার রাজধানীর নাম ছিল সেণ্টপীটার্সবর্গ। কয়েকদিন হইল উহা বদলাইয়া নাম রাখা হইয়াছে পেট্রোগ্রাড্। সেণ্ট পীটার্সবর্গ নামটার "বর্গ" অংশটা জার্ম্মেন ভাষা হইতে লওয়া; এখন জার্ম্মেনরা রুশদের শত্রু; অতএব রাজধানীর নামের সঙ্গে জার্ম্মেন শব্দের সম্পর্ক রাখিতে অনিচ্ছাই এই পরিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বাস্তবিক যাহারা স্বদেশপ্রেমিক তাহারা সহরের নাম বা অন্য ভৌগোলিক নাম, রাস্তাঘাট বাজারের নাম, নিজের ঘরবাড়ী বাগানের নাম, সন্তানদের নাম, সবই দেশী ভাষাতেই রাখে।

গুর্খারা লড়িবে। রয়টার তারে খবর পাঠাইয়াছেন যে ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ বলিয়াছেন, গুর্খারা লড়াইয়ে যোগ দিবে। গুর্খা ছাড়া অন্য যে-সব ভারতীয় সৈন্য ইউরোপ গিয়াছে, তাহারা কি করিবে, তাহাও গবর্ণমেণ্টের জানান কর্ত্তব্য। যে-সকল সিপাহী লড়িবে, তাহারা কিরূপ লড়িতেছে, তাহার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সমস্ত ভারতবাসী উৎসুক হইয়া আছে। গবর্ণমেণ্ট এই কৌতূহল পূর্ণ করিলে সকলে সুখী হইবে।

চিনি। জাভা ১৯০৮-০৯ সালে ভারতবর্ষে ছয় কোটি কুড়িলক্ষ একুশহাজার টাকার চিনি ও গুড় বিক্রী করিয়াছিল। তাহার পাঁচ বৎসর পরে নয় কোটী তিপ্পান্ন লক্ষ একানব্বই হাজার টাকার গুড় ও চিনি বেচিয়াছে। আগে প্রধানতঃ ভারতবর্ষেই গুড় ও চিনি হইত। এখন

সেই ভারতবর্ষ পরান্ত হইয়া নানাদেশ হইতে গুড়চিনি আমদানী করিতেছে। কি কারণে এরূপ হইতেছে, তাহা স্থির করিয়া দেশের লোকের ও গবর্ণমেন্টের প্রতিকারে মন দেওয়া দরকার। চাষারা চাষ ভাল জানে না; না, আমাদের আকের জা'ত ভাল নয়; না, রস বাহির করিবার যন্ত্র ভাল নয়; না, রস হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার কল ও প্রক্রিয়া ভাল নয়; না, গুড়-চিনির কারখানার যথেষ্ট নিকটে ইক্ষুক্ষেত্রসকল স্থিত নয়; না, ইক্ষুক্ষেত্রসকল টুকরা টুকরা ২।১০ বিঘা পরিমিত না হইয়া একএকটা ক্ষেত্র দশবিশ হাজার বিঘা পরিমিত এবং কারখানার সন্নিহিত হওয়া দরকার; না, বিদেশী চিনির উপর প্রথম প্রথম গবর্ণমেন্টের ট্যাক্স্ বসান দরকার; এই-সমস্ত ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য অনেক প্রশ্ন অনুসন্ধানের বিষয়। জাভা ও মরিশসে যোগ্য লোক গিয়া অনুসন্ধান করিলে তবে ঠিক খবর পাইবার সম্ভাবনা।

আমাদের দেশে হাজার হাজার খেজুরগাছ অযত্নে জন্মে। তাহা হইতে পূর্ব্বে প্রচুর গুড় হইত, এখনও কিছু কিছু হয়। সামান্য যত্ন করিলে এই-সব গাছ হইতে আরও বেশী গুড় উৎপন্ন হইতে পারে। আকের গুড় উৎপাদনের চেষ্টা অপেক্ষা খেজুরগুড় উৎপাদনের কেবল যে এই সুবিধা যে খেজুরগাছ জন্মাইবার ও রক্ষা করিবার জন্য বেশী পরিশ্রম ও ব্যয় করিতে হয় না, তাহা নয়; একবার গাছ হইলে বহুবৎসর ধরিয়া তাহা হইতে রস পাওয়া যায়, এবং যে জমীতে খেজুর গাছ আছে, তাহাতে বরাবরই অন্য ফসলের আবাদ করা চলে।

মধ্যভারতে খাণ্ডোয়ার উকীল শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় তথাকার স্বভাবজাত বহুসংখ্যক খেজুর গাছ হইতে ব্যবসা হিসাবে গুড় প্রস্তুত করিবার চেষ্টা অনেক বৎসর হইতে করিতেছেন। এখন তিনি ইন্দোরে আছেন এবং মহারাজা হোলকারের সাহায্যে এবিষয়ে পরীক্ষা করিতেছেন।

লবণ। সমুদ্রের লোণা জল ত খাওয়া যায় না, তাই একটি ইংরাজী কবিতায় এক প্রাচীন নাবিক সমুদ্রে ভাসমান ভগ্ন জাহাজে ভাসিতে ভাসিতে বলিতেছে— "Water, water everywhere, but not a drop to drink;" "চারিদিকেই জল, কিন্তু খাইবার জল এক-বিন্দুও নাই।" ভারতবর্ষেরও তিনদিকে সমুদ্র, তাহার জলে প্রচুর লবণ আছে। কিন্তু আমাদের জন্য নুন বেশীর ভাগ বিদেশ হইতে আসিত; এখন আমদানী কম হওয়ায় আমরা সমুদ্রের ধারে বসিয়া কোথা নুন, কোথা নুন বলিয়া চীৎকার করিতেছি। রাজপুতানায় সম্ভর হ্রদ হইতে কিছু নুন পাওয়া যায়, উত্তরপশ্চিম সীমান্তে এবং আরও কোথাও কোথাও লবণের আকর আছে।

জাতীয় জীবনের যেদিকে তাকাই সেখানেই মনে হয় যেন লেখা রহিয়াছে, "কর্ত্তব্য," "উচিত"। আমরা নিজে কিছুই করিতে পারি না। এইজন্য কেবলই "কর্ত্তব্য" ও "উচিত" লিখিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। কিন্তু যদি কেহ কোন কাজ করিতে পারে না, অথচ তাহার আবশ্যকতা বুঝে, তাহা হইলে সে কথাটা অন্ততঃ সে বলুক। যদি কোন কার্য্যক্ষম লোকের কানে কথাটা যায়, এই ভরসা।

মৈমনসিংহ জেলা ভাগ। মৈমনসিংহ জেলা ত্রিখণ্ডিত হইয়া তিনটি জেলায় পরিণত হইবে, গবর্ণর এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন। জেলাভাগের বিরুদ্ধে আমাদের যাহা বলিবার ছিল, তাহা আমরা আষাঢ়ের প্রবাসীতে বলিয়াছি। তাহা আবার বলিতে চাই না, বলিয়া কোন লাভও নাই। নূতন কথা এই বলিবার আছে, যে, জেলা ভাগ করা এত জরুরী ব্যাপার নয়, যে এই সময়ে উহার চূড়ান্ত সংবাদ প্রকাশ না করিলে চলিত না। এখন প্রকাশ করায় এই অসুবিধা হইয়াছে যে লোকে উহার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইবার ও আন্দোলন করিবার সুবিধা পাইল না। এখন আন্দোলন করিতে লোকে অনিচ্ছুক, করিলেও তাহাতে লোকে কান দিবে না। অথচ লোকের সমালোচনা শুনা গবর্ণমেন্টের পক্ষে আবশ্যক। কারণ রাজপুরুষেরা সর্ব্বজ্ঞও নহেন, অভ্রান্তও নহেন। দোষ ত্রুটি ভুল সকলেরই হয়। তাহা সংশোধনের একটা পথ থাকা চাই। এমনও বলা যায় না যে গবর্ণমেন্ট ইতিপূর্ব্বেই লোকদের সব আপত্তি ও সমালোচনা শুনিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট যে যে কারণে জেলাভাগ করিতে চান, তাহা প্রথমে যেরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, লোকেও তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এখন কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাহার কোনটিরই উল্লেখ না করিয়া একটি মাত্র সম্পূর্ণ নূতন কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা এই, যে, জেলা ছোট না হইলে স্থানিক স্বায়ত্তশাসনের উন্নতি ও প্রচলন হইবে না। কেননা, মাজিষ্ট্রেট বড় জেলার স্বায়ত্তশাসনের সব খুঁটিনাটি ভাল করিয়া তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না। হঠাৎ এইরূপ একটি নূতন কারণ

উপস্থিত করায়, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট জেলা ভাগ করা ধার্য্য করিয়াছেন, এইরূপ চূড়ান্ত কথা বলায়, লোকে এই কারণটির সারবত্তা পরীক্ষা করিবার কোন সুযোগ পাইল না। কারণটি যে খুব মজবুত, তা ত মনে হয় না। যদি জেলা ছোট ছোট টুকরায় বিভক্ত করিলে স্বায়ত্ত-শাসন ভাল হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমানে যে-সব ছোট জেলা আছে, তাহাতে বড় জেলার চেয়ে স্বায়ত্তশাসন বেশী অগ্রসর, ইহার প্রমাণ থাকা চাই। কিন্তু তাহার কোনই প্রমাণ নাই। বর্ত্তমানে মৈমনসিংহের লোক সংখ্যা ৪৫,২১, ৪২২। উহা ভাগ করিয়া যে তিনটি জেলা হইবে, মোটামুটি তাহাদের লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষ করিয়া হইবে। বীরভূম, বাঁকুড়া, প্রভৃতি যে-সকল জেলায় ১৫ লক্ষেরও কম লোক বাস করে, বড় জেলা-গুলির চেয়ে সেখানে কি খুব বেশী স্বায়ত্তশাসন চলিতেছে? জেলা ছোটই হউক আর বড়ই হউক, মাজিষ্ট্রেট্ ও-সব কাজ একা করেন না। তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা বটেন; কিন্তু পুলিস বিভাগের জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেট আছেন, আবকারীর জন্য স্বতন্ত্র ডেপুটী আছেন, খাজাঞ্চী-খানার জন্য স্বতন্ত্র ডেপুটী আছেন। এইরূপ স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য আলাদা একজন পাকা লোক মাজি-ষ্ট্রেটের অধীনে রাখিলেই হয়। আর বাস্তবিকও যতদিন সরকারী কর্ম্মচারীরা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডগুলির উপর শক্ত শাসন না ছাড়িবেন, ততদিন স্বায়ত্ত শাসন হইবে না। মানুষকে ভ্রমে পড়িবার, এমন কি বিপথে যাইবার স্বাধীনতা না দিলে সে নিজের কাজ নিজে কখনও করিতে সমর্থ হয় না। ধনী লোকের আদুরে ছেলের চেয়ে গরীবের ছেলে শীঘ্র চলিতে শিখে। কারণ তাহাকে কোলে করিয়া রাখিবার জন্য ও তাহার পতন নিবারণের জন্য বহুসংখ্যক দাসদাসী নিযুক্ত নাই। মাজিষ্ট্রেটের কড়া পাহারা ও খবরদারী না ঘুচিলে স্বায়ত্ত শাসন প্রকৃত প্রস্তাবে জন্মগ্রহণ করিবে না। গবর্ণমেণ্ট যদি চান ত সব জেলায় স্বায়ত্ত শাসনের তত্ত্বাবধানের জন্য বরং বিলাতের মত একটি স্থানিক শাসন-তত্ত্বাবধায়ক সমিতি (Local Government Board) নিযুক্ত করুন। তাঁহারা সব জেলার কাজ দেখিবেন। লণ্ডন কাউণ্টির লোকসংখ্যা ৪৫ লক্ষ ২১ হাজার ৬৮৫। তাহার স্বায়ত্ত শাসনের অনেক কাজ একটি সমিতি দ্বারা হয়। আমাদের দেশী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি এত রকমের এত বেশী কাজ করেন না। বিলাতে ৪৫ লক্ষ লোকের স্বায়ত্তশাসন যদি একত্র চলিতে পারে, ত এখানে ৪৫ লক্ষের ঐ শ্রেণীর কাজ কেন চলিবে না?

অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাকে অভি-নন্দিত করিয়াছেন। সভাস্থলে বঙ্গের প্রধান প্রধান মনীষীদিগের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

ঠাকুর স্বরচিত ও স্বহস্তলিখিত যে অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া ত্রিবেদী মহাশয়কে উপহার প্রদান করেন, তাহার একটি প্রতিলিপি আমরা মুদ্রিত করিতেছি। উহাতে যে কেবল কবির নিজ হৃদয়ের ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে,

ওঁ

সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

হে মিত্র, পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গসাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছ আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

যখন নবীন ছিলে তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতকে [illegible] করিয়াছে। জ্ঞান প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজায় [illegible] হে মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্যপরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিয়ত বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্যের দ্বারা জড়তাকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে

প্রিয়জনের মধ্যে প্রেমপ্রিয় তুমি তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠনিধি তুমি তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘজীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুদের হৃদয়মাঝে আহ্বান করি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫ই ভাদ্র ১৩২১

তাহা নহে; যিনি ত্রিবেদী মহাশয়কে জানেন, তিনিই কবির কথায় সায় দিবেন। ত্রিবেদী মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার রচনানৈপুণ্য, বঙ্গসাহিত্য-রসিক মাত্রেরই সুবিদিত। যিনি তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সৌজন্য ও মধুর স্বভাবে মুগ্ধ হইয়াছেন।

কতকগুলি সাহিত্যব্যবসায়ী ও সাহিত্যদালাল কয়েকটা গণ্ডীতে বঙ্গসাহিত্যজগৎকে বিভক্ত করিয়া সাহিত্যিক ও সাহিত্যসেবীদিগকেও তদনুযায়ী দলে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে। সুখের বিষয় রামেন্দ্রবাবু পূর্ণমাত্রায় বঙ্গবাণীর সেবক হইলেও কেহ তাঁহাকে কোন দলের সামিল করিতে পারে নাই। অথচ, যেমন অনেক "গোবেচারা ভালমানুষ" আছে যাহাদের পাঁচেও হুঁ সাতেও হুঁ, রামেন্দ্রবাবু তদ্রূপ মেরুদণ্ডবিহীন স্বাতন্ত্র্যশূন্য ব্যক্তি নহেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বের চিন্তার মতের স্বাতন্ত্র্য আছে।

বড় দুঃখের বিষয় এই অল্প বয়সেই রামেন্দ্রবাবুর স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে। তাঁহার মত লোকের পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার উৎসবে আনন্দ পাইয়াছি, কিন্তু আরও আনন্দিত হইতাম, যদি ইহা তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার উৎসব হইত।

জাতিতে জাতিতে মৈত্রীসাধক রবীন্দ্রনাথ। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার আডিলেড্ সহর হইতে কুমারী কনষ্টান্স র‍্যাড্‌ক্লিফ্ মান্দ্রাজ টাইম্‌সে একখানি পত্র লিখিয়া এই মত প্রকাশ করিতেছেন, যে, তাঁহার স্বদেশবাসীগণ ভারতবাসীদের প্রতি মন্দ ব্যবহার করে বলিয়া তাহাদের যে নিন্দা হইতেছে, তাহা অন্যায় নহে; কিন্তু তাহারা এখনও বুঝিতে পারে নাই যে অষ্ট্রেলিয়ার বাহিরের জাতিরা এক মহা ভ্রাতৃসংঘের অঙ্গ। তাহাদিগকে তাহারা নিজেদের সভ্যতার শত্রু বলিয়া সন্দেহ ও ভয় করে। তাহাদের মনের এই ভাব হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া, বাহিরের জাতিদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার জায়গায় সত্য ও পূর্ণ জ্ঞান জন্মিতে সময় লাগিবে। এইরূপে অন্য জাতিদের প্রতি সদ্ভাব জন্মিবার দিকে একটা গতি লক্ষিত হইতেছে। তাহার অন্যতম কারণ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলী। সুন্দর ও শান্ত ধীর ভাবে তাঁহার গান ও প্রবন্ধগুলি ভারতবাসীর বিরুদ্ধে কুসংস্কার বিনষ্ট করিয়া ভারতের জীবন ও চিন্তার মর্ম্মের মধ্যে মানুষকে প্রবেশ করিতে সমর্থ করিতেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর এই গুণ লক্ষিত হইয়াছে।

ভারতের সিপাহীর শৌর্য্য। পঞ্জাবের অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান মিঃ এস্, এস্, থরবান কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের "ঈষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট" মাসিক পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতবর্ষের শিখ্, গুর্খা, রাজপুত, পাঠান, প্রভৃতি সৈন্যদের রণদক্ষতার প্রশংসা করেন এবং বলেন:—

Only a few months ago Sir Ian Hamilton in his scrap book on the first part of the Russo-Japanese War recorded: "Every thinking soldier who has served on our recent Indian campaigns is aware that for the requirements of such operations, a good Sikh, Pathan or Gurkha battalion is more generally serviceable than a British battalion." In the next page, he wrote: "Why, there is material in the North of India, and in Nepal sufficient and fit, under good leadership, to shake the artificial society of Europe to its foundation."

ইহাতে সেনাপতি সার আয়েন হামিল্টনের সিপাহীদের সম্বন্ধে এই মত উদ্ধৃত হইয়াছে যে, "উত্তর ভারতে ও নেপালে সেনাদল গঠনের এমন উৎকৃষ্ট উপাদান আছে যে ভাল নেতাদের অধীনে তাহাদের দ্বারা ইউরোপের কৃত্রিম সমাজকে আমূল কাঁপাইয়া তুলা যায়।" এইরূপ কারণেই সিপাহীদিগকে ইউরোপে লইয়া যাওয়া হইয়াছে

প্রবন্ধাদির দৈর্ঘ্য। যাঁহারা প্রবাসীর জন্য প্রবন্ধাদি প্রেরণ করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ রাখিলে উপকৃত হইব যে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধাদি আমরা একটু বেশী সহজে ও শীঘ্র ছাপিতে পারি। প্রবন্ধ প্রবাসীর ৪।৫ পৃষ্ঠা অপেক্ষা লম্বা না হইলেই ভাল হয়। গল্প ইহা অপেক্ষা কিছু বড় হইলেও চলে। রচনা ক্রমশঃ প্রকাশ্য না হইয়া এক সংখ্যায় সমাপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সৈনিকের স্বপ্ন।

এডুয়ার্ড ডিটেইল কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।
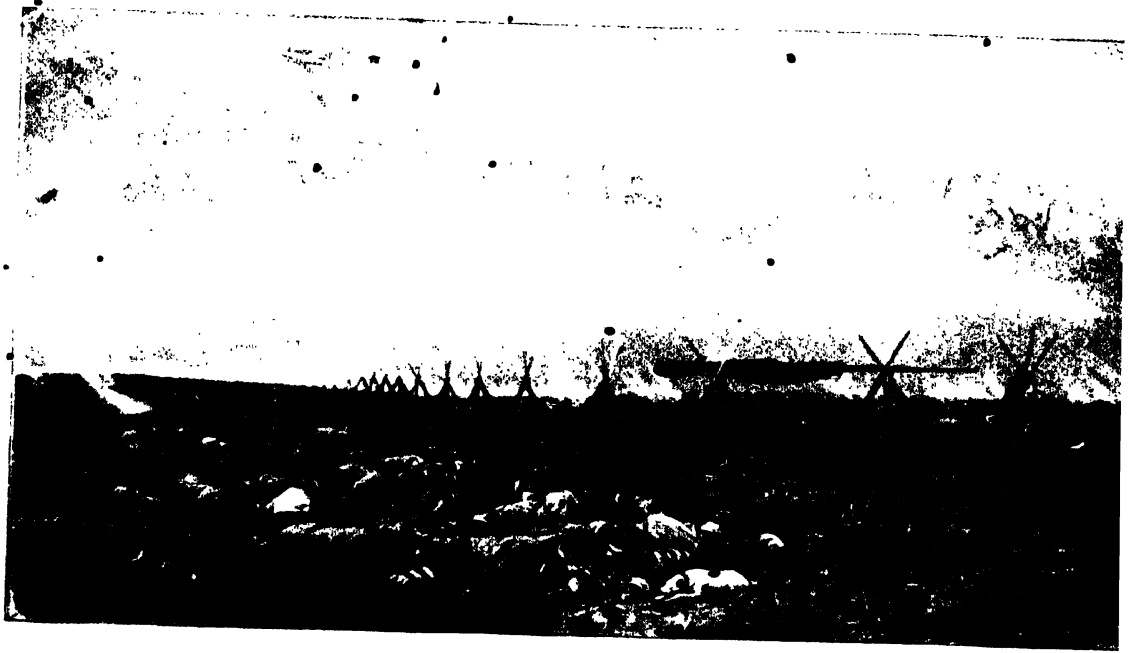
অস্ত্র-সাধনা।

জন পেটি কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।

হাতের লেখা

লিখব তোমার রঙীন পাতায় কোন্ বারতা ?
রঙের তুলি পাব কোথা ?
সে রং ত নেই চোখের জলে, আছে কেবল হৃদয়-তলে,
প্রকাশ করি কিসের ছলে মনের কথা ?
কইতে গেলে রইবে কি তার সরলতা ?

বন্ধু, তুমি বুঝ্‌বে কি মোর সহজ-বলা ?
নাই যে আমার ছলা-কলা।
সুর যা ছিল, বাহির ত্যেজে অন্তরেতে উঠ্‌ল বেজে,
একলা কেবল জানে সে যে মোর দেবতা।
কেমন করে করব বাহির মনের কথা ? *

১১ই আষাঢ়, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৩২১। শান্তিনিকেতন, বোলপুর।

* কোনও বন্ধু, কবির হাতের লেখার জন্য তাঁহার নিকট একখানি খাতা পাঠাইলে, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে এই কয়টী লাইন লিখিয়া দিয়াছিলেন।

বিশ্বসভ্যতায় হিন্দুসমাজের বাণী †

সাম্রাজ্যবিস্তার ও পাশ্চাত্য আদর্শের প্রাবল্য।

ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর হইতেই পৃথিবীতে পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শ প্রবল হইয়াছিল। আরও একটা ধারণা জন্মিয়াছিল, যে, ঐ আদর্শের দ্বারাই পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই সমাজ পুনর্গঠিত হইবে। ফরাসীশক্তির পতনের পর যখন ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছিল, তখন সত্য-সত্যই ইংলণ্ডের চিন্তাবীর দার্শনিকগণ বিবেচনা করিলেন জগতে বুঝি শীঘ্রই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বেন্থাম্-মিল্-প্রমুখ 'লোকহিত'-প্রচারক (utilitarian) দার্শনিকগণ ভাবিলেন প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী ও শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব ইংলণ্ডের নেতৃত্বাধীনে থাকিয়া শীঘ্রই স্বর্গে পরিণত হইবে। বাস্তবজগতের শক্তিপুঞ্জের সংঘর্ষে এ স্বপ্নের মোহ অনেক কমিয়াছে, কিন্তু স্বপ্ন যে ভাঙ্গিয়াছে, তাহা এখনও বোধ হয় না। জর্ম্মানীতে দার্শনিক হেগেল প্রচার করিলেন বিশ্ব-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাই জগতে সমাজ-জীবনের আদর্শ। আর এই বিশ্বসাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা কে হইবেন? দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের দর্পহারী জর্ম্মানজাতির অধিনায়ক ফ্রেডরিকের বংশধরগণ। কিন্তু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও ভোগ করিতে লাগিল ইংলণ্ড।

জর্ম্মানীর দুর্ভাগ্য।

জর্ম্মানী সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা-কর্ম্মে ইংলণ্ড অপেক্ষা বহুকাল পরে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এশিয়া ও আফ্রিকা ভূখণ্ডের সর্ব্বোত্তম অংশগুলি ইংলণ্ড পূর্ব্বেই দখল করিয়া ফেলিয়াছে; কাজেই জর্ম্মানীকে অপেক্ষাকৃত মন্দ দেশগুলি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। কিন্তু তবুও জর্ম্মানী আশা ছাড়ে নাই;—কি জানি কখন্ সে নূতন রাজ্য লাভ করে। জর্ম্মানী প্রচার করিতেছে, ইংলণ্ড বিলাস ও ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই সাম্রাজ্য চাহে, কিন্তু জর্ম্মানীর সাম্রাজ্য-নীতি সেজন্য নহে! লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়াতে, জর্ম্মানরাজ্য তাহার অধিবাসীগণের অন্নসংস্থানের সুযোগবিধান করিতে পারিতেছে না। জর্ম্মানজাতির পক্ষে সাম্রাজ্য জীবননির্ব্বাহের জন্য। ইংলণ্ড কিন্তু একথা স্বীকার করে না। জর্ম্মানীর সমস্ত কাজকর্ম্মকে সে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখে।

আধুনিক ইউরোপে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

জর্ম্মানী তাহার সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যদি ১০ খান যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ করে, ইংলণ্ড ১৬টি জাহাজ নির্ম্মাণ করিতেছে। জর্ম্মানী যদি বিমানপোত নির্ম্মাণ করিতেছে, ইংলণ্ড ফ্রান্সের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করিয়া আপনার ও ফ্রান্সের বিমানপোতগুলির সংখ্যা গুণিতেছে। এরূপে জগতের দুইটী প্রধান রাজ্য সাম্রাজ্য-স্থাপন ও রক্ষার জন্য বহু অর্থব্যয় করিতেছে। এ অর্থব্যয়ের শেষ নাই। কে কাহাকে হটাইতে পারে, ইহাই এখনকার রাষ্ট্রীয় জীবনের উদ্দেশ্য। জর্ম্মানীকে ইংলণ্ড জাহাজনির্ম্মাণ কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিতে বলি-

† এই প্রবন্ধটি চারি পাঁচ মাস পূর্ব্বে আমাদের হস্তগত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে ছাপিবার সুবিধা হয় নাই।
প্রবাসী-সম্পাদক।

তেছে। কিন্তু ইংলণ্ডের নৌযুদ্ধ বিভাগের মন্ত্রী চর্চ্চিলের যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণে বিরত থাকিবার (naval holidayর) প্রস্তাব জর্ম্মানী নামঞ্জুর করিয়াছে। সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম যুগে ইংলণ্ডে ভাব-প্রবণতা ছিল। বেন্থাম ও মিল্ আশার বাণী প্রচার করিতেন। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ প্রমুখ কর্ম্মবীরগণও কম ভাবুক ছিলেন না। জর্ম্মানী-সন্তান হেগেলের দর্শনবাদও চরম আদর্শবাদের সুরে বাঁধা। কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে এ ভাবুকতা একবারেই স্থান পায় না। সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার যে উচ্চ আদর্শ ছিল, তাহা বাস্তবজীবনের আবেষ্টনের আঘাতে বিনষ্ট হইয়াছে। বিশ্ব-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা যে কোন একজাতির পক্ষে সম্ভব, তাহা এখন কোন পাগলও স্বীকার করিবে না। এমন কি প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য রক্ষা করাই রাজনীতিক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাম্রাজ্যের প্রসার অসম্ভব। যখন বর্ত্তমান সাম্রাজ্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, যখন রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে "ততঃকিম্"এর আশা নাই, তখন ভাবুকতা কি প্রকারে থাকিবে? কাজেই আজ-কালকার রাষ্ট্র-মণ্ডল ভাবুকতার পরিবর্ত্তে সঙ্কীর্ণতা, হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতায় পরিপূর্ণ। ইউরোপ এক্ষণে সর্ব্বদাই একটা মহাযুদ্ধের জন্য যেন প্রস্তুত। ইউরোপের যতগুলি রাজ্য আছে তাহারা হয় ইংলণ্ড না হয় জর্ম্মানীর পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য অগ্রসর। বাস্তবিক ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জীবন একটা মহাযুদ্ধের সূচনা করিতেছে। মাঝে মাঝে দুই একজন ভাবুক যুদ্ধের বিরাম আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। নর্ম্যান এঞ্জেল ছদ্মনাম-ধারী লেখক প্রচার করিয়াছেন ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য ব্যাঙ্ক যৌথকারবার প্রভৃতির জন্য এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে একটা বড় রকম যুদ্ধ হইলে জেতা ও বিজিতপক্ষ উভয়ই সমান ভাবে সর্ব্বস্বান্ত হইবে। কিন্তু ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থ, অথবা খৃষ্টানধর্ম্মের উপদেশ, অন্তর্জাতিক সালিসী আদালত (Arbitration Court) অথবা জাতি-কংগ্রেস্ (Races Congress) কোন রকমেই পাশ্চাত্য জগতে যুদ্ধসজ্জার আয়োজন রোধ করিতে পারিতেছে না। গত বাল্কান্ যুদ্ধের খবর যাহাঁরা রাখিয়াছেন তাহাঁরা জানেন, কয়মাস ইউরোপকে কি অশান্তি ও সংশয়ের সহিত কাটাইতে হইয়াছে। সকলেই জানেন যে বাল্কান্‌রাজ্যসমূহের অধিবাসীগণ তুর্কীর সুলতানের অধীনে সুখে বাস করিতেছিল। কিন্তু ইউরোপীয় বহু শাসনকর্ত্তার আদৌ ইচ্ছা নহে যে ঘৃণিত তুর্কী পবিত্র ইউরোপের এক কোণেও স্থান পায়, কাজেই তাঁহারা তুর্কীর খৃষ্টান প্রজাদিগকে বিদ্রোহের উপদেশ দিতে লাগিলেন। বিদ্রোহের পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যখন তুর্কীর রাজধানী কনষ্টাণ্টি-নোপল যায় যায়, তখন ইউরোপীয় শাসনকর্ত্তারা ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিলেন, তুর্কী এবার "ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিবে,"—এশিয়ায় আসিয়া মুসলমান শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত হইবে, এশিয়ার মঙ্গল হইবে। ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইল। ইতিমধ্যে বাল্কানরাজ্যগুলির মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল। এ গৃহবিবাদ মিটাইতে যাইয়া ইউরোপে মহাসংগ্রামের সূচনা হইল। শেষে কূট-নীতির জয় হইল। সমগ্র ইউরোপ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইল না বটে, কিন্তু যুদ্ধশিবির থাকিয়া গেল। শিবির ছাড়িয়া ইউরোপীয়গণের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা সব সময়েই রহিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় জীবনে ভাবুকতার অভাব।

কি ছিল, আর কি হইল! ইউরোপ উনবিংশ শতাব্দী আরম্ভ করিয়াছিল পৃথিবী জয় করিবার উদ্দেশ্যে। শুধু শস্ত্রের দ্বারা জয় নহে, হৃদয়ের দ্বারা জয়ের জন্য। আশা ছিল, ইউরোপ পতিত নিম্নজাতিসমূহকে উদ্ধার করিবে। শুধু আলেকজাণ্ডার, সিজার, শার্লেমেনের আত্মা নহে; সেণ্ট পল, সেণ্ট পিটার, সেণ্ট ফ্রান্সিসের আত্মাও ইউরোপকে দিগ্বিজয়কর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিয়া-ছিল। সমগ্র জগতে খৃষ্টিয়ানধর্ম্ম প্রচার করিয়া অসভ্য বর্ব্বর জাতিসমূহকে ত্রাণ করিবার একটা উদ্যম ছিল। খৃষ্টিয়ান শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা অনুন্নত জাতিসমূহকে উত্তো-লন করা একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আজ উনবিংশ শতাব্দীর শেষে কি দেখিতেছি?—এই সমস্ত আশার মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে। পিট্ ডিসরেলীর

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। হেগেল-শিষ্যগণের রাষ্ট্রনৈতিক ভাবুকতা বাস্তবজীবনের সম্পর্কে আসিয়া প্রলাপে পরিণত হইয়াছে। ইউরোপের দিগ্বিজয়ের আশা ব্যর্থ হইয়াছে। এখন দিগ্বিজয় দূরে থাকুক, আত্মরক্ষাই রাষ্ট্রীয় জীবনের চরম লক্ষ্য হইয়াছে। শুধু বিদেশী শত্রু হইতে রক্ষা নহে, দেশের শত্রু হইতেও রক্ষা আবশ্যক। সমগ্র ইউরোপ আজ নিজের ঘর সামলাইবার জন্য সমস্ত শক্তি ও সাধনা নিয়োগ করিতেছে।

(ক) ঘরের শত্রু।

প্রথমে ঘরের শত্রুর কথা বলিতেছি। ইউরোপীয় সমাজের বিভীষণ হইয়াছেন সমাজতন্ত্রবাদীগণ। ইহাঁদের মধ্যে দেশ-সেবার প্রবৃত্তি নাই বলিলেই চলে। জাতীয়তার দোহাই ইঁহারা অগ্রাহ্য করিতেছেন। এমন কি বিদেশের শত্রু হইতে যখন ঘোর অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা, তখনও সমাজতন্ত্রবাদীগণ দেশের শ্রমজীবী ও ধনী সমাজদ্বয়ের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত করিতেছেন। এইরূপ দ্বন্দ্ব বাধাইতে ইহাঁরা কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না। ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই সমাজতন্ত্রবাদীগণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন। আর ইহাঁদিগের আশাও বড় কম নহে। পাশ্চাত্য সমাজ যে শিল্প ও ব্যবসার প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধনবলে এত গরীয়ান ও গর্ব্বিত, সেই প্রণালীর তাঁহারা আমূল পরিবর্ত্তন করিবেন। এই পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য যদি সমাজের গোড়াপত্তন ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হয়, তাহাও করিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর। ইহাঁরা যদি কিছুদিন অপেক্ষা করেন তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ সুবিধা; কিন্তু কিছুতেই ইহাঁরা সবুর করিবেন না। কাজেই ইউরোপীয় সমাজের এখন সমস্যা—ঘর দেখিবে, না বাহির দেখিবে, ঘরের শত্রু সামলাইবে, না বাহিরের শত্রুকে ঠেকাইবে ?

(খ) বিদেশী শত্রু।

আর বাহিরের শত্রু বড় যেমন-তেমন নহে। ইউরোপে রাজ্যে রাজ্যে এখন আকাশ পাতাল তফাৎ নাই, উনিশ বিশ তফাৎ মাত্র। সব দেশই ব্যবসায় দ্বারা বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। যুদ্ধের আয়োজনের জন্য সব দেশই অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছে। একারণে ঋণ গ্রহণ করিতেও সব দেশই সমান ভাবেই প্রস্তুত ও অগ্রসর। বিজ্ঞান এখন কোন দেশবিশেষের গৌরবের সামগ্রী নহে। বিজ্ঞান আজকাল সমগ্র মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। বিশেষতঃ বিজ্ঞানের যে প্রয়োগ দ্বারা মানুষ মানুষকে সহজে হত্যা করিতে পারে, তাহা ইউরোপের হাট বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। কালের প্রভাবে ধনুর্বিদ্যা ব্যক্তিগত তপস্যালব্ধ ধন নহে। ইউরোপীয় শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট মহাদেবের সযত্নরক্ষিত পাশুপত অস্ত্র শেল ও বাণগুলি নন্দী ভৃঙ্গী অর্থের বিনিময়ে পরিত্যাগ করিতেছে। শিবকে আরাধনা কেহই করিতেছে না. এখন নন্দী ভৃঙ্গীর উপাসনা চলিতেছে। কাজেই ইউরোপীয় সমাজ মহাশ্মশানের মত ভূত পিশাচ দৈত্য দানবের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

আমেরিকার মোহ।

কাজেই বিংশশতাব্দীর প্রথমভাগে ইউরোপ দিগ্বিজয়ের আশা একবারেই ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে। আবেষ্টনের আঘাতে ইম্পীরিয়ালিজমের * অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের মোহ গিয়াছে। শুধু আমেরিকা আবেষ্টনের আঘাত পায় নাই, তাই এখনও সে আস্ফালন করিতেছে। তাই সে স্পর্দ্ধার সহিত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীন করিয়া দিবে বলিয়া প্রচার করিয়াছে। তাই মেক্সিকোর জনশক্তির প্রতি তাহার এতাদৃশ অবজ্ঞা। আবেষ্টনের আঘাত পাইলে আমেরিকা তাহার 'মিশন'কে এত বড় করিয়া দেখিত না, এবং ফিলিপাইন অধিবাসীগণের শিক্ষা ও দীক্ষার গুরুভারকে সে এত লঘু বোধ করিত না। আবেষ্টনের আঘাত আমেরিকা পায় নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে যে পাইবে না তাহা নহে। প্রাচ্যজগতে জাপানী নূতন বলে বলীয়ান হইয়াছে। চীনও মাথা তুলিয়াছে। আর পানামা খাল কাটিয়া দেওয়াতে দক্ষিণ আমেরিকায় যে এক নূতন রাষ্ট্রশক্তির শীঘ্রই উদ্বোধন হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সমস্ত শক্তির

* অর্থাৎ জাতিবিশেষ দ্বারা বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনাতেই মঙ্গল, এই বিশ্বাস।—প্রবাসী-সম্পাদক।

সংস্পর্শে আসিয়া আমেরিকার মোহ কতদিন থাকিবে, কে বলিতে পারে ! আমেরিকার মোহ এখনও যায় নাই।

নব্য পাশ্চাত্যের তথাকথিত শান্তিপ্রিয়তা।

নব ইংলণ্ড এখনও নূতন করিয়া গড়িতে চাহে। কিন্তু ইংলণ্ড এখন পুরাতন লইয়াই ব্যস্ত। ইংলণ্ড নূতন কিছু আর চাহে না। নূতন ব্যবসায়ে নামিবার আর তাহার ইচ্ছা নাই। এখন পুরাতন হিসাবপত্রের অনুযায়ী তাহার প্রাপ্য আদায়গুলি পাইলেই সে সন্তুষ্ট থাকিবে। ইম্পীরিয়ালিজমের পরিবর্ত্তে জিঙ্গোয়িজমের অর্থাৎ যুদ্ধপ্রিয়তার এখন আদর। টেনিসনের আসন কিপ্‌লিং অধিকার করিয়াছেন। নবযুগের নূতন বাণী প্রচার করিবার লোক ইংলণ্ডে কেহ নাই। বৃদ্ধ ফ্রেড্‌রিক হ্যারিসন ইহাঁদের একমাত্র চিন্তাবীর। ব্যার্গস, মেটার-লিঙ্ক, অয়কেন সকলেই বিদেশী। আলষ্টার ও দক্ষিণ আফ্রিকায় গোলমাল বাধিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার গোলমাল মিটিবার আশা নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যে রংয়ের জন্য অধিকারের প্রভেদ যতদিন না যাইবে, ততদিন এ গোলমাল মিটিবে না; আর এই প্রভেদ যে জগতে শীঘ্র দূর হইবে, তাহা কেহই বলিতে সাহসী নহেন। ইংলণ্ডের ভিতর যাঁহারা ঘরের লক্ষ্মী, সেই রমণীগণ ঘর দরজা জানালা ভাঙিয়া চুরমার করিতেছেন। তাঁহাদিগকে ভোট দিবার ক্ষমতা না দিলে তাঁহাদের নারীজন্ম ব্যর্থ হয়, এই তাঁহাদের অভিযোগ। তাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইংরেজ ভূম্যধিকারীগণ লয়েড জর্জ্জের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিতেছেন না। যাঁহারা ক্রেসী, পোয়াটিয়ে যুদ্ধ জিতিয়া ইংলণ্ডের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, ইংলণ্ড তাঁহাদের বংশধর ও সমশ্রেণীস্থগণের সম্মান রাখিতেছে না। তাঁহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে তাহাদের ক্ষমতা প্রায় অন্তর্হিত। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে শ্রমজীবীগণ মূলধনী শ্রমব্যবসায়-পরিচালকগণের সহিত তুমুল কলহ আরম্ভ করিয়াছে। ধর্ম্মঘট করিয়া আপনাদের মজুরী বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে। লার্কিনিজম্ * এখন প্রবল। রাষ্ট্রীয় জগতে ও ব্যবসায়-জগতে ঘরের গোলমাল মিটান ইংলণ্ডের শাসনকর্ত্তাদিগের একটি দুরূহ সমস্যা। আর এ গোলমালকে বাড়িতে দেওয়া কোন মতেই শ্রেয় নহে। কারণ পাছে জর্ম্মান বিমান-পোত বৃটিশ ডকের উপর উড়িয়া আসিয়া শেল্ ছুড়িয়া ডক পুড়াইয়া দেয় এই আশঙ্কায় ইংলণ্ডে অনেক ডক-দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। কান্দাহার-প্রিটোরিয়া-জয়ী লর্ড রবার্টস্ সৈন্যসংস্কার চাহিতেছেন। এই ত গেল ইংলণ্ডের অবস্থা।

জর্ম্মানীরও সেই দশা।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সন্ধিস্থাপন জর্ম্মানী অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় সভাপতি ইংলণ্ডে গেলেন, তাহাতে জর্ম্মানীর কাগজওয়ালাদিগের নানা ভয় ও সন্দেহ উপস্থিত হইল। জর্ম্মানীর দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানায় দুর্গ-নির্ম্মাণ চলিল। কি জানি ফরাসী সৈন্য যদি এল্‌সাস্-লোরেনের লোভ সামলাইতে না পারিয়া হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বসে। এদিকে সমাজ-তন্ত্রবাদীরা (social democrats) রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে খুব প্রবল হইয়াছে। জর্ম্মানীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা তাহারা চাহে না। যুদ্ধসজ্জার জন্য তাহারা অর্থব্যয় ও শক্তিনাশ করিতে চাহে না। গবর্ণমেণ্টের সমস্ত শক্তি শ্রমজীবীগণের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হউক, ইহাই তাহাদের ইচ্ছা।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মানী প্রতিমুহূর্ত্ত এরূপে দিনে দুপুরে বজ্রাঘাতের প্রতীক্ষা করিতেছে। জর্ম্মানী ইহাদিগের মধ্যে দুঃসাহসী, সে একটা গোলমাল বাধাইতে পারি-লেই বাঁচে। ফ্রান্সের তত সৈন্যবল নাই, সে সময় চাহে। আর ইংলণ্ডের পক্ষে তাহার সাম্রাজ্য-রক্ষা প্রধানতম কর্ত্তব্য। জগতে শান্তি তাহার পক্ষে কল্যাণপ্রদ। সে status quo বা স্থিতিশীলতার পক্ষপাতী, কারণ একবার একটা গোলমাল বাধিলে কি হইতে কি হয় কে জানে?

* অর্থাৎ লার্কিনের মত ও তাহার অনুসরণ। জেমস্ লার্কিন শ্রমজীবীদের একজন নেতা। কোন এক ব্যবসায়ে নিযুক্ত শ্রমজীবী-দিগের অধিক পরিশ্রম, কম বেতন বা তদ্রূপ কোন অসুবিধা থাকিলে, তাহা দূর করিবার জন্য যদি, অসুবিধা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে, তাহাদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইবার জন্য অন্যান্য সব ব্যবসায়ের শ্রমজীবীদেরও ধর্ম্মঘট (sympathetic strike) করা উচিত। ইহাই লার্কিনের বিশেষ মত, ও ইহাই তাঁহার হাতে মূলধনীদের সঙ্গে সংগ্রামের প্রধান অস্ত্র।—প্রবাসী-সম্পাদক।

তাই রুশ যে পারস্য ও মোঙ্গলিয়ায় ব্যবসায় ও রাজনীতিক্ষেত্রে আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিতেছে, তাহা ইংলণ্ড অবাধে সহ্য করিতেছে; অথচ ইংলণ্ডের পক্ষে এশিয়া-ক্ষেত্রে রুশের পশ্চাতে পড়া কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু রুশ শীঘ্রই একটা কিছু করিয়া উঠিবে না। সে ভয়ে ভয়ে অতি সাবধানে কাজ করিতেছে। কারণ সে জাপানের নিকট যে শিক্ষালাভ করিয়াছে সে শিক্ষা ভুলিতে পারে নাই, আর ভুলিতে পারিবে না। জাপান শুধু রুশের কেন, সমগ্র ইউরোপেরই চোখ ফুটাইয়াছে।

নব্য প্রাচ্যের ভাঙ্গাগড়া।

রুশ পরাজয়ের পর হইতে এশিয়ায় নবযুগ আসিয়াছে। এই নবযুগের প্রধান লক্ষণ এশিয়াবাসীর আত্মপ্রতিষ্ঠা। পারস্যদেশে রাজনৈতিকক্ষেত্রে প্রজাবৃন্দ আপনাদের অধিকার সম্রাটের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছে; তবুও সেখানে প্রজাতন্ত্র এখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। চীনে রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল; চীন এখন তিব্বতপ্রদেশ দখল করিতে প্রস্তুত। নব্য এশিয়ায় যে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে সর্ব্বত্র গতি, পরিবর্ত্তন, ভাঙ্গাগড়া ও উন্নতির লক্ষণ বর্ত্তমান। নব্য এশিয়ার ভিতর দিয়া একটা জীবন-চাঞ্চল্য বহিয়া যাইতেছে, প্রত্যেক শিরায় শিরায় জীবনস্পন্দন অনুভূত হইতেছে।

উদাহরণ—চীনের রাষ্ট্রবিপ্লব।

চীন একটা ছোট দেশ নহে। আয়তনে চীন একটা ইউরোপ বিশেষ! কিন্তু কি শীঘ্রই অতবড় একটা বিপ্লব সাধিত হইল। মানচুদিগের ক্ষমতা চীনসমাজে বড় কম ছিল না, আর সৈন্য সামন্ত সবই ত মানচুদিগেরই হাতে ছিল। কিন্তু যখন সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা জাগিয়া উঠিল, তখন মানচুদিগকে অবিলম্বে হঠিতে হইল। চীনে যে আন্দোলন হইয়াছিল তাহা সার্ব্বজনীন, সমাজকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া সেখানে খুব অধিক যুদ্ধ ও রক্তপাত হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস স্মরণ করিলে বুঝা যায়,—রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বে চীনসমাজে কত বড় একটা আন্দোলন হইয়াছিল।

সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডে যে নূতন শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা সমাজকে গভীরভাবে জীবন-চাঞ্চল্যে স্পন্দিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচ্য সমাজ যে এখন সাড়া দিয়াছে, তাহা প্রাচ্যের পক্ষে মঙ্গল।

নব্য এশিয়ার বাণী।

যখন প্রাচ্য জগতে রুশ ও জাপান রাষ্ট্রশক্তির তুমুল সংঘর্ষের আয়োজন চালাইতেছিল, তখন জাপানের প্রধান দার্শনিক ভাবুক ওকাকুরা 'The Ideals of the East' (প্রাচ্যের আদর্শ) গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। প্রাচ্য জগতে যখন জাপানের রাষ্ট্রশক্তির প্রাধান্য প্রমাণিত হইল, তখন ওকাকুরা প্রাচ্য সমাজের বাণী প্রচার করিলেন। যখন ইউরোপীয় সমাজ সভ্যতম সমাজ বলিয়া স্বীকৃত, যখন ইউরোপীয় সমাজ পৃথিবীর সকলদেশের সামাজিক আদর্শ নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল, তখন প্রশ্ন করিলেন,—

The west is for progress, but progress towards what? When material efficiency is complete, what end, asks Asia, will have been accomplished? When the passion for Fraternity has culminated in universal co-operation, what purpose is it to serve? If mere self-interest, where do we end the boasted advance? * * * * Size alone does not constitute true greatness, and the enjoyment of luxuries does not always result in refinement. In spite of the vaunted freedom of the west, true individualism is destroyed in the competition for wealth, and happiness and contentment are sacrificed to an incessant craving for more.

তুমি সভ্য, তুমি উন্নত, তুমি ধনী, তুমি ক্ষমতাশালী, কিন্তু ততঃ কিম্? তোমার অর্থ, তোমার বিলাসিতা, তোমার সাম্রাজ্য দেখিয়াই কি তোমার উন্নতি বিচার করিব? তুমি ব্যক্তির স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছ, কিন্তু তোমার সমাজ ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বিকাশ না করিয়া উহাকে খর্ব্ব করিতেছ। অর্থপূজা ও অভাব-অর্চ্চনায় তুমি মনুষ্যের স্বাধীনতা ও প্রকৃত আনন্দ বলিপ্রদান করিয়াছ।

জাপান রুশকে হটাইয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজের প্রবল আক্রমণ হইতে জাপান রক্ষা পাইয়াছে। জাপান প্রাচ্য আদর্শ নিজ বলে বজায় রাখিয়াছে। অনেকে বলিতেছেন,

জাপান ক্রমশঃ ইউরোপীয় আদর্শ নকল করিতেছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। জাপানে বুসিদোর প্রতিপত্তি, জাপানের চিত্রকলা ও শিল্পপদ্ধতি, জাপানের সমাজ ও চিন্তার উপর, বৌদ্ধধর্ম, কনফুসিয়াসের ধর্ম ও চীন সভ্যতার প্রভাব বিদেশীয়গণ ধারণা করিতে পারেন না। একজন জাপানী লেখক সম্প্রতি 'Life and Thought in Japan' 'জাপানী জীবন ও চিন্তা' নামক পুস্তকে জাপানের ভিতরকার জীবন সম্বন্ধে অনেক সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, জাপান পাশ্চাত্য আদর্শকে হজম করিতেছে, এখনও সে এশিয়া জননীর প্রিয় পুত্রের মত তাঁহারই কোল আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে।

চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আর এক পুত্রের গৌরবে এশিয়া-মাতার মুখোজ্জ্বল হইল।

ভারতাত্মা।

কিন্তু এশিয়ামাতার যে প্রিয়তম পুত্র, সে হতাশ হীনবল হইয়া এতকাল পথে পথে ভিখারীর মত কাঁদিতেছিল। অতীতের গৌরবের সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া সে ভগ্নোদ্যম। নিরাশার গভীর অন্ধকারে সে বিষাদের গান গাহিতেছিল,—

"ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নেরি ঘোর, ছিঁড়ে গেছে মোর এ বীণার তার,
আজ এ শ্মশানে ভগ্নপরাণে কি গান আমি গাহিব আর?"

এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও শেষে দিব্য আলোক আসিল।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দিব্য দৃষ্টি।

একজন তরুণ সন্ন্যাসী সেই দিব্য আলোক পাইয়াছিলেন। বাংলার পল্লীগ্রামের এক প্রান্তে দেবীমন্দিরের সামনে বসিয়া তিনি এক বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। তাঁহার দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে ভারতের এক গৌরবময় যুগ অত্যুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইল। সে আলোকে বর্ত্তমানের সমস্ত কালিমা দূর হইল। জগতে সেই যুগ আরও উজ্জ্বল ও গরীয়ান হইয়া ফিরিয়া আসিল। ভগবান বুদ্ধবেশে নূতন মূর্ত্তিতে এই পবিত্র ভূমিতে আবার অবতীর্ণ হইলেন। বিশ্বজগতে ভারতের সেই চিরপুরাতন বাণী আবার প্রচারিত হইল। হিন্দু ও বৌদ্ধের মৈত্রী ও অহিংসামন্ত্র আবার প্রচারিত হইল। আলেকজাণ্ডার, সীজার, অশোক, শার্লেমেন, নেপোলিয়ানের আত্মা এক বিরাট বিশ্ববিজয়ের সূচনায় চঞ্চল হইলেন। তাঁহারা তাঁহাদের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধনের সুযোগ দেখিয়া আবার জগতে নূতন দেহ পরিগ্রহ করিলেন। ভারতবর্ষের পরিব্রাজক দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন। অতীত ইতিহাসে শুধু দিগ্বিজয়ী রণবীরসমূহের আত্মা নহে, খ্রীষ্টীয় সাধুগণ, মোহম্মদীয় সুফীগণ, কনফুসিয়াস প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণ, দান্তে, কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি ভাবুকগণের আত্মাও নূতন দেহ পরিগ্রহ করিয়া পরিব্রাজককে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। বিশ্বে শান্তি ও মৈত্রীর রাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন দেখিয়া তাঁহারা পরিব্রাজককে তাঁহাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। ভারতীয় পরিব্রাজকের এবার শুধু চীন, জাপান, তিব্বত, শ্যাম, কাম্বোজ, যবদ্বীপে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা নহে, এবার সমগ্র সভ্যজগৎ ব্যাপিয়া ভারতের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইল। বিশ্বসভ্যতার বাণিজ্যের পথগুলি ভারতীয় পরিব্রাজককে আহ্বান করিয়া লইল। সভ্যজগতের মুদ্রাযন্ত্রের সমস্ত শক্তি পরিব্রাজকের সহায় হইল। লণ্ডন, চাকাগো, রোম, জেনেভা, ভিয়েনা নগরীর বক্তৃতা-মঞ্চ পরিব্রাজকের চরণ-ধূলিতে পবিত্র হইল। ভারতীয় পরিব্রাজক পাশ্চাত্য সমাজের অন্তস্তলে পৌঁছিলেন। সেখানে দেখিলেন,—দক্ষের মহাযজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। মহাযজ্ঞ অসীম শক্তি, অপরিসীম ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। সেখানে অর্থ আছে, ভোগ বিলাসিতা আছে, শুধু নাই শিব মঙ্গল। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর, বিলাসিতার মত্ততা ও ধর্ম্মের অপমানের মধ্যে শিব কল্যাণ উপেক্ষিত। শক্তির সেখানে অপমান ও লাঞ্ছনা।

পরিব্রাজক ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে চক্ষু মুদিলেন। মানসনেত্রে তিনি এক অপরূপ ভুবনমোহন মূর্ত্তি দেখিলেন। কর্ণকুহরে অতি গম্ভীর ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সহসা সে মূর্ত্তি, সে ধ্বনি আরও পরিস্ফুট হইল,—বিশ্বের গরল কণ্ঠে ধরিয়া, মস্তকে বিশ্বসংসারের জটাভার লইয়া, ভালে চিরনবীনতার অকলঙ্ক শশী লইয়া, বম্ বম্ শব্দ

করিয়া ত্রিশূলপিনাকধারী শিব আবির্ভূত হইলেন। জগতে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইল। জল স্থল আকাশ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অসংখ্য সমুদ্রপোত বিমানপোতের কামান বন্দুক ও শেলের সংঘর্ষে মহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। জগতের মহাচিতা জ্বলিয়া উঠিল, আর সে মহাচিতায় মহারুদ্র নাচিতে লাগিলেন। মহারুদ্রের মহানৃত্যের প্রতিপদক্ষেপে বলটিক, ভূমধ্যসাগর, প্রশান্ত ও আটলাণ্টিক মহাসাগরের বিপুলকায় রণতরী-গুলি খণ্ড খণ্ড, চুরমার হইতে লাগিল, মহানৃত্যের তালে তালে অগণ্য সেনানিবাস, ডকইয়ার্ড, বন্দর, মহানগরী গুঁড়াইয়া গেল, মহাজাতি সমূহের অগণ্য সৈন্যদল একনিমেষে কোথায় দলভঙ্গ হইয়া ছুটিয়া গেল। মরণের উন্মত্ত কোলাহলে চারিদিক মুখরিত হইল। তাহার পর শান্তি, আনন্দ, নূতন দেহ, নূতন বল, নূতন আশা।

হিন্দু সন্ন্যাসী এ দৃশ্য দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইলেন। তিনি তাঁহার জীবনে এ অলৌকিক দৃশ্য বাস্তবে পরিণত হইতে দেখেন নাই।

বিবেকানন্দ অকালে দেহত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অল্পায়ু জীবন হইতে তাঁহার জাতি নবজীবন লাভ করিয়াছে। তিনি যে উদাত্ত স্বরে ভারতবাসীকে নূতন কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিয়াছেন, সে আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই,—

"পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, দাসসুলভ দুর্ব্বলতা এবং ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা" পরিত্যাগ করিয়া ভারতবাসী মাত্রেই আজ 'মানুষ' হইতে চাহিতেছে।

হিন্দুর আত্মপ্রতিষ্ঠা।

বাস্তবিক আমাদের জাতীয় জীবনে কেবল যে পরানুবাদ পরানুকরণের আকাঙ্ক্ষা হ্রাস পাইয়াছে তাহা নহে, কেবল ভারতের সামাজিক আদর্শ ভারতবাসীর নিকট যে আরও গরীয়ান হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের হিন্দু আদর্শ এখন জাতীয় চরিত্র গঠন ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ এখন তাহাদের সমস্ত শক্তিতে হিন্দু আচার ব্যবহার রীতি নীতি রক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেছে না, হিন্দুর বিচিত্র আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়া যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র ফুটিয়া উঠে—তাহাই ধর্ম্ম ও সমাজের উদ্দেশ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষের সমাজ আত্মরক্ষা করিতে গিয়া বুঝিয়াছে, তাহার নিকট শত্রু নিশ্চয়ই পরাজিত হইবে। ভারতীয় সমাজের মূলমন্ত্র এখন আত্মরক্ষা নহে। এখন পরানুবাদ পরানুকরণের বিপদে সমাজ ত্রস্ত নহে। সমাজে এখন নূতন বল নূতন শক্তি আসিয়াছে। হিন্দু সভ্যতার আদর্শগুলি বিদেশীয় সমাজের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিবে, ইহা একটা আশা নহে, একটা কল্পনা নহে,—ইহা সমাজের একটা বদ্ধমূল ধারণা। আর এই ধারণা হিন্দু সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অনুপ্রাণিত করিতেছে বলিয়া, হিন্দু চরিত্রে নূতন গুণের সমাবেশ দেখা যাইতেছে।

হিন্দুর নূতন ব্যক্তিত্বের সূচনা।

হিন্দুর ব্যক্তিত্বে নূতন গুণের আভাস কে না লক্ষ্য করিয়াছেন? বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত নরনারায়ণ পূজার মর্ম্ম কে না বুঝিয়াছেন? হিন্দুর বৈরাগ্য এখন কর্ম্মে অস্পৃহা না আনিয়া কর্ম্মপ্রবণতা আনিতেছে। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন, কর্ম্মীই প্রকৃত ভক্ত যখন তিনি আপনাকে ভগবানের যন্ত্রী ভাবিয়া কর্ম্ম করেন; যোগীই প্রকৃত ভক্ত যখন তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবৎচিন্তায় আত্মসমর্পণ করেন। এখন কর্ম্মীই প্রকৃত ভক্ত হইয়াছেন। কর্ম্মযোগই এখন লক্ষ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষের আধুনিক বৈরাগ্য এবং মুক্তি শুধু একা আপনাকে লইয়া নহে। কবি এই নূতন প্রকার মুক্তির বাণী প্রচার করিয়াছেন,—কবি গাহিয়াছেন,—

> "চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর
> লক্ষ কোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর।"
> "বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
> আমি একা বসে র'ব মুক্তি-সমাধিতে?"

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-হৃদয়ের ভিতর হইতে এই প্রশ্ন এখন উত্থিত হইয়াছে। "অনন্ত জগৎভরা দুঃখ শোক" থাকিতে ভক্ত শুধু আপনার ক্ষুদ্র আত্মা লইয়া জগতের পানে বিমুখ হইয়া যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় চাহিয়া থাকিবে,

আধুনিক হিন্দুর ব্যক্তিত্ব তাহা চাহে না। নৈতিক দুর্ব্বলতা, বহির্মুখী প্রবৃত্তির প্রাবল্য অথবা প্রকৃত 'বৈরাগ্যের' অভাবের জন্য যে এই প্রকার পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে, তাহা নহে। আমাদের সমাজে এখন একটা সর্ব্বাঙ্গীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের সূচনা হইতেছে বলিয়া এই নূতন তত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।"

সমগ্র সমাজ আরও কঠোর বৈরাগ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছে বলিয়া সমস্ত বন্ধনকে সে আলিঙ্গন করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার খুলিয়া সে মুক্তির আনন্দ লাভের প্রত্যাশী—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি—সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণ-গন্ধময়! প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার!
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া;
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

গৃহ সংসার, পিতামাতা, মিত্র পরিবার, সমাজ—তখন বন্ধন নহে; ইন্দ্রিয়ের সুখদুঃখ ভোগ, মোহ নহে; তখন

"দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদের এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি,
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালী হিয়ার অমিয়া মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।

শুধু ক্ষুদ্র সংসার সমাজ কেন, সমস্ত বিশ্বভুবন প্রেমের টানে ধরা দেয়।

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়,
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়,
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে;—সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে,
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী—জন্মমৃত্যু-সমুদ্র দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাঁটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান্।
সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজ করিছে নর্তন।

রবীন্দ্রনাথ, বৈরাগ্য নহে, প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার গীতাঞ্জলির একমাত্র সুর এই

"ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন গাহিস্ ওরে?
* * * *
কর্ম্মযোগে তার সাথে এক হয়ে
ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে।"

নর-নারায়ণের পূজা।

নর-নারায়ণ-পূজা-প্রবর্ত্তক বিবেকানন্দ তাঁহার অমোঘ কণ্ঠে বলিয়াছেন,—

শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার
—মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম, প্রেম প্রেম এই মাত্র ধন!
হয় বাক্যমন-অগোচর, সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা মাতৃভাবে তাঁরি আগমন॥
ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

বিবেকানন্দ বুঝাইয়াছেন, বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির নিকট আত্মা বলিতে জীবাত্মা বুঝায় না, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী সকলের আত্মারূপে অবস্থিত সর্ব্বেশ্বর বুঝিতে হইবে। যখন জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন, তখন জীবের সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম দুই একই। জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয় তাহা করা প্রেম নহে, আত্মবুদ্ধিতে জীবের যে সেবা করা হয় তাহা প্রেম। আমাদের অবলম্বন—প্রেম; দয়া নহে। আমরা দয়া করি না, সেবা করি। কাহাকেও দয়া করিতেছি, এ অনুভব আমাদের নাই, তাহার পরিবর্ত্তে আমরা সকলের মধ্যে প্রেমানুভূতি ও আত্মানুভব করিয়া থাকি।

বিবেকানন্দ এই বৈরাগ্যরূপ প্রেমানুভবের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। ইহারই উপর তাঁহার নর-নারায়ণ-

পূজা প্রতিষ্ঠিত। বিবেকানন্দ আমাদিগকে গরীবের জন্য, দুঃখীর জন্য, পাপীর জন্য কাঁদিতে শিখাইলেন। তিনি দেখাইলেন, ভগবান নারায়ণ দুঃখী, পাপী, তাপী, গরীব সাজিয়া আমাদের নিকট কৃপা চাহিতেছেন। আর আমরা এতকাল তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। তিনি ভিখারী সাজিয়া আমাদের দেবমন্দিরে আসিয়া ভক্ত পুরোহিতের নিকট কাতর কণ্ঠে কহিতেছেন,

> গৃহ মোর নাই
> এক পাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাই।

আর আমরা দেবতার নিকট বসিয়া জপমালা জপিতে জপিতে তাঁহাকে বলিয়াছি,

> "আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে।"
> সে কহিল, "চলিলাম।"—চক্ষের নিমেষে
> ভিখারী ধরিল মূর্ত্তি দেবতার বেশে।
> ভক্ত কহে, "প্রভু মোরে কি চল ছলিলে
> দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি দিলে!
> জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে
> গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

দেবতা চলিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তিনি মন্দিরে আবার আসিয়াছেন। আমাদের সমাজে দরিদ্র, নীচ, মূর্খ, নিরক্ষর নির্যাতিতদের সেবা আরম্ভ হইয়াছে।

বিবেকানন্দের নর-নারায়ণ পূজা আজ ভারতবাসীর পূজা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ভারতবাসী আজ বলিতে শিখিয়াছে, "আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী।"

হিন্দুসমাজের ক্রমবিকাশের মূলমন্ত্র।

প্রাচীনকালে হিন্দুর ব্যক্তিত্ব বিভিন্নভাবে বিকাশলাভ করিয়াছিল। প্রাচীনকালের হিন্দু ঋষিগণ আমাদের সমাজকে বিভিন্ন আশ্রমে ও জাতিতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহিত গোষ্ঠীজীবনের সমন্বয় বিধান করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুসমাজে গোষ্ঠীর প্রভাব যেরূপ প্রবল হইয়াছিল, অন্য কোন সমাজে তাহা হয় নাই। অথচ গোষ্ঠীপ্রভাবের প্রাবল্য হেতু হিন্দুর ব্যক্তিত্বের খর্ব্ব হয় নাই। কারণ হিন্দু-ধর্ম্মের কেন্দ্র সমাজ নহে—ব্যক্তি। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের চরমবিকাশ, মুক্তি,—গৃহ, সংসার, সমাজের বন্ধন হইতে মুক্তি। সমাজ ব্যক্তিকে নানা কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়া বাঁধিয়া রাখিতেছে, অপরদিকে ধর্ম্ম তাহাকে বৈরাগ্যের কথা শুনাইয়া মুক্তির পথ প্রশস্ত করিতেছে। এইরূপে হিন্দুর ব্যক্তিত্ব বিকাশলাভ করিয়াছিল।

প্রাচ্য সমাজের ক্রমবিকাশের মূলমন্ত্র।

পাশ্চাত্য জগতের নৈতিক ব্যবস্থা ঠিক বিপরীত। পাশ্চাত্য জগতে সমাজই ব্যক্তির প্রভাব বিস্তারের প্রধান সহায়। সমাজ ব্যক্তিকে পূজা করিতেছে। তাহার বিনিময়ে সমাজের নিকট ব্যক্তির কিছু দেয় নাই। এমন কি, সমাজ অনেক সময়ে সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগ প্রদান করিয়া থাকে। শুধু সামাজিক ব্যবস্থা নহে, সেখানকার আধুনিক দর্শন বলিতেছে, মনুষ্যের প্রতিযোগিতার দ্বারাই ব্যক্তিত্বের পুষ্টিসাধন হয়। সমর্থের জয়লাভ ও অক্ষমের বিনাশ না হইলে, সমাজের উন্নতি অসম্ভব, ইহাই সেখানকার ধারণা। সমাজ আপনার পদে নিজেই কুঠারাঘাত করিতেছে। ধর্ম্ম, যীশুখৃষ্টের সেবার ধর্ম্ম, পাশ্চাত্য সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতাকে খর্ব্ব করিয়া, ব্যক্তিকে গোষ্ঠীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করাইয়া লইয়াছিল; কিন্তু ফরাসীবিপ্লবের নেতারা যখন খৃষ্টকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া বুদ্ধিকে বরেণ্য বলিয়া মনোনীত করিলেন, তখন হইতে পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীপ্রভাব যে আবার প্রবল হইবে সে আশা গিয়াছে। * এজন্য সম্প্রতি পাশ্চাত্য জগৎ নূতন মূলমন্ত্র গ্রহণ করিয়া আপনার সমাজ পুনর্গঠন করিতে প্রয়াসী।

---

* If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar."

"Love thy neighbour as thyself,"

ইহা ত আর ইউরোপ গাহিতেছে না। টলষ্টয় খৃষ্টকে The greatest of socialists বলিয়াছিলেন। The end of the commandments is charity out of a pure heart and of a good conscience। কিন্তু খৃষ্টের সমাজসেবামূলক ধর্ম্ম, সেবার ধর্ম্ম পাশ্চাত্য জগৎকে আর অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেছে না।

সমাজে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহিত অসংযম ও স্বৈরাচার প্রভৃতি ব্যাধি প্রবল হইয়াছে। বিপ্লববাদীর সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আশা আজ নির্ম্মূল। খৃষ্টপ্রচারিত প্রেম ভোগের প্রবৃত্তিকে ও অনৈক্যের অত্যাচারকে দমন করিতে পারে নাই।

হিন্দুসমাজতন্ত্রে প্রতিযোগিতা দমন—বর্ণধর্ম্মে প্রতিযোগিতা ও অধিকারভেদের সমন্বয়।

হিন্দু-সমাজ বর্ণ ও জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়া সমাজকে প্রতিযোগিতার কুফল হইতে রক্ষা করিয়াছিল। হিন্দু-সমাজে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা বর্ণ ও জাতির মধ্যে আবদ্ধ থাকিত। সমাজের ছোট ছোট কর্ম্মকেন্দ্রের মধ্যে থাকিয়া ব্যক্তি পরস্পরের প্রতিযোগী হইত। হিন্দুসমাজেও প্রতিযোগিতা ছিল, জীবনসংগ্রামে সক্ষমের জয় অক্ষমের পরাজয় ছিল। কিন্তু জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্র সমগ্রসমাজব্যাপী ছিল না, সমাজের এক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই জীবনসংগ্রাম চলিত। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের প্রতিযোগী; অন্যবর্ণের সহিত ব্রাহ্মণের প্রতিযোগিতা ছিল না। হিন্দুব্রাহ্মণের প্রতিযোগিতা ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং এই কারণেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণবর্ণের যাহা বিশিষ্টগুণ—সাত্ত্বিকভাব ও আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন হইত। এরূপে ক্ষত্রিয়গণের ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে রাজসিক ভাব ও শৌর্য্য, এবং বৈশ্যগণের বৈশ্যবর্ণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে রাজসিক ভাব ও শিল্পব্যবসায়কুশলতার অনুশীলন হইত।

সমাজের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যেও যে আদান প্রদান আদৌ ছিল না, তাহা বলা যায় না। সমাজ যখন রাষ্ট্রশক্তি হইতে বঞ্চিত হয় নাই, "নৃপস্য বর্ণাশ্রমপালনং যৎ, স এব ধর্ম্মো মনুনা প্রণীতঃ," দেশের রাজা যখন সমাজধর্ম্ম পালন করিতেন, তখন কোন ব্যক্তি অসাধারণ প্রতিভাবলে একবর্ণ হইতে উচ্চবর্ণের অধিকার লাভ করিতে পারিত।

সুপ্রজনন-বিদ্যা (হিন্দু Eugenics)।

হিন্দুর অধিকারভেদের মূল ভিত্তি এই—এক জন্মের শিক্ষা ও সংস্কার অপেক্ষা স্বভাব ও জন্মাধিকারই কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সূচনা করে। আধুনিক ইউরোপে সুপ্রজনন-বিদ্যা (Eugenics) খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। সুপ্রজনন-বিদ্যার মূলতত্ত্ব ইহাই। কার্ল-পীয়র্সনের ভাষায় আমরা হিন্দুর এই ধারণা সম্বন্ধে বলিব, Heredity is more important than the environment, আবেষ্টন অপেক্ষা জন্মাধিকার বলবত্তর। প্রাচীন হিন্দুগণ হিন্দু সমাজকে এই বিশ্বাসেই বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ভাগের এক একটি বিশিষ্ট গুণ তাঁহারা দেখিয়াছিলেন এবং এক একটি বিভাগের অনুবর্ত্তী ব্যক্তিগণের প্রতিযোগিতার ফলে ঐ বিশিষ্ট গুণের অনুশীলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু এক বিভাগের ব্যক্তির সহিত অপর বিভাগের কোন ব্যক্তির প্রতিযোগিতা তাঁহারা নিবারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সুপ্রজনন-বিদ্যার সারটুকু অবলম্বন করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে এরূপ প্রতিযোগিতা নিষ্ফল। ইহা ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুবিধা বিধান করে না। উপরন্তু সমগ্র সমাজে অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার ফলে সমাজে হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি দোষ বৃদ্ধি পায়। "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।" স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাবান মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে। "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।" স্বধর্ম্ম হীন হইলেও পরধর্ম্ম অপেক্ষা ভাল, কারণ উহা "স্বভাবনিয়ত,"—স্বভাবনির্দ্দিষ্ট, পূর্ব্বজন্ম-সংস্কারের ফল। ঐ-সকল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুগণ যাহাতে বিভিন্ন ধর্ম্মবৃত্তি পরস্পর মিশ্রিত না হয় তাহার তত্ত্বাবধানের ভার রাজার উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

হিন্দুসমাজ বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যে শুধু প্রতিযোগিতা দমন করিয়াছিল তাহা নহে। উহাদিগের সহযোগিতারও ব্যবস্থা বিধান করিয়াছিল। প্রত্যেক বর্ণ অপর বর্ণের সাহায্যেই স্বধর্ম্মে নিয়ত থাকিয়া উন্নতি লাভ করিত, একের উন্নতি অপরের উন্নতির উপর নির্ভর করিত। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের সূত্র, each for all and all for each, প্রত্যেকেই সকলের জন্য, এবং সকলেই প্রত্যেকের জন্য, আমাদের সমাজেই

যথোচিত অবলম্বিত হইয়াছিল। সমাজে যাহাদের উচ্চতম অধিকার তাহাদের একমাত্র ধর্ম্ম ছিল,—সকলের হিতসাধন; একমাত্র গুণ ছিল—মৈত্রী। এরূপে হিন্দুসমাজ বর্ণ ও অধিকার ভেদ সৃষ্টি করিয়া প্রতিযোগিতার কুফল হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া বর্ণ ও জাতির ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে প্রতিযোগিতার উৎসাহ দিয়া ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ মুক্ত রাখিয়াছিল। সমস্ত সমাজ ব্যাপিয়া জীবনসংগ্রাম চলিলে প্রতিযোগিতার কুফল অবশ্যম্ভাবী তাহা আমাদের ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন; তাই তাঁহারা প্রতিযোগিতাকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায় জানিয়া উহাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু উহাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া যথোচিত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন।

আশ্রম ও পরিবারধর্ম্মে অনৈক্যের অত্যাচার নিবারণ।

হিন্দু সমাজের প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা ছিল তাহাও যথোচিত নিয়ন্ত্রিত হইত। হিন্দুর পরিবার ও আশ্রমধর্ম্মও উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের অতি সুন্দর উপায় ছিল। হিন্দুসমাজে প্রতিযোগিতা ব্যক্তিগত ছিল না। একান্নবর্ত্তী পরিবারের জন্য প্রতিযোগিতা পরিবারগত ছিল। এবং একারণে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় যে হিংসা বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা লক্ষিত হয়, তাহা হইতে আমাদের সমাজ অনেক পারমাণে মুক্ত ছিল। ইহা ছাড়া একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস হিন্দু সমাজে ব্যক্তির স্বৈরাচার নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল। আশ্রম-ধর্ম্ম হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম অনন্তবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। সংসার ত দু দিনের জন্য, প্রতিযোগিতাই বা ক'দিনের জন্য?

অসার-সংসার-বিবর্ত্তনেষু
মা যাত তোষং প্রসভং ব্রবীমি।

ইহাই হিন্দুর বাণী।

"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুতমিতরমণীসমাজে।"

এই বৈরাগ্যবোধ একটা সংসারের অনুষ্ঠানে মূর্ত্তি পাইয়া সমাজে সজীব ছিল। দিন কতক খুব প্রতিযোগিতা, তাহার পর আশ্রম পরিবর্ত্তন, তখন প্রতিযোগিতার চিন্তা একেবারেই দূর হইবে। সংসার-যাত্রায় যদি একটা নিয়ম বা আদর্শ থাকে যে পঞ্চাশ বৎসর পরে নিজ সংসারের যেমন অবস্থাই থাকুক না কেন উহা হঠাৎ ছাড়িয়া বনে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে তাহা হইলে সংসার-যাত্রাটা বেশ সহজ, সুন্দর হয়।

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিনাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তিনাম্ যোগেনান্তে তনুত্যজাম॥

সংসারের দৈনন্দিন জীবনে হিংসা বিদ্বেষ মারামারি কাটাকাটি থাকে না; এরূপ থাকিলে ভোগের সংসারও আনন্দময় হয়, সংসার-যাত্রায় কঠোর বৈরাগ্যবোধ থাকিলে ব্যথিত প্রাণে কাঁদিতে হয় না—

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া চলিব
তোমারি রসাল নন্দনে।
কবে তাপিত এ দেহ করিব শীতল
তোমার চরণ স্পর্শনে।
ভবের সুখ দুখ চরণে ঠেলিয়া
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া;
চরণ টলিবে না হৃদয় গলিবে না
তোমার আকুল আহ্বানে।

আশ্রমধর্ম্মে সাম্যবাদ

আশ্রমধর্ম্ম হিন্দুসমাজে আরও একটা সুন্দর ফল দিয়াছিল। বর্ণধর্ম্মের ভিত্তি,—অধিকারভেদ। বর্ণধর্ম্মের ফল, প্রতিযোগিতার গণ্ডীকে ছোট করিয়া দেওয়া, প্রতিযোগিতা নিবারণ নহে। ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ব্যক্তির প্রতিযোগিতা আবদ্ধ থাকিলে, ব্যক্তির চিন্তা ও কর্ম্মের স্বাধীনতা লোপ পাইতে পারে, বর্ণানুমোদিত ক্রিয়াকর্ম্ম বন্ধন বলিয়া ঠেকিতে পারে। বর্ণধর্ম্মের এই দোষ আশ্রমধর্ম্ম নিবারণ করিয়াছিল। আশ্রমধর্ম্ম বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে মোক্ষলাভের আদর্শ জাগাইয়া রাখিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেই * মোক্ষলাভের জন্য প্রস্তুত হইবে,—কিন্তু বিভিন্ন ভাবে ও প্রকারে স্বভাবনিয়ত স্বধর্ম্মে ক্রিয়াবান হইয়া সেই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হইবে। ব্যক্তি যখন সমাজের ভিতর, তখন প্রত্যেকের বিভিন্ন কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন অধিকার, তখন অনৈক্য;—কিন্তু ব্যক্তি যখন বর্ণ ও সমাজের বাহিরে, ভগবানের সম্মুখীন, তখন ঐক্য ছিল।

* শূদ্র বেচারা কি করিবে?—প্রবাসী-সম্পাদক।

বানপ্রস্থ ও যতি আশ্রমে বর্ণ-ধর্ম্মের অনৈক্য ছিল না, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য * সকলেরই সমান অধিকার ছিল, সকলেই সমাজ হইতে সমান শ্রদ্ধা পাইত। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বানপ্রস্থাবলম্বীর নিকট ব্রাহ্মণকুমারের শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণের কোন বাধা ছিল না। হিন্দুসমাজ রুশোর ঐক্যমন্ত্র 'all men are born equal' "সকল মানুষ জন্মতঃ সমান", অবলম্বন করে নাই। হিন্দুর অধিকারভেদ অনৈক্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ অনৈক্য সমাজসৃষ্ট, অস্বাভাবিক, কৃত্রিম নহে। এ অনৈক্য স্বাভাবিক,—জন্মাধিকারের বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু হিন্দু সমাজ বলিয়াছিল, all men are made equal, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য সকলেই আপনাদের বিশিষ্ট ধর্ম্মের ক্রিয়াকর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ হইলে, শেষ বয়সে সমান অধিকার পাইবে,—বানপ্রস্থ বা যতির অধিকারে সকলেই সমগ্র সমাজের নিকট হইতে ভক্তি ও শ্রদ্ধা পাইবে।

এরূপে হিন্দুর বর্ণ-ধর্ম্ম প্রতিযোগিতাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া যথোচিত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল; হিন্দুর আশ্রমধর্ম্ম প্রতিযোগিতা নিবারণের কুফল হইতে সমাজকে রক্ষা করিয়াছিল।

বিবর্ত্তনবাদের ব্যক্তিপূজা ও প্রতিযোগিতা-মন্ত্র।

ইউরোপের আধুনিক ভাবুকগণ প্রতিযোগিতার কুফল এখন বেশ বুঝিয়াছেন। এতই তাঁহারা চিন্তিত হইয়াছেন যে তাঁহারা প্রতিযোগিতার প্রতিরোধ করাই সমাজের একমাত্র ধর্ম্ম মনে করিতেছেন! অথচ এতকাল ইউরোপীয় দার্শনিকগণ একবাক্যে বলিয়া আসিতেছিলেন, প্রতিযোগিতা ভিন্ন সমাজের উন্নতি একেবারেই অসম্ভব।

ডারউইন বিশেষ স্পষ্টভাবে মনুষ্যসমাজ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। তবুও তিনি বলিয়াছেন সমাজের উন্নতি ব্যক্তির প্রতিযোগিতার উপরই নির্ভর করে। আবেষ্টনের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে প্রতিযোগী জাতিসমূহের মধ্যে যে সক্ষম হয় সেই জগতে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে। বাইজম্যান (Wiesmann) কিন্তু স্পষ্ট বলিয়াছেন

The progress of Society depends upon the intensity of rivalry and competition. Without natural selection degeneration must set in by the principle of *panmixia*.

অধ্যাপক হেকেলের একই মত।

"The cruel and relentless struggle for existence which rages through all living creatures...the picking out of the chosen, the survival of the minority of the privileged fit and the death of the majority of the competitors.

অধ্যাপক অস্কার স্মিট (Oscar Schmidt) বলিতেছেন, সমাজতন্ত্রবাদীরা প্রতিযোগিতার প্রতিরোধ করিয়া সমাজের উন্নতির পথ রোধ করিতেছে।

The Socialists choke the doctrine of descent.

হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বলিয়াছেন,

The absence of the beneficent working of the survival of the fittest will lead to degeneration; for no society can hold its own in the struggle with other societies if it disadvantages its superior units that it may advantage its inferior units.

বেঞ্জামীন কীড (Benjamin Kidd) সোজাসুজি প্রতিযোগিতাকেই জীবজগতের একমাত্র উন্নতির সোপান বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

All progress from the beginning of life has been the result of the most strennuous and imperative conditions of rivalry and selection. Without this struggle degradation must set in.

সকলেই বলিতেছেন সমাজে প্রতিযোগিতা থাকিলেই সক্ষমের জয়লাভ ও অক্ষমের বিনাশ হইবে। যে সমাজে প্রতিযোগিতা নাই, সেখানে অক্ষমেরা সক্ষমদিগের নিকট হইতে তাহাদের ন্যায্য অধিকারের ভাগ লইবে। সক্ষমেরা একারণে দুর্ব্বল হইবে। শেষে সমগ্র সমাজ অন্যদেশের সমাজের সহিত জীবনসংগ্রামের প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইবে। সমাজের ভিতরে বা বাহিরে প্রতিযোগিতাই উন্নতির একমাত্র পথ। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এপথ ত্যাগ করা মহাপাপ।

অধ্যাপক হক্সলী তাঁহার রোমেঞ্জ (Romanes) বক্তৃতায় চরমপন্থী না হইয়া একটা মাঝামাঝি পথ লইয়াছিলেন।

* শূদ্র কি মানুষ নয়? "অন্ত্যজ" কি মানুষ নয়? তাহারা কেন বাদ পড়িল?—প্রবাসী-সম্পাদক।

Social progress means a checking of the cosmic process at every step (i.e. of the struggle of individual with individual) and the substitution for it of another called the ethical process.

প্রতিযোগিতা বন্ধ হইলে যে সমাজের অবনতি হইবে. তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, মানুষের নৈতিকজীবন জীবজগতের প্রতিযোগিতার নিয়মকে প্রতিরোধ করিতেছে। তবুও তিনি সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না,—তিনি লিখিয়াছেন,

Socialism wars against natural equality and sets up an artificial equality in place of a natural order.

রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তিপূজার পরিণাম।

ইউরোপ এখন এসব মত আর চাহে না। প্রতিযোগিতার নিয়ম ইউরোপ আর মানিতে চাহে না। ব্যক্তির প্রভাবকে ইউরোপ এখন খর্ব্ব করিতেছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে ইউরোপের প্রজাতন্ত্র এতকাল ব্যক্তিকেই পূজা করিয়াছে, তাহার স্বাভাবিক অধিকারের নিকট রাষ্ট্রীয় মস্তক অবনত করিয়া বসিয়াছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তির প্রভাবের চূড়ান্ত আমরা ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে দেখিতে পাই। কিন্তু রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যক্তি যদিই প্রধান হয়, ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর যদি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে, রুশোর মতানুযায়ী যদি রাষ্ট্র একটা ব্যবসায় বা কারবারের মত দলিল বা চুক্তির ফলে সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে একদিন-না একদিন রাষ্ট্র ব্যক্তির নিকট আবশ্যক বলিয়া বোধ হইবে না। উপরন্তু রাষ্ট্রই অনর্থের মূল বলিয়া অনুমিত হইবে। তাহাই এখন হইয়াছে। ইউরোপে এনার্কিষ্ট ও নিহিলিষ্টদিগের সংখ্যা বড় কম নহে! রাষ্ট্রই যত অমঙ্গলের মূল, ইহা অনেকে বলিতে শিখিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তি-পূজার পরিণাম আমরা দেখিলাম।

বৈষয়িক জীবনে ব্যক্তিপূজার পরিণাম।

বৈষয়িক জীবনে ব্যক্তিপূজা ও প্রতিযোগিতার মন্ত্র উচ্চারণের পরিণাম আরও ভীষণ হইয়াছে। প্রতিযোগিতার ফল অনৈক্য। অনৈক্যের ফল স্বৈরাচার। প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া মুষ্টিমেয় ধনী সম্প্রদায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মের সেবাব্রতের মহিমা কমিয়াছে। অসংখ্য শ্রমজীবী আহার্য্য ও বস্ত্রাভাবে প্রপীড়িত, অথচ ধনীদিগের ভ্রূক্ষেপ নাই। * কার্ণেগী পিয়ারপণ্ট মর্গান, রকফেলার বৈষয়িক জীবনে ব্যক্তির প্রভাবের চূড়ান্ত নিদর্শন। কিন্তু সমাজে এরূপ ধনী কয় জন? শ্রমজীবীগণের অভাবের অভিযোগে ধনীগণ কর্ণপাত করিতেছেন না। পাশ্চাত্য জগতের বৈষয়িক জীবন এখন ঘোর অশান্তিতে পরিপূর্ণ। বৈষয়িক জীবনে ব্যক্তিপূজার পরিণাম আমরা দেখিলাম।

আধুনিক বিবর্ত্তনবাদ ও প্রতিযোগিতা দমন

ইউরোপ তাই আর ব্যক্তিপূজা করিতে চাহে না। ইউরোপ প্রতিযোগিতা দমন করিতে প্রত্যাশী। ফরাসীবিপ্লবের পর হইতে ইউরোপ ধর্ম্মের উপর আস্থা হারাইয়াছে। ধর্ম্মের উপর প্রতিযোগিতা দমনের ভার না দিয়া সেখানকার সমাজই ব্যক্তির প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিতেছে। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের আশা যে তাঁহারা ব্যক্তির জীবন গঠন করিয়া সমাজকে অশান্তি হইতে রক্ষা করিবেন, প্রতিযোগিতার জন্য সমাজ যে অনর্থক শক্তি ব্যয় করিতেছে, তাহা নিবারণ করিয়া সমাজকে আরো সবল করিবেন। যে সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্ব এতকাল প্রতিযোগিতার ফলে বিকাশলাভ করিয়া সমাজ-বন্ধন শিথিল করিতেছিল, তাহার পরিবর্ত্তে এক সর্ব্বাঙ্গীন ব্যক্তিত্ববিকাশের পথ মুক্ত করিয়া দিবেন। কাল মার্কস্ লাসাল হইতে আরম্ভ করিয়া এডওয়ার্ড বেলামী, এইচ জি ওয়েল্‌স্ পর্য্যন্ত সকলেই সহযোগিতাকেই সমাজের উন্নতির একমাত্র উপায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অধ্যাপক কালপীয়র্সনের ভাষায়

The progress of modern societies must depend upon the reduction of the waste due to extra-group rivalry and competition, the lessening of which will strengthen them against extra-group stress and lead to uniform distribution of powers over the community.

* এই উক্তিতে পাশ্চাত্য জগতের সম্বন্ধে সমগ্র সত্য প্রকাশিত হইতেছে না। সেখানে দারিদ্র্যের দুঃখ ক্লেশ খুব আছে, কিন্তু সমাজ-সেবকও বিস্তর আছেন। তন্মধ্যে অনেক ধনীও আছেন। এরূপ প্রবল সমাজ-সেবা প্রাচ্য কোনও দেশে নাই।—সম্পাদক।

সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা কমিয়া আসিলে সমাজের শক্তি অধিক হইবে এবং অন্যজাতির সহিত জীবন-সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় উহার অধিক সুবিধা হইবে। Prince Kropotkin (ক্রপটকিন) জীবজগৎ হইতে দেখাইয়াছেন প্রতিযোগিতা নহে, সহযোগিতা, Mutual Aid and Association, উন্নতির একমাত্র কারণ।

আধুনিক ইউরোপে হিন্দুসমাজতন্ত্রের পদ্ধতি অবলম্বন।

ভারতবর্ষের সমাজ যেমন এতকাল বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও অধিকারভেদ সৃষ্টি করিয়া ব্যক্তির জীবন গঠন করিতেছিল, পাশ্চাত্য সমাজ ঠিক সেইরূপে এখন ব্যক্তির জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিতেছে। ইউরোপ হিন্দুসমাজের ক্রমবিকাশের মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতেছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম নহে, সমাজ-তন্ত্রই ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিবে।—আধুনিক ইউরোপের ইহাই আশা!

হিন্দু ও পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্র।

কিন্তু ভারতবর্ষে যেরূপ সমাজতন্ত্র ছিল এবং এক্ষণে ইউরোপ যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, তাহাতে অনেক প্রভেদ। ইউরোপের শ্রমজীবীগণ অনেক সময়ে সমাজতন্ত্রবাদীগণ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া একটা ভীষণ সামাজিক বিপ্লবের জন্য আয়োজন করিতেছে। তাহাদের আশা, ধনীগণের অর্থ লুট করিয়া রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করিয়া তাহারা নিজেরাই আইন-কানুন করিবে। ধনীগণের অর্থ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলে সমাজে দুঃখদারিদ্র্য থাকিবে না। তাহারা মুখে বলিতেছে, সহযোগিতাই মনুষ্যের ধর্ম্ম; তাহারা প্রচার করিতেছে, প্রত্যেকে সকলের জন্য এবং সকলে প্রত্যেকের জন্য; কিন্তু কাজে তাহারা তস্কর দস্যুর ন্যায় স্বার্থপর—সমাজদ্রোহী।

আবার সেই ব্যক্তির প্রভাবের পরিণাম। রাষ্ট্রজীবনে যাহা এনার্কিজ্‌ম্ ও নিহিলিজ্‌ম্, সমাজক্ষেত্রে তাহাই এই লুণ্ঠনপ্রবৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। সেই একই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, যাহা দমন করিতে ইউরোপ এত সাধ্য-সাধনা করিতেছে।

Socialist propaganda carried on as a class war suggest none of those ideals of citizenship with which socialist literature abounds, 'each for all, and all for each,' and so on. It is an appeal to individualism (which seems to be an euphemism for envy and cupidity) and results in getting men to accept socialist formulae without becoming socialists. (Macdonald, Socialism and Society.)

পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রতিরোধ।

কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞ ও প্রকৃত ভাবুক আছেন। তাঁহারা সমাজে নূতন প্রেম, সদ্ভাব ও ভাবুকতার স্রোত আনিতে চাহিতেছেন। তাঁহারা মনুষ্যের অধিকার প্রচার করেন না, তাঁহারা বিপ্লবের পক্ষপাতী নহেন। সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী সমাজকে শুনাইয়া তাঁহারা আধুনিক ইউরোপের ব্যক্তির প্রভাবকে কমাইতে চাহিতেছেন, ব্যক্তির প্রভাবকে যথোচিত নিয়ন্ত্রিত করিতে তাঁহারা প্রত্যাশী। তাঁহাদিগের সমাজতন্ত্রবাদের সহিত হিন্দুসমাজতন্ত্রবাদের সাদৃশ্য আছে। তাঁহারা সত্য সত্যই ব্যক্তির প্রভাব নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের মতে

"Socialism is merely individualism rationalised, organised, clothed and in its right mind". The Fabian Society Papers].

কিন্তু উদ্দেশ্য এক হইলেও উভয়ের প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

হিন্দুসমাজতন্ত্রের নেতা ছিলেন ব্রাহ্মণগণ, যাঁহাদিগের প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যেই একটা অনন্তবোধ ও অসীমে প্রীতির চিহ্ন থাকিত; যাঁহারা সংসারের সমস্ত বন্ধনের ভিতর থাকিয়াও আপনাদের মুক্তিসাধনের জন্য সদা সচেষ্ট থাকিতেন; যাঁহাদিগের নিকট মুক্তিসাধন চরম লক্ষ্য; যাঁহাদিগের নিকট ভোগের সংসার, বৈরাগ্য সাধন ও মুক্তিলাভের উপায়মাত্র ছিল। ব্রাহ্মণগণ ব্যক্তির মুক্তিসাধন,—ব্যক্তিত্ববিকাশই সমাজ-জীবনের চরম উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা যে সমাজতন্ত্র গঠন করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐক্য ছিল, অনৈক্যও ছিল; সহযোগিতা ছিল, প্রতিযোগিতাও ছিল; সাম্য ছিল, অধিকারভেদও ছিল; তাহাতে অনৈক্য ছিল কিন্তু

স্বৈরাচার ছিল না; তাহাতে প্রতিযোগিতা ছিল কিন্তু বিদ্বেষ ছিল না; তাহাতে অধিকারভেদ ছিল কিন্তু নির্য্যাতন ছিল না। তাহাতে ব্যক্তির প্রভাব নিয়ন্ত্রিত হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনও হইত।

আধুনিক ইউরোপের সমাজতন্ত্রের নেতা হইবেন—বিষয়ী শ্রমজীবীদিগের সর্দ্দারগণ। তাঁহাদের অনন্তবোধ নাই, তাঁহাদের দৃষ্টি সসীমের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে যে বিশ্ববিজয়িনী শক্তি সুপ্ত আছে, তাহার পরিচয় তাঁহারা পান নাই। তাই তাঁহারা ব্যক্তির প্রভাব কমাইতে যাইয়া একেবারে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রোধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আইন-কানুন সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে যাইতেছেন, সকল ব্যক্তিকেই একই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের অনুবর্ত্তী করাইয়া তাঁহারা এক ছাঁচে সমস্ত লোককে গড়িতে যাইতেছেন। তাঁহাদের সমাজতন্ত্র প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশসাধনের অন্তরায় হইতেছে।

পাশ্চাত্য জগতে আধুনিক সমাজ ব্যক্তিত্বের প্রভাব দমন করিতে যাইতেছে। হিন্দুসমাজ প্রতিযোগিতা ও অধিকারভেদের সমন্বয়সাধন করিয়া যেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করিয়া ব্যক্তিত্ববিকাশের পথ মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্য সমাজ পারিতেছে না, কখনও পারিবে না। হিন্দুর অনন্তবোধ না থাকিলে পারিবে না। হিন্দুর অহিংসা, মৈত্রী, করুণা না থাকিলে পারিবে না। হিন্দুর ব্যক্তিত্বপূজা, "মানুষের ঠাকুরালি", না থাকিলে পারিবে না। হিন্দু কি কখনও পাশ্চাত্য দেশবাসীকে এই অনন্তবোধ, এই অহিংসা ধর্ম্ম, এই "মানুষের ঠাকুরালি" শিক্ষা দিতে পারিবে না?

হিন্দুসমাজ-বন্ধনের শৈথিল্য।

আধুনিক হিন্দু ইহা কি একবার ভাবিয়া দেখিবেন না? আধুনিক হিন্দুসমাজের হীন অবস্থা কে না লক্ষ্য করিয়াছেন? আমাদের সমাজবন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে। আমাদের বর্ণাশ্রম একান্নবর্ত্তীপরিবারধর্ম্ম হীনবল অথবা মৃত। গুণকর্ম্মবিভাগের উপর আমাদের বর্ণ-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু যে-সমস্ত গুণ ও কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে সমাজে ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা ও সম্মান নির্ভর করিত, তাহাদের আদর আজ হ্রাস পাইয়াছে। বর্ণ-ধর্ম্ম তখন হইতেই মৃতপ্রায়। তবুও এখনও কি আমাদের সমাজে আধ্যাত্মিকতার আদর্শ গরীয়ান্ নহে, এখনও কি সাদাসিধে চালচলন ও উচ্চচিন্তার আদর্শে আমরা জীবন-গঠন করি না? আমাদের সমাজে এখনও বিদ্যার আদর ও বৈরাগ্যের সম্মান অটুট রহিয়াছে। কোন লোক বড় কি ছোট তাহা বিচার করিতে গেলে আমরা তাহার অর্থ বা পদ দেখি না, তাঁহার চরিত্র ত্যাগবল দেখিয়াই তাঁহাকে বড় বা ছোট বলি। বর্ণ-ধর্ম্মের মূলমন্ত্র আমরা ছাড়ি নাই। কখনও ছাড়িতে পারিব না। বর্ণ-ধর্ম্মের সহিত আশ্রমধর্ম্মও জীবন হারাইয়াছে। তবুও এখনও কি আমাদের বাটীর কর্ত্তাকে পুত্রপৌত্রাদির হস্তে আপনার সংসারের ভার দিয়া বৃদ্ধ বয়সে তীর্থক্ষেত্রে ভগবচ্চিন্তা করিতে দেখি না? বৃদ্ধবয়সে আমরা নিজেরাই কি ইউরোপীয়দিগের ন্যায় শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কাজের জোয়াল ঘাড়ে করিয়া মরিব? আশ্রমধর্ম্ম জীবিত নাই তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস হিন্দু কখনই বিষয়কর্ম্মের জোয়াল কাঁধে করিয়া মরিবে না। যতদিন তাহা হয় ততদিন বলিব আশ্রমধর্ম্ম বাঁচিয়া আছে। তাহার পর পরিবারধর্ম্ম। আমাদের দেশে বৈষয়িক জীবনসংগ্রাম এখন খুব কঠোর হইয়া পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের ব্যক্তিপূজাও আমরা আমাদের সমাজে আনিতেছি; তবুও আমরা এখনও কি বাপ খুড়া জেঠার সহিত বাস করি না? আমরা এখনও বলিয়া থাকি

> পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
> পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

আমাদের গৃহ শুধু স্ত্রীপুত্র লইয়া নহে, আমাদের গৃহ মাতাপিতা আত্মীয় কুটুম্ব পোষ্য প্রতিবেশী লইয়া। এখনও আমরা ভারতাত্মার শিক্ষা ভুলিতে পারি নাই

> "গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
> প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে;
> ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে।
> নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল।
> সম্পদেরে পুণ্য কর্ম্মে করেছ মঙ্গল।

শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে!

তবুও আমাদের সেই প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রম পরিবার আর নাই। নাই বা থাকিল? আমরা যে ক্রমোন্নতিশীল হিন্দু। হিন্দুর ব্যক্তিত্ব কি ক্রমবিকশিত হইতেছে না? বর্ণ ও আশ্রম, জাতি ও পরিবার এতদিন হিন্দুর ব্যক্তিত্ব গঠন ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল। সমাজ যখন রাষ্ট্রের নিকট "সংরক্ষণ" আশা করিতে পারিল না, তখন হইতেই আমাদের সমাজবন্ধন শিথিল হইতে লাগিল, সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি হীনবল হইতে লাগিল। কিন্তু তখন হইতেই কি হিন্দুর ব্যক্তিত্বের অবনতি হইয়াছে? তাহা ত হয় নাই। হিন্দু পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত আচরণের সামঞ্জস্য করিবার একটা অসাধারণ ক্ষমতা (adaptability) দেখাইয়াছে, হিন্দুর ব্যক্তিত্ব বিকাশলাভ করিয়াছে। তাই বলিতেছি হিন্দু এখনও সজীব রহিয়াছে।

হিন্দু ও ইউরোপীয় ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশধারা।

আমরা দেখাইয়াছি পাশ্চাত্যজগতে সমাজবন্ধন শিথিল হওয়াতে সেখানকার ভাবুকগণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজ দৃঢ় করিতেছেন। পূর্ব্বে সেখানে ধর্ম্ম সমাজগত ছিল, ধর্ম্মই সমাজবন্ধনের, ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের, উপায় ছিল। আমাদের দেশে ধর্ম্ম ব্যক্তিগত। আপনার মুক্তির উপায় আপনিই করিতে হইবে। ধর্ম্ম নহে, সমাজই ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিত। ইউরোপে ব্যক্তি স্বস্ব স্বাভাবিক অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সমাজের তাহার নিকট কোন দাবী নাই। সমাজই বরং তাহার নিকট ঋণী। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণ এই যে সমাজ রাষ্ট্রের নিকট আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে নাই। তাই প্রজাশক্তি রাক্ষসীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমাজকে একবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। হিন্দুসমাজে ব্যক্তি ঋণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। "পঞ্চায়ত" করিয়া পঞ্চঋণ ব্যক্তিকে পরিশোধ করিতেই হইবে। হিন্দু স্বত্ব জানে না, "ঋণ" জানে; অধিকার জানে না, কর্ত্তব্য জানে। পাশ্চাত্যসমাজ অধিকার জানে, কর্ত্তব্য জানে না; ব্যক্তির প্রভাব সেখানে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে ব্যক্তিত্ব বিকাশ পাইতেছে না। তাই পাশ্চাত্য-জগৎ হিন্দুসমাজের ক্রমবিকাশের মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতেছে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্যক্তির প্রভাব দমন করিতে চেষ্টা করিতেছে। পাশ্চাত্যসমাজ সজীব রহিয়াছে, তাই সেখানকার ব্যক্তিত্ব নূতনভাবে বিকাশলাভ করিবার পন্থা খুঁজিতেছে।

হিন্দুও সজীব রহিয়াছে, তাই হিন্দুর ব্যক্তিত্ব নূতন ভাবে বিকাশলাভ করিতেছে। সমাজবন্ধন এখন শিথিল হইতেছে। হিন্দুর সনাতন সমাজতন্ত্র এবং বর্ণাশ্রম ও পরিবারধর্ম্মের মহিমা চলিয়া যাইতেছে। তাহার জন্য কাঁদিবার অবসর নাই। আধুনিক হিন্দুর ব্যক্তিত্ব বর্ণাশ্রম ও পরিবারধর্ম্মের মূলমন্ত্রগুলি হজম করিয়াছে। হিন্দুসমাজের সমস্ত অতীতের মন্ত্রগুলি আমাদের মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়াছে। অতীত আমাদের নিকট অচেতন নহে।

তব সঙ্কার শুনেছি আমার
মর্ম্মের মাঝ খানে,
কত দিবসে কত সঞ্চয়
রেখে যাও মোর প্রাণে।
* * *
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।

নর-নারায়ণপূজা ও প্রেমধর্ম্ম হিন্দুর নূতন ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

অতীতের সমাজজীবনের সমস্ত ধারাগুলি সমাজের প্রাণে আসিয়া মিশিয়াছে। হিন্দুর প্রাণ হিন্দুর ব্যক্তিত্ব অতীতের শক্তিতে শক্তিমান ত হইয়াছেই, ভবিষ্যতের জন্য উহা এখন কঠোর শক্তিসাধনায় নিযুক্ত। ভবিষ্যতের জন্য এই কঠোর শক্তিসাধনার ফল হিন্দুর ব্যক্তিত্বে নূতন গুণের সমাবেশ, হিন্দুর নরনারায়ণ পূজা।

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

এই আশা। হিন্দুর বৈরাগ্য এখন সমাজবিমুখ নহে; হিন্দুর মোহ এখন মুক্তি: প্রেম এখন ভক্তি হইয়াছে।

সমাজবন্ধন এখন শিথিল হইয়াছে কিন্তু হিন্দুর নূতন ব্যক্তিত্ব সেবার ধর্ম্মে প্রেমের ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনাকে প্রেমের বন্ধনে সমাজের নিকট ধরা দিয়াছে। আধুনিক হিন্দুর নরনারায়ণ পূজার মর্ম্ম সেই একই। হিন্দু এখন সমাজের সকলের মধ্যে প্রেমানুভূতি ও আত্মানুভব করিতেছে।

নরনারায়ণ পূজা হিন্দুর আধুনিক সমাজবন্ধনের সহায়।

প্রাচীন হিন্দুর সমাজতন্ত্র এখন হীনবল, কিন্তু আধুনিক হিন্দুর নরনারায়ণ পূজা সমাজবন্ধনকে দৃঢ় করিয়া দিয়াছে।

প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ছিল, এখন ধর্ম্ম সমাজগত হইয়াছে। ধর্ম্ম এখন সমাজমুখীন হইয়াছে। হিন্দু এখন গীতার এই শ্লোকে অনুপ্রাণিত—

> সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি
> ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।

আধুনিক হিন্দুর সেবার ধর্ম্ম কোম্‌ৎ হেগেলের মানবহিতবাদের (humanitarianismএর) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। হিন্দুসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যে প্রচার করিয়াছেন

> "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর",

তাহার দ্বারাই আমরা অনুপ্রাণিত।

> যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
> তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

ভগবান চৈতন্য যে ঈশ্বরে প্রেম ও জীবে দয়া করিতে বলিয়াছেন, তাহাতে এবার আমাদের দেশ পাগল হয় নাই। আমাদের সমাজ এবার পাগল হইয়াছে, অদ্বৈতনিষ্ঠ বিবেকানন্দের বাণীতে—জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন, নর ও নারায়ণ অভিন্ন, মানুষের সেবা করা ভগবানের সেবা করা, মানুষের সেবায় প্রেমানুভূতি ও আত্মানুভব করা। বিবেকানন্দের সেই বাণীতে,

> "হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিওনা—তোমার উপাস্য সর্ব্বত্যাগী উমানাথ শঙ্কর; ভুলিওনা তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়-সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র; ভুলিওনা—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"

এবং ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহার শরীরের শিরায় শিরায় এক বিশ্বব্যাপী প্রাণ-তরঙ্গমালা অনুভব করিয়াছেন, সেই অনন্ত প্রাণ, আমাদের সমাজকে আজ মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বপ্রাণের বিরাট স্পন্দন অনুভব করিয়াই আমরা জীবে দয়া ও ঈশ্বরের সেবায় অভিন্নতা বুঝিয়াছি। আমাদের ঘরে ঘরে এখন নারায়ণ ভোগ ও পূজা পাইতেছেন। ঘরের বাহিরে রাস্তায় মাঠে হাটে ঘাটে নর-নারায়ণ আমাদের সেবা লইয়া ফিরিতেছেন।

হিন্দুর আশা।

হিন্দুসমাজে নরনারায়ণ পূজা করিয়া হিন্দু আজ সমাজবন্ধনের শৈথিল্যের কুফলও প্রতিরোধ করিয়াছে। হিন্দু সবল, স্বাধীন ও নির্ভয় হইতেছে, দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা ত্যাগ করিতেছে।

> জীবের মধ্যে শিব রয়েছেন সকল কালে সকল কাজে,
> শঙ্কা কি তোর? ঝাঁপ দিয়ে পড়, দেখরে তাঁরে নিজের মাঝে।

হিন্দু নিঃশঙ্কচিত্তে বিষম অগ্নিপরীক্ষায় ঝাঁপ দিয়াছে। বাস্তবিক বিংশশতাব্দীতে নর-নারায়ণই ভবিষ্যৎ হিন্দুচরিত্রের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ হইয়াছেন। বুদ্ধ অবতারে নরনারায়ণ জগতে করুণা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে নারায়ণ জগতে সেই একই বাণী প্রচার করিয়া জগদ্ব্যাপী অশান্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে শান্তি ও আনন্দ আনিবেন। হিন্দুসমাজ তাঁহার পূজার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। তিনি আসিলে বিশ্বসভ্যতার মধ্যে যে তাহার জীবন সার্থক হয়; তাই সে অটল বিশ্বাসে ভবিষ্যতের জন্য উন্মুখ রহিয়াছে,—

> "ভবিষ্যতের পানে মোরা চাহি আশা-ভরা আহ্লাদে।
> বিধাতার কাজ সাধিব আমরা ধাতার আশীর্ব্বাদে॥"

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই প্রবন্ধটি যখন আমাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, তখন যদি আমরা উহা ছাপিতে পারিতাম, তাহা হইলে পাঠকগণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেন যে তিনি ইউরোপে যে মহা যুদ্ধ হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা এখন হইতেছে। যাহাই হউক, আমরা যথাসময়ে প্রবন্ধটি ছাপিতে না পারিলেও, অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া ভবিষ্যতে কিরূপে ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা অনুমান করিবার ক্ষমতা যে তাঁহার আছে, তাহা প্রবন্ধটির দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

তিনি যেরূপ আশা ও উৎসাহের সহিত প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে তিনি নিজের হৃদয় দিয়া দেশের অবস্থার বিচার করিয়াছেন। তিনি দেশকে যতটা উদ্বুদ্ধ এবং লোকহিতে সমুদয় শক্তি প্রয়োগে ইচ্ছুক ও উদ্যত মনে করিয়াছেন, আমাদের তাহা মনে হয় না। কতকগুলি লোক জাগিয়াছে, কতকগুলি লোক সেবায় উৎসাহী হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ এখনও নিদ্রিত ও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন;

আমাদের এইরূপই মনে হয়। রাধাকমল বাবু যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা যদি বর্ত্তমানে সত্য হয়, বড়ই আনন্দের বিষয়: যদি অদূর ভবিষ্যতেও সত্য হয়, তাহা হইলেও কম সুখের বিষয় হইবে না।

তাঁহার প্রবন্ধে ব্যক্ত অনেক মতের সহিত আমাদের মতের মিল নাই; কিন্তু অনেকগুলি দীর্ঘ প্রবন্ধ না লিখিলে সব কথা বলা যায় না। আমরা কয়েকটি মাত্র কথা বলিব।

এক সময়ে খৃষ্টীয় জগতের লোকে মনে করিত, পৃথিবী অচল, দাঁড়াইয়া আছে; সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি তাহার চারিদিকে আকাশ-পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। এরূপ মনে করিবার একটা মানসিক কারণ ছিল। খৃষ্টিয়ানেরা ভাবিত, সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ, তাহার জন্যই জড় চেতন সমুদয় পদার্থের সৃষ্টি। অতএব এহেন শ্রেষ্ঠ জীবের বাস যে পৃথিবীতে, তাহাই বিশ্বের কেন্দ্র: আর সব গ্রহ, এবং সূর্য্য নক্ষত্রাদি তাহারই চারিদিকে ঘুরিবে, ইহাই স্বাভাবিক। তাহা না হইলে বিশ্বদরবারে পৃথিবীর মানসম্ভ্রম থাকে কি করিয়া? পাশ্চাত্য জগতে পূর্ব্বে আর একটি মত খুব প্রচলিত ছিল, এখনও বেশ তাহার চলন আছে। তাহা এই যে জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্ম, আর সব ধর্ম্মে যদি খৃষ্টধর্ম্মের মত কিছু ভাল উপদেশ থাকে, তাহা খৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে গৃহীত। অর্থাৎ ধর্ম্মজগতে খৃষ্টধর্ম্মই কেন্দ্র স্বরূপ। পাশ্চাত্য জগতের আরও এই একটি বিশ্বাস আছে, যে, মানব সভ্যতা গ্রীককেন্দ্রিক; অর্থাৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অন্যান্য দেশের সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, রাজনীতি, প্রভৃতিতে উন্নত কিছু দেখিলেই সাধারণতঃ ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে ঐ সব দেশে স্বাধীন ভাবে সভ্যতার কিছু উন্নতি হয় নাই, সবই গ্রীকদের কাছে ধার করা।

বাস্তবিক এইরূপ মত মত, সবই অল্পজ্ঞানের ফল, এবং স্বদেশ বা স্বমহাদেশ বা স্বসম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিতা হইতে উদ্ভূত। প্রাচীন কাল হইতে ভাব, চিন্তা, প্রথা, প্রক্রিয়া প্রভৃতিতে নানা দেশের মধ্যে আদান প্রদান হইয়াছে; কেহই সম্পূর্ণ অন্যনিরপেক্ষ হইয়া প্রত্যেক বিষয়ে উন্নত হয় নাই; ইহা সত্য। কিন্তু (১) ইহাও সত্য যে মানুষ মানুষ বলিয়াই এই আদান প্রদান সম্ভব হইয়াছে। ভারতবাসীরা গ্রীকদের নিকট হইতে শিখিয়াছে, গ্রীকেরা ভারতবাসীদের নিকট শিখিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ বা গ্রীসের পশুগণ ঋণ করিয়া সভ্য হইতে পারে নাই; কারণ, তাহারা পশু, মানুষ নহে। (২) ইহাও সত্য যে একই কোন তত্ত্ব স্বাধীন ভাবে নানা দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি সত্য দুটি কিম্বা পাঁচটি দেশে থাকিলে, বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে এরূপ মনে করা উচিত নয়, যে, একটি দেশ অন্য দেশের নিকট ঋণী।

রাধাকমল বাবুর প্রবন্ধে যেন এইরূপ ভাবের একটা আভাস পাওয়া গেল যে পাশ্চাত্য সমাজ যে ভাবে গঠিত তাহাতে কুফল ফলাতে, উহা আবার এমন ভাবে গঠিত হইতে যাইতেছে যাহা হিন্দু-সমাজের গঠনের অনুরূপ; পাশ্চাত্য সমাজ হিন্দু সমাজের অনুকরণ বা অনুসরণ করিতে যাইতেছে। কেননা তিনি বলিতেছেন, "ভারত-বর্ষের সমাজ যেমন এতকাল বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও অধিকারভেদ সৃষ্টি করিয়া ব্যক্তির জীবন গঠন করিতেছিল, পাশ্চাত্য সমাজ ঠিক সেই-রূপে এখন ব্যক্তির জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিতেছে। ইউরোপ হিন্দুসমাজের ক্রমবিকাশের মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতেছে।"

আমাদের বিবেচনায় তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজে পরিবর্ত্তন, এমন কি আমূল পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কিন্তু এই-সব পরিবর্ত্তন হিন্দুসমাজের অনুকরণ বা অনুসরণ করিয়া হইতেছে না। পাশ্চাত্য সমাজ নূতন করিয়া জাতিভেদ বা বর্ণাশ্রমের কাছে যে'সা দূরে থাক, যে যে দেশে জন্ম বা বংশানুসারী শ্রেণীবিভাগ ছিল, আভিজাত্য ছিল, তথা হইতে সেরূপ বিভাগ ও আভিজাত্য উঠিয়া যাইতেছে। ট্রেড্ গিল্ড্, ট্রেড্ ইউনিয়ন, প্রভৃতি নামধারী যে-সব ব্যবসায়ী বা শ্রমজীবীদের সমিতি আছে, সেগুলা বংশগত নহে; জন্মনির্বিশেষে যে-কোন ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তি শক্তি ও শিক্ষা অনুসারে যে-কোন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া তাহার গিল্ডের বা ইউনিয়নের সভ্য হইতে পারে। যদি কোন পাশ্চাত্য দেশে এখনও সম্পূর্ণরূপে এ অবস্থা দাঁড়ায় নাই, তাহা হইলে সেখানেও সামাজিক পরিবর্ত্তনের গতি জন্মনির্বিশেষে ব্যবসা-নির্ব্বাচনে স্বাধীনতার দিকে। সকল দেশেই প্রতিযোগিতা সমকর্ম্মী-দের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এবং এখনও আছে। কোন-না-কোন যুগে সব দেশেই প্রধানতঃ জন্ম অনুসারে মানুষ সমকর্ম্মী হইত। কিন্তু এখন কোন কোন দেশে বংশ বা জন্মে ঐক্য না থাকিলেও লোকে সমকর্ম্মী হইতেছে; যে-সব দেশে এখনও এরূপ অবস্থা হয় নাই, সেখানেও প্রবৃত্তি, শক্তি ও শিক্ষার একতা বা সাদৃশ্য অনুসারে মানুষের সমকর্ম্মী হইবার দিকে প্রবল গতি দেখা যাইতেছে।

দেশে যে সেবার ভাব দেখা যাইতেছে, রাধাকমল বাবু স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশকেই তাহার প্রধান বা একমাত্র কারণ মনে করেন। ভক্তের পক্ষে এরূপ মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক হইলেও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক এরূপ কথা বলিবেন না। কেননা বিবেকানন্দ উপদেষ্টা হইবার পূর্ব্ব হইতেই দেশস্থ নানাধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে সেবার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। বিবেকানন্দ যে বলিয়াছেন, "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর," ইহা যে খুব পুরাতন কথা, তাহা আমরা পরে দেখাইব।

"বিশ্বসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা"র গুণ বা দোষের জন্য প্রশংসা বা নিন্দা একা পাশ্চাত্যদের প্রাপ্য নহে। প্রাচীন হিন্দু রাজাদের দিগ্বিজয় ব্যাপার এবং মুসলমান খলিফাদের এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা বিজয়ের চেষ্টা, এই প্রকারের ছিল।

রাধাকমল বাবু লিখিয়াছেন:—"রুশ পরাজয়ের পর হইতে এশিয়ায় নবযুগ আসিয়াছে। এই নবযুগের প্রধান লক্ষণ এশিয়া-বাসীর আত্মপ্রতিষ্ঠা।" ইহা সত্য কথা। কিন্তু ভারতবর্ষকে এই জাগ্রত এশিয়ার অংশ বলিয়া এখনও মনে করিতে পারিতেছি না। কারণ, ভারত এখনও ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে যে সে জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি। দর্শনাচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের নিকট সেদিন শুনিতেছিলাম যে "লেটার্স অব্ জন্ চায়নাম্যান্"এর লেখক ডিকিন্সন সাহেব এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে এশিয়ার খাঁটি প্রাচ্য হইতেছে ভারতবর্ষ; চীন, জাপান পাশ্চাত্যেরই মত। অর্থাৎ কিনা, ভারতবর্ষ স্বপ্নদর্শনপটু, জড়ভাবাপন্ন, ও সেকেলে। কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিবার উপায় নাই।

পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে রাধাকমল বাবু লিখিয়াছেন:—"সেখানে অর্থ আছে, ভোগবিলাসিতা আছে, শুধু নাই শিব মঙ্গল।" একথা স্বীকার করা যায় না। প্রাচ্য পুরাকালে কি ছিল বলিতে পারি না; বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে প্রভেদ দেখিতেছি, কেবল শক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের পরিমাণে। পাশ্চাত্য প্রভূত শক্তির সহিত অর্থ উপার্জ্জন করে, প্রভূত শক্তির সহিত ভোগ করে, বিলাস-লালসা চরিতার্থ করে। অপর দিকে তথায় যাহারা কল্যাণচেষ্টা করে, তাহারাও খুব শক্তির সহিত করে। আমরা দু পয়সা বা তিন কাঠা জমীর জন্য চেষ্টা করি বা ঝগড়া করি, তাহারা বড় বড় দেশ মহাদেশের অধিকারী হইবার জন্য চেষ্টা বা ঝগড়া করে। উভয়ত্রই তামসিক বা রাজসিক ভাব আছে, কেবল আমাদের শক্তি কম বলিয়া আমরা

কেহ কেহ বকধার্ম্মিক সাজিয়া সাত্ত্বিকতার ভান করি। আমরা ভোগ করিতে বা বিলাসলালসা চরিতার্থ করিতে চাই না, ইহা সত্য নহে। আমরাও চাই, কিন্তু পারি না। পুরাকালেও ভারতবর্ষে যুদ্ধবিগ্রহ হিংসাদ্বেষ, রাজ্যের জন্য পিতৃহত্যা ভ্রাতৃহত্যা ইত্যাদি, ভোগ, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, বিলাসলালসা, কিছুরই অভাব ছিলনা।

পাশ্চাত্যদেশে এমন কোন অকল্যাণ নাই, যাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কোন-না-কোন একদল লোক প্রবল ভাবে লাগিয়া না আছে। আমাদের দেশ সম্বন্ধে কি একথা বলা যায়? আমরা পাশ্চাত্যের স্তুতিবাদী বা প্রাচ্যের নিন্দুক নহি। কিন্তু পাশ্চাত্যের অযথা নিন্দা দ্বারা আপনাদিগকে বড় করিতে চাই না।

লেখক বলিতেছেন :—

"বিবেকানন্দ আমাদিগকে গরীবের জন্য, দুঃখীর জন্য, পাপীর জন্য কাঁদিতে শিখাইলেন। তিনি দেখাইলেন, ভগবান নারায়ণ দুঃখী, পাপী, তাপী, গরীব সাজিয়া আমাদের নিকট কৃপা চাহিতেছেন। আর আমরা এতকাল তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। তিনি ভিখারী সাজিয়া আমাদের দেবমন্দিরে আসিয়া ভক্ত পুরোহিতের নিকট কাতর কণ্ঠে কহিতেছেন,

গৃহ মোর নাই
এক পাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাই।

আর আমরা দেবতার নিকট বসিয়া জপমালা জপিতে জপিতে তাঁহাকে বলিয়াছি,

আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে!
সে কহিল 'চলিলাম।' চক্ষের নিমেষে
ভিখারী ধরিল মূর্ত্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, 'প্রভু মোরে কি ছল ছলিলে।'
দেবতা কহিল, 'মোরে দূর করি দিলে।
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।'"

উনিশ শত বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্ট ঠিক্ এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। খৃষ্টিয়ান মতে ঈশ্বরপুত্র ও ঈশ্বরাবতার যীশু শেষ বিচারের দিনে ধার্ম্মিকদিগকে বলিবেন—

"আইস, আমার পিতার আশীর্ব্বাদপাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও। কেননা আমি ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, আর তোমরা আমাকে আহার দিয়াছিলে; পিপাসিত হইয়াছিলাম, আর আমাকে পান করাইয়াছিলে; অতিথি হইয়াছিলাম, আর আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলে; বস্ত্রহীন হইয়াছিলাম, আর আমাকে বস্ত্র পরাইয়াছিলে; পীড়িত হইয়াছিলাম, আর আমার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলে; কারাগারস্থ হইয়াছিলাম, আর আমার নিকটে আসিয়াছিলে। তখন ধার্ম্মিকেরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে বলিবে, প্রভো, কবে আপনাকে ক্ষুধিত দেখিয়া ভোজন করাইয়াছিলাম, কিম্বা পিপাসিত দেখিয়া আপনাকে পান করাইয়াছিলাম? কবে বা আপনাকে অতিথি দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছিলাম, কিম্বা বস্ত্রহীন দেখিয়া আপনাকে বস্ত্র পরাইয়াছিলাম? কবে বা আপনাকে পীড়িত বা কারাগারস্থ দেখিয়া আপনকার নিকট গিয়াছিলাম? তখন রাজা উত্তর করিয়া তাহাদিগকে বলিবেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, আমার এই ভ্রাতৃগণের—এই ক্ষুদ্রতমদিগের—মধ্যে একজনের প্রতি যাহা করিয়াছিলে, তাহা আমারই প্রতি করিয়াছিলে। পরে তিনি বাম দিকে স্থিত লোকদিগকেও বলিবেন, ওহে শাপগ্রস্ত-সকল, আমার নিকট হইতে দূর হও,......। কেননা আমি ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, তোমরা আমাকে আহার দেও নাই; পিপাসিত হইয়াছিলাম, আমাকে পান করাও নাই; অতিথি হইয়াছিলাম, আশ্রয় দেও নাই; বস্ত্রহীন হইয়াছিলাম, বস্ত্র পরাও নাই; পীড়িত ও কারাগারস্থ হইয়াছিলাম, আমার তত্ত্বাবধান কর নাই। তখন তাহারাও উত্তর করিবে, প্রভো, কোন্ সময়ে আপনাকে ক্ষুধিত, কি পিপাসিত, কি অতিথি, কি বস্ত্রহীন, কি পীড়িত, কি কারাগারস্থ দেখিয়া আপনকার পরিচর্য্যা করি নাই? তখন তিনি তাহাদিগকে উত্তর করিবেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা এই ক্ষুদ্রতমদিগের মধ্যে কোন এক জনের প্রতি যাহা কর নাই, তাহা আমারই প্রতি কর নাই।" (মথি লিখিত সুসমাচারের ২৫ অধ্যায়।)

খৃষ্ট যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহার প্রকৃত ভক্তেরা যেরূপ নরসেবা করিয়াছেন, তদপেক্ষা বেশী আধুনিক যুগে কেহ করেন নাই, পুরাকালে করিয়াছিলেন কি না জানি না। খৃষ্টের এই উপদেশ অবলম্বন করিয়া আখ্যায়িকাও লিখিত হইয়াছে; যেমন, লাওয়েলের লেখা "দি ভিজন অব্ সার্ লন্‌ফল্।" সার্ লন্‌ফল্ নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক কুষ্ঠী ভিখারীকে যখন অবজ্ঞাভরে এক স্বর্ণমুদ্রা দান করেন, তখন সে তাহা লয় নাই; কিন্তু বহুকাল পরে সার্ লন্‌ফল পৃথিবীর দুঃখতাপে দগ্ধ হইয়া যখন ঐ ভিখারীকে নিজেরই রুটির ভাগ দিলেন, তখন ভিখারী ঈশ্বরাবতার যীশুর মূর্ত্তি ধরিয়া আত্মপরিচয় দিলেন এবং বলিলেন—

"Who gives himself with his alms feeds three,
"Himself, his hungering neighbour, and Me."

এই কবিতা বিবেকানন্দের জন্মের অনেক পূর্ব্বে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।

জীবের সেবা যে ভগবানের সেবা, এই উপদেশ নানা আকারে পৃথিবীর অনেক সাধু দিয়াছেন। তদনুসারে কাজ ভারতবর্ষেরও নানা সম্প্রদায়ের লোকে করিয়াছে ও করিতেছে। বিবেকানন্দ যে পরিমাণে যতগুলি লোককে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু "তাঁহার অল্লায়ু জীবন হইতে তাঁহার জাতি নবজীবন লাভ করিয়াছে," "বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত নর-নারায়ণ-পূজা," ইত্যাদি কথা ব্যবহার করিয়া লেখক নানা সম্প্রদায়ের নানা সাধুর চেষ্টার অস্তিত্ব পরোক্ষ ভাবে অস্বীকার করিয়াছেন, বা তৎসমুদয়কে উল্লেখেরও অযোগ্য মনে করিয়াছেন। ইহা একদেশদর্শিতাপ্রসূত।

"খৃষ্টের সমাজসেবামূলক ধর্ম্ম, সেবার ধর্ম্ম পাশ্চাত্য জগৎকে আর অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেছে না।" আমরা যাহা জানি তাহাতে লেখকের এই মন্তব্য অভ্রান্ত বলিতে পারি না।

"গোষ্ঠী-প্রভাবের প্রাবল্য হেতু হিন্দুর ব্যক্তিত্বের খর্ব্ব হয় নাই।" "খর্ব্ব হইয়াছে" লিখিলে আমাদের বিবেচনায় ঠিক লেখা হইত।

সমাজ ব্যক্তির হিতের জন্য, না ব্যক্তি সমাজের হিতের জন্য, না, এই উভয়ের মাঝামাঝি মতই সত্য, এ বিষয়ে পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ একমত নহেন। তাঁহাদের সকলের মতের উল্লেখ ও আলোচনা এখানে অসম্ভব। লেখক বলিয়াছেন বটে যে পাশ্চাত্য জগতের "আধুনিক দর্শন বলিতেছে, মনুষ্যের প্রতিযোগিতার দ্বারাই ব্যক্তিত্বের পুষ্টিসাধন হয়। সমর্থের জয় লাভ ও অক্ষমের বিনাশ না হইলে, সমাজের উন্নতি অসম্ভব, ইহাই সেখানকার ধারণা।" কিন্তু লেখক যখন পাশ্চাত্য অন্যবিধ মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং যখন প্রিন্স্ ক্রপট্‌কিন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বিবর্ত্তনবাদে সহযোগিতা বা পরস্পর সাহায্যকে (mutual aid) একটা প্রধান স্থান দিয়াছেন, তখন পাশ্চাত্য সমুদয় সমাজতাত্ত্বিকদিগকে একমাত্র প্রতিযোগিতারই সমর্থক বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

লেখক বলিতেছেন—

"হিন্দু-সমাজ বর্ণ ও জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়া সমাজকে প্রতিযোগিতার কুফল হইতে রক্ষা করিয়াছিল। হিন্দুসমাজে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা বর্ণ ও জাতির মধ্যে আবদ্ধ থাকিত। সমাজের ছোট ছোট কর্ম্মকেন্দ্রের মধ্যে থাকিয়া ব্যক্তি পরস্পরের প্রতিযোগী হইত। হিন্দুসমাজেও প্রতিযোগিতা ছিল, জীবনসংগ্রামে সক্ষমের জয় অক্ষমের পরাজয় ছিল। কিন্তু জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্র সমগ্রসমাজব্যাপী ছিল না, সমাজের এক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই জীবনসংগ্রাম চলিত। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের প্রতিযোগী; অন্যবর্ণের সহিত ব্রাহ্মণের প্রতিযোগিতা ছিল না।"

ইহার অর্থ এই যে, হিন্দুসমাজের এক এক বর্ণ বা জাতির এক একটি স্বতন্ত্র কাজ, বা এক এক রকমের স্বতন্ত্র কাজ নির্দ্দিষ্ট আছে। এক এক জাতি বা বর্ণ তাহাই করে, অন্য জাতি বা বর্ণের কাজে হস্তক্ষেপ করে না। যদি বা এখন করে, পুরাকালে করিত না। আমরা দেখাইতেছি যে ইহা বর্ত্তমান বা অতীত কোন কালের পক্ষেই সত্য নহে। ১৯১১সালের সেন্সস্ রিপোর্টে দেখিতেছি যে সমগ্রভারতে ব্রাহ্মণদের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশেরও কম কৌলিক কার্য্য করে। বৈদ্যদের মধ্যে এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র চিকিৎসাব্যবসায়ী। কায়স্থদের মধ্যে এক-ষোড়শাংশ কৌলিক কাজ করে। যাহা হউক, বর্ত্তমান কালে সকল লোকে জাতিব্যবসা করে না, সত্য হইলেও, অতীত কালে করিত, এরূপ তর্ক উঠিতে পারে। তাহার উত্তর মনুসংহিতাতেই রহিয়াছে। শ্রাদ্ধে কিরূপ ব্রাহ্মণকে ভোজন করান অবিধেয়, মনু তাঁহার সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৫১ হইতে ১৬৬ শ্লোকে তাহাদের এক দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন।

জটিলঞ্চানধীয়ানং দুর্ব্বলং কিতবং তথা।
যাজয়ন্তি চ যে পূগাং স্তাংশ্চ শ্রাদ্ধে ন ভোজয়েৎ॥
চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িণস্তথা।
বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্জ্যাঃ স্যুঃ হব্যকব্যয়োঃ॥
প্রেষ্যো গ্রামস্য রাজ্ঞশ্চ কুনখী শ্যাবদন্তকঃ।
প্রতিরোদ্ধা গুরোশ্চৈব ত্যক্তাগ্নির্বার্দ্ধুষিস্তথা॥
যক্ষ্মী চ পশুপালশ্চ পরিবেত্তা নিরাকৃতিঃ।
ব্রহ্মদ্বিট্ পরিবিত্তিশ্চ গণাভ্যন্তর এব চ॥
কুশীলবোঽবকীর্ণী চ বৃষলীপতিরেব চ।
পৌনর্ভবশ্চ কাণশ্চ যস্য চোপপতির্গৃহে॥
ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।
শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ॥
অকারণপরিত্যক্তা মাতাপিত্রোর্গুরোস্তথা।
ব্রাহ্মৈর্যৌনৈশ্চ সম্বন্ধৈঃ সংযোগং পতিতৈর্গতঃ॥
আগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
সমুদ্রযায়ী বন্দী চ তৈলিকঃ কূটকারকঃ॥
পিত্রা বিবদমানশ্চ কিতবো মদ্যপস্তথা।
পাপরোগ্যভিশস্তশ্চ দাম্ভিকো রসবিক্রয়ী॥
ধনুঃশরাণাং কর্ত্তা চ যশ্চাগ্রে দিধিষূপতিঃ।
মিত্রধ্রুগ্ দ্যূতবৃত্তিশ্চ পুত্রাচার্য্যস্তথৈব চ॥
ভ্রামরী গণ্ডমালী চ শ্বিত্র্যথো পিশুনস্তথা।
উন্মত্তোঽন্ধশ্চ বর্জ্জ্যাঃ স্যুর্বেদনিন্দক এব চ॥
হস্তিগোঽশ্বোষ্ট্রদমকো নক্ষত্রৈর্যশ্চ জীবতি।
পক্ষিণাং পোষকো যশ্চ যুদ্ধাচার্য্যস্তথৈব চ॥
স্রোতসাং ভেদকো যশ্চ তেষাঞ্চাবরণেরতঃ।
গৃহসংবেশকো দূতো বৃক্ষারোপক এব চ॥
শ্বক্রীড়ী শ্যেনজীবী চ কন্যাদূষক এব চ।
হিংস্রো বৃষলবৃত্তিশ্চ গণানাঞ্চৈব যাজকঃ॥
আচারহীনঃ ক্লীবশ্চ নিত্যং যাজনকস্তথা।
কৃষিজীবী শ্লীপদী চ সদ্ভির্নিন্দিত এব চ॥
ঔরভ্রিকো মাহিষিকঃ পরপূর্ব্বাপতিস্তথা।
প্রেতনির্য্যাপকশ্চৈব বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে সেকালে ব্রাহ্মণদের মধ্যে অতি দুশ্চরিত্র লোক ছিল; যাহারা জন্ম হিসাবে নীচ, এরূপ লোকও ছিল। কিন্তু তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল ব্যবসায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যে মাংসবিক্রেতা, দোকানদার (নানাপ্রকারের), সুদজীবী, গোয়ালা, নট (অভিনেতা), পেশাদার গায়ক, তৈলবিক্রেতা, জুয়ার আড্ডাধারী, মশলাবিক্রেতা, ধনুর্ব্বাণনির্ম্মাতা, হস্তী গো অশ্ব ও উষ্ট্রের দমক (trainer), পক্ষিপোষক ও বিক্রেতা, যুদ্ধাচার্য্য, গৃহসংবেশক (architect), সেতুনির্ম্মাতা, বাস্তুবিদ্যাজীবী, কুকুরক্রীড়াদর্শক, শ্যেনপক্ষীবিক্রেতা, শূদ্রের ভৃত্য, নিত্যযাজনকারী, কৃষিজীবী, মেষমহিষপালক ও বিক্রেতা, মৃতদেহবহনজীবী, প্রভৃতি ছিল। সুতরাং সেকালে যে বহু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রচণ্ডালাদির কার্য্য করিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নতুবা এত লম্বা নিষেধের প্রয়োজন হইত না।

মহাকাব্য ও পুরাণাদিতেও দেখা যায় যে দ্রোণ ব্রাহ্মণ হইয়াও যুদ্ধ করিতেছেন, ভীষ্ম ও কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন। বস্তুতঃ উপনিষদ্গুলি প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়দের রচিত বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বর্ণে বর্ণে প্রতিযোগিতার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে আছে। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের ঝগড়া বর্ণে বর্ণে শত্রুতা ভিন্ন আর কি? ব্রাহ্মণ পরশুরাম যে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিলেন, তাহা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ভীষণ বিদ্বেষজাত সংগ্রাম ভিন্ন আর কি? শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী হিন্দু এগুলিকে কবিকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। উড়াইয়া দিলেও এগুলি যে বর্ণে বর্ণে বাস্তব সংঘর্ষের পৌরাণিক চিত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক প্রমাণও দিতেছি। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনুসারে ক্ষত্রিয়দেরই রাজা হইবার কথা। কিন্তু নন্দবংশের রাজারা ক্ষত্রিয় ছিল না, নীচজাতীয় শূদ্র ছিল। মৌর্য্যবংশীয়েরাও নিম্নশ্রেণীর শূদ্র ছিল। অন্য দিকে কাণ্ব বা কাণ্বায়নবংশের রাজারা ব্রাহ্মণ ছিল। চীনপর্য্যটক য়ুয়ান চাং উজ্জয়িনী, জিজোহোটী এবং মহেশ্বরপুরে ব্রাহ্মণ রাজার অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। মনুর সময়ে ব্রাহ্মণেরা যে অনেকে শূদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন, উদ্ধৃত শ্লোকগুলির "শূদ্রশিষ্য" কথাটি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং একদিকে যেমন সেকালে ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণের ব্যবসায় করিত, তেমনি শূদ্রও ব্রাহ্মণের কাজ করিত, ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। বৈদিকযুগে ত বর্ত্তমান সময়ের মত বা মনুর সময়ের মত জাতিভেদই ছিল না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ক্ষত্রিয়েরা উপনিষদ্ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারাই যে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতেন, তাহার প্রমাণ উপনিষদেই রহিয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।৩) বর্ণিত আছে যে পাঞ্চালরাজ প্রবহণজৈবালির নিকট শ্বেতকেতু-আরুণেয় ও তাঁহার পিতা আরুণি গৌতম ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ প্রাপ্ত হন। ইহাও তাহাতে লেখা আছে যে ঐ রাজা বলিয়াছিলেন যে ঐ বিদ্যা পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণ জানিতেন না, অতএব কেবল ক্ষত্রিয়দেরই তদ্বিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে। ঐ উপনিষদেই আছে যে চারি জন ব্রাহ্মণ

বিদ্যার্থী ও উদ্দালক-আরুণি অশ্বপতি রাজার নিকট ধর্ম্মোপদেশ লয়েন। এইরূপ উপাখ্যান বৃহদারণ্যক এবং কৌশিতকী উপনিষদ্-দ্বয়েও আছে। অতএব কেবল ব্রাহ্মণেরাই ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন, কিম্বা তাঁহারা কেবলমাত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনা ধর্ম্মোপদেশদানাদি কৌলিক কার্য্যই করিতেন, ইহার কোন কথাই সত্য নহে। একালে যেমন সেকালেও তেমনি সব জাতিই সব জাতির কৌলিক কাজ করিতে পারিত ও করিত। ব্রাহ্মণপ্রাধান্য প্রমাণ করিবার জন্য সমুদয় শাস্ত্র ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা "সম্পাদিত" (edited) হওয়া সত্ত্বেও, ঐ প্রাধান্যের বিরোধী কথা শাস্ত্রে রহিয়া গিয়াছে।

লেখক বলিতেছেন, "হিন্দুসমাজতন্ত্রের নেতা ছিলেন ব্রাহ্মণগণ"। এই নেতৃত্ব বর্ত্তমান-কালে হিন্দুসমাজেও সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয় না। তাহার প্রমাণ প্রবন্ধেই রহিয়াছে। লেখক ব্রাহ্মণ হইয়াও অব্রাহ্মণ বিবেকানন্দের শিষ্য। প্রাচীনকালেও যে এইরূপ হইত, তাহার প্রমাণ উপরে দিয়াছি। অতি প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয়েরা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। * বদ্ধমূল সংস্কার দ্বারা চালিত না হইয়া সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে বর্ণাশ্রমের যেরূপ ছবি সংহিতাদিতে আঁকিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা বাস্তব সমাজচিত্র নহে, তাহা সংহিতাকারদের অভিপ্রেত আদর্শ মাত্র।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণ থাকিতে রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, এই-সকল অবতার ক্ষত্রিয়কুলে কেন জন্মিলেন, এবং ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্রাহ্মণ থাকিতে সর্ব্বজনমান্য ভগবদ্গীতা ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া কেন বাহির হইল, তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখান আবশ্যক।

বাস্তবিক, প্রতিযোগিতা না থাকা, বা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সংকীর্ণ হওয়া, যে, সব অবস্থাতেই ভাল, তাহা নয়। শিশুকে প্রাপ্ত-বয়স্কের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ফেলিয়া দিলে, তাহার পরাজয় বা বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু চিরকালই কোন মানুষের প্রতিযোগিতা শিশুদের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে সে শিশুর চেয়ে বড় হইতে পারে না। কোন দেশের কোন শিল্প বা ব্যবসার প্রথম অবস্থায় তাহার সংরক্ষণ আবশ্যক। কিন্তু চিরকাল সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করিলে তাহার সম্যক্ উন্নতি হইতে পারে না। ভারতবর্ষে বর্ণে বর্ণে বা জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতা ছিল না, ইহা সত্য না হইলেও, কোন কোন বিষয়ে অন্যান্য দেশের চেয়ে যে এখানে প্রতিযোগিতা সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল ও আছে, ইহা সত্য। কিন্তু ইহাতে কি ফল ভাল হইয়াছে? ইহার ফলে আমাদের দেশে কি অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশী বা তাহাদের সমান শক্তিশালী প্রতিভাশালী দক্ষ মানুষ জীবনের সকল রকম কাজ নির্ব্বাহের জন্য জন্মিতেছে? তাহা ত জন্মিতেছে না। পরীক্ষায় যে ছাত্র নিজের স্কুলে প্রথমস্থানীয় হয়, তাহা অপেক্ষা জেলার মধ্যে যে প্রথম হয় সে শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। এইরূপ, কোন একটা সাম্রাজ্যে বা জগতে কে প্রথমস্থানীয়, তাহা জানা গেলে শ্রেষ্ঠতার আরও উচ্চ প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র যত বড় হয়, মানুষেরও তত বড় হইবার সম্ভাবনা ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরাজয় ও বিনাশের সম্ভাবনাও ঘটে বটে, কিন্তু মহতী বিনষ্টির সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত না হইলে মহত্তম সিদ্ধিরও সম্ভাবনা ঘটিতে পারে না।

প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা উভয়েরই প্রয়োজন আছে। প্রকৃতিতে উভয়েরই ব্যবস্থা আছে। উভয়ের দ্বারাই জীবের উন্নতি ঘটে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যাঁহারা ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা-জাত মহা অমঙ্গলের ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়। কারণ ইহারই ফলে ভারতে কোটি কোটি লোক অস্পৃশ্য অনাচরণীয় বিবেচিত হইয়া পশুর অধম অবস্থায় পতিত হইয়াছে! তাহা হইতে উদ্ধার লাভ করিতে তাহাদের কত কাল লাগিবে, কে জানে? এই অমঙ্গলের প্রতিকার না করিলে ভারতের উন্নতি হইবে না।

লেখক হিন্দু ইউজেনিক্স্ (হিন্দু Eugenics) কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। ইউজেনিক্সের অর্থ সুপ্রজনন বিদ্যা, অর্থাৎ যে বিদ্যা দ্বারা মানুষের বংশের উন্নতি হইতে পারে। বিজ্ঞানের পাশ দিয়া না গিয়াও সভ্য অসভ্য সব দেশের লোকেই মনে করে যে সুস্থ সবল বাপমায়ের সন্তান সুস্থ সবল হইবার সম্ভাবনা। সুস্থ সবল বা ঈপ্সিত গুণশালী বরকন্যার বিবাহ যে কোন দেশের লোক দেয়, তাহারাই ইউজেনিক্স্ বা সুপ্রজনন বিদ্যা জানে, ইহা মনে করা কি ঠিক্? সভ্য অসভ্য সব দেশের লোকেই কিছু কিছু পুষ্টিকর খাদ্য খায়, আহারের পর বিশ্রাম করে, এমন কি পশু-পক্ষীরাও করে। কিন্তু সব মানুষে এবং পশুপক্ষীরাও খাদ্যের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং পরিপাকের শারীরতত্ত্ব (physiology) জানে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। বাস্তবিক প্রাচীন কোন বহিতে বা প্রথাতে বা ব্যবস্থায় আধুনিক কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের মত কিছু থাকিলে, তাহা হইতে প্রাচীনদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অনুমান করিয়া লওয়া একটা রোগে দাঁড়াইয়াছে। আরব্য উপন্যাসে গালিচায় বসিয়া আকাশমার্গে যাতায়াতের বর্ণনা আছে বলিয়া ইহা মনে করা যায় না যে আরবেরা ব্যোমযান, বিমানপোত, প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিত। প্রাচীন কোন কোন সংস্কৃত বহিতে আছে যে উদ্ভিদের প্রাণ আছে;—অমনি ঢিঢি পড়িয়া গেল যে জগদীশবসু প্রাচীন হিন্দুদের কথাই পুনরাবৃত্তি করিতেছেন! তাহা হইলে তাঁহার বিংশবর্ষব্যাপী সাধনা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাটা কিছু নয়, সবই শাস্ত্রে লেখা আছে! যাঁহারা এইরূপ কথা বলেন, তাঁহারা বিজ্ঞান কথাটার আধুনিক অর্থই বুঝেন না।

যাহা হউক, লেখক যদি মনে করেন যে হিন্দুরা সুপ্রজনন বিদ্যা জানিতেন, ত করুন। কিন্তু আমাদের কাছে হিন্দু ইউজেনিক্স্ কথাটা সোনার পাথরবাটির মত স্ববিরোধী মনে হয়। ইউজেনিক্স পরীক্ষিত-তত্ত্বমূলক বিজ্ঞান নামের উপযুক্ত হউক বা না হউক, ইহার সর্ব্ববাদিসম্মত উপায় সংক্ষেপে এই যে সুস্থ শক্তিশালী দেহ ও মন যাহাদের তাহারাই বিবাহ ও বংশবৃদ্ধি করিবে, অপরেরা বিবাহ করিয়া বংশবিস্তার করিতে পারিবে না।

"Schemes of Eugenics, then, may be either positive or negative : they may aim at the encouragement of reproduction in the specially fit, or at its prevention in the specially unfit. It is in the latter direction that the most practical proposals have been made. An eminently sensible one has been that there should be a medical examination previous to marriage, the requirements being a moderate general physique, soundness of mind, and freedom from such diseases as may be communicated to the offspring. It may be that the reproduction of the unit would not be entirely prevented in this way ; but that obviously undesirable

---

* Vincent Smith's *Early History of India*, p. 347 : "So far back as the time when the *Dialogues of the Buddha* were composed the Kshatriyas ....in their own estimation stood higher than the Brahmans."†

† Rhys Davids, *Dialogues of the Buddha*, pp. 57, 119; *J. R. A. S.*, 1894, p. 342.

marriages should continue to be countenanced by Church and State, is a deplorable state of affairs." *Heredity*, by J. A. S. Watson, B. Sc., p. 89.

এইরূপ উপায় অবলম্বনার্থ আমেরিকার কোন কোন প্রদেশে বিবাহার্থী বরকন্যাকে উপযুক্ত চিকিৎসকের সার্টিফিকেট দেখাইয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হয়। হিন্দুসমাজে প্রত্যেক কন্যার (সে যেমনই হউক) বিবাহ অবশ্যকর্তব্য; ইহাই রীতি। ছেলে যদি পাগল বা অকর্ম্মণ্য বা অচিকিৎস্যরোগগ্রস্ত হয়, তবুও তাহার বিবাহ দেওয়াই রীতি; তদ্রূপ চেষ্টাও হয়। বাপ মা ইহাতে কোন দ্বিধা বোধ করেন না। শাস্ত্রের ব্যবস্থার কথা আমি বলিতেছি না। সমাজে যাহা হইতেছে, তাহাই ধর্ত্তব্য, তাহারই কথা বলিতেছি। ইহাই যে-দেশের ব্যবস্থা, তাহার কোন ইউজেনিক্স্ আছে বলা বা মনে করা কি উচিত?

লেখক বলিতেছেন, "আধুনিক ইউরোপে সুপ্রজননবিদ্যা (Eugenics) খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে।" ইহা ভ্রান্ত কথা। এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার নূতন সংস্করণে আছে—"It can hardly be said that the science has advanced beyond the stage of disseminating a knowledge of the laws of heredity, so far as they are surely known, and endeavouring to promote their further study." ইংলণ্ডে টাইম্‌স্ পত্রিকা অভিজাতদের, বংশের গৌরব যাঁহারা করেন তাঁহাদের, রক্ষণশীলদের, মুখপত্র। ইউজেনিক্সের প্রশংসা ও প্রতিপত্তির কথা এই কাগজে অন্ততঃ থাকা উচিত। কিন্তু টাইম্‌স্ কি বলেন? "The Stud-farm View of Marriage" শীর্ষক এক প্রবন্ধে টাইম্‌স্ বলিতেছেন :—

"The fact is, Eugenics is not yet a policy at all, but merely an enquiry into a new subject; and the eugenist who comes forward at present with a cut-and-dried policy for improving the race is no better than a charlatan. Eugenics is at present an infant science, and infants should not lay down the law. Yet Mr. Franklin Kidd tells us of a man of science who considered himself qualified to make sweeping social generalisations because he had dealt in a laboratory with thirteen generations of fowls besides several thousand hens. It was no doubt well enough that he should thus spend so much time and trouble upon observing poultry; but after all his observations were made they remain poultry and men remain men."

লণ্ডনের বিখ্যাত কোয়ার্টার্লী রিভিউ নামক ত্রৈমাসিকে "The Fallacy of Eugenics", ইউজেনিক্সের ভ্রম, নামক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে একটি মাত্র বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Weissman's invaluable contribution has been the shattering of the once-prevalent superstition that characters acquired in an individual's life-time are heritable by his children."

৪৫ বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত গ্যাল্টনের লেখা "Hereditary Genius" নামক বহি ইউজেনিক্সের ভিত্তি। সম্প্রতি ম্যাকমিলান কোম্পানী এই বহি আবার ছাপাইয়াছেন। সেই উপলক্ষে লিভারপুল পোষ্ট নামক কাগজ বলিতেছেন—"To-day neither the conclusions nor the premises of the great statistician are accepted with as much confidence as they evoked in the scientific world when they were first propounded." তাহাতে সায় দিয়া পব্লিক ওপিনিয়ন নামক কাগজ বলিতেছেন—"What we doubt is whether that gift (কোন স্বোপার্জ্জিত বিশেষ গুণ বা শক্তি) is transmitted at birth from one generation to another." কণ্টেম্পোরারী রিভিউ নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিকে বিখ্যাত লেখক হেভ্‌লক এলিস্ একটি প্রবন্ধে বলিতেছেন—"The destruction of genius, and its creation, alike elude the eugenist."

যে কার্ল পিয়ার্সনের কথার উপর ঝোঁক দিয়া রাধাকমল বাবু এত কথা বলিয়াছেন, তিনিই টাইম্‌স্ কাগজে লিখিয়াছেন :—

It is well known that the founder of eugenics, the late Francis Galton, thought progress towards increased race efficiency lay along two routes—scientific study of heredity and environment as they bore on racial development, and a popular movement emphasizing the importance of these factors in national welfare. Galton and Pearson both saw the danger that before the lines of the science of race efficiency were firmly drawn and substantial foundations laid, "the whole subject of the new science would be made ridiculous by the efforts of an uninstructed press to tickle the taste of a jaded public, using catchwords from a science which implicated in certain branches even as the sister science of medicine does—problems of sex. Galton feared before his death that the new science of eugenics would do more harm than good. This fear seems to have been "sadly realized."

"It has become a subject for buffoonery on the stage and in the cheap press. We are treated to 'eugenic' marriages and to 'eugenic' babies, and to plays which have nothing whatever to do with the problem of race welfare; officials of eugenic societies submit to being interviewed with regard to well-advertized babies, and any one who stands wholly apart from such absurdities may wake up one morning to find his name associated with a 'eugenic' baby whose very existence he has never heard of! He is left with the alternatives of grinning with the rest of the world or bringing an action for libel. What we feared might result has become a fact. Eugenics is rapidly developing into a topic for the *poseur*, the 'Kongress-bummler,' and the paragraphist. 'Eugenic aspirations have begun to appeal to the imagination of the public,' so the report of a eugenic society tells us, and the fitting comment is found in that public writing to the daily press and contrasting the relative effectiveness of 'eugenics' and 'ancestry'! Even on a slightly higher plane we find the same disheartening experience, eugenic publications and eugenic congresses issuing statements with regard to such vitally important topics as insanity, mental defect, or the influence of heredity and environment which are obviously or demonstrably incorrect. We have not yet nearly adequate knowledge on these topics. Years of patient work in medico-social observation, in genetic experiment, and in careful study of family history are needed before the laws of eugenics as a science can be dogmatically stated. When we meet such dogmas proclaimed in the name of eugenics as 'At last it is possible to give definite advice to those about to marry or who do not wish to transmit their undesirable traits. . . . Weakness in any trait should marry strength in that trait, and strength may marry weakness,' we stand aghast at the evil worked by the rapid popularization of 'eugenics,' and recognize the certainty that a movement thus careless of its facts

and vaunting in its conclusions must collapse, as the older 'social science' collapsed."

আর বেশী মত উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে ইউজেনিক্স এখনও একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান হয় নাই। পূর্ব্বপুরুষের উপার্জ্জিত গুণ বংশানুক্রমে সন্তানে বর্ত্তে না, ইহাই বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের মত; কাহারও কাহারও মত ইহার বিপরীত হইলেও সমুদয় জিনিষটাই এখনও সন্দেহে আচ্ছন্ন। অতএব ইহা লইয়া লেখক যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার কোন কথারই আলোচনা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন; কারণ কোনটিরই কিছু মূল্য নাই। যে বিষয়ে "dogmatically" কিছু বলিবার সময় কাল-পিয়ার্সনের মত বৈজ্ঞানিকের মতে এখনও আসে নাই, তাহা লইয়া তথাকথিত হিন্দু ইউজেনিক্সের বড়াই করা আমাদের মত হাতুড়িয়া ও মূর্খের দেশে ভাল নয়, কারণ এখানে সংশোধন করিবার লোক কম।

"বর্ণধর্ম্মের ভিত্তি অধিকার-ভেদ।" তথাস্তু। কিন্তু এমন কোন্ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ বা সম্প্রদায় আছেন যিনি বা যাঁহারা, জন্মিবামাত্র প্রত্যেক শিশুর অধিকার ঠিক্ করিতে পারেন? কেহ এরূপ চেষ্টাও করিয়াছেন বলিয়া ত শুনি নাই। "জন্মিবামাত্র কোন্ শিশুর কিরূপ গুণ বা শক্তি হইবে, তাহা আমরা জানি," মানুষের পক্ষে এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা আর হইতে পারে না। চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণত্বের লেশ মাত্র নাই; চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, জ্ঞানে চরিত্রে কত অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ-লক্ষণাক্রান্ত; চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, একই মানুষ জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বয়সে, অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণবিশিষ্ট হয়; তথাপি আমরা জন্মগত শ্রেণীবিভাগে বিশ্বাস ত করিবই, অধিকন্তু তাহার বড়াই করিব ও তাহার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমর্থন করিব। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে?

অভিনেতা

(ফরাসী লেখক ক্লারেটির গল্প হইতে গৃহীত)

তখন বিখ্যাত ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান যুদ্ধের অবসান হইয়া আসিতেছে। ফরাসী সৈন্য নগরের পর নগর ছাড়িয়া দিয়া হটিয়া গিয়াছে; বিজয়ী জার্ম্মান সৈন্যের গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? দেখিতে দেখিতে তাহারা পারী নগরী অবরোধ করিল। ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই জানেন কিরূপে সেডানে এই যুদ্ধের পরিণাম হইল ও কিরূপে হতভাগ্য সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন রাজ্যচ্যুত হইয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যাহা হউক ইতিহাসের কথা ইতিহাস বলিবে, এখন আমি আমার কথা বলি। আমি একজন ফরাসী অভিনেতা, অভিনয়-কার্য্যে আমি কিছু কম সুখ্যাতি অর্জ্জন করি নাই। যাউক, আত্মশ্লাঘা করিব না, কেবল একটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে—একাধিক সম্রাট আমার সহিত করমর্দ্দন করিয়াছেন, সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ন স্বয়ং আমার নিকট অভিনয়-বিষয়ে শিক্ষা-লাভ করিতেন। বুদ্ধিমান পাঠক ও বুদ্ধিমতী পাঠিকা ইহা হইতেই আমার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন।

পারীনগরীতে সেই যুদ্ধের সময়েও আমি অভিনয় দেখাইতাম। ফরাসী নাগরিকগণ এইরূপ বিপদ সম্মুখীন দেখিয়াও আমোদ প্রমোদে রত থাকিত, তাহাদিগের ভয় নাই, আতঙ্ক নাই, আশঙ্কা নাই। ধীর, স্থির ভাবে, নির্ভীকচিত্তে তাহারা মৃত্যুমুখে অগ্রসর! অন্য লোকে কি ভাবিবে জানি না, কিন্তু ফরাসী স্বভাব এইরূপ অদ্ভুত। নগরে অনবরত গোলাবর্ষণ হইতেছে, ফরাসী নাগরিক, ফরাসী বালক তাহার সম্বন্ধেই ব্যঙ্গ কৌতুক করিতে প্রবৃত্ত হইল। হয়ত একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া বেড়াইতেছেন, হঠাৎ একটি ফরাসী বালক চীৎকার করিয়া উঠিল "গোলা, গোলা"। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ধূলি ও কর্দ্দমের উপর শুইয়া পড়িলেন! কিন্তু কোথাও গোলাগুলি নাই, বালক রঙ্গ দেখিবার জন্য এইরূপ করিয়াছিল! বস্তুতঃ বিপদের সম্মুখেও আমরা এই প্রকারে আমাদের জীবন যাপন করিতেছিলাম। কিন্তু আমার আর অভিনয় ভাল লাগিতেছিল না। কেবল রঙ্গ-মঞ্চে বীর নায়কের চরিত্র অভিনয় করিয়া আমি আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতাম না। আমার ইচ্ছা হইল বাস্তব জগতেই এইরূপ একটি চরিত্র সাজিব, একবার যুদ্ধে যোগদান করিব। এই সময়ে বাহির হইতে পারী নগরে এক অভিনব উপায়ে খবর পাঠান হইত। টাইম্‌স কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় এই-সকল খবর ছাপাইয়া দিত, তাহার পর ইহার একটি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ লইয়া পায়রা অথবা বেলুনের দ্বারা ইহা পাঠান হইত। একদিন এই-রূপ একটি খবর আসিল। পারী নগরীর কিছু দূরে একটি গ্রামের যুবকেরা যুদ্ধে যোগদান করিতে প্রস্তুত, তাহারা অপর পার্শ্ব হইতে শত্রুকে আক্রমণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। তাহারা আমাদিগের সেনাপতির নিকট উপদেশ ও একজন লোক চাহিয়া পাঠাইয়াছে। আমি যাইতে প্রস্তুত হইলাম। সেনাপতির নিকট হইতে একখণ্ড কাগজ লইয়া আমি চলিলাম। আমাকে

শত্রু-সৈন্যের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে, তাহার পর অন্য পার্শ্বস্থিত যুবকদিগের সহিত আমি যোগদান করিতে পারিব। আমি মনে করিলাম "আচ্ছা, এইবার আমার সমস্ত অভিনয়শক্তি প্রয়োগ করিব। এইবার আমি প্রকৃত অভিনেতা হইলাম।" যাউক, তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আমি কৃষক সাজিলাম। রঙ্গমঞ্চে কতবার কৃষক সাজিয়াছি, কাহার সাধ্য আমাকে চিনিতে পারে! একটি লোক আমাকে সীন নদী পার করাইয়া দিল, অপর কূলেই শত্রু। তীরে নামিয়া আমি কিছু দূর অগ্রসর হইলাম, হঠাৎ কর্কশ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন হইল "কে যায়?" আমি ধীরভাবে বলিলাম "ফ্রান্স।" তৎক্ষণাৎ একদল জার্ম্মান সৈন্য আমাকে বেষ্টন করিল, আমার কাগজটি গোলা পাকাইয়া আমি মুখে ফেলিয়া দিলাম। একজন সেনাপতি আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে নিযুক্ত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এই যুদ্ধের সময়ে কেন নগর ছাড়িয়া আসিয়াছ?" আমি আমার পালা ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম, কৃষকের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী করিয়া বলিলাম "আজ্ঞা, মুই চাষালোক, মোর সাথে যুদ্ধ কি? এই আজ্ঞা, গ্রামে মোর ইস্ত্রী-পরবার আছে, তাদের দেখতে যাচ্ছি।" সেনাপতি বলিলেন "না, তুমি গুপ্তচর।" আমি উত্তর দিলাম "আজ্ঞা, কি বল্লেন গু-গু-প্-ত-চর, সে আমি নই, আজ্ঞা না, আমি চাষা।" সেনাপতি পুনরায় বলিলেন "আরে না, তুমি চর।" আমি নয়ন বিস্ফারিত করিয়া বলিলাম "এঁ্যা আজ্ঞা না, মুঁই চর নই, মুঁই চাষ করি।" সেনাপতি আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য সৈন্যদিগকে বলিলেন "যাও ইহাকে গুলি কর।" আমি মনে করিলাম এইবার নাটকের নায়কের ন্যায় একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়া মরিব। কিন্তু আত্মদমন করিয়া বলিলাম "আজ্ঞা গুলি, ইস্ত্রী-পরবার দ্যাখতে আস্যা প্রাণডা হারালাম।" সেনাপতি আদেশ করিলেন "আচ্ছা, ইহাকে কারাগারে লইয়া যাও।"

আমি এখন কারাগারে বন্দী। আমার সহিত আরও অনেক ফরাসী সৈন্য এইরূপ বন্দী। আমার প্রথমে অতিশয় ক্ষোভ হইল যে কৃষকের চরিত্র অভিনয় করিয়াও আমি যাইতে পারিলাম না। কিন্তু সুখের বিষয় যে জার্ম্মানেরা সকলেই আমাকে নর্ম্মাণ্ডির একটি আস্ত কৃষক বলিয়াই মনে করিয়াছিল। যাহা হউক কারাগারে বসিয়া বসিয়া একটি ফন্দী আঁটিলাম। কতকগুলি নাটকে সেইরূপ কৌশলের কথা পড়িয়াছিলাম। আমি স্থির করিয়াছিলাম—যে জার্ম্মান সম্রাট যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাকেই বন্দী অথবা নিহত করিব, তাহা হইলে শান্তি স্থাপিত হইবে। জার্ম্মান সম্রাট সৈন্যদিগের সহিত ছিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে অধিকসংখ্যক প্রহরী থাকিত না। সুতরাং তাঁহাকে বন্দী করিয়া সন্ধি স্বীকার করাইয়া লইতে কষ্ট হইবে না। আমার মন্ত্রীরা সকলেই বলশালী ফরাসী সৈন্য। আমি তাহাদিগকে এই প্রস্তাবের কথা বলিলাম। তাহারা সকলেই স্বীকার করিল। একটি দিন ঠিক করা গেল। সেই দিনে নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে আমি হুকুম দিবা মাত্রই তাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

সেই দিন উপস্থিত। সেই শুভমুহূর্ত্ত, সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ ঘনাইয়া আসিতেছে! আমার যেন হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে উত্তপ্ত শোণিত-প্রবাহ ধাবিত হইল। আর কয়েক সেকেণ্ড পরেই একটি বিরাট, অলৌকিক অভিনয় হইয়া যাইবে। প্রধান অভিনেতা আমি ফ্রান্সের মুক্তি সাধন করিব! অবশেষে, অবশেষে সেই মুহূর্ত্ত উপস্থিত। আমি হুকুম দিতে প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু কথা আমার কণ্ঠেই রহিয়া গেল! অদূরে শ্বেত-পতাকা হস্তে ফরাসী দূত বশ্যতার প্রস্তাব লইয়া আগত। হায়! আমার আর অভিনয় হইল না। আমার সেই অলৌকিক অভিনয় এইরূপেই সাঙ্গ হইল! সেদিন অভিনেতার কার্য্য ঐখানেই শেষ! এবং যবনিকা পতন।

শ্রীসারদাচরণ মহাপাত্র।

সাধ

আমার আঁচল যদি হ'ত এত বড়,
ঢাকা পড়ে' যেত যাহে সকল আকাশ,
নিখিলের ফুল পাতা সব করে' জড়
যত্নে রাখিতাম ঘিরে আমি বারোমাস;
একটি ছিঁড়িতে তার পেত না বাতাস।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

শিল্প ও বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি *

ইতালীবাসী জনগণ সর্ব্বপ্রথম শিল্প, বাণিজ্য ও স্বাধীনতার প্রভাব অনুভব করে। ইতালী হইতে আল্‌প্‌স পর্ব্বতের অপর পারে এই প্রভাব পরে জর্ম্মান-সমাজে বিস্তৃত হয়। ক্রমশঃ ইতালীর ন্যায় জর্ম্মানির উত্তর সমুদ্রকূলেও শিল্প, বাণিজ্য ও স্বাধীনতার আন্দোলন স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইতে লাগিল।

জর্ম্মানসম্রাট অটো দি গ্রেট ইতালীর নগর-রাষ্ট্রসমূহকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারই পিতা সম্রাট্ হেনরি জর্ম্মানির সমুদ্রকূলে নানা নগর প্রতিষ্ঠার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে প্রাচীন রোমীয় নগর ও উপনিবেশসমূহের ধ্বংসাবশেষের উপর এবং অন্যান্য স্থানে অনেক নূতন নূতন নগর নির্ম্মিত হয়।

এই যুগের জর্ম্মান সম্রাটেরা নানা উদ্দেশ্যে নগর-গঠনে সহায়তা করিতেন। প্রথমতঃ, ধনীসম্প্রদায় রাজশক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তাহাদিগকে খর্ব্ব করিবার জন্য নগরের বণিকসম্প্রদায় হইতে সম্রাটেরা সাহায্য আশা করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের রাজস্ব বাড়াইবার পক্ষে নগরসমূহের প্রতিষ্ঠা বিশেষ কার্য্যকরী ছিল। এই বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ বিবেচিত হইত। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র রক্ষার উপায় চিন্তা করিয়াও সম্রাটেরা নগর নির্ম্মাণে উৎসাহী হইতেন।

উত্তর জর্ম্মানির বন্দরসমূহ ইতালীর সমুদ্র-নগরসমূহের সঙ্গে ব্যবসায়-সম্বন্ধ পাতাইয়াছিল। ইতালীর শিল্পী ও কারিগরের সঙ্গে জর্ম্মানদিগের প্রতিযোগিতা স্বতই উপস্থিত হইল। এতদ্ব্যতীত বন্দরের জনগণ অনেক বিষয়ে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভোগ করিত। এই-সকল কারণে জর্ম্মানির নগরকেন্দ্রে সম্পদ ও সভ্যতার বিকাশ হইতে লাগিল।

স্বাধীনতা ও শিক্ষাকর্ম্মের প্রভাবে বন্দরগুলি শক্তিশালী হইয়া উঠিল। কিন্তু জলপথে এবং স্থলপথে তাহাদের উপর দস্যু-তস্করগণের আক্রমণ অল্প হইত না। কাজেই আত্মরক্ষার জন্য নগরসমূহের মধ্যে একটা যৌথ-প্রতিষ্ঠান গঠন আবশ্যক হইয়া পড়িল। ১২৪১ খৃষ্টাব্দে হাম্বার্গ এবং লুবেক নগরদ্বয় একটা লীগ বা যৌথ-সমিতি স্থাপন করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভিতরই বাল্‌টিক এবং উত্তর সাগরদ্বয়ের কূলস্থ সকল বন্দর, এবং ওডার, এল্‌ব, ওয়েজার, রাইন ইত্যাদি নদতটবর্ত্তী নগরসমূহ এই লীগে যোগদান করিল। সর্ব্বসমেত ৮৫ নগররাষ্ট্র এই লীগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। জর্ম্মানভাষায় সেই লীগ বা যৌথ প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল "হান্‌সা"।

এই যৌথ-নগররাষ্ট্র বাণিজ্যের নিয়মসমূহ প্রবর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইল। সমুদ্র-বাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য "হান্‌সা" সামুদ্রিক সমর-বিভাগের সুব্যবস্থা করিল। কতিপয় রণতরী এই উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইল। বাণিজ্য-পোতসমূহের সংখ্যা বাড়াইবার জন্যও তাহাদের কম প্রয়াস ছিল না। এই জন্য তাহারা নিয়ম করিল যে, হান্‌সার অন্তর্গত জাহাজেই হান্‌সার মাল আমদানী রপ্তানী করা হইবে। এই কার্য্যের জন্য কোন বিদেশীয় বাণিজ্যতরীর সাহায্য গ্রহণ করা হইবে না। এতদ্ব্যতীত হান্‌সা সমুদ্রকূলের নানাস্থানে ধীবরপল্লী স্থাপন করিল। তাহার ফলেও হান্‌সার অধীনে বহুসংখ্যক ধীবর-পোত সমুদ্রে চলা ফেরা করিত। এই-সকল বাণিজ্য-নিয়ম হান্‌সালীগ ভেনিসের নিকট শিক্ষা করিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে ইংরাজজাতির বাণিজ্যনিয়ম (Navigation Laws) ও হান্‌সা-নীতির অনুকরণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

সমুদ্র-বাণিজ্যে লাভবান্ হইতে হইলে এই নীতি অবলম্বন করিতেই হইবে। বিদেশীয় জাহাজের গতি-বিধিকে কথঞ্চিৎ বাধা না দিলে স্বদেশীয় সমুদ্র-বাণিজ্য কখনই দাঁড়াইতে পারে না। এই জন্য সকল জাতিই অর্ণব-যান এবং নৌ-বাণিজ্য ও নৌ-শিল্প সম্বন্ধে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়া থাকে। আজ ইংলণ্ড এই বিদেশীয়-বর্জ্জন-রীতি কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। ইংলণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী ইউরোপীয় বণিকজাতিরাও সকলে এইরূপ সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে

* জর্ম্মান পণ্ডিত ফ্রেড্‌রিকলিষ্ট-প্রণীত "স্বদেশী ধন-বিজ্ঞান" গ্রন্থের ঐতিহাসিক বিভাগের এক অধ্যায়।

যাঁহারা সমুদ্র-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন তাঁহাদিগকেও স্বদেশীয় নৌশিল্প ও অর্ণবপোতসমূহকে বিদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে রক্ষা করিতে হইবে। এইজন্যই উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও এই নীতি দেখিতে পাই। তাঁহারা স্বাধীন হইবার পূর্ব্বেই বিদেশীয় অর্ণব-যান এবং সমুদ্রবাণিজ্যের প্রতিকূল নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অবাধ বাণিজ্য-নীতি বন্ধ করিয়া যুক্ত-রাষ্ট্র ইংরেজজাতির ন্যায়ই ব্যবসায়ে লাভবান হইয়াছে।

হ্যান্সা-সমিতির বাণিজ্যদক্ষতা জর্ম্মানীর বাহিরেও প্রশংসিত হইতে লাগিল। উত্তর ইউরোপের নরপতিগণ এই যৌথ বণিক-সমিতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন হ্যান্সার সঙ্গে ব্যবসায়-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহাদের স্বদেশীয় কৃষিজ ও ধাতুজ পদার্থ ঐ সমবায়ের নগরসমূহে প্রেরিত হইতে পারিবে, এবং ঐ নগরসমূহ হইতে তাঁহারা উৎকৃষ্ট শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য আমদানী করিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত, আমদানী রপ্তানীর উপর শুল্ক বসাইয়া তাঁহারা রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ, তাঁহাদের প্রজাপুঞ্জ নূতন শিল্প, নূতন কারবার, নূতন বাণিজ্য ইত্যাদির পরিচয় পাইয়া আলস্য ও দুর্নীতিপরায়ণতা ত্যাগ করিতে শিখিবে। এই-সকল কারণে উত্তর ইউরোপের নরপতিগণ হ্যান্সা-লীগকে নিজ নিজ দেশে নগর, বন্দর ও কারখানা গঠন করিতে আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। হ্যান্সা-সমিতির এই কার্য্যে যথাসম্ভব সাহায্য ও উৎসাহ দিবার জন্য রাজারা তাঁহাদিগকে নানা রাষ্ট্রীয় অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। ইংলণ্ডের রাজারাই এই বিষয়ে বিশেষ অগ্রগামী হইয়াছিলেন।

বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক হিউম বলেন "ইংলণ্ডের ব্যবসায় প্রথমে বিদেশীয় বণিকগণের হস্তে ছিল। তাঁহাদের মধ্যে হ্যান্সা-লীগেরই প্রাধান্য ছিল। এই হ্যান্সা-লীগকে ইংরেজেরা "ইষ্টার্লিং" বা প্রাচ্য বণিক্-সমিতি নামে জানিত। তৃতীয় হেন্‌রি এই প্রাচ্য ব্যবসায়ীদিগকে অন্যান্য বিদেশীয় ব্যবসায়ী অপেক্ষা বেশী সম্মান ও আদর করিতেন। এইজন্য হ্যান্সালীগের ইংলণ্ডীয় কেন্দ্রসমূহে কতকগুলি রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যদেশীয় বণিকগণের উপর শুল্ক যথারীতি বসান ছিল। তাহাদিগকে অনেক বাঁধাবাঁধি ও বিঘ্নের ভিতর থাকিয়া ব্যবসায় চালাইতে হইত।"

ইংরেজ জাতি তখনও বাণিজ্যে এবং ব্যবসায়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিল। দ্বিতীয় এডোয়ার্ডের আমলেও হ্যান্সা-লীগের অন্তর্গত বিদেশীয় বণিক্-সম্প্রদায়ই ইংলণ্ডের সমগ্র বিদেশীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে হ্যান্সা-লীগের বাণিজ্য-নীতি-অনুসারে তাহাদের কোন কার্য্যই বিদেশীয় জাহাজে হইত না। এই কারণে ইংলণ্ডের সমস্ত বিদেশীয় বাণিজ্যই হ্যান্সার জাহাজে চলিত। ফলতঃ ইংরেজ জাতির নৌশিল্প, নৌ-বিদ্যা এবং অর্ণবপোত ইত্যাদি তখন অতি নগণ্য অবস্থায় ছিল। অধিকন্তু ইংলণ্ডের মুদ্রা সেই ইষ্টার্লিং যুগে হ্যান্সা-লীগের টাকশালে প্রস্তুত হইত! বণিকগণ যে টাকা ব্যবহার করিতেন সেই টাকাই ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইত। ইংরেজেরা এই ইষ্টার্লিং মুদ্রা পাইলে অন্য কোন মুদ্রা গ্রহণ করিত না। এ জন্য আজপর্য্যন্ত ইংরেজের 'পাউণ্ড' মুদ্রা "ষ্টার্লিং" বা খাটি নামে অভিহিত হয়।

হ্যান্সা-লীগের সঙ্গে ইংলণ্ডের এইরূপ সম্বন্ধ ইউরোপীয় বাণিজ্যের ইতিহাসে আরও দুই এক স্থলে দেখা গিয়াছে। ওলন্দাজ জাতির সঙ্গে পোল্যাণ্ডের, এবং আধুনিককালে ইংলণ্ডের সঙ্গে জর্ম্মানীর এইরূপ ব্যবসায়-সম্বন্ধ দেখিতে পাই। ইংলণ্ড হইতে হ্যান্সায় পশম, রাং, চামড়া, মাখন, এবং বহুবিধ কৃষিজাত এবং খনিজ পদার্থ রপ্তানী হইত। হ্যান্সা হইতে ইংলণ্ডে নানাপ্রকার শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য আমদানী হইত।

১২৫২ খৃষ্টাব্দে হ্যান্সা-লীগ ব্রুজেস্-বন্দরে একটা বৃহৎ কার্য্যালয় খুলেন। সেই খানে ইংলণ্ড ও অন্যান্য উত্তর ইউরোপীয় দেশের পদার্থসমূহ পুঞ্জীকৃত হইত। ঐ কেন্দ্রে বেল্‌জিয়ামের বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য আসিয়া জমিত। আবার ইতালীয় বণিকগণের সাহায্যে এশিয়ার বিভিন্নদেশীয় পণ্যসমূহও এই নগরে আমদানী করা হইত। পরে এই-সমুদয় দ্রব্য ইংলণ্ডে এবং উত্তর ইউরোপের অন্যান্য দেশে রপ্তানী করা হইত।

ব্রুজেস্-কেন্দ্রের ন্যায় আরও তিনটি কেন্দ্র হান্সা-লীগ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১২৫২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন-নগরে তাঁহারা "ষ্টীলইয়ার্ড" নামক কার্য্যালয় খুলিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ইংরেজসমাজে উচ্চশিল্প ও সভ্যতার যথেষ্ট প্রসার হয়। আর এক কেন্দ্র রুশিয়ায় গঠিত হইয়াছিল। ১২৭২ খৃষ্টাব্দে "নবগরড" বন্দরে হান্সা-লীগ কর্ত্তৃক একটী ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত হয়। হান্সা এই কেন্দ্র হইতে লোম, পাট ইত্যাদি পদার্থ সংগ্রহ করিত। চতুর্থ কেন্দ্র নরওয়ে দেশের বার্জেন-নগরে ১২৭২ সালেই স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে মাছ এবং মাছের তেল ইত্যাদি পাওয়া যাইত।

যতদিন পর্য্যন্ত কোন জাতি অসভ্য বর্ব্বর বা আদিম অবস্থায় থাকে ততদিন তাহার পক্ষে অবাধ বাণিজ্য-নীতিই প্রশস্ত ও উপকারী। এইরূপ স্বাধীন বাণিজ্যের নিয়মে তাহারা তাহাদের শিকারজাত, কৃষিজাত এবং অনায়াসলব্ধ সামগ্রী অন্যদেশে পাঠাইয়া দিতে পারে এবং তাহার পরিবর্ত্তে সভ্যজনোচিত কাপড়চোপড়, বাসন-কোশন, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্র হাতিয়ার ইত্যাদি পাইতে পারে। এইরূপ ব্যবসায়ের ফলে অসভ্য লোকেরা ক্রমশঃ উচ্চ-অঙ্গের সভ্যতার অধিকারী হইতে থাকে। এইজন্য তাহারা বিদেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতিকূল কোন নিয়ম পছন্দ করে না। তাহাদের পক্ষে বিদেশীয় দ্রব্যের বাধাহীন আমদানীই বিশেষ হিতকর।

অবশ্য অসভ্য জাতিসকল ক্রমশঃ স্বদেশেই সকল প্রকার শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন করিতে শিখে। তখন তাহারা আর অবাধে-বাণিজ্যনীতি পছন্দ করে না। এই অবস্থায় বিদেশীয় বণিকগণকে তাহারা প্রতি-দ্বন্দ্বী বিবেচনা করে এবং নানা উপায়ে তাহাদিগকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হয়। বিদেশীয়গণকে বাধা দিয়া স্বদেশী শিল্পীদিগকে সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা ইংরেজ-সমাজেও যথাসময়ে জাগরিত হইয়াছিল। ইংরেজেরা কেবলমাত্র প্রাকৃতিক পদার্থ বিদেশীয় শিল্পীদিগকে জোগাইয়া আর সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিল না। স্বদেশেই নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য তাহারা উদ্‌গ্রীব হইল।

হান্সা-লীগের ষ্টীল-ইয়ার্ড কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার ৮০০ বৎসরের ভিতরেই ইংলণ্ডে এই স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ নরপতি তৃতীয় এডোয়ার্ড স্বদেশী শিল্প সংরক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এইজন্য তিনি হান্সা বণিক্‌গণের প্রভাব যথোচিত বন্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়া স্বদেশেই বস্ত্রবয়ন-কার্য্যের সূত্রপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও ইংলণ্ডে বয়নশিল্প নাবালক অবস্থায় ছিল। ইংরেজেরা পশমমাত্র তৈয়ারী করিতে জানিত; পশম হইতে কাপড় প্রস্তত করিতে পারিত না। এজন্য তৃতীয় এডোয়ার্ড বিদেশ হইতে সুদক্ষ তন্তুবায় ইংলণ্ডে আনাইতে যত্ন করিলেন। বিদেশীয় বণিকেরা দেশত্যাগ করিতে সহজে রাজী হয় নাই। কাজেই ইংলণ্ডে তাহাদিগকে বসতির বহুবিধ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা এডোয়ার্ড কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে নানা রাষ্ট্রীয় অধিকার এবং সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রদানের আশা দিয়া তবেই তিনি ইংলণ্ডে বিদেশীয় পশমশিল্পীদিগের বসতি স্থাপন করাইতে পারিয়াছিলেন। এই বিদেশীয় শিল্পী-গণের মধ্যে বেলজিয়ামের লোকই প্রধান ছিল। তাহারা আসিয়া দলে দলে ইংরেজসমাজের মধ্যে বাস্তু-ভিটা স্থাপন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ ইংলণ্ডের তন্তুবায়-সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। অবশেষে এডোয়ার্ড আইন দ্বারা বিদেশীয় বস্ত্রের আমদানী ও ব্যবহার নিষিদ্ধ বলিয়া আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন। কোন ইংরেজ তখন হইতে বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিত না। স্বদেশী-প্রতিষ্ঠা এবং বিদেশী-বর্জ্জন দুইই সংরক্ষণনীতির অঙ্গ। তৃতীয় এডোয়ার্ডের রাজত্বকালেই এই দুই নীতি ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের তৃতীয় এডোয়ার্ড বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহপ্রদানে নানাদেশের শিল্পী ও কারিগর আসিয়া ইংলণ্ডে বাস করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ফ্ল্যাণ্ডার্স ব্রাবান্ত প্রভৃতি জনপদের শাসন-কর্ত্তারা স্বদেশীয় শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছিলেন। নানা কারণে তাঁহাদের সঙ্গে দেশীয় শিল্পীদিগের মনোমালিন্য ও বিরোধ ঘটে। ফলে শিল্পীরা তাহাদের অত্যাচারী রাজগণের দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিবার জন্য রাজারা কোন চেষ্টা করিলেন না। সুতরাং চতুর্দ্দশ-শতাব্দীতে "একস্য সর্ব্বনাশঃ অন্যস্য তু পৌষমাসঃ" হইল। বেল্‌জিয়াম হইতে শিল্পীরা বিতাড়িত হইল—ইংলণ্ডের লোকেরা তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিল। বেলজিয়ামের লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশ ত্যাগ না করিলে বহুসংখ্যক শিল্পী, কারিগর ও ব্যবসায়ী এক সঙ্গে ইংলণ্ডে পাওয়া কঠিন হইত। তাহা হইলে ইংলণ্ডের শিল্প, বাণিজ্যও অত শীঘ্র প্রতাপশালী হইয়া উঠিত না। কিন্তু বেলজিয়ামের গৃহবিবাদ এবং লোক-পীড়ন ইংরেজদিগের সৌভাগ্যউদয়ের কারণ হইল। ব্যবসায়ের ইতিহাসে এইরূপ দৈবঘটনা অনেক ঘটিয়াছে।

১৪১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ডে পশম-শিল্প অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। হিউমের ইতিহাসে জানা যায় যে এই সময়ে বিদেশীয় বণিকগণকে ইংরেজেরা নানা অসুবিধায় ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিল। বিদেশীয় বাণিজ্যের বিরুদ্ধে নানা বিঘ্ন সৃষ্ট হইতে লাগিল। আইন জারি হইল যে, বিদেশীয় বণিকেরা বিলাতে যত টাকার মাল আমদানী করিবেন, ঠিক তত টাকার বিলাতীমাল তাহাদিগকে বিলাতেই কিনিতে হইবে। বিদেশীর আমদানী এবং স্বদেশীর রপ্তানী সমান করাই এই সময়ে ইংরেজগবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য ছিল।

বিদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ চতুর্থ এডোয়ার্ডের আমলে আরও প্রবল হইল। ইংলণ্ডের চতুঃসীমার মধ্যে বিদেশীয় বস্ত্র আসিতেই পারিবে না - এই আইন প্রবর্ত্তিত হইয়া গেল। হান্সালীগ এই নিষেধ-নীতির যৎপরোনাস্তি প্রতিবাদ করিল। তাহার ফলে হ্যান্সা সম্বন্ধে নিষেধ তুলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু অন্যদেশীয় বস্ত্র ব্যবহারের সম্বন্ধে বর্জ্জননীতি থাকিয়াই গেল।

চতুর্থ এডোয়ার্ডের পঞ্চাশবৎসর পরে সপ্তম হেন্‌রি ইংলণ্ডের রাজা হন। তাঁহার আমলে ইংরেজ জাতির সামাজিক অবস্থা বিশেষ উন্নত হয়; এই উন্নতির প্রধান কারণ তাহার বৈষয়িক অবস্থার নূতন রূপ। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১০০।১৫০ বৎসরের ভিতর ইংলণ্ডে বহু নূতন নূতন শিল্প ও ব্যবসায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কারণে বহুসংখ্যক লোকের অন্নসংস্থানের নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। অন্নবস্ত্রের জন্য পরের উপর নির্ভর করিবার প্রবৃত্তি কমিতেছিল। হিউম বলেন "ধনী জনগণ আর ভৃত্যসংখ্যা বাড়াইয়া গৌরবান্বিত হইতেন না। তাঁহাদের এই অনর্থক অপব্যয় নিবারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে বহু চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু আইনের দ্বারা তাঁহাদের স্বভাব বদলাইতে পারা যায় নাই। এক্ষণে সমাজের উন্নতি শিল্পের প্রভাবে সাধিত হইল। ধনবানেরা অট্টালিকা, সাজসজ্জা, যুদ্ধের আসবাব, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য-সমন্বিত করিতে উৎসাহী হইলেন। উচ্চ অঙ্গের শিল্প ও কারিগরি তাঁহারা পছন্দ করিতে লাগিলেন। ইহার দ্বারা দেশের শিল্পীকুল যথেষ্ট উপকৃত হইল। ধনীগণের প্রতিযোগিতায় শিল্পীরা শিল্পের উৎকর্ষ বিধান করিতে পারিল। বড় লোকেরা শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া গৌরব বোধ করিতেন। শিল্পীরাও তাহাদের উৎসাহদাতা সাহায্যকারী ধনীগণের কীর্ত্তি প্রচার করিয়া গৌরবান্বিত হইল। সুতরাং নূতন ধরণের প্রশংসা, নূতন আদর্শের গৌরব, নূতন ছাঁচের "বড়মানুষী" ইংরেজ সমাজে দেখা দিল। ধনী জনগণের কার্য্যফলে মোসাহেব, কর্ম্মচারী এবং ভৃত্যকুলেরও উন্নতি হইল। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আর বড়মানুষের ধামাধরা হইয়া জীবন যাপন করিবার সুযোগ পাইত না। তাহাদিগকে বড়লোকেরা আর মাহিনা না দিয়া অন্নধ্বংস করিতে দিত না। মনিবগণের খেয়াল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; কোথাও তাহারা আর বিলাসী অপব্যয়শীল প্রভু খুঁজিয়া পাইল না। কাজেই তাহারাও শিল্প, কারুকার্য্য, ব্যবসায় শিখিতে বাধ্য হইল। শিল্পে, ব্যবসায়ে পারদর্শী হইয়া সমাজের যথার্থ উপকারে তাহারা নিযুক্ত হইল। অকর্ম্মণ্য, আলস্যপরায়ণ, মূর্খ জনগণের পরিবর্ত্তে সমাজে কর্ম্মঠ, শিল্পকুশল, কলাবিৎ, সমাজহিতকর লোক ইংলণ্ডে দেখা দিল।"

শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসায়ের প্রভাবে ইংরেজসমাজ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিদেশীয় বণিকগণকে বাধা প্রদান করা গবর্মেণ্টের স্থির

নীতির মধ্যে পরিগণিত ছিল। অষ্টম হেন্‌রির রাজত্ব-কালে স্বদেশীয় শিল্প যথেষ্ট পরিমাণেই লাভের উপায় হইয়াছিল। ইংলণ্ডের টাকা অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছিল। সুতরাং কৃষিজাত দ্রব্য, খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধি লক্ষিত হইল। এই মূল্যবৃদ্ধি অবশ্য ইংলণ্ডের বৈষয়িক অবস্থার সচ্ছলতাই সপ্রমাণ করিতেছিল।

কিন্তু অষ্টম হেন্‌রি ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার ভয় হইল দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। ইংরেজ শিল্পীরা তাঁহাকে বুঝাইল যে গত ১০০।১৫০ বৎসরের ভিতর বেলজিয়াম হইতে ইংলণ্ডে অনেক শিল্পী আসিয়া বাস করিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা এত বেশী যে কৃষিজাত দ্রব্য এবং খাদ্যের পরিমাণ অল্প পরিমাণে তাহারা পাইতেছে। কাজেই মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

হেন্‌রি এই যুক্তিই বুঝিলেন। এক আইন জারি করিয়া এক সঙ্গে ১৫,০০০ বেলজিয়ান শিল্পীদিগকে ইংলণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। তৃতীয় এডোয়ার্ডের আমলে বেলজিয়ামের নরপতিরা মূর্খের ন্যায় তাহাদের শিল্পীকুলকে তাড়াইয়াছিলেন। আজ এডোয়ার্ডের বংশধর নির্ব্বোধের মত সেই কার্য্যই করিলেন।

হান্‌সা-লীগ হেন্‌রির এই মূর্খতা দেখিল ও বুঝিল। কিন্তু তাঁহাকে সংবুদ্ধি ও পরামর্শ দিতে অগ্রসর হইল না। বরং তাহারা এই মূর্খ রাজার আমলে যথাসম্ভব স্বকীয় স্বার্থ পুষ্ট করিবার সুযোগ পাইল। তাহাদের রণতরী ছিল, যথেষ্ট মূলধনও ছিল। ইংরেজদিগের সকল অভাব মোচন করিবার জন্য ইহারা প্রাচীনকালের ন্যায় এক্ষণেও সুবিধা পাইল। ইহারা চতুর ব্যবসায়ী—স্বকীয় স্বার্থ খুব ভালই বুঝিত। আজকাল ইংরেজেরাও চতুর হইয়াছে। ইংরেজেরা পর্ত্তুগালের সঙ্গে যেরূপ সম্বন্ধ আজকাল পাতাইয়াছে হান্‌সা-লীগও অষ্টম হেন্‌রির আমলে সেইরূপ ব্যবসায়-সম্বন্ধ রাখিতে চেষ্টিত হইয়াছি[ল]।

ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের রাজত্বকালে ষ্টীলইয়ার্ড কারখানার স্বাধীনতা ও অধিকারসমূহ লোপ করিবার জন্য ইংরেজ গবর্মেণ্ট আইন প্রচার করিলেন। হান্‌সা-লীগ প্রবল প্রতিবাদ করিল। কিন্তু আইন জারি হইয়া গেল। এই আইন কার্য্যে পরিণত হইবামাত্র ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীরা বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণকে পরাস্ত করিতে পারিল। এতদিন তাহারা স্বদেশেই পশম, বস্ত্র ও অন্যান্য পদার্থ সস্তায় কিনিয়া নূতন নূতন দ্রব্যে পরিণত করিত। মোটের উপর কম খরচেই তাহারা জিনিষ বাজারে ফেলিতে পারিত। কিন্তু হান্‌সা-লীগ সুদূর সমুদ্রকূলে মাল লইয়া যাইত। সেখানে নূতন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পুনরায় ইংলণ্ডে লইয়া আসিত। তাহাতে খরচ খুব বেশী পড়িত। তথাপি তাহারা ষ্টীলইয়ার্ড কারখানার জন্য নানা অধিকার ভোগের ফলে ইংলণ্ডে বসিয়াই স্বদেশীয় শিল্পীগণকে পরাস্ত করিতে পারিত। ইংলণ্ডের স্বদেশী বণিকেরা কোন মতেই এই বিদেশী বণিক্‌গণের সমকক্ষ হইতে পারিত না। ষষ্ঠ এডোয়ার্ড বিদেশীয় বণিকগণের সকল সুযোগ লুপ্ত করিয়া দিবার পর ইংরেজ কারিকরেরা সহজে বিদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে বাজার হইতে হঠাইতে সমর্থ হইল। এই সংরক্ষণ নীতির সাহায্যে ইংরেজসমাজের সর্ব্বত্র শিল্পের আন্দোলন বদ্ধমূল হইয়া গেল। ইংলণ্ডের জনগণের হৃদয়ে আশা, বিশ্বাস ও সাহস জাগিতে লাগিল।

তিন শত বৎসর হান্‌সা-লীগ ইংলণ্ডে একচেটিয়া ব্যবসায়-সম্পদ ভোগ করিয়াছে। তিন শতাব্দী ধরিয়া ইংলণ্ডের বাজার তাহাদের করতলগত ছিল। আজকাল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং জর্ম্মানীতে ইংলণ্ড যে আধিপত্য ভোগ করিতেছে, হান্‌সা-লীগ তিন শত বৎসর কাল ইংলণ্ডে ঐ আধিপত্য ভোগ করিত। ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের এক আইনে তাহাদিগকে ইংলণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। পরে রাণী মেরির আমলে জর্ম্মান সম্রাটের অনুরোধে ইংলণ্ডে হান্‌সা পুনরায় বাণিজ্য-সুযোগ লাভ করে।

হান্‌সা-লীগ প্রাচীন কালের সকল অধিকারই পাইতে ইচ্ছা করিল। তাহারা অল্প মাত্র অধিকারে সন্তুষ্ট থাকিল না। এলিজাবেথ যখন সিংহাসনে বসিলেন, হান্‌সা তাঁহার নিকট খুব লম্বাচৌড়া দরখাস্ত পাঠাইল। এলিজাবেথের উত্তরে তাহারা সন্তুষ্ট হইল না।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের শিল্পীকুল এবং ব্যবসায়ীগণ শক্ত সবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বিদেশীয় বাণিজ্য হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই ইংলণ্ডে বিদেশীয় বণিকগণের স্থান রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িল। ইংরেজ

বণিকেরা দুইদলে বিভক্ত হইল। একদলে স্বদেশীয় নগর, বন্দর ও সমুদ্রকূলের বাণিজ্য লইয়া ব্যাপৃত থাকিল। অপর দল ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিলাতী মাল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। হ্যান্সা-লীগ হিংসায় অধীর হইয়া পড়িল। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় উভয় বাজারই ইংরেজ বণিকেরা তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইতে উদ্যত। ইহা দেখিয়া ইংরেজ বণিকগণকে তাহারা নানা উপায়ে অপদস্থ ও নির্য্যাতিত করিতে চেষ্টিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন দেশের নরপতিগণের বিদ্বেষ ইংরেজ বণিকগণের বিরুদ্ধে তাহারা সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইল।

১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে হ্যান্সা-লীগের প্ররোচনায় জর্ম্মান সম্রাট আইন জারি করিলেন যে, ইংরেজ বণিকেরা জর্ম্মানীতে বাণিজ্য চালাইতে পারিবে না। জর্ম্মান জাতি ইংরেজকে বর্জ্জন করিবামাত্র রাণী এলিজাবেথ তাঁহার ক্ষমতা দেখাইলেন। প্রতিহিংসা লইবার জন্য তিনি ৬০ খানা হ্যান্সা-লীগের বাণিজ্যতরী আটক করিলেন। বিবাদ বাড়িয়া চলিল। হ্যান্সার জাহাজে ইংরেজ-শত্রু স্পেনকে রসদ জোগান আরম্ভ হইল। বাণিজ্য-প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাষ্ট্রীয় শত্রুতায় পরিণত হইল। লুবেক নগরে হ্যান্সা-লীগ ইংরেজ-বাণিজ্য ধ্বংস করিবার জন্য নূতন নূতন ব্যবস্থা করিতে লাগিল। এই-সকল দেখিয়া শুনিয়া এলিজাবেথ হ্যান্সা-লীগের ৫৮ খানা জাহাজ ইংরেজ সরকারের দখলে রাখিয়া দুই খানা মাত্র লুবেকে পাঠাইয়া দিলেন। জাহাজের নায়কগণকে বলা হইল যে, এলিজাবেথ হ্যান্সা-লীগকে অতি ঘৃণার চোখেই দেখিয়া থাকেন; হ্যান্সার কাজকর্ম্ম এলিজাবেথ তৃণের ন্যায় অবজ্ঞা করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এলিজাবেথের সঙ্গে প্রতিযোগিতাই হ্যান্সা-লীগের অধঃপতনের সূত্রপাত। ইতিপূর্ব্বে সমগ্র উত্তর ইউরোপ তাহাদের শিল্প ও ব্যবসায়ের দ্বারা লাভবান্ ও সভ্যতায় উন্নত হইয়াছে। ডেনমার্ক, সুইডেন, ইংলণ্ড সকল দেশের নরপতিগণই তাহাদের নিকট কতবার মাথা অবনত করিয়াছে। তাহাদের অর্থ পাইয়াই এই-সকল দেশের রাজারা অনেক সময়ে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছে। ইহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, ইহাদিগকে অধিকার প্রদান করিয়া, ইহাদিগকে স্বদেশে বসাইয়া এই-সকল দেশের জনগণ নিজ নিজ জাতীয় শিল্প ও ব্যবসায়ের ভিত্তি গঠন করিয়াছে। তিনশত বৎসরের কার্য্যফলে এই-সকল দেশ এক্ষণে যথেষ্ট উন্নত ও শক্তিশালী হইয়াছে। কাজেই তাহারা হ্যান্সার সাহায্য আর চাহে না। যাহাদের নিকট তাহারা ঋণী তাহাদিগকে তাহারা এক্ষণে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করিতেছে। যাহাদের ভয়ে তাহারা সন্ত্রস্ত ছিল তাহাদিগের সঙ্গে এক্ষণে কুকুরের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে। ইহার কারণ স্বাভাবিক। পূর্ব্বে এই জাতিসমূহ শৈশবাবস্থায় ছিল, এক্ষণে ইহারা যৌবনাবস্থায় আসিয়াছে। কাজেই পুরাতন অভিভাবকগণকে এক্ষণে ইহারা সাহায্যকারী বিবেচনা না করিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রতিবন্ধক মনে করিতেছে।

হ্যান্সা-লীগের অবনতির অনেক কারণ ছিল। ডেনমার্ক এবং সুইডেন এত দিন ইহার অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিয়াছে। এজন্য তাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে বেদনা অনুভব করিয়াছে। ইহাকে জব্দ করিবার জন্য তাহাদের ইচ্ছা অতি স্বাভাবিক। নানা কৌশলে তাহারা ইহার বাণিজ্যপথ আবদ্ধ করিতে লাগিল। রুশিয়ার সম্রাটেরা হ্যান্সাকে সাহায্য না করিয়া ইংরেজ বণিকদিগকে বিশেষ সুযোগ প্রদান করিলেন। অন্যান্য সমাজ হইতেও তাহারা বাধা পাইতেছিল। ওলন্দাজ এবং ইংরেজ জাতি সকল ক্ষেত্র হইতে তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিয়া দিল। অবশেষে ভারতে আসিবার নূতন পথ আবিষ্কৃত হইয়া প্রাচীন বণিকগণের ঘোরতর অসুবিধা সৃষ্টি করিল।

পূর্ব্বযুগে হ্যান্সা-লীগ জর্ম্মান সম্রাট্‌কে পর্য্যন্ত সম্মান করিত না। কিন্তু এক্ষণে সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইল। তাহারা জর্ম্মান জাতীয়সভা রীচ্‌ষ্ট্যাগের নিকট নিবেদন করিল যে ইংরেজ বণিকেরা জর্ম্মানীতে প্রায় ২০০,০০০ খানা বস্ত্র প্রতিবৎসর পাঠাইতেছে। জর্ম্মানীতে বিলাতীবস্ত্র আমদানী ও ব্যবহার নিষেধ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। তাহা হইলেই ইংরেজেরা হ্যান্সাকে পুনরায় বাণিজ্যসুবিধা প্রদান করিতে বাধ্য হইবে। জর্ম্মান রীচ্‌ষ্ট্যাগ্ হ্যান্সার পরামর্শানুসারে বিলাতীর বর্জ্জন ঘোষণা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

কিন্তু ইংরেজদূতের অনুরোধে রীচষ্ট্যাগ তাহা করিতে পারেন নাই।

এইরূপে হ্যান্সা-লীগ জর্ম্মানীতেও অপদস্থ হইল। তাহারা কোথাও আর পুরাতন অধিকার পাইল না। তাহাদের ক্ষমতা কমিতে লাগিল। অবশেষে লজ্জায় ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে তাহারা নিজ ইচ্ছায় যৌথসমিতি বন্ধ করিয়া দিল। এই ঘটনার প্রায় ১৫০ বৎসর পরে হ্যান্সা-লীগের অন্তর্গত নগরসমূহের দৃশ্য অতি শোচনীয় হইয়া পড়ে। ইহাদের বণিক্‌গণ যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে প্রবল-প্রতাপান্বিত কর্ম্মবীর ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগরিকেরা তাহা বিশ্বাসই করিত না। হ্যাম্বার্গ নগরই পূর্ব্বে সমুদ্র-তস্করদিগকে ধ্বংস করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহার দুর্গতির সীমা ছিল না। কোন উপায়ে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে জলদস্যুগণের নিকট কর দিতে হইল।

জলদস্যুগণকে ধ্বংস করিবার প্রণালী হ্যান্সা-লীগের আমলে বড় সুন্দর ছিল। সমুদ্রতস্করগণকে লোকেরা সভ্যতার শত্রু বিবেচনা করিত। তাহাদিগকে মানবশত্রু জ্ঞানে সকলের নির্য্যাতন করিবার অধিকার ছিল। হ্যান্সা-লীগের সমুদ্র-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রপ্রভাব তিরোহিত হইলে পর জলদস্যু সম্বন্ধে নূতন নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ওলন্দাজেরা তখন সমুদ্রবাণিজ্যে শীর্ষস্থানীয়। তাহারা দস্যুদিগকে সভ্যজাতিমাত্রের শত্রু বিবেচনা করিত না। বরং উত্তর আফ্রিকার জলতস্করগণের সাহায্যে তাহারা নিজ শত্রুদিগের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইত। কাজেই জলদস্যুদিগকে ধ্বংস না করিয়া রক্ষা করাই ওলন্দাজ বণিকগণের নীতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। দুঃখের কথা ইংরেজেরাও ওলন্দাজদিগের পন্থা অনুসরণ করিয়া জলদস্যুগণের সাহায্য করিয়াছেন। সম্প্রতি ফরাসীর সাহায্যে জগৎ ঐ মানবশত্রুদিগের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে।

হ্যান্সা-লীগের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা অনেক ছিল। প্রথমতঃ তাহাদের রাষ্ট্রশক্তির যথেষ্ট অভাব ছিল। দ্বিতীয়তঃ লীগের অন্তর্গত নগরসমূহের মধ্যে যথার্থ ঐক্য এবং পরস্পর সাপেক্ষতা কিছুই ছিল না। 'জাতীয়' সমবেত স্বার্থ তাহারা বুঝিত না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ নগরের ক্ষুদ্র স্বার্থ পুষ্ট করিতে চেষ্টিত হইত। সমগ্র হ্যান্সা-লীগের হিতসাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহারা স্বকীয় উন্নতিসাধনের জন্য হিংসাদ্বেষ এবং প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকিত। ফলতঃ, বিবাদ, বিরোধ, বিশ্বাসঘাতকতা হ্যান্সা-লীগে নিত্য ঘটনা ছিল। কোলন-নগরের অধিবাসীরা ইংলণ্ডে ষ্টীলইয়ার্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কাজেই ইংলণ্ডের সঙ্গে যখন হ্যান্সার বিরোধ উপস্থিত হইল তখন কোলনের লোকেরা হ্যান্সার সমবেত স্বার্থ না দেখিয়া স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছায় ইংলণ্ডের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সেইরূপ যখন লুবেক নগরের সঙ্গে ডেনমার্কের গোলযোগ উপস্থিত হয়, হ্যাম্বার্গ নগর নির্লজ্জভাবে নিজের সুবিধা খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

তারপর হ্যান্সা-লীগের ব্যবসায়-প্রথাও অতি বিচিত্র ছিল। তাহারা কোন নগরেই কৃষিকর্ম্মের উন্নতিবিধান করিতে যত্নবান্ হয় নাই। বরং তাহাদের বাণিজ্যফলে বিদেশীয় কৃষিকার্য্যই উন্নত হইতেছিল। তাহারা কোন-নগরে শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিতেও চেষ্টিত হয় নাই। তাহাদের কোন বন্দরে একটিমাত্র কারখানা ফ্যাক্টরী বা কল খোলা হয় নাই। বেলজিয়ামের কারিগর ও শিল্পীরা যে দ্রব্য প্রস্তুত করিত তাহারা সেই সমুদয়ই অন্যদেশে চালান করিত। সুতরাং তাহারা মাল আমদানী ও রপ্তানী করিবার উপায়মাত্র ছিল—তাহাদের নগর ও বন্দরসমূহ এই গমনাগমন ও লেনদেনের কেন্দ্র মাত্র ছিল।

তাহাদের কার্য্যফলে পোল্যাণ্ডের কৃষিক্ষেত্র এবং চাষ আবাদ উন্নতিলাভ করিয়াছে। তাহাদের ব্যবসায়ের সাহায্যেই ইংলণ্ডের মেষপালন এবং পশম বয়নের উন্নতি হইয়াছে। বেলজিয়ামের শিল্প ও কারুকার্য্য এবং সুইডেনের লৌহ-কারবারও তাহাদের বাণিজ্যের ফলেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে।

কিন্তু একমাত্র কেনাবেচার দ্বারাই কি একটা জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে? ক্রমশঃ সকল জাতিই হ্যান্সা বণিকগণকে তাহাদের দেশ হইতে তাড়াইতে লাগিল।

তাহাদের বাজারে হান্সা বেচিতে পাইত না, কিনিতেও পাইত না। তখন তাহাদের দুর্গতি আরম্ভ হইল। তাহাদের জাহাজ আছে এবং মূলধন আছে। কিন্তু কৃষিকর্ম্মে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতে তাহারা শিখে নাই এবং শিল্পে পারদর্শিতাও তাহারা লাভ করে নাই। কাজেই তাহারা ইংরেজ ও ওলন্দাজ জাতিদ্বয়ের শিল্পীগণের জন্য বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বন করিল। ঐ দুই দেশের মাল পাঠাইবার জন্য তাহাদের জাহাজ ব্যবহৃত হইতে থাকিল। তাহারা জাহাজকোম্পানী মাত্র হইয়া রহিল।

হান্সা ইচ্ছা করিলে তখন জর্ম্মানজাতিকে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করিতে পারিত। কিন্তু তাহাদের রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি ছিল না। তাহাদের স্বজাতি-প্রিয়তা ছিল না—স্বদেশ-প্রীতি তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না। তাহারা ব্যবসায়ে ধনী হইয়া স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বসমাজকে ভুলিয়া গিয়াছিল। ধনের মত্ততায় তাহারা জর্ম্মান সম্রাট্ ও রীচ্‌ষ্ট্যাগ্‌কে অবজ্ঞা করিত। তাহাদের ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে ইউরোপের সকল রাজদরবারেই যথেষ্ট খ্যাতি রটিয়াছিল। রাজা-রাজড়ারা এবং আমীর ওমরাহেরা তাহাদের অর্থশক্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকিতেন। এই অহঙ্কারে তাহারা স্বদেশের রাষ্ট্রকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিখিয়াছিল। অথচ তাহারা যদি উত্তর জর্ম্মানীর নগর-রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে মিলিত হইত তাহা হইলে জর্ম্মান-সভা রীচ্‌ষ্ট্যাগের ক্ষমতা যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি পাইত। তাহা হইলে রাষ্ট্রশক্তি ও ধনশক্তি সমবেত হইয়া জর্ম্মানসাম্রাজ্যকে সকল বিষয়ে ইউরোপের সর্ব্বোচ্চ স্থানে তুলিতে পারিত। জর্ম্মানীতে একটা যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া পৃথিবীর শিল্প ও ব্যবসায় জর্ম্মান-জাতি আয়ত্ত করিত।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হান্সা-লীগ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে কোন দিনই যোগ দেয় নাই। জর্ম্মান-রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া ও স্বতন্ত্রভাবে তাহারা তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইত। পরে এলিজাবেথের সঙ্গে বিরোধের ফলে তাহারা ঘরমুখো হইয়াছিল সত্য। কিন্তু তখন তাহাদের ক্ষমতা কমিয়া আসিয়াছে—তাহাদের ব্যবসায়-শক্তি অল্পমাত্র ছিল। কাজেই রীচষ্ট্যাগ তাহাদের কথায় বেশী কর্ণপাত করিল না—হান্সার অপমানে জর্ম্মানী অপমান বোধ করিল না।

হান্সা-লীগ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু তাহার গৌরব-যুগের অবস্থা আলোচনা করিলে কে না বুঝিতে পারে যে, বিদেশীয় বর্জ্জন এবং স্বদেশী-সংরক্ষণই জাতীয় শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রাথমিক ভিত্তি? ইংলণ্ড হান্সার সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছে বলিয়াই তাহার উন্নতি এত দ্রুত হইয়াছে। অধিকন্তু, ইংরেজজাতি হান্সা-লীগের দুর্ব্বলতাগুলির প্রশ্রয় দেয় নাই বলিয়া ইংরেজের শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইংরেজজাতি অবাধবাণিজ্যনীতি অবলম্বন করে নাই। ইংরেজজাতি যৌথ অবস্থায় বর্জ্জন ও সংরক্ষণের নীতিই কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল। ইহাই তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। যদি বর্জ্জন-নীতির পরিবর্ত্তে অবাধবাণিজ্যের নিয়ম ইংরেজ পছন্দ করিতেন তাহা হইলে আজ কি দেখিতে পাইতাম? দেখিতাম যে, হান্সা-লীগের অধীনস্থ ষ্টীলইয়ার্ড কারখানার বিদেশীয় বণিকেরা ইংলণ্ডের সমস্ত বাণিজ্য চালাইতেছে; ইংরেজদিগের জন্য বেলজিয়ামের তন্তুবায়েরা বস্ত্রবয়ন করিতেছে; অপিচ, ইংলণ্ডের লোকেরা বিদেশীয় শিল্পীদিগের জন্য মেষপালন মাত্র করিতে জানে। আজ পর্ত্তুগাল যেমন ইংলণ্ডের জন্য কৃষিজাতদ্রব্য যোগাইয়া মূর্খতা প্রকাশ করিতেছে, ইংলণ্ডও সেইরূপ নিজেই পরদেশের জন্য পশম যোগাইয়া ধন্য হইত। আর, এই সংরক্ষণ-নীতি ও বর্জ্জন-নীতির প্রভাবে ইংরেজের ধনসম্পদ বৃদ্ধি না পাইলে তাহারা কি এরূপ স্বাধীনতা-প্রিয় প্রজাতন্ত্রপ্রিয় জাতিরূপে গড়িয়া উঠিতে পারিত? শিল্প ও বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভের ফলেই তাহারা আজ জগতে বরেণ্য হইয়াছে।

হান্সা-লীগের প্রাধান্য ও অবনতি আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা আনুষঙ্গিকভাবে ইংরেজজাতির কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের অভ্যুদয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি অবগত হইলাম:—

(১) ইংলণ্ডের কৃষি প্রথমে অতি জঘন্য অবস্থায় ছিল। হান্সা-লীগকে ইংরেজজাতি স্বদেশে নিমন্ত্রণ করিয়া

আনে। তাহাদিগকে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ দেয়। তাহার ফলে ইংলণ্ডের কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হইতে থাকে। এইরূপ কার্য্যফলে ইংলণ্ডের কৃষিকার্য্য যথেষ্ট উন্নতিলাভ করে।

(২) কৃষিকার্য্যে যথোচিত উন্নতিলাভের পর ইংরেজেরা শিল্পকর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। এই অবস্থায় হ্যান্সালীগ, বেলজিয়ামবাসী কারিগর এবং ওলন্দাজশিল্পী প্রধানতঃ এই তিনদেশীয় লোকের বিরুদ্ধে ইংরেজেরা বর্জ্জন-নীতি প্রবর্ত্তন করে। তাহার ফলে বিদেশীয় শিল্পীকুল বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং স্বদেশীয় শিল্পীগণ সংরক্ষিত হইয়া বাড়িয়া উঠে। এই উপায়ে ইংলণ্ডের শিল্পসম্পদ স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে।

(৩) শিল্পজগতে ইংরেজজাতি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলে পর ব্যবসায়-ও-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে তাহারা দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। এই জন্য ফ্লোরেন্স, ভেনিস ও হ্যান্সালীগের ন্যায় তাহারা বাণিজ্য-নিয়ম প্রবর্ত্তন করে। বিদেশীয় জাহাজ, সমুদ্র-বাণিজ্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে নানাপ্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করাই এই নিয়মসমূহের লক্ষ্য। এই নিয়মের ফলেই ইংরেজেরা বাণিজ্য-জগতের শীর্ষস্থানে উঠিয়াছে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

অরণ্যবাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদসমূহের সারাংশ :—কলিকাতাবাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটী বিক্রয় করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত পার্ব্বত্য বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই খানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাঁহাকে কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইল। গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল।

ক্ষেত্রনাথ অমরনাথ-নামক একজন দরিদ্র যুবককে আশ্রয় দিয়া বল্লভপুরে একটি পাঠশালা ও পোষ্ট-অফিস খুলিলেন, এবং সেই-সকল কর্ম্মে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। ক্ষেত্রনাথ মাধব দত্তের সহিত পরামর্শ করিয়া বল্লভপুরে একটি হাট ও কয়েকটি দোকান প্রতিষ্ঠা করিলেন। ডেপুটি কমিশনর এই সমস্ত শুনিয়া ও দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং ক্ষেত্রনাথকে নন্দনপুর মৌজা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ক্ষেত্রনাথ নন্দনপুরে যাইবার পথ ও পুল করিয়া সেখানে প্রজা বসাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে তাঁহার বিলক্ষণ অর্থলাভ হইতে লাগিল। ক্রমে কলিকাতা হইতে ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র প্রভৃতির আত্মীয়েরা আসিয়া নন্দনপুরে বাস ও চাষ আবাদ করিবার জন্য ক্ষেত্রনাথের শরণাপন্ন হইতে লাগিলেন।]

চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে ক্ষেত্রবাবুর সহিত আবার নন্দনপুরে গিয়া সকলে কৃষিযোগ্য ভূমি-সকল পুনর্ব্বার পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। সমস্ত দেখা শেষ হইলে, রজনীবাবু ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, আমার ছেলে নিশি আর যতীন্দ্র, চারু ও কতিপয় ভদ্রলোক এই প্রদেশে যৌথ-কৃষি ও যৌথ-কারবার করবার অভিপ্রায়ে একটী কোম্পানী বা সমবায় সংগঠন করেছেন। সতীশের উপদেশেই এই সমবায় সংগঠিত হয়েছে। এক এক জনের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে কৃষি বা ব্যবসায় করা কিছু কঠিন; কিন্তু আপনার ও সতীশের উপদেশক্রমে সকলে যদি মিলে মিশে কাজ করে, আর সেই কাজ যদি সুপরিচালিত হয়, তা হ'লে অনায়াসে কৃষিকাজ ও ব্যবসা চল্‌তে পারে। নিশি, যতীন, চারু প্রভৃতি সকলেই অনভিজ্ঞ ও অল্পবয়স্ক। এরা একলা একলা কোনও কাজ করতে পারবে না। এই জন্য সমবায় বা কোম্পানী হয়েছে। সমবায়ের মূলধন ২৮০০০৲ টাকা অবধারিত হয়েছে। আপাততঃ সকলে মিলে ৭০০০ টাকা দেবে; তার পর যেমন যেমন টাকার আবশ্যক হবে, তেমনি টাকা দেবে। উপস্থিত আমরা নন্দনপুরে আপনার কাছে সাত শত বিঘা জমী বন্দোবস্ত ক'রে নেব, আর এইস্থানেই এদের জন্য একটী বাটী প্রস্তুত করবো। বাটীতে এরা থাকবে, আর তারই একটী কামরা আপিস-ঘরে পরিণত হবে। সর্ব্বপ্রথমে জমীকে কৃষিযোগ্য করা আবশ্যক। আমরা এই অধিত্যকার দক্ষিণ দিকে নন্দাতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী চকে সাত শত বিঘা জমী চাই। আপনি তা নির্ব্বাচন ক'রে দিন, আর সেই জমীকে কৃষিযোগ্য করতে কত টাকা খরচ হবে, তা অবধারণ করুন।" ক্ষেত্রনাথ যৌথকৃষির কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন "এক চকেই সাত শত বিঘা জমী লওয়া কর্ত্তব্য। তা হ'লে আপনারা বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী অবলম্বন ক'রে অল্প খরচে ও অল্প পরিশ্রমে তা'তে বহু শস্য উৎপন্ন

কর্‌তে পারবেন। সতীশ সেদিন ষ্টীমে পরিচালিত লাঙ্গলের কথা বল্‌ছিল। সেই লাঙ্গল চালাতে হ'লে বিস্তৃত সমতল ভূমির আবশ্যক। অধিত্যকার ঐ দক্ষিণ-ভাগে নন্দাতট পর্য্যন্ত যে ভূমিখণ্ড আপনারা নির্ব্বাচন করেছেন, তা সেই উদ্দেশ্যের জন্য সুন্দর হবে। এই ভূমিকে সমতল ও কৃষিযোগ্য কর্‌তে আনুমানিক দুই হাজার টাকা খরচ হবে। আর এঁদের থাক্‌বার জন্য একটী বাটী প্রস্তুত কর্‌তে হ'লে, তিন হাজার টাকার বেশী খরচ হবে না। বাটীখানি পাথরের প্রস্তুত কর্‌তে হবে; কেননা পাথর এখানে সুলভ। কালীনদী ও নন্দাতে বালির অভাব নাই। চূনও এখানে সুলভ। কেবল তীর·বরগা-দরজা-জানলার জন্য কাঠ চাই। সে কাঠও এদেশে সুলভ।''

রজনীবাবু বলিলেন ''এই নির্ব্বাচিত ভূমির উপরি-ভাগে ঠিক্ মধ্যস্থলে অধিত্যকার উপর বাটীনির্ম্মাণ করা উচিত। আমরা তজ্জন্য এই চকুটি পছন্দ কর্‌ছি। এই স্থানটী বড় চমৎকার। এখানে কেমন বড় বড় সুন্দর গাছ রয়েছে। এর পরিমাণ আনুমানিক পঞ্চাশ বিঘা হবে। এত বড় স্থান লওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, এদের থাকবার বাটী ব্যতীত, শস্য রাখবার জন্য খামার-বাটী, গো-মহিষের জন্য গোয়ালঘর, চাকরবাকরদের থাক্‌বার ঘর—এই সমস্ত প্রস্তুত কর্‌তে হবে। তা ছাড়া কোম্পানীর কোনও কোনও সভ্য সপরিবারে এখানে বাস কর্‌তে চাইলে, তাঁদের জন্যও স্বতন্ত্র বাটী-নির্ম্মাণের আবশ্যকতা। সে-সমস্ত বাটী কোম্পানী প্রস্তুত ক'রে দেবে না। যে সভ্য সেরূপ বাটী প্রস্তুত কর্‌তে চান, তিনি তা নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত ক'রে নেবেন। কিন্তু তাঁকে তো বাটী নির্ম্মাণের জন্য স্থান দিতে হবে? সভ্যগণের মধ্যে অন্ততঃ দশজন কখনও কখনও এখানে এসে সপরিবারে বাস কর্‌বেন, এইরূপ অনুমান হয়। তাঁদের বাটীগুলি পাশাপাশি থাক্‌লেই সুবিধা হবে। প্রত্যেকের বাটীর জন্য অন্ততঃ দুই বিঘা পরিমিত স্থান চাই। অবশিষ্ট ভূমিতে আফিস্-ঘর, খামার-বাড়ী প্রভৃতি থাক্‌বে। আপনি কি বলেন?"

ক্ষেত্রনাথ কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন ''আপনার ব্যবস্থা অতিশয় সুন্দর। আপনি যে এমন সুব্যবস্থা কর্‌তে পারেন, তা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি।"

রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন "আরে, মশায়, না, না; এ ব্যবস্থা আমার নয়। এই সমস্ত ব্যবস্থাই সতীশের। আমরা পুরুলিয়ায় নেমে সতীশের বাসায় তিনদিন ছিলাম। সেই সময়ে সে নন্দনপুরের নক্সা এঁকে, কোন্ খানে জমী নিতে হবে, কোন্ খানে বাড়ী-ঘর প্রস্তুত কর্‌তে হবে, সব আমাদের ব'লে দিয়েছিল। এমন কি, সে বাড়ীর একটী মোটামুটী নক্সাও প্রস্তুত ক'রে দিয়েছে। সে সাহস না দিলে কি আমরা কখনও এই সব কাজে এগুতে পারি?"

ক্ষেত্রনাথ তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন "এই নন্দনপুরে আমার যে কাছারীবাটী হবে, সতীশ তারও নক্সা প্রস্তুত ক'রে দিয়ে গিয়েছে।"

রজনীবাবু বলিলেন "বেশ কথা মনে ক'রে দিয়ে-ছেন, মশায়। ঐ পাহাড়ের উপর যেখানে আপনার কাছারীবাড়ী হ'বে, আপনি সেখানে আমাকে পাঁচ বিঘা জমী বন্দোবস্ত ক'রে দিতে ভুল্‌বেন না। আমি আপনার কাছারী-বাড়ীর পাশেই একটী ছোট কুঁড়েঘর বেঁধে মাঝে মাঝে সেখানে এসে থাক্‌ব। এদের এই কোম্পানীর আমি কোনও সভ্য নই, তা মনে রাখ্-বেন। আমি মাঝে মাঝে এখানে এসে দুই এক মাস থাক্‌ব মাত্র।''

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন ''আমি ঐ পাহাড়ের উপর আপনার জন্য স্থান নিশ্চয়ই নির্দ্দিষ্ট করে রাখ্‌ব।''

অতুলচন্দ্র কোম্পানীর সভ্য ছিলেন না। তিনি কৌতূহলপরবশ হইয়া পার্ব্বতীয় দেশে বেড়াইতে আসিয়া-ছিলেন মাত্র। গতকল্য নন্দনপুরে আসিয়া তাঁহারও কৃষিকার্য্য করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি স্বতন্ত্রভাবেই কৃষি-কার্য্য করিবেন। কিন্তু এখন কোম্পানীর কার্য্যপ্রণালী ও ব্যবস্থার বিষয় অবগত হইয়া তিনিও কোম্পানীর সহিত যোগদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। অতুলচন্দ্র রজনীবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মশাই, চোদ্দটি

সভ্য নিয়ে আপনারা এই কোম্পানী গঠিত কর্‌ছেন; কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমাকেও গ্রহণ করুন। কোম্পানীর মূলধন ২৮০০০্ টাকা না ক'রে ৩০০০০্ টাকা ক'রে ফেলুন। মশায়, আমায় ফেলে যাবেন না। এক যাত্রার যেন পৃথক ফল না হয়।" রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন "বেশ তো; তার জন্য ভাবনা কি? আপনাকেও একজন সভ্য ক'রে নেওয়া যাবে। আর আপনি যখন নন্দনপুরে এসে বাস কর্‌তে চান, তখন তো আমরা আপনাকে এক-জন 'সকর্ম্মক' সভ্য ব'লে গণ্য কর্‌তে পার্‌ব। 'অকর্ম্মক' সভ্য অপেক্ষা 'সকর্ম্মক' সভ্যের সংখ্যা অধিকতর হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

সভ্য শব্দের "সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক" বিশেষণ শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। অতুলচন্দ্র বলিলেন "কিন্তু, মশায়, আমি সকর্ম্মক সভ্য হ'লেও, আপনাদের এই প্রস্তাবিত ব্যারেকে বাটী প্রস্তুত কর্‌ব না। আমি ঐ পাহাড়ের উপর ক্ষেত্রবাবুর প্রস্তাবিত কাছারী-বাটীর উত্তরদিকে একটী স্থান দেখে এসেছি; সেই স্থানে আমি বাটী প্রস্তুত কর্‌তে চাব—তা আগেই আপনাকে ব'লে রাখ্‌ছি। ঘরের মধ্যে ব'সে বা শুয়ে আমি যেন কালাবুরু আর কালীঞ্জর দেখ্‌তে পাই।"

রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, তার জন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই।"

অতুলচন্দ্র বলিলেন "মশায় এসব বিষয়ে আমার কোনও চিন্তা নাই, তা বুঝ্‌লাম। কিন্তু একটা বিষয়ে চিন্তা থাক্‌ছে! আমাদের যে কোম্পানী গঠিত হচ্ছে, তা'তে কি আমরা ক্ষেত্রবাবুকে একজন সভ্য ও প্রধান পরিচালকরূপে পাবার আশা কর্‌তে পারি না? কাল ওঁকে আমি গুরুর পদে বরণ করেছি; আর এই জীবন-সংগ্রাম-ব্যাপারে ইনিই আমাদের যথার্থ গুরু ও নেতা হবার যোগ্য। ক্ষেত্রবাবুর মতন লোক যদি আমাদিগকে পরিচালনা করেন, তা হ'লে আমি সকর্ম্মক সভ্য হ'তে পার্‌ব; নতুবা ঠিক্ অকর্ম্মক হ'য়ে যাব।"

রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন "আপনি ঠিক্ কথাই বলছেন। ক্ষেত্রবাবুকে সভ্য ও পরিচালকরূপে পেলে তো কোম্পানীর কার্য্যের সফলতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না, কিন্তু আমরা সাহস ক'রে এঁর কাছে সে প্রস্তাব উত্থাপন কর্‌তে পারি নাই। ইনি নিজের নানা কাজে ব্যস্ত—"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "কোম্পানীর মধ্যে আমাকে লওয়া যদি আপনাদের অভিপ্রায় হয়, তা হ'লে আমাকেও নেবেন। আমিও আপনাদের মধ্যে থাকলাম।"

রজনীবাবু আনন্দিত হইয়া বলিলেন "বস্! আর কোনও চিন্তা নাই। ক্ষেত্রবাবু যখন সকলের পরিচালক ও অভিভাবক হ'তে সম্মত হলেন, তখন কোম্পানীর উন্নতি অবশ্যম্ভাবিনী। ক্ষেত্রবাবু, সাত শত বিঘা নয়—আপনি কোম্পানীকে আট শত বিঘা জমি বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন, আর ঘর বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য আপাততঃ পঞ্চাশ বিঘা জমী হ'লেই যথেষ্ট হবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সকলে বল্লভপুরে প্রত্যাগত হইলেন। সেই দিন সন্ধ্যার পর রজনীবাবু প্রভৃতি পুরুলিয়া যাত্রা করিলেন।

কোম্পানীর নাম "নন্দনপুর কৃষি ও বাণিজ্য সমবায়" হইবে, তাহা স্থির হইয়া গেল।

পঞ্চ-পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে সমবায় সংগঠিত ও দলীল রেজেষ্টরী হইয়া গেল। শিশিকান্ত ও যতীন্দ্র কলিকাতা হইতে টাকা লইয়া নন্দনপুরে আসিল।

ক্ষেত্রনাথ ইতিপূর্ব্বেই নন্দনপুরের কাছারী-বাটী নির্ম্মাণের জন্য পাথর কাটাইতে লোক নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। এক্ষণে তিনি আরও অধিক লোক নিযুক্ত করিয়া পাথর কাটাইতে লাগিলেন। চুনের পাথর পোড়াইয়া তিনি প্রচুর চুনও সংগ্রহ করিলেন। বহু বৃহৎ শালকাঠও সংগৃহীত হইল। ক্ষেত্রনাথ তাহা হইতে দরজা, জানালা প্রভৃতি প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। নিশি ও যতীন্দ্র সেই-সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল।

নন্দনপুরে আমীনের বাটীর নিকটে একটী সুবৃহৎ তৃণাচ্ছাদিত গৃহ প্রস্তুত হইল। তাহাতে গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী মাল-মশলা ও কাঠ ইত্যাদি রক্ষিত হইতে লাগিল। নিশি ও যতীন্দ্র দিনের বেলায় সেই গৃহে

থাকিয়া সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিত। পুরুলিয়া হইতে তাহারা একটী পাচক ব্রাহ্মণ আনিয়াছিল। নন্দনপুরে আহারাদি সমাপন করিয়া বন্য জন্তুর ভয়ে তাহারা রাত্রিতে বল্লভপুরে চলিয়া আসিত।

সতীশচন্দ্রের প্রস্তুত নক্সা অনুসারে গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরব্ধ হইল। ক্ষেত্রনাথ শুভদিনে গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। একসঙ্গে কাছারী-বাটী ও কোম্পানীর কার্য্যালয় নির্ম্মিত হইতে লাগিল। কৃষিক্ষেত্রের মাটী কাটিবার জন্যও বহু লোক নিযুক্ত হইল।

বড়দিনের ছুটীর সময়ে সতীশচন্দ্র সৌদামিনীকে লইয়া বল্লভপুরে আসিলেন। তিনি ক্ষেত্রনাথের সহিত নন্দনপুরের সকল স্থান দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে কাছারী-বাটী ও কার্য্যালয়ের ভিত্তি উঠিয়া গিয়াছে দেখিয়া তাঁহার মনে বিস্ময় জন্মিল। ছাদের জন্য টালির অভাব দেখিয়া সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "টালির জন্য তোমার ভাবনা কি? ভগবান্ এখানে অনেক টালি প্রস্তুত করে রেখে দিয়েছেন। তুমি কি তোমার শ্লেটের পাহাড় দেখ নাই?"

ক্ষেত্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন "কই না! শ্লেটের পাহাড় কোথায়?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "তুমি তো চমৎকার লোক দেখ্‌চি! কালীঞ্জরের পশ্চিমদিকে ঐ যে দুটো কাল পাহাড় পিরামিডের মতন উঁচু হ'য়ে উঠেছে, ঐ দুইটী পাহাড়ই শ্লেটের পাহাড়। এমন স্তরে স্তরে শ্লেট সাজানো আছে যে, তা দেখলে তুমি চমৎকৃত হবে। এখান থেকে পাহাড় দুইটী প্রায় দেড় মাইল দূরে রয়েছে; ওখানে যেতে হলে ঐ নিবিড় বনটা পার হতে হয়। সুতরাং একলা ওখানে যাওয়া নিরাপদ নয়। আমি শ্লেট আনিয়ে তোমায় এখনি দেখাচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি লখাই সর্দ্দার ও আর একটী ভৃত্যকে বন্দুক সহ সেখানে গিয়া একখানি চৌড়া শ্লেট পাথর কুড়াইয়া আনিতে আদেশ করিলেন।

ভৃত্যেরা শ্লেট আনিতে গমন করিলে সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "তুমি বুঝি এখনও এই মৌজার সকল স্থানে ঘুরে বেড়াবার অবসর পাও নাই? তুমি এক কাজ কর। একটা পাহাড়ীয়া টাট্টু পোষ, ও ঘোড়ায় চড়্‌তে শেখ। তোমার হাটে ভাল ভাল টাট্টুর আমদানী হয়। একটা ভাল টাট্টু কিনে তার উপরে চ'ড়ে লোকজন সঙ্গে নিয়ে মৌজার সকল স্থান ভাল ক'রে দেখে বেড়াও। তা না হলে তুমি এত বড় মৌজা শাসন করবে কিরূপে? তুমি সব স্থান দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, এই মৌজায় কত মূল্যবান্ বস্তু সঞ্চিত আছে। ঐ শ্লেটের পাহাড় দুটীর সমস্ত শ্লেট দশপুরুষেও বার হবে কি না সন্দেহ। ঐ শ্লেট বেচেই তুমি ও তোমার বংশধরেরা লক্ষ লক্ষ টাকা পাবে। কল্‌কাতা অঞ্চলে টালির জন্য ভাল শ্লেট আম্‌দানী হয় না; সেইজন্য লোকে শ্লেটের ছাদ করে না। তুমি কল্‌কাতায় শ্লেটের নমুনা পাঠিয়ে দাও; দেখ্‌তে পাবে, সাহেবেরা শ্লেট দেখেই পছন্দ করবেন। শ্লেটের ছাদ দেখতে চমৎকার, আর বেশ মজবুত। রজনীদাদার জন্য এখানে যে বাঙ্গলা প্রস্তুত হবে, আমি সেই বাঙ্গলাটি শ্লেট দিয়ে ছাওয়াবো মনে করেছি। আর তোমাদের সদুঠাকুরুণের জন্যও এই নন্দনপুরে একখানা বাড়ী প্রস্তুত করতে হবে। তাতেও আমি শ্লেট লাগাব। শিমলা-পাহাড়ে, দেরাদুনে, মুশৌরী পাহাড়ে আমি শ্লেটের ছাদের অনেক বাড়ী দেখেছি। ঐ শ্লেটের পাহাড় ছাড়া তোমার এই মৌজাতে অভ্রের খনিও আছে। দশ ইঞ্চি এক ফুট লম্বা আর প্রায় ছয় ইঞ্চি চৌড়া অভ্র আমি এখানে দেখেছি। লাল, সবুজ, সাদা, হল্‌দে সব রকমের অভ্র আছে। অভ্র যে কত মূল্যবান্ বস্তু, তা তুমি জান। তোমার মৌজাতে তামারও খনি যদি বা'র হয়, তাতে তুমি বিস্মিত হয়ো না। আমি তারও চিহ্ন দেখেছি। আর ঐ যে কালাবুরু পাহাড়টি দেখছ, ঐ পাহাড়টি রত্নের আকর। আমি গত অক্টোবর মাসে ঐ পাহাড়ে উঠেছিলাম। সেখানে সোনার খনি আছে, হীরার খনি আছে, আর কত কি যে আছে, তা ভগবানই জানেন। সেখানে এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগাছের অরণ্য আছে যে, তা দেখলে বিস্মিত হবে। অবশ্য সমতল ভূমিতে যে-সকল অরণ্য ছিল, সে-সকল কাটা হয়েছে। এখন যে অরণ্যগুলি আছে, সেগুলি দুর্গম স্থানে অবস্থিত। আমার মনে হয় যেন সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে সেই অরণ্যসমূহের গাছে আজ পর্য্যন্ত কুড়ুলের ঘা পড়ে নাই। এক একটা

শালের গুঁড়ি ত্রিশ চল্লিশ হাত লম্বা, আর গুঁড়ির বেড়ও পাঁচ ছয় হাত হবে। তোমার নন্দনপুর থেকে দশ বার ক্রোশ দূরে এই কালীনদীর ধারেই একটা পাহাড়ের উপর প্রায় এক হাজার বিঘা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগাছের বন আছে। সেই পাহাড়ের মালিক একজন মুণ্ডা। সে সেই পাহাড়টি দশ বার বছরের জন্য ইজারা দিতে চায়। ইজারার সেলামীও সে বেশী চায় না। দুই হাজার টাকা পেলেই সে পাহাড়টি বন্দোবস্ত করে দিতে প্রস্তুত আছে। তোমাদের কৃষি ও বাণিজ্য সমবায় যদি সেই অরণ্যটি ইজারা নেয়, তা হলে তোমরা বড় লোক হয়ে যাবে। পাহাড়ে গাছ কেটে, আর সেইখানেই তা ফেড়ে চিরে বর্ষার সময় মাড় বেঁধে সমস্ত কাঠ কালীনদীতে ভাসিয়ে অনায়াসে নন্দনপুরে নিয়ে আস্‌তে পার্‌বে। তা করলে বহানী খরচ তোমাদের সামান্য মাত্র হবে। আমি ফাল্গুন মাসে আবার ঐ অঞ্চল পরিদর্শন কর্‌তে যাব। তুমি যদি সেই সময় আমার সঙ্গে সেখানে যাও, তা হলে নিজের চোখে সব দেখতে পাবে। বড়লোক হবার সুবিধা এদেশে যেমন আছে, এমন আর কোনও দেশে নাই। সেই পাহাড়ে এঞ্জিন বসিয়ে কলের করাতে গাছ ফাড়তে হবে; তা হলে তোমাদের খরচ অনেক কম হবে। তোমাদের 'সকর্ম্মক' অংশীদারদের মধ্যে দুই তিনজনকে সেই পাহাড়ে রাখ্‌তে হ'বে; তাদের একটু সাহসী হওয়া আবশ্যক।... হাঁ ভাল কথা মনে হয়েছে। যতীন আর নিশি রোজ সন্ধ্যার সময় বল্লভপুরে যায় কেন? এত লোক নন্দনপুরে ঘর বেঁধে রয়েছে; কেউ বাঘের মুখে পড়ে না, আর তারাই পড়বে। এত ভীরু হ'লে কি তারা কাজ কর্‌তে পার্‌বে? তাদের বন্দুক ছুড়্‌তে ও শিকার কর্‌তে শেখাও। তা হ'লে সাহস হবে। আর তোমার নগিনকেও নন্দনপুরের সব স্থান দেখাও। তোমার নগিন বেশ শিকারী হয়েছে। শুন্‌লাম, সেদিন নাকি সে একটা চিতা বাঘ মেরেছে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময়ে লখাই সর্দ্দার এক খণ্ড শ্লেট্ স্কন্ধে করিয়া আনিল। ক্ষেত্রনাথ শ্লেট্ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। সতীশচন্দ্র বলিলেন "এই শ্লেট্ খানা প্রায় দুই ইঞ্চি পুরু। এর মধ্যে কত স্তর রয়েছে, দেখ। এক একটী স্তর ছাড়ালে এক একটী গোটা শ্লেট্ পাবে। এই শ্লেট্ কত শক্ত দেখেছ? ছাদের টালির জন্য এত পুরু শ্লেটের প্রয়োজন নাই। সিকি ইঞ্চি পুরু টালি হ'লেই যথেষ্ট হ'বে। টালির কোনও নির্দ্দিষ্ট আকার না ক'রে, যেমন যেমন আকারের শ্লেট্ পাবে, তেমনই তেমনই টালি প্রস্তুত করাবে। ঘরের দেওয়ালের উপর কাঠামো ক'রে চাল প্রস্তুত কর্‌তে হ'বে; আর তার উপর টালি বিছিয়ে চাল ঢাকৃতে হ'বে। খড়ো ঘরের চাল যেমন হয়, তেমনই হবে। তফাৎ এই যে, খড়ো ঘরের চাল খড় বা বিচালী দিয়ে ছাওয়া হয়; আর এই ঘর শ্লেটের টালি দিয়ে ছাওয়া হবে। তোমার এখানে শাল কাঠের অভাব নাই। সেই কাঠ চিরিয়ে ঘরের জন্য মজবুৎ কাঠামো প্রস্তুত করাও। তুমি কাল থেকেই টালি প্রস্তুত কর্‌তে লোক নিযুক্ত কর।"

শস্যক্ষেত্রের কোন্ কোন্ স্থানে মাটী কাটাইতে হইবে, সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে তাহা দেখাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন "সমতল ভূমি দেখ্‌লেই এক একটী ক্ষেত যত বড় কর্‌তে পার, তা করবে। চল্লিশ পঞ্চাশ বিঘাতেও যদি একটী ক্ষেত হয়, তাও কর্‌বে; কিন্তু ভূমি সমতল হওয়া আবশ্যক; যেন সকল স্থানেই সমান ভাবে জল দাঁড়াতে পারে। তোমার নন্দনপুরে জলের কোনও অভাব হবে না। কালী নদী বা নন্দাতে যদি একটী, আর কালীঞ্জর হ্রদে যদি আর একটী এঞ্জিন্ বসিয়ে দাও, তা হ'লে সমগ্র নন্দনপুরের জমীতেই জল সেচন কর্‌তে পার্‌বে। কিন্তু তোমার প্রজারা এঞ্জিন বসাতে পার্‌বে না। তোমাদের কোম্পানী একটী এঞ্জিন্ বসাবেন, আর তুমি তোমার প্রজাদের জন্য কালীঞ্জরে একটী এঞ্জিন্ বসিয়ে দেবে। জল সেচনের জন্য প্রজাদের নিকট বিঘা প্রতি কিছু কর আদায় কর্‌লে, এঞ্জিন্ চালাবার খরচ আর এঞ্জিনের দামও উঠে যাবে। কিন্তু জল সেচনের সুব্যবস্থা ক'রে দেওয়া নিতান্তই আবশ্যক। মাটীতে যে সার দেওয়া যায়, তাই শস্যে পরিণত হয় বটে; কিন্তু মাটী নরম না থাকলে, শস্য ফলে না। এই কারণে, শস্য উৎপাদনের জন্য একদিকে যেমন সারের প্রয়োজন, তেমনই অপর দিকে জলেরও প্রয়োজন। যে দেশ কেবল

দেব-মাতৃক, সে দেশে দেবতা অকৃপা কর্‌লে কিছুই হবার যো নাই। এই কারণে জমীতে জল সেচনের সুব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তোমার এই নন্দনপুরের মাটীতে সকল প্রকারের শস্য তো হবেই; কিন্তু এখানে ফসল যেমন হবে, নিকটে আর কোনও মৌজার মাটীতে তেমনটি হবে না। এই এক নন্দনপুর মৌজাতেই যদি বৎসরে দশ পনর হাজার মণ তূলা উৎপন্ন হয়, তা'তে বিস্মিত হয়ো না। এক মণ তূলার দাম যদি ২৫৲ টাকা হয়, তা হ'লে এই মৌজা থেকে আড়াই লক্ষ তিন লক্ষ টাকার কেবল তূলাই উৎপন্ন হবে। আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, তোমাদের এই অঞ্চলে কালক্রমে তূলা ধুনবার কল, সূতার কল, এবং এমন কি, কাপড়ের কলও প্রতিষ্ঠিত হবে।"

সতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "বড় বড় ক্ষেত এইজন্য প্রস্তুত কর্‌তে তোমায় বল্‌ছি যে, আবশ্যক হ'লে নন্দনপুরে ষ্টীমের লাঙ্গল চালাতে হবে। আগেও একবার তোমাকে সেই কথা বলেছি। ষ্টীমের লাঙ্গলে মাটী গভীর ভাবে খনিত হবে আর অল্প সময়ের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের কোনও কোনও স্থানে ষ্টীমের লাঙ্গল চল্‌ছে ব'লে শুনেছি। আমেরিকায় ষ্টীমের লাঙ্গলেই মাটী চষা হয়। ষ্টীমের লাঙ্গলের নীচেই ঘোড়ার লাঙ্গল; তার নীচে মহিষের লাঙ্গল; আর তার নীচে বলদের লাঙ্গল। বড় বড় ক্ষেত না হ'লে ষ্টীমের লাঙ্গল চালানো যায় না। এই কারণে আমার অনুরোধ, কোম্পানীর জমীতেই হোক্, আর তোমার নিজের জমীতেই হোক্, বড় বড় ক্ষেত কাটাতে উপেক্ষা ক'রো না।

"এই গেল এক কথা; আর একটা কথা আমি তোমায় বল্‌তে চাই। এই নন্দনপুরে যেরূপ তৃণাচ্ছাদিত ভূমি ও শালবন আছে, তা'তে এখানে অনায়াসে উৎকৃষ্ট জাতীয় গরু, ঘোড়া, মহিষ ও মেষ উৎপাদন করা যেতে পারে। গোচারণের মাঠের অভাবে বাঙ্গালা দেশের গোবংশ তো শীঘ্রই লোপ পাবে ব'লে মনে হয়। জমীদার মহাশয়েরা এই গোচর ভূমিগুলিকেও গ্রাস ক'রে বসেছেন। তুমি যেন এই মৌজার মধ্যে উৎকৃষ্ট তৃণাচ্ছাদিত ভূমি—অন্ততঃ পাঁচ শত বিঘা—আলাদা ক'রে রেখে দিতে কিছুতেই ভুলো না। তোমার দ্বারা হোক্, আর তোমার ছেলেদের দ্বারাই হোক্, এক দিন না এক দিন এখানে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট জাতীয় গো মহিষ ও অশ্ব উৎপাদনের কোনও ব্যবস্থা হ'লে তা'তে যে কেবল প্রচুর লাভ হবে, তা নয়; পরন্তু দেশেরও প্রভূত মঙ্গল হবে। মোটামুটি এই সকল উদ্দেশ্য চক্ষের সম্মুখে রেখে কাজ ক'রে যাও।"

এই বলিয়া সতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে কি যেন মনে হওয়াতে তিনি হাসিয়া বলিলেন "হাঁ, একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। তোমাদের কবি অতুলচন্দ্র এবৎসর রসায়ন-শাস্ত্রে এম্‌-এ পরীক্ষা দিয়েছেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি বি কোর্স নিয়েছিলেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রে তাঁর বেশ জ্ঞান আছে দেখেছি। লোকটি এক অদ্ভুত রকমের কবি—অপর কবিদের মত কেবল ফুলে, ফলে, লতায় পাতায়, পাখীর গানে, চাঁদের জোছনায় ও নারীর প্রেমে কবিত্ব দেখেন না। তিনি বলেন, রসায়নে কবিত্ব আছে, বিজ্ঞানে কবিত্ব আছে, লোকসেবায় কবিত্ব আছে, কার্য্যে কবিত্ব আছে, সুখে কবিত্ব আছে, দুঃখেও কবিত্ব আছে। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডটিই তাঁর নিকট কবিত্বময়, এবং স্বয়ং পরমেশ্বর এক, অদ্বিতীয় ও মহান্ কবি। বড় চমৎকার লোক। তিনি এম্‌-এ পরীক্ষার ফল দেখেই এখানে আস্‌বেন। এখন পর্য্যন্ত বিয়েটিয়ে কিছুই করেন নাই। মনে করেছি, কোনও ভাল কৃষিকলেজে কিছুদিন পড়্‌বার জন্য আমি তাঁকে বল্‌ব। তিনি বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ ক'রে এলে, তোমাদের বিলক্ষণ উপকার হবে। তাঁকে তোমার ঐ কাছারী-বাড়ীর কাছে উত্তরদিকে অনেকটা জায়গা দিতে হবে, তার জন্য তোমায় বল্‌তে আমায় ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ ক'রে গেছেন।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "অতুলের জন্য আমি স্থান নির্ব্বাচন ক'রে রেখেছি।"

ষট্‌পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

ফেব্রুয়ারী মাসে ডেপুটী কমিশনার সাহেব, পুলীশ সাহেব ও রাঁচির জুডিশিয়াল্ কমিশনার সাহেব প্রভৃতি নন্দনপুরে মৃগয়া করিতে আসিলেন। অধিত্যকার

উপর তাঁহাদের তাম্বু পড়িল। ডেপুটী কমিশনার সাহেব ক্ষেত্রনাথের উদ্যোগ ও কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। সকলেই তাঁহার প্রস্তরনির্ম্মিত দুইটী বাটী ও বাটীর উপরে শ্লেটের ছাদ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

মৃগয়াতে সাহায্য করিবার জন্য চতুর্দ্দিকের গ্রাম হইতে বহুলোক আনীত হইল। তাহারা এক একটী অরণ্য তিন দিকে বেষ্টন করিয়া দুন্দুভি প্রভৃতি বাজাইতে ও ভীষণরবে চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। যে দিক্ লোকদ্বারা বেষ্টিত হয় নাই, সেই দিকে দুই তিনটি উচ্চ মঞ্চের উপর সাহেবেরা বন্দুক লইয়া বসিয়া রহিলেন। দুন্দুভির ধ্বনিতে ও লোকের চীৎকারে সন্ত্রস্ত হইয়া বন্য পশুপাল সেই মঞ্চসমূহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অমনই সাহেবেরা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতে লাগিলেন। কতকগুলি পশু নিহত হইল; কিন্তু অধিকসংখ্যক পশু বেগে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। প্রথমদিনের মৃগয়াতে একটী নরখাদক বড় ব্যাঘ্র, তিনটি চিত্রক বা চিতা বাঘ, সাতটি ভল্লুক ও দশটি হরিণ নিহত হইল।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনের মৃগয়াতেও অনেক বন্য পশু নিহত হইল। সর্ব্বসমেত দুইটী নরখাদক বৃহৎ ব্যাঘ্র, দশটি চিত্রক, পঁচিশটি ভল্লুক ও সাতাইশটি হরিণ নিহত হইল। মৃগয়া করিয়া সাহেবদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা কালীঝরের হ্রদ এবং তাহাতে অসংখ্য জলচর পক্ষী দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিন্তু কালীঝরে কোনও নৌকা বা জলিবোট না থাকায়, সেখানে পাখী মারিবার সেরূপ সুবিধা হইল না। যাহা হউক, আগামী বৎসর শীতকালে তাঁহারা মৃগয়া করিবার জন্য আবার যে নন্দনপুরে আসিবেন, তাহা ক্ষেত্রনাথকে বলিয়া গেলেন।

এই মৃগয়ার পর নন্দনপুরের অরণ্যসমূহ অনেক পরিমাণে নিরুপদ্রব হইল। ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক প্রজাগণের গোমহিষাদি বিনষ্ট হওয়ার কথা আর শ্রুত হইল না। ক্ষেত্রনাথ অরণ্যের কিয়দংশের বৃক্ষাদি কাটাইয়া দিয়া তন্মধ্যে একস্থান হইতে স্থানান্তর গমনাগমনের নিমিত্ত সুপ্রশস্ত ও সুগম পথসমূহ প্রস্তুত করাইয়া দিলেন।

মার্চ্চমাসে ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রের সমভিব্যাহারে কালাবুরু পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী সেই শালের অরণ্য দেখিয়া আসিলেন। মুণ্ডা আঠার শত টাকা সেলামী লইয়া বার বৎসরের জন্য সেই অরণ্য ইজারা দিতে সম্মত হইল। তৎসম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিবার জন্য অন্যান্য পরিচালকগণকে পত্র লিখিত হইল।

কোম্পানীর কর্ম্মচারীবর্গের বাসগৃহ ও খামারবাড়ী প্রস্তুত করিতে ২০০০৲ টাকা, আটশত বিঘা ভূমির সেলামীতে ১৬০০৲ টাকা এবং চারিশত বিঘা ভূমিকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতে ২০০০৲ খরচ হইল। এতদ্ব্যতীত কর্ম্মচারীগণের বাসাখরচ এবং চাকর ও ব্রাহ্মণের বেতন ইত্যাদিতেও প্রায় ৩০০৲ টাকা খরচ হইল। এইরূপে ৮০০০৲ টাকার মধ্যে ৫৯০০৲ টাকা খরচ হইয়া ২১০০৲ টাকা অবশিষ্ট রহিল। ষ্টীমপরিচালিত লাঙ্গল আনয়নের অপেক্ষা না করিয়া ক্ষেত্রনাথ পরিচালকগণের পরামর্শক্রমে এখন গোমহিষের লাঙ্গল দ্বারাই চাষ আবাদ করা স্থির করিলেন। তদনুসারে বার জোড়া মহিষ ও তের জোড়া বলদ এক হাজার টাকায় ক্রীত হইল এবং অবশিষ্ট টাকা চাষের খরচপত্রের জন্য সঞ্চিত রাখা হইল। এক বৎসরের মধ্যে কৃষিকার্য্যে কত টাকা লভ্য হয়, তাহা দেখিয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ পরে শালের অরণ্য বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিবেন, তাহা জানাইলেন।

ক্ষেত্রনাথের উপদেশ ও পরিচালনে নিশি, যতীন্দ্র, চারু ও অতুলচন্দ্র কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

বৎসরের শেষে চৈত্রমাসে হিসাব নিকাশ করিয়া ক্ষেত্রনাথ দেখিলেন যে, তাঁহাদের দোকানে সর্ব্বপ্রকার খরচবাদে প্রায় ৩৫০০৲ টাকা লাভ হইয়াছে। মাধব দত্ত মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। লভ্যের টাকা গ্রহণ না করিয়া তাঁহারা তদ্দ্বারা দোকানসমূহের মূলধন বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন।

নববর্ষের প্রথমভাগেই নন্দনপুরের মহুয়া ফুল, কঁচড়া তৈল, কুসুম তৈল, লাহা, তসর, হরিতকী, আমলা প্রভৃতি

বিক্রয় করিয়া ক্ষেত্রনাথ প্রায় ৫০০০৲ টাকা পাইলেন। ব্যবসায়ের হিসাবে এবং কঁচড়া তৈল সরিষা কলিকাতায় রপ্তানী করিয়াও তিনি ৪০০০৲ টাকা লভ্য পাইলেন।

রজনী বাবু শ্রাবণ মাসে নন্দনপুরে আসিয়া কৃষিক্ষেত্র-সমূহের এবং প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহদ্বয়ের শোভা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি তাঁহার নির্ব্বাচিত ভূমির উপর একটী বাঙ্গলা নির্ম্মাণের জন্য ক্ষেত্রনাথের উপর ভার অপণ করিলেন।

সেই বৎসর সুচারুরূপে বৃষ্টিপাত হওয়ায় নন্দনপুর-কৃষি-কোম্পানী তাঁহাদের কর্ষিত চারিশত বিঘা ভূমি হইতে দুই হাজার চারিশত মণ ধান্য, দেড়শত মণ কলাই, একশত মণ অড়হর, পঞ্চাশ মণ মুগ ও ছয়শত মণ গোলআলু প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিশ বিঘা ভূমিতে কার্পাস ছিল। কার্পাস ব্যতীত শস্য ও ফসলের মূল্য প্রায় ৫৫০০৲ টাকা অবধারিত হইল। সমগ্র মূলধনের মধ্যে কেবল ৮০০০৲ টাকা মাত্র গৃহাদি নির্ম্মাণে, গবাদি পশুক্রয়ে ও কৃষিকার্য্যে ব্যয় করিয়া এত টাকার শস্য ও ফসল উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা কলিকাতার পরিচালকগণ প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এই কারণে, রজনীবাবু তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নন্দনপুরে আসিলেন। সকলেই নন্দনপুরের শোভা এবং কৃষিজাত শস্যাদি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারাও পার্ব্বত্যনিবাসের জন্য নন্দনপুরে একএকটী গৃহনির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিলেন।

অবশিষ্ট চারিশত বিঘা ভূমিকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইল। ক্ষেত্রনাথের পরিচালনা এবং অতুলচন্দ্র প্রভৃতির যত্ন, উদ্যম, ও পরিশ্রম সকলেরই প্রশংসার বিষয় হইল। আগামী বর্ষ হইতে অতুলচন্দ্রের মাসিক ৭৫৲ টাকা এবং চারু, যতীন্দ্র ও নিশিকান্তের মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া বেতন অবধারিত হইল। পরিচালকগণ ক্ষেত্রনাথকেও মাসিক ১০০৲ টাকা বেতন দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ক্ষেত্রনাথ বলিলেন যে, কোম্পানীর বর্ত্তমান অবস্থায় তিনি কিছুই গ্রহণ করিবেন না।

পরিচালকগণের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষেত্রনাথের সহিত সেই শালের অরণ্যটি দেখিয়া আসিলেন; মুণ্ডার নিকট তাহা বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া স্থিরীকৃত হইল। জঙ্গলের সেলামী ও জঙ্গলের কার্য্য করিবার জন্য পরিচালকগণ ৮০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিলেন।

ক্ষেত্রনাথ নন্দনপুরের কাছারীবাটীর সমীপবর্ত্তী তাঁহার খাশদখলী সাতশত বিঘা ভূমির মধ্যে দুইশত বিঘা ভূমি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিলেন এবং আগামী বর্ষ হইতে তাহা নিজে চাষ-আবাদ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। নগেন্দ্রনাথ দোকান লইয়া ব্যস্ত থাকায় তিনি অমরনাথকে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে নন্দনপুরের কৃষিকার্য্যের ভার প্রদান করিলেন এবং তাহাকে পঁচিশ বিঘা ভূমি বিনা সেলামীতে বার্ষিক খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অমরনাথের পদে আর একটী ব্যক্তি পাঠশালার শিক্ষক ও পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত হইলেন।

সপ্ত-পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

নন্দনপুর-কৃষি কোম্পানীর বার্ষিক বিবরণ পাঠ করিয়া সতীশচন্দ্র অতীব আহ্লাদিত হইয়া ক্ষেত্রনাথকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। অন্যান্য কথার পর সতীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন:—

"তোমাদের প্রথমবর্ষের কৃষিকার্য্যের ফল অতীব আশাপ্রদ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতিবর্ষেই যে ফল এইরূপ আশাপ্রদ হইবে, তাহা মনে করিও না। কৃষির শত্রু অনেক। প্রথমতঃ অনাবৃষ্টি; দ্বিতীয়তঃ অতি-বৃষ্টি; তৃতীয়তঃ উপযুক্ত সারের অভাব; চতুর্থতঃ যথা-সময়ে জলসেচনের অভাব; এবং পঞ্চমতঃ শস্যের নানা-প্রকার রোগ ও শস্যনাশক কীটপতঙ্গাদির উৎপাত। এই-সমস্ত আপৎ নিবারণের জন্য তোমাদিগকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নন্দনপুরে তোমরা জলসেচনের সুব্যবস্থা করিয়াছ; সুতরাং তাহার অভাব হইবে না এবং অনাবৃষ্টির আশঙ্কাও তোমাদিগকে পীড়িত করিতে পারিবে না। কিন্তু অতিবৃষ্টি হইলে, যাহাতে বৃষ্টির জল শস্যক্ষেত্রসমূহ হইতে সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই কারণে সর্ব্বত্র drainage বা জলনিকাশের সুব্যবস্থা করিবে। নন্দন

পুরের মাটী এখন স্বভাবতঃই উর্ব্বর আছে। বহুকাল হইতে জঙ্গলের গলিতপত্রে ও উদ্ভিজ্জাদি পচিয়া মাটীর সহিত মিশিয়াছে। এই কারণে নন্দনপুরে মাটীতে এখন দুই চারি বৎসর সার না দিলেও চলিবে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে মাটীর সারই শস্যে পরিণত হয় (It is manure that is converted into crops)। প্রতি বৎসর যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, সেই পরিমাণে জমীর উৎপাদিকা শক্তি অর্থাৎ সারাংশও কমিয়া যায়। সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য জমীতে প্রতিবৎসর গোময় প্রভৃতি দিতে হয়। দুই তিন বৎসর পরে, তোমাদের জমীতে সার দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইবে। নতুবা ফসল আশানুরূপ উৎপন্ন হইবে না। তোমাদের জমীর পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে। কোম্পানী এখন চারিশত বিঘা জমী আবাদ করিতেছেন; তোমারও আবাদী জমীর বর্ত্তমান পরিমাণ দুই তিন শত বিঘা হইবে। ভবিষ্যতে তোমাদের জমীর পরিমাণ আরও বর্দ্ধিত হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এত জমীর জন্য তোমরা প্রচুর সার পাইবে কোথা হইতে? কৃষক মাত্রেই বহুসংখ্যক গো-মহিষ পালন করে এবং তাহাদের পুরীষগুলি জমীতে সাররূপে ব্যবহার করে। তোমাদিগকেও এইজন্য বহুসংখ্যক গোমহিষ পুষিতে হইবে। চাষের জন্য তোমরা যতগুলি মহিষ-বলদ রাখিবে কিম্বা দুগ্ধের জন্য যতগুলি গাভী পালন করিবে, তাহাদের পুরীষ তোমাদের সমস্ত জমীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত সার হইবে না। পর্য্যাপ্ত সারের জন্য তোমাদিগকে আরও অধিকসংখ্যক গোমহিষ পালন করিতে হইবে। কিন্তু বহু গোমহিষ পালন করিতেও বিস্তর অর্থব্যয় হয়। এই কারণে কৃষি-কাজের সঙ্গে সঙ্গে যদি গোয়ালারও কাজ করা যায়, তাহা হইলে সুবিধালাভ হইতে পারে। "গোয়ালার কাজ" এই বাক্যটি পাঠ করিয়াই নাসিকা সঙ্কুচিত করিও না। ইহা নিকৃষ্ট কাজ বা নীচবৃত্তি নহে। ইংরেজীতে তোমরা এই কাজকে dairy-farming বলিয়া থাক। আপনাদিগকে যদি গোয়ালা বলিয়া পরিচিত করিতে লজ্জা হয়, তাহা হইলে dairy-farmers বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিও। ডেয়ারী স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে বিশুদ্ধ দুগ্ধ, মাখন, ঘৃত ও জমান দুগ্ধ যোগাইতে পারিলে, বিস্তর লাভ করিতে পারিবে; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে গোপালন এবং গোজাতির উন্নতিসাধনও করিতে সমর্থ হইবে। আমি যে তোমাকে পাঁচশত বিঘা গোচারণের ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে বলিয়াছি, তাহা এই উদ্দেশ্যেই বলিয়াছি। বহু গোমহিষ পালন করিলে, তাহাদের দুগ্ধ হইতে তো বিস্তর লাভ হইবেই, অধিকন্তু তোমাদের জমীর জন্য প্রচুর সারেরও অভাব হইবে না। আমার মনে হয়, আমাদের দেশে এখনও ষ্টীমের লাঙ্গল পরিচালনের সময় উপস্থিত হয় নাই। ষ্টীমের লাঙ্গল সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে, গোজাতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে গোময়েরও অভাব হইবে। তোমাদের কোম্পানী যেরূপ বৃহদাকারে কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে দুই একটী কলের লাঙ্গল চালাইতে পারা যায়, সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধারণতঃ গোমহিষের লাঙ্গলই আমাদের দেশের পক্ষে একান্ত উপযোগী। যাহা হউক, ইহা স্মরণ রাখিবে যে, গোময় সংগ্রহ করিয়া তোমাদের জমীতে সার দিতে হইবে এবং যাহাতে প্রচুর গোময় সংগৃহীত হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। সার-সংগ্রহের জন্য আর একটী উপায় অবলম্বন করিবে। নন্দনপুরে অরণ্যের অভাব নাই। প্রতি বৎসর ফাল্গুন চৈত্র মাসে অরণ্যের বৃক্ষসমূহ হইতে বিস্তর পাতা ঝরিয়া পড়ে। সেই পাতাগুলি শুকাইয়া নষ্ট হয়। আমার প্রস্তাব এই যে, তোমরা স্থানে স্থানে একএকটী গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে শুষ্ক পাতাগুলি নিক্ষেপ করিবে। বর্ষার জলে সেই পাতাগুলি পচিয়া গেলে, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট সার হইবে। তোমরা যদি এই উপায় অবলম্বন কর, তাহা হইলে, তোমাদের কখনও সারের অভাব হইবে না। গোময় ও পচা পাতা ব্যতীত, খইলও উৎকৃষ্ট সার। সরিষা, গুঞ্জা ও তিলের খইল সাররূপে ব্যবহার করিতে গেলে, তোমাদের ব্যয় অধিক হইবে এবং গোমহিষের আহার্য্যেরও অভাব হইবে। এই কারণে, আমার প্রস্তাব এই যে, তোমরা টাঁড় জমীতে প্রতিবৎসর রেড়ীর চাষ করিয়া, তাহা হইতে তৈল নিষ্কাশিত করিলে, তোমাদের বিলক্ষণ লাভ হইবে;

অধিকন্তু রেড়ীর খইল সাররূপে ব্যবহার করিতে পারিবে। রেড়ীর খইল হইতে উৎকৃষ্ট সার হয়। এইরূপ নানা উপায়ে তোমাদের জমীর জন্য প্রচুর সার সংগ্রহ করিতে কখনও শৈথিল্য করিও না। জমীর সারই যে শস্য ও ফসলে পরিণত হয়, এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। মাটী যেরূপই হউক না কেন, তাহাতে যদি সার দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা উর্ব্বর হইবে এবং ফসলও উৎপাদন করিবে। সামান্য জল হইলেও, ফসল হইতে পারে; কিন্তু জমীতে সার না থাকিলে, কেবলমাত্র প্রচুর বৃষ্টি বা জলসেচন দ্বারা কখনও ভাল ফসল হইতে পারে না।

"এই গেল এক কথা; আর একটি কথা আমি তোমাকে বলিতে চাই; তাহাও তোমাদের প্রণিধানযোগ্য। একই জমীতে প্রতিবৎসর একজাতীয় শস্য বপন করিও না। এক এক বৎসর এক এক জাতীয় শস্য বপন করিবে। বিভিন্ন জাতীয় শস্যের বিভিন্ন গুণ আছে। সকল শস্যেরই খাদ্য একপ্রকার নহে। কোনও শস্য মাটী হইতে একপ্রকার খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বর্দ্ধিত হয়; অপর শস্য আবার অন্যপ্রকার খাদ্য গ্রহণ করে। যদি একজাতীয় শস্য একই মাটীতে প্রতিবৎসর বপন করা যায়, তাহা হইলে, সেই শস্যের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব হইয়া পড়ে। কাজেই, তাহার ফসল ভাল হয় না। এই কারণে পর্য্যায়ক্রমে (by rotation) জমীতে বিভিন্ন জাতীয় শস্য বপন করিবে। আর সকল জমীতেই প্রতিবৎসর শস্যের আবাদ করিও না। ভূমি সত্যসত্যই গর্ভধারণ করে। সকলেই জানে যে, স্ত্রীলোকের প্রতিবৎসর সন্তান হইলে প্রসূতি দুর্ব্বল ও নির্জ্জীব হইয়া পড়েন এবং সন্তানগুলিও দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয়। কিন্তু যাঁহার তিন চারিবৎসর অন্তর সন্তান হয়, তিনি নিজে সবল ও সুস্থ থাকেন, এবং সন্তানগুলিও সবল ও সুস্থ হয়। সেইরূপ প্রতিবৎসর শস্য উৎপাদন করিতে করিতে ভূমির প্রজননী শক্তির হ্রাস হয়। সেই লুপ্তশক্তির পুনঃসঞ্চয়ের জন্য ভূমিকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। বিশ্রাম করিতে না দিলে, ভূমি পূর্ব্ববৎ আর উর্ব্বর থাকে না এবং নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। এই কারণে দুই এক বৎসর অন্তর এক এক বৎসরের জন্য ভূমিকে অনাবাদী (fallow) অবস্থায় ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সেই ভূমিতে কেবল লাঙ্গল দিয়া রাখিলে, তাহা বায়ুমণ্ডল হইতে তাহার উর্ব্বরশক্তিসাধক বস্তুচয় আকর্ষণ করিয়া লইয়া পুষ্ট ও সতেজ হয়। তোমাদের কোম্পানীর যখন আটশত বিঘা ভূমি আছে, তখন তোমরা অনায়াসে একবৎসর চারিশত বিঘা ভূমি আবাদ করিয়া অপর চারিশত বিঘা ভূমি ফেলিয়া রাখিতে পার। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে চাষ করিলে, তোমাদের কখনও প্রচুর ফসলের অভাব হইবে না।

"আলু, কার্পাস, ধান্য প্রভৃতি ফসলের কখনও কখনও নানাবিধ রোগ উপস্থিত হয়। সময়ে সময়ে নানাপ্রকার কীটাণু প্রভৃতিও জন্মিয়া ফসল নষ্ট করিয়া থাকে। এই সকল উৎপাত নিবারণ না করিলে, ভাল ফসল হয় না। যখনই এইরূপ কোনও উৎপাত উপস্থিত হইবে, তখনই কোনও বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানাভিজ্ঞ (expert) ব্যক্তির দ্বারা রোগের পরীক্ষা ও প্রতীকার করাইবে। আমার বিবেচনায় তোমাদের অতুলচন্দ্রকে কোন কৃষিকলেজে কিছুদিন কৃষিবিজ্ঞান শিখিবার জন্য যদি পাঠাইতে পার, তাহা হইলে খুব ভাল হয়। আমিও অতুলকে এই কথা বলিয়াছি।

"উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, তোমরা কেবল কৃষাণ মুনিষের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না। 'আঁতে পুতে চাষ'—এইরূপ একটী প্রবাদ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। এই প্রবাদবাক্যটি খুব সত্য। নিজে না দেখিলে, কৃষিকার্য্যে কেহ কখনও লাভবান হইতে পারে না। এই কারণে, কৃষিকার্য্যের প্রত্যেক অঙ্গ নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিবে। প্রত্যেক ফসলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে। কি কারণে ফসল ভাল বা মন্দ হইল, তাহা জানা নিতান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক ফসলের বিবরণের নিম্নে নিজ মন্তব্যও লিখিয়া রাখিবে; তদ্দ্বারা তোমাদের বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মিবে। এই অভিজ্ঞতাফলে তোমরা কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইবে।

"হাঁ, একটা কথা তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। কাপাসের বীজ গোমহিষের পক্ষে বিলক্ষণ

পুষ্টিকর খাদ্য। গোমহিষকে গোটা বীজ না খাওয়াইয়া, বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশিত করিয়া লইয়া তাহার খইল তাহাদিগকে খাইতে দিবে। কাপাস-বীজের তৈল অনেক কাজে লাগে এবং তাহা মূল্যবান্ সামগ্রী। সুতরাং প্রচুর কাপাস জন্মিতে আরম্ভ করিলে, তাহার বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশিত করিতে ভুলিও না!”

অষ্ট-পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

পাঁচবৎসর পরে নন্দনপুরের শ্রী একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। অধিত্যকার উপর প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহশ্রেণী শোভা পাইতে লাগিল; নির্জ্জনস্থান সজন হইল। ক্ষেত্রনাথ নন্দনপুরেও হাটবাজার স্থাপন করিলেন।

নন্দনপুরে অনেক সুবিন্যস্ত ও সুদৃশ্য প্রজাপল্লী স্থাপিত হইল। পাঁচবৎসর পূর্ব্বে যে স্থানে জনমানবের সঞ্চার ছিল না, সেই স্থানের লোকসংখ্যা সহস্রাধিক হইল। হিংস্রজন্তুর উপদ্রব একেবারে তিরোহিত হইল।

নন্দনপুরের কাছারীবাটীর উত্তরভাগে অতুলচন্দ্র একটী মনোরম বাঙ্গলা প্রস্তুত করাইলেন এবং অবসর সময়ে একখানি আরামচৌকীতে উপবিষ্ট হইয়া কালাবুরু ও কালীঝরের মনোহারিণী শোভা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন।

অতুলচন্দ্র একটী কৃষিবিদ্যালয়ে দুইবৎসর পড়িয়া এবং স্বহস্তে কাজ করিয়া ও স্বচক্ষে কৃষিকার্য্য দেখিয়া বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী শিক্ষা করিলেন। নানাস্থানে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত আদর্শ কৃষিক্ষেত্র-সমূহও পরিদর্শন করিয়া তিনি কৃষিবিদ্যায় বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। সেই অভিজ্ঞতাফলে বল্লভপুর ও নন্দনপুরের কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতিসাধন হইল।

রজনীবাবু মধ্যে মধ্যে সপরিবারে নন্দনপুরে আসিয়া বাস করিতেন এবং নন্দনপুরের কৃষি ও বাণিজ্য সমবায়ের ক্রমোন্নতি দেখিয়া আনন্দলাভ করিতেন।

সতীশচন্দ্র পুরুলিয়া হইতে বীরভূমে বদ্‌লী হইয়াছেন। নন্দনপুরে ক্ষেত্রনাথের কাছারীবাটীর দক্ষিণভাগে তিনিও একটী মনোহর প্রস্তরময় গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, এবং প্রতিবৎসর পূজাবকাশের সময় সপরিবারে নন্দনপুরে আসিয়া তাহাতে বাস করেন। সৌদামিনীর ক্রোড় দেবশিশুর ন্যায় একটী পুত্ররত্নে অলঙ্কৃত হইয়াছে। যে সময়ে সৌদামিনী নন্দনপুরে আসেন, সেই সময়ে মনোরমাও দুই তিন দিন অন্তর নন্দনপুরে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান। সৌদামিনীও অবসরক্রমে মনোরমাদের বাটীতে ও পিতৃগৃহে গমন করেন।

কোম্পানীর অংশীদারগণের মধ্যেও অনেকে সময়ে সময়ে সপরিবারে নন্দনপুরে আসিয়া নিজ নিজ বাটীতে বাস করেন। নন্দনপুরে যাঁহাদের কোনও প্রকার কার্য্যসংস্রব নাই, কলিকাতাবাসী এইরূপ অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও বায়ুপরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে সেখানে বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং সময়ে সময়ে নিজ নিজ বাটীতে আসিয়া বাস করেন।

“নন্দনপুর কৃষি ও বাণিজ্য-সমবায়” কৃষিকার্য্যে বাৎসরিক ১৭০০০৲ টাকা এবং কাষ্ঠের কারবারে বাৎসরিক ১৮০০৲ টাকা লাভ করিতেছেন। তাঁহাদের সঞ্চিত মূলধন ৭০০০০৲ টাকা হইয়াছে এবং তাহা কলিকাতার একটী ব্যাঙ্কে মৌজুৎ করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক অংশীদার সর্ব্বপ্রকার খরচবাদে বার্ষিক প্রায় ১৫০০ টাকা লভ্য পাইতেছেন। অতুলচন্দ্র এখন মাসিক ১০০ টাকা এবং যতীন্দ্র প্রভৃতি মাসিক ৭৫ টাকা বেতন গ্রহণ করিতেছেন।

ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুর ও নন্দনপুরের প্রজাগণের নিকট প্রায় ৪০০০ টাকা খাজনা আদায় করিতেছেন। নন্দনপুরের বনজদ্রব্যাদি হইতে বার্ষিক ৬০০০ টাকা, দোকান হইতে বার্ষিক ৫০০০ টাকা, কৃষিকার্য্য হইতে বার্ষিক ১২০০০৲ টাকা, কলিকাতায় প্রতিবৎসর কঁচড়াতৈলাদি চালান দিয়া গড়ে ৫০০৲ টাকা এবং কোম্পানীর কারবার ও কৃষি হইতে বার্ষিক ১৫০৲ টাকা লভ্য ও মাসিক বেতন ১২৫৲ টাকা প্রাপ্ত হইতেছেন। সর্ব্বসমেত তাঁহার বার্ষিক আয় প্রায় ৩৫০০০৲ টাকা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কলিকাতার একটী প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কে তাঁহার যে লক্ষ টাকা মৌজুৎ হইয়াছে, তাহা হইতেও তিনি বার্ষিক ৪০০০৲ টাকা সুদ পাইতেছেন।

যে ব্যক্তি ক্ষেত্রনাথের কলিকাতার পৈত্রিক বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন, তিনি তাহা বিক্রয় করিতে উদ্যত হওয়ায় ক্ষেত্রনাথ তাহা ১৫০০০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন এবং তাহার সংস্কার ও তাহা দুই অংশে বিভাগ করিয়া একাংশ মাসিক ৬০৲ টাকা ভাড়ায় বিলি করিয়াছেন ও অপরাংশ আপনাদের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় মাসিক ২০ টাকা বৃত্তিলাভ করিয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ্-এ পড়িয়াছিল, এবং এফ্-এ পরীক্ষাতেও মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তিলাভ করিয়া উক্ত কলেজে বি-এ পড়িয়াছিল। সে এ বৎসর বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে ফার্ষ্ট ক্লাস অনার প্রাপ্ত হইয়া শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

বল্লভপুরে বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা নাই দেখিয়া নরুর মাসীমাতা সৌদামিনী তাহাকে বীরভূমে আপনার কাছে লইয়া গিয়াছেন এবং সে সেই স্থানের স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া উৎসাহের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিতেছে।

বল্লভপুরের পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায়, তাহা একটী মধ্যবাঙ্গলা ও মধ্যইংরাজী স্কুলে পরিণত হইয়াছে এবং ক্ষেত্রনাথ তাঁহার বাটীর পশ্চিমদিকের মাঠে একটী পাকা স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। স্কুলে চারিজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। বালিকাদের জন্যও ক্ষেত্রনাথ একটী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন; তাহার জন্যও দুইজন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন।

মাধব দত্ত মহাশয়ের কন্যা শৈলজার সহিত নগেন্দ্রনাথের শুভবিবাহ মহান্ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে বল্লভপুরে একদল ইংরেজীবাদ্যকার আসিয়াছিল এবং বিবাহের সময়ে সমগ্র বল্লভপুর ও নন্দনপুর উৎসবময় হইয়াছিল। মনোরমার জনকজননী এবং ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূগণও বিবাহের সময় বল্লভপুরে আসিয়াছিলেন; সতীশ সৌদামিনীও আসিয়াছিলেন; আর আসিয়াছিলেন ক্ষেত্রনাথের সেই অসময়ের বন্ধু নীলমণি মুখোপাধ্যায় যিনি ক্ষেত্রনাথকে অন্নের সুখে অরণ্যবাসের জন্য উপদেশ ও উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং এই বল্লভপুর মৌজাটি ক্রয় করিয়া দিয়া তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিলেন। মনোরমার জননী কন্যাকে জলে ফেলিয়া দিয়াও পরিশেষে তাহাকে বল্লভপুর ও নন্দনপুরের রাজরাণী দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার পিতাও কুলাঙ্গার জামাতাকে কুলতিলক দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। নগেন্দ্রনাথের বিবাহের পর পুত্রদিগকে ও পুত্রবধূকে লইয়া ক্ষেত্রনাথ ও মনোরমা কলিকাতায় গমন করিলেন এবং কলিকাতার কুটুম্ব ও আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথোচিত সৎকৃত করিলেন। কলিকাতার বাটী পুনর্ব্বার হস্তগত হইলেও, তাঁহারা বল্লভপুর ও নন্দনপুরের মায়া ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে তাঁহারা সেই স্থানে প্রত্যাগত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কলিকাতা তাঁহাদের নিকট অরণ্যতুল্য এবং অরণ্যই তাঁহাদের নিকট মহানগরীর তুল্য প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অন্নের সুখে তাঁহারা যে অরণ্যবাস করিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হইল।

পুরুলিয়ার ডেপুটী কমিশনার সাহেব ছোটনাগপুরের কমিশনার হইয়াছেন। তিনি বল্লভপুরে নন্দনপুরে কর্ম্মবীর ক্ষেত্রনাথের উদ্যম, অধ্যবসায়, চেষ্টা ও সুকার্য্যের কথা বিস্মৃত হন নাই। তিনি ক্ষেত্রনাথ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের নিকট এক প্রশংসাসূচক রিপোর্ট করিয়া তাঁহাকে কোনও বিশিষ্ট উপাধিভূষণে ভূষিত করিতে অনুরোধ করেন এবং একটী গোপনীয় পত্রে সমস্ত কথা ক্ষেত্রনাথকে লিখিয়া পাঠান। ক্ষেত্রনাথ তদুত্তরে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া লিখিয়াছিলেন "আপনার অনুগ্রহ, উৎসাহ ও উপদেশ ব্যতিরেকে আমি আমার বর্ত্তমান কার্য্যে কখনও এতাদৃশ সফলতা লাভ করিতে পারিতাম না। আমি এই জন্য আমার কতিপয় বন্ধুরও নিকট ঋণী। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষভাবে সাধারণের মঙ্গলকর এমন কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারি নাই, যাহার নিমিত্ত আমি আপনার প্রশংসাভাজন ও গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারি। আমি আপনার পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া অবধি অতিশয় সঙ্কোচ ও অপ্রসন্নতা অনুভব করিতেছি। আমি কোনও প্রশংসা বা সম্মানের যোগ্য নহি। যাহাতে গভর্ণমেণ্ট আমাকে কোনও সম্মান বা উপাধি প্রদান না

করেন, তজ্জন্য আপনি পুনর্ব্বার গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া আমাকে সুখী ও নিশ্চিন্ত করিবেন।” কিন্তু ক্ষেত্রনাথের এই প্রার্থনা বিফল হইল; যথা সময়ে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে “রায় বাহাদুর” উপাধিভূষণে ভূষিত করিলেন। এই উপাধিলাভে ক্ষেত্রনাথ ও কমিশনার সাহেব কেহই সন্তুষ্ট হইলেন না। কমিশনার সাহেব ক্ষেত্রনাথের জন্য কোনও উচ্চতর উপাধির প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। সেই আশা বিফল হওয়াতে তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষেত্রনাথ সম্বন্ধে আর একটী সুবিস্তৃত ও প্রশংসাসূচক রিপোর্ট করিলেন। তাহার ফলে দুই বৎসর পরে ক্ষেত্রনাথ সি, আই, ঈ (C. I. E.) উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। কলিকাতার “বেল্‌ভিডিয়ার” প্রাসাদের দরবার উপলক্ষে ক্ষেত্রনাথকে এই শেষোক্ত উপাধি প্রদানের সময় ছোট লাট বাহাদুর তাঁহার উদ্যম, অধ্যবসায় ও কর্ম্মকুশলতার উল্লেখ করিয়া তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিবার নিমিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণকে সাদরে আহ্বান করেন এবং ক্ষেত্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

নন্দনপুরে ক্ষেত্রনাথের কার্য্য এখনও সমাপ্ত হয় নাই। নন্দনপুরের বহু শত বিঘা জমী এখনও অকৃষ্ট ও পতিত রহিয়াছে; এখনও শ্লেটের পাহাড় দুইটী তেমনই দণ্ডায়মান রহিয়াছে; এখনও নন্দনপুরের অভ্র, তাম্র ও লৌহের খনিসমূহ তেমনই স্বাভাবিক অবস্থায় পতিত রহিয়াছে; এখনও নন্দনপুরের সর্ব্বত্র বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এবং এখনও নন্দনপুরে কার্পাস-বিধুনন-যন্ত্র ও বস্ত্রবয়নযন্ত্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথ ইঞ্জিনীয়ার হইয়া আসিয়া এই সমস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে, তাহা সে তাহার পিতাকে বলিয়াছে। সুরেন্দ্র ইঞ্জিনীয়ার হইয়া আসিয়া নন্দনপুরের কি প্রকার উন্নতি-সাধন করে, তাহা দেখিবার জন্য সকলের ঔৎসুক্য থাকিলেও, তজ্জন্য আরও পাঁচ বৎসর কাল পাঠকবর্গের ধৈর্য্যশক্তি পরীক্ষা করা অন্যায় ভাবিয়া অরণ্যবাসের এই অদ্ভুত ইতিবৃত্ত আমি এই স্থানেই সমাপ্ত করিলাম।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

রাজপুতানায় বাঙ্গালী উপনিবেশ

রাজপুতানার * অন্তর্গত জয়পুররাজ্যে বাঙ্গালীর প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। জয়পুরের পূর্ব্ব নাম ছিল অম্বর এবং অম্বরের প্রাচীন নাম ছিল ধুন্দর। উক্ত হয়, রামচন্দ্রের পুত্র কুশ হইতে উৎপন্ন কুশাবহ-কুলের জনৈক প্রতাপশালী রাজা এখানকার এক পাহাড়ে যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন সেই যজ্ঞশৈল ধুন্দ হইতে তৎপ্রদেশের নাম হয় ধুন্দর। অন্যত্র কথিত আছে রাজা ঢোলারায় কর্ত্তৃক ৯৬৭ খৃঃ অব্দে ইহার পত্তন হয়। এইস্থান প্রাচীন মীনগণের আদি বাসভূমি এবং এই মীনদিগের কুলদেবতা অম্বাদেবী। কথিত আছে এই দেবীর স্মরণার্থ তাঁহার নামে অম্বর নগর স্থাপিত হয়। অম্বর নগরকে চলিত কথায় আমের বলা হয়। মহারাজা জয়সিংহের প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান রাজধানীর নাম জয়পুর। রাজধানীর নামেই এক্ষণে সমগ্র রাজ্যটী অভিহিত। জয়পুর নগরী প্রাচীন রাজধানী আমের হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বর্ত্তমান জয়পুর রাজ্য ১৪,৪৬৫ বর্গমাইল বিস্তৃত; ইহার লোকসংখ্যা ২৮,৩২,২৭৬; পরিসরে জয়পুর প্রায় সুইজার্ল্যাণ্ডের সমতুল্য। প্রাচীন অম্বরেই প্রথমে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৬০৫—১৬১৫

---

* অযোধ্যা হস্তিনাপুর প্রভৃতি প্রাচীন রাজবংশের সন্তান সন্ততিগণ রাজপুত্র বলিয়া আপনাদিগকে অভিহিত করিতেন। রাজপুত্র শব্দের অপভ্রংশ রাজপুত। যে ভূমি বা স্থানে রাজপুতগণ পরে বাস করিতে থাকেন তাহা রাজপুতানা নামে অভিহিত। উহা সূর্য্য চন্দ্র বংশীয় আর্য্য রাজাদিগের বাসস্থান বলিয়া ‘রাজস্থান’ নামেও অভিহিত। রাজার অপভ্রংশ ‘রায়’ এবং স্থান শব্দের অপভ্রংশ ‘থানা’; তাহা হইতে রাজপুতগণ চলিত ভাষায় রাজস্থানকে ‘রায় থানা’ও বলিয়া থাকে। ইহার অন্য নাম রাজকরা। কর্ণেল টড মহোদয়ের সময় রাজপুতানা অষ্টরাজ্যে বিভক্ত ছিল,—(১) মিবার (উদয়পুর), (২) মারবার (যোধপুর), (৩) অম্বর (জয়পুর), (৪) কোটা (৫) বুন্দী (৬) বিকানীর ও কিষণগড়, (৭) যশল্মীর এবং (৮) মরু প্রদেশ। বর্ত্তমান বিভাগক্রমে কিষণগড় স্বতন্ত্র হইয়া এবং কেরৌলী, ধোলপুর, সিরোহী, ভরতপুর, আলবার, টোঁক, ডুঙ্গরপুর, বন্‌শ্‌বারা, ঝালাবার, সাহুরা ও প্রতাপগড় যুক্ত হইয়া উনবিংশতি রাজ্য লইয়া রাজপুতানা। ইহার উত্তরে ভাওয়ালপুর, ভট্টিয়ানা, ঝজ্জর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য; দক্ষিণে সিন্ধিয়া ও হোলকর রাজ্য; পূর্ব্বে গুর্গাঁও, গোয়ালিয়র প্রভৃতি এবং পশ্চিমে সিন্ধুদেশ।

অব্দের মধ্যে জয়পুরাধিপতি মানসিংহের সহিত যশোহরের বাঙ্গালীরাজা প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হয়। প্রতাপাদিত্য প্রবলপ্রতাপান্বিত হইয়া দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের অধীনতা অস্বীকার করিয়া করপ্রদানে বিরত হইলে দিল্লীশ্বর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য মানসিংহকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা ইতিহাসের প্রসিদ্ধ কথা; এস্থলে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। প্রথমে মানসিংহকে পরাস্ত এবং চিন্তাকুল হইতে হইয়াছিল, কিন্তু ফলে তাঁহারই জয় হয়। এসম্বন্ধে এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে প্রতাপাদিত্যের গৃহে তাঁহার রাজলক্ষ্মী অচলা ছিলেন। তাঁহারই কৃপায় প্রতাপাদিত্য অজেয় হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম শিলাদেবী। পুরাকালে মথুরার রাজা কংসের রঙ্গস্থলে একখানি অপূর্ব্ব শিলা ছিল। কংসরাজা দেবকীর গর্ভের সন্তানগুলিকে ঐ শিলায় আছড়াইয়া হত্যা করেন। দেবকীর গর্ভে যোগমায়া আসিয়া জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহাকেও কংস ঐরূপে হত্যা করিবার কালে শিলাস্পর্শে দেবী অষ্টভুজা হইয়া আকাশপথে অন্তর্ধান করেন। প্রতাপাদিত্য যখন মথুরায় আগমন করেন * তখন এই শিলার মাহাত্ম্য তাঁহার শ্রুতিগোচর হইলে তিনি তাহাতে অষ্টভুজা দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া লইয়া যান এবং তাঁহার বরে অজেয় হইয়া গৌড়নগরের যশ হরণ করিয়া যশোহর নামে আপনার নূতন রাজ্য স্থাপিত করেন এবং স্বীয় প্রাসাদে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে কোন কারণে শিলাদেবীর বিরাগভাজন হইলে প্রতাপাদিত্য মানসিংহের হস্তে পরাজিত হন। এবং মানসিংহ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শিলাদেবীকে জয়পুরে লইয়া গিয়া অম্বর সহরে বা আমেরের একটী পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে দেবীর সন্তোষার্থ তাঁহার সম্মুখে ছাগ মহিষ এবং নরবলি দেওয়া হইত। কথিত আছে তাহাতে দেবী প্রসন্না হইয়া মহারাজা মানসিংহ এবং জগৎসিংহকে দর্শন দিতেন। কিন্তু মহারাজা জয়সিংহ নরবলি রহিত করিয়া দিলে দেবী রুষ্ট হইয়া মুখ ফিরাইয়া লয়েন। এখনও তাঁহার মুখ বামে ফিরান আছে। মানসিংহ শিলাদেবীকে যখন জয়পুরে লইয়া যান, তখন তাঁহার সেবা ও পূজার জন্য দশঘর বৈদিক শ্রেণীর বাঙ্গালী পূজারী লইয়া যান। জয়পুরে মহারাজার কলেজের ভূতপূর্ব্ব ভাইস প্রিন্সিপাল স্বর্গীয় মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, বি, এ, মহাশয় আমের ভ্রমণকালে তাঁহার দিনলিপিতে লিখিয়াছিলেন।—

"শিলাদেবীর একজন পূজারীর কাছে * * শুনিলাম—তাঁহারা সর্ব্বসুদ্ধ ২০ ঘর আছেন, কয়েকঘর আমেরে এবং কয়েক ঘর জয়পুরে। মাথাগুণতি শতাবধি পূরে না। ইঁহারা বৈদিক শ্রেণী, প্রথম যিনি বাঙ্গালা হইতে আসেন তাঁহার নাম কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌম কমলাকান্তের পুত্রদের মধ্যে একজন। ইহাঁদের সহিত বাঙ্গালার বৈদিক শ্রেণীয়গণের বৈবাহিক সম্বন্ধ অনেক দিন হইতেই প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান পূজকের পিতামহের সময় নদীয়া শান্তিপুরের নিকট হইতে চারিটী বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণকন্যা এইখানে পরিণীতা হন। আরও বর্ত্তমান পূজকের ভ্রাতা কাশীধামের নিকটস্থ সোমনাথ ভট্টাচার্য্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের দুই সন্তান হইয়াছে এবং তিনি রীতিমত বাঙ্গলা কথা কহিতে পারেন। ইহাঁদিগের স্ত্রীলোকদিগের ভিতর ঘাঘরা ও কাঁচুলির প্রথা নাই, সেই বাঙ্গালী শাড়ীর চলন আছে। ইহাঁরা বামাচারী।" *

রাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যলক্ষ্মী যশোহরেশ্বরী শিলাদেবীকে যশোহর হইতে আনিয়াছিলেন ইহাই প্রসিদ্ধ, কিন্তু মাড়ওয়ারী ভাষায় লিখিত একখানি বংশতালিকায় লিখিত আছে যে রাজা মানসিংহ পরতাপদীকে (প্রতাপাদিত্য) জয় করিয়া কেদার কায়েতের (বারভুঁইয়ার অন্যতম জমিদার স্বনামখ্যাত কেদার রায়) রাজ্যে উপনীত হন। তাঁহার নিকট শিলামাতা ছিলেন। শিলামাতার বরে কেদাররাজা অজেয় ছিলেন। রাজা মানসিংহ শিলামাতার প্রসন্নতা লাভ করেন। কেদা-

* সম্রাট আকবর সাহের রাজত্বকালে প্রতাপাদিত্য তাঁহার পিতা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক মোগল সম্রাটের প্রতাপ, ঐশ্বর্য্য, সামরিক শক্তি প্রভৃতি স্বচক্ষে দর্শন এবং রাজনীতি-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য দিল্লী ও আগ্রায় প্রেরিত হন। তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মথুরা হইয়া আসিয়াছিলেন।

* এই দিনলিপির তারিখ ২১ শে আগষ্ট ১৮৯০। "শ্রীশ্রীশি দেবী সহায়" বলিয়া ইহার আরম্ভ করা হইয়াছে।

রাজা এই সময় স্বীয় আচরণে শিলামাতার বিরাগভাজন হইলে মানসিংহ ঐ রাজাকে পরাজিত করেন। কিন্তু পরে তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং এই নববধূসহ শিলামাতাকে জয়পুরে আনয়ন করেন। ঐ তালিকায় উক্ত হইয়াছে মানসিংহ ১৬১৪খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার ২০ জন মহিষী সহমরণে যান। তন্মধ্যে "মহলরাজকী চেটী রাণী বাঙ্গালনী পরাভাবতী" (প্রভাবতী) অন্যতমা।* ইহাতে কেদাররায়ের কন্যার (কেদারকায়তকী বেটী) নাম উল্লিখিত হয় নাই এবং মানসিংহের মহলরাজের কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করিবার উল্লেখও বঙ্গ-বিজয়ের ইতিহাসে উক্ত হয় নাই। কোন বাঙ্গালী রাজার নামও মহলরাজ বলিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং কেদাররায়কে মহলরাজ বলা হইয়াছে কি না সন্দেহ। সে যাহাই হউক আমরা দেখিতে পাইতেছি জয়পুরে উপনিবেশের প্রারম্ভেই বাঙ্গালীরা একজন বঙ্গনারীকে সেখানকার রাজমহিষীর গৌরবময় আসন অলঙ্কৃত করিতে দেখিয়াছিলেন। রাণীপ্রভাবতী যদি কেদাররায়ের কন্যা না হন তাহা হইলে অম্বররাজ মানসিংহের দুইজন বাঙ্গালী রাণী ছিলেন।

শিলাদেবীর পুরোহিত রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সাতটী কন্যা ছিলেন। রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার সহোদর রামনারায়ণ বঙ্গদেশ হইতে আনীত হইয়া রত্নগর্ভের দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং জয়পুরেই স্থায়ী হন। রাজেন্দ্রের পুত্র সন্তোষরাম ওরফে শান্তেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহারাজা সওয়াই জয়সিংহের নিকট ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ৫১ বিঘা পরিমাণ ভূসম্পত্তি উদকদান * প্রাপ্ত হন। ১৭১৫ অব্দে সন্তোষরাম পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র বিদ্যাধর ঐ জমীদারীর উত্তরাধিকারী হন।† বিদ্যাধরের মাতুল কৃষ্ণরাম ওরফে কিষণরাম সে সময় মহারাজা জয়সিংহের দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একদিন অম্বরে রাজা জয়সিংহ দেওয়ান কিষণরামের সহিত মতিমহল নামে নূতন একটী প্রাসাদের নির্ম্মাণকার্য্য পরিদর্শন করিবার কালে ছাদে উঠিবার পথ না পাইয়া মিস্ত্রীদিগকে একটী সিঁড়ী প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। কিন্তু তাহারা সকলেই একবাক্যে বলে যে সিঁড়ী হইবার কোন উপায় নাই। বালক বিদ্যাধর

* (১) "পাছে উঠানে কেদার কায়তকো রাজ ছো * * * সে সিলামাতা ছী * * সো মাতাকা প্রতাপ-সে উহ্নে কোইভী জীৎতা নহী। * * রাজা মানসিংহজী উ কী বেটী মাঁগী। * * * রাজা কেদার দেনী করী॥ * * * অওর মাতা নেঁলে আয়া। অওরা বংগাল্যা নেঁ পূজন সোঁপো * * *।" এই বিষয়ই "ইতিহাস রাজস্থান" গ্রন্থে চারণদিগের উক্তি অনুসারে লিখিত আছে (২) "প্রতাপাদিতাকো জীতকর্ রাজা কেদারকো রাজ্যপর চঢ়াই কী। বহ জাতিকা কায়স্থ থা, ঔর সল্লামাতা নামী দেবী উস্‌কে ইহাঁ থী। মানসীংহজী কী লড়াইকে সমাচার শুনকর্ কেদার নৌকামে বৈঠ্‌কর্ সমুদ্র-কী ওর ভগ্ গয়া ঔর মন্ত্রী-সে কহ গয়া কি যদি হো-সকে তো মেরী পুত্রী মানসীংহজী-কো দে কর্ সন্ধি কর্ লেনা। মন্ত্রী-নে ঐসা হী কিয়া। মানসীংহজী * * উস্‌কা রাজ্য পীছা দে দিয়া, ঔর সল্লাদেবী-কো আম্বের লে আয়ে।" অর্থাৎ (১) পশ্চাৎ ঐ স্থানে কেদার কায়েতের রাজ্য ছিল * * উঁহার নিকট শিলামাতা ছিলেন। সেই মাতার প্রতাপে কেহই উহাঁকে জয় করিতে পারিত না * * মানসিংহ উহাঁর কন্যার পাণি প্রার্থনা করেন * * রাজা কেদার (কন্যা) দান করেন। * * আর মাতাকে লইয়া আসেন এবং বাঙ্গালীদের হস্তে পূজার ভার সমর্পণ করেন। (২) প্রতাপাদিত্যকে জয় করিয়া রাজা কেদারের রাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন আর সল্লামাতা (শিলামাতা) নাম্নী দেবী তাঁহার ওখানে ছিলেন * * * * মানসিংহের যুদ্ধসমাচার শুনিয়া কেদার নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রের দিকে পলাইয়া যান এবং মন্ত্রীকে বলিয়া যান যে যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে মানসিংহকে আমার কন্যা-সম্প্রদান করিয়া সন্ধি করিয়া লইবে। মন্ত্রী সেইরূপই করিয়াছিলেন * * মানসিংহজী * * * তাঁহার রাজ্য হইতে প্রস্থান করেন এবং সল্লাদেবীকে আম্বেরে লইয়া আসেন।

শিলাদেবীকে মানসিংহ যে প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন তাহা আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কেহই বলিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন অম্বরে প্রতিষ্ঠিতা শিলা বা সল্লাদেবী যশোহরেশ্বরী নহেন। ঐতিহাসিক নজীর দুই পক্ষেই বিদ্যমান সুতরাং মীমাংসায় গোল আছে। ৬১ বৎসর পূর্ব্বে ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় মথুরায় প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক কংস রাজের রঙ্গস্থলে রক্ষিত শিলায় নির্ম্মিত অষ্টভুজা মূর্ত্তি স্বরাজ্যে লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার কিম্বদন্তী শুনিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু জনশ্রুতি অপেক্ষা মাড়বারীভাষায় লিখিত রাজবংশাবলী ও ইতিহাস রাজস্থান অধিক প্রামাণ্য।—জ্ঞ।

* গঙ্গোদক লইয়া সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করাকে উদকদান বলে। সন্তোষরাম যে ৫১ বিঘা ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন তাহার মধ্যে ১২ বিঘা সাহন কোটরা এবং ৩৯ বিঘা সাকড়া।

† বিদ্যাধর পৈতৃক জমীদারীর পাট্টা রাজা ঈশ্বর সিংহের নিকট হইতে ১৭৭২ সম্বতে নূতন করিয়া প্রাপ্ত হন। পাট্টায় লিখিত আছে,—

"সীধী শ্রীরাওজী শ্রীমুকুন্দ সংঘজী বচনাৎ দয়ারাম গোলাবচন্দ্ ওসেয়াল পুণ্য উদক সন্তোষরাম চক্রবর্ত্তীনে দীনীছে বিঘা ৫১ মিতি ফাগণ বুদি ৮ সম্বৎ ১৭৫৬ মে দীনীছে ও ত কালবস্ হোগিয়ো উস্‌কা বেটা বিদ্যাধরান ধরতী বিঘা ৫১ দিজ্যো। তপসীল উজল ১৭৭২ সম্বৎ সাবন বুদি ১৪।"

তখন মাতুল কিষণরামের সঙ্গে ছিলেন। তিনি মিস্ত্রীদের কথা শুনিয়া মাতুলকে বলেন যে পাঁচসের মোম পাইলে তিনি বলিয়া দিতে পারেন যে ঐ প্রাসাদে সিঁড়ি করা যাইতে পারে কি না। রাজা দেওয়ানের মুখে বালকের এই কথা শুনিয়া কৌতূহলবশে তাঁহাকে পাঁচসের মোম দিবার আদেশ দিলেন। বিদ্যাধর গৃহে ফিরিয়া সেই মোমে মতিমহলের অনুরূপ বাড়ী তৈয়ার করিয়া তাহার নিম্নতল হইতে দ্বিতল ভেদ করিয়া ছাদপর্য্যন্ত একটী পেঁচওয়া সিঁড়ী (Spiral) সংযোজিত করত রাজাকে দেখাইলেন। রাজা সিঁড়ীর কৌশল বুঝিতে না পারিলে বিদ্যাধর ছাদ হইতে জল ঢালিয়া দেখাইয়া দিলেন যে ছাদের জল সিঁড়ী বাহিয়া নিম্নতলে পড়িতেছে। গুণগ্রাহী মহারাজা এই বালকের অদ্ভুত শিল্প-কৌশল তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন। রাজানুগ্রহে বিদ্যাধরের সুশিক্ষালাভের সুবিধা হইল এবং তিনি অল্পকালেই গণিত, জ্যোতিষ, পূর্ত্তবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। তিনি বিদ্যা- ও বুদ্ধিবলে রাজা ও প্রজা সকলেরই প্রীতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া অম্বরাধিপতি সওয়াই জয়সিংহ তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

কর্ণেল টড তাঁহার রাজস্থান নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে অম্বররাজের বাঙ্গালী মন্ত্রী বিদ্যাধরের উল্লেখ এবং তাঁহার বিবিধ গুণ গান করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকের কয়েকখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ৩২ বৎসর পূর্ব্বে চারুবার্ত্তার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অনুবাদ গ্রন্থের ২য় ভাগে ১৭: পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিয়াছিলেন,—

"ব্রাহ্মণকুলপুঙ্গব পণ্ডিতবর বিদ্যাধর বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন। কি জ্যোতিস্তত্ত্ব, কি ভূতত্ত্ব, কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি স্মৃতিশাস্ত্র, কি পুরাণ-তত্ত্ব, সকল বিষয়েই বিদ্যাধর পারদর্শী ছিলেন। যে জয়পুর নগর আজি শোভা সৌন্দর্য্যে ভারতের একটী শ্রেষ্ঠ মনোহর নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার আদর্শ মহানুভব বিদ্যাধরই আঁকিয়া দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই মহাপুরুষের জীবনী দুর্লভ।"

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সময় ইংরেজী রাজস্থানের আমূল অনুবাদ প্রকাণ্ড দুইখণ্ডে বাহির করেন। উপস্থিত ঐ পুস্তক আমার নিকটে না থাকায় বিদ্যাধরের জীবনী সম্বন্ধে তিনি কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন কি না বলিতে পারিলাম না। উক্ত গ্রন্থখানি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। ইহার ১১ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩০২ বঙ্গাব্দে গোপালশাস্ত্রী স্বাক্ষরিত "বিদেশী বাঙ্গালী" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে বিদ্যাধরের জীবনী সম্বন্ধীয় বহু তথ্য সহ অনেক আজগুবি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার সাত বৎসর পরে, আজ ১২ বৎসর হইল জয়পুর-প্রবাসী স্বর্গীয় মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাধরের প্রপৌত্রের পৌত্র সুরজবক্স মহাশয়ের নিকট হইতে প্রকৃত ও বিস্তৃত জীবনী সংগ্রহ করিয়া এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ করেন। তাহার পরবৎসর ঐ প্রবন্ধ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া বিদ্যাধরের প্রতিকৃতিসহ প্রবাসীতে প্রকাশ করিবার জন্য আমায় পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তখন সমগ্র রাজস্থানের বাঙ্গালী উপনিবেশের তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকায় উহা তৎকালে প্রকাশিত না হওয়ায় পরবৎসর অর্থাৎ ১৩১১ বঙ্গাব্দে সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর হইতে আমরা প্রবাসীতে দেশীয় রাজ্যে বাঙ্গালী উপনিবেশের ইতিহাস প্রকাশ করিতে থাকি। সেই প্রসঙ্গে আমরা জয়পুরের প্রধান প্রধান কয়েকজন বাঙ্গালীর জীবনী সাধারণের গোচর করিয়াছিলাম। এক্ষণে ৺ মেঘনাথ বাবুর স্বহস্ত-লিখিত অপ্রকাশিত কাগজপত্র হইতে এবং স্বনামপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রায় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুরের পিতা ৺ যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কর্ত্তৃক ৬ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত তাঁহার দিনলিপি হইতে প্রাপ্ত শিলাদেবী এবং বিদ্যাধরের পূর্ব্বপুরুষ ও বাঙ্গালী উপনিবেশ সম্বন্ধে দুই একটী নূতন তথ্য সাধারণের গোচর করিলাম।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বিদ্যাধর স্বীয় প্রতিভার বলে জয়পুর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান সুদৃশ্য নগরী জয়পুর, যাহা সৌন্দর্য্যে ও নির্ম্মাণ-পারিপাট্যে জগতের সকল ভ্রমণকারীদিগের দ্বারা প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে

একমাত্র সুব্যবস্থিত নগরী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহার পত্তন ও নির্ম্মাণকৌশলের গৌরব বাঙ্গালী বিদ্যাধরেরই প্রাপ্য। এই নগরী ১৭২৮ খৃঃঅব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কর্ণেল টড তাঁহার রাজস্থানে লিখিয়াছেন "বিদ্যাধর একজন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ, সুপণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। অম্বরের বর্ত্তমান সহর জয়পুর তাঁহারই নক্সা অনুযায়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা ড্রামষ্টাড সহরের মত সুশৃঙ্খলাবদ্ধ।" * অন্যত্র লিখিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র জয়পুরনগরই সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ম্মিত। ইহার পথগুলি পরস্পর সমদ্বিখণ্ডিত ভাবে ও সমকোণ করিয়া অবস্থিত। ইহার আদর্শ প্রস্তুতকরণ ও নির্ম্মাণ বিষয়ে গুণপনা বা কৃতিত্বের ভাগী বাঙ্গালী বিদ্যাধর।"

রাজা জয়সিংহ স্বয়ং জ্যোতিষবিদ্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন; তিনি বিদ্যাধরের ন্যায় একজন বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদ্ পণ্ডিতকে মন্ত্রীরূপে পাইয়া রাজ্যের প্রভূত হিতসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনিই মুসলমান সম্রাটদিগের কলঙ্কস্বরূপ ঘৃণিত 'জিজিয়া' নামক কর বহু চেষ্টায় রহিত করিয়াছিলেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রচারের জন্য এবং গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি ও আকার নিরূপণ করিবার জন্য দিল্লী, জয়পুর উজ্জয়িনী, কাশী ও মথুরায় এক একটী গ্রহদর্শনযন্ত্রাগার বা মানমন্দির (Observatory) স্থাপিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জয়পুরের যন্ত্রাগারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদশাহ তাঁহাকে তদানীন্তন পঞ্জিকা সংশোধন করিবার ভার প্রদান করিলে তিনি প্রথমে সমরখন্দের তুরস্ক পণ্ডিত বিখ্যাত রাজজ্যোতির্ব্বিদ্ উলুক বেগের যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া তাহাতে সুফল না পাওয়ায় স্বয়ং বিবিধ যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন এবং সাতবৎসর গ্রহাদির গতি নির্ণয় ও গণনা দ্বারা একটী তালিকা প্রস্তুত করেন। তিনি পর্ত্তুগীজ জ্যোতির্ব্বিদ প্রসিদ্ধ ডি-লা-হায়ারের যন্ত্রে ও গণনায় ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার গণনা পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয়। সেই-সকল পণ্ডিতের মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিত খোদিল এবং ডাক্তার হাণ্টার অন্যতম। রাজা জয়সিংহ একখানি গণনাপুস্তকও রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই-সকল কার্য্যে মন্ত্রী বিদ্যাধর তাঁহার অদ্বিতীয় সহায় ছিলেন। এমন কি রাজবংশাবলীর তালিকা প্রণয়নেও বিদ্যাধর মহারাজার সহযোগিতা করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে মহামতী কর্ণেল টড তাঁহার রাজস্থানে লিখিয়াছেন *—"এই গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে প্রকাশিত রাজবংশাবলীর বিস্তীর্ণ তালিকা প্রণয়নে বিদ্যাধর রাজার সহযোগী ছিলেন।" "বিদ্যাধর একজন বাঙ্গালী এবং কি বৈজ্ঞানিক, কি জ্যোতিষিক, কি ঐতিহাসিক, যাবতীয় কার্য্যেই তিনি রাজার সহযোগী ছিলেন।" "বিদ্যাধর তাঁহার (রাজার) জ্যোতিষের কার্য্যকলাপের একজন প্রধান সহযোগী।" "জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রাগার" নামক পুস্তিকাপ্রণেতা রাজইঞ্জিনীয়ার গ্যারেট মহোদয় লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালী বিদ্যাধর তাঁহার আর একজন সহযোগী ছিলেন, এবং তিনিই মহারাজের জ্যোতিষিক ও ঐতিহাসিক গবেষণাকার্য্যে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছিলেন।" † বিদ্যাধরের রাজনৈতিক প্রতিভা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। সংক্ষেপে তাহার দুই একটীর উল্লেখ করা

* "Vidyadhar was a Brahmin of Bengal, a scholar and a man of science. The plan of the modern city of Amber named Jeypur, was his ; a city as regular as Dramstadt."—Rajasthan, Vol. II, P. 105, S. K. Lahiri's Edn.

† "Jaipur is the only city in India built upon a regular plan with streets bisecting each other at right angles. The merit of the design and execution is assigned to Vidyadhar, a native of Bengal,"—Ditto, P. 344.

* "He was also the joint-compiler of the celebrated geneological tables which appear in the first volume of this work." "Vidyadhar, a native of Bengal, one of the most eminent coadjutors of the prince in all his scientific pursuits both astronomical and historical." "Vidyadhar one of his chief coadjutors in his astronomical pursuits. —Rajasthan, Vol. II. pp. 105, 344, 354.

† "Vidyadhar, a Bengali, was another of his coadjutors, and he appears to have been of the greatest help to the Maharaja in both his astronomical and historical researches."

যাইতে পারে। রাজস্থানের ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে যোধপুরপতি একবার বিকানীর আক্রমণ করিলে বিপন্ন বিকানীরপতি, অম্বররাজ জয়সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু মহারাজের নিকট উপস্থিত হওয়াই দুর্ঘট হইয়া পড়ে। যোধপুরের বিরুদ্ধে সাহায্য দান করায় কি মন্ত্রীদল কি সর্দ্দারগণ কাহারও সম্মতি ছিল না। একমাত্র বাঙ্গালী মন্ত্রী বিদ্যাধর শরণাগতকে রক্ষা করিবার জন্য রাজাকে উৎসাহিত করেন। দূতের ইচ্ছা ছিল মহারাজের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করেন। বিদ্যাধরের সহিত এই রাজদূতের পরম মিত্রতা ছিল, সুতরাং তাঁহারই সাহায্যে দূত সফলমনোরথ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে টড মহোদয় লিখিয়াছেন—

"But the envoy had a friend in the famous Vidyadhar the Chief Civil Minister of the State, through whose means he obtained permission to make a verbal report standing."

বলা বাহুল্য যোধপুরের কবল হইতে বিকানীর রক্ষা পাইয়াছিল। আর এক সময় একটী ঘটনা হয়; যোধপুরের রাজা অভয়সিংহ তাঁহার ভগ্নীপতি অম্বররাজ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া জয়পুরে আগমন করেন। এবং জয়পুরের অন্তর্গত নারাণা নামক পরগণা প্রার্থনা করেন। জয়সিংহ আমোদের মত্ততায় ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া তাহাতে স্বীকার পান। ঐ পরগণায় যে তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ নাগা সৈন্যদল বাস করে তাহা তাঁহার মনেও হয় নাই। কিন্তু তীক্ষ্ণধী বিদ্যাধর বুঝিয়াছিলেন নারাণা কোন মতেই হস্তান্তর করা যাইতে পারে না। তজ্জন্য তিনি দানপত্রে রাজকীয় মোহর অঙ্কিত করিয়া দিতে বিলম্ব করেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী মোহর না করিলে দান সিদ্ধ হয় না। সুতরাং কয়েক মাস পরে কোন কার্য্য উপলক্ষে রাজা যোধপুরে গমন করিলে অভয়সিংহ অম্বররাজের নিকট বিদ্যাধরের দীর্ঘসূত্রিতা সম্বন্ধে অনুযোগ করেন। স্বরাজ্যে ফিরিয়া জয়সিংহ বিদ্যাধরকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নারাণার গুরুত্ব এবং তাহার অভাবে রাজ্যের ক্ষতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। রাজা তখন বিষম চিন্তাযুক্ত হন এবং ঐ পরগণা রক্ষা করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করেন। দূরদর্শী বিদ্যাধর বলেন নারাণার সমতুল্য বিষণগড় নামে যোধপুরের এক সম্প্রদায় সেনানিবাসবহুল পরগণা আছে; সুতরাং নারাণার বিনিময়ে আপনি অভয়সিংহের নিকট বিষণগড় প্রার্থনা করুন; তাহাতেই ফল হইবে, কারণ যোধপুরপতি বিষণগড় কোন ক্রমেই ছাড়িতে পারিবেন না এবং বাধ্য হইয়া নারাণার আশা পরিত্যাগ করিবেন। ফলে তাহাই হইয়াছিল।

জয়সিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরীসিংহকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া পরলোক গমন করেন। কিন্তু যে সর্ত্তে তিনি উদয়পুরের রাণার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র এবং রাণার দৌহিত্র মাধবসিংহেরই রাজ্য পাইবার কথা। ইহার পরিণামে রাজ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। বিদ্যাধর ইহার অনতিকাল পূর্ব্ব হইতে বার্দ্ধক্যবশতঃ ঈশ্বরীসিংহের মন্ত্রিত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সহকারী হরগোবিন্দ নাটাণী মন্ত্রী হন। হরগোবিন্দ ভিতরে ভিতরে গুপ্তবন্ধু মাধবসিংহের পক্ষে ছিলেন এবং ঈশ্বরীসিংহের সর্ব্বনাশ সাধনে যত্নপর ছিলেন, বাহিরে তাহার কিছুই প্রকাশ পায় নাই। উদয়পুরের রাণা, মলহর রাও হোলকারকে সহায় করিয়া, যখন জয়পুর আক্রমণ করেন তখন জয়পুরের প্রধান সেনাপতি কেশবদাস তাঁহাদের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হন। যখন কেশবদাস ঘোরতর যুদ্ধে ব্যাপৃত এমন সময় বিশ্বাসঘাতক হরগোবিন্দের কৌশলে রাজা তাঁহার প্রতি সন্দেহযুক্ত হন এবং তাঁহাকে যুদ্ধে বিরত করিয়া স্বহস্তে বিষের পাত্র দিয়া তাহা পান করিতে বলেন। কেশবদাস সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং বিষপান করিবার কালে বলিলেন "যাহার ষড়যন্ত্রে আমায় অবিশ্বাস করিয়া বিনষ্ট করিলেন তাহারই জন্য আপনারও এইরূপ পরিণাম হইবে।" শত্রুসৈন্য যখন সহরের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত, ঈশ্বরীসিংহ হরগোবিন্দকে বলেন—"তুমি যে বলিয়াছিলে ফৌজ তোমার পকেটের মধ্যে আছে, কৈ সে ফৌজ, আর কবে বাহির করিবে?" হরগোবিন্দ হাসিয়া বলিল "মহারাজ! আমার পকেট ফাটিয়া গিয়াছে।" হরগোবিন্দই যে

বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে রাজা তাহা এখন বুঝিয়া আসন্ন অপমান ও পরাজয়ের ভয়ে স্বয়ং বিষপানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। সহসা তাঁহার মৃত্যুতে রাণীগণ মহা শোকাকুল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া চিরবিশ্বস্ত বৃদ্ধমন্ত্রী বিদ্যাধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন মুহূর্ত্ত বিলম্বেরও অবসর ছিল না, সুতরাং শিবিকার অপেক্ষা না করিয়া তাঁহাকে ঝুড়ি করিয়া রাজান্তঃপুরে আনা হইল। বিদ্যাধর সমস্ত অবগত হইয়া রাণীদিগকে রাজার মৃত্যু অন্ততঃ একদিনও গোপন রাখিয়া ক্রন্দনাদি সম্বরণ করিতে বলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার পরমমিত্র ঝালাইএর সর্দ্দার ঠাকুর কুশলসিংহকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিলেন। অতঃপর হরগোবিন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন "হরগোবিন্দ তুমি যৌবনমত্ত রাজাকে বিনাশ করিয়া বেশ কাজ করিয়াছ, কিন্তু এখন তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যাহাতে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয় তাহার আয়োজন কর।" এই কথা শুনিয়া হরগোবিন্দ সময়োচিত আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়া কোন দ্রব্য আনিবার প্রয়োজনে তাড়াতাড়ি যেমন একটা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল অমনি বিদ্যাধর ও কুশলসিংহ গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া তাহাতে তালা লাগাইয়া দিলেন। তিনি বিশ্বাসঘাতককে এইরূপে বন্দী করিয়া জয়পুর উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিলেন এবং উভয়ে দূত হইয়া গিয়া রাণাকে বাক্‌কৌশলে মুগ্ধ করিয়া এবং তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া মহারাজা ঈশ্বরীসিংহের সাক্ষাতে সমস্ত স্থির করিবার জন্য তাঁহাকে ৫০ জন অশ্বারোহী সহ প্রাসাদে আনয়ন করিলেন। এদিকে পূর্ব্ব হইতে রাণার প্রবেশপথ সাঙ্গানীর দরওয়াজা হইতে প্রাসাদদ্বার পর্য্যন্ত ৫টা ঘাটি সুশিক্ষিত সৈন্য দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত রাখা হইয়াছিল। রাণা ঐ পথে প্রবেশ করিলে প্রতি ঘাটিতে দশজন করিয়া অশ্বারোহীকে আটক করা হইলে রাণা জগৎসিংহ একাকী প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত হন এবং বিদ্যাধরের প্রস্তাবমত সন্ধি সাক্ষর করিতে বাধ্য হন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে রাণা তাঁহার সৈন্যগণ লইয়া নগর পরিত্যাগ করেন ও মাধবসিংহ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হন। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে এইরূপে এক বাঙ্গালীর রাজনৈতিক কৌশলে মাধবসিংহ বিনা রক্তপাতে রাজপুতানার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হন। মাধবসিংহ বিদ্যাধরকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অনুরোধ করেন কিন্তু বার্দ্ধক্যবশতঃও বটে এবং রাজবন্ধু হরগোবিন্দের সংস্রব ত্যাগ করিবার জন্যও তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। প্রধান মন্ত্রী হরগোবিন্দর কুপরামর্শে অথবা যে কারণেই হউক মাধবসিংহ ক্রমে বিদ্যাধরের উপর রুষ্ট হইয়া ঐশ্বর্য্যক্ষমতা খর্ব্ব করিবার মানসে তাঁহাকে নির্য্যাতিত করেন।

বিদ্যাধরের তিন পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ মুরলীধর, মধ্যম গঙ্গাধর, এবং কনিষ্ঠপুত্র গজাধর (গদাধর); প্রথম কন্যা মায়াদেবী এবং দ্বিতীয়া কামিয়া দেবী। গজাধর নিঃসন্তান ছিলেন। মুরলীধরের ও গঙ্গাধরের পুত্র পৌত্রাদিতে বংশবিস্তৃত হইয়াছিল। * এই বংশতালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে বাঙ্গালী শান্তেন্দ্র চক্রবর্ত্তী হইতে ধীরে ধীরে নামগুলি কিরূপ মাড়বারী আকার ধারণ করিয়াছে। নামের ন্যায় পোষাকপরিচ্ছদ আকৃতি প্রকৃতিতেও পরিবর্ত্তন বড় অল্প হয় নাই। পরে সে-সকল আলোচিত হইবে। এই চক্রবর্ত্তী গোষ্ঠী জয়পুরে অট্টালিকা দেবালয় ভূসম্পত্তি প্রভৃতিতে প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন। জয়পুরের বিশ্বেশ্বর কী চৌকুড়ী নামক মহল্লায় এবং পুরাতন অম্বরে বিদ্যাধরের কয়েকখানি বৃহৎ অট্টালিকা, ঘাটপর্ব্বতসানুতে তাঁহার সুবৃহৎ উদ্যান, সাহন-কোটরা ও সাচড়ৌর জমাদারী, বিদ্যাধরের পুত্রগণকে প্রদত্ত বিজাপুর গ্রাম প্রভৃতি সম্পত্তি তাঁহাদেরই ছিল। বর্ত্তমান জয়পুরে "বিদ্যাধরজীকী গলি" নামে যে পথ বিদ্যমান আছে উহা বাঙ্গালী বিদ্যাধরের নাম এখনও জাগরুক রাখিয়াছে। ঐ পথের পশ্চিমদিকে বিদ্যাধরের আবাসবাটী ছিল। অম্বর সহরে বিদ্যাধরের কন্যা মায়াদেবীর প্রতিষ্ঠিত আমের মহাদেব ও মন্দির, জয়পুরে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত তারকেশ্বর মহাদেব ও বকনাকে

* মুরলীধর হইতে—লছমীধর—বংশীধর—শিওবক্স্—সূরজ (এক্ষণে বয়স ৪৫)। গঙ্গাধর হইতে—শ্রীধর, ধরণীধর, মহীধর, (ইনিই লছমীধরের পোষ্যপুত্র)। শ্রীধর হইতে—গিরিধর, চিমণধর, প্রেমধর।

গিরিধর হইতে বিষণলাল এবং প্রেমধর হইতে—মায়ারাম—শিবরাম। মুরলীধর মহারাজের ফরাসখানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এবং গঙ্গাধর সম্বয়ের নাজিম ছিলেন।

কুয়েকা মহাদেব নামক শিব ও শিবমন্দির আজিও বিদ্যমান আছে। হরগোবিন্দের ঈর্ষ্যাবশে রাজরোষ বিদ্যাধরের উপর পতিত হইলে তিনি স্বীয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন এবং তাঁহার পুত্র মুরলীধর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একখানি অর্দ্ধসমাপ্ত বাড়ীতে সপরিবারে বাস করিতে বাধ্য হন।

প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাধরই অম্বররাজ্যে বাঙ্গালীর নাম গৌরবান্বিত করেন এবং রাজপুতানায় বাঙ্গালী উপনিবেশ সুদৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপিত করেন। বিদ্যাধরের বংশজ সন্তানগণ ব্যতীত তাঁহার কোন কোন আত্মীয় তাঁহারই সময় জয়পুরে আগমন করেন। তন্মধ্যে তন্ত্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরিহর চক্রবর্ত্তী অন্যতম। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বিদ্যাধর বঙ্গদেশ হইতে উপযুক্ত পাত্র আনাইয়া স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিদ্যাধর ১৮০৮ সংবতে মাধবসিংহের রাজত্বকালে পরলোক গমন করেন। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য হইতে বিদ্যাধরের পুত্রগণ পর্য্যন্ত শিলাদেবীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মাতৃভাষার চর্চ্চা ছিল। মেঘনাথ বাবু লিখিয়াছেন—"কোন কোন বাটীতে ৩০০ বৎসরের পুরাতন হস্তলিপিতে বঙ্গীয় অক্ষরের ন্যায়শাস্ত্রের পুঁথির পাতা দেখিতে পাওয়া যায়। রত্নগর্ভের সময় হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত এই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালা অক্ষরেই লেখাপড়া করিতেন। পরে কালবশে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা ছাড়িয়া দেন, তন্ত্রশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও পূজাপদ্ধতির পুঁথিগুলি হিন্দী অক্ষরেই লিখিতে আরম্ভ করেন। সাজসজ্জা সম্পূর্ণই হিন্দুস্থানী হইয়া যায়। কিন্তু পূজাপদ্ধতি আজিও বঙ্গীয় রীতি অনুসারে চলিতেছে। বহুকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালী নামেই নামকরণ করার প্রচলন ছিল, কিন্তু দুই তিন পুরুষ হইতে হিন্দুস্থানী নাম রাখা আরম্ভ হইয়াছে, যথা—শিওবক্স, রামবক্স, ইত্যাদি। বৈবাহিক সম্বন্ধ স্বশ্রেণীর মধ্যে আছে; তবে বাঙ্গালীর সঙ্গে সম্বন্ধ দুর্ঘট হওয়ায় অনেক দিন হইতে তাহা স্থগিত রহিয়াছে।"

শিলাদেবীর শাক্ত পুরোহিতগণ জয়পুরে আসিবার অর্দ্ধশতাব্দী পরে বৃন্দাবন হইতে গোস্বামীগণ আসিয়া জয়পুরে উপনিবিষ্ট হন। তাঁহাদের উপনিবেশকাহিনী পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

গান

বাধা দিলে বাধবে লড়াই
মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই ?
সরতে হবে।
লুঠকরা ধন করে জড়
কে হতে চাস সবার বড়,
এক নিমেষে পথের ধূলায়
পড়তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায়
নড়তে হবে।

নীচে বসে আছিস কে রে
কাঁদিস কেন ?
লজ্জা-ডোরে আপনাকে রে
বাঁধিস কেন ?
ধনী যে তুই দুঃখধনে
সেই কথাটি রাখিস মনে,
ধূলার পরে স্বর্গ তোমায়
গড়তে হবে
বিনা অস্ত্র বিনা সহায়
লড়তে হবে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওরাওঁদের শিল্প

ওরাওঁদিগকে অনেকে যতটা অসভ্য মনে করেন, প্রকৃত পক্ষে তাহারা ততটা অসভ্য নয়। সভ্যতার আদিমতম সোপান তাহারা অনেক দিন অতিক্রম করিয়াছে। সূক্ষ্ম কলা সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান অতি ক্ষীণ হইলেও শিল্প-যন্ত্রাদি সম্বন্ধে তাহারা অনেক দূর উন্নতি লাভ করিয়াছে।

বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পুত্র

U. RAY & SONS,
100, Garpar Road, Calcutta

সূক্ষ্ম কলা।

ওরাওঁরা তাহাদের গৃহের প্রাচীরগাত্রে নানা প্রকার আলঙ্কারক পুষ্প ও জীবজন্তু প্রভৃতির চিত্র রচনা করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া ওরাওঁ স্ত্রীলোকদের অঙ্গে গহনার আকারে উল্কি পরায়ও তাহাদের শিল্প-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম সূচ দ্বারা বিশেষ এক প্রকার নীল রং শরীরের ভিতর ফুঁড়িয়া প্রবেশ করাইয়া ইহারা উল্কি পরিয়া থাকে। এই উল্কি দুই প্রকারের:—এক রকম ফুল লতা পাতা প্রভৃতি; অন্য এক রকম নানা প্রকার রেখাবলী দ্বারা চিত্রিত হয়। পার্শ্বের ছবিতে ওরাওঁ স্ত্রীলোকদিগের উল্কির একটি নমুনা পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন।

ইহা ছাড়া ওরাওঁগণ কাপড়ের আঁচলায় সূচি দ্বারা নানা প্রকার শিল্পকার্য্য করিয়া থাকে। ওরাওঁদের নাচ ও গান খুব কৌতূহলোদ্দীপক। তাহাদের ডমরুর মত এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র আছে তাহাকে উহারা 'রঞ্জ' বলে। দুইটি কাঠির দ্বারা উহা বাজান হয়। ওরাওঁদের সূক্ষ্ম শিল্পের মধ্যে সব চেয়ে দ্রষ্টব্য উহাদের 'কারসা-হাঁড়িয়া' —বিবাহের সময় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটি হাঁড়িকে চিত্রিত করিয়া তাহার মাথা হইতে ধানের শীষ ঝালরের মত করিয়া সাজাইয়া 'কারসা হাঁড়িয়া' প্রস্তুত করা হয়।

শিল্প।

ওরাওঁরা শিল্পজীবী জাতি না হইলেও লৌহ ও কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত চর্কির সাহায্যে ক্ষেত্রজাত তুলা হইতে সুতা কাটিয়া থাকে। 'রাহ্‌তা' নামক এক প্রকার যন্ত্রের দ্বারা তুলার বীজগুলি আগে তুলা হইতে পৃথক করা হয়। যে যন্ত্রে তুলাগুলি পূর্ব্বে পিঁজিয়া লওয়া হয় ওরাওঁরা তাহাকে 'চির্খি' বলে। পরে সেই সুতা 'ঢেরা' বা মধ্যে-ছিদ্র-করা গোল এক খণ্ড পাথরের ভিতর পরানো একটি কাঠিতে জড়াইয়া ফেলা হয়। ঐ ক্ষুদ্র বংশখণ্ডটিকে 'ঘুর্ণি' বলে। লাল সুতার দ্বারা এক প্রকার বাঁশের সূচের সাহায্যে ওরাওঁরা কাপড়ে নানা প্রকার পুষ্প লতা পাতা প্রভৃতির নক্‌সা কাটিয়া থাকে।

ওরাওঁদের উল্কির নক্‌সা।
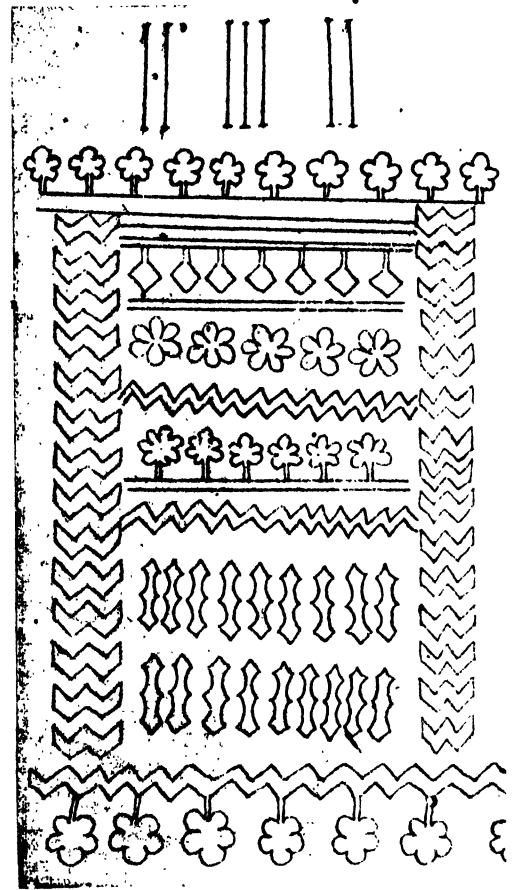
দড়ির কাজ।

ওরাওঁরা কুক্রুম নামক এক প্রকার ঘাসের সাহায্যে সুন্দর দড়ি প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই দড়ি ধরামী প্রভৃতির কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহার দ্বারা তাহারা শিকা, মাছ ধরিবার জাল প্রভৃতি রচনা করিয়া থাকে।

ঘাস, পাতা, খড় প্রভৃতির কাজ।

ওরাওঁ স্ত্রীলোকেরা খেজুর গাছের পাতায় এক প্রকার মাদুর তৈয়ারী করে। 'ঘুঙ্গু' নামক এক প্রকার গাছের পাতা পরস্পর সংবদ্ধ করিয়া তাহারা বর্ষাকালের জন্য এক প্রকার মস্তকাবরণ টোকা প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহাকে তাহারা 'ছুপি' বলে। মাথার উপর হইতে ইহা

ওরাওঁদের উল্কির নকসা।

লাঙ্গল, ঢেঁকী, আহার করিবার সময় বসিবার জন্য 'কান্দু' বা পীঁড়ি, ঘরের দ্বার, খিল (মাকৃরি), ধান চাল প্রভৃতি মাপিবার জন্য পৈলা ও আরো নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করে।
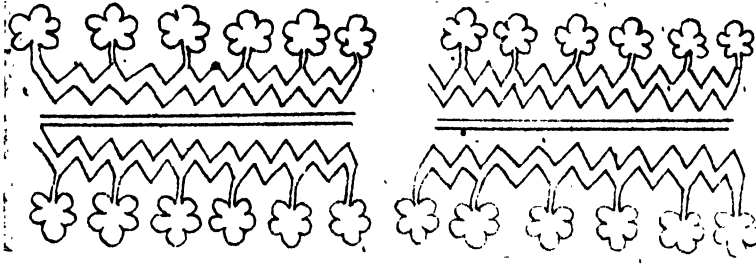
পিছন দিকে হাঁটুর পশ্চাৎ পর্য্যন্ত পড়ায় বৃষ্টির হাত হইতে সমস্ত শরীর রক্ষা হয়। ইহা পরিতেও বেশ মোলায়েম ও আরামপ্রদ, অনেকটা ওয়াটারপ্রুফের মত। ইহা পরিয়া অনায়াসে দুই হাতে কাজ কর্ম্ম করা যায়। 'ফুটচিরা' নামক এক প্রকার ঘাসের সাহায্যে ইহারা মাথায় পরিবার জন্য কয়েক প্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত করে। আর এক প্রকার ঘাসের দ্বারা ইহারা ঝাঁটা মাছ ধরিবার 'কুমনি' তৈয়ারী করে।

বাঁশের কাঠির দ্বারা গাঁথিয়া তাহারা শালপাতার থালা বাটি প্রভৃতি তৈয়ারী করে। খেজুর পাতা অথবা খড় ও পাতার সাহায্যে তাহারা জলের কলসী প্রভৃতি রাখিবার বা মাথায় করিয়া লইয়া যাইবার জন্য এক প্রকার বিঁড়া প্রস্তুত করে। ধান রাখিবার জন্য খড়ের মোটা দড়ির দ্বারা তাহারা মরাই প্রস্তুত করিয়া থাকে।
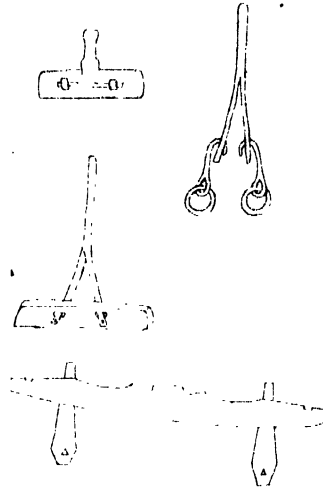
ওরাওঁদের জোয়াল, বিধে ইত্যাদি চাষের যন্ত্র।

কাঠের কাজ।

ওরাওঁরা নিজেদের যাবতীয় কাঠের কাজ নিজেরাই করিয়া থাকে। বাটালী বা 'রুখনা' ও 'বাসলা' নামক এক প্রকার কুঠারের সাহায্যে তাহারা নিজেরাই চাল কাঁড়িবার জন্য উখ্‌লি (চুক্কা ও মান), ঘানি গাছ (কুলহু)

কর্ষণযন্ত্রাদি।

ইহাদের লাঙ্গল পাঁচ ভাগে বিভক্ত। আমাদের দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই তাই। আসল হইতেছে আড়াই ফুট লম্বা মোটা ও ক্রমশঃ সূক্ষ্মাগ্র শালের একটি শক্ত গুঁড়ি—ইহাকে ওরাওঁরা 'হার' কহে। তাহার সরু মুখে প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা একটা লোহার ফলক (ফার) দেওয়া থাকে। 'হারে'র সহিত একটি মোটা দীর্ঘ কাঠ সংযুক্ত থাকে—ইহারই সহিত যোয়ালটি চর্ম্মরজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহার পঞ্চম অঙ্গটি হইতেছে 'হারে'র পশ্চাদ্দেশের বক্রাগ্র এক খণ্ড কাঠ (চাঁদলি)। ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার
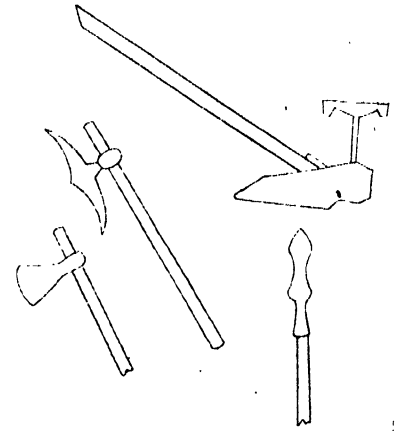
ওরাওঁদের লাঙ্গল, টাঙ্গী, কুড়ালি ও বর্শা।

সময় এই 'চাঁদলি'কে চাপিয়া ধরিয়া কৃষক গরু তাড়াইয়া লইয়া যায়।

ইহাদের মই বাংলার অন্যান্য স্থানের মইএরই মত। মইয়ের পাতাকে উহারা 'পাত্তা' ও সংযুক্ত কাঠকে 'ঠাঠা' বলে। ইহা ছাড়া উহারা জমি সমান করিবার

যন্ত্র (হাঙ্গা), জমি তৈয়ারী করিবার যন্ত্র (কারহা), মাটির ঢেলা ভাঙিবার যন্ত্র (ঢেল ফোরা), শাবল (শাবর), কাস্তে (হাঁসুয়া), কোদাল (কারি), কুড়াল (টাঙ্গা), ভারী জিনিসপত্র বহন করিবার জন্য ভার বা বাঁক (বাহিঙ্গা), ধান মাড়িবার পর ঐ বিশৃঙ্খল খড়গুলি একত্রিত করিবার জন্য লোহার বঁড়শী লাগান একটি লম্বা বাঁশ (আর্কাই), মালপত্রাদি বহন করিবার জন্য গরুর গাড়ী (শগড়) ব্যবহার করিয়া থাকে।
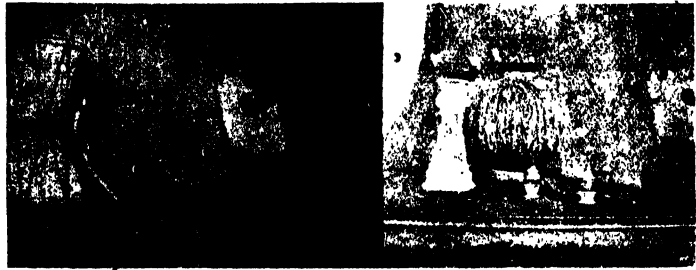
ওরাওঁদের মৃদঙ্গ বা ডমরু; গাছা প্রদীপ; কাসা-হাঁড়িয়া।

ইহাই ওরাওঁদের যাহা কিছু শিল্প-ও-কলা-সম্পদ্। যদিও উহাদের প্রস্তুত জিনিসপত্র, কারুকার্য্য শিল্প প্রভৃতি এমন কিছুই নয়, তথাপি ছোটনাগপুরের কোরোয়া, অসুর, বীরহোর প্রভৃতি অন্যান্য জাতির তুলনায় তাহারা সভ্যতার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে ইহা অসঙ্কোচে বলা যায়।

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

কৃষ্ণ ও গীতা

(সমালোচনা)

Krishna and the Gita পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত। ইহা গীতোক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা ও ঐতিহাসিক গবেষণা সম্বলিত দ্বাদশটি বক্তৃতা। মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত পিঠাপুরের দানশীল ধর্ম্মোৎসাহী রাজা সূর্য্যরাও মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হইয়াছে। এগুলি প্রথম বৎসরের বক্তৃতা। দ্বিতীয় বৎসরের বক্তৃতা চলিতেছে, তাহাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ যে অদম্য উৎসাহে হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান ও প্রচারব্রতে ব্রতী রহিয়াছেন তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। আমাদের দেশের শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে একটী বিশেষ কর্ত্তব্য রহিয়াছে, এবং সেই কর্ত্তব্য পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ বিশেষ ভাবে সাধন করিতেছেন। বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকের সাহায্যে আমাদের শাস্ত্রের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কিন্তু এই কার্য্যে যে পরিমাণ নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতা আবশ্যক তাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ গীতার ব্যাখ্যায় যে সাহস ও স্বাধীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা সর্ব্বাংশেই অবিচারে গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন; যদিও কার্য্যকালে তাঁহারাই ইহার অসম্ভবত্ব প্রতিপাদন করেন। আবার আর এক শ্রেণীর লোক ইহার মধ্যে কিছুই গ্রহিতব্য নাই বলিয়া মনে করেন। গ্রন্থকার ইহার মধ্য পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে যদিও জ্ঞানের আলোকে আমাদিগকে কিছু কিছু পরিত্যাগ করিতে হইতেছে, তাহা হইলেও উহার মূল সত্যগুলি দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। সুতরাং ক্ষতি অপেক্ষা লাভ হইয়াছে বেশী। পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক যে আমাদের শাস্ত্রের মূলতত্ত্বগুলিকে সমর্থন করিতেছে তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে সত্য গ্রহণের প্রণালী একই এবং ঐ একই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই সকলে সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। সুতরাং পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ যে বলিয়াছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রণালীদ্বয় বিভিন্ন, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না। আমাদের গীতা উপনিষদাদিতে সত্যটাই সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা যে প্রণালীতে ঐ সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা আমরা পাই নাই। কেননা তাহা শিষ্য গুরুর নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন, কাজেই উহা লিপিবদ্ধ হয় নাই। লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে এক দিকে কিছু সুবিধা হয় না তাহা নহে, কিন্তু অসুবিধাও কিছু আছে। যিনি সত্যটি আত্মসাৎ করিয়াছেন তাঁহার শ্রীমুখাৎ গ্রহণ করিলে আমিও উহা আত্মসাৎই করিব, কেবল মুখের কথা, জ্ঞানের বিষয় থাকিবে না—জীবনগত হইবে। গ্রন্থ পাঠ দ্বারা সকল তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে যাই বলিয়া আমাদের সকল কথাই স্মৃতিপ্রসূত ভাবপ্রসূত ("memorised ideas") হয়, প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট আত্মচেষ্টাজনিত নহে। * ধর্ম্মদর্শনের সমস্যা সত্যের জ্ঞান নহে বা নূতন সত্যের আবিষ্কারও নহে, কিন্তু জ্ঞাত তত্ত্বের আত্মসাৎ-করণ। সুতরাং প্রণালীটা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হওয়া অপেক্ষা গুরু দ্বারা শিষ্যে সংক্রামিত হইলে ফল ভাল হইবার সম্ভাবনা। আমি প্রণালী-বদ্ধ ভাবে লিখিত গ্রন্থের দোষ ধরিতেছি না, কিন্তু উহা দ্বারা আসল বিষয় হইতে প্রাকৃত জনের দৃষ্টি দূরে সরিয়া যাইবার যে আশঙ্কা আছে তাহারই সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত করিলাম। অনেক সময়ে দেখিয়া কষ্ট হয় যে বহু পাশ্চাত্য মনীষী সত্য দর্শন করিয়াও ধ্যান ধারণার অভাবে তাহাতে সম্যক্ প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। আমাদের দেশে হইলে যে স্থলে একজন মনস্বী ধর্ম্ম-সাধন-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক হইতেন, পাশ্চাত্য দেশে দেখি সেরূপ স্থলে তিনি এক খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াই শেষ করিলেন। বোধ হয় এইরূপ কোন কারণেই একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ধর্ম্ম দর্শন পাশ্চাত্য দেশে কিয়ৎ পরিমাণে উপেক্ষিত হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। †

* Our speech is made up of memorised ideas, based neither on perception nor on productive effort.—Froebel.

† "The theoretical student of Natural Religion has to learn that he cannot comprehend ultimate

গ্রন্থ দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার প্রথম তিন অধ্যায়ে কৃষ্ণ-চরিত্রের ঐতিহাসিকতা ও আদর্শত্ব আলোচিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-চরিত্রের অধিকাংশই যে কাল্পনিক তাহা চিন্তাজগতের নিতান্ত আতুর ভিন্ন আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ডাক্তার ভাণ্ডারকারের মতে বালকৃষ্ণ-চরিত্র বালক খৃষ্টের অনুকরণ মাত্র। বিশেষতঃ বৃন্দাবনলীলার অনৈতিহাসিকতার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ মহাভারতেও যথেষ্ট বর্ত্তমান রহিয়াছে। পৌরাণিক কৃষ্ণে যে বহুতত্ত্বের সমাবেশ আছে তাহা বলাই বাহুল্য। ঋগ্বেদের ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দী অনার্য্য রাজা কৃষ্ণ ও ছান্দোগ্যের আঙ্গিরস ঘোরের নিকট যোগশিক্ষার্থী দেবকীনন্দন তো আছেনই। তারপর আর কত নদী এই মহাসাগরে পতিত হইয়াছে কে বলিবে? কেহ কেহ বৃন্দাবন-লীলার অঙ্গীভূত কেশী, অরিষ্টক, চানুর, মুষ্টিক বধ ও কালীয়দমন প্রভৃতি রাশিচক্রের মেষ বৃষ মিথুন কর্কট ইত্যাদি রাশির উপমারূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। গোপীদিগের সঙ্গে ব্যবহারের মূলে সাধারণ ভাবে কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্বের গন্ধ অনেকে পাইয়াছেন। এমন সময় নাকি ছিল যখন কোনও পর্ব্ব উপলক্ষে পুরুষ রমণীর এইরূপ মিলামিশা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না। রাসলীলার জ্যোতিষিক ব্যাখ্যায় রাসচক্র সম্বৎসর, শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্য এবং গোপীরা দিনের উপমাস্থল। ইহাতে কৃষ্ণ কেন যে চক্র মধ্যে প্রতি গোপিকার সঙ্গেই অবস্থিত তাহার ব্যাখ্যা মেলে। মহাভারতে কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা পাণ্ডবদিগের সঙ্গে জড়িত। এই আর্য্য দেশে এক স্ত্রীর পাঁচস্বামী পাণ্ডবেরা যে নিতান্ত কল্পিত তাহা না বলিলেও চলে। সুতরাং পাণ্ডব-আখ্যায়িকা হইতে কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করা সুদূরপরাহত। বঙ্কিমচন্দ্র বাদ্‌সাদ্ দিয়া কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিকতা স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু লোম বাছিতে কম্বল উজাড় হইয়া গিয়াছে। যদিই বা ঐতিহাসিকতা স্বীকার করা যায়, আমরা কৃষ্ণের যে চরিত্র পাইতেছি তাহাকে কিছুতেই আদর্শ চরিত্র বলা যাইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র সেই জন্যই ঐতিহাসিক সমালোচনার ব্যপদেশে এক আদর্শ চরিত্র খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই, এইরূপ চেষ্টা সফল হইতেই পারে না। তিনি পূর্ব্বসংস্কারের দ্বারা এত অভিভূত ছিলেন যে যেখান হইতে আরম্ভ করা প্রয়োজন ছিল সেখান হইতে আরম্ভ করিতে সাহস পান নাই। কৃষ্ণচরিত্রে বাস্তবিকই কিছু ঐতিহাসিকতা আছে কি না এইখান হইতে বিচার আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। তাহা না করিয়া তিনি ঐতিহাসিকতা ধরিয়া লইয়াছেন। তারপর যখন যেমন ইচ্ছা বাদসাদ দিয়াছেন, সুতরাং কোন পক্ষকেই সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কৃষ্ণচরিত্র গঠিত হইয়াছিল। এই অনুমানের মূলে যে কিছু সত্য আছে তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টার দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা, খৃষ্টধর্ম্মের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য খৃষ্টের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তিনি এক আদর্শ বর্ত্তমান যুগোপযোগী মহাপুরুষ গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ভগবদ্‌গীতার কৃষ্ণ যে, কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন, কিন্তু দেশ-কালাতীত পরম পুরুষ এবং গভীর যোগের অবস্থায় প্রত্যেক মানুষ যাঁহার সঙ্গে একত্ব অনুভব করিয়া থাকেন তিনি, এ বিষয়ে অভিজ্ঞ মাত্রই গ্রন্থকারের সঙ্গে একমত হইবেন। কৃষ্ণ এখানে পরমাত্মার মুখপাত্র মাত্র। পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হইয়া এইরূপ উপদেশ করিবার প্রথা এবং এইরূপ অবতারবাদ—যাহাকে বৈদান্তিক অবতারবাদ বলা যায় তাহার মূল সূত্র কৌষিতকী প্রভৃতির ইন্দ্রপ্রর্দ্দন-সংবাদে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে আমরা এ কথা বলিতে বাধ্য যে গীতার মধ্যে পৌরাণিক অবতারবাদের দিকে একটা গতি সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। উপনিষদ যাহার ভিত্তি তাহার উপর পুরাণের এই প্রবল প্রভাব দেখিয়া মনে হয় গীতা রচনার কালে পুরাণ দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য গীতারচনাকাল খুব প্রাচীন হইতে পারিতেছে না। গীতার অবতারবাদের মূলসূত্র আমরা পুরুষসূক্তে প্রাপ্ত হই। যদি গীতার কৃষ্ণ ঐ পুরুষের পরিণতি, তবে পুরাণ ও উপনিষদ্ উভয়েই গীতাকারকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। গীতায় যে যজ্ঞের ব্যাখ্যা রহিয়াছে তাহা পুরুষযজ্ঞের সমশ্রেণীর। সুতরাং যেদিক দিয়াই বিচার করি না কেন ঐতিহাসিক কৃষ্ণকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতার সঙ্গে সাংখ্য, যোগ, ও বেদান্ত দর্শনের সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে গীতোক্ত জ্ঞান-যোগ পাশ্চাত্য জ্ঞানীগণ-প্রদর্শিত জ্ঞানমার্গের সঙ্গে তুলিত হইয়া পাশ্চাত্য প্রণালীর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে।¹ আমরা সকলকে এই অধ্যায় বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। কেননা, এ বিষয়ে সকলে গ্রন্থকারের সঙ্গে একমত হইবেন তাহা কেহ আশা করে না, কিন্তু গ্রন্থকার যে তাঁহার গভীর গবেষণার ফল আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন তাহা আমরা উপেক্ষাও করিতে পারি না। অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে গীতার ভক্তিতত্ত্ব বৈষ্ণবীয় ও খৃষ্টীয় ভক্তিতত্ত্বের সঙ্গে তুলিত হইয়াছে। ভক্তিধর্ম্মের মূল যে দ্বৈত-গর্ভ অদ্বৈততত্ত্ব তাহা গ্রন্থকার যেমন সুন্দর ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সচরাচর সাধারণ লেখকদিগের মধ্যে—প্রাচ্যই হউক আর পাশ্চাত্যই হউক—দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রন্থকার খৃষ্টের ঐতিহাসিকতা মানিয়া লইয়াছেন; তিনি কৃষ্ণ সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন খৃষ্ট সম্বন্ধেও সেইরূপ আলোচনা করিলে ভাল হইত। লগস-তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে "বিশ্বাসে পাইবে বস্তু" এই ন্যায়ের অনুসরণ করিয়াছেন, আমরা এরূপ গোঁজামিল তাঁহার কাছে আশা করি নাই। দশম বক্তৃতায় গীতোক্ত কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সম্বন্ধ ও প্রাচীনকালে তাহাদের মধ্যে যে সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছিল তাহার কথা বলা হইয়াছে। একাদশ ও দ্বাদশ বক্তৃতায় নৈতিক জীবনের আদর্শ ও কার্য্যগত জীবনের কর্ত্তব্য আলোচিত হইয়াছে। সাধারণতঃ লোকে যাহাকে গীতার বিশেষত্ব বলিয়া বিবেচনা করে সেই নিষ্কাম কর্ম্ম সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা একাদশ অধ্যায়ে আছে। গভীর দার্শনিক প্রণালীতে কর্ম্মসন্ন্যাস মতের ভিত্তিহীনতা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিরূপে সকল কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া মানুষ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে যুগধর্ম্মের এই বিশেষ মত অতি বিশদ ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের সম্বন্ধ নির্ণয় না করিয়া এই তত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। তাই পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ

---

philosophical truth merely by reading the reports of other people's reasonings, but must do his thinkings for himself, not indeed without due instruction, but certainly without depending wholly upon his textbooks. And if this be true, then the final issues of religious philosophy may be said to be relatively neglected, so long as students are not constantly afresh grappling with the ancient problems, and giving them renderings due to direct personal contact with their intricacies. It is not a question of any needed originality of opinion, but it is rather a matter of our individual intimacy with these issues."—P. 7. The World and the Individual by J. Royce.

সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন যে আত্মা কোন অবস্থাতেই কর্ম্মহীন বা নিষ্ক্রিয় নহে।

আমরা সকলকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি—বিশেষতঃ গীতাভক্তদিগকে। তাঁহারা ইহার মধ্যে এমন কিছু পাইবেন যাহা অন্যত্র পান নাই। একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি যে এই গ্রন্থ পাঠে যে সময় ব্যয়িত হইবে তাহা বৃথায় ব্যয়িত হইবে না।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

জমিদার ও কৃষকপ্রজা

বাখরগঞ্জ জিলায় যেবার দুর্ভিক্ষ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, সেবার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ক্লিষ্ট নরনারীদের অন্ন বিতরণ করিবার উদ্দেশ্যে দু একটি গ্রামে কিছুদিন বাস করিয়াছিলাম। এই দুঃসময়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামবাসীদের প্রতি স্থানীয় জমিদারী কাছারীর কর্ম্মচারীরা কিপ্রকার ব্যবহার করিত তাহা লক্ষ্য করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। আমাদের কাজে ইহারা অযাচিত সহায়তা না করিলেও কখন কখনও ইহাদের দ্বারস্থ না হইলে কার্য্যোদ্ধার সম্ভব হইত না। আদায়কারীরা বরকন্দাজ সঙ্গে গ্রামে যখন ভ্রমণে বাহির হইতেন, দেখিতাম কুটিরে কুটিরে উপবাসী প্রজা ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া আছে। কোনো কোনো কর্ম্মচারীকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতাম যে যে পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হ্রাস না হয় অন্ততঃ সেই সময় পর্য্যন্ত কি আদায়ের কাজ বন্ধ রাখা সঙ্গত নহে? তাহারা কেহ কোনো তর্ক না করিয়া বলিত "কি করি মশায়, নায়েবের হুকুম ত তামিল করতেই হবে।"

বর্ত্তমান সময়ে বাংলাদেশে জমিদারের সহিত প্রজার কি সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে কিছুকাল হইতে লক্ষ্য করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। প্রজাপীড়নের কি কি যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে জানি না; তবে এইটুকু স্বীকার করিতেই হইবে যে যেখানে দাতা-গৃহীতার সম্বন্ধ সেখানে স্বার্থের সংঘাত এত তীব্র যে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধকে সহজ করিয়া তোলা সম্ভব নহে। সহজ নয় বলিয়াই আমাদের পল্লীসমাজ-সংস্কারের সমস্যা এত জটিল হইয়া পড়িয়াছে, কেননা জমিদার ও প্রজা লইয়াই পল্লীসমাজ গঠিত।

আমাদের দেশের শিক্ষিত-সমাজ পল্লীসংস্কারের সমস্যা লইয়া যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াছেন তাহার কোনো নিদর্শন এতদিন দৃষ্ট হয় নাই। সম্প্রতি দুএকজন চিন্তাশীল সমাজ-নেতা এই বিষয় লইয়া আলোচনা তুলিয়াছেন বটে; কিন্তু অন্যান্য সভ্য দেশে যে একাগ্রতার সহিত এই সমস্যার মীমাংসার জন্য বহু নরনারী সমস্ত চেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া অল্পকালের মধ্যে পল্লীসমাজে নবজীবনের সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কই, বাঙ্গলাদেশের জমিদার ও সমাজ-নেতাদের মধ্যে ত তেমন উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে না। আসল কথা, আমাদের পল্লীসংস্কারের সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক জমিদারের সহিত প্রজার সম্বন্ধকে সহজ করিয়া তোলা এবং কার্য্যে জমিদারকেই স্বার্থের বন্ধন কিছু-পরিমাণ শিথিল করিতে হইবে। যে করিয়া হৌক্, প্রজার অন্তঃকরণকে জয় করিতেই হইবে—সে আজ জমিদারকে ভয় করে, জমিদার যে প্রজার হিতসাধন করিতে ইচ্ছুক এ যে তাহাকে কিছুতেই বোঝান যায় না, এখানে সম্বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে খাদ্য ও খাদকের—ইহা দূর না করিলে বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতিসাধন সম্ভব হইবে না!

আজকাল পল্লীগ্রামে নিজেদের জমিদারীতে জমিদার আর বাস করেন না। সেখানে ইহাঁদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত দুর্ব্বহ বলিয়া বোধ হয়। পল্লীগ্রামের উন্মুক্ত নির্ম্মল বাতাসে ইহাঁদের দম্ আট্‌কাইয়া আসে বলিয়া কলিকাতার ধূলি-আবর্ত্তে বায়ুরথে ভ্রমণের জন্য ইহাঁরা ব্যাকুল হন্। আমি মনে করি, পল্লীগ্রামগুলি যে ক্রমশঃই শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে তাহার কারণ এই যে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা আর পল্লীসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রাখেন না। জমিদার তাঁহার নায়েবের হস্তে প্রজাদের সুখদুঃখের ভার অর্পণ করিয়া রাজধানীতে অট্টালিকায় বসিয়া প্রজার হিত করিবেন ইহা সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। ইহার ফল এই হয় যে, একদিকে পল্লীগ্রামগুলি কাণ্ডারীহীন হইয়া পড়ে, অপর দিকে নায়েবের একাধিপত্য রাজত্বে প্রজাদের বাস করিতে হয় বলিয়া প্রজার দুঃখের আর সীমা থাকে না।

গ্রামে রাস্তাঘাট, জলাশয়, গোচারণের ভূমি, ইত্যাদি অত্যন্ত আবশ্যকীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছে। রাস্তাঘাট. অভাবে গ্রামবাসীদের বর্ষাকালে চলা-ফেরার কি অসুবিধা হয়, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে ধারণা করা যায় না। পানীয় জলাভাবে গ্রীষ্মকালে কোনো কোনো গ্রামে খানা-ডোবা-খালের জল পান করা ব্যতীত আর উপায় থাকে না এবং ইহার ফলে নানা ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া গ্রামবাসীদের মৃত্যু-মুখে লইয়া যায়। গরু চরাইবার কোনো মাঠ নাই বলিয়া বর্ষাকালে এই নিরীহ জীব-গুলিকে কি কষ্ট ভোগ করিতে হয় তাহা দেখিলে মানুষের প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠে। দেশের জমিদারবর্গ যদি পল্লীগ্রামের সহিত নিকট যোগ রক্ষা করিতেন এবং স্বচক্ষে গ্রামবাসীদের এই প্রকার দুরবস্থা দেখিতেন তাহা হইলে অনেকগুলি সংস্কারকার্য্য আরম্ভ হইতে পারিত এবং আমাদের পল্লী-সংস্কার অপর দেশের তুলনায় এত পিছাইয়া পড়িত না। অতএব পল্লী-সংস্কারের প্রথম উপায় ধনী-জমিদারগণের স্ব স্ব জমিদারীতে অন্তত বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস গ্রামবাসীগণের পাশাপাশি বাস। ইহা দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে জানিতে পারে এবং প্রজার সহিত আন্তরিক একটা সম্বন্ধ স্থাপন হইতে পারে।

জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে জমিজমা-সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ বিশেষরূপে লিখিত থাকে বটে কিন্তু প্রজার সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না! কিছুদিন পূর্ব্বে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত এক প্রবন্ধে কৃষি ও শ্রমজীবীগণের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইবার জন্য এক মুদ্রিত বিবরণলিপির নমুনা দেখিয়াছিলাম। আমি যে বিবরণলিপি * ব্যবহার করিতাম তাহার সহিত উক্ত বিবরণের যথেষ্ট ঐক্য আছে। মোট কথা প্রজার আর্থিক, সামাজিক, দৈহিক, সর্ব্ব প্রকার অবস্থা লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। শিক্ষিত জমিদারকে নিজে এই বিষয়ে উদ্যোগী হইতে হইবে; কোনো আমলা বা নায়েব দ্বারা ইহা সম্ভব হইবে না।

* প্রবন্ধের আয়তন দীর্ঘ হইবে বলিয়া আমি কোনো নিদর্শন-লিপি দিলাম না।

আমাদের দেশে কৃষিজীবীগণ অন্য দেশ অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করে, কিন্তু স্বল্প পারিশ্রমিক তাহার অদৃষ্টে জোটে। এইরূপ হইবার কি কারণ তাহা বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কৃষিজীবীগণ সুখ. স্বাস্থ্য, ও সম্পদ ভোগ করে; আর এই সুজলা সুফলা বঙ্গদেশের চাষীর অন্ন জোটে না! যে অল্প পরিমাণ অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারও কিছু পরিমাণ জমিদারকে, কতক মহাজনকে দিয়া যেটুকু বাকি থাকে তাহা দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হয়।

কৃষিজীবীদের উন্নতিসাধনের নিমিত্ত য়ুরোপ ও আমেরিকাতে যে বিপুল আয়োজন চলিতেছে, তাহার বর্ণনা আমাদের ধনী জমিদারগণের পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। আয়ার্ল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে কি আশ্চর্য্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইহাদের পল্লীগ্রামগুলি সুখ-স্বচ্ছন্দতা ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। জমিদারপ্রধান ইংলণ্ডেও আজ কৃষি-উন্নতির সাড়া পড়িয়াছে; তাহাদের পরিত্যক্ত গ্রাম-গুলি আবার কৃষিজীবীদের কুটীরে শোভিত হইতেছে। কারখানার কারাগার হইতে শ্রমজীবীগণ বাহির হইয়া কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। ইংলণ্ডের সমাজসংস্কারকগণ এই পরিবর্ত্তনে উৎফুল্ল হইয়াছেন। আমাদের দেশও জমিদার-প্রধান। আমরাও কি পরিবর্ত্তন-স্রোত আনিতে সমর্থ হইব না?

যেখানেই কৃষির উন্নতির চেষ্টা হইয়াছে, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে জমিদার সংক্রান্ত আইনকানুনেরও কিছু কিছু পরি-বর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। ইহা অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দেশে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক যে আইন আছে তাহা পরিবর্ত্তিত না হইলে কৃষির উন্নতির ভিত্তি পাকা হইবে না। যে পর্য্যন্ত না আমাদের দেশে Fixity of Tenure (অর্থাৎ কৃষককে জমিদার ইচ্ছামত তাহার ভিটা হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবে না) Fixity of Rent (অর্থাৎ কৃষকের দেয় খাজনা ইচ্ছামত বৃদ্ধি করিতে পারিবে না) এবং Free Right of sale (অর্থাৎ কৃষক বিনা আপত্তিতে জমি হস্তান্তর করিতে পারিবে) জমিদার-প্রজা-আইনের অন্তর্গত না হইবে ততদিন কৃষির উন্নতি বা কৃষিজীবীর

অবস্থা সচ্ছল হইবার সম্ভাবনা নাই। শুনিতে পাই গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে ভাবিতেছেন।

প্রজাস্বত্ব মৌরসী হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশের কোনো কোনো জমিদার প্রজাকে ঐ স্বত্ব দিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহা দ্বারা উভয়েরই মঙ্গল হইবে, কেননা প্রজার উন্নতিতেই জমিদারের প্রকৃত উন্নতি।

বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকের মাথা ঋণদায়ে বংশপরম্পরাক্রমে মহাজনের নিকট বিক্রীত হইয়া আছে বলিয়া কৃষিজীবীগণ তাহাদের উপার্জ্জিত আয় হইতে কিছু বাঁচাইতে পারে না। গ্রামে গ্রামে মহাজনেরা কি অমানুষিক অত্যাচার করে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। নিরুপায় কৃষিজীবী কখনও জমিদারকে খাজনা দিবার জন্য, হয় ত বা হালের গরু খরিদের জন্য, কিংবা কেহ বীজ খরিদের জন্য মহাজনের দ্বারস্থ হয়। মহাজন পরম বন্ধুর ন্যায় তাহার বাড়ীতে যাইয়া টাকা দিয়া আসে এবং একখানি খত সহি করাইয়া লয়। সুদের হার মাসিক টাকায় এক আনা করিয়া লওয়া হয়, অবশ্য কখনও ইহার বেশী কখনও কিছু কমও লওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু আসলে সুদের হারের উপর কিছু আসে যায় না, কেননা মহাজনেরা সাধারণতঃ সুদের অঙ্ক কষিবার প্রণালী এমন জটিল করিয়া রাখে যে মূর্খ প্রজার পক্ষে ইহার মধ্যে দন্তস্ফুট করিবার সাধ্য কি? সমস্ত দেনা শোধ করিয়াও ইহাদের হাত হইতে এড়াইবার যো নাই। খতের টাকা শোধ করিয়া খত ফেরৎ পায় নাই, টাকা দিয়া রসিদ পায় নাই, প্রতিদিনই প্রজার কাছে এরূপ অভিযোগ শুনা যায়।

ইহার প্রতিকারও জমিদারের হাতে। সম্প্রতি সরকার পক্ষ হইতে যৌথ ঋণদান সমিতি গ্রামে গ্রামে শাখা স্থাপন করিয়া কৃষিজীবীদের অল্প সুদে ঋণ পাইবার সুযোগ করিয়া দিতেছেন বটে, কিন্তু এই সমিতির উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ ভাবে সফলতা লাভ করিতে হইলে, জমিদারগণের সহায়তা আবশ্যক। আশা করি বাংলাদেশের জমিদারগণ এই সমিতির কার্য্যের প্রসারে সহায় হইবেন এবং যদি সমিতির প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাঁহাদের নিজেদের "দাদনা কারবারের" কিছু লোকসানও হয়, তবু দেশের হিতকল্পে সেটুকু ক্ষতি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

কৃষির উন্নতির জন্য যে যে ব্যবস্থা করা আবশ্যক অর্থাৎ ভাল বীজ, সার, চাষ করিবার উপযুক্ত যন্ত্রাদি, ইত্যাদি যাহা না হইলে কৃষির উন্নতির সূত্রপাত সম্ভব নহে, জমিদারের এই-সকল বিষয়ে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। কৃষিশাস্ত্রজ্ঞ কাহারো পরামর্শ লইয়া তদনুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আমেরিকান্ গবর্ণমেণ্ট কৃষিজীবীদের সাহায্যের জন্য যে বিরাট আয়োজন করিয়াছেন, আমাদের গবর্ণমেণ্ট তদ্রূপ কোনো ব্যবস্থা করেন নাই, কিন্তু আমাদের দেশের ভূস্বামীগণ কি এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে পারেন না? বিধাতার কোন্ অভিশাপে আমরা এমন অলস, আদুরে ছেলে হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি যে আমাদের অন্ন, জল, ঔষধ, পথ্য, ঘর-বাড়ীর সরঞ্জাম, সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে এক কর্ম্মিষ্ঠ জাতি আসিয়া সংগ্রহ করিয়া দিবে? বিদেশী গবর্ণমেণ্ট এ দেশের কল্যাণের আয়োজনের সূত্রপাত করিয়াছে। পোষ্যপুত্রের নিকট হইতে জননী যা কিছু পাইতেছেন তাহাই যথেষ্ট, কিন্তু তাঁহার নিজের সন্তানেরা কি কিছু দিতে পারিবে না? যখনই তিনি তাঁহার নিজের কোলের সন্তানের নিকট হইতে কোনো অর্ঘ্য পাইয়াছেন তাঁহার মুখে হাসি ধরে নাই। আমরা কি ভারতমাতার সেই হাস্য দেখিব না?

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পতিত জমি উদ্ধারের জন্য সেখানকার গবর্ণমেণ্ট কি বিপুল আয়োজন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। যুক্তরাজ্যে কৃষি বিভাগের অন্তর্গত একটি সমিতি হইয়াছে তাঁহার নাম Land Reclamation Service of the States. ইহাদের কাজ অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে ধনধান্যে-পুষ্পে শোভিত করা। যে-সকল কৃষিজীবী অর্থাভাবে কৃষিকর্ম্ম চালনা করিতে অক্ষম, তাহারা এই বিভাগের অধ্যক্ষকে সংবাদ পাঠাইলে সরকার হইতে একজন তদন্তকারী তাহার নিকট প্রেরিত হয়। তিনি তাহার জমিজমা ঘরবাড়ী ও ফসলাদির অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া লিখিয়া বিভাগীয় অধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করেন; মাটি বিশ্লেষণ করিবার জন্য সরকারী রসায়নাগারে প্রেরিত হয়। কৃষিবিভাগ হইতে যাহাদের এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহারা প্রত্যেকেই কৃষিবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। অতএব ইহারা

কৃষককে ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া বিহিত প্রণালী অবলম্বনে কৃষিকার্য্যের পরিচালনায় বিশেষ সহায়তা করিতে পারে। কৃষিবিভাগ হইতেও কৃষককে সাহায্য করা হয়। তাহার জমিতে কি ফসল দেওয়া কর্ত্তব্য, কি সার-প্রয়োগে তাহার জমির উর্ব্বরশক্তি বৃদ্ধি পাইবে, এবং ফসলকে পোকা ও জীবাণুর আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে ইত্যাদি, যাবতীয় সংবাদ তাহাকে জানান হয়। কৃষিবিভাগনির্দ্দিষ্ট উপায়ে সে কাজ করিতেছে কিনা তাহা তদন্ত করিবার জন্য মাঝে মাঝে বিভাগীয় কর্ম্মচারী পাঠান হয়। এমন করিয়া যে দেশের কৃষিজীবীকে সাহায্য করা হয়, সে দেশের কৃষকগণ ধনী হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অল্পকালের মধ্যেই সে কৃষিক্ষেত্রকে শস্যশালী করিয়া তাহার আয় বৃদ্ধি করিতে পারে এবং কৃষিবিভাগ তাহার নিমিত্ত যে ব্যয় করিয়াছেন তাহা শোধ করিয়া দিতে সমর্থ হয়। *

বাংলাদেশের সমৃদ্ধিশালী জমিদারগণ কৃষির উন্নতিকল্পে স্ব স্ব জমিদারীতে কৃষিবিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়া কৃষিজীবীদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিলে আমাদের দেশেও কৃষির উন্নতি সম্ভব হইতে পারে। বেপারীগণ কৃষিজীবীদের নিকট হইতে নানা কৌশলে অল্পমূল্যে ফসল খরিদ করে; যে ক্ষেত্রে মহাজনই বেপারী সে ক্ষেত্রের ত কথাই নাই। কৃষিবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে উক্ত বিভাগ ফসল বিক্রয়েরও সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন। যৌথ-ক্রয়বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হইলে বীজ, সার, হাল, গরু খরিদ ও শস্য বিক্রয় উভয়েরই বিহিত বিধান হইতে পারে। আয়ার্ল্যাণ্ডের জমিদারবর্গ এ দিকে মনোযোগী হইয়াছেন বলিয়া আয়ার্ল্যাণ্ডের সৌভাগ্য ফিরিয়া আসিয়াছে। বঙ্গদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধনী ভূস্বামীবর্গের কি এই দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে? শুনিয়াছি কোনো কোনো জমিদার কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া শস্যাদি উৎপন্ন করিতেছেন, কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি ইহা সৌখিন ধরণের বাগান বা কৃষিক্ষেত্র স্থাপন দ্বারা সম্পন্ন হইবে না। একবার নিজেদের ভোগবাসনা খর্ব্ব করিয়া বহুকালের সঞ্চিত স্বার্থের পুঁটলীর বাঁধন শিথিল করিতে হইবে; পল্লীগ্রামের যে-সকল সমস্যা, পল্লীসমাজের উন্নতিকল্পে যাহা আবশ্যক, ইহাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতার আয়োজনে যাহা করণীয়, বাংলাদেশের ভূস্বামীগণকেই তাহা করিতে হইবে। ইহাঁদের স্মরণ রাখিতে হইবে বাংলাদেশে প্রায় সাতলক্ষ গ্রাম আছে এবং এই গ্রামবাসীগণের সুখ-দুঃখের জন্য বাংলাদেশের ভূস্বামীগণ দায়ী। এই বিপুল প্রজাপুঞ্জের উপার্জ্জিত অর্থের অংশলাভ করিয়াই ভূস্বামী ধনসম্পদের কোল লাভ করিয়াছেন; ইহাদের মুখের অন্নেই ভূস্বামীগণ বিলাসে প্রতিপালিত।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

* কৃষিবিভাগ অক্ষম কৃষকের জন্য যে অর্থ ব্যয় করেন তাহার সুদের হার বেশী নহে। এই ঋণ পরিশোধের জন্য তাহার ব্যাঙ্ক কিংবা যৌথ-ঋণদান সমিতির শরণাগত না হইলেও চলে, কেননা বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিক্ষেত্র পরিচালনার ফলে শস্যের পরিমাণও বৃদ্ধি হয়, এবং সরকারী বিভাগের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কৃষক বাহুল্য ব্যয় করিতে পারে না। এই ভাবে একদিকে যেমন কৃষকের ঋণভার মুক্ত হইতে থাকে, আবার বিভাগীয় তত্ত্বাবধানে কৃষিক্ষেত্র উন্নতি লাভ করে এবং কৃষক তাহার ত্রুটী বুঝিয়া ভবিষ্যতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারে।

ধর্ম্মপাল

[বরেন্দ্রমণ্ডলের মহারাজ গোপালদেব ও তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক ভগ্নমন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে দস্যুলুণ্ঠিত এক গ্রামের ভীষণ দৃশ্য দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন দুর্গে লইয়া যান। সন্ন্যাসীর নিকট সংবাদ আসিল যে গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্যে আসিতেছেন; অথচ দুর্গে সৈন্যবল নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার এক অনুচরকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধর্ম্মপালদেব দুর্গরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্গ শীঘ্রই শত্রুর হস্তগত হইল। তখন দুর্গস্বামিনীর কন্যা কল্যাণীদেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পিঠে বাঁধিয়া ধর্ম্মপাল দেব দুর্গ হইতে লম্ফ দিয়া পলায়ন করিলেন। ঠিক সেই সময় উদ্ধারণপুরের দুর্গস্বামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ ঘোষকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। তখন সন্ন্যাসী তাঁহার শিষ্য অমৃতানন্দকে যুবরাজ ও কল্যাণী দেবীর সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। এদিকে গৌড়ে সংবাদ পৌছিল যে মহারাজ ও যুবরাজ নৌকাডুবির পর সপ্তগ্রামে পৌঁছিয়াছেন। গৌড় হইতে মহারাজকে খুঁজিবার জন্য দুই দল সৈন্য প্রেরিত হইল। পথে ধর্ম্মপাল কল্যাণী দেবীকে লইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

সন্ন্যাসীর বিচারে নারায়ণ ঘোষের মৃত্যুদণ্ড হইল। এবং গোপালদেব ধর্ম্মপাল ও কল্যাণী দেবীকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত

হাতেখড়ি
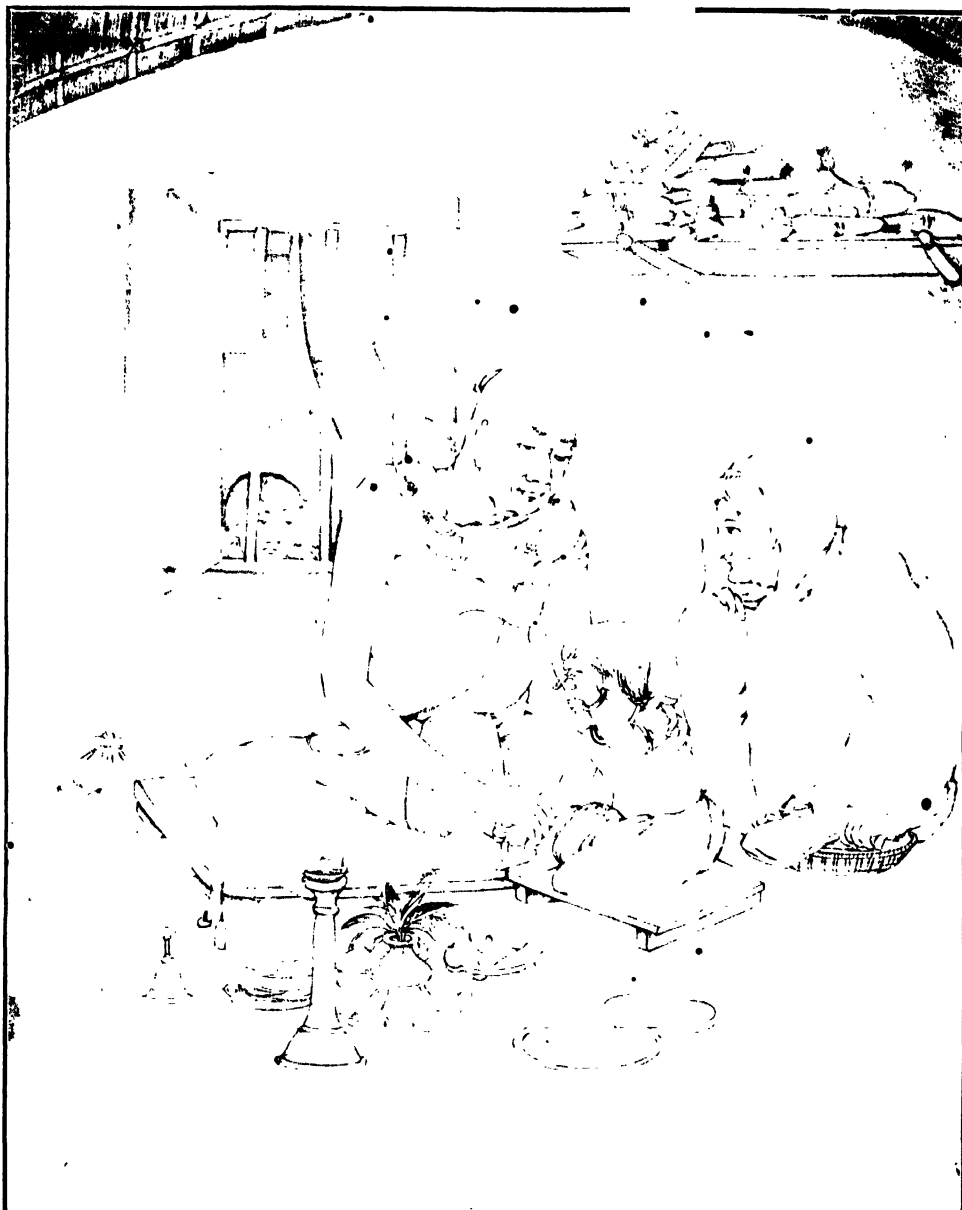
যুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক অঙ্কিত ও শিল্পীর অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত।

U. RAY & SONS,
100, Garpar Road, Calcutta.

হইলেন। কল্যাণীর মাতা কল্যাণীকে বধূরূপে গ্রহণ করিবার জন্য মহারাজ গোপালদেবকে অনুরোধ করিলেন। গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করার উৎসবের দিন মহারাজের সভায় সপ্ত রাজা উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীর পরামর্শক্রমে তাঁহাকে মহারাজাধিরাজ সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মণিদত্তের গুপ্তগৃহ।

রাত্রিশেষে ধর্ম্মপাল অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিষেকের উৎসবে সমস্তদিন এবং রজনীর অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়াছিল, যুবরাজ পরিশ্রান্ত হইয়া অন্তঃপুরে শয়ন করিতে যান নাই, সভামণ্ডপের অলিন্দে শয্যা রচনা করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চারিদিকে পরিচারক, প্রতীহার, দণ্ডধর প্রভৃতি রাজসেবকগণ ভূমিশয্যায় ঘুমাইতেছিল। রাজপুরী নীরব নিস্তব্ধ সুষুপ্তিমগ্ন, প্রাসাদের অধিকাংশ আলোক নিবিয়া গিয়াছে। অন্ধকারে সভামণ্ডপ পার হইয়া একজন দীর্ঘাকার পুরুষ তাঁহার খট্বার নিকটে আসিল এবং তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া ডাকিল, ধর্ম্মপাল তখন গভীর নিদ্রামগ্ন, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। দীর্ঘাকার পুরুষ তখন তাঁহার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিল, যুবরাজ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?"

অস্ফুটস্বরে উত্তর হইল "ধর্ম্ম, আমি।" যুবরাজ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ক্ষীণ দীপালোকে দেখিতে পাইলেন, বিশ্বানন্দ দাঁড়াইয়া আছেন। ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, এত রাত্রিতে ডাকিতেছেন কেন? কোন বিপদ হইয়াছে কি?" সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন "ভয় নাই ধর্ম্ম, সমস্ত মঙ্গল। তোমাকে এখনই আমার সহিত নগরের বাহিরে যাইতে হইবে। তুমি নিঃশব্দে বাহির হইয়া আইস।" উভয়ে নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া সুষুপ্তিমগ্ন গৌড়ের অন্ধকার রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অন্ধকারে প্রধান রাজপথ অতিক্রম করিয়া উভয়ে ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বানন্দ ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া বংশীধ্বনি করিলেন, তাহা শুনিবামাত্র নদীতীর-স্থিত আম্রবৃক্ষের অন্তরাল হইতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বাহির হইয়া ঘাটে আসিয়া লাগিল, সন্ন্যাসী ধর্ম্মপালকে তাহাতে আরোহণ করিতে কহিলেন। যুবরাজ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, কোথায় যাইতে হইবে?" সন্ন্যাসী কহিলেন "বলিয়াছি ত নগরের বাহিরে যাইতে হইবে।"

ধর্ম্ম।— প্রভাতের অধিক বিলম্ব নাই, পিতা যদি অনুসন্ধান করেন?

সন্ন্যাসী।— আমরা রাজসভা বসিবার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিব।

ধর্ম্ম।— মাতাকে সংবাদ পাঠাইলে হইত না?

সন্ন্যাসী।— ধর্ম্ম, তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস করিতেছ?

ধর্ম্ম।— না।

সন্ন্যাসী।— তবে নৌকায় আইস।

যুবরাজ ও সন্ন্যাসী নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকা চলিতে লাগিল। গৌড় নগরের শত শত ঘাট অতিক্রম করিয়া একটি জীর্ণ পুরাতন ঘাটে গিয়া লাগিল। সন্ন্যাসী নাবিকগণকে ঘাটে থাকিতে আদেশ করিয়া ধর্ম্মপালের হস্ত ধারণ করিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং সোপানশ্রেণী বহিয়া উপরে উঠিয়া একটি জীর্ণ অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অট্টালিকাটি অন্ধকার ও জনমানবশূন্য, কোন কক্ষের দ্বারে বা বাতায়নে কবাট নাই। অট্টালিকাটি বোধ হয় সন্ন্যাসীর পরিচিত, কারণ তিনি ধর্ম্মপালের হস্তধারণ করিয়া বহু-কক্ষ ও অলিন্দ অতিক্রম করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া সন্ন্যাসীর গতিরোধ হইল, ধর্ম্মপাল স্পর্শে অনুভব করিলেন যে সম্মুখে প্রাচীর। উভয়ে পথ আবিষ্কার করিবার জন্য বহু অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু পথ মিলিল না। তাঁহাদিগের বোধ হইল যে কক্ষের চারিদিকেই প্রাচীর, তাঁহারা যে পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন সে পথও খুঁজিয়া পাইলেন না।

সন্ন্যাসী বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহাদিগের পশ্চাতে কে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহা শুনিয়া ধর্ম্মপাল শিহরিয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসী তীব্রস্বরে

জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?" অন্ধকারে আবার কে হাস্য করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?" অন্ধকারে উত্তর হইল "আমি।"

"কে তুমি।"

"আমি।"

"তোমার নাম কি?"

"আমার নাম আমি, তুই কে?"

"আমি চক্ররাজ বিশ্বানন্দ।"

"কাহাকে সঙ্গে আনিয়াছিস্?"

"মণিদত্তের উত্তরাধিকারীকে।"

"কে সে?"

"যুবরাজ ভট্টারক ধর্ম্মপাল দেব।"

"সাক্ষী কে?"

"আমি—চক্ররাজ বিশ্বানন্দ।"

অকস্মাৎ কক্ষের অন্ধকার দূর হইল। তীব্র নীল আলোকে কক্ষ আলোকিত হইল, সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মপাল দেখিলেন যে বিশাল কক্ষের এক কোণে তাঁহারা দাঁড়াইয়া আছেন। কক্ষের অপর প্রান্তে দেবপ্রতিমার সম্মুখে এক জরাজীর্ণ শীর্ণ কুব্জপৃষ্ঠ দাঁড়াইয়া আছে। প্রতিমার পশ্চাৎ হইতে উজ্জ্বল নীল আলোক বাহির হইয়া কক্ষটিকে দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। বৃদ্ধ তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং কহিল "ভয় নাই, এই দিকে আয়।" উভয়ে অগ্রসর হইয়া প্রতিমার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ কহিল "প্রণাম কর।" উভয়ে প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধ তখন যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই মণিদত্তের কে?" ধর্ম্মপালদেব কহিলেন "কেহই না।"

"তবে তাহার ধনরত্ন লইতে আসিয়াছিস্ কেন?"

"সে মরিবার সময়ে আমাকে দিয়া গিয়াছে।"

"কেন দিয়াছিল?"

"তাহা জানি না।"

"তুমি তাহার কোন উপকার করিয়াছিলে?"

"কিছুই না।"

"মিথ্যা কথা।"

অকস্মাৎ আলোক নিবিয়া গেল, অন্ধকারে পুনরায় শব্দ হইল "মিথ্যা কথা।" সন্ন্যাসী অন্ধকারে বলিয়া উঠিলেন "ধর্ম্ম, তুমি কি মৃত্যুকালে মণিদত্তের মুখে জল দিয়াছিলে?" যুবরাজ কহিলেন "হাঁ, সে কথা স্মরণ ছিল না।" অন্ধকারে শব্দ হইল "তবে?" যুবরাজ কহিলেন "আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম।" পুনরায় নীল আলোক জ্বলিয়া উঠিল, উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন বৃদ্ধ সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া আছে। তাহার আহ্বানে উভয়ে দেবপ্রতিমার পশ্চাতে গমন করিলেন। বৃদ্ধ দেবপ্রতিমা সম্মুখে ঠেলিয়া দিল, ধর্ম্মপাল ও বিশ্বানন্দ দেখিলেন যে কক্ষতলের একখানি প্রস্তর স্থানচ্যুত হইয়া সরিয়া গিয়াছে ও সোপানশ্রেণী নিম্নাভিমুখে নামিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ নিম্নে নামিয়া গেল এবং তাঁহাদিগকে পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। ধর্ম্মপাল সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিলেন। সন্ন্যাসী ইঙ্গিতে তাঁহাকে আসিতে বলিয়া স্বয়ং অবতরণ করিলেন। উভয়ে সোপান অবলম্বন করিয়া অবতরণ করিবামাত্র প্রস্তরখণ্ড নিঃশব্দে স্বস্থানে সরিয়া আসিল।

তাঁহারা দেখিলেন যে তাঁহারা যে স্থানে আসিয়াছেন তাহা পাষাণনির্ম্মিত একটি নাতিক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, সোপান-শ্রেণী ব্যতীত তাহাতে প্রবেশ করিবার আর কোন পথ নাই। কক্ষের পার্শ্বে বোধ হয় জলপ্রবাহ আছে, কারণ কক্ষের প্রাচীরের সন্ধিস্থল দিয়া জল প্রবেশ করিতেছে ও কক্ষ হইতে স্রোতের কলকল শব্দ শুনা যাইতেছে। উপরের কক্ষের ন্যায় প্রকোষ্ঠটিও তীব্র নীল আলোকে উজ্জ্বল, বৃদ্ধ প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছে।

বৃদ্ধ ধর্ম্মপালদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিল "ইহাই মণিদত্তের ভাণ্ডার।" যুবরাজ ও বিশ্বানন্দ প্রকোষ্ঠের চারিদিকে চাহিলেন কিন্তু ধনরত্নের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। বৃদ্ধ তাঁহাদিগের অবস্থা বুঝিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল "কি ভাবিতেছ! ভাবিতেছ, মণিদত্ত মিথ্যা কথা কহিয়াছে? এখানে এত ধনরত্ন আছে যে তাহাতে রাজার রাজত্ব ক্রয় করা যায়।" সন্ন্যাসী বিস্মিত হইয়া কহিলেন "আমরা ত কিছু দেখিতে পাইতেছি না?" বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিল এবং কহিল "মণিদত্ত বণিক,

সে তাহার বহুপুরুষের সঞ্চিত ধন লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া গিয়াছে। তোমরা দেখিতে পাইবে কি করিয়া?" যুবরাজ বিরক্ত হইয়া কহিলেন "তবে আমাদিগকে এখানে আনিলে কেন?" বৃদ্ধ কহিল "দেখাইব বলিয়া।"

বৃদ্ধ প্রকোষ্ঠের প্রাচীরের নিকট গিয়া একখানি প্রস্তরে আঘাত করিল, প্রাচীরে লুক্কায়িত একটি লৌহ নির্ম্মিত দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মপাল দেখিলেন যে দ্বারের পশ্চাতে একটি পুরাতন লৌহ পেটিকা রহিয়াছে। বৃদ্ধ অনায়াসে তাহার আবরণ উঠাইল, সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মপাল তাহার নিকটে গিয়া দেখিলেন যে তাহা স্বর্ণ মুদ্রায় পরিপূর্ণ। বৃদ্ধ প্রাচীরের আরও তিন চারি স্থান হইতে গুপ্তদ্বার মুক্ত করিয়া তিন চারিটি বৃহৎ লৌহাধার দেখাইল, কোনটিতে স্বর্ণ, কোনটিতে হীরক, কোনটিতে বা নানাবর্ণের মণিমুক্তা মরকত পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিশ্বানন্দ ও ধর্ম্মপাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, বৃদ্ধ সেই অবসরে গুপ্তদ্বারগুলি বন্ধ করিয়া দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ধর্ম্মপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "এত ধনরত্ন এখন লইয়া যাইব কি করিয়া?" বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল "কোথায় লইয়া যাইবে?"

"কেন গৃহে?"

"এখন ত পাইবে না।"

"কেন, মণিদত্ত ত আমাকে দিয়া গিয়াছে?"

"তুমি এখনও ইহার যোগ্য হও নাই।"

"কি করিলে যোগ্য হইব?"

"যখন লোকহিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে, তখন ইহার অধিকার পাইবে।"

"কেমন করিয়া বুঝিব?"

"আপনিই বুঝিতে পারিবে, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।"

যুবরাজ সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "আমরা যদি বলপূর্ব্বক মণিদত্তের ভাণ্ডার হইতে ধনরত্ন লইয়া যাই তাহা হইলে এই বৃদ্ধ আমাদিগের কি করিতে পারে?" সন্ন্যাসী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ কহিল "সাবধান যুবরাজ, বলপ্রকাশ করিলে জীবন্ত সূর্য্যালোকে ফিরিবে না।" অকস্মাৎ আলোক নির্ব্বাপিত হইল। অন্ধকারে বিশ্বানন্দ ধর্ম্মপালের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন "ধর্ম্ম, চপলতা পরিত্যাগ কর, ইহা অতি ভীষণ স্থান, বৃদ্ধের সাহায্য ব্যতীত দিবালোকে ফিরিবার ভরসা নাই।" তখন ধর্ম্মপালদেব অতি বিনীতভাবে কহিলেন "আমরা বল প্রকাশ করিব না।"

আবার আলোক জ্বলিয়া উঠিল। উভয়ে দেখিলেন বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া আছে। সে কহিল "এখন ফিরিয়া চল। ফিরিয়া গিয়া বলপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলে এই গুপ্ত গৃহ খুঁজিয়া পাইবে না।" বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উভয়ে উপরে উঠিলেন। সে প্রতিমা স্বস্থানে পুনস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে কহিল। তাঁহারা দেখিলেন যে-কোণে তাঁহারা দ্বার খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, সেই কোণেই দ্বার রহিয়াছে। উভয়ে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, একবার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন, তরুণ উষার ক্ষীণ আলোকে দেখিতে পাইলেন যে তাঁহাদিগের পশ্চাতে দ্বারের চিহ্নমাত্রও নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়ভিখারী।

বারাণসীতে বরুণাসঙ্গমে আদি-কেশবের ঘাটে বসিয়া এক ব্রাহ্মণ স্নানান্তে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিল। তখন দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে, তপনতাপে ঘাটের উপরের পাষাণ-আচ্ছাদন উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আদি-কেশবের মন্দিরে অনবরত ঘণ্টানিনাদ হইতেছে, শত শত যাত্রী পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পঙ্কিল সলিলে অবগাহন করিয়া দেবদর্শন-মানসে মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে। ব্রাহ্মণের পশ্চাতে ঈষৎ দূরে একজন দণ্ডধর দাঁড়াইয়া আছে, সে যাত্রীগণকে সতত সাবধান করিয়া দিতেছে। তাহার পার্শ্বে রজতদণ্ড-বিশিষ্ট ছত্র লইয়া একজন পরিচারক দাঁড়াইয়া আছে। ঘাটের উপরে অশ্বত্থবৃক্ষতলে প্রস্তরনির্ম্মিত বেদীর উপরে একজন যোদ্ধা বসিয়া আছে।

ব্রাহ্মণের অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া সে বলিয়া

উঠিল, "ঠাকুর, আর কতক্ষণ জপ করিবে? সত্বর সারিয়া লও, আমার জুতা জোড়াটা বোধ হয় এতক্ষণ চুরি হইয়া গেল।" ব্রাহ্মণ উত্তর দিল না, কেবল রোষকষায়িত নেত্রে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন হইল। যোদ্ধা বিরক্ত হইয়া অস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিল "ব্রাহ্মণের কাশীতে আসিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠা বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে, দেশে থাকিলে এতক্ষণ তিনবার ভোজন হইয়া যাইত।"

এই সময় মন্দির হইতে নির্গত হইয়া একজন প্রৌঢ় ও একটি যুবক বৃক্ষতলে আসিল। প্রৌঢ় ব্যক্তি কহিল "আপনি এখনই নদী পার হইয়া যান, তাহা হইলে আর কোন বিপদ থাকিবে না।" যুবক কাতর কণ্ঠে কহিল "জয়সিংহ, এখন নদী পার হইয়া কোথায় যাইব। আমি সহায়সম্পদহীন, নিরাশ্রয়, আমাকে আর একদিন বারাণসীতে থাকিতে দাও।"

প্রৌঢ়।— যুবরাজ, আমি তোমার পিতার অন্নে প্রতিপালিত। আমি তোমারই মঙ্গলের জন্য তোমাকে বারাণসী পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি। তুমি নগরে থাকিলে তোমারও বিপদ, আমারও বিপদ। তোমার খুল্লতাতের আজ্ঞা ত স্বকর্ণে শুনিয়াছ, তুমি নগরে আছ জানিয়া এবং তোমাকে স্বচক্ষে দেখিয়া তোমাকে বন্দী করি নাই ইহা শুনিলে ইন্দ্ররাজ আমাকে বধ করিবে। পর পারে কান্যকুব্জের অধিকার নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে সেনা সংগ্রহ করিতে পারিবে।

যুবক।— তবে কি আমার পিতৃরাজ্যে বাস করিবার অধিকার আমার নাই?

জয়।— কি করিব যুবরাজ, বিধাতা বিমুখ।

যুবক।— তবে যুবরাজ বলিয়া আমাকে আর পরিহাস করিও না। জয়সিংহ, আমি একবস্ত্রে প্রতিষ্ঠান দুর্গ হইতে পলাইয়া আসিয়াছি, আমার অর্থ নাই, লোকবল নাই, কেমন করিয়া বিদেশে যাইব! ভাবিয়াছিলাম তুমি আশ্রয় দিবে, সেই জন্যই বারাণসী আসিয়াছিলাম।

জয়।— যুবরাজ, আমি সামান্য নগরপাল, আমি ধনী নই। আমার কিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থ আছে, তাহার কিয়দংশ তোমাকে দিতে পারি। তুমি তাহা লইয়া শীঘ্র কান্যকুব্জের অধিকার পরিত্যাগ কর।

যুবক।— একাকী যাইব কি করিয়া?

জয়।— চক্ররাজ, তুমি রাজপুত্র, অস্ত্রধারণ করিতে শিখিয়াছ, বালকের ন্যায় ভয় পাইও না?

যুবক।— জয়সিংহ, শুনিয়াছি বারাণসী বিশ্বনাথের নগর, সেখানে অন্য রাজার অধিকার নাই, দেবাদিদেবের নগরে কেহ উপবাস করে না, কেহ আশ্রয়হীন হয় না সে-সমস্ত কি তবে মিথ্যা কথা? এই বিশাল নগরে সহস্র সহস্র ভিক্ষুক ও লক্ষ লক্ষ যাত্রীর স্থান আছে কিন্তু আমার ন্যায় অসহায় অনাথের স্থান নাই?

ব্রাহ্মণের জপ শেষ হইয়া গিয়াছিল, তিনি ঘাটের উপরে আসিয়া দেখিলেন যে যোদ্ধা একমনে যুবক ও প্রৌঢ়ের কথোপকথন শুনিতেছে। যুবক কহিতেছে, "শুন জয়সিংহ, আমি পিতৃরাজ্য ছাড়িয়া যাইব না, আমি বিশ্বনাথের পাষাণমূর্ত্তি জড়াইয়া থাকিব, তুমি আমাকে বন্দী করিয়া কান্যকুব্জে পাঠাইয়া দিও। বিশ্বনাথের পাষাণদেহে সত্যসত্যই যদি প্রাণ থাকে তাহা হইলে তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন।" জয়সিংহ কহিলেন "চক্রায়ুধ, পাগল হইও না, বারাণসীতে থাকিলে কেহ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না, আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, যত শীঘ্র পার বারাণসী পরিত্যাগ কর।"

এই সময়ে ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইয়া যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপুহে, তুমি কে, তোমার কি হইয়াছে?"

যুবক কাতরকণ্ঠে কহিল "আমি আশ্রয়-ভিখারী এই বিশাল কান্যকুব্জরাজ্যে আশ্রয় খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

ব্রাহ্মণ।— কেন?

যুবক।— একদিন আমি এই রাজ্যের যুবরাজ ছিলাম। আমি যখন শিশু তখন পিতৃব্য সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, এখন রাজ্যে আর আমার স্থান নাই।

ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইয়া যুবকের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন "ভয় নাই, আমি তোমাকে আশ্রয় দিব।"

যুবক ও জয়সিংহ বিস্মিত হইয়া সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কে?"

"আমার নাম পুরুষোত্তম শর্ম্মা, আমি গৌড়ের মহাপুরোহিত।"

"আপনি আশ্রয় দিলে গৌড়েশ্বর যদি ক্রুদ্ধ হন?"

"আমার গৌড়েশ্বর যেমন-তেমন গৌড়েশ্বর নহেন, তিনি গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপাল। গোপালদেবের নাম শুনিয়াছ কি?"

জয়সিংহ কহিলেন "শুনিয়াছি, গৌড়ের প্রজাবৃন্দ নাকি স্বেচ্ছায় তাঁহাকে রাজপদে বরণ করিয়াছিল, তিনি বার বার গুর্জ্জরগণকে পরাজিত করিয়াছেন।" যুবক অবনত মস্তকে চিন্তা করিতেছিল, সে এই সময়ে বলিয়া উঠিল "ধর্ম্মপাল পিতৃব্যের কথা শুনিয়া আমাকে ধরাইয়া দিবে না ত?" ব্রাহ্মণ তাহা শুনিয়া সরোষে কহিল "শুন যুবক, মহারাজ ধর্ম্মপালদেব লঘুচেতা নহেন, তিনি তোমাকে আশ্রয় ত দিবেনই, অধিকন্তু তোমাকে তোমার সিংহাসনে স্থাপন করিবেন।" যুবক তাহা শুনিয়া বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিল, "তাহা অসম্ভব ব্রাহ্মণ, আর্য্যাবর্ত্তে আমার এমন বান্ধব কেহ নাই যে ইন্দ্ররাজের বিরুদ্ধে আমার হইয়া যুদ্ধ করে।" ব্রাহ্মণ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া ঘাট হইতে জলে নামিল এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিল "শুন যুবক, আমি পুরুষোত্তম শর্ম্মা গৌড়ের মহাপুরোহিত, জাহ্নবীজলে দাঁড়াইয়া, বারাণসীক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বর আদি-কেশবকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি যে গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালদেব দ্বারা তোমার অপহৃত পিতৃরাজ্য তোমাকে প্রত্যর্পণ করাইব।"

যুবক শপথ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন পূর্ব্বোক্ত যোদ্ধা ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল "ঠাকুর করিলে কি? এতবড় শপথটা করিয়া ফেলিলে? মহারাজ কি বলিবেন? আমি জানি যে তুমি ভোজনে দড়, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে তুমি বচনেও বিলক্ষণ দড়! শপথ রাখিবে কি করিয়া?"

ব্রাহ্মণ অতি গম্ভীরভাবে কহিল "দেখ নন্দলাল। সকল সময়ে পরিহাস ভাল লাগে না।" যোদ্ধা অপ্রস্তুত হইয়া আর কথা কহিল না।

ব্রাহ্মণ ও যোদ্ধা উভয়েই পাঠকবর্গের পূর্ব্বপরিচিত। ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তম শর্ম্মা, ইঁহাকে পাঠক পূর্ব্বে গৌড়ে ভাগীরথীতীরে জীর্ণ শিবমন্দিরের পুরোহিতরূপে দেখিয়াছেন। যোদ্ধা নন্দলাল, সে গৌড়ের একজন বিখ্যাত সেনানায়ক। গোপালদেবের সাম্রাজ্য পদবীলাভের পরে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই তিনবৎসরকাল নূতন সাম্রাজ্য দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে অতিবাহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কামরূপ, উত্তরে হিমাদ্রির পাদমূল, দক্ষিণে মহাসমুদ্র ও পশ্চিমে শোণনদ পর্য্যন্ত নূতন সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে। মরুবাসী গুর্জ্জরগণ কর্ত্তৃক নূতন সাম্রাজ্য বার বার আক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু গোপালদেব প্রতিবার তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। ইচ্ছাসত্ত্বেও এই কর্ম্মবহুল তিন বৎসরে পুত্রের বিবাহ দিতে পারেন নাই। ধর্ম্মপালদেবের সহিত কল্যাণীদেবীর বিবাহ স্থির হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত অবসরের অভাবে বিবাহ হয় নাই। সম্প্রতি গোপালদেবের মৃত্যু হইয়াছে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পুরুষোত্তম শর্ম্মা ও নন্দলাল গৌড়সাম্রাজ্যের প্রান্তবাসী রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নিমন্ত্রণ শেষ করিয়া গৌড়ে ফিরিতেছেন, সেই সময়ে পথে বারাণসীতে তাঁহাদিগের সহিত যুবরাজ চক্রায়ুধের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে তাঁহার মাতুলপুত্র ভণ্ডি কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ তখনও কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্য নরপতির অভিষেকের অষ্টশতাব্দী পরে ভণ্ডির বংশধর ইন্দ্ররাজ গুর্জ্জরপতি বৎসরাজের সাহায্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শিশুপুত্র চক্রায়ুধের সিংহাসন বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন। চক্রায়ুধ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কান্যকুব্জ হইতে পলায়ন করেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন। বৎসরাজের সাহায্যে ইন্দ্ররাজ বা ইন্দ্রায়ুধ বার বার তাঁহাকে পরাজিত করেন। অবশেষে চক্রায়ুধ গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে প্রতিষ্ঠান দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ছয়মাস অবরুদ্ধ থাকিয়া চক্রায়ুধ যখন দেখিলেন যে জয়লাভের কোন আশাই নাই, তখন তিনি প্রতিষ্ঠান হইতে বারাণসীতে পলায়ন করেন। বারাণসীর নগরপাল জয়সিংহ তাঁহার পিতার পুরাতন ভৃত্য, তিনি ভরসা করিয়াছিলেন

যে জয়সিংহ নিশ্চয়ই তাঁহাকে আশ্রয় দিবেন। তিনি যেদিন বারাণসীতে আসিলেন সেই দিনই আদি-কেশবের মন্দিরের নিকট ভাগীরথীতীরে তাঁহার সহিত পুরুষোত্তম শর্ম্মার সাক্ষাৎ হয়।

যুবরাজ চক্রায়ুধ তখনও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, জয়সিংহ পুরুষোত্তমের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ! আপনি সত্যই ব্রাহ্মণ! মহত্ত্ববিহীন ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, আপনার মহত্ত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। যুদ্ধ ব্যবসায়ে কেশ শুক্ল করিয়াছি; অসি হস্তে আর্য্যাবর্ত্তের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি; বহু রাজা, বহু বীর দেখিয়াছি; কিন্তু আপনার ন্যায় মহৎ কখনও দেখি নাই। আশ্রিত সংরক্ষণ মহত্তের ধর্ম্ম। এই যুবক কান্যকুব্জের রাজপুত্র, কিন্তু আজি কান্যকুব্জ রাজ্যে এমন কেহ নাই যে একমুষ্টি অন্ন ভিক্ষা দিয়া বা একরাত্রির জন্য আশ্রয় দিয়া ইহাঁর প্রাণরক্ষা করে। ইহাঁর পিতার অন্নে আমার দেহ পুষ্ট, কিন্তু আমার এমন ভরসা নাই যে বিশ্বনাথের নগরে একদিনের জন্য ইহাঁকে আশ্রয় দিই। সত্য, বিশ্বনাথের নগরে কেহ উপবাসী থাকে না, কিন্তু দেবতা অন্নপূর্ণার প্রসাদে অবিমুক্তক্ষেত্রে যুবরাজ চক্রায়ুধের অন্ন মিলিতেছে না। আপনি ইহাকে আশ্রয় দিয়া যে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা জগতে বিরল. কিন্তু অস্ত্রব্যবসায়ীর পরামর্শ গ্রহণ করুন, এখনই ইন্দ্ররাজের অধিকার পরিত্যাগ করুন।"

পুরু।— আপনার কথা সত্য, আমরা এখনই নগর পরিত্যাগ করিতেছি।

জয়।— বিশ্বনাথ আপনার মঙ্গল করুন। চক্রায়ুধ, আমাকে ঘৃণা করিও না, বৃদ্ধ জয়সিংহ যে লবণ আস্বাদন করিয়াছে, তাহা বিস্মৃত হয় নাই। যদি আবার কখনও ইন্দ্ররাজের সহিত যুদ্ধ করিতে আইস তাহা হইলে দেখিতে পাইবে জয়সিংহ চক্রায়ুধকে বিস্মৃত হয় নাই, তাহার অসি চক্রায়ুধের অরি নিধনেই নিযুক্ত আছে।

বৃদ্ধ সাশ্রুনয়নে চক্রায়ুধকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। পুরুষোত্তম ও নন্দলাল চক্রায়ুধের সহিত বারাণসী হইতে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। উত্তরাপথের রাষ্ট্রনীতির স্থির সরোবরে যে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইল তাহা হইতে উৎপন্ন একটি তরঙ্গ গৌড়ের সিংহাসনপ্রান্তে উপস্থিত হইল, দ্বিতীয় তরঙ্গ কান্যকুব্জে ও ভিন্নমালে পৌঁছিল। মরুমাঝে বৎসরাজ ও মহোদয়ে ইন্দ্রায়ুধ জানিতে পারিলেন যে চক্রায়ুধ গৌড়রাজ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গৌড়-নগরে।

রজনীর চতুর্থ যামের শেষভাগে গৌড়নগরে মধুসূদন-মন্দিরের ঘাটে একখানি বৃহৎ নৌকা আসিয়া লাগিল। ইহার পূর্ব্ব হইতেই ঘাটে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বাঁধা ছিল, বৃহৎ নৌকার নাবিকেরা দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে নৌকা সরাইতে বলিল, কিন্তু ক্ষুদ্র নৌকার সমস্ত লোক তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগের কর্ণে সে শব্দ প্রবেশ করিল না। বৃহৎ নৌকা যখন ঘাটে আসিয়া লাগিল তখন তাহার আঘাতে ক্ষুদ্র নৌকা বন্ধনমুক্ত হইয়া ভাগীরথীর জলে ভাসিয়া চলিল। যখন আঘাত লাগিল তখন একজন দীর্ঘাকার পুরুষ ক্ষুদ্র নৌকা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া তীরে অবতরণ করিল।

বৃহৎ নৌকা হইতে আলোক লইয়া দুইজন নাবিক নির্গত হইল, অপর দুইজন নৌকা হইতে ঘাটের সোপান পর্য্যন্ত দারুনির্ম্মিত অবতরণিকা বিস্তৃত করিয়া দিল। একজন ব্রাহ্মণ ও দুইজন অস্ত্রধারী পুরুষ নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন, তাঁহাদিগের পশ্চাৎ তিন চারিজন পরিচারক ও বহু অস্ত্রধারী সেনা নৌকা ত্যাগ করিয়া ঘাটের সোপানে আসিয়া দাঁড়াইল। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র নৌকা হইতে লম্ফ দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল, সে ঘাটের মণ্ডপে স্তম্ভের অন্তরালে ঘন অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ব্রাহ্মণ ও অস্ত্রধারী পুরুষদ্বয় ঘাটের উপরে উঠিলে সে ব্যক্তি মন্দিরের মণ্ডপে সরিয়া গেল।

ঘাটের উপরে মধুসূদনের মন্দির;—বিশালকায় মন্দিরের গগনস্পর্শী চূড়া গৌড় নগরের দশ ক্রোশ দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যাইত। ঘাটের সোপানশ্রেণী মণ্ডপের

নিম্নে আসিয়া শেষ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও অস্ত্রধারী পুরুষ-দ্বয় মণ্ডপের নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন যে ব্যক্তি মণ্ডপের অন্ধকারে লুকাইয়াছিল সে অন্ধকারের আশ্রয়ে তাঁহাদের নিকটে সরিয়া আসিয়া কথোপকথন শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ কহিলেন "মহারাজ! পূর্ব্বাহ্নে আমাদিগের মহারাজকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই, সেই জন্যই তিনি আপনার অভ্যর্থনা করিতে আসেন নাই। সংবাদ পাইলে তিনি নিশ্চয়ই ঘাটে উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার অভাবে কান্যকুব্জরাজের অভ্যর্থনা আমি করি। মহারাজ গৌড়পুরে স্বাগত।" তিনি একজন অস্ত্রধারী পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা কয়টি বলিলেন। অস্ত্রধারী পুরুষ তদুত্তরে কহিলেন "ঠাকুর! আপনি কি উপহাস করিতেছেন? কে কান্যকুব্জের রাজা? নিরাশ্রয় দীন হীন পথের ভিখারী জঠর-জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া গৌড় নগরের রাজপথে নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট অন্নের অন্বেষণে আসিয়াছে, রাজাধিরাজ মহারাজ ধর্ম্মপালদেব কি তাহার অভ্যর্থনা করিতে আসিবেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিয়া উঠিলেন "সে কি কথা মহারাজ! আপনি গৌড়ের একজন মাননীয় অতিথি, আপনি অন্যায় কথা বলিয়া দরিদ্র গৌড়বাসীকে লজ্জা দিবেন না।"

অস্ত্রধারী পুরুষ কান্যকুব্জের যুবরাজ অথবা মহারাজ চক্রায়ুধ এবং ব্রাহ্মণ গৌড়ের মহাপুরোহিত পুরুষোত্তম শর্ম্মা। চক্রায়ুধ বলিলেন "ঠাকুর! দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছেন, সেই জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকিব, আমাকে অযথা বাক্য বলিয়া অপরাধী করিবেন না।" এই সময়ে দ্বিতীয় অস্ত্রধারী পুরুষ—পুরুষোত্তমের নিকটে সরিয়া আসিয়া তাঁহার কানে কানে কহিল "বলি ঠাকুর! রাজসভায় গিয়া বাক্‌চাতুরি ত বিলক্ষণ শিখিয়াছ দেখিতে পাইতেছি। এদিকে রাত্রি ত শেষ হইয়া আসিয়াছে, ঘরে দুয়ারে ফিরিতে হইবে না? তোমার ত তিন কুলে কেহ নাই, থাকিবার মধ্যে আছে সেই রাজবাড়ীর—।" পুরুষোত্তম ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "নন্দলাল চুপ।"

নন্দলাল।— তবে চল গৃহে ফিরি।

পুরুষ।—গৃহে ফিরিব কেমন করিয়া? মহারাজকে কোথায় রাখিয়া যাইব?

নন্দ।— তাও ত বটে। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি হইবে? চল নগরে প্রবেশ করি।

তিন জনে মণ্ডপ ছাড়িয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন বহিঃশত্রু ও দস্যুর ভয়ে রাত্রিকালে নগরতোরণ ও ঘাট-সমূহের দ্বারগুলি রুদ্ধ থাকিত। নগর-পালের আদেশ ব্যতীত কেহ রাত্রিকালে নগরে প্রবেশ করিতে পাইত না। মধুসূদন-মন্দিরের ঘাটে দ্বার ছিল না বটে, কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া নগরে প্রবেশ করা যাইত না। মন্দিরবাসীগণ সন্ধ্যাকালে মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছিল। নন্দলাল মন্দিরদ্বারে ঘন ঘন করাঘাত করিয়া তাহাদিগকে জাগা-ইয়া তুলিল। একজন প্রদীপ হস্তে দ্বারের উপরের গবাক্ষে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে তোমরা?" নন্দলাল, কহিল "আমরা নগরের লোক। আমি সেনানায়ক নন্দ-লাল, ইনি মহাপুরোহিত পুরুষোত্তম শর্ম্মা, আর ইনি কান্যকুব্জরাজ চক্রায়ুধ। আমাদিগের সহিত চারি পাঁচ-জন পরিচারক ও ত্রিশজন পদাতিক সেনা আছে। দুয়ার খুলিয়া দাও, আমরা নগরে প্রবেশ করিব।"

মন্দির বাসী।— বাপু হে, নগরপালের আদেশ ব্যতীত রাত্রিকালে এত অস্ত্রধারী পুরুষ নগরে প্রবেশ করিতে দিতে পারিব না। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এখন মণ্ডপে বসিয়া থাক, প্রভাতে দুয়ার খুলিয়া দিব।

নন্দ।— তুমি ত বেশ লোক দেখিতেছি, আমরা গৌড়ের লোক হইয়াও নগরে প্রবেশ করিতে পাইব না? বিশেষতঃ আমাদিগের সহিত কান্যকুব্জের মহারাজ রহিয়াছেন, তাঁহাকে কি করিয়া মণ্ডপে বসাইয়া রাখিব? তুমি মন্দিরস্বামীকে সংবাদ দাও।

মন্দিরবাসী গবাক্ষ হইতে সরিয়া গেল। অল্লক্ষণ পরে প্রদীপ হস্তে লইয়া একজন প্রৌঢ় সন্ন্যাসী আসিয়া গবাক্ষে দাঁড়াইলেন। নন্দলাল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি মন্দিরস্বামী?"

উত্তর হইল "হাঁ। তুমি কে?"

"আমি গৌড়ের সেনানায়ক . . .

"কি চাও?"

"আমরা নগরে . . .

"রাত্রিকালে শস্ত্রধারী পুরুষকে নগরে প্রবেশ করিতে দিতে পারি না। রাত্রিকালে মণ্ডপে অবস্থান কর, প্রভাতে প্রবেশ করিও।"

"আমাদিগের সহিত কান্যকুব্জরাজ চক্রায়ুধ আসিয়াছেন। পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া হয় নাই বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার কোন আয়োজন হয় নাই। তিনি কেমন করিয়া মণ্ডপে অপেক্ষা করিবেন?"

"অপেক্ষা করা ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা দেখিতেছি না, মহারাজের জন্য উপযুক্ত আসন পাঠাইয়া দিতেছি।"

"আমাদিগের সহিত আসন আছে, সুতরাং আসনের আবশ্যক নাই। মন্দিরদ্বার খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করুন।"

"অসম্ভব।"

"আপনি কি আমাকে চিনেন না?"

"চিনিলেও দ্বার খুলিতে পারিব না।"

"তবে আমরা দুয়ার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিব।"

মন্দিরস্বামী মুখ ফিরাইয়া মন্দির মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কটাহের তৈল উত্তপ্ত হইয়াছে?" সে ব্যক্তি কহিল "হইয়াছে প্রায়।" তাহা শুনিয়া পুরুষোত্তম, নন্দলাল ও চক্রায়ুধের হস্তধারণ করিয়া তাহাদিগকে টানিতে টানিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘাটের দিকে পলায়ন করিলেন। সেই অবসরে যে ব্যক্তি মণ্ডপের অন্ধকারে লুকাইয়া ছিল সে মন্দিরদ্বারের নিকটে আসিয়া ডাকিল "হরেশ্বর?"

মন্দিরস্বামী চমকিত হইয়া বলিলেন "কে তুমি?" আগন্তুক কহিল "আমি চক্ররাজ।"

"প্রভু?"

"হাঁ।"

"প্রভু দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। প্রমাণ?"

"মন্দিরমধ্যে রজতের হরিহর মূর্ত্তি খুলিয়া দেখ।"

"যথেষ্ট হইয়াছে। প্রভু, আদেশ করুন।"

"দ্বার মুক্ত কর।"

অবিলম্বে মন্দিরদ্বার মুক্ত হইল, আগন্তুক মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরস্বামী দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। আগন্তুক কহিলেন "হরেশ্বর ইহাদিগকে নগরে প্রবেশ করিতে দাও। আমি জানি ইহারা গৌড়ের লোক।"

"প্রভু! স্বয়ং মহারাজাধিরাজ আদেশ করিয়াছেন যে রাত্রিকালে অস্ত্রধারী পুরুষ গৌড় নগরে প্রবেশ করিতে পাইবে না।"

"তোমার কোন ভয় নাই, আমি আদেশ করিতেছি, দ্বার মুক্ত কর।"

মন্দিরস্বামীর আদেশে দ্বার মুক্ত হইল, আগন্তুক ঘাটে গিয়া নন্দলালকে কহিলেন "আপনারা আসুন, মন্দিরস্বামী আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন।" পুরুষোত্তম বলিয়া উঠিলেন "কেন, তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করিবার জন্য?"

"না, কোন ভয় নাই, মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে।"

সকলে মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরস্বামী আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, দ্বার কি মুক্ত রাখিব?" আগন্তুক কহিলেন "হরেশ্বর, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি ফিরিয়া আসিতেছি।" তিনি এই বলিয়া দ্রুতপদে সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া জলের নিকটে আসিলেন। ক্ষুদ্র নৌকার নাবিকেরা জাগিয়া উঠিয়া নৌকাখানি ঘাটে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। নৌকার সম্মুখে এক ব্যক্তি আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত হইয়া ঘুমাইতেছিল, আগন্তুক তাহার নিকটে গিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন "গৌর।" সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল "আজ্ঞা।"

"তোমরা নৌকা লইয়া প্রাসাদের ঘাটে চলিয়া যাও।"

"যে আজ্ঞা।"

"কল্য দ্বিপ্রহর রাত্রিতে একখানা ছোট নৌকা লইয়া জগদ্ধাত্রীর মন্দিরের নিম্নে অপেক্ষা করিও।"

"যে আজ্ঞা।"

আগন্তুক ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে গৌর ডাকিল "প্রভু।"

"কি?"

"চাউল ফুরাইয়া গিয়াছে।"

আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কল্য একাদশী উপবাস করিয়া থাকিও।"

গৌর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় শয়ন করিল। ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদ্ভিদের বুদ্ধি

বিলাতের বিজ্ঞান-সভায় দাঁড়াইয়া অধ্যাপক ডারউইন যেদিন প্রচার করিলেন—আমরা যাহাকে অনুভূতি বলি উদ্ভিদের ভিতরেও তাহা আছে—সেদিন সে কথা কেহই অবিসংবাদিত ভাবে মানিয়া লন নাই। নিম্ন শ্রেণীর জীবের ভিতর ও উদ্ভিদের ভিতর কোথাও কোথাও এক আধটু সাদৃশ্য থাকিতে পারে, শুধু এইটুকু স্বীকার করাই বৈজ্ঞানিকেরা সেদিন যথেষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর হইতেই বৈজ্ঞানিকদের মাথার টনক নড়িয়া উঠিয়াছে। তাহারা এই দীর্ঘ দুইযুগ ধরিয়া নানা উপায়ে, বিবিধ যন্ত্রের সাহায্যে, অসাধারণ অধ্যবসায়সহকারে উদ্ভিদের প্রাণ আছে কি না—তাহারা অনুভব করিতে পারে কি না—তাহাদের কোষে স্মৃতিশক্তি কতটুকু সঞ্চিত আছে প্রভৃতি প্রশ্নের মীমাংসায় প্রভূত প্রয়াস পাইয়াছেন। অবশেষে আজ আমাদের জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের পর, একথা আর কিছুতেই বলা চলে না যে উদ্ভিদজগৎ নিতান্তই জড়—প্রাণীজগতের প্রাণস্পন্দন বা অনুভূতি তাহার ভিতর নাই।

বস্তুতঃ বৃক্ষলতাসমূহের প্রতি একটু অভিনিবেশের সহিত দৃষ্টিপাত করিলেই এমন কতকগুলি অনন্যসাধারণ ব্যাপার আমাদের চোখের সামে আসিয়া পড়ে যে উদ্ভিদের অনুভূতি এবং ধারণাশক্তির কথা অগ্রাহ্য করিলে আর কোন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ের দ্বারাই তাহার মীমাংসা করা যায় না। এমন কি কখনো কখনো এমন একটা যায়গায় আসিয়া পড়িতে হয় যে ইতর জীবজন্তু দূরের কথা, মানুষের সহিতও তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, কার্য্যতৎপরতা প্রভৃতির যথেষ্ট সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। একটু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে কোনো গাছের ভিতর স্মৃতিশক্তির অনুরূপ একটা জিনিষ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। মটরজাতীয় লতাগুলির নিদ্রাকালটুকু একটা নির্দ্দিষ্ট গতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'লালচে সিমের' ছোট ছোট পাতাগুলিকে দিনের বেলায় সবল এবং ঋজু দেখায় কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে সেগুলি মুদিয়া আসে। লজ্জাবতী ও 'বনচাঁড়ালের' ভিতরে এই নিদ্রার ভাবটি আরও স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট। সূর্য্যালোকে ইহাদের পাতাগুলি সতেজ এবং পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন; সূর্য্যাস্তে নিদ্রার আবেশে নিস্তেজ ও ম্রিয়মাণ। কিন্তু এইটিই ইহার প্রধান বিশেষত্ব নহে। এই জাতীয় গাছগুলিকে একটি সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরের ভিতর রাখিয়া দিলেও সন্ধ্যাসমাগমে ইহাদের পাতাগুলি ঘুমের ঘোরে ঢুলিয়া পড়ে এবং উষার অরুণালোকের সঙ্গে সঙ্গেই আবার জাগিয়া উঠে। যথাকালে নিদ্রা এবং জাগরণে এমনি তাহারা অভ্যস্ত এবং নিত্য অভ্যাসের দ্বারা ঐ সময় দুটির সঙ্কেত তাহাদের ভিতর এমন গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে যে বাহিরের ইঙ্গিতগুলি সরাইয়া লইলেও, ইহারা কোন মতেই ভুল করিয়া বসে না—ঠিক সময়েই ঘুমায় এবং ঠিক সময়েই জাগে।

সর্বজয়া ছত্রাকারে পত্র বিস্তার করিয়া আওতায় পড়শী গাছপালা বিনাশ করিয়া নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে।

হায়াসিন্তের ছুটি দুর্ব্বল বৃন্ত যুক্ত হইয়া বহু পুষ্প ধারণ করিয়াছে।

ম্যাডোনা লিলির ফুলের তোড়া।

হাতিশুড়ো, কাঁটানটে গাছের ফুল।

উদ্ভিদের এই স্মরণশক্তিটিকে যদি মানিয়া লওয়া যায় তবে আর একটি প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে স্বতই আসিয়া পড়ে—উদ্ভিদের বিচারশক্তি আছে কি না? পোটেনটিলা (Potentilla) নিজে অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু গরমের সময় লম্বা লম্বা শিকড়ের দ্বারা ইহারা চারিদিকের ভূমিখণ্ডকে অনেক দূর পর্য্যন্ত নিবিড় ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। প্রসারলাভের প্রবৃত্তিই যে ইহার একমাত্র কারণ, একথা কিছুতেই মানিয়া লওয়া যায় না। এই জাতীয় গাছগুলি সাধারণতঃ খুব বড় একখণ্ড পাথরের ফাটলের ভিতর জন্মগ্রহণ করে। পরে চারিদিকের কঠিন শিলা যখন তাহাদের মূলপ্রসারণকে পদে পদে বাধা দিতে থাকে তখন তাহারা অপেক্ষাকৃত কোমলভূমির অন্বেষণে ধাবিত হয়। কেমন করিয়া যে পোটেনটিলার শিকড় কোমলভূমি নির্ণয় করিয়া লয় সেইটাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু একবার সন্ধান পাইলে আর বলা কহা নাই একেবারে সেই দিকে শিকড়গুলিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। সেঁয়াকুল ও সাধারণ বেড়াটির লতাগুলি যখন পাথরের স্তূপ বা ভাঙা দেয়ালের গা বহিয়া উঠিতে প্রয়াস পায় তখনও কতকটা এই ধরণের ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ এই লতার সতেজ কেন্দ্রগুলি পাথর বা দেয়ালের ভিতর ফাটলের অনুসন্ধান করিতে থাকে এবং গঠনোপযোগী উপাদানে পূর্ণ কোনো ফাটলের সন্ধান পাইবামাত্র ইহাদের গ্রন্থিগুলি স্ফীত হইয়া যষ্টির আকার ধারণ করে ও ক্রমশঃ সুদৃঢ় শিকড় প্রসারের দ্বারা সেইখানকার মাটিকে অধিকার করিয়া বসে। এইরূপে তাহারা নূতন নূতন স্থানে তাহাদের উপনিবেশ স্থাপন করে এবং কালে যখন এই নবোদ্গত অঙ্গগুলি মূল লতা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও হইয়া পড়ে তখনও জীবনধারণের জন্য ইহাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

অধিকাংশ বৃক্ষই স্থিতিশীল। যেখানে জন্মে সেই খানেই থাকে—এক পাও স্থানান্তরে যাইতে পারে না। এই জন্যই উদ্ভিদজগতে প্রাণধারণের মত আলো ও বাতাস লইয়া রীতিমত লড়াইয়ের সূত্রপাত হইতে দেখা যায়। প্রতিবাসীদের ভিতর একটা রেষারেষির ভাব থাকিলেও উদ্ভিদরাজ্যের প্রজাগণ নিজেদের প্রয়োজনীয় যাহা কিছু তাহারা নিজেরাই বেশ দক্ষতার সহিত জোগাড় করিয়া লয়। কোন বৃক্ষ বা লতাকে অন্ধকার ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়া যদি একটিমাত্র ফুকর দিয়া সেই ঘরে আলোক প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়, তবে দেখা যায় যে বৃক্ষ বা লতার সমস্ত ডাল পাতাগুলি সেই আলোকের দিকে ঝুঁকিয়া যেন প্রাণপণে খাদ্য আহরণের চেষ্টা করিতেছে। একটি সর্ব্বজয়া গাছ

জন্মিয়াই দেখিল তাহার চারিদিকে কতকগুলি বড় বড় গাছের জটলা। এমন কি গরমের দিনেও নিতান্ত প্রয়োজনীয় সূর্য্যের আলোটুকু লাভ করাও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। অনন্যোপায় গাছটি তখন বাড়িয়া উঠিবার এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। সে ব্যাঙের ছাতার ধরণে বাড়িয়া উঠিতে সুরু করিয়া দিল। ইহারা বসন্তের অগ্রদূত। সুতরাং অন্যান্য কাননদুলালেরা মাথা তুলিয়াই দেখে যে ইহারাই প্রায় সমস্তটা মাঠ অধিকার

গাছের গুঁড়ি জিলাপীর মতো ঘুরিয়া বাধা এড়াইয়া গিয়াছে।

করিয়া বসিয়া আছে। তখন তাহারাও নিজেদের জীবন ধারণের জন্য নানারূপ অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিতে তৎপর হয় এবং অচিরে ঐ-সকল স্বার্থসর্ব্বস্বদের ভিড়ের ভিতর হইতেও নিজেদের পাওনাটি কড়ায়গণ্ডায় আদায় করিয়া লয়! প্রিমরোজ জাতীয় কতকগুলি বাসন্তিক ফুলের আচরণও অত্যন্ত বিস্ময়জনক। প্রথম গ্রীষ্মের সময় পাতাগুলিকে নমিত করিয়া ইহারা রুদ্রদিনের ফসলগুলি সম্পূর্ণভাবে অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে; এসম্বন্ধে শম্বুলমণি বা হায়াসিন্থ জাতীয় গাছের আচরণও কতকটা এইরূপ। গ্রীষ্মকালে ইহাদের পুষ্পগুলি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়া উঠে। চারিধারে অদ্ভুত ধরণের পত্রব্যূহ রচনা করিয়া ইহারা আততায়ীদের হাত হইতে উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখে এবং পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিখণ্ডের সমস্ত আলোক ও বাতাস আপনারাই অধিকার করিয়া বসে।

আপনাদের অভাবমোচনের পক্ষেও উদ্ভিদজগতে চেষ্টার ত্রুটী দেখা যায় না। বিশেষতঃ গাছ যদি এমন স্থানে জন্মগ্রহণ করে, যেখানে পুষ্টির জন্য যথেষ্ট রস সংগ্রহ সুসাধ্য নয় তবে এই চেষ্টা সমধিক পরিমাণে স্ফূর্ত্তি লাভ করে। প্রত্যেক ফুলের গাছই চায় যে তাহার সমস্ত প্রয়াস, সমস্ত সাধনাটুকুই পুষ্পের আকারে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠুক। কিন্তু সকল বৃন্তই পুষ্প ধারণের মত যথেষ্ট দৃঢ় নহে। এরূপ অবস্থায় তিন চারিটি দুর্ব্বল বৃন্ত একত্র মিলিত হইয়া প্রমাণ করিয়া দেয় যে একতার মূল্য তাহারাও বোঝে। হায়াসিন্থ, এস্পারেগাস প্রভৃতি উদ্যান-পুষ্পের ভিতরেই এ দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এস্থলে ম্যাডোনা লিলির কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার একটিমাত্র বৃন্তে কুঁড়ি, অর্দ্ধস্ফুট, পূর্ণস্ফুট প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার প্রায় ৮০টি ফুল বিকশিত হইতে দেখা গিয়াছে। পানিজাম, কাঁটানটে, হাতিশুঁড়ো প্রভৃতিরও এইরূপ এক বৃন্তে অনেক ফুল হয়।

ঋতুর সঙ্গে গাছের যোগ যে ঠিক কোন জায়গাটায় সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসা কঠিন ব্যাপার। এইটাই বিস্ময়ের বিষয় যে ঋতুর পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই সে কেমন করিয়া টের পায় যে তাহার বিকাশের সময় আসিয়াছে। অবশ্য প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এ পরিবর্ত্তনের যথেষ্ট যোগ আছে কিন্তু তাই বলিয়া একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না যে এইটাই ইহার একমাত্র কারণ। কতকগুলি গাছ আছে প্রাকৃতিক অবস্থা যতই অনুকূল হোক না কেন বসন্তাগমের পূর্ব্বে তাহারা কিছুতেই ফুল ধরায় না। কেহ কেহ এমনও সিদ্ধান্ত করেন যে সকল গাছই একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশ্রাম চায়
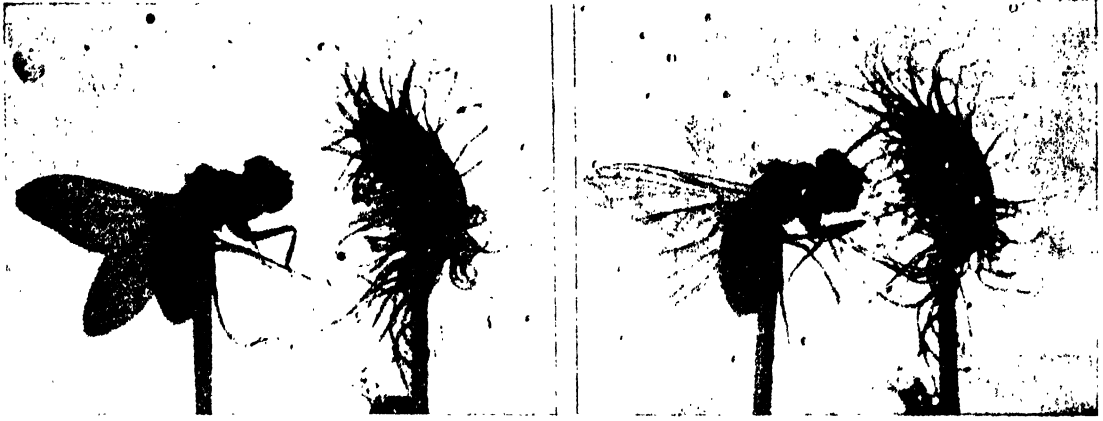
জীবভুক বৃক্ষের সামনে মাছি ধরাতে গাছ শুঁয়া বাড়াইয়া মাছিকে গ্রাস করিতেছে।

এবং সেই বিরামকালটুকু না ফুরানো পর্য্যন্ত কিছুতেই কাজের আসরে আসিয়া হাজির হয় না। এ সিদ্ধান্ত আংশিকভাবে সত্য হইতে পারে, কারণ এমন অনেক গাছ আছে যাহা সমস্ত বৎসর ধরিয়াই ফল প্রসব করে। গাছের পূর্ব্বানুভূতির ক্ষমতা আছে এই সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুতেই ইহার সম্যক মীমাংসা হয় না। এই অনুভূতিই গাছকে ঋতুর আগমন সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলে।। যে কোনো উপায়েই হোক্, একথা ধ্রুবসত্য যে ঋতুচক্রের আবর্ত্তনের কথাটা উদ্ভিদ্‌জগতে নিতান্ত নূতন নহে, বরং এই পরিবর্ত্তনের সহিত তাহারা বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত। ভুঁইচাপার গাছগুলির দিকে তাকাইয়া দেখিলেই একথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়। ইহারা বসন্তের আগমন সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই এত সজাগ যে ঘন বরফের স্তূপ ভেদ করিয়াও ফুল ফুটাইয়া বসন্তকে বরণ করিয়া লয়।

উদ্ভিদরাজ্যের অধিবাসীগণকেও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত আপনাদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে হয়। একান্ত প্রতিকুল অবস্থার ভিতর হইতেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে ইহারা নিজেদের বৃদ্ধির পথ ঠিক করিয়া লয়। লার্চ-দেবদারু জাতীয় বৃক্ষগুলি উর্দ্ধমুখে ইহাদের লম্বা সরু শাখা প্রসারিত করিয়া বাড়িয়া উঠে। সুতরাং প্রবল বাতাসের বেগে ইহাদের প্রচুর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে দিক হইতে বাতাস বহে তাহার ভিন্নদিকে ইহারা নিজেদের বর্দ্ধিষ্ণু কেন্দ্রগুলি প্রেরণ করে এবং এইরূপে বাতাসের অত্যাচার যতদূর সম্ভব কমাইয়া আনে। এখানে বিশেষভাবে দেখিবার জিনিষ এই যে শাখাপ্রশাখার অবলম্বন সত্ত্বেও মূল বৃক্ষকাণ্ড সম্পূর্ণ ঋজুভাবেই উঠিয়া যায়—কোথাও একটু বাঁকিয়া যায় না। ইহা ছাড়া আরও এমন অনেক গাছ

ফার্ণের চারা জলের অন্বেষণে টবের বাহির দিয়া শিকড় নামাইয়া দিয়াছে।

আছে যাহাদের গতিবিধির দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হয় যে বাহিরের পৃথিবীর সহিত যোগ রাখিতে গেলে যতটুকু চাতুর্য্য এবং বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন উদ্ভিদজগতে তাহার অভাব আদৌ নাই। বাধার হাত এড়াইবার জন্য বৃক্ষসমূহ কেমন করিয়া তাহাদের কাণ্ডগুলিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া
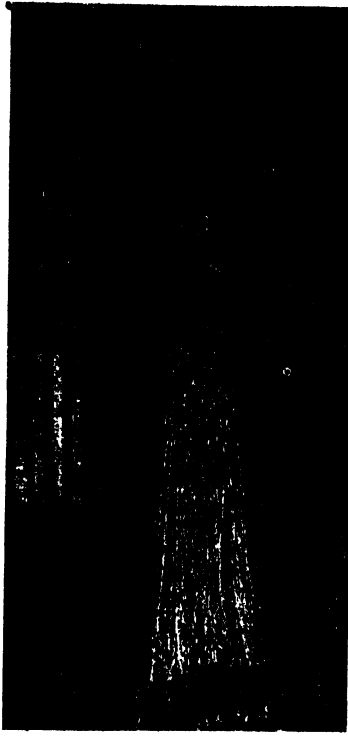
ছাদের ফুটার ভিতর দিয়া গাছ মাটিতে শিকড় নামাইয়া দিয়াছে।

শিয়ালকাঁটার বীজ বিস্তারের কৌশল।

ঘাসের সপক্ষ বীজ ও পানিজামের ফুল।

অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলে তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। একটি বীচ গাছের সম্বন্ধে একবার এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গিয়াছিল। বীচের একটা ছোট চারা বড় আর একটা বীচের গোড়ায় গজাইয়া উঠে। প্রথম হইতেই চারাটি বড় গাছটির নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়া বেশ সবল ও সুস্থ আকারে বাড়িতে থাকে। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল যে চারাটি বড়গাছটির সহিত প্রায় সম্পূর্ণভাবেই জড়াইয়া গিয়াছে। মটরলতার দুই ইঞ্চি তফাতেও যদি একখানি লাঠি পুঁতিয়া রাখা যায় তবে কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই দেখা যায় যে—যে ডাঁটাটা এতক্ষণ ধরিয়া পাতাগুলির ভিতর ঘুমাইয়াছিল তাহা ঋজু হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যষ্টির অভিমুখে ইহার একটা গতিও বেশ স্পষ্টই অনুভব করা যায়। অবশেষে দেখা যায় যে শুষ্ক নীরস লাঠিটাকে আলিঙ্গনে বেড়িয়া নবীন সজীব লতাটী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবভুক বৃক্ষগুলির কাছে কোনো পোকা মাকড় মাছি ফড়িং ধরিলে তাহারা অমনি চঞ্চল হইয়া উঠে; এবং ঠিক হাত বাড়াইয়া শিকার ধরার ন্যায় শুঁয়া বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া শিকারকে ধরে।

গাছের প্রত্যেক অংশেই বেশ একটি সমঞ্জস-শক্তির ভাব দৃষ্ট হয়। বৃক্ষের কাণ্ড এবং শাখা পত্রাদিতে যেমন একটা বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় মূলেও তাহা সম্পূর্ণ ভাবে বিরাজমান। একবার বড় একটা ওকের কোটরের ভিতর ঘটনাক্রমে অন্য গাছের বীজ পতিত হয়। কিছুকাল ধরিয়া ওকগাছের ধ্বংসজাত সারের সাহায্যে গাছটি বাড়িতে থাকে কিন্তু সেখানে যথেষ্ট রস না থাকায় মাটি হইতে রস সংগ্রহের জন্য গাছটি কতকগুলি শিকড়কে মাটির পানে প্রেরণ করে। শিকড়গুলি অনেকদূর পর্য্যন্ত বেশ সোজা ভাবেই নামিয়া আসিয়া মাটি হইতে প্রায় অর্দ্ধগজ ঊর্দ্ধে থাকিতে টের পাইল তাহাদের নীচেই মাটির পরি-

কাঁটাকরের ও ওকড়ার বীজ।

হইতেও ইহারা এমন নির্ভুল পথ ধরিয়া নামিয়া আসে যে ইহাদের অনুভব-শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। একবার একটি কার্ণের চারার টবকে জলযুক্ত একটি বড় পাত্রের ভিতর রাখিয়া দেওয়া হয়। খুব সম্ভব চারাটি টবের ভিতর হইতে আবশ্যকীয় জল পাইতেছিল না। ফলে দেখা গেল কিছুদিনের ভিতরেই টবের বাহির দিয়া জল পর্য্যন্ত একটি শিকড় নামিয়া আসিয়াছে। ভাঙা বাড়ীর ছাদের উপর গাছ হইলে গাছ শিকড় দিয়া মাটি ছুঁইতে বিধিমত চেষ্টা করে; কোনো দিকে পথ না পাইয়া একটা গাছ একটি ফুটা দিয়া শিকড় নামাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল।
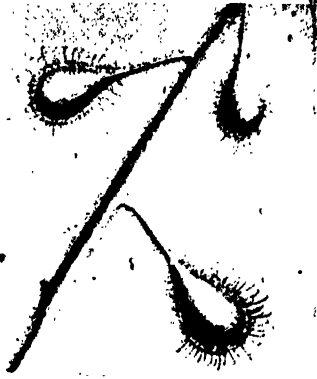
বর্ত্তে একখানা প্রকাণ্ড পাথর। তৎক্ষণাৎ সেইখানে তাহার নিম্নাভিমুখী শিকড়গুলি বিভক্ত হইয়া একভাগ বামপার্শ্বে বেষ্টন করিয়া মাটির ভিতর প্রবেশ করে এবং এইরূপে সেইখান হইতে জীবন-রস আহরণ করিয়া লয়।

জল সম্বন্ধীয় এমন অনেকগুলি রহস্য আছে যাহার সমাধান করা কিছুমাত্র শক্ত ব্যাপার নয়। গাছের শিকড়গুলি সাধারণতঃ কঠিন মাটির দিকে না গিয়া সরস বা জলা ভূমির দিকেই ধাবিত হয়। কারণ স্বরূপ এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কঠিন মাটির দিকে যাইতে তাহাকে যেমন পদে পদে বাধা পাইতে হয় জলাভূমির দিকে যাইতে সেরূপ কোনো বাধাবিঘ্ন নাই। সেখানে তাহার প্রবেশ লাভ অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু "উড়ে এসে জুড়ে বসা" গাছগুলি অনেক সময়ে এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া যথাস্থানে তাহার শিকড় পরিচালনা করে যে যুক্তি তর্কের দ্বারা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা বাস্তবিকই কঠিন হইয়া পড়ে। মনষ্টেরা জাতীয় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গাছগুলি ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে রক্ষণগৃহের ভিতর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কখনো কখনো ইহারা রক্ষণগৃহের ছাদ হইতে মাটির উপরকার জলাধারের পানে লম্বা লম্বা শিকড়গুলি সটান প্রসারিত করিয়া দেয়। এই জলের অন্বেষণে ১৫।২০ ফুট

উদ্ভিদের বংশবিস্তারের কৌশলও বিশেষ কৌতুকপ্রদ। অনেক ফলের বীজাবরক শাঁস জীব জন্তুর মুখে মিষ্ট স্বাদু লাগে। ইহার লোভে তাহারা এক স্থান হইতে অপর স্থানে ফল বহন করিয়া লইয়া গিয়া নূতন স্থানে বীজ বিস্তার করে। অনেক ফল পাকিলে খোলা হঠাৎ ফাটিয়া এমন শীঘ্র গুটাইয়া যায় যে তাহার ভিতরকার বীজ দূরে ছড়াইয়া পড়ে—যেমন দোপাটি, অতসী, দুপুরে সূর্য্যি ইত্যাদি। অনেক বীজের গায়ে পাখা বা পালকের ন্যায় থাকে, তাহাতে বীজ বৃক্ষচ্যুত হইলে বাতাসে উড়িতে উড়িতে নানা স্থানে নীত হয়—যথা, শিমুল, আকন্দ, ঘলঘষে, শিয়ালকাঁটা, কাঁটাকর ইত্যাদি। কোনো কোনো বীজের গায়ে বঁড়শীর ন্যায় বক্র কাঁটা থাকে, পশুপক্ষীর পায়ে লাগিয়া তাহা স্থানান্তরিত হয়—যেমন ওকড়া, ভাঁটুই বা চোরকাঁটা। প্রত্যেক গাছেরই বীজ হয় প্রচুর—উদ্দেশ্য নানান বিঘ্ন বিপত্তিতে বিনাশ বাঁচাইয়া বংশরক্ষা করা। পরগাছা জাতীয় গাছের বীজও এমনি করিয়া ছড়াইয়া বড়লোকের মোসাহেবের মতন পরের স্কন্ধে দিব্য আরামে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে জীবন কাটায়।

এইরূপে বহু দৃষ্টান্তের দ্বারা একথা বার বার প্রতিপন্ন হইয়াছে যে উদ্ভিদ ভিতরে বাহিরে একেবারেই জড় নয়, পর্ব্বত প্রস্তর মৃত্তিকা স্তূপের সহিত তাহাদিগকে এক করিয়া দেখা কোনো মতেই চলিতে পারে না। মহামতি ডারউইন-প্রমুখ পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিৎ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বারম্বার দেখাইয়া আসিয়াছেন যে চেতনা বলিয়া একটা জিনিস উদ্ভিদজগতেও কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্যমান আছে—অনুভূতি জিনিসটাও তাহাদের নিকট একেবারে অপরিচিত নহে।

বনচাঁড়া লেরজাগরণ ও নিদ্রা।

আজ বিশ্বের প্রবীণ বৈজ্ঞানিক সুধীজনমণ্ডলীর মাঝে বাংলার ও বাঙ্গালীর গৌরব জ্ঞানতপস্বী আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার নবোদ্ভাবিত তরুলিপি যন্ত্রের সাহায্যে সন্দেহের অতীত করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে একমাত্র প্রাণীজগতই যে সুখ দুঃখের অনুভূতির দাবী করিতে পারে তাহা নহে—উদ্ভিদজগতেরও তাহার উপর ষোলো আনা দাবী আছে। আনন্দে তাহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠে, যাতনায় তাহারা মুহ্যমান হইয়া পড়ে—মৃত্যুর সময় পশুপক্ষী বা মানবের মতই তাহাদিগকেও যোঝাযুঝি করিতে হয়; মন বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহাও যে আংশিক ভাবে উদ্ভিদের ভিতর নাই একথা জোর করিয়া বলা, কোনো মতেই চলে না। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের এই বৃক্ষের মনস্তত্ত্বের আবিষ্কার নিঃসন্দেহই বিংশ শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য

(সমালোচনা)

(১)

গীতাঞ্জলি পশ্চিমের সাহিত্যের অরণ্যে দাবানলের মত গিয়া পড়িয়াছে, এ সংবাদ যখন আমরা প্রথম পাই, তখন এই ঘটনার আকস্মিকতা আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিকে তাঁহার শ্রেষ্ঠকাব্য বলিয়া আমাদের মনে হয় নাই, সুতরাং তাহাকে লইয়া এতটা মাতামাতির ব্যাপার কেন হইল, তাহার কারণটা আমরা ঠিকমত বাহির করিতে পারি নাই।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাঞ্জলি যে কেবলমাত্র বাংলা গীতাঞ্জলির অনুবাদ নয়, আমাদের মধ্যে অনেকেই তাহা জানিতেন না। তাহাতে পাঁচ সাজির ফুল একত্র করা হইয়াছিল। নৈবেদ্যের অনেক ভাল ভাল কবিতা, খেয়ার বহু কবিতা, গীতাঞ্জলির গান এবং গীতিমাল্যেরও প্রায় ১৫।১৬টি গানের অনুবাদ ইংরেজী গীতাঞ্জলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং ইংরেজী গীতাঞ্জলি একপ্রকার রবিবাবুর শেষ বয়সের কবিতার "কষ্টিপাথর"।

আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন অক্সফোর্ডে এক সান্ধ্য সভায় রবিবাবুর গোটাকতক বাছা বাছা কবিতার অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলাম! আমার সৌভাগ্যক্রমে তখন রবিবাবুর নিজ কাব্যের অনুবাদচেষ্টা অসম্ভবের রাজ্যে বাষ্প মুড়ি দিয়া নিদ্রিত ছিল—সে যে সম্ভবের দেশে কোন দিন পক্ষবিস্তার করিবে, এমন স্বপ্নও কেহ দেখে নাই। আমি তাই নিশ্চিন্ত মনে একটা দুঃসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিলাম। আমার রচনার সৌষ্ঠব বা কলাচাতুর্য্য, ভাষার মাধুর্য্য বা বিশুদ্ধি, উৎকৃষ্ট কি মাঝারি কি নিকৃষ্ট সে দিকে কেহ লক্ষ্যমাত্র করিল না—আমি বাংলা কাব্যের পরিচয়বহনকার্য্যে সেই পাদপহীন দেশে স্বচ্ছন্দে দ্রুম বলিয়া চলিয়া গেলাম।

সোনার তরী, চিত্রা ও চৈতালীর অনেকগুলি কবিতার সঙ্গে গোটা দুইতিন মাত্র নৈবেদ্য ও খেয়ার কবিতার অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলাম। শ্রোতাদের মধ্যে আমার দু-একজন বন্ধু নৈবেদ্য ও খেয়ার কবিতাগুলিকেই সর্ব্বোত্তম বলাতে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা বলিলেন—"প্রেমের কবিতা আমাদের দেশে এত জমিয়াছে যে পাঠকেরা আর তাহাতে স্বাদ পায় না। টেনিসন্, ব্রাউনিং, জর্জ্জ এলিয়ট্ প্রভৃতির 'বস্তুতন্ত্র' সাহিত্যেও জগৎটা এমনি গায়ে-ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে, যে, তাহার 'মায়া' যেন সূর্য্যাস্তে মেঘের চতুর্দ্দিকের চঞ্চল বর্ণচ্ছটার মত আর হিল্লোলিত হইয়া বেড়ায় না—সব যেন বড্ড স্পষ্ট, বড্ড নিরেট, বড্ড বেশি গোচর! আমরা তাই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের মোহাঞ্জন চোখে পারতে চাই; সেই অঞ্জন পরিয়া জগৎকে, মানুষকে, মানুষের প্রেমকে নূতন করিয়া দেখিতে চাই। ইয়েট্স্ প্রভৃতি কেল্টিক্ অভ্যুত্থানের কবিদল, ফ্রান্সিস্ টম্প্‌সন্, জন্ মেস্‌ফিল্ড প্রভৃতি আধুনিক ইংরেজ কবিগণ সেই অঞ্জন চোখে মাখাইয়াছেন বলিয়া পাঠকেরা তাঁহাদের আদর করে। নৈবেদ্য ও খেয়ার কবিতার মধ্যে সেই অতীন্দ্রিয়-রাজ্যের অনির্ব্বচনীয় রস আছে—রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতায় সে রস নাই।"

কথাটা তখন আমার মনে লাগিয়াছিল, কিন্তু আধুনিক ইংরেজি কাব্যের সহিত আমার পরিচয় যথেষ্ট ছিল না বলিয়া আমি ভাল করিয়া কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। ইয়েট্সের কাব্য লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ইয়েট্সের কাব্যের মধ্যে বিশেষত্ব যে কি, তাহা বুঝিলাম না। প্রাচীন কেল্ট-পুরাণকাহিনীকে ছন্দোবদ্ধ করাতেই যদি কোন বিশেষ বাহাদুরী থাকে তবে সে স্বতন্ত্র কথা। ইংলণ্ডে সবাই বলিত ইয়েট্স্ একজন অসাধারণ "মিষ্টিক্"। যাহা কিছু দুর্ব্বোধ্য ও হেঁয়ালী তাহাকেই "মিষ্টিক" আখ্যা দেওয়া হয়, ইহাই জানিতাম। এখনকার কালের সাহিত্যে হঠাৎ যে দক্ষিণে হাওয়া মাধবীবনে পুষ্পবিকাশ বন্ধ করিয়া পূবদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া পূবে হাওয়া হইয়া আকাশকে রহস্যগম্ভীর জলদজালে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, সে খবর কে জানিত! ইউরোপের ইতিহাসে পড়িয়াছি মধ্যযুগকে বলিত Dark ages, অন্ধকারের যুগ। সেই অন্ধকারের খনি খুঁড়িয়া যে রাশি রাশি মধ্যযুগের ভক্ত, সাধক ও কবিদের মণি-মালা গাঁথিয়া তুলিবার প্রভূত আয়োজন চলিতেছে, তাহাই বা কে জানিত! সেন্টফ্রান্সিস্ অব্ অ্যাসিসি, ম্যাডাম গেঁয়ো, রিচার্ড রোলে, জুলিয়ান অব্ নরবিচ্, ক্যাথারিন ডি সায়েনা, ইত্যাদি নামই লোকে ভুলিয়া ছিল। এ ছাড়া কোথায় পারসিক, কোথায় ভারত-বর্ষীয়, কোথায় চৈন,—সকল দেশের "মিষ্টিক"দের যে তলব পড়িয়াছে, এ দেশে বসিয়া শেক্সপীয়র, বার্ক, টেনিসন্ পড়িয়া পরীক্ষা পাস করিবার উদ্যোগে সে-সব সংবাদের কিছুই আমাদের কাছে আসিয়া হাজির হয় নাই। পশ্চিমের লোকেরা যেমন জানে যে মহাভারতের প্রায় আড়াই লক্ষ শ্লোক এবং রামায়ণের আটচল্লিশ হাজার শ্লোক এবং যতরাজ্যের অসম্ভব অলৌকিক গাঁজাখুরী গল্পই হিন্দুসাহিত্য—কেবল উপমা অনুপ্রাস ও অলঙ্কারের ঘটা, শব্দের চাতুর্য্য এবং তত্ত্বের কচ্‌কচি তাহাকে এমনি ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে যে আপাদমস্তক গহনামণ্ডিত দেহের মত, তাহার গড়ন যে কেমন, সৌন্দর্য্য যে কেমন, তাহা বুঝিবারই জো নাই—আমরাও তেমনি জানি যে পশ্চিমের সাহিত্য মানে সেই শেক্সপীয়র এবং টেনিসন্ এবং তাহাদের সমালোচকবর্গ। পশ্চিমের লোকেরা যখন আমাদের গালি দেয় যে তোমাদের কলাবোধ নাই, আমরা পাল্টা জবাব দিই যে, ও বোধটা তোমাদের জন্য কায়েম করিয়া রাখিয়াছি; তোমরা তো তত্ত্বের ধার ধারনা, ঐ বস্তুর বোধ ভিন্ন আর কোন্ বোধ তোমাদের জন্মিবে বল?

যাহাই হউক, আমাদের অজ্ঞাতসারে বিধাতা-পুরুষের গোপন দূতেরা হাওয়ার মুখে পশ্চিমের কলা-সৌষ্ঠববোধের বীজ এদেশে আনিয়া ফেলিয়াছিল এবং এ দেশের ভারি ভারি তত্ত্বের বীজ ও সাধনার বীজ ওদেশে লইয়া যাইতেছিল! আমরা ভাবের খনি হইতে সোনার তাল তুলিয়া আনিতেছিলাম, তাহাতে সোনার ভাগের চেয়ে পাথর ও মাটির ভাগই জেয়াদা ছিল—সেই সোনা গালাইয়া আমরা তাহা দ্বারা হার

বানাই নাই। উহারা আবার তত্ত্বরন্ত নিঃশেষে ছেদন করিয়া অত্যন্ত মিহিসূত্রে ভাবের ফুলের মালা গাঁথিবার চেষ্টায় ছিল; তাহাতে মালাগাঁথা কোনমতেই জমিতেছিল না। আমাদের সঙ্গে উহাদের তফাৎটা ছিল এই যে, আমাদিগকে যে কারণেই হৌক্ বাধ্য হইয়া পশ্চিমের সাহিত্য পড়িতে হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে সেই সাহিত্য হইতে রস আদায় করিয়া আমাদের নিজেদের সাহিত্যের সঙ্গে তাহার একটা সজীব সম্বন্ধ স্থাপন করিতেও হইয়াছিল। এইরূপে আমরা বিদেশী সাহিত্য হইতে যে আহার পাইয়াছিলাম তাহাকে অল্পে অল্পে জীর্ণ করিয়া আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু বিদেশীরা আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে কিছুই জানিত না—শুধু জানিত এই যে হিন্দু সাহিত্যে অনাবশ্যক মালমসলা এতই অধিক যে তাহার মধ্য হইতে রস আদায় করা বিষম শক্ত। সংস্কৃত সাহিত্যের উপমার আড়ম্বরের এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুপ্রাসের ঘটার যেটুকু রস পশ্চিমীরা চাখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদের বিতৃষ্ণা জন্মাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল।

সকলেই জানেন যে ইংরেজী গীতাঞ্জলি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাহা যে এক মুহূর্ত্তেই ইংরেজ পাঠকের মন হরণ করিয়াছিল, তাহা কেবল ভাবের সৌন্দর্য্যের জোরে নয়, ভাষার ও রচনার আশ্চর্য্য কলা-সৌষ্ঠবের জোরে।

Have you | not heard | his si | lent steps ? |
He comes, | comes, | ever comes |
তোরা শুনিস্‌নিকি শুনিস্‌নি তার পায়ের ধ্বনি?
সে যে আসে, আসে, আসে।

গদ্যানুবাদে ছন্দের এমন দোল ইতিপূর্ব্বে ইংরেজী সাহিত্যে কাহারও রচনায় প্রকাশ পায় নাই। হুইট্‌ম্যান্ মিল বাদ দিয়া গদ্যে কাব্য রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে গদ্যই হইয়াছে, কাব্যের ভাষার ললিত নৃত্যগতি সে গদ্যে জাগে নাই। এড্‌ওয়ার্ড কার্পেন্টার Towards Democracy নামক গ্রন্থে সেই একই প্রয়াস করিয়াছেন, কিন্তু তিনি হুইটম্যানী ধাঁচার ভাষা ও ভঙ্গিমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন—তাঁহার গদ্যের একটানা প্রবাহে ছন্দের তরঙ্গদোললীলা জমে নাই। সেই জন্য গীতাঞ্জলির ছন্দযুক্ত গদ্যের তুলনা খুঁজিতে গিয়া ইংরেজ সমালোচক-বর্গকে হিব্রু সামগাথার (Psalms) কথা পাড়িতে হইয়াছে।

তারপর শুধু ছন্দ নয়, শুধু ভাষার শিল্পমাধুর্য্য নয়, এ কবিতায় প্রাচ্যদেশসুলভ অলঙ্কারবাহুল্য পশ্চিমবাসীগণ একেবারেই লক্ষ্য করেন নাই। অধ্যাত্ম উপলব্ধির বাণীতে যে অলঙ্কার সাজে না, কারণ—

অলঙ্কার যে মাঝে প'ড়ে
মিলনেতে আড়াল করে
তোমার কথা ঢাকে যে তার
মুখর ঝঙ্কার।—

—সে কথাটি হয়ত ও-দেশের লোকেরা ভাল করিয়া ভাবে নাই। অলঙ্কার অধ্যাত্ম উপলব্ধির বাণীর গভীরতাকে ঢাকুক্ বা না ঢাকুক্, সে যে কবিতার কলা-সৌষ্ঠবকে নষ্ট করে, ইহাই তাহার বিরুদ্ধে সকলের চেয়ে প্রবল অভিযোগ। অতএব এই নিরাভরণ সরল কবিতার বিরল সৌষ্ঠব পশ্চিমের রসগ্রাহীদিগের মনকে এক মুহূর্ত্তে অধিকার করিয়াছিল।

অলঙ্কার বাদ দিয়া একেবারে অনাবৃত উলঙ্গ করিয়া কলামূর্ত্তি গড়িবার সাধনা এখনকার কবিদের একটি প্রধান সাধনা। এ কাল যে আবরণ মোচন করিবার কাল—বহুযুগসঞ্চিত সংস্কারের একটি একটি করিয়া আবরণ খসাইয়া সমাজকে, মানুষকে, মানুষের সম্বন্ধ-গুলিকে, বিশ্বজগৎকে একেবারে তাহার যথাযথ মর্ম্মস্থানে দেখিবার জন্য এ-কালের মানুষের মন যে চেষ্টা করিতেছে, তাহার প্রমাণ আধুনিক সাহিত্য হইতেই প্রচুর পাওয়া যায়। হেন্‌রিক্ ইবসেন্, মেটারলিঙ্ক, বার্নার্ড শ, এচ জি ওয়েল্‌স্, হাউপ্‌টম্যান্, বদ্‌লেয়ার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের যে-কোন রচনা পড়িলেই দেখা যাইবে যে, হয় সমাজের কোন পাকাপোক্ত সংস্কারের পর্দ্দা তুলিয়া সমাজের ভিতরকার জীবননাট্যলীলাকে তাঁহারা উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতেছেন, নয় স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধঘটিত সংস্কারকে ছিন্ন করিয়া তাহাদের সম্বন্ধের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিতেছেন—কোন-না-কোন জায়গায় তাঁহাদের আঘাত আবরণ ছিন্ন করিবার জন্য উদ্যত।

সাহিত্যের এই ভিতরের চেষ্টা বাহিরে নিরাভরণ ভাষার ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। সাহিত্য রচনার কোন আলঙ্কারিক প্রথা বা নিয়ম (Conventions) এ কালের সাহিত্যিকেরা মানেন না। সেই জন্য তাঁহাদের রচনা সময়ে সময়ে এত ন্যাড়া হইয়া পড়ে, যে, পড়িয়া কোন রসই পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার প্রধান কারণ তাঁহারা অনেকেই নিজেদের সম্বন্ধে অতি-সচেতন। আমি একটা কিছু বলিতেছি, আমি এমন করিয়া লিখিয়া থাকি, আমি ভাষার বা সাহিত্যিক প্রথাপদ্ধতির ভারি একটা বদল করিয়া দিতেছি—এ কথা কোন কবি বা সাহিত্যিক লিখিবার সময়ে ভাবিলেই তাঁহার রচনা কখনই সরলতার মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিবে না। অবলীলাক্রমে যে কাজটি হয়, তাহাতেই সৌন্দর্য্য ফোটে। যে গায়ক গানের প্রত্যেক তালটিতে লয়টিতে তানটিতে অত্যন্ত বেশি ঝোঁক দেয় অর্থাৎ সে সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাহার গানের মাধুর্য্য নষ্ট হইতে বাধ্য। এই জন্য আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যখন ভাবের প্রেরণার হাতে কবিরা আপনাদিগকে সমর্পণ করেন, তখনই তাঁহাদের সঙ্গীত ফুলের মত রঙে ও গন্ধে পূর্ণ হইয়া ফোটে; ঢেউয়ের মত কলক্রন্দনে বাজিতে থাকে; বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য, সকল আনন্দের সঙ্গে একাসন গ্রহণ করে। ইউরোপে আধুনিক কালে একজন কবিও নাই, যিনি এমনি আত্মভোলা সরল। সেই কারণে তাঁহাদিগকে বলিতে হয় এবং তাঁহারাই আপনাদিগকে বলিতে সুরু করিয়াছেন—

> তোমরা কেউ পারবেনা গো
> পারবেনা ফুল ফোটাতে।
> যতই বল যতই কর
> যতই তারে তুলে ধর
> ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন
> আঘাত কর বোঁটাতে।
> তোমরা কেউ পারবেনা গো
> পারবেনা ফুল ফোটাতে।

তাঁহাদের কাব্যরচনা ঐ বোঁটায় আঘাত করা মাত্র—আলঙ্কারিক প্রথাকে ভাঙিবার প্রয়াস মাত্র—কিন্তু ফুল ফুটিয়াছে কোথায়? সেই ফুল ফুটিয়াছে "গীতাঞ্জলি"তে। সেই জন্য তাহার বাহ্য সৌষ্ঠবেই ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের মন সর্ব্বপ্রথমে ভুলিয়াছিল।

(২)

আমি বলিয়াছি যে দ্রাক্ষা হইতে মদ চুলাইয়া লইবার মত বাস্তব সাহিত্য নিঙড়াইয়া যেটুকু রস আদায় করিবার তাহা পূর্ণ মাত্রায় আদায় করিয়া অবশেষে পশ্চিমের সাহিত্যের রসপাত্র রিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গ্যয়টে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস্, টেনিসন প্রভৃতি কবিদিগের কাব্যে এখনকার কালের মানুষের মন আর রস পাইতেছিল না। এখন নূতন সাকীর প্রয়োজন। বাস্তব লোকের রসাস্বাদন তো হইল, এবার অতীন্দ্রিয় লোকের মধু যে কেমনতর তাহা আস্বাদন করা চাই। একদল নূতন সাকী অত্যন্ত আভরণহীন, ছায়ার মত না-যায়-ধরা না-যায়-ছোঁয়া গোচের পাত্রে সেই 'নন্দন-বন-মধু' ভরিয়া আনিলেন এবং রসপিপাসুদিগকে বিতরণ করিলেন। ইয়েটস্ প্রভৃতি কেল্টিক অভ্যুত্থানের কবিগণ, ফ্রান্সিস্ টম্প্‌সন্ প্রভৃতি 'মিষ্টিকে'র দল মিষ্ট রস পরিবেষণে আসর জম্‌কাইয়া পুরাতন সাকীদিগের রস-ভাণ্ডারে একেবারেই কুলুপ লাগাইয়া দিলেন। এখন হইতে অতীন্দ্রিয় লোক এবং বাস্তব লোকের মধ্যে যে পর্দ্দা ছিল, তাহা ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হইয়া উড়িতে লাগিল। কবির সেই ক্ষণিকার "এক গাঁয়ে" কবিতার মত এই দুই লোকের মধ্যে রহস্যলীলা চলিতে লাগিল মন্দ না—

> "তাদের ছাদে যখন ওঠে তারা
> আমার ছাদে দখিন হাওয়া ছোটে;
> তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ-ধারা
> আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।"

সেখানকার হাওয়া আসিয়া এখানকার পুষ্প ফোটায়, সেখানকার পরীদের গান এখানকার বনমর্ম্মরে নদী নির্ঝরে শোনা যায় এবং নবীন সাকী সেই গান শুনিয়া গাহিয়া ওঠেন—

> Fairies, come take me out of this dull world
> For I would ride with you upon the wind,
> Run on the top of the dishevelled tide
> And dance upon the mountains like a flame!

> ওগো পরীরা, এই নিরানন্দ জীর্ণ জগৎ থেকে আমায় নিয়ে যাও,
> আমায় বের করে নিয়ে যাও।
> তোমাদের সঙ্গে আমি পবন-মাতলির পৃষ্ঠে চ'ড়ে ছুটব,
> বন্যা যখন তার কুন্তল এলিয়ে দেবে,
> তখন তার চূড়ায় চূড়ায় আমি চলব

এবং পর্ব্বতে পর্ব্বতে অগ্নিশিখার মত নৃত্য করব।

—The Land of Heart's Desire (W. B. Yeats).

ইঁহারা বলেন যে এই বাস্তব জগৎ তো আসল জগৎ নয়—সেই অদৃশ্য ছায়ার জগৎই আসল জগৎ। কারণ যাহাকে বাস্তব বলিতেছ, তাহার বস্তুত্ব কোথায়? সীমা, যে ক্রমাগতই তাহার সীমারূপ পরিত্যাগ করিতেছে, সে কথাটা তো আজ বিজ্ঞান অণুপরমাণুর মধ্যে পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিতেছে। ইয়েট্‌স্ তাঁহার The Shadowy Waters নামক পরম রমণীয় স্বপ্নের একটি নাট্যে নায়কের মুখ দিয়া বলাইতেছেন—

All would be well
Could we but give us wholly to the dreams,
And get into their world that to the sense
Is shadow, and not linger wretchedly
Among substantial things; for it is dreams
That lift us to the flowing, changing world
That the heart longs for.

যদি স্বপ্নের হাতে আমরা আমাদের ছেড়ে দিতে পারতুম,
সে কি চমৎকার হ'ত।
যে জগৎটা ইন্দ্রিয়ের কাছে ছায়ার মত,
যদি সেই জগতে প্রবেশ পেতুম,
যদি কঠিন বস্তুগুলোর মধ্যে হতভাগ্যের মত
দিন গোঁয়াতে না হ'ত!
যে জগৎ কেবলি ব'য়ে চল্‌ছে, কেবলি বদ্‌লে চল্‌ছে,
হৃদয় যার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে রয়েছে—
ওগো এই স্বপ্নই যে আমাদের সেই জগতে পৌঁছে দেবে।

এখনকার কাব্যের এই জগৎ—এই flowing changing world। এই বাস্তব জগতের মাঝখানেই সেই অদৃশ্য জগৎ; এই বাস্তব রাজ্যের মধ্যেই সেই ছায়ার লীলা, সেই স্বপ্নের গতায়াত; এই "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।" ফ্রান্সিস্ টম্প্‌সনের নিম্নলিখিত কবিতাটিতে এই একই ভাবের সাক্ষ্য পাওয়া যায়—

O world invisible, we view thee,
O world intangible, we touch thee,
O world unknowable, we know thee,
Inapprehensible, we clutch thee!

Does the fish soar to find the ocean,
The eagle plunge to find the air—
That we ask of the stars in motion
If they have rumour of thee there?

Not where the wheeling systems darken,
And our benumbed conceiving soars!—
The drift of pinions, would we hearken,
Beats at our own clay-shuttered doors.

হে অদৃশ্য জগৎ, আমরা তোমায় দেখ্‌ছি;
হে অস্পর্শ জগৎ, আমরা তোমায় স্পর্শ করছি;
হে অজ্ঞাত জগৎ, আমরা তোমায় জান্‌ছি;
হে ধারণার অগম্য, আমরা তোমায় মুষ্টি দিয়ে ধরছি।

সমুদ্রকে পাবার জন্যে মাছকে কি উড়তে হয়?
আকাশকে অনুভব করবার জন্যে পাখীকে কি
ডুব দিতে হয়?
যে অগণ্য গ্রহচন্দ্র শূন্যপথে বেগে ঘূর্ণ্যমান,
তারা তোমার খবর পেয়েছে কিনা সে কথা
আমরা জিজ্ঞাসা করছি কেন?
যেখানে সেই চক্রপথে ভ্রাম্যমান গ্রহেরা অন্ধকার
জমিয়ে আছে,
আমাদের মন যেখানে উড়তে গিয়ে হতচেতন
হ'য়ে ফিরে আস্‌ছে—
সেখানে নয় সেখানে নয়।
আমরা যদি শুন্‌তে পেতুম তবে দেখ্‌তুম যে স্বর্গের পাখার ব্যাধুনন
আমাদের এই দেহের মৃদর্গলবিশিষ্ট দ্বারের কাছেই শোনা যাচ্ছে

গীতাঞ্জলির কবিতায় এই অদৃশ্য, অস্পর্শ, অজ্ঞাত জগতের রূপস্পর্শ, রসগন্ধ অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং অসন্দিগ্ধ রূপে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই নবীন সাকীর দল এই কবিকে তাহাদের সকলের সেরা জানিয়া তাঁহারি ললাটে জয়মাল্য বাঁধিয়া দিয়াছে এবং কাব্যের কুঞ্জবনে তাঁহাকে রত্ন-আসনে উপবেশন করাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জগৎও "flowing changing world" চিরবহমান চিরপরিবর্ত্তমান জগৎ—"খ'সে যাবার ভেসে যাবার ভাঙবার" জগৎ।

পাগলকরা গানের তানে
ধায় যে কোথা কেই বা জানে,
চায় না ফিরে পিছন পানে
রয়না বাঁধা বন্ধে রে,
লুটে যাবার ছুটে যাবার
চল্‌বারই আনন্দে রে।

এই জগৎ যেমন বহমান চলমান, এই জগতের যিনি স্বামী তাঁহাকেও কবি নিশ্চল নির্ব্বিকল্প নির্গুণ ঈশ্বর করিয়া ভাবেন নাই। লোকলোকান্তর জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া জীব-অভিব্যক্তির যে যাত্রাপথ বাহিয়া আমাদের প্রত্যেকের জীবনখানি পূর্ণ পূর্ণতর হইয়া চলিয়াছে, সেই

পথেই যিনি সকল পথের অবসান যিনি পরম পরিণাম তিনি সঙ্গীরূপে পথিকরূপে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিতেছেন। কবির জীবনে জীবনে এই লীলা করিবার জন্য তিনিও বাহির হইয়াছেন। "আমার মিলন লাগি তুমি আস্‌ছ কবে থেকে?"—সে কোন্ অনাদিকাল হইতে যে তিনি বাহির হইয়াছেন, তাহা কে জানে! সেই জন্যই তো এই পরিচিত জগদ্দৃশ্যের মধ্যে সেই অদৃশ্যের ছায়া পড়ে—"O world invisible, we view thee!"

একদিন ভরা শ্রাবণের প্রভাতে যখন রাত্রির মত সমস্ত নিস্তব্ধ, যখন কাননভূমি কুজনহীন এবং ঘরে ঘরে সকল দ্বার রুদ্ধ, তখন সেই নিরুদ্ধ নিস্তব্ধ বর্ষাপ্রভাতের জনশূন্য পথে চকিতের মত সেই অনাদিকালযাত্রী একক পথিকের ক্ষণিক দর্শন মিলিয়া যায়—

> কুজনহীন কাননভূমি,
> দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে,
> একেলা কোন্ পথিক তুমি
> পথিকহীন পথের পরে।

এমনি করিয়াই ক্ষণে ক্ষণে কত দৃশ্যে কত গন্ধে কত রসে সেই অদৃশ্য অনির্ব্বচনীয় পরমরসকে বারম্বার পাওয়া গিয়াছে—

> বিশ্বের সবার সাথে, হে বিশ্ব-রাজন্
> অজ্ঞাতে আসিতে হাসি আমার অন্তরে
> কত শুভদিনে; কত মুহূর্ত্তের পরে
> অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ!

তবেই দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার ঐক্য স্থির ও ধ্রুব হইয়া আছে এবং ইহাদের মধ্যে বস্তুতই কোন দ্বৈত নাই—কবির কাছে এই বৈদান্তিক মতের কোন অর্থ নাই। কারণ জগতের সমস্ত রূপরূপান্তর এবং মানবজীবনের সমস্ত পরিবর্ত্তনপরম্পরাকে 'মায়া' বলিয়া উড়াইয়া দিয়া একটি নিশ্চল শূন্য এককে একমাত্র করিবার একান্ত চেষ্টা করিলেও, মায়া কোন মতেই দূর হইবার নহে। ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের মিলনের মধ্যে যে একটি চিরবিরহ আছে, এই মায়াই যে উভয়ের মধ্যে সেই বিরহের ব্যবধান রচনা করিয়াছে। ইহাতেই তো মিলনের সার্থকতা। নহিলে মিলন যে আছে এ কথাটাই কে অনুভব করিত?

> হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
> ভুবনে ভুবনে রাজে হে।
> কত রূপ ধরে' কাননে ভূধরে
> আকাশে সাগরে সাজে হে।

সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় বেদনা, তাহা এই বিরহেরই বেদনা। গ্রহতারার অনিমেষ দৃষ্টির মধ্যে সেই বিরহের চিরব্যাকুলতা। মানব-প্রেমের ও বাসনার সকল অতৃপ্তির মধ্যে সেই অনাদিবিরহের বেদনা। এই বিরহই রূপ ধরিতেছে বলিয়া রূপ ক্রমাগতই "flowing and changing" বহমান এবং পরিবর্ত্তমান।

গীতিমাল্যের একটি কবিতায় এই মায়ার তত্ত্ব বড় চমৎকার করিয়া কবি ব্যক্ত করিয়াছেন—

> আমি আমায় করব বড়
> এই ত আমার মায়া;—
> তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে
> ফেল্‌ব রঙীন্ ছায়া।
> তুমি তোমায় রাখ্‌বে দূরে,
> ডাকবে তারে নানা সুরে
> আপনারি বিরহ তোমার
> আমায় নিল কায়া।

কবি বলিতেছেন, এই যে আমি নিজেকে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জানিতেছি, ইহাই তো মায়া! কিন্তু এই মায়াটি যদি না থাকিত, তবে কি আমাদের কান্নাহাসি, আশা ভয় এমন নানা রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠিত—তবে যে বিচিত্রতার কোথাও কোন স্থানই থাকিত না। এই তাঁতে আমাতে যে আড়াল রহিয়াছে, তাহাতেই তো "দিবানিশির তুলি দিয়ে হাজার ছবি আঁকা" হইতেছে—এই মায়ার পর্দ্দাখানি না থাকিলে কি এত রং, এত আঁকা বাঁকা কিছুই থাকিত—বর্ণ ও আকার লোপ পাইয়া সমস্তই একমাত্র অখণ্ড এক হইয়া যাইত না? ভাগ্যে এই মায়া ছিল, নহিলে ঈশ্বরেরই বা আপনাতে আপনি থাকিয়া কি আনন্দ ছিল, এবং আমাদেরই বা অহঙ্কার বিলুপ্ত হইয়া তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কি আনন্দ ছিল?

> তাই তোমার আনন্দ আমার পর
> তুমি তাই এসেছ নীচে।
> আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
> তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।

মায়ার আড়ালে সসীম ও অসীমের এই খেলাটাই সমস্ত জগতের খেলা, সৃষ্টির খেলা, আমাদের জীবনের খেলা বলিয়া সসীম ক্রমাগতই অসীমে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছে এবং অসীম ক্রমাগতই সসীম রূপে আপনাকে ধরা দিতেছে। আমাদের জীবনের পথে যেমন আমাদের জীবন "প্রতিপদেই উৎসুক, অধীনা কোন্ নিরুদ্দেশের তরে", সেইরূপ সেই পথের যিনি চিরসঙ্গী তাঁহারও রূপের অন্ত নাই। ক্ষণে ক্ষণে তন্নবতামুপৈতি। সন্ধ্যার গভীর ছায়াগহন নদীর ঘাটে কোন্ "অজানার বীণাধ্বনি" বাজে, ঝড়ের রুদ্র মাতনির মধ্যে "মেঘের জটা" উড়াইয়া কাহার অকস্মাৎ আবির্ভাব হয়, "প্রভাতের আলোর ধারায়" কাহার একটি নতমুখ মুখের উপর প্রেমদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ঋতুতে ঋতুতে সেই চিরন্তন পথিক কত নব নব রঙীন্ বেশে দেখা দেয়। শুধুই কি তাহার মনোহরণ বেশ! প্রভাতে শুধু "অরুণবরণ পারিজাত লয়ে হাতে" সোনার রথে চড়িয়া বাতায়নের কাছে একটি বার আসিয়া ঘরের অন্ধকারকে আনন্দে কম্পিত করিয়াই কি সে চলিয়া যায়? তাহার ঝড়ের বেশ। তাহার মৃত্যুর বেশ। জীবনের সকল রূপের মধ্যেই সেই অপরূপের লীলা।

(৩)

আমরা দেখিলাম যে, গীতাঞ্জলির হিরণ্ময় পাত্রখানি অতীন্দ্রিয় লোকের অনির্ব্বচনীয় রসে পূর্য্যমান এবং ইয়েট্স্, টম্প্সন্ প্রভৃতি আধুনিক কোন কবির কাব্যের পেয়ালা সেই রসে এমন ভরপুর নহে বলিয়া গীতাঞ্জলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া আদৃত হইয়াছে। কিন্তু গীতাঞ্জলিতে যদি কেবলমাত্র দৃশ্য এবং অদৃশ্য জগতের মাঝখানের পর্দ্দাটি তুলিয়া ধরা হইত এবং এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উপরে সেই অতীন্দ্রিয় জগতের অপরূপ আলো পড়িয়া সকল রূপরস সকল শব্দগন্ধকে যে কি অনির্ব্বচনীয় বেদনায় ঝঙ্কৃত করিয়া তোলে, যদি গানে কবি তাহারই আভাস মাত্র দিতেন,—তবে কাব্য হিসাবে ইহা অতুলনীয় হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু গীতাঞ্জলিতে শুধু উপলব্ধির কথা তো নাই—কেমন করিয়া সেই উপলব্ধি সম্ভাবনীয় হইল তাহার 'সাধনার' ইতিবৃত্তও আছে। কাব্য হিসাবে এই সাধনার ইঙ্গিতসম্বলিত কবিতাগুলি নিকৃষ্ট—ফরাসী গীতাঞ্জলির ভূমিকায় কবি আঁদ্রে গিদ্ এইরূপ কোন কোন কবিতাকে নৈতিক কবিতা বলিয়াছেন দেখিলাম।

ইংরেজী গীতাঞ্জলি নৈবেদ্য হইতে গীতিমাল্য পর্য্যন্ত সমস্ত কাব্যগুলি হইতে অবচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাপুষ্পের সাজি—সুতরাং তাহার কোন কোন কবিতা সম্বন্ধেই যদি গিদের এ কথা মনে উদয় হইয়া থাকে, তবে কেবল মাত্র বাংলা গীতাঞ্জলি পাঠ করিলে এ কথা তাঁহার পুনঃ-পুনঃই মনে হইত। বাংলা গীতাঞ্জলির গানগুলিতে কবির অধ্যাত্ম "সাধনা"র বার্ত্তার ভাগই বেশি; পরিপূর্ণ উপলব্ধির বাণীর ভাগ কম। কিন্তু গীতিমাল্যে সাধনার কথা অল্প গানেই আছে, প্রায় নাই বলিলেই হয়। উপলব্ধির কথা বড় সরল বড় মধুর করিয়া বলা হইয়াছে।

বাংলা "গীতাঞ্জলি"র যে-সকল গানে কবির অধ্যাত্ম সাধনার আভাস ইঙ্গিত আছে সেগুলি পরে পরে সাজাইলে কবির সাধনার একটি সুস্পষ্ট চেহারা ধরিতে পারা যায়। মোটামুটি সাধনার তিনটি ধারা আমি ধরিতে পারিয়াছি; যথা—

১। সংসারের দুঃখ আঘাত বেদনার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। ইহারা তাঁহার "দূতী"; তিনি যে আমাদের জন্য অভিসারে বাহির হইয়াছেন ইহারাই সেই সংবাদ জানায়। আমাদের চিত্ত যখন অসাড় থাকে, তখন এই দুঃখ আঘাতই তো তাঁহার স্পর্শ, তিনিই আমাদের জাগাইয়া দেন। ধূপকে না পোড়াইলে সে যেমন গন্ধ দেয় না, দুঃখের আঘাত ভিন্ন আমাদের জীবনের পূজা তাঁহার দিকে উচ্ছ্বসিত হয় না। কবি তাই বলিয়াছেন "আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে।" এই ব্যথার গানই তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি।

২। "সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।" অহঙ্কারের বাঁধন যতক্ষণ প্রবল, ততক্ষণ বিশ্বের সকলের সঙ্গে এবং ভগবানের সঙ্গে মিলন হইতেই পারে না—কারণ অহঙ্কার "সকল সুরকে ছাপিয়ে দিয়ে আপনাকে যে বাজাতে চায়।"

গীতিমাল্যের একটি গানে আছে—

বেসুর বাজে রে
আর কোথা নয় কেবল তোরি
আপন মাঝেরে।

এই অহঙ্কারের মধ্যেই সমস্ত বেসুর,—এই খানে বিশ্ব প্রতিদিন প্রতিহত, আনন্দ সংকীর্ণ, প্রেম সংকুচিত। এই অহংটিকে তাঁহার পায়ে বিসর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত আমাদের শান্তি নাই।

৩। এ দেশের "সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে" অপমানের তলায় ভগবানের চরণ নামিয়াছে—সেই খানে তাঁহাকে প্রণাম না করিলে তাঁহাকে প্রণাম করাই হইবে না। সেই খানে তাহাদের সঙ্গে এক না হইলে "মৃত্যু মাঝে হ'তে হবে চিতাভস্মে সবার সমান"—সেই বড় যাত্রায়, সেই সকল মানুষের মধ্যে ভিড়ের মধ্যে কর্ম্মযোগে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া সকল কর্ম্ম করিতে হইবে, তবেই মুক্তি। কারণ

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাট্‌চে যেথায় পথ
খাট্‌চে বারো মাস।

বাংলা "গীতাঞ্জলিতে" কবির সাধনার ধারার এইরূপ সুস্পষ্ট চেহারা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, গীতাঞ্জলিতে ও গীতিমাল্যে যে-সকল কবিতায় সাধনার সফলতার মূর্ত্তি পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহারা যে কত সত্য তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

কিন্তু সচরাচর আর্টিষ্টের কাছে আমরা তাহার সাধনার শ্রেষ্ঠ ফলটাই পাই, কেমন করিয়া সে ফল ফলিল সে সংবাদ চাপা থাকে। কারণ, পাকশালায় রন্ধনের সামগ্রী যখন স্তূপীকৃত, তখন তাহাতে কোন আনন্দ নাই; কিন্তু যখন অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়, তখনই ভোজের প্রকৃত আনন্দ। 'গীতাঞ্জলি"র এই সাধনার কবিতাগুলি কবিতা হিসাবে নিকৃষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে কবির সমস্ত স্বরূপটি কেমন সহজে কেমন অনায়াসে এই কাব্যের মধ্যে ধরা দিয়াছে। এ যেন কবির প্রতিদিনের ডায়ারী —শুধু প্রভেদ এই যে মানুষ ডায়ারী লিখিবার কালে প্রায়ই আপনার সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু সচেতন না হইয়া পারে না। এই কাব্যে কবির অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম অভিজ্ঞতাগুলি পরে পরে বাহির হইয়া আসিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যের স্পর্শে তাঁহার অপূর্ব্ব পুলক, তাঁহার অপেক্ষা ও আশা, আপনার সঙ্গে আপনার দ্বন্দ্ব, প্রবল দুঃখ ও আঘাতের মধ্য দিয়া কেবলি জাগরণ, তাঁহার সুদূর পরিণামের দৃষ্টি—সমস্তই স্তরে স্তরে, পত্রে পত্রে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। শিল্পীর মত কেবল শিল্পের শ্রেষ্ঠ ফল দান করিয়া কবি বিদায় লন্ নাই, তিনি এই কাব্যে আপনাকে সম্পূর্ণ করিয়া দান করিয়াছেন। এইখানেই গীতাঞ্জলির বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের জন্যই পশ্চিমে এই শ্রেণীর অন্যান্য সকল কাব্যের অপেক্ষা গীতাঞ্জলির সমাদর এত অধিক হইয়াছে। এই কাব্যে মানুষের জীবনের মধ্যে কবির সাধনা গিয়া আঘাত করিতেছে। আমার যতদূর মনে পড়ে গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে একখানি পত্রে ষ্টপফোর্ড ব্রুক এই কথাটিই বলিয়াছিলেন।

কিন্তু কবির অধ্যাত্ম 'সাধনা'র কথা মানুষের যতই উপকার সাধন করুক, তাহা সেই "আঘাত করা বোঁটাতে"—তাহা "ফুল ফোটানো" নহে। একজনের সাধনা আর একজনের জীবনকে সাহায্য করিতে পারে বটে, কিন্তু সাধনা নিজেই যখন কূলে উত্তীর্ণ হয় নাই, তখন তাহার উপর নির্ভর করিতে গেলে, যে ব্যক্তি নির্ভর দেয় এবং যে ব্যক্তি নির্ভর করে উভয়কেই ডুবিতে হয়। সকল দেশেই গুরুবাদ এইজন্য অন্ধ অনুকরণেরই সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ কোন একজন মানুষের পন্থা আর একজনের পন্থার সমান নহে। যে যে-পন্থা দিয়াই যাউক, গম্যস্থানে পৌঁছিয়া সেখানকার কথা বলিলে আর ভয় নাই,—কারণ সেখানকার আনন্দের হিল্লোল তখন সকল বিচিত্র পথের মধ্যেই সমান হিল্লোলিত হইবে। আমাদের দেশের লোক সাধনার বিচিত্রতাকে— "Varieties of Religious Experience"কে— উইলিয়ম জেমসের মত বৈজ্ঞানিক ভাবে বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক—একটি বিষয়ে এদেশের লোকের বোধ সুপরিণত হইয়াছে। অধ্যাত্ম সাধনার ফলটিতে ঠিক পাক ধরিল কিনা, তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝি।

কথায় আমাদের চিড়া ভিজাইতে পারে না। আমাদের দেশের লোক শ্রুতিধারণের মত করিয়া যে-সকল ভক্তদের বাণী ও সঙ্গীত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহা শ্রবণমাত্র আমরা এ বিষয়ে আমাদের 'জাতির' প্রতিভা বুঝিতে পারিব। ভক্তির সঙ্গে ভেক এদেশে মিশিয়া আছে সত্য; কিন্তু কালের চালুনিতে ভেকের রচনা তলায় থিতাইতেছে কই?

আমরা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনবৃক্ষের পরিণামের দিকে চাহিয়া আছি; একটা "গীতাঞ্জলি"কেই আমরা সেই জীবনমহাবৃক্ষের পরিণত ফল বলিতে যাইব কেন? গীতাঞ্জলিকে পশ্চিম বেশি বুঝিয়াছে, একথা তাহারা গর্ব্ব করিয়া উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিলেও আমরা তাহা সত্য নয় জানি। যথার্থ বোধ জনসংখ্যার আধিক্যের উপর নির্ভর করে না। পৃথিবীর কোন কবিকেই বহুলোকে বুঝে নাই। আমরা যে কবিকে তাঁহার সমগ্র কাব্য-জীবনের ভিতর হইতে দেখিতেছি—তাঁহার জীবনের পশ্চাতে যে বহুযুগের অধ্যাত্ম রসধারা তাঁহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে তাহাকে দেখিতেছি,—কিছুই আমাদের কাছে ঝাপ্‌সা নহে। আমরা জানি তাঁহার প্রাণের মূল জীবনের সুখদুঃখময় সকল বিচিত্র রসের মধ্যে কত দুরে গভীরতম তন্তুতে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছে এবং সমস্ত বিশ্বের আলোকে সমীরণে নানা আঘাতে বিকাশ লাভ করিয়া দিকে দিকে সেই বিচিত্র জীবনের রসপুষ্ট কাব্যের শাখাপ্রশাখা কি আশ্চর্য্য পত্রপুষ্পে শোভিত হইয়া আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। ক্রমে যখন শাখাগ্রভাগে পরিণত জীবনের ফল ধরিল, তখন তাহার কাঁচা রং আমরা দেখিয়াছি—তখনও তাহা রসে মধুর হয় নাই, জীবনের ভোগের বৃন্তে তাহার জোড় দৃঢ়বদ্ধ। ক্রমে ভিতরে ভিতরে রসে যখন সে পূর্ণ হইতে লাগিল, তাহার ভিতরের সেই পূর্ণতা তাহার বাহিরে আত্মদান-রূপে অত্যন্ত অনায়াসে যখন প্রকাশ পাইল, তাহার পুষ্পদল ছিন্ন হইয়া তাঁহার ভোগের বৃন্ত শিথিল হইল—তখন তাহার সেই বিশ্বের কাছে নিবেদিত অঞ্জলিকে আমরা যে চিনি নাই, একথা স্বীকার করিনা। কিন্তু সেই অঞ্জলিকেই সম্পূর্ণ বলিতে যাইব কেন? সে তো রসের ভারে একেবারে অবনত হয় নাই—তাহার রসের কথার চেয়ে তাহার সাধনার কথা তাহার বেদনার কথা যে অধিক। এই নবপ্রকাশিত গীতিমাল্যের গানগুলি রসে টুস্‌টুসে ফলের মত—স্পর্শমাত্রেই যেন ফাটিয়া পড়িবে। ইহার মধ্যে সাধনার বিশেষ কোন বার্ত্তাই নাই—সেইজন্য বেদনার মেঘ-মলিনিমা নাই। আগাগোড়া আনন্দের জ্যোতির্ম্ময় উচ্ছ্বাস। গীতাঞ্জলি এবং গীতিমাল্য এই দুই নামের মধ্যেই দুই কাব্যের পার্থক্য দিব্য সূচিত হইয়াছে। গীতাঞ্জলি যেন দেবতার পায়ে সসম্ভ্রমে গীতি-নিবেদন—সেখানে "দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে, বন্ধু ব'লে দুহাত ধরিনে।" গীতিমাল্য বঁধুর গলায় গীতিমাল্যের উপহার। দূরত্বের বাধা দূর হইয়া অত্যন্ত নিকট নিবিড় পরিচয়।

> বঁধুর কাছে আসার বেলায়
> গানটি শুধু নিলেম গলায়
> তারি গলার মাল্য ক'রে
> করব মূল্যবান।

কিন্তু ইহার কথা এত সংক্ষেপে সারিয়া দিবার মত নহে। আগামীবারে সেই গীতিমাল্যের গীতিপুষ্পগুলির বর্ণ ও গন্ধের অপূর্ব্বতার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। আজ এইখানেই আমার পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

পঞ্চশস্য

জাপানী খোঁপা—

আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে উড়ের মাথায় যেমন ঝুঁটি দেখিতে পাওয়া যায় প্রাচীনকালে জাপানী পুরুষের মাথায়ও তেমনি দীর্ঘ-কেশের ঝুঁটি ছিল। এবং আশ্চর্য্যের কথা যে তাহাদের বেণী রচনার জন্য বিশেষ লোক থাকিলেও রমণীগণের জন্য সেরূপ কোনো লোক ছিল না। অগত্যা রমণীগণকে স্বহস্তেই স্ব স্ব বেণী রচনা করিতে হইত।

আজকাল সকল জাপ-নারীই পেশাদার বেণীরচয়িত্রীর নিকট চুল বাঁধিয়া থাকেন। বাঙালীর অন্তঃপুরে যেমন নাপিতানীর নিত্য আবির্ভাব হয়, জাপ-অন্তঃপুরে বেণীরচয়িত্রীও তেমনি ঘন ঘন যাতায়াত করে। সাধারণত রমণীগণ তিন চার দিন অন্তর একবার করিয়া চুল বাঁধেন; ধনীনন্দিনী বা নর্ত্তকীদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহারা প্রত্যহই বাঁধেন। চুল বাঁধিতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। চলন-সই রকম কবরী রচনা করিতে দশ পয়সা আন্দাজ ব্যয় হয়। সৌখিন উঁচুদরের কবরী ছয় সাত আনার কমে হয় না।

জাপানের একটি প্রসিদ্ধ কেশপ্রসাধন-গৃহ।

জাপানী আধুনিক খোঁপা ইগা মুসুবি। সোকুহাৎসু খোঁপা।
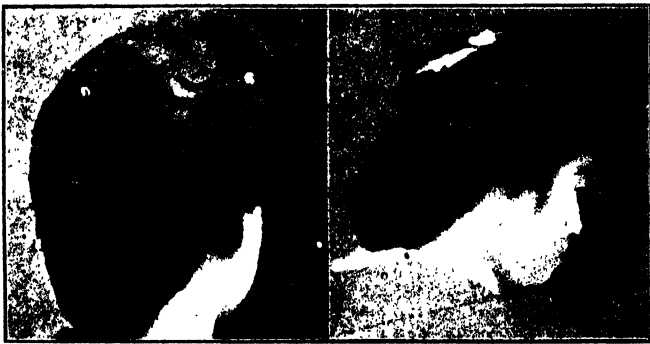
জাপ-নারীর নানা আকারের নানা ভঙ্গীর রমণীয় কেশপ্রসাধনকে কেহ যদি মূর্ত্তিগঠন ও চিত্রাঙ্কনেরই ন্যায় আর্টের অন্তর্ভুক্ত করেন তো তাঁহাকে দোষ দেওয়া চলে না। পটের উপর লিখিত রেখা হিল্লোল যেমন করিয়া আমাদের মন মোহিত করে, জাপ-নারীর সুদীর্ঘ ঘন কৃষ্ণ মসৃণ কেশদামে রচিত কবরীর তরঙ্গও দর্শকের চিত্ত তেমনি উল্লসিত করিয়া তোলে।

প্রথম যে-ব্যক্তি জাপ-নারীর কেশপ্রসাধনের ব্যবসা গ্রহণ করে সে ছিল এক পুরুষ। থিয়েটারে ব্যবহারের জন্য সে পরচুলার খোঁপা নির্ম্মাণ করিত। তখনকার দিনে জাপানী অভিনেত্রী একেবারেই ছিল না, পুরুষেই নারীর অংশ অভিনয় করিত। নানা প্রকার নূতন নূতন কবরী রচনায় তাহার দক্ষতা দেখিয়া প্রথমে নর্ত্তকী প্রভৃতি ও পরে গৃহস্থের বধূগণও তাহার দ্বারাই স্ব স্ব বেণী রচনা করাইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশ তাহার দেখাদেখি রমণীরাও এই ব্যবসায় আরম্ভ করিলে পুরুষটি আসর হইতে সরিয়া পড়িল।

জাপানী খোঁপা রীতিমত একটি ইমারত বিশেষ; বাংলা খোঁপার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর নয়। জাপানীর মাথার বালিশ কাষ্ঠনির্ম্মিত, মধ্যভাগ হাড়িকাঠের মত করিয়া কাটা; তাহার মধ্যে গ্রীবাদেশ স্থাপন করিয়া জাপ-নারী নিদ্রা যান। মাথা শূন্যে ঝুলিয়া থাকে, তাই বালিশের সহিত ঘর্ষণে কবরী নষ্ট হয় না। স্নানের সময়, কেবল চুল বাঁধিবার দিন নারীগণ মাথা ভিজাইয়া থাকেন; অন্য দিন আকণ্ঠ চৌবাচ্চায় ডুবাইয়া গাত্র মার্জ্জনা করেন মাত্র। তবে আজকাল ইস্কুলের মেয়েরা কতকটা য়ুরোপীয় ধরণে চুল বাঁধিয়া থাকেন। সেরূপ কবরী দেখিতে সুদৃশ্য, অথচ স্বহস্তে বাঁধাও অসম্ভব নয়। আর একটি লাভ এই যে ইচ্ছা করিলে প্রতিদিন মাথায় জল ঢালিতে পারা যায় এবং হাড়িকাঠে গলা না দিয়া তুলার বালিশে মাথা রাখিয়া ঘুমানো যায়। এই শ্রেণীর কবরীর মধ্যে "সোকুহাৎসু" খোঁপাই সমধিক প্রচলিত।

চুল বাঁধিতে নানা প্রকার চিরুনি, কাঁটা ও যন্ত্রপাতি, সূক্ষ্ম সোনালি সূতা, কোমল রঙীন কাগজ, ছোট ছোট ইস্পাতের স্প্রীং প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক বেণীরচয়িত্রীর সঙ্গে দুই একজন শিক্ষানবিশ থাকে। সাধারণত তাহারা পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া, যিনি চুল বাঁধিবেন তাঁহার কেশপাশ মুক্ত করিয়া ধৌত করে এবং আঁচড়াইয়া সুগন্ধি মাখাইয়া প্রস্তুত করিয়া রাখে। তারপর ওস্তাদ

জাপানী খোঁপা।

মারুমাগে খোঁপা।　　　　শিমাদা খোঁপা।

আসিয়া কেশগুচ্ছ তৈলমর্দ্দনে মসৃণ করে। সমস্ত কেশ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া সম্মুখের দিকে একটি গুচ্ছ মুখের উপর দিয়া বিলম্বিত করিয়া দেওয়া হয়। পশ্চাতে মধ্যভাগে প্রধান গুচ্ছ এবং দুই পার্শ্বে দুটি ছোট ছোট্ট গুচ্ছ ঝুলাইয়া দিয়া বেণীরচনা আরম্ভ হয়।

প্রথম শ্রেণীর বেণীরচয়িত্রী কাহারো বাড়ীতে যায় না। তাহারই দোকানে আসিয়া চুল বাঁধিয়া যাইতে হয়।

চুল বাঁধিবার সময় বেণীরচয়িত্রীগণ পোশাকের উপর সাদা আলখেল্লা পরে। অনেকটা হাঁসপাতালের নার্স্‌দের মত।

কোনো কোনো রমণী বেণীরচনা ব্যবসায়ে মাসিক ৭৫-১০০টাকা উপার্জ্জন করে। যে-সকল রমণী এ কার্য্যে খুব দক্ষ তাহাদের উপার্জ্জন মাসিক বহু শত মুদ্রা।

"শিমাদা"-খোঁপা বাঁধে কুমারী ও নর্ত্তকীগণ। বিবাহিতা নারীর খোঁপার নাম "মারুমাগে"।

সু।

তামাকের পূর্ব্বইতিহাস (B. M. J.)—

পৃথিবীর প্রায় সব দেশে এবং সকল জাতির মধ্যে তামাকের প্রচলন থাকিতে দেখা যায়। সভ্য দেশে অতিথিসৎকারের পক্ষে তামাক একটা নিত্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। তামাক না হইলে আমাদের যেন চলিতেই পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তামাকের সঙ্গে আমাদের বেশি দিনের পরিচয় নয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে তামাক বলিয়া একটা যে কিছু আছে সভ্য জগতে কেহই তাহা অবগত ছিলেন না। সে সময় মানুষ তামাকের অভাবটা কি দিয়া পূরণ করিত, সেটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ১৫৯৭ খৃঃ অব্দে ইয়ুরোপে তামাকের যে বেশ ব্যবহার ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। লিলি (Lyly) সে সময় তামাককে "our holly hearbe Nicotine" বলিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। অনেকে অবশ্য তামাকের মোটেই পক্ষপাতী নহেন। একিলিসের ক্রোধে পড়িয়া গ্রীকদের যেমন দুর্গতির সীমা পরিসীমা ছিল না, ইঁহাদের বিশ্বাস তামাকের নেশায় পড়িয়া মানুষেরও দুর্গতির অবধি নাই। অতিরিক্ত ধূমপানে যে অপকার হয় তাহা নিশ্চয়। অতিমাত্রায় সৃষ্টির কোন্ জিনিসের না অপকার হয়? তামাকখোরদের মধ্যে মধ্যে তামাকের প্রতি বিরাগ জন্মিতে দেখা যায়, তাঁহারা আর খাইব না বলিয়া তামাকের তোড়যোড়গুলিকে বিদায় করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বসিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য তাঁহাদের এই প্রতিজ্ঞা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। দুদিন বাদে তামাককে আবার আদর করিয়া বরণ করিয়া লইতে হয়। Charles Lamb (চার্লস্ ল্যাম্ব) The Confessions of a Drunkard নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটিতে তামাকখোরদের তামাক ছাড়ার পর কি দশা হয়, তাহার একটা সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। "তামাক! ও যে আমাকে কী ভয়ানক রকম পেয়ে বসেছিল, তা কি পাঠকদের বুঝাতে পারি? আমি যে ওর দাসানুদাস ছিলাম। ওর ভয়ঙ্কর বশীভূত ছিলাম। যখনই ওর দাসত্ব ত্যাগ করব বলে মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, কে যেন আমার হৃদয়ের কানে কানে এসে বলেছে 'হারে অকৃতজ্ঞ!' কে যেন বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে, দীননেত্রে আমার সহানুভূতিটুকুর দাবি

ভিক্ষা করেছে। (Joseph Andrew) যোষেফ্ আণ্ড্রুর উপন্যাসে সরাইয়ের চাকর আদমের চিম্নি-ঘরের কোণে বসিয়া পাইপ্ টানার কথা প'ড়ে, কিম্বা Complete Angler (কম্প্লিট্ এঙ্গ্লার) গ্রন্থে (Piscator) পিস্কেটরের প্রাতঃকালীন ধূমপানের কথা পড়ে' আমার কত দিনের সংযম মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে ধূলিকণার মত শূন্যে বিলীন হ'য়ে গেছে। আবার সেই পাইপটাকে (pipe) মনে পড়েছে। যেমনি মনে পড়া, অমনি ধূমপানের প্রবল আনন্দ যেন আমার চোখের সামনে মূর্ত্তিমান হ'য়ে প্রকাশ হয়েছে! আমি আবার সেই দেবী বা রাক্ষসীর সেবায় মগ্ন হয়েছি। ও! সে কি আনন্দ! বহু দিনের পর আবার আমার চোখের সম্মুখে ধূম্রপটল কুণ্ডলী হ'য়ে ঊর্দ্ধের পানে উত্থিত হয়েছে! সুগন্ধে ঘর ভরপুর—মন ভরপুর। কে যেন জীবনের সকল ব্যথার উপর ঘুমপাড়ানি হাত বুলিয়ে গেল! আলো! চোখের সামনে আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু তারপর? তারপর কেবল অন্ধকার! গাঢ় অন্ধকার! মুহূর্ত্তেকের জন্য সান্ত্বনা ও শান্তি—তার পর শান্তি নয়, শুধু অশান্তির অভাব মাত্র! তারপর মর্ম্মে মর্ম্মে অসন্তোষ, বৃশ্চিক-দংশন ও উদ্বেগের প্রচণ্ড কশাঘাত! তারপর দুর্দ্দশার পরাকাষ্ঠা—দুর্গতির শেষ সোপানে অবরোহণ! তবু কি আমি রাক্ষসীর মোহ ত্যাগ করতে পেরেছি! আমার আর উদ্ধারের পন্থা নাই। তামাক আমার হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করেছে।" বলা বাহুল্য ল্যাম্ব্ তামাক আর মদের নেশায় খিচুড়ি পাকাইয়া বসিয়াছেন। তামাক-বিদ্বেষীদের তামাকের বিরুদ্ধে অভিযানের এ একটা মন্দ ছুতা নয়। তাঁহারা বলেন—তামাক আর মদের মধ্যে যেন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আর তামাকখোরদের অবস্থাটা (Calverley) ক্যাল্‌ভার্লীর কথায়—

ধীরে ধীরে ধীরে
বুদ্ধি যায় উড়ে।
ভায়া যেন সিম্পাঞ্জি
দেহখানা গিরগিটি।
হিতাহিত জ্ঞান,
করে তিরোধান।
চোক রাঙিয়ে সদা
বৌকে লাগায় গদা।
চুরী ডাকাতি খুন
এ তিনে সুনিপুণ।"
ছুরী বসিয়ে উদরে
আত্মঘাতী হয়ে মরে।

বেচারা তামাকের উপর এ কী অন্যায় অবিচার! Ode to Tobacco র কবি তামাকের সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলেছেন আমাদের কাছে তাহাই সত্য বলিয়া বোধ হয়। পরিমিত মাত্রায় তামাক যে কোন অনিষ্ট করে, একথা জোর করিয়া বলা যায় না।

লোকের বিশ্বাস (Sir Walter Raleigh) সার্ ওয়াল্টার্ র‍্যালেই সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকা হইতে ইয়ুরোপে তামাক আমদানী করেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে (Francis Drake) ফ্রান্সিস্ ড্রেক্ নামক এক নাবিক কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথমে তামাক আনীত হয়। ড্রেক্ যে জাহাজের নাবিক ছিলেন সার্ ওয়াল্টার্ র‍্যালে সেই জাহাজে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহারও ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী দেশে আঁদ্রে তেভে (Andre Thevet) নামক এক ব্যক্তি তামাক আনয়ন করেন। (Dr. Charles Singer) ডাক্তার চার্লস্ সিঙ্গার্ ১৯১৩ সালের জুলাই মাসের Quarterly Review পত্রিকায় তামাকের পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি তামাকের পূর্ব্ব ইতিহাসের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না, কেননা ডাক্তার সিঙ্গার যে-সকল সূত্র হইতে তাঁহার প্রদত্ত বিবরণের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলি সম্পূর্ণ প্রামাণিক ও মৌলিক। সিঙ্গার বলেন প্রাচীন ভূখণ্ড তামাকের জন্মভূমি নহে। ইহা আমেরিকা হইতে তথায় আনীত হইয়াছে। আমেরিকা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইয়ুরোপবাসীর তামাকের সহিত পরিচয় হয়। কলম্বাস্ (Columbus) আমেরিকায় পদার্পণ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে তামাকের সহিত পরিচিত হয়েন। তিনি যে দ্বীপটিতে অবতরণ করেন তাহার নাম "Guanahani" বা San Salvador। তাঁহার রোজনামচা (Journal) বহিতে সোমবার ১৫ই অক্টোবর তারিখ দিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি উল্লিখিত থাকিতে দেখা যায়;—

"স্যাণ্টা মেরিয়া (Santa Maria) ও ফার্ণেন্‌ডাইনা (Fernandina) দ্বীপ দুটির মধ্যে যে একটা খাঁড়ী আছে, তার মধ্যে যখন আমি পৌঁছাই, তখন দেখি একটা লোক ডোঙায় চ'ড়ে ওর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে; তার ডোঙায় এক টুকরা রুটি, লাউয়ের খোলায় কতকটা পানীয় জল, কতকটা লাল গোছের মাখা মাটি আর কতকগুলা শুক্‌না পাতা ছিল। পাতাগুলা সেখানকার লোকদের খুবই প্রিয় জিনিস হবে; কেননা স্যান্ স্যাল্‌ভেডরে (San Salvador) থাকবার সময়, তারা আমাকে এই পাতা কতকটা উপহার দিয়েছিল।"

সিঙ্গার (Singer) বলেন এই পাতা যে তামাকের পাতা সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। আর ঐ লাল মাটি যে তামাককে উহার সঙ্গে মাখিয়া ব্যবহার করিবার জন্য, এও কতকটা অনুমান করা যায়। ভারতবর্ষে মাটি না হোক্ এক রকম গুড়ের সঙ্গে মাখিয়া যে তামাকের ব্যবহার প্রচলিত আছে এ অবশ্য অনেকেরই জানা আছে।

ইহার কয়েক দিবস পরে কলম্বাস্ কিউবা (Cuba) দ্বীপে উপনীত হ'ন। তিনি তথায় শুনিলেন ভিতরে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা আছেন। কলম্বাস সেই রাজার উদ্দেশে দুই জন দূত প্রেরণ করেন। দেশটা যে কি দেশ কলম্বাস্ তখনও তাহা জানিতে পারেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস তিনি আশিয়ার উপকূলে ক্যাথে (Cathay) নামক স্থানে আসিয়াছেন। আর এই রাজ্যটা বাদসার রাজ্য বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। ২।৩ দিবস পরে দূতেরা ফিরিয়া আসিল। তাহারা দর্শনযোগ্য কোন জিনিসেরই বর্ণনা করিতে পারিল না। দেশটায় নগর উপনগর প্রভৃতি কিছুই নাই, কেবল কতকগুলা গ্রাম অসভ্য বর্ব্বরদের বাসভূমি। এই দুই দূত এই-সব অসভ্যদের যে বর্ণনা করে, তাহা Las Casas (লা কাসাস) তাঁহার Historia de las Indians নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ডাক্তার সিঙ্গার্ (Dr. Singer) তাহার খানিকটা উদ্ধৃত করিয়াছেন;—"স্ত্রী পুরুষ দলে দলে গ্রামের মধ্যে আনাগোনা করিতেছিল—পুরুষদের সকলেরই হাতে একখণ্ড করিয়া জ্বলন্ত কাঠ আর এক রকম শুকনো পাতা ছিল। এই পাতার খানিকটা অন্য কোন গাছের পাতায় বন্দুকের নলের আকারে জড়াইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া তাহার ধূম পান করিতে দেখা গিয়াছিল ইহাতে তাহাদের যেন বেশ নেশার ভাব হইতেছিল। মদ খাইলে যেমন সব ইন্দ্রিয় অসাড় হয়, ইহাতেও তাহাদের কতকটা যেন সেই রকমই হইতেছিল। ইহাদের জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে, ইহাতে তাহাদের বেশ শ্রান্তিনাশ করে, শরীর মোটেই ক্লান্ত হইতে পায় না।" তামাকের সম্বন্ধে

উল্লেখ এই সর্ব্ব প্রথম পাওয়া যায়। এস্থলে একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক tabaco (ট্যাব্যাকো) আর tobacco (টোব্যাকো) ঠিক এক জিনিস নয়। নলাকারে পাকান তামাকের পাতাকে আদিম আমেরিকানরা ট্যাব্যাকো (tabaco) বলিত। লা কাসাস্ সিগারের আকারে তামাক ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—তাঁহার গ্রন্থে নস্য ব্যবহারের কোন কথা পাওয়া যায় না।• কিন্তু ১৪৯৪ খৃঃ অব্দে কলম্বাস যখন দ্বিতীয়বার আমেরিকায় যান তখন নস্যের আকারেও তামাকের ব্যবহার থাকিতে দেখিয়াছিলেন। আমেরিকাবাসীরা যে প্রণালীতে ধূমপান করিত তাহার সর্ব্বপ্রথম চিত্র Gonzalo Fernandes de Oviedo Valdes এর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি ১৫১৪ খৃঃ অব্দে আমেরিকায় পদার্পণ করেন এবং ১৫২৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করেন। ইনি আমেরিকা সম্বন্ধে দুই খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার প্রথম গ্রন্থ ১৫২৬ খৃঃ অব্দে, ও দ্বিতীয় গ্রন্থ ১৫৪৭ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক গ্রন্থেই ধূমপান বিষয়ে একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় থাকিতে দেখা যায়। দ্বিতীয় গ্রন্থখানিতে আবার তামাক খাওয়ার একটা নলেরও ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। ধূমপান প্রসঙ্গে ইনি লিখিয়াছেন—

তামাকের গাছ ও আমেরিকাবাসীর তামাক খাওয়া।
[আঁদ্রে তেভের পুস্তক হইতে গৃহীত।]

"Espanola (এস্প্যানোলা) দ্বীপের লোকদের যে-সব কুঅভ্যাস আছে, তাহাদের মধ্যে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা tabaco (ট্যাবাকো) নামক একটা পদার্থের ধূমপান করিয়া একবারে অচৈতন্য হইয়া পড়ে। এর জন্য ইহারা এক রকম গাছের পাতা ব্যবহার করে। এই পাতার গাছ ৪।৫ হাত দীর্ঘ হয়। পাতাগুলি বেশ চওড়া, পুরু মকমলের ন্যায় কোমল, আর ইহার রঙটা ডাক্তারেরা যাহাকে "bugloss" (বাগ্‌লস্) বলেন তাহারই মত শ্যামল।" এই পাতা কি করিয়া ব্যবহার করিতে হয় ওবেইদো তাহারও বর্ণনা করিয়াছেন। "গ্রামের মধ্যে যাহারা প্রধান তাহাদের একটা করিয়া ফাঁপা নল থাকিত। নলটা কয়েক ইঞ্চি দীর্ঘ, কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মত মোটা। ইহার আকার অনেকটা ইংরাজি Y অক্ষরের মত। এই নলটাই তাহাদের ধূমপানের যন্ত্র। নলের যেদিকে দুটি বাহু আছে সে দিকটা দুটা নাকের মধ্যে দিবার জন্য আর অন্য দিকটা জ্বলন্ত তামাকের পাতার ধূঁয়ের মধ্যে রাখিবার জন্য। এই নলের সাহায্যে তাহারা যতবার ইচ্ছা ধূমপান করিত। সাধারণতঃ ২।৩ বার টানিলেই অজ্ঞান হইয়া পড়িত। যাহাদের পূর্ব্বোক্ত রূপ নল নাই তাহারা ঘাসের কিম্বা শরের নলের সাহায্যে ধূমপান করিত। ধূমপানের এই নলকে তাহারা tabaco (ট্যাবাকো) বলিত। তামাকের পাতাকে তাহারা বহুমূল্য জিনিস জ্ঞান করিত। ইহার বহু আবাদও হইত। ধূমপানকে তাহারা যে কেবলই উপকারী মনে করিত তাহা নহে—পুণ্য কাজ বলিয়াও বিশ্বাস করিত। গ্রামের মণ্ডলী বা মাতব্বর ব্যক্তিরা ধূম টানিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িত। ইহাদের স্ত্রীরা (স্ত্রীও অনেকগুলি) উঠাইয়া লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইয়া রাখিত। অজ্ঞান হইয়া পড়িবার পূর্ব্বে স্ত্রীদের প্রতি যদি পূর্ব্বোক্তরূপ আদেশ না থাকিত, তাহা হইলে, স্বামীদের সেই অবস্থায় ফেলিয়া তাহারা যেখানে খুসী গমনাগমন করিতে পারিত, কিন্তু জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই হাজির হইতে হইত। ধূমপান করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ায় কি যে আনন্দ আমি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমি শুনিয়াছি কতকগুলি খৃষ্টানও নাকি ধূমপান অভ্যাস করিয়াছে। বসন্ত রোগের নিদারুণ যন্ত্রণা লাঘব করিবার জন্যই নাকি ইহাদের ধূমপান ধরা। কেননা যতক্ষণ বেহুঁস্ হইয়া থাকা যায় ততক্ষণ কোন যন্ত্রণাই অনুভব করা যায় না। আমি কিন্তু ইহাকে জীবন্মৃত মনে করিয়া থাকি।"

এখানে দুটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে। তামাকের গুণের বর্ণনা পড়িয়া আমাদের মনে হয় সেকালে তামাকের যেরূপ মাদকতাশক্তি ছিল, এখন আর ততটা আছে বলিয়া মনে হয় না। আর ধূমপান শুধু পুরুষেই করিতে পাইত, স্ত্রীলোকের ধূমপানের কোন অধিকার ছিল না। সিঙ্গার মনে করেন Hernando Cortes (হার্ণেণ্ডো কর্টেস্) নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃকই ইয়ুরোপে তামাকের প্রচলন হয়। ইনি মেক্সিকো বিজয়ের পর ইয়ুরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৫১৪ খৃঃ অব্দে ইনি স্পেনের রাজা ৫ম চার্ল্‌সকে কতকগুলি তামাকের বীজ উপহার দেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্প্যানিয়ার্ড্ ছাড়া আরও কয়েকটি ইয়ুরোপীয় জাতি আমেরিকায় গমনাগমন করে। (Jacquis Cartier) জাকুই কার্ত্তিয়ে নামক একজন ব্রেটন্ (Breton) নাবিক চারি বার আমেরিকায় গমন করে। ১৫৩৫ খৃঃ অব্দে এ ব্যক্তি ক্যানেডায় গমন করিয়া তথাকার অধিবাসীদের ধূমপান করিতে দেখে। ইহার পর আঁদ্রে তেভে নামক একজন ফরাসীকে ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে ব্রেজিলে পদার্পণ করিতে শুনা যায়। এ ব্যক্তি ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে দেশে ফিরিয়া আসে। আসিবার সময় তেভে কতকগুলি তামাকের গাছ সঙ্গে আনিয়াছিল। এ ব্যক্তি একখানি পুস্তকও লিখিয়াছে তাহাতে দুটি অধ্যায় আগাগোড়া তামাকের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ডাক্তার সিঙ্গার উক্ত পুস্তক হইতে নিম্নের অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন—"সেখানে আর এক রকম নূতন গাছ দেখিলাম, লোকে তাহাকে Petan (পেটান্) বলে। ইহারা যেখানেই যাকনা কেন, কতকটা পেটান্ সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। পেটান্ গাছ পুষ্ট হইলে, ইহারা তাহা সংগ্রহ করিয়া একটা ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিয়া শুকাইয়া লয়। ইহার ব্যবহারের প্রথা এইরূপ—একটা বাতির সমান লম্বা একটা তালপাতার নল প্রস্তুত করে, এই নলের মধ্যে কতকটা শুষ্ক পেটান্ পত্র রাখে, তারপর নলটার একদিকে আগুন ধরাইয়া অন্য দিকটা দিয়া নাক কিম্বা মুখ দিয়া ধূম টানিয়া লয়। ইহারা বলে—মাথার মধ্যে অধিক রস সঞ্চিত হইলে, তাহাতে ইহা ভারি উপকারী।

তৃষ্ণা নিবারণ করিতেও ইহার আর সমকক্ষ নাই। কোন বিষয়ে গোপন পরামর্শ করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে ইহারা একবার ধূমপান করিয়া বুদ্ধির গোড়ায় ধুম দিয়া লয়। যুদ্ধ-বিষয়ে পরামর্শ করিতে হইলে, বারম্বার ধূমপান করিবার আবশ্যক হয়। স্ত্রীলোকের ধূমপানের অধিকার নাই। ধূমপান করিলে বাস্তবিকই মাথাটা কতকটা হাল্কা হয়। এদেশে যে-সব খৃষ্টিয়ান আছে, তাহাদের মধ্যেও ধূমপান প্রবেশ করিয়াছে। প্রথমবার ধূমপানে একটু বিপদও যে না আছে এমন নয়। অভ্যস্ত হইবার পূর্ব্বে ধূমপানের পর গা দিয়া পল্ পল্ করিয়া ঘাম ঝরিতে থাকে। দেহে যেন কোন শক্তি থাকে না, গা বমি বমি করে—মূর্চ্ছা হইবার মত হয়। আমি যখন প্রথম তামাক টানি সে সময় আমারও ঐরূপ লক্ষণ হইয়াছিল।" উদ্ধৃত অংশটুকুতে একটা কথা লক্ষ্য করিবার আছে। কার্লাইল্ যে (ফ্রেড্রিক্ দি গ্রেটের পিতা উইল্‌হেল্ম্‌কে ("Tobacco Parliament") টোব্যাকো পার্লামেণ্টের আবিষ্কারকর্ত্তা বলিয়াছেন, সে কথা সত্য বলা যায় না। কেননা ক্যানেডাবাসীদের মধ্যে কোন্ প্রাচীনতম কাল হইতেই উক্ত প্রথা প্রচলিত ছিল। তেভের পুস্তক প্রচারিত হওয়ার ৩ বৎসর পরে (Jean Nicot) জাঁ নিকোট্ নামক এক ব্যক্তি পর্ত্তুগালের রাজার নিকট দৌত্যকার্য্যে প্রেরিত হ'ন। ইনিই ফরাসী দেশে তামাকের আমদানি করেন। ইনি যে আমেরিকায় গিয়া তামাক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন তাহা নহে। পর্ত্তগাল-যাত্রার পথে ইঁহার সহিত একটি ফ্লেমিশ্ (Flemish) ব্যাপারীর সাক্ষাত ঘটে। সে ব্যক্তি ইঁহাকে কতকটা তামাকের বীজ দিয়াছিল। ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি এই বীজের কতকটা কাথেরিন দ্য মেদিচি (Catherine de Medici, ও (Grand Prieur) গ্রাঁ প্রিএয়ুরকে প্রদান করেন। এ সময় (Cardinal de Sainte Croix) কার্দিনাল দ্য স্যাঁত ক্রোয়া ও (Nicolo Tornaboni) নিকোলো তোর্ণাবনি যথাক্রমে পর্ত্তুগাল ও ফ্রান্সে পোপের দূত স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইঁহাদেরই কর্ত্তৃক ইতালীতে তামাকের প্রচার হয়। সে সময় লোকের বিশ্বাস ছিল, তামাক অব্যর্থ ঔষধ। নিকোট্ (Nicot) হইতে তামাকের নাম নিকোটিন্ (nicotine) হইয়াছে। নামকরণটা কিছু অন্যায় ভাবে করা হইয়াছে বলিতে হইবে। তামাকের নাম নিকোটিন্ (nicotine) হওয়ায় তেভের কিছু গাত্রদাহ হয়। তিনিই যে সর্ব্বপ্রথমে ফ্রান্সে তামাক আনিয়াছিলেন তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। তিনি লিখিয়াছেন—"কি আশ্চর্য্য! যে ব্যক্তি তামাকের জন্মভূমি আমেরিকা কখনও চোখে দেখিল না, সে কিনা আমার আনীত জিনিসের তাহার নামে নামকরণ করিল। তামাক যে ক্ষতাদি আরোগ্য করিতে পারে এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক।" নিকোটের উপর রাগ করিয়া তেভে নিজের কথারই প্রতিবাদ করিয়া বসিয়াছেন। ইহার রোগ-প্রতিকারক-শক্তি সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের খুবই বিশ্বাস ছিল। ডাক্তার সিঙ্গার বলেন ক্ষত ও স্ফোটকাদিতে এক কালে ইহার খুবই ব্যবহার ছিল। ইহার antiseptic (পচননিবারক) শক্তি যে আছে একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এ ছাড়া ইহার প্রত্যুপ্রতাসাধক (counter-irritant), অবসাদক (aneasthetic) ও মাদক (narcotic) শক্তিও বড় অল্প নাই। ক্লোরফরম্ (chloroform) আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে ইহার যথেষ্টই ব্যবহার ছিল, একথা সকলেই অবগত আছেন। বমন করাইবার উদ্দেশ্যেও ...কানি রোগে এ কাল পর্য্যন্তও ইহার ... হইয়াছে ১৫৮৬ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে তামাকের ব্যবহার ছিল না। সিঙ্গার কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তিনি বলেন নাবিকদের মধ্যে ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলন ছিল। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্, স্কটলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জেম্‌স্, দেনমার্কের রাজা চতুর্থ ক্রিশ্চিয়ান্ এবং ইয়ুরোপের অন্যান্য নৃপতিবৃন্দ সকলেই ধূমপান নিবারণের জন্য বহুবিধ চেষ্টা করেন। পোপ চতুর্থ আর্বান এবং তাঁহার পর পোপ একাদশ ক্লেমেণ্ট উপাসনা-কালে ভজনালয়ে যাহাতে কেহ ধূমপান না করিতে পারে, তাহার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে এই কথা মনে হয় এক সময়ে লাটিন দেশসমূহে ভজনাকালে ধূমপানের প্রথা প্রচলিত ছিল। যে-সকল দেশ পোপের অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইয়াছিল সে-সকল দেশে অনেক দিন পর্য্যন্ত এই কুপ্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। পাঠকগণ তাহার প্রমাণ সার্ ওয়াল্‌টার স্কটের Heart of Midlothian (হার্ট অফ্ মিড্‌লোথিয়ান্) উপন্যাসে দেখিতে পাইবেন। কাপ্তেন নক্‌ডাণ্ডারকে ভর্ৎসনা করিয়া ডেভিড্ ডীন্‌স্ বলিতেছেন—"তোমার ব্যবহার রেড্ ইণ্ডিয়ানদেরও যোগ্য নয়। গির্জায় বসিয়া উপাসনার সময় তামাকের ধোঁয়া ছাড়িতে কোন খৃষ্টিয়ানই তো পারে না—কোন ভদ্রসন্তানও পারে না।" রাজা রাজড়া আর পোপদের যতই শাসন থাকুক না কেন তামাকের ব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেই চলিয়াছিল। ইহার অবসাদক, শ্রান্তিহারক শক্তির মোহ লোকে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে নাই।

তামাক খাওয়ার প্রাচীনতম চিত্র।
তামাকের ধোঁয়া দিয়া রোগ-চিকিৎসা হইতেছে।
[আঁদ্রে তেভের পুস্তক হইতে গৃহীত।]

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী।

খৃষ্টের জাতি—

যীশুখৃষ্টের জাতি লইয়া মতভেদ আছে। অনেকের মতে তিনি কৃষ্ণকায় ছিলেন, আবার কেহ কেহ বলেন যে তিনি শ্বেতকায়

ছিলেন। কেম্ব্রিজ এনসাইক্লোপিডিয়া কোম্পানী (Cambridge Encyclopedia Company) মুদ্রা সংগ্রহ বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে এ সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারা যায়।

"আমাদের মুদ্রাসংগ্রহ বিভাগে দ্বিতীয় জষ্টিনিয়ানের সময়ের একটি দুর্লভ স্বর্ণমুদ্রা আছে। ইহা ৭০৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। আমরা এই মুদ্রাটি লিঙ্কল্‌ন্ কোম্পানি নামক বিখ্যাত মুদ্রাবিজ্ঞান-বিদ্‌দিগের নিকট ক্রয় করিয়াছিলাম এবং ব্রিটিশ ম্যুজিয়মের মুদ্রা-বিভাগে যাচাই করিয়া লইয়াছিলাম।

ইহার সোজাদিকে জষ্টিনিয়ানের সমগ্র মুখমণ্ডল ও আবক্ষ মূর্ত্তি মুদ্রিত আছে। তদ্ভিন্ন 'জষ্টিনিয়ান খৃষ্টের দাস', এই লিপিও খোদিত আছে। উল্টা দিকে যীশুর পূর্ণ মুখমণ্ডল ও আবক্ষ মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির চুল নিগ্রোদের মতন কোঁকড়া। যীশুর পশ্চাতে ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত এবং 'আমাদের প্রভু, যীশু খৃষ্ট, রাজার রাজা' এই লিপি মুদ্রিত আছে। এই মুদ্রার সাহায্যে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে তখনকার লোকেরা যীশুখৃষ্টকে নিগ্রো বলিয়া বিশ্বাস করিত। এই মুদ্রাটির ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। জষ্টিনিয়ান ওম্মিয়াদগণের পঞ্চম খলিফা আবদুল মালিককে এই মুদ্রায় কর দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু খলিফা গ্রহণ করিতে রাজি না হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যায়।"

এই উক্তিতে নির্ভর করিয়া কাফ্রী নিগ্রোরা আপনাদিগকে যীশু-খৃষ্টের স্বজাতীয় মনে করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন।

শিল্পীর অধ্যবসায়—

মারুয়ামা ওকিয়ো জাপানে যে চিত্রশিল্পী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন তাঁহারা চিত্রাঙ্কণে স্বভাবের অনুকরণ করেন। তিনি ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। শ্রীযুক্ত হারাদা জিরো ইণ্টারন্যাশনাল ষ্টুডিয়ো নামক পত্রে এই ওকিয়ো সম্বন্ধে একটি গল্প বলিয়াছেন। আজকালকার অনেক নবীন শিল্পী দিনে ছয় সাত খানা ছবি আঁকিয়া ফেলেন। এই গল্পটির মধ্যে তাঁহাদের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন তিরস্কার নিহিত আছে।

তানিকাজে কাজিনোসুকে কুস্তিগীর ছিলেন। একদিন তিনি মারুয়ামা ওকিয়োর বাড়ী গিয়া হাজির হইয়া পরস্পরের শক্তি পরীক্ষার এক প্রস্তাব করিলেন। স্থির হইল দুইজনই নিজ নিজ অভ্যস্ত বিদ্যায় পরীক্ষা দিবেন; তানিকাজে তাঁহার দৈহিক বলের শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিবেন, ওকিয়ো তাঁহার চিত্রবিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখাইবেন। দেখা যাউক, কে জয়মাল্য পায়। পরদিন ভোর-বেলা ওকিয়ো তখনো নিদ্রা যাইতেছিলেন; হঠাৎ ঘরের বাহিরে কি একটা পড়ার গুরু শব্দে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দরজা খুলিয়া দেখিলেন তানিকাজে এক বিশাল পর্ব্বতবৎ শিলাখণ্ডে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সাধারণ বার জন লোকও বোধহয় সেটা সহজে নাড়িতে পারে না, তিনি সেই প্রস্তরখণ্ড বহু ক্রোশ দূরস্থিত কুরামা পর্ব্বত হইতে সারা পথ বহিয়া আনিয়াছেন; মাঝে এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম করেন নাই।

এইবার ওকিয়োর পালা। তিনি নিয়মিত ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন, কিন্তু মুহূর্ত্ত মাত্র ছুটি পাইলে আপনার চিত্রশালায় যাইয়া অঙ্কণ করিতেন। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যের অবসান হইত না। ইতিমধ্যে তানিকাজে কয়েকবার খোঁজ করিতে আসিয়াছিলেন কিন্তু তখনও চিত্র শেষ হয় নাই।

প্রায় চারি মাস কাটিয়া গেল; কুস্তিগীর আসিয়া চিত্রকরকে বলিলেন, "আজও যদি তুমি চিত্র না দেখাও তাহা হইলে আমি নিজেকেই জয়ী মনে করিব। আজ আমি সেই পাথরটা ফিরাইয়া যে পাহাড়ের পাথর সেই পাহাড়ে রাখিয়া আসিব বলিয়া আসিয়াছি।"

মৃদুহাস্য করিয়া ওকিয়ো বলিলেন, "আমার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে।" এই বলিয়া একটা রেশমী কাপড়ের তাড়া আনিয়া দিলেন। তানিকাজে ধীরে ধীরে খুলিতে লাগিলেন—রেশমের কাপড়খানি সাত ফুট লম্বা। তানিকাজে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। "এইটা করিতে তোমার চার মাস লাগিল? এই তোমার নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয়!" তানিকাজের বিস্ময়টা একেবারেই ভিত্তি-হীন নহে। শিল্পী কেবল একটি গুণযুক্ত ধনু আঁকিয়াছেন, সেটা প্রকৃত ধনুর সমান মাপের।

ওকিয়ো ধীরভাবে এই কয়েকটি কথা বলিলেন—"কয়েক মাস পূর্ব্বে তুমি যখন রাজপ্রাসাদে কুস্তি দেখাইয়াছিলে, তখন রাজা তোমাকে একটি ধনুক দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। ইহা তাহারই চিত্র। এই ছিলাটি আঁকাই ইহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। কোন-কিছুর সাহায্য না লইয়া ছয় ফুট লম্বা একটি সরল রেখা টানা বড় সোজা ব্যাপার নয়। তুমি যেমন সেই পাহাড়টা পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে একটানে লইয়া আসিয়াছিলে, আমিও তেমনি তুলির এক-টানে এই রেখাটি আঁকিয়াছি। আমি অনেকবার চেষ্টা করিয়া-ছিলাম, কখনও বা রেখা বাঁকিয়া গেল, কখনও বা রেখা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তুলির কালি শেষ হইয়া গেল। তুমি কুরামা পর্ব্বত হইতে শিলাখণ্ড তুলিয়া আনিতে যত কষ্ট ভোগ করিয়াছ, আমি তুলির লিখন টানিতে গিয়াও তেমনি কষ্ট ভোগ করিয়াছি। এস তাহার প্রমাণ দেখাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি তানিকাজেকে আপনার চিত্রাঙ্কণগৃহে লইয়া গেলেন এবং একটা মস্ত বড় বাক্স খুলিয়া দেখাইলেন যে কত রেশমী বস্ত্রখণ্ড ও কত কাগজের টুক্‌রা তুলির একটানে ছয় ফুট রেখা টানার প্রয়াসের ব্যর্থতার সাক্ষ্য দিতেছে। তানিকাজের সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া গেল। তিনি চিত্রখানি মস্তকে স্পর্শ করাইয়া আপনার কৃতজ্ঞতা জানাইলেন, এবং বিদায়-কালে ওকিয়োকে বলিয়া গেলেন, "আমি ইহা অমূল্য রত্নের মত আদর করিয়া রাখিব এবং আমার সন্তান সন্ততিগণও বংশপরম্পরায় ইহাকে সেইরূপ যত্ন করিবে। ধন্য শিল্পীর অধ্যবসায় এবং তাঁহার স্থির লক্ষ্য!"

সৌর চিকিৎসা—

ফরাসী দেশে সূর্য্যকিরণের সাহায্যে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে। এই চিকিৎসা-প্রণালী আশ্চর্য্য ফল প্রদান করিতেছে। ডাক্তার গাই হাঁস্‌দাল The Inter-state Medical Journal নামক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পত্রে এই প্রণালীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। মুক্ত বায়ু সেবনে যে যক্ষ্মা রোগীর প্রভূত উপকার হয় তাহা প্রায় সকলেই জানেন, কিন্তু রৌদ্র যে মুক্ত বায়ুর কত বড় একজন অংশীদার তাহা অনেকেই দেখিতে পান না। ডাক্তার হাঁস্‌দালের মতে সমুদ্রতীরের স্বাস্থ্যনিবাসসমূহে সূর্য্যদেবই স্বাস্থ্য বিতরণ করেন। আল্পস্ পর্ব্বতের স্বাস্থ্যাবাসগুলিতে এই প্রণালী প্রয়োগ করা হয়। অধ্যাপক পঁসে ইহার আবিষ্কর্ত্তা, ডাক্তার রোলিয়ে সর্ব্ব প্রথমে ইহার প্রচার আরম্ভ করেন। ডাক্তার হাঁস্‌দাল রোলিয়ের চিকিৎসা-প্রণালীই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি ইহার নিম্নলিখিত রূপ বিবরণ দিয়াছেন:—

সৌর-চিকিৎসা।

"রোগীকে গ্রীষ্মকালে কার্পাস-বস্ত্র ও শীতকালে ফ্লানেল পরাইয়া রাখা হয়, মাথায় একটা সাদা টুপি (hat) দেওয়া হয় এবং রৌদ্রের আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার জন্য মুখের উপর একটা পরদা ও চোখে এক জোড়া হরিদ্রা বর্ণের চশমা দেওয়া হয়।

শরীরের বিভিন্ন স্থানে যক্ষ্মার বীজাণু আক্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু সকলের চিকিৎসাই এক প্রকারের। প্রথম দিন পদতল অনাবৃত করিয়া রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা যায়, দ্বিতীয় দিন দুই পদ খুলিয়া দেয়, তৃতীয় দিন জানুদেশ, চতুর্থ দিন তলপেট, পঞ্চম দিন বক্ষস্থল, তারপর ষষ্ঠ কি সপ্তম দিনে অত্যন্ত যত্নে ও সাবধানতার সহিত গ্রীবা ও মস্তকে রৌদ্র লাগানো হয়। চামড়ায় রংধরানই এই রৌদ্র-চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাতে রোগীর রৌদ্র ও ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য করিবার শক্তি আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পায়।

রবিরশ্মির রাসায়নিক শক্তি যে যক্ষ্মার বীজাণু ধ্বংস করে ইহা নিঃসন্দেহ। রৌদ্রে পুড়িয়া চামড়া একেবারে তাম্রবর্ণ হইয়া উঠে। তাহা না হইলে কেহ প্রত্যহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া রৌদ্র-চিকিৎসাধীন থাকিতে, অথবা অনাবৃত দেহে বরফের মধ্যে খেলা করিয়া বেড়াইতে পারে না। পার্ব্বতীয় প্রদেশে সূর্য্যরশ্মির রাসায়নিক শক্তি অধিক পরিমাণে অনুভব করা যায়; সমুদ্রতীরস্থ দেশসমূহে ততটা যায় না। এই জন্য পার্ব্বত্য দেশে রৌদ্র-চিকিৎসায় অপেক্ষাকৃত অল্প সময় লাগে। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের বহু উন্নতি হইয়াছে, যক্ষ্মা রোগকে দ্বন্দ্বে পরাভূত করিবার জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রে অনেক প্রয়াস দেখা যাইতেছে। ডাক্তার রোলিয়ে এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে যে সহায়তা করিয়াছেন তাহা অমূল্য। তিনি তাঁহার রোগ-নিবারণ-প্রণালীর সাহায্যে ১,২০০ রোগীর মধ্যে ১০০০ জনকে রোগমুক্ত করিয়াছেন।"

কনি দ্বীপে Sea Breeze Hospital (সাগর-সমীর চিকিৎসালয়) নামক একটি চিকিৎসালয় আছে। এই চিকিৎসালয়ে রৌদ্র-চিকিৎসার ফল এত ভাল হইয়াছে যে নিউ ইয়র্ক সহরের লোকেরা আর একটি হাঁসপাতাল স্থাপন করিবার জন্য কনিদ্বীপ হইতে দশ মাইল দূর সমুদ্রতীরে এক হাজার ফুট উচ্চ একটি ভূমি ক্রয় করিয়াছে। চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিতে আনুমানিক পঁচাত্তর লক্ষ টাকা লাগিবে। তাহা এক হাজার রোগীর বাসোপযোগী হইবে।

আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা অনেক সময়েই অনাবৃত দেহে রৌদ্র বাতাস লাগাইয়া খেলা করে। ইহা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান এক্ষণে স্বীকার করিতেছে।

শ।

তারা ও উল্কা

(গল্প)

সাঁঝের বেলায়, নীল আকাশের একটি কোণে, চক্চকে ছোট্ট তারাটি রোজ যেমন ওঠে, তেমনি সেদিনও উঠে নীচের পানে চাইলে।

নীচে, পৃথিবীরও একটি কোণে, একটি ছোট্ট নদী কূলে কূলে ভ'রে বয়ে যাচ্চে! তার দুই ধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত, সবুজ ঘাসের দুখানা পুরু আসন বিছানো! দূরে বনের আঁধার রেখা! সেই নদীটির জলে মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে, কূলের সেই সবুজ গালিচার পানে চাইতেই, সেই ছোট্ট তারার, তার চেয়েও ছোট্ট মনটি অন্য দিনের মতই কেমন যেন হ'য়ে উঠ্‌ল। একদৃষ্টে সেই বনের রেখা, নদীর জল, ও তার কূলের পানে চেয়ে তারাটি সেদিনও বিমনা হ'য়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল "কেন এমন হয়? ওখানে কি ছিল কে আমায় বলে দেবে?"

"আমি বল্‌ব, শুন্‌বে?"

তারা সবিস্ময়ে চেয়ে দেখ্‌লে কোথা হ'তে একটা জ্বলন্ত উল্কা এসে তার আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্চে!

"ওখানে কি ছিল আমি বল্‌ব শুন্‌বে?"

তারা মৃদুস্বরে বল্‌লে 'বল!' উল্কা বল্‌তে লাগ্‌ল।

অনেক দিনের কথা! তখনো অমনি বনের মাঝে দুই ধারের সবুজ ঘাসের ক্ষেতের তলায় ঐ নদীটি ব'য়ে যেত। বর্ষায় তার জল বেড়ে ঘাসবনের অর্দ্ধেকখানি ডুবিয়ে তাদের মাঝে মাঝে এমনি করেই কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ ক'রে খেলা কর্‌ত, আবার শীত গ্রীষ্মে অমনি ঘাসের নীচে নেমে

গিয়ে তাদের তলায় তলায় কুলুকুলু ঝুরুঝুরু সুরে গান গাইত। বনের অশান্ত বাতাস তার কাছে এসে তার ঠাণ্ডা জলটি ছুঁয়ে এমন শান্ত নিরীহটি হ'য়ে যেত যে তার সে নরম ভাবের স্পর্শে কচি ঘাসগুলি আনন্দে নুয়ে নুয়ে তার সঙ্গে একজুটি হ'য়ে সেই নদীর ধারে সারা বিকাল খেলা করত!

নদীর ওপারে, সূর্য্য যখন এমনি অস্ত যেতেন, তখন নদীর জলে তাঁর আলোর খেলা সারা হবামাত্র পাঁচরঙা মেঘেরা এসে ঐ আয়নাখানিতে মুখ দেখ্‌বার জন্যে দলে দলে ঝুঁকে পড়্‌ত! তার পরে মেঘেরা যখন তাদের সে খেয়াল্ সেরে ঘরে যাবার জন্যে এদিকে ওদিকে স'রে পড়্‌ত, নীল আকাশে যখন কোন দিন একটুখানি চাঁদ, কোন দিন কেবল গোটাকতক ছোট বড় দপ্‌দপে মিটুমিটে নক্ষত্র ফুটে উঠ্‌ত, তখন দেখা যেত আরও একটি কে এই নদীর ঘাসবনের ওপারে থেকে তার আঁচলখানি সেরে তুলে নিয়ে অস্তবেলার লোহিতরাগের মত নিঃশব্দে ঐ বনের গভীর আঁধারের মধ্যে মিশে যাচ্চে!

সেই বনের মাঝে বিজন নদীর তীরে কে সে, কেউ জান্‌ত না! কেবল সেই নদীর জল, যার স্পর্শ মাত্রে তারা পুলকিত উল্লসিত হ'য়ে কলভাষায় তাকে আদর করত; সেই ঘাসের সবুজ কোমলশির, যার পদস্পর্শে তারা একটুও নুইত না; সেই স্নিগ্ধ বাতাস, যে তার কপালের চুলগুলি ও লুটানো আঁচলখানি নিয়ে সারা বিকাল খেলা করত; তারাই মাত্র জান্‌ত চিন্‌ত সে কে! সাঁঝের তারার প্রশ্নভরা দৃষ্টি তার ওপরে পড়্‌বা মাত্র সে সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠে দাঁড়াত এবং বনতল তখনি সেই কৌতূহলী দৃষ্টির মধ্য হ'তে নিজের কোলে তাকে টেনে নিয়ে অটল মৌন ভাবে দাঁড়িয়ে তার বুকের মাঝের লুকানো ধনটির আভাস মাত্র আর কারুকে জান্‌তে দিত না।

সেদিনও সে সারা বেলা আপন মনে ভুঁইচাঁপা ও ঘাসের ফুলগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছিল। বর্ষার জলভরা নদী তার পা দুখানিকে হাতের কাছে পেয়ে মনের সাধে কেবলি আদর ক'রে ছুঁয়ে ছুঁয়ে পালাচ্ছিল আর তাদের রাঙা রংটুকুকে ধুয়ে নেবার চেষ্টায় ছিল। কোমল ঘাসের সবুজ আসন সেই তনুদেহখানিকে সযত্নে বুকে ধরে' তার চারিপাশে লুটিয়ে পড়েছিল; বাতাস সেদিন তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে না পেরে অশান্ত হ'য়ে উঠে ঘাসের উপর লুটানো চুলগুলিকে তার চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে, কানের পাশের গুলিকে চোখে মুখে এনে ফেলে তাকে বিব্রত ক'রে তুলছিল! বাতাসের এই অত্যাচারে শেষে জ্বালাতন হ'য়ে নীলাভ সুন্দর চক্ষু দুটি আর রাঙা মুখখানি দ্বিগুণ রাঙা ক'রে সে মুখ ফেরাতেই দেখ্‌তে পেলে, সেই বিজনবনভূমির বিজন নদীর বুকে কোথা হ'তে একখানি নৌকা ভেসে এসেছে! চোখের মুখের চুল সরিয়ে অবাক্ হ'য়ে তারপরে চেয়ে দেখ্‌লে, শুধু নৌকা নয়, নৌকার মাঝেও কে একজন! তারই মত অবাক্ হ'য়ে সেও তার পানে চেয়ে আছে।

তাদের সেই অবাক্ দৃষ্টি যে কতক্ষণ দুজনার দৃষ্টির মধ্যে আট্‌কানো ছিল তার তারা কেউই খোঁজ রাখেনি! হঠাৎ সম্মুখের নীল আকাশে শুক্লাতৃতীয়ার ছোট্ট একখানি জ্যোতির নৌকা ভেসে তাদের চোখের কাছে এসে দাঁড়াবামাত্র কূলের সে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল, এবং নদীর বুকে চোখের দৃষ্টি তেমনি স্থির রেখে অস্তগামী তারকার মত ক্রমে ক্রমে সে বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল! নৌকাখানি তারপরে নদীর কূলে কূলে কতক্ষণ ফিরল! বনের দিকে অনিমেষে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে গভীর রাত্রে সে-নৌকা আবার একদিকে ভেসে গেল।

পরদিন আবার যথাকালে একটু যেন বাধো বাধো পায়ে, নদার দিকে তেমনি স্থির দৃষ্টি নিয়ে বনের বাধা ভেদ করে সে এসে দাঁড়াল। নদীর জল উতলা হ'য়ে তাকে আবাহন করলে, তার স্পর্শ পেতে অধীর হ'য়ে উছ্‌লে উছ্‌লে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, বাতাস আনন্দে ছুটে গিয়ে তার আঁচলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল, ঘাসেরা তাদের সবুজ দেহ মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে আগ্রহে মাথা নেড়ে ডাকাডাকি করতে লাগ্‌ল 'এস এস, আমাদের চিরদিনের আপন ধন! আমাদের কাছে এস! কেন অমন ক'রে নদীর পানে চাইছ, কেউ নেই, কিছু নেই কোথাও! কেবল তোমার চিরদিনের আমরাই তোমার জন্যে বুক পেতে দিয়ে প'ড়ে আছি, তুমি আস্‌বে বলে' পথ চেয়ে আছি! এস তুমি আমাদের বুকে এস।"

কোথাও কেউ নেই দেখে একটু আশ্বস্ত ভাবে সে অন্য দিনের মতই নদীর জলে পা ডুবিয়ে বস্‌ল বটে, কিন্তু তবু তার চিরদিনের সাথীদের ডাকে সেদিন উত্তরও দিতে পার্‌লে না এবং তার বিমনা ভাবও গেল না! ক্ষণেক পরেই সেই বনভূমি দেখ্‌লে, সেদিন তাদেরই চেয়েও শতগুণ বেশী আগ্রহে আর একজনও তার পথ চেয়ে ছিল! তখনি নদীর বুকে সেই নৌকা ভেসে এল, এবং আবার জলের ও স্থলের চার্‌টি চোখের দৃষ্টি একত্র হ'য়ে নিবিড়তর ভাবে মিলিত হ'ল! জলে একজন, স্থলে একজন, তবু কি গভীর সে মিলন! মুহূর্ত্তে সে নদী, সে বায়ু, সে শতস্পন্দনময়ী প্রকৃতি, সব নিস্তব্ধ নীরব হ'য়ে সেই দৃষ্টির মিলনকে অব্যাহত ও গভীরতর ক'রে তুল্‌লে! সেই দুটি প্রাণীর চারিটি দৃষ্টি ছাড়া জলে স্থলে সেদিন যেন আর অন্য কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা মাত্র রইল না! সেই বিজন স্থানের নীরব নদীকূলের এবং পশ্চাতের বনরেখার দৃশ্যপটে সেই দুটি দৃষ্টি-মুগ্ধ প্রাণীর চিত্র আঁক্‌বার জন্যে প্রকৃতির সেই নিস্তব্ধ নীরব আয়োজন!

সন্ধ্যার অন্ধকারে এবং চাঁদের কঠোর করস্পর্শে চকিত হ'য়ে আবার সে অন্য দিনের মত বনের বুকে লুকিয়ে গেল। নদীর জল কুলু কুলু রবে কেঁদে উঠ্‌ল, "গেল সে আজ্‌কের মত গেল! আবার পাব কি, কাল আবার তার দেখা পাব কি?" বায়ু গুম্‌রে উঠেও আশ্বাস দিলে "আস্‌বে, আস্‌বে সে, আসবে আবার!" চাঁদের নির্ম্মম করস্পর্শে তাদের এ সুখচিত্র ভেঙে গেল বলে' তারা যেন চাঁদের ওপর বিষম ক্রুদ্ধ হ'য়ে জলের তরঙ্গের অশান্ত আঘাতে তার তনুদেহের ছবিখানি চুর্ণ বিচুর্ণ ক'রে ভাঙ্‌তে লাগ্‌ল। পাল উঠিয়ে নিশ্বাস ফেলে আবার সে নৌকাও পূর্ব্বদিনের মত দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলে গেল।

পরদিনে সে বন হ'তে বার হয়ে নদীতীরে আস্‌বার আগেই নৌকাখানি নদীর বুকের মধ্যখানে এসে তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল এবং তার আসার বিলম্ব দেখে নৌকার মধ্য হ'তে অধীর সঙ্গীতধ্বনি বেজে উঠল—

"এস ওগো এস! এই প্রকৃতির নির্জ্জন খনির মণি-স্বরূপা, গভীর বনের বনলক্ষ্মী! ঐ সবুজ সমুদ্রে বিকচ পদ্মের মত ফুটে উঠে এই প্রাণহীনা শোভনা প্রকৃতিতে প্রাণ সঞ্চারিত কর! বায়ু ম'রে আছে, নদীর বুকে, এসে তাদের ভাষা দাও, আশা দাও, প্রাণ দাও, তাদের চঞ্চল এবং কলধ্বনিময় কর। আর বনে লুকিয়ে থেক না,—এস ওগো এস! আমি তোমার নিকটে যাবনা, আর কিছু চাইব না, কেবল এমনি দূর হ'তে তোমায় চেয়ে দেখব মাত্র! যেমন নদীর এই অপর পারের গভীর বনভাগ,—তার বুকের ঘন আঁধার চিরদিন অটলভাবে বুকে ব'য়ে স্তব্ধনেত্রে কেবল দূর হ'তে তোমায় চেয়ে ঢাখে,—এপারের এই সবুজ ঘাসের মত, নদীর জলের মত তোমার পাদুটি স্পর্শ করেও কৃতার্থ হতে পায় না,—আমিও তেমনি দূরে দাঁড়িয়ে কেবল তোমায় দেখ্‌ব মাত্র, একটি কথা কইব না, একটি কথা কইতেও বল্‌ব না। এস ওগো এস! এসে এ তোমার সবুজ আসনের উপরে একবার দাঁড়াও! বাক্‌হীন জলস্থল অধীর বাসনায় গুম্‌রে মর্‌ছে, তাদের আশা একবার পূর্ণ কর!"

এই আবেগভরা প্রাণের কাতর আবাহনকে সার্থকতা দিয়ে সে ধীরে ধীরে অতিকুণ্ঠিতপদে ক্রমে নদী-তীরে এসে দাঁড়াল! সে-দৃষ্টি সেদিন এক-একবার লজ্জিত কুণ্ঠিত, আবার এক-একবার ঐ গানের মতই ভাষাময় আশাময় আবেগময়। সে-প্রাণের গোপন কথাও বুঝি সেদিন সেই সঙ্গীতের মত ভাষাময় হ'য়ে ফুটতে চাচ্ছিল, পার্‌ছিল না;—তাই এক অব্যক্ত ব্যথায় ভরে উঠে কেবল দুই চক্ষের আকুল দৃষ্টিপথে ছুটে গিয়ে সেই নৌকার গায়ে নদীর ঢেউয়ের সঙ্গে আছড়ে পড়ছিল!—দেখ্‌তে দেখ্‌তে আবার স্থল ও জলের চার্‌টি দৃষ্টি তেমনিভাবে এক হ'য়ে সে বিজনভূমিকে একেবারে নিস্তব্ধ করে দিলে! কতক্ষণ, ক'দণ্ড যে তাদের সেই দৃষ্টিমিলন সেইভাবে ছিল, তা সেখানকার বায়ু নদী বা সেই বিজনভূমি কেউই বল্‌তে পারে না! তারাও সেই দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে এমন হয়ে মিশে গিয়েছিল! যখন তাদের আপন আপন সাড়া ফিরে এসে আপন কথায় তারা চঞ্চল ও মুখর হ'য়ে উঠ্‌ল তখন তাদের সর্ব্বাঙ্গ চাঁদের আলোয় ভরে গেছে, সন্ধ্যাতারা উঠে কখন্ অস্ত গেছে, নদীর তট ও বুক একেবারে খালি। সে বনের লক্ষ্মী উঠে কখন্ বনের বুকে মিলিয়ে গেছে এবং নৌকাখানাও

পাল তুলে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে কোন্‌দিকে চ'লে গেছে।

এম্‌নি করে সেই জলস্থলের ব্যবধানের মাঝের সেই দৃষ্টির মিলন কতকাল কতদিন ধরে যে চলেছিল—তারও হিসাব রাখবার মত সেখানে কেউ ছিল না! নদীস্রোত সাদরে কলভাষার সঙ্গে সেই নৌকাখানিকে প্রত্যহ যথাস্থানে নিয়ে আস্‌ত, কূলের কোমল আসনখানি তার জন্যে তেমনি বিছিয়ে রাখত, বন তার বুকের ধনটিকে যথাকালে নদীতীরে, বায়ু ক'রে বসাত, বায়ু তেমনিভাবেই তাদের সেই একাগ্রদৃষ্টির বাধাস্বরূপ তার সুমুখের চুলগুলিকে পেছনে সরিয়ে দিত এবং লুটানো আঁচলখানি গুছিয়ে রাখ্‌ত! তাদের সেই মিলনের জন্য এরাও যেন সমস্তরাত সমস্তদিন ধরে প্রতীক্ষা করে আছে; সে মিলনের যেন এরাই উত্তরসাধক দূতস্বরূপ ছিল। তাদের অনুকূল চেষ্টায় সংঘটিত সেই মিলনচিত্রটি রাত্রির আগমনে ভেঙে যেত বলে' নদীর ধারের চখাচখীর সঙ্গে তারাও রাত্রি আর চাঁদকে কেবল গাল্‌ পাড়্‌ত!

সেই নদীর বুকের নৌকা থেকে কতদিন কতভাবের কত আকুলভাষার সঙ্গীত, বায়ু তার সেই রাঙা পা-দুখানির কাছে ব'য়ে এনে দিয়ে তাদের লজ্জায় সঙ্কুচিত করত, এবং কখনো বা রাঙা রাঙা কপোল দুখানির পাশের চুলগুলি সরিয়ে সেকথা তার কানে কানে ক'য়ে সে দুটিকে আরও রাঙা ক'রে তুল্‌ত! সে সঙ্গীতের এক-একদিনের এক একটি নূতন ভাবের নূতন ভাষার অর্থও বোধ হয় সবদিন সে ঠিক্‌ বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ত না। যেদিন তার আসার বিলম্ব দেখে সে সঙ্গীতে আবাহনের অধীর রাগিণী বাজ্‌ত, সেদিন সে নদীর কূলে একটু যেন অগ্রসর হয়ে বস্‌ত; যেদিন সে সঙ্গীতের ভাষায় ও সুরে তাদের সেই নিত্যমিলনের আশা আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও কৃতার্থতা আরতির দীপশিখার মত জ্বলে উঠে তার পদতল হ'তে সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে তাকে বন্দনা ক'রে ফির্‌ত, সেদিন সে নির্ব্বাক মুখে দ্বিগুণ স্পন্দহীন হ'য়ে যেত; এবং যেদিন সে নৌকা হতে ভাবীবিরহের আশঙ্কা-কাতর বিষাদাপ্লুত করুণ সুর ভেসে আস্‌ত, সেদিনও সে এক অজ্ঞাত বেদনায় দুই চক্ষে জল ভরে' একভাবেই বসে থাকত! ঐ একদৃষ্টে চেয়ে থাকা ছাড়া সে আর যেন জগতের বেশী কিছু বুঝ্‌ত না বা জান্‌ত না!

একদিন সে ঘাটে এসে শুন্‌লে ওকি এক নূতন রাগিণী সেই নৌকা ও নদীর বুক ছাপিয়ে জলে এসে আছড়ে পড়্‌ছে! এ তো সেই ভাবী বিরহ-আশঙ্কার বিষাদমন্থর অলস করুণ স্বর নয়, এ যে স্থির নিশ্চিত কোন' তীক্ষ্ণ বেদনার তীব্রবেগে ভরা সুর, সে সুরের ভাষাও ততোধিক তীব্র আকুলতায় ভরা। গান উঠ্‌ছিল—

"আর নয়, আর নয়! ওগো আমার জীবন দুদিনের, অথচ চিরকালের জন্য উদিত স্থিরোজ্জ্বল তারা, তোমার ও অপলকদৃষ্টি আমার দিক্‌ হ'তে ফিরিয়ে নাও!—আর নয়, কালপূর্ণ হয়ে এসেছে, আজ তাকে তোমার ঐ নয়নের শেষদৃষ্টিতে সারাজীবনের চিরসম্বল দিয়ে বিদায় দাও! হতভাগ্য সে জগতে তার স্থিতির স্থির কেন্দ্র কোথাও নাই, উল্কার মতই সে ঘুরে বেড়ায়! দণ্ডের জন্য তোমার পাশে এসে তোমার ঐ মধুরোজ্জ্বল দৃষ্টিসুধায় অভিষিক্ত হ'য়ে আবার তার সেই অভিশপ্ত জীবন নিয়ে অনির্দ্দিষ্ট শূন্য পথে ছুটে চল্‌ল! জানি না কবে তার এ অনির্দ্দিষ্ট গতির শেষ হবে, কবে তার এ জ্বলন্তজীবন একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে রেণু রেণু হ'য়ে তোমারই চারিপাশে ঘিরে থাক্‌বে। ক্ষমা ক'রো, ওগো তোমার দৃষ্টিপথের এই দু'দণ্ডের অতিথিকে ক্ষমা ক'রো। তারই কথা ভেবে, তারই প্রতীক্ষায় এই নদীতীরে এমনি করে', সুদূরের পানে চেয়ে যদি চিরদিনই তোমায় ব'সে থাক্‌তে হয়, ওগো তবু এই অপরাধীকে ক্ষমা ক'রো। সাধ্য নাই তার, একস্থানে স্থিরভাবে তার থাক্‌বার ক্ষমতা নাই! উল্কার মতই এসে সে আবার তেমনি চল্‌ল!—কিন্তু তবু,—দেখা হবে আবার! লোক-লোকান্তে যুগযুগান্তে একদিন তোমার ঐ স্থিরদৃষ্টির সম্মুখে আমি পড়্‌ব, একদিন অন্ততঃ দুদণ্ডের জন্যও আমাদের আবার দেখা হবে। বিদায়—এখন তবে বিদায়! তোমার ও ভীত স্তব্ধ মুগ্ধদৃষ্টি আমার দিক্‌ হ'তে তুলে নাও! ঐ দ্যাখ তোমার চিরদিনের সঙ্গীরা তোমার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, নদীর জল পদতল স্পর্শ করে' স্নেহগদগদকণ্ঠে সান্ত্বনা জানিয়ে বল্‌ছে "হবে,

আবার একদিন দেখা হবে।—বিদায়—আজ তবে বিদায়!"

কোথায়! কে কোথায়! বিস্ময়ে বেদনায় স্তব্ধ নির্ব্বাকমুখে তারকা চেয়ে দেখ্‌লে—তার পাশে আর কেহ নাই! এইমাত্র পাশে দাঁড়িয়ে যে এই কাহিনী বল্‌ছিল তার আর সেখানে চিহ্নমাত্রও নাই!—হুহুশব্দে জ্বলতে জ্বলতে সে উল্কা—কোথায়—অসীম আকাশের কোন্‌দিকে ছুটে চলে গেছে।

আশে পাশে তার আকাশভরা অপরিচিত তারার দল! কেউ তার পরিচিত নয়, কারো মুখ সে চেনে না! নীচে চেয়ে দেখলে এই অস্পষ্ট বনের রেখা নদীর তীর, চাঁদের আলোয় মৌন মূক হয়ে কাদের স্মৃতি বুকে করে' একভাবে দাঁড়িয়ে আছে, এবং তাদের সেই মৌন বুক হ'তে একটা বহুদিনের পরিচিত সান্ত্বনার অননুভূত স্পর্শ ও সহানুভূতির কোমল স্মৃতি নীরবে উঠে সেই সুদূর নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত ভেসে আস্‌ছে। তারাটি খানিকক্ষণ তাদের সেই মূক স্নেহনিবেদনটি উপভোগ ক'রে নিয়ে এবং পরে মুখ তুলে—যে দিকে সেই ক্ষণপরিচিত অতিথি এইমাত্র ছুটে চলে গেছে—সেই অসীম শূন্যপথে স্থির দৃষ্টে চেয়ে রইল।

শ্রীনিরুপমা দেবী।

কষ্টিপাথর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি।

বোম্বাইয়ে গিয়াই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন—সে সেতার বাদ্য। বোম্বাই হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার সেতার শুনিয়া বাড়ীর সকলেই বিশেষতঃ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরমহাশয় একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। গুণেন্দ্রবাবু (ostrich) সাত্রোক্ পক্ষীর ডিমের তুম্বে একটি সুন্দর সেতার তৈরি করাইয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। অভ্যাসের অভাবে এক্ষণে তাঁহার সেতারের হাত আদপেই নাই।

দ্বিজেন্দ্র বাবুর পুরাণো কোন-রকমে-কাজচলা একটা পিয়ানো ছিল; দ্বিজেন্দ্রবাবু যখন ঘরে থাকিতেন না, জ্যোতিবাবু তাঁর ঘরে ঢুকিয়া সেই পিয়ানো বাজাইতেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু দেখিতে পাইলেই "ভেঙ্গে যাবে, ভেঙ্গে যাবে" বলিয়া ধমক দিয়া উঠাইয়া দিতেন। এমনি করিয়া বাজাইয়া বাজাইয়া পিয়ানোতেও তাঁর একটু হাত হইয়াছিল। হার্ম্মোনিয়মেও তাঁর বেশ একটু জ্ঞান জন্মিল। ব্রাহ্মসমাজে তখন গানের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ সেই যন্ত্র বাজাইতেন। তখন এ দেশে এই যন্ত্রটা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে চলিত হয় নাই।

"আমার মনে পড়ে, একদিন রামতনু লাহিড়ী মহাশয় আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে একটি নোট্‌বুক্ থাকিত, যাহা কিছু নূতন তাঁহার নজরে পড়িত তাহাই সেই নোট্ বুকে টুকিয়া রাখিতেন। সেই বৃদ্ধের অপরিসীম জ্ঞান-পিপাসা ছিল। পিয়ানোর সহিত হার্ম্মোনিয়মের কি তফাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া, সমস্ত তথ্য তিনি তাঁহার নোট্‌বুকে টুকিয়া রাখিলেন।"

হার্ম্মোনিয়ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে সমাজে বিষ্ণু বাবুর গানের সঙ্গে একজন হিন্দুস্থানী সারঙ্গ বাজাইত। পরে হার্ম্মোনিয়ম আসিলে সারঙ্গ উঠিয়া গেল। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়। হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রে হিন্দু রাগরাগিণী ঠিকমত বাজান একরূপ অসম্ভব।

মহাত্মা রামমোহন রায় মহাশয়ের আমল হইতেই কৃষ্ণ ও বিষ্ণু দুই ভাই সমাজের গায়ক ছিলেন। বিষ্ণুর হিন্দি গান ভাঙ্গিয়া সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। তাঁহার রচনায় এমনি একটা সহজ সুন্দর কবিত্ব ছিল এবং সুরের সঙ্গে ভাবের এমনি একটা মাখামাখি ছিল যে তাহা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিত। তারপর সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই চলিয়া গেলে, জ্যোতিবাবু, তাঁহার সেজ্ দাদা (৺ হেমেন্দ্রনাথ) ও বড় দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতেন। এই বিষয়ে মহর্ষিদেব খুব উৎসাহ দিতেন।

"তখন বড়বড় গায়কদিগকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া হইত। ইঁহাদের গান ভাঙ্গিয়া তখন আমি এবং বড় দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) আমরা অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলাম। কি সৌখীন কি পেশাদার কোনও গায়কের কোনও গান ভাল লাগিলে, সেইটি টুকিয়া লইয়া আমরা ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতে বসিতাম। এইরূপে ব্রহ্মসঙ্গীতে অনেক বড় বড় ওস্তাদী সুর ও তাল প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালায় সঙ্গীতের উন্নতি এমনি করিয়াই হইয়াছে। এর পরেই শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের আমল। তাঁহার অসামান্য কবিপ্রতিভা এখন ব্রহ্মসঙ্গীতকে প্রায়-পূর্ণতায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। নানা সুর, নানা ভাব, নানা ছন্দ, নানা তাল ব্রহ্মসঙ্গীতে আজ তাঁহারই দেওয়া। তাঁর বীণা এখনও নীরব হয় নাই।"

তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রায় সঙ্গীত চর্চ্চাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। নাটক অভিনয় করিবার দিকেও তাঁহার ঝোঁক্ ছিল। অভিনয়, তাহার আয়োজন, অভিনয়োপযোগী নাটক-নির্ব্বাচন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য একটি সমিতি গঠিত হইল। কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিবাবু, অক্ষয়বাবু (চৌধুরী) জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এই পাঁচ জনে এই নাট্য সমিতির সভ্য হইলেন।

নীচের ঘরে আহোরাত্রই—হয় নাচ, নয় গান, নয় বাদ্য, নয় "পঞ্চজনে"র নাট্য-সমিতিতে বাদানুবাদ কিছু-না-কিছুর একটা গোলমাল চলিতই। বাড়ীখানি সারাদিন হাস্যকলরবে ও গানবাদ্যে মুখরিত হইয়া থাকিত। মধ্যে মধ্যে বামাচরণ বলিয়া একজন যাত্রাদলের ছোক্‌রা আসিয়া নাচগানে তাঁহাদের আমোদ বর্দ্ধন করিত। তাঁহাদের একটা "Eating Club"ও ছিল। সে ক্লবে পালা করিয়া এক একজনের খাওয়াইতে হইত। ইঁহারা দেখিলেন বাঙ্গালা সাহিত্যে অভিনয়োপযোগী নাটক মাত্র দুই তিনখানি। কিন্তু তাহাতে লোকশিক্ষার মত কোন' জিনিষই নাই। আমোদের পরিসমাপ্তি আমোদে না হইয়া যাহাতে শিক্ষায় হয়, তজ্জন্য ইঁহারা একটু চঞ্চল হইলেন। কাগজে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে যিনি একখানি উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক রচনা করিতে পারিবেন,

এবং যাঁহার রচনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাঁহাকে দুইশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রাপ্ত রচনা পরীক্ষার জন্য বিচারক নিযুক্ত হইলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের তাৎকালীন সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। অল্প দিনের মধ্যেই কয়েকখানি নাটক পাওয়া গেল, কিন্তু পুরস্কার প্রদানের উপযুক্ত বলিয়া একখানিও বিবেচিত হইল না। এরূপ প্রতিযোগিতায় আশানুরূপ সুফল ফলিল না দেখিয়া Commitee of five স্থির করিলেন যে, একজন প্রসিদ্ধ নাটককারের উপর ভার অর্পণ করাই সুবিধাজনক। তখন বাঙ্গলা লেখক অতি অল্পই ছিল। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় এ সময়ে "কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব" নামে একখানি নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন তাঁহাকেই শেষে এ ভার প্রদত্ত হইল। তিনি একখানি সামাজিক নাটক লিখিতেও স্বীকৃত হইলেন। পণ্ডিত রামনারায়ণ ইংরেজি জানিতেন না, তিনি খাঁটি দেশীয় আদর্শে নাটক রচনা করিতেন। তাঁহাকেই প্রকৃতরূপে আমাদের National dramatist বলা যাইতে পারে। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন যে, ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে, তখন তাঁহারাই এ কার্য্যের সমস্ত ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। এবং পুরস্কারের পরিমাণও পাঁচশত করিয়া দিলেন। জ্যোতিবাবুরা যেমন নিষ্কৃতি পাইলেন তেমনি অধিকতররূপে উৎসাহিতও হইয়া উঠিলেন। নাটক রচিত হইল। নাটকের নাম ছিল "নবনাটক।" যেদিন এই উপলক্ষ্যে তর্করত্ন মহাশয়কে পুরস্কার প্রদান করা হয় সে একটি স্মরণীয় দিন। কলিকাতার সমস্ত ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, সভার মধ্যস্থলে একটা রূপার থালায় নগদ ৫০০৲ টাকা সাজাইয়া রাখা হইল এবং সভাস্থলে নাটকখানি আগাগোড়া পঠিত হইল। শুনিয়া সকলেই প্রশংসা করিলেন। তখন ঐ পাঁচ শত টাকা তর্করত্ন মহাশয়কে প্রদান করা হইল। তিনিও ইহাতে খুব খুসী হইলেন। পণ্ডিত রামনারায়ণের এই "নবনাটকে" একটু বিদেশী আদর্শের গন্ধ আছে। আমাদের সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কোন বিয়োগান্ত নাটক নাই; তিনি ইংরেজিশিক্ষিত লোকদিগের রুচিকে প্রশ্রয় দিয়া এই সর্ব্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিলেন।

এখন "বড়"র দলই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে অভিনয়ের উদ্যোগ আয়োজনে কিছুকাল খুব আমোদে কাটিয়াছিল। তারপর যেদিন প্রকাশ্য অভিনয় হইবে সেই দিন যাহারা স্ত্রীলোকের ভূমিকা লইয়াছিল, অভিনয়ের ঠিক্ পূর্ব্বেই, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখীন হইবার ভয়ে সাজঘরে মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে, বাড়ীর ডাক্তার দ্বারি বাবু উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে তোয়াজ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই খাড়া করিয়া তুলিলেন। অন্য সকলেই, যথাসময়ে ষ্টেজে প্রবেশ করিয়া অভিনয় করিতে লাগিল। কেবল স্ত্রীবেশেসজ্জিত জ্যোতিবাবুর কবি-বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী শেষ মুহূর্ত্তে কিছুতেই সাহস করিয়া দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখীন হইতে পারিলেন না। সকলের অনুরোধ উপরোধ সবই ব্যর্থ হইল। কি করা যায়, অগত্যা তাঁহাকে বাদ দিতে হইল।

অভিনয় দর্শনের জন্য কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অভিনয়ও খুব নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি (Scene) অঙ্কিত হইয়াছিল। ষ্টেজও (রঙ্গমঞ্চ) যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিবার জন্যও অনেক চেষ্টা করা হইয়াছিল। বনদৃশ্যের সিনখানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আঠা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যকার বনের মতই বোধ হইত। এই সব জোনাকী পোকা ধরিবার জন্য অনেকগুলি লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহাদের পারিশ্রমিক-স্বরূপ এক একটি পোকার দাম দুই আনা হিসাবে দেওয়া হইত।

অক্ষয়বাবুর অভিনয়ে একটা বিশেষত্ব এই ছিল, তিনি বই ছাড়া অনেক কথা উপস্থিত মত নূতন বানাইয়া বলিতেন। আমরা তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"অত লোকের সামনে বেহায়ামি করিতে আপনার কি একটুও সঙ্কোচ হয় না?" তিনি বলিলেন—"আমার একটা মন্ত্র আছে, আমি তখন দর্শকদিগকে বানর বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকি।"

প্রথম দিনের অভিনয়ে পণ্ডিত রামনারায়ণ উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া "যা—রা পলাট্ (plot) নাই, পলাট্ নাই বলে এখানে এসে একবার দেখে যাক্", সমালোচকদিগের উপর এইরূপ মধুর্ব্বর্ষণ করিয়া তিনি আস্ফালন করিতে লাগিলেন। এ নাটকখানি দর্শকগণকে এত মোহিত করিয়াছিল যে, তাঁহাদের অনুরোধে একাধিক রজনী "নবনাটক" অভিনীত হইয়াছিল। যে উদ্দেশ্যে এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম তাহা কতক পরিমাণে সফল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, কেননা নবনাটক তখন দেশে বেশ একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। একদিনকার অভিনয়ে একটা বেশ কৌতুককর কাণ্ড ঘটিয়াছিল। জ্যোতিবাবু নটীর বেশ পরিয়াই সাজঘরে (Green-room) কন্‌সার্টের সহিত হার্ম্মোনিয়ম্ বাজাইতেছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সেটন কার সেদিন নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয় দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি কনসার্ট শুনিবার জন্য এবং কি কি যন্ত্রে কন্‌সার্ট বাজিতেছে দেখিবার জন্য কন্‌সার্টের ঘরে ঢুকিয়াছিলেন। ঢুকিয়াই "Beg your pardon, জেনানা" বলিয়া অপ্রতিভ হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পরে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, জেনানা কেহই ছিলেন না, যাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তিনি স্ত্রী-সাজে সজ্জিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

তখন কন্‌সার্ট পদবাচ্য ভাল কন্‌সার্ট ছিল না বলিলেই হয়। এক ছিল মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে; তার পর "নব নাটক" উপলক্ষ্যে এ বাড়ীতে আর এক দল হইয়াছিল। আদি-ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুবাবু তখন এই কন্‌সার্টের গৎ তৈয়ি করিয়া দিতেন। তারপর এখন ত গলিতে গলিতে কনসার্ট। তখনকার হইতে বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না।

(ভারতী, ভাদ্র) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আসাম গোয়ালপাড়া এবং আসামীয়া ভাষা।

আসাম প্রদেশের পরিমাণ-ফল প্রায় সাড়ে একষট্টি হাজার বর্গ-মাইল হইলেও, ইহার অর্দ্ধেকের অধিক পাহাড় পর্ব্বত এবং জঙ্গলময়; তাই, এইক্ষণে সমগ্র আসাম প্রদেশে মাত্র সত্তর লক্ষ যাইট্ হাজার লোকের বাস। পৃথিবীর অন্য কোথাও, ভারতের এই ক্ষুদ্র কোণের ন্যায় সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে এত অধিক ভাষাভাষী লোক দৃষ্ট হয় না।

আসামের আদিম অধিবাসী—আকা, আবর, আহোম, কাছাড়ি, খাসিয়া, খাম্‌তি, গারো, চিংফো, নাগা, ভেটিয়া, মিকির, মিরি, মিসমি, রাভা এবং ডর্ফ্‌লা প্রভৃতি জাতির কথিত ভাষা বাদে বাঙ্গালা এবং আসামীয়া এই দুই ভাষাই প্রধান এবং এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আসাম প্রধানতঃ (১) পার্ব্বত্যপ্রদেশ (Hills Districts) (২) সুর্ম্মা উপত্যকা (Surma Valley) এবং (৩) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা (Brahmaputtra Valley) এই তিন ভাগে বিভক্ত।

১। পার্ব্বত্যপ্রদেশ বা জেলা সমূহ:—ইহার ভূমি-পরিমাণ ১৯,৬২৫ বর্গ-মাইল, কিন্তু লোকসংখ্যা ১০,০৮,৩৫০; অর্থাৎ প্রতি বর্গ-মাইলে ৩৫ জন মাত্র। এই প্রদেশে আসামীয়া এবং বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষী লোক থাকিলেও তাহার সংখ্যা নগণ্য। এযাবৎ খাসিয়া এবং গারো প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে বাঙ্গালা অক্ষরই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এইক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে ইংরেজি অক্ষরে (Roman Character) পুস্তকাদি মুদ্রিত ও লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালা অক্ষরের ব্যবহার থাকাতে অনেক লোকের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বেশ সুযোগ হইয়াছিল।

২। সুর্ম্মা উপত্যকা:—শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জিলাই এই বিভাগের অন্তর্গত। ইহার ভূমি-পরিমাণ মাত্র ৭২৪৭ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ২৯,৪২,৮৮৮ জন। এই স্থানে বাঙ্গালা ভাষাই আবহমানকাল হইতে প্রচলিত।

৩। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা:—ইহার ভূমি-পরিমাণ ২৪,৫১৮ বর্গ-মাইল এবং লোকসংখ্যা ৩১,০৮,৬৬৯ অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে ১২৬ জন লোকের বাস। এইক্ষণে এই উপত্যকার জিলা-সমূহের মধ্যে একমাত্র গোয়ালপাড়াতেই বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপাততঃ সেই গোয়ালপাড়ার আদালত এবং বিদ্যালয় সমূহেও বিকল্পে আসামীয়া ভাষা প্রচলনের আদেশ হইয়াছে। এমন কি, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, স্থানীয় লোকের প্রার্থনানুসারে, গবর্ণমেণ্ট যখন সমগ্র উপত্যকা প্রদেশে বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্ত্তে আসামীয়া ভাষা প্রচলনের আদেশ দেন, তখনও গোয়ালপাড়ায় এতদ্রূপ পরি-বর্ত্তন করা কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্গত বোধ করেন নাই।

আসামীয়া এবং বাঙ্গালা এই ভাষাদ্বয় পৃথক নহে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আসামীয়া ভাষা বাঙ্গালা হইতে পৃথক স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ধর্ম্ম, বর্ণ বা কার্য্যগত বিভাগ অপেক্ষাও ভাষাগত বিভাগই আমাদিগের প্রকৃত জাতিভেদ; সুতরাং জাতীয় উন্নতির প্রতিবন্ধক। ১৯০১ সনের জনগণনায় গোয়ালপাড়া জিলাতে বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা শতকরা প্রায় সত্তর জন, আর আসামীয়া-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা শতকরা মাত্র তিন জন অবধারিত হইয়াছে। সুতরাং পরবর্ত্তী ১৯০১ সনের জনগণনায় আসামীয়া-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও পক্ষান্তরে বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য উদ্যোক্তাগণ দৃঢ়সংকল্প হন। বলিতে গেলে, তাহারই ফলে গত ১৯১১ সনের জনগণনায় আসামীয়-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা দুই চারি গুণ নহে, এক দমে দশ গুণেরও অধিক অর্থাৎ ১৯০১ সনের গণনায় নির্দ্ধারিত এগার হাজার আসামীয়া-ভাষা-ভাষীর স্থলে এক লক্ষ পনর হাজার দাঁড় করান হইয়াছে।

ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করিলে জানা যায়, এই অভিনব গোয়াল-পাড়া জিলার স্থানসমূহ স্মরণাতীত কাল হইতেই বঙ্গদেশের সীমান্ত-র্গত ছিল। গত ১৮২২ অব্দে গোয়ালপাড়া রংপুর হইতে খারিজ হইয়া স্বতন্ত্র জিলায় পরিণত হইলেও, গত ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই জিলা উত্তরবঙ্গের অর্থাৎ কোচবিহারের কমিশনারের শাসনা-ধীনেই থাকে। তৎকালে গোয়ালপাড়ায় আসামীয়া-ভাষা-ভাষীর অস্তিত্ব থাকিলেও তাহা নগণ্য ছিল। ১৮৭২ খৃঃ অব্দের পরবর্ত্তী এবং ১৯০১ খৃঃ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিশ বৎসরে গোয়ালপাড়ায় ক্রমে যে তিনবার জনগণনা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে আসামীয়া-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা ক্রমে কমিয়াছে। ইহার কারণ, ১৯০১-১৯১১ এই দশ বৎসরে গোয়ালপাড়ায় যে একলক্ষ আঠার হাজার লোকের আমদানী হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই গোয়ালপাড়া জিলার পার্শ্ববর্ত্তী বঙ্গদেশের জিলাসমূহ হইতে সমাগত; সুতরাং আসামীয়া নহে। পক্ষান্তরে, এই জিলা হইতে ১৯০১ সনের পরবর্ত্তী দশ বৎসরে যে সতের হাজার লোক অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই কামরূপ জিলার পূর্ব্বাধিবাসী। সুতরাং রিপোর্টের এই আমদানী এবং রপ্তানীর হিসাব অনুসারে গত ১৯১১ সনের জনগণনায় আসামীয়া-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধির ও পক্ষান্তরে বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা হ্রাসের কোনই কারণ দেখা যায় না। বরং লক্ষাধিক বাঙ্গালা-ভাষী বৃদ্ধি হইবারই কথা। জন্ম মৃত্যুর হিসাবে লোকাধিক্য এস্থলে দশগুণ হইয়াছে কল্পনা করিয়া লইলেও, মোটের উপরে আসামীয়া-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা এক হাজারও বৃদ্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে।

আসাম প্রদেশে, এমন কি গোয়ালপাড়া জিলার অধিবাসীদিগের মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ বা মিত্রাদি বঙ্গজ কুলীন কায়স্থের কোনও বংশধর নাই। ব্রহ্মপুত্র নদের চরভূমিতে গো মহিষাদি চরাইবার উপযুক্ত পতিত জঙ্গলাজমির আধিক্য দেখিয়া, যে-সকল গোয়াল, ময়মনসিংহ জিলা হইতে, এই প্রদেশে আগমন করেন এবং যাঁহা-দিগের উপনিবাস জন্যই এই "গোয়ালপাড়া" নামকরণ হইয়াছে, দীর্ঘকাল আসামপ্রদেশান্তর্গত গোয়ালপাড়াতে বাস করিলেও এই জাতীয় লোকের আসামীয়া ভাষা শিক্ষার কিছুমাত্র সুযোগ হয় নাই। কাজেই স্ত্রী পুরুষ সকলেই বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। সেন্‌-সাস্‌ রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে, গোয়ালপাড়া মহকুমার কর্ত্তা সাহেব বাহাদুরেরা অনেকগুলি খাতায় লিখিত ব্যক্তিগণের জাতি এবং ভাষা সম্বন্ধে সন্দেহজনক (Doubtful) চিহ্ন করিয়া তাহা সেন্‌সাস্‌ আফিসে ফেরত পাঠাইতে বাধ্য হন, এবং সেই সন্দেহের ফলে, অবশেষে, দুই চারি দশ হাজার নহে, ত্রিশ হাজার বাঙ্গালার মাথা কাটিয়া আসামীয়া মাথা তৎস্থলে যোগ করা হয়।

যাহা হউক, এইরূপে গত জনগণনায় গোয়ালপাড়া জিলায় ভাষা-বিভ্রাট ঘটিলেও মোটের উপরে বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা এখনও আসামীয়ার তিনগুণ। তবে, গোয়ালপাড়া সবডিভিজনের জনসংখ্যা তৎবিপরীত দৃষ্টে, পক্ষান্তরে গোয়ালপাড়ার আদালতে এবং বিদ্যালয়সমূহে আসামীয়া ভাষা প্রচলনের জন্য কতক লোক গবর্ণমেণ্টে আবেদন করায়, আপাততঃ একমাত্র গোয়ালপাড়া সব ডিভিজনেই বিকল্পে আসামীয়া ভাষা প্রচলনের আদেশ হইয়াছে। কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে যাঁহারা আসামীয়া ভাষা প্রচলনের জন্য দরখাস্ত ও চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালী, এবং কেহই আসামীয়া ভাষা জানেন না।

গত জনগণনায় গোয়ালপাড়া জিলায় যে ছয় লক্ষ লোক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে গোয়ালপাড়া সবডিভিজনে মাত্র দেড় লক্ষ অর্থাৎ একলক্ষ সাতান্ন হাজার লোকের বাস। ইহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ পঁচানব্বই হাজারই আসামীয়া শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু অধিবাসীগণের জাতি, ধর্ম্ম এবং সম্প্রদায়াদি যথারীতি শ্রেণী-বিভাগ করিয়া দেখিলে, এইরূপ নির্দ্ধারণ যে ভ্রমাত্মক তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। গোয়ালপাড়া সবডিভিজনে ছয়ত্রিশ

হাজার মেছ বা কাছাড়ি-ভাষা-ভাষী লোকের বাস, তৎসহ পঁচানব্বই হাজার বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষী যোগ করিলে, সবডিভিজনের মোট জন-সংখ্যা ছাড়াইয়া যায়। সুতরাং হিন্দি ও নেপালি প্রভৃতি ভাষাভাষী প্রবাসীগণের, বিশেষতঃ স্থানীয় অধিবাসী গারো এবং রাভা এই দুই প্রধান জাতীয় লোকের অস্তিত্ব আর থাকে না।

একপ্রদেশে, বিশেষতঃ একই কমিসনারের এলাকা-মধ্যে একাধিক ভাষা প্রচলিত থাকিলে, রাজকীয় কার্য্য-পরিচালন এবং শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে যে বিশেষ অসুবিধা ঘটে, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একই ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা অবশ্যই অসঙ্গত নহে। তবে একই জিলায় একাধিক ভাষা ব্যবহার যে ততোধিক অসুবিধাজনক এবং স্থানীয় অবনতির কারণ হইবে, তাহাও সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে, এত চেষ্টাতেও যখন বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষীর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থাৎ আসামীয়া-ভাষা-ভাষীর তিনগুণ রহিল, তখন দূরভবিষ্যতেও যে সমস্ত জিলায় আসামীয়া ভাষা, বাঙ্গালা ভাষার স্থান অধিকার করিতে পারিবে, ইহা দুরাশা মাত্র।

অতএব আমাদিগের বিবেচনায়, এই বিসদৃশ জিলা আসাম উপত্যকা হইতে উত্তরবঙ্গে খারিজ করিয়া দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও সুবিধাজনক। বিশেষতঃ এই জিলা যৎসামান্য রাজস্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তাধীনে থাকাতে আসাম গবর্ণমেণ্টেরও আয়ের তুলনায় ব্যয়ভার অধিক বহন করিতে হইতেছে। যুগ যুগান্তর হইতে বাঙ্গালা-ভাষা-প্রচলিত এবং বাঙ্গালা-সমাজ-ভুক্ত শ্রীহট্ট, কাছাড় এবং গোয়ালপাড়ার অধিবাসীদিগকে এইক্ষণে আসামীয়া ভাষায় দীক্ষিত বা শিক্ষিত করিয়া আসামের সমাজ-ও-জাতিভুক্ত করার চেষ্টা স্বাভাবিক এবং সহজসাধ্য নহে।

(বিজয়া, আষাঢ়)

লোকহিত

আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড় সে ছোটর অপকার অতি সহজে করিতে পারে, কিন্তু ছোটর উপকার করিতে হইলে কেবল বড় হইলে চলিবে না, ছোট হইতে হইবে, ছোটর সমান হইতে হইবে। মানুষ কোনোদিন কোনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে। হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। লোকের সঙ্গে আপনাকে পৃথক রাখিয়া যদি তাহার হিত করিতে যাই তবে সেই উপদ্রব লোকে সহ্য না করিলেই তাহাদের হিত হইবে।

এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সম্প্রদায়ের ত পার্থক্য থাকেই, কিন্তু সাধারণ সামাজিকতার কাজই এই—সেই পার্থক্যটাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যক্ষগোচর না করা। ধনী দরিদ্রে হিন্দু মুসলমানে পার্থক্য আছে—কিন্তু দরিদ্র ধনীর, মুসলমান হিন্দুর ঘরে আসিলে ধনী বা হিন্দু সেই পার্থক্যটাকে চাপা না দিয়া সেইটেকেই যদি অত্যুগ্র করিয়া তোলে তবে আর যাই হউক দায়ে ঠেকিলে সেই দরিদ্রের বা মুসলমানের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে যাওয়া ধনীর বা হিন্দুর পক্ষে না হয় সত্য, না হয় শোভন। কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বশে মানুষ মানুষকে ঠেলিয়া রাখে, অপমানও করে—তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, হৃদয়ে লাগে না। কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে। কারণ সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে, পরস্পরের পার্থক্যের উপর সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া।

বঙ্গবিচ্ছেদ-ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই। লোক-সাধারণের সম্বন্ধেও আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের ঠিক ঐ অবস্থা। তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে অপমানিত করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস। যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। বাংলা দেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ হিন্দুভদ্রসমাজ এই শ্রেণীয়দিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই। আমাদের সেই মনের ভাবের কোনো পরিবর্ত্তন হইল না অথচ এই শ্রেণীর হিতসাধনের কথা আমরা কষিয়া আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি; তাই একথা স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে যে, আমরা যাহাদিগকে দূরে রাখিয়া অপমান করি তাহাদের মঙ্গলসাধনের সমারোহ করিয়া সেই অপমানের মাত্রা বাড়াইয়া কোনো ফল নাই।

আমাদের দেশে লোক-সাধারণ এখনো নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান্ দিতেও পারে না। আমরা তাহাদিগকে ইংরেজী বই পড়িয়া জানিব এবং অনুগ্রহ করিয়া জানিব সে জানায় তাহারা কোনো জোর পায় না, ফলও পায় না। তাহাদের নিজেদের অভাব ও বেদনা তাহাদের নিজের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত। তাহাদের একলার দুঃখ যে একটি বিরাট দুঃখের অন্তর্গত এইটি জানিতে পারিলে তবে তাহাদের দুঃখ সমস্ত সমাজের পক্ষে একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত। তখন সমাজ, দয়া করিয়া নহে, নিজের গরজে সেই সমস্যার মীমাংসায় লাগিয়া যাইত। পরের ভাবনা ভাবা তখনি সত্য হয়, পর যখন আমাদিগকে ভাবাইয়া তোলে। অনুগ্রহ করিয়া ভাবিতে গেলে কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইতে হয় এবং ভাবনাটা নিজের দিকেই বেশি করিয়া ঝোঁকে।

সাহিত্য সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আমরা যদি আপনার উচ্চতার অভিমানে পুলকিত হইয়া মনে করি যে ঐ-সব সাধারণ লোকদের জন্য আমরা লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিব, তবে এমন জিনিসের আমদানি করিব যাহাকে বিদায় করিবার জন্য দেশে ভাঙা কুলা দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিবে। ইহা আমাদের ক্ষমতায় নাই। আমরা যেমন অন্য মানুষের হইয়া খাইতে পারি না, তেমনি আমরা অন্য মানুষের হইয়া বাঁচিতে পারি না। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, তাহা ত প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরদিনই লোক-সাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। দয়ালু বাবুদের উপর বরাৎ দিয়া সে আমাদের কলেজের দোতালার ঘরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই। সকল সাহিত্যেরই যেমন, এই লোকসাহিত্যেরও সেই দশা। অর্থাৎ ইহাতে ভালো মন্দ মাঝারি সকল জাতেরই জিনিষ আছে। ইহার যাহা ভালো তাহা অপরূপ ভালো—জগতের কোনো রসিক সভায় তাহার কিছুমাত্র লজ্জা পাইবার কারণ নাই। অতএব দয়ার তাগিদে আমাদের কলেজের কোনো ডিগ্রিধারীকেই লোকসাহিত্যের মুরুব্বিয়ানা সাজিবে না। স্বয়ং বিধাতাও অনুগ্রহের জোরে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না, তিনি অহেতুক আনন্দের জোরেই এই যাহা কিছু রচিয়াছেন।

যেখানেই হেতু আসিয়া মুরুব্বি হইয়া বসে সেইখানেই সৃষ্টিপ্রটি হয়। এবং যেখানেই অনুগ্রহ আসিয়া সকলের চেয়ে বড় আসনটা লয় সেইখান হইতেই কল্যাণ বিদায় গ্রহণ করে।

আমাদের ভদ্রসমাজ আরামে আছে, কেননা আমাদের লোক-সাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এই জন্যই জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিস তাহাদিগকে শুষিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে, আর তাহারা কেবল সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন-জারি করিবার জো নাই। আমরা বড়জোর ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জমিদারকে বলি তোমার কর্ত্তব্য কর, মহাজনকে বলি তোমার সুদ কমাও, পুলিসকে বলি তুমি অন্যায় করিয়ো না—এমন করিয়া নিতান্ত দুর্ব্বলভাবে কতদিন কতদিক ঠেকাইব। তাহাতে কোনো এক সময়ে এক মুহূর্ত্তের কাজ চলে কিন্তু চিরকালের এ অবস্থা নয়। সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোর বেশি।

অতএব সব প্রথমে দরকার, লোকেরা আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে একটা যোগ দেখিতে পায়। অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা রাস্তা থাকা চাই। সেটা যদি রাজপথ না হয় ত অন্তত গলি রাস্তা হওয়া চাই।

লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা। যদি বলি জ্ঞান শিক্ষা, তাহা হইলে তর্ক উঠিবে, আমাদের চাষাভুষারা যাত্রার দল ও কথক-ঠাকুরের কৃপায় জ্ঞান শিক্ষায় সকল দেশের অগ্রগণ্য। যদি বলি উচ্চ শিক্ষা, তাহা হইলে ভদ্রসমাজে খুব একটা উচ্চহাস্য উঠিবে,—সেটাও সহিতে পারিতাম যদি আশু এই প্রস্তাবটার কোনো উপযোগিতা থাকিত। আমি কিন্তু সব চেয়ে কম করিয়াই বলিতেছি কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে শেখা। তাহা কিছু লাভ নহে, তাহা কেবলমাত্র রাস্তা—সেও পাড়াগাঁয়ের মেটে রাস্তা। আপাতত এই যথেষ্ট—কেননা এই রাস্তাটা না হইলেই মানুষ আপনার কোণে আপনি বদ্ধ হইয়া থাকে। তখন তাহাকে যাত্রা কথকতার যোগে সাংখ্যযোগ বেদান্ত পুরাণ ইতিহাস সমস্তই শুনাইয়া যাইতে পারো, তাহার আঙিনায় হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনেরও ধূম পড়িতে পারে, কিন্তু এ কথা তাহার স্পষ্ট বুঝিবার উপায় থাকে না যে সে একা নহে, তাহার যোগ কেবলমাত্র অধ্যাত্মযোগ নহে—একটা বৃহৎ লৌকিক যোগ। দূরের সঙ্গে নিকটের, অনুপস্থিতের সঙ্গে উপস্থিতের সম্বন্ধপথটা সমস্ত দেশের মধ্যে অবাধে বিস্তীর্ণ হইলে তবেই ত দেশের অনুভব-শক্তিটা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। মনের চলাচল যতখানি, মানুষ ততখানি বড়। মানুষকে শক্তি দিতে হইলে মানুষকে বিস্তৃত করা চাই। লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কি শিখিবে ও কতখানি শিখিবে সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার কথা অন্যকে শোনাইবে; এমনি করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে—তাহার চেতনার অধিকার যে চারিদিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে এইটেই গোড়াকার কথা। য়ুরোপে লোকশিক্ষা আপাততঃ অগভীর হইলেও তাহা যদি ব্যাপ্ত না হইত তবে আজ সেখানে লোক-সাধারণ নামক যে সত্তা আপনার শক্তির গৌরবে জাগিয়া উঠিয়া আপন প্রাপ্য দাবী করিতেছে তাহাকে দেখা যাইত না।

লোকহিতৈষীরা বলিবেন, আমরা ত সেই কাজেই লাগিয়াছি—আমরা ত নাইট স্কুল খুলিয়াছি। কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনো সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। আমরা ভদ্রলোকেরা যে শিক্ষা লাভ করিতেছি সেটাতে আমাদের অধিকার আছে বলিয়া আমরা অভিমান করি,—সেটা আমাদিগকে দান করা অনুগ্রহ করা নয়, কিন্তু সেটা হইতে বঞ্চিত করা আমাদের প্রতি অন্যায় করা। এই জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোন খর্ব্বতা ঘটিলে আমরা উত্তেজিত হইয়া উঠি। আমরা মাথা তুলিয়া শিক্ষা দাবী করি। সেই দাবী ঠিক পায়ের জোরের নহে, তাহা ধর্ম্মের জোরের। কিন্তু লোক-সাধারণেরও সেই জোরের দাবী আছে, যতদিন তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না হইতেছে ততদিন তাহাদের প্রতি অন্যায় জমা হইয়া উঠিতেছে এবং সেই অন্যায়ের ফল আমরা প্রত্যেকে ভোগ করিতেছি, একথা যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা স্বীকার না করিব ততক্ষণ দয়া করিয়া তাহাদের জন্য এক-আধটা নাইট্ স্কুল খুলিয়া কিছুই হইবে না। সকলের গোড়ায় দরকার লোক-সাধারণকে লোক বলিয়া নিশ্চিতরূপে গণ্য করা। কিন্তু সমস্যাটা এই যে, দয়া করিয়া গণ্য করাটা টেঁকে না। তাহারা শক্তি লাভ করিয়া যেদিন গণ্য করাইবে সেই দিনই সমস্যার মীমাংসা হইবে। সেই শক্তি যে তাহার নাই তাহার কারণ তাহারা অজ্ঞতার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি তাহাদের মনের রাস্তা তাহাদের যোগের রাস্তা খুলিয়া না দেয় তবে দয়ালু লোকের নাইট্ স্কুল খোলা অশ্রু বর্ষণ করিয়া অগ্নিদাহ নিবারণের চেষ্টার মত হইবে। কারণ, এই লিখিতে পড়িতে শেখা তখনি যথার্থ ভাবে কাজে লাগিবে যখন তাহা দেশের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী হইবে। সামান্য লিখিতে পড়িতে শেখা দুই চার জনের মধ্যে বদ্ধ হইলে তাহা দামী জিনিষ হয় না, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইলে তাহা দেশের লজ্জা রক্ষা করিতে পারে।

শক্তির সঙ্গে শক্তির বোঝাপড়া হইলে তবেই সেটা সত্যকার কারবার হয়। এই সত্যকার কারবারে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। য়ুরোপে শ্রমজীবীরা যেমনি বলিষ্ঠ হইয়াছে অমনি সেখানকার বণিকেরা জবাবদিহির দায়ে পড়িয়াছে। ইহাতেই দুইপক্ষের সম্বন্ধ সত্য হইয়া উঠিবে—অর্থাৎ যেটা বরাবর সহিবে সেইটেই দাঁড়াইয়া যাইবে, সেইটেই উভয়েরই পক্ষে কল্যাণের। স্ত্রীলোককে সাধ্বী রাখিবার জন্য পুরুষ সমস্ত সামাজিক শক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে—তাই স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষের কোনো জবাবদিহি নাই—ইহাতেই স্ত্রীলোকের সহিত সম্বন্ধে পুরুষ সম্পূর্ণ কাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; স্ত্রীলোকের চেয়ে ইহাতে পুরুষের ক্ষতি অনেক বেশি। কারণ দুর্ব্বলের সঙ্গে ব্যবহার করার মত এমন দুর্গতিকর আর কিছুই নাই। আমাদের সমাজ লোক-সাধারণকে যে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে এইখানেই সে নিজের শক্তিকে অপহরণ করিতেছে। পরের অস্ত্র কাড়িয়া লইলে নিজের অস্ত্র নির্ভয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে—এইখানেই মানুষের পতন।

আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের, মহাজনের, রাজপুরুষের, মোটের উপর সমস্ত ভদ্রসাধারণের দয়ার অপেক্ষা রাখিতেছে, ইহাতে তাহারা ভদ্রসাধারণকে নামাইয়া দিয়াছে। আমরা ভৃত্যকে অনায়াসে মারিতে পারি, প্রজাকে অনায়াসে অতিষ্ঠ করিতে পারি, গরীব মূর্খকে অনায়াসে ঠকাইতে পারি,—নিম্নতনদের সহিত ন্যায়-ব্যবহার করা, মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা নিতান্তই আমাদের ইচ্ছার পরে নির্ভর করে, অপর পক্ষের শক্তির পরে নহে, এই নিরন্তর সঙ্কট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা। সেই শক্তি দিতে গেলেই তাহাদের হাতে এমন একটি উপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে—সেই উপায়টিই তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো।

(সবুজপত্র, ভাদ্র) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিল্পে অত্যুক্তি

আমাদের চোখ যাহা দেখে, আর মন যাহা দেখে, এই দুইটার মধ্যে অনেক প্রভেদ। মন যখন ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকে আপনার খাতায় জমা করে, তখন তাহার উপর যথেচ্ছা কলম চালাইতে সে কিছুমাত্র ইতস্তত করে না। তাহার নিজের ভাললাগা-না-লাগার খাতিরে সে কত অবান্তর জিনিষকে বড় করিয়া তোলে, কত বড় জিনিষকে বিনাবিচারে, হয়ত অজ্ঞাতসারে, বাদ দিয়া বসে। এই গ্রহণবর্জ্জনের মধ্যে কোন নিয়মসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া অনেকস্থলেই দুষ্কর।

আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যেক ঘটনাসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন রকমের সংবাদ দেয়। বাহির হইতে আলোচনা করিয়া দেখিলে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এগুলি সমস্তই স্বতন্ত্র ব্যাপার বলিয়া ঠেকে; কিন্তু মনের মধ্যে এই সমস্ত মিলিয়া যখন একটা অখণ্ড "রসমূর্ত্তি"তে পরিণত হয়, তখন তাহার মধ্যে কতখানি চাক্ষুষ, কতটা শ্রুত, আর কতটা অন্যকিছুর প্রতিধ্বনি, তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া বাহির করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কথাটা কাহারও নিকট হঠাৎ অদ্ভুত শুনাইতে পারে, তাই একটা সামান্য উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে করুন সূর্য্যাস্তের কথা। সূর্য্যাস্ত যে দেখিতেছে, অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড ছবি মিলিয়া তবে তাহার মনে সূর্য্যাস্তের একটা পরিপূর্ণ ছবি অঙ্কিত হইতেছে। যেমন,—একটা অগ্নিগোলক ক্রমে রক্তবর্ণ হইয়া দিগন্তরেখার তলে ডুবিয়া গেল, তাহার আভায় আকাশের নীলিমা হইতে নগরের ধূলিধূসর কুয়াশা পর্য্যন্ত সোনার সিঁদুরে অপরূপবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল; রৌদ্রাবসানের সঙ্গে সঙ্গে গাছের দিগন্তোন্মুখ ছায়াগুলি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আলো ও ছায়ার দ্বন্দ্বকে লুপ্তপ্রায় করিয়া তুলিল; এবং সকলের শেষে রজনীর অন্ধকার নামিয়া সারাদিনের রৌদ্রক্ষত পৃথিবীর শেষ রক্তরেখাটুকু পর্য্যন্ত মুছিয়া দিল। ইহার মধ্যে রাখাল কখন যে তাহার গরুর পালকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল বা পাখী যে কুলায়লাভের জন্য যে-যার পথে চলিয়া গেল, সেদিকে হয়ত বিশেষভাবে চোখ নাও পড়িতে পারে, কিন্তু তথাপি মনে হয় বিশ্রামলাভের আকাঙ্ক্ষাটা যেন প্রকৃতির মনকেও ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। অন্ধকারের অবসাদ যেন বৃক্ষপত্রে বাতাসে চারিদিকে সংক্রামিত হইয়া একটা অলস ঔদাস্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মনের মধ্যে যে স্ফুট অস্ফুট এতগুলি ছবি জাগিয়া উঠে, তাহার মধ্যে কতটা যে দেখিয়াছি আর কতটা শুনিয়াছি, আর কতটা দেখি নাই শুনি নাই অথচ স্বীকার করিয়া লইয়াছি, তাহা বলা শক্ত; অথচ, ইহার কোনটাকে যদি বাদ দিতে যাই তবেই হয়ত আমার মনের ছবিটিতে অনেকটা ফাঁক পড়িয়া যায়। যদি পাখীর গৃহপ্রয়াণের সঙ্গীতটুকু না থাকে, যদি জীবজগতের অস্ফুট শব্দোন্মেষের স্থলে একেবারে জনতার কোলাহল বা মরুপর্ব্বতের নিস্তব্ধতা কল্পনা করি, তবেই আমার মনের ছবি আর সে-ছবি থাকে না।

প্রকৃতির কোন একটা চাক্ষুষ পরিচয়মাত্রকে শিল্পে ব্যক্ত করিয়াই যদি শিল্পী মনে করেন "যথেষ্ট হইল," তবে অনেকস্থলেই তাঁহার বলাটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। শিল্পী এটি বেশ অনুভব করেন যে, তাঁহার চোখ তাঁহাকে যেটুকু দেখায়, কেবল সেইটুকুকে ঠিক তদ্বৎ করিয়া আঁকিলেই তাঁহার মনের কথাটাকে বলা হয় না। আবার শিল্পীর মাত্রাজ্ঞান যখন মুখ্যগৌণ বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে "চারকড়ায় একগণ্ডা" "বারো ইঞ্চিতে একফুট" এরূপ হিসাব ধরিয়া চলে না। সুতরাং জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, শিল্পীর মন তাহার ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যগুলিকে একটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট "আদর্শের" অনুযায়ী করিয়া গড়িয়া লয়। এইখানেই শিল্পঘটিত প্রায় সকল প্রকার সত্য ও মিথ্যা অত্যুক্তির মূল বলা যাইতে পারে।

"সূর্য্যাস্ত জিনিষটা একটা রঙের খেলামাত্র" কোন শিল্পী এই কথা বলায়, ইংরেজশিল্পী ব্লেক্ আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন "আমি স্পষ্টই দেখিতে পাই, আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে স্বর্গের জয় জয় সঙ্গীত উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে।" ব্লেক্ অনেকের নিকট অক্ষমশিল্পী বলিয়াই পরিচিত, কিন্তু সেই "অক্ষমতার" মধ্যেই তিনি তাঁহার সরল প্রাণটির এমন

পরিচয় দিয়াছেন যে সেই জিনিষটিকে পাইবার জন্য অনেক শক্তিমান শিল্পী শক্তির বিনিময়ে তাঁহার অক্ষমতাকে বরণ করিতে প্রস্তুত আছেন। ব্লেক্ যদি তাঁহার সান্ধ্য-চিত্রে একটা অপার্থিব জয়োচ্ছ্বাসের ছবি আঁকিতেন সেটা তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইত না। কিন্তু আমিও যদি দেখাদেখি আমার লাল নীল আকাশের মধ্যে বীণা-শুদ্ধ গুটি দু'চার পরীর অবতারণা করি, তবেই সমঝদার লোকে আমায় কান ধরিয়া শিল্পের আসর হইতে নামাইয়া দিবে।

আর একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর একই দৃশ্যের মধ্যে রৌদ্র বৃষ্টি কুয়াশা প্রভৃতি অবস্থাবিপর্য্যয়ের কয়েকটি ধারাবাহিক চিত্র দেখাইয়াছেন। তাহার মধ্যে সন্ধ্যার একটি চিত্র আছে, হঠাৎ দেখিলে সেটিকে অন্য কোন দৃশ্যের ছবি বলিয়া ভ্রম হয়। আসলে দৃশ্য সেই একই, কিন্তু এখানে সম্মুখের গাছগুলিকে খাটো করিয়া আকাশের আলো হইতে নীচের অন্ধকারে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে—যেন চিত্রকর গাছগুলিকে একটা অসম্ভব রকম উচ্চস্থান হইতে দেখিতেছেন। কোন সমালোচক ইহার ব্যাখ্যা করেন এই যে—চিত্র বলিতেছে, মানুষের মনটা যেন পার্থিব তুচ্ছতার উপরে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক এক্ষেত্রে এরূপ "অত্যুক্তির" আরও গূঢ় কারণ দেখা যায়। আকাশের দিগন্তশায়ী মেঘস্তরের আলম্বিত শান্তভাব ও নিম্নে পাহাড় ও উপত্যকার সহজ সুন্দর গড়ানে টানগুলি মিলিয়া চিত্রে এমন একটি মৃদু-দোলায়মান রেখাছন্দের সৃষ্টি করিয়াছে যে, সন্ধ্যার বিশ্রামোন্মুখ ভাবটি আপনা হইতেই মনে জাগিয়া উঠে,—মনে হয় সংগ্রামকলুষিত দিবসের পঙ্কিলতা যেন এমনি করিয়াই সন্ধ্যার নিস্তব্ধতার মধ্যে স্তরে স্তরে নামিয়া যায়। ইহার মধ্য হইতে গাছগুলি যদি সঙ্গীনের মত অতিমাত্রায় খাড়া হইয়া উঠিত, তবে সেই উদ্ধত রেখাসজ্ঘাতে সমস্ত ছন্দটিকে একেবারে মাটি করিয়া দিত। সুতরাং এস্থলে শিল্পীর মনের ভাবটিকে রক্ষা করিতে হইলে এরূপ একটা "মিথ্যা"র আশ্রয় লওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর ছিল না। শিল্পের হিসাবে অত্যুক্তিটা যথার্থ ভাবসঙ্গত সুতরাং এক্ষেত্রে সত্যসঙ্গত।

অজ্ঞতাবশত আনাড়ি শিল্পী প্রাকৃতিক সত্যের যে-সকল অপলাপ করিয়া থাকেন, বা ব্যঙ্গচিত্রে ইচ্ছাপূর্ব্বক যে-সকল অত্যুক্তির অবতারণা করা হয়, সেগুলি বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। কিন্তু 'বাস্তবিকতার একটা বিকৃত আদর্শের কল্যাণে মাঝে মাঝে শিল্প-বাজারে যে এক শ্রেণীর নাটকীয় অত্যুক্তির আমদানী হইয়া থাকে, তাহার সহিত আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিচিত। নিজের অন্তর্দৃষ্টির উপর যে শিল্পীর বড় একটা আস্থা নাই, পাছে তাহার বক্তব্যটি সর্ব্বজনসুবোধ্য না হয়, এই আশঙ্কায় সে তাহার কথাগুলিকে অতিমাত্রায় স্পষ্টোচ্চারিত করিয়া অজস্র ইঙ্গিত ও ভঙ্গীবাহুল্যের আটঘাট এমন করিয়া বাঁধিয়া দেয় যে, শিল্পরঙ্গভূমির প্রশংসাবাদীগণের মনে আর অণুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ইহার দু একটি পরিচিত নমুনা দিলে ভাল হইত, কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া সে দুঃসাহসিক কার্য্যে বিরত থাকিলাম। আমাদের দেশে এই জাতীয় অত্যুক্তির প্রসারের জন্য পাশ্চাত্য শিল্পকে দায়ী করাটা ঠিক ন্যায়সঙ্গত হয় না। কারণ, ইহার দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য জগতে বিরল না হইলেও, পাশ্চাত্য বাস্তবশিল্পের দোহাই দিয়া আমাদের দেশে সাধারণত যে জিনিষটার চর্চ্চা হইয়া থাকে, সেটা পাশ্চাত্যও নয় বাস্তবও নয়, এবং অধিকাংশ স্থলে শিল্প নামেরও যোগ্য নয়। অতিরিক্ত কথা বলাটাও একপ্রকারের অত্যুক্তি এবং কাব্যের ন্যায় শিল্পেও তাহা নিন্দনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া, অত্যুক্তি বলিতেই কিছু বাক্যের অসঙ্গত বাহুল্য বুঝায় না। অত্যুক্তি জিনিষটাও যে শিল্পসঙ্গত হইতে পারে, এ কথাটা আর কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও এদেশের মাসিক পত্রের পাঠকগণকে বুঝাইয়া বলা আবশ্যক হইত। কেন হইত তাহা জানি না, কারণ কাব্যে সাহিত্যে অত্যুক্তির ছড়াছড়িতে আমরা ত বেশ অভ্যস্ত আছি।

শিল্পের প্রচলিত পদ্ধতিগুলা যখন নিতান্ত অভ্যস্ত ও "মামুলী" হইয়া আসে, তখন তাহারই প্রতিক্রিয়ারূপে যে-সকল নব্য তন্ত্রের অবির্ভাব হয়, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই একটা অত্যুক্তির ধূয়া দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যুক্তির বাড়াবাড়িটা কত দূর গড়াইলে তবে তাহাকে অসঙ্গত বলা

চলে এ প্রশ্নের খুব একটা সোজাসুজি মীমাংসা হয় না। কিন্তু অনেক প্রকার অনাবশ্যক অপ্রাসঙ্গিক, বা অতিস্পষ্ট অত্যুক্তির মূলে প্রায়ই একটা আদর্শবিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। শিল্পী তাঁহার মনের ভাবকেই যথাসঙ্গত ভাষায় ব্যক্ত করিবেন, এই অত্যন্ত সহজ কথাটিকেই টানিয়া ফেনাইয়া অতিরিক্ত ব্যাপক করিয়া তুলিলে কথাটা নিতান্তই উদ্ভট হইয়া পড়ে। ভাব জিনিষটা যখন বস্তু-

সুন্দরীর ডাগর আঁখি।
এই মর্ম্মরমূর্ত্তিটি একটি জীবন্ত সুন্দরীর ; শিল্পী ব্রাঙ্কুসি এই মূর্ত্তিতে সুন্দরীর আঁখির গভীর দৃষ্টি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন।
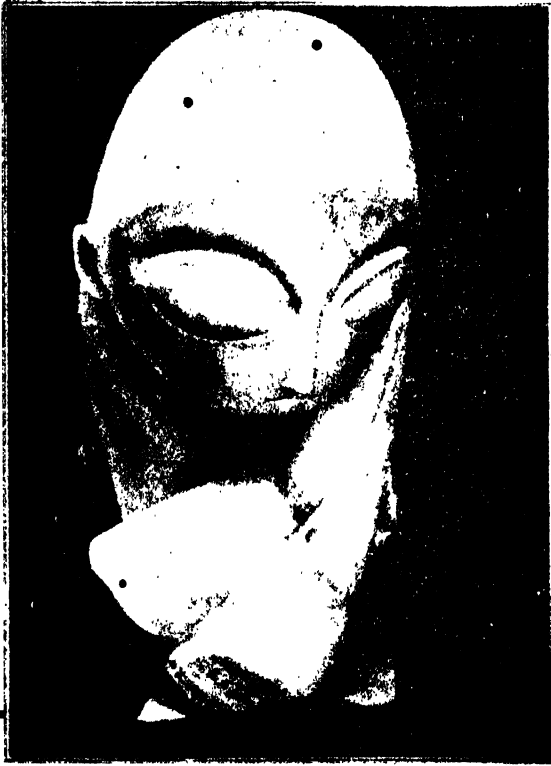
নিরপেক্ষ প্রকাশের উৎকট চেষ্টায় প্রকৃতির সহিত একটা অর্থহীন কলহ বাধাইয়া বসে, তখনই তাহাকে কিছু-কালের জন্য শিল্পরাজ্য হইতে নির্ব্বাসন দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। যে অত্যুক্তিমূলক ভাবকল্পনা-পদ্ধতিকে আমরা প্রাচ্য শিল্পের মধ্যে বিশেষ ভাবে দেখিতে পাই, সেই জিনিষটার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ঘটিলে তাহা কত দূর উৎকট ও অসঙ্গত হইতে পারে, তাহারই নমুনাস্বরূপ ব্রাঙ্কুসি নামক রুমানীয়ার শিল্পীর রচিত একটি মূর্ত্তির ছবি দেওয়া গেল। এই রমণীমূর্ত্তির ভীষণায়ত দৃষ্টির কল্পনায় নাকি বিশেষ ভাবে অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা ও স্পষ্টতা সূচিত হইয়াছে! বিভিন্ন শিল্পের ইতিহাস, বিশেষত আজ-কালকার পাশ্চাত্য "অত্যুক্তিমূলক" শিল্পের ইতিহাস, আলোচনা করিলে আমরা এই একটা তত্ত্বলাভ করি যে, অত্যুক্তি জিনিষটা যে-কোন সূত্র অবলম্বন করিয়াই শিল্পে প্রশ্রয়লাভ করুক না কেন, সে অনেক সময়ে ছুঁচটি হইয়া প্রবেশ করে বটে, কিন্তু পরিণামে প্রায়ই ফালটি হইয়া বাহির হয়।

রুড, টার্ণার প্রভৃতি শিল্পীগণ নিষ্ঠার সহিত আলোক-রহস্যের চর্চ্চা করিয়া শিল্পে একটা নূতন রসের সঞ্চার করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ইঁহারা নানাপ্রকার অত্যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন এবং রাস্কিন্ সেই সূক্ষ্ম অত্যুক্তির আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে টার্ণারের "অত্যুক্তি"-গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা সত্যসঙ্গত এবং সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক। এই আলোকসৌন্দর্য্যের কুহকে পড়িয়া পরবর্ত্তী যুগের বর্ণোপাসকগণ "কেবলমাত্র আলোক- ও বর্ণবৈচিত্র্যের সাধনাতেই উচ্চতম শিল্পপ্রতিভা সার্থকতালাভ করিতে পারে" এইরূপ একটা ধুয়া তুলিয়া বস্তুনিরপেক্ষ আলোক-তত্ত্বের সন্ধানে আপনাদের শক্তি ও সময় ব্যয় করিয়াছেন। ইঁহাদের চক্ষে প্রাকৃতিক ঘটনামাত্রই কতগুলি অপরূপ বর্ণের বিচিত্র সমাবেশমাত্র। নীলিমার গম্ভীর সুর কেমন করিয়া অবাধে ও অলক্ষিতে রক্তিমতায় আরোহণ করে, এবং খণ্ড আলোকের ছন্দ কেমন করিয়া তাহার নিরব-চ্ছিন্নতাকে ভাঙিয়াও ভাঙে না—প্রতিদিন সূর্য্যের উদয়ে ও অস্তগমনে ইঁহারা এই শিক্ষাই লাভ করেন। শিল্প চিরকাল এই শিক্ষা দিয়াছে যে কোন বস্তুর "রূপ" বলিতে তাহার বর্ণের চাইতে তাহার আকৃতিটাকেই বেশি বুঝায়, করণ আকৃতিটাই বিশেষ ভাবে তাহার প্রকৃতির পরিচায়ক! সুতরাং বর্ণ জিনিষটা বহুকাল ধরিয়া কেবল-মাত্র আকৃতি প্রকাশের সহায়তার জন্যই ব্যবহৃত হওয়ায়, তাহার যে একটা নিজস্ব মূল্য ও বিশেষত্ব আছে এ কথা লোকে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। সুতরাং বর্ণের পুনঃ-

প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া শিল্পী যে, বস্তুর আকারগত রূপটাকে উড়াইয়া বসিবেন, ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই ; প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মই এই। বর্ণগত অত্যুক্তির মাত্রা বাড়িতে বাড়িতে শেষটায় এই সিদ্ধান্তে আসিয়া ঠেকিল যে, "যেহেতু বিজ্ঞান বলেন যে চোখের মধ্যে কয়েকটা মৌলিকবর্ণের পাশাপাশি সমাবেশকেই আমরা আলোকরূপে প্রত্যক্ষ করি, অতএব আলোককে সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করিতে হইলে উক্ত কয়েকটি মৌলিক বর্ণের বিন্দু বিন্দু প্রয়োগ ভিন্ন সত্যসঙ্গত আর কোন উপায় নাই।" কথাটা ঠিক বৈজ্ঞানিক সত্য না হইলেও একদল শিল্পী এই "আদর্শ" অনুসারে, লাল নীল হলুদের ছোট বড় ফুট্‌কীর মধ্যে সাদা কালো মিশাইয়া শিল্প রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। একটা উৎকট মতানুবর্ত্তিতার খাতিরে অকারণ শক্তিক্ষয়ের এমন আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত আর বড় দেখা যায় না।

ফটোগ্রাফ জিনিষটাকে সত্যনিষ্ঠার চূড়ান্ত নিদর্শন জ্ঞানে অনেকে তাহাকে খুব একটা সম্ভ্রমের চক্ষে দেখেন। কিন্তু বাস্তবিক অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে সত্যের বিকৃতিসাধনে ফটোগ্রাফও বড় কম পটু নহে। তা ছাড়া, তাহার ছোটবড়জ্ঞানশূন্য নির্ব্বিচার দৃষ্টিতে "মুড়ি মুড়কি এক দর" হইয়া যে অসঙ্গতি ঘটায়, সেটিও বড় সামান্য নয়। ফটোগ্রাফ-বর্ণিত কোন ব্যাপারের ছবিতে তাহার একটা সাময়িক অবস্থামাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যে জিনিষ স্থির থাকে না, যাহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তমান, তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইলে রীতিমত সিনেম্যাটোগ্রাফের প্রয়োজন। এস্থলে শিল্পীর কর্ত্তব্য কি? তিনিও কি ফটোগ্রাফের অনুকরণে গতির ছন্দকে একটা ক্ষণিক আড়ষ্ট সংহত ভঙ্গীর দ্বারা প্রকাশ করিবেন? দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল ঘটনার পরিবর্ত্তনপর্য্যায়-গুলিকে ত আমরা স্বতন্ত্র করিয়া দেখি না মোটের উপর একটা গতিপ্রবাহ উপলব্ধি করি মাত্র। যে উপায়ে এই গতির প্রবাহ ও ছন্দকে সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করা যায় তাহাই গতি সূচনার প্রকৃষ্টতম উপায়। ইহা অতি পুরাতন সর্ব্ববাদীসম্মত কথা ; কিন্তু কথাটাকে সকলে ঠিক এক ভাবে বা এক অর্থে গ্রহণ করে না। একটা ঘোড়া ছুটিতেছে ; আমি দর্শক, তাহার চারি পায়ের উঠা নামা, সঙ্কোচন প্রসারণ এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্তদেহের সম্মুখীনগতিরূপ একটা প্রকাণ্ড জটিল ব্যাপারকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু, ঠিক কোন্ মুহূর্ত্তে কোন্ কার্য্যটি কতদূর অগ্রসর হইতেছে তাহার একটা চাক্ষুষ হিসাব রাখা অসম্ভব ; আর সে হিসাব পাইলেও, কোন বিশেষমুহূর্ত্তের দেহাব-স্থানের দ্বারা গতির জটিল ছন্দটি সম্যক্ সূচিত না হওয়াই সম্ভব। নৃত্য গীত বাদ্য আহার বিহার প্রহার বক্তৃতা পলায়ন প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যের এক একটা নিজস্ব ছন্দ ও রূপ আছে। সাধারণ ভাবে আমরা ইহাই বুঝি যে, যে প্রকার দেহভঙ্গী বা অঙ্গবিন্যাসের দ্বারা এই ছন্দটি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয় চিত্রে তাহাই প্রযোজ্য। আধুনিক অত্যুক্তিবাদী ইহার উপর নিজের এই টিপ্পনী যোগ করিয়াছেন যে "গতির ছন্দকে ব্যক্ত করিতে হইলে যদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির অসম্ভব বিক্ষেপ বা দেহবিচ্যুতি পর্য্যন্ত ঘটান আবশ্যক হয়, তবে তাহাও শিল্পসঙ্গত বলিতে হইবে। আর, দুই চারিটা অতিরিক্ত হস্তপদ যোজনা করিলে যদি কথাটা আরও সুব্যক্ত হয়, তবে তাহাতেই বা বিরত থাকিব কেন?"

এই-সকল কথা কেবল সম্প্রদায় বিশেষের "মত" মাত্র নহে। "ফিউচারিষ্ট" নামধারী "শিল্পী"গণ হাতে কলমে ইহার সমস্তই করিয়া দেখাইতেছেন। এই ফিউ-চারিস্‌ম্ বা ভবিষ্যবাদ একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভবিষ্যৎবাদীগণ শিল্পের সকল প্রকার নিয়ম-কানুন ও বাঁধাবুলিকে এবং অতীতের সকল প্রকার সংস্কার ও বন্ধনকে আবর্জ্জনা জ্ঞান করিয়া থাকেন। সৌন্দর্য্য বল, শৃঙ্খলা বল, সুরুচি বল, এ সমস্তেরই মধ্যে একটা নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যের আনুগত্য দেখা যায়! এ উপদ্রব নাই কেবল জীবনসংগ্রামে এবং জীবনের মূলগত অকাট্য সত্যের নির্ভীক অনুসরণে ; কারণ প্রাণশক্তি সেখানে কৃত্রিমতার বন্ধন ছাড়িয়া আপনার প্রেরণায় আপনার অতীতকে অতিক্রম করিয়া আসিতেছে! ভবিষ্যৎবাদী যাহাকে জীবন-'সংগ্রাম' বলেন তাহা কেবল জীবনের অন্তর্নিহিত একটি গূঢ় শক্তির উচ্ছ্বাস মাত্র নহে ; তাঁহার মতে বাহিরের বিরোধ, যুদ্ধ বিদ্রোহ, বাণিজ্যের

স্বার্থসংঘাত, শক্তির উদ্ধত অভিমান, লৌহকঙ্কাল সভ্যতার স্পর্দ্ধা ইহারাই বর্ত্তমান যুগে জীবন প্রসারের শ্রেষ্ঠতম মূর্ত্ত পরিচয়! সুতরাং পুরাতন সংস্কারের চর্ব্বিত চর্ব্বণ ও মামুলী ভাব-রসিকতার পুনরুক্তি করিয়া আর অরুচির মাত্রা বাড়াইও না। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, বিজ্ঞানবাণিজ্যের উদ্দাম ধূমোদ্গার ও সমাজসংগ্রামের নির্ম্মম গদ্যকে তোমার শিল্পে ও কাব্যে বরণ করিয়া তাহাতে চির নূতনত্বের সঞ্চার কর। কৃত্রিমতা আমাদের হাড়ে হাড়ে, নতুবা শিল্পী তাঁহার ভাব প্রকাশের জন্য আবার একটা "ব্যাকরণ" গড়িবেন কেন? তাঁহার মন যাহা দেখিল তাহাকে আবার চোখের দেখার সহিত মিলাইয়া সংযত করিয়া লইবেন কেন? আমাদের সকল কার্য্যের অর্থাৎ সকল প্রকার আত্মপ্রকাশের এক একটা অব্যক্ত রূপ আছে। মনের কথাগুলি যতক্ষণ মনেই থাকে, ততক্ষণ অনর্থক ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া বা কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়াপদের পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া কেহ তাহাকে চিন্তা করে না। আমি তুমি, এখান সেখান, যাওয়া করা, ইত্যাদি মোটা মোটা "আইডিয়া"গুলিই অবিচ্ছেদে মনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হইয়া অব্যক্ত চিন্তায় পরিণত হয়। যদি "ফিউচারিষ্ট" হইতে চাও তবে ঘটনামাত্রেই মনের মধ্যে যে-সকল অস্ফুট ছাপ রাখিয়া যায়, তাহারই কয়েকটার খিচুড়ী বানাইয়া চিত্রপটে ছড়াইয়া দাও। সুতরাং আদর্শ, মত, বিষয়নির্ব্বাচন ও রচনাপদ্ধতি সকল বিষয়েই ফিউচারিষ্টের মৌলিকতা স্বীকার্য্য। ফিউচারিষ্ট-অঙ্কিত নৃত্যামোদের চিত্রটিতে নৃত্য ব্যাপারটা একটা উদ্দামবিক্ষিপ্ত বর্ণচ্ছন্দে পরিণত হইয়াছে বটে, কিন্তু কতকগুলি অর্দ্ধ-সংলগ্ন হস্তপদমুখাকৃতি অবয়বের ছড়াছড়িতে সমবেত নৃত্যভঙ্গীর রূপটি ফুটিয়াছে মন্দ নয়। কোথাও বিশেষ

নৃত্যসভা।
এই চিত্রে শিল্পী গিনো সেভেরেনি একটি নাচের মজলিসে বহু নরনারীর অঙ্গগতির চঞ্চলতা ও সদাপরিবর্ত্তমান অবস্থানপরম্পরা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন।

বিপ্লববাদী গ্যালির শ্মশানযাত্রা এই চিত্রে শিল্পী কার্লো কার' ভীষণ রমনীয় মহিমান্বিত কল্পনায় এক বিপ্লববাদীর মৃত্যুর পরও যে বিপ্লবের জড় মরে না তাহাই প্রকাশ করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

পথের দাঙ্গা।

শিল্পী রুসোলা এই চিত্রে দেখাইতে চাহিয়াছেন—ক্রোধে উন্মত্ত দাঙ্গাকারী লোকেরা পথের একটি দিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই দিক হইতে লোকের ভয়ের কৃষ্ণ ছায়া ক্রমশ বর্দ্ধিত বিস্ফারিত হইয়া দাঙ্গাকারীদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

জিনিষের জট পাকাইয়া, তাহাকে "গত" রজনীর স্মৃতি" বলিতে ইঁহারা একটুকু ইতস্তত করেন না। কেহ আবার আপনার ভাবকে লইয়াই সন্তুষ্ট নহেন "নাগর দোলায় আরূঢ় ব্যক্তির মনোভাব", "আক্রান্ত যোদ্ধার ভয়-তুমুল মনোভাব", "দাঙ্গাকারী ভিড়ের সমষ্টিভূত মনোভাব" ইত্যাদি অনেক বিচিত্র "মনোভাবের" চর্চ্চা ইহাঁরা করিয়া থাকেন। এখন বাকী আছে "কটাহ-নিক্ষিপ্ত কই মৎস্যের মনোভাব" ও "অর্দ্ধপক্ক পাঁউরুটির মনোভাব"। অনেকে সন্দেহ করেন যে, কোন কোন "ভবিষ্য শিল্পী" হয়ত এই ফাঁকে জগতের সঙ্গে বুজরুকী করিয়া একটা মস্ত রসিকতার চেষ্টায় আছেন।

কিছু নাই অথচ মনে হয়, হাত পা উঠিতেছে পড়িতেছে এবং সেই গতির হিল্লোল যেন সমস্ত চিত্রটিকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। 'গ্যালির শ্মশানযাত্রা'র বিষয়টি ফিউচারিষ্ট শিল্পীর ঠিক মনের মত হইয়াছে। সূর্য্যাস্তের অগ্নিগর্ভ রক্তচক্ষু যেমন সূর্য্যদেবের বিদায়কালেও তাঁহার বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া রাখে এবং পৃথিবীকে শাসাইয়া যায় যে, রৌদ্রের কষাঘাতে সকলকে উত্যক্ত করিবার জন্য কাল আবার আসিব; সেইরূপ বিপ্লববাদীর অন্তিম প্রয়াণে একটা "মরিয়া না মরে রাম" গোছের ভাব দেখান হইয়াছে। বিরুদ্ধ রেখাবর্ণের উদ্ধত সংঘাত, এবং ঘূর্ণায়মান আলোকচক্রে ছায়ামূর্ত্তিগুলির উল্লসিত তাণ্ডব নৃত্যে মৃত্যুর বিভীষিকাকে একটা বিজয়দৃপ্ত ঝঞ্জনার মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছে। এখানে আমরা যাহা দেখিতেছি ইহা ভবিষ্য শিল্পের একটা অপেক্ষাকৃত সংযত রূপ! ইহার "পরিপূর্ণ" রূপের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া অনর্থক পুথি বাড়াইবার কোন প্রয়োজন দেখি না। একই চিত্রের মধ্যে মানুষের চোখ 'খানার টেবিল' তাসের আড্ডা, অন্ধকার পথ, মোটর গাড়ী প্রভৃতি অসংলগ্ন

কিন্তু অত্যুক্তি জিনিষটার চরম পরিণতি দেখিতে হইলে তথাকথিত cubist বা "চতুষ্কোণবাদী"র সংবাদ লওয়া উচিত ইঁহাদের মতে অধমতম বাস্তব শিল্পী ও ভবিষ্যবাদীর মধ্যে বড় বেশী তফাৎ নাই! ভবিষ্যবাদী চাক্ষুষ-দৃশ্যের অনুকরণ না করিয়া একটা মানসরূপের অনুকরণ করেন, এইটুকুমাত্র তাঁহার মৌলিকতা। তাঁহার শিল্প-সাধনায় এই "অব্যক্তরূপের" একান্ত বশ্যতা ও রেখা বর্ণাদির ঐকতানমূলক একটা সংস্কার ত স্পষ্টই দেখা যায়। যদি সত্যই সংস্কারবিমুক্ত হইতে হয়, তবে দৃষ্ট বা কল্পিত বস্তুর রূপকে এমন কিছু দ্বারা ব্যক্ত করা আবশ্যক, যাহার সহিত সেই বস্তুর আকৃতিগত বা প্রকৃতিগত কোনপ্রকার সাদৃশ্য নাই। এইজন্য জীবদেহের সুগোল বর্ত্তুলতাকে "কিউবিষ্ট" কতগুলি সোজা রেখার আঁচড় ও একটানা বর্ণ প্রলেপে পরিণত করেন। রেখার উপর রেখা চাপাইয়া এক একটী "কিউবিষ্ট" চিত্রে ত্রিকোণ চতুষ্কোণাদির যে

জঙ্গল রচিত হয়, তাহাকে হঠাৎ দেখিলে কোথাকার মানচিত্র বা ক্ষেত্রতত্ত্বের কোন সিদ্ধান্ত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। অসঙ্গত ঋজুতার টানে সকল ছন্দকে এবং রেখা ও গঠনের সৌন্দর্য্যজাত সকল সংস্কারকে একেবারে নির্ম্মূল করিতে না পারিলে কিউবিষ্ট নিশ্চিন্ত হন না; কারণ, তিনি সভ্যাসঙ্গত শিল্পমাত্রেরই কৃত্রিম জটিলতাকে ভাঙিয়া শৈশবের সহজ রেখার অনাবিলতাকে আবার শিল্পের মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে চান! কথাগুলি শুনিতে যাহার কাছে যেমন লাগুক, কার্য্যত ইহার ফল কিরূপ দাঁড়ায় তাহার একটু নমুনা দেওয়া গেল। চিত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া কিউবিষ্ট শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, সুতরাং চিত্রপরিচয়ের বৃথা চেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম।

প্রসাধন। কিউবিষ্ট শিল্পী পাব্লো পিকাসো এই চিত্র কোণালো আয়ত ক্ষেত্রের সমষ্টি দ্বারা রচনা করিয়াছেন।

বেহালাবাদক কুবেলিকের প্রতিকৃতি শিল্পী পাব্লো পিকাসোর চোখে যেমন লাগিয়াছে।

শেষ কথা এই যে, অত্যুক্তি জিনিষটা কোন-না-কোন আকারে শিল্পের মধ্যে থাকিবেই। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে মাথায় চড়িতে দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। অবশ্য প্রত্যেকটি উক্তি সুসঙ্গত হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য মনের ভাবগুলাকে অহরহ অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিতে হইবে, এরূপ উপদেশ কেহ দেয় না; কিন্তু অত্যুক্তি জিনিষটা অত্যাচারে পরিণত না হউক, শিল্পীর মনে যদি এরূপ কোন অভিপ্রায় থাকে, তবে ভাবের সঙ্গে বস্তুজ্ঞানের একটা পরিচয় ঘটান আবশ্যক। আর, সর্ব্বোপরি আবশ্যক আত্মনিষ্ঠা। শিল্পীর অন্য দোষ গুণ যাহাই থাকুক, এই জিনিষটি যদি থাকে, এবং যদি লোকে হাসিবে বা পাগল বলিবে এই ভয়ে তিনি আত্মগোপন না করেন, তবে তিনি আর কিছু লাভ করুন আর নাই করুন, আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক আনন্দ ও সার্থকতা হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

শ্রীসুকুমার রায়।

গত রজনীর স্মৃতি।
শিল্পী রুসোলা এই চিত্রে গত রজনীতে পথ চলিতে চলিতে মানুষের চকিত-দৃষ্ট দৃশ্যপরম্পরার যে মিশ্র চিত্র মনের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া মাঝে মাঝে উঁকি মারে তাহা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন—একখানি রমণী-মুখ, একটা শ্যাকড়া গাড়ীর বেটো ঘোড়া, একটা মোটর গাড়ীর দ্রুত ঘূর্ণিত চক্র, একটি রমণীর কৃশ কটি, একখানি হাত, একটা শ্রান্ত শীর্ণ নগ্ন ভিক্ষুক প্রভৃতি।

নিম্নশ্রেণীয়ের উন্নয়ন

আমরা হিন্দুরা মানুষ হইয়া মানুষকে যেমন ঘৃণা করিয়াছি এমন আর কাহাকেও করি নাই। গোরু আমাদের নমস্য, তাহার বিষ্ঠা পর্য্যন্ত পবিত্র; কিন্তু মানুষ আমাদের অস্পৃশ্য। আমাদের রন্ধনশালায় বিড়ালের অবাধ গতি, মানুষের প্রবেশ নিষেধ; মানুষ ঘরে আসিলে আমাদের হাঁড়ি কলসী মারা যায়, ছোঁয়ার ত কথাই নাই। মানুষের ছায়া মাড়াইলেও স্নান করিতে হয়, আমাদের সনাতন শাস্ত্রের বিধান!

মানুষ হইয়া মানুষের প্রতি এই ঘৃণার অত্যাচারের ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে—আমরা সমস্ত জগতের অস্পৃশ্য পতিত জাতি হইয়া আছি। আমরা যে স্পর্দ্ধায় অপরকে অস্পৃশ্য পতিত বলিয়া ঘৃণা করিয়াছি, সেই স্পর্দ্ধা শতগুণ হইয়া জগতের চারিদিক হইতে আমাদিগকে অপমানিত করিতেছে। আমরা জগতের রাষ্ট্রসভায় নগণ্য; একই রাজার অধীন হইয়াও স্বাধীন দেশের উপনিবেশে আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমরা এমনি অস্পৃশ্য পতিত যে কোনো য়ুরোপীয় আমাদের সহিত এক গাড়ীতে যাইতে ঘৃণা বোধ করে; আমরা শ্বেতাঙ্গদের উপনিবেশের মাটি ছুঁইলে তাহাদের দেশকে-দেশ অশুচি হয়। ইহাই ধর্ম্মের নিয়ম; সমস্ত অত্যাচার অবিচার তোলা থাকে, একদিন শতগুণ হইয়া তাহা অত্যাচারীর মাথায় ভাঙিয়া পড়ে।

বাস্তবিক পক্ষে এতগুলি মানুষের উপরে পশুর মতো ব্যবহার করিয়া হিন্দু সমাজ এতদিন যে কি করিয়া বাঁচিয়া আছে সেইটাই বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু বাঁচিয়া আছে বলিলে কথাটার উপর অনর্থক অনেকটা জোর দিয়া ফেলা হয়। কারণ কোনো রকমে টিকিয়া থাকার নাম বাঁচিয়া থাকা নয়—তাহা মরণেরই রূপান্তর। বাঁচা কথাটায় যাহা বুঝায় হিন্দুসমাজের কারণে অকারণে জীবনের সেই নিত্য নূতন অনাহত আনন্দ-স্পন্দন তো নাইই, বরং এমন একটা বিশ্রী রকমের নিশ্চল জড়তার ভাব আসিয়া পড়িয়াছে যে তাহা প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে স্থবির করিয়া ফেলিতেছে—প্রতি পলে তাহাকে মৃত্যুপথের আসন্ন পথিক করিয়া তুলিতেছে। এত লোক খৃষ্টান ও মুসলমানের তালিকায় নাম লেখাইবার জন্য এই সঙ্কীর্ণতার জীর্ণ দেয়াল ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে যে এরূপ ভাবে চলিলে আর কিছুদিন পরে পৃথিবীর বুকে ইহার চিহ্ন মাত্রও পাওয়া যাইবে না। কিন্তু নৌকা দরিয়ার মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়াই হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিব, তরঙ্গের আঘাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইব না, এটা একটা প্রকাণ্ড রকমের কাপুরুষতা। এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না—তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে, শিক্ষার দ্বারা তাহাকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে, জ্ঞানের প্রসারতার দ্বারা তাহার ভিতরে জীবনের সাড়া জাগাইতে হইবে; যাহারা এতদিন পবিত্রতার দোহাই দিয়া এতগুলি লোককে নির্দ্দয় ভাবে অপমান করিয়া আসিয়াছে তাহাদিগকেই একপাশে সরাইয়া দিয়া, যাহারা একপাশে পড়িয়া ছিল তাহাদিগকে প্রীতির আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ধরিতে হইবে।

আর্য্যসমাজভুক্ত মেঘ চৌধুরীগণ অর্থাৎ মেঘদিগের সর্দ্দারগণ।

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী, যিনি প্রথমাগত ২০০ জন মেঘের শুদ্ধিসংস্কার সম্পাদন করেন।

স্তূপ সরাইয়া, জ্ঞানে কর্ম্মে তাহাদিগকে স্পৃশ্য করিয়া তুলিতে হইবে।

পাঞ্জাবের দিক্‌চক্রবালে ইহার পূর্ব্বাভাস দেখা দিয়াছে। আর্য্য সমাজের কর্ম্মীগণ মেঘ জাতির উন্নতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন এবং অজস্র প্রতিকূলতার ভিতর হইতেও তাঁহারা যে পরিমাণ সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই গৌরব ও গর্ব্বের বিষয়।

শিয়ালকোট, গুজরাট, গুরুদাসপুর, জম্মু এবং কাশ্মীরের কয়েকটি সহরে এই মেঘদের বাস। লোক-গুন্‌তির হিসাব অনুসারে তাহারা সংখ্যায় এক লক্ষ পনর হাজার চারিশত উনত্রিশ জন। মেঘেরা সাধারণতঃ গৌরবর্ণ—তাহাদের চেহারা ও আচার ব্যবহারের ভিতর শ্রেষ্ঠ হিন্দুত্বের আভাস এতই সুস্পষ্ট যে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, তাহারা যে একদিন সমাজে উচ্চস্তরে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল একথা কিছুতেই অস্বীকার করিবার যো থাকে না। এখনো তাহারা কোনো অপরিষ্কার ব্যবসায় স্বীকার করে না; তাহারা ছুতার, দর্জ্জি ও প্রধানত তাঁতীর কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে; কেহ কেহ বা মুসলমানের বাড়ীতে চাকর ও কৃষাণের কাজও করে। মুসলমানের বাড়ীতেই শুধু কাজ করে, কারণ হিন্দুরা যে তাহাদের ছায়া পর্য্যন্ত, স্পর্শ করা দূরে থাকুক, পা দিয়া মাড়ায় না।

কাজটা সহজ নহে—কিন্তু যাহা সহজ নহে তাহাই চিরকাল মানব-সমাজকে উন্নতির পথে চালিত করিয়া আসিয়াছে।—সহজ নহে বলিয়াই দেশের ভিতর আজ ইহার এতটা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

ঘরে বাহিরে লাঞ্ছনা অপমানে আহত জর্জ্জরিত হইয়া এখন আমাদের চৈতন্যের উন্মেষ হইতেছে, দেশের ভিতর একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—পতিত জাতিকে উদ্ধার করিতে হইবে, অস্পৃশ্যদের ভিতর হইতে আবর্জ্জনার

সমাজের অতখানি উচ্চস্তর হইতে সহসা মেঘেরা কেমন করিয়া অধঃপতনের এই শেষ সীমায় আসিয়া পড়িয়াছে সে সম্বন্ধে অনেকগুলি কিম্বদন্তী স্থানীয় জনসাধারণের ভিতর প্রচলিত আছে। ইহাদের কোন্‌টি সত্য, ঐতিহাসিক
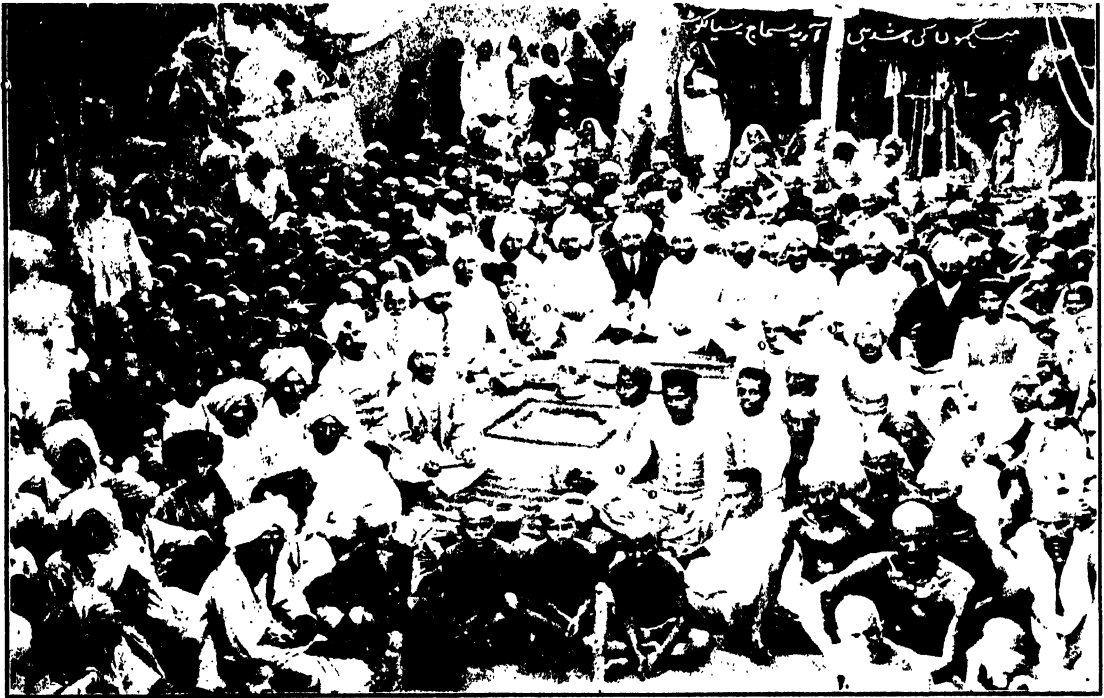
মেঘদিগের শুদ্ধিসংস্কার।

মেঘদিগের সহিত অপর জাতির লোকের পংক্তিভোজন।

মেঘ ভক্তপ্রচারক, রাজপুতের দ্বারা আহত।

শিয়ালকোটের আর্য্য শিল্প-বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা।
ডেপুটি কমিশনর শ্রীযুক্ত কর্ণেল পপ্‌হাম ইয়ং পত্নীসহ ভিত্তি স্থাপন করিতে আসিয়াছেন।

প্রমাণের দ্বারা আপাততঃ তাহার তথ্য নির্ণয় না করিলেও চলিবে কিন্তু যে পীড়ন এবং অত্যাচার তাহারা সমাজের নিকট হইতে এযাবৎকাল সহ্য করিয়া আসিতেছে তাহার প্রতিকার না করিলে কিছুতেই চলিবে না। মানুষ মানুষের প্রতি পশুরও অধম ব্যবহার করিতে পারে, এই সভ্যতা-পরিপ্লাবিত যুগে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন হইলেও একথা একান্ত সত্য যে মেঘেরা হিন্দু পল্লীর ভিতরে বাস করিতে পায় না; জলের প্রয়োজন হইলে পাত্রহস্তে তাহাকে অন্যের কৃপার্থী হইয়া কূপের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়, তাহারা কূপ স্পর্শ করিতে

পায় না, যদি 'পবিত্র' জাতির কাহারো দয়া হয় সে জল তুলিয়া দূরে গিয়া মেঘের কলসীতে জল ঢালিয়া দেয়; রাজপথ দিয়া স্বাধীন ভাবে চলা ফেরা করিবার অধিকার হইতে তাহারা বঞ্চিত, তাহারা যখন পথে চলে তখন 'পবিত্র' হিন্দুদিগকে শুচিতা রক্ষা করিবার জন্য হাঁকিয়া হাঁকিয়া সাবধান করিয়া চলিতে হয়। হিন্দুর দেবতার মন্দিরের দ্বার পর্য্যন্ত তাহাদের কাছে রুদ্ধ; সামাজিক বা ধর্ম্ম ব্যাপারের সহিত তাহাদের কোন সংযোগ নাই; তাহাদের স্পর্শ, এমন কি তাহাদের ছায়া পর্য্যন্তও অপবিত্র।

গুরুকুলের মেঘ ব্রহ্মচারী ছাত্র।

সমাজ যখন এমনি অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায় তখন তাহার ভিতর কোনো একটা পরিবর্ত্তন আনিতে গেলে, চারিদিক হইতে বহুপ্রকারের বিদ্রোহ সহস্র বাহু বাড়াইয়া একেবারে উদ্যত হইয়া উঠে; যুক্তি তর্কের অবতারণা করিলে সঙ্কীর্ণতর প্রতিবাদের দ্বারা ভুলটাকেই তাহার সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চায়; সহৃদয়তা, উদারতাকে পাশববলের দ্বারা পীড়ন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ হিন্দুসমাজের ভিতর ধর্ম্ম এবং সমাজ এমন ভাবে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে যে সমাজের গলদ দূর করিতে গেলে ধর্ম্মের মর্য্যাদার হানি হইল ভাবিয়া সে ক্ষেপিয়া উঠে—একবারও চিন্তা করিয়া দেখে না যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছে তাহা শুদ্ধ ব্যভিচারে ভরা সামাজিক নিয়মমাত্র, সে ধর্ম্ম তাহাকে সত্যের পানে না টানিয়া বর্দ্ধিষ্ণু গতিতে নরকের পানেই টানিয়া লইতেছে।

মেঘদিগকে সমাজের এই পঙ্কের ভিতর হইতে টানিয়া তোলা যে সহজ ব্যাপার নহে তাহা জানিয়াও আর্য্যসমাজ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিধা করেন নাই; হিন্দু মুসলমানের নিকট হইতে সমানভাবে পদে পদে বাধা পাইয়াও তাঁহারা বিরত হন নাই, মেঘদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সমাজের ভিতর তাহাদিগকে একটি স্থায়ী আসন দিতে চেষ্টা করিতেছেন। আর্য্যসমাজ অস্পৃশ্য মেঘদিগকে সাদরে সসম্মানে আপনাদের ভজনে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করাতে হাজার হাজার মেঘ মন্দিরে উপাসনায় যোগ দিতেছে। এইরূপে সমাজের শ্রেষ্ঠ লোকদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের মনে সাহস বাড়িতেছে; তাহারাও যে মানুষ, অস্পৃশ্যতা বা পাতিত্য যে অত্যাচারীর মনগড়া অবস্থা তাহা তাহারা বুঝিতেছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের কানে যদি কেবলি ধ্বনিত হয় তোরা হীন, তোরা হেয়, তোরা ঘৃণ্য, তোরা অস্পৃশ্য, তোরা পতিত, তবে তাহাদের অন্তরের ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হইয়া আসেন, তাহাদের উদ্যম সাহস আত্মপ্রত্যয় লোপ পায়। তাহাদের কানে যাঁহারা আশার উত্থানের বাণী শুনান তাঁহারা নরহিতব্রতী। আর্য্যসমাজ এই নরহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তথাকথিত অস্পৃশ্যদের এবং তথাকথিত পবিত্র সমাজের মনের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য ইঁহারা একটি শুদ্ধিসংস্কারের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু ইহা কতদূর উচিত তাহা ভাবিবার কথা। মানুষ শুদ্ধ হয় নিজের চরিত্র ও ব্যবহারের গুণে, কোনো অনুষ্ঠানের দ্বারা নহে। ব্রাহ্মণবংশের কদাচারী লোকেও পবিত্র, এবং যাহাদিগকে

মেঘ পাঠশালা (কিলা শোভাসিং নামক স্থানে)।

তাহারা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে তাহারা চরিত্রে, কর্ম্মে পবিত্র হইলেও পতিত, ইহা কোন্ যুক্তির বিধান? যাহাই হোক আর্য্যসমাজ শুভব্রত উদ্‌যাপন করিতেছেন—তাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন শ্রেয়াংসি বহু-বিঘ্নানি। মেঘদিগকে উন্নত স্পৃশ্য করিয়া লইতে চেষ্টা করায় হাজার হাজার মেঘ উৎসাহিত করিয়া উঠে। কিন্তু অন্তরায় হইল হিন্দুরা, জাতি যাইবে বলিয়া; এবং মুসলমানেরাও ক্রুদ্ধ হইয়া বাধা দিতে লাগিল, চাকর না পাইবার ভয়ে। শুদ্ধির দিন মাত্র ২০০ জন লোকের বেশী আর কেহ আসিল না। আর্য্যসমাজভুক্ত মেঘ প্রচারকেরা মেঘপল্লীতে প্রচার করিতে গেলে ক্রুদ্ধ হিন্দু মুসলমান তাহাদিগকে অস্ত্রাঘাত পর্য্যন্ত করিতে লজ্জা বোধ করে নাই। আর্য্যসমাজ বুঝিয়াছেন একমাত্র শিক্ষা বিস্তারেই মানুষকে মানুষ করিয়া তোলে; তাহার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব জাগাইয়া দেয়। তাই তাঁহারা মেঘদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। দেশের ভিতর স্থানে স্থানে পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কয়েকটি কারখানাও স্থাপিত হইয়া সুতার, কামার, দর্জ্জির কাজে মেঘদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছে। অনেকগুলি মেঘ ছাত্র গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া আর্য্য প্রথায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছে। কিন্তু এত বড় একটা জাতিকে মানুষ করিয়া তুলিতে কেবলমাত্র প্রচুর মনের বল নয়, প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন। ক্ষুদ্র আর্য্যসমাজের অর্থ নাই, তাই তাঁহারা ভিক্ষার ঝুলি বহিয়া আজ স্বদেশভক্তদের দ্বারে সাহায্যের ভিখারী। কাহারও এই সৎকার্য্যে কিছু দান করিবার ইচ্ছা হইলে শ্রীযুক্ত গঙ্গারাম, মেঘউদ্ধার সভা, শিয়ালকোট, ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে পারেন।

মেঘদিগের সুতারের কাজ শিখিবার কারখানা।

পাঞ্জাবের ভিতর হইতে মুক্তির যে ইঙ্গিত উষার অরুণাভাসের মতো জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা হইতেই বেশ বুঝা যায়, যে, ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে আজ সেই দিন আসিয়াছে যেদিন স্রোতের টানে গা ঢালিয়া কেবল ভাসিয়া চলিলেই চলিবে না!—প্রবল স্রোতের
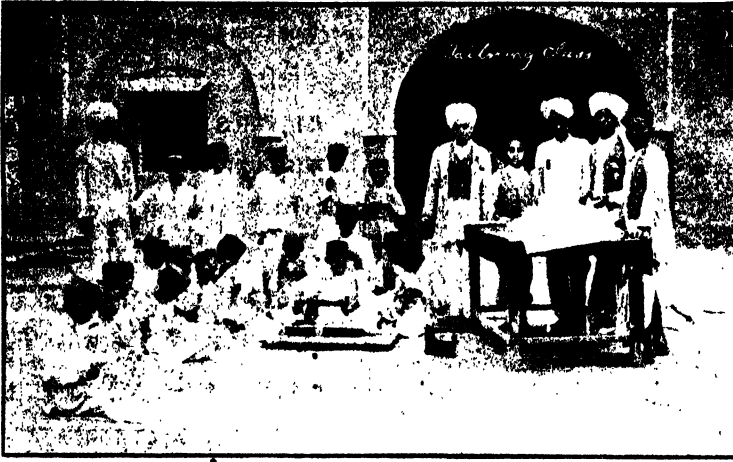
মেথদিগের দর্জ্জির কাজ শিখিবার কারখানা।

বিরুদ্ধে সবলে পথ কাটিয়া উজান বাহিয়া ছুটিতে হইবে; দুঃখকে নিতান্ত নিঃস্বের মত মানিয়া লইলেই চলিবে না, তাহাকে দলন করিয়া, পীড়ন করিয়া সুখের সন্ধান জানিতে হইবে। ভগীরথের সাধনা সমস্ত ভেদকে মিলিত করিয়া, সমস্ত কুসংস্কারের পাহাড় চূর্ণ করিয়া, শতাব্দীর অন্ধকে দৃষ্টি দান করিয়া, এই তেত্রিশ কোটী সগরবংশের ভস্মস্তূপের উপর যেদিন নামিয়া আসিবে সেই দিন আমরা মুক্তির বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলিয়া জাগিয়া উঠিব; ভগবান আমাদের ললাটপটে স্বহস্তে সেদিন বিজয়-মাল্য বেষ্টন করিয়া দিবেন।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

বাঙ্গালা শব্দ-কোষ

(সমালোচনা)

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সঙ্কলিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে তিন খণ্ড বাহির হইয়াছে। মূল্য প্রতি খণ্ডের ১॥০ টাকা। পরিষদের সদস্য পক্ষে ১৲ টাকা। এই অভিধানখানি এমন উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে প্রত্যেক বাঙালীর কাছে ইহা থাকা উচিত। এই উপাদেয় অভিধানের সম্পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য ব-আদি শব্দগুলির মধ্যে যাহা ছাড় পড়িয়াছে বা যাহার ব্যুৎপত্তি আমার অন্যরূপ জানা আছে তাহা নিয়ে কোষকারের বিচারের জন্য উপস্থিত করিতেছি।

বক-ধার্ম্মিক—বকের ন্যায় ধার্ম্মিক, অর্থাৎ ভণ্ড, শঠ। শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণিনাং বধশঙ্কয়া। পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকো পরমো ধার্ম্মিকঃ॥

বকম, বকবকম—পায়রার ডাকের অনুকৃতিশব্দ। খোপে বসে পায়রা যেন করছি শুধু বকবকম—রবীন্দ্রনাথ।

বক্কাল—যাহারা ঔষধ বিক্রয় করে, প্রায়ই বেনে-বক্কাল। বক্কাল—হিন্দীতে বেনেকেই বুঝায়।

বকলস—ইং Buckles, কিন্তু ফরাসী Buckle নহে Boucle—উচ্চারণ বুকল্।

বইন—বঙ্কিমচন্দ্র বহিন লিখিয়াছেন সর্ব্বত্র।

বগ দেখানো—হাতের আঙুল ফণাকৃতি করিয়া দেখানো, ব্যঙ্গ উপহাসে।

(এক)-বগ্‌গা—একগুঁয়ে, একরোখা।

বঁটি—হিন্দুস্থানীরা বলে বঁইঠী, পূর্ব্ববঙ্গে বলে বঠী। ইহা হইতে যাহা বসে, যে দা বসে তাহা বুঝাইতে পারে বোধহয়। হিন্দী বৈঠনা—বসা।

বসা—ভক্তাসনে বসা অপেক্ষা হাঁটু গাড়িয়া বসা অধিক প্রচলিত। আসনপীঁড়ি হইয়া বসাকে বাঁকুড়া জেলায় ঠাকুরমণ্ডলী হইয়া বসা বা আঁটুল বাঁটুল দিয়া বসা বলে।

বাঁ বাঁ—টো টো, যথা—বাঁ বাঁ করিয়া সমস্ত দিন ঘুড়িয়া বেড়ানো।

বাউরী—নিম্ন শ্রেণীর জাতি বিশেষ।

বাজারু—বাজারে সুলভে প্রাপ্তব্য, সাধারণ।

বাড়ন্ত—সংসারে কোনো জিনিস নাই বলিতে নাই; নাই বলিলে সাপের বিষও থাকে না বলিয়া বিশ্বাস। এহেতু কোনো জিনিস ফুরাইয়া গেলে তাহা বাড়ন্ত বলিতে হয়। চাল তেল প্রভৃতি বাড়ন্ত বলিলে তাহা ফুরাইয়াছে জানিতে হইবে বুঝিতে হইবে।

বাড় বাড়ন্ত—সহচর শব্দ, অতি বৃদ্ধি, চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধি।

বাতাস খাওয়া—নিজে নিজেকে বীজন করা।

বাতাসা—ফাঃ বাতাশা—বুদ্বুদ : বুদ্বুদ-তুল্য ফাঁপা মিষ্টান্ন। মিষ্টান্ন-দ্যোতক বাতাশা শব্দও ফারসীতে আছে।

বাবরী—ফাঃ ববর—সিংহ, ববরী—সিংহসদৃশ, সিংহের কেশরতুল্য দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ।

বাহান্ন—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন—বাহান্নটা অপকর্ম্ম করাও যা তিপ্পান্নটা অপকর্ম্ম করাও তা, বিশেষ ইতর বিশেষ নাই। একজন ডাকাত বাহান্ন জন মানুষ খুন করিয়া অনুতপ্ত হয়। এক সাধুপুরুষের শরণাপন্ন হইয়া সে বলিল ঠাকুর, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি বল, নয়ত তোমার মাথা ভাঙিব। তিনি দেখিলেন, এই মহাপাপীর প্রায়শ্চিত্ত নাই, অথচ ব্যবস্থা না করিলেও নয়। তখন তিনি একখানা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দিয়া বলিলেন এই কাপড় যেদিন শাদা হইবে সেদিন তুমি নিষ্পাপ হইবে। ডাকাত বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করিয়াই আছে, কালো কাপড় শাদা আর হয় না। একদিন সে দেখিল এক দুর্বৃত্ত এক অসাহায়া রমণীকে অপমান করিতে উদ্যত হইয়াছে। তখন সে যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন বলিয়া দুর্বৃত্তকে বধ করিল এবং আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, তাহার বস্ত্র অমল শুভ্র হইয়া গিয়াছে।

উদ্বাস্তু করা—বাস্তু হইতে উচ্ছেদ করা। উদ্‌বাস্তু।

বিঝা—ওড়িয়া অর্থে মালদহে কথিত হয়। কোথায় ওড়িষ্যা ও কোথায় মালদহ, অথচ শব্দসাদৃশ্য কিরূপে হইল চিন্তার বিষয়।

বেনা—বীজন বা পাখা অর্থে, মালদহ, পাকুড় প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।

বিঘ্নি,বিঘিনি—ঠিক বিঘ্ন নহে, ইহার অর্থের মধ্যে একটা ঘৃণার ভাব আছে।

বিচ—হিন্দী, মধ্যস্থল।

বিচালী—মানে খড়ের দড়ি নয়; ধানগাছ হইতে ধান ছাড়াইয়া লইলে যে খড় থাকে তাহা বিচালী; বিচালীতে ঘর ছায়, গরুর আব হয়। খড় ও বিচালীতে তফাৎ এই যে বিচালী ধানগাছ, খড় সাধারণ সংজ্ঞা।

বিজক—ফারসী (?), টাকার তোড়া বা বাক্স সিন্দুকের মধ্যে জমা-খরচের স্মারক সংক্ষিপ্ত চিঠা। জমিদারী সেরেস্তায় ব্যবহৃত শব্দ। শব্দকোষে বীজক দেখুন।

বিত্তি—মাছ ধরিবার বাঁশের বাখারীর তৈয়ারী ফাঁদ বিশেষ; মালদহ জেলায় মাছ ধরিবার ফাঁদের বিভিন্ন আকার অনুসারে বিভিন্ন নাম আছে—যথা, ঘুণী, বিত্তি। আর অন্য নাম এখন মনে পড়িতেছে না; কোনো মালদহবাসী সহজেই সাহায্য করিতে পারেন। বিত্তি শব্দকোষের বেঁঅতি হওয়া সম্ভব।

বিথা—ব্যথা, যথা বিরহ-বিথা লাগি উর-অন্দর।

বিরাশি সিক্কার ওজন—৮২ টাকার ওজন মানের সের; তাহা হইতে খুব ভারী, পাকা রকমের। যথা—বিরাশি সিক্কার ওজনের কীল।

বিড়ি—শালপাতায় জড়ানো তামাকগুঁড়োর চুরুট।

বিব্রত—বি—বিগত, ভ্রষ্ট+ব্রত—নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম, হইতে বাংলা অর্থ ব্যস্ত, উৎক্ষিপ্ত, এক বিষয়ে মনোযোগ দিতে অসমর্থ, বুঝাইতে পারে।

বুধি—প্রায়ই গরুর নাম, যে গরু বুধবারে জন্মিয়াছে।

বাঁও—শব্দকোষে বেঁঅ, কখনো শুনি নাই। জাহাজের খালাসিরা বাঁও বলিয়া জল মাপে। তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পে 'দু বাঁও মেলে না।'

বানু—ফাঃ, রাজান্তঃপুর-মহিলা, মহিলা।

তেলে বেগুনে জ্বলা—গরম তেলে বেগুন দিলে যেমন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠে সেইরূপ অকস্মাৎ বিষম ক্রুদ্ধ হওয়া।

ব্যাং—আসাপা ব্যাং, আস্ফালন করিয়া হঠাৎ লাফাইয়া যায় বলিয়া বোধহয় এই নাম; সাপের সহিত কোনো সম্পর্ক নাই বোধহয়। আকার চ্যাপ্টা লম্বাটে ধরণের, রং কটা, যেদিক হইতে তাড়া বা খোঁচা খায় সেই দিকেই বেগে লম্ফ দেয়, এবং পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর প্রস্রাব করিয়া দিয়া যায়।

বে-চারা - ঠিক অর্থ উপায়হীন।

বেটো ঘোড়া—বাতগ্রস্ত ঘোড়া, না বাট-আশ্রিত ঘোড়া? যে ঘোড়া পথে পথে চরিয়া বেড়ায়, কোথাও আশ্রয় বা ভোজন নির্দ্দিষ্ট নাই।

বেতকাল—মালদহে বেতের ডগা শাগকে ও ফলকে বেতকাল বলে। বেত-কল, বেতের অঙ্কুর হইতে?

বেত-আছড়া—সাপ, বেতের চাবুকের ন্যায় সরু লকলকে আকারের বলিয়াও বটে, অধিকন্তু লোকের বিশ্বাস এই সাপ বেতের চাবুকের ন্যায় সপাং করিয়া আছাড় খাইয়া গায়ে পড়ে, এবং সেই আঘাতে লোকের গায়ের চামড়া কাটিয়া বিবাইয়া উঠে।

বিতী, বেতী—হিন্দী, অতীত; জমিদারী হিসাবের খাতায় গত কোনো দিবসের খরচ লিখিতে হইলে সেই তারিখের পূর্ব্বে বিতী বা বেতী লেখা হয়।

বৈঠকিরা—রহস্য, বিদ্রূপ, ঠাট্টা (যশোহর জেলায় কথিত শব্দ।)

বস—লাউয়ের তুম্বা জলাধার; মালদহে বুঁআশ।

বোমা—লৌহসূচী, ইহার পেটে খোল কাটা থাকে, শস্যের বস্তা না খুলিয়া ইহার খোঁচা দিয়া অল্প শস্য বাহির করিয়া দেখা হয় তাহাতে কিরূপ কি জিনিস আছে। ইহা হইতে পেটে বোমা মারা মানে পরীক্ষা করিয়া দেখা বুদ্ধি বিদ্যা কিছু আছে কি না। ফা: বর্মা—an auger or gimlet.

বয়ার—মহিষ বা বরাহ। পয়ারো বয়ার—দীনবন্ধু মিত্র।

বোল—বৌল, বউল, মউল, মুকুল সব একার্থক। শব্দকোষে বোল নাই; অথচ আমের বোল শব্দ খুব প্রচলিত।

বাঁম—বাঁও শব্দে অর্থ দেখিতে বলা হইয়াছে; কিন্তু শব্দকোষে বাঁও শব্দ নাই। তাই আমি পূর্ব্বে বাঁও শব্দের উল্লেখ করিয়াছি; শব্দকোষে বেঁঅ আছে।

বিদায়—সংস্কৃত সাহিত্যে এই শব্দটির ব্যবহার দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে না। যদি না থাকে, তবে ইহা নিশ্চয় আরবী শব্দ, উর্দ্দুর ভিতর দিয়া বাংলায় আসিয়াছে।

বিদিকিচ্ছি—বিশেষ ভাবে কুৎসিত।

বেঁওনা—খড়ের নুড়োর আগুন।

বউনী—বর্দ্ধনা (বৃদ্ধিকারক) হইতে, না বহন- হইতে; বহন করিয়া আনিয়া পসরা যেখানে নামানো যায়, তাহার দেয় কর শুল্ক।

বুঁদে, বোঁদে—হিন্দি বুঁদ—বিন্দু; বিন্দু বিন্দু আকারের মিষ্টান্ন।

বুঁদ—নেশায় লোকে বুঁদ হয়ে থাকে। মানে অভিভূত। কি করিয়া হইল?

বরুষী—ফাঃ, বুরুষ্‌তন—ভাজা, সিদ্ধ করা। অগ্নিপাত্র, যাহার উপরে কিছু ভাজা বা সিদ্ধ করা যায়। মালদহ জেলায় মাটির আলগ্‌-চুলার মতো অগ্নিপাত্রকে বরুষী বলে; ইহা প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে অগ্নি সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়; শীতকালে ইহাতে করিয়া বা খাপরায় করিয়া আগুন পোহায়।

বাতি—মালদহে বাখারীকে বাতি বলে; চৌড়া হইলে বাতা—যেমন, চালের বাতা; সরু হইলে, বাতি—যেমন, বাতি মাঠিয়া (চাঁচিয়া ছুলিয়া সরু করিয়া) বেড়া বাঁধা হয়।

বাঁদরাম, বাঁদরামি—বাঁদরের ন্যায় কার্য্য বা ব্যবহার।

বাঘা-ভেলকি—জবর রকমের ভেলকি। চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রজালে ঘেরা।

বাঁশা—বাঁশের চোঙা (মালদহ)।

বাঁশা—ধাতু, বাঁশ দ্বারা প্রহার। যথা, আচ্ছা বাঁশান বাঁশিয়েছে। তুলনীয়—আচ্ছা চাবকান চাবকিয়েছে।

বথাটে —ঈষৎ বথা। ঈষৎ অর্থে টে প্রত্যয় হয়—যথা, পাগলাটে, সাদাটে; কিন্তু লালচে, কালচে।

বে-শায়েস্তা—অভব্য, অবশীভূত।

বডি—ইং Bodice, স্ত্রীলোকের আঙ্‌রাখা।

ব্রেসলেট—ইং Bracelet.

বেটারী—Battery.

বাংরা—শব্দকোষে বাখুরা দেখুন। বাখুরা, বাংরা দুই বলে।

বিলটি—ইং Billet.

বাঁশী ফোঁকা- শিঙে ফোঁকা, মৃত্যু হওয়া। মালদহে শিঙে ফোঁকা না বলিয়া বাঁশী ফোঁকা বলে।

বাকড়া: বাখড়া—কঠিন বীজাবরণ, যথা—(কাঁচা কচি) আম বঁটিতে কাটা যাচ্ছে না, বাকড়া হয়েছে।

বালদো—তাল নারিকেল খেজুর গাছের ডাল।

বগ্‌গা—প্রায়ই এক-বগ্‌গা. যে এক বর্গ বা পথ ধরিয়া চলে. গোঁয়া জেদী।

বাইসম্যান—যে মিস্ত্রী বাইস চালায়।

বিলি—বিলি করা—অর্পণ; বিলি দেওয়া—বিভাগ, যথা, চুলে বিলি দিয়ে দিয়ে কুল্লে দাও, অর্থাৎ চুলের গোছ চিরিয়া চিরিয়া আঁচড়াও।

বড়্‌ বড়্‌—বড়বড় শব্দের কালাবরোধকতা বুঝাইতে ব্যবহার হয়। অনেকক্ষণ ধরিয়া বকা। তেমনি বদর বদর বা ভেদর ভেদর—অনেকক্ষণ ধরিয়া অনাবশ্যক বকা।

বৌ-দিদি—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া, জ্যেষ্ঠ শ্যালকজায়া প্রভৃতি। কোনো স্থলে বৌ-ঠাকরুণও বলা হয়।

বাছাই—বাছ ধাতুর verbal noun and adjective.

বে-রসিক—ফা: ও সং মিশ্রণ। অরসিক।

বে-তরিবৎ—ফা:, বে-সায়েস্তা, অভব্য, অসভ্য।

বেতাক—বেতের ডগা যাহা শাগ করিয়া খায় তাহাকে বেতাক বা বেতকল বলে।

বাদাবাদি—পরস্পরে বিবাদ বা বিতণ্ডা।

বড় ঠাকুর—বড় ঠাকুর-পো শব্দের পো লোপ পাইয়া বড় ঠাকুর অর্থে ভাসুরকে বুঝায়।

বালি ধরানো—দেয়ালে বালিচুনের জমাট করা।

বাহিরসারা—কোনো খোল-ওয়ালা জিনিসের বাহিরকার মাপ; যেমন ঘর, আলমারী, বাক্স প্রভৃতির বাহিরের এক দেয়ালের কোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত। উল্টা—ভিতরসারা, অর্থাৎ ভিতরের খোলের মাপ, দেয়ালের স্থূলতা বাদ দিয়া যে মাপ।

বাঘা—বাঘের তুল্য আকারে বা ব্যবহারে। যথা, বাঘা তেঁতুল; বাঘা কড়ি—যে কড়ির গায়ে বাঘের গায়ের মতো ফোঁটা ফোঁটা দাগ থাকে; ইহাকে চিতী কড়িও বলে।

বাইল—ফা: বাল—বাহু, পক্ষ; এক বাল কপাট।

বাচ্চা—ফার্সী বাচ্চা শব্দ আছে, সুতরাং বৎস শব্দের অপভ্রংশ বাংলায় চলিয়াছে মনে হয় না।

বরযাত্র, বরযাত্রা—বরের অনুচর সহচর।

বর্জাইস—ফরাশী বুর্জ্যা—ছোট। বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ছাপিবার হরপের নাম। ইহা অপেক্ষাও ছোট টাইপ ব্রিভিয়ার বাংলায় আছে; কিন্তু উহার তেমন প্রচলন হয় নাই।

বুকড়ি—মোটা। যথা, বুকড়ি চালের ভাত। বুৎপত্তি কি?

বিসরণ—বিস্মরণ, বিস্মৃত।

বেবভুল—বিহ্বল শব্দের অপভ্রংশ। কিন্তু ভুল-ভ্রান্ত অর্থে ব্যবহার হয়।

ব্যাপিকা—প্রগল্‌ভা; পাড়াবেড়ানি।

বাজরা—হিন্দী নহে; আরবী বজর—বীজ।

বরুজ—আরবী বরুজ—a tower বা বরাজ—an extensive open plain.

বোরকা—আ:, অবগুণ্ঠন।

বারান্দা—ফা: বরান্দা—যে বহন করিয়া লইয়া যায়। পর্ত্তুগীজ Varanda.

বিঘৎ—ফা: বিলস্ত—a span.

বোকা—বোবাকে অনেক সময় বোকা বলে। আরবী বকুম—বোবা, হইতে হইতে পারে।

বাঁহিচা—মালদহে ধানের বৃদ্ধি দেওয়াকে বাঁহিচা দেওয়া বলে।

বাই মারা—নারিকেল বা তালগাছের মতো সোজা স্তম্ভবৎ গাছে বা খুঁটিতে যেমন করিয়া বুকের পায়ের ধাক্কায় উঠিতে হয়।

বাই—তাল খেজুর নারিকেলের সমস্ত পাতা।

বাউটি—বাহু পর্য্যন্ত, যেমন বাউটি সুটের গহনা, অর্থাৎ অঙ্গুলি হইতে বাহু পর্য্যন্ত যেখানকার যা সমস্ত।

বাঁশবাজি—বাঁশ পুতিয়া তাহাতে equilibrium রাখার যে সমস্ত কসরৎ।

বাজিভোর—বাজি (খেলা) শেষ: জীবন শেষ।

বিমকি—ফিন্‌কি।

বে-সামাল—অসাবধান। অসামাল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাঁতারের কথা

সাঁতার যে জীবনের মধ্যে কত প্রয়োজনীয় এবং কত যে উপকারী তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। আজ প্রায় দুই বৎসর গত হইল শিবপুর বোটানিকাল বাগানের সম্মুখস্থ ঘাটে, গঙ্গার উপর যে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে, এবং ইহার মূল কারণ, অনেকের সাঁতারের অনভ্যাস ও অনভিজ্ঞতা।

অনেককেই দেখি সাঁতার জানেন না, এবং ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া ইহা শিক্ষা করিতেও মনোযোগ দেন না; ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা। কিন্তু সকল দিন সমান যায় না,—আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে এ বিষয়ে বাঙ্গালীকর্ত্তৃপক্ষের নজর পড়িয়াছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে প্রত্যেক বাঙ্গালীসন্তান সাঁতার শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

সাঁতারের উপকারিতা ও সুফলতার সম্বন্ধে দেশীয় ও পাশ্চাত্য প্রধান প্রধান ডাক্তার ও ব্যায়ামকারীগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে স্বাস্থ্য অটুট রাখিয়া শরীরকে বলবান ও পেশীপুষ্ট করিতে ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট ও নির্দ্দোষ ব্যায়াম আর নাই। সাঁতারে, মাথার ব্রহ্মতালু হইতে পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত সমানভাবে ব্যায়াম প্রাপ্ত হয়। ইহাতে মস্তিষ্ক 'প্রখর' হইয়া বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করে এবং দেহের প্রত্যেক শিরা, উপশিরা, পেশী ও
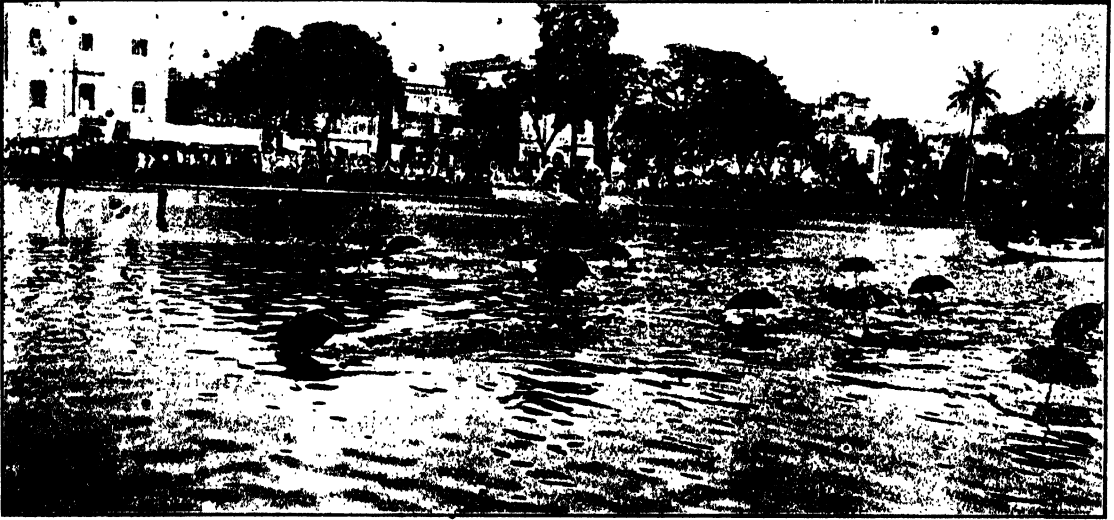
এক হাতে ছাতা ধরিয়া সাঁতারের প্রতিযোগিতা।

দূর জলে ঝম্প প্রদান।
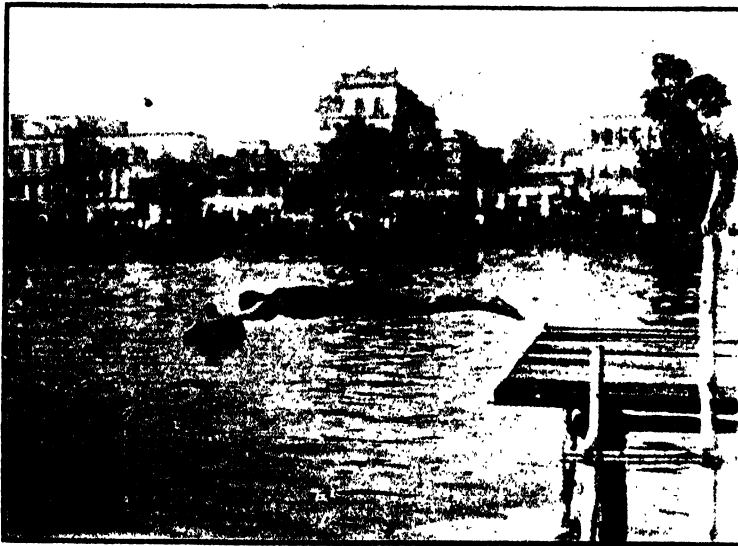
জরা ও দৌর্ব্বল্য সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। অতএব প্রত্যেক বাঙ্গালীসন্তানের সাঁতার শিক্ষা করা অতাব প্রয়োজনীয়।

সাঁতার শিক্ষা করা বিশেষ শক্তও নহে অথবা অত্যন্ত কষ্টকরও নহে। প্রমাণ জলে সকলেই সাঁতার অভ্যাস করিতে পারেন; কিন্তু প্রথমে একজন বলবান সাঁতার-বাজ ব্যক্তির সাহায্য একান্ত প্রয়োজন, নহিলে বিপদের যথেষ্ট সম্ভাবনা। তারপর সাঁতার অধিক বয়সে শিক্ষা করা অপেক্ষা বাল্যাবস্থায় অভ্যাস করা প্রশস্ত, কেননা ৮ বৎসর হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে সাঁতার শিখিলে শিক্ষার্থী ক্রমশঃ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন উন্নতিলাভ করিতে পারে এমনটি আর কিছুতেই হয় না। তারপর অনেকের যে একটা জলাতঙ্ক ভাব আছে সেটা গোড়াতেই ভাঙ্গিয়া যায়। এই যে ভয়—হাঙ্গরে খাইবে কি কুম্ভীরে খাইবে, সেটা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভুল ধারণা। জলের মধ্যে এমন কোন সাহসী জন্তু নাই যাহারা সাঁতারের সময় আসিয়া

স্নায়ুমণ্ডলীকে স্নিগ্ধ ও ধীরভাবে কার্য্য করাইয়া বিশেষ বলযুক্ত করে। ইহাতে শরীর হাল্‌কা হইয়া শরীর চতুর্গুণ শক্তিশালী হইয়া দেহের অঙ্গসৌষ্ঠব সুন্দর ও পরিপাটি রকমে তৈয়ারী হয়। সাঁতারে পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি হইয়া ক্ষুধার আধিক্য হয় এবং সাঁতার কাটা অভ্যাস থাকিলে বাত, পক্ষাঘাত, রক্তাল্পতা, জ্বর

ডিগবাজি খাইয়া জলে ডুব।

সন্তরণকারীকে আক্রমণ করিতে পারে—তাহাদেরও মানুষের উপর একটা বিষম ভয় আছে। তবে হ্যাঁ এমন কোন কোন নদী আছে যেখানে স্নান করিতে নামিলে কুম্ভীরে টানিয়া লইয়া যায়।

পাড়াগাঁয়ের অধিকাংশ লোকই সাঁতার কাটিতে পারে, এমন কি সেখানকার বালিকা ও স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত সাঁতার জানে। কিন্তু কলিকাতার ন্যায় বিশাল সহরে অনেক দাড়ীগোঁফওয়ালা পুরুষপুঙ্গবেরা সাঁতারের মর্ম্ম বোঝে না এবং জলে নামিতে ভয় করে; সে স্থলে সহরের স্ত্রীলোকেরা কি প্রকারে সাঁতার জানিবে। ভাগীরথীর নিকটস্থ কলিকাতার পল্লীতে যে-সকল বাঙ্গালী যুবকেরা বাস করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সাঁতার শিক্ষা করিবার সুযোগ ও সুবিধা পায়, সুতরাং তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র সাঁতার শিখিয়া উন্নতি লাভও করেন। কিন্তু যাঁহারা সহরের দুরবর্ত্তী স্থানে বাস করেন, তাঁহারা সে সুবিধা ও অবসর পান না, কাজেই তাঁহারা সামান্য একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া গঙ্গায় আসিয়া সাঁতারটা শিক্ষা করিতে চেষ্টাও করেন না। বাঙ্গালা—চাকরীগত-প্রাণ, কোন রকমে ৯ টার মধ্যে স্নানাহার সমাধা করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ১০টার মধ্যে আফিসে হাজির হয়। সে কেমন করিয়া এ-সকল বাধাবিপত্তি ঠেলিয়া সাঁতার শিক্ষা করিবে! কিন্তু ইহার কি কোনই উপায় নাই? ইহার দুইটিমাত্র উপায় আছে। প্রথম উপায়, বাল্যকালেই কোনো পাড়াগাঁয়ে শিক্ষা করা। তারপর দ্বিতীয় উপায়, এই কলিকাতা সহরে একটি সন্তরণআগার প্রতিষ্ঠিত হওয়া। বৃদ্ধ যাঁহারা অর্থাৎ যাঁহারা নিজেকে বুড়ো মনে করেন, তাঁহারা নিজেরা সাঁতার শিক্ষা করুন আর নাই করুন, তাঁহারা আপন আপন ছেলেপুলেদের সাঁতার শিক্ষা দিবার সুযোগ অবসর ও সাহস প্রদান করুন।

ভগবানের আশীর্ব্বাদে বাঙ্গালী ক্রমেই নিজের চেষ্টায় সাঁতারের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতেছে, এবং যাহাতে প্রত্যেক বাঙ্গালী-সন্তান সমভাবে সন্তরণশিক্ষা করিয়া দক্ষতা লাভ করে সে বিষয়ে বাঙ্গালীকর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং

উচ্চ মঞ্চ হইতে ডিগবাজি খাইয়া ও নানাবিধ কসরৎ করিয়া জলে ঝম্প প্রদান।

আশা করা যায় যে শীঘ্রই এই কলিকাতা সহরে ইংরেজদের মত একটা সন্তরণ-আগার প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গালীর ক্ষোভ দূর করিবে—তাহার আয়োজনও হইতেছে। তবে টাকার অভাব! আমাদের এই বাঙ্গালায় যে-সকল ধনী টাকার গদীর উপর বসিয়া থাকেন তাঁহারা যদ্যপি দশজনে মিলিয়া এই মহৎকার্য্যে কিছু কিছু সাহায্য করেন তাহা হইলে প্রত্যেক বাঙ্গালাসন্তান তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকে।

শুশ্রূষার শিবির।
সিকি মাইল সাঁতারের প্রতিযোগিতায় বেদম হইয়া অজ্ঞান ব্যক্তির শুশ্রূষা হইতেছে।

গত ১৯১৩ সাল হইতে একটি সন্তরণ-সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং সেই সমিতি হইতে প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে, কলেজ স্কোয়ারের গোলদীঘিতে একটা সাঁতারের প্রতিযোগিতা হইতেছে। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা যাহাতে সাঁতারের প্রচলনটা উত্তমরূপে হয়। তাহাতে অনেক বাঙ্গালী যুবক, সাহেব গোরা থাকা সত্ত্বেও, পুরস্কার লাভ করিয়াছে। এ বৎসর গত ২২শে আগষ্ট ১৯১৪ সালে যে সন্তরণ ক্রীড়া হইয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালী যুবারা গতবৎসর অপেক্ষা সাঁতারের কৌশল, বেগ ও ক্ষিপ্রকারিতার বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতির পরিচয় দিয়াছে। কোন একটা শ্রেষ্ঠ সাঁতারের বাজিতে এবৎসর বাঙ্গালীই বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার সাধুখাঁ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, নিবারণচন্দ্র দে, সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এবং এম এম, দে—ইহাঁদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে কালে বাঙ্গালী সাঁতারে অদ্বিতীয় হইবে।

ডাক্তার হরিধন দত্ত এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী এবং তাঁহারই যত্নে আজ বাঙ্গালী যুবা ও ছাত্রসমাজ নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা প্রার্থনা করি ভগবানের আশীর্ব্বাদে তিনি সুস্থ শরীরে এবং মনের শান্তিতে দীর্ঘজীবী হইয়া বাঙ্গালীসমাজে গৌরবলাভ করুন।

আর দুই একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিব। যাঁহারা সাঁতারে উন্নতিলাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা প্রত্যহ তো সাঁতার কাটিবেন, কিন্তু তৎসঙ্গে প্রতি প্রাতঃকালে কিম্বা সন্ধ্যাকালে অর্দ্ধঘণ্টাকাল লঘু ব্যায়াম করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। ব্যায়াম ভিন্ন হাতের গুলি ও স্কন্ধদেশ শক্তিমান হয় না। ব্যায়ামের মধ্যে মুগুর ভাঁজা, প্যারালালবার ও ডনকসা সাঁতারের পক্ষে বিশেষ সাহায্যকারী। বাদাম ও ভিজান ছোলায় দম্ বৃদ্ধি হয়, অতএব প্রত্যহ বাদাম ও ভিজান ছোলা প্রত্যেক সাঁতারশিক্ষার্থীর আহার করা উচিত। আর একটা প্রধান কথা—প্রত্যেক সন্তরণকারীকে দৃঢ়ভাবে জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিতে হইবে,—সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত জগতের কোনো ক্ষেত্রেই

সাঁতারের প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত।

সম্মুখ ভাগ—উপবিষ্ট।

(১) ন. রায়, (প্রেসিডেন্সি কলেজ) ১১০ গজ—৩য় পুরস্কার। (২) ন. চ. দে, (স্পোর্টিং ইউনিয়ান) ৪৪০ গজ সাঁতার—৩য় পুরস্কার। (৩) স. ভট্টাচার্য্য (শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ) ১১০ গজ—চিৎ সাঁতার—২য় পুরস্কার। (৪) উ. ল. মুখোপাধ্যায় (ঐ কলেজ) ১১০ গজ সাঁতার—১ম পুরস্কার, ২২০ গজ সাঁতার—১ম পুরস্কার (শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী)। (৫) শ. ল. মুখোপাধ্যায় (ওরিয়েণ্টাল সেমি) ৩০ গজ সাঁতার—১ম পুরস্কার (বালক) (৬) ম. ম. দে (হিন্দু স্কুল) লম্ফে জল ঠেলিয়া গমন—১ম পুরস্কার। (৭) ম. ল. ভট্টাচার্য্য (মোহন ক্লাব) ১১০ গজ চিৎ সাঁতার—৩য় পুরস্কার (উচ্চ মঞ্চ হইতে কসরৎ করিয়া ডুব দেওয়ায় শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী)।

পশ্চাৎভাগ—দণ্ডায়মান।

(১) স. ন. বন্দ্যোপাধ্যায় (আহিরীটোলা) ২২০ গজ—৩য় পুরস্কার (২) ক. ধ. পাল (শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা) টবের খেলা—২য় পুরস্কার (Tub Race)। (৩) জ. ন. চক্রবর্ত্তী (শোভাবাজার) টবের খেলা—১ম পুরস্কার (Tub Race)। (৪) স. কৃ. সাধুখাঁ (বাগবাজার) ৪৪০ গজ সাঁতার—১ম পুরস্কার (শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বিতা)। (৫) অ. ক. সেন (শোভাবাজার) লম্ফে জল ঠেলিয়া গমন—২য় পুরস্কার টবের খেলায় তৃতীয় হন, কিন্তু পুরস্কার পান নাই। (৬) ন. ন. সেন (আহিরীটোলা স্পোর্টিং) ২২০ গজ সাঁতার—২য় পুরস্কার। (৭) ত. চ. বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা) ৩০ গজ সাঁতার—৩য় পুরস্কার (বালক)।

জয়ী হওয়া যায় না। যে সকল সন্তরণকারী যুবক, ছাত্র, ও বালক সাঁতারের উন্নতির জন্য কলকৌশল জানিতে উৎসুক আছেন তাঁহারা আমার মতে বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ সাঁতারবাজ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু মহাশয়ের নিকট উপদেশাদি লইতে পারেন। তাঁহার বাটীর ঠিকানা, মাণিকতলা, কারবালা ট্যাঙ্কের নিকট।

স্পোর্টিং ইউনিয়ান ক্লাব শ্রীনিবারণচন্দ্র দে।

মেছুয়াবাজার।

সাঁতারের প্রতিযোগী খেলার পুরস্কার-বিতরণ-সভায় লর্ড কারমাইকেল ডাক্তার হরিধন দত্ত কর্ত্তৃক রিপোর্ট পাঠ শুনিতেছেন

মৌন

আজিকে নাহিক ভাষা শুব্ধ চেয়ে আছি
মুখোমুখি তোমায় আমায়,
হেমন্তের রিক্ত দীন তরু সম বাঁচি
ভবিষ্যের সুখের আশায়!
অনিমেষ এ সাধনা অহোরাত্রি ধরে
জাগরণে স্বপন ঘনায়,
ধেয়ান-স্তিমিত মোর এ ধরণী ভরে'
রবিকর ঝরে করুণায়।
শুব্ধ পিক, নগ্ন বন মর্ম্মরবিহীন
মৌনী জাগে তটিনী-ধারায়,
শীতের সমাধি-তলে আজি বিশ্ব লীন
বসন্তের পুষ্প-সাধনায়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ভাবুক-সভা

(ভাবুক-দাদা নিদ্রাবিষ্ট—ছোকরা ভাবুকদলের প্রবেশ)

ভাবুক নং ১

ইকি ভাই লম্বকেশ, দেখছ নাকি ব্যাপারটা ?
ভাবুকদাদা মূর্চ্ছাগত, মাথায় গুঁজে র‍্যাপারটা !

ভাবুক নং ২

তাই ত বটে ! আমি বলি এত কি হয় সহ্য ?
সকালবিকাল এমনধারা ভাবের আতিশয্য !

নং ১

অবাক কল্লে ! ঠিক্ যেমন শাস্ত্রে আছে উক্ত—
ভাবের ঝোঁকে একেবারে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত।
সাংঘাতিক এ ভাবের খেলা বুঝতে নারে মূর্খ—
ভাবরাজ্যের তত্ত্ব রে ভাই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম !

নং ২

ভাবটা যখন গাঢ় হয়—ব'লে গেছেন ভক্ত,—
হৃদয়টাকে এঁটে ধরে আঠার মত শক্ত।

নং ১

(যখন) ভাবের বেগে জোয়ার লেগে বন্যা আসে তেড়ে,
আত্মারূপী সূক্ষ্মশরীর পালায় দেহ ছেড়ে—
(কিন্তু) হেথায় যেমন গতিক দেখছি শঙ্কা হচ্ছে খুবই
আত্মাপুরুষ গেছেন হয়ত ভাবের স্রোতে ডুবি।
যেমন ধারা পড়ছে দেখ গুরুগুরু নিশ্বাস,
বেশীক্ষণ বাঁচবে এমন ক'রোনাক বিশ্বাস।
কোন্ খানে হায় ছিঁড়ে গেছে সূক্ষ্ম কোন স্নায়ু
ক্ষণজন্মা পুরুষ কিনা, তাইতে অল্প-আয়ু।

বিলাপ সঙ্গীত

ভবনদী পার হবি কে চ'ড়ে ভাবের নায় ?
ভাবের ভাবনা ভাবতে ভাবতে ভবের পারে যায় রে
ভাবুক ভবের পারে যায়।
ভবের হাটে ভাবের খেলা, ভাবুক কেন ভোল ?
ভাবের জমা চাষ দিয়ে ভাই ভবের পটোল তোল রে
ভাই ভবের পটোল তোল।
শানবাঁধান মনের ভিটেয় ভাবের ঘুঘু চরে—
ভাবের মাথায় টোকা দিলে বাক্য-মাণিক ঝরে রে মন
বাক্য-মাণিক ঝরে।
ভাবের ভারে হদ্দ কাবু ভাবুক বলে তায়
ভাব-তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ভাবের খাবি খায় রে
ভাবুক ভাবের খাবি খায়।

(কীর্ত্তন "জমাট" হওয়ায় ভাবুকদাদার নিদ্রাচ্যুতি)

ভাবুকদাদা

জুতিয়ে সব সিধে করব, ব'লে রাখছি পষ্ট,—
চ্যাঁচামেচি ক'রে ব্যাটা ঘুমটি কল্লি নষ্ট ?

নং ১

ঘুম কিহে ? সেকি কথা ? অবাক্ ক'ল্লে খুব !
ঘুমোওনি ত—ভাবের স্রোতে মেরেছিলে ডুব।
ঘুমোয় যত ইতর লোকে—তেলী মুদী চাষা—
তুমি আমি ভাবুক মানুষ ভাবের রাজ্যে বাসা।

দাদা

সে ঘুম নয়, সে ঘুম নয়, ভাবের ঝোঁকে টং,
ভাবের কাজল চোখে দিয়ে দেখছি ভাবের রং;
মহিষ যেমন পড়ে রে ভাই শুক্‌নো নদীর পাঁকে,
ভাবের পাঁকে নাকটি দিয়ে ভাবুক প'ড়ে থাকে।

নং ১

তাই ত বটে, মনের নাকে ভাবের তৈল গুঁজি
ভাবের ঘোরে ভোঁ হ'য়ে যাই চক্ষু দুটি বুঁজি।

নং ২

হাঃ হাঃ হা—দাদা তোমার বচনগুলো খাসা,
ভাবের চাপে জমাট, আবার হাস্যরসে ঠাসা !

দাদা

ভাবের ঝোঁকে দেখতেছিলাম স্বপ্ন চমৎকার
কোমর বেঁধে ভাবুক জগৎ ভবের পগার পার।
আকাশ জুড়ে তুফান চলে, বাতাস বহে দম্‌কায়,
গাছের পাতা শিহরি কাঁপে, বিজলী ঘন চম্‌কায়
মাভৈ রবে ডাকছি সবে খুঁজছি ভাবের রাস্তা,
(এই) ভণ্ডগুলোর গণ্ডগোলে স্বপ্ন হ'ল ভ্যাস্তা।

নং ১

যা হবার তা হ'য়ে গেছে—ব'লে গেছেন আর্য্য—
গতস্য শোচনা নাস্তি বুদ্ধিমানের কার্য্য।

নং ২

কি আশ্চর্য্য, ভাবতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে ম'শায়
এম্নি ক'রে মহাত্মারা পড়েন ভাবের দশায় !

ভাবুক-দাদা।
শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

দাদা।—

অন্তরে যার মজুৎ আছে ভাবের খোরাকী—
তার) ভাবের নাচন মরণ বাঁচন বুঝবি তোরা কি ?

নং ২

পরাবিদ্যা ভাবের নিদ্রা—আর কি প্রমাণ বাকী
পায়ের ধুলো দাও ত দাদা মাথায় একটু মাখি।

দাদা

সবুর কর স্থিবোভব, রাখ এখন টিপ্পনী,
ভাবের একটা ধাক্কা আস্‌ছে, সরে দাঁড়াও এক্ষণি ?

(ভাবের ধাক্কা)

নং ১

বিনিদ্র চক্ষু, মুখে নাহি অন্ন—
আক্কেল বুদ্ধি জড়তাপন্ন !
স্নানবিহীন যে চেহারা রুক্ষ—
এত কি চিন্তা—এত কি দুঃখ ?

নং ২

সঘনে বহিছে নিঃশ্বাস তপ্ত—
মগজে ছুটিছে উদ্দাম রক্ত।
দিন নাই রাত নাই—লিখে লিখে হাত ক্ষয়-
একেবারে প'ড়ে গেলে ভাবের পাত্‌কোয় !

দাদা

শৃঙ্খল টুটিয়া উন্মাদ চিত্ত
আঁকুপাঁকু ছন্দে করিছে নৃত্য—
নাচে ল্যাগ্‌ব্যাগ্‌ তাণ্ডব তালে
ঝলক জ্যোতি জ্বলিছে ভালে।

জাগ্রত ভাবের শব্দপিপাসা
শূন্যে শূন্যে খুঁজিছে ভাষা।
সংহত ভাবের ঝঙ্কার মাঝে
বিদ্রোহ ডম্বরু অনাহত বাজে।

নং ২

(হ্যাঁ হ্যাঁ) ওই শ্মশান দুর্দ্দাড় মার মার শব্দ
দেবাসুর পশুনর ত্রিভুবন স্তব্ধ ;

নং ১

বাজে শিঙা ডম্বরু শঙ্খ জগঝম্প,
ঘন মেঘ গর্জ্জন, ঘোর ভূমিকম্প— !

দাদা

কিসের তরে দিশেহারা ভাবের ঢেঁকি পাগলপারা
আপনি নাচে নাচে রে !
ছন্দে ওঠে ছন্দে নামে নিত্যধ্বনি চিত্তধামে
গভীর সুরে বাজে রে !
নাচে ঢেঁকি তালে তালে যুগে যুগে কালে কালে,
বিশ্ব নাচে সাথে রে !
রক্ত-আঁখি নাচে ঢেঁকি, চিত্ত নাচে দেখাদেখি
নৃত্যে মাতে মাতে রে !

নং ১

চিন্তা পরাহতা বুদ্ধি বিশুষ্কা
মগজে পড়েছে ভীষণ ফোস্কা !
সরিষার ফুল যেন দেখি দুই চক্ষে !
ডুবজলে হাবুডুবু কর দাদা রক্ষে।

নং ২

সূক্ষ্ম নিগূঢ় নব ঢেঁকিতত্ত্ব
ভাবিয়া ভাবিয়া নাহি পাই অর্থ !

দাদা

অর্থ ! অর্থ ত অনর্থের গোড়া !
ভাবুকের ভাত-মারা সুখ-মোক্ষ-চোরা।
যতসব তালকাণা অথামারা আনাড়ে
"অর্থ—অর্থ"—করি খুঁজে মরে ভাগাড়ে !
(আরে) অর্থের শেষ কোথা কোথা তার জন্ম
অভিধান ঘাঁটা, সেকি ভাবুকের কর্ম ?
অভিধান, ব্যাকরণ, আর ওই পঞ্জিকা—
ষোলআনা বুজরুকী আগাগোড়া গঞ্জিকা !
মাথন-তোলা দুগ্ধ, আর লবণহীন খাদ্য,
(আর) ভাবশূন্য গবেষণা—ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ !

ভাবের নামতা

ভাবের পিঠে রস, তার উপরে শূন্যি—
ভাবের নামতা পড় মাণিক বাড়্‌বে কত পুণ্যি—
(ওরে মাণিক মাণিক রে নামতা পড় খানিক রে)
ভাব একে ভাব, ভাব দুগুণে ধোঁয়া,
তিন ভাবে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া—ঢেকুর উঠবে চোঁয়া
(ওরে মাণিক মাণিক রে, চুপটি কর খানিক রে)
চার ভাবে চতুর্ভুজ ভাবের গাছে চড়—
পাঁচ ভাবে পঞ্চত্ব পাও গাছের থেকে পড়।
(ওরে মাণিক মাণিক্ রে (এবার) গাছে চড় খানিক রে)

(যবনিকা পতন)

শ্রীসুকুমার রায়।

ভাদুর পরব

হিন্দুর বার মাসে তের পরব। মানভূম অঞ্চলে ভাদু-পূজা আবার তাহাদের সংখ্যায় আরও একটি সংযোগ করিয়াছে।

বর্ষাশেষে শরৎপ্রকৃতির মধুর হাস্যের সহিত বঙ্গে যখন আগমনীর সুর মিলিত হয়, মানভূম অঞ্চলে তখন ভাদুপূজার বড় রোল পড়িয়া যায়। দোকানে দোকানে নানাবর্ণরঞ্জিত সূতায় টাঙ্গান মিষ্টান্নগুলি ঝুলিতে থাকে, আর মাদলের শব্দে ও কামিনীকণ্ঠনিঃসৃত সংগীতে দিক্ ধ্বনিত হইয়া উঠে।

প্রবলপরাক্রমশালী পঞ্চকোটাধিপতিদিগের খ্যাতি বঙ্গে কাহারও অবিদিত নাই। কুলে শীলে, মানে মর্য্যাদায়, পুরাকাল হইতে এই বংশ বিখ্যাত। এই বংশীয় 'বিক্রমসিংহেরা' বহু দিবস পর্য্যন্ত ব্রিটিশ আক্রমণের বিপক্ষে যুঝিয়া আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। পঞ্চকোটের বর্ত্তমান অধিপতির নাম রাজশ্রী

জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ (দেব বর্ম্ম)। মানভূম জেলার অন্তর্গত কাশীপুর নগর তাঁহার অধুনাতন আবাসস্থল।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই বংশে এক পরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র নীলমণি সিংহ একজন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি, সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইনি পুরুলিয়ায় সরকারের খাজনাখানা লুট করেন। ইঁহার উদারতা ও বীরত্বের কথা মানভূম অঞ্চলে আজিও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে এই মহাত্মার সর্ব্বরূপগুণসম্পন্না পরম কল্যাণী এক ভগিনী ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল ভদ্রেশ্বরী। ভদ্রেশ্বরী পিতার অতি প্রিয়পাত্রী ছিলেন। শুধু পিতার কেন দেশের রাজা প্রজা সকলেই তাঁহাকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু কৈশোরের সীমা অতিক্রম করিতে না-করিতেই সমস্ত দেশকে শোকে ভাসাইয়া ইনি এক ভাদ্রসংক্রান্তিতে পরলোকে গমন করিলেন, কুন্দকলিকা অকালে শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল। স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয়ে এ শোক বড় দারুণ আঘাত করিল, রাজা শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কয়েক দিবস বড় ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। পরে শোকের বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে এই কল্যাণী কন্যার কোন স্মৃতি-চিহ্ন রাখিতে তাঁহার অভিলাষ হইল। তিনি স্বীয় রাজ্যে আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে ভাদ্রসংক্রান্তিতে সকলে ভদ্রেশ্বরীর উৎসব করিবে। প্রজাগণ পরমানন্দে এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইল। এই সময় হইতে ভদ্রেশ্বরী পূজা বা ভাদুপূজার আরম্ভ হইল।

কুমারীগণই সাধারণতঃ এই পূজা করিয়া থাকে, তবে ছোটলোকের গৃহের ২০।২৫ বৎসর বয়স্কা কামিনীকুলও সানন্দে ইহাতে যোগ দেয়।

শ্রাবণ সংক্রান্তিতে তাহারা একটি কুমারী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া ভাদ্রসংক্রান্তি পর্য্যন্ত উহার পূজা করে। যদিচ ইহাকে পূজা বলা হয় কিন্তু ঘটাদিস্থাপন পূর্ব্বক হিন্দু রীতি অনুসারে ইহার পূজা করে না। ভাদুর নিকট তাহারা পুষ্প ও ফলমূল মিষ্টান্নাদি উপহার দেয় এবং সন্ধ্যাকালে কুমারীরা দুই তিন ঘণ্টা একত্র মিলিত থাকিয়া প্রতিমার নিকট ভাদু-বিষয়ক গান করে। অন্য গানের সহিত এই গানের সুর বিভিন্ন; ইহাকে ভাদুর সুর বলা হয়। "দেখে যা লো কুসুম, বাঁকুড়াতে ভাদু পূজার বড় ধুম" এইটি তাহাদের সুর রাখা পদ বা ধুয়া; প্রত্যেক গানের শেষে এইটি যোগ করিয়া সুর রাখা হয়। কোমল কামিনীকণ্ঠে টানা সুরে নিতান্ত সাধারণ রকমের এই গানও বড় মধুর বোধ হয়। নিম্নস্থ একটি গানেই ভাদু গানের অনেকটা ধারণা হইতে পারে, গানগুলি এইরূপ—

"চল্ সারদা, চল্ বরদা, কুলিতে * বাঁধ বাঁধ্‌বো।
কুলির জলে সিনান্ করে ঝরকায় চুল শুকাবো॥
দেখে যালো কুসুম, বাঁকুড়াতে ভাদু পূজার বড় ধুম্।"

সারা ভাদ্র মাস তাহারা এই উৎসবে মাতিয়া থাকিয়া সংক্রান্তির দিন প্রতিমা বিসর্জ্জন দেয়। বিসর্জ্জনের পূর্ব্বরাত্রি জাগিয়া তাহারা ভাদুর নিকট সমস্ত রাত্রি গান ও তামাসাদিতে কাটায়। ছোটলোকের স্ত্রীলোকেরা "হাঁড়িয়া" নামক মদ্য পান করে ও সারারাত্রি নাচগানে মাতিয়া থাকে, ঐ রাত্রিতে বহুবিধ ফলমূল মিষ্টান্নাদি সুতায় বাঁধিয়া ভাদুর গৃহে ঝুলাইয়া দেওয়া হয় এবং দীপাবলী দ্বারা যথাসাধ্য ঘরটি আলোকিত করিয়া রাখা হয়। ঐ রাত্রিতে পূজাকারিণীগণের বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। রীতিমত সতর্কতার সহিত ভাদু রক্ষা না করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে গ্রামের বা পাড়ার অন্যান্য বালক বালিকাগণ আসিয়া ভাদুর মুণ্ডপাত ও খাদ্যগুলি অপহরণ করিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

তৎপর দিবস প্রাতে তাহারা ভাদু বিসর্জ্জন দেয়। তার পর স্নান করিয়া ঘাটে বসিয়াই দই চিড়া শশা প্রভৃতি পেট পুরিয়া আহার করিয়া গৃহে ফিরিয়া আইসে। এইরূপেই ভাদুপূজার শেষ হয়।

ভাদুপূজার প্রারম্ভে পঞ্চকোটাধিপতিদিগের যত দূর পর্য্যন্ত প্রতাপ ছিল তত দূরেই ভাদুপূজার প্রসার দৃষ্ট হয়,—বাঁকুড়া মানভূম ও মানভূমের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূভাগেই ভাদুপূজা হইয়া থাকে।

কোমল প্রাণে বিমল আনন্দধারা ঢালিয়া এই দারিদ্র্য-পীড়িত দেশে ভাদু একটু শান্তির মারুত প্রবাহিত করে।

শ্রীজীবনহরি সামন্ত।

* কুলি—কাঁচা রাস্তার দুইধারে কাঁচা ঘরের বীথি।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

সে বহু দিনের কথা! সিপাহী বিদ্রোহের দুর্দ্দিন সবেমাত্র কাটিয়াছে। স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক সেটনকার তখন কলিকাতা হাইকোর্টের জজ। স্বর্গীয় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তখন সাহিত্যক্ষেত্রে একজন যশস্বী লেখক। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অধিকার, সংস্কৃত কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র, এবং "ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী" নামক গ্রন্থের লেখক বলিয়া তখন তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি। ঐ গ্রন্থের প্রথম ভাগ তখন এণ্ট্রান্স ক্লাসের, দ্বিতীয় ভাগ এফ এ ক্লাসের এবং তৃতীয় ভাগ বি এ ক্লাসের নির্দ্ধারিত পাঠ্য ছিল। তবে কি ঐ গ্রন্থ সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের বি এ পরীক্ষার পাঠ্য হইয়াছিল? বিগত শতাব্দীর সেই মধ্যযুগে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী হইলেন।

বিদ্রোহ দমন করিবার পর অযোধ্যা প্রদেশ ইংরেজের করতলগত হইল। অযোধ্যার তালুকদারী যখন নূতন নিয়মে ও নব সর্ত্তে বিলি করা হয়, তখন যে-সকল জমিদারী সম্পূর্ণরূপে বাজেআপ্ত করা হইয়াছিল, অযোধ্যার চীফ্‌কমিশনর বাহাদুর তাহা বিদ্রোহের দিনে যাঁহারা ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। সেই সূত্রে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় শঙ্করপুরের তালুক প্রাপ্ত হইয়া রাজা উপাধিতে ভূষিত হন এবং তালুকদারদিগের অন্যতম ও অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে আর কোন বাঙ্গালী ওরূপ অধিকারলাভ করেন নাই। অযোধ্যার নবাব ওয়াজীদআলি সাহের বিখ্যাত প্রমোদ উদ্যান কৈশরবাগের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যে রাজা দক্ষিণারঞ্জনের চেষ্টায় সুবিখ্যাত ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের সংস্কৃত-সাহিত্য ও আইনের অধ্যাপকের প্রয়োজন হওয়ায় দক্ষিণারঞ্জনবাবু তাঁহার পুরাতন বন্ধু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে ঐ পদে আহ্বান করেন এবং রাজকুমারবাবু লক্ষ্ণৌএ আসিলে তিনি স্বীয় তালুকদারী অধিকারে প্রাপ্ত কৈশরবাগের একটি অংশে তাঁহার বাসস্থান স্থির করিয়া দিলেন। কলেজের অধ্যাপনা ব্যতীত রাজকুমারবাবু এখানে Taluqdars' Association—অর্থাৎ অযোধ্যার তালুকদার সভার সহকারী সম্পাদকের কার্য্যও করিতে লাগিলেন। উভয় পদেই তিনি অতিশয় দক্ষতার ও যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। একবার অযোধ্যার তালুকদারী আইন সর্ত্তের গোলযোগ উপস্থিত হইলে তিনি Taluqdari System of Oudh অর্থাৎ অযোধ্যার তালুকদারী প্রথা নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। লক্ষ্ণৌ-টাইমস্ নামক সুবিখ্যাত পত্রিকার তিনি প্রথম প্রকাশক এবং সম্পাদক। এই সময়ে লক্ষ্ণৌএ একটি বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপন করিবার কল্পনা ইহাঁদের মনে জাগরুক হয়। রাজা দক্ষিণারঞ্জন তখন স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জন বিশিষ্ট বাঙ্গালীকে একে একে লক্ষ্ণৌপ্রবাসী করেন।

এই সূত্রে লক্ষ্ণৌএ বাস না করিলেও রাজকুমার বাবুর সহোদর ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নাম এবং গৌরবময় স্মৃতি লক্ষ্ণৌএর সহিত জড়িত আছে। তিনি সেনাপতি হ্যাভ্‌লকের (General Havelock) রেজিমেণ্টের ব্রিগেড সার্জ্জন (Brigade Surgeon) হইয়া লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সী উদ্ধার করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয়দের আদিবাস হুগলী জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে। এই রাধানগর রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। কলিকাতায় বহু দিন হইতে ইহাঁদের বাস স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ Graduate Medical College of Bengal নামে অভিহিত ছিল। সেই জন্য এখন যাঁহারা এল্, এম্, এস, উপাধি পাইতেছেন, তখনকার কালে তাঁহারা জি, এম্, সি, বি, উপাধি লাভ করিতেন। সিপাহীবিদ্রোহের পর হইতে এল, এম, এস, উপাধির সৃষ্টি হয়। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় জি, এম, সি, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবমেণ্টের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* ১৮৫৮ অব্দে বি, এ, পরীক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইলে বঙ্কিমবাবু বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম গ্রাজুয়েট হন।

১৮৫২ অব্দে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সূত্রে "ফায়ার কুইন" নামক যুদ্ধ-জাহাজ রেঙ্গুন যাত্রা করে। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সেই জাহাজের Nayal Surgeon নিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মদেশে গমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে "ফায়ার কুইন" জাহাজের কর্ম্ম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি গাজীপুরের গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসালয়ের ডাক্তার নিযুক্ত হইয়া যান। জেনারেল মেসন, তখন গাজীপুর জেলার ব্রিগেডাধ্যক্ষ (Brigade in Charge) এবং ডাঃ পামার (Dr. Palmer) ব্রিগেড্ সার্জ্জন (Brigade Surgeon) ছিলেন। এই মেসন সাহেব দেশীয় লোককে জুতা পায়ে দিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে দিতেন না। গাজীপুর পৌঁছিয়া সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে দ্বারবান্ তাঁহাকে জুতা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার আদেশ জ্ঞাপন করে। তখন তিনি আর দেখা করিবার চেষ্টা না করিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলে সাহেব উপর হইতে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া দ্বারবানকে বলেন "উহাকে ভিতরে আসিতে দাও"। এই সামান্য ঘটনা হইতেই সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মে। সাহেব তাঁহার সহিত কথোপকথনে পরম প্রীত হন এবং তাঁহার আত্মসম্মানবোধ প্রশংসার চক্ষেই দেখেন।

গাজীপুরে অবস্থিতি করিবার কালে সিপাহী-বিদ্রোহের দিন ঘনাইয়া আসিতেছিল। এমনই দিনে একদিন তিনি মুন্সেফ (পরে সবজজ) বাবু কাশীনাথ বিশ্বাস এবং অপর এক ভদ্রলোকের সহিত বৈকালে গঙ্গার ধারে পাদচারণ করিতেছেন এমন সময় কয়েকজন সিপাহী তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। অথচ কেহই তাঁহাদিগকে সেলাম (salute) করিল না। ইঁহারা তিনজনেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, বিশেষতঃ ডাঃ সর্ব্বাধিকারী জনসাধারণের বিশেষ প্রিয় এবং সম্মানিত। সম্মানপ্রদর্শন দূরে থাক সেদিন সিপাহীদিগের মধ্যে একজন কাশীনাথ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপোক্তিতে বলিয়া উঠিল "আরে মুন্সেফোয়া, আব্ কেয়া হোগা, বড়া যো ডিগ্রী ডিস্‌মিস্ হোতা হ্যায়?" সূর্য্যকুমার বাবুর মনে তৎক্ষণাৎ আসন্ন দুর্ঘটনার আশঙ্কা জন্মিল। তিনি ভাবিলেন এইবার সত্য সত্যই আগুন লাগিয়াছে। নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবার আর সময় নাই। তিনি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়া দিলেন এবং আত্মরক্ষার্থ স্বয়ং উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি সরকারী চিকিৎসালয়টি শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নৌকা হইতে চিনির ও ময়দার বস্তা স্তূপাকার করাইয়া চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া লইলেন। প্রথমে সাহেবেরা তাঁহার আশঙ্কা অমূলক মনে করিয়া সাবধান হয়েন নাই। কিন্তু দুর্দ্দিন যখন উপস্থিত হইল তখন তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে সুরক্ষিত ডিস্পেন্সরীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং ডাক্তারের দূরদর্শিতার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। প্রশংসাকারীদিগের মধ্যে তদানীন্তন সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট পরে ছোটলাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলী মহোদয় প্রধান ছিলেন।

গাজীপুরে শান্তি স্থাপিত হইবার পর লক্ষ্ণৌএর উদ্ধারার্থ জেনারাল হ্যাভ্‌লককে যাইতে হয়। তিনি পামার সাহেবকে তাঁহার রেজিমেণ্টের জন্য একজন সুদক্ষ য়ুরোপীয় ডাক্তার পাঠাইতে বলেন। কিন্তু পামার সাহেব ডাক্তার সূর্য্যকুমারকে উপযুক্ত বুঝিয়া ব্রিগেড সার্জ্জন স্বরূপ পাঠাইয়া দেন। গোরারা বাঙ্গালী ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকে। ইতিমধ্যে এমন একটি সুযোগ উপস্থিত হয় যাহাতে আপত্তিকারীগণ ইঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠে। হ্যাভলক্ সাহেবের হাতে একটি ফোড়া হয়। বাঙ্গালী ডাক্তারকে পরীক্ষা করিবার এবং সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার পরিচয় দিবার উহা উত্তম সুযোগ বুঝিয়া কাওয়াজের সময় যখন সমস্ত গোরাসৈন্য উপস্থিত, তখন তিনি ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীকে ডাকিয়া পাঠান এবং ফোড়া অস্ত্র করিতে বলেন। ডাক্তার মহাশয় নিমিষের মধ্যে সাতিশয় দক্ষতার সহিত ফোড়া অস্ত্র করিয়া বাঁধিয়া দেন। সেনাপতি সর্ব্বসমক্ষে তখন ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে তিনি বড়ই আরাম পাইলেন। স্বচক্ষে সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অস্ত্রচিকিৎসা দেখিয়া এবং সেনাপতির মুখে তাঁহার প্রশংসা স্বকর্ণে শুনিয়া সৈন্যগণ আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ হাইল্যাণ্ডরগণ তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নাচিতে নাচিতে লইয়া যায়।

ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী।

একদিন যুদ্ধাবসানের পর হঠাৎ এই রেজিমেণ্টসংক্রান্ত রসদ-বিভাগ বিদ্রোহীদগের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। গুদামে এক বোতল মদ্য পর্য্যন্ত আর পড়িয়া ছিল না। সমস্তদিন পরিশ্রমের পর গোরারা একটু মদ্য না পাইলে বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে, সুতরাং এরূপ প্রস্তাব হয় যে এক্ষণে ডাক্তারখানা (Medical Store) হইতে মদ্য বিতরিত হউক। তখন এডজুটাণ্ট সাহেব সেনাপতির আদেশ জানাইয়া সূর্য্যকুমার বাবুর নিকট মদ্য এবং শ্রান্তি-নিবারক দ্রব্যাদি প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু ডাক্তার তাহা কোন মতেই দিতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন সেনাপতির লিখিত আদেশ ব্যতীত তিনি চিকিৎসা বিভাগীয় মালখানা হইতে কোন সাহায্যই করিতে পারিবেন না। এডজুটাণ্ট সাহেব ডাক্তারের ব্যবহারের কথা সেনাপতিকে জ্ঞাপন করিলেন। মৌখিক আদেশ বাস্তবিকই হ্যাভলক্ সাহেব দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার আদেশ অমান্য হইতে দেখিয়া তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উন্মুক্ত অসি হস্তে ডাক্তারের প্রতি ধাবিত হইলেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যথাবিহিত স্যালুট করিয়া দাঁড়াইলেন। সাহেব বলিলেন "তুমি আমার আদেশ পালন করিবে কি না? সামরিক বিভাগে অবাধ্যতার দণ্ড কি তাহা তুমি জান?" ডাক্তার মহাশয় অকম্পিত স্বরে উত্তর করিলেন, "জানি। দণ্ড—মৃত্যু। কিন্তু আপনার মৌখিক হুকুম পালন করিয়া আমি আপনার লিখিত আদেশ অমান্য করিতে পারি না।" হ্যাভলক্ সাহেব কোর্ট মার্শালের আজ্ঞা দিলেন এবং তিনি সেই বিচার-সভার প্রেসিডেণ্ট হইয়া বসিলেন। বিচারস্থলে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় দণ্ডায়মান হইলে সেনাপতি হ্যাভলক্ জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আমার আদেশ তুমি এডজুটাণ্টের মারফৎ শুনিয়াছিলে, কিন্তু তাহা পালন কর নাই। অবাধ্যতার দণ্ড তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া। তোমার কিছু বলিবার আছে?" সর্ব্বাধিকারী মহাশয় পূর্ব্ববৎ অবিচলিত চিত্তে বলিলেন, "আমি পূর্ব্বেও যাহা বলিয়াছি এখনও তাহার পুনরুক্তি করিতেছি মাত্র।" এই বলিয়া তিনি নিজের পকেট হইতে একখানি নোট বহি বাহির করিয়া বিচারপতির সমক্ষে ধরিলেন। তাহাতে হ্যাভলক্ সাহেবের নিজের হাতে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীকে উদ্দেশ করিয়া লেখা ছিল "সেনাপতির লিখিত আদেশ ব্যতীত চিকিৎসাগারের গুদাম হইতে কোন দ্রব্য কাহাকেও দেওয়া হইবে না।" সাহেব তাহা পাঠ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সকল গোল মিটিয়া গেল। পুনরায় কুচ আরম্ভ হইল। ক্রমে তাঁহারা লক্ষ্ণৌরের নগরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এতদিনের পর ব্রিগেডিয়ার জেনেরাল মেসন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে চিনিতে পারেন এবং গাজীপুরের সেই জুতাবিভ্রাটের কথা তাঁহার

মনে পড়ে। পরদিন বিদ্রোহীদিগের সহিত শেষ যুদ্ধ হইয়া লক্ষ্ণৌয়ের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়; তাহাতে সার্ হেনরি লরেন্স আহত হন। সেই দিন রেজিমেণ্টের স্থায়ী সার্জ্জন ফিরিয়া আসিয়া চার্জ্জ লয়েন এবং সর্ব্বাধিকারী মহাশয় অন্য ব্রিগেডের সহিত বিদ্রোহী কুমারসিংএর দলের বিরুদ্ধে যাত্রার আদেশ প্রাপ্ত হন। ইহার তিন ঘণ্টা পরেই যেখানে ডাক্তার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন ঠিক সেই স্থানে বিদ্রোহীদিগের একটি গুলি আসিয়া পড়ে এবং নবাগত সার্জ্জন সাহেব হত হন।

বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে বিচারের দিন আসিল। তখন অপরাধীদিগের দণ্ডবিধানের ক্ষমতা, রাজস্ব, বিচার, চিকিৎসা এবং সমর বিভাগের অনেকের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছিল। ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই তাহা জানেন। ঐ সময় বিচার ও দণ্ডবিধানের নির্দ্দিষ্ট স্থান বা কাল ছিল না। বিদ্রোহী দস্যু বলিয়া যাহারা যেখানে ধরা পড়িতেছিল সেইখানেই তাহাদের বিচার ও দণ্ড হইতেছিল। পূর্ব্বোক্ত সেনাদল যখন লক্ষ্ণৌ হইতে কুচ করিয়া যাইতেছিল তখন একদিন রাত্রি একটার সময় এক বরযাত্রীর দল শোভাযাত্রা করিয়া সশস্ত্র গমন করিতেছিল। ডাকাতের দল বলিয়া তাহারা ধৃত হইয়া ছাউনিতে আনীত হইলে হতভাগ্যগণ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। বৃক্ষে বৃক্ষে তাহাদের দেহ লম্বিত করিবার আয়োজন যখন দ্রুতবেগে চলিয়াছে, আর মুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময় সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সেনানায়ক কাপ্তেন সাহেবকে বলিলেন 'ইহারা বিদ্রোহী নহে, দস্যুও নহে, ইহারা সত্যকার বর লইয়া বিবাহ দিতে যাইতেছে। ডাক্তার মহাশয় যাহা সত্য বা ন্যায় বলিয়া বুঝিতেন তাহা হইতে কোন কারণেই একপদ সরিয়া দাঁড়াইতেন না। কাপ্তেন সাহেবের তাহা বিলক্ষণ জানা ছিল, তিনি প্রতিবাদ না করিয়া পূর্ব্ব আদেশই বাহাল রাখিলেন। তখন সূর্য্যকুমার বাবু বলিলেন—"আমি আপনাকে সাবধান করিয়া দিলাম, তাহার পর আপনার যাহা অভিরুচি করিতে পারেন।" অধিকন্তু তিনি সাহেবকে কয়েকটি লক্ষণ বলিয়া দিলেন এবং গোপনে বরযাত্রীদিগের মধ্যে সেই-সকল লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিলেন। দেশপ্রচলিত প্রথা তাঁহার বিলক্ষণ জানা ছিল। এবার কাপ্তেন সাহেব কি বুঝিয়া তাঁহার কথা-মতই স্বয়ং পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন এবং তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সেই নিরীহ লোকদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। পরক্ষণেই কাপ্তেন সাহেব সূর্য্যকুমার বাবুকে ডাকাইলেন, আত্মগ্লানি এবং অনুতাপে তখন তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। সূর্য্যকুমার বাবু আসিতেই তিনি উদ্বেগভরে বলিলেন "Do you pray, can you pray, have you any objection to pray with me? অর্থাৎ আপনি কি উপাসনা করিয়া থাকেন, আপনি এখন উপাসনা করিতে পারিবেন, আমার সঙ্গে উপাসনা করিতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি?" এই বলিয়া সাহেব নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিয়াছিলেন, তিনি খৃষ্টীয় উপাসনা মন্দিরে যাহা কখন শুনেন নাই এবং যাহা কখন কোথাও তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই এরূপ প্রাণস্পর্শী এবং অকপট প্রার্থনা সেই গভীর রজনীতে মনুষ্যের বাসবিহীন প্রান্তরের সেনানিবাসে শুনিয়াছিলেন। এই ঘটনায় সূর্য্যকুমার বাবুর মনের গতি এরূপ হইল যে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ডাক্তার ফেরার্ড (পরে Sir Joseph Ferard যিনি লক্ষ্ণৌয়ের বিদ্রোহের সময় সার হেনরী লরেন্স মহোদয়ের চিকিৎসা করিয়াছিলেন) এবং ডাক্তার পামার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শুনিলেন ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী কার্য্যে ইস্তফা দিয়াছেন, তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তখন আর তাঁহাকে ফিরাইবার উপায় ছিল না।

মিউটিনীর কিছুকাল পরে ডাক্তার ক্রম্বী (Dr Crombie) কলিকাতা মেডিকেল কলেজে আগমন করেন এবং ইণ্ডিয়া আফিসের কাগজপত্রে বিদ্রোহ সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহকালে দেখিতে পান, যাহারা সে দুর্দ্দিনে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া এবং কর্ত্তব্যে অচল অটল থাকিয়া ইংরেজের সুখ দুঃখের ভাগী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে "A Bengali Doctor of Ghazipur" অর্থাৎ গাজীপুরের একজন বাঙ্গালী ডাক্তারও ছিলেন। ক্রম্বী সাহেব সূর্য্যকুমার বাবুকেই একদা জিজ্ঞাসা করেন

সে বাঙ্গালী ডাক্তারটি কে ? সূর্য্যকুমার বাবুকে গাজীপুরে থাকিতে তাঁহার বড়সাহেব স্বহস্তে একখানি Surgical Atlas উপহার দিয়াছিলেন। তাহাই তিনি তাঁহার সন্তোষের পরিচায়ক উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ রাখিয়াছিলেন। এখন ক্রম্বী সাহেবকে সেই মানচিত্রখানি দেখাইয়া তিনি বলিলেন যে তিনিই সেই বাঙ্গালী ডাক্তার। তখন সার ষ্টুয়ার্ট বেলী মহোদয় বঙ্গের ছোট লাট। গাজীপুরের বাঙ্গালীর কথা উত্থাপিত হইলে বেলী সাহেব বলিয়াছিলেন গাজীপুরে সূর্য্যকুমার বাবুর সহিত তিনি একত্রে কাজ করিতেন। ক্রম্বী তখন বেলী সাহেবের সুপারিশ সহ গবর্ণমেণ্টে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর প্রশংসনীয় কার্য্যের কথা লিখিয়া পাঠান। অতঃপর স্যার রিভার্স টমসনের আমলে হঠাৎ রায় বাহাদুরী খেতাবে সূর্য্যকুমার বাবু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্মানিত হন। সনদটি দিবার সময় লাট বলিয়াছিলেন—

"Who would have thought that these mild appearances cover the spirit of an ardent mutiny veteran who was present at many bloody action not indeed to add to human miseries but to relieve them so far as science, skill and devotion could."

কে জানিত যে এই শান্ত সৌম্যমূর্ত্তির মধ্যে একজন বিদ্রোহকালের অভিজ্ঞ ব্যক্তির তেজস্বী প্রাণ রহিয়াছে—সে অভিজ্ঞতা বহু যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতা; কিন্তু ইহাঁর যুদ্ধে উপস্থিতি লোকের প্রাণ নাশের জন্য নহে; বিজ্ঞান, নিপুণতা এবং একাগ্র নিষ্ঠার সাহায্যে যথাসাধ্য লোকের প্রাণ রক্ষা ও বেদনা নিবারণের চেষ্টার জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কর্ণধার মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলার ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ মহাশয় এই যশস্বী ডাক্তার মহাশয়ের যশস্বী পুত্র।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ (বর্ত্তমান নাম আরামবাগ) হইতে তিন মাইল দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর নদের পশ্চিম পার্শ্বে দিঘড়া নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এই গ্রামে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

জাহানাবাদের নিকটে এক বৃহৎ দীঘি আছে। তাহা রণজিৎসিংহের দীঘি নামে খ্যাত। ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে রণজিৎসিংহ জাহানাবাদের নিকটে গড় নির্ম্মাণ করিয়া গড়বাড়ী গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রাজা হইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার বংশের উপাধি রায় হইয়াছে। এই বংশের এক শাখা তিনশত বৎসর পূর্ব্বে দিঘড়া গ্রামে গিয়া বাস করেন। যোগেশবাবুর জন্ম এই রায়বংশে। কেহ কেহ বলেন রণজিৎসিংহ ক্ষত্রিয় কিম্বা রাজপুত ছিলেন। তিনি বহুকাল তৎকালের কংসাবতী ও অমরাবতী গড়ের দুই রাজার দুই কন্যা বিবাহ করেন। কালে রায়বংশ সদ্‌গোপ জাতির অন্তর্গত হইয়াছে।

যোগেশবাবুর পিতামহ তেজস্বীপুরুষ ছিলেন। তিনি গ্রামের জমিদারের অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার এমন দৈন্যদশা ঘটিয়াছিল যে তাঁহার একমাত্র পুত্র ৺রামতারক রায়কে মাতুল-আশ্রয়ে লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছিল। পরে তিনি বহুকষ্টে, নিজ মেধা ও পরিশ্রমের গুণে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া হুগলী কলেজে আইনের শিক্ষক হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি সদর আমীন (এখনকার মুন্সেফ্) ও শেষে সদরআলা (এখনকার সব্-জজ) পদে নিযুক্ত হন।

যোগেশবাবু ৺রামতারক রায়ের কনিষ্ঠপুত্র। ইনি প্রথমে বাড়ীতে স্থাপিত পাঠশালায় লেখাপড়া আরম্ভ করেন। নয়বৎসর বয়সে বাঁকুড়ায় পিতার নিকট প্রেরিত হন, এবং সেখানে জেলা ইস্কুলে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। বাঁকুড়ায় সদরআলা থাকিবার সময় রামতারক-বাবুকে চট্টগ্রামে ৮০০৲ টাকা বেতনে পাঠাইবার প্রস্তাব হয়। তিনি দূরদেশে আর যাইতে চাহিলেন না। ইহার কয়েকমাস পরে হঠাৎ বাঁকুড়ায় তাঁহার মৃত্যু হইল। যোগেশচন্দ্র স্বগ্রামে ফিরিয়া গেলেন। সে বৎসর ভীষণ মেলেরিয়া বর্দ্ধমান হইতে দক্ষিণগামী হইয়া জাহানাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেশের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। যোগেশচন্দ্র মেলেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া প্রায়

দেড়বৎসর জীবন্মৃত অবস্থায় রহিলেন। জ্বর ও উদরের প্লীহা কিঞ্চিৎ উপশম হইলে জাহানাবাদে ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তখন ইস্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৯ জন মাত্র ছিল! শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তিনি বর্দ্ধমানে মহারাজার ইস্কুলে পড়িতে গেলেন। সেখানে পাঁচবৎসর পড়িয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও দশটাকা মাসিক বৃত্তি পান। কলিকাতা হিন্দুস্কুলের সুযোগ্য হেড্‌মাষ্টার রায় বাহাদুর রসময় মিত্র ও বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায় বাহাদুর মনোমোহন রায় যোগেশবাবুর সহপাঠী ছিলেন।

অতঃপর যোগেশবাবু হুগলীকলেজে গিয়া ভর্ত্তি হইলেন। এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক কুড়িটাকা বৃত্তি পান এবং বি-এ পরীক্ষায় তিনি ও রসময়বাবু একত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম স্থান অধিকার করেন। হুগলী কলেজের ২৫্ বৃত্তি ইঁহাদের দুইজনকে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এফ-এ পড়িবার সময় যোগেশবাবুর চক্ষুর দোষ ধরা পড়ে। বি-এ পরীক্ষার পর কলিকাতার এক ডাক্তার সেই দোষ বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া বলেন, "যদি সম্পূর্ণ অন্ধ হইতে না চাও, লেখা পড়া অবিলম্বে ত্যাগ কর।" সে কালে নিকটদৃষ্টি যুবা অধিক দেখা যাইত না। যোগেশবাবু ভীত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কোনোক্রমে এম্-এ পরীক্ষা না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এম্-এ অনার পরীক্ষায় দ্বিতীয়বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন।

ইত্যবসরে ঘটনাচক্রে চুঁচুড়ার নিকটবর্ত্তী ভদ্রেশ্বর গ্রামে যোগেশবাবুকে এক নবস্থাপিত ইংরেজী স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পরীক্ষা দিয়াই সেখানে যাইতে হইল, কিন্তু একমাস যাইতে না-যাইতে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেব হুগলীকলেজের অধ্যক্ষ গ্রিফিথ্‌স্ সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া যোগেশবাবুকে কটক যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। এই আদেশ শুনিয়া যোগেশ বাবু অবাক্ হইলেন ও ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। অভিভাবক জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহাকে উকীল হইতে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং তিনি হুগলীকলেজে আইনক্লাসে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। ইহার উপর ভদ্রেশ্বরে অতি অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার এমন সুখ্যাতি হইল যে সেখানকার বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহিলেন না। ইঁহারা তাঁহাকে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় মাস হইতে ১০০্ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন কলেজের নূতন অধ্যাপক (Lecturer) প্রায়ই মাসিক ১০০্ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইতেন। হুগলী কলেজের অধ্যাপকবর্গ, বিশেষতঃ সংস্কৃত অধ্যাপক ৺গোপালচন্দ্র গুপ্ত ও অধ্যক্ষ গ্রিফিথস্ সাহেব, যোগেশবাবুকে ভাল বাসিতেন। ইঁহাদের আদেশ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া অগত্যা তিনি এপ্রিলমাসে কটককলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেন। তখন ফেব্রুয়ারি মাসে এম্-এ পরীক্ষা হইত। মার্চ্চ মাসে, যখন গেজেটে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় নাই, তখন যোগেশবাবুকে কটক পাঠাইবার পরামর্শ চলিয়াছিল! ইহা হইতে বুঝা যায় যে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তাঁহার অধ্যাপকদের উচ্চ ধারণা ছিল।

যোগেশবাবু কটকে গিয়া দেখিলেন সেখানেও আইন ক্লাস আছে। এই সংবাদে তাঁহার অভিভাবক আর আপত্তি করিলেন না। কিন্তু সেকালে কলেজে অল্প অধ্যাপক দেওয়া হইত। যোগেশবাবুকে একা এফ্-এ, বি-এ, চারিক্লাসের বিজ্ঞান পড়াইতে হইত। এক এম্-এ পড়িবার ছাত্রও জুটিল। সুতরাং রায়মহাশয় খুব হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

আইনক্লাসেও ভর্ত্তি হইলেন বটে, কিন্তু ক্লাসের ছাত্র নামমাত্র হইলেন। কটকে তাঁহার স্বদেশীয় এক উকীল ছিলেন। অদ্যাপি তিনি যোগেশবাবুকে ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। একদিন তিনি বলিলেন, দেখ, যখন উকীল হইতে যাইতেছ, তখন সন্ধ্যার পর আমার বাসায় আসিয়া মকদ্দমার কথাবার্ত্তা শুনিলে শিক্ষা ভাল হইবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও যোগেশবাবু দুইতিন দিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত বসিয়া ওকালতী ব্যবসায় প্রত্যক্ষ করিলেন, এবং মনে মনে ব্যবসায়ের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিতে লাগিল। মনে হইল, এই রকম করিয়া দুষ্ট

অধার্ম্মিকের সহবাসে সারাজীবন কাটাইতে হইবে? টাকাটা কি এতই লোভনীয়? প্রতিবেশী এক নব্য উকীলের সহিত পরিচয়ে বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন ইনি উৎফুল্লচিত্তে যোগেশবাবুর বাসায় আসিলেন। যোগেশবাবু মনে করিলেন, সেদিন তাঁহার উকীল বন্ধুর কিছু অর্থ উপার্জ্জন হইয়াছে। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জন নহে, প্রবীণ বুদ্ধিমান গবর্ণমেণ্ট উকীলকে হারাইয়া তিনি এক সেশন আদালতের আসামীকে খালাস করিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উল্লাস হইয়াছে। প্রশ্ন করিয়া যোগেশবাবু জানিলেন, আসামী প্রকৃত দুরাত্মা; দুরাত্মাকে সমাজে বিচরণ করিতে দিয়া উকীল মহাশয় কত লোকের সর্ব্বনাশের কারণ হইলেন, তাহা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। যোগেশবাবু ভাবিলেন, ওকালতি এই রকম জিনিষ! তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে লিখিলেন, ওকালতি তাঁহার কর্ম্ম নহে, এবং পরদিন আইনের বহি কয়েকখানি সহপাঠীদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া শান্তিলাভ করিলেন।

এখন স্থির হইয়া গেল, শিক্ষকতা ও বিজ্ঞানশিক্ষা জীবনের কর্ম্ম হইবে। অতএব বিজ্ঞানশিক্ষা আরম্ভ হইল। কলেজে পড়িবার সময় যে শিক্ষা হয়, তাহা গাড়াপত্তন মাত্র। শিক্ষা দিবার সময় সে শিক্ষায় কুলায় না। নিজের সন্তোষ না হইলে অধ্যাপনা বৃথা, এবং বিজ্ঞানের শাখা অনেক হইলেও, বিজ্ঞান এক। মূল হইতে নানা শাখার সংবাদ লইতে না পারিলে বিজ্ঞান-বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায় না। তখন কটক-কলেজে তিন যুবা অধ্যাপক তিন দিক রক্ষা করিতেন। উপেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় ইংরেজী সাহিত্যের, শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু মহাশয় গণিতের, এবং যোগেশবাবু বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তিনজনেরই অধ্যাপনার খ্যাতি হইল। স্বর্গীয় উপেন্দ্রবাবু স্বভাবতঃ মৃদুভাষী ও আলাপবিমুখ ছিলেন। কিন্তু এমন অধ্যয়নশীল, পণ্ডিত, ও প্রবীণ অধ্যাপক অল্পই দেখা যাইত। কালীপদবাবু ছাত্রগণকে রবিবারেও ছাড়িতেন না। অনেক দিন হইতে তিনি ঢাকা কলেজে আছেন।

তিন বৎসর কটকে থাকিবার পর যোগেশবাবুকে হঠাৎ কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজে আনা হইল। তখন ডাঃ হর্ণলে সাহেব মাদ্রাসা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেখানে বিজ্ঞান অধ্যাপনা সন্তোষজনক হইত না বলিয়া হর্ণলে সাহেব ডিরেক্টর ক্রফট্ সাহেবের নিকট এক দক্ষ অধ্যাপক প্রার্থনা করেন। তদনুসারে যোগেশবাবু মাদ্রাসায় নিযুক্ত হন। হর্ণলে সাহেব যোগেশবাবুকে আদর করিতেন এবং মিউজিয়মে গিয়া পড়িবার অনুমতি আনিয়া দিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলমাসে মাদ্রাসার কলেজবিভাগ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের সহিত

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

মিলিত হইল। মাদ্রাসার অধ্যাপকদিগের কাহাকে কোথায় নিযুক্ত করা হইবে তাহা দুই তিন মাস স্থির হইল না। চট্টগ্রাম-কলেজের গণিতের অধ্যাপক (তখন নাম ছিল সেকেণ্ড মাষ্টার) রুগ্ন হইয়া ছুটি লইয়াছিলেন। ডিরেক্টর ক্রফট্ সাহেব যোগেশবাবুকে ডাকাইয়া চট্টগ্রামে পাঠাইলেন, কিন্তু বলিয়া দিলেন শীঘ্র তাঁহাকে কলিকাতায় আনিবেন। যোগেশবাবু চট্টগ্রামে দুইমাস মাত্র ছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কলেজের

অধ্যক্ষ মহাশয় ও চট্টগ্রামবাসী ছাত্রদিগের অভিভাবকগণ যোগেশবাবুর কর্ম্মতৎপরতা ও বিদ্যানুরাগ দেখিয়া তাঁহাকে সেখানে স্থায়ী করিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু ক্রফ্‌ট্‌ সাহেব নিজের অঙ্গীকার পালন করিলেন, পূজার ছুটীর পর যোগেশবাবুকে প্রেসিডেন্সী কলেজে লইয়া আসিলেন। এখানে তাঁহাকে কলেজসংক্রান্ত কোন কাজ করিতে হইত না। যোগেশবাবু প্রচুর অবসর পাইয়া বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানশালায় নিজের শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সুযোগ অধিককাল ভোগ করিতে পাইলেন না। কটক-কলেজে বিজ্ঞান অধ্যাপনায় তথাকার অধ্যক্ষ অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রফ্‌ট্‌সাহেব যোগেশবাবুকে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আবার কটক পাঠাইলেন। তদবধি তিনি সেখানেই আছেন।

যোগেশবাবু শিক্ষকতা-কর্ম্মে ব্রতী হইয়া বুঝিয়াছিলেন, কেবল কলেজে নহে দেশেও বিজ্ঞানপ্রচার করিতে হইবে। কলিকাতায় থাকিবার সময় তিনি প্রথমে বঙ্গবিদ্যালয়ের পাঠ্য "পদার্থবিজ্ঞান" নামক পুস্তক লেখেন। পূর্ব্বে বঙ্গবিদ্যালয়ে বিজ্ঞানপুস্তক সাহিত্য-পুস্তকের মত কথার মানে করিয়া করিয়া শিখান হইত। ইহাঁর "পদার্থবিজ্ঞান" সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের হইল। "সঞ্জীবনী" লিখিয়াছিলেন, যোগেশবাবু বাঙ্গলা পাঠ্যপুস্তক রচনায় যুগান্তর আনিয়াছেন। কারণ, চিত্র, ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ইত্যাদিতে তিনি ব্যয়ের দিকে তাকান নাই। চট্টগ্রামে থাকিবার সময় ইনি বঙ্গবিদ্যালয়ে বিজ্ঞানশিক্ষার দোষ দেখিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে প্রকৃত রীতি প্রদর্শন করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া ক্রফ্‌ট্‌সাহেবের নিকট কয়েকটি প্রস্তাব করেন। তিনি নিবেদন করিলেন যে যদি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিখাইতে হয়, তাহা হইলে প্রথমে শিক্ষক আবশ্যক। প্রতিবৎসর গ্রীষ্মের ছুটির সময় এক এক জেলার কিম্বা ডিবিজনের প্রধান নগরে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে আহ্বান করা হউক। সেখানে কলেজের যোগ্য যোগ্য বিজ্ঞান-অধ্যাপক দুই তিন সপ্তাহ বিজ্ঞান-বিষয়ে শিক্ষকদি'ক শিক্ষা দিউন। লণ্ডনে যেমন টীচার্স সার্টিফিকেট (Teacher's certificate) পরীক্ষা আছে এখানেও সেই পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হউক। ক্রফ্‌ট্‌ সাহেব যোগেশবাবুর প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। কিন্তু দেশের ভাগ্যদোষে কলিকাতার ইস্কুলের এক দেশীয় ইন্‌স্পেক্টর বিরোধী হইলেন। ইনি জানাইলেন তাঁহার "পণ্ডিত টণ্ডিতরা এত বিদ্যা শিখিতে পারিবে না।" ক্রফ্‌ট্‌ সাহেব একথা শুনিয়া যোগেশবাবুকে বলিলেন, "তোমার দেশ এখনও প্রস্তুত হয় নাই।" আসল কথা, প্রস্তাবটা ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় নিজে করেন নাই, অন্যের প্রস্তাবে সম্মতি দিলে নিজের মানহানির আশঙ্কা করিয়াছিলেন। যোগেশবাবুর প্রস্তাব অনুসারে কাজ হইলে এতদিনে কত অল্পব্যয়ে কত শিক্ষক শিক্ষিত হইতেন, এক কঠিন প্রশ্নের অন্ততঃ কথঞ্চিৎ সমাধান হইত। এই ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছিলেন। প্রচুর পরিশ্রম করিয়া কলিকাতা মিউজিয়মে বসিয়া যোগেশবাবু "প্রাকৃত ভূগোল" লিখিলেন এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে মুদ্রিত করাইলেন। বিরোধী ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় নানা চক্রে যোগেশবাবুর "প্রাকৃত ভূগোল" প্রচারিত হইতে দিলেন না। যোগেশবাবু দেখিলেন, স্বার্থের টানাটানির বাজারে 'পাঠ্যপুস্তক' লেখা পণ্ডশ্রম মাত্র। মেডিক্যাল ইস্কুলের জন্য রসায়ন লিখিয়া সেই জ্ঞান সবিশেষ লাভ করিলেন। তদবধি আর পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ধারেও যান না। তিনি নিম্নলিখিত 'পাঠ্যপুস্তক'-গুলি লিখিয়াছিলেন—Practical Chemistry for Beginners, A Primer of Physiography, সরল-রসায়ন (তেজঃ সহিত), সরল প্রাকৃত ভূগোল, সরল পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নপ্রবেশ ও বিজ্ঞানকলিকা। পুস্তক লিখিয়া অর্থ উপার্জ্জন দূরে থাক, যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহাই পান নাই।

যে কারণে তিনি ইস্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি মাসিকপত্রে সহজ বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি যত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, একত্র করিয়া ছাপাইলে এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ হয়। এমন কোন পুস্তক-প্রকাশক কি নাই, যিনি এই কাজ করিতে পারেন? এমন বিজ্ঞান নাই, যে

বিষয়ে তিনি কিছু-না-কিছু লিখিয়াছেন। বিশেষত্ব এই, যে-বিষয় নিজে হাতে-কলমে আয়ত্ত না করিয়াছেন, সে বিষয়ে লেখেন নাই। সন ধরিয়া এই-সকল প্রবন্ধ সাজাইলে তাঁহার এক এক বিষয় শিক্ষার সনও পাওয়া যাইবে। তাঁহার বিশ্বাস মাসিকপত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ খুব সহজ করিয়া লিখিতে না পারিলে তাহা বৃথা হয়। এই বিশ্বাসে তাঁহার "পত্রালীর" জন্ম। ভাষা সোজা, কিন্তু বিষয়ের গুরুত্বে যথেষ্ট পাঠক হয় নাই। ইহার কোন কোন পত্র যখন প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়, তখন সমঝদার পাঠকেরা তাহা আগ্রহ ও আনন্দের সহিত পড়িতেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন—

"আমাদের দেশে সাধারণ মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচার করিতে হইলে এই ধরণের পুস্তকেরই প্রয়োজন। পত্রালীর বিষয়নির্ব্বাচন বড়ই সুন্দর হইয়াছে।"

প্রবাসীর সমালোচনায় লেখা হইয়াছিল—

"পত্রালীর মত পুস্তক পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। * * * ইহাকে জ্ঞান-মন্দিরের সোপান বলা যাইতে পারে; ইহার অধিকাংশ, চিত্তরঞ্জক বৈজ্ঞানিক কথায় পূর্ণ; ইহাতে দার্শনিক বিষয়ের আলোচনাও আছে। * * অধিকাংশ পত্র আমরা উপন্যাসের মত আনন্দ ও আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি ও নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছি।"

যোগেশ বাবু দ্বিতীয় বার কটকে গিয়া ঘটনাক্রমে জ্যোতির্বিদ ৺ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিংহের পরিচয় পান। তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান দেখিয়া যোগেশ বাবু সংস্কৃত জ্যোতিষের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। সিংহ মহাশয় কি করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে গিয়া সংস্কৃত জ্যোতিষের ইতিহাস উদ্ধার করিতে বসিলেন, চন্দ্রশেখর-কৃত "সিদ্ধান্ত-দর্পণ" প্রকাশ করিলেন, সাধারণের নিমিত্ত ইংরেজীতে দীর্ঘ মুখবন্ধ লিখিলেন। বিলাতে ও দেশে যিনি সেই মুখবন্ধ পড়িলেন, তিনিই এক দিকে চন্দ্রশেখরের ধীশক্তি ও উদ্ভাবনপটুতায় চমৎকৃত হইলেন, অন্য দিকে সম্পাদকের পাণ্ডিত্যেরও প্রশংসা করিলেন। বিলাতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্র "নেচার" (Nature) greater than Tycho Brahe জ্যোতির্বিদ্ টাইকো ব্রা অপেক্ষা বড় বলিয়া চন্দ্রশেখরের প্রশংসা করিলেন। এই মুখবন্ধের উৎকর্ষ হেতু প্রার্থনা করিবা মাত্র লণ্ডনের রয়াল এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী যোগেশ বাবুকে সদস্য নির্ব্বাচিত করিলেন। "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" প্রথমভাগ প্রকাশিত হইল। এই দুই গ্রন্থে তাঁহার দশ বৎসরের অবকাশ লাগিয়াছিল। "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" সম্বন্ধে ৺রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থকারকে লেখেন—

You have done an invaluable service by compiling such an exhaustive account... I appreciate your lucid and exhaustive account of our astronomical systems, – our *Samhitas* and *Siddhantas*, and our later astronomical works down to the present time... The value of a compilation such as yours cannot be exaggerated, and I wish once more to express my high sense of the obligation you have conferred on all of us—on all Indians—by your patriotic labour.

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রবাসীতে দীর্ঘ সমালোচনার মধ্যে লিখিয়াছেন—

অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, সন্তান বহুক্ষণ মাতৃদুগ্ধ পান না করিয়া থাকিলে মাতার স্তনে দুগ্ধভার এত বেশী হইয়া পড়ে যে, তখন দুগ্ধপান-কালে সন্তানের মুখে দুগ্ধধারা অতি প্রবল বেগে আসিতে থাকে এবং তাহাতে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। বহুকাল-ক্ষুধিত জ্যোতিঃপিপাসু আমরাও সেই সন্তানের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছি; যোগেশ বাবু এত বেগে এত অধিক পরিমাণে আমাদের মুখে দুগ্ধধারা ঢালিয়া দিয়াছেন যে, আমরা প্রায় রুদ্ধশ্বাস হইয়া পড়িতেছি। গ্রন্থে এত বেশী কথা আছে যে, কোন্ কথা ছাড়িয়া কোন্ কথা কহিব, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না। * * * বহুকালের অজ্ঞতার মাথায় এত বেশী জ্ঞানের চাপ বহিতে পারা দুষ্কর হইয়া পড়িতেছে। * * * গ্রন্থখানি কেবল ঐতিহাসিক নহে। ইহার ইতিহাস-ভাগ কেবলমাত্র ঘটনা-পরম্পরায় গ্রথিত না হইয়া বহুল পরিমাণে বিজ্ঞানের যুক্তির উপর খাড়া করিতে চেষ্টা হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন লিখিয়াছেন—

সংযমী নিষ্ঠাবান্ দৃঢ়ব্রত তপস্বী পুরুষ সকল সময়ে সকল দেশেই অল্প, বঙ্গদেশে অত্যল্প। মাতৃভাষার হিতকামনায় অঙ্গুল্যগ্রে গণনীয় যে কতিপয় সুশিক্ষিত আছেন, তন্মধ্যে আপনি একজন শ্রেষ্ঠ। * * * আপনি যে বঙ্গ-সরস্বতীর জন্য একখানি সুবৃহৎ জ্যোতির্ম্ময় মুকুটের নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই আকাশোদ্ভাসি-মহামূল্য-মুকুট মস্তকে সগর্ব্বে পরিধান করিয়া বঙ্গ-সরস্বতীর নির্ম্মল মুখমণ্ডল আজ স্মিত-রেখায় উদ্ভাসিত। মাতাকে এই হার পরাইয়া, এই মুকুটে মাতাকে বিভূষিত করিয়া, আপনি ধন্য হইয়াছেন, বঙ্গভূমিকে ধন্য করিয়াছেন, বঙ্গবাসীকে গর্ব্বিত হইবার অধিকার দিয়াছেন।

দুঃখের বিষয় জ্যোতিষের দ্বিতীয় ভাগ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। যে দেশে জ্যোতিষ-জ্ঞান অল্প সে দেশে জ্যোতিষের ইতিহাস পড়িবার পাঠক কোথায়? পাঠক-

সংখ্যা অল্প হইলেও সাহিত্যপরিষৎ যোগেশ বাবুর দ্বারা দ্বিতীয় ভাগ লিখাইয়া প্রকাশিত করুন।

ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিবার সময় যোগেশ বাবু আমাদের প্রাচীন রত্নপরীক্ষার আভাস পান। পরে তাহা আধুনিক ধরণে লিখিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া "রত্ন-পরীক্ষা" নামে পুস্তক হইয়াছে। উহা পড়িলে বুঝা যায় যে প্রাচীনকালে আমাদের দেশে হীরা মাণিক প্রভৃতি রত্ন সম্বন্ধে যে চমৎকার জ্ঞান ছিল, তাহা আধুনিক ইউ-রোপীয় বিজ্ঞানের দিনেও চমৎকার। পুস্তকখানি সম্বন্ধে প্রবাসীতে বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন—

যোগেশ বাবু আর্য্যশাস্ত্রের লুপ্ত রত্নোদ্ধারের যে চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার গ্রন্থখানি যে প্রীতিপ্রদ হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের দেশীয় সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা, যাঁহারা রত্নাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি একটু শ্রদ্ধান্বিত হন, এবং অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া যদি বর্ত্তমান কালে দেশের উন্নতির প্রতি একটু মনোযোগ করেন, তাহা হইলে গ্রন্থকারের পরিশ্রম সফল হইবে। নাটক-নবেল-প্লাবিত বঙ্গদেশে আমরা এইরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। রত্ন-পরীক্ষা আমাদের বিশেষ তৃপ্তিকর হইয়াছে।

জ্যোতিষের দিকে চিত্ত আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে যোগেশ বাবু "শঙ্কুনির্ম্মাণ" নামক পুস্তক লিখিয়াছেন। বিলাতী ঘড়ী থাকিলেও সূর্য্যঘড়ী আবশ্যক। এই বহির সাহায্যে যে-কেহ নিজে সূর্য্যঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়া নিজের বাড়ীতে স্থাপন করিতে পারেন। ইহার সম্বন্ধে অধ্যাপক অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রবাসীতে লিখিয়াছেন—

যোগেশ বাবু অনেক রকম লোকহিতকর বিদ্যা এবং কার্য্যগত নানা বিষয়ক উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতেছেন, বর্ত্তমান গ্রন্থ তাহারই অন্যতম। সূর্য্য-ঘড়ী নির্ম্মাণের প্রয়োজন ও প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইবে ইহার উদ্দেশ্য। * * সূর্য্য-ঘড়ী বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপার নহে। ইহা একবার স্থাপন করিলে বিনা 'দমে' ও বিনা 'তৈল দানে' বহু শতাব্দী চলিবে। * * গ্রাম্য জমিদার যদি বাড়ীতে একটা সূর্য্য-ঘড়ী স্থাপন করেন, তাহা হইলে সমস্ত গ্রামে একটা সময়-বোধ জাগরিত হইয়া উঠিবে।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের জ্যোতিষী লইয়া এক সভা হইয়াছিল। দেশের পঞ্জিকাসংস্কার এই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল। যোগেশ-বাবু সেই সভায় নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার অভিমত Hindu Almanac Reform (হিন্দু পঞ্জিকাসংস্কার) নামে এক পুস্তিকা লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন, পুরাকাল হইতে এ পর্য্যন্ত এদেশে পঞ্জিকা-সংস্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিয়া বর্ত্তমানে কোথায় আট-কাইতেছে তাহা এই পুস্তিকায় দেখান হইয়াছে। শেষ কথা তিনি এই বলিয়াছেন যে, হিন্দু মানমন্দির প্রতিষ্ঠা না করিলে সংস্কারের পথ সুগম হইবে না।

কলিকাতা সাহিত্যপরিষদের জন্মাবধি যোগেশ বাবু পরিষদের সদস্য আছেন। প্রথম অবধি পরিষদ বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলনের নিমিত্ত সদস্যগণকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। কেহ অগ্রসর হই-লেন না দেখিয়া আজি দশ বার বৎসর হইল যোগেশ বাবু বাংলা ভাষার প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রমের ফলস্বরূপ "বাঙ্গালাভাষা" নামক গ্রন্থ প্রকা-শিত হইতেছে। "বাঙ্গালাভাষা" দুই ভাগে বিভক্ত হই-য়াছে। প্রথম ভাগে বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও গতি, শব্দের উচ্চারণ ব্যুৎপত্তি পরিবর্ত্তন, বাংলা অক্ষর, বাংলা ব্যাকরণ বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ভাগে "বাঙ্গালা শব্দকোষ।" ইহার তৃতীয় খণ্ড ("ম"শেষ) প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ভাগ পড়িয়া শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রবাসীতে লিখিয়া-ছিলেন, যোগেশ বাবু মাটি খুঁড়িয়া আকর হইতে লৌহ উত্তোলন করিয়া স্বরচিত শস্ত্রে বাংলা ভাষা ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি যে ভবিষ্যৎ কর্ম্মীদিগের নিমিত্ত নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা স্বীকার করি-তেই হইবে। অনেকে মনে করিয়াছেন যোগেশ বাবু বাঙ্গালা শব্দের বানান পরিবর্ত্তন করিতেছেন। তিনি কেবল কয়েকটা যুক্ত অক্ষর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেটা প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। সাহিত্য-পরিষৎ এই গ্রন্থ প্রচার করিয়া বাংলার কলঙ্কমোচনের প্রয়াসী হইয়া-ছেন। যোগেশ বাবুর শব্দকোষের যথাসাধ্য বিস্তৃত আলোচনা প্রবাসীতে হইতেছে।

এ-সকল তাঁহার সখের কাজ, অবসরের কাজ, যখন দৈনিক বিজ্ঞান আলোচনা হইতে বিশ্রাম প্রয়ো-জন হয়, তখনকার কাজ। ঘটনাক্রমে কলেজে তাঁহাকে সময়ে সময়ে বিজ্ঞানের তিনচারি শাখা অধ্যাপনা করাইতে হইয়াছে, ইহাতে এক দিকে যেমন এই-সকল

শাখায় জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইয়াছে, তেমনি এক বিদ্যায় আবদ্ধ না থাকিয়া তাঁহার মনের গতি নানাদিকে ধাবিত হইয়াছে। তিনি বলেন, কিছু না জানিলে চলিবে কেন? বিজ্ঞান ত আছেই, কিন্তু বিজ্ঞান ত দশটা নহে, একটা। এইরূপে তিনি লণ্ডনের রয়্যাল মাই-ক্রস্কোপিক্যাল সোসাইটী, এবং লিডন নগরে স্থাপিত ইণ্টারন্যাশন্যাল এসোসিয়েশন অব্ বটানিষ্ট্‌স্ সভার সদস্য হইলেন। কিছুদিন লয়েড্ লাইব্রেরীর (Loyd Library) mycology (ছত্রাকবিদ্যা) সম্বন্ধে corresponding member হইয়াছিলেন। প্রায়ই এক এক ক্ষুদ্র প্রয়োজনে বিদ্যা হইতে কলা অভ্যাস করিয়াছিলেন। দধি কি, দধিবীজ কি, তাহা ইঁনিই এদেশে প্রথম ব্যাখ্যা করেন। আবগারী বিভাগের এক ডিপুটী বন্ধুর অনুরোধে চাউল হইতে মদ্য প্রস্তুত করিবার দেশীয় কলা আমূল ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পরে এই ব্যাখ্যা ইংরেজীতে বেঙ্গল এশিয়াটীক সোসাইটীর পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। একবার এক গায়কের গানে মুগ্ধ হইয়া কয়েক বৎসর অবসরকালে দেশীয় গীতবাদ্যের বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, নিজে গাইতে বাজাইতে না পারি, অন্যে গাইলে বাজাইলে বুঝিতে ও রস গ্রহণ করিতে পারা চাই। "প্রাকৃত ভূগোল" লিখিবার সময় ফোটোগ্রাফ তোলা অভ্যাস করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে চিত্রের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে অনুশীলন করেন। দেশীয় গাছের রঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র দেখিয়া কয়েক বৎসর রঞ্জনবিদ্যা ও রঞ্জনকলা অভ্যাস করিয়াছিলেন। এক কবিরাজ তৈলপাকের যোগ্য হাঁড়ী না পাওয়াতে যোগেশবাবুর নিকট দুঃখপ্রকাশ করেন। অমনি যোগেশ-বাবু কুম্ভকারকলার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং বাড়ীতে কুমার রাখিয়া নানাবিধ মৃত্তিকার পরীক্ষা করিয়া দুইবৎসর পরে সফলকাম হইয়াছিলেন। কলেজে কলার বিজ্ঞান এবং বাড়ীতে কলার করণ, এই দ্বিবিধ উপায়ে তাঁহার কলা শিক্ষা হইয়াছিল। যখন কলেজে প্রথম নিযুক্ত হন, তখনই বুঝিয়াছিলেন, যন্ত্রনির্ম্মাণ না জানিলে বিজ্ঞানশিক্ষা চলিবে না। এইরূপে তিনি ছুতারের কামারের কাজ, টিন-পিতলের কাজ, নিজে হাতে কিছু কিছু অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, হাত নাই হউক, দক্ষতা নাই জন্মুক, কোন্ যন্ত্র কিরূপে করিতে হয় তাহা না জানিলে কারিগরকে উপদেশ দিতে পারা যায় না। এমন গ্রাম্য কলা নাই, যাহার করণ তিনি অবগত না আছেন। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে যে চরকা নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ছয়মাস পরীক্ষার ফল। গ্রামে সুলভে শক্তিসংগ্রহের উদ্দেশ্যে পবনচক্র (wind mill) নির্ম্মাণ করিয়া তিনি তাহার দোষগুণ পরীক্ষা করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদ তাঁহার পরীক্ষার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছেন। তিনি তাঁহার পবনচক্র দ্বারা কুয়া হইতে জল তুলিবার সহজ উপায় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ফলে গ্রাম্য কামার দ্বারা নির্ম্মিত হইতে পারে, এমন পম্প নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ধানভানা, কলাইভাঙ্গা এবং এইরূপ কাজ করাইবার উদ্দেশ্যে ছোট বড় কল করাইয়াছিলেন। কলাইভাঙ্গা জাঁতা ও জলতোলা পম্প দ্বারা অদ্যাপি তাঁহার বাসার কাজ চলিতেছে। সময় পাইলে এই দুই কলের একটু উন্নতি করিয়া সাধারণের গোচর করি[illegible] জ্যোতিষ চর্চ্চার সময় দূরবীণের কাচ কিনিয়া [illegible] দূরবীণ তৈয়ার করাইয়া ব্যবহার করিতেন। কলেজে তাঁহার নিজের হাতের কিম্বা কারিগরকে উপদেশ দিয়া গড়া অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আছে। এই সকলের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য। একবার কলেজের X-Ray দেখিবার বহুমূল্য এক যন্ত্র (Induction Coil) বিগড়াইয়া যায়। যাঁহারা এই যন্ত্র চালাইয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন, একবার বিগড়াইলে নূতন করিয়া না গড়িলে সে যন্ত্রে আর কাজ হয় না। গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রনির্ম্মাণ আফিস ও বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের টেলিগ্রাফ আফিস এই যন্ত্র দেখিতে চাহিল, কিন্তু হাত দিতে সাহস করিল না। ইহার কিছুপরে ডিরেক্টর পেডলার সাহেব কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলেন। সেই যন্ত্র কোথায় মেরা-মত হইতে পারে, তাহা যোগেশবাবু পেডলার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "এদেশে হইতে পারিবে না, বিলাত পাঠান।" "এদেশে হইতে পারে না" শুনিয়া যোগেশবাবুর মনে আঘাত লাগিল।

পূজার অবকাশে তাহা খুলিয়া নিজে নির্ম্মাণসূত্র... লন করিয়া নূতন গড়িলেন। কেবল সেটা নহে, তাহার সূত্র ঠিক্ কি না পরীক্ষার নিমিত্ত আরো দুইটা গড়িলেন। পরবৎসর পেড্‌লার সাহেব যখন আবার আসিলেন, তখন যন্ত্রের কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তিনি সুবিধা হইলেই এইরূপ হাতেগড়া যন্ত্র লইয়া অধ্যাপনা করিতে ভাল বাসেন। প্রথম-শিক্ষার্থীকে তিনি জটিল কিম্বা বিলাতি চাকচিক্যময় যন্ত্র দেখান না। তিনি বলেন, ইহাতে ছাত্রের মন বিষয়ের প্রতি আবদ্ধ থাকে না, যন্ত্রের প্রতি ধাবিত হইয়া প্রকৃত শিক্ষার ব্যাঘাত হয়। শিক্ষার্থী ব্যবহৃত যন্ত্রের দোষ বুঝিতে পারিয়া সে দোষ সংশোধিত দেখিতে অভিলাষ করিলে উন্নত যন্ত্র দেখিবার অধিকারী হয়। তিনি মনে করেন, ছাত্রের মনে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা জন্মানই তাঁহার কার্য্য, শেখা ছাত্রের হাতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌স্পেক্টরগণ বৎসরে বৎসরে তাঁহার শিক্ষাদান-পদ্ধতির প্রশংসা করিতেছেন, তাহাতেই তাঁহার চেষ্টার ...া বুঝিতে পারা যাইতেছে। যাহাতে ছাত্রেরা ...ধী ও অনুসন্ধিৎসু হইয়া (তাহাদের পক্ষে) নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারে, আবিষ্কারের নামে ভীত না হয়, তাঁহার চেষ্টা সেই দিকে। ইহাতে যে তাঁহার ছাত্রেরা অধিক সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। বোধ হয় এই কারণে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায়সাহেব" উপাধি দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গুণের আদর ঠিক্‌মত করা হইত যদি তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগের ইম্পীরিয়্যাল সার্ভিসে উন্নীত করা হইত। জন্মের দেশ ও গায়ের রং, এই দুই অপরাধে শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম কাজগুলি তাঁহার মত লোকদের অনধিগম্য হইয়া রহিয়াছে।

কটক-কলেজে বহুকাল থাকাতে উড়িষ্যার কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত অধিকাংশ ব্যক্তি যোগেশবাবুর ছাত্র। সকলেই তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে, অধিকাংশ লোকে তাঁহাকে আপনার লোক মনে করে। উড়িষ্যার পণ্ডিতবর্গ তাঁহার সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া শ্রদ্ধা করেন। এইরূপে পুরীর মুক্তিমণ্ডপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে মন্দিরে বিদ্যানিধি উপাধি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তাহার বৃত্তান্ত আমরা যথাসময়ে প্রকাশ করিয়াছিলাম। "কটকের সাধারণ লোকের কাহারও কিছু সন্দেহ হইলে মনে করে যোগেশবাবুর কাছে সন্দেহ দূর হইবে,—যেন বিজ্ঞানের অধ্যাপকের নিকট অজ্ঞাত কিছু নাই।

কিন্তু অধিক মস্তিষ্ক চালনায়, বিশেষতঃ দেহের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলায়, যোগেশবাবু তিনবৎসর হইতে অজীর্ণরোগে ভুগিতেছেন। এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু বুঝিয়াছেন, দেহের স্বাস্থ্য না থাকিলে কর্ম্ম করিবার শক্তি থাকে না, লেখাপড়া কম না করিলে দেহ টিকিবে না। একারণে বিলাতী সভাগুলির সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কেবল দেশীয় দুইতিনটি সভার সঙ্গে যোগ রাখিয়াছেন।

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র অনাড়ম্বর, সাদাসিধা মানুষ। জ্ঞান-অর্জ্জন ও জ্ঞানদান তাঁহার জীবনের ব্রত। তপস্বীর মত একাগ্রতার সহিত তিনি এই ব্রত পালন করিতেছেন। দেশের হিতৈষী প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিবে।

দেশের কথা

স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্য সাধনা।

রংপুর দিকপ্রকাশ লিখিয়াছেন :—

সম্প্রতি রয়টার খবর পাঠাইয়াছেন—"ইংলণ্ডের বাণিজ্যসমিতি, জার্ম্মানী যে সমুদায় জিনিষ এ পর্য্যন্ত সরবরাহ করিয়া আসিতেছিল সেই সমুদায় জিনিষ সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। যদি মূলধন সংগ্রহ করা যায় তাহা হইলে যুদ্ধ শেষ হইতে হইতে গ্রেট ব্রিটেনে নানাবিধ ঔষধ, রাসায়নিক উপকরণ, রং, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি বিষয়ক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ফরাসীরাও জর্ম্মান বাণিজ্য হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছে।" স্বাধীনপ্রকৃতি আত্মসম্মানজ্ঞান- ও ব্যবসায়বুদ্ধি-বিশিষ্ট জাতি বিপৎপাতেও আপনাদের মঙ্গল-চিন্তা বিসর্জন দিতে পারেন না। এইরূপ বিষয়ে দৃষ্টি না থাকিলে কোন জাতি বড় হইতে পারে না।

আমরা যুদ্ধের জন্য জাহাজ দিতেছি, হাজারে হাজারে লাখে লাখে টাকা দিতেছি, কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের জন্য কি করিতেছি? 'স্বদেশী' দুদিনের জন্য জাগিয়া উঠিয়াছিল আবার কুম্ভকর্ণের মত মোহনিদ্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছে।

যাঁহারা বিদেশীয় প্রতিযোগিতায় ভয় করেন, তাঁহাদের পক্ষে আজ সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। অনেক বিষয়ে কিছু দিনের জন্য

প্রতিযোগিতার আশঙ্কা উঠিয়াই গেল। সুতরাং এখন আমাদের নিজেদের জিনিষ নিজেদের প্রস্তুত করিবার সময় উপস্থিত।

জার্ম্মানী প্রভৃতি হইতে অনেক টাকার ডাক্তারী ঔষধ আসিত; সে সমুদায় এখন বন্ধ হওয়ায় ডাক্তার ও রোগীদিগকে কম অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের মূলধন বাড়াইয়া নূতন নূতন প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রস্তুত করান হউক। বেঙ্গল কেমিক্যালের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠ কারখানার শেয়ার কিনিতে বাঙালী পশ্চাৎপদ হইবে না। পঞ্জাবে নাকি একটি কাচের কারখানা আছে, তাহার মূলধন বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করা হউক। কাগজ না হইলে শিক্ষিত ব্যক্তির এক মুহূর্ত্ত চলে না—ভারতীয় মিল সমুদায়ের উন্নতির সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এ দেশের শর্করাশিল্প লুপ্তপ্রায়—বাঙালীর এ দিকে লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে, বিশেষতঃ এবার ইক্ষুর আবাদ গত বৎসর অপেক্ষা বেশী। জাপানকেও বোধ হয় যুদ্ধে জড়িত হইতে হইবে, সুতরাং আজ একবার দিয়াবাতির জন্য চেষ্টা করিলে ক্ষতি কি? অবশ্য দেশের ধনকুবেরগণ পৃষ্ঠপোষকতা না করিলে কিছুই হইবে না।

দেশার্থবুদ্ধির জাগরণের প্রথম ফলস্বরূপ যে 'স্বদেশী'কে আমরা লাভ করিয়াছিলাম তাহা যদি আজ হেলায় না হারাইতাম—তবে আজ এই বিদেশী মালের আমদানীর বন্ধে চারিদিকে এমন অন্ধকার না দেখিয়া ইহাতে আনন্দে নৃত্য করিয়াই উঠিতাম! আজ তাহা হইলে চারিদিকে শিল্পী ব্যবসায়ী শ্রমজীবী প্রভৃতিরা আশা ও আনন্দ—সুখ ও সাফল্যের উন্মাদ উত্তেজনায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে বিপুল অধ্যবসায়ে স্ব স্ব কর্ম্মে লাগিয়া যাইত—এক বৎসরের ভিতর দেশীয় শিল্পবাণিজ্যকে পঁচিশ বৎসরের পথ আগাইয়া রাখিতে পারিত। কিন্তু সে স্বদেশী আজ কোথায়—স্বদেশী ভাবের অভ্যুত্থানের পরও কে ভাবিতে পারিয়াছিল হে দেশমাতৃকা, তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরেই থাকিবে!

আজও আশার কথা কেউ শোনায় না—দেশীয় শিল্পের অগৌরব ও অক্ষমতা, লজ্জা ও অপমানের ছিন্ন ধ্বজাই সকল দিকে মাথা উঁচু করিয়া আছে!

রংপুর দিকপ্রকাশেই প্রকাশ—

সরকারী হিসাবে প্রকাশ—গত মে মাসে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে সুতা তৈয়ারী হইয়াছে, ৫ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড,—আর বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে,—কিঞ্চিদধিক ২ কোটি ১ লক্ষ পাউণ্ড। গত বৎসর এই মে মাসে সুতা তৈয়ার হইয়াছিল কিঞ্চিদধিক ৫ কোটি ৮ লক্ষ পাউণ্ড,—আর বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল কিঞ্চিদধিক ২ কোটি ২ লক্ষ পাউণ্ড। সুতরাং গত বৎসরের মে মাস অপেক্ষা এ বৎসরের মে মাসে ভারতের কলসমূহে সূতা এবং বস্ত্র দুইই উৎপন্ন হইয়াছে অনেক কম। এ দেশে 'স্বদেশী সাধনার' কি ইহাই পরিণাম?

যাহাই হউক দেশের কাছে, শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের কাছে আমাদের নিবেদন, আজ আর যেন তাঁহারা দেশার্থ ভুলিয়া, শিল্প বাণিজ্য ও ব্যবসায় ভুলিয়া বৃথা আন্দোলনে মত্ত না থাকেন—চারিদিক হইতে সহস্র কাজ আমাদের ব্যাকুল ভাবে ডাকিতেছে আমরা কি চিরদিনই জড়ের মত পড়িয়া থাকিব!

মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলির প্রতি আমাদের বিনীত নিবেদন—তাঁহারা চারি-পৃষ্ঠা-ব্যাপী যুদ্ধসংবাদের পরিবর্ত্তে দেশের বর্ত্তমান অভাব অভিযোগ ও প্রয়োজনগুলি যদি বিস্তৃতভাবে বরাবর কিছুকাল ধরিয়া আলোচনা করিতে থাকেন তাহা হইলে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ সকলেই তাহাদের ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে, বাস্তবিক দেশের প্রকৃত উপকারও হয়। আমরা দেখিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছি যে 'বরিশালহিতৈষী', 'সুরাজ', 'রংপুর দিক্‌প্রকাশ' প্রভৃতি কয়েকটি সংবাদপত্র আমাদের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ঐরূপ ভাবে দেশের অভাব মোচন ও জনসাধারণের বর্ত্তমানে কি করা কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্দেশ করিবার কার্য্যে যথাসাধ্য লাগিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য পত্রিকাগুলি তাঁহাদের পন্থা অনুসরণ করিবেন, এ আশা আমাদের আছে।

সৎকার্য্যে দান:—

সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল, লোকনাথ দাতব্য চিকিৎসালয়, গঙ্গাবাড়ী অতিথিশালা স্বর্গীয় জাহ্নবী চৌধুরাণীর প্রোজ্জ্বল কীর্ত্তি; সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল টাঙ্গাইলের সর্ব্ব প্রকার উন্নতির মূল। এতব জমিদারী হইতে স্কুল, চিকিৎসালয় ও অতিথিশালার ব্যয় নি হইত। শ্রীযুক্তা রাণী দীনমণি এই সকলের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য লক্ষ তেষট্টি হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ এক ট্রাষ্টী অর্পণ করিয়াছেন; কোম্পানীর কাগজ হইতে মাসিক ৯০০ আয় হইবে।—চারুমিহির।

শত সহস্র অভাবপীড়িত আমাদের এই [illegible] চাহে যে, যাঁহাদের অর্থ আছে সামর্থ্য আ[illegible] সহায়হীন সম্বলহীন ও উপায়হীন দেশবাসীর সদনুষ্ঠান করুন। দেশের বাস্তবিক উন্নতি তাঁহাদেরই অনুকূল ইচ্ছার ভিতরে রহিয়াছে

নীগণ মহাপ্রাণা রাণী দীনময়ীর পদাঙ্ক অনুসরণ... দেশের অভাব মোচনে যত্নবান হইবেন। আমরা ঃকরণে রাণী দীনমণির কল্যাণ কামনা করি।

র মতামত ঃ—

একটা নদী পার হইতে আমাদের অন্তর দুরদুর করে আর কলম্বস পৃথিবীর গোলত্ব সপ্রমাণ করিতে অকূল সমুদ্রে ভাসিয়াছিলেন। তাই আমেরিকা আবিষ্কার হইয়াছিল। আমরা ঘরে বসিয়া অন্নপূর্ণার পূজা দিয়া মনে ভাবি আর অন্নকষ্টের ভাবনা হইবে না। এদিকে ত দিন দিন অন্নচিন্তাই আমাদের চমৎকার হইয়া উঠিয়াছে। মা পূজাতে সন্তুষ্ট হইয়া তোমার দৈনিক আহার জোগাইবেন না। তোমার হাত পা দিয়াছেন করিয়া খাইতে হইবে। যদি দেশের অভাব দূর করিতে চাও বসিয়া থাকিলে চলিবে না, নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। লোকের নিকট কাঁদিলে দুঃখ ঘুচিবে না, যখন যে অভাবকে সম্মুখে দেখিবে তাহার প্রতিকারের জন্য পুরুষকারের আশ্রয় লইতে হইবে। সর্ব্বকার্য্যে শক্তিমান হওয়া যে অবশ্যকর্ত্তব্য তখন বুঝিতে পারিবে। সবলে পদাঘাতে, শত্রুর তাড়নায়, হিংসুকের হিংসাতে, তোমার বল আরও বৃদ্ধি হইবে। ইহাই সকল কার্য্যের মূল, ইচ্ছা হইতেই চেষ্টা আইসে, চেষ্টার ফলেই সাধনার উৎপত্তি, শেষে সাধনাতেই সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।—সুরাজ।

আমাদের মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলি এখন যুদ্ধ-এমন ব্যস্ত যে দেশের কথা ভাবিবার তাঁহাদের ও সময় নাই। অগত্যা আমাদের এবার এই সামান্য কয়টি সংবাদ উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল। তাঁহারা সবাই বিশ্বজনীন হইয়া উঠিয়াছেন, তাই বিশ্বজনীন সংবাদ ব্যতীত স্বদেশের কোনো সংবাদের প্রতি তাঁহারা কৃপা কটাক্ষে চাহেন না। প্রবাসীর মত সহস্র মাসিকপত্র কণ্ঠ বিদীর্ণ করিলেও আমাদের মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলির সে কথা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে বলিয়া আদৌ বিশ্বাস হয় না। বাস্তবিকই ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

শ্রীক্ষীরোদকুমার রায়।

শপথ

(পুরাতন জাপানী শ্লোক হইতে)

দোঁহার অঞ্চল আজি অশ্রু জলে গেছে ভিজি,
শপথ, এ প্রেম হোক্ অটুট অক্ষয়!
যতদিন দীর্ঘ চারু গিরিপরে দেবদারু
সিন্ধুর অতল জলে নাহি পায় লয়।

শ্রীকালিদাস রায়।

ব্যঙ্গচিত্র

আমাদের দেশে সচরাচর ব্যঙ্গচিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এরূপ চিত্র আমাদের দেশে যে একেবারেই ছিল না এমন নয়। প্রাচীন চিত্রাবলীর মধ্যে কখন কখন হাস্যোদ্দীপক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এরূপ চিত্রের সংখ্যা খুবই অল্প, তাহার প্রধান কারণ আমাদের শিল্প ঐহিক কাজে বড় একটা ব্যবহৃত হইত না। অজন্তা গুহায় পানাসক্ত লোকের এবং অন্যান্য কতকগুলি চিত্র আছে, যেগুলিকে ব্যঙ্গচিত্র বলা যাইতে পারে। মোগল ও রাজপুত চিত্রাবলীর মধ্যেও অনেক রঙ্গরসপূর্ণ ছবি দেখিতে পাওয়া যায়!

মদের পাত্র দেখিয়া মাতাল পারসিকের নৃত্য।
[অজন্তা গুহার চিত্র হইতে।]

বিদ্রূপ করিবার ইচ্ছা আমাদের নিতান্তই স্বাভাবিক। মনটা যখন প্রফুল্ল থাকে তখন স্বভাবতঃই আমাদের কৌতুক করিবার ইচ্ছা হয়, অন্তরে লুকানো হাস্যরসের উৎস আপনি ফুটিয়া উঠিতে চায়। কৌতুকটা আমাদের যেমন স্বাভাবিক, শিল্পে সেই ভাবের প্রকাশও তেমনি স্বাভাবিক। শিল্প ভাব প্রকাশের একটা মার্গ। যে ভাবটা স্বভাবতঃই আমাদের মনে আসে, শিল্পে সেই ভাবের প্রকাশও তেমনি স্বাভাবিক। শিল্পীর প্রাণ যদি রসালাপে ব্যাকুল হয়, তাহার সৃজিত শিল্পও কৌতুকপূর্ণ হইয়া উঠে।

সাধারণতঃ বিদ্রূপ বলিতে আমরা কেবল হাস্যকৌতুকই বুঝি। কিন্তু উহাই ত বিদ্রূপের সকল সময়ে

সরাইয়ের দৃশ্য।
[মোগল চিত্র হইতে]

মোল্লা দো-পেয়াজা।

মুখ্য উ... নয়। আমরা দুই রকম হাসি হাসিয়া থাকি। সাদাসিদে ঠাট্টা তামাসা করিতে একরকম হাসি। সে হাসিতে কেবল রঙ্গপ্রিয়তাই থাকে। সে হাসি ফাঁকা—সোলার মত হাল্কা, কাহারও বুকে বাজে না, অন্তরে তাহার কিছু লুকানো থাকে না। আমাদের অন্য রকম হাসিটি কিন্তু একেবারেই অন্য রকমের। সেও হাসি বটে, কিন্তু সে হাসির আড়ালে ঘৃণা, ভর্ৎসনা, আক্ষেপ ও শিক্ষা থাকে, সে হাসি সোলার মত রংকরা লোহার গোলকের মত। দেখিতে বড় হাল্কা, কিন্তু যাহার উপর পড়ে তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথা দিয়া বাজে!

চিত্রে এই দুই প্রকার বিদ্রূপই প্রকাশ পাইতে পারে, এই দুইপ্রকার হাসির রেখাই তুলির টানে আঁকা যায়। কল্পনায় যাহা অসম্ভব, যাহা মনে করিলেই হাসি পায় ছবিতে তাহা আঁকিয়া ফুটাইয়া তুলিলে ছবিটি ...শ উঠে। ভাষায় যেমন অসঙ্গত অত্যুক্তি কৌতুকরসাত্মক, চিত্রে তেমনি অতিরঞ্জন বা অসামঞ্জস্য হাস্যোদ্দীপক হইয়া পড়ে।

কয়েকটা পুরাতন ছবি লইয়া দেখা যাক আমাদের দেশের চিত্রকরেরা কেমন করিয়া তাহাদের চিত্রে ব্যঙ্গ-ছটা ফুটাইয়া দিত।

প্রথম চিত্রটি অজন্তা গুহা হইতে সংগৃহীত। একজন পারসিক মদের নেশায় পেয়ালা দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া নৃত্য করিতেছে। নেশার ঝোঁকে কিরূপ মত্ততা আসে চিত্রকর কয়েকটা আঁচড়ে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তাহা দেখাইয়া দিয়াছে।

দ্বিতীয়টি একটি মোগল চিত্র। একটি সরাইএর দৃশ্য; সরাইএ কতরকম লোক আসে। ছবিতে বৃদ্ধ, যুবা, শিশু সবই আছে। কাঙালী কুকুরেরও অভাব নাই। সরাই সদাই গুলজার। কতলোক আসে যায়, কিন্তু কেহ কাহারও প্রতি চাহিয়াও দেখে না! সবাই নিজের নিজের ধান্দা লইয়া ব্যস্ত, অন্য লোকে কে কি করিতেছে কেহ ফিরিয়াও দেখে না। চিত্রকর যেন এই ভাবটি ছবিতে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ছবির মাঝখানে বসিয়া দুজন সঙ্গীত চর্চ্চায় ব্যস্ত; হয়ত কত খেয়াল, কত আলাপ চলিতেছে, কিন্তু শোনে কে? কেহ বা হুঁকা লইয়া উন্মত্ত ও কেহ বা পাগড়ী বাঁধিতে ব্যস্ত; কেহ আটা মাখিতেছে, কেহ বা তন্ময় হইয়া ভাঙ ছাঁকিতেছে! গান শোনে কে?

ছবিটিতে ব্যঙ্গরসেরও অভাব নাই। অধিকাংশ লোকেরই আকার-প্রকার, বসিবার চলিবার ঢং এমন যে দেখিলেই হাসি পায়। ছবির উপর দিকে এক পাশে একটা গাছের তলায় বসিয়া দু'জন লোক গল্প করিতেছে। কি গূঢ় তত্ত্বের আলোচনা হইতেছে তাহারাই জানে, কিন্তু উভয়েই বাহ্যজ্ঞান শূন্য! গাছের উপর হইতে একটা বাঁদর যে পাগড়ীপরা লোকটার মাথা থেকে পাগড়ীটা খুলিয়া লইতেছে তাহাও টের পাইতেছে না!

মানুষের প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়াও মোগল চিত্রকরেরা কখন কখন বিদ্রূপ করিত বাদশাহ আকবরের দরবারে মোল্লা

দো-পেয়াজা একজন প্রসিদ্ধ ভাঁড় ছিল। মোল্লাজীর 'দো-প্যেয়াজা' মাংস বড় প্রিয় ছিল বলিয়া তাহার নাম হইয়া গিয়াছিল "মোল্লা দো-পেয়াজা"। মোল্লাজীকে ঠাট্টা করিত না রাজদরবারে এমন লোকই ছিল না; কিন্তু মোল্লাজীর কথার ধার এমনই তীক্ষ্ণ যে সে একাই সকলকে বাক্যযুদ্ধে পরাস্ত করিত। মোল্লা-জীর বিস্তৃত বৃত্তান্ত পূর্ব্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। মোল্লা দো-পেয়াজার অনেকগুলি ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। সব ছবিগুলিই এমন যে দেখিলেই হাসি পায়। তৃতীয় ও চতুর্থ চিত্রে মোল্লার প্রতিমূর্ত্তি দেখিলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাহাকে উপহাস করিবার জন্যই তাহার চেহারা আঁকা হইয়াছিল।

কাঙড়ার ছবিগুলির মধ্যেও সময়ে সময়ে গার্হস্থ্য নক্‌সা ও নাচগানের ছবিতে ঠাট্টা তামাসা দেখা যায়।

লাহোরের 'আজাব'-ঘরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনটি (৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম) ব্যঙ্গচিত্র আছে। আমার বিশ্বাস এ ছবিগুলি কাঙড়ার। সেগুলি কাঙড়ায়ই পাওয়া যায়, এবং একটির উপর গুরমুখী ভাষায় কয়েকটি নাম লেখা আছে। ছবিগুলি আঁকিবার ধরণও অনেকটা কাঙড়ার চিত্রকরদের মত।

মোল্লা দো-পেয়াজা।

পঞ্চম চিত্রে কয়েকটি ফকির ও একটি রমণীর ছবি আঁকা আছে। মাঝখানে যিনি বসিয়া আছেন তিনি বোধ হয় দলের সর্দ্দার। ফকিরি বেশ বটে কিন্তু আমীরি খেয়ালটা এখনও সম্পূর্ণরূপেই বর্ত্তমান। হাঁটুর নীচে 'এহতবা' বাঁধা—যাহাতে বেশ আরামে বসা যায়। মাথায় ময়ূরপুচ্ছ; ভাঙের পাত্র লইবার জন্য ব্যাকুল! যাহার হাতে পেয়ালা রহিয়াছে তাহার পাশে বসিয়া একজন ভক্ত মনের আনন্দে হুঁকা টানিতেছে! নীচে বসিয়া আর একজন হাই তুলিতেছে; তাহার নেশার ঘোরটা যেন টুটিয়া যাইতেছে! বামদিকে একজন স্ত্রীলোক; তাহার মাথায় তিলকের ঘটা খুব, কিন্তু কোলে এখনও একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু! সে এখনও সংসারের মানুষ, তবুও যেন সে দেখাইতে চায় সে সব ত্যাগ করিয়া চুকিয়াছে! তাহার পাশেই সন্ন্যাসীর আর একজন চেলা। সে কৌপীনধারী; তাহার ত্যাগ করিবার বাকি কিছু নাই। তাহার একহাতে মালা; মন কিন্তু সেদিকে নাই। মন পড়িয়া আছে অপর-হাতে-বসা পোষা বুলবুলটির উপর!

ষষ্ঠ চিত্রটি আরও মজার। ছবির মাঝখানে এক বাবাজীর অধিষ্ঠান। তাঁহার বাম প্রাশে [illegible] বসিয়া

ভণ্ড ফকিরির ব্যঙ্গ।
[কাঙড়ার চিত্র।]

আমাদের সন্ন্যাসীর হাত পা বড় সরু সরু, বড় ক্ষীণ— তাহা উপবাস করিয়া নয়, বিনা পরিশ্রমে খুব খাইতে পান বলিয়া। উনি যে আদপেই উপবাস করেন না, ওঁর প্রশস্ত ভুঁড়ি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিতেছে। বাবাজীর আলস্য যেমন প্রিয়, ধর্ম্মচর্চ্চা ততটা নয়। তাঁহার নিজের হাত বহন করবার জন্যও একজন চেলীর প্রয়োজন! সন্ন্যাসীটি বড় ত্যাগী; তাহার বুঝি আর কিছুতেই আসক্তি নাই। কিন্তু কি জানি কেন একজন নর্ত্তকী আসিয়া সন্ন্যাসীর সামনে তাম ধরিয়াছে। নর্ত্তকীর চেহারা যেমন, পোষাক পরিচ্ছদও তেমনি। ছবিতে কণ্ঠস্বরের ত রূপ দেওয়া যায় না, কিন্তু নর্ত্তকীর সঙ্গীতও যে তাহার পরিচ্ছদের মতই জীর্ণ ও মলিন সেটা বুঝিতে যেন বেশী চেষ্টা করিবার প্রয়োজন হয় না!

সপ্তম চিত্রে তিনটি চেহারার উপর বৈষ্ণব ভক্ত কবি প্রেমদাস, গরীবদাস ও তুলসীদাসের নাম লেখা আছে। প্রেমদাসের মাথায় ঘোমটা; গরীবদাসের আকৃতি হাড়-গোড়-ভাঙ্গা "দ"-এর মত; আর তুলসীদাসকে একটি অসার অলাবুর মত আঁকা হইয়াছে। চিত্রটিতে প্রেমদাস, গরীবদাস ও তুলসীদাসকেই বিদ্রূপ করা হইয়াছে, এমন মনে হয় না। তাঁহাদের নাম লইয়া, তাঁহাদের প্রেমোচ্ছ্বাস ঠিক হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারিয়া, যাহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে কালি দেয়, তাহাদেরই যেন ঠাট্টা করা হইয়াছে। ছবির অন্যদিকে দু'জন রাজপুরুষ একজন ভৃত্য সঙ্গে করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহারা বোধ হয় কবিদের ভক্ত; কিন্তু তাহাদের ভক্তি কেবল কপটতাপূর্ণ! মাথায় তিলক, হাতে মালা, গলায় মালা মাথায় মালা, কিন্তু আবার অন্য হাতে বল্লম, কটিতে অসি! ইহারা যেন ধর্ম্মের সরল সত্যের সামনে আসিয়াও জীবহিংসা, কঠোরতা ছাড়িতে পারিতেছে না! তবুও কিন্তু মালা হাতে রাখা চাই!

এ ছবিগুলি সবই বিদ্রূপ করিবার জন্য আঁকা। কিন্তু এ বিদ্রূপে হাসিবার ত কিছুই নাই। এ ঠাট্টার ভিতর অনেক শিক্ষা লুকানো আছে। যা ঘৃণ্য, যা দুষণীয়, যা কেবল কপটতা, এ ছবিগুলি যেন আমাদের তাহা ত্যাগ করিতে শিখাইতে চায়। অসত্য অপেক্ষা কপটতা আরও জঘন্য। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যে কপটতা প্রচার হয় সেই কপটতা আমাদের চোখের সামনে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই যেন এ কপট সন্ন্যাসীদের ছবিগুলি আঁকা
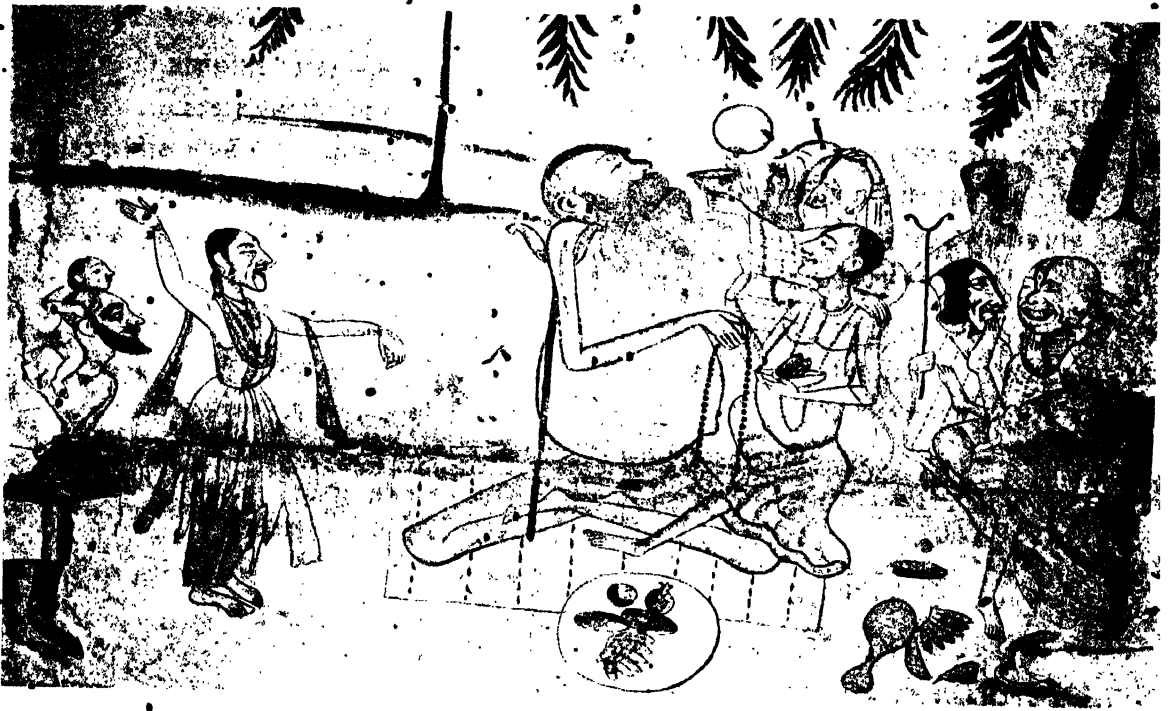
ভণ্ড সন্ন্যাসীর ব্যঙ্গচিত্র।
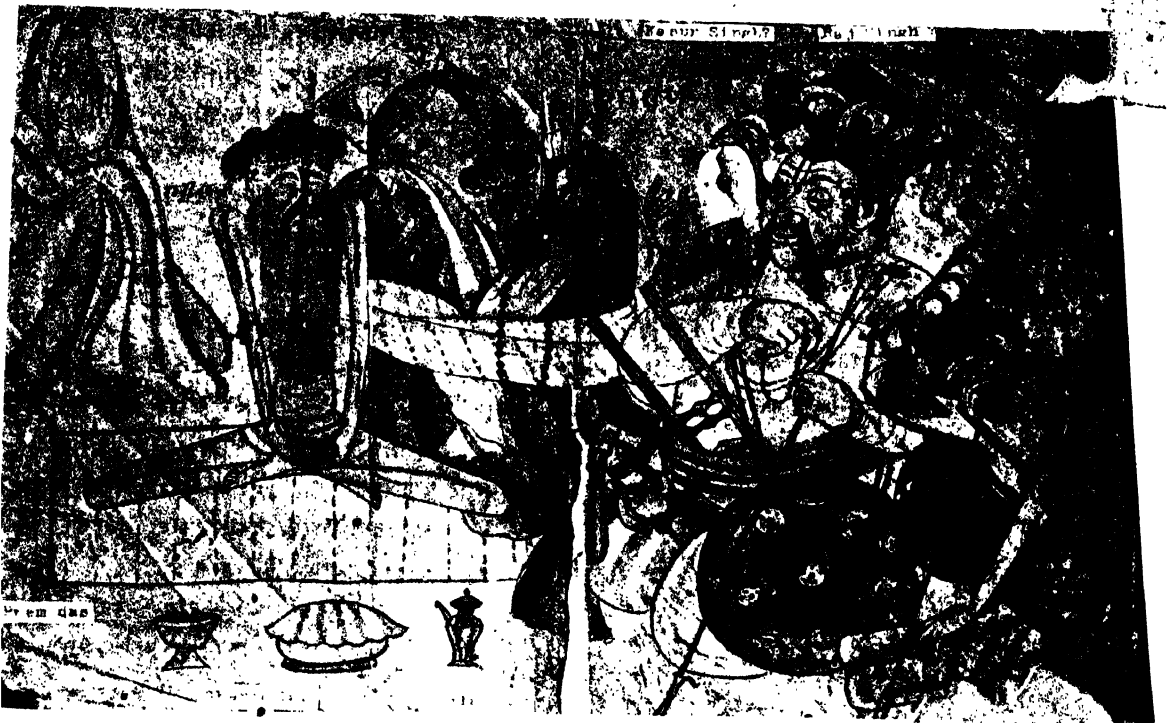
ভণ্ড বৈষ্ণবের ব্যঙ্গচিত্র।

হইয়াছিল। এ ছবিগুলি যেন আমাদের বলিয়া দিতেছে ।। যেন অসত্যের, কপটতার ছদ্মবেশ না পরি, যেন গুর কাছে নিজেকে না ঠকাই,

"মালা ফেরত জনম গয়া,
পর গয়া না মনকা ফের।
হাথকা মণকা ছোড়কে,
মনকা মণকা ফের ॥"

হাতের মালা ঠক্‌ঠকিয়ে জন্মটা যে কেটে গেল, তবুও ত মনের ফের গেল না! ওরে এই বেলা হাতের মালা রেখে দিয়ে মনের মণিমালা গুণে নে!

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

প্রতীক্ষা

আমাদের ম...র নয়নপাতে জেগেছিল প্রাণ,
দলে দলে বিকশিয়া শতদল সম;
ঊষার অরুণবিভা, পাখীর সুতান,
নীরবে ফুটায়েছিল শোভা অনুপম।

আজি তো প্রভাত নাই, নামিছে যামিনী
মরণকুহকদণ্ড বুলাইয়া শিরে,—
অবসন্ন চিত্তদল পর্ণবাস টানি'
মুদিয়া ঢলিয়া পড়ে ধীরে অতি ধীরে।

কোন্ সে সুদূর পুরে অভিসার তব?
ওগো মর্ম্মকমলের তপন আমার!
বিকশি' তুলিছ সেথা চিত্ত নব নব,
জাগায়ে তুলিছ কত লাবণ্য আবার!

মুদিত কমলহিয়া হেথা নিশিদিন
তপনে ডাকিয়া মরে স্তব্ধ বাক্‌হীন।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

চিঠি

ছয়দিন,—ভোরে আজিকার!
চারিদিনে চিঠি আসে তার।
বাড়িয়া চলিল বেলা, ঊষার ভাঙ্গিল খেলা,
থেমে গেল কাকলি পাখীর;
পাগল,—পথের দিকে, ছুটে চায় অনিমিখে
চাহনি এ আকুল আঁখির।
আসে কি না আসিছে পিয়ন,
কাছে তারি মরণ জীবন।
যত সবে জাগে, বাড়ে বেলা
হয়ে যাই ততই একেলা।
জাগে যত হাসি গান, তত আমি ম্রিয়মাণ,—
হয়ে পড়ি সংশয়বিহীন;—
শুধু পিয়নের পথে চেয়ে থাকি, কোন মতে
বহিয়া না যেতে চায় দিন।
ও বাড়ীতে,—চিঠি আছে বলে'
ডাকিয়া পিয়ন যায় চলে'।
ও বাড়ীর দরজার কাছে
চিঠিখানি পড়িয়াই আছে।
কেহ না তুলিয়া লয়, ধূলি-তলে পড়ে রয়;
ভাবি চেয়ে চিঠিখানি পানে—
যেন কার শত কথা পরাণের আকুলতা
বুকে ওর কাঁদে অভিমানে।
কেবলি সে খোলা হ'তে চায়;—
কেউ তো না তুলে দেখে হায়!
মাঝে-পড়া পথখানি দলি'
কত কেহ আসে যায় চলি'।
আমি আর চিঠিখানি কেহ কারে নাহি জানি,
দু'বাড়ীর দু'টি দরজায়,
দুজনার দুটি হিয়া এ উহার আশা নিয়া
গুমরিয়া কাঁদে বেদনায়।
ও যে চায় একটি পরাণ;
আমি চাই ওরি মত—দান।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

নূতন গান ও স্বরলিপি।

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

II র্সা -া না। ধা না। পা া I ধা পা -া। মা -পা। গা -মা
ও দে র ক ০ থা ০ য় ধাঁ দা ০ লা ০ গে

I মা পা -া। ধা -া। পা -া। পা -া -মা। পা -ধা। না -া I
তো মা র ক ০ থা ০ আ মি ০ বু ০ ঝি ০

I র্সা -া না। ধা -না। পা -া I মা পা -া। দা -া। পা -া I
ও দে র ক ০ থা য় তো মা র আ ০ কা শ

I মা পা দা। মা -পা। গা মা I মা পা -া। দা -া। পা
তো মা র বা ০ তা স এ ই ত স ০ ব

I পা -া -মা। পা -ধা। না -া I র্সা -া না। ধা -না। পা া
সো জা ০ বু ০ ঝি ০ ও দে র ক ০ থা য়

II মা পা -া। দা -া। পা -া I মা ধা পা। মা -পা। গা
হৃ দ য় কু ০ সু ম ০ আ প নি ফো ০ টে

I পা পঃধঃ না। না -া। নঃধঃ পা I পা ধা -র্সা। র্সা -া। র্সা
জী ব ন আ ০ মা র ভ রে ০ ও ০ ঠে

I পা ধা র্সা। র্সা -া। র্রা র্সা I -র্সা -া -া। পা -া। পা ধা I
দু য়া র খু ০ লে ০ ০ ০ ০ আ ০ মা র

I র্সা -া -া। র্সা -া। র্সা -া I র্রা র্সা -া। রর্সা -া। না -া I
দু য়া র খু ০ লে ০ চে য়ে ০ দে ০ খি ০

I ধঃর্সঃ র্সা না। ধনা া। ধা পা I -পা -ধা -র্না। র্সা -া। র্রা র্সা I
হা তে র কা ০ ছে ০ ০ ০ ০ আ ০ মা র

I র্না র্সা -না। ধনা -া। ধা -পা I ধা পা মা। পা ধা। না -া I
হা তে র কা ০ ছে ০ স ক ল পুঁ ০ জি ০

I র্সা -া না। ধা -না। পা -া II
ও দে র ক থা য়

সা -া -া। রা -া। রা -া I গা রা গা। মা -া। গা -া I
স কা ল সাঁ ॰ ঝে ॰ সু রু যে বা ॰ জে ॰

I সগা -া -া। গা -া। গা মা I মা পা -া। ধা -া। পা -া I
ভু ব ন জো ॰ ড়া ॰ তো মা র না ॰ টে ॰

I পা ধা র্সা। র্সা -া। র্সা -া I র্রা র্সা -া। র্রর্সা -া। না -া I
আ লো র জো ॰ য়া র বে যে ॰ তো ॰ মা র

I ধা র্সা -না। ধনা -া। পা -া I -পা -ধা -র্সা। র্সা -া। র্রা র্সা I
ত রী ॰ আ ॰ সে ॰ ॰ ॰ ॰ তো ॰ মা র

র্সা -না। ধনা -া। ধা -পা I ধা পা মা। পা -ধা। না া II
ত রী ॰ আ ॰ সে ॰ আ মা র ঘা ॰ টে ॰

-া না। ধনা -ধা। পা -া I মা ধা পা। মা -পা। গা -মা I
শু ন্‌ ব কি ॰ আ র বু ঝ্‌ ব কি ॰ বা ॰

পা -া। পা -া। পা -মা I পা -া না। ধনা -ধা। পা -ধা I
এ ই ত দে ॰ খি ॰ রা ॰ ত্রি দি ॰ বা

I ধা র্সা -া। র্সা -া। র্রর্সা -া I -র্সা -া -া। পা -া। পা ধা I
ঘ রে ই তো ॰ মা র ॰ ॰ ॰ আ ॰ মা র

I ধা র্সা -া। র্সা -া। র্রা র্সা I র্রা র্সা -া। র্রর্সা -া। না -া I
ঘ রে ই তো ॰ মা র আ না ॰ গো ॰ না ॰

I ধা র্সা -না। ধনা -া। পা -া I -পা -ধা -র্সা। সা -া। র্রর্সা -া I
প থে ॰ কি ॰ আ র ॰ ॰ ॰ প ॰ থে ॰

I ধা র্সা -না। ধনা -ধা। পা -া I ধা পা মা। পা -ধা। মা -া I
প থে ॰ কি ॰ আ র তো মা য় ॰ খুঁ ॰ জি ॰

I র্সা -া না। ধনা -ধা। পা -া II II
ও দে র ক ॰ থা য়

([illegible]নী-[illegible]ন্সা, ভাদ্র) শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সা -দা -া -া। দা -া -া ণা। র্গা র্সা -া -া। র্সর্ঋা -ণা র্সঃর্রঃ র্জ্ঞঃর্মঃ I
ফু • টে ল পূ • জা র ফু • লে র ম • ত •

I র্ঋা -া র্জ্ঞ র্ঋা। জর্ঋা -া সা -া। র্জ্ঞা -র্ঋা র্সা -া। ণর্স -ণা দা -পা I
জী • ব ন ন • দী • কূ • ল ছা পি • য়ে •

I ণা -া দা -া। পা -া জ্ঞা -া। মা -া মজ্ঞা -া। ঋা -জ্ঞা সা -া II II
ছ ড়ি য়ে • গে • ল • অ • সী ম দে • শে •

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা, ভাদ্র)

স্বরলিপি।

স্বর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

া মা II { পা পঃধঃ -ণা। পধা -া পা I মা -রঃমঃ -জ্ঞঃরঃ। সা -ন্‌া -সা।
রে ভি খা • রী • সা জা • • য়ে • •

পা মা জ্ঞ। র সন্‌া স্‌া। গা -া ঋা। -মা -া -া } I মা পা -া।
ক র ঙ্গ তু মি ক রি লে • • • হা সি তে

ঋা -া -া। পা -া পঃধঃ। -ধা গা মা I { … … } II
ধা কা শ ভ রি লে • এ রে

II মা পা -া। পা -া -ধ I মপা মজ্ঞা -া। -জ্ঞা -া -মা I পা া -না।
প থে • প থে • ফে রে • • • • দ্বা রে •

I না ধঃনঃ -র্সা I র্সা -া -া। -া -া -া I না র্সা -র্জ্ঞা। র্রা র্জ্ঞা -া I
দ্বা রে • যা • • • • য় ঝু লি • ভ রে •

I র্রা মর্জ্ঞা -া। -র্রা -র্সা -া I না র্সা -া। র্রা র্সা -া I রর্সা -ণা -া।
রা খে • • • • যা হা • কি ছু • পা • •

I -ণা -া -া I র্সা ণা ধা। পা -া -া I পা ণা ধা। ণা ধর্সা ণঃধঃ I
• • য় ক ত বা র্ তু মি প থে এ সে হা য়

I পা -া ধা। পা মা পা I গা মা পা। -পা গা মা I { … … } II
• আ র ধ ন হ রি লে • এ রে

| সা · সংজ্ঞঃ জ্ঞা | জ্ঞা -া -া | জ্ঞা রংজ্ঞঃ মংপঃ | পা -া ধপ
ভে বে ছি ল চি র কা ঙা ল সে এ

| মা জ্ঞঃরঃ · সা | -সা -া -া | জ্ঞা রংজ্ঞঃ মংপঃ | পা -া ধংপা
ভু ব নে ॰ ॰ ॰ কা ঙা ল ম র ণে

| মা জ্ঞংরঃ সা | -সা -া -া |
জী ব নে ॰ ॰ ॰

|| মা পা -া | পা -া -দপা | মংপঃ দপা -মংপঃ | জ্ঞা -মংজ্ঞঃ -মা | পা -া -না |
ও গো ॰ ম হা ॰ রা ॰ ॰ ॰ জা ॰ ॰ ব ড় ॰

| না -া র্সা | র্সা -া -না | র্সা -া -া | না র্সা -র্জ্ঞা | র্রা র্জ্ঞা
ভ রে ॰ ভ ॰ ॰ য়ে ॰ ॰ দি ন ॰ শে

| র্জ্ঞা -া -র্রা | র্জ্ঞা -র্রা -র্সা | না র্সা -র্সংর্রঃ | র্সা র্সা -া | র্সা -ণা
এ ॰ ॰ ল ॰ ॰ তো মা ॰ রি আ ॰ য়

| ণা -া -া | র্সা ণা ধা | পা -া -া | পা ণা ধা | ণা ধা
য়ে ॰ ॰ আ ধে ক আ স নে ডে কে ল যে তা

| পা ধ পা | পা মা পা | গা মা · পা | -পা গা মা | { ... ...
নি জ মা লা দি য়ে ব রি লে ॰ এ রে

(প্রবাসীর জন্য লিখিত) শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুস্তক-পরিচয়

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের ১৩১২-১৩১৯ বর্ষাষ্টকের বিবরণ—

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের এই কার্য্যবিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে এই শাখা পরিষৎ কিরূপ উৎসাহে কত উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়াছেন। এই পরিষৎ কর্ত্তৃক সংগৃহীত কতকগুলি পুরাকীর্ত্তির বিবরণ ও চিত্র এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল। আমাদের অনুরোধে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের পরম উৎসাহী কর্ম্মকুশল সম্পাদক মহাশয় বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় সংগৃহীত ঐতিহাসিক নিদর্শনাদির গৃহীত চিত্রের পরিচয়।

১। সিংহবাহিনী ; কষ্টিপ্রস্তরে নির্ম্মিত এই কালীমূর্ত্তি রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কুড়িগ্রাম মহকুমার কুলাঘাট নামক স্থানে পতিপরিবর্ত্তিতা ত্রিস্রোতা নদীর গুহগর্ভ হইতে জনৈক কৃষকের লাঙ্গলাহত হইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অভিনব কালীমূর্ত্তির আরাধনা শক্তিক্ষেত্র কামরূপে কোন্‌কালে প্রচলিত ছিল তাহা আজও নির্ণীত হয় নাই। বিশ্বসার তন্ত্রে চতুর্থ পটলে একাদশাক্ষরী কালীমূর্ত্তির যে ধ্যান আছে তাহার সহিত এই মূর্ত্তির কিয়ৎপরিমাণে সাদৃশ্য আছে।

২। সের সার কামান,—রঙ্গপুর জেলার নীলফামারী মহকুমার ডিমলা নামক স্থানে পরগণার ভূম্যধিকারীর ভবনে এই কামানটি রক্ষিত ছিল। কামানটির দৈর্ঘ্য ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি, মুখের ব্যাস ১৫০ ইঞ্চি, বেড় ১০ ইঞ্চি ; পিত্তলনির্ম্মিত, ব্যাঘ্রমুখযুক্ত ও পশ্চাতে একটি ৩ ইঞ্চি দীর্ঘ কীলক আছে। এরূপ কীলকযুক্ত কামান স্থলযুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। কামানের অগ্রভাগে পারসীক অক্ষরে যে লিপি খোদিত রহিয়াছে তাহার বঙ্গানুবাদ—"হিন্দুস্থানকে জয় করার জন্য ৮০৮ হিজরী সাবান মাসের ১লা তারিখে এই কামান প্রস্তুত করা হইল ও সেরসা বাদসাহের আদেশ অনুসারে ইহা রাজ্যশাসন জন্য সৈন্যাধ্যক্ষ সৈয়দ আহাম্মদ গাজীকে প্রদত্ত হইল। সেরসাহ আলী আকাব্বের হায়দর জগতের শাসনকর্ত্তা। উহার শেষভাগে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে নিম্নলিখিত সংস্কৃত লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে—"শ্রীশ্রীস্বর্গদেব জয়ধ্বজ সিংহ মহারাজের যবনং জিত্বা [illegible] অন্তরং প্রাপ্তং

১১×।" এই কামান সম্বন্ধে মল্লিখিত বিস্তৃত পুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার সপ্তমভাগ দ্বিতীয় প্রকাশিত হইয়াছে।

পাণ্ডুনগরের মুদ্রা,—এই দুইটি মুদ্রা পাণ্ডুয়ার মসজিদের উত্তরপূর্ব্বাংশে ন্যূনাধিক দুই ক্রোশ মধ্যে সময় পাওয়া যায়। উহাতে রাজার নাম, রাজধানীর ,জকুলের দেবতার নাম এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাব্দার সংখ্যা দৃষ্ট হয়। এই রজত মুদ্রাদ্বয়ের লিপি াক্ষর। মুদ্রা দুইটির একটিতে দনুজমর্দ্দন দেবের এবং পরটিতে মহেন্দ্র দেবের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। দনুজমর্দ্দন েবের মুদ্রার ওজন ১১৬ গ্রেন, পরিধি ৩৮০ ইঞ্চি এবং হেন্দ্রদেবের মুদ্রার ওজন ১১০ গ্রেন এবং পরিধি ৩।।০ ইঞ্চি। দ্রাঙ্কিত শকাব্দা ২৩৯ ও ৩৩৬। এই মুদ্রা সম্বন্ধে ৺রাধেশ-ন্দ্র শেঠ মহাশয়লিখিত বিশদ বিবরণ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পত্রিকায় ৫ম ভাগ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক সংগৃহীত পারসীক, ... বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা সংগৃহীত ... মুদ্রাগুলি আহোম-রাজের, জয়ন্তীয়া-ত্রিপুরারাজের। এতদ্ব্যতীত পারসীক লিপিযুক্ত মুদ্রার (১ ও ৩ নং) পাঠ ও নাগর লিপিযুক্ত ... মুদ্রার পাঠ নির্ণীত হয় নাই। এইরূপ ... ও তাম্রমুদ্রা একশতের অধিক সংগৃহীত

ইতিহাসপ্রসিদ্ধা নাটোরের মহারাণী ভবানীর ছোতিম গ্রামস্থিত পিতৃভবনের ধ্বংসাবশেষ হইতে ... যে সূতিকাগৃহে ভূমিষ্ঠা হইয়াছিলেন সেই ...র পরবর্ত্তী কালে তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অধুনাভগ্ন ...র চিত্র।

...ধুরে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্ত্তিপঞ্চক,—এই জেলার ...হকুমার গোবিন্দগঞ্জ থানার অন্তর্গত আরঙ্গাবাদের ...নভূমিতে মঙ্গলা সাঁওতাল নামক কৃষকের হলমুখে ১৯১০ ...লের ৬ই নভেম্বর তারিখে ইষ্টকগ্রথিত স্থানে স্থাপিত বৃহৎ মৃৎ-...লসের মধ্য হইতে এই ধাতব মূর্ত্তিপঞ্চক আবিষ্কৃত হয়। রঙ্গপুর-...াহিত্য-পরিষদের আবেদনে ভূতপূর্ব্ব পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট ...ই মূর্ত্তিপঞ্চকের মধ্যে একটিমাত্র মূর্ত্তি রঙ্গপুরে রক্ষার ব্যবস্থা ...রিয়াছেন। অবশিষ্ট মূর্ত্তিচতুষ্টয় ভারতীয় চিত্রশালাগৃহে রক্ষিত ...ইয়াছে। রঙ্গপুর তাজহাটের ধর্ম্মশীল রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল ...ায় বাহাদুর স্বব্যয়ে একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে ...ই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ...ঞ্চমভাগ ৩য় ৪র্থ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সিংহবাহিনী কালীমূর্ত্তি।

উত্তরবঙ্গ ও আসামের পুরাকীর্ত্তির গৃহীত চিত্র।

৭। তুরকান সহিদের দরগা,—বগুড়া সেরপুর টাউনের নিকটে তুরকান সাহেব বা তুরকান সহিদের দুইটি দরগার ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। টাউনের মধ্যে অবস্থিত দরগার নাম শিরমোকাম এবং বাহিরের দরগার নাম ধড়মোকাম। তুরকান সহিদ একজন গাজী ছিলেন এবং কথিত আছে তিনি হিন্দুরাজা বল্লালসেন কর্ত্তৃক নিহত হন। যেস্থানে তাঁহার মস্তক পতিত হইয়াছিল সেই স্থানের উপর নির্ম্মিত ম... নাম ... মোকাম ও দেহোপরি নির্ম্মিত মস-জিদটি ধড় মোকাম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শির মোকামের চিত্র প্রদত্ত হইল। ইহাতে একখানি প্রস্তরফলকে নাগরাক্ষরে নিম্নলিখিত লিপি উৎকীর্ণ আছে—

ভাবয়ন্তি ঠক্কুর শ্রীবামনস্বামী
দানপতি ঠক্কুর শ্রীঈশ্বরস্বামী।

এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে কোনও হিন্দুমন্দির পরবর্ত্তীকালে মসজিদে পরিণত হইয়াছে। মসজিদগুলি সাধারণতঃ পশ্চিমদ্বারী হইয়া থাকে কিন্তু হিন্দু মন্দিরের ন্যায় ইহা দক্ষিণদ্বারী ও আকারও তদনুরূপ। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চমভাগ অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু-লিখিত সেরপুরের ইতিহাসে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৮। পাবনার জোড় বাঙ্গালা,—পাবনা সহরের উপকণ্ঠবর্ত্তী এই হিন্দুকীর্ত্তি এক সময়ে কোনও বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ করিত। বিগ্রহশূন্য হওয়ার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত জোড় বাঙ্গালা নামে জনসাধারণের নিকট পরিচিত থাকিয়া এ দেশের মসজিদ ও মন্দির নির্ম্মাণে স্থপতিগণের কি আদর্শ ছিল তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই জোড় বাঙ্গালা সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, পাবনাবাসী ব্রজমোহন রায় ক্রোরী (ক্রোরপতি) নামক জনৈক ব্রাহ্মণসন্তান বাঙ্গালার

রাণী ভবানীর পিতৃভবনস্থ মন্দির, বগুড়া।

নবাব সিরাজদ্দৌলার সময়ে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীশ্রী-৺রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মুরশিদাবাদে নবাব সরকারে সামান্য বেতনে চাকরী করিতেন এবং ক্রমে নবাবের বিশ্বাসভাজন হইয়া উচ্চপদ লাভ, বহু অর্থ উপার্জ্জন ও ক্রোরী (ক্রোরপতি) আখ্যা লাভ করেন। এই জোড় বাঙ্গালার আয়তন চতুর্দ্দিকে ১৮ হাত, সমচতুষ্কোণ পরস্পরসংলগ্ন বিপরীতদিকে দ্বার-বিশিষ্ট দুইটি দোতালা বাঙ্গালা ঘরের আকারে উহা নির্ম্মিত। বাঙ্গালা দুইটির উচ্চতাও ১৮ হাত, বহিঃপ্রাচীরের বেধ ২ হাত, মধ্যপ্রাচীরের বেধ ১॥০ হাত। সম্মুখেপশ্চাতে-সংলগ্ন একটি বারান্দা আছে। এই বারান্দার ছাদ চারিটি স্তম্ভের উপর ন্যস্ত এবং দুই দুইটি স্তম্ভের মধ্যে কারুকার্য্য বিশিষ্ট মেহেরাব (arch) আছে। উহার সম্মুখবর্ত্তী প্রথমটির গাত্রে কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টক বিন্যস্ত রহিয়াছে। তন্মধ্যে রাম-রাবণের যুদ্ধ, কৃষ্ণবলরাম ইত্যাদি দেব দেবীর মূর্ত্তি খোদিত। নিম্নভাগে একপার্শ্বে ইষ্টকোপরি ঢোল দামামা সহ বাদ্যকর, পাল্কী বেহারা, নর্ত্তক নর্ত্তকী ইত্যাদি সহ শোভাযাত্রার চিত্র এবং অপর পার্শ্বে মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত বাহকস্কন্ধে সানুচর রাজমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। ব্রজমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺রাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ অধুনা পাবনার শ্রীশ্রীনৃসিংহ জীউর আখড়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ-লিখিত ইহার বিস্তৃত বিবরণ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চতুর্থভাগ ২য় সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

৯। আসাম শিবসাগর গড়গাঁওস্থিত আহোম ধ্বংসাবশেষের চিত্র।

১০। আসাম নওগাঁ জেলার ডিমাপুর নামক স্থানের বাণরাজার রাজপ্রাসাদের প্রস্তরস্তম্ভাবলীর আলোকচিত্র। এই স্থান হইতে বাণরাজদুহিতা উষা কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক অপহৃত হন। আসামে বাণরাজার, অপর প্রাসাদ শোণিতপুর বর্ত্তমান তেজপুরে অবস্থিত ছিল। দিনাজপুর জেলার বাণগড় নামক স্থানের প্রস্তর-নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদের বহু চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং বাণ-রাজার স্মৃতি বহন করিতেছে। বাণ বিষ্ণুদ্বেষী এবং শিবভক্ত ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত চড়কপূজা ও আনুষঙ্গিক বাণফোড়া ইত্যাদি আজও বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

তুলির লিখন—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ১৮০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে কান্তিক প্রেসের সুদৃশ্য ছাপা। মূল্য এক টাকা।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নূতন পসরা লইয়া এবার পূজার বাজারে বাহির হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিও কবিতার গ্রন্থই বটে; কিন্তু কবিতাগুলি গাথা জাতীয়। এক-একটি গল্পের আভাস মাত্র অবলম্বন করিয়া বিচিত্র রসমধুর ছন্দে জটিল মানবহৃদয়ের অপূর্ব্ব ভাবলীলা চমৎকার 'লিরিক' বা গীতিকবিত্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] দমদমা, বগুড়া।
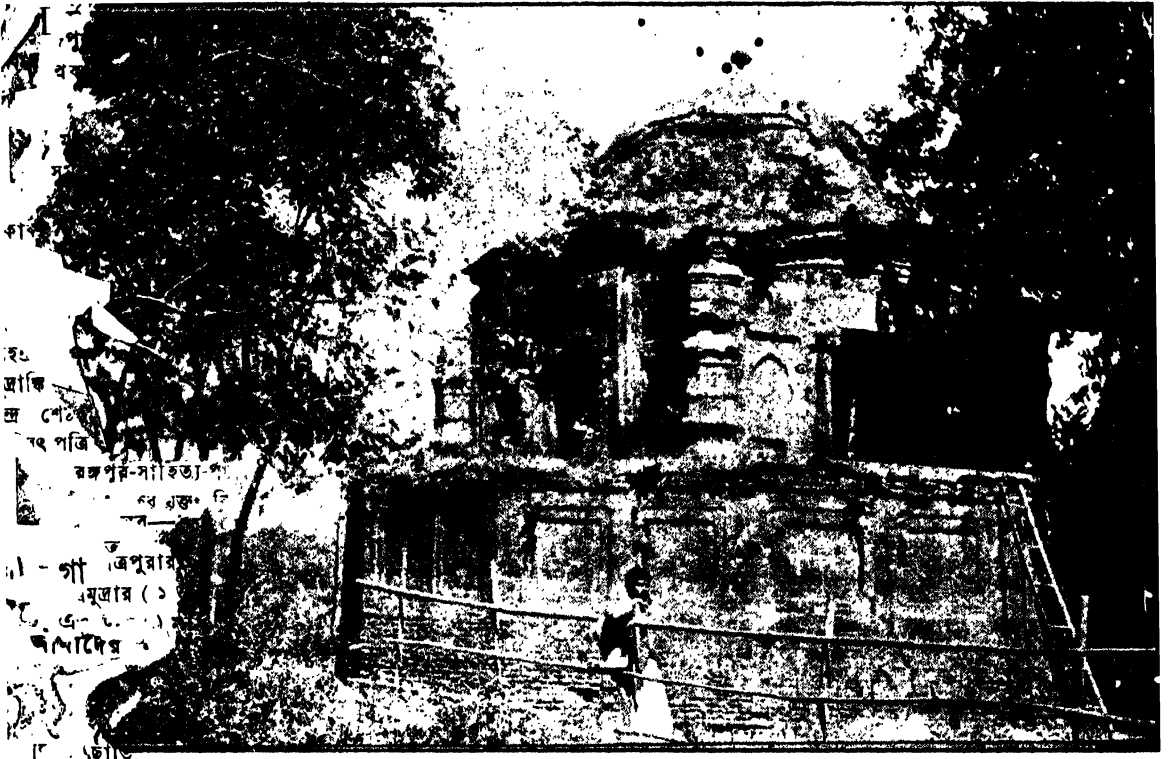
দিতেছে। ... পুরাপুরি গল্প নয় বলিয়া ইহাকে ঠিক গাথা বলা ...য় বলিয়াছি ; সম্পূর্ণ কবির নিজের সুখদুঃখের কথা নয় বলিয়া এগুলিকে কেবলমাত্র লিরিক বা গীতি কবিতাও বলা চলে না। কবি বহু অবস্থার বহু লোকের বহু বিচিত্র হৃদয়ভাবের একাত্ম-অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। এজন্য ইহাকে আমি গাথার লিরিক বা গল্পের গীতিকবিতা বলিতে চাই।

একাত্ম-অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন লোকের মর্ম্মকথা প্রকাশ করিতে গিয়া কবি একটি অতি উদার প্রশস্ত-হৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি "মথুরাপুরীর শ্রেষ্ঠ গায়িকা" গণিকা শোভিকার সহিতও যেমন সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, "সতী"র সহিতও তেমনি ; অস্পৃশ্য অনার্য্য "পরেয়া" বা "মরিয়া"র সহিতও যেমন, পরম ঋত্বিক "বাজশ্রবা' বা "শবাসীন'' সাধকের সহিতও তেমনি। কবি যাহার কথা যখন বলিয়াছেন, তখন তাহার হইয়া বলিয়াছেন ; আপনাকে একেবারে তাহার মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া তাহার ভাবে ভাবিত হইয়া বলিয়াছেন। এইজন্য বহু বিরুদ্ধ ভাবের রচনা পাশাপাশি ঠাঁই পাইয়া পরস্পরের বৈপরীত্যে বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। "সতী" সহমরণে চলিয়াছেন বিশেষ কোনো উচ্চ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নহে—প্রেমের আকর্ষণে যে তাহারও কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না ; কেবল তাঁহার যুক্তি শুনি—

"ছাঁদনা-তলায় শক্ত বাঁধন, সে বাঁধন যে খুলতে নারি,
পুরু... যে ...বে সঙ্গে যাবে তার যে নারী।"

কিন্তু "দেবদাসী''ও "শোভিকা'' প্রেমের নিষ্ঠায় পরম সতী হইলেও তাহারা সমাজের চক্ষে ঘৃণ্য জীবন বহন করে—

"কাঠ-মল্লিকা ফুলের বিতানে
কাঠ পিঁপড়েতে বেঁধেছে বাসা।"

বলিয়া কবি তাহাদের ব্যর্থ জীবনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই কবিতাগুলির মধ্যে আর একটি লক্ষ্য করিবার জিনিস ইহাদের ব্যঞ্জনা (suggestiveness)। উপরে উদ্ধৃত দুটি লাইন শোভিকার সমস্ত জীবনের করুণ ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছে। ''অনার্য্যা" যখন নিজের ছেলে হারাইয়া পরের ছেলেকে কোলে পাইয় আবার তাহাকেও হারাইল, তখন তাহার সমস্ত অন্তর মাতৃত্বের অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে তখন পরের ছেলেরও মা হইয়াছে ; সেই অনার্য্যা কুৎসীর করুণ কাহিনীর আরম্ভ হইতেই সমস্ত কবিতাটির কারুণ্য মনের মধ্যে ঘনীভূত হইয়া উঠে—

"কানাচ দিয়ে শাবক-হারা বিড়াল কেঁদে যায়!"

এমনিতর অতি মধুর আঠারটি কবিতা এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। আমাদের সব চেয়ে ভালো লাগিয়াছে ''শবাসীন' কবিতাটি। মৌনী ব্রহ্মচারী নিত্য ভিক্ষা করিতে যায়, একদিন তাহাকে ভিক্ষা দিতে যে ডাকিল—

"দুটি চোখে তার অমৃতের পুর,
স্নেহসিঞ্চিত কণ্ঠ মধুর।"

মৌনীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে "মৌন প্রেমের চিহ্ন উঠাতে তপের পরিশ্রমে" লাগিয়া কত রকম সাধনাই করিল। শেষে শব
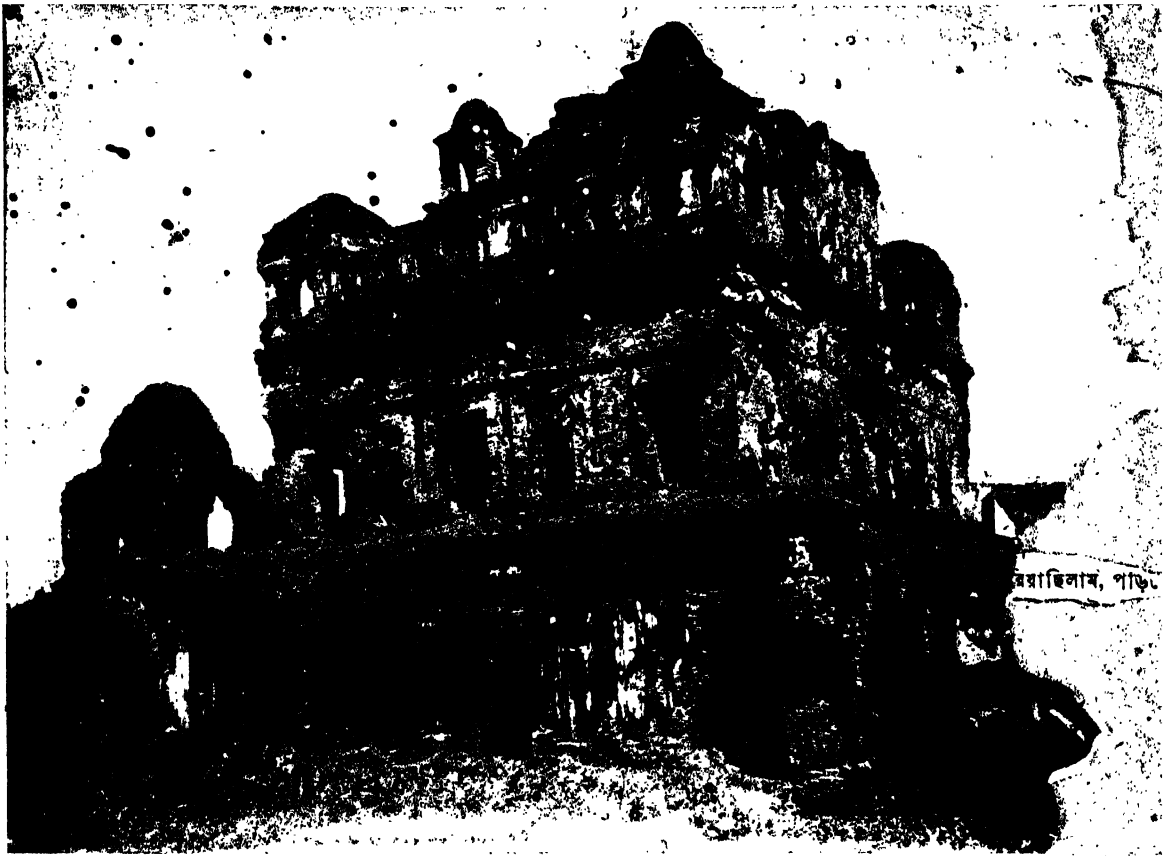
আহোম্ রাজপ্রাসাদ, আসাম।

সাধনায় মন দিল। একদিন শবসন্ধানে গিয়া নদী হইতে যখন শব তুলিল অমনি—

"সহসা বিপুল আলোকোচ্ছ্বাস! ওগো! একি! একি! একি!
চিনেছি! পেয়েছি!......
আমি অভিসারে এলাম শ্মশানে, জলে ভেসে তুমি এলে!
দুঃখ কেবল এত কাছে এসে এত দূর হয়ে গেলে!"

প্রভৃতি বাক্যে শাবাসীনের যে দারুণ খেদ তাহা মর্ম্মনিপীড়িন করিয়া অশ্রু আদায় করে। এমনি মর্ম্মস্পর্শী আর-একটি কবিতা "দুর্ভাগ্য"। সকল কবিতাই একটি করুণ রসে অভিষিক্ত।

"সূর্য্যসারথি" "রাজবন্দিনী" ভাবদ্যোতনায় অত্যুৎকৃষ্ট। কিন্তু আমাদের স্থানের ও সময়ের নিতান্ত অভাবে ইচ্ছা সত্ত্বেও এই-সব সুন্দর কবিতার পরিচয় দিতে পারিলাম না। পাঠকপাঠিকাগণ এক টাকা খরচ করিলে অপব্যয় করিয়াছেন মনে হইবে না; এই পুস্তকে গল্পভক্ত ও কবিতাভক্ত উভয়বিধ পাঠকই আনন্দসম্ভোগের প্রচুর উপাদান পুঞ্জীভূত দেখিতে পাইবেন।

পুস্তকের আদ্যে ও অন্তে দুটি কবিতায় কবি আপনার কল্পনা-লীলায় যে পরিচয় দিয়াছেন তাহার যেমন অপরূপ ছন্দ তেমনি উৎকৃষ্ট দ্যোতনা এবং তেমনি কারুমণ্ডিত ভাষার প্রকাশ। কবির কল্পনা "বিদ্যুৎপর্ণা" আত্মপরিচয় দিয়া এবং তাহার "শেষ" কোথায় বলিয়া কবির পরিচয় খুব ভালো করিয়াই দিয়াছে।

অবশেষে একটু খুঁত ধরিব, কারণ খুঁত ধরাই সমালোচকের ব্যবসা। কবির ছন্দের ঝঙ্কার, ভাষার বাহার, বিশেষ অবস্থার বিশেষ পরিভাষা-প্রয়োগ-পটুতা কানকে এমন মুগ্ধ করিয়া ফেলে যে সহসা ভাব মনের মধ্যে তলাইবার অবসর পায় না। ইহা অবশ্য গুণ হইয়াও দোষ হইল বলিতে হইবে। দ্বিতীয় ত্রুটি—দুইটি কবিতা এত দীর্ঘ হইয়াছে যে তাহার ভাব দানা বাঁধিতে পারে নাই, পানসে হইয়া মনের উপর দিয়া বহিয়া যায়; যেমন "সূর্য্যসারথি" ও "পরিব্রাজক"। তথাপি বলিব এই দুটি কবিতাই চমৎকার। তৃতীয় ত্রুটি—এক একটি পংক্তিকে প্রশ্ন ও উত্তরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া মনকে খোঁচা দিয়া জাগাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাওয়াতে পাঠকের মন হয়ত সচেতন হয় কিন্তু হৃদয় আহত হয়, রসের পাত্র ছিদ্র হইয়া যায়। চতুর্থ ত্রুটি, দুই চারিটি মিল একটু গোঁজামিল হইয়াছে, দুই চারি জায়গায় ভাব একটু টানিয়া বোনা বা ফেনাইয়া তোলা হইয়াছে। এ সব ত্রুটি; কিন্তু অতি সামান্য ত্রুটি। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় এ খুঁতগুলিও থাকা-উচিত ছিল না।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিশক্তির উন্মেষ ... দেখিয়া

আনন্দিত হইয়াছি। এই সুন্দর সরস গল্পগীতির পুস্তকের আদর পাঠকসমাজে হইবে আশা করি।

ছড়া— শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক কে, ভি, এণ্ড ব্রাদার্স, ব্লকনির্ম্মাতা। বিক্রয়ের এজেণ্ট আশুতোষ লাইব্রেরী, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই বইখানি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার পড়ার বই। সুন্দর লেখা। কচি ছেলেদের নিত্যকার জীবনযাত্রার একটি বর্ণনা ... দের সহিত মিশাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পদ্যগুলি প্রায়ই খুব সংক্ষিপ্ত এবং বস্তুত ছন্দে গ্রথিত; সুতরাং ইহা মুখস্থ করিয়া ফেলিবার খুব উপযোগী। রচনার মধ্যে কবিত্বেরও অভাব ...

"খোকন হাসে খিল খিল গালভরা হাসি—
ছড়িয়ে পড়ে ক্ষীর-সাগরের মুক্তা রাশি রাশি।"

অথবা

দে দোল দে দোল।
... দোলে রে ননীর দেহ নিরেট নিটোল।
... মেঘের পায় পরীদের পুরী
... দোলনা আয় সেই দেশ ঘুরি'
... দোলে নেমে আয় পেতে লই কোল।
দে দোল দে দোল।

... এমন সরস মধুর তেমনি কবিত্বময় হইয়াছে। ... আজকাল যেমন ছন্দের জবাই হয়, এথ নিতে তেমন ... বেচারা আস্ত আছে; দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত ও হইয়াছি।

... কবিতায় খোকাকে "দুঃখকে তুই করবি হেলা" বলিয়া ... হইয়াছে; কোনো কবিতায় প্রসিদ্ধ বীরদিগের নামের ... তাহাদের তুল্য কীর্ত্তিমান হইতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে— ... প্রচ্ছন্ন ভাবে ছেলেদের মনে ইতিহাসের বীজ রোপণ ... ফিরিঙ্গি-বেশে সজ্জিত ব্যাং সাহেবকে উদ্দেশ করিয়া ... করিয়া কবি বলিতেছেন—

"কোন্ বাড়ীর ছ... কোণে ছিলে দিনেক দুই ?
কোন্ দেশের সকড়ি মেখে সাজলে বহুরূপী।"

এই-সমস্ত উপদেশের ব্যঙ্গের তলে একটি প্রচ্ছন্ন বেদনার করুণ রস মনের মধ্যে বেশ সহজেই ধরা পড়ে।

বইখানি পড়িলেই বুঝা যায় ইহা পূর্ব্ববঙ্গের লোকের লেখা যেখানে চন্দ্রবিন্দু থাকা উচিত সেখানে তাহার অভাব, দুই একটা প্রাদেশিক বাক্যরীতি, তাহার পরিচয় দেয়। পশ্চিম বঙ্গের বাক্যরীতি পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ব্বোধ্য এবং হয়ত হাস্যোদ্দীপক; এবং পূর্ব্ববঙ্গের বাক্যরীতি পশ্চিমবঙ্গের লোকের কাছে তেমনি অদ্ভুত মনে হওয়ার কথা। অতএব সমস্যা কাহাকে কে অনুসরণ করিবে? আমাদের মনে হয়, পশ্চিম বঙ্গের বাক্যরীতিই সাহিত্যের মান (standard) হইয়া গিয়াছে, তাহাই পালন করা উচিত। দ্বিতীয়ত, যাহা শ্রুতিকটু ও কুৎসিত-ধ্বন্যাত্মক শব্দ তাহা যে-প্রদেশেরই হোক সাহিত্যের বর্জ্জনীয়।

"হা করেছে কে খেতে দুধ এক চুমুকে হোৎ হোৎ?
—একখানি মুখ এই যে দেখি—টগ্‌রোৎ—টগ্‌রোৎ।"

পাঠ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের শিশু হয়ত যথার্থ কথিত বাক্যের ভাবরস হৃদয়ঙ্গম করিয়া আনন্দিত হইবে, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের কোনো শিশু কিছু ত বুঝিবে না, অধিকন্তু অদ্ভুত ধ্বনি শুনিয়া হাস্যসম্বরণ করিতে পারিবে না। সুখের বিষয় এরূপ প্রাদেশিকতা আর বেশি নাই। বরফের পুতুলগড়াটা একেবারে বিদেশী জিনিস; এ বইয়ে ব্যাপারটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে।

বইখানির রচনা-পারিপাট্যের সহিত মুদ্রণপারিপাট্য সংযুক্ত হওয়াতে ইহা শিশুদের মনোরঞ্জন ও নয়নরঞ্জন উভয়ই করিবে। প্রত্যেক পাতা বহু বিচিত্র নকসায় ছাপিয়া তাহার মধ্যে অন্য রঙে লেখা ছাপা। প্রত্যেক লেখার সামনে সামনে সেই বিষয়ের ছবি বহু বর্ণে মুদ্রিত; পাতায় পাতায় রং একেবারে ঢালা। চিত্রগুলির মধ্যে বিশেষত্ব সৌন্দর্য্য খুব বেশি না থাকিলেও রঙের বাহারে মানাইয়া গিয়াছে। নীমার-বাড়ীর বড় ছবিখানির নকসাটি মন্দ হয় নাই। লোকগুলির মুখ প্রায়ই এক রকমের।

এমন সুন্দর সুদৃশ্য বইখানির দাম মাত্র ছয় আনা। ইহা দর্শন মাত্রেই পাইবার জন্য শিশুরা উৎসুক হইবে, এবং পাইলে আনন্দিত হইবে নিশ্চয়।

ভারতীয় সাধক—শ্রীশরৎকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ৬৮ পৃষ্ঠা, পট্টবদ্ধ, মূল্য বারো আনা।

ইহাতে বুদ্ধ, রামানন্দ, নানক, কবীর, রবিদাস ও রামমোহন এই ছয়জন সাধকের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ধর্ম্মজগতের কার্য্যকলাপ, উপদেশবাণী প্রভৃতি অতি দক্ষতার সহিত স্বচ্ছ সাধু ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ৪ খানি চিত্র—বুদ্ধ, নানক, কবীর, রামমোহন সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা যুবক ছাত্র ও বয়স্ক ব্যক্তি সকলের নিকট সমাদৃত হইবার যোগ্য।

পাথার—শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ১৩৫ পৃষ্ঠা, পট্টবদ্ধ, ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট, মূল্য এক টাকা।

এই গ্রন্থে সমুদ্রকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত অনেকগুলি কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। মুদ্রারাক্ষস।

জীবনীশক্তি—(স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘজীবন লাভ বিষয়ক কয়েকটি কথা।) শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

লেখক মহাশয় একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। তিনি লিখিতেছেন "বয়সের কথা বলিলে, আমি পঞ্চাশের অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছি।.... কিরূপে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারা যায়, কিরূপে শরীর রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে, কিরূপে সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তৎসমস্ত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যাইবে।" তিনি নিজের অভিজ্ঞতা এবং অন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের অভিজ্ঞতা মিলিত করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে অনেক সদুপদেশ পাওয়া যায়। পুস্তকের ভাষা বেশ সহজ। যাঁহারা স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন চান, তাঁহারা এই পুস্তক পড়িলে অভীষ্ট লাভে সাহায্য পাইবেন।

অকল্পিতা—শ্রীহেমলতা দেবী প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস। মূল্য আট আনা। এণ্টিক কাগজে ছাপা ৮৮ পৃষ্ঠা। এই অনাড়ম্বর কবিতা-পুস্তকখানিতে কবির অন্তরের সাত্ত্বিক মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি পুস্তকখানিকে "নিরলঙ্কার নিরাভরণা" বলিয়াছেন; কিন্তু আন্তরিক সৌন্দর্য্য বাহ্য সাজগোজের অভাব সত্ত্বেও অনেক কবিতাকে সুন্দর করিয়াছে। ভাববিলাসিতার জন্য যাঁহারা কবিতা পড়েন না, উচ্চতর আনন্দ-লোকে যাইতে চান, তাঁহারা ইহার অনেকগুলি কবিতা পড়িয়া তৃপ্তি পাইবেন।

আগুনের ফুল্কি—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্। মূল্য এক টাকা। এণ্টিক কাগজে ছাপা। ২৪৮ পৃষ্ঠা।

এই উপন্যাসখানি প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক প্রস্পার মেরিমে লিখিত কলোঁবা নামক উপন্যাসের মূল ফরাসী হইতে অনুবাদিত। ইহা ১৩২০ সালের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। যাঁহারা ইহা পড়িয়া আনন্দ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা ইহা পুস্তকাকারে রাখিতে ইচ্ছা করিবেন। যাঁহারা পড়েন নাই, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে—সুযোগ উপস্থিত।

রবিন্ হুড—শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত। সিটিবুক সোসাইটী, কলিকাতা। মূল্য ॥৵০ আনা। ২০০ পৃষ্ঠা। মলাটে একটি রঙীন ছবি আছে। তদ্ভিন্ন ভিতরে ১ খানি রঙীন ও ৮ খানি এক রঙের ছবি আছে।

আমাদের দেশে যেমন বিশে বাগ্দী ও তাঁতিয়া ভীল প্রভৃতি ডাকাতের অদ্ভুত সাহস, প্রবল অত্যাচারীর দর্পহরণ এবং গরীবের প্রতি দয়ার অনেক গল্প আছে, বিলাতে তেমনি রবিন্ হুডের সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প চলিত আছে। তাহার সম্বন্ধে অনেক বহিও আছে। প্রসঙ্গতঃ অন্য বহিতেও রবিন্ হুডের কাহিনী আছে; যেমন স্কটের আইভ্যান হো উপন্যাসে। লেখক এই বহি ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিয়াছেন। রবিন হুডের গল্প এমন কৌতূহলোদ্দীপক যে বাঙ্গালায় তাহা বাহির হইয়াছে দেখিয়াই মনে হইয়াছিল, যে, ছেলেরা ইহা খুব আগ্রহের সহিত পড়িবে। এই অনুমান যে ঠিক্, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। প্রাপ্তবয়স্কেরও ইহা ভাল লাগিয়াছে। ইহার ভাষা বেশ সোজা। তবে, ইহা যে ইংরেজীর অনুবাদ তাহা সর্ব্বত্র বেমালুম চাপা পড়ে নাই। যাহা হউক, তাহাতে গল্প উপভোগে কোন ব্যাঘাত হইবে না, এবং এই দোষ দ্বিতীয় সংস্করণে সহজে শুধরান যাইবে।

বসন্ত-প্রয়াণ—শ্রীসরযূবালা দাসগুপ্তা প্রণীত। (শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।) শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কাপড়ে বাঁধা। ভূমিকা ২৪ পৃষ্ঠা, মূল পুস্তক ১৭৫ পৃষ্ঠা।

আমরা গতমাসের প্রবাসীতে বিবিধপ্রসঙ্গে (৪৯৬ পৃঃ) এই পুস্তকের বিষয়ই লিখিয়াছিলাম। লিখিয়াছিলাম যে ম্যাক্‌মিলান কোম্পানী নিজব্যয়ে ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিতেছেন। ফরাসী অনুবাদও হইতেছে।

রবিবাবু ভূমিকায় লিখিতেছেন :—

"পাঠকের কাছে এই গ্রন্থখানির পরিচয় করাইবার ভার আমার উপর পড়িয়াছে। আমি এমন ভার লইতে ভয় করি। কারণ আমি জানি কর্ম্ম হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এ কাজটি করিলেই ইহার অনুরূপ কাজের জন্য অত্যন্ত অনুরোধ সহিতে হইবে। আমার বয়সে নিত্য প্রয়োজনের পক্ষেই শক্তির টানাটানি ঘটে, এই জন্য কাজ যাহাতে না বাড়ে সে জন্য সাবধান হইতেই হয়।

"কিন্তু সাবধানী মানুষের সঙ্কল্প স্থির থাকে না এমন ঘটনাও ঘটে। বইখানি পড়িয়া আমারও সেই দশা হইয়াছে। যখন ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিবার অনুরোধ পাইলাম, তখন ভাবী বিপদের আশঙ্কা ভুলিয়া গিয়াও সম্মত হইতে দ্বিধা করিলাম না।

"পৃথিবীর অধিকাংশ লেখকই ক্রমে ক্রমে আপনার পরিচয় আপনিই দিয়া থাকেন। তাঁহাদের রচনা অল্পে অল্পে অঙ্কুর হইতে ফুটিয়া ক্রমে ক্রমে শাখাপল্লবে সম্পূর্ণ রূপ ধারণ করে—ইতিমধ্যে পাঠকেরা রহিয়া বসিয়া তাঁহাদিগকে চিনিয়া লইবার অবকাশ পায়। এই জন্য অল্প বয়সের কোনো লেখকের প্রথম রচনা দেখিবার যখন অনুরোধ পাওয়া যায়, তখন তাহা পড়িতে ভয় করি। জানি, এরূপ লেখা কাঁচা হইবারই কথা। কারণ, যদি কেহ গুণী বিধাতাদত্ত বীণা লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, [illegible] বাঁধিতে এবং তাহাকে আয়ত্ত করিয়া লইতে, অভ্যাস [illegible] হয়। যতক্ষণ তাহা না [illegible] তাঁহার [illegible] থাকে। কেননা বাহিরের [illegible] প্রকাশমাত্র করে তাহা নহে, [illegible]

"খাতাখানি হাতে লই[illegible] মেয়েলি ছাঁদের। জানি না তাঁহার [illegible] অধিকাংশ মেয়ের হাতের অক্ষরের ছাঁদ কেন যে [illegible] রকমের হইবে, তাহা ত বুঝিতে [illegible] থাক, তাহার ফলে এই হয়, মেয়ের [illegible] প্রথমেই ধারণা হয়, ইহার মধ্যে অসা[illegible] যিনি লিখিতেছেন, নিজের ছাঁদে জোর করিয়া চলিবার সা[illegible] নাই। দস্তর মানিয়া, দশের মুখ চাহিয়া, অন্তঃপুরের গ[illegible] কতকগুলি প্রচলিত কথাকে মেয়েলি পো[illegible] অত্যন্ত জড়সড় ভালমানুষ করিয়া বসানে[illegible] ভুবনের নহে, ইহারা ঘরের কোণের সামগ্রী মাত্র।

"মনে সেই আশঙ্কা করিয়াই পড়িতে সুরু করিয়াছিলাম, পাড়[illegible] পড়িতে মন নম্র হইয়া আসিল। বিচারকের [illegible] নামিয়া বসিতে হইল। ক্রমেই আর সন্দেহ র[illegible] নূতন সৃষ্টি বটে। এ ত একেবারেই শেখা ক[illegible] একটা পেন্সিল হাতে করিয়া বসিয়াছিলাম, ভাবিয়াছি[illegible] ভাষা বা ভাব কাঁচা আছে দাগ দিব, কিম্বা কিছু কিছু [illegible] পেন্সিল রাখিয়া দিলাম—কোথাও কিছু দাগ দিই নাই।

"এই রচনার মধ্যে কোথাও যে কিছু বদল [illegible] এমনতর কথা নয়। কিন্তু সে দিকে [illegible] রাখিবার উৎসাহ রহিল না।......

"...এই 'বসন্ত-প্রয়াণ' একেবা[illegible] পাইয়াছে। আমাদের সাহিত্যে কি[illegible] কোনো বইয়ের সঙ্গে ইহাকে শ্রেণীবদ্ধ ক[illegible]

"অথচ ইহাকে খাপছাড়া রকমের নূতন বলিলে ঠিক বলা হইবে না। কারণ, কেবল ত ইহা ভাবের বিকাশ নহে, দেখিতেছি ইহার মধ্যে চিন্তার প্রণালীও আছে। সে চিন্তা অশিক্ষিত চিন্তা নহে। আমাদের দেশের রসশাস্ত্রের ভাষা ও তাহার ছাঁদ লেখিকার বেশ জানা আছে। ইহাতে বোঝা যায় তাঁহার মনের মধ্যে শিক্ষার সঞ্চয় ও চিন্তার শক্তি ছিল। সেইটি হৃদয়ের গভীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়া জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া বিচিত্ররূপে দেখা দিয়াছে;—শোকের সঙ্ঘাতে ভিতরের কথা বাহিরে প্রকাশ করিবার একটি আকস্মিক বেদনা লেখিকার চিত্তে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই-সকল কারণে এই রচনাটি সাহিত্যে বড় অপূর্ব্ব হইয়াছে। ইহা লেখিকার নবীন সৃষ্টি, অথচ ইহার মধ্যে প্রবীণতা আছে। ইহা তাজা, অথচ ইহা কাঁচা নহে। সমুদ্র মন্থনে অপ্সরী যেমন একেবারেই পূর্ণ যৌবনে প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি শোকে লেখিকার হৃদয় মথিত করিয়া এমন একটি পূর্ণাবয়ব রচনা প্রকাশিত হইল যাহা তাঁহার জাগ্রত চৈতন্যের তলদেশের অব্যক্ত লোকে সকলের অগোচরে পরিপুষ্ট হইতেছিল।

"এ লেখাটি যদি বিশুদ্ধ তত্ত্বালোচনা হইত, তবে ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া শ্রেণীবিভক্ত করিয়া দিলে, ইহ[illegible] পূর্ব্বক [illegible] স্পষ্ট হইয়া

নইত। কিন্তু যাহা জীবনের অভিজ্ঞতার নিগূঢ়রূপে পাওয়া ...ময় হইয়া উঠিয়াছে, ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাহার উপাদানগুলি ...তে গেলে তাঁহার আসল জিনিষটিই, তাহার প্রাণটিই ... আমার কাছে এইরূপ রচনায় প্রাণময় সত্তাটিই ...

অনাথের :—মানুষের মর্মান্তিক একটি বোধশক্তি বেদনায় ... বিশ্বে ও বিশ্ব হইতে বিশ্বাতীতে ... বইখানি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লিখিতেছে। উহাই এই লেখার ... কচি ছেলেদের নিত্যকার ... সম্পাদক।

... সহিত মিশাইয়া দিবার চেষ্টা ... প্রণীত ও প্রকাশিত, পশ্চিম- ... খুব সং... মূল্য আট আনা। ৬৯ পৃষ্ঠা। ... কেলিবার ... অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

... মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ...

... শ্রীপুলিনবিহারী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ... পৃষ্ঠা। এণ্টিক কাগজে পাইকা হরপে পরিষ্কার ... ছাপা। মূল্য আট আনা।

... ওমর খায়ামের চতুষ্পদী শ্লোকের ১০১ টির ... ইংরেজ কবি ফিটজেরাল্ডের প্রদর্শিত ... করিয়া কবিতাগুলি অনুবাদিত হইয়াছে। ... ভূমিকায় মানিয়া লইয়াছেন—"আমি কবি নহি......সেইজন্য ... ত্রুটী ওয়াই সম্ভব।" কিন্তু তথাপি এই অনু- ... ত্রুটী অধিক নাই ; এবং রচনা একটু আড়ষ্ট ... রস নহে।

... —শ্রীহরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক ... কোম্পানী। ৭২ পৃষ্ঠা, এণ্টিক কাগজে পাইকা ... ছাপা। মূল্য আট আনা।

... আরম্ভ করিয়াছেন এই বলিয়া যে—"যাহা নাই ... নাই জগতে" এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ... ভাবে ছেলেদেয়াছেন। কিন্তু এই সন্দর্ভগুলিতে ... ফিরিঙ্গি-বেশে সজ্জিত হইয়া পাঠ করিলে চিন্তা উদ্বোধিত ... করিয়া কলি বলি ... মুদ্রারাক্ষস।

পুস্তক-প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমরা এ পর্য্যন্ত সমালোচনার জন্য পাইয়াছি, কিন্তু এখনো পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। কোনো কোনো পুস্তক বৎসরাধিক কাল সমালোচনা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। সে-সব পুস্তকের লেখক লেখিকা ও প্রকাশকদের নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ; তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করিবেন, অনবসরই এই ত্রুটির একমাত্র কারণ। আমরা ক্রমশঃ ইহাদের পরিচয় পাঠকদিগকে জানাইতে থাকিব।—

১। কেদার রায়—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
২। বৈদ্য জাতির ইতিহাস—শ্রীবসন্তকুমার সেনগুপ্ত, বি,এল
৩। কৃতবোধ—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বসু
৪। মল্লিকা—শ্রীমতী চারুবালা দেবী
৫। পরিণীতা—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬। পরিণাম—শ্রীমতী সরলাবালা দেবী
৭। রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়—শ্রীহরিচরণ বন্ধু
৮। ... প্রকাশক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়।
৯। দেবব্রত—শ্রীকালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১০। সতীত্বসরোজ—
১১। আয়ুর্ব্বেদোক্ত শস্ত্র নির্ম্মাণ—শ্রী...ননন নিয়োগী
১২। আত্মিক-তত্ত্ব—শ্রীদীনবন্ধু মিত্র
১৩। রহস্যভেদ—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ
১৪। আর্য্যদের জীবন—লেখক: জে, এম্, বি, ডনক্যান্ এম্-এ।
১৫। মধু-পা—স্বর্গীয় কুঞ্জলাল গুপ্ত
১৬। Social Problem—Maharaj-Kumar Sailej Krishna Deb
১৭। জাতিভেদ—শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
১৮। ধ্যানলোক—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত
১৯। তপোবন—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত
২০। মূর্চ্ছনা—শ্রীঋষিকেশ মল্লিক
২১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
২২। শ্রীচৈতন্য ভাগবত—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
২৩। শ্রীঅমরেন্দ্র—শ্রীমতী কুমুদিনী বসু
২৪। পোষ্যপুত্র—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী
২৫। শোভা—শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস
২৬। মহত্তাক—শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ
২৭। উদয় সিংহ—শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৮। স্বাধীন-সন্ধান—শ্রীউপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
২৯। হোমিওপ্যাথিক মতে গৃহচিকিৎসা—প্রকাশক, এম্, চৌধুরী এণ্ড কোং
৩০। পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব—শ্রীবিনোদবিহারী রায়
৩১। ভীষ্ম—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি,এল,
৩২। সাবিত্রী—শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন
৩৩। স্বর্গে ও মর্ত্তে— ঐ
৩৪। কপালকুণ্ডলা—শ্রীভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ
৩৫। আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা—শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত
৩৬। ব্যাকরণ-বিভীষিকা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
৩৭। আনোয়ারা—শ্রীমোহাম্মদ নজিবর রহমান
৩৮। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

চিত্রপরিচয়

মুখপাতের ছবিখানি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর অ... বাউলের ছবি।

য়ুরোপের 'নাইট' হইয়া অস্ত্র ধরিবার অধিকার লা... জন্য সংযতভাবে অভিষেকের পূর্ব্বরাত্রে জাগিয়া প্রহরা দিতে ও অস্ত্র ধ্যান করিতে হইত। সেই প্র... "অস্ত্রসাধনা" নামক চিত্রখানিতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

পূজার ছুটি উপলক্ষে প্রবাসী-কার্য্যালয় ১০ আ... ২৭ সেপ্টেম্বর হইতে ২৪ আশ্বিন ১১ অক্টোবর পর্য্যন্ত ... থাকিবে। এই বন্ধের কয়দিন কোনো কার্য্য হই... পারিবে না।

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।